কলিকাতার পঙ্কিল রাজনৈতিক আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। সুখের বিষয়, কলিকাতার বাহিরে তাহার প্রভাব বিশেষ কিছু হয় নাই। বরঞ্চ কলিকাতার গণ্ডীর বাহিরের লোকের মধ্যে, অর্থাৎ প্রকৃত ... , লোকের মন কিছু উন্নত হওয়ার আভাষ পাওয়া গিয়াছে। লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, রাজধানীর বিষাক্ত আবহাওয়া যাহাতে মফস্বলের গ্রাম ও নগরাঞ্চল দূষিত না করে।

পশ্চিমবাংলার অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার গত বৎসর পরিপূর্ণরূপে ভরিয়াছিল। আগামী বৎসরে যদি তাহার কাছাকাছিও হয় তবে এদেশের সর্ব্বপ্রধান সমস্যার পূরণ আগাইয়া আসিবে। গত বৎসরের পর্য্যাপ্ত ফসলের মধ্যে প্রকৃতির দান ও কৃপা অনেক এবং সরকারী বিভাগের কৃতিত্বও কিছু আছে। আগামী বৎসরে দেশের লোক যদি চেষ্টিত হয় তবে বিশেষ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় না ঘটিলে দেশ সুফলা হইবেই।

এ দেশের প্রধান সমস্যা অন্নবস্ত্রের। তাহার সমাধানে দেশবাসীর অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। কেবল অনুযোগ, কেবল দারিদ্র্য-জ্ঞাপন ইহা সুস্থমনের পরিচায়ক নয়। বলিষ্ঠ মনোভাব লইয়া সমস্যার সম্মুখীন হইলে অসম্ভবও সম্ভব হয়।

পশ্চিম বাংলার সীমান্তের পরপারে পূর্ব্ব পাকিস্থানে সম্প্রতি নির্ব্বাচনের যে ফলাফল দেখা গিয়াছে, তাহাতে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইয়াছে। আমরা যদিও ভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসী, তবুও মাতৃভাষার এই মানরক্ষার কারণে আমরা আনন্দিত। যাঁহারা বঙ্গভাষার সম্মান এইরূপে বর্দ্ধিত করিয়াছেন তাঁহাদের আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

আমাদের উচিত পূর্ব্ববঙ্গবাসীর এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা। আজ একদল অজ্ঞ লোকের এই ধারণা হইয়াছে যে, হিন্দী রাষ্ট্রভাষায় পরিণত হওয়ায় যাহাদের মাতৃভাষা হিন্দী তাহারা দেশের লোকের মধ্যে উচ্চতম পর্য্যায়ে আছে এবং সেই কারণে অন্য ভাষাভাষীরা হেয়। পূর্ব্ববঙ্গে উর্দ্দুর ব্যাপারে অনুরূপ মনোবৃত্তি প্রকাশ পায় এবং তাহার প্রতিক্রিয়ায় মোস্লেম লীগ ধরাশায়ী হইয়াছে। আমরা উচিত পথ অবলম্বন করিলে ঐ ভাবেই জয়যুক্ত হইতে পারি।

বাংলা ভাষা ভারতের সকল ভাষা অপেক্ষা সাহিত্যে ও অলঙ্কারে সমৃদ্ধ। আজ বাংলার দুর্দ্দিন, তাই অন্য সকল ব্যাপারের ন্যায় বাংলা ভাষাও দারিদ্র্য এবং অবহেলা-প্রপীড়িত। যদি আমরা সজাগ না থাকি তবে আমরা আমাদের এই অমূল্য জন্মস্বত্ব হইতেও বঞ্চিত হইব। মানভূমে বাঙালীর উপর যে অত্যাচার চলিতেছে তাহাতে যদি আমাদের মন বিচলিত না হয়, তবে বুঝিতে হইবে বাঙালীর আর মনুষ্যপদবাচ্য হইবার যোগ্যতা নাই।

মানভূমে বাংলা ভাষা ও বাঙালীর সংহতি ও সংস্কৃতি লইয়া যাঁহারা সত্যাগ্রহ করিতেছেন, তাঁহারা প্রত্যেক বাঙালীর শ্রদ্ধাভাজন। যদি আমাদের আত্মসম্মানজ্ঞান থাকে, রক্তের টান থাকে ও বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনও চেতনা থাকে তবে এখনই আমাদের সক্রিয়ভাবে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের প্রতিরোধে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

মানভূমে বাংলা ভাষা দলন

মানভূমে বিহার-সরকারের দুর্নীতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ভাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে গিয়াছে:

"৪ঠা এপ্রিল—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নিকট প্রদত্ত এক স্মারকলিপিতে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির ... শ্রীঅতুল্য ঘোষ মানভূম ও বিহারের অন্যান্য বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলে ... ভাষা দমনের ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হইতেছে তাহার প্রতি ... কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের নির্দ্দেশ সত্ত্বেও বিহার সরকার মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন।

শ্রীঘোষ বিহার সরকারের দমননীতির প্রতিও ওয়ার্কিং কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। 'টুসু' সঙ্গীত সম্পর্কে ধৃত ব্যক্তিদের প্রতি, বিশেষ করিয়া লোকসেবক সঙ্ঘের সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান নেতা শ্রীঅতুল ঘোষ, শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দেবী ও লোকসভার সদস্য শ্রীভজহরি মাহাতোর প্রতি যে অমানুষিক আচরণ করা হইয়াছে, শ্রীঘোষ তাহার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীমাহাতোকে হাতকড়া দিয়া ও কোমরে দড়ি বাঁধিয়া আদালতে ... লইয়া যাওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতি তাঁহার স্মারকলিপিতে ... ছেন যে, সমস্ত বিদ্যায়তনে হিন্দীকে শিক্ষার একমাত্র মাধ্যমরূপে প্রবর্ত্তন করিয়া বিহার সরকার আদেশ দেওয়াতেই গোলযোগের সূচনা হয়। পুরুলিয়া ও মানভূম জেলার অন্যান্য স্থানে বহু পুরাতন কয়েকটি স্কুলে (যথা—ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন, ঝালদা এইচ. ই. স্কুল, মানবাজার এইচ. ই. স্কুল প্রভৃতি) শতকরা ৯০ জনেরও অধিক ছাত্র বাংলাভাষাভাষী। এইগুলি ছাড়াও আরও বহু স্কুল রহিয়াছে যেখানে অধিকাংশ ছাত্রই বাংলাভাষাভাষী। বিহার সরকারের এই আদেশ স্থানীয় লোকদের বহু অসুবিধার সৃষ্টি করে। ... লোকসেবক সঙ্ঘের সংগঠকেরা তখন (বিহার সরকারের ঐ নির্দ্দেশ দানের সময়ে) মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। শ্রীঅতুল ঘোষ ও শ্রীবিভূতি দাশগুপ্ত যথাক্রমে ... কংগ্রেসের সভাপতি ও জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁহারা এই বিষয় সম্পর্কে কংগ্রেস সভাপতি, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দ ও কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারীদের সহিত সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ওয়ার্কিং কমিটি বা অপর কাহারও পক্ষে এ বিষয়ে কিছুই করা সম্ভব হয় না।

আমি জানিতে পারিয়াছি যে, ভারত সরকারের শিক্ষা-দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রীহুমায়ুন কবীর পুণায় অনুষ্ঠিত ভাষা সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সরকারের বারংবার প্রদত্ত নির্দ্দেশ সত্ত্বেও বিহার সরকার নিম্নশ্রেণী-

গুলিতে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রবর্তন না করায় দুঃখ প্রকাশ করেন। এই সমস্ত স্কুলের সমস্ত শ্রেণীতে চিরদিনই বাংলায় শিক্ষাদান করা হইত। বিহার-সরকারের হস্তক্ষেপের পর হইতে উচ্চশ্রেণী ত দূরের কথা, নিম্নশ্রেণীর ছাত্রেরাও মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ইহার পরেও যে সব স্কুলে বাংলাভাষায় শিক্ষাদান করা হয়, সে সব স্কুলকে সরকারী সাহায্যদান শেষ পর্যন্ত বন্ধ করিয়া [illegible]। এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই বিহার সরকারের উপরোক্ত আদেশের তাৎপর্য্য বিচার করিয়া [illegible]তে হইবে।"

বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ

গোলাপবাগ (বর্দ্ধমান) ১০ই এপ্রিল—এখানে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়া বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বিরোধের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বিহার কতখানি জমি পাইবে, আর পশ্চিমবঙ্গ কতখানি জমি পাইবে তাহা বড় কথা নহে, বিহারের বঙ্গভাষীদের সহিত বিহার সরকারের মনের সংযোগ কতখানি আছে তাহাই [illegible] প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

ডাঃ রায় অতঃপর ভাষাসমস্যা সম্পর্কে মন্তব্য করিতে যাইয়া পূর্ববঙ্গের সরকার পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই সমস্যা আজ জনসাধারণকে বুঝিতে হইবে। ভাষার মধ্য দিয়া আমরা আমাদের অনুভূতি, শিক্ষাদীক্ষা প্রকাশ করিয়া থাকি। যদি কোন সরকার মনে করেন, জনসাধারণের ভাষা না বুঝিয়াই শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভব তবে সেই সরকার অত্যন্ত ভুল করিবেন। কারণ জনসাধারণের সহযোগিতা পাইবার জন্য যাহা [illegible] প্রয়োজন তাহা হইতেছে জনসাধারণের মনের ভাষা বুঝা। তিনি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন, যে সরকার জনসাধারণের মনের ভাষা বোঝেন না, সেই সরকার যত দক্ষ হউন না কেন, তাহার পক্ষে হিতব্রতী রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব নহে।

কংগ্রেস হিতব্রতী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ডাঃ রায় ভাষা সম্পর্কে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যে বিসম্বাদ চলিতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া আরও বলেন যে, [illegible] কোন সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার প্রশ্ন নহে। মনের মিল না [illegible] বিহার ও অন্য কোন রাষ্ট্রের শাসনকর্তা যত বড় ব্যক্তি হউন না কেন, তাঁহাদের পক্ষে কংগ্রেসের আদর্শ সার্থক করা সম্ভব নহে।"

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাবলী

গোলাপবাগ (বর্দ্ধমান) ১০ই এপ্রিল—অদ্য এখানে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সম্মেলনে সভাপতিরূপে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব বলেন যে, মাথা গুঁজিবার স্থানের সমস্যা আজ বাঙালীর একটি বড় সমস্যা। তিনি মনে করেন যে, নবনিযুক্ত [illegible] পুনর্গঠন কমিশনকে এই সমস্যার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে।

কতকগুলি আন্তঃপ্রাদেশিক বিরোধের ক্ষেত্রে যে [illegible] অবলম্বন করা হইতেছে কোন সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই তাহা সমর্থন করিতে পারে না বলিয়া মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে, ভাষা বা সীমানা সংক্রান্ত সকল বিরোধই পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা মিটাইয়া লওয়া উচিত।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব বলেন, তিনি মনে করেন পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা জরুরী সমস্যাগুলি হইল স্থানাভাব, বেকার ও বাস্তুহারা সমস্যা। পূর্ব্বে সমগ্র উত্তর ও পূর্ব্ব ভারতে বাঙালীর জীবিকার ক্ষেত্র, বিশেষ করিয়া যে সকল কাজে মস্তিষ্ক চর্চ্চার প্রয়োজন হয়, সেই সকল ক্ষেত্র উন্মুক্ত ছিল। অন্যান্য রাজ্যগুলির ইতিমধ্যে অগ্রগতি হওয়ায় কেবল যে সেগুলিতে বাঙালীর দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে তাহা নহে, বাংলা দেশই খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। সত্যসত্যই বাঙালীর বর্ত্তমান সমস্যা হইল—মাথা গুঁজিবার স্থানের সমস্যা।

তিনি মনে করেন যে, রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনকে স্থানাভাবের সমস্যা ভালভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। ভাষা বা সীমানা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যে বিরোধ হয়, তাহা আলাপ-আলোচনার দ্বারা আপোষে তাহার মীমাংসা করিয়া ফেলা উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই বিষয়ে এমন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হইতেছে, যাহা সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন কোন মানুষই সমর্থন করিতে পারে না।

শ্রীমহতাব বলেন, "আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আছে যে, বাংলা ও বিহারের মধ্যে যে বিদ্বেষভাবের সৃষ্টি হইয়াছে, উভয় রাজ্যের নেতৃবৃন্দ তাহার অবসান ঘটাইবেন এবং উভয় রাজ্যই পরস্পরের অসুবিধাগুলি যথাসম্ভব সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিবে।"

আমাদেরও এই বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সম্প্রতি মানভূমে বাঙালী দমনে বিহারী অধিকারীবর্গের মনোবৃত্তির যে পরিচয় আমরা পাইতেছি তাহা আশাপ্রদ নহে। সুতরাং অন্য পথের চিন্তা করিতে হইবে।

কংগ্রেসের কর্ত্তব্যপথ

সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনের উদ্বোধন করিতে উঠিয়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেন যে, দীর্ঘ পঞ্চাশ-ষাট বৎসরকাল বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া দেশ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে। আজ দেশের লোকের মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে, স্বাধীনতা লাভের পর সংসদ হিসাবে কংগ্রেসের আর কোন সার্থকতা আছে কি না। মহাত্মা গান্ধী একবার তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই তিনি নিজেই তাঁহার উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন যে, বিদেশী শাসনকালে কংগ্রেসের

প্রোগ্রাম ছিল তাহা অনেকটা নেতিবাচক। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেস এই দেশকে গড়িয়া তোলার কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিবে... এই স্বাধীনতাকে ফলে-ফুলে সার্থক করিয়া তোলার জন্য আজ ...ক রচনাত্মক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইবে। দেশের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও অন্যান্য জাতীয় সমস্যা সমাধানে কংগ্রেস উদ্যোগী হইবে এবং এই প্রতিষ্ঠান নিশ্চিতভাবে তাহা সম্পূর্ণ করিবে। ইহা গরিমার কথা নহে, ইহা হইতেছে কংগ্রেসের পূর্ব্ব ঐতিহ্য স্মরণ করার কথা এবং কংগ্রেস সেবকের আত্মবিশ্বাসের কথা।

স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেস সরকার যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, ডাঃ রায় তাহার উল্লেখ করেন এবং বলেন, তবু দেশে এমন সমালোচকও বিরল নয় যাঁহারা বলেন যে, এই কয়েক বৎসরে দেশে কোন উন্নতিই হয় নাই; বরং দেশের অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে। এ বিষয়ে যদি আমরা সোভিয়েট রাশিয়া, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা অন্যান্য রাষ্ট্রের কথা তুলনা করি, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব—কংগ্রেস এই কয়েক বৎসরে কি কাজ করিতে পারিয়াছে। যে কোন দেশেরই বিচার করুন না কেন, আমরা দেখিব যে, বহু দেশই স্বাধীনতা লাভের দশ বৎসর পরেও সংবিধান রচনা করিতে পারে নাই।

ডাঃ রায় বলেন, স্বাধীনতা লাভের কয় বৎসরের মধ্যে কংগ্রেস দেশের সংবিধান রচনা করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, দেশের প্রত্যেকটি বয়স্ক নর-নারীকে ভোট দানের অধিকার দিয়াছে। বহু সমালোচক বলিয়াছিলেন, সংবিধানে বয়স্কদের ভোটদানের অধিকার দিলেও কোনদিন তাহা কার্য্যকরী হইবে না। কিন্তু তাহা সম্ভব হইল। অবশ্য দেশের দারিদ্র্য, অশিক্ষা ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রামের দায়িত্ব জনসাধারণ কংগ্রেস সরকারের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। ফলে কংগ্রেস সরকারের দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইংরেজের আমলে কিছু কিছু রাস্তার সংস্কার, হাসপাতালের উদ্বোধন হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার পশ্চাতে কোন পরিকল্পনা ছিল না। বর্ত্তমান জাতীয় সরকার দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য হিতব্রতী রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠাই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা সম্পর্কে অনেক সমালোচনা হইতে পারে। কিন্তু কংগ্রেসসেবীরা যদি ইহা সফল করিবার জন্য আন্তরিকতা প্রদর্শন করিতে পারেন তবে ইহা সাফল্যলাভ করিবে বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে এবং তাহা হইলেই হিতব্রতী রাষ্ট্রের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

পণ্ডিচেরীর ভারতভুক্তি

"নয়াদিল্লী, ১০ই এপ্রিল—ওয়াকেবহাল মহলের এক সংবাদে প্রকাশ যে, ফরাসী ভারতীয় এলাকার ভারতভুক্তির দাবী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ফরাসী সরকার গণভোট গ্রহণের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন ভারত সরকার সরাসরি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং অবিলম্বে পণ্ডিচেরীকে ভারতের হস্তে অর্পণ করার দাবী জানাইয়াছেন। গত রাত্রে ভারতস্থ ফরাসী রাষ্ট্রদূতের হস্তে উপরি-উক্ত মর্ম্মে এক লিপি প্রদান করা হইয়াছে।"

ফরাসী সরকারের ইন্দোচীনে যথেষ্ট শিক্ষা হয় নাই। মুখে "লিবার্ত্তে, এগালিতে, ফ্রাতার্নিতে" (স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃভাব) ও কাজে সাম্রাজ্যবাদের শোষণ নীতির ফলেই ফরাসী জাতির অধঃপতন।

হাইড্রোজেন বোমা

মানুষের বিনাশকালে যে বিপরীত বুদ্ধি হয় তাহার উদাহরণ এই বোমা। উহার বিস্ফোরণের ফল যতই ভয়াবহ মারাত্মক হইতেছে বিস্ফোরণকারী অধিকারিবর্গ যেন ততই অধিক উৎফুল্ল হইতেছেন। এই পরীক্ষার পথ যে কোন্ নরকের দিকে চলিয়াছে তাহা চিন্তা করিবার অবসরও তাঁহাদের নাই।

"ওয়াশিংটন, ৩০শে মার্চ্চ—এক সাংবাদিক বৈঠকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মিঃ চার্লস ই. উইলসন বলেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরে অদ্য বিদীর্ণ হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের ফল 'অভাবনীয়' হইয়াছে।

তিনি বলেন যে, গত শুক্রবার বর্ত্তমান পর্য্যায়ে দ্বিতীয় বার হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ করা হইয়াছে। উহা হইতে বিচ্ছুরিত তেজস্ক্রিয়া বা অন্যবিধ কারণে কেহ আহত হয় নাই।

বোমা বিস্ফোরণের ফলাফল অভাবনীয় হইয়াছে, এই উক্তির ব্যাখ্যা করিতে বলা হইলে মিঃ উইলসন এই মর্ম্মে মন্তব্য করেন যে, আধুনিক সভ্যতার সবকিছুই অভাবনীয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বেতার ও টেলিভিশনের জন্য চিন্তাই করা যাইত না।

মিঃ উইলসনকে হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা, উহার মারাত্মক ধ্বংসক্ষমতা এবং ভবিষ্যতে বোমা বিস্ফোরণ বিলম্বিত বা বন্ধের ব্রিটেন ও জাপানের দাবী সংক্রান্ত বহু প্রশ্ন করা হয়। তিনি এসব বিষয়ে হাঁ না কিছুই বলেন না।"

"লণ্ডন, ৩০শে মার্চ্চ—পার্লামেণ্টে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনষ্টন চার্চ্চিল বিরোধী দলের সদস্যদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, ব্রিটেন স্বীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতা বলে হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের ফলাফল অপরিমেয় হইয়াছে বলার কোন ভিত্তি নাই।

অতঃপর তিনি বলেন যে, আমেরিকার পরীক্ষাকার্য্য বন্ধের কোন ক্ষমতাই ব্রিটেনের নাই। উহা [illegible] করিতে বলা ঠিক বা বিজ্ঞোচিত হইবে না।

তিনি আরও বলেন যে, আমেরিকা কর্ত্তৃক হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষার জ্ঞান ব্রিটেনের সীমাবদ্ধ। তবে যাঁহারা পরীক্ষাকার্য্য চালাইতেছেন, তাঁহারা বোমার বিস্ফোরণ ক্ষমতার সীমা নির্ণয়ে অথবা ফলাফল পূর্ব্ব হইতে গণনা করিতে অক্ষম।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, রাশিয়া যখন অনুরূপ ধরণের পরীক্ষা

চাল, তখন উহা বন্ধ বা বিলম্বিত করার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করি(য়া) কেহ প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে পড়ে না।"

(হা)ইড্রোজেন বোমার এইরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা সভ্যজগৎকে কোথ(ায়) লইয়া যাইতেছে সে সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু অত্যন্ত সময়োচিত ও যথাযথ মন্তব্য করিয়াছেন। উহার ফল যাহাই হউক, ঐরূপ প্রস্তাব জগতের কল্যাণকামী প্রত্যেক মনুষ্যের সমর্থনযোগ্য।

"[illegible] এপ্রিল—হাইড্রোজেন [illegible] পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণে সারা জগৎপূর্ণ ধ্বংসের যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে তাহার নিবারণে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ঐকান্তিকতাপূর্ণ গঠনমূলক প্রস্তাব করিয়াছেন।

প্রতি-হাইড্রোজেন বোমার যে সকল পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ [illegible] সে সম্বন্ধে লোকসভায় এক বিবৃতি দিয়া শ্রীনেহরু [illegible] ধরণের পরীক্ষা বন্ধ হওয়া উচিত ইহাই ভারত-সরকারের [illegible] অভিমত। এই সর্ব্বধ্বংসী মারণাস্ত্র নিষিদ্ধকরণ ও বর্জ্জন [illegible]খের প্রধান শক্তিগুলির মধ্যে পাকাপাকি চুক্তি হওয়ার [illegible] বিলম্বে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য তিনি প্রস্তাব [illegible]

(১) সংশ্লিষ্ট প্রধান পক্ষগুলির মধ্যে পাকাপাকি চুক্তি ব্যতীত [illegible]ণের অস্ত্র উৎপাদন ও মজুত রাখা বন্ধের ব্যবস্থা যদি সম্ভব [illegible]হা হইলেও এই ধরণের বিস্ফোরণ সম্বন্ধে কোন একপ্রকার [illegible]ব চুক্তি সম্পাদন। (২) এই ধরণের অস্ত্রের ধ্বংস সাধনের [illegible]তা [illegible] দূর, এগুলির বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইয়াছে [illegible] হইতে পারে তাহার পূর্ণ বিবরণ সংশ্লিষ্ট প্রধান দেশগুলি [illegible] কর্তৃক সর্ব্বতোভাবে প্রচার। (৩) রাষ্ট্রসঙ্ঘ সাধারণ [illegible] রষ্ট্রীকরণ কমিশনকে এই ধরণের অস্ত্র বর্জ্জন ও নিয়ন্ত্রণের [illegible]বেচনার জন্য যে অনুরোধ করেন, সে সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত [illegible] পর্য্যন্ত কমিশনের সাব-কমিটির ঘরোয়া বৈঠকে অবিলম্বে [illegible] এই বিষয় বিবেচনার ব্যবস্থা। (৪) পৃথিবীর যে [illegible] সরাসরি এই সকল অস্ত্র উৎপাদনের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে, [illegible]লির সাধারণ কর্তৃক এ সম্বন্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন; [illegible] এইরূপ পরীক্ষার পরিণতি চিন্তা করিয়া তাঁহারাও নিরতিশয় [illegible]।

শ্রীনেহরু বলেন, এই সকল ঘটনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং [illegible] ও সম্ভাবিত পরিণাম সব সময় এশিয়ার এবং [illegible]রণের সন্নিকটেই ঘটিয়া থাকে বলিয়া ইহা আমাদের [illegible] চিন্তার বিষয়।

সাম্প্রতি বিস্ফোরণের [illegible] যে সকল জাপানী জেলে ও অন্যান্য [illegible] শারীরিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং জাপানের যে [illegible]অধিবাসীদের বিস্ফোরণের সরাসরি ফলভোগ করিতে এবং খাদ্য-বস্তু সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনায় ভীতিগ্রস্ত হইতে হয় তাহাদের প্র[illegible] শ্রীনেহরু পার্লামেন্টে এবং দেশবাসীর পক্ষ হইতে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীনেহরু আরও বলেন, আমরা শুনিয়াছি যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের এই হাইড্রোজেন বোমা আছে। [illegible] দুই বৎসরের মধ্যে এই দুইটি দেশ পরীক্ষামূলকভাবে যেসব বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে তাহার সংঘাত মানুষ যে সকল মারণা[illegible] জানে সেগুলির অপেক্ষা সকল দিক দিয়াই অধিক [illegible] মার্চ্চ যে বিস্ফোরণ ঘটান হয়, সম্প্রতি আমেরিকা তাহার অপেক্ষা প্রচণ্ড আর একটি বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে এবং আরও কতকগুলি বিস্ফোরণের ব্যবস্থা হইয়া আছে। হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের ভয়াবহ সম্ভাবনা সর্ব্বত্রই জনসাধারণ ও জাতিসমূহের পক্ষে উদ্বেগের বিষয়—তাহারা যুদ্ধে অথবা কোন শক্তিপুঞ্জের সহিত জড়িত হউক বা না হউক।

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ম্যালেনকফ-প্রমুখ বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞ ও বিজ্ঞানীরা যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া নেহরুজী বলেন, এই সকল অস্ত্র ও এইগুলির ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে জগতে যে ব্যাপক ও গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু উদ্বেগই যথেষ্ট নহে। ভয় এবং আতঙ্কে গঠনাত্মক চিন্তা বা ফলপ্রদ কর্ম্মপন্থা অবলম্বন সম্ভব হয় না। আতঙ্কে বর্ত্তমান বা ভাবী কোন বিপর্য্যয়ের প্রতিকার হয় না। তাহার জন্য মানব সমাজের বাস্তব সম্বন্ধে সজাগ হওয়া, দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হওয়া এবং দুর্য্যোগ এড়াইবার জন্য নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। ভারত বরাবর এই কথাই বলিয়া আসিয়াছে যে, অণু, হাইড্রোজেন, রসায়ন, জীবাণু সংক্রান্ত জ্ঞান ও শক্তি, পাইকারী ধ্বংস সাধনের উপযোগী এই সকল অস্ত্র নির্ম্মাণের জন্য প্রয়োগ করা উচিত নহে। পরস্পরের সম্মতিক্রমে অবিলম্বে এই ধরণের মারণাস্ত্র নিষিদ্ধ করার জন্য আম[রা] অনুরোধ করিয়া আসিতেছি। এই সকল অস্ত্র বর্জ্জনের ইহাই একমাত্র কার্য্যকরী উপায়।

রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারত এজন্য যে সকল চেষ্টা করে তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহরু বলেন যে, আমাদের এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কি করা যায় সে সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট ক্রমাগত চিন্তা করিতেছেন এবং করিয়া যাইবেন।

শ্রীনেহরু বলেন, সংবাদপত্রে যে সব বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে বা এ সম্বন্ধে লোকের যে সাধারণ জ্ঞান আছে বা জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে তাহা ছাড়া হাইড্রোজেন বোমা সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। তবে আমরা এইটুকু জানি যে, ইহার প্রয়োগে মানবসমাজ ও সভ্যতা ধ্বংস হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। শুনিয়াছি যে, ইহার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার কোন কার্য্যকরী উপায় নাই এবং একটি মাত্র বোমার বিস্ফোরণেই লক্ষ লক্ষ মানুষ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে পারে এবং আরও বেশীসংখ্যক লোক আহত ও রোগে-[illegible] ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতে পারে।

কিছুকাল পূর্ব্বে অধ্যাপক আইনষ্টাইন [illegible]

[illegible]জেন বোমা যদি সফল হয়, তাহা হইলে জলবায়ু তেজস্ক্রিয়ায় বিষা[illegible] হইবার ও তাহার ফলে সমগ্র প্রাণিজগতের ধ্বংস হওয়ার সম্ভা[illegible] দেখা দিবে।

মা[illegible] অধ্যাপক ডাঃ গ্রীণহেড বলিয়াছিলেন, 'ধারাবাহিকভাবে এইরূপ বিস্ফোরণ ঘটিতে থাকিলে হঠাৎ এক সময় দেখিবে যে, আমরা নিজেদের ধ্বংস করার মত যথেষ্ট উপকরণ সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছি।'

অষ্ট্রেলিয়ার বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা মিঃ মার্টিন বলিয়াছিলেন, 'এই সর্ব্বপ্রথম আমি হাইড্রোজেন বোমার জন্য উদ্বিগ্ন বোধ করিতেছি। আমি ব্যক্তিগত ভাবে বলিতেছি, অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে মানবসমাজের কল্যাণের জন্য চতুঃশক্তির মধ্যে এই বিষয় একটা আলোচনা আর স্থগিত রাখা যায় না।'

কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ পিয়ার্সনও বলিয়াছেন, 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে আণবিক ও রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের ফলে সভ্যতা ধ্বংস হইয়া যাইবে।'

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীও বলিয়াছিলেন যে, এই সকল অস্ত্র ব্যবহৃত হইলে পূর্ণ ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।"

পণ্ডিত নেহরুর বিবৃতি যে সভ্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহার সাক্ষ্য আমরা নিম্নস্থ সংবাদে পাই। উহা ৯ই এপ্রিলে নিউইয়র্কে নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের বৈঠক সম্পর্কিত :

"ব্রিটিশ প্রতিনিধি স্যার পিয়ার্সন ডিক্সনের প্রস্তাবের অল্পক্ষণ পরেই মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ হেনরি ক্যাবট লজ নিরস্ত্রীকরণ কমিশনে এক বিবৃতিপ্রসঙ্গে বলেন যে, হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা সম্পর্কে একটি 'স্থিতাবস্থা চুক্তি' সম্পাদনের অনুরোধ জানাইয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা স্পষ্টতঃই শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণের অধিকারী—নেহরুজীর প্রস্তাব শ্রদ্ধাসহকারে বিবেচনা করা যাইতে পারে।

আণবিক অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে চুক্তি সম্পাদন প্রভৃতি ব্যবস্থা এবং গোপন আলোচনাদি উত্থাপিত হইবার পর মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ হেনরী ক্যাবট লজ বলেন, 'নেহরুজীর প্রস্তাবের লিপি নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের দলিলরূপে প্রতিনিধিদের মধ্যে বিলি করা হইয়াছে। আম[illegible] প্রস্তাব করি যে, এই দলিল সাব-কমিটিতে উল্লিখিত হউক এবং তথায় এই সম্পর্কে আলোচনা হউক।'

"আণবিক বোমা সমস্যা আজ নূতন গুরুত্বপূর্ণ পর্য্যায়ে উপনীত হইয়াছে, এজন্য গত বৎসরের পর এই প্রথম বৈঠকে সম্মিলিত এই কমিশনও নূতন নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতেছেন।"

প্রতিরক্ষা-বিভাগে মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা

প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদপ্তরের অধীনস্থ প্রতি[illegible] বিজ্ঞান সংস্থার মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা শাখার (Psychological Research [illegible] ১৯৫৩ সনের বার্ষিক অগ্রগতির রিপোর্ট আলোচনা প্রসঙ্গে "বোম্বে ক্রনিকলের" নয়াদিল্লীস্থিত বিশেষ সংবাদদাতা লিখি[illegible]ছেন যে, উক্ত শাখার কার্য্যাবলী চারিটি বিভাগে ভাগ করা যা[illegible] (১) মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার সংগঠন—পরীক্ষাগুলির নিয়তই প[illegible]র্ত্তন সাধিত হইতেছে, কারণ একবার লোক নিয়োগ করার [illegible]রই পরীক্ষার বিষয়গুলি প্রকাশ হইয়া পড়ে, (২) নির্ব্বাচনের [illegible]র্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে শিক্ষাদান—প্রায়শঃই কর্ম্মীদের স্থানান্তর [illegible]রার দরুন এই শিক্ষাকার্য্য প্রতিনি[illegible] [illegible]লাইয়া যাইতে হইতেছে (৩) নিরীক্ষণ (follow up)—সৈন্যবাহিনীর কার্য্যে নিযুক্ত ব্য[illegible]দের অগ্রগতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়, যাহাতে নির্ব্বাচন [illegible]তির গুণাগুণ এবং সাফল্য অথবা ব্যর্থতা সম্পর্কে জ্ঞান [illegible]ন্মে, (৪) নির্ব্বাচন পদ্ধতির ত্রুটি দূর করিয়া তাহার উন্নতি[illegible] গবেষণা।

১৯৫৩ সনে উক্ত শাখা কর্ত্তৃক অফিসারদের নির্ব্বাচনে[illegible] জন্য দুইটি পরীক্ষা, অফিসার-প্রার্থীদের ব্যক্তিত্ব নির্দ্ধারণের জ[illegible]টি পরীক্ষা এবং সাধারণ সৈন্যদের জন্য তিনটি সম্পাদন পরীক্ষা [illegible]-formance test) উদ্ভাবন করা হয়।

নির্ব্বাচনকার্য্যে নিযুক্ত সকল ব্যক্তিকে তাঁহাদের স্ব[illegible] যোগদানের পূর্ব্বে মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা শাখা হইতে বি[illegible] শিক্ষিত করিয়া তোলা হয়। গত বৎসর এই উদ্দেশ্যে [illegible] শিক্ষা-তালিকা (course) গৃহীত হইয়াছিল। এই [illegible] অনুসারে সামরিক নির্ব্বাচন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, ডেপুটি [illegible], মনস্তত্ত্ববিদ এবং দল পরীক্ষাকারী অফিসারদিগকে ([illegible]-testing officers) শিক্ষা দেওয়া হয়। সাধা[illegible] নির্ব্বাচনের জন্য নিযুক্ত কর্ম্মীদেরও শিক্ষা-তালি[illegible] করা হয়।

পরীক্ষাগুলি কত দূর নির্ভরযোগ্য এবং দলগত পরীক্ষা[illegible] নির্ব্বাচিত ব্যক্তিরা স্বতন্ত্রভাবে কর্ম্মসম্পাদনে কিরূপ [illegible] বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার জন্য মনস্তাত্ত্বিক[illegible] শাখা কয়েকটি পরীক্ষার অনুষ্ঠান করেন। বিভিন্ন সাম[illegible] কর্ত্তৃক গৃহীত মান সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনার উদ্দে[illegible] একটি পরীক্ষাকার্য্য চালান হয়। পরীক্ষার [illegible] যায় যে বিভিন্ন বোর্ড কর্ত্তৃক গৃহীত মানের মধ্যে ব[illegible] রহিয়াছে।

সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের নির্ব্বাচন ব্য[illegible] ব্যতীত অন্যান্য অনেক ব্যাপারেও মনস্তাত্ত্বিক [illegible] সাহায্য লওয়া হয়। ইউনিয়ন পাবলিক স[illegible] কমিশন, [illegible] কমিশন এবং শিক্ষাবিভাগীয় মন্ত্রীদপ্তর [illegible] শাখার নিকট [illegible] অনেক বিষয়ে সাহায্য পাইয়াছে[illegible]।

ভারতে সামরিক কার্য্যে ব্যক্তিনিয়োগের পদ্ধতি [illegible]র্কে ওয়াকিবহাল হইবার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি দেশের সামরি[illegible]বং পুলিস বিভাগের কর্ম্মচারিগণ গত বৎসর উক্ত শাখার কার্য্যা[illegible] পর্য্যবেক্ষণ করিতে ভারতে আগমন করেন।

স্বাবলম্বন

মেদিনীপুর তমলুকের অন্তর্গত মহিষাদল থানার গ্রামবাসিগণ সম্প্রতি আত্মনির্ভরশীলতার একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ঐ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ রাজাখালি খাল এতদিন মজিয়া অকেজো হইয়া ছিল। সম্প্রতি স্থানীয় প্রায় সহস্রাধিক গ্রামবাসীর সম্মুখে পানিসিটির ভূমিসেনাদল, ৬নং ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যগণ, "পল্লীজীবন" কর্ম্মীদল এবং কল্যাণ-চক হাইস্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকগণ উহার উদ্ধারকার্য্য আরম্ভ করেন। খাল চার মাইল লম্বা ও প্রায় পঁয়ত্রিশ ফুট চওড়া এবং উহা কার্য্যকরী হইলে প্রায় ছয় হাজার বিঘা পরিমাণ ক্ষেতে সেচের [illegible] হইবে যাহার ফলে সেখানকার ফসলে ছয় হাজার মণ ধান [illegible] হাজার মণ ডাল বেশী জন্মিবে, অর্থাৎ ঐখানের চাষীর আয় [illegible] টাকার মত বাড়িবে।

এইরূপ কার্য্যে দেশের ও দশের সকল দিক দিয়াই উপকার হয়। অন্য উপরোক্ত কর্ম্মীবৃন্দকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি এবং [illegible] সাফল্য কামনা করিতেছি। পশ্চিম বাংলার সন্তানগণ যদি এই আদর্শকে গ্রহণ করেন এবং সর্ব্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন তবে নূতন আশার আলোকে উদ্ভাসিত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের বনসম্পদ

পশ্চিম বাংলায় ৪০৪৯ বর্গমাইল বন-জঙ্গল আছে। উহা এই রাজ্যের ভূমিফলের (area) শতকরা ১৪ ভাগ মাত্র। দেশের কৃষি ও [illegible] সংরক্ষণের জন্য শতকরা ২৫ ভাগ বন-জঙ্গল থাকা উচিত। বর্ত্তমানে দেশের উত্তর ভাগে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার অঞ্চলে [illegible]০০ বর্গমাইল, দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলে ১৬০০ বর্গমাইল এবং দেশের পশ্চিমপ্রান্তে, বিশেষতঃ মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায়, ১২০০ বর্গমাইল বনানী আছে। শেষের অংশ কতকটা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। [illegible] অঞ্চলের কাঠ, তক্তা ইত্যাদি কলিকাতা বা শিল্পাঞ্চলে [illegible] প্রধান অন্তরায় পথঘাট ও সোজা রেলপথের অভাব। পশ্চিম অঞ্চলে শাল ইত্যাদি গাছ ছোট অবস্থায় কাটার দরুন প্রধানতঃ জ্বালানী কাঠ হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবনেরও তাই, তবে কিছু দিয়াশলাই শিল্পে ব্যবহৃত হয়। সবসুদ্ধ গড়ে প্রতি বৎসর বড় কাঠ ২৬·১৩ লক্ষ ঘনফুট, খুঁটি ও রলা ২৪·১৪ লক্ষ ঘন-ফুট, [illegible]তে কাটা ·৭৯ লক্ষ ঘনফুট এবং জ্বালানী কাঠ ২২৬·৭৭ লক্ষ [illegible] আহরিত হয়। ইহাতে দেখা যায় যে, বনসম্পদের অধি-কাংশ [illegible]য় হইয়া থাকে। প্রায় ৮·৫ লক্ষ সংখক বাঁশ, ২২,৩০০ গাড়ী [illegible] ঘনফুট প্রস্তর, ৫৮২০ মণ মধু, ১৩০৭ মণ মোম [illegible] লক্ষ গাঁইট [illegible] রাষ্ট্রের অধিকৃত বন হইতে পাওয়া যায়। দেশের বনজঙ্গলের [illegible]৭৪ বর্গমাইল রাষ্ট্রের অধিকারে আছে, ৭৩ বর্গমাইল আছে ব্যক্তিগত অধিকারে, ৫০ বর্গমাইল কোম্পানীর হাতে, ৩৬ বর্গমাইল সাধারণ অধিকারে এবং ৮ বর্গমাইল সকলের বাহিরে আছে।

সুন্দরবন আবাদের জন্য দাবী শুনা যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওখানকার জঙ্গল উপরের কৃষিভূমিকে রক্ষা করে। প্রকৃতপক্ষে মেদিনীপুর সমুদ্র উপকূল হইতে ২৪ পরগণার উপকূল অঞ্চল পর্য্যন্ত সমস্ত সাগরতট অঞ্চলে ঘন জঙ্গল থাকা প্রয়োজন। সমুদ্রের ভীষণ ঝড় ও প্লাবন হইতে দেশের সমতল ভূমিকে রক্ষা করা অন্য কোন উপায় নাই। রাষ্ট্রের ভিতরেও নূতন বনমালা [illegible] প্রয়োজন ভূমিক্ষয় রোধ এবং জ্বালানী কাঠের জন্য। [illegible] কতকটা আরম্ভ হইয়াছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী।

তিস্তা বাঁধ নির্ম্মিত হইলে উত্তরাঞ্চলের বনসম্পদের আহরণ ও ব্যবহার দুইই সহজ হইবে। ফরক্কা বাঁধ হইলে সুন্দরবন মিঠা জল পাইয়া সরস ও সতেজ হইবে এবং উত্তরাঞ্চলের বনসম্ভার দক্ষিণে আনাও সহজ হইবে।

পাটশিল্পে মন্দা

রপ্তানীর দিক হইতে ১৯৫৩ সাল পাটশিল্পের পক্ষে দুর্বৎসর বলিতে হইবে। ১৯৫২ সালে ভারতবর্ষ ৭,৪৩,৮০০ টন পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিয়াছে, এবং ১৯৫৩ সালে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৭,৪৩,১০০ টন, যদিও গত বৎসর পাটের থলি ও কাপড়ের উপর রপ্তানী শুল্কের যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করিয়াও দেওয়া হইয়াছিল। অবস্থা আরও খারাপ হইত যদি না আর্জেন্টিনা ইদানীং অধিকতর পরিমাণে ভারতীয় পাটজাত দ্রব্য আমদানী করিত।

১৯৫২ সালে ভারতে ৪৬ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু ১৯৫৩ সালে উৎপন্নের পরিমাণ হইয়াছে মোট ৩১ লক্ষ গাঁইট। ইদানীং পাটের মূল্য হ্রাস পাইতেছে এবং যে সকল জমিতে উৎপাদন খরচ অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল, তাহাতে ধান চাষ সুরু হইয়াছে। ভারতীয় জুটমিলগুলির বাৎসরিক পাটের প্রয়োজন প্রায় ৫৬ লক্ষ গাঁইট, পাটের উৎপাদন হ্রাস পাওয়াতে মিলগুলি পুরাদমে কাজ করিতে পারিতেছে না।

অধিকন্তু পাটের রপ্তানী বাজারও বর্ত্তমানে সীমাবদ্ধ। যে পাটজাত দ্রব্য মিলে উৎপন্ন হইতেছে তাহাও রপ্তানী করা যাইতেছে না। ভারতীয় জুটমিল এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, যখন কাঁচা পাটের সরবরাহ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল তখনও মিলগুলি পুরাদমে কাজ করিতে পারে নাই রপ্তানী বাজারের অভাবের জন্য। ভারতীয় জুটমিল বর্ত্তমানে সপ্তাহে মাত্র সাড়ে বিয়াল্লিশ ঘণ্টা কাজ করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহার উপর আবার শতকরা সাড়ে বারো ভাগ তাঁত বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর যুগে পাটের আন্তর্জাতিক বাজার ভাল হওয়ার কথা, কারণ পাটের থলির চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য কোরিয়া যুদ্ধের "[illegible]ক পাইলিং" বন্ধ হওয়ায় দাম অনেক নামিয়াছে।

১৯৫২ সনে ভারতীয় জুট মিল এসোসিয়েশন প্রচারকার্য্যের জন্য আমেরিকায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিল এবং গত বৎসর অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড এবং সিঙ্গাপুরে প্রতিনিধিবর্গ গিয়াছিলেন। প্রচারকার্য্যের জন্য গত বৎসর আমেরিকায় ১ লক্ষ দশ হাজার পাউণ্ড খরচ করা হইয়াছিল। এ বৎসরও নাকি এই পরিমাণে টাকা খরচ করা হইবে। প্রচারকার্য্যের ফলে আমেরিকায় রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু রপ্তানীর পরিমাণ যথোচিত নয় [illegible]

প্রচারকার্য্যের দ্বারাই রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে না। পাকিস্থান বর্ত্তমানে ভারতের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে। পাকিস্থানের উচ্চ শ্রেণীর পাট, আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং সুবিধাজনক শ্রমিক আইন তাহার উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে। অবশ্য সেখানে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন এখনও অত্যন্ত কম।

ভারতীয় পাটশিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে দুইটি জিনিষের প্রয়োজন—উচ্চ শ্রেণীর কাঁচা পাট উৎপাদন এবং আধুনিক কলকারখানা। ভারতীয় পাট-উৎপাদনকারী প্রদেশগুলির সচেষ্ট হওয়া উচিত যাহাতে উচ্চশ্রেণীর পাট বপন করা হয়। পরিমাণ অপেক্ষা গুণের দিকে নজর দেওয়া উচিত। ভাল পাট উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন ভাল বীজ এবং ভাল বীজ উৎপাদনের জন্য বীজভূমি তৈয়ার করা দরকার। শুধু তাহাই নহে, চাষীদের বাধ্য করা উচিত যাহাতে তাহারা উন্নত বীজ ব্যবহার করে। উন্নত শ্রেণীর বীজবপনের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় সরকার উন্নত ধরণের মই সরবরাহ করিতেছেন। বর্দ্ধমান জেলার পানাগড়ে ২০০ শত একর জমি লওয়া হইয়াছে বীজবর্দ্ধনভূমি সৃষ্টি করার জন্য। ব্যারাকপুরের নিকট নীলগঞ্জ এলাকায় যে কৃষি অনুসন্ধান প্রতিষ্ঠান আছে তাহাকে প্রায় ৫০ একর জমি দেওয়া হইয়াছে দুইপ্রকার চাষ সম্বন্ধে পরীক্ষা করার জন্য —ধান এবং পাট।

কাঁচা পাটের মূল্য নির্দ্ধারণে ভারতীয় জুট মিল এসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত একমত নহে। জুট মিল এসোসিয়েশন মনে করে যে, নিম্নশ্রেণীর পাটের জন্য উচ্চমূল্য নির্দ্ধারণ করাতে ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন খরচ বেশী পড়ে এবং তাহাতে আন্তর্জাতিক বাজারে তাহার মূল্য অধিক পড়ে।

ডাণ্ডীর জুট মিলগুলিকে সম্প্রতি উন্নত ধরণের কলকারখানা দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছে। নূতন ব্যবস্থায় একটি শ্রমিক সাধারণতঃ ১০।১২টি তাঁত চালাইতে পারে—ইহাতে উৎপাদন খরচ যথেষ্ট কম পড়ে। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে হইলে ভারতীয় জুটমিলগুলিকে দশ-বার বৎসরের মধ্যে উন্নত ধরণের আধুনিক কলকারখানা দ্বারা সজ্জিত করিতে হইবে।

এ বৎসরে ভারতীয় পাটের বাজার অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়া যাইতেছে। এবারে আর্জেন্টিনা কি করে বলা যায় না। সেপ্টেম্বর মাসের পর তার অর্ডার আসিবে। পাট রপ্তানী ব্যাপারে অধিকাংশ ভারতীয় ব্যবসাদাররা নীতিগর্হিত কাজ করিতেছে বলিয়া আমেরিকা অনুযোগ করিতেছে। তবে পুরনো ব্যবসাদারদের নিকট হইতে পাট আমদানী না করিয়া নূতন ব্যবসাদারদের নিকট হইতে আমেরিকা সস্তায় পাট আমদানী করিতেছে। নূতন রপ্তানীকারকগণ দুর্নীতির আশ্রয় লইতেছে ইহা অতীব দুঃখের বিষয়—ব্যক্তিগত লাভের জন্য জাতীয় ক্ষতি করা হইতেছে। ১৯৪৭-৪৮ সনে ভারতীয় ব্যবসাদাররা এমন নিকৃষ্টশ্রেণীর অভ্র আমেরিকায় রপ্তানী করিতে সুরু করিয়াছিল যে, ফলে অভ্র রপ্তানী যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস

আমেরিকা ভারতের বৃহত্তম পাটের বাজার, সুতরাং তার সহিত ব্যবসায়িক অসদ্‌ব্যবহার অত্যন্ত গর্হিত কাজ, এ সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের সজাগ হওয়া উচিত। আজ নূতন রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে, অর্থাৎ পাক-আমেরিকা আঁতাতে, আমেরিকা পাকিস্থান হইতে অধিক পরিমাণে পাট ক্রয় করিবে। সুতরাং আমেরিকায় ভারতীয় পাট রপ্তানী বজায় রাখিতে হইলে ভারতীয় ব্যবসাদারদের ব্যবসায়িক নীতি উচ্চ থাকা উচিত। অধিকন্তু, আমেরিকায় বর্ত্তমান ব্যবসায়িক মন্দা যাইতেছে, তাই পাটের বাজার সঙ্কুচিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। চলতি বৎসরে পাকিস্থানে ৩৫ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইয়াছে। ভারতীয় প্রান্তিক জমিতে পাট চাষ [illegible] দেওয়া উচিত, তাহাতে পাট উৎপাদনের খরচ কম হইবে।

ভারতে বীমা ব্যবসায়

ভারত-সরকারের বীমা নিয়ামক (Controller of [illegible]rance) কর্ত্তৃক সদ্যপ্রকাশিত ভারতীয়-বীমা বর্ষলিপি ১৯৫৩—[illegible] জানা যায় যে, ১৯৫২ সনে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির [illegible] জীবন-বীমার পরিমাণ ছিল ১২৯·২৮ কোটি টাকা। ইহা [illegible] বার্ষিক ৬·৯৬ কোটি টাকা প্রিমিয়ম আয় হইবে। ঐ বৎসর [illegible] নূতন পলিসির সংখ্যা ছিল ৫১২,০০০। ভারতে কার্য্যরত [illegible] বীমা কোম্পানীগুলি বার্ষিক ৯৩ লক্ষ টাকা প্রিমিয়ম আয়ের [illegible] কোটি টাকার নূতন বীমা করেন। তাঁহারা ২২,০০০ নূতন [illegible]পত্রের প্রচলন করেন।

১৯৫২ সনে অগ্নি এবং নৌ-বীমা ব্যবসায়ের প্রিমিয়ম [illegible] ১৯৫১ সনের তুলনায় সামান্য হ্রাস পায় এবং বিবিধ শ্রেণীর [illegible] আয় কিছু বৃদ্ধি পায়।

১৯৫৩ সনের ৩০শে নবেম্বর তারিখে ১৯৩৮ সনের বীমা [illegible] অনুযায়ী রেজেষ্ট্রীকৃত ৩২২টি কোম্পানী ছিল; তন্মধ্যে [illegible] ভারতীয়, বাকিগুলি বিদেশী। ১১৫টি ভারতীয় কোম্পানী [illegible] বীমার ব্যবসা করেন; ৪৬টি কোম্পানী জীবন-বীমা এবং [illegible] বীমার ব্যবসায় করেন এবং অবশিষ্ট ভারতীয় কোম্পানীগুলি [illegible]ভাবে (জীবন-বীমা ব্যতীত) অন্যান্য বীমা ব্যবসায়ে নিযুক্ত রহিয়াছেন। ঐ সকল ব্যবসায়ে নিযুক্ত বিদেশী কোম্পানীর সংখ্যা যথাক্রমে ৪,১৩ এবং ৮৪।

১৯৫১ সনের তুলনায় জীবন-বীমা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে [illegible] সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে ১০০০ বীমাকৃত [illegible] পরিমাণ ২·১০ কোটি টাকা এবং বার্ষিক প্রিমিয়ম আয়ের পরিমাণ ২২ লক্ষ টাকা। বিদেশী কোম্পানীগুলির জীবন বীমা ব্যবসায়ের পরিমাণও ঐরূপ ভাবে কিছু হ্রাস পাইয়াছে।

১৯৫২ সালের শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির জীবনবীমা ব্যবসায়ের নীট পরিমাণ ছিল ৭৮৯·৮৮ কোটি টাকা। উহার বার্ষিক প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণ ৩৭·৯৫ কোটি টাকা। ঐ সময় পর্য্যন্ত মোট ৩,৬৭৮,০০০টি বীমাপত্র চালু ছিল। দেশী

বীমা কোম্পানীগুলির জীবনবীমা ব্যবসায়ের পরিমাণ ছিল ১২৬·০২ কোটি টাকা। উহা হইতে মোট ৬·৯৩ কোটি টাকার বার্ষিক প্রিমিয়াম আয় হয়। মোট বীমাপত্রের সংখ্যা ২৪৭,০০০।

১৯৫২ সালের শেষ পর্য্যন্ত বিদেশে কার্য্যরত ভারতীয় কোম্পানীগুলির বীমা ব্যবসায়ের নীট পরিমাণ ছিল ৬৯·৮৩ কোটি টাকা এবং পলিসির সংখ্যা ২৬৫,০০০। ঐ বৎসর তাহাদের নূতন ব্যবসায়ের পরিমাণ ছিল ১১·৪৫ কোটি টাকা এবং নূতন পলিসির সংখ্যা ২৭,০০০।

জীবনবীমা ব্যবসায় হইতে ১৯৫২ সালে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির মোট আয়ের পরিমাণ ছিল ৫০·১০ কোটি টাকা, বিদেশী কোম্পানীগুলির ৯·৭৭ কোটি টাকা। মোট ব্যয় যথাক্রমে [illegible] ৮৫ কোটি টাকা এবং ৬·৭৬ কোটি টাকা।

কনট্রোলারের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, ১৯৪৩ সাল হইতেই বীমা ব্যবসায়ে উন্নতির লক্ষণ দেখা দেয়। তাঁহার হিসাব হইতে দেখা যায়, গত কয়েক বৎসর যাবৎ বাতিল বীমার সংখ্যা [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জীবনবীমা ব্যতীত অন্য বীমা ব্যবসায়ে নিযুক্ত ভারতীয় কোম্পানীগুলির মোট নীট আয়ের পরিমাণ ছিল ১৪·৪৭ কোটি টাকা; বিদেশী কোম্পানীগুলির ২·৮০ কোটি টাকা।

বিক্রয় করের অব্যবস্থা

বিক্রয় কর সংগ্রহের ব্যাপার লইয়া কিছুদিন যাবৎ আন্তঃপ্রাদেশিক বাদানুবাদ চলিতেছে। ভারতীয় সংবিধান রচয়িতাদের [illegible] উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে আন্তঃপ্রাদেশিক ব্যবসার উপর কোন কর স্থাপন না হয়। কিন্তু ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট সম্প্রতি রায় দিয়াছেন [State of Bombay V. United Motors (India) Ltd.] যে, আন্তঃপ্রাদেশিক ব্যবসার উপর বিক্রয় কর বসাইবার অধিকার প্রদেশগুলির আছে। সেই অনুসারে প্রদেশগুলি ভিন্নপ্রদেশের ব্যবসাদারদের উপর বিক্রয় কর দাবী করিয়া নোটিশ জারি করিতেছেন। কোন কোন প্রদেশ গত ১৯৫০ সনের ২৬শে জানুয়ারী হইতে যত মাল ভিন্ন প্রদেশে বিক্রয় হইয়াছে তার উপর কর দাবি করিয়াছেন। এই ব্যাপারে বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্স কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুযোগ প্রকাশ করিয়াছেন। তদনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশগুলির "কর্ম্মচারী সমিতি"র অধিবেশন আহ্বান করেন। এই বিক্রয় কর কর্ম্মচারী সমিতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, যদিও প্রদেশগুলি আইনতঃ ১৯৫০ সনের ২৬শে জানুয়ারী হইতে আন্তঃপ্রাদেশিক [illegible]য়ের উপর কর ধার্য্য করিতে পারে, তথাপি সুপ্রীম কোর্টের রায়ের [illegible] হইতে (অর্থাৎ, ৩০শে মার্চ ১৯৫৩ সন) এইরূপ কর আদায় করা উচিত। তাই কোন কোন প্রদেশ ঠিক করিয়াছে যে, ১৯৫৩ সনের ১লা এপ্রিল হইতে আন্তঃপ্রাদেশিক ব্যবসায়ের উপর বিক্রয় কর ধার্য্য করা হইবে এবং কোন কোন প্রদেশ ১৯৫৪ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে এই কর আদায় করিবে। এই ব্যবস্থা কিন্তু খানিকটা জোড়াতালি গোছের এবং সাময়িক। চিরস্থায়ী সমাধান হিসাবে 'কর্ম্মচারী সমিতি' মত দিয়াছেন যে, ভিন্নপ্রাদেশিক ব্যবসায়ীর উপর বিক্রয় কর আরোপ না করিয়া প্রদেশগুলি নিজেদের অধিবাসীদের উপর ক্রয় কর (Purchase Tax) ধার্য্য করা উচিত। [illegible] বিক্রয় কর রহিত করিয়া দিয়া ক্রয় কর ধার্য্য করিলে ভিন্নপ্রাদেশিক ব্যবসায়ীদের উপর আর বিক্রয় কর আরোপ করিতে হইবে না। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সজাগ হওয়া উচিত।

মিশ্রনীতির দুর্নীতি

ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোয় বহুরকম অব্যবস্থা আছে—তার মধ্যে তিনটি জিনিষ সত্যই রহস্যজনক, যাহা সাধারণ বুদ্ধিতে বোধগম্য নয়। এই তিনটি ব্যাপার হইতেছে বস্ত্রসমস্যা, চিনি-সমস্যা ও স্বর্ণসমস্যা। ইহাদের ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় যেন ইহারা কেন্দ্রীয় সরকারের আদুরে ছেলে (spoilt children)। ইহাদের উপদ্রবে যখন জনসাধারণ প্রতিবাদ করে, তখন কেন্দ্রীয় সরকার বলেন, "আচ্ছা দেখব।" পরে লোকদেখানো গোছের কিছু করেন, কিন্তু ইহাদের অত্যাচার সত্যিকারভাবে বন্ধ হয় না। সরকারী ভাব দেখিয়া মনে হয় যে, তাঁহারা যেন দুই পক্ষকেই সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেন।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর হইতেই (১৯৪৭) এই তিনটি ব্যবসায়ে মুনাফা লাভের আগ্রহে সামাজিক নীতিজ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়াছে। কাপড়ের কালোবাজারী ও সাদাবাজারী অতিরিক্ত মূল্য ভারতীয় জনসাধারণকে ১৯৪৭ সন হইতে ১৯৫২ সন পর্য্যন্ত জর্জ্জরিত করিয়াছে—আর কেন্দ্রীয় সরকার যেন অসহায় শিশুর মত ইহাদের কালোবাজারী ব্যবসা নীরবে পরিদর্শন করিয়াছেন। লোকে ইহাতে বলিবার সুযোগ পায় যে সরকারী অসহায়ভাব খানিকটা লোকদেখানো, সত্যিকার প্রতিকারের বন্দোবস্ত করিলে কালোবাজারী ব্যবসা বন্ধ করা যাইত। এবারে তাঁতশিল্পের সাহায্যকল্পে মিলবস্ত্র নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। ফলে কাপড়ের সরবরাহ অল্প হইয়াছে এবং তাহার জন্য কাপড়ের মূল্য বাড়িয়াছে।

চিনিশিল্পের কালোবাজারী ব্যবসাও সর্ব্বজনবিদিত, কারণ সবাই ভুক্তভোগী। এবারে কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশ হইতে চিনি আমদানী করিতে রাজী হইয়াছিলেন। চিনি আমদানী হওয়াতে মূল্য সাময়িক ভাবে কিছু কমিয়াছিল, কিন্তু আবার মূল্য বৃদ্ধির পথে। সম্প্রতি চিনির মূল্য হঠাৎ বাড়িয়া গিয়াছে, কারণ চিনির জমা কমিয়া আসিতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য—কেন্দ্রীয় সরকার যখন জানেন যে, চিনির জমা কমিয়া আসিতেছে এবং আভ্যন্তরিক উৎপাদন চাহিদার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তখন কেন তাঁহারা সময় থাকিতে চিনি আমদানীর বন্দোবস্ত করেন নাই? বাজার যদি জানে যে চিনির সরবরাহ যথেষ্ট তাহা হইলে চিনির মূল্য বৃদ্ধি পাইতে পারে না। চিনিশিল্পের মালিকরা এবং ব্যবসাদাররা এই সময়ের মধ্যে বেশ কিছু মুনাফা করিয়া লইবে জনসাধারণের অর্থে। ইহাকেই অর্থনীতিতে বলে—"Windfall profit."

এই মুনাফালাভের সাহায্য করার জন্ত কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্যই নীতি-গত ভাবে দায়ী। চিনি নাই, তাই মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে—শুধু এই কথা বলিলেই জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব খালাস হয় না।

এবার সোনার কথা: আমরা বহুবার বলিয়াছি যে, ভারতে সোনা আমদানী নিষিদ্ধ হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজার হইতে ভারতীয় বাজারে সোনার মূল্য প্রায় দুই হইতে আড়াই গুণ বেশী।

ভারতীয় আভ্যন্তরিক যে সোনা উৎপাদন হয় তাহা আমাদের শতকরা ৫০ ভাগ চাহিদা মিটায়, গুপ্তভাবে আমদানী সোনা বাকী ৫০ ভাগের চাহিদা মিটায়। ইংরেজ আমলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সোনা বিক্রয় করিত এবং তাঁহাতে সোনার মূল্য বাড়িতে পারিত না। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আর সোনা বিক্রয় করে না, ফলে সোনার মূল্য অসম্ভবভাবে বাড়িয়া গিয়াছে এবং গুপ্ত আমদানীও বৃদ্ধি পাইয়াছে। গুপ্ত আমদানীতে সরকার আমদানী কর হইতে বঞ্চিত হন। সোনার দাম মাঝখানে বেশ কমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ইদানীং গুপ্ত আমদানী সম্বন্ধে কড়াকড়ি হওয়াতে সোনার মূল্য হঠাৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতে লাভ করিতেছে কাহারা?—বম্বে বুলিয়ান এক্সেঞ্জের কতিপয় ভদ্রলোক মাত্র। কাহার সাহায্যে? অবশ্য সরকারী আইনের সাহায্যে। কাহার অর্থে লাভ করিতেছে? অবশ্য জনসাধারণের অর্থে। ইহার কারণ রহস্যজনক।

ভারতে বিজ্ঞান গবেষণার অগ্রগতি

ভারত সরকারের প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিজ্ঞান গবেষণা দপ্তরের ১৯৫৩-৫৪ সালের কার্য্যবিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, ঐ সময়ের উল্লেখযোগ্য কাজ হইল জাতীয় গবেষণা উন্নয়ন কর্পোরেশন গঠন। জাতীয় গবেষণা মন্দিরগুলিতে যে সকল দ্রব্য ও পদ্ধতি আবিষ্কার করা হইবে সেগুলিকে শিল্প ও ব্যবসাক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযুক্ত করিয়া তোলাই এই কর্পোরেশনের কাজ। শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের অন্তর্গত সমস্ত প্রতিষ্ঠান, রাজ্যসরকারের গবেষণা-কেন্দ্র, পণ্য গবেষণা পরিষদ ও অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি এই কর্পোরেশনের আওতায় পড়িবে।

১৯৫৩-৫৪ সালে ভারতে ১১টি জাতীয় গবেষণা মন্দির স্থাপনের কাজ সম্পূর্ণ হয়। এই গবেষণা মন্দিরগুলিতে নানাবিধ যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম উদ্ভাবিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আমিটার, বোন-ডাই-জেষ্টার, মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সি মিটার, স্বর্ণের চোরাই চালান ধরিবার যন্ত্র ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গবেষণা মন্দিরগুলিতে উদ্ভাবিত প্রক্রিয়াগুলি বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে ব্যাপকভাবে তৈরির জন্য জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বৃত্তিধারী গবেষকদের শিক্ষাদানের জন্য ১৯৫১ সালে যে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করা হইয়াছিল তাহার মেয়াদ আরও তিন বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন গবেষণা-কেন্দ্রে প্রায় ৪০ জন গবেষক শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে। গবেষণার জন্য প্রদত্ত বৃত্তির সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ অনেকগুলি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। আগামী অক্টোবর মাসে ভারতে বায়ু ও সৌরশক্তি সম্পর্কে এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হইবে। আগামী অক্টোবর ও ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসের মধ্যে দেরাদুনে এশিয়ার মানচিত্র অঙ্কন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে।

শান্তিপূর্ণ কাজে পরমাণু শক্তির ব্যবহারই ভারতীয় আণবিক শক্তি কমিশনের লক্ষ্য। একটি পরমাণু শক্তি কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে বোম্বাই বন্দরের নিকট ট্রম্বেতে দুই শত ত্রিশ একর জমি সংগ্রহ করা হইয়াছে। মোনাজাইট হইতে ইউরেনিয়ম ও থোরিয়ম উৎপাদনের জন্য ট্রম্বেতে একটি কারখানা নির্ম্মাণের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। খরচ পড়িবে আনুমানিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।

সার্ভে অব ইণ্ডিয়া—এক ইঞ্চি=এক মাইল এই স্কেলে সমগ্র ভারত (হিমালয়ের অত্যুচ্চ অঞ্চল ব্যতীত) জরীপের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রতি পঁচিশ বৎসর অন্তর পুনরায় জরীপ করা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

গ্রামসেবকদের শিক্ষা

ভারতে সমাজ-উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলিতে কাজ করিবার জন্য শিক্ষিত কর্ম্মীর প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয় কৃষি-গবেষণা পরিষদের উদ্যোগে ৩৪টি কেন্দ্রে প্রায় ... হাজার তরুণ কর্ম্মীকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ইঁহাদের কয়েকজন মহিলাও আছেন। পঞ্জাবে দুইটি, মাদ্রাজে দুইটি, বোম্বাইয়ে তিনটি, মধ্যপ্রদেশে দুইটি, উত্তরপ্রদেশে ছয়টি, পশ্চিমবঙ্গে চারটি এবং মহীশূর, আসাম, ভূপাল, হিমাচল প্রদেশ, পেপসু, হায়দরাবাদ, মধ্যভারত, অন্ধ্র, উড়িষ্যা, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ও বিন্ধ্যপ্রদেশে একটি করিয়া কেন্দ্র আছে।

এই সকল কেন্দ্রে কর্ম্মীদের ছয়মাস ধরিয়া কৃষি, স্বাস্থ্য, ... গৃহনির্ম্মাণ, পল্লীশিল্প, স্বাবলম্বীদল সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। কৃষি পল্লীবাসীর প্রধান অবলম্বন বলিয়া কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি, শাক-তরকারী আবাদ, পশুপক্ষী পালন ও মৎস্যচাষ শিক্ষার উপর বেশী অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। গ্রামসেবকদের কৃষি-বিদ্যালয়ে এক বৎসরকাল শিক্ষা গ্রহণও করিতে হইবে।

শিক্ষার দুইটি দিক আছে। প্রথমে ক্লাসে পুস্তকাদি ... তথ্য ও তত্ত্ব পাঠ করানো হয়। পরে কর্ম্মীদের নিজ হাতে ঐ সকল কাজ করিতে হয়। তবে কর্ম্মীদের সাহায্যের জন্য ... থাকেন। শিক্ষার্থীদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা হয়। যখন এক দল ক্লাসে শিক্ষা গ্রহণ করেন তখন অপর দল ... বা গ্রামে গিয়া বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন।

উপযুক্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভের পর কর্ম্মীদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলিতে পাঠানো হয়। তাঁহারা সেই সকল গ্রামে দুই সপ্তাহকাল অবস্থান করিয়া সেখানকার নানা বিষয়ের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেন। ঐ সকল স্থানে তাঁহাদিগকে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় শিক্ষাকেন্দ্রে প্রত্যাগমনের পর তাঁহারা সেগুলি লইয়া আলোচনা করেন।

কর্মীদের দৈনন্দিন জীবনের সুরু হয় সকাল সাড়ে পাঁচটায়, রাত্রি সাড়ে নয়টায় তাঁহার অবসান। তবে কেবলমাত্র শিক্ষা ও কাজের মধ্যেই শিক্ষাকেন্দ্রগুলির জীবন সীমাবদ্ধ নহে। খেলাধূলা, সঙ্গীত ও অভিনয়ের ব্যবস্থাও সেখানে থাকে।

আইনের প্রহেলিকা

১৪ই চৈত্র সংখ্যার "সেবক" পত্রিকা এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে ত্রিপুরা রাজ্যের নানাবিধ আইন সংস্কারের আশু প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লিখিতেছেন যে, মহারাজার আমলের অনেক আইন এখন পর্য্যন্ত চালু থাকায় জনসাধারণ ও সরকারকে বহুবিধ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে।

১৯৪৯ সনে ভারত সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনভার সরাসরি [illegible] করেন। তাহার পর ভারতরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি (তৎকালীন [illegible]র্ণর জেনারেল) স্বীয় ক্ষমতা বলে 'ক' শ্রেণীর রাজ্যের কতকগুলি [illegible]ন ত্রিপুরা রাজ্যে প্রয়োগ করেন। মহারাজার আমলের আইন [illegible] করিবার অধিকার তাঁহার থাকিলেও সেই সময় তাহা করা [illegible] নাই। ১৯৫০ সনে সংবিধান চালু হইবার পর হইতে এইরূপ [illegible]ইন প্রণয়ন এবং নাকচের ক্ষমতা কেবলমাত্র পার্লামেন্টেরই [illegible]য়াছে।

'সেবক' লিখিতেছেন, "ত্রিপুরা রাজ্য ভারতভুক্ত হইয়াছে [illegible]জ সাত বৎসর। অথচ এই দীর্ঘ সাত বৎসরেও একটি [illegible]গোপযোগী আইন এখানে চালু হইল না। যে রাজ্যে উপযুক্ত [illegible]উনিসিপ্যাল আইন, পি, ডব্লিউ, ডি আইন, বন আইন, সংরক্ষিত [illegible]ন আইন, ভূমি আইনের অভাবে জনসাধারণ প্রতি পদক্ষেপে [illegible]ত হইতেছে, এমন কি সরকার নিজেও বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম [illegible]তেছেন এবং কোটি কোটি টাকা জলের মত ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও [illegible]ল্যাণমূলক কোন কাজ হইতেছে না, সে স্থলে সরকারের [illegible]থিলতাকে ক্ষমা করা যায় না।"

এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় নিবন্ধটিতে ত্রিপুরা হইতে নির্ব্বাচিত [illegible]ার্লামেন্টের দুই জন সভ্যের নিষ্ক্রিয়তার কঠোর সমালোচনা করা [illegible]য়াছে।

বর্দ্ধমানে বি-টি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা

বর্দ্ধমান রাজ-কলেজে শিক্ষকশিক্ষণ শিক্ষা বিভাগ খুলিবার [illegible]নুমতি প্রার্থনা করিয়া কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট একটি [illegible] প্রেরণের সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিয়া সাপ্তাহিক 'বর্দ্ধমানবা[illegible]' লিখিতেছেন, "প্রস্তাবটি অত্যন্ত সময়োচিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। বর্দ্ধমান জেলায় শতাধিক উচ্চ বিদ্যালয় আছে এবং এই সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকসংখ্যা প্রায় তিন হাজার। সরকারের পরিকল্পনা অনুসারে প্রত্যেক শিক্ষককে ট্রেনিং লইতে হইবে। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে বর্দ্ধমানে শিক্ষকশিক্ষণ শিক্ষা-বিভাগ খোলার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কোন দ্বিমত থাকিতে পারে না। তাহার উপর শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থার কথাও চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। অন্যত্র যাইয়া ট্রেনিং লওয়া অধিকাংশের [illegible] কুলাইবে না।"

পত্রিকাটি শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে এই প্রস্তাব সহানু[illegible] সহিত বিবেচনা করিবার অনুরোধ জানাইয়া এই আশা [illegible] করিয়াছেন যে, মন্ত্রীমহোদয় প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইবেন। আমরাও এ অনুরোধ সমর্থন করি।

বোম্বাই রাজ্যপালের পদত্যাগের সম্ভাবনা

"বোম্বে ক্রনিকল" পত্রিকার প্রধান রিপোর্টার টমাস জে. কুটিনহো ওয়াকিবহাল মহলের সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া লিখিতেছেন যে, শীঘ্রই নাকি বোম্বাইয়ের রাজ্যপাল শ্রীগিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী পদত্যাগ করিবেন। কয়েকটি ব্যাপার লইয়া শ্রীবাজপেয়ীর সহিত বোম্বাই রাজ্য মন্ত্রীসভার মতানৈক্য ঘটিয়াছে। ভাষাসমস্যা এবং শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজীর স্থান সম্পর্কে রাজ্যপাল এবং মন্ত্রীমণ্ডলীর অভিমতের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে।

সম্প্রতি পুণা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টে ২৫ জন সদস্য মনোনয়ন সম্পর্কিত ব্যাপারেও রাজ্যপাল এবং মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে গভীর মতভেদের সৃষ্টি হয়। রাজ্যপাল এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি তাহার অভিরুচি অনুযায়ী সদস্য মনোনয়ন করিবেন। মন্ত্রীমণ্ডলী এই ব্যাপারে রাজ্যপালকে মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ মানিয়া চলিতে হইবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। ফলে এক শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার উদ্ভব হয় এবং রাজ্যপাল নাকি বিষয়টি রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করেন। রাষ্ট্রপতি এটর্নী-জেনারেল শ্রী এম. সি. শীতলবাদের অভিমত চাহিয়া পাঠাইলে শ্রীশীতলবাদ জানান যে, উক্ত মনোনয়ন সম্পর্কে রাজ্যপাল মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ মানিয়া চলিতে বাধ্য।

মার্চ্চ মাসের শেষ সপ্তাহে সেই অনুযায়ী মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ মত রাজ্যপাল ২৫ জনকে পুণা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সভ্য হিসাবে মনোনীত করেন।

এই ঘটনার পর রাজ্যপাল নাকি নয়াদিল্লীতে পদত্যাগের অনুমতি চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। সংবাদে আরও প্রকাশ যে, শীঘ্রই ওয়াশিংটনস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীগগনবিহারীলাল মেহতা ছুটিতে দেশে ফিরি[illegible] আসিলে শ্রীবাজপেয়ী তৎস্থলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হইবেন। শ্রীমেহতা ছুটির পর অন্য কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে, শ্রীবাজপেয়ী কিছুকাল ওয়াশিংটনস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের তত্ত্বাবধায়ক (Charge d' Affairs) [illegible]লেন। ১৯৫২ সনে মহারাজসিংহের অবসর গ্রহণের পর শ্রীবাজপে[illegible] পররাষ্ট্রবিভাগের সেক্রেটারী-জেনারেলের পদ হইতে বোম্বাইয়ের রা[illegible]পালের পদে অধিষ্ঠিত হন।

"[illegible]লভূমের পল্লীচিত্র"

শ্রীরাম[illegible]াস মুখার্জ্জী উপরোক্ত শিরোনামা দিয়া ১৪ই চৈত্রের "নবজাগরণ" পত্রিকায় এক প্রবন্ধে লিখিতেছেন যে, স্বাধীনতা-

লাভের পর সাত বংসর অতীত হইলেও ধলভূমের গ্রামাঞ্চলের বিশেষতঃ গোলমুড়ী থানার অধীন পল্লীসমূহের অবস্থা পূর্ব্ববংই অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। কোন দিকেই উন্নতির কোন চিহ্ন নাই। লেখকের মতে এ বিষয়ে গ্রামবাসীদের যে কোন দায়িত্ব নাই তাহা নহে ; কিন্তু কল্যাণকামী সরকার তাহাদের দায়িত্ব কত দূর পালন করিয়াছেন তাহাও বিবেচ্য বিষয়।

শ্রীমুখাৰ্জ্জী লিখিতেছেন, "সরকার গ্রামোন্নতির জন্য যে সকল সুযোগ এবং সুবিধা দিতেছেন তাহা কি গ্রামবাসীরা অবাধে পাইতেছে ? মোটেই না। অথচ সরকারের অর্থও যে এ বিষয়ে খরচ হইতেছে না তাহা নহে। এই যে অস্বাভাবিক অবস্থা, ইহার পরিবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজন।

"মানগো হইতে যে কাঁচা রাস্তা আসনবনী হইয়া ঘাটশীলা চলিয়া গিয়াছে সেই রাস্তায় যদি কোন সদাশয় ব্যক্তি ২০।২১টি গ্রাম পার হইয়া যান, তবুও একটি ক্ষুদ্রতম পাঠশালাও দেখিতে পাইবেন না। যদি সংবাদ সংগ্রহ করেন তবে দেখিতে পাইবেন যে, শিক্ষালাভ করিবার জন্য গ্রামবাসীদের চেষ্টার অন্ত নাই ! কিন্তু দরিদ্রতাই তাহাদের সকল চেষ্টার অন্তরায়।"

"শিক্ষার অভাব ব্যতীত আর যে সকল ব্যাপারে স্থানীয় জনসাধারণকে চরম কষ্ট সহ্য করিতে হয় তন্মধ্যে পানীয় জলের কষ্ট অন্যতম। গ্রীষ্মকালে অধিকাংশ জলাশয়ই শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় জনসাধারণের দুরবস্থা অবর্ণনীয় রূপ ধারণ করে। কখন এক মাইল, কখনও বা দেড় মাইল দূর হইতে এই পানীয় জল সংগ্রহ করিতে হয়। যে কয়েকটি বাঁধ এই অঞ্চলে আছে সেগুলি প্রায় সবই শুকাইয়া যায় এবং যেগুলিতে সামান্য জল থাকে তাহার অবস্থা দেখিলে সেই জল স্পর্শ করিতেও ঘৃণা বোধ হয়।

"এই যে অবস্থা ইহার কোন প্রতিকারের উপায় আজ পর্য্যন্ত সরকার করেন নাই এবং করিতেছেন কিনা তাহাও জানা যায় নাই।

"অথচ এই সমস্ত অজ্ঞ নিরক্ষর গ্রামবাসীই বংসরের পর বংসর 'সেচ' হিসাবে একটা অর্থ, যাহা অকিঞ্চিংকর নহে, জেলা বোর্ডকে দিয়া আসিতেছে।"

ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় পল্লী অঞ্চলে জনস্বাস্থ্যের অবস্থা কিরূপ। শ্রীমুখাৰ্জ্জী লিখিতেছেন যে, প্রায় প্রত্যেক গ্রামে এবং প্রায় প্রত্যেক গৃহেই ছেলে, বুড়ো সকলে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া শক্তিশূন্য হইয়া পড়িতেছে। প্রায় সকল গৃহেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কঙ্কালসার দেহে প্লীহার ভারে নুইয়া পড়িয়াছে।

তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, "এই যে অবস্থা ইহার কি কোন প্রতিকার নাই ? তাহারা কি স্বাধীন ভারতের অধিবাসী নহে ? তাহারা কি শাসনকর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে [illegible] প্রকার দয়াই পাওয়ার যোগ্য নয় ?"

শ্রীমুখাৰ্জ্জী এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই বেদনাময় পরিস্থিতিতেও স্বার্থান্বেষী কোন কোন রাজনৈতিক দল নিরীহ এবং দরিদ্র গ্রামবাসীদিগকে লইয়া রাজনৈতিক খেলা খেলিতে কুণ্ঠা বোধ করে না।

গ্রামবাসী যখন বুঝিবে অর্থাং শিক্ষিত লোকেরা তাহাদের বুঝাইবেন যে, "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ" তখনই তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইবে। সরকারের সবকিছু করা উচিত ইহা ঠিক, কিন্তু গ্রামবাসীর দারিদ্র্য আছে অতএব তাহাদের কর্ত্তব্য কিছুই নাই, ইহা ঠিক নয়। সরকারের বিরুদ্ধে অনুযোগ করাতেই কর্ত্তব্য কি শেষ হইয়া যায় ?

জঙ্গীপুর কলেজ উন্নয়ন লটারী

"ভারতী" পত্রিকার ১৮ই চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জঙ্গীপুর কলেজের অধ্যক্ষ ও সম্পাদক জানাইতেছেন যে, জঙ্গীপুর কলেজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নয়নকল্পে অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে সরকারের অনুমোদনক্রমে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক আগামী ২৩শে মে [illegible] লটারীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান বংসরে কলেজের ছাত্রসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় কলেজের ছাত্রাবাসে (ভাড়া বাড়ী) [illegible] সঙ্কুলান না হওয়ায় বহু ছাত্রকে ফিরাইয়া দিতে হইয়াছে। অবিলম্বে প্রতিকারের ব্যবস্থা না করিলে আগামী বংসর সমস্যার তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পাইবে। তদুপরি কলেজে বি-এ ক্লাশ খোলার একটি পরিকল্পনাও কর্ত্তৃপক্ষের আছে। এই অবস্থায় অবিলম্বে একটি ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ করা নিতান্ত প্রয়োজন। সরকার আংশিক সাহায্য দানে সম্মত হইয়াছেন, কিন্তু কলেজকেও ব্যয়ের কতকাংশ বহন করিতে হইবে। যদিও ছাত্রাবাস নির্ম্মাণই বর্ত্তমানে কলেজের প্রধান সমস্যা, তবুও ইহার সঙ্গেই কতকগুলি উন্নতিমূলক ব্যবস্থা করারও প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই সকল কাজের [illegible] যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন তাহা দিবার সামর্থ্য কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের [illegible]। তাই সরকারের অনুমতি লইয়া তাঁহারা লটারীর ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আসামের গ্রামে বিবাহ-কর

৩০শে মার্চ্চ তারিখের "হিতবাদ" পত্রিকায় প্রকাশিত ডিব্রুগড় হইতে প্রেরিত প্রেস ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়ার এক সংবাদে প্রকাশ যে, ডিব্রুগড় মহকুমার অধীন চাবুয়া গ্রামের পঞ্চায়েং নাকি বিবাহের উপর কর ধার্য্য করিয়াছে। গ্রাম্য-পঞ্চায়েতের এক সাম্প্রতিক সার্কুলারে বলা হইয়াছে যে, প্রতিটি প্রকাশ্য বিবাহের জন্য পাঁচ টাকা করিয়া কর দিতে হইবে। তবে গন্ধর্ব্বমতে বিবাহ হইলে আড়াই টাকা কর দিলেই চলিবে।

মধ্যপ্রদেশে দুর্নীতি

২৭শে মার্চ্চ মধ্যপ্রদেশ ব্যবস্থা সভায় শ্রীজে. পি. জ্যোংসির এক প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল জানান যে, ১৯৫২ সালে সরকারী কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে কর্ম্মে শিথিলতা এবং দুর্নীতির জন্য ৩৬২৮টি অভিযোগ সরকারের নিকট আসে। তন্মধ্যে ৫৯১টি ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করা হয় এবং ১২৩ জনের শাস্তি হয়।

২,৯১৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। ১৯৫৩ সালের হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই। ['হিতবাদ', ২৯।৩।৫৪]

২৯শে মার্চ বিধান সভায় উপযোজন (appropriation) বিলের সমালোচনা প্রসঙ্গে ঠাকুর প্যারেলাল সিং শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আনয়ন করেন। "হিতবাদ" পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণী হইতে জানা যায়, ঠাকুর প্যারেলাল সিং বলেন যে ঐদিন সকালে জনৈক ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একটি উত্তরপত্র (answer book) তাঁহার দিকে ছুঁড়িয়া দেয়। ঐ উত্তরপত্রটি বনবিভাগের জনৈক পরীক্ষার্থীর। উক্ত পরীক্ষার্থী ১১ নম্বর পাইয়া পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয়। এই সংশোধনগুলি লাল কালিতে করা হইয়াছিল। কিন্তু পরে তাহার নম্বর বৃদ্ধি করিয়া ২২ করিয়া দেওয়া হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে, বালকটি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। পরের সংশোধনগুলি নীল কালিতে করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত শুক্ল তাঁহাকে প্রশ্ন করেন যে, শ্রীসিংহ মন্ত্রী-মহোদয়কে উত্তরপত্রটি দেখাইতে পারেন কিনা। উত্তরে শ্রীসিংহ তৎক্ষণাৎ পাতাখানি বাহির করিয়া দেখান।

আসামে শ্রীহট্ট হইতে আগত কর্মচারী

"যুগশক্তি"র বিশেষ প্রতিনিধি উক্ত পত্রিকার ১২ই চৈত্র সংখ্যায় লিখিতেছেন, "দেশবিভাগের সময় সরকারের নিশ্চিত আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া যে সকল সরকারী কর্ম্মচারী ভারতীয় ইউনিয়নে চাকুরী করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন পরবর্তী কালে তাঁহাদের অনেকের ভাগ্যেই বহু লাঞ্ছনা ঘটিয়াছে। বহু-সংখ্যক কর্ম্মচারীর পক্ষে পুনরায় সরকারী চাকুরী লাভ করাই সম্ভবপর হয় নাই। আর যাঁহারা বা চাকুরী লাভে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহারাও সমশ্রেণীর অন্যান্য সহকর্ম্মিগণের অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা লাভে সমর্থ হন নাই।"

দেশবিভাগের পর প্রথম দিকে শ্রীহট্ট হইতে আগত সরকারী কর্ম্মচারিগণ অপরাপর সরকারী কর্ম্মচারীদের ন্যায় সকল সুযোগ-সুবিধাই পাইতেন। ১৯৪৮ সালে পে-কমিশনের নির্দ্দেশমত তাঁহাদেরও প্রারম্ভিক বেতন ইত্যাদি বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু অতঃপর কাছাড় জেলার সরকারী কর্ম্মচারীদের এক-চতুর্থাংশকে যখন আপার ডিভিশনে রূপান্তরিত করা হয় তখন কাছাড়ের তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার মহাশয় চিরাচরিত নীতি পরিত্যাগ করিয়া নিজের অভিপ্রায়মত [illegible]গুলিতে কর্ম্মচারী নিয়োগ করেন। "অবশ্য শ্রীহট্ট হইতে আগত [illegible]চারীদের মধ্যে নামেমাত্র কয়েকজনকে গ্রহণ করা হইলেও যাঁহাদের [illegible] যোগ্যতা এবং সিনিয়রিটির বলে ন্যায়সঙ্গত তাঁহাদের সকলকেই উপেক্ষা করা হইয়াছে।" ইহার ফলে স্বভাবতঃই কর্ম্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং প্রায় ত্রিশ জন কর্ম্মচারী স্বতন্ত্রভাবে আসাম সরকারের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া আপীল করেন। কিন্তু তাহার পর প্রায় চারি বৎসর অতীত হইলেও সরকার সেই আপীলগুলি সম্পর্কে তাঁহাদের মতামত জানান নাই। ফলে এই সকল হতভাগ্য কর্ম্মচারী [illegible] বিশেষ অনিশ্চয়তার মধ্যে কালযাপন করিতে হইতেছে।

কিন্তু ইহাতেই অবিচারের শেষ হয় নাই। [illegible] প্রতিনিধির সংবাদ অনুযায়ী শীঘ্রই নাকি কাছাড়ের [illegible] কমিশনার এবং তাঁহার অধীনস্থ সকল আপিসের কর্ম্মচারীদের একটি গ্রেডেশন তালিকা প্রস্তুত হইবে। এই তালিকায় সিনিয়রিটির প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে নির্দ্ধারিত হইবে। শ্রীহট্ট হইতে আগত কর্ম্মচারীদের দেশ-বিভাগের পূর্ব্বের চাকুরীকাল নাকি সেই তালিকা প্রণয়নের সময় অগ্রাহ্য করা হইবে। উক্ত প্রতিনিধি লিখিতেছেন যে, এই ব্যবস্থা "কার্য্যকরী হইলে বর্ত্তমানে যাহাদের চাকুরীর মেয়াদ মাত্র সাত-আট বৎসর হইয়াছে পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসরের অভিজ্ঞ কর্ম্মচারিগণও তাহাদের জুনিয়র হইয়া পড়িবেন। অবশ্য কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার শুধু যে আপন বিচারবুদ্ধি অনুসারেই এই বৈষম্যমূলক আচরণ করিতেছেন তাহা মনে হয় না; এই সম্পর্কে হয়ত সরকারের কোন ইঙ্গিতও রহিয়াছে।"

তৃতীয়তঃ শ্রীহট্ট হইতে আগত স্থায়ী কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে স্থায়ীপদের স্বল্পতার জন্য যাঁহাদিগকে অস্থায়ী চাকুরী দেওয়া হইয়াছে কাছাড়ে স্থায়ী পদ খালি হইলেও তাঁহাদিগকে সেই পদে নিযুক্ত করা হইতেছে না।

চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির অবস্থা

২৪শে মার্চ এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান" লিখিতেছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক সপ্তাহে দূরপ্রাচ্য এবং চীনে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা বাহিরে প্রচার লাভ করে নাই। প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি হইতেছে, ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশন। ইহার সর্ব্বশেষ অধিবেশন হয় ১৯৫০ সালের জুন মাসে কোরীয় যুদ্ধারম্ভের ঠিক পূর্ব্বে। ফেব্রুয়ারী অধিবেশনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন মিঃ লিউ শাও-চি; ইনি কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারী। উক্ত পত্রিকার অভিমতে লিউ শাও-চি "সভায় যে দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন তাহাতে পার্টির মধ্যে বহিষ্করণের প্রচ্ছন্ন হুমকি থাকে।

"তিনি কয়েকজন উচ্চপদস্থ সভ্যের অতিরিক্ত আত্মাভিমান সম্পর্কে অভিযোগ করিয়া বলেন, 'তাঁহারা ব্যক্তিকে খুব বেশী বড় করিয়া দেখিয়াছেন এবং ব্যক্তির মর্য্যাদার উপর বড় বেশী গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন এই বিরাট বিশ্বে তাঁহাদের সমকক্ষ কেহ নাই। তাঁহারা কেবল খোশামোদ এবং প্রশংসাই শুনিতে চান, সমালোচনা এবং কোনরূপ অধীনতা সহিতে পারেন না, তাঁহারা কোথাও কেহ সমালোচনা করিলে তাঁহার টুঁটি চাপিয়া [illegible]তে চান এবং নিজেদের নেতৃত্বাধীন অঞ্চল বা বিভাগকে ক[illegible]তে চান নিজেদের একটি স্বাধীন 'রাজ্য'।"

কেন্দ্রী[illegible] স্থির করেন যে, বর্ত্তমান বৎসরেই পার্টির একটি সম্মেলন আহ্বান করা হইবে। পার্টির বর্ত্তমান সভ্যসংখ্যা ৬৫ লক্ষ।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি হইতেছে চীন-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর-সম্পর্কিত চতুর্থ বার্ষিক উৎসব পালন। পত্রিকাটি লিখিতেছে "ইহা সাধারণ পর্যবেক্ষকদের নিকট খুব বেশী সুখকর হয় না, সিরণ ষ্টালিনের মৃত্যুর পর তাঁহারা অনেকেই আশা করিয়াছিলেন একটা পরিবর্তন হয়ত হইবে, এবং চীন হয়ত ইহার পর আর রাশিয়ার তাঁবেদারী করিবে না। সভায় বক্তারা মস্কোর উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাকেন এবং চীনকে সাহায্য করার জন্য রুশ উপদেষ্টার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে থাকেন।" বক্তারা বলেন, চীন তাহার নূতন নূতন কারখানার জন্য রাশিয়া হইতে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম গ্রহণ করিতেছে তাহার মূল্য আমেরিকা এবং ব্রিটেনে প্রস্তুত যন্ত্রপাতির মূল্যের তুলনায় শতকরা ২০ হইতে ৩০ ভাগ কম।

এই প্রসঙ্গে পত্রিকাটি ফরমোসার কুয়োমিনটাং দলের আভ্যন্তরীণ বিরোধের কথারও উল্লেখ করেন। ২১শে মার্চ চিয়াং দ্বিতীয় ব্যালটে ফরমোসায় অবস্থিত জাতীয়তাবাদী চীনা গবর্ণমেণ্টের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। প্রথম ব্যালটে তাঁহার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা সম্ভব হয় নাই। চিয়াঙের এই বিপর্য্যয়ের কারণ ফরমোসার প্রাক্তন শাসনকর্তা ডাঃ কে. সি. উ সংক্রান্ত ঘটনাটি।

ডাঃ উ স্বেচ্ছায় ফরমোসা ত্যাগ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া যান। মার্চ মাসের মাঝামাঝি চিয়াঙের নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পূর্ব্বে ডাঃ উ ফরমোসা সরকারের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণ এবং দুর্নীতির কতকগুলি অভিযোগ প্রকাশ্যভাবে উত্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, ফরমোসা একদলীয় রাষ্ট্র হইয়া আছে। চিয়াং কাইশেক তাঁহার পুত্র চিয়াং চি-কুওর জন্য ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার করিতেছেন এবং এখনও ফরমোসায় গুপ্ত পুলিস সক্রিয় রহিয়াছে ও কঠোরভাবে সংবাদপত্রগুলি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ডাঃ উও বলেন যে, ফরমোসায় নাকি তাহাকে একবার হত্যা করিবার চেষ্টাও হইয়াছিল।

মিশরের ঘটনাবলী

মিশরের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান" ৩০শে মার্চ লিখিতেছেন, সম্প্রতি মিশরে যে সকল অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটিতেছে তাহা বুঝিতে হইলে ফারুকের সিংহাসনচ্যুতির সময় হইতে যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

সামরিক পরিষদ এক দুর্নীতিপরায়ণ রাজা এবং দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিকদের অপসারিত করেন। প্রায় দুই বৎসর যাবৎ তাঁহারা এক সামরিক সরকার চালাইয়া যাইতেছেন। এই সরকার প্রায় কোন রক্তপাত করেন নাই বলিলেও চলে। সামরিক পরিষদের প্রায় সকল নেতাই এখনও জনসাধারণের নিকট প্রিয় রহিয়াছেন। এগুলি তাহাদের পক্ষে খুবই কৃতিত্বের বিষয়। কিন্তু সামরিক সরকার মাত্রই অস্থায়ী হইতে বাধ্য। এই বৎসরের গোড়ার দিকে বেসামরিক সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা সুসংহত অংশগুলি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধতা করেন; কিন্তু সামরিক পরিষদ কোন নূতন রাজনৈতিক কাঠামো গঠন করিবার প্রচেষ্টা দেখান নাই। সরকারকে অধিকতর আইনসঙ্গত এবং স্থায়ী রূপ প্রদানের জন্য সামরিক পরিষদের প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবেই ২৪শে ফেব্রুয়ারী এবং তৎপরবর্ত্তী ঘটনাগুলি ঘটিয়াছে।

পত্রিকাটির মতে জেনারেল নেজীব এবং কর্ণেল নাসের উভয়ের সমাধানই সমান নিরুৎসাহজনক। নীতির দিক হইতে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার পুনঃপ্রচলন উত্তম, কিন্তু পুরাতন রাজনীতিকদের প্রত্যাবর্ত্তনে কেই-বা উৎসাহী হইতে পারেন? সৈন্যবাহিনীর একটি অংশ ক্রুদ্ধ হওয়াতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই; তাঁহারা প্রশ্ন করিতেছেন, বিপ্লবের উদ্দেশ্য কি ছিল? কিন্তু কর্ণেল নাসেরের সমাধান কি উৎকৃষ্টতর? ২৯শে মার্চ যে মিটমাট ঘোষণা করা হইয়াছে তাহার ফলে সামরিক পরিষদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবে কিন্তু বর্ত্তমান গণ্ডগোলের কারণ তাহাতে লোপ পায় নাই। এই অবস্থায় একটি বিপদের সম্ভাবনা এই যে, হয়ত বর্ত্তমানের নম্র একনায়কত্বের স্থানে রূঢ় একনায়কত্ব দেখা দিতে পারে।

"ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান" মনে করেন যে, জেনারেল নেজীব ও কর্ণেল নাসেরের মধ্যে বর্ত্তমান সংগ্রামের ফলাফল যাহাই হউক না কেন, স্পষ্টতঃই পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন ঘটিবে। মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র এবং বিশেষভাবে সুদানে ইহার পরিণতি অনুভূত হইবে। এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে একটি প্রশংসনীয় জিনিষ চোখে পড়ে। নেজীব অথবা নাসের কেহই এই সংগ্রামে সভ্যতার গণ্ডী অতিক্রম করেন নাই। এই জন্য তাঁহারা শ্রদ্ধার্হ।

আফ্রিকায় ঔপনিবেশিকতা

মিঃ উইলফ্রেড ওয়েলক গত ডিসেম্বর মাসে লণ্ডনের "পীস নিউজ" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৩ই মার্চের "হরিজন পত্রিকা"য় উক্ত শিরোনামা দিয়া প্রবন্ধটির একটি বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটিতে ঔপনিবেশিকতার উচ্ছেদ সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিতেছেন যে, পূর্ব্বগত অর্থব্যবস্থার ফলে "গুটিকয়েক পাশ্চাত্য দেশে রূপকথার সমান ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত হয় এবং উহার মূল্যস্বরূপ পৃথিবীর কোটি কোটি অশ্বেতকায় অধিবাসীদিগকে অনশনে, অর্দ্ধাশনে ভয়াবহ দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটাইতে হয়। দরিদ্র মানুষের শ্রমশক্তি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণের অবসান হইলে অনেকগুলি পাশ্চাত্য দেশের ব্যবসায়ে লাভের অঙ্ক কমিবে এবং তাহাদের জীবনযাত্রার মান নামিয়া যাইবে। অশ্বেতকায়-অধ্যুষিত দেশগুলি জাগিয়া উঠিয়াছে এবং একযোগে কাজ করিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে। তাহারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দাবী করিতেছে এবং সেই উদ্দেশ্যে কৃষিশিল্প সংযুক্ত এমন অর্থব্যবস্থা রচনা করিতে চায় যাহাতে প্রত্যেক অঞ্চল যথাসম্ভব

স্বাবলম্বী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারিবে। কম্যুনিষ্ট মতবাদ অশ্বেতকায় দেশগুলির পক্ষে সাহায্য করিতেছে।…"

উপনিবেশগুলিতে যে বিরাট গণ-আন্দোলনের ঢেউ জাগিয়াছে তাহাতে ঔপনিবেশিক শক্তিবর্গের মনে ভয় ঢুকিয়াছে যে, তাহাদের শিল্পের জন্য কাঁচামালের যোগান বিপন্ন হইয়া পড়িবে। "এই ত্রাসের ফলে পাশ্চাত্য জাতিগুলির দুনিয়ায় যেখানে যেটুকু অর্থনৈতিক প্রভুত্ব বিদ্যমান আছে তাহা তাহারা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চায় এবং তজ্জন্য নানা আপোষরফা করিতে তাহারা প্রস্তুত।"

লেখকের অভিমতে আফ্রিকার সমস্যা একদিক হইতে অদ্বিতীয়। গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিকা মহাদেশের অধিকাংশ স্থানই শ্বেতকায়দের পক্ষে বসবাসের অযোগ্য। কিন্তু উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য-দক্ষিণ এবং কেনিয়ার উচ্চভূমি প্রভৃতি অঞ্চলে তাহারা বসতি করিতে পারে এবং করিতেছেও। এই সমস্ত অঞ্চলের সেরা চাষযোগ্য জমিগুলি শ্বেতকায়গণ বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছে। লেখক কেনিয়ার দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন, "কেনিয়াতে কয়েক সহস্র শ্বেতকায় বসতিকারীরা দেশের সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর উচ্চভূমির লক্ষ লক্ষ একর জমিদারীর মালিক এবং তাহারাই দেশের রাজনীতির হর্ত্তাকর্ত্তা।

"ঐ সকল উর্ব্বর জমি কাফ্রী মালিকদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে নিকৃষ্ট জমিতে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

"আজ যাহারা মাউ মাউ দলভুক্ত তাহাদের অনেকের পূর্ব্বপুরুষ এই অত্যাচারের ভুক্তভোগী ছিল।

"কাফ্রীদের এই দাসত্বের মধ্যে যে আশাভঙ্গ, অপমান এবং জাতিগত অসম্মানের ভাব বহন করিতে হয় তাহাই মাউ মাউয়ের দুঃখজনক বিস্ফোরণের অন্যতম কারণ বলা হয়।"

মিঃ ওয়েলক লিখিতেছেন, "কেনিয়া এবং মধ্য-আফ্রিকায় রাজনৈতিক সংস্কার প্রবর্ত্তনের বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু বাস্তব কল্যাণকর্ম্ম সুদূরপরাহত করিয়া রাখা হইয়াছে। এজন্য কর্তৃপক্ষের ঐ সকল সংস্কারের প্রতিশ্রুতির উপর কাফ্রীদের সকল আস্থা বিনষ্ট হইয়াছে।

"প্রস্তাবিত রাজনৈতিক সংস্কার তলাইয়া দেখিলে এক সুপরিচিত চিত্র উহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ চিত্রই হইল এই: অল্প মজুরি উপার্জ্জনকারী বহুসংখ্যক মজুরদের উপরে মুষ্টিমেয় শ্বেতকায়দের একটি অভিজাতশ্রেণী থাকিবে এবং মধ্যে বুদ্ধিমান জনকয়েক কাফ্রীকে লইয়া একটি ক্ষুদ্র মধ্যবিত্তশ্রেণী থাকিবে। মধ্যশ্রেণী এই অর্থনৈতিক রচনার ভারসাম্য রক্ষা করিবে।

"কেনিয়ার উচ্চভূমিগুলি দেশের কৃষিকর্ম্মের প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ হইবে এবং শ্বেতকায়দিগের অধিকারভুক্ত থাকিবে। আর্থিক, রাজনৈতিক পরিচালনা ক্ষমতা শ্বেতকায়দিগের হাতে থাকিবে, নামে মাত্র কয়েকজন কাফ্রীকে সাক্ষীগোপাল করিয়া রাখা হইবে।

"এই প্রকার বন্দোবস্ত চলিতে পারে না। কাফ্রীরা ইহা স্বীকার করিবে না। কাফ্রী নেতৃবৃন্দ বুঝিয়াছেন যে, ইহাতে সমস্যার মূলের কোন মীমাংসাই হইবে না।"

মিঃ ওয়েলক বলিতেছেন যে, কেবলমাত্র আফ্রিকাবাসীদিগকে তাঁহাদের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণাধীনে স্বকীয় জীবনধারা রচনা করিবার অধিকার দিলেই আফ্রিকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং তাহার ফলে বিশ্বশান্তির পথও সুগম হইবে।

ইন্দোচীন

বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিতে ইন্দোচীন এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অর্জ্জন করিয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত ইন্দোচীনের সংগ্রাম বহুলাংশে ফ্রান্স এবং ইন্দোচীনের জাতীয়তাবাদের মধ্যে ঘরোয়া সংগ্রাম হিসাবেই ছিল, যদিও ইন্দোচীনের সংগ্রামের জন্য ফরাসীদের যে পরিমাণ অর্থব্যয় হইতেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বহন করিতেছিল।

গত জানুয়ারী মাসে বার্লিনে চতুঃশক্তি বৈঠকে যখন স্থির হয় যে, জেনেভা সম্মেলনে ইন্দোচীন-সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনা হইবে তখন অনেকেই আশান্বিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সম্মেলন যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছে কোন মিটমাটের আশা ততই যেন সুদূরপরাহত হইতেছে। গত ১৯শে মার্চ্চ মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব জন ফষ্টার ডালেস বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনক্রমেই ইন্দোচীনে ফ্রান্সকে পরাজিত হইতে দিতে পারে না।

৬ই এপ্রিল মার্কিন বৈদেশিক কার্য্যক্রম দপ্তরের (Foreign Operations Administration) ডিরেক্টর মিঃ হ্যারল্ড ষ্ট্যাসেন জানান যে, ১লা জুলাই হইতে যে অর্থনৈতিক বৎসর সুরু হইবে তাহার বাজেটে বৈদেশিক সাহায্য কর্ম্মসূচীর জন্য যে ৩,৪৯৭,৭০০,০০০ ডলার বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহার এক-তৃতীয়াংশ ইন্দোচীনের সংগ্রামের জন্য দেওয়া হইবে। তিনি প্রতিনিধি সভার বৈদেশিক বিষয়ক কমিটিকে জানান যে, ইন্দোচীনের সংগ্রাম অদূরভবিষ্যতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার দিক হইতে সবিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। উক্ত বাজেটে ইন্দোচীনের জন্য বরাদ্দ প্রায় ১১৩ কোটি ৩০ লক্ষ ডলারের মধ্যে ৮০ কোটি ডলার ব্যয়িত হইবে তথায় যুদ্ধরত ফরাসী বাহিনীর সাহায্যের জন্য, প্রায় ৩০ কোটি ডলার দেওয়া হইবে বিমান, ট্যাঙ্ক, কামান, বন্দুক এবং কার্ত্তুজ প্রভৃতি সামরিক অস্ত্রশস্ত্রের জন্য। ইতিমধ্যেই একটি মার্কিন সামরিক উপদেষ্টা বাহিনী তথায় পৌঁছিয়াছে।

ইন্দোচীনের সংগ্রামের একটি দিক খুবই পরিষ্কার যে ইন্দোচীনের জনসাধারণ আর ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের অধীন থাকিতে চায় না। গত সাত বৎসরের সংগ্রামে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। বাও-দাইকে শিখণ্ডীরূপে খাড়া করিয়া প্রভুত্ব বজায় রাখিবার যে চেষ্টা ফরাসীরা করিয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইন্দোচীনে ফরাসীদিগকে যে সামরিক বিপর্য্যয়ের মুখে পড়িতে হইয়াছে ইহা সেই ব্যর্থতারই নিদর্শন।

অপরদিকে ডাঃ হো-চি-মিনের নেতৃত্বে ভিয়েৎনামের মুক্তিফৌজ

যে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছে তাহাতে ভিয়েৎনামের জনসাধারণের সমর্থন আছে—ইহা অস্বীকারের উপায় নাই। লণ্ডন "টাইম্‌স্‌" পত্রিকায় বলা হইয়াছে যে, যদি ইন্দোচীনে একটি শান্তিচুক্তির পর নির্বাচন হয় তবে নিঃসন্দেহে ডাঃ হো-চি-মিন বিনা রক্তপাতে জয়লাভ করিবেন।

ফরাসী কর্তৃপক্ষও যে এই পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন তাহা প্রধানমন্ত্রী লানিয়েলের বিবৃতি হইতেই বুঝা যায়। সম্প্রতি ফরাসী জাতীয় পরিষদে ইন্দোচীন সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ১৯৫৩ সালে কেহ কেহ আলোচনার মাধ্যমে বিরোধের অবসান চাহিতেন, আবার কেহ চাহিতেন সশস্ত্র শক্তির মাধ্যমে; কিন্তু এখন সকলেই আলোচনার মাধ্যমে মিটমাটের পক্ষপাতী।

কিন্তু ফরাসী সরকার অন্তরের কথা বলেন নাই। ফ্রান্সের জনসাধারণের মধ্যে ইন্দোচীন লড়াইয়ের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিকূলতার জন্যই মুখে তাহাদিগকে শান্তির বুলি আওড়াইতে হয়। সুইডিশ পত্রিকা "এক্সপ্রেসের" প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে ডাঃ হো-চি-মিন ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতির জন্য যে আহ্বান জানান তাহার উত্তরে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী এমন সব সর্ত আরোপ করেন যে তাহা বিনাসর্তে আত্মসমর্পণেরই নামান্তর। তাঁহারা ভাল করিয়াই জানেন যে, ডাঃ হো-চি-মিন কোনক্রমেই ঐরূপ সর্ত মানিয়া লইতে পারেন না।

প্রকৃতপক্ষে ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই ঐ বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। অনুরূপ ভাবে পণ্ডিত নেহরু যুদ্ধবিরতির যে আবেদন করেন ফরাসী সরকার তাহাও অগ্রাহ্য করেন।

ইহাতে মার্কিন মহল তুষ্ট হইবার কথা। কারণ ইন্দোচীনে যুদ্ধ চলিলেই তাহাদের স্বার্থরক্ষায় বিশেষ সাহায্য হয়। ইন্দোচীনে ফরাসীদের একা সংগ্রাম চালাইবার ক্ষমতা নাই। যুদ্ধ চালাইতে হইলে ফ্রান্সের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভর করা ব্যতীত কোন উপায় নাই। ফরাসীদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও মার্কিন চাপে তাহারা বাও-দাইকে মানিয়া লইয়াছে। মার্কিন সরকার এখন চাপ দিতেছেন যে, ইন্দোচীনে এখন হইতে যে সকল সামরিক দ্রব্য প্রেরণ করা হইবে তাহা ফ্রান্সের মারফত না দিয়া ইন্দোচীনের সহযোগী রাষ্ট্রগুলিকে দেওয়া হইবে যাহাতে সেই সকল রাষ্ট্র সরাসরি ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য মানিয়া লয়।

ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিস

ব্রিটিশ সরকারের ষ্টেশনারী ডিপার্টমেণ্ট কর্তৃক নবপ্রকাশিত মিঃ উইন গ্রিফিথ লিখিত "দি ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিস" শীর্ষক পুস্তকটির সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ আর্নেষ্ট অ্যাটকিন্সন লিখিতেছেন, "সরকারী চাকুরের আইনগত (statutory) সংজ্ঞা কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। পাঠকদের অনেকে তাহা স্পষ্টভাবে জানিতে চাহিবেন। এ সম্পর্কে শুধু বলা যাইতে পারে যে, আধুনিককালে ইহার অর্থ ব্যাপকতর হইয়াছে। চিরাচরিত অফিসার বা কেরাণী অর্থে আর ইহা ব্যবহৃত হয় না।" বর্তমানকালে অর্থনীতিক, কৃষিবিদ, বিজ্ঞানী, সাংবাদিক, সমাজকল্যাণকর্মী, শিক্ষাবিদ, ঐতিহাসিক, আইনজীবী প্রভৃতি সর্ববিভাগীয় বিশেষজ্ঞগণই সরকারী চাকুরের তালিকায় পড়েন। "যে রাজনৈতিক দলই দেশের শাসনভার গ্রহণ করুক না কেন ইঁহারা ব্যক্তিগতভাবে কিংবা সমষ্টিগতভাবে গবর্ণমেণ্টকে সকল সময় সর্বাবস্থায় যথাসাধ্য শক্তি এবং বুদ্ধি দিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।"

মিঃ অ্যাটকিন্সন লিখিতেছেন "কোন দায়িত্বশীল লোকই যে সিভিল সার্ভিসের নিরপেক্ষতা এবং শিক্ষা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তুলিবে না এ কথা প্রায় জোর করিয়াই বলা চলে।"

ব্রিটেনের জনসংখ্যা প্রায় ৫ কোটি, তন্মধ্যে চাকুরিয়ার সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৩৫ লক্ষ। ইহাদের মধ্যে সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ ৬৬ হাজার এবং এক ডাক বিভাগেই কাজ করেন প্রায় আড়াই লক্ষ কর্মচারী।

চাকুরীর সর্ত এবং অন্যান্য ব্যাপারে সরকারের সহিত সময় সময় কর্মচারীদের বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে তাহার নিষ্পত্তির ব্যবস্থাও আছে। ২০ বৎসর অন্তর একটি রাজকীয় কমিশন সিভিল সার্ভিসের মাহিনা সম্পর্কিত অবস্থা পরীক্ষা করেন। ১৯৫৩ সনে এইরূপ একটি রয়াল কমিশন নিয়োগ করা হইয়াছে। সিভিল সার্ভিসে বহুকালের একটি অভিযোগ হইল এই যে, নারী কর্মচারিগণ মাহিনা সম্পর্কে পুরুষের সমান অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। বর্তমান রয়াল কমিশন এ সম্পর্কে তাঁহাদের অভিমত জানাইবেন।

মিঃ অ্যাটকিন্সন লিখিতেছেন, প্রথম মহাযুদ্ধের পর নিয়োগকর্তা হিসাবে রাষ্ট্র এবং চাকুরে ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে এক নূতন সম্পর্ক দেখা দেয়। সরকারী কর্মচারীদের বিভিন্ন সমিতিকে গবর্মেণ্টের স্বীকৃতিলাভের জন্য বহুকাল ধরিয়া সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হয়, যাহাতে এই সকল সংগঠন গবর্মেণ্টের সহিত চাকুরেদের পক্ষ হইতে প্রত্যক্ষ আলাপ-আলোচনার সুযোগলাভ করে, তাহারা এই সংগ্রামে ক্রমশঃ সাফল্য লাভ করে।

ট্রান্সভালে ভারতীয়দের ছায়াছবি দর্শনে বাধা

"ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন" পত্রিকার ১৯শে ফেব্রুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ, আফ্রিকাস্থিত ট্রান্সভালের হাইডেলবার্গে অবস্থানকারী ভারতীয় এবং চীনা সম্প্রদায় স্থানীয় প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশের অধিকারের জন্য যে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন তাহা প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। পূর্বে ভারতীয় এবং চীনদেশীয়দের সিনেমাগৃহে প্রবেশের অধিকার ছিল, কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্বে এই অধিকার হরণ করা হয়। পৌরসংসদের (Town council) নিকট অনুরোধ জানান হইয়াছিল যেন সিনেমা-গৃহের অভ্যন্তরে একটি পার্টিশান দিয়া জাতিবৈষম্য নীতি বজায় রাখিয়া এশিয়াবাসীদিগকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়; কিন্তু পৌরসংসদ সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। উপরন্তু শহরের ব্যাঙ্ক এবং পোষ্ট-আপিসগুলিতেও যাহাতে জাতিবৈষম্য নীতি চালু হয় সেই বিষয়ে কার্য্যকরী ব্যবস্থা শীঘ্রই গৃহীত হইবে। পৌরসংসদ এই ব্যাপারে দৃঢ় সমর্থন জানাইয়াছেন।

গান্ধীবাদ

শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

মহাত্মা গান্ধীর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লুই ফিশার এক জায়গায় বলেছেন, "গান্ধীজীর বিবৃতির আগাগোড়া না পড়ে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করে বিকৃত অর্থ খুঁজে বার করতে বিরুদ্ধবাদীদের বিশেষ কষ্টই হয় না।" বাস্তবিক দেশে-বিদেশে কেউ কেউ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে অথবা অজ্ঞানতা-বশতঃ গান্ধীবাদের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। অধুনা শ্রীযুক্ত অম্লান দত্ত তাঁর বিখ্যাত 'ফর ডেমোক্রেসী' নামক বইয়ে গান্ধীবাদের যে সমালোচনা করেছেন তাতেও এই রকম মারাত্মক ত্রুটি ঘটেছে। গান্ধীজী ও গান্ধীবাদ সম্পর্কে তিনি তিনটি মূল প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। প্রথম, গান্ধীজী উদার-মনা ছিলেন না, তাঁর প্রকৃতি যুক্তিবাদী ছিল না এবং তিনি সামাজিক পরিবর্ত্তনের গতি বুঝবার চেষ্টা করেন নি; দ্বিতীয়, গান্ধীজীর মানবতাবাদ রহস্যবাদে (Mysticism) ও অযৌক্তিকতায় ভরা; তৃতীয়, গান্ধীবাদে ধনী ও জমিদার-হীন কোন অর্থ নৈতিক কাঠামোর ইঙ্গিত নেই এবং সেই জন্যই গান্ধীবাদ শাসকশ্রেণীর উচ্ছেদ-পরিকল্পনার প্রতিবন্ধক রূপে প্রযোজিত হয়।

গান্ধীজী চাইতেন না যে, তাঁর মৃত্যুর পর গান্ধীবাদ বলে কোন মতবাদ প্রচলিত থাকুক। নূতন কিছু উদ্‌ভাবন করেছেন, এমন অহমিকাও তাঁর ছিল না। মানুষের বিবিধ সমস্যায় ও দৈনন্দিন জীবনে শাশ্বত সত্যের প্রয়োগ করেছেন, এইটুকুই ছিল তাঁর দাবি। তবু কয়েকটি মূল কথা গান্ধীবাদ বলে প্রচলিত হয়েছে। গান্ধীজী তাঁর জীবনকেই তাঁর বাণী বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই জন্য গান্ধীবাদ বুঝতে হলে তাঁর দীর্ঘ জীবনের ঘটনাপ্রবাহ এবং রচনাই একমাত্র স[illegible]া। গান্ধীবাদের ভাষ্যের প্রয়োজন নেই।

গান্ধীবাদে অতিনিশ্চয়তা (dogma) অথবা পক্ষ-পাতিত্বের কোন স্থান নেই। গান্ধী-জীবনেও তাই আপাত-অসঙ্গতিপূর্ণ বহু ঘটনা ঘটেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ইংরেজের পক্ষে ভারতীয় সেনা সংগ্রহ করেছিলেন, আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনিই 'কুইট ইণ্ডিয়া' ঘোষণা করেন। গান্ধীজী যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিলেন, তবু হিংসার দ্বারা ভারতকে স্বাধীন করতে তিনি চান নি। কেননা হিংসার দ্বারা সত্যকারের স্বরাজ আসতে পারে না, এই ছিল তাঁর ধারণা। তাঁর হৃদয়ের উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়, যখন নেতাজী ভারতের বাইরে গিয়ে ইংরেজ-শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতকে স্বাধীন করার পরিকল্পনার বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, এই পদ্ধতিতে ভারতের মুক্তিলাভ সম্ভবপর বলে তিনি মনে করেন না, তবু নেতাজী যদি এতে সক্ষম হন তবে গান্ধীজীই তাঁকে প্রথমে অভিনন্দিত করবেন।

গান্ধীজীর জীবন হ'ল কর্ম্মের জীবন। তিনি বই লিখে তাঁর মতবাদ প্রচার করেন নি। কাজের মধ্য দিয়েই তাঁর চিন্তাধারার মূল ভাবটি প্রকাশিত হয়েছে। তাই একবার যে-কথা বলেছেন পরে পরিস্থিতির পরিবর্ত্তনে তিনি কার্য্য-ক্রমেরও পরিবর্ত্তন করেছেন। এতেই তাঁর যুক্তিবাদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে গিয়ে কেউ যদি ম্লান হয়ে যায়, তাতে গান্ধীজীর অনুদারতার প্রমাণ হয় না; বস্তুতঃ এ রকম ঘটনা ত গান্ধীজীর জীবনে অনেক ঘটেছে। তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে এসে কেউ কেউ বিরুদ্ধ মত প্রকাশ না করেই চলে গেছেন। গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বে তাঁরা অভিভূত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু তাঁর নিজের মনে প্রত্যেক বিষয়েই পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তির দ্বন্দ্ব অনুক্ষণ চলতে থাকত। লুই ফিশারের একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—"গান্ধীজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ-আলোচনার সময় তাঁর একটি বিশেষ রূপ নজরে পড়ে। কোন প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় তিনি নিজেকে একেবারে প্রকাশ করেন এবং দর্শকেরা তাঁর মনের আনাচে-কানাচে যে বিরাট ভাবের আলোড়ন চলেছে তার সত্য রূপ দর্শন করে স্তম্ভিত হয়ে যায়।"

গান্ধীজীবনের বহু ঘটনা তাঁর চারিত্রিক উদারতা ঘোষণা করে। একবার আশ্রমে একটি যুবক অসুস্থ হয়ে পড়ে। গান্ধীজী নিয়মিত তার কাছে আসতেন। একদিন যুবকটি গান্ধীজীর কাছে তার গোপন ইচ্ছা প্রকাশ করে। আশ্রমবাসীদের চা বা কফি খাওয়া বারণ ছিল। কিন্তু যুবকটি কফিই খেতে চায়। গান্ধীজী দেখলেন আশ্রমের অন্যান্য লোকেরা বিশ্রাম করছেন। তিনি নিজেই কফি তৈরি করে যুবকটিকে দিলেন। আর একবার, নোয়াখালীতে গান্ধীজী অধ্যাপক নির্ম্মলকুমার বসুকে, তিনি মাছ খান কিনা, এই [illegible] করেন। অধ্যাপক মশাই নিরামিশাষী নন এবং গান্ধী[illegible]র পক্ষে মাছ খাওয়া স্বাভাবিক বলেই ঘোষ[illegible]। সেখানে কয়েকজন অ-বাঙালী বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা গান্ধীজীর এই কথায় বিচলিত হন এবং প্রশ্ন করেন মাছ খাওয়া কি প্রাণিহত্যা নয়?

গান্ধীজী উত্তর দেন, প্রাণিহত্যা ঠিকই তবে খাদ্যে ভেজাল মেশানো অপেক্ষা অল্প ক্ষতিকর।

গান্ধী-জীবনের ও গান্ধীবাদের মূল সূত্র হ'ল প্রেম। তাঁর চরিত্রে [illegible] ছিল কিন্তু অযৌক্তিক উদারতার স্থান ছিল না। আইনসভা বয়কট আন্দোলনের স্রষ্টা গান্ধীজী। কিন্তু প্রয়োজন বোধ করলে আইনসভা প্রবেশের নির্দেশও তিনি দেন—'আইনসভা বয়কট কখনই সত্য ও অহিংসার মত চিরন্তন নীতি হতে পারে না।' কোন কিছুর অন্ধ অনুসরণ তিনি অস্বীকার করতেন। ঈশ্বরপ্রেম তাঁর জীবনে প্রধান ছিল। কিন্তু 'যে ধর্ম্ম নীতিবিরোধী এবং যা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়' তাকে তিনি বাতিল বলেই গণ্য করতেন। তিনি লিখেছেন, 'আমি যদি কোন ব্যক্তিকে যুক্তির দ্বারা বিশ্বাস করাতে না পারি, তবে আমি তাকে আমার অনুসরণ করতে বলব না। শাস্ত্র যতই প্রাচীন হউক না কেন, তা যদি আমার বুদ্ধির কাছে আবেদন না করে, তবে তার স্বর্গীয়তা এবং পবিত্রতা আমি বিসর্জ্জন দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হব না।' আবার, 'যে কর্ম্মপদ্ধতি আদর্শ তা নিজের জীবনে রূপায়িত করে অথবা যদি তাতে বিশ্বাস না থাকে—তবে সর্ব্বশক্তি দিয়ে তার প্রতিরোধ করেই আমার বন্ধুরা আমার প্রতি শ্রেষ্ঠ সম্মান দেখ'তে পারেন। কাজ করার যুগে অন্ধ অনুসরণ সম্পূর্ণ মূল্যহীন এবং তা প্রায়ই প্রতিবন্ধক ও সমান বেদনাদায়ক হয়ে উঠে।' কিন্তু শুষ্ক যুক্তির কোন মূল্য নেই। তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল এই নিয়ে আবহমান কাল যুক্তি-তর্ক চলতে পারে। কিন্তু যে মতবাদ নূতন সমাজ রচনা করতে চায় তার পক্ষে কেবল যুক্তিসঙ্গত হওয়া সম্ভবপর নয়। কোন মতবাদ যতই যুক্তিযুক্ত হউক না কেন, তা যদি হৃদয়কে স্পর্শ না করে, তাকে রূপায়িত করার কর্ম্মী পাওয়া যাবে না। 'যুক্তিবাদীরা প্রশংসার পাত্র। কিন্তু যুক্তিবাদ যখন নিজেকে সর্ব্বশক্তিমান মনে করে তখন সে এক ভয়নাক দৈত্য হয়ে দাঁড়ায়।' এইজন্য যুক্তিকে বিশ্বাসের রসে জারিত করতে হবে। যাকে বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় তাকে হৃদয় দিয়ে স্বীকার করতে হবে। বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের প্রারম্ভেও ত প্রকৃতির সমরূপতার (uniformity in nature) উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। সেই মতবাদকেই যুক্তিসঙ্গত বলা হবে যাতে অতিনিশ্চয়তা অথবা অন্ধবিশ্বাসের অবকাশ নেই। কি করে তা প্রমাণ হবে? কর্ম্মীকে তার বিশ্বাসকে রূপ দিতে হবে। এই রূপ [illegible] করার [illegible] নিজেকে বিলীন করে দিতে হবে। মনের [illegible] অভিমান রেখে চুপ করে থাকলে প্রমাণ করা যাবে না, [illegible] বিশ্বাস কতটা মস্তিষ্ক ও হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। যুক্তিকে যন্ত্রণা-ভোগের দ্বারা শক্তিশালী করতে হবে এবং যন্ত্রণাভোগ ধীশক্তির (understanding) চোখ উন্মুক্ত করবে।'

গান্ধীজী বৃহৎ যন্ত্রের বিরোধী ছিলেন। এই জন্য সাধারণ ভাবে মনে করা হয় যে, তিনি পুরানো যুগে ফিরে যাবার কথা বলেছেন, বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে তিনি অস্বীকার করেছেন। কিন্তু এই ধারণা ভুল। গান্ধীজী যন্ত্রের বিরোধী ছিলেন না, যন্ত্রোন্মাদনারই বিরোধী ছিলেন। মানুষ তার কাজের সুবিধার জন্য বিজ্ঞানকে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আজ এমন অবস্থা এসে পড়েছে যে, মানুষের জন্য বিজ্ঞান আর নয়, বিজ্ঞানের জন্যই যেন মানুষ। প্রগতির অর্থ নয় যেমন কেবল ছুটে বেড়ানো, তেমনি বিজ্ঞানের অর্থ নয় যে, কেবল ভুরি উৎপাদনের যন্ত্র ও মারণাস্ত্রের উদ্ভাবন করা। গান্ধীবাদ বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে না, বিজ্ঞানের যাত্রাপথ পরিবর্ত্তনই সে করতে চায়। 'যন্ত্রের একটি স্থান আছে ; যন্ত্র থাকার জন্যই এসেছে',—একথা গান্ধীজী জানতেন। মানুষের দেহও একটি যন্ত্র, তাকে বাদ দেওয়া যায় না। সমাজ-জীবনে শোষণকারী যন্ত্রের পরিবর্ত্তে কল্যাণকারী যন্ত্রের প্রচলন করতে হবে। শেলাইকল এমনই একটি যন্ত্র। গান্ধীবাদ একে অস্বীকার করতে পারে না এবং এই ধরণের যন্ত্রের প্রস্তুতির জন্য কিছু বৃহৎ যন্ত্রেরও প্রয়োজন হবে। আসল কথা হ'ল, 'লোভের স্থানে প্রেমকে পুনঃস্থাপিত' করতে হবে, 'যন্ত্রের সেই ব্যবহারই আইন-সঙ্গত যা সকলের কল্যাণে সাহায্য করবে।' এই জন্য যন্ত্রের আজকের যে-স্থান তার পরিবর্ত্তন করলে পুরনো যুগে ফিরে যাওয়া হবে না, বরং তা অগ্রগতির সূচনা করবে। 'শস্য-ভাণ্ডার আদিম পদ্ধতিতে, সেই পদ্ধতি আদিম বলেই, ফিরে যাবার কোন পক্ষপাতিত্ব আমার নেই। আমি ফিরে যাবার কথা এই জন্যই বলি যে, গ্রামের লক্ষ লক্ষ অলস লোককে কাজ দেবার অন্য কোন উপায় নেই।'

গান্ধীজী ছিলেন বাস্তব আদর্শবাদী। তাই মান[illegible] কল্যাণের যে পথ তিনি নির্দ্দেশ করেছেন তা কঠিন সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সার্থক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যা আমাদের ত্যাগের দিকে, তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম্ম।' কিন্তু মানুষকে তার স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে কি করে? ক্ষুধার্ত্ত মানুষের [illegible] ধর্ম্মের কথা বলা ত কপটতারই নামান্তর। 'ক্ষুধার্ত্ত এবং অলস মানুষের কাছে যে গ্রহণীয় রূপ নিয়ে ঈশ্বর আবির্ভূত হতে পারেন তা হ'ল কাজ এবং পারিশ্রমিকরূপে খাদ্যের প্রতিশ্রুতি।' যদি শক্তি থাকত তবে গান্ধীজী 'প্রত্যেক সদাব্রত, যেখানে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ করা হয় তা বন্ধ করে দিতেন'। তাঁর মানবতা-বাদ অলস স্বপ্নমাত্র নয়। নতুন সমাজের প্রতিশ্রুতিই হ'ল

তাঁর মানবতাবাদের ইঙ্গিত। আজকের জগতে দেখা যায় মানুষ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর দ্বারা নিষ্পেষিত গণতন্ত্রের নামে, সর্ব্বহারার একনায়কত্বের নামে মানুষকে শাসন ও শোষণ করার কত প্রক্রিয়াই না চালু আছে। মানুষের কল্যাণ করতে হলে এই সমাজ-কাঠামোর অবসান করতে হবে। গান্ধীজী যে সমাজ রচনার কথা বলেছেন তা হ'ল সর্ব্বোদয়। অধিকসংখ্যক লোকের অধিকতম কল্যাণ (greatest good of the greatest number) নয়; সকলের হিতই তাঁর কাম্য। গান্ধীজী বিকেন্দ্রীকরণের উপর জোর দিয়েছিলেন। এই নীতি মানবতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যষ্টি ও সমষ্টির যে দ্বন্দ্ব, তারই যদি অবসান না হয় তবে ব্যর্থ হয়ে যাবে মানবতাবাদের সকল স্বপ্ন। একমাত্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণই এই দ্বন্দ্বের সমাপ্তি করতে পারে। 'আমি সেই ভারতের জন্য কাজ করে যাব, যে ভারতে দীনতম ব্যক্তিও মনে করবে যে, দেশ তারই দেশ।' গান্ধীজী নিজেও এর বেশী কামনা করেন নি—'আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে যদি মানুষের সমাজে আমি এই বিশ্বাস জন্মাতে পারি যে, প্রত্যেক পুরুষ এবং স্ত্রী, শরীরের দিক থেকে যতই দুর্ব্বল হউক না কেন, তার আত্মসম্মান ও স্বাধীনতার অভিভাবক।' মানুষের প্রতি কি গভীর প্রেম থাকলেই না এ উক্তি করা যেতে পারে। এই জন্যই রমঁ্যা রঁলা লিখেছিলেন, 'গান্ধীজী ইউরোপীয় বিপ্লবীদের মত আইন এবং অর্ডিন্যান্সের স্রষ্টা নন। তিনি এক নব মানবতার সংগঠক।'

কিন্তু গান্ধীজীর এই প্রেম রহস্যবাদের ছোঁয়ায় আচ্ছন্ন নয়। রহস্যবাদের অর্থ কি? গীতায় যাকে সাত্ত্বিক জ্ঞান (১৮।২০) বলা হয়েছে বা ইংরেজীতে যাকে 'unity in diversity' বলা হয়, তার মধ্যে রহস্যবাদের ঝলক পাওয়া যায়। কবিমনের এ কল্পনা হতে পারে, কিন্তু যে অদ্বৈতবাদ কেবল দার্শনিক তথ্য নয় তাতে এর স্থান কোথায়? গান্ধীজী স্বপ্নবিলাসী ছিলেন না, গান্ধীবাদও একটি নিষ্ক্রিয় তথ্য নয়। তাঁর অহিংসা নঙর্থক নয়, উপরন্তু একটি সক্রিয় কর্মপন্থা। অন্যান্য ধর্মপ্রচারক, যাঁরা জগতে অহিংসার বাণী [illegible]ছেন তাঁদের সঙ্গে গান্ধীজীর পার্থক্যও এইখানে। অসত্য-অ[illegible] থেকে সরে যেতে গান্ধীবাদ নির্দেশ করে না। হিমালয়ের গুহায় বসে তপস্যা করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না; গান্ধীজী জানতেন, 'যদি আমি পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করি তা হলে কখনও জীবনপাত করেও ঈশ্বরকে জানতে পারব না।' 'Resist not evil' (মন্দকে প্রতিরোধ করিও না)—একথা গান্ধীবাদ বলে না। 'এই পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়া কিছুই সফল হয় নি। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, এই কথাগুলিকে যথেষ্ট নয় বলে' তিনি বাতিল করে দিয়েছিলেন। গান্ধীজী কর্মফলকে নিজের অধিকার-বহির্ভূত বলে গণ্য করতেন, [illegible] ঠিক। কিন্তু কর্মফলের চিন্তা কর্মপন্থা নির্ণয়ে কখনই প্রতিবন্ধক হতে পারে না। অন্যায়কে অন্যায় বলেই গ্রহণ করতে হবে এবং অহিংসভাবে তার প্রতিরোধ করতে হবে। এই প্রতিরোধ মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক উভয় দিক থেকেই সার্থক। ১৯২৬ সনে আহমদাবাদে কয়েকটি রাস্তার কুকুরকে মারা হয়। গান্ধীজীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, 'এ ছাড়া আর কি করা যেতে পারে?' অহিংসার পূজারীর এই উক্তি অহিংসাধর্ম-বিশ্বাসীদের উত্তেজিত করল। বিদ্রূপ বর্ষিত হ'ল যথেষ্টই। প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে গান্ধীজী যা বললেন, গান্ধীবাদের স্বরূপ বুঝতে তার মূল্য কম নয়। তিনি লিখলেন, 'মানুষের প্রাণ নেওয়াও কর্তব্য হতে পারে। মনে কর একটি লোক, হাতে তলোয়ার নিয়ে ভীষণভাবে পাগলের মত ছুটে চলেছে এবং তার সামনে যে আসছে তাকেই সে হত্যা করছে। লোকটিকে জীবিত অবস্থায় ধরতেও কেউ সাহস পাচ্ছে না। এই পাগলা লোকটিকে যে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেবে সে আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করবে।'

গান্ধীবাদের প্রধান কথা হ'ল সমাজের কল্যাণ করা। সহিংস পন্থায় সত্যকার কল্যাণ আনা যায় না, এ অভিজ্ঞতা পৃথিবীর হয়েছে। সুতরাং সত্যকারের কল্যাণের পথ অহিংস পন্থায়ই কেবল আনা যেতে পারে। তাই গান্ধীবাদ অহিংস সমাজ রচনার কথা বলে। অহিংস সমাজের মানে হ'ল শোষণহীন সমাজ। আর 'আর্থিক সমতা হ'ল অহিংস সমাজের প্রধান চাবিকাঠির মত।' গান্ধীজী জানতেন যে, যতদিন ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান থাকবে ততদিন অহিংস রাষ্ট্রব্যবস্থার স্থাপনা করা যাবে না। তিনি তাঁর স্বপ্নের ভারত রচনা করার অবসর পান নি, কিন্তু সেই ভারতই তাঁর ধ্যানের ভারত যেখানে 'উচ্চ-নীচ শ্রেণীরূপে মানুষের কোন সমাজ থাকবে না।' শ্রেণী-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সত্যকারের সমতা আনা যাবে না। অধিক ধন অর্জনের কৌশল যাঁরা আয়ত্ত করেছেন তাঁদের বিনষ্ট করলে সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং সমাজের মনস্তাত্ত্বিক স্থিতির পরিবর্তন সাধন করে ধনীকে রূপান্তরিত করতে হবে। 'দরিদ্রের অজ্ঞানতা দূর করে এবং তাদের শোষণকর্তার সঙ্গে অসহযোগ করার দীক্ষা দিয়ে' ধনী [illegible] পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। যদি সকল প্রচেষ্টা [illegible] ধনী দরিদ্রের 'সত্যকারের অর্থানুযায়ী অভিভাবক' না হয়, তবে আইন-অমান্য আন্দোলন সুরু করতে হবে একথা গান্ধীবাদ স্বীকার করে। কালের

পরিবর্তন গান্ধীজী উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি জানতেন, এই বিভেদমূলক সমাজ চলতে পারে না। তাই যদি সম্পদের স্বেচ্ছায় ত্যাগ না হয় তবে অহিংস বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী।

সমবণ্টন আদর্শ হলেও বাস্তবক্ষেত্রে তার প্রয়োগ কতদূর সফল হবে সে সন্দেহ জাগে। এইজন্য গান্ধীজী ন্যায্য (equitable) বণ্টনের পক্ষপাতী ছিলেন, এই কথা তাঁর উক্তি থেকে প্রমাণ করা যায়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, গান্ধীবাদের দোহাই দিয়ে অর্থনৈতিক বৈষম্যকে স্বীকার করে নেওয়া হবে। স্বরাজের পর ভূমির কিরূপ বণ্টন হবে সে প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন যে, ভূমি রাষ্ট্রের মালিকানায় থাকবে। সে-সময় অধিকাংশ জমিদারই আপনা থেকে রাষ্ট্রের হাতে ভূমি ছেড়ে দেবেন। আর যাঁরা দেবেন না 'আইনের বলে তাঁদের রাজী হতে হবে'। 'স্বাধীন ভারতে এক দিনের জন্যও নিউ দিল্লীর প্রাসাদ আর পার্শ্ববর্তী কুটীরের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা চলতে দেওয়া হবে না।' কি করে হবে? লোকশক্তি জাগ্রত করে, সমাজের মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের পরিবর্তন করে আর প্রয়োজন হলে আইনের সাহায্য নিয়ে। যদি জাতীয় সরকার এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, এই বিলাসের স্থানের প্রয়োজন নেই, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের 'স্বার্থচ্যুত করতে হবে এবং এই স্বার্থচ্যুত করার জন্য কোনরূপ ক্ষতিপূরণও করা হবে না।' এই সিদ্ধান্তের উপর গান্ধীজীর সঙ্গে অনেক সমাজতন্ত্রীর কিছু মিল থাকতে পারে। 'আমি জানি এমন অনেক সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী আছেন যাঁরা একটি মাছিকেও মারবেন না; কিন্তু তাঁরা উৎপাদন-ব্যবস্থার সর্বজনীন মালিকানায় বিশ্বাস করেন। আমি নিজেকে তাঁদের দলেরই এক জন বলে মনে করি।' গান্ধীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গীর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ১৯৪৭ সালে আচার্য কৃপালনী কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ ও সরকারের প্রধানদের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। গান্ধীজী তাঁর শূন্য স্থান পূরণের জন্য সমাজতন্ত্রী আচার্য নরেন্দ্র দেবের নাম মনোনয়ন করেন। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি তা মেনে নিতে পারেন নি। গান্ধীজী জানতেন যে, কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমাজতন্ত্রীদের আদর্শগত বিরোধ আছে। তবু সামাজিক বিপ্লবে দেশকে নিয়োজিত করার জন্যই তিনি এই চেষ্টা করেছিলেন।

গান্ধীবাদে শেষ কথা বলে কিছু নেই। মূলনীতিকে স্বীকার করে সমাজ রচনা করতে হবে। স্থান-কাল ভেদে ব্যবস্থাপনার পার্থক্য কিছু ঘটতে পারে। মানুষ প্রাণবান, মানুষ বিচারশীল। মানুষের সমগ্র সমাজকে একটি ফরমূলায় ফেলে দেওয়া যায় না। কিন্তু মূলনীতি থেকে যেন বিচ্যুতি না ঘটে। কি সে মূলনীতি? গান্ধীজী নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন—'আমি তোমাদের একটি মন্ত্রপূত কবচ দোব। যখনই কোন সন্দেহের দোলায় মন দুলে উঠবে কিংবা আত্ম-ভাবটা বড় বেশী রকম জেগে উঠবে, এই পরীক্ষাটা করে দেখো তো। সবচেয়ে গরীব আর দুর্বল মানুষ আজ পর্যন্ত যাকে দেখেছ, তার মুখটা মনে কর, তার পর ভেবে দেখো, যে কাজটা করার মতলব করেছ তাতে তার কোন উপকার হবে কিনা। তার কি কোন লাভ হবে কাজটার দ্বারা? সে কি তার জীবন আর ভাগ্য গড়ার কাজে ফিরে পাবে তার পুরনো অধিকার? আসল কথাটা এই যে, তোমাদের কাজটার ফলে কি স্বরাজ আসবে? লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত আর আধ্যাত্মিক অনশনক্লিষ্ট জনগণের সেই সত্যকারের স্বরাজ? এর পরেই দেখবে তোমার মনের সেই সন্দেহের ভাব কেটে গেছে আর অহংকে নিয়ে যে বিপদে পড়েছিলে তাও দূর হয়েছে।'

খবরটা শুনিয়া গণেশ রায় স্তম্ভিত হইলেন। তিনি সম্ভ্রান্ত কন্‌ট্রাক্টর। স্বয়ং মিনিষ্টার খাল-খননের কাজ স্বচক্ষে পরিদর্শন করিতে আসিতেছেন, এই খবর পাইয়াই তাঁহাকে কলিকাতা হইতে ছুটিয়া আসিতে হইয়াছে; নহিলে বীরভূমের এই জনহীন ও বৃক্ষহীন প্রান্তরে তিনি ছুটিয়া আসিতেন না। সরকারী পূর্ত্ত বিভাগে তাঁহার নাম-ডাক আছে। অথচ তিনি নিজে হাজির থাকা সত্ত্বেও ঠিক মিনিষ্টারের পরিদর্শনের দিন মাটি কাটার চারশ' মজুর কাজ বন্ধ করিয়া বসিলে তাঁহার সম্মান থাকিবে কি?

'ব্যাটাদের বদ্‌মাসিটা দেখলেন, স্যর? ঠিক সময় বুঝে কোপ দিয়ে বসেছে।' তাঁবুর স্বল্প পরিসরের মধ্যে বারবার পায়চারিরত প্রভুর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া গণেশবাবুর বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ভগীরথ সামন্ত মন্তব্য করিলেন। 'নিশ্চয় এর পেছনে দুষ্ট লোকের উস্কানি আছে। নইলে কুলিদের পেটে এত শয়তানি!...ইদিকে আমি মন্ত্রীর অভ্যর্থনার জন্য সব বন্দোবস্ত করে ফেলেছি। বাগদীপাড়ার কুলবধূরা এসে শাঁখ বাজাবে, সাঁওতাল আর বুনোদের দল ঢোল-মাদল বাজাতে আসছে, অভ্যর্থনার ফটক ত রেডিই, ফটকের উপর থেকে কারা কারা মন্ত্রীর মোটরে পুষ্পবর্ষণ করবে তাও ঠিক আছে। মানে, অভ্যর্থনার কোন ত্রুটিই রাখা হয় নি। ইদিকে মন্ত্রীমশায় যা পরিদর্শন করতে আসছেন, তাই যদি ফাঁকা পড়ে থাকে...'

'ওদের মিনিমাম ডিমাণ্ড কি?' গণেশ রায় প্রশ্ন করিলেন।

'আজ্ঞে, নিম্নতম দাবি ত [illegible]। এক [illegible] কেন, এক বছরেও তা মেটানো সম্ভব নয়।' ভগীরথ সামন্ত কহিলেন। 'তবে কখনো বা ধমকে, কখনো বা পিঠ চাপড়ে যা বুঝতে পেরেছি, তাতে মনে হয়, অন্তত একটা দাবি মেটাতে পারলেই কালকের মত ধর্ম্মঘট আটকানো যায়...।'

'তবে আর দেরি করছ কেন?' গণেশবাবু অধৈর্য্য ভাবে কহিলেন। 'মিনিষ্টারের কাছে নাকাল হতে পারব না। বল কি করতে হবে?...'

'আজ্ঞে, একটা নাপিত এনে দিতে হবে।' ভগীরথ সামন্ত মাথা চুলকাইয়া কহিলেন। 'মানে, অনেক দিন থেকেই এরা এই নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করছে। বলছে, চুল দাড়ি ফেলতে হলেই পাঁচ মাইলের রাস্তা চণ্ডীগ্রামে ছুটে যেতে হবে, এও কখনো পারা যায়। একটা নাপিত এনে বসান। অথচ নাপিত ব্যাটারাও এমন বদমা[illegible], কেউ যদি সাইটে এসে থাকতে রাজী হয়। বলে, মশায়, ঐ মরুভূমিতে গিয়ে মানুষে বাস করতে পারে?...যেন আমরা মানুষ নই...'

'যা হয় একটা ব্যবস্থা কর!' গণেশবাবু হাসি দমন করিয়া কহিলেন।

'ভাবছি [illegible] কাল কাক-ভোরে উঠেই জীপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। [illegible]বাবু [illegible]রে কাজ দেখতে এসেছিলেন, তখন চণ্ডী[illegible] নাপিতকে একবার জীপে করে নিয়ে [illegible]ছিলাম। ভাবছি, খুব সকালবেলা গিয়ে তাকে ধরে তুলে নিয়ে আসব।'

কাক-ভোরেই ভগীরথ সামন্ত উঠিয়াছিলেন, তবু আধঘণ্টা দেরি হইয়া গেল। পনের-কুড়ি মিনিট ব্যর্থ চেষ্টার পর জীপ-চালক কহিল, 'না স্যর, ফুয়েল-পাম্পে গোলমাল হচ্ছে, স্টার্ট নেবে না মনে হয়...'

"আরে মশাই ইচ্ছামত পরামাণিক পাচ্ছেন কোথায় ?"—গঙ্গারাম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কহিল

'আঃ, কি মুশকিল।' সামন্ত মশায় অধৈর্য্য হইয়া কহিলেন। কৈ, কাল ত কিছু বল নি। নাও, শীগগির করে। কলকাতার ড্রাইভারকে ডেকে তোল। হুজুরের গাড়ীটাই বের করতে হবে। আর একটুও দেরি করার জো নেই...'

রোগা লিকলিকে চেহারার লোক ভগীরথ, কিন্তু কাজ করিতে ও করাইয়া লইতে তাহার জুড়ি নাই। সে-ই গণেশ রায়ের স্থানীয় কাজের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। প্রভু এবং তাঁহার কলিকাতার মোটর-চালক সকাল সাতটার আগে ঘুম হইতে উঠেন না। প্রভুর নিদ্রার ব্যাঘাত না করিয়া অগত্যা তাঁহার ড্রাইভারের নিদ্রার ব্যাঘাত করিতে হইল। গণেশ রায়ের প্রকাণ্ড ষ্টুডিবেকার গাড়ী ইহার আধ ঘণ্টার মধ্যেই চণ্ডীগ্রামের দিকে রওনা হইয়া পড়িল।

গঙ্গারাম নাপিতের বাড়ী [illegible] আগে হইতেই চেনা। গাড়ি যখন সেখানে হাজির [illegible] গঙ্গারাম প্রামাণিক কাজে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে।

গাড়ী হইতে নামিয়া মুখে প্রসন্ন হাসি আনিয়া সামন্ত মহাশয় বিশেষ তোয়াজের গলায় কহিলেন, "এই যে গঙ্গারাম, চিনতে পারছ ? বের হচ্ছ বুঝি ?'

'কে, কাকিনীর খালের বড়বাবু না ?' গঙ্গারাম নাপিত একবার ধূর্ত্ত দৃষ্টিতে ভগীরথের দিকে তাকাইয়া সবিনয়েই কহিল। 'চিনতে পারছি বৈকি। তার-পর এদিকে কি মনে করে ?'

প্রয়োজন জরুরি না হইলে গাড়ী করিয়া এই সাতসকালে কাকিনীর মাঠ হইতে কেহ আসে না, এ সম্বন্ধে গঙ্গারামের কোন সন্দেহই ছিল না, তবু নিজের দাম বাড়াইবার জন্যই সে ফাল্‌তো প্রশ্ন করিল।

'আর বল কেন। পুরুষ-মানুষ হয়ে জন্মালে তোমাদের কাছে না এসে উপায় কি, ভগীরথ কহিলেন। 'একবার সাইটে যেতে হবে...'

'এই অনুরোধটি করবেন না, সামন্ত মশায়, ইটি রাখতে পারব না।' গঙ্গারাম গম্ভীর হইয়া কহিল। 'সেবারে আপনাদের ওখান থেকে ফিরে দু'কান মলেছি আর ও মুখো হচ্ছি না।

'কেন বল ত ?' ভগীরথ বিস্মিত হইয়া কহিলেন। 'মোটরগাড়ী করে তুলে নিয়ে গিয়েছিলাম, ছোটবাবু খুশী হয়ে এক টাকা মজুরি দিয়েছিলেন...'

গঙ্গারাম এক টাকা মজুরির কথা কানে তুলিল না। কহিল, 'মোটর চড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু ফিরিয়ে দিয়ে যাওয়া দরকার মনে করেন নি। কথায় বলে কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরলে পাজী। সেই দুকুর-রদ্দুরে ঘেমে তেতে দ্'কোশ পথ হেঁটে আসতে প্রাণান্ত। সেদিন ফিরে এসেই দ্'কান মলেছি...'

ভগীরথ সামন্ত কনট্রাক্টরের ঝানু কর্ম্মচারী। দরকার হইলে সে বাঘের চোখ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারে। নাপিতের অভিমান ভাঙাইতে তাহার কষ্ট হইবে কেন ?

'কিছু ভেবো না, সামন্ত' বিশেষ মোলায়েম গলায় কহিলেন, 'এক বার ক্রটি ঘটেছে বলে সব বারই ক্রটি থেকে যাবে, সেটি মনে করছ কেন ? এবার গাড়ী করেই ফেরত পাঠাব দেখো। প্রায় শোখানিক লোক হয় দাড়ি চাঁচবে, নয় চুল ছাঁটাবে—মজুরিও নেহাত কম হবে না...'

সম্ভাব্য আয়ের পরিমাণে গঙ্গারামের দুই চোখে পলকের জন্য লুব্ধ খুশির পলক খেলিয়া গেল। তবু সে ঔদাসীন্যের

ভান করিইয়া কহিল, 'ওরে বাবা, এক বেলায় অত মক্কেল পার করবে কে! চারটের পরে মশায় আমি বাড়ীর বাইরে থাকি নে…'

ভগীরথ মনে মনে কহিলেন, 'নবাব খাঞ্জা খাঁ! চারটের পরে হারেমের বাইরে থাকেন না!' কিন্তু প্রকাশ্যে তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে দিলেন না। মনিব গণেশ রায়ের সম্মান আজ নাপিতের উপর নির্ভর করিতেছে এবং নাপিতের যাওয়া না যাওয়া নির্ভর করিতেছে ভগীরথের মেজাজের উপর। এ অবস্থায় কোনও বেফাঁস কথা উচ্চারণ করার উপায় নাই, তা প্ররোচনা যতই তীব্র হউক।

'আরও একজন কাউকে ধরে নিয়ে যেতে পার না?' সামন্ত সবিনয়ে কহিলেন।

'আরে মশায়, ইচ্ছে মত পরামাণিক পাচ্ছেন কোথায়?' গঙ্গারাম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কহিল। 'এ কাজ অত সোজা নয় যে, যে ইচ্ছে সেই পরামাণিক সেজে বসবে।…এক ঐ নিকুঞ্জকে ডাকতে পারতাম। কিন্তু সে ত দিব্যি গেলে বসে আছে। মশানে যাব, ত এ জন্মে আর কাকিনীর মাঠে যাব না। পয়সার লোভে সেবার গিয়ে মেহনতে হেদিয়ে দুকুর-রদ্দুরে বাড়ী ফিরে সর্দ্দি-গর্‌মিতে যায় আর কি। পনের দিন যমে-মানুষে লড়াই হয়ে প্রাণটা যখন ধুকধুক করছে, তখন কোনও গতিকে রেহাই পেল।…সে আর ওমুখো হচ্ছে না…'

'তবে তুমিই চল।' ভগীরথ অধৈর্য্য দমন করিয়া কহিলেন। 'দু ছুটো করে ক্ষুরের টান দিও, তাতে যা কাটে। কুলি ব্যাটাদের খুশি করা বৈ ত নয়…' মন্ত্রীর আসার কথা এবং ধর্ম্মঘটের হুমকির কথা সামন্ত সযত্নে গোপন রাখিলেন।

'তা যেমন জরুরি ব্যাপার বলছেন, যেতেই হবে।' গঙ্গারাম নরম হইয়া কহিল। কিন্তু রুটিনের কাজগুলি না সেরে ত যেতে পারব না, মশায়। আপনারা ছ' মাস ন' মাস পরে একদিন ডাকবেন। আমার বাঁধা ঘরগুলো সারা বছরের খদ্দের।…তা ঘণ্টাখানেকের বেশি দেরি হবে না। গাড়ীটা নিয়েই চলুন, তাড়াতাড়ি সেরে নিই। দু-পাঁচ বাড়ী বৈ ত নয়…'অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া গঙ্গারাম গটগট করিয়া মোটরে আসিয়া চড়িল।

এমন অসম্ভব প্রস্তাবও কেউ কখন শুনিয়াছে? কিন্তু রাজী না হইয়া উপায় কি? তাড়াতাড়ি লইয়া যাইবার তাড়া ত ছিলই, তার উপর সবেধন পরামাণিক বেহাত না হইয়া যায়, সেদিকেও নজর রাখা নেহাত প্রয়োজন।

নাপিত মোটরে চড়িয়া বাড়ী বাড়ী দাড়ি গোঁফ কামাইয়া বেড়াইতেছে, এই দৃশ্য হয় ত আমেরিকার পক্ষে বেমানান হইত না। চণ্ডীগ্রামে এমন তাজ্জব ব্যাপার গ্রামের যত ডেঁপো ছোঁড়ার কৌতূহল আকর্ষণ করিবে, [illegible] আর বিচিত্র কি। এই কৌতূহলী জনতা-পরিবৃত হইয়া এক এক বাড়ীর সামনে আধ ঘণ্টা হইতে—সোয়া ঘণ্টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা ভগীরথের মত বিবেচক লোকের ধৈর্য্যের পক্ষেও চূড়ান্ত পরীক্ষা। কিন্তু কিছু বলিবার উপায় নাই। সামান্যতম অনুযোগ করিলেই গঙ্গারাম বলে, 'সারা বছরের মক্কেল, নিজে থেকে কথা ওঠালে চটিয়ে আসতে পারি না, এক আধটু গল্প-গুজব করতেই হয়।…আর বেশী দেরী হবে না, আর দু'তিনটে বাড়ী মাত্র…'

শেষ বাঁধা মক্কেলটির পরিচর্য্যা সারিয়া গঙ্গারাম যখন মোটরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, তখন ভগীরথ অর্দ্ধেক তৃপ্তি ও অর্দ্ধেক ব্যঙ্গের স্বরে কহিলেন, 'এবার রওনা হবার সুবিধা হবে কি?'

'হবে বৈকি।' গঙ্গারাম গদীতে আসীন হইয়া কহিল। 'আপনাদের জরুরি কাজ, তাই তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হ'ল। দু'গণ্ডা বাড়ী বাদ দিলুম। এবার রওনা হব বৈ কি। হাতে ঘড়ি আছে? সময় ক'টা হ'ল দেখুন ত একবার?'

'সোয়া সাতটায় এসেছিলাম, ভগীরথ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, 'এখন এগারটা। সামান্য চার ঘণ্টার ব্যাপার!'

'ক'টা বললেন? এরই মধ্যে এগারটা বেজে গেছে!' গঙ্গারাম উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকাইল। 'তা হলে আর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে যেতে হবে। বাড়ীতে নেমে চট করে চানটা সেরে নেব…'

'বল কি, আরও দেরি!' ভগীরথ শঙ্কিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন। চার ঘণ্টা অপেক্ষা করাইয়াও তোমার তৃপ্তি হইল না,—এই মন্তব্যটি অতিকষ্টে ঠোঁটের উপর চাপিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, 'চানটা এখন থাক। সে ব্যবস্থা না হয় সাইটে গিয়ে করে দেব। এতক্ষণ বলছি কি, আমার জরুরি দরকার…আর দেরি হলে ত আমার চলবে না…

'আপনার ত জরুরি ব্যাপার, মশায়', গঙ্গারাম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কহিল, 'ইদিকে আমার স্বাস্থ্যটি বিগড়োলে তখন কি দেখতে আসবেন! সেবার বলে নিকুঞ্জ আপনাদের কাজে গিয়ে সর্দ্দি-গর্‌মি [illegible] জো হয়েছিল, তখন কি তার জন্যে [illegible] পাইপয়সাটি খরচা করেছিলেন? যাই বলুন আর তাই বলুন, এত বেলায় চান না সেরে আমি দু'কোশের পথ বেরুতে পারব না।'
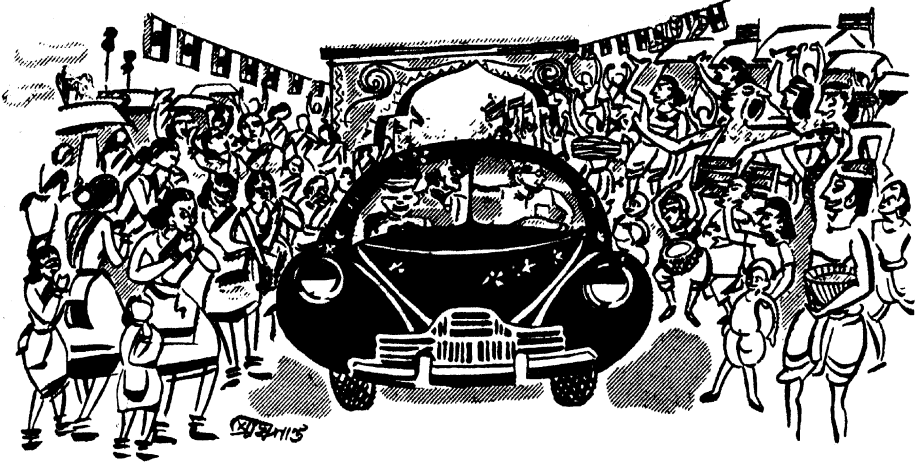
পলকে বাগদীপাড়ার কুলবধূদের শঙ্খ দিগন্ত কাঁপাইয়া ধ্বনিত হইল।

এখন হাত কামড়াও আর দাঁত কিড়মিড় কর, সুদুর্লভ নরসুন্দরের মর্জ্জি না মানিয়া উপায় নাই। একটা বেফাঁস কথা উচ্চারণ করিলেই গণেশ রায়ের সম্মান, ভগীরথের কর্ম্মতৎপরতার খ্যাতি এবং মন্ত্রীর খাল-খনন-পরিদর্শন ভণ্ডুল হইয়া যায়।

ভগীরথের নির্দ্দেশেই ড্রাইভার গাড়ি গঙ্গারামের বাড়ির দরজার সামনে হাজির করিল।

অবশেষে যখন সত্যসত্যই কাকিনীর মাঠের দিকে রওনা হওয়া গেল, তখন বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা। গঙ্গারাম স্নান সারিয়া ফর্সা জামা গায়ে দিয়া ফিট্‌ফাট্‌ বাবুটি হইয়া আসিয়াছে। খাওয়া-দাওয়াও নিশ্চয়ই সারিয়া লইয়াছে—মেজাজের উন্নতি লক্ষ্য না করিয়া উপায় নাই। তপ্ত দ্বিপ্রহরে বৃক্ষবিরল প্রান্তরের মধ্য দিয়া কাঁচা রাস্তার ধুলা উড়াইয়া মোটরগাড়ী যতই মরীয়ার মত ছুটিতে লাগিল, ততই তার কৌতূহল এবং প্রশ্ন উদ্দাম হইয়া উঠিল। খাল খুঁড়িয়া কি লাভ হইবে, কোথা হইতে কতদূর পর্য্যন্ত খননকার্য্য বিস্তারিত হইবে, নেড়া জমিতে আবাদের কিরূপ সুবিধা হইবে—প্রভৃতি হইতে লাট-বেলাটের সম্প্রতিক হালচাল সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই বাদ পড়িল না। ভগীরথের কাছ হইতে জবাব না পাইলেও তাহার [illegible] যায় না। তাহার নিজস্ব পুলকে সে বকর বকর ক[illegible]ন্তর মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে কোন তোয়াক্কাই রা[illegible]।

'বেড়ে গাড়িটা কিন্তু আপনার!' বোধ হয় এতক্ষণ পর ভগীরথের নীরবতা লক্ষ্য করিয়া তাকে খুশি করিবার জন্যই গঙ্গারাম অবশেষে কহিল—'এই যে এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো পথের উপর দিয়ে. কাঁটা আর শেকড় মাড়িয়ে হন্‌ হন্‌ করে ছুটে চলেছি, একটু টেরও পাওয়া যাচ্ছে না, বরঞ্চ গদির দুলুনিতে তোফা আরাম লাগছে···কিচ্ছু ভাববেন না, স্যার, বেলা তিনটের এখনও ঢের দেবি। তার মধ্যে চার পাঁচ গণ্ডা মক্কেলের গণ্ড-মুণ্ডুর ব্যবস্থা না করতে পারি তবে এদ্দিন মিছেই এ ব্যবসা করে আসছি। একটাকে ধরবো, আর গলায় এক এক পোঁচ বসিয়ে ছেড়ে দোব!' বলিয়া নিজের রসিকতায়ই সে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

গঙ্গারামের গলায়ই ভগীরথের এই পোঁচটি দিতে ইচ্ছা হইতেছিল, অতিকষ্টে নিজেকে সংবরণ করিয়া সে একটু ফিকা হাসি হাসিল মাত্র।

'গিন্নী বলছিল', গঙ্গারাম উদারতার সঙ্গে জানাইল, 'কাকিনীর মাঠের বাবুরা ভাল কোয়াটারের ব্যবস্থা করে দিতেন, তবে না হয় ক'মাস ওদের ওখানে গিয়েই থাকতুম। কিন্তু আমি বললাম, শুধু কোয়াটার আর পয়সার দিক দেখলেই তো চলবে না গিন্নী, ওস্তাদ কারিগরের কাজের ওখানে কি রকম কদর, তার ওপরই যাওয়া না-যাওয়া নির্ভর করছে। আরে, এরই মধ্যে এসে গেলাম দেখছি!··· ওটা কি মশায়, ফুল, পাতা, নিশেন সাজিয়ে এক পেল্লাই ফটক খাড়া করেছেন দেখছি···কি ব্যাপার···?

'ওটা', ভগীরথ কাকিনীর মাঠের প্রবেশ-মুখের সুসজ্জিত অভ্যর্থনা-তোরণটার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া হিংস্র-গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'তোমারই অভ্যর্থনার সামান্য আয়োজন! গুণীলোকের কদর আর কি!···

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

মৃগয়া

শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত
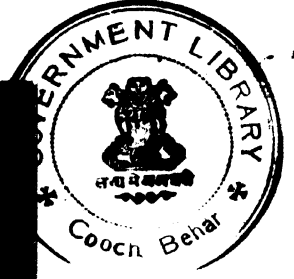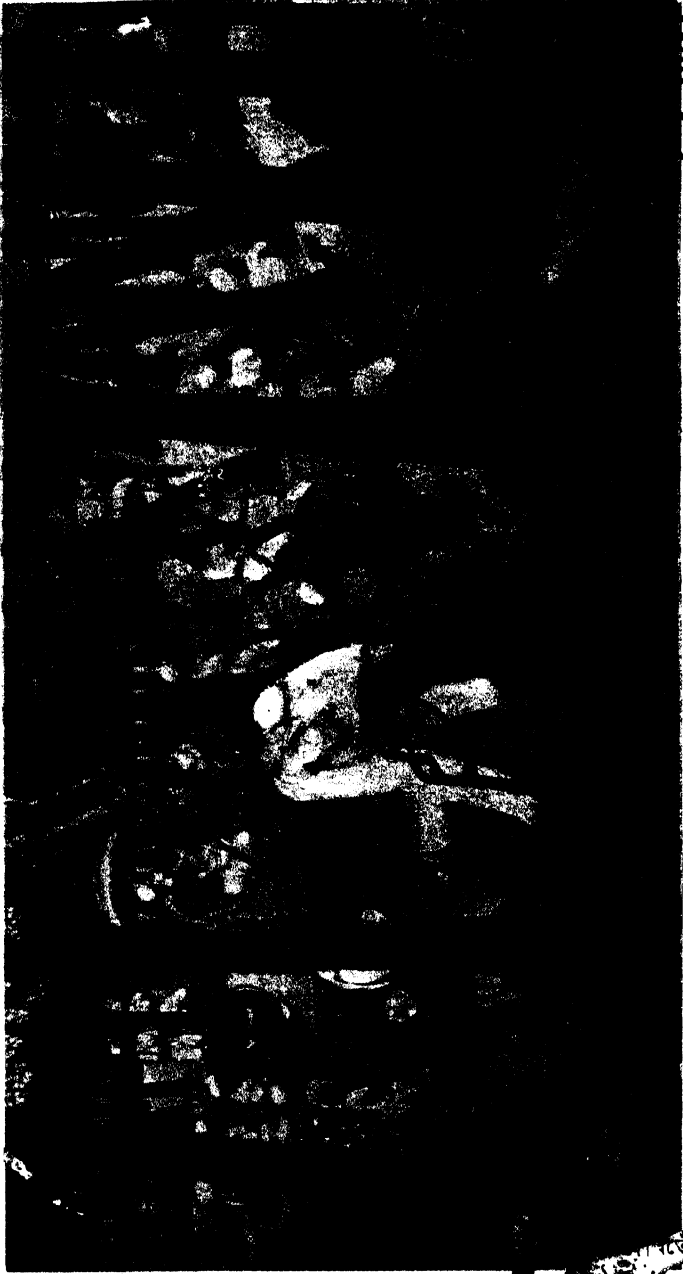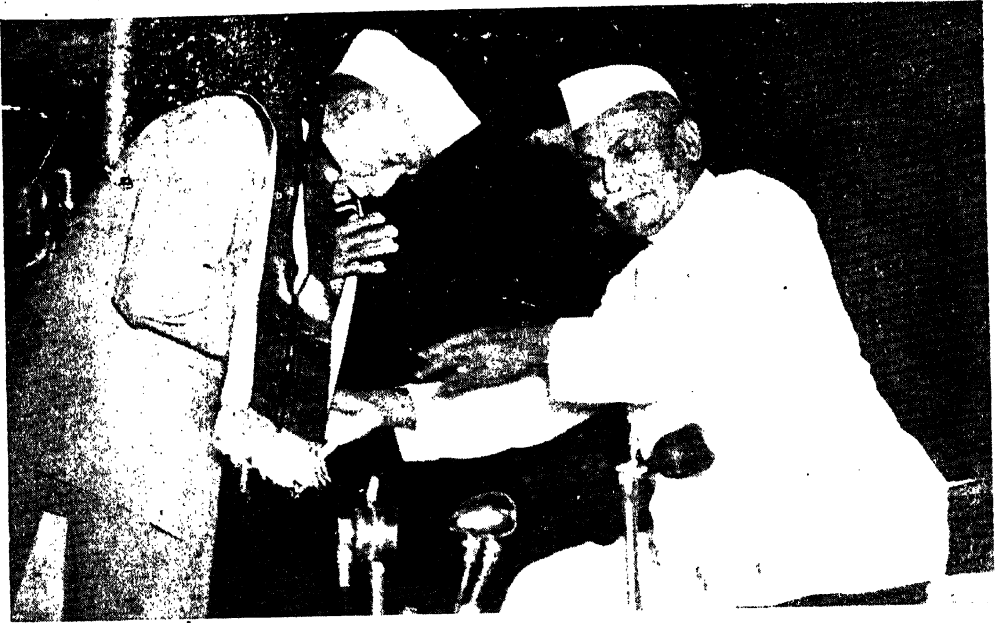
নিউদিল্লীতে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্তৃক ওস্তাদ আলাউদ্দীনকে সনদ প্রদান

মন্ত্রী-অভ্যর্থনাকারীদল বেলা বারটার আগে হইতেই প্রস্তুত হইয়া আছে। উৎসাহে একেবারে টগ্‌বগ্‌ করিতেছে। সম্মানিত অতিথি-মহোদয় যখনই আসিয়া পৌছান না কেন, তাহাদের দৃষ্টি বা অভ্যর্থনা এড়াইয়া যাইতে পারিবেন না। এমন সময় দূরে দেখা গেল নতুন চক্‌চকে প্রকাণ্ড মোটরগাড়ী, সকলে উদ্‌গ্রীব ও প্রস্তুত হইল। গাড়ীর আরোহীরাও এইবার নজরে আসিয়াছে। ম্যানেজার ভগীরথ সামন্তের পাশে ফর্সা পাঞ্জাবী গায়ে ভারিক্কী চালে গদীতে পিঠ এলাইয়া হাঁটুর উপরে হাঁটু রাখিয়া একজন বসিয়া আছেন। গাড়ীর চালকের সাজসজ্জাই বা কি আড়ম্বরপূর্ণ! মুহূর্তে দলের নেতার সঙ্কেত ছুটিয়া আসিল। পলকে বাগ্দীপাড়ার কুলবধূদের শঙ্খ দিগন্ত কাঁপাইয়া ধ্বনিত হইল; সাঁওতাল এবং বুনোদেরও মুহূর্ত্ত দেরি হইল না, কাড়া-নাকাড়া-দামামার সম্মিলিত আওয়াজে কাকিনীর মাঠ প্লাবিত হইয়া গেল। তোরণের চূড়ায় অদৃশ্য জায়গায় যাহারা পুষ্প-বর্ষণের জন্য নিয়োজিত ছিল, তাহারা নিশানা লক্ষ্য করিতে একটুও ভুল করিল না; মোটরগাড়ী তোরণের তলায় পৌঁছানোমাত্র ধামা ধামা ফুল সম্মানিত অতিথির উপর শ্রাবণের বৃষ্টির মত ঝরিয়া পড়িল।

গুণীর গুণের তারিফ করিবার লোকের তবে অভাব নাই! গঙ্গারাম প্রকৃতই খুশি হইল। সে স্থির করিল, উপযুক্ত 'কোয়াটা'র পাইলে ক'মাসের জন্য সে কাকিনীর মাঠে আসিয়াই বাস করিবে।
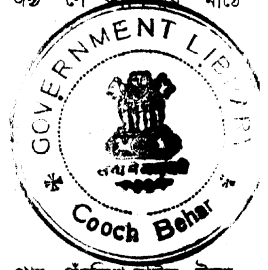
প্রাচীনযুগে মিথিলা

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা

মিথিলা বিদেহরাজ্যের রাজধানী। ইহার অপর নাম ছিল তীরভুক্তি। বর্তমানে ইহা তিরহুত নামে খ্যাত। শ্রীকৃষ্ণ ভীম ও অর্জুন সহ ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে রাজগৃহে যাইবার পথে এখানে আসেন। জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর বিদেহের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বিদেহ নাম লইয়া এখানে ত্রিশ বৎসরকাল বাস করেন। মহাবীরের মাতার নাম ছিল বিদেহদত্তা। মিথিলা পঞ্চগৌড়ের অন্যতম। মগধের সভ্যতার পতন হইলে মিথিলা হইতে ন্যায়দর্শন বাংলার নবদ্বীপে আসিল। ইহাতে বাংলার খ্যাতি বাড়িয়া গেল। মুসলমান কর্তৃক ভারত বিজয়ের পর গঙ্গেশ মিথিলায় নব্য-ন্যায়ের টোল খুলিলেন এবং মিথিলা হইতেই ইহা বঙ্গদেশে বিস্তারলাভ করে।

বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যার বৈষ্ণব কবি ও ধর্মপ্রচারকগণের অগ্রগণ্য বিখ্যাত কবি ও গায়ক বিদ্যাপতি মিথিলার অধিবাসী। নেপালের সীমানার মধ্যে অবস্থিত বর্তমান জনকপুর ও প্রাচীন মিথিলা অভিন্ন। মজঃফরপুর ও দ্বারভাঙ্গা জেলা ইহার উত্তরে অবস্থিত। বিল সাহেবের মতে জনকপুর চৈনিক চেনস্থুনা নামে পরিচিত। হিমালয় প্রদেশের অন্তর্গত নেপালের পাদদেশে বিদেহরাজ্য ছিল। বিদেহরাজ জনকের রাজত্বকালে রাজর্ষি বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যা হইতে চারি দিবসে মিথিলায় আসিয়া পৌছান। পথিমধ্যে তাঁহারা বিশালায় এক রাত্রি যাপন করেন।

মিথিলা বৈশালী হইতে প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ছিল। আরও জানা যায়, মিথিলা অঙ্গের রাজধানী চম্পানগরী হইতে ষাট যোজন দূরে বিদ্যমান ছিল। বুদ্ধ কোণাগমনের সময়ে মিথিলা-রাজা পর্বতের রাজধানী ছিল। পূর্বে কোশী নদী, দক্ষিণে গঙ্গা, পশ্চিমে সদানীরা বা রাপ্তি নদী এবং উত্তরে হিমালয় পর্বতশ্রেণী দ্বারা তীরভুক্তি (বর্তমান তিরহুত) বেষ্টিত ছিল। শতপথব্রাহ্মণের মতে ঔপনিবেশিক মাথাববিদেঘের নাম হইতে বিদেহ নামের উৎপত্তি। সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ টীকাকার বুদ্ধঘোষ বলেন, পূর্ব-বিদেহ হইতে আগত প্রাচীন বাসিন্দা (বসবাসকারী) হইতেই বিদেহ নাম আসিয়াছে। মহাভারতে এদেশকে ভদ্রাশ্ববর্ষ বলা হইয়াছে।

রামায়ণের মতে, রাজধানী ও দেশ উভয়ই মিথিলা নামে খ্যাত ছিল। বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হুয়াংচুয়াং বলেন যে, বিদেহ ও বিহারের অন্তর্গত বর্তমান তিরহুত অভিন্ন। মিথিলা নামটির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে একটি মনোরম কাহিনী পাওয়া যায়। বশিষ্ঠ ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া রাজা নিমির যজ্ঞ আরম্ভ করিতে মিথিলায় গমন করেন। সেখানে পৌঁছিয়া তিনি দেখিতে পান যে, রাজা নিমি যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার [illegible] গৌতমকে নিযুক্ত করিয়াছেন। রাজাকে নিদ্রিত [illegible] পাইয়া তিনি এইভাবে তাঁহাকে অভিশাপ দেন—রাজা নিমি বি = বিগত, দেহ = শরীর অর্থাৎ অশরীরী হইবেন, কেননা তিনি বশিষ্ঠকে ত্যাগ করিয়া গৌতমকে

নিযুক্ত করিয়াছেন। নিদ্রাভঙ্গের পর রাজাও অভিশাপ দেন—যেহেতু বশিষ্ঠ নিদ্রিত নরপতিকে অভিশাপ দিয়াছেন, অতএব তিনি নিজেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবেন। ঋষিগণ নিমির মৃতদেহ মন্থন করিলে মিথি নামে এক পুত্র জন্মে। এই মিথি নাম হইতে মিথিলা নাম আসিয়াছে এবং নৃপতিগণ মৈথিল নামে খ্যাত হইয়াছেন। ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে, নিমির পুত্র মিথি এই মিথিলা নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। নগরীর প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তাঁহার অপর নাম হয় জনক। আবার কাহারও কাহারও মতে গোবিন্দ কর্তৃক এই রাজধানী মিথিলা সহ পৃথক সীমানা বেষ্টিত বিদেহ রাজ্য গঠিত হয়। মিথিলা নগরীর পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর এই চারিটি দ্বারে পণ্য-দ্রব্যের বাজারসহ চারিটি উপনগর গড়িয়া উঠে। বিদেহরাজ্যে বহু গ্রাম, ভাণ্ডার-গৃহ এবং নর্তকী ছিল।

মিথিলায় বহু হস্তী, অশ্ব, রথ ও গোমেষাদি পশু ছিল। ইহা ব্যতীত স্বর্ণ, রৌপ্য, মণিমুক্তাদিসহ প্রভূত সম্পদও ছিল। সুবিস্তৃত সুগঠিত মনোহর নগরীটি প্রাচীর, তোরণ, প্রাকার, উদ্যান ও জলাশয়ের দ্বারা সুশোভিত ছিল। বহুজনশ্রুত বিদেহরাজ্যের রাজধানী মিথিলা সত্যই আনন্দ-পুরী (আনন্দপূর্ণ নগরী)। এখানে পট্টবস্ত্র-পরিহিত ব্রাহ্মণগণ চন্দনচর্চিত দেহে মণিমুক্তার অলঙ্কার ধারণ করিতেন। সুশোভিত প্রাসাদসমূহে রাজ্ঞীগণ উত্তম পরিচ্ছদ ও কিরীট পরিধান করিতেন। হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত শিখরের পশ্চাদভাগে গঙ্গার উত্তর তীরে অবস্থিত এই নগরীটি উর্বর ও শান্তিপূর্ণ ছিল। এই নগরীটি উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত ছিল। ইহা সুরক্ষিত এবং বিদেহরাজ জনকের যজ্ঞে পূত হইয়াছিল। এই সুরম্য নগরীটিতে সুনির্মিত অনেক-গুলি রাজপথ ছিল। এখানকার অধিবাসীরা স্বাস্থ্যবান ছিল এবং ইহারা উৎসবগুলিতে যোগদান করিত। মহাসম্মত হইতে আরম্ভ করিয়া গৌতম বুদ্ধের পিতা শুদ্ধোধন পর্য্যন্ত যে সব সূর্য্যবংশীয় রাজা মোট উনিশটি নগরের উপর রাজত্ব করিয়াছেন, মিথিলা সেই নগরীগুলির মধ্যে অন্যতম। মিথিলায় লক্ষ্মীহর নামে এক চৈত্যে মহাগিরি শিক্ষকেরা বাস করিতেন। বারাণসীপ্রমুখ রাজ্যের সহিত বাণিজ্যের ফলে বিদেহরাজ্যের সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হয়। বুদ্ধের সময়ে বিদেহ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। কথিত আছে, শ্রাবস্তী হইতে লোকেরা জিনিষপত্র বিক্রয় করিতে বিদেহরাজ্যে আসিত। শ্রাবস্তী নগরীর অধিবাসী জনৈক বুদ্ধশিষ্য বহু মালপত্র লইয়া বাণিজ্য করিতে বিদেহরাজ্যে আসেন।

রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মিথিলার আদিপুরুষ হইতেছেন নিমি। এই নিমির পুত্র মিথি এবং পৌত্র প্রথম জনক। সীতার পিতা ছিলেন দ্বিতীয় জনক। বৃহদারণ্যক উপনিষদে রাজর্ষি জনকের কথা বর্ণিত আছে। মিথিলার রাজন্যবর্গ উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। রাজর্ষি জনক ব্রাহ্মণ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী। তিনিই মিথিলার শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি মিথিলায় রাজসূয় যজ্ঞ করেন। মিথিলার প্রজাগণ তাঁহাকে খুব মান্য করিত। তিনি অযোধ্যার রাজা দশরথের পুরাতন বন্ধু। রাজা জনক শুধু রাজা ও যাজ্ঞিক হিসাবে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাহা নহে, তিনি কৃষ্টি ও দর্শনের শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। অশ্বল, জারৎকারব, আর্তভাগ, গার্গী, বাচকনবী, উদ্দালক আরুণি, বিদগ্ধ সাকল্য এবং কহোড় কৌশীতকেয় প্রমুখ সুপণ্ডিতগণ তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। জনকের কন্যা সীতার পাণিপ্রার্থী হইয়া বহু রাজা জনকের রাজসভায় গমন করেন। রাম হরধনু ভঙ্গ করিয়া সীতাকে লাভ করেন। ইহাতে অন্যান্য নরপতিগণ ক্রুদ্ধ হন। পরশুরাম ইহার প্রতিশোধ লইতে রামের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। অতঃপর বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, জনক, দশরথ প্রভৃতির চেষ্টায় যুদ্ধ বন্ধ হয়। পরশুরাম পরাস্ত হইয়া বিজয়ী রামচন্দ্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন, এবং রামচন্দ্রও পরাজিত পরশুরামের চরণে পতিত হইয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন।

রাজর্ষি জনক হইতে এই বংশের নাম জনকবংশ হয়। রাজা কীর্তির সময় হইতেই জনকবংশের অবসান ঘটে। বিদেহ নামে পরিচিত ইক্ষাকুপুত্র নিমি হইতেই বিদেহ রাজবংশের উৎপত্তি হয়। তিনি এক বিখ্যাত নগরে বাস করিতেন। কথিত আছে যে, এই রাজবংশ অযোধ্যা, মিথিলা, গয়া প্রভৃতি নগরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিদেহ এবং মিথিলার রাজবংশ সূর্য্যবংশের একটি শাখা মাত্র। মিথিলার রাজারা উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। বৌদ্ধযুগে রাজা সুমিত্র ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। বিদেহ নামে মিথিলার জনৈক রাজা চারি জন মুনির নিকট হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করেন। ইঁহার পুত্র তক্ষশিলায় বিদ্যালাভ করেন।

ইহা ব্যতীত আমরা মিথিলার অন্যান্য রাজাদিগের কথা অনেক কিছু জানিতে পারি। মিথিলার রাজা অঙ্গটির তিন মন্ত্রী ছিল। পর্ব্বদিবসে মিথিলা নগরী ও রাজপ্রাসাদ দেবনগরীর তুল্য সজ্জিত হইত। রাজা জিয়সত্ত (অর্থাৎ কোশলরাজ প্রসেনজিৎ) বিদেহ রাজ্যের রাজধানী মিথিলা শাসন করিতেন। বিদেহের অপর এক রাজা চেটক লিচ্ছবিগণের শক্তিশালী নেতা ছিলেন। তাঁহার কন্যা চেল্লনার সহিত মগধরাজ বিম্বিসারের বিবাহ হয়। ইঁহাদের পুত্রের নাম ছিল অজাতশত্রু। বিদেহরাজ নিমি পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া সংসার ত্যাগ করেন। মিথিলারাজ্য ত্যাগ করিয়া তিনি নির্জ্জন স্থানে গমন করেন। তিনি

বলিতেন লোকে অন্যায়ভাবে শাস্তি পায় এবং প্রকৃত অপরাধী ব্যক্তি মুক্তি পাইয়া থাকে। আত্মজয়ী পুরুষ সুখী হন। প্রত্যেকেরই ব্রহ্মচর্য্য পালন করা কর্ত্তব্য। রাজা মাথব সংসার ত্যাগ করেন। প্রাচীন বৌদ্ধনিকায়ের মতে এই সময়ে ভারতবর্ষ সাতটি রাজনৈতিক বিভাগে বিভক্ত হয়—মিথিলা ইহাদের অন্যতম।

পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, মগধের নৃপতিগণের সহিত মিথিলার রাজন্যবর্গের উন্নতি ঘটিয়াছিল। জানা যায়, মিথিলায় পুষ্পদেব নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার চন্দ্র ও সূর্য্য নামে দুই ধাম্মিক পুত্র ছিল। মিথিলার দানশীল নরপতি বিজিতাবী রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া হিমালয়ের সন্নিকটে একটি পর্ণকুটিরে আশ্রয় লন। ইহা ব্যতীত আরও অনেক রাজা মিথিলায় বাস করিতেন। নমিসাপ্য নামে মিথিলায় আর এক রাজা ছিলেন।

মহাভারতে উক্ত আছে, কর্ণ দিগ্বিজয়কালে মিথিলা জয় করেন। মিথিলার ন্যায়বান রাজা সাধিন বহুকাল সুখে বাস করিয়াছিলেন। তিনি ছয়টি ভিক্ষাগৃহ নির্ম্মাণ করেন এবং প্রত্যহ বহু অর্থ দান করিতেন। মিথিলায় মহাজনক নামে আর এক রাজা ছিলেন। কৈবর্ত্ত (মাহিষ্য) বেদখলকারীকে পরাভূত করিয়া পালবংশের রাজা রামপাল মিথিলা জয় করেন। বৈদ্যদেবের কামৌলি শিলালিপিতে মিথিলাজয়ের উল্লেখ আছে। বঙ্গদেশের সেনরাজগণের বরেন্দ্র ও মগধজয়ের পর নান্যদেবের নেতৃত্বে বিদেহে এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বর্দ্ধমান মহাবীরের আগমনে মিথিলা ধন্য হয়। রাজা মখাদেব জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া ভিক্ষু হন এবং উচ্চস্তরের অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন। ধার্ম্মিক রাজা সাধিন পঞ্চশীল এবং উপবাসের ব্রত পালন করিতেন। মিথিলার অপুত্রক রাজা সুরুচির বিধবা পত্নী সুমেধা সন্তান লাভের জন্য অষ্টশীল পালন করেন এবং সদ্‌গুণের ধ্যান করেন। অতঃপর তিনি পুত্রলাভ করেন।

ভারতীয় মুনিগণের ইতিহাসে বিদেহ রাজ্য একটি উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে। বুদ্ধদেব মিথিলায় বাসকালে মঘাদেব ও ব্রহ্মায়ু সূত্র প্রচার করেন। বাসিষ্ঠি নামে এক থেরী মিথিলায় বুদ্ধের দর্শনলাভ করে ও তাঁহার বাণী শ্রবণ করিয়া সঙ্ঘে যোগদান করে। বুদ্ধ কোণাগমন ও পদুমত্তর মিথিলা ধর্ম্মপ্রচার করেন। ভাগবত পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, মৈথিলগণ আত্মবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। বৌদ্ধযুগে বিদেহে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রবল ছিল। বিদেহ এবং মিথিলায় বুদ্ধের ধর্ম্মপ্রচারকার্য্য কিরূপ চলিয়াছিল এ বিষয়ে বৌদ্ধনিকায় হইতে কিছু জানিতে পারা যায় না। ভগবান বুদ্ধ মিথিলা মঘাদেবের আম্রকুঞ্জে অবস্থিতিকালে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আচার্য্য ব্রহ্মায়ুকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। মিথিলার রাজা রাজর্ষি জনকের কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। রাজা জনক সম্বন্ধে একটি শ্লোক কথিত আছে—'মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন'—মিথিলা অগ্নিদগ্ধ হইতে দেখিয়া রাজা জনক বলিয়াছিলেন, ইহাতে আমার কিছুই দগ্ধ হইতেছে না। জৈন উত্তরাধ্যয়ন সূত্রে রাজা নমি সম্বন্ধে এরূপ একটি উক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিরহে

শ্রীকালিদাস রায়

দোঁহারেই তুমি হেরিছ নয়নে ঊর্দ্ধ গগনে বসি,
দোঁহার বারতা হৃদয়ের ব্যথা তুমি ভালো জানো শশী।
তোমা পানে চেয়ে মোরা মনে মনে
যত লিপি লিখি বিরহ-শয়নে
তুমি বহ সবি, তাই তো তোমার বুকে মাখা তারি মসী॥

কিন্তু বন্ধু; মোদের বিরহে এত কেন তব হাসি?
হাসি পায় তব হেরি আমাদের এই ভালবাসাবাসি
তুমি ভাব' বুঝি মিলনে বিরহে
প্রেমের ভুবনে প্রভেদ কি রহে?
ভেদবুদ্ধিটা মোদের ভ্রান্তি প্রেম যদি অবিনাশী

তোমারি ভ্রান্তি, মানুষের সাথে নেই তব পরিচয়,
প্রিয়ার বিরহ কত যে অসহ জান না তা মহাশয়।
জান না বন্ধু শরীরীর কাছে
মিলনে বিরহে ভেদ খুবই আছে।
বিচারে তোমার ভেদ না থাকুক, ব্যথা ত মিথ্যা নয়।

কটকের 'সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ান ফিসারিজ রিসার্চ' ষ্টেশনের সহিত সংশ্লিষ্ট জলাধার সমন্বিত চালাঘর। এখানে জলের গুণাগুণ সম্পর্কে পরীক্ষাকার্য্য চালানো হয়

মৎস্যের চাষ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

গত যুদ্ধের সময় হইতেই মাছের আমদানী কম হইতেছে এবং উহার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে; মাছের আমদানী বাড়াইবার জন্য সরকারী মৎস্য বিভাগ বহু পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন এবং বহুস্থানে ঐ সকল পরিকল্পনা অনুসারে মাছের উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা চলিতেছে। এমন কি গভীর সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার জন্য "ট্রলারের"ও ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সকল প্রচেষ্টার ফলে মৎস্যের উৎপাদন কত পরিমাণ বাড়িয়াছে তাহার সঠিক হিসাব জানি না; তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, যদিও বর্ত্তমানে মৎস্যের দাম পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়াছে তথাপি উহা এখনও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরেই আছে; তরিতরকারীর দামের তুলনায় মাছের দাম কমে নাই। এই প্রসঙ্গে ইহা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, সরকারী পরিকল্পনার সুযোগ ও সুবিধা অনেক ক্ষেত্রেই পল্লীবাসিগণের গ্রহণ করা অসম্ভব। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেই এই কথা বলিতেছি। প্রবাসীর নিয়মিত পাঠকগণ পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যা হইতে আমার অভিজ্ঞতার বিবরণ পাইয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

যাহা হউক, আমাদের নিজেদের চেষ্টায় পল্লী-অঞ্চলে জলাশয়গুলিতে মাছের উৎপাদন অনেক পরিমাণে বাড়াইতে পারি। নয়-দশ বৎসর পূর্ব্বে যখন "অধিকতর খাদ্য উৎপাদন আন্দোলনের" বিশেষ কর্ম্মচারী ছিলাম, তখন মৎস্য বিভাগের তদানীন্তন অধিকর্ত্তা ডক্টর এস. এল. হোরা মহাশয়ের উপদেশ ও সাহায্যে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে প্রচারকার্য্য চালাইয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে ডক্টর হোরা বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ইনি পল্লী-অঞ্চলে জলাশয়গুলিতে মৎস্য উৎপাদনের অধিকতর বৃদ্ধির উপর বিশেষ জোর দিতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহার উপদেশগুলি পল্লী-অঞ্চলবাসিগণ অনায়াসে গ্রহণ করিয়া মৎস্যের উৎপাদন বাড়াইতে পারেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার কতকগুলি উপদেশের সারাংশ দেওয়া হইতেছে।

প্রথমেই বলা প্রয়োজন অন্নে আমাদের শরীরের পুষ্টি ও ক্ষয় পূরণের উপযোগী যে সকল উপাদানের অভাব থাকে, মাছ, মাংস প্রভৃতির দ্বারা তাহাদের পূরণ করিতে হয়, সুতরাং "অন্নজীবীদের পক্ষে মাছের একান্ত প্রয়োজন আছে। পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবেও মাছের চাষ বাড়ানো একান্ত আবশ্যক।

মাছের চাষে ব্যয় অপেক্ষা আয়ের পরিমাণ খুব বেশী। তবে মাছ সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া উহার সংরক্ষণ এবং উহাকে দ্রুতভাবে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা দরকার; তাহা করিতে পারিলে মৎস্য-চাষে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কোনই কারণ নাই। দেশের সকল স্থানের জলাশয়গুলিতে মৎস্য সংরক্ষণ করিতে পারিলে প্রত্যেক স্থানই মৎস্য সম্বন্ধে আত্মনির্ভরশীল হইবে।

বাংলাদেশে বর্ষাকালে ধানের ক্ষেতে ও ছোট ছোট পুকুরে, খালে-বিলে রুই, কাৎলা, মৃগেল প্রভৃতি মাছের পোনা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়; সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া জলাশয়ে ছাড়িয়া দিলে মাছের চাষ বাড়ানো যায়। ধানের ক্ষেতে স্বাভাবিকভাবে যে মাছ উৎপন্ন হয় তাহার প্রতি সামান্য যত্ন লইলেও অনেক পরিমাণে মাছ পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপে ধানের ক্ষেতেও মাছের চাষ করা যায়।

ডেরিস পাউডারের দ্রব প্রস্তুতি

আবহমানকাল হইতে বাংলাদেশে মাছের চাষ চলিয়া আসিলেও চাষের প্রণালীর অতি অল্প উন্নতিবিধান হইয়াছে। মৎস্যের চাষ সম্পর্কে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে। এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চাষ করিলে খুবই লাভবান হইবার সম্ভাবনা। অনেক স্থলে এই সকল বিষয় সম্পর্কে অনভিজ্ঞ হওয়ার জন্য মাছের চাষে হতাশ হইতে হয়। প্রধান বিষয়গুলি হইতেছে—

১। বোয়াল, সোল, ল্যাটা, চিতল প্রভৃতি যে সকল মাছ—মাছ খাইয়া থাকে সেগুলিকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করিয়া সরাইয়া না লইলে উহারা মাছের ডিম বা পোনা খাইয়া ফেলে এবং সেই কারণেই বহু জলাশয়ে প্রচুর মাছের পোনা ছাড়িয়াও পরে বেশী পরিমাণে মাছ পাওয়া যায় না। সেইজন্য মাছ ছাড়িবার পূর্ব্বে পুকুরে জাল টানিয়া কিংবা গ্রীষ্মকালে উহার জল শুকাইয়া ফেলিয়া যতদূর সম্ভব এই সকল মাছকে

হাওড়া ষ্টেশন হইতে বোম্বাই মেলের একটি তৃতীয় শ্রেণীর রিজার্ভ করা কামরায় ভূপালে 'মৎস্য-বীজ' চালান

পুকুর হইতে সরাইয়া ফেলা উচিত। ইহা ছাড়া অনন্তকাল ধরিয়া পুকুরে জল ভর্ত্তি করিয়া রাখার জন্য অতি শীঘ্র শীঘ্র এবং যথেষ্ট পরিমাণে মাছ কমিয়া যায়। পুকুরে জল অল্প দিনের জন্যও শুষ্ক করিয়া রাখিলে মাছের চাষের পক্ষে উহা অধিকতর উপযোগী হয়।

২। মৎস্য চাষের জন্য গভীর পুকুর খননের প্রয়োজন নাই। অভিজ্ঞতার ফলে জানা গিয়াছে যে, পুকুরের বা জলাশয়ের অগভীর অংশই মাছের চাষের পক্ষে বেশী উপযোগী। নূতন পুকুর খনন করিবার পর কিছুকাল ফেলিয়া রাখিয়া পরে উহাতে মাছ ছাড়া উচিত।

ট্রেণে চালান দিবার জন্য মাটির পাত্রে মাছের পোনা ভর্ত্তি এবং এরোপ্লেনে চালান দিবার জন্য টিনের পাত্রগুলি অক্সিজেন-মিশ্রিত জলধারা পূর্ণ করা হইতেছে

৩। কচুরিপানা এবং অন্যান্য জলজ ঘাস জলাশয় হইতে নির্মূল করিতে হইবে। ঝাঁজ পানা, কলমী শাক প্রভৃতি কয়েকটি উদ্ভিদ মাছের খাদ্য সরবরাহে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে; সেগুলি সরানো উচিত নহে। যদিও মাছের ছায়ার জন্য জলের উপর কিছু জলজ উদ্ভিদের প্রয়োজন আছে কিন্তু উহাদের পরিমাণ বেশী হইলে এবং উহারা সমস্ত জলতল ছাইয়া ফেলিলে উহাদের পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে।
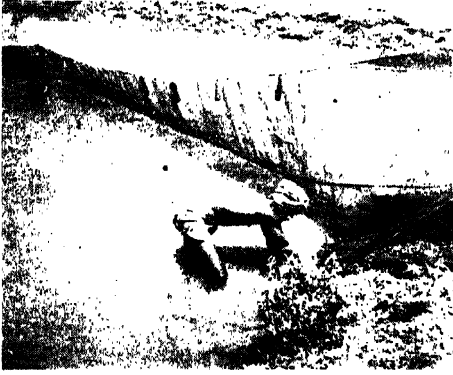
মহানদী জলসেচের খাল হইতে মাছের চারা সংগ্রহ

৪। মাছের ডিম প্রথমেই পুকুরে না ছাড়িয়া উহাকে প্রথমে একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ে ফুটাইয়া একটু বড় করিয়া পুকুরে ছাড়া উচিত। কারণ ঐ সকল ডিমের মধ্যে সোল, বোয়াল, ল্যাটা, চিতল প্রভৃতি মৎস্যভুক মাছের ডিমও থাকিতে পারে। পোনাগুলি আঙ্গুল প্রমাণ হইলে তাহা হইতে ঐ সকল মৎস্যভুক মাছের পোনা বাছিয়া লইয়া পুকুরে ছাড়াই নিরাপদ। ডিম ফুটাইবার জন্য আট ফুট লম্বা, আট ফুট চওড়া এবং দেড় ফুট গভীর জলাশয়ই যথেষ্ট। চব্বিশ হইতে ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যেই ডিমগুলি ফুটিয়া যাইবে; তখন কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইয়া উহাদিগকে তিন চারি ফুট গভীর একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত এবং উহাদের খাদ্য হিসাবে তাহাতে সামান্য পরিমাণ গোময়, খৈল বিচালি, শুকনা পাতা প্রভৃতি সার হিসাবে প্রয়োগ করিলে ভাল হয়। যতদিন পর্য্যন্ত পোনাগুলি পুকুরে ছাড়িবার উপযুক্ত না হয় ততদিন উহাদিগকে ঐভাবে পালন করিতে হইবে। শীতকালে তিন হইতে ছয় ইঞ্চি পরিমাণে লম্বা পোনা পাওয়া যায়; সেরূপ পোনা সংগ্রহ করিতে পারিলে উপরোক্ত নিয়মে পালন করিবার প্রয়োজন হয় না।

৫। পুকুরের আয়তন, গভীরতা এবং মাছের খাদ্যের পরিমাণের হিসাব করিয়া মাছ ছাড়িতে হইবে। মোটামুটি ভাবে বলিতে পারা যায় যে প্রত্যেক মাছের জন্য অন্ততঃ এক গ্যালন বা পাঁচ সের জল থাকা আবশ্যক অথবা ছয় ফুট গভীর স্থান দরকার এবং উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য থাকাও চাই। পুকুরের তুলনায় মাছ সংখ্যায় খুব বেশী হইলে সুফল পাওয়া যায় না।

৬। মাছের যাহা খাদ্য অর্থাৎ জলজ উদ্ভিদ, কীট, পোকা মাকড় ইত্যাদি তাহা জলে এবং জলের তলায় থাকা

পরীক্ষণের জন্য কটকের ফিসারিজ রিসার্চ সাবষ্টেশনের একটি পুকুর হইতে জাল দিয়া মাছের পোনা ধরা

দরকার। স্বল্প গভীর জলাশয়ে ঐ সকল জলজ উদ্ভিদ সহজেই বর্দ্ধিত হয়। পরে উহারা জলের তলায় চলিয়া যায় এবং সেখানে বিস্তৃত হইয়া পোকামাকড়ের আহার জোগায়। এই সকল পোকা মাকড় জলজ উদ্ভিদই পরে মাছের খাদ্য হয়। সকল পুকুরের জল সমান নহে বলিয়া মৎস্যের আকারেরও তারতম্য দেখা যায়। সকল মাছও একই প্রকার খাদ্যে পুষ্ট হয় না। মৃগেল মাছের পক্ষে জলাশয়ের তলদেশের জৈব খাদ্যই উপকারী, কিন্তু রুই কাৎলার পক্ষে পুকুরের কিনারায় ভাসমান উদ্ভিদ খাদ্যই ফলপ্রদ। কৃত্রিম খাদ্য সরবরাহ করিলেও ভাল ফল পাওয়া যায়।

৭। গ্রীষ্মকালে অথবা মাছগুলি আট-দশ মাসের হইলে জলাশয়ে মাঝে মাঝে জালটানা আবশ্যক। উহাতে জলাশয়ের উপরিভাগের দূষিত পদার্থসমূহ নষ্ট হইয়া যায় এবং মৎস্যগুলির দ্রুত সঞ্চালনে তাহাদের ব্যায়ামেরও সুবিধা হয়। পুকুরে মাছের রীতিমত বৃদ্ধির অভাব ঘটিলে তাহাতে উপরে বর্ণিত সার প্রয়োগ করা আবশ্যক এবং প্রয়োজন হইলে তাহা হইতে কিছু মাছ সরাইয়া ভিন্ন জলাশয়ে ছাড়া উচিত।

৮। মাছের জন্য জলাশয়ের উপর কিছু অংশে ছায়া থাকা আবশ্যক। পুকুরের পাড়ে গাছ থাকিলে তাহার ছায়া জলের উপর পড়িয়া মাছের উপযোগী ছায়া দান করিয়া থাকে; কিন্তু সেরূপ না থাকিলে পুকুরের দুই-এক অংশে কলমী, শুশুনী, শাপলা প্রভৃতি জন্মাইবার ব্যবস্থা করা দরকার।

কটকের ফিসারিজ সাবষ্টেশনে প্রতিপালিত কয়েকটি মৎস্য

৯। মাছের গায়ে অনেক সময় পোকা বা উকুন লাগে। তাহারা গা ঘষিবার সুযোগ পাইয়া অনেক সময় ঐসকল পরজীবীর হাত হইতে মুক্তি পাইতে পারে। সুতরাং মাছের গা ঘষিবার সুবিধার জন্য পুকুরের মাঝে মাঝে খুঁটি পুঁতিয়া দিতে হয়।

মাছের দেহে কোনরূপ লাল দাগ বা উকুন দেখিতে পাইলে তাহার চিকিৎসা করা প্রয়োজন। সেই সকল মৎস্যকে শতকরা দুই বা তিন ভাগ লবণ মিশ্রিত জলে বা ৫ সের জলে ½ গ্রেন পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট মিশাইয়া সেই জলে কয়েক মিনিটের জন্য রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে। ব্যাপক ভাবে মাছের মধ্যে ঐরূপ রোগ দেখা দিলে পুকুরের জলকে ঐভাবে শোধন করিয়া লওয়া আবশ্যক।
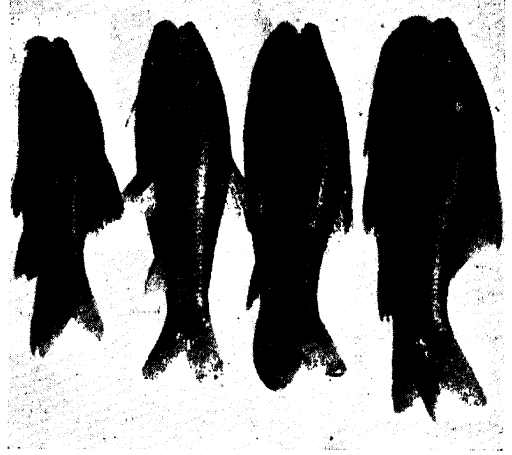
কটকের ফিসারিজ সাবষ্টেশনে প্রতিপালিত আরও কয়েকটি মৎস্য

১০। গ্রীষ্মকালে পুকুরের পাড় ও তলদেশ হইতে পচনশীল উদ্ভিদগুলি সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করা দরকার। তলদেশে মৃত জৈব পদার্থের পচন বশতঃ সময়-সময় অনেক পরিমাণে মাছ মরিতে থাকে, তখন জাল টানিয়া পুকুরের জলরাশিকে বিশেষ ভাবে আলোড়িত করা উচিত। মাছের মধ্যে মড়ক দেখা দিলে জলকে চুণ কিম্বা পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট দ্বারা শোধন করিয়া দেওয়া দরকার। মাছের মৃত্যুর হার অধিক হইলে সে সম্বন্ধে রীতিমত অনুসন্ধান করিয়া কারণ নির্দ্ধারণ-পূর্বক ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ডায়েরী

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে আজ সকাল থেকে জনস্রোত বয়ে চলেছে। নিশ্চয় রাত্রির শেষ প্রহর থেকেই, কিন্তু তা' ত আর দেখা হয় নি। ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ, দলে দলে চলেছে সব। এ ধরণের স্রোতে যেমন হয়ে থাকে—মেয়েই বেশী। কারুর মাথায় একটি বড় পোঁটলা, তারই সঙ্গে আবার ছোটখাটো দু'একটিও বোধ হয় ঝুলছে, এদিকে যেমন নিজে আর কাঁখে হয় ত একটা শিশু, হাতে একটা পেট-মোটা হুঁকো। পোঁটলায় আছে রুটি, যবের, কিংবা গমের, কিংবা মেরুয়ার; পুষ্টকায়, এক একখানি রুটি বেশ ছোটখাটো চাকির মতই; দশখানা, পনেরখানা, ত্রিশখানা, যে দলটা যেমন। হয়ত ছাতুও আছে, কিম্বা চিঁড়েই। ছোট পুঁটুলি-গুলিতে নুন, লঙ্কা, পাতায় মোড়া আমের আচার, তামাক, টিকে। এর অতিরিক্তও কত কি থাকতে পারে, মেয়েদের পুঁটুলিই ত, ওর মধ্যে পুরুষের মন কি সিঁদ কাটতে পারে?

কাল মাঘী পূর্ণিমা, 'কমলা' নাইতে যাচ্ছে সব।

শুধু এ-জেলারই লোক নয়, আসছে মজঃফরপুর থেকে, মোতিহারি থেকে, ছাপরা থেকে; কতকটা পায়ে হেঁটে, কতকটা গাড়ীতে, তারপর এই শেষ মোহাড়ায় এখন পায়ে হাঁটারই পালা। এর মধ্যে হয়ত গঙ্গার তীরেরও লোক আছে। কমলা-মাঈ যে বড় জাগ্রত। হয়ত ঘরের গঙ্গার অবস্থা গেঁয়ো যুগীর মতই, তবু কমলা-মাঈ সত্যই বড় জাগ্রত, বাঁজার কোল ভরে দিতে এমনটি আর কেউ নেই। "হে কমলা মাঈ!" বলে একটা ডুব দিলেই হ'ল, পার ত দুটো জবা ফুল, কি জবায়-বিল্বপত্রে গাঁথা একটা মালা; খাশি দিতে পারলে ত তার কথাই নেই।

ওসব গেল ওদিককার কথা। মা গঙ্গা বড় কি মা কমলা—সে ঝগড়াও তাঁরাই মেটাবেন। আমি দেখছি জীবনের জয়যাত্রা। চরৈবেতি-চরৈবেতি—এগিয়ে যেতে হবে—কুম্ভমেলায় মৃত্যু জয়ডঙ্কা বাজিয়েছে?...ও কিছু নয়, ওর ওপারেও জীবনের জয়ডঙ্ক। বাজিয়ে যেতে হবে—ঘর ছেড়ে বাইরে. দেশ ছেড়ে দেশান্তরে, ঘরের দেবতা হোন বড়, কিন্তু বেঁধে রাখেন যে! হে গঙ্গা মাঈ অপরাধ নিও না, দেখে আসি একটু কমলা-মাঈকে।

সকাল থেকে দেখছি, কি আবেগ পদক্ষেপে! ক্লান্তিও আছে, তবে মানবে না ত ক্লান্তিকে?

ইচ্ছে করে নেমে পড়ি আমিও, কিন্তু এও বুঝছি, তার উপায় নেই। বাড়ীর গেটের বাইরে দিয়েই গেছে বটে তবু এ পথ বহু দূর, এ পথ কোঁচানো ধুতি, পাট-ভাঙা, পালিশ করা জুতোর জন্যে নয় যে, তাদের হাত থেকে কি করে পরিত্রাণ পাব? যাওয়া যায় এই শুচি-বেয়েদের শুচিতো বাঁচিয়েও; যাচ্ছেও ত রিক্সা, টাঙ্গা, মোটর, কিন্তু ও-যাত্রা আর এ-যাত্রা ত এক নয়; এ বরং ওর উপর একটা উদ্ধত উপদ্রব। ঐ ত চলেছেও, ভিড় চিড়ে, চীৎকার করতে করতে, ধুলো উড়িয়ে—সর, সর, পথ ছাড়। অনধিকারীর দল।

আমার ত মনে হয় সব তীর্থযাত্রাই রথযাত্রা, তাতে অতি ক্ষিপ্রতা, অতি শুচিতা থাকলে চলবে না, পেছটানও নয়, চিন্তাও নয়। সে মুক্ত অশুচিতা কবে হারিয়ে ফেলেছি, আর কি পাবার উপায় আছে?

তবুও মনটা ছটফট করছে।

একটা রফা করা গেল মনের সঙ্গে।

রফার কথাটা খেয়াল হ'ল বাগানটার উপর নজর পড়ে যেতে।

বাড়ী আর রাস্তার মাঝামাঝি ছোট্ট বাগানটা আমাদের, মরশুমী ফুলে রয়েছে ভরে। মাঝখানে খানিকটা সবুজ লন, তার চার দিক ঘেরে পিঙ্ক, ফ্লক্স্, মেরিগোল্ড, ভারবিনার সারি—ছোট ছোট গাছ, কোনটা লতানে, কোনটা বা নয়; এমন রঙ নেই যা নেই; বসন্তের উৎসবে যেন সাজগোজের রেষারেষি করে বেড়িয়ে এসেছে একপাল ছেলেমেয়ে। তাদের পেছনে আছে ডালিয়া, গোলাপ, গন্ধরাজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে; অত ফুল, অত বিচিত্র সম্পদ, মাথা উঁচু থাকবারই ত কথা। তারও পেছনে কঞ্চির বেড়াগুলোকে সবুজে সবুজে আচ্ছন্ন করে দিয়ে, সাদা, বেগুনে, গোলাপী, নীল ফুলের চুনি-পান্না-হীরা-জহরতের তাজ পরে কাতারে কাতারে সুইটপী।

আজ আর ঘরে বসে লেখা নয়। মনের সঙ্গে রফা হ'ল, পথে বেরুতে না পারি, আজ পথের ধারে বসেই লেখা চলবে আমার। আমার গতি ত আমার দল নিয়েই—লক্ষ্মণ, ভিখারী, অনঙ্গ, নয়ান-বৌ, সোনা—দেখি না আজকের পথের এই দুরন্ত সচলতা ওদের পায়েও যদি খানিকটা এনে ফেলতে পারি। চাকরটাকে বলতে ক্যাম্প-চেয়ারটা পেতে দিয়ে এল, সামনে একটা নীচু চৌকো টেবিল।

একটু কি অ-বিনয় হ'ল? আমার সরস্বতী এখনও

নারায়ণের নব বধূরূপেই থাকতে চান, একটু আড়াল, একটু প্রচ্ছন্নতা। তা কিন্তু আছেই। আমি বসেছি বাগানের একটা কোণ ঘেঁষে, দু'দিক থেকে ফুলের দু'টি সারি সেখানে এসে মিলেছে। বসেছি রাস্তার দিকে মুখ করে। সামনের সারিটা একটু পাতলা, কতকটা স্বচ্ছ; নীচে মাত্র একসার পিঙ্ক, তার পরেই সুইট-পী; রাস্তায় কি হচ্ছে না হচ্ছে দেবী মোটামুটি পারেন দেখতে, অথচ তাঁর প্রচ্ছন্নতাও মোটা-মুটি থাকবে বজায়।···শুভযাত্রা, পেয়েও গেছি বসবার এক রকম সঙ্গে সঙ্গেই। ঐ যে মেয়েটি হ্যালা-ফ্যালা করে সবুজ সাড়িপরা, সিধে, বেপরোয়া পুরুষালি চাল, এত ভিড়েও মাথায় কাপড় নেই, খোঁপাটা না আছে দেখাবার মাথাব্যথা, না আছে লুকোবার গরজ—ওই হবে আবার লক্ষ্মণের বৌ সোনা। চেয়ে আছি ওর লঘুচপল, অনাসক্ত পদক্ষেপের দিকে—পথ চলছে, কিন্তু কৈ—পথের ধূলি কি লাগছে পায়ে ওর?···এই রকম করে গড়তে হবে সোনাকে আমার—জীবনের পথে, তার পা দুটি চলায় চঞ্চল, কিন্তু কখনই ধূলায় মলিন নয়।

সোনা ধীরে ধীরে বেশ মূর্ত্তি নিয়ে উঠছিল মনে আমার, হঠাৎ বাধা পড়ল; মন আমার পথ থেকে এসেছে গুটিয়ে। আমার সামনের দিকটার কথা বলেছি, পাশের বলা হয় নি। আমার ডান পাশটায় সবুজ লনটা রয়েছে ছড়িয়ে—ঐ মেয়েটার সবুজ সাড়িখানা যেন হ্যালাফ্যালা করে গায়ের উপর বিছানো—মেরিগোল্ডের হলদে আঁচলাটা অবহেলাতেই পুকুরপাড়ে রয়েছে লুটিয়ে। আমার বাঁ দিক ঘেঁষে আবার ঐ মরশুমী ফুলের কেয়ারি; এইটাই সব চেয়ে ঘন, পুষ্ট আর সতেজ। তার কারণ, প্রথমত এদিকে জায়গাটা একটু বেশী, যার জন্যে ছোট ছোট পিঙ্ক থেকে একেবারে শেষে সুইট-পীর লতাগুলো ত রয়েছেই, মাঝে মাঝে গোটাকতক বৈজয়ন্তীর ঝাড়ও বসিয়ে দেওয়ার সুযোগ পাওয়া গেছে। দ্বিতীয়ত—এই দিকেই ইঁদারাটা আমাদের, যার জন্যে গাছগুলো মালীর হাতে সাধারণ যেটুকু প্রাপ্য তার অতিরিক্ত কিছু কিছু জল পেয়েই যায় সমস্ত দিন। সুইট-পীর সারিটা আবার ইঁদারা ঘেঁষেই; লতাগুলো কঞ্চির ডগা ছাড়িয়ে অনেকখানি গেছে উঠে, ফলে ইঁদারার চাতালটা উঁচু হলেও, বাগান থেকে বেশ একটু আড়াল করে রেখেছে সেটাকে। পুরু ভেলভেট বা সাটিনের পর্দ্দা নয় (যদিও গাছগুলোকে দেখে তাই বলতে ইচ্ছে করে), চিকের পর্দ্দা, দরকার পড়লে ভেতর থেকে বাইরে দেখা যায়, তেমন মাথাব্যথা পড়লে বাইরে থেকে ভেতরেও, তা যদি না হ'ল ত নিজেকে নিজেকে নিয়ে বেশ নিরুপদ্রবেই কাটানো যায় এক রকম।

আমার মনটা যে রাস্তার দিক থেকে গুটিয়ে এসেছে তার কারণ ইঁদারার চাতালের খোঁজ নেওয়া একটু দরকার পড়ে গেছে আমার।

কানে গেল—"আমায় ঐ রাঙা ফুলটা দেবে তুলে?"

সবুজ চিকের ফাঁকে দৃষ্টি প্রসারিত করতে হ'ল; ফুল চাইছে দশ-বার বছরের একটি ছোট ছেলে, তার লুব্ধ দৃষ্টি পড়েছে আমার বাগানের সবচেয়ে বড় লাল টকটকে ডালিয়াটির উপর। চেয়েছে মালীর কাছে, সে বাগানের জন্যেই জল তুলছিল। অবশ্য ভয় নেই, মালী ইতিপূর্ব্বেই শিউরে উঠেছে, বলছে—"ফুল! আরে বাস্‌রে! তোমরা গেঁয়ো, এসব বিলিতী ফুলের কদর কি বুঝবে? এক একটা ফুলের পেছনে কতগুলো করে টাকা খরচ করতে হয়েছে জান? একি তোমাদের গাঁয়ের বাগানের টগর কি গাঁদা নাকি যে নিলেই হ'ল একটা তুলে? দেখছ যে তারই দাম দিতে জিভ বেরিয়ে যাবে!"

দেবে না, তা জানি, ফুল মালিকের চেয়ে মালীরই বেশী, আমি ফুলদানির জন্যে দুটো চাইলেই কাঁচুমাচু করে। তা দেবে না, ভালই, কিন্তু এত লোভ বাড়িয়ে দিতে গেল ঐটুকু একটা ছেলের? ওটা না হোক, ছোট একটা তুলে ওর হাতে দেওয়া উচিত কি না ভাবছি, এমন সময় ওদিককার সিঁড়ি দিয়ে আরও কয়েকজন এস উঠে। একজন বয়স্থ পুরুষ, একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক, একটি ছোট মেয়ে, আট নয় বছরের আর একটি যুবতী, বেশ খানিকটা পর্য্যন্ত ঘোমটা-টানা, নিশ্চয় বাড়ীর বৌ।

সবাই কমলার যাত্রী।

কোন কোন দল এমনি করে আটকে যায় একটু। ওদিকে গেটের পাশেই যে শানের বেঞ্চটা আছে সেটা করে আকৃষ্ট, তারপর এই ইঁদারাটা। একটু পা মুড়ে বসে, গল্প-সল্প করে, পুঁটুলি খুলে দরকার পড়ল ত কিছু খেয়ে নেয়, নিদেন, ছোট ছেলে-মেয়ে রইল ত তাদের কিছু খাইয়ে দেয়। মেয়েরা একটু সরে বসে তামাক সেজেও গোটাকতক টান যাতে দিয়ে দিতে পারে তারও জন্যে জায়গা আছে। চেনা কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ত যথাপদ্ধতি গলা-জড়াজড়ি করে একটু কেঁদেও নেয় শুষ্ক চোখে। তারপর আবার পৌটলা বাঁধা হ'ল, হুঁকো বোলানো হ'ল; একটি ছোট্ট—"কমলা মাঈ কী জয়!" আবার সেই পথ।

সবাই মিলে আমার ফুলের ব্যাখ্যান করছে, বেশ অভিভূত হয়ে পড়েছে সকলে। কর্ত্তা মনে হ'ল পণ্ডিত-মানুষ আর সব ফুল চিনতে পারছেন না, তবে বৈজয়ন্তী নিয়ে চমৎকার একটি শ্লোক বলে সবাইকে মানেটা বুঝিয়ে দিলেন। বৈজয়ন্তী আবার দুর্গার নামও ত, চমৎকার একটা মিল টানা হয়েছে শ্লোকটিতে।

রাস্তা থেকে উঠে এসে ক্ষতি হয় নি, পুষ্পে, শ্লোকে, দেবীতে আমার মনটা অন্য এক রসে বেশ ডুবে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।...আর এও ত রাস্তারই দান।

এক বালতি জল তুলে দিব্যি করে মুখ হাত পা ধুয়ে কর্ত্তা নেমে চলে গেলেন। গিন্নি তখন বসলেন অন্নপূর্ণা হয়ে।

এঁরা ব্রাহ্মণ, রুটির পাট নেই। পোঁটলা খুলে চিঁড়ে বের করলেন, ছেলেমেয়েরা ঘিরে বসল ছোট ছোট কলাপাতা নিয়ে, বৌটিও 'ক্ষিদে নেই' 'ক্ষিদে নেই' বলে আরম্ভ করে তারপর শাশুড়ীর জিদে বিছিয়ে নিলে একটি পাতা—যেমন করা উচিত। চিঁড়ে, গুড়, বোধ হয় একটু করে আচার। ছেলেমেয়েরা নাকে কেঁদে, আব্দার করে এক আধমুঠো বেশীই নিলে, বৌটি আব্দার করলে না, বরং মানাই করলে—যেমন করা উচিত, অবশ্য পেলে আরও বেশ বড় মুঠোরই এক মুঠো।...খাচ্ছে ওরা, কিন্তু আমার মুখটি মিষ্টি রসে আসছে ভরে!...নয়ান বৌ যদি ওরকম করে শ্বশুরবাড়ী ছেড়ে চলে না আসত ত শাশুড়ী-শ্বশুর ননদে এই ধরণের একটা চিত্র বেশ আঁকা যেত কোন তীর্থযাত্রার পথে। সে আপশোশ করে এখন আর কি হবে? অনেকখানিই যে এগিয়ে গেছে নভেলটা আমার।

ওরা থাক, ওদিকে স্রোতের অনেকখানিই জল গেল বেরিয়ে, কত বৈচিত্র্যে, কে জানে? এই হয়েছে মুশকিল—স্রোত দেখি কি এই রকম আবর্ত্ত দেখি?

আমার বিশ্বাস ওটা দ্বিতীয় পক্ষের ব্যাপার। একেবারে বুড়ো অবশ্য নয়, তবে প্রৌঢ়ত্বে বেশ এগিয়েই এসেছে লোকটা; কাঁধে একটি শিশু বছর দুয়েকের; যেটি হাত ধরে চলছে সেটি চার বছরের হবে। মা চলেছে এগিয়ে এগিয়ে। গতিও বেশ দ্রুত, যার জন্যে দেখছি ছেলে ঘাড়ে করে ও-বেচারির পাল্লা দিতে রীতিমত বেগ পেতে হচ্ছে। বয়স কম ত বটেই, গতরেও বেশ, যার জন্যে মনে হয় দুটো ছেলেকে ও নিজেই দু' কাঁধে করে নিয়ে যেতে পারত; ঐ রকম বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতেই। ইঁদারা থেকে আমার মন সরে গেছে, ওদের কথাই ভাবছি। লোকটার নিশ্চয় তীর্থস্থান দরকার, প্রায়শ্চিত্ত চাই ত! কিন্তু মেয়েটাও তো আরও সন্তানকামনায় ডুব দিতে যাচ্ছে—তার পর?

দিন এগোবার সঙ্গে ভিড়ও হচ্ছে পুষ্ট। এতক্ষণ বেশীর ভাগ বাইরের যাত্রীই ছিল, যারা দূর থেকে হেঁটে আসছে বা ভোরের গাড়ীতে নেমেছে, এবার শহরের ভেজাল আরম্ভ হয়েছে আস্তে আস্তে। মেয়েদের দলে আর পুঁটুলির বালাই নেই, কমলার জলে ধুইয়ে ফেলবার বেশী কিছু আছে বলে বাইরে থেকে মনেও হয় না; বেশ ফিটফাট, সাজগোজে শহরের পরিপাটি আছে। পর্দ্দানশীনরাও রয়েছে, ছই দেওয়া রবার টায়ারের গোরুর গাড়ীতে, পর্দ্দার বিভিন্ন স্তরের, অর্থাৎ এক একটা ছইয়ের মুখ আবার চাদর দিয়ে ঢাকা। অসূর্য্যম্পশ্যা; ভেতর থেকে সমবেত সঙ্গীত উঠছে। শহরের ভেজালে পুরুষের ভাগও বেশী। তা হোক্, শুধু ডম্ফাটা যদি বাদ দিত!

ডম্ফা হচ্ছে ওদের সেই দোলের মাদল। এদের দোলের সূত্রপাত আবার এই মাঘী পূর্ণিমা থেকে, হয়তো un-official, তবু কার্য্যতঃ তাই। কতকটা বাঁচোয়া এই যে সাধারণতঃ নাইতে যাওয়ার মুখে ওরা নিজ মূর্ত্তি ধরে না, এখন গান যা গাইছে তা ভদ্রই—কান্হাইয়া কিংবা রাম-লক্ষ্মণ।...'রাম খেলে হোলি হো, লছমন্ খেলে হোলি!...' বিকেলের দিকে ফেরবার সময় আর এ শান্তভাব থাকবে না। সেই আদি অকৃত্রিম হোলির গান। কি মনে করে ওরাই জানে, হয়তো ভাবে, এত পুণ্য সঞ্চয় হয়ে গেছে একটা ডুবে যে আর দাগ লাগার ভয় নেই আপাততঃ। নয়তো জীবন মানেই তো এই; চলুক বছরখানেক ধরে, তার পর কমলা-মাঈ তো আছেনই।

আছেন আর কোথায়? শুকিয়ে আসছেন কমলা-মাঈ; গঙ্গা-মাঈও। আর কত সইবেন, কত পাপ আর ধোবেন?

দুটি ছেলে নিয়ে সেই দম্পতি আমার প্রায় সামনেই রাস্তার ধারে এসে দাঁড়িয়েছে, বাগানের নীচু দেয়ালটায় ঠেস দিয়ে। একটু পরে মেয়েটা ছেলে দুটোকে নিয়ে সরে গেল; জল খাওয়াবার জন্যে আমাদের ইঁদারাতেই নিয়ে আসছে বোধ হয়, গেট হয়ে ঘুরে, কিংবা রাস্তার ধারে টিউবওয়েলটায় যাবে। নিজেরও তৃষ্ণা পেয়েছে নিশ্চয়, নইলে পুরুষটাকেই তো দিত ঠেলে। ভাবছি পুরুষটার তৃষ্ণা কেন পেলে না, সবচেয়ে বেশী পাওয়ার কথা তো ও বেচারিরই। হয়তো তাঁবেদারির এও একটা অভিনব রূপ, দেখ, তোমার সেবায় ক্ষুধা তৃষ্ণাও ভুলেছি।

অর্থাৎ আরও সয়; তুমি যথেচ্ছা ডুব দাও কমলা-মাঈর জলে, আমি আরও বইব ঘাড়ে-পিঠে।

একটা দুর্জ্জয় লোভ হচ্ছে মনে, ডেকে নিয়ে চুপি চুপি একটু কানভাঙানি দেব? অসহায় পুরুষই তো, বলি—"অত কেন? শেষকালে, যেমন দেখছি, ওকে সুদ্ধ যে ঘাড়ে তুলতে হবে। "না হয় দ্বিতীয় পক্ষেরই, তা ব'লে..."

মনটি আবার হঠাৎ রাস্তা ছেড়ে ইঁদারায় চলে এল। কানে গেল—"এবার আপনারা দু'জনেও একটু জল খেয়ে নেবেন মা।"

সেই বৌটি বলছে। ওদের সবার খাওয়া হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। বৌটির ইচ্ছে শ্বশুর আর শাশুড়ীও এইবার বাসী-মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নেন। টের পেলাম আর এক জনও আছে সঙ্গে; কিন্তু উচিত নয়তো তার কথা তোলা। এ সবে বেশ হুঁসিয়ার বৌটি।

শাশুড়ী বললেন—"আমরা মা-কমলায় না ডুব দিয়ে কি খেতে পারি মা? এতদূর বেয়ে আসা। বরং দেবেন্দ্রকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে যদি কিছু খায় তো দেখ।...আমরা দুজনে নেমরক্ষা করে গেলেই হ'ল; সব্বাইকেই উপোস করে থাকতে হবে কেন? পুঁটুলিটা রইল, পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি।"

"আমার কথা কেউ শুনবে?"

"শুনবে'খন; না শোনবার কি আছে?"...একটু জিরোনোও হবে তোমার, পা দুটো ব্যথা করছে বলছ; ইঁদারার চাতালটিও বেশ চমৎকার।"

উঠে গেলেন গিন্নি, বাকি তিনটিকে নিয়েই।

আমি বেশ একটু দ্বিধায় পড়ে গেছি, আর বসে থাকাটা ঠিক হয় কি? ভাল করে ভেবে দেখতে অল্প একটু দেরিই হয়ে গিয়ে থাকবে, তার পর—আমি উঠে পড়তেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই যে ব্যাপার আশঙ্কা করে উঠতে যাওয়া সেটা একেবারেই এমন গুরুতর আকারে দিলে দেখা যে, ওঠবার আর উপায় রইল না।

"তোমার পায়ে নাকি বড্ড ব্যথা?...আমি বারণই করেছিলাম। তা আমার কথা কে শুনছে?

—কেউ কারুর কথা শোনে না ওরা।

মেয়েটি বললে—"কে বললে ব্যথা পায়ে আমার?... হ'ল আরম্ভ!"

"কেউ না বললেও টের পাওয়ার লোক আছে।... ফুলেছেও তো দেখছি।"

"তুমি ঐরকম দেখো।...নাও, যার জন্যে পাঠিয়েছেন, একমুঠো খেয়ে নাও, এখনও অনেকটা দুর।"

"খাওয়ার জন্যেই আমার মাথাব্যথা যত! অনেকটা দুর তো যাবে কি ক'রে?"

"যেতেই হবে। কেউ তো ঘাড়ে করে নিয়ে যাবে না।"

এ রসিকতাটুকুতে ছেলেটি নিশ্চয় একটু সুবিধা পেলে। কাছ ঘেঁসে বসল মেয়েটির। বসবার আগে যদি চারিদিকটা একটু ভাল করে দেখে নেয় তো এইখানেই শেষ হয়ে যায় ব্যাপারটা, গেটের দিকে যেদিকে ওরা সব—সেই দিকটাতেই নজরটা নিলে বুলিয়ে এক বার, কামিনীগাছের বেশ একটি আড়াল আছে; নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ল বসে।...তাও এমন হুট করে বসে পড়ল যে আমি যে এ সুযোগটাও গ্রহণ করব তারও কোন উপায় রইল না। সময় নেই তো, এখনি আবার পথে নামতে হবে, তারে আগে দুটো মিনিট—

"না, অন্যায় করব; দাও একটু না হয় টিপে দিই... মানে একটু হাতটা টেনে টেনে আর কি..."

"কি বলছ তুমি?"—খুবই শিউরে উঠেছে নিশ্চয় মেয়েটা।

"ঠিকই বলছি। দোষ হয় না এতে...কেন গীতগোবিন্দও তো শুনিয়েছি তোমায়।"

"সে-সব ঠাকুরদেবতার ব্যাপার...আর তা ভিন্ন তুমি না তীর্থ করতে চলেছ?"

"আমার তীর্থ...মানে, শুনলে তো মার কথাই—ওরা রয়েছেন, আমাদের এখন অত তীর্থের জন্যে নেম-আচার করতে হবে না...দাও এগিয়ে একটা পা..."

একটা গলা-খাঁকারিই না হয় দিই?...সেটা কেমন যেন ঠিক হয় না এ-অবস্থায়; অর্থাৎ এতদূর যখন গড়িয়েছে। তা ভিন্ন ভাবলাম—

ঠিক কি যে ভেবেছিলাম এখন মনে পড়ছে না। তবে হয় নি ওঠা। তাই বোধ হয় হয়েছিল ভাল, কেননা এর পরে যে নীরবতাটুকু এসে পড়ল তাতে মনে হ'ল 'গীত-গোবিন্দে'র একটি গার্হস্থ্য সংস্করণ সুরু হয়েই গেছে সুইট পীর ওধারে।

একটি হাওয়া উঠেছে বেশ, ফোটা ফুলে মৌমাছিদের ভিড়ও হঠাৎ বেড়ে গেল কি?
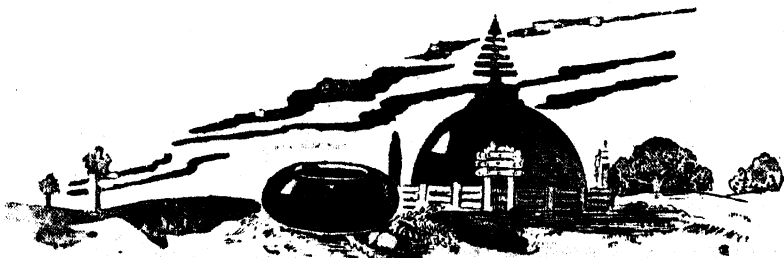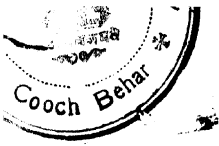
উড়িষ্যায় শ্রীচৈতন্যদেব

শ্রীকালিদাস দত্ত

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের শেষভাগ নীলাচলে অতিবাহিত হয়। তিনি সেখানে চব্বিশ বৎসর বয়সে যান। তৎপূর্ব্বে নবদ্বীপে অবস্থানকালে, শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তনের দ্বারা বঙ্গদেশের জনচিত্তে এক অপূর্ব্ব ভগবৎপ্রেমের বন্যা আনিয়া তিনি অশেষ জনকল্যাণ সাধন করেন। গত মাঘ মাসের প্রবাসীতে শ্রীচৈতন্যদেবের পতিতোন্নয়ন নামক একটি প্রবন্ধে আমি উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছি।

নীলাচল গমনের পরে কিছুদিনের মধ্যে বঙ্গদেশের ন্যায় সেখানেও ঐ প্রকার শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তনের মাধ্যমে তাঁহার প্রভাব সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার উহার এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন,

> "হেনমতে শ্রীগৌর সুন্দর নীলাচলে।
> রহিলেন কাশীমিশ্র গৃহে কুতুহলে॥
> নিরন্তর নৃত্যগীত আনন্দ আবেশে।
> প্রকাশিল গৌরচন্দ্র দেব সর্ব্বদেশে॥"১

সেকারণ ঐ সময় তাঁহার সেখানকার বাসভবন, উক্ত কাশীমিশ্রের বাটির বহির্ভাগ, প্রায় সর্ব্বক্ষণই জনাকীর্ণ থাকিত এবং সকলে তাঁহাকে দর্শন করিবার আগ্রহে চিৎকার করিতেন। তিনি জনসাধারণের ঐ প্রকার চিৎকার শুনিলেই গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিতেন এবং সকলকে সর্ব্বদা শ্রীভগবানের নাম লইবার জন্য উপদেশ দিতেন। তাঁহারাও ঐরূপে তাঁহার দর্শনলাভে ঈশ্বর-প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উহারও যে উল্লেখ আছে তাহা এই,

> "বাহিরে ফুকারে লোক দর্শন না পাঞা।
> কৃষ্ণ কহ বলে প্রভু বাহির হইয়া॥
> প্রভুর দর্শনে সব লোক প্রেমে ভাসে।
> এই মত যায় প্রভুর রাত্র দিবসে॥"২

কাশীমিশ্রের বাটির বহির্ভাগের ন্যায় ভিতরেও বহু লোক তাঁহার দর্শনলাভের আশায় ব্যাকুলচিত্তে প্রবেশ করিতেন। সময় সময় উক্ত জনতা এত বেশী হইত যে সেই দৃশ্য উৎকল-রাজের সভাপণ্ডিত শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চিত্তেও বিস্ময় উৎপাদন করিত। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে তাঁহার ঐরূপ বিস্ময়সূচক উক্তি এইভাবে উল্লিখিত আছে,

> "যুগান্তেঽস্তঃ কুক্ষেরিব পরিসরে পল্লবল.ঘা
> রমী সর্ব্বে ব্রহ্মাণ্ডকসমুদয়াদেব বপুষঃ।
> যথাস্থানং লব্ধাংবসরসিমহ যান্তি স্ম শতশঃ
> সহস্রং লোকানাং বত লঘুনি মিশ্রাশ্রমপদে॥"৩

অর্থাৎ, অহো! যুগান্তে শিশুরূপী সেই ভগবানের অশ্বত্থ-পল্লবের ন্যায় ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড যেরূপ অবস্থান করিয়াছিল, স্বল্পপরিসর মিশ্রালয়েও সেইরূপ সহস্র সহস্র লোক প্রবেশ করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছে।

এই সকল বিবরণ হইতে মিশ্রালয়ের বাহিরে ও ভিতরে ঐ সময় জনসমাগমে কি বিশাল ব্যাপার ঘটিত তাহা বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার বাসভবনের ঐ রকম ঘটনা ব্যতীত নীলাচলের রাজপথেও তিনি যখন বাহির হইতেন তখনও অসংখ্য ব্যক্তি তাঁহার অনুগমন করিতেন ও প্রেমানন্দে মগ্ন তাঁহার দেবদুর্ল্লভ মূর্ত্তি দর্শনে আনন্দে অধীর হইয়া সকলে হরিধ্বনি দিতেন ও তাঁহার পদরজ সংগ্রহের নিমিত্ত তিনি যে পথে চলিতেন সেখানকার ধূলি লুণ্ঠন করিতেন,

> "যে পথে যায়েন চলি শ্রীগৌর সুন্দর।
> সেই দিকে হরিধ্বনি শুনি নিরন্তর॥
> যেখানে পড়য়ে প্রভুর চরণ যুগল।
> সেই স্থানের ধূলি লুঠ করেন সকল॥"৪

এইরূপে কি বাসগৃহে, কি রাজপথে, নীলাচলের সর্ব্বত্র দিবারাত্রি শ্রীভগবানের নামের মধ্যে তিনি ভগবৎ প্রেমরসে ডুবিয়া থাকিতেন। নীলাচলবাসীরা তাঁহার সেই অপূর্ব্ব অবস্থা দেখিয়া সর্ব্বক্ষণই চারিদিক হরিধ্বনিতে মুখরিত করিতেন।

> "নিরবধি নৃত্যগীত আনন্দ আবেশে।
> রাত্রি দিন না জানেন প্রভু প্রেমরসে॥
> নীলাচলবাসী যত অপূর্ব্ব দেখিয়া।
> সর্ব্বলোকে হরি বলে ডাকিয়া ডাকিয়া॥৫

এই ভাবে শ্রীভগবানের নামের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্যদেবের অলৌকিক প্রেমশক্তি নীলাচলেও জনচিত্তে এক প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করিয়া আপামর সাধারণকে মাতাইয়া তোলে ও উহার প্রভাব নীলাচল হইতে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া ক্রমশঃ উড়িষ্যার পল্লী অঞ্চলে এবং অন্যান্য অংশে উচ্চনীচ সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে, যাহার ফলে যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত উচ্চনীচে বিভেদমূলক সংস্কার শিথিল হইয়া যায় এবং উচ্চ নীচ সকলেই জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে, একত্রে

১ শ্রীচৈতন্যভাগবত, ; ২ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৯ম পরিচ্ছেদ

৩ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়, ৮ম অঙ্ক

৪ শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্য খণ্ড, ৩য় অধ্যায়, ৫ শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্য খণ্ড, ৩য় অধ্যায়

শ্রীভগবানের নামগানে সমভাবে মিলিত হইতে আরম্ভ করেন। যে সমস্ত নরনারী ঐ সময় অস্পৃশ্য ও পতিতরূপে নানারকম কদাচারে কালাতিপাত করিতেন তাঁহাদের অনেকেরও তখন ঐ প্রকারে নিয়মিতভাবে শ্রীভগবানের নামগান সাধনের ফলে প্রভূত নৈতিক উন্নতি ঘটে।

ঐ সকল পতিত নরনারীর তৎকালীন দুরবস্থা দর্শনে শ্রীচৈতন্যদেব অন্তরে কত ব্যথা অনুভব করিতেন তাহা আমরা জানিতে পারি ঐ সময়ে রচিত গ্রাম্য কবিদের গানের এই রকম বহু অংশ হইতে। যথা

"পতিত দুর্গত দেখি যুগল আঁখি তাঁর
ভাসয়ে সদা প্রেমজলে।"

ঐরূপ পতিত ও দুর্গতদের ধর্ম্মোন্নয়নের নিমিত্তই তিনি তাঁহার অনুগামীদের সর্ব্বদা জাতির গণ্ডির বাহিরে থাকিতে নির্দ্দেশ দেন। উহার যে উদাহরণ শ্রীচৈতন্যভাগবতে আছে তাহা এই,

"যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অশেষ পাতকে ডুবে মরে॥"৬

উক্ত কারণেই তৎকালে অসংখ্য সমাজবহির্ভূত ও পতিত নরনারী কি উড়িষ্যায়, কি বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র তাঁহার ধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিয়া শিক্ষাদীক্ষা লাভের সুযোগ পান। আপামর সাধারণের নৈতিক উন্নতির জন্য ঐ সময় তিনি তাঁহার মতানুবর্ত্তীদের আরও এইরূপ আদেশ প্রদান করেন,

"যারে দেখ তারে কর কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হয়ে তার এই দেশ॥"৭
"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনের অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥"৮

তাঁহার এই প্রকার উপদেশ অনুসরণেই তৎকালে তাঁহার মতানুবর্ত্তীরাও সর্ব্বদা উচ্চনীচ সকলকে জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমভাবে শ্রীভগবানের নামদান দ্বারা মানবতার পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করেন। তজ্জন্য কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,

"পাত্রাপাত্র বিচার নাহি স্থানাস্থান;
যে যাঁহা পায় তাঁহা করে প্রেম দান॥
সজ্জন দুর্জ্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ।
প্রেম বন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥"৯

এই রকমে আপামর সাধারণের মধ্যে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারিত হইবার ফলে ঐ সময় উড়িষ্যার যে সকল জাতি-বহির্ভূত পতিত নরনারী শিক্ষাদীক্ষা পাইয়া ভক্তিধর্ম্ম সাধনে আত্মনিয়োগ করিতে সক্ষম হন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে তৎকালে ও উহার পরবর্ত্তী সময়ে কত উন্নত জীবন যাপন করেন তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায় উড়িয়া ভাষায় লিখিত "দার্ঢ্যভক্তিরসামৃত" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে।

নীলাচলে শ্রীচৈতন্যদেবের যে সমস্ত উড়িয়া ভক্ত ছিলেন তাঁহাদের কয়েকজনের মাত্র নামোল্লেখ করিয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার বলিয়াছেন,

"এই মত সংখ্যাতীত চৈতন্য ভক্তগণ।
দিঙ্‌মাত্র লিখি সাম্যক না যায় কথন॥"১০

এই উক্তি যে মোটেই অতিরঞ্জিত নয় তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে উড়িষ্যার বিভিন্ন অংশে এ নাগাদ বহু পুথির আবিষ্কার হইতে ও নানা প্রকার ঐতিহাসিক অনু-সন্ধান ও গবেষণার ফলে। ঐরূপ একখানি উড়িয়া পুথি শূন্যসংহিতায় নীলাচলেই তাঁহার ভক্তের সংখ্যা দ্বাদশ সহস্র ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে।১১ যে কয়জন উড়িয়া পণ্ডিত উৎকলে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়াছেন শ্রীসূর্য্যনারায়ণ দাস তন্মধ্যে অন্যতম। তিনিও উক্ত বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই,

"Sri Chaitanya Dev's place in Orissa is unique. There is not a single Village in Orissa in which he is not worshipped. Nearly seventy five per cent of the Hindu population of Orissa are Vaisnavas."[12]

পূর্ব্বোল্লিখিত প্রাচীন পুথিগুলি হইতে জানা যায় যে, ঐ সময় উড়িয়া জনসাধারণ তাঁহাকে সচল জগন্নাথ বলিতেন।১৩ কোন কোন উৎকল কবি তাঁহাকে "হরিনাম-মূর্ত্তি"নামে অভিহিত করিয়াছেন।১৪ তৎকালে যে সকল উড়িয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব মুক্ত ছিলেন না তাঁহারাও তাঁহাকে বুদ্ধদেবের অবতার বলিয়া জ্ঞান করিতেন।১৫ উড়িষ্যায় তাঁহার প্রতি লোকানুরাগ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক কেনেডী সাহেবও এইরূপ বলিয়াছেন,

"Orissa became such a stronghold of the Chaitanya faith that today the name of Gauranga is more commonly reverenced and worshipped among the masses in Oricca than in Bengal itself."[16]

ঐ সময় উৎকলের জনসাধারণ ব্যতীত প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজা প্রতাপরুদ্রদেব, রাজসভাপণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য

---

৬ শ্রীচৈতন্য ভাগবত, মধ্য খণ্ড, ১০; ৭ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা; ৮ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৪; ৯ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা ৭

১০ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১০

11. *Mediaeval Vaisnavism in Orissa*. Mukherjee. Page 123.

12. *Vaitarani*, Vol. XI. I.

13. *Mediaeval Vaisnavism in Orissa*. Mukherjee, Pages 156-161.

১৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, পৃষ্ঠা ৫৬

১৫ শূন্যসংহিতা, শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাস

16. *The Chaitanya Movement*, Page 75.

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সর্ব্বাধিকারী কাশীমিশ্র, বিদ্যানগরাধীপ রায় রামানন্দ প্রমুখ উচ্চ রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতি বহু পদস্থ ব্যক্তিরাও শ্রীচৈতন্যদেবের দেবদুর্ল্লভ ভগবৎপ্রেম, অপরিসীম মানবপ্রীতি ও মধুর আচরণ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া কি ভাবে একান্ত ভক্তরূপে তাঁহার শরণাপন্ন হন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও অন্যান্য গ্রন্থে তাহার বিশেষ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণান্তে নীলাচলে আসিবার পর তিনি যখন বৃন্দাবনে যাইবার জন্য বঙ্গদেশাভিমুখে রওনা হন তখন পথে কটকে তাঁহার সহিত মহারাজা প্রতাপরুদ্রদেবের সাক্ষাৎ ঘটে। উহার যে বিস্তৃত বিবরণ কবিরাজ গোস্বামী দিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এইরূপ,

"রামানন্দ রায় সর্ব্বগণ নিমন্ত্রিল।
বাহির উদ্যানে আসি প্রভু বাসা কৈল॥
ভিক্ষা করি বকুলতলে করিল বিশ্রাম।
প্রতাপরুদ্র ঠাঁই রায় করিল পয়ান॥
শুনি আনন্দিত রাজা শীঘ্র আইলা।
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়িলা॥
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে হইয়া বিহ্বল।
স্তুতি করে পুলকাঙ্গ পড়ে অশ্রুজল॥
তাঁরে দেখি মহাপ্রভুর তুষ্ট হৈল মন।
উঠি প্রভু তাঁহারে করিল আলিঙ্গন॥
পুনঃ স্তুতি করি রাজা করয়ে প্রণাম।
প্রভুর কৃপাশ্রুতে তাঁর দেহ হৈল স্নান॥"[১৭]

এই সকল এবং পূর্ব্বোক্ত বিবরণগুলি হইতে তৎকালে উড়িষ্যার সার্ব্বভৌম নরপতি হইতে অতি দীনহীন ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেরই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি কি রকম ভক্তিমূলক আকর্ষণ ছিল তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সে কারণ পূর্ব্বোল্লিখিত উড়িয়া পণ্ডিত শ্রীসূর্য্যনারায়ণ দাসও বলিয়াছেন যে ঐ সময়—

"For nearly twenty years Orissa was Chaitanya and Chaitanya was Orissa. The King, the subjects, the high and the low all were mad after him."[18]

উহার জন্যই তিনি যে পথ দিয়া প্রথমে নীলাচলে প্রবেশ করেন তাহা আজিও "গৌরবাট" নামে প্রসিদ্ধ এবং কটকে যেদিন প্রথমে উপনীত হন সেই দিনের স্মৃতি জাগরূক রাখিবার নিমিত্ত এখনও সেখানে প্রতি বৎসর বারুণীযাত্রা উৎসবের অনুষ্ঠান হয়।

এ পর্য্যন্ত উড়িষ্যার নানাস্থানে যে সমস্ত পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে কয়েকখানি হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, শ্রীচৈতন্যদেবের উড়িষ্যা গমনের পরেও অনেকে তাঁহার অসামান্য প্রেমপ্রবাহের আকর্ষণে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও কিছুদিন যাবৎ তাঁহাদের প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রভাবমুক্ত হইতে পারেন নাই। ঐ শ্রেণীর কতকগুলি শূন্যবাদী বৌদ্ধই ঐ সময় শ্রীচৈতন্যদেবকে বুদ্ধের অবতার বলিয়া প্রচার করেন। অনন্ত, অচ্যুত, যশোবন্ত, বলরাম ও জগন্নাথ দাস নামক ঐরূপ পাঁচ জনের পরিচয় কয়েকখানি পুথি হইতে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা পঞ্চসখা নামে পরিচিত ছিলেন এবং সকলেই উড়িয়া ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হন। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থগুলি হইতে শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে অনেক নূতন সমাচারও পাওয়া গিয়াছে। অচ্যুতানন্দের শূন্যসংহিতায় শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতার পরিচয় আছে। উহাতে দেখা যায় তাঁহারা সকলেই তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত হন ও তাঁহার সহিত একত্রে সংকীর্ত্তন করিবার সৌভাগ্যলাভ করেন। অচ্যুতানন্দের ভাষায় উহা এইরূপ,

"বৈষ্ণবমণ্ডলী খোল করতাল বজাই বোলন্তি হরি।
চৈতন্য ঠাকুর মহানৃত্যকার দণ্ডকমণ্ডলুধারী॥
অনন্ত অচ্যুত যেনি যশোবন্ত বলরাম জগন্নাথ।
এ পঞ্চ সখাহি নৃত্য করি গলে গৌরাঙ্গচন্দ্র সঙ্গত॥"[১৯]

অচ্যুতানন্দ আরো বলিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশে সনাতন গোস্বামী তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। যথা,

"শ্রীসনাতন গোসাইঁকি চাহিন আজ্ঞা দেলে শচীসুত।
অচ্যুতানন্দকুতুন্তে উপদেশ কর হে যাই ত্বরিত॥
আজ্ঞা পাই শ্রীসনাতন গোসাইঁ সঙ্গে সুখে যেনি গলে।
দক্ষিণ পারুণ বটমূলে বসি কর্ণ উপদেশ দেলে॥"[২০]

এই অচ্যুতানন্দ জাতিতে গোয়ালা ছিলেন। কটক জিলার অন্তর্গত ত্রিপুর গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। তিনিই পুরীর গোপাল মঠের প্রতিষ্ঠা করেন। উড়িষ্যার গোয়ালা জাতির অধিকাংশ ঐ মঠের শিষ্য। সেখানকার পূজাদি অনুষ্ঠান গোয়ালারা সম্পন্ন করেন।

উল্লিখিত পঞ্চসখার মধ্যে বলরাম দাসও শ্রীচৈতন্যদেবের নিকটে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতেন বলিয়া তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি উহাতে আরও লিখিয়াছেন যে, পুরীতে স্বামী মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও উড়িয়া ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসিদ্ধ অনুবাদক জগন্নাথ দাসকে শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশে তিনিই বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। জগন্নাথ দাসের ভাগবত পাঠ শ্রবণে চৈতন্যদেব এত আনন্দিত হন যে, তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গনদান করেন ও বলরাম দাসকে তাঁহার দীক্ষার জন্য নির্দ্দেশ দেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের উড়িষ্যাগমনের সময় সেখানে উক্তরূপ

১৭ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৬

18. *Vaitarani*, Vol. XI. I.

১৯ শূন্যসংহিতা, ১ম অধ্যায়

২০ ঐ, গ্রন্থারম্ভ

পঞ্চসখার ন্যায় আরও অনেক তন্ত্রমন্ত্র বিশারদ শূন্যবাদী বৌদ্ধ ছিলেন। ষ্টারলিং উড়িষ্যার ইতিহাসে ঐ প্রকার বৌদ্ধদের তৎকালে উড়িষ্যার রাজসভায় প্রাধান্য ছিল বলিয়াছেন। উঁহারাও ঐ সময় হইতে উড়িষ্যার অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী অসংখ্য নরনারীর সহিত ক্রমশঃ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

উড়িষ্যার প্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিয়া শ্রীযুত প্রভাত মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন,

"In the first half of the 16th century Vaisnavism in Orissa had undergone a change. Chaitanya came from Bengal and settled in Orissa. His super-human personality and religious fervour arrested popular imagination. . . . The mediaeval Vaisnavism of Orissa was declared heterodox by triumphant Neo-Vaisnavism, and gradually died away. Even the followers of Achutananda or Atibad Jagannath Das will not now talk of Buddha Mata, Tantra, Mantra, Yantra or Buddha incarnation."

"The Vaisnavas of Orissa now adore Chaitanya and Nityananda. They love to sing Bengali devotional songs. . . . No Oriya pauses to think that Nityananda was a Bengali, and Chaitanya was born and brought up in Bengal."

এইরূপে এখনও উৎকলে তাঁহার পুণ্যময় স্মৃতি পূজিত হইবার কারণ এই যে, তাঁহার জীবনের অনুপম আদর্শ ভক্তগণের চির আরাধ্য এবং তাঁহার প্রেমধর্ম্ম প্রচারের ফলে সেখানে যে অশেষ জনকল্যাণ ঘটে তাহাও অবিস্মরণীয়।

অনেকে এ নাগাদ প্রকাশিত নানা গ্রন্থে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঐ সময় শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম উৎকলবাসীরা ঐভাবে গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহারা রাজকার্য্য পরিচালনে অনুপযুক্ত ও নিবীর্য্য হইয়া পড়েন এবং তাহার ফলেই উড়িষ্যার রাজনৈতিক স্বাধীনতা নষ্ট হয়। কিন্তু উক্তরূপ মন্তব্য যে মোটেই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে তাহা ঐ সময়ের উড়িষ্যার ইতিহাস ভাল করিয়া অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায়। তৎকালে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যই সামন্ততান্ত্রিক ছিল এবং ঐ সকল রাজ্য কতকগুলি স্বৈরাচারী শাসক-সম্প্রদায় পরিচালনা করিতেন। ঐ প্রকার কোন রাজ্যের ঐ শ্রেণীর শাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে, যখনই নির্বুদ্ধিতা, স্বার্থপরতা ও শঠতা প্রভৃতি অসদ্‌গুণের প্রাবল্য হইত তখনই বীর ও রণনিপুণ সৈন্যবাহিনী প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও সেই রাজ্যের বিনাশ ঘটিত। ভারতবর্ষের ইতিহাসে উহার উদাহরণের অভাব নাই।

উড়িষ্যারাজ্যেও মহারাজা প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পঁচিশ বৎসরের মধ্যে ঐ অবস্থা ঘটিয়া উহার রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিলোপ হইয়াছিল।

সেই কারণে শ্রীযুত প্রভাত মুখোপাধ্যায়ও উড়িষ্যার তৎকালীন শাসক-সম্প্রদায়ের ঐ প্রকার নৈতিক দুরবস্থার বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন,

"It is difficult to link this sickening tale of moral turpitude with the Chaitanya movement which taught mankind to be faithful and honest."[21]

21. *Mediaeval Vaisnavism in Orissa,* page 178.

আলেয়ার আলো

রওশান আলি শাহ্

আলেয়ার আলো, দূর থেকে মোরে দিয়েছিলে হাতছানি
চিনিতে পারি নি তখন তোমার মিথ্যে মুখোশখানি।
আঁধার রাত্রি আমি পথহারা
সম্মুখে নদী অতি খরধারা—
তোমার ঝিলিক ডেকে ডেকে সারা আমারে আপন মানি।

সঙ্কেতে মোরে করেছিল মানা আকাশে তারার দল
বুঝিতে পারি নি আমি নির্বোধ—আলো নয় ও যে ছল।
কে জানিত ওই আলোকের বুকে
বিষের বাতাস রহিয়াছে ঢুকে
কে জানিত মোর নয়ন-সম্মুখে কুহকিনী কৌশল।

আলোর ছলনা ভুলালো আমারে ভুলালো আমার পথ
জানি না তোমার পুরেছিল কিনা নির্মম মনোরথ,
সারা রাত শুধু প্রান্তরে বনে
ঘুরিয়া মরেছি ছায়ার পেছনে
ভীত শিহরণ জাগালো পবনে রাত্রির পর্বত।

আঁধারে বিপাকে ফেলেছিলে মোরে, কেড়ে নিয়েছিলে দিশা,
এখন এসেছে সোনালী প্রভাত কেটে গেছে অমানিশা,
আমারে ভোলাতে প্রতি নিশ্বাসে
জ্বলিছ আপন বিষের বাতাসে
হায় মায়াবিনী! মরিলে তরাসে মিটিল না মরু-তৃষা
পেয়েছি পথের নিশানা এখন কেটে গেছে অমানিশা।

আজিকে রাতি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

প্রিয়া, সেই প্রিয় পূর্ণিমা নিশি,
সেই চম্পক-সুরভি,
বাজে দরবারী কানাড়া কোথাও।
কোথাও বেহাগ, পূরবী।
সুমুখে মাধবী তেমনি শ্যামলা
শাখে থলো থলো কুঁড়ি গো,
বরণপিঁড়িতে এখনো রয়েছে
পুরানো এলুন গুঁড়ি গো।
কোকিলের ডাক তেমনি মদির,
কই তো হয় নি পুরাতন ?
মণিমঞ্জীর ঝঙ্কৃত নিশি
বাজে কঙ্কণ কন্‌কন্‌
এ রাতি করেছে মধুরা—
যুগের যুগের কিশোর-কিশোরী
জগতের বর-বধূরা।

২

হয় তো এমনি আলোকতিথিতে
তুমি যা বলেছ মিছে নয়,
হলো 'সাবিত্রী' 'সত্যবানের'
শুভদৃষ্টির বিনিময়।
আজও শোনা যায় কলধ্বনি যে
সেই স্রোতবহা মালিনীর,
বেতসকুঞ্জ তেমনি শোভন,
হয় নি বদল অবনীর।
'চন্দ্রাপীড়' আর 'কাদম্বরীর'
বাসরজাগা এ রজনী,
কত চাঁদ সুখসুধা দিয়ে এর
গরব বাড়ানো সজনি !
যায় নি যাবার কিছু নয়,—
তৃষিত অধর উৎসুক বুক
তেমনি রয়েছে মধুময়।

৩

এই সুধাময়ী ক্ষুধাময়ী নিশি
বুঝিতে পারি নে কি বটে ?
নৃত্যে ইহার একটি ভঙ্গী
প্রিয়তমে ডাকে নিকটে।
সুধার গাগরী কক্ষে ইহার
'চুনুরিয়া' সাড়ী পরনে,
লালে লাল করি চলে সুন্দরী
অনুরাগ-রাঙা চরণে।
কতই 'শিরিণ' কতই 'ফরহাদ'
কত 'জুলিয়েট' 'রোমিও'
কুসুম-বিছানো এই পথে গেল
তার পর তুমি-আমিও।
এ নিশি কি কেহ ভোলে গো ?
অমর হয়েছে রাই ও কানুর
ঝুলনরাসে ও দোলে ও।

৪

লাগেনা কি ভাল ? মোর ভাল লাগে,
ভাল লাগে মোর অতিশয়,
পরিচিত সেই রঙ্গমঞ্চে
এই নূতনের অভিনয় !
সুরভিত হ'ল যে নিশি মোদের
স্মৃতির গোলাপী আতরে,
তরুণ-তরুণী গোলাপে গোলাপে
সাজাইছে তারে আদরে।
আছে পথ চাওয়া, সেই গান গাওয়া,
বহে সেই হাওয়া অনুখন,
ফোটে সেই ফুল, সেই গাছে আজও,—
সেই সে বিরহ সে মিলন।
সে বাঁশীই বাজে অবিরাম—
উহাদের খেলা আমাদের চোখে
লীলা হয়ে রাজে অভিরাম।

নিউ দিল্লী, সেণ্ট্রাল কলেজ অব নার্সিং-এর জনৈক ছাত্রী কর্তৃক পল্লীগ্রামের একজন মাতাকে শিশুপালন শিক্ষাদান

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন ফোরামে'র প্রতিনিধিবর্গ। বাম দিক হইতে তৃতীয়—ভারতীয় প্রতিনিধি ভাজালা জয়রাম
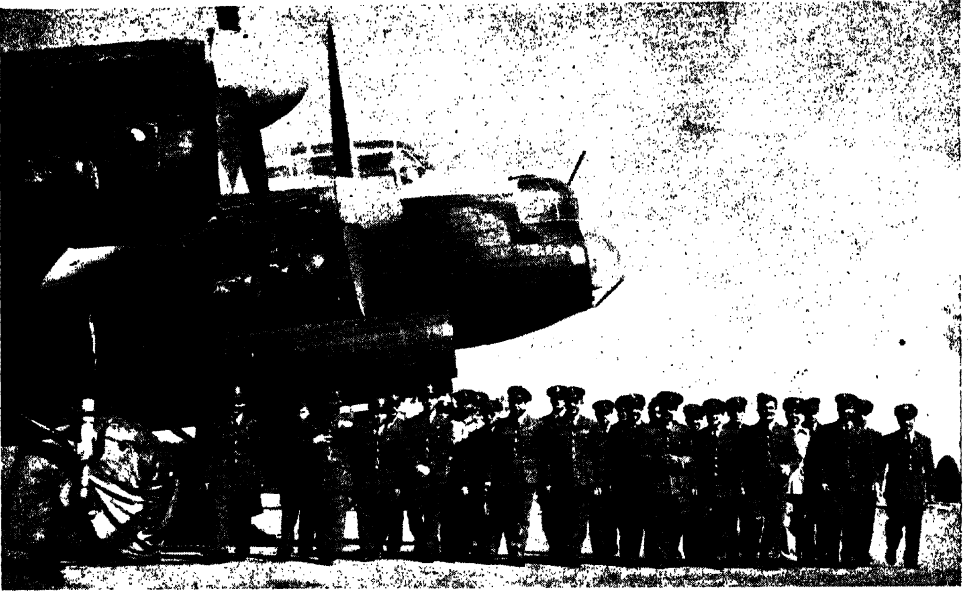
পালাম বিমানঘাটিতে ভারতীয় বিমান-বাহিনীর কর্ম্মীদের সহিত ভারত-পরিদর্শনরত মিশরীয় বিমানবাহিনীর কর্ম্মীদল ও মিশরীয় বিমান

সিংহল-পার্লামেণ্টারি ডেলিগেশনের সভ্যগণ কর্ত্তৃক দিল্লীর দশ মাইল দূরবর্ত্তী মুখমলপুর 'কম্যুনিটি প্রোজেক্ট' কেন্দ্র পরিদর্শন

গীতা-প্রবচন

শ্রীবিনোবা ভাবে

অনুবাদক : শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

নবম অধ্যায়

১

আমার গলায় ব্যথা। আমার কথা আজ শোনা যাইবে কিনা ঠিক বুঝিতেছি না। এই প্রসঙ্গে সাধুচরিত্র বড় মাধবরাওয়ের অন্তিম সময়ের কথা মনে পড়িতেছে। ঐ মহাপুরুষ তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। কফের প্রকোপ অত্যন্ত প্রবল। কফের পর্যবসান অতিসারে করা হয়। মাধবরাও বৈদ্যকে বলিলেন, "কফ দূর হয়ে অতিসার আসে সে ব্যবস্থা করুন। তা হলে কণ্ঠ মুক্ত হবে। হরিনাম করতে পাব।" আমিও আজ পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতেছিলাম। ভগবান বলিলেন, "গলায় যেমন দেয় তেমন বলবে।" আমি এখানে গীতার আলোচনা করিতেছি। কাহাকেও উপদেশ দেওয়ার জন্য তাহা নয়। লাভবান যাঁহারা হইতে চান তাঁহাদের অবশ্য লাভ হইবে। কিন্তু গীতা রামনাম, তাই তো আমি গীতা শুনাইতেছি। আমি গীতা বলি না, আমি হরিনাম করি।

আমি যাহা বলিতেছি আজিকার আলোচ্য নবম অধ্যায়ের সহিত তার সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই অধ্যায়ে হরিনামের অপূর্ব মহিমা কীর্তন করা হইয়াছে। এই অধ্যায় গীতার মধ্যস্থলে অবস্থিত। গোটা মহাভারতের মধ্যভাগে গীতা আর গীতার মধ্যভাগে নবম অধ্যায়। নানা কারণে এই অধ্যায় পবিত্র হইয়া গিয়াছে। কথিত আছে, অন্তিম সমাধিকালে জ্ঞানদেব এই অধ্যায়ের জপ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন। এই অধ্যায়ের স্মরণমাত্রে আমার চক্ষু ছলছল হয়, হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়। ব্যাসদেবের ইহা কত বড় কৃপা! কেবল ভারতবর্ষ নহে, সমস্ত মনুষ্যজাতির উপর তাঁহার এই কৃপা বর্ষিত হইয়াছে। যে অপূর্ব কথা ভগবান অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, তাহা শব্দে ব্যক্ত করার মত নয়। কিন্তু দয়াপরবশ হইয়া ব্যাসদেব সে কথা সংস্কৃত ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। গুহ্য বস্তুকে বাণীরূপ দিয়াছেন। এই অধ্যায়ের আরম্ভে ভগবান বলিতেছেন :

"রাজবিদ্যা মহাগুহ্য উত্তমোত্তম পাবন"

এই যে রাজবিদ্যা, এই যে অপূর্ব বস্তু, তাহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়। উহাকে ভগবান 'প্রত্যক্ষাবগম' বলিয়াছেন। শব্দ যাহা ধরিতে অসমর্থ, অথচ প্রত্যক্ষ অনুভবের কষ্টিপাথরে যাহার যাচাই হইয়া গিয়াছে এরূপ কথা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহার ফলে ইহা একান্ত মধুর হইয়াছে।

কে জানে কোথা, যমপুর কি সুরপুর যাবো।
রামদাস তুলসীর এ জীবনই ভালো॥

মরিলে স্বর্গলাভ হইবে সে কথায় এখানে কি লাভ? স্বর্গে কে যায়, আর যমপুরে কে যায় সে কথা কে বলিবে? এখানে যে দুই দিন থাকিতে হইবে, রামের গোলাম হইয়া থাকাতেই আমার আনন্দ—তুলসীদাস এ কথা বলেন। রামের গোলাম হইয়া থাকার মাধুর্য এই অধ্যায়ে রহিয়াছে। প্রত্যক্ষ এই দেহেই, এই চক্ষেই অনুভব করা যায় এইরূপ ফলের, জীবদ্দশায় উপলব্ধি করা যায় এইরূপ বিষয়ের কথা—এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। গুড় পাইলে গুড়ের মিষ্টতা বুঝা যায়। তদ্রূপ রামের গোলাম হইয়া থাকার মাধুর্য এখানে বিদ্যমান। তেমনি এই মৃত্যুলোকের জীবনের মাধুর্য—যাহা দ্বারা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা যায় সেই রাজবিদ্যার কথা এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। এই রাজবিদ্যা গূঢ়। কিন্তু ভগবান সকলের পক্ষে তাহা সুলভ করিয়া রাখিয়াছেন, সকলের জন্য খুলিয়া ধরিয়াছেন।

২

গীতা যে ধর্মের সার তাহাকে বৈদিক ধর্ম বলে। বৈদিক ধর্ম মানে বেদ হইতে নিষ্পন্ন ধর্ম। জগতে যত প্রাচীন গ্রন্থ আছে তন্মধ্যে বেদ প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া মান্য। তাই ভাবুক লোকেরা বেদকে অনাদি বলিয়া থাকেন। সেহেতু বেদ পূজ্য হইয়া রহিয়াছে। আর ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখিলেও বেদ আমাদের সমাজের প্রাচীন ভাবনার প্রাচীনতম নিদর্শন। তাম্রপট্ট, শিলালেখ, মুদ্রা, পাত্র, প্রস্তরীভূত প্রাণীদেহ ইত্যাদি উপকরণ হইতে এই লিখিত প্রমাণ অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। জগতে যদি আদি ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছু থাকে তো সে বেদ। এই বেদে যে ধর্ম বীজরূপে ছিল তাহা বাড়িতে বাড়িতে বৃক্ষ হইয়াছে আর অবশেষে তাহাতে গীতারূপ দিব্য মধুর ফল ধরিয়াছে। ফল ছাড়া গাছের আমরা আর কি-ই বা খাইতে পারি? বৃক্ষে ফল ধরিলেই না বৃক্ষ হইতে খাওয়ার বস্তু মিলে। বেদ-ধর্মের সারের সার এই গীতা।

প্রাচীনকাল হইতে এই যে বেদ-ধর্ম প্রসিদ্ধ ছিল, তাহাতে নানা যজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপ, বিবিধ তপশ্চর্যা, বহুবিধ সাধনার কথা আছে। এই যে সব কর্মকাণ্ড তাহা নিরর্থক নয় বটে, তবে তার অধিকারী হইতে হয়। কর্মকাণ্ড সকলের পক্ষে সুলভ ছিল না। উচ্চ নারিকেলবৃক্ষে উঠিয়া নারিকেল কে ছিঁড়ে, কে ছাড়ায়, কে ভাঙ্গে? আমার খুব ক্ষুধা লাগিতে পারে কিন্তু ঐ উচ্চ বৃক্ষের নারিকেল পাওয়ার উপায় কি? আমি নীচে হইতে নারিকেল দেখি, নারিকেল উপর হইতে আমাকে দেখে। তাহাতে কি পেটের ক্ষুধা মিটে? ঐ নারিকেল যতক্ষণ না আমার হাতে আসে, ততক্ষণ সবই বৃথা। বেদের এই নানা ক্রিয়াতে অতি সূক্ষ্ম বিচার নিহিত। সাধারণ লোকে তাহা বুঝিবে কিরূপে? বেদমার্গ ছাড়া মোক্ষ নাই,

কিন্তু বেদের অধিকারও ত নাই, তবে অপর সকলের কাজ চলে কি ভাবে? তাই ত কৃপাসিন্ধু সাধুপুরুষেরা অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "এই বেদের সার নিষ্কাশন করছি। সংক্ষেপে বেদের সারসঙ্কলন করে জগতের কাছে ধরছি।" তাই তুকারাম মহারাজ বলিয়াছেন: "বেদ বলেছে অনন্ত। অর্থ ইহাতেই লভ্য।" সে অর্থ কি? হরিনাম। হরিনাম বেদের সার। রামনামের দ্বারা মোক্ষ নিশ্চিত লভ্য হইয়াছে। স্ত্রী, শিশু, শূদ্র, বৈশ্য, অশিক্ষিত, দুর্বল, রোগী, পঙ্গু, সকলের পক্ষে মোক্ষ সুলভ হইয়া গিয়াছে। বেদের আলমারিতে আবদ্ধ মোক্ষ ভগবান রাজপথে আনিয়া দিয়াছেন। কেমন সহজ সরল পথ! যাহার যেরূপ সহজ জীবন, যাহা স্বধর্ম-কর্ম, সেবা-কর্ম তাহাকেই যজ্ঞময় করিয়া দিন না কেন? অন্য যাগ-যজ্ঞের দরকার কি? তোমার দৈনন্দিন সহজ সেবা-কর্মকেই যজ্ঞ-রূপ দাও। তাহাই রাজমার্গ।

যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিং।
ধাবন্নিমীল্য বা নেত্র ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥

এই মার্গে চক্ষু বুঁজিয়া দৌড়াইয়া গেলেও পতনের ভয় নাই। দ্বিতীয় মার্গ হইতেছে, "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া"-র ন্যায়। তার তুলনায় তরবারির ধারও কতকটা ভোঁতা, এমনই দুরূহ বৈদিক মার্গ। রামের গোলাম হইয়া থাকার পথ সহজ। একটু একটু করিয়া উঁচু করিতে করিতে ইঞ্জিনীয়ার রাস্তা শিখরে লইয়া যায়, আর আমাদের উচ্চশিখরে বসাইয়া দেয়। এত উপরে যে উঠিতেছি তাহা টেরও পাওয়া যায় না। ইঞ্জিনীয়রের এই বিশেষত্বের মতই রাজমার্গের বিশেষত্ব। মানুষ যেখানে কর্ম করিতেছে সেই কর্মদ্বারা সেখানেই সে ভগবানকে পাইতে পারে। এইরূপই এই মার্গ।

পরমেশ্বর কি কোথাও লুকাইয়া আছেন? কোনও উপত্যকায়, ন গহ্বরে, কোন নদীতে, কোন স্বর্গে কি তিনি আত্মগোপন করিয়া বসিয়া গিয়াছেন? হীরামাণিক্য, সোনারূপা পৃথিবীর অন্তরে লুকাইয়া থাকে। মোতি-প্রবাল, রত্নাকর সমুদ্রে লুক্কায়িত থাকে। তেমনই কি পরমেশ্বররূপ 'লালরতন' কোথাও লুকাইয়া রহিয়াছেন? ভগবানকে কোথাও হইতে কি খুঁড়িয়া বাহির করিতে হইবে? তিনি ত সব সময়ে আমাদের সকলের সামনে সর্বত্র দণ্ডায়মান। এই যে সব লোক তাহারা সকলেই ভগবানের মূর্তি। ভগবান বলেন, "এই যে মানবরূপে প্রকটিত হরিমূর্তি তার অবমাননা করিস নে ভাই।" ঈশ্বরই চরাচরে ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে খোঁজার নিমিত্ত কৃত্রিম উপায়ে কি প্রয়োজন? উপায় সহজ। যে সব সেবা-কার্য তুমি কর সে সবের সম্বন্ধ রামের সহিত জুড়িয়া দাও। ব্যস—কর্ম হাসিল। রামের গোলাম হইয়া যাও। ঐ কঠিন বেদমার্গ, ঐ যজ্ঞ, স্বাহা, স্বধা, ঐ শ্রাদ্ধ, তর্পণ, সবই মোক্ষের দিকে লইয়া যাইবে। কিন্তু অধিকারী অনধিকারীর ঝামেলা সেখানে উপস্থিত হয়। তাহার দরকারই আমাদের নাই। যাহাকিছু কর তাহা সব ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া দাও, এইটুকু মাত্র কর। প্রত্যেক কর্মের সম্বন্ধ তাঁর সহিত জুড়িয়া দাও। ইহাই নবম অধ্যায়ের কথা। তাই ভক্তের তাহা অতীব প্রিয়।

৩

কৃষ্ণের সারা জীবনে তাঁর বাল্যকাল অতি মধুর। লোকে আলাদা করিয়া বালকৃষ্ণের উপাসনা করে। গোপ-বালকদের সহিত সে গরু চরায়, তাহাদের সহিত খায়-দায়, তাহাদের সহিত হাসে-খেলে। গোপ-বালকেরা ইন্দ্রের পূজা করিতে যাইবে ত সে তাহাদের বলিল, "ইন্দ্রকে কেউ দেখেছে? কোন উপকার সে করে? এই গোবর্ধন পর্বত প্রত্যক্ষ দেখা যায়। সেখানে গরু চরে। সেখান হইতে নদী বয়। তার পূজা কর।" এই শিক্ষা তিনি দিতেন। যে গোপ-বালকদের সহিত তিনি খেলিয়াছিলেন, যে গোপীদের সহিত তিনি কথা বলিয়াছিলেন, হাসিয়াছিলেন, যে গরু-বাছুরের সহিত তিনি চলা-ফেরা করিয়াছিলেন তাহাদের সকলের জন্য মোক্ষের পথ তিনি উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কৃষ্ণ-পরমাত্মা নিজ প্রত্যক্ষ অনুভব দ্বারা এই সহজ মার্গ প্রদর্শন করিয়াছেন। বাল্যকালে তাঁহার সম্বন্ধ ছিল গরু-বাছুরের সহিত, প্রাপ্ত বয়সে ঘোড়ার সহিত। মুরলীর ধ্বনি কানে আসিতেই গাভী আহ্লাদে আত্মহারা হইত, আর কৃষ্ণ হাত বুলাইতেই ঘোড়া পুলকিত হইয়া উঠিত। সেই গাভী, রথের সেই ঘোড়া, একেবারে কৃষ্ণময় হইয়া যাইত। 'পাপযোনি' বলিয়া বিবেচিত ঐ পশু-দেরও যেন মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটিত। মোক্ষে কেবল মানুষেরই অধিকার নহে, পশুপক্ষীরও আছে—এ কথা শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। নিজ জীবনে তিনি এ কথা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

ভগবানের যে অনুভূতি ব্যাসদেবেরও সেই অনুভূতি। কৃষ্ণ ও ব্যাস দুইই এক রূপ। উভয়ের জীবনের সারও এক। মোক্ষের অবলম্বন বিদ্যাবত্তা নহে, আর কার্যকলাপও নহে। সাদাসিধা সরল ভক্তিই পর্যাপ্ত। 'আমি' 'আমি' বলিয়া বলিয়া অহঙ্কারী জ্ঞানী ব্যক্তি কোথায় পেছনে পড়িয়া রহিয়াছেন আর শ্রদ্ধাপরায়ণা সাদাসিধা নারী আগাইয়া গিয়াছেন। পবিত্র মন আর সরল শুদ্ধ ভাব—আর কি চাই, মোক্ষ দূর নহে। মহাভারতে জনক-সুলভা-সংবাদ নামে একটি প্রকরণ আছে। জ্ঞানলাভের নিমিত্ত জনক রাজা এক নারীর কাছে গিয়াছিলেন, ব্যাসদেব এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। বেদে স্ত্রীলোকের অধিকার আছে কিনা আপনারা এই তর্ক জুড়িবেন, কিন্তু এদিকে দেখুন সুলভা জনক রাজাকে পর্যন্ত ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন। সে সামান্যা নারী। জনক কত বড় রাজা! কত বিদ্যায় বিভূষিত! কিন্তু মহাজ্ঞানী জনকের হাতে মোক্ষ ছিল না। তাই ব্যাসদেব তাঁহাকে সুলভার শরণ লইতে পাঠাইলেন। তুলাধার বৈশ্যও তদ্রূপ। জাজলি ব্রাহ্মণ তাহার কাছে জ্ঞানের জন্য উপস্থিত। তুলাধার বলিতেছেন, "পাল্লার দাঁড়ি সমান রাখাতেই আমার সবকিছু জ্ঞান।" ঐ ব্যাধের কথাও তদ্রূপ। ব্যাধ ত কসাই।

পশুহত্যা করিয়া সমাজের সেবা করিত। কোনো অহঙ্কারী ব্রাহ্মণকে তাহার গুরু ব্যাধের কাছে যাইতে বলিলেন। ব্রাহ্মণের আশ্চর্য ঠেকিল। কসাই কি জ্ঞান দিবে! ব্রাহ্মণ ব্যাধের কাছে গেল। ব্যাধ কি করিতেছিল? মাংস কাটিতেছিল, ধুইতেছিল, বিক্রীর জন্য পরিষ্কার করিয়া রাখিতেছিল। ব্রাহ্মণকে সে বলিল, "এ কার্যকে যতটা ধর্মময় করা যায় তাহা আমি করি। এই কার্যে আত্মা যতটা ঢেলে দেওয়া যায় ততটা ঢেলে দিয়ে আমি এই কর্ম করি, আর মা-বাপের সেবা করি।" এই ভাবে এই ব্যাধের রূপে ব্যাসদেব আদর্শ মূর্তি খাড়া করিয়াছেন।

মোক্ষের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত এ কথা প্রতিপাদনের নিমিত্ত মহাভারতে এই সব নারী, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদির প্রসঙ্গ অবতারণা করা হইয়াছে। এই তত্ত্ব নবম অধ্যায়ে ধরা হইয়াছে। ঐ সব কথার উপরে এই অধ্যায়ে শীলমোহর অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রামের গোলাম হইয়া থাকাতে যে মাধুর্য, ব্যাধের জীবনে তাহা রহিয়াছে। তুকারাম মহারাজ অহিংসার সাধক। কিন্তু সজন কসাই কসাইয়ের কাজ করিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন এ-কথা তিনি বড়ই আগ্রহে বর্ণনা করিয়াছেন। আর এক জায়গায় তুকারাম জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ভগবান, পশু-হত্যাকারীর গতি কি হবে?" কিন্তু,

"সজন কসাইয়ের সাথে বেচে মাংস"—

এই চরণ লিখিয়া তিনি বলিয়াছেন যে ভগবান সজন কসাইয়ের সহায়তা করেন। যে ভগবান নরসী মেহতার হুণ্ডি চুকাইয়া দিয়াছিলেন, একনাথের জল-ভরা বাঁক বহিয়া আনিয়াছিলেন, দামাজীর জন্য মহার* হইয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রের প্রিয় জনাবাঈকে ধান-ভানায় সহায়তা করিয়াছিলেন, সেই ভগবান সজন কসাইকেও তেমন প্রেমে সহায়তা করিতেন, এ কথা তুকারাম বলিতেছেন। সারাংশ— পরমেশ্বরের সহিত সকল কর্মের সম্বন্ধ জুড়িতে হইবে। কর্ম যদি শুদ্ধ ভাব হইতে করা হয়, সেবাময় হয়, তবে তাহা যজ্ঞরূপই বটে।

এই বিশেষ কথা নবম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ এই দুইয়ের মধুর মিলন হইয়াছে। কর্মযোগের অর্থ, কর্ম করিতে হইবে, কিন্তু ফল ত্যাগ করিতে হইবে। এই ভাবে কর্ম করিবে যে ফলের বাসনা চিত্ত স্পর্শ না করে। এ যেন আখরোটের গাছ বসানো। আখরোট গাছে পঁচিশ বৎসরে ফল ধরে। যে লাগায় তার ভাগ্যে ফল খাওয়া ঘটে না। তবু তাহা লোকে লাগায় ও যত্নে বাড়ায়। কর্মযোগ মানে গাছ লাগানো আর ফলের প্রত্যাশা না রাখা। ভক্তিযোগ মানে কি? ভাবপূর্বক ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হইয়া যাওয়া ভক্তিযোগ। রাজযোগে কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ একত্র মিশিয়া যায়। নানা লোকে রাজযোগের নানা ব্যাখ্যা করিয়াছে। কিন্তু সংক্ষেপে, রাজযোগ মানে কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের মধুর মিশ্রণ, ইহা আমার ব্যাখ্যা।

কর্ম ত করিতে হইবেই, কিন্তু ফল ত্যাগ করা নয়—তাহা ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে। ফল ত্যাগ কর বলিতে ফলের নিষেধ বুঝায়। অর্পণে তাহা নাই। ইহা এক অতি উত্তম ব্যবস্থা। তাহাতে অপূর্ব মাধুর্য বিদ্যমান। ফলত্যাগের অর্থ এই নয় যে কেহই ফল লইবে না। কেহ না কেহ তাহা নিশ্চয় লইবে। কেহ না কেহ তাহা নিশ্চয় পাইবে। এখানে তর্ক উঠিতে পারে, যে পাইবে সে পাওয়ার উপযুক্ত কিনা? দ্বারে ভিখারী আসিলে আমরা চট করিয়া বলিয়া বসি, "বেশ মোটা-তাগড়া। ভিক্ষে করা শোভা পায় না। পথ দেখ।" তার ভিক্ষা চাওয়া উচিত কি অনুচিত সে বিচারে আমরা প্রবৃত্ত হই। বেচারা ভিখারী লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া যায়। তার প্রতি আমাদের অন্তরে সহানুভূতি আদৌ নাই। তবে আর ভিখারীর যোগ্যতা আমরা কিরূপে নির্ধারণ করিব? ছেলেবেলায় আমি মার কাছে এরূপ সংশয় ব্যক্ত করিয়াছিলাম। তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন আজিও তাহা আমার কানে ধ্বনিত হয়। মাকে বলিয়াছিলাম, "এ ত দেখতে হৃষ্টপুষ্ট। একে ভিক্ষা দেওয়ার অর্থ বাসন ও আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া।" গীতার 'দেশে কালে চ পাত্রে চ" শ্লোকটি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম। মা বলিয়াছিলেন, "যে ভিখারী এসেছে সে ত পরমেশ্বরই। কর এবার পাত্রাপাত্রের বিচার। ভগবান কি অপাত্র? পাত্রাপাত্র বিচারে তোমার আমার কি অধিকার? আর অধিক বিচার করার প্রয়োজনও দেখি না। আমার কাছে সে ভগবান।" মায়ের এ কথার উত্তর আজও আমি খুঁজিয়া পাই নাই।

অন্যকে খাওয়ানোর কথায় পাত্রাপাত্রের কথা আমি বিচার করি। কিন্তু নিজে যখন খাই তখন ভুলেও কি ভাবি যে খাওয়ার অধিকার আমার আছে কিনা? আমাদের দ্বারে উপস্থিত ভিখারীকে তবে ইতর মনে করি কেন? যাঁহাকে দিতেছি তিনি ভগবান—এ কথা মনে করি না কেন? রাজযোগ বলে: "তোমার কর্মের ফল কেউ না-কেউ ত পাবেই, তা নয় কি? তা পুরাপুরি ভগবানকেই দিয়ে দাও। তাঁকে অর্পণ কর।" রাজযোগ যোগ্য স্থান দেখাইয়া দিতেছে। ফলত্যাগরূপ নিষেধাত্মক কর্ম ইহাতে নাই, আর ভগবানকে যখন অর্পণ করিতে হইবে তখন পাত্রাপাত্রের প্রশ্নও নাই। ভগবানে সমর্পিত দান তাহা ত সর্বদা শুদ্ধ হইবেই। তোমার কর্মে যদি দোষও থাকে ত তাঁর হাতে পড়িবামাত্র পবিত্র হইয়া যাইবে। দোষ দূর করিতে যতই চেষ্টা করি না কেন তবুও দোষ কিছু থাকিয়া যায়ই। তাহা হইলেও, যতটা শুদ্ধ হইয়া কর্ম করা যায় তাহা করিতে হইবে। বুদ্ধি ঈশ্বরের দান। যতদূর শুদ্ধভাবে তাহা ব্যবহার করা যায় ততদূর শুদ্ধ ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য। তাহা না করিলে পাপ হইবে। অতএব পাত্রাপাত্র বিচারও করা চাই। কিন্তু ভগবদ্ভাবের দরুন সে কাজ সোজা হইয়া যায়।

ফলের বিনিয়োগ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত করা চাই। যে কর্ম যেরূপ হইবে, তেমনই তাহা ভগবানকে অর্পণ করিবে। প্রত্যক্ষ

* মহারাষ্ট্রের এক হরিজন জাতি

কর্ম যেমন যেমন হইতে থাকিবে তেমন তেমন তাহা ভগবানে অর্পণ করিয়া মনস্তুষ্টি লাভ করা চাই। ফল ত্যাগ করা নয়, ভগবানকে তাহা দিয়া দেওয়া। কেবল তাহাই নয়, মনে যে সব বাসনা জন্মে তাহা এবং কাম ক্রোধাদি বিকার পর্য্যন্ত ভগবানকে দিয়া মুক্ত হওয়া চাই।

"কাম ক্রোধ মোর, হলো এবে তোর"

এই রাজযোগে সংযমাগ্নিতে পড়িয়া জ্বালা নাই পোড়া নাই, যেমনি অর্পণ, তেমনি ছুটি। নাই কাহকে পায়ে দলা, নাই মারামারি।

"রোগ মরে হুধে চিনিতে, তবে কি কাজ তিতো নিমে।"

ইন্দ্রিয়সমূহও সাধন। তাহাদিগকে ঈশ্বরার্পণ কর। বলা হয়—কান কথা মানে নাই; তাই বলিয়া কি শোনাই বন্ধ করিয়া দিবে? শুনিবে, কেবল হরিকথা শুনিবে। শ্রবণ না করা বড় কঠিন। কিন্তু হরিকথারূপ শ্রবণের বিষয়ে কানের ব্যবহার করা অনেক বেশী সহজ, রুচিকর ও হিতকর। তোমার কান রামকে দিয়া দাও। মুখে রামনাম কর। ইন্দ্রিয় শত্রু নহে। তাহারা ভাল। অনেক তাহাদের সামর্থ্য। ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধি হইতে, ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে কাজ আদায় করা—ইহা রাজমার্গ। ইহাই রাজযোগ।

৫

অমুক কর্ম ভগবানকে অর্পণ করিতে হইবে, তাহা নয়। কর্মমাত্রই তাঁকে সমর্পণ কর। সে সবই শবরীর কুল। রাম কতই না আদরে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরমেশ্বরের আরাধনা করার জন্য গুহায় যাওয়ার দরকার নাই। তুমি যেখানে যে কর্ম কর তাহা ভগবানে অর্পণ কর। মা সন্তানের দেখাশুনা করেন না ত, ভগবানেরই যেন দেখাশুনা করেন। সন্তানকে স্নান করান, তাহা যেন পরমেশ্বরের অভিষেক। শিশু পরমেশ্বরের দয়ার দান, এ কথা মনে করিয়া পরমেশ্বরের ভাবনা হইতে শিশুর লালন-পালন করা মায়ের কর্তব্য। কি প্রেমবশেই না কৌশল্যা রামচন্দ্রের, ও যশোদা কৃষ্ণের কথা ভাবিতেন! তাহা বর্ণনা করিতে পাইয়া শুক, বাল্মীকি, তুলসীদাস নিজেদের ধন্য মানিয়াছেন। এই কর্মে তাঁহাদের আনন্দের সীমা নাই। মাতার এই সেবা-কার্য অতি উচ্চ স্তরের। ঐ যে শিশু সে ত পরমেশ্বরেরই মূর্ত্তি, সেই মূর্ত্তির সেবা অপেক্ষা অধিক ভাগ্যের আর কি থাকিতে পারে? পরস্পরের সেবার বেলায় এই ভাবনা হইতে যদি আমরা কাজ করি তবে আমাদের কর্মে কি পরিবর্তনই না দেখা দিবে। যাহার কাছে যে সেবা-কর্ম উপস্থিত, তাহা ঈশ্বরেরই সেবা এ কথা আমাদের নিরন্তর মনে রাখা চাই।

কৃষক বলদের সেবা করে। এই বলিবর্দ কি তুচ্ছ? না। বেদে বামদেব শক্তিরূপে বিশ্বব্যাপী যে বৃষের বর্ণন করিয়াছেন তাহাই ঐ কৃষকের বলদে মূর্ত।

"চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা
দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি
মহো দেবো মর্ত্যাং আবিবেশ॥"

যার চারিটি শিং, তিন পা, দুই মাথা, সাত হাত, যে তিন স্থানে বাঁধা, মহান্ তেজস্বী হইয়া যে সকল মর্ত্য বস্তুতে ব্যাপ্ত এইরূপ গর্জনকারী বিশ্বব্যাপী বলিবর্দের পূজা কৃষক করে। টীকাকারেরা ইহার পাঁচ সাত রকম বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। আর এই বলদও বিচিত্র! আকাশে গর্জন করিয়া যে বলদ বৃষ্টিপাত করে, সেই ক্ষেতে মল-মূত্র বর্ষণ করিয়া শস্যোৎপাদনকারী কৃষকের বলদ রূপে বিদ্যমান। এই উচ্চ ভাবনা হইতে কৃষক যদি নিজ বলদের সেবা করে, যত্ন করে তবে এই সাধারণ বলদের সেবাই ঈশ্বরার্পণ হইয়া যাইবে।

তদ্রূপ গৃহলক্ষ্মী যদি পাকশাল লেপিয়া মুছিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন, উনুন ধরান, শুদ্ধ সাত্ত্বিক আহার্য প্রস্তুত করেন, আর এই ভাব পোষণ করেন যে আমার পাকান্ন খাইয়া গৃহের সকলে তৃপ্ত হউক, পুষ্ট হউক ত তার এই সব কর্মই নিঃসন্দেহ যজ্ঞরূপ। মা যেন ক্ষুদ্রায়তন যজ্ঞাগ্নিই প্রজ্বলিত করেন। পরমেশ্বরের তৃপ্তি-বিধান করিব এই কামনা হইতে যে আহার্য প্রস্তুত করা হয় তাহা কত যে শুদ্ধ ও পবিত্র হইবে একবার দেখুন। ঐ গৃহলক্ষ্মীর মনে যদি এরূপ উচ্চ ভাবনা থাকে ত তাহাকে ভাগবতের ঋষিপত্নীর সমান স্থান দিতে হইবে। ঐরূপ কত মাতাই না সেবা করিতে করিতে তরিয়া গিয়া থাকিবেন, আর আমি-আমি উচ্চারণকারী জ্ঞানী ও পণ্ডিত কোথায় কোন্ কোণে পড়িয়া রহিয়াছেন!

৬

আমাদের দৈনন্দিন জীবন, প্রতিক্ষণের জীবন দেখিতে সাধারণ হইলেও বস্তুতঃ সাধারণ নহে। তাহার মহান্ অর্থ রহিয়াছে। সমস্ত জীবনটাই এক মহান্ যজ্ঞকর্ম। তোমার নিদ্রা, তাহাও এক সমাধি। সর্বপ্রকারের ভোগ ঈশ্বরার্পণ করিয়া নিদ্রা গ্রহণ করিতে তাহা সমাধি নয় ত কি? স্নান করার সময় পুরুষসূক্ত আবৃত্তি করার রীতি আছে। স্নান-ক্রিয়ার সহিত এই পুরুষসূক্তের সম্বন্ধ কি তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। খোঁজেন ত সম্বন্ধ দেখিতে পাইবেন। সহস্র যাহার বাহু, সহস্র যাহার চক্ষু সেই বিরাট পুরুষের সহিত আমার স্নানের কি সম্বন্ধ? সম্বন্ধ এই, ঘটি ভরিয়া যে জল তুমি মাথায় ঢালিতেছ তাহাতে হাজারো বিন্দু রহিয়াছে। সেই বিন্দু তোমার মাথা ধুইতেছে, তোমায় নিষ্পাপ করিতেছে। তোমার মস্তকে উহা আশীর্বাদ বর্ষণ করিতেছে। পরমেশ্বরের সহস্র হাত হইতে যেন সহস্র ধারা তোমার উপর বর্ষিত হইতেছে। বিন্দু-রূপে স্বয়ং পরমেশ্বর যেন তোমার মস্তকাভ্যন্তরের ময়লা দূর করিতেছেন। এরূপ দিব্য ভাবনা ঐ স্নানে যদি আরোপ কর তবে সে স্নান অন্য কিছু হইয়া যাইবে। তাহাতে অনন্ত শক্তি আসিবে;

যাহা করিতেছি তাহা পরমেশ্বরের কাজ এই ভাবনা হইতে যে কাজই করি না কেন, তাহা সামান্য হইলেও পবিত্র হইয়া যায়। ইহা অনুভবসিদ্ধ কথা। আমাদের বাড়ীতে যিনি আসিয়াছেন তিনি ঈশ্বররূপ একথা একবার মনে করুন দেখি। সাধারণ কোন বড় লোক আসিলে আমরা ঘর-দোর কেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করি। কেমন ভাল আহার্য প্রস্তুত করি। আর যদি ধরেন যে, ভগবান আসিয়াছেন তবে সেই কর্মেই মহা পার্থক্য দেখা যাইবে না কি? কবীর কাপড় বুনিতেন। তন্ময় হইয়া যাইতেন।

"ঝীণী ঝীণী ঝীণী, বিণী চদরিয়া"—

এই গান গাহিতেন, দুলিতেন। পরমেশ্বরকে পরাইবেন বলিয়া যেন চাদর বুনিতেছেন। ঋগবেদের ঋষি বলিতেছেন:

"বস্ত্রেব ভদ্রা সুকৃতা সুপাণী"—

সুন্দর হাতে বোনা বস্ত্রের মত আমার এই স্তোত্র আমি ঈশ্বরকে পরাইতেছি। কবি স্তোত্র রচনা করেন ঈশ্বরের জন্য, তাঁতি কাপড় বোনে সেও ঈশ্বরেরই জন্য। কেমন হৃদয়গ্রাহী কল্পনা! কিরূপ চিত্তশুদ্ধকারী হৃদয়-উদ্বেলকারী ভাবনা! এই ভাবনা জীবনে যদি একবার আসে তবে জীবন কতই না নির্মল হইয়া যাইবে! অন্ধকারে বিজলী গেলে ত মুহূর্তে অন্ধকার আলো হইয়া যায়। ঐ অন্ধকার কি আস্তে আস্তে আলো হয়? না, মুহূর্তে সারা ভিতর-বাহিরের পরিবর্তন ঘটিয়া যায়। তদ্রূপ, প্রত্যেক কর্ম ঈশ্বরে জুড়িয়া দেওয়া মাত্র জীবনে একেবারে অভূতপূর্ব শক্তি আসে। প্রত্যেক ক্রিয়া তখন বিশুদ্ধ হইতে থাকিবে। জীবনে উৎসাহের সঞ্চার হইবে। আজ আমাদের জীবনে উৎসাহ আছে কি? মরি না তাই বাঁচিয়া আছি। সর্বত্র উৎসাহের অভাব। রোরুদ্যমান কলাহীন জীবন। কিন্তু সর্ব ক্রিয়া ঈশ্বরের সহিত জুড়িতে হইবে এই ভাবনা মনে আন। তখন দেখিবে তোমার জীবন, কেমন রমণীয় হইয়াছে, নমনীয় হইয়াছে।

পরমেশ্বরের নাম লওয়া মাত্রেই সহসা পরিবর্তন ঘটিয়া যায়। সংশয়ের অবকাশ ইহাতে নাই। রামনাম করিলে কি হয় এ কথা বলিও না। নাম কর তারপর দেখ। মনে কর দিনের কাজ শেষ করিয়া কৃষক সন্ধ্যাকালে ঘরে ফিরিতেছে। পথে এক পথিকের সহিত দেখা। তাহাকে সে বলে:

"চাল ঘরা উভা রাহেং নারায়ণা"—

"ভাই পথিক, হে নারায়ণ, থাম। রাত হয়ে এল। দেব, আমার ঘরে চল।" ঐ কৃষকের মুখ হইতে এরূপ বাক্য নিঃসৃত হইতে দাও আর তারপরে দেখ, ঐ পথিকের রূপ বদলাইয়া গিয়াছে কিনা। বাটপাড় হইলেও সে পবিত্র হইয়া যাইবে। ভাবনা-হেতু এই পার্থক্য হয়। সবকিছু ভাবনাতে নিহিত। জীবন ভাবনাময়। বিশ বৎসরবয়স্ক পরের ছেলে ঘরে আসে। পিতা তাহাকে কন্যা দান করেন। বরের বয়স কুড়ি আর কন্যার পিতার বয়স পঞ্চাশ। তবুও কন্যার পিতা বরের পা ছোঁয়। এ কি ব্যাপার? কন্যা অর্পণ করার ঐ কার্য কত পবিত্র। কন্যা যাহাকে অর্পণ করা হয় তাহাকে পরমেশ্বর জ্ঞান করা হয়। জামাতার প্রতি, বরের প্রতি এই যে ভাবনা পোষণ করা হয় তাহা আরও উর্ধ্বে লইয়া যাও, অগ্রসর করিয়া দাও।

কেহ কেহ বলিবেন, এরূপ বাজে কল্পনা করিয়া কি লাভ? সত্য-মিথ্যার প্রশ্ন প্রথমেই তুলিও না। আগে যত্ন কর, উপলব্ধি হউক তখন সত্য-মিথ্যা বুঝা যাইবে। বর সত্য সত্যই পরমাত্মা এরূপ শাব্দিক ভাবনা-স্থলে যথার্থ ভাবনা কন্যাদান-ক্রিয়াতে আসিতে দাও, তারপরে দেখ ত দেখিতে পাইবে কত ব্যবধান হইয়া গিয়াছে। এই পবিত্র ভাবনা হেতু বস্তুর পূর্বরূপে ও উত্তররূপে আকাশ-পাতাল ব্যবধান সৃষ্টি হইবে। কুজন সুজন হইবে। দুষ্ট শিষ্ট হইবে। এই ভাবেই বাল্যাকোলের জীবনের পরিবর্তন হইয়াছিল না কি? বীণার তারে অঙ্গুলি নাচিতেছে, মুখে নারায়ণের নাম জপ চলিতেছে, আর মারিতে আসিলেও শান্তি টলিতেছে না, পক্ষান্তরে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতেছেন—বাল্যা এরূপ দৃশ্য ইতিপূর্বে কখনও দেখে নাই। তাহার কুড়াল দেখিয়া হর লোকে ভয়ে পালাইয়াছে, নয়ত তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে—এতকাল ইহাই সে দেখিয়া আসিয়াছে। এ ক্ষেত্রে সে দেখিল নারদ আক্রমণ করিলেন না বা ভাগিয়াও গেলেন না। শান্তভাবে তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। বাল্যার কুড়াল নামিল না। নারদের ভ্রূ কাঁপিল না। চক্ষু মুদিত হইল না। মধুর ভজন পূর্ববৎ চলিতেছিল। নারদ বাল্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুড়ুল যে নামল না?" বাল্যা বলিল, "তোমাকে শান্ত দেখে।" নারদ বাল্যাকে রূপান্তরিত করিয়া দিলেন। ঐ রূপান্তর সত্য ছিল কি মিথ্যা?

বস্তুতঃ কেহ দুষ্ট কিনা তাহা নির্ণয় করিবে কে? সত্য সত্যই যদি কোন দুষ্ট লোক সামনে আসে তাহা হইলেও মনে কর যে সে পরমাত্মা। দুষ্ট হইলেও সে সাধু হইয়া যাইবে। খামকা তবে এরূপ ভাবা কেন? আমি বলি, একথা কে জানে যে সে দুষ্ট? কেহ কেহ বলিয়া থাকে, "সজ্জনেরা নিজে ভাল তাই জগৎ দেখে ভাল। আসলে তা নয়।" এখানে জিজ্ঞাস্য, তোমার কাছে যেরূপ দেখায় তাহাই যে সত্য একথা কিরূপে মানিয়া লওয়া যায়? সৃষ্টির সম্যক্ জ্ঞান আহরণের উপকরণ যেন এক মাত্র দুষ্টের হাতেই রহিয়াছে! একথাই বা কেন বলা হইবে না যে জগৎ ভাল, কিন্তু তুমি নিজে দুষ্ট, তাই তোমার কাছে জগৎ দুষ্ট দেখায়? আরে ভাই, সৃষ্টি ত দর্পণ। তুমি যেমন, সম্মুখের সৃষ্টিতে তেমনই তোমার প্রতিবিম্ব পড়িবে। যেমন দৃষ্টি তেমন সৃষ্টি। তাই ভাব, এই সৃষ্টি ভাল, এই জগৎ পবিত্র। সাধারণ কর্মেও এই ভাবের সঞ্চার কর। তখন দেখিবে রূপ কি চমৎকার।

"যা খাও, যা দেখ, যত কর হোম যাগতপ
যা কিছু কর কর্ম তা সব মোরে কর সমর্পণ।"

যাহা কিছু কর তাহা হুবহু ভগবানে অর্পণ করিয়া দাও।

আমার মা ছোটবেলায় একটি গল্প শুনাইতেন। গল্পটি মজার কিন্তু তার তাৎপর্য অতি মূল্যবান। এক ছিল স্ত্রীলোক। যাহা-

কিছু করিবে তাহা কৃষ্ণকে অর্পণ করিয়া দিবে ইহা সে নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। সে করিত কি—না, এঁটো নিকানোর পরে অবশিষ্ট গোবর তাল করিয়া নিক্ষেপ করিত আর বলিত—'কৃষ্ণার্পণমস্তু'! আর হইত কি—সে গোবর তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে উঠিয়া মন্দিরের মূর্তির মুখে গিয়া আটকাইয়া যাইত। মূর্তি ধুইয়া ধুইয়া পূজারী আর পারে না। কি করে? অবশেষে সে বুঝিতে পারিল যে, এই মহিমা হইতেছে ঐ স্ত্রীলোকের। স্ত্রীলোকটি যতদিন বাঁচিয়াছিল মূর্তি কখনও পরিষ্কার রাখা যায় নাই। স্ত্রীলোকটির অসুখ হইল। অন্তিম সময় উপস্থিত। মৃত্যুকেই সে কৃষ্ণার্পণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে দেবালয়ের মূর্তি টুকরা টুকরা হইয়া গেল। চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। স্ত্রীলোকটিকে লইয়া যাওয়ার জন্য আকাশ হইতে বিমান আসিল। বিমানকেও সে কৃষ্ণার্পণ করিল। বিমান মন্দিরে গিয়া ধাক্কা খাইল, চুরমার হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানের কাছে স্বর্গ ব্যর্থ।

তাৎপর্য এই যে, ভালমন্দ যে-কোন কর্ম আমাদের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে সে সব ঈশ্বরার্পণ করিয়া দিলে তাহাতে স্বতন্ত্র একরূপ সামর্থ্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। জোয়ারের দানা স্বভাবতঃই একটু পাণ্ডুবর্ণের, লাল রঙের। কিন্তু ভাজিলে তাহা হইতে কেমন সুন্দর খৈ হয়—সাদা, পরিষ্কার, আট কোণা। ধোপ-ধোলাই কাপড়ে সুদৃশ্য ঐ খৈ দানার পাশে রাখিয়া দেখ। কত ব্যবধান! কিন্তু ঐ দানারই যে সেই খৈ তাহাতে সংশয় নাই। এই ব্যবধানের মূলে একমাত্র অগ্নি। তদ্রূপ ঐ শক্ত দানা জাঁতায় পিষিলে, হইয়া যাইবে মসৃণ আটা। আগুনের সংস্পর্শে খৈ, জাঁতার চাপে মোলায়েম আটা। ঠিক তদ্রূপ আমাদের ক্ষুদ্র কর্মটিতে যদি হরিস্মরণরূপ সংস্কার করেন তবে তাহা অপূর্ব হইয়া যাইবে। ভাবনার কারণে মূল্য বাড়িয়া যায়। সাধারণ ঐ জবাফুল, ঐ বেল-পাতা, ঐ তুলসীমঞ্জরী, ঐ দূর্বা—ইহাদের তুচ্ছ মনে করিও না:

"তুকা কহে স্বাদ পেয়েছে সে।
রামমিশ্রিত হয়ে গেছে যে॥"

প্রতিটি ব্যাপার ভগবানে মিলাইয়া দাও। আর তারপর অনুভব কর। রামরূপ এই সামগ্রীর মত আর কোন সামগ্রী আছে কি? এই দিব্য সামগ্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কোন সামগ্রী তুমি আনিবে? নিজের প্রতিটি কর্মে ঈশ্বররূপ মশলা মিলাইয়া দাও, দেখিবে সব কিছু সুন্দর ও রুচিকর হইয়া গিয়াছে।

রাত্রি আটটায় মন্দিরে যখন আরতি চলে, চারিদিক ধূপ-গন্ধে ভরিয়া যায়, দীপ জ্বলে, আরতি শেষ হইয়া আসে তখন সত্য সত্যই মনে হয় আমরা পরমাত্মাকে দেখিতেছি। ভগবান দিবসভর জাগিয়াছিলেন, এখন তাঁর শয়নের সময় হইয়াছে। ভক্ত গাহে:

"সুখ নিঁদে এবে মগন হও গোপাল"।

কিন্তু সংশয়ী বলে, "ব্যাগো, ভগবান কখনও নিদ্রা যান বুঝি?" আরে, কেন নয়? আচ্ছা লোক! ভগবান শোন না, জাগেন না, শোয় আর জাগে বুঝি ঐ পাথর? ভাই, ভগবানই শোন, ভগবানই জাগেন আর ভগবানই পান-আহার করেন। ভোরবেলা তুলসীদাস ভগবানকে জাগান, মিনতি করেন:

"জাগিয়ে রঘুনাথ কুঁবর পংছী বন বোলে"।

নিজের ভাই-বোনদের, নর-নারীদের রামচন্দ্রের মূর্তি মনে করিয়া তিনি বলিতেছেন, "হে মোর রামচন্দ্র এবে ওঠ।" কিরূপ দিব্য ভাবনা। তদ্বিপরীত কোন বোর্ডিঙের কথা ধরুন। জাগানোর সময়ে সেখানে তাড়নার স্বরে বলা হয়, "উঠবে, কি উঠবে না?" ভোরের মঙ্গল-বেলা। তখন রূঢ় কথা মানায় কি? রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের আশ্রমে নিদ্রাগত। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে জাগাইতেছেন। বাল্মীকি-রামায়ণে এই বর্ণনা আছে:

"রামেতি মধুরাং বাণীং বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত।
উত্তিষ্ঠ নরশার্দূল পূর্বা সন্ধ্যা প্রবর্ততে॥"

"বৎস রাম, এবার ওঠ।"—এমন মধুর সম্বোধনে বিশ্বামিত্র তাঁহাকে জাগাইতেছেন। কত মাধুর্যে ভরা এই কর্ম। আর বোর্ডিঙের ঐ জাগানো কিদৃশ কর্কশ! বেচারা নিদ্রামগ্ন ছেলেদের মনে হয় জন্ম-জন্মান্তরের শত্রু যেন শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথমে মৃদু করে ডাক, পরে আর একটু জোরে। কিন্তু কঠোরতা, কর্কশতা যেন আদৌ না থাকে। ওঠে নাই, ত দশ মিনিট পরে যাও। আজ ওঠে নাই, কাল উঠিবে এই ভরসা রাখ। ঘুম ভাঙানোর তান ধর, প্রভাতী গাও, স্তোত্র শ্লোক আবৃত্তি কর। ঘুম ভাঙানো সাধারণ মামুলি কার্য। কিন্তু উহাকে আমরা কতই না কাব্যময়, প্রেমময় ও মাধুর্যপূর্ণ করিতে পারি। ধর, ভগবানকেই জাগাইতে হইবে। পরমেশ্বরের মূর্তিকেই আস্তে জাগাইতে হইবে। নিদ্রা হইতে জাগানো তাহাও এক শাস্ত্র।

সকল কর্মে, সকল আচরণে এই ভাব আন। শিক্ষা-শাস্ত্রে এই ভাব ত আনা চাই-ই। বালক, সে ত প্রভু-মূর্তি। আমি দেবতার পূজা করিতেছি, গুরুর এই মনোভাব থাকা চাই। সেই স্থলে, "ঘরে চলে যা, দাঁড়িয়ে থাক ঘণ্টাভর, হাত লম্বা কর, আঃ কাপড় কি ময়লা, নাকে কত শিকনি"—এরূপ কথা তাহার মুখে আসিবে না, ভ্রূ কুঞ্চিত হইবে না। স্নেহ-কোমল হাতে সে তখন নাক পরিষ্কার করিয়া দিবে, ময়লা কাপড় কাচিয়া দিবে, ছেঁড়া সেলাই করিয়া দিবে। শিক্ষক যদি তাহা করেন তবে অতি উত্তম ফললাভ হইবে। মার-ধর করিয়া কি ফল পাওয়া যায়? বালকেরও কর্তব্য অনুরূপ দিব্য ভাবনা হইতে গুরুকে দেখা। গুরু মনে করিবেন বালক হরিমূর্তি, আর বালক মনে করিবে গুরু হরিমূর্তি। এই ভাবনা হইতে পরস্পরের প্রতি আচরণ করিলে বিদ্যা তেজস্বী হইবে। বালকও ভগবান আর গুরুও ভগবান! গুরু নয় ত সাক্ষাৎ শঙ্করের মূর্তি, আমরা তাঁহার কাছ হইতে জ্ঞানামৃত পান করিতেছি, তাঁহার সেবা করিয়া জ্ঞান আহরণ করিতেছি, এই ভাব যদি বালকদের হয়, বল তাহা হইলে গুরুর প্রতি তাহাদের আচরণ কিরূপ হইবে?

৭

হরি সর্বত্র বিরাজমান এই ভাব যদি অন্তরে জন্মে, চিত্তে নিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে পরস্পরের প্রতি আমাদের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত, এই নীতিজ্ঞান স্বতঃই আমাদের অন্তঃকরণে স্ফূর্ত হইবে। শাস্ত্র অধ্যয়নের দরকারই থাকিবে না। তখন দোষ দূর হইয়া যাইবে। পাপ পলায়ন করিবে। দুরিতের অন্ধকার বিনষ্ট হইবে। তুকারাম বলেন ঃ

"মুক্ত নাহি বন্ধন। নে হরিনাম হরদম॥
ছোঁবে নাক পাপ। নিতে নাম হরি পাবে পাশ॥"

চল, তুমি মুক্ত। যত খুশি পাপ কর। পাপ করিতে করিতে তুমি হয়রান হও, কি পাপ মোচন করিতে করিতে হরি হয়রান হন তাহা আমি দেখিব। এমন দুরন্ত উদ্দাম পাপ কি থাকিতে পারে যাহা হরিনামের সামনে তিষ্ঠিবে? "যত ইচ্ছে পাপ কর।" যত পার পাপ কর। ঢালা অনুমতি পাইলে। চলুক হরিনামে আর তোমার পাপে কুস্তি! আরে, এই নামে কেবল এই জন্মেরই নহে, অনন্ত জন্মের পাপ মুহূর্তে নাশ করার শক্তি রহিয়াছে। অনন্ত যুগের অন্ধকার গুহায় জমিয়া থাকে। একটি কাঠি ধরাও, অমনি অন্ধকার অদৃশ্য। ঐ অন্ধকারই আলো হইয়া যায়। পাপ যত পুরাতন তত সহজে তাহা নষ্ট হয়; কারণ মরিবার জন্যই পাপের উৎপত্তি। পুরাতন লাকড়ি দেখিতে দেখিতে ছাই হইয়া যায়!

পাপ রামনামের কাছে তিষ্ঠিতে পারে না। ছোটরা বলে না কি, "ভূত ভাগে রামনামে।" ছোটবেলা আমরা রাত্রে শ্মশান ঘুরিয়া আসিতাম। বাজি রাখিয়া শ্মশানে খোঁটা পুঁতিতাম। রাত্রিকাল। চারিদিক অন্ধকার। সাপে কাটার ও কাঁটা ফোটার ভয় ত ছিলই। তবুও মনে কিছু হইত না। ভূতের সাক্ষাৎ কখনও মিলে নাই। ভূত ত কল্পনার সৃষ্টি। দেখা যাইবে কোথা হইতে? একটি দশ বৎসরের বালকের রাত্রিকালে একাকী শ্মশানে যাইয়া ফিরিয়া আসার সামর্থ্য কোথা হইতে আসিত? আসিত রামনাম হইতে। তাহা ছিল সত্যরূপ পরমাত্মার সামর্থ্য। হরি পাশে রহিয়াছেন এই ভাব অন্তরে থাকিলে সমস্ত জগৎ উল্টিয়া গেলেও হরির দাস ভীত হয় না। তাহাকে খাইবে এমন রাক্ষস কোথায়? রাক্ষসে তাহার দেহ খাইতে পারে, পরিপাক করিতে পারে। কিন্তু সত্য হজম করার শক্তি তার নাই। সত্য পরিপাক করিতে পারে এমন শক্তি জগতে নাই। ঈশ্বরের নামের সামনে পাপ তিষ্ঠিতে পারে না। তাই ঈশ্বরে মন বসাও। তাঁর কৃপা লাভ কর। সর্ব কর্ম তাঁকে অর্পণ করিয়া দাও। তাঁরই হইয়া যাও। সকল কর্মের নৈবেদ্য প্রভুকে অর্পণ করা চাই—এই ভাব উত্তরোত্তর তীব্র করিয়া চল ত ক্ষুদ্র জীবন দিব্য হইবে, মলিন জীবন সুন্দর হইবে।

৮

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্" যাহাই হোক না। তার সঙ্গে ভক্তি মিলে তো পূর্ণ ষোল আনা। কতটা দিলে, কতটা চড়াইলে তাহা বিচার্য নহে। বিচার্য—কি ভাব হইতে দিলে। একবার কোন অধ্যাপকের সহিত আমার আলোচনা চলিতেছিল। শিক্ষা ছিল আলোচনার বিষয়। আমাদের দুই জনের দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য ছিল। শেষ পর্যন্ত অধ্যাপক বলিলেন, "ভাই, আঠার বছর আমি এই কাজ করছি।" যুক্তিতে আমাকে খণ্ডন করা ছিল অধ্যাপকের কর্তব্য। তাহা না করিয়া তিনি বলিলেন, আমি এত বৎসর শিক্ষকতা করিতেছি। পরিহাসচ্ছলে তাঁহাকে আমি বলিয়াছিলাম, "কোন বলদ আঠার বছর যন্ত্রের সঙ্গে চলেছে বলেই সে যন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ হয়ে গেছে, এ কথা কি বলা চলে"? যন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ এক, ঘানির চারিদিকে পরিক্রমাকারী বলদ আর এক। শিক্ষাশাস্ত্রী এক, শিক্ষার ভারবাহী আর এক। শিক্ষাশাস্ত্রী ছয় মাসে এরূপ জ্ঞান আহরণ করিয়া লইবে যাহা মোটবাহী মজুরের মগজে আঠার বৎসরেও দাগ কাটিবে না। তাৎপর্য এই—অধ্যাপক বড়াই করিয়া বলিলেন, আমি অত বছর কাজ করিয়াছি। কিন্তু বড়াইয়ে সত্য প্রমাণিত হয় না। তদ্রূপ, পরমেশ্বরের সম্মুখে কত বড় স্তূপ লাগানো হইয়াছে গুরুত্ব তার নয়। মূল্য নামের, আকারের নহে। মূল্য ভাবনার। কতটা অর্পণ করিলে তাহা বিচার্য নহে, বিচার্য কি ভাব হইতে করিলে তাহা। গীতায় সাত শত শ্লোক আছে। এমন বহিও আছে যাহাতে দশ হাজার শ্লোক রহিয়াছে। বস্তু বড় হইলেই যে তার কার্যকারিতা বেশী তাহা নয়। বিচার্য বিষয়—বস্তুতে কতটা তেজ, কতটা সামর্থ্য আছে। জীবনে কত কর্ম করা হইয়াছে গুরুত্ব তার নয়। কিন্তু ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধি হইতে যদি একটি কর্মও করা হয় তবে সেই এক ক্রিয়া হইতেই পূর্ণ উপলব্ধিলাভ হয়। সময়বিশেষে—কোন এক পবিত্র মুহূর্তে এত অনুভূতি আমাদের হয় যে বার বৎসরেও তাহা মিলিবার নহে।

তাৎপর্য এই ঃ জীবনের সাধারণ কর্ম, সাধারণ ক্রিয়া পরমেশ্বরকে অর্পণ করিয়া দাও। তাহা হইতে জীবনে সামর্থ্য আসিবে। মোক্ষ হাতের মুষ্টিতে আসিবে। কর্ম তো করিবেই আর তার ফল ত্যাগ না করিয়া ঈশ্বরে অর্পণ করিবে, এই হইতেছে রাজযোগ। এই রাজযোগ কর্মযোগ অপেক্ষা এক পা অধিক আগাইয়া গিয়াছে। কর্মযোগের কথা, "কর্ম কর ও ফল ত্যাগ কর। ফলের আশা রাখিও না।" এখানে কর্মযোগের শেষ। রাজযোগ বলে, "কর্মের ফল ছাড়িও না। সকল কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ কর। তাহা ফুল, তাহা তোমাকে অগ্রসর করিয়া দেওয়ার উপকরণ। তাহা ঐ মূর্তির মাথায় চড়াও।" একদিক হইতে কর্ম, অন্যদিক হইতে ভক্তি, এই দুইয়ের মিলন ঘটাইয়া জীবন সুন্দর করিতে থাক। ফল ত্যাগ করিও না। ফল ফেলিয়া দেওয়ার নহে, ফল ঈশ্বরে যুক্ত করিয়া দেওয়ার। কর্মযোগে ফেলিয়া দেওয়া ফল রাজযোগে জুড়িয়া দেওয়া হয়। বোনার মধ্যে আর ছড়াইয়া ফেলার মধ্যে পার্থক্য আছে। যাহা বপন করা হয় তাহা তুচ্ছ হইলেও বাড়িয়া অনন্তগুণ ফল দান করে। ছিটাইয়া ফেলিলে যেখানে পড়ে সেখানেই নষ্ট হইয়া যায়। ঈশ্বরে যাহা অর্পণ করিবে তাহা বপন করিবে। তার ফলে জীবন অনন্ত আনন্দে ভরিয়া উঠিবে, জীবনে অপার পবিত্রতা আসিবে।

অবিনশ্বর আমি

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন প্রসন্নময়ী।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের অটল গাম্ভীর্য্য খান খান হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। দুই মেয়ে পরস্পরের গা টেপাটিপি করে নিঃশব্দে হাসল—তার পর চাপা গলায় ভর্ৎসনা করে উঠল এক সঙ্গে:

আঃ—চুপ কর না মা? এ ত আর সত্যি সত্যি হচ্ছে না যে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছ? লোকেই বা কি মনে করবে বল ত? ভাববে সাত জন্মে ছবি দেখে নি—তাই এমন নাটুকেপনা করছে!

মেয়েদের ধমক খেয়ে আঁচলে চোখ চেপে ধরে প্রসন্নময়ী ধরা গলায় বললেন, সত্যি না হলে আর ছবিতে দেখাচ্ছে।

আঃ—চুপ কর বলছি—ছবিটা দেখতে দাও। বাঁ পাশ থেকে বড় মেয়ে সুরমা ধমকে উঠল।

এমন জানলে তোমাকে কখনও নিয়ে আসতাম না। ডান পাশের মেজ মেয়ে সরমাও শাসনের জের টানলে।

প্রসন্নময়ী বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করলেন। কিন্তু মনের মাঝে দুঃখের তাপটা লেগে রইল। ওরা ছবি দেখতে এসেছে বলেই কি সংসারটাকে মন থেকে অন্য কোথাও নামিয়ে রেখে এসেছে? এমন ভাবে ছবি দেখতে আসার কি-ই বা প্রয়োজন। পর্দ্দায় কান্না-হাসি, মিলন-বিচ্ছেদের স্রোত বয়ে যাক ক্ষতি নেই—মনের শক্ত জমিটি সেই স্রোতের তলায় তলিয়ে না যায়—জলে ভিজে সাঁতসেঁতে না হয়—সাবধান!

সাবধান হয়ে আঁচলে মুখ মুছে কাপড় গুছিয়ে ভাল হয়ে বসলেন প্রসন্নময়ী। উৎসুক দৃষ্টি মেলে ধরলেন পর্দ্দার গায়ে। দৃশ্য, মানুষ, কথা, সুর, গতি, স্পন্দন সবকিছু মিলিয়ে তারই গায়ে অবিকল ফুটে উঠছে—রোজকার দেখা প্রতিটি মুহূর্ত্তে অনুভব করা সব ঘটনা। বস্তু-ব্যক্তি আর এদের সংযোগে যে ক্রিয়া ছবি হয়ে ফুটছে—তার সবটাই পর্দ্দার গায়ে মিলিয়ে যাচ্ছে না, অত্যন্ত সূক্ষ্ম সংবেদনশীল কিছু অংশ মনের গভীরেও রেখাপাত করছে। মুখের হাসি আর চোখের জলে সেই হিসাবটা অভ্রান্ত। মেয়েরাও কত বার চোখ মুছেছে—কত বার শব্দ করে হেসে উঠেছে—কতবার চাপা নিঃশ্বাস ফেলেছে; সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে হাসিকান্নার তাপটা লাগছে—আর একা প্রসন্নময়ীর ফোঁপানিটাই শ্রুতি বা দৃশ্য-কটু বলে এরা ধরে নিল কেন!

সংসারে যেমন ঘটে—ছবিতেও হুবহু তাই ঘটছে। দু'ভায়ের সংসার। একজন উপার্জ্জন করে, একজন বেকার। বাইরের এই অসামঞ্জস্যটা স্নেহের সুকোমল পর্দ্দার আড়ালেই ছিল—যেমন ফুলে ভরা অপরাজিতা-লতার আড়ালে রয়েছে বাড়ীর লোহার ফটকের উপরিভাগ। দুই ভায়ের বিয়ে হ'ল—বউরা এল ঘর করতে। ঘর করতে করতে তারা আবিষ্কার করল—নরম লতার নীচেকার লোহার কঠিন দেহ। এক জনের উপার্জ্জনে সংসার চলে, অন্যজন বসে বসে খায়। বাস্তবের কঠিন শিলায় নিকষিত হয়ে স্নেহের রূপ হ'ল ভিন্নতর। খুঁটিনাটি ব্যাপারের সংঘাতে এতদিনের প্রশান্তি নষ্ট হতে লাগল, কাঁচের গায়ে বিদারণরেখা স্পষ্ট হ'ল। এর পর বেকার বড় ভাইয়ের ছোটর সংসারে থাকা চলল না। কঠিন সংসার দুঃখ-দুর্ঘটনার শতপাকে জড়িয়ে ধরল বড় ভাইকে—সেই একটানা দুঃখের স্রোতে ভেসে যেতে লাগল বড় বউ। কি তীব্র সে দুঃখ…চোখে জলই যদি এসে থাকে প্রসন্নময়ীর—সে কি কোন কালে সিনেমা না-দেখার অভ্যাব্যতা, না দুর্ব্বল মনে কতকগুলি প্রবল বৃত্তির নাটকীয় সংঘাতজনিত পরিণাম? যাই হোক, মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলেন তিনি—হে ভগবান, বড় বউয়ের মত এমন ভাগ্য যেন কারও না হয়। ছোট বউয়ের মত এমন হৃদয়-হীনা মেয়ে যেন কোন সংসারে না আসে, ছোট ভাইয়ের মত এমন দুর্ব্বলচিত্ত পুরুষ-মানুষও যেন ভগবান সৃষ্টি না করেন!

দপ্ করে আলো জ্বলে উঠল—দুঃস্বপ্নের অবসান হ'ল। প্রসন্নময়ীর চৈতন্য তখনও দুঃখের বাষ্পে ছায়াচ্ছন্ন। কাহিনীর শেষ যেন এইখানেই নয়—আরও এগিয়ে যাবে কাহিনী—যেমন ছেলে-বেলায় শোনা সুয়োরাণী দুয়োরাণীর কাহিনীটা এগিয়ে যেত। দুঃখের মধ্যেই যদি শেষ হ'ল কাহিনী ত পাপপুণ্যের তারতম্য রইল কোথায়? স্বর্গ আর নরক এ-পাড়া ও-পাড়ার মতই সহজগম্য—একটি থেকে আর একটিতে পৌঁছতে হলে দুস্তর বাধা অতিক্রমের কোন সাধনারই প্রয়োজন নাই!

বড় মেয়ে ঠেলা দিয়ে বললে, উঠবে—কি উঠবে না?

শেষ হয়ে গেল এরই মধ্যে?

না—তোমার জন্যে আবার নতুন করে আরম্ভ হবে! নাও—ওঠ, ন'টার 'শো'তে যারা আসছে—আমরা না যাওয়া পর্য্যন্ত তারা বাইরেই থাকবে কি?

কিন্তু এত দুঃখু কষ্ট পেয়েও বউটার কপালে আর সুখ হ'ল না। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন প্রসন্নময়ী।

বউটার সুখ দেখবার জন্য ত ঘুম নেই মানুষের চোখে। মেজ মেয়ের মুখে বাঁকা হাসির রেখা তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল। তুমি এমন আজুলির মত কথা কইছ মা—যেন সংসারে হামেশাই মিল হচ্ছে, সবাইয়ের সঙ্গে সবাইয়ের গলায়-গলায় ভাব।

তা নাই হোক, তা বলে অমন বুকচাপা দুঃখুই বা পাবে কেন মানুষ!—আপন মনে উচ্চারণ করলেন প্রসন্নময়ী। সত্যি বলতে কি মেয়ে দু'টি যেন রহলা দহলা। সর্ব্বদাই জিভে শান দিয়ে তান করছে—কখন কে বেফাঁস কিছু বলে ফেললে। মানুষের মনের ভুলে এলোমেলো কথা কি বার হয় না মুখ থেকে? মন-

মেজাজ ঠিক না থাকলে চড়া কথা বার ত হবেই। কার সংসারে ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী, বউ, গিন্নী, কর্ত্তা, দেওর, ননদ, শাশুড়ী কুটুম-সাক্ষাৎ সবাই নিপাট ভাল মানুষ হয়ে থাকে? হাঁড়িতে-কলসীতে ঠোকাঠুকি হয় না পাশাপাশি রাখলে? কে-ই বা নিজের কোলে ঝোল টানে না—পরের দুঃখু দেখলে মুখ ফিরিয়ে আপন কাজ করে না, নিজের সুখ্যাতি আর পরের নিন্দায় পঞ্চমুখ হয় না? যেখানে এসব হয় না—সেটা ত স্বর্গই, সেখানে···

আঃ—গাড়ীতে বসে বসেও তোমার ঢুলুনি আসে! ধন্যি যা হোক!

বড় মেয়ের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ কানে পৌঁছুতেই ধড়মড় করে উঠলেন প্রসন্নময়ী।

ভাবতে ভাবতে ঢুলুনিই এসেছিল হয় ত। গাড়ীর দোলাটাও স্নায়ুগুলিকে শিথিল করে ঘুমের আমেজ এনে দেওয়ার অনুকূল। আর হাতে কোন কাজ না থাকলে দু'চোখ বন্ধ করে একটুক্ষণের জন্য আলস্য উপভোগ করা যায়ই যদি—সে কি এমনই দোষের! এটি বয়সের ধর্ম্ম। ওদের এ নিয়ে ক্যাট ক্যাট করে কথা বলার কি আছে?

প্রসন্নময়ীর মেজাজে আগুনের আঁচ এসে লাগল। বললেন, ঘুমুচ্ছি ত ঘুমুচ্ছি—তোদের ঘাড়ে ত ঢুলে পড়ি নি যে চেঁচাচ্ছিস?

চেঁচাচ্ছি সাধে—বাড়ী পৌঁছে গেছি—নামতে হবে না গাড়ী থেকে? বড় মেয়েও চড়া গলায় জবাব দিল।

এই ত সবে পৌঁছুল। বলি তোরা নেমেছিস গাড়ী থেকে?

আমাদের নামা আর তোমার নামা। যে দেখে বিশ্বাসই করে না, বলে হাতীর বাচ্চা নেংটি ইঁদুর। মেজ মেয়ে টিপ্পনী কাটলে।

কি—কি বললি? আমি হাতী?

কি জ্বালা—সব কথা গায়ে পেতে নাও কেন?

না—তোদের বাঁকা বাঁকা কথা আমি বুঝতে পারব কেন? বলি তোরা আমার পেটে জন্মেছিস—না আমি—

আমরা কি তাই বলেছি—যে গলা ফুলিয়ে ঝগড়া করতে এলে? এখন নেমে গাড়োয়ানকে খালাস দাও।

ছবির গল্প যেটুকু বাষ্প জমিয়েছিল মনে—এই উত্তর-প্রত্যুত্তরের উত্তাপে তা হাওয়া হয়ে মিলিয়ে গেল। মোটা মোটা পা ফেলে দুম্ দুম্ শব্দে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন প্রসন্নময়ী।

এখানে জল ফেললে কে? আমার ঘরের দোরগোড়ায়···আর একটু হলেই পা পিছলে হয়েছিল আর কি! একটু যদি হায়া-আক্কেল থাকে কারও? সংসার ত নয়—শত্রুপুরীতে বাস করছি।

কণ্ঠধ্বনিতে কেঁপে উঠল চওড়া বারান্দা। সে ধ্বনি তীরের মত বিঁধল আর একটি প্রাণীর বুকে—রাত্রির অন্নব্যঞ্জন আগলে যে অপরিসর রান্নাঘরে প্রতীক্ষা করছে অভুক্ত পরিজনদের কে কখন ফিরবে এই আশায়। মেয়ের আঁচল বিছিয়ে একটুখানি গড়িয়ে নিচ্ছিল সে; উদয়াস্ত খাটুনির চাপে মাজা পিঠ একখানা হয়ে গেছে, সুযোগ বুঝে ঘুম নেমে আসছিল দু'চোখের পাতা ছেয়ে। এত শীঘ্র ওরা ফিরবে ভাবতে পারে নি সে।

কাকীমা—শুনছ ত মেঘগর্জ্জন? এবার পেখম তুলে নাচবার পালা তোমার। রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বড় মেয়ে সুরমা হাসতে লাগল।

এত শীগগির যে ভেঙে গেল বায়স্কোপ?

আরও কিছুক্ষণ চললে মাকে কি আর ফিরিয়ে আনতে পারতাম কাকীমা! আহা, ছবির মানুষের দুঃখু দেখে মানুষটা যেন কান্নায় কান্নায় গলে যাবার দাখিল হয়েছিল।···

খিল খিল করে হেসে উঠল দুই বোন।

হাসি থামিয়ে মেজ মেয়ে সরমা বললে, যাকগে, খাবার দেবে চল। দুঃখের ছবি দেখলেই আমার কিন্তু বড্ড খিদে পায়।

কিসের দুঃখু রে?

এই ধর—দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছে—মানুষ খেতে পাচ্ছে না। চাল আছে মহাজনের গোলায়, শুধু কালোবাজারে তার দর্শন পাওয়া যাচ্ছে।···তোমার মত যারা সাধারণ গেরস্ত তাদের কেনবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু আমার মত যারা পয়সাওয়ালা লোক—তারা এই বাজারেই চালের ওপর দুধ ঘি খেয়ে খেয়ে মুটিয়ে যাচ্ছে। তারা খালি ভাবছে, এই বেলা খেয়ে নেয়া যাক পেট ভরে। তাই ছবিতে যাই দেখলাম দুর্ভিক্ষ—অমনি ভাল ভাল খাবারগুলোর চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠল। তখন খালি খিদে—আর খিদে—

চ—রাতও হয়েছে ত—ওদের কাকীমা অর্থাৎ ছোট বউ উঠে বসলেন।

উপরে তখন গর্জ্জন চলছে, বলি বাড়ীর মানুষজন সব ঘুমিয়েছে, না মরেছে?

দাঁড়া বাছা—দিদি কি বলছেন আগে শুনে আসি। ছোট বউ ছুটবার উপক্রম করতেই সুরমা তাঁর হাত ধরে বললে, মা বলছেন, ঘুম আর মরণ কি একই জিনিস? এর উত্তর কি দেবে কাকীমা? হয় ত বলবে—একই। এ বাড়ীতে মরা মানুষ কথার তেজে জীবন্ত হয়ে ওঠে—যেমন তুমি। আর জীবন্ত মানুষের জো কি ঘুমোবার—কি অফুরন্ত কাজের ঘানিতে তাকে জুড়ে দেওয়া হয়।

থাম বাপু, আর রঙ্গ করিস নে। তিনি ছুটে গেলেন।

ছোট বউকে দেখে প্রসন্নময়ী মুখখানিতে রাজ্যের অপ্রসন্নতা জমিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, এতক্ষণে হুঁস হ'ল রাজরাণীর। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে একটা লোকের প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'ল—

'মেয়েরা বললে—খাবার দাও, খিদে পেয়েছে।'—কৈফিয়তের সুরে বললে, ছোট বউ।

আ মরণ! এই ত বায়স্কোপে বসে বসে যত রাজ্যের ছাই-ভস্ম গিললে সব! চিনে বাদাম, ডালমুট ভাজা, আইস ক্রীম, পান ···আবার বাড়ীতে পা দিতে-না-দিতে—

ছেলেমানুষ—ওদের ত দণ্ডে দণ্ডে পহরে পহরে খিদে।

আর বুড়ো মানুষের খিদে-তেষ্টা নেই—তারা পাকা হর্তুকী খেয়েছে কি না? আমি সেখানে গিয়ে ইস্তক পান দোক্তা ছাড়া দাঁতে একটি ডালমুট কি বাদাম কাটলাম না—

তা তোমাকেও না হয় ওই সঙ্গে দিই?

দিতে চাস দে, তোরও ক্ষ্যাটা চুকে যাক। কিন্তু জিগ্গেস করি—আমার ঘরের দুয়োরে এমন করে জল ফেললে কে? আর একটু হলেই যে—

ছেলেরা কেউ ফেলে থাকবে হয় ত—

বেশ ত, বুড়োরা রয়েছে কি করতে—ন্যাকড়া দিয়ে মুছে নিতে পারে নি? তা পুঁছবেই বা কেন, নিজেদের ঘরের দোরে ত জল পড়ে নি। যা শত্তুর পরে পরে। আছাড় খেয়ে যদি অপঘাতই হয়—আপদ বালাই বিদেয় হয়ে—

ছি ছি—কি যে বল দিদি!

যা ঠিক—তাই বলি। এই ত দেখে এলাম বায়স্কোপে—যা সত্যি সত্যি হয়—তাই ত দেখালে। ভালমানুষ বড় বউয়ের কি খোয়ার। ছোটর সোয়ামী যেন রোজগার করে—তাই বলে বড় জাকে করবে হেনস্তা? যদ্দিন গতর ছিল—গতর জল করে খেটে-ছিল সংসারে, বয়স হ'ল, স্বামী দেহ রাখলে—অমনি তার দুঃখে-শেয়াল কুকুর কেঁদে কুল পায় না!

তা রাত্তিরে কি খাবে দিদি—দু'খান লুচি ভেজে দেব কি? কথার মোড় ফেরাবার জন্য ছোট বউ চেষ্টা করলে।

আবার নতুন করে উনুন জ্বালতে হবে ত? তাতে কাজ নেই বাপু—একটু সন্দেশ-টন্দেশ কিনে আনাও, একটু দুধ দিও, বাস—ওইতেই হয়ে যাবে'খন। আমার ত পাখীর আহার, গুচ্ছের ছাই-ভস্ম গব গব করে গিলতেও পারি না—ড্যাঙ্গাডহর দৌড়ঝাঁপ করে বেড়াতেও পারি না। যে শোনে—সেই অবাক হয়। বলে, ও-মা—বল কি, ওইটুকুন মাত্তর খাওয়া! তবে দেহ তোমার টিঁকবে কি করে?

না দিদি—দু'খানা লুচিই ভেজে দিই। এই মাত্তর সতু ষ্টোভ জ্বাললে—চা করবে বলে, ওইতেই হয়ে যাবে'খন। বলে পিছন ফিরলে ছোট বউ।

দেখ বাপু—মেলাক্ষণ জ্বালিও না যেন ষ্টোভ। তোমাদের কি—লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন!

আহারাদি সেরে একটি তৃপ্তির উদ্গার তুলে বললেন, ছোট বউ, একটা কাজ কর্ না ভাই! কোমরটায় একটু টারপিন তেল মালিশ করে দে ত। তিন ঘণ্টা ধরে বসে বসে মাজা পিট যেন একখানা হয়ে গেছে। পোড়া কপাল বায়স্কোপের। খালি কান্না আর কান্না। মেয়ে দুটোও যেমন ধিঙ্গী হয়েছে—ওই বই আবার দেখাতে নিয়ে যায়। বলে এমনিতেই দুঃখের সমুদ্দুরে ভাসছি—তায় আবার পয়সা খরচ করে···উহুঁ-হুঁ ওখানটায় আস্তে আস্তে দে, বড্ড ব্যথা।

আধ ঘণ্টা ধরে মাজা টেপার পর প্রসন্নময়ী বললেন, এইবার তুই যা—খেয়ে দেয়ে হেঁসেল পাট তুলে শুয়ে পড়গে যা। কাল সকালে আবার আপিস-ইস্কুল আছে, যা খেয়ে নিগে।

আজ যে একাদশী দিদি। মৃদু স্বরে ছোট বউ বললে।

একাদশী! পোড়া মনের দশা দেখ—ভুলে বসে আছি। ও-বেলা মাছ আনালাম বেশী করে—বলি এইস্ত্রী মানুষের লক্ষণ-টক্ষণ-গুলো পালতে হবে ত, আর এ-বেলাতেই ভুলে বসে আছি সব। ঝাঁটা মার বায়স্কোপের মাথায়। খালি বড় বৌয়ের কথা মনে হচ্ছে—ওর দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছে। আমিও যে বড় বউ, তাই ভয় হয়—

ছোট বউ শিউরে উঠে বললে, না দিদি, ভগবান করুন, এমন দশা যেন কারও না হয়।

কার ভাগ্যে কি লেখা আছে—কে বলবে ভাই। এই যে তুই সাতসকালে কপাল পুড়িয়ে বসে আছিস—তোর কর্ম্মফল নয় ত কি! আর জন্মে কাকে বঞ্চিত করেছিলি—কার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছিলি—

ছোট বউ আস্তে আস্তে উঠে গেল সেখান থেকে। এ সব কথা বহুবার সে শুনেছে—বলতে গেলে রোজই শোনে। নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া আর কিসেই বা সান্ত্বনা সে পেতে পারে! ভাল ঘর-বর দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন বাপ মা। রাঢ়-দেশে ধানের জমি আছে—সম্বৎসরের খোরাক হয়েও কিছু উদ্বৃত্ত হয়। ছেলেটি চাকরি করে সরকারী আপিসে—বিদ্বান, সুতরাং চাকরির ক্ষেত্রে উন্নতি তার অবশ্যম্ভাবী। শহরে দোতলা বাড়ী—পাড়াগাঁয়ে অর্থাৎ দেশেও দোমহলা প্রকাণ্ড বাড়ী। আত্মীয়-স্বজন সকলকারই অবস্থা ভাল। অর্থে, মানে, প্রতিপত্তিতে, বিদ্যায়, স্বভাব চরিত্রে এমন কাম্য সম্বন্ধ বাংলাদেশের কন্যার অভিভাবকেরা কল্পনাও করতে পারেন না। অথচ বছর না পুরতেই সব মিথ্যা হয়ে গেল। একজনের সঙ্গে সবই ভোজবাজীর মত মিলিয়ে গেল।

ভাসুর কাজ করেন সদাগরী আপিসে, মাইনে তেমন মোটা নয়। কিন্তু মাইনে ছাড়াও কি করে অর্থ উপার্জ্জন করতে হয় তার ফন্দী জানেন। আপিসে খত লিখিয়ে টাকা ধার দেন—টাকাপ্রতি এক আনা সুদ মাসে। বাড়ীতে গহনা বন্ধকীর কারবার চলে—টাকায় দু'পয়সা সুদ। জমির ধান বেচে মোটা টাকা ব্যাঙ্কজাত করেন বৎসরান্তে। বাড়ীর বাইরের দিকের দু'খানা ঘর মোটা সেলামী নিয়ে দোকানদারদের ভাড়া দিয়েছেন—মাস মাস দেড় শ টাকা ভাড়া পান।···তিনতলায় আর দু'টো ফ্ল্যাট তুলবেন—আলোচনা চলছে, তারও আয় মাস গেলে দেড়শ'র কম হবে না। আর কিছু জমিও নাকি কিনে রেখেছেন বালিগঞ্জের দিকে। দু' চার কাঠা এমনি হাত-ফেরাফিরি করে লাভও করেছেন মোটা টাকা। বড় ছেলেকে ঢুকিয়েছেন নিজের আপিসে, মেজ ছেলেটি ভাল লেখাপড়া শেখে নি—মোটর মেরামতির কাজ শিখছে। ওকেও একখানি মোটর কিনে দেবেন—যাতে নিজের পায়ে ভর দিয়ে

দাঁড়াতে পারে। ছোট ছেলেটি তিনটে পাশ দিয়ে বিলেত যাবার সুযোগ খুঁজছে—সেখান থেকে একটা কেষ্টবিষ্টু হয়ে আসবেই বাজারে সোনা যত আক্রা হচ্ছে—বড় জায়ের শরীরও তেমনি ভর্তি হচ্ছে সোনাতে। শরীরের আয়তন ক্রমশঃই বাড়ছে, গহনার গুরুত্বও তাল দিচ্ছে তার সঙ্গে। একদিন যেন হিসেব হ'ল দেড়শ ভরি সোনা আর গহনা দখলীস্বত্ব নিয়েছে—লোহার সিন্দুকে আর দেহ-ভূমিটিতে। কিন্তু এমনই কালের ফ্যাসান—আর বয়সের বিড়ম্বনা যে প্যাটার্নগুলি তাড়াতাড়ি বাতিল হয়ে যাচ্ছে—যেগুলো বাতিল হয় নি সেগুলো বয়সের অগ্রগতিকে সসম্মানে পথ ছেড়ে দিয়ে সিন্দুকের কোণ আশ্রয় করছে, অর্থাৎ তারাও বাতিলের দলে।

যাই হোক—এতগুলি লোকের রন্ধনপর্ব্বটা এত দিন ছোট বউ-ই সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহ করেছে। বছরে বছরে পোষ্য-সংখ্যা বাড়ছে—ইস্কুল, আপিস, ব্যবসা প্রভৃতির বিবিধ বিধানে ভোর থেকে রাত এগারটা পর্য্যন্ত রান্নাঘরের পাট যেন চুকতেই চায় না।··· কয়েক দিন হ'ল মাত্র এ নিয়ম পাল্টেছে। কারণ—ছোট বউয়েরও বয়স বাড়ছে—প্রসন্নময়ীর মনোগত ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াল দুই মেয়ে সরমা আর সুরমা। বললে, বামুন রাখ একটা।

প্রসন্নময়ী আপত্তি তুললেন, এ আর ক'জন লোকেরই বা আয়োজন? আমার বাপের বাড়ীতে মা একলা দু'শো জনকে পাতা পেড়ে খাইয়েছেন—

মেয়েরা বললে, তাঁদের খাওয়ার ভোগ ত কম ছিল না। তুমিই গল্প করেছ—ঘরে আটটি গাই গরু ছিল—এক সঙ্গে চার পাঁচটি গরুতে দুধ দিত, দুধ নিয়ে হেলা-ফেলা। অত দুধ খেয়ে দিদিমা যদি দস্যির মত খাটতে না পারতেন—

থাম বাপু—আমরাও যেন সংসার করি নি। ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন প্রসন্নময়ী। তোর কাকার বিয়ের আগে কে হাঁড়ি হেঁসেল ঠেলেছে দু'বেলা?

তখন ত মোটে সাড়ে তিনটি প্রাণী বাড়ীতে। বাবা, কাকা, তুমি আর তিন বছরের আমি। বড় মেয়ে সুরমা হেসে বললে।

তার পরেও—

হুঁ—তার পর সরমা কোলে আসতেই কাকীমা এলেন এ বাড়ীতে। তোমায় ধরল বাতে, কাকীমা ধরলেন হাঁড়ি।

থাম—থাম বলছি। চেঁচিয়ে—কেঁদে—প্রলয়কাণ্ড বাধালেন প্রসন্নময়ী।

মেয়েরা অবশ্য দমল না, রাঁধুনীর ব্যবস্থা পাকা করে তবে নিরস্ত হ'ল। প্রসন্নময়ীর মনের প্রসন্নতা নষ্ট হ'ল। ছোট বউ-ই এই সবের হেতু ঠিক করে আরও বিরূপ হয়ে উঠলেন তার উপর।

ছোট বউ আড়ালে কাঁদলে খানিক। দুই বোনকে ডেকে বললে, কেন তোরা এ ব্যবস্থা করলি মা?

ভালই ত করলাম কাকীমা! গালটা তোমায় ন্যায্য পাওনাই—উপরি খাটুনিটা তার সঙ্গে কেন ভোগ কর! মায়ের কথা আমরা যেমন গা পেতে নিই না—তুমিও তেমনি কান দিও না। মেয়েরা হাসল।

ছোট বউয়ের মনে পড়ল—একবার বড় দাদা এসেছিলেন নিয়ে যেতে। প্রসন্নময়ী বিছানা থেকে উঠলেন না—ওকে ডেকে পাঠালেন নিজের ঘরে। বললেন, এই দেখ ভাই আমার অবস্থা—বাতের ব্যথায় শয্যাগত। ছোট বউ আছে তাই যত্ন আত্তিটা পাই, না হলে কি দুর্গতি যে হ'ত। মেয়েরা ত ফিরেও তাকায় না, ওদের সাজ-পোশাক নিয়েই মত্ত।

বড় দাদা চলে যাবার সময় আশ্বাস দিলেন, মাসখানেক বাদে আমি আসব।

তার আগেই চিঠি লিখলে ছোট বউ—এই সংসার ফেলে আমার অন্য কোথাও যাওয়া অসাধ্য। দিদি শয্যাগত—কার ওপর সংসারের ভার চাপাব।

সেই দিন রাত্রে সিঁড়ি দিয়ে নামবার মুখে বড় জায়ের মুখে তার নাম শুনে থমকে দাঁড়াল ছোট বউ। নিজের নাম অপরের মুখে শুনলে অতি বড় সংযমীরও কৌতূহল অদম্য হয়ে ওঠে। ছোট বউ শুনলে:

দিদি বলছেন, বাতের ব্যথা না চাগালে ওকে ত নিয়ে গিয়েছিল বাপের বাড়ীতে।

তা দু'দিনের জন্য গেলেনই বা ছোট বউমা।

যেমন বুদ্ধি তোমার—গেলেনই বা ছোট বউমা!···ব্যঙ্গে শাণিত হয়ে উঠল অপর কণ্ঠ। বলি ওর বাপের বাড়ীতে যারা আপনার লোক রয়েছে—সবাই ত সাধুসন্ন্যেসী মানুষ নয়। তুমি যে বিষয়-আশয় ভোগদখল করছ একা একা—তার ভাগের ভাগী ত ছোট বউও। ওকে হিস্যে বুঝে নেবার কুমন্ত্রণা দেবার মানুষের অভাব আছে পৃথিবীতে? বিষয় ভাগ হলে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে কোথায় দাঁড়াব আমি। তা ছাড়া—

তর তর করে নেমে এসেছিল ছোট বউ। এই বিষ দু'কান ভরে পান করে দেহেও ক্রিয়া হয়েছিল বৈ কি। এই অনাত্মীয় পরিবেশ—সংশয়-সঙ্কুল সংসার—স্বার্থ-সঙ্কীর্ণ কঠিন হৃদয়—এ সবের মধ্যে সে দিনযাপন করবে কেমন করে। তবু, এইখানেই যে সুরভিমণ্ডল রচনা করে একজনের স্মৃতি শৃঙ্খল হয়ে তার সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করে ধরেছে। স্বামীর ঘর—নারীর সর্ব্ব তীর্থের সার। বিরাট পৃথিবীর শূন্যমণ্ডল আর কোন বস্তু দিয়েই বা পূর্ণ করতে পারে সে! আজীবন যে সমাজকে আশ্রয় করে রয়েছে সে—সেখানকার সুখশান্তি, মর্য্যাদা-গৌরব সমস্তই দু'অক্ষরের একটি বাক্যের মধ্যে সীমায়িত। শিখা নিভে গেলেও প্রদীপের গর্ভ যেমন তৈলের আশ্রয়ভূমি—স্বামী অবর্ত্তমানে বিধবার আশ্রয়স্থল তেমনি শ্বশুর-ভবন।

লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সত্ত্বেও ছোট বউ এখানে রয়ে গেল।

দুই মেয়ে ভালবাসে কাকীমাকে। মায়ের অশোভন ব্যবহারের জন্য মনে মনে যথেষ্ট লজ্জাবোধ করে। তারাই

একদিন পরামর্শ করে প্রসন্নময়ীকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সিনেমায়।

বইখানার গল্প যেন তাদেরই সংসার থেকে নেওয়া। দুই জায়ের আচার-আচরণে মা আর কাকীমার চেহারাই ফুটে ওঠে। সম্বন্ধটা যা একটু উল্টে পাল্টে দেখানো হয়েছে। ছোট জায়ের অত্যাচারের মাত্রা যতই বাড়ে, বড় জায়ের প্রতি সমবেদনায় ততই ভরে ওঠে দর্শকচিত্ত। ছোট জায়ের নীচতা, স্বার্থপরতা, কলহ-পরায়ণতা মনে বিতৃষ্ণা জাগায়। আরশিতে কুৎসিত মুখভঙ্গী কার বা ভাল লাগে, কে সহ্য করতে পারে সেই দৃশ্য বেশীক্ষণ ধরে? মা কি আর ছবির আয়নায় নিজের স্বরূপটি বুঝতে পারবেন না?

প্রসন্নময়ী কিন্তু বড়ত্বের সিংহাসন থেকে এক তিলও নামলেন না—নিত্যকার অভ্যাসমত ভোরবেলাতেই ঝঙ্কার দিলেন—ছোট বউ বুঝি এখনও ওঠে নি? দোরে জল দেওয়া, উঠোন ঝাঁট দেওয়া, বাসিপাট সারা—গেরস্তর লক্ষণের কাজ সব যে পড়ে রয়েছে। ধন্যি অলক্ষ্মী ধরে এনেছিলাম মা—কোনদিন যদি ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি হ'ল!

সরমা ও সুরমা দোর খুলে বাইরে এল। বললে, মা, তোমার কেমন কথা! কাল কাকীমার একাদশী গেছে—সারাদিন জলস্পর্শ করেন নি—আজ একটু দেরিই হয় যদি—কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে তাতে! আমরাই না হয় কাজগুলো সেরে দিচ্ছি।

তা ত বলবিই যে—তোরা যে ঘরজ্বালানী—পরভোলানী! পরের ঘরে গিয়েছিস—তোদের টান আর আমার ওপর থাকবে কেন বল! তা আমার যদি শতেক খোয়ার না হয় ত কার হবে। ছবিতেও ত দেখলাম কাল—বড় বউটাকে দু' পায়ে থেঁতলাচ্ছে দজ্জাল ছোট বউটা। বড় বউ হলেই ত ওই দশা হবে। কপালে করাঘাত করে ডুকরে কেঁদে উঠলেন প্রসন্নময়ী।

দুই বোন অবাক হয়ে পরস্পরের পানে চাইল। অর্থাৎ, মাকে এত করে ছবি দেখানোর এই পরিণাম! গল্পের সম্বন্ধটিই ওঁর কাছে হ'ল অগ্রগামী, আর যে মানুষ দুঃখের ভার বইল—সম্বন্ধ বদল করেও সে ওঁর হৃদয়ের ধারে-কাছে পৌঁছতে পারল না! দুঃখের আঁচ না পেয়েও সেই দুঃখকে কল্পনায় এনে উনি নিজের মনের মধ্যে রচনা করলেন দুঃখের একটি প্রবল নদী—আর অপরিসীম দুঃখ-বেদনা নিয়ে কাকীমা তৃণের মত ভেসে গেলেন তারই প্রবল স্রোতে।

বজ্রাঘাতে ওদের জাগাও

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

আর ডাকব কত ওদের দয়াল বুকফাটা চিৎকারে,
এই রাত্রিশেষে লক্ষ ডাকে আঘাত দিলাম দ্বারে।
ওগো, শুধাই তোমায় ওদের কেন ভাঙ্‌ছে নাকো ঘুম,
হোথা প্রলয়শিখায় লক্ষফণায় ঐ উঠেছে ধূম।
আজ শীর্ষে যে ওই মৃত্যু তাহার জাগছে না সে তবু,
বুঝি মোদের ডাকে ওদের মোহ ভাঙবে নাকো কভু।
তুমি প্রেরণ করো তোমার ওগো ভৈরব আহ্বান,
আজ বজ্রাঘাতে ওদের জাগাও রুদ্র ভগবান।

ওগো, হাজার যুগের মিথ্যা আচার মনটি ওদের ঘিরে,
আজ ঢাকলো যে গো জীবনশিবের পরম সত্যটিরে।
তাই সত্য যে আজ হাঁপিয়ে উঠে শিবের চুলে আঁখি,
চির সুন্দরেরি অঙ্গ ওরা ধুলায় দিল মাখি,
ওই ক্রন্দন উঠে মন্দিরেরি আকাশ ঘেরি ঘেরি
ওগো ধ্বংস হতে আর বুঝিবা নেইকো ওদের দেরি।
ওরা নিত্য যে গো করছে নিজের আত্মার অপমান,
তুমি বজ্রাঘাতে ওদের জাগাও রুদ্র ভগবান।

আজ সংস্কারেরি ধর্মে ওদের মর্ম হ'ল ভারি,
চলে বাহ্যপূজা দেবতা কোথা নেই ঠিকানা তারি।
ওরা মিথ্যাভয়ে নিত্য ভীত যৌবনেতে জরা,
এই বসুন্ধরার বাতাস হ'ল ওদের পাপে ভরা।

আজ যাত্রাপথে ওদের নানান বিধিনিষেধ মানা,
ওরা জাগ্রত কি ঘুমিয়ে আছে নেইকো ওদের জানা।
তবু জীর্ণপচা অন্ধকারে গাচ্ছে শুয়ে গান,
তুমি বজ্রাঘাতে ওদের জাগাও রুদ্র ভগবান।

ওগো একদিন ওরা ঘুরত জগৎ বিজয়রথে চড়ে,
হঠাৎ আজ যে ওরা অন্ধকারের গর্ত্তে গেছে পড়ে।
তবু গর্ত্তমাঝেই ঘর বেঁধে গো বলছে—খাসা আছি,
ওগো মৃত্যুসাথেই বাস যে ওরা করছে কাছাকাছি।
আজ তোমার আঘাত নইলে ওদের আর হবে না জাগা,
ওরা ঐক্যহারা পক্ষাঘাতী বড়ই হতভাগা।
তুমি ওদের লাগি প্রেরণ কর ভৈরব আহ্বান,
আজ বজ্রাঘাতে ওদের জাগাও রুদ্র ভগবান।

তুমি এমনি করেই আঘাত হানো আজকে ওদের শিরে,
যেন লক্ষ গিঁঠের মৃত্যুবাঁধন এক্ষণি যায় ছিঁড়ে।
তব হুঙ্কারেতে উঠুক তারা ধড়ফড়িয়ে জেগে,
তুমি ঝঞ্ঝাসম ধাক্কা মারো গর্জ্জে মহা বেগে।
ওগো, বংশী নহে চক্র ঘোরাও বক্র চোখে হাসি,
যত ভাগ্যেরি সব আপদবালাই দাও আঘাতে নাশি।
আজ প্রলয়রোষের আশীর্বাদে হও গো অধিষ্ঠান,
তুমি বজ্রাঘাতে ওদের জাগাও রুদ্র ভগবান।

অন্তর-ভারতী

(ভারতীয় ভাষা-বিনিময় পরিকল্পনা)

শ্রীসুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়

মহারাষ্ট্রদেশের সংস্কৃতি-কেন্দ্র হইল পুণা। এখানকার বিদ্যায়তনসকল এবং নানাবিধ গবেষণা-মন্দির বিদ্বজ্জন-সমাজে সুপরিচিত ও সমাদৃত। ইহা জ্ঞান-পিপাসু, জ্ঞান-তপস্বীর তীর্থ। "অন্তর-ভারতী" নামে একটি প্রতিষ্ঠান এখানে বৎসর দুই হইল স্থাপিত হইয়াছে। ইহারই ব্যবস্থায় কতিপয় মরাঠী পুরুষ ও মহিলা বাংলা-সাহিত্যালোচনায় উদ্যোগী হইয়াছেন।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাধনা এবং সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার যোগস্থাপনের সঙ্কল্প লইয়া রবীন্দ্রনাথ "বিশ্ব-ভারতী" প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগসাধন যেমন বিশ্বভারতীর মুখ্য উদ্দেশ্য, তেমনই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাংস্কৃতিক-সংযোগ-প্রতিষ্ঠা হইল "অন্তর-ভারতী"র প্রধান উদ্দেশ্য।

ইহার পরিকল্পনা যাঁহার মনে সর্ব্বপ্রথম আসিয়াছিল তিনি মহারাষ্ট্র প্রদেশে "সানে-গুরুজী" নামে জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃত নাম হইল পাণ্ডুরঙ্গ সদাশিব সানে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর সানে শিক্ষাব্রত গ্রহণ করেন—সেইজন্য তিনি সকলের নিকট "সানে-গুরুজী" নামে পরিচিত। মরাঠী ভাষায় বহু গল্প, উপন্যাস, কাব্য, প্রবন্ধাদি লিখিয়া তিনি মরাঠী-সাহিত্যে অমর হইয়া আছেন। শিশুদিগের জন্যও মনোরম শিশু-সাহিত্য রচনা করিয়া তিনি এ-দেশের শিশু-হৃদয় অতি অনায়াসে জয় করিয়া লইয়াছেন। রবীন্দ্র-নাথের বিশ্বভারতীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সানে-গুরুজীর মনে "অন্তর-ভারতী" প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগসাধনের একমাত্র উপায় হইল পরস্পরের সাহিত্যালোচনা—সাহিত্যের মাধ্যমে আমরা যেমন পরস্পরের সান্নিধ্যলাভ করিতে পারি তেমন আর কিছুতে নহে। মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে সানে-গুরুজী 'অন্তর-ভারতী' পরিকল্পনা-মূলক প্রস্তাব উত্থাপিত করিলে ইহা সকল সাহিত্যামোদীর অনুমোদন লাভ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় এই পরিকল্পনাটি কার্য্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই। গান্ধীজীর হত্যা এবং তাহার পরে ভারতের পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ চিন্তা তাঁহার মনে দারুণভাবে আঘাত করিয়াছিল। ইহার পর হইতে তিনি ক্রমশঃ জগৎ ও জীবনের প্রতি বীতরাগ হইয়া পড়েন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে মনের দুর্ব্বল অবস্থায় নিজেই নিজের প্রাণ বিনাশ করিয়া তিনি মর্ত্যলীলার অবসান করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র পঞ্চাশ বৎসর। অকস্মাৎ তাঁহার এই অপমৃত্যুতে তাঁহার দেশবাসী স্তম্ভিত হইয়া যায়। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করিয়া মৃত্যুর এক বৎসর পরে তাঁহার অনুরক্ত ভক্তবৃন্দ 'অন্তর-ভারতী' স্থাপিত করেন। সানে-গুরুজীর দ্বারা অনুপ্রেরিত দেশ-সেবার আদর্শ এবং অন্তর-ভারতীর পরিকল্পনা সাধারণ্যে প্রচারিত করিবার উদ্দেশ্যে বোম্বাই হইতে মরাঠী ভাষায় "সাধনা" নামে এক-খানি সাপ্তাহিক পত্রিকা তাঁহার পরিচালনায় প্রকাশিত হইত। তাঁহার মৃত্যুর পর "সানে-গুরুজী-স্মারক-নিধি"র (স্মৃতি-ভাণ্ডারের) অর্থ-সাহায্যে "সাধনা-ট্রাষ্ট" সৃষ্টি করিয়া এই পত্রিকা ও প্রকাশ-বিভাগকে স্থায়ী করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

"সানে-গুরুজী"

অন্তর-ভারতী প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন প্রদেশের ভাষায় আদান-প্রদান-সূত্রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগসাধন। সানে গুরুজী বাংলা-সাহিত্যের, বিশেষতঃ রবীন্দ্র সাহিত্যের, অতিশয় অনুরাগী ছিলেন। নিজে বাংলা শিক্ষা করিয়া মরাঠী ভাষায় কয়েকখানি পুস্তক অনূদিত করিয়া গিয়াছেন।

অন্তর-ভারতীর প্রধান কেন্দ্র হইল পুণায়। বোম্বাই, কোহলাপুর, সংগলি, মিরাজ, জলগাঁও ও আমেদাবাদ শহরে ইহার শাখা ইতিমধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক শাখা-প্রতিষ্ঠানে কতিপয় গুণী-জ্ঞানী সানে-গুরুজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া 'অন্তর-ভারতী'র কাজ উৎসাহের সহিত চালাইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

ইঁহাদের সকলের বিশ্বাস যে, অন্তর-ভারতীর কাজের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর কাজই পরিপুষ্ট হইতেছে।

অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই প্রতিষ্ঠানের মূলে আছেন দুই জন উপযুক্ত নীরব কর্ম্মী। তাঁহাদের নাম আচার্য্য ভাগবত এবং শ্রীশ্রীপাদ জোশী। আচার্য্য ভাগবত প্রৌঢ়—বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। শ্রীপাদ জোশী নিরলস প্রাণবন্ত যুবক। ইঁহাদের কাহারও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও ছাপ নাই, কিন্তু দুই জনেই নানা ভাষাবিৎ পণ্ডিত ও সদা কর্ম্মরত।

নিজের মাতৃভাষা মরাঠীতে আচার্য্য ভাগবত একজন বিশেষজ্ঞ এবং সুবক্তা হিসাবে খ্যাত। ইহা ব্যতীত ইংরেজী, হিন্দি, উর্দু, গুজরাটী, কানাড়ী, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন। আরবী ও ফারসী ভাষাতেও তাঁহার কিছু জ্ঞান আছে। এই সব আধুনিক ভাষা ব্যতীত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তিনি সুপণ্ডিত। পরিব্রাজকের ন্যায় মহারাষ্ট্রদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া দেশের বিবিধ সাংস্কৃতিক কার্য্যে তিনি আজীবন ব্যাপৃত রহিয়াছেন। অধুনা তিনি অন্তর-ভারতীর কেন্দ্র পুণা এবং অন্যান্য শাখাগুলিতে পালাক্রমে উপস্থিত থাকিয়া এই সব প্রতিষ্ঠানের কার্য্য পরিচালনা করেন। ইহা ব্যতীত মহারাষ্ট্রীয় গ্রামবিদ্যাপীঠের আচার্য্য (Chancellor) পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি গ্রাম-সেবকদিগের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। গ্রাম-সেবকদিগের কাজ হইল দেশে স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে শিক্ষাদান ও প্রচার।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অন্তর-ভারতীর মুখ্য কাজ হইল প্রাদেশিক ভাষার আদান-প্রদান দ্বারা বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগস্থাপন। এই উদ্দেশ্যেই অন্তর-ভারতীর পুণা-কেন্দ্রে এবং অন্যান্য শাখা প্রতিষ্ঠানে আচার্য্য ভাগবত কয়েকজন শিক্ষিত মরাঠী পুরুষ ও মহিলার মধ্যে বাংলাভাষা শিক্ষার প্রেরণা আনিয়াছেন। তিনি নিজে গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ রবীন্দ্র-সাহিত্যালোচনায় নিবিষ্টচিত্ত। যখনই তিনি পুণায় থাকেন, তখনই অন্তর-ভারতীর বাংলা-সাহিত্যের ক্লাশ লইয়া থাকেন। তাঁহার বাংলা ক্লাশে আমি একদিন যোগ দিয়াছিলাম। সেদিন তিনি রবীন্দ্রনাথের "উর্ব্বশী" কবিতাটি পড়াইলেন। প্রায় জন চল্লিশেক পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন—অধিকাংশের হাতে রবীন্দ্রনাথের "সঞ্চয়িতা"। ইঁহারা সকলেই বিশেষ শিক্ষিত—কেহ কেহ কলেজের অধ্যাপক, কেহ কেহ গবেষক, কলেজের ছাত্রছাত্রী, অনেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকা। ইঁহাদের মধ্যে কবি ও সাহিত্যিক খ্যাতি-সম্পন্ন ব্যক্তির অভাব নাই।

আচার্য্য ভাগবত মরাঠি-ভাষার সাহায্যে পড়াইলেন। টম্‌সন, অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির সমালোচনার উল্লেখের পর ভারি সুন্দর ভূমিকা করিয়া কবিতাটি উচ্চস্বরে পড়িতে পড়িতে মরাঠী-ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া চলিলেন। তাঁহার ব্যাখ্যায় তিনি কবিতার অন্তর্গূঢ় ভাবরসটি অতি সুন্দরভাবে শ্রোতাদের নিকট পরিস্ফুট করিলেন। তাঁহারা সকলেই শুনিতে শুনিতে নোট লইতেছিলেন। ইঁহাদের উদ্দেশ্য বাংলা-সাহিত্য-সম্পদের সঙ্গে পরিচয়লাভ এবং তাহার রসাস্বাদন। বাংলা-সাহিত্যের, বিশেষতঃ রবীন্দ্র-সাহিত্যের, ইংরেজী এবং অধিকাংশ স্থলে ইংরেজী হইতে মরাঠী অনুবাদের মধ্যে তাঁহারা তেমন রস পান না, সেই জন্য তাঁহারা মূল সাহিত্যের রস-সম্ভোগাকাঙ্ক্ষী। আচার্য্য ভাগবত তাঁহার অধ্যাপনায় এই রস যথাযথ বিতরণ করিতে সমর্থ দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম—মনে হইল তিনি যথার্থ রবীন্দ্র-সাহিত্য-রসিক। নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া মুখে মুখে এই রস বিতরণপূর্ব্বক লোককে রবীন্দ্র-সাহিত্য-রসপিপাসায় উদ্বুদ্ধ করিতেই তিনি ব্যস্ত—সেইজন্য তিনি নিজে যৎসামান্য রচনা করিবার অবকাশ পাইয়াছেন। ইহা খুবই পরিতাপের বিষয়ও বটে।

এই অভাব অংশতঃ দূর করিয়াছেন তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য ও সহকর্ম্মী শ্রীশ্রীপাদ জোশী। ইনি নিজের মাতৃভাষা মরাঠীতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ও সুলেখক। তাহা ছাড়া তিনি হিন্দি, উর্দু, গুজরাটী, বাংলা ও ইংরেজী ভাষা বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন—ইনি সংস্কৃত-সাহিত্যেও অনুরাগী এবং অন্তর-ভারতীর একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী। ইহার আদর্শের প্রতি তাঁহার অনুরাগ এবং সেই আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ঐকান্তিক নিষ্ঠা অন্তর-ভারতীকে প্রাণবন্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই কাজে তাঁহার সহযোগী কর্ম্মসচিব শ্রীঅরবিন্দ মংগরুলকরের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি স্থানীয় পরশুরামভাও কলেজে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়া থাকেন—তিনি অন্তর-ভারতীর একজন উৎসাহী সহায়ক। মরাঠী ভাষায় তিনি সুলেখক। দেশীয় সঙ্গীত-পদ্ধতির বিশিষ্ট রসজ্ঞ এবং সমালোচক হিসাবেও মংগরুলকর খ্যাত। তিনি নিজেও সুগায়ক।

উপরে যে তিন জনের নাম করা হইল, তাঁহাদের উদ্যোগে গত ২২শে শ্রাবণ ১৩৬০ রবীন্দ্র-স্মৃতি-তিথি অতি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। পরশুরামভাও কলেজের বিশাল হলে পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার ডাক্তার জয়কারের পৌরোহিত্যে এই সভার অনুষ্ঠান হয়। সাধারণতঃ ঐ ধরণের অনুষ্ঠানে বক্তৃতাদির আড়ম্বর বেশী হইয়া থাকে, কিন্তু ঐদিনকার সভায় বক্তৃতার বাহুল্য ছিল না—বিশেষ ভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও সঙ্গীতের দ্বারা কবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আচার্য ভাগবত রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ শীর্ষক কবিতাটি মরাঠীভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। দেবনাগরী অক্ষরে বাংলা কবিতা ও তাহার মরাঠী অনুবাদটি পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়া সভায় উপস্থিত করা হইয়াছিল। একজন কবি মরাঠী অনুবাদটি ভারি সুন্দর রূপে আবৃত্তি করিলে রবীন্দ্রনাথের নিজের কণ্ঠে আবৃত্তি কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ গ্রামোফোন রেকর্ড সহযোগে সভায় পরিবেশিত হয়। উপরন্তু অনেকগুলি রবীন্দ্র সঙ্গীতও গীত হয়। মরাঠীদের উদ্যোগে এবং বাঙালী জনকয়েক পুরুষ ও মহিলার সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ায় অন্তর-ভারতীর আদর্শ অংশতঃ সফল হইয়াছিল।

২

শ্রীশ্রীপাদ জোশীর সহিত তাঁহার নিজের সম্বন্ধে এবং অন্তর-ভারতী সম্পর্কে তাঁহার কাজের বিষয়ে আমার যে কথোপকথন হইয়াছে তাহার চুম্বক নীচে দেওয়া হইল :

প্রশ্ন : এতগুলি ভাষা আপনি কি করিয়া এবং কেন শিখিলেন ?

উত্তর : এতগুলি ভাষা আর শিখিলাম কোথায় ? যে কয়টি ভাষা জানি সে কয়টি আমার নিজের চেষ্টায় শিখিয়াছি। সাধারণ বিদ্যার্জ্জনের সুযোগ আমি বেশী পাই নাই—কেবলমাত্র ম্যাটিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। তাহার পর হইতে নূতন ভাষা শিক্ষার কোনও সুযোগ আমি ছাড়ি নাই। আমাদের বিশাল দেশের নানা ভাষাভাষী জনগণের সাহিত্যের প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ। আমার ইচ্ছা মূল ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া মরাঠী ভাষাকে সমৃদ্ধ করি। সেই জন্য আমি কয়েকটি ভারতীয় ভাষা শিখিয়াছি এবং আরও শিখিবার ইচ্ছা রাখি। অনেক দুঃখকষ্টের মধ্যে থাকিয়া আমাকে এই সব ভাষা আয়ত্ত করিতে হইয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনে অনেক সময়ে জেলে থাকিতে কোনও কোনও ভাষা শেখা আমার পক্ষে সহজ হইয়াছে।

প্রশ্ন : আপনি বাংলা ভাষা কি করিয়া এবং কতদিন ধরিয়া শিখিতেছেন ?

উত্তর : বহুদিন হইতে বাংলা ভাষা শিখিবার ইচ্ছা আমার ছিল। সেই জন্য বাংলা অক্ষরপরিচয় হইতেই আমি বাংলা পুস্তক পড়িতে চেষ্টা করি। এ বিষয়ে জেলে বন্দী অবস্থায় আমি অন্যের সাহায্য পাইতাম। এইভাবে বাংলা শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়—তাহার পর এ যাবৎ নিজের চেষ্টায় শিখিতেছি। যখনই কোনও জায়গায় বুঝিতে পারি না তখনই আচার্য্য ভাগবত অথবা কোনও বাঙালী বন্ধুর শরণাপন্ন হই।

প্রশ্ন : বাংলা সাহিত্যের কোনও লেখা মরাঠীতে তর্জ্জমা করিয়াছেন কি ?

উত্তর : বাংলা সাহিত্য হইতে বলিবার মত তেমন কিছু করি নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে কবি নজরুলের একটি ছোট কবিতা মরাঠীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলাম। মাসকয়েক পূর্ব্বে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ছোট গল্প মরাঠী ভাষায় তর্জ্জমা করিয়াছি, সেটি "সকাল" পত্রিকায় "দেওয়ালি" সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি কবি নজরুলের কবিতার সহিত মরাঠী পাঠক-পাঠিকার পরিচয়সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার সে প্রবন্ধটি "রবিবারের সকাল" পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে নয় সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়াছে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি অনুবাদ করিবার বাসনা আছে।

প্রশ্ন : আর কোন্ কোন্ ভাষা হইতে কি কি অনুবাদ করিয়াছেন তাহা একটু বলিলে বিশেষ বাধিত হইব।

উত্তর : আমি বহুদিন আচার্য্য কাকা কালেলকারের শিষ্য ও সংস্পর্শে ছিলাম। তিনি নিজে মহারাষ্ট্রীয় হইলেও, তাঁহার সমস্ত রচনা তিনি গুজরাতী ভাষায় লিখিয়াছেন। আমি তাঁহার অনেক রচনা হিন্দি ও মরাঠী ভাষায় অনূদিত করিয়াছি। ইহা ব্যতীত উর্দ্দু ভাষার একখানি বিখ্যাত উপন্যাস মরাঠী ভাষায় অনুবাদ

শ্রীশ্রীপাদ জোশী

করিয়াছি—সে বইখানি হইল—শ্রীরামানন্দ সাগরের লিখিত "আউর্ ইন্‌সান্ মর্ গয়া"। উর্দ্দু ভাষা হইতে অনেকগুলি ছোট গল্পও মরাঠীতে এবং মরাঠী ভাষা হইতে বহু রচনা হিন্দিতে ভাষান্তরিত করিয়াছি।

প্রশ্ন : অন্তর-ভারতী সম্পর্কে আপনার কাজের বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা হয়।

উত্তর : পুণা-কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কাজ আমাকে করিতে হয়। প্রয়োজন হইলে অন্যান্য শাখা-কেন্দ্রেও আমাকে সময়ে সময়ে যাইতে হয়। পুণাকেন্দ্রের বাংলা সাহিত্যের ক্লাশে আমি রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্য, বিশেষতঃ গল্পগুচ্ছ পড়াইয়া থাকি। তদ্ব্যতীত নানা ভাষা হইতে অনুবাদের কাজের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

অতঃপর শ্রীশ্রীপাদ জোশী 'কবি নজরুল ইসলাম' সম্বন্ধীয় তাঁহার সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি সংক্ষেপে হিন্দি ভাষায় বলিয়া গেলে, তাহা আমি বাংলায় লিখিয়া লই। তিনি বাংলা বই পড়িতে পারেন,

পড়িয়া বুঝিতে পারেন, শুনিলেও বুঝেন, কিন্তু মুখে বলিতে পারেন না—কারণ সে অভ্যাস কখনও করেন নাই। আচার্য্য ভাগবত সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। যাহা হউক জোশীর প্রবন্ধের নাম "অগ্নিবীণা"। তাহার চুম্বক তাঁহার নিজের জবানিতে নীচে দেওয়া গেল :

আচার্য্য ভাগবত

"বৎসরখানেক পূর্ব্বে স্থানীয় সংবাদপত্রে একটি ছোট অথচ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আমরা পাঠ করি। সংবাদটি এই যে, বাংলা ভাষার লোকপ্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের চিকিৎসার জন্য ভারত ও পাকিস্তান সরকার একযোগে সরকারী খরচায় তাঁহাকে বিদেশে পাঠাইয়াছেন। সংবাদপত্রে সাধারণতঃ আমরা রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক সংবাদাদি পড়ি এবং অনুরূপ সংবাদসমূহকে বিশেষ মর্য্যাদা দিয়া থাকি। সুতরাং কবির বিদেশ-যাত্রা বিষয়ক সংবাদটি সচরাচর কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার কথা নহে। কিন্তু যে সকল মুষ্টিমেয় লোক সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাকে জীবনে বড় স্থান দিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট কবির চিকিৎসাসম্পর্কীয় ব্যবস্থাটি বিশেষ মূল্যবান সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তদ্ব্যতীত আরও একটি কারণে এই সংবাদটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ঘটনাটিকে ভারত ও পাকিস্তান সরকারের একযোগে একমত হইয়া কাজ করিবার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বলা যায়। শুধু যে উভয় সরকার একমত হইয়াছেন তাহা নহে, তাঁহারা কবির চিকিৎসার্থে একযোগে অর্থসাহায্য করিয়াছেন। এই দুই প্রতিবেশী দেশের একত্র এই কাজ শান্তিকামী সকল লোকের নিকট বিশেষ মূল্যবান তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

জোশীজী লিখিতেছেন—"কবির ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমরা বেশী কিছু জানিতে পারি না। তিনি নিজে এ সম্বন্ধে কোথাও কিছু বলিয়াছেন বা লিখিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। কি করিয়া তাঁহার মধ্যে বাগ্‌দেবীর উন্মেষ হইল এ প্রশ্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, ঝড় কি করিয়া আসে এবং কোথা হইতে আসে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লাভ কি ?

"বাঙালীর নিকট কবির জীবন ও রচনা সম্বন্ধে আমার পক্ষে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু তথ্য আমি মরাঠীভাষী পাঠক-পাঠিকার নিকট উপস্থিত করিয়াছি সে সকল তথ্য আমি বাংলা পুস্তক পাঠ করিয়াই জানিয়াছি। অবাঙালী হইয়াও আমি কেন কবি নজরুলের কবিতার প্রতি আকৃষ্ট এবং তাহার গুণগ্রাহী হইলাম—তাহার ভাবরসের আস্বাদন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম সেই কথাই আমি বাঙালীর নিকট নিবেদন করি।

"প্রথমতঃ, নজরুলের কবিতার বীর্য্য, আবেগ এবং অনুপ্রাণনা আমাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে—তাহার পূর্ব্বে বাংলা কবিতায় এই রসাস্বাদন আমি পাই নই। দৃষ্টান্তস্বরূপ দু'একটি পংক্তি উল্লেখ করি :

"আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ"

এবং

"আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন
আমি স্রষ্টাসূদন শোকতাপহানা খেয়ালী বিধির
বক্ষ করিব ভিন্ন"—

এই সকল পংক্তি আমাদের মনে যে ভাব মুদ্রিত করে তাহা কখনও ভুলিবার নহে।

"দ্বিতীয়তঃ, দরিদ্র, পদদলিত, পীড়িত, দুর্গতদিগের প্রতি তাঁহার সুগভীর সমবেদনা এবং অকৃত্রিম প্রেম আমাকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করিয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দিই :

"নাই দানব,
নাই অসুর—
চাইনে সুর—
চাই মানব।"

"বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি। কবির উগ্র বিদ্রোহ-ভাবাবেশ উপশমিত হইলে তিনি বাংলাদেশের স্নিগ্ধ শ্যামল পল্লী-জীবনকে অবলম্বন করিয়া গীতি-কবিতা ও সঙ্গীত রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। সে সকল কবিতা ও গানে মাতৃভূমির প্রতি দরদ এবং তাহার শ্যামলশ্রীর চিত্র প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

"পরিশেষে আমি কেমন করিয়া এবং কেন কবি নজরুলের কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হইলাম সেই কথা বলিয়া প্রসঙ্গ শেষ করিব।

"কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দিল্লীতে একদিন আমার হাতে একখানি বাংলা কবিতার বই আসিল। কবির নাম দেখিলাম কাজী নজরুল ইসলাম। বাংলা ভাষায় মুসলমানের লিখিত কবিতার বই দেখিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম। মুসলমান হইয়া

কোনও ব্যক্তি উর্দু-ফার্সী প্রভৃতি ভাষা ব্যতীত অন্য কোনও ভাষায় সাহিত্য রচনা করে এ ধারণা আমার ছিল না। কোনও মুসলমান সাহিত্যিক, তিনি ভারতের যে-কোনও প্রদেশেরই হউন্ না কেন, কখনও দেশীয় ভাষাকে মাতৃভাষা রূপে গ্রহণ করেন নাই—সাহিত্য-রচনাকালে উর্দু-ফার্সী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, কোনও মুসলমানের পক্ষে ফার্সী-উর্দু ব্যতীত অন্য কোনও ভাষাকে মাতৃভাষা জ্ঞান করা এবং সেই ভাষায় সাহিত্য রচনা করা এক বাংলা ভাষাতেই সম্ভব হইয়াছে—ভারতবর্ষের আর কোনও ভাষায় হয় নাই। কেবলমাত্র কাজী নজরুল ইসলামই যে বাংলাকে মাতৃভাষা জ্ঞান করিয়া কবিতা-রচনা করতঃ বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন তাহা নহে—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, শত শত মুসলমান সাহিত্যিক বাংলা ভাষার উষাকাল হইতে ইহার পরিপুষ্টিসাধন করিয়া বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হইয়া আছেন এবং বর্ত্তমানে বহু প্রতিভাবান মুসলমান সাহিত্যিক বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিতেছেন।

"বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে যে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত মুসলমান আছেন, তাঁহারা সে সব প্রদেশের ভাষাকে নিজেদের মাতৃভাষা-রূপে বরণ করেন নাই এবং সে সব ভাষায় কোনও সাহিত্যরচনা করেন নাই। এই মহারাষ্ট্র প্রদেশে যে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতা-ভগিনী আছেন, তাঁহারা বাংলা দেশের মুসলমানদিগের এই অবিস্মরণীয় মহান্ কীর্ত্তির কথা স্মরণপূর্ব্বক মরাঠী ভাষাকে নিজেদের মাতৃভাষা মনে করিয়া তাহার সেবায় আত্মনিয়োগ করুন—এই নিবেদন জানাইয়া আমি আমার প্রবন্ধ শেষ করি।"

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই প্রবাসী বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীকে প্রাদেশিক ভাষা আবশ্যিক ভাবে শিখিতে হয়। এই সকল ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে কেহ কেহ যাহাতে বিশেষ ভাবে বাংলা ভাষা এবং প্রাদেশিক ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করে, সে সম্বন্ধে তাহাদের অভিভাবকগণের সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয়। উপরন্তু এই সকল ছাত্র-ছাত্রীকে বিশেষ বৃত্তি ও পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ এবং নিখিল-ভারত বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের করা কর্ত্তব্য—তাহা হইলে ছাত্রছাত্রীগণ প্রাদেশিক ভাষার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাও বিশেষভাবে শিখিবার প্রেরণা ও উৎসাহ পাইবে নিঃসন্দেহ। এই ব্যবস্থায় অন্তর-ভারতীর মূল আদর্শটি সফল হইবে এমন আশা করা অসঙ্গত নয়।

জাতিস্মর

শ্রীকৃষ্ণধন দে

জলধিমন্থনশেষে ক্লান্ততনু, নির্জ্জন সৈকতে
একা আমি। ভগ্নকটি দাবদগ্ধ মৈনাকপর্ব্বতে
তখনো উঠিছে ধূম। শ্লথ দেহ তটপ্রান্তে রাখি
লুটায় বাসুকি দূরে। গরলাক্ত ফেনপুঞ্জ মাখি
তখনো চঞ্চল সিন্ধু। সুরাসুর চলে গেছে দূরে
সকল বণ্টনশেষে। দূর হতে শুনি স্বর্গপুরে
বাজে উৎসবের বাঁশী। আমি ক্ষুদ্র দেব-অনুচর
লজ্জায় চাহি নি কিছু, পড়ে আছি সহি অনাদর
নির্জ্জন সিন্ধুর তটে। সম্মুখে রয়েছে মোর পড়ি
প্রবালের মালা কার, রূপোজ্জ্বলা কোন্-সে অপ্সরী
জলধিমন্থন হতে সদ্যোত্থিতা, যেতে স্বর্গপথে
ফেলে গেছে মালাখানি সায়াহ্নের ধূসর সৈকতে।

দেবতারা নিল যারে, তারে আমি দেব-অনুচর
কোথা পাব? তবু তার মুক্তানিভ কান্তি মনোহর
এখনো ভাসিছে চোখে। অম্লান যৌবন স্পন্দমান
ধরণীর প্রথম আলোকে। যেন সহি রূঢ় অপমান
অতল পাতাল হতে তন্দ্রাতুরা কোন্ নাগবধূকা
ছিন্ন করি আসিয়াছে দয়িতের বাসর-মালিকা
বিজয়ের পণ্যারূপে। কেশদাম ফেনাদ্র্দ মাখি
চঞ্চল সাগরবাতে। দুটি নীল স্বপ্নাতুর আঁখি
ক্ষণে ক্ষণে মুদে আসে আলোকের নিষ্ঠুর আঘাতে।
কম্পিত চরণ দুটি বালুকায় ধীরে ধীরে পাতে
শঙ্কিত পরশরেখা। রূপোজ্জ্বল সর্ব্ব অঙ্গ ভরি
কুণ্ঠিত লজ্জায় কাঁপে সদ্যস্ফুট যৌবন-মঞ্জরী।

তার পর গেল চলি বাসরের রত্নময় রথে
সে অপ্সরী। সঙ্গীহারা আমি শুধু সাগর-সৈকতে
রহিলাম মোহ-স্বপ্নে। কণ্ঠচ্যুত মালাখানি তার
ব্যথাতুর বক্ষে চাপি, পদচিহ্ন স্পর্শি বার বার
কহিনু অস্ফুট কণ্ঠে—হে অপ্সরী, তব রূপচ্ছবি
স্বর্গ আজ করেছে মুখর, তব নয়নের দ্যুতি
স্বর্গ আজ করেছে সুন্দর। হেথা কাটাই প্রহর
তব ধ্যানস্বপ্নে আমি। ক্ষুদ্র দেব-অনুচর,
এ কি অভিলাষ তার! অপরাধ ক্ষমা কর দেবি,
কেন ভাগ্য নহে মোর, তব অলক্তক-পদ সেবি।

সহসা শুনিনু কণ্ঠ—"মালা মোর দাও ফিরাইয়া,
সিন্ধুতটে আসিলাম সারা পথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া

বাসবের সভা হতে। ও যে মোর চির স্মৃতিডোর
সাগরিকা-জীবনের। দাও ভদ্র, মালাখানি মোর!"

চমকি' চাহিনু ফিরে। গোধূলির গৈরিক কিরণে
সমুজ্জ্বল বেলাভূমি। তারি মাঝে নূপুর-চরণে
দাঁড়ায়েছে সে অপ্সরী অপরূপ তনুভঙ্গিমায়।
একদিকে নীল সিন্ধু ফেনায়িত উদ্বেল-লীলায়,
অন্য দিকে শুভ্রতট। বারে বারে নীলাঞ্চল টানি
সলজ্জ ধরিত্রী যেন আবরিছে স্বর্ণতনুখানি।
আমি কহিলাম তারে—"মালা যদি চাও ফিরে নিতে,
আমারে কি দেবে বল? জীবনের মরুপথটিতে
কি লয়ে রহিব আমি? হে অপ্সরী, শোন নিবেদন,
লহ মালা, শুধু দাও ক্ষণতরে একটি চুম্বন।"

পশ্চাতে গর্জ্জিল বজ্র। চমকিয়া উঠিনু দু'জনে
সহসা বাসবে হেরি'। মোর প্রতি আরক্ত নয়নে
কহিল বাসব ক্রোধে—"ওরে ক্ষুদ্র দেব-অনুচর,
এতখানি স্পর্দ্ধা তব? দেবভোগ্য পুণ্য-কলেবর
স্পর্শিবারে এত আকিঞ্চন? লহ এই অভিশাপ,
মর্ত্ত্যের ধূলির মাঝে চিরদিন করিবে বিলাপ
তোমার মানসী লাগি। জন্ম হতে জন্মান্তর ধরি
জাতিস্মর হয়ে তুমি বৃথা খুঁজে মরিবে অপ্সরী।"

বাসব ফিরিয়া গেল। মালাখানি হাতে লয়ে তার
অপ্সরী চলিল সাথে। শুধু ম্লান দৃষ্টি বেদনার
আমারে জানাল—"আমি যুগে যুগে আসি অলক্ষিতে
রহিব তোমারি কাছে, শুধু মোরে পাবে না দেখিতে।"
ক্ষুব্ধ জলধির তটে তরঙ্গের অধীর উচ্ছ্বাসে
গাঢ় ছায়া মেলি সন্ধ্যা এল নামি আমার আকাশে।

অন্তহীন কালস্রোতে জন্ম হতে পশি জন্মান্তরে
এই ধরিত্রীর বুকে কত কল্প মন্বন্তর পরে
ভুলি নাই তারে আমি। আজো যবে বসন্ত-সন্ধ্যায়
কৃষ্ণচূড়াশাখা-ফাঁকে আধখানি চাঁদ দেখা যায়,
যেন কত দূর হতে, মনে হয়, সে এসেছে কাছে।
যেন তার স্বপ্নময় গাঢ় স্নিগ্ধ ছায়া পড়িয়াছে
আমারি বুকের 'পরে! সদ্য ফোটা অশোকমঞ্জরী
যেন সে দুলায়ে কেশে অভিসারিকার রূপ ধরি'
আমারি নিকটে আসে! তন্দ্রাহীন কত অর্দ্ধ রাতে
ছায়াপথ ছাড়ি আজো নামে সে আমারি আঙিনাতে
নূপুরশিঞ্জন তুলি! জ্যোছনায় দেবদারুবনে
আলোক-আঁধারে দ্রুত লুকায় সে চকিত চরণে
শুনি মোর পদধ্বনি! উপল-বিছানো গিরি-নদী
উচ্ছল চঞ্চল স্রোতে তাল দিয়ে যায় নিরবধি
তাহারি নূপুরসাথে! মেঘঘন শ্রাবণ-শর্ব্বরী
রূপরসশব্দগন্ধে দেয় সে পুলকছন্দে ভরি
তাহারি পরশ দিয়া! সন্ধ্যাতারা-দীপখানি জ্বালি
আমারি উদ্দেশে সে যে নিত্য আনে প্রেমের বৈকালী
ঝরা বকুলের পথে! তন্দ্রাঘোরে নিস্তব্ধ নিশীথে
পাই যে নিঃশ্বাস তার আমারি বুকের কাছটিতে!
উতল বৈশাখীঝড়ে সে যেন উড়ায়ে এলো চুল
কনক চাঁপার বনে ছুটে আসি ছুঁড়ে দেয় ফুল
আমারি চলার পথে! পত্রের মর্ম্মরধ্বনি মাঝে
চপল হাসিটি তার ঝিল্লীরবমুখরিত সাঁঝে
শুধু জাগে লীলাচ্ছলে! আমারি শিয়রে তন্দ্রাহারা
নীরবে রয় সে বসি, পূর্ব্বাকাশে যবে শুকতারা
ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে উষসীর পদপ্রান্ত চুমি,
শুনি যেন কণ্ঠ তার—"শুকতারা, কেন এলে তুমি?"

আমার অনন্ত তৃষ্ণা হে নিষ্ঠুর, যুগ যুগ ধরি'
রবে চিরতৃপ্তিহীন? আমার জীবন-মৃত্যু ভরি
তোমার অদেখা-রূপ অজানা-আভাসখানি দিয়া
অসহ আকাঙ্ক্ষা মোর দিকে দিকে দেবে প্রসারিয়া
ব্যর্থ মিলনের স্বপ্নে? ইন্দ্রিয়ের সর্ব্ব-অনুভূতি
তোমারে লভিতে আজো বার বার জানাবে আকুতি
জন্ম হতে জন্মান্তরে? ধরণীর রূপ-গন্ধ-সুর
চির অতৃপ্তির মাঝে আমারে কি করিবে বিধুর
বিরহ-ব্যথায় তব? এ প্রশ্নের দেবে না উত্তর
হে অ-ধরা? এই অভিশাপ বুকে রব জাতিস্মর?

গঙ্গোত্রী যমুনোত্রীর উৎস সন্ধানে

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

[এ তীর্থকাহিনী শ্রুতিলিখনের মাধ্যমে। অর্থাৎ, গঙ্গাজল দিয়ে আমি গঙ্গাপূজা সেরেছি।

যে গৃহী-সন্ন্যাসী মানুষটিকে (শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়) আমি আমার আধ্যাত্মিক শিক্ষার সবকিছু বলে মেনে নিয়েছি—তিনিই তীর্থ করেছেন, আমি নয়। তিনি বলে গেছেন—আমি লিখে গেছি। মাতৃমূর্তির কাঠামো তাঁরই দেওয়া—আমি তাতে রং ধরিয়েছি, ডাকের সাজ পরিয়েছি। মা আমার চিন্ময়ী হলেন কি না সে বিচার আমার নয়। কায়িক পরিশ্রমের ভিতর দিয়ে তীর্থ আমার হয় নি বটে—তবে লেখা শেষ করে ভেবেছি এ আমার ভ্রমণেরও অতিরিক্ত হয়েছে।

এই গৃহী-সন্ন্যাসীর আমি ছাড়া আরও একটি অনুচর আছে। সে এই ভ্রমণ ইতিহাসের শিল্পী সুশীল—আমার আবাল্য বন্ধু ও সখা। এও এঁকেছে ওঁর মুখ থেকে শুনে শুনে। এ কাহিনীতে এর প্রতিভার দান স্মরণীয়।

মনির সঙ্গে যেমন তার বিভা—সূর্য্যের সঙ্গে যেমন উত্তাপ, তেমনি এ কাহিনীর সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আমার লেখা বই—শ্রীশ্রীকেদারনাথ ও বদরীনাথ। ও বইয়ের শেষে যে ইঙ্গিত আছে তার সূত্র ধরেই এ দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা। পাঠকবর্গের অবগতির জন্যে এ বিজ্ঞপ্তির প্রয়োজন আছে।

—লেখক]

ডাক এল আবার।

গতবার ডাক এসেছিল কেদারনাথ ও বদরীকানাথ থেকে, সে ডাককে এড়ান যায় নি···বেরিয়ে পড়েছিলাম।

এবারেও ডাক এল তারও উত্তরের দুটি তুষারতীর্থ যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরী থেকে।

এ যেন নিশির ডাক : যাকে এড়ান যায় না—ওড়ান যায় না। আমি ত এরই জন্তে বসে ছিলাম···এরই জন্তে ত আমার প্রহর গোণা!

গত বৎসরের বদরীকার মন্দির প্রাঙ্গণের সেই বালক মহা-সাধুটির* কথা, যিনি বলেছিলেন—"গঙ্গোত্তরী জানেসে সব মিল জায়গা"। তীর্থ শেষ করে বাড়ী ফেরার পর ঐ কথাক'টি আমার জপের রুদ্রাক্ষ হয়েছিল—জানতাম সার্থক মুহূর্ত্তটি আমার আসবে—আর চাওয়ার বৃহৎ অঞ্জলির সন্ধান পাব ঐ গঙ্গোত্তরীর পরি-প্রেক্ষিতে···।

গত বারে বাধা এসেও বাধা আসে নি, বন্ধন এলেও তার গ্রন্থিগুলো ছিল আলগা। এবারেও যাত্রার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত অশরীরী আত্মার মত এল মায়া, কান্না ও অভিমান। বুঝলাম, এ হ'ল ছলনা—সঙ্কল্পের পথে ঝোড়ো হাওয়া।

কিন্তু···

ভাঁটায় এল অদৃশ্য জোয়ার। দেখলাম নোঙরের দড়ি ছিঁড়ে যাত্রার নৌকা ভেসে উঠল। পাল তুলে দিলাম আমি। এ পাল তুলে দেওয়ার তারিখ জুনের বাইশে—বাংলার এগারই বৈশাখ···।

তীর্থযাত্রীদের স্বীকৃতির ইতিহাসে এই প্রামাণিক সত্যিটাই বার বার ধরা পড়েছে যে যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরীর পথ বন্ধুর ও বিপৎ-সঙ্কুল। এ পথে তিতিক্ষার যোল আনা ব্যয় করা চাই, নতুবা স্বপ্ন দেখা বৃথা। সেই কারণে মনে মনে সঙ্গী চেয়েছিলাম, প্রয়োজন-বোধ করেছিলাম আমি ছাড়া অন্য কোন মানুষের সাহচর্য্য ও সখ্য। তাই যাত্রার আগে ডাক দিলাম চন্দননগরের সর্ব্বজনপরিচিত গত বৎসরের কেদারবদরীর সঙ্গী দাস মশাইকে। জানালাম, আপনি আসুন, আমি তৈরী। মোটঘাট আমার বাঁধা···আপনি ছাড়া যাবে কে? উত্তরে জানালেন—

"ঘোর অমাবস্যার রাত্রে সাইকেল থেকে পড়ে আচমকা হাত ভেঙেছেন। তিনি সাইকেলে চড়েন নি, সাইকেলই তাঁকে চড়েছে। ডাক্তারের মতে [illegible]ড়ো হাড় জুড়তে মাস দুই লাগবে। আপনি এগোন।"

---

* লেখকের "শ্রীশ্রীকেদারনাথ ও বদরীনাথ" দ্রষ্টব্য

সঙ্গী আমার জুটল না। তা না হোক, হয়ত বা যোগাযোগের অদৃশ্যলিপিতে এই সঙ্গীহীনতারই ইঙ্গিত আছে…।

এ পরীক্ষা। যাত্রারম্ভেই যার সুরু।

কলকাতা থেকে হরিদ্বার। পেরিয়ে গেল ধানবাদ—গয়া—কাশী। ইণ্টার ক্লাশে স্থান পেয়েছিলাম ভালই—যাত্রীর ভীড়ের মধ্যে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আর চলমান ষ্টেশনগুলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে দার্শনিকের মত একটু ভাববার অবকাশ পেয়েছিলাম। ঘর ছেড়ে এলাম, এতটুকু বাধল না—হাঁসের গায়ে জল লাগার মত সবই গেল ঝরে। কোথা থেকে কি ডাক এল ঘূর্ণীবায়ুর মত, শূন্যে সব বিলীন হয়ে গেল, না রইল তার থাকার অভিমান, না রইল তার শেকড়ের জোর, শুধু মাত্র উৎখাত হলাম, উৎক্ষিপ্ত হলাম। গত বৎসরে কেদার ও বদরীকার স্বর্ণাঞ্চল ছেড়ে আসার সময় কেমন যেন শূন্যতার অভিমান নিয়ে ফিরেছিলাম, সে অভিমান সবকিছু ফেলে আসার অভিমান, সব পেয়েও সেটি হারিয়ে আসার ক্ষোভ। নারায়ণই ত সব, সর্ব্বভূতের মালিক তিনি, আমার বুকের দীর্ঘনিশ্বাসটিও তিনি শুনেছিলেন—তা না হলে আমি আবার বেরুব কেন? গাড়ীর একটি কোণে বসে বসে জিজ্ঞাসুর মত জীবনকে তন্ন তন্ন করে বিচার করছিলাম—অনুসন্ধান করছিলাম এটা ওটা। ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পেরিয়ে যায়, চিন্তার ও দার্শনিক তত্ত্বের ছোট ছোট শহর এবং জনপদও পেরিয়ে যায় মনে মনে। সহযাত্রীদের কাছে গন্তব্যস্থলের খবর চেপে যাই, লক্ষ্যস্থলকে চেপে রাখি—যদি কেউ জুটে যায় বাধার মত, বোঝার মত। একাকিত্বকে মেনে নিয়েছি, শুধু মেনে নেওয়া নয়, তাকে ফুল-লতা-পাতা দিয়ে বরণও করেছি, তাই যাত্রীদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন কেমন যেন অর্থহীন হয়ে ওঠে। শুধু চেপে যাই আর এড়িয়ে যাই…।

জীবনের যাযাবর বৃত্তির মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের তীর্থের পর তীর্থ এসেছে আর গেছে—স্মৃতির মধ্যে তাদের রঙের ছোপ কতক লেগেছে, কতক লাগে নি। আসামের কামাখ্যা থেকে সুদূর কন্যাকুমারিকা—কাশ্মীরের তুষারতীর্থ অমরনাথ থেকে সৌরাষ্ট্রভূমির নীলাম্বুচুম্বিত সোমনাথের মন্দিরের শিবলিঙ্গ, একের পর এক—বহু থেকে সংখ্যাহীন, কিন্তু দেখার ভেতর একটা অব্যক্ত কান্নাই থেকে গেছে…অনুভূতির চোখ দুটো দিয়ে কান্না ত আসে নি কোন দিন। আর আসে নি বলেই পথ খুঁজে বেড়ান আর আত্মানুসন্ধানের আলেয়ায় মাথা খুঁড়ে মরা।

তার পর…।

খচ করে কাঁটা বেঁধার মত মনের অন্তস্তলে কি যেন বিঁধে গেল আর এটি কেদারনাথ ও বদরীনাথ ঘুরে আসার পরই। মরুভূমির ধু-ধুর মধ্যে কেমন যেন জলের ভিজে হাওয়ার স্পর্শ পেলাম। মনে হ'ল যাযাবর বৃত্তির ইতি হ'ল। ও দুটি তীর্থে মন্দির দেখতে দেখতে চোখে সুর্মা লাগার মত লেগে গেল সত্য শিব ও সুন্দরের অঞ্জন, যা মোছা যায় না। ফিরে এসে মনে করেছি জীবন আমার পুণ্য হ'ল, ধন্য হ'ল।

কিন্তু…

কিছু দিন যেতে না যেতেই সেই তৃষ্ণা, সেই হাহাকার। বিশ্বসংসার জোড়া সেই হাঁ করা শূন্যতা আর মরীচিকার ক্লান্তি। যে সম্পদকে অতলস্পর্শী বলে মনে করেছিলাম ফেরার পর, এক দিন দেখি তা নিঃশেষ হয়ে এসেছে। ভাবলাম অবাক হয়ে, এ আবার কি? এমনি করেই মাসের পর মাস, আর তা জুড়ে জুড়ে মালার মত একটি বৎসরের আবির্ভাব। কান্না বাড়ে—উষ্ণতায় সবকিছু যেন দাউ দাউ করে জ্বলে যায়।

তার পর আবার ডাক এল। আজকে দেরাদুন এক্সপ্রেসের একটি কামরায় সেই ডাকেরই আর এক পূর্ব্বানুবৃত্তি। আমি চললাম—পাল তুলে দিয়ে ভাসলাম আবার…।

হরিদ্বার। এ ত আমার দেখা। দাঁড়ান গেল না, কেননা সময় নেই—তার অপচয়ও বুকে বাজবে। সোজা বাস ষ্ট্যাণ্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়ান, একটি টিকিট কেনা, তারপরেই হৃষীকেশের উদ্দেশে উঠে বসা। ওখানে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা দশটা।

হৃষীকেশকে আমি প্রয়াগ বলব—কেননা দুটি মহত্তম তীর্থের যাত্রাপথের বাস্তব রূপের সার্থকতা এখান থেকেই। ওদিকে কেদার-বদরী, এদিকে যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরী। একটা বেছে নিলেই হ'ল। প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিল কুলী তথা বাহক সংগ্রহের ব্যাপারে, বিশেষতঃ যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরী তীর্থের কষ্টস্বীকারের প্রয়োজন আছে আর তার জন্যে হৃষীকেশে দু'এক দিন থাকা অপরিহার্য। শুনেছিলাম কালী কমলীওয়ালার ধর্ম্মশালার কাছাকাছি ওদের আড্ডা, তা ছাড়া আমাদের মত অর্ব্বাচীন তীর্থযাত্রীদের জন্যে মাথা গোঁজার স্থানও ওখানে—কাজেই মোটঘাট নিয়ে ওখানেই হাজির হওয়া গেল।

কিন্তু হাজির হওয়ামাত্র সেই সুরই বেজে উঠল তিনতলা ধর্ম্মশালার চৌকিদারের গলায়, যা কেদার-বদরীর পথে দেখ না দেখ শুনে শুনে কান এখনও ভোঁ ভোঁ হয়ে আছে। বললাম, "ঘর চাই।" বললে,—"ঘর নেই, ঘরের ছাদ পর্যন্ত 'বুক' হয়ে আছে, তবে কিনা পশ্চিম দিকের বত্রিশ নম্বর ঘর বরাবর এক ফালি বারান্দা এখনো পর্য্যন্ত বেওয়ারিস পড়ে আছে, ইচ্ছে করলে ওখানে মালপত্র রেখে থাকার অর্থাৎ রাত্রিবাসের আয়োজন করতে পারি।" তথাস্তু—যা আসে তাই লাভ…বিছানাপত্র ওখানেই রাখা হ'ল।

স্নানের দরকার আছে—তার পর খাওয়া অবশ্য যদি বরাতে জোটে বিনা রান্নায়। এক ছুটে চলে এলাম গঙ্গায়।

মা গঙ্গাকে দেখলাম বা দেখেছি যত জায়গায়, হৃষীকেশের গঙ্গাকে দেখা বুঝি বা সকলের সেরা! অবশ্য গঙ্গোত্তরীর অথবা গোমুখের দিকের গঙ্গাকে এখানে টেনে আনছি না, কেননা তার রূপ পুরোপুরি আধ্যাত্মিক রূপ, শাশ্বতের রূপ। এখানে গঙ্গাকে শহর বা জনপদের ধারে প্রবাহিণীরূপেই আখ্যাত করছে—এ দিক থেকে হৃষীকেশকে গরীয়সী বলব। কি যে অদ্ভুত প্রশান্তির ছায়া

গঙ্গার সারা অঞ্চলটি জুড়ে ছড়ান তা বলার নয়। মনে হয় এখানে একটি কুটীর বাঁধি—থেকে যাই চিরটা কাল। দিনান্তে শুধু একটি বেলার আহার, একটি রুদ্রাক্ষের মালা, দূরদিগন্তের পাহাড় আর ছলছলে গঙ্গার দিকে চেয়ে বসে থাকা·· আর কিছুর দরকার নেই এখানে। গোটা তীরভূমির ধারেই পাহাড়ের পরিক্রমণা আর তারই কোলে কোলে হৃষীকেশ শহরের নামমাত্র ইট-পাথরের অস্তিত্ব। গঙ্গার স্রোত আছে, তবে সে উচ্ছলা নয়, সে মৌন। স্নান সমাপনান্তে উপলখণ্ডের ওপর আসন পেতে বসে ছিলাম অনেকক্ষণ···ভাল লাগার এ যেন সম্পদ্‌বিশেষ।

ধর্ম্মশালায় প্রবেশের আগে এক বিপত্তি। দেখলাম ছোট্ট একটি সংসার—বৃদ্ধা, বৃদ্ধ ও একটি সতের-আঠার বছরের ছেলে চৌকীদারের ঘরের সামনে অত্যন্ত অসহায় ভাবে বসে আছে। মুখে চোখে সন্ত্রস্ত ভাব। তৎক্ষণাৎ বুঝলাম, সেই শাশ্বত সমস্যা, ঘর পায় নি ওরা। বাঙালী পরিবার সন্দেহ নেই। লক্ষ মানুষের মধ্যেও বাঙালী বাঙালীকে চেনে, এ গল্প হলেও সত্যি, তাই আমাদের কথাবার্ত্তা সুরু হতে বেশী দেরী হ'ল না। কিন্তু এখানেও বিপত্তি—একেবারে খাস চাটগাঁই, বুড়োর কথা তবুও বোঝা যায়, বুড়ীর ত একদম নয়! দু'জনের কথা শুনে ঠিক ঠিক উপলব্ধির আওতায় আনা ত নয়—এ ডন-বৈঠক দেওয়া! যা হোক, বুঝলাম ঘর দেয় নি চৌকীদার, বেমালুম হাঁকিয়ে দিয়েছে। এদের ঘর চাই—কেদার-বদরীর বাস ধরিয়ে দেওয়া চাই, টিকিট কিনিয়ে দেওয়া চাই আবার যাওয়াও চাই সঙ্গীহিসেবে। তখনই ভাঙলাম না যে ওদের পথ আমার পথ নয়। অনন্যোপায় হয়ে চৌকীদারের কাছে যাওয়া হ'ল আবার। তার পর সুরু হ'ল নানাবিধ খোসামোদ তথা অনুনয়-বিনয়। অবশেষে পাথরে চিড় খেল—চার জনের দল বলে বত্রিশ নম্বর ঘরটা সে দিয়েই দিল দু' দিনের জন্যে। অর্ব্বাচীন বারান্দা থেকে বিছানাপত্র এল এদের ঘরে, ওয়াই জোর করে আনালে। কোথা থেকে এদের উদয়—বারান্দা গেল পুঁছে, জুটে গেল চারটে দেয়াল আর একটা ছাদের আশ্রয়। যোগাযোগ আর কি! রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার ভারটাও বুড়ী নিল আমার—মনে হ'ল যেন মা অন্নপূর্ণা।

মনে মনে এমন একটি বাহকের কল্পনা করেছিলাম যার সঙ্গে সম্বন্ধ আমার আত্মিক হবে, তাকে দেখেই মনে হবে তার আসাটা যোগাযোগের আলা। সে আমার মত পঙ্গু মানুষের সকল দায়িত্ব, সকল ঝঞ্ঝাট মাথায় তুলে নেবে—আমার কোন ভাবনা থাকবে না। মনের অন্তস্তলে এ বিশ্বাসটি ছিল যে, সময়ের লগ্নে সে আসবেই···।

এসেও গেল। যেমন দুয়ে দুয়ে চার হয়, তেমনি করেই সে এল। ধরাসুগামী বাসের ষ্ট্যাণ্ডেই ওর সন্ধান পেলাম, যে টিকিট দিচ্ছে তার কাছে কথাটা পাড়তেই আমার আপাদমস্তক একবার

"আই উইল গো দেয়ার—বাট উইল নট রিটার্ণ"

সার্ভেয়ারী চোখে দেখে নিয়ে বললে, "চার পাঁচ বাজতক্ ইধার আ জানা, আচ্ছা আদমী হ্যায়, মিল্ জানা—।" বিকালে গেলাম। দেখলাম একটা তক্তপোষের কোণে চুপচাপ বসে আছে আর বাসের মালিক মোহন তাকে হাত-পা নেড়ে কি সব বোঝাচ্ছে। বয়স বড় জোর সতের কি আঠার, সুঠাম সুশ্রী চেহারা, ধবধবে পাজামা আর বেনিয়ান পরা—চোখে-মুখে বালকের ঢলঢলে মিষ্টি ভাব। নাম—ধরম সিং। পরিচয় করিয়ে দিল মোহন; উত্তর কাশীতে এর বাড়ী, এ অঞ্চলে এর মত সৎ ছেলে আর কেউ নেই। জাতিতে ব্রাহ্মণ—রান্নাবাড়ার কাজ সবই করবে। গোমুখ পর্য্যন্ত এ যাবে। আমাকে দেখে এক গাল হেসে প্রণাম করলে, যে প্রণাম আমার

ছেলে শঙ্করও করে, এত সোজা, এত প্রাণবন্ত। মনে মনে বুঝলাম সেই নরনারায়ণই এল, কোন ভুল নেই!

ফেরার মুখে দেখি বাজারের কাছে এক জটলা। ব্যাপার কি? না, একজন সাহেব। ভীড় ঠেলে ঢুকতেই দেখলাম অন্ততঃ পঞ্চাশ-ষাট জন পাহাড়ী লোক সাহেবকে ঘিরে ধরেছে—আর সাহেব হাত-পা নেড়ে কি সব বোঝাচ্ছে। আমার উপস্থিতি তার পক্ষে কতকটা কুল পাওয়া। হাত নেড়ে কাছে ডেকে বললে, "ডু ইউ নো ইংলিশ?" সম্মতিসূচক উত্তর পাওয়ার পর উপস্থিত বিপদের যে কাহিনী আমাকে বললে, তা কতকটা সংক্ষেপে এই:—সাহেবের কুলীর দরকার, যাবে কেদারনাথ। তার দরকার এক পিঠের মাল-পত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার মত বাহক, যার চল্লিশ টাকার থেকে বেশী নেওয়া কিছুতেই উচিত নয়। কুলীরা তাতে রাজী নয়। তাদের মতে সাহেব যা বলছে তা অবাস্তব।

সত্যিই ত। আমার কাছেও গোটা জিনিষটা কেমন যেন বেসুরো ঠেকে। সাহেব, সে বিষয়ে কোন ভুল নেই, আমাদের দেশীয়ও নয়। মনে হ'ল খাস ইউরোপীয়। কথায় ভাল রকম আসল সাদা চামড়ার প্রভাব আছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি—ইংরেজীতে, "তুমি সাহেব ফিরবে না?"

"আই উইল গো দেয়ার, বাট আই উইল নট রিটার্ণ।"

শুধু একবার নয়, বার বার সে একই কথার পুনরাবৃত্তি করে। কুলী চাই সেই রকম যে কেবলমাত্র কেদারনাথ পর্য্যন্তই যাবে, ফিরে আসবে সে একলা। দু' পিঠের ভাড়া চাওয়া কি ন্যায়সঙ্গত? সাহেবের দিকে ভাল করে তাকাই। বেশভূষার পারিপাট্য নেই, একমাথা তৈলবিহীন চুলের সমারোহ, চোখে যেন সুদূরের হাত-ছানি। যারা ভিড় করে ছিল তাদের সকলকে বোঝালাম প্রস্তাবের সারমর্ম। রাজী হ'ল না কেউই। না হওয়ারই ত কথা। সাহেবকে তাদের অস্বীকৃতির কথা জানিয়ে ভীড় থেকে সরে আসি। লোকটা বোধ হয় পাগল—তবে কিসে পাগল তারই একটা অদ্ভুত প্রশ্ন মনের ভেতর ঘোরাফেরা করতে থাকে। চিন্তা করতে করতে ধর্ম্মশালায় ফিরে আসি।

সকাল হ'ল হৃষীকেশে, এখানে আসার দ্বিতীয় দিনের সুরু। ধরম সিংকে বলা ছিল যে, তুমি সকাল পাঁচটার ভেতর ধর্ম্মশালায় এসে বিছানাপত্র বেঁধেছেঁদে তৈরী হয়ে নিও। যা বলা সেই কাজ। গঙ্গার ধার বরাবর পাহাড়গুলোর ওপর সূর্য্যের ক্ষীণতম আলো ফুটে ওঠবার আগেই ধরম সিং হাজির। দেখলাম, তার স্নান শেষ, কাপড় জামা বদলান শেষ—শুচিতার পূর্ণকুম্ভ হয়েই তার আসা। সকাল-বেলায় তাঁর শুভ্র মূর্ত্তিটি বড় ভাল লাগে আমার। বললাম, "কি রে, তৈরী?" সেই হাসি, হাত জোড় করে শুধু বললে, "জি মহারাজ।"

একটি ছোট্ট বিছানা বগলদাবায়, হাতে একটা লোটা আর একটা লাঠি, যমুনোত্তরী-গঙ্গোত্তরীর বাহক আমার তৈরী। বললাম, "তোর বিছানার সঙ্গে আমার বিছানাটা বেঁধে নে।"

ধর্ম্মশালা থেকে বিদায় নিলাম সেই চট্টলবাসী মানুষ তিনটির কাছ থেকে। একটি করুণ মুহূর্ত্তে ভিজে চোখের বিদায় এ। দুটি দিনের সঙ্গ লাভ, অথচ কত কাছে এসে যাওয়া, কত সুখদুঃখের অংশ ভোগ। বুড়ী ত কেঁদেই অস্থির। জানিয়ে দিলেন, গত জন্মে আমি যে তাঁর গর্ভে ছিলাম সে বিষয়ে কোন ভুল নেই। স্থির হয়ে শুনি, মাতৃ আশীর্ব্বাদে ঘন হয়ে উঠি। চলতে হবে আমায়, ফেলে যেতে হবে এদের, ধরম সিংকে বলি, "চল্ রে—"

ধরাসুর বাস ছাড়ল সকাল সাড়ে ছ'টায়। আশী মাইল পথ, টিহিরী হয়ে যাবে, পৌঁছবে সেই বিকেল পাঁচটায়। বাস ষ্ট্যাণ্ডে বিদায় জানিয়ে গেল অর্ব্বাচীন কয়েকটি গাড়োয়ালী লোক—আমাকে নয়, ধরম সিংকে। আমাকে তাদের একান্ত অনুরোধ যে আমি যেন ধরম সিংকে দেখি, কেননা সে বাচ্চা। এ রাস্তায় বাহক হিসেবে তার প্রথম যাওয়া, বিচক্ষণতাহীন, অভিজ্ঞতাহীন অবোধ শিশুই ও—আমি যেন সব মানিয়ে নি। বললাম, "আচ্ছা—।"

দেবপ্রয়াগগামী বাসের ষ্ট্যাণ্ডে আসমুদ্র হিমাচলের লোক—কে উঠবে আগে, কে পড়ে থাকবে পেছনে—তারই প্রতিযোগিতা। লোক বেশী, বাস কম। কিন্তু আমাদের বাস যখন ছাড়ল তখন দেখা গেল ভীড়ও নেই, হৈ-চৈও নেই, গোণাগুণ্‌তি আমরা একুশ জন যাত্রী। বাঙালী বলতে আমিই। বাদ বাকীর মধ্যে সংখ্যা-গুরু যোধপুরী। এরা সকলেই যমুনোত্তরী-গঙ্গোত্তরীর যাত্রী. উত্তর কাশী বা ধরাসুরে স্থায়ী বাসিন্দা কেউই নয়, একটু আত্ম-প্রসাদ জাগল যে বাংলা দেশের কোন মানুষ আমার যাত্রাপথের দিকে চেয়ে নেই বা লভ্যাংশের দাবী কেউই করবে না।

হৃষীকেশ ছাড়িয়ে যে পাঁচ মাইলের পথ—সে পথ যন্ত্রযানকে থোড়াই 'কেয়ার' করে। কিন্তু তার পর পথের আর কোন কৃতিত্ব নেই—অসমান, বন্ধুর ও প্রস্তরসমাকীর্ণ। ষ্টীয়ারীংগুলোর ওপর চালকের হাতদুটো চেপে বসে যায়। দশ মাইলের মাথায় নরেন্দ্র-নগর। ছোট্ট শহরটি—সমৃদ্ধির দাবী রাখে। পাহাড়ের ওপরই এখানকার রাজাসাহেবের অনুপম প্রাসাদ—দূর থেকে বড় ভাল লাগে দেখতে। বাস এখানে দম নেবে, জিরুবে, টিহিরী থেকে হৃষীকেশগামী বাস না আসা পর্য্যন্ত এর ছাড়ার হুকুম নেই, কেনন একমুখো রাস্তা। গরম গরম চা খাওয়া গেল এখানে—ধরম সি বললে, "চা সে খায় না, চা কি জিনিষ তা সে জানেই না। কিছু ক্ষণ পর পাহাড় থেকে ধস নেমে আসার মত এসে গেল হৃষীকেশ গামী যাত্রীবাস, আমাদেরটা মুক্তি পেল, সুরু হ'ল যাত্রা।

অবাস্তবতার ভেতরেও বাস্তব, সাহারার ভেতরও জোলো হাওয়া। একটি বছরখানেকের শিশু সহযাত্রিণী আহমদাবাদী মায়ে কোলে অঘোরে ঘুমুচ্ছে, ছোট্ট ধবধবে একটি কচি মুখ, দুটি চো সুপ্তির ভারে বোজা—এও যমুনোত্তরী-গঙ্গোত্তরীর যাত্রী, এও যা যাবে না। ভাবছিলাম কি অশেষ ভাগ্যবান এ 'শিশু এশিয়াটি কি অপার করুণার সম্ভাবনায় এ সমুজ্জ্বল। মায়ের কোলে কোলে বাপের বুকে বুকে এও চড়াই উঠবে, উৎরাই ডিঙোবে—দুটি মা

তীর্থের আশীর্ব্বাদ পাওয়া যায় জীবনের প্রথম বৎসর থেকেই সুরু। আরও ভাবছিলাম সহযাত্রী ও শিশুটির বাবা-মায়ের কথা, পুণ্য-সঞ্চয়ের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার স্রোতে তাদের জীবনের বৃহত্তম ভবিষ্যৎকে ভাসিয়ে দেয় নি, তারা তাকে বুকের উষ্ণতার ভেতর বহন করেই নিয়ে চলেছে···কি মহান্, কি তিতিক্ষাপূর্ণ। শুধুমাত্র জিজ্ঞাসা করেছিলাম বাসে বসে বসে—"তোমরা পারবে একে নিয়ে যেতে ?" বাসের শূন্য গবাক্ষপথ দিয়ে কল্যাণী মা সুদূর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে—"গঙ্গামাই জান্‌তা হ্যঁ—।"

কি একটা জায়গা, নাম মনে নেই নরেন্দ্রনগর ও নাগিনা ছাড়িয়ে আরও বার-তের মাইল দূরে বাস একটা পাহাড়ের খাদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেল। শোনা গেল, খাদের পাশ দিয়ে পথ খারাপ, আগেভাগে দেখে নেওয়া দরকার। দু'পাশেই ঝুরে। পাহাড়—পাথর পড়াটা এখানে হামেশাই। গাড়ী এই পথ পেরিয়ে যাওয়ার আগে পথকে অনুসন্ধানের পর্য্যায়ে আনা চাই, নচেৎ বিপদের ষোল আনা সম্ভাবনা। ড্রাইভার গাড়ী থেকে নেমে গেল, পড়া পাথরগুলোর ওপর পা দিয়ে দিয়ে তাদের স্থিতিকে পরখ করে নিল—একবার পাহাড়-গুলোর দিকে তাকিয়ে কি সব ভাবলে, তার পর আবার গাড়ীতে উঠে এসে ষ্টার্ট দিল।

ওপরের পাহাড় থেকে যে গোটা দশ-বার আধমণী পাথর যে এই মুহূর্ত্তটুকুর জন্যে ওৎ পেতে বসে ছিল তা কে জানত ? বাস যেই চলতে সুরু করা, আর কোথাও কিছু নেই দম্ দম্ করে অকৃপণ ভাবে পাথরের চাঁই ছাদের ওপর পড়তে সুরু করল···গড় গড় করে এক একবার অদ্ভুত শব্দ হয় আর বুলেটের মত ছুটে আসে এক এক খানি পাথর, সে কি আওয়াজ, মনে হ'ল বিদঘুটে এক 'অরকেষ্ট্রা' সুরু হ'ল। গাড়ীর ভেতর যাত্রীদের সে কি দাপাদাপি, সে কি হৈ-চৈ! এ কাণ্ড বড় জোর পাঁচ মিনিট, তার পরেই সব চুপচাপ—কিন্তু এ এক প্রচণ্ড রকমের ভূমিকম্পের সম্মুখীন হওয়া। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টির গল্প শোনা ছিল, কিন্তু পাথরের পুষ্পবৃষ্টির গল্প শোনা ছিল না। বাসের ছাদ গেল তুবড়ে, কিন্তু ফুটো হ'ল না। হুড়োহুড়ি করে বেরুনোর ফলে কারুর ছিঁড়ল হাত-মুখের চামড়া, কারুর ছিঁড়ল দাড়ী অথবা পাগড়ী। আমি, ধরম সিং আর সেই আহমদাবাদী দম্পতি বেরুই নি, ভাগ্যকে শিখণ্ডী করে বসে ছিলাম। মানুষ আহত হ'ল না বটে, কিন্তু গাড়ীর ছাদটা গুরুতর রূপে জখম হ'ল, যার দুঃখ ড্রাইভারটি ধরাসু পর্য্যন্ত করতে করতে গেছে। অদ্ভুত কাণ্ড, চিরকাল মনে থাকবে।

টিহিরী ঢুকল না বাস, কাছ দিয়েই অন্যপথ ধরলে। পার্ব্বত্য পথ, দেবপ্রয়াগের কিম্বা শ্রীনগর থেকে পাউরীর রাস্তার মত ভাল নয়। এক জায়গায় ড্রাইভার গাড়ী থামিয়ে তৃষ্ণার্ত্ত যাত্রীদের 'ইউ-কালিপটাসের' পাতা খাওয়ালে, ঝাল ঝাল, মিষ্টি মিষ্টি, কিন্তু তৃষ্ণা ঘোচে, জলের দরকার হয় না। ধরাসুতে বাস পৌঁছল বিকেল সাড়ে পাঁচটায়—নির্দ্ধারিত সময়ের আধ ঘণ্টা দেরী, আর এই দেরীটুকুর জন্যে সেই আধমণী পাথরগুলোই দায়ী।

ধরাসুর পথে
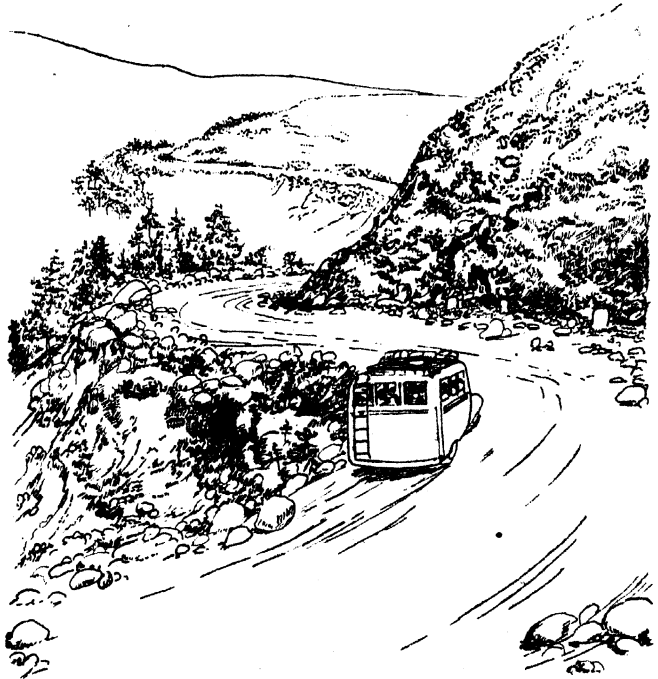
এখানে গঙ্গাকে দেখা গেল আবার। এর কিছু দূরেই কালী-কমলীওয়ালার ধর্ম্মশালা, বাস থেকে নেমেই আগে আস্তানার সন্ধান, তার পর অন্য কিছু। সান্ত্বনা এই যে গোণাগুণতি যাত্রী, পুণ্য-লোভাতুরদের ভীড় নেই অযথা। মোটরের রাস্তাটা যেখানে এসে শেষ হয়েছে তার বেশ নীচুতেই ধর্ম্মশালা, যার দোতলার ছাদ রাস্তার সমান্তরালে এসে ঠেকেছে। রাস্তা থেকে নীচুমুখো সিঁড়ি, এই সিঁড়ি বেয়ে ধর্ম্মশালার আওতায় আসা গেল। ঢুকতেই বিস্ময়, বাংলা দেশের কথা হুঁৎ করে মনে এসে যায়। ধর্ম্মশালার দুয়ারের সামনেই দুটি পাশাপাশি গাছ—একটি অশ্বত্থ, অন্যটি বট।

প্রথম গাছের তলাতেই চেয়ার-টেবিল পেতে ডাক্তারবাবু বসে, এখানে 'ইনকুলেশনের' ব্যবস্থা। ঝামেলা কাটিয়ে ওপরে উঠে গেলাম। পর পর তিনটি ঘর, মধ্যের ঘরটা দখল করা গেল। ধরম সিংও পিছুপিছু এসে হাজির। দু'মিনিট কি তিন মিনিট, একটি পঞ্জাবী দম্পতির আগমন ও বিনা বাক্যব্যয়ে তাদের বিছানা পাতা —ধরম সিং এসেই বিছানা খুলে দিয়েছিল, এদেরটা নিয়ে হ'ল তিন। চার জনের দাবী নিয়ে কেউ এল না, বেশীর ভাগ বারান্দাকেই পছন্দ করল। আহমদাবাদী দম্পতিও তাই।

উপন্যাসের আগে যেমন ভূমিকা, ফুল ফোটার আগে যেমন কুঁড়ির উদ্গম—তেমনি ধরাসুই যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরীর যাত্রা-পথের ভূমিকা। ওদিকে রুদ্রপ্রয়াগের পর মন্দাকিনীর স্রোত বরাবর কেদারনাথের পথের সুরু, অলকানন্দার পাশে পাশে যেমন বদরী বিশালের পথ—তেমনি এদিকে ধরাসুর পর যমুনাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যমুনোত্তরীর আর গঙ্গার ধারে ধারে গঙ্গোত্তরী ও গোমুখের ঐতিহাসিক পথের রেখা। এ দুটি তীর্থই দুর্গম, তবে যমুনোত্তরী এখনও দুর্গমতার দিক থেকে নিঃসন্দেহে প্রাগৈতিহাসিক হয়ে আছে। গঙ্গোত্তরী ও গোমুখকে তার পরে আমি স্থান দেব। যমুনোত্তরী কেদারবদরী পথের থেকে শতগুণে ভয়াবহ—তীর্থযাত্রীর যেখানে তিতিক্ষার শেষ কণাটুকু বিলোতে হয়।

ঘর থেকে যখন বেরিয়েছিলাম তখন মা ভবতারিণীর কাছে কি যে চেয়েছিলাম তা আজও জানি না। তিনি ঘরে রাখতে চান নি, তাই ত আমার এমনি করে বার হওয়া। মানুষের ডাক তিনি কান পেতে শোনেন, যদি সে ডাক ডাকের মত হয়। জড় জগতের জড়ত্ব থেকে যদি মুক্তিই ব্যক্তিবিশেষের চাওয়া হয়ে থাকে, তবে সে চাওয়ার অঞ্জলি সার্থক হয়ে ভরে ওঠে, সে বিষয়ে ভুল নেই। এ পথে আসা আমার পাহাড় দেখা নয়, কাব্য করা নয়, পরিব্রাজক হিসেবে পথের মূলধন ইতিহাসের জন্যে তুলে রাখাও নয়—এ পথে আসা আমার মুক্তির সন্ধানে। আমি চেয়েছিলাম যদি সুকৃতির জোর থাকে, যদি বিশ্বাসের ভেতর ধ্যানের জ্যোতির্ময় মূর্ত্তিকে কাম্য বলে মনে করে থাকি—তা হলে যা আমার চাওয়ার তা আসবে। আজকে বলতে বাধা নেই যে, আমি তা পেয়েছি। আর এই পাওয়া যমুনোত্তরীর পথেই।

অবিশ্বাস আর নাস্তিকতাবাদের অন্ধকারে মাথা খুঁড়ে মরা যাদের কাজ, রোজনামচার গতানুগতিকতায় যাদের মেরুদণ্ড বেঁকে দুমড়ে গেছে—তাদের কাছে আমার এই পথের কাহিনী অর্থহীন, মূল্যহীন, ব্যঞ্জনাহীন। বিশেষতঃ যমুনোত্তরীর পথে আমি কি পেয়েছি তার মূল্য সেই মানুষদের জন্যে নয় যাদের সকলই দেউলে হয়ে গেছে। এ কাহিনী তাঁদেরই জন্যে, যাঁরা আধ্যাত্মিক সঞ্চয়ে বিশ্বাসী। আমার সবকিছু তাঁদেরই জন্যে, যাদের মনের মন্দিরে ফুল-বিল্বপত্রের অঞ্জলি পড়ে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে।

ভাগীরথী-লাঞ্ছিতা ধরাসুর থেকেই এই রহস্যাবৃত অঞ্চলের অবগুণ্ঠন উন্মোচনের প্রথম অঙ্কের সুরু। এখানে এসে পৌঁছান থেকে যমুনোত্তরীর মন্দির পর্য্যন্ত আবার সেখান থেকে নেমে উত্তর-কাশী হয়ে গঙ্গোত্তরী ও গোমুখ পর্য্যন্ত এখন মনে মনে ভাবি, সবই যেন একটি সুতোয় গাঁথা ছিল। এ গাঁথা আমারই জন্যে কি অপর কোন ভবিষ্যৎ পরিব্রাজকের জন্যে তার হিসেব এখানে নয়, তবে শুধু এইটুকুই বার বার মনে হয়েছে যে যা ঘটেছে তা শুধু ঘটবার জন্যেই তৈরী হয়ে ছিল। যার বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ নেই, তর্ক দিয়ে যার বিচার চলে না এমন এক একটি ঘটনা ঘটে গেছে যা বুঝলে জ্ঞান থাকে না, উন্মাদ হয়ে ছুটোছুটি করতে হয়। যমুনোত্তরী রহস্যতম অঞ্চল—গুরুবলের অভাব না ঘটলে বড় বড় হীরের খনির সন্ধান মেলে এখানে। এতটা আমার জানা ছিল না, এতটা আমি ভাবি নি। কেদারনাথ ও বদরীনাথ অঞ্চল থেকে সম্পদ আমি আহরণ করে এনেছিলাম সত্যি, কিন্তু যমুনোত্তরী তীর্থ থেকে যে জিনিষ আমি পেয়েছি তার তুলনা নেই, তার তুলনা হয় না। এ পথের অদ্ভুত নির্জ্জনতা ও অদ্ভুত দুর্গম পথের মধ্যে কি যে নেই আর কি যে আছে তার প্রামাণিক হিসেব আমার কাছে স্তব্ধ হয়ে আছে বা থাকবে। এক একটি ঘটনা নীহারিকাপুঞ্জের মত নিস্তব্ধ ও নিথর হয়ে আছে এখানকার দিগন্তব্যাপী নিরাভরণতার মধ্যে যার তুলনা জীবনভোর খুঁজে বেড়ালেও পাওয়া যায় না।

ধরম সিং বিছানা পেতে দিয়ে গেল, কাপড় জামা না ছেড়েই শুয়ে পড়লাম একটু, বলে গেল, "রান্নাবাড়ার জোগাড় করি গে।" সামনের দরজাটা খোলা, ওদিকের বারান্দায় যাত্রীদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি—সন্ধ্যা হব হব। পঞ্জাবী দম্পতি তলায় চলে গেছে আহার্য্যের সন্ধানে, ঘরে কেবল আমিই একা। চত্বরের সামনের বটগাছটার একটি ডাল বারান্দার সামনে দোল খাচ্ছিল। চোখ বুঁজে পড়েছিলাম আর ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত নানারকম ভাবনা মস্তিষ্কের ভেতর পাক খাচ্ছিল। দু'এক ফার্লং দূরেই গঙ্গা প্রবাহিণী, তার আওয়াজ আমি শুনতে পাচ্ছি, ভারি সুন্দর আওয়াজটি। ভাবছিলাম, এই ত এসে গেলাম, কলকাতা থেকে হরিদ্বার, হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশ, আর হৃষীকেশ থেকে ধরাসু। যাত্রা-ইতিহাসের প্রথম পরিচ্ছেদ আজকেই শেষ; ধরাসু এসে গেলাম। কাল থেকে সূর্য্য উঠার আগেই সুরু হবে পায়ে হাটার পথ, আটচল্লিশ মাইলের দুর্গমতম পরিচ্ছেদের যেখান থেকে সুরু। কামনা করেছিলাম সঙ্গীর। পাই নি। ধরম সিং এসে সঙ্গী ও বাহকের অভাব দুটোই পূরণ করে দিয়েছে। কোথা থেকে কি ভাবে যে সে এসেছে তার বিচার-বিশ্লেষণ আমি করি নি, আমি পেয়েছি এইটুকুই সত্যি।

ভাবছিলাম, মায়ের ইচ্ছে কি, সন্তানকে তিনি কি ভাবে পথ দেখাবেন, কি ভাবে আলো দেখাবেন? তাঁকে বুকের পাঁজরার ভেতর আষ্টেপিষ্টে বেঁধে নিয়ে এসেছি, এ নিয়ে আসা কি ব্যর্থ হবে? বিয়াল্লিশটা বৎসরের জীবন-ইতিহাসের পাতায় পাতায় যে খুদকুঁড়ো জমিয়েছি—রাজরাজেশ্বরী মা আমার কি তা নেবেন না? বহুক্ষেত্রে তিনি নিয়েছেন, আবার ফিরিয়েও দিয়েছেন। আজকে

সন্ধ্যার প্রাগন্ধকারের কুহেলিকায় এই কথাটাই ভাবতে ভাবতে চিন্তা হ'ল যে কোন এক অদৃশ্য পাপের ভারে আজকের আসার ভারসাম্যের দড়িটা না ছিঁড়ে যায়। সিদ্ধযোগী মহাপুরুষদের আবাস-স্থল, তাপস ও সাধকদের লীলাভূমি এই যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরী, তাঁদের দেখা যদি না পাই, আমার মাথার উপর হাত রেখে এ মরসংসার থেকে যদি মুক্তির আশীর্ব্বাদটুকু না করেন, তা হলে আমার আসাই বা কেন, পথ চলাই বা কেন? হঠাৎ আমার কান্না এল এই ভেবে যে সেই ব্যর্থতার আঘাত আর লাঞ্ছনা যদি মা আমার এনে দেন, তা হলে আমি বোধ হয় বাঁচব না, খানচুর হয়ে ভেঙে যাব।

হঠাৎ···

একটা ভারী গলার আওয়াজ—"এ পাগলা, চললি?"

চোখ দুটো বোঁজাই ছিল, ধড়মড়িয়ে উঠলাম। দেখি খোলা দরজাটার দুটো কপাটের উপর হাত রেখে একটা অদ্ভুত পাগলা-গোচের লোক। খালি গা, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল একমাথা, ছেঁড়া একটা কুর্ত্তা পরা, দুটো পায়ে দুটো পট্টি। হা-হা করে হাসল একবার, তারপর আর একবার ঐ কথাক'টির পূর্ব্বানুবৃত্তি—"এ পাগলা, চললি?" কথাটা এত স্পষ্ট, এত নগ্ন যে, গোটা ঘরটায় তাই যেন ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারপর দেখলাম, আর কোন কথা না বলে ও বারান্দা থেকে একটি মহিলাযাত্রীর কাছ থেকে কি যেন নিল, সম্ভবতঃ কোন খাদ্যবস্তু, তারপর মাথাটা রেলিঙের উপর দিয়ে ঝুঁকিয়ে আমার দিকে একবার তাকিয়ে সিঁড়িটা দিয়ে হন্-হন্ করে নেমে চলে গেল।

পাঁচ মিনিটেরই ব্যাপার, তার অন্তর্দ্ধানের পর আমার হুঁস হ'ল যেন আমি সম্বিৎ ফিরে পেলাম। মুহূর্ত্তে বুঝলাম, এ লোকটা অনন্যসাধারণ তথা অসাধারণ হতে পারে, আবার পাগলাও হতে পারে। "এ পাগলা, চললি?" কথাটায় মন কেমন যেন ঘুলিয়ে উঠল। ধরাসু থেকেই কি সুরু হ'ল? এত তাড়াতাড়ি, এত আকস্মিক? চিনতে পারলাম না বোধ হয়, ধরতেও পারলাম না হয়ত। ইলেকট্রিক শক খেয়ে গেলাম যেন। ধরম সিং ততক্ষণে রুটি, ডাল এনে হাজির। বললাম, "তুই রেখে দে, আমি একটু ঘুরে আসি।"

অবোধের মত জিজ্ঞাসা সুরু করি ধর্ম্মশালার তলাকার দোকান-গুলোর লোকজনকে, আশে-পাশের মানুষগুলোকে। তাঁর শরীরের বর্ণনা দি, বেশভূষার তথ্য জানাই, বলি, এই রকম চেহারা, এই রকম তার কথাবার্ত্তা। তারা ঘাড় নাড়ে—বুঝি, জানে না। এক ছুটে চলে আসি গঙ্গার ধারটায়···নির্জ্জনতার একটা প্রকাণ্ড ঘেরা-টোপ দিয়ে ঢাকা সমগ্র উপকূলভাগ, আশেপাশের পাহাড়-পর্ব্বত, চারিদিক যেন ঝাঁ ঝাঁ করছে। খুঁজে বেড়াই ছিন্নভিন্না রোগীর মত, কিন্তু কোথায় কে? তিনি চলে গেছেন, কর্পূরের মত উবে গেছেন···।

যোগাযোগের প্রথম পাতা এটি। বুঝলাম সুরুতেই যার সম্পদ, না জানি যমুনোত্তরীর গর্ভে কি আছে। জানলাম মহামায়ার অদৃশ্য খেলার প্রথম দৃশ্যটি এই ধরাসু থেকেই সুরু।

ভোর পাঁচটায় যাত্রা। ধরম সিং পিঠের উপর বিছানাটাকে মোক্ষমভাবে বেঁধে নিল, আমি নিলাম লাঠি, ছাতা আর কাঁধে বার্ম্মিজ ব্যাগ। সেই অনামী পরিবারটি অর্থাৎ বীরবলের সংসার আমার আগেই রওনা হয়ে গিয়েছিল—আমি হলাম দ্বিতীয়।

কুমারীর সীমন্তের মত উত্তর-পূর্ব্বকে লক্ষ্য করে একটি সরু রাস্তা গঙ্গার ধারে ধারে উত্তর-কাশীর দিকে চলে গেছে। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর একটি ঝর্ণার স্রোতধারার উপর স্থানীয় পূর্ত্ত-বিভাগের তরফ থেকে পুল তৈরী করার প্রয়াস চোখে পড়ল, এটি সম্পূর্ণ হলে উত্তর-কাশী পর্য্যন্ত টানা মোটরের রাস্তা তৈরী করার আয়োজনও সুরু হবে। প্রথমে সমতলভূমি, তারপরই ঐ সরু রাস্তাটা ধাপে ধাপে চড়াইয়ের উপর উঠে গেছে। প্রায় এক মাইল এমনি করেই উঠে যাওয়া, তারপরই বাঁ-দিকে রাস্তা চলে গেছে, যে রাস্তায় বার্ত্তাফলকের উপর বিজ্ঞপ্তি—"রোড টু যমুনোত্তরী।"

একটি মাত্র বাঁক, তারপরই গঙ্গা অদৃশ্য হয়ে গেল—তার উচ্ছ্বাসও শোনা গেল না, প্রকৃতপক্ষে যমুনোত্তরীর পথ এখান থেকেই সুরু।

আর সুরুতেই পাইনগাছের সমারোহ, শ্রেণীবদ্ধ পাহাড়গুলোর উপর প্রত্যেকটি অংশেই যার আধিপত্য। মনে হ'ল, গবর্ণমেণ্টের 'রিজার্ভ ফরেষ্টের' ভেতর ঢুকে পড়লাম। আর সত্যিই তাই, একটি বিরাট পাইনগাছের কাণ্ডের উপর বিজ্ঞপ্তি—"নো স্মোকিং—রিজার্ভ ফরেষ্ট।" চার মাইলের মাথায় কল্যাণী পেরিয়ে গেলাম, দুটি মাত্র চায়ের দোকানের অস্তিত্ব—লোকালয়হীন। চলছিলাম একা, বড় ভাল লেগেছিল চলতে: ধ্যান আসে, যদি সদ্গুরুর দেওয়া মন্ত্র থাকে। বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত্তে ব্যক্তিকেন্দ্রিক একাকিত্বটা সম্পদ হয়ে উঠে আর তা বোঝা যায় এই সব পথে যার সবটুকুই অসীমের হাতছানিতে সমৃদ্ধ।

বেশ চলছিলাম আপন মনে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে, হঠাৎ সামনে দেখি জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত পায়ে চলার রাস্তাটা আচমকা কোথায় হারিয়ে গেল। ব্যাপার কি? উঁকি মেরে দেখি, পথ আছে, তবে সে অসূর্য্যম্পশ্যা···এ পাশে হাঁ করা খাদ, ওপাশে পাহাড়ের একটা খাড়াই পাঁচিল, তার পাশ দিয়ে আধবিঘৎ পরিমাণ প্রস্থ রাস্তা, পিছু হটে আসার উপায় নেই, ওর উপর দিয়ে খাদ পেরিয়ে এক ফার্লং দূরের চওড়া রাস্তায় গিয়ে উঠতেই হবে। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। মনে হ'ল ধরম সিং আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করি, তারপর মনে হ'ল বীরবলের মা, বৌ, ছেলে যখন এ রাস্তা পেরুতে পারে তখন আমিই বা পড়ে থাকি কেন? লাঠিটা শক্ত করে চেপে ধরি, নিশ্বাসটাকে ভাল করে টেনে নি, তারপর ঐ আধবিঘৎ রাস্তায় উঠে পড়ি। আর কপালের উপর লেগে গেল এইটুকু রাস্তা পেরুতে।

হিমসিম খেয়ে রাস্তার এ দিকে আসতেই দেখি, একটা পাথরের উপর উবু হয়ে বসে আছে একটি সাধুগোছের মানুষ, যাঁর দৃষ্টি আমার উপর সম্পূর্ণভাবে নিবদ্ধ। চুল দাড়ি ত আছেই, বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দেখলাম গলাটা সাধারণ মানুষের থেকে অনেক স্থুল। এ আবার এল কোত্থেকে? আর এ জায়গায় সজাগ প্রহরীর মত বসেই বা আছে কেন? মনে করলাম এড়িয়ে যাই, আমারই মত কোন যাত্রী হবে বা—খাদ পেরিয়ে দম নিচ্ছে! কিন্তু মূর্ত্তিটির দিকে আর একবার তাকাতেই থেমে গেলাম, কে যেন থামিয়ে দিল আমাকে। মনে হ'ল, একটু বিশ্রাম করে যাই এঁরই পাশে বসে, ততক্ষণে ধরম সিং আসুক।

বিধাতাপুরুষ অদৃশ্যে হাসেন। আমার ক্ষমতা কি যে আমি এই অর্ব্বাচীন গোত্রহীন মানুষটিকে এড়িয়ে যাই! বসে পড়ি আবিষ্টের মত একটা পাথরের উপর।

আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসেন, তারপর বিনা ভূমিকাতেই সুরু করেন—"মুঝে মালুম থি, আপ যমুনোত্তরী জায়েগা, উস লিয়ে ম্যয় ইঁহা হাজির হুঁ। দো কাম করনা। ঘর লউটনেকা বাদ পনের রোজ কোহি মাত খাও। দো, কিসিসে প্রণাম মাত লিও।"

বাঁশীর মত গলার আওয়াজ—অথচ এ আওয়াজটি এল ঐ অস্বাভাবিক স্থূল গলার ভেতর দিয়ে।

প্রণাম করলাম, প্রণাম নিলেন। ধরম সিং-ও এসে বোঝা নামাল আর কোন কথা না বলেই প্রণাম করল এঁকে। মৃদু হাসলেন, তারপর উঠে পড়ে যে পথ দিয়ে আমরা এসেছি সেই পথ দিয়ে চলে গেলেন। কথা বলবার অবসর পেলাম না, কথা বলবার অবসর দিলেন না। শুধু বাতাসে দুটি আদেশ ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগল, "ঘর লউটনেকা বাদ পনের রোজ কোহি মাত খাও। কিসিসে প্রণাম মাত লিও।"

ধরাসুতে এক রহস্য, এখানে আর এক প্রহেলিকা।

কথা হচ্ছে এই, ধরাসুর ধর্ম্মশালার সেই অদ্ভুত মানুষটি আর এই মানুষটি এক কি না। বস্তুতান্ত্রিক বিচার এখানে নয়, এর বিচার সূক্ষ্ম বুদ্ধির সবটুকু দিয়ে। গত বৎসর বদরীকার পথে পিপুল-কুঠীর আগে ঠিক এই রকম এক রহস্যের সম্মুখীন হতে হয়েছিল যার প্রভাব থেকে এখনও মুক্ত হতে পারি নি বা পারা যায় না। প্রশ্ন হ'ল এই, আজকের এই ঘটনা তারই এক সংস্করণ কি না। এ পথে যে সবকিছুই সম্ভব, তার চুলচেরা হিসেব পেয়েছি যত পথ চলেছি, যত 'মাইলেজ' পেরিয়ে গেছি। সারা রাস্তাটা এ দুটি মানুষের কথা চিন্তায় এসেছে আর দুটিকে একটি নবমূর্ত্তিতে রূপান্তরিত করবার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছি। যোগবিভূতির সাহায্যে নররূপের পরিবর্ত্তন ত জানা—এও কি তাই, না অন্য কিছু। মানুষ ত আমরা, ভেতরে গোঁজা মান্ধাতা আমলের অবিশ্বাস যাবে কোথায়! সেইজন্যে আলো দেখেও চোখ বুজে থাকি, তার্কিক বুদ্ধিতে সম্পদ যায় নষ্ট হয়ে। কিন্তু কুয়াশা কেটেছিল বড় বেশী রূয়ে বাড়ী ফেরার পর। এঁর দুটি আদেশের মর্ম্ম যখন জ্যামিতিক বিচারের ন্যায় আমার কাছে জলজলে হীরের মত স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল তখন বুঝেছিলাম কি ঐশ্বর্য্য আমি ফেলে এসেছি।

এর কাহিনী এখন নয়, পরে যখন বাড়ী ফিরব।

কল্যাণীর পর কুমরারা—পাঁচ মাইলের মাথায়। এ কয়েক মাইল ধরম সিং আমার পাশে পাশেই এসেছে, কেন কে জানে। আপন মনে গল্প করে চলছিল এখানকার অলৌকিক ঘটনাবলীর রহস্যঘন ইতিহাস—এখানকার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের কথা, ঐশ্বর্য্যের কথা। কতক শুনছিলাম, কতক নিজস্ব চিন্তায় ডুবে যাচ্ছিল, তবুও ও থামে নি। বলে বলে যাচ্ছিল সাধুসন্তদের কথা, মহাত্মাদের কথা, সিদ্ধ যোগীপুরুষের কথা। ওর মতে "আচ্ছা আদমী"দের ভগবান দেখা দেন, 'দেওতা' তাদের পথ দেখান। বলছিল, উত্তর কাশীর দক্ষিণে আটানব্বই মাইল দূরে "সগরু"তেই নাকি ভয়ানক ভয়ানক জিনিষ আছে—সে অঞ্চল মুনি-ঋষিদের অঞ্চল, একবার যেতে পারলে জীবনে অ-পাওয়া বলে কিছু থাকে না। যমুনোত্তরী-ও তাই, তবে "সগরু"র মত কেউ নয়। তবে তার মতে পুণ্যের ভাণ্ডার শূন্য না হলে এ অঞ্চলেও অনেকটা অভাব মেটে। পিঠের উপর বোঝা নিয়ে সতের-আঠার বছরের উত্তর-কাশীবাসী ধরম সিং বলছিল এ সব তথ্য-ইতিহাস—এ বলার ভেতর তার সবটুকু বিশ্বাস, সবটুকু 'রিয়ালিটি'···শুনতে শুনতে চলছিলাম! এ ক'দিনেই ধরম সিং আমার মনের ভেতর বাসা বেঁধে ফেলেছে, অদৃশ্য মায়া-জালে আমি ইতিমধ্যেই আটকা পড়েছি। অপরের কাছে এর পরিচয় কুলী বা বাহক নয়, এর পরিচয় বন্ধু বা সাথী। সহযাত্রীদের বলতে বলতে গেছি—পথ থেকে একে পাওয়া এক মুঠো শিউলি ফুলের মত। ধরম সিং মনুষ্যত্বে গরীয়ান, সেবাধর্ম্মে প্রকাশমান, যার ক্রম-ইতিহাসের পাতা একটার পর একটা খুলে গেছে পথচলার রোজনামচায়। ভগবানকে দেখা যায়, হাত দিলে ছোঁওয়া যায়, তার স্বর্ণময় অধ্যায়ের ব্যঞ্জনা করতে করতে চলছিল ধরম সিং—অর্ব্বাচীন ছোট্ট এক পাহাড়ী ভগবান। এই শোনা আর না-শোনার মূর্চ্ছনার মধ্যে দিয়ে কুমরারা পেরিয়ে গেল, আরো ২'ফারলঙের মাথায় ব্রহ্মতাল এসে হাজির। সেই পাইন গাছের মধ্যে দিয়ে এ কয়েক মাইল চলে এলাম, ঠাসবুনুনী সর্ব্বত্র, কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। কমসে কম ন' মাইল হেঁটে এলাম, কোন কষ্ট নেই। এ পথটুকুতে চড়াইয়ের বেশী উৎপাত নেই, সেই সুরুতে যা একটু পেয়েছিলাম এই যা! ধরম সিং এসে বোঝা নামাল—ঘরও পেয়ে গেলাম পুরোপুরি একটা। কিছুক্ষণ পর বীরবলের সংসার এসে হাজির এবং আমার ঘরেই তাদের বিছানা পড়ল। গাড়োয়াল রাজ্যের সর্ব্বত্র ধর্ম্মশালাগুলোর সেই একই নিয়ম, চারজনের জন্যেই ঘর মিলবে; একজনের জন্যে নয়। কেদারবদরীর পথে এ নিয়ে কত ভুগেছি এই চারজনের সংখ্যা মেলে নি বলে। এখানে সে অভাবটা ভগবান রাখেন নি। আমি রোগা ডিগডিগে মানুষ, সকলের পেছনে রওনা হয়ে আগে পৌছুতাম আর ঘর দখল করতাম, তারপর বীরবলের মা, বৌ,

ছেলের আগমন হলে সংখ্যায় চার হ'ত, হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেতাম।

বীরবলের সংসারটি আমাকে যমুনোত্তরী পর্য্যন্ত আর সেখান থেকে উত্তর-কাশী পর্য্যন্ত ছায়ার মত অনুসরণ করেছে, এদের আমি কোথাও এড়াতে পারি নি। আমাকে তারা 'বাবাজী'র পর্য্যায়ে নিয়েছিল, আর তার জন্য আতিথেয়তা ও সেবাপরায়ণতার যে দৃষ্টান্ত খাড়া করেছিল, তার তুলনা কোথায়? আহমদাবাদ আর কোথায় রাণাঘাট, পথে তার পরিচয় ছিল না, সংজ্ঞা ছিল না—আমরা একটি প্রয়াগে মিশেছি, কোথাও এতটুকু বাধে নি। আমাকে তারা একটা 'অতিমানব' বলে মনে করেছে, তাদের এ ভাবপ্রবণতাকে দূর করবার হাজার চেষ্টা করেও পারি নি। নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে পা চালিয়ে গিয়েছি নির্দিষ্ট চটি ছাড়াও অন্য কোথাও রাত্রের আশ্রয়ের জন্যে, দেখেছি ইংরিজী 'এপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশনের' মত এরা হাজির। "বাবাজীকো মিল গিয়া—" এই আবিষ্কারের তত্ত্বেই তারা আনন্দ পেয়েছে, খুশী হয়েছে। ধরম সিংকে পাওয়াও যেমন যোগাযোগ, এ বীরবলের সংসারটিকে পাওয়াও তেমনি।

বেলা তখন তিনটে কি চারটে, ঘড়ির বালাই নেই, কাছে ছিলও না। ধরম সিং তার 'ডিউটি' করে দিয়ে গেল, অর্থাৎ, বিছানা নামিয়েই বিছানাটা পেতে ফেলল। আমার বলাই ছিল যে, ঘরে বিছানা খুলে আগে পেতে ফেলবে, আর এসেই আমি খানিকটা জিরুব, অন্য কাজ সব পরে। এখানেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না—জামা কাপড় না ছেড়েই শুয়ে পড়লাম বিশ্রামের আশায়। একটানা ন' মাইল পথ হেঁটেছি, কিছুক্ষণ শুয়ে পড়ার দরকার। ধরম সিং নেমে গেল তলায় চাল ডাল কিনতে, বীরবলরাও তাই—ঘরে শুধু সেই ছোট্ট শিশুটি শোয়ান রইল।

কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবেই শুয়ে ছিলাম। চোখ দুটো খোলা ছিল বটে, কিন্তু মনের চোখ দুটো ছিল বোজা। খিন্ন অবসন্ন দেহ, একটানা ন' মাইল চড়াই-উৎরাই করতে করতে এসেছি··· লম্বালম্বি দু'পা মেলে দিয়ে হাত দুটোকে বালিসের তলায় দিয়ে খোলা দরজাটার দিকে শুধুই তাকিয়ে ছিলাম। ভাবনা যে আসছিল না তা নয়, আসছিল, এটা, ওটা, সেটা···ভাবনারই একটা তরঙ্গ খেলা করছিল অবচেতনায় আর অনড় হয়ে চোখ দুটো খুলে রেখেছিলাম শুধু। দরজাটার সামনেই একটা ছোটখাট পাহাড় রাস্তার পাশ দিয়েই ঊর্দ্ধমুখে উঠে গেছে, শুয়ে শুয়ে তার অর্দ্ধ অবয়বটাই দেখতে পাচ্ছি···।

তন্দ্রা ও দিবাস্বপ্নের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ চলছে—যা ভাবছি তার সমাপ্তি হচ্ছে না, কেমন যেন একাকার হয়ে যাচ্ছে সব।

একটি মেয়ে···গৌরবর্ণা, লাবণ্যময়ী, কল্যাণী, অসূর্য্যম্পশ্যা। যেন দেখতে পেলাম সামনের পাহাড়টার বাঁকের বাঁ দিক থেকে নেমে আসছে। ফিকে সবুজ রঙের সাড়ীটা অদ্ভুত সুঠাম দেহবল্লরীর ওপর জড়ান, ঝিঁঝির পাতের মত পাতলা সাড়ী···কাঁচা সোনার রং যেন ফেটে বেরুচ্ছে সারা অঙ্গ দিয়ে। তরতরিয়ে নেমে এল মেয়েটি—এ নেমে আসা কাব্যের ছন্দ, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা। আঁকা-বাঁকা পথ···উত্তর প্রান্ত থেকে নেমে এসে দক্ষিণ প্রান্তে মিলিয়ে গেল যেন।

ফিকে সবুজ সাড়ী···কাঁচা সোনার রঙ···উন্মুক্ত হাতের ওপর সোনার বাজু, মাথার সীমন্তে টিকলী। হাওয়ায় সে মেয়ে মিশে গেল···।

স্বপ্ন?

তাই হবে বা। পাগলের মত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। কেউ নেই কোথাও, সামনের পাহাড়টা শুধু বোবা হয়ে আছে।

তবে কি মায়া? না শুধুই স্বপ্ন?

যাত্রা সুরু থেকে আমার এ কি আরম্ভ হ'ল। একটার পর একটা প্রহেলিকা, যাদের প্রামাণিক তথ্য নির্ব্বাকই থেকে যাচ্ছে। ঝিম ঝিম করছে শরীর, ঘেমে উঠলাম আমি। চোখে হাত দিলাম, দেখি, কাঁদছি—কখন অশ্রু নেমেছে বুঝতে পারিনি···।

কে এই মেয়ে? ফিকে সবুজ সাড়ী পরা? একটা অব্যক্ত প্রশ্নের ভারে আমি যেন স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

ঐ ত পথ, ধর্ম্মশালার পাশ দিয়ে উত্তরাভিমুখী হয়েছে—তার মিশিয়ে যাওয়া ত ঐ পথের প্রান্তে! আঁকাবাঁকা পথ···পাহাড়ী পথ, ওইখানেই ত মিলিয়ে গেল!

আর অপেক্ষা করা নয়, দাঁড়ান নয়···এগুতে হবে। ও পথটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে নেওয়া দরকার, ও পথটাকে জীবন দিয়ে জানা দরকার। কে বললে যেন ভেতর থেকে, "তুই এখানে থাকিস না। পথটাকে ভাল করে খোঁজ, পাবি।"

ধরম সিংকে জানাই না, শুধু বলি, "এখানে থাকব না, ওসব-গুলো বেঁধে নাও।

"কাহে বাবুজী?"

উত্তর দিই না। বোঝে—সিদ্ধান্ত অপরিবর্ত্তনীয়।

ব্রহ্মতাল থেকে সিলকিয়ারা—প্রত্যেক পাদবিক্ষেপটিতে ছিল সমগ্র জীবনের অনুসন্ধিৎসা, জিজ্ঞাসু মন।

কিন্তু ছলনাময়ী আলেয়াই থেকে গেল···পেলাম না। এ কাহিনীর ইতি এখানে নয়—এর চরম পরিণতি ঘটেছিল যমুনোত্তরী মন্দিরের কাছাকাছি। অসম্ভব সে কাহিনী—অবিশ্বাস্য সে এক ইতিহাস—যা আমার জীবনে শুধু চিরন্তন কান্নাকেই এনে দিয়েছে, অবদান হিসেবে রেখে গেছে ব্যর্থতার হতাশা আর শূন্যতার হাহাকার।

সিলকিয়ারা পৌঁছনোর আধ ঘণ্টার মধ্যেই বীরবলরা এসে হাজির। "বাবাজীকো নাহি ছোড়েগা—ইহা মিল গৈ।"

প্রথমে এল বীরবলের বৃদ্ধা মাতাজী, তার পর শিশু কোলে ওর বৌ, তার পর লাঠি হাতে ঠক ঠক করতে করতে বীরবল। আমাকে পেয়ে কি খুশী ওরা। অভিযোগ জানাল, তাদের না বলে কয়ে চলে এসেছি কেন। ওদের ছেড়ে আসার কোন অধিকারই নাকি আমার

নেই। তথাস্তু। তাদের অভিযোগকে মেনে নিলাম, বললাম, আমার অন্যায় হয়েছে।

ধর্ম্মশালায় পৌঁছনোর পর খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বীরবলের প্রথম কাজই ছিল মাতৃসেবা, যা তুলনাহীন, অবর্ণনীয়। এ রকমটি আমি দেখিনি কোথাও। আগে এক বাটি তেল গরম করে নিয়ে আসত বীরবল, তার পর মাকে ধরাশায়ী করে কঙ্কালসার পা-দুটিকে কোলের ওপর টেনে নিত আর সুরু হ'ত মালিশ, এ মালিশ খাঁটি আহমদাবাদী, বাঙালীর হাতে যা কখনই সম্ভব নয়। বৃদ্ধা চুপ করে পড়ে থাকতেন আর মৃদু মৃদু হাসতেন। প্রথমে দুটি পা, তার পর হাত, বুক, পিঠ। ঝাড়া এক ঘণ্টা এই কাজ, তার পর ভূমিষ্ঠ হয়ে মাকে একটি পরিপূর্ণ প্রণাম সেরে রুক্মিণীবাঈকে নিয়ে পড়ত। স্ত্রী যার কাছে লক্ষ্মীরূপিণী, তার কাছে আমি ঘরে আছি কি নেই তার প্রশ্ন ওঠে কি করে? কি অসীম মায়াপরবশ হয়ে বৌয়ের ছোট্ট পা দুটি তুলে নিত, দেখলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। এর পরের পূর্ণ আক্রমণ হ'ত আমাকে লক্ষ্য করে—আমার পা ও মালিশ করবেই। দুকুলভাঙা সর্ব্বগ্রাসী বানের মুখে আমার প্রতিবাদ খড়ের কুটোর মত, তাকে ঠেকান যায় নি।

আমরা গৃহগতপ্রাণ মানুষ, পিছটানের মানুষ। একটা হয় ত দুটো হয় না, দুটো হয় ত চারটে মেলে না। ভগবান পথ দেন নি, ঘর দিয়েছেন; মায়া দিয়েছেন, বৈরাগ্য দেন নি···আমরা শুধু সংসারের ফসল বুনে যাই, গেঁথে যাই। দিনগত পাপক্ষয়ই হ'ল সঞ্চয়, জীবনের মূলধন। যদি বা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির টানে সুদূরের হাতছানি আসে, এড়িয়ে যাই এই বলে যে সংসারকে আমার কে দেখবে? অকাট্য এই অজুহাতের যুক্তি, যার পাপে আমাদের সবকিছু শুকিয়ে গেল।

কিন্তু বীরবলের মত গোটা সংসারকে যদি এই মহাতীর্থের অঙ্গনে শেকড় শুদ্ধ উড়িয়ে নিয়ে আসা যায়, তবে মায়াই বা আসে কোথায়, তিতিক্ষার পথে আগড়ই বা দেয় কে? এ ত পেছনে কিছু রাখে নি, ফেলে আসে নি ত কিছু···এর আসা মহত্তম যোগাযোগের আসা, কল্যাণের আসা। তাই মাতাজী এর কাছে শুধুমাত্র গর্ভধারিণী নয়, মাতাজী বীরবলের কাছে রাজরাজেশ্বরী, ভবতারিণী। ব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিনী মাতৃস্বরূপাকে সে দর্শন করেছে তার সর্ব্বস্ব মাতাজীর ভেতর—তাই ত বীরবল সম্পূর্ণ। সুদূর আহমদাবাদের এক নিভৃততম পল্লী অঞ্চলে আঠার বছরের বীরবল একদা হোমাগ্নির সামনে মন্ত্রের সজ্যারামে সেই যে কিশোরী গ্রাম-কন্যা রুক্মিণীর ছোট্ট হাত দুটো তুলে নিয়েছিল—আজকে যমুনোত্তরীর দুস্তর দুর্গম পথের প্রান্তে সেই যুক্ত করাঙ্গুলির সার্থক রূপটি দেখতে পাই। ভগবান যাকে যোগ করে পাঠিয়েছিলেন, বীরবল তাকে বিয়োগ করিয়েছে। বৈরাগ্যের উত্তরীয় বীরবল রুক্মিণীকে পরিয়েছে, রুক্মিণী পরিয়েছে বীরবলকে। সার্থক এ সংসারটি!

দ্বিতীয় দিনের পথ হাঁটা সুরু হ'ল আমাদের। সামনে এক বিদ্‌ঘুটে চড়াই, এটা পেরুতে পারলেই ডিণ্ডিলগাঁও, তারপর শিমলী ও গাংনানী। কমসে কম সাড়ে ছ'মাইলের চড়াই আর এ চড়াইটুকুর মধ্যে কোন খুঁত নেই···অর্ব্বাচীন বিদ্রোহীর মতই এর ঊর্দ্ধাকাশে উঠে যাওয়া। সিলকিয়ারার বুক থেকেই এক ঐরাবত পাহাড়শ্রেণী উত্তর-পূর্ব্বদিককে বেড়া দিয়ে রেখেছে যেন, আর এর ওপর দিয়ে সর্পিল পাকদণ্ডীর পথ। এখান থেকে শোনা গেল সাধারণ যাত্রীরা ঐ চড়াইয়ের ওপর কোনরকমে উঠেই ফুরিয়ে যায়, নড়বার চড়বার ক্ষমতা থাকে না। ডিণ্ডিলগাঁওই আপাততঃ সকলের লক্ষ্য, উৎসাহ ও উদ্যম, সেইখানেই ইতি।

দ্বিতীয় দিনের চলা সুরু হ'ল ভোর না হতে হতে। সিলকিয়ারার সামনে থেকেই এক অতিবৃহৎ পাহাড়, কত যুগের সাক্ষী কে জানে? ঊর্দ্ধাকাশে হারিয়ে গেছে অনন্ত জিজ্ঞাসার মত। আগেই জানান হয়েছে যমুনোত্তরীর পথ সহজ নয়, এ তীর্থ দুরারোহ ও দুর্গম। এ দুটি কথার সত্য জিনিষটা ধরা পড়ে এই চড়াইয়ের সুরু থেকে। পথ ভাল হলে উঠে যাওয়ার ভেতর তবু সান্ত্বনা থাকে, কিন্তু যমুনোত্তরীর পথের এ সব বালাই নেই। মা যমুনা পথের ছায়া ফেলে রেখেছেন মাত্র, আর কিছু দেন নি: পূর্ণ করে রেখেছেন তাঁর সাম্রাজ্যকে শুধু পাষাণস্তূপ আর বিক্ষিপ্ত উপলখণ্ড দিয়ে, যাত্রীদের সম্বল শুধু ঐ পথের ছায়া। এ কেদারনাথ বা বদরীকানাথ নয় যে আধুনিক সভ্যতার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার যাত্রীর পথচলার কৌলিন্য আছে—মা এখানে নিরাভরণা। যমুনোত্তরী-গঙ্গোত্তরী তীর্থ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সৃষ্টিতত্ত্বকে শুধু উপেক্ষাই জানিয়েছে···দুর্গমতাই এ তীর্থদুটির যাবতীয় সঞ্চয়। তাই পথ এখানে পথ নয়, পথ এখানে ছায়া···।

ডিণ্ডিলগাঁওর চড়াই এই ছায়াপথের প্রথম সাক্ষী, সাধারণ যাত্রীদের এই পাহাড়ই প্রথম তালঠুকে স্পর্দ্ধা জানিয়েছে। খাড়াই পাহাড়ের ভিত্তিমূল থেকে ঊর্দ্ধদেশ, নৃতত্ত্ববিদের হিসেবে ছ' মাইল, আর এই ছ' মাইলের প্রথম তিন মাইল চড়াই হিসেবে আদি ও অকৃত্রিম। বুকে নিশ্বাস থেমে থেমে যায়···শারীরিক ভারসাম্যের একটা পরীক্ষা আসে এখানে। বীরবলের সংসার আগেই রওনা দিয়েছিল, তারা জানত লম্বা লম্বা পা ফেলে আমি তাদের পাশ দিয়ে বেরুবই। এখানে হ'লও তাই! সাড়ে তিন মাইলের মাথায় ওদের ধরে ফেললাম, দেখলাম বীরবলের মাতাজী একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের মূর্ত্তিরূপিণী হয়েই এগোচ্ছেন সকলের আগে আগে, তার পর শিশুকোলে রুক্মিণী, পেছনে বীরবল। পাইনের সেই অরণ্য চলেছে—পাখীর ডাক শুনছি, আর এই অরণ্যের ঊর্দ্ধে পাহাড়ী হাওয়া চলার একটা সাঁ সাঁ আওয়াজ—অদ্ভুত এক ভালো লাগা—অদ্ভুত এক অনুভূতি। যাত্রী যারা যাচ্ছে তারা সংখ্যায় অল্প, আঙুল গুণে তাদের ধরা যায়। বাঙালী আমি এখনও দেখলাম না, গোটা বাংলা দেশের মূর্ত্তিমান সাক্ষী হয়েই এখনও আমার পথ চলা।

চার মাইলের মাথায় চড়াই তখনও শেষ হয় নি, একটা মজার ব্যাপার ঘটে গেল। আমার আগে চলছিল একজন বৃদ্ধে-

ওয়ালা, ঠিক তারই পেছনে সে কুলীকে রেখেছে চোখাচোখি, যেটা সাধারণতঃ এ সব অঞ্চলে হয় না। যাত্রী এগিয়ে যায়, তারপর বহুদূরে পড়ে থাকে বাহক, কিন্তু তারই ব্যতিক্রম ঘটেছিল। হঠাৎ পরিষ্কার দেখতে পেলাম বন্দেওয়ালার বাহকের পিঠের বোঝা গড়াতে সুরু করল, বুঝলাম দড়ি ছিঁড়েছে। এখানে মাধ্যাকর্ষণের একাধিপত্য আর এই সর্বনেশে ব্যাপারটি থেকে সেই দু'মণী বোঝাও রেহাই পেল না, হু হু শব্দে সে গড়াতে গড়াতে তলায় নামতে লাগল। এত কষ্টের ভেতরেও হাসি এল আমার—মনে হ'ল বাহক হারে কি বোঝা হারে! বোঝাটি একবার এ গাছে আটকে কিছুটা থামে, আবার গড়াতে গড়াতে আর একটা গাছে আটকে থেমে দম নেয়; কিন্তু তার গড়ান আর থামে না, ধ্বস নেমে আসার মতই তার অবস্থা। তারপর দেখলাম, অন্ততঃ তিনশ' ফুট এক টানে নেমে এসে সে বৃহৎ বস্তুটি দুটি গাছের মাঝখানে আটকে থেমে গেল, আর নড়ল না! যাক, তবুও রক্ষে! বন্দেওয়ালা ওপরে থাকলেন আর বাহকের এই তিনশ' ফুট নীচে নেমে এসে বোঝা কাঁধে তুলে নিয়ে আবার ওপরে ওঠার ব্যাপক পরিশ্রম সুরু হ'ল। বেচারী!

ডিঙিলগাঁওয়ের চড়াই যখন শেষ করে পাহাড়ের ওপর ওঠা গেল, তখন বেলা দশটা। শরীর ঘেমে উঠেছে, মনে হ'ল কোথাও একটা যুদ্ধের মহড়া দিয়ে ফিরছি। একটিমাত্র চায়ের দোকান, সর্ব্বক্লান্তিহর, মনে মনে একে বন্দনা করে নিলাম। বিশ্রাম নিলাম কিছুটা, সেই সঙ্গে কড়া এক ভাঁড় চা। ধরম সিং আর বীরবলরা কখন এসে পৌঁছবে কে জানে?

ক্রমশঃ

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

আজকাল আমাদের দেশে সকলের মুখেই শুনিতে পাই যে, আমাদের সমাজে শিক্ষা-সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। পুত্রকন্যাদিগের শিক্ষা-ব্যবস্থার ফলে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ভদ্র গৃহস্থকে দারুণ অর্থসঙ্কটে পড়িতে হইয়াছে, ইহা সর্বজনবিদিত। এই সঙ্কট হইতে কিরূপে উদ্ধার পাওয়া যায় সকলেই আজ এই কথা ভাবিতেছেন। কোন রোগ নিরাময় করিতে হইলে সুচিকিৎসক রোগের নিদান অন্বেষণ করেন। যে কারণে রোগ হইয়াছে সেই কারণ দূর করিতে না পারিলে কেবল ঔষধ প্রয়োগে রোগ চিরতরে নিবারিত হয় না। এই প্রসঙ্গে গত ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র বাগলের "শিক্ষা-সঙ্কট" শীর্ষক সুচিন্তিত ও তথ্যপূর্ণ, ব্রিটিশ আমলের শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ক প্রবন্ধটি বড়ই সময়োপযোগী হইয়াছে। ইংরেজ আমলের শিক্ষা-ব্যবস্থায় যে রোগ প্রকট হইয়া দেখা দিয়াছে তৎসম্বন্ধে দীর্ঘকালের নিজ অভিজ্ঞতা হইতে এখানে কিছু বলিব;

ইংরেজ আমলের পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহাতে শিক্ষার্থীদিগকে কোনরূপ অর্থব্যয় করিতে হইত না। কি নিম্নশিক্ষা আর কি উচ্চশিক্ষা, শিক্ষার্থীরা বিনা ব্যয়ে সকল শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইতে পারিত। মুসলমান আমলের পূর্ব্বে আমাদের সমাজে সাধারণতঃ দুই প্রকার শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। নিম্নশিক্ষার ব্যবস্থা হইত পাঠশালায়, আর উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা হইত চতুষ্পাঠীতে। পাঠশালার ছাত্রগণকে কোন কোন স্থলে নামমাত্র বেতন দিতে হইত বটে, কিন্তু সেজন্য ছাত্রের অভিভাবকগণকে কখনও চিন্তাগ্রস্ত হইতে হইত না। মাসিক দুই-এক আনার বেতন পুত্রকন্যার শিক্ষায় ব্যয় করা কোন অভিভাবকই কষ্টকর বলিয়া মনে করিতেন না। অভিভাবকগণ কোন নির্দিষ্ট পর্ব্বাহে পাঠশালার শিক্ষকদিগকে "সিধা" অর্থাৎ আহার্য্যদ্রব্য প্রদান করিতেন। সে সময় দেশে রাজা বা ধনবানেরা পাঠশালার শিক্ষকদিগকে প্রতিপালন করা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। পাঠশালার শিক্ষকেরাও তাঁহাদের সংসার খরচের জন্য কখনও চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন হইতেন না। তাহার প্রধান কারণ সমাজে তখন বিলাসিতারূপ পাপ প্রবেশ করে নাই। বিলাসিতা তখন রাজপ্রাসাদে ও ধনবান ব্যবসায়ীদিগের অট্টালিকার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। মধ্যবিত্তশালী লোকেরা কখনও ধনবানের অট্টালিকা দেখিয়া হতাশার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিত না। এখনও বাংলার পল্লীগ্রামে এরূপ অনেক পাঠশালা দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাঠশালার শিক্ষক বা গুরুমহাশয়কে প্রতিপালন করা জমিদার বা ধনবানেরা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। গুরুমহাশয়েরা কখনও ছাত্রদিগের উপর নির্ভর করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন না।

এই সকল পাঠশালাতে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর বালকেরাই প্রাথমিক বিদ্যা লাভ করিত। আমার মনে আছে, এখন হইতে প্রায় আশী বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পাড়ায় যে পাঠশালায় আমি পড়িতাম সেখানে আমার সতীর্থদের মধ্যে একজন রজকের পুত্র, এক জন চর্ম্মকারের পুত্র, দুই জন ধীবরের পুত্র এবং দুই-তিন জন নিম্নশ্রেণীর কৃষকের পুত্র ছিল। তিন-চারি জন মুসলমান শ্রমিকের পুত্রও আমাদিগের সহিত পড়িত। এই মুসলমান বালকদিগের মধ্যে দুই জন পরবর্ত্তীকালে রাজমিস্ত্রীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

আমার প্রৌঢ় বয়সে আমারই বাটীতে উহারা নূতন গৃহ নির্ম্মাণ বা পুরাতন গৃহের জীর্ণ সংস্কার করিয়াছিল। ঐ দুই জন রাজমিস্ত্রী লেখা পড়া জানিত। সামান্য হিসাবপত্রও করিতে পারিত। আমি প্রথমে তাহাদিগকে চিনিতে পারি নাই। একদিন তাহারা আমাকে বলিল, "বাবু, আপনি আমাদের চিনতে পারছেন না। আমার নাম মকবুল। আমি রাম মশায়ের পাঠশালায় আপনার সঙ্গে পড়েছিলাম।"

সেকালে পাঠশালার গুরুমহাশয়েরা সকলেই যে উচ্চবংশজাত হইতেন তাহা নহে। পল্লীগ্রামে ও মফস্বল শহরে অনেক পাঠশালায় "বাগদী মশাই", "চাঁড়াল মশাই" ও "বাইতি মশাই" প্রভৃতিও শিক্ষকতা করিতেন। আমার মনে পড়ে আমাদের পাড়ায় একটা পাঠশালায় একজন বাগদী জাতীয় গুরুমশায় ছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। তিনি অতি দ্রুতবেগে লিখিলেও তাঁহার লিখিত অক্ষরগুলি যেন মাল্যগ্রথিত মুক্তার মত সুদৃশ্য ছিল। আমি যখন বাল্যকালে স্কুলে পড়িতাম, তখন আমার একজন গৃহশিক্ষক বাইতি জাতীয় ছিলেন। বাইতিরা জাতিতে চর্ম্মকার বা মুচি। উৎসবের বাড়ীতে ঢাক-ঢোল বাজান তাহাদিগের পেশা। আমার গৃহশিক্ষক "নবাই মাষ্টার" বা নবীনচন্দ্র বাইতি সুন্দর ইংরেজী লিখিতে ও বলিতে পারিতেন। আমি পাঠশালা ছাড়িয়া যখন বাংলা স্কুলে প্রবেশ করিলাম তখন যুধিষ্ঠির নামে একটি বালক আমার সহপাঠী ছিল। সে জাতিতে হাড়ি। অঙ্কে তাহার অদ্ভুত প্রতিভা ছিল।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাঠশালার গুরুমহাশয়েরা ছাত্রদিগের নিকট হইতে মাসিক বেতন লইতেন। সে বেতনের পরিমাণ আট পয়সা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত। সেকালে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকদিগকে ইহার অধিক নগদ পয়সা ব্যয় করিতে হইত না। তবে অভিভাবকেরা মধ্যে মধ্যে পাল-পার্ব্বণে নিজের ইচ্ছা ও ক্ষমতা অনুসারে "সিধা" দিতেন। পাঠশালায় ছাত্রদের বসিবার জন্য কোনরূপ কাষ্ঠাসনের ব্যবস্থা ছিল না। ছাত্রেরা বসিবার জন্য অতি ক্ষুদ্র মাদুর কিংবা খেজুরপাতার চাটাই বাটী হইতে প্রত্যহ পাঠশালায় আনিত। তাহারা প্রথমে তালপত্রে লেখা আরম্ভ করিত। তালপাতায় লেখার "হাত বসিলে" কদলীপত্র এবং সর্ব্বশেষ কাগজ ব্যবহার করিত। সুতরাং তাহাদিগকে হস্তাক্ষরের জন্য বা অঙ্ক কষিবার জন্য "এক্সারসাইজ বুক" কিনিতে হইত না। প্রথমে বোধ হয় এক আনা দামের কতকগুলা তালপত্র কিনিতে হইত। সেই তালপত্র অনেকে বিনামূল্যেই সংগ্রহ করিত। সুতরাং পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, পুত্রকন্যাগণের নিম্নশিক্ষার জন্য কত অল্প অর্থ ব্যয় করিতে হইত। পাঠশালার ছাত্রেরা কখনও লেখনীর জন্য বিদেশজাত ষ্টীল পেন প্রস্তুতকারীদের শরণ লইত না। কঞ্চি, শর, খাগড়া, পাহাড়ে কলমী ইহাই ছিল লেখনীর উপাদান। ইংরেজী লিখিবার জন্য হংসপুচ্ছ বা ময়ূরপুচ্ছ লেখনীরূপে ব্যবহৃত হইত। বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরাই উহা ব্যবহার করিত। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষা-বিভাগের ব্যবস্থা অনুসারে অনেক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত বিনা বেতনে পড়াইবার ব্যবস্থা হইতেছে। ঐ সকল শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকগণকে বিদ্যালয়ে মাসিক বেতন দিতে হয় না সত্য, কিন্তু এক্সারসাইজ বুক, পাঠ্য পুস্তক, কাগজ, কলম, কালি প্রভৃতির জন্য যে অর্থ ব্যয় করিতে হয় তাহা নিতান্ত কম নহে। সেকালে ছাত্রেরা প্রায় সকলেই বাটীতে কালি প্রস্তুত করিয়া লইত। চালভাজা হাঁড়িতে ভাজিতে ভাজিতে যখন পুড়িয়া কালো হইত তখন সেই চালের অঙ্গার, রন্ধনশালার হাঁড়ির তলার ভুষা এবং সামান্য হিরাকষ জলে দুই-তিন দিন ভিজাইয়া রাখিলে উত্তম কালি প্রস্তুত হইত। সে কালিতে অতি অল্প পরিমাণ বাবলার আঠা বা গঁদ মিশাইলে উহাতে লেখা অক্ষরগুলি চক্ চক্ করিত। বাটীতে কালি প্রস্তুত করিবার আরও নানাপ্রকার উপায় ছিল। বাহুল্যভয়ে তাহার আর উল্লেখ করিলাম না।

একটা ব্যাপার দেখিয়া আমার এই বৃদ্ধ বয়সে মনে বড় ক্ষোভ হয়। ক্ষোভের কারণ—কাগজের অপব্যয়। বর্ত্তমান কালে কোন ছাত্রকেই নিম্নশ্রেণীতে পড়িবার সময় কোন কাগজে মক্স করিতে দেখি না। আমি দেখিতে পাই বালকেরা যে সকল এক্সারসাইজ বুক কিম্বা গৃহে নির্ম্মিত খাতায় কিছু লেখে সে সকল খাতায় প্রচুর স্থানের অপব্যয় হয়। অঙ্কের খাতা যে অঙ্ক কষিবার পর হস্তাক্ষরের খাতা রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে ইহা ছাত্র ত দূরের কথা ছাত্রের অভিভাবকেরাও মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিয়া দেখেন না। আমরা কিন্তু বাল্যকালে স্কুলে পড়িবার সময় অঙ্কের খাতাকে হস্তাক্ষরের খাতা রূপে ব্যবহার করিতাম। অভিভাবকেরা যদি এই দিকে একটু দৃষ্টিপাত করেন তাহা হইলে তাঁহাদের অনেক অপব্যয় নিবারিত হইতে পারে।

বিদ্যাশিক্ষাকে আমরা চলিত কথায় লেখাপড়া শেখা বলি। কেহ পড়ালেখা শেখা বলে না। অর্থাৎ, অগ্রে লেখা ও পরে পড়া ইহাই ছিল আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। কিন্তু ইংরেজ আমলের ব্যবস্থায় লেখাপড়ার বদলে 'reading and writing' হইয়াছে। হাতের লেখাটা বর্ত্তমান কালে অত্যন্ত অবহেলিত হইতেছে। কিন্তু আমরা যখন স্কুলে পড়িতাম তখন হাতের লেখা এরূপ অবহেলিত হইত না। এমনকি বাৎসরিক পরীক্ষাতেও সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য পরীক্ষার্থীরা অতিরিক্ত নম্বর পাইত। আজকাল এরূপ প্রথা কোনও বিদ্যালয়ে আছে বলিয়া আমার জানা নাই। আমার বাসস্থান চন্দননগর এই সেদিন পর্য্যন্ত ফরাসীদিগের একটি উপনিবেশ ছিল। ফরাসীরা বোধ হয় ইংরেজদের অপেক্ষা হস্তাক্ষরের প্রতি সমধিক মনোযোগী। বর্ত্তমান কালে চন্দননগরে যে বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, তাহা প্রথমে স্থাপন করেন ফরাসী পাদ্রী বা ধর্ম্মযাজকেরা। সেজন্য উহার নাম ছিল পাদ্রীর স্কুল। সেই পাদ্রীরা, ফ্রান্স হইতে হস্তাক্ষরের copy book আনাইয়া মাত্র এক আনা মূল্যে তাহা বিক্রয় করিতেন। প্রায়

৭০ বৎসর পূর্ব্বে ফ্রান্সের গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্মযাজকদিগের হস্ত হইতে শিক্ষাব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ করিলে, চন্দননগরে পাদ্রীর স্কুলও পাদ্রীদিগের হাত হইতে গবর্ণমেণ্টের হাতে আসে। পাদ্রীদের আমলে স্কুলের নাম ছিল সেণ্ট মেরিজ ইনষ্টিটিউশন। গবর্ণমেণ্টের হাতে আসার পর উহার নাম হইল ডুপ্লে কলেজ। এখন চন্দননগর ফরাসী গবর্ণমেণ্টের হস্তচ্যুত হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীন হওয়াতে ঐ বিদ্যালয়ের নাম হইয়াছে "কানাইলাল বিদ্যালয়।" (পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে চন্দননগরের যুবক, ডুপ্লে কলেজের ছাত্র কানাইলাল দত্ত বিশ্বাসঘাতক নরেন গোস্বামীকে হত্যা করিবার অপরাধে ইংরেজের বিচারে হাসিমুখে, তাঁহার "পাপের" জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। চন্দননগরে গঙ্গাতীরে যেখানে পূর্ব্বে ডুপ্লের মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল এখন সেইখানে কানাইলালের মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।) সেকালে সেই পাদ্রীদের আমলে যে সকল ছাত্র পাদ্রীর স্কুলে পড়িতেন তন্মধ্যে যাঁহারা এখনও জীবিত আছেন তাঁহাদের সকলেরই হস্তাক্ষর এত সুন্দর যে দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। সেকালে হস্তাক্ষর ভাল করিবার জন্য পাঠশালার গুরুমহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া স্কুলের শিক্ষকেরা পর্য্যন্ত সবিশেষ যত্ন লইতেন। অনেক বালক অভ্যাস-দোষে লিখিবার সময় বামে বা দক্ষিণে মাথাটি ঈষৎ হেলাইয়া রাখে—তাহাদের হস্তাক্ষর সাধারণতঃ একটু বাঁকা হইয়া থাকে। সেজন্য সেকালের গুরুমহাশয়েরা ছাত্রদিগকে হস্তাক্ষর লেখাইবার সময় বলিতেন—

"ঘাড় বাঁকা হইলে অক্ষর হবে বাঁকা
এ যে না বুঝিতে পারে তারে বলি বোকা।"

চন্দননগরে ফরাসী ধর্ম্মযাজকদের সময় পাদ্রীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সেণ্ট মেরিজ স্কুলে দুই-একটি ব্যবস্থা বড় সুন্দর ছিল। কোন ছাত্র কোন অন্যায় কার্য্য করিলে তাহারা কখনও শারীরিক দণ্ডে বা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইত না। ফরাসী দেশে কোন বিদ্যালয়েই ছাত্রদিগকে শারীরিক দণ্ডে দণ্ডিত করা হয় না। চন্দননগরে ধর্ম্মযাজকেরা মনে করিতেন যে, ছাত্রদিগকে কোন অপরাধে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিলে সে দণ্ড তাহাদের অভিভাবকদিগের উপরেই প্রয়োগ করা হয়। বালক ও কিশোর ছাত্রগণ অর্থ উপার্জ্জন করে না। সুতরাং অর্থদণ্ড তাহাদের উপর প্রযুক্ত হইতে পারে না। কোন কারণে ছাত্রগণের জরিমানা হইলে ছাত্রেরা অভিভাবকের অগোচরে সেই জরিমানার অর্থ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবে। সুবিধা পাইলে অভিভাবকদের অর্থ চুরি করিবারও চেষ্টা করিবে। তাহাতে ছাত্রগণের প্রথম অপরাধের প্রতিকার ত হইবেই না, উপরন্তু আর একটি অপরাধের সহায়তা করা হইবে। সেই জন্য চন্দননগরের পাদ্রীর স্কুলে শিক্ষকেরা অপরাধী ছাত্রের প্রতি হস্তাক্ষর লিখিবার দণ্ড প্রয়োগ করিতেন। বিদ্যালয়ে প্রত্যহ মধ্যাহ্নে আধ ঘণ্টা করিয়া "টিফিনে"র ছুটী হইত। ছাত্রেরা ঐ সময় ক্লাসের বাহিরে গিয়া জলযোগ করিত ও খেলাধূলা করিত। কিন্তু অপরাধী ছাত্রগণ টিফিনের ছুটী পাইত না। তাহাদিগকে সেই সময় ক্লাসের ভিতরে বসিয়া আদর্শ হস্তাক্ষরের খাতায় ৫০ ছত্র বা ১০০ ছত্র লিখিতে হইত। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে লেখার দণ্ড বর্দ্ধিত হইত। যদি কাহারও লেখা এক দিনের টিফিনের সময়ে শেষ না হইত, তাহা হইলে দুই দিন, তিন দিন বা চারি দিন পর্য্যন্ত ছাত্রগণকে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইত। যাহারা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছাত্র তাহাদিগকে অনেক সময় অপরাহ্নে বিদ্যালয় বন্ধ হইবার পরেও আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা কয়েদ রাখা হইত। এই কয়েদের সময়টাও ছাত্রদিগকে বসিয়া লিখিতে হইত। দণ্ডভোগ কালে ছাত্রগণ যে লেখা লিখিত, তাহা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর না হইলে সে লেখা অগ্রাহ্য হইত।

পাদ্রীর স্কুলে আর একটি সুন্দর নিয়ম ছিল। প্রায় সকল স্কুল ও পাঠশালায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিদ্যালয়ে ছুটী হইবামাত্র বালকেরা হুড়াহুড়ি ও গোলমাল করিয়া ক্লাস হইতে বাহির হইয়া যায়। কিন্তু পাদ্রীর স্কুলে সেরূপ হইত না। ছুটীর ঘণ্টা বাজিবামাত্র ছাত্রগণ দণ্ডায়মান হইয়া নিজ নিজ বই-খাতা-পেন্সিল প্রভৃতি গুছাইয়া লইত। সারিবদ্ধ ভাবে দুই জন দুই জন করিয়া সমবেত পদক্ষেপে অর্থাৎ ড্রিল করিবার সময় যেরূপ চলাফেরা করে সেইরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া স্কুলের ফটক পর্য্যন্ত শান্ত ভাবে গমন করিত। তাহার পর ফটক পার হইয়া রাজপথে পড়িলে তাহারা যেদিকে ইচ্ছা যেমন করিয়া হউক চলিয়া যাইত। বিদ্যালয়ের শেষ ঘণ্টায় যে শিক্ষক ক্লাসে উপস্থিত থাকিতেন, তিনিই ছাত্রদিগকে ড্রিল করাইয়া ফটক পর্য্যন্ত লইয়া যাইতেন। এই ব্যবস্থা সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী হইতে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত ছিল। আজকাল এ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে কিনা জানি না। না থাকাই সম্ভব। তবে আমার মনে হয়, এব্যবস্থা কি শহরে কি মফস্বলে প্রত্যেক বিদ্যালয়েই প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। টিফিনের ছুটীর সময়েও ছাত্রেরা ঐরূপ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ক্লাস হইতে বাহির হইত। কোন ছাত্র শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিলে তাহার প্রতিও হস্তাক্ষর-দণ্ড প্রয়োগ করা হইত।

ইংরেজ আমলের পূর্ব্বে, অর্থাৎ হিন্দু রাজত্বে অথবা মুসলমান রাজত্বে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল চতুষ্পাঠীতে ও মাদ্রাসায়। হিন্দু সমাজের উচ্চশিক্ষাদাতা ছিলেন চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকেরা, আর মুসলমান সমাজের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল মাদ্রাসার মৌলবী ও মৌলানার হস্তে। সেকালের এই শিক্ষাব্যবস্থায় রাজা বা রাজপুরুষগণ কখনও হস্তক্ষেপ করিতেন না। এক বৎসরে কোন্ পুস্তকের কতটা পড়াইতে হইবে তাহা অধ্যাপকেরা ও মৌলবীরা নিজেরাই স্থির করিতেন। মাদ্রাসার ও চতুষ্পাঠীর এই স্বাধীনতা ব্রিটিশ আমলে বিলুপ্ত হইয়াছিল। সরকারী শিক্ষা-বিভাগের প্রতিষ্ঠা হইবার পর ঐ বিভাগে উচ্চতম কর্ম্মচারীরা নির্দেশ দিতে লাগিলেন—বিদ্যালয়ের কোন্ শ্রেণীতে কোন্ পুস্তক পড়ান হইবে। বিদ্যালয়ের পরিদর্শকেরা মধ্যে মধ্যে আসিয়া দেখিয়া যাইতেন যে, তাঁহাদের নির্দেশ অনুসারে পাঠের ব্যবস্থা হইতেছে কিনা। কিছুদিন এই ব্যবস্থা চলিবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইল। এই

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কার্য্য ছিল ছাত্রদের বিদ্যা-বুদ্ধির পরীক্ষা গ্রহণ করা। প্রবেশিকা পরীক্ষাই উচ্চশিক্ষার একমাত্র প্রবেশপথ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ দেখিলেন যে, ছলে বলে ও কৌশলে যেরূপেই হউক যখন ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধীন হইয়াছে তখন রাজকার্য্য ও ব্যবসাকার্য্য পরিচালনার জন্য যথেষ্টসংখ্যক ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ রাজকর্ম্মচারীর নিয়োগ করিতেই হইবে। সেকালে খুব উচ্চ বেতন না পাইলে ইংলণ্ড হইতে কোন শিক্ষিত ইংরেজ সন্তান ভারতে আসিতে চাহিত না। এই অসুবিধার একমাত্র প্রতিকার এদেশের লোককে যদি অন্ততঃ সরকারী কার্য্য ও বণিকদিগের কার্য্য চালাইবার জন্য প্রয়োজনমত ইংরেজী শিক্ষা দিতে পারা যায়। সেইরূপই ব্যবস্থা করা হইল। "গোলদীঘির গোলামখানা" বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর "গোলাম" প্রস্তুত করিবার ভার অর্পিত হইল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত সার্টিফিকেট বা প্রতিষ্ঠাপত্র সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হইবার একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। বাঙালী বালক ও যুবক ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট সংগ্রহই তাহাদের জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিল।

কিন্তু এই উচ্চশিক্ষালাভ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল। স্কুল বা কলেজের ছাত্রগণকে প্রতি মাসে যে বেতন দিতে হইত তাহা অনেক সময় দরিদ্র গৃহস্থের ক্ষমতার অতীত হইয়া উঠিল। ইংরেজ সরকার এইরূপে বিশ্ববিদ্যালয়রূপ দোকান খুলিয়া বিদ্যা বিক্রয় করিতে লাগিলেন। শুধু তাহাই নহে, সার্টিফিকেট-লোভাতুর পরীক্ষার্থীদিগের নিকট হইতে Examination Fee বা সার্টিফিকেট বিক্রয়ের মাশুল হিসাবে অর্থশোষণ করিতে লাগিলেন। শেষে অবস্থা এমন হইল যে, দরিদ্র ছাত্রের পক্ষে উচ্চশিক্ষার পথ প্রায় অবরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। অথচ ব্রিটিশ আমলের পূর্ব্বে চতুষ্পাঠী ও মাদ্রাসার ছাত্রগণ বিনা বেতনে উচ্চশিক্ষা লাভ করিত। শুধু তাহাই নহে, চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণ আচার্য্যের গৃহে বাস করিয়া সেখানেই আহারাদি করিত, সেজন্য ছাত্রের অভিভাবকদিগকে ছাত্রদের ভরণপোষণের ব্যয় বহন করিতে হইত না। সে ব্যয় প্রত্যক্ষভাবে বহন করিতেন চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকেরা এবং পরোক্ষভাবে স্থানীয় ভূস্বামী ও ধনবান ব্যক্তিরা। সেকালে ধনবান ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই নিজ নিজ বাটীতে পাঠশালা ও চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতেন। তাঁহারাই অধ্যাপকগণকে বৃত্তি দিতেন। এখন সেই অধ্যাপক প্রতিপালনের ভার গবর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই ব্যয়ভার বহনের জন্য ছাত্রের অভিভাবকদিগকে বাধ্য করিয়াছেন।

বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রের জন্য পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এখন হইতে ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বেও একখানি নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক কোন নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীতে বহুকাল ধরিয়া প্রচলিত থাকিত। সেকালের সেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া সীতার বনবাস ও শকুন্তলা পর্য্যন্ত এক-এক শ্রেণীতেই দীর্ঘকাল ছাত্রদিগের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেইরূপ প্যারীচরণ সরকারের *First book* বা ইংরেজী প্রথম ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতর শ্রেণীর পাঠ্যরূপে একই পুস্তক প্রচলিত থাকায় ছাত্রগণকে অর্থাৎ ছাত্রের অভিভাবকদিগকে প্রতি বৎসর নূতন পুস্তক কিনিবার দায়ে পড়িতে হইত না। জ্যেষ্ঠ সহোদর যে বই স্কুলে পড়িয়াছে কনিষ্ঠও সেই বই স্কুলে পাঠ করিত। এমনকি অনেক সময় পিতা-পুত্র উভয়েই "কথামালা", "বোধোদয়", "চরিতাবলী", "পদ্যপাঠ", "চারুপাঠ". "First book", "Second book" পাঠ করিবার সুযোগ পাইত। কিন্তু আজকাল আর সে ব্যবস্থা নাই। এখন প্রায় প্রতি বৎসরই নূতন পাঠ্য পুস্তক কিনিতে হয়। যে পাঠ্য পুস্তক বড় ভাই পড়িয়াছে, সে পাঠ্য পুস্তক ছোট ভাইয়ের বেলায় একেবারে অচল। প্রতি বৎসরই নূতন নূতন পাঠ্য পুস্তক ক্রয়ের জন্য ছাত্রের অভিভাবকদিগকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতে হয়। এই পাঠ্য পুস্তক পরিবর্ত্তনের ফলে পাঠ্য পুস্তকের বাজারেও কিরূপ অসাধুতা প্রবেশ করিয়াছে তাহা আজিকার দিনে বিশেষ ভাবে আলোচনার যোগ্য।

লয়

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

দিবস-শর্বরী যে সুখ খুঁজে মরি
তাতে যে কঞ্চুকী তোমার কৌতুক,
কুলের ক্রীড়াভূমি যতই অবতরি
তুমি যে অবসাদ—এ তব যৌতুক!

ভোগের পাত্রটি না হতে নিঃশেষ
জাগে যে মরশুম নূতন পাত্রের।
তাই তো প্রত্যয়—কোথাও অবশেষ
আছে এ দুর্মদ নীলাভ রাত্রের।

তুচ্ছ সুখ তাই করিতে চাই জয়,
চরম সুখ তুমি—তোমাতে পাব লয়।

সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ   শিল্পী—রামচাঁদ রায়, ১৮১৬

সেযুগের ধাতু-খোদাই ও কাঠ-খোদাই শিল্প

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বাংলাদেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ-পাদে। ইহারও বহু পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজরা গোয়ায়, এবং ব্রিটিশ ভারতে বোম্বাইয়ে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে মুদ্রণশিল্প বেশ উন্নতিলাভ করে। আমরাও ইংরেজের সংস্পর্শে আসিয়া এই উন্নতির সুযোগ লাভ করি।

বাংলাদেশে হুগলী শহরে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র কোম্পানীর আনুকুল্যে স্থাপিত হয়। এখানেই নাথানিয়েল হালহেড-কৃত. ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে প্রথম বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহাতে ব্যবহৃত বাংলা শব্দ ও বাক্যাবলীর অক্ষর খোদাই করিয়াছিলেন ওয়ারেন হেষ্টিংসের আগ্রহাতিশয়ে কোম্পানীর সিবিলিয়ান কর্ম্মচারী চার্লস উইলকিন্স। মুদ্রণকার্য্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাদি চিত্রিত করিবারও তাগিদ আসে তখনকার কৃতীদের মনে। এই তাগিদের বশে এদেশে তক্ষণশিল্পের উৎপত্তি ও প্রচলন। খোদাই-চিত্র সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে।*

এই সকল আলোচনায় সেযুগের কাঠ-খোদাই ও ধাতু-খোদাই চিত্র সম্বন্ধে তথ্যাদি প্রধানতঃ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসংস্কৃতির বিষয় অনুসন্ধানকালে এইরূপ আরও বহু নূতন তথ্য আমার গোচরে আসিয়াছে। পূর্ব্ব আলোচনা-সমূহের পরিপূরকরূপে সেগুলি এখানে পরিবেশন করিব।

২

বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির আনুকুল্যে প্রকাশিত 'এশিয়াটিক রিসার্চেস্'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই খণ্ডে সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সার্ উইলিয়ম জোন্স লিখিত "On the Gods of Greece, Italy and India" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে ভারতীয় দেব-দেবীর চৌদ্দখানি চিত্র দেবনাগরী অক্ষরে নামসহ মুদ্রিত হয়। দেখিলে বুঝা যায়, এগুলি সমুদয়ই ধাতু-খোদাই চিত্র। আমি বাংলাদেশে মুদ্রিত পুস্তক-পুস্তিকা বা পত্র-পত্রিকা যাহা দেখিয়াছি তাহার মধ্যে এইটিই প্রথম সচিত্র। যতদুর জানা যায়, ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর' কাব্যগ্রন্থ কলিকাতা হইতে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য সর্ব্বপ্রথম চিত্রিত করাইয়া প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে ছয়খানি চিত্র আছে। ইহার মধ্যে দুইখানির সঙ্গে 'Engraved by Ramchand Roy' বা 'রামচাঁদ রায় কর্ত্তৃক খোদিত' এইরূপ উল্লেখ আছে।

---

* ১। আধুনিক কাঠ-খোদাই-চিত্র (Wood-Cuts)—শ্রীনীরোদচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীসজনীকান্ত দাস, প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৪।

২। খোদাই-চিত্রে বাঙালী (প্রাচীন কাঠ-খোদাই)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৪৬শ ভাগ (১৩৪৬), ২য় সংখ্যা।

৩। বাংলার প্রাচীন ধাতু-খোদাই চিত্র—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৫০।

১৮১৭, জুলাই মাসে কলিকাতা নগরীতে ক্যালকাটা স্কুল-বুক সোসাইটি গঠিত হয়—প্রধানতঃ ইংরেজী এবং বাংলা-ভাষায় সুষ্ঠু পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ ও প্রচারের উদ্দেশ্যে। সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক বিবরণে মূল উদ্দেশ্যের সহায়ক আরও কয়েকটি আনুষঙ্গিক কার্য্যের কথা এইরূপ পাওয়া যাইতেছে ঃ

"The more general introduction and the improvements of the arts of printing, engraving in all its branches and the humble though very useful art of type-cutting are objects which naturally fall within the province of this society, not merely as colateral but as subsidiary to its main design." (*Second Annual Report*, 1818-19, p. 20).
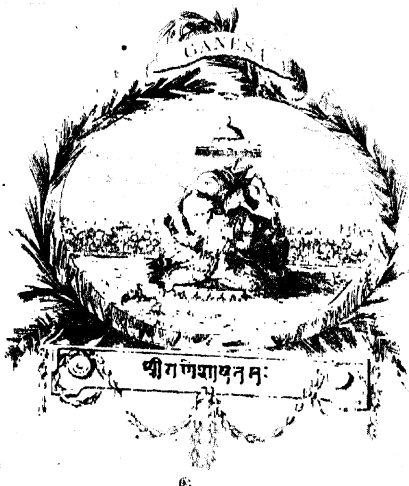
গণেশ

—'এশিয়াটিক রিসার্চেস', ১৭৮৮

মুদ্রণ ও অক্ষর-নির্ম্মাণ শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের খোদাই-চিত্র বা তক্ষণশিল্পের প্রবর্ত্তন এবং উন্নতিসাধনেও সোসাইটি তৎপর হইয়াছিলেন। এই রিপোর্টে দেখিতেছি, *Joyce's dialogues On Mechanics and Astronomy* নামীয় পুস্তকে ধাতু-খোদাই চিত্র সংযোজিত করা হইয়াছিল। ইহার শিল্পী ছিলেন বাঙালী কাশীনাথ মিস্ত্রী। উক্ত বিবরণীতেই কাশীনাথের কৃতিত্বের এইরূপ উল্লেখ পাইতেছি ঃ

"The highly creditable execution of the plates by a native artist, Casheenath Mistree, deserves particular mention, as evincing the progress already made by the natives in the elegant and useful art of engraving on copper. That art they owe to the efforts of a member of this society, . . ."

৩

১৮১৮-১৯ সাল পর্য্যন্ত একাধিক সচিত্র পুস্তকের এবং দুই জন দেশীয় খোদাই-চিত্রশিল্পীর উল্লেখ পাইলাম। ১৮২০, সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া'র প্রথম সংখ্যায় "On the Native Press" শীর্ষক একটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ হইতে জানা যায়—তখনই অনেকগুলি পুস্তকে চিত্র সংযোজিত হওয়ায় তাহা সাধারণের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইয়াছিল। এই সকল চিত্র-খোদাইকারী শিল্পীরূপে উক্ত প্রবন্ধে হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় নামে আর এক জন কৃতী ব্যক্তির উল্লেখ আমরা পাই। 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'র কথাগুলি এখানে আংশিক উদ্ধৃত হইল ঃ

"Many of these works are accompanied with plates which add an amazing value to them in the opinion of the majority of native readers and purchasers. Both the design and execution of the plates have been exclusively the effort of a native genius; and had they been printed on less perishable materials than Patna Paper, the future Wests, and Lawrences and Wilkies of India might feel some pride in comparing their productions with the rude delineations with their barbaric fore-fathers. . . . They are in general intended to represent some powerful action of the story; and happy is it for the reader that this action of the hero or the heroine is mentioned at the foot of the plate; for without it the design would be unintelligible; the plates cost in general a gold mohur, designing, engraving and all; for in the infancy of this art, as of many others, one man is obliged to act many parts. Thus Mr. Huree Hur Banerjee, who lives at Jorasanko, performs all the requisite offices from the original outline, to the full completion . . . The plates which he and others have executed from European designs, have been tolerably accurate and not discreditable for neatness, . . ."

জোড়াসাঁকো-নিবাসী হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার মত আরও কেহ কেহ যে এই শিল্পে নিয়োজিত থাকিয়া দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, উপরের উদ্ধৃতিতে তাহার আভাস রহিয়াছে। তবে হরিহরের বিষয়েই এখানে বিশেষ ভাবে বলা হয়। তাঁহাকেই অঙ্কন, খোদাই সবই একা করিতে হইত। ইহার পর ক্রমে ক্রমে আরও পুস্তক এবং পত্রিকাদি চিত্রসহ প্রকাশের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। ১৮২২, ফেব্রুয়ারী হইতে পাদ্রী লসন এবং পাদ্রী ডবলিউ. এইচ. পীয়ার্সের যুগ্মসম্পাদনায় 'পশ্বাবলী' নামে একখানি মাসিক-পত্র প্রকাশিত হয়। প্রতি মাসে এক-একটি জন্তুর সম্বন্ধে আলোচনা থাকিত এবং সেই সেই জন্তুর প্রতিচিত্র ইহাতে

মুদ্রিত হইত। এই চিত্র খোদাই করিতেন পাদ্রী লসন স্বয়ং। প্রকাশ, তাঁহার নিকটে কোন কোন বঙ্গসন্তান এই শিল্প শিক্ষা করিয়াছিলেন। এ সময় হইতে আরও পুস্তক চিত্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকে, যথা: 'সঙ্গীততরঙ্গ'—প্রকাশকাল ১৮১৮, 'গৌরীবিলাস' ১৮২৪, 'বত্রিশ সিংহাসন'—১৮২৪, 'কালী কৈবল্যদায়িনী'—১৮৩৬, 'ভগবদ্গীতা'—১৮৩৬, প্রভৃতি। ১২৪২ ও ১২৪৩ বঙ্গাব্দে সচিত্র নূতন পঞ্জিকা বাহির হইল। উপরে তিন জন বাঙালী শিল্পীর নাম আমরা এ পর্য্যন্ত পাইয়াছি। তাঁহারা ব্যতীত বিশ্বম্ভর আচার্য্য, রামধন স্বর্ণকার, মাধবচন্দ্র দাস, রূপচাঁদ আচার্য্য, রামসাগর চক্রবর্ত্তী, বীরচন্দ্র দত্ত প্রমুখ আরও কয়েকজন শিল্পীর নাম পাওয়া যায়। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের সুবিখ্যাত কর্ম্মী মনোহর মিস্ত্রীর পুত্র কৃষ্ণ মিস্ত্রীও একজন সুনিপুণ তক্ষণশিল্পী রূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। এই সকল শিল্পী কাঠ-খোদাই এবং ধাতু-খোদাই উভয়প্রকার শিল্পকর্ম্মে পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা বিশেষ করিয়া দেব-দেবীর মূর্ত্তিই খোদাই করিতেন। তখন চিত্রশিল্পে নূতন পদ্ধতি বা ভাবধারা প্রবর্ত্তিত না হওয়ায় এ শিল্পেও গতানুগতিকতার ব্যতিক্রম তেমন লক্ষ্য করা যায় না।
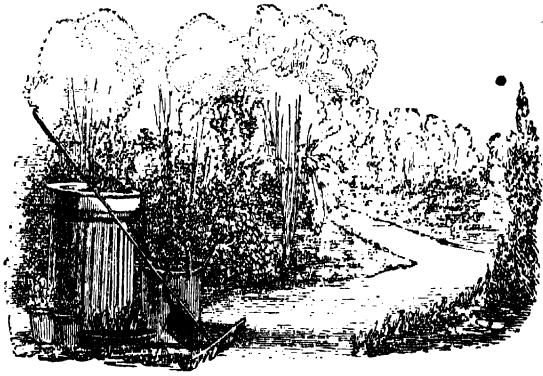
পুষ্পোদ্যান

[১৮৫৫ সনে প্রকাশিত *On Flowers and Flower-Garden* হইতে

—'অন্নদামঙ্গল', ১৮১৬

গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকের গোড়ায় এবং চতুর্থ দশকের শেষে আর্থিক বিপর্য্যয় উপস্থিত হওয়ায় কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির কার্য্য সঙ্কুচিত হইয়া যায়। ব্যক্তিগত ভাবে যাঁহারা পুস্তকাদি প্রকাশে লিপ্ত ছিলেন তাঁহারাও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। এজন্য পঞ্জিকা এবং স্বল্পসংখ্যক গ্রন্থ ও পত্রিকা ব্যতিরেকে তক্ষণশিল্পের ব্যাপক প্রয়োগ সম্ভব হয় নাই। ফলে এই শিল্পের উন্নতির পক্ষেও অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটে। এ সময় কলিকাতায় আর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল—নাম "Vernacular Literatue Committee" বা "বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ"। ইহার প্রতিষ্ঠাকাল—ডিসেম্বর ১৮৫০। এই সমাজের আনুকূল্যে পর বৎসর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় বিলাতের পেনী ম্যাগাজিনের আদর্শে 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' নামক সচিত্র মাসিক প্রকাশিত হইল। ইহাতে যে সব চিত্র মুদ্রিত হইত তাহার প্লেট আনা হইত লণ্ডন হইতে। বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের প্রধান উদ্যোগী বেথুন সাহেব প্রথম বৎসরেই বিলাত হইতে এরূপ প্রায় আশীখানা ব্লক আনাইয়াছিলেন। বাংলাদেশে তখনও কম মূল্যে দেব-দেবীর চিত্রাদি ব্যতীত অন্যান্য চিত্রের ব্লক করাইবার রেওয়াজ হয় নাই। ১৮৫১ সনে প্রকাশিত 'হরপার্ব্বতী-মঙ্গল'ও দেব-দেবীর চিত্র সমন্বিত।

৪

বাংলা দেশে দেশী-বিদেশী বিদগ্ধজনের মধ্যে তক্ষণ-শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে অনুভূত হইতে লাগিল। এই প্রয়োজন মিটাইতে আর একটি প্রতিষ্ঠান বিশেষ সহায়ক হয়। ১৮৫৪ সনের আগষ্ট মাসে শিল্পোন্নতি-সমাজের আনুকূল্যে 'School of Industrial Art' বা শিল্পবিদ্যালয় কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

দশভুজা

শিল্পী—বিশ্বম্ভর আচার্য, ১৮২৪

বর্ত্তমান 'গবর্নমেণ্ট কলেজ অফ আর্ট এণ্ড ক্র্যাফট্' বা কলা-মহাবিদ্যালয়ের পূর্ব্বজ এই শিল্পবিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের একজন প্রধান উদ্যোক্তা এবং প্রথম যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তিনি পূর্ব্বেই 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' সম্পাদনাকালে তক্ষণশিল্প-চর্চ্চার আবশ্যকতা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে তক্ষণ-শিল্প বা কাঠ-খোদাইয়ের কাজ ইহার একটি প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া ধার্য্য হইল। ধাতু খোদাইয়ের কাজও শিক্ষা দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষিত হইলেও এখানে বরাবর কাঠ-খোদাই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। বিলাত হইতে টি. এফ. ফাউলার নামক একজন বিখ্যাত তক্ষণশিল্পীকে এই বিষয়টি শিক্ষা দিবার জন্য আনানো হইল। ১৮৫৫ সনের মাঝামাঝি এ বিষয়ে যে সুষ্ঠুরূপে শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল, নিম্নের পত্রাংশ হইতে তাহা জানা যাইতেছে ঃ

"In the other hall were about 30 boys drawing and engraving on wood, under the direction of an able professor Mr. Fowler. I was much gratified at the skill evinced both by the pupils and the instructors of the Institution, the success of which during the short period of its establishment, in August 1854, is indeed wonderful." (*The Bengal Hurkaru and the India Gazette*, May 17, 1855).

শিল্পবিদ্যালয়ে তখন অধ্যাপক ফাউলারের নিকট ত্রিশ জন ছাত্র তক্ষণশিল্প শিক্ষায় রত ছিলেন। বাহির হইতেও

এই বিভাগ তক্ষণকার্য্যের 'অর্ডার' গ্রহণ করিতেন। ইহার বাবদে যে মূল্য পাওয়া যাইত তাহার এক অংশ কমিশন-স্বরূপ শিক্ষার্থী ছাত্রেরাও পাইতেন। এইরূপ ব্যবস্থা থাকার দরুন ছাত্রগণ বিশেষ মনোযোগের সহিত তক্ষণশিল্প স্বল্পসময়ে আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেন। একটি ব্যাপারে শীঘ্রই ইহার প্রমাণ পাওয়া গেল। ১৮৫৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে তৎকালীন হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ সুকবি ও সুপণ্ডিত ডি. এল. রিচার্ডসনের *On Flowers and Flower-Gardens* শীর্ষক একখানি পুস্তক কলিকাতায় মুদ্রিত হয়। এই পুস্তকের জন্য কয়েকখানি কাঠ খোদাই ডিজাইনও ব্লক করিয়া দেন শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্রেরা। পুস্তক-প্রকাশের পূর্ব্বেই ছাত্রদের এতাদৃশ কৃতিত্বের কথা সংবাদপত্রের স্তম্ভে ঘোষিত হয়। এখানে এই সংবাদটিও উদ্ধৃত করিতেছি:

জগদ্ধাত্রী

শিল্পী—রামধন স্বর্ণকার, ১২৪৩ বঙ্গাব্দ

"The employment of Mr. Fowler has done eminent benefit to the School of Industrial Art. Several of his pupils have so improved that the wood-cuts that will adorn the pages of the work of Capt. L. L. Richardson *On Flowers and Flower-Gardens* have for the most part been prepared for them. From our knowledge of the performance we are able to say that they have been neatly executed, and reflect much credit on pupils and instructors." (Quoted from *The Citizen* in *The Bengal Hurkaru*, etc., for July 5, 1855.)

৫

শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর বা শিক্ষা-অধিকর্ত্তার নির্দ্দেশে এই সময় যে *Æsop's fables* (ঈশপের গল্প) প্রকাশিত হয় তাহার কাঠ-খোদাই চিত্রগুলিও শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা করানো হইল। ছাত্রদের কাজে নৈপুণ্য হেতু বাহির হইতেও বিভিন্ন ব্যবসায় এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠান তাহাদের নিজ নিজ প্রয়োজনমত চিত্রের কাঠ-খোদাইয়ের অর্ডার দিতে থাকে। এই বিভাগ সত্বর একটি অর্থাগমের উপায় হইয়া দাঁড়াইল। দুই-তিন বৎসরের মধ্যে তক্ষণশিল্পে বিদ্যালয়ের সুনাম অধিকতর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। প্রতি বৎসর পরীক্ষা গ্রহণান্তে সাধারণ সভা করিয়া উৎকৃষ্ট ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ করা হইত। এইরূপ একটি পুরস্কার-বিতরণী সভার পূর্ণ বিবরণ ১৮৫৮, ১৩ই সেপ্টেম্বর সংখ্যার 'বেঙ্গল হরকরা'য় পাইয়াছি। কলিকাতা টাউনহলে সুপ্রীমকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি সার আর্থার বুলারের পৌরোহিত্যে এই পুরস্কার-বিতরণ-উৎসব সম্পন্ন হয় ঐ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর। তক্ষণশিল্পে পারদর্শিতা দেখাইয়া এই শ্রেণীর ছাত্র কালিদাস পাল প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। দ্বিতীয় পুরস্কার পান এই শ্রেণীর নিমাইচরণ শেঠ। নিমাইচরণ দাস এবং প্রসন্নকুমার রায়কে নৈপুণ্যের নিদর্শন স্বরূপ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। সভাপতি বুলার শিল্পবিদ্যার বিভিন্ন শাখার অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়া একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি হইতে তক্ষণশিল্প বিষয়ক অংশ এখানে দিলাম:

"The inconvenience of having no one here who

could engrave on wood has long been experienced by every person engaged in scientific pursuits, and they had heretofore no alternative but to do without illustrations altogether, which would simply render their works unintelligible, or to submit to the delay and expense to an artist at home. But now, the Engineer's Journal is brought to this School for its engravings. Mr. Oldham, the Geologist, thankfully accepts its aid; and here too come in daily increasing numbers, the tradesmen who want to decorate their advertisements and to give a crowning alterations to their periodical puffs. But it is to the native portion of the community that this art should have its peculiar charm. European children are born as it were with picture books in their hands, and from the moment almost of their being able to discern external objects become familiar with pictorial art. But native children have ordinarily no such advantage, and this no doubt is the principal reason of their growing up even to manhood with such ridiculously confused notions of shape and form. But in a few years this School might turn out a set of wood-engravers who would provide picture-books for every child and adult in Bengal, and I doubt not that future generations would give rapid proof of the benefit of this unconscious instruction. You may form some idea of the perfection to which this art may hereafter be brought from these specimens of what the pupils have been able to turn out after a few months' teaching."*

উপরি-উদ্ধৃত অংশে সভাপতি বুলার এই মর্ম্মে বলেন যে, এ যাবৎ পুস্তকে বা পত্রিকায় চিত্রের প্রতিলিপি মুদ্রণ একরূপ অসম্ভব ছিল। শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর হইতে এই অভাব অনেকটা দূরীভূত হইয়াছে। এখন 'ইঞ্জিনীয়ার্স জর্ন্যাল' চিত্রিত হয় এখানকার কাঠ-খোদাই কাজের দৌলতে। ভূতত্ত্ববিদ্ ওল্‌ডহাম ভূতত্ত্ববিষয়ক চিত্রাদি প্রকাশে এস্থান হইতে সাহায্য লইয়া থাকেন। কিন্তু এ বিদ্যার উন্নতি হইতে এখনও অনেক বাকী, ইউরোপে শিশু-পাঠ্য পুস্তক কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়া থাকে! ওখানকার বালকেরা শৈশব হইতেই রং ও রূপের বাহার অনুভব করে। এই অনুভূতি হইতে ভারতীয় শিশুরা বঞ্চিত। বুলার এই আশা পোষণ করেন যে, হয়ত সেদিন দূরে নয় যখন বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তক্ষণশিল্পে সুনিপুণ হইয়া এই দিকের অভাবও নিরাকৃত করিতে সমর্থ হইবেন।

* *The Bengal Hurkaru*, etc., September 13, 1858.

ইহার পরও বহু বৎসর যাবৎ কলিকাতার শিল্পবিদ্যালয়ে তক্ষণশিল্প ব্যবসায়গত ভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। পঞ্চম দশকের শেষ ভাগ হইতে বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রিকা দেশীয় তক্ষণশিল্পীদের কাঠ-খোদাই চিত্রে বেশী করিয়া চিত্রিত হইতে দেখিতে পাই।

৬

ভারতীয় অন্যান্য শিল্পবিদ্যালয়েও তক্ষণশিল্প শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল। এই বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া বহু যুবক জীবিকার উপায়স্বরূপ এই শিল্পবৃত্তি গ্রহণ করিতে থাকেন। প্রমথনাথ বসু ১৮৯৪ সন নাগাদ লিখিয়াছেন:

"Of late years wood-engraving has made considerable progress in large towns. The reading public has learnt to appreciate illustrated books and magazines, and the demand for wood-cuts is increasing year by year. The men engaged in the work are mostly ex-students of the schools of Art, and the work they execute, when done with care, is not inferior to what is done in Europe. This industry may be recovered as one solely due to English influence."*

এখানে তক্ষণশিল্প বা কাঠ-খোদাই কাজের কথা বিশেষ করিয়া বলা হইল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই যে কোন কোন বঙ্গসন্তান ধাতু-খোদাই চিত্রেও পারদর্শী হইয়াছিলেন, আগেই আমরা তাহা জানিতে পারিয়াছি। বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া না হইলেও, ব্যক্তিগত ভাবে কেহ কেহ এই বিভাগটিও জীয়াইয়া রাখিয়াছিলেন। ইদানীন্তন কালে ধাতু-খোদাই চিত্রেরই বহুল প্রচলন, এবং তাহাই ক্রমশঃ উৎকর্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছে। শত শত লোক আজ এই শিল্পের দ্বারা জীবিকার সংস্থান করিয়া লইতেছেন। অধুনা শিল্পবিদ্যালয়ে কাঠ-খোদাই চিত্রের রচনা বা শিল্পের রীতিপদ্ধতিই শেখানো হইয়া থাকে, খোদাই বা ব্লক তৈরির কাজ এখন প্রায়ই শেখানো হয় না। গত শতাব্দীতে পুস্তক ও পত্রিকা মুদ্রণের সঙ্গে সঙ্গে যে শিল্পের সূচনা, আজ তাহা আশ্চর্য্য উন্নতিলাভ করিয়াছে। আর্থার বুলারের আকাঙ্ক্ষা এবং আশাও অক্ষরে অক্ষরে ফলিতে চলিয়াছে। ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নহে।

* *A History of Hindu Civilization Under British Rule*, Vol. II, p. 229, 1894.

গান্ধীজী ও পল্লী-সভ্যতা

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীতে দুর্ব্বলের কোন স্থান নেই। বসুন্ধরা বীরভোগ্যা। শক্তির—পশুশক্তির নয়, আত্মিক শক্তির সাহায্যেই আমরা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করেছি। এবার অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং নৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জনের পালা দেশের লাখো লাখো তমসাচ্ছন্ন পল্লীর জন্যে। এই স্বাধীনতা অর্জ্জনও শক্তিসাপেক্ষ। ভারতবর্ষ যদি পেট ভরে পুষ্টিকর খাদ্য খেতে পায় তবেই সে আবার শক্তিমান হয়ে উঠবে। ভারতের যে আজ এত দুর্গতি—তার মূলে অন্নাভাব। শরীরের সঙ্গে মনের সম্পর্ক অত্যন্ত নিকট। সুসম খাদ্যের অভাবে আমাদের দুর্ব্বল মস্তিষ্ক ঠিক মত চিন্তাও করতে পারে না।

এই খাদ্য যাদের পরিশ্রমে উৎপন্ন হয় তারা সহরের লোক নয়, গ্রামের লোক। সুতরাং পল্লীর মানুষের শ্রমের উপরে নির্ভর করে সমাজের সমস্ত শক্তি এবং স্বাস্থ্য, না, সমাজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত। যে দেশের প্রাণবন্ত চাষীরা গ্রাম্য উপজীবিকায় পরিতৃপ্ত থেকে পল্লীর মাটিতে বসবাস করছে সে দেশকে কখনও দুর্ভাগা বলা যেতে পারে না। পক্ষান্তরে যে দেশে চাষীরা গ্রাম্য জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে শহরের দিকে ধাওয়া করেছে সে দেশ নিশ্চয়ই অভিশপ্ত। তার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আকাশচুম্বী অট্টালিকার আড়ম্বর পোকায় খাওয়া ফলের বাহিরের রক্তিমার মত।

গ্রামের লোকের পরিশ্রমে কি শুধু খাদ্যশস্যই উৎপন্ন হয়? ছোট-বড় শিল্পের জন্য যে কাঁচা মালের প্রয়োজন—তারও সৃষ্টি চাষীর পরিশ্রম থেকে। আর একটা কথা। আমাদের এই কৃষিপ্রধান দেশে শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ লোক কৃষিজীবী। এমতাবস্থায় আমাদের দেশের আগামী কালের অর্থনৈতিক ভাগ্য যার উপরে নির্ভর করছে সে হচ্ছে ভূমি আর চাষ-আবাদ। জমি আর কৃষিই হচ্ছে আমাদের দেশের সম্পদের মূল ভিত্তি। এখানে আর একটা কথার উল্লেক থাকা প্রয়োজন। তৈরী মাল হোক অথবা যে কোন মালই হোক—তাদের খরিদ্দার হ'ল বেশীর ভাগ গ্রামেরই লোক। সুতরাং আগামী দিনগুলিতে আমাদের সমস্ত মন দিয়ে চেষ্টা করতে হবে যাতে গ্রামবাসীদের মঙ্গল হয়, যাতে তাদের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, যাতে তারা মানুষের মত বাঁচতে পারে।

এর জন্যে দরকার এমন ভাবে গ্রাম্য জীবনকে সংগঠিত করা যাতে গ্রামবাসীরা নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র গ্রামেই তৈরী করে নিতে পারে। কেবল নিজেদের প্রয়োজনমত খাদ্য এবং অন্যান্য সামগ্রী তৈরী করে ক্ষান্ত থাকলেই হবে না। শহরগুলিকেও বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন আছে। গ্রামবাসীদের আরও কিছু অতিরিক্ত দ্রব্যসম্ভার উৎপাদন করতে হবে শহরবাসীদের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে। বাঁচবার জন্যে যে-সব জিনিসের প্রয়োজন আছে সেগুলোকে তৈরী করবার জন্যে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের উপরে জোর দেওয়া কোন কাজের কথা নয়—এই কথাটি গান্ধীজীর নানা লেখার মধ্যে আমরা খুঁজে পাই। জীবনসায়াহ্নে গান্ধীজী একখানি ছোট পুস্তিকা লিখেছিলেন গঠনকর্ম্ম সম্পর্কে। এই পুস্তিকাখানিতে খাদির তাৎপর্য্য সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে তার মধ্যে আছে:

"খাদির পূর্ণ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করে তবে একে গ্রহণ করতে হবে। পরিপূর্ণ স্বদেশী মনোভাবের প্রতীক হ'ল খাদি। বাঁচতে গেলে যা যা দরকার সবকিছু ভারতেই তৈরী হবে এবং সেগুলি তৈরী হবে গ্রামবাসীদের পরিশ্রমে এবং বুদ্ধিবলে—এই সঙ্কল্পেরই প্রকাশ খাদির মধ্যে।"

এখানে শহরের উপরে নয়, গ্রামের উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। খাদির আলোচনাপ্রসঙ্গে পুনরায় লিখছেন:

"খাদি-মনোভাব মানে বাঁচার জন্যে যা যা প্রয়োজনীয় সে সকলের উৎপাদনে এবং বন্টনে বিকেন্দ্রীকরণের নীতির অনুসরণ। প্রতিটি পল্লী তৈরী করবে তার প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী এবং সেগুলি ব্যবহারও করবে। অতিরিক্ত আরও কিছু তৈরী করবে শহরগুলির প্রয়োজন মেটাবার জন্যে।"

এখানে দেখতে পাই গান্ধীজী গ্রামকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে শহরকে একেবারে উপেক্ষা করেন নি। তবে এ কথা ঠিক যে তাঁর স্বরাজের পরিকল্পনায় শহরগুলিকে অতিক্রম করে আছে গ্রাম। শহর থাকবে গ্রামের পরিচর্য্যার জন্যে। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথারও উল্লেখ থাকা দরকার। কুটিরশিল্পকে নিশ্চয়ই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন কিন্তু বৃহৎ শিল্পকেও তার প্রাপ্য মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হন নি। জাতির সম্পদ বাড়ানোর জন্যে বিদ্যুতের শক্তিকে কাজে লাগানো দরকার—এ কথা বার বার তিনি বলেছেন। বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন কুটীরশিল্পের সাহায্যে সম্ভব নয়। আসলে গান্ধীজীর মধ্যে কোনরকমের গোঁড়ামি ছিল না। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমস্ত মানুষের কল্যাণ ছিল তাঁর লক্ষ্য। সেই কল্যাণের পথে যা কিছু সহায় হবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন তাকেই গ্রহণ করবার মত সত্যানুরাগ ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সমস্ত আদর্শেরই তিনি যাচাই করতেন লোক-সেবার কষ্টিপাথরে। কুটির-শিল্পের দ্বারা যেখানে জাতির কল্যাণের পথ প্রশস্ত হবে সেখানে কুটিরশিল্পই প্রাধান্য পাবে; সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্যে যেখানে বৃহৎশিল্পের প্রয়োজন আছে সেখানে বৃহৎশিল্পকে নিশ্চয়ই গ্রহণ করতে হবে।

গ্রামীণ সভ্যতাকে গৌরবের মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এ যুগের বৃহত্তম প্রয়োজন—এই বিরাট সত্যে গান্ধীজীর মনে অণুমাত্র সংশয় ছিল না। দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী, তাদের শ্রমের উপর নির্ভর করে সমাজের অস্তিত্ব, জাতির সম্পদ। সুতরাং

যেখানে তাদের মঙ্গল নেই সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নেই। এই অকাট্য যুক্তির দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে বহু বৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে গ্রামকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। গান্ধীজী এই ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্রেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন।

পল্লী-সভ্যতার উপরে গান্ধীজী এতখানি যে জোর দিয়েছেন তার একটা বড় কারণ আছে। মাটি আমাদের সকলের মা। প্রকৃতির কাছ থেকে আমরা সংগ্রহ করি আমাদের জীবন-রস। যেখানে প্রচুর রৌদ্রালোক নেই, নির্ম্মল বাতাস নেই সেখানে আমাদের জীবন কি শুকিয়ে যায় না? জাতির প্রাণের উৎস, স্বাস্থ্যের উৎস তাই গ্রাম। মানুষের সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে গান্ধীজী দিতে চেয়েছেন একটা নূতন রূপ। নীল নির্ম্মল আকাশের নীচে সবুজ বনানীঘেরা প্রান্তরের মধ্যে ছোট ছোট স্বাবলম্বী গ্রাম—গান্ধীজীর মনে ছিল স্বরাজের এই লোভনীয় ছবি। এই ছবিকে জাতির জীবনে মূর্ত্ত করে তুলবার সাধনা ছিল তাঁর জীবনব্রত। আমাদের এই সভ্যতাকে তিনি দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন সেখানে যেখানে রৌদ্রালোকিত আকাশে ভেসে চলেছে সাদা সাদা মেঘ, যেখানে বাতাসে মধু, বনে বনে মর্ম্মরধ্বনি, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে স্নিগ্ধ শ্যামলিমা। নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশের প্রশান্তি, সমুদ্রের সীমাহীন বিস্তার আমাদের চিত্তকে মুক্তি দেয় প্রাত্যহিক তুচ্ছতার বন্ধন থেকে, তাকে প্রসারিত করে দেয় দিক থেকে দিগন্তরে বিরাটের মধ্যে। মার্কিন কবি হুইটম্যান গেয়েছিলেন:

'এখন আমি জানতে পেরেছি শ্রেষ্ঠ মানুষ তৈরির রহস্যকে। সে রহস্য মুক্ত বাতাসের মধ্যে মাটির কাছাকাছি বাস করা।'

এ যুগের রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে গান্ধীজীই বোধহয় একমাত্র ব্যক্তি যিনি মানুষের মনে দিয়েছেন একটা নূতনতর সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছবি। এই সভ্যতা শহুরে সভ্যতা নয়, গ্রামীণ-সভ্যতা। এই সংস্কৃতির মূল গ্রামের মাটিতে, বিকাশ মুক্ত প্রকৃতির আনন্দময় বিস্তারের মধ্যে। আসলে গান্ধীজীর মন ছিল রূপশিল্পীর মন। সেই মনকে জুড়ে ছিল সুন্দরের স্বপ্ন। বিলাতে তখন তিনি গিয়েছেন গোলটেবিল বৈঠকে। এক মেমসাহেব তাঁর ছবি আঁকছেন। তুলিটা তাঁর কাছ থেকে নিয়ে ছবির নীচে গান্ধীজী লিখলেন: 'আমিও একজন পটুয়া। আমার পটভূমি ভারতবর্ষ।' গ্রামময় ভারতের জয় হোক।

উপসংহারে এই কথা বলতে চাই যে, আমাদের এই কৃষিপ্রধান দেশে শিল্পকে তার মূল্য দিতেই হবে—কিন্তু আরও বেশী মূল্য দিতে হবে কৃষিকে। কৃষির স্বচ্ছন্দ গতিকে অব্যাহত রেখে তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে শিল্পকে। বৃহৎ শিল্পেরও প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার আয়তনের এবং আওয়াজের বিপুলত্বের দ্বারা অভিভূত হয়ে কৃষিকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখলে আমরা আত্ম-হত্যার পথে এগিয়ে যাব। লাঙ্গলের পিছনে যে মানুষটি আছে দাঁড়িয়ে, ভারতীয় জীবননাট্যে রঙ্গমঞ্চের কেন্দ্রকে অধিকার করে আছে সে। তাকে নেপথ্যের অনাদরের মধ্যে রেখে যা কিছু আমরা গড়তে যাব তা হবে বালুকার উপরে ইমারত গড়ার চেষ্টার মত একটা বিরাট পণ্ডশ্রম। প্রকৃতির সঙ্গে জীবন্ত যোগ রেখে পল্লী-সভ্যতাকে গড়ে তোলাই যে এ যুগের বৃহত্তম প্রয়োজন—এ কথা পাশ্চাত্ত্যের মনীষীদেরও অনেকে আজ স্বীকার করেছেন। মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, প্রকৃতির কোল থেকে দূরে গিয়ে বিরাট জনাকীর্ণ শহরের মধ্যে পাশ্চাত্ত্যের প্রাণ আজ হাঁপিয়ে উঠেছে। নাগরিকদের জীবনের উপরে শহুরে সভ্যতার বিষময় প্রভাব আজ স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে পাশ্চাত্ত্যের চিন্তাবীরদের কাছে। মার্কিন ঔপন্যাসিক সিনক্লেয়ার লুইসের 'ব্যাবিট', আইরিস কবি ও দার্শনিক A. E.'র The National Being, ইংরেজ কবি এডওয়ার্ড কার্পেন্টারের রচনা—এদের মধ্যে যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে তা প্রণিধান-যোগ্য। গান্ধীজীর লেখার মধ্যে একই সুর। এইজন্যে পল্লী-সভ্যতার উপরে গান্ধীজীর গুরুত্ব আরোপের মধ্যে যাঁরা প্রগতিশীল মনের কোন পরিচয় দেখতে পান না, তাঁরা নিজেরা কতখানি প্রগতিশীল তা ভাববার কথা।

অভয়ের গান

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

শুনেছি শুনেছি আমি নূতনের অপূর্ব্ব আহ্বান।
ব্রহ্মাস্ত্র-নির্ম্মাণে ব্যগ্র দেশে দেশে আজি বৈজ্ঞানিক,
জ্ঞানহারা, পথভ্রান্ত, ভুলে গেছে তারা দিগ্বিদিক,
সৃষ্টির দুয়ারে বসি' করিতেছে মৃত্যুর সন্ধান।
বিশ্বের প্রলয়-অগ্নি প্রজ্জ্বালনে নিয়োজিত জ্ঞান;
শত্রুমিত্র-নির্ব্বিশেষে গ্রাসিবে সে, হায় মূঢ়, ধিক,
প্রাণের তপস্যা ত্যজি' এ-সাধনা কেন দানবিক?
নিষ্ঠুর হিংসার পায় মানবত্বে দিবে বলিদান?

আত্মা জয়ী, মৃত্যু নয়। শোন শোন জীবন-সঙ্গীত?
এ জগৎ প্রাণময়, নাহি ভয়, নাহি তার ক্ষয়,
মানব অমৃতপুত্র, ফিরে পাবে সে দিব্য সম্বিৎ,
তমসা অনিত্য, সেথা দেখা দেবে চিরজ্যোতির্ম্ময়।
হে কবি, জীবন-যজ্ঞে তুমি আজ হও পুরোহিত,
নূতন আহ্বান করে, বল জয়—জীবনের জয়!

তড়িৎ-লতা

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
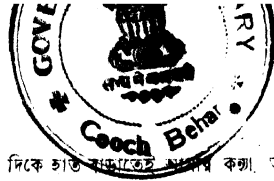
আজ প্রায় ত্রিশ বছর পরেও বিনুদাকে ভুলতে পারলাম না। জীবনের এই দীর্ঘদিনের অন্তরালে আমার পরিবর্ত্তন হয়েছে অনেক। তখন ছিলাম ছাত্র, পরে হলাম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট—ইংরেজ আমলে ভারতীয় হয়ে গৌরীশৃঙ্গ-আরোহণ বলতে হয়। এখনও অবসর-গ্রহণের সময় হয়ে যাওয়ার পরও এক্সটেনসন পেয়ে চাকুরীতে বহাল আছি। তারপর থেকে কত সহযাত্রী পেয়েছি, কত হারিয়েছি অন্ত নেই! তাদের কেউ বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে ডুবে গেছে, অনেকের স্মৃতি আবার মেঘলা দিনের মত ঘোলাটে হয়ে আছে। কিন্তু ঐ যে সৌম্য, শান্ত, শক্ত চোয়ালওয়ালা মানুষটা বিনুদা—সে কিন্তু আজও আমার মনে রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিবার মতই আপন গরিমায় উদ্ভাসিত!

ভুলব কি করে—এমন মানুষ কি ভোলা যায়! আমি ভোগের মাঝ গাঙ্গে। পদ-গৌরব, মান-সম্মান, লোকের খোশামোদ, দাস-দাসী, ঘর উজল করে আছেন সুন্দরী স্ত্রী, ভরে আছে পুত্রকন্যা—সম্প্রতি জুটেছে এক নাতি শৈশবের সবটুকু আনন্দ নিয়ে! লোকে বলে আমার সবটুকুই লাভের ঘরে, আমার সুখের জীবনে এখনও জোয়ারই চলছে, অর্থাৎ ভাটার চিহ্নমাত্রও নাকি নেই! অনেক শুনে শুনে আমার মনেও তাই প্রতীয়মান হচ্ছে।

আর বিনুদা সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী—যিনি দেশকে সত্যিকার ভালবেসে নিজের সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়েছেন; কোন ক্ষোভ নেই, কোন নালিশ নেই। মহৎ আদর্শের জন্য দুঃখকে মহা আনন্দে রূপায়িত করবার এক অপূর্ব্ব জ্যোতি দেখেছি বিনুদার আয়ত ঐ চোখ দুটিতে।

একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে নিজেকে তিনি বিলুপ্ত করে গেছেন। যে নামটুকুর উপর লোভ ভোগৈশ্বর্য্য ত্যাগের পরেও মানুষের মনে জেগে থাকে, যার লোভে কত দুর্জ্জয় সাহসের কাজ, এমন কি নিশ্চিত মরণ পর্য্যন্ত বরণ করে নেয়, সেই নামটুকুকেও তিনি নিজেই মুছে নিয়ে গেছেন। তিনি অনামা, অখ্যাত ও অজ্ঞাত জীবনই চিরটা কাল যাপন করে গেছেন।

কাগজ কলম নিয়ে বসেছি পুরানো কথা—বিনুদার কথা লিখব এমন সময় আমার কন্যা তার শিশুপুত্রটিকে কোলে নিয়ে এসেই বললে—"বাবা স্নান করবে না? বেলা গেল যে!"

তৎক্ষণাৎ লালাবাবুর কথা মনে পড়ে গেল। মেয়ের মুখে এই রকম একটা কথা শুনে তার মনে বৈরাগ্য এল, তিনি সকল ঐশ্বর্য্য ছেড়ে, গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবন চলে গেলেন। কিন্তু এই কথাটাই আমাকে আমার বিগত জীবনের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে লজ্জা দিয়ে গেল। আমি মনে মনে বললাম—"মা, বেলা আমার আগেই বয়ে গেছে। তাকে আর ফিরে পাব না।" "যাচ্ছি মা," বলে খোকার দিকে হাত বাড়াতেই আমার কন্যা তার পুত্রকে আমার সম্মুখে ধরলে। খোকা আমার দিকে তাকাল না, সামনে কাগজ আর কালির দোয়াত তাকে আকর্ষণ করল। কম্পিত হস্তে কাগজ দুমড়ে দুই হাতে মুড়ে,দোয়াতটা উল্টে দিয়ে টেবিলময় কালি ছড়িয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল। মনে মনে হাসি পেল—বিধাতাও বুঝি চান না বিনুদার স্মৃতি থাক এই পৃথিবীর বুকে।

বিনুদার কথা বলতে গিয়ে নিজের কথাই দেখি লিখতে বসে গেলাম। চিরটা কাল নিজের কথাই ভাবলাম, তাই এখন সুখের ভারে নুয়ে পড়েছি, দুঃখের গৌরবের সন্ধান পেয়েও হারিয়েছি।

বিনুদার সঙ্গে আমি একই ক্লাশে পড়তাম। ফি বছর তিনিই প্রথম হতেন, আমিও মোটামুটি ভাল ছাত্রই ছিলাম। তিনি আমার চেয়ে বয়সে একটু বড় ছিলেন।

একবার মনে আছে বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী সভায় তিনি অনেকগুলি বই পেলেন। সেবার আমিও পেয়েছিলাম কয়েকটা বই। উৎসব-শেষে আমরা দুজন একসঙ্গেই বাড়ী ফিরছিলাম। একটু নির্জ্জন পথে আসতেই দেখলাম তিনি পুরস্কারের কথা লেখা পাতা-গুলি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। মুখে তিনি কিছুই বললেন না। পরে দেখলাম বইগুলো জন দুই ছাত্রের পাঠ্যপুস্তকে পরিণত হয়েছে। এমনিতর ভালমানুষি আর তাকে গোপন করবার চেষ্টা এক এক সময় অত্যন্ত অসহ্য বোধ হ'ত! কখনও সিদ্ধান্ত করতাম আসলে ওটা একান্তই ভণ্ডামি আর নয় ত তিনি একটি আকাট মূর্খ! এ জন্য তাঁর মনে আঘাত দিতে একটুও ত্রুটি করি নি, তাঁর মূর্খতা প্রতিপন্ন করবার জন্য চেষ্টাও কম করি নি। কিন্তু এত সমালোচনা যাঁকে নিয়ে তাঁর এ বিষয়ে কোন মাথাব্যথা দেখি নি। পাথরে মাথা খোঁড়বার মতই আমাদের এই আক্রোশ ব্যর্থ হ'ত! লাভ হ'ত এই যে তাঁর নিঃশব্দ ক্ষমা আমাদের ক্রোধ শতগুণ বাড়িয়ে তুলত!

২

তখন স্বদেশী আন্দোলনে দেশ প্লাবিত। বন্দেমাতরম্ আর বিদেশী পণ্যবর্জ্জনের ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত। বিলিতী বস্ত্রের অগ্নিতে ভাবী মুক্ত ভারতের আকাশ উদ্ভাসিত। স্কুল-কলেজের ছেলেরা এবং প্রধানতঃ যুবসমাজ এর পুরোভাগে। চারিদিকে সভাসমিতি, বক্তৃতা, পিকেটিং, কারাবরণ।

আমাদের বিদ্যালয়ে ছেলেদের সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ করা হ'ল এই ব[illegible]সে সবাইকে এক প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করতে হবে যার [illegible] হ'ল এই যে বিদেশী দ্রব্য কদাচ ব্যবহার করব না।

কাড়াকাড়ি পড়ে গেল কে কার আগে দস্তখত করবে। বিনুদা

সভায় এক কোণে এতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সকলের দস্তখত শেষ হওয়ার পরও তাকে এগোতে দেখলাম না। তারপর সভার কর্তৃপক্ষ তাঁকে ডাকল দস্তখত করতে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে তিনি গম্ভীর মুখে না করলেন এবং বললেন "বিদেশী দ্রব্য কদাচ ব্যবহার করব না," এই প্রতিজ্ঞা পালন করা সম্ভব হবে না। কয়েক মুহূর্তের জন্য সবাই একটু আশ্চর্য্য হয়েছিল, কিন্তু তা ঐ ক্ষণটুকুর জন্যই! অচিরেই যে ধিক্কার, টিটকারী, উপহাস ও লাঞ্ছনা বর্ষিত হয়েছিল বিনুদার উপর, তা সেদিন উপভোগ করেছিলাম সত্য, কিন্তু পরে তার জন্য নিজের মনেই লজ্জিত হয়েছি একান্ত ভাবে।

যারা হুজুগের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয় তারা নীরব ব্রতীর নিষ্ঠাকে বুঝতেও পারে না —বুঝতে চায়ও না। একটু হুঁস থাকলে জানতে পারতাম বিনুদা বিলিতী দ্রব্য সাধ্যমত ব্যবহার করতেন না —বিলিতী বস্ত্র ত একেবারেই নয়। তাই বিনুদার চেহারায় কোন গ্লানিই দেখতে পাই নি। যে লোক পরোপকারী, দুঃখ-বেদনা ঘোচাতে যে লোক নিজের সবকিছু হাসিমুখে বিসর্জ্জন দিতে পারে, সে কেন বাহ্যাড়ম্বর এমনি করে এড়িয়ে চলে সে রহস্যজাল আজও ভেদ করতে পারলাম না।

লাঙ্গলবন্ধে স্নানযাত্রা উপলক্ষে মেলা বসত। লক্ষাধিক লোক আসত দূরদূরান্তর থেকে সেই মেলায়। পুণ্যকামী সরলপ্রাণ নরনারী তখন যে কতভাবে লাঞ্ছনা ভোগ করত তার ইয়ত্তা নেই—ঠগ, জোচ্চোর, পকেটমার, নিদারুণ অব্যবস্থা, তার উপর অসুখ-বিসুখের ত কথাই নেই! সেকালের পুলিসের শান্তিরক্ষার ব্যবস্থায় লোকের অশান্তি আরও বাড়িয়ে তুলত।

সেবার স্নানযাত্রা উপলক্ষে আমাদের বিদ্যালয়ে সভা করে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠিত হ'ল। স্বেচ্ছাসেবক হ'ল অনেক। বিনুদাকে অনুরোধ করা হ'ল, তিনি রাজী হলেন না। লোকচক্ষে তিনি আর এক ধাপ নেমে গেলেন। কিন্তু আমরা সেখানে গিয়ে ক্যাম্প পেতে দেখলাম আমাদের আগেই বিনুদা এসে উপস্থিত এবং এসেই তিনি স্নানযাত্রীদের নিয়ে ব্যস্ত।

সেই থেকে মেলা একেবারে ভেঙ্গে যাওয়ার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিনুদার যে কর্ম্মশক্তি দেখলাম তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না।

মেলাশেষে পত্রিকার ফটোগ্রাফার এলেন আমাদের ছবি তুলতে। কাগজে ছবি উঠবে, লক্ষ লক্ষ লোক তা দেখবে; তাই ভেবে আনন্দে, গৌরবে বুকের ছাতি দশ হাত ফুলে উঠল! সবাই সারবন্দী দাঁড়িয়ে গেলাম। কিন্তু বিনুদা এলেন না, অনুরোধ করতে তিনি বললেন—"না ভাই, আমি ত আর স্বেচ্ছাসেবকের তালিকাভুক্ত নই, আমার যাওয়া ঠিক নয়।"

বিনুদা কি মানুষ!

প্রায় সমবয়সী হয়েও বিনুদাকে বুঝতে পারি নি। অথচ তাঁর উপর যত আক্রোশই থাকুক না কেন তাঁর আকর্ষণ কখনও উপেক্ষা করতে পারি নি।

তিনি লোক এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু লক্ষ্য করেছি কয়েকটি ছেলে তাঁর বিশেষ অনুগত। আশ্চর্য্য এই যে এদের মধ্যে ছিল অনেক উঁচু ক্লাসের ছেলে। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম—এরা বিনুদার কথায় এমনি বাধ্য যে তাঁর হুকুম পেলে পিতামাতার আদেশ অমান্য করতেও এরা কুণ্ঠিত হ'ত না। বিনুদার আদেশ পালন করতে গিয়ে বিদ্যালয়ের কোন শাস্তিভোগকেই এরা শাস্তি মনে করত না।

আমার সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে আনুগত্য। তারই ফলে আমি ক্রমশঃই তাঁর প্রভাবের আওতায় গিয়ে পড়লাম। অনেক অনিচ্ছা এবং দোষ-ত্রুটিও আমাকে সেই প্রভাব হতে রক্ষা করতে পারে নি!

আমাদের বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণের এক কোণে ছিল একটা মস্ত অশ্বত্থ গাছ। তারই নীচে বসত ওদের আড্ডা। পাঠ্যপুস্তকের বাইরের বই নিয়েই ছিল ওদের বেশী আলোচনা। অনেক দিন দেখেছি বই ছাড়াও ওদের আলোচনা চলছে।

বাইরের বড় একটা কেউ ওদের আড্ডায় যেত না এবং ওরাও নিত না। তবে আমি ও আর দুই একটি ছেলে মাঝে মাঝে যেতাম। আমাকে কখনও বারণ করে নি।

রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, বঙ্কিমচন্দ্র এবং স্বামী বিবেকানন্দের পুস্তকাবলী ও এই সঙ্গে বিভিন্ন দেশের স্বদেশহিতৈষী মহাত্মাদের জীবনী, যুগযুগান্তের মহৎ নরনারী ছিল ওদের আলোচ্য। লোকহিতার্থে কে কোথায় আত্মোৎসর্গ করেছে, কে আশ্রিতের রক্ষায় নিজেকে বলি দিতে কুণ্ঠিত হয় নি, কুন্তী কিরূপে অপরের প্রাণরক্ষার্থে নিজের পুত্রকে রাক্ষসের মুখে পাঠিয়েছিলেন, শিবিরাজা কিরূপে একটা কপোতের প্রাণের বিনিময়ে নিজ দেহের মাংস দান করেছিলেন, বুদ্ধদেব কিরূপে মানবের দুঃখমোচনার্থে স্ত্রী-পুত্র ও রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করেছিলেন, এই সঙ্গে আবার ম্যাটসিনি, গ্যারীবল্ডি, ওয়াশিংটন, রাণা প্রতাপ, শিবাজী, গুরুগোবিন্দ সিং প্রভৃতির পুণ্য চরিতকথা তাঁরা আলোচনা করতেন। ইংরেজের শাসন ও শোষণ, দুর্ভিক্ষ এবং তার প্রতিকারের উপায়ও তাঁরা আলোচনা করতেন। এই সমস্ত কথা যখন বিনুদা বলতেন তখন তাঁর চোখে দীপ্তি ফুটে উঠত, তার ক্ষণিক আলোকে আমার মনের অন্ধকারে শুধু বিজলী-চমকই হ'ত, কিন্তু আমি তখনও তাঁর আদর্শ বুঝতেও পারতাম না, অনুসরণ করা ত দূরের কথা।

এখন বুঝতে পারছি—এসব আলোচনার মাধ্যমে চেষ্টা হ'ত এক দল দৃঢ়চেতা কর্ম্মীগোষ্ঠী সৃষ্টি করা যাদের কাছে "জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।"

মুগ্ধ মৃগের মতই অপলকনেত্রে আলোচনা শুনেছি। হৃদয়ে রক্তচলাচল শুনতে পেতাম, উত্তেজিত হয়ে উঠত! বেশী দিন আর নিরপেক্ষ দর্শক হয়ে থাকতে পারলাম না। আমার মনের অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে দূর না হলেও ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল দিনের আশায় যে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

আমি নিয়মিত ওদের সভায় যোগ দিতে লাগলাম।

৪

কিছুদিনের মধ্যেই বিনুদাকে অবশ্য অন্তর্দ্ধান হতে হ'ল। কারণ অনুমান করা সত্ত্বেও কাউকে বলি নি, কেননা সেটা নিরাপদ নয়। কিন্তু চলে যাওয়ার প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে যা ঘটেছিল তা বলছি—

পরীক্ষা হচ্ছে। বিনুদা আমার সামনের বেঞ্চিতে বসে পরীক্ষা দিচ্ছেন। গার্ড সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ধপ করে একটা আওয়াজ হ'ল। তিনি পিছন ফিরে একখানা বই বিনুদার পায়ের কাছ থেকে কুড়িয়ে নিলেন এক রকম ছোঁ মেরেই। পাতা উল্টে দেখলেন বিনুদার নাম। ওঁকে জিজ্ঞেস করে জানলেন বইটা ওঁরই, তাতে সন্দেহ নেই। গার্ডের ভ্রু কুঞ্চিত হ'ল, একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত হলেন—এমন ভাল ছেলে তার এই কাজ! কিন্তু হাতে-নাতে ধরা পড়েছে এতে আর সন্দেহ কি আছে! স্বপ্ন নিশ্চয়ই নয়। বিনুদার খাতাখানা তিনি নিয়ে, ওঁকে আদেশ করলেন বেরিয়ে আসতে। ক্ষণেকের তরে বিনুদার প্রশান্ত মুখে যেন একটা বিমূঢ় ভাব এল।

অমনি অবস্থায় ধরা পড়লে, ছাত্রের মুখের ভাব ফাঁসীর আসামীর মতই হয় বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু বিনুদার চোখে তার বিন্দুমাত্র আভাস নেই। নির্বিকার শান্ত। ওখানে অন্ততঃ দু'শ ছেলে পরীক্ষা দিচ্ছিল, গার্ড ছিলেন প্রায় জনা পাঁচেক, হেড-মাষ্টার মশায়ও স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সকলের মুখ থেকে উচ্চারিত ও অনুচ্চারিত যে ধিক্কারের গুঞ্জনধ্বনি উঠেছিল তার সবটা যাকে বিদ্ধ করেছিল সে হচ্ছে আমি স্বয়ং! কিন্তু সবাই জানল, বিনুদা এত ভাল ছেলে হয়েও তার এমনি অধঃপতন। বিস্মিত হয়েছিল সকলেই, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সবাই স্বীকার করল যে উপর দেখে কোন মানুষকে আসলে চেনা যায় না।

আমি নীরব, নিথর, অধোবদন। আমার হাত, পা যেন ক্রমশঃ অবশ হয়ে আসছিল! দাঁড়িয়ে থাকলে হয়ত পড়ে যেতাম। এ শীতের মধ্যেও গা ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল। প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হচ্ছিল যে প্রকৃত অপরাধী এখখুনি ধরা পড়ে যাবে। বিনুদা নিশ্চয়ই আত্মপক্ষ সমর্থন করবার জন্য আসল কথা প্রকাশ করে দেবেন। কিন্তু একটা কথা না বলে, একটা প্রতিবাদ না করে তিনি হ'ল থেকে বেরিয়ে গেলেন। সেই হ'ল তার স্কুল থেকে শেষ বেরিয়ে যাওয়া।

বাইরের আচরণ দেখে যে লোকের অন্তর চেনা যায় না তার উজ্জ্বল প্রমাণও আমি। নয়ত আমাকে দেখে সেদিন সকলে প্রকৃত অপরাধী নিশ্চয়ই চিনতে পারত। আমিই আগের দিন বিনুদার কাছ থেকে বইখানা চেয়ে নিয়ে এসেছিলাম। গার্ডকে সামনে দিয়ে যেতে দেখে কোলের বইখানা সামলাতে গিয়ে উরুর উপর দিয়ে গিয়ে পড়ল বিনুদার পায়ের সামনে।

আমি সেদিন আর পরীক্ষা দিতে পারলাম না। মনের অবস্থা লেখবার মত ছিল না। অসুস্থতার ভান করে বেরিয়ে গেলেও মানসিক সুস্থতা যে আমার সম্পূর্ণ ছিল না তাতে আর সন্দেহ কি। বাকি পরীক্ষাগুলিও আর দিলাম না। ফল অবশ্যম্ভাবী। সবাই আপশোশ করলে। আমি কিন্তু খুব দুঃখিত হই নি। আংশিক হলেও কৃত কর্ম্মের কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করলাম।

পরের ভাল করতে গিয়ে নিজের ক্ষতি হয়ত আরও লোকে করে, কিন্তু 'অমুকের ভাল করতে গিয়ে আমার এই ক্ষতি হ'ল' এই কথাটুকু বলবার লোভ সম্বরণ করতে আজ পর্য্যন্তও বেশী লোককে দেখি নি।

শুধু যে সেদিনই তিনি আমার নাম প্রকাশ করেন নি তা নয়—পরেও কোন দিন নয়।' এজন্য তার কাছে ক্ষমা চাওয়া বৃথা। যে লোক এত বড় শাস্তি, বিনা প্রতিবাদে, বিন্দুমাত্র ক্ষোভ প্রকাশ না করে গ্রহণ করতে পারে—সে এ সবের অনেক ঊর্দ্ধে তাতে আর সন্দেহ কি। কিন্তু কি সেই পরশমণি যার ছোঁয়া লেগে এ সবের বাইরে গিয়েছিলেন তা জানতে কৌতূহল ছিল খুবই। তাই এক-দিন অন্য কথার মধ্যে সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আচ্ছা বিনুদা, দুর্নামটা কি এতই তুচ্ছ!

হেসে জবাব দিয়েছিলেন, সত্যি কি জানিস ভাই, সুনাম-দুর্নাম ও দুটোই হচ্ছে মানুষের দেওয়া। মানুষ মানুষকে কতটুকু জানতে পারে বল দেখি? অপর মানুষের আমরা যখন মূল্য নির্দ্ধারণ করি তখন তার মধ্যেকার অমূল্য বস্তুর সন্ধান ত আমরা বড় পাই নে। মানুষের বানানো কথা গ্রাহ্য করে দুঃখ পেয়ে লাভ কি?

আর একদিন কি একটা কথার মাঝে বিনুদা বললেন, "দেখ নীতিশ, লোকে যখন দুর্নাম করে, তখন আত্মবিচার করে দেখি বাস্তবিক আমি নিন্দার্হ কিনা, যদি তাই হয় তবে তা সংশোধন করতে লেগে যাই তৎক্ষণাৎ। কিন্তু যদি মিথ্যা দুর্নাম হয় তবে তাতে বিচলিত হয়ে নিজের মনে অশান্তিই বা কেন ডেকে আনব আর এর ফলে দুর্নামকারীর স্পর্দ্ধাই বা বাড়িয়ে দেব কেন?"

বহুদিন থেকেই চুম্বকের আকর্ষণে নিজের অন্তর আকৃষ্ট হচ্ছিল। এই ঘটনা সেই চুম্বকক্ষেত্র করল পরিপূর্ণ। বিনুদার কাছে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করলাম। কিছুদিনের মধ্যেই দীক্ষিত হলাম গুপ্ত সমিতির সভ্যরূপে।

৫

বিনুদার অজ্ঞাতবাসের প্রকৃত ঠিকানা আমরা কেউ জানতাম না। কৌতূহল থাকলেও উপায় ছিল না। কেননা সমিতির নিয়ম, এক সভ্যের অবস্থান সম্পর্কে অপর সভ্য প্রয়োজন ব্যতিরেকে অনুসন্ধান করতে পারবে না।

বছর দেড়েক পরে—

আমাদের জেলার সদরকে দ্বিখণ্ডিত করে একটা প্রশস্ত খাল বয়ে গেছে। তারই একটা পুলের উপর দিয়ে যাচ্ছি, পাশেই বাজার, হঠাৎ যেন [illegible]লাম—নারকেল চাই বাবু, ভাল নারকেল। কণ্ঠস্বর অন্তরকে বিদ্ধ করল। ফিরে তাকিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম, চোখ রগড়ে নিলাম—দিবাস্বপ্ন দেখছি না ত, এ যে বিনুদা!

হাঁটুর উপর একখানা ময়লা কাপড় পরা, খালি গা, কাঁধে একখানা গামছা ভাঁজ করা। তেল, চিরুণী, নাপিতের কাঁচি বোধ হয় মাসতিনেক মাথায় পড়ে নি। গায়ের চামড়া খসখসে খড়ি উঠছে। গৌরবরণ কান্তি রোদে পুড়ে একেবারে তামাটে রং ধরেছে। পা ফুটিফাটা।

আমার মানসিক অবস্থাটা অনুমান করে ওঁর চোখে হাসি নেচে উঠল। দাঁড়িয়ে ছিলেন রাস্তার ধারে কতকগুলি নারকেল ছড়িয়ে। আমায় বললেন, এ আর কি বাবু, নৌকোর ভিতর আছে আরও অনেক। আসুন একবার দেখলে পছন্দ হবে নিশ্চয়।

ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম অদূরে নারকেল বোঝাই একখানা নৌকা। লগী হাতে দাঁড়িয়ে আছে আমাদেরই অপর এক সহকর্ম্মী।

এর মাহাত্ম্য বোঝা আমার পক্ষে অসাধ্য। ব্রত উদযাপন কি মানুষকে এমনি করই করতে হয়! হঠাৎ খেয়াল হ'ল এমনি বিস্মিত চোখ হয়ত বিপদ ডেকে আনতে পারে, তাই ক্রেতার অভিনয় করতে হ'ল।

নৌকোয় গেলাম। বিনুদা ছিলেন আমার আগে। তিনি লাফিয়ে উঠলেন। নৌকোটা সরে গিয়ে ধাক্কা লাগল আর একটা চলন্ত ডিঙ্গির গায়ে। মাঝি একটু টাল খেয়েছিল। টাল সামলে একটা অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করে বললে, চোখে কি দিয়েছিস রে শালা? বললে, শালা, চোখ খেয়েছিস না কি দেখে উঠতে পারিস নে! বিনুদা বিলম্ব না করে, কথায় ততোধিক ঝাঁঝ মিশিয়ে যে ভাষায় তাকে উত্তর দিলেন তা লিখে প্রকাশ করা ত দূরের কথা, কোন ভদ্রলোকের ছেলে এমনি কথা মুখে আনতে পারে এ ভাবতেও পারি নি কোন দিন। বিনুদার হ'ল কি? মাঝি ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে বিড় বিড় করতে করতে চলে গেল।

অনাচার কি করে প্রবেশ করেছে তাই ভাবছিলাম আমাদের অপর সহকর্ম্মীকে খেলো হুঁকোয় তামাক টানতে দেখে। বিনুদাও দেখলাম ওর হাত থেকে হুকোটা হ্যাঁচকা টানে নিয়ে গোটা দুই জোরে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, চলুন বাবু মশাই, নারকেল আছে ভেতরে—পছন্দ করবেন, আসুন। কথা শেষ করেই তিনি মাথা নীচু করে নৌকোর ছইয়ের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

ছইয়ের মধ্যে ঢুকব কি ঢুকব না এমনি মনে ইতস্ততঃ করছিলাম। তবুও শেষ পর্য্যন্ত না দেখে যাওয়া সঙ্গত নয়। তাই ভিতরে ঢুকে পড়লাম। আমার অবস্থাটা বিনুদা অনুমান করেই হাসি চাপতে গিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে পিঠ চাপড়ে বললেন, কিরে, খুব অবাক হয়েছিস যে। আরে ভাই—যখন যেমন, তখন তেমন। মাঝি হয়ে ভদ্র কথা আর পোশাক কোনটাই মানায় না। তামাক টানা ত মাঝিদের জীবনের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ। তামাক ত তামাক, দরকার হলে গাঁজায়ও এক টান [illegible]। অথচ সাধারণ জীবনে আমরা অশ্লীল কথা উচ্চারণ করি নে, তামাক-সিগারেট পর্য্যন্ত খাই নে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ধূমপান ত আমাদের নিষিদ্ধ। দাদা এ সব জানেন?

বিনুদা হেসে জবাব দিলেন, তিনি জানলে বলবেন কিরে, দরকার হলে নিজেও করেন। তিনি ত এমনি নির্দ্দেশ দিয়েছেন। মাঝি হয়ে ভদ্রলোকের মত আচরণ এখন অপরাধ। জানিস, সেদিন ভারী মজা হয়েছিল। নটে নৌকোর মাঝি হয়েছে। পরের দিন সকালে টুথ ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজতে সুরু করলে। দাদা নৌকোতেই ছিলেন। তিনি বিরাশি ওজনের এক চড় কষিয়ে দিলেন ওর গালে, আর ব্রাশটা নদীর জলে ফেলে দিলেন। বললেন, ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজলে দুদিনেই সবসুদ্ধ ধরা পড়তে পারবে। আসল কথা কি জানিস, যখন যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হবি তার অভিনয়টুকু হওয়া চাই নিখুঁত। লোকের বাহবা কিংবা হাততালির জন্য নয়, আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথকে প্রশস্ত করবার জন্য। এ সব কথা থাক্।

কথা শেষ করেই বিনুদা পাটাতনের নীচ থেকে ভাঁজ করা কয়েকখানা কাগজ বার করে আমার হাতে দিয়ে আমায় বললেন—এগুলো কালকের মধ্যে দাদার হাতে পৌঁছে দিবি। দ্বিতীয় কথা, পরশু আমরা একশনে বেরুব। ঠিক হয়েছে তোকেও সঙ্গে নেওয়া। এই একশন কথাটার আমাদের সমিতির পরিভাষার অর্থ ছিল ডাকাতি। ডাকাতি শব্দটার উচ্চারণ বাইরের লোকের কৌতূহল জাগতে পারে, তাই এই সাঙ্কেতিক শব্দটাই আমরা ব্যবহার করতাম। কেমন ঠিক হয়েছে ত?

দলভুক্ত হয়েছি আজ অনেক দিন। কিন্তু প্রত্যক্ষ একশনে বেরুতে পারি এমনি বিশ্বস্ততার পর্য্যায়ে গেছি ভেবে মনটা নেচে উঠল। বইয়ে পড়া রোমাঞ্চ সত্যি হয়ে উঠবে আমার জীবনে। মন আনন্দে নেচে উঠল। কিন্তু তার পেছনে যে অনিশ্চয়তা ঘুরে বেড়াচ্ছে জীবন্ত হয়ে, তা যে মনকে শঙ্কিত করে নি তা নয়—তবে পিছু হটতেও মন চাইল না। তাই যথাসম্ভব দৃঢ় স্বরে জবাব দিলাম, আমার অমত কিসের। তোমরা যা ঠিক করবে তাই হবে।

তারপর বিনুদা আমাকে সবিশেষ নির্দ্দেশ দিয়ে বাইরে আসবার জন্য পা বাড়ালেন। কেন জানি না, আজ মনে সাহস এসেছে অনেক। বিনুদাকে বাধা দিয়ে বললাম, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে। অবশ্য কোন গোপন খবর জানবার জন্য নয়। যদি আমাকে না বলবার হয় তবে আমায় বলো না।

কি জানতে চাস বল না, বললেন বিনুদা।

এমনি করে সুপুরি, আর নারকেল বোঝাই করে নৌকো চালিয়ে আমাদের কি ফায়দা হচ্ছে।

বিনুদা হেসে ফেলে বললেন, ওঃ, এই কথা! তবে শোন—

দেশে নানা জায়গায় যেমন বারহা, নড়িয়াবাজার, মোহনপুর-বাজার, রাজনগর, সিঙ্গারবাজার—আরও কয়েকটা জায়গায় স্বদেশী ডাকাতি হয়েছে জানিস ত। প্রায় সব ক্ষেত্রেই কর্ম্মীরা ডাকাতি করেছে ও পালিয়েছে নৌকোর সাহায্যে। তাই পুলিসের

কড়া নজর পড়েছে নৌকোচলাচলের ওপর। তাই ত শুনেছিস না, ফ্লোটিং থানা, ষ্টিপ বোট, পেট্রোল বোট, আরও কত কি সব করেছে। করলে হবে কি, আমাদের নাগাল পাচ্ছে কোথায়। নিরীহ দরিদ্র মাঝিদের আটক করে অশেষ লাঞ্ছনা দেয়, আর তাই করে ঘুস আদায়ের ফন্দি বার করেছে।

আমাদের পাবে কি করে বল না। ওরা চলেন ডালে ডালে, আর আমরা চলি পাতায় পাতায়। তবে ওদের আওতা কাটিয়ে যে বরাবর চলতে পারি তা নয়। চেহারা, চলন-বলন আর কিছু না পেয়ে মারধর কিংবা কিছু ঘুষ নিয়ে ছেড়ে দেয়, সাধারণ মাঝি অথবা ব্যবসায়ী বলে। বর্ষায় নদীনালা, খাল সব জলে ভরে গিয়ে দুই তীর ভাসিয়ে দেয়, তখন নৌকোচলাচলের রাস্তা খুলে যায় সর্ব্বদিকে। তখন বাঁধা-ধরা রাস্তায় আর আমরা চলি নে।

আমি বিস্মিত কণ্ঠে বললাম, মারধরও সহ্য করতে হয়?

যেখানে সেখানে রাগ দেখানো ত আর বীরত্ব নয়। ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়ে কোন কাজ করাই অনুচিত। এ হ'ল ক্রোধরিপুর দাসত্ব। ষড় রিপুর যে-কোন রিপুর দাস হলে আর বড় কাজ করার শক্তি থাকে না। আর দেখ, আমাদের দেশের দরিদ্র মেহনতী মানুষ নিত্য শত লাঞ্ছনা ভোগ করে। এমনি করেই জানতে পারি, অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি ঐ মানুষগুলোর দুঃখ, জ্বালা। হৃদয়ে পাই দ্বিগুণতর জোর শক্ত হয়ে দাঁড়াবার—সমস্ত অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবার।

আমি পুনরায় প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা আমাদের পক্ষে এমনি অপমান সহ্য করা ভীরুতার লক্ষণ নয় কি? জবাব পেলাম, মোটেই নয়। আমাদের উদ্দেশ্য লক্ষ্যে পৌঁছানো। কোমরে রিভলবার থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করতে পারা নিজেকে অত্যন্ত সহিষ্ণু করে তোলা। রাগের মাথায় ওটি বার করলে তার ফলাফল চিন্তা করে দেখ ত। তাই, আমাদেরও হতে হবে ঐ মেহনতী মানুষগুলোর মতই সহনশীল। এই যে নারিকেল বোঝাই নৌকো নিয়ে এলাম সুদূর নোয়াখালি থেকে—পথে কত অত্যাচার-অবিচার সইতে হয়েছে। রাগ করলে কি সম্ভব হ'ত এসে পৌঁছানো, না সম্ভব হ'ত একশন প্লান করা।

আমার সন্দেহ তখনও দূর হয় নি। জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু এমনি অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে না দাঁড়ালে, অপমানকে প্রতিরোধ না করলে ক্রমে যে মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলব।

জবাব দিলেন, দূর পাগল। মহাভারত পড়িস নি? দ্রৌপদীকে পঞ্চপাণ্ডবসহ কত অপমান-লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে তাদের অজ্ঞাতবাসের সময়। ওরা ছিল তখনকার যুগের শ্রেষ্ঠ বীরদের অন্যতম। তা সত্ত্বেও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সাজতে হয়েছিল রাজার পারিষদ। বিরাট রাজা ত পাশা খেলতে খেলতে রাগের মাথায় ঘুষি মেরে ওঁর নাকই ভেঙে দিল। অন্য ভাইদের কেউ গেল ঘোড়ার আস্তাবলে, কেউ হাতীশালায়, আবার কেউ বা হ'ল পাচক ঠাকুর। সে আবার যে-সে নয়—স্বয়ং ভীম। সবচেয়ে মজা হ'ল অর্জ্জুনের। তখনকার যুগে পুরুষশ্রেষ্ঠদের অন্যতম হয়ে তাকে নপুংসক সেজে রাজার বাড়ীর মেয়েদের নাচ শেখাতে হয়েছিল। আর দ্রৌপদী হ'ল রাণীর পরিচারিকা।

আমাদেরও চলেছে সেই অজ্ঞাতবাস। শক্তিসঞ্চয়ের উদ্যোগ-পর্ব্ব। আমাদেরও সইতে হবে সব—দিন না আসা পর্য্যন্ত। কিন্তু ভাবিস নে—দিন আগত ঐ। যেদিন আমাদের হাতের বজ্র ওদের দর্প হরণ করবে।

মন অনেক শান্ত হ'ল, কিন্তু আর একটা কৌতূহল ছিল—আমাদের এমনি করে ব্যবসা চালানোর মানে কি?

সহজ করেই জবাব দিলেন—জানিস ত বর্ষাকালে আমাদের নৌকো ছাড়া চলে না। বর্ষা শেষ হলে ওগুলো রাখি কোথায় বল ত। আমাদের ত আর নির্দ্দিষ্ট বাড়ী ঘর নেই যে তার পুকুরে ডুবিয়ে রেখে দেব। কারুর বাড়ীর এলাকায় খালের ধারে বেঁধে রাখলে ছোট ডিঙ্গি হলেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর ঘাসি নৌকো হলে ত কথাই নেই।

ঘাসি নৌকো কি—আমি জিজ্ঞেস করলাম।

এই যে নৌকোয় দাঁড়িয়ে আছিস—লম্বামত। এমনি নৌকোকেই ঘাসি নৌকো বলে। আমাদের দেশে যাত্রীচলাচলের জন্য গহনার নৌকো চলে তা এই ঘাসি নৌকোতেই হয়। এগুলো খুব দ্রুত চলতে পারে। এখন অবশ্য ষ্টীমার হয়ে গহনার নৌকো চলাচল অনেক কমে গেছে যাত্রী-পারাপারের জন্য।

আসল কথা হ'ল নৌকো লুকিয়ে রাখা যায় না। তাই একে সচল রাখতে হয়। কায়দা এ ছাড়াও আছে। আমাদের ছেলেরা নৌকো চলাচলে খুব পাকা হয়ে যাচ্ছে। কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে বিলাসবর্জ্জিত জীবনে হচ্ছে অভ্যস্ত। আর্থিক দিকে যে একেবারে ফাঁকা যাচ্ছে তাও নয়। তার পর ধর না কেন—পূর্ব্ববঙ্গ হ'ল গিয়ে তোর নদী-নালার দেশ। নৌকোচলাচলের সমস্ত পথ ভাল করে জানা হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া ঝড়বাদলে পদ্মা, মেঘনার মত বড় বড় নদীতে কি করে নৌকো চালাতে হয় তারও অভিজ্ঞতা হয়ে যাচ্ছে সকলের। কেননা অভিজ্ঞতা না থাকলে বিপদ অনিবার্য্য। ময়মনসিংহ আর সিলেট জেলায় আছে বড় বড় হাওর। ওর মধ্যে নৌকো চালাতে চাই প্রচুর সাহস।

হাওর কি—জিজ্ঞেস করলাম।

হাসতে হাসতে বললেন—বাঙাল দেশে বাড়ী হয়ে হাওর কি তাও জানিস নে। ওগুলো আমাদের দেশের বিলের মতই। প্রকাণ্ড বড়। দশ-পনর মাইল লম্বায়-চওড়ায় হয়। কোন কোনটা আরও বড় হয়। বর্ষাকালে এপার-ওপার দেখা যায় না। একটু বাতাস এলে একেবারে সমুদ্রের মত হয়। শুনেছিস ত সেবার নেত্রকোণায় ডাকাতি হয়েছিল। ফেরবার কথা ছিল অমনি একটা হাওরের মধ্য দিয়ে। তাই আগে থেকেই সাবধান হয়ে একটা কম্পাস নিয়ে গিয়েছিলাম। নইলে দিক ভুল করবার খুবই সম্ভাবনা। ঝড় উঠলে নৌকো মারা পড়বে অনিবার্য্য।

বুঝলে ত এবার এর তাৎপর্য্য, আর দেরি নয়, চল বাইরে যাই। চাল ফুরিয়ে গেছে, কিছু রাঙা চাল কিনে আনতে হবে। চাল না এলে আজ আর রান্না-খাওয়া হবেই না। খাই নি জানতে পারলে দাদা রাগী করবেন। বিনা কারণে খাওয়া-শোওয়ায় অনিয়ম ও দেরি তিনি বরদাস্ত করেন না। তিনি ঠিক কথাই বলেন। আমাদের শক্তিসঞ্চয় করাই কাজ। অনর্থক শরীর নষ্ট করব কেন। যা না করলে নয়, তার আর উপায় কি। অসুখ-বিসুখ হলে কাজের ত ক্ষতি হয়ই, তা ছাড়া পলাতক আসামীর চিকিৎসাতে কম হাঙ্গামা পোয়াতে হয় না।

পরের কথাগুলি আমার কানে ভাল করে প্রবেশ করে নি। বিনুদা বলল রাঙা চাল কিনবে। জিজ্ঞেস করে জবাব পেলাম—মাঝি হয়ে ভাঙ্গ আর সরু চাল, হাসালি নীতিশ!

এর আর প্রতিবাদ কি করব। আমরা ফিরে রাস্তায় গেলাম। গিয়ে দেখি একটি পুলিস নারকেলের সামনে লাঠি হাতে বীরদর্পে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁত খিচিয়ে বলল—এই নারকেল বুঝি শালা তোর। শালা রাস্তা একদম বন্ধ কর দিয়া। ভাগ হিঁয়াসে।

মুখে বলে ওর শান্তি হ'ল না। গলাধাক্কা দিয়ে বিনুদাকে ফেলে দিলে আর নারকেলগুলি পা দিয়ে রাস্তার বাইরে ঠেলে দিলে।

আমার সমস্ত শরীর রাগে কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল এখখুনি বসিয়ে দিই ঘা কতক। কিন্তু অতি কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করলাম বিনুদারই উপদেশ স্মরণ করে। অসহিষ্ণু হলে এখখুনি যে সব ফাঁস হয়ে পড়বে। বাস্তবের লগুড় নিজের মাথায় না পড়লেও হাতে-খড়ি হ'ল।

৬

যথানির্দ্দিষ্ট দিনে আমরা কয়েক জন মিলে ভৈরব ট্রেণে চেপে বসলাম। গাড়ীতে খোঁজ করে বিনুদাকে দেখতে পেলাম না। ট্রেণ ছাড়বার সময় যতই এগিয়ে আসতে লাগল, আমরা মনে মনে ততই উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠতে লাগলাম। বিনুদাই এই এক্‌শনের পরিচালক।

কথা ছিল বিভিন্ন জায়গা থেকে দু'চার জন করে লোক এসে জমায়েত হবে একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গায়। সবাই আমরা জমায়েত হব কিশোরগঞ্জ মহকুমার এক গ্রামে একটা প্রকাণ্ড গাছের নীচে। ওখানেই আমরা পাব, মশাল, বন্দুক, রিভলবার, তলোয়ার আর সিন্দুক ভাঙবার সরঞ্জাম।

গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা বাজল। আমাদের দৃষ্টি সারা বাইরেটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ দেখি দূরে বিনুদা প্রাণপণে দৌড়াচ্ছেন। গাড়ী আস্তে আস্তে মোশান দিল। তখন মনে হচ্ছিল বিনুদা কেন আরও তাড়াতাড়ি দৌড়াতে পারছেন না! যা হোক তিনি শেষ পর্য্যন্ত গাড়ীতে এসে উঠলেন একেবারে হাঁপাতে হাঁপাতে। আমাদের উৎসুক দৃষ্টি দেখে বললেন দাঁড়া বলছি সব, আগে একটু দম নিতে দে।

আমরা যে কামরায় উঠেছিলাম ওটা একে বড় ছিল, তায় অল্প যাত্রী মাত্র জনা দুয়েক। ওরা কামরার অপর কোণে বসে। সবাই আমরা জড়ো হয়ে উল্টো কোণে গিয়ে বসলাম। বিনুদা বলতে লাগলেন, কাল রাতে দাদার বাড়ী গিয়েছিলাম। কথা বলতে বলতে রাত হয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়া সেরে দাদার পাশেই শুয়ে পড়লাম।

এদিকে শেষ রাত্তিরে লাল পাগড়ী বাড়ী ঘেরাও করেছে, ভোর হতে না হতেই বাড়ী তল্লাসী সুরু হবে। দাদার মা আমাকে একটা ছেড়া নোংরা কাপড় দিয়ে বললেন—দেখ ভোর হতে না হতেই এটা পরে তুমি কলতলায় বসে বাসন মাজতে সুরু করবে গড়িমসী করে। একটু মাজবে আবার একটু কোমর টান করবে।

কথামত বসে গেলাম বাসন মাজতে। পুলিস ততক্ষণে বাড়ী ঢুকে তল্লাসী সুরু করে দিয়েছে। কয়েকটা বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে কেউ না পালায়।

কিছুক্ষণ বাদেই মা তাড়া দিতে আরম্ভ করলেন—কই রে হতচ্ছাড়া! সারা সকাল বাসন মাজলেই চলবে? বাজারে যেতে হবে না? শীগগির বাসনগুলো মেজে ফেল বাবা।

বার দুই তাড়া খেয়ে আমিও জবাব দিলাম—আমি কি বসে আরাম করছি! দেখছেন না কাজ করছি।

তিনি বললেন—না হয় বাপু আরাম নাই করছ, কিন্তু বলি কেবল বাসন মাজলেই চলবে, বাজারে যাবি নে।

আমিও সমানে জবাব দিয়ে চললাম—এদিকে যজ্ঞিবাড়ীর বাসন জড়ো করেছ! তখন মনে থাকে না।

মা এবারে ইনসপেক্টরকে সাক্ষী রেখে বললেন, দেখেছ ত বাবা চাকর-বাকরের আস্পর্দ্ধা! কাজ ত করবেই না, আবার মুখে মুখে তর্ক।

বাসনমাজা সেরে ফেললাম। মা আমাকে মাছের চুপড়িটা দিয়ে বললেন—যা তাড়াতাড়ি বাজার থেকে আসবি। একবার বেরুলে ত আর ফেরবার নামটি নেই। তুই না এলে রান্না চাপবে না কিন্তু।

পা বাড়িয়েছি, পথ রোধ করে পুলিস দাঁড়িয়ে। মা ইনসপেক্টরকে অনুরোধ করে বললেন—বাবা ওকে বাজারে যেতে দাও। বাজার থেকে না এলে আজ আর রান্নাই চাপবে না। ছেলেরাই বা কখন স্কুলে যাবে আর কর্ত্তাদেরও যে আপিসের দেরি হয়ে যাবে!

ইনসপেক্টর বাবু ইউরোপীয়ান পুলিস সাহেবকে সব বুঝিয়ে বলতে আমার শরীর তল্লাস করে যেতে দিতে হুকুম হ'ল। আমার ত বলতে গেলে কেবল একটা গামছা পরা ছিল, কাজেই আর দেখবার কি আছে। বেশী সময় তাই নষ্ট হ'ল না। মুখে অতি নিকটতম সম্পর্ক স্থাপন করে গলাধাক্কা দিয়ে বললে—যা নিয়ে আয় বাজার।

আমিও 'জী হুজুর' বলে একটা সেলাম দিয়ে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করলাম।

আমরা সবাই খুব একচোট হেসে নিলাম। ছাড়া পেয়ে শেষ পর্য্যন্ত যে আসতে পেরেছেন তার জন্য ভগবানকে অসীম ধন্যবাদ জানালাম।

বিনুদা কাজের কথা পেড়ে বললেন, দেখ, যাওয়ার সময় প্রায় মাইল আটেক হাঁটতে হবে। কিন্তু ফেরবার পথ একান্তই অনিশ্চিত, কাউকে কাউকে পঁচিশ-তিরিশ মাইলও হাঁটতে হতে পারে। কেননা সবাই ত আর একসঙ্গে ফিরব না, চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে হবে। পুলিশের লোকেরা খুজবে নৌকোঘাট আর ষ্টেশনগুলি। পারবি ত সবাই। আমরা পায়ে হেঁটেই এত দূরে চলে যাব যে পুলিস ভাবতেই পারবে না এই সময়ের মধ্যে এত দূরে কেউ হেঁটে চলে যেতে পারে।

পারব বলেই আমরা সকলে প্রতিশ্রুতি দিলাম।

গাড়ী তখন প্রাণপণ বেগে ছুটেছে। দুলুনিতে একটা আরামের আমেজ। আর খটাখট আওয়াজ একটা একঘেয়েমি সৃষ্টি করে যেন চোখ বুজিয়ে দিচ্ছে। এরই পরপারে আছে আজ এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের রোমাঞ্চ।

বিনুদার হাঁটার কাহিনী ছিল অনেক। তাই তিনি আমাদের চাঙ্গা রাখবার জন্য বললেন, শুনবি আর এক মজার কাহিনী। আমরাও শোনবার জন্য উৎসুক। বলতে আরম্ভ করলেন—দেখ ভগবান পা দিয়েছেন, তার সদ্ব্যবহার করতে কসুর করছি না। তোরাও করিস না।

তখন আমি পুলিসের কড়া নজরে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে আমাকে জেলে পুরতে পারছে না। কাজেই গোয়েন্দা লেলিয়ে দিয়েছে দিবারাত্র আমার পেছনে থাকবার জন্য, কোন কিছু ছুতো বার করতে পারে কি না।

সেদিন ময়মনসিংহ যাব বলে ঢাকা ষ্টেশনের টিকিটঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। লক্ষ্য করলাম জনা-দুই লোককে আড়াল করে যিনি দাড়িয়ে আছেন তিনি আমার পরম সুহৃদ! হয় আমার সঙ্গেই একেবারে যাবে, নয়ত জেনে নিতে চায় আমি কোথাকার টিকিট কাটছি। ভাবলাম, যদি বুঝিয়ে বলি তবে হয়ত সঙ্গ ছাড়তে পারে। তাই তাকে একধারে ডেকে বললাম, কেন আমার সঙ্গে যাচ্ছেন বলেন ত। আমি একান্তই ব্যক্তিগত কারণে যাচ্ছি। আপনার কোনই ভয় নেই। নিরাপদেই ফিরে আসব।

কোন চিন্তা না করেই সে সাফ জবাব দিলে, আপনাকে চোখের আড়াল করলে আমার চাকরী যাবে। ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করি। আপনার সঙ্গে আমাকে যেতেই হবে।

আমি তখন এক ফন্দি আঁটলাম মনে মনে বাছাধনকে আক্কেল দেওয়ার জন্য: বললাম, আচ্ছা বেশ, আপনি যখন একান্তই আমাকে ছাড়বেন না, তখন কি আর করা যায়।

এই বলে আর টিকিটঘরের কাছে না গিয়ে সোজা রেললাইন ধরে এগোতে লাগলাম হেঁটে। তখন বৈশাখ মাস, বেলা বারটা নাগাদ হবে। বুঝতেই পারছ কেমন চনচনে রোদখানা, গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। কি জানি কেন বেচারার সঙ্গে ছাতাও ছিল না, তার উপর 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা'—লাইনের ধারে ধারে বড় গাছও ছিল না যে ছায়ায় হাঁটবে।

এমনি করে মাইল-তিনেক হেঁটে তেজগাঁও ষ্টেশন ছাড়বার পর বাছাধনের ধৈর্য্যের সীমা বোধ করি অতিক্রম করেছে। শুকনো গলায় আমায় বললে, শহর ছাড়িয়ে ত অনেক দূর এলেন; আপনি যাবেন কোথায় বলুন ত!

আমি যাব ময়মনসিংহ—হাঁটতে হাঁটতেই জবাব দিলাম।

গোয়েন্দা—এ্যাঁ হেঁটে! বলেন কি!

এতক্ষণ হেঁটে হেঁটে বেচারার তালু শুকিয়ে গেছে। চোখের দিকে তাকাই নি, তাকালে হয়ত দেখতাম ওটা আমার কথা শুনে আরও গর্ত্তে ঢুকেছে, যা হোক বিস্মিত কণ্ঠে বলল, সে ত প্রায় আশি মাইল দূরে।

আমি নির্ব্বিকার কণ্ঠে জবাব দিলাম—তাতে আর কি হয়েছে, এইটুকু ত পথ! চলুন না। এই ধরুন ঘণ্টায় যদি চার মাইল করে হাঁটা যায় তবে ঘণ্টা কুড়ি লাগবে। এক দিনেরও কম।

গোয়েন্দা প্রশ্ন করলে, আপনি কি ঐ গজারীগড়ের মধ্য দিয়েই যাবেন নাকি! ওর মধ্যে যে বাঘ, ভালুক থাকে।

আমি কথাটাকে যতটা সম্ভব সহজ করে বললাম, তাতে আর কি হয়েছে বলুন না। আপনার সঙ্গে ত রিভলবারই আছে, যদি খায় ত আমাকেই খাবে।

গোয়েন্দার কথায় পরিহাসের সুর ফুটে উঠল, রিভলবার দিয়ে বাঘ; কি যে বলেন তার ঠিক নেই।

ওর কথায় আমি আর জবাব দিলাম না। হাঁটতে লাগলাম। বেচারা বোধ হয় ততক্ষণে নিজের প্রাণের শেষ একেবারে পরিষ্কার দেখতে পেল। হাঁটছিল আমার পেছন পেছন, একটু জোরে হেঁটে একেবারে আমার সামনে এসে আমার পায়ে ধরে বিনীত সুরে বললে, আপনার পায়ে ধরছি স্যার! আপনি ফিরে চলুন, আর যে আমি এক পা-ও হাঁটতে পারছি না। ফিরে গেলে চাকরী যাবে, না খেয়ে ছেলে-পুলে নিয়ে মরব. আর আপনার সঙ্গে গেলে বাঘে খাবে। মরণ আমার নিশ্চিত, গরীব মানুষ কোন গতিকে সংসার চালাই। আপনাদের কি, প্রাণের ভয়-ডর ত আর নেই—দয়া করে ফিরে চলুন।

ওর অবস্থা দেখে মনে মনে হাসি পেল। ওকে বুঝিয়ে বললাম, আপনার কোন ক্ষতিই হবে না, আপনি ফিরে যান। কথা দিচ্ছি আমি ফিরে আসব।

বেচারাকে আমার কথা বিশ্বাস করতেই হ'ল। কেননা ওর হাঁটবার [illegible] ছিল না। পিছুপা হ'ল, আমিও পরের ষ্টেশন কুর্ম্মিটোলায় উঠব বলে এগিয়ে চললাম।

গল্প শেষ হতেই আমাদের মধ্যে হাসির রোল পড়ে

পুলিসের লোককে কেউ সামান্যতম কষ্ট দিতে পেরেছে জানতে পারলে মনে একটা অসীম তৃপ্তির স্বাদ পেতাম।

আমাদের পথ যতই কমে আসছে, ততই নিবিড় ভাবে অনুভব করতে লাগলাম আজকের রাত্রির অভিযানের কথা। আমাদের মনকে এর চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে বিনুদা এর পরও অনেক নূতন নূতন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে করতে হাসি-তামাশার খোরাক যোগাতে লাগলেন। আমরা যে এমনি একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছি তা গাড়ীতে বসে অন্ততঃ আর অনুভব করতে পারি নি। যে বিনুদাকে কর্ম্মনিরত গম্ভীর মানুষ দেখেছি তার আজকের এই হাস্যমুখর আনন্দ-পরিবেশক মূর্ত্তি খুবই উপভোগ করলাম।

ট্রেন টঙ্গি ষ্টেশন কখন ছেড়ে এসেছে, ঘোড়াসাল ষ্টেশনের কাছে শীতললক্ষ্যা নদীর উপরের ব্রিজ পার হচ্ছে। আমাদের গল্প চলতে লাগল। গাড়ী নরসিংদি ষ্টেশনে এল। বিনুদা গল্প থামিয়ে দিলেন। ভৈরব ষ্টেশন আর বেশী দূর নয়, তাই আমাদের বিভিন্ন কামরায় ছড়িয়ে বসতে বললেন। আরও জানা গেল যে, ভৈরব ষ্টেশনে কুমিল্লা, নোয়াখালি, এসব অঞ্চল থেকেও কয়েকজন কর্ম্মী আসবে। তাদের আমরা চিনলেও যেন অচেনার ভান করি। এখান থেকেই পুলিসের নজর বেশী। যদি কেউ ধরা পড়ে তা হলে সে যাতে একাই পড়ে, তাই এ সাবধানতা।

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ আমাদের গাড়ী নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে গিয়ে থামবে। আমাদের নির্দ্দেশ ছিল যে, ওখানে নেমেও কেউ কারুর জন্য অপেক্ষা না করে কিংবা কেউ কারুর পরিচিত এমনি ভাব না দেখিয়ে যে যার মত যেন ষ্টেশনের বাইরে চলে যাই।

যথাসময়ে কিশোরগঞ্জগামী ট্রেন ভৈরব ষ্টেশন ছাড়ল।

ক্রমশঃ

তনুতীর্থ

শ্রীসুবোধ রায়

আমি আনিয়াছি বিধুর বিরহ
মধুর স্বপনভরা,
আমি আনিয়াছি অশ্রু-মালিকা
হাসি দিয়ে রঙ-করা।
বহু দিবসের হারানো রতন
আমি আনিয়াছি জীবন-মথন
রূপসায়রের অরূপ-মাধুরী-
পরশ সুধাক্ষরা।

তুমি আনিয়াছ আমার লাগিয়া
কোন্ সে অতীত হ'তে
বুকভরা প্রীতি, প্রাণভরা প্রেম,
স্নেহভরা দেহস্রোতে।
স্নান করি তায়, করি তাহা পান
শুচি হ'ল মোর তনুমনপ্রাণ,
জীবন-তরণী বহিল উজান
অজানা তীর্থপথে।

তোমার তনুর তীর্থে তাই তো
আমার তনুর ডালি,
জীবনদেবতা মন্দিরমাঝে
সাজালো পূজার থালি।
মোদের প্রাণের পঞ্চপ্রদীপ
গগনের ভালে পরায়েছে টিপ,
মোদের মিলন দেহের বেদীতে
হোমশিখা দিল জ্বালি।

দনুজমাধব

(বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা)

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বাঙ্গলার ইতিহাসে পাঠান আমলের একটি ঘটনা অদ্যাপি প্রত্যেক ঐতিহাসিকের চিত্ত আলোড়িত করিয়া থাকে। দিল্লীর সম্রাট্ ঘিয়াসুউদ্দিন্ বলবন ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহী তুঘরীল খানের দমনের জন্য সোণারগাঁর রাজা দনুজ রায়ের সহিত ঐক্যবদ্ধ হন, বিদ্রোহী যেন জলপথে পলায়ন করিতে না পারে। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বার্ণীর গ্রন্থে উল্লিখিত এই স্বাধীন হিন্দু নরপতি "দনুজ রায়" কে ছিলেন? ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শতাধিক বৎসর ধরিয়া এই প্রশ্নের সমাধান বহু লেখক নানাভাবে করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্বর্গত ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ঐ খ্রীষ্টাব্দে একটি "পাথুরে" প্রমাণ আবিষ্কার করিয়া এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অগ্রসর হন। বিক্রমপুরের অন্তর্গত আদাবাড়ী গ্রামে একটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। "মহারাজাধিরাজ দশরথদেব" বিক্রমপুরে তদ্দ্বারা ভূমিদান করিয়াছিলেন (Inscriptions of Bengal, III, pp. 181-2)। "দেব"বংশীয় এই নরপতির বিরুদ ছিল "অরিরাজ-দনুজমাধব।" সেন রাজাদেরও সকলেরই এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ বিরুদ ছিল—যথা বিজয়সেনের বিরুদ "অরিরাজ-বৃষভশঙ্কর", তৎপুত্র বল্লালসেনের "অরিরাজ-নিঃশঙ্কশঙ্কর" ইত্যাদি। এই সকল বিরুদের অন্তর্গত সর্ব্বসাধারণ "অরিরাজ" অংশ বাদ দিয়া অসাধারণ বৃষভশঙ্করাদি পদ দ্বারাই ঐ সকল নরপতি উল্লিখিত হইতেন। বল্লালসেনের নৈহাটি শাসনে "শ্রীবৃষভশঙ্করনন্দেন" পদ দৃষ্ট হয় এবং তদ্রচিত "অদ্ভুতসাগর" গ্রন্থের প্রারম্ভে অষ্টম শ্লোকে "নিঃশঙ্কশঙ্করনৃপঃ" পদদ্বারা আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দশরথদেবও "দনুজমাধব" উপাধিদ্বারাই পরিচিত ছিলেন সন্দেহ নাই এবং মুসলমান ঐতিহাসিকের লেখায় তাহাই "দনুজরায়" আকার ধারণ করিয়াছে. এইরূপ সিদ্ধান্ত এখন অপরিহার্য্য। দুঃখের বিষয় আদাবাড়ী শাসন হইতে দনুজমাধবের পিতৃপরিচয় জ্ঞাত হওয়া যায় নাই।

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে অধুনা পাকিস্থানের অন্তর্গত ত্রিপুরা জিলায় দনুজমাধবের অপর একটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে—তাহার একটি অস্পষ্ট ছাপ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। শাসনটির সম্মুখভাগে উৎকীর্ণ পঙ্‌ক্তিসংখ্যা ২৪ ও পশ্চাদ্ভাগে ২৬। সম্মুখে চতুর্দ্দশ পঙ্‌ক্তিতে "শ্রীমদ্দামোদর" নামক এক রাজার উল্লেখ আছে। "তস্যায়ং তনয়ো" (১৫ পঙ্‌ক্তি), "জয়তি দশরথঃ শ্রীমান" (১৭-১৮), "অরিরাজদনুজমাধবঃ শ্রীদশরথদেবঃ" (২১ পঙ্‌ক্তি) প্রভৃতি যে কয়েকটি পদ আমরা পড়িতে সমর্থ হইয়াছিলাম তন্মধ্যে একটী অতীব মূল্যবান্ তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে যে, এই দনুজমাধব দামোদরদেবের পুত্র ছিলেন। পশ্চাদ্ভাগে একজন মাত্র দানীয় বিপ্রের নাম পড়িতে পারা গিয়াছিল "শ্রীউমাপতি শর্ম্মণে" (১১ পঙ্‌ক্তি)। এই দামোদরদেবের অধুনা অপহৃত চট্টগ্রামশাসন ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হইয়াছিল (Ins. of Bengal, pp. 158-63—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩৫৪, পৃ. ২১-২২ অস্মৎকৃত সংশোধনাদি দ্রষ্টব্য)। এই শাসন ১১৬৫ শকাব্দে (১২৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তৎপর দামোদরদেবের চতুর্থ রাজ্যাঙ্কে ১১৫৬ শকাব্দে উৎকীর্ণ "মেহার"শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে—তন্মধ্যে তাঁহার বিরুদ লিখিত আছে "অরিরাজ-চাণূরমাধব"। সুতরাং দেখা যায় এই দামোদরদেব চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা অঞ্চলে ১২৩১-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে অন্ততঃ ১৩ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন—তাঁহার রাজত্বাবসানের কাল অদ্যাপি অজ্ঞাত। আপাততঃ অনুমান করা যায় যে, তৎপুত্র দনুজমাধব প্রায় ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পিতৃরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দেও জীবিত থাকিয়া বলবনকে সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করেন। আদাবাড়ীশাসন তাঁহার তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল—তৎপূর্ব্বে সম্ভবতঃ তাঁহার পিতার রাজত্বকালেই লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপসেন ও পৌত্র সূর্য্যসেনাদির অধিকার বংশলোপাদি কারণবশতঃ বিলুপ্ত হওয়ায় বিক্রমপুর-রাজ্যলক্ষ্মী "দেব"বংশের অধীন হইয়াছিল।

কুলগ্রন্থে দনুজমাধবের উল্লেখ

দনুজমাধবের শাসনদ্বয় আবিষ্কৃত হওয়ার বহু পূর্ব্বে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের চারিটি কুলগ্রন্থে তাঁহার নাম যথাযথ উল্লিখিত হইয়াছিল—(১) এডুমিশ্রের কারিকাত্মক কুলপঞ্জিকা (২) হরিমিশ্রের কারিকা (৩) ধ্রুবানন্দমিশ্রের মহাবংশাবলী এবং (৪) সর্ব্বানন্দ মিশ্রের কুলতত্ত্বার্ণব। বাঙ্গলার অতি প্রামাণিক ইতিহাসগ্রন্থে (Hist. of Bengal, vol. I, Dacca University. pp. 623-34) কুলজী সাহিত্যের একটি বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। কুলগ্রন্থের তালিকামধ্যেও (pp. 62) উক্ত চারিটি গ্রন্থেরই নামোল্লেখ আছে। তন্মধ্যে কুলতত্ত্বার্ণব একটি জাল গ্রন্থ—ইহা আমরা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছি (ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৪৭, পৃ.

৭০ ১-২। উক্ত ইতিহাসগ্রন্থেও ইহা আধুনিক রচনা বলিয়া অনুমিত হইয়াছে—"a modern compilation palmed on to an ancient author" (p 624)। কিন্তু এস্থলে একটি মারাত্মক ভ্রম অজ্ঞাতসারে প্রতিপাদিত হইতেছে যে, ধ্রুবানন্দ মিশ্রের পুত্রের নাম প্রকৃতই সর্ব্বানন্দ মিশ্র ছিল এবং তিনি একজন প্রাচীন গ্রন্থকার ছিলেন। ইহা একেবারেই মিথ্যা। ধ্রুবানন্দ মিশ্র অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার কুলবিবরণ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত একটি বিরাট কুলগ্রন্থের পুথি হইতে উদ্ধৃত করিতেছি (২১০২নং পুথির ৯৯।২ পত্র):—

"ধ্রুবানন্দস্যাৰ্দ্ধি চং শ্রীবরমিশ্র সাধু,···অয়ং ঘটকতাগ্রন্থকারী বংশাভাবঃ।"

আমাদের নিকট রক্ষিত ঘটককেশরীর কুলপঞ্জীতেও আছে:—

"ধ্রুবানন্দমিশ্রস্যাৰ্ত্তি চট্টশ্রীবরমিশ্র···অপুত্রোয়ম্।" (সাগরদিয়া প্রকরণ ২০।২ পত্র)। সুতরাং সর্ব্বানন্দ মিশ্র স্বয়ংই আকাশকুসুম প্রমাণিত হইতেছেন এবং তদ্রচিত গ্রন্থের অলীকতাও স্বতঃসিদ্ধ হইতেছে। গ্রন্থটি মুদ্রিত হইলে ডঃ ভট্টশালী মূল পুথি দেখিতে চাহিয়াছিলেন—পান নাই। এই গ্রন্থে "দনৌজামাধবে"র বিবরণ (পৃ. ৬৮-৭৩), বিশেষ করিয়া ১২১১ শকে তাঁহার মৃত্যুর উল্লেখ, কোন দায়িত্বসম্পন্ন লেখকের আলোচনার বিষয় হইতে পারে না।

ইংরেজশাসনে পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহগ্রস্ত বাঙালী কুলতত্ত্বার্ণবের ন্যায় বহু কৃত্রিম গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া শিক্ষিত-সমাজকে বিভ্রান্ত করিয়াছে এবং দুঃখের বিষয় অদ্যাপি করিতেছে। বাংলার বহু খ্যাতনামা ঐতিহাসিকের এজাতীয় কৃত্রিম রচনায় পক্ষপাত বর্ত্তমানে বাঙালী জাতির দুরপনেয় কলঙ্ক হইয়া পড়িতেছে—ইহা সাবধানে লক্ষ্য করা আবশ্যক। কোন্ রচনা কৃত্রিম তাহা যদি ঐতিহাসিকগণ ধরিতে না পারেন ত তাঁহাদের ইতিহাসচর্চ্চা অভ্রান্ত হইতে পারে না। কৃত্রিম রচনা বাছিয়া লওয়ার সহজ উপায় হইল প্রত্যেক স্থলে মূল হস্তলিখিত আকরগ্রন্থের সন্ধান লওয়া এবং কতিপয় বিশেষজ্ঞের সহযোগে তাহা পরীক্ষা করা—ব্যক্তিবিশেষের উক্তি দ্বারা ঐরূপ আকরগ্রন্থের অস্তিত্ব স্বীকার করা উচিত নহে। "বাঙালীর ইতিহাসে" (প্রথম পর্ব্ব, পৃ. ২৬১) "বল্লালচরিত" নামক গ্রন্থের বিষয় আলোচিত হইয়াছে—সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার মহাশয় অবগত নহেন যে, ঐ মুদ্রিত গ্রন্থের মূল পুথি সর্ব্বথা অপ্রাপ্য, কোন পুথিশালায় তাহা রক্ষিত নাই। উহা যে অত্যাধুনিক রচনা তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

হরিমিশ্রের কারিকা নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন—বসু মহাশয়ের সঞ্চিত বিপুল কুলজী পুথিরাশি এখন ঢাকায় রক্ষিত আছে। অর্থাৎ তাহা বর্ত্তমানে অপ্রাপ্য। নগেন্দ্রবাবুর গ্রন্থে তাহা হইতে দনৌজামাধব সম্বন্ধে যে কয়টি শ্লোক মুদ্রিত হইয়াছে (ব্রাহ্মণকাণ্ড, প্রথমাংশ, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৫২-৩) তাহাও আমরা মূল পুথি না দেখিয়া আলোচনা করিলাম না।

ধ্রুবানন্দ মিশ্রের শ্লোকাত্মক গ্রন্থের হস্তলিখিত প্রতিলিপি বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সুপ্রাপ্য—বিক্রমপুরের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে বীরভূম-বাঁকুড়া পর্য্যন্ত। ঢাকা, নবদ্বীপ, এশিয়াটিক সোসাইটী, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কাশীর সরস্বতী-ভবন ও লণ্ডনের পুথিশালায় প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। সৌভাগ্যবশতঃ ১৩২৩ সনে নগেন্দ্রনাথ বসু "মহাবংশ" নামে ইহা মুদ্রিত করিয়াছেন। ধ্রুবানন্দ-রচিত পৃথক্ দুইটি গ্রন্থ ছিল—"সমীকরণসার" ও "মহাবংশাবলী"। গ্রন্থদ্বয়ের সংমিশ্রণে "মিশ্রগ্রন্থ" নামে পরিচিত এই জনপ্রিয় কুলশাস্ত্র বর্ত্তমান আকারে প্রচারিত হইয়াছে। মূল গ্রন্থদ্বয় দুষ্প্রাপ্য হইলেও বিলুপ্ত হয় নাই। আমরা বহু কষ্টে এই অতি দুরূহ গ্রন্থের সমগ্রাংশ পরীক্ষা করিয়াছি—ইহা ১৫০০-২৫ খ্রীষ্টাব্দ-মধ্যে রচিত বলিয়া আমাদের ধারণা (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৮, পৃ. ১০৭-১১ প্রমাণাবলী দ্রষ্টব্য)। রাঢ়ীয় কুলীন-সমাজের ৩০০।৩৫০ বৎসরের এই পরম প্রামাণিক ইতিহাসগ্রন্থে বহু সহস্র পারিবারিক ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। প্রসঙ্গক্রমে একবার মাত্র ধ্রুবানন্দ "দনুজমাধবে"র নামোল্লেখ করিয়াছেন। পঞ্চম সমীকরণে মুখবংশীয় মহাদেব সম্মানিত হইয়াছিলেন—তাঁহার সম্বন্ধে ধ্রুবানন্দ মহাবংশাবলীগ্রন্থে লিখিয়াছেন "দনুজমাধবেনাসৌ রাজ্ঞা পূর্ব্বং পুরস্কৃতঃ" (পৃ. ৫)। মহাদেব ছিলেন উৎসাহের ১৬ পুত্রের মধ্যে তৃতীয়—উৎসাহের প্রথম পুত্র আয়িত (লক্ষ্মণসেনের অভিষেককালে সংঘটিত) প্রথম সমীকরণের প্রথম কুলীন ছিলেন। ১২ বৎসর পূর্ব্বে আমরা এই মূল্যবান্ তথ্য বিশ্লেষণ করিয়াছিলাম (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৮, পৃ. ১১২-৪)। এই বিশ্লেষণের ফলে এখন একটি সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়িতেছে যে, দামোদরদেবের রাজত্ব ১১৬৫ শকাব্দের অনতিব্যবধানে সমাপ্ত হইয়াছিল। কারণ, মহাদেব ঐ শকাব্দে প্রায় শতবর্ষ-বয়স্ক ছিলেন এবং অতি বার্দ্ধক্যই সম্ভবতঃ দনুজমাধব কর্ত্তৃক তাঁহার "পুরস্কারে"র হেতু হইয়াছিল। ধ্রুবানন্দের গ্রন্থে এইরূপ একবার মাত্র প্রসঙ্গতঃ লক্ষ্মণসেনের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় (পৃ. ২)—আদিশূর কিংবা বল্লালসেনের নাম একবারও উল্লিখিত হয় নাই। অথচ আদিশূর-কোলিন্যগ্রস্ত ঐতিহাসিক-গোষ্ঠী কুলশাস্ত্রের প্রামাণ্যবিচারে

ধ্রুবানন্দকে বাদ দেন না—তাঁহার দুরূহ রচনার একটি পঙ্‌ক্তিও বুঝিবার বা বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা না করিয়াই তাঁহার পিণ্ডপাতের ব্যবস্থা করেন। কি অপূর্ব্ব বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী!

দনুজমাধব সম্বন্ধে এড়ুমিশ্রের অতি মূল্যবান্ রচনা উদ্ধৃত করার পূর্ব্বে আমরা তাঁহার কুলপরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছি—কোন সহজলভ্য মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে নহে পরন্তু হস্তলিখিত কুলগ্রন্থ হইতে। ধ্রুবানন্দের গ্রন্থানুসারে মুখবংশের আদি পুরুষ মেধাতিথির অধস্তন নবম পুরুষ "শ্রীজিয়া-গুঞ্জিকৌ" (মেধাতিথি—আবর — ত্রিবিক্রম — কাক-ধাধু "মুখে খ্যাতঃ"—জলাশয়—বাণেশ্বর—প্রাণেশ্বর—জিয়াগুঞ্জিকৌ)। তন্মধ্যে গুঞ্জির প্রপৌত্র আয়িত আদি কুলীন ছিলেন। জিয়ার শাখা অকুলীন বলিয়া সকল গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নাই—"সমুদ্রগৌড়- কুলং" বলিয়া কয়েকটি "মূল" পুথিতে আমরা এই শাখার নামমালা আবিষ্কার করিয়াছি। যথাঃ

"জিয়োসুৎ শালু তৎসুত শঙ্কর তৎসুতো বলদেববশিষ্ঠৌ, বলদেবসুতাঃ গদো (প্রভৃতি), গদাধর মিশ্রসুত দুর্য্যোধন মিশ্র তৎসুতাঃ এড়ুমিশ্র-চক্রপাণিগণপতিকাঃ। এড়ুমিশ্র পঞ্জিকাকারঃ, তৎসুৎ কুশধ্বজ মিশ্র (কাশীর সরস্বতী-ভবনে রক্ষিত ১০৮৭নং পুথির ১৪৩।২ পত্র—এই পুথির ১৪৩ ৪৫ পত্রে এড়ুমিশ্রের অধস্তন বিস্তীর্ণ বংশধারা লিপিবদ্ধ আছে)। সাহিত্য-পরিষদের পুথিতে (৫৪৫।১ পত্রে) শালুর পরিবর্ত্তে আছে সত্বমণি এবং এড়ুমিশ্রের স্পষ্টতর পরিচয় আছে "এড়ুমিশ্র কুলপণ্ডিত পত্নী রত্নাবলি ভৃত্য বক্রাইনামা মালাকারঃ"। কিন্তু পুত্র কুশধ্বজের নাম নাই। রাজসাহীর একটি পুথিতেও (৩৯৮।১) কুশধ্বজের নাম বাদ পড়িয়াছে—পরিচয় আছে "এরূ কুলপঞ্জিকাঃ (?) অস্য পত্নি রত্নবতী"। এতদনুসারে এড়ুমিশ্র হইতেছেন আদি কুলীন আয়িতের প্রপৌত্র পর্য্যায়। তাঁহার প্রপিতামহ বলদেবের সহিত আদি কুলীন শিশো গাঙ্গুলী "উচিত" সম্বন্ধ করিয়াছিলেন (ধ্রুবানন্দ পৃ. ১)। সুতরাং ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পরে এড়ুমিশ্রের জন্ম ধরা যায় এবং দনুজমাধবের রাজত্বারম্ভকালে তিনি যৌবন অতিক্রম করেন নাই। সম্বন্ধনির্ণয়-গ্রন্থে (২য় সং, পৃ. ৫৬২-৬৭; ৩য় সং, পৃ. ৭১২-১৭) "এড়ুমিশ্রের পরিচয়" শীর্ষক মুলো পঞ্চাননের একটি সুদীর্ঘ কবিতা মুদ্রিত হইয়াছে। তদনুসারে তিনি ছিলেন কুন্দবংশীয় রোষাকরের পৌত্র। ইহা ধ্রুবানন্দাদি সমস্ত কুলগ্রন্থের বিরোধী নিষ্প্রমাণ উক্তি এবং সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। কুন্দবংশের নামমালা কুলগ্রন্থে দুষ্প্রাপ্য নহে—তন্মধ্যে এড়ুমিশ্র নাম আমরা পাই নাই।

ধ্রুবানন্দের গ্রন্থে ২৩ সমীকরণে কাঁটাদিয়া বন্দ্যবংশীয় ভীমপুত্র হরির কুলবিবরণ আছে (পৃ. ২৩)—তৎস্থলে একটি পুথির পাঠান্তরে "কিঞ্চ এড়ুমতে" বলিয়া উক্ত হরির সম্বন্ধে এড়ুমিশ্ররচিত বসন্ততিলক ছন্দের সার্দ্ধশ্লোক মুদ্রিত হইয়াছে (মহাবংশ পরিশিষ্ট, পৃ. ১৪৮)। এই পাঠান্তর প্রামাণিক। কারণ, ধ্রুবানন্দের টীকাকার "কিঞ্চ এড়ুমতে" প্রতীক উদ্ধৃত করিয়া ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। লালমোহন বিদ্যানিধির পুত্র শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্যের নিকট রক্ষিত এই অতি দুর্ল্লভ টীকার খণ্ডিতাংশ পরীক্ষা করিয়া আমরা অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি (৩৪।২ পত্র দ্রষ্টব্য)। ধ্রুবানন্দের প্রামাণিক গ্রন্থে উদ্ধৃত এড়ুমিশ্রের এই শ্লোক বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায়, আদি কুলীন মকরন্দের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র (সুপ্রসিদ্ধ নরসিংহ ওঝার এক পুরুষ পরবর্ত্তী) হরিবন্দ্যোর ছয় পুত্রই এড়ুমিশ্রের গ্রন্থরচনাকালে বয়ঃপ্রাপ্ত ছিলেন—তাঁহাদের বিশেষণ পদ "উদ্ভটগুণাম্বুধয়ঃ" লক্ষণীয়। তাঁহারা ছিলেন এড়ুমিশ্রের পৌত্রপর্য্যায়। সুতরাং অনুমান করা যায়—এড়ুমিশ্রের কুলগ্রন্থ তাঁহার বার্দ্ধক্যে প্রায় ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।

সম্বন্ধনির্ণয়গ্রন্থের নানা স্থলে এড়ুমিশ্রের বহু কারিকা (সমস্তই অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত) মুদ্রিত হইয়াছে (৩য় সং, পৃ. ৫০১-২. ৫৮৮, ৬৩০, ৬৩৬, ৭১৫, ৭১৯; ক্রোড়পত্র পৃ. ৯২-৩)। আমরা এযাবৎ ইহাদের একটি কারিকাও কোন মূল পুথিতে পাই নাই। কিন্তু সন্ধানকালে এমন একটি লেখা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় যাহাতে আমাদের সন্দেহ বাড়িয়া যায় যে ঐ সমস্ত কারিকা অত্যাধুনিক রচনা এবং কৃত্রিম করিয়া এড়ুমিশ্রের নামে প্রচারিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা সম্বন্ধনির্ণয় গ্রন্থের প্রামাণ্য বিশেষ ভাবে ব্যাহত হইতেছে। গ্রন্থের ক্রোড়পত্রে (পৃ. ৬৫-৭) মুদ্রিত ভট্টভবদেবের কুল-কারিকাটি "কুলচন্দ্র ঘটক সংগৃহীত মহাবংশাবলী" হইতে উদ্ধৃত বলিয়া লিখিত হইলেও নিশ্চিতই আধুনিককালে রচিত। কারণ, তন্মধ্যে ভুবনেশ্বরে ভবদেবনির্ম্মিত মন্দিরের উল্লেখ আছে এবং সম্প্রতি তাহা ভ্রমাত্মক ও অমূলক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

নগেন্দ্রনাথ বসুর গ্রন্থেও এড়ুমিশ্রের কতিপয় কারিকা (শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে রচিত) মুদ্রিত হইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এই প্রাচীনতম আকরগ্রন্থের আরম্ভাংশ আমরা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের গৃহে একখণ্ড ধ্রুবানন্দের মিশ্রগ্রন্থের পুথিতে এড়ুমিশ্রের গ্রন্থের প্রথম ৩ পত্র মাত্র পাওয়া যায়—তন্মধ্যে প্রথম ২২ শ্লোক আছে। নবদ্বীপ পাঠাগারে ২৩ পত্র রক্ষিত আছে তাহাতে ১৫-৪৩ শ্লোক আছে। শেষোক্ত শ্লোকগুলি আমরা একটি আলোচনায়

মুদ্রিত করিয়াছিলাম (ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৪৭, পৃ. ৭০২-৪)—প্রথমাংশ তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। সমস্ত শ্লোকই শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে রচিত এবং বুঝা যায় নগেন্দ্র বসুও এই গ্রন্থেরই ক্ষুদ্রাংশ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থেই আদিশূরকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণানয়নের প্রসঙ্গ সর্ব্বপ্রথম বর্ণিত হইয়াছে। সাবধানে লক্ষ্য করা আবশ্যক, এডুমিশ্রের মতে কেবল "সভাশোভা"র জন্য ব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিল—যজ্ঞার্থে নহে। ব্রাহ্মণের সহিত পঞ্চ-কায়স্থ আনয়নের কথা ঘুণাক্ষরেও এডুমিশ্র উল্লেখ করেন নাই—তাহা বহু পরে কল্পিত হইয়া থাকিবে। আদিশূর সম্পর্কে এডুমিশ্রের মনোহর শ্লোকত্রয় (১২-১৪ সংখ্যক) উদ্ধৃত হইল :

পশ্চাদাবিরভূৎ বিভূতিসুভগঃ শ্রীলাদিশূরো নৃপঃ
যস্মাদাদিবরাহদেব-ঘটনাসংস্থাবলং লক্ষ্যতে।
যৎকীর্ত্তির্বিনির্ত্তি-কার্ত্তিকশশিস্ফীতাংশুমূর্ত্তিঃ ক্ষিতৌ
যঃ সৌরাষ্ট্র-কলিঙ্গ-বঙ্গ-মগধাধীশস্য জেতাভবৎ ॥
নানাদানবিধান-সদ্গুণিগণাবস্থানসম্মানৈঃ
লব্ধোলক্ষ-বিপক্ষসংক্ষয়করব্যাপ্রতাপাদিভিঃ।
নানাপণ্ডিতমণ্ডলীপরিচয়ৈঃ নানাকথাকৌশলৈঃ
স্পর্দ্ধাং কুর্ব্বতি স্ফুটং স হি মহাকাশীশ্বরেণৈব চ ॥
কিন্তু ক্ষৌণিপতেরমুষ্য ন সভাশোভা তথা বীক্ষ্যতে
বিখ্যাতদ্বিজরাজহীনগগনঃ শ্রীমদ্দ্বিজেন্দ্রোজ্ঝিতা।
তামালোচ্য বিষণ্ণতামুপগতঃ ক্ষৌণীপতি-র্ধাবকান্
তত্ত্বজ্ঞানদিশং দ্বিজাকৃতিকৃতে গণ্ডং দিশং পশ্চিমাম্ ॥

পরবর্ত্তী ১৫-২৯ শ্লোকে কান্যকুব্জের অন্তর্গত কোলাঞ্চ দেশ হইতে ক্ষিতীশ প্রভৃতি পঞ্চবিপ্রের আগমন, বেশভূষা-দর্শনে রাজার অশ্রদ্ধা এবং পরিশেষে রাজার নিকট কামটী প্রভৃতি নগরপ্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে। বহু পরে বল্লালসেনের রাজত্ব (৩০-৩১ শ্লোক) এবং তৎপর

তৎপুত্রো রঘুবীর-লক্ষ্মণসমঃ খ্যাতোঽভবৎ লক্ষ্মণঃ
তস্যাভূৎ বিধিবৈশসেন সুচিরং দুর্লক্ষণং কিঞ্চন।
তস্যাভূত্তনয়ঃ প্রচণ্ডবিনয়ঃ শ্রীকেশবাখ্যঃ স্বয়ং
দেশঞ্চাপি বিহায় বঙ্গমগমৎ ভীতস্তুরুষ্কাত্ততঃ ॥ ৩২
তত্রাসীদ্দনুজাদিমাধবনৃপস্তং কেশবো ভূপতিঃ[১]
সৈন্যৈর্বিপ্রগণৈঃ পিতামহকৃতৈরন্যৈশ্চ যুক্তো গতঃ।
তাঞ্চক্রে নৃপতির্মহাদরতয়া সম্মানয়ন্ জীবিকাং
তদ্বর্গস্য চ তস্য চ প্রথমতশ্চক্রে প্রতিষ্ঠান্বিতঃ ॥ ৩৩
ভূপালঃ স চ কেশবং নরপতিং কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গান্তরে
বাক্যং প্রাহ "ভবৎপিতামহকৃতী বল্লালসেনো নৃপঃ।
কীদৃগ্বিপ্রকুলাকুলাদিনিয়মং কস্মাৎ কথং বা কুতঃ
কেনোদ্যোগভরেণ বিপ্রনিকরং চক্রে তদাখ্যাসি মে।"৩৪
তৎশ্রুত্বা কুলপণ্ডিতং কথয়িতুং তত্তজ্জগাদাদরাৎ
এডুং মিশ্রমশেষশাস্ত্রকুশলং বিপ্রপ্রথাপারগং।
যো মিশ্রঃ কবি(জিষ্ণু)রেষ জগতীবিখ্যাতকীর্ত্তি-র্দ্বিজ
শ্রেণিপ্রস্তুতসংকুলাকুল বিধির্বিদ্যাবতামগ্রণীঃ ॥৩৫
পুত্রো যস্য কুশধ্বজঃ সমভবৎ পত্নী চ রত্নাবতী
যস্ত্যো বকরাগ্নিকঃ স তু কুলব্যাখ্যাং বিতেনে তদা।
ভো রাজন্নবধেহি সম্প্রতি কুলব্যাখ্যানমাকর্ণ্যতাম্
আস্তে পশ্চিমদিগ্বিশেষবিষয়ে শ্রীকান্যকুব্জাহ্বয়ঃ ॥৩৬

(সারার্থঃ বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণ দুর্দ্দৈবহেতু দীর্ঘকাল কষ্টে পতিত হন—তৎপুত্র কেশব তুরুষ্কের ভয়ে দেশত্যাগ করিয়া সসৈন্যে বিপ্রগণসহ বঙ্গে রাজা দনুজমাধবের আশ্রয়ে যান। উক্ত রাজা সাদরে সকলের জীবিকা করিয়া দেন। একদিন প্রসঙ্গক্রমে দনুজমাধব কেশবসেনকে বল্লালসেনকৃত বিপ্রকুলব্যবস্থাদির বিষয়ে প্রশ্ন করিলে কেশব কুলপণ্ডিত এডুমিশ্রকে তাহা বলিতে বলেন। তদনুসারে কেশবের সম্মুখে দনুজমাধবের নিকট এডুমিশ্র "কুলব্যাখ্যা" করিয়াছিলেন।)

এডুমিশ্রের গ্রন্থরচনার এই অবতরণিকা ছাড়া মূলগ্রন্থের মাত্র সাতটি শ্লোক আবিষ্কৃত হইয়াছে—তন্মধ্যে বল্লালসেনকর্ত্তৃক চণ্ডীর বরে প্রহরদ্বয়ে "সপ্তশতী" ব্রাহ্মণসৃষ্টি (৩৮-৪১ শ্লোক) অতীব কৌতুকজনক। ৩৩ শ্লোকে "আসীৎ" পদের প্রয়োগদ্বারা প্রমাণ হয় রচনাকালে দনুজ-মাধব জীবিত ছিলেন না। এডুমিশ্রের পুত্রাদির নামোল্লেখ (৩৬ শ্লোক) পরবর্ত্তী কুলগ্রন্থদ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। ৪৩ শ্লোকে এডুমিশ্র স্পষ্টোক্তি করিয়াছেন যে, বল্লালসেনের মৃত্যুর পর তাঁহার জন্ম হয় ("জাতোঽহং নৃপতৌ গতে সুরপুরং বল্লালসেনে ততঃ")। এডুমিশ্রের এই রচনামধ্যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের ইতিবৃত্ত যেটুকু লিপিবদ্ধ হইয়াছে, বঙ্গদেশের প্রামাণিক কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত বস্তুতঃ তাহার কোন বিরোধ নাই—বরং দনুজমাধবের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়া কুলশাস্ত্রের এই আকর সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইল। তুরুষ্কের ভয়ে কেশবসেন বিক্রমপুরে দনুজমাধবের আশ্রয় লইয়াছিলেন—এই একটিমাত্র ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ অনন্য-লভ্য তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াই প্রত্যক্ষদর্শী এডুমিশ্র বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। ইহাই প্রমাণপরতন্ত্র বিদ্বৎ-সমাজের আশংসা।

১। নগেন্দ্রবাবুর পুথিতে এই পঙ্‌ক্তির প্রথমার্দ্ধ (অর্থাৎ দনুজমাধবের নাম) ত্রুটিত ছিল। তিনি লিখিয়াছেন, "উক্ত শ্লোকের পূর্ব্বাংশ বহু চেষ্টায় সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কেহ সংগ্রহ করিতে পারিলে ঐতিহাসিক-জগতের বিশেষ উপকার হইবে।" (রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণবিবরণ, ২য় সং, পৃ. ১৫৮ পাদটীকা)। নগেন্দ্রবাবু এস্থলে ২।০ শ্লোক (৩৩-৩৪, ৩৫-এর প্রথমার্দ্ধ) উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহাই যথেচ্ছ পরিবর্ত্তিত ও পূরিত করিয়া "কুলতত্ত্বার্ণবে" মুদ্রিত হইয়াছে (পৃ. ৬৯)। কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না যে নগেন্দ্রবাবুর গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়ার পর কুলতত্ত্বার্ণব রচিত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী

শ্রীসুকুমারী দত্ত

প্রেমভক্তি প্রদাতারং আনন্দানন্দ বর্দ্ধনম্।
স্বর্ণময়ী সুতং বন্দে যোগমায়া মনোহরম্ ॥
বিজয়বল্লভাং দেবীং বিজয়ানন্দ বর্দ্ধিনীম্।
সদানন্দময়ীং সাধ্বীং যোগমায়া নমাম্যহম্ ॥
পতিতানাং পাবনেভ্যঃ বৈষ্ণবেভ্যঃ নমঃ নমঃ ॥

১২৮৩ বঙ্গাব্দে ২২শে চৈত্র মঙ্গলবারে রাত্রি ষোল দণ্ড চৌদ্দ পলে যখন ধনু লগ্নোদয় হইয়াছিল এবং ধনুরাশিতে মূলা নক্ষত্রের প্রথমপাদে গৌণ চৈত্রী কৃষ্ণাষষ্ঠীর শশধর উদিত হইয়াছিলেন সেই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে ফরিদপুর জেলার পালং-এর অধীনে কোঙরপুর গ্রামে, পদ্মাতীরে শ্রীঅনন্তরূপী শ্রীনিত্যানন্দের একান্ত শরণাগত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীল দুর্গাচরণ গুপ্তের সহধর্ম্মিণী পতিব্রতাশিরোমণি শ্রীযুক্তেশ্বরী সত্যভামা দেবীর অষ্টম গর্ভে উদয় হইলেন শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজ।

সুন্দর। অতি ধীরে ধরণীবক্ষে পদক্ষেপ করিতেছেন, সর্ব্বাঙ্গে আনন্দ-শিহরণ খেলিতেছে। অতি মৃদুস্বরে মধুর "নিতাই নিতাই" উচ্চারণ করিতেছেন। পোড়ামাতলা আসিয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির লক্ষ্য করিয়া গড় হইয়া ধুলায় লুটাইতেছেন। শ্রীশ্রীপ্রভু হরিসভায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। শারিকা শ্রীরাধিকা গুপ্ত আদেশ অনুযায়ী পূর্ব্ব হইতেই হরিসভাতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। কীর্ত্তনানন্দ চলিতে লাগিল। বন্ধুসুন্দর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় দাঁড়াইয়া অপলকনেত্রে নৃত্যরঙ্গী গৌরসুন্দর দর্শন করিতেন। একদিন শ্রীশ্রীপ্রভু আদরের শারিকার (শ্রীরাধিকা গুপ্তের) নাম রাখিলেন—শ্রীরামদাস এবং তাঁহাকে এই নামে ডাকিলেন। বন্ধুসুন্দর প্রিয়জনদের যত নাম রাখিয়াছেন তন্মধ্যে রামলীলার সঙ্গে যুক্ত নাম এই একটি বৈ আর দৃষ্ট হয় না। রামের দাস বীর হনুমানের সেবাভজন নিষ্ঠার কিছু লক্ষণ শারিকার মধ্যে দেখিয়া কিংবা
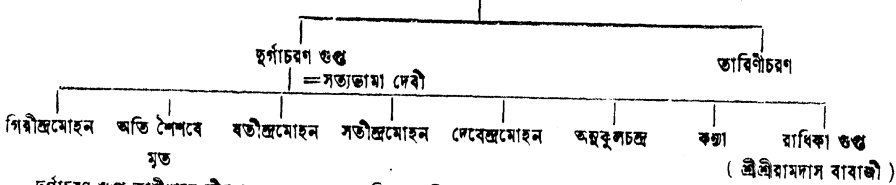
দুর্গাচরণ গুপ্ত কাশীধামে স্বীয় গুরুদত্ত নাম জপ করিতে করিতে স্বর্গারোহণ করেন। সত্যভামা দেবী শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর স্মরণ মনন জপ করিতে করিতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

রাধিকা গুপ্ত (শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজীর পূর্ব্বাশ্রমের নাম) যখন ফরিদপুরে বাংলা স্কুলের নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র—বয়স মাত্র আট-নয় বৎসর, তখন একদিন বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণের সন্নিকটস্থ এক পুষ্করিণী-তীরে বট-বৃক্ষতলে লীলাময়ের ইচ্ছায় প্রেম-কল্পতরু প্রভু শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরের মোহনরূপ তাঁহার নয়নে পড়ে। সেই অতি অল্প বয়সে প্রথম দর্শনমাত্রেই তাঁহার মনে গৃহত্যাগের সঙ্কল্প উদিত হয় এবং তাঁহার জীবন-নদীতে ভক্তির বন্যা আসে। সেই বন্যা সমগ্র ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়াছে ও লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে শ্রীশ্রীনিতাইগৌর-প্রেমে পাগল করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে।

মধ্যরাত্রে প্রভু শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দর স্বরূপগঞ্জের ঘাট হইতে নৌকায় পার হইয়া গোকুলানন্দের ঘাটে আসিলেন। আসিয়াই দণ্ডবৎ হইয়া শ্রীধামকে প্রণাম করিলেন—

"সুরধুনী পারে রয়ে, অষ্টাঙ্গে প্রণাম হয়ে,
ভাসিব যে নয়ন ধারায়।"

স্বরচিত এই পদের সার্থকতা নিজ আচরণ দ্বারা দেখাইলেন 'বন্ধু-দেখিতে ইচ্ছা করিয়া এই নামকরণ করিয়া থাকিবেন অথবা অন্য কোন কারণ আছে, তাহা যাঁহার নাম আর যিনি রাখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। রামদাসকে বন্ধুসুন্দর আদর করিয়া রামঁ, রামি, রামা এইরূপও ডাকিতেন। কখনও পূর্ব্ব অভ্যাসবশতঃ শারিকাও বলিতেন।

একদিন কীর্ত্তনানন্দের পর প্রিয় রামদাসকে ডাকিয়া বন্ধুসুন্দর কহিলেন, "রামি, তুই ব্রজের পথে চল।" আদেশ শুনিয়া রামদাস ব্যাকুলভাবে প্রভুর শ্রীমুখের দিকে চাহিলেন। প্রভুর শ্রীচরণ সেবা ছাড়িয়া একা সম্বলহীন অবস্থায় ব্রজের দিকে যাইতে তিনি ইচ্ছুক নহেন, চাহনির মধ্য দিয়া যেন এই কথাই ব্যক্ত হইল। ভক্তের অন্তরের কথা জানিয়া মধুরতরভাবে বন্ধুসুন্দর কহিলেন, "তুই কাতর হোস না। পাথেয় দেওয়া হবে, চলে যা। আমি তোর পিছনে আছি। তুই হাতরাসে [illegible] অটল নন্দীর বাসায় আমার অপেক্ষায় থাকবি।" এই আদেশের উপর "না" কথাটি বলিবার সামর্থ্য আর রহিল না। চির অনুগত শ্রীরামদাস কৃপাপাথেয় ও অর্থপাথেয় উভয়ই গ্রহণ করিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে ব্রজের পথে চলিলেন। তখন তিনি পঞ্চদশ বর্ষীয়বালক।

"তোমা সনে ব্রজ-বনে শ্রীকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধনে
সেই সঙ্গে সে সুখবিলাস।
ব্রজরস গৌররস নিঙাৱি তার নির্য্যাস
পিয়াইলে মিটাইয়া আশ।"

—শ্রীশ্রীরামদাস

হাতরাসে আসিয়া রামদাস প্রভুর আদেশ অনুযায়ী রেলবিভাগের কর্ম্মচারী ভক্তবর শ্রীযুক্ত যোগেন বাঁড়ুজ্যে মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হন। হাতরাসে তখন অটলবিহারী নন্দী, হরিদাস গোস্বামী প্রভৃতি বহু ভক্ত অবস্থান করিতেন। রামদাসজী তাঁহাদের প্রীতিকর সঙ্গ পাইলেন। একটি ঠাকুরবাড়ীতে তাঁহার প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা হইল। তিনি প্রভুর প্রতীক্ষায় দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। রামদাস এই হাতরাসে—ব্রজের দুয়ারে, আসিয়াও ব্রজে প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। আদেশ নাই। ভক্ত অবিরাম অশ্রুনীরে ভাসিতেছেন। আর সহ্য হয় না। রামদাস পত্র লিখিলেন—

"বন্ধু, আমার মানস-সন্তাপ নাশিতে
যদি তোমার অতি দুঃখ হয়।
তবে আমার যা হবার তা হবে, কেন তুমি দুঃখ পাবে,
সুখে থাক তুমি সুখময়।
ফেলে মোরে একা বন্ধুহীন দেশে,
প্রাণবন্ধু জগদ্বন্ধু কোথা র'লে বসে,
আমি তোমার উদ্দেশে যাব কোন্ দেশে
কে দিবে পথের পরিচয়।"

রামদাসের অন্তরের সুনিবিড় বেদনা যেন এই কয়টি পংক্তির মাঝে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনের দ্বারপ্রান্তে বসিয়া তিনি ছটফট করিতেছেন। বন্ধুহীন দেশে বন্ধুর আদরের শারিকা রামদাস জীবন্মৃতবৎ হইয়া কেবল অশ্রুধারায় ভিজিতেছেন। প্রাণবন্ধুর স্নেহ-সিন্ধুর কথা স্মরণ করিয়া অশ্রুভরা নয়নে কম্পিত কণ্ঠে গান করিতেন—

"তাঁর ভালবাসা রীতি, অসীম গুণ সম্পত্তি
মনে হইলে হৃদয় বিদরে।
মোর অধ্যয়নকালে, আকর্ষিয়া কৃপাবলে,
ডুবাইল অমিয় পাথারে।
তাঁরই বাৎসল্য স্নেহ, সোহাগে লালিত দেহ,
তাঁরই হৃদয় মনপ্রাণ।
তাঁর মুই ক্রীতদাস, সেই পদে সদা আশ,
সেই মোর ভজন সাধন।
সোঙরি তাঁহার কথা, হৃদয়ে বাড়য়ে ব্যথা,
কে মোরে পাঠাবে বৃন্দাবন।

রামের পত্র পাইয়া বন্ধুসুন্দর এই মর্ম্মে উত্তর লিখিলেন—"রামদাস, তুমি একাকীই বৃন্দাবনে যাবে। শ্রীগোবিন্দজীর পুরনো মন্দিরে থাকিবে। মাধুকরী করিবে। ফিরে আবার হাতরাসে আসিবে। আমি শীঘ্রই যাইতেছি।" আদেশবাক্য সম্বল করিয়া রামদাস একাকীই বৃন্দাবন-যাত্রা করিলেন। সন্ধ্যার পরে তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে পৌছিলেন। কোথায় গোবিন্দজীর মন্দির, কেমন করিয়া সেখানে যাইবেন, কিরূপে থাকিবেন এ সকল সমস্যার কথা উদ্বিগ্ন-চিত্তে ভাবিতে ভাবিতে সমাধানের জন্য যিনি আদেশ করিয়াছেন তাঁহারই শরণাপন্ন হইলেন।

"তুমি কোথায় যাবে, বাবা"—জনৈকা বর্ষীয়সী রমণী রামদাসজীর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। "গোবিন্দজীর পুরনো মন্দিরে, কিন্তু মন্দিরের পথ যে চিনি না মা!" "তার জন্য কি বাবা, আমি তোমাকে পৌছে দেব।" রমণী চলিতে লাগিলেন আর রামদাস তাঁর অনুগমন করিতে লাগিলেন। গোবিন্দজীর মন্দিরের নিকট গিয়া "এই যে বাবা, গোবিন্দজীর মন্দির"—বলিয়া রমণী অদৃশ্য হইয়া গেলেন। রামদাস ফিরিয়া আর রমণীকে দেখিতে পাইলেন না। ব্রজমণ্ডলে আর কোন দিন ঐ বৃদ্ধাকে তিনি দেখিতে পান নাই। শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজের দৃঢ় অক্ষুণ্ণ ধারণা ছিল—এই রমণীই সাক্ষাৎ যোগমায়া। গোবিন্দজীর মন্দিরের শ্রীমৎ চৈতন্য-দাসজীর সঙ্গে রামদাসের বিশেষ পরিচয় হইল।

শ্রীমৎ চৈতন্যদাসজীর যত্নে ও চেষ্টায় রামদাস শ্রীগোবিন্দজীকে দর্শন করতঃ তিন দিন পুরনো মন্দিরে অবস্থান করিলেন, তারপর শ্রীরাধাকুণ্ড দর্শন করিলেন। বন্ধুসুন্দরের আদেশবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তিনি কয়েকদিন মাধুকরী করিলেন, বনে বনে ঘুরিলেন। তারপর পুনরায় হাতরাসে ফিরিয়া আসিয়া জগদ্বন্ধুসুন্দরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন—তাঁহার অন্তরে আবেগভরা উৎকণ্ঠা আবার কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

রামদাসের আর্ত্তিতে ও প্রাণের আকর্ষণে বন্ধুসুন্দরের আসন টলিল। ভক্তদের উপর সকল কাজের ভার দিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া বৃন্দাবনদাসসহ শ্রীশ্রীপ্রভু বাঁকচর হইতে রওনা হইলেন। বৃন্দাবনদাসজী পূর্ব্বেই হাতরাসে আসিয়া পৌছিলেন। "প্রভু আসিতেছেন" এই সংবাদে ভক্তমহলে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল; রামদাসের হৃদয় আনন্দে নাচিতে লাগিল। যথাসময়ে প্রভুও আসিয়া পৌছিলেন। কয়েকদিন হাতরাসে অবস্থান করিয়া প্রিয় রামদাসসহ প্রভু শ্রীবৃন্দাবনধামে ছত্রিশগড় রাজার কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। আশ্বিন মাস, সপ্তমী পূজার দিন। সেই সময় বৃন্দাবনে লালাবাবুর মন্দিরের সম্মুখে দুর্গোৎসব হইত। ইহাই ছিল তখন বৃন্দাবনে একমাত্র দুর্গোৎসব। উৎসবের প্রথম দিনেই ভক্ত-সহ প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে পৌছেন। আদরের রামদাসের চিত্তকে গভীর ভাবে ব্রজ-ভজনে উন্মুখ করিবার জন্যই যেন প্রভুর এবারকার ব্রজে বাস। "শ্রীরূপে শিক্ষা দিলা শক্তি সঞ্চারিয়া"—কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই কথাগুলি এই গুরু এবং শিষ্যের প্রতিও প্রযোজ্য। সমস্ত কার্ত্তিক মাস রাধাকুণ্ডে শ্রীদাসগোস্বামীর সমাধি-মন্দিরের সন্নিধানে বাস করিয়া রামদাস নিয়ম সেবাব্রত করেন। তখনও বন্ধুসুন্দর শ্রীকুণ্ডের জলস্পর্শ করিতে পারেন না। করিলেই ভাবাবিষ্ট হন। শ্রীরাধা নাম শ্রুতিগোচর হইলেই অচৈতন্য হইয়া পড়েন। সে ভাব-

বিহ্বলতা রামদাস প্রাণ ভরিয়া দেখেন, হৃদয় ভরিয়া আঁকিয়া লন। রামদাস স্বরচিত এই গান গাহিতেন—

"ব্রহ্মচর্য্য দৃঢ়ব্রত, করি করায় অবিরত,
কঠোর নিয়ম সদাচারে।
নদে ব্রজ উপাসনা, রাত্রি-দিন অন্তর্ম্মনা,
"রা" ভাবিতে ধৈরয পাসরে॥
শ্রীরাধানাম যদি শুনে, অচেতন সেই ক্ষণে,
নিশিদিশি ভাবে ডুবে রয়।

রামদাসের পরিধানে কালো ফিতে পাড়ের কাপড় ছিল। তাহা ছিঁড়িয়া কৌপীন ও বহির্ব্বাস তৈয়ারী হইল। তাহাই পরিধান করিয়া প্রভুর ইচ্ছায় রামদাস নিষ্কিঞ্চন সাজিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নূতন জীবনের নূতন শিক্ষা আরম্ভ হইল। বন্ধুসুন্দরের শিক্ষার পদ্ধতি অভিনব। কথা কম, কাজই বেশী। কখনও হয়ত দিনের পর দিন মোটেই কথা বলিতেছেন না। কিন্তু নিজ আচরণগুলির মধ্য দিয়া অপূর্ব্ব শিক্ষা দিতেছেন। রামদাস নিত্য তিন বার যমুনাবগাহন, কুঞ্জে কুঞ্জে মাধুকরী যাচন, বিহ্বলভাবে শ্রীবিগ্রহ দর্শন ইত্যাদি করেন, ঠাকুর বৈষ্ণবের সম্মুখে ভূলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাদের স্নেহ-প্রীতি করুণা আকর্ষণ করেন। স্মরণ, মনন, সাধন-ভজন, ইত্যাদিতে নিষ্ঠার সহিত রত থাকেন। বন্ধুসুন্দরের নিখুঁত আচরণগুলির মধ্য দিয়া রামদাসজীর জীবনের নূতন শিক্ষার রেখাপাত হইতে লাগিল। প্রভু রামদাসকে খুব কৃচ্ছ্র সাধন করাইতেন। রামদাস একনিষ্ঠ ভক্তের ন্যায় প্রভুর সেবা করিতেন। প্রভু তাঁহাকে কোন মিষ্ট দ্রব্য উদরস্থ করিতে দিতেন না। এমনি ভাবে তিনি ক্রমে ক্রমে রামদাসকে তৈয়ারী করিয়া লইলেন। অবশেষে রামদাসের কৃষ্ণানুরাগ এমন বর্দ্ধিত হইল যে, নাম করিতে বসিলেই অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত। পাছে এই অশ্রুজল ও ভাবাবেশের মধ্য দিয়াও কোন ফাঁকে প্রতিষ্ঠা প্রবেশ করে, এই আশঙ্কায় বন্ধুসুন্দর বাহিরে শুষ্ক ভাব দেখাইতেন। "ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্"—ইত্যাদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যের মধ্যে যে শিক্ষার বীজ নিহিত আছে, সেই শিক্ষাই শ্রীশ্রীপ্রভু আপন আচরণের মধ্য দিয়া রামদাসকে প্রদান করিলেন। বন্ধুসুন্দর রামদাসসহ শ্রীশ্রীকুণ্ডতটে শ্রীল দাসগোস্বামীর ঘেরায় থাকিতেন। প্রভুর আদেশে রামদাস প্রত্যহ তিন বার শ্রীকুণ্ডদ্বয় পরিক্রমণ করিতেন। ব্রজবাসের সময় ব্রজবালা বালকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ রামদাসকে ব্রজমাধুরী ভোগ করাইয়াছিলেন। পরে কলিকাতায় পরস্পরের মিলন হইয়াছিল। প্রেমে ভোলা প্রেমানন্দ-ভারতী রামদাসকে কোলে টানিলেন। নিত্য যমুনাবগাহনে যাতায়াতের কালে পথে প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীর পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডপাত প্রণতি করিতেন; শ্রীধাম নবদ্বীপে হরিসভায়, কলিকাতায়ও তাঁহার সহিত রামদাসের অপূর্ব্ব মিলন হইয়াছিল। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজী তাঁহার কৃপাশক্তি রামদাসের মধ্যে পূর্ণভাবে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন।

ব্রজবালা বালকৃষ্ণ রামদাসকে সঙ্গে লইয়া চুরাশি ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়াছিলেন। এই পরিক্রমার সময় একদিন ফুল তুলিয়া সিঁড়ির উপরে রাখিয়া কুসুম-সরোবরে দুই জনেই স্নান করিতে জলে নামিয়াছিলেন। এমন সময় এক প্রৌঢ়া ও এক কিশোরী সেই তীরে আসেন ও কিশোরী সিঁড়ির উপরে রাখা সেই ফুল লন। ব্রজবালা তাড়াতাড়ি জল হইতে উপরে উঠিয়া ঐ ফুল লইতে আপত্তি জানান, তাহাতে কিশোরী বলেন, "মেরী ফুল হায়", "মেরী ফুল হায়", "মেরী ফুল হায়"। ব্রজবালা নিরস্ত হন এবং কিশোরীকে দেখাইয়া রামদাসকে বলেন, "এই তোর স্বরূপ।"

ব্রজে বাসকালে একদিন রামদাসকে নিকটে আহ্বান করিয়া বন্ধুসুন্দর কহিলেন, "রাম, তুই বৃন্দাবনে থাকিয়াই ভজন কর।" রামের মুখ মলিন হইয়া গেল। ব্রজে ভজন ভাগ্যের কথা। কিন্তু রামদাসের কাছে তার চেয়েও বড় ভাগ্য প্রভুর শ্রীচরণ-সান্নিধ্য—"কোটি গোপীনাথ সেবা তৎপদ দর্শন"—শ্রীকৃষ্ণদাস। তাই রামদাস প্রভুর সঙ্গে যাইতেই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভুও পুনরায় বলিলেন, "রাম থাক, মঙ্গল হবে।" তখন রামদাস অগত্যা বলিলেন, "তবে থাকি।" রামের উত্তরের ভঙ্গীতে দুঃখিত হইয়া মৃদু তিরস্কারের সুরে বন্ধুসুন্দর বলিলেন, "ছিঃ, চাঁদে কলঙ্ক হ'ল?" রামদাস প্রভুর ভাব বুঝিয়া লজ্জিত হইলেন এবং প্রফুল্ল চিত্তে তাঁহার আদেশ পালনে সম্মত হইলেন। বিদায়কালে বন্ধুসুন্দর বলিলেন, "রাম, নিত্য শ্রীগৌর গায়ত্রী, শ্রীনিতাই গায়ত্রী সংখ্যা করিয়া জপিবে। নিত্য লক্ষ নাম করিবে। মাধুকরী করিবে। আমার হস্তাক্ষর ভিন্ন পড়িবে না। অন্যের চিঠি পাইলে যমুনায় ভাসাইয়া দিবে।" কিছুকাল বাদে প্রভু রামদাসকে নিজে চিঠি দিলেন। অন্যের চিঠি তাঁহাকে পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন, তাই তিনি নিজেই চিঠি দিলেন। আসিতে লিখিলেন। তখন রামদাস বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীবঙ্কুবিহারীজীর মন্দিরের অনতিদূরে শ্রীপাদ রঘুনন্দন গোস্বামীর রাধামাধবের মন্দিরে আছেন। শ্রীরঘুনন্দনও আছেন। পত্রের কথা শুনিয়া রঘুনন্দনজী সুখী হইলেন না। তিনি রামদাসকে বলিলেন, "প্রভুকে লিখিয়া দিন যে এখন যাওয়া যাবে না। ব্রজের এই ভজন ছাড়িয়া কোথায় যাইবেন?" ধীর বিনীতভাবে রামদাস কহিলেন, "গোসাইজী, একি কথা বলেন? যিনি ঘরের বাহির করিয়াছেন, নবদ্বীপ দর্শন করাইয়াছেন, ব্রজরজে টানিয়া আনিয়া মধুর ভজন উপদেশ দিয়া নিয়ত শক্তিসঞ্চারে এই আনন্দরস আস্বাদন করাইতেছেন, তিনি কি এই ভোগের চেয়ে বড় নহেন? বন্ধুর আদেশ উপেক্ষা করিয়া ব্রজে বাস আমার পক্ষে বিড়ম্বনা।" এই কথা শুনিয়া শ্রীরঘুনন্দন পরম প্রীতিলাভ করিলেন, হাসিমুখে বলিলেন, "আপনি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। আপনি প্রভুর কাছে চলিয়া যান। আপনি ধন্য, যাঁহার পরম করুণায় ব্রজবাস ও ব্রজরস সম্ভোগ, তাঁহারই আহ্বানে ব্রজ পিছনে পড়িয়া রহিল। অথবা, ব্রজ-ধন যাঁর হৃদয়ে সদাই বিরাজমান, ব্রজধাম তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই চলে। যথানির্দ্দিষ্ট ভাবে পথ চলিয়া "জয় রাধে শ্যাম রাধে" ধ্বনি দিয়া রামদাস আলমবাজারস্থ কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগান-

বাড়ীতে পৌঁছিলেন, শ্রীশ্রীপ্রভু-জগদ্বন্ধুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া শ্রীচরণ দর্শন করিলেন।

শেষরাত্র হইতে কীর্ত্তন আরম্ভ হইত। রামদাস মাঝে মাঝে বন্ধুসুন্দরকে জানাইতেন যে, এই দেশে থাকিতে ইচ্ছা হয় না। বৃন্দাবনে বাস করিয়া ভজনানন্দে ডুবিয়া থাকিতেই প্রাণ চায়। তদুত্তরে জগদ্বন্ধুসুন্দর বলিয়াছিলেন, "আপন আপন খাবারের যোগাড় ত পশু-পক্ষীরাও করিয়া থাকে। দশ জনকে খাওয়াইয়া যে খায় সেই প্রকৃত মানুষ।" কথা কয়টি মন্ত্রের মতন কাজ করিল, কানে প্রবেশ করিবামাত্র রামদাসের ব্রজে থাকিবার আবেশ একেবারে লোপ পাইল। নিজে ভাবিয়াছিলেন ব্রজের ভজনানন্দী বৈষ্ণব হইবেন, কিন্তু তাঁহার ভাবী জীবনের রূপটি যাঁহার নখ-দর্পণে, তিনি জানেন যে এক সময়ে তাঁহাকে (রামদাসকে) ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া নিতাইগৌরের গুণগাথা গাহিতে হইবে। তাই তাঁহার প্রাণের দেবতা তাঁহাকে আস্বাদনের কুঞ্জ হইতে টানিয়া আনিয়া বিতরণের রাজপথে তুলিয়া দিলেন।

নিত্যানন্দ পতিতপাবন।
যুগের দুর্লভ ধন করে বিতরণ॥

বন্ধুসুন্দরের ইঙ্গিতে সিঙ্গুরের ভৈরবচন্দ্র গোস্বামী প্রভুর নিকট হইতে শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীশ্রীহরিনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর কটকে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহারাজ ইঁহাকে শ্রীশ্রীগৌরমন্ত্রে দীক্ষিত করতঃ সর্ব্বশক্তি সঞ্চার করিয়া নামসঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত করেন। ১৩০২ সালে শ্রীশ্রীধাম নবদ্বীপস্থ লালগোবিন্দের আখড়ায় ইঁহাদের পরস্পরের মহামিলনে কলিহতজীবের মহামঙ্গলের সূচনা হইল, তখন উভয়ের মধ্যে এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় ভাবের বিনিময় হয়।

কাশীধামে শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী, কলিকাতায় চোরবাগানে এবং কলুটোলায় শীলবাড়ীতে হরিবোলানন্দ স্বামী, শ্রীধাম নবদ্বীপের সিদ্ধ বাবা শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজকে সাদরে করুণামৃত বর্ষণ করিয়া ধন্য করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীরাধারমণচরণদাস বাবাজী মহাশয়ের উপদেশ ও নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে নিজের জীবনে পালন করিতেন শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজ। ইঁহাদের মিলনের বিস্তৃত বিবরণ ও কাহিনী "চরিতসুধা, ৫ খণ্ড" গ্রন্থে (প্রাপ্তিস্থান—শ্রীশ্রীপাঠ বাড়ী, বরাহনগর) লিপিবদ্ধ আছে, উহা পাঠ করিলে রসসম্ভোগ হইবে। ১৩০৯ সালের ৫ই শ্রাবণে লিখিত নিম্নে উদ্ধৃত পত্রটি শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজের নিত্য স্মরণ ও সাধন ভজনের সহায়ক—

"৫ই শ্রাবণ ১৩০৯

শ্রীশ্রীরাধারমণোজয়তি

নিতাই গৌর রাধেশ্যাম
হরে কৃষ্ণ হরেরাম।

প্রাণাধিক গোবিন্দ,

শ্রীমান অটলকে পাঠাইতেছি, সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া মাধুকরী বৃত্তি দ্বারায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ এবং শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে ঝাড়ুদারী কার্য্য করিবে ও করাইবে। রাজান্নাদি ও স্থূল ভিক্ষা করিও না ও করিতে দিবে না। পারস পাইলে অন্যকে দিবে। বৈষ্ণব সাজিও না ও সাজিতে দিবে না। কাঙাল হইয়া কাঁদিতে থাক বড়ই ভয়ানক সময় আমি ভাল আছি। ইতি

শ্রীরাধারমণচরণদাস।"

গুরুবাক্য অনুসারে প্রতিষ্ঠাকে শূকরীবিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী। নিজেকে সর্ব্বদা অন্তরালে রাখিতেন, কখনও আত্মপ্রকাশ বা ঐশ্বর্য্যের বিকাশ করিতেন না। "আমি মরি যবে কৃপা পাবে তবে"—এই অমূল্য উপদেশবাণীর বিশুদ্ধ, বিনম্র, জীবন্ত রূপ ছিলেন রামদাস। তিনি ছিলেন নিয়ম, নিষ্ঠা, আচার, বিনতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি প্রকৃত বৈষ্ণবের সকল গুণের আকর। 'আপনি আচরি' ধর্ম্ম প্রকাশের এবং প্রচারের এক মহান্ দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীনাম ও মহাপ্রসাদ তিনি জনসাধারণের মধ্যে অকাতরে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। সকল ধর্ম্মকে ও সকল সম্প্রদায়কে যথোচিত সম্মানপ্রদর্শনে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। কি মন্দির, কি মসজিদ; কি গীর্জ্জা সকল ধর্ম্মায়তনেই তিনি ভক্তিভরে প্রণাম করিতেন। শিব, শক্তি—যথা দুর্গা, কালী, তারা, গণেশ, সীতারাম, মহাবীর, গোপাল, গোবিন্দ, রাধাকৃষ্ণ, নিতাইগৌর, ঠাকুর হরিদাস, সকল ধর্ম্মের ভক্তগণকে তিনি শ্রদ্ধা, পূজা ও সম্মান করিতেন। রাত্রিতে দশটা সাড়ে দশটা হইতে রাত্রি দেড়টা বা দুইটা পর্য্যন্ত অর্দ্ধশয়নে থাকিতেন, তদ্ব্যতীত দিনরাত সকল সময় ঘড়ির কাঁটার ন্যায় বিনা বিশ্রামে জপ, ধ্যান, স্মরণ, পূজা, আহ্নিক, বিগ্রহাদি দর্শন, দণ্ডপাত-প্রণতি, পাঠ, শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনে নিমগ্ন থাকিতেন। বৃথা বাক্যব্যয়ে আদৌ সময় কাটাইতেন না।

সকল কৃপার প্রবাহ শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজের মধ্যে এক অখণ্ড অভূতপূর্ব্ব পতিতপাবন সঙ্গমে পরিণত হইয়াছিল। পুরীধামে হরিদাস ঠাকুরের উৎসবে রথাগ্রে সঙ্কীর্ত্তন, 'রাঘবের ঝালি' বহন ও গম্ভীরায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে সমর্পণ—যাহা বিগত প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া প্রতি বৎসর অব্যাহত ভাবে চলিয়াছে—পানিহাটীর বৃক্ষরাজমূলে সঙ্কীর্ত্তন, বৃন্দাবনধামে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আগমনী-উৎসব-সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের পদাঙ্কিত ভারতের প্রত্যেক লীলাতীর্থে সঙ্কীর্ত্তন ইত্যাদি রামদাসের বিভিন্ন পুণ্যকৃত্য চিরস্মরণীয় থাকিবে এবং ভক্তহৃদয়ে সাধন-ভজনের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিবে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু নিজের অপূর্ণ সাধ পূর্ণ করিবার জন্যই যেমন তাঁহার প্রকটলীলার যুগে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ভার দিয়াছিলেন তেমনি বর্ত্তমান যুগে প্রভু তাঁহার অপ্রকট লীলার প্রকাশ স্বরূপ শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজকে সেই গুরুভার প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার দান শ্রীমন্মহাপ্রভুরই দান। তিনি একাধারে নিতাই, গৌর, ঠাকুর হরিদাস সকলের মিলিত চিন্ময় তনু। "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচারিত হবে মোর
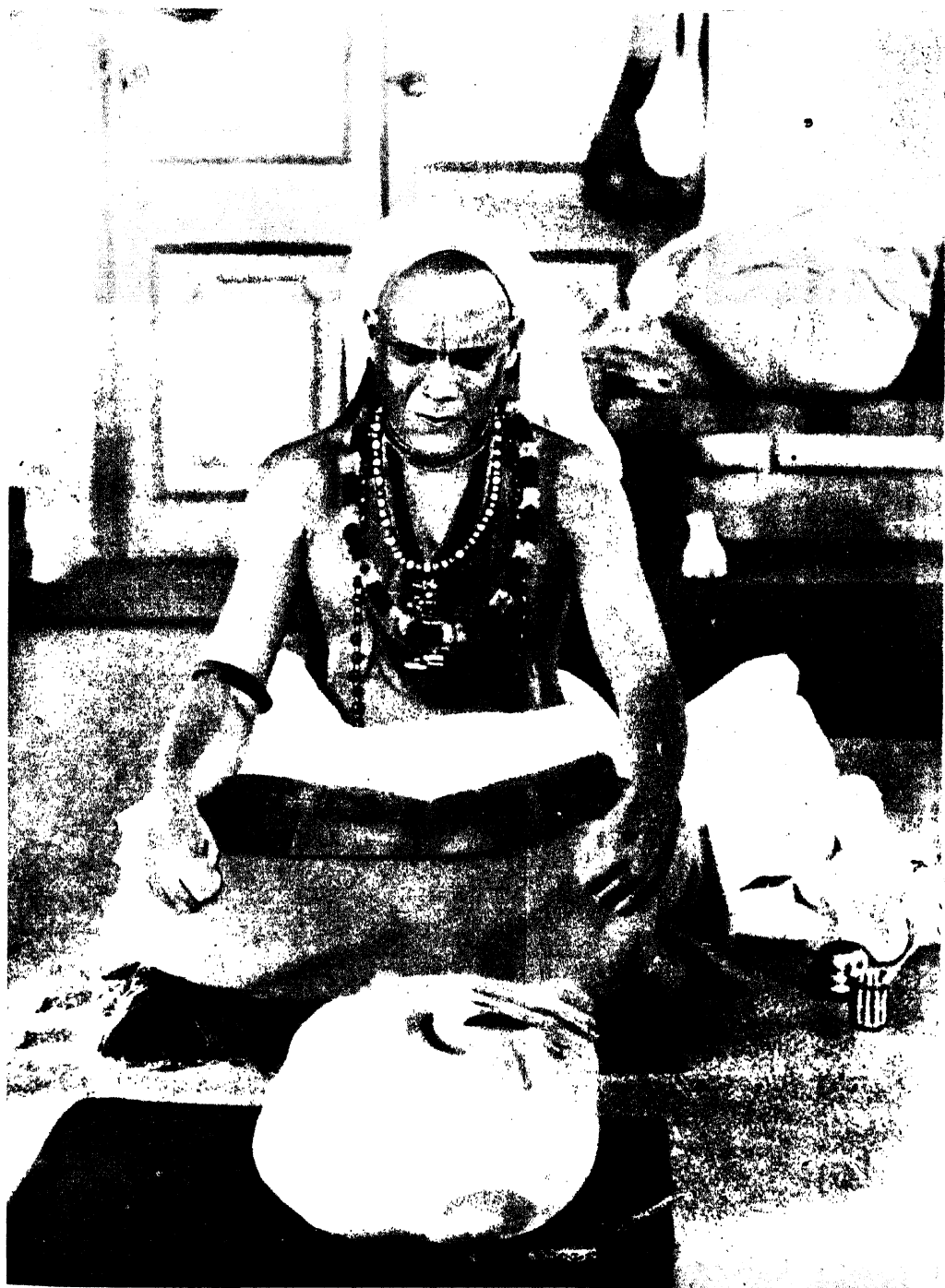
শ্রীশ্রীরামদাসবাবাজী

নাম।"—গৌরাঙ্গসুন্দরের এই শুভবাণী সার্থক করিবার জন্যই শ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজ করুণাবশতঃ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং প্রকটে যে লীলা করিয়াছেন অপ্রকটেও সেই লীলা অদ্যাপি করিতেছেন—তাঁর এই লীলা ত্রিকালসত্য লীলা। প্রেমের ঠাকুর নিত্যানন্দ-প্রতিম শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর ও শ্রীশ্রীরাধারমণচরণ দাস বাবাজী যাঁহার জীবনপথের বর্ত্তিকাধারী—শ্রীশ্রীনিতাইগৌর, ঠাকুর হরিদাস, গোঁসাই গোবিন্দ যাঁহার জীবনের সর্ব্বস্ব, যিনি সকল বৈষ্ণবশক্তির, দেবদেবীর, সর্ব্বভক্তের মিলন-ক্ষেত্র-স্বরূপ, যিনি উদ্দণ্ড সঙ্কীর্ত্তন-কালে পুরুষসিংহ ও কলিহত জীবগণের কল্যাণের জন্য আর্ত্তস্বরে ও অশ্রুবর্ষণে ক্ষুদ্র, সরল, সরস শিশু, যিনি 'রসো বৈ সঃ', যিনি গৌড়ীয় লুপ্ততীর্থ উদ্ধারে শ্রীরূপ গোস্বামী, চিরকৌমার্য্যে যিনি দেবব্রত ভীষ্ম, শ্রীশ্রীনাম সাধনে ও যাজনে যিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বৈষ্ণবগণের অকুণ্ঠ স্মরণই যাঁহার সাধন ও ভজন, প্রেমভক্তি-বিনম্র চিত্তে যাবতীয় লীলা-স্থলের রজঃ গ্রহণ ও তীর্থবারি সেবা যাঁহার নিত্যসাধন, রসতত্ত্ব আস্বাদনে যিনি রায় রামানন্দ, ত্যাগ তপস্যায় যিনি শ্রীসনাতন ও শ্রীদাস গোস্বামী সেই পতিতপাবন শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজের প্রেমের ও কৃপার স্পর্শে আমাদের জীবন যাহাতে কৃতার্থ হয় সেই জন্য তাঁহারই শ্রীশ্রীপাদপদ্মে বিনীত ভাবে প্রার্থনা ও ভিক্ষা জানাই। তিনি অপ্রকট হইলেও ভাগ্যবানের কানে আসে অদ্যাপি তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত নামগান।

ধর্ম্মই বিশ্বসংসারকে ধারণ করে। ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইলে মানবসমাজে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ধর্ম্মবন্ধনের শিথিলতাই বিশ্বব্যাপী সকল দুর্দ্দৈব, অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতার মূল কারণ।

জগন্মঙ্গল শ্রীশ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই এই কলিযুগের "যুগধর্ম্ম"।

"প্রণমহ কলিযুগ সর্ব্বযুগ সার।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন যাহাতে প্রচার॥"

শ্রীশ্রীনাম ও প্রেমের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর "সকারুণ্য" বশতঃ অবতরণে কলিযুগ ধন্য।

"এই অবতারে বহে প্রেমামৃত বন্যা।
এই বন্যায় যেই ভাসে সেই হয় ধন্যা॥"

এমন কে আছে জীবের—কলিহতজীবের সুহৃৎ, পাপীর বন্ধু, দীনের শরণ, অগতির গতি, কাঙালের ঠাকুর, চিরদিন সঙ্গে সঙ্গে থাকে যে, পতিতে যার ঘৃণা নাই—আছে বুকভরা স্নেহ দরদ, অন্ধ আতুর বাছে না যে, প্রেমের কোলে টানে, পারের কড়ি নেয় না, যে হাসিমুখে পার করে মলিন মুখ দেখিয়া? কি সে অভয় আশ্রয়—কে সে পরম বন্ধু? উত্তর: মধুমাখা হরিনাম। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন, "ধন্য হরি রাজ্যপাটে, ধন্য হরি শ্মশানঘাটে, বল ভাই ধন্য হরি, ধন্য হরি"।

শ্রীশ্রীহরিনাম পাত্রাপাত্রের বিচার করে না। সম্মুখে যাহাকে দেখে তাহাকেই কোলে টানিয়া লয়। এই বিষয়ে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অজামিল ও রত্নাকর দস্যু হইতে আরম্ভ করিয়া জগাই মাধাই পর্য্যন্ত; ধ্রুব, প্রহ্লাদ হইতে আরম্ভ করিয়া মীরাবাঈ পর্য্যন্ত—কেহ বাদ যায় নাই। শিব, শুক, নারদ শ্রীশ্রীনামে বিভোর। বেদ, পুরাণ, সর্ব্বধর্ম্মের সকল গ্রন্থের পাতায় পাতায় সেই রহস্যই বিদ্যমান। রামানুজ মধ্ব নিম্বার্ক ইঁহার বিজয়গীতি-বার্ত্তাবহ। সকলে সেই এক কথাই বলে।

"ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে॥"

বিশ্বপ্রেমের বিজয়-পতাকা শ্রীহস্তে গগনমণ্ডলে মেঘাবরণ ভেদ করিয়া কে ঐ সোনার মানুষ প্রেমের ঠাকুর আসেন? তাঁহার শ্রীচরণকমলে চন্দ্রকিরণ, শ্রীঅঙ্গে সুধার মাধুরী, নয়নে প্রেম-পরিমল—কে ঐ শ্রীমূর্ত্তি? ইনিই সেই আজানুলম্বিতভুজ, যুগধর্ম্ম-পালনকর্ত্তা, জগৎপ্রিয়কর, ত্রিকালসত্য নদীয়ার পূর্ণচন্দ্র শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু। ভক্তির লহরী, নামের সুধা ছড়াইয়া দিয়া কলিহত-জীবগণকে অমৃতময় করিবার নিমিত্ত তাঁহার ধরায় অবতরণ ও ধরা দেওয়া। পৃথিবীর সকল ভক্তের আশীর্ব্বাদে আমরা বদ্ধজীব যেন তাঁর রাতুল শ্রীচরণ ধরিতে পারি—কারও বাধা নাই, কারও নিষেধ নাই—অবারিত দ্বার, আমরা প্রাণ ভরিয়া সদাই বলিতে পারি তাঁহারই শ্রীমুখে আনা কলিযুগের জীবের জন্য মহাদান তারক-ব্রহ্ম 'হরিনাম'—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

শ্রীশ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের ও বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ স্তম্ভস্বরূপ, ভাগবতোত্তম, বৈষ্ণবজগতের প্রখ্যাত শ্রীগুরু আচার্য্য শ্রীল শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজ বিগত ১৮ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার রাত্রি ২-৪০ মিনিটে বরাহনগরস্থিত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত শ্রীশ্রীপাঠবাড়ীতে তাঁহার প্রকটলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার পরমপাবন শ্রীশ্রীচরণার-বিন্দের সাক্ষাৎ স্পর্শ-সৌভাগ্যে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি। সুরধুনী-তীরে এই শ্রীশ্রীপাঠবাড়ীতেই তাঁহার চিন্ময় দেহ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রথা অনুসারে সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছে ও তথায় তাঁহার নিত্য সেবা পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। তিনি স্বয়ং অপ্রকট অবস্থাতেও তাঁহার চিরদিনের সেবায় নিমগ্ন আছেন। কোন কোন ভাগ্যবান নাকি ইহা দেখিতে পান।

তাঁহার এই প্রকটলীলা সংবরণের কাহিনী হৃদয়কে গভীর শ্রদ্ধায় পূর্ণ করিয়া দেয়। দেহরক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে রামদাস নিকটস্থ সেবকগণকে অন্যান্য সেবকদিগকে ডাকিতে ও সকলকে খবর দিতে বলেন এবং স্থির, ধীর ও শান্তভাবে বলেন যে, তাঁকে যেতে হবে—"দিদি" (নবদ্বীপ সমাজবাটীর শ্রীশ্রীললিতাসখী) "ডাকছেন", এই বলিয়া তাঁহার আরাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের, শ্রীশ্রীনিতাই গৌরের এবং "গোঁসাইজীর" (শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর) চিত্রপট তাঁহার সম্মুখে আনিতে বলেন, সেবকগণ তাঁহার আদেশ পালন করেন। সেই চিত্রপটগুলি ও তাঁহার শয়নকক্ষের সকল আরাধ্য চিত্রপট দর্শন, স্মরণ ও ভজন করতঃ 'জয় মহাবীর জয় রাধারমণ' বলিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে হুঙ্কার করিয়া জয় নিতাই বলিয়া, "বন্ধুসুন্দর" শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক বরাহনগরের [illegible] বিনা আসনে উপবেশন করিয়া শ্রীশ্রীনাম করিতে [illegible] প্রকটলীলা সম্বরণ করেন। লীলাময়ের অপরিসীম কৃপায় কলির জীবের অশেষ কল্যাণের নিমিত্ত সেই শ্রীশ্রীনাম সেই পুণ্যক্ষণ হইতে অদ্যাপি শ্রীশ্রীপাঠবাড়ীতে অব্যাহতভাবে চলিতেছে।

স্বর্ণাক্ষর

শ্রীদেবাংশু সেনগুপ্ত

পূর্ব্বাভাষ

[অসিতের বৈঠকখানা। অসিত লেখক। যুবক। সে আজই মাত্র আসিয়া পৌছিয়াছে। সন ১৯৪৫, স্থান বাংলা-দেশের একটি ক্ষুদ্র শহর। কাল—রাত্রি দশটা। পর্দ্দা উঠিতে দেখা গেল বাহিরের দিকের চেয়ারখানাতে নবেন্দুবাবু বসিয়া আছেন। নবেন্দু স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সারথি'র সম্পাদক। বয়স চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। হাতে একখানা ফ্ল্যাট-ফাইল, টেবিলের উপর রাখা একখানা গোল করিয়া গুটানো ক্যালেণ্ডার। সিগারেট খাইতেছেন এবং মাঝে মাঝে ভিতরের দরজাটার দিকে তাকাইতেছেন। হাতে সিগারেটের টিন। দুই মিনিট কাল পরে অসিতের প্রবেশ। পরনে ধুতি ও গেঞ্জী। হাতে লেখার সরঞ্জাম। নবেন্দু উঠিয়া দাঁড়াইলেন]।

অসিত। কিছু মনে করবেন না, খেতে বসেছিলাম। (উভয়ে বসিলেন) তারপর ?

নবেন্দু। আমার প্রেসের একখানা ক্যালেণ্ডার এনেছিলাম, ভাবলাম নূতন এসেছেন, কাজে লাগতে পারে।

অসিত। নিশ্চয় কাজে লাগবে, খুব কাজে লাগবে। কলকাতা থেকেই একখানা নিয়ে আসা উচিত ছিল। (স্মিতহাস্যে) তবে এর জন্যে আবার এত রাত্রে কষ্ট করে এলেন। (উঠিবার উপক্রম)

নবেন্দু। (ব্যস্ত হইয়া) শুধু এর জন্যে নয়, আর একটু সামান্য কাজ আছে। (অসিত পুনরায় ভাল হইয়া বসিল। নবেন্দু সিগারেটের টিনটা আগাইয়া দিলেন)।

অসিত। ওটা আর খাই না। বিদেশী বলে ছেড়ে দিয়েছিলাম। চুরুটটা খাই, মাদ্রাজে তৈরি বলে, তাও খুব কম।

নবেন্দু। আপনার কাছে এসেছিলাম একটা ছোট গল্পের জন্যে। আমার পত্রিকা 'সারথি'কে মনে আছে নিশ্চয়ই ? আগামী সংখ্যাটা কালকে বেরুবার কথা, এ শহরে আপনার ফিরে আসবার কথা, বিকেলের অভ্যর্থনা-সভা, আপনার ছোট একটু জীবনী সব মিলে প্রায় এক পৃষ্ঠা দাঁড়িয়েছে, এর সঙ্গে যদি আপনার একটা গল্প পাই—

অসিত। সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিছু লেখা নেই।

নবেন্দু। না হয় কালকে সকালে দেবেন, এই সাতটা-আটটা নাগাদ ? এ সংখ্যাটা না হয় বিকেলেই বেরুবে। আপনার লেখার জন্য সারথি একবেলা দেরি করে বেরুলে কেউ কিছু দোষ ধরবে না।

অসিত। আপনি বুঝছেন না। অন্য লেখকের কথা জানি না, আমি নিজে যখন তখন মোটেই লিখতে পারি না : আমাকে অনেক ভাবতে হয়।

নবেন্দু। কি যে বলেন ! গত এক মাসের মধ্যেও ত আপনার প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটা লেখা অন্ততঃ বেরিয়েছে।

অসিত। সব আগের লেখা। জেলে বসে এ ক'বছরে যা লিখেছিলাম, এ ক'মাসে তা ছাপতে দিয়েছি। আর একটাও নেই।

নবেন্দু। ছোট-খাটো যা মনে আসে একটা লিখে দিন।

অসিত। যা মনে আসে লেখা যায় না, লিখলেও আপনি খুশী হবেন না।

নবেন্দু। নিশ্চয়ই হব।

অসিত। হবেন ?—ধরুন যদি লিখি—দশ বছর আগে একটা নেমন্তন্ন-বাড়ীতে ঘটনাক্রমে সারথি-সম্পাদক মশায়ের মুখোমুখি আসন পড়েছিল। মাননীয় সম্পাদক মশায়কে তখন আমি ঠিক চিনতাম না। আমি বললাম, (নবেন্দু উসখুস করিতে লাগিলেন) খুব বিনীত ভাবেই বললাম, আপনাকে আগে কোথায় দেখেছি—সম্পাদক মশায় আমাকে কথাটা শেষ করতে পর্য্যন্ত দিলেন না।

নবেন্দু। পুরনো কথা তুলে আমাকে আর লজ্জা দেবেন না।

অসিত। উদ্দেশ্য ছিল না। তবে, আপনাদের মত টাইপ যদি না থাকবে পৃথিবীতে, তা হলে লেখকরা লিখবে কি নিয়ে বলুন ?

নবেন্দু। (কথা ঘুরাইতে চেষ্টা করিয়া) আর কিছু মনে আসছে না ?

অসিত। (হাসিয়া) আসবে না কেন—বালিগঞ্জ থেকে হাওড়ার পথে দুটো অনুপ্রাস এসে মাথায় বাসা বেঁধেছে, 'তিনি ঘাবড়াইতে ঘাবড়াইতে হাবড়া চলিলেন'—'তিনি ডাম্বেল ভাজিতে ভাজিতে ক্যাম্বেলে চলিলেন, কিন্তু 'অর্থ তার ভাবি ভাবি গবুচন্দ্র চুপ।'

নবেন্দু। গল্প না হয়, একটা প্রবন্ধ কি কবিতা ?

অসিত। আচ্ছা দেখি—(বলিতে বলিতে অন্যমনস্ক ভাবে টেবিলের উপর আঙুল বাজাইতে সুরু করিল, ভাবটা যেন খুব গভীর চিন্তামগ্ন। নবেন্দু বুঝিতে পারিয়া উঠিয়া পড়িলেন)

নবেন্দু। (অনিশ্চিত ভাবে) কালকে সাতটা-আটটায় আসব ? (অসিত তেমনি তন্ময়, শুধু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল) একটা গল্প হলেই কিন্তু ভাল হয়। (অসিত পুনরায় তেমনি ঘাড় নাড়িল। অসিতের মুখের দিকে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান)।

[কতক্ষণ সব চুপচাপ, শুধু আঙুল দিয়া অসিতের টেবিল বাজানো শোনা যায়। ধীরে ধীরে জানালার বাহিরে একটি মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। অসিতের মুখ জানালার দিকে হইলেও চোখ কোথাও নিবদ্ধ নয় ; সে তাহা দেখিতে পাইল না। সমস্ত গায়ে মালিন্যের কয়েকটি স্তর স্বাভাবিক গাত্র-

চর্ম্মকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়াছে, কেবল নাকটি পরিষ্কার এবং চক্‌চক্ করিতেছে। মূর্ত্তিটির একটি মুদ্রাদোষ আছে, হাতের তালুর অপর পিঠ দিয়া অনবরত নাক ঘষা। মাথায় দীর্ঘ কেশ, লম্বমান দাড়ি; চক্ষু বসা ও রক্তবর্ণ, আগাগোড়া অসিতের উপর নিবদ্ধ। গাত্র হইতে একটি বিকট চিমসে গন্ধ বাহির হইতেছে। ধীরে ধীরে অসিতের আবিষ্ট ভাবটা কাটিয়া যাইতে লাগিল। সে কাগজ-কলম গুছাইয়া মূর্ত্তিটির দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত করিল]

অসিত। (ভীত-কর্কশকণ্ঠে) কে, কে ওখানে ?

মূর্ত্তি। (ধীরকণ্ঠে) আমি একটা গল্প—(আরও কিছু বলিল, কিন্তু তাহা শোনা গেল না)।

অসিত। (আশ্বস্ত হইয়া আশান্বিত তরল কণ্ঠে) একটা গল্প বলতে চাও নবেন্দুবাবুর ফরমাশমত ? বেশ, গল্প যদি সত্যিই ভাল হয় এক টাকা বক্‌শিশ দেব। এস, ভেতরে এস। (মূর্ত্তিটির প্রবেশ। অনেক দিন পরে লোকে কোন একান্ত পরিচিত স্থানে ফিরিয়া আসিলে যেমন করিয়া তাকায় সে ঠিক তেমন ভাবেই এদিক-ওদিক তাকাইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে নবেন্দুর পরিত্যক্ত চেয়ারটাতে বসিয়া পড়িল। অসিত বলিতে যাইতেছিল, 'বসো' কিন্তু তাহা মুখেই থাকিয়া গেল। সে উঠিয়া গিয়া জানালা ও দরজাগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল, এবং পূর্ব্ব ভঙ্গীতে বসিল) হাঁা, বল এবার।

মূর্ত্তি। অসিত, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না ? (অসিত বিমূঢ় বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল)। আমাকে তুমি এক সময়ে মেসোমশায় বলে ডাকতে। আমরা তোমার এ বাড়ীর ঠিক সামনের বাড়ীতে থাকতাম।

অসিত। (ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল, যেন মূর্ত্তিটিকে প্রণাম করিতে যাইবে একবার এইরূপ ভাব দেখাইল, কিন্তু কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল।) [ধরা গলায়] আপনি অঘোরবাবু ? আপনার এই অবস্থা ! মাসীমা কোথায় ? ছবি, ছবি কোথায় ? [যেন গলাটা বন্ধ হইয়া গেল গলায় হাত দিয়া এইরূপ ভাব করিল]

অঘোরনাথ : হাঁা, আমি অঘোরনাথ বোস। একদিন তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য পাগল ছিলে। (হাত তুলিয়া যেন অসিতের প্রতিবাদ বন্ধ করিয়া) তুমি বল নি, কিন্তু আমি সব জানি। দীর্ঘদিন পরে শুধু ছবির জন্যই তুমি ফিরে এসেছ এই শহরে, আমি তাও জানি।

অসিত। (ধরা গলায়) ছবি কোথায় ?

অঘোরনাথ। (জেরার কণ্ঠে) অসিত, কবিতাটা তোমার লেখা—? 'যুদ্ধবিরতি' কবিতা (আবৃত্তি করিয়া)

—কিন্তু থেমেছে কি,
দিগবিদিকের বুকফাটা যত মাতাবনিতার ক্রন্দন ?
মুক্তি অন্তে বিক্রীতা দুহিতা ফিরেছে ঘরে ?
পথ-প্রান্তরে ফেলে আসা যত গলিত শবে
পেল কি আচ্ছাদন ?

জেনেছ কি ?—

অসিত, আমি পাগল হয়ে গেছি।

অসিত। (ব্যাপারটাকে মোলায়েম করিতে চেষ্টা করিয়া) ভাল হয়ে যাবেন, নিশ্চয় ভাল হয়ে যাবেন, একটু চিকিৎসা আর সেবা—

অঘোরনাথ। (বাধা দিয়া, জোরগলায়) না, আমি ভাল হতে চাই না। (আবেগকম্পিত নিম্নকণ্ঠে) জান অসিত, আমি যখন পাগল থাকি তখন খুব ভাল থাকি, খাবার ভিক্ষে করতে হয় না, কাপড়ের প্রয়োজন হয় না, স্মৃতিতে পুড়ে মরি না। আর যখন জ্ঞান হয় তখন দেখি আমি উলঙ্গ, মনে পড়ে আমি কে ছিলাম (স্বর চড়াইয়া), সে যে কি যন্ত্রণা অসিত ! (উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন)।

অসিত। মেসোমশায় ! বসুন !

অঘোরনাথ। (বসিয়া) যখন ভাল থাকি, কাঁদি। পুরানো জীবনের জন্য কাঁদি। মনে পড়ে, এই ঘরে বসে আমরা সোনার ভারতের স্বপ্ন দেখেছি ? সকল শহীদের নাম আঁকা দেখেছি ভবিষ্যতে, স্বর্ণাক্ষরে ? (বুক পাতিয়া) দেখ, আমি সেই স্বর্ণাক্ষর ! উন্মাদ ভিখারী—পথ সম্বল।

অসিত। আপনি আর কোথাও যাবেন না, এখানেই থাকবেন আমার কাছে।

অঘোরনাথ। অসিত, এই শহরে এই একটি মাত্র বাড়ী, যেটা বদলে যায় নি। শহরের বাড়ীগুলো হয় মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, নয় তিনতলা হয়ে মাথা তুলেছে। তুমি যা দেখে গিয়েছিলে, কিছুই আর নেই তার। খুব ভাল ছিলে জেলখানায়। ভাবনা ছিল না। চিন্তা ছিল না। পাতা বিছানা পেয়েছ, তৈরি খাবার খেয়েছ, গল্প লিখেছ, কবিতা লিখেছ, নাম করেছ।

অসিত। (সন্তর্পণে) আপনি কোথায় ছিলেন মেসোমশায় ? ছবিরা কোথায় ?

অঘোরনাথ। কি মূর্খ তুমি ! যতদিন বাড়ী ছিল, বাড়ীতে ছিলাম। তারপর, হাঁা, তারপর, পাগলের কি আর থাকার জায়গার অভাব হয় ? যখন জ্ঞান হয়, কিসের দাবিতে জানি না, তোমার বারান্দায় এসে আস্তানা গাড়ি ! আর সম্মোহিতের মত চেয়ে থাকি, যেখানে আমার বাড়ী ছিল, সংসার ছিল, সেই দিকে, যেখানে এখন সন্তোষ দে'র তিনতলা ইমারত উঠেছে, দুখানা মোটর আনাগোনা করে, সেই দিকে। (বাহিরে মোটরের শব্দ হইল) ঐ শোন।

অসিত। ওটা না আপনার নিজের বাড়ী ছিল ? সন্তোষ দে কে ?

অঘোরনাথ। সন্তোষকে মনে নেই ? আমার বাড়ীতে চাকর ছিল ? তিনিই এখন মিঃ সন্তোষ দে। দুখানা বাড়ী, দুখানা গাড়ী, আরও অনেককিছুর মালিক।

অসিত। কি আশ্চর্য্য!

অঘোরনাথ। অসিত তুমি গল্পলেখার মশলা পাও না। নবেন্দু চলে যাওয়ার পর থেকে তুমি মাথা খুঁড়ছ, আমি জানলা দিয়ে দেখছি। রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় যে সব উলঙ্গ পাগল, তাদের নিয়ে গল্প লেখ, মহা মহা কাব্য সৃষ্টি করতে পারবে। যে জাত-ভিখারী সে পাগল হয় না। যে পাগল হয় তার পেছনে থাকে বিরাট ইতিহাস, (ব্যঙ্গস্বরে) তোমার গল্পের উপকরণ!

অসিত। মাসীমা কোথায়? ছবি কোথায়? তারক কোথায়?

অঘোরনাথ। যখন ভাল থাকি তখন পড়তে ইচ্ছে করে। ষ্টেশনে বইয়ের ষ্টলে বাবুরা পাতা ওল্টান, আমি পেছন থেকে পড়তে চেষ্টা করি। (বিষণ্ণ স্বরে) আমাকে বই ছুঁতে দেয় না!

অসিত। আমার বইগুলো সবই যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে। ভাড়াটেরা ওসব কিছু ধরে নি। আরও নতুন বই এনেছি; যত খুশি পড়তে পারবেন। এখন চলুন আপনার শোবার বন্দোবস্ত করে দি'। খাবারও কিছু হয় তো আছে, চলুন, দেখি। (উঠিয়া পড়িয়া কাগজপত্র গুছাইতে সুরু করিল)

অঘোরনাথ। না, না, না। তোমাকে যা বলতে এসেছি সে তো এখনও বলা হয় নি! তুমিও ত জানতে চাইছ বারবার।

অসিত। (পুনরায় বসিয়া, যন্ত্রচালিতের মত) মাসীমাদের কথা?

অঘোরনাথ। তুমি জানতে চেয়েছ—(গভীর আবেগের সহিত)
—কিন্তু থেমেছে কি,
দিগবিদিকের বুকফাটা যত মাতাবনিতার ক্রন্দন?
মুষ্টি অন্নে বিক্রীতা দুহিতা ফিরেছে ঘরে?
পথপ্রান্তরে ফেলে আসা যত গলিত শবে,
পেল কি আচ্ছাদন?
জেনেছ কি?

অসিত। জেনেছ কি? (অসিতও কিছু উত্তেজিত হইয়া বিমূঢ়ভাবে তাকাইয়া রহিল)

(যবনিকা)

—

প্রথম অঙ্ক

[অঘোরনাথের বৈঠকখানা। ঘরটি ক্ষুদ্র। একটি বড় টেবিল, তাহার এক পাশে একখানি কাঠের চেয়ার, অপর দিকে দুইখানা বেতের চেয়ার। দুইটি জানালা, দুইটি দরজা; খদ্দরের পর্দ্দা ঝুলিতেছে।

সন ১৯৪২। দেওয়ালে মহাত্মা ও নেতাজীর ছবি। কাঠের চেয়ারটিতে বসিয়া অঘোরনাথ উত্তেজিতভাবে খবরের কাগজ পড়িতেছেন। তাঁহার পরনে খদ্দরের ধুতি ও ফতুয়া। পায়ে চটি। বেশ পরিচ্ছন্ন ভাব। বৈশিষ্ট্য—পুষ্ট এক জোড়া গোঁফ ও মাথার মাঝখানে চওড়া সিঁথি। বয়স পঁয়তাল্লিশ হইতে পঞ্চাশের মধ্যে। অঘোরনাথের স্ত্রী সীতার আগমন। ঘরে সম্পূর্ণ প্রবেশ করিলেন না; অন্দরের দিকের দরজার পর্দ্দার দুই অংশ দুই দিকে সরাইয়া প্রথমে দেখিয়া লইলেন বাহিরের ঘরে অপর কেহ আছে কিনা, পরনে আটপৌরে কাপড়; নিরাভরণা—কিছু বলিতে যাইবেন এমন সময়—]

অঘোরনাথ। (স্ত্রীর অস্তিত্ব বুঝিতে পারিয়া, টেবিল চাপড়াইয়া) সাবাস মেদিনীপুর! দেখ মেদিনীপুরে কি হয়েছে, ছোট খবর, কিন্তু—(উচ্চ কণ্ঠে কাগজ হইতে পড়িবার উপক্রম)

সীতা। ডাক্তার কি বলল?

অঘোরনাথ। অ্যাঁ?

সীতা। (বিরক্ত হইয়া আর একটু উচ্চ কণ্ঠে) ডাক্তার কি বলল?

অঘোরনাথ। (হাতের তালুর অপর পিঠ দিয়া নাক ঘষিতে ঘষিতে) ওঃ হ্যাঁ ডাক্তার। রক্ত পরীক্ষায় ম্যালেরিয়া পাওয়া গেছে সে তো কয়েকদিন আগেই বলেছিলেন, না?

সীতা। ম্যালেরিয়া তো সারাতে পারছেন না কেন? এক-রত্তি ছেলে আর কত ভুগতে পারে, বিছানার সঙ্গে তো মিশে গেছে একেবারে! (আঙুলের পর্ব্ব গুনিয়া) আজ আঠারো দিন হ'ল। (ঘরেরমধ্যে এক পা আগাইয়া দৃঢ় কণ্ঠে) এবার অন্য ডাক্তার দেখ।

অঘোরনাথ। দেখ, দোষ ডাক্তারের নয়, ওষুধের। বসো, বুঝিয়ে বলি। (সীতা পূর্ব্ববৎ পিছনেই দাঁড়াইয়া রহিলেন) বললে মিথ্যে কষ্ট পাবে তাই এতদিন বলি নি। তোমার প্রথম দু'গাছা চুড়ি বিক্রি করে ছ'টা ইনজেকশন কিনলাম দেখলে। পাঁচটা ইনজেকশন তোমার সামনেই দেওয়া হতে দেখলে; শেষটার সময় তুমি ছিলে না। ডাক্তারবাবু বললেন, পাঁচ-পাঁচটা কুইনিন ইনজেকশন দিলাম জ্বর একটুও কমল না, দোখ তো! শিশি ভেঙে ওষুধ জিভে দিয়ে কি বললেন জান? (উত্তরের প্রত্যাশায় কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) বললেন, ওষুধ নয়, জল। দু'গাছা সোনার চুড়ি বিক্রির টাকা দিয়ে ছ'শিশি স্রেফ জল কিনে আনলাম! সব কুইনিনের ইনজেকশনেই নাকি অমন জল বেরুচ্ছে।

সীতা। (অবসন্ন ভাবে আসিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন) কি সর্ব্বনাশ!

অঘোরনাথ। (অল্পক্ষণ থামিয়া) তার পর কালোবাজার থেকে আটাশ টাকা দিয়ে দিল্লী কেমিক্যালের সেই বিখ্যাত পেটেন্টটা কিনলাম, লেবেল, সীল, বাক্স ঠিক যেমন থাকার কথা তেমনি আছে কিন্তু ভেতরে (ঢোঁক গিলিলেন) সেই একই ব্যাপার—জল।

সীতা। (বিশেষ ভীত) কি হবে তা হলে?

অঘোরনাথ। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া একান্ত হতাশ ভাবে) বোধ হয়, ভ'ল না আর!

সীতা। অমন কথা বলো না, আমার বুক কাঁপছে।

অঘোরনাথ। চারদিকে শুধু মানুষ মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র। প্রতিজ্ঞা ছিল, কালোবাজার থেকে কিছু কিনব না। তাও রইল

না, কিছু লাভও হ'ল না। বোধ হয় সেই পাপেই—। (কিছু আশ্বস্ত হইয়া) তবে জ্ঞান ছিল না, আমার একেবারেই জ্ঞান ছিল না। ডাক্তার যখন বললেন, ইন্‌জেকসানে হ'ল না, পেটেন্টটাই একমাত্র ভরসা, দিশেহারা হয়ে ছুটলাম। ও শিশিটার দাম যে ছত্রিশ টাকা হতে পারে না একবার মনেও এল না।

সীতা। তোমার পাপ-পুণ্য বুঝি না বাপু। ঐ ছোট শিশু— নিজের ছেলে ; তাকে যে-কোনরকমে বাঁচাবার চেষ্টাকে যারা পাপ বলে তারা হয় পাগল, নয় ত তোমার আশ্রমের লোক। দুই-ই এক কথা।

অঘোরনাথ। এত দিনেও তোমাকে বোঝাতে পারলাম না যে আদর্শের চাইতে বড় কিছু নেই।

সীতা। বোঝাতে পারবেও না কোন দিন। তোমাদের পাগল বললে অনেক কম করেই বলা হয়। বলি, এতদিন ছেলেটার অসুখ, একদিন দু'দণ্ড বসেছ তার কাছে ? আজকে আশ্রমের মিটিং, কাল ন'ই আগষ্ট, আর এক দিন কোথায় আইন অমান্য—এই নিয়ে ত আছ। শুধু আজকেই দেখছি সকাল থেকে ঘরে বসে, তাও ঘরে বসে না থেকে নিজে একটু ঘুরলে বোধ হয় অন্ততঃ খোকার বার্লিটা যোগাড় করে আনতে পারতে।

অঘোরনাথ। সম্পূর্ণ অন্যায় আক্রমণ ! হাটবাজারের ব্যাপারে শ্রীমান সন্তোষ অনেক দক্ষ। তার পর হয়ত কালোবাজারের দাম দিতে হবে, সে আমি পারব না। তা ছাড়া আশ্রমের লোক দেখলে কালোবাজারীরাও ভয় পেয়ে যায়, বলে জিনিষ নেই। এমনিতেই ওষুধ কেনার ব্যাপারে বেশ নিন্দে রটেছে।

সীতা। তোমার ঐ আশ্রমের লোকদের কাছে ত ? হয় তুমি আশ্রম ছাড়, নয় ত একটা লাঠি দিয়ে পরিবারের সকলের মাথা ভেঙে ফেলে আশ্রমে গিয়ে ওঠ, আর যত খুশি সুভাষচন্দ্র আর গান্ধীজীর জয় কর ! আজকে বলে নয়, প্রথম থেকেই দেখছি। যাদের অত সাধু হবার ঝোঁক তাদের বিয়ে করাই উচিত নয়।

অঘোরনাথ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) তখন কি আর জানতাম যে তোমাকে আমি কিছুই শেখাতে পারব না ? যে দেশে পুরুষ এক পা এগোলে নারী তাকে দু'পা পেছনে টেনে আনতে চায় সে দেশে কারুরই বিয়ে করা উচিত নয় একথা নিশ্চয় স্বীকার করতে হবে।

সীতা। (রাগিয়া) কি, আমি তোমাকে পেছু টানছি, না ? তা হলে খদ্দর-পরা, মিটিঙে নাচনেওয়ালী একটা বিয়ে করলেই পারতে ! দিন-রাত এগিয়ে চলত, আর সংসারের বালাই থাকত না, দু'জনে মিলে জেলের ভাত খেতে !

অঘোরনাথ। (ঈষৎ বিরক্তির সহিত) সেকালে স্বদেশী মেয়ে এত কোথায় পাওয়া যেত। (স্বপ্নাতুর স্বরে) ভেবেছিলাম তোমাকেই আমার মত গড়ে পিটে নেব, সঙ্গিনী আর মন্ত্রী করব। (হতাশায় মাথা নাড়িলেন) এখন সে সব সুদূরের স্বপ্ন।

সীতা। তোমার স্বপ্ন নিয়ে তুমি থাক। আমায় ত স্বপ্ন দেখলে চলবে না, এখুনি খোকার কাছে গিয়ে বসতে হবে। আর তোমার মেয়েও তেমনি তৈরি হচ্ছে, যখনই কাজের কথা বলি তখনই তার সুতো কাটার সময়। (বেগে প্রস্থান)

অঘোরনাথ। (অপস্রিয়মান সীতার উদ্দেশ্যে) সীতা শুধু নামেই সীতা ! [ভৃত্য সন্তোষের প্রবেশ। এখনও সে বড়লোক হয় নাই—তবে হইবার লক্ষণসকল প্রকট হইতেছে। বেশভূষা ঠিক অঘোরনাথের মত। মাথার চুলে ঠিক তেমনই মাঝখানে সিঁথি, গোঁফ জোড়াও অবিকল অঘোরনাথের মত। ভৃত্যসুলভ আচরণ কিছু দেখা যায় না।] (সন্তোষের শূন্য হাতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) কিরে পেলি না ?

সন্তোষ। (চতুরতার হাসি হাসিয়া) এক জায়গায় আছে, আর চার টাকা হলে পাওয়া যায়। [ছবির প্রবেশ। আঠার বৎসরের সাধারণ একটি মেয়ে। পরনে খদ্দরের সাড়ি। হাতে সরু একটি ফুলের মালা। মালাটি সঙ্কোচের সহিত টেবিলের এক কোণে ঝুলাইয়া রাখিল।]

ছবি। বাবা—

অঘোরনাথ। (এতক্ষণ নীরবে সন্তোষের দিকে তাকাইয়া ছিলেন ; যেন কথাটা কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। ছবি কথা বলিতে তাহাকে নিরস্ত করিয়া) তুই বলিস কি সন্তোষ, এক কৌটো বার্লির দাম ছ'টাকা চাইছে ? পাঁচ সিকে না দাম ছিল ?

সন্তোষ। সে আগের কথা বাদ দিন। বাজারে কোথাও বার্লি নেই ; যদি চান, ছ'টাকা দাম দিতে হবে, নইলে পাবেন না ; ব্যস। (ট্যাক হইতে দুইটি টাকা খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিল)

ছবি। আবার বার্লি কি হবে বাবা ? (সন্তোষকে) তুই যে কালকে সন্ধ্যের পর ছ'কৌটো বার্লি এনে বাবার তক্তপোশটার তলায় লুকিয়ে রাখলি তার একটাও ত এখন পর্য্যন্ত খোলা হয় নি। মাও ত জানতেন না, মাকেও ত এইমাত্র বললাম।

সন্তোষ। সে আমার বার্লি। পুরো দাম না পেলে আমি কাউকে ধরতে দেব না। (দ্রুতপদে অন্দরের দিকে অগ্রসর হইল)

অঘোরনাথ। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া কঠোর স্বরে) এই, দাঁড়া ! (সন্তোষ থামিল) আগে আমার কথার জবাব দে। তোর বার্লি মানে কি ? তোর কি জ্বর হয়েছে ? (সন্তোষ নিরুত্তর, অঘোরনাথ জবাবের জন্য অল্পক্ষণ থামিয়া তারপর) আর জ্বর হলেই বা ছ' কৌটো দিয়ে তুই কি করবি ? না কি ভাতের বদলে খাবি ?

সন্তোষ। ব্যবসা করব। (সংশোধন করিয়া) বিক্রি করব।

অঘোরনাথ। বিক্রি করবি ? কত করে ?

সন্তোষ। ([illegible] হইয়া) ছ' টাকা করে।

অঘোরনাথ। (অবিশ্বাসের স্বরে) তোর থেকে কে কিনতে যাবে ছ'টাকা করে ? তোর কাছে যে আছে সেও ত কেউ জানবে না। কে কিনবে, কেউ কিনবে না !

সন্তোষ। (দৃঢ়তার সহিত) যার দরকার হবে সে-ই কিনবে। শহরে আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

অঘোরনাথ। (অবাক হইয়া) যার দরকার হবে!

ছবি। বুঝলে না বাবা, যেমন আমাদের দরকার হচ্ছে তেমনি আর কি।

অঘোরনাথ। (পুনরায় বসিয়া, বিষাদের সহিত ধীরে ধীরে) বুঝতে কিছুই আর বাকী থাকছে না মা। সব আস্তে আস্তে জলের মত পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। (সন্তোষকে) কত করে কৌটো কিনেছিস ?

সন্তোষ। দু' টাকা করে।

অঘোরনাথ। হুঁ; দু টাকা করে কিনে ছ' টাকা করে বিক্রি, মোট চব্বিশ টাকা লাভ। (প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সহিত) সন্তোষের ব্যবসার মাথা খুব পরিষ্কারই বলতে হয়!

সন্তোষ। (ব্যঙ্গটাকে প্রশংসা মনে করিয়া) আজ্ঞে আপনার আশীর্ব্বাদে এ মাসে এখন পর্য্যন্ত আমার একশ' ত্রিশ টাকা লাভ দাঁড়িয়েছে। (অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ছবির দিকে চাহিল)

অঘোরনাথ। (ক্রমশঃ উষ্ণ হইতে লাগিলেন) আমার আশীর্ব্বাদের ভরসায় যদি এ ব্যবসায় নেমে থাকিস খুব ভুল করেছিস। ক খ জানতিস না, আমি তোকে হাতে ধরে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়ালাম, কেন ? চালাক হতে হতে চোরাকারবারী বনে যাবি তারপর আমার প্রয়োজনের সুযোগ নিয়ে, বাজার থেকে সব মাল সরিয়ে আমার তক্তপোশের তলায় জমা করে পরের দিন আমার কাছেই তিন গুণ দামে বিক্রি করবি, এই জন্যে ?

সন্তোষ। আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। কালকে ডাক্তারবাবু যখন বললেন, শহরে অসুখ-বিসুখ বড্ড বেড়ে যাচ্ছে, বার্লিটা অনেকই কিনে ফেলুন, আপনি গা করলেন না। আমি তাড়াতাড়ি বাজারে যা ছিল কিনে ফেললাম, নইলে আজকে কোথায় পেতেন ?

ছবি। বেশ ত, দু' টাকায় কিনেছিস, (টেবিলের টাকা আগাইয়া দিল) দু' টাকাতেই আমাদের কাছে বিক্রি কর না এক কৌটো ? আর গুলো ত তোর রইলই।

সন্তোষ। (অঘোরনাথকে) দেখুন ত বাবু; তাতে আমার লাভ ? মাইনে পাচ্ছি না, তবু আছি, কাজকর্ম্ম করে দিচ্ছি, (ছবির দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল) আমার চলবে কি করে ?

অঘোরনাথ। মাইনে আজ না হয় কাল পাবি। খাচ্ছিস-দাচ্ছিস, (বৈঠকখানার মেঝে দেখাইয়া) শোবার জায়গার অভাব হচ্ছে না, আবার টাকা কি করবি ?

সন্তোষ। বাবুর যেমন কথা! (ছবিকে) টাকা না হলে কেউ সম্মান করে ? এখন তুই-তুকারি করছেন, টাকা হলে, হ্যাঁ, তখন— (থামিয়া) আমাকে বড় হতে হবে।

অঘোরনাথ। (উচ্চকণ্ঠে) চোরাকারবার ছাড়া অন্য কোন পথ নেই বড় হবার ? এতদিন এই তোকে শেখালাম ? যীশু, গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র, এঁরা বড় হবার কি পথ দেখিয়েছেন, কি বলেছি তোকে ?

সন্তোষ। আমি টাকা চাই। বড়লোক হবার অন্য যে সব পথ আছে তাতে অনেক দেরি হয়। তা ছাড়া সবাই এ কাজ করছে। নবেন্দুবাবু যে এত ভাল ভাল বক্তৃতা দেন, তিনি আজকাল কত লাটকে লাট কাগজের চোরাকারবার করছেন দেখুন ত।

অঘোরনাথ। (গর্জিয়া উঠিয়া) কি বললি ?

সীতা। (পাশের ঘর হইতে পর্দা ফাঁক করিয়া) কি ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ! পাশের ঘরে যে এখন-তখন রুগী রয়েছে, সে খেয়াল আছে ? বার্লিটা খেয়ে একটু ঘুমিয়েছিল, তুমি দিলে উঠিয়ে! (সন্তোষের দিকে চোখ পড়িতে) কালকে বার্লি এনে রেখেছিস তা কিছু বলিস নি, আজকে আবার বার্লি আনার ছুতো নিয়ে দু' ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে এলি। যা কাজকর্ম্ম কর গিয়ে। (যথালাভ ভঙ্গিতে টেবিল হইতে দ্রুত টাকা দুইটা উঠাইয়া সন্তোষের প্রস্থান) চেঁচাচ্ছিলে কেন ?

অঘোরনাথ। মানুষ মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র করছে যে পাষণ্ডেরা, সন্তোষ তাদের দলে নাম লিখিয়েছে।

সীতা। মিলিটারিতে ভর্ত্তি হয়েছে ? তা মাইনে-পত্র পাচ্ছে না—

অঘোরনাথ। না, সৈন্যদলে ভর্ত্তি হয় নি। যা করছে তার তুলনায় সৈন্যরা তো অহিংস! যা করছে তার তুলনায় ওরা তো দয়ালু! দুই পক্ষে যুদ্ধ হয়, দু'জনের হাতেই অস্ত্র থাকে। তারা হুকুমে গুলি চালায়, হিংসা মনে নিয়ে তারা যুদ্ধ করতে আসে না। নিরস্ত্র আহত শত্রুকে তারা শুশ্রূষা করে, কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যায়। আর যারা চোরাকারবারী, মুমূর্ষুর মুখের পথ্য তারা কেড়ে নিয়ে যায়, অবোধ শিশুকে তারা অভুক্ত রাখে। রোগীর ওষুধ লুকিয়ে রেখে তাদের শ্মশানের দিকে ঠেলে দেয়, অসহায়, সম্বলহীনের যারা শত্রু সন্তোষ তাদের দলে নাম লিখিয়েছে।

সীতা। (ঘরে ঢুকিয়া ছবিকে) তুই যা খোকার কাছে একটু বোস গিয়ে, আমি এখখুনি আসছি।

[ছবির প্রস্থান]

দেখ সন্তোষের চালচলন আমারও যেন কেমন আজকাল একটুও ভাল লাগছে না।

অঘোরনাথ। একটার থেকেই আর একটা আসে। কোন জিনিষের যে-কোন দিক থেকেই পচন ধরুক না কেন, আস্তে আস্তে সবটাই যেমন পচে যায়, মানুষও তেমনি একদিকে খারাপ হতে সুরু করলে অন্য সব দিকেই খারাপ হয়ে যেতে বাধ্য। কি হয়েছে ?

সীতা। ছবির দিকে ও যেন আজকাল কিরকম করে তাকায়। ওকে শিগগীরই বিদেয় কর।

অঘোরনাথ। হুঁ।

সীতা। 'হুঁ' কি? তোমার তো আজ নয় কাল করে সময় কাটানোর অভ্যেস।

অঘোরনাথ। শুধু মাইনেটা দিতে পারলেই হয়। দু' মাসের মাইনে বাকী, কোত্থেকে দি', তাই ভাবছি। তা ছাড়া যা দিনকাল পড়েছে, আমাদের পক্ষে আর চাকর রাখা সম্ভবও নয়।

সীতা। আমার আর একগাছা চুড়ি বিক্রি কর।

অঘোরনাথ। (বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িয়া) এর জন্য? অসুখ-বিসুখের কথা আলাদা।

সীতা। মেয়ের ভালমন্দ তুমি চিন্তা না করতে পার, আমি করি। ছেলের চাইতেও আমার গয়না বড় নয়, মেয়ের চাইতেও নয়। যা বলি কর। (অঘোরনাথ উঠিয়া বাহিরের দিকে চলিলেন) কোথায় চললে আবার?

অঘোরনাথ। অসিতের কাছে একবার যাই। এখুনি আসব।

সীতা। জামাটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। গায়ে দিয়ে যাও।

[প্রস্থান]

[ছবির প্রবেশ]

ছবি। বাবা, বাবা, যেও না!

অঘোরনাথ। কেন রে?

ছবি। ভোর থেকে অসিতদার বাড়ীতে পুলিস এসেছে। বাড়ী সার্চ্চ হচ্ছে।

অঘোরনাথ। কে বললে তোকে?

ছবি। (জানালার নিকট গিয়া) দেখ এসে।

অঘোরনাথ। (জানালার নিকট গিয়া দেখিয়া) তাই তো! (উদ্বিগ্ন হইয়া নিম্নস্বরে) ছবি, কাগজগুলো—কাগজগুলো কোথায়? (ছবি অঘোরনাথের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কি বলিল, তিনি আশ্বস্ত হইলেন) বলা যায় না, এখানে আসতেই বা কতক্ষণ! তুই জানতিস?

ছবি। তুমি আবার চিন্তা করবে, তাই তোমায় বলি নি বাবা। (নিম্নস্বরে) কাল সন্ধ্যের সময় অসিতদা এসে বলে গিয়েছিলেন:

অঘোরনাথ। (নিম্নস্বরে) কি বলে গিয়েছিল?

ছবি। (অনুরূপস্বরে) অসিতদাকে ধরে নিয়ে যাবে, বাড়ী সার্চ্চ হবে আর আমাদের বাড়ীও সার্চ্চ হতে পারে।

অঘোরনাথ। আর আমাকে কিছুই বলিস নি! অসিতকে ধরে নিয়ে যাবে? (হঠাৎ দৃষ্টিটা একটু তীক্ষ্ণ হইল। পুনরায় চেয়ারে আসিয়া বসিলেন) ও তাই সকাল থেকে টেবিলের কোণে একটা মালা ঝুলছে দেখছি। অসিতের জন্যে বুঝি?

ছবি। (লজ্জিতভাবে) খোকা বলছিল—

অঘোরনাথ। (কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত) খোকা বলছিল? কি বলছিল? কবে বলছিল?

ছবি। সে অসুখের আগে বাবা। বলছিল, নেতারা যখন জেলে যায় তখন গলায় মালা দিতে হয়; অসিতদাকে যখন ধরে নিয়ে যাবে তখন ও গলায় মালা দেবে, (হাসিয়া) তোমাকে যখন ধরে নিয়ে যাবে তখন তোমাকেও দেবে। (সাড়ির আঁচল আঙুলে জড়াইতে জড়াইতে দ্বিধাগ্রস্তভাবে) খোকার অসুখ—

অঘোরনাথ। (নির্লিপ্ত কণ্ঠে) মালাটা না হয় তুই-ই দিবি আর কি।

ছবি। আমি বাবা?

অঘোরনাথ। নয় তো কে দেবে? আমি বুড়ো বয়সে ওসব মালাটালা দিতে পারব না। তুই এখন দে। অসিত ফিরে এলে না হয় খোকা দেবে আর একবার।

ছবি। আচ্ছা, তা হলে না হয় বাবা আমিই দেব। [ছবি খুশিমনে জানালার দিকে অগ্রসর হইল, অঘোরনাথ ছবির পিছনে নীরবে একটু স্নেহের হাসি হাসিলেন।] (জানালা দিয়া দেখিয়া) আস্তে আস্তে অনেক ভিড় জমে গেছে ত।

অঘোরনাথ। ছবি, এদিকে আয়। (ছবি নিকটে গিয়া টেবিল ধরিয়া দাঁড়াইল) বোস। (না বসাতে, পুনরায়) বোস। (বসিল) ধরা পড়া, জেলে যাওয়া, এতে উত্তেজনা থাকতে পারে, কিন্তু ওগুলোই আসল নয়। শান্ত মনে কাজ করে যেতে হবে। এখন যত কাজের লোক কমে যাচ্ছে তত বেশী কাজ করতে হবে।

ছবি। আজকে আর একটুও সুতো কাটতে পারি নি। সন্তোষ বার্লি কেনার নাম করে সকাল থেকে বেরিয়ে গেল, তারপর খোকার কাছে বসলাম,···

অঘোরনাথ। না না, সুতো কাটতে হবে, অন্ততঃ পাঁচ মিনিট হলেও কাটতে হবে। কাজ করতে হলে মন স্থির করা দরকার, মন স্থির করতে হলে সুতো কাটা অবশ্য প্রয়োজন।

ছবি। হাঁ বাবা।

(প্রস্থানোদ্যত, এমন সময় নেপথ্যে তুমুল ধ্বনি: বন্দেমাতরম, আগষ্ট বিপ্লব জিন্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, সুভাষচন্দ্র জিন্দাবাদ: দুই জনেই উৎকর্ণ হইলেন)

অঘোরনাথ। একি নিয়ে চলল নাকি?

ছবি। (তাড়াতাড়ি জানালার নিকট গিয়া) না বাবা এ-দিকেই আসছে। (ফিরিয়া আসিল)

অঘোরনাথ। ঘাবড়ে যাস না যেন, ভয়ের কোন কারণ নেই।

[মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে একজন পুলিস অফিসারসহ অসিতের প্রবেশ। একজন পুলিস দরজার পর্দ্দা সরাইয়া ভিতরে একবার মুখ বাড়াইয়া বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিল। অসিতের চেহারা প্রায় একই রকম, তবে ভাবটাকে একটু বীরোচিত বলা যাইতে পারে। ছবি তাড়াতাড়ি উঠিয়া একপাশে সরিয়া অসিতের দিকে দাঁড়াইল]

পুলিস ইন্‌সপেক্টর। (অসিতকে) তাড়াতাড়ি করুন।

অসিত। (উদ্ধত ভাবে) তাড়াতাড়িই করা হচ্ছে।

অঘোরনাথ। অসিত! অসিত! মাথা গরম করো না। বোস, (ইনসপেক্টরকে) বসুন। (কেহ বসিল না)

অসিত। মেসোমশায়, এই চাবিটা আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি। (পাশের পকেট হইতে চাবি বাহির করিল)

অঘোরনাথ। (মৃদু হাসিয়া) আমারই বা ভরসা কি? —(ইনসপেক্টরকে) কি বলেন? (অসিতকে) তোমার চাকরটি, কি যেন নাম, সে কোথায়? চাবি সঙ্গেই নিয়ে যাও না।

ইনসপেক্টর। মাষ্টারমশায়, আমার ডিউটি আপনাকে সতর্ক করে দেওয়া। ও চাবি রাখলে আপনার বিপদ বাড়বে ছাড়া কমবে না। ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করেন, তাই বললাম।

অসিত। কথাটা মিথ্যে নয় মেসোমশায়। (প্রায় নিজের মনে) চাবিটা কার কাছে রেখে যাই তাও ত বুঝতে পারছি না। সুখন ত পুলিসের টিকি দেখেই কোথায় পালিয়েছে, ব্যাটার আবার জিনিষপত্রগুলো রয়েছে। তারপর মা যদি হঠাৎ না জেনে এসে পড়েন কলকাতা থেকে, তা হলেও ত বিপদ।

ছবি। (আগাইয়া আসিয়া) দিন, আমাকে দিন, (অসিতের হাত হইতে চাবি প্রায় ছিনাইয়া লইয়া) আমাকে ধরে নিলে কারুর কিছু ক্ষতি হবে না।

অসিত। (মুগ্ধ ও আনন্দিত) তা হলে এই টাকাটাও রাখ। (ঘড়ির পকেট হইতে ভাঁজকরা একটি দশ টাকার নোট দিল)

ছবি। টাকা কিসের?

অসিত। সুখনের মাইনেটা দেওয়া হয় নি। ওর মোট পাওনা সাড়ে-ন-টাকা। আট আনা বকশিশ (হাসিয়া) ওর বীরত্বের বকশিশ।

ইনসপেক্টর। চলুন এবার।

অঘোরনাথ। (অন্দরের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া ইনসপেক্টরকে) অসিত পাশের ঘরে একবার একটু যেতে পারবে।

ইনসপেক্টর। (অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হইয়া) কেন?

অঘোরনাথ। আমার ছোট ছেলেটির খুব অসুখ, তাই। অন্য কোন মতলব নেই। আসুন, দেখুন এসে। [উঠিয়া গিয়া অন্দরের পর্দ্দাটা তুলিয়া ধরিলেন, ইনসপেক্টর যেন কোন ফাঁদে পা দিতে যাইতেছেন এইরূপ ভাবে ধীরে ধীরে আগাইয়া মাথাটা কতক্ষণের জন্য ভিতরে গলাইয়া দিলেন]

[ইতিমধ্যে]

অসিত। (কথা খুঁজিয়া না পাইয়া) ছবি, আমাকে মনে থাকবে ত?

ছবি। (মাথা নীচু করিয়া সলজ্জভাবে) কি যে বলেন!

অসিত। কবে ছাড়া পাব, কবে আমাদের বিয়ে হবে—এই জেবেই কিন্তু আমার দিন কাটবে। অপেক্ষা করবে ত?

ছবি। (মুখ তুলিয়া চোখে চোখে তাকাইয়া) করব।

অঘোরনাথ। (ইনসপেক্টরকে) আপনি না হয় এখানেই দাঁড়ান। এসো অসিত। অসিত ক্ষণকালের জন্য অন্দরে চলিয়া গেল। নেপথ্যের বন্দেমাতরম্, ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ, আগষ্ট-বিপ্লব জিন্দাবাদ, প্রভৃতি ধ্বনি উঠিতে ছবি জানালার নিকট গিয়া দাঁড়াইল: সে কি বলে শুনিবার জন্য নিকটের ধ্বনি থামিয়া শুধু দূরের ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল)

ছবি। দেখুন, আমার ছোট ভাইটির খুব অসুখ। যদি একটু আস্তে বলেন।

[এবার কিছু আবোল-তাবোল গণ্ডগোল শোনা গেল, তারপর সব নিস্তব্ধ। অসিত ফিরিয়া আসিল। সে সকলের দিকে একবার তাকাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, অঘোরনাথ ইঙ্গিত করিতে ছবি তাড়াতাড়ি তাহাকে মালাটি পরাইয়া দিল। অসিত ফিরিয়া আসিয়া অঘোরনাথকে প্রণাম করিল, তাহা দেখিয়া ছবিও অসিতকে প্রণাম করিল]

অসিত। (ছবিকে) মা যদি আসেন, একটু দেখাশুনো করো।

ছবি। আপনি ভাববেন না। মাসীমার কোন অসুবিধে হবে না।

অসিত। (হাসিমুখে) আচ্ছা, আসি।

[সদলবলে অসিতের প্রস্থান। ছবি দ্রুত গিয়া জানালায় দাঁড়াইল। অঘোরনাথ পায়চারি করিতে সুরু করিবেন এমন সময় ঝড়ের বেগে সীতার প্রবেশ। বাহিরে ধ্বনি সুরু হইল এবং তাহা আস্তে আস্তে মিলাইয়া গেল]

সীতা। বলি, এসব হচ্ছে কি?

অঘোরনাথ। অনুরোধ, একটু আস্তে কথা বল। বলি, খোকার যে অসুখ সে কি তোমাকেও মনে করিয়ে দিতে হবে?

সীতা। এসব মালা পরাপরির ঢং কিসের শুনি? ছবি, তোর বড় বার বেড়েছে, না? বললাম, বাবাকে জামাটা দিয়ে খোকার কাছে একটু বস এসে; না, বসলি না। কে তোকে মালা দিতে বলেছিল?

ছবি। (অস্ফুট স্বরে) বাবা। (সীতা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে অঘোরনাথের দিকে চাহিয়া রহিলেন)

অঘোরনাথ। হ্যাঁ, আমিই বলেছিলাম।

সীতা। কেন? তুমি বিয়ের প্রস্তাব করেছিলে? ও রাজী হয়েছে?

অঘোরনাথ। না, বীরের পূজা।

সীতা। তোমার যত-সব আদিখ্যেতা! ছবি তুই যা এ ঘর থেকে। (ছবির প্রস্থান) আর বিয়ের কথাবার্ত্তা ঠিক হলেই বা কি, তাই বলে অতগুলি লোকের সামনে? (আরও রাগিয়া গিয়া) আর বলছিই বা কাকে, নিজের জ্ঞান থাকলে তবে ত অন্যকে শেখাবে!

অঘোরনাথ। ব্যাপারটা কি, আমি ত কিছুই বুঝছি না।

সীতা। আর বুঝবেও না। বলছি, বিয়েটা হয়ে গেলেই ল্যাঠা চুকে যেত, তা তুমি একটু চেষ্টা পর্য্যন্ত করলে না!

অঘোরনাথ। এতবার এত করে বোঝাতে চেষ্টা করলাম,

তোমার আবার সেই এক কথা। এই ত ধরে নিয়ে গেল, তখন কি হ'ত ছবির ?

সীতা। কেন, আমার কাছে থাকত, তা ছাড়া গবর্ণমেণ্ট টাকা দিত, পদ্মবাবুর বৌ যেমন পাচ্ছে।

অঘোরনাথ। (ব্যঙ্গস্বরে) ও, ও, ও,—অসিত জেলে গেলে তুমি টাকা পেতে, তাই বল ; আমি ভাবলাম মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে বুঝি উতলা হচ্ছ। তা আমি জেলে গেলে ত পাবে।

সীতা। আমি কি বলি আর তুমি কি বোঝ ! (ঈষৎ অভিমান)

[তারকের প্রবেশ। হাফশার্ট-পরিহিত উনিশ বৎসরের যুবক। চালচলন ও কথাবার্ত্তা একটু উগ্র। বাপের সঙ্গে বিশেষ মতবিরোধ আছে মনে হয়। হাতে বাজারের থলিয়া, তাহার ভিতর হইতে দুই গাছা ডাঁটা উঁকি দিতেছে ও রুটি তৈয়ার করিবার একখানা ভাঙা বেলুন।]

তারক। (ভাঙা বেলুনটা মাকে দিতে গিয়া) হ'ল না মা।

সীতা। আমাকে এখানে দিচ্ছিস কি, ভেতরে রাখগে যা ; হ'ল না কেন ? ঐ ত সামান্য কাজ, এক মিনিটের ব্যাপার।

তারক। শহরের কোন কাঠ মিস্ত্রীর ঐ এক মিনিটও সময় নেই। আটচল্লিশটা ড্রেসিং টেবিলের অর্ডার হয়েছে, সাত দিনের মধ্যে ডেলিভারি চাই। সবাই তাতে ব্যস্ত, আমার কথায় কেউ কানও দেয় না।

সীতা। সে কিরে, এত ড্রেসিং টেবিল কি হবে ?

অঘোরনাথ। আটচল্লিশটা ড্রেসিং টেবিল, কে অর্ডার দিলে ?

তারক। শুনলাম মিলিটারির অর্ডার। শহরে মিলিটারি আসছে।

সীতা। মিলিটারি ত বন্দুক নিয়ে লড়াই করে শুনেছিলাম, ড্রেসিং টেবিল কেন ? [ঘাড় নাড়িয়া তারকের প্রস্থান]

অঘোরনাথ। (উচ্চৈঃস্বরে) রমেনবাবুর খবরের কাগজটা দিয়ে আসিস তারক। [কাগজখানা ভাঁজ করিয়া টেবিলের এক পাশে রাখিলেন] (সীতাকে) বুঝলে না ? ব্রিটিশ ব্যাটারা যুদ্ধ-টুদ্ধ সব ভুলে গেছে। (উত্তেজনায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন) একবার জার্ম্মানীর কাছে মার খাচ্ছে, একবার জাপানের কাছে মার খাচ্ছে, বেশ হচ্ছে, খুব হচ্ছে !

সীতা। বুঝলাম না, যুদ্ধে আবার ড্রেসিং টেবিল কিসে লাগে ?

অঘোরনাথ। আহা হা, যুদ্ধ এরা করেই না, ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কেবল টেরী বাগায়। (অনুকরণ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন) বিশ্বেস হচ্ছে না ? কাগজে কি লিখেছে শোন তবে। (কাগজখানা পুনরায় খুলিতে লাগিলেন)

সীতা। (বাধা দিয়া) তোমার ত ঐ আনন্দ 'ব্রিটিশ হারছে, ব্রিটিশ হারছে', ব্রিটিশ হারলে তোমাকে যেন কেউ রাজা করে দিচ্ছে ! কাজের কথা বলি, একটু মন দিয়ে শোন।

অঘোরনাথ। (বিমর্ষ চিত্তে) কাগজটা দিয়েই আসুক তা হলে তারক।

[তারকের উদ্দেশ্যে অন্দরের দিকে ঘাড় ফিরাইলেন, এমন সময় বাহিরের দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ হইল] (সীতাকে) আবার কে এলো ?

সীতা। (মাথায় কাপড় দিয়া ত্রস্তে উঠিয়া পড়িয়া) নিশ্চয় কোন অচেনা লোক হবে।

(দ্রুত প্রস্থান)

অঘোরনাথ। (বাহিরের দরজার দিকে তাকাইয়া) আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন, দরজা খোলা আছে।

[মেজর সাধুলালের প্রবেশ, হঠাৎ দেখিয়া তাহাকে মিলিটারি কিংবা অবাঙালী কোনটাই বুঝিবার উপায় নাই। পরনে জলপাই-সবুজ ফুল প্যাণ্ট ও ধবধবে দামী হাফ শার্ট। হাতে সিগারেটের টিন ও দেশলাই। মুখের বিশেষত্ব—বাটার্-ফ্লাই গোঁফ ও মেকি হাসিটি।]

সাধুলাল। আসতে পারি ?

অঘোরনাথ। (সম্পূর্ণ নূতন মুখ দেখিয়া লোকে যেমন বিস্মিত হয় তেমনি ভাবে) আসুন, (সাধুলাল সোজা আসিয়া চেয়ারে বসিল এবং সিগারেটের টিন ও দেশলাই টেবিলের উপর রাখিল) আপনি কোত্থেকে আসছেন ?

সাধুলাল। (খোলা সিগারেটের টিন সামনে ধরিয়া) মে আই ? (অঘোরনাথ মাথা নাড়িলেন, সাধুলাল নিজে সিগারেট ধরাইল। অঘোরনাথ অন্দরের পর্দ্দাটা ভাল করিয়া টানিয়া দিলেন।)

অঘোরনাথ। আপনি কি পুলিসের লোক ?

সাধুলাল। না, আমি মিলিটারি।

অঘোরনাথ। (মিলিটারি পোশাক না দেখিয়া) আপনি, কি ?

সাধুলাল। মিলিটারি। শহরে মিলিটারি আসছে শুনেন নি ? খবরটা সিক্রেট কিনা, তাই তাড়াতাড়ি জানবার কথা।

অঘোরনাথ। হাঁা, হাঁা, শুনেছি। মিলিটারির জন্য আট-চল্লিশটি ড্রেসিং টেবিলের অর্ডার হয়েছে। (হাসিয়া ফেলিলেন)

সাধুলাল। আমিই অর্ডার করেছি। আমার নাম, মেজর সাধুলাল।

অঘোরনাথ। (হাসি থামাইয়া) ওঃ।

সাধুলাল। দেশের লোকে টাকা পাবে, মিলিটারির টাকা, গবর্ণমেণ্টের টাকা।

অঘোরনাথ। তা বটে, তা বটে, (জোর দিয়া) টাকা পাবে। উঁহু, একটা মানুষও না, একটা পয়সাও নয়। নট এ পাইস, নট এ ম্যান,—গান্ধীজী বলেছেন।

সাধুলাল। আপনি বোঝেন, ভাল হয়েছে। সকলে বুঝছে না, সেজন্যই আপনার কাছে আসতে হয়েছে। আপনি মাষ্টারবাবু, অঘোরবাবু ত ?

অঘোরনাথ। হাঁ। আমার একটা মাইনর স্কুল আছে।

সাধুলাল। দেখুন মিলিটারি আসছে, আপনার শহরের অতিথি, গেষ্ট হবে। পাঁচ শ' ঘর চাই, শহরের বাইরে থাকবে। লোকে

বলছে ঘর তৈয়ার করব না। যুদ্ধকে সাহায্য করব না। টেবিল করব, ঘর করব না। টেবিলেও টাকা পাবে, ঘরেও টাকা পাবে, তফাৎ কি হ'ল ? (অন্তরঙ্গ ভাবে) আপনার সাহায্য করতে হবে।

অঘোরনাথ। লোকে যদি না করে আমি কি করব ?

সাধুলাল। আপনি লোককে বলে দিন। সবাই বলছে, মাষ্টারবাবু মন্দ বলবে, মাষ্টারবাবু না বললে করব না।

অঘোরনাথ। ড্রেসিং টেবিলের কথা আলাদা, (দৃঢ়ভাবে) যুদ্ধের কাজে সাহায্য করতে আমি কখনই বলতে পারব না। (উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

সাধুলাল। আপনি আমার সব কথা শুনছেন না। বসুন, আমাকে পাঁচ মিনিট বলতে সময় দিন, তার পর অপছন্দ হলে আমাকে ঘাড় ধরে বার করে দিবেন।

অঘোরনাথ। না, না, সে কি কথা! (বসিলেন) তা কি হয়! আমাদের মত ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু আমরা দু'জনেই ভদ্রলোক।

সাধুলাল। আমিও সেই কথাই বলি। কিন্তু আমাদের মত ভিন্ন নাই। আপনিও ব্রিটিশের ক্ষতি চান, আমিও ব্রিটিশের ক্ষতি চাই।

অঘোরনাথ। (অবাক হইয়া) কি বলছেন ?

সাধুলাল। দেখেন, আমি বরাবর ক্যালকাটায় থেকেছি, ক্যালকাটায় পড়েছি। একজন স্বদেশী-ডাকাত আমার বন্ধু ছিল, সে বলত ব্রিটিশের টাকা লুঠ কর। তখন সুবিধা ছিল না, ধরা পড়বার ভয় ছিল। মিলিটারিতে আসলাম; ডিপার্টমেণ্টও এমন হ'ল যত খুশি লুঠ কর কেউ ধরতে পারবে না। যুদ্ধের সময় আরও সুবিধা, এমন ক্ষতি করেছি যে ব্রিটিশ টাকা তৈয়ার করেও সাপ্লাই দিতে পারে না।

অঘোরনাথ। যে টাকাটা ক্ষতি হচ্ছে ব্রিটিশের, সেটা কোথায় যাচ্ছে ?

সাধুলাল। আমার কাছে আসছে, আমার মত অন্য পেট্রিয়টের কাছে যাচ্ছে।

অঘোরনাথ। (বিশেষ আমোদ অনুভব করিয়া) আপনার সেই স্বদেশী-ডাকাত-বন্ধু, আপনি যাঁর শিষ্য বলছেন—সে শুধু টাকা লুঠ করতেই বলেছিল, আর কিছু বলে নি ?

সাধুলাল। (মাথা চুলকাইয়া) কৈ, না, আর মনে পড়ছে না।

অঘোরনাথ। ভাল করে ভেবে দেখুন ত, লুঠের টাকাটা ব্রিটিশকে ভারত থেকে সমূলে উচ্ছেদ করবার কাজে লাগাতে বলেছিলেন কিনা ?

সাধুলাল। (এদিক ওদিক তাকাইয়া নিম্নস্বরে) চুপ করুন! এমন কথা ভাবলেও বিপদ!

অঘোরনাথ। (হাসিয়া) যতক্ষণ চুরি করে পকেট ভারী করবেন ততক্ষণ নির্ভয়, আর যেই তা সদ্ব্যয়ের কথা ভাবতে গেলেন অমনি বিপদ আরম্ভ হ'ল!

সাধুলাল। আপনাকে টাকা দিব, আপনি সদ্ব্যয় করুন। (ভিতর হইতে সন্তোষের প্রবেশ। কথাটা শুনিয়া দাঁড়াইল)

অঘোরনাথ। (আশান্বিত হইয়া) কি রকম ?

সাধুলাল। এখন আমার কাজ ঘর তৈয়ারি করা। নিজে করি না, কনট্রাক্ট দি'। একটা ঘর তৈয়ার হলে দুটা ঘরের বিল হয়। ফালতু টাকা অর্দ্ধেক আমার অর্দ্ধেক কনট্রাক্টরের।

(সন্তোষের বাহিরের দরজা দিয়া নিষ্ক্রমণ। বাহিরের জানালায় একবার তাহার মাথা দেখা গেল)

অঘোরনাথ। হুঁ। (অন্যমনস্ক ভাবে) অসৎ কাজে যুক্তি আর ফন্দি কোনটারই অভাব হয় না।

সাধুলাল। আপনি কনট্রাক্ট করুন। আপনার কিছু চিন্তা করতে হবে না। বন্দোবস্ত সব আমার, খালি নাম আপনার। টাকা নিন, তার পর সেই টাকা (আমতা আমতা করিয়া) যেরকম খুশি সদ্ব্যয় করুন। আর যদি বলেন ত, এক মাসের মধ্যে আপনার এই বাড়ী তিনতলা করে দিব।

অঘোরনাথ। (বিনীত ভাবে) মেজর সাধুলাল, আমি সামান্য মাষ্টার মানুষ, কনট্রাক্টর নই। সদ্ব্যয় করবার জন্য আমার টাকার দরকার হয় না, আমি নিজেকে সদ্ব্যয় করি। (অঙ্গুলি দিয়া নিজেকে দেখাইলেন।)

সাধুলাল। কিন্তু আপনার স্কুল ত থাকছে না। তখন কি খাবেন ?

অঘোরনাথ। (উত্তেজিত হইয়া) আমার 'আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়' থাকছে না ? আমার স্কুল, আমি কিছু জানি না! আপনি কি করে জানলেন, আপনি কিছু শুনেছেন ?

সাধুলাল। ঐ স্কুলবাড়ীটা আমাকে রিকুইজিশান করতে হবে, আমার অপিস হবে। আগেই নিতাম, ভাবলাম আপনার সঙ্গে যদি রফা হয়। কনট্রাক্ট করুন সব ঠিক হয়ে যাবে।

অঘোরনাথ। এতক্ষণ লোভ দেখাচ্ছিলেন, এখন ভয় দেখাচ্ছেন। (উত্তেজিত হইয়া) মেজর সাধুলাল, আই এম নট এ মার্কেটেবল কমোডিটি, আণ্ডারষ্টাণ্ড! (অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে) আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, সকল মানুষকেই বাজারের মাছ-তরকারির মত কেনা-বেচা যায় না। (উঠিয়া পড়িলেন) আপনি স্কুলবাড়ীটা নিলে, স্কুলটা না হয় আশ্রমে বসবে। আচ্ছা, নমস্কার। (অন্দরের দিকে প্রস্থানের উপক্রম)

সাধুলাল। আশ্রমবাড়ীটাও গবর্ণমেণ্ট দখল নিবে।

অঘোরনাথ। (থামিয়া, বিচলিত হইয়া) কেন ?

সাধুলাল। অপ্রিয় সত্য কথাটা আপনাকে এতক্ষণ বলি নি। গবর্ণমেণ্ট মনে করে, আপনি, আপনার স্কুল, আপনার আশ্রম, গবর্ণমেণ্টের শত্রুতা করছে। আমি বললাম, না, মাষ্টারমশায় যখন দেখবে আমিও স্বদেশী, আমার কথা শুনবে, নিজে কনট্রাক্ট করবে, না হয় অন্য লোককে বলে দেবে।

অঘোরনাথ। (বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া) অপ্রিয় সত্য কথাটা আমিও

এতক্ষণ আপনাকে বলি নি। আপনার স্বদেশী বুলিটা সম্পূর্ণ ভণ্ডামি। আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য টাকা চুরি করা আর অন্য লোককে চুরি করতে শেখানো।

সাধুলাল। ব্রিটিশ আমাদের টাকা লুঠ করে নি? ব্রিটিশের টাকা লুঠ করাকে যদি চুরি বলেন তো আমি ভিন্নমত।

অঘোরনাথ। আচ্ছা, নমস্কার।

সাধুলাল। (ব্যস্ত হইয়া) মাষ্টারবাবু, লেট আস পার্ট ফ্রেণ্ডস। আমি আপনার বন্ধু থাকতে চাই। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া অঘোরনাথের কানে কানে কি জিজ্ঞাসা করিলেন, অঘোরনাথ যথাসম্ভব কানটা সরাইয়া লইতে চেষ্টা করিলেন)

অঘোরনাথ। (বক্তব্য শুনিয়া যথাসম্ভব ক্রুদ্ধ হইলেন) আপনি আমাকে পেয়েছেন কি। আপনাদের দেশে কি হয় জানি না, এটা বাংলা দেশ। আপনি একটি স্কাউণ্ড্রেল, আপনাকে সত্যিই ঘাড় ধরে বার করে দেওয়া উচিত!

সাধুলাল। নো অফেন্স, আপনিও ব্যাটাছেলে, আমিও ব্যাটাছেলে।

অঘোরনাথ। এসব খবর আমাকে জিজ্ঞেস করছেন! স্কাউণ্ড্রেল, রাস্কেল, গেট আউট! (বাহিরের দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইলেন। যখন দেখিলেন সাধুলাল স্বস্থানে বসিয়া পূর্ব্ববৎ হাসিতেছে তখন নিজেই সরোষে অন্দরে চলিয়া গেলেন এবং পর্দ্দার পিছন হইতে হাত বাড়াইয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিলেন!

সাধুলাল। ম্যাডম্যান!

[বাহিরের দরজা দিয়া সন্তোষের প্রবেশ]

সন্তোষ। সাহেব!

সাধুলাল। (চমকাইয়া উঠিয়া) কে? কি চাও?

সন্তোষ। (হাত কচলাইয়া) সাহেব, আমি কন্ট্রাক্ট করতে চাই।

সাধুলাল। তুমি! মাষ্টারমশায়ের ভয়ে শহরে কেউ কন্ট্রাক্ট নিতে রাজী হ'ল না, আর তুমি এ বাড়ীতে থেকে—

সন্তোষ। আমি এখন আর কারুর চাকর নই। হ্যাঁ, মাইনে দিতে পারে না, তাকে আবার ভয়!

সাধুলাল। বেশ! তুমি নাম সই করতে পার? ইংরেজীতে?

সন্তোষ। পারি।

সাধুলাল। পার? (পকেট হইতে নোট-বই ও কলম বাহির করিয়া) লেখ তো? (সন্তোষ লিখিল। তাহা দেখিয়া) এস-ও-এন-ও-এস, ডি-ই—সনোস দে! তোমার নাম কি? কি পড়েছ?

সন্তোষ। হুজুর, আমার নাম সন্তোষ দে। ক্লাশ সিক্স পর্য্যন্ত পড়েছি।

সাধুলাল। (কলম দিয়া দেখাইয়া) দেখ, এখানে একটা 'টি' হবে। আচ্ছা সে ঠিক হয়ে যাবে। তুমি মাষ্টারমশাকে ভয় পাও না, ঠিক? (উঠিয়া দাঁড়াইল)

সন্তোষ। না।

সাধুলাল। (যাইতে যাইতে সন্তোষের পিঠ চাপড়াইয়া) সা-বাস!

[উভয়ের প্রস্থান]

ক্রমশঃ

উদূখলে ধানভানা

শিল্পী: শ্রীমনীষী দে

বৈদেশিকী

উদ্বাস্তু জার্ম্মানদের বসবাসের জন্য নির্ম্মিত অসংখ্য ঘরবাড়ী

জার্ম্মানীতে জার্ম্মান উদ্বাস্তু

"জার্ম্মানীতে জার্ম্মান উদ্বাস্তু" কথাটি কেমন অদ্ভুত ঠেকে। কিন্তু গত দশ বৎসরের মধ্যে এইরূপ ঘটনাই ঘটিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হয় ১৯৪৫ সনের প্রথম দিকে। জার্ম্মানী যখন পতনের মুখে, সেই সময় সোভিয়েট শক্তি ক্রমশঃ পোলাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী অধিকার করিয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয় এবং জার্ম্মানীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ঐ সকল অঞ্চল হইতে জার্ম্মানগণও পশ্চিম দিকে চলিয়া যাইতে থাকে। 'রাইক' বা জার্ম্মান-রাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে—শ্লেসভিগ-হলষ্টিন, লোয়ার স্যাক্সনি, ব্যাভেরিয়া এবং হেস এই চারিটি রাজ্যে তাহারা গিয়া ভিড় জমায়। এসময়কার লোকাপসরণের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে দুইটি মেলা ভার। অডার নীস-লাইনের পূর্ব্বাঞ্চল, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপ হইতে, যেখানে যত জার্ম্মান ছিল প্রায় সমুদয়ই ঐ ঐ অঞ্চলের বাস তুলিয়া মূল জার্ম্মানীর দিকে প্রধাবিত হয়। পরে গণনা করিয়া দেখা গেছে, এই চলমান জার্ম্মান জাতির সংখ্যা ছিল এক কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষের মত। ইহাদের মধ্যে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ পশ্চিম জার্ম্মানীতে গিয়া পৌঁছিতে পারিয়াছিল। পথিমধ্যে পঁচিশ লক্ষ নর-নারী-শিশু অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে, রোগে, মহামারীতে প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়।

জার্ম্মান জাতির সমস্যা ত অনেক। পঁচিশ বৎসরের মধ্যে দুইটি মহাযুদ্ধে তাহার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার সীমা-সংখ্যা হয় না। আজিকার দিনে, ইহার জন্য দায়ী কে ছিল, কেনই-বা জার্ম্মানী ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত হইয়া গেল সে বিষয়ে আলোচনা করিয়া লাভ নাই। প্রথম মহাসমরের পর লক্ষ লক্ষ বিকলাঙ্গ ও বেকার জার্ম্মান রাষ্ট্রের এক ভীষণ ভার হইয়া ছিল। এই ভার লাঘব করিবার প্রয়াসে যে-সকল চেষ্টা হয় তাহাতে জাতির স্বস্তিই সায় ছিল। এই বিকলাঙ্গ ও বেকার সমস্যা দূরীকরণের পূর্ব্বেই আসিল দ্বিতীয় মহাসমর। যুদ্ধের মধ্যেও যদি-বা জার্ম্মান-রাষ্ট্র তাহার দায় পূরণে ত্রুটি করে নাই, কিন্তু জার্ম্মানীর পতনের পর উহাদের দুঃখ-কষ্টের সীমা-পরিসীমা রহিল না। ইহার মধ্যেই আবার দেখা দিল বিরাট জনসমুদ্রের আবির্ভাব। এই সকল কারণে জার্ম্মান জাতির কি দুর্দ্দৈব উপস্থিত হয় তাহা আজ—মাত্র এই দশ বৎসরে কল্পনারও অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

মিত্রশক্তিবর্গ—সোভিয়েট রাশিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—জার্ম্মানীর পতন ঘটাইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। জার্ম্মান জাতিকে নির্বিষ করিবার উদ্দেশ্যে জার্ম্মানীকে চারিটি 'zone' বা অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটিকে তাহারা নিজ নিজ আয়ত্তে আনিল। কিন্তু অল্পপরেই দেখা গেল, সোভিয়েট রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রের মূলগত বিভেদ রহিয়াছে, তাহাতে তাহাদের একযোগে কাজ করা একেবারেই কঠিন। তখন জার্ম্মান-রাষ্ট্র মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ হইয়া গেল—পূর্ব্ব-জার্ম্মানী এবং পশ্চিম-জার্ম্মানী। পূর্ব্ব-জার্ম্মানীতে সোভিয়েট রাশিয়ার একাধিপত্য। এই অঞ্চল কিভাবে শাসিত হইয়াছিল তাহা অপরের জানিবার বুঝিবার অবকাশও ছিল না। এইজন্য একটি কথার বড়ই চলন হয়—পূর্ব্ব-জার্ম্মানী যেন লৌহপর্দ্দার (Iron-curtain) আড়ালে। ফ্রান্স, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পশ্চিম-জার্ম্মানী গণতন্ত্রনীতিতে শাসিত হইতেছে। সেখানে এই তিনটি অঞ্চলে মিলিয়া ফেডারাল

গবর্ণমেণ্ট বা সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাষ্ট্রের সাধারণ সমস্যাগুলি ইহা দ্বারাই সমাধানের চেষ্টা হইয়া থাকে। সাম্রাজ্য-বাদের প্রতিষ্ঠা তথা সামরিক প্রাধান্যের আকাঙ্ক্ষা জার্ম্মানদের মন হইতে বিলুপ্ত করাই ফরাসী-ব্রিটিশ-মার্কিন তত্ত্বাবধায়কদের উদ্দেশ্য। তবে নিজ নিজ আচরণের ফলে ইহা তাহাদের মনে কতটা বদ্ধমূল হইবে বলা যায় না।

উদ্বাস্তু-সমস্যা নিরাকরণে পশ্চিম-জার্ম্মানীর কর্ত্তৃস্থানীয়দের প্রয়াস সত্যই প্রশংসার্হ। আজ আমরাও এই সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি। এই সময়ে পশ্চিম-জার্ম্মানীতে অবলম্বিত নীতি-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা সময়োপযোগীও বটে। বিরাট উদ্বাস্তু-সমস্যা সমাধান করিতে গিয়া পশ্চিম-জার্ম্মানী যে কতখানি বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে তাহা কয়েকটি তথ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে পরিষ্কার বুঝা যাইবে। জার্ম্মানীর আয়তনের শতকরা ৫২·৩ অংশ মাত্র পশ্চিম-জার্ম্মানীর ভাগে পড়িয়াছে, অথচ লোকসংখ্যা বর্ত্তমানে সমগ্র জার্ম্মানীর শতকরা ৭৩ ভাগ। দ্বিতীয় মহাসমরের পূর্ব্বে এই অংশের জনসংখ্যা ছিল ৩,৯৩,৫০,০০০; বর্ত্তমানে ইহা দাঁড়াইয়াছে ৪,৮৬,০০,০০০। ইহার উপর আবার গত বৎসর (১৯৫৩) মার্চ্চ মাসে পূর্ব্ব জার্ম্মানীর সোভিয়েট 'জোন' হইতে যে ব্যাপক জার্ম্মান-বিতাড়ন সুরু হয় তাহার দরুনও এপর্য্যন্ত কুড়ি লক্ষ জার্ম্মান পশ্চিম-জার্ম্মানীতে আসিয়া পড়িয়াছে।

পশ্চিম-জার্ম্মানী মুখ্যতঃ তিনটি শক্তির মধ্যে বিভক্ত থাকিলেও প্রধান প্রধান বিষয়ে শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন ওখানকার উপরি-উক্ত ফেডারেল গবর্ণমেণ্ট। জার্ম্মান-উদ্বাস্তু সমস্যার দায় প্রধানতঃ এই সরকারের। টাকাকড়ি যুক্তরাষ্ট্রই বেশীর ভাগ জোগাইতেছে। উদ্বাস্তু-সমস্যা সমাধানকল্পে সরকার কতকগুলি মৌলিক বিষয়ের দিকে দৃক্‌পাত করিতেছেন। বাস্তুচ্যুত জনগণ যদি শীঘ্র শীঘ্র বসতিস্থাপন করিয়া সমাজবদ্ধ ভাবে বাস করিতে আরম্ভ না করে তাহা হইলে তাহারা সমাজশৃঙ্খলা রক্ষায় ভীষণ প্রতিবন্ধক হইয়া উঠে। এ কারণ বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহাদের মনে এক-দিকে যেমন আত্মপ্রত্যয় ফিরাইয়া আনিতে হইবে, অন্যদিকে তেমনি সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাসের সুযোগ দিয়া তাহাদের দায়িত্বশীল করিয়া তুলিতে হইবে। পশ্চিম-জার্ম্মানীর ফেডারাল গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়টির দিকে এ কারণ সর্ব্বপ্রথম বিশেষ ভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছেন। প্রত্যেকটি জার্ম্মান পরিবারের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া কতখানি সময় ও অর্থসাপেক্ষ তাহা ভাবিয়া কুল পাওয়া যায় না। তথাপি স্থানীয় সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রদত্ত প্রচুর অর্থের দ্বারা উদ্বাস্তুদের জন্য স্থান সংগ্রহ ও ঘরবাড়ী নির্ম্মাণে অগ্রসর হইয়াছেন। ১৯৫২ সনের শেষ নাগাদ সাড়ে তিন লক্ষ বাসগৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। প্রতি গৃহে গড়ে চার জনের (এক-একটি পরিবার) স্থান ধরিলে, এযাবৎ চৌদ্দ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্ব্বাসন সম্ভব হইয়াছে। কুড়ি লক্ষ জার্ম্মান আগেকার তৈরী পাঁচ লক্ষ বাড়ীতেই ইতিমধ্যে স্থান পাইয়াছিল। এখনও আরও বাধ লক্ষ বাসগৃহ নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক, যাহাতে অন্যূন আটচল্লিশ লক্ষ ছিন্নমূল জার্ম্মানের স্থান হইতে পারে।

১৯৫৪ সনে সোভিয়েট-বিতাড়িত বাস্তুত্যাগী চলমান জার্ম্মানগণ—ইহাদের মধ্যে নারী ও শিশু বিস্তর রহিয়াছে।

উদ্বাস্তু জার্ম্মানদের মধ্যে কৃষকও রহিয়াছে অনেক—প্রায় তিন লক্ষ চাষী-পরিবার। তাহাদের ত শুধু বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেই চলে না, তাহাদের নিমিত্ত চাষের জমিও জোগাড় করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ১৯৪৯ সনের আগষ্ট মাসে একটি আইন করিয়া জমি যোগাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ৫,৬২,৫২৩ একর জমি অতঃপর সংগৃহীত হইয়া চাষীদের ভিতরে বিলি করা হইয়াছে। কৃষকগণ পূর্ব্বের মত এখানেও চাষবাসে রত থাকিয়া গ্রাম্য সাদাসিধা জীবনযাপন করিতেছে।

লোকজন স্থিতি করার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় সমস্যা দেখা দিল। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর জন্ম কর্মসংস্থান এক বিরাট ভাবনার বিষয়। পশ্চিম-জার্মানী ইহার সমাধানেও সচেষ্ট রহিয়াছে। স্থায়ী বাসিন্দা এবং উদ্বাস্তু জার্মান—উভয়ের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনরূপ পার্থক্য করা হয় নাই। ফেডারাল গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্যই হইল—উদ্বাস্তু জার্মানরা যেন কোনমতেই মনে না করে যে, তাহারা 'পরবাসী'। 'নিজ বাসভূমে' তাহারা জার্মান জাতির অঙ্গরূপে বসবাস করিতেছে এবং তাহার দায় সর্ব্বপ্রকারে বহন করিয়া তাহারা স্বীয় কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিবে—এই বোধ জাগ্রত করানোই বেকারসমস্যা সমাধানের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই সরকার এদিকেও মনোযোগী হইয়াছেন। ১৯৫০ সনের

জার্ম্মানীর একটি বোমা বিধ্বস্ত অঞ্চলে উদ্বাস্তু উপনিবেশ
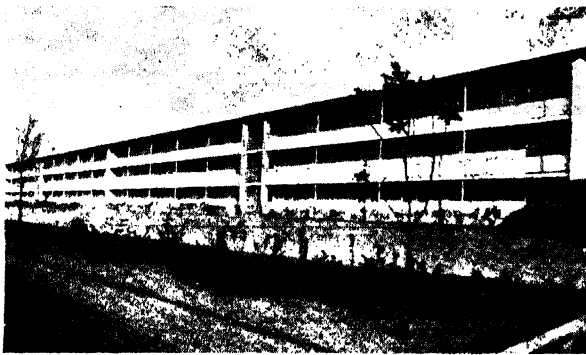
উদ্বাস্তুদের জন্য নির্ম্মিত নূতন ধরনের বাসগৃহ

প্রথমে সমগ্র জার্মান বেকারদের মধ্যে উদ্বাস্তু বেকারসংখ্যা ছিল শতকরা ছত্রিশ, কিঞ্চিদধিক দুই বৎসরের মধ্যে তাহা কমিয়া শতকরা উনত্রিশে দাঁড়াইয়াছে। ১৯৫২ সনের ফেব্রুয়ারী হইতে অক্টোবরের মধ্যে মোট উদ্বাস্তু বেকারদের শতকরা আটষট্টি জনের কর্ম্মসংস্থান হইয়াছে উদ্বাস্তু-অধ্যুষিত এই চারিটি রাজ্যে—শ্লেসভিগ-হলষ্টিন, লোয়ার স্যাক্সনি, ব্যাভেরিয়া এবং হেস-এ। ১৯৫২, ফেব্রুয়ারী মাসে বেকারসংখ্যা ছিল ১২,৫০,০০০। ঐ সনের অক্টোবর মাসে তাহা কমিয়া দাঁড়ায় ৬,৭৭,০০০। বেকারসংখ্যা হ্রাসের জন্ম পশ্চিম-জার্মানীতে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে বড় বড় কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল কলকারখানায় নিযুক্ত হইবার পরেও এখনও প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ বেকার সেথানে রহিয়াছে।

উদ্বাস্তু-কারবারীদের অর্থসাহায্য দিয়া ব্যবসা বা শিল্প-কারথানার উন্নতির চেষ্টা চলিতেছে, যাহাতে বেকারসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাইতে পারে। জার্মানরা পূর্ব্বে স্বাধীনভাবে জীবিকার সংস্থান করিতে সমর্থ ছিল। ছিন্নমূল হইয়া যখন তাহারা প্রথমে পশ্চিম-জার্মানীতে চলিয়া আসে তখন তাহাদের ভিতরে শতকরা আট জন মাত্র পরমুখাপেক্ষী না হইয়া চলিতে পারিত। বর্ত্তমানে অতি দ্রুত তাহাদের কাজের সংস্থান করিয়া দেওয়ায় তাহারা সুদিনের আশায় অনেকটা মনঃস্থির করিয়া চলিতে সক্ষম হইতেছে। সর্ব্বশেষ হিসাব হইতে জানা গেছে, ছিন্নমূল জার্মানদের শতকরা পঁয়ত্রিশ জনের জন্য সব দিক দিয়াই সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। শতকরা পঁয়তাল্লিশ জনের জন্য প্রারম্ভিক সামান্য সুবিধা ভিন্ন আর বিশেষ কিছুই করা যায় নাই। শতকরা কুড়ি জনের এখনও কোনরূপ ব্যবস্থা হয় নাই—কি বাসস্থানের দিক হইতে, কি কর্ম্মের দিক হইতে। এখনও তিন লক্ষ জার্মান তাঁবুতে জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইতেছে।

ফেডারাল গবর্ণমেণ্ট ছোট ছোট শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠায় উৎসাহদান এবং দরিদ্র নিঃসম্বল উদ্বাস্তুদের মধ্যে স্বাবলম্বন-প্রবৃত্তি উন্মেষের উদ্দেশ্যে কিছুদিন পূর্ব্বে সামান্য মূলধন লইয়া একটি ব্যাঙ্কও প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছিলেন। আজ উদ্বাস্তু জার্মানদের মধ্যে এই ব্যাঙ্ক মারফত প্রচুর লেন-দেন কারবার চলিতেছে। ছোট ছোট কারবারী ও শিল্পকর্ম্মী ইহা দ্বারা সাহায্য পাইতেছে। ব্যাঙ্কের মূলধন আজ ঢের বাড়িয়া গিয়াছে; আর্থিক স্বাবলম্বনের দিক হইতে এটি যে তাহাদের কত উপকারে আসিতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

দেশ হইতে দেশান্তরে লোক-চলাচলের সময় নারী ও শিশুদেরই দুঃখভোগ হয় সবচেয়ে বেশী। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমরা ভারতবর্ষেও তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই সকল নারী ও শিশুর যাহাতে পালন-পোষণের সুব্যবস্থা হয়

বাড গোডেশ বার্গে আমেরিকান হাইকমিশনে নিযুক্ত জার্ম্মান কর্ম্মচারীদের বাসগৃহ

সেদিকেও পশ্চিম-জার্ম্মানীর ফেডারাল গবর্ণমেণ্ট বিশেষ তৎপর হইয়াছেন। নারীদের মধ্যে যাহারা কর্ম্মক্ষম অথচ অসহায় তাহাদের নিমিত্ত কর্ম্মসংস্থানের আয়োজনেরও ত্রুটি হয় নাই। ছিন্নমূল শিশুসমেত কুড়ি লক্ষ জার্ম্মানের পোশাক-পরিচ্ছদ সরবরাহের আয়োজন রাষ্ট্র কর্ত্তৃক করা হইতেছে। ১৯৪৯-৫১ সনের মধ্যে নারী ও শিশুদের স্থানান্তরিত করার জন্য ত্রিশ লক্ষ কম-ভাড়ার টিকেট ক্রয় করা হইয়াছিল, ১৯৫২-৫৩ সনে এই টিকিট-সংখ্যা কমিয়া হয়ত কুড়ি লক্ষ হইয়াছে।

কেহ কেহ ছিন্নমূল জার্ম্মানদের বিদেশে, বিশেষতঃ অষ্ট্রেলিয়ার মত জনবিরল অঞ্চলে প্রেরণের কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু কি ছিন্নমূল জার্ম্মান, কি মূল জার্ম্মানীর অধিবাসী, কি ফেডারাল গবর্ণমেণ্ট—এ প্রস্তাবে কোন পক্ষই সম্মত হইতে পারেন নাই। বিদেশে, যেমন অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বড়জোর পঞ্চাশ হাজার সবল জার্ম্মান যুবকের কর্ম্মের সংস্থান হইত। কিন্তু ইহাতে বিরাট ছিন্নমূল জার্ম্মান জাতির সমস্যা অতি সামান্যই মিটিত। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত জার্ম্মানীর পুনর্গঠন কার্য্যে লক্ষ লক্ষ সবল সুস্থ জার্ম্মান প্রয়োজন। এ অবস্থায় তাহাদের মধ্য হইতে সামান্যসংখ্যকও বিদেশে প্রেরণ যুক্তিযুক্ত মনে হয় নাই। তবে উদ্বাস্তু জার্ম্মানেরা ইচ্ছা করিলে পৃথিবীর যে-কোন অঞ্চলে বা দেশে গিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকার সংস্থান করিতে পারে তাহারা ব্যবসা-শিল্পাদির অনুষ্ঠান দ্বারা স্বজাতির অর্থশক্তির পুষ্টিসাধনের সম্পূর্ণ অধিকারী।

একটু আগেই বলিয়াছি, বহিরাগত জার্ম্মানদের জন্য বাসগৃহ নির্ম্মাণ এবং কর্ম্মের সংস্থান এই দুইটি প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া ফেডারাল সরকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে, যাহারা কৃষিকর্ম্মে অভ্যস্ত ও অভিজ্ঞ তাহাদের নিমিত্ত ভূমিসংগ্রহ করিয়া দেওয়াও হইতেছে; যাহারা ব্যবসা বা শিল্পকর্ম্মে পটু তাহাদের জন্য অর্থের বরাদ্দও সরকার করিতেছেন। তবে এত করিয়াও কিন্তু সবটা করা হয় না—যতক্ষণ না তাহাদের জার্ম্মান নাগরিকের

চিকিৎসক কর্ত্তৃক উদ্বাস্তু শিশুর স্বাস্থ্য-পরীক্ষা

পূর্ণ অধিকার স্বীকৃত হয়। ১৯৫৩ সনের মার্চ্চ মাসে 'ফেডারাল রিফিউজী ল' নামে পরিচিত নাগরিকের অধিকার-স্বীকৃতির আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সকল ছিন্নমূল জার্ম্মান—যাহারা পূর্ব্বে পশ্চিম-জার্ম্মানীতে আশ্রয় পাইয়াছিল ও যাহারা সোভিয়েট রাষ্ট্রকর্ত্তৃক ব্যাপক জার্ম্মান-বিতাড়ন নীতি অনুসরণের ফলে এখানে আসিয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে সকলেই—পশ্চিম-জার্ম্মানীর সাহায্য-গ্রহীতাদের নাগরিকের অধিকার এই আইনে প্রদত্ত হইয়াছে। জার্ম্মানরা এখন আর 'পরবাসী' নহে। তাহারা দুঃখ-ভোগের মধ্যে আজ স্বাধিকারে নূতন জীবন লাভ করিতে উদ্যত।

ইহারই প্রথম ফল বলা যাইতে পারে—সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে তাহাদের পরস্পরের মিলনের আন্তরিক প্রয়াস। 'Man does not live by bread alone'—মাত্র খাওয়া-পরার জন্যই মনুষ্য-জীবন নহে, এই শাশ্বত সত্য কথাটি উদ্বাস্তু জার্ম্মান-সমাজ যেন এত দিন ভুলিয়াই বসিয়াছিল। তাহারা আবার সংস্কৃতির ভিত্তিতে মিলিত হইতে চায়। পশ্চিম-জার্ম্মানীর মূল অধিবাসী এবং বহিরাগত ছিন্নমূল জার্ম্মান সমাজ আজ একই সূত্রে মিলিত হইয়া নূতন জাতি গঠনে লাগিয়া গিয়াছে। যে জার্ম্মান-জাতিকে শক্তিহীন করিয়ার

অঙ্গ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল, সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুশীলনের ফলে আবার তাহারা সম্মিলিত হইবে ইহাই যেন আজ সকলে বুঝিতেছেন। প্রথমে বিভিন্ন অঞ্চলের উদ্বাস্তু জার্মানগণ আলাদা আলাদা সমাজ-কল্যাণকর সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করে। পরে সেখানে তাহাদের কেন্দ্রীয় সমিতিও গঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীদের ভাষা, চালচলন, রীতিনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও অনুশীলন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনেরও আয়োজন চলিতেছে। ইহার ফলে একদিকে যেমন আপন আপন বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে, অন্য দিকে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবারও প্রবৃত্তি জন্মিবে। গণতন্ত্রের ভিত্তিতে ইহারা রাজনৈতিক দলও গঠন করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

সোভিয়েট 'জোন' হইতে বার্লিনের পশ্চিম অঞ্চলে আগত উদ্বাস্তুদের নাম রেজিষ্টারি করা হইতেছে

বিগত ১৯৫০ সনের ৫ই আগষ্ট "Charter of the German Enpellecs" নামে একটি উদ্বাস্তু-সনদ ঘোষণা করিয়াছে ছিন্নমূল জার্মানরা। ইহাতে তাহারা বলিয়াছে যে, তাহারা সর্ব্বপ্রকার প্রতিহিংসা এবং প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি পরিহার করিয়া চলিবে। গত দ্বাদশ বর্ষব্যাপী দুঃখ-দৈন্যের চরম ভোগ করিয়াই তাহারা আজ এই সঙ্কল্পগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। ইউরোপের প্রতিটি জাতিকে ভয় এবং বাধাবিমুক্ত করিয়া স্বাধীন ভাবে বসবাসের নিমিত্ত এক সম্মিলিত ইউরোপ গঠনে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেও তাহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছে। তাহারা ঘোষণা করিতেছে: "আমরা জার্মানী এবং ইউরোপ পুনর্গঠনে কঠোর এবং অবিশ্রান্ত কর্ম্মের দ্বারা সাধ্যমত সাহায্য করিব।" ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া তাহারা আপামরসাধারণ এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে।

লক্ষ লক্ষ জার্মানদের পুনর্ব্বাসনে পশ্চিম-জার্মানী যেরূপ সার্থক প্রয়াস করিতেছে এবং তাহাতে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেরূপ সহায়তা করিতেছে তাহাতে বিচ্ছিন্ন জার্মান জাতি আবার সংহত ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিবে আশা করা যায়। জার্মানদের উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন প্রয়াস—এই সমস্যাগ্রস্ত অন্যান্য দেশকেও সুষ্ঠু উপায় বাতলাইয়া দিবে। তবে যে সব কারণে জার্মান জাতি দুইটি মহাসমরে লিপ্ত হইয়া পড়িতে প্রলুব্ধ ও প্ররোচিত হইয়াছিল তাহার বিলুপ্তি না ঘটিলে জার্মান-সংহতি আবার বিপদের কারণ হইবে না ত?*

য-চ-ব

* প্রবন্ধের তথ্যাদি Germany Reports হইতে প্রাপ্ত

ভ্রম-সংশোধন

সংখ্যা	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পঙক্তি	হইবে না	হইবে
চৈত্র ১৩৬০	৬৬১	২	৩	নাটকীয় ব্যর্থতা	নাটকীয় বৈপরীত্য
বৈশাখ ১৩৬১	৭৪	১	...	'এসিয়াটিক বিসার্চেস'	'এসিয়াটিক রিসার্চেস'
"	৭৫	২	...	*On Flowers and Flower-Garden*	*On Flowers and Flower-Gardens*
"	৭৫	২	৮	*Vernacular Literatue Committee*	*Vernacular Literature Committee*

লাইফবয় সাবান

প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে আপনাকে রক্ষা করে

ভারতে প্রস্তুত

L. 246-X52 BG
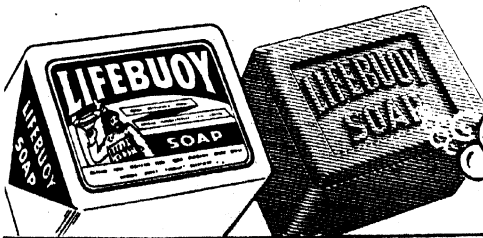
বৈশেষিক-দর্শন—শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য্য। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। মূল্য আট আনা।

৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই গ্রন্থে বৈশেষিক দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় অভ্রান্তরূপে একজন বিশিষ্ট সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। ষড়দর্শনের মধ্যে পদার্থবিভাগ বিষয়ক, সুপ্রাচীন কণাদমুনির অবদান ভারতীয় সংস্কৃতির চিরস্থায়ী কীর্ত্তি—সংক্ষেপে তাহার বিষয় জ্ঞাত হওয়া প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য। সুতরাং যাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ নহেন এই গ্রন্থ তাঁহাদের অবশ্যপাঠ্য। আর যাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ বটেন তাঁহাদের নিকটও এই দর্শনের দুরূহ তত্ত্বসমূহের সরল প্রাথমিক বিশ্লেষণ মূল্যবান বিবেচিত হইবে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। শ্রীবল্লভাচার্য্যের "ন্যায়লীলাবতী" প্রশস্তপাদের "ব্যাখ্যা" নহে, (পৃ, ৫), পরন্তু পৃথক প্রকরণ।

উপনিষৎ (প্রথম ভাগ)—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ বোধচক্র, ১২ শাখারীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৪। পৃ, ২৫+১৯০, মূল্য ২৲।

স্বামীজীর এই গ্রন্থে দশটি উপনিষদের সারমর্ম্ম প্রাঞ্জল বাংলায় বিবৃত হইয়াছে—ঈশ, কেন, মুণ্ডক, ঐতরেয়, প্রশ্ন, কঠ, শ্বেতাশ্বতর, কৌষিতকী, তৈত্তিরীয় ও মাণ্ডুক্য। ইহা ঠিক অনুবাদ নহে, সঙ্কলন কিংবা ব্যাখ্যাও নহে। বর্ত্তমানে ভাষ্যটীকাদিসহ মূল উপনিষদের পাঠকসংখ্যা বঙ্গদেশে ক্রমে কমিয়া যাইতেছে—অথচ উপনিষদের মর্ম্মকথা না জানিলে এখন শিক্ষিত-সমাজে চলা কঠিন। পাঠকসাধারণের মধ্যে উপনিষৎ-প্রভাবের এই নূতন প্রচেষ্টাকে আমরা সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি। প্রত্যেক উপনিষৎ সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থশেষে বিদেশে উপনিষৎ প্রচারের মনোজ্ঞ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

রথচক্র—শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২॥০ টাকা।

কাল পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু কোন কোন যুগ রাষ্ট্রে ও সমাজে পরিবর্ত্তনের কাজটি দ্রুত করিয়া তুলে এবং মানুষের চরিত্রে, চিন্তাধারায় ও কর্ম্মে তাহার চিহ্ন ফুটিয়া উঠে। বিংশ শতাব্দীর কয়েকটি দশকে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই পরিবর্ত্তন দ্রুততালে ঘটিতেছে। দুটি যুদ্ধ এবং বহু প্রকারের মতবাদ পৃথিবীর মানুষকে সুস্থির হইয়া কোনকিছুতে চিত্ত নিবিষ্ট করিতে দিতেছে না—নির্ব্বিঘ্নে জীবনের ভারকেন্দ্র ঠিক থাকিতেছে না, অথচ সারা দুনিয়াই চঞ্চল হইয়া তাহারা শান্তি খুঁজিতেছে। এই পরিবর্ত্তনের ছাপটা অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষে—বিশেষ করিয়া বাংলা-সাহিত্যে স্পষ্ট হইতেছে। ছোট গল্পের

যা দিনকাল পড়েছে তাতে প্রতিটি পয়সা বুঝে না খরচ করে উপায় নেই—সংসার চালানো এক দায়। সম্প্রতি আমার স্বামীর হঠাৎ একদিন বাজার করবার শখ হলো। ফিরলেন যখন তখন আমার ত মাথায় হাত! একটা বড় ডাল্‌ডা বনস্পতির টিন এনে হাজির করেছেন!

আমি কিসে দুপয়সা বাঁচে তাই ভেবে সংসারের সব জিনিষ, মায় রান্নার জন্য স্নেহপদার্থ অবধি, সস্তায় খুচরো কিনছি, আর এদিকে ব্যবসাদার স্বামী আমার কিনে আনলেন বড় একটিন ডাল্‌ডা বনস্পতি। বেহিসেবী আর কাকে বলে!

কিন্তু স্বামী ঠিক কাজই ক'রেছিলেন। পরে তাঁর সব কথা শুনে বুঝলাম যে রান্নার স্নেহপদার্থ সম্বন্ধেও অনেক কিছু শেখবার আছে…

"দেখ", স্বামী বললেন, "সংসারে আমাদের কাছে আমাদের তিনটি ছেলেমেয়ের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই। তাদের স্বাস্থ্যের দামই আমাদের কাছে সব চেয়ে বেশী। খোলা অবস্থায় খুব দামী স্নেহপদার্থেও ভেজাল চলতে পারে। তা ছাড়া তাতে ধুলোবালি ও মাছি, ময়লা পড়ার দরুণ তা দূষিত হয়ে যেতে পারে।"

"রান্নার ব্যাপারে শুধু একটি কাজ করলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, সেটি হচ্ছে শীলকরা টিনে স্নেহপদার্থ কেনা, তার ভেতর বীজাণু ঢুকতে পারে না, তাই তা সর্ব্বদা খাঁটি ও তাজা থাকে।" স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলাম "তা বেছে বেছে ডাল্‌ডা বনস্পতি কিনলে কেন?" তিনি বললেন যে ডাল্‌ডা বনস্পতির প্রস্তুতকারীরা বিশ বছর ধরে এই জিনিষ তৈরী করে হাত পাকিয়েছে। একেবারে উৎকৃষ্ট জিনিষ ছাড়া আর কিছুই ডাল্‌ডা তৈরীর কাজে ব্যবহার হয় না। প্রতিটি জিনিষ আগে পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়, আর তা উৎকৃষ্ট না হ'লে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। ডাল্‌ডা বনস্পতিতে এখন ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' দেওয়া হচ্ছে।

আপনাদের সুবিধার জন্য ডাল্‌ডা বনস্পতি ১০, ৫, ২ ও ১ পাউণ্ড বায়ুরোধক শীলকরা টিনে বিক্রি করা হয়। ডাল্‌ডা বনস্পতি সর্ব্বদা তাজা ও বিশুদ্ধ অবস্থায় পাবেন আর এতে সবরকম রান্নাই চমৎকার হয়, খরচও কম।

আমার স্বামী জোর দিয়েই বললেন "যে জিনিষ পেটে যায় তা নিশ্চিত বিশুদ্ধ হওয়া চাই।" আমাদের বাড়ীতে এখন শুধু ডাল্‌ডা বনস্পতিই ব্যবহার হয়—আপনিও তাই করুন।

আপনার দৈনিক খাদ্যে স্নেহপদার্থের কি দরকার?

বিনামূল্যে খবর জানবার জন্য আজই লিখুন:

দি ডাল্‌ডা এ্যাডভাইসারি সার্ভিস
পোষ্ট বক্স ৩৫৩, বোম্বাই ১

ডাল্‌ডা বনস্পতি

রাঁধতে ভালো - খরচ কম

HVM 211-X58 BG

ক্ষেত্র ইহার ব্যতিক্রম নহে। খানিকটা অবসর ও নিরুদ্বিগ্ন চিত্ত লইয়া যে কাহিনী রচিত হইয়া এককালে গল্প-রসিকের চিত্তবিনোদন করিয়াছে—আজিকার জীবনযাত্রার তালে সেই ধরণের কাহিনী যেন ঠিকমত তাল রাখিতে পারিতেছে না। আজ যাহা রচিত হইতেছে তাহাতে দেখি জীবনের কত ক্ষুদ্র ঘটনার অংশ, দ্বন্দ্ববিক্ষোভ সমাকীর্ণ সংসার, অভাব-তাড়নে সঙ্কুচিত মন, রূঢ় বাস্তব প্রেরণায় লাঞ্ছিত ভালবাসা। কিন্তু এই পরিবেশেও বাংলা কথাসাহিত্য যে শ্রীহীন হয় নাই তাহার প্রমাণ আলোচ্য গল্প-সংগ্রহের কয়েকটি গল্পে পাওয়া গেল। ছোট ছোট ঘটনা, সামান্য একটু মনস্তত্ত্বের ইঙ্গিত, সুসংবদ্ধ সংলাপ প্রভৃতির দ্বারা এক একটি চিত্র রচনা করিয়াছেন লেখক। অল্প কথায় এক একটি মানুষ ভিন্নতর মনোবৃত্তি ও চরিত্রসমেত সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, ঘটনার আবর্ত রচিত না হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে গল্প হইয়াছে উপভোগ্য। সব গল্পই অবশ্য খণ্ড জীবনের ছায়াপাত নহে; কোন গল্প ঘটনার দ্রুত তালে অগ্রসর হইয়াছে—কোথাও বা সামাজিক ক্লেদ-পঙ্কিলতা গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। রঙের মাত্রা অবশ্য সব গল্পে ঠিক থাকে নাই, তবু সেগুলি এই যুগেরই গল্প। অভাব-দ্বন্দ্ব-অশান্তি-সমাকুল যুগের লক্ষণটি এগুলির মধ্যে পরিস্ফুট এবং এই কারণেই পাঠক-মনকেও স্পর্শ করিতে পারিয়াছে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়
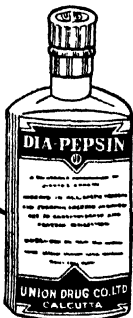
বাংলা সাহিত্যের নরনারী—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২॥০।

সাহিত্যের পথে আমরা কত নরনারীর দেখা পাই। অনেককে ভুলি, কিন্তু সকলকে ভুলিতে পারি না। কেহ কেহ পরমাত্মীয়ের মত আমাদের মনের সংসারে চিরদিনের জন্য রহিয়া যান। তাঁহাদের ধরণ-ধারণ, ভাবভঙ্গী নিতান্ত পরিচিত বলিয়া বোধ হয়। অবশ্য পাঠক-বিশেষে এই আত্মীয়তা-বোধের মাত্রাভেদ ঘটে। কিন্তু সাহিত্যের বিশিষ্ট চরিত্রসমূহের স্মরণযোগ্যতা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী বাংলা-সাহিত্যের সাঁইত্রিশটি স্মরণীয় চরিত্রের রেখাচিত্র আঁকিয়াছেন। রেখাচিত্র, কিন্তু আদলটি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট। প্রথমে স্থান পাইয়াছেন বড় চণ্ডীদাসের রাধা, আর সর্বশেষে পরশুরামের শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী। মাঝখানে আছে মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, টেকচাঁদ, মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিম, গিরিশ, হরপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার ও শরৎ চন্দ্রের কল্পনাসৃষ্ট চরিত্রাবলী। লেখকের আঁকিবার ভঙ্গিতেও নূতনত্ব আছে। অধ্যয়নপুষ্ট চিন্তা, স্বাভাবিক রসবোধ, মৌলিক কল্পনা এবং স্নিগ্ধ কৌতুকের সমন্বয়ে তাঁহার রচনা বড়ই উপভোগ্য। হরপ্রসাদের 'ভবতারণ পিশাচ গণ্ডী' এবং প্রভাতকুমারের 'রমাসুন্দরী' আধুনিক পাঠকের মনে কৌতূহল জাগাইবে; বাঁধা পথের বাহিরে একাধিক এই অদৃষ্ট দুইটি মূর্তির সাক্ষাৎ পাইয়া পাঠক মনে মনে খুশী হইবেন।

নতুন কবিতা—শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ২্।

গ্রন্থকার একদা কবি হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। তখন বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁহার মনোজ্ঞ কবিতাবলী প্রকাশিত হইত। বহুদিন তিনি সাহিত্যক্ষেত্র হইতে নিরুদ্দেশ। এই বইখানি পাইয়া অনেকদিন আগে শোনা সেই মিঠা সুর আবার মনে পড়িল। মনে পড়িল, হারানো যুগের স্বপ্নছবি: "মালিনীতীরে তাপসবনে মিলনমধুরাতি"; "কৈলাসমন্দিরে যজ্ঞের ধূম"। কিন্তু হায়, সে যুগ হইতে কত দূরে সরিয়া আসিয়াছি। 'টারম্যাকাডাইজড্ রাস্তায়' অরীন্দ্রবাবু আবার আধুনিক বেশে দেখা দিলেন। পুরাতন বেশ ভাল, না নূতন? কে জানে?

> "স্রোত আজ নতুন খাতে বইছে;
> আজ আমাদের ঘাট বাঁধতে হবে নতুন করে।
> যুগে যুগে এমনিই হয়ে থাকে।
> ইহাই যুগধর্ম।"

ভাঙ্গো ভাঙ্গো শৃঙ্খল—শ্রীবিমল সেনগুপ্ত। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ।৶০।

নেতাজীর মুক্তি-সংগ্রামের কথা লইয়া রচিত 'ছায়ানাট্য'। ছায়ানাট্যের সাফল্য নির্ভর করে প্রধানতঃ উপস্থাপন-কৌশলের উপর। লেখক স্বল্প-পরিসরে কাহিনীটিকে যথাযোগ্য ভাবে ধরিয়া দিয়াছেন।

দীপিকা—সুমিত্রা। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২৲।

"অন্তরে আমার
জাগে এক অজানা বিস্ময়।"

এই বিস্ময়ের সুরটি অধিকাংশ কবিতায় বাজিয়াছে। নারী-হৃদয়ের স্নিগ্ধ সৌকুমার্যে কবিতাগুলি অভিষিক্ত; অসাধারণ না হইলেও প্রীতিকর।

অবাক্—শ্রীঅতন্দ্র ভট্টাচার্য। ৪।১ কেরী রোড, শিবপুর, হাওড়া। মূল্য ॥০।

প্রধানতঃ উদ্বাস্তুজীবনের দুঃখ-বেদনাকে অবলম্বন করিয়া রচিত সাতটি কবিতা। নিখুঁত না হইলেও মনে হয় আন্তরিক, অকৃত্রিম—অনুভূতিহীন কথার কারসাজি নয়।

মানবতার প্রাণশক্তি—রফিউদ্দীন। জিলাপাড়া, পাবনা। মূল্য ২।০।

প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতি, প্রাচীন রোমক সংস্কৃতি, প্রাচীন সেমিটিক সংস্কৃতি, মধ্যযুগীয় আরব্য সংস্কৃতি এবং বর্তমান ইউরোপীয় সংস্কৃতি—এই পাঁচটি প্রবন্ধ পুস্তকখানিতে সঙ্কলিত হইয়াছে। আজিকার চিন্তাদৈন্যের দিনে এরূপ জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের আলোচনা সুলক্ষণ। লেখকের ভাষা সংস্কৃতপন্থী, কিন্তু আড়ষ্ট। একটি প্রশ্ন পাঠকের মনে স্বভাবতঃই জাগিবে, প্রধান প্রধান সংস্কৃতির আলোচনায় ভারতবর্ষের কথা বাদ পড়িল কেন? ভারতীয় সংস্কৃতি হইতে কি মানবসমাজ প্রাণশক্তি আহরণ করে নাই?

ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা এবং আমার জীবনে ব্রাহ্মসমাজের পরীক্ষিত বিষয় ও কয়েকটি উপদেশ—ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। নববিধান পাবলিকেশন কমিটি, ৯৫ কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ॥০।

একালের বিখ্যাত ভারতীয় ধর্মসাধকগণের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী অন্যতম। কিছুকাল তিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন, পরে ঐ সমাজের আনুষ্ঠানিক ব্যাপার হইতে দূরে থাকিয়াছেন; অবশ্য উহার উদ্দেশ্যের প্রতি শ্রদ্ধা হারান নাই। বস্তুতঃ প্রকৃত ধর্মের কোনও গণ্ডী নাই। তাহার পথ প্রশস্ত, সার্বজনীন ও সনাতন। আলোচ্য পুস্তকে প্রথম প্রবন্ধে বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজের পূর্বতন পবিত্রতা ও মহিমার কথা স্মরণ করিয়া পরবর্তী কালের আদর্শচ্যুতির জন্য দুঃখ করিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য ব্রাহ্মসাধকগণের উপদেশ তাঁহার মনে এক সময়ে যে ভক্তির উদ্রেক করিয়াছিল তাহা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন: "আমি জীবনের পরীক্ষায় বুঝিয়াছি যে ব্রাহ্মসমাজ কোন দল বা সম্প্রদায় নহে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী সকল সম্প্রদায়েরই সেই এক পরব্রহ্মের পূজা করা লক্ষ্য।... দলাদলি না করিয়া প্রকৃত ধর্মের জন্য লালায়িত হইলে আর ব্রাহ্মসমাজ লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদ করিতে হয় না।" সমাজমন্দিরে বিজয়কৃষ্ণ প্রদত্ত কয়েকটি ভক্তিসূচক উপদেশ এই পুস্তিকায় সঙ্কলিত হইয়াছে।

মানসমুকুর—শ্রীঅসিতকুমার হালদার। দি ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। মূল্য ৫৲।

চিত্রশিল্পী এখানে কাব্যশিল্পীরূপে দেখা দিয়াছেন। অবশ্য কয়েকটি রেখাচিত্রও এ গ্রন্থে আছে। গ্রন্থের বহিঃসজ্জা শিল্পরুচিসম্মত।

'মায়া' সখী মধুমালা ও কারুবাকীকে লইয়া 'মায়াভূমি' অর্থাৎ হরিদ্বার হইতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। পথে কুবের আসিয়া তাঁহাকে রথে তুলিয়া অলকাপুরীতে লইয়া গেলেন। এই পর্যন্ত কাব্যের প্রথম সর্গ। দ্বিতীয় সর্গের ঘটনাস্থল অলকা।

> "ইন্দ্রিয়ভোগ শুনহে কুবের, মায়াভূমিসুতা পেয়েছে চরম,
> দুর্লভ যাহা লভিতে সে চায়, জানিবারে সাধ দু'খের মরম।"

কৌতূহলবশে মায়া একদিন কুবেরের মুকুর তুলিয়া লইলেন। কুবের-প্রদত্ত 'রসদিঠি'-প্রভাবে বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন: সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ, পৃথিবীর আদি ইতিহাস, অতিকায় প্রাণী, 'হিত্তাই, মিতানি', আর্য-অনার্য, রামায়ণ-মহাভারত ও বৌদ্ধপ্রভাবের যুগ—কত না কালের কত না কাহিনী! অবশেষে, "কোথায় কুবের, কোথা হিমগিরি···মানসমুকুর কোথা মিলায়।" প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের ছায়া আর পুরাবৃত্ত মিলাইয়া লেখক একটি কল্পচিত্র রচনা করিয়াছেন। দুই এক স্থানে ভাষার দুর্বলতা থাকিলেও ভাবগৌরবে কাব্যখানি উপভোগ্য।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণচরিত—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী। উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩। ২৯৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ৪৲।

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহু জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি এই বইখানি কি উদ্দেশ্যে লিখিত হইল তদুত্তরে গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিতেছেন, 'পরমহংসদেবের একখানি নাতিদীর্ঘ, তথ্যবহুল জীবনচরিতের অভাব মোচনকল্পে এই পুস্তকখানি রচিত। ইহাতে তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনাবলী সংক্ষেপে ও যথাযথভাবে বর্ণনের চেষ্টা করা হইয়াছে; কোনরূপ দার্শনিক বিচার-ব্যাখ্যা ইহার বিষয়ীভূত নহে।' এই গ্রন্থ প্রধানতঃ স্বামী সারদানন্দ প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' ও মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' অবলম্বনে লিখিত; কারণ এই দুখানি গ্রন্থই, গ্রন্থকারের মতে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট ও প্রামাণ্য পুস্তক। 'অবতরণিকা'য় গ্রন্থকার হিন্দুধর্মের যুগসন্ধিক্ষণে যুগাবতার পরমপুরুষের আবির্ভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজের শাসনকালে ইংরেজী-শিক্ষার ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংঘাতে যখন একদিকে ডিরোজিও-প্রমুখ শিক্ষকগণের প্রভাবান্বিত নব্য বঙ্গসমাজ হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের প্রচলিত ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির উপর কুঠারাঘাত করিতে লাগিল, অন্যদিকে তেমনি কেশবচন্দ্র সেন-প্রমুখ ব্রাহ্মগণ হিন্দুসমাজের আচার-ব্যবহার রীতিনীতির সংস্কারে ব্রতী হওয়াতে হিন্দুর সমাজজীবনে আলোড়নের সৃষ্টি হইল। বিজাতীয় পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতার প্লাবন হইতে

হিন্দুধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য একদিকে রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ গোঁড়া হিন্দুগণ, অন্য দিকে বঙ্কিম, ভূদেব প্রভৃতি নব্যপন্থী হিন্দুগণ হিন্দুধর্ম যে সনাতন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ইহাই প্রমাণ করিতে লাগিলেন। বেদ উপনিষদ পুরাণাদি শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষ ঈশ্বরানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুধর্ম যে সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ, বিবেকানন্দ অভেদানন্দ প্রভৃতি ঠাকুরের শিষ্যগণ নিজ নিজ জীবনের সাধনা দ্বারা শুধু ভারতে নহে, সমগ্র জগৎসমক্ষে ইহাই প্রমাণ করিয়া ঠাকুরের জীবনাদর্শ ও বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। জীবে প্রেম ও জীবসেবাই যে ঈশ্বরের সেবা, ইহার মধ্যেই সকল ধর্মের সার নিহিত, কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ করিয়া নির্লিপ্ত ভাবে সংসারধর্ম পালন করাই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ উপদেশ, ইহাই ঠাকুর ও ঠাকুরের ভক্ত শিষ্যগণ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। জগতের বহু মনীষী ঠাকুরের হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা ও উপদেশামৃত পড়িয়া যে হিন্দুধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন, ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর অসাধারণত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে।

'শ্রীরামকৃষ্ণচরিত' অত্যন্ত সুখপাঠ্য হইয়াছে। কয়েকখানি চিত্র পুস্তকের শোভাবৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

মৃগতৃষ্ণিকা—শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী। বৃন্দাবন ধর বুক হাউস, ৯৩।৩।১ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ১৷০।

উপন্যাস। অবৈধ প্রেম ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ হইতে আরম্ভ করিয়া লম্পট অক্ষম স্বামীকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে গুলি করা স্বামীকে খুনের অন্য দায়ী করা, থানা-পুলিস, আদালত ও শেষ পর্য্যন্ত আত্মসমর্পণ, সমালোচ্য এক শত পৃষ্ঠার উপন্যাসখানিতে ইহার কোনকিছুর অভাব নাই। সাহিত্যক্ষেত্রে লেখিকার কিছু সুনাম আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আলোচ্য পুস্তকখানিতে তাহা তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই।

একফালি বারান্দা—শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী। ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, ২০৯ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲।

গল্পপুস্তক। একফালি বারান্দা, রূপান্তর, কালমেয়ে, জোঁক, শিল্পী, দধীচি, নারী, লগ্ন যদি হয় অনুকুল, আহুতি ও জন্মদিন এই দশটি গল্প পুস্তকখানিতে স্থান লাভ করিয়াছে। প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ নবম ও দশম এই ছয়টি গল্পে লেখিকা যথেষ্ট মুন্সিয়ানা দেখাইয়াছেন এবং প্রথম গল্পটি একটি শ্রেষ্ঠ গল্প হইতে পারিত যদি লেখিকা রচনায় আর একটু শালীনতার পরিচয় দিতে পারিতেন। বাকী চারিটি গল্প উল্লেখযোগ্য নহে। আলোচ্য পুস্তকে ইহাদের স্থান না দিলেই ভাল হইত।

লেখিকার ভাষা সহজ, সুন্দর ও সাবলীল এবং ছোট গল্পকে রসোত্তীর্ণ করার কৌশলটি তাঁহার জানা আছে।

ঝড় (চতুর্থ ভাগ)—ইলিয়া এরেনবুর্গ। অনুবাদক—শ্রীঅশোক গুহ। ভারতী লাইব্রেরী, ১৪৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ৩৲।

সমালোচ্য পুস্তকখানি ষ্টালিন পুরস্কারপ্রাপ্ত *The Storm*-এর বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক হিসাবে অশোকবাবু যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন এবং আলোচ্য পুস্তকখানিতে তাঁহার খ্যাতি বৃদ্ধি পাইবে। এই সুবৃহৎ পুস্তকখানি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইলেও প্রত্যেকটি খণ্ড স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই শ্রেণীর পুস্তকের অনুবাদ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। অনুবাদের মাধ্যমে আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিবার এই উদ্যম প্রশংসনীয়।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার নিমিত্ত আবেদন

রবীন্দ্রনাথের আসন্ন জন্মদিবস উপলক্ষে বঙ্গে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের নিকট সাহায্যের আবেদন জানাইয়া বাংলার বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকবৃন্দ 'টেগোর সোসাইটি' কর্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের নামে 'রবীন্দ্র-অধ্যাপক পদ' প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন—

"বাংলা সাহিত্যের মর্ম্মমূল হইতে ইহার শাখা-প্রশাখায় যে প্রাণ রস সঞ্চারিত তাহার প্রধান উৎস ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পঁচিশে বৈশাখ কবির এই জন্মদিন উপলক্ষে প্রতি বৎসরই বহু সভা-সমিতি, নৃত্য-গীতাদির অনুষ্ঠান বাংলায় ও বাংলার বাহিরে উদ্‌যাপিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা বাংলাদেশে হইয়া উঠে নাই, ইহা সত্যই পরিতাপের বিষয়।

সম্প্রতি কলিকাতার 'টেগোর সোসাইটি' এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'রবীন্দ্র-অধ্যাপক' পদ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হইলে এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবে। এই ব্যাপারে সর্ব্বসাধারণের ও রবীন্দ্র-সাহিত্যানুরাগীদের সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজন। আমাদের বিনীত নিবেদন :

বাংলাদেশে এবং বাংলার বাহিরে যে সকল রবীন্দ্র-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকল অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা যথাসাধ্য অর্থ-সংগ্রহ করিয়া তাহা অবিলম্বে 'টেগোর লেকচার ফণ্ড'—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নামে প্রেরণ করিবেন।"

বাঁকুড়া মধ্যস্বত্বাধিকারী ও কৃষকগণের সাধারণ সভার মন্তব্য

সর্ব্বপ্রথমেই আমরা বলিয়া রাখি যে, আমরা বর্ত্তমান কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাবান ও আমরা অন্য কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত নহি। গত ইলেক্‌শনে আমরা কংগ্রেস পক্ষকেই সমর্থন করিয়াছি। কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের প্রত্যেক জনহিতকর কর্ম্মের প্রতি আমরা সম্যক্ সহানুভূতিসম্পন্ন। বর্ত্তমান জমিদারী প্রথা রহিত আইনে জমিদারী, পত্তনী, দরপত্তনী, তালুক, ইজারা প্রভৃতি মৌজাওয়ারী স্বত্ব উচ্ছেদ বিষয়ে আমাদের বিশেষ কোন আপত্তি নাই, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাজা, খাজনা বা ভাগচাষ দ্বারা উৎপন্নভোগী মধ্যবিত্তভোগীদের সমস্ত স্বত্ব রহিতসূচক আইন প্রণয়নের দ্বারা যে দেশব্যাপী আতঙ্কের সূচনা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে দেশবাসীর মনোভাব প্রকাশ করাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য।

জমিদারী স্বত্ব উচ্ছেদ আইনের ধারাগুলি সম্যক্ আমাদের হস্তগত না হইলেও সংবাদপত্রে প্রকাশিত ও আলোচিত বিষয়গুলি পাঠ করিয়া আমাদের দৃঢ় ধারণা হয় যে, আইনসভার বহুসংখ্যক সভ্য দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতির পরিবর্ত্তে প্রতিকূল ভাবাপন্ন। অনেকে মনে করেন পল্লীগ্রামে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর লোকগুলির কোন প্রয়োজন নাই, শতকরা ৯৯ ভাগ অশিক্ষিত কৃষক ও মজুর এবং তদুপরি রাজসরকার প্রতিষ্ঠিত থাকিলেই পল্লীর-স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও শৃঙ্খলার উন্নতি হইবে, মধ্যবিত্ত জমিজমা উৎপন্নভোগী শ্রেণী, সমাজের আগাছা বিশেষ, তাহাদের সম্যক্ উচ্ছেদ করিলেই পল্লীর সকল প্রকার মঙ্গল হইবে। দেহ হইতে মস্তিষ্ক বা মেরুদণ্ড বাদ দিয়া কেবল হস্তপদকে পুষ্ট করিলে যেরূপ কোন কার্য্যই সম্পাদিত হইতে পারে না, সেরূপ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীকে বাদ দিয়া পল্লীর কোন কার্য্যই চলিতে পারে না। এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত জনসাধারণ স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিল। বড় বড় জমিদার বা কৃষক, মজুর সম্প্রদায় প্রায় কোনদিন স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন নাই বরং প্রতিরোধিতা করিয়াছিলেন। আইনসভার অনেক সভ্যের ধারণা যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা জোতদার শ্রেণী দ্বারা কৃষক ও মজুরগণ প্রপীড়িত হইয়া আসিতেছে, অতএব এই শ্রেণীকে ধ্বংস করিয়া কৃষক ও মজুর রাজ্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশে শান্তি স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু আমরা দৃঢ় স্বরে ঘোষণা করিতেছি যে, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ধীশক্তিই এই জগৎ চালনা করিতেছে এবং ইহার অভাবে জগৎ অচল হইবে, এই চির সত্যের উচ্ছেদ আইন দ্বারা সম্ভব নয়। পল্লীর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, বৈশ্য প্রভৃতি শিক্ষিত ও মাজ্জিত শ্রেণীর জনসাধারণ মধ্যস্বত্বে স্বত্বাধিকারী হইয়া হাজার হাজার বৎসর জমিজমা দখল করিয়া আসিতেছেন, ইহার উদ্ভব দশ-সালা বন্দোবস্তের সহিত হয় নাই। দশ-সালা বন্দোবস্তের দ্বারা জমিদারী স্বত্বের সৃষ্টি হওয়ার পর জমির মধ্য স্বত্বগুলি নির্ণীত হইয়াছিল মাত্র এবং তদবধি প্রজাস্বত্ব আইন অনুসারে হস্তান্তরযোগ্য বা অস্থায়ী বিভিন্ন প্রকার স্বত্বের প্রবর্ত্তন হইয়াছে, গত সেটেলমেণ্টে জমিজমার মধ্যস্বত্বগুলি নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা :

(ক) নিষ্কর—ব্রহ্মোত্তর বা দেবোত্তর, (খ) মোকররী, (গ) দখলী-স্বত্ব বিশিষ্ট মধ্যস্বত্ব (মোকররী নহে), (ঘ) স্থিতিবান রায়ত, (ঙ) রায়ত, (চ) কোর্ফা রায়ত।

উপরোক্ত যে কোন একটি স্বত্বে বা বিভিন্ন স্বত্বে একই ব্যক্তি জমিজমা সাধারণতঃ দখল করিয়া থাকেন এবং এইরূপ স্বত্বাধিকারী প্রজাগণকে বা জমিজমার উৎপন্নভোগীদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা—

(১) মালিক নিজ তত্ত্বাবধানে লাঙ্গল রাখিয়া জমি চাষ করিয়া থাকে।

(২) মালিক অন্য লোকের দ্বারা ভাগচাষে জমি চাষ করাইয়া থাকে এবং প্রচলিত প্রথানুযায়ী উৎপন্ন ফসলের অংশ পাইয়া থাকে।

(৩) মালিক কোন কৃষককে জমির বার্ষিক গড় উৎপন্নের নির্দ্দিষ্ট অংশ (rent in kind) গ্রহণ করিয়া কৃষককে চিরস্থায়ী স্বত্ব প্রদান করে, এইরূপ অংশের পরিমাণ সচরাচর এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশও হইয়া থাকে।

উপরোক্ত তিন প্রকার প্রণালীতে জমিজমার চাষ-আবাদ প্রথার সুবিধা বা অসুবিধাগুলি আলোচনা করা হউক :—

১। মালিক নিজ তত্ত্বাবধানে নিজের গরু ও লাঙ্গল দ্বারা যেখানে চাষ করে সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। প্রবর্ত্তিত আইনে এই শ্রেণীর কৃষক বা জোতদারের অধিকৃত জমির পরিমাণ ৩৩ একর বা ৯৯ বিঘা বা কম বেশী নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এরূপ জোতদারের সংখ্যা অতি অল্প। সাধারণতঃ কৃষকগণ ২।৩ খানি লাঙ্গল দ্বারা ৭০।৭৫ বিঘা বা এক শত বিঘা জমি চাষ করিয়া থাকে—অতিরিক্ত পরিমাণ জমি যথাযথ ভাবে চাষ করাও কষ্টকর ও উৎপন্নের পক্ষে ক্ষতিকারক, সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের বলিবার কিছুই নাই।

২। ভাগচাষ-কর্ত্তা বা ভাগচাষীর বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, ভাগচাষে জমি বিলি নিম্নলিখিত কারণে হইয়া থাকে—

(ক) দায়ভাগ আইনে বিভাগ-বন্টনের ফলে এক এক অংশ জমির পরিমাণ এরূপ কম হইয়া যায় যে তাহা একখানি লাঙ্গলের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে, সুতরাং অন্যকে বিলি করিয়া কিছু অংশ গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

(খ) জমির মালিকের মৃত্যু-রোগ-জনিত অকর্ম্মণ্য বা বার্দ্ধক্য ইত্যাদি অবস্থায় অন্যকে দিয়া চাষ করান ব্যতীত আর কি উপায় হইতে পারে। অন্য কোন কৃষককে ভাগচাষে বা সাজা অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট ফসলের অংশ বা খাজনা অর্থাৎ নগদ টাকা লইয়া বিলি করিলেই উক্ত কৃষক Intermediary অর্থাৎ মধ্যসত্ব পর্য্যায় আসিবে ও সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমানে তাহার স্বত্ব রহিত করিলে তাহার পরিবারবর্গের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা ভাবিলেও কষ্ট হয়।

সাজা অর্থাৎ 'Fixed rent in kind' সম্বন্ধে আইন-সভার অনেক সভ্য এমন কি মন্ত্রীমণ্ডলীরও সঠিক ধারণা নাই, কাহারও কাহারও ভ্রান্ত ধারণা আছে যে ইহা অসঙ্গত, অতএব উচ্ছেদযোগ্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা কৃষকগণের পক্ষে দখলিস্বত্ববিহীন ভাগচাষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। প্রচলিত ভাগচাষ প্রথায় মালিকগণ ইচ্ছামত চাষী পরিবর্ত্তন করা হেতু কৃষকগণ তেমন যত্নপূর্ব্বক চাষ করে না, ফলে শস্যের উৎপন্ন কমিয়া যায়। এরূপ স্থলে যদি কৃষককে উৎপন্ন ফসলের নির্দ্দিষ্ট অংশ দিবার সর্ত্তে স্থায়ীভাবে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় তাহা হইলে কৃষক উক্ত জমিতে নিজ জমি বিধায় তাহার সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য নিয়োগ করিয়া উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করে এবং তদ্দ্বারা তাহাতে যথেষ্ট লাভবান হয়। যদি উক্ত সাজা বন্দোবস্ত দ্বারা কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিত, তাহা হইলে অনায়াসে ইস্তফা দিতে পারিত। কিন্তু এইরূপ ইস্তফা দেওয়ার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। সুতরাং প্রচলিত Fixed rent in kind প্রথাকে Intermediary right শ্রেণীভুক্ত করিয়া মধ্যস্বত্বাধিকারী রায়তি স্বত্ব ধ্বংস করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। বহুকালব্যাপী প্রচলিত আইনের আওতায় যে Intermediary rights-এর সৃষ্টি হইয়াছে তাহা যদি বর্ত্তমান কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অসঙ্গত বিবেচিত হইয়া উচ্ছেদযোগ্য হয় তবে তাহা বাতিল করিয়া বন্দোবস্তকারী মালিককে নিজ তত্ত্বাবধানে চাষ করিবার জন্য ১০০ বিঘা পূরণ হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বাগ্রে অধিকার দেওয়া হউক। একদল ভূমিহীনকে ভূমিদান করতঃ অপরপক্ষকে ভূমিহীন করার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না।

কমিউনিষ্ট মনোভাববিশিষ্ট বহুলোক প্রচার করিতেছে যে, মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী বিলাস-জীবন যাপন করিতেছে, অপর দিকে যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া শস্য উৎপন্ন করিতেছে তাহারা বঞ্চিত হইয়া বহু কষ্টে জীবনযাপন করিতেছে। হাজারকরা দুই-একজন লোক এইরূপ বিলাসভোগী থাকিলেও প্রকৃত ব্যাপারটি ঠিক বিপরীত। জমি-জমার উৎপন্নভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সকলেই আজ সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছে। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ প্রাপ্ত ফসল হইতে তাহাদের দুই-চারি মাসের সংস্থান হয় মাত্র। হয়ত কেবল চাউলটি সংগৃহীত হয়। বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যয়ভার অন্য বৃত্তি অবলম্বনে চালাইতে হয়। এই বেকারযুগে যাহারা কোন বৃত্তি বা অবলম্বন যোগাড় করিতে না পারে তাহারা অর্দ্ধাশনে, অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় দিনপাত করিতে বাধ্য হয়। ইহার উপর যদি জমিজমার মধ্যস্বত্ব হইতে চিরতরে বঞ্চিত হয় তবে কৃষকের অধীন মজুর হওয়া ব্যতীত আর কোন উপায় দেখি না। আমরা মন্ত্রীমণ্ডলীকে প্রত্যেক ইউনিয়নে শুভাগমন করিয়া মধ্যবিত্ত, কৃষক ও মজুরদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে অনুরোধ করি। শস্যমূল্য বৃদ্ধির সুযোগে কৃষকগণ আজ প্রচুর বিত্তশালী হইয়াছে। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু বলিতে কৃষকের বাড়ীতেই দেখিতে পাওয়া যায়। বরং দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে, আজকাল কৃষকগণ ক্রমশঃ বিলাসপরায়ণ হইতেছে।

আয়কর Income-tax, কৃষিকর (Agricultural tax) প্রভৃতি প্রচলিত প্রত্যেক আইনেই দুই-তিন হাজার টাকা বার্ষিক আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। সেইরূপ যে সকল মধ্যস্বত্বাধিকারীর বার্ষিক আয় পাঁচ হাজার টাকার অনধিক তাহাদিগকে এই উচ্ছেদ আইনের কবল হইতে অব্যাহতি দেওয়া হউক। তাহা হইলে বহু দরিদ্র পল্লীবাসী আবশ্যকমত নিজ লাঙ্গলে চাষ বা অন্যের দ্বারা চুক্তি সর্ত্তে চাষ করাইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে পারিবে। অন্ততঃ ৩০ একর জমি বর্ত্তমান প্রত্যেক মালিককে স্বাধীনভাবে বিলি ব্যবস্থা বা মজুর দ্বারা চাষ করিতে বা করাইতে দেওয়া একান্ত আবশ্যক। ইহার অন্যথা করিলে পল্লীতে হাহাকার উঠিবে। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায় যাহারা এখনও পল্লীতে বাস করিতেছে তাহারা জমিজমার স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইলে স্বল্পকালমধ্যেই পল্লী ত্যাগ করিয়া শহর ও শিল্পাঞ্চলে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইবে। ক্ষতিপূরণের যৎসামান্য অর্থের দ্বারা পল্লীতে বসিয়া শিল্প বা ব্যবসা করিবার কিছুই নাই। ফলে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দেশে ঘোর অশান্তির সৃষ্টি হইবে, উচ্চ প্রণালীর চুরি ডাকাতিরও বৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব নয়। শিক্ষিত সম্প্রদায় পল্লী ছাড়িয়া চলিয়া গেলে কাহাকে লইয়া গ্রাম-সংস্কারকার্য্য সমাধা হইবে।

এতদ্ব্যতীত আর একটি বিষয়ে আমরা বর্ত্তমান কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করি, তাহা সামাজিক পদমর্য্যাদা ও পরস্পরের প্রীতিবন্ধন। আজ প্রতিটি পল্লীতে ঢুকিলেই দেখা যায়, ইহার মধ্যে আজও সনাতন চতুর্বর্ণ বিদ্যমান। উচ্চশ্রেণীর লোক সকলেই মধ্যবিত্ত বা জমিজমার উৎপন্নভোগী এবং তাঁহারাই জমিজমার উপরিস্থ মালিক যদি এই শ্রেণীর স্বত্ব সম্পূর্ণ রহিত করিয়া দেওয়া হয় তবে তাঁহাদের আর কোন মর্য্যাদা থাকিবে না, ফলে তাঁহারা কেহই অন্নহীন বেকার জীবনযাপন করিবার জন্য পল্লীতে পড়িয়া থাকিবেন না।

মধ্যস্বত্ব চিরকাল ছিল এবং সাময়িকভাবে রহিত করিলেও আবার অল্পসময় মধ্যে গজাইয়া উঠিবে। মনে করুন আজ সমস্ত প্রকার মধ্যস্বত্ব (Rent-receiving right) নষ্ট করিয়া কৃষক ও ভূমিহীনদের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমি বিভাগ করা হইল। কিছুদিন পরে কেহ মরিয়া গেল বা কেহ রোগাক্রান্ত হইল তখন তাহার অধিকৃত জমি অন্যকে বন্দোবস্ত করিয়া তাহার বিধবা নাবালক পরিবারবর্গকে ভরণপোষণ করা ব্যতীত কি উপায় হইতে পারে?

আমরা ক্রমশঃ উচ্ছেদ প্রথার কুফল সম্বন্ধে আগামী অধিবেশনে আলোচনা করিব। উপস্থিত মন্ত্রীমণ্ডলীকে হঠাৎ একটা আইন পাশ করিয়া বহুদূর প্রসারিত বৃক্ষের মূলচ্ছেদ কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করি। ইতি—

বিনীত রাধানগর ইউনিয়নবাসী মধ্যস্বত্বাধিকারী ও কৃষকবৃন্দ
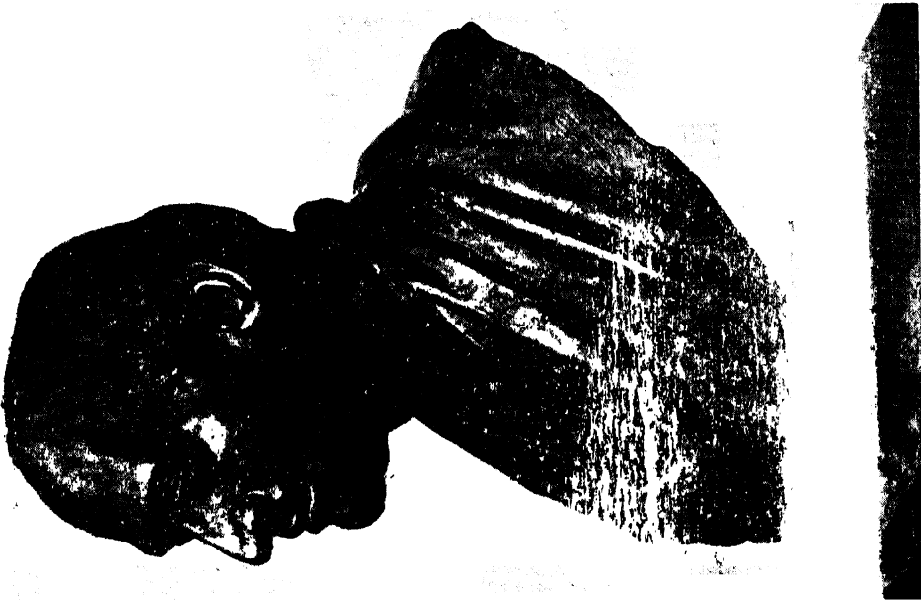
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীচৈতন্য ও বাসুদেব সার্বভৌম
শ্রীবীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

'স্বতন্ত্র'-সম্পাদক কে. সুধা রাওয়ের আবক্ষ ব্রোঞ্জমূর্তি

কলা-সমালোচক জি. ভেঙ্কটাচলমের আবক্ষ ব্রোঞ্জমূর্তি

ভাস্কর—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী
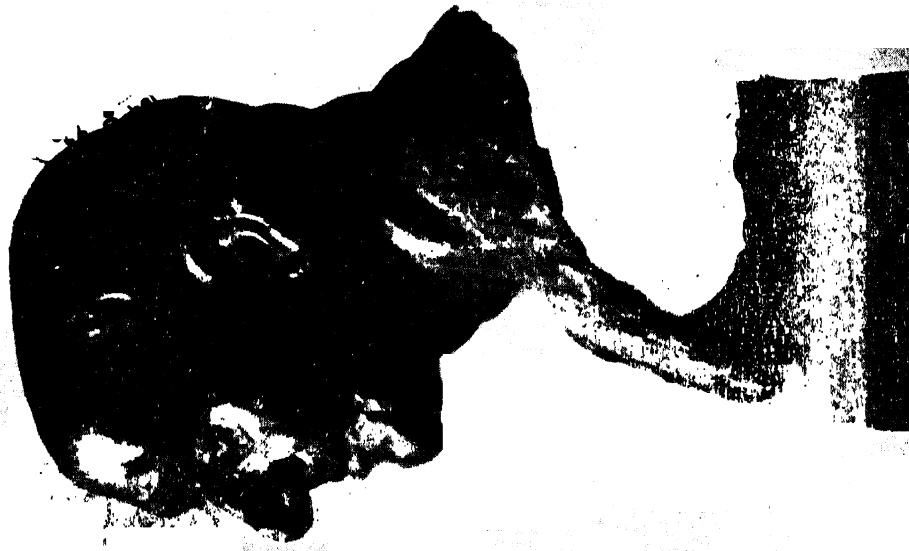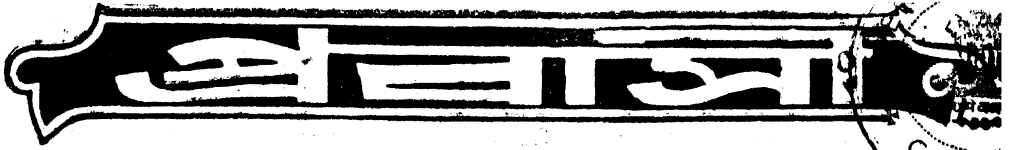
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৪শ ভাগ ১ম খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১ | ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

২৫শে বৈশাখ

এ বৎসরও রবীন্দ্র জন্মোৎসব আগেকারই মত মহা আড়ম্বরের সহিত আমরা, অর্থাৎ বাঙালী ও অবাঙালী রবীন্দ্রভক্তগণ সম্পন্ন করিয়াছি। বহু বক্তৃতা, নৃত্য-গীত, গদ্য-পদ্য-মুখরিত অসংখ্য সভা-সম্মেলনে নিবেদন করিয়াছি আমাদের শ্রদ্ধা। কিন্তু আজ সে সকল শেষ হইবার পর মনে যেন একটা তিক্ত আস্বাদ রহিয়া গিয়াছে। এ যেন ক্ষুধিত পাষাণের সেই "সব ঝুটা হায়!"

এই যে এত পূজার অর্ঘ্য, এত যে গুরুদেবের স্মৃতিতর্পণে ঘটা, ইহার মধ্যে কতটা স্থির ও স্থায়ী বিশ্বাস বা ভক্তির উৎস-প্রসূত, কতটাই বা ক্ষণিকের উচ্ছ্বাসজনিত? কতটা গুরুভক্তি অকপট সত্যের আধারে রক্ষিত মহামূল্য রত্ন, কতটাই বা নাট্যমঞ্চের রূপসজ্জার কৃত্রিম আভরণ? অর্থাৎ কতটা নির্মল, নিষ্কলুষ গুরু-দক্ষিণার নৈবেদ্য আর কতখানি আত্মপ্রসাদ ও আত্মপ্রতারণার ক্ষণস্থায়ী উপকরণ?

২৫শে বৈশাখ আসিয়া চলিয়া গিয়াছে, আবার আসিবেই আসিবে। তবে কেন এই সপ্তাহব্যাপী উৎসবের পর মনে তৃপ্তি নাই, আগামী দিনের উৎসবের জন্য আশাপূর্ণ প্রতীক্ষার ইঙ্গিত মাত্র নাই? উৎসবের পর আজ দেশের দিকে চাহিয়া মনে হয় অবস্থা :

—Like a banquet-hall deserted
When the lights are sped
And the garlands dead
And all the guests departed—

বিলাস-ব্যসনপূর্ণ উৎসবের শেষে রহিয়াছে শুধু ধূলি-আবর্জনা, শুকানো মালার স্তূপ। ধূপধুনার হোমানলের ঘ্রাণমাত্র নাই সেখানে।

যে শিক্ষাব্রত তিনি আজীবন উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার সম্যক্ পরিচয় আমরা পাইয়াছি, তাঁহার দৃষ্টান্তে, ভাষায়, লেখায়। আজ এই তাঁহার জন্মভূমিতে শিক্ষার অবস্থা কি?

তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী তো মহা-শ্মশানে পরিণত হইলেও ছিল ভাল। সে কথা ছাড়িয়া অন্য কথাই বলি।

বাঙালীর সকল গৌরবের উৎস শিক্ষা। ঐ শিক্ষার ভুলভ্রান্তি অনেক কিছু ছিল সন্দেহ নাই। ঐরূপ শিক্ষার নিন্দাবাদ আজ চতুর্দ্দিকে চলিতেছে, কেননা উহা হুজুগের সহায়তা করে। নিন্দাবাদ যাহাই হউক, উহা তখন সময়োপযোগী ছিল এবং বাঙালী সেই সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়া অশেষ লাভবান হয়। আজ সেই শিক্ষার পথ ধ্বংস করার ব্যবস্থা চলিতেছে কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে কি আসিবে তাহার সুস্পষ্ট ধারণা কোথায়ও দেখিতেছি না।

তাহার পর শিক্ষকের কথা। শিক্ষার পথ যাহাই হউক, মাধ্যম, পাঠ্য বা প্রণালী যাহাই হউক, শিক্ষক বিনা শিক্ষা অসম্ভব।

এদেশে শিক্ষক এখন ভদ্রস্থ রক্ষায় অসমর্থ, ইহাই সহজ ভাষায় বলা যায়। শিক্ষকের জীবনযাত্রার মান কোন দেশেই কোন সময়েই অতি উচ্চ ছিল না। বিদেশেও তাঁহাদের আদর্শ ছিল "Plain living and high thinking", অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিলাস-বর্জ্জিত জীবন কিন্তু অতি উচ্চস্তরের চিন্তাশীলতা। কিন্তু সেরূপ অবস্থা এবং সম্পূর্ণ সম্বিৎহীন দারিদ্র্যে অনেক প্রভেদ। সন্তান-সন্ততির অন্নের চিন্তা, তাহাদের শিক্ষাদীক্ষার অভাব, ইহাই এখনকার শিক্ষকের দৈনন্দিন সমস্যা, সুতরাং অন্য চিন্তার অবকাশ কোথায়?

পূর্ব্বদিনের শিক্ষক ও গুরু ভদ্রসমাজের উচ্চতম স্তরে উন্নত মস্তকে চলিতে পারিতেন। তিনি নির্লোভ শিক্ষাব্রতী, জ্ঞানার্জ্জনের পথনির্দ্দেশক, ইহাই ছিল উচ্চ সম্মানের কথা। তাঁহার উপার্জ্জনে পরিবার-পরিজনের মূল্যবান বেশভূষা বা বিলাস-ব্যসন চলিত না। কিন্তু লজ্জানিবারণ বা ক্ষুধাতৃষ্ণার উপশম হইত এবং উপযুক্ত পুত্র-কন্যা সাধারণ অপেক্ষা উন্নততর শিক্ষা প্রাপ্ত হইত। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার তাঁহার সম্মানে গর্ব্বিত হইত। সেই গর্ব্বেই বুনো রাম-নাথের স্ত্রী নদীয়ার মহারাণীকে বলিয়াছিলেন, "আমার হাতে লাল সুতো বাঁধা আছে বলেই নবদ্বীপের মান আছে।"

আজ সেই শিক্ষক নিদারুণ অভাবগ্রস্ত, অন্নবস্ত্রের চিন্তায় প্রপীড়িত হইয়া শিক্ষাব্রত উদযাপনে অসমর্থ ও স্খলিতপদ। ছাত্রও সেই কারণে শিক্ষকের অবাধ্য, দুর্বিনীত ও উদ্দাম ভাবপ্রাপ্ত। তাহাকে শিক্ষা দিবেই বা কে ও তাহার শিক্ষা হইবেই বা কি? সেও চলিয়াছে চরম দুর্গতির পথে।

যে কথা শিক্ষার বিষয়ে বলা যায়, তাহাই তো সাহিত্য-শিল্প ও সকল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেখানেও রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও আশিস আমরা কতটুকু লইতে পারিয়াছি?

সরকারী অপব্যয়

কেন্দ্রীয় সরকার বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা দুইটি ভিন্ন পর্য্যায়ের ব্যক্তি সমষ্টিতে গঠিত। প্রথমতঃ উচ্চতম অধিকারীবর্গ, অর্থাৎ মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, পার্লেমেণ্টারী, সেক্রেটারী ইত্যাদি। ইহারা আমাদের বুদ্ধি ও বিবেচনার প্রতীক, কেননা আমরাই ইঁহাদিগকে নিজেদের যোগ্য প্রতিনিধি রূপে নির্ব্বাচিত করিয়া লোকসভায় পাঠাইয়াছি। বলা বাহুল্য ইঁহাদের অধিকাংশই অযোগ্য এবং আমাদেরই মত বিচারবুদ্ধিহীন। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে আছেন ব্রিটিশ-রাজের গঠিত, প্রাক্তন "নোকরশাহীর" উচ্চ ও নিম্নস্তরের রাজপুরুষ-বর্গ। ইঁহারা অভিজ্ঞ, সুচতুর ও কর্ম্মঠ। বলা বাহুল্য, ইঁহাদের মধ্যে যে বিশাল অংশ উপরন্তু চৌর্য্যগুণসম্পন্ন, তাঁহাদের পক্ষে উচ্চ অধিকারীবর্গের চক্ষে ধূলি দেওয়া অতি সহজ। তাহারই একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল:

"নয়াদিল্লী, ১২ই মে—খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের ট্রাক্টর সংস্থা কি অবস্থায় কোটি কোটি টাকা মূল্যের ট্রাক্টর ও উহার বিভিন্ন অংশ 'এলোপাথারিভাবে' ক্রয় করে, সে বিষয়ে ভারত সরকারকে তদন্ত করিবার জন্য লোকসভায় ব্যয়বরাদ্দ কমিটির বিবরণে সুপারিশ করা হইয়াছে। অদ্য কমিটির সভাপতি শ্রীঅনন্তশয়নম আয়েঙ্গার লোকসভায় উহার বিবরণ পেশ করেন।

ট্রাক্টর, মালপত্র ও উদ্বৃত্ত বিভিন্ন অংশ প্রভৃতি ক্রয়ের ব্যাপারে 'অবিবেচনাপ্রসূত নীতি' অনুসরণের ফলে যে গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে, ইহার জন্য দায়ী কর্ম্মচারিবৃন্দের বিরুদ্ধে 'কঠোর শাস্তি' দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া কমিটি বিবেচনা করেন।

তাহা ছাড়া কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সংস্থার হেফাজতে যেসব ট্রাক্টর, সাজ-সরঞ্জাম ও মালপত্র রহিয়াছে, তাহাদের উপযুক্ত মূল্য নির্দ্ধারণ-কল্পে একজন বিশেষজ্ঞ 'কষ্ট একাউণ্ট্যাণ্ট'সহ একটি ক্ষুদ্র কমিটি নিয়োগের সুপারিশও উহাতে করা হইয়াছে।

কমিটির মতে কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সংস্থা ১৯৫০-৫১ হইতে ১৯৫২-৫৩ সন পর্য্যন্ত ৬৮ লক্ষ ৩২ হাজার ৭০৭ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তবে প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ ইহার চেয়েও বেশী; আর আনুমানিক এক কোটি টাকা মূল্যের উদ্বৃত্ত মাল হিসাবের বইয়ে উল্লেখ অনুযায়ী বিক্রয় হইবে কি না এবং ১৯৫৪ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যের নিকট পাওনা ৫ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা পুরা উশুল হইবে কি না, তাহা না জানা পর্য্যন্ত প্রকৃত ক্ষতির হিসাব মিলিবে না।"

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বাতিল

অযোগ্যতা ও কর্ম্মপরিচালনায় অক্ষমতার অভিযোগে রাজ্য সরকার গত ১১ই মে হইতে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে বাতিল করিয়া দিয়াছেন। সরকার কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দাসকে পর্ষদের এডমিনিষ্ট্রেটর নিয়োগ করিয়াছেন।

মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা। চারি বৎসর পূর্ব্বে উহা গঠিত হয়। পরস্পর বিরোধী নানা স্বার্থযুক্ত কয়েকটি দলের বাদবিসম্বাদ ও কুটচক্রান্তের অবিরাম সংঘাতের ফলে উহার ব্যর্থতা চরমে উঠিয়াছে। সরকারী অধিকারে ঐরূপ চক্রান্তের কি নূতন রূপ দেখা দেয় তাহাই ভবিষ্যতে দ্রষ্টব্য।

এডমিনিষ্ট্রেটর নিয়োগের ফলে ৪৪ জন সদস্য লইয়া গঠিত মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ এবং উহার কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের (সদস্য সংখ্যা ১৬ জন) কাজ বন্ধ হইয়া গেল। পর্ষৎ ও উহার কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের সাধারণ নির্ব্বাচন ১৯৫১ সনের প্রথম ভাগে সম্পন্ন হয়। ঐ বৎসরেরই জুন মাস হইতে পর্ষদের কাজ সুরু হয়। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরবর্ত্তী নির্ব্বাচন ১৯৫৫ সনে হওয়ার কথা ছিল।

মঙ্গলবার রাত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন: "বিগত কিছুকাল যাবৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কার্য্যকলাপ ক্রমবর্দ্ধমান উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছিলেন। পর্ষৎ উপর্য্যুপরি যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি ও অব্যবস্থার পরিচয় দেয় স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা সংক্রান্ত সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে উহার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে। বিশেষ যত্নসহকারে বিভিন্ন তথ্য বিবেচনার পর গবর্ণমেন্টের সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পুনর্গঠনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। যে পর্ষৎ অযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাহার পুনর্গঠন সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত উহাকে বাতিল করিয়া পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার ভার গ্রহণকল্পে সাময়িক বন্দোবস্ত করা উচিত বলিয়া সরকার মনে করেন। যেসব নিয়মবহির্ভূত ব্যাপার ও অব্যবস্থার জন্য সরকার পর্ষৎ বাতিল করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন নিম্নে তাহাদের কয়েকটি উল্লিখিত হইল—(ক) পরিদর্শনকারী অফিসারদের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া অথবা কোনরূপ পরিদর্শন না করিয়াই কয়েকটি বিদ্যালয়ের অনুমোদন দান; (খ) সাহায্যদান সম্পর্কিত আইনকানুন না মানিয়া বিদ্যালয়সমূহকে সাহায্যদান; (গ) যথাসময়ে বহুসংখ্যক বিদ্যালয়কে সাহায্য না দেওয়ায় ঐসব বিদ্যায়তনের দুর্ভোগ; (ঘ) অনুমোদনের যোগ্যতা বিচার না করিয়া পাঠ্য পুস্তক অনুমোদন; (ঙ) স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার জন্য যেসব প্রশ্নপত্র রচনা করা হয়, সেগুলি যথোপযুক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখার অসামর্থ্য; ইহার ফলে গুরুতর ভুলত্রুটি ঘটে এবং পাঠ্যসূচী বহির্ভূত প্রশ্নপত্র রচনা হয় ও কয়েকবার পরীক্ষা বন্ধ থাকে; (চ) প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে ব্যর্থতা; ইহার ফলে কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হইয়া যায়।

গবর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, ছাত্র ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের স্বার্থ রক্ষার খাতিরেই এ জাতীয় অবস্থা আর চলিতে দেওয়া অনুচিত। এই হেতু সরকার কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দাস এম-এ, বি-এলকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কার্য্য-পরিচালক নিযুক্ত করিয়াছেন। একটি অর্ডিনান্স-বলে নিযুক্ত কার্য্য-পরিচালক যথাশীঘ্র ছাত্রসম্প্রদায় ও বিদ্যায়তন-

সমূহের অসুবিধা এবং পূর্ব্বোক্ত ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে গবর্ণমেণ্ট মধ্য-শিক্ষা পর্ষৎ পুনর্গঠন করিতে ইচ্ছুক। ঐসব সুপারিশ কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ অনুমোদন ও ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।"

প্রাথমিক শিক্ষার পুনর্গঠন

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার আশু পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে "মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, ব্রিটিশ আমলে প্রাথমিক শিক্ষা সরকারের নিকট হইতে যে বৈমাতৃসুলভ ব্যবহার পাইত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের পরও তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই।

প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করিবার প্রচেষ্টার ফলে পৌর-সভাগুলিতে ক্রমে ক্রমে বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়, গ্রামাঞ্চলেও পাঠশালা চালাইবার জন্য জেলায় জেলায় স্কুল বোর্ড গঠিত হয়। আদায়ীকৃত শিক্ষা সেস হইতে প্রাপ্ত অর্থ স্কুল বোর্ডের মারফত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় হয়। কিন্তু স্কুলবোর্ড-গুলি এমন ভাবে গঠিত যাহাতে প্রাথমিক শিক্ষার বাঞ্ছিত প্রসার হওয়া সম্ভব হয় নাই।

এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া পত্রিকাটি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের মত একটি প্রাথমিক শিক্ষাবোর্ড গঠনের পরামর্শ দিয়াছেন। পত্রিকাটির মতে :

"প্রাথমিক শিক্ষাবোর্ড গঠিত হইলে তাহাতে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতিনিধি থাকা উচিত এবং সেই সঙ্গে জেলা স্কুল বোর্ডগুলিতেও প্রাথমিক শিক্ষক প্রতিনিধিদের অবিলম্বে গ্রহণ করা দরকার। সেই কারণে স্কুল বোর্ডগুলির পুনর্গঠনের প্রয়োজন দেখা গিয়াছে। দেশে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রাথমিক শিক্ষকদের সর্ব্বাত্মক সহযোগিতা দরকার এবং সেই হেতু স্কুল বোর্ডে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতিনিধি থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। দেশে প্রাথমিক শিক্ষার খবরদারীর জন্য জেলা স্কুল বোর্ডগুলি ঢালিয়া সাজার প্রয়োজন আছে। প্রায় দেখা যায় একই ব্যক্তি ইউনিয়ন বোর্ড, জেলা বোর্ড, স্কুল বোর্ড হইতে আরম্ভ করিয়া বিধানসভা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। এই জাতীয় প্রতিনিধিবর্গ স্কুল বোর্ডে থাকিয়া দেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারকল্পে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন না, ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহাদের সাধ্যে কুলাইতে পারে না, সে কথা অবশ্যই বলা যায়।"

এই যুক্তি আমরাও সমীচীন মনে করি। যে টাকা শিক্ষা-সেসে আদায় হয় এবং তদুপরি সরকারী সাহায্য যতটুকু আসে, তাহার খরচ যথাযথ ভাবে হইলে প্রাথমিক শিক্ষা কিছু অগ্রসর হইতে পারে।

অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার দেশব্যাপী তখনই হইবে যখন দেশের লোকে উহার মূল্য ও আবশ্যকতা বুঝিবে। এখন পর্য্যন্ত আমরা বুঝি শুধু দাবী করিতে। সবকিছুই চাই, কিন্তু সে সবই হইবে পরস্মৈপদী, অর্থাৎ আমি কিছুই দিব না, নগদেও না শ্রমেও না, ইহা সুস্থ মনের লক্ষণ নহে।

স্পেশাল কেডার প্রাথমিক শিক্ষক

পশ্চিম বাংলায় শিক্ষিত বেকার সমস্যা লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে এবং জনসাধারণের নিরক্ষরতা দূরীকরণ কল্পে সরকার স্পেশাল কেডার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত করেন এবং তদনুযায়ী বিভিন্ন জেলায় শিক্ষক নিয়োগের কোটা (quota) ঘোষণা করা হয় এবং গুণানুসারে শিক্ষকদের মাহিনাও ঘোষিত হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলায় স্পেশাল কেডার শিক্ষকের সংখ্যা বরাদ্দ ছিল ৫৯৭ জন, এবং উক্ত সংখ্যক বিজ্ঞাপিত পদের জন্য আবেদন করেন ২৬০০ শিক্ষিত যুবক—তাঁহাদের মধ্যে ৭ জন এম-এ ও এম-এসসি (ইঁহাদের মধ্যে একজন আবার আরবী ভাষায় প্রথম শ্রেণীর এম-এ); ১২৫ জন বি-এ; ২৫০ জন আই-এ এবং বাকী ম্যাট্রিক। কিন্তু পরে জানান হয় যে, ১৯৫৪ সালে মুর্শিদাবাদে মোট ৩৯২ জন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করা হইবে। আরও জানা যায় যে, পূর্ব্ব-ঘোষিত ১৫০টি নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবর্ত্তে জেলাতে মাত্র ৫৫টি নূতন পাঠশালা খোলা হইবে।

এই সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "মুর্শিদাবাদ সমাচার" লিখিতেছেন যে, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে কিছু সংখ্যক স্পেশাল কেডার প্রাথমিক শিক্ষক হিসাবে কাজ পাইয়াছেন সত্য তবে "তন্মধ্যে বর্ত্তমানে কতজন কাটিয়া পড়িয়াছেন তাহা সঠিক না জানিলেও কিছু যে কাটিয়া পড়িবার চেষ্টায় আছেন, তাহা স্থির নিশ্চিত।"

স্পেশাল কেডার শিক্ষকদের মাসিক বেতন সর্ব্বপ্রকার ভাতাসহ ৫৫৲ টাকা। পত্রিকাটির মতে এত অল্প টাকা মাহিনায় এম-এ ও বি-এ প্রার্থিগণ অধিক দিন শিক্ষকতা করিবেন কিনা সে বিষয়ে স্বভাবতঃই সন্দেহ জাগে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় এইরূপ শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করা হইয়াছে বলিয়া উক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করা হইয়াছে। জেলা নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন স্কুল বোর্ড, জেলা বোর্ড ও জেলা কংগ্রেসের তিন সভাপতি এবং জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ও সমাজ শিক্ষা প্রাধিকারিক। পত্রিকাটি লিখিতেছেন : "শুনিয়াছি শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে দুই জন সভ্য যাহা করিয়াছেন তাহাই হইয়াছে।" এক মহকুমার প্রার্থীকে অন্য মহকুমার কাজ দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে প্রার্থী শিক্ষকগণ কত দূর পর্য্যন্ত কাজ চালাইয়া যাইতে পারিবেন সে বিষয়ে "মুর্শিদাবাদ সমাচার" বিশেষ সন্দিহান।

বর্দ্ধমানে মহিলা কলেজ

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানের ন্যায় বর্দ্ধমানেও বিদ্যালয়, ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বাড়িতেছে। বর্দ্ধমান শহরে দুইটি বালিকা বিদ্যালয়

আছে। কিন্তু ইহাদের উপর ছাত্রীসংখ্যার চাপ এত বেশি যে অনায়াসেই আরও একটি বালিকা বিদ্যালয় চলিতে পারে। উক্ত জেলার মফস্বল অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতেও ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু বিদ্যালয় ও ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও শহরে একটি মহিলা কলেজের অভাবে অনেক ছাত্রীকে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পাশ করিয়া ইচ্ছা ও অর্থ থাকা সত্ত্বেও পড়া বন্ধ রাখিতে হয়।

"বৰ্দ্ধমানবাণী" এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন, "বৰ্দ্ধমানে একটি মহিলা কলেজের অভাব অনেক দিন হইতে অনুভূত হইতেছে। সম্প্রতি শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বৰ্দ্ধমানে মহিলা কলেজ স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন দেখিয়া সুখী হইয়াছি।"

পত্রিকাটি বৰ্দ্ধমান পৌর বালিকা বিদ্যালয়টিকে মহিলা কলেজে রূপান্তরিত করিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

পত্রিকাটির সংবাদ অনুযায়ী দুই বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি ডিসপারসাল স্কীম অনুযায়ী উক্ত বালিকা বিদ্যালয়টিকে কলেজে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য দিতেও সরকার স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তখন সে প্রস্তাবে সম্মত হন নাই।

বর্ত্তমানে কয়েকজন পৌরসদস্যও মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহান্বিত হইয়াছেন দেখিয়া "বৰ্দ্ধমানবাণী" আনন্দ প্রকাশ করিয়া লিখিতেছেন: "পৌর কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী হইলে কলেজ স্থাপন সহজসাধ্য হইবে। পর্য্যাপ্ত স্থান যখন আছে তখন নূতন গৃহ নির্ম্মাণের জন্য অর্থের অভাব হইবে না বলিয়া মনে করি।"

সরকার ডিসপারসাল স্কীম অনুসারে অর্থ সাহায্যে রাজী ছিলেন কিন্তু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সম্মত হন নাই জানিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। এমনকি সর্ত্ত ছিল যে ঐ সুযোগ গ্রহণ করা কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব হয় নাই? বস্তুতঃ বাংলাদেশ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে পিছাইয়া যাইতেছে। এ বিষয়ে প্রত্যেক জেলায় আন্দোলন হওয়া উচিত।

বিহারে বাংলাভাষা

বাংলা ভাষা লইয়া দীর্ঘকালব্যাপী বিহারে যে আন্দোলন চলিতেছে, এত দিনে পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা তাহা মিটমাটের পক্ষে এক সম্ভাবনাময় পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বিহারে বাংলা ভাষা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য এই প্রথম বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অদূর ভবিষ্যতে এক সম্মেলনে মিলিত হইবেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কর্তৃপক্ষ বিহার সরকারের সহিত অতীতে কয়েকবারই বিহারে বাংলা ভাষার সমস্যা লইয়া আলাপ-আলোচনা উদ্যোগী হন; কিন্তু বিহার সরকার এইবার প্রথম এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে ভাষা শিক্ষার যে সকল অসুবিধা রহিয়াছে, তাহা "দূর করার জন্য সর্ব্ববিধ চেষ্টা করা দরকার" বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, বিহার সরকার তাহাতে সম্মত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

আশা করা যায়, এই আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গের আয়তন প্রসারের বিপরীত কোনও সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে না।

সিংহলে মার্কিন অনুপ্রবেশ

প্রেস ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়ার এক সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নাকি সিংহল সরকারকে সাহায্য দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাবের সর্ত্ত হইল—সিংহল সরকারকে চীনের সহিত বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, ১৯৫২ সালে আন্তর্জ্জাতিক বাজারে রবারের দাম অত্যধিক পড়িয়া যাওয়ায় মার্কিন সরকারের তীব্র বিরোধিতা এবং নানাবিধ হুমকি সত্ত্বেও সিংহল সরকার চীনের সহিত এক বিনিময়-বাণিজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হন। তাহাতে স্থির হয় যে, চীন সিংহলকে চাউল দিবে এবং পরিবর্ত্তে সিংহল চীনে রবার দিবে। এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের অর্থনৈতিক কমিশনের রিপোর্টে বলা হয় যে সিংহলের পক্ষে এই বাণিজ্যে বিশেষ উপকার হয়। প্রথমতঃ তাহার প্রধান রপ্তানী দ্রব্য রবারের একটি বাজার মিলে এবং দ্বিতীয়তঃ চীন হইতে অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে চাউল পাওয়ায় সিংহলের তৎকালীন খাদ্যসঙ্কটের তীব্রতা হ্রাস পায়।

মার্কিন সরকারের সাম্প্রতিক প্রস্তাবে সিংহলের রাজনৈতিক মহলে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে। পর্য্যবেক্ষকগণ মনে করেন যে সিংহল সরকার যদি এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হন, তবে সিংহলের বর্ত্তমান সরকারী দল এবং মন্ত্রীসভার মধ্যে ভাঙন দেখা দিবে। বহু বেসরকারী মহল হইতে এই মার্কিন প্রস্তাবের নিন্দা করা হইয়াছে। তবে সরকারীভাবে এই প্রস্তাবের কথা স্বীকার বা অস্বীকার কোন কিছুই করা হয় নাই।

ভারত ও আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ

"১০ই মে—আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য আমেরিকার সর্ব্বশেষ প্রস্তাব সম্পর্কে ভারতের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ পার্লামেণ্টে বলেন, সৈন্য বা রক্ষী নিয়োগ লাইসেন্স প্রদান, খনি, কলকারখানা ও কাঁচমালের মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ ও কোন্ কোন্ দেশের আণবিক শক্তি থাকা বাঞ্ছনীয় তাহা স্থির করার অধিকার সহ, অন্যান্য দেশের উপর ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রসঙ্ঘ হইতে স্বতন্ত্র একটি আন্তর্জ্জাতিক সংস্থা গঠনের জন্য আমেরিকা সর্ব্বশেষ যে প্রস্তাব করিয়াছে সম্ভাবনার দিক হইতে উহা বাঞ্ছনীয় নহে।

গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার আন্তর্জ্জাতিক আণবিক ভাণ্ডার গঠনের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা জগতের লোকের সমবেত কল্যাণের জন্য ইহাতে প্রস্তুত আছি, এজন্য আমাদের স্বাধীন কর্ম্মপন্থাও সীমায়িত করিতেও প্রস্তুত আছি,

কিন্তু এই আন্তর্জাতিক সংস্থার উপর কয়েকটি দেশের আধিপত্য বাঞ্ছনীয় নহে।

শান্তিপূর্ণ কাজে আণবিক শক্তি নিয়োগ সম্পর্কে আজ লোক-সভায় ডাঃ মেঘনাদ সাহার প্রস্তাবক্রমে দুই ঘণ্টা যে আলোচনা চলে তাহারই উত্তর দান প্রসঙ্গে শ্রীনেহরু এই মন্তব্য করেন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু ডাঃ মেঘনাদ সাহার অধিকাংশ প্রস্তাবের সহিত এক মত হন এবং বলেন—"আমরা আণবিক শক্তি ও অন্যান্য মারণাস্ত্র নিষিদ্ধ করার, আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ এবং শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে উহার ব্যবহারের পক্ষপাতী। কিন্তু অসুবিধা এই যে, উহা নিয়ন্ত্রণ করা হইবে কি উপায়ে? আমাদের কাঁচামাল ও খনি-গুলি বাহিরের কোন কর্তৃত্বসম্পন্ন সংস্থার হাতে ছাড়িয়া দিতে রাজী হওয়া আমাদের পক্ষে ঠিক হইবে না।"

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের মোটামুটি দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত আমরা একমত। উহাতে উদারতা-ব্যঞ্জক মনোভাবের পরিচয়ও আছে, কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবগুলি অস্পষ্ট। ভারত এবং এশিয়ার ও আফ্রিকার অন্যান্য যে সব দেশে আণবিক শক্তির অভাব আছে সেগুলির পক্ষে শান্তিপূর্ণ কাজে আণবিক শক্তি নিয়োগের প্রশ্নটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। যাহাদের যথোপযুক্ত পরিমাণ শক্তি আছে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় তাহাদের সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু আমাদের পক্ষে ইহা নিয়ন্ত্রিত হওয়া বা বন্ধ হওয়া অসুবিধাজনক। আন্তর্জাতিক আণবিক ভাণ্ডার গঠনের সুবিধাজনক একটা উপায় খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে আমরা সুখী হইব।

"১০ই মে—আজ বিজ্ঞানশাস্ত্রবিৎ রাজনীতিক ডাঃ মেঘনাদ সাহা লোকসভায় জন-কল্যাণমূলক কার্যে আণবিক শক্তির প্রয়োগ সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের অবতারণা করিয়া বলেন যে, এই দেশে আণবিক শক্তি উৎপাদনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

এই সম্পর্কে ডাঃ সাহা নিম্নলিখিত চারিটি বিশেষ প্রস্তাব করেন: (১) আণবিক শক্তি উৎপাদন সংস্থাকে ব্যাপক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা; (২) কাঁচামাল আহরণের জন্য বড় একদল পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন ভূতত্ত্ববিৎ নিয়োগ; (৩) বর্তমান আণবিক শক্তি আইন বাতিল করা এবং বর্তমান আইনে গোপনতা রক্ষার যে বিধান আছে, নূতন আইন হইতে তাহা বাদ দেওয়া; এবং (৪) যথোপযুক্ত তহবিল গঠন (অন্ততঃ ২০ কোটি টাকা)।

তিনি বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আণবিক শক্তি কমিশন খাতে বাজেটে প্রায় দুই শত কোটি ডলার (অর্থাৎ ভারতের সমগ্র জাতীয় বাজেটের সমান) বরাদ্দ করা হইয়াছে। ব্রিটেন ঐ বাবদ বরাদ্দের পরিমাণ মার্কিন বাজেটের শতকরা প্রায় দশ ভাগ এবং ফ্রান্সে উহা ব্রিটিশ বাজেটের প্রায় এক-দশমাংশ।

আণবিক অস্ত্র লইয়া পৃথিবীব্যাপী উত্তেজনা এবং আণবিক অস্ত্রসজ্জা লইয়া পৃথিবীর দুইটি প্রধান রাষ্ট্রগোষ্ঠীর প্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ করিয়া ডাঃ সাহা বলেন, "প্রামাণিক সূত্র হইতে বলা হইয়াছে যে, সম্ভবতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছয় হাজার আণবিক বোমা তৈয়ার করিবার মত ফিশন (আণবিক বিভাজন) যোগ্য উপাদান আছে এবং সোভিয়েট রাশিয়ায় আছে তিন শত বোমা তৈয়ার করিবার মত উপাদান। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার আণবিক বোমা উৎপাদনের হার নাকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় বেশী। বর্তমানে 'ফিশন'যোগ্য যে উপাদান হাতে আছে, তাহাতে কয়েক বৎসরের জন্য পৃথিবীর তাপ-শক্তি ব্যবহারের কাজ চলিয়া যাইবে। কিন্তু কয়লা বা পেট্রলিয়াম পুড়াইয়া শক্তি উৎপাদনের কিংবা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের যে ব্যবস্থা বর্তমানে রহিয়াছে, খরচের দিক দিয়া তাহার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মত আণবিক শক্তি উৎপাদনের প্রণালী আবিষ্কারের জন্য আমাদিগকে আরও বৎসর দশেক অপেক্ষা করিতে হইবে। অতএব আমাদের সম্মুখে সঞ্চিত আণবিক শক্তির উপাদানগুলি কাজে লাগানোর এমন একটি পথ খোলা আছে, যেখানে খরচের জন্য পরোয়া করা হইবে না। যথা: আমরা ঐ উপাদানগুলি দ্বারা আণবিক অস্ত্র উৎপাদন করিতে পারি এবং সাবমেরিণ চালাইবার জন্য আণবিক শক্তি উৎপাদক যন্ত্র চালাইতে পারি। এই কাজ অফুরন্তভাবে চলিতে পারে। একটি উচ্চশক্তি-সম্পন্ন আণবিক যুদ্ধ-জাহাজবহর তৈয়ার করিবার কল্পনাও একটা রহিয়াছে। এই সঞ্চিত আণবিক উপাদানগুলি যুদ্ধে ব্যবহৃত না হইলে বৎসরের পর বৎসর এগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। তখন এইগুলি দিয়া কি কাজ হইবে, এই প্রশ্ন থাকিয়াই যাইতেছে।"

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা

জেনেভা সম্মেলনের উদ্দেশ্য কি এবং সেখানে মিলিত শক্তি-গোষ্ঠীরই বা উদ্দেশ্য কি, এই প্রশ্নের উত্তর ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস নিম্নে উদ্ধৃত প্রবন্ধে দিয়াছেন:

"জেনেভা সম্মেলনে আলোচনার যে জটিল রূপ প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে ইহা আরও জটিল হইতে বাধ্য যদি সম্মেলন দীর্ঘস্থায়ী হয়—তাহার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণের মনে এই প্রশ্নই জাগে বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীর বর্তমান নীতির মূল উদ্দেশ্য কি?

"সম্মেলনে ব্রিটেনের উদ্দেশ্য কিন্তু সত্যসত্যই অত্যন্ত সহজ ও সরল। ব্রিটেনের উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার এমন এক কাঠামো গড়িয়া তোলা যাহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ অন্যান্য বৃহৎ দেশগুলির ন্যায় নিজেদের নিরাপদ বোধ করিতে পারিবে। বর্তমান ক্ষেত্রে যে ক্ষুদ্র দুইটি দেশের কথা বিবেচনা করা হইতেছে তাহারা হইল কোরিয়া ও ইন্দোচীন।

"এই যে সমস্যা, কিভাবে বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্য এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি পাশাপাশি শান্তিপূর্ণভাবে বাস করিতে পারে—তাহা আজিকার সমস্যা নয়, এই সমস্যা বহুকাল ধরিয়া মানুষের মনকে আন্দোলিত করিয়া আসিয়াছে। বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্যকে দেখা গিয়াছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাজ্যকে গ্রাস করিবার জন্য সর্বদা উৎসুক। অথচ ইতিহাসে দেখা যায় সভ্যতার ক্ষেত্রে এই ক্ষুদ্র দেশগুলির দান

সামান্য নয়, তাহারা এই দিক দিয়া যে-কোন বৃহৎ সাম্রাজ্যের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। এথেন্স, ফ্লোরেন্স, হল্যাণ্ড, এলিজাবেথান ইংলণ্ড এবং সেই সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশের কথা এসম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

"উপরন্তু বিশ্বশান্তির জন্যও প্রয়োজন আছে এই সকল দেশকে রক্ষা করিবার। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশের নিরাপত্তার অভাবই বরাবর মহাযুদ্ধের কারণ হইয়া আসিয়াছে। নিরাপত্তার এই অভাবই বৃহৎ শক্তিবর্গকে প্ররোচিত করিয়া থাকে পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ বাধাইয়া তুলিতে। ১৯১৪-১৮ সালে যুদ্ধ বাধিয়া উঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলকান রাষ্ট্রের উপর প্রভুত্ব বিস্তার সম্পর্কে অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্য।

"১৯১৪ সালের যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমরা উপলব্ধি করিতে পারি যে, শান্তির জন্য প্রয়োজন আছে যৌথ ব্যবস্থাঃ। আক্রমণকারীকে রোধ করিবার শ্রেষ্ঠ পন্থা হইল আক্রমণকারীকে বুঝাইয়া দেওয়া যে তাহার এই আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা যেমন আক্রান্ত ক্ষুদ্র দেশটি করিবে তেমনই করিবে অন্য সকল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শক্তি যাহারা মনে করে আইনের শাসন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শেষ হইয়া যায় নাই। ইহাই ছিল লীগ অব নেশনসের বিধান এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনন্দের একটা উদ্দেশ্য। বিধান ব্যর্থ হয়। সনন্দ ফলপ্রদ হয় যদিও আংশিক ভাবে।

"ইহা স্বীকার না করিয়া আজ উপায় নাই যে কোরীয় যুদ্ধের মধ্য দিয়া এই যৌথ নিরাপত্তার ব্যবস্থার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আক্রমণকারীরা বিস্মিত হয় যখন রাষ্ট্রসঙ্ঘ দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য অগ্রসর হয়। যুদ্ধে ক্ষতি হয় যথেষ্ট, কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘ তাহার কর্ত্তব্য পালন করিতে ত্রুটি রাখে নাই। আক্রমণকারীদের হটাইয়া দেওয়া হয় ৩৮ অক্ষরেখার অপর পারে। তাহাদের এই কথা আরও স্পষ্ট বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, অন্যকে আক্রমণ করার মধ্যে আজ আর লাভের কোন আশা নাই।

"এই শিক্ষাই যথেষ্ট হয় বিশেষভাবে তাহাদের ভবিষ্যৎ আক্রমণাত্মক কার্য্যকলাপ সম্পর্কে। কোরীয় যুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘ অংশ গ্রহণ না করিলে অন্যদিকেও হয়ত এত দিনে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিত। ইহা সত্য বটে যে চীনারা ইন্দোচীনে সাহায্য করিয়া আসিতেছে, কিন্তু ইন্দোচীনের অবস্থা অন্যরূপ। কোরিয়ার দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে না থাকিলে চীনা সেনা-বাহিনী কি প্রকাশ্যভাবে ইন্দোচীনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিত না?

"কোরিয়ার যুদ্ধ সেইজন্য আক্রমণকারী সাম্রাজ্যগুলিকে এই শিক্ষাই দিয়াছে। কিন্তু এই সকল দেশকে এইভাবে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। তাহাদের স্বাধীনতাই তাহাদের শান্তিতে থাকার পক্ষে যথেষ্ট হইবে না, তাহাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—ইহার অর্থ হইল বিশ্বের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে দেশ-বাসীর মধ্যে কোথাও কোনরূপ অসন্তোষের ভাব না থাকে। দুর্ব্বল, বিশৃঙ্খল এবং অসন্তুষ্ট দেশগুলিই শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত গণ্ডগোলের মূল হয়। তাহারা বাহিরের লুব্ধ আক্রমণকারীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে।

"জেনেভা সম্মেলনের সম্মুখে যে সমস্যা রহিয়াছে তাহা কেবল যুদ্ধ শেষ করিবার সমস্যা নয়, কোরিয়া ও ইন্দোচীনের ভবিষ্যৎ গঠনের সমস্যাও এই সম্মেলনের চিন্তার বিষয়। তাহাদের এমনভাবে পুনর্গঠিত করিতে হইবে যাহাতে তাহাদের পক্ষে স্বাধীন থাকিয়া এবং আভ্যন্তরীণ সুখশান্তি বজায় রাখিয়া আক্রমণ প্রতিরোধের শক্তি অর্জ্জন করা সম্ভব হয়। সম্মেলনে ব্রিটেনের মূল লক্ষ্য ইহাই।

"স্বাধীন এশিয়ার দেশগুলিরও ইহাই লক্ষ্য। ভারত, পাকিস্থান, সিংহল, বর্ম্মা ও ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রীদের কলম্বো সম্মেলন জেনেভা সম্মেলনের পূর্ব্বে পরিকল্পিত হইলেও আশ্চর্য্যভাবে জেনেভা সম্মেলনের সহিত প্রায় একই সময় অনুষ্ঠিত হয়। কলম্বো সম্মেলনে এশীয় জাতিপুঞ্জ এই ইচ্ছাই প্রকাশ করে যে, প্রত্যেক জাতির, ক্ষুদ্র হউক কিংবা বৃহৎ হউক, অধিকার আছে স্বাধীন ভাবে নিজের নিজের ভাগ্য নির্দ্ধারণের, এই ভাগ্য নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে বৃহৎ জাতিপুঞ্জের ও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয়।"

অপহৃতা নারী উদ্ধার

দেশবিভাগের সময় নারীজাতির উপর যে অকথ্য অত্যাচার হইয়াছে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোনদিনই হইবে না। প্রতিকারের শেষ চেষ্টা এইবার হইবে এইরূপ সংবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল:

"নয়াদিল্লী, ৮ই মে—অপহৃতা নারীদের উদ্ধারের জন্য এখানে তিন দিবসব্যাপী পাক-ভারত বৈঠক আজ সমাপ্ত হইয়াছে। ভারত ও পাকিস্থানে অপহৃতা নারীদের উদ্ধার সংক্রান্ত যে সকল কাজ বাকী রহিয়াছে, সেগুলির পরিমাণ নির্দ্ধারণ এবং উভয় দেশে উদ্ধার-কার্য্য দ্রুত সমাপ্ত করার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত, সে সম্বন্ধে দুই সরকারকে পরামর্শ দানের জন্য একটি যুক্ত তথ্যনির্দ্ধারণ কমিশন গঠন এই বৈঠকে গৃহীত প্রধান সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে অন্যতম।

বৈঠকের পর একটি যুক্ত বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, উদ্ধার-কার্য্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণের কাজ দুই জন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারী কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ছয় মাসের মধ্যে উদ্ধারকার্য্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণের কাজ শেষ করিতে হইবে। অপহৃতা নারীদের নামের তালিকার সত্যাসত্য যুক্তভাবে দ্রুত নির্দ্ধারণের জন্য অবিলম্বে একটি কার্য্যক্রম রচনা সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

অপরাধ মার্জ্জনার জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তে অপহরণকারীদের শাস্তিদান করা হইবে, এই মর্ম্মে একটি ধারা সংযোগ করিয়া উদ্ধার-কার্য্য সংক্রান্ত বর্ত্তমান আইন সংশোধন তথ্যনির্দ্ধারণ কমিশনের অন্যতম কাজ হইবে।

অপহৃতা নারীরা যে দেশ হইতে অপহৃত হইয়াছে, সেই দেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে তাহাদের মনের ইচ্ছা জানা যে দরকার, বৈঠকে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে এবং কিভাবে অপহৃতাদের মনোভাব নির্দ্ধারণ করা হইবে বৈঠকে তাহার একটা পদ্ধতি রচিত হইয়াছে।"

কলিকাতায় মৌলবী ফজলুল হক

পূর্ব্ব পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক সম্প্রতি কয় দিন কলিকাতায় থাকিয়া গিয়াছেন। সেই সময় বহু ব্যক্তি ও বহু সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান তাঁহার সম্বর্দ্ধনা ও অভিনন্দন করেন। ফজলুল

হক সাহেব তাঁহার স্বাভাবিক হৃদ্যতার সহিত ঐ সকল অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সম্প্রীতি জ্ঞাপন করেন।

তাঁহার বক্তব্যের মধ্যে নানা অর্থ নানা লোকে সংগ্রহ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য প্রকৃত অর্থ হক সাহেবই দিতে পারেন এবং যথাসময়ে দিবেন। সংবাদপত্রে তাঁহার উক্তি যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কিছু আমরা নীচে দিলাম :

"দেশ বিভাগ সম্পর্কে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিতে যাইয়া পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জনাব হক জোর দিয়া বলেন যে, তিনি কোন দেশেরই রাজনৈতিক ব্যবচ্ছেদে বিশ্বাস করেন না। ভারত ও পাকিস্থানের অধিবাসীরা যদি দেশের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য মনে রাখিয়া দেশের অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন তাহা হইলে পৃথিবীর কোন শক্তি আমাদের বিভক্ত করিতে পারিবে না। হক সাহেব বলেন যে, ভারতকে যাহারা বর্ত্তমানের ন্যায় অর্থহীন ভাবে ভাগ করিয়াছে তাহাদের তিনি দেশের শত্রু বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মতে পাকিস্থানের কোন অর্থ হয় না। উহার একমাত্র অর্থ হইতে পারে, মুসলমানদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করা যে তাহারা মেঘলোক হইতে আসিয়াছে এবং দেশের জন্য তাহাদের কিছুই করিবার নাই। তিনি এই মনোভাবে বিশ্বাসী নহেন।

"তিনি বলেন যে, অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করিবার ১১ বৎসর পরে তিনি পুনরায় পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে পাকিস্থানের ঘটনাস্রোত অথবা ভারতের প্রতি পাকিস্থানের নীতি পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। বর্ত্তমানে তিনি সবেমাত্র কাজ আরম্ভ করিয়াছেন এবং ভারত ও পাকিস্থানের যুক্ত ইতিহাস সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পর্কে তিনি সচেতন আছেন। ভারত ও পাকিস্থানের মিলিত ভূখণ্ডে ভবিষ্যতে সকল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনি যে অংশ গ্রহণ করিবেন তাহাতে শরৎ চন্দ্র বসু ও নেতাজীর শিক্ষা তাঁহাকে পরিচালিত করিবে। বিশ্বসভায় ভারত ও পাকিস্থানকে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার কার্য্যে তিনি ভারতের নেতৃবৃন্দের সহিত সহযোগিতা করিবেন।

"তিনি আরও বলেন যে, পূর্ববঙ্গের মুসলমান সাম্প্রদায়িক নহে। তাহারা দরিদ্র ও অজ্ঞ ; কিন্তু তাহাদের দৃঢ়তা আজ মুস্লিম লীগকে পরাজিত করিয়াছে। তাহাদের ঠিক পথে পরিচালিত করিবার জন্য একজন উপযুক্ত নেতা দরকার এবং উপযুক্ত নেতা পাইলে তাহারা বহু বিরাট কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবে।"

"পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক রবিবার কলিকাতায় এক সম্বর্দ্ধনার উত্তরে বলেন, তাঁহার জীবনের শেষ বয়সে আর কোন আশা নাই, শুধু দুই বাংলার মধ্যে যে বাধা-নিষেধ তাহা যে বাস্তব নহে—স্বপ্ন ও ধোঁকা মাত্র—সেই ভাব যেন তিনি সৃষ্টি করিয়া যাইতে পারেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি সকলের আশীর্ব্বাদ কামনা করিতেছেন।

"সোমবার রাত্রে নেতাজী ভবনে শরৎ চন্দ্র বসু একাডেমী কর্ত্তৃক প্রদত্ত এক সম্বর্দ্ধনার উত্তরদানপ্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী মিঃ এ. কে. ফজলুল হক বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে চলিয়াছে, ভারতকে যদি উহাতে অংশ গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে তিনি ভারতের এই অংশের নেতৃবৃন্দের সহিত একযোগে দণ্ডায়মান হইয়া ভারতকে বিশ্বের দরবারে যোগ্য আসনে অধিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করিবেন।

"মিঃ হক বলেন যে, তিনি একটি দেশের 'রাজনৈতিক বিভাগ' বিশ্বাস করেন না। তাঁহার মতে ভারতের অস্তিত্ব সমগ্রভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি দেশ বিভাগকে কৃত্রিম বিভাগ বলিয়া মন্তব্য করেন।"

ঢাকা, ৯ই মে—পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :

'আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ও রাজনৈতিক দিক হইতে আমার বিরুদ্ধ পক্ষের লোকেরা তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য পূর্বাপর সম্পর্কসূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমার বক্তৃতার এক একটি বাক্য পড়িয়াছেন এবং পাকিস্থানে আমার বিশ্বাস নাই, এই বলিয়া নিন্দা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

"আমি প্রকৃতপক্ষে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা এই যে, রাজনৈতিক ভাবে কোন দেশকে বিভক্ত করিলেই তাহাতে উভয় অংশের পারস্পরিক সংযোগ, মৈত্রী এবং পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতার ভিত্তি দূর হইয়া যায় না। পাকিস্থান ও হিন্দুস্থানের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকিবে না, কোন ব্যবসা-বাণিজ্য থাকিবে না, এইরূপ অবস্থার কথা আমার পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব। আমি যখন পারস্পরিক যোগাযোগের উপকারিতার কথা বলিয়াছিলাম, তখন পাকিস্থান-হিন্দুস্থানের মধ্যে এই ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক ও পারস্পরিক নির্ভরতার কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলাম। আজ হিন্দুস্থান এবং পাকিস্থান দুইটি পৃথক ও সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে, ইহা বাস্তব সত্য। এই দুই দেশের অধিবাসীরাই বুঝিতে পারিয়াছে যে, তাহাদের পারস্পরিক মঙ্গলের জন্যই উভয় দেশের মধ্যে সহযোগিতা প্রয়োজন। পৃথিবীর কোন শক্তিই তাহাদের এই মৈত্রী ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা নষ্ট করিয়া দিতে পারে না।

"আমি ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি দেখি নাই। আমার কলিকাতায় প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর কোন কোন অংশ সংবাদপত্রগুলি ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি।

"আমি ইহাই বলিতে চাহিয়াছি যে, পারস্পরিক বুঝাপড়ার ভিত্তিতেই উভয় দেশের কল্যাণ সম্ভব হইবে। আমি বারংবার একথা বলিয়াছি যে, ভারত এবং পাকিস্থান এখন রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক দিক হইতে বাস্তব সত্য। পাকিস্থানের সার্ব্বভৌমত্ব ও ঐক্য যে কোন প্রকৃত পাকিস্থানীর মত আমিও রক্ষা করিব। আমার এই সব প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও যাহারা আমার কথার বিকৃত অর্থ করিয়াছে, পাকিস্থানের নাগরিকগণ সেই সব ব্যক্তির উদ্দেশ্য-

প্রণোদিত প্রচারকার্য্যে বিশ্বাস করিবেন না, ইহাই শুধু আমি বলিতে পারি।"

মৌলানা ভাসানীর মন্তব্য

সোমবারের (১০ই মে) 'ষ্টেটসম্যানে' ষ্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত একটি সংবাদ আছে যাহা কলিকাতার অন্য দৈনিকে ঐ দিন ছিল না। উহার বিষয়বস্তু মৌলানা ভাসানীর এক বিবৃতি। ঐ বিবৃতি ৭ই মে রাত্রে ঢাকায় প্রদত্ত হয়। বিবৃতিটি কলিকাতায় মৌলভী ফজলুল হকের বক্তৃতা ও মন্তব্য সম্পর্কে দেওয়া হয় এবং উহার ভাবার্থ এইরূপ :

"যাহা কথিত হইয়াছে তাহার কৈফিয়ত বা সাফাই হিসাবে যাহাই বলা হউক, তাহাতে যে ক্ষতি ও অনর্থের সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে তাহার বিষের উপশম হইবে না। আমরা পাকিস্থানের জন্য বহু শ্রম ও অশেষ কোরবানী করিয়াছি এবং কোনও সাচ্চা পাকিস্থানী ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক বিভাজনের বিষয়ে হাল্‌কাভাবে কথা বলিতে পারে না। ইতিহাসের নজীরে ভারত কখনও অখণ্ড রাষ্ট্র ছিল না। উহার তথাকথিত ঐক্য সাম্রাজ্যবাদী মুঘল ও ব্রিটিশরাজের সৃষ্টি এবং উহার উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদের রীতি অনুযায়ী এই ক্ষুদ্র মহাদেশের বিভিন্ন ছোট ছোট জাতির ও বর্ণের শোষণ ও শাসন।"

মৌলানা আরও বলেন, "পাকিস্থানের ভিত্তি হইল উৎপীড়িত জাতির স্বাতন্ত্র্যের ও স্বমতপ্রকাশের জন্মগত অধিকার, যাহা গণতন্ত্রের উচ্চতম নীতি। পাকিস্থান চিরস্থায়ীরূপে আসিয়াছে। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর নশ্বরতা লইয়া দার্শনিক চর্চ্চা এ সম্পর্কে অবান্তর, কেননা এখন রাজনৈতিক দলগোষ্ঠি লইয়াই চর্চ্চা চলিতেছে, অলস মস্তিষ্কের ভাব ও ইচ্ছা লইয়া নহে।"

তিনি সবশেষে বলেন, "ইউনাইটেড ফ্রণ্ট পার্লিয়ামেণ্টারী পার্টি সত্বরই ইহার আলোচনা করিবে এবং ঐ বৈঠকেই বর্ত্তমান সরকারের নীতি ও কার্য্যক্রমের শেষ সিদ্ধান্ত রচিত ও গৃহীত হইবে।"

আমাদের দেশে যে ভাববিলাসীদিগের দল মৌলবী ফজলুল হকের উক্তির স্বকপোলকল্পিত নানারূপ অর্থ করিতেছেন, তাঁহারা এই বিবৃতির মর্ম্ম বুঝিবেন আশা করি।

পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা

৭ই মে পাক-গণপরিষদের এক সিদ্ধান্তে উর্দু ও বাংলাকে পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষারূপে ঘোষণা করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে, বাংলা ও উর্দু রাষ্ট্রের সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হইবে এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলির পরামর্শমত রাষ্ট্রের কর্ণধার অপরাপর ভাষাকেও এই মর্য্যাদা দিতে পারিবেন। পার্লামেণ্টের সভ্যরা বাংলা, উর্দু অথবা ইংরেজীতে বক্তৃতা করিতে পারিবেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও সংবিধান চালু হইবার পর ২০ বৎসর পর্য্যন্ত ইংরেজীতেই সরকারী কার্য্য পরিচালিত হইবে। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগুলিকে সমপর্য্যায়ভুক্ত করা হইবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে বাংলা, উর্দু এবং আরবী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে ছাত্রগণ যে ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে তাহা ব্যতীত উপরোক্ত ভাষা তিনটির যে-কোন একটি অথবা দুইটি ভাষায় শিক্ষিত হইতে পারে। রাষ্ট্র সাধারণ জাতীয় ভাষার উন্নতিকল্পে সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। সংবিধান চালু হইবার দশ বৎসর পর ইংরেজীর পরিবর্ত্তনের জন্য কি কি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে সে সম্পর্কে সুপারিশ করিবার নিমিত্ত একটি কমিশন নিয়োগ করিতে হইবে। উপরোক্ত সর্ত্তাবলী সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় বিধানসভা আইন করিয়া বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য ২০ বৎসর পরেও ইংরেজীর ব্যবহার চালু রাখিতে পারিবেন।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকার করিয়া লওয়ায় লীগের প্রভাবশালী অবাঙালী সভ্যগণ নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। গণ-পরিষদের মুসলিম লীগদলের সভায় যখন প্রথম এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহার অব্যবহিত পরেই করাচীতে বাংলা-বিরোধী হাঙ্গামা ঘটে। গণপরিষদের আলোচনার সময়েও অর্থমন্ত্রী মহম্মদ আলী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুরমানী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাফরুল্লা এবং পঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খাঁ নুন গণপরিষদ ভবনে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও পরিষদের আলোচনায় যোগদান করেন নাই।

করাচীতে বাংলাভাষা-বিরোধী বিক্ষোভ

১৯শে এপ্রিল পাক-গণপরিষদের মুস্লিম লীগ দলের এক সভায় বাংলা ও উর্দ্দু এই উভয় ভাষাকেই পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মানিয়া লওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ২২শে এপ্রিল করাচীতে এক বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। পাকিস্থান পার্লামেণ্ট ভবনের সম্মুখে প্রায় পাঁচ হাজার জনতার এক মিছিল কেবলমাত্র উর্দ্দুকেই পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণের দাবি জানায়। প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলী তাহাদের সম্মুখে কিছু বলিতে আসিলে তাহারা তাঁহাকে কোন কিছু বলিতে না দিয়া চলিয়া যাইতে বলে।

প্রেস ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়ার সংবাদে প্রকাশ যে, ঐদিন শহরে বেশ উত্তেজনা ছিল। বাংলাভাষা-বিরোধী দলের লোকেরা পাড়ায় পাড়ায় গিয়া দোকানপাট বন্ধ করিয়া দেয়। অনেক দোকান সকালে বন্ধ করা হয় নাই, কিন্তু মিছিলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে সেই সকল দোকানপাট তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র আসিয়া তারপর মিছিলে যোগ দেয়। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলিতেছিল, যে সকল ছাত্র পরীক্ষার হল হইতে বাহির হইয়া আসে তাহারা সাংবাদিকদের বলে যে, ঐদিন প্রশ্নপত্র বিতরণ করা হয় নাই এবং পরীক্ষার হলের গার্ডরা নাকি বলে যে ছাত্ররা শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষার হল হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে। যে সকল ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র বিতরণ করা হইয়াছিল ছাত্ররা তাহা ছিঁড়িয়া ফেলে এবং পরীক্ষার হল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া পড়ে।

ঐদিন বিকালে গণপরিষদে ভাষাসমস্যার আলোচনা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কোন কাজ না করিয়াই গণপরিষদের অধিবেশন

মুলতুবী রাখা হয়। বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীরা পার্লামেণ্ট ভবনে প্রবেশ করিলে পুলিস তাহাদিগকে বাধা দেয় না। বিক্ষোভকারীদের নেতা মৌলভী ডাঃ আবদুল হককে প্রধান মন্ত্রীর সহিত আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয়।

করাচীর উর্দ্দু-পন্থী দৈনিক পত্রিকাগুলি কালো বর্ডার দিয়া কাগজ বাহির করে। কয়েকটি পত্রিকাতে বাংলাবিরোধী এবং উর্দ্দুর স্বপক্ষে সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয়। একটি পত্রিকায় বলা হয় যে, যদি বর্ত্তমান সরকার ভাষা সমস্যার সমাধানে অক্ষম হন তবে যেন তাঁহারা যোগ্যতর ব্যক্তিদের আসন ছাড়িয়া দেন।

আসাম সেন্সাস রিপোর্টের কারসাজী

দেশ স্বাধীন হইবার পর ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবী প্রবল হইয়া উঠে। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠিত হইলে যে সকল রাজ্যের আয়তন সঙ্কুচিত হইবার সম্ভাবনা আছে ১৯৫১ সালের লোক-গণনায় বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসংখ্যা নির্দ্ধারণে সেই সকল রাজ্য নানাবিধ কারসাজী করে। ২৮শে চৈত্রের "বাতায়ন" পত্রিকা এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আসাম রাজ্যের ১৯৫১ সালের লোক-গণনার নানাবিধ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটিবিচ্যুতির আলোচনা করিয়া দেখান হইয়াছে কিরূপে আসামে অসমীয়া ভাষাভাষীদের সংখ্যা অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত করা হইয়াছে এবং তদনুপাতে বাংলাভাষা-ভাষীর সংখ্যা লঘু করা হইয়াছে।

"বাতায়ন" লিখিতেছেন: "১৯৩১ সনে আসামে অসমীয়া ভাষাভাষীর সংখ্যা ছিল ১৯,৭৩,০০০। ১৯৪১ সনের সেন্সাসে ভাষা সম্পর্কে কোন তথ্য প্রকাশিত হয় নাই। ১৯৩১ সনের ১৯,৭৩,০০০ অসমীয়া ভাষাভাষী ১৯৫১ সনে দাঁড়াইয়াছে ৪৯,৭২,৪৯৩ !!! সংখ্যাতত্ত্বের এ ভোজবাজীর জোড়া ইতিহাসে আর পাওয়া যায় না।

"অসমীয়া ভাষাভাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে হইতে হইবে স্বাভাবিক কারণে—মৃত্যু হইতে জন্মের আধিক্য হেতু, কারণ অন্য কোন প্রদেশে এমন কোন অসমীয়া ভাষাভাষী লোক নাই, যাহারা আসামে নূতন বসবাস স্থাপন করিয়া অসমীয়া ভাষাভাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে। ১৯২১ সন হইতে ১৯৩১ সন পর্য্যন্ত দশকে আসামের লোকসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৬·৫ জন, এবং ১৯৪১ হইতে ১৯৫১ সনে যে দশক তাহাতে বৃদ্ধির হার শতকরা ১৩, কিন্তু নূতন সেন্সাস মতে গত ২০ বৎসরে অসমীয়া ভাষাভাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে মোটামুটি শতকরা ২৫০ জন !!!

"১৯৩১ সনের সেন্সাসে করিমগঞ্জের ও শ্রীহট্টের লোকসংখ্যা বাদ দিয়া আসামে বঙ্গভাষাভাষীর সংখ্যা ছিল মোটামুটি ১৮,০০,০০০। উহা বর্ত্তমান ১৯৫১ সনের সেন্সাসে দাঁড়াইয়াছে ১৭,১৯,১৫৫-এ !!! যদি অসমীয়া ভাষাভাষীর সংখ্যা শতকরা ২৫০ জন বাড়িতে পারে তাহা হইলে বঙ্গভাষাভাষীদিগের লোকসংখ্যা কেন শতকরা ২৫০ জন বাড়িবে না, তাহার কি কারণ থাকিতে পারে ?

"১৯৩১ সনের সেন্সাস রিপোর্টে বঙ্গভাষাভাষীর সংখ্যা ছিল ১৮,০০,০০০, তার পর ১৯৫১ সনের সেন্সাস রিপোর্ট মতে আসামে বাস্তুহারা আসিয়াছে ২,৭৬,৮২৪, তথাপি আসামে বঙ্গভাষাভাষীর সংখ্যা কমিয়া দাঁড়াইল ১৭,১৯,১৫৫-এ !!!"

আসামে বাংলাভাষাভাষীদের সংখ্যা ন্যূন করিয়া দেখাইবার প্রচেষ্টায় যে কিরূপ কারসাজী করা হইয়াছে শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত আসামের গোয়ালপাড়া জেলার পরিসংখ্যান দ্বারা তাহা সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। ১৯১১ সাল হইতে ১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট হইতে আসাম রাজ্যের গোয়ালপাড়া জেলায় বাংলা ও অসমীয়া ভাষাভাষীদের সংখ্যা যথাক্রমে সাজাইলে যে চিত্র ফুটিয়া উঠে তাহা এইরূপ :

বৎসর	মোট লোকসংখ্যা	বঙ্গভাষাভাষী	মোট জনসংখ্যার কত অংশ শতকরা	অসমীয়া ভাষাভাষী	মোট জনসংখ্যার কত অংশ শতকরা
১৯১১	৬,০১,০০০	৩,১৭,০০০	৫২·৭	১,১৫,০০০	১৯·১
১৯২১	৭,৬৩,০০০	৪,০৬,০০০	৫৩·২	১,৩৯,০০০	১৮·২
১৯৩১	৮,৮৩,০০০	৪,৭৬'০০০	৫৪·০	১,৬১,০০০	১৮·৩
১৯৪১	—	ভাষাভিত্তিক আদমশুমারী হয় নাই			—
১৯৫১	১১,০৮,০০০	১,৯৩,০০০	১৭·৪	৬,৮৭,০০০	৬২·০

উপরোক্ত তথ্য উদ্ধৃত করিয়া শ্রীযুত দত্ত লিখিতেছেন : "জেলার লোকসংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে সত্য, কিন্তু সংখ্যায় ও আনুপাতিক হারে বঙ্গভাষাভাষীর সংখ্যা যে শুধু কমিয়াছে তাহা নহে, অস্বাভাবিকরূপেই কমিয়াছে। বঙ্গভাষাভাষী ও অসমীয়া ভাষা-ভাষীর সংখ্যা বেশ একটা আনুপাতিক হার বজায় রাখিয়া চলিয়াছিল। অসমীয়াভাষীর সংখ্যা হঠাৎ শতকরা ৩২·৭ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে। ইহা স্বাভাবিক বৃদ্ধি হইতে পারে না।"

আসাম রাজ্যের অন্যান্য জেলা হইতে অসমীয়া ভাষাভাষী লোক এই জেলায় আসিয়া বসবাস করার ফলে যে এরূপ হইয়াছে, তাহাও নহে। কারণ ১৯৫১ সালের সেন্সাস হইতেই দেখা যায় যে, আসাম রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ অন্যান্য জেলা হইতে এই জেলায় বস-বাসকারীর মোট সংখ্যা হইল মাত্র ২৮,৯৯৭। ঐ সময়ে পাকিস্থান হইতে আসিয়াছে ?,৩৫,৬২৬ জন লোক এবং পশ্চিমবঙ্গ হইতে ৮,৯৩০ জন লোক—ইহারা সকলেই বঙ্গভাষাভাষী। যদি জেলার মোট বঙ্গভাষাভাষীর সংখ্যা ১,৯৩,০০০ হইতে এই সংখ্যা বাদ

দেওয়া যায় তবে জেলার আদি বঙ্গভাষাভাষীর সংখ্যা কমিয়া দাঁড়ায় ৪৮,০০০।

শ্রীযুত দত্ত অতঃপর লিখিতেছেন, "এই জেলার অসমীয়া ভাষাভাষী ও বঙ্গভাষাভাষীদের সংখ্যাগুলি যদি পরস্পর অদলবদল করি তবেই একটা যুক্তিযুক্ত কৈফিয়তে পৌঁছিতে পারি। ৬,৮৭,০০০ বঙ্গভাষাভাষী হইতে পাকিস্থান-আগতদের সংখ্যা বাদ দিলে বঙ্গভাষাভাষীরা হইবে শতকরা ৫০·০ এবং অসমীয়া ভাষাভাষীদের সংখ্যা হইবে শতকরা ১৭·৪।"

ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী সেন্সাস রিপোর্টগুলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

"কাজেই মনে হয় যেন ভাষাভিত্তিক সংখ্যাগুলিকে পরস্পর অদলবদল করা হইয়াছে। যদি কেহ এই কৈফিয়ত না মানেন তবু এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, ১৯৫১ সালের আসামের আদমশুমারীতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়া কারসাজী করা হইয়াছে।"

পূর্ব্বভারতের রাষ্ট্রভাষা বাংলা

ঐ তারিখের "বাতায়ন" পত্রিকার এক সংবাদে প্রকাশ, গত ১০ই এপ্রিল বর্দ্ধমানে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সম্মেলনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য আসামের শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়া বক্তৃতাকালে বাংলাকে পূর্ব্ব-ভারতের রাষ্ট্রভাষা স্বীকার করিয়া লইবার জন্য বলেন; যেহেতু ঐ অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই বাংলাভাষা বুঝিতে পারে।

ইহা লইয়া আসাম কংগ্রেস মহলে বিশেষ হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছে।

অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সমস্যা

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের খরচা নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সম্প্রতি কিছু আলোড়ন শোনা গিয়াছিল। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাবিত পদত্যাগে সমস্যাটির সমাধান বোধ হয় মুলতুবী রাখা হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দ্দেশ অনুসারে শ্রী এ. কে. চন্দ একটি রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন—কিভাবে বিভিন্ন বিভাগের খরচ নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী চন্দ-রিপোর্টের সুপারিশ সম্বন্ধে যথেষ্ট আপত্তি করিয়াছেন। বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুসারে অর্থমন্ত্রীর বিভাগ অন্যান্য বিভাগের খরচের উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করেন। প্রত্যেক মন্ত্রী-বিভাগের সঙ্গে একজন করিয়া ফিন্যান্স অফিসার রাখা হইয়াছে এবং ইঁহারা প্রত্যেক বিভাগের খরচের প্রস্তাব পরীক্ষা করেন ও অনুমোদন করেন। বলা বাহুল্য, এই সকল ফাইন্যান্স অফিসাররা অর্থমন্ত্রী-বিভাগ কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছেন। শ্রীযুত চন্দ তাঁহার রিপোর্টে এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করিয়াছেন এবং তিনি খরচ করার অধিকার বিনিয়ন্ত্রণের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। চন্দের মতে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয়করণ সুব্যবস্থার সহায়ক নহে, ইহাতে অযথা শাসনব্যবস্থা ব্যাহত হয়, পরিকল্পনা আশু কার্য্যকরী করা যায় না। অর্থাৎ, খরচের ক্ষমতা কেন্দ্রীয়করণে শাসনব্যবস্থা অযথা মন্দগতি লাভ করে। প্রত্যেক মন্ত্রী-বিভাগের যদি নিজস্ব খরচের উপর দায়িত্ব এবং অধিকার থাকে তাহা হইলেই সত্যিকার মিতব্যয়িতা আসিবে। আর দ্বিতীয়তঃ, অর্থমন্ত্রীর বিভাগ খরচ নিয়ন্ত্রণের অজুহাতে যদি অন্যান্য বিভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন তাহা হইলে কার্য্যতঃ অর্থমন্ত্রী-বিভাগ "সুপার ক্যাবিনেট" বা ঊর্দ্ধতন মন্ত্রীপরিষদ পর্য্যায়ে উন্নীত হইবে এবং ইহা অবাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমানে অন্যান্য বিভাগের অর্থমন্ত্রী-দপ্তরের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, যখনই কোন নূতন পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাব করা হয় অর্থমন্ত্রী-দপ্তর তখনই তাহাতে আপত্তি করে। কোন নূতন পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিতে হইলে অন্যান্য মন্ত্রী-দপ্তরকে অর্থমন্ত্রী-দপ্তরের সহিত রীতিমত দরকষাকষি করিতে হয়। বর্ত্তমানে অধিকাংশ বিভাগেই অফিসারদের সংখ্যা কম, তাহাতে কার্য্যে ব্যাঘাত হয়, কিন্তু অফিসার নিয়োগ ব্যাপারে অর্থমন্ত্রী-বিভাগ সব সময়েই আপত্তি করে।

অর্থমন্ত্রী-বিভাগের বক্তব্য অগ্রাহ্য করা যায় না। ইঁহাদের মতে খরচ করার অধিকার কেন্দ্রীয়করণে অনেক সুবিধা আছে। প্রধান সুবিধা হইতেছে—অমিতব্যয়িতা বন্ধ করা যায়। অমিতব্যয়িতার দুই একটি উদাহরণ, যথা—কোশী নদী পরিকল্পনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য কেন্দ্রীয় সেচ-বিভাগ প্রায় দুই কোটি টাকা খরচ করিয়াছে। কিন্তু যখন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইল, তখন উক্ত অনুসন্ধান কোন কার্য্যে লাগে নাই। অর্থাৎ, দুই কোটি টাকা প্রায় জলে ফেলা হইয়াছে। হীরাকুণ্ড, দামোদর এবং বখরা-নঙ্গল পরিকল্পনা-ব্যাপারে অমিতব্যয়িতার উদাহরণ প্রচুর। চন্দ-রিপোর্টের বিরোধিতার কারণ সম্বন্ধে শ্রীদেশমুখ বলিয়াছেন যে, ভারতীয় সংবিধান আইন অনুসারে জাতীয় রাজস্ব ও খরচের জন্য অর্থমন্ত্রী-দপ্তরই ভারতীয় আইন পরিষদের নিকট দায়ী। সুতরাং জাতীয় খরচের বিকেন্দ্রীকরণ সংবিধান-বিরুদ্ধ হইবে। অধিকন্তু, নূতন বাজেটে যে ২৫০ কোটি টাকার ঘাটতি খরচ ধরা হইয়াছে, তাহা উৎপাদনশীল হওয়া উচিত এবং তাহার জন্য অর্থমন্ত্রী-দপ্তরের যথেষ্ট দায়িত্ব আছে।

শ্রীযুত চন্দের সুপারিশ অনুসারে জাতীয় খরচ বিকেন্দ্রীকরণের যেমন অল্পমাত্রায় যৌক্তিকতা আছে, তেমনি বিপদও আছে। আবার, শ্রীদেশমুখের অভিমত অনুসারে খরচ কেন্দ্রীকরণে মিতব্যয়িতা সম্ভবপর, কিন্তু তাহাতে পরিকল্পনার উন্নতি কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোয় অমিতব্যয়িতা অবাঞ্ছনীয়, কিন্তু মিতব্যয়িতাই একমাত্র আদর্শ এবং কাম্য নয়; মিতব্যয়িতার সহিত উন্নতি—ইহাই কাম্য। এই দুইটি বিরুদ্ধ সমস্যার সমাধান অবশ্য দুরূহ। যুদ্ধ-পূর্ব্ব যুগে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট হইত একশ' কোটি টাকার মত এবং উন্নয়ন খরচ হইত ১০ হইত ২০ কোটি টাকার মত। বর্ত্তমানে পরিকল্পনা খাতে বৎসরে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার মত খরচ হয়—সেই তুলনায় অফিসারদের সংখ্যা অল্প। এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন—শুধু অর্থনৈতিক কেন্দ্রীকরণের দ্বারা সমস্যা সমাধান হইবে না।

আয়কর ফাঁকি

জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মুখপত্র "ইণ্ডিয়ান ওয়ার্কার" পত্রিকার ২৪শে এপ্রিলের এক সংবাদে প্রকাশ যে, ১৯৪৭ সালে আয়কর তদন্ত কমিশনের নিয়োগের সময় হইতে এতদিন পর্য্যন্ত ১৬৬৮টি বিষয় কমিশনের নিকট উপস্থাপিত হয়; তন্মধ্যে কমিশন ১০৩১টি বিষয়ের নিষ্পত্তি করিয়াছেন এবং ৬৩৭টি কেস এখনও বিবেচনাধীন রহিয়াছে। তদন্ত কমিশন যে ১০৩১টি কেসের নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহা বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত তথ্য জানা যায়:

বৎসর (জানুয়ারী — ডিসেম্বর)	নিষ্পত্তিকৃত কেসের সংখ্যা	লুক্কায়িত আয়ের পরিমাণ রিপোর্ট অনুযায়ী (Report basis) টাকা	রফার ভিত্তিতে (Settlement basis) টাকা	মোট যে পরিমাণ লুক্কায়িত আয়ের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে টাকা
১৯৪৮	৪	৩,৭৭,৩৭৭	———	৩,৭৭,৩৭৭
১৯৪৯	১০১	১,৩১,৭৩,১১৯	১,৫৬,৩৩,৩৩৮	২,৮৮,০৬,৫০৭
১৯৫০	২৩২	২,০৮,৫০,১৮৮	৬,০২,৯২,৭৯৭	৮,১১,৪২,৯৮৫
১৯৫১	৩২০	৩০,৭৭,০২২	১৭,৮১,৪৯,৯৫৩	১৮,১২,২৬,৯৭৫
১৯৫২	২০৬	১,৬৮,৯৪,৫৩৪	৯,১৯,৬৮,২২৪	১০,৮৮,৬২,৭৫৮
১৯৫৩	১৬৮	২০,৩৯,০৩১	৫,৭২,৪৮,৮৬৭	৫,৯২,৮৭,৮৯৮
	১০৩১	৫,৬৪,১১,২৭১	৪০,৩২,৯৩,২২৯	৪৫,৯৭,০৪,৫০০

কমিশনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, আয়কর ফাঁকি দিবার পদ্ধতিগুলিকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—হয় আয় দেখান হয় না বা আয়ের পরিমাণ কম করিয়া দেখান হয়, নতুবা খরচের পরিমাণ স্ফীত করিয়া দেখান হয় অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে এই দুই উপায়েই আয়কর ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা হয়। যে সকল ক্ষেত্রে তদন্ত কমিশনের নিকট হিসাবের খাতাপত্র দাখিল করা হয় সে সকল ক্ষেত্রে কমিশন কোন কোন বিষয়ে আয় কমাইয়া দেখান হইয়াছে বা একেবারেই দেখান হয় নাই তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিসাবের খাতা কমিশনের নিকট উপস্থিত করা হয় নাই।

যাহাতে ভবিষ্যতে লুক্কায়িত আয়ের সন্ধান পাইলে কর চাপাইতে অসুবিধা না হয় তজ্জন্য রফার ভিত্তিতে যে সকল কেসের নিষ্পত্তি করা হইয়াছে সেই সকল ক্ষেত্রে কমিশন এই মর্ম্মে একটি সর্ত্ত আরোপ করিয়াছেন যে, যে তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া রফা করা হইয়াছে তাহার বাহিরে যদি কোন আয়ের সন্ধান কমিশনের গোচরে আসে তবে সে সম্পর্কে তাঁহারা আইন অনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন।

আয়কর তদন্ত কমিশনের বার্ষিক রিপোর্ট সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে নাগপুরের "হিতবাদ" পত্রিকা লিখিতেছেন, অচিরে ভারতীয় বৃহৎ পুঁজিপতিগণ আয়কর ফাঁকি দিতে বিরত হইবার সম্ভাবনা যখন স্পষ্টতঃই অল্প তখন আয়কর তদন্ত কমিশনকে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গঠিত করিলে কাজের বিশেষ সুবিধা হইবে এবং বর্ত্তমানে কমিশনের অস্থায়ী গঠনের সুযোগ লইয়া ব্যবসায়িগণ যে চতুরতা করিবার সুবিধা পাইতেছেন তাহা দূর হইবে।

চাউল

ভারতবর্ষ ব্রহ্মদেশ হইতে নয় লক্ষ টন চাউল আমদানী করিতেছে সেই সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। আমরা বলিয়াছিলাম যে, ভারতবর্ষে এই বৎসর চাউলের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, সুতরাং অত্যধিক মূল্য দিয়া ব্রহ্ম হইতে এত চাউল আমদানী করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। আসামে এই বৎসর অনুমান আড়াই লক্ষ টন চাউল অতিরিক্ত হইয়াছে এবং উড়িষ্যায় প্রায় দেড় লক্ষ টন চাউল বাড়তি হইয়াছে অর্থাৎ শুধু এই দুই প্রদেশেই অনুমান চারি লক্ষ টন চাউল বাড়তি আছে। আসাম উনিশ টাকা মণ চাউল বিক্রয় করার প্রস্তাব করিয়াছিল। কিন্তু সুদূর ব্রহ্মদেশ হইতে প্রায় ত্রিশ টাকা মণ চাউল কেন্দ্রীয় সরকার ক্রয় করিতেছেন।

দামোদরের বিপত্তি

দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছিল সম্প্রতি তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটির কার্য্যতালিকার মধ্যে ছিল:

(১) দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন কর্ত্তৃক পতিত জমি উদ্ধার এবং তাহার পুনর্বসতির বিবরণ;

(২) কোনার ও তিলায়া বাঁধের পরিকল্পনার পরিবর্ত্তন এবং তৎসংক্রান্ত কন্ট্রাক্ট ও পারিশ্রমিক নির্দ্ধারণের ব্যাপার;

(৩) দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের মালপত্র ক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত ও প্রথা;

(৪) ১৯৪৮ সালের দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন আইনের উপযুক্ততা, এবং

(৫) কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ ব্যাপার।

অনুসন্ধান কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের অকর্ম্মণ্যতা ও সরকারী অর্থ অপচয়ের জন্য কঠিন মন্তব্য করিয়াছেন। দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের অতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত শাসনের জন্যও

কমিটি আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। কমিটি রিপোর্টে এমন সব তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন এবং এমন নিন্দাসূচক মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই জাতীয় সমবায়ী কর্পোরেশনের উপর জনসাধারণের আস্থা রাখা দুরূহ ব্যাপার।

কমিটি বলিয়াছেন যে, দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে পরিকল্পনার অভাব প্রথম হইতেই ছিল এবং টাকা-কড়ি খরচের ব্যাপারে কোন নিয়মই পালন করা হয় নাই। যথেচ্ছ খরচ করার ব্যাপার এত অধিক যে, দু'একটি উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। অকর্ম্মণ্য ব্যবস্থার জন্য একমাত্র কোনার পরিকল্পনাতেই এক কোটি চৌবট্টি লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। প্রায় আড়াই বৎসর ধরিয়া কোন চীফ ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করা হয় নাই এবং তার জন্য কমিটি কর্পোরেশনের উপর দোষারোপ করিয়াছেন। চীফ ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ না করার জন্য ঘন ঘন পরিকল্পনার পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে এবং তাহাতে অযথা খরচ বৃদ্ধি পাইয়াছে ও সরকারী অর্থের অপচয় হইয়াছে। উপযুক্ত টেক্‌নিক্যাল উপদেশের অভাবে পরিকল্পনার বৃহত্তর সমস্যাগুলির উপলব্ধি সম্ভবপর হয় না। সুতরাং প্রথমে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম যোগাড়ের দিকে যথাযথ নজর দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। কার্য্যসূচীর ঘন ঘন পরিবর্ত্তনের জন্য সামগ্রিক পরিকল্পনা ব্যাহত হইয়াছে। কমিটি বলিয়াছেন যে, কর্পোরেশন যদিও বার্মো কয়লার খনি ১৯৫০ সনের অক্টোবর মাসে পত্তনি লইয়াছে, অদ্যাপি তাহাতে কার্য আরম্ভ করা হয় নাই। ইহা পরিকল্পনার অভাবের পরিচায়ক।

কোনার পরিকল্পনার পরিবর্ত্তনের জন্য কমিটি তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। ১৯৪৬ সালের প্রথমে মিঃ ভরডুইন কোনার পরিকল্পনা করেন। পরে একটি ফরাসী ফার্ম্ম (Societes de Construction des Batignolles) এই পরিকল্পনাটির পরিবর্ত্তনের জন্য নিয়োজিত হয় এবং তাহার পরে একটি সুইস ফার্ম্ম কর্তৃক ফরাসী পরিকল্পনার কিছু রদবদল করা হয়। কমিটি বলিয়াছেন, এমন একটি ব্যয়বহুল পরিকল্পনা কেন সুইস ফার্ম্ম কর্তৃক মঞ্জুর হওয়ার পরই গৃহীত হইল।

চীফ ইঞ্জীনিয়ার নিয়োগ ব্যাপারে যদিও কর্পোরেশনের উপর দোষারোপ করা হইয়াছে, তথাপি তার সত্যিকার দায়িত্ব পড়িয়াছে চেয়ারম্যানের উপর। কমিটির মতে অর্দ্ধ-স্বাধীন কর্পোরেশন এই সকল কার্য্যের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। পরিকল্পনা স্থির হওয়ার পর কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং এই পরিকল্পনার পরিবর্ত্তন করার অধিকার কর্পোরেশনের থাকিবে না। আইন-পরিষদ পরিকল্পনাটি ঠিক করিয়া দিবে এবং দৈনন্দিন কার্য্যের ভার কর্পোরেশনের উপর থাকিবে। পরিকল্পনার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে গবর্মেণ্টের অনুমোদন প্রয়োজন।

রেল লাইন ও ত্রিপুরা রাজ্য

২৮শে চৈত্রের "সেবক" পত্রিকায় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ত্রিপুরা রাজ্যের সহিত রেল লাইনের সাহায্যে ভারতীয় ইউনিয়নের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার বিশেষ গুরুত্বের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

বৎসরাধিক কাল হইতে পাকিস্থানের মধ্য দিয়া ত্রিপুরা রাজ্যে কিছু কিছু মাল আমদানী করা হইতেছিল। কিন্তু পাকিস্থানের কাষ্টমস বিভাগ নিত্য নূতন আইন চালু করিয়া এইরূপ আমদানীর কাজ ক্রমশঃই দুঃসাধ্য করিয়া তুলিতেছিলেন। সম্প্রতি তাঁহারা একটি পাঁচ দফা আইন সৃষ্টি করিয়াছেন। ত্রিপুরা ব্যবসায়ী সমিতি তাঁহাদের সাম্প্রতিক অধিবেশনে এই সকল নিয়ম মানিয়া চলিতে তাঁহাদের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহারা পাকিস্থানের পথ পরিত্যাগ করিয়া বিমানযোগে মালপত্র আমদানীর পক্ষে মত দিয়াছেন।

"সেবক" লিখিতেছেন : "বিমানপথে মাল আমদানী হইলে ব্যবসায়ীদের ব্যক্তিগত ক্ষতির কোন কারণ নাই। বিমানযোগে মাল আমদানী হইলে অতিরিক্ত মালের ভাড়া জনসাধারণকেই বহন করিতে হইবে। ত্রিপুরার জীবনধারণের মান এমনিতেই অত্যধিক, তারপর বিমানে মাল আমদানী হইতে থাকিলে জনসাধারণ অতিরিক্ত দর দিয়া মালপত্র খরিদ করিতে যথেষ্ট বেগ পাইবে।

"পাকিস্থানের ভিতর দিয়া মাল আমদানী যাহাতে সহজসাধ্য হয় তজ্জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের কর্তৃপক্ষ কুমিল্লার জেলাশাসকের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতেছেন। তাহাতে সাময়িক সুরাহা হইলেও বিশেষ কোন স্থায়ী ফল হয় না। যত দিন পর্য্যন্ত মাল আমদানী ব্যাপারে পাকিস্থানের উপর নির্ভরশীলতা দূর না হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত সমস্যা থাকিয়াই যাইবে। কেবলমাত্র রেলপথে ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত যোগাযোগ সাধনের মাধ্যমেই এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হইতে পারে।"

"সেবক" আরও লেখেন : "ত্রিপুরায় রেলওয়ে লাইন কেবল প্রয়োজন বলিলেই চলে না; ত্রিপুরাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে রেল লাইন অপরিহার্য্য। ত্রিপুরা সরকার ভারত সরকারকে কথাটি সমঝাইতে কি অসমর্থ?"

সবই সত্য। কিন্তু রেল লাইন দূরের কথা, যখন রাস্তা নির্ম্মাণ চলিতেছিল তখনই মজুর ও তত্ত্বাবধানের লোকের অভাব দেখা দেয়। ত্রিপুরার লোকের অসুবিধা দূর তখনই হইবে যখন ওখানকার লোকে নিজেদের উন্নতির জন্য কায়িক পরিশ্রম—অবশ্য মজুরীর বিনিময়ে—করিতে রাজী হইবে। শ্রমিক আনিতে হইবে পাকিস্থান হইতে এবং তত্ত্বাবধায়ক পঞ্জাব হইতে, এই অবস্থায় দেশের উন্নতি কিরূপে সম্ভব?

বালুরঘাটে বিমান-ডাক বন্ধ হওয়ায় অসুবিধা

নবপ্রকাশিত "সাপ্তাহিক আত্রেয়ী" পত্রিকার ১৩ই বৈশাখ সংখ্যায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে বালুরঘাটে বিমানডাক চলাচল বন্ধ

করিয়া দেওয়ায় যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে তৎপ্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহা নিরসনের আবেদন জানান হইয়াছে।

দেশবিভাগের পর পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন হয়, এবং বহু চেষ্টার পর বিমান ডাকের প্রচলন হয়। কিন্তু ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস কর্পোরেশন গঠিত হইবার পর বিমানে বালুরঘাটের ডাক চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে জেলার বাহির হইতে চিঠিপত্র আসিতে চার দিন হইতে আট দিন সময় লাগে, বর্ষাকালে আরও বিলম্ব হয়।

"সাপ্তাহিক আত্রেয়ী" লিখিতেছেন: "এরূপ অবস্থায় বিমান-ডাক চলাচল বন্ধ করিয়া দিবার কোন উপযুক্ত কারণ নাই। খাম-পোষ্টকার্ডের মূল্য বর্দ্ধিত করিয়া সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, যেখানে বিমান-চলাচলের ব্যবস্থা আছে সেখানে বিমানযোগে ডাকবহনের ব্যবস্থা করা হইবে। বালুরঘাটে বিমান চলাচল ব্যবস্থা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞাত কারণে ডাকবহন বন্ধ করিয়া দিবার পিছনে কোনরূপ সৎ যুক্তি নাই। এই ব্যবস্থার দ্বারা এই অঞ্চলের অধিবাসীদের অন্যায়ভাবে অসুবিধার মধ্যে নিক্ষেপ করা হইয়াছে।"

বর্দ্ধমান শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের অব্যবস্থা

বর্দ্ধমান শহরে বিজলী সরবরাহের অপ্রতুলতা এবং অব্যবস্থা সম্পর্কে "দামোদর" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, যদিও সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গের মধ্যে বর্দ্ধমানেই বিজলীর ইউনিটের হার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তবু বর্দ্ধমানে বিজলী সরবরাহ ব্যবস্থা এমন নিম্নস্তরের যে তাহাতে জনসাধারণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার উপক্রম ঘটিয়াছে। "কোম্পানীটি অজস্র অর্থ লুটিতেছেন অথচ এমন এক তৃতীয় শ্রেণীর পরিত্যক্ত মেসিন বসাইয়াছেন যাহার প্রচণ্ড শব্দে বর্দ্ধমান হাসপাতালের রোগীরা উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। অন্যস্থলে হাসপাতালের নিকটবর্ত্তী স্থানে শব্দ না করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া থাকে, কিন্তু বর্দ্ধমানের শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ, স্বাস্থ্য-কর্ত্তৃপক্ষ এবং পৌর-কর্ত্তৃপক্ষ এত উদাসীন যে কেহ ইহার দিকে লক্ষ্য রাখিবারই অবসর পান না।"

পত্রিকাটি অবিলম্বে কোম্পানীর লাইসেন্স বাতিল করিয়া সরকারকে বিজলী সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানাইয়াছেন যাহাতে দামোদর ভ্যালীর বিদ্যুৎ আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা আসানসোলের ন্যায় চারি আনা হারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করেন।

সাপ্তাহিক "নূতন পত্রিকা"ও এই সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের চরম অব্যবস্থার সমালোচনা করিয়াছেন। পত্রিকাটি বিবৃতি অনুযায়ী বর্দ্ধমানের পৌর-কর্ত্তৃপক্ষ সরকারের বিদ্যুৎ বিভাগীয় উচ্চ কর্ম্মচারীর নিকট এ বিষয়ে অভিযোগ করিলে একজন ইনসপেক্টরকে বর্দ্ধমান পাঠান হয়, কিন্তু তিনি বিজলী কোম্পানী ব্যতীত কাহারও সহিত এমনকি আবেদনকারী পৌর-কর্ত্তৃপক্ষের সহিতও সাক্ষাৎ করেন নাই বা তাঁহাদিগকে কোন সংবাদ দেন নাই। বর্দ্ধমান শহরবাসীদের প্রতি এইরূপ তাচ্ছিল্যে পত্রিকাটি ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন।

সরকারকে প্রতিকারের জন্য হস্তক্ষেপ করিবার অনুরোধ করিয়া "নূতন পত্রিকা" লিখিতেছেন: "কিছুদিন পূর্ব্বে শহরবাসীর নিকট আবেদন করিয়া এই কোম্পানীই প্রায় লক্ষাধিক টাকার শেয়ার বিক্রয় করেন ও অবিলম্বে যোগ্য যথেষ্ট সরবরাহ ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তাঁহারা তাহার পরিবর্ত্তে নূতন কালেকশনের অর্থ গুটাইতেই বেশী আগ্রহ দেখাইয়াছেন। আমরা অবিলম্বে এরূপ অব্যবস্থার প্রতিকার ও বিজলী সরবরাহের যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধির দাবী করি।"

নারীর অধিকার ও মর্য্যাদা

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ইংরেজী সাপ্তাহিক "ক্ল্যারিয়ন" পত্রিকা তথা যে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে নারীর অধিকার ও মর্য্যাদা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিতেছেন যে, ভারতের প্রগতিশীল জনসাধারণ নারীর পূর্ণ অধিকার এবং মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠায় সবিশেষ উৎসুক। কিন্তু এই উদ্দেশ্য পূরণের পথে নানাবিধ বাধাবিপত্তি রহিয়াছে—যদিও তাহা দুর্লঙ্ঘ্য নহে। তবে নারীর মুক্তি যদি কাম্য হয় তবে এই সকল বাধাবিপত্তি দূর করিবার প্রচেষ্টা এখন হইতেই সুরু করিতে হইবে। তাহা না হইলে কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া মহৎ উদ্দেশ্যে কেবল কতকগুলি সুমিষ্ট প্রস্তাব পাশ করিলে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

নারীর মুক্তির পথে প্রধান অন্তরায় কতিপয় পুরুষের বিশেষ ধরণের মনোভাব। তাঁহাদের গোঁড়ামি লইয়া এরূপ পুরুষেরা মনে করেন, যে কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া যাওয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য। তাঁহারা ভ্রান্ত হইলেও সদুদ্দেশ্যেই এরূপ করেন। ইহাতে ঈর্ষা অথবা ক্ষতিকর কোন কিছু নাই।

কিন্তু অপরপক্ষে অল্পবয়স্কদের মধ্যে একটা বিপজ্জনক মনোভাব প্রায়ই দেখা যায় যেন রাস্তার উপর সঙ্গীহীন যে কোন রমণীকে তাহারা অপমান করিতে পারে। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী এই সকল যুবকের নিকট নারীর স্বাধীনতা অথবা রাস্তা দিয়া একক হাঁটিয়া যাইবার অধিকার প্রভৃতির কোন মূল্য নাই। তাহারা কখনও নারীকে মানুষ হিসাবে, একজন সৎ নাগরিক হিসাবে দেখিতে পারে না। নারীকে তাহারা কেবল তাহাদের জঘন্য কামনার বস্তু ব্যতীত অপর কোনরূপে চিন্তা করিতে পারে না। ফলে অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে এমন কতকগুলি স্থান দেখা দিয়াছে যেখান দিয়া কোন সুরুচিসম্পন্না নারীর পক্ষে রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া যাওয়া অসম্ভব। পত্রিকাটি মন্তব্য করিতেছেন যে, এরূপ অবস্থায় স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা ব্যঙ্গের মত শোনায়। অন্ততঃ কতকগুলি বিশেষ স্থানে সুরুচি-সম্পন্না নারীদের কোন স্বাধীনতাই যে নাই তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

"ক্ল্যারিয়ন" লিখিতেছেন যে, অনতিকালপূর্ব্বে একটি প্রতিষ্ঠান এই দুর্নীতির ব্যাপকতা পরিমাপ করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের সংগৃহীত তথ্য হইতে যে চিত্র প্রকাশ পায় তাহা সত্যই ধিক্কার-

জনক। প্রশস্ত রাজপথে প্রকাশ্যভাবে ট্রামের উপর একটি নারীকে চুম্বন করার ঘটনার পরই এই তদন্ত আরম্ভ হয়। সেই ঘটনার সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার হইতেছে এই যে, উহার পর উক্ত বালিকার পক্ষ হইয়া বলিবার মত সাহস ট্রামের লোকের মধ্যেও দেখা যায় নাই।

প্রতিষ্ঠানটির তদন্তের রিপোর্ট হইতে দেখা যায়, সকল সম্প্রদায়ের এবং সকল বয়সের লোকের মধ্যেই এই কুৎসিত আচরণ প্রকাশ পায়। তবে পীড়নের উপায় নানাবিধ। এক ধরণের উচ্ছৃঙ্খল যুবক স্কুল যাতায়াতের পথে বালিকাদিগকে বিরক্ত করে। পোড়া সিগারেটের অংশবিশেষ মেয়েদের মুখে ছুঁড়িয়া দেওয়া হইতে সুরু করিয়া বিভিন্ন অশোভন ব্যবহার দ্বারা তাহারা এরূপ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে মহিলাদিগকে স্বহস্তেই এ সকল উৎপীড়নের প্রতিকার করিতে হয়। এ সম্পর্কে পত্রিকাটি কতিপয় বাঙ্গালী টেলিফোন অপারেটর কর্ত্তৃক জনৈক অসভ্য গুণ্ডার শায়েস্তার উল্লেখ করেন।

উপসংহারে পত্রিকাটি লিখিতেছেন, কেবল আইন পাস করিয়া সমান বলিয়া ঘোষণা করিলে নারীর অবস্থার বিন্দুমাত্রও উন্নতি হইবে না। যখন তাঁহাদের প্রাপ্য মর্য্যাদা তাঁহাদিগকে দেওয়া হইবে মাত্র তখনই তাঁহাদের প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ হইবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজীর বাধা ও জাতীয় শক্তির অপচয়

"যুগবাণী" লিখিতেছেন: "উচ্চশিক্ষার পথে ইংরেজী কি ভীষণ বাধা এবং জাতীয় শক্তির অপচয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, নূতন বিশ্ববিদ্যালয় আইনের প্রথম সিনেট সভার রিপোর্টে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। প্রায় ৭০ পারসেণ্ট ছাত্রছাত্রী সব পরীক্ষায় পাস করে, কিন্তু ইংরেজীতে ফেল করে বলিয়া ফেল হয়।

"১৯৫২ সালে বিভিন্ন পরীক্ষায় পাশের হার ছিল এইরূপ:

	শতকরা
আই-এ	৩০.৩
আই-এসসি	৩২.৭
বি-এ	৩১.৪
বি-এসসি	৩৫.৩

"অধীতব্য বিষয়গুলি মাতৃভাষায় লিখিতে পারিলে কি ভাবে পাস করে তাহার দৃষ্টান্ত—

আই-এ

বিষয়	পাসের শতকরা হার
ইংরেজী	৩৫.৮
ইতিহাস	৭৭.২
ন্যায়	৬৮.৫
অঙ্ক	৭১.৬
পৌরনীতি	৮১.৩
বাং	৭০.০১
সংস্কৃত	৭৯.৫
অর্থনৈতিক ভূগোল	৯১.৯
বাণিজ্যের অঙ্ক ও হিসাব	৮৬.১
প্রাণিতত্ত্ব	১০০
আই-এসসি	
ইংরেজী	৪০.২
বাংলা	৬৭.৮
রসায়ন	৬৮.৩
পদার্থবিদ্যা	৭১.১
অঙ্ক	৭৩.৫
উদ্ভিদতত্ত্ব	৭২.৩
প্রাণিতত্ত্ব	৬৮.২
শারীরবিদ্যা	১০০
ভূগোল	৯১.৪
বি-এ	
ইংরেজী	৪৩.৬
বাংলা	৭৭.৫
অতিরিক্ত বাংলা	৮৭.০৮
সংস্কৃত	৬৯.৪
ইতিহাস	৭৮.৩
অর্থনীতি	৬১.০
দর্শন	৬১.৮

"ইণ্টারমিডিয়েট এবং বি-এ পরীক্ষায় আজকাল অধিকাংশ পরীক্ষার্থী বাংলায় উত্তর লিখিতেছে। ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি কমিয়া গিয়াছে, পড়াশুনায় মন নাই, একথা যে সম্পূর্ণ ঠিক নয় তাহা উপরোক্ত তালিকায় দেখা যাইতেছে। অধীতব্য বিষয়ে মাতৃভাষায় মনের কথা প্রকাশ করিতে পারিতেছে, ইংরেজীতে পারে না। প্রায় তিন-চতুর্থাংশ পরীক্ষার্থী সব বিষয়ে পাস করিতেছে, ঠেকিতেছে আসিয়া ইংরেজীতে।"

এই অবস্থার আশু নিরসন নিতান্তই কাম্য। কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চতম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা দ্বারাই তাহা সম্ভব। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে চাই মাতৃভাষায় লিখিত উচ্চতম মানের পাঠ্য পুস্তক এবং মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের জন্য পূর্ণভাবে উপযুক্ত শিক্ষক ও অধ্যাপক। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ইত্যাদি বিষয়ের বৈদেশিক শব্দমালার যথাযথ পরিভাষা ও অভিধান এখনও এদেশে নাই। একমাত্র হায়দরাবাদে উর্দ্দু অভিধান সেই বিষয়ে অগ্রসর। অথচ ঐ সকল ব্যবস্থা না হইলে মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা বৃথা।

ধলভূমের কৃষক ও কৃষি

শ্রীবামন মুখোপাধ্যায় "নবজাগরণ" পত্রিকায় ধলভূমের কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিতেছেন যে, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারসমূহ খাদ্যে স্বাবলম্বী হইবার জন্য নানারূপ পরিকল্পনা

গ্রহণ করিয়াছেন অথচ যাহারা এই পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবে সেই কৃষকসমাজ সম্পর্কে সকলেই সমান উদাসীন। ধলভূমে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হইয়াছে। চাষীরা কতই না আশা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের কোন আশাই পূর্ণ হয় নাই। বহুক্ষেত্রেই এখনও জমিদারের লোকেরা খাজনা আদায় করিয়া লইয়া যায়। কারণ জমিদারকে খাজনা দিতে নিষেধ করিয়া সরকার যে বিজ্ঞপ্তি দিয়াছিলেন বহুক্ষেত্রেই তাহা অজ্ঞ কৃষকের গোচরে আনিবার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। সরকারী কর্ম্মচারী আসিয়া তারপর খাজনা দাবী করে এবং তাহা না দিতে পারিলে সার্টিফিকেট জারীর ভয় দেখায়।

বামনবাবু সরকারী প্রচার বিভাগের কঠোর সমালোচনা করিয়া লিখিতেছেন: "শহর কেন্দ্রে সংবাদপত্রের অভাব নাই। শহরবাসী অতি সহজেই সরকারের বক্তব্য জানিতে পারে। কিন্তু সেই শহরেই প্রচার বিভাগের মোটরভ্যান মাইকের সাহায্যে চীৎকার করিয়া বেড়ায়। অথচ যে স্থানে এই চীৎকারের একান্ত প্রয়োজন সে স্থানে চিরনিস্তব্ধতাই রহিয়া যায়।"

চাষের উন্নতিকল্পে গৃহীত সরকারী পরিকল্পনাগুলির ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে তিনি লিখিতেছেন: "সরকারী রাজস্বে ধলভূমে অনেক বাঁধ চাষের সুবিধার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, জল উহার একটি বাঁধেও দেখিতে পাওয়া যায় না। যে উদ্দেশ্য লইয়া উহা নির্ম্মিত হইল সে উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইল। না পাইল চাষী বাঁধের জল, না পাইল গ্রামবাসী উহাতে স্নান করিতে বা উহার চাষের বলদগুলিকে জল খাওয়াইতে।" অথচ দরিদ্র গ্রামবাসীর নিকট হইতে এই সকল বাঁধ নির্ম্মাণের ব্যয়ের অর্দ্ধাংশ আদায় করা হইয়াছে। লেখকের অভিমতে, যদি একই সঙ্গে সকল স্থানের বাঁধের কাজ আরম্ভ না করিয়া একটি দুইটি করিয়া বাঁধ নির্ম্মাণ করা হইত তবে সেগুলির নির্ম্মাণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইত এবং বর্ত্তমানের এই অসন্তোষজনক পরিস্থিতি দেখা দিত না। উপরন্তু সরকার হইতে এই সকল বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণেরও কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই।

লেখক বলিতেছেন যে, সরকারী কর্ম্মচারীরা যদি কৃষকদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন না হইতে পারেন তবে কোন পরিকল্পনাই সার্থক হইতে পারে না, এবং তাহাতে সরকারের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইতে বাধ্য। "কৃষক জানে না যে সে তাহার চাষের উন্নতির জন্য কোথা হইতে ভাল বীজ এবং রাসায়নিক সার পাইতে পারে। অথচ এই সমস্ত দ্রব্য পরিবেশনের জন্য সরকার অর্থব্যয় করিয়া আপিস খুলিয়াছে। যদি কোন কাজই না হইল তবে এইরূপ অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন কি।"

সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের ভারত-সফরে অভিজ্ঞতা

বিগত জানুয়ারী মাসে হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হইয়া অন্যান্য দেশের ন্যায় সোভিয়েট ইউনিয়ন হইতেও এক বিজ্ঞান প্রতিনিধিদল ভারতে আসেন। সোভিয়েট-জীববিজ্ঞানী এঙ্গেলহার্ড্ৎ ঐ প্রতিনিধিদলের অন্যতম সভ্য ছিলেন। গত ১১ই মার্চ মস্কোস্থিত সোভিয়েট বিজ্ঞানমন্দিরের প্রশস্ত হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি তাঁহার ভারত-সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

এঙ্গেলহার্ড্ৎ তাঁহার বক্তৃতায় ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্য্যের প্রভূত অগ্রগতির উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কার্য্যকলাপের সহিত পরিচয় লাভ করিয়া সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা যথেষ্ট লাভবান হইয়াছেন। বম্বেতে তাঁহারা ভারতের সর্ব্ববৃহৎ জীবাণু বিজ্ঞান পরিষদটি দেখিয়াছিলেন। ঐ পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর হাফকিন একজন রুশ; সংক্রামক ব্যাধির বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য তিনি ভারতে আগমন করেন। হায়দরাবাদে তাঁহারা জীববিদ্যাবিষয়ক মিউজিয়মের সকল বৈজ্ঞানিক গবেষণার সহিত পরিচিত হন। বাঙ্গালোরে অবস্থিত রামন ইনষ্টিটিউটও তাঁহারা দেখিতে যান। কলিকাতায় সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ ভারতীয় বিজ্ঞানের বহু প্রখ্যাত প্রতিনিধিদের সহিত তাঁহাদের আলাপ-পরিচয় হয়। সর্ব্বত্রই তাঁহারা সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের দান সম্পর্কে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে গভীর আগ্রহের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছেন।

এঙ্গেলহার্ড্ৎ বলেন, "কংগ্রেসে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া কাজ করিয়া আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি যে, বিজ্ঞানের সামাজিক কর্ত্তব্যের ভূমিকা ও বিজ্ঞানীদের দায়দায়িত্ব সম্পর্কিত মনোভাবে আমাদের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে।"

ভারতে বিদেশী মিশনরীদের কার্য্যকলাপ

"পিপল্" পত্রিকা এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করিতেছেন যে, একাধিক কারণে ভারতে বৈদেশিক মিশনরীদের কার্য্যকলাপের অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। পত্রিকাটির মতে ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্ব্বাচনে বিদেশীদের সক্রিয় মনোযোগ আমরা কখনই নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া দেখিতে পারি না। যে কোন উদ্দেশ্যেই হউক, তাহারা বেতার প্রেরক যন্ত্র সঙ্গে লইয়া বেড়াইবে তাহাও বরদাস্ত করা যায় না। কি উদ্দেশ্যে তাহারা এসব করে তাহা অনেকের নিকট যথেষ্ট পরিষ্কার। শ্রী সম্পূর্ণানন্দ বলিয়াছেন যে, এই সকল দুষ্কৃতকারীদের অধিকাংশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আগত।

তদন্ত কমিশনের কর্ত্তব্য হইবে ইহাদের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে যথাসম্ভব বিস্তৃত সংবাদ সংগ্রহ করা। কোন্ কোন্ অঞ্চলে এই মিশনরীরা কাজ চালায়? কেন সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলগুলিই তাহাদের এত প্রিয়? কেন বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলেই তাহারা থাকিতে ভালবাসে? পুলিস কি ইহাদের কার্য্যকলাপের উপর নজর রাখে? মিশনরীরা অধিকাংশ কোন্ জাতির লোক? তাহারা আজ পর্য্যন্ত কতদূর সাফল্যলাভ করিয়াছে এবং তাহাদের কার্য্য হইতে ভবিষ্যৎ

বিপদের সম্ভাবনাই বা কতদূর? সম্প্রতি তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ কি?

পত্রিকাটির মতে বিশেষ সতর্কতার সহিত এই সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে যাহাতে বিদেশী মিশনরীদের বিরুদ্ধে সরকার যদি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তখন যেন স্বদেশী খ্রীষ্টানগণ সরকারের কার্য্যে অন্যায় কিছু মনে করিতে না পারেন অথবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেন ভারত সরকার পরমত-অসহিষ্ণু রূপে প্রতিভাত না হন।

ভারতকে সাহায্য দান

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মার্কিন সাহায্যের উপর কতটা নির্ভর করা হইয়াছে তাহার সঠিক পরিমাণ জানা যায় না। এবং অন্য দিকে উহা আদৌ আর পাওয়া যাইবে কিনা—বিনা সর্ত্তে—সে বিষয়েও অনেকে সন্দিহান ছিলেন। সেই হিসাবে নিম্নস্থ বিবৃতি প্রণিধান যোগ্য:

"ওয়াশিংটন, ৪ঠা মে—মার্কিন প্রতিনিধিসভার বৈদেশিক বিষয়ক কমিটিতে সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে ভারতস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ জর্জ ভি. অ্যালেন বলেন, 'স্বাধীন বিশ্বের শক্তির উৎস হইল স্বাধীন ভারত।

প্রতিনিধিসভার বৈদেশিক বিষয়ক কমিটিতে শুনানীর দ্বিতীয় দিনে রাষ্ট্রদূত অ্যালেনই প্রথম সাক্ষ্যদান করেন। সোমবার সহকারী পররাষ্ট্রসচিব হেনরী এ. বাইরোড কমিটির সম্মুখে হাজির হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কমিটির গোপন অধিবেশনে সাক্ষ্যদান করিয়াছিলেন এবং এ সম্পর্কে তাঁহার কোন বিবৃতি প্রকাশিত হয় নাই।

ভারতের জন্য মোট ১০,৪৫,০০,০০০ ডলার সাহায্য সুপারিশ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৮ কোটি ৫০ লক্ষ অর্থনৈতিক সাহায্য বাবদ এবং ১ কোটি ৯৫ লক্ষ কারিগরী সাহায্য বাবদ পৃথক রাখা হইয়াছে।

মিঃ অ্যালেনের বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল:

'এই বৎসর প্রথম দিকে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ভারতকে অর্থনৈতিক ও কারিগরী সাহায্যদানের সুপারিশ করিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা সমর্থনের জন্য আপনাদের নিকট উপস্থিত হইবার সুযোগ পাইয়া আমি আনন্দিত।

'আমাদের প্রতি ভারতের মনোভাব সম্পর্কে বহু আলোচনা হইয়াছে এবং নূতন পরিকল্পনা অনুসারে আমাদের সাহায্য চালাইয়া যাওয়া উচিত হইবে কিনা তাহা লইয়া কেহ কেহ প্রশ্ন করিতেছেন। ভারতে আমার কার্য্যকালের মধ্যে আমি যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা কমিটির সদস্যদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করিবে বলিয়া আমি আশা করি।

'প্রথমতঃ আমি বলিতে চাই যে, ভারতের নেতৃবর্গ আমাদের সাহায্য কামনা করেন এবং সাহায্য অব্যাহত থাকিলে তাঁহারা প্রীত হইবেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্য্যবেক্ষণ হইতে আমি বিশ্বাস করি যে, অতীতে আমরা ভারতকে যে সাহায্য দিয়াছি তাহা সার্থকতার সহিত ব্যবহার করা হইয়াছে এবং ১৯৫৫ সালের জন্য প্রস্তাবিত সাহায্য পরিকল্পনা যদি কংগ্রেস মঞ্জুর করেন, তাহা হইলে তাহাও অনুরূপভাবেই সার্থকতার সহিত নিয়োগ করা হইবে।'

'ভারতকে সাহায্যদানের জন্য আমরা যাহা কিছু করিতেছি ভারতীয়রা তাহা ভালভাবেই অবগত আছে। আমেরিকানরা বর্ত্তমানে নয়াদিল্লী ও ভারতের বিভিন্ন মন্ত্রীসভায় পরামর্শদাতা হিসাবে কার্য্য করিতেছে। আমেরিকানরা অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়াছে এবং অর্থনৈতিক সাহায্য পরিকল্পনা তাহাদের কারিগরী পরামর্শের সহায়তা করিতেছে বলিয়া তাহাদের কার্য্যাবলী অবিলম্বেই ফলপ্রসূ হইতেছে। ভারতীয় জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতির আশা-আকাঙ্ক্ষা অন্ততঃ কিছু পূরণের জন্য তাহারা ভারতীয় বিশেষজ্ঞ ও কারিগরদের সহিত একযোগে কার্য্য করিতেছে। আমার মতে জাতীয় স্বার্থের খাতিরেই যুক্তরাষ্ট্রের এরূপভাবে সাহায্য চালাইয়া যাওয়া উচিত যে, তাহার কার্য্যকারিতা বাধাপ্রাপ্ত হইবে না।

'ভারতের জনগণ এবং তাহাদের নেতৃবৃন্দ গণতান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টের প্রতি আস্থাসম্পন্ন, তাহারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের চেষ্টা করিতেছে। ইহা স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রী কমিউনিষ্ট পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতের বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দ এবং কংগ্রেসদল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশের উন্নতি বিধানের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। আমি তাহাদের সাহস ও উচ্চাশার প্রশংসা করি। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপর তাহাদের যে আস্থা আছে তাহারা যদি তাহা হারায় এবং গণতান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ভবিষ্যতের সকল আশায় জলাঞ্জলি দেয় তবে তাহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক হইবে। ভারতে বর্ত্তমানে উন্নয়নের যে সকল চেষ্টা হইতেছে, সম্পূর্ণ আমাদের স্বার্থের খাতিরেই এই সকল প্রচেষ্টায় সাধ্যমত সহায়তা করিতে হইবে। ভারত সরকার ও আমাদের মধ্যে যে মতবিরোধ ও নীতি সম্পর্কে অনৈক্য রহিয়াছে তাহা আমি বিশেষরূপ অবগত আছি। ভারত সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রের অনুসৃত বৈদেশিক নীতির মধ্যে প্রায়ই পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু আমাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য গণতন্ত্র ও অভিমত প্রকাশের স্বাধীনতা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কযুক্ত। এই স্বাধীনতায় মতানৈক্য প্রকাশেরও অধিকার দিতে হইবে। আমার ধারণা স্বতন্ত্র ভারত স্বাধীন বিশ্বের শক্তির উৎস।

'আপনারা জানিয়া রাখুন, ভারতকে আগামী বৎসরে সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত আমি খুব সহজে গ্রহণ করি নাই। এই প্রশ্নটি আমি গভীরভাবে অনুধাবন করিয়াছি এবং এক বৎসর ধরিয়া চিন্তা-ভাবনার পর আমি এই সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছি যে, ভারতকে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করা উচিত। এই সাহায্যের ফলে ভারত এবং আমেরিকা উভয়েই উপকৃত হইবে।"

সপ্তপদী

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

সম্প্রতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র "তত্ত্বকৌমুদী" পত্রিকায় (১৪ই এপ্রিল ১৯৫৪) বিবাহের "সপ্তপদী মন্ত্র" সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে :

"সামাজিক অনুষ্ঠানকে যতদূর সম্ভব দেশাচার অনুসারে করিতে উৎসাহ থাকা বাঞ্ছনীয় হইলেও, সেই উৎসাহে আদর্শ হইতে চ্যুত হওয়া কখনই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। কিন্তু দেখা যাইতেছে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত কেহ কেহ উৎসাহের বশে আদর্শের বিপরীত কার্যও করিতেছেন। সম্প্রতি একটি বিবাহ-বাসরে এরূপ অনুষ্ঠান দেখিয়া এ সম্পর্কে আমাদের বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের সচেতন হইবার সময় আসিয়াছে বলিয়া প্রত্যয় হইয়াছে। সপ্তপদীগমন একটি পুরাতন দেশাচার। কিন্তু উহার মন্ত্রগুলির মধ্যে এমন কথা আছে যাহা ব্রাহ্ম আদর্শের অনুকূল নহে। ব্রাহ্মসমাজ নর-নারীর সমান অধিকারে আস্থাবান, অথচ সপ্তপদী-গমনে পতির অনুব্রতা হইবার সঙ্কল্প রহিয়াছে, এরূপ আরও প্রতিজ্ঞা এই মন্ত্রে আছে। সেজন্য দেশাচার অনুসরণ করিবার জন্য যদি সপ্তপদীগমনের ন্যায় একটি অনুষ্ঠান করিবার বাসনা ব্রাহ্মদিগের মনে থাকে, তাহা হইলে মন্ত্রগুলিকে আদর্শানুযায়ী পরিবর্তন করিয়াই করা উচিত। দেশাচার-নিষ্ঠা যেন আমাদের ভ্রান্ত পথে লইয়া না যায়।"

ব্রাহ্মসমাজ কোন্ দেশাচার অনুসরণ করবেন, তা অবশ্য সম্পূর্ণরূপে তাঁদের নিজেদেরই কথা—সে সম্বন্ধে কারও কিছু বলবার থাকতে পারে না। কিন্তু আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত সপ্তপদী মন্ত্রে যে নর-নারীর সমান অধিকার স্বীকৃত হয় নি, এবং নারীকে সম্পূর্ণরূপে পুরুষের অধীনা ও হীনতরা বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে, যেজন্য নর-নারীর সমান অধিকারে বিশ্বাসী ব্রাহ্মগণ এই মন্ত্রসমূহ উচ্চারণই করতে অপারগ—এটি সত্যই অতি বিস্ময়জনক উক্তি! কারণ আমাদের শাস্ত্রে সপ্তপদী মন্ত্রে, বস্তুতঃ বিবাহের অন্যান্য সকল মন্ত্রেও, সর্বত্রই বর ও বধূর সমান অধিকার ও মর্যাদা সানন্দে স্বীকৃত হয়েছে।

প্রথমে সপ্তপদীমন্ত্রের কথাই আলোচনা করা যাক। আমাদের উপনয়ন-বিবাহ-জাতকর্ম প্রমুখ সকল সংস্কার বা করণীয় কর্মাদির বিধিবিধান প্রধানতঃ বিভিন্ন গৃহ্যসূত্রাদিতে পাওয়া যায়। এরূপ গৃহ্যসূত্রসমূহ বহুলাংশে বৈদিক মন্ত্রাবলীর চয়নই মাত্র। প্রায় সকল গৃহ্যসূত্রেই সপ্তপদীমন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদীয় গৃহ্যসূত্রে সপ্তপদীমন্ত্র

ঋগ্বেদীয় গৃহ্যসূত্রে সুবিখ্যাত "আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রে"র সপ্তপদীমন্ত্র নিম্নলিখিতরূপ :

"অথৈনামপরাজিতায়াং দিশি সপ্তপদান্যভ্যুৎক্রাময়তীষ একপদ্যূর্জে দ্বিপদী রায়স্পোষায় ত্রিপদী মায়োভবায় চতুষ্পদী প্রজাভ্যঃ পঞ্চপদ্যৃতুভ্যঃ ষট্‌পদী সখা সপ্তপদী ভব সা মামনুব্রতা ভব পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহূংস্তে সন্তু জরদষ্টয় ইতি।" (১-৭-২০)

অর্থাৎ, বিবাহকালে বর বধূকে সম্মুখে নিয়ে সপ্তপদ গমন করবেন, এবং বর পুরোবর্তিনী বধূকে প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে বলবেন—"আনন্দরসপূর্ণ নবীন জীবন লাভের জন্য প্রথম পদ ক্ষেপণ কর, শক্তি লাভের জন্য দ্বিতীয় পদ ক্ষেপণ কর, সমৃদ্ধি লাভের জন্য তৃতীয় পদ ক্ষেপণ কর, মঙ্গল লাভের জন্য চতুর্থ পদ ক্ষেপণ কর, সন্ততি লাভের জন্য পঞ্চম পদ ক্ষেপণ কর, সাম্বৎসরিক শুভ পরিবেশ লাভের জন্য ষষ্ঠ পদ ক্ষেপণ কর, সপ্তম পদ ক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমার সখা বা বন্ধু হও। তুমি আমার ব্রত অনুসরণ কর। আমাদের দীর্ঘজীবী বহু পুত্র হোক্।"

এই সুন্দর, সুমিষ্ট মন্ত্রটিতে বধূকে একটি বাক্যাংশ পর্যন্ত দিয়েও বরের অধীনা বা বরের অপেক্ষা কোনো বিষয়ে ন্যূনা বলে বর্ণনা করা হয় নি। উপরন্তু বধূই এস্থলে পুরোবর্তিনী—প্রকৃত ও রূপক উভয় অর্থেই। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ সপ্তম পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে ত তিনি পতির "সখা" বা অভিন্নাত্মা বন্ধু হয়েই গেলেন; অতএব নর-নারীর সমান অধিকার ব্যতীত আর অন্য কি এস্থলে বলা হয়েছে? যাঁরা সমমনঃ-প্রাণ, সমপদস্থ, সমানাধিকারশীল তাঁরাই ত একমাত্র প্রকৃত বন্ধু হতে পারেন—উচ্চ-নীচ, প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে সখ্য বা বন্ধুত্বের নিকটতম, মধুরতম সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বাধীন প্রভু ও পরাধীনা দাসীর সম্বন্ধ নয়—সমানমর্যাদাশীল দুই সখার সম্বন্ধ, কেবল এই কথাটিই এই মন্ত্রে স্পষ্টতমভাবে বলা হয়েছে।

"অনুব্রতা" কথাটিতেও ভয় পাবার কিছু নেই। এর ব্যুৎপত্তিগত মুখ্য অর্থ হ'ল, ব্রতের অনুসারিণী হওয়া, বা বরের জীবনব্রতকে নিজের বলে গ্রহণ করে, তাকে সার্থকতম করে তোলা; এবং সাধারণ বা গৌণ অর্থ হ'ল, বরের প্রতি নিঃস্বার্থ একনিষ্ঠ প্রেমে বিভোরা হয়ে একমাত্র তাঁকেই জীবন সমর্পণ করা। স্ত্রী স্বামীর জীবনব্রত গ্রহণ করে তাঁকেই মনঃ প্রাণ অর্পণ করবেন—এতে কি স্ত্রীর হীনতা বা পরাধীনতা প্রমাণিত হয়?

অবশ্য কেবল স্ত্রীই যে পতিব্রতা ও পতিগতচিত্তা হবেন, তাই নয়; স্বামীও ঠিক তেমনি পত্নীব্রত ও পত্নীগতচিত্ত হবেন। সেজন্য বিবাহকালে বরও বধূকে অপূর্ব সুন্দরভাবে আহ্বান করে হৃদয় দান করেন এবং বধূর নিকট

আনুগত্যের সঙ্কল্প করেন। একই ভাবে, বধূও স্বয়ং বরকে অনুব্রত হবার জন্য আহ্বান জানান। এ সম্বন্ধে স্বল্পসংখ্যক মন্ত্র নিয়ে উদ্ধৃত করছি।

এরূপ "আনুব্রত্যই" প্রকৃত সখ্য বা বন্ধুত্বের মূল ভিত্তি। দুই বন্ধুর জীবনব্রত বা লক্ষ্য যদি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও বিপরীতমুখী হয়, তা হলে ত তাঁদের সম্মিলিত আনন্দময় পরিপূর্ণ জীবন অসম্ভব। সেজন্য নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন না দিয়েও বন্ধুর সত্তায় নিজেকে মিলিত করাই বন্ধুর কাজ—এখানেই বন্ধুত্বের চরমোৎকর্ষ ও পরম মাধুর্য। একই ভাবে পতিপত্নী হবেন সমমর্মী, সমধর্মী, সমকর্মী—একে অপরের অর্ধাংশ, একে অপরের পরিপূরক, সহায়ক, শক্তিদায়ক। তবেই ত হবে দুই স্বতন্ত্র জীবনের পূর্ণতম মিলন, "ঐকব্রাত্য বা আনুব্রাত্য" যে মধুর মিলনের অপর নামই মাত্র।

যজুর্বেদীয় গৃহ্যসূত্রে সপ্তপদী মন্ত্র

শুক্লযজুর্বেদের "পারস্কর-গৃহ্যসূত্রে"র সপ্তপদী মন্ত্র উপরের ঋগ্বেদীয় "আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রে"র সপ্তপদী মন্ত্রেরই অনুরূপ।

কিন্তু কৃষ্ণ-যজুর্বেদের তিনটি প্রখ্যাত গৃহ্যসূত্রে বর-বধূর সখ্য বা বন্ধুত্বই যে বিবাহের মূল কথা, তা স্পষ্টতর ভাবে সপ্তপদী মন্ত্রে উল্লিখিত আছে। এরূপে "বারাহ-গৃহ্যসূত্রে" "আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রের" উপরি উদ্ধৃত সপ্তপদী-মন্ত্রের পরে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রও এইভাবে আছে :

"অথৈনাং প্রাচীং সপ্ত পদানি প্রক্রময়তি—একমিষে বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু। দ্বে ঊর্জে। ত্রীণি রায়স্পোষায়। চত্বারি মায়োভবায়। পঞ্চ প্রজাভ্যঃ। ষড়্ ঋতুভ্যঃ। সপ্ত সপ্তভ্যো হোত্রাভ্যঃ। বিষ্ণুস্ত্বাং নয়ত্বিতি দ্বিতীয়প্রভৃত্য-নুষজেৎ।

"সখী সপ্তপদী ভব। সখ্যং তে গমেয়ং, সখ্যাত্তে মা য়িসমিতি সপ্তম এনাং প্রেক্ষমাণাং সমীক্ষতে।" (১৪-২৩)

"মৈত্রায়ণীয় মানব গৃহ্যসূত্রে" সামান্য পরিবর্তিত উপরের মন্ত্রের পরে অতিরিক্ত মন্ত্রটী এইরূপ :

"সখা সপ্তপদী ভব। সুমৃড়ীকা সরস্বতী। মা তে ব্যোম সংদৃশী। বিষ্ণুস্ত্বমুন্নয়ত্বিতি সর্বত্রানুসজতি। (১-১১-১৮)

বিশ্ববিশ্রুত "হিরণ্যকেশি-গৃহ্যসূত্রে"র অতিরিক্ত সপ্তপদী মন্ত্রটী স্পষ্টতম—

"সপ্তমং পদমবস্থাপ্য জপতি। সখা য়ৌ সপ্তপদাবভুব, সখ্যং তে গমেয়ং, সখ্যাত্তে মা যোষং, সখ্যান্মে মা যোষ্ঠাঃ॥" ইতি। (১,২ ,১-২)

সপ্তপদী মন্ত্রের অন্তর্গত এই অতিরিক্ত মন্ত্রগুলির অর্থ এইরূপ :

বর বধূকে সপ্তপদ গমনের শেষে বলছেন :

"সপ্তপদ-ক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমার সখা হলে ; আমি যেন তোমার সখ্যলাভ করি, তোমার সখ্য থেকে আমি যেন কোন দিন বিচ্যুত না হই।"

"সপ্তপদ ক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমার সখা হলে, আনন্দদায়িনী, জ্ঞানদায়িনী হলে। আকাশের মতই তুমি আমার সমগ্র জীবন পরিব্যাপ্ত করে থাক। পরমরক্ষক তোমাকে সকল রকমে রক্ষা করুন।"

"সপ্তপদ ক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা উভয়ে সখা হলাম, আমি যেন তোমার সখ্যলাভ করি ; আমি যেন কোনদিন তোমার সখ্য থেকে বিচ্যুত না হই ; তুমিও যেন কোনদিন আমার সখ্য থেকে বিচ্যুতা না হও।"

পতিপত্নীর প্রগাঢ় বন্ধুত্বমূলক এরূপ অত্যাশ্চর্য সুন্দর মন্ত্র জগতের কোনো বিবাহ-বিধিতেই নেই। ঈদৃশ স্পষ্ট ও প্রাঞ্জলতম মন্ত্র থাকা সত্ত্বেও কি করে বলা চলে যে, প্রাচীন সপ্তপদী মন্ত্র নর-নারীর বৈষম্যমূলক বিধিই মাত্র, এবং নারীদের পরাধীনতা ও নিকৃষ্টতর অবস্থার দ্যোতকই মাত্র।

উপরের যজুর্বেদীয় গৃহ্যসূত্রে "অনুব্রতা" কথাটী পর্যন্ত নেই, যদিও পূর্বেই যা বলা হয়েছে, থাকলেও কোন ক্ষতি ছিল না।

সামবেদীয় গৃহ্যসূত্রে সপ্তপদী মন্ত্র

সামবেদীয় "জৈমিনি-গৃহ্যসূত্রে"র সপ্তপদী মন্ত্র উপরের মন্ত্রাদিরই অনুরূপ। "সখা সপ্তপদী ভবেতি সপ্তমে" (১-২১) এইখানেই মন্ত্রের শেষ। "সা মামনুব্রতা ভব" বা "সখ্যং তে গমেয়ম্" প্রভৃতির উল্লেখ নেই।

অথর্ববেদীয় গৃহ্যসূত্রে সপ্তপদী মন্ত্র

অথর্ববেদীয় গৃহ্যসূত্র "কৌশিকসূত্রে"র সপ্তপদী মন্ত্র এইরূপ :

সপ্ত মর্যাদা ইত্যুত্তরতোঽগ্নেঃ সপ্ত লেখা লিখতি প্রাচ্যঃ। (৭৬, ২১) তাসু পদান্যুৎক্রাময়তি ।২২ ইষে ত্বা সুমঙ্গলি প্রজাপতি সুসীম ইতি প্রথমম্ ।২৩ ঊর্জে ত্বা রায়স্পোষায় ত্বা সৌভাগ্যায় ত্বা সাম্রাজ্যায় ত্বা সংপদে ত্বা জীবাতবে ত্বা সুমঙ্গলি প্রজাপতি সুসীম ইতি সপ্তমং সখা সপ্তপদী ভবেতি। ২৪॥

অর্থাৎ, "বর বধূকে সম্বোধন করে বলছেন—হে পরম-মঙ্গলময়ি সীমন্তিনি! আনন্দ, শক্তি, সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য, সাম্রাজ্য, সম্পদ্ ও সুখময় জীবন-লাভের জন্য যথাক্রমে তুমি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম পদ ক্ষেপণ কর। হে পরমমঙ্গলময়ি সীমন্তিনি! সপ্তম পদ ক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গেই তুমি আমার সখা হও।"

এরূপে, যে সকল গৃহ্যসূত্রে সপ্তপদী মন্ত্র আছে, সে সবগুলিতেই "সখা সপ্তপদী ভব" এই মন্ত্রের উল্লেখ আছে। দুটীতে "সা মামনুব্রতা ভব" বলে বলা আছে (ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন ও শুক্লযজুর্বেদীয় পারস্করগৃহ্যসূত্র) ; পাঁচটিতে নয় (কৃষ্ণযজুর্বেদীয় বারাহ, মানব ও হিরণ্যকেশি-গৃহ্যসূত্র, সামবেদীয় জৈমিনি-গৃহ্যসূত্র, অথর্ববেদীয় কৌশিক-সূত্রে)।

দুটিতে "সখ্যং তে গমেয়ম্" প্রভৃতি স্পষ্টতর অতিরিক্ত মন্ত্র আছে (কৃষ্ণযজুর্বেদীয় বারাহ ও হিরণ্যকেশি-গৃহ্যসূত্রে)।

সুতরাং সন্দেহের কোনরূপ অবকাশ থাকতেই পারে না যে, প্রাচীন সপ্তপদী মন্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল বর ও বধূর পরিপূর্ণ সমানাধিকার তাঁদের সম্মিলিত নবজীবনের প্রথম শুভমুহূর্ত থেকেই স্থাপন করা।

সপ্তপদী মন্ত্রের অনুরূপ বিবাহের অন্যান্য মন্ত্র

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিবাহবিধির 'আনুব্রত্য' কেবল এক দিক্ বা কেবলমাত্র বধূর দিক থেকেই ছিল না, দুই দিক্ বা বরবধূ উভয়ের দিক্ থেকেও ছিল। এ সম্বন্ধে বিবাহের দু'একটি মাত্র মন্ত্রের উল্লেখ করছি। বর বধূকে উদ্দেশ্য করে যে অনুপম মন্ত্রগুলি পাঠ করেন, তার মধ্যে কয়েকটি এইরূপ :

পতির মন্ত্র

"ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।" (ঋগ্বেদ ১০-৮৫-৪৭ আশ্বগৃহ্য, ১. ৮, ৯)
সং মাতরিশ্বা সংধাতা সমু দেষ্ট্রী দধাতু নৌ।"

"সকল দেবতা আমাদের উভয়ের হৃদয় সম্মিলিত করুন। বিধাতা আমাদের বুদ্ধিকে পরস্পরানুকূল করুন ("আবয়োর্বুদ্ধীঃ পরস্পরানুকুলাঃ করোত্বিত্যর্থঃ"—সায়ণ)।

"বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে।" (সাম-মন্ত্র-ব্রাহ্মণ ১-৩-৮)

"সত্য-গ্রন্থি দ্বারা তোমার মন ও হৃদয় আমি বন্ধন করি।"

"ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু।
মম চিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু" ॥

(শাঙ্খায়ন অথবা কৌষীতকি গৃহ্য-সূত্র—২-৪-১। মানব-গৃহ্য-সূত্র—১-১০-৩। পারস্কর-গৃহ্য-সূত্র—১-৮-৮।

"আমার ব্রতে তোমার হৃদয় দান কর; আমার চিত্ত তোমার চিত্তেরই অনুগামী হোক্।"

"ওঁ যদেতদ্ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।" (সাম-মন্ত্র-ব্রাহ্মণ ১-৩-৯)

"তোমার যে হৃদয় তা আমার হৃদয় হোক;
আমার যে হৃদয় তা তোমার হৃদয় হোক্।"

"সহ ধর্মশ্চর্যতাং সহাপত্যমৎপাদ্যতামিতি
ধর্মে চার্থে চ কামে চ নাতিচরয়িতব্যামিতি।
প্রাজাপত্যবিধিঃ প্রথিতঃ।" (কাঠকগৃহ্য-সূত্র ভাষ্য ১৫-১)

"সহধর্মিণীকে ধর্মে, অর্থে ও কামে অতিক্রম করবে না—এই হ'ল বিবাহবিধি।"

"ওঁ ইহ ধৃতিঃ স্বাহা। ইহ স্বধৃতিঃ স্বাহা।
ইহ রন্তিঃ স্বাহা। ইহ রমস্ব স্বাহা।
ময়ি ধৃতিঃ স্বাহা। ময়ি স্বধৃতিঃ স্বাহা।
ময়ি রমঃ স্বাহা। ময়ি রমস্ব স্বাহা।"

(লাট্যায়নশ্রৌত-সূত্র ৩, ৮, ১২ এবং দ্রাহ্যায়ণ-শ্রৌতসূত্র।)

"তুমি এই গৃহের প্রতি প্রসন্না হও, তোমার স্বজনবর্গও হোন। তুমি এই গৃহে আনন্দে লীলা কর। তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও, তোমার স্বজনবর্গও হোন। তুমি আমাতে আনন্দে লীলা কর।"

"ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্বাং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু॥" (ঋগ্বেদ ১০-৮৫-৪৬)

"শ্বশুরের সম্রাজ্ঞী হও, শ্বশ্রূর সম্রাজ্ঞী হও, ননন্দার সম্রাজ্ঞী হও, দেবরগণের সম্রাজ্ঞী হও।"

"দশাস্যাং পুত্রানাধেহি, পতিমেকাদশ কৃধি।" (ঋগ্বেদ ১০-৮৫-৪৫)।

"এঁকে দশটি পুত্র দান কর, পতিকে তাঁর একাদশ পুত্র কর।"

এরূপে উপরের স্বল্প-সংখ্যক বর কর্তৃক উচ্চার্য বিবাহের মন্ত্র দ্বারাই স্পষ্ট প্রমাণিত হবে যে, বর কোনো ক্ষেত্রেই বধূকে নিজের অধীনা, নিজের সমান অধিকারবিহীনা, নিজের অপেক্ষা হীনা বা নিম্নস্তরীয়া বলে ইঙ্গিতমাত্রও করেন না। উপরন্তু তিনি সর্বক্ষেত্রেই বধূর আনুগত্য সানন্দে স্বীকার করে তাঁর নিজের চিত্তকে বধূর চিত্তের অনুগামী করেন, এমন কি, তাঁকে সম্রাজ্ঞী ও মাতৃরূপেও শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করেন বিনা দ্বিধায়। নারীদের এরূপ উচ্চ সম্মান পৃথিবীর কোনো মন্ত্রেই নেই। অন্যান্য দেশের উদ্বাহ-বিধিতে কেবল পত্নীকেই বারংবার পতির আজ্ঞানুবর্তিনী হতে আদেশ করা হয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় বিবাহমন্ত্রে তার চিহ্নমাত্র নেই। বর ও বধূ উভয়েই উভয়ের অনুগামী হবেন—দুটী অসম্পূর্ণ অর্ধাংশ মিলে এক সম্পূর্ণ, অখণ্ড সত্তা হবেন—বেদোপনিষৎসম্মত ভারতীয় বিবাহবিধির এইটিই হ'ল মূল কথা। এই অপূর্ব সুন্দর নীতিরই প্রতিধ্বনি করে সুবিখ্যাত, প্রাচীনতম বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলছেন :

"স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ত্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং তস্মাদিদমর্ধবৃগলমিব স্ব ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্যত এব।" (১-৪-৩)।

"পরমাত্মা নিজেকে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করে পতি ও পত্নী সৃষ্টি করলেন। সেজন্য পতি ও পত্নী প্রত্যেকে একটি পূর্ণ ঝিনুকের অর্ধাংশই মাত্র—এইটি মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্যের মত। সুতরাং পতির জীবনের শূন্যস্থান পত্নীর দ্বারাই পূর্ণ হয়।"

পত্নীর মন্ত্র

এর চেয়েও সুন্দর কথা আছে পত্নীর অনুপ্রসঙ্গে উচ্চারিত মন্ত্রে। যথা :

"ওঁ অহমস্মি সহমানাথো ত্বমসি সাসহিঃ।
মামনু প্র তে মনো বৎসং গৌরিব ধাবতু পথা বারিব ধাবতু।
(অথর্ববেদ ৩-১৮-৫ আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র ৩-৯-৬
আপস্তম্ব মন্ত্র ব্রাহ্মণ, ১-১৫-৫)

"আমি তোমার সঙ্গে জয়যুক্তা হই, তুমিও আমার সঙ্গে জয়যুক্ত হও। বৎস যেমন গাভীর পশ্চাতে, জল যেমন নিম্নভূমিতে স্বভাবতঃই ধাবমান হয়, তুমিও ঠিক তেমনি আমার অনুগামী হও।" (সায়ণভাষ্য, ঋগ্বেদ, ১০, ১৪৫, ৬—"তে তব ভর্তুঃ মনঃ মাম্ অনুলক্ষ্য) প্র ধাবতু প্রকর্ষেণ শীঘ্রং গচ্ছতু। তত্র নিদর্শনদ্বয়মুচ্যতে। গৌরিব যথা গৌঃ বৎসং শীঘ্রং গচ্ছতি যদ্বা নিম্নেন মার্গেণ বারিব বারুদকং যথা স্বভাবতো গচ্ছতি তদ্বৎ। অনেন নিদর্শনদ্বয়েন ঔৎসুক্যাতিশয়ঃ স্বাভাবিকত্বং চ প্রতিপাদ্যতে॥"

এরূপে বরই যে কেবল বধূকে অনুব্রতা হতে বলছেন,

তাই নয়, বধূও সমানভাবে বরকে অনুব্রত, অনুগামী, অনুচিত্ত হতে সাদরে, সগৌরবে আহ্বান জানাচ্ছেন। পরাধীনতা, পুরুষাধীনতা, সমানাধিকারবিহীনতার চিহ্নমাত্র এস্থলে কোথায়?

পতি ও পত্নীর সম্মিলিত মন্ত্র

এতৎপরে বর ও বধূ সম্মেলিতভাবে মন্ত্রোচ্চারণ করেন :

"অরিষ্টাসু সচেবহি
বৃহতে বাজসাতয়ে।" (অথর্ববেদ ১৪-২-৭২)

"আমাদের পরস্পরকে সংযুক্ত কর; আমাদের দু'জনের হৃদয় এক ও অভিন্ন কর; বৃহৎ শক্তি লাভের জন্য আমাদের সুরক্ষিত জীবন যেন অগ্রগতি লাভ করে।"

"ওঁ সং বাং ভগাসো অগ্মত সং চিত্তানি সমুব্রতা।
যথা সংমনসো ভূত্বা সখায়াবিব সচাবহৈ॥"
(অথর্ব বেদ ২, ৩০, ২; ৬-১৩-১)

"আমাদের দু'জনের ভাগ্য, আমাদের দু'জনের চিত্ত, আমাদের দু'জনের ব্রত বা কর্ম এক হোক, যাতে আমরা অভিন্ন-মন-প্রাণা হয়ে, দুই সখার ন্যায় মিলিত হয়ে জীবনপথে নির্ভয়ে অগ্রসর হতে পারি।"

এরূপে প্রথমে বর বধূকে তাঁর অনুব্রতা হতে বা তাঁর জীবনব্রত নিজের জীবনে গ্রহণ করতে ও সখা হতে আহ্বান জানান, এবং স্বয়ং নিজের চিত্তকে বধূর চিত্তের অনুগামী করতে সঙ্কল্প করেন; একই ভাবে বধূও বরকে অনুব্রত ও সখা হতে আহ্বান করেন এবং স্বয়ং নিজের চিত্তকে বরের চিত্তের অনুগামী করতে সঙ্কল্প করেন। পরিশেষে এরূপে হৃদয় বিনিময়ের পর, এরূপে মধুরতম সখ্যসূত্রে শাশ্বতভাবে আবদ্ধ হবার পর, বর ও বধূ এক সম্মিলিত অখণ্ড, সম্পূর্ণ সত্তায় পরিণত হয়ে সার্থকতম জীবনলাভ করেন। প্রাচীন ভারতীয় বিবাহনীতির এই হ'ল স্বরূপ ও আদর্শ।

উপসংহার

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হতেই প্রতিভাত হবে যে, প্রাচীন বেদ, উপনিষদ্‌, গৃহ্যসূত্রাদিতে বিহিত বিবাহমন্ত্রাদি সত্যই নিরুপম। এই ভারতীয় বিবাহবিধির মূল কথা হ'ল বধূর সহধর্মিণীত্ব বা সর্ববিষয়ে পতির অর্ধাঙ্গিনীরূপে তাঁর সঙ্গে অভিন্নত্ব, ক্রীতদাসীরূপে কদাপি নয়। সেজন্য ভারতীয় বিবাহানুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান অঙ্গ সপ্তপদীগমনে অকস্মাৎ বধূকে বরের অধীনা, সমানাধিকারবিহীনা বলে গ্রহণ করা হয়—এ যে কেউ ভাবতেই পারেন, সেটাই অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়! বস্তুতঃ ব্রাহ্ম-বিবাহ-বিধির দুটি প্রধান প্রতিজ্ঞা: "তোমার যে হৃদয় তা আমার হোক, আমার যে হৃদয় তা তোমার হোক", এবং "ধর্মেতে, অর্থেতে, কামেতে অতিক্রম করিব না"—উপরের সাম-মন্ত্র-ব্রাহ্মণ ও কাঠকগৃহ্যসূত্রের মন্ত্রেরই অনুবাদ মাত্র। একই ভাবে, পরস্পরের সখ্যমূলক এই অনুপম সপ্তপদী মন্ত্রেও কারও আপত্তি হবার কথা নয়।

ছবি

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আজি এই চৈত্রশেষে বসন্তের ছবি—
একি কভু ভুলিবার? দুলিছে করবী
বায়ুভরে; রক্তজবা দোলে সমীরণে
'বোগেনভিলা'র গুচ্ছ দুলিছে পবনে;

নিম্বমঞ্জরীর গন্ধে মন উচাটন;
কাঁঠালি-চাঁপার গুচ্ছ; কপোত কূজন;
চামেলির ফুলে ফুলে গুঞ্জরে ভ্রমর;
শালিখের কলরব; বনের মর্মর,

উল্লসিত দোয়েলের কণ্ঠ-ভরা গান
জুড়ায় কানের ক্ষুধা, জুড়ায় পরাণ;
উড়িতেছে প্রজাপতি আপন খেয়ালে;
গ্রামান্তের বন-রেখা দিকচক্রবালে।

দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠে চরিছে গোধন,
দেখে দেখে ক্লান্তি নাই, অতৃপ্ত নয়ন।

চিন্তা

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

এলাহাবাদ প্যাসেঞ্জারখানা ছাড়ে ঠিক ভোর পাঁচটায়। জানুয়ারীর শেষ। ভোর পাঁচটায় গাড়ী ধরা সামান্য কথা নয়। চারটে না হোক, অন্ততঃ সোয়া চারটে নাগাদ বাড়ী থেকে না বেরুলে গাড়ী ধরা যাবে না।

কাশীতে অত ভোরে গাড়ী পাওয়া এক সমস্যা। গোধোলিয়ায় একটা টাঙ্গাওয়ালা ঠিক করছি, যাতে ভোর-বেলায় বাড়ী যায়। বিশ্বাসী ও নির্ভরযোগ্য হওয়া চাই। নইলে অত ভোরে গাড়ী পেতেই আধ ঘণ্টা বেরিয়ে যাবে।

রাজী হ'ল লোকটা। কিন্তু মিশ্রীপোখরায় বাড়ীটা আর বুঝিয়ে উঠতে পারছি না। বলতে কি একটু ঝামেলাই হ'ল।

গাড়ীর আড্ডায় গাড়ীর তত্ত্ব-তালাস করতে গেছি। অন্যান্য কণ্ঠও প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছিল।

হঠাৎ একজন হিন্দীতেই বললে, "ম্যয় জানতা হুঁ আপকা ঘর। ম্যাঁয় লে চলুঁগা।"

বাঁচলাম। বললাম, "ঠিক তো?"

অমনি আগেকার লোকটা বাগড়া দিয়ে বললে, "ওর পাল্কী-গাড়ী বাবু।"

"তাই নাকি? না বাবা! যেতেও দেরি, ভাড়াও বেশী। টাঙ্গা চাই।"

রোগা, অস্থিচর্ম্মসার লোকটা। মাথায় একটা বালাক্লাভা ক্যাপ আগাগোড়া গলা পর্য্যন্ত ঢুকিয়ে পরা। তীক্ষ্ণ ফলার মত নাকটার দু'পাশে জল্ জল্ করছে দুটো চোখ. দুটো গর্ত্তের মধ্য থেকে উঁকি মারছে। গায়ে ব্যারাকের পরিত্যক্ত খাকী পট্টুর শতচ্ছিন্ন মলিন কোট। একখানা ছেঁড়া ধুতি লুঙ্গীর মত করে পরা। হাতে চাবুক। গা দিয়ে আস্তাবলের গন্ধ বেরুচ্ছে। ঘ্যানঘেনে গলায় বলল, "টাঙ্গার চেয়ে দেরিতে যাবে না। টাঙ্গার ভাড়াই দেবেন। আমি যাব।"

বিশ্বাস হ'ল না। বললাম, "যাবি ত?"

লোকটা সতেজ গলায় বলল, "হ্যাঁ যাব। জানকীবাবুর বাড়ী ত।"

ব্যস্ নিশ্চিন্ত হলাম—বাড়ী চলে এলাম।

আমি তৈরি। এ সময়টা দিদিই আমার গোছগাছ করে দিতেন। বললেন, "কৈ রে, তোর গাড়ী ত এল না। চারটে দশ বেজে গেছে যে।"

সত্যিই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

যখন চারটে পনের তখন আর থাকতে না পেরে বেরিয়ে পড়লাম অন্য গাড়ীর আশায়। ব্যাটাদের যদি একটুও কথার ঠিক থাকে।

নিস্তব্ধ চারিধার। কাশীর শীত। জানুয়ারীর শেষ। হিম যেন সির-সির করে ঝরে পড়ছে। কোথায় কুকুরে ছানা দিয়েছে। ছাইয়ের গাদার মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে তারা কুঁই কুঁই করছে। অনিদ্রায় ভোগা বুড়ী কল খুলে স্নান করে গা মুছতে মুছতে "দেবী সুরেশ্বরী" গান গাইছে কেঁপে কেঁপে। বেতো বুড়ো কাতরাচ্ছে আর ডাক দিচ্ছে, "ও বড়-বৌ, ওঠ না, চায়ের জলটা চাপাও।" তার চাপা গলা বন্ধ দরজা ভেদ করে রাস্তায় ভেসে আসছে। হু হু করে একখানা মোটর বেরিয়ে গেল। বড় রাস্তার এপার ওপারে একখানা গাড়ীর আশাও নেই। ল্যাম্প-পোষ্টগুলি সারি সারি ঠায় জলছে।

হঠাৎ পথের পাথরগুলো যেন ছন্দে ছন্দে গেয়ে উঠল। ক্ষীণ শব্দ, তবু স্পষ্ট, স্পষ্টতর। ঘোড়াটা আসছে কদমচালে। হ্যাঁ, পাল্কী-গাড়ীই বটে। শান্ত হবার কথা। আরও যেন চটে উঠলাম।

পাশে এসে দাঁড়াতেই বললাম, "বেশ লোক ত তুমি!"

দরজা খুলে ভিতরে বসে বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বললাম, "জলদি হাঁকো!"

চমৎকার গাড়ীখানা। ভাড়াটে গাড়ী নয় বেশ বোঝা যায়। বার্ম্মা টীকের সরু সরু বেটন খাঁজে খাঁজে বসিয়ে গাড়ীর ভিতরটা তৈরি। চমৎকার বানিশ। পথের আলো পড়ে চমকাচ্ছে, গদীগুলোয় কোমল স্পর্শ, বনাতমোড়া, আর স্প্রীং খুব মজবুত। হাতলগুলো চক্‌চক্ করছে। চাকা চলেছে—এতটুকু শব্দ হচ্ছে না; ঘোড়াটার পা থেকে যেন বাঁয়ার বোল বেরুচ্ছে, এত ভারী জোরালো তার চাল। র দামী নাল বাঁধানো, বেশ বোঝা যায়, ভাড়াটে গাড়ী নয় এ'

কিছু বলতে হ'ল না, ও বাড়ীর দিকে চলল। কিন্তু জবাব দিল না।

দিদি আমার বাক্সটা বাইরে এনে রেখেছিলেন। এক-ঝুড়ি রামনগরের বেগুন ছিল। সেটা আনতে পারেন নি। আমি আনতে যাচ্ছি। দিদি বললেন, "তুই কেন বোঝাটা টানবি? রামহরককে ডাক দে।"

আমি তাচ্ছিল্যভরে বললাম, "বুড়োমানুষ শুয়ে আছে। আমিই পারব।"

পরিষ্কার বাংলায় গাড়োয়ান বলল, "থাক আমি আনছি! কোথায় আছে বলুন। ভেতরে দালানে না ভাঁড়ারঘরের সামনের বারান্দায়।"

ও যেন এ বাড়ীর সব জানে। দিদিই বললেন, "পূবের বারান্দাতেই বটে। তুমি কি বাপু বাঙালী?"

...সেই বালাক্লাভা-ক্যাপে ঢাকা মুখ। গলাবন্ধ কোট আর লুঙ্গী। বললে, "হ্যাঁ, থাক অজিতবাবু। আপনাকে আর উঠতে হবে না। সরস্বতীপুজো হয় যে দালানে সেখানটায় তো? তুলসীতলীর পাশে। ও আমি জানি, আনতে পারব।"

আমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম।

গাড়োয়ান ততক্ষণ অদৃশ্য।

দিদি বললেন, "কে জানে বাপু, গেলি নে কেন সঙ্গে। হাঁড়ির খবর জানা লোক ঘরে উঠে গেল।"

উঠবার চেষ্টা করার আগেই ঝোড়াটা কাঁধে করে লোকটি হাজির। গাড়ীর মধ্যে সেটাকে বসিয়ে ও দিদিকে গড় হয়ে প্রণাম করল।

দিদি বললেন, "কে বাবা তুমি?"

হাসল কি না জানি না। স্বরে কোনও ব্যতিক্রম নেই।

"চিনলেন না চারু দিদি? আমি মহেশ।"

পরক্ষণেই ও চেপে বসল ওর আসনে গাড়ীর উপরে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ীটা একটা টাল খেয়েই চলতে সুরু করল। বেগে চলতে লাগল।

ততোধিক বেগে চলতে লাগল আমার চিন্তাধারা। মহেশ! কোন্ মহেশ? মহেশ মিত্তির? সেই ত ছেলেবেলায় আসত আমাদের বাড়ীতে। পাঠশালায় পড়তাম তখন। দিদিমা মুড়ি আর নারকেলনাড়ু নিয়ে দাঁড়াতেন পাঠশালার বারান্দায়। আমি উঠে আসতাম। মহেশও আসত, ভাগ নিত। ওর বাড়ী থেকে আসত মালপো, ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলি; ভাগ দিত আমায়। ঝকঝকে চেহারার নাদুস-নুদুস কাত্তিকের মত ছেলে—মিত্তির বাড়ীর মহেশ। ওদের গাড়ী ছিল, জুড়ি ছিল। ও আসত একখানা পাল্কী-গাড়ী ...। চমৎকার গাড়ী। এটা কি সেই গাড়ী? সেই ...শ ও? তখন ত আমরা ছেলেমানুষ। ওদের বাড়ীতে যেন একটা মামলাঘটিত বিপর্য্যয় চলছিল। বাবা-জ্যেঠামশায়ের মুখে প্রায়ই শুনতাম ওতেই নাকি ওরা সর্ব্বস্বান্ত হয়েছিল।

অত্যধিক নাকউঁচু বনেদী বাড়ী ছিল ওদের। আমাদের সঙ্গে মিশ খেত না। তাই পরের ইতিহাসের স্রোতে মহেশকে আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম।

কিন্তু সেই মহেশ ও?

গাড়ী ততক্ষণ বেনিয়া পার্কের ধার ধরে চলেছে।

আমি গলাটা বাড়িয়ে ডাকলাম, "মহেশ!"

গাড়ী থেমে গেল।

বললাম, "আমি ওপরে বসব ভাই, গল্প করব।"

একটু কি ভাবল যেন ও। বলল, "শীত করবে তোমার বোধ হচ্ছে। তা হোক। এস বস।"

ওভারকোটটার ফাঁকে ফাঁকে কম্ফর্টারটা গুঁজে দিয়ে দস্তানাটা টেনে এঁটে বসলাম ওর পাশে। অল্প জায়গা তাই একটু বেশী ঘেঁষাঘেঁষি করেই বসতে হ'ল।

লজ্জা করছিল ওর পাশে ওভারকোট আর দস্ত'না চাপিয়ে বসতে। ওর গায়ে সেই ছেঁড়া জামা, আস্তাবলের গন্ধ।

চলন্ত ঘোড়াটার উপর চোখ পড়ল। সাদায়-বাদামীতে ছোপধরা রং। বেঁটেখাটো ঘোড়া। আঁটসাট শরীরে পেশী-গুলো দুলে দুলে উঠছে কদমে কদমে। মনে হচ্ছে যেন পালিশ করা গা। এই দুর্দ্দিনে ছোলা খাইয়ে তৈরি করা শরীর ওর। ঘাড়ভর্ত্তি লম্বা লম্বা চুল, ছলকে ছলকে এপাশ ওপাশ করছে। নাক দিয়ে শব্দ করছে, মাথাটা নীচু করে ঝোকড়ে আবার উঁচু করে দুলে দুলে ছুটছে। পিছনটা চওড়া আর ভারী, অসীম শক্তির পরিচায়ক। পিঠটি নীচু হয়ে গেছে ঢেউয়ের মত। ক্ষুর অবধি ঝুলছে ভারী গোছার লেজ। কান দুটো সজাগ সতর্ক। লাগাম, রাশ, সাজ—সব ঝকঝকে তকতকে।...হ্যাঁ, আদরের ঘোড়া বটে!

আমার ওভারকোটে বাঁ হাত বুলিয়ে বলল, "বেশ দামী জিনিষ, ইংলিশ, নয়?"

একটুও ভাল লাগে নি বলতে, "হ্যাঁ, কিন্তু তোমার ভাই, এ দশা কেন?"

মোটে না তাকিয়ে বলল, "তোমারই বা এ দশা কেন? ...এ প্রশ্ন ওঠে কি? 'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ' দুঃখানি চ'—সত্যই ঠিক। আমি মিত্তিরবাড়ীর ছেলে। আজ অঙ্গে বাস নেই, উদরে খাদ্য নেই, শীতের ভোরে গাড়ীর টোঙ্গে চেপে উদরান্নের সংস্থান করছি—এমনটা হ'ল কি করে?...বিস্ময় জাগছে, নয়? আমারও বিস্ময় জাগে না কি ভাবতে—চালকলা-বাঁধা পুরুতের ছেলের গায়ে বিলিতী ওভারকোট, হাতে দস্তানা কেন? কেন 'সিদ্ধি সাধ্যেসতামস্তু' ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে "to be or not to be" করছ? হয় না বিস্ময়? ক্লাসের সেরা আমি, আজ আমি গাড়োয়ান। বিস্ময় বটে। আর মাটো ছেলে অজিত এখন কৃতবিদ্য হতে চলেছে, বিস্ময় নয়?...তুমি আরোহী, গদি ছেড়ে টোঙ্গে বসলে সেটা বিস্ময় নয়?"

হঠাৎ খক্ খক্ করে কাশতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ওর সিটের হাতলের সঙ্গে ঝোলানো একটা টিনের কৌটা টেনে তুলল। শব্দ করে ঢাকনা দেওয়া, থুতুটা যত্ন করে তার মধ্যে ফেলে আবার বন্ধ করে রাখল।

ঘৃণা ও বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম। থুতু ফেলার এত সরঞ্জাম কেন?

"থুতুটা রাস্তায় ফেললে না কেন?"

"জান না? আমার টি-বি। জেনে-শুনে পথে ফেলি কি করে এই বিষ। কার্বোলিক এ্যাসিড সলুশন আছে ঐ ডিবেতে রোজ পরিষ্কার করি নিজের হাতে…বাঃ চমৎকার সিগারেট ত! গোল্ড ফ্লেক না মার্কোভিশ? একটা দাও না।"

দিলাম একটা সিগারেট। "স্মোক্ কর, ক্ষতি হয় না?"

ঘ্যান্‌ঘেনে গলায় আবার হেসে বলল, "জানুয়ারীর শেষে ভোর চারটায় গাড়ী হাঁকিয়ে যদি ক্ষতি না হয়, এতেও হবে না—ডিয়ার ব্রুটাস—তোমার সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ!"

ওঃ কি 'মরবিড' ওর মন হয়ে গেছে। যে ধার দিয়ে ছুঁই না কেন স্পর্শকাতর, ফিরে আসতে হয়।

নিজে থেকেই ও বলল, "হাউ হ্যাপি!"

"কি?"

"লাইফ—জীবন! মদির গন্ধব্যাকুল এই জীবন! পাচ্ছ না গন্ধ? ভোরের বাতাসে জীবনের গন্ধ পাই আমি; রাত্রের অন্ধকারে পাই মৃত্যুর ইশারা।"

কথার মোড় ফেরাবার জন্য বললাম, "চমৎকার গাড়ীখানা ভাবছিলাম এতক্ষণ। চমৎকার ঘোড়াটি বটে! সুন্দর!"

"কার কথা বলছ, চিল্কার? ওর নাম চিল্কা, আমার দুলারি চিল্কা।"

ঘোড়াটা যেন বুঝতে পারল। কান দুটো বার বার ঘুরিয়ে ঘাড়টা বেঁকিয়ে ও যেন মহেশের কথাগুলো শুনতে লাগল। দুলকি চালে ছন্দ তুলে চলতে লাগল ও।

এবার মহেশ ডুব মারল অতীত-রোমন্থনে। বলতে লাগল, "ওর নাম চিল্কা কেন জান? চিত্রা আর উল্কার সমন্বয়ে চিল্কা। চিত্রাকে তুমি চেন না, আমার স্ত্রী, আর উল্কা ছিল এই ঘোড়াটির নাম। বড় ভালবাসতাম এই ঘোড়াটাকে তাই স্ত্রী নাম দিয়েছিল চিল্কা। ঠাট্টা-করা নাম। বলত ওর নামে জড়িয়ে আমার নাম যদি মনে পড়ে তোমার। তাই সতীনকে নাম পরিয়ে দিলাম। সত্যিই তাই ওকে চিল্কা বলে ডাকি।…

"কেন, তোমার তো মনে পড়া উচিত সাদ। ঘোড়াটা ছিল আমাদের। তারই বাচ্চা ও। সেই মামলায় আমাদের সবই তো গেল। যেদিন নীলাম হ'ল তার আগের দিন মেজদার কাছে গিয়ে কেঁদে পড়েছিলাম এই ঘোড়াটি আর গাড়ীটার জন্য। পিসীমা জানতেন আমার সঙ্গে এই ঘোড়াটার সম্পর্কের ইশারা…তাঁরই দয়ায় এ দুটো বজায় থাকে। আমাদের সবই গেছে—কিছু নেই। শেষ ছিলেন মতিদি আর নান্নুদা। ওরাও গেল বার বেরিবেরিতে শেষ হয়ে গেল।"

"তোমার স্ত্রীর কথা বলছিলে। এর মধ্যে বিয়ে করলে কবে? এ ব্যবসাও তো তোমার করবার দরকার নেই। তুমি তো বি-এ অবধি পড়েছ জানতাম।"

আবার ও আমার দিকে চাইল। কি যেন হ'ল। অনেকক্ষণ কাশলে। টিন খুলে গয়ার ফেলল। গা-টা ছম্‌ছম্ করতে লাগল।

"বলছি, বলব সে কথা। মিত্তিরবাড়ীর পাত্র; আই-এ পড়তে পড়তেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। ব্যারিষ্টারের মেয়ে। ওদের পরিবেশ ছিল স্বাধীনতার পরিবেশ। এসে ঢুকল ঘেরাটোপ দেওয়া বনেদী বাড়ীর দুর্গে। আভিজাত্য নষ্ট হতে দেওয়া হ'ত না, পিসীমাদের বাড়ীর আর আমাদের বাড়ী অত কাছাকাছি থাকার জন্য রেষারেষিটা সনাতন ও মোক্ষম ছিল। কার বাড়ীর বাঁধন কত শক্ত। সেই বেড়াজালে এসে পড়ল চিত্রা।…

"জান ত ভাই আমি বরাবরই একটু মৃদু প্রকৃতির ছিলাম। বউকে পেয়েই ভালবেসেছিলাম, উত্তরা আর অভিমন্যুর ভালবাসা ভাবতে আমার মিষ্টি লাগত। ঝগড়া-ঝাঁটির মধ্যেই ওদের ছেলেবেলায় বিয়ে হয়েছিল কিনা? কি ভালই বাসতাম চিত্রাকে—আজও তা মনে হলে বাঁচতে ইচ্ছে করে। তার চিন্তার স্মৃতিতেই মাধুরী ভরা।…

—"তার একটা আবদার ছিল আমার কাছে। বেড়ানো। ঘোড়া চালনায় আমার ভারি প্রীতি ছিল। চিত্রা জানত বই আর বউ ছাড়া আমার তৃতীয় ব্যসন ছিল উল্কা…এই ঘোড়াটা। ও ক্রমাগত বলত, 'আমায় একদিন নিয়ে চল না তোমার গাড়ী চড়িয়ে বেড়াতে। শুধু তুমি আর আমি। দেখব তোমার উল্কার গতি। উল্কা টের পাবে না যে তার মনিবের লাগাম যার হাতে সে গাড়ীতে স্বয়ং। মজা হবে।' এমনি কত কথা!

—"কিন্তু পারলাম না তার সে সাধ পুরাতে।…না না, একেবারে পারি নি তা নয়।…প্রথম ছেলে হবার সময় পুরো হ'ল না। বাচ্চাটা তো গেলই চিত্রাকেও মেরে গেল। সেই কথাই বলছি। চিকিৎসা ঘটা করে হ'ল…বড়লোকের বাড়ী তার ত্রুটি হ'ল না। কিন্তু বাইরে বার করা গেল না বনেদী ঘরের বৌকে। তখন মামলায় আমরা হেরেছি তাই বাড়ীটা শোকে মুহ্যমান। রোগীর সেবায় ভাঁটা পড়েছে।…মা আর বাবা আমায় বলে গেলেন, 'আজ তুমি বৌমার কাছে থাক। আমরা বেরুচ্ছি, আসতে রাত হবে।' মতিদিকে শ্বশুরবাড়ী রাখতে নান্নুদা ভাগলপুর গিয়েছিলেন।…সত্যিই চিত্রার কাছে থাকবার কেউ ছিল না। ও জানত না তিন-চার দিনের মধ্যে বাড়ী ঘরদোর নীলাম হবে। মামলার সংবাদ ওর অজ্ঞাত ছিল।…সেদিন বিকেলটায় আমায় একা পেয়ে ওর

মন যেন গেয়ে উঠল। বলল, 'এ তোমার উষ্কাকে আদর করবার সময়। আমার কাছে আজ আটকা পড়েছ। এক কাজ কর না গো, কেউ তো নেই আজ, চল না আজ আমায় নিয়ে বেড়াতে। ওঁরা ফেরবার আগে ফিরে আসব।...একটু যাব ঐ রাজঘাটের ভাসা পুলটার উপর...গঙ্গার বাতাস, নদীর কলকলানি, তোমার উষ্কার খুরের শব্দ, তোমার সঙ্গ... চল না গো।' বাধা দিলাম। বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে, এ রোগে এতটা ধকল সইবে না। দুঃসময় আমাদের, এই সময়ে এই ধকল সামলাতে পারা যাবে না। তা ছাড়া বাবা-মাই বা কি বলবেন! বাবা-মা যে এই ক্ষয়া বৌটাকে দু'চোখে দেখতে পারতেন না, চিত্রা তা জানত। বললে, 'কিছু বলবেন না তারা। আগেই ফিরে আসব। চল না গো। আমি আর ভাল হব? তখন আবার গাড়ী চাপবে কি করে? তোমার মনে আমি রেশমের গুটিপোকা। উড়ে যদি পালাই ফুটো করে দিয়ে যাব। আর কোন কাজে লাগবে না সে গুটি—তুমি তো ভুলতে পারবে না। চল না গো..."

গাড়ী ধরতে যাব, এ কি বালাই! কি গল্প ফাঁদলে ও।

বললাম, "থাক্ ভাই গল্প তোমার। ভাল লাগছে না আমার।"

ঘড়ঘড়ে গলায় ও বললে, "লাগছে ভাল আমি জানি, সইতে পারছ না। হোক তা, শোন হে শোন। গুটি-পোকাটা পালাল কেমন করে। বুকটা যে ফুটো করে দিয়ে গেছে তা তো দেখতেই পাচ্ছ।" কাশতে কাশতে গয়ার ফেলল কৌটোয়।

"কি যেন নেশায় চাপল। গাড়াটা আস্তাবলে গিয়ে জুড়ে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। ওকে চমৎকার করে সাজালাম নিজের হাতে। রোগা হয় নি ততটা, সাদা হয়ে গিয়েছিল, সীমন্তে সিঁদুর তাই ডগডগ করছিল। বললে, 'সব করলে, পান দাও খাই। আলতা পেড়ে দাও, নিজে পরব।' সবই করলাম। সন্তর্পণে সিঁড়ি নেমে গাড়ীতে চাপলাম।

"পাল্কী-গাড়ী। এই গাড়ী। আমি উপরে। ওর সান্নিধ্য খুব যে পেলাম, তা নয়। ওর কিন্তু তাতেই আনন্দ। বলল, 'রাজঘাটে গিয়ে কিন্তু খানিকটা বালুর তীরে বসব দু'জনে, কেমন?' বসেছিলাম। ওর হাতে যেন স্বর্গ সেদিন। গাড়ীতে চেপে বাড়ী ফিরলাম। দেখি সদরে বাবা দাঁড়িয়ে। রাগে থম্‌থম্ করছে মুখ। আমি ভয় পাচ্ছিলাম। মনে হ'ল চিত্রার কথা, 'কিছু বলবেন না, দেখো।'

"কিছু তাদের বলতে হ'ল না। বউ আর বাড়ী ঢোকে নি। এই গাড়ীতেই সে মরে গিয়েছিল। মুখে তার আনন্দের রেখা, আনন্দের তুফানে ডুবে মরেছিল চিত্রা।

"বুঝতেই পারছ এ গাড়ী আমার কত প্রিয়। তাই পিসীমা দিতে দ্বিধা করেন নি।"

গাড়ীটা চলকে থেমে গেল একটা অন্ধকার জায়গায়।

আমি বললাম, "এ কোথায় থামলে এসে?"

ও বললে, "মারুয়াডিহ ষ্টেশন। ক্যান্টের গাড়ী কি আর পেতে? তাই কালীমহল দিয়ে সোজা মারুয়াডিহ এলাম। এখুনি গাড়ী আসবে। দেরি করাই নি তোমায়। কৈ আমার ভাড়াটা দাও।"

মারুয়াডিহ! অবাক হলাম। খুব জোর গাড়ী এসেছে তো! টের পাই নি। দিলাম ভাড়াটা। বললাম, "কত আয় হয় রোজ মহেশ?"

"তা হয়। গাড়ীটা ভাল, ঘোড়াটা ভাল। মাড়োয়ারীরা নেয়।"

"ঘোড়া গাড়ী এত ভাল রাখ, অথচ তোমার এ অবস্থা কেন?"

"তাজমহলের উপর শাজাহান যা খরচা করেছিলেন, নিজের ওপর তা করেন নি! কেন হে পণ্ডিত?" কিছুই যেন বলে নি, এমনি আলগোছে কথাটা বলেই, "চিন্ধা, আমার চিন্ধা—ওর উপর আমার বড্ড টান"—বলে ঘোড়াটার ঘাড়ে ও দুটো চাপড় মারলে আদর করে। ঘাড় থেকে কান অবধি ঘোড়াটার কেঁপে উঠল। চিন্ধার পিচ্ছিল দেহে আনন্দের সাড়া।

ট্রেন তখন 'ইন' করছে ষ্টেশনে।

সাহজীর মন্দির—শ্রীবৃন্দাবন

হিত-হরিবংশজী

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

১
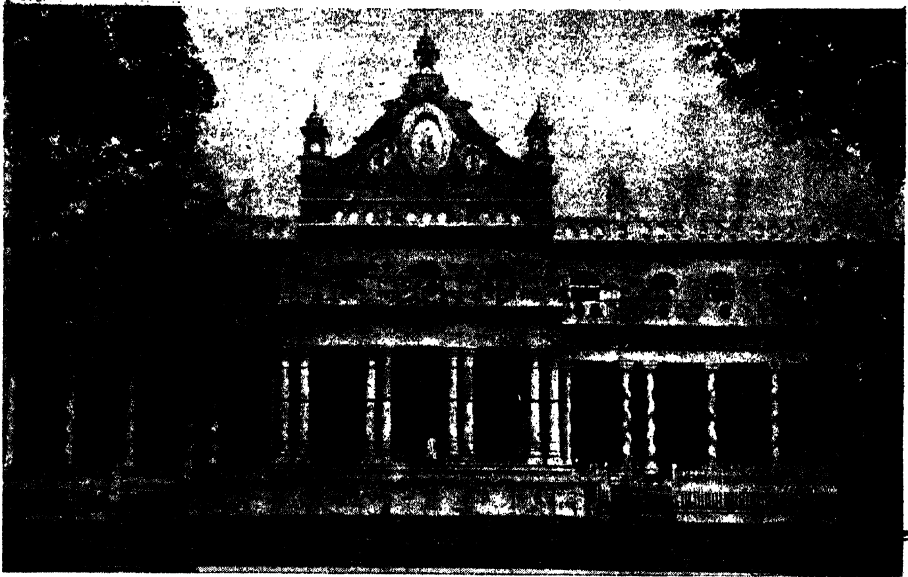
হরিদ্বারের নিকট সাহারাণপুর জেলার দেববন নামক গ্রামে ব্যাসমিশ্র নামক এক গৌড়-ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল তারা। ব্যাসমিশ্র নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি তদানীন্তন দিল্লীর বাদশাহের রাজজ্যোতিষীর কার্য করিতেন। সপরিকর বাদশাহ সিকন্দর লোদী দিল্লী হইতে আগ্রা যাইবার কালে পথিমধ্যে (মথুরা-আগ্রা রোডের উপরে, মথুরার পাঁচ মাইল দক্ষিণে) বাদগ্রামে শিবির স্থাপন করেন। তখন বাদশাহের অনুচর রূপে সপত্নীক ব্যাসমিশ্রও ছিলেন। ১৫৫৯ বিক্রম-সংবতে* (=১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে) উক্ত বাদগ্রামে বৈশাখী শুক্লা একাদশী তিথিতে সোমবারে অরুণোদয়কালে ব্যাসমিশ্রের ভার্যা তারা এক পুত্র প্রসব করেন। বহুদিন যাবৎ নিঃসন্তান বিপ্র-দম্পতি একটি সুসন্তান লাভের আশায় শ্রীহরির নিকট প্রার্থনা করিয়া আসিতেছিলেন। নবজাত পুত্রের দ্বারা বংশরক্ষা হইল দেখিয়া তাঁহারা পুত্রের নাম 'হরিবংশ' রাখিলেন। হরিবংশের সাক্ষাৎ শিষ্য দামোদর-দাসজী তাঁহার 'সেবকবাণী'-গ্রন্থে হরিবংশের আবির্ভাব-সংবতের উল্লেখ করেন নাই; কেবলমাত্র মাস, তিথি, বার, স্থান ও মাতাপিতার নামোল্লেখ করিয়াছেন।*

চৌদ্দ বৎসর বয়সে, স্বগ্রামে (দেববনে) রুক্মিণী নাম্নী একটি কন্যার সহিত হরিবংশের বিবাহ হয়। ইহার গর্ভে যথাক্রমে বনচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র ও গোপীনাথ নামে তিন পুত্র ও সাহেবাদেবী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হরিবংশ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে পুত্রকন্যাদির বিবাহ-প্রদানপূর্বক পত্নীকে স্বগ্রামে রাখিয়া শ্রীবৃন্দাবনের উদ্দেশে যাত্রা করেন (১৫৯৪ বিক্রম-সংবৎ=১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দ)। পথিমধ্যে হোডেলের নিকট চড়থাবল নামক এক গ্রামে আত্মদেব নামে জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হন। উক্ত ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের অর্চনা করিতেন। ব্রাহ্মণের কৃষ্ণদাসী ও মনোহরী নাম্নী দুইটি যুবতী অনূঢ়া কন্যা ছিল। ব্রাহ্মণ তাঁহার পূজিত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ ও কন্যাদ্বয়কে হরিবংশের হস্তে

* *Mathura: A District Memoir* by F. S. Growse (2nd Edition), p. 185. 1880.

* সেবকবাণী-গ্রন্থ জশবিলাস-নামক ১ম প্রকরণ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা শ্রীবৃন্দাবন ২০০৯ বিক্রম-সংবত।

সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইলে হরিবংশ তাহাতে স্বীকৃত হন। চড়থাবল গ্রামেই যথাবিধি বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বিগ্রহ এবং নববিবাহিতা পত্নীদ্বয় ও বহুবিধ যৌতুকদ্রব্য-সম্ভার সহ হরিবংশ বৃন্দাবনে আগমন করেন। ১৫৯৮ বিক্রম-সংবতে (=১৫৪১ খ্রীঃ) কৃষ্ণদাসীর গর্ভে মোহনচাঁদ নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মনোহরীর কোন সন্তানাদির কথা জানা যায় না।

হিত-হরিবংশজী

কথিত আছে, প্রায় ১৫৯০ বিক্রম-সংবতে (=১৫৩৩ খ্রীঃ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পার্ষদ শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ ভগবদ্ভক্তি প্রচার করিতে করিতে সাহারাণপুর জিলার দেববন নামক গ্রামের প্রান্তভাগ দিয়া যাইতেছিলেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগবশতঃ তিনি উক্ত গ্রামবাসী জনৈক গৌড়-ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীগোপাল ভট্টপাদের সৎকার করিয়া উক্ত গৃহস্বামী আপনাকে ধন্য জ্ঞান করেন এবং তাঁহার প্রথম সন্তানকে ভট্ট গোস্বামিপাদের সেবায় চিরতরে উৎসর্গ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। সেই সময় উক্ত গ্রামবাসী ব্যাসমিশ্রের পুত্র হরিবংশও গোপালভট্ট গোস্বামিপাদের দর্শনে ও বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার চরণাশ্রয় করেন এবং অচিরে বৃন্দাবন-গমনে কৃতসঙ্কল্প হন। পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণের পুত্র গোপীনাথও বৃন্দাবনে আসিয়া চিরতরে গোপালভট্ট গোস্বামিপাদের আশ্রয়ে অবস্থান করেন এবং পরে ভট্ট-গোস্বামিপাদের সেবিত শ্রীরাধারমণের সেবাভার প্রাপ্ত হন। গোপীনাথ দারপরিগ্রহ করেন নাই। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দামোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোপীনাথের আশ্রিত হন এবং সস্ত্রীক বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করেন। দামোদরের বংশধরগণের হস্তেই বর্তমানে বৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণের সেবার ভার ন্যস্ত
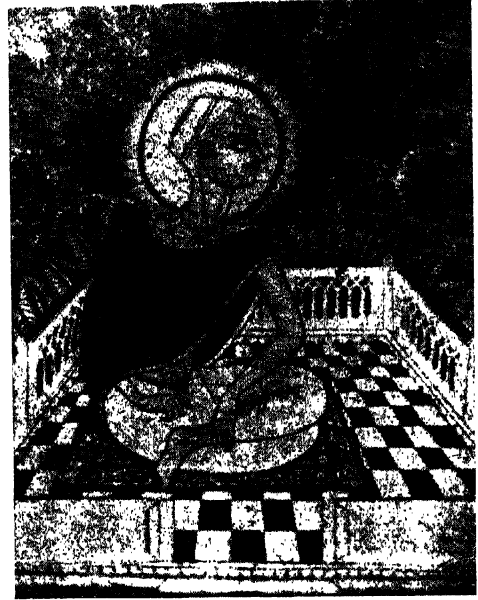
আচার্য-গাদীতে উপবিষ্ট হিত-হরিবংশজী

রহিয়াছে। হরিবংশ ও গোপীনাথ উভয়েই দেববন গ্রাম-নিবাসী ও গৌড় ব্রাহ্মণ-কুলে আবির্ভূত; এ জন্য গোপী-নাথের ভ্রাতা দামোদরের অধস্তন রাধারমণ-ঘেরার গোস্বামি-গণের সহিত হরিবংশের অধস্তন রাধাবল্লভী-সম্প্রদায়ের গোস্বামিগণের বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রচলিত আছে।

২

হরিবংশ পূর্বে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের (প্রচলিত মতানুসারে মাধ্ব-গৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ের) আচার্যবর্য গোপালভট্ট গোস্বামি-পাদের শিষ্য ছিলেন। এজন্য গ্রাউস্ সাহেবও লিখিয়াছেন:

"Originally he (Harivanas) had belonged to the Madhvacharya-Sampradaya."*

আলিগড়-হাইকোর্টের এডভোকেট বাবু তোতারাম

* Growse's *Mathura*, p. 186.

তাঁহার রচিত ব্রজবিনোদ* পুস্তকেও ইহা সমর্থন করিয়াছেন। ব্রজমণ্ডলের সর্বত্রও ঐরূপ কথা প্রচারিত আছে।

লালদাসকৃত ভক্তমালে পাওয়া যায়—

শ্রীমন্-হরিবংশ-গোস্বামি-চরিত্র।
জগতে ব্যাপিত হয় পরম পবিত্র॥
শ্রীমন্ গোপাল ভট্টজীর শিষ্য তেঁহো।
মহাভক্তিবান্ তেঁহো রাধাকৃষ্ণ প্রেমবহ॥†

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরণানুচর পরম-বিরক্ত লোকনাথ গোস্বামিপাদ ও ভূগর্ভ গোস্বামিপাদ সর্বপ্রথমে বৃন্দারণ্যে আসিয়া ভজন করিতে থাকেন। তৎ-পরে রূপ-সনাতন-রঘুনাথ দাস, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ প্রমুখ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ 'কাঁথা-করঙ্গিয়া-কাঙ্গালে'র বেশে বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করেন। ইহার পরে হরিবংশ-পত্নী, পরিকর ও ঐশ্বর্যাদি পরিবেষ্টিত হইয়া বৃন্দাবনে আগমন করেন। প্রাচীন কাগজপত্রাদি হইতে সনাতন ও রূপের ব্রজে আগমনকাল ১৫৭২ বিক্রম-সংবৎ (= ১৫১৫ খ্রীঃ) এবং গোপালভট্টের ব্রজে আগমনকাল—১৫৮৮ বিক্রম-সংবৎ (= ১৫৩১ খ্রীঃ) বলিয়া জানা যায়। হরিবংশের ব্রজে আগমনকাল—১৫৯৪ বিক্রম-সংবৎ (= ১৫৩৭ খ্রীঃ)।

বংশীবট—শ্রীবৃন্দাবন

সপত্নীক হরিবংশ বৃন্দাবনে আসিয়া দেখেন, অরণ্য-সমাকীর্ণ বৃন্দাবিপিনের কোথাও গৃহস্থের বাসোপযোগী স্থান নাই। বিশেষতঃ, সেই সময় নরবাহন নামক এক দস্যু-দলপতি দিল্লী ও আগ্রার পথে দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইত এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বৃন্দাবনের গহন অরণ্যে লুকাইয়া রাখিত। নরবাহন যে গ্রামে বাস করিত, উহার নাম হইয়াছিল ভয়গাঁও। এই স্থানটি বৃন্দাবন হইতে প্রায় চারি ক্রোশ উত্তরে যমুনাতীরে অবস্থিত। অদ্যাপি তথায় এক টিলার উপর নরবাহনের মৃন্ময় দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

জনশ্রুতি, হরিবংশ অলৌকিক শক্তি দ্বারা দুর্দান্ত নরবাহনকে স্বীয় পদানুগত করেন এবং নরবাহন চিরতরে দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া হরিবংশের বাণী-প্রচারের একজন প্রধান সহায়ক ও তৎসম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট সাধু বলিয়া পরিগণিত হন। হিন্দী ভক্তমাল লেখক নাভাদাসজী তাঁহার ভক্তমালে বাইশ জন অনুকূল ভগবদ্ভক্তের অন্যতমরূপে নরবাহনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।*

হরিবংশজী বৃন্দাবনে বরাহঘাটের নিকট মদনটের নামক স্থানে প্রথমে অবস্থান করেন এবং পরে 'পুরানাশহরে' যমুনার তটপ্রদেশে আত্মদেব ব্রাহ্মণের প্রদত্ত বিগ্রহকে 'শ্রীরাধা-বল্লভজী' নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। হরিবংশের অন্যতম শিষ্য (মতান্তরে হরিবংশজীর তৃতীয় পুত্র গোপীনাথজীর শিষ্য) ও তদানীন্তন দিল্লীর বাদশাহের খাজাঞ্চী কায়স্থ সুন্দরদাস শ্রীরাধাবল্লভজীর মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। অদ্যাপি পুরানাশহরে ঔরঙ্গজেবের দৌরাত্ম্য-কবলিত উক্ত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। উহার একটি স্তম্ভে মন্দির-নির্মাণের তারিখ ১৬৮৪ বিক্রম-সংবৎ (= ১৬২৭ খ্রীঃ) বলিয়া উৎকীর্ণ রহিয়াছে।† এখন কেবল মন্দিরের জগমোহন ও নাট-মন্দিরটি অর্ধভগ্নাবস্থায় আছে। উক্ত জগমোহনের এক

* 'ব্রজবিনোদ', ১২৬ পৃষ্ঠা, আলিগড়, ১৮৮৮ সম্বৎ।

† লালদাসবাবাজী বিরচিত, বলাইচাঁদ গোস্বামি-সম্পাদিত "শ্রীশ্রীভক্তমালগ্রন্থ"—২০শ মালায় 'চরিত্র-শ্রীহরিবংশ গোস্বামী', ৩১৯ পৃঃ, কলিকাতা ১৩০৫ বঙ্গাব্দ।

* শ্রীভক্তমাল সটীক, ১০৫ ছপ্পয়, ৬৪৪ পৃষ্ঠা, লক্ষ্ণৌ নবলকিশোর প্রেস, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ।

† ১৬৪৭ বিক্রম-সংবতে (= ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে) আকবর বাদশাহের ৩৪ রাজ্যাব্দে বৃন্দাবনস্থ শ্রীগোবিন্দদেবের নির্মাণকার্য শেষ হয়।

"The temple of 'Radha-Ballabh' is somewhat later than the series of four (Govinda, Madanmohan, Gopinath and Jugalkishore) already described, one of the pillars in the front giving the date of its foundation." —*Muttra A Gazetteer,* Vol. VII, p. 246, edited and compiled by D. L. Drake Brockman, 1911.

প্রকোষ্ঠের মধ্যে বর্তমানে হিত-হরিবংশের একটি আলেখ্য পূজিত হইতেছে। মুসলমান-উপদ্রবের পূর্বে শ্রীরাধাবল্লভজীকে কাম্যবনে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। ১৮৪১ বিক্রম-সংবতে (= ১৭৮৪ খ্রীঃ) আশ্বিনী শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে কাম্যবন হইতে পুনরায় রাধাবল্লভজীকে বৃন্দাবনে আনয়ন করা হয়। রাধাবল্লভজী আটখাম্বা পল্লীর (রাধাবল্লভজীর পুরাতন মন্দিরের পার্শ্বস্থ পল্লী) গদাধরপণ্ডিত গোস্বামিপাদের পরিবার ভট্টবংশীয় ব্রজবাসী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণের গৃহে এক বৎসরকাল অবস্থান করিবার পর পুরাতন মন্দিরের পার্শ্বে গুজরাটদেশীয় লোল্লুভাই নামক বণিক্-নির্মিত নূতন মন্দিরে অধিষ্ঠিত হন।

হিত-হরিবংশজীর শিষ্য দামোদরদাসজী (নামান্তর সেবকজী)

কাম্যবনে রাধাবল্লভজীর আর একটি সুবৃহৎ মন্দির আছে। রাধাকুণ্ডে (শ্যামকুণ্ডের তটে) রাধাবল্লভজীর একটি মন্দির ও হিত-হরিবংশের একটি বৈঠক আছে। বৃন্দাবনের কেশীঘাট হইতে পূর্বাভিমুখে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে মানসরোবর নামক স্থানে হরিবংশজীর ভজনস্থল ও সমাধি বিদ্যমান। বৃন্দাবনে সেবাকুঞ্জও (নিকুঞ্জবন) রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের একটি প্রধান স্থান। শৃঙ্গারবটের নিকট যমুনার তীরে রাসমণ্ডল নামক স্থানে হিত-হরিবংশের আর একটি সমাধিপীঠ আছে। রাধাবল্লভ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ ইহাকে 'হরিবংশসদন' বলেন। ১৬৪১ বিক্রম-সংবতে আষাঢ়ী কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথিতে হরিবংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র বনচন্দ্রজীর উপস্থিতিতে তাঁহার শিষ্য বিষ্ণুপুত্র-ভগবানদাস স্বর্ণকার বর্তমান আকারে উক্ত সদন নির্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রায় ঐ সময়েই (১৬৪০ বিক্রম-সংবতের মধ্যে) হিত-হরিবংশজীর নিধন হয়।* রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের মতে হরিবংশ সশরীরে অলৌকিক ভাবে অন্তর্হিত হন; বৃন্দাবনে ও নানা স্থানে অনুরূপ জনশ্রুতিও প্রচারিত রহিয়াছে। ১২৯৯ বঙ্গাব্দে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তৎসম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকায়† 'শ্রীমানসরোবর' শীর্ষক প্রবন্ধে হিত-হরিবংশজীর সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

৩

হিত-হরিবংশ শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের ধার ধারিতেন না, ইহার ইঙ্গিত কবি নাভাদাসজীও তাঁহার হিন্দী ভক্তমালের মধ্যে প্রদান করিয়াছেন।

> সর্বসু মহাপ্রসাদ প্রসিধতাকে অধিকারী।
> বিধি নিষেধ নহি, দাস অনন্য উৎকট ব্রতধারী॥‡

শাস্ত্রে একাদশীতে নিরাহার অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণের পক্ষে নিরাহার বলিতে মহাপ্রসাদান্ন পরিত্যাগই বুঝায়। কারণ তাঁহারা মহাপ্রসাদ ব্যতীত কখনও অন্য কিছু ভোজন করেন না। জীবগোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভে শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন, "অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্ন পরিত্যাগ এব,—তেষামন্যভোজনস্য নিত্যমেব নিষিদ্ধত্বাৎ, যথোক্তং নারদপঞ্চরাত্রে,—

> প্রসাদান্নং সদা গ্রাহ্যমেকাদশ্যাং ন নারদ।
> রমাদি-সর্বভক্তানামিতরেষাঞ্চ কা কথা॥ ইতি"; **

অর্থাৎ, শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে, "হে নারদ! সর্ব্বদা প্রসাদান্নই গ্রহণীয়; কিন্তু একাদশীতে তাহা গ্রহণীয় নহে। এই বিধি স্বয়ং লক্ষ্মীপ্রমুখ ভগবদ্ভক্তগণের পক্ষেও প্রযোজ্য; সাধারণের পক্ষে আর কি কথা!"

রাধাবল্লভী-সম্প্রদায়ে দীক্ষিত ব্যক্তিগণ একাদশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি হরিতোষণব্রতদিবসেও অন্ন-তাম্বুলাদি প্রসাদ গ্রহণ করেন; তৎসম্প্রদায়ে কোনপ্রকার ব্রতোপবাস স্বীকৃত হয় না। তাঁহাদের সম্প্রদায়ে শালগ্রাম পূজা, বৈদিক মন্ত্র, কামবীজ, কামগায়ত্রী প্রভৃতিও স্বীকৃত হয় না। তাঁহারা

---

* রামচন্দ্র শুক্ল-কৃত "হিন্দী সাহিত্যকা ইতিহাস" ১৮০-১৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† 'সজ্জনতোষণী'-পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় 'শ্রীমানসরোবর' প্রবন্ধ, বঙ্গাব্দ ১২৯৯, পৃঃ ৪৩-৪৫ দ্রষ্টব্য।

‡ শ্রীভক্তমাল সটীক—৯০তম ছপ্পয় ৫৭৯ পৃষ্ঠা. লক্ষ্ণৌ, নবলকিশোর প্রেস, ১৯১৩।

** শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৯৯ অনুচ্ছেদ।

অর্চনে শঙ্খ ও গরুড়ের মূর্তি-সংযুক্ত ঘণ্টা ব্যবহার করেন না। ঐসকল উপকরণ রাগমার্গের প্রতিকূল বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্যে তুলসী প্রদান করিলে তাঁহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণের ভোগের পূর্বেই তাহা উচ্ছিষ্ট হইয়া যায়। এজন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্যে কখনও তুলসী প্রদান করেন না। রাধাবল্লভী ব্রাহ্মণগণ সামাজিক প্রথা অনুসারে ব্রহ্মসূত্র গ্রহণ করিলেও ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করেন না। এই সম্প্রদায়ে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণশাস্ত্রের বিহিত উপাসনামূলক সিদ্ধান্তসমূহ স্বীকৃত হয় না। উক্ত সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইলে সকলেই বেদবিধির অতীত রাগমার্গের অধিকার প্রাপ্ত হন বলিয়া তাঁহারা মনে করেন।

ইঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত গোপীগণের বিরহ স্বীকার করেন না। হিত-হরিবংশজী তাঁহার চৌরাশী পদ-ধৃত 'মোহন-মদন-ত্রিভঙ্গী' নামক একটি পদে যে রাসলীলার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীমদ্ভাগবত-সম্মত শ্রীকৃষ্ণান্তর্ধান

মানসসরোবর

ও গোপীগণের বিরহানুভবের কথা উল্লেখ করেন নাই। তাঁহারা বলেন, হিত-হরিবংশের অনুভবই প্রধান প্রমাণ।

হিত-হরিবংশজী বৃন্দাবনে নিম্নলিখিত লুপ্ত লীলাস্থান-সমূহ পুনরায় প্রকট করিয়াছেন বলিয়া কথিত হয়। (১) সেবাকুঞ্জ (নিকুঞ্জবন), (২) রাসমণ্ডল (সাহাজীর মন্দিরের পশ্চাতে যমুনাতটে), (৩) বংশীবট ও (৪) মানসরোবর।

হরিবংশের নাদ ও বিন্দু-ভেদে দুই প্রকার পরিবার। নাদ অর্থাৎ শব্দাত্মক মন্ত্র হইতে যে বংশের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই শিষ্যবংশই 'নাদ পরিবার'-নামে খ্যাত। আর ঔরসজাত বংশপরম্পরা 'বিন্দু পরিবার' নামে বিদিত। ইঁহারাই রাধা-বল্লভী-গোস্বামিবংশ। শ্রীহরিবংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র বনচন্দ্রজীর বংশীয় গোস্বামিগণ শ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহের সেবা করেন।

হিত-হরিবংশজী স্বতন্ত্রভাবে যে সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা রাধাবল্লভী সম্প্রদায় নামে খ্যাত হয়। ইঁহারা শ্রীরাধা-বল্লভকে রাধাকৃষ্ণের মিলিত স্বরূপ বলেন। এই সম্প্রদায়ের ধ্রুবদাসজীর বাণীতে পাওয়া যায়:

রূপবেলি প্যারী বনি।
প্রিয়তম প্রেম তমাল॥
দোমন মিল একৈ ভয়ে।
শ্রীরাধাবল্লভ লাল॥

কথিত আছে, গোপালভট্ট গোস্বামি-পাদের রাধারমণ বিগ্রহের বামে যে রাধিকাস্বরূপ গোমতী-চক্রের সেবা আছে, তদনুসরণে হিত-হরিবংশজী রাধাবল্লভ বিগ্রহের বামে রাধিকার গাদী সেবা স্থাপন করেন। ইতঃপূর্বে গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ দ্বাদশটি শালগ্রাম সংগ্রহ করিয়া সেবার্থ তাহা বৃন্দাবনে আনিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে কয়েকজন শেঠ গোপালভট্ট গোস্বামীর ভজন-কুটীরে বিগ্রহের শৃঙ্গারের উপযোগী কিছু অলঙ্কারাদি প্রদান করিয়া যান। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের উপযোগী ঐ সকল অলঙ্কার শালগ্রাম শিলাকে কিরূপে পরাইবেন, ইহা চিন্তা করিতে করিতে গোস্বামিপাদ
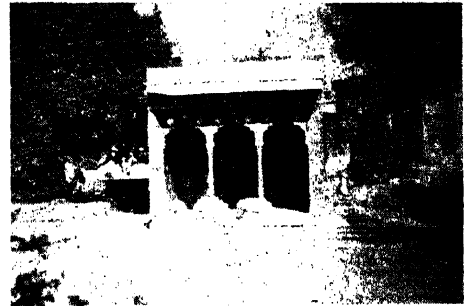
মানসরোবরের তটে হিত-হরিবংশের ভজনস্থান

সেই রাত্রি যাপন করেন। রাত্রি প্রভাত হইলে শালগ্রামের সেবার্থ উপস্থিত হইয়া গোস্বামিপাদ দেখিতে পান, দ্বাদশটি শালগ্রামের মধ্যে একটি শালগ্রাম ত্রিভঙ্গভঙ্গিম ব্রজকিশোর দ্বিভুজরূপে প্রকটিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এই বিগ্রহটিকে রূপ সনাতনাদি গোস্বামিপাদগণের উপদেশানু-সারে গোপালভট্ট 'শ্রীরাধারমণ' নামে প্রকাশ করেন। ইহার পর যুগল-সেবা করিবার উদ্দেশ্যে স্বর্ণময়ী রাধারাণী মূর্তি রাধারমণের বামে প্রকাশিত করা হয়। সেই রাত্রেই রাধারমণ স্বপ্নযোগে জানান যে, তাঁহার সহিত তাঁহার স্বরূপ-শক্তি শ্রীরাধা নিত্যই আছেন এবং তিনি স্বয়ম্ভূ-বিগ্রহ; তাঁহার বামে ধাতুময়ী অর্চা স্থাপন করা উচিত হয় নাই। ইহার পরই সেই স্বর্ণপ্রতিমাকে স্থানান্তরিত করিয়া রাধা-রমণের বামে গোমতী-চক্রসেবা সংস্থাপন করা হয়। ইহার অনুসরণেই পরবর্তীকালে হিত-হরিবংশজী রাধা-

বল্লভের বামে ও হরিদাসস্বামী বাঁকাবিহারীর বামে গাদী-সেবা স্থাপন করিয়াছেন।* রাধাবল্লভীগণ রাধারাণীকে তাঁহাদের আদিগুরু মনে করায় রাধাবল্লভ-বিগ্রহের বামে অধিষ্ঠিত গাদী-সেবাকে গুরুপীঠের সেবা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

ইঁহাদের মতে 'হিত হরিবংশ' শব্দটির মধ্যে 'হিত' শব্দের অর্থ পরম মাঙ্গলিক প্রেম; আর 'হরিবংশ' পদের অন্তর্গত 'হ' = হরি, 'র' = রাধা, 'ব' = বৃন্দাবন ও 'শ' (স) = সখী। ইঁহারা নিম্নলিখিত বাক্যকে মহামন্ত্ররূপে জপ ও কীর্তন করেন :

শ্রীরাধাবল্লভ শ্রীহরিবংশ।
শ্রীবৃন্দাবন শ্রীবনচন্দ্র॥

সেবাকুঞ্জ, শ্রীবৃন্দাবন

এই 'বনচন্দ্র' হিত-হরিবংশজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। সুতরাং এই পদটি বনচন্দ্রের পরে বা সমকালে তৎসম্প্রদায়ে প্রচলিত হইয়াছে।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, ইঁহারা বেদাদি শাস্ত্রকে স্বতন্ত্রভাবে ও স্বকল্পনানুসারে স্বীকার করেন। ব্রহ্মসূত্রের উপর ইঁহাদের তিনটি ভাষ্য আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, অদ্যাপি কোনটিই মুদ্রিত হয় নাই। পাটনানিবাসী জনৈক প্রিয়দাস ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের মাত্র তিন পাদের উপর রাধাবল্লভীয় সিদ্ধান্তানুযায়ী এক ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ইহার নাম 'ত্রিপদী ভাষ্য'। এতদ্ব্যতীত রেওয়ার রাজা বিশ্বনাথ সিংহ (রাজত্বকাল সংবত ১৮৯০-১৯১১) 'রাধাবল্লভীয় ভাষ্য' নামক ব্রহ্মসূত্রের একটি সম্পূর্ণ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।† হরিবংশজীর দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রজী 'ব্যাসনন্দন ভাষ্য' নামক আর একটি সূত্র-ভাষ্য রচনা করিয়াছেন একথা ইঁহারা বলেন; কিন্তু উক্ত ভাষ্যের কোন অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। পাটনানিবাসী প্রিয়দাস ঈশোপনিষদের একটি ভাষ্য লিখিয়াছেন। বৃন্দাবনস্থ রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের কোনও পণ্ডিত ও আচার্য আমাদিগকে বলিয়াছেন, হিত-হরিবংশজীর সিদ্ধান্তের নাম—'সিদ্ধাদ্বৈতবাদ'; কিন্তু উক্ত মতবাদের বিশ্লেষণাত্মক কোনও গ্রন্থ আজও পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। রাধা ও রাধাবল্লভে অদ্বৈতভাব বা অভেদত্ব নিত্যসিদ্ধ—ইহাই সিদ্ধাদ্বৈতবাদ। ইহা জীবের সিদ্ধাবস্থায় ঈশ্বরের সহিত অভেদজ্ঞাপক কেবলাদ্বৈতবাদ নহে। অপর পক্ষে উক্ত সম্প্রদায়েরই কেহ কেহ বলেন, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের কোনও বিশেষ বৈদান্তিক মতবাদ নাই।
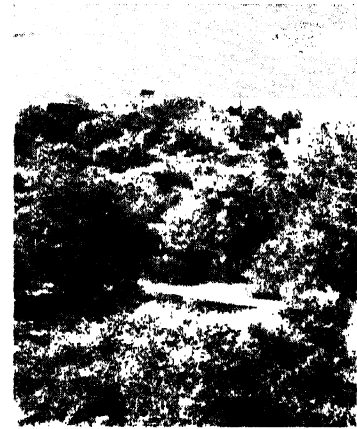
সেবাকুঞ্জ (নিকুঞ্জবন), শ্রীবৃন্দাবন

৪

হিত-হরিবংশজী তাঁহার ভজনবিষয়ক মতবাদসমূহ ব্রজভাষাতেই প্রচার করিয়াছেন। ব্রজভাষায় রচিত তাঁহার (১) স্ফুটবাণী (২৬টি বা ২৭টি পদ), (২) গদ্যে লিখিত দুইটি পত্র (দেব-বনবাসী 'বিটলদাস' নামক শিষ্যের নিকট লিখিত) ও (৩) চৌরাশীজী (চৌরাশীটি পদ) এই তিনখানি গ্রন্থ দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার নামে আরোপিত, সংস্কৃত ভাষায় রচিত যমুনাষ্টক ও রাধারসসুধানিধি গ্রন্থও বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থটি হরিবংশ ছয় মাস বয়সে দোলায় শায়িতাবস্থায় গান করেন, এরূপ কথা তৎসম্প্রদায়ে প্রচারিত আছে।*

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতে 'শ্রীরাধারসসুধানিধি' গ্রন্থখানি

* আমরা এই কথাটি বৃন্দাবনের রাধারমণঘেরাস্থ সধামগত পণ্ডিত মধুসূদন সার্বভৌম মহাশয়ের মুখে শ্রবণ করিয়াছি এবং এইরূপ কথা বৃন্দাবনের রাধারমণঘেরার সেবকগণের মধ্যে পরম্পরাক্রমে প্রচারিত আছে।

† রেওয়া নরেশের সরস্বতী-ভাণ্ডার, বস্তা নং ১২, পুস্তক-সংখ্যা ৫১। এই হস্তলিখিত পুথির পত্রসংখ্যা ২৩৭।

* শ্রীহিতদাস সম্পাদিত শ্রীরাধাসুধানিধির ভূমিকার অন্তর্গত 'জীবন-চরিত্র', ৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুচর প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের রচিত। তাঁহারা বলেন, প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের রচিত 'শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃত', 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থের সহিত শ্রীরাধা-রসসুধানিধির ভাব, ভাষা ও ছন্দের এতটা সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় যে, ঐ সকল গ্রন্থ একই ব্যক্তির রচনা—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।* তবে যে রসসুধানিধির কোন কোন পুথির পুষ্পিকায় বা রসিকোত্তংস-রচিত, মুদ্রিত 'প্রেমপত্তন' গ্রন্থ-ধৃত রাধারস-সুধানিধির দুই-একটি উদ্ধৃতির পূর্বে হিত-হরিবংশের নাম পাওয়া যায়, তাহার কারণ এই যে, হরিবংশজী গোপালভট্ট গোস্বামিপাদের স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইবার পরও ভট্ট-গোস্বামীর বিদ্যাগুরু বর্ষীয়ান্ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ প্রশিষ্য হরিবংশকে আশ্রয়প্রদান এবং স্বলিখিত শ্রীরাধারস-সুধানিধি গ্রন্থটি তাঁহার নামে প্রচার করেন। এই কথা বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে বহুকাল হইতে প্রচারিত আছে।

শ্রীরাধাবল্লভজীর পুরাতন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ—পুরানাশহর, বৃন্দাবন

শ্রীরাধারসসুধানিধির-রচয়িতা তাঁহার গ্রন্থের বহু স্থানেই বৃন্দাবনের বিচিত্র শোভা বর্ণনা করিয়াছেন এবং উক্ত গ্রন্থ রচনাকালে বৃন্দাবনবাসিগণের দর্শনলাভ করায় তাঁহাদের প্রতি তাঁহার আরাধ্য বুদ্ধির উদয় ও গ্রন্থ-রচনায় প্রেরণা লাভ হইয়াছে, ইহাও উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, শ্রীরাধারসসুধানিধি বাদগ্রামে দোলায় শায়িত ছয় মাসের শিশুর গান নহে। ইহা বৃন্দাবনবাসী, বৃন্দাবনমহিমামৃত-লেখক, সংস্কৃত দর্শন ও কাব্যশাস্ত্রে পরম-পণ্ডিতের পরিপক্ক লেখনীপ্রসূত স্তোত্রকাব্য।* যথা :

> সদ্‌যোগীন্দ্র সুদৃশ্য সান্দ্ররসদানন্দৈকসম্মূর্ত্তয়ঃ
> সর্বেঽপ্যদ্ভুত সন্মহিম্নি মধুরে বৃন্দাবনে সংগতাঃ।
> যে ক্রূরা অপি পাপিনো ন চ সতাং সম্ভাষ্য দৃশ্যাশ্চ যে
> সর্বান্ বস্তুতয়া নিরীক্ষ্য পরম-স্বারাধ্য-বুদ্ধির্মম॥†

আশ্চর্যময় নিত্য মহিমাশালী মধুর বৃন্দাবনে মিলিত সকলেই সাধুশ্রেষ্ঠ যোগিগণের সুদৃশ্য, গাঢ় আনন্দাস্বাদপ্রদ এবং একমাত্র আনন্দের শোভনবিগ্রহ। এমন কি, যাহারা নৃশংস, পাপপরায়ণ, সাধুগণের সম্ভাষণ ও দর্শনের অযোগ্য, তাঁহাদের সকলকে দেখিয়া বাস্তবপক্ষে আমার পরম সুখা-রাধ্যরূপে বুদ্ধি উদিত হইতেছে।

শ্রীরাধাবল্লভজীর বর্ত্তমান মন্দির—পুরানাশহর, বৃন্দাবন

রাধাবল্লভীগণ গ্রন্থটিকে 'রাধারসসুধানিধি' নামে অভিহিত না করিয়া 'রাধাসুধানিধি' বলেন। বস্তুতঃ উক্ত গ্রন্থের উপসংহারে গ্রন্থের নাম 'রসসুধানিধি'ই দৃষ্ট হয় :

> অদ্ভুতানন্দলোভশ্চেন্নাম্না রসসুধানিধিঃ।
> স্তবোঽয়ং কর্ণ-কলসৈর্গৃহীত্বা পীয়তাং বুধাঃ॥‡

* এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রবন্ধলেখকের রচিত 'শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

* শ্রীরাধারসসুধানিধিঃ—স্তোত্রকাব্যম্—শ্রীমধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতিনা বঙ্গভাষানুদিতং সম্পাদিতঞ্চ, আলাটি, হুগলী, বঙ্গাব্দ ১৩২০, ভূমিকা।

† শ্রীরাধাসুধানিধিঃ, ২৬৪ শ্লোক

‡ ঐ, ২৭০ শ্লোক

হে পণ্ডিতবর্গ, যদি আপনাদের অত্যাশ্চর্য আনন্দপ্রাপ্তি বিষয়ে লোভ থাকে, তাহা হইলে এই 'রসসুধানিধি' নামক স্তব কর্ণরূপ কলসসমূহ দ্বারা গ্রহণপূর্বক পান করুন।

হিত-হরিবংশজীর শিষ্য নরবাহন ব্রজভাষায় পদ রচনা করিয়াছিলেন। হরিবংশের অন্যতম শিষ্য দামোদরদাস (নামান্তর সেবকজী) 'সেবকবাণী' নামে রস ও সিদ্ধান্তবিষয়ক পদ ব্রজভাষায় রচনা করিয়াছেন। ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। হরিবংশের জ্যেষ্ঠপুত্র বনচন্দ্র সংস্কৃতভাষায় 'শ্রীরাধষ্টোত্তর

হিত-হরিবংশজীর সমাধি-মন্দির

শতনামানি', 'হরিবংশাষ্টকম্' ও 'প্রিয়ানামাবলী' এবং ব্রজভাষায় পদাবলী রচনা করেন। দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র সংস্কৃত ভাষায় 'আশাস্তবঃ', 'ব্যাসনন্দনাষ্টকম্', 'বৃহদ্‌রাধাভক্তিমঞ্জুষা' 'মানাষ্টপদী' (১ম ও ২য়) ইত্যাদি গ্রন্থ এবং ব্রজভাষায় পদাবলী রচনা করেন। তৃতীয় পুত্র গোপীনাথ ব্রজভাষায় রসবিষয়ক পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। হরিবংশের দ্বিতীয়া পত্নী কৃষ্ণদাসীর গর্ভজাত মোহনচন্দ্রও ব্রজভাষায় পদাবলী রচনা করিয়াছেন। শ্রীরাধারসসুধানিধি হরিবংশজীর রচিত বলিয়া তৎসম্প্রদায় হইতে দাবি করা হইয়াছে। কিন্তু হরিবংশের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত-পুত্রগণ বা তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ কেহই উক্ত গ্রন্থের টীকা রচনা করেন নাই। উক্ত সম্প্রদায়েরই বিবরণানুসারে* অষ্টাদশ শতাব্দীতে সন্তদাস, লোকনাথ ও তুলসীদাস এবং উনবিংশ শতাব্দীতে দুই-একজন ব্যক্তি ব্রজভাষায় শ্রীরাধারসসুধানিধির টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। মুম্বই বেঙ্কটেশ্বর প্রেস হইতে ১৯৬৪ সংবতে প্রকাশিত সংস্করণে রাধাবল্লভীয় কৃপালাল গোস্বামী কর্তৃক ১৮৩০ সংবতে রচিত চষক নামক একটি সংস্কৃত টীকা মুদ্রিত দেখা যায়। অষ্টাদশ, বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দী হইতেই উক্ত গ্রন্থের টীকার বহুল প্রচার-প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকটি স্বতন্ত্র উপ-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

১। রেওয়া-নিবাসী প্রিয়াদাসজীর স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। ইহাঁরা হরিবংশকে স্বীকার করেন।

২। প্রাণনাথী-সম্প্রদায় (হরিবংশ হইতে চতুর্থ অধস্তন দামোদরজীর শিষ্য প্রাণনাথের প্রবর্তিত)। ইহাঁরা হরিবংশকে মানেন না।

হরিরাম ব্যাস হরিবংশজীকে শিক্ষাগুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন; কিন্তু তাঁহার অধস্তনগণ হরিবংশকে হরিরামের শিক্ষাগুরুরূপে স্বীকার করেন না। তাঁহারা নিজেদের মাধ্ব-সম্প্রদায়ী বলিয়া পরিচয় দেন।

* শ্রীহিত-রাধাবল্লভীয় সাহিত্যরত্নাবলী, সম্পাদক—কিশোরীশরণ অলি, বৃন্দাবন ২০০৭ সংবৎ।
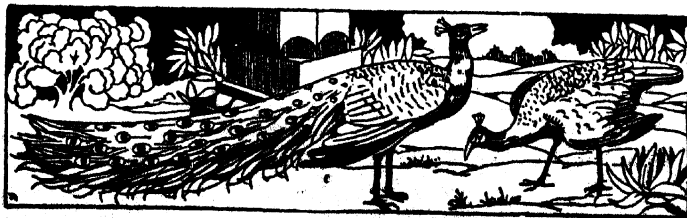
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

[তৃতীয় অধ্যায়]

অনুবাদিকা—শ্রীচিত্রিতা দেবী

য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ
সর্ব্বাল্লোঁকানীশত ঈশনীভিঃ
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥১

যে পরম এক শাসন করেন, বিশ্বশক্তি মায়া
যাঁহার নিয়মে, নবীন জন্মে, জীব লভে নবকায়া
যিনি মায়বলে, ঘটান সবার জন্ম অভ্যুদয়,
তাঁহারে স্বরূপে, যে জানে, সেই তো, মর্ত্যে অমৃতময় ॥১

একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায়
তস্থু র্য
ইমাল্লোঁকান ঈশত ঈশনিভিঃ
প্রত্যঙ্ জনাং স্তিষ্ঠতি
সঙ্কুকোপান্তকালে,
সংসৃজ্য বিশ্বাভুবনানি গোপাঃ ॥২

মায়াবী রুদ্র, তুমি অখণ্ড এক,
দ্বিতীয় কাহারে চায়নি তোমার ঋধি,
প্রতি জীবে তুমি অন্তর্যামী, বিশ্বে রয়েছে,
তোমারি শক্তি মিশি,
তোমার শক্তি করিছে সৃষ্টি,
পালিছে নিত্য অনন্ত ত্রিভুবন,
আবার প্রলয়ে সংহার রূপে,
ধ্বংস করিছ আপনি আপন ধন ॥২

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো
বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ
স বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈ
দ্যাবাভূমী জনয়ন্
দেব একঃ ॥৩

এই বিশ্বের চোখ মুখ, আর বাহু, পদ যত,
সকলি তাঁহার ধন।
পক্ষীরে দেন পক্ষ, মানুষে, হস্ত চরণ মন।
দ্যুলোক ভূলোক রচনা করিয়া আপনি প্রকাশ পান,
বিচিত্র রূপে সে অনাদি দেব, একাকী বিরাজমান ॥৩

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস
পূর্বস্।
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥৪

তাঁহারি মাঝারে, দেবতাগণের
জন্ম অভ্যুদয়,
বিশ্বপালক সর্বজ্ঞানী রুদ্র সর্বময়।
সৃষ্টিপূর্বে সৃষ্টিশক্তি সৃজেন যে মহামুক্ত।
সেই প্রভু আজ মোদের বুদ্ধি, মঙ্গলে কর যুক্ত ॥৪

যা তে রুদ্র শিবা তনূ রঘোর
হপাপবাশিনী
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া
গিরিশন্তাভিচাকশীহি ॥৫

দেহ মাঝে মম, তুমি দেহসুখ, হে রুদ্র মঙ্গল।
দেখাও তোমার পবিত্র রূপ শুদ্ধ সমুজ্জ্বল।
শুচিসুন্দর আনন্দময়, তব চক্ষের আলো,
পড়ুক মোদের (মূঢ়তার পরে,
দূর হোক যত কালো) ॥৫

যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে
বিভর্ষ্যস্তবে
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু
মা হিংসীঃ
পুরুষং জগৎ ॥৬

ওগো সুখ, ওগো রক্ষক প্রভু
করধৃতবাণ কর মঙ্গলময়।
তোমারি জগৎ, তোমারি মানব,
মেরো না তাদের, (আনন্দে করো জয়)
তাহাদের চোখে, নিজেরে কেবলি,
রেখো না আবৃত করে।
এমন হিংসা কোরো না গো আর
নিজ সন্তান 'পরে ॥৬

ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং
যথা নিকায়ং সর্বভূতেষু
গূঢ়ম্‌।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্‌
ঈশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতা
ভবন্তি ॥৭

জগতের আদি মূল বীজ সেই
বিরাট হতেও শ্রেষ্ঠ।
সর্ব্বভূতের বিভিন্ন দেহে,
নিগূঢ় পরম শ্রেষ্ঠ,
বিশ্ব ঘেরিয়া অনাদি একক, পরমেশ্বর প্রভু।
যে জানে তাঁহার স্বরূপ তাহার, জন্ম হবে না কভু ॥৭

বেদাহ মেতং পুরুষং
মহান্তম্‌।
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যু মেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥৮

জেনেছি তাঁহারে, তমপরপারে,
প্রকাশস্বরূপ সত্য।
মহান্‌ পুরুষ পূর্ণ মানব সূর্য্যের মত দীপ্ত।
তাঁহারে জানিলে, মৃত্যুসাগর পার হয়ে যায় ভক্ত
তিনি ছাড়া আর পথ নাই কোন
যদি হতে চাও মুক্ত ॥৮

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি
কিঞ্চিদ্‌
যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি
কশ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্‌ ॥৯

সবার শ্রেষ্ঠ, সকলের নীচে,
অণু হতে অণু, মহত্তেরো বড়,
মহিমায় উজ্জ্বল।
বৃক্ষের মত স্তব্ধ পুরুষ,
আপন প্রভাবে, ব্যাপিয়া বিশ্ব,
ভরেছে ভুবনতল ॥৯

ততো যদুত্তরং তদরূপমনাময়ম্‌
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্য-
থেতরে, দুঃখমেবাপি
যন্তি ॥১০

জগৎ-কারণ-অতীত, মহান, অরূপ অতাপতত্ত্ব।
যে তাঁরে জেনেছে, সেই তো লভেছে,
পরম অমৃতসত্ত্ব।
জানে না যাহারা তারা ভোগ করে, দুঃখ জীবন ভরে,
(বাসনার জালে জড়ায়ে নিজেরে,
বাঁধে মৃত্যুর ডোরে) ॥১০

সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ
সর্বব্যাপী স ভগবাং স্তস্মাৎ
সর্বগতঃ শিবঃ ॥১১

মুখ মস্তক কণ্ঠ ও বাহু সর্ব প্রাণীর
সর্ব অঙ্গ পূর্ণ বিভূতিময়।
তবু বুদ্ধির গহন গুহায় গোপনে সম্প্রবিষ্ট,
মঙ্গলরূপ নিখিল বিশ্বময় ॥১১

মহান প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ
প্রবর্তবাঃ
সুনির্মলামিমাং প্রাপ্তি
মীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥১২

অবিনাশী প্রভু, মানসবিহারী,
তাঁরি মহা প্রেরণায়,
চিত্তগহনে, নির্মলা আশা,
তাঁরে লভিবারে চায় ॥১২

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ
হৃদা মন্বীশো মনসভিক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥১৩

হৃদে* দৃশমান, পূর্ণস্বরূপ, অন্তর্যামীরূপে,
গোপনে গোপনে, সবার হৃদয়ে, ফিরেছেন চুপে চুপে
জ্ঞানালোক জ্বেলে, তাঁরে দেখা যায়,
মননে প্রকাশ পান,
যে জানে এ বাণী মর্ত্যে সে জন, নিত্য অমৃতবান্‌ ॥১৩

* হৃদয়ের পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠ মাত্র। হৃদয়ে অনুভূত হন বলে পরমাত্মাকে যেন অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ বলা হয়েছে।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ
সহস্রপাৎ
স ভূমিং বিশ্বতোবৃত্বাহত্যতিষ্ঠৎ
দশাঙ্গুলম্ ॥১৪

হাজার চক্ষু কোটি মস্তক, হাজার
চরণতলে,
বিশ্ব ব্যাপিয়া, তাঁহার বিকাশ-
হৃদয় পদ্মদলে ॥১৪

পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ ভূতং
যচ্চভব্যম্ ।
উতামৃতত্বস্যে শানো যদন্নে
নাতিরোহতি ॥১৫

অনাগত তিনি তিনিই অতীত, বর্তমানের অন্তরে।
মুক্তিবিধাতা নন শুধু তিনি, এই জীবনেরো তরে,
অসীম আশায় অন্ন বহিয়া
ফিরিছেন ঘরে ঘরে ॥১৫

সর্বতঃ পাণিপাদস্তৎ সর্বতোঽ
ক্ষিশিরোমুখম্
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোবা,
সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥১৬

সকল প্রাণীর মুখ মস্তক, তাঁহারি বলিয়া জেনো,
হস্ত চরণ চক্ষুকর্ণ সকলি তাঁহার মেনো,
তিনিই আত্মা প্রতি প্রাণীদেহে, বিশ্বে বিরাজমান্।
সর্বব্যাপিয়া চিত্তে নিগূঢ় নন্দিত করে প্রাণ ॥১৬

সর্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং
সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ ।
সর্বস্য প্রভুমীশানং
সর্বস্য শরণং বৃহৎ ॥১৭

সব ইন্দ্রিয় গুণাভাস তিনি,
তবু ইন্দ্রিয় ছাড়া।
সবার শরণ, পরম কারণ,
তবু তিনি গুণহারা ॥১৭

নবদ্বারে পুরে দেহী হংসে ।*
লেলায়তে বহিঃ
বশী সর্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য
চরস্য চ ॥১৮

অবিদ্যাঘাতী পরম আত্মা,
যিনি ত্রিলোকের নিয়ন্তা ।
তিনি অকারণে, দেহ-উপবনে, জীবভাবে হয়ে মুগ্ধ,
নবদ্বারপথে, নিজ মনোরথে, বিষয় লভিতে লুব্ধ॥১৮

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্য চক্ষু স শৃণোত্যকর্ণঃ
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি
বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥১৯

অঙ্গবিহীন করপদহীন তবু দ্রুত চ'লে যান,
চক্ষুকর্ণ নেই তাঁর তবু দেখিতে শুনিতে পান ।
যাহা জানিবার, জানেন সকলি,
কেউ তো জানে না তাঁরে,
ঋষি বলে তিনি পূর্ণ পুরুষ, চাও তাঁরে জানিবারে ॥১৯

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান,
আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য
জন্তোঃ
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো,
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমান
মীশম ॥২০

অণু হতে অণীয়ান, মহৎ হইতে মহীয়ান্
গোপন গুহায় নিহিত রয়েছে, জীবের আত্মপ্রাণ ।
বাসনাশূন্য সে মহাচেতনা, এই ক্ষণিকের জীবনে,
শাশ্বত আর অক্ষয় রূপে, যে দেখে আপন মনে,
লভে সে শান্তি, লভে আনন্দ দুঃখশোকের পার ।
তাঁহারি কৃপায় হেলায় তরায় দুস্তর পারাবার ॥২০

বেদাহমেতমজরং পুরাণং
সর্বাত্মানং সর্বগতং বিভুত্বাৎ
জন্মনিরোধ প্রবদন্তি যস্য
ব্রহ্মবাদিনো হি প্রবদন্তি নিত্যম্ ॥২১

জন্মবিহীন, অজর (অমর) চির শাশ্বত সত্য ।
সর্ব ব্যাপিয়া সকলের মাঝে,
সে দেব আছেন নিত্য,
জেনেছি তাঁহারে (চিত্ত মাঝারে),
চির অনন্ততত্ত্ব ॥২১

* হংসঃ— অবিদ্যা হনন করেন বলে তিনি হংস।

দীর্ঘজীবী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

হে সুধী, তোমাকে দীর্ঘজীবন দিয়াছেন ভগবান।
সার্থক তুমি করেছ কি তাঁর দান ?
লইয়া রুগ্ন মন, আর তনু ক্ষীণ,
নিরানন্দেই যাপ না তো শুধু দিন ?
তোমার জীবনে বৈচিত্র্যের
হয় নি তো অবসান ?

২

করে না তো আজ একদা-সরস ভাব-ভূয়িষ্ঠ মন—
অতীত সুখ আর দুখই রোমন্থন ?
বহু আগে যদি ছেড়ে যেতে তুমি ধরা—
কি করিতে বাকি রহিত ? উচিত স্মরা,
ভোগ ও রোগের কথাই কেবল
করনা তো চিন্তন ?

৩

আজ তুমি যেন, বিগত দিনের স্মৃতি ও সংস্কৃতি,
শ্রদ্ধা জাগায় তোমার উপস্থিতি।
বহুদূরাগত হে পুরুষ পুরাতন,
আনন্দময় তব সন্দর্শন,
তারা-ভরা তব জীবন-প্রদোষ
যুগের জন্মতিথি।

৪

দেশ ও জাতির পূর্ণকুম্ভ, তুমি মঙ্গলঘট,
বৃদ্ধ বকুল, তুমি অক্ষয় বট।
যুগ-দেবতার হে প্রসাদী মৃগমদ—
তব গাত্রের সমীরও পুণ্যপ্রদ,
চক্রতীর্থ তব সন্নিধি
তোমার সন্নিকট।

৫

দেহ চেয়ে তব অধিক কর্ম্ম করিবে এখন মন।
প্রভাসে গড়িবে গোকুল বৃন্দাবন।
মতি অচপল, গতি তব মন্থর,
মানস-পূজার এই শুভ অবসর,
কর তব ম্লান নেত্র দীপেতে
আরতির আয়োজন।

৬

দেবীর চরণে হয়েছে কি দেওয়া—কাল যে হতেছে গত
নীল উৎপল অষ্টোত্তর শত ?
কর বর লাভ, নাহি তো অধিক দেরী,
শোনো, রহি রহি ওই যে বাজিছে ভেরী,
জয়ের স্বপ্ন দেখিছে এখনো
পতাকা সমুন্নত।

৭

পরিপূর্ণতা দুর্লভ—উহা অভিশাপ কভু নহে।
ভবিষ্যতের বীজ যে উহাতে রহে।
করিবার কাজ এখনো তোমার আছে,
তোমার নিকট ভাব আজও রূপ যাচে,
চন্দনসম সার্থক তুমি—
তব জয় জেনো ক্ষয়ে।

৮

বৃথায় তোমারে দীর্ঘজীবন দেন নাই পরমেশ,
তোমারে যে চায় এখনো জাতি ও দেশ।
অকর্ম্মণ্য নির্জীব তুমি নহ,
শিব সুন্দরে আলিঙ্গি' তুমি রহ,
মার্কণ্ডেয় সম লাভ কর
অমৃতের পরিবেশ।

মহেন্দ্রলাল সরকার

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বাংলার একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। তাঁহার একখানি সুষ্ঠু জীবন-চরিত বাংলা ভাষায় এখন পর্য্যন্ত লিখিত হইল না, ইহা বাস্তবিকই পরিতাপের বিষয়। শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ বসু ডাঃ সরকার সম্বন্ধে মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রবন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। ডাঃ সরকার নিজের 'ডায়েরী' বা দিনলিপি রাখিয়া গিয়াছেন। তাহাতে অনেক মূল্যবান্ তথ্য থাকিবার কথা। এই দিনলিপি যথাযথ সম্পাদনার পর প্রকাশিত হইলে উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসংস্কৃতির নানা দিকে বিশেষ আলোকপাত করিবে নিঃসন্দেহ। ডাঃ সরকারের কথা সমসাময়িক সংবাদপত্রে, সাময়িকপত্রে, শিক্ষাবিষয়ক সরকারী রিপোর্টে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনিট্‌সে এবং নানা পুস্তক-পুস্তিকায় পাওয়া যায়। আমি এই সমুদয় হইতে কিছু কিছু তথ্য বহুদিন সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। যিনি বা যাঁহারা ডাঃ সরকারের পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখিবেন, এগুলি তাঁহাদের কাজে লাগিতে পারে, এই ভরসায় এখানে প্রদত্ত হইল।

ছাত্রজীবন

মহেন্দ্রলাল একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। বর্ত্তমান হেয়ার স্কুলের পূর্ব্বনাম ছিল কখনও হিন্দু কলেজ ব্রাঞ্চ স্কুল, আবার কখনও কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল। মহেন্দ্রলাল যখন এই বিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন ইহা শেষোক্ত নামে আখ্যাত হইতেছিল। এখানে অধ্যয়নকালে তিনি জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। 'নীলদর্পণ'-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ দীনবন্ধু মিত্র ডাঃ সরকারের সহপাঠী ছিলেন। ১৮৪৯-৫০ সনে তাঁহারা উভয়েই জুনিয়র বৃত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হন। মহেন্দ্রলাল পান ৩০০ নম্বরের মধ্যে ১৭৬·৫ নম্বর। এই বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন শেষ হইলে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৫১-৫২ সনের এডুকেশন রিপোর্টে প্রকাশ, এই বৎসর মহেন্দ্রলাল কলেজের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন।

মহেন্দ্রলাল ১৮৫২ সনে তৃতীয় শ্রেণী হইতে পরীক্ষা দিয়া সিনিয়র বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি এইরূপ নম্বর পান: সাহিত্য—৩৮·৫ ; দর্শন—৪২ ; বিশুদ্ধ গণিত—৪৪·৫ ; মিশ্র গণিত—৬৫ ; ইতিহাস—৪৪·৫ , ইংরেজী রচনা—২৭ ; বাংলা রচনা—১০ , মোট ২৭১·৫ ।

১৮৫৩-৫৪ এবং ১৮৫৪-৫৫, এই দুই বৎসরের এডুকেশন রিপোর্ট হইতেও সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় মহেন্দ্রলালের কৃতিত্বের কথা জানিতে পারি। সিনিয়র বৃত্তির পরিমাণ ছিল প্রতি মাসে ত্রিশ টাকা। শেষোক্ত সনে তিনি প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। ১৮৫৫ সনের সিনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষায় মহেন্দ্রলাল মোট ৫৬০ নম্বরের মধ্যে ২৮৬·৪০ নম্বর পাইয়াছিলেন। তিনি প্রতিটি বিষয়ে কত নম্বরের মধ্যে কত নম্বর পাইয়াছিলেন তাহার বিস্তারিত বিবরণ শেষোক্ত রিপোর্টে পাওয়া যাইতেছে। বলা বাহুল্য, এ বৎসরেরও তিনি সিনিয়র বৃত্তি লাভ করিলেন। নম্বরের বিস্তারিত বিবরণ এই :

বিষয়	মোট নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
সাহিত্য	৭০	৪০½
দর্শন ও অর্থশাস্ত্র	৬০	৫২
ইতিহাস	৭০	৩৫
বিশুদ্ধ গণিত	১০০	২৯
মিশ্রগণিত	১০০	৪৯·৫
ইংরেজী রচনা	৪০	২৮
অনুবাদ	৫০	২৫
প্রাকৃতিক ভূগোল	৫০	১৭·৪
জরীপ	৩০	১০

মহেন্দ্রলাল ইহার পর কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। তিনি ১৮৬১ সনে এম-বি এবং ১৮৬৩ সনে এম-ডি উপাধি পান। মহেন্দ্রলাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় এম-ডি ; প্রথম এম-ডি ছিলেন চন্দ্রকুমার দে।

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা মহেন্দ্রলালের অক্ষয় কীর্ত্তি। সমগ্র ভারতে ইহাই সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণা-আলোচনা প্রতিষ্ঠান। ১৮৬৯ সনে তিনি নিজ সম্পাদিত *Calcutta Journal of Medicine* মাসিকে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, এই বিষয়ে তিনি ইংরেজী ও বাংলায় একখানি অনুষ্ঠানপত্রও অবিলম্বে প্রচার করেন। ইংরেজী 'প্রস্‌পেক্টাস' বা অনুষ্ঠান-পত্র প্রকাশিত হয় ১৮৭০, ৩রা জানুয়ারী দিবসীয় 'হিন্দু পেট্রিয়টে'। ইহার বাংলাটি কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিতাকারে আমরা পাই 'বঙ্গদর্শন'—ভাদ্র, ১২৭৯ সংখ্যায় প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে। ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা বর্ত্তমানে এক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। ইহা কি উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নহে। বস্তুতঃ

এই অনুষ্ঠানপত্রখানি আধুনিক যুগে ভারতীয় বিজ্ঞান-সাধনার 'ম্যাগনা কার্টা'। অনুষ্ঠানপত্রখানি এই :

"জ্ঞানাৎ পরতরো নহি।

"১। বিশ্বরাজ্যের আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল স্থিরচিত্তে আলোচনা করিয়া অন্তঃকরণে অদ্ভুত রসের সঞ্চার হয়, এবং কি নিয়মে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত কৌতূহল জন্মে। যদ্দ্বারা এই নিয়মের বিশিষ্ট জ্ঞান হয়, তাহাকেই বিজ্ঞানশাস্ত্র কহে।

২। পুরাকালে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানশাস্ত্রের যথেষ্ট সমাদর ও চর্চ্চা ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞানশাস্ত্রের যে সকল শাখা সম্যক্ উন্নত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে অনেকগুলির প্রথম বীজরোপণ প্রাচীন হিন্দু ঋষিরাই করেন। জ্যোতিষ, বীজ-গণিত, মিশ্রগণিত, রেখাগণিত, আয়ুর্ব্বেদ, সামুদ্রিক, রসায়ন, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, সঙ্গীত, মনোবিজ্ঞান, আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি বহুবিধ শাখা বহুদূর বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, এক্ষণে অনেকেরই প্রায় লোপ হইয়াছে, নামমাত্র অবশিষ্ট আছে।

৩। এক্ষণে ভারতীয়দিগের পক্ষে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুশীলন নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে; তন্নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা নামে একটি সভা কলিকাতায় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই সভা প্রধান সভারূপে গণ্য হইবে, এবং আবশ্যকমতে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ইহার শাখা-সভা স্থাপিত হইবে।

৪। ভারতবর্ষীয়দিগকে আহ্বান করিয়া বিজ্ঞান অনু-শীলন বিষয়ে প্রোৎসাহিত ও সক্ষম করা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য; আর ভারতবর্ষ-সম্পর্কীয় যে সকল বিষয় লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহা রক্ষা করা (মনোরম ও জ্ঞানদায়ক প্রাচীন গ্রন্থ সকল মুদ্রিত ও প্রচারিত করা) সভার আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য।

৫। সভা স্থাপন করিবার জন্য একটি গৃহ, কতকগুলি বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক ও যন্ত্র এবং কতকগুলি উপযুক্ত ও অনুরক্ত ব্যক্তি বিশেষের আবশ্যক। অতএব এই প্রস্তাব হইয়াছে যে কিছু ভূমি ক্রয় করা ও তাহার উপর একটি আবশ্যকানুরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করা, বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক ও যন্ত্র ক্রয় করা এবং যাঁহারা এক্ষণে বিজ্ঞানানুশীলন করিতেছেন, কিম্বা যাঁহারা এক্ষণে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথচ বিজ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়নে একান্ত অভিলাষী, কিন্তু উপায়াভাবে সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না, এরূপ ব্যক্তি-দিগকে বিজ্ঞানচর্চ্চা করিতে আহ্বান করা হইবে।

৬। এই সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে অর্থই প্রধান আবশ্যক, অতএব ভারতবর্ষের শুভানুধ্যায়ী ও উন্নত জনগণের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা আপন আপন ধনের কিয়দংশ অর্পণ করিয়া উপস্থিত বিষয়ের উন্নতি সাধন করুন।

৭। যাঁহারা চাঁদা গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের নাম পত্রে প্রকাশিত হইবে, আপাততঃ যাঁহারা স্বাক্ষর করিতে বা চাঁদা দিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করিলে সাদরে গৃহীত হইবে।

অনুষ্ঠাতা শ্রীমহেন্দ্রলাল সরকার।"

অনুষ্ঠানপত্রখানি প্রচারের পর মহেন্দ্রলাল অসীম ধৈর্য্য-সহকারে বিজ্ঞান সভা স্থাপনে তৎপর রহিলেন। দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল অনবরত চেষ্টায় প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সংগৃহীত হইল। বাংলা সরকার তাঁহাকে এই কার্য্যে অর্থসাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। বাংলা সরকার ১৮৭৬, ২১শে জানুয়ারী বিজ্ঞান সভার জন্য একটি গৃহের ব্যবস্থা করিতে সম্মত হন। ১৮৭৫-৭৬ সনের এডুকেশন রিপোর্টে এ সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে :

"In a minute, dated the 21st January, 1876, Sir Richard Temple was pleased to grant the projected Science Association an eligible building with its premises at the junction of the College Street and Bowbazar, for occupation free of all charge for a term of years, on condition that at least Rs. 70,000 be actually obtained by donations of which at least Rs. 50,000 must be invested by the Association in Government securities, and that a monthly subscription of at least Rs. 100 per mensem be promised for two years. The management of the institution was left to the members of the Association, and they were to raise and judicially invest their funds and collect current subscriptions as far as their funds might permit. The Association has been promised nearly a lakh of rupees in donations, and Rs. 200 a month in subscriptions. The objects of the institution are to provide lectures of a very superior kind in science, especially general physics, chemistry, and geology, mainly for students who have already passed through school or college, or have otherwise attained some profisiency in those subjects. The several sciences will be taught with a view to their application to practical uses. . ."—*Report of the Director of Public Instruction*, 1875-76, page 83.

ইহার পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদে আছে, ছোটলাট টেম্পলের আনুকূল্যে ১৮৭৬, ২৯শে জুলাই দিবসে ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভার দ্বার উন্মোচিত হইল। টেম্পল সভার স্থায়ী সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। বিজ্ঞান-শিক্ষার্থী ছাত্র এবং অন্যান্যরা আট আনা মাত্র 'ফি' দিয়া এখানে প্রদত্ত বক্তৃতা শুনিতে পাইতেন। চাঁদাদাতা ছাত্রের সংখ্যা তখন পঞ্চাশ জন।

নারীর বিবাহের বয়স

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন-প্রবর্ত্তিত বিবাহ-আইন বিষয়ক আন্দোলনের পরিণতি হয় ১৮৭২ সনের তিন আইনের মধ্যে। নারীর বিবাহের ন্যূনতম বয়স কত হওয়া উচিত তৎসম্পর্কে স্থিরনিশ্চয় হইবার জন্য ১৮৭১, ১লা এপ্রিল কেশবচন্দ্র বারো জন দেশী-বিদেশী সুবিখ্যাত চিকিৎসকের নিকট ভারত-সংস্কার সভার সভাপতিরূপে একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন এই বারো জনের মধ্যে অন্যতম। নিজ অভিজ্ঞতা, সামাজিক রীতিনীতি, সমাজের তৎকালীন অবস্থা এবং আঙ্গিরা, মনু, শুশ্রূত প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনাপূর্ব্বক তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নারীর বিবাহের ন্যূনতম বয়স হওয়া উচিত ষোল। ডাঃ সরকার এই প্রসঙ্গে বলেন: পূর্ব্বে নিয়ম ছিল—উপযুক্ত বয়স না হইলে বিবাহিতা কন্যাকে পতিগৃহে পাঠানো হইবে না। এই নিয়ম ক্রমশঃ শিথিল হইয়া যাইতেছে। সুতরাং বর্ত্তমানে ঐরূপ বয়স নির্দ্ধারণ করাই শ্রেয়ঃ। অল্প বয়সে গর্ভধারণ নারীর সর্ব্ববিধ অকল্যাণই শুধু ডাকিয়া আনে না; ভবিষ্যদ্-বংশীয়দেরও অশুভ ইহা দ্বারা সূচিত হয়। ডাঃ সরকার দীর্ঘ মন্তব্যের উপসংহারে বলেন:

"This view of the state of things imperatively demands that, for the sake of our daughters and sisters, who are to become mothers, and for the sake of generations yet unborn, but upon whose proper development and healthy growth, the future well-being of the country depends, the earliest marriageable age of our females should be fixed at a higher point than what obtains in our country. If the old grandmother's discipline, alluded to above, could be made to prevail, there would be no harm in fixing that age at 14, or even 12, but as that is well-nigh impossible or perhaps would not be perfectly right and consistent with the progress of the times, I should fix it at 16."*

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংস্রব

সেনেট, সিণ্ডিকেট এবং বিভিন্ন 'ফ্যাকাল্‌টি'র সদস্যরূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ডাঃ সরকারের সংস্রব সুবিদিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মিনিট'সমূহে ইহার কথা ছড়াইয়া আছে। এখানে ১৮৭৭-৭৮ এবং ১৮৭৮ ৭৯ সনের মিনিট বই হইতে মাত্র দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। মহেন্দ্রলাল 'ফ্যাকাল্‌টি অফ আর্টসে'র সদস্য ছিলেন। ফার্ষ্ট আর্টসের পাঠ্যতালিকায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্ত্তনকল্পে উক্ত ফ্যাকাল্‌টি ১৮৭৫, ১১ই ডিসেম্বর একটি সাব-কমিটি গঠন করেন। মহেন্দ্রলাল ইহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্ত্তনের বিশেষ অনুকূল ছিলেন, ইহা বলাই বাহুল্য। তথাপি সংস্কৃত-শিক্ষার সঙ্কোচসাধন করিয়া বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হউক, ইহা তাঁহার আদৌ অভিপ্রেত ছিল না। আজকাল এক দল তথাকথিত বিজ্ঞানসেবী দেখা দিয়াছেন যাঁহারা বিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষাদান মোটেই পছন্দ করেন না। সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ডাঃ সরকারের মত এক-জন প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীর মতামত তাঁহাদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তখনও সংস্কৃত-শিক্ষার বিরোধী লোকের অভাব ছিল না। মহেন্দ্রলাল একটি স্বতন্ত্র মিনিটে ১৮৭৭, ২রা অক্টোবর তাঁহার মত এইরূপ ব্যক্ত করিলেন:

"I am strongly opposed to the abolition of a classical language from the course of the First Arts, and I would retain it even in the B course of the B.A. To the majority of Indian students the classical language is Sanskrit, and, without a knowledge of Sanskrit, the mother of nearly all the Indian vernaculars, their education will be sadly incomplete and useless. The masses can be reached only through the vernaculars, and the alumni of our colleges, to be really and substantially useful to their country, must teach what they have learned of Western literature and science with so much labour, by means of the vernacular, and it is impossible they can do so effectually unless they are acquainted with the parent language."*

১৮৭৮ সনে একটি ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ কতকটা বিব্রত হইয়া পড়েন, এবং তাহার উপলক্ষ্য হইলেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। মহেন্দ্রলাল সেনেটের সদস্য ও 'ফ্যাকাল্‌টি অফ আর্টস'-এর সভ্য। ১৮৭৮ সনে সেনেটের সভায় সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক প্রেরিত এন্যুয়াল রিপোর্ট উপস্থিত করা হয়। ইহা গ্রহণের প্রস্তাব যথারীতি উত্থাপিত হইল। রিপোর্টের সংশোধনস্বরূপ রেভাঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে এবং রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে ডাঃ সরকার 'ফ্যাকাল্‌টি অফ মেডিসিন'-এর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। ইহা লইয়া গোল বাধিল। ডাঃ সরকার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-পদ্ধতিতে আস্থাবান এই ওজুহাতে 'ফ্যাকাল্‌টি অফ মেডিসিন'-এর অন্যান্য চিকিৎসক সভ্য তাঁহার সঙ্গে একযোগে কার্য্য করিতে অসম্মত হইলেন। এই ফ্যাকাল্‌টির সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব সেনেটে আসিল। মহেন্দ্রলাল ১৩ই জুলাই ১৮৭৮ তারিখে চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে একখানি পত্র পাঠাইলেন। সেনেট ঐ দিনের অধিবেশনে ফ্যাকাল্‌টি

* *First Annual Report* of the Indian Reform Association, reproduced in *Biography of a New Faith*, Vol. II, Appendix II, p. 311.

(শ্রীযুত সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।)

* *Calcutta University Minutes*, 1877-78, p.

অফ মেডিসিনকে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু ফ্যাকালটির সভ্যগণ পূর্ব্বমতে দৃঢ় রহিলেন। এবারে মহেন্দ্রলাল পুনরায় একখানি পত্র লেখেন (১৭ই আগষ্ট)। ইহাতে তাঁহার মতামত অধিকতর পরিষ্কার করিয়া সর্ব্বশেষে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবকরূপে ইহাকে আর বিব্রত করিতে চাহেন না, ইহার যে-কোন সিদ্ধান্তই তিনি নতমস্তকে গ্রহণ করিবেন। পরবর্ত্তী ৭ই সেপ্টেম্বর সিণ্ডিকেট-সভা এই সিদ্ধান্ত করিলেন:

"Resolved that Dr. Mahendra Lal Sircar's name be transferred from the Faculty of Medicine to that of Engineering."

এই প্রস্তাবক্রমে মহেন্দ্রলাল 'ফ্যাকাল্‌টি অফ মেডিসিনে'র পরিবর্ত্তে 'ফ্যাকাল্‌টি অফ ইঞ্জিনীয়ারিং'-এর সভ্যরূপে গৃহীত হইলেন! বিবাদেরও অবসান হইল। ইহা হইতে দুইটি বিষয় সবিশেষ জানা গেল। মহেন্দ্রলাল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-প্রণালীর পক্ষপাতী হওয়ায় এলোপ্যাথ ডাক্তারগণ (স্বদেশীও বিদেশী) তাঁহার উপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, মহেন্দ্রলাল যে দুইখানি পত্র লেখেন তাহাতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার যথার্থ পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছিল। এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্ব্বেদ —প্রতিটি চিকিৎসা-শাস্ত্রই তিনি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কোনটিরই গুরুত্ব তিনি অস্বীকার করেন নাই, তবে চিকিৎসা-পদ্ধতি হিসাবে হোমিওপ্যাথিই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইহা তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন এবং তদনুযায়ী চিকিৎসা-কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী

বর্ত্তমান 'ন্যাশনাল লাইব্রেরী' বা জাতীয় গ্রন্থাগারের পূর্ব্বজ ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরী। যে সকল লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগারকে ভিত্তি করিয়া ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরী গঠিত হয় তাহাদের মধ্যে প্রধানতম ছিল কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী। এই গ্রন্থাগারটির আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস আমি পূর্ব্বে কয়েকটি প্রবন্ধে লিখিয়াছি।* ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহার একটি শেয়ার বা অংশ ক্রয় করিয়া অন্যতম প্রোপ্রাইটর হন। ১৮৭৫ সনে তিনি ইহার আরও একটি শেয়ার কিনিলেন। কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীতে প্রথমে ইউরোপীয়দের প্রাধান্য ছিল। পরে ক্রমশঃ ইহা দেশীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কর্ত্তৃত্বে আসে। ১৮৭৫সনে মহেন্দ্রলাল লাইব্রেরী কৌন্সিল বা অধ্যক্ষ-সভার সদস্য হন। এই বৎসর গ্রন্থ-নির্ব্বাচন কমিটিতেও সদস্যরূপে প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে তিনি কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মহেন্দ্রলাল কৌন্সিলের অন্যতর সহকারী-সভাপতি হইলেন, তাঁহার সহযোগী ছিলেন শোভাবাজারের মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর। মহেন্দ্রলাল সহকারী-সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ১৮৮২ সনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। ১৮৮২-৮৪ পর্য্যন্ত তিনি পুনরায় অধ্যক্ষ-সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

এই সময় কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। সরকার প্রয়োজনানুরূপ অর্থসাহায্য করিতেন না। অবশেষে সরকারের মধ্যস্থতায় কলিকাতা করপোরেশন এবং কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর প্রোপ্রাইটরগণ একযোগে ইহার পরিচালনাভার গ্রহণ করেন। করপোরেশন এবং প্রোপ্রাইটরগণের প্রত্যেকের পক্ষ হইতে ছয় জন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হইল। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এ সময় করপোরেশনের পক্ষে অধ্যক্ষ-সভার সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন।

বেঙ্গল প্রোভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স

প্রাদেশিক বিষয়সমূহ আলোচনার জন্য বাংলাদেশে কংগ্রেসের ন্যায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে অক্টোবর তারিখে। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এই সম্মেলনের সভাপতিপদে বৃত হন। তখন আসামের চা-বাগানের শ্রমিকদের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়। সম্মেলনের প্রধান প্রস্তাব ছিল চা-বাগানের শ্রমিকদের দুর্দ্দশামোচনের উদ্দেশ্যে। এই সকল শ্রমিক 'কুলী' নামে সাধারণ্যে পরিচিত। মহেন্দ্রলাল সভাপতির উপসংহার-বক্তৃতায় এই প্রস্তাবটিকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করেন, এবং 'কুলী' শব্দটির প্রয়োগ বর্জ্জন করার নিমিত্ত সকলের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানান। কারণ, ইহার মধ্যে মানবের মনুষ্যত্বের অবমাননাই সূচিত হয়। মহেন্দ্রলালের উপসংহার-বক্তৃতাটির কিয়দংশ এই:

"I have to congratulate you that in your very first resolution you have advocated the cause of the labourers in the tea-gardens in Assam, and do not call them coolies for I hate the name 'coolie' being applied to human beings; in passing this resolution you have given unmistakable indication of the sympathy, humanity and philanthropy which should be the guiding principle of all men, both as individuals and forming communities."

এই উদ্ধৃতিতে মহেন্দ্রলালের গভীর এবং অকুণ্ঠ মানবপ্রীতিই প্রকাশ পাইয়াছে। মহেন্দ্রলালের প্রতিভা ছিল বহুমুখী; সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া মানব-সেবার বিভিন্ন দিকেই তাহা নিয়োজিত হইত। তবে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভার উৎকর্ষের নিমিত্তই তিনি নিজ সময়, শক্তি ও অর্থ সর্ব্বাধিক ব্যয় করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রলালের আদর্শ জীবন-কথা যতই আলোচিত হয় ততই মঙ্গল।

* 'প্রবাসী,' ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৫৭; বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮।

স্বর্ণাক্ষর

শ্রীদেবাংশু সেনগুপ্ত

দ্বিতীয় অঙ্ক

[অঘোরনাথের বৈঠকখানা, কিন্তু পূর্ব্ববৎ সাজান নহে। বেতের চেয়ার দুখানা নাই। বই-সেলফ-পর্দ্দা এই সকলও কিছু নাই। নূতন জিনিষের মধ্যে দেওয়ালের গায়ে নীচু একটা সস্তা ধরণের টুল দেখা যায়। বাহিরের ও অন্দরের দরজা ভেজানো। বাহিরের দরজা ঠেলিয়া তারকের প্রবেশ। মলিন চেহারা, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। অন্দরের দিকে অগ্রসর হইয়া ভেজান দরজাটায় হাত দিয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইল, পরে ফিরিয়া আসিয়া নীচু টুলটাতে হতাশভাবে বসিয়া পড়িয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। বাহিরে ঢং ঢং করিয়া কাঁসর বাজাইয়া একজন বাসন ফিরিওয়ালা চলিয়া গেল। তারক মাথা তুলিল না। দুইখানা ছোট ছোট পুরাতন থালা লইয়া ব্যস্তভাবে ছবির প্রবেশ। দেহ সম্পূর্ণ আবরণহীন, বেশ মলিন।]

ছবি। বাঃ বেশ ত, দাদা, তুমি এখানে চুপ করে বসে আছ আর বাসনওয়ালাটা চলে যাচ্ছে, বাঃ এ কি, ডাকো!

তারক। (নিরুৎসাহভাবে জানালার নিকট গিয়া ফিরিয়া আসিল) অনেক দূর চলে গেছে। তা ছাড়া এই থালা দুটো বিক্রি করে ফেললে ভাত খাব কিসে?

ছবি। ভাত রান্না হলে তবে ত খাবেরে বাপু, যাও এই থালা দুটো কোনরকমে বিক্রি করে চাল কিনে নিয়ে এসগে যাও। ঘরে কিন্তু কিছু খাবার নেই।

তারক। (অনড়ভাবে) এ বেলা না হয় খেলাম, তারপর?

ছবি। তারপরের কথা পরে ভেব, এ বেলা ত চলুক। আমার বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে বাপু।

[সীতার প্রবেশ, বেশ ছবির মত]

সীতা। কিরে ছবি, কার সঙ্গে—(তারককে দেখিয়া অবাক হইয়া) কিরে তুই যে বড় বাইরের ঘরে এসে বসে আছিস; আর আমি ভাবছি এত দেরী হচ্ছে কেন তোর!

তারক। হ'ল না মা।

সীতা। কোনটাই না? (তারক মাথা নাড়িল) কি, হবে কি হবে না, কি বলল?

তারক। হবে হয়ত কোনদিন, কিন্তু তার এখন অনেক দেরী।

সীতা। (চেয়ারখানাতে বসিয়া পড়িয়া) কি সর্ব্বনাশ! ওঁকে যে ধরে নিয়ে গেল, সে ত আজ প্রায় ছ'মাস হ'ল, এ ছ' মাস যে কি করে চালিয়েছি, সে শুধু ভগবান জানেন আর আমি জানি। আশায় আশায় ছিলাম গবর্ণমেণ্টের টাকা অন্ততঃ এর মধ্যে এসে যাবে। এখন কি হবে?

তারক। মক্তারের কাছ থেকে আর কিছু টাকা ধার করব মা?

ছবি। (দৃঢ়ভাবে) ওর থেকে আর কিছু না নিলে ভাল হবে।

[ক্যাপ্টেন দীনবন্ধু বোস, আই-এম-এসের প্রবেশ, তাহার ইউনিফর্ম্ম দেখামাত্র সীতা অন্দরের দিকে ছুটিলেন]

—মা, মা, দীনুদা! পালিও না।

দীনবন্ধু। আমি মাসীমা, আমি।

[সীতা ফিরিয়া আসিলেন]

সীতা। ওঃ আমি এমন ভয় পেয়েছিলাম! (বুকে হাত দিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া) বুকটা এখনও ধড়াস ধড়াস করছে।

দীনবন্ধু। দোষটা ত তোমারই মাসীমা। পোশাকপরা অবস্থায় ক'বার ত দেখলে আমাকে, তবু ভয় পাও। [তারক টুলটা ছাড়িয়া জানালায় গিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু দীনবন্ধু বসিল না]

সীতা। না বাপু, মিলিটারি দেখলেই আমার ভয় লাগে। তা যা বলিস তুই। আর যা শুনি, বাবাঃ।

দীনবন্ধু। সব শোনা কথায় বিশ্বাস ক'রো না। খারাপ লোক যে নেই মিলিটারিতে তা নয়, তবে সাধারণ সমাজে যত আছে, তার চাইতে বেশী নয়। তবে কি জান, যারা আগেই খারাপ ছিল, সমাজের বাইরে এসে, টাকা পয়সা হাতে পেয়ে একটু উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে; তাতে সাধারণ গৃহস্থের কিছু ভয়ের কারণ নেই।

সীতা। তুই বাপু মিলিটারি পোশাকটা আমার এখানে আসবার আগে ছেড়ে রেখে আসিস্।

দীনবন্ধু। তা যদি বল মাসীমা, আমি ত মিলিটারিই নই; আমি ডাক্তার। পোশাকটা পরতে হয় এই পর্য্যন্ত। খাঁটি মিলিটারি দেখতে চাও ত তোমার নাতিকে দেখো। (হাত দিয়া তাহার ছয় বৎসরের পুত্রের উচ্চতা দেখাইল) আবার কালি দিয়ে মোটা এক-জোড়া গোঁফ আঁকে। (হাসিল এবং পকেট হইতে খামে-করা এক-খানা চিঠি ও একখানা ফটো বাহির করিল) বিশ্বাস না হয়, এই দেখ, তোমার বৌমা পাঠিয়েছে। [সীতা ও ছবি ঝুঁকিয়া পড়িয়া ছবি দেখিল]

ছবি। ও মা, তাই ত, কি সুন্দর!

দীনবন্ধু। ছবি, যা ত চট করে এক কাপ চা করে নিয়ে আয় আমার জন্য।

সীতা। (মুগ্ধ দৃষ্টিতে তখনও ছবিখানি দেখিতেছিলেন) আমার ত সত্যিই ভয় করছে যে দীনু! তা নাতিটির আমার ক'বছর বয়স হ'ল, কি নাম রেখেছিস?

দীনবন্ধু। বয়স ছয়। নাম রাণা।

সীতা। তা বেশ, বেঁচে থাক বাবা।

দীনবন্ধু। কিরে ছবি, তোকে না চট করে এক কাপ চা করে

আনতে বলজায়। (ঘড়ি দেখিয়া) আমি আর বেশীক্ষণ বসতে পারব না কিন্তু। (সীতাকে) তোমার রান্নাবান্না হয়ে গেছে নাকি মাসীমা? (ছবিকে) কিরে দাঁড়িয়ে রইলি যে? (ছবি হতাশার চক্ষে এদিক-ওদিক চাহিল)

সীতা। (ছবির অবস্থা বুঝিয়া) ঘরের লোক তুই, তোকে বলতে কি, চিনি-টিনি নেই।

দীনবন্ধু। তাতে কি মাসীমা, চিনি ছাড়াই খাব।

সীতা। দুধও নেই বাছা।

দীনবন্ধু। এসবের জন্ম কিছু ভেব না তুমি মাসীমা, আমার শুধু 'লিকার', মানে—চা-ভেজান গরম জল হলেই চলে।

ছবি। (ঢোঁক গিলিয়া) চা-ও নেই।

দীনবন্ধু। (হাসিয়া ফেলিয়া) তা হলে তুই একটা রেস্তোরাঁ খোল ছবি, রেস্তোরাঁর চায়ে আজকাল দুধ-চিনি-চা কোনটাই থাকে না।

সীতা। এক কাজ কর ছবি, রমেনবাবুদের বাড়ী থেকে না হয় এক কাপ চা করে নিয়ে আয়। বলগে আমার দাদা এসেছে। মিলিটারিতে কাজ করে, ডাক্তার—

দীনবন্ধু। বল কি মাসীমা, এক কাপ চা পেতে হলে একেবারে এতগুলি গুণ থাকা দরকার! (প্রস্থানোদ্যত ছবিকে) তুই যাস না ছবি, অত হাঙ্গামায় দরকার নেই।

সীতা। দরকার নেই কিরে, সেই কত সকালে হয়ত বেরিয়েছিস, এখনও খাসনি কিছু—

দীনবন্ধু। (হাত তুলিয়া নিরস্ত করিয়া) খেয়েছি মাসীমা, সকাল থেকে তিন-চার কাপ চা খেয়েছি, এমন অভ্যেস হয়ে গেছে, সব সময়ই খেতে ইচ্ছে করে। আর এক কাপ যে খেলাম না ভালই হ'ল, চা বেশী খাওয়া ত আর ভাল নয়! খাবারও খেয়েছি।

সীতা। ঐ মিলিটারির ছাইভস্ম খাবার ত? কি করে যে খাস তোরা!

দীনবন্ধু। ছাইভস্ম কি মাসীমা! আমরা কি খাই শোন তবে। ভোরবেলা সেই অন্ধকার থাকতে দুখানা বিস্কুট আর চা এক কাপ দু' কাপ দিয়ে ত আরম্ভ হ'ল। তারপর আটটার সময় খেয়েছি দুটো ডিম, বড় দুটুকরো মাছ ভাজা, পোয়াখানেক দুধ দিয়ে একটা খাবার, মাখন দিয়ে রুটি টোষ্ট চারখানা, তিন কাপ চা। এটা জলখাবার। (তারক এতক্ষণ জানালার দিকে ফিরিয়াছিল, এবার আবার ফিরিয়া বিস্মিত নেত্রে দীনবন্ধুর দিকে তাকাইয়া রহিল) আবার দুপুরে খাব, মাছ কিংবা মাংস, দুধ আর ডিম দিয়ে পুডিং—

ছবি। [ক্ষুধার যন্ত্রণা আর অবিশ্বাসে উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিল] (উচ্চ কণ্ঠে) দীনুদা নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছে মা! বড়লোকেরা পর্য্যন্ত মাছ-ডিম কিনে খেতে পারছে না, আর ওঁরা এই বাজারে রাজ্যের ভাল জিনিষ বস্তু পাবছেন খাচ্ছেন। হি হি। (হাসি)

দীনবন্ধু। সত্যি কথা বলছি মাসীমা, বিশ্বাস না হয়, তুমি চল আমার সঙ্গে, তোমাকেও খাওয়াব।

সীতা। রক্ষে কর বাবা। আমার ওসব ম্লেচ্ছপনা সইবে না। তোর ভাই-বোনদের না হয় খাওয়াস। হ্যাঁরে এসব কি শুধু তোদের জন্ম না ছোট সৈন্তরাও কিছু পায়?

দীনবন্ধু। সৈন্তরাও খু-উ-ব ভাল খায়। রোজ দু'বেলা অন্ততঃ তারা নেমন্তন্ন খায়।

সীতা। তাই উনি বলতেন, ব্রিটিশরা মানুষ ধরবার ফাঁদ পেতেছে।

দীনবন্ধু। তা কেন মাসীমা, সৈন্তরা বরাবরই ভাল খায়।

ছবি। কিন্তু দেশে বরাবরই এমন দুর্ভিক্ষ থাকে না, খাবার-পরবার জিনিষ বাজার থেকে সব উধাও হয় না। উচিত দামের দশ গুণ জিনিষের দাম হয় না। এ সবের মানে আর কিছুই নয়, দেশের লোকে যাতে না খেতে পেয়ে যুদ্ধের কাজে যেতে বাধ্য হয়। বিপ্লবীরা যাতে জব্দ হয়!—বাবা বলতেন।

দীনবন্ধু। আস্তে ছবি, আস্তে। আমি সরকারী কাজ করি বাপু। কর্ত্তারা এ সব কথা শুনলে আমার চাকরি চলে যাবে। (অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে) তুইও বুঝি মেসোমশায়ের দলে?

সীতা। সে কথা আর বলতে! কোন্‌দিন এটাকেও ধরে নিয়ে যাবে দেখিস।

দীনবন্ধু। তারক কোন্ দলে? (তারককে) তুই যে একদম চুপচাপ, কারণটা কি?

তারক। (নির্জ্জীব ভাবে) আমি কোন দলে নেই।

সীতা। আর চুপচাপ হবে না বাবা? এত বড় সংসারের চাপ একটা ঘাড়ে এসে পড়েছে, ঐটুকুন ত ছেলে! কোথায় যেতে হবে, কি করতে হবে, কিছুই জানে না। নয় ত পাওনা টাকা গবর্ণমেণ্টের ঘরে পড়ে থাকে আর আমরা না খেয়ে মরি? তুই দেখ না যদি একটু সাহায্য করতে পারিস। তোদের ঐ মিলিটারিরই ত ব্যাপার।

দীনবন্ধু। (তারককে) কাগজপত্রগুলি নিয়ে আয় দেখি।

[অন্দরের দিকে তারকের প্রস্থান]

[সীতা চেয়ারটা ছাড়িয়া দিয়া টুলের উপর গিয়া বসিলেন]

সীতা। নে বোস, কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবি। (দীনবন্ধু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বসিয়া পড়িল)

ছবি। (হাসিয়া দীনবন্ধুকে) টুলটায় বসলে আবার পিঠে চুণ লেগে যেত। (সীতাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া) মা, সেই যে খোকার কথা বলবে বলেছিলে?

সীতা। হাঁ বাবা, যাবার আগে খোকাকে একটু দেখে যাস বাবা। জ্বরটা ত ছেড়েছে, প্রায় ওষুধপত্তর ছাড়াই, একমাত্র ভগবানের কৃপায়। (যুক্তকর কপালে ঠেকাইলেন) বাচ্চাটা ত

একটুও ভাল হচ্ছে না, একেবারেই নড়তে পারে না। বারান্দায় বিছানা করে শুইয়ে রেখে এসেছি, আপন মনেই খেলা করছে।

দীনবন্ধু। আমি আর বসব না মাসীমা, চল দেখে আসি।

[সীতা ও দীনবন্ধুর অন্দরের দিকে প্রস্থান। ছবি জানালায় গিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে সন্তোষের প্রবেশ। তাহার সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়াছে। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, পরনে কোঁচানো ফরাসডাঙ্গার ধুতি। মুখে পাউডারের বাহুল্য। গোঁফের দুই প্রান্ত ছুঁচালো। মধ্যভাগ অবলুপ্ত। মুখে এক গাল দাড়ি। পকেটে তিনটা ফাউন্টেন পেন, ডান হাতে চারিটা আংটি, বাম হাতে একটা। সমস্তটা জড়াইয়া হাস্যরসের সৃষ্টি করে।

সন্তোষের পদশব্দে ছবি ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া যারপরনাই অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল]

সন্তোষ। (একগাল হাসিয়া, গোঁফে তা দিতে দিতে) কি, চিনতে পারছ না?

ছবি। (দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে) সন্তোষ···

সন্তোষ। হ্যাঁ-ও বলতে পার, না-ও বলতে পার। সন্তোষ, কিন্তু সেই সন্তোষ নয়! (সটান গিয়া দীনবন্ধু-পরিত্যক্ত চেয়ারটাতে বসিয়া পড়িয়া টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিল। ছবি বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইয়া রহিল)

ছবি। (সামলাইয়া লইয়া কঠোর স্বরে) কি, চাই কি?

সন্তোষ। (রহস্যের হাসি হাসিয়া) আমি কি চাই? যাও, তারককে জিজ্ঞেস কর।

ছবি। (উষ্ণ কণ্ঠে) আমি তোকে জিজ্ঞেস করছি।

সন্তোষ। (গোঁফে তা দিতে দিতে) জিজ্ঞেস ত করছ বুঝলাম, কিন্তু মেজাজটা অত গরম কেন ঠাকরুণ? তারক আমার কাছে একশ'টা টাকা ধার নিয়েছিল, সেই টাকাটা দিয়ে দাও, তার পর যত খুশি গরম হও। আমার সময়ের এখন অনেক দাম, বুঝলে? তোমার সঙ্গে বসে গল্প করতে আমি আসি নি। তা ছাড়া তোমার মত মেয়ে আজকাল পথে ঘাটে ভেসে বেড়ায়, বুঝলে?

ছবি। (অপেক্ষাকৃত নরম হইয়া) তুই এখন কথা না বাড়িয়ে বাড়ী যা। টাকা পেলেই দাদা তোর টাকা দিয়ে আসবে।

সন্তোষ। তা বাড়ীতে বসে টাকা পেতে আমার কিছু আপত্তি নেই। বাড়ীটা আবার বদলালাম কিনা। এটা হচ্ছে চৌরাস্তার মোড়ের তিনতলা বাড়ীটার দোতলা। (অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ছবির দিকে তাকাইয়া) সুন্দর বাড়ী, সামনের ঘরে একটা ফ্যান লাগিয়েছি। পেছনের ঘরে একটা ফ্যান লাগিয়েছি। তা ছাড়া আমার বাড়ীর চেয়ার এমন শক্ত কাঠের নয়। নীচু নরম নরম, বালিশওয়ালা গদী, হ্যাঁ, দু'দণ্ড বসে আরাম আছে। ঐ বাড়ীতে সাজিয়ে বসা অবধি কত বিয়ের সম্বন্ধ আসছে আমার। কথাটা রাগের মাথায় বললায় বটে তবে, হ্যাঁ, তোমার মত একটি মেয়েও নয়।

[দীনবন্ধু, তারক ও সীতার প্রবেশ। দীনবন্ধুর হাতে ছোট একটি কাগজের বাণ্ডিল। তাহার চেয়ারে সন্তোষকে অসভ্যভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া বিস্মিত হইল]

দীনবন্ধু। (সন্তোষকে ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ছবিকে) কে ইনি?

ছবি। (ঈষৎ ব্যঙ্গস্বরে) ইনি আগে আমাদের চাকর ছিলেন, এখন দাদার কাছে টাকা পাবেন কিনা তাই চেয়ারে বসে অপেক্ষা করছেন।

দীনবন্ধু। বটে! (কঠোর স্বরে সন্তোষকে) ধৃষ্টতার একটা সীমা আছে, বুঝলে হে ছোকরা? আগে লেখাপড়া শেখ, তার পর সমান চালে চলতে এস। তার পর শুধু লেখাপড়াতেও হয় না। ভদ্রলোক হতে তিন পুরুষ লাগে।

সন্তোষ। কে বলে আমি ভদ্রলোক হই নি?

দীনবন্ধু। বেশভূষায় বলে। আচ্ছা সে কথা না হয় পরে হবে। এখন পয়লা নম্বর কথা হ'ল, চেয়ারটা ছেড়ে এই এক পাশে দাঁড়াও।

[সন্তোষ যেন কথাটা শুনিতে পায় নাই এমন ভাবে সামনের দিকে তাকাইয়া রহিল, এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া দীনবন্ধু প্রচণ্ড ধমক দিল]

—এই দাঁড়াও! [সন্তোষ তাড়াতাড়ি উঠিয়া এক পাশে দাঁড়াইল, দীনবন্ধু চেয়ারে বসিয়া পকেট হইতে চেক বই বাহির করিয়া স্থির কণ্ঠে] কত টাকা পাবে?

ছবি: একশ' টাকা। (দীনবন্ধুর চেক লিখিবার উপক্রম)

সন্তোষ। আমি চেক নেব না।

দীনবন্ধু। একশ'টা টাকা বোধ হয় নগদই আছে। (মণি-ব্যাগ বাহির করিয়া টাকা গুণিতে সুরু করিল)

সন্তোষ। আপনার থেকে আমি টাকাও নেব না।

দীনবন্ধু। আচ্ছা বেশ। (তারককে ইসারা করিতে তারক আগাইয়া আসিল, তারকের হাতে টাকা কয়টা দিয়া সে উহা সন্তোষকে দিতে ইসারা করিল। সন্তোষ হাত বাড়াইল না)

সন্তোষ। একবার উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

দীনবন্ধু। তোমার নিজের টাকা নিজে নেবে আবার উকিলের পরামর্শ কিসের?

তারক। (সন্তোষকে) হ্যাণ্ডনোটটা এনেছিস?

সন্তোষ। না।

দীনবন্ধু। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তারককে) হ্যাণ্ডনোটের জন্য চিন্তা করিস না, টাকা শোধ হলে হ্যাণ্ডনোট ঠিক আদায় হয়ে যাবে। আমি আদায় করে দেব।

(ইতিমধ্যে নিঃশব্দে সন্তোষের পলায়ন)

ছবি। (প্রায় চীৎকার করিয়া) দীনুদা, দীনুদা, সন্তোষ চলে গেল। (জানালায় গিয়া আনন্দের সহিত) ওমা, পালিয়ে যাচ্ছে, কি মজা!

সীতা। যাক, আপদ গেছে। টাকা না নিতে চায় না নিক।

দীনবন্ধু। আপদ গেছে কি আসছে, বলা শক্ত মাসীমা। শ্রীমানটি যে একটি দানবীর এ রকম লক্ষণ ত কিছু দেখলাম না। যে যা হোক, আমি বলি মাসীমা, উল্টো অমন কিছু দেখলেই সাবধান হওয়া ভাল। চাকর এসে পাওনাদার সেজে গ্যাঁট হয়ে চেয়ারে বসে থাকে, নগদ টাকা ফেরত নেবার জন্য দেনদারকেই সাধাসাধি করতে হয়—না মাসীমা, আমার এর কোনটাই ভাল মনে হচ্ছে না। বিশেষ কিছু মতলব আছে লোকটার।

সীতা। হ্যাঁ বাবা, তোরও টাকা বেশী হয়েছে নাকি? অমন চট করে একশ'টা টাকা দিয়ে বসছিলি ওকে।

দীনবন্ধু। ওকে কি আর দিচ্ছিলাম? গবর্ণমেণ্টের টাকাগুলি পেলে তুমিই ত শোধ দিতে। তা ছাড়া যুদ্ধের দৌলতে আর তোমাদের আশীর্ব্বাদে দু'পয়সা অমনি অমনি হাতে আসছে।

ছবি। (অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া) আপনার যেমন সব কথা? টাকা কখনও অমনি অমনি আসে?

দীনবন্ধু। সত্যিই আসে। জান ত মাসীমা, বাজারে কোন দরকারী ওষুধ মোটে পাওয়া যায় না। আমি ডাক্তার, আমার হাতে এত সরকারী ওষুধ থাকে দরকারও হয় না, লোকে বাড়ী এসে দশ গুণ দাম দিয়ে কিনে নিয়ে যায়। আর দিনকাল এমন হয়েছে, হয় উপরি রোজগার কর, নয় মর, বেঁচে থাকবার আর কোন পথ নেই। (তারক দীনবন্ধুকে টাকা ফিরাইয়া দিল)

সীতা। উনি যদি একথা বুঝতেন! একটা মিলিটারী লোক এসে টাকা দেবার জন্য কত সাধাসাধি, তোর মেসোমশায় তাকে গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। আর সন্তোষ, লেখা জানে না, পড়া জানে না, সেই মিলিটারীটাকে ধরেই বড়লোক। আর আজকে আমাকে বাড়ীতে এসে অপমান করে যায়। (চোখ মুছিলেন)

ছবি। আর গোঁফ রেখেছে দেখেছেন? দু'পাশে আছে মাঝখানে নেই। আবার বলে তার সামনের ঘরে ফ্যান একটা—পেছনের ঘরে ফ্যান একটা;—টাকার দেমাকে কি বলবে, কি করবে, হদিশ পায় না।

দীনবন্ধু। মাসীমা কোন্ মিলিটারীর কথা বলছে তার নাম জানিস?

তারক। সাধুলাল। মেজর, না কি যেন।

দীনবন্ধু। মেজর সাধুলালকে মেসোমশায় গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে? কৈ সাধুলালের কথা শুনে তা ত মনে হয় না। সে আরও মেসোমশায়ের নাম শুনলে কপালে হাত ঠেকায়, বলে এ রকম লোক সে জীবনে দেখে নি। তোমাদের কথা ত প্রায়ই জিজ্ঞেস করে।

সীতা। (ছবি ও তারককে) শুনছিস? শোন্। সন্তোষ আরও বলে যে সাধুলালের আমাদের ওপর খুব রাগ।

দীনবন্ধু। একদম মিথ্যে কথা। আমি প্রথম যে দিন এ বাড়ীতে এসেছি সে দিনই সে খবর পেয়ে গেছে, যে এখানকার মিলিটারী ঘাঁটির বড় কর্ত্তা কিনা, সব খবর রাখে। আমা জিজ্ঞেস করলে তোমরা আমার কেউ হও কিনা। বললাম। দিনই সে বলেছিল, তারক আর ছবিকে একদিন নিয়ে যেতে ছবিকে ত আবার নেমন্তন্নই করে রেখেছে এক রকম। সপ্তা এক দিন যে কেউ বাড়ীর মেয়েদের নিয়ে যেতে পারে। তুমি আবার মিলিটারী শুনলেই যেমন ভয় পাও, তাই তোমায় বলি নি। নইলে ত প্রায়ই বলে।

সীতা। (অনেকক্ষণ ছবি ও তারকের শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া) তা বাবা তুই যদি বলিস, তুই নিয়ে যাবি তোর বোনকে—বেশ আজকেই নিয়ে যা। কখন যাবে?

দীনবন্ধু। বিকেলে, সন্ধ্যের পর। আজকেই নিয়ে যেতে পারব।

সীতা। আর দেখ্ তারকেরও একটা কিছু হিল্লে করতে পারিস কিনা। সন্তোষকে বলেছিলাম তারককে সাধুলালের কাছে নিয়ে যেতে, সে ত ঐ কথা বললে!

দীনবন্ধু। একটা চাল চেলেছে আর কি! ও চায় তোমরা ওর কাছে চিরকাল ঋণী হয়ে থাক। আমার ত সে রকমই মনে হচ্ছে। কিছু একটা ঘোর মতলব আছে মনে হয়। (ছবির প্রতি ইঙ্গিত করিল) আচ্ছা এখন যাই মাসীমা, বিকেলে আসব, তোরা তৈরী হয়ে থাকিস। (প্রস্থানোদ্যত)

সীতা। (বাধা দিয়া) তুই সন্তোষকে একশ'টা টাকা দিয়ে ফেলছিলি, তাই বলছি। তোর মাসীকে দশটা টাকা ধার দিয়ে যা। বেশী চাইতে পারি না, কবে শোধ দিতে পারব কে জানে।

[দীনবন্ধু মনিব্যাগ খুলিয়া টাকা বাহির করিতে করিতে ছবি অতি দ্রুত অন্দরে গিয়া একটি থলি নিয়া আসিয়া তারককে দিল]

দীনবন্ধু। শোধ দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ো না মাসীমা। কাগজ-পত্র দেখে মনে হচ্ছে গবর্ণমেণ্টের টাকা শীগ্‌গিরই পেয়ে যাবে। অল্প-স্বল্প টাকার দরকার হলে আমাকে বলবে।

তারক। কি আনব মা?

সীতা। শুধু চাল আর আলু আনবি। ছবি যা উনুনে কাঠ জ্বালিয়ে গরম জল বসিয়ে দে গে। (বাহিরে পুনরায় বাসন ফিরিওয়ালার ঘণ্টা শুনা যাইতে ভাই-বোন পরস্পর মুখের দিকে চাহিল) ঐ থালাটাও নিয়ে যা। (ছবি থালাটা টেবিলের উপর হইতে উঠাইয়া লইল)

দীনবন্ধু। (কাগজের বাণ্ডিলটা আগাইয়া দিয়া) আর এই বাণ্ডিলটাও এখন রেখে দে। বিকেলে এগুলো নিয়ে গিয়ে সাধু-লালের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। (ছবি বাণ্ডিলটা লইল। ছবি ও তারক উভয়ে বিপরীত দিকে প্রস্থানোদ্যত) একটু দাঁড়া তোরা। পকেট হইতে এক খণ্ড লম্বা চকোলেট বাহির করিয়া এক টুকরা ভাঙিয়া প্রথমে সীতাকে দিল) নাও মাসীমা এটুকু তুমি একটু খেয়ে দেখ।

সীতা। (সভয়ে কিছু হটিয়া) না বাবা, না বাবা, আমি ওসব জিনিষ খাই না। ওদের দে।

দীনবন্ধু। (হাসিয়া চকোলেটটি আরও দু'টুকরা করিল এবং এক খণ্ড তারককে ও অপর দুই খণ্ড ছবির হাতে দিল) (ছবিকে) ওটা খোকাকে দিবি। (সীতাকে) তোমার ওপর আমি খুব রাগ করেছি মাসীমা। ঘরে হাঁড়ি পর্যান্ত চড়ছে না, সেটা আমাকে একবার বলছ না। আমি ভাবছি, খোকার পেটটা এ রকম ভাবে খালি লাগছে কেন। এখন দেখছি, তোমাদের পেট টিপলে সেই এক অবস্থাই দেখতাম। খাবার যদি পেটে ঠিকমত না পড়ে ছেলেটা আর তিন দিনও বাঁচবে না। (তারক ও ছবির চিন্তিত ভাবে প্রস্থান।)

সীতা। (চোখ মুছিয়া) ভগবান তোর ভাল করুন বাবা। তোর আরও উন্নতি হোক।

দীনবন্ধু। খোকার ভাতটা যেন একটু বেশী নরম করে দিও। এখন যাই মাসীমা, বিকেলে আসব। খোকাকে একটা ইনজেকশানও দিতে হবে।

(প্রস্থান)

[সীতা আগাইয়া গিয়া বাহিরের দরজাটা ভেজাইয়া দিলেন, এমন সময় যবনিকা]

তৃতীয় অঙ্ক

[মিলিটারী মেসের ডাইনিং হল। এক পাশে এক সেট সোফা অপর পাশে একখানি লম্বা টেবিল, তাহারই অর্দ্ধেক ঘিরিয়া চেয়ার বসান। সাদা টেবিল-ক্লথের উপর ছয়খানা প্লেট, গ্লাস ইত্যাদি সাজান। প্রতিটি গ্লাসে ফুলের আকৃতিতে ভাঁজ-করা ন্যাপকিন। সব জানালায় এবং উভয় পার্শ্বের দরজায় নীল রঙের পর্দা ঝুলিতেছে।

দৃশ্য-পট উঠিতে দেখা গেল বয়-বেশে সজ্জিত একজন নেপালী কোমরস্থিত ন্যাপকিন দিয়া মুছিয়া মুছিয়া কাঁটাচামচগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিতেছে।

মেস-সেক্রেটারি লেফটেনান্ট নরেন রায়ের প্রবেশ। তরুণ বাঙালী অফিসার। হাতে কয়েকটি ন্যাপকিন আঁটিবার লেবেল-আঁটা রিং ও একখানা ইংরেজী খবরের কাগজ। পত্রিকাটি সোফা-সেটের গোলটেবিলে রাখিল]

নরেন। সব ঠিক হ্যায় ?

বয়। (গোড়ালির শব্দ করিয়া) জী।

নরেন। (রিংগুলি যে ন্যাপকিন ঢুকাইয়া রাখিবার তাহা ইসারায় বুঝাইয়া, একটির লেবেল পড়িয়া) মেজর সাবকো। (রিংটি টেবিলের মাথার দিকে রাখিল) লেফটেনাণ্ট ভার্মা সাবকো (আর একটি রিং বাছিয়া উহার দক্ষিণ দিকে রাখিল) ক্যাপ্টেন সিং সাবকো (অনুরূপ ভাবে আর একটি রিং আগের রিংটির দক্ষিণে রাখিল) যো জেমাদার আব্বাস হ্যায় উনকো (উহার দক্ষিণে আর একটি রিং রাখিল) ক্যাপ্টেন বোস সাবকো। (আরও দক্ষিণে আর একটি রিং রাখিল) মেরা (চেয়ারের বাম দিকে রাখিল)

[ন্যাপকিনগুলি যে রিংগুলির মধ্যে রাখিতে হইবে এবং চেয়ারগুলিও যে অনুরূপ ভাবে সাজাইতে হইবে তাহা ইসারায় বয়কে বুঝাইয়া দিয়া সে একখানা একক সোফায় বসিয়া পকেট হইতে নোট-বুক খুলিয়া লিখিতে লাগিল। বয় নির্দ্দেশ পালন করিল। দীনবন্ধু ও ছবির প্রবেশ]

দীনবন্ধু। আমরা একটু আগেই এলাম।

নরেন। (নোট-বই পকেটে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল) আসুন মিস বোস (নমস্কার করিল, ছবিও প্রতিনমস্কার করিল) বসুন। (ছবি ও দীনবন্ধু দুই জনে সোফাটায় বসিল)

দীনবন্ধু। (নরেনকে দেখাইয়া ছবিকে) ইনি লেফটেনাণ্ট নরেন বোস। বাড়ী বীরভূম, খুব বীর পুরুষ। ভাল বাঁশী বাজাতে পারেন।

নরেন। ক্যাপ্টেন বোসের সব কথা বিশ্বাস করবেন না। (উত্তরে ছবি শুধু হাসিল)

দীনবন্ধু। সে কি ; আমি ত জানতাম আপনার নাম লেফটেনাণ্ট নরেন রায়, বাড়ী বীরভূম !

নরেন। (হাসিয়া) আমি তা বলি নি। (টেবিলের নিকট গিয়া সাজান ঠিক হইয়াছে কিনা পর্য্যবেক্ষণ করিল) একটু আসছি। (বয়কে লইয়া ভিতরের দিকে অর্থাৎ রান্নাঘরের দিকে প্রস্থান)

দীনবন্ধু। কিরে তুই কথা বলছিস না যে ?

ছবি। আমার ভয় করছে।

দীনবন্ধু। দূর বোকা মেয়ে, ভয় কিসের ! দাঁড়া দেখি আজকের মেনু কি। [উঠিয়া গিয়া টেবিল হইতে কার্ড-ষ্ট্যাণ্ড হইতে মেনু-কার্ডটা তুলিয়া লইয়া একবার চক্ষু বুলাইল, তারপর চকিতে একবার ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মেনু-কার্ডটা লইয়া পুনরায় ছবির নিকট গিয়া বসিল] (আঙ্গুল দিয়া নির্দ্দেশ করিয়া) প্রথম ত একটা হাড়ের সুপ, তারপর আলু-ভাজা, মাছ-ভাজা, তারপর দেশীমতে মাংস আর পোলাও—

ছবি। (কানে আঙ্গুল দিয়া) থামুন ত। এমনিতেই যা ক্ষিদে পেয়েছে, আমি আর থাকতে পারছি না।

দীনবন্ধু। কেন, চা বিস্কুট খেলি যে ! দুপুর বেলা পেট ভরে খাস নি ?

ছবি। (অস্ফুট স্বরে) না।

দীনবন্ধু। না ? কেন, বিকেলে নেমন্তন্ন খাবি বলে ? কি বোকা মেয়ে ! আমার কথা যদি শুনিস—ভবিষ্যৎকে কোন দিন বিশ্বাস করবি না ; তা এ বেলাই হউক আর ও বেলাই হউক। আমি অনেক ঠকেছি।

ছবি। দাদা আসছে না কেন ?

দীনবন্ধু। তারক ত এখানে আসবে না। সে অন্য সৈন্যদের

খাবার ঘরে একজনে খেতে বসে গেছে। এ টেবিলে অফিসার ছাড়া আর কারুর বসার অধিকার নেই।

ছবি। বাঃ-রে, আমি যে এলাম!

দীনবন্ধু। তুই যে লেডি। তোর কথা আলাদা। আমাদের নিয়মে যে কোন একজন লেডির সম্মান অফিসারদের চাইতে বেশী। দেখবি মেজরও তোকে সেলাম ঠুকবে।

ছবি। মেজর সাধুলাল?

দীনবন্ধু। হ্যাঁ।

ছবি। কি সর্ব্বনাশ! (মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে সুরু করিল)

দীনবন্ধু। দাঁড়া দেখি, তোর জন্ত অল্প-স্বল্প কিছু—অন্ততঃ একটু চকোলেট হলেও আনতে পারি কিনা। (রান্না ঘরের দিকে প্রস্থান)

[বাহিরের দরজা দিয়া মোটর-সাইকেল-আরোহীর বেশে সজ্জিত বার্ত্তাবহের প্রবেশ]

বার্ত্তাবহ। (পকেট হইতে একখানা খাম বাহির করিয়া ছবিকে সেলাম করিল) ক্যাপ্টেন ডি. বাসু—ইধার আঁয়ে হ্যায়?

ছবি। হাঁ, উধার হ্যায় (অন্দরের দিকে নির্দ্দেশ করিল) আভি আয়েঙ্গে।

বার্ত্তাবহ। আপসে বোলিয়ে একঠো বহুত জরুরী মেসেজ আয়া। হাম বাহার ঠারতা। (বাহিরের দিকে প্রস্থান করিয়া বিড়ি ধরাইল। বিড়ির ধোঁয়া দমকে দমকে ভিতরে আসিতে লাগিল। অপর দরজা দিয়া চকোলেট হাতে হাসিতে হাসিতে দীনবন্ধুর প্রবেশ)

দীনবন্ধু। (ছবির হাতে চকোলেট খণ্ড দিয়া) নে খা ততক্ষণ। লেমনেড খাবি?

ছবি। না। (চকোলেটের অর্দ্ধেক ভাঙ্গিয়া দিয়া) তুমিও অর্দ্ধেক খাও না!

দীনবন্ধু। না। আমি ক্ষিধেটা নষ্ট করতে রাজী নই। আর ক'মিনিট মাত্র বাকি।

ছবি। (চকোলেট খাইতে খাইতে বিড়ির ধোঁয়ার প্রতি নজর পড়িল) দেখ, বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম, কি একটা জরুরী চিঠি নিয়ে ভূতের পোশাক-পরা একটা লোক এসেছে তোমার কাছে।

দীনবন্ধু। (চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) অ্যাঁ! কোথায় সে? (ছবি অঙ্গুলী দিয়া বাহিরের দিকে নির্দ্দেশ করিতে উচ্চকণ্ঠে) এই কোন্ লে আয়া চিঠ্‌ঠি? ইধার আও। (বার্ত্তাবহের পুনঃ প্রবেশ; সে সেলাম করিয়া চিঠিখানা দিয়া সই করাইয়া লইয়া পুনরায় সেলাম করাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল। সংবাদটি পাইবা-মাত্র তাহার মুখখানা অতিরিক্ত গম্ভীর হইয়া গেল)

ছবি। (উৎকণ্ঠিত হইয়া) চিঠিতে কি আছে, দীনুদা?

দীনবন্ধু। বিশেষ কিছু না। আমাকে এখ্‌খুনি একটু বেরুতে হবে।

ছবি। সে কি! না খেয়ে?

দীনবন্ধু। হ্যাঁ, তাই ত দেখছি। তবে কি জানিস, এমনিতেই মিলিটারি কাজের ত সময়ের ঠিক-ঠিকানা নেই, আর ডাক্তারের কাজ কেমন নিশ্চয়ই জানিস। দুটোয় মিলে সোনায় সোহাগা আর কি!

ছবি। একটু কিছু খেয়ে নাও না। একটা চকোলেট হলেও না হয় খেতে খেতে যাও।

দীনবন্ধু। (হাসিয়া) না-রে পাগলী, খাবার জন্ত চিন্তা করছি না। যেখানে যাব সেখানে খাবারও নেমন্তন্ন আছে। সেজন্ত নয়। (গম্ভীর হইল)

ছবি। (উঠিয়া পড়িয়া) আমার ভয় করছে দীনুদা। আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যাও।

দীনবন্ধু। (কাঁধে হাত দিয়া ছবিকে পুনরায় বসাইয়া দিয়া) সে কি হয় নাকি রে? লোকে বলবে কি! তুই বস, আমি ঠিক দশ থেকে পনের মিনিটের মধ্যে ফিরে আসব। একটা ইন্‌জেকশানের ব্যাপার মাত্র। দাঁড়া, আমি লেফটেনাণ্ট রায়কে বলে দিয়ে যাচ্ছি। (অন্দরে ঢুকিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাহির হইয়া আসিল) বস তুই, আমি এখ্‌খুনি আসছি।

(বাহিরের দরজা দিয়া প্রস্থান)

[আধ মিনিট পরে লেঃ নরেন রায়ের প্রবেশ, হাতে এক গ্লাস লেমনেড]

নরেন। (অপর একটি সোফায় উপবেশন করিয়া) নিন, একটু লেমনেড খান।

ছবি। না, না। ইচ্ছে করছে না।

নরেন। লোকে শুনেছি অনুরোধে ঢেঁকি পর্য্যন্ত গিলে ফেলে, আর এ ত একটু জল মাত্র। নিন। (ছবি লেমনেড পান করিল) খুব ভয় পাচ্ছেন শুনলাম?

ছবি। দীনুদা কোথায় যাবেন?

নরেন। বা-রে! যাবেন কি, তিনি ত কখন চলে গেছেন।

ছবি। ওঃ।

নরেন। আমার কথার ত জবাব দিলেন না।

ছবি। কোন্ কথায়?

নরেন। সত্যি সত্যি ভয় পাচ্ছেন?

ছবি। আমাকে একটু বাড়ী দিয়ে আসতে পারেন?

নরেন। ঐ ত ভয় পাচ্ছেন। আপনার ভয়টা ঠিক কিসের বুঝতে পারছি না। গোলাগুলি, কামান, বন্দুক এ বাড়ীর ত্রি-সীমানার মধ্যে নেই। আর যদি মানুষকে ভয় করেন তা হলে কে কে থাকে, তারা কি রকম লোক বুঝিয়ে বলি শুনুন। আপনাকে, আপনার দাদাকে আর আমাকে বাদ দিলে আর থাকে মাত্র তিন জন। লেফটেন্যাণ্ট ভার্মা আর ক্যাপ্টেন সিং দু'জনেই পরিবার নিয়ে বাস করেন, দু'জনেই ভাল লোক। আমি আর মেজর দু'জনেই শুধু এই মেসে থাকি। লেঃ ভার্মা আর ক্যাপ্টেন সিজের

বাড়ীর মেয়েরাও কোন-কোন দিন এখানে আপনার মতই নেমন্তন্ন খেতে আসেন।

ছবি। আপনার পরিবার কোথায়?

নরেন। ঠিকানাটা এখনও জানতে পারি নি।

ছবি। সে কি কথা! নিজের বাড়ীর লোকের ঠিকানা রাখেন না?

নরেন। না। মানে এখনও বিয়ে করি নি। (ক্ষণকাল থামিয়া) আমাকে ভয় পাচ্ছেন না ত? তা হলে আমি না হয় কোথাও পালাই ততক্ষণ। (প্রস্থানোদ্যত)

ছবি। (বাধা দিয়া) না, না, ছি, ছি। আপনার কথা আমি একবারও ভাবি নি। একদম সত্যি কথা, বিশ্বাস করুন।

নরেন। (পুনরায় বসিয়া) আপনার দাদা যতক্ষণ না আসেন, ততক্ষণ আপনার ভার তিনি আমার উপর দিয়ে গেছেন।

ছবি। আর আপনি আমাকে ফেলে পালাতে চাইছেন? বেশ ত!—বরং আমাকে বাড়ী দিয়ে আসুন। (উঠিয়া দাঁড়াইল)

[বাহির হইতে মেজর সাধুলাল ও ক্যাপ্টেন সিঙের প্রবেশ। সাধুলালের পরণে সুদৃশ্য ডিনার স্যুট। ক্যাপ্টেন সিং মধ্যবয়সী পুরাতন সৈনিক। আগাগোড়া, পাগড়ী হইতে পায়ের অফিসার প্যাটার্ণের নরম বুট পর্য্যন্ত মিলিটারি। বুকে বহুযুদ্ধের নিদর্শনস্বরূপ লম্বা বহু রঙের রিবন। লোকটি অত্যন্ত স্বল্পভাষী। সর্ব্বদা গোঁফ বিন্যস্ত করিতে ব্যস্ত। বসিয়াই খবরের কাগজে মন দিল।

সাধুলাল একবার মাত্র দণ্ডায়মান ছবির অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু সে কে বুঝিতে পারিয়াছে এমন কোন ভাব প্রকাশ করিল না।]

নরেন। (লাফ দিয়া উঠিয়া এটেনশাম হইয়া) গুড-ইভনিং স্যার!

সাধুলাল। গুড-ইভনিং এভরিবডি। (ছবিকে) নমস্কার, বসুন।

[ছবি প্রতিনমস্কার করিয়া লম্বা কোচখানায় বসিল। সাধুলাল ও সিং দুই জনে দুইখানা একক সোফায় আসন গ্রহণ করিল। নরেন অন্দরের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইলে সাধুলাল তাহাকে ফিরাইল] মিঃ রায়, একটা জরুরী কথা ছিল।

নরেন। (সাধুলালেরসম্মুখে ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল) ইয়েস স্যার?

সাধুলাল। মেসের ষ্টোর্স ত আমাদের প্রপার্টি, গবর্ণমেণ্টের না?

নরেন। না।

সাধুলাল। বিশেষ দরকার হলে বিক্রি করা যায়?

নরেন। (বিনীত ভাবে) কি রকম দরকার, কে কিনবে জানলে…

সাধুলাল। আমার একটা ইন্টিমেট ফ্রেণ্ডকে গবর্ণমেণ্ট আটক করে রেখেছে। সাধুলোক, নামকরা লোক, আপনি চিনতে পারেন, সকলে মাষ্টারবাবু বলে জানে, নাম অঘোরনাথ। তার ফ্যামিলি গবর্ণমেণ্টের টাকা পায় নি দু'মাস হ'ল। খুব অভাব হয়েছে। তাদের জন্যে কিছু ষ্টোর পাঠাতে চাই। দাম আমি দিব। অল-রাইট?

নরেন। (ছবির দিকে একবার তাকাইয়া) ইয়েস স্যর। কি জিনিষ পাঠাতে চান বলুন? যদি এলাউ করেন ত আমিও কিছু কনট্রিবিউট করি।

সাধুলাল। নো, দিস ইজ অ্যাবসোলিউটলি মাই প্রিভিলেজ, হি ইজ মাই ফ্রেণ্ড। কি জিনিষ চাই? হ্যাঁ—আধ মণ ময়দা, দশ সের ঘি, এক মণ চাউল, আধ মণ আলু, ব্যস এখন এই হলে চলবে। ওঃ, হাঁ, দশটা মিল্ক টিন, দশ সের চিনি আর দু'পাউণ্ড চাও দিবেন।

নরেন। জিনিষগুলি কখন যাবে?

সাধুলাল। এখনি যাবে। (বাহিরের দরজার দিকে নির্দ্দেশ করিয়া) এইখানে পাঠিয়ে দিন। মাষ্টারবাবুর ছেলে এসেছে, নিয়ে যাবে। (অন্দরের দিকে নরেন প্রস্থান করিলে তাহার গতিপথের দিকে ইঙ্গিত করিয়া ছবিকে) আপনার দাদা খুব কাজের লোক।

ছবি। (অভিভূত স্বরে) আমি অঘোরবাবুর মেয়ে।

সাধুলাল। ও মাই! মাই! (উচ্ছ্বসিত হইয়া বার বার ছবির ডান হাতখানা নিজ হইতে উঠাইয়া লইয়া হ্যাণ্ডসেক করিতে লাগিল) আপনার সঙ্গে আলাপে খুব আনন্দ পেলাম, খুব আনন্দ পেলাম, খুব আনন্দ পেলাম। (হাত ছাড়িয়া দিয়া) আপনাদের পভার্টির কথা বলে দুঃখ দিলাম না ত আপনাকে? ক্ষমা করবেন। (পুনরায় অনুরূপ ভাবে হ্যাণ্ডশেক করন)

ছবি। (আড়ষ্টভাবে একটু দূরে সরিয়া গিয়া মাথা নীচু করিয়া।) আপনার ঋণ কবে শোধ হবে কে জানে!

সাধুলাল। টাকার কথা বলছেন? খুব শীগ্গিরই শোধ হয়ে যাবে। আপনার দাদা মাইনে পেলেই শোধ করে দেবে।

ছবি। দাদা কোন চাকরী করে না।

[নেপালী বয়ের প্রবেশ]

বয়। (সেলাম ঠুকিয়া সাধুলালকে) খানা তৈয়ার সাব।

[প্রস্থান]

সাধুলাল। কাল থেকে করবে। আমার অপিসে একশ'-পঁচিশ টাকা মাইনার চাকরী তৈয়ার করে আপনার দাদাকে দিলাম।

ছবি। (আরও অভিভূত হইয়া) ওঃ—।

সাধুলাল। (বিষয়টাকে হালকা করিয়া) কিছু না, কিছু না! (ঘড়ি দেখিয়া) চলুন, সময় হয়েছে, আমরা বসি, চলিয়ে ক্যাপ্টেন সিং।

ক্যাপ্টেন সিং। (খবরের কাগজ নামাইয়া রাখিয়া) চলিয়ে।

[তিন জনে খাবারের টেবিলের দিকে অগ্রসর হইল।

[ক্যাপ্টেন সিং বিংগুজির লেবেল পড়িয়া স্থান নির্দ্দেশ করিতে তাহারা নিজ নিজ আসন গ্রহণ করিল]

সাধুলাল। বাসু ইজ মিসিং ? ভার্মা ইজ লেট অ্যাজ ইউজুয়েল। হোয়ার ইজ ডক্টর বাসু ?

ছবি। আমার সঙ্গে এসেছিলেন। খুব জরুরী কি কাজে গেলেন, এখুনি আসবেন।

সাধুলাল। আপনাকে ফেলে যাওয়া খুব দোষ হয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার পরে গেলেই হ'ত। আমি তাকে শাস্তি দিব। (ছবি সাধুলালের দিকে সভয়ে তাকাইতে, হাসিয়া) আজকে আমার জায়গায় তাকে সভাপতি বানাব, এই শাস্তি। (ন্যাপকিন সমেত রিং বদলাইয়া ছবির পাশে বসিল এবং আরও হাসিতে লাগিল)

[লেঃ ভার্মার প্রবেশ। মিলিটারি পোশাকে সজ্জিত অল্প বয়সী উগ্র প্রকৃতির যুবক।]

লেঃ ভার্মা। (দরজার নিকট 'এটেনশান' হইয়া) মে আই কাম্ ইন্ স্যার ?

সাধুলাল। ইয়েস, ইয়েস, উই আর ওয়েটিং কর ইউ।

লেঃ ভার্মা। (নিজ স্থানে বসিয়া উগ্রভাবে) বাট আই অ্যাম নট লেট। ইট ইজ ওনলি সেভেন ফিফটি ফাইভ বাই দি ব্যাটালিয়ন ক্লক।

সাধুলাল। পিস ভার্মা, পিস। (ছবিকে পরিচয় করাইয়া) মিস বোস (ভার্মাকে দেখাইয়া) লেঃ ভার্মা। (উভয়ে উভয়কে নমস্কার করিল)

লেঃ ভার্মা। (ছবিকে) এক রোজ হামারা ঘরমে চলিয়ে সাবিত্রীকো সাথ ইনট্রাডিউস কর দেঙ্গে।

ছবি। সাবিত্রী কোন্ ?

ভার্মা। মেরা জেনানা। বি-এ তক পড়েথে। (নিজের মনে) আজ মেনু কা হ্যায় ? (মেনু পাঠে মগ্ন হইল)

সাধুলাল। (উচ্চকণ্ঠে) বয় ! (বয় প্রবেশ করিয়া এটেনশান হইয়া দাঁড়াইতে) ঠাণ্ডা সোডা আউর মেরা ঘরসে বোতলঠো লে আনা। (বয় প্রস্থান করিতে ছবিকে) বাড়ীতে কাঁটাচামচে খান ?

ছবি। (হাসিয়া) না।

সাধুলাল। আপনার দাদা আসলে তবে ডিনার সুরু হবে। ততক্ষণ আপনাকে কাঁটাচামচেয় খাওয়া শিখিয়ে দিচ্ছি। (ছবির হাতে হাত দিয়া শিখাইতে সুরু করিল) নাইফ ডান হাতে, কাঁটা বাঁ হাতে, চামচ ডান হাতে (বরফ দেওয়া সোডার বড় পাত্র লইয়া বয় প্রবেশ করিতে ইসারায় উহা সকলকে দিতে বলিল) নাইফ এমন করে ধরতে হয়, কাঁটা এমন করে ধরতে হয়। (বয় প্রথমেই সাধুলাল ও ছবির গেলাসে সোডা ঢালিতে) নিন খান, খুব ঠাণ্ডা। (গ্লাস আগাইয়া দিল।) খান আমার একটা অনুরোধ রাখুন। (ছবি সরল মনে এক চুমুকে গেলাস নিঃশেষিত করিয়া ফেলিল।)

সিং। (ছবির বিপরীত দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভার্মাকে) শ্যায়দ আদত হ্যায়।

ভার্মা। বড়ে তাজ্জব কি বাত্তী হৈ !

সাধুলাল। (ছবিকে) ওদের কথায় কান দিবেন না। ওরা ওদের ঘরের কথা বলছে। ওরাও আপনার মত নিমন্ত্রণ খেতে এসেছে ; হপ্তায় দু'দিন আসে।

ছবি। ওঃ ! (যন্ত্রণায় মাথা চাপিয়া ধরিল)

সাধুলাল। কি হ'ল ?

ছবি। (হাত নামাইয়া) না, কিছু না।

সাধুলাল। (পূর্ব্বের জের টানিয়া) এটা মাছ খাবার নাইফ—

[একটা দশ সেরি ঘিয়ের টিন ও এক ধামা আলু লইয়া খাকি হাফ-প্যাণ্ট সার্ট-পরা একটি লোকের প্রবেশ]

লোকটি। কিধার রখেঙ্গে সাব ?

[নরেনের প্রবেশ]

নরেন। (বাহিরের দরজার পর্দা ফাঁক করিয়া বারান্দা দেখাইয়া) ইধার রাখ্যো। আওর সব চিজভি লে আও।

[লোকটির প্রস্থান]

সাধুলাল। (ছবিকে) আপনার দাদার আসতে বেশী দেরী হচ্ছে, আমরা আরম্ভ করি। মিঃ রায়, লেট আস বিগিন।

নরেন। ফার্ষ্ট, লেট আস টেক আওয়ার সিটস প্রপারলি, (কতক্ষণ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সাধুলালের দিকে তাকাইয়া রহিল কিন্তু সে তাহা অগ্রাহ্য করিতে, উচ্চকণ্ঠে) ধ্যান বাহাদুর ! (অনতি-বিলম্বে বয়ের প্রবেশ) মেজর সাবকো আপনে জায়গামে বৈঠনে বোলো। (বয় বিস্মিত দৃষ্টিতে নরেনের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে, ব্যাখ্যা করিয়া) মেজর সাব ডিসিপ্লিন ব্রেক কিয়া, উনকো আপনে জায়গামে বৈঠনে বোলো।

বয়। জী, আচ্ছা। (সাধুলালের নিকটে গিয়া এটেনশন ও স্যালুট করিয়া) আপ প্রিসিডেণ্টকে জায়গামে বৈঠিয়ে সাব !

সাধুলাল। যাও সুপ লে আও। (ছবিকে) আপনি নিজে যখন লেখাপড়া জানেন, আপনিও চাকরী করতে পারেন।

[বয় প্রস্থানোদ্যত, নরেন তাহাকে নিরস্ত করিল]

ছবি। কি করে জানলেন আমি লেখাপড়া জানি ?

সাধুলাল। আপনার দেশে বলে, আগুন ছাই চাপা থাকে না।

ছবি। (প্রীত হইয়া) ম্যাট্রিকটা পাশ করেছিলাম। ছেলেরাই চাকরী পাচ্ছে না, আমাকে কে চাকরী দেবে ?

[নরেনের নিকট হইতে ইসারা পাইয়া বয় পুনরায় সাধুলালের নিকট গেল]

বয়। (সাধুলালের কানের কাছে) আপ প্রিসিডেণ্টকে কুরশীমে বৈঠিয়ে সাব !

সাধুলাল। আজকো লিয়ে ডাক্তার সাবকো প্রেসিডেণ্ট বনায়া গিয়া।

বয়। (বুঝিতে বিলম্ব হইল) জী ?

সাধুলাল। আজকো লিয়ে ডাক্তার বাসু সাবকো প্রেসিডেন্ট বনায়া গিয়া।

[বয় পুনরায় প্রস্থানোদ্যত, নরেন তাহাকে ইসারায় ডাকিয়া লইয়া জনান্তিকে কিছু বলিল]

সাধুলাল। (ছবিকে বিস্ময়ের ভান করিয়া) অঁ্যা! ম্যাট্রিক পাস করেছেন। তবে ত আমিই আপনাকে চাকরী দিতে পারি। শো টাকা মাহিনা।

ছবি। বাবা আমাকে চাকরী করতে দেবেন কি ?

বয়। (পুনরায় সাধুলালের কানের কাছে গিয়া) ডাক্তার সাব নাহি আয়েঙ্গে, আপ প্রেসিডেন্ট বৈঠিয়ে।

সাধুলাল। (ঈষৎ বিরক্তির সহিত) সুপ লে আও না !

বয়। হুকুম নেহি হ্যায়। আপ উধার নেহি বৈঠনেসে সুপ নেহি দি যায়গি।

সাধুলাল। (মুহূর্তের জন্য মুখের ভাব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল কিন্তু পরক্ষণেই উচ্চ হাসি হাসিয়া) অল রাইট লেফটেনাণ্ট রায়, অল রাইট, ইউ ক্যান বি এ রিয়েল নুইসেন্স হোয়েন ইউ ওয়াণ্ট টু বি। (সাধুলাল উঠিয়া দাঁড়াইতে নরেন বয়কে ইসারা করিল, বয়ের অন্দরের দিকে প্রস্থান) দেখুন মিস বোস, আমাদের এখানে কি কড়া ডিসিপ্লিন।

[নরেন ও সাধুলাল নিজ নিজ স্থানে উপবেশন করিল। একটি একটি করিয়া সুপের প্লেট আনিয়া বয় পরিবেশন করিতে লাগিল]

ক্যাপ্টেন সিং। (ছবির হাতে বড় গোল চামচ তুলিয়া দিয়া) ইসকো ইস্তেমাল কিজিয়ে।

[সকলে সুপ পান করিতে সুরু করিল, তাহাদের অনুকরণে ছবি এক চামচ মুখে দিল, কিন্তু পরক্ষণেই সুপের প্লেট ঠেলিয়া দিয়া টেবিলের উপর মাথা নীচু করিল। ইহা দেখিয়া ভার্মা ও সিং পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিল]

নরেন। (আতঙ্কিত হইয়া) কি হ'ল মিস বোস ?

সাধুলাল। (নরেনকে নিরস্ত করিয়া) আপনি বুঝবেন না, আমি জানি কি হয়েছে। (দ্রুত কণ্ঠে) ওঁকে যদি সাহায্য করতে চান শীগ্‌গির একটা কাজ করুন। আমার জিপটা নিয়ে ক্যাপ্টেন বাসুকে নিয়ে আসুন (নরেন উঠিয়া পড়িয়া ছবির দিকে তাকাইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল) বি কুইক। (ছবির দিকে তাকাইতে তাকাইতে নরেনের প্রস্থান) এক্সকিউজ মি, ক্যাপ্টেন সিং, (উঠিয়া দাঁড়াইল) ড্যামসেল ইন ডিসট্রেস, এক্সকিউজ মি, লেফটনাণ্ট ভার্মা। সি ইজ দি ডটার অব এ্যান ওল্ড ফ্রেণ্ড অব মাইন। (ছবির নিকট গিয়া) দু' মিনিট শুয়ে থাকলেই ভাল হয়ে যাবেন। উঠুন, পাশেই ডাক্তার বাসুর ঘর। ওনাকে আনতে পাঠিয়েছি, উঠুন। (ছবি মুখ তুলিল, গম ও চাউলের বস্তা লইয়া পূর্ব্ববর্ণিত লোকটি আসিল এবং বারান্দার দিকে চলিয়া গেল) উঠতে চেষ্টা করুন। (ছবি উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঈষৎ টলিতে থাকিল) আমাকে ধরুন না হয় (ছবি সাধুলালের বাহু জড়াইয়া ধরিল। বয়ের প্রবেশ) দোয় খানা ডাক্তার সাবকো ঘরমে দেনা।

(বয় নরেনের উদ্দেশ্যে এদিক-ওদিক তাকাইয়া নরেন, সাধুলাল ও ছবির সুপ-প্লেট লইয়া অন্দরের দিকে চলিয়া গেল। বাহু সংলগ্ন অবস্থায় ছবি ও সাধুলালের বাহিরের দিকে প্রস্থান)

ভার্মা। (ছবির বাহুসংলগ্ন অবস্থাটাকে ভঙ্গীসহকারে ভেঙ্গচাইয়া) দেখা আপনে ?

সিং। হাম বহুত দেখ্ চুকা, অভি আপলোগ দেখিয়ে।

ভার্মা। (ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) মেজর লালকো ঢং ভি মেরা বহুত বুরা মালুম হোতা হায়। বুড্ঢা আদমী, সাদি ভি কর চুকা। এইসা দো এক আদমী কো লিয়ে নাম খারাব হোতা, বহুত আপশোষ কি বাত।

সিং। আপান নহি ক ?

ভার্মা। নাহি তো ! ক্যা বাত ?

সিং। মেজর লাল কা ওয়াইফ উনকো ছোড় কর্ ভাগ গিয়া। চার মাহিনা হুয়া।

ভার্মা। আপকো কেইসে মালুম ?

সিং। আরে ! কেইসে মালুম ? যানে কো টাইম পর মেজেরবাণীসে একঠো চিঠ্ঠি ভি ইধার ভেজা, উ চিঠ্ঠি হামকো খুদ দিখায়া।

ভার্মা। চিঠ্ঠি ভেজা ? ক্যা বাতলায়া চিঠ্ঠিমে ?

সিং। লিখা বহুত তাজ্জব, আউর বহুত মামুলী বাত। (সুর করিয়া) 'মেরি যৌবন ভুখা মর রহে, হাম চল রহে।'

[দুই প্লেট মাংস লইয়া ধ্যান বাহাদুর ঘরটি পার হইয়া গেল।]

ভার্মা। সাদিকা কিৎনা রোজ হুয়াথা ?

সিং। চার বরস।

ভার্মা। ঘরমে কিৎনে দিন তক ঠহরা থা ?

সিং। কৌন ?

ভার্মা। মেজর লাল। [ধ্যান বাহাদুর ফিরিয়া ডাইনিং টেবিলের প্লেটগুলি লইয়া অন্দরে ঢুকিল]

সিং। তিন মাহিনা। অল টোল্ড।

[নেপথ্যে ছবির উচ্চ হাসির শব্দ]

ভার্মা। (সরোষে টেবিল চাপড়াইয়া) আই হেট দিস ওয়ার ! আই হেট দিস ওয়ার ! আই হেট দিস ওয়ার !

সিং। খামোশ, ভার্মা, খামোশ। মেরা ববানিকি টাইম পর হাম ভি এইসা ঘাবড়ায় থা। [ধ্যান সিং মাংসের প্লেট সাজাইয়া দিয়া গেল] অভি, হুঁ (গোঁফ বিন্যস্ত করিয়া খাবারে মন দিল)

[নেপথ্যে পুনরায় ছবির খিল-খিল হাসির শব্দ শুনা গেল। ভার্মা চক্ষু বুজিয়া দুই কান দুই হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল।]

[যবনিকা] ক্রমশঃ

ওয়ালটেয়ার—ভারতীয় ঐতিহাসিক সম্মেলন

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

শেষ পর্যন্ত সত্যসত্যই আমার ওয়ালটেয়ার যাওয়া স্থির হইল। ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত আমাকে তাঁহাদের ঐতিহাসিক সমিতির সদস্য করিয়া লইলেন—তাহার ফলে যাতায়াতের সুবিধা হইল। ২৭শে ডিসেম্বর ওয়ালটেয়ারের উদ্দেশে রওনা হওয়া গেল। ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলাম—বাংলার শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের দল সকলেই চলিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলি প্রায়ই রিজার্ভ। আমি মধ্যম শ্রেণীর একখানা গাড়ীতে স্থান করিয়া লইলাম। আমাদের সহযাত্রী ছিলেন আশুতোষ কলেজের একজন অধ্যাপক। তিনি সপরিবারে হায়দরাবাদ বিজ্ঞান মহাসম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য যাইতেছিলেন। আর একজন যাইতেছিলেন গুণ্টুর। তাঁহার নাম রাধামোহন ভট্টাচার্য্য। আলাপ বেশ জমিয়া উঠিল।

খড়্গপুর হইতে গাড়ী চলিল ভিন্ন পথে। এ পথ যদিও পূর্ব্বপরিচিত, তবু বহু বৎসর পর যাইতেছি বলিয়া বেশ আনন্দবোধ হইতেছিল।

রাত্রিতে কখন বালেশ্বর, ভদ্রক, কটক, ভুবনেশ্বর, খুর্দ্দা পার হইয়া গেলাম খেয়াল করি নাই। শ্রীক্ষেত্রের পথ খুর্দ্দা জংশন পড়িয়া রহিল। চিল্কার কিনারা দিয়া গাড়ী চলিয়া গেল। জানালা খুলিয়া দেখিলাম চিল্কার বিরাট বিস্তার। অগভীর নীল সলিলরাশি প্রায় পাঁচ শত বর্গমাইল স্থান অধিকার করিয়া আছে। ক্ষীণ আলো ও অন্ধকারের এক অপূর্ব্ব মিশ্রণে চিল্কাকে অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। উড়িষ্যার পুরী জেলা হইতে মাদ্রাজের গঞ্জাম জেলা পর্য্যন্ত ইহার বিস্তার। বঙ্গোপসাগর ও এই চিল্কা হ্রদের মধ্যে ব্যবধান কোন স্থানে অতি সামান্য এবং কোথাও চিল্কার সঙ্গে সমুদ্রজলের মিলন হইয়াছে। চিল্কা হ্রদ ও তাহার চারিদিকের শোভা বড় সুন্দর। হ্রদের বুকে ছোট ছোট দ্বীপ অনেক, আর পশ্চিমে ও দক্ষিণে তরুগুল্মশোভিত পর্ব্বত-প্রাচীর দাঁড়াইয়া আছে। চিল্কার পরেই আরম্ভ হইল নবগঠিত অন্ধ্ররাজ্য। প্রভাত হইলে দেখা গেল যেন এক সম্পূর্ণ নূতন দেশে আসিয়া পড়িয়াছি। তালবনের সারি। দূরে নীল পাহাড়। ভাষা বাঙ্গালীর সম্পূর্ণ অবোধ্য। অধিবাসিগণের দৈহিক গঠনও বাঙ্গালী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একটা ষ্টেশনে—বোধ হয় পলাশ হইবে, পরিচিত কণ্ঠস্বর—'এই যে দাদা! দূর হইতেই আপনার উঁচু মাথা চোখে পড়িয়াছে।' প্রবাসীর নলিনী ভায়া (নলিনীকুমার ভদ্র) চলিয়াছেন, বিশাখাপত্তনে একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলনে। এ ষ্টেশনে কলা খুব সস্তা। সুস্বাদুও বটে। চা-পানও আমরা দু'জনে এখানেই শেষ করিলাম। এখন সহযাত্রীদের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়া গিয়াছে। কত কথা, কত তর্কই না হইতেছে।

বিজয়নগর পার হইবার পরই ট্রেন অতি অল্প সময়ের মধ্যে আসিয়া ওয়ালটেয়ার ষ্টেশনে পৌঁছিল বেলা ঠিক এগারোটায়। ষ্টেশনে ভলান্টিয়াররা উপস্থিত ছিলেন। আমরা আমাদের মালপত্রসহ অন্ধ্র ইউনিভার্সিটির বাসে চড়িয়া অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের হোষ্টেলে গিয়া পৌঁছিলাম। ওয়ালটেয়ারের প্রধান রাজপথ ধরিয়া আমরা প্রাচীরঘেরা অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বেষ্টনীর ভিতর দিয়া চলিলাম। প্রবেশদ্বার বেশ বড়। আমরা যে পথ দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলাম, সেই পথের দক্ষিণে ও বামে একরূপ চারিদিক বেড়িয়া বিভিন্ন শিক্ষাভবন, লাইব্রেরী, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, আর্টস কলেজ, চিকিৎসালয় প্রভৃতি রহিয়াছে। বাড়ীগুলি সুগঠিত, সুন্দর। পথ প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন। অদূরে সমুদ্রের নীল জলরাশি সূর্য্যকিরণে টলমল করিতেছে। শীত নাই, শান্ত স্নিগ্ধ সুমধুর সমীরণ দেহ ও মন শীতল করে।

আমার ও শ্রীযুত অভয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের আস্তানা হইল অশোক বর্দ্ধনের ১২২ নং ঘর। সে ঘরে যে ছেলেটির বাসস্থান ছিল সে তাহার একখানি খাটিয়া আমার জন্য আনিয়া দিল। ত্রিতল অট্টালিকা। বারান্দায় যে দিকেই দাঁড়াই না কেন মুক্ত জানালা-পথে দেখা যায় সমুদ্রের নীল তরঙ্গভঙ্গী। তালীবননীলা সৈকতভূমি, দূরে ডলফিন্ নোজের গায়ে সমুদ্র-তরঙ্গের ফেনিল উচ্ছ্বাস। এখানে আসিয়া কেবলই মনে হইতেছিল বহুদিন আগে পঠিত, কবি গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতার কয়েকটি পংক্তি :

> আমার এই কুটীরখানি সমুদ্রের ধারে,
> মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ওপারে!
> ঘন তালীবনের মাঝে সরু-পথের রেখা,
> সুন্দরী-সীমন্তে যেন সিন্দূরের রেখা!
> বাতাস সদা মাতাল যেন উঠে পড়ে ছুটে;
> নারিকেলের কুঞ্জগুলি আকুল মাথা কুটে!

সত্যই তাই। সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার। নীল জলে তরঙ্গমালা। তালীবনের আড়াল দিয়া পথ। প্রাণে আপনা হইতে একটা উদার ভাবের উদয় হয়। স্নান-আহার সারিলাম। ব্যবস্থা ছিল সুন্দর। দৈনন্দিন খাদ্যের মধ্যে পোলাও, সামুদ্রিক মৎস্য, মাংসও প্রতিদিন দিবার ব্যবস্থা ছিল। ডিম দিয়াও অনেক ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইত। অত্যন্ত যত্নের সহিত আমাদের ভোজ্যদ্রব্য পরিবেশন করা হইত। নিমন্ত্রিত প্রতিনিধিবর্গের কোনরূপ ত্রুটি না হয় সেদিকে ছিল সকলেরই বিশেষ লক্ষ্য। পরিবেশকদের মধ্যে পাইয়াছিলাম জগবন্ধুকে। সে বাংলা বলিত এবং বুঝিত আর বাঙ্গালীর খাদ্যাদি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল বলিয়া তাহার একটু গর্ব্বও ছিল। বাঙ্গালী সদস্যদের জগবন্ধুকে না ডাকিয়া তৃপ্তি হইত না। ভোজনালয়ে প্রায় সব প্রদেশেরই লোক দেখিয়াছি। মনে হইল বাঙ্গালী প্রতিনিধির দলই ছিলেন সংখ্যায় বেশী।

ওয়ালটেয়ারে এবার ভারতীয় ঐতিহাসিক সম্মেলনের ষোড়শ

অধিবেশন হইল। সাধারণ সদস্যসংখ্যা বর্ত্তমান বৎসরে দাঁড়াইয়াছে ৩২৩ জন। এ বৎসর আজীবন-সদস্য হইয়াছেন ৭ জন। ২৮শে ডিসেম্বর আমরা বিশ্রাম করিলাম ও ইতস্ততঃ বেড়াইলাম—বিশেষ করিয়া সমুদ্রসৈকতে। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন, ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ডক্টর জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাটোয়া কলেজের অধ্যক্ষ হরিমোহন বাবুও ছিলেন। ডক্টর ঘোষাল, নগ্ন-পদে সমুদ্রের কিনারায় নামিলেন, হরিমোহনবাবুও সঙ্গী হইলেন, নীল সিন্ধুজল আসিয়া উভয়কে আক্রমণ করিল—ইহারাও লুকোচুরি খেলিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। আকাশে তারার মালা ফুটিয়া উঠিল। আবার মনে পড়িল গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রিয় সঙ্গীত—"সাগরকুলে বসিয়ে বিরলে গণিব লহরীমালা!" অজানা, উচু-নীচু পথ। উপরে উঠিয়া অশোক বর্দ্ধনের ঘরে গিয়া পৌঁছিলাম। ঘরে ঘরে প্রতিনিধিদলের কলগুঞ্জন শোনা গেল।

২৯শে, ৩০শে ও ৩১শে ডিসেম্বর এই তিন দিন সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধি রূপে এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলাম।

২৯শে তারিখ কয়েকজন সদস্য সীমাচলম্ দেখিতে গিয়াছিলেন। প্রীতিভাজন বন্ধু ডক্টর শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীও ছিলেন তাঁহাদের এক জন। সীমাচলমের প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন—'আপনার পক্ষে সেখানে যাওয়া ঠিক হইবে না। সত্তর বৎসর বয়সে এইরূপ দুঃসাহসিক কাজ করিতে গেলে হার্ট ফেল হওয়া অসম্ভব নহে।' সেখানে কিছু বলিলাম না। পরদিন আমরা তিন জন চলিলাম সীমাচল অভিযানে—সিটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ইটাকোণা কলেজের অধ্যাপক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন ও আমি। খুব সকালে উঠিয়া অন্ধ্র ইউনিভার্সিটির বাসে আসিলাম শহরের এক ধারে—যেখান হইতে সীমাচলমের বাস চলে।

৭-৩০ মিনিটে বাস ছাড়িল। সঙ্গী হইলেন এক মাদ্রাজী ভদ্রলোক। নাম বোধ হয় নারায়ণ রায়—বয়স পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশের ভিতরে হইবে। পথের দুই দিকের শোভা অতি সুন্দর। পাহাড়-পর্ব্বত, বনজঙ্গল, থানা, বাজার ও পল্লী। অন্ধ্র দরিদ্র দেশ। তালপাতার ছাউনি, অতি ছোট নীচু ঘর, ক্ষুদ্র দরজা। সে ঘরে বাস করে স্ত্রী পুত্র লইয়া গৃহস্বামী। অভাব ও দৈন্যের জীবন্ত চিত্র।

প্রথম দিন সকাল ৮-৩০ মিনিট হইতে ১-৩০ মিনিট পর্য্যন্ত অধিবেশন হয়। প্রথমেই ডক্টর শ্রীরাধাকৃষ্ণন জানাইলেন তাঁহার স্বাভাবিক সরস বাক্যে সাদর অভিনন্দন, তারপর অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ ডক্টর ভি. এস. কৃষ্ণ তাঁহার স্বাগত-ভাষণে বলেন—ভারতের অন্যান্য যে সকল প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেগুলির মত ওয়ালটেয়ার ঐতিহাসিক স্থান নহে। কিছুদিন পূর্ব্বেও এ স্থান ছিল বিজন—প্রকৃতি তাহার অপরূপ সৌন্দর্য্যলীলায় এ স্থানটিকে পরম রমণীয় করিয়াছে।—অতঃপর তিনি স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তথা অভ্যাগত প্রতিনিধিগণকে স্বাগত করেন। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের প্রস্তাবে ও ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেনের সমর্থনে মহামহোপাধ্যায় ডক্টর কেন্ সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার দীর্ঘ ভাষণে তিনি ইতিহাসের সংজ্ঞা, মহেঞ্জোদাড়োর পুরাবৃত্ত ও অন্যান্য বিষয়ের অবতারণা করেন। প্রথম দিনের সভাশেষে 'জনগণমন অধিনায়ক' এই জাতীয় সঙ্গীতটি গান করেন একটি অন্ধ্র তরুণী। ৩০শে, ৩১শে ঐ দুই দিনও বিভিন্ন শাখার সভাপতিগণের ভাষণ পঠিত হয়। বিভিন্ন শাখার সভাপতিগণ এবং প্রবন্ধ-পাঠকগণ নানা বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাহার অধিবেশন হইয়াছিল। সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ফিরিয়া সে সব প্রবন্ধ শুনিবার সুযোগ আমরা করিতে পারি নাই।

সভামণ্ডপের সম্মুখে ইতিহাস-কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্য

ধীবর, শ্রমজীবী এবং কৃষিজীবীদের যতটুকু দেখিলাম কোনও উন্নতি হয় নাই। তবে উচ্চশিক্ষিত লোকেরা এবং কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে—ক্রমশঃ এই দেশ উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিবে সন্দেহ নাই। সংস্কৃতির পথেও তাহাদের অগ্রগতির লক্ষণ পরিস্ফুট। কোন দেশ ও জাতির সম্বন্ধে সামান্য পরিচয় ও দুই-এক দিনের দেখায় কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। তবে এ কথা সত্য—যে দেশের লোক স্বতন্ত্র অন্ধ্র রাজ্য গঠনের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই তাঁহাদের কে রুখিবে?

৮-৩০ পর বিশাখাপত্তন হইতে রওনা হইয়া ৮-৪০ মিনিটে সীমাচলমের পাদমূলে আসিয়া পৌঁছিলাম। বেশ চওড়া রাস্তা। রাস্তার দুই পাশে সারি সারি দোকান। চা, কফি, কলা ও ইডলি আছে। আমরা তিন জনে কফি ও কদলী ভক্ষণ করিয়া পর্ব্বতারোহণে অগ্রসর হইলাম। বড় রাস্তা হইতে একটি প্রশস্ত বাঁধানো পথ মন্দিরে যাইবার সিঁড়ি পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। প্রশস্ত সোপানাবলী। এ অঞ্চলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মন্দির এই সীমাচলম্। উচ্চতা ৮০০ শত ফুট। বিশাখাপত্তন হইতে উত্তর দিকে দেবমন্দির অবস্থিত।

আমরা ধীরে ধীরে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। প্রস্তরনির্ম্মিত দীর্ঘ সোপানশ্রেণী। এরূপ সুগঠিত ও সুপ্রশস্ত সোপান অন্য কোন পর্ব্বতোপরি অবস্থিত দেবমন্দিরে বড় একটা দেখি নাই। মোট সোপানের সংখ্যা এক হাজার আট। আমি ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিলাম। যেখানে খাড়াই বেশী সেখানে মধ্যে মধ্যে সোপান-শ্রেণী বিস্তৃত—সোপানের সংখ্যাও অধিক। ইহাতে যাত্রীদের উঠিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা।

পথের দুই পাশে শ্যামল তরুশ্রেণী। পুষ্পিত লতা। নির্ঝর-ধারা ঝর্ ঝর্ করিয়া উপর হইতে পড়িতেছে। পর্ব্বতগাত্রে আনারস, পেঁপে প্রভৃতির ক্ষেত। বন্য গোলাপ এবং নানাজাতীয় আরণ্য কুসুমের সমাবেশ ও বিচিত্র রূপ পথশ্রম দূর করে। দুই দিকে শ্যামল তরুলতাগুল্ম থাকায় রৌদ্রের প্রখর তাপ অনুভব করিতে হয় না। আমি মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে করিতে চলিলাম। ছায়াশীতল পথে চলিতে বেশ লাগিতেছিল। ক্রমে শতাধিক সিঁড়ি উত্তীর্ণ হইয়া আসিলাম একটি ক্ষুদ্র গ্রামে। স্থানটি সমতল। এক সুবৃহৎ বটবৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে—বহু স্থান জুড়িয়া-চারিদিকে জট নামিয়াছে মাটিতে। এখানে যাত্রীদের জন্য ধর্ম্ম-শালার মত একটি একতলা দীর্ঘ দালান। রন্ধনশালা ও স্নানের জায়গা আছে। এক পাশে সোপানশ্রেণীর কাছে একটি জলাধার। জলাধারটি প্রস্তরনির্ম্মিত। দূরে উচ্চ পর্ব্বতশিখর হইতে নিম্নগামিনী সলিলরাশির পতন-পথে এই জলাধারটি বিদ্যমান। এখানে ভগ্ন ও অভগ্ন কয়েকটি দেবমূর্ত্তি দেখিলাম। পাণ্ডারা এগুলিকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া যাত্রীদের নিকট হইতে পয়সা আদায় করে। আমি এখানে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। বড় ভাল লাগিতেছিল। পাখীর গান—নির্ঝরের কলতান—দূরে বহুদূরবিস্তৃত তরঙ্গায়িত পর্ব্বতশ্রেণী—উপরে অনন্ত নীল গগন—নানা রঙের ফুলের রাশি। বহুনিম্নে দেখা যাইতেছিল সমতলভূমির হরিৎসুষমা। আম, কাঁঠাল গাছের সংখ্যাও বড় কম নয়।

মন্দির-সোপান হইতে বন্ধুরা ডাকিতেছিলেন—চলে আসুন আমরা পৌঁছে গেছি। আমিও ধীর পদক্ষেপে উপরে উঠিলাম। এক জন পাণ্ডাও জুটিল। পাহাড়ের নীচে অর্দ্ধবৃত্তাকার সমতলভূমি। বেশ প্রশস্ত চত্বর বা প্রাঙ্গণ। এক পাশে বিভিন্ন দেবতার মন্দির। আমরা পূজা দিলাম। ঘণ্টা বাজাইলাম। তারপর পৌঁছিলাম সীমাচলম্ মন্দিরদ্বারে। প্রথমেই একটি অনতিবৃহৎ চত্বর। এখানে দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য মন্দিরের মত গোপুরম্ বা মুখমণ্ডপ, গোপুরমের উপরে একটি বৃত্তাকার মঞ্চ। তার পরেই নাটমণ্ডপ। ষোলটি প্রস্তর-স্তম্ভের দ্বারা সুরক্ষিত ও সুশোভিত। সম্মুখে একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত রথ, প্রস্তরনির্ম্মিত অশ্বযুগল রথে সংযোজিত। সম্মুখে বারান্দা। প্রস্তরস্তম্ভের উপর ছাদ। ছাদের ভিতরের দিকে অতি সুন্দর ভাবে লতা-পাতা, নানা জীবজন্তুর মূর্ত্তি, বিষ্ণুপুরাণ হইতে গৃহীত দেবদেবীর মূর্ত্তি। অনেকগুলি মিথুনমূর্ত্তিও আছে। পূর্ব্বে আরও অনেক ছিল, কিন্তু ভিজিয়ানাগ্রামের রাণী এ সকল মূর্ত্তি দেখিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং পুরু প্লাষ্টারে এগুলি আবৃত করা হয়। এখনও এ ধরণের মূর্ত্তি একেবারে নাই এমন কথা বলা যায় না। মূল মন্দিরের বেষ্টনীর বাহিরে উত্তরদিকে কল্যাণমণ্ডপ। কল্যাণমণ্ডপটি অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত ছিয়ানব্বইটি প্রস্তরস্তম্ভের উপর অবস্থিত। ষোলটি সারি। প্রত্যেক সারিতে ছয়টি করিয়া স্তম্ভ। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশ দিবসে দেবতার বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন হয়। এই মন্দির বোধ হয় পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল—স্থাপত্যকলার দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে এই মন্দিরের কারুকার্য্য তেমন উচ্চশ্রেণীর নহে। তবে যাঁহারা হিন্দু ভাস্কর্য্যকীর্ত্তির ও দেবদেবীর পরিচয় জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের ভালই লাগিবে। ইহার গায়ে মৎস্যাবতার, ধন্বন্তরী, বরুণ এবং নৃসিংহদেবের মূর্ত্তিসমূহ দর্শনযোগ্য।

এই পর্ব্বতে একটি প্রস্রবণ আছে। তাহার নাম গঙ্গাধারা। ইহাতে স্নান করিলে নানা রোগ আরোগ্য হয়, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। এখানকার এই পবিত্র জলে স্নান করিলে নাকি মানুষের আর পুনর্জন্ম হয় না। একেবারে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হয়।

এক সময়ে—বিশেষতঃ মধ্যযুগে—সীমাচলম্ ছিল বিখ্যাত বিদ্যা-কেন্দ্র। নরহরি তীর্থপ্রসাদ এবং তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যেরা এখন কলিঙ্গের গঙ্গ রাজা এবং স্থানীয় রাজাদের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহারা এ অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। স্থানীয় নৃপতিমণ্ডলীর অর্থানুকূল্যে অনন্ত প্রদেশে বহু মঠ, মন্দির, চতুষ্পাঠী ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সে সকল স্থানে বিবিধ শাস্ত্র, বেদ, জ্যোতির্বিদ্যা এবং দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষাদান করা হয়।

আবার মন্দিরের কথা বলি। মূল মন্দিরের গায়ে সেকালের সামাজিক ঘটনাবলীর বহু চিত্রও খোদিত আছে। নরনারীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, কোথাও খোলবাদনরত নর ও নারী, কোথাও উৎসবদৃশ্য, কোথাও নৃত্যপরায়ণা নারী, কোথাও শোভাযাত্রা—আবার জীবজন্তুর মধ্যে মরাল-মরালী, কোথাও হস্তীযূথ, কোথাও সিংহ প্রভৃতি শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক।

এখানে প্রথম কক্ষ অতিক্রম করিলে প্রবেশপথের দুই পার্শ্বে পদ্মাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি নজরে পড়ে। মূর্ত্তির নয়নে, অধরে স্নিগ্ধ ও পবিত্র প্রশান্ত ভাব। আশ্চর্য্যের বিষয় বাহু ভগ্ন।

আমরা মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলাম। গৃহ অন্ধকার। উচ্চ পিত্তলের প্রকাণ্ড পিলসুজের উপর বৃহৎ পিত্তল-প্রদীপ ঘৃতপুষ্ট হইয়া আলোক বিস্তার করিতেছে। সে আলোকে এবং মন্দিরের পূজারী-বৃন্দের গমনাগমনে বেশ্ একটা প্রশান্ত ভাব অনুভব করিতেছিলাম। কয়েকজন বাঙালী ভদ্রলোক ও বাঙালী মহিলার সঙ্গেও আলাপ-পরিচয় হইল। তাঁহার কেহ তীর্থযাত্রী, কেহ বা এখানে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়াছেন।

এখানকার প্রধান দেবমূর্ত্তি নৃসিংহদেব। তাহা শিবলিঙ্গের অভ্যন্তরে সংস্থাপিত। চৈত্র মাসের শুক্লা একাদশী ও বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়ায় মহাসমারোহে পূজা এবং উৎসব হয়—চৈত্র মাসে হয় পঞ্চদিবসব্যাপী উৎসব, বৈশাখের উৎসব একদিন। সেই সময় নৃসিংহদেবের শিবলিঙ্গরূপী আবরণ অপসারিত করা হয়। যাত্রীরা দেবমূর্ত্তির প্রকৃত রূপ দেখিয়া ধন্য হন। উভয় উৎসবেই দেশ-দেশান্তর হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। এই পাহাড়ের নাম সীমাচলম বলা হয় কেন—মন্দিরের পুরোহিত তাহার উত্তরে বলিলেন, মন্দিরের অধিষ্ঠিত দেবতা নৃসিংহ হইতেই এই মন্দিরের ও পর্ব্বতের নাম হইয়াছে। সিংহ-অচলম, সিংহাচলম—ক্রমে রূপান্তরিত হইতে হইতে সিম্হাচলম এবং লোকের মুখে-মুখে দাঁড়াইয়াছে সীমাচলম।

সীমাচলম্ মন্দিরের পথে

ইতিহাস-কংগ্রেসের বাঙালী সদস্যাদ্বয়

বিজয়নগরের বিখ্যাত নৃপতি কৃষ্ণদেব রায়ের সহিত যখন ষোড়শ শতাব্দীতে উড়িষ্যার রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধ চলিতেছিল, সে সময়ে কৃষ্ণদেব রায় ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে ও ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে দুই বার নৃসিংহদেবকে দর্শন করেন। সে সময়ে তিনি দেবতাকে বহু মূল্যবান মণিরত্নখচিত অলঙ্কার দান করেন এবং মন্দিরের পূজা, রক্ষণাবেক্ষণ, দেবতার ভোগ, দৈনিক পূজা ইত্যাদির ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কয়েকটি গ্রামের রাজস্ব দান করেন। কৃষ্ণদেব রায় প্রদত্ত দেবতার অলঙ্কারের কিছু কিছু এখনও মন্দিরে আছে। সেই সকল অলঙ্কার সেকালের অনন্য শিল্পীদের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। কৃষ্ণদেব রায় উড়িষ্যার নৃপতি গজপতির উপর মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়াছিলেন। রাজা গজপতির পতনের পর গোলকুণ্ডার কুতবশাহী সুলতানেরা এই মন্দির বিধ্বস্ত করেন, বহু স্তম্ভ, মূর্ত্তি এবং দুর্গের ধ্বংসসাধন করেন। হনুমান দরোয়াজার কাছে প্রাচীন দুর্গের কতকটা ধ্বংসাবশেষ দেখিলাম। কুতবশাহী সুলতানদের সামন্তনৃপতি ভিজিয়ানাগ্রামের অধীশ্বর পুনরায় মন্দিরের সংস্কার করেন; মন্দিরের সর্ব্ববিধ ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ভূমিদান, অর্থদান করিয়া ইহার পূর্ব্বগৌরব ও সমৃদ্ধি রক্ষা করিয়াছিলেন। তদবধি ভিজিয়ানাগ্রামের রাজারাই মন্দিরের পরিচালক। বর্ত্তমান সময়ে ভিজিয়ানাগ্রামের নৃপতি শ্রীরাজা পশুপতি ভিজিয়ারাম গজপতি বাহাদুর মন্দিরের ট্রাষ্টি। এখন অবশ্য কতকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

আট শ' ফুট উচ্চ পর্ব্বতোপরি বৃহৎ প্রস্তর আনিয়া এমন করিয়া যাঁহারা এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের দেবতার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার তুলনা হয় না। কত অর্থব্যয়, কত অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, যাত্রিগণের সুবিধার জন্ম সোপান তৈরি হইয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ আমি, আমিই যে শুধু পর্ব্বতারোহণের সময় তিন-চার বার বিশ্রাম করিয়াছি তাহা নহে—পর্ব্বতারোহণে অনভ্যস্ত অনেক সবল ব্যক্তিকেও বহুবার বিশ্রাম করিতে দেখিয়াছি। অবশ্য অক্ষমের পক্ষে উঠিবার জন্ম ডুলির ব্যবস্থাও আছে। পাণ্ডাদের ব্যবহার ভদ্র—কোন জোরজুলুম নাই। বেশ হাসিখুশি। উপরে উঠিয়া সাক্ষাৎ হইল দুইটি বাঙালী তরুণী সদস্যার সঙ্গে। তাঁহারাও মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিয়া উঠিয়াছেন বলিলেন। দর্শনাদি শেষ করিয়া নীচে প্রায় এগারটার সময় নামিয়া আসিলাম এবং অল্প পরেই বাস চলিল। বেলা ১২টা ১০ মিনিটে হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

এখন আবার ঐতিহাসিক সম্মেলনের কথা বলি। নানা স্থানে সম্মেলনের বিভিন্ন শাখার অধিবেশন হইতেছিল। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুত অমলেন্দু ঘোষ আমার বহুদিনের পরিচিত বন্ধু—"শিশুভারতী"তে 'আমাদের দেশ' শীর্ষক বিভাগে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'আদি-ভারতের ইতিহাস' তিনিই লিখিয়াছিলেন। এইবার অনেককাল পরে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। অনেক কথাও হইল। প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস সম্পর্কে তাঁহার বক্তৃতাটি বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। মাটির হাঁড়ি, কলস এবং বিভিন্ন পাত্রাদি হইতে কেমন করিয়া আমরা আদিযুগের ইতিহাসের সন্ধান পাই এবং বর্ত্তমানকালের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও বুঝা যায়, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হওয়াতে যে সকল মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দ্রব্যাদির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তৎসমুদয় সম্বন্ধে আলোচনা দ্বারা ঐতিহাসিকেরা সেকালের সমাজ, ধর্ম্ম ও জাতিগত রীতিনীতি আচার-অনুষ্ঠানের সন্ধান পাইতে পারেন।

অন্যান্য শাখার সভাপতিগণের পঠিত প্রবন্ধের মধ্যে ডক্টর অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "Modern India" আমার ভাল লাগিয়াছিল—তাহাতে লেখকের অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, স্বাধীনতার ইতিহাস লেখা সম্পর্কে এই প্রবন্ধে যে ইঙ্গিতটুকু আছে তাহা প্রশংসনীয়। বিভিন্ন শাখায় অনেক প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

এই অধিবেশনের সহিত একটি পুরাতত্ত্ব সম্পর্কিত প্রদর্শনীও হইয়াছিল। প্রদর্শনী ও নানা প্রত্নদ্রব্যের সংগ্রহ বেশ চিত্তাকর্ষক—এস. সোমশেখর শর্ম্মা ইহার উদ্বোধন করেন। তামিল ও অন্ধ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে যে সকল প্রত্নচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার চিত্রগুলি ছিল কৌতূহলোদ্দীপক। মাদুরা, কাঞ্চীপুরম, কাবেরীপুম্পট্টিনাম, গাদাইকোণ্ডাচোলম, বেজি, নেল্লুর, কলিঙ্গনগর প্রভৃতি স্থানে বহু স্বাধীন নৃপতি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের রাজধানী ও নিকটবর্ত্তী যে সকল স্থানের ঐতিহাসিক কীর্ত্তিমণ্ডিত কাহিনীরঞ্জিত স্তূপ, রাজধানী ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে, সেই সকল স্থান খনিত হইলে কতই না প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে। কি পুরাতত্ত্ব বিভাগ, কি বিশ্ববিদ্যালয় কেহই এদিকে মনোযোগী হন নাই। কোন ধনী ইতিহাসানুরাগীর লক্ষ্যও এদিকে পড়ে নাই।

প্রদর্শনীতে অন্ধ্ররাজ্যের প্রাগৈতিহাসিক কীর্ত্তিচিহ্ন, বৌদ্ধ-যুগের নিদর্শন, তাম্রশাসন ও শিলালেখ, কতক ফটোগ্রাফ, কতক তাম্রশাসন ও শিলাফলক, প্রভৃতি এবং গিরিমন্দিরের চিত্রগুলি এমন সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছিল যে, তাহা হইতে অতি সহজেই গিরিমন্দিরের ক্রমবিকাশের ধারা বুঝিতে পারা যায়। অজন্তার ত কথাই নাই।

আমোদ-প্রমোদের জন্ম অভিনয়ের ব্যবস্থাও ছিল। ২৯শে তারিখ রাত্রিতে ইংরেজীতে ওথেলো এবং তেলুগু নাটক—বিশ্বান-তারা অভিনয় অতি সুন্দর হইয়াছিল। মুক্ত আকাশতলে সমুদ্র-বায়ুহিল্লোলে পুলকিত দেহ ও মনে অভিনয় আমাদের বেশ আনন্দ দিয়াছিল।

৩১শে ডিসেম্বর সাড়ে আটটায় সভা আরম্ভ হইয়া বেলা একটায় শেষ হইল। তার পর অপরাহ্ণ আড়াইটার সময় বিশাখা-পত্তন বন্দর, জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা প্রভৃতি দেখিলাম। লঞ্চে করিয়া বন্দরের চারিদিক এবং সমুদ্রমধ্যে খানিকটা ঘুরিয়া আনন্দবোধ করিলাম।

বিশাখাপত্তন শহরের কথা এবার কিছু বলিব। ওয়ালটেয়ারের নগরোপকণ্ঠে বিশাখাপত্তন অবস্থিত। শহর খুব বড় নয়। পথ অপ্রশস্ত, স্থানে স্থানে কোথাও প্রশস্তও রহিয়াছে। আবর্জ্জনা ও অপরিচ্ছন্নতা সর্ব্বত্র চোখে পড়ে। বর্ত্তমানে পথের অনেক উন্নতি হইয়াছে। বিশাখাপত্তনের উত্তরে ওয়ালটেয়ার। দক্ষিণে সমুদ্রশাখা। যাকে বলে Back water। সেখানে একটি তরুলতাগুল্ম-সমাচ্ছন্ন সুন্দর শ্যামল পাহাড়। এই পাহাড়টিকে আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্ম বলা হয় ডলফিন্‌স নোজ। উপরে উঠিবার সিঁড়ি আছে। বর্ত্তমানে পথটি বেশ সুগঠিত। পাহাড়টির উপরে একটি সুন্দর বাড়ী দেখিলাম। সেখানে লঞ্চে চড়িয়া বেড়াইবার সময় দেখিয়াছিলাম সুন্দর ফুলের বাগান।

ডলফিন্‌স নোজের সানুদেশে অপর একটি পাহাড়ে দেখা গেল হিন্দুর মন্দির, খ্রীষ্টানের গীর্জ্জা ও মুসলমানের মসজিদ। তাহাদের সুগঠিত ধবলশ্রী চূড়া ও গম্বুজ অতি সুন্দর। এক সময়ে এই শহরে ওলন্দাজদিগেরও উপনিবেশ ছিল। একটি নামমাত্র দুর্গ আছে। রামকৃষ্ণ মঠও আছে একটি। সেখানকার স্বামিজী মদ্রদেশবাসী। তিনি পরিষ্কার বাংলা বলেন বলিয়া বন্ধুজনের মুখে শুনিলাম।

এখানকার কয়েকটি শিল্পদ্রব্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। গজদন্তনির্ম্মিত

দ্রব্য, মহিষের শৃঙ্গের ও চন্দনকাষ্ঠের কারুকার্য্য, কাগজ-কাটা ছুরি, ফটোফ্রেম, কলমদানি, যষ্টি, ঘড়ি ও অঙ্গুরীয়ের বাক্স প্রভৃতি আছে।

ওয়ালটেয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন। পুরীতে শুধু বালুকাস্তীর্ণ সমুদ্রতট; আর এখানে পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্র একাধারে দেখিতে পাওয়া যায়। ওয়ালটেয়ারে হাট-বাজার দেখি নাই। শুনিলাম বিশাখাপত্তন হইতে সব সংগ্রহ করিতে হয়।

এখানকার ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যেরা মৎস্য-মাংস খান না। শূদ্রেরা মাছ-মাংস খান। অনেকে ভাতের পরিবর্ত্তে এক বেলা মাণ্ডিয়ার জাউ খাইয়া থাকেন।

বিশাখাপত্তনকে সহজ কথায় বলা হয় ভাইজাগ। বিশাখাপত্তনের নাম হইয়াছে বিশাখাদেবীর নাম হইতে। পূর্ব্বে সমুদ্রতটে বিশাখাদেবীর মন্দির ছিল। এখন তাহা সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়াছে। ওয়ালটেয়ার হইতে সমুদ্রতট দিয়া বিশাখাপত্তন যাইবার সুন্দর পথ। বামে পূর্ব্বদিকে সমুদ্রের বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গ আর দক্ষিণে তালীবন-শ্রেণী। সমুদ্রের তীরে ছোট-বড় গণ্ডশিলা—সারি বাঁধিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত স্তূপের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। কোনটি একেবারে জলের মধ্যে নামিয়াছে:

> 'ছোট-বড় গণ্ডশিলা পড়ে জলের তীরে,—
> করী যেন কবজ সাথে নেমেছে নীল নীরে।'

আর তীরে তীরে বালুর স্তূপে কড়ি-ঝিনুক মেলা। সমুদ্রসৈকতে একপ্রকার লতাগাছ। বালির মধ্যে বাড়িয়া চলিয়াছে নীল ছোট ছোট ফুল, বড় সুন্দর। ওয়ালটেয়ার হইতে বিশাখাপত্তন যাইতে রাস্তার পার্শে সমুদ্রের দিকে ছোট-বড় পাহাড়। পাহাড়ের নীচে অদূরে সাগর। এখানকার রমণীরা অত্যন্ত পরিশ্রমী। পথে দুই জন ধীবর-নারীকে মাথায় মাছের পসরা লইয়া যাইতে দেখিলাম। বেশ বড় বড় সামুদ্রিক মৎস্য—দাম সুলভ।

শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে নারীদের মধ্যেও শিক্ষার প্রচলন বাড়িতেছে। হোষ্টেলের কয়েকটি শিক্ষিত যুবকের সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা ও এদেশের জনশিক্ষা সম্বন্ধে আলাপ হইল। তাঁহারা বলিলেন, ধীরে ধীরে আমাদের দেশের অশিক্ষিত লোকেরা শিক্ষার প্রতি অনুরাগী হইতেছে, তবে খুব দ্রুত কিছুই হইতেছে না। এ বিষয়ে আমাদের সামাজিক বাধাবিঘ্নও যথেষ্ট আছে। একটি ছেলে আমাকে বলিল, আমি ব্রাহ্মণ নই, সেজন্য সমাজে ব্রাহ্মণদের কাছে আমরা এখনও ঘৃণিত। অনেকেরই মুণ্ডিত কেশ, নগ্ন পদ দেখিলাম। কলেজের ছাত্রদের সকলেরই ইংরেজী পোশাক পরা। আমাদের সঙ্গে ইংরেজীতেই কথাবার্ত্তা হইয়াছে। ছোট ছোট ভৃত্যেরাও ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে কথা বলে।

এখানে সমুদ্রতীরে বসিলে দেখা যায়, জেলেরা কয়েক খণ্ড কাষ্ঠ একত্রে বাঁধিয়া তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক দূর সমুদ্রে মৎস্য ধরিতেছে। অসাধারণ সাহসী ও পরিশ্রমী এই ধীবরদের কর্ম্মতৎপরতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

ইহারা তালপত্রে ছাওয়া, একদ্বারবিশিষ্ট নিতান্ত নীচু ঘরে বাস করে। গৃহের মেঝে মৃত্তিকা হইতে এক হাতের বেশী উঁচু নহে। ঘরের দেওয়াল মাটির। চাল মৃত্তিকার উপর হইতে দুই বা আড়াই হাতের বেশী উচ্চ নহে। প্রাচীরগাত্র বিচিত্র আলিপনা দ্বারা চিত্রিত—রেখা ও বিন্দু-রচিত।

ভারতীয় ইতিহাস সম্মেলনে আসিয়া দেখিলাম বিভিন্ন প্রদেশ-বাসীরা বাঙালী ঐতিহাসিকগণের প্রতি শ্রদ্ধাবান। পরস্পরের মেলা-মেশার অবসর বড় হয় নাই। বাঙালীদের মধ্যেও সময়াভাব,
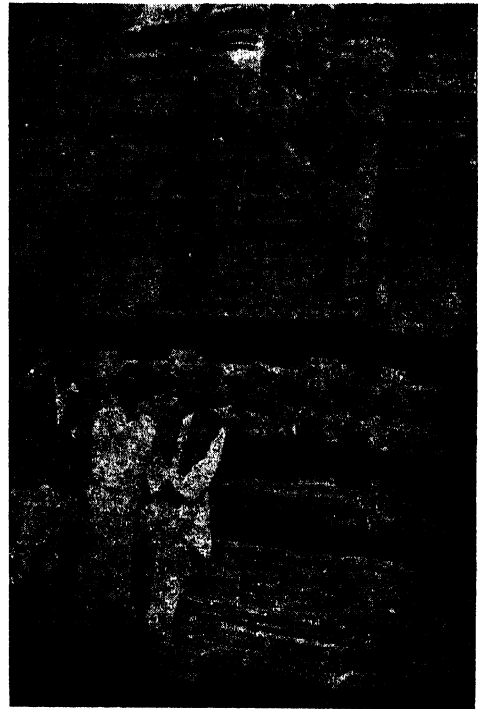
সীমাচলম্, নৃসিংহদেবের মন্দিরের কারুকার্য্য

বিভিন্ন শাখায় অধিবেশনে যোগ দেওয়ার সময় করিতে পারেন নাই। সভায় উপস্থিতি, ভোজন, ভ্রমণ ও বিশ্রম্ভালাপেই এই তিনটি দিন অতিবাহিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক সম্মেলনের সম্পাদক ডক্টর প্রতুল গুপ্ত সভা পরিচালনা করিয়াছেন ধীর ও শান্তভাবে। তাঁহার প্রতি প্রত্যেক প্রদেশবাসী সদস্যগণ শ্রদ্ধান্বিত দেখিলাম।

এখানে আমার পুরাতন বন্ধু পরমানন্দ আচার্য্যকে দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম, তিনি এখন ভুবনেশ্বরে আছেন, বহু দিন পরে দেখিতে পাইয়া অতীতের কত কথাই বলিলেন। আর পাইলাম

আমার তরুণ বন্ধু পাণিগ্রাহীকে, সে আমার কলিকাতার বাসায় কত দিন আসিয়াছে—সে আমাকে ভুলে নাই। আমি ভুলিয়াছিলাম। খিচিং ভ্রমণের সময় পরমানন্দ মহাশয় নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহারও চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পাণিগ্রাহী এখন যুবক, অধ্যাপকরূপে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছে।

মহারাজা আলামবাজার ও তাঁহার স্ত্রী থাকিতেন পথে বীচ হোটেলে। হোটেলটি সমুদ্রের উপর। নারিকেল ও তালীবন-বেষ্টিত, সম্মুখে অনন্ত পারাবার। চক্রবালরেখায় নীল জল আর নীল আকাশের মিলন। বড় সুন্দর—কোথাও গভীর নীল, কোথাও কৃষ্ণবর্ণ, তার তুলনা মিলে না। সন্ধ্যার পর দূরে আলোকোজ্জ্বল অর্ণবপোত চলিতেছে, ডলফিন্‌স নোজের দিকে আলোকস্তম্ভের চঞ্চল আলো নাচিয়া বেড়ায়, ছুটিয়া বেড়ায় কখনও বা নিবিয়া যায়। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।

কবি গিরীন্দ্রমোহিনী অনেক দিন ওয়ালটেয়ারে ছিলেন। এখানে আসিয়া তাঁহার লিখিত 'সমুদ্রদর্শনে' কবিতাটি মনে পড়িতেছিল—বিদায়ের বেলা সমুদ্রকে প্রাণ ভরিয়া নয়ন ভরিয়া দেখিয়া মনে হইতেছিল :

"এমনি চঞ্চল জীবন-বারিধি
নাহিক এমনি আশার অবধি
হেন ভীমস্রোত বহে নিরবধি
সতত দুরাশা-কূলে।

এমনি সফেন, এমনি তরল,
এমনি উদ্দাম, এমনি প্রবল
এমনি ছুটিয়া করি কলকল,
লুটিয়া বেলার কোলে।"

ক্ষিতীশবাবু ও আমি এক গাড়ীতে ফিরিলাম। প্রভাতচন্দ্র রামেশ্বরের দিকে চলিয়া গেলেন।

শুকতারা

শ্রীসবিতা চৌধুরী

তোমার নির্ম্মল দৃষ্টি সজল করুণ
জননীর স্নেহ-স্পর্শ সেথায় মেশানো,
তোমার ইঙ্গিতে আসে প্রভাত অরুণ
আলোকের রশ্মি-রথে। শিশির-ভেজানো
শ্যামল তৃণের শীর্ষে তোমার আশিস
হীরকের দীপ্তি সম জ্বলে সগৌরবে।
তোমারে স্মরিয়া বুঝি ধরা অহর্নিশ
বায়ুরে সিঞ্চিত করে কুসুম-সৌরভে?
তুমি কি রাতের অশ্রু, রুদ্ধ-বেদনার?
যন্ত্রণার নিষ্পেষণে নীল-দ্যুতিময়?
না তুমি দুঃস্বপ্নভরা রাত্রে সান্ত্বনার
মূর্ত্ত বাণী, মানবের দাত্রী বরাভয়?
অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন নিদ্রিত পরাণ
তোমার ইঙ্গিতে পায় আলোর সন্ধান।

পূর্ণিমায় পল্লীগ্রাম

শ্রীসুধীর গুপ্ত

পূর্ণ-চন্দ্র আনন্দ-কমল ফুটিল রে
নীলাম্বর-সরোবরে, রজত-ধবল
ফুল্ল-দল বিস্তারিয়া ; শ্যামল—কোমল
ঘুমন্ত পল্লীর বল্লী-বীথিকার পরে,
বেণু-বনে, বাপী-বারি লহরে—লহরে
শুভ্র হাসি শিহরিছে ; সুন্দর-শীতল
ঝলিছে শিশির-কণা ; মেলিতেছে দল
মালঞ্চের শতদল শান্ত লীলাভরে।
পূর্ণ চন্দ্র পদ্ম-মধু—ক্ষরিছে জোছনা
সুপ্তি-স্বপ্ন-মুগ্ধ-মতি পল্লীর হিয়াতে।
অকস্মাৎ আনন্দেতে আমি অন্যমনা
হেরিলাম, হেমন্তের চন্দ্র-কান্ত রাতে
রুক্ষ খর্জ্জুরেরও বীথি আনন্দাশ্রু ফেলে ;
তাল-তরু ঊর্দ্ধ-লোকে ডানা বুঝি মেলে।

পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

বাংলা সালের ত্রয়োদশ শতকে আমাদের দেশে যে-সব স্মরণীয় মনীষী ও মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে স্বামী কৃষ্ণানন্দ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। আজ এই সভায়* তাঁর জীবন-কথা নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করতে আমি আপনাদের মতন বিদ্বান্ ও সুধীবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি। সাহিত্যিক বলে স্পর্দ্ধা করবার আমার দুঃসাহস নেই, দোষত্রুটির জন্য আপনারা নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করবেন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যাঁর গীতার্থ সন্দীপনী পাঠ করে লিখে-ছিলেন "ইহার ভাব ও রচনা চিরদিন বাংলা ভাষায় অপূর্ব্ব রত্নরূপে বিরাজিত থাকিবে", এই সাহিত্য-বাসরে তাঁর বিষয় আলোচনা অশোভন হবে না।

ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগেই পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষা ও সংস্কৃতি শিক্ষিত বাংলার চিত্তে প্রাচীন ভারতের গতানুগতিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও শাস্ত্রাদির বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের ভাব জাগিয়ে তুলেছিল। এই রূপান্তরের ও সংঘর্ষের যুগে ১২৫৬ সালের ১৭ই শ্রাবণ মঙ্গলবার হিন্দোল দ্বাদশী তিথিতে গোধূলিলগ্নে পিতা কবিরাজ ঈশ্বরচন্দ্র কবিভূষণের গৃহে, হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া গ্রামে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন জন্মগ্রহণ করেন। মাতা ভবসুন্দরী দেবী ভক্তিপ্রিয়া রমণী ছিলেন। এই শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরে তাঁহার গুরুদত্ত নাম শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী নামে—হিন্দী ও বাংলা ভাষায় ভারতের অদ্বিতীয় বক্তা এবং ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। গুপ্তি-পাড়া ভাগীরথীতটবিধৌত পুণ্যতীর্থ গ্রাম, এখানে প্রাচীন শ্রীশ্রীবৃন্দা-বনচন্দ্রের মন্দির রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন প্রথম স্থানীয় ব্রহ্মচারী গুরুমহাশয় গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন। পরে মাতুলস্থান কালনায় ইংরেজী মিশনরি বিদ্যালয়ে কিছুকাল পাঠ করে বহরমপুরে মামাতো ভাই সুপ্রসিদ্ধ শ্রীচরণ কবিরাজের নিকট অবস্থান করেন। সেখানে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও পরে কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন করতে থাকেন। শ্রীচরণ কবিরাজ বহরমপুরের দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ীর গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন। সে কারণ মহারাণীর গৃহে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের শাস্ত্রালোচনা শুনবার ও তাঁদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের হ'ত। কীর্ত্তন ও যাত্রাভিনয়ে তাঁর খুব উৎসাহ ছিল। কিশোর বয়সেই তিনি গীত-রচনা করতেন, পরে এই গীতগুলি "সঙ্গীত মঞ্জরীতে" প্রকাশিত হয়। সাংসারিক, পারিবারিক বিপদে ও আর্থিক অনটনের জন্য মুঙ্গেরে রেলে তিনি কার্য্য গ্রহণ করেন। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য তিনি কিশোর বয়স থেকেই পালন করতেন। যৌবনেও তা অটুট ছিল—শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন দারপরিগ্রহ করেন নাই। রেলের চাকুরিতে ছুটি নিয়ে ভারতের নানা তীর্থ-দর্শন ও দেশ-পর্যটন করেন। তৎকালে "সোমপ্রকাশ" ও "হাওড়া হিতকরী" দুইখানি পত্রিকায় তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সব প্রবন্ধে দেশের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। মুঙ্গেরের কষ্টহারিণী ঘাটেই এক দিন সিদ্ধ মহাপুরুষ দয়ালদাস মহারাজ প্রসন্ন দৃষ্টিতে জনতার ভিতর থেকে যুবক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে নিজের কাছে ডেকে নেন এবং গঙ্গাতীরে তাঁকে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। দীক্ষাকালে বাবা দয়ালদাস তাঁকে বলেছিলেন, "যদি অরূপকে রূপের ভিতর দর্শন করতে চাও তবে তোমার দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী কর।"

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন দেখতে পেলেন—ইংরেজী শিক্ষিত যুবকেরা হিন্দুর সনাতন আদর্শ বিস্মৃত হয়ে পাশ্চাত্ত্য ভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে। তিনি মুঙ্গেরে আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভা, সুকুমার বালকদের বাল্যকালে সদাচার ও সুনীতি শিক্ষা দিবার জন্য সুনীতিসঞ্চারিণী সভা স্থাপন করেন। তাঁর চরিত্র-মাধুর্য্যে, পাণ্ডিত্যে, ধর্ম্মনিষ্ঠায় ও অমায়িক ব্যবহারে অনেকে তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর হিন্দুশাস্ত্রাদির অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা, সহজ সরলভাবে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা শুনে সকলে মুগ্ধ হতেন। শহরের আবালবৃদ্ধবনিতা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন হলেন। চারিদিকে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাংলাভাষার ন্যায় হিন্দী ভাষাতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি অতি সুললিত হিন্দীতে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করতেন। হিন্দুস্থানী শ্রোতারা যুগপৎ শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে তা শুনতেন। বাংলা ও হিন্দী ভাষায় তিনি "ধর্ম্মপ্রচারক" নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। হিন্দী ভাষায় যুক্তিতর্ক সহকারে প্রবন্ধ-রচনায় তাঁর অপূর্ব্ব প্রতিভা ও অসাধারণ দক্ষতা দেখে কাশীধামের হিন্দী পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। কাশীধামের শ্রীমদ্ বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, মহামহোপাধ্যায় বাসুদেব শাস্ত্রী, শ্রীরামমিশ্র শাস্ত্রী প্রভৃতি ও অন্যান্য সাহিত্যাচার্য্যগণ সরস্বতীর বরপুত্র, পরিব্রাজক, কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের উৎসাহদাতা ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। একথা মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারি, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের পূর্ব্বে আর কোন বাঙালী হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা, পত্রিকা-প্রকাশ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন নি এবং হিন্দুস্থানী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছে আজ পর্য্যন্ত এমন সম্মান লাভ করেন নি।

খ্রীষ্টান মনীষীবৃন্দ ও বাগ্মী কেশবচন্দ্রের অগ্নিময়ী বাণী হিন্দুসমাজে আলোড়ন তুলেছিল। সুপণ্ডিত, সুবক্তা শশধর তর্কচূড়ামণি, বাগ্মী শ্রীশিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রভৃতি তাঁদের গতিরোধের জন্য দাঁড়িয়ে-ছিলেন। এই সব পণ্ডিতমণ্ডলী পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের যুক্তিতর্ক-সহ শাস্ত্রসিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান দেখে বিস্মিত হন ও

* রবিবাসরের ২২শ অধিবেশন (১৩৫৭)

তাঁর সহিত যোগদান করেন। পল্লীতে পল্লীতে হরিসভা, শাস্ত্রপাঠ, সুনীতিসঞ্চারিণী সভার প্রতিষ্ঠা, সংস্কৃত বিদ্যালয় ও চতুষ্পাঠী স্থাপিত হ'ল এবং সমগ্র বাংলা বিহার উড়িষ্যা ও আসাম পর্য্যন্ত হরিসঙ্কীর্ত্তনে মুখরিত হয়ে উঠল। হিন্দু কৃষ্টির সেই সঙ্কটকালে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সাধনায় হিন্দুজাতি যেন আত্মসম্বিৎ ফিরে পেল।

মাতার মৃত্যুর পর পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাবা দয়ালদাসের নিকটে সন্ন্যাসগ্রহণ করলেন। অত্যল্পকালেই পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামীর যশঃপ্রভা ভারতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হ'ল।

শ্রীকৃষ্ণানন্দের কর্ম্মশক্তি চিন্তা করলে বিস্ময়ে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়। এক দিকে সমগ্র ভারতের নানাস্থানে প্রচার ও বক্তৃতা, ইংরেজী, হিন্দী ও বাংলা ভাষায় মাসিক পত্রিকা সম্পাদন, পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধরচনা, ইংরেজী ভাষায় 'Motherland' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ, মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন; অপর দিকে ভাষাটীকাসহ প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় নিজকৃত গীতার্থ সন্দীপনীতে গীতার গূঢ় তাৎপর্য্য ও তত্ত্ববিচার, নারদ ও শাণ্ডিল্যসূত্রের বিশদ ব্যাখ্যা, ভক্তি ও ভক্তের মহিমাবর্ণনা, রামগীতা, পরমার্থসার, মণিরত্নমালা, পঞ্চামৃত, স্বপ্নতত্ত্ব, যোগ ও যোগী এবং সুমধুর হিন্দী ও বাংলা ভজন সঙ্গীতাবলী রচনায় নিরত—এক দিকে ভারতে পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত সমাজসংস্কার, ধর্ম্মের ও শাস্ত্রাদির বিকৃত ব্যাখ্যায় পারমার্থিক অবনতির গতিরোধ করবার ঐকান্তিক উদ্যম ও চেষ্টা; অপর দিকে হিন্দুধর্ম্মের সনাতন আদর্শে নানা প্রতিষ্ঠান গড়তে ব্যস্ত, সমাজে দুর্নীতি অনাচার বিজাতীয় অনুকরণ দূর করতে দৃঢ়সঙ্কল্প। অক্লান্তকর্ম্মা একদিকে তিনি আপামর সাধারণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে বজ্রগম্ভীর স্বরে প্রকৃষ্ট পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন—অপর দিকে কাশীধামে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার মন্দিরের অদূরে যোগাশ্রম স্থাপন করে তাতে অন্নপূর্ণার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে মাতৃভাবে মাতোয়ারা বালক। একদিকে তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ আত্মত্যাগী কৌপীনসম্বল নিষ্কিঞ্চণ গৈরিকধারী মুণ্ডিতমস্তক পরমহংস সন্ন্যাসী, অপর দিকে নিষ্কাম পরহিতব্রতী দেশপ্রেমিক দেশসেবক কর্ম্মযোগী। একদিকে বক্তৃতায় জলন্ত আগ্নেয়গিরির অগ্নিময় উচ্ছ্বাস, অপর দিকে ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে গদগদ কণ্ঠে মাতৃনামে বিভোর—কথায় গানে ভাবের নির্ঝরিণী বয়ে যাচ্ছে।

স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দের বক্তৃতা অনর্গল গৈরিক-প্রপাত-ধারায়, সুমধুর শব্দসুষমায়, ভাষার ভাবসম্পদে শ্রোতাদের মনে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা সঞ্চার করত। টাউন হলে তাঁর প্রথম বাংলা বক্তৃতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী দেন। সেই বিরাট সভায় বক্তৃতান্তে সভাপতি বলেন—"বক্তৃতায় যে অবিরল ভাবস্রোত চলিয়াছিল তাহার সমালোচনা করা আমার সাধ্যাতীত। এই সভায় শঙ্করাচার্য্য বা চৈতন্যদেবের মত মহাপুরুষ সভাপতি হইলে সঙ্গত হইত।" তিনি আরও বলেছিলেন "বঙ্গভাষার শত্রুগণের নিকট এ ভাষায় এই শক্তির পরিচয় করিয়া দিয়া তিনি মাতৃভাষার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, তিনি সার্থকজন্মা।"

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে হ্যারিসন রোড এবং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে এক ত্রিতল অট্টালিকায় প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ বাস করতেন। আমি তাঁর কাছে যাতায়াত করতাম। একদিন শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী সেখানে এসেছিলেন—সন্ধ্যার পর আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। বোধ হয় সংবাদ পূর্ব্বে পাঠানো হয়েছিল, তাই একটি পৃথক আসন তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখা হয়। মুণ্ডিতমস্তক, সৌম্যদর্শন, গৈরিক বসনপরিহিত স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ গোঁসাইজীকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। দুই জনে নানা প্রসঙ্গের আলাপ-আলোচনার পর গোঁসাইজী বললেন, "কুম্ভমেলায় আপনার সমাদরের কথা শুনেছি। আপনার হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা শুনে সকলেই মুগ্ধ হয়েছে—এ সবই ভগবদ্ ইচ্ছায় হচ্ছে। আপনার গুরুদেব বাবা দয়ালদাসের আপনার প্রতি অশেষ কৃপা।" শ্রীকৃষ্ণানন্দ বিদায়গ্রহণ করার পর উপস্থিত একজন ভদ্রলোক অপর এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই সাধুটি কে?" গোঁসাইজী তা শুনতে পেয়ে বললেন—"এঁকে জানেন না? ইনি পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী। আজ যে আমাদের দেশে সহরে সহরে পল্লীতে পল্লীতে হরিসভা দেখছেন—এই সব এঁর কীর্ত্তি—এঁর প্রভাব। আজীবন অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালন করেছেন—ইনি কুমার-সন্ন্যাসী। এঁর গুরুদেব বাবা দয়ালদাস একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ, স্বামীজীর উপর তাঁর অশেষ কৃপা—তাই ঈশ্বরদর্শন ও ভগবৎকৃপা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। গুরু ও ঈশ্বর কৃপায় এঁর শক্তিও অসাধারণ।" এই বলে গোঁসাইজী নীরব হলেন। গোঁসাইজীর কথা শুনে আমার বাল্যস্মৃতি জেগে উঠল। দর্জ্জিপাড়া জয়মিত্রের লেনে এক সুবৃহৎ অট্টালিকার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণানন্দের বক্তৃতা শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। হাজার হাজার শ্রোতা স্থানাভাবে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণানন্দের অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা স্তম্ভিত হয়ে শুনছে। সেই স্মৃতি এখনও সমুজ্জ্বল রয়েছে—সেই সুমধুর ঝঙ্কার এখনও স্মরণ হলে কানে বেজে ওঠে। গোঁসাইজীর কথা শুনে আমার অন্তরে শ্রীকৃষ্ণানন্দের প্রতি শ্রদ্ধভক্তি গভীর হ'ল।

কিছুদিন পরে একদিন প্রাতে সংবাদপত্রে দেখলাম শ্রীকৃষ্ণানন্দকে কুৎসিত অভিযোগে ফৌজদারী আসামী রূপে পুলিশ ধরেছে। বড় বড় অক্ষরে তা ছাপা হয়েছে—"এক দিন সন্ধ্যারতির পর যোগাশ্রমে গুপ্ত ধ্যানকক্ষে একটি বার বছরের মেয়েকে বলাৎকারে সতীত্বনাশ করেছেন।" বঙ্গবাসী পত্রিকার স্তম্ভে "প্রভু তুমি কে" প্রবন্ধে সেই কাহিনী বিস্তারিত ভাবে বিবৃত হয়েছিল। জনসাধারণের মধ্যে একটা ঘোর আন্দোলন হতে লাগল। 'বঙ্গবাসী'র বিবরণে কৃষ্ণানন্দের এই অপকীর্ত্তি তীব্র ভাবে প্রকাশিত হ'ত, আবার নব-প্রকাশিত 'বসুমতী'তে এর প্রতিবাদে কৃষ্ণানন্দের বিরুদ্ধে এটি ষড়যন্ত্র বলে আভাস দেওয়া হ'ত। মামলার বিবরণে দুই কাগজে ঠিক মিল ছিল না। এই সংবাদ, এই অভিযোগ সত্য বলে মেনে নিতে পারি নি। কিন্তু আদালতের জুরীর বিচারে জজ-

সাহেবের রায়ে শ্রীকৃষ্ণানন্দের যখন কঠোর সশ্রম কারাদণ্ড হ'ল তখন মনে হ'ল বোধ হয়, এর মূলে কিছু সত্য আছে, নতুবা সাহেব জজ তাঁকে দণ্ড দেবেন কেন? প্রায় পঞ্চাশের কাছে যাঁর বয়স—এক রকম বৃদ্ধ বললেই হয়, তাঁর এইরূপ অধঃপতন! আশ্চর্য্য কি—পুরাণে কত ঋষি-মহর্ষির সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। যাক্, মনে মনে তাঁর প্রতি আমার একটা বিজাতীয় অশ্রদ্ধাই জন্মেছিল। কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে নানা-স্থানে প্রচারকার্য্যে ঘুরে বেড়ালেন। সাধারণ লোকের মনে তাঁর প্রতি আর পূর্ব্বের মত শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল না! দু'বছর পরে কাশী-ধামে তিনি বিশ্বনাথের পাদপদ্মে দেহরক্ষা করেন।

কার্য্যোপলক্ষে ১৯০৩ থেকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত আমি বোম্বাইয়ে থাকি। গ্রাণ্ট রোড়ে টোপিয়ালা চালে ছিলাম। তিনতলা চারতলা প্রকাণ্ড বাড়ীকে তারা 'চাল' বলে থাকে। সেখানে তেতলার একটি ফ্লাটে বাঙালীর মেস ছিল—আমিও সেখানে ছিলাম। দোতলায় বাঙালী, গুজরাটী, মরাঠী, প্রভৃতি ভদ্রলোকেরা ঘর ভাড়া নিয়ে বাস করতেন। এঁরা প্রায় সকলেই চাকুরিজীবী। সেখানে একদিন দোতলার ফ্লাটের একটি বাঙালী ভদ্রলোক আমি নবাগত বলে আলাপ করতে এসেছিলেন—তাঁর নাম···সেন—বৈদ্য, ঢাকা বিক্রমপুরে তাঁর দেশ। বি-বি-সি-আই রেলে তিনি কেরাণীগিরি করেন। তিনি চলে গেলে অন্যান্য বাঙালী ভদ্রলোক আমায় বললেন, ইনি ক্ষান্তকালীর স্বামী। ক্ষান্ত-কালীর নাম শুনে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"তিনি কে?" তাঁরা আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, "ক্ষান্তকালীর নাম শোনেন নি? যার জন্য কুমার-পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন জেলে গেছে!" কয়েক দিন পরে ভদ্রলোকটিকে কথাপ্রসঙ্গে বললাম, "আপনি যাঁকে বিয়ে করেছেন শুনেছি তিনি নাকি কৃষ্ণানন্দের দ্বারা ধর্ষিতা—মামলায় তা প্রমাণ হয়েছে।" তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, পরে ধীরে ধীরে বললেন, "আপনারা যা শুনেছেন বা খবরের কাগজে পড়েছেন তা সত্যি নয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন তাকে বলাৎকার করেন নি, তাঁর বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র হয়েছিল—আমার স্ত্রী তখন নিতান্ত বালিকা। তাকে যা শেখানো হয়েছিল তাই সে করেছে, বলেছে।" আমি প্রশ্ন করলাম, "খামকা অপরের কথায় তিনি শেখানোমত কাজ করলেন কেন?" তিনি উত্তর করলেন, "আমার স্ত্রী যাঁর আশ্রয়ে ছিল—তিনি ষড়যন্ত্রে ছিলেন। তাঁর কথা ঠেলতে পারে নি পাছে তারা তাড়িয়ে দেয়। তার মা অন্য লোকের কাছে থাকত।" কিন্তু এই কথায় মনের খটকা গেল না। নিজের দোষক্ষালনের জন্য স্ত্রী মিথ্যে বলে, এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। যাক, স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হ'ত যদিও একটি ছেলে হয়েছিল। একদিন এমন হ'ল যে বোম্বাই-প্রবাসী কোন যুবকের সঙ্গে স্ত্রীকে আসক্ত জেনে অন্য স্থানে বাস স্থাপন করলেন। উক্ত যুবকটি পুত্রসহ ক্ষান্তকালীর ব্যয়নির্ব্বাহ করত। প্রবাসী বাঙালী-সমাজ উক্ত পরিবারকে হেয় চক্ষে দেখত। এই ঘটনা ঘটে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই শহরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সার ফিরোজ শা মেটা অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। ডাঃ সার বালচন্দ্র কৃষ্ণ মেটা সাহেবের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকায় একদিন আমাদের চারজন বাঙালীকে তিনি আহ্বান করে মেটার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। তাঁর চেম্বারে আমরা গেলে মেটা সাহেব আমাদের সম্বোধন করে বললেন, "শুনেছি আপনারা এখানকার কংগ্রেসের সদস্য না হলেও কংগ্রেসের প্রতি আপনাদের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা আছে। এবার বাংলাদেশ থেকে আশী জন প্রতিনিধি আসছেন এবং সিন্ধুদেশ থেকেও অনেকে আসবেন। তাঁরা সকলেই আমিষ-ভোজী। এই শিবিরগুলির তদারক ও আহারের বন্দোবস্তের ভার আপনাদের উপর দিতে চাই। আপনারা যা পরামর্শ দেবেন আমরা তা করব—আপনাদের অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য করে নিলাম। নিরামিষ-ভোজীদের ভার মাননীয় দীক্ষিতের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সার হেনরী কটন জাতীয় মহাসমিতির সভাপতিরূপে আসছেন। আমরা সম্মত হলাম। সেবারে কংগ্রেসের বিরাট আয়োজন—সুবৃহৎ কংগ্রেস-মণ্ডপ, দশ সহস্র দর্শকের জন্য চেয়ার আর তার সামনেই প্রকাণ্ড এগজিবিশন। আমাদের চার জনের মধ্যে তিন জনই রেলের কর্ম্মচারী, সুতরাং বেশীর ভাগ কাজকর্ম্ম দেখা-শুনা আমাকেই করতে হয়। তাঁরা কেউ প্রাতে এক ঘণ্টা এবং সন্ধ্যার পর এসে তদারক ও আমায় সাহায্য করতেন।

একদিন কাশীধামের নির্ব্বাচিত এক বাঙালী প্রতিনিধি আমাকে অনুরোধ করলেন যে, সন্ধ্যার পর তাঁকে শহর দেখাতে নিয়ে যেতে হবে। একটি ভিক্টোরিয়া অর্থাৎ খোলা ছোট ফিটন গাড়ী ভাড়া করে তিনি এবং আমি চললাম। ভদ্রলোকটি পরিচয় দিলেন তিনি কাশীধামের উকিল নাম···মজুমদার। খানিক দূর যেতেই চলন্ত গাড়ীতে আমাকে একটু ব্যঙ্গভাবে বললেন, "আপনি ত যুবক, বোধ হয় বিয়ে করেন নি?" আমি বললাম, "না"। তিনি অমনি রসিকতার সুরে বললেন, "তবে এখানকার···সন্ধান জানেন, শহর আর কি দেখব—এক জায়গায় নিয়ে চলুন।" বিরক্তি সহকারে আমি বললাম, "আপনি কংগ্রেস ডেলিগেট—আমাদের অতিথি, তাই আপনার অনুরোধে আপনাকে শহর দেখাতে যাচ্ছি। কিন্তু আপনি ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করছেন। আপনার মত শিক্ষিত ও প্রৌঢ় ব্যক্তির কাছে এইরূপ জঘন্য ব্যবহার আশা করি নি। আমি এখান থেকে নেমে যাচ্ছি।" ভদ্রলোক জোড়-হাত করে ক্ষমা চাইলেন। অগত্যা তাঁর সঙ্গে চললাম।

কিছুদূর গেলে হঠাৎ তিনি আমাকে বললেন, "আপনি কিছু মনে করবেন না—বন্ধুভাবেই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। আমাদের ক্ষান্তকালী বোম্বাই শহরে তার স্বামীর সঙ্গে বাস করছে। আপনিও বাঙালী—তার স্বামীও বাঙালী, আপনি তাদের চেনেন কি? আমি বললাম, "কোন ক্ষান্তকালী"? "খবরের কাগজ পড়েন নি—যে ক্ষান্তকালীর জন্য শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের জেল হয়েছিল?" আমি বললাম,

"সে কান্তকালীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি ? সে বৈষ্ণ—আপনি ব্রাহ্মণ।" তিনি বললেন, "ওকে খুব জানি—আমাদের বাড়ীতেই থাকত—ওর মা তো তান্ত্রিক পূর্ণানন্দের ভৈরবী।" আমি বললাম, "ওর স্বামী আমাকে বলেছেন যে, তাঁর স্ত্রী তাকে এই সম্বন্ধে বলেছেন—শ্রীকৃষ্ণানন্দ তাকে ধর্ষণ করে নি—সে ছেলেমানুষ ছিল, ষড়যন্ত্রকারীরা যা শিখিয়েছে তাই বলেছে।"···মজুমদার বললেন, "তা ঠিক।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনিও কি এই ষড়যন্ত্রে ছিলেন ?" "নিশ্চয়ই ছিলাম—ওকে···যোগাশ্রমে পাঠাই, সঙ্গে সঙ্গে ওর মা পুলিস নিয়ে হাজির। পুলিসকে পূর্ব্বেই হাত করা ছিল—মোকদ্দমায় ওর বিরুদ্ধে আমি উকিল ছিলাম।" আমি ধীরভাবেই বললাম, "আপনার তার প্রতি এত আক্রোশ কেন ? এক জন নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে ষড়যন্ত্র করে জেলে পাঠিয়ে আপনার লাভ কি ? বিশেষ তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী, পণ্ডিত, প্রসিদ্ধ বক্তা।" ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে বললেন, "বেটা বদ্যি হয়ে ব্রাহ্মণকে শিষ্য করে মাথায় পা তুলে দেয়। বেটা সন্ন্যাসী সেজে ধর্ম্মগুরু হয়েছিল—ব্রাহ্মণকে শিষ্য করে—বামুনদের পায়ের ধূলো দেয়। একি সহ্য হয়—এই ষড়যন্ত্রে আমি একা ছিলাম না, বাংলাদেশের বড় বড় ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরাও ছিলেন। ব্রাহ্মণ-সমাজ কি মরেছে ? চিরকাল ব্রাহ্মণেই হিন্দুর ধর্ম্মগুরু—ব্রাহ্মণ ছাড়া পূজো, বিয়ে, শ্রাদ্ধ কিছুই হবার জো নেই। পণ্ডিত, বক্তা, সাধু হয়ে তার এত গর্ব্ব—এত অহঙ্কার ছিল। তেমনি জব্দ হয়েছে, আর মাথা তুলতে পারে নি। যেমন সুনাম আর প্রতিপত্তি হয়েছিল তেমনি দুর্নামে সারা ভারত ছেয়ে গিয়েছে। অন্য উপায়ে এমন ভাবে জব্দ করা যেত না।" শেষ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার নিকট মুখ এনে বিকট হাস্য করলেন। তাঁর মুখে একটা দুর্গন্ধ পেলাম—বুঝলাম সুরামত্ত। তাঁর কথা সত্যি কিনা জানবার জন্য কৌতূহল হ'ল। আমি তাঁকে আমার বাসগৃহে নিয়ে গিয়ে দোতলা ফ্ল্যাটের ঘর দেখিয়ে দিলাম—যেখানে ক্ষান্তকালী দু'বছরের ছেলে নিয়ে বাস করছে। অন্তরালে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম—দেখলাম,···জুমদার "ক্ষান্ত ক্ষান্ত" করে অতি আদরের সুরে ডাকতে লাগলেন। শ্যামবর্ণা কুরূপা যুবতী ক্ষান্তকালী দোর খুলেই ···মজুমদারকে দেখে আনন্দে অভিভূতা হয়ে পড়ল।···বাবু তার ঘরে প্রবেশ করলেন। এই দৃশ্য দেখে···মজুমদারের উক্তিতে আমার সংশয় রইল না।

পরদিন কংগ্রেস প্যাণ্ডালের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, দেখলাম আমার আত্মীয় কাশীধামের সুপ্রসিদ্ধ উকিল নিবারণ গুপ্ত একজন বৃদ্ধের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হলেন। কথাপ্রসঙ্গে আমি···মজুমদারের কথাগুলি তাঁদের শোনালাম। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে দেখিয়ে নিবারণবাবু বললেন—"উনি তখন সরকারী উকীল ছিলেন। মামলা উনি চালিয়েছিলেন।" জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকে বললাম, "আপনি কি বলেন—এটা সত্য, না মিথ্যা ষড়যন্ত্র।" তিনি বললেন—"আমি সব জানি। প্রমাণ বেশ দুর্ব্বল ছিল—যদি দায়রার জজ সাহেব না হতেন—তবে কৃষ্ণানন্দ বেকসুর খালাস হতেন বলে আমার বিশ্বাস। সাহেবের ধারণা ছিল—হিন্দু সন্ন্যাসীমাত্রই বদমাস।

নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীরও আভিজাত্যের অত্যাচারের হাত থেকে নিস্তার নেই। ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, নীচতা, দলাদলি সমাজকে কতটা নীচু করছে—তা এই সব ঘটনা থেকে বোঝা যায়। তথাকথিত সমাজের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের গর্ব্ব মিথ্যা অভিমান কূট চক্রান্ত আমাদের সমাজকে কতদূর অধঃপাতিত করতে পারে তা ভেবে দেখা উচিত। ত্যাগ সদাচার চরিত্র বীর্য্য পৃথিবীর সকল দেশেই আদর্শস্বরূপ। মহানুভবতা পরার্থপরতা হিন্দু কখনও ভুলতে পারে না। কিন্তু আমাদের অতীত ইতিহাসে যেমন ব্রাহ্মণের গৌরবমহিমা দেখতে পাওয়া যায় তেমনি নীচ স্বার্থপর কূটচক্রী তথাকথিত ব্রাহ্মণাভিমানী হীন চরিত্রেরও অভাব নেই। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচার "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি-পরায়ণঃ···" কিংবা "মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে" সর্ব্বভূতে নারায়ণ—সর্ব্বংখল্বিদংব্রহ্ম, আমাদের ধর্ম্মাচার্য্যেরা প্রচার করেছেন। এই সব কথা শুধু মুখেই আমরা বলি—জীবনে, সামাজিক জীবনে তা কখনও রূপায়িত হয় নি। বাংলার প্রেমের অবতার নিমাই সমাজে এই ভগবদ্ দৃষ্টির সাম্যবাদ আনতে চেয়েছিলেন—কিন্তু কয়েকজন দুষ্ট দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের হাত থেকে নিস্তার তিনি পান নি। তারা তারস্বরে প্রচার করত—

সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে সর্ব্বনাশ।
নীচ শূদ্র দিয়া করে ধর্ম্মের প্রকাশ॥

এমনকি কায়স্থ নরোত্তম দাসের অনেক ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল—তা শুনে ব্রাহ্মণসমাজ উত্তেজিত হয়েছিল। নানারূপ চক্রান্ত করেও তাঁর সঙ্গে তারা এঁটে উঠতে পারে নি—তিনি ছিলেন রাজপুত্র, তাঁর গুণগ্রাহীদল তাঁকে বেষ্টন করে রাখত। তাঁর অনুগত বৈষ্ণব-সমাজ তাঁকে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলে উপবীত পরিয়ে দেয়। নিষ্ফল আক্রোশে ও ক্রোধে নরোত্তম-বিরোধী দল অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হলেন। তখন ইংরেজী আদালতের উকীলের দল ছিল না—যাঁরা হয়কে নয় এবং নয়কে হয় করতে পারত। এ ত প্রতিদিন আমাদের চোখের উপর ঘটছে, ধনী জালজুয়াচুরি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে গরীবকে নিষ্পেষণ করে আদালতে ডিক্রি পেয়ে পথের ভিখারী করছে। আগে এইরূপ জঘন্য বা নীচ উপায় অবলম্বন করতে লোকে কুণ্ঠা বোধ করত।

কিন্তু শ্রুতিবাণী অব্যর্থ: "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"—সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার জয় ক্ষণস্থায়ী। শ্রীকৃষ্ণানন্দ আর ইহজগতে নেই, দুষ্কৃতকারীরাও কোথায় বিলীন হয়েছে। মিথ্যার ঘন আবরণ কোথায় সরে গিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণানন্দের সমুজ্জ্বল গৌরবমূর্ত্তি এখন প্রকাশ পাচ্ছে। হিন্দী ভক্তিমাল গ্রন্থে তাঁর জীবনী প্রকাশ হয়েছে। তাঁর শতবার্ষিকীর জয়ন্তী উৎসবে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত তাঁর কীর্ত্তিগানে মুখরিত হয়েছে। জন্মভূমি গুপ্তিপাড়ায় শ্রীকৃষ্ণানন্দের স্মৃতিসৌধ নির্ম্মিত হয়েছে। তাঁর পুণ্য জীবন-কাহিনী

তাঁর গ্রন্থাবলী, তাঁর অলৌকিক গুণাবলী, প্রচারিত আদর্শ ও বাণী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোচিত হচ্ছে। যে মধ্যাহ্নসূর্য্য ঘন মেঘে আবৃত হয়েছিল—সে মেঘ কেটে গিয়েছে, দ্বিগুণ তেজে তার প্রভা ছড়িয়ে পড়ছে। ঐ শোন সাধক সিদ্ধ পরিব্রাজকের ব্রজভাবে মাতোয়ারা গান—

"যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিণী।
ও যার বিমল তটে রূপের হাটে বিকাত নীলকান্তমণি।"

ঐ শোন পরিব্রাজকের ভক্তিমাখা নগর-সঙ্কীর্ত্তন

"নামামৃত পান সবে কর ভাই। (হরি)
এমন নাম কখনও শুনি নাই।
হরিনাম যে করে সার ভবে ভাবনা কিবা তার
নামে যায় মহাপাপ রোগ-শোক-তাপ সংসার-বিকার।
(হরি) নামে জগাই-মধাই উদ্ধারিল নাম শুনায় গৌর-নিতাই।"

এই গান বাংলার পথে-ঘাটে ভিখারী, এমন কি চাষী দিনমজুরের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে, আমরা তরুণ বয়সেও তা শুনেছি। অনেকে নগরকীর্ত্তনে এই গীত গেয়েছে, প্রেমোন্মত্তভাবে নৃত্য করেছে।

এই দুর্দ্দিনে, এই সঙ্কটকালে নানা দুর্নীতি অনাচারের মাঝে তাঁর পবিত্র জীবন, তাঁর বাণী কি আমাদের পথনির্দ্দেশ করবে না? পরমহংস, পরিব্রাজক, বাগ্মীশ্রেষ্ঠ, বাণীর বরপুত্র শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী আর ইহজগতে নেই, কিন্তু চিন্ময় মূর্ত্তিতে নিজের কীর্ত্তিপ্রভায় তিনি অমর, নিত্যভাস্বর।

জাগরণ

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

১

কোথা হতে আসিয়াছি কোথা যাব চলে
দু'দিনের দেখা-শোনা। সেই পরিচয়
এপারে মৃত্তিকা-বক্ষে না রহে অক্ষয়,
তবু ব'সে মালা গাঁথি কত কি যে ছলে।
স্বপ্নাতুর জীবনের মান-অভিমান
চক্রের পেষণে জানি ব্যর্থ হয়ে যায়,
তবু যদি দেখা হ'ল তোমায় আমায়
গেয়ে যাব মিলনের প্রথম সে গান।
অযাচিত ক্ষণিকের পরিচয়ে আজি
যাহা আমি পাইয়াছি, যাহা পাই নাই,
সেগুলি কুড়ায়ে লয়ে শুধু পূজিয়াছি
অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্রতাকে, ঘিরে রাখি তাই
গর্ব্বের প্রাচীর দিয়ে। পিছনে তাকাই
যে সুরে উঠেছি জেগে আজো ওঠে বাজি'।

২

ওপারের প্রান্ত হতে এপারের কূলে
প্রসারিত ক্ষণিকের সঙ্কীর্ণ বন্ধন,
তারি তরে এত লোভ অজস্র ক্রন্দন
শীর্ণ এই বক্ষ মাঝে ওঠে ফুলে ফুলে।
কামনার শেষ নাই, শুধু বহ্নি-জ্বালা
দগ্ধ করে, ভস্ম করে যত কিছু দান,
আজ যাহা খরদীপ্ত কাল তাহা ম্লান,
পড়ে রহে পরিত্যক্ত জীবনের ডালা।
খুঁজিয়া পাই না তবু কি যে চাহিলাম,
কার তরে সারা বেলা কুসুম-চয়ন,
হৃদয়ের সিংহাসনে কারে রাখিলাম,
গোপনে ফেলিল অশ্রু বিরহী নয়ন।
স্বপ্ন সম ক্ষণিকের এই জাগরণ,
তবু লহ হে মৃত্তিকা, একটি প্রণাম।

ভাঙছে

শ্রীরামশঙ্কর চৌধুরী

হাঁটু দুটোকে একত্র করে তারই উপর মাথাটা রেখে গোবরমাটি লেপা দাওয়ার উপর বসে ছিল অবনী। প্রভাতের স্নিগ্ধ সূর্য্য অবনীর রোগে-ভোগা শরীরটার উপর বুলিয়ে দিচ্ছিল উষ্ণ পরশ। ভারি আরাম বোধ হচ্ছিল অবনীর। ক্লান্তির ম্যাজমেজে ভাবটা কেটে গিয়ে আবেগে জড়িয়ে আসছিল চোখ দুটি।

—এই নাও গরম জল। শৈলজা একটা পাত্রে কিছু গরম জল এনে স্বামীর পাশে রেখে দিয়ে বলল।

অবনী একবার পাত্রটার দিকে ও একবার শৈলজার দিকে তাকিয়ে বলল, গরম জল কেন, একটু ঠাণ্ডা জলই দাও—গা-টা ঠাণ্ডা হোক।

—না, কবরেজ মশায় এখনও ঠাণ্ডা জল ব্যবহার করতে বলেন নি।

কবিরাজ মশায় যা বলে যাবেন তা থেকে একচুল এদিক-ওদিক হবে না, সেবাপরায়ণা এই নারীটির আচরণে, সেবায়, যত্নে। বেশী অনুরোধ করা নিরর্থক মনে করে আর কোন কথাই বলল না অবনী। শৈলজাও কথা না বাড়িয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল—যদি সাহায্যের প্রয়োজন হয় এই ভেবে।

অবনী জলের পাত্রে, বাম হাতটা রেখে তাকিয়ে দেখছিল শৈলজাকে—সে দৃষ্টিতে মেশানো ছিল শ্রদ্ধা, ছিল ভালবাসা; আর ছিল অন্তরের কৃতজ্ঞতা। অবনী জানে যে শত কবিরাজ এলেও এ যাত্রায় তাকে ফিরিয়ে আনতে পারতেন না, যদি না শৈলজার কল্যাণ-হস্ত দুটি তার সেবার জন্য সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকত।

শৈলজা স্বামীকে অপলক নেত্রে তার পানে তাকিয়ে থাকতে দেখে মৃদু হাস্যে বলল, কি দেখছ অমন করে?

অত্যন্ত সহজ গলায় উত্তর দিল অবনী—তোমাকে।

—আমাকে কি কোন দিন দেখ নি নাকি?

দেখেছে। বহুবার দেখেছে, কিন্তু এমন পরিবেশে, এত আপন করে কোন দিন দেখেছে বলে মনে পড়ছে না অবনীর। কৈশোর থেকে প্রৌঢ়ত্বের সীমা পর্য্যন্ত অবনীকে কাটাতে হয়েছে বিদেশে। তখন ছিল সংসার—অবনীকে চালিয়ে নিয়ে যাবার নিষ্ঠুর তাগিদ, সাংসারিক অনটনের মাঝে, বহু থেকে শৈলজাকে আলাদা করে দেখবার প্রয়োজন উপলব্ধি করে নি। অবসরও হয় নি। প্রথম প্রথম শৈলজা আপনাকে দেখাবার বাসনা নিয়েই এসেছিল স্বামীর কাছে। আপনার বিরহ-বেদনার লিপিকা পাঠিয়ে চেয়েছিল স্বামীর সোহাগ, কিন্তু দিতে পারে নি অবনী। পাছে লোকে কিছু বলে, পাছে সংসার-তরণীর মধ্যে প্রবেশ করে বারিরাশি সামান্য এই ছিদ্র-পথ দিয়ে। একবার মনে আছে তার—সে শৈলজাকে স্পষ্টই লিখেছিল:—'তুমি আমার স্ত্রী, আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী—আমার যাত্রাপথে তুমি সঙ্গিনী, আমাকে সাহায্য করবে, আমাকে শক্তি দেবে।' শৈলজা সেদিন এ পত্রের কি মানে করেছিল—তা সেই জানে, কিন্তু এর পর কোন দিন নিজের জন্য একটা চুল-বাঁধার ফিতেও চায় নি। আজ সে সব দিনের কথা চিন্তা করতে গেলেও ব্যথায় দুমড়ে পড়ে অবনীর অন্তর। অপরাধী মনে হয় আপনাকে। কি ভুলই করেছে, একটি কিশোরীর কচি মনকে পিষে মেরেছে সে। অনুতাপে দগ্ধ হয় অবনী।

—যেমন দেখা উচিত ছিল—তা দেখি নি বৈ কি বড়বৌ! আমাকে তুমি মাপ কর!

অবনীর সখেদ উক্তি শৈলজার মর্ম্মমূলে গিয়ে আঘাত করল। হৃদয়-বীণার বাঁধা তারগুলো আঘাত পেয়ে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল সারা অন্তঃকরণ মথিত করে—চোখের কোণে দেখা দিল উদ্গত অশ্রু। আর সেখানে সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না—ত্বরিতপদে ঘরের মধ্যে ঢুকে খানিক কাঁদল, এখন যে তার কিছু নেই—এখন যে সে রিক্তা! কি উপঢৌকন দেবে তার স্বামীর পায়ে! হায় রে হতভাগিনী, সময় না হতেই ফুলকে বৃন্তচ্যুত করলি? খানিকক্ষণ কাঁদার পর মনের ভার খানিকটা লাঘব হলে ফিরে এসে বলল, ভুলেই গিয়েছিলাম যে তোমার সাগু চাপিয়ে এসেছি, না গেলে সবটুকু ফুটে ফুটে মরে যেত! ওমা, এখনও মুখ ধোও নি?

—এই ধুচ্ছি। কিন্তু—

—কিন্তু আবার কি?

—একবার দেবে না?

শৈলজা বুঝল, অবনী তামাকের কথা বলছে। তামাকটা বেশী না খেতেই মানা করেছেন কবিরাজ মশায়, তাই এটার একটু কড়া-কড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে শৈলজা। বহুবার বলেছে —'তামাক ছাড়তে হবে তোমাকে', কিন্তু পারে নি অবনী। প্রতি-শ্রুতি দিয়েছে দিনে-রাত্রে তিন বারের বেশী নিশ্চয় খাবে না, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা যায় নি। শৈলজা বিরক্ত হয়েছে, রাগ করেছে—অভিমান করেছে—তবু না।

—বাসিমুখে সতীনের চুমু না খেলে আর মুখে জল দেবে না? বেশ, এনে দিচ্ছি—

—আহা রাগ করছ কেন বড়বৌ, এতকালের অভ্যাস—

—কিন্তু ইদানীং সে অভ্যাসটা যে বাড়ছে, পরশু হয়েছে পাঁচ বার, কাল সাত বার, আর আজ এই আরম্ভ হ'ল।

—সঙ্গী বল, বন্ধু বল—আপনজন বল, ওইটাই ত আছে বড়-বৌ। যাদের আপন করে নিয়েছিলাম তারা ত কৈ কেউ রইল না। তুমি আপত্তি করো না বড়বৌ—আপত্তি করো না।

কথাটা নেহাত মিথ্যা নয়।

সব সুখ ছিল অবনীর। পরম স্নেহশীল ভাই পেয়েছিল, হাস্য-মুখর একটি পরিবার পেয়েছিল, সদ্যপ্রস্ফুটিত পদ্মের মত ছিল শিশুরা,

তাদের কলহাস্যে মুখরিত থাকত অবনীর ছোট্ট সংসারটি। কিন্তু কোন্ পথ দিয়ে শনি প্রবেশ করে তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেল সকল সম্পদ, তার মুখের হাসি, মনের শান্তি।

সাগু নিয়ে প্রত্যহই পীড়াপীড়ি করতে হয় শৈলজাকে। কিছুতেই ঐ পদার্থটা আর মুখে তুলতে চায় না অবনী, কিন্তু শৈলজাও ছাড়বার পাত্রী নয়, অনেক অনুনয়বিনয়, শেষে চোখের জল ফেলে সাগুটুকু খাওয়াতে হয়।

আজও সাগু হাতে নিয়ে কাছে আসতেই অবনী বলে বসল, ওটা ফেলে দাওগে, আমি খেতে পারব না।

কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল শৈলজা, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই সমর এসে উপস্থিত হতেই আর বলা হ'ল না।

সমর অবনীর সর্ব্বকনিষ্ঠ ভগ্নীপতি।

—ও মা ঠাকুর জামাই যে! বলে মাথার কাপড়টা একটু সামনের দিকে টেনে দিল শৈলজা।

—এস ভাই, এস। বড়বৌ, সমরকে হাত-পা ধোবার জল দাও, চা করে দাও।

সমর বলল, আপনি যে অসুখে ভুগছেন তা ত কেউ জানায় নি!

ক্ষীণ, কৃশ দুর্ব্বল মানুষটিকে দেখে দুঃখ হ'ল সমরের।

তুমিও ত ভাই কোন খোঁজখবর নাও নি। হাসতে হাসতে বলল শৈলজা।

তা অবশ্য নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু না নিয়ে যে অন্যায় করেছে তা স্বীকার করে বলল, বিপদটা যখন আপনাদের তখন আপনাদের জানানোই ছিল প্রথম কর্ত্তব্য।

—কেন জানাই নি তা পরে বলব ভাই, এখন হাত-মুখ ধুয়ে নাও।

জল-গামছা সমরের কাছে এগিয়ে দিয়ে গেল শৈলজা, সমর অবনীর অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। মা-বাবা যখন দু'জনেই সাত মাসে পর পর মারা গেলেন তখন কল্যাণী ছোট। মা মরবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে অবনী আর শৈলজাকে ডেকে বললেন, তোরা ছাড়া আমার কল্যাণীর আর কেউ রইল না বাবা, তাই তোদের হাতেই ওকে দিয়ে গেলাম, একটি সৎপাত্রের হাতে যেন আমার কল্যাণী পড়ে—এইটুকু দেখিস।

মৃত্যুপথযাত্রিণীর নিকটে সেদিন চোখের জলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল অবনী, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। পুত্রকন্যা কিছু ছিল না শৈলজার, শূন্য কোলে কল্যাণীকে টেনে এনে আদরে যত্নে তার সমস্তটুকু স্নেহরসে সিঞ্চিত করে কল্যাণীকে কন্যার অধিক স্নেহে মানুষ করেছিল সে, বিবাহের বয়স উপস্থিত হলে অবনী নিজে কল্যাণীর পাত্র-নির্ব্বাচন করেছিল। সমর গরীব, কিন্তু তার রূপ, তার গুণ অন্য সকলের থেকে সম্পদশালী করেছিল সমরকে। তার উপর সমর ছিল উপার্জ্জনশীল।

বিয়ের দিনকয়েক আগে কল্যাণীকে রাগাবার জন্যই অবনী শৈলজাকে লক্ষ্য করে বলেছিল, জান বড়বৌ, কল্যাণীর যে বর হচ্ছে সে দেখতে ভালই, তবে রংটি ময়লা।

দাদার মুখে তার হবু স্বামীর বর্ণনা শুনে অভিমানে সারাদিন আর খায় নি কল্যাণী। শৈলজা অভিমানের কারণ জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে বকুনি খেল; ছোট বৌ আবার বেশী বাড়াবাড়ি সহ্য করতে পারত না, সে কতকটা জানত ঠাকুরঝির রাগের কারণ, তাই বড় জাকে তিরস্কৃত হতে দেখে বললে, ওগো দিদি, রাজকন্যার রাজপুত্র ছাড়া মনে ধরবে না; যাও বড়-ঠাকুরকে বল—তিনি আবার যেরূপ রাজপুত্রের সন্ধানে।—কল্যাণী এবার কেঁদে ফেলে বলল, আমি কি তাই বলেছি নাকি! দাও না আমার বিয়ে, আমি যদি না মরি···শৈলজা খপ করে কল্যাণীর মুখখানা চাপা দিয়ে বলল, ফের যদি ও কথা মুখে আনিস তবে আমিই মার দোব। এর পর চুপ করল কল্যাণী।

অবনী সব শুনে খানিক হাসল, তারপর অভিমানাহতা বোনটিকে আপনার বুকের কাছে টেনে নিয়ে, তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, হ্যাঁরে, তোর বর কি কালো হয়। দেখবি ছাদনাতল আলো-করা বর আসবে তোর, চল, খাবি আমার সঙ্গে।

সেদিন একই থালায় দু'ভাই-বোনে খেল।···

সেই কল্যাণীর স্বামী—এই সমর, সে যে কত আদরের তা কি প্রকাশ করে বলা যায়!

বিয়ের পর বর-কনে বিদায় হবার দিন অবনী সমরের হাতে কল্যাণীকে সঁপে দিয়ে বলল, একদিন আমার মা আমাকে কল্যাণীকে দিয়ে গিয়েছিলেন—ভাই, আজ তোমার হাতে দিচ্ছি আমি। কল্যাণী যেন সুখী হয় সমর—এইটুকুই আমার আকাঙ্ক্ষা!

একদিনেই এই মানুষটির অন্তরখানি দেখতে পেয়েছিল সমর—কত নির্ম্মল আর কত পবিত্র! মানুষটির সংস্পর্শে এলে আপনিই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে পড়ে, ভালবাসতে ইচ্ছা হয়। সেদিন সমর কল্যাণীকে সুখী করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিয়েছিল দাদা-বৌদিদির কাছ থেকে, আজও সে প্রতিশ্রুতি ভাঙে নি সে।

হাত-মুখ ধোয়ার পর শৈলজা চা এনে দিতেই সমর বলে উঠল, বাড়ীটা বড় ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে যে, তারপর আপনি চা এনে দিচ্ছেন। ছোট বৌদিরা কোথায়?

চায়ের ব্যাপারটা ছোটবৌ-ই করত, ঠাকুর জামাইদের চা পরিবেশন করা ছিল তার কাজ, তাই অবাক হ'ল সমর।

—ওরা ছোট বৌয়ের দিদির বাড়ী গেছে ভাই।

—ছোটদাও?

—হাঁ।

—কেন?

—এখন শুধু গল্প করলে বেলা যে বেড়ে যাবে ভাই, তার চেয়ে তুমি স্নান সেরে খেতে বসবে—আমি তোমাকে হাওয়া করতে করতে সব বলব।

দেখতে দেখতে বৈশাখী সূর্য্যের অগ্নিস্রাবী রূপের প্রকাশ ঘটল। অবনীর পক্ষে আর বসে থাকা সম্ভব হ'ল না। দুর্ব্বলতা তাকে এত বেশী কাবু করে ফেলেছে যে একবার খুঁটি ধরে উঠতে গিয়ে বসে পড়ল অবনী। ধাক্কা খেয়ে খুঁটিটার ফাটল দিয়ে ঝরে পড়ল খানিকটা ধুলো—ঘুণ ধরেছে খুঁটিটায়। ভিতরে ভিতরে ফাঁক করে দিয়েছে ঐ নিরেট শক্ত পদার্থ টাকে। দুঃখ হ'ল অবনীর।

এই খানেই ছিল কোঠা-বাড়ী। গাঁয়ের মধ্যে সেরা বাড়ী ছিল অবনীদের কোঠা, কিন্তু রাখতে পারে নি, উপরি-উপরি কয়েক বৎসর বর্ষায় আর কালবৈশাখীর ঝড়ে কোঠার আচ্ছাদনটাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে দেয়ালগুলোকে করে দিয়েছিল নরম। তারপর এই বৎসর-খানেক হ'ল একেবারেই ভূমিসাৎ হয়ে গেছে। সমরের বিয়ের বৎসরেও কোঠাটা ছিল পড়োপড়ো। তারপর অবনী নিজে বন থেকে বেছে বেছে শক্ত কাঠ এনে খুঁটি করে এই চালাটা তুলেছে, সেটারও মূলে ধরেছে ঘুণ। দুঃখ হবে বৈকি।

স্বামীকে বসে পড়তে দেখে শৈলজা এগিয়ে এসে বললে, অনেকক্ষণ বসে আছ, চল এবার শোবে।

আপত্তি করল না অবনী। শৈলজার প্রসারিত বাহুযুগলের উপর আপনার ভার অর্পণ করতে দ্বিধা করল না। শুধু যাবার সময় বলল, খাওয়া-দাওয়ার পর সমরের জন্ম আমার কাছেই একটা বিছানা করে দিও। যা গরম পড়েছে।

স্বামীকে শুইয়ে দিয়ে এসে স্নানে পাঠিয়ে দিল সমরকে শৈলজা। সমর ফিরে এলে তাকে খাবার বেড়ে দিয়ে পাশটিতে বসল পাখা হাতে নিয়ে।

—এখন বলুন দেখি, ছোটদাদা হঠাৎ চলে গেছেন কেন?

ম্লান হাসি বেরিয়ে এল শৈলজার মুখে।

—এখনও তা বলতে হবে ভাই, ভাতের থালার দিকে তাকিয়ে আঁচ করতে পার না? তোমাকে একটা তরকারি বৈ দুটো দিতে পারি নি যে!

এমনই একটা অনুমান করেছিল সমর, তবু সবটুকু শুনবার আকাঙ্ক্ষা তার প্রবল হয়ে উঠল এবং যা ঘটেছে তাই বলবার জন্ম অনুরোধ করল বড়বৌদিকে।

শৈলজা সবই বলল, একটুও বাড়িয়ে বা কমিয়ে নয়। অবনী বিহারের কোন এক কারখানায় চাকুরি করত, মাইনেও পেত ভাল। ঐ দিয়েই সংসারের যাবতীয় খরচ চলত, কিন্তু একদিন হাঙ্গামা বাধল কারখানায়। শ্রমিকেরা নাকি কাদের প্ররোচনায় বলল, বাঙালীবাবুরাই তাদের ক্ষতি করছে। সাহেব ওদের কথা শুনে অনেককে বিদায় করে দিলেন, শুধু থেকে গেল অবনী। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আত্মসম্মান বজায় রেখে সেখানে টিকে থাকা সম্ভব হ'ল না তার। তাই কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে এল অবনী। সংসারের ভার গিয়ে পড়ল রমণীর উপর। গ্রামে ডাক্তার বলতে কেউ ছিল না, রমণীর খানিকটা কমপাউণ্ডারী বিদ্যা ছিল, সেই বিদ্যাকেই পুঁজি করে ডাক্তার হয়ে বসল সে। টাকাও রোজগার হতে লাগল। প্রথম প্রথম উপার্জ্জনের সব টাকা দাদার হাতেই তুলে দিত রমণী, কিন্তু ছোটবৌয়ের তা সহ্য হ'ত না। অকস্মাৎ স্বামীর প্রতি দরদ-ভালবাসা তার উথলে উঠল। একদিন বলল, একা কি তোমারই সংসার যে খাওয়া নেই দাওয়া নেই এমনি ভূতের মত টাকা টাকা করে বেড়াচ্ছ। দেহটার দিকে নজর আছে কি?

—না ছোটবৌ, সংসার আমাদের বাবার। আর আমার খাটার কথা বলছ? তা নিজের পোষাদের মুখে ভাত তুলে দিতে হলেও খাটুনি কিছু কমবে বলে ত মনে হচ্ছে না।—এরপর আর কিছু বলে নি ছোটবৌ। বলাও চলে না।

—তারপর? ভাতের গ্রাস মুঠোর ভিতর রেখে জিজ্ঞাসা করল সমর।

তারপর? পুরুষ-মানুষের মন মেয়েদের কাছে কত দিন শক্ত থাকে ভাই?

—দাদার ত ছিল, জানি।

—তোমার দাদা এক শ'য়ে একটি বৈ ত নয়। যাক্ শোন—ওমা তুমি খাওয়া বন্ধ করে দিলে কি করে বলি।

—না বলুন, এই খাচ্ছি।

আবার আরম্ভ করল শৈলজা:

ছোটবৌয়ের আচারে-ব্যবহারে এমনই সব অশোভনতা প্রকাশ পেতে লাগল যে তা বলতে গেলেও দুঃখ হয়। অবনীর চিরকালের নিয়ম, বাড়ীতে থাকলে দুটি ভাই পাশাপাশি খেতে বসতেন। পাশে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খাওয়াতেন কনিষ্ঠকে। বললে বলতেন, আমি না থাকলে পেট ভরে রমণী খায়ও না। এই নিয়ম চলে আসছিল বরাবর, হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন অবনী—দুটো খাবারের থালা দু' রকম খাদ্য-সামগ্রীতে ভর্ত্তি। এই স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করেও কোনও কথা বললেন না অবনী, কিন্তু স্ত্রী হয়ে শৈলজা স্বামীর প্রতি এই অপমান সহ্য করতে পারে নি। সে ছোটবৌকে ডেকেই বলেছিল, এ রকম করিস না ছোটবৌ, ওদের মন ভাঙিয়ে দিস না। ওরা দুটি মায়ের পেটের ভাই, আমরা ত পর।

বড়বৌয়ের এই কথায় কুপিত হ'ল ছোটবৌ। একদিন রাত্রে স্বামীকে চুপি চুপি জানাল সেদিনের ঘটনা অতিরঞ্জিত করে। তার উপর বড়দি তাকে নাকি যে অপমান করেছে, তা সয়ে এ বাড়ীতে থাকা সম্ভব নয়। সে চলে যেতে চাইল, কিন্তু বাধা দিল রমণী অপমানের কারণ অনুসন্ধান করবার আশ্বাস দিয়ে।

আশ্বাস পেয়ে মুখ খুলে গেল ছোটবৌয়ের। একদিন রমণীকে একলা পেয়ে বলল, তুমি ত টাকা এনে হাতে দিচ্ছ বড় দাদার, কিন্তু সেই টাকায় কি হচ্ছে কিছু খোঁজখবর রাখ কি?

—না।

—কেন শুনি?

—এ বাড়ীর নিয়ম নয় বড় ভাইয়ের উপর খবরদারি করা।

—নিয়ম শুধু নিজের স্ত্রীকে দিনের পর দিন শুকিয়ে মারা, লাঞ্ছিত করা।
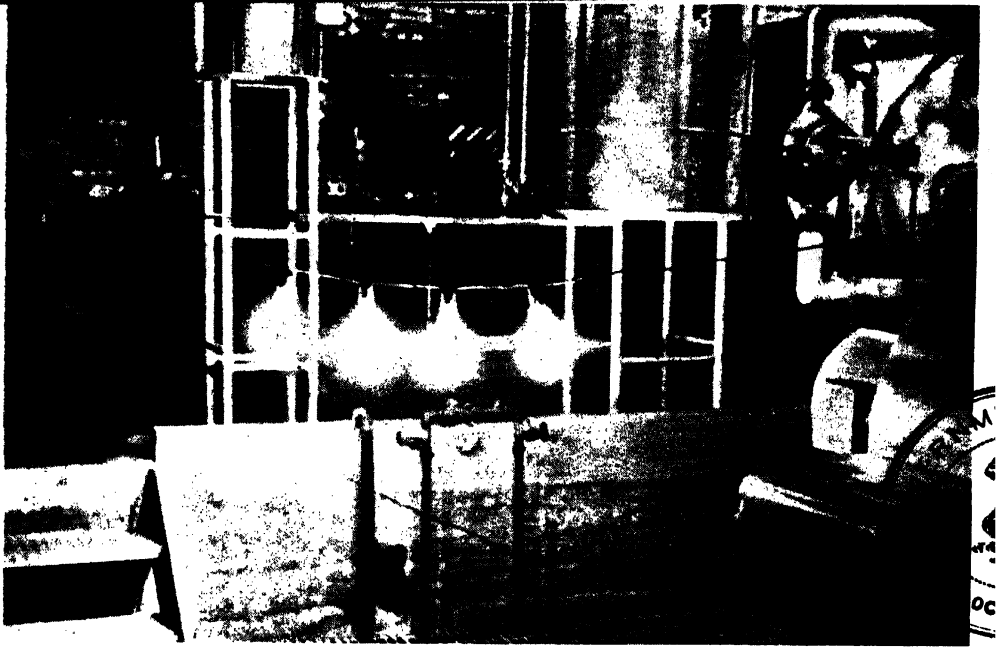
জনৈক ইটালীয় কারুশিল্পীর মৃৎপাত্রের বিপণি
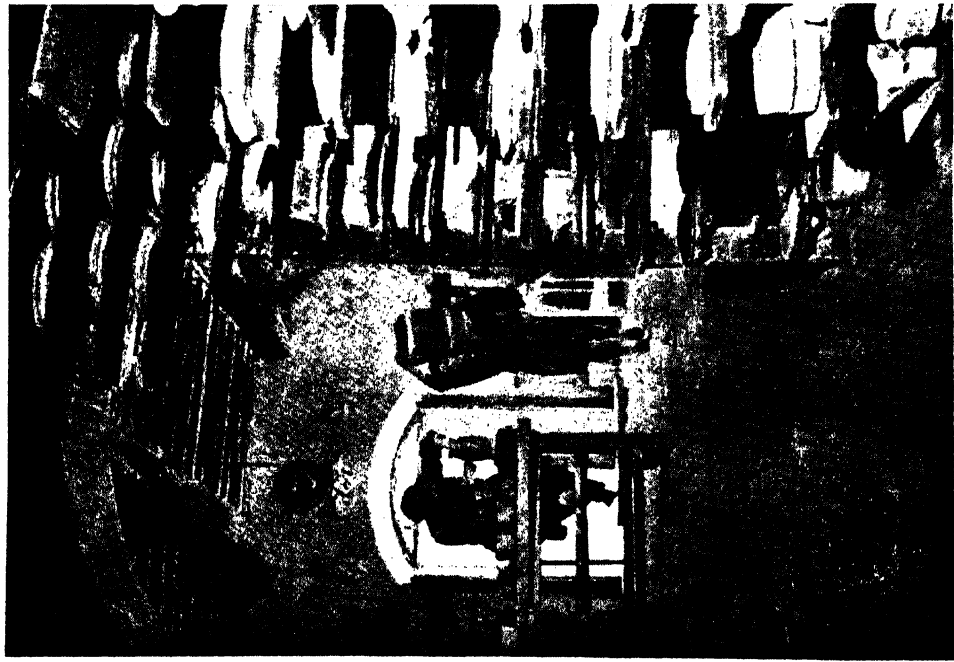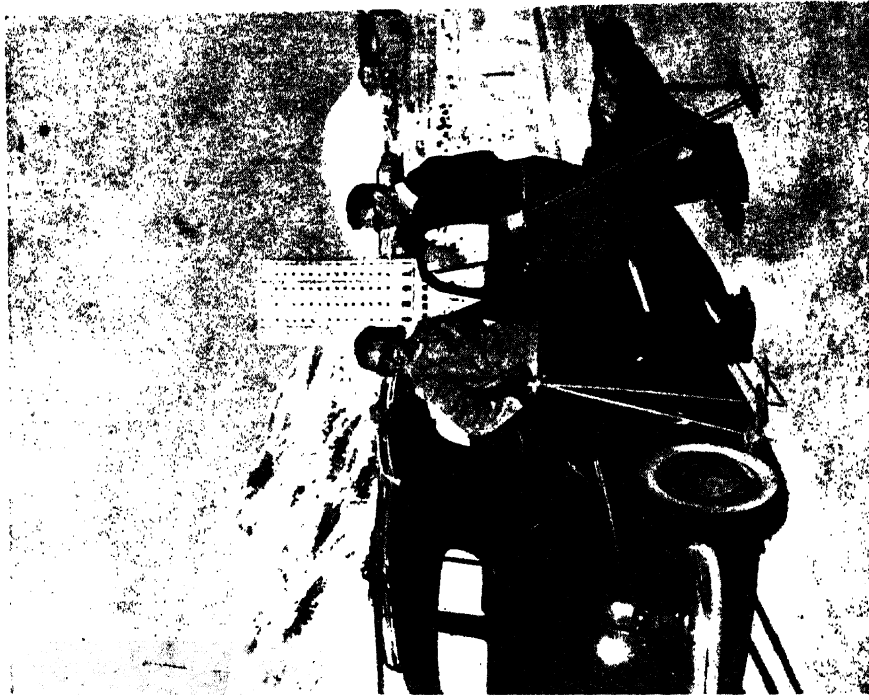
ইটালীর সেস্ত্রিয়ের (তুরিন) শীতকালীন স্কিইং ক্রীড়া-কেন্দ্রের একটি দৃশ্য

—তুমি আবার লাঞ্ছিতা হলে কার কাছে ?

—ঐ তোমাদের বড়বৌদিদির কাছ থেকে। ছেলে-মেয়ে-গুলোর জামায় আজ এক মাস হ'ল একটু সাবান পড়ে নি, তাই চাইতে গেলাম, বললাম, দিদি গোটাকয়েক পয়সা দেবেন ভাই! তা উত্তর এল, বাড়তি পয়সা কি আর আছে ছোটবৌ? ক্ষারে বসিয়ে দিস। আমার বেলাতেই ক্ষার, সোডা, আর নিজের গায়ে-মাখা সাবানটি না হলে চলে না।

কথার কোনও উত্তর দিল না রমণী, কিন্তু মনে মনে জাগল জিজ্ঞাসা; জমে উঠল সন্দেহের কালো মেঘ, দিনের পর দিন পুঞ্জীভূত হ'ল অসত্য-আশ্রয়ী বিক্ষোভ। একদিন দাদাকে না বলে থাকতে পারল না রমণী যে, তার দ্বারা এত খরচ সামলানো সম্ভবপর হবে না। অত্যন্ত সোজা মানুষ অবনী, তাই রমণীর বক্তব্যের গূঢ়ার্থ উপলব্ধি না করেই বললেন, এই যে চালাচ্ছিস ভাই, কয় জনে তা পারে ?

—কিন্তু আর পারব না দাদা।

কথাটা অপ্রত্যাশিত—তাই হাঁ করে ক্ষণকাল তাকিয়ে রইলেন অবনী ভাইয়ের মুখের দিকে। সে মুখমণ্ডলে কি দেখল অবনী তা সে-ই জানে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তা প্রকাশ করে নি।

যেদিন ছোটবৌ সকল ব্যবস্থা করল তার দিদির বাড়ী যাবার সেই দিনই শুধু অবনী বলল, ওরে আমি বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে ভার নিয়েছিলাম এ সংসারের—বলেছিলাম আমরা কোনও দিন পৃথক হব না, ভাইয়ে ভাইয়ে আলাদা খাব না।

চুপ করে রইল অবনী। এক পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদল শৈলজা। কিন্তু ব্যবস্থার কিছু ওলট-পালট হ'ল না।

রমণী যখন ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে গাড়ীতে উঠল, তখনই রমণীর ছোট সন্তানটিকে কোলে নিয়ে তার ছোট্ট মুখে চুমো দিয়ে জিজ্ঞেস করল অবনী, আমাকে একলা ফেলে যাচ্ছিস জ্যেঠামণি—। সেদিন গলাটা জড়িয়ে ধরে ছোট অবোধ শিশু, আধ আধ সুরে বলল, আমি যাব না জ্যেঠামণি—আমি—

কিন্তু শেষ করে ওকে বলতেও দিল না ওরা ওই ছোট শিশুটির মনের কথা। ট্রেনের সময়ের নাম করে কেড়ে নিয়ে গেল খোকাকে।

—জানলে ভাই সেই শোক কাটাতে পারলেন না তোমার দাদা। জ্বরে পড়লেন।…

খাওয়া হয়ে গিয়েছিল সমরের—উঠে হাত ধুয়ে অবনীর ঘরে গিয়ে বসল সে। এঁটো থালাটা পরিষ্কার করে শৈলজাও গেল সেখানে।

বৈশাখী আকাশের পশ্চিম-দিগন্তে দেখা দিল ঝড়ের পূর্ব্বাভাস—আঁধার হয়ে এল চারিদিক—অবনী আপন মনেই বলল, চালাটাকেও হয়ত রাখা যাবে না ভাই।

—ভেঙেই যখন গেছে দাদা, তখন আর ওটার উপর মায়া কেন? ভেঙে যেতে দিন।

ম্লান হাসি বেরিয়ে এল অবনীর রোগ-পাণ্ডুর মুখে। আস্তে আস্তে বলল, তাই কি দিতে পারি সমর, আমার বাপের ভিটে, এই ঘরেই যে আবার একদিন ফিরে আসবে রমণী। তার পয়সা আছে—সে তুলবে আবার সেই কোঠাবাড়ী।

"শিরসি মা লিখ"

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

আর কত গান গাহিবে এখনো কবি ?
ঊষর মরুতে ঢালিবে কতই সুর ?
কি ফল লভিবে ভস্মে ঢালিয়া হবি,
সকলেই যবে নিজের নেশায় চুর ?

বীণা তুলে রাখো ঝঙ্কারে নাই কাজ,
মীড়ে ও গমকে আলাপন অশোভন ;
স্বার্থ-সন্ধ আমাদের নাই লাজ,
অরসিকে বৃথা করো রস-নিবেদন।

মানুষ আমরা কূপ-মণ্ডূক সম,
চির-বিব্রত নিজের সমস্যায় ;
নিষিক্ত গীতি সুধারসে অনুপম
করিতে কে বলো ব্যর্থ প্রয়াস পায়।

চির জাগরূক মোদের আত্ম-প্রীতি,—
কবিতা না বলি শুনাও অর্থনীতি।

অশোক ও কুণাল

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

সম্রাট অশোক চতুরশীতিসহস্র ধর্ম্মরাজিকা[১] প্রতিষ্ঠা শেষ করিয়া শুনিলেন—সেইদিন তাঁহার পদ্মাবতী নাম্নী রাজ্ঞী এক পরমসুন্দর পরমসুদর্শন পুত্র প্রসব করিয়াছেন। কুমারের নয়নযুগল অতীব শোভনীয়—ইহা শ্রবণ করিয়া অশোক বলিলেন:

"লভিনু পরমপ্রীতি
পরিতৃপ্ত প্রাণ।
ধর্মে সেবি লভিলাম
ধর্মেরি এ দান।
বংশের ভূষণ মম
সর্বশোকহারী।
ধর্ম হতে জন্ম, হোক
ধর্মবৃদ্ধিকারী।"

সম্রাটের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া অমাত্যগণ কুমারের নাম রাখিলেন, "ধর্ম্মবর্দ্ধন।" কুমারকে যখন রাজসমীপে আনয়ন করা হইল, তখন রাজা প্রসন্ন বদনে কহিলেন:

"সুজাত-নীলোৎপলসদৃশ এ আঁখি দুটি।
পূর্ণ এ শশীসম মুখে রহে প্রস্ফুটি।"

"এমন সুন্দর নয়ন কেউ কোথাও দেখিয়াছেন কি?"

অমাত্যগণ কহিলেন, "দেব, মনুষ্যের মধ্যে দেখি নাই, কিন্তু পর্ব্বতরাজ হিমালয়ে কুণাল নামক এক জাতীয় পক্ষী বাস করে, তাহাদের নয়নযুগল এইরূপ সুন্দর।"

ইহা শ্রবণ করিয়া সম্রাট কহিলেন, "কুণালপক্ষী কিরূপ দেখিতে চাই।" রাজ-আদেশে কুণাল পক্ষী আনা হইল। কুণালপক্ষী ও কুমারের নয়ন নিরীক্ষণ করিয়া রাজা কোনই প্রভেদ দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি কহিলেন, "নয়ন যখন কুমারের কুণালপক্ষীর ন্যায় তখন কুমারের নাম রাখা হউক কুণাল।"

ক্রমে কুমার বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া কৈশোরে এবং কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তখন কাঞ্চনমালা নামে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল।

কুমার কুণাল একদিন সম্রাটের সহিত কুক্কুটারাম বিহারে গমন করিলেন। সেখানে তখন ভিক্ষুসঙ্ঘের অধ্যক্ষ ছিলেন যশঃ নামক ঋদ্ধি-সম্পন্ন এক স্থবির। তিনি দেখিলেন কুমারের নয়নযুগল অবিলম্বে বিনষ্ট হইবে। পদতলে প্রণত কুমারকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন:

"সতত শতেক দুঃখ দিতেছে এ নয়নযুগল।
সতর্কে পরীক্ষ দোঁহে। হে কুমার, স্বভাবচঞ্চল,
মিত্ররূপী শত্রু এরা! বোঝে না তা জনসাধারণ।
রূপেতে আসক্ত তারা করে কত পাপ-আচরণ!"

স্বভাবতঃ ধর্ম্মপরায়ণ কুণাল স্থবিরের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া নির্জ্জনে সতত নয়নযুগলের অনিত্যতা এবং নয়নের অনুবর্ত্তী হইয়া মনুষ্যকুল সমাজের যে সর্ব্বনাশ সাধন করে সে-সম্বন্ধে ভাবনা করিতে লাগিলেন। একদিন অন্তঃপুরের এক নির্জ্জন প্রদেশে এইরূপ অনিত্য-ভাবনায় কুমার যখন মগ্ন হইয়া আছেন, তখন সম্রাটের অগ্রমহিষী তিষ্যরক্ষিতা তথায় আগমন করিলেন। কুমারের পরমসুন্দর নয়নযুগলের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন:

"হেরিয়া তোমার এই অভিরাম নয়নযুগল,
কমনীয় কান্ত তনু, সুদর্শন অতি সুকোমল;
জ্বলিছে বক্ষেতে মোর অবিশ্রাম দাবানল-শিখা,
দহিছে কোমল হৃদি লক্ষ লক্ষ অনল-কণিকা!"

ইহা শ্রবণ করিয়া কুমার সন্ত্রস্তচিত্তে উভয় হস্তে শ্রবণ যুগল আচ্ছাদন করিয়া বলিলেন:

"অযুক্ত এ বাক্য দেবি,
আমি যে মা তোমার সন্তান!
অধর্মের পথ বাহি
নরকে মা করো না প্রস্থান!"

তিষ্যরক্ষিতা এইভাবে প্রত্যাখ্যাত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন:

"অনুরক্ত তোমা প্রতি
আসিনু লভিতে প্রীতি
মোরে তুমি করিলে নিরাশ!
মূর্খ তুমি হতজ্ঞান
মোরে কর প্রত্যাখ্যান
অবিলম্বে লভিবে বিনাশ।"

কুণাল উত্তর দিলেন, "বিনাশ লভি তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু ধর্ম্মপথে থাকিয়াই যেন বিনাশ লাভ করি!"

সেই হইতে তিষ্যরক্ষিতা কুমারের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এই সময় উত্তরাপথে তক্ষশিলা নগরে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। সম্রাট স্বয়ং এই বিদ্রোহ দমনে প্রস্তুত হইতেছিলেন। অমাত্যগণ বলিলেন, "মহারাজ, কুমার কুণালকে প্রেরণ করুন। তিনিই বিদ্রোহ দমন করিবেন।" সম্রাট অমাত্যগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কুমারের যুদ্ধযাত্রার সর্ব্বপ্রকার আয়োজন করিলেন।

অতঃপর রাজমার্গ হইতে স্থবির, ব্যাধিগ্রস্ত ও আতুর-

---

১ ধর্মরাজ—বুদ্ধ। ধর্মরাজিকা—বৌদ্ধস্তূপ।

জনকে অপসারিত করিয়া একই রথে কুমার কুণালের সহিত স্বয়ং সম্রাট পাটলিপুত্র নগরের বহির্দ্বার পর্য্যন্ত অনুগমন করিলেন। অবশেষে কুমারকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিয়া সজল নয়নে কহিলেন :

"সকল সে নয়নের জ্যোতিঃ, সে-জনারই নয়ন সকল।
অবিরাম হেরে অভিরাম যে-জন এ আঁখি-শতদল।"

ক্রমে কুমার তক্ষশিলায় উপস্থিত হইলেন। তথাকার নাগরিকগণ নগরের পথসমূহ ও গৃহাদি সুসজ্জিত করিয়া পূর্ণকুম্ভাদি মাঙ্গলিক সামগ্রী নগরদ্বারে স্থাপন করিলেন। অতঃপর সকলে প্রত্যুদ্গমন করিয়া কুমারকে অভ্যর্থনা করিলেন।

তাঁহারা সসম্ভ্রমে কুমারকে অভিবাদন করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "আমরা কুমার বা সম্রাট অশোকের সহিত বিরোধ করিতে চাহি না। দুষ্ট অমাত্যগণ আমাদের অপমান করিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা বিদ্রোহ করি।" এই বলিয়া তাঁহারা সসম্মানে কুমারকে নগরে প্রবেশ করাইলেন।

ইতিমধ্যে সম্রাট অশোকের এক ভয়ঙ্কর ব্যাধি হইল। তিনি অনবরত বমন করিতে লাগিলেন। রোমকূপসমূহ হইতেও তাঁহার দুর্গন্ধি মল বাহির হইতে লাগিল। চিকিৎসকগণের সমস্ত চিকিৎসা বিফল হইল। অশোক অধৈর্য্য হইয়া আদেশ দিলেন, "কুমারকে আনয়ন কর। তাঁহাকেই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিব। এইরূপ জীবনধারণের প্রয়োজন নাই।"

ইহা শ্রবণ করিয়া তিষ্যরক্ষিতা চিন্তা করিতে লাগিলেন, "কুণাল যদি রাজ্যলাভ করে তাহা হইলে আমার জীবনের আশা নাই।" তিনি সম্রাটকে বলিলেন, "আমি মহারাজকে সুস্থ করিব। কিন্তু বৈদ্যগণ যেন মহারাজের নিকট না আসে।"

অতঃপর তিষ্যরক্ষিতা বৈদ্যগণকে বলিলেন, "আপনাদের নিকট যদি এইরূপ রোগাক্রান্ত কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক আসে আমাকে দেখাইবেন।" এক আভীরের এই রোগ হইয়াছিল। আভীর-পত্নী বৈদ্যগণের নিকট আসিয়া তাহা নিবেদন করিল। বৈদ্যগণ কহিলেন, "রোগীকে আনিতে হইবে, তাহাকে না দেখিয়া চিকিৎসা করা যাইবে না।" আভীরকে তখন বৈদ্যগণসমীপে উপস্থিত করা হইল। বৈদ্যগণ তাহাকে তিষ্যরক্ষিতার নিকট পাঠাইলেন।

তিষ্যরক্ষিতা গোপনে তাহাকে হত্যা করাইয়া তাহার উদর ভেদ করিয়া পাকস্থলী পরীক্ষা করিলেন। অন্ত্রের মধ্যে এক বিরাট কৃমি দৃষ্ট হইল। সেই কৃমি যখন ঊর্দ্ধদিকে গমন করিতেছিল, তখনই রোগীর মুখ দিয়া অশুচি নির্গত হইতেছিল।

তিষ্যরক্ষিতা মরিচ চূর্ণ করিয়া ঐ কৃমির উপর নিক্ষেপ করিলেন। কৃমি মরিল না। এইভাবে পিপুল ও আদা দিলেন। তথাপি কোন ফল হইল না। অবশেষে পলাণ্ডুর রস প্রচুর পরিমাণে তাহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। কৃমি বিনষ্ট হইল।

তিনি তখন সম্রাট অশোককে নিবেদন করিলেন, "দেব, পলাণ্ডু ভক্ষণ করুন। সুস্থ হইবেন।" সম্রাট কহিলেন, "আমি ক্ষত্রিয়। কেমন করিয়া আমি পলাণ্ডু ভক্ষণ করি।" তিষ্যরক্ষিতা বলিলেন, "দেব, ইহা ঔষধ। প্রাণরক্ষার জন্য ইহা গ্রহণ করিতে হইবে।"

প্রভূত পরিমাণে পলাণ্ডুভক্ষণে কৃমি নির্গত হইল। সম্রাট সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। পরম পরিতুষ্ট সম্রাট তিষ্যরক্ষিতাকে বর দিতে চাহিলেন। তিষ্যরক্ষিতা করজোড়ে বলিলেন, "হে দেব, যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, আমাকে সপ্তাহকালের জন্য রাজ্য প্রদান করুন।"

অতঃপর রাজ-আদেশে সপ্তাহকালের জন্য তিষ্যরক্ষিতা সমস্ত সাম্রাজ্যের কর্ত্রী হইলেন। তিনি স্থির করিলেন সেই সপ্তাহের মধ্যেই কুণালের প্রতি তাঁহার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবেন। তৎক্ষণাৎ এইরূপ এক লিপি প্রস্তুত করা হইল :

প্রচণ্ড প্রতাপশালী সম্রাট অশোক,
এই তাঁর দণ্ডাদেশ হতেছে প্রচার :
"কুলের কলঙ্ক মম কুণাল কুমার,
অবিলম্বে উৎপাটন করো অক্ষি তার!"

সম্রাটের যে আদেশ অত্যন্ত জরুরী তাহা দন্ত-মুদ্রার দ্বারা মুদ্রিত হইত। তিষ্যরক্ষিতা তাঁহার এই আবেদনপত্র দন্তমুদ্রার দ্বারা মুদ্রিত করিবার জন্য নিদ্রিত সম্রাটের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। রাজা সহসা ভীতচকিত হইয়া উত্থিত হইলেন। তিষ্যরক্ষিতা প্রশ্ন করিলেন, "দেব! একি!" রাজা কহিলেন, "দেবি, এক অশুভ স্বপ্ন দর্শন করিলাম। যেন দুই গৃধ্র কুণালের অক্ষিদ্বয় উৎপাটন করিতে চাহিতেছে।" দেবী সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "কুমারের মঙ্গল হইবে।" এইভাবে পুনর্ব্বার সম্রাটের নিদ্রাভঙ্গ হইল। পুনর্ব্বার তিনি বলিলেন, "দেবি। অশুভ স্বপ্ন দেখিলাম। যেন দীর্ঘশ্মশ্রু, দীর্ঘকেশ, দীর্ঘনখধারী কুণাল পুরপ্রবেশ করিতেছে।" দেবী পুনরায় সান্ত্বনা দিলেন, "কুমারের মঙ্গল হইবে।"

অতঃপর সম্রাট নিদ্রিত হইলে তিষ্যরক্ষিতা সেই লিপি দন্তমুদ্রার দ্বারা মুদ্রিত করিয়া তক্ষশিলায় প্রেরণ করিলেন। রাজা তখন স্বপ্ন দেখিতেছেন যে, দন্তসমূহ তাঁহার বিশীর্ণ হইতেছে।"

রাত্রি প্রভাত হইলে সম্রাট জ্যোতিষীগণকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই স্বপ্নের ফল কি হইবে?" জ্যোতিষীগণ বলিলেন :

"শীর্ণ হয় দন্তরাজি, অথবা পতিত হয় স্বপনেতে যাঁর,
অবশ্যই চক্ষুনাশ, হবে বা জীবননাশ সন্তানের তাঁর।"

ইহা শ্রবণ করিয়া সম্রাট চকিতে সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে চতুর্দ্দিকে দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন :

"প্রসন্ন যে-দেবগণ ধর্মরাজ সুগতের প্রতি,
সর্বত্র আছেন যাঁরা মানবের দৃষ্টি-অন্তরালে।
বরিষ্ঠ যে-ঋষিগণ তপোনিষ্ঠ ধর্মনিষ্ঠ অতি,
তাঁহারা করুন রক্ষা ধর্মশীল কুমার কুণালে।"

তিষ্যরক্ষিতা-প্রেরিত সম্রাটের দন্তমুদ্রাঙ্কিত দণ্ডাদেশ যখন তক্ষশিলায় পৌঁছিল, তখন সেখানকার অধিবাসিগণ অতীব বিস্মিত হইলেন। কুমার কুণালের গুণমুগ্ধ পৌরজন প্রথমতঃ সেই অপ্রিয় আদেশ তাঁহাকে নিবেদন করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা কুমারকে উহা নিবেদন করাই স্থির করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "চণ্ড এবং দুঃশীল সম্রাট যখন নিজের পুত্রকেই ক্ষমা করেন না, তখন এই আদেশ অমান্য করিলে পরকে কি কখনও ক্ষমা করিবেন?"

তাঁহারা কুমারের হস্তে সম্রাটের সেই দণ্ডাদেশ-লিপি অর্পণ করিলেন। কুণাল তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন, "যাহা করণীয় তাহা আপনারা নিশ্চিন্তচিত্তে সমাপ্ত করুন।" তখন কুমারের নয়নদ্বয় উৎপাটন করিবার জন্য চণ্ডালগণকে আহ্বান করা হইল। তাহারা কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, "আমাদের শক্তি নাই ইঁহার নয়ন উৎপাটন করি :

"জগজন মনোলোভা
অনুপম শশিশোভা
কে হরিবে বল মোহ-বশে?
শশিসম যেবয়ান
তার শোভা এ নয়ান
কে নাশিবে কেমনে রভসে!"

তাহাদিগকে এইরূপ ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া কুমার কুণাল তাঁহার মুকুট দান করিয়া বলিলেন, "এই দক্ষিণা লইয়া আমার নয়ন উৎপাটন কর।" ভবিতব্য কে নিবারণ করিতে পারে? অষ্টাদশ দুর্লক্ষণযুক্ত এক পুরুষ জনতার মধ্য হইতে অগ্রসর হইয়া কহিল, "আমি ইঁহার চক্ষু উৎপাটন করিব।"

তাহাকে কুণালের নিকট আনয়ন করা হইল। ঠিক সেই সময়ে যশঃ নামক সঙ্ঘস্থবিরের বাণী কুমারের কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল :

"সতত শতেক দুঃখ দিতেছে এ নয়নযুগল।
সতর্কে পরীক্ষ দোঁহে। হে কুমার, স্বভাবচঞ্চল,
মিত্ররূপী শত্রু এরা! বোঝে না তা জনসাধারণ।
রূপেতে আসক্ত তারা করে কত পাপ-আচরণ!"

অতঃপর কুমার কুণাল সেই নিষ্ঠুর পুরুষকে বলিলেন, "প্রথমে একটি নয়ন উৎপাটন করিয়া আমার হস্তে অর্পণ কর।" সেই ব্যক্তি কুমারের নয়ন উৎপাটনে প্রবৃত্ত হইলে বহু সহস্র নরনারী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "হায় হায়! কি হইল!"

"কমল কে নিল তুলে, অবোধ কে মোহে ভুলে হরি নিল শশী!
বরষি মধুর হাসি, অতুল জোছনারাশি পড়িল কি খসি!"

অসংখ্য নরনারী যখন এইভাবে রোদন করিতেছে, তখন সেই নির্দ্দয় পুরুষ কুণালের একটি নয়ন উৎপাটন করিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। কুমার সেই নয়ন হস্তে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন :

"কোথা সেই দৃষ্টি-শক্তি তব, দর্শন করো না রূপরাজি?
পালিনু আপন ভাবি সদা, অচেতন মাংসপিণ্ড আজি!
মিত্ররূপী শত্রু তুমি হায়, বোঝে না তা জনসাধারণ।
রূপেতে আসক্ত সদা তারা, করে কত পাপ আচরণ!"
এমনি ভাবনা জাগে অন্তরেতে তাঁর
সবে যবে করে আর্তনাদ;
ভাঙিল মোহের ঘোর, লভিলা কুমার,
অমৃতের প্রথম আস্বাদ!

অতঃপর কুমার সেই নির্দ্দয় পুরুষকে আজ্ঞা দিলেন, "এইবার দ্বিতীয় নয়ন উৎপাটন কর।" তখনই দ্বিতীয় নয়ন উৎপাটন করিয়া সেই নিষ্ঠুর পুরুষ কুণালের হস্তে প্রদান করিল। কুণাল বলিয়া উঠিলেন :

"বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সুদুর্লভ যুগল নয়ন,
অপহৃত আজি মম। তথাপি বিষণ্ণ নহে মন!
চর্ম-চক্ষু হরি নিয়া কে করিল দিব্যচক্ষু দান,
বিশুদ্ধ ও অনিন্দিত; অপূর্ব আনন্দে ভরি প্রাণ!
রাজ্যেশ্বর পিতা মোর করিলেন মোরে নিরাশ্রয়,
ধর্মরাজ ক্রোড়ে তুলি পুত্র বলি দিলেন আশ্রয়।
পার্থিব ঐশ্বর্য যাহা সর্বদুঃখশোকের আকর,
হারায়ে তা লভিলাম যে-ঐশ্বর্য অজর অমর!"

কুমার যখন জানিতে পারিলেন, সম্রাট অশোক নহেন, তিষ্যরক্ষিতাই সম্রাটের নামে এই নিষ্ঠুর আদেশ দিয়াছেন, তখন কহিলেন :

"চিরসুখে থাক দেবি, হে তিষ্যরক্ষিতা!
হও তুমি আয়ুষ্মতী তেজোবলান্বিতা।
কৃতার্থ হলাম মাতঃ, তোমারি কৃপায়,
তোমারি এ কীর্তি দেবি, নমি তব পায়!"

কুমারের নয়নযুগল উৎপাটিত হইয়াছে—এই ভয়ঙ্কর সংবাদ শ্রবণ করিয়া কাঞ্চনমালা উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে ছুটিয়া আসিয়া কুমারের পদতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে অশ্রু-

কুণালকে দর্শন করিয়া হতভাগিনী করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন :

"কাজলবরণ মেঘের মতন যে-দুটি সরল আঁখি,
হরষি এ তনু প্রাণে দিত দোলা বরষি মধুর স্নেহ।
শ্বেতশতদল ছাড়িয়া ভ্রমর কোথা গেল দিয়ে ফাঁকি,
তারি সাথে হায় যায় মোর প্রাণ ছাড়ি এ বিধুর দেহ।"

কুণাল মধুর স্বরে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন :

"শুভাশুভ কর্মবশে চলে এই লোক।
দেখনি কি দুঃখময় জীবের জীবন?
লভিছে বিচ্ছেদ দুঃখ সদা সর্বজন।
প্রিয়া মোর, বৃথা তুমি করিতেছ শোক!"

অতঃপর রাজদণ্ডপ্রাপ্ত কুমার ভার্য্যাসহ তক্ষশিলা হইতে অপসারিত হইলেন। রাজকুমার, তাহাতে অন্ধ। কোনরূপ দাসত্বের কার্য্যে অভ্যস্ত নন। রাজকুমারীর অবস্থাও তাই। উভয়ে বীণা বাজাইয়া গান করিয়া ভিক্ষা করেন, সেই ভিক্ষাই তাঁহাদের উপজীবিকা। এই ভাবে বহুকাল ধরিয়া দেশ-দেশান্তরে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন তাঁহারা পাটলিপুত্রে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। দ্বারপাল ভিক্ষুক ভাবিয়া বাধা দিল। অনুপায় দম্পতী সম্রাটের যানশালায় রাত্রিযাপন করিলেন। ব্রাহ্মমুহূর্তে কুমার কুণাল বীণা বাজাইয়া গান ধরিলেন :

"নয়ন শ্রবণ আদি ইন্দ্রিয়সমূহ,
পবিত্র প্রজ্ঞার দীপে হেরি ভাগ্যবান;
ভেদ করি সংসারের জন্মমৃত্যু-ব্যূহ,
মুক্তি-সুখ লাভ করি তৃপ্ত করো প্রাণ।

সেই অপূর্ব্ব মধুর কণ্ঠস্বর সম্রাট অশোকের কর্ণগোচর হইল। তিনি উৎকণ্ঠিত চিত্তে কহিলেন :

"স্বপনে ভাসিয়া আসে দূর হতে দূর,
কার এই গীতধ্বনি অপূর্ব মধুর?
কুমার কুণাল মোর গাহিছে কি গান?
শিহরিছে অঙ্গ মোর কাঁপিতেছে প্রাণ!
গেছে সে নন্দন করি নিরানন্দ গেহ,
তাহারে খুঁজিতে প্রাণ ছাড়ে বুঝি দেহ!"

তিনি তৎক্ষণাৎ একজন ভৃত্যকে কহিলেন, "কুমার কুণাল আসিয়াছেন। শীঘ্র তাঁহাকে লইয়া আইস।" ভৃত্য যানশালায় প্রবেশ করিয়া কোথাও কুমারকে দেখিতে পাইল না। বাতাতপ-পীড়িত অনশনক্লিষ্ট, জীর্ণবসন, শীর্ণাকৃতি অন্ধকে রাজকুমার বলিয়া কে বিশ্বাস করিবে? সে ফিরিয়া আসিয়া সম্রাটকে নিবেদন করিল, "কুমার নহেন, অন্ধ এক ভিক্ষুক ভার্য্যাসহ যানশালায় আশ্রয় লইয়াছে। তাহারাই বীণাযোগে গান করিতেছে।" সম্রাট আকুল হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'তবে কি আমার স্বপ্ন সত্য হইল? সত্যই কি কুমার কুণালের নয়নযুগল বিনষ্ট হইল?' সম্রাট অশ্রুজড়িত স্বরে কহিলেন :

"হোক সে ভিক্ষুক! ত্বরা করি নিয়ে এসো তারে।
যাও দ্রুতগতি!
সুতের সঙ্কট-শঙ্কা ব্যাকুল করেছে মোরে,
চিত্ত ক্ষুব্ধ অতি!"

অবিলম্বে পত্নীসহ কুমার রাজসমীপে নীত হইলেন। দুর্দ্দশাগ্রস্ত অন্ধ কুণালকে পিতাও তাঁহার চিনিতে পারিলেন না। বিস্ময়ে উৎকণ্ঠিত চিত্তে সম্রাট প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কুণাল!" অন্ধ, শীর্ণ, জীর্ণাকৃতি, কৌপীন-পরিহিত কুমারের উত্তর শুনিয়া অশোক মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন :

"কমললোচনহীন কোমল আনন,
শীর্ণ ম্লান কুণালের হেরিলা যখন।
দহিলা জনক হিয়া নিদারুণ শোক,
মূর্ছিত ভূতলে পড়ে ভূপতি অশোক!

মূর্ছাভঙ্গে কুণালেরে করি আলিঙ্গন,
মুছিলা সযত্নে নৃপ পুত্রের আনন।
কণ্ঠ ধরি কুমারের রুদ্ধ কণ্ঠস্বর,
অজস্র বিলাপ করে নৃপ রাজ্যেশ্বর!

কুণাল-পক্ষীর ন্যায় অক্ষি অনিন্দিত
হেরিয়া কুণাল নামে করি অভিহিত।
সে-আঁখি না হেরি আজি ভাসি আঁখিলোরে
কেমনে কুণাল নামে ডাকি বৎস তোরে।"

শোকার্ত্ত সম্রাটের সুগম্ভীর কণ্ঠস্বর এবং অন্তঃপুরিকা-গণের করুণ বিলাপ সমস্ত রাজপুরী ধ্বনিত করিল :

"শতদল-সমশোভা
শতজন-মনোলোভা
কে হরিল সে-দুটি নয়ন!
আকাশের শশিতারা
হরি আহা নিল কারা
জ্যোতিহারা সে চারু বয়ন।"

সম্রাট যখন জানিতে পারিলেন তিষ্যরক্ষিতাই সম্রাটের নামে এই নৃশংস কর্ম্ম করিয়াছেন তখন তিনি শোকে, ক্ষোভে ক্রোধে, ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। কুণাল পিতাকে স্ত্রীহত্যারূপ দুষ্কর্ম্ম হইতে ক্ষান্ত করিবার জন্য সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন :

"ক্ষান্ত হও পিতা তুমি!
এ জগৎ কর্ম-ভূমি
শোননি কি হে রাজন মুনির বচন?
আপনার কর্ম দিয়া
সুখে দুঃখে ভরি হিয়া
আপন জগৎ মোরা করেছি রচন।
কারে হায় দিব দোষ,
কার প্রতি করি রোষ?
আপনারি ভ্রমে আজি ফেলি অশ্রুজল!
কবে কোন্ জন্মান্তরে
রোপিনু আপন করে
আজিকে ভুঞ্জিনু সেই বিষবৃক্ষ-ফল।"

শোকদগ্ধ ক্ষুব্ধ পিতৃহৃদয় ইহাতে সান্ত্বনা মানিল না। দুর্দ্দান্ত সম্রাট ক্রমেই অধিকতর উত্তেজিত হইতে লাগিলেন :

"এখনই নয়ন এর করি উৎপাটন !
সুতীক্ষ্ণ নখর-অস্ত্রে করিব ছেদন
দেহ এর ? বধিব কি তুলি শূলোপরি ?
ক্ষুর দিয়া জিহ্বা এর নেব ছিন্ন করি ?
বিষ দিয়া বধিব কি ? বল কি প্রকারে
করি হত্যা দুষ্টা এই তিষ্যরক্ষিতারে !"

কুণাল পিতাকে স্নেহভরে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন :

"হিংসাভরে করেছে যা জননী আমার,
নৃশংস সে-কর্ম্ম তাত ক'রো নাকো আর !
দুর্ভাগা জননী মোর ! ক'রো তারে ক্ষমা।
হিংসা নহে—স্নেহ, প্রেম, মৈত্রী অনুপমা,
অন্তরে বিতরে শান্তি—সুগতের বাণী।
ভরো প্রাণ অমৃতের প্রস্রবণ আনি।
প্রসন্ন অন্তর মোর নাহি দুঃখ তাপ।
নাহি হিংসা, নাহি ক্রোধ, নির্ম্মল নিষ্পাপ,
প্রশান্ত এ চিত্ত মোর ! হরিল যে আঁখি,
তার প্রতি বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ না রাখি।
বলিনু যা তাহা যদি হয় অবিতথ,
অক্ষিযুগ হোক মোর পূর্ব্বেকার মত।"
যেমনি উচ্চারে ইহা কুণাল কুমার
আচম্বিতে প্রস্ফুটিল পদ্ম-আঁখি তার !*

* সংস্কৃতে রচিত "অশোকাবদান" অন্তর্গত "কুণালাবদান" হইতে অনূদিত। এই অবদান কখন রচিত হইয়াছিল বা কাহার দ্বারা রচিত হইয়াছিল জানা যায় না। তবে ইহা যে খুব প্রাচীন ২৮১-৩০৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃত ইহার চীনা অনুবাদ তাহার সাক্ষ্য।

শঙ্করাচার্য্য-গিরিতে

শ্রীমহাদেব রায়

শঙ্করের গিরি-গাত্রে ঊর্দ্ধ ঋজু-পথে
শ্বাস-কষ্ট ক্ষীণ বক্ষে—তবু মনোরথে
দরিদ্রের শক্তিদাতা সারথি মহান্,
হীন-বল তাঁরই বলে মহাশক্তিমান্,
কৃপায় তাঁহারই পঙ্গু লজ্ঘে তুঙ্গ গিরি,
অনায়াসে আঁকা-বাঁকা পথে ঘুরি' ফিরি'
দক্ষিণে ও বামে করি দিব্য উপভোগ—
ডাল হ্রদ এক দিকে, অন্য দিকে যোগ
স্বচ্ছ ধরি বাঁকা তলোয়ার ঝিলমের—
নেত্রপাতে বিসর্পিল কান্তি হেরি এর।
গিরি-গাত্র হ'তে নিম্নে মহানগরীর
হেরি নাই কান্তি হেন স্নিগ্ধ সোনালির
চিনারের ফাঁকে ফাঁকে গৃহ গুহাবলী—
সুসজ্জিত চিত্রে যেন অর্পিত সকলি।
রক্ষী-ঘেরা পুরী যেন পপলার চিনারে,
শ্যামল শস্যের ক্ষেত হ্রদের আধারে
সম-চতুষ্কোণ—শ্যাম-সৌন্দর্য্য-নিলয়,
আঁখির জিজ্ঞাসা—কোথা এ বৈচিত্র্যময়
রূপসজ্জা—শ্যাম শয্যা করে ঝল্‌মল ?
বর্ণাঢ্য চিনার-পত্র আরক্ত উজ্জ্বল—
হোথা ডাল স্বচ্ছ-তোয়, হোথা গিরি' পরে
উত্তুঙ্গ সুরম্য দুর্গ আকাশে বিহরে।
হেরিয়া মন্দিরে লিঙ্গ-মূর্ত্তি দেবতার
ভরি' গেল বক্ষঃ, ভূমি-নত নমস্কার
করি' ভিক্ষা চাহি দেব। প্রসন্ন সহাস
অন্তরে জাগায়ে রেখো অটল বিশ্বাস,
দেব-দেব, হে শঙ্কর, অনাদি দেবতা,
শিখাইতে ভোগে ত্যাগ—যেন পবিত্রতা
ভস্ম-রাগ-রূপে তব রাখে মোরে ঘিরে,
বাহ্য পিপাসায় পুনঃ হেরি ঘুরে ফিরে'
দূরে হিম-শীর্ষ শৈলমালা স্বর্গ চুমি'
নিম্নে হেরি স্বপ্ন-রাজ্য বৈজয়ন্তী ভূমি।
সমক্ষে দেবতা—চারি দিকে তাঁরই রূপ
—শিবময়—অনন্ত সৌন্দর্য্যে অপরূপ।
শ্রীনগর-গাত্রে এ উত্তুঙ্গ গিরি মোর
সর্ব্ব হিয়া দিল ভরি'—করিল বিভোর।
আঁকা-বাঁকা তলোয়ারে বারংবার হেরি—
অতৃপ্ত আঁখির নেশা রহে মোরে ঘেরি'।

মেয়েদের রোজগার

শ্রীদীপ্তি পাল

মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের উপার্জ্জন জিনিষটা আমাদের দেশে নূতন নয়; কিন্তু গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে এর চেহারা যেন পাল্টে গেছে। যুদ্ধের আগে আমাদের দেশের অনেক মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরাই কাজ করতেন ঘরের বাইরে। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তখন সেই জাতীয় মেয়েরাই রোজগারের জন্য বাইরে বেরুতেন যাঁরা কারুর গলগ্রহ হতে চাইতেন না কিংবা যাঁদের ভরণ-পোষণ করার মত কোন আত্মীয়স্বজন থাকত না। যে সব মেয়েরা বিয়ে করতেন না কিংবা যাঁরা দুর্ভাগ্যক্রমে বিধবা হতেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই রোজগার করে স্বাবলম্বী হতেন। গত মহাযুদ্ধের সময় মধ্যবিত্ত-ঘরে আর্থিক অনটন যেমন বেড়েছিল, চাকরির হরিরলুঠও তেমনি হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি, বেকার শব্দটাই তখন যেন এই চির বেকারের দেশ থেকে ভোজ-বাজির মত উবে গিয়েছিল। পুরুষদের উপার্জ্জন যথেষ্ট নয় এবং চাকরির সুবিধা আছে বলে তখন বহু মেয়েই ঘরের বাইরে কাজ করতে আরম্ভ করেন।

মেয়েদের কাজের ব্যাপারে এই সময় আর একটি লক্ষণীয় পরিবর্ত্তন হ'ল—কাজের বৈচিত্র্য। আগে মেয়েরা প্রধানতঃ শিক্ষয়িত্রী বা সেবিকার কাজই গ্রহণ করতেন; যুদ্ধের সময় আপিস-আদালতে তাঁদের হ'ল অবারিতদ্বার। যুদ্ধ শেষের সঙ্গে সঙ্গেই এই রামরাজত্বের অবসান হ'ল; তবে রাবণের রাজত্বও যে আরম্ভ হ'ল তাও নয়। ততদিনে আপিস-আদালতে মেয়েরা বেশ চলতি হয়ে গেছেন; এ বাদেও তাঁরা কাজে ফাঁকি দিতেন কম এবং অর্থ-লোলুপতা, প্রভৃতি থেকে তাঁরা বরাবরই দূরে থাকতেন। আর সত্যি কথা বলতে কি, আপিসের কাঠখোট্টা আবহাওয়া কয়েকটি সহকর্ম্মিণীর উপস্থিতিতে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হয়ে উঠলে তাতে আপত্তি করতে দেখা যেত না বড় একটা কাউকেই। বরং অনেকের কর্ম্মোদ্যম এতে বেড়ে গেছে বলেই শুনেছি। অবশ্য ঐ মেয়েদের জন্যই যে সব ছেলের কাজ পেতেন না আমি তাঁদের কথা বলছি না।

এই ভাবেই আপিস, আদালত, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদিতে মেয়েরা কাজ করে আসছেন। কিন্তু সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে এইসব মেয়ের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। যুদ্ধোত্তর কালে মধ্যবিত্ত ঘরে আর্থিক অনটন বেড়েছে বৈ কমে নি; বেকার সমস্যাও ছেলেমেয়ে উভয়তঃ ভয়াবহরূপ ধারণ করছে। বর্ত্তমানে একটি রোজগেরে লোকের একার রোজগারে সুষ্ঠুভাবে সংসার চলা শতকরা নিরানব্বইটি মধ্যবিত্ত ঘরে সম্ভব নয়। এই অবস্থায় মেয়েরা যদি দলবলে বাহিরে রোজগার করতে যান তবে তাঁদের কাজ হয়তো জুটতে পারে, কিন্তু তাঁদেরই জন্য তাঁদের বাপ, দাদা, স্বামীর কাজ থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কা আছে। আর একটি কথাও মনে রাখা দরকার যে, অভাব শতকরা ৯৯টি ঘরে থাকলেও বাহিরে কাজ করার সুযোগ-সুবিধা এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা অনেকেরই নাই। সুতরাং সমস্যাটা দাঁড়াল এই যে, অভাবটা মেটাতে হবে এবং সম্ভব হলে ঘরে বসে অবসর সময়ে কাজ করে সেটা মেটাতে হবে। অর্থাৎ, কুটীরশিল্পকেই এখন মুশকিল আসান করতে হবে।

সমস্যার যে সমাধান আমি তুলে ধরলাম সেটা এত পুরনো, অতি ব্যবহারে এত জীর্ণ এবং এতই নগণ্য ফলপ্রসূ যে, এটা হ'ল দুধের অভাব মেটাবার জন্য রুগ্ন বুড়ো গরু কেনার পরামর্শের মত। যে গাই বাছুর হবার পরে কিছুদিন দুধ দেয় ঠিকই, কিন্তু তার পরিমাণ সামান্য এবং পরের দুধের পরিমাণ সামান্যতর—তখন তার গোবরই গৃহস্থের একমাত্র ভরসা। কুটীরশিল্প বলতে মেয়েদের উপযোগী যে সব কাজের কথা মনে হয় সেগুলি হ'ল—দরজির কাজ, এমব্রয়ডারি বোনা, চামড়ার ব্যাগ ইত্যাদি বানানো বা একটু তাঁত চালানো। আর এর সঙ্গে থাকে আচার, বড়ি, পাঁপর ইত্যাদি তৈরি করা একে ত এই কাজগুলি অধিকাংশ ঘরের মেয়েরাই জানেন বলে অবস্থাপন্ন কয়েকটি পরিবার ভিন্ন মেয়েদের জিনিষ বড় কেউ কিনতে চান না; দ্বিতীয়তঃ ঠিক পেশাদার ব্যবসায়ীর মত দর সস্তা হয় না বলেও বাজারে এই সব জিনিষের কাটতি হয় কম। সেই জন্যেই যত মেয়ে এই কাজগুলিকে উপার্জ্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাঁদের সকলকে সব সময় কাজ দেওয়া যায় না অথবা বিক্রয়ের (Marketing) অসুবিধার জন্য তৈরি জিনিষ-গুলি জমা হয়ে কর্ম্মীদের টাকা আটকে পড়ে থাকে।

এই সমস্যার সমাধান হিসাবে অনেকে দেখিয়ে দিয়েছেন —সুতোকাটা, বাগান করা, মৌমাছি-পালন, হাঁস-মুরগী-পালন ইত্যাদি। এই সব কাজের সুবিধা-অসুবিধাগুলি এক এক করে বিচার করে দেখা যেতে পারে। সুতোকাটা

অবসরের কাজ হিসাবে শহরে না হলেও গ্রামে অনেকদিন থেকেই চলতি ; কিন্তু কাটুনিরা এর থেকে নিয়মিত এবং যথেষ্ট রোজগার খুব কমই করতে পেরেছেন। মিলের সুতোর সঙ্গে হাতেকাটা সুতো পাল্লা দিয়ে পারবে না এ বলাই বাহুল্য ; বরং আমার মনে হয়, বড় বড় নদীতে বাঁধ দেবার ফলে জল-বিদ্যুৎ সুলভ হলে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা বাড়ীতে 'Powerloom' বা বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালানো তাঁত বসিয়ে বেশ কিছু রোজগার করতে পারবেন। তাড়াতাড়ি হবে বলেই তখন জিনিষের দাম হবে সস্তা অথচ এতে শিল্পী তাঁর নিজস্ব প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ফোটাতে পারবেন বলে Mass prodaction-এর একঘেয়েমি এতে থাকবে না—উৎপন্ন দ্রব্য হবে জনপ্রিয়। এমনকি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের মারফত এগুলি বিদেশে রপ্তানি করাও যেতে পারে।

বাগান করে কিছু উপার্জ্জন করা শহর-বাজারে একেবারেই সম্ভব নয় কেবলমাত্র স্থানাভাবে। গ্রামে অবশ্য যত্ন করলে প্রচুর শাকসব্জি উৎপন্ন হতে পারে—কিন্তু সেখানে সমস্যা বিক্রয়ের। মৌমাছি বা গুটিপোকার চাষ এখনও আমাদের দেশে বিশেষ চল হয় নি ; কিন্তু এসবও যে গ্রাম ভিন্ন শহরে প্রায় অসম্ভব তা বলাই বাহুল্য। হাঁসমুরগী পোষা গ্রামে বেশ চল আছে, আর প্রধানতঃ মেয়েরাই এইকাজ করে ; কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে এর দ্বারা তারা যথেষ্ট রোজগার করতে পারে না।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারসমূহের দৃষ্টি পড়েছে এই সব অসুবিধার দিকে এবং তাঁরা এর প্রতিবিধান করারও চেষ্টা করছেন। কেন্দ্রীয় সরকার কতকগুলি বোর্ড গঠন করে কুটীরশিল্পের বিভিন্ন দিক পর্য্যালোচনা করে দেখেছেন। এদের মধ্যে আছে অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম বোর্ড, অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌টস বোর্ড, অল ইণ্ডিয়া খাদি এণ্ড ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ বোর্ড। এ বাদে খাদির প্রসারের জন্য তাঁরা সরকারী প্রয়োজনে খাদি কিনতে রাজী হয়েছেন এবং তার জন্য শতকরা পনর ভাগ পর্য্যন্ত দাম বেশী দিতেও স্বীকার করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছেন। তাঁরা কুটীরশিল্পীদের আর্থিক সাহায্য করবার জন্য ষ্টেট ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়েছেন এবং উদ্বাস্তু মেয়েদের হাতে তৈরি বিভিন্ন জিনিষ বিক্রির সুবিধার জন্য রিফিউজী হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌ট সেল্‌স এম্পোরিয়াম স্থাপন করেছেন। সরকারী মহলের ধারণা যে, এই সব ব্যবস্থার কার্য্যকারিতা অচিরেই জানা যাবে ; কিন্তু জনসাধারণের তরফ থেকে বলব যে, "না আঁচালে বিশ্বাস নেই"।

উপরে যে-সব ব্যবস্থার কথা বলেছি সেগুলি সাধারণভাবে কুটীরশিল্পীদের জন্যেই করা হয়েছে। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের চেয়ে কুটীরশিল্পী-পরিবারই এর থেকে বেশী সুবিধা পাবেন। বিশেষ করে মেয়েদেরই জন্যে সম্প্রতি দিল্লীতে একটি ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশলাইয়ের কারখানায় অবসর সময়ে কাজ করার সুবিধা এখানে আছে। এই ব্যবস্থায় মেয়েদের কতটা উপকার হয় তা কিছুদিন অপেক্ষা করলেই দেখা যাবে।

কুটিরশিল্পের অসাধারণ উন্নতি হয়েছে জাপানে। এদেশে কুটীরশিল্পের ব্যবস্থাপনা অতি চমৎকার। এখানে যে কেবল নানা জাতীয় জিনিস প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয় তা নয়—উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়-ব্যবস্থাও সুপরিচালিত। এমন অনেক জিনিস এখানে তৈরি হয় যার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন শিল্পী তৈরি করেন। শিল্পীরা নিজের নিজের বাড়ীতে বসে কাজ করেন—একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান এক শিল্পীর কাছ থেকে জিনিস নিয়ে পরবর্ত্তী শিল্পীকে দেন এবং তৈরি মালের বিক্রয়-ব্যবস্থা করেন। এইভাবে বাড়ীতে বসেই শিল্পীরা যথেষ্ট উপার্জ্জন করতে পারেন। কাঁচামাল সংগ্রহ বা তৈরি মাল বিক্রয়ের ভাবনা তাঁদের ভাবতে হয় না। জাপানের কুটীরশিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল সুতি, গরম ও রেশমী কাপড়, বাঁশের ও কাগজের নানারকম জিনিস, সেফ্‌টিপিন, আলপিন, ছুঁচ ইত্যাদি।

মধ্যবিত্ত-ঘরের মেয়েদের জীবন-সংগ্রামে সাহায্য করতে হলে জাপানী প্রথার অনুকরণ করা ভাল। প্রধানতঃ যে জিনিসগুলি আমরা বিদেশ থেকে আমদানী করি আর যে-সব জিনিস তৈরির কাঁচামাল আমাদের দেশে সহজে পাওয়া যায়—এই দুই জাতীয় জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদের কুটীরশিল্পের পরিকল্পনা করতে হবে। এই সঙ্গে দেখতে হবে উৎপন্ন দ্রব্যের যথেষ্ট চাহিদা দেশে আছে কিনা, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও শিল্পীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাবে কিনা এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের কি ব্যবস্থা হবে। সহৃদয়তা ও সুবিবেচনা নিয়ে কাজে নামলে সরকারী মহল যে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করে তাদের আর্থিক দুর্দ্দশা বহুলাংশে মোচন করতে পারবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

জাহ্নবী যমুনার উৎস সন্ধানে

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

ডিণ্ডিলগাঁওর যে উৎরাই, তার সীমা গাংনানী পর্য্যন্ত। একটানা উৎরাই—এবার শুধু নেমে যাওয়ার পালা। পাহাড়ের উপর উঠে মনে হয় বিরাট একটা মালভূমি আস্তে আস্তে নেমে চলে গেছে যমুনার ধার পর্য্যন্ত। যমুনা এখান থেকে সম্পূর্ণ প্রকাশমানা নয়, তাঁর সাক্ষাৎ মিলবে গাংনানী পৌঁছনোর পর। ডিণ্ডিলগাঁও থেকে গাংনানী সাড়ে তিন মাইল। আশ্রয়ের ব্যবস্থা সেখানে, খাদ্যবস্তুর সন্ধানও সেখানে, এ বিদ্‌ঘুটে পাহাড়টার উপর কেবল ঐ অপাংক্তেয় চায়ের দোকান আর তারই সংলগ্ন একটা গোয়ালঘর, যেখানে একটু বসা চলে মাত্র। নামা সুরু হ'ল।

যমুনোত্তরী পথের বৈশিষ্ট্য শুধু তার দুর্গমতাই নয়, আর একটি সম্পদও সে যাত্রীদের জন্যে নিজস্ব ভাণ্ডারে জমা করে রেখেছে, সেটি জলকষ্ট। মাইলের পর মাইল পেরিয়ে যাচ্ছে, বুকের ভেতরটা মনে হচ্ছে শুকিয়ে উঠেছে—অথচ ধারে কাছে কোথাও জল নেই। পথ থেকে নেমে অনেকটা অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টায় ঝর্ণা থেকে জল হয় ত আসে, কিন্তু লাভের কড়ি তাতে যায় ফুরিয়ে। মধ্যে মধ্যে পথে-প্রান্তরে দুধ মেলে—তৃষ্ণার তাই হ'ল কাণ্ডারী। গাংনানীর আগেও তাই—পরেও তাই। ওখানে পৌঁছনোর পর যদি-বা যমুনার সাক্ষাৎ মেলে—কিন্তু তাও স্থানবিশেষে অসূর্য্যম্পশ্যা, বহু দূর দিয়ে তিনি প্রবাহিণী, শব্দ শুনে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। গঙ্গোত্তরীর পথে এটা নেই—মা গঙ্গাকে দরকার মত আহ্বান জানালেই তিনি ধরা দেন। যমুনা রহস্যময়ী, স্তবস্তুতির মধ্যে দিয়েই তাঁর আসা।

বেশ নেমে যাচ্ছি, এ পাথর ডিঙিয়ে, ও পাথর মাড়িয়ে। হাতে লাঠি, দুর্গতদের সহায়। আকাশে মেঘ জমে উঠেছে, জল আসার আগেই গাংনানী পৌঁছলে হয়। সূর্য্যদেব ঠিক মাথার ওপর আসেন নি, বুঝলাম বারটার আগেই ডিণ্ডিলগাঁও পেরিয়ে গেলাম। পশ্চিম দিগন্তের ওদিকটায় একসার পাখী পাহাড়ের উপর নেমে পড়ল, ওরাও ক্লান্ত। মালভূমির উৎরাইয়ের পরই প্রাগৈতিহাসিক পাহাড়গুলো বোবার মত দাঁড়িয়ে—তারও ওদিকটায় যমুনোত্তরী, আমাদের যাত্রার যেখানে শেষের ইঙ্গিত। নামতে নামতে দেড় মাইলের মাথায় শিমলী পার হলাম। শিমলী ত শিমলী, শুধু নামটি আছে, আর পাণ্ডার বিলনো হ্যাণ্ডবিলে ওর পরিচয় আছে, আর কিছু নেই। টিম টিম করছে দু'একটি দোকান, দু'একখানি ঘর। এখানে নামার মুখে পায়ের ক্লান্তির মধ্যে একটু ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশ আছে। একটু বসে যাওয়া যায়।

গাংনানী পৌঁছলাম একটা নাগাদ। আজকেও, দশ মাইল হাঁটা হ'ল—একটা চড়াই পেরোন হ'ল, এসে গেলাম গাংনানী, যমুনোত্তরীর পথে যে স্থান সমৃদ্ধির দাবী করতে পারে। যমুনাকে ওখান থেকে পাওয়া যাবে, এখন এরই ধারে ধারে আমাদের পথ চলা। তৃষ্ণায় কাতর—অনাহারে ক্লিষ্ট—তার ওপর ধর্ম্মশালার ব্যাপার আছে—যমুনা পরে দেখব, দেখা ত নয়—দর্শন। ধর্ম্মশালায় এলাম—উপরের দোতলার ঘরে স্থানও পেলাম। এবারকার তীর্থ-পর্য্যটনে এই ঘর পাওয়াটাও নানা দিক থেকে যোগাযোগের পর্য্যায়ে। এখানে যাত্রীর অভাব ছিল না—ভারতভূমির নানা জায়গার নানা মানুষ, সিন্ধী, গুজরাটী, দক্ষিণী···যমুনোত্তরীর যাত্রী আবার গঙ্গোত্তরীর ফেরত যাত্রী, গাংনানীতে তাদের থাকতে হবেই। ভয় ছিল হয়ত বারান্দার একটা ভগ্নাংশ কপালে আছে—কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গেই আস্তানা জুটে গেল, পেয়ে গেলাম চারটে দেয়ালের একটা দুষ্প্রাপ্য সংস্থান, অথচ আমি একাই এসেছি, দোকলা বলে আমার পরিচয় ছিল না। শুধু এখানে নয়—গোটা তীর্থপথেই, কেন জানি না, আশ্রয় আমার জুটে গেছে—আশ্রয় আমি পেয়েছি। সুদূর বাংলাদেশের ঘর গেছে অদৃশ্য হয়ে কিন্তু এখানকার ঘর আমার সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে গঙ্গোত্তরীর মন্দির পর্য্যন্ত। বহু যাত্রীর অভিযোগ পেশ হয়েছে চৌকীদার সমীপে, লাগান-ভাঙানোর কথাটা শুনেছি আমার এই ঘর পাওয়াকে কেন্দ্র করে—তবু আস্ত একখানা ঘর শেষ পর্য্যন্ত মিলে গেছে। কেদারবদরীর পথে দুর্ভোগের অন্ত ছিল না—এখানে সে দুর্ভোগের একটা কণাও খুঁজে পাই নি। কেন কে জানে? বোধ হয় মায়েরই খেলা।

কিছুক্ষণ পর এসে গেল ধরম সিং আর তার পিছু পিছু বীর-

বনের সংসার। ঘর ত আমি পাবই, এ ত তাদের জানা··· সোজা চলে এল আমার ঘরে চারটি প্রাণী। বিছানা পড়ে এলাকা তৈরী হয়ে গেল তাদের···আমিও খুশী, তারাও খুশী।

আগে স্নান তার পর খাওয়া। ক্ষিধে যত না পাক—যমুনার গর্ভে নামার দরকার ছিল বেশী। বেলা একটা তখন, ধরম সিং রান্নাবান্নার কাজে নেমে গেল, আমি চলে গেলাম যমুনার তীরে।

যমুনা, যমুনা—যমুনা এসে গেল, আমি তার তীরে দাঁড়িয়ে। ডিণ্ডিলগাঁও চড়াইয়ের উপর থেকে যমুনাকে প্রথম দেখি, পাহাড়ের গা বেয়ে সরু ফিতের আকারে নেমে আসছে। এই প্রথম দর্শনকে বিশ্লেষণের গণ্ডীতে আনা বৃথা, ব্যক্তিগত অনুভূতিরই তার একমাত্র সম্পদ। ধর্মশালার কিছুদূরেই যমুনা, বেশ একটু নেমে আসতে হয়। উপলখণ্ড সমাকীর্ণ তীরভূমি, একটি পাবে নানাবিধ গাছের সমারোহ, তাতে পাখীর কাকলী আছে, কূজন আছে। প্রশান্তির ছায়া নেমে আছে যেন। স্রোতধারায় বেগ আছে, অবগাহনের চেষ্টা দুরাশা। এক খণ্ড বড় পাথরের উপর বসে স্নান সেরে নিলাম। কতকটা দূরে যমুনার উপর ব্রীজ দেওয়ার চেষ্টা চলছে, স্থানীয় ইঞ্জিনীয়ারিং বুদ্ধিই এর মূলধন। লোহালক্কড় নেই, স্তূপীকৃত সিমেন্টের বস্তা নেই, যন্ত্রের ঝনঝনা নেই···পাইন কাঠ আর বৃহদাকার প্রস্তরখণ্ডের যুক্ত সম্মেলনের উপর সেতুর আকৃতিকে গড়া হয়েছে। দুটো দিকের প্রসারিত বন্ধনীর উপর একটিমাত্র কাঠের 'লগ' ফেলা যা বাকী, এটি সুসম্পন্ন হলেই মানুষের যাতায়াত চলবে, গরু ভেড়াও বাদ যাবে না। যান্ত্রিক সভ্যতাকে এখানে মূল্য দেওয়া হয় নি, মূল্য দেওয়া হয়েছে প্রকৃতিকে আর মানুষের সহজাত বুদ্ধিকে। যমুনার ধারে ধারেই একটি সর্পিল পথ চলে গেছে গাংনানীর অপর পারের রাজতার গ্রামের দিকে, সমৃদ্ধির দিকে—গ্রামের অবদান প্রামাণিক। কাঠ আর পাথর দিয়ে গড়া এই সেতুর কিছু দূরেই বৃহদাকার শাল বৃক্ষ চেরাই করান হচ্ছে, শোনা গেল জুলাই মাসের শেষে যমুনাতে বর্ষার জল নেমে এলে দু'তিন লক্ষ টাকার এই সব সম্পত্তি ভাসতে ভাসতে চলে যাবে উত্তর ভারতের দিকে। কাঠ চেরাই আর যমুনার ধারার শব্দ, দুটো মিশিয়ে সুরের একটা বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে এখানে।

ভাবলাম, এ শব্দ থেমে যাক···লোকজন অদৃশ্য হয়ে যাক—যমুনার আওয়াজই যখন সত্যি হয়ে দাঁড়াবে, তখন আবার আসা যাবে। এখন আমি চলে যাই। প্রবাহিনীর স্বরূপ জানা যাবে না এখন, এর মর্মকথাও নয়।

সন্ধ্যার একটু আগে সকলের অলক্ষ্যে আবার এখানে এসে দাঁড়ালাম। নিঃশব্দ পরিবেশ, প্রকৃতির চোখে এবার সুপ্তির জড়িমা এসে লেগেছে। পাখীর কাকলী গেছে থেমে, রাজতার গ্রামের সরু রাস্তাটাও আর দেখা যায় না—যমুনার গর্জনই এখন শাশ্বত, অন্য কোন শব্দের অণুকণাও বেঁচে নেই।

শীতবস্ত্র ঢাকা আমি—চুপ করে জপ করতে করতে পাথরের একটা কোণে এমন করে বসি যাতে যমুনার ধারাকে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়।

চিন্তার গভীরতা সেইখানে, যেখানে বুঝি প্রকৃতিও গভীর। চোখ দিয়ে দেখার ভেতর যদি অনুভূতির দ্বারোদ্ঘাটন হয়, তা হলে মনের গহনে ও গভীরে অচেনা চেনা হয়—অদৃশ্য রূপ তখন রূপময়ী হতে থাকে। সন্ধ্যার অবগুণ্ঠনে ঢাকা লজ্জানতা, বেপথুমতী যমুনার কাছে বসে বসে আমার আসল মন্দিরে অকস্মাৎ কাঁসর-ঘণ্টা বেজে ওঠে—অজানিতে ও অলক্ষ্যে। যা ভাবি নি, তাই এল জল জল হয়ে, চিন্ময়ী হয়ে।

চোখের সামনে যমুনা—ফিকে সবুজ রঙের গর্বে গরীয়সী। চোখ বুজি, পরিব্রাজক জীবনের দেখা সব নদনদী যায় মিলিয়ে, মাতৃরূপিণী হয়ে ভেসে উঠে চারটি ধারা, যে ধারাকে মানুষ নিয়েছে, জীবনের প্রবাহিণী হিসেবে, সাধকেরা দেখে গেছে তপস্যার ক্ষেত্র রূপে। কেদারনাথকে কেন্দ্র করে, তারই পাশে পাশে প্রবহমাণা ঘনশ্যামা মন্দাকিনী এসে মিশেছেন রুদ্রপ্রয়াগে ধূসর অলকানন্দায়। ঘন নীল রং গেছে বিসর্জন হয়ে সর্বশক্তিরূপী পরমপুরুষের ভিতর··· মা সেখানে নিঃস্বা, সর্বস্বত্যাগিনী, তাই অলকানন্দার ধূসর জটাজালই চোখে পড়ে, অন্য কিছু নয়। এত যে ঘন নীল রং, রুদ্রপ্রয়াগের আবর্তে তার কণামাত্র পড়ে নেই, তার সব শেষ সেখানে। মার সেখানে নিঃশেষে মিশে যাওয়া, ব্যোমভোলা ত্রিনেত্রই সব আকর্ষণ করে নিয়েছেন, পুরুষ নিয়েছেন প্রকৃতিকে। আবার দেবপ্রয়াগেই ওই মা-ই চিন্ময়ী, আদ্যাশক্তি—পুরুষ সেখানে শব ও নির্বীর্য। সেখানে ধূসর রং গেছে মুছে, তপস্বিনী ভাগীরথীর গৈরিক রংটাই সেখানে প্রামাণিক। পুরুষ সেখানে শক্তিহীন ও জড়পরমাপ্রকৃতি সেখানে সৃষ্টিরূপিণী, সর্বশক্তির আধারভূতা।

যমুনার ধারে বসে বসে মনে হয় ভবতারিণী মায়ের পাশে বসে আছি—সেই স্নেহ, সেই মায়া, সেই চিরন্তন আশ্বাস ও আশ্রয়। এই ফিকে সবুজ রঙের বেনারসী শাড়ীপরা প্রবাহিণী যমুনা, এ মায়েরই আর একরূপ, আর এক উপলব্ধির অধ্যায়। মায়ের দুটো বাহুর ভেতর যে সব পাওয়ার উষ্ণতা, এখানে বসে বসে তারই স্পর্শ পাই অণুপরমাণু হিসেবে; মনে হয় জীবন ধন্য হ'ল, পবিত্র হ'ল। পুরুষ ও প্রকৃতির লীন হয়ে যাওয়ার ভেতর আধ্যাত্মিক মার্গের সমস্ত কিছু জানার সীমাও শেষ হয়ে গেল—গাড়োয়াল রাজ্যের মধ্যহিমালয়ের এই ধারা ক'টির ভিতর সে সীমার সার্থকতা ত আছেই—আবার মাতৃস্বরূপার একক রূপটিও এই প্রবাহিণীর ভিতর অলক্ষ্যে যে মিশে আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মাতৃরূপ একটি নয়—সৃষ্টির জন্যে মাতৃরূপের বিকাশ বহুধা ও ব্যাপক। তাঁর সন্তান তাঁকে যে যে ভাবে চেয়েছে, পেয়েছেও সেই সেই ভাবে। এখানে যমুনাকে আমার মা বলেই ডাকা; দেখাও সেইভাবে। যে দয়া তুলনাহীন, যে মায়া বিশেষণহীন; যে স্নেহ পরিমাণহীন—যমুনাকে দেখা আমার ঠিক এইভাবে। গঙ্গোত্রীর পথে বা বদরীকার পথে প্রবাহিনীর একক মূর্তিকে দেখেছি
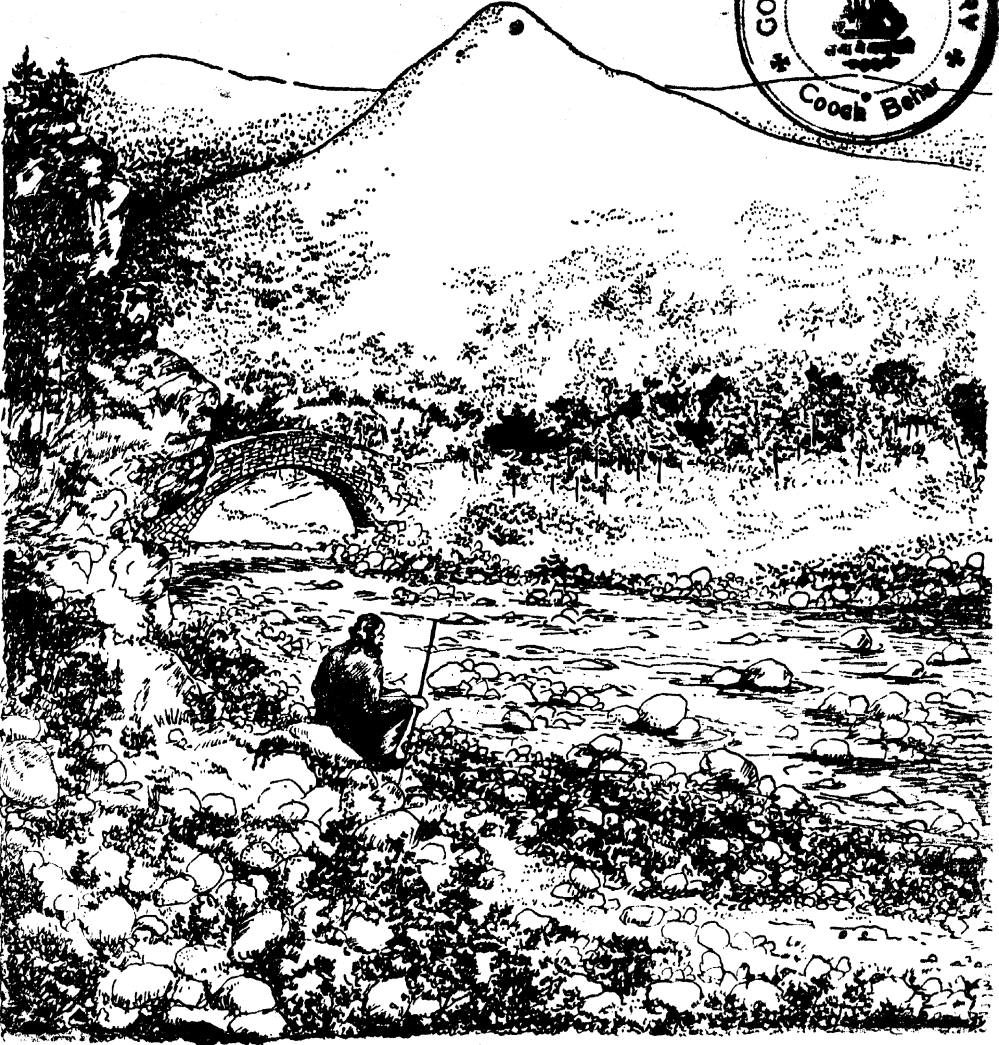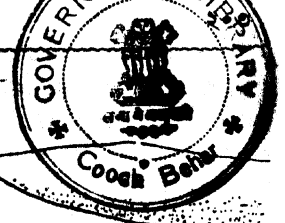
গাংনানীর যমুনা

তপস্বিনীরূপে, বৈরাগিণীরূপে। এ দুটি পথের ধারে ধারে মা ভাগীরথী সন্ন্যাসিনীর উত্তরীয় তুলে ধরেছেন সন্তানদের জন্যে, সাধকদের জন্যে, তাপসদের জন্যে—তাই তাঁর গায়ের রঙে গেরুয়ার ছোপ। কেদারনাথের পথে মন্দাকিনীর যে রূপ, সে রূপ মার চণ্ডালিকা রূপ, ভীমা ও ভয়ঙ্করীর রূপ। সে ধারাকে স্থানবিশেষে মানুষ নিয়েছে প্রলয়রূপিণী হিসেবে, খড়্গধারিণী হিসেবে, তাই ত মায়ের রং সে ধারায় ঘননীল। বদরীকার পথে দেবপ্রয়াগের পর অলকানন্দা যেন রাজরাজেশ্বরী, সর্ব্বঐশ্বর্য্যময়ী, নানালঙ্কারবিভূষিতা। সার্থক রূপের সার্থক পরিচয় সেখানে—নারায়ণের বদরীকার সঙ্গে তার ঐতিহ্যময় সামঞ্জস্য আছে। সুমহান্ সুপ্রাচীন চারিটি তীর্থ—যমুনোত্তরী, গঙ্গোত্তরী, কেদারনাথ ও বদরীকানাথ···যুগযুগান্তের ইতিহাস যেখান জড়ান ও মেশান—তাদেরই পাশে পাশে চির-প্রবহমাণা যমুনা, গঙ্গা, মন্দাকিনী ও অলকানন্দা—আধ্যাত্মিক যুগের সার্থক এ সমন্বয়, সার্থক এ সৃষ্টি।

গাংনানীর এই যমুনা, স্নেহাতুর মায়ের অঞ্চলই এ, আর এই অঞ্চল ধরে ধরে আমার বা আমাদের মত অর্ব্বাচীন সন্তানের উঠে

[illegible] তীর্থের স্থানে। সাফল্য একটিমাত্র প্রশ্নের উপর, সেটা হ'ল [illegible] ও [illegible] ভক্তির রক্তজবা দিয়ে এই ফিকে সবুজ শাড়ীপরা [illegible] মায়ের ছোট্ট দুটি পা আমি পূজো করতে পেরেছি কিনা বা পারব কিনা। সবকিছুর ভারসাম্য ঐ দুটি জিনিষের উপর—অন্যথায় জীবনে হাহাকার উঠবে, গোলাপের বাগান যাবে শুকিয়ে। মূর্তিময়ী মা এখানে চেয়েছেন জীবনের সব তিতীক্ষার ষোল আনা, এ পথ সেই পথ যে পথে এই ষোল আনারই পূজো চাই, কড়াক্রান্তি তার থেকে ভাঙলে চলবে না। যমুনোত্তরীর আসল পথ এই গাংনানীর পর থেকে, পথের প্রান্তে যা ফেলে এলাম তা জোড়া লাগবে তারই উপর যাকে জীবনভোর বলে এসেছি—'নমঃ।' এ তীর্থ হ'ল মহত্তম, সাধকদের বুকের রক্ত দেওয়া, সিদ্ধযোগীদের আশীর্ব্বাদে যে মহান্ তীর্থভূমির আকাশ-বাতাস মথিত হয়ে আছে। তাঁরা অলক্ষ্যে টেনেছেন তাই সুকৃতিকে মনে হয়েছে জীবনের আশীর্ব্বাদ, আত্মার পরম সদগতি।

রাত্রির প্রথম যাম—আকাশে চাঁদ উঠেছে, গোলাকার ঝক্‌ঝকে চাঁদ। তরল রূপোর মত চারিদিকে পাহাড়গুলোতে এই চাঁদেরই চাঁদোয়া পরিয়েছে কে! সারা আকাশটা ঘিরে কোটি কোটি নক্ষত্রের মায়াজাল আর নীহারিকার অনন্ত জিজ্ঞাসা—মায়েরই আর এক সার্থক সৃষ্টি! যমুনার জলে চাঁদের আলো পড়েছে, মনে হচ্ছে সমগ্র স্রোতধারায় অভ্রের কুচি মেশান, ফিকে সবুজ শাড়ীর উপর এক অদৃশ্য শিল্পী চুমকি বসিয়েছে যেন।

জপের সঙ্গে মিশে গেছে ধ্যান, ধ্যানের বেদীতে বিশ্বচরাচর-সৃষ্টিকারিণী মাতৃরূপা সমাসীনা···ডুবে গিয়েছিলাম গহনে গভীরে—চমকে উঠলাম, মনে হ'ল রাত ন'টা বেজে গেছে। উঠে পড়লাম পাষাণখণ্ড থেকে, ফেরা যাক এইবার!

ধর্ম্মশালায় ফিরে এসে দেখি আমার নামে নিরুদ্দেশের পরোয়ানা জারী হয়েছে, আমি যে গাংনানীতে নেই এবং আমাকে ধরে টেনে নিয়ে গেছে কোন অশরীরী মানুষ সে বিষয়ে কারুর সন্দেহ নেই। ধরম সিংকে দেখি ধর্ম্মশালায় তলাকার বারান্দায় কয়েক-জন যাত্রীকে নিয়ে গবেষণা সুরু করেছে, সে গবেষণাকে দস্তুরমত প্রথম শ্রেণীর বলা যায়। আমাকে দেখা আর ভুত দেখা কতকটা একই পংক্তিতে, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, "আপ কিধার গিয়া।" কিছু না বলে উপরে উঠে গেলাম আমি। দেখলাম ঘরেও সেই অবস্থা। বীরবল, তার মা, রুক্মিণী অপেক্ষায় বসে আছে আমার জন্তে, অন্নজল ত্যাগ করে রাত্রির প্রহর গুনছে। কৈফিয়ত দিতে কেটে গেল আধ ঘণ্টা এবং এ রকম আর হবে না এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে তবে তারা সন্তুষ্ট হ'ল। নিস্কৃতি পেলাম আমি, ঝঞ্ঝাট মিটে গেল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া চুকে গেল—যাত্রীনিবাস হয়ে এল নিস্তব্ধ, বীরবল এক কাহিনী সুরু করল—যা শুধু আমার মত অর্ব্বাচীন মানুষের জন্তেই নাকি তোলা ছিল। কাহিনীটি অদ্ভুত, সাধারণ বস্তুতান্ত্রিক মানুষের বিশ্বাসের মাপকাঠির ভিতর নাও আসতে পারে—তবে এটি সত্যি, সাময়িক উচ্ছ্বাসের ভিতর ভাব-প্রেরণাকে শিখণ্ডী করে কোন মিথ্যে জিনিষ চালিয়ে দেওয়া নয়। আমি এটি পুরোপুরি বিশ্বাস করেছি আর মেনেও নিয়েছি। সুকৃতি নিয়ে যারা আসে, কল্যাণ নিয়ে যারা আসে তারা সবই পায়, অঞ্জলি তাদের ভরে উঠে। বীরবলপ্রদত্ত কাহিনীটি শুয়ে শুয়ে যা শুনলাম তা এই পর্য্যায়ে।

কাহিনীটি বীরবলের মায়ের। কানায় কানায় তাঁর সবকিছু পূর্ণ হয়ে উঠেছে—তাই তাঁর পাওয়া। ডিণ্ডিলগাঁওয়ের চড়াই পেরিয়ে আসার সময়ে এ ঘটনাটি ঘটে। বৃদ্ধা সকলের আগেই আসছিলেন, বীরবল ও রুক্মিণী ছিল পিছিয়ে। আপন মনেই আসছিলেন তাঁর গুরুজীর নাম স্মরণ করতে করতে, হঠাৎ সামনের দিকে পথের পাশে এক পাইনগাছের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে গেল—যে পড়ে যাওয়াটা গোটা জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। তিনি দেখলেন, গাছটির উপরকার শাখা-প্রশাখার ভিতর একটি বৃদ্ধ-মূর্ত্তি—শ্বেতকায় ও শ্মশ্রুমণ্ডিত। গাছের একটি ডালের উপর তিনি বসেছিলেন, ক্ষীণকায় শরীর, বীরবলের মায়ের দিকেই তিনি তাকিয়ে ছিলেন এক দৃষ্টে। অবিস্মরণীয় ঘটনা, অলৌকিক ঘটনা। মায়ের চলার গতি গেল রুদ্ধ হয়ে, তিনি শুধু দৃষ্টিটুকু খোলা রাখলেন সেই অদ্ভুত মূর্ত্তিটির দিকে। ইতিমধ্যে বীরবলরা এসে যায়। আঙুল বাড়িয়ে বীরবলকে তিনি দেখাতে যাওয়ামাত্র মূর্ত্তি গেল অদৃশ্য হয়ে—দীর্ঘ মহীরুহের কাণ্ড আর ডালপালাই রইল দৃশ্যমান হয়ে।

বীরবলের ধারণা তার মাতাজীর তীর্থে আসা সার্থক হয়ে গেল, পাত্র গেল পূর্ণ হয়ে। তার নিজের আক্ষেপ যে তার পাপের বোঝা এখনও টানতে হবে, ভুল-ক্রটি তার জীবনে এখনও আছে, সেইজন্তে সেই অদ্ভুত মূর্ত্তিটির দেখা পেল না। যাত্রীনিবাসের ছোট্ট ঘরটুকু তার মর্ম্মান্তিক আক্ষেপে ভারী হয়ে উঠল যেন। তার একমাত্র কথা—"মাতাজীকো দর্শন মিলা, হামকো নহি।"

বুঝলাম, যা শুনে এসেছি তা বাস্তবে এল। যমুনোত্তরীর রহস্যময় অঞ্চলে সিদ্ধযোগীরা দেখা দেন সেই মানুষদের যাদের মন্দিরে ধূপধুনার গন্ধের অভাব নেই—বীরবলের মা সেই মন্দিরেরই একজন যোগ্যা পূজারিণী, তাই দর্শন পেয়েছেন, আশীর্ব্বাদ পেয়েছেন যা সকলের ভাগ্যে জোটে না। এই দর্শন পাওয়ার সার্থকতার রূপ আমরা দেখেছিলাম ওই বৃদ্ধার ভিতর। এই ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর তাঁর জীবনে কোথা থেকে যে অকাল তারুণ্য নেমে এল বুঝলাম না। গাংনানীর পরই তাঁর পায়ের গতি যায় বেড়ে, তিনি বৃদ্ধত্বের গণ্ডী ছাড়িয়ে নেমে এসেছিলেন অদ্ভুত এক পংক্তিতে যেখানে মানুষের আসাটা সচরাচর ঘটে না। যমুনোত্তরীর দুরারোহ দুর্গম পথকে তিনি গ্রাহ্য করেন নি—সকলের আগেই তিনি পথ পেরিয়েছেন, পথ হেঁটেছেন, কোথা থেকে যে শক্তি এসেছিল কে জানে! যে পথ কান্নার পথ, গোটা জীবনের অধ্যবসায়ের পথ সেই পথে এই বৃদ্ধাকে দেখেছি হাসতে হাসতে চলেছেন বিজয়িনীর মত—অথচ

যা অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য। এটি ঘটেছিল ঐ মূর্তিটির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটবার পরই।

ভোরবেলা গাংনানী ছাড়ালাম—আজকের পাড়ি বিষম পাড়ি, একটানা ষোল মাইল। সামনে চড়াই আছে, বন্ধুর পথ আছে, জলকষ্টও আছে প্রচুর। গাংনানী থেকে খারারী তিন মাইল। যমুনাকে বাঁ দিকে রেখে পথ চলে গেছে পাইনগাছের ভিতর দিয়ে। এ পথটুকুকে অপবাদ দেওয়া যায় না, বরং তাকে সুখ্যাতি করা যায়। সমতল রাস্তা—পাহাড়গুলো মারমুখী নয় এই যা। যমুনা কখন কাছে, কখন দূরে দূরে—ওদিকটায় গাছের সমারোহ নেই, সমারোহ যত পথের ডান দিকে—সারা পথের উপর শুকনো পাতার আস্তরণ। মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট কুটীরের সন্ধান পাওয়া যায়। এখানকার স্ত্রী-পুরুষ যা দেখছি—শ্রদ্ধা আসছে তাদের দেখে। বীর্য্যবান, স্বাস্থ্যবান, রূপবান। পাহাড়ের হাওয়া আর স্বর্গরাজ্যের প্রভাব তারা ষোল আনাই পেয়েছে—কি সহজ, কি সরল, কি অমায়িক। আসার পথে দেখা গেল এমনি একটি অনামী কুটীরে চালকোটার পর্ব্বে মেতে আছে একটি মেয়ে—আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসল, আমরাও হাসলাম, যে হাসিটুকু এ অঞ্চলেই মেলে, অন্য কোথাও নেই। ধরম সিং বললে, 'ওর কাছ থেকে কিছু চাল কিনে নেওয়া দরকার।' বুঝিয়ে দি, চটিতে চটিতে আশ্রয় মেলে ওই চাল-ডাল কেনার উপর, 'চাল আমার সঙ্গে কেনা আছে' বললে, রাত্রের আশ্রয় নাও মিলতে পারে। ধরম সিং নিরস্ত হয়, মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করাও হয় না তার, সেই সঙ্গে চাল কেনা। খারারীর নাম পাওয়া যায় ছাপার অক্ষরে পাণ্ডার দেওয়া বইয়ের ভিতর, তাতে লেখা আছে খারারীতে কমপক্ষে দুটি চটির অস্তিত্ব আছে। তিন মাইল পেরিয়ে এসে দেখি খারারীতে ছোট্ট একটি চায়ের দোকান লোকালয়বর্জ্জিত আবহাওয়ার ভিতর জিজ্ঞাসার মত জেগে আছে—গাছের ছেঁড়া ছেঁড়া পাতার আস্তরণ দেওয়া একটি মাত্র বাস্তুঘর—তারই ভিতর নামমাত্র সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে চায়ের এই বিপণি। দোকানের মালিককে জিজ্ঞাসা করি, "গ্রাম-টাম নেই?" হাত উঁচিয়ে দিকচক্রবালের কাছাকাছি কয়েকটি বিন্দুর মত কুটীর দেখিয়ে দেয়, সেগুলোই নাকি খারারী গ্রামের ভগ্নাংশ। ইতিহাসের পণ্ডিতের কাছে চুপ করে শুধু চায়ের ভাঁড়টি টেনে নি, উত্তর দিই না। এখানে দুধ বিক্রি করা হচ্ছে, ইচ্ছে করলে কেনা যায়। আমি শুধু চা-ই খেলাম।

সামনে চড়াই—আর এ চড়াইয়ের জের চলল পাঁচ মাইল দূরের যমুনা চটি পর্য্যন্ত। চারিদিকেই পাহাড়, আর এ পাহাড়ের কোনরকম শালীনতাবোধ নেই, খাড়াই ঊর্দ্ধমুখে উঠে গেছে। পথের কৌলীন্যও নেই, তারও নিঃশেষে শেষ হয়ে গেছে···এদিকে-ওদিকে শুধু পাথর ছড়ান, বুনো পাথর, এর উপর দিয়েই যমুনা চটির অবাস্তব রাস্তা। গাংনানী থেকে খারারী পর্য্যন্ত আমরা দলে ছিলাম সাত-আট জন যাত্রী মাত্র, এর মধ্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্নতা আসে নি। খারারীর পর সব কেটে বেরিয়ে গেলাম, জোড় বলে কিছু রইল না, বিজোড়ই তখন এ পথের মূলধন। জল নেই—শুধু যমুনার শব্দ শুনেই আত্মতৃপ্ত হতে হয়। যমুনা এ পথ থেকে বহু দূরেই প্রবহমাণা—মা এখানে তৃষ্ণার্ত্ত যাত্রীকে নিজের শব্দই শুনিয়েছেন, অঞ্জলিতে বারিবিন্দু দান করেন নি।

কোন রকমে এসে গেলাম পাঁচ মাইলের কৃচ্ছ্র সাধন শেষ করে যমুনা চটিতে—বেলা তখন দশটা। যমুনার ঠিক ধারেই চটির অস্তিত্ব, সেই জন্যে স্থানটির নামের আগে অনিবার্য্য 'যমুনা' শব্দটির যোগ হয়েছে। এখানে এসে ক্লান্তি দূর হয়ে গেল, মনে হ'ল পেছনের ফেলে-আসা চড়াই-ভাঙাটা দিবাস্বপ্ন হয়ে গেছে। যমুনা চটি বরণীয় স্থান, রমণীয় এর পরিবেশ। জীবনের চাঞ্চল্য আছে এ স্থানটিতে। আবহাওয়া স্তিমিত নয়—মানুষের পদসঞ্চার আছে। ধর্ম্মশালা রয়েছে কালী কমলীওয়ালায়, দু'পাঁচটা দোকান-পাটের হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকুনীও এখানে বর্ত্তমান। তবে এখানে বিশ্রামের যতটা তাগিদ অনুভবে আসে, রাত্রিযাপনের প্রয়োজনীয়তা ততটা নেই। কেননা সাধারণ যাত্রীদের লক্ষ্য থাকে যমুনা চটি পেরিয়ে আরও আট মাইলের মাথায় হনুমান চটিতে পৌঁছনোর। যারা খারারীর চড়াইয়ের দাপটে অশক্ত হয়ে নেমে আসে, তাদের পক্ষে এখানে মাথা গুঁজে থাকবার বন্দোবস্ত আছে—সে কৌলীন্যের বদনাম যমুনা চটির নেই। তবে আমাদের মুষ্টিমেয় যাত্রীদলে সে রকম অশক্ত কেউ ছিল না। আমরা শুধু বিশ্রাম নিলাম কিছুক্ষণ, তার পর যমুনা চটিকে ছাড়িয়ে পুল পেরিয়ে আবার পথের প্রান্তে নেমে এলাম। এবার আট মাইলের আর একটা পরীক্ষা, আর সেটি উত্তীর্ণ হতে পারলে হনুমান চটিতে পৌঁছনোর অধিকার মিলবে।

পরীক্ষা আর পরীক্ষা—চরমতম তথা বৃহত্তম। গাংনানী ছাড়ানোর পর মা যমুনাকে বাঁ দিকে প্রবহমাণা দেখেছিলাম, এবার যমুনা চটির পর তিনি ডান দিকে এলেন, সেই দিকে সবুজ শাড়ী-পরা মায়াবিনীর রূপ, যাঁর সামান্যতম দর্শনেই সন্তুষ্টির বন্যা নেমে আসে। আধ মাইল পার হবার পর যমুনা ধীরে ধীরে পাহাড়ের গহনতায় অদৃশ্যা হলেন—আমাদের মত যাত্রীদের জন্যে এ সরে-যাওয়া বিগত রাত্রির স্বপ্ন মাত্র! মনে হ'ল, কাছাকাছি জল আছে, তবে সে জল নয়, জলের আলেয়া। এখানে ব্যথা জমে মনে মনে, অভিমানে বুক ভরে যায়। মনে হয় ফিরে যাই। যমুনোত্তরী তীর্থের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জলকষ্ট এই স্থান থেকেই সুরু হয়েছে সার্থক হয়ে—কেননা সামনের চড়াইয়ের যেমন তুলনা নেই, তেমনি তুলনা হয় না একটিমাত্র অঞ্জলির জলের হা-হুতাশের! যমুনা চটির আগেও জলকষ্ট যে নেই তা নয়, তবে সে মানুষের সহ্যশক্তির সীমাকে পেরিয়ে যায় নি।

যে চড়াইয়ের সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা, উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব্ব থেকে পশ্চিম—সমস্তদিকেই তার একটা অমানুষিক স্পর্দ্ধা যেন ফুটে বেরুচ্ছে। যাত্রীদের জানিয়েছে সর্ব্বাত্মক 'চ্যালেঞ্জ' ও ঔদ্ধত্যের রক্তচক্ষু। এ চড়াই কান্নার চড়াই। পথ ত নেই-ই,

তায় থাকা শুধু আদলমাত্র—আর এই আদলের উপর লক্ষ কোটি পাথরের বিক্ষিপ্ত আস্তরণ, যার উপর পায়ের পাতা দু'টিকে সমান ভাবে রাখার উপায় নেই যাত্রীদের—অদ্ভুত অসমান পথ, মনে হয়, যাব কি করে? এরকম পথ গঙ্গোত্তরীর পথে নেই—এই ধরণের পথ যমুনোত্তরীরই একমাত্র সম্পদ।

চড়াই যে পেরোই নি তা নয়, যাযাবর জীবনের তলা দিয়ে পথের ইতিহাসই চলে গেছে যেন—তবু সে ইতিহাসের সান্ত্বনা আছে, কেননা অধ্যবসায়ের পরীক্ষায় এমনভাবে স্পর্দ্ধার স্বরূপটি ফুটে ওঠে নি। কাশ্মীর থেকে কুমারিকা, ভারত-ভূমির নানা প্রান্তে নানা দিকে কাঁধের ঝুলিকে সম্বল করে পথ হেঁটেছি প্রচুর, কেননা জীবনে ভগবান ঘর দিলেও আমার পথকেই করেছেন সত্যের আরাধনা—তাই বেঁচে থাকাটাই আমার পথ আর পথই আমার বেঁচে থাকা। ধরিত্রীর নানা রূপকে দেখেছি দু'চোখ মেলে, কেননা তার দরকার ছিল পর্যটনের খাতার পাতায়। অসমান, বন্ধুর, দুরারোহ, এসব বিশেষণের মাত্রায় ভূপৃষ্ঠের যে ক্রমবিকাশের ধারা আমার ঝুলিতে তার স্বাক্ষর বড় কম নয়। গত বছরে ত্রিযুগী-নারায়ণ আর তুঙ্গনাথের সামনে দাঁড়িয়ে ভেবেছিলাম—ঊর্দ্ধমুখী এ বিদ্রোহীযুগলের ভ্রূকুটির সামনে তীর্থপ্রয়াসের ঝুলি শূন্য হয়ে যাবে না ত? কিন্তু শূন্য হয় নি, লাভই হয়েছে—কেননা তাদের ভ্রূকুটিকে মেনে নেওয়া যায়, মানুষের সহ্যশক্তির সীমা তারা লঙ্ঘন করে নি। চড়াই সেখানে পথ রেখে গেছে, পথের মর্য্যাদাকে তারা এমন ভাবে নষ্ট করে নি।

কিন্তু এ কি! এর ত কিছুই নেই—এর নিরাভরণতার সবটাই যে অদ্ভুত! না আছে পথ, না আছে পাকদণ্ডী, না আছে এ দুটি জিনিষের সৃষ্টির এতটুকু প্রয়াস—বিধাতা তাঁর বিরাট খড়্গ দিয়ে শুধু খেয়ালেরই অজুহাতে এ অঞ্চলটিকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন—আর তাঁর একটা অট্টহাস্য এখানকার আকাশে-বাতাসে মথিত হয়ে রয়েছে।

কিন্তু চলতে ত হবে, পথ ত আমার জন্যে নতুন করে দেখা দেবে না, তাই চড়াইয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। বদ্ধমুষ্টির ভিতর চেপে ধরি লাঠিটাকে—সেই বিপদের কাণ্ডারী হয়ে ওঠে এ পথে। আমি, ধরম সিং আর বীরবলের মা এক সঙ্গেই এসেছি এ পথটুকু—বিচ্ছিন্নতা আসে নি। রুগ্নিণী বীরবল আসছিল একটু পিছিয়ে—আমার সঙ্গে তাদের মাতাজী আছে, তাই তাদের সান্ত্বনা ও শান্তি। এক পা, দু'পা—মনে হয় এ যেন দিনের শেষের অবসাদ ও খিন্নতা। একটি সমান্তরাল রেখা ধরে এ যেন আট-ন'তলা বাড়ীর আলসে-বরাবর উঠে যাওয়া—সেই জন্যে প্রতি পাদবিক্ষেপে বিদ্রোহ ঘনিয়ে উঠে। চড়াই ভাঙার মুখে এক বোম্বাইবাসী দম্পতীর সঙ্গে দেখা হয়। বিপুলকায়া গৃহিণী অসহায়ভাবে বসে পড়েছেন একটি পাথরের উপর, মুখে শারীরিক ক্লান্তিজনিত হা-হুতাশ যে, এত কষ্ট করেও যমুনোত্তরী দর্শন আর হ'ল না—ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরা ও অসহায়ত্বের প্রতিমূর্ত্তি। সঙ্গে চলমান পাণ্ডা ও চারটি বাহকের পিঠে যাবতীয় ইহলৌকিক তত্ত্বের সাজসরঞ্জাম, এমন কি ট্রাঙ্কও বাদ নেই। বুঝা গেল, রৌপ্যমুদ্রার অভাব নেই, লক্ষ্মী বিরাজমানা। স্বামী শুধু বুঝিয়ে যাচ্ছেন যে, এরকম করে শক্তিহীনা হলে তার হাজার টাকার একটা অঙ্ক সামান্য কারণে ব্যর্থ হয়ে যাবে। কথাবার্ত্তায় বুঝা যায়—আজকের দুঃখ তার তীর্থের নয়, কাঞ্চনমুদ্রার। পাণ্ডাকে ডেকে বলি, "কাণ্ডী করা হয় নি কেন ভদ্রমহিলার জন্যে? টাকার ত অভাব নেই!" সংক্ষেপে উত্তর দেয়, "এত বড় কাণ্ডী পাওয়া দুঃসাধ্য।"

সত্যিই ত! বীরবলের মা নিজের উদাহরণ দেখিয়ে বোম্বাই-বাসিনীকে নানা ভাবে উৎসাহ দেন। এতে কাজও হয় কিছু। উঠেন—কিন্তু কতকটা চড়াই উঠে আবার সেই অবস্থা—সেই কান্না আর—'হামকো নেহি হোগা—।' উপায়ান্তর না দেখে আমরা এদের এড়িয়ে যাই। হনুমান চটিতে এদের আমরা দেখি নি তা নয়, দেখেছিলাম—কিন্তু সে এক ধ্বংসস্তূপের অবস্থা।

চড়াই ভাঙার মুখে তিন মাইলের মাথায় পাওয়া গেল উজলী। নামমাত্র চটি, সেই টিমটিমে চায়ের দোকান একটি, আর তার লাগোয়া একটি পোড়ো জীর্ণ ঘর। উজলীর পর চড়াইয়ের একটু দয়া-দাক্ষিণ্যের ভাব আছে, অর্থাৎ চারিদিকের পাহাড়ের গা বেয়ে যে পথ তার নিম্নমুখী হওয়ায় ঔদার্য্য আছে খানিকটা। পাইনেরই সমারোহ চলছে একটানা—এত পাইন গাছ দুনিয়ার আর কোথাও নেই। ধরাসু ছাড়ার পর সেই যে এদের পথ-পরিক্রমা সুরু হয়েছে—এর পরিসমাপ্তি ঘটেছে খরসালীতে। গাছের সারি চলেছে ত চলেছেই, এর আর শেষ নেই। কষ্টসহিষ্ণুতার ভিতর এদের স্মৃতি শাশ্বত।

এক মাইল নেমে আসার পর যমুনার তীরে একটি স্থানের সামনে এসে দাঁড়ান গেল—যার পরিচয় আমাদের জানা ছিল না। শোনা গেল এ স্থানটির নামকরণ হয়েছে নয়া চটি। কালী কমলীওয়ালার ধর্ম্মশালা তৈরী সুরু হয়েছে, শেষ হতে বেশী দেরি নেই। একতলার কাঠামো শেষ হয়ে গেছে, দোতলাও তাই, শুধু ছাদ হওয়া যা বাকি। ধর্ম্মশালার আশপাশে জীবনের চাঞ্চল্য দেখা গেল অর্থাৎ দোকানপাটের বনিয়াদ গড়ে উঠেছে সুষ্ঠু ভাবে। সবই পাওয়া গেল—চাল, ডাল, আটা, মশলা ও কাঠ। স্নান করা হ'ল যমুনায়—সে স্নান গা ডুবিয়ে নয়, পাথরের ওপর বসে বসে মাথায় জল ঢালা। এখানে যমুনা বেগবতী ও খরস্রোতা।

নয়া চটি থেকে যাত্রা সুরু হ'ল আবার বেলা তিনটায়—এইবার হনুমান চটি, সেখানে বিশ্রাম ও রাত্রিবাস। নয়া চটির সামনেই যে যমুনা তার উপর একটি আস্ত পাইনগাছ ফেলা আছে—ওটাই ব্রীজ আর ওরই নীচে দিয়ে মাত্র চার-পাঁচ ফুট তলাতেই স্রোতস্বিনীর খোড়ো রূপ, শুধু পা হড়কে পড়তে যা বাকি, মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হওয়ার সম্ভাবনা। যতবার যমুনাকে পেরুলাম আমরা—ব্রীজের ঐ একটিমাত্র রূপ, অর্থাৎ বিরাটকায় একটি গাছ ফেলা। পেরুতে পারলে ভাল—না পারলেও ও গাছ কস্মিনকালে উঠবে না।

এখান থেকে হনুমান চটি তিন মাইল। আজ তের মাইল হাঁটা শেষ হয়ে গেছে, ষোল মাইল পূর্ণ হলে তবে আজকের মত নিষ্কৃতি পাব, বিশ্রাম পাব। পথ সেই চড়াইয়ের ইতর-বিশেষের মধ্যে দিয়ে চলেছে, একটানা চড়াই আর নেই। যমুনা আবার বাম দিকে এলেন, কেননা পথ ঘুরেছে, নানা বাঁকের মধ্য দিয়ে পথের সোজা পরিচয় আর নেই। এদিকে-ওদিকে বন ও উপবন—পাহাড়ের সেই অনন্ত রুক্ষতা। পায়ের উপর মাংসপেশীর চাপ পড়ছে, কেননা একটানা তের মাইলের একটা অঙ্ক শেষ হয়ে গেছে আমার। কাঁধের উপর ঝোলান একটিমাত্র ব্যাগ, তাই মনে হচ্ছে ভারী, ওটা ফেলে দিলেই হয়। পগলসের ভিতর চোখ দুটো হয়ে এসেছে স্তিমিত—মনে হয় ঘুমিয়ে পড়ি। চামড়ার উপরেও কিসের একটা টান পড়েছে, এর কারণ আর কিছু নয়, মর্ত্যের মানুষ আমরা বহুদূর উঠে এসেছি বলে। আকাশ ঘোলাটে, পাংশুবর্ণ—এ আকাশ যেন আমার আকাশ নয়। চারিদিকে নগ্ন পাহাড়-পর্ব্বত—একটানা নীরন্ধ্র নিস্তব্ধতা—এ পৃথিবী যেন আমার চেনা পৃথিবী নয়। গোটা আবহাওয়ায় কি রকম ছমছমে ভাব—মনে হয় আমাদের পথ চলার আওয়াজ এখানে অপাংক্তেয় ও অযৌক্তিক। প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের ভিতর দিয়ে সর্পিল গতিতে চলেছি আমরা মুষ্টিমেয় তীর্থযাত্রী—অবাস্তব উপন্যাসের ছেঁড়া পাতার মত।

হনুমান চটির আগে পাইন ছাড়াও আর এক রকমের গাছের সন্ধান পাওয়া গেল, এ দেখা প্রথম। এ দেশের ভাষায় তাদের নাম রিঙাল, আমাদের ভাষায় শর জাতীয় গাছের ঝোঁপ। পাহাড়ের নগ্ন আবরণের ভিতর শেকড় চালিয়ে অজস্র এই রিঙালের বেঁচে থাকা—প্রথম দৃষ্টিতে এদের বেখাপ্পা বলে মনে হয়। ভাল ঝুড়ি বোনা চলে এ দিয়ে। বাংলাদেশ হলে কখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। দু'একটা অনামী ফুলের গাছও দেখা গেল—পাহাড়ী অনামী ফুল, নাম জানি না। চটিতে পৌঁছানোর আগে পথটা অদ্ভুত ভঙ্গীতে ঢুকে গেছে গ্রামের ভিতর—যমুনা ছাড়াও আর একটি নদীর উপর দিয়ে কাঠের সেতু পেরিয়ে যাত্রীদের প্রবেশের ব্যবস্থা, পরে জেনেছি ও নদীটির নাম হনুমান, যমুনোত্তরী গ্লেসিয়ার থেকেই নেমে এসেছে। যমুনা ছাড়া এই প্রথম দ্বিতীয় স্রোতস্বিনীর সন্ধান পেলাম আমরা, এর আগে কোথাও পাই নি, যমুনাকেই দেখে এসেছি একমেবাদ্বিতীয়ম্ হিসেবে। সন্ধ্যা হব হব—হনুমান চটিতে এসে গেলাম আমরা।

ষোল মাইলের একটা ধাক্কা—জীবনে একটানা পথ কখনও যা হাঁটি নি। এটি সম্ভব হ'ল তার কারণ এটি স্বর্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে। সবই এখানে সম্ভবের পরিপ্রেক্ষিতে।

এখানে শীত আছে, রাত্রে কম্বলের প্রয়োজন হয়। যমুনা চটিতে শীতের আমেজ লেগেছে, এখানে তার বহিঃপ্রকাশেরই একটা ধাপ, যমুনোত্তরী যে কাছে, এখানকার শীতের অনুভূতিই তার প্রমাণ। রাত্রে ধরম সিং চমৎকার ডাল আর রুটি পাকাল—একটা অদ্ভুত আবেষ্টনীর পিংরণের ভিতর জলন্ত কাঠের সামনে তাই বসে বসে খাওয়া গেল। বীরবলরা তাদের তৈরি রান্নার কতক অংশ দিয়ে যায়। আমরা একই ঘরে,—এখানেও নির্ব্বিবাদে উপরের ভাল ঘরটি জুটে গেছে আমাদের। পায়ে তেল মাখানোর প্রশ্ন নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি হ'ল একবার বীরবলের সঙ্গে, বহু কষ্টে তাকে নিবৃত্ত করা গেল। এ সংসারটি আমাকে মিশিয়েছে কি আমিই তাদের সংসারকে মিশিয়ে নিয়েছি নিজের ভিতর বুঝা দুষ্কর। অদ্ভুত এক রাজ্যের ভিতর বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে মানুষের কোন পংক্তিভাগ এখানে নেই—সব মিশে একাকার হয়ে গেছে।

অনেক রাত পর্য্যন্ত ঘুম এল না চোখে। নানা রকম ভাবনা, নানা রকম আত্মবিশ্লেষণ। যা 'নয়' তাই চলে আসছে স্বীকৃতির ভিতর, সিনেমার পর্দ্দার মত যত রাজ্যের সব চিন্তা ভেসে ভেসে যাচ্ছে। ডানদিকে ধরম সিং—অবোধ শিশুই সে, অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ঘরের ভিতর একটিমাত্র লণ্ঠনের স্তিমিত আলোর জ্যোতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব বেধেছে ভিতরের ও বাইরের অন্ধকারের—সভ্যতার ও নিদর্শনটুকুকেও মনে হয় অর্ব্বাচীন, ও আলোটুকু নিভে গেলেই যেন ভাল হ'ত। ওদিকটায় আপাদমস্তক ঢাকা বীরবল, রুক্মিণী, তার শিশু ও মাতাজী—কারুর সাড়া নেই। আমার যেন মনে হয় ওরা বোধ হয় বেঁচে নেই! অশরীরী আত্মার পদসঞ্চারের আবর্ত্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া হনুমান চটি, আমি শুধু প্রহর গুনি। যে চিন্তাটুকু আর সব চিন্তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বড় হয়ে ওঠে—সে চিন্তা সেই ব্রহ্মতালের, সেই স্বপ্নের ঘোরে দেখা এক মায়াবিনীর রূপ, সেই ফিকে সবুজ শাড়ী! সেই পথটুকু, পাহাড়েরই এক ভগ্নাংশে মিশে-যাওয়া একটি পথ, যার এক প্রান্তে দেখা দিয়ে সেই অসূর্য্যম্পর্শা লঘুচ্ছন্দে মিশে গেলেন আর আমি শুধু কিসের ঘোরে যেন তাই দেখলাম অথচ বুঝা গেল না, জানা গেল না··· অনুভূতিতে এসেও যেন হারিয়ে গেল! আজকের এই মায়াময় আবেষ্টনীর এক অখ্যাত প্রান্তে শুয়ে শুয়ে সেই দেখাটাই কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে শত বাহু নিয়ে, কিছুতেই ভুলতে পারি না···ঘুম আসে না আমার!

সারা পথ যা পেরিয়ে এলাম তা তন্ন তন্ন করে খুঁজে এলাম, ব্রহ্মতালে দেখা সেই পথের সঙ্গে যদি মেলে—কিন্তু মেলে নি। সেই বাঁকটুকু, পথের প্রান্তে অনাদৃত দু'একটি পাথরের টুকরো, কয়েকটি পাইনগাছের ছোট্ট একটি উপনিবেশ···সারা পথ অনুসন্ধান করে এলাম, জিজ্ঞাসা কেবল জিজ্ঞাসাই থেকে গেল। কোথায় সেই পথ—কোথায় সেই দেবীমূর্ত্তির ছায়া? পাই নি···এল না। রহস্য শুধু রহস্যতমের আবরণ নিয়ে থেকেছে পথের প্রান্তে—জীবনের প্রান্তে!

অনাস্বাদিত ইতিহাসকে চেনে না কেউ, তাই তার সন্ধানে ছুটে বেরোয় না। যা চির অদৃশ্যমান—তা দৃষ্টির সামনে আসেও না, দাগও ফেলে না কোনদিন। জীবনে তারই প্রয়োজন বেশী, যা চুয়ে চুয়ে চার মিলে যাওয়ার মত মিলে যায় জীবনে, তাই

সার্থক, তাই মূল্যবান। কিন্তু আলেয়ার মত যে ষড়ৈশ্বর্য্যে শুধু এসেই নিভে গেল, বুঝতে দিলে না, জানতে দিলে না—তার জন্যে কান্না বড় বেশী। দুটো হাতের বৃহৎ অঞ্জলির ভিতর এক তুলনা-হীন সম্পদ পুষ্পাঞ্জলি হয়ে যদি বা এল, না পাওয়া গেল তার ঘ্রাণ অনুভব করতে, না পাওয়া গেল নৈবেদ্য দেওয়ার শেষ অধিকারটুকু। মধ্যরাত্রের আকাশে এ যেন এক বিদ্যুতের আলো, শুধু জ্বলেই নিভে যাওয়া···।

ঘুম আসে না আমার···ঘুম আমার দু'চোখ থেকে কে যেন পুঁছে নিয়েছে! সবই কি মায়া, সবই কি ভুল? কেবল কি চড়াই-উৎরাইয়ের ক্লান্তিটুকু নিয়ে বাড়ী ফিরব? যার জন্যে আসা, তার লাভের কড়ি যদি না ঝুলিতে আসে—তা হলে যমুনোত্তরী তীর্থের মাহাত্ম্যই বা কেন? বা এর ঐতিহ্যের প্রচার কেন দিকে দিকে?

একটা অহেতুক অভিমান বুকের পাঁজরাগুলোতে যেন বেজে উঠে···কেমন যেন শূন্য বলে মনে হয় নিজেকে···।

কালকেই ত পূর্ণিমা—কালকেই যমুনোত্তরী পৌঁছনোর কথা। মধ্যে খরসালী ও ভৈরবঘাটি—তার পরই তীর্থের শেষ, যাত্রার প্রথম অধ্যায়ের হবে পরিসমাপ্তি! উল্কার মত ছুটে এসেছি আমরা হৃতসর্ব্বস্ব এক মনুষ্যগোষ্ঠী—কালকেই তার বেগ হবে প্রশমিত। কোথায় ছিলাম আর কোথায়-বা এলাম—একটা জগৎ ছিন্ন হয়ে আর একটা জগৎ তাতে জুড়ে গেছে আর এই শেষের জগতের একটি স্বর্ণময় যুগের ইতিহাসের সঙ্গে হবে দেখা! কোথায় বাংলা-দেশ আর কোথায় যমুনোত্তরীর পথের প্রান্তে নগণ্য এই হনুমান-চটির ঘর—সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দশ হাজার ফুটের উপর, আমিই বা কে, ওরাই-বা কে?

আর যেন ভাবতে পারি না···কয়েকটা ঘণ্টা মাত্র—পাখী ডেকে উঠবে, সকাল হবে; তার পর চরম পুরস্কার লাভের চেষ্টায় আবার সেই চড়াই ওঠা, উৎরাই ভাঙা হবে সুরু! আর একটি দিন···চব্বিশ ঘণ্টা একটা ব্যবধান—তার পরেই মায়ের আশীর্ব্বাদ পাব, ধন্য হব আমরা!

ঘড়ির কাঁটার মত যাত্রা সুরু হ'ল—সকাল ছ'টার মধ্যে হনুমান চটির মায়া কাটিয়ে পথে নেমে এলাম, পথ হ'ল একান্তের পরিচিত, একান্তের কাব্য, আজকে নতুন আশা; নতুন উদ্যম···এর যেন শেষ নেই। 'যমুনামায়ী কি জয়' ধ্বনিতে আবহাওয়া ঘন হয়ে উঠল···যাত্রীরা যেন পুনর্জ্জন্মের পর্য্যায়ে নেমে এসেছে। ক্ষয়িষ্ণু মানুষ বলে এদের আর চেনা যায় না···আজকের দিনে এরা মহত্তমের গণ্ডীতে এসে মিশেছে। যে ভাবের বিকাশটি দেখেছিলাম বদরীকার আগে, সেখানেও সেই হনুমান চটি ছাড়ার পর···যে একাকারের চরমতম পর্য্যায় চোখে পড়েছিল কেদারনাথের আগে রামবাড়া ছাড়ার পর—আজকে যমুনোত্তরীর আগেও সেই একই ভাব—সেই একই অনুভূতিই চোখে পড়ল। বড় সুন্দর, বড় মহান্ মানুষের এই ভাব—এর তুলনা নেই। গণ্ডীবদ্ধ মানুষের নিঃস্ব ও দেউলে হয়ে যাওয়ার উদাহরণই বেশী, যত পাপ যত দীনতা, অশুচিতার পাকে পাকে আমাদের ভিতরকার সম্পদ হয়ে গেছে ভিখারীর খুদকুড়ো—আমরা তাই আত্মাকে দেখি না, তার অবমাননা করি পদে পদে! সমাজের স্তরে স্তরে গ্লানির স্তূপ—আর এই স্তূপের পলিমাটির ভিতর আমরা আটকা পড়ে আছি, তাই ভুল আমাদের পদে পদে, রাজসিক ও তামসিক বৃত্তিটাই হয়ে উঠেছে বড়।

কিন্তু···।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অনাঘ্রাত পুষ্পের মত একটি বৃত্তিও ভগবান দিয়ে রেখেছেন, সে পুষ্প দুর্লভ, সে অম্লান। তাকে চিনতে হয় বুদ্ধি দিয়ে—আত্মবিশ্লেষণের ভিতর, তবে সেই ফুলের সার্থকতা। মাটির উর্ব্বরতাই যখন সব—তখন সে ফুলের জন্যে ভাবনা নেই। হনুমান চটি ছাড়ার পর মনে হ'ল মাটির এই উর্ব্বরতার ভিতর প্রত্যেকটি যাত্রীর সেই বৃত্তির দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়েছে···খুলে গেছে সব। এখানে মানুষ শুধু মানুষই নয়, এখানে তার সংজ্ঞা আলাদা, পরিচয় আলাদা। গাইতের মায়ের মুখে এক-একটি বিরাট সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে সকল যাত্রীর ভিতর, তাই মানুষ এখন কেবলমাত্র নর নয়, সে নরোত্তম। যা অসত্য, যা ভুল তাই ধুয়ে মুছে গেছে—মায়ের আশীর্ব্বাদপূত সন্তানের বিরাটত্বের এখানে তুলনা নেই। তাই এই বুকফাটা চীৎকারের ওঙ্কার—'যমুনামায়ী কি জয়'।

তিন মাইল পথ পেরিয়ে এলাম, আর এক মাইল, তার পর খরসালী—যমুনোত্তরী পথের মানুষের গড়া শেষ উপনিবেশ। এই এক মাইল সুরু হ'ল আর চলতে চলতে চোখে পড়তে লাগল নানা-বিধ পুষ্পসম্ভার, নামী ও অনামী। চিনতে যা পারলাম, তা হ'ল কাঠ গোলাপের ঝোঁপ, কিংশুকের গুচ্ছদল আর বন্যফুলের সম্ভার, আর এদের পটভূমিকায় ধ্যানগম্ভীর বিশাল অর্জ্জুনগাছের অতন্দ্র সাক্ষীর মত জেগে থাকা। পাইনগাছ দেখতে দেখতে এসেছি, মনে হয়েছে এ ছাড়া আর কোন বৃক্ষের উৎপত্তির সন্ধান নেই এ পথে—ফুল ত চোখে পড়েই নি। খরসালীর আগে এদের পরিচয়টি আকস্মিক ও অনাস্বাদিত বলে প্রত্যেক যাত্রীকে ভাবিয়ে তোলে। পাখীর কাকলীর সুরুও এখানে, ইতি খরসালীর শেষে। গোলাপের ঝোঁপ সংখ্যাহীন—অকৃপণভাবেই পাষাণ মৃত্তিকাকে এরা বর্ণ দিয়েছে, পরিচয় দিয়েছে, আর আবহাওয়াকে করে তুলেছে নম্র ও মিষ্টি। কিংশুকের পরিচয়ও তাই—তারাও সংখ্যাতত্ত্বকে হার মানিয়েছে, প্রত্যেক ফুলটি সৃষ্টিতত্ত্বের এক-একটি সম্পদ, মনে হয় দেবাদিদেবের জটাজালের উপর একাদশীর চাঁদের মত এক-একটি ফুলের পরিচয়। যত দূর দৃষ্টি চলে শুধু ফুল আর ফুল—আর তা চলল ঐ গ্রাম পর্য্যন্ত।

ভাবছিলাম সৃষ্টির কি অপার মহিমা, ধ্যানের ভিতর দিয়ে এ মহিমার সূত্র খোঁজা যায় শুধু। এ ফুল-ফল ত এমনি নয়, সৃষ্টি হয়েছে এদের একটি বিশেষ অধ্যায়ের জন্যে—এদের সৃষ্টি জীবনের শ্রেষ্ঠতম পূজার নৈবেদ্যের জন্যে, বরণডালা সাজানোর জন্যে। মায়ের মন্দির ত আর বেশী দূর নয়, সামনে খরসালী আর তা

ছাড়ানোর পর একটিমাত্র দুরূহ চড়াইয়ের যা ভ্রূকুটি, তার পরেই মা যমুনার আঞ্চলিক আশীর্ব্বাদ নেমে আসবে যাত্রীদের উপর, তাঁরই সৃষ্ট সন্তানদের উপর। আর এই সন্তানদের অঞ্জলির জন্যে পুষ্প-সম্ভারের অভাব রাখেন নি মা, তিনি যে চিন্তাহরণী ও চিন্ময়ী। সারা অঞ্চল জুড়ে শুধু ফুলেরই ইতিহাস আর সেই সঙ্গে পট-পরিবর্ত্তনের আভাস, এ আর কিছু নয়, এ কেবল তাঁরই প্রয়োজনের জন্যে। ষোড়শোপচারের পূজার জন্যে ফুলসম্ভার···কাঠগোলাপ আর কিংশুক, কিংশুক আর রিভাল—সবই তিনি কঠিন পাষাণমৃত্তিকার ভিতর থরে-বিথরে সাজিয়ে রেখেছেন। আমরা—যারা হামাগুড়ি দিতে দিতে এত দূর উঠে এলাম, আমাদের কর্ত্তব্য হ'ল অঞ্জলির ভিতর এ গুচ্ছদল তুলে নেওয়া আর মায়ের মন্দিরে বৃহত্তম কল্যাণের জন্যে পৌঁছে দেওয়া। চোখের ভিতর দিয়ে আত্মার উপলব্ধির ভিতর এর সঙ্কেত যদি না আসে, তা হলে বুঝব কিছুই চেনা হ'ল না, জানা হ'ল না কিছুই।

বিভোর হয়ে চলছিলাম এ পথে। সারা দেহে রোমাঞ্চ আসছিল দৃষ্টির বাইরে সেই পরমাশক্তির কথা ভেবে—যাঁর সৃষ্ট বিশ্বচরাচরে কোন কিছুরই অভাব নেই। আমরা তাঁকে দেখি না, খুঁজি না, তাই তিনি আসেন না। গুছিয়ে রেখেছেন তিনি সব, ছোট ও বড়—আমরা চোখের দেখার ভিতর দিয়ে তার কল্যাণকে হারিয়ে ফেলি।

খরসালী গ্রামের আগে এই এক মাইল পথ, ফুলের বর্ণ-উচ্ছ্বাসে সমৃদ্ধ ও সুমহান্ চিন্তার ভিতর একটা নেশার আমেজ যেন···বিভোর হয়েই পথচলা আমার।

কত কে আসছে, যাচ্ছে···দেখেও দেখি না, অনামী তারা, পরিচয়হীন গোত্রহীন তারা···তীর্থ পথের পাশকাটান নরনারী! আমি ফুলের মহিমা জপতে জপতেই পথ হাঁটছি।

কিন্তু এ কি?

পাহাড়ের নেমে-আসা বাঁকের মুখে পথেরই উপর এই পাশকাটান নর ও নারীর ভিতর একটি অদ্ভুত লাবণ্যসমৃদ্ধা অষ্টাদশীর আবির্ভাব। ফিকে সবুজ শাড়ী অঙ্গে জড়ান, হন্ হন্ করে আসছে এদিকে। দেখেও দেখি না—ঐ পরিচয়হীনদের ভিতর কেউ হবে বা। দু'পাশে ফুলের যে সমারোহ তার উপরেই আমার দৃষ্টি—আর তার আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণেই মন ছায়াচ্ছন্ন, তাই সূত্র হারিয়ে ফেলি, দেখেও দেখি না। আমার পাশ ঘেঁষেই অষ্টাদশী চলে গেল একটি বিশেষ অনাবিষ্কৃত ছন্দের মত, তরঙ্গের উচ্ছ্বাসের মত।

কেমন একটা শিহরণ—কিসের একটা অদ্ভুত অনুভূতি—শিরা-উপশিরায়···ঝিমঝিম করে উঠে সারাটা শরীর আমার।

এ রকম ত হয় না, এ অনুভূতি ত নতুন, অনাস্বাদিত!

চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকাই—অনামী কান্তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের উপর ফেলা ফিকে সবুজ শাড়ীর অবগুণ্ঠন, তারই সিঁথির সীমন্তে সোনার একটি টিকলী, ছায়াঘন-পল্লবিত দুটি চোখ—মায়াবিনী পথেরই প্রান্তে অদৃশ্য হয়ে কর্পূরের মত উবে যায়—।

আমারই সামনে—তৃষাতুর দুটো চোখেরই সামনে এ অষ্টাদশীর বাতাসে লীন হয়ে যাওয়া! কয়েকটি মুহূর্ত্ত—তার পরেই বাজ-পড়ার মত উপলব্ধির আকাশে চৈতন্যোদয়ের একটা চোখ ধাঁধান আলোর ঝলক, যা সমস্ত জীবনের বুদ্ধির ও অনুভূতিকে বিদীর্ণ ও মথিত করে চলে যায়।

কয়েকটি সেকেণ্ড, তার পরেই জ্বলজ্বলিয়ে সেই ব্রহ্মতালে দেখা দৃশ্যসম্পদ ভেসে ওঠে মনের ভেতর। যে পথে চলছিলাম—তাকে আবার দেখি, বিচার করে নি, মিলিয়ে নি।

সেই পথের বাঁক—অসমাপ্ত তরুবীথিকার ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশ! সেই ফিকে সবুজ শাড়ী, সেই রহস্যময়ীর অদৃশ্য হয়ে যাওয়া—সব ঠিক, কোন ভুল নেই!

কিন্তু আমার ভুল হয়ে গেল। ভুল হয়ে গেল গোটা জীবনের। এ ভুল সর্ব্বগ্রাসী ভুল। মা ফুল দেখিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিলেন আমার মত নির্বোধ শিশুকে, তারই আকর্ষণে সম্পদ হারালাম আমি—। এক মিনিটের ইতিহাস জীবন ইতিহাসে যা চির আরাধনার, বন্দনার ও সর্ব্বোত্তম সুকৃতির. হারালাম আমি—।

হনুমান চটির অন্ধকারাচ্ছন্ন ধর্ম্মশালার ঘরের একটি প্রান্তে বুক-জোড়া অভিমান সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ফুলে ফুলে উঠেছে গত রাত্রে—তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি মনের ভিতর ফেলে-আসা পথকে যদি ব্রহ্মতালে দেখা স্বপ্নের পথপ্রান্তটুকুকে সামঞ্জস্যের সীমায় আনা যায়···অভিমানই থেকে গেছে, সে পথের সাদৃশ্য পাই নি কোনখানে।

কিন্তু···।

একটি রাত্রের পর সে অভিমান ঘোচাতে এলেন সেই মাতৃমূর্ত্তি, পরে এলেন নানালঙ্কার বিভূষিতা হয়ে, ফিকে সবুজ শাড়ী পরে। যে পথকে দেখেছিলাম সেই পথই ছবির মত খরসালীর প্রান্তসীমায় ফুটে উঠল বাস্তব হয়ে, সত্য হয়ে, শাশ্বত হয়ে। আমি ফুল দেখলাম, তার রং দেখলাম—অথচ আসল ফুল অঞ্জলিতে নিলাম না—তার রংও আমি চিনলাম না।

মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় বসে পড়লাম আমি সামনের মত একটি পাথরের উপর। চোখে হাত দিলাম। কাঁদছি আমি শিশুর মত। সব হারানোর হাহাকারে বুকের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছিঁড়ে গেল রেণু রেণু হয়ে—মনে হ'ল পাগলের শেষ দশা আমার: আমি কি হারালাম? আক্ষেপের আবর্ত্তে আমি যেন শতধাবিভক্ত হয়ে গেছি।

কলম ও কালি দিয়ে এ নিগূঢ় তত্ত্বের মর্ম্মকথার স্বরূপ উদ্ঘাটন সম্ভব নয়, তাই সে প্রচেষ্টাকে নিবৃত্তির পথে টেনে আনাই উচিত। যে জিনিষ দেখেছি, হারিয়েছি যে সম্পদ সামান্য ভুলের জন্যে, ভবিষ্যৎ জীবনেতিহাসের পাতায় পাতায় তার প্রভাব কতখানি—তার কড়া-ক্রান্তির হিসেব এখানে থাক। এ প্রচেষ্টা আমার শুধু মায়ের কাঠামোর উপর অবোধ শিল্পীর মত রং বুলান মাত্র, আসল রং কি দেওয়া যায়? সে রং থাক আমার মনেরই ভিতর।

যা গুহ্য তা চিরকালই মূক, যা অব্যক্ত তা চির মৌন···খরসালীর পথপ্রান্তে ফেলে-আসা কাহিনী এই পর্য্যায়ে—একে বাক্য দিয়ে, বিশেষণ দিয়ে বুঝান যাবে না।

তবে উপসংহারের তাগিদ মত এইটুকু বলে রাখি—পাত্র পূর্ণ হওয়া চাই না হলে আরাধ্য সম্পদ আসবে না, এলেও তা মরীচিকার মায়াই শুধু জীবনে এনে দেবে। মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনধারণে সাধারণ যে জীবনের যোগাযোগ—তারও মাপ আছে, পরিধি আছে, ব্যাপ্তি আছে। এই যোগাযোগ আসে তখনই যখন আত্মা প্রদীপের ঊর্দ্ধশিখার মত তাঁরই উদ্দেশ্যে জ্বলতে পারে যাকে আমরা চিরকাল জীবনের প্রণাম জানিয়েছি। এ প্রণাম হওয়া চাই পূর্ণাঙ্গ—স্বয়ংসম্পূর্ণ—জপের ভিতর দিয়ে এ প্রণাম অষ্টপ্রহরের হওয়া চাই। না হলে হাহাকারই থেকে যাবে, সব পেয়েও শূন্য হয়ে যাবে সব।

যমুনোত্তরী তুর্গম অঞ্চল—রহস্যের পীঠস্থান। এমন কোন জিনিষ নেই যা মেলে না ওখানে। অতন্দ্র বিশ্বাস নিয়ে এগুতে হবে, পথ চলতে হবে—ভুল হলে চলবে না। সম্পদের পর সম্পদ—ঐশ্বর্য্যের পর ঐশ্বর্য্য—শুধু আসার জন্যেই ওখানে থরে-বিথরে সাজান—প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত্তিতে যোগাযোগের সন্ধিপূজায় মানুষের জীবনে এদের স্রোতস্বিনীর মত নেমে আসা অপরিহার্য্য ও অমোঘ।

এক মাইলের এই স্বর্ণাঞ্চল শেষ হয়ে গেল, এসে গেল খরসালী, সমাজবদ্ধ মানুষের গড়া যমুনোত্তরী পথের শেষ জনপদ। দুটো পথ। প্রথম পথটি গ্রামকে হাতছানি দিয়ে দূর দিয়ে চলে গেছে, গিয়ে মিশেছে যমুনার ধার বরাবর। দ্বিতীয় পথটি খরসালী গ্রামের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে এঁকে-বেঁকে—এরও শেষ যমুনায়। খরসালীর নাম শুনেছিলাম—না দেখেই যাব? দ্বিতীয় পথকেই বেছে নিলাম। রাস্তার দু'ধারেই লাইনবন্দী ঘর অর্থাৎ মকান আর রাস্তাটি এ বাড়ীর উঠান ও বাড়ীর চাতালের তলা দিয়ে চলে গেছে—আমরা যেন ব্যক্তিবিশেষের বাড়ীর ভিতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। পথঘাট নোংরা—অশুচিতায় ভরা যেন সমগ্র খরসালী গ্রাম—অথচ যমুনোত্তরী মন্দিরের অধিকাংশ পাণ্ডাদের আস্তানা এখানে। বদরীকার পথের পাণ্ডুকেশ্বরকে স্মরণ করিয়ে দেয় অপরিচ্ছন্নতার দিক থেকে। একটি মন্দির চোখে পড়ল—অনামী মন্দির, নাম পেলাম না বা বিগ্রহ দর্শন হ'ল না। ছোট্ট গ্রাম খরসালী, তবে বসতি ঘন—প্রাণের চাঞ্চল্য আছে। আধ ঘণ্টার ভিতর চলার বেগে খরসালী গ্রাম মায়া কাটাল আমাদের, এসে পড়লাম যমুনার তীরে। এখানেও সেতুর সেই সহজ সংস্করণ অর্থাৎ কাঠের গুঁড়ি ফেলা আছে—কোনরকমে পার হওয়া গেল। যমুনার স্রোত এখানে মারমুখী ও ভীষণ—উন্মাদিনীর মূর্ত্তিতে পৃথিবীর দিকে ছুটে চলেছেন। গাংনানীর সে যমুনা এ নয়—যমনা এখানে ভৈরবিনীর মূর্ত্তি ধারণ করেছেন।

যমুনার অপর পারে জানকীমাই চটি। বিশ্রামের যোগ্য স্থান বটে—হেঁটে এসেছি অনেকটা, সামনে ভৈরবঘাঁটির বিখ্যাত প্রাগৈতিহাসিক চড়াই—বসে যাই একটু যমুনার ধারে—শান্তি মিলবে।

ধরম সিং হঠাৎ বললে—"বাবাজী, উধার দেখ।" চা খাচ্ছিলাম, ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি দৃশ্যের এক বৃহত্তম সম্পদ। দূর আকাশের নীলিমায় যমুনোত্তরী পর্ব্বত শ্রেণীর অভ্রভেদী রূপ, সুমহান্ ও শাশ্বত। গোটা দিকচক্রবাল ঘিরে তুষারমণ্ডিত গিরিশ্রেণীর অন্তহীন শোভা-যাত্রা একটি অখণ্ড জিজ্ঞাসার মত ফুটে আছে—পাতলা মেঘের একটি আস্তরণ এই শোভাযাত্রার উপর মালার মত জড়ান। যা দেখলাম—এরই নাম যমুনোত্তরী গ্লেশিয়ার, এর রূপ ব্যাখ্যায় আনা দুঃসাধ্য। যা দেখেছিলাম কেদারের পথে অগস্ত্যমুনি ছাড়ার পর, এবার থেকে ওবার পর্য্যন্ত ধূম্র জটাজালের প্রচ্ছন্ন রূপ, জানকীমাঈ থেকে সেই দেখার আর এক অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়। ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গের তলায় যমুনামায়ের মন্দির। যার জন্যে আমাদের উঠে আসা।

আর দেরি নেই—পথ শেষ হয়ে এল।

ক্রমশঃ

ইটালীর সাম্প্রতিক চিত্রকলা ও চলচ্চিত্র

১

ইটালীর চিত্রকলার ঐতিহ্য গৌরবময়। প্রাচীনকালে ইটালীতে যেমন লিওনার্দ দা ভিঞ্চি প্রমুখ শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আবির্ভাব হইয়াছে, বর্তমানকালেও তেমনি ইটালীয় চিত্রশিল্পী পিকাসোর খ্যাতি সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইটালীর সাম্প্রতিক চিত্রকলা সনাতন পন্থা পরিত্যাগ করিয়া এক সম্পূর্ণ নূতন খাতে বহিয়া চলিয়াছে। ১৯৫৩ সালে ইটালীতে অনুষ্ঠিত চিত্র-প্রদর্শনীসমূহে আধুনিক শিল্পীদের যে সকল চিত্রকর্মে নব নব রূপলোক উদ্ঘাটিত হইয়াছে, বর্তমান প্রবন্ধে আমরা তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

দুইটি বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে যে শিল্পীগোষ্ঠীর অভ্যুদয় হইয়াছে, উনবিংশ শতাব্দীর গতানুগতিক পন্থা পরিত্যাগ করিয়া যাহারা নূতন পথ ধরিয়া চলিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমরা কঠোর মন্তব্য করিতে পারি, কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাঁহাদের চিত্রকর্মে যে প্রাণশক্তির পরিচয় সুপরিস্ফুট তাহা উপেক্ষণীয় নহে। বচ্চিওনি, মোদিগ্লিয়ানি প্রমুখ শিল্পীদের পরবর্তী শিল্পী-গোষ্ঠীর চিত্রকর্মের অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে, বয়স্ক লোকেরা ঐ সকল চিত্রের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন নাই, অত্যন্ত সাবধানী সমালোচকেরাও তাঁহাদের আঁকা ছবি, অভিজ্ঞতা এবং গবেষণার উপর আন্তর্জ্জাতিকতার মার্কা মারিয়া দিয়া থাকেন। এ সকল হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ঐ সকল শিল্পীর রচনায় সজীবতা এবং নৈপুণ্য উভয়ই বিদ্যমান। অবশ্য ইটালীর নব্য-চিত্রকলার রুচি যে আন্তর্জ্জাতিক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আধুনিক রুচির উপযোগী কোন নিজস্ব দানই ইটালীর চিত্রকলার নাই—এ অভিযোগ যে সর্ব্বৈব মিথ্যা, তাহা 'ফিউচারিজমে'র প্রভাব এবং দ্য চিরিকোর 'মেটাফিজিক্যাল পেন্টিং'স' বা অনৈসর্গিক চিত্রকলা হইতেই প্রমাণিত হয়। ইটালীর জাতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধেও ইটালীর সাম্প্রতিক শিল্পীরা উদাসীন নহেন। আসল কথা হইতেছে, স্কুলমাষ্টারী মনোভাবই নূতন শিল্পকলার পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক।

ভাবাবেগপ্রবণ বাস্তবতার ক্ষেত্রে নূতন পথ আবিষ্কারের জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল জিনো বনিচি এবং তাঁহার বন্ধু মাফাইয়ের স্বাভাবিক প্রতিভার। সকল প্রকার ক্লাসিক্যাল এবং অনৈসর্গিক (Metaphysical) ভাব বর্জ্জন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে রোমান্টিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই খুব সাবধানতা সহকারে আধুনিক শিল্পীগোষ্ঠী এবং তাঁহাদের শিল্পকর্ম্মের বিচার করিতে হইবে।

ভারজিলিউ গুইদি বয়সে তরুণ না হইলেও, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার শিল্পকলার নবজন্মলাভ হইয়াছে। তিনি পূর্ব্বে ছিলেন বিংশ শতাব্দীর ক্লাসিসিজমের অনুসরণকারী, কিন্তু বর্ত্তমানে তিনি নূতন পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন।

চিত্রকলা এবং ভাস্কর্য্য উভয়ক্ষেত্রে রূপাত্মক শিল্পের (Figurative Art) এখন বস্তু-নিরপেক্ষ (Abstract) হইয়া উঠিবার প্রবণতা দেখা যাইতেছে। Abstractionism (বস্তু-নিরপেক্ষতা) শব্দটিকে পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়—ইহা হইতেছে চিত্রের কবিতা এবং ইহাই সাম্প্রতিক কালের অনেক ইটালীয় চিত্রশিল্পীর লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে।

এপ্রিল এবং মে মাসে ভ্যালি জিউলিয়ার আর্ট ক্লাবের বার্ষিক প্রদর্শনীতে ফরাসী এবং ইটালীয় শিল্পীদের আঁকা অনেকগুলি এবষ্ট্রাক্ট চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। ই. প্রাম্পোলিনি এমন একটি সমিতির সভাপতি যাহা ক্রমে ক্রমে পুরাপুরি এবষ্ট্রাক্ট চিত্রের সাধনায় নিরত শিল্পীগোষ্ঠীর বিশেষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। তথাকথিত ফিগারেটিভ আর্টের চর্চ্চায় যাহারা ব্যর্থ হইয়াছে তদ্ব্যতীত কতিপয় তরুণবয়স্ক সৌখীন শিল্পীকেও ইহাতে ভর্ত্তি করা হয়। ই. প্রামপোলিনি তাঁহার চিত্র-তালিকার ভূমিকায়

"পানশালা" শিল্পী ঃ ইলিয়ানো পানটুৎসি

ইটালী এবং ফরাসীদেশের যে সকল শিল্পী দর্শকদের রুচির পরিবর্ত্তনের জন্য অক্লান্ত প্রচেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের শিল্পকর্মের তুলনার উদ্দেশ্যে উক্ত বৎসরে তুরিনে যে তৃতীয় ইটালো-ফ্রেঞ্চ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক ইটালীয় শিল্পকলা বস্তুনিরপেক্ষতা এবং বাস্তবতার সংঘাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। মাফাই, পিরান্দেলো প্রমুখ শিল্পীদের সম্বন্ধে একথা বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা আধুনিকতার ফর্ম্মুলাসমূহের মধ্যে মানবীয় এবং কবিত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু-প্রয়োগে-ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন—তাঁহারা সাম্প্রতিক চিত্র-কলাকে প্রথাগত-বন্ধনের হাত হইতে মুক্তি দিয়া ইহার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিয়াছেন, নতুবা সমালোচনার কচকচানিতে ইহার রসবস্তু চাপা পড়িয়া যাইত।

ইহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে, প্রথমে 'রোম গ্যালারি অব মডার্ণ আর্ট' এবং তার পরে 'মিলান রয়্যাল প্যালেস' অনুষ্ঠিত পিকাসো প্রদর্শনী ইটালীর শিল্পকলার ক্ষেত্রে একটি অনন্যসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং শিল্পানুরাগীরা এখনও সত্যসত্যই একটি স্মরণীয় বিষয় বলিয়া এ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিয়া থাকেন।

দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলিয়াছেন—"চিত্রকলার ঐতিহ্যের যে রূপাত্মক প্রকাশ (Figurative presentation), নিশ্চিতরূপে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, এবং এবষ্ট্রাক্ট অথবা বস্তুনিরপেক্ষ আর্টই হইতেছে একমাত্র জীবন্ত এবং যথার্থ আর্ট। চার হাজার বা ততোধিক বৎসর-কাল শিল্পকর্ম্মের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের পর ফিগারেটিভ আর্ট আমাদিগকে আর নূতন কি বলিতে পারে?

আর্ট ক্লাব প্রদর্শনীতে ইটালী ও ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর এবং ভাস্করদের শিল্পকর্ম্মের সঙ্গে এবষ্ট্রাক্‌শনিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠাবান আতানাসিও সোলদাতির ছবিও প্রদর্শিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই বৎসরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে—কিউবিজম, মেটাফিজিক্যাল পেন্টিং এবং এবষ্ট্রাক্‌শনিজম ত্রিবিধ ক্ষেত্রেই এই শিল্পীর শক্তির ক্রমবিকাশ হইতেছিল এবং তাঁর অনুরাগীর সংখ্যাও উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল

অবশ্য শিল্পী স্বয়ং প্রদর্শনীর উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, কিন্তু ইটালীয় শিল্পকলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি-দের এবং শিল্পানুশীলনকারীদের (রাজনৈতিক জগতের কতিপয় ব্যক্তির কথা না হয় বাদই দিলাম) উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীটিতে বাস্তবিকই উৎসব-সমারোহের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং এটাও খুবই আনন্দের বিষয় যে, স্বয়ং রিপাব্লিকের প্রেসিডেন্ট পর্য্যন্ত এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। চিত্রকলার বিরাট ঐতিহ্যময় দেশ ইটালী অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত এমন একজন সমসাময়িক চিত্র-করের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিল, যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য এবং আধুনিক রুচিসম্মত চিত্রকলা নিঃসংশয়ে যাঁহার নেতৃত্বে বিকাশলাভ করিতেছে। রোম অপেক্ষা মিলান প্রদর্শনীতে অধিকতরসংখ্যক চিত্রকর্ম্ম প্রদর্শিত হইয়াছিল। শত সহস্র লোক রয়্যাল প্যালেসে এই মহান্ শিল্পীর আঁকা ছবি দেখিবার জন্য আসিয়াছিল। রোমেও

দর্শকের সংখ্যা হইয়াছিল অত্যধিক। প্রদর্শনীটি যে যে কারণে চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইতেছে এই যে, শিল্পী ইহাতে বিপুলসংখ্যক এমন সব ছবি দিয়াছিলেন যাহা দেখিবার সুযোগ দর্শকদের এই প্রথম হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে কতকগুলি ছিল নিতান্ত আধুনিকতম ছবি। ইহাতে কতিপয় অধুনাবিখ্যাত ছবির সঙ্গে দর্শকেরা এমন কতকগুলি ছবি দেখিতে পাইয়াছিল যাহা পূর্ব্বে কখনও শিল্পীর ষ্টুডিওর বাহিরে প্রদর্শিত হয় নাই। শিল্পী গত কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁর রচনায় কিউবিজম, এক্সপ্রেসনিজম্ এবং অতিবাস্তবতা (super-realism) প্রভৃতি বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগে যে সকল সার্থক এবং অপেক্ষাকৃত অল্প

"জনৈক নাবিক"
শিল্পী : টম্মাসো বেক্তোলিনো

সার্থকপ্রয়াস করিয়াছেন, এই সমুদয় চিত্রকর্ম্ম দেখিয়া তৎসম্বন্ধে দর্শকদের মনে কতকটা ধারণা জন্মিয়াছিল। ১৯৫৩ সালে অনুষ্ঠিত ইটালীর পিকাসো প্রদর্শনীসমূহ দ্বারা নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় প্রমাণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ—ইটালীর চিত্র-সমালোচনার উচ্চ মান যাহা তথ্য এবং ঔপপত্তিক (Theoretical) ও প্রণালীবদ্ধ সংজ্ঞার ক্ষেত্রে বর্ত্তমান জগতে অদ্বিতীয়। দ্বিতীয়তঃ—সাম্প্রতিক শিল্পকলার প্রতি অ-বিশেষজ্ঞ সাধারণ লোকেদের অপরিসীম কৌতূহল। তৃতীয়তঃ—ইটালীর নব্য শিল্পীগোষ্ঠীর উপর পিকাসোর বিপুল প্রভাব এবং পিকাসোর চিত্রকর্ম্মের সহিত এই শিল্পীগোষ্ঠীর সাক্ষাৎ সংস্পর্শ-স্থাপনের যুক্তিযুক্ততা।

পিকাসো এবং চাগাল (শেষোক্ত শিল্পী উক্ত বৎসরে তুরিনে তাঁর শিল্পকর্ম্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছিলেন) যেমন নিজেদের খ্যাতিকে এবার অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তেমনি ইটালীর অন্যান্য চিত্রকর এবং ভাস্করেরাও বিদেশে একক ও সমবেত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ফিউচারিজমের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন পদ্ধতিতে আঁকা ইটালীয় চিত্রকর্ম্মের কতকগুলি প্রদর্শনী লিসবন এবং অপোর্তোতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অন্যদিকে লণ্ডনে, অশলোতে, ষ্টকহোমে এবং নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত একক-প্রদর্শনীসমূহ ইটালীতে অনুষ্ঠিত পিকাসো এবং চাগালের প্রদর্শনীর সমগোত্রীয় বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এগুলির সঙ্গে রোম ন্যাশনাল গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত বর্ত্তমান গ্রীক শিল্পীদের প্রদর্শনীগুলির কথাও উল্লেখ করিতে পারা যায়।

"প্রতিকৃতি"
শিল্পী : ফিয়োর বি. জাকারিয়ান

এতদ্ব্যতীত রোম এগজিবিশন প্যালেসে দক্ষিণ ইটালীর শিল্প-কলারও একটি প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে এবং রোমে ইউনিভার্সাল এগ্রিকালচারাল এগজিবিশনে কৃষি-বিভাগ হইতে অনুপ্রেরণা-প্রাপ্ত, চিত্রকলা এবং ভাস্কর্য্যের আরও একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু কলা-বিশেষজ্ঞগণ শেষোক্ত দুইটি প্রদর্শনী অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করেন যদিও প্রথমোক্তটি বাস্তবিকই সুন্দর ও তার হস্তশিল্প বিভাগটি শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে একথা বলা দরকার যে, অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও অসংখ্য শিল্প-প্রতিযোগিতা হইয়াছে এবং যোগ্য শিল্পীদের পুরস্কারও প্রদান করা হইয়াছে। আজিকার দিনে দেশের আর্থিক

জীবন যখন বিপর্যস্ত তখন এই সমস্ত পুরস্কারের নৈতিক মূল্য স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

এক কথায় ইটালীতে চিত্রকলার ক্ষেত্রে যে ভারসাম্য বজায় রহিয়াছে তাহা বাস্তবিকই প্রীতিকর। ইটালী শিল্পকলার ক্ষেত্রে

'লাভ ইন্ দি টাউন' ফিল্মের চিত্রণে চিত্র-পরিচালক আন্তোনিওনি

আধুনিকতাকে ভয় পায় না, তাহা সত্ত্বেও সে কিন্তু অতীতকে—দূর এবং নিকট উভয় অতীতকে, সম্মানপ্রদর্শনে কুণ্ঠিত নহে। যে সকল ইটালীয় শিল্পকর্ম জার্মানগণ কর্তৃক অপসারিত হইয়াছিল সেগুলি আবার ইটালীতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সম্প্রতি এক চুক্তি হইয়াছে। পুরনো শিল্পকলার ন্যাশনাল গ্যালারি পুনরায় রোমে খোলা হইয়াছে। ফরাসীদেশের প্রাচীন এবং অতি-আধুনিক কারুকার্যখচিত বস্ত্রসমূহও প্রদর্শিত হইয়াছে। সর্বশেষে ১৯৫৩ সনের ডিসেম্বর মাসে প্যালাৎসো ভেনেৎসিয়াতে চমৎকার এবং অসাধারণ মিনিয়েচারসমূহ একত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার দরুন রোমে প্রাচীন ও সাম্প্রতিক চীনা চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যের এমন সব নিদর্শন আনীত হইয়াছে যাহা দ্বারা এদেশে প্রথম প্রাচ্য-শিল্পকলার মিউজিয়ামের গোড়াপত্তন হইবে—শিল্পরসিকগণ এতকাল এই জিনিষটির অভাব তীব্রভাবে অনুভব করিতেছিলেন।

২

"ইউরোপ, '৫১ সন" নামক চলচ্চিত্র দ্বারা ১৯৫৩ সনের ইটালীয়ান সিনেমার উদ্বোধন হইয়াছিল। তাহাতে বিত্তশালিনী কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বিতা একটি নারীর কাহিনী চিত্রে রূপায়িত হইয়াছে। এই কাহিনী হইতে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তাহা হইতেছে এই যে, আজিকার দিনে পাশ্চাত্যে যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে তাহার দরুন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির, সুতরাং পাশ্চাত্য সিনেমার উপর গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে এবং চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে নব্য-বাস্তবতার (Neo-realism) প্রবর্তন হইয়াছে—নব্য-বাস্তবতার স্রষ্টা রোসেলিনি এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে দর্শকদের মনে নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছে। লুচিনো ভিসকন্তি হইতেছেন ইটালীর সাম্প্রতিক চিত্রপরিচালকদের শীর্ষস্থানীয়দের অন্যতম। তাঁর সৃজনী-প্রতিভা এখন সিনেমা এবং রঙ্গমঞ্চ এই দুয়ের মধ্যে দোদুল্যমান। ভিসকন্তির 'সেন্স' নামক চিত্রনাট্যটির বিষয়বস্তু হইতেছে প্রণয় এবং মৃত্যু—বিগত শতাব্দীর রোমান্টিক ভাব ইহার সহিত ওতপ্রোত। অবশ্য ইহার মধ্যে বাস্তবতার স্পর্শও রহিয়াছে।

পক্ষান্তরে গত বৎসর রেনাতো কাস্তেলানির নিকট হইতে নূতন কিছুই পাওয়া যায় নাই। ১৯৪২ সালে একটি রোমান্টিক ফিল্ম লইয়া কাস্তেলানির চলচ্চিত্র-পরিচালক-জীবনের সূচনা। সম্প্রতি তিনি 'রোমিও এণ্ড জুলিয়েটে'র একটি চিত্র-রূপায়ণের পরিকল্পনা করিতেছেন। কিন্তু মনে হয়, বাস্তবতা লইয়া পরীক্ষণকে উপেক্ষা করিতে তিনি অনিচ্ছুক এবং একটি নূতন চিত্রে তিনি বাস্তবতার প্রয়োগ করিতে আগ্রহান্বিত—অবশ্য বিষয়টি তিনি গোপন রাখিয়াছেন। গত বৎসর নব্য-বাস্তবতার একটি অভিনব পদ্ধতির সহিত দর্শকেরা পরিচিত হইয়াছে—তাহাকে বলা যাইতে পারে অনুসন্ধানমূলক চিত্র (Enquiry film) ইহাতে সাত জন
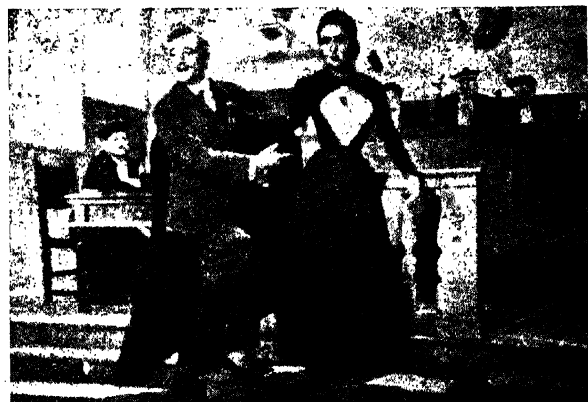
"ইন্ আদার টাইমস" ফিল্মে ভ সিসা এবং জিনা লোলোব্রিজিদা

বিভিন্ন চিত্র-পরিচালক দ্বারা ছয়টি কাহিনী বিশদভাবে চিত্রে রূপায়িত হইয়াছে। 'লাভ ইন্ দি টাউন' (শহরে প্রেম) নামক চিত্রে রাস্তা হইতে কুড়ানো লোকেদের ক্যামেরার সামনে হাজির করা হইয়াছে এবং তাহাদের জবানিতে তাহাদের জীবনকথা এবং সমস্যা-গুলি বলানো হইয়াছে। 'প্রণয়ীদের আত্মহত্যা' নামক যে কাহিনীটি মিচেল আঞ্জিলো আন্তোনিওনির পরিচালনায় চিত্রে রূপায়িত হইয়াছে তাহা অন্যান্য চিত্রসমূহ অপেক্ষা ঢের বেশী সার্থক হইয়াছে।

মিচেল আঞ্জিলো আন্তোনিওনি কতক-গুলি Documentary film (শিক্ষামূলক চিত্র) লইয়া তাঁহার চিত্র-পরিচালক-জীবন সুরু করেন। তাঁহার 'টাউন স্কাভেঞ্জারস' (শহরের ঝাড়ুদার) 'এ লাভিং লাই' (একটি মনোরম মিথ্যা) প্রভৃতি চিত্র বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ, কেননা ঐ সকল শিক্ষামূলক চিত্রেই প্রথম বাস্তবতার বীজ উপ্ত হয়। ওগুলিকে বলা যাইতে পারে সিনেমায় নব্য-বাস্তবতার সূতিকাগার। প্রথম 'ফিচার-ফিল্ম' 'দি ক্রনিক্‌ল অব এ লাভ' যখন মুক্তিলাভ করিল তখন আধুনিককালের একজন শ্রেষ্ঠ চল-চ্চিত্র-সমালোচক আন্তোনিওনিকে এক নূতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তক বলিয়া অভিনন্দিত করেন।

"দি লেডি উইদাউট দি ক্যামেলিয়াস্" ফিল্মে লুশিয়া বোসে

গত বৎসর আন্তোনিওনির 'দি লেডি উইদাউট দি ক্যামেলিয়াস' দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছে। এই চিত্রে নায়িকার ভূমিকা প্রথম দেওয়া হয় জিনা লোলোব্রিগিদাকে, কিন্তু শেষে তিনি চুক্তির সর্ত্ত ভঙ্গ করায় মিস লুশিয়া বোসেকে এই ভূমিকা গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করা হয়। তিনি একজন খাঁটি আর্টিষ্ট। 'দি লেডি উইদাউট দি ক্যামেলিয়াস'-এ অনন্যসাধারণ প্রতিভাময়ী চিত্র-পরিচালকরূপে আন্তোনিওনি প্রতিষ্ঠালাভ করেন।

এই সমস্ত বিষয় হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, ইটালীর সাম্প্রতিক সিনেমার সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মই হইতেছে নব্য-বাস্তবতা। অবশ্য ব্যবসায়িক ফিল্মগুলি (commercial film) উৎকর্ষ লাভ না করিলেও সংখ্যার দিক দিয়া বাড়িতেছে।

১৯৫৩ সনের সর্ব্বাপেক্ষা বিতর্কমূলক ফিল্ম হইতেছে 'ইজি টাইমস'। আমলাতন্ত্রের মধ্যে দুর্নীতি ইহার বিষয়বস্তু। অনেক পরস্পর-বিরোধী বিষয় স্থান পাওয়া সত্ত্বেও ইহাতে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে তজ্জন্য ইহা দর্শককে আকৃষ্ট করে, যদিও শিল্প-রচনার দিক দিয়া ইহা পুরাপুরি ব্যর্থ হইয়াছে।

উপসংহারে ক্লডিও গোরার 'দি ফায়ার অব লাইফ' (জীবনের তাপ) নামক ছবিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গোরা আগে ছিলেন সাধারণ একজন অভিনেতা, আজ চিত্র-পরিচালকরূপে তিনি বিশেষ শক্তির পরিচয় দিতেছেন।

আজিকার দিনে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে নানা সমস্যা দেখা দিয়াছে। নূতন সংস্কৃতির প্রবর্ত্তন এবং পরিমিত সাহসিকতার দ্বারাই শুধু সকল সমস্যার সমাধান হইতে পারে। আজ শুধু ইটালীর নহে, সমগ্র পাশ্চাত্যের চলচ্চিত্রজগৎ এমন একজন শক্তিমান শিল্পীর প্রতীক্ষা করিতেছে যিনি ভাবীকালের মানুষকে নূতন আশায় উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে পারিবেন।

ন. ভ.

"East and West" ত্রৈমাসিক নামক হইতে তথ্যাদি গৃহীত

সত্য ও স্বপ্ন

শ্রীকালিদাস রায়

তুমি কি জান না কবি মরুময় চন্দ্র উপগ্রহ
তারে তুমি নিশাপতি তারানাথ শশী কেন কহ ?
চকোরের মিটাইতে ক্ষুধা,
কোথা পেলে চন্দ্রিকায় সুধা ?

প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে, ক্ষুধায়, তৃষায়,
অথবা নবীন ডিম্ব সৃষ্টির আশায়,
তুমি কি জান না কবি করে থাকে পাখীরা চীৎকার ?
তাহারে সঙ্গীত বলি কেন তুমি করিছ প্রচার ?

তুমি কি জান না কবি ফুলে মধুগন্ধের বসতি
অন্য ফুলে করাইতে পরাগসঙ্গতি ?
পতঙ্গে আহ্বান শুধু ফন্দী প্রকৃতির,
কোথা পেলে তার মাঝে প্রেমলীলা মোহন মদির ?
কোথা পেলে রসাবেশ লাজুক বধূর ?
অলি সে ত তস্কর মধুর।

তুমি কি জান না কবি সূর্য্যতাপে উঠে বাষ্পরাশি,
ঘনীভূত হয়ে তাই মেঘরূপে ঊর্দ্ধে আসে ভাসি' ?
তাহার উদয়ে তব মন কেন উদাস অমন,
তার মাঝে হের মিথ্যা অতীতের মোহন স্বপন।

সবচেয়ে এ বড় অদ্ভুত,
সে মেঘে করিতে চাও প্রেয়সীর বার্ত্তাবহ দূত।

ধীরে ধীরে কহিলেন কবি,
তোমার দৃষ্টিতে দেখে জানি বন্ধু জানি আমি সবি।
আরো জানি নারীদেহ অস্থিমজ্জা মেদোরক্তময়,
তার স্তন্যাধারযুগ মাংসপিণ্ড ছাড়া কিছু নয়।
রূপের মাধুর্য্যে তবু সে দেহের পাই না'ক সীমা,
প্রেমে তারই মগ্ন রই, বর্ণিতে মহিমা
ক্লান্ত নহি কোন দিন, তার মাঝে আমি দেখিলাম
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ আর কাম।

একা আমি মুগ্ধ নই, তুমিও তাহাই
আমার রয়েছে কল্পস্বপ্নদৃষ্টি, তোমার তা নাই।
রূপে-রসে-গন্ধে-স্পর্শে-শব্দে শুধু উপাদান লভি,
নূতন করিয়া গ'ড়ে নিই আমি সবি
মনের মাধুরী দিয়ে, স্বপ্ন দিয়ে তাই আমি কবি।

মহাসুপ্তি

শ্রীঅমরকুমার দত্ত

মধুর তোমার আলিঙ্গনেতে প্রিয়
চেতনা হারায়ে শয়ন লভি গো যবে,
অধরে অধর রাখিয়া মরিয়া যাই
বেপথু হৃদয়ে কম্পিত অনুভবে।

অমৃত-সরস সে মোহ পরশটুকু
নীরব মধুর নিবিড় সুপ্তিতলে,
আত্মারে মোর উধাও লইয়া যায়
অমরায় যেথা অমর প্রদীপ জ্বলে।

বাহিরে ধরণী কি জানি কেমন করি'
ধীরে অতি ধীরে অচিন্ হইয়া যায়,
অন্তর মোর ধূলির কক্ষ ছাড়ি'
স্বরগের পানে পক্ষ মেলিয়া ধায়।

সুনীল আকাশে যেন দেখিবারে পাই
তোমার নয়ন-তারকা রয়েছে আঁকা,
সুরমণ্ডলে মোদের পরাণ দুটি
মিলিছে সেথায় বন্ধ করিয়া পাখা।

সেথায় তোমার বাস্তব পরশ প্রিয়
কত সুমধুর পারি না বুঝিতে আমি,
মহাসুপ্তির নিবিড় আবেশ ভরে
অন্তর মোর ঢেকে যায় দিবাযামী।

ভিতরে বাহিরে আঁধারে-আলোকে এক
জাগে আনন্দ শান্তির পারাবারে,
অসীম শূন্যে তারকার আঁখি ভাতি
লুপ্ত হইয়া মুছে যায় একেবারে।

আলোকের মাঝে চাহিয়া দেখি যে তবে
স্বর্ণ গলিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে,
পরমানন্দে বিশ্ব পূর্ণ হয়ে
হৃদয়ের 'পরে পরতে পরতে ঝরে।

বাহুর ডোরেতে বাঁধা হয়ে যবে থাকি
চেতনা আমার লুপ্ত হইয়া যায় ;
গভীর সুপ্তি নীরবে কখন আসি,
সত্তারে মোর নিয়ে যায় কোথা হায়।

তড়িৎ-লতা

শ্রীপ্রভুল গঙ্গোপাধ্যায়

৭

তখন অনেক রাত। অন্ধকার গেঁয়ো রাস্তায় চলেছি চার-পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন দলে, বিভিন্ন পথে। কিন্তু অবশেষে মিলতে হবে আমাদের সবাইকে এক গাছের নীচে।

কোথাও ক্ষেত, কোথাও ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল। কাহারও মুখেই কথা নেই, মনের সমস্ত শক্তি নিবদ্ধ হচ্ছে ঐ আগত ক্ষণের মধ্যে। তাড়াতাড়ি হাঁটবার উপায় নেই। একে অচেনা পথ, তায় এমনি ঘন অন্ধকার, মনে হচ্ছিল যেন শরীরে তার স্পর্শ অনুভব করতে পারছি। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে যেমন লোকে দু'হাতে ছোট ছোট গাছপালা সরিয়ে এগোয়, এ যেন তেমনি করেই অন্ধকার ঠেলে পথ এগোতে হবে বলে মনে হচ্ছিল! তখন আমরা হাঁটছিলাম একটা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। গাছপালা নীরব, নিথর, নিরীহ ভদ্র-সন্তানদের ডাকাতি করবার সাহস দেখে বোধ হয় স্তম্ভিত হয়েছিল। আমার বুকের মধ্যে কিন্তু দুরু দুরু করছিল, হৃৎপিণ্ডে রক্তচলাচলের শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা বিশাল মাঠে এসে পড়লাম। আকাশ মিলেছে ঐ দিগন্তে মাঠের সীমারেখায়। অগণিত তারা মিটি-মিটি করে আমাদেরই লক্ষ্য করছে। হঠাৎ বিনুদা গান ধরে বসলেন—

নিশি অবসান প্রায়,

শ্যাম আর কেন হে কর দেরী

আমরা যে অবলা বালা।

বিনুদা তা হলে গাইতে পারেন। তখন বেশ কৌতুকবোধ করেছিলাম সন্দেহ নেই, কিন্তু একটু পরেই জানতে পারলাম ওটা হচ্ছে সঙ্কেত। দূরে একটা মানুষের ছায়া ফুটে উঠল। আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। সন্দেহ হ'ল—কিরে বাবা, তুমি আবার কে? বিনুদাকে এ বিষয়ে সতর্ক করব কি করব না ভাবছিলাম, হঠাৎ দেখি বিনুদা আমাদের ছেড়ে একটু জোরে হেঁটে গিয়ে লোকটির সঙ্গে মিলিত হলেন। কি যেন কথা হ'ল, তারপর আবার দু'জনে ছাড়াছাড়ি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা গিয়ে পৌঁছলাম একটা প্রকাণ্ড গাছের নীচে। গাছের তলাটায় অন্ধকার যেন জমে আছে। সেখানে তখন আর সবাই উপস্থিত, সকলেই নীরব।

বিনুদা অন্য দুই ছেলেকে নিয়ে আশে-পাশে একটু ঘোরাঘুরি করে টর্চ জ্বেলে একটা কাগজের উপর থেকে নীচ পর্য্যন্ত ভাল করে দেখে নিলেন। টর্চের আলো ছড়িয়ে না পড়তে পারে এমন ভাবে ভাল করে ঢেকে নিয়েছিলেন। তালিকাভুক্ত সকলে এসেছে কিনা জেনে নিলেন। তারপর আমাদের সবাইকে ভাল করে বলে দিলেন—চারটি ঘরে চার জন করে ষোল জন, বাড়ীর সামনে দুই জন, পেছনে দুই জন প্রহরী। দুই জন ঘুরে ঘুরে সব দেখবেন আর বিনুদা স্বয়ং পরিচালক। আমরা সবসুদ্ধ তেইশ জন ছিলাম।

আমরা তখন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পর পর দাঁড়িয়ে আছি। বিনুদা একে একে আমাদের সকলের কপালে দেবতার আশীর্ব্বাদী ফুল ছুঁইয়ে দিলেন। দেবতার আশীর্ব্বাদ যেন হৃদয় স্পর্শ করল। এক স্বামীজী ছিলেন আমাদের সমিতির পরম শুভাকাঙ্ক্ষী। এমনি বিপদের ঝুঁকি নিতে হলে তিনি তাঁর পূজার আশীর্ব্বাদী ফুল পাঠিয়ে দিতেন।

তার পরের পর্ব্ব—সকলের হাতে তার কর্ম্ম অনুসারে হাতিয়ার বণ্টন করা। কার হাতে কি থাকবে পূর্ব্বেই স্থির করা ছিল এবং তালিকায় লেখা ছিল। আমার হাতে এল একটা পিস্তল। সকলের মুখেই লাল মুখোশ, লাল সালু-কাপড়ের তৈয়ারি, চোখ আর নাকের দিকটা ছিদ্র করা। কয়েক জনের হাতে বোতলের মশাল। বোতলের ভিতরে কেরোসিন তেল, মুখে বড় পলিতা কাদামাটি দিয়ে আটকানো।

প্রত্যেককেই আবার একবার করে তার যথানির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য বুঝিয়ে দেওয়ার পর সকলকে অগ্রসর হওয়ার সঙ্কেত দেওয়া হ'ল।

নির্দ্দিষ্ট বাড়ীর সম্মুখে পৌঁছে মশালগুলি একই সঙ্গে জ্বেলে, একটা বিকট আওয়াজ করে বিদ্যুদ্‌গতিতে আমরা সবাই বাড়ী ঢুকে পড়লাম। মুহূর্ত্তমধ্যে যে যার নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করল। বাড়ীর সামনে ও পিছনে দু'জন করে লোক দাঁড়িয়ে গেল রাইফেল নিয়ে পাহারা দেওয়ার জন্য, কেউ যেন আমাদের অতর্কিতে আক্রমণ করতে না পারে। আর অন্য দুই বাড়ীর চারদিক ঘুরে পাহারা দিতে লাগল। বিনুদা একপাশ পরিদর্শন করতে লাগলেন, ও ঘুরে-ফিরে যথাযথ নির্দ্দেশ দিতে লাগলেন, কোথাও বা দরজা-ভাঙ্গা কি সিন্দুকভাঙ্গায় সাহায্য করতে লাগলেন।

আমাদের দল একটা দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকল। ঘর তখন অন্ধকার। টর্চ ফেলে দেখতে পেলাম একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন। তক্তপোশের উপর ছিল এক বৃদ্ধ, তাকে আলোটা জ্বালতে বলা হ'ল। আমরা জ্বালাতে চাইলাম না, বাজে কাজে কেউ জড়িয়ে না পড়ার জন্য।

ভীতিবিহ্বল বৃদ্ধ কম্পিত হস্তে ও কাজটা কিছুতেই করতে পারছে না দেখে দরজার আড়াল থেকে একটি যুবতী মেয়ে (বোধ হ'ল ঐ ভদ্রলোকের পুত্রবধূ, বয়স বছর বাইশ-তেইশ হতে পারে) বেরিয়ে এসে বললেন, বাবা, দিন আমিই জ্বেলে দিচ্ছি। আপনি ভয় পাবেন না, এরা ডাকাত নয়। কথা শেষ করেই বৃদ্ধকে আড়াল করে নিজে আলোটা জ্বালিয়ে দিলেন। আলো জ্বলতেই মহিলাটির সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কার ঝলমল করে উঠল।

এই ঝলসানিতে প্রলুব্ধ হয়ে আমাদের একটি ছেলে তার হাত খপ করে ধরে ফেলে বলল, তোমার গহনাগুলি খুলে দাও ত।

ওর অদৃষ্ট খারাপ। তখনই বিনুদা ঘরে ঢুকলেন। অবস্থা দেখেই, বুঝি তিনি শুনতেও পেয়ে থাকবেন—ওর গালে খুব জোরে চড় কষিয়ে দিলেন—হাত ছাড়, শুয়ার কোথাকার!

ছেলেটি অধোবদনে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রইল। মহিলাটি আস্তে আস্তে সমস্ত গহনা বার করে দিতে লাগলেন। পরিষ্কার উজ্জ্বল বর্ণ, কপালের সিঁদুর প্রভাতসূর্য্যের মত টকটকে লাল। চোখে নির্ভীক দীপ্তি। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে মাথা যেন আপনিই নুয়ে পড়তে চায়। কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে লক্ষ্য করলাম যে, একটি গৃহস্থ বাঙালী মেয়ে ভয়ে চোখ মুখ না ঢেকে অস্ত্রধারী লাল মুখোশপরা ডাকাতের দিকে চেয়ে আছেন! মেয়েটি বিনুদার দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে রয়েছেন, মনে হ'ল চোখ যেন তিনি ফেরাতে পারছেন না, তাঁর সুন্দর চোখ ছুটি দিয়ে যেন প্রীতি ও শ্রদ্ধা ঝরে পড়ছে।

গহনাগুলি খুলে দিতে দেখে বিনুদা সেই ছেলেটিকে বললেন—"দেখ হতভাগা, মেয়েছেলে হয়ে হাসিমুখেই গা থেকে গহনা খুলে দিতে যিনি পারেন, তুই গিয়েছিলি তাঁর গা থেকে গয়না জোর করে খুলে নিতে।"

যুবতী মেয়েটি গা থেকে গহনা খুলতে খুলতে হাসিমুখে বললেন—"মেয়েরা সবকিছু পারে, সোনার গহনা ত তুচ্ছ!" আমার দামী গয়নাগুলো কিন্তু দিলাম না।"

আমরা অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম—তার গায়ে ত আর কোন গহনাই নেই!

তিনি হেসে বললেন—"অবাক হচ্ছেন! এই দেখুন আমার হাতের নোয়া ও শাঁখা—এর চেয়ে মূল্যবান বস্তু আর আমার নেই। এ দেবার শক্তি আমার নেই, আর এ আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতাও কারুর নেই।"

তাঁর এই শ্লেষ বিনুদাকে বিদ্ধ করেছে দেখলাম। যে লোক ছুনিয়ার শত আঘাত অনায়াসে অবহেলা করতে পারে তাকেও এই শ্লেষোক্তি আহত করেছে দেখে আশ্চর্য্য হয়েছিলাম। তিনি বললেন—আপনার কাছে স্বর্ণালঙ্কার বাজে, তুচ্ছ হলেও আমাদের ওরই জন্য এই কাজে নামতে হয়েছে। জোর করে না নিয়ে আপনার কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারলেই খুশী হতাম বেশী। আপনি যদি ফেরত চান তবে তাও দিতে পারি ফিরিয়ে।"

তার পর অনুগ্রহপ্রার্থীর মত অনুনয় করে বললেন—"দেখুন সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন—গয়নাগুলো ফেরত দিতে হচ্ছে। এ-গুলো নিয়ে যান।"

যুবতীটির পাতলা ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে উঠল, বললেন—"আপনারা বড় দুর্ব্বল। ভাবাবেগে কর্ত্তব্যও ভুলে যান।"

বিনুদা যেন আঘাত পেলেন, বললেন—"ঠিক বলেছেন। এগুলো নেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। তবে আপনার দান হিসেবেই চেয়ে নিলাম।

—"থাক, হয়েছে! জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া জিনিষ দান বলে উৎসর্গ করবার ইচ্ছা আমার নেই। এখন নিজেদের কাজ করুন গিয়ে।"

মেয়েটির কথার ঝাঁজ অগ্রাহ্য করে বিনুদা বিনীতভাবে বললেন, "মাপ করবেন। কর্ত্তব্য আমরা করবই। আপনি যাই বলুন—এগুলি আপনার দান বলেই চিরদিন স্মরণ রাখব।"

ততক্ষণ জনা দুই লোক বৃদ্ধকে সিন্দুকের চাবির জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। বৃদ্ধ এত লাঞ্ছনায়ও চাবি দিচ্ছিলেন না। কেবল বলছিলেন—আমার কিছু নেই, কিছুই নেই।

মহিলাটির পা জড়িয়ে বছরতিনেকের একটি শিশু নির্ব্বাক বিস্ময়ে এ দৃশ্য দেখছিল। একজন শিশুটিকে মহিলার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এক হাতে তাকে তুলে ধরে আর এক হাতে তীক্ষ্ণ ধারালো ঝকঝকে ভোজালি উদ্যত করে বললে, "চাবি না দিলে এর গলা কেটে ফেলব।" বৃদ্ধ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আকুল কণ্ঠে বললেন, "সব নিয়ে যাও তোমরা, সব নিয়ে যাও, দাদুভাইকে আমার ফিরিয়ে দাও। ওর মা বড় দুঃখী।"

শিশুর মাও যেন মুহূর্ত্তের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলেন—চোখ জলে ভরে এল, গলা কেঁপে গেল, স্বর রুদ্ধ হ'ল, কথা বলতে পারলেন না। কিন্তু এ সব মুহূর্ত্তের জন্যই। অচিরেই তাঁর হাসি ফিরে এল। বললেন, "মিছে ভয় পাচ্ছেন বাবা, এ কাজ ওরা করতে পারবে না।" আর আমাদের দিকে ঘুরে বললেন, "তা আপনারা পারবেন না, সে ক্ষমতা আপনাদের নেই! শরীরে দয়ামায়া রেখে ডাকাত হওয়া যায় না। সাজলেই ডাকাত হতে পারে না। আমি আপনাদের চিনে ফেলেছি।"

তার এই অসীম সাহস আর নির্ভীক দৃষ্টি ততক্ষণে আমাদের সবাইকে যেন পরাস্ত করেছে। বিনুদা বললেন, "আমরা ডাকাতি করতে এসেছি সত্যি, কিন্তু আমরা ডাকাত নই বোন্। লোকে মিছিমিছি আমাদের ভয় পায়। আমাদের ভয় দেখানোতে ভয় না পেলেই আমরা জব্দ হয়ে যাই। এ গোপন তথ্য আপনি কি করে জানলেন তাই ভাবি।"

বিনুদা শিশুটিকে ছাড়িয়ে নিয়ে ওর মার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। গাল টিপে একটু আদর করে বললেন, "ঐখানেই দাঁড়িয়ে থাক ভাই।" মহিলাকে লক্ষ্য করে বললেন, "ওকে ধরে রাখুন, হঠাৎ আঘাত লেগে যেতে পারে।"

পরে আমাদের লক্ষ্য করে বললেন, "পীড়ন করে যত সময় নষ্ট হবে তার আগে আমাদের হাতিয়ার দিয়েই কাজ সারতে পারব। মিছিমিছি লোককে পীড়ন করা কেন? এস।"

কথা শেষ করেই একটা লোহার ছেনী সিন্দুকের ডালার কিনারে সংযোগস্থলে রেখে বললেন, "হাতুড়ি চালাও। ছেনীর মুখটা একটু ঢুকতেই তিনি নিজ হাতে হাতুড়িটা নিয়ে ঘা মারতে

লাগলেন। আর একটু ফাটল ধরতেই একটা ঈষৎ মুখবাঁকানো ষ্টীলের ডাণ্ডার মুখটা তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নির্দ্দেশ দিলেন—আমাদের দু'জনকে ডাণ্ডার এক ধারে চাপ দেওয়ার জন্য। আমার হাতে পিস্তল দিল, তার 'সেফটি' টানা-ই ছিল, ওটাকে নিরাপদে না রেখে ও কাজ করতে গেলাম; সিন্দুকের ডালাটা খুলে গেল বটে, কিন্তু হাতের চাপে বা অন্য কোন কারণে একটা গুলি গুড়ুম করে বেরিয়ে এল—আর বিদ্ধ করবি ত কর একেবারে বিনুদার উরুতে বিদ্ধ করল।

সিন্দুকের ডালাটা খুলে পড়তেই চকিতে রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রাগুলি ঝক্ ঝক্ করে যেন হেসে উঠল। সোনার মোহরগুলি হতে যেন আলো ঠিকরে বের হতে লাগল। আমাদের সকলের চোখ-মুখ ক্ষণেকের তরে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু এই আকস্মিক বিপদ এই আনন্দোজ্জ্বল দীপ্তিকে ম্লান করে দিল, সবই যেন মর্ম্মান্তিক বিদ্রূপে পরিণত হ'ল। তখনই অন্যান্য ঘর থেকে খবর এল, তারাও পেয়েছে অনেক মুদ্রা।

ক্ষতস্থান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছিল। বিনুদা নিজের পরনের কাপড় দিয়েই ক্ষত স্থান চেপে বসে পড়লেন। প্রকাশ না করলেও মুখ ক্রমে বেদনায় রঞ্জিত হ'ল।

আমারই হাতের পিস্তলের গুলিতে বিনুদার জীবনান্ত হবে এই কথা ভেবে আমি বেদনায় অস্থির হয়ে পড়লাম, স্থান কাল সব ভুলে গিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলাম। এক হাতে নিজের ক্ষতস্থান চেপে, অপর হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বিনুদা বললেন—"ছিঃ। এখন এমনি অবস্থায় দিশেহারা হতে নেই। আকস্মিক দুর্ঘটনা কারও স্বেচ্ছাকৃত নয়। একে রোধ করা যায় না। আমার হাত থেকেও এমনি হতে পারত। এখন বিহ্বল হয়ে পড়লে সব ত নষ্ট হবেই, তা ছাড়া আমাদের সবার হাতেই হাতকড়ি পড়তে পারে। এ সময়ে মন খারাপ করলে কিন্তু কাজও পণ্ড হবে। তুই এজন্য কিছু ভাবিস নে। তোর কোন দোষ নেই। তবে জেনে রাখ, এমনি গুলিভরা পিস্তল বা রিভলবার নিয়ে এমন কাজ করতে নেই—ওটাকে 'সেফটি' বন্ধ করে সাবধানে রেখে তবে অন্য কাজে হাত দিতে হয়। আমারই ভুল হয়েছে—এ বিষয়ে তোদের আগে সাবধান করি নি বলে। ভাগ্যিস তোর নিজের গায়ে লাগে নি।"

"এ তুমি কি বলছ বিনুদা, আমার গায়ে লাগলে এর চেয়ে ঢের ভাল ছিল। তোমার কিছু হলে সমিতির ক্ষতি হবে প্রচুর।"

বিনুদা আমার কথার কোন জবাব দিলেন না। বিমলদাকে ডাকিয়ে এনে বললেন, "আমি ঘায়েল হয়ে পড়লাম ভাই। এখন থেকে তুমিই এই কাজ পরিচালনা কর। টাকা পেয়েছি আমরা অনেক। বহুদিন পর এমন সাফল্যলাভ করেছি। বেশ কিছুদিন ডাকাতির পথে পা না দিলেও চলবে। তুমি টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে চলে যাও। আর শোন, যেতে হবে অনেক দূর, পথঘাটও মোটেই ভাল নয়। আমার পক্ষে হেঁটে যাওয়া একান্তই অসম্ভব। আমাকে নিতে হলে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। বুঝতে পারছ ত বাইরে অনেক লোক বাধা দেবার জন্য জমায়েত হয়েছে। কাজেই আমাকে বয়ে নিয়ে যাবে কি করে? বাইরের লোকের হাতেও যে বন্দুক আছে তার আওয়াজ ত পাচ্ছ।"

কথা বলতে কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বিনুদা বলতে লাগলেন, "ধাতব দ্রব্যের বিষম ভার। যে কুলি দু'মণ চালের বস্তা অক্লেশে মাথায় করে বয়ে নিয়ে যায়, সে দু' হাজার রুপোর টাকা অর্থাৎ পঁচিশ সের পর্য্যন্ত টাকা বয়ে নিতে পারে, তাও অতি কষ্টে, অতি ধীরে ধীরে হেঁটে। কাজেই এত টাকা নিয়ে অপর পক্ষের ব্যূহ-ভেদ করাই মুশকিল। তার উপর আমাকে যদি বইতে হয় তবে তোমাদের ধরা পড়তে হবে নিশ্চয়। রাত থাকতেই তোমাদের পৌঁছতে হবে কোন নিরাপদ স্থানে। আর আমার দেহটা ত জীবিতই থাক আর মৃতই হোক এখানে পড়ে থাকলে পুলিসে সনাক্ত করে ফেলবে। কাজেই আমার মাথাটা···

কথা শেষ হওয়ার আগেই বিমলদা তার মুখ চেপে ধরে বললেন, "থাম, পাগলের মত যা তা বকছিস!" ওদিকে তীব্র বেদনার্ত্ত কণ্ঠে "ওঃ ভগবান" বলে অস্ফুট কণ্ঠে চীৎকার করে যুবতীটি দুই হাতে মাথা চেপে ধরে নিজের কম্পিত দেহটাকে যেন স্থির রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

বিমলদার হাত সরিয়ে দিয়ে বিনুদা বলতে লাগলেন, "অমন অবুঝ হয়ো না ভাই। স্থির হয়ে কথা শোন, আমার শরীর ক্রমে অবশ হয়ে আসছে, ক্ষতস্থানের বেদনাও ক্রমশঃ যেন বেড়ে যাচ্ছে, এর পর হয়ত আর কথাই কইতে পারব না। আমার মাথাটা কেটে ফেল, আর শরীরটাকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়ে যাও যেন কেউ সনাক্ত করতে না পারে। মাথাটাকে যদি টুকরো টুকরো করবার সময় না পাও তবে ছোরা দিয়ে মুখটাকে বিকৃত করে দিও। এই দাগটা দেখে কেউ হয়ত আমার মৃতদেহটা চিনে ফেলতে পারে। মাথাটাকে পথে একটা জঙ্গলে পুতে রেখে যেও, জন্তু-জানোয়ারে খেয়ে ফেলবে, কোন চিহ্নই থাকবে না। আর আমার এই জামা-কাপড় খুলে নিয়ে যেও। ভুলো না কিন্তু। ওগুলো পুলিসের হাতে না পড়ে।

ওদিকে মাথা কেটে নেওয়ার কথা বলামাত্র মেয়েটি "ওঃ" বলে একটা মর্ম্মবিদারক কাতরোক্তি করে দুই হাতে নিজের মাথা চেপে ধরে চোখ বুঁজে মাথা নীচু করে রইল। তার দেহ থর থর করে কেঁপে কেঁপে উঠছে দেখা গেল। বিনুদার চোখ এ দৃশ্য এড়ায় নি, তিনি মেয়েটির দিকে চেয়ে আমাকে ইঙ্গিত করলেন। আমি মেয়েটির মাথায় হাত দিয়ে বিনুদার কাছে যেতে বললাম। কাছে যেতেই বিনুদা সস্নেহে তার হাত ধরে বললেন, "অমন অস্থির হয়ো না বোন, শক্ত হও।" বিনুদার দিকে কিছুক্ষণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে মেয়েটি হঠাৎ অঝোরে কেঁদে ফেললেন।

আশাতীত সাফল্যে যেমন আমরা সবাই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম, তেমনি এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা আমাদের সকলের মধ্যে এনে

দিয়েছিল এক অবসাদ ও নিক্রিয়তা ! কিন্তু বিহ্বলতা আমাদের বিপদ ডেকে আনবে, তাই অবস্থা আমাদের আয়ত্তে রাখবার জন্য বদ্ধপরিকর হলাম। সকলেই বিমলদার আদেশের অপেক্ষা করতে লাগল।

বিমলদার চোখে জল! বিনুদাকে জড়িয়ে ধরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "ছাই টাকা! টাকা দিয়ে কি হবে! ও অনেক পাওয়া যাবে। কিন্তু তোর মত প্রাণ দুটি খুঁজে পাব না। এ আমরা নষ্ট হতে দেব না।"

বিনুদা হাত তুলে বিমলদার চোখ মুছিয়ে দিয়ে তাঁর একটা হাত নিজের বুকে চেপে ধরে প্রীতিঝরা কণ্ঠে বললেন, পার্টির কথা ভেবে দেখ। অর্থাভাবে সমিতির আজ কি দুর্দ্দশা! টাকার অভাবে আজ আমাদের ডাকাতি করতে হচ্ছে! ডাকাতি আমরা পছন্দ করিনে, করতে চাইনে, বাধ্য হয়ে করি। কেউ ত আমাদের অর্থসাহায্য করে না!

কথায় বিনুদার মুখ বিবর্ণ হয়ে আসতে লাগল। যেন হাঁপাতে লাগলেন। একটু জল খেয়ে পুনরায় বললেন, "আজ প্রায় লক্ষ টাকা পাব। সমিতির মঙ্গলসাধন ছাড়া আমার প্রাণের আর কি মূল্য বল ত বিমল!" তা ছাড়া. আমিই ত আজকের নায়ক, আমার আদেশ অমান্য করো না।

বিনুদার এই কথার মধ্যে বিমলদা যেন খুঁজে পেলেন তাঁর পথ। বিনুদাকে ছেড়ে দিয়ে স্থির কণ্ঠে বললেন, "না, তুমি নও, আমি আজকের নায়ক। এইমাত্র তুমি আমার হাতে তুলে দিয়েছ আজকের কাজের ভার একটু আগেই। এখন থেকে আমার আদেশই চলবে।"

বিনুদা আমাদের মুখের দিকে চোখ একবার বুলিয়ে নিয়ে ঈষৎ হেসে বললেন, "ও, তোদের মায়া হচ্ছে, বুঝেছি তোরা পারবি নে।" আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, দে ত পিস্তলটা—

আমি হুকুমমানার অভ্যাসবশে বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে হাত বাড়িয়ে দিতে যাচ্ছি, বিমলদা প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, "সাবধান, পিস্তল দিস নে।" তারপর আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঘোষণা করলেন যে তার কথাই এখন থেকে হুকুম। তখনই নির্দ্দেশ দিলেন—যাওয়ার তোড়জোড় করতে। তিনি বললেন, টাকা-পয়সা কিছু নিয়ে যাব না। পথখরচ ত সঙ্গেই নিয়ে এসেছি। শুধু বি[illegible]দাকে নির্ব্বিঘ্নে বয়ে নিয়ে যেতে হবে লোকের ভিড় এড়িয়ে।

ওদিকে বিনুদা পিস্তলটা চাওয়ামাত্রই [illegible]টি ভীত আর্ত্ত কণ্ঠে 'ও মাগো' বলে চীৎকার করে বিনুদার বুকে[illegible] উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললেন, "তুমি কি মানুষ! এ দেহটা কি তোমার নয়! নিজের গলাটা কেটে ফেলতে হুকুম দি[illegible]ও, তাও নিজের প্রিয় বন্ধুকে—তোমার গলা একটু কাঁপল না[illegible] এত কঠিন তোমার হৃদয়।

বিনুদার বুকের উপর মাথা রেখে চোখের জলে তাঁর বুক ভিজিয়ে দিয়ে মেয়েটি বললেন, "যারা ভালবাসে তাদের কাঁদিয়ে তোমার এত আনন্দ! তুমি এত নিষ্ঠুর।"

বিনুদা মেয়েটিকে নিজের বুকের উপর থেকে সরিয়ে একটু ঠেলে দিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, "এতটা আত্মহারা হতে নেই। স্থির হয়ে ওখানে বসুন গিয়ে। যান বলছি।"

মেয়েটির মুখ ম্লান হয়ে গেল, একটু যেন বিব্রত হয়ে পড়লেন, বোধ হয় একটু লজ্জিতও হলেন। একটু সরে বসে, মনে হ'ল যেন অভিমানাহত কণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ, বড্ড আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম। আত্মহারা হয়ে দূরের মানুষকে এত আপন ভাবতে নেই। মাপ করুন। সত্যি বলতে কি আপনাকে 'আপনি' সম্বোধন করতে মুখে আটকে গেল। বড় লজ্জা বোধ হ'ল, মিথ্যাচার করছি মনে হ'ল। দেবতাকে কেউ 'আপনি' সম্বোধন করে না, আর করে না যাকে—" দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করে বললেন, "যাক, আপনাকে বলা বৃথা, আপনি বুঝতে পারবেন না। তবু একটা কথা বলছি, আত্মহারা হওয়াটা সব সময় হারিয়ে যাওয়া নয়।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কি করে যেন মনে হ'ল যে তার পুত্রবধূটি কোনরকমে বোধ হয় আমাদের বিরক্তিভাজন হয়ে পড়েছে। তিনি এগিয়ে এসে বলেন, "মা, তোমার যা মুখের ধার, এতে রাগ না হয় কার!" তারপর আমাদের দিকে হাতজোড় করে বললে, "আমার মায়ের কথায় আপনারা রাগ করবেন না, মা আমার চিরদুঃখিনী। তাও আমারই দোষে—আমি হীন স্বার্থপর হয়ে এমন—"

মেয়েটি একটা ট্রাঙ্ক খুলতে খুলতে শ্বশুরকে বললেন, "আঃ বাবা, আপনি চুপ করুন। আমাদের এখন অনেক কাজ, আপনি খোকাকে নিয়ে ও ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকুন।"

ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করবার জন্য মাত্র আমার নিজের কাপড় ছিঁড়তে সুরু করেছি, যুবতীটি তখন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, "ও রেখে দিন, ময়লা কাপড়ে ব্যাণ্ডেজ করা যাবে না।" দেখি আমাদের সকলের অজ্ঞাতে ততক্ষণে মেয়েটি পরিষ্কার একখানা সাড়ী ছিঁড়ে ফেলেছেন। আমার পাশে এসে আমায় সরে যেতে বলে নিজেই নিপুণ হাতে পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে আর একখানা ধোয়া সাড়ী আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এটাও সঙ্গে নিয়ে যান, প্রয়োজন হতে পারে।" আলনা থেকে একখানা ধুতি টেনে নিয়ে আমার হাতে দিলেন; বললেন, "ওঁর সমস্ত কাপড় রক্তে ভিজে গেছে, এই ধুতিখানা ওঁকে পরিয়ে দিন।"

বিমলদা সাড়ীখানার পাড় দুটি ছিঁড়ে দিলেন আর ধোপার দাগ সাড়ী ও ধুতির যে কোণটিতে ছিল তাও ছিঁড়ে ফেললেন। মহিলাটি কৌতুক বোধ করলেন, এর উদ্দেশ্য তার চোখ এড়ায় নি। তিনি বললেন, "যাক, হুঁসিয়ার হতে দেখছি একটুও ভুল হয় না!" ঠোঁটের হাসি দাঁতে চেপে বললেন, "সাড়ী বার করতে ট্রাঙ্কটা খুলে রেখে এসেছি। ভেতরটা দেখুন, আপনাদের নেবার যোগ্য কিছু আছে কি না।"

বিমলদার ফর্সা মুখে রক্ত ফুটে উঠল, "সব জেনে বুঝে কেন

আর আমাদের আঘাত দিচ্ছ বোন্। যে স্নেহমমতা দিয়ে আমাদের এই দৌরাত্ম্যকে মাথা হেঁট করাতে বাধ্য করেছ, তার চেয়ে বড় আঘাত আজ পর্য্যন্ত কেউ কোনদিন করতে পারে নি।''

''এতক্ষণে আমাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিচ্ছেন নয় কি?'' বললেন বিনুদা।

''আপনারা বলেই সাহস করে আঘাত দিচ্ছি, ডাকাত হলে একটা কথা বলতেও সাহস করতাম না, আমাদের যে কি দশা হ'ত ভাবলে গা শিউরে উঠে। আর প্রতিশোধ নেব কার উপর? প্রতিশোধের মধ্যে থাকে দেয়া-নেয়ার সম্পর্ক। আমরা ত শুধু পেলামই। আপনারা শুধু দিয়েই গেলেন দেশবাসীকে, পেলেন না ত কিছুই!''

ওদিকে বাইরে লোক জমেছে অনেক। তারা নিরস্ত্র নয়, বন্দুক, বর্শা, রামদা, লাঠি তাদের হাতে। বিমলদা হুকুম দিলেন টাকা রেখে যাওয়ার জন্য। বিমলদা বিউগল বাজিয়ে সঙ্কেতধ্বনি করে সকলকে একত্র করে এক সারিতে দাঁড় করালেন। আমাদের নিয়ম ছিল—বিউগল বা হুইসেলে ''ফল ইন'' করার আদেশ পাওয়া মাত্র সব কাজ ফেলে দৌড়ে এসে একত্র দাঁড়াতে হবে। বিমলদা লোকগণনা করলেন, সকলে উপস্থিত আছেন কি না দেখে নিলেন, সব ঠিক আছে কি না দেখে নিশ্চিত হলেন। বিনুদাকে ঘিরে ব্যূহ রচনা করে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বেরিয়ে যাব, এই ঠিক হ'ল। আমরা প্রস্তুত হলাম যাওয়ার জন্য। বিমলদা বিনুদাকে কাঁধে তুলে নিলেন, অগ্রসর হবার আদেশ দিলেন।

মেয়েটি ছুটে সামনে এসে বাধা দিয়ে বিমলদাকে উদ্দেশ করে বললেন, "দেখুন, দয়া করে এক মিনিট অপেক্ষা করে আমার একটা কথা শুনুন—ওঁকে আপনারা বয়ে নিয়ে যেতে পারবেন না। উনি এরই মধ্যে বোধ হয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। ওঁর জন্য একজন ডাক্তার অবিলম্বে দরকার। আপনাদের কত পথ যেতে হবে তার ঠিক নেই। ওঁকে বয়ে নিয়ে দৌড়ে যেতে পারবেন না। আপনাদের এতগুলো লোকের বিপদের কথা একবার ভেবে দেখুন। আমি বলি ওঁকে এখানেই আমার কাছে রেখে যান। কাল পুলিশ এলে বলব আমার দাদা, ডাকাতদের বাধা দিতে গিয়ে জখম হয়েছেন।''

আমরা সকলেই মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বিমলদা বললেন, "না, তা হয় না।"

''কেন হয় না? আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না? ধরিয়ে দেব মনে করছেন? একটু বিশ্বাস করেই দেখুন না। আপনারা শুধু নিজেদের নিয়েই আছেন কিনা, তাই আপনাদের দলের বাইরেও যে বিশ্বাসযোগ্য লোক থাকতে পারে তা মনেও করতে পারেন না। আমাদের বাড়ী ডাকাতি করেছেন, ধরিয়ে দেওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু চোর চুরি করে চোরাই বাক্সটা ফেলে পালাচ্ছে আর তার পিছু পিছু বাক্সের মালিক দৌড়চ্ছে বাক্স মাথায় করে, চোরকে সেটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে—এমন পুণ্যকাহিনী আমাদের দেশেও আছে। আমি যে এদেশেরই মেয়ে।''

বিমলদা বললেন, ''কিন্তু আপনি জানেন না, ওঁর সবকিছু পুলিসের নখদর্পণে। আপনার স্নেহাঞ্চলে ওঁকে ঢেকে রাখতে পারবেন না। আমাদের সঙ্গেই ওঁকে যেতে হবে।''

বিনুদা মেয়েটিকে ইশারায় খুব নিকটে ডেকে নিয়ে তার হাতে নিজের হাত রেখে বললেন, "তোমার হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিতে পারি একেবারে—একটুও দ্বিধা না করে। তোমাকে প্রাণ দিয়েও বিশ্বাস করি। তোমাকে মুখে ধন্যবাদ দিতে লজ্জা হচ্ছে। তুমি আমাদের অবাক করে দিয়েছ! তুমি আমাদের এমন আপন করে নিয়েছ যে তোমাকে কখনও ভুলতে পারব না। এমন জায়গায় এমন অবস্থায় এরূপ অমূল্য বস্তুর সন্ধান পাব ভাবতেও পারি নি।" বিনুদা মেয়েটির হাতে মৃদু চাপ দিলেন। মেয়েটি যেন কৃতার্থ হ'ল। মেয়েটির চোখের জলের মধ্যেও তৃপ্তির অপূর্ব্ব আভা যেন ফুটে উঠল।

আমরা আর কালবিলম্ব না করে গুলি ছুড়তে ছুড়তে বেরিয়ে গেলাম। অপর পক্ষও আমাদের উপর বন্দুক চালাচ্ছে ও মাঝে মাঝে বর্শা ছুড়ছে।

কয়েক মাইল যাওয়ার পর যখন নিশ্চিত রূপে বুঝতে পারলাম যে আমাদের আর কেউ অনুসরণ করছে না তখন একটা গাছের ছায়ায় বসে অস্ত্রশস্ত্রগুলি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি নিরাপদ স্থানে প্রেরণের সুব্যবস্থা করে আর সবাইকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল চারিদিকে ছড়িয়ে। ফেরবার সময় কে কোন্ পথে যাবে আগেই তা স্থির করা ছিল। কেবল পাঁচ জন রয়ে গেলাম বিনুদাকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

মাইল আষ্টেক দূরে যশোদল গ্রাম পর্য্যন্ত বিনুদাকে কাঁধে করেই বয়ে নিয়ে যেতে হ'ল। সেখান থেকে একটা ডুলি যোগাড় করে প্রায় মাইল পঞ্চাশ দূরে গৌরীপুর চলে গেলাম। আমরা নিজেরাই বেহারা সেজে ডুলি বয়ে নিয়ে গেলাম।

আমাদের পথ অফুরন্ত। মানুষকে এমনি করে হাঁটতে হয়, এই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। দিনের বেলায় পথচলা অসম্ভব। প্রভাতেই সম্ভবমত কোন বিশ্বস্ত সভ্যের নিকট আশ্রয় নিয়ে আবার রাত্রির অন্ধকারে হাঁটতে সুরু করেছি। দিন দুই আশ্রয় নিয়েছি সরল কৃষকের গৃহে। এমনি করে তিন-চার দিন পর এক নিরাপদ স্থানে এসে পৌঁছলাম—সেখানেই মিলল আমাদের আশ্রয়।

খবর পাঠালাম ঢাকায় চাঁদসীর অস্ত্র-চিকিৎসকের কাছে। তিনি ছিলেন আমাদের সমিতির একজন পরম শুভানুধ্যায়ী সভ্য। তিনি ছুটে এলেন। তাঁর নিপুণ চিকিৎসায় বিনুদার ঘা শীঘ্রই সেরে গেল। কিন্তু রক্তক্ষয় হয়েছিল যেজাই, তাই শরীর সুস্থ সবল হতে বেশ কিছুদিন সময় লাগল।

৮

● এই ঘটনার পর কিছুদিনের জন্য বিনুদার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। [illegible]

নিস্তব্ধ রাত্রি। শান্ত নদীর মৃদু কলরোল যেন চুপি চুপি কথা কইছে। নদীর ধারে এক ডিঙিতে বসে বিনুদার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। ছোট ছোট ঢেউ ডিঙির পাশে লেগে ছলাৎ ছলাৎ করে আমার উৎকণ্ঠা ক্রমশঃ বাড়িয়ে তুলছে। এতক্ষণ দেরি হচ্ছে কেন, তার ত অনেক আগেই ফিরে আসবার কথা! রাত তখন বোধ হয় এগারটা হবে। এত রাত্রে এপারে নৌকা রাখবার নিয়ম নেই। সমস্ত নৌকা তখন ওপারে চলে গিয়েছে। ওপারেও নৌকার আলো নিভে গেছে। অত রাত পর্যন্ত তেল পোড়াবার পয়সা দরিদ্র মাঝিদের নেই। ওপারে কারুর কারুর বাড়ী থেকে মাঝে মাঝে আলো চিক্ চিক্ করে উঠছে।

খেয়াপারাপার বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। এক ভদ্রলোক অসময়ে এসে আমার ডিঙি দেখে একটু আশ্বস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু অনেক পীড়াপীড়ি করেও যখন আমায় রাজী করতে পারলেন না তখন অভিশাপ দিতে দিতে চলে গেলেন। বেশী পয়সা দিলেও যে মাঝিরা রাজী হয় না, এই বোধ হয় তার জীবনে প্রথম। আজকাল মাঝিদের পয়সা হয়েছে, তাই তাদের দেমাক। এমনি আরও অনেক মন্তব্য করতে করতে উনি চলে গেলেন।

মনে মনে না হেসে পারলাম না। পোশাক তা হলে মানানসই হয়েছে। খানিক বাদে পুলিশ এসে চৌদ্দগুষ্টির খবর নিয়ে গেল। এবার আমার মেক-আপ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হলাম—অবশ্য রাত্রির অন্ধকার যে আমার সহায় হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তবুও বিনুদার দেখা নেই। উৎকণ্ঠা ক্রমশঃ ভয়ে পরিণত হতে লাগল। হঠাৎ মনে হ'ল কে যেন আসছে, চমকে উঠলাম। তবে কি কেউ আমাদের খবর পেয়ে আসছে। এতক্ষণ নৌকোর পাটাতনের ওপর কাত হয়েছিলাম—উত্তেজনায় সোজা উঠে বসলাম। মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ভাবতে লাগলাম, নিশ্চয় কোন মাতাল। কিন্তু মাতাল হলে আরও মুশকিল। এখখুনি চেঁচামেচি করে একেবারে মাথায় করে তুলবে দুনিয়া!

কিছুক্ষণের মধ্যেই শঙ্কা টুটে গেল। দেখলাম বিনুদা-ই, আস্তে আস্তে নৌকোর কিনারা ধরে উঠছেন। একটু যেন টলছেন, হাঁটুজলে নেমে এক হাত দিয়ে নৌকো ধরে অপর হাতে হাতমুখ ধুয়ে, ভিতরে উঠে এলেন। উঠেই কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে পাটাতনের উপর সোজা হয়ে শুয়ে পড়লেন।

আমি শঙ্কিত হলাম, কি হয়েছে বিনুদা।

কৈ কিছু হয় নি ত। তুই এতক্ষণ ভাল ছিলি ত, কোন হাঙ্গামা হয় নি?

তার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ; কথায় তেজ নেই। আমি প্রশ্ন করলাম, আমায় ফাঁকি দিও না, কি হয়েছে বল না।

আরে না পাগল, কিছু হয় নি। তোর খাওয়া হয়েছে কি? কেমন ছিলি এতক্ষণ? কোন গোলমাল হয় নি ত? স্পষ্টই বুঝতে পারলাম অতি কষ্টে কথা বলতে চেষ্টা করছেন।

না খাই নি, তোমারই অপেক্ষা করছিলাম। একটা পুলিশ এসেছিল। জিজ্ঞাসাবাদ করে চলে গেল, সাধারণ পাহারাওয়ালা কনেষ্টবল।

তুই কি বললি।

বললাম, চাচা গেছে বাজারে তেল আনতে!

ওরা দু'চার পয়সা ঘুষ নিতে আসে। দিয়ে দিলে আর অত জিজ্ঞাসাবাদ করে না।

একটু থেমে পুনরায় হেসে বললেন, তবু যা হোক তুই যে চাচা বলেছিস, দাদা না বলে।

আমি বললাম, তুমিই ত বলে দিয়েছিলে আমরা সবাই যে পরস্পর সহোদর ভাইয়ের চেয়েও বেশী তা গোয়েন্দা পুলিশ টের পেয়েছে। তাই যখন যা সুবিধে তাই বলতে হবে।

হঠাৎ বিনুদা আমার দিকে উল্টো হয়ে কাত হলেন। পরনের কাপড়টা টেনে নাক মুছে কপালে চেপে ধরলেন। আমার সন্দেহ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। কিছু একটা নিশ্চয় হয়েছে। পাটাতনের নীচে রাখা লণ্ঠনটা বার করে আলো ধরতেই যা দেখলাম তাতে আমার বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। এ কি ব্যাপার, তোমার যে সারা কপাল ছিন্ন ভিন্ন, নাক দিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত পড়ছে।

আমাকে আলো জ্বালতে দেখে বিনুদা ধমক দিলেন। আমি বললাম, আলো জ্বেলে অন্যায় করেছি, কিন্তু এ তুমি কি গোপন করছ বল ত?

তুই অত চেঁচাস নি ওষুধ দিলে এখখুনি সেরে যাবে। দেখ ত পাটাতনের নীচেই বোধ হয় শিশিটা আছে। বার করে দে দিকিন। পরে চিঁড়ে গুড় বার করে নিজেও খা আমাকে যা হোক কিছু দে। আর দেরি করা মোটেই সঙ্গত নয়। আমাদের যেতে হবে অনেক দূর। রাতারাতিই মালপত্র নিরাপদ স্থানে পৌঁছাতে হবে।

তোমার শরীরের ঐ অবস্থা, আমি একা এত পথ কি করে নিয়ে যাব। কোন বিপদ না হয়।

কিছু বিপদ হবে না। আমি শুধু হাল ধরে থাকব। তুই দাঁড় টেনে যাবি, পরিশ্রম আমার কম হবে। আজ রাতের অন্ধকারে যে করেই হোক যেতে হবে।

চিঁড়ে গুড় বার করলাম। চিঁড়েটা ধুয়ে নিলাম নদীর জলে। খানিকটা আমি নিলাম আর বাকীটা দিলাম বিনুদাকে। আহারান্তে বিনুদা ভদ্রবেশ ত্যাগ করে মাঝির বেশ ধারণ করলেন। তিনি বোসেদের বাড়ী গিয়েছিলেন, সে বাড়ীর একটি ছেলের সঙ্গে দেখা করতে হয়েছিল তাই তার ভদ্রবেশ ছিল।

হাল ধরে বললেন, সুরু কর টানতে। আর শোন্, তোকে বলছি ঘটনাটা। অভিজ্ঞতা হবে অনেক। কাজে লাগতে পারে—

গিয়েছিলাম বোসেদের বাড়ী। মনে করেছিলাম ক্ষীরোদ ওর পড়ার ঘরেই থাকবে। আমায় দেখলে ঘরে ডেকে নিয়ে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, ও বাড়ী ছিল না। কাকে জিজ্ঞেস করি বল। নিরাপদ মনে করলাম না।

ওদের বসবার ঘরের বারান্দায় বসে কয়েকটি যুবক তখন বেশ আড্ডা জমিয়েছে। বারান্দাটা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। রাত্রির নিস্তব্ধতায় ওদের কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। পাড়াগাঁয়ের লোক তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়ে। তাই এমন নিঝুম। দু'চার কথা শুনেই বুঝতে পারলাম, ওরা একেবারেই আড্ডাবাজ আর গোয়েন্দভীতিই হচ্ছে ওদের আলোচ্য। ওদের কাছে জিজ্ঞেস করা বোলতার চাকে ঢিল ছোঁড়ার মত বিপজ্জনক।

খোলা জানালার মধ্য দিয়ে ওদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। এদের মুখেই শুনে শুনে ওদের নামগুলি আমি জেনে নিলাম।

প্রথম কে যে কথাটা বলেছিল তা ঠিক ধরতে পারি নি, কিন্তু ওটাই হ'ল গিয়ে সূত্রপাত। কে যেন বলল, আজকাল স্পাইয়ের যা উৎপাত বেড়েছে তা আর কি বলব।

এই কথা শোনামাত্রই ওদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলাম। সবাই যেন একটু নড়ে চড়ে বসল এবং এতক্ষণে একটি রসালো বস্তুর সন্ধান পেয়েছে বলে মনে হ'ল। প্রথম উৎসাহ কেটে যেতে বোধ হ'ল—সবার চোখে যেন উদ্বেগের চিহ্ন। এর অবশ্য কারণ ছিল। এদের সবই হচ্ছে গিয়ে সেই শ্রেণীর যাদের উপর 'মুখেন মারিতং জগৎ' কথাটা প্রযোজ্য।

আড্ডায় বসে ইংরেজ নিপাত না করতে পারলে ওদের দু'বেলা ভাত হজম হ'ত না। ওদের কাছে ওটা ফ্যাশান। তাই ওদের ভাবনা যে, স্পাই ওদের পেছনে নিশ্চয়ই লেগে আছে। যদি স্পাই পেছনে না থাকে, তবে আর স্বদেশী হ'ল কি!

যা হোক ওদের আলোচনা শুনতে মন্দ লাগছিল না। ঘরে বসেই ইংরেজের নৌবহর ডুবিয়ে দিচ্ছে সমুদ্রের অতলে। কখন কখনও ফরাসী, রুশ, জার্মান, মায় আফগানিস্থান আর নেপালের সাহায্যে তাড়াচ্ছে ইংরেজকে দেশ থেকে। এর পরেও চরম আছে—শুনলাম একটু বাদেই। একজন বললে, এতক্ষণ সে চুপ করে ছিল—কেন ধর না আমাদের স্বাধীন ত্রিপুরার কথা। ও-রাজ্যের মহারাজ কি করে বসেন তার ঠিক নেই। মহারাজ আসলে ভীষণ স্পিরিটেড। সেজন্যই ত তার সঙ্গে অন্যান্য রাজাদের বনিবনাও হয় না।

আমার হাসি রোধ করা ক্রমশঃই কঠিন হয়ে উঠছিল। এরা মুখেই জটার বাঁধন খুলে দিয়ে পৃথিবীতে বিপ্লবের গঙ্গা বইয়ে দিতে চায়। এদের সিদ্ধান্ত এই যে, দিন আর বাকি নেই—শ্রীঅরবিন্দ নাকি ওদের দাদার কাছে পত্র লিখে এ খবর পাঠিয়েছেন। আবার দাদাই নাকি ওদের জানিয়েছে। এমন কি শ্রীঅরবিন্দের পত্রও নাকি পড়ে শুনিয়েছে।

তোর হয় ত জানতে ইচ্ছে হচ্ছে যে ওদের দাদা কি করে এই গোপন খবর ওদের বললে। আরে ভাঁওতা দিয়ে দল পাকায় এমন দাদাও আছে, আর ওদের ধারণা যে ওদের পরামর্শ ছাড়া দাদার এক পা নড়বার উপায় নেই। এমনি ওরা। তাই ত সমস্ত গোপন খবর ওদের নখদর্পণে। এই সমস্ত থেকেই ওদের সিদ্ধান্ত যে, গোয়েন্দা ওদের পেছনে একেবারেই জোঁকের মত লেগে আছে।

তুই হয় ত জানিস নে নীতীশ, দেশের বর্ত্তমান অবস্থার সুযোগ নিয়ে কত কুমতলব কত লোকে হাঁসিল করে নিচ্ছে দেশোদ্ধারের জীগির তুলে। এরা সুরু করে বড় বড় কথা বলে, কথা ভাঁড়িয়ে সরলমতি ছেলেদের সামনে তুলে ধরে রোমাঞ্চকর এক উজ্জ্বল জীবন—তার পর সুরু হয় চুরি, ডাকাতি, তার পর সমস্ত অর্থ নিজেরা আত্মসাৎ করে সরে পড়ে, মারা পড়ে ঐ ছেলে-গুলো। অবশ্য সবক্ষেত্রেই যে ওরা পরিত্রাণ পায় তা নয়।

ওদের স্পাই-ভীতি হ'ল সবচেয়ে বেশী। তাই ওদের পাল্লায় পড়ে কত দরিদ্র নিরপরাধ লোক, সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক, ফকির, বোষ্টম লাঞ্ছিত হয়েছে তার অন্ত নেই। কেননা ওদের বদ্ধমূল ধারণা এরাই আসলে স্পাই প্রায় সকলেই। তবে ওদের অধিকাংশেরই বরাত ভাল থাকে যে, ওদের হাত নির্দ্দোষের গায়েই পড়ে, সত্যি-কারের স্পাইয়ের গায়ে পড়লে রোগ দু'দিনে ঘুচে যেত।

এতক্ষণ ওদের আলোচনা যে ধারায় চলেছিল, তার পর ওদের সুরু করতে হ'ল কার পেছনে কত স্পাই লেগেছে, আর কে কত ঠেঙ্গিয়েছে। নটবরই কথাটা পেড়েছিল—আরে ভয়ানক, ভয়ানক, ধর না আজকের সন্ধ্যেবেলাকার ঘটনাই বলি, বেড়িয়ে ফিরছি—দেখি একটি আমার পিছু নিয়েছে! বাছাধনকে তিন পাক ঘুরিয়ে এক সুযোগে চোঁ করে বেরিয়ে এলাম। টের পাবার জোটি নেই।

কথাটা শেষ করে নটবর সগৌরবে সকলের দিকে তাকিয়ে একটু নড়ে-চড়ে বসল।

সুরনাথ পিছু হটবার ছেলে নয়। সে বলতে সুরু করল—আরে জানিস সে ভারি মজা—দূরে দেখি এক বাছাধন ঘুরে বেড়াচ্ছেন, হঠাৎ আমার সামনে পড়তেই একেবারে 'অন্ধ নাচার বাবা' সেজে বসলেন। আরে বাবা, আমাদের চোখ এড়ানো কি এত সহজ। ইচ্ছে হচ্ছিল ব্যাটাকে ঠেঙ্গিয়ে স্পাইগিরি একেবারে জন্মের মত ঘুচিয়ে দিই; কিন্তু অনেক কষ্টে চেপে গেলাম।

যাদের বিরুদ্ধে ওদের এই অভিযান তাদের কেউ ওদের কাছা-কাছি থাকতে পারে সে খেয়াল ওদের এতক্ষণ ছিল না। সবাইকে সাবধান করবার জন্য সর্ব্বমোহন বলল, আরে অত চেঁচাস নে, কে কোথায় ঘাপটি মেরে বসে আছে তার ঠিক নেই। কথায় বলে দেয়ালেরও কান আছে। জানিস ত এ বাড়ীর উপর পুলিশের নজর।

সবাই মনে মনে কৃত কর্ম্মের জন্য হয় ত অনুতাপ করছিল। সবাই এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইল। নটবরকে দেখলাম কানে কানে সর্ব্বমোহনের কাছে যেন কি বলল।

সর্ব্বমোহন ল্যাম্প নিয়ে বেরিয়ে এল। তাড়াতাড়িতে আমি

নিজেকে সামলাতে পারলাম না। আমাকে দেখেই হঠাৎ ও আঁতকে উঠল, 'কে?'

মনে মনে আমার হাসি পেলেও চেপে গিয়ে বললাম, ভয় পাবেন না।

আমার জবাব শুনে ওর সম্বিৎ ফিরে এল। ভয় পাওয়া যে ওর একান্তই অনুচিত, বিশেষ করে প্রায় ওর সমবয়সী এক ছেলের কাছেই ও ভয় পাবে এটা মেনে নেওয়া তার পক্ষে একান্ত অসম্ভব। তাই ও চেঁচিয়ে উঠল, ভয়—ভয় আবার কিসের। আপনি কে, আপনার নাম কি, কাকে চাই। একনিশ্বাসে অনেকগুলি প্রশ্ন করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

আমি ক্ষীরোদের বন্ধু, ওর খোঁজে এসেছি।

ততক্ষণে আর সবাই এসে গিয়েছে। শশধর বলে একটি ছেলে ছিল ওদের মধ্যে, সেটি দেখলাম ভারি ওস্তাদ। সে বললে, আসুন ভেতরে, তার পর আপনার সব কথা শুনব।

আমি একটু চিন্তিত হলাম। কিন্তু ওদের সঙ্গে না গিয়ে উপায় নেই। ঘরে ঢোকামাত্রই ওদের সবার মুখে শত শত প্রশ্ন ফুটে উঠল। স্পাইয়ের যে ভূত এতক্ষণ ওদের আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এবার সেটা ওদের ঘাড়ে চেপে বসেছে। নটবরই বারে বারে জিজ্ঞেস করতে লাগল, তুমি কে বাছাধন বল ত, কার খোঁজে এসেছ।

বলেছি ত ক্ষীরোদের খোঁজে।

উঃ, আবার চোখ রাঙায় যে। কি চাই তোমার?

ওর সঙ্গেই আমার প্রয়োজন। আপনাদের কাছে বলবার হলে এতক্ষণে বলতাম।

ক্ষীরোদ বলে এখানে কেউ নেই।

কেন মিথ্যে গণ্ডগোল করছেন বলুন ত? আপনারা আমাকে না চিনলেও ক্ষীরোদের সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দিনের।

তার পুরো নামটি বলতে পারবে?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে মন চাইছিল না, কিন্তু চেঁচামেচি বন্ধ করবার জন্য বললাম, ক্ষীরোদ বসু।

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। পুরো নামটি ত জেনে আস নি দেখছি। সে কি করে?

স্কুলে পড়ে।

তার পর কি জিজ্ঞাসা করবে তার খেই যেন ওরা হারিয়ে ফেলল। হঠাৎ ওদের খেয়াল হ'ল, আমি ওর পুরো নাম বলতে পারি নি, তাই আমি নিশ্চয়ই বদমায়েস। আমি জল ঘোলা করেছি এ সূত্রেই তা ওরা প্রমাণ করতে চায়। তাই ওরা সুরু করে দিল চেঁচামেচি। কিন্তু ওদের একটা মুশকিল হয়েছিল যে, যাকে ওরা ঘাঁটাচ্ছিল সে ছিল একান্ত উদ্বেগশূন্য ও উদাসীন। তবে মুখ্য জানিস ত তাতেই ওদের রাগ ক্রমশঃ বেড়ে উঠছিল। জেরা করে যখন ওদের আশ মিটল না তখন প্রত্যক্ষভাবেই আমাকে অপমানজনক কথাবার্ত্তা বলতে সুরু করল। চোখা চোখা বাণ বর্ষিত হতে লাগল।

ওদের মধ্যে একটি দেখলাম বেশ রসিক—"কেন ভদ্রলোকের ছেলেকে অপমান করছিস, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, যথেষ্ট হয়েছে।"

ভদ্রলোক না ইয়ে। বেটা চোর না হয় স্পাই। নয় ত জানলা দিয়ে উঁকি মারবে কেন?

হাত থাকতে মুখে কেন বাবা? দাও ঘাকতক বসিয়ে— কথায় বলে লাঠির ঘায় বাবো দেবতা খাটে। এখন ভালমানুষটির মুখে রা-টি নেই, উত্তম-মধ্যম পড়লেই একেবারে চড় চড় করে বেরিয়ে আসবে সব কথা।

এতক্ষণে যেন বারুদে আগুনের স্পর্শ লাগল, ওরা একেবারে সবাই আমার ওপর লাফিয়ে পড়ল। তার পর যে যা পারল তাই সুরু করে দিল। তার পরিমাণ বোধ হয় কিছু অনুমান করতে পারছিস।

ইচ্ছে করলে ওদের প্রতিরোধ হয়ত করতে পারতাম। কিন্তু আমার চিন্তা হ'ল যদি ওদের চেঁচামেচিতে সত্যিকারের পুলিশের লোক কিম্বা স্পাই এসে জোটে তবেই হবে মুশকিল। কিংবা সত্যিই যদি ওরা থানায় খবর দেয়? তুই বসে আছিস নৌকোয় একা, কিছু মালও আছে। তোর ত এসব কিছুই জানা নেই যে তুই এখান থেকে চলে গিয়ে আত্মরক্ষা করবি কিংবা মালগুলি বাঁচাবি। ওদের তখন নেশা চলে গিয়েছে। ওদের ছেলেমানুষি আর সহ্য হচ্ছিল না। হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় চাপল। ভাবলাম কৈয়ের তেলেই কৈ ভাজতে হবে। ওদের বললাম, শুনুন, আমাকে একা পেয়ে আপনারা খুব ত বীরত্ব প্রকাশ করছেন। কিন্তু আপনারা জানেন না যে আমি সত্যই একজন স্পাই। একটা বড় মামলা শীগ্‌গির সুরু হবে, তারই সমস্ত আসামী আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনাদের নামে অনায়াসে আমি রিপোর্ট করতে পারি। তার ওপর আমার শারীরিক ক্ষতি যদি পুলিশকে জানাই তা হলে আপনাদের যে কি অবস্থা হবে সে কথাটা একবার চিন্তা করে দেখেছেন কি? প্রথমেই ত কয়েক গাড়ী লাঠি নিয়ে ছুটে আসবে, তার পরের অবস্থা—

সাপের মাথায় ধুলো-পড়া পড়ল। সকলের মারমুখ মুহূর্ত্তমধ্যে বিবর্ণ হয়ে গেল। প্রহার করলে স্পাই যে ওদের ক্ষতি করতে পারে এ হুঁস ওদের একেবারেই ছিল না। সম্ভাব্য বিপদ ওদের হাত অচল করল।

সর্ব্বমোহন ছেলেটি দেখলাম সব ব্যাপারেই অগ্রণী। সেই বললে, বয়ে গেল, ভয় আবার কি, আমি ত আর কোন স্বদেশী ব্যাপারে নেই?

শশধর অত সহজে দমবার পাত্র নয়। সে বললে, ভয়টা কিসের শুনি। যে লোক চুপি চুপি ঘরে ঢুকতে চায়, তাকে ট্রেসপাস কেসে ফেলে একেবারে চোর বলে ধরিয়ে দেব না?

ধরিয়ে দেব বললেই ধরিয়ে দেওয়া যায় না। পুলিশ কি আর

ওকে ধরবে। ফাঁদে পড়বে তুমিই। স্বদেশী মামলা ঠুকে দিলে তখন ঠেলা বুঝবে। আমি বাপু মারতেও বলি নি, আমি এ সব কিছু জানি নে, এ কথা জানিয়ে দিল সর্ব্বমোহন।

সুরেনাথও আর এর মধ্যে থাকতে চায় না। সেও বলল, শশধরটার একগুঁয়েমির জন্ম চিরকাল আমাদের হাঙ্গামা পোয়াতে হয়। আমি বাপু মারধোর চিরকাল অপছন্দ করি।

নটবরও দেখলাম এ ব্যাপারে পিছু-পাও হতে চায় না। সে আমায় সাক্ষী মেনে বলল, আমি আপনাকে একেবারেই মারি নি। শুধু আপনাকে ধরেছিলাম মাত্র।

তখন আমার সমস্ত শরীর আঘাতে ব্যথিত ও ক্লান্ত। ওদের এই ছেলেমানুষি আর কাপুরুষতা দেখে আমার হাসি পেল। তবু ওদের বললাম, ভয় নেই, তবে এমনি ছেলেমানুষি আর কোন দিন করবেন না।

পারলে তখন ওরা নাকে খত দেয়। তখন ওদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল আমায় সাহায্য করবার জন্য। আমি ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এলাম।

এই কাহিনী আমি নির্ব্বাক বিস্ময়ে শুনছিলাম, শুনতে শুনতে আমার শরীর উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল ভীষণ। মনে হচ্ছিল, যদি পেতাম ঐ কাপুরুষগুলোকে হাতের কাছে! আমার নিষ্ফল ক্রোধ নদীর বুকে আছাড় খেয়ে পড়তে লাগল। ঝপাঝপ দাঁড় ফেলছি। নৌকো ছুটেছে দ্রুতগতিতে।

বিমুদা আমাকে বললেন, জানিস, এটা কোন একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। উচ্চ আদর্শ তাদের মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দেয় কিন্তু পথ পায় না। মন দুর্ব্বল হয়ে পড়ে।—নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, না হয় বিপথে যায়।

আরও অনেক আলোচনার মধ্যে আমি ডুবে রইলাম। কেন জানি না আমি একেবারে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। কতক্ষণ দাঁড় বেয়েছি সে সম্বন্ধে আমার খেয়াল ছিল না। খেয়াল হ'ল যখন আমরা আমাদের নির্দ্দিষ্ট ঘাটে এসে নৌকা থামালাম। প্রায় চার ঘণ্টার পথ ঘণ্টাতিনেকের মধ্যে চলে এসেছি।

ক্রমশঃ
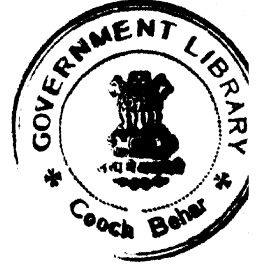
নতুন পাতার জনমতিথির দিনে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বাসরঘরের বাসি কুসুমের সম
আমি যে বিরলে শুনি বিদায়ের বাঁশী।
আজি কোন মালা মর্ম্মের কাছে মম
সোহাগে আবেশে বলে নাকো—ভালবাসি।
আমার এ পথে সন্ধ্যার কালো জলে
খেয়াতরী এসে নিতে চায় মোরে কোলে।
তোমার নয়নে নিশীথের নীলাকাশে
তারকালোকের আরতির শিখা দোলে।

সে যেন কিসের আশা করে অবেলায়,
যার বাঁধাঘাট ভেঙ্গে পড়ে নদীজলে!
কুয়াশা-আকুল হিমেলি হাওয়ায় যার
পঙ্গুর মত দিনগুলি যায় চলে!
নতুন পাতার জনমতিথির দিনে
জীর্ণপাতারে কে বলো ধরিয়া রাখে!
পৃথিবী তোমারে ভালোবাসা দিতে চায়,
আমারে সে আর সমাদরে নাহি ডাকে।

আমার আকাশে সোনালী রঙের রেখা
গোধূলি বেলায় দিগ্‌বধূ এঁকে যায়:
তোমার ভুবনে কল্পনা ফোটে কত,
কুসুমের মত মৃদুল দখিণা বায়।
এখনো তোমার পরিচিত রাজপথে
কত মানসীর দেখা যায় বাঁকা বেণী!
এখনো তোমার স্বপনের সরোবরে
শতদল সনে খেলিছে মরালশ্রেণী।

আমার জীবনে আসে নাই শুভদিন
শুনেছি কেবল(?) আশা-নিরাশার বাণী।
মানুষের মাঝে মানুষ পাই নি খুঁজে
আমি কেন আজো হৃদয়ের সন্ধানী?
এ সংসার-পথে নেমে আসে বেলা মোর,
তোমার প্রভাতী আলোকের কণা ঝরে:
আমার যে গান-হয় নিকো গাওয়া আজো
রেখে গেনু কবি! তোমাদের সভাঘরে।

আমাদের জাতিভেদ রহস্য

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতের হিন্দুসমাজ নানা জাতিতে বিভক্ত। বিদেশীরা আমাদের এই জাতিভেদ দেখিয়া বিস্মিত হয়। তাহারা বুঝিতে পারে না—এক ভাষাভাষী, এক দেশবাসী, এবং এক ধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্য-সমাজের মধ্যে এই জাতিগত পার্থক্য কেন? কিরূপে ইহা হইল?

আবার বঙ্গদেশে এই অসংখ্য জাতিভেদ দেখিয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীরাও বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ, বাংলার হিন্দুসমাজ যত অধিকসংখ্যক জাতি এবং উপজাতিতে বিভক্ত, বোধ হয় অন্য কোন প্রদেশে সেরূপ নহে। আমাদের সমাজে এই জাতিগত প্রভেদ এত প্রবল হইল কিরূপে? কত দিন হইতে ইহার সূত্রপাত হয় এবং কেনই বা এই প্রথা নানা শাখা-উপশাখায় বৃদ্ধি পাইল আজ আমরা সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব।

সমাজতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন, অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ যে যুগে আর্য্য-সভ্যতা ভারতে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে আপনার মহিমা প্রচার করিতেছিল, সে যুগে সেই আর্য্যসমাজে কোনরূপ জাতিভেদ ছিল না। তখন আর্য্যসমাজভুক্ত যে-কোন লোক যে-কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিত। কোনও অ-সভ্য সমাজ যখন বুঝিতে পারে যে, কেবল মৃগয়ার দ্বারা স্ত্রী-পুত্রাদি পালন আর সম্ভব হইতেছে না, তখন উক্ত সমাজ মৃগয়ার অতিরিক্ত অন্য কোন বৃত্তি অবলম্বনে সচেষ্ট হয়। এই চেষ্টার ফলে কৃষিকার্য্যের দিকে এবং পশুপালনের দিকে লোকের দৃষ্টি পতিত হয়। ফলে মৃগয়া ত রহিলই, তাহার উপর কৃষিকার্য্য ও পশুপালনে লোক অগ্রসর হইল। কিন্তু এই দুই নূতন বৃত্তি সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল না। বন্য পশু ও আদিম জাতির আক্রমণে এই কৃষিকার্য্য এবং পশুপালন অনেক সময়ে ব্যাহত হইতে লাগিল। তখন এই ব্যাঘাত হইতে পরিত্রাণের জন্য নূতন বৃত্তিদ্বয়কে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইল; ফলে এক শ্রেণীর লোক বাহুবল, অস্ত্রবল এবং বুদ্ধিবলের দ্বারা এই নূতন বিপদ দূর করিবার জন্য নিযুক্ত হইল। সমাজে তখনও জ্ঞানচর্চ্চার প্রয়োজন তত অনুভূত হয় নাই, সুতরাং অনুমান করা যায় যে, বৈশ্য এবং ক্ষ[illegible] বর্ণ সভ্যতা-শৃঙ্গের আরোহণে প্রথম পথিপ্রদর্শক হইয়াছিল। যাহারা পশুপালন এবং কৃষিকার্য্য করিত তাহারা আর্য্যসমাজে "বৈশ্য" নামে এবং যাহারা উপদ্রব নিবারণের জন্য ব্যাপৃত ছিল তাহারা "ক্ষত্রিয়" নামে অভিহিত হইল।

ক্ষত্রিয়দিগের বাহুবলে রক্ষিত সমাজ এইরূপে যখন শান্তি[illegible] ভোগ করিতে লাগিল তখন সেই সমাজের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান ছিলেন তাঁহারা জ্ঞানচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলেন। কারণ তাঁহারা দেখিলেন যে, কেবল বাহুবল বা পশুবলের দ্বারা কোন সমাজের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না। সমাজের উন্নতির জন্য বুদ্ধিবলেরও আবশ্যক। আবার জ্ঞানচর্চ্চা না হইলে বুদ্ধিবলও সম্যক্ পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। আবার অপর দিকে বাহুবলশালী এক দল লোক না থাকিলে সমাজের সেবা হয় না। যাহারা এইরূপে কেবল শারীরিক শক্তির দ্বারা সমাজসেবায় নিযুক্ত হইল, তাহারা সমাজের সেবক বা দাস বলিয়া অভিহিত হইল। এই দাস শ্রেণীর অধিকাংশই অনার্য্য জাতি হইতে গৃহীত হইল। যে সকল অনার্য্য আর্য্যদিগের সংস্রবে আসিয়াছিল, তাহারা আর্য্যদিগের অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ ও ক্ষুদ্রকায় ছিল। সেই জন্য তাহারা "ক্ষুদ্র" বলিয়া কথিত হইত। এই ক্ষুদ্র শব্দ কালসহকারে "শূদ্র" শব্দে রূপান্তরিত হইয়াছিল। এইরূপে ভারতীয় আর্য্যসমাজে চারিটি পৃথক বর্ণের সৃষ্টি হইল। বাহুবল অপেক্ষা বুদ্ধিবল শ্রেষ্ঠ সেই জন্য বুদ্ধিজীবীরা সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন। সমাজ তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণে বিভক্ত হইল। কিন্তু তখন এমন কোন নিয়ম ছিল না যে, ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই তাঁহাকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে বা ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের পুত্র হইলে তাহাকে ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য হইতে হইবে। তখন জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা লোকের বর্ণ নির্দ্ধারিত হইত। গীতাতেও আমরা দেখিতে পাই যে, জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারাই আর্য্যসমাজ চারি বর্ণে বিভক্ত হইয়াছিল; বর্ত্তমান কালে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যেরূপ জ্ঞান ও বিদ্যার পরিমাণ অনুসারে কাহাকেও বি-এ কাহাকেও এম-এ প্রভৃতি উপাধি প্রদান করে, কিন্তু বি-এ উপাধিধারীর পুত্রকে বি-এ বলিয়া বা এম-এ উপাধিধারীর পুত্রকে এম-এ বলিয়া অভিহিত করে না। সেকালের প্রাচীন আর্য্যসমাজেও বর্ণাশ্রমিগণ পৈত্রিক মর্য্যাদা পাইত না। সকলেই নিজের জ্ঞান ও বৃত্তি অনুসারে চতুর্বর্ণের অন্তর্গত হইত। ক্রমে ক্রমে এই বর্ণ বংশগত হইল, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের পুত্র বৈশ্য এবং শূদ্রের পুত্রেরা শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইল।

আর্য্যসমাজ চারি বর্ণে বিভক্ত হইবার পরে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে সময় সময় বিবাদ-বিসংবাদ হইত এমন কি যুদ্ধবিগ্রহও হইত। ব্রাহ্মণ পরশুরাম কর্তৃক এক সময় ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইয়াছিল তাহা রামায়ণের পাঠকগণ অবগত আছেন। এই বিবাদের ফলে শেষে বোধ হয় এরূপ একটা মীমাংসা হইয়াছিল যে, ব্রাহ্মণগণ ভোগস্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক সমাজ হইতে দূরে অবস্থান করিবেন এবং সমাজের উন্নতির জন্য নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিবেন। ক্ষত্রিয়েরা রাজ্য শাসন করিবেন এবং তাঁহারা

ব্রাহ্মণকে সমাজের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া স্বীকার করিবেন। সে সময় বোধ হয় এই চতুর্বর্ণের ব্যবস্থা বংশগত হইয়া পড়িয়াছিল—কেননা আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই যে, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয়-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মণ-সমাজভুক্তই ছিলেন।

এই চতুর্বর্ণে বিভক্ত সমাজব্যবস্থা বুদ্ধদেবের সময় পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। বুদ্ধদেবই প্রথমে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন—তিনি সমাজের এই বর্ণভেদ স্বীকার করিলেন না। তাঁহার মতে সকল মানুষই সমান। বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্ম যে-কোন ব্যক্তি গ্রহণ করিলেই বৌদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত। এই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্লাবনে পূর্ব্ব-ভারত অর্থাৎ বর্ত্তমান বঙ্গদেশ, বিহার, আসাম, নেপাল, ভুটান এবং সিকিম প্রভৃতি দেশও প্লাবিত হইয়া গেল। আমাদের বঙ্গদেশে মাত্র কয়েক শত ঘর ব্রাহ্মণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, কুলাচার্য্যদিগের মতে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণ নিজেদের ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের চর্চ্চা না থাকায় তাঁহারা নামেই ব্রাহ্মণ রহিলেন, বেদোক্ত যাগ-যজ্ঞাদি ও কর্ম্মকাণ্ডের জ্ঞান তাঁহাদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

বঙ্গদেশে এই বৌদ্ধপ্লাবন সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অব্যাহত ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৌদ্ধসমাজে জাতিভেদ ছিল না, এখনও নাই। সেই জন্য বৌদ্ধযুগে সর্ব্বত্র অন্তর্বিবাহ বিশেষ প্রবল ছিল। পাত্র বা কন্যা যে বর্ণেরই হউক না কেন, তাহাদের বিবাহে কোনও বাধানিষেধ ছিল না। ফলে বঙ্গদেশে বহু বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হইয়াছিল। এক-দেশবাসী, এক-ভাষাভাষী এবং এক-ধর্ম্মাবলম্বী হওয়াতে সমাজে উচ্চনীচ ভেদবৈষম্য ছিল না। প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাংলার হিন্দু রাজা আদিশূর বঙ্গদেশে পুনরায় বর্ণাশ্রমাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাহার কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ-ভারতে শঙ্করাচার্য্য অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও যুক্তিবলে বৌদ্ধ-শ্রমণদিগকে পরাস্ত করায় তথায় পুনরায় বৈদিকধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়। সে সময়ে দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যকে বিশেষ বাধার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। কিন্তু বঙ্গদেশের অবস্থা সেরূপ ছিল না। বঙ্গের পালবংশীয় নৃপতিগণ বৌদ্ধ ছিলেন। সেনবংশীয় নৃপতিদিগের মধ্যেও অনেকেই বৌদ্ধ ছিলেন। বঙ্গদেশে আদিশূর বৈদিকধর্ম্ম পুনঃপ্রচারের জন্য বাহুবলের আশ্রয় লইতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। এইরূপ জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে, তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল বীরসেন। বাহুবলে বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত করায় তিনি "আদিশূর" এই গৌরবজনক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তদবধি ইতিহাসে তিনি আদিশূর নামেই পরিচিত।

আদিশূর অপুত্রক ছিলেন। সেইজন্য তিনি পুত্রলাভের আশায় বেদোক্ত পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু সে সময় বঙ্গদেশে যে অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তাঁহাদের মধ্যে কেহই বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বা যজ্ঞাদিতে অভিজ্ঞ ছিলেন না। তখন আদিশূর অনুপায় হইয়া তাঁহার আত্মীয় কান্যকুব্জের অধীশ্বরকে পাঁচ জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। আত্মীয়ের অনুরোধে কান্যকুব্জের রাজা পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে বাংলায় পাঠাইয়া দেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, মহারাজ আদিশূর ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণকে বরেন্দ্রভূমিতে বাস করাইয়াছিলেন। বরেন্দ্রভূমিতে তাঁহারা বিবাহাদি করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ওদিকে কান্যকুব্জেও ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের যে সকল সন্তানাদি ছিলেন, তাঁহারাও পিতৃগণের কোনও সংবাদ না পাইয়া বঙ্গদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আদিশূর তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া সসম্মানে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং বঙ্গদেশে বৈদিকধর্ম্ম প্রচারের জন্য রাঢ়দেশে বাস করাইলেন। এই রাঢ়দেশবাসী পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধরগণ রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। এই আদি পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত পাঁচ জন কায়স্থ-সন্তানও কান্যকুব্জ হইতে বাংলায় আসিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বঙ্গদেশে ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ ও দত্ত উপাধিধারী কায়স্থ-গণের পূর্ব্বপুরুষেরাও বাংলার আদি অধিবাসী নহেন।

যাহা হউক, বাংলায় বৈদিকধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হওয়ায় বাংলার বৌদ্ধসমাজ নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। তখন সকলেই হিন্দু-সমাজভুক্ত হইল। কিন্তু একটা বিষয়ে গোল বাধিল। তাহারা হিন্দুসমাজে কোন বর্ণের অন্তর্গত হইবে? বৌদ্ধযুগে চতুর্বর্ণের মধ্যে বৈবাহিক কার্য্যের দ্বারা বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়াছিল। আমাদের মনে হয় ইহাদিগকে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করিবার সময় যাহাদের শরীরে শূদ্রশোণিত ছিল না, তাহারা নবশাখ বা সৎশূদ্র বলিয়া পরিগণিত লইল। আর যাহাদের শরীরে শূদ্রশোণিত ছিল, তাহারা নবশাখশ্রেণীভুক্ত শূদ্র অপেক্ষা নিম্নতর শ্রেণীভুক্ত হইল। সদ্‌ব্রাহ্মণগণ তাহাদের পৌরোহিত্য করিতে বা তাহাদের দান গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন। তখন যে সকল ব্রাহ্মণ লোভে পড়িয়া বা দারিদ্র্যবশতঃ ঐ নিম্নস্তরস্থ শূদ্রের যজন, যাজন বা দান গ্রহণ করিয়া-ছিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণের বংশধরগণ বর্ত্তমানকালে বাংলার ব্রাহ্মণসমাজে "বর্ণের ব্রাহ্মণ" বলিয়া পরিচিত।

আমার বন্ধু ও সহকর্ম্মী পরলোকগত পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনাদের বাংলায় শুনিতে পাই, বর্ণের ব্রাহ্মণ বলিয়া একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন। কুলীন বা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ তো দূরের কথা তাঁহাদের অন্ন পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না ইহার কারণ কি?" উত্তরে তাঁহাকে বলিলাম, তাঁহারা নবশাখ-শ্রেণীভুক্ত শূদ্র অপেক্ষাও নিম্নতর শ্রেণীভুক্ত শূদ্রদের যজন-যাজনে বা দানগ্রহণে ব্রাহ্মণসমাজে পতিত হইয়াছেন। উত্তরে সখারামবাবু বলি-লেন, "বেশ কথা, কিন্তু মনে করুন, নিম্নশ্রেণীভুক্ত একজন শূদ্র কোন পাপকার্য্য করিয়াছে। সে স্মার্ত্তপণ্ডিতের নিকট হইতে ব্যবস্থা লইল যে, তাহাকে আট কাহন কড়ি উৎসর্গ করিতে হইবে এবং বারটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে। কিন্তু কোনও সদ্‌ব্রাহ্মণ যদি তাহার দান গ্রহণ না করেন, বা সে নিম্নবর্ণীয় বলিয়া

তাহার বাড়ীতে ভোজন না করেন, তাহা হইলে ত সে বেচারার প্রায়শ্চিত্ত করাই হয় না। ঐ প্রায়শ্চিত্ত না করার দরুন যে পাপ, সে পাপের ভার কাহার স্কন্ধে অর্পিত হইবে?" বলা বাহুল্য, সখারামবাবুর এই যুক্তি আমি খণ্ডন করিতে পারি নাই। এস্থলে আর একটি কথাও বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মনে করুন, একজন ব্রাহ্মণ গৃহনির্ম্মাণের জন্য রাজমিস্ত্রী লাগাইলেন। তখন একজন নবশাখ সেই মিস্ত্রীকে নিজের বাড়ীতে কাজ করিতে বলিলে সেই মিস্ত্রীও ত উত্তর দিতে পারে যে, "আমি ব্রাহ্মণের মিস্ত্রী, নবশাখের মিস্ত্রী নই।" ঐরূপ একজন সূত্রধরও ত বলিতে পারে, "আমি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের সূত্রধর, আপনি সুবর্ণবণিক, আমি আপনার বাড়ীতে কাজ করিলে আমার জাতি যাইবে, আমাকে আমার স্বসমাজে পতিত হইতে হইবে।" এইরূপ একজন নাপিত বা রজক কোন নির্দ্দিষ্ট জাতিকে ক্ষৌরকার্য্য করিবার জন্য বা বস্ত্র ধৌত করিবার নিমিত্ত যদি স্বসমাজে পতিত হয়, তাহা হইলে দেশের অবস্থাটা কিরূপ হইবে? এইরূপ যদি কর্ম্মকার, সূত্রধর, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি শিল্পীরা অবাধে সকল জাতির কার্য্য করিতে পারে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণরাই বা কেন সকল জাতির যজন-যাজন করিয়া ব্রাহ্মণ-সমাজ কর্ত্তৃক জাতিচ্যুত হইবেন? কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর পুত্রের সহিত নিজের একটি কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। বিহারীলাল সুবর্ণবণিকের ব্রাহ্মণ ছিলেন। আমি এই বিবাহের কথা শুনিয়া একদিন রবীন্দ্রনাথকে বলিলাম, "আপনি বেনের বামুনের সহিত কুটুম্বিতা করিলেন, ইহাতে আপনাকে সামাজিক মর্য্যাদায় ছোট হইতে হইল না?" হাসিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি ত জান আমরা পিরালী, আমার মেয়েকে বিবাহ করিয়া আমার জামাতার জাতি গেল, না, সোনার বেনের বামুনের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়া আমার জাতি গেল?" অর্থাৎ, তাঁহার বক্তব্য এই, ব্রাহ্মণসমাজের মধ্যে এই যে শাখা-উপশাখা, জাতি-উপজাতি প্রভৃতি রহিয়াছে, ইহার কোন অর্থ হয় কি?

ফলতঃ, আমরা দেখিতে পাই যে, বঙ্গদেশ বৌদ্ধপ্লাবন হইতে আবার বৈদিকধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে নানা জাতি-উপজাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িল। এই সকল জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণের মধ্যে বৌদ্ধমতে বিবাহের ফলে যে সঙ্কর জাতির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহারাই হিন্দুসমাজে নবশাখ বা সৎশূদ্র রূপে পরিগণিত হইল। আর যে সকল সঙ্করজাতির শরীরে অনার্য্য বা শূদ্রের রক্ত ছিল, তাহারা নিম্নশ্রেণীর শূদ্র বলিয়া গণ্য হইল। ইহারাই বর্ত্তমানকালে "তপশীলী জাতি" বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে এইরূপ যে সঙ্করজাতি শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসারে বিবাহিত দম্পতির বংশে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারা সমাজে পতিত হয় নাই। এদেশে এরূপ একটা জনপ্রবাদ আছে যে, ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মাতার গর্ভজাত সন্তানেরাই "বৈদ্যজাতি" বলিয়া পরিগণিত। তবে তাহাদের উদ্ভবকাল বৌদ্ধ-প্লাবনের পূর্ব্বে এবং তাহাদের আদি জনকজননী হিন্দুশাস্ত্রমতে বিবাহিত হইয়াছিলেন। তখন সমাজে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল। সেইজন্য বৈদ্যেরা দ্বিজ-মর্য্যাদার চিহ্নস্বরূপ উপবীত-ধারণের অধিকারী। এইরূপ বিবাহ সমাজে পূর্ব্বে অনেক ঘটিত। আরও পূর্ব্বকালে অনুলোম বিবাহজাত সন্তানেরা পিতৃমর্য্যাদা বা পিতার জাতি প্রাপ্ত হইতেন। মহর্ষি বেদব্যাসের জননী মৎস্যগন্ধা শূদ্র-জাতীয়া। কিন্তু বেদব্যাস শুধু যে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাহা নহে, তিনি মহর্ষিও হইয়াছিলেন।

কিন্তু বৌদ্ধযুগে যখন সকলেই এক জাতি হইল, দ্বিজে ও অ-দ্বিজে কোনও প্রভেদ রহিল না, তখন পরস্পরের বিবাহে উৎপন্ন সন্তান সকলেই এক জাতি হইয়া গেল। পুরাণে উল্লেখ আছে যে, ব্রাহ্মণ পিতা ও ক্ষত্রিয়া জননীর গর্ভে তন্তুবায় এবং কুম্ভকারের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের আদিপুরুষের বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রানুসারে না হইয়া বৌদ্ধমতে হইয়াছিল। সেকালের সমাজ-ব্যবস্থায় দ্বিজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রথম, ক্ষত্রিয় দ্বিতীয় এবং বৈশ্য তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্যের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াও সমাজে শূদ্রশ্রেণীতে পরিণত হয় নাই। ইহার কারণ কি? অথচ আমরা দেখিতে পাই যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ার সম্মিলনে উৎপন্ন তন্তুবায় এবং কুম্ভকারগণ নবশাখ বা সৎশূদ্র রূপে গণ্য হইয়াছে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, বৈদ্যদের আদিপুরুষের বিবাহ হিন্দু-শাস্ত্রের অনুমোদন অনুসারে হইয়াছিল, আর নবশাখগণের আদি-পুরুষের বিবাহ বৌদ্ধমতে হইয়াছিল। সেই জন্যই নবশাখেরা শূদ্র হইল।

এই নবশাখগণ প্রথমে নয়টি শাখায় বিভক্ত ছিল, যথা—

তিলি মালী তাম্বুলী,
কামার, কুমার, পুটুলী,
গোপ, নাপিত, গোছালী।

এই শ্লোকে "পুটুলী" বলিয়া যাহাদিগকে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা বণিক এবং "গোছালী"গণ বর্ত্তমান বারুজীবী বা বারুই। কিছুদিন পরে এই বণিক জাতি আবার চারিটি শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িল। যথা,—(১) গন্ধবণিক, (২) সুবর্ণ বণিক (৩) কাংস্যবণিক এবং (৪) শঙ্খবণিক।

প্রথমে এই বণিকগণ নবশাখ, সুতরাং সৎশূদ্র বলিয়া বিবেচিত হইত। রাজা বল্লালসেনের কোপে পড়িয়া সুবর্ণবণিকগণ সমাজে পতিত হইল। তাহাদের যজন-যাজনের জন্য একশ্রেণীর ব্রাহ্মণও "বর্ণের ব্রাহ্মণ" অর্থাৎ বেনের বামুন বলিয়া গণ্য হইলেন। কিন্তু গন্ধবণিক, কাংস্যবণিক বা কাঁসারি এবং শঙ্খবণিক বা শাঁখারি পূর্ব্ববৎ নবশাখই রহিয়া গেল। সদ্‌ব্রাহ্মণেরাই তাহাদের যজন-যাজন করিতে লাগিলেন।

বুদ্ধদেবের পর বোধ হয় মহাপ্রভু গৌরাঙ্গই জাতিভেদ অস্বীকার

করিয়াছিলেন। তাঁহার মতানুবর্ত্তীরা ও তাঁহার ভক্তগণ সমাজে "বৈষ্ণব" বলিয়া কথিত হইল। নিম্নশ্রেণীর শূদ্রগণও অবাধে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমাদের পল্লীতে কৈলাস নামে একজন চর্ম্মকার বাস করিত। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি যে, কোনও ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে আমাদের বাড়ীতে কৈলাস বা তাহার পরিবারবর্গ উঠানের একপার্শ্বে বসিয়া ভোজন করিত। কিছুদিন পরে কৈলাস সপরিবারে "ভেক" লইয়া বৈষ্ণব হইল। মাংস-ভোজন ত্যাগ করিল। আমাদের পাড়ায় আরও দুই-তিন ঘর বৈষ্ণবের বাস ছিল এবং এখনও আছে। কৈলাস মুচি যখন উঠানে বসিয়া খাইত, তখন অন্যান্য বৈষ্ণবগণ রোয়াকের উপর বসিয়া খাইত। কৈলাস "ভেক" লইয়া বৈষ্ণব হইল এবং উঠান হইতে রোয়াকে তাহার প্রমোশন হইল। অন্যান্য বৈষ্ণবগণের তাহাতে কোনও আপত্তি দেখা যায় নাই। গৌরাঙ্গের প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম জাতি-ভেদের মূলোৎপাটন করিতে গিয়া এক নূতন "বৈষ্ণব" জাতির সৃষ্টি করিল। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আর একটি নূতন জাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। তিনি যখন সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন, তখন মধুসূদন নামক একজন নাপিত তাঁহার ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদন করে। মস্তকমুণ্ডনের পর সেই নাপিত মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া বলিল, "প্রভো, আমি আপনার মস্তক স্পর্শ করিয়াছি। যে হাতে আপনার মস্তক স্পর্শ করিয়াছি, আশীর্ব্বাদ করুন সেই হাতে যেন অপর কাহারও চরণ স্পর্শ করিয়া পদাঙ্গুলির নখ ছেদন করিতে না হয়।" উত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন, "তোমার নাম মধু, তোমার ভক্তিও সেইরূপ মধুর। তোমার মিষ্ট কথায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি এবং তোমার আত্মীয়কুটুম্বগণ মিষ্টান্নের ব্যবসা কর, তোমাদের বংশধরগণ সমাজে "মধুনাপিত" বলিয়া পরিচিত হইবে।" এই মধুনাপিতগণই বর্ত্তমানকালে "মোদক" বা "ময়রা" নামে পরিচিত।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় জাতিভেদ অগ্রাহ্য করিয়া সকল অনুবর্ত্তীকেই এক জাতিতে পরিণত করিয়াছিলেন। ইঁহারা সাধারণতঃ "ব্রাহ্ম" বলিয়াই পরিচিত। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের দ্বারা প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্মে জাতিভেদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা ছিল না। কেবল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ও নববিধান সমাজে জাতিভেদ নাই। গুরুগোবিন্দের প্রচারিত "শিখধর্ম্মে" বা দয়ানন্দ সরস্বতী-প্রচারিত "আর্য্যসমাজেও" জাতিভেদ নাই। আর্য্যসমাজে অনেক মুসলমান, খ্রীষ্টান, এমন কি শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয় পর্য্যন্ত প্রবেশলাভ করিয়াছে। শিখসমাজেও মুসলমান-বংশধরের অভাব নাই। তবে বৌদ্ধধর্ম্ম যেরূপ সমগ্র পূর্ব্ব-ভারতকে এক সময়ে গ্রাস করিয়াছিল, শিখ, ব্রাহ্ম বা আর্য্যসমাজ সেরূপ করিতে পারে নাই। শিখগণ পঞ্জাব প্রদেশে এবং আর্য্যসমাজীরা পশ্চিম ভারতের কিয়দংশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ব্রাহ্মগণের প্রভাবও বঙ্গদেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

ভারতে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে—পাশ্চাত্ত্যশিক্ষা প্রচলিত হওয়ায় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে জাতিভেদের কঠোরতা ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িতেছে। সনাতন হিন্দুসমাজের অন্তর্গত থাকিয়াও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেরই অন্য জাতির অন্নগ্রহণে, এমন কি অন্য জাতির সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে আর আপত্তি দেখা যায় না। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যেরূপ আচরণ করেন লোকেরা তাহারই অনুবর্ত্তন করে। বর্ত্তমানকালে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে শিক্ষিত ব্যক্তিরাই আমাদের সমাজে আদর্শ বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকেন। এই শিক্ষিত-সমাজে যেরূপ আচার-ব্যবহার পোশাক-পরিচ্ছদ, পান আহার প্রচলিত আছে, তাহাই ধীরে ধীরে সমাজের সকল স্তরে প্রবেশ ও বিস্তারলাভ করিতেছে। সুতরাং কিছুদিন পরে রাজধানী ও নগরীর এই সভ্যতা সুদূর মফস্বলের পল্লীগ্রামে প্রভাব বিস্তার করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। পৃথিবীর কোনও শক্তিই ইহাতে বাধা দিতে পারে না এবং পারিবেও না। মুসলমান-শাসনকালে ভারতের শ্রেষ্ঠ সমাজে মুসলমানী আদবকায়দা, বেশভূষা এবং ভাষা প্রবেশলাভ করিয়াছিল; তাহার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

তাহার পর ইংরেজ আমলেও ইউরোপীয় আচার-ব্যবহার বেশভূষা এবং 'এটিকেট' বাংলার শিক্ষিত-সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা একেবারে নির্ম্মূল হইবে না, কতকটা থাকিয়া যাইবে। তবে আশার কথা এই যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ায় আর কোনও বিদেশীয় জাতি মুসলমান বা ইংরেজের ন্যায় ভারতে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। শিক্ষিত ভারতবাসী, বিশেষতঃ বাঙালীর মনে আত্মমর্য্যাদাবোধ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালী জাতি নিজ সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বর বাঙালীর এই আত্ম-মর্য্যাদাবোধ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করুন, ইহাই আমাদের একমাত্র কামনা।

গান

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল

যাহার—একতালা

আকাশ তোমার বন্দনা গায়
বাতাস করে বীজন
ভূমি তোমায় প্রণাম করে
নদী ধোয়ায় চরণ!

ফুলগুলি সব ফুটে উঠে
তোমার চরণ ধূলায় লুটে—
চন্দ্রতারা জ্বালায়ে দীপ
করে আরাধন!

পাখীরা সব আনন্দে গায়
নীল আকাশের সীমা না পায়—
প্রেম-আকাশে চিত্ত করে
করবে বিহরণ!

বিশ্বে মধুর মেলা তোমার
অন্তরে কি লীলা অপার—
খুলিয়া দাও অন্ধ নয়ন
করি দরশন॥

	২´				৩				0				১			
II	সা	সা	মা	|	মা	া	-া	|	মপা	-ধা	পা	|	মা	জ্ঞা	-া	I
	আ	কা	শ্		তো	মা	র্		ব০	ন্	দ		না	গা	য়	

২´				৩				0				১			
মা	ণা	-া	|	ধা	ধা	ণধা	|	পা	-র্সনা	-র্সা	|	-া	-া	-া	I
বা	তা	স্		ক	রে	বী০		জ	০০	০		০	ন্	০	

২´ ৩ 0 ১
ণা ণা -া | পা পা -া | মজ্ঞা জ্ঞা -মা | ণা পা -া I
ভু মি ০ তো মা য্ প্র ণা ম্ ক রে ০

২´ ৩ 0 ১
মা মজ্ঞা -া | জ্ঞা রজ্ঞা -মা | রা -া -া | সা -া -া II
ন দী০ ০ ধো য়া০ য্ চ ০ ০ র ০ ণ্

২´ ৩ 0 ১
II { মা -ণা ধা | ধা ধা -না | না না -র্সা | র্সা র্সা -া I
{ ফু ল গু লি স ব্ ফু টে ০ উ ঠে ০

২´ ৩ 0 ১
র্সা নর্সা -র্রা | র্রা র্সা -া | র্সা নর্সা -র্রর্সা | ণা ধা -া } I
তো মা০ র্ চ র ণ্ ধূ লা০ ০য় লু টে ০ }

২´ ৩ 0 ১
র্সা -র্মা র্মা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া | র্মা র্মা -া | র্রা র্সা -া I
চ ন্ দ্র তা রা ০ জ্বা লা ০ য়ে দী প্

২´ ৩ 0 ১
ণা ণা -পা | পা -র্সা না | র্সা -া -া | -া -া -া I
ক রে ০ আ ০ রা ধ ০ ০ ০ ন্ ০

২´ ৩ 0 ১
ণা ণা -া | পা পা -া | মজ্ঞা জ্ঞা -মা | ণা পা -া I
ভু মি ০ তো মা য্ প্র ণা ম্ ক রে ০

২´ ৩ 0 ১
মা মজ্ঞা -া | জ্ঞা রজ্ঞা -মা | রা -া -া | সা -া -া II
ন দী০ ০ ধো য়া০ য্ চ ০ ০ র ০ ণ্

২´ ৩ 0 ১
II { সা সা -মা | মা মা -া | মা মা -া | মা মা -া I
{ পা খী ০ রা স ব্ আ ন ন্ দে গা য়্

২´ ৩ 0 ১
মা -পা পা | পা পা -া | মা পা -মা | জ্ঞা জ্ঞা -া I
নী ল্ আ কা শে র্ সী মা ০ না পা য়

২´ ৩ 0 ১
ণা -া পা | পা পা -া | মজ্ঞা -া মা | ণা পা -া I
প্রে ম্ আ কা শে ০ চি ০ ত্ত ক বে ০

২´ ৩ 0 ১
মজ্ঞা -া জ্ঞা | রজ্ঞা -মা রা | সা -া -া | -া -া -া } II
ক র্ বে বি০ ০ হ র ০ ০ ০ ণ্ ০

২´ ৩ 0 ১
II { মা -া ণা | ধা ধা -না | না না -র্সা | র্সা সা -া I
বি ০ শ্বে ম ধু র্ মে লা ০ তো মা র্

২´ ৩ 0 ১
না -া র্রা | র্রা র্সা -া | র্সা নর্সা -র্র্সা | ণা ধা -া } I
অ ন ন্ত রে কি ০ লী লা০ ০০ অ পা র্

২´ ৩ 0 ১
র্সা র্মা -া | র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া | র্রজ্ঞা -র্মা র্মা | র্রা র্সা -া I
খু লি ০ যা দা ও অ০ ন্ ধ ন য় ন্

২´ ৩ 0 ১
ণা ণা -পা | পা -র্সা না | র্সা -া -া | -া -া -া I
ক রি ০ দূ ০ র শ ০ ০ ০ ন্ ০

২´ ৩ 0 ১
ণা ণা -া | পা পা -া | মজ্ঞা জ্ঞা -মা | ণা পা -া I
তু মি ০ তো মা য় প্র ণা ম্ ক রে ০

২´ ৩ 0 ১
মা মজ্ঞা -া | জ্ঞা রজ্ঞা -মা | রা -া -া | সা -া -া II
ন দী০ ০ ধো য়া০ য় চ ০ ০ র ০ ণ্

রোস্তমজী

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

ডিসেম্বর মাস, ক্রীষ্টমাস উপলক্ষে ইন্দোরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "রেন্‌বো" হোটেল সরগরম, আশপাশের নানা শহর থেকে আগন্তুকে শহর-ভর্ত্তি। হোটেলটাও দেখবার মত, যেমনি তার নূতন ধরণের কক্ষগুলি, তেমনি তার বহু মূল্যবান আসবাবপত্র। নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের রাজা-মহারাজা, সর্দ্দার-সামন্ত এসে এই হোটেলেই অলঙ্কৃত করে থাকেন। এবার এই হোটেলের দ্বিতলের কক্ষগুলি অধিকার করেছেন এক মরাঠা সামন্তরাজ, তাঁর সভাসদ ও বিশিষ্ট কয়েকজন নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত অতিথি—উর্দ্দীপরা খানসামা, বয় এদের আর বিরাম নেই, খানিক পর পরই ঘন্টি বেজে উঠে, আর 'বয়'রা এ কামরা, ও কামরা করে ছুটাছুটি করতে থাকে। তকমামোড়া সুগন্ধি পান, সর্ব্বোৎকৃষ্ট সিগার, আর হুইস্কি- শ্যাম্পেনের ছড়াছড়ি। সন্ধ্যা হতে না হতেই গোটা রেইনবো হোটেল দীপমালায় আলোকিত হয়ে উঠে, আর কোন কোন দিন বা তবলার তালের সঙ্গে নর্ত্তকীর নূপুরের রুণুঝুনু আওয়াজ হাওয়ায় ভেসে আসে। বহু দূর থেকে দীপমালায় উদ্ভাসিত, নৃত্যগীতমুখরিত রেন্‌বো হোটেলের দিকে চেয়ে সাধারণ পথিক ভাবতে থাকে, আহা এদের কি আনন্দের জীবন!

বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে একজন ইংরেজ, একজন রাজপুত সর্দ্দার ও পার্শী রোস্তমজী উল্লেখযোগ্য ছিলেন। পার্শী রোস্তমজী অতি সুদর্শন, তাঁর মাথার সেই বিশেষ ধরণের পার্শী টুপী, আর "খগরাজ পায় লাজ" তীক্ষ্ণ নাসিকাটি না লক্ষ্য করলে তাকে লোকে ইংরেজ বলেই ভ্রম করত।

রোস্তমজী খুবই আমুদে, কথাবার্ত্তায় দিলখোলা, নানা রকম খোশগল্পে আসর জমিয়ে রাখেন। কিন্তু এত আমোদ-প্রমোদের মধ্যে থাকলেও বিশেষ লক্ষ্য করলে মনে হয়, মাঝে মাঝে তার মুখে কেমন একটা বিষাদের ছায়া খেলে যাচ্ছে।

সেদিনের হলঘরে সামন্তরাজ বন্ধুবৃন্দ-পরিবৃত হয়ে খুব আসর জমিয়ে বসেছেন, অনেক রাত পর্য্যন্ত তাস জুয়া এবং মদ্যপান চলল। সভাভাঙ্গার সঙ্গে স্থির হ'ল পরদিন তারা শিকারে যাবেন।

নিকটবর্ত্তী বিন্ধ্যপর্ব্বতের জঙ্গলগুলি শিকারের জন্য বড় চমৎকার জায়গা। জঙ্গলে বুনো শুয়োর, ভালুক, চিতা কোনকিছুরই অভাব নেই। বন্ধুবান্ধবদের প্রায় অধিকাংশেরই সখ আছে শিকারের, তাই সবাই হাততালি দিয়ে রাজাসাহেবের প্রস্তাব সমর্থন করলেন, এক রোস্তমজী ছাড়া।

রোস্তমজী বললেন, "আমাকে মাপ করুন রাজাসাহেব, আমি শিকারে যেতে পারব না।"

দু'জন সভাসদ হুইস্কি খেয়ে চুর হয়ে ছিল, তারা হাততালি দিয়ে হাসতে লাগল, রোস্তমজী ভয় পেয়ে গেছেন শিকারের নামে। পলকের জন্য রোস্তমজীর মুখ লাল টকটকে হয়ে উঠল, ঘৃণা-ভরা চোখে ওদের পানে তাকালেন, তার পর মুখ ফিরিয়ে যখন বসলেন, তখন তার সমস্ত মুখ একেবারে সাদা, যেন রক্তশূন্য হয়ে গেছে। সর্দ্দাররাজ তার চেহারার এই পরিবর্ত্তন দেখে বিস্মিত হলেন, বললেন, রোস্তমজী শিকারের প্রস্তাবে আপনার কেন ভাবান্তর হ'ল বুঝতে পারলাম না। আপনার সঙ্গে বন্দুক রয়েছে, আমার ত ধারণা আপনি একজন বড় শিকারীই হবেন, তবে শিকারের প্রস্তাবে আপনার এ অনিচ্ছার কারণ কি বলবেন না?

রোস্তমজী ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললেন, "রাজাবাহাদুর, আজ আমাকে মাপ করুন, আপনারা শিকার করে আসুন, আপনাদের শিকারযাত্রা সফল হোক। একদিন নিরিবিলিতে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব।—বলে রোস্তমজী বিদায় নিয়ে নিজ কক্ষে চলে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে আসর ভেঙে গেল। পরদিন সামন্তরাজ সদলবলে শিকারের উদ্দেশে যাত্রা করলেন—তিন দিন পর ফিরে এলেন সঙ্গে দুটো হরিণ, একটা নীল গাই, আর একটা চিতা। হোটেলে হৈ চৈ পড়ে গেল, রাত্রে হরিণের মাংসের বিরাট ভোজ হ'ল, আর চিতার চামড়া খুলে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল দোকানে—তাতে কৃত্রিম চোখ বসিয়ে ও দেহ তৈরি করে দিতে রাজপ্রাসাদের শোভাবর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে।

তারপর হোটেলের বিরাট 'হল' দু'চারদিন চুপচাপ, সবাই ঘুমিয়ে শিকারের ক্লান্তি দূর করতে লাগল। একদিন সামন্তরাজ নৈশ-ভোজের পর রোস্তমজীকে নিজ-কক্ষে নিয়ে এলেন, সোফাতে নিজের পাশে সমাদরে বসিয়ে বললেন, "এবার আমার প্রশ্নের জবাব দিন, আমি খবর নিয়ে জেনেছি, আপনি পূর্ব্বে মস্তুতে একজন নামকরা শিকারী ছিলেন, তবে এখন আপনার এই শিকার-বৈরাগ্যের কি কারণ?

রোস্তমজী ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ থেকে তার কাহিনী বলতে সুরু করলেন:—"আমি পিতার একমাত্র সন্তান, মস্তুতে আমার পিতার মস্ত বড় কারবার, পিতা লক্ষপতি। বহুদিন থেকেই পিতার সাধ পুত্রবধূর মুখ দেখবার। আমাকে তখন শিকারের নেশায় পেয়ে বসেছে, বিয়েতে আমার মন নেই, কোন নারীর দিকে মন দেবার অবস্থা আমার ছিল না। আমার বয়স যখন পঁচিশ তখন একদিন বিকেলে বাবা আমাকে বসবার ঘরে ডেকে পাঠালেন। ঘরের দরজায় ঢুকেই আমি থমকে দাঁড়ালাম, সোফাতে একটি কিশোরী বসে আছে—অপূর্ব্ব রূপসী, আমার জুতার আওয়াজ শুনেই কিশোরীটি মুখ তুলে চাইল, চার চোখের মিলন হ'ল। সে চোখ নামিয়ে নিল, আমি নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলাম,

হঠাৎ হুঁস হ'ল আমি ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর দিয়ে বারান্দায় চলে গেলাম বাবার খোঁজে। দেখি বাবা রেলিং ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন, আমাকে দেখে বললেন, এই যে রোস্তম ভেতরে এস, তোমাকে গুলবেনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি'। বাবার মধ্যস্থতায় গুলবেনের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হ'ল।

খানিক পরে গুলবেন তার আত্মীয়ের সঙ্গে চলে গেলে বাবা আমাকে বললেন, "এবার আর তোর আপত্তি শুনব না, এই মেয়েটির সঙ্গে আমি তোর বিয়ে দেব। মেয়েটির বাবা নৌসারিতে ব্যবসা করেন, এককালে অবস্থা খুবই ভাল ছিল, এখন ব্যবসা মন্দা পড়েছে, তা অর্থের মোহ আমার নেই, এ জীবনে যথেষ্ট রোজগার করেছি, তুই সারাজীবন বসে খেলেও এই অর্থ শেষ হবে না। আমার শেষ বয়সের সাধ, একটি পুত্রবধূ এসে আমার হারানো কন্যার স্থান পূর্ণ করুক, একটি নাতি এসে তার কলরবে আমার গৃহ মুখরিত করে তুলুক।"

আমি বাবার এই অনুনয়মিশ্রিত আদেশের বিরুদ্ধে আপত্তি করতে পারলাম না। গুলবেনের অপরূপসুন্দর মুখখানা আমার চোখে ভেসে উঠল, আমি মাথা নীচু করে আমার সম্মতি জানালাম, বাবার আনন্দের অন্ত রইল না।

কিছুদিনের মধ্যেই বাবা আমার আর গুলবেনের বাগদান-উৎসব খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন করলেন, চার মাস পর বিয়ের দিন স্থির হ'ল। বিয়ের মাসখানেক আগে বাবা আমাকে বললেন, "রোস্তম তুই বোম্বে থেকে ঘুরে আয়, তোর পছন্দমত বিয়ের পোশাক তৈরি করে আন্।"—আর বাবার ভাবীবধূর জন্যেও সাড়ী-গয়না এসবের অর্ডার দিলেন পছন্দ করে আনতে।

আমি বাবার প্রস্তাবে সানন্দে বোম্বে রওনা হলাম সঙ্গে একজন কর্মচারী নিয়ে। বোম্বে যাবার পথে কোন অজুহাতে নৌসারীতে গিয়ে গুলবেনের সঙ্গে দেখা করলাম। অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাকে দেখে গুলবেন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বিদায়-মুহূর্তে গুলবেনের মুখ ম্লান হয়ে এল, শীগগিরই গুলবেন আর আমার চিরদিনের জন্য মিলন হবে এই আশ্বাস দিলাম, বিদায়ক্ষণে তার আরক্ত মুখের ছল ছল দৃষ্টি আমাকে ব্যথিত করে তুলল, আমি তার কুসুমপেলব হাত দুখানি ধরে ওষ্ঠাধরে ছুঁইয়ে বিদায় নিলাম, হায় তখন কি জানতাম, গুলবেন, আমার প্রিয়তমা গুলবেন, আমাকে শেষ বিদায় দিচ্ছে।

আমি তখন বোম্বের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, বড় বড় দোকান ঘুরে ফিরে সাড়ী, গয়না আমার পোশাক এসব কেনা-কাটা করছি, আনন্দভরা দিনগুলো রঙ্গীন প্রজাপতির মত উড়ে যাচ্ছিল। একদিন সকালে আমাদের অগ্নিমন্দিরে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে গিয়ে উপাসনা করে এলাম আমাদের ভবিষ্যৎ মিলিত জীবনের কল্যাণার্থে—কিন্তু সেদিনই সন্ধ্যায় তার পেলাম, নৌসারিতে গুলবেন হঠাৎ প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত মর্মান্তিক খবরটা এল। রাতটা কি দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে কাটল বলবার নয়। পরদিন আমি উদ্‌ভ্রান্তের মত এধার-ওধার ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে মালাবার হিলের উদ্যানে বসলাম। একে একে গুলবেনের কত স্মৃতি মনে পড়তে লাগল। গুলবেন, হ্যাঁ গুল-বেনই, গুলের মতই তার সৌন্দর্য্য ছিল, কি অপরূপ রূপসী ছিল সে। বইয়ের ভাষায় তার রূপবর্ণনা চলে না, তার ঠোঁট দুটি যেন পদ্মকোরক, হাসলে মুক্তার মত দাঁতগুলি শোভা পেত, যখন তার রূপের স্তুতি করতাম, লজ্জায় তার গৌর মুখ লাল হয়ে উঠত, মনে হ'ত যেন একটি তাজা গোলাপ। বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ দুটি কি সুন্দর! তার ঐ আয়ত চোখের দৃষ্টি ছিল স্নিগ্ধ প্রেমভরা। ঐ দৃষ্টিতে আমি আত্মহারা হয়ে যেতাম। ভাবতাম আমি কি সুখী, কি ভাগ্যবান। শুধু যে সে অপরূপ সুন্দরী ছিল, তা নয়, তার স্বভাবও ছিল অতি মিষ্টি, কোমল।

আমার কত রাত মধুর কল্পনায় কেটে গেছে। কত ভাবে, কত রূপে কল্পনায় তাকে বিয়ের সাজে দেখতে চেয়েছি। সাড়ী, অলঙ্কার, এক-একটা কিনছি, আর ভেবেছি তাকে কি চমৎকার মানাবে। আমাদের পার্শী মেয়েরা কপালে সিন্দুরের ফোটা দেয় না, কিন্তু নিয়ম আছে বিয়ের সময় দিতে হয়। গুলবেনের সুন্দর গৌরবর্ণ মুখে, শুভ্র ললাটে, ছোট্ট সিন্দুরবিন্দু, তার কি রূপই না খুলবে। এ সব চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতাম।

গুলবেনের কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে টাওয়ার অব সায়লেন্সে এসে দাঁড়ালাম নিজেই বুঝতে পারি নি, দেখলাম শকুনির দল আকাশে উড়ছে, আর টাওয়ার অব সায়লেন্সের প্রাচীরঘেরা গোল চত্বরে নামছে আর উপরে উঠছে। শরীরটা শিউরে উঠল, ভাবলাম আমার প্রিয়তমা, অপরূপ রূপলাবণ্যবতী গুলবেনের দেহও ও ভাবে শকুন তার তীক্ষ্ণ চঞ্চু দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। অসহ্য বেদনায় আমার সমস্ত হৃদয় টুকরা টুকরা হয়ে যেতে লাগল। মৃত্যুর পর সুন্দর মনুষ্যদেহের কি শোচনীয় পরিণতি।

সুখে হোক, দুঃখে হোক দিন চলে যায়, বসে থাকে না, আমারও দিন কাটতে লাগল, কিন্তু আমি আর মহুতে যেতে পারলাম না। গুলবেনকে পেয়ে শিকার ভুলেছিলাম, আবার শিকার করা সুরু হ'ল, যেখানেই যাই, আশেপাশের জঙ্গলে শিকার করে বেড়াই। গুলবেনের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর মহুতে ফিরলাম, বাবা তখন অন্তিম শয্যায়। বাবার মৃত্যুর পর বাধ্য হয়েই আমাকে মহুতে থাকতে হ'ল সমস্ত কাজকর্ম বিষয় সম্পত্তি দেখবার জন্যে। মৌর জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে সুরু করলাম—একদিন জঙ্গলে রাস্তার মোড়ে দেখা হয়ে গেল পেরিনের সঙ্গে। দুটি তেজী ঘোড়ায় দু'জন সওয়ার, একটি প্রৌঢ়, অপরটি তরুণী। আমার ঘোড়া ওদের অতিক্রম করে চলে গেল। আমি জঙ্গলের দিকে যাচ্ছি আর ওরা ফিরছে। পেরিন আর আমার দু'জনের চোখাচোখি হ'ল, ক্ষুর দিয়ে ধুলো উড়িয়ে আমার সাদা ঘোড়া ছুটে চলল। ভাবতে লাগলাম, কে এই মেয়েটি যে মহুর জঙ্গলে ব্রিচেস পরে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেড়ায়। খোঁজ নিয়ে জানলাম সম্প্রতি কিছুদিন হ'ল

ক্যান্টনমেণ্টে একজন পার্শী মিলিটারী অফিসার এসেছেন, মেয়েটি তাঁরই। মেয়েটি আধুনিকা, আর শিকারের দিকে তার খুব ঝোঁক। একদিন এক পার্টিতে ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হ'ল, আমি ভদ্রলোক ও তাঁর কন্যাকে পরদিন চায়ের নিমন্ত্রণ করলাম। যথাসময়ে ওঁরা এলেন। ভদ্রলোক সোরাবজীর একমাত্র কন্যা পেরিন। সোরাবজী খুব আলাপী। কথাবার্ত্তা বেশ জমে উঠল। পেরিনের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম ছিপছিপে তন্বী শ্যামলী, অপূর্ব্ব রূপসী নয়। কিন্তু চেহারায় আকর্ষণী-শক্তি আছে, চোখ দুটি বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। তার সপ্রতিভ আচরণ ও চালচলন আমাকে আকৃষ্ট করল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি বুঝি শিকার করতে ভালবাসেন? পেরিন মিষ্টি হাসি হেসে বললে, হ্যাঁ।

সোরাবজী বললেন, আপনার মত বয়সে আমিও খুব শিকার করেছি, এখন বয়স হয়েছে, তাই আর শিকারে যাই না তবু বিন্ধ্য-পর্ব্বতের জঙ্গল যখন দেখি মনটা নেচে উঠে শিকারের জন্য। পেরিনের খুব সখ আছে, ছোটবেলা থেকেই সে আমার সঙ্গে শিকারে যেত। একমাত্র মেয়ে বিপদের আশঙ্কায় তার মা কত আপত্তি করতেন, তা মেয়ে সেকথা শুনবে না, মাকে বলত, মা আমাকে ভীরু বানাতে চাও? আজ ওর মা মারা গেছেন দু'বছর, ও এখন স্বাধীন—শিকারে যেতে অস্থির, তা সুযোগ বড় হয়ে উঠে না।

প্রথম পরিচয়ের পর থেকে তাদের সঙ্গে সর্ব্বদাই আসা-যাওয়া চলল, আমি মেজর সোরাবজীর বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলাম। পেরিনের সঙ্গে প্রথমে বন্ধুত্ব, তার পর বন্ধুত্ব ক্রমশঃ গাঢ় হতে হতে ভালবাসায় পরিণত হ'ল। মাঝে মাঝে গুলবেনের অপূর্ব্বসুন্দর মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠত কিন্তু পেরিনের আকর্ষণ এত প্রবল হয়ে দাঁড়াল যে তাকে এক রকম ভুলেই গেলাম। পেরিনের সঙ্গে পরিচয়ের এক বছর পর তার কাছে আমি প্রেমনিবেদন করলাম, তাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে চাইলাম, পেরিন সানন্দে আমার প্রস্তাবে রাজী হ'ল। আমরা উভয়ে বাড়ী ফিরে মেজর সোরাবজীকে প্রণাম করলাম, তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে আমাদের বুকে জড়িয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন, দু'জনে চিরসুখী হও।

সুদীর্ঘ পাঁচ বছর পর মন আবার রঙীন স্বপ্নের জাল বুনতে সুরু করল। পেরিনের সংস্পর্শে এসে, তার গাঢ় ভালবাসার প্রলেপে আমার ভগ্ন হৃদয়ের গভীর ক্ষত মুছে গেল। আবার নিজেকে পরম সুখী মনে করলাম। পৃথিবী আমার কাছে মনোরম হয়ে উঠল।

এমন সময় একদিন খবর এল, মহুর জঙ্গলের ভিতর থেকে একটা বড় চিতা দেখা দিয়েছে। খবর পাওয়ামাত্রই আমি শিকারে যেতে মনস্থ করলাম। পেরিন শুনে বলল, সেও আমার সঙ্গে যাবে। আমি বললাম, না না, এখন তোমার শিকারে-টিকারে যাওয়া হবে না—পেরিন আমার হাত দুখানা ধরে এমন অনুনয় করে বললে, লক্ষ্মীটি আমাকে বাধা দিও না, আমি তোমার সঙ্গে যাবই।—মায়াবিনীর চোখে কি যাদু ছিল জানি না, তাকে বাধা দিতে পারলাম না। সে খুশী হয়ে এক রকম নাচতে নাচতে চলে গেল তৈরি হবার জন্যে। সে যখন প্রস্তুত হয়ে এল, তখন তার দিকে চেয়ে রইলাম। সে সবুজ ব্রিচেস আর সবুজ কোট পরেছে, চুলগুলো বেণী করে উপরে রিবন দিয়ে বেঁধে রেখেছে, পায়ে সেই ভারী বুট জুতা হাঁটু অবধি, হাতে বন্দুক, মুখে চটুল হাসি, চোখ দুটি খুশীর দীপ্তিতে উজ্জ্বল। আমি চট করে টেবিল থেকে ক্যামেরাটা তুলে তার ঐ হাসিমাখা তেজী মুখখানার ফটো তুলে নিলাম।

তারপরে দু'জনে ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলাম। আমাদের ঘোড়া কদমে কদমে চলতে লাগল, সঙ্গীরা শিকারের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে এগিয়ে গেল। সেই জঙ্গলে রাস্তায় দু'জনে পাশাপাশি ঘোড়া চড়ে কত কথা বলতে বলতে চললাম, তারপর এক সময়ে জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। মাঝে মাঝে তার শ্রমকাতর, আরক্ত মুখখানার দিকে চেয়ে দেখি, আর দেহমনে অপূর্ব্ব পুলকের শিহরণ খেলে যায়।

বনের ভিতর গিয়ে দেখলাম মাচান তৈরি হয়েছে, দূরে একটা খুঁটিতে একটা ছাগশিশু বাঁধা আছে। পেরিন সব সুব্যবস্থা দেখে উৎফুল্ল হয়ে আমার আগেই মাচানে উঠল। দু'জনে বহুক্ষণ বন্দুক হাতে নিয়ে বাঘের অপেক্ষায় মাচানে বসে রইলাম। দু'জনেই চুপচাপ, কোন কথা বলবার উপায় ছিল না, কারণ সামান্য ফিসফিস আওয়াজও বাঘের কানে গেলে বাঘ নিকটে থাকলে পালাবে। ঘণ্টাখানেক উভয়ে নীরবে পাশাপাশি বসে রইলাম। সে সময়কার উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠাপূর্ণ তার দেহের স্পর্শ আমার শরীরে লেগে আছে।

ঘণ্টাখানেক পর সত্যি সত্যি ঝোপ নড়ে উঠল, এবং ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এক বিশাল চিতা নিরীহ ছাগ শিশুকে লক্ষ্য করে। অন্ধকারে আগুনের গোলার মত চিতার চোখ দুটা জ্বল জ্বল করে উঠল, আমি পেরিনকে একটু ধাক্কা দিলাম। পেরিন বাঘকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল। বন্দুকের ধোঁয়াটা মিলিয়ে যাবার পর দেখতে পেলাম, ছাগশিশুটি অক্ষত অবস্থায় মৃতবৎ দাঁড়িয়ে আছে, তবে কি বাঘ পালাল? পেরিন বললে, গুলি না লেগে যায়ই না, দূর থেকে একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ শুনে পেরিন মাচা থেকে তর তর করে নেমে পড়ে ঝোপের দিকে এগিয়ে গেল, চোখের পলকে এ ঘটনা ঘটল, আমি পেরিনকে বাধা দেবার অবসর পেলাম না। আমিও লাফিয়ে নীচে পড়লাম। হঠাৎ পেরিনের আর্ত্তনাদে চমকে উঠে যা দৃশ্য দেখলাম, তাতে আমার শরীর ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

ঝোপে লুকানো আহত বাঘটা ক্ষিপ্ত হয়ে পেরিনের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছে তার থাবার আঘাতে পেরিনের হাত থেকে বন্দুকটা দূরে ছিটকে পড়ল। কোন রকমে নিজেকে সচেতন করে পেরিনকে বাঁচাতে উন্মাদের মত পর পর দুটা গুলি ছুড়লাম বাঘের মাথা লক্ষ্য করে। বাঘটা ভীষণ আর্ত্তনাদ করে পেরিনকে ছেড়ে দূরে লাফিয়ে

পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে পেরিনের সংজ্ঞাহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। লাল টকটকে রক্তে তার সমস্ত পোশাক ভিজে উঠেছে, তার পিঠের ডান দিকের একখাবলা মাংস উঠে গেছে, ডান হাতটা অর্দ্ধেক খসে পড়েছে। বন্দুকের গুলির শব্দে, আর বাঘের আর্ত্তনাদে সব লোকজন একত্র হয়েছে—আমার মানসিক যন্ত্রণা অবর্ণনীয়। আহা, আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় পেরিনের সেই নিদারুণ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে আর্তনাদ করে আমি দু'হাতে মুখ ঢাকলাম। পেরিনকে শহরে হাসপাতালে নিয়ে আসা হ'ল। তীব্রবেগে মোটর ছুটল ইন্দোরের শ্রেষ্ঠ ডাক্তারকে আনতে। যথাসাধ্য চিকিৎসার বন্দোবস্ত করলাম, কিন্তু সব ব্যর্থ হ'ল—কয়েক ঘণ্টা অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে পেরিন আমারই কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। শৈশব থেকেই সে অসীম সাহসী ছিল, আর এই দুঃসাহসই তার কাল হ'ল।

আজ দশ বছর ধরে আমার এই অভিশপ্ত জীবন বহন করে চলেছি। সেই নিদারুণ ঘটনার পর থেকে আমি শিকার করা ছেড়ে দিয়েছি। অভ্যাসবশে বন্দুকটা সঙ্গে থাকে মাত্র।"

রোস্তমজী তার কোটে ঝুলানো ঘড়ির মোটা সোনার চেনটা থেকে একটা সোনার লকেট বই বের করলেন, তার ঢাকনা খুলে সামন্তরাজের সামনে তুলে ধরলেন। সামন্তরাজ দেখতে পেলেন বইয়ের দু'পাতায় দুটি নারীর রঙীন ফটো। একটি কিশোরী, হাসিমাখা মুখখানি অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যে ঢলঢল, অন্যটি একটি তরুণীর—মুখে চটুল হাসি, চোখ দুটি বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। রোস্তমজী লকেট বন্ধ করে গম্ভীর স্বরে বললেন, রাজাসাহেব ভাগ্যচক্রের পীড়নে আজ আমি নিষ্পিষ্ট। আমার অর্থের অভাব ছিল না, একের পর এক এভাবে দুটি নারী ক্ষণিকের জন্য এসে আমার জীবন মধুময় করে তুলেছিল; ভেবেছিলাম, আমি অতি ভাগ্যবান, কিন্তু এখন দেখছি আমার মত দুর্ভাগা খুব কমই আছে।—রোস্তমজী ধীরে ধীরে উঠে তার কক্ষে চলে গেলেন। সমস্ত কক্ষটা ব্যথায় থম থম করে উঠল। সামন্তরাজ বহুক্ষণ অভিভূতের মত নীরবে বসে থেকে শয্যাগ্রহণ করলেন। টিপয়ের উপর তাঁর নিয়মিত পেয় হুইস্কির পেগ অমনি পড়ে রইল অস্পৃষ্ট।*

* সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

গ্রন্থাগার-আন্দোলন

শ্রীবিমলকুমার দত্ত

জাতির সম্মুখে আজ যে সকল প্রধান প্রধান সমস্যা দেখা দিয়াছে, সেগুলির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার অন্যতম। কিছুদিন যাবৎ জাতীয় সরকার ও নেতৃবৃন্দ এই বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন, কিন্তু আজও তাঁহারা কোন সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই। বয়স্কদিগের শিক্ষা-ব্যবস্থার সহিত গ্রন্থাগার-আন্দোলনকে যদি একযোগে সুপরিকল্পিত ব্যবস্থার মধ্য দিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়, তাহা হইলে অদূরভবিষ্যতে অশিক্ষা-দূরীকরণ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইতে পারে। কেবলমাত্র শিক্ষাবিস্তারের জন্য নয়—দেশের বেকার-সমস্যা সমাধানেরও ইহা একটি প্রশস্ত পথ।

গ্রন্থাগার-আন্দোলন বলিতে সাধারণতঃ আমরা কি বুঝি? এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য দেশে শিক্ষা ও সুরুচি বিস্তার করা। বিভিন্ন চিন্তাধারা, পরিবেশ ও শিক্ষাবিশিষ্ট নানা ধরণের সাধারণ মানুষের কাছে তাঁহাদের উপযোগী পুস্তকাদি নিয়মিত পরিবেশন করিয়া তাঁহাদের শিক্ষা ও রুচির মান উন্নয়ন করাতেই এই আন্দোলনের সার্থকতা।

দেশের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষাবিস্তার করা স্বাধীন দেশের সরকারের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য। সকল দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনই চিরকাল এই সত্য প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছে। গ্রন্থাগার-আন্দোলনের খরচ অন্যান্য আন্দোলন পরিচালনা অপেক্ষা অনেক কম, কিন্তু একমাত্র টাকার সাহায্যেই এই আন্দোলনকে সার্থক করা যায় না। ইহাকে সম্পূর্ণ সার্থক করিতে হইলে একদল কর্ম্মীর নিঃস্বার্থ ও প্রাণপণ চেষ্টার প্রয়োজন। অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেরও এই সকল কর্ম্মীর চেষ্টা যেদিন জীবনব্রতের পর্যায়ভুক্ত হইবে সেইদিনই আমরা এ আন্দোলনকে সার্থক করিয়া এই দেশ হইতে অশিক্ষা দূর করিতে সমর্থ হইব কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, কার্য্য সুরু হইলে কর্ম্মীর অভাব হইবে না।

আজ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে বেকারসমস্যা এক জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। যদি তাহাদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে দেশের গঠনমূলক অনেক কাজে তাহাদের সাহায্য লাভ করা যায়। গ্রন্থাগার-আন্দোলন পরিকল্পনা যদি জাতীয় সরকার কোনদিন গ্রহণ করেন তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যেই এই সকল বেকার যুবকের কাজের সংস্থান করা যাইবে। সরকারের ভাবা উচিত যে, এই আন্দোলন দ্বারা যে কেবল বেকারদের চাকুরির সুবিধা হইবে তাহা নয়, দেশের শিক্ষিত যুব-শক্তির নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণে কাজ আদায় করিয়া লওয়া যাইবে। তাহাদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ সাহায্য ব্যতীত দেশের কোন ব্যাপক গঠনমূলক কাজে সাফল্যলাভ কোনদিনই সম্ভব নয়।

দেশে ব্যাপকভাবে শিক্ষাবিস্তার ব্যতীত জাতির মান ও মর্য্যাদা বাড়াইবার অন্য কোন দ্বিতীয় পথ নাই এবং ব্যাপক ও সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাবিস্তার করিতে হইলে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদিগের সাহায্য অবশ্য গ্রহণীয়। সে কারণ গ্রন্থাগার-আন্দোলনকে সার্থক করিতে

হইলে চাই সরকারের নিকট যথাযোগ্য অর্থসাহায্য। আশা করা যায়, অন্যান্য স্বাধীন দেশসমূহের ন্যায় আমাদের সরকারও এ ব্যাপারে কার্পণ্য বা দ্বিধা করিবেন না। এখন দেখা যাক—গ্রন্থাগার আন্দোলনকে কোন্ পথে পরিচালিত করিলে উহা সার্থক ও কার্য্যকরী হইতে পারে।

সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল পরিচালনা ব্যতীত কোন আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করা সম্ভব নয়। সরকার যদি গ্রন্থাগার-আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহা হইলে ইহার পরিচালনার জন্য "গ্রন্থাগার অধিকর্ত্তা" নামে একটি নূতন পদ সৃষ্টি করিতে হইবে এবং তিনি প্রত্যক্ষভাবে এই আন্দোলন পরিচালনার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। এই আন্দোলনের যে ব্যয় তাহার আংশিক সঙ্কুলানের জন্য "গ্রন্থাগার আন্দোলন আইন" (Library Act) দ্বারা "গ্রন্থাগার কর" ধার্য্য করিতে হইবে। অনুরূপ গ্রন্থাগার আন্দোলন আইন ১৯৪৮ সালে মাদ্রাজে পাস হইয়াছে। এই আইনের বলে সরকার সাধারণ গ্রন্থাগারসমূহের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করিতে পারিবেন। সম্ভব হইলে "গ্রন্থাগার অধিকর্ত্তা" সরকারী শিক্ষাবিভাগ ও সরকারী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সহিত একযোগে কাজ করিবেন।

বর্ত্তমানে সাধারণতঃ প্রদেশসমূহের রাজধানীতেই একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফতে "গ্রন্থাগার বিজ্ঞান" শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ, সে কারণ সাধারণের পক্ষে এ শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হইয়া উঠে না। কিন্তু গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সার্থক করিতে হইলে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক চাই। যাহাতে সাধারণে অল্প ব্যয়ে এই বিজ্ঞান শিখিবার সুবিধা পান সেজন্য সরকারী প্রচেষ্টায় প্রতি গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময় প্রত্যেক মহকুমার সদরে স্বল্পদিনব্যাপী এই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এই ব্যবস্থার ফলে প্রতি মহকুমার ছাত্রছাত্রী অল্প ব্যয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মোটামুটি বিষয়গুলি শিখিবার সুযোগ পাইবেন।

গ্রামগুলিকে কেন্দ্র করিয়া এই আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে ও গ্রন্থাগারগুলি গ্রাম, থানা, মহকুমা, জেলা এবং কেন্দ্রীয় সদর এই পর্য্যায়ে স্তরে স্তরে বিভক্ত থাকিবে। প্রতি দশখানা গ্রামের কেন্দ্রীয় স্থানে একটি করিয়া সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং যানবাহনাদির সাহায্যে উক্ত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হইতে দশখানি গ্রামে পুস্তক সরবরাহ করা হইবে। সেই সঙ্গে জনশিক্ষার জন্য গ্রামোফোন রেকর্ড, রেডিও, শিক্ষামূলক ফিল্ম ও চিত্রাদির সাহায্য লইতে হইবে। চিত্তাকর্ষক ব্যবস্থার মধ্যদিয়া শিক্ষাদানের জন্য ইহা বিশেষ প্রয়োজন।

এইভাবে যখন দেশময় গ্রন্থাগারের বিস্তার হইবে তখন উহাদের পরিচালনা ও নিয়মিত তত্ত্বাবধান করা বিশেষ প্রয়োজন। অন্যথায় হয়ত তাহারা ভুল পথে চালিত হইয়া অকালমৃত্যুর সম্মুখীন হইতে পারে। সরকার প্রতি প্রদেশে সরকারী সাহায্যপুষ্ট শিক্ষালয়গুলির নিয়মিত তত্ত্বাবধানের জন্য বহু School Inspectors বা বিদ্যালয় পরিদর্শক নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সকল বিদ্যালয়-পরিদর্শককে যদি স্বল্পদিনব্যাপী গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিখিতে বাধ্য করা যায় তাহা হইলে সরকার একাধারে ইঁহাদের দ্বারা গ্রন্থাগার ও বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শকের কাজ পাইতে পারেন, নূতনভাবে নিয়োগ-ব্যবস্থা করিতে হয় না।

সরকারী সাহায্যপুষ্ট গ্রন্থাগারসমূহ যদিও সরকারের নিকট হইতে অর্থসাহায্য পাইবেন তথাপি স্থানীয় জনসাধারণের উপর তাঁহাদিগকে অনেকখানি নির্ভর করিতে হইবে। গ্রন্থাগারের কার্য্যব্যবস্থার উপর জনসাধারণের বিশ্বাসই গ্রন্থাগারের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে পারে। জনসাধারণের মধ্যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আনয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিটি সরকারী সাহায্যপুষ্ট গ্রন্থাগারকে সোসাইটিস রেজিষ্ট্রেশন এক্ট অনুযায়ী রেজেষ্ট্রীভুক্ত হইতে হইবে।

এই সকল গ্রন্থাগারে পুস্তক সরবরাহের দিকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে এই ধরণের প্রাথমিক বইয়ের একান্ত অভাব। যে সমস্ত বই বর্ত্তমানে বাজারে পাওয়া যায় তাহাদিগের মধ্যেও কিছু কিছু বই অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক দ্বারা নির্ব্বাচন করাইয়া পরিবেশন করা উচিত। স্থানীয় জনসাধারণের রুচি, শিক্ষার মান, জীবনযাত্রার প্রণালী ইত্যাদির উপর লক্ষ্য রাখিয়া এই নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

সাধারণতঃ শ্রমিক ও চাষী শ্রেণীর লোকেরা দিনের বেলা কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন। সারাদিনে তাঁদের আদৌ ফুরসত নাই। সন্ধ্যার পর তাঁহারা সুবিধা হইলে শিক্ষার জন্য এক আধ ঘণ্টা সময় দিতে পারেন। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন অংশ হইতে প্রায় দুই শত পঞ্চাশ লক্ষ শ্রমিক আমেরিকায় আসিয়াছেন। ইঁহারা সম্পূর্ণ নিরক্ষর, কিন্তু মার্কিন সরকার নৈশ বিদ্যালয়ের মারফত বাধ্যতামূলক শিক্ষা-ব্যবস্থার দ্বারা এই সকল নিরক্ষর শ্রমিকগণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। ঐ উপায়ে আমাদের দেশেও সরকার ইচ্ছা করিলে কি অশিক্ষা দূর করিতে পারেন না ?

দীর্ঘদিনের পরাধীনতা ও অশিক্ষার দরুন আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ আজ পিছনে পড়িয়া আছেন। শিক্ষা তো দূরের কথা, কোনক্রমে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাহাদের উদয়াস্ত পরিশ্রম —জীবনমরণ সংগ্রাম। ঘুমন্ত লোককে জাগাইতে হইলে যেমন একটা বড় রকমের ঝাঁকুনি দেওয়া প্রয়োজন, সেইরকম আমাদের সাধারণ লোকের মধ্যে আবার জ্ঞান-পিপাসা ও চেতনা জাগাইতে হইলে দেশব্যাপী নিয়মিত প্রচারকার্য্য একান্ত প্রয়োজন। সরকারী প্রচার-বিভাগের রেডিও, সংবাদপত্র, সিনেমা, বক্তৃতা ও চিত্রাদির সাহায্যে এই প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে। প্রচার ব্যতীত আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সার্থক করিয়া তুলিবার আশা খুব কম।

দেশের শিক্ষা-সমস্যা স্বাধীন জাতীয় সরকারের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা এবং এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় দেশব্যাপী বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার করা। দিল্লীতে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিকল্পনা অনুযায়ী কিভাবে কাজ হইতেছে এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে গ্রন্থাগারকে কিভাবে সাহায্য করা যায়—এ বিষয় লইয়া আজ দেশের অনেকেই চিন্তা করিতেছেন।

পদার্থবিদ্যায় আরব্য বিজ্ঞানীদের দান

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

রোম সাম্রাজ্য এবং সংস্কৃতির পতন হয়েছিল ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে। ৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট জাষ্টিনিয়ান্‌, এথেন্স শহরে যে একটি মাত্র শিক্ষাকেন্দ্র ছিল তাও বন্ধ করে দেওয়ার আদেশ দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে রোমীয় বিজ্ঞান-সাধনারও পরিসমাপ্তি ঘটল। তখন থেকে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি স্থানে (যেমন এডিসা, নিসিবিস প্রভৃতি) এবং মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় রোমীয় বিজ্ঞানের প্রভাব এবং তদনুশীলন বিশেষ ভাবে আরম্ভ হয়। নেষ্টোরিয়ানদের প্রচেষ্টায়ই এ কার্য্য সম্ভব হয়েছিল। ক্রমে দক্ষিণ-পশ্চিম পারস্যের জণ্ডিসাপুরে বিজ্ঞান আলোচনার একটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এখানে জগৎ সম্বন্ধে গ্রীক বিজ্ঞানীদের পার্থিব মতবাদ এবং হিন্দু দার্শনিকদের রহস্যবাদের এক অদ্ভুত সমন্বয় ঘটেছিল। ইসলাম-সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যখন বাগদাদ শহরে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে খলিফাদের রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তখন উপরোক্ত শিক্ষাকেন্দ্র বাগদাদে স্থানান্তরিত হ'ল। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, মুসলমান বিজ্ঞানীদের বৈজ্ঞানিক ভাব ও চিন্তাধারা গ্রীকদের জ্যামিতিক মতবাদ এবং হিন্দুদের বিশ্লেষণবাদের সমন্বয়ে গঠিত। এই দুই বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয়ে মুসলমান বিজ্ঞানীরা যে নূতন মতবাদের সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন তার দান বিজ্ঞানক্ষেত্রে অবহেলার নয় মোটেই।

৭৫০ থেকে ৯০০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে গ্রীক পদার্থবিদ্যার সমুদয় তত্ত্বগুলি আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল, কোন কোন ক্ষেত্রে তা মূল থেকে উৎকর্ষলাভও করেছিল। তা ছাড়া সংস্কৃত থেকে ত্রিকোণমিতি এবং জ্যামিতির ধারণাও আরব্য পণ্ডিতগণ আয়ত্ত করেছিলেন। এই সময় ইউক্লিডের আলোতত্ত্বের উন্নত সংস্করণ আরবী ভাষায় প্রকাশ করলেন এল-কিন্‌দি। স্টিলইয়ার্ড সম্বন্ধে বিশেষ অধ্যয়ন করলেন থাবিট-ইবন্‌-কুরা এবং বানু-মুসা যন্ত্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এক কথায় বলা যায় যে, পদার্থবিদ্যার মধ্যে যন্ত্রবিজ্ঞান এবং আলোবিজ্ঞান সম্বন্ধেই আরব্য বিজ্ঞানীদের দান সর্ব্বাধিক।

নবম থেকে একাদশ শতাব্দীই হ'ল আরব্য বিজ্ঞান সাধনার সর্ব্বশ্রীয় সময়। মধ্যপ্রাচ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষীদের আবির্ভাব ঘটেছিল এ সময়ে। তাঁরা জগতের জ্ঞানভাণ্ডার মন্থন করে নিত্য নূতন রহস্যের আহরণে আরব্য বিজ্ঞানের চরমতম উৎকর্ষসাধন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে আর-রাজী চিকিৎসাবিদ হয়েও আলোতত্ত্ব, পদার্থের গুণাগুণ নির্দ্ধারণ, তাদের গতি, আয়তন ও কালের সঙ্গে এদের কি সম্পর্ক এসব নিয়ে যথেষ্ট গবেষণাকার্য্য করেছেন। ইবন্‌-সিনা ছিলেন একাধারে দার্শনিক, পদার্থবিদ এবং চিকিৎসাবিদ। ইনি যে অতি উন্নত স্তরের একখানা পদার্থবিদ্যার পুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন তার এক খণ্ড ইয়ারখন্দের একটি মরুদ্যানে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। তার পর ইবন্‌-অল-হেইথাম্‌ এবং কবি ফেরদৌসীর সমসাময়িক অল-বিরুণীর নামও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অল-বিরুণীর ছিল বহুমুখী প্রতিভা, তিনি বিজ্ঞানের প্রায় সব শাখায়ই কমবেশী কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছিলেন। তবে ইনি বিশেষ ভাবে ধাতব পদার্থের এবং মূল্যবান প্রস্তরের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দ্ধারণ-কার্য্যে ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করেন।

মধ্যযুগীয় ইউরোপে অল-হাজেন নামে খ্যাত ইবন্‌-অল-হেইথাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন অবশ্য বসরায়, কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি কায়রোর অল-আজারের উপকণ্ঠে অতিবাহিত করেছেন। আলোবিজ্ঞানে এঁর গবেষণাকার্য্য অতুলনীয়। গ্রীক বিজ্ঞানীরা আলোর প্রতিফলন ক্রিয়াটি লক্ষ্য করেছিলেন মাত্র, কিন্তু অল-হাজেন সে সম্বন্ধে উপযুক্ত গবেষণাকার্য্য করে তা নিয়মবদ্ধ করেছিলেন। ইউক্লিড ও গ্রীক বিজ্ঞানীরা সরল কাচের ক্ষেত্রে আলোর প্রতিফলনের নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি গণিতসাহায্যে উক্ত নিয়ম যে সংবৃত-মধ্য কাচ (concave mirror) এবং অনুবৃত্তাকার কাচের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা প্রমাণ করে দেখালেন। তিনি Spherical aberration আবিষ্কার করেন এবং অনুবৃত্তেরও যে কেন্দ্র আছে তা নির্দ্ধারণ করেন। অল-হাজেনের গবেষণাপদ্ধতি পশ্চিমদেশীয় স্বনামধন্য বিজ্ঞানীদের পর্য্যন্ত প্রভাবান্বিত করেছিল। আলোবিজ্ঞানে বিভিন্ন তথ্যের অবতারণা এবং তার সমাধান করতে গিয়ে তিনি যে উচ্চাঙ্গের গণিতের সাহায্য নিয়েছিলেন তা আলোচনা করলে বিস্ময়ান্বিত হতে হয়। গোধূলির আলোর সম্বন্ধেও তিনি প্রচুর গবেষণা করেছিলেন। তা ছাড়া আলোর উৎস সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, যে-কোন আলোদানকারী পদার্থই আলোর উৎস, যদিও এ সময় ইউক্লিড এবং টলেমীর মত ছিল যে, আমাদের চক্ষুদ্বয় থেকে এমন একটা পদার্থ বহির্গত হয় যা কোন পদার্থের উপর পতিত হয়েই আলোর অনুভূতি দান করে। আলোর প্রতিসরণ সম্বন্ধে অল-হাজেন বহু পরীক্ষা করে যে মত প্রকাশ করেছিলেন তা অদ্যাবধি চলে আসছে। তিনি বললেন, কোন ঘনতর মাধ্যমে আলোর গতিবেগ কমে যাবে এবং কোন পদার্থ ঘনতর মাধ্যমে অবস্থিত থাকলে তা যখন কোন কমঘন মাধ্যম থেকে দেখা যাবে তখন তার গভীরতা অনেকটা কম হবে। চৌবাচ্চায় জলভরা থাকলে তার তলাটা একটু উঁচু বলে মনে হওয়া আমাদের নিত্যকারের ঘটনা। পরীক্ষাকার্য্য করে এসব মতবাদের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অল-হাজেনের প্রায় সাতশত বছর পরে নিউটন যে আলোতত্ত্ব আবিষ্কার করে-

ছিলেন তার সাহায্যে ঘনতর মাধ্যমে আলোর গতিবেগ কমে যাওয়ার ব্যাখ্যা সম্ভব হয় নি। অল-হ্যাজেন আলোর সম্বন্ধে যে গবেষণাকার্য করেছিলেন তা প্রধানতঃ পাঁচটি অংশে ভাগ করা যায়: (১) পরবর্তীকালে নিউটন-আবিষ্কৃত পদার্থের গতিবেগের প্রথম নিয়মটি তিনি সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন, (২) Rectangle of forces সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল, (৩) আলোর রশ্মি যে নিকটতম এবং সহজতম পথে চলাফেরা করে তা তিনি বলেছিলেন। এ নিয়মটি পরবর্তীকালে ফারমেট আবিষ্কার করেছিলেন, (৪) আলোর প্রতিসরণের প্রথম নিয়মটি তিনি জানতেন, (৫) প্রতিসরণের দ্বিতীয় নিয়মটি স্নেল ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কার করেছিলেন; কিন্তু অল-হ্যাজেন এ নিয়মটি জ্ঞাত ছিলেন, কেবল ভাষায় প্রকাশ করে যান নি। এ ছাড়া কুব্জকাচের ভিতর দিয়ে দেখলে পদার্থের আয়তন যে বহুগুণে বেড়ে যায় তা এবং বায়ুমণ্ডলের প্রতিসরণ সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট গবেষণাকার্য করেছিলেন।

১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নাসির-উদ্দিন-আট-টুসীকে প্রধান পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করে আজারবাইজানে তৎকালীন সম্রাট হুলাজুখান একটি মান মন্দির নির্মাণ করান। এখানে নামকরা সহকর্মীদের সাহায্যে আট-টুসী জ্যোতির্বিদ্যার যন্ত্রপাতি বিশেষ নিপুণতার সহিত তৈরি করেন। তিনিও আলো-বিজ্ঞানে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন এবং আলোর প্রতিফলন বিষয়ে পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁরই এক ছাত্র কুতুবউদ্দিন আস-সিরাজী (১২৩৬-১৩১১ খ্রীষ্টাব্দ) বৃষ্টি-বিন্দুতে আলোর প্রতিসরণ সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন। এঁর ছাত্র কামাল-উদ্দিন অল-ফারিসি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অল হেইথামের আলোবিজ্ঞান পুস্তকের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করে তার এক মনোজ্ঞ সমালোচনা লিখেছিলেন।

সিসিলির সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডিক আরব্য-বিজ্ঞানের বিশেষ উৎসাহী পর্যবেক্ষক ছিলেন। তাঁরই একান্ত চেষ্টায় আরব্য বিজ্ঞানের পুস্তকগুলি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। ১২২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নেপলস বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে তাতে আরব্য বিজ্ঞানের সকল প্রকার গ্রন্থেরই পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। এখান থেকেই বোলোঙ্গা ও প্যারিসে মুসলিম বিজ্ঞানীদের কার্য্যাবলী ছড়িয়ে পড়ে। একথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না যে, আলোবিজ্ঞানের নূতন তথ্যাদির জন্যে ইউরোপের নামজাদা বিজ্ঞানীরা আরব্য বিজ্ঞানের নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

১১৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকেই আরব্য বিজ্ঞানের অবনতি আরম্ভ হয়। এ সময় আর্কিমিডিসের সূত্র-সাহায্যে পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়, দণ্ড-যন্ত্র (lover), তুলাদণ্ড, জল ঘড়ি প্রভৃতি তৈরী ব্যাপারে আরব্য বিজ্ঞানীরা বিশেষ তৎপর হয়ে উঠেন। যদিও এ সমস্ত কার্য্য বহু দিন পূর্ব্বেই আরম্ভ হয়েছিল, তথাপি এ সময় এ যন্ত্রগুলির বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় দামাস্কাসে একটি ঘড়ি স্থাপিত হয় যা তৎকালে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেছিল। ইবন্-আস-সাটি এ ঘড়ি সম্বন্ধে ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিকে অল-খাজিনি এবং অল্-জাজারী যন্ত্র-বিজ্ঞান সম্বন্ধে দুখানা অতি চমৎকার প্রমাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। মুসলমান বিজ্ঞানীগণ নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরির কাজেও বিশেষ নিপুণতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

আলো-বিজ্ঞান ও যন্ত্র-বিজ্ঞান ব্যতীত মধ্যযুগীয় মুসলমান বিজ্ঞানীরা পদার্থবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় তেমন পারদর্শিতা লাভ করতে পারেন নি। জবির-ইবন্-হাজান অষ্টম কিম্বা নবম শতাব্দীতে চুম্বক-শক্তির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গবেষণাকার্য্য করেছিলেন। কিন্তু চুম্বকশলাকা দিয়ে দিগদর্শন যন্ত্র চীনদেশেই প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল। মুসলমান নাবিকগণ এ কম্পাস বিশেষভাবে তৎকালে ব্যবহার করত। তবে একটা বিষয় লক্ষ্য করবার যে, অল-হ্যাজেনের গবেষণাকার্য্য বাদ দিলে আরব্য বিজ্ঞানীদের গবেষণাকার্য্য এরিষ্টটল ধর্ম্মী। এরিষ্টটল ও ইউক্লিড কর্ত্তৃক এঁদের গবেষণাকার্য্য প্রভাবান্বিত।

"বিদ্যাপতির পদাবলী"

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

প্রাচীনকালে যে সমস্ত কবি জনসমাজে সমধিক প্রতিষ্ঠা ও সমাদর লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের রচনার আদি ও অকৃত্রিম রূপ উদ্ধার করা এক কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুগে যুগে তাঁহাদের লেখা লোকের হাতে হাতে মুখে মুখে এমন ভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে—তাঁহাদের লেখার মধ্যে অর্বাচীন লেখকদের রচনা এত বেশি ঢুকিয়া গিয়াছে যে, অনেক ক্ষেত্রে 'তিন নকলে আসল খাস্তা' হইয়া গিয়াছে—নকলের মধ্য হইতে খাঁটি জিনিষ খুঁজিয়া বাহির করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কৃতে ব্যাস-বাল্মীকির মূল রচনা লইয়া যে সমস্যা বাংলায় কৃত্তিবাস কাশীরাম চণ্ডীদাস মুকুন্দরামের রচনা লইয়া ততোধিক সমস্যা দেখা দিয়াছে। তাই একজন সমালোচক দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, কৃত্তিবাসের রামায়ণ নামে আজ যাহা প্রচলিত তাহার এক পংক্তিও কৃত্তিবাসের অবিকৃত রচনা নহে। তবে দুঃখের বিষয়, কৃত্তিবাসের মত যে কবি বাঙালীর ঘরে ঘরে আজও শ্রদ্ধা ও সমাদরের উচ্চ সিংহাসনে সমাসীন তাঁহার রচনার যথাসম্ভব আদিরূপ উদ্ধার করিবার জন্য আমরা যথোচিত যত্ন করি নাই। ব্যাসের মহাভারত ও বাল্মীকির রামায়ণের প্রাচীন রূপ প্রতিষ্ঠার জন্য পুণা ও বরোদায় যেরূপ চেষ্টা চলিতেছে তাহার অনুকরণ প্রাদেশিক সাহিত্যেও বাঞ্ছনীয়। সুখের কথা, বাঙালী তাহার পরম গৌরব ও আদরের বস্তু বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে দীর্ঘ দিন ধরিয়া এই জাতীয় কিছু কিছু চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। তাহারই একটি উল্লেখযোগ্য ফল অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বহু পুথি ও পদসংগ্রহ গ্রন্থ অবলম্বনে সম্পাদিত চণ্ডীদাস পদাবলী। ইহার আর একটি ফল বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্প্রতি প্রকাশিত শোভন সংস্করণ।

মৈথিল কবি বিদ্যাপতির পদ মৈথিল ভাষায় লিখিত হইলেও বাঙালীর নিকট ইহা বাংলা এবং ব্রজবুলি পদের মতই পরিচিত ও প্রিয় দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙালী সাধক ও রসিক বিদ্যাপতির পদ শুনিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। আজ প্রায় এক শত বৎসর যাবৎ বাঙালী সাহিত্যিকগণ আধুনিক পদ্ধতিতে ইহার আলোচনা ও সঙ্কলনের কাযে ব্রতী হইয়াছেন। প্রথম দিকে যাঁহারা এই কার্যে হস্তক্ষেপ করেন তাঁহাদের মধ্যে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি পরলোকগত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় অন্যতম। তিনি তাঁহার কর্মজীবনের প্রারম্ভে বিদ্যাপতির পদসংকলনে ব্যাপৃত হন। ১২৮১ সাল হইতে খণ্ডশঃ প্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে' তাঁহার সহযোগিতা ছিল। ১২৮৫ সালে* তিনি 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' অবলম্বনে স্বতন্ত্রভাবে 'বিদ্যাপতির পদাবলী' প্রকাশ করেন। এই সংস্করণকে দ্বিতীয় সংস্করণ বলা হয়। ইহাতে মাত্র ১২৫টি পদ প্রকাশিত হইয়াছিল।

পরবর্তীকালে (১৩১৬ সালে) তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ও ব্যয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাবলীর মধ্যে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত বিদ্যাপতি-পদাবলীর ব্যাপক সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। ইহাতে নানাবিষয়ক ৯৩৫টি পদ স্থানলাভ করে। মিত্র মহাশয়ের পরলোকগমনের পরে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীশরৎকুমার মিত্র মহাশয় এই পদাবলী প্রচারে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। ফলে তাঁহারই প্রযোজকতায় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সম্পাদনে এই পদাবলীর আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি মিত্র মহাশয় ও অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়দ্বয়ের সম্পাদনায় এক নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সংস্করণে প্রকাশিত পদের সংখ্যা প্রায় এক হাজার। পদগুলি ছয়টি খণ্ডে সাজান হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে রাজনামাঙ্কিত পদ, দ্বিতীয় খণ্ডে মিথিলা ও নেপালে প্রাপ্ত বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত অন্যান্য পদ, তৃতীয় খণ্ডে কেবল মাত্র বাংলাদেশে প্রচলিত রাজার নামবিহীন বিদ্যাপতির পদ, চতুর্থ খণ্ডে মিথিলায় লোকমুখে সংগৃহীত হরগৌরী ও গঙ্গাবিষয়ক পদ, পঞ্চম খণ্ডে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত নাতিপ্রামাণিক পদ, পরিশিষ্টে রাজনামাঙ্কিত আরও কিছু পদ, বাঙালী বিদ্যাপতির পদ এবং বিদ্যাপতির পদসংবলিত গ্রন্থে প্রাপ্ত অন্যান্য কবিদের পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। অন্যতর সম্পাদক শ্রীযুক্ত মজুমদার মহাশয়ের মতে ইহাদের মধ্যে ৭৭৯টি পদ অকৃত্রিম অর্থাৎ বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। বিস্তৃত ভূমিকায় তিনি বিদ্যাপতির পদের কৃত্রিমতা অকৃত্রিমতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গের (যথা, বিদ্যাপতির বংশ, জীবন, কাল, পদাবলীর আকর, কবিচিত্তের ক্রমবিকাশ প্রভৃতি) দীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। সংস্করণখানিকে সকল দিক দিয়া অনুসন্ধিৎসু পাঠকের ব্যবহারের উপযোগী ও অধিকতর আলোচনার সহায়ক করিয়া তুলিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রতি পদের সঙ্গে তাহার বিভিন্ন আকর নির্দেশ করা হইয়াছে এবং অনেক স্থলে পাঠান্তর উল্লিখিত ও আলোচিত হইয়াছে। এই জন্য কিছু কিছু নূতন পুথি ও গ্রন্থের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন আকর-গ্রন্থের সহিত বর্তমান সংস্করণের যোগাযোগ কয়েকটি নির্ঘণ্টে প্রদর্শিত হইয়াছে। পদগুলির সঙ্গে সঙ্গে প্রদত্ত বঙ্গানুবাদ ও শব্দার্থ এবং গ্রন্থশেষের অর্থসহিত শব্দসূচী পাঠকের বিশেষ কাজে লাগিবে। পদসংগ্রহগ্রন্থাদি হইতে পদগুলির প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইলে পদের তাৎপর্য গ্রহণে সুবিধা হইত। বিবিধ নির্ঘণ্ট ও সূচী সমলঙ্কৃত এই সংস্করণে বিদ্যাপতির পদাবলীর বিভিন্ন আলোচনার—অন্ততঃপক্ষে ইহার বিভিন্ন সংস্করণের—একটি কালানুক্রমিক তালিকা ও বিবরণের অভাব অনুভূত হয়। বিদ্যাপতির পদাবলীর সংস্করণ ক্রমিক উন্নতির ধারা অনুসরণ করিয়া আজ যে স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে অচিরকাল মধ্যে এ জাতীয় অভাব-অভিযোগ দূরীভূত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।*

* ঐ সালেই চুঁচুড়া হইতে অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'বিদ্যাপতিকৃত পদাবলি'ও প্রকাশিত হয়। ইহা 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে' প্রকাশিত পদের পুনর্মুদ্রণ মনে হয়।

* **বিদ্যাপতির পদাবলী**। সম্পাদক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্‌-এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক এবং শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম্‌-এ, পি-আর-এস্‌, পি-এইচ-ডি, ভাগবতরত্ন, বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহের পরিদর্শক। প্রকাশক—শ্রীশরৎকুমার মিত্র বি-এল্‌, ৮০নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পঁচিশ টাকা।

গানের গান—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। অরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। মূল্য এক টাকা।

বাইবেল শুধু ধর্ম্মগ্রন্থ নয়, পাশ্চাত্য-সাহিত্যের ভাব ও ভাষার সহিত ইহা ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত। বাইবেলের নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ ইংরেজী সাহিত্যের রাস্কিন প্রমুখ লেখকগণের রচনারীতিকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। ওল্ড টেষ্টামেণ্টে কতকগুলি অপূর্ব্ব অধ্যায় আছে। ধর্ম্ম এবং আধ্যাত্মিকতার কথা ছাড়িয়া দিলেও সাহিত্য হিসাবে সেগুলি অতুলনীয়। 'সং অফ সলোমন' বাইবেলের এইরূপ একটি অংশ। যুগে যুগে মিষ্টিক কাব্য মানুষের মনকে আনন্দরসে অভিষিক্ত করিয়াছে। আমাদের দেশে বৈষ্ণব পদাবলী এবং বাউলের গান মিষ্টিক কাব্যের উদাহরণ। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ একটা অনুভূতির ব্যাপার। সে অনুভূতি অনির্ব্বচনীয়। অথচ সে অনুভূতিকে প্রকাশ না করিয়াও উপায় নাই। যাহা দিব্য, যাহা অপার্থিব তাহাকে লৌকিক এবং সাংসারিক প্রসঙ্গের মধ্য দিয়া ভাষায় ব্যক্ত করিতে হয়। তাই ভক্ত ভগবানকে কখনো প্রেমিক, কখনো বা প্রেমিকা সাজাইয়াছে। 'সং অফ সলোমনে'র আর একটি নাম 'সং অফ সংস্'। লেখক অনুবাদ করিয়াছেন, 'গানের গান'। 'সং অফ সংস্'কে মিষ্টিক কবিতার অগ্রদূত বলা যাইতে পারে।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত শুধু পণ্ডিত নন, তিনি রসজ্ঞ। তাঁহার সাহিত্য-সম্পর্কিত লেখাগুলি পাঠককে বহুদিন ধরিয়া আনন্দ দান করিয়া আসিয়াছে। ভূমিকায় লেখক বলিতেছেন, "ইংরেজী বাইবেল ভাষা-বৈদগ্ধ্যে অতুলনীয়।" বাইবেলের অনুবাদ দুরূহ, বিশেষতঃ 'সং অফ সংসে'র মত অংশের অনুবাদ। এই দুরূহ কার্য্যে লেখক সফলতা লাভ করিয়াছেন। গদ্যকাব্যে গীতিকাব্যের সুর বাজিয়াছে।

"তোমার ভালবাসা সুরার চেয়ে মধুর। তোমার সুন্দর অঙ্গরাগের সুবাসে তোমার নামটিতেও নেমেছে সুবাসের ঢল—তাই ত কুমারীরা তোমায় বাসে ভাল।"

"শারণ দেশের গোলাপ আমি, আমি পাহাড়তলির কুমুদ কলি।"

"ডুমুরের গাছে কচি ডুমুর ধরেছে, কাঁচা আঙ্গুরে ভরা আঙ্গুরলতায় সুগন্ধ ছড়িয়েছে; উঠে এস প্রিয় আমার, সুন্দর আমার, এস চলে।"

"রাত্রে আমার শয্যায় তাঁকে খুঁজলাম আমি, যিনি আমার প্রাণের প্রিয়—খুঁজলাম কিন্তু পেলাম না ত।"

"আমি ঘুমিয়ে, হৃদয় কিন্তু আমার জেগে। ও যে আমার দয়িতের কণ্ঠ—দরজায় ঘা দিয়ে তিনি বলছেন, খুলে দাও, খুলে দাও, এ যে আমি।

"দরজা আমি খুলে দিলাম আমার দয়িতের জন্য—কিন্তু দয়িত আমার তখন যে ফিরে গিয়েছেন, চলে গিয়েছেন। যখন তিনি আমায় ডেকেছিলেন, তখন হৃদয় আমার সাড়া দিল না। তাঁকে খুঁজলাম, কিন্তু পেলাম না ত—ডাকলাম তিনি উত্তর দিলেন না।"

"বহুল জলধারা ভালবাসাকে নিবিয়ে দিতে পারে না—সকল বন্যা মিলে তাকে ডুবিয়ে দিতে পারে না। ভালবাসার বিনিময়ে ঘরের যাবতীয় সম্পদ দিয়ে দিলেও তা হবে অকিঞ্চিৎকর।"

ইংরেজী বাইবেল যাঁহাদের আছে তাঁহারা মিলাইয়া দেখিতে পারেন, শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের অনুবাদ মূলানুগ হইয়াও কত সুন্দর এবং সাবলীল হইয়াছে। একটি প্রশ্ন আছে, সং অফ সংস্ 'গানের গান' না 'গানের সেরা গান'? আকারে বৃহৎ না হইলেও এই বত্রিশ পাতার বইখানি রসগ্রাহী পাঠকের চিত্তকে নন্দিত করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ছায়াছবি—শ্রীঅমলা দেবী। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য আড়াই টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসখানির কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে জীবন-অপরাহ্নে উপনীত এক কর্ম্মময় জীবনের স্মৃতি-রোমন্থনের মধ্য দিয়া। নায়কের ছবির এলবামে অসংখ্য আলোকচিত্র; সেইগুলির মধ্যে পাওয়া যায়—কেমন

রেক্সোনার ক্যাডিলযুক্ত ফেনা আপনার গায়ে আস্তে আস্তে ঘ'ষে নিন ও পরে ধুয়ে ফেলুন। আপনি দেখবেন দিনে দিনে আপনার ত্বক্ আরও কতো মসৃণ, কতো কোমল হচ্ছে—আপনি কতো লাবণ্যময় হ'য়ে উঠছেন।

রেক্সোনা

ক্যাডিলযুক্ত একমাত্র সাবান

Rexona
BLENDED WITH CADYL

* ত্বক্‌পোষক ও কোমলতাপ্রসূ কতকগুলি তৈলের বিশেষ সংমিশ্রণের এক মালিকানী নাম

RP. 121-X52 BG

করিয়া এক অতিসাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে সুযোগ, সুবিধা ও কর্ম্মোদ্যমের সদ্ব্যবহারে অতুল ধনসম্পদ মানযশের অধিকারী হইয়াছে। প্রেমের স্পর্শ ও কামনার ক্ষুধা দুই তাহার জীবনক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। গল্পটিতে ঘটনা এবং চরিত্রের সংখ্যাও কম নহে—দ্রুত সঞ্চরণশীল ছবির মতই সেগুলি মনের পর্দায় ছায়া ফেলিয়া দৃষ্টির নেপথ্যে অন্তর্হিত হইয়া যায়, বেশীক্ষণের জন্য মনে দাগ কাটিয়া রাখে না। ছবির গতি যেমনই হোক—লেখিকার বাস্তবজ্ঞান প্রখর—কল্পনার ছায়া কোথাও গভীর হয় নাই, মনস্তত্ত্বের গভীরেও আসল বস্তুটিকে সন্ধান করিয়া লইয়াছে। একটি জীবনকে জড়াইয়া সামাজিক ক্লেদ ও গ্লানি এবং তাহারই সঙ্গে কামনা-দুর্ব্বল কয়েকটি নরনারীর মনকে অদ্ভুতভাবে উন্মোচন করিয়াছেন লেখিকা। কাহিনীটি পূর্ণ পরিণতির দিকে পৌঁছিবার সুযোগ না পাইলেও—চিত্র হিসাবে সার্থক হইয়াছে। বর্ত্তমান জীবনের প্রতিক্রিয়া গল্পটিকে স্থানে স্থানে ছুঁইয়া গিয়াছে; কোথাও সমস্যায় জটিল কিংবা সমাধানে তৎপর হয় নাই। এই কারণে গল্পটির গতি হইয়াছে সাবলীল। এই ছায়াছবির মধ্যে যুগের প্রভাবটি বেশ পড়িয়াছে। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন যুগ-প্রভাবান্বিত জীবন-বৃত্তান্ত পড়িতেছি—ভালমন্দে-মেশানো যে জীবন নিষ্ঠাভরে রূঢ় বাস্তবকেই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। প্রচ্ছদ-সজ্জা সুরুচির পরিচায়ক।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

গঠনকর্ম্ম ও গঠনকর্ম্মীর প্রাণধর্ম্ম—শ্রীরঞ্জনকুমার দত্ত। ১৩।১, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা ৭৬। মূল্য ১।০ আনা।

লেখক ১৯৩৮ সনে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। ১৯৪৬ সনে তিনি বগুড়া জেলায় এক গ্রাম-কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত হন। ঐ বৎসর যখন নোয়াখালিতে দাঙ্গা হয় তখন শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের পরিচালনাধীনে সংগঠিত অহিংস শান্তি মিশনের কর্মীরূপে সেখানে যান। ১৯৪৬, অক্টোবর হইতে ১৯৫১ জানুয়ারী পর্য্যন্ত তিনি নোয়াখালিতে ছিলেন। পরে তিনি বরিশালের শ্রীসতীন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক পরিচালিত গান্ধীগ্রাম সেবাশ্রমে অধ্যক্ষরূপে যোগদান করেন। গান্ধীবাদে যাঁহারা সম্পূর্ণ বিশ্বাসী লেখক তাঁহাদেরই একজন। সমালোচ্য এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তাঁহার জীবনের মূল্যবান অভিজ্ঞতা চিত্তাকর্ষক ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তিনি দেশবাসীর দুর্ব্বলতা এবং ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে অনবহিত নহেন। কি উপায়ে এই গলদ দূর করিয়া দেশকে উন্নত করিতে হইবে এ বিষয়ে তিনি যে সকল মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যে-কোন গ্রাম-উন্নয়ন কর্ম্মীর পক্ষে খুব মূল্যবান। লেখক কর্ম্মিগণকে যে সকল গুণের অধিকারী হইতে বলিয়াছেন তাহা খুবই সমীচীন। অবশ্য কর্ম্মীর সংখ্যার উপর লেখক মোটেই জোর দেন নাই। তিনি দেশপ্রেমিক এবং দেশের মানুষকে ভালবাসেন, তাই বলিয়াছেন—গ্রাম্য দলাদলি, সঙ্কীর্ণতা, জাতিভেদ, হিন্দু-মুসলমানের ভেদ-বৈষম্য, অপমান, ক্ষতি, মিথ্যা বদনাম ইত্যাদি নানা প্রতিকূলতার ভিতর দিয়া গ্রাম-কর্ম্মীকে কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে হইবে। সত্যের আলোকে পথ চিনিয়া ভগবানে বিশ্বাস রাখিয়া একমনে কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে।

স্বাধীনতালাভের পর ভারতে নূতন করিয়া গ্রাম-উন্নয়নের উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে। গান্ধীজীর মূল আদর্শও যে পরিবর্ত্তিত হইতেছে না তাহা বলা চলে না। গ্রাম-উন্নয়ন ব্যাপারে মার্কিনী আদর্শ প্রবেশলাভ করিতেছে। ইহা ভাল কি মন্দ এ বিষয়ে চূড়ান্ত মতামত প্রকাশ করিবার সময় না আসিলেও এখন হইতেই দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা খুবই বাঞ্ছনীয়। ভারতের আত্মা গ্রাম—একথা কেবল মুখে স্বীকার করাই যথেষ্ট নয়, প্রকৃত স্বরাজের প্রতিষ্ঠা এই গ্রামেই করিতে হইবে। লেখক যেভাবে গ্রাম পুনর্গঠনের কর্ম্মসূচী দিয়াছেন তাহা সফল করিতে হইলে আর্থিক ও সামাজিক কাঠামো নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে হইবে, জীবনের প্রতি প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন দরকার হইবে। এক কথায় পল্লীস্বরাজের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ দ্বারা পল্লীর পুনরুজ্জীবন ছিল মহাত্মাজীর স্বপ্নের ভারতের আদর্শ। আমাদের সংবিধান এই আদর্শে রচিত হয় নাই যদিও ইহাতে পল্লী-পঞ্চায়েতের উল্লেখ আছে। লেখক যে দরদের সহিত এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা পাঠকের অন্তর স্পর্শ করিয়া তাহার মনকে পল্লীমুখী করিবে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত
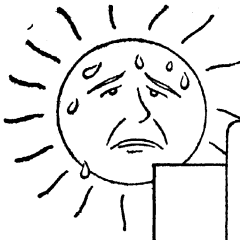
গা বড্ডবেশী চটচটে আর নোংরা বোধ হ'চ্ছে কি?

লাইফবয়ের "রক্ষা-কারী ফেনা" আপ-নার স্বাস্থ্যকে নিরা-পদে রাখে

লাইফবয় সাবান

প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে আপনাকে রক্ষা করে

ভারতে প্রস্তুত L. 247-X 52 BG

চলতি পথে—শ্রীমৃণালকান্তি বসু। চক্রবর্তী চাটার্জি এণ্ড কোং লিঃ, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য ১।০ আনা।

গ্রন্থকার সাংবাদিক এবং রাজনীতিক মহলে সুপরিচিত। জীবনের চলতি পথে যাহা তিনি দেখিয়াছেন ও শিখিয়াছেন, তাহার কয়েকটি সারকথা এখানে গুছাইয়া বলিয়াছেন। অলঙ্কারবিন্যাস বা সাহিত্যিক আড়ম্বর নাই, সহজ সরল আলোচনা। কাজের লোকের কাছে নিশ্চয়ই ইহার আদর হইবে। ইহাতে মোট তেইশটি অধ্যায় আছে, তন্মধ্যে কয়েকটি—কথোপকথনের কৌশল, ভুল স্বীকার, ধনিক-শ্রমিক বিরোধ, কথা ও কাজ, আত্মপ্রত্যয়, মানুষচেনা, ভাবনা ও নির্ভাবনা। অভিজ্ঞতা ও স্বাধীন-চিন্তার ছাপ আছে বলিয়াই বইখানিকে মামুলি উপদেশ-সংগ্রহের পর্য্যায়ে ফেলা চলে না।

অহনা—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। মূল্য ২৷৷০ আনা।

"চিন্ময়ী বাঙ্ময়ীরূপে হলে সমুদিতা,
মৃন্ময়ী চেতনা লভি' ভুবন-বন্দিতা।"

কবিতাগুলিতে চিন্তাশীল মার্জিত মনের ছাপ রহিয়াছে। ভাবগৌরব ও ভাষাগাম্ভীর্যের মিলনে রচনা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। অধ্যাত্ম-চেতনার একটি স্নিগ্ধ আভা সর্বত্র বিকীর্ণ।

মনীষীদের দৃষ্টিতে আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ—সম্পাদক স্বামী আত্মানন্দ। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা-১৯। মূল্য ১।০,

হিন্দুসমাজে আত্মপ্রত্যয় ও চেতনা-সঞ্চারের জন্য স্বামী প্রণবানন্দ বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কর্মশক্তি দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে। এ গ্রন্থে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি বাইশ জন ব্যক্তির শ্রদ্ধাসূচক রচনা সঙ্কলিত হইয়াছে।

কুরুক্ষেত্র—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বোম্বাই-২১। মূল্য ১৲ টাকা।

ইতঃপূর্বে লেখক কঠ ও কেন উপনিষদ অবলম্বনে 'নচিকেতা' এবং 'উমা' নাটিকা রচনা করিয়াছেন। আলোচ্য নাটিকাখানি 'গীতা' অবলম্বনে রচিত। বিষয়-গৌরব ক্ষুণ্ণ না করিয়া এই ভাবে শাস্ত্রকথাকে জনপ্রিয় আকারে উপস্থিত করার প্রয়োজন যথেষ্ট। শ্রীকৃষ্ণের মহান্ জীবনাদর্শ ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে। এক স্থানে (পৃ, ৩৪) পদ্যচ্ছন্দ রচনাকে গদ্য আকারে সাজানো হইয়াছে। বোধ হয় উহা পদ্য আকারে সাজাইলে ভালো হইত।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সর্বোদয় ও ভূদান—শ্রীসু-মো-দে। ওরিয়েণ্ট বুক কোং, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৵০ আনা।

'বিপ্লবী মেদিনীপুর' ও 'সপ্তরশ্মি' প্রণেতা গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে 'সর্বোদয় সমাজ ও ভূদানযজ্ঞ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ এবং কয়েকটি কবিতা ও গান লিখিয়া আচার্য্য বিনোবা ভাবেজীর নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। প্রথম কবিতাটির নাম 'জয়তু বিনোবা'।

জননী সারদেশ্বরী—শ্রীঅর্চনাপুরী। ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস, ৫১-সি, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭। ২৪৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ৩৲।

শ্রীশ্রীমার (জননী সারদেশ্বরী) শতবার্ষিকী উপলক্ষে অনেকগুলি পুস্তক বাহির হইয়াছে। কিন্তু এই পুস্তকখানিতে একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়, রচনা-মাধুর্য্যে ও ভাষার ঝঙ্কারে এখানিকে গদ্য-কাব্য বলা যায়। ভূমিকায় ডাঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'মাতা অর্চনাপুরী এই জীবনালেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন ভক্তির আবেশে। তাঁহার চিত্ত শ্রীশ্রীমাতার ধ্যানরসে পূর্ণ হইয়া পূর্ণকুম্ভের ন্যায় অতিরিক্ত ভাবাবেগে উচ্ছলিত হইয়া পরিণতি লাভ করিয়াছে ভাষায়।' শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন মানবদেহ ধারণ করিয়া লীলা করিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীমাও তেমনি জগজ্জননী মহামায়ারূপিণী পরিপূর্ণা নারীশক্তিরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। তাঁহার মহিমা শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতেন। তাঁহার জীবনকাহিনী আদ্যোপান্ত গল্পের মত করিয়া লিখিয়াছেন মাতা অর্চনাপুরী, পড়িতে পড়িতে ভাবরসে হৃদয় উদ্বেলিত হয়, অপূর্ব্ব পুলকের আবেগে অন্তর অভিসিক্তিত হয়। শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসু অঙ্কিত প্রচ্ছদপট ও ভিতরের একখানি ছবি এবং শ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি পুস্তকের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। পরিশিষ্টে শ্রীমার বাণীসকল সংক্ষিপ্তরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

পঞ্চমী—শ্রীসত্যেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। ৫১-বি, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭। পৃষ্ঠা ৩২। মূল্য ৷৷০ আনা।

গ্রন্থকার ইতিপূর্ব্বে কয়েকখানি কবিতার বই লিখিয়া পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সরলতা, মাধুর্য্য, ভাবুকতা ও রচনানৈপুণ্যে কবিতাগুলি অন্তর স্পর্শ করে।

ছায়া—শ্রীকরুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়। রমা নিকেতন, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭। পৃষ্ঠা ৭২। মূল্য ১৷৷০।

কবিতাগুলিকে 'ক' হইতে 'ছ' কারাদিক্রমে সাজানো হইয়াছে। 'ঙ'র কবিতাগুলি প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও কর্ম্মবীরগণের উদ্দেশ্যে লিখিত, 'চ'-য়ে কয়েকটি ব্যঙ্গ-কবিতা স্থান পাইয়াছে, অবশিষ্ট কবিতাগুলিতে কবি-জীবনের বিবিধ ভাবের অভিব্যক্তি ও কবিমানসের দর্শন ও জিজ্ঞাসা প্রতিফলিত হইয়াছে। কবিতাগুলি প্রগাঢ় ভাবাভিব্যক্তি ও সহজ সরল ছন্দে অল্প কথায় বিপুল ব্যঞ্জনায় পাঠকের চিত্ত তৃপ্ত ও রসাপ্লুত করে। কবি করুণানিধান ভূমিকায় লিখিয়াছেন, কবির লেখা পড়িয়া তিনি প্রীত হইয়াছেন।

অপ্রত্যাশিত—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বড়াল। রঘুনাথগঞ্জ। পৃষ্ঠা ৯০। মূল্য ১৲।

ছোট গল্পের সঙ্কলন। বারটি গল্প আছে। লেখকের লিপিকৌশল ও বর্ণনাভঙ্গী গল্পগুলিকে সার্থক ও সুখপাঠ্য করিয়াছে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

অন্তর ও বাহির—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার। জিজ্ঞাসা, ১৩৩এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯। মূল্য ২৲।

দুইটি দুর্দান্ত ছেলেকে কেন্দ্র করিয়া কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। ভালমন্দ সবকিছু লইয়াই মানুষ—এই কথাটাই উপন্যাসখানিতে মুখ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই দুইটি ছেলের জীবনে যে সকল স্ত্রী-পুরুষের প্রভাব পড়িয়াছে তাহাদের মধ্যে মায়ের চরিত্রটি লেখকের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। মা তাঁর কাজের মধ্যেই স্বকীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছেন। আর ভাল লাগিল আনন্দ ঠাকুরাণীকে। খুব অল্প সময়ের জন্যই তাঁর দেখা পাওয়া যায়, কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিটুকু মনে গভীর রেখাপাত করে। বক্তব্য গুছাইয়া বলিবার ক্ষমতা লেখকের আছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

দ্রুত-ফেনিল সানলাইট

না আছড়ে কাচলেও সাদা ও ঝকঝকে ক'রে দেয়

"আমার ক্লাসের মধ্যে আমাকেই
সব চেয়ে চমৎকার দেখায়। সানলাইট
দিয়ে কাচার জন্য আমার রঙিন ফ্রক
কেমন ঝকঝকে থাকে দেখুন। মা বলেন
সানলাইট দিয়ে কাচলে কাপড়-চোপড়
নষ্ট হয় না আর তা টেঁকেও বেশী দিন।
এতে খুব খুসী হবার কথা — নয় কি?"

S. 219-X52 BG

অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস—ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। নবভারত পাবলিশার্স, ১৫৩।১, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১। পৃ, ১'+৩৫৩। মূল্য সাড়ে চারি টাকা।

গ্রন্থকার 'মুখবন্ধে' লিখিয়াছেন : "এই পুস্তকখানি 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস' নামে প্রকাশিত হইলেও, ইহা লেখক-প্রণীত 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম' নামক পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডরূপেই পরিগণিত হইবে। এই পুস্তকে বিদেশে ভারতীয় বৈপ্লবিকদের কার্য্যের বিবরণই বিশেষ করিয়া প্রদত্ত হইয়াছে। বার্লিন কমিটির সেক্রেটারীরূপে অধিকাংশ ঘটনাগুলির সহিত লেখক সংশ্লিষ্ট ছিলেন।"

এই আদর্শে পুস্তকখানি রচিত হইলেও প্রবীণ বৈপ্লবিক গ্রন্থকার ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের বিপ্লব-প্রচেষ্টার কথাও ইহাতে বিবৃত করিয়াছেন। পুস্তকখানি প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত। মূল অংশ সতরটি অধ্যায়ে তিনি ভাগ করিয়াছেন। (পৃ ১-১৬৮); পরিশিষ্ট অংশে রহিয়াছে ছয়টি অধ্যায় (১৬৯-৩৫৩)। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কাল হইতে ১৯২৬ সনে গ্রন্থকারের ভারত-প্রত্যাবর্তন পর্য্যন্ত বিদেশে বিপ্লবকার্য্যের কথা এখানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভারতের বিপ্লব আন্দোলন সম্পর্কে এপর্য্যন্ত অনেকগুলি বই প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতের বাহিরে ইউরোপে, আমেরিকা, নিকট ও দূর-প্রাচ্যে ভারতীয় বিপ্লবীরা যে-সব বিপ্লব-কর্ম্মে জীবনপণ করিয়া লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহার একটি তথ্যমূলক ধারাবাহিক ইতিহাসের একান্ত অভাব ছিল। আমরা এযাবৎ খণ্ডশঃ কোন কোন আন্দোলন বা বিপ্লব-কার্য্য সম্বন্ধে পুস্তক-পুস্তিকা কিংবা লোকমারফত কিছু কিছু জানিতাম শুনিতাম; কিন্তু একখানি ধারাবাহিক বর্ণনাসম্বলিত ইতিহাস-পুস্তকের প্রয়োজন বরাবরই অনুভূত হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এইরূপ শ্রমসাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করায় বাস্তবিকই জাতির ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

গ্রন্থকারের পক্ষে এরূপ পুস্তক প্রণয়নের একটা সুবিধাও ছিল খুবই। তিনি দীর্ঘকাল ভারতের বাহিরে থাকিয়া, ভারতের স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে-সব বিপ্লব-প্রচেষ্টা হইয়াছে তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে যুক্ত ছিলেন। তিনি স্বদেশী আন্দোলনের মরশুমে কারামুক্ত হইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং সেখান হইতে তুরস্কে গমনান্তর জার্ম্মানীতে গিয়া অবস্থান করেন। প্রথম মহাযুদ্ধকালে তিনি বার্লিনে ছিলেন। যুদ্ধান্তেও বার্লিনকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপে ভারত-কথা প্রচারে নিবিষ্ট হন। সোভিয়েট বিপ্লবের পরে তিনি মস্কোতেও গিয়াছিলেন। গ্রন্থকার বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে একযোগে বার্লিন কমিটি নামে বিপ্লবী কর্ম্মসংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এই কমিটিকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র ইউরোপে এবং আমেরিকায়ও বিপ্লব-কর্ম্ম পরিচালিত হইতে থাকে। কমিটি নানা স্থানে প্রচুর অর্থসাহায্য প্রদান করেন। এই সকল কার্য্যের একটি তথ্যগত বিবরণ আলোচ্য গ্রন্থখানিতে পাঠক পাইবেন।

স্বদেশের স্বাধীনতাকল্পে ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাহিরের বিপ্লব-প্রচেষ্টা কেন সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই সে সম্বন্ধেও গ্রন্থকার স্বীয় অভিজ্ঞতাপ্রসূত অভিমত সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে অন্যের মতানৈক্যের অবকাশ আছে, এরূপ ক্ষেত্রে থাকাই সম্ভব। তবে একটি কথা আমাদের নিকট যথার্থ বলিয়া মনে হয়। ১৯২১ সনের পূর্ব্বে ভারতের সহিংস বা নিয়মানুগ আন্দোলনের পরিচালনায় জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগরক্ষা করা হয় নাই। তাই পদে পদে ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যেরই সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর অবির্ভাবের পর হইতেই সত্যকার গণসংযোগ প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছে, আবার এই গণসংযোগ যতই দৃঢ়মূল হইয়াছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি ততই টলিয়াছে। গ্রন্থকারের এই ব্যাখ্যান শুধু ইতিহাস-অনুগ নহে, ইহা ভবিষ্যৎ ভারতের বিবিধ উন্নতি-প্রচেষ্টায় সাফল্য ব অসাফল্যেরও নির্দ্দেশ দিতেছে। সমগ্র সমাজ বা মানবসমষ্টি লইয়াই ভারতবর্ষ—একথা যেন আমরা প্রতিনিয়ত মনে রাখি। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে একটি বিষয় পাঠকের বিশেষভাবে অনুভূত হইবে। আমাদের জাতীয় চরিত্রে বহু দোষ-ত্রুটি রহিয়াছে—নেতাদের এবং তাঁহাদের অনুবর্ত্তীদল উভয়েরই। আজ ইংরেজ ভারতবর্ষ ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে। আজ স্বদেশের উন্নতি-অবনতির জন্য আমাদিগকেই দায়ী হইতে হইবে। গ্রন্থকার বিদেশে, এবং স্বদেশেও, ভারতবাসীদের যে-সব দোষ-ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছেন ও স্প ভাষায় সমুদয় বিবৃত করিয়া আমাদিগকে সাবধান হওয়ার নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমরা যেন সবিশেষ অবহিত হই। ইতিহাস আলোচনায় তথ্যনিষ্ঠা প্রয়োজন। ইদানীং কোন কোন লেখকের মধ্যে বিপ্লব-ইতিহাস বর্ণনায় ইহার ব্যত্যয় দেখিয়া গ্রন্থকার তাহার প্রতিবাদ এবং সংশোধন করিতেও ক্ষান্ত হন নাই। পরিশিষ্ট অংশে ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিখ্যাত বিপ্লবীদের বিবৃতি দেওয়ায় গ্রন্থখানির গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। পুস্তকের 'মস্কো-যাত্রা' অধ্যায়টি দীর্ঘ ও বহু তথ্যে পূর্ণ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার ইতিহাস-রচনায় বর্ত্তমান গ্রন্থখানি বিশেষ সাহায্য করিবে। এরূপ মূল্যবান একখানি আকর-গ্রন্থের স্থানে স্থানে মুদ্রণ-প্রমাদ পীড়াদায়ক।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
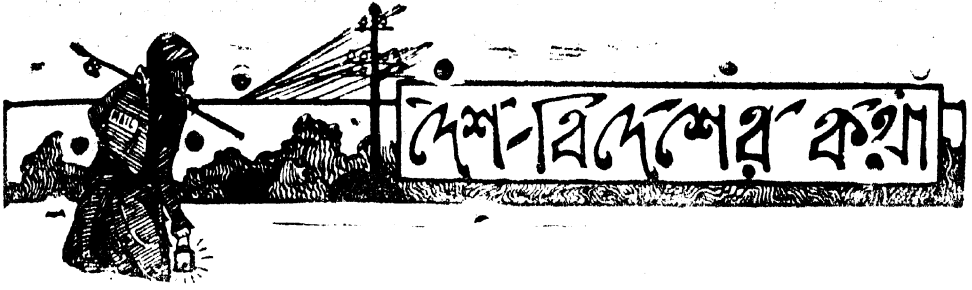
রবিবাসরের রজত-জয়ন্তী বর্ষ

বাংলাদেশের কোন বিশিষ্ট সাহিত্য-সভা সাধারণতঃ দীর্ঘজীবী হয় না। 'রবিবাসর' এই নিয়মের ব্যতিক্রম। এই প্রসিদ্ধ সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানটি পঞ্চবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিল। রবীন্দ্রনাথ ইহার অধিনায়ক ছিলেন। কবিগুরুর সাদর আহ্বানে ১৩৪৩ সালে শান্তিনিকেতনে ইহার যে অধিবেশন হয় তাহা এক স্মরণীয় ঘটনা। শরৎচন্দ্র যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন প্রায় ইহার প্রতি অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতেন। নবীন এবং প্রবীণ খ্যাতনামা সকল সাহিত্যিকই কোন না কোন সময় 'রবিবাসর'র সদস্যশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ইহার সভ্য ছিলেন। স্বর্গত জলধর সেন ছিলেন ইহার প্রথম সর্ব্বাধ্যক্ষ। বর্ত্তমান সর্ব্বাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক এবং সাহিত্যানুরাগী লইয়া এই প্রতিষ্ঠানটি গঠিত। এক সময় পরলোকগত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরে শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ইহার সম্পাদক ছিলেন। ভারতবর্ষ-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কিছুদিন ইহার সম্পাদকত্ব করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু ইহার সম্পাদকপদে অধিষ্ঠিত। গত ৫ই বৈশাখ রবিবার তাঁহার আহ্বানে তাঁহার ভবনে রবিবাসরের রজত-জয়ন্তী বর্ষের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।
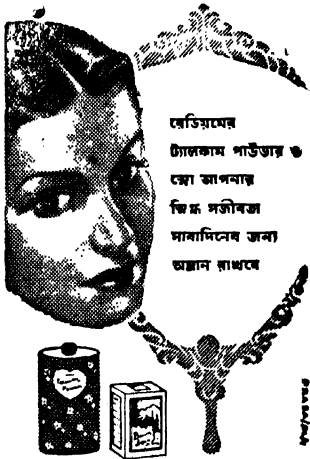
শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক বৈদিকমন্ত্রে স্বস্তিবাচন পঠিত হওয়ার পর সর্ব্বাধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহার উদ্বোধন-ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীমতী চিত্রিতা দেবী উপনিষদ হইতে কয়েকটি শ্লোকের বাংলা অনুবাদ পাঠ করেন। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা রবিবাসরের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে রচিত একটি কবিতা পাঠ করিয়া সকলের আনন্দবিধান করেন। এই অধিবেশনে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত "দেশমাতৃকা মৃন্ময়ী ও চিন্ময়ী" শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

গত ৩রা বৈশাখ গুপ্তিপাড়ায় নবনির্ম্মিত শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দিরে পরিব্রাজক স্বামী শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ মহারাজের স্মৃতিরক্ষাকল্পে প্রতিষ্ঠিত "শ্রীকৃষ্ণ সংস্কৃত বিদ্যাপীঠে" কাব্য ও ব্যাকরণ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা আরম্ভ হইয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতি সাংখ্যতীর্থ মহাশয় অধ্যাপনাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। গুপ্তিপাড়া ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের ছাত্রেরা ইহাতে অধ্যয়ন করিতেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের সংস্কৃত-অধ্যয়নের পৃথক ব্যবস্থা শীঘ্রই করা হইতেছে।

প্রাচ্যবাণীমন্দির

সম্প্রতি কলিকাতায় প্রাচ্যবাণীমন্দিরের একাদশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী বর্ণনাপ্রসঙ্গে প্রাচ্যবাণীমন্দিরের যুগ্মসম্পাদক ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বলেন যে, বিগত একাদশ বৎসরে প্রাচ্যবাণীমন্দির হইতে ১১০খানা গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচ্যবাণীমন্দিরের জন্য বিগত এক বৎসরে দশ হাজার টাকা সাহায্যদানের নিমিত্ত ডক্টর চৌধুরী কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আরও বলেন, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাচ্যবাণীমন্দিরের শাখাসংস্থাসমূহ বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কার্য্যপরিচালনা করিতেছে এবং সংস্কৃত-প্রতিষ্ঠানসমূহ সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে।
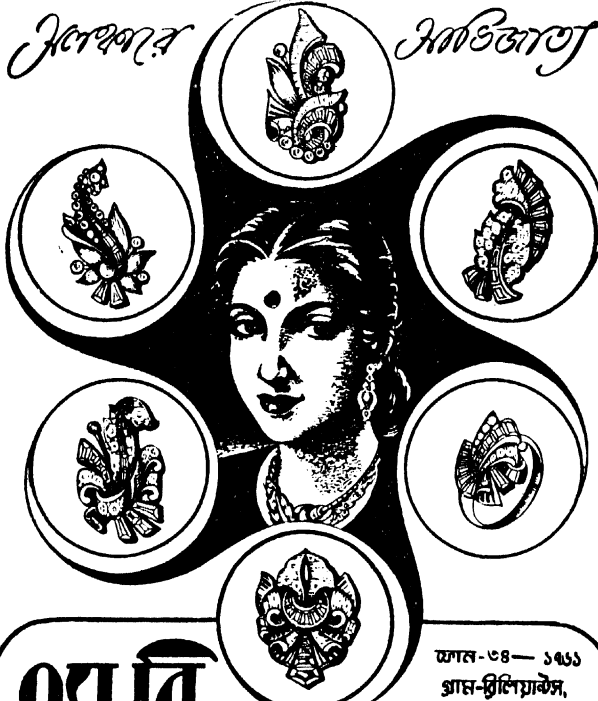
এই উপলক্ষে প্রাচ্যবাণীমন্দিরের যে সকল সদস্যা বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উচ্চারণ-নৈপুণ্য ও অভিনয়-কৌশল উপস্থিত সকলের বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করে।

দিল্লীতে শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবর্দ্ধনা

দিল্লী রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার পুত্র শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১লা এপ্রিল দিল্লী পৌঁছিলে ষ্টেশনে তাঁহাদিগকে বিপুল ভাবে সংবর্দ্ধনা করা হয়। নিউদিল্লী কালীবাড়ী ক্লাব, বেঙ্গলী ক্লাব এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের

পক্ষ হইতে সঙ্গীতনায়ক মহাশয়কে মাল্যভূষিত করা হয়। ৩রা এপ্রিল রাত্রিতে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে তাঁহাদের দরবারী কানড়া, নায়েকী কানড়া, বিহঙ্গড়া ও বাহার রাগের আলাপ, ধ্রুপদ এবং ধামার শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। তানসেন-প্রবর্তিত সঙ্গীতধারার ইঁহারা শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। রাগ-আলাপ বিস্তার, মীড়, গমক, মূর্চ্ছনা, তাঁহাদের সঙ্গীতকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়াছিল। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি-সঙ্গীত যদু ভট্ট রচিত "আজ বহত বসন্ত পবন" গানটি শ্রোতৃবর্গের নিকট বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। ৪ঠা এপ্রিল সন্ধ্যায় নিউ দিল্লী কালীবাড়ীতে দিল্লীর বাঙ্গালী-সমাজ সঙ্গীতনায়ক মহাশয় ও রমেশচন্দ্রকে অভিনন্দিত করেন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মাননীয় শ্রীবিজনবিহারী মুখোপাধ্যায় কর্তৃক তাঁহারা মাল্যভূষিত হন। সঙ্গীতনায়ক মহাশয় তাঁহার অতুলনীয় কণ্ঠসঙ্গীতে সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। রমেশবাবুর উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্র-সঙ্গীত, শ্যামা-সঙ্গীত বিশেষ উপভোগ্য হয়। সকলের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ-রচিত "আজি বহিছে বসন্ত পবন" গানটি গাহিয়া তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন।

পরলোকে সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ৯ই এপ্রিল 'ক্যালকাটা পোর্সেলিন ওয়ার্কস লিমিটেডে'র প্রতিষ্ঠাতা সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে

পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে শিল্পজগতের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সুধীরকুমার ছিলেন গবর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউটের অবসর-প্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। গবর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউটে 'কমার্স' বিভাগের ছাত্ররূপে কলিকাতায় তিনি শিক্ষালাভ করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্স গ্রাজুয়েট হন। তার পর তিনি বিক্রয়কর বিভাগে যোগদান
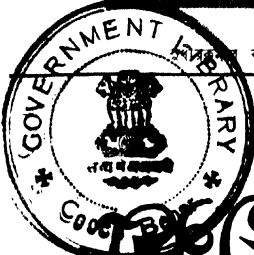
জন্মেন এবং কয়েক বৎসর উক্ত বিভাগে বিভিন্ন পদে কাজ করেন। অল্প বয়স হইতেই ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। সরকারী চাকুরি পরিত্যাগ করিয়া তিনি জেনারেল ম্যানেজাররূপে তাঁহার পিতার প্রতিষ্ঠিত "ব্যাঙ্ক অব বাঁকুড়া"র কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন।

ব্যবসায়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া সুধীরকুমার ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সামান্য মূলধনে বেলঘরিয়ায় ১৪ বিঘা জমির উপর "ক্যালকাটা পোর্সেলিন ওয়ার্কস" নামক শিল্পসংস্থাটি স্থাপিত করেন। কেবলমাত্র নিজের অক্লান্ত চেষ্টায় স্বল্পকাল মধ্যেই তিনি আর্থিক সঙ্কটের সময়েও এই প্রতিষ্ঠানের মূলধন প্রভূত পরিমাণে বাড়াইতে সক্ষম হন। কিন্তু অতিরিক্ত কাজের চাপ পড়ায় অবশেষে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্যাঙ্কের কাজ ছাড়িয়া দেন এবং পোর্সেলিন ওয়ার্কস-এর উন্নতিবিধানে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন। তিনি এই শিল্পের উৎকর্ষসাধনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন একথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া তিনি দিনরাত এই শিল্প প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়নের জন্য কাজে লিপ্ত থাকিতেন। এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের মূলে রহিয়াছে তাঁহার প্রখর ব্যবসাবুদ্ধি ও কঠোর পরিশ্রম। কোম্পানীর বর্ত্তমান কার্য্যকরী মূলধন (working capital) দাঁড়াইয়াছে পাঁচ লক্ষের উপর এবং ইহাতে মাসিক ৩৫,০০০৲ টাকা মূল্যের বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত হয়। সুধীরবাবু 'হরিদাস মেডিক্যাল হল লিমিটেড' এবং 'বেলেঘাটা হোসিয়ারি লিমিটেডে'র ডিরেক্টর ছিলেন।

ফ্যাক্টরির কর্ম্মচারীদিগের প্রতি সুধীরবাবু অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বাহিরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিবার উপদেশ দিতেন। অভিনয়ে তাঁহার অনুরাগ ছিল। বিশ্বকর্ম্মা পূজা উপলক্ষে ফ্যাক্টরির কর্ম্মীদের সঙ্গে 'কেদার রায়ে'র অভিনয়ে তিনি শ্রীমন্তের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নিরুপমা দত্ত

অবিভক্ত বাংলা সরকারের ইকনমিক বোটানিষ্ট, সুপ্রসিদ্ধ কৃষিতত্ত্ববিদ দ্বিজদাস দত্ত মহাশয়ের পত্নী নিরুপমা দত্ত গত ৯ই চৈত্র পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার পিতা আনন্দকিশোর দত্তরায় সবজজ ছিলেন।

নিরুপমা ছিলেন একজন স্বভাব-কবি। পিতৃগৃহের ও স্বামী-গৃহের অনুকূল আবেষ্টনীতে অল্প বয়সেই তাঁহার কবিত্বশক্তির উন্মেষ হয়। অধুনালুপ্ত 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র তিনি একজন নিয়মিত লেখিকা ছিলেন। তাঁহার বহু কবিতা ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। দিনের অধিকাংশ সময় তিনি কাব্য, সাহিত্য আলোচনা করিয়া ও ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়া কাটাইতেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা বিদগ্ধজনের নিকট প্রশংসালাভ করে।

নিরুপমা দত্ত

নিরুপমা ধর্ম্মপ্রাণা ও লোকহিতৈষিণী ছিলেন। তাঁহার দেশপ্রীতি ছিল সুগভীর—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় হইতে তরুণ বয়সেই তিনি স্বদেশীমন্ত্রে দীক্ষিতা হন। পারতপক্ষে তিনি বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করেন নাই। ধর্ম্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ থাকায় নিরুপমা বহু সাধুর সঙ্গ লাভ করিয়াছেন। পার্থিব জীবনের সুখসম্পদের অধিকারিণী হইয়াও তিনি গৃহী-সন্ন্যাসিনীর জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০৷২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

নববর্ষার আবাহন

শ্রীবীরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

নিউ দিল্লীতে লোকসভার স্পীকার জি. ভি. মবলঙ্কার সহ সিংহল 'পার্লামেণ্টারি ডেলিগেশনে'র সদস্যগণ
(বাঁ দিক হইতে দ্বিতীয়) প্রতিনিধিদলের নেতা এলবার্ট এফ. পেরিজ

নিউ দিল্লীতে হাতে ছাপা ভারতীয় বয়ন-শিল্পের প্রদর্শনীতে ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী
(ছবির ডান দিকে) শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়
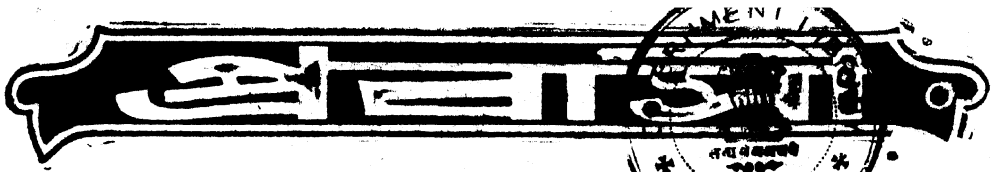
বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের আয়তন বৃদ্ধি

বাঙালী মাত্রেই পশ্চিমবঙ্গের আয়তন বৃদ্ধি চাহেন। এই আকাঙ্ক্ষা কাহারও ক্ষেত্রে সুচিন্তিত ও ন্যায়সঙ্গত কারণের ভিত্তিতে স্থাপিত, কাহারও বা কেবলমাত্র অন্য সকল বিষয়ে যেরূপ স্বার্থচিন্তা থাকে সেইরূপ চিন্তাপ্রসূত। আবার এরূপ বহু লোক আছেন যাঁহাদের ঐ বিষয়ে চিন্তার অবকাশই নাই, শুধু মাত্র উচ্ছ্সিত ভাবধারার ধূম-ফেনিল স্বপ্নের উপরেই তাঁহাদের ঐ ঈপ্সা ভাসিয়া বেড়ায়। বলা বাহুল্য, প্রথম শ্রেণীর লোক সংখ্যায় অতি সামান্য, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক অনেক বেশী এবং তৃতীয় শ্রেণীর লোকই বাঙালী সাধারণের অধিকাংশ।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের সীমানার পরিবর্ত্তনের ভাষাভিত্তিক দাবী কেন্দ্রীয় সীমান্ত পরিবর্ত্তন কমিটিতে প্রেরিত হইয়াছে। দাবীর নথী (Memorandum) সম্পর্কে কোনও সমালোচনা এখন করা শুধু বৃথা নয়, বোধ হয় অসমীচীনও বটে। কেননা উহাতে প্রতিপক্ষের সুবিধা হইতে পারে। সুতরাং এইমাত্র বলা চলে যে, যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ঐ পুস্তকের বিষয়বস্তু রচনা ও যুক্তিতর্কের উপস্থাপন করিয়াছেন তাঁহারা আরও দুই-তিন জন সহকারী পাইলে হয়ত পশ্চিমবঙ্গের দাবি আরও সুস্পষ্ট ও দৃঢ় ভাবে গঠিত করিতে পারিতেন। আমরা জানি মাত্র দুই-তিন জন পূর্ণ মনোনিবেশ করিয়া ঐ কার্য্যে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, অন্যেরা তাঁহাদের সময় নষ্ট ও অলীক যুক্তি উত্থাপন ভিন্ন বিশেষ কিছু করেন নাই। যাহাই হউক মোটের উপর কার্য্যফল মন্দ হয় নাই।

আর এক দল লোক সম্প্রতি কল্পনাপ্রসূত ইচ্ছার ভেলায় ভাসিয়া ভাবোচ্ছ্বাসের তরঙ্গের সাহায্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম-বঙ্গের মধ্যস্থ রাষ্ট্রীয় সীমানা উড়াইয়া দিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কলিকাতার এক দল সাংবাদিক ও ব্যবসায়ী নাগরিকই প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উন্মত্ত ভাবোচ্ছ্বাসের ফলে মৌলবী ফজলুল হক পদচ্যুত ও পূর্ব্ব-পাকিস্থানের প্রায় আট শত পদস্থ নাগরিক বন্দী!

দোষের মধ্যে হক সাহেব তাঁহাদের কল্পনাশক্তির সামান্য কিছু উপকরণ দিয়াছিলেন। তাহাকেই অতিরঞ্জিত করিয়া মিথ্যার মায়াজাল রচিত হয়।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস সঙ্কলন

কিছুদিন পূর্ব্বে ভারত-সরকার ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক ইতিহাস সঙ্কলনের জন্য বিশেষজ্ঞদের লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে মালমশলা সংগ্রহের নিমিত্ত এই কমিটি যেমন চেষ্টা করিতেছেন, সেইরূপ ইউনিয়ন-সরকারের নির্দ্দেশে বিভিন্ন রাজ্য-সরকারও যথোপযুক্ত মালমশলা সংগ্রহার্থে এক একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। এই সকল কমিটি আবার গবেষক ও অনুসন্ধানকারী নিয়োগ দ্বারা এই কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য-সরকারও একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। এই কমিটির পক্ষে কয়েকজন গবেষক নিযুক্ত হইয়াছেন বিভিন্ন সরকারী বিভাগ, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও নেতৃবর্গের নিকট হইতে উপাদান সংগ্রহের জন্য। এই বিষয়ে কতটা অগ্রসর হওয়া গিয়াছে তাহারও একটা ফিরিস্তি আমরা সম্প্রতি জানিতে পারিয়াছি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন সূচনার তারিখ এক এক প্রদেশে এক এক প্রকার। তবে মোটামুটি ১৭৫৭ সনে পলাশীর যুদ্ধের সময় হইতে ইহার সূচনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বা চুয়ার বিদ্রোহকে কি ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে? কিছুকাল পূর্ব্বে আমাদের একজন মুসলমান বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, টিপু সুলতানের যুদ্ধকে কি স্বাধীনতা সংগ্রাম বলিয়া ধরা হইবে না? পলাশীর যুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতা অপহৃত হইয়াছে বটে, তবে ঐ সময়কে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের সূচনা বলিয়া ধরা হইলে নানা বিপদ আছে এবং বিতর্কেরও উদ্ভব হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটি কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই। বিদেশী রাজ্যলোলুপ শক্তি দেশীয়দের সহায়ে নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পলাশীর রণক্ষেত্রে চিরতরে হারাইয়া দেয় বটে, কিন্তু নবাবের নৃশংস অত্যাচার হেতু নেতৃস্থানীয় বাঙালীরা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার উপরে তিক্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং গোবিন্দরাম মিত্র প্রমুখ কতিপয় বাঙালী-প্রধান তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করিয়াছিলেন।

বস্তুতঃ পক্ষে আমরা 'স্বাধীনতা' বলিতে যাহা কিছু বুঝি, তদ্‌বিষয়ক আন্দোলন সুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম-পাদে। সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়েই

যুগোপযোগী সংস্কারের বার্তা লইয়া ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁহার পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ কলিকাতা শহরে প্রগতিশীল অথচ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনসমূহ আরম্ভ হয়; তাহা ক্রমে সমগ্র দেশে, গ্রামে ও পল্লীতে ছড়াইয়া পড়ে। এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে, পলাশীর যুদ্ধের ঠিক এক শত বৎসর পরে, ১৮৫৭-৫৮ সনে যে সিপাহী বিদ্রোহ হয় তাহাকেও কেহ কেহ ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা-সমর বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। ইহা যে জরাজীর্ণ শতছিন্ন দিল্লীর বাদশাহী-তক্তকে পুনরায় পূর্ব্ব গৌরবে বসাইবার জন্যই একটি মধ্যযুগীয় প্রচেষ্টা, যাহার সঙ্গে জনসাধারণের যোগ ছিল না বলিলেই চলে, সে কথা নিরপেক্ষ তথ্যাদর্শী ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। এই অভিমতের সমর্থনে আচার্য্য জে. বি. কৃপালনীর সাম্প্রতিক আলোচনার প্রতিও আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। শুধু ভাবালুতার বশবর্ত্তী হইয়া সিপাহী বিদ্রোহকে প্রথম স্বাধীনতা সমর আখ্যা দিয়া আমরা যেন ঐতিহাসিক সত্য ও তথ্যকে ক্ষুণ্ণ এবং বিকৃত না করি।

বাংলার প্রায় সমসময়ে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন মাদ্রাজ এবং বোম্বাই শহরেও সুরু হয়, কিন্তু তাহা ছিল নিতান্তই প্রাদেশিক; নিখিল-ভারতীয় আদর্শ সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী এই কলিকাতা শহর হইতে অন্যান্য প্রদেশে বিচ্ছুরিত হয়। অর্দ্ধ-শতাব্দীব্যাপী এই প্রয়াসের ফল—ভারতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস রচনাকালে এ কথাটা ভুলিলে চলিবে না। বাংলা দেশের এই নব আন্দোলন ক্রমে দুইটি ধারায় চলিতে থাকে: একটি আইনানুগ, অপরটি বৈপ্লবিক। এ সকল বিষয় সবিশেষ আলোচিত হইয়া পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইবে এরূপ আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের উপাদান সম্পর্কেও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। সরকারী ও বেসরকারী উভয় সূত্র সম্পূর্ণ যাচাই করিয়া তবে সত্য নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। অবশ্য এ বিষয়েও আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে। কতকগুলি বিষয় এখনও সরকারী দপ্তরখানায় এবং আইন-আদালতে মজুত রহিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি আলিপুর বোমার মামলার নথিপত্র, মায় শ্রীঅরবিন্দের স্বহস্তলিখিত পত্র ও রচনাদি, কলিকাতায় প্রদর্শিত হইতেছে। এইরূপ বিভিন্ন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক মামলার বিবরণ আইন-আদালতের নথিপত্র হইতে সংগৃহীত হওয়াও প্রয়োজন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অধিকার এবং জালালাবাদ পাহাড়তলীতে সরকারী সেনাদের সঙ্গে বিপ্লবীদের সংগ্রাম সংক্রান্ত তথ্য হয়ত এখনও হাইকোর্টের বিশেষ দপ্তরে কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, নিজ রক্ত দ্বারা লিখিত বিপ্লবীদের কোন কোন চিঠি হাইকোর্টে বিচারকালে প্রদর্শিতও হইয়াছিল। ইহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে কি? গুপ্ত পুলিসবিভাগে নয় শতাধিক ফাইল এখনও রহিয়াছে, যাহাতে বিপ্লবী ও অবিপ্লবী রাজনীতিক আন্দোলন এবং রাজনীতিক কর্ম্মীদের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

বাংলাদেশে যে বিপ্লব আন্দোলন বর্ত্তমান শতকের প্রথমে স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বেই আরম্ভ হয় তাহা ক্রমে ভারতবর্ষে বিস্তৃত হয়। এই সকল আন্দোলনের উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভ। এই প্রসঙ্গে বঙ্গের অনুশীলন সমিতির নাম সর্ব্বাগ্রে করিতে হয়। সুখের বিষয়, সরকারী ও বেসরকারী সূত্রে আজ এই সমিতি ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহের যথাযথ ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইবার অনেকটা সুযোগ ঘটিয়াছে। গুপ্ত সমিতির কোনরকম লিখিত বিবরণ না থাকায় সে সম্বন্ধে খুব সতর্কতার সহিতই স্বাধীনতার ইতিহাস-রচয়িতাদের অগ্রসর হইতে হইবে।

এখানে আর একটি বিষয়ও স্বাধীনতার ইতিহাস-রচয়িতাদের বিশেষ স্মরণ রাখিতে হইবে: ভারতের বিপ্লব আন্দোলন বহু চিন্তাবীর মনীষীর চিন্তা ও সাধনাপ্রসূত। দাদাভাই নৌরজী, এ. ও. হিউম প্রমুখ নেতৃবর্গের পরিচালিত কংগ্রেসের নিয়মানুগ আন্দোলন যে আমাদের স্বাধীনতা আনিবার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট ছিল না, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ চিন্তানায়কেরা ইহা বুঝিয়াছিলেন এবং শক্তি-সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই শক্তি-সাধনা ক্রমে বিপ্লব-আন্দোলন নামেই আখ্যাত হয়। এই শক্তি-সাধনার মধ্যে যে কতখানি সার্থকতা নিহিত আছে তাহা পরবর্ত্তীকালে গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত ভারত ছাড় আন্দোলন এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পরিচালনায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন ও ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামই তাহার প্রমাণ। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এই বিপ্লব-আন্দোলনের সার্থকতা আজ দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট। শেষোক্ত সংগ্রাম না হইলে আমাদের স্বাধীনতা হয়ত আরও বিশ বৎসর বিলম্বিত হইত।

প্রতিটি রাজ্যে যে সব মালমশলা সংগৃহীত হইতেছে, নিখিল-ভারতীয় ইতিহাস রচনায় তাহা ব্যবহৃত হইবে বটে, কিন্তু প্রত্যেক রাজ্যের আলাদা বিশদ ইতিহাস রচনায়ও রাজ্য-সরকারসমূহ ইচ্ছা করিলে এ সকল ব্যবহার করিতে পারিবেন। ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তর, বিশেষতঃ বাংলাদেশের এই সকল মালমশলা সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ কিছু অর্থসাহায্য করিতেছেন না। ১৯৫৩ সনের ১লা আগষ্ট হইতে এ বিষয়ে বাংলায় কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্য-কমিটি মারফত গবেষক ও অনুসন্ধান-কারীদের বেতন-ভাতা এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় পুরাপুরি বহন করিতেছেন। গত বৎসরে তাঁহারা দিয়াছেন দশ হাজার টাকা; এবারে তাঁহারা দিবেন কুড়ি হাজার টাকা। আশা করা যায়, বর্ত্তমান বৎসরের মধ্যে মালমশলা সংগৃহীত হইয়া ১৯৫৫ সনের শেষ নাগাদ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। ভারত-সরকার এবং রাজ্য-সরকার জনসাধারণের নিকটও উপাদানাদি সংগ্রহে সাহায্য চাহিয়া আবেদন জানাইয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী বিলোপ

আমরা জমিদার নহি এবং জমিদারের সপক্ষে বা বিপক্ষে বলিবার কোনও ব্যক্তিগত কারণ আমাদের নাই। তাহা সত্ত্বেও এই নূতন ব্যবস্থা চলিবার বিষয়ে আমরা নিরুদ্বেগ নহি।

জমিদারদিগের কি হইবে তাহা আমাদের চিন্তার কারণ নহে। যে শ্রেণীর লোক নিজেদের সপক্ষে কিছু বলিতেও অপারগ তাঁহাদের স্থান বর্ত্তমান জগতে নাই। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে অনেক কৃতী ও জনহিতৈষী লোক ছিলেন. যাঁহারা দেশের ও দশের অশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন, যথা: মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। তাঁহাদের স্মরণ করিয়াই সে প্রসঙ্গে শেষ করি। আমাদের চিন্তার প্রধান কারণ জমিদারীতে নিযুক্ত সপরিবার ৮৫ হাজার লোক ও ন্যূনকল্পে আজও দেড় দুই লক্ষ পরিবার যাহারা জমিদার আশ্রিত বা প্রতিপালিত তাহাদের কি হইবে?

১৩৬২ সনের ১লা বৈশাখ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব রাজ্য সরকারের দখলে আসিতেছে। এই জমিদারী দখলের ব্যাপক ও জটিল কার্য্য সুসম্পন্ন করার জন্য সরকার এখন হইতেই উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করিয়াছেন। ১৩৬১ সনের ৩১শে চৈত্রের মধ্যে এই রাজ্যের ২৫ হাজার জমিদারী ও ১৩।১৪ লক্ষ মধ্যস্বত্ব ভোগীর জমি রাষ্ট্রায়ত্ত করার ব্যবস্থার জন্য রাজ্য মন্ত্রীসভা ১৯৫৪-৫৫ সনের জন্য ১৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

জমিদারী গ্রহণ কার্য্য আরম্ভের জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম্মচারী নিয়োগেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। ৪ জন ডেপুটি কালেক্টর, ২৮ জন সাব-ডেপুটি কালেক্টর, ৬০ জন সেটেলমেণ্ট কানুনগো, ৬০৪ জন তহশীলদার, ২৮৪ জন কেরাণী, ১১৫৯ জন পিওন, আর্দালী প্রভৃতি নিযুক্ত করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। খাদ্যদপ্তরের উদ্বৃত্ত কর্ম্মচারী ও বিভিন্ন জমিদারের কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের মধ্য হইতে এই লোক নিয়োগ করা হইবে। আনুমানিক হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, জমিদারীর কাজে প্রায় ৮৫ হাজার লোক নিযুক্ত আছে।

গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীসভার এক বৈঠকে জমিদারী সরকারী কর্তৃত্বে আনার সর্ব্বাঙ্গীণ ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ আরম্ভ করার প্রাথমিক কর্ম্মপন্থা লইয়া আলোচনা হয়। ১৯৫৩ সনের পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী দখল আইন অনুযায়ী ১৯৫৫ সনের ১৫ই এপ্রিল (বাংলা ১৩৬২ সনের ১লা বৈশাখ) রাজ্যের সমস্ত জমিদারী ও মধ্যস্বত্বভোগীর জমি সরকারের দখলে আসিবে। এখন পর্য্যন্ত হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সরকারকে ৮০।৯০ লক্ষ বাস্তব খাজনা আদায় করিতে হইবে। ১৩৬১ সনের ৩১শে চৈত্রের মধ্যে সমস্ত জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীকে আইন অনুযায়ী নোটিশ দেওয়া, জমাজমির হিসাব তৈয়ারী করা, খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা প্রভৃতি নানাবিধ বিরাট ও জটিল কাজ সরকারকে শীঘ্রই আরম্ভ করিতে হইবে। এই কাজের জন্য কর্ম্মচারীদের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থাদি করিতে হইবে। ইহা ছাড়া জেলা ও মহকুমা সদরে লোকজন নিয়োগের ব্যবস্থাদি ইতিমধ্যে শেষ করিতে হইবে। রাজ্য সরকার ১৯৫৪-৫৫ সালে এই কাজ বাবদ মোট ১৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। রাজ্যের জমিদারী দখলের জন্য প্রয়োজনীয় সেটেলমেণ্ট কার্য্য নিষ্পন্ন করার নিমিত্ত পূর্ব্বেই ১ কোটি ১৭ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

কেসি-নেহরু সংবাদ

অষ্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ আর. জি. কেসি জেনেভার পথে নয়া দিল্লী হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমাচার নিম্নস্থ সংবাদে আছে:

"নয়া দিল্লী, ১০ই জুন—আজ পররাষ্ট্র দপ্তরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরুর সহিত অষ্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ আর. জি. কেসির যে আলাপ-আলোচনা হইয়াছে, দিল্লীর রাজনৈতিক ও কূট-নৈতিক মহল তাহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন।

মিঃ কেসি দূর-প্রাচ্য সংক্রান্ত সম্মেলনে যোগদানের নিমিত্ত জেনেভা গমনের পথে ঐ স্থানে আগমন করেন। তিনি যে নির্দ্দিষ্ট কোনও প্রস্তাব লইয়া চলিয়াছেন, এ কথা তিনি অস্বীকার করেন, কিন্তু পালাম বিমান ঘাঁটিতে উপনীত হইয়া তিনি বলেন, 'ইন্দো-চীন সমস্যা সম্পর্কে অষ্ট্রেলিয়ার একটি নিজস্ব মনোভাব আছে। এই মনোভাব প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মনোভাবের অনেকটা অনুরূপ। ইন্দো-চীনে যুদ্ধবিরতি তত্ত্বাবধায়ক কমিশন নিয়োগ সম্পর্কে কমিউনিষ্ট ও অ-কমিউনিষ্ট মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লইতে হইবে।'

রাজনৈতিক পর্য্যবেক্ষকগণ শ্রীনেহরুর মতামতের বিষয় এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতেছেন। শ্রীনেহরু বলিয়াছিলেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার কোনও মীমাংসা করিতে হইলে চীনাগণ ও পাশ্চাত্ত্য শক্তি-বর্গের উভয় পক্ষ সম্মত ভিত্তিতেই তাহা সম্পাদন করিতে হইবে, তথাকথিত 'প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত মৈত্রী চুক্তির ফলস্বরূপ' মীমাংসা করিলে চলিবে না।

ইন্দো-চীনে অবলম্বনীয় কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে যদি উভয় পক্ষ সম্মত মীমাংসার সূত্র গৃহীত হয়, তাহা হইলে এই সূত্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে স্থিতাবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার অন্যান্য অংশেও প্রয়োগ করা যাইবে। এই প্রকার মীমাংসার সূত্রের সহিত যুক্ত থাকিতে ভারতেরও কোনও অসুবিধা হইবে না।

কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলিতে ইন্দো-চীন সম্পর্কে যে ক্রমবর্দ্ধমান 'সাধারণ আদর্শ ও উদ্দেশ্য' দেখা দিয়াছে, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীনেহরুর সহিত অষ্ট্রেলীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ আর. জি. কেসির আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। জেনেভায় ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মিঃ এণ্টনী ইডেনের মীমাংসা প্রচেষ্টা এবং সেই সময়ে উক্ত নগরীতে শ্রীকৃষ্ণ মেননের উপস্থিতিতে যে রাজনৈতিক মতের প্রাবল্য দেখা দিয়াছে, ইন্দো-চীনে মীমাংসার ব্যাপারে শ্রীনেহরুর তথা ভারতের মন্তব্য শোনা উচিত—মিঃ কেসির এই মত তাহারই প্রতিধ্বনি বলিয়া বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন।"

মার্কিন রাষ্ট্রের বুদ্ধিহীন কার্য্যকলাপে ভারতের দ্বারে যে নূতন বিপদের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে সে সম্পর্কে মিঃ কেসি কিছু শুনিয়া গিয়াছেন কিনা আমরা বুঝিলাম না। যাহার গৃহদ্বারে বিপদ ঘনাইয়া আসিবার চিহ্ন দেখা দিয়াছে সে অপরের ঝগড়া মিটাইবার জন্য দূরদেশে জড়াইয়া পড়িবে কোন্ বুদ্ধিতে, সে বিষয়ে উপরোক্ত বিশেষজ্ঞমহল কি বলেন?

পূর্ব্ব-পাকিস্থান ও আমেরিকা

পূর্ব্ববঙ্গে হক মন্ত্রীসভার পদচ্যুতি সম্পর্কে ৩রা জুন এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে "চিত্তবাদ" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, হক মন্ত্রীসভার পদচ্যুতির পিছনে আমেরিকার চাপ আছে বলিয়া যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে সেই প্রসঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের নূতন গভর্ণর হিসাবে মেজর জেনারেল ইস্কন্দর মির্জ্জার নিয়োগও বিশেষ তাৎপর্য্য-পূর্ণ। জেনারেল মির্জ্জা যখন পাকিস্থানের প্রতিরক্ষা সচিব ছিলেন তখন পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি এবং পাক-তুরস্ক চুক্তি সম্পাদনে তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং সক্রিয় ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে এইরূপ সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানান হইয়াছিল। নির্ব্বাচনে যুক্তফ্রণ্টের জয়লাভেও সেই প্রতিবাদেরই প্রতিফলন দেখা গিয়াছিল। এই অবস্থায় সামরিক চুক্তির অন্যতম সমর্থককে গভর্ণর করিয়া পাঠানোর পশ্চাতে কোন তাৎপর্য্য নাই মনে করা যায় না।

পূর্ব্ব-পাকিস্থানের ঘটনাবলী হইতে আর একটি দিকের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সকল সময়েই বলে যে, কমিউনিজমের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকে সমর্থন করাই তাহার নীতি; বস্তুতঃ আমেরিকা ঘোষণা করিয়াছে যে, কমিউনিজমের অগ্রগতি রোধ করিয়া গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করিবার জন্যই তাহাদের সামরিক সাহায্য দানের কর্ম্মপন্থা গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু পাকিস্থানে কি গণতন্ত্র আছে? কয়েকটি সংশোধনসহ ১৯৩৫ সনের পুরাতন ভারত শাসন আইন এখনও পর্য্যন্ত পাকিস্থানে বলবৎ রহিয়াছে; এখনও সেখানে কোন নূতন শাসনতন্ত্র গৃহীত হয় নাই। উক্ত আইনের বলে গবর্ণর-জেনারেল যে কোন মন্ত্রীসভাকে গদীচ্যুত করিতে পারেন। ব্রিটিশ রাজত্বে গবর্ণর জেনারেল মাত্র একবার এই ক্ষমতা ব্যবহার করিয়াছিলেন যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সিন্ধুর আল্লাবক্স মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু পাকিস্থান সৃষ্টির পর করাচীর শাসকচক্রের অপ্রিয় বিভিন্ন জনপ্রিয় মন্ত্রীসভাকে গদীচ্যুত করা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খানসাহেব মন্ত্রীসভা, পশ্চিম পঞ্জাবে মামদোত মন্ত্রীসভা, সিন্ধুতে খুরো মন্ত্রীসভা, কেন্দ্রে নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভা এবং সর্ব্বশেষে পূর্ব্ব-পাকিস্থানে হক মন্ত্রীসভাকে গবর্ণর-জেনারেল ক্ষমতাচ্যুত করিয়াছেন। ইহাতে কি পাকিস্থানে গণতন্ত্রের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়? "মুখে গণতন্ত্রের মহান্ সমর্থক বলিয়া প্রচার করিলেও পাকিস্থানের সহিত মিলিত হইয়া আমেরিকা কি গণতন্ত্রের সমাধি রচনায় সাহায্য করিতেছে না?"

নারায়ণগঞ্জে আদমজী মিলে দাঙ্গা

পূর্ব্ব-পাকিস্থানের নারায়ণগঞ্জে আদমজী পাটকলে দাঙ্গার ফলে প্রায় পাঁচ শতাধিক লোক নিহত এবং তাহারও বেশী লোক আহত হয়। এই দাঙ্গার উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করিয়া অর্দ্ধসাপ্তাহিক "ওয়াতান" (১০ই জ্যৈষ্ঠ) এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন, "এইরূপ একটি শোচনীয় ঘটনা একদিনে ঘটিতে পারে না। ইহা একটি সুপরিকল্পিত অভিযান এবং এখানে কোন বিশেষ স্বার্থের প্রশ্ন সুপরিকল্পিত ভাবে কাজ করিয়াছে।" পত্রিকাটির মতে, অবাঙ্গালীদের প্রভুত্বপ্রিয়তা এবং বাঙ্গালীকে সুনজরে না দেখিবার অভ্যাসই এই শোচনীয় দাঙ্গার কারণ। "ওয়াতান" লিখিতেছেন: "ব্যক্তিগত-ভাবেও আমাদের যে অভিজ্ঞতা জাগিয়াছে তাহা হইতে একথা বলিতে পারা যায় যে, নানাক্ষেত্রে অবাঙ্গালীরা বাঙ্গালীদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে এবং অতি সাধারণ ব্যাপারেও তাহাদের শোষণ করিতে কার্পণ্য করে নাই। মুসলীম লীগের প্রাধান্যের সময় উহার কোন প্রতিকার হয় নাই। সুতরাং ইহা স্বাভাবিক যে লীগ শাসনের পতনের পর অবাঙ্গালীদের সেই স্বার্থের প্রশ্ন বিঘ্নিত হইবার আশঙ্কায় তাহারা উত্তেজিত হইতে পারে এবং বাঙ্গালীদের মনেও নূতন আশার সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক।"

হক মন্ত্রীমণ্ডলী সম্প্রসারিত হইবার পরক্ষণেই এই বীভৎস দাঙ্গার সঙ্ঘটন বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। একজন মন্ত্রীর প্রাণপণ চেষ্টাতেও দাঙ্গা প্রতিরোধ করা সম্ভব হইল না। মিলের মধ্যে বহু-সংখ্যক পুলিশ থাকা সত্ত্বেও নারী এবং শিশুসহ পাঁচ শত লোকের হত্যা ও অনুরূপসংখ্যক লোককে আঘাতের হাত হইতে রক্ষা করা গেল না। "জনতাকে নিরস্ত্র করিবার নামে কারণে অকারণে গুলি চালাইতে অভ্যস্ত পুলিশ সেদিন একটি বুলেটও নিক্ষেপ করিল না—অথচ গুণ্ডার দল আগ্নেয়াস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সব অস্ত্রই ব্যবহার করিতে পারিল। সেই সব কোথা হইতে রাতারাতি আমদানী হইল? তারপর তথা হইতে বাহির হইয়া গ্রামের উপরেও উত্তেজিত হস্তীর দল চড়াও করিল এবং আগুন দিয়া হত্যা করিল। এই সকল ঘটনা পর্য্যালোচনা করিলে কি এত বড় একটা ঘটনার জন্য একটি নরহত্যার উত্তেজনার ফলে রাতারাতি প্রস্তুতি সম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে? অতঃপর অবাঙ্গালীদের প্রত্যেকের বাহুতে কাল ফিতা এবং গৃহশীর্ষে কাল নিশান উড্ডীন করাও কি অর্থব্যঞ্জক নহে? প্রভুত্বপ্রিয় অবাঙ্গালীরা বাঙ্গালীদের মুখখোলার বিরুদ্ধে একটা চরম শিক্ষা দিবার মানসিকতা লইয়াই যে এই বীভৎস কাণ্ড করিয়াছিল এই সকল ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়া তাহাই আমাদের মনে হইতেছে।"

দাঙ্গার ফলে যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ পাইয়াছে এই যুক্তি খণ্ডন করিয়া "ওয়াতান" লিখিতেছেন যে, নির্ব্বাচনেই আস্থা-অনাস্থার প্রশ্ন চূড়ান্ত ভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। যদিও মন্ত্রীসভার প্রতি কাহারও অনাস্থা থাকিয়া থাকে তবে তাহা মুষ্টিমেয় লীগপন্থীদেরই ছিল। "সুতরাং অনাস্থা প্রকাশের জন্য যদি দাঙ্গার প্রয়োজন কেহ বোধ করেন তবে তাঁহারাই। অতএব এই-রূপ কোন পরিকল্পনা তাঁহাদের ছিল কিনা সে কথা একমাত্র তাঁহারাই বলিতে পারেন। অপরের পক্ষে তাহা বলা সম্ভব নয়।

কমিউনিষ্টরা ঐ দাঙ্গা সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ আলী যাহা বলিয়াছেন তাহার বিদ্রূপ করিয়া পত্রিকাটি বলিতেছেন, "যদি এইরূপ তথ্যাদি পূর্ব্ব হইতেই করাচীতে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল তাহা হইলে কেন পূর্ব্ব হইতেই প্রতিরোধ-ব্যবস্থা হয় নাই? করাচী কি তবে নারায়ণগঞ্জের এই হত্যাকাণ্ডের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল?"

পূর্ব্ববঙ্গে হক মন্ত্রীসভার পদচ্যুতি

৩০শে মে পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব্ব-পাকিস্থানের হক মন্ত্রীসভাকে পদচ্যুত করিয়া সেখানকার শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং পূর্ব্ববঙ্গের গবর্ণর চৌধুরী খালিকুজ্জমানকে অপসারিত করিয়া পাকিস্থানের প্রতিরক্ষা সচিব মেজর-জেনারেল ইস্কন্দর মির্জ্জাকে তথাকার গবর্ণর করিয়া পাঠান। ঐ তারিখের পাকিস্থান গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারে ঐরূপ সিদ্ধান্তের সংবাদ প্রকাশ করিয়া বলা হয় যে, পূর্ব্ব-পাকিস্থানের আইনসভাকে বাতিল করা হয় নাই এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলেই পুনরায় সেখানে জনপ্রিয় মন্ত্রীমণ্ডলীর হস্তে শাসনভার প্রত্যর্পণ করা হইবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানে ব্যাপক ধরপাকড়ের হিড়িক পড়িয়া যায় এবং ১১ই জুন পর্য্যন্ত ১৯ জন আইনসভার সদস্যসহ ৮২৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ডাক্তার, সাংবাদিক এবং শিক্ষাবিদও রহিয়াছেন। পূর্ব্ব-পাকিস্থান আওয়ামী লীগের সম্পাদক এবং হক মন্ত্রীসভার সমবায় মন্ত্রী শ্রীমুজিবর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং মৌলবী ফজলুল হককে স্বগৃহে অন্তরীণ করা হয়। পূর্ব্ব-পাকিস্থানের আওয়ামী লীগের সভাপতি মৌলানা আবদুল হামিদ ভাসানীর বিরুদ্ধেও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হয়। তিনি বর্ত্তমানে বিশ্বশান্তি সংসদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য ইউরোপে আছেন।

গবর্ণরী শাসন সুরু হইবার পর হইতে পূর্ব্ব পাকিস্থানের জনমত বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেও অবস্থা শান্তই থাকে, কিন্তু তৎসঙ্গেও গ্রেপ্তার চলিতে থাকে। কয়েকটি সংবাদপত্রের উপর পূর্ব্বনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়; ১১ই জুন এই আদেশ প্রত্যাহার করা হইয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্থানের প্রায় প্রত্যেক শহরে মিলিটারী টহল দিতে থাকে। ১৪৪ ধারা জারী করা হয় এবং সমস্ত প্রকার সভা শোভাযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হয়। যাহাতে কোন প্রকার ছাত্র আন্দোলন না হইতে পারে সেজন্য সকল স্কুল-কলেজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নবনিযুক্ত গবর্ণরের আশ্বাস সত্ত্বেও ৬ই জুন যুক্ত ফ্রন্টের সভা করিতে দেওয়া হয় নাই।

হক মন্ত্রীসভাকে পদচ্যুত করার সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্থানের প্রচার ও বেতার বিভাগের ভার শোয়াইউব কুরেশীর নিকট হইতে প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলী স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ৩০শে মে এক বেতার বক্তৃতায় মহম্মদ আলী বলেন, পাকিস্থান সরকারের নিকট যে সকল সংবাদ পৌঁছিয়াছে তাহাতে দুইটি জিনিষ বিশেষ পরিষ্কাররূপে বুঝা গিয়াছে। প্রথমতঃ পূর্ব্ব-পাকিস্থানে শত্রুর চরেরা পাকিস্থানের ঐক্য ধ্বংস করিবার কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। তাঁহারা মুসলমানকে মুসলমানের বিরুদ্ধে এবং প্রদেশকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়া পাকিস্থানের অস্তিত্ব বিপন্ন করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ স্পষ্টই দেখা গিয়াছে যে, হক মন্ত্রীসভা এই সকল দুষ্কৃতকারীকে দমন করিতে অক্ষম অথবা অনিচ্ছুক। তিনি আরও বলেন যে, কমিউনিষ্টরা পূর্ব্ব-পাকিস্থানে খুবই তৎপর হইয়া উঠিয়াছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার কঠোর হস্তে তাহাদিগকে দমন করিবেন।

৫ই জুন ঢাকায় এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে নবনিযুক্ত গবর্ণর জেনারেল মির্জ্জা বলেন, বর্ত্তমানে অবস্থা শান্ত থাকিলেও কোনরূপ গণ্ডগোল দেখা দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সামরিক আইন জারী করিতে দ্বিধা করিবেন না। তিনি বলেন যে, প্রদেশের সর্ব্বত্র প্রয়োজনীয় সৈন্য মোতায়েন করা হইয়াছে। তিনি আরও স্মরণ করাইয়া দেন—পূর্ব্ববঙ্গে চল্লিশ হাজার পুলিস আছে।

কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর দমননীতি চালাইবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া জেনারেল মির্জ্জা বলেন, সকলপ্রকার শ্রমিক আন্দোলন তাঁহারা সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া দমন করিবেন। কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে সেই প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। যে সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পাঁচ হাজারের অধিক শ্রমিক কাজ করে সেই সকল প্রতিষ্ঠান হইতে কমিউনিষ্টদের বিতাড়িত করিবার জন্য "স্ক্রিনিং বোর্ড" গঠন করা হইবে। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানকে সংরক্ষিত বলিয়া ঘোষণা করা হইবে এবং শ্রমিকদিগকে স্ব স্ব প্রতিকৃতি সহ পাসপোর্ট দেখাইয়া কাজে যোগদান করিতে দেওয়া হইবে। ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলিতে কমিউনিষ্টরা যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার জন্য ম্যানেজারদের দায়ী করা হইবে।

পূর্ব্ব-পাকিস্থান আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং যুক্ত ফ্রণ্ট দলের অন্যতম নেতা মৌলানা আবদুল হামিদ ভাসানী ৩১শে মে লণ্ডন হইতে এক বিবৃতিতে বলেন যে, পাকিস্থান সরকার কর্ত্তৃক হক মন্ত্রীসভার পদচ্যুতি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। তিনি বলেন, পূর্ব্ব-পাকিস্থানে যে সকল দাঙ্গা হইয়াছে তাহার জন্য দায়ী মুসলিম লীগ এবং প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলী। এক জন সামরিক বিভাগীয় ব্যক্তিকে গবর্ণর নিযুক্ত করায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, কমিউনিষ্টরা পূর্ব্ব-পাকিস্থানের একটি দল; কিন্তু তাহারা যুক্ত ফ্রণ্টে নাই।

আওয়ামী লীগের নেতা মিঃ সুরাবর্দ্দী হক মন্ত্রীসভার পদচ্যুতিতে "চরম দুঃখ" প্রকাশ করেন বলিয়া করাচী আওয়ামী লীগের সভাপতি মিঃ এম. এইচ. উসমানী ১লা জুন এক বিবৃতি দেন। ৫ই জুন এক বিবৃতিতে মিঃ সুরাবর্দ্দী স্বয়ং অনুরূপ দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, গণতন্ত্রের ইতিহাসে নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পরেই মন্ত্রীসভাকে এইভাবে বাতিল করিয়া দেওয়া অভূতপূর্ব্ব।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আওয়ামী লীগের সভাপতি, মানকী শরীফের পীর পাকিস্থান সরকারের এই ব্যবহারকে "যথেচ্ছাচার" বলিয়া নিন্দা করেন। পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তৃতাদানকালে তিনি বলেন যে, হক মন্ত্রীসভা হয়ত ভুল করিয়া থাকিতে পারে ; কিন্তু বিচারালয়ে তাহাদের দোষ সাব্যস্ত হয় নাই।

বিগত মে মাসের মাঝামাঝি পূর্ব্ব-পাকিস্থানের নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত আদমজী পাটকলে বাঙালী ও অবাঙালী মুসলমান শ্রমিকদের মধ্যে এক দাঙ্গার ফলে প্রায় ৫০০ লোক নিহত এবং ১০০০ হাজার লোক আহত হয়। দাঙ্গার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার হক মন্ত্রীসভার উপর দোষারোপ করেন এবং বলেন যে, কমিউনিষ্টরাই এই দাঙ্গার জন্য দায়ী। মৌলানা ফজলুল হক এক বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কঠোর সমালোচনা করিয়া বলেন যে, কমিউনিষ্টরা কোনক্রমেই জুটমিলের দাঙ্গার জন্য দায়ী নয়। তিনি দাঙ্গার জন্য মুসলিম লীগ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত নীতিকেই দায়ী করেন। তখন কেন্দ্রীয় সরকার মৌলবী হক ও তাঁহার পাঁচ জন সহকর্মীকে করাচীতে ডাকিয়া পাঠান। করাচীতে হক এবং মহম্মদ আলীর মধ্যে যে সাক্ষাৎকার হয়, তাহাতে হক সাহেব পূর্ব্ববঙ্গের জন্য প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন দাবী করেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া মন্ত্রীসভাকে পদচ্যুত করিয়া তথায় গবর্ণরী শাসন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

গবর্ণর ইস্কন্দর মির্জ্জার বিবৃতি

সাংবাদিক বৈঠকে জেনারেল ইস্কন্দর মির্জ্জার প্রদত্ত বিবৃতির নিম্নরূপ বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি হিন্দুদের যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য :

"ঢাকা, ২ই জুন—পূর্ব্ববঙ্গের গবর্ণর মেজর জেনারেল ইস্কন্দর মির্জ্জা আজ সকালে এখানে তাঁহার সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গে গবর্ণরের শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর হইতে যে ৭০৬ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তন্মধ্যে দেড়শতাধিক কম্যুনিষ্ট ও তাহাদের সমমতাবলম্বী লোক আছে। সরকার শীঘ্রই এই সব ধৃত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কমিটি নিয়োগ করিতেছেন। এই কমিটি ইহাদের বিষয় বিবেচনা করিবেন।

তিনি আরও বলেন যে, সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জ পাটকলে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে তৎসম্পর্কে তদন্তের জন্য শীঘ্রই একজন হাইকোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে একটি বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিটি নিযুক্ত হইবে। এই হাঙ্গামায় প্রায় ছয় শত লোক নিহত এবং প্রায় এক হাজার লোক আহত হইয়াছে।

মেজর জেনারেল মির্জ্জা বলেন যে, ধৃত ব্যক্তিগণ আইন ও শৃঙ্খলা বিপন্ন করিতে পারে এই আশঙ্কাতেই আইন ও শৃঙ্খলার স্বার্থে এই সব গ্রেপ্তার হইয়াছে। কেবলমাত্র রাজনৈতিক কারণে ইহাদের গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

তিনি আরও বলেন, 'অধিকসংখ্যক লোকের সর্ব্বাধিক কল্যাণ সাধনের জন্যই সরকার। মুষ্টিমেয় পেশাদারী রাজনীতিকের সুবিধার জন্য সরকারের তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য নহে। যতদিন গবর্ণরী শাসন বলবৎ থাকিবে ততদিন কোন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি কিংবা দল জনসাধারণকে যাহাতে স্বীয় স্বার্থে কাজে লাগাইতে না পারে তৎসম্পর্কে অবহিত থাকিতে আমি কৃতসঙ্কল্প। জনসাধারণের অভাব-অভিযোগকে পুঁজি করিয়া সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও ঘৃণা ছড়াইতে আমি কোন রাজনৈতিক আন্দোলনকারীকে কিছুমাত্র সুযোগ দিব না।'

জেনারেল মির্জ্জা বলেন যে, বর্ত্তমানে এই প্রদেশে অসামরিক শাসন-ব্যবস্থার সাহায্যকল্পে প্রভূত সামরিক শক্তি নিযুক্ত আছে। 'একজন সৈনিক হিসাবে আমি আপনাদের বলিতে চাই যে, সৈনিকের নিকট স্বদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপনের কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার চাইতে অপ্রীতিকর কাজ কিছু নাই।'

হিন্দুদের তিনি এই প্রতিশ্রুতি দেন, 'হিন্দু বন্ধুদের এখানে অন্য যে কোন ব্যক্তির মতই এখানকার নাগরিক অধিকার আছে। তাহাদের সম্মান ও আমার সম্মানে কোন পার্থক্য নাই। তবে তাহাদের একটি কর্ত্তব্য করিতে হইবে—চিন্তায় ও কার্য্যে তাহাদের পাকিস্থানী হইতে হইবে এবং সংযুক্ত বাংলার স্বপ্ন দেখা তাহাদের ত্যাগ করিতে হইবে।'

সম্প্রতি প্রযুক্ত কয়েকটি নিরাপত্তার ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, 'আমি কোনপ্রকার শান্তিভঙ্গ বন্ধ করিতে চাহি এবং এই উদ্দেশ্যে যে কোন আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বনে আমি দ্বিধা কিংবা ইতস্ততঃ করিব না।'

জেনারেল মির্জ্জা কম্যুনিজমকে পাকিস্থানের 'পয়লা নম্বর শত্রু' এবং মোল্লাতন্ত্রকে 'দুই নম্বর শত্রু' বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহার উপর ভার দেওয়া হইলে তিনি সারা পাকিস্থানে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করিবেন। তিনি জনসাধারণকে অন্তর হইতে প্রাদেশিকতার বিষবাষ্প নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিতে উপদেশ দেন।"

তুরস্কে পাক-প্রধানমন্ত্রী

এশিয়া মহাদেশে পাক-মার্কিন চুক্তির প্রধান খুঁটি তুরস্ক। পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী সেখানে গিয়াছেন ঐ খুঁটির সঙ্গে পাকিস্থানের যোগ দৃঢ়তর করার জন্য। ইহার ফল কি হইবে তাহা এখন বিচার করা চলে না। তবে মিশর ও আরব দেশে প্রতিকূল সমালোচনা চলিতেছে।

তুরস্ক ইসলামের প্রাচীন মতবাদ অনেক দিনই ছাড়িয়া দিয়াছে। এখানে পাকিস্থানের মুসলিম রাষ্ট্রবাদ কিরূপে খাপ খায় তাহা দ্রষ্টব্য।

"আঙ্কারা, ১১ই জুন—পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলি গতকল্য এখানে পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গে তুরস্কের সংবাদপত্রে তাঁহার এই সফরকে এক মহান্ মুসলিম রাষ্ট্রের নেতার সফর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অবশ্য সরকারী মহল হইতে অনতিবিলম্বে এইরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে যে, পাকিস্থান প্রতিনিধি দলের এই সফরের সহিত 'মুসলিম' বলিয়া কোন কিছুর সম্পর্ক নাই।

কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি তুরস্ক সফরে আসিলে বাহিরে যে জাঁকজমক

পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ সেইরূপ কোন নিদর্শন পায় নাই। গত মার্চ্চ মাসে মার্শাল টিটো সফরে আসিলে এবং গ্রীসের রাজার সফরকালে রাস্তায় রাস্তায় যে বিজয়তোরণ শোভা পাইয়াছিল এবার সেরূপ একটি তোরণও কোন রাস্তায় দেখা যায় নাই এবং রাজপথে যে পতাকা উড্ডীন ছিল, উহার সংখ্যা নিতান্তই সামান্য। যুগোশ্লাভ ও গ্রীক দূতাবাসের পক্ষে তাহাদের রাষ্ট্রের প্রধানের সফর সম্পর্কে তুরস্কের জনসাধারণকে সজাগ রাখিবার জন্য ত্রিশ সহস্রাধিক টাকা রাষ্ট্রীয় পতাকা প্রভৃতির জন্য ব্যয় করা হয়।'

তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী আদনান মেন্ডারেস, পররাষ্ট্রসচিব ফুয়াত করকুলু এবং অন্যান্য পদস্থ কর্ম্মচারীরা পাক প্রধানমন্ত্রী মিঃ আলিকে রেল ষ্টেশনে সম্বর্দ্ধনা করেন। মার্কিন দূত মিঃ আভরা ওয়ারেণও ষ্টেশনে ছিলেন। ওয়াকিবহাল সূত্রে বলা হইয়াছে যে, মিঃ ওয়ারেণকে বর্ত্তমান আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে।

উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে আজ যে আলোচনা আরম্ভ হইবে উহার ভিত্তি প্রস্তুত করিবার জন্য তুরস্কের পররাষ্ট্র দপ্তরের সহিত প্রাথমিক আলোচনা চালাইতে পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী মিঃ জে. এ. রহিমকে ভারার্পণ করিয়া পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ আলি এখানে পৌঁছিবার অব্যবহিত পরেই সামাজিক অনুষ্ঠানাদি লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়েন।

তুরস্কের পদস্থ কর্ম্মচারীরা পি.টি.আই প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, তুরস্ক ও পাকিস্থানের মধ্যে যত বেশী সম্ভব সহযোগিতার ব্যবস্থা করাই প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের আলোচনার উদ্দেশ্য। কিন্তু মিঃ আলির নিজস্ব বিবৃতি এবং তুরস্কের কর্ম্মচারীরা ইতিপূর্ব্বে ঘরোয়াভাবে যে আশা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে এইরূপ আভাষ পাওয়া যায় যে, মধ্যপ্রাচ্যের গোষ্ঠীভুক্ত করিবার লক্ষ্য লইয়া তুর্কী-পাকিস্থানী চেষ্টা কেন্দ্রীভূত করা সম্পর্কে আলোচনা হইবে।

মিঃ মহম্মদ আলির সঙ্গে পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী মিঃ রহিম, সিরিয়া, লেবানন ও জর্ডনের পাকিস্থানী দূত ডাঃ মামুদ হুসেন আছেন। এতদ্ভিন্ন তুরস্কের নবনিযুক্ত দূত মির্জা আমিনুদ্দিনও আলোচনায় সকল দিক দিয়া সহযোগিতা করিবেন।"

ব্যাঙ্ক রেট

বিলাতের ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড সম্প্রতি তাহাদের ব্যাঙ্ক রেট হ্রাস করিয়া দেওয়ায় ভারতেও অনেকে দাবি করিতেছেন যে ব্যাঙ্ক রেট হ্রাস করিয়া দেওয়া হউক। বিলাতের ব্যাঙ্ক রেট শতকরা ৪ হইতে ৩।০ এবং পরে শতকরা তিনে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতের ব্যাঙ্ক রেট ১৯৫১ সনের নবেম্বর মাসে শতকরা ৩ হইতে সাড়ে তিনে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বর্ত্তমানেও তাহাই আছে। ব্যাঙ্ক রেট হইল বাট্টার হার যাহাতে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রথম শ্রেণীর ব্যবসায়িক হুণ্ডী ক্রয় করে কিংবা বাট্টা দেয়—ইহা বাজারের সাধারণ সুদের হার নয়। ব্যাঙ্ক রেটের কার্য্যকারিতা বাজারের সুদের কাঠামোর উপর প্রান্তিকহারে হয়, সুতরাং ব্যাঙ্ক রেট নিজস্বভাবে একটা বৃহৎ কিছু ব্যাপার নয়। অনেকগুলি আনুষঙ্গিক পরিবেশের উপর ইহার কার্য্যকারিতা নির্ভর করে। বিলাতের টাকার বাজার সুগঠিত এবং ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড আমাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মত ঠুঁটো জগন্নাথ নয়। হুণ্ডী শেষ দফায় বাট্টা দিয়া ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড বিলাতের টাকার বাজারকে প্রায় মুঠার মধ্যে রাখে, তাই ব্যাঙ্ক রেট ওখানে অধিক কার্য্যকরী। ভারতবর্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেষ দফায় হুণ্ডীর বাট্টা দেওয়া (lender of the last resort) প্রায় নাই বলিলেই চলে, তাই ব্যাঙ্ক রেট এদেশে তেমন কার্য্যকরী নয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে টাকার বাজারের লেনদেন সীমাবদ্ধ বলিয়া ব্যাঙ্ক রেট প্রায় অকেজো।

দ্বিতীয়তঃ, লণ্ডন আন্তর্জাতিক টাকার বাজারের একটি প্রধান কেন্দ্র লণ্ডনের মারফতে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের লেনদেন হয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হুণ্ডীর দ্বারা। লণ্ডনের বাজারে হুণ্ডীর বাট্টার হার হ্রাস পাওয়ায় ওখানকার ব্যাঙ্ক রেট বাজার হারের অনেক উপরে ছিল। আন্তর্জাতিক হুণ্ডীর বাজার হিসাবে লণ্ডনের উপযোগিতা বজায় রাখিবার জন্য ব্যাঙ্ক রেট হ্রাস করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অধিকন্তু, আমেরিকার ব্যাঙ্ক রেট হইতে বিলাতের ব্যাঙ্ক রেট অধিক থাকায়, আন্তর্জাতিক টাকার ব্যবসায়ীরা স্বল্পমেয়াদী আমানত বিলাতের ব্যাঙ্কগুলিতে রাখিতে আরম্ভ করিয়াছিল অধিক সুদের লোভে। এইরূপ স্বল্পমেয়াদী আন্তর্জাতিক টাকার আমদানী বড় বিপজ্জনক, কারণ উহা যেমন হঠাৎ আসে তেমনি হঠাৎ চলিয়া যায়। যাইবার সময় টাকার বাজারে একটা বিপর্য্যয় সৃষ্টি করিয়া যায়। এই স্বল্পমেয়াদী টাকার আমদানী বন্ধ করিবার জন্যও বিলাতের ব্যাঙ্ক রেট হ্রাস করা হইয়াছে।

বিলাতের ব্যাপার ভারতবর্ষের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। এখানে ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধি করা হইয়াছে মুদ্রাস্ফীতি তথা দ্রব্যমূল্য হ্রাস করিবার জন্য। ব্যাঙ্ক রেট যখন কম ছিল তখন ফাটকার বাজার অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। অল্প সুদে ব্যাঙ্ক হইতে ব্যাপারীরা টাকা ধার লইয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ধরিয়া রাখিত পরে চড়া দামে বেচিবার জন্য। ফলে দ্রব্যমূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কোরিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ব্যাপারীদের ফাটকার বাজার অসম্ভব রূপে বৃদ্ধি পায় এবং দ্রব্যমূল্য প্রায় দুর্ম্মূল্য হইয়া ওঠে, ইহাকে বন্ধ করার জন্য ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধি করা হইয়াছিল।

অধিকন্তু ভারতবর্ষ অনুন্নত দেশ; এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চয় হইতেছে না, যাহার ফলে শিল্পমূলধন গড়িয়া উঠিতেছে না। ব্যাঙ্ক রেট তথা সুদের হার বেশী থাকিলে জনসাধারণের সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইবে। ১৯৫১ সনে ভারতে সুদের হার বৃদ্ধির পর বাজারের সুদের হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। উচ্চ ব্যাঙ্ক রেট তাই সঞ্চয়ের সহায়ক, সুতরাং এ অবস্থায় ব্যাঙ্ক রেট হ্রাস করিলে দেশের ক্ষতি হইবে—ফাটকার বাজার বাড়িবে, দ্রব্যমূল্য বাড়িবে এবং জাতীয় সঞ্চয় হ্রাস পাইবে।

ব্যক্তিগত শিল্পক্ষেত্রে মূলধন

ভারতে শিল্পমূলধনের অভাব ইহা সর্বজনবিদিত। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আশানুরূপ মূলধন ব্যক্তিগত শিল্পক্ষেত্রে আসে নাই, ইহাতে পরিকল্পনা বহুল পরিমাণে ব্যাহত হইতেছে। এই অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি কমিটি নিয়োগ করেন কি উপায়ে ব্যক্তিগত শিল্পের জন্য অধিক হারে মূলধন পাওয়া যায়। এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন শ্রী এ. ডি. শ্রফ। কমিটির রিপোর্ট সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু এ কথা মনে করা ভুল হইবে যে, কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর হইতেই ব্যক্তিগত মূলধন অবিলম্বে বৃদ্ধি পাইবে।

কমিটির কার্য্যতালিকা নিম্নলিখিত ভাবে নির্দিষ্ট ছিল :

(১) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার হিসাব অনুযায়ী কেন ব্যক্তিগত শিল্পক্ষেত্রে মূলধন পাওয়া যায় নাই এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে ইহার সুরাহা হইতে পারে।

(২) কর অনুসন্ধান কমিশন যে সকল ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতেছে সে সকল ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কি উপায়ে মূলধনের হার বৃদ্ধি পাইতে পারে।

(৩) ব্যক্তিগত শিল্পকে ব্যাঙ্কগুলি মূলধন দিয়া সাহায্য করিতে পারে কিনা।

কমিটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, দেশে মূলধনের অভাব নাই, কিন্তু অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অনুকূল পরিবেশের অভাবে মূলধনের অভাব হইতেছে। কমিটি বলিয়াছেন, ব্যক্তিগত শিল্পকে সরকার সন্দেহের চক্ষে দেখেন বলিয়া ব্যক্তিগত শিল্প ভরসার সহিত মূলধন বৃদ্ধি করিতে পারে না। সুতরাং কেবলমাত্র মূলধন সরবরাহের প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি করিলেই মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে না। অন্য দুটি কারণও মূলধনের অভাবের জন্য দায়ী, প্রথম কারণ এই যে, অতিরিক্ত মুনাফা প্রবৃত্তিকে সমাজ ঘৃণা করে এবং দ্বিতীয় কারণ সঞ্চয়ের অভাব। সরকারী সন্দেহ সম্বন্ধে কমিটি যাহা বলিয়াছেন সে বিষয়ে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর হইতে প্রধান প্রধান শিল্পগুলি—যথা বস্ত্রশিল্প ও শর্করাশিল্প—যেরূপ দুর্নীতির আশ্রয় লইয়াছে সেই তুলনায় ভারত সরকার যথেষ্ট অনুকম্পা (কিংবা দুর্বলতা) দেখাইয়াছেন। এই শিল্পগুলির গত কয়েক বৎসরের ইতিহাস শুধু অসামাজিক ও দুর্নীতিপরায়ণ কার্য্যাবলীতে পূর্ণ। অধিকন্তু ব্যক্তিগত শিল্পগুলি আয়কর ফাঁকি দিয়াছে এবং দিতেছে ও যুদ্ধকালীন গুপ্ত মুনাফাকে ইহারা নূতন মূলধন হিসাবে কার্য্যে না লাগাইয়া বিদেশীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত চলতি ব্যবসায়ী কারবারগুলি ক্রয় করিতেছে। অর্থনৈতিক সংজ্ঞায় ইহাতে দেশের সত্যকার সমৃদ্ধি কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় না। নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে সরকার কোন সময়ে আপত্তি করেন নাই, বরং সব সময়ে তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে আমরা নূতন অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্য দিয়া যাইতেছি এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্রই নূতন অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী আসিতেছে। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক পরিবেশে ব্যক্তিগত শিল্প-কাঠামোর পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী এই কথাটি আমাদের দেশের শিল্পপতিরা ভুলিয়া যান, কারণ তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী এখনও ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দ্বারা প্রভাবান্বিত।

কিন্তু তাহার উপর আরও দুইটি কারণ দেশের ব্যক্তিগত শিল্প উদ্যোগের পথে বিশেষ প্রতিবন্ধক হইয়া আছে। সেই দুইটির পূর্ণ আলোচনা বা বিচারের স্থান সম্পাদকীয় মন্তব্যের মধ্যে দেওয়া অসম্ভব। সংক্ষেপে তাহার বিবৃতিমাত্র দেওয়া যায়।

প্রথমতঃ, দেশের শিল্পে সাধারণের সংযোগের অভাব। শিল্পপতি বলিতে যাঁহারা এদেশে আছেন তাঁহাদের মধ্যে টাটা, মার্টিন-বার্ণ ও কয়েকটি বৈদেশিক চালিত প্রতিষ্ঠানের অধিকারী ভিন্ন প্রায় সকলেই জুয়াড়ী ও কালোবাজারের প্রবঞ্চক। ইহাদের মধ্যে শিল্পচালনার বুদ্ধি-বিবেচনা বা পরিচালনক্ষমতা কিছুই নাই। অল্প সময়ের মধ্যে প্রভূত লাভ কি করিয়া হইতে পারে তাহাই ইহাদের একমাত্র চিন্তা, তা সে সদুপায়েই হউক বা অসৎ উপায়েই হউক। ইহাদের উপদেশ, অনুযোগ বা শাস্তি দিলেও শিল্প-উদ্যোগের প্রকৃত পথে ইহারা চলিতে অক্ষম। সুতরাং অন্য উপায়ে, যথা সাধারণের সঞ্চিত অর্থের দ্বারা তিল কুড়াইয়া তাল করিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠা করা ভিন্ন গতি নাই। সে ক্ষেত্রেও বহু জুয়াচোরে গরীবের সর্ব্বনাশ করিয়া সাধারণের বিশ্বাস নষ্ট করিয়াছে। ঐ বিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সরকারী তদারকে ও সাহায্যে মূলধন গচ্ছিত করিবার এবং খাটাইবার জন্য "গ্যারান্টি ট্রাষ্ট করপোরেশন" বা সমবায় জাতীয় নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক, দেশের অধিকাংশ শ্রমিক নেতারা। ইঁহাদের মধ্যে ক্ষমতালোলুপতা ও প্রকৃত বিচার-ক্ষমতার অভাব প্রায় সকলেরই আছে। উপরন্তু অধিকাংশেরই সত্যাসত্যের বালাই নাই ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি একেবারেই নাই। ইঁহাদের শিক্ষাদান না করিলে এবং সংযমের পথে না আনিলে এদেশের শ্রমিক কার্য্যক্ষম হইবে না।

নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠাকে উৎসাহিত করিবার জন্য কমিটি অভিমত দিয়াছেন যে, জাতীয়করণ ব্যাপারে সরকারী মনোভাব সুস্পষ্ট করিয়া বলা উচিত। কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহাদের জাতীয়করণ নীতি পূর্ব্বে বহুবার ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও শিল্পপতিরা নাকি আশ্বস্ত হইতে পারিতেছেন না। উদাহরণস্বরূপ তাঁহারা বলেন যে, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের এষ্টিমেটস কমিটি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু শিল্পপতিদেরও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, পরিকল্পিত অর্থনীতি কতকটা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধ্য। সুতরাং এ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট কোনক্রমেই চিরকালের জন্য আশ্বাস দিতে পারেন না যে, ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে কোন অবস্থাতেই জাতীয়করণ করা হইবে না। জাতীয় স্বার্থ হইবে একমাত্র মাপকাঠি এবং ইহার দ্বারাই অবস্থাবিশেষে বিচার্য্য হইবে যে কোনও ব্যক্তিগত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা

হইবে কি না। তাহা করা হইলেও শিল্পপতিরা ক্ষতিপূরণ পাইবেন, তাহাই কি যথেষ্ট নয় ? তাহার পরে, বর্ত্তমানে কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট যদি আশ্বাস দেনও, কিন্তু ভবিষ্যতে অন্য কোন দলীয় গবর্ণমেণ্ট যদি ক্ষমতা পায় তাহা হইলে সে আশ্বাস পালন নাও করিতে পারে। সুতরাং পার্লামেণ্টারী গবর্ণমেণ্টে নিছক সরকারী আশ্বাস সাময়িক মাত্র।

শিল্পমূলধনের উৎস হইতেছে ব্যক্তিগত তথা সামাজিক সঞ্চয়। ভারতবর্ষ গরীব দেশ, এখানে গড়পড়তা মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ২৬৫৲ টাকা মাত্র। সুতরাং, ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের পরিমাণ পৃথকভাবে যৎসামান্য হইতে বাধ্য। আর এই সঞ্চয় বর্ত্তমানে বহুধা বিভক্ত, তাই জাতীয় সঞ্চয়কে সামগ্রিকভাবে শিল্পাভিমুখী করণ সহজসাধ্য নয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ধরা হইয়াছে যে, কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলি অন্ততঃ ১৫৮ কোটি টাকার মত অতিরিক্ত ঋণ দিবে শিল্পগুলিকে ; এই হারে ঋণ দিতে হইলে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলির আমানত অন্ততঃ ২৩০ কোটি টাকার মত অতিরিক্ত হওয়া চাই। কিন্তু গত তিন বৎসরে ব্যাঙ্ক আমানত একেবারে বৃদ্ধি পায় নাই। ব্যাঙ্কগুলি কি করিয়া শিল্পগুলিকে সাহায্য করিতে পারে সে সম্বন্ধে কমিটি কতকগুলি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাঙ্কের কার্য্যকলাপ বৃদ্ধির অন্তরায় হইতেছে এইগুলি : (১) দেশে ব্যাঙ্কিং মনোবৃত্তির অভাব ; (২) শ্রমিক আদালতের সুপারিশ অনুসারে ব্যাঙ্কগুলির প্রতিষ্ঠান খরচা বৃদ্ধি পাওয়ায় নূতন শাখা প্রতিষ্ঠা করা সহজসাধ্য হইতেছে না ; (৩) সরকারী মূলধন অধিকতর হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাঙ্কগুলি কঠিনতর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়াছে ; (৪) ব্যাঙ্কগুলি যে সকল ক্ষেত্রে গ্যারাণ্টি দেয় সে সকল ক্ষেত্রে কোম্পানীর কাগজ জমা রাখার জন্য গবর্মেণ্ট দাবি করেন ; এবং (৫) আয়কর এবং বিক্রয়কর বিভাগ ব্যক্তিগত আমানত সম্বন্ধে ব্যাঙ্কে অনুসন্ধান করার ফলে ব্যাঙ্ক আমানত হ্রাস পাইতেছে ইত্যাদি। এই অসুবিধাগুলি দূরীভূত করিবার জন্য কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন।

ইহা ব্যতীত ব্যাঙ্কগুলি যাহাতে তাহাদের আমানত বৃদ্ধি করিতে পারে এবং শিল্পগুলিকে অধিকতর হারে সাহায্য করিতে পারে তাহার জন্য কমিটি নিম্নলিখিত অভিমত দিয়াছেন : রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্প্রতি যে হুণ্ডীর বাজারপ্রথা সৃষ্টি করিয়াছে তাহার আরও সম্প্রসারণ, টাকা পাঠানোর অধিকতর সুবিধা, গ্রামে শাখা খোলার জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে অর্থসাহায্য দেওয়া, আমানত বীমা প্রচলন, মিথ্যা চেক কাটা আইনতঃ দণ্ডনীয়, গ্রামে ব্যাঙ্কগুলির নিরাপত্তা সম্বন্ধে যথোচিত বন্দোবস্ত করা, ভ্রাম্যমাণ ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্কিং মনোবৃত্তি বাড়ানোর জন্য প্রচারকার্য্য।

কমিটির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলি কেমন করিয়া দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়া শিল্পগুলিকে সাহায্য করিতে পারে। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক প্রধানতঃ স্বল্পমেয়াদী আমানত গ্রহণ করে এবং স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেয়। শিল্প-মূলধন দীর্ঘমেয়াদী, তাই কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক দীর্ঘমেয়াদী মূলধন সরবরাহ করে না, কারণ তাহা বিপজ্জনক। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে সাধারণতঃ কার্য্যকরী মূলধন দিয়া সাহায্য করে, যাহা অবশ্যই স্বল্পমেয়াদী। ভারতবর্ষে ব্যাঙ্ক ফেল্ হওয়ার প্রধান কারণ এই যে, কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কসমূহ দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়া নিজেদের কাঁচা টাকাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। জার্ম্মানীতে মিশ্র ব্যাঙ্কিং প্রথা প্রচলিত আছে, অর্থাৎ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক দীর্ঘমেয়াদী শিল্পমূলধন সরবরাহ করে ; কারণ জার্ম্মানীতে ব্যাঙ্কিং মনোবৃত্তি খুব ব্যাপক এবং দ্বিতীয়তঃ জার্ম্মানীতে শিল্পী, শ্রমিক ও পরিচালক তিনটিই দায়িত্বজ্ঞানযুক্ত ও সুশিক্ষিত হওয়ায় শিল্পব্যর্থতা প্রায় নাই বলিলেই চলে, তাই কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক যদিও দীর্ঘমেয়াদী শিল্পমূলধন সরবরাহ করে, তথাপি তাহাতে বিপদ প্রায় নাই।

শ্রফ্ কমিটি অবশ্য মিশ্র ব্যাঙ্কিং প্রথা সমর্থন করেন নাই। কারণ ভারতবর্ষ অনুন্নত দেশ, এখানে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক যদি দীর্ঘমেয়াদী শিল্পমূলধন অধিক পরিমাণে সরবরাহ করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে বিপদ অনিবার্য্য। তবে সীমাবদ্ধভাবে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক যদি শিল্পের দীর্ঘমেয়াদী কাগজ ক্রয় করিয়া টাকা খাটায় তাহা হইলে দেশের শিল্পোন্নতিতে সাহায্য করা হইবে। প্রত্যক্ষভাবে দীর্ঘমেয়াদী মূলধন না দিয়া পরোক্ষভাবে শিল্পের ডিবেঞ্চার কিংবা অন্যান্য সিকিউরিটিতে ব্যাঙ্ক টাকা খাটাইতে পারে। শ্রফ্ কমিটি তিনটি উপায় প্রস্তাব করিয়াছেন যাহার দ্বারা ব্যাঙ্ক দেশের শিল্পমূলধন বৃদ্ধি করিতে পারে, যথা : (১) প্রথম শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠানের ডিবেঞ্চার এবং শেয়ার ক্রয় করিয়া ; (২) এইরূপ শেয়ার এবং ডিবেঞ্চারের বিরুদ্ধে টাকা ধার দিয়া এবং (৩) ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিন্যান্স কর্পোরেশান ও প্রাদেশিক ফিন্যান্স কর্পোরেশনের অধিক পরিমাণে বণ্ড ও সেয়ার ক্রয় করিয়া। কমিটি মনে করেন যে, পরোক্ষভাবে শিল্পকে মূলধন যোগাইলে ব্যাঙ্কের কাঁচা টাকার গতি (liquidity) অব্যাহত থাকিবে। কিন্তু এই প্রস্তাবে বিপদের দিকটা বোধ হয় কমিটির নজরে পড়ে নাই। শেয়ার বাজারে ফাটকার পাল্লায় যদি কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার মার খায়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের উপর 'রান' অবশ্যম্ভাবী, কারণ ব্যাঙ্কের ব্যাপারে আমরা সদাই আশ্বস্ত না হইয়া বরং আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া থাকি। কেহ কেহ বলিবেন যে, কেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ত আছে, ব্যাঙ্কের ভয় কি ? কিন্তু গত কয়েক বৎসরের ব্যাঙ্ক বিপর্য্যয়ের ইতিহাসে দেখা যায় যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকে শিখণ্ডীর মত মূক দ্রষ্টা হিসাবে। ব্যাঙ্কের পর ব্যাঙ্ক যখন দরজা বন্ধ করিয়াছে (যাহারই দোষে হউক না কেন), রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তখন আইনের অক্ষরগুলি আঁকড়াইয়া ধরিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে এই বলিয়া যে ব্যাঙ্ক গেল ঠিকই, কিন্তু আইন ত বাঁচিল। তাই শ্রফ কমিটি যেমন উপায়ের কথা ভেবেছেন তেমনি আশঙ্কার কথাও ভাবা উচিত ছিল।

এই বিষয়ে শ্রফ কমিটির আর একটি প্রস্তাব আছে। কমিটির মতে ব্যাঙ্কগুলি দীর্ঘমেয়াদী শিল্পমূলধন পরোক্ষভাবে যোগাইতে পারে যদি ভারতের প্রধান প্রধান ব্যাঙ্কগুলি ও বীমা কোম্পানীসমূহ একটি সমিতি স্থাপন করিয়া যুক্তভাবে নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান-

২

সমূহের ডিবেঞ্চার এবং শেয়ার ক্রয় করে। যদি ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের আমানতের অন্ততঃ শতকরা পাঁচ ভাগ এইভাবে নিয়োগ করে তাহা হইলে ব্যক্তিগত শিল্পকে আরও অতিরিক্ত ত্রিশ কোটি টাকার মূলধন দিয়া সাহায্য করিতে পারে। এই ব্যাঙ্ক-বীমা সমিতি ভারতের বৃহত্তম ব্যাঙ্ক, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নেতৃত্বাধীনে কার্য্য করিবে। এই জন্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক আইনের কিছু রদবদল করা প্রয়োজন। কমিটির এই প্রস্তাবটি মন্দ নয়, কিন্তু প্রাথমিক-লেখাতে (underwriting) যদি ব্যাঙ্কের টাকা খাটানো হয় তাহা হইলে শিল্পগুলির কার্য্যকরী মূলধন পাওয়ার অসুবিধা হইবে। শিল্পের কার্য্যকরী মূলধন বর্ত্তমানে ব্যাঙ্ক দেয়, কিন্তু ব্যাঙ্কের টাকা প্রাথমিক-লেখাতে আটক থাকিলে কার্য্যকরী মূলধন-সরবরাহ হ্রাস পাইবে, যদি অবশ্য ব্যাঙ্কের আমানত খুব বেশী পরিমাণে না বৃদ্ধি পায়। আর যদি বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় প্রস্তাবিত ডেভেলাপমেণ্ট কর্পোরেশন স্থাপিত হয় তাহা হইলে আর এইরূপ ব্যাঙ্ক-বীমা সমিতির কোন প্রয়োজন থাকিবে না।

চলচ্চিত্র অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট

ভারতীয় চলচ্চিত্র অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশসমূহ সম্পর্কে ভারত-সরকার যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন গত ১৯শে মে এক লিখিত বিবৃতি মারফত কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রী বি. ভি. কেশকার তাহা লোকসভা ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের নিকট উপস্থাপিত করেন।

শ্রীকেশকারের বিবৃতিতে প্রকাশ যে, কোনও চলচ্চিত্রকে লাইসেন্স দিতে অস্বীকার করা হইলে ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করিবার অধিকার দিবার জন্য কমিটির সুপারিশ সরকার মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সরকার চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে বিধিনিষেধ অপসারণ করিতে সম্মত হন নাই। কারণ সরকার মনে করেন যে, দৈর্ঘ্য হ্রাসের ফলে বিবিধ শ্রেণীর চলচ্চিত্রের উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংবাদচিত্র ও প্রামাণ্য চিত্রের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইবে। সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি ও অবান্তর ঘটনা পরিহার দ্বারা চলচ্চিত্রের মান উন্নীত হইবে। সরকার মনে করেন, প্রতিটি চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য অনধিক ১১ হাজার ফুট ও ট্রেলারের দৈর্ঘ্য ৪০০ ফুট হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ভারতীয় চলচ্চিত্র সঙ্ঘকে জানান হইবে চলচ্চিত্র-গৃহ নির্ম্মাণ সম্পর্কে বিধিনিষেধ রহিত করিতে সরকার সম্মত হইয়াছেন। চলচ্চিত্রের উৎপাদন, বণ্টন ও প্রদর্শনের জন্য অবিলম্বে সরকারী, চলচ্চিত্র শিল্প ও শিল্পীদের প্রতিনিধিবৃন্দ লইয়া একটি অস্থায়ী ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিষদ গঠন করার প্রস্তাবে সরকার অসম্মত হইয়াছেন। জাতীয় সংহতি, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের মাধ্যমরূপে চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য ভারত-সরকার একটি চলচ্চিত্র উৎপাদন সংস্থা ও চলচ্চিত্র নিকেতন খুলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কমিটি অভিনেতা, অভিনেত্রী ও শিল্পীদের শিক্ষার জন্য দুইটি চলচ্চিত্র নিকেতন খোলার পরামর্শ দিয়াছিলেন। সরকার আরও স্থির করিয়াছেন যে, সর্ব্বত্র সমন্বয় সাধনের জন্য বর্ত্তমানের কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র সমালোচনা পর্ষদের (Central Board of Film Censor) পরিবর্ত্তে তিনটি আঞ্চলিক শাখাসহ একটি জাতীয় চলচ্চিত্র পর্ষৎ গঠিত হইবে। এই পর্ষৎ চলচ্চিত্র উৎপাদন সংস্থা ও চলচ্চিত্র নিকেতনের কাজকর্ম্ম সম্পর্কে খোঁজখবর লইবেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শাদি দান করিবেন। চলচ্চিত্র উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব গ্রহণের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা করিতে কেন্দ্রীয় সরকার সম্মত হইয়াছেন। সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সিনেমা আইন রাজ্য গবর্ণমেণ্টের তালিকা হইতে যুক্ত তালিকায় স্থানান্তরিত করিতে সরকার সম্মত নহেন; তবে সামঞ্জস্য সংরক্ষণের জন্য একটি আদর্শ আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

শিশুদের উপযোগী চলচ্চিত্র নির্ম্মাণের দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করিবার জন্য কমিটি সুপারিশ করেন। সুপারিশে আরও বলা হয় যে, সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন শিশুদিগের জন্য পরিকল্পিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং প্রকৃত প্রদর্শনী খরচ ব্যতীত অতিরিক্ত অর্থ ও আমোদকর শিশুদের নিকট হইতে আদায় করা চলিবে না। সরকার নীতি হিসাবে, প্রয়োজনবোধে শিক্ষণীয় ও শিশুদের উপযোগী চলচ্চিত্র গ্রহণের জন্য আর্থিক সাহায্য দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এইরূপ চলচ্চিত্র গ্রহণ ও উহা সর্ব্বত্র প্রদর্শনের জন্য একটি সমিতি গঠন করা উচিত বলিয়া সরকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই প্রস্তাব বর্ত্তমানে বিবেচনাধীন রহিয়াছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাহায্য লইয়া ফিল্মস ডিভিসনকে বিদ্যালয়ের উপযোগী চলচ্চিত্র গ্রহণের জন্য যে সুপারিশ কমিটি করেন সরকার তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। বর্ত্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহিত পরামর্শক্রমে প্রতি বৎসর বুনিয়াদী ও সামাজিক শিক্ষা সম্পর্কে ১২টি চলচ্চিত্র গ্রহণের জন্য ফিল্মস ডিভিসনের দুইটি শাখা খোলা হইয়াছে। চলচ্চিত্র প্রদর্শনের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য বিদ্যালয়গুলিকে স্বতন্ত্রভাবে অর্থসাহায্য দান সম্পর্কে সুপারিশটির প্রতি ভারত-সরকার বিভিন্ন রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সকল রাজ্যের বিদ্যালয়ে ও সুদূর পল্লী অঞ্চলে চলমান গাড়ীর সাহায্যে চাক্ষুষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার জন্য কমিটি একটি সুপারিশ করিয়াছিলেন। সেই সম্পর্কে জানান হয় যে, সামাজিক ও চাক্ষুষ শিক্ষাদান কার্য্যে বর্ত্তমানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মোট ২৩১টি চলমান গাড়ী নিয়োজিত রহিয়াছে। বোম্বাই, মাদ্রাজ, মহীশূর, উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে এজন্য স্বতন্ত্র বিভাগও আছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রচারের জন্য ঐরূপ ৩২টি গাড়ী নিয়োজিত রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, সমাজ-উন্নয়ন কর্ত্তৃপক্ষ ঐ অঞ্চলসমূহে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিতেছেন। শিশুদিগকে পিতামাতা অথবা অভিভাবকের সহিত একমাত্র প্রাপ্ত-বয়স্কদের জন্য নির্দ্ধারিত চলচ্চিত্রসমূহও দেখিবার অনুমতি দিতে সরকার স্বীকৃত হন নাই।

বাধ্যতামূলক ভাবে প্রামাণ্য চিত্র ও সংবাদচিত্র প্রদর্শনের ফল

বিশেষ ভালই হইয়াছে বলিয়া কমিটি অভিমত প্রকাশ করিয়া সরকারকে আরও কিছুকাল এইরূপ চিত্র গ্রহণের অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। বেসরকারী প্রযোজকদিগকেও এ বিষয়ে উৎসাহ দিবার নিমিত্ত তাঁহারা সুপারিশ করিয়াছেন। সরকার এই বিষয়ে মোটামুটি ভাবে সম্মত আছেন এবং প্রতি বৎসর বেসরকারী প্রযোজকদিগের দ্বারা এইরূপ ১২টি চলচ্চিত্র তোলাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

চলচ্চিত্রের সাহিত্যিক ও শৈল্পিক কার্য্যাদির সংজ্ঞা নির্দ্ধারণের জন্য আইনের পরিধি বৃদ্ধির যে পরামর্শ কমিটি দিয়াছিলেন, সরকার জানাইয়াছেন যে সেই মর্ম্মে ভারতীয় সংসদে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় অবিলম্বে একটি সুদূরপ্রসারী আইন প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতেছেন।

সরকার প্রতি বৎসর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চিত্র ও শ্রেষ্ঠ সংবাদচিত্রকে পুরস্কার দান করিবেন। তাহা ছাড়া আঞ্চলিক ভাষা-ভিত্তিতেও শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রগুলিকে পুরস্কৃত করা হইবে।

মহাজনদের অভিপ্রেত আধিপত্য হইতে চলচ্চিত্রের উৎপাদকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এক কোটি টাকা আদায়ীকৃত মূলধন লইয়া একটি ফিল্ম ফাইন্যান্স কর্পোরেশন গঠনের প্রস্তাব অর্থাভাবের জন্য সরকার গ্রহণ করেন নাই। তবে বিশেষ প্রদর্শনী প্রভৃতির দ্বারা চলচ্চিত্র-শিল্প অর্থসংগ্রহ করিতে চাহিলে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। নূতন ঋণ করিয়া চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী কার্য্যে ২৬ কোটি টাকা এবং উৎপাদন ও বণ্টন কার্য্যে ৯ কোটি টাকা মূলধনসহ মোট ৩৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করিবার যে প্রস্তাব কমিটি করিয়াছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয় সেই বিষয়ে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইবেন। বিদেশে ভারতীয় চলচ্চিত্রের সরবরাহ-বৃদ্ধির জন্য চলচ্চিত্র শিল্প যদি একটি রপ্তানী কর্পোরেশন স্থাপন করিতে স্বীকৃত হন তবে সরকার সকল সম্ভাব্য সুবিধা প্রদান করিবেন। ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের জন্য ২৪ কোটি ফুট কাঁচা ফিল্ম, ৪৫ লক্ষ টাকার ষ্টুডিওর যন্ত্রপাতি ও ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকার থিয়েটারের আসবাবপত্র ও কার্ব্বন অবাধ সাধারণ লাইসেন্স অনুযায়ী আমদানী করিবার ব্যবস্থায় সরকার সম্মত হইয়াছেন।

ভারতে কাঁচা ফিল্ম উৎপাদনের জন্য মহীশূরে একটি বিদেশী কোম্পানীর সহযোগিতায় চেষ্টা চলিতেছে। তাহা সাফল্য লাভ না করিলে সরকার স্বয়ং একটি কারখানা স্থাপনে ব্রতী হইবেন। চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য প্রোজেক্টর নির্ম্মাণের একটি পরিকল্পনা সরকার মঞ্জুর করিয়াছেন। অন্যান্য যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের বিষয়ও সরকার বিবেচনা করিতে প্রস্তুত আছেন। জাতীয় মান-নির্দ্ধারণ প্রতিষ্ঠান চলচ্চিত্রের যন্ত্রপাতির মান এবং রসায়ন দ্রব্যাদির যথার্থতা নির্দ্ধারণ করিবেন। প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান হইলেই শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ চলচ্চিত্রের যান্ত্রিক সমস্যাসমূহ সম্পর্কে গবেষণা চালাইবার ভার লইবেন।

মুর্শিদাবাদ সীমান্তে ব্যাপক মাল-পাচার

মুর্শিদাবাদ সীমান্ত দিয়া বেআইনী ভাবে ব্যাপক মাল চলাচলের সংবাদ প্রায়ই জেলার স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি উক্ত পত্রিকাগুলিতে যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা যথার্থ হইলে সীমান্ত দিয়া অবৈধ মাল-পাচারের ব্যাপকতা যে ভয়াবহ রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। ভারত ও পাকিস্থানের সীমান্তে এইরূপ অবৈধ বাণিজ্যের ফলে পাকিস্থান হইতে রেডিও, গ্রামোফোন, সাইকেল, লাইট, ঘড়ি, পেন্সিল, সোনা, রূপা, চাঁদি, ব্লেড প্রভৃতি জিনিষ ভারতে আসে এবং ভারত হইতে প্রধানতঃ সুতা, কাপড়, গামছা, বিড়ির পাতা, মশলা ইত্যাদি দ্রব্য পাকিস্থানে যায়। ইহার ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা শুল্ক হইতে ভারত-সরকার বঞ্চিত হইতেছেন।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠের "মুর্শিদাবাদ সমাচারে" প্রকাশিত এক সংবাদে দেখা যায় যে, গত ১২ই মে পাকিস্থান হইতে বেআইনী ভাবে আমদানী করিবার পথে ৮৬০ তোলা পাকা রূপা ধরা পড়ে। পত্রিকাটির জলঙ্গীস্থিত সংবাদদাতা লিখিতেছেন, "প্রকাশ, ঐ রূপা পাকিস্থানের রাজসাহী হইতে আমদানী করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ঐ রূপার মালিক শ্রীজগন্নাথ মারোয়াড়ী, কলিকাতার ১৫০।১ কটন ষ্ট্রীটের 'গৌরীশঙ্কর নারায়ণ দাস' নামক একটি বৃহৎ কার্ম্মের মালিক। প্রকাশ, উক্ত বাসখানি নাকি বহরমপুরের জনৈক ব্যবসায়ীর এবং জলঙ্গী-বহরমপুর উঁহার রুট।" অবশ্য কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ সীমান্তে মাল-পাচার সম্পর্কে উক্ত পত্রিকায় এক বিশেষ প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে যে, সম্প্রতি নাকি পাকিস্থান হইতে ১০ হাজার গ্রোস বিলাতি ভেনাস পেন্সিল কলিকাতায় চালান দেওয়া হইয়াছে। প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, বর্ত্তমানে মুর্শিদাবাদ সীমান্ত লুঠের রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। চর কানাইনগর, চর ফজলীনগর, মধুবোনা, জলঙ্গী, দয়ারামপুর, সরদাঘাট, কাতলামারী, চর সরন্দরপুর, পতিবোনাঘাট, মাণিকচক, কোন্দালনাটি, তুর্লভপুর, জয়কৃষ্ণপুর প্রভৃতি এলাকা দিয়া ব্যাপকভাবে মাল পাচার হইতেছে। পাচারকারীদের পাসপোর্ট নাই, কিন্তু তাহারা অবাধে সকল স্থানেই যাইতে পারে।

এই ব্যাপারে দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্ম্মচারীদের নাকি যথেষ্ট উৎসাহ আছে। পাচারের সময় যে সকল মাল সীমান্তে ধরা পড়ে তাহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লাভের অংশ লইয়া গোলমালের সূচনা হয়। প্রবন্ধটিতে বলা হইতেছে: "চাঁদনীচক হইতে ধুলিয়ান পর্য্যন্ত [illegible] মাইলের মধ্যে দুইটি থানা সুতী ও সমসেরগঞ্জ এবং দুইটি [illegible] শুল্ক বিভাগের অফিস আওরংগাবাদ ও ধুলিয়ান। তবুও লক্ষ লক্ষ টাকার কাপড়, সুতো আর বিড়ির পাতা ও মশলা কিভাবে পাচার হয়ে যাচ্ছে ভাবতেও আশ্চর্য্য লাগে।"

এই ব্যবসার প্রধান কর্মী কাহারা? প্রবন্ধকারের ভাষায়,

"কলকাতার ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট ও মধ্য কলিকাতার কয়েকটি বিশেষ বিশেষ গুণ্ডাদল পুলিস কমিশনারের তাড়া খেয়ে নদীয়া-মুর্শিদাবাদ সীমান্ত এলাকায় গিয়ে দল বেঁধে সুরু করছে এই ব্যবসা। এরাই একদিন ব্রিটিশ আমলের পোষ্য ছিল। স্থানীয় বেকার উদ্বাস্তু যুবকদের নিয়ে চমৎকার এই ব্যবসা ফেঁদেছে আর দাবার ঘোড়াকে সামনে রেখে লুঠের রাজত্বে কিস্তি মাতের জন্য ছড়াচ্ছে হাজার হাজার টাকার খেল।"

কি ভাবে এই দুর্নীতিমূলক ব্যবসায় চালানো হয় প্রবন্ধটিতে তাহাও বলা হইয়াছে। ঝানু ব্যাপারীরা কলিকাতার এক ভুয়া ঠিকানা দিয়া ভুয়া এবং চটকদার নামের ফার্ম্ম গড়িয়া তোলে। এইরূপ ফার্ম্ম হইতে মুর্শিদাবাদের সীমান্তবর্তী এলাকাতে বিভিন্ন ব্যাপারীর নিকট মাল পাঠান হয় রাত্রির অন্ধকারে। অনুরূপভাবে পাকিস্থান হইতে আগত মালও ঐ সীমান্তের ব্যবসায়ীর নিকট পৌঁছায়। এই সকল মাল ট্রাক বোঝাই করিয়া উপরে কিছু পাট, গুড় বা করোগেট টিন চাপাইয়া রাতারাতি একদিকে কলিকাতা এবং অপরদিকে রাজসাহীতে চালান দেওয়া হয়। এই ভাবে দিনের পর দিন ব্যবসা চলে; কেবল লভ্যাংশ লইয়া বিবাদ হইলেই ধরা পড়ে এবং তখন কয়েকদিনের মত ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়।

নিমতিতা অঞ্চলে এই চোরাকারবারের ফলে সামাজিক এবং নৈতিক জীবনে যে ক্ষতি হইতেছে উক্ত পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতার প্রেরিত একটি সংবাদে তাহা বিশেষ পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রকাশ যে, উক্ত এলাকার গ্রামরক্ষীদলে নাকি ভাঙন ধরিয়াছে। কারণ চোরাকারবার সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে অনৈক্যের ফলে স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া একে অন্যকে দল হইতে বাদ দিয়া নিজের পছন্দমত লোক নিয়োগ করিতেছে।

"রাত্রি দশটা হইতে নাকি ঐ এলাকায় গ্রাম্য রক্ষীদল, চৌকিদার ও ব্যবসায়ীর সমাবেশে বাজার বেশ কর্ম্মতৎপর হইয়া উঠে। অতঃপর রাত্রির অন্ধকার থাকা পর্য্যন্ত সুযোগ-সন্ধানীরা তাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য অবাধগতিতে চালাইয়া যায়। অপরদিকে চোরাকারবারপুষ্ট দোকানদারগণ দোকানের একটি পাট খুলিয়া বা অনেক সময় সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়াই ভিতরে আলো জ্বালাইয়া মাল পাচারের কার্য্য অবাধগতিতে চালাইয়া আসিতেছে। ভয়ের বালাই নাই—কেহ কিছু বলিবার বা করিবার নাই। লাভের একটা অংশ ধরিয়া দিলেই হইল। এ যেন এক আশ্চর্য্য দেশের লুঠের রাজত্ব।..." ("মুর্শিদাবাদ সমাচার", ৭ই জ্যৈষ্ঠ)

সীমান্তে মাল-পাচার সম্পর্কে ৬ই জ্যৈষ্ঠ এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে "ভারতী" লিখিতেছেন, প্রত্যেক দেশেই সীমান্ত দিয়া অবৈধ মাল-পাচার হয় বটে, কিন্তু কোন দেশেই তাহার এরূপ ব্যাপকতা নাই। সরকার এই দুর্নীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত বলিয়া পত্রিকাটি মনে করেন না। "কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে চোরাকারবারিগণের এইরূপ কার্য্যকলাপের ফলে একদিকে যেমন দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতেছে ও জাতীয় জীবনের নৈতিক মান কলুষিত হইতেছে অপর দিকে তেমনি লক্ষ লক্ষ টাকা শুল্ক হইতে সরকার বঞ্চিত হইতেছেন।"

সীমান্তে সরকারী শুল্ক-বিভাগীয় পরিচালনা ব্যবস্থাকারীর সমালোচনা করিয়া পত্রিকাটি লিখিতেছেন: "বিস্তৃত সীমান্ত রক্ষা সম্ভব নহে এই অজুহাতে আমাদের সরকার তাঁহাদের পোষা কর্ম্মচারিবৃন্দের দোষ ক্ষালনের জন্য যত চেষ্টাই করুন না কেন, অত্যন্ত রূঢ় ও বাস্তব সত্য এই যে চোরাকারবারিগণের এই সাহসের উৎস নিহিত রহিয়াছে দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্ম্মচারিগণের সক্রিয় সহযোগিতার মধ্যে।" এই অবস্থায় আইন-শৃঙ্খলার প্রতি যদি জনসাধারণ আস্থা হারায় তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। পত্রিকাটি দৃঢ়হস্তে এই অনাচার বন্ধ করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাইয়া লিখিতেছেন যে, অন্যথা যে কোন ভাবে জনসাধারণকে স্বহস্তেই এই দুর্নীতি দমনের জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। তজ্জন্য প্রয়োজন হইলে সরকারের উপর চাপ দিবার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষক

নবপ্রকাশিত "প্রাথমিক শিক্ষক পত্রিকা'র ১৮ই বৈশাখ সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিক্ষক সম্পর্কে তুলনামূলক তথ্য দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইতে দেখা যায়, একদিন বাংলাদেশ শিক্ষাব্যাপারে ভারতের অপরাপর প্রদেশ হইতে অগ্রসর থাকিলেও বর্ত্তমানে সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রদত্ত পরিসংখ্যান হইতে দেখা যায় যে, যেস্থলে আসাম ও মহীশূরে প্রতি এক শত জন অধিবাসীর জন্য একটি, বোম্বাই রাজ্যে প্রতি বারো শত জনের জন্য একটি এবং মাদ্রাজ ও উড়িষ্যা রাজ্যে প্রতি ১৬ শত জনের জন্য একটি করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে সেস্থলে পশ্চিমবঙ্গে প্রতি সতর শত জনের জন্য একটি করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

অর্থব্যয়ের দিক হইতেও অবস্থা প্রায় অনুরূপ। দিল্লী রাজ্যে মাথাপিছু শিক্ষার ব্যয় ৩৩·৫ টাকা, বোম্বাই রাজ্যে ২৮·২ টাকা, পঞ্জাবে ২৩·৪ টাকা, মধ্যপ্রদেশে ২১·৪ টাকা, মাদ্রাজে ১৯·৪ টাকা আর পশ্চিমবঙ্গে ১১·৮ টাকা।

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন এবং মহার্ঘ্য ভাতার হিসাবে দেখা যায় যে, যেখানে সরকারী পরিচালনাধীনে বিদ্যালয়ে কর্ম্মরত শিক্ষকরা দিল্লীতে পান ১৩০ টাকা, আজমীড়ে ১১৮ টাকা, কুর্গে ১১৩ টাকা, হায়দ্রাবাদে ৯৮ টাকা, কচ্ছে ৮৭ টাকা, বিহারে ৬৭৷৷০ টাকা, মাদ্রাজে ৬৩ টাকা সেস্থলে পশ্চিমবঙ্গে তাঁহারা পান মাত্র ৫০ টাকা।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের মাসিক বেতন দিল্লীতে ১২০ টাকা,

আজমীড়ে ১০৫ টাকা, কুর্গে ৬৫ টাকা, মাদ্রাজে ৬২ টাকা এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪৭॥০ টাকা।

ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্ম্মরত শিক্ষকদের বেতন দিল্লীতে ১২০ টাকা, হায়দ্রাবাদে ১০৮ টাকা, আজমীড়ে ১০৫ টাকা, কুর্গে ৬৮ টাকা, মাদ্রাজে ৫৬ টাকা এবং পশ্চিমবঙ্গে ৩০ টাকা।

প্রবন্ধটিতে বলা হইয়াছে, "বৎসর তিনেক আগে তেল কল ও ময়দার কলে নিযুক্ত শ্রমিকদের সর্ব্বনিম্ন বেতন ধার্য্য করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুইটি কমিটি নিযুক্ত করেন; কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মজুরদের বেতন মাসিক ৫০ টাকা ধার্য্য হয়। তাহা ছাড়া প্রদেশের বহু কারখানায় ঐ শ্রেণীর শ্রমিকেরা মাথাপিছু মাসিক ৮০ টাকা হইতে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক শিক্ষকগণকে তথা-কথিত মজুর অপেক্ষাও হীন মনে করেন।"

প্রবন্ধটিতে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা মিলাইয়া মাসিক ১০০ টাকা করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলা হইয়াছে, ইহাতে পশ্চিমবঙ্গের ৪৮ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের জন্য শিক্ষাখাতে সরকারের ব্যয় বড় জোর বার্ষিক ৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে।

পশ্চিমবঙ্গে স্পেশাল ক্যাডার শিক্ষক নিয়োগ

বর্ত্তমান বৎসরে স্পেশাল ক্যাডার শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে আলোচনাপ্রসঙ্গে ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ "মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকায় শ্রী"প্রসাদ" লিখিতেছেন যে, গত বৎসর স্পেশাল ক্যাডার শিক্ষক হিসাবে মনোনীত অনেক প্রার্থীই কাজে যোগদান করেন নাই এই কথা স্মরণ রাখিয়া যেন এই বৎসর শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। তিনি যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, ১৯৫৩-৫৪ সনে মোট ৮৫০০ স্পেশাল ক্যাডার প্রাথমিক শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে শতকরা ১৯ জন কাজে যোগদান করেন নাই। উক্ত পদের জন্য কলিকাতায় ৫০০০ এবং অন্যান্য জেলায় ৩২০০০ মোট ৩৭০০০ আবেদন পত্র পাওয়া যায়। এই সংখ্যার মধ্য হইতে যাঁহাদিগকে মনোনীত করা হয়, নিয়োগের পনর দিন পরে দেখা যায় যে তাঁহাদের শতকরা ৬০ জন তখনও কাজে লাগেন নাই। শিক্ষাবিভাগ তখন ১০,০০০ শিক্ষকের এক প্যানেল করিয়া যাঁহারা গ্রামে কাজ করিতে অনিচ্ছুক তাঁহাদের বাদ দিয়া শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু এখনও নাকি ১০০০টি পদ অপূর্ণ রহিয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসরে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ৭৫০০ প্রাথমিক শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় স্পেশাল ক্যাডার শিক্ষক নিয়োগ ব্যাপারে গত বৎসর যথার্থ যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বজনপোষণ নীতি অনুসৃত হইয়াছিল। প্রবন্ধকার লিখিতেছেন, ঐরূপ নীতি বর্ত্তমান বৎসরেও অনুসৃত হইলে গত বৎসরের ন্যায় অধিকাংশ শিক্ষকেরই কাজে যোগদানের সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহ থাকিবে। গত বৎসর নাকি শিক্ষক-নিয়োগের ব্যাপারে কান্দী মহকুমা হইতেই অধিক ব্যক্তিকে চাকরী দেওয়া হয়। "আরও শোনা যায়, সিলেকশন বোর্ডের সিলেক্টেড লিষ্টও নাকি পরে বদলাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহা লইয়া জেলায় কংগ্রেসী এম. এল. এ-দের মধ্যে কিছু মনকষাকষিও হইয়া যায়। ইহার সবই যে গুজব ঘটনাপরম্পরায় তাহা মনে হয় না। এবারে নূতন স্কুলবোর্ডে যদি সংখ্যালঘু দল দলে ভারী হইয়া যায়, তাহা হইলে স্পেশাল ক্যাডারের শিক্ষক নিয়োগ কি ভাবে হইবে তাহা আল্লাই বলিতে পারেন। বেকার-সমস্যা ও সমাজসেবা লইয়াই কি কম ব্যাপার চলিতেছে?"

পুনর্ব্বাসন মন্ত্রণাদপ্তরের বিলোপ

কেন্দ্রীয় সাহায্য ও পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী শ্রীএ. পি. জৈন সম্প্রতি সাহায্য ও পুনর্ব্বাসন মন্ত্রণাদপ্তরগুলি বিলোপের যে প্রস্তাব করিয়া-ছেন ২৮শে মে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "ক্রনিকল" পত্রিকায় তাহার বিশেষ প্রতিবাদ করা হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, উদ্বাস্তদের সাহায্য এবং পুনর্ব্বাসনের কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমহোদয় যাহা বলিয়াছেন তাহা কোনরূপেই প্রণিধান-যোগ্য নহে। আসামে উদ্বাস্তদের অবস্থা বর্ণনাপ্রসঙ্গে পত্রিকাটি লিখিতেছেন, সকল উদ্বাস্তর পুনর্ব্বাসন ত দূরের কথা শতকরা ৪০ জন উদ্বাস্তকে কোন সাহায্যই দেওয়া হয় নাই। কাছাড় জেলায় আগত উদ্বাস্তদের মধ্যে যাঁহারা সরকারী তাঁবুতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন কেবলমাত্র তাঁহাদিগকেই চা-বাগানের জঙ্গল, ডুহালিয়া, কাঠিরাইল প্রভৃতি টিলায় অথবা কিল্লোয়ার খাল প্রভৃতি জলাভূমিতে বাসের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। উদ্বাস্ত উপনিবেশ-গুলির ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই পুনর্ব্বাসনের সকল ব্যবস্থা বানচাল হইয়া যায়। তদুপরি সরকারী কর্ম্মচারীদের নানাবিধ গাফিলতি রহিয়াছে। যে ভাবে উদ্বাস্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব তাহা কিছুই করা হয় নাই। কৃষকদিগকে জমি দিবার বন্দোবস্ত হয় নাই বা যাঁহারা কৃষক নহেন তাঁহাদিগকে শিল্পের মাধ্যমে কর্ম্মে ব্যাপৃত করারও কোন প্রচেষ্টা হয় নাই। উদ্বাস্তদের মধ্যে যাঁহারা সরকারী তাঁবুতে আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই তাঁহাদের সংখ্যা নির্ণয়ের চেষ্টা পর্য্যন্তও করা হয় নাই। এই ব্যাপারে বিভিন্ন দল এমন কি কংগ্রেসের আবেদনও বিফল হইয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তদের পুনর্ব্বাসনের জন্য কলিকাতায় একজন কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী-নিয়োগের পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে বলিয়া সম্প্রতি নয়াদিল্লী হইতে বেসরকারী সূত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে পত্রিকাটি তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

রাজচাকুরীর পুনর্গঠন

নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী নেহরু কর্ত্তৃক "ইনষ্টিটিউট অব পাব-লিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে"র উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এক প্রবন্ধে শ্রীমগনভাই

দেশাই লিখিতেছেন, "আমাদের রাজচাকুরীর দৈনন্দিন কার্য্যক্রমে যে সকল সমস্যায় লোকের মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছে সেই সকল সমস্যার দিকে প্রতিষ্ঠানটি প্রথম মনোযোগ দিবেন ইহাই আশা করা যায়।"

রাজকার্য্য পরিচালনার সমস্যাগুলির অন্যতম হইল লাল ফিতার দৌরাত্ম্য, দুর্নীতি এবং অযথা বিলম্ব। প্রকাশ যে উক্ত সংস্থা রাজকার্য্য পরিচালনার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা করিবেন। কিন্তু মগনভাই বলেন, "এ সকল সমস্যার সমাধান রাজসরকারকেই করিতে হইবে। নূতন সংস্থাটি বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এবং আলোচনা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের সমক্ষে তাহাদের সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিতে পারেন মাত্র।"

আলোচনাপ্রসঙ্গে শ্রীদেশাই আরও কয়েকটি সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। রাজপুরুষেরা অধিকাংশই তাঁহাদের পুরাতন আমলাতান্ত্রিক মনোভাব ত্যাগ করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাঁহাদের ঐ মনোভাব পরিত্যাগ করা নিতান্ত জরুরী প্রয়োজন। তিনি এই সকল সমস্যা বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়া রাজপুরুষদের সমক্ষে স্পষ্ট কর্ম্মপন্থা তুলিয়া ধরিবার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়াছেন। অন্যত্র রাজ্যে রামমূর্ত্তি কমিটি দেখাইয়াছেন যে, সেখানে রাজসরকারের ঘোষিত নীতিকে আমলাতন্ত্র নস্যাৎ করিয়া দিয়াছিল। মধ্যপ্রদেশের মাদকনিবেধ অনুসন্ধান কমিটিও অনুরূপ ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছেন। এইগুলিরও অনুসন্ধান ও আলোচনার আয়োজন নূতন প্রতিষ্ঠানে থাকা উচিত।

আর একটি মৌলিক প্রশ্ন হইল—ভবিষ্যতে রাজচাকুরীতে কিরূপে লোক নিয়োগ হইবে? লেখাপড়া, শিক্ষাদীক্ষা ও অন্য কি গুণ থাকিলে চাকুরীতে লওয়া হইবে?

শ্রীদেশাই লিখিতেছেন: "রাজপুরুষদের কিরূপ ভাষাজ্ঞান থাকা প্রয়োজন তাহা সংবিধানের কথা স্মরণে রাখিয়া স্থির করিতে হইবে। সংবিধানের ৮ম সিডিউলে ভারতবাসী যে সকল ভাষা ব্যবহার করিবে তাহার তালিকা দেওয়া হইয়াছে। আন্তঃপ্রাদেশিক সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে কোন্ ভাষা চলিবে তাহাও ঐস্থানে উল্লিখিত আছে। নূতন রাজপুরুষদের এই প্রয়োজন মিটাইবার যোগ্যতা থাকা চাই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি লক্ষ্য রাখিবেন যেন ছাত্রেরাও প্রয়োজনানুরূপ শিক্ষালাভ করে। শিক্ষার্থীরা নিজ আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করিবে এবং তাহারা সর্ব্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষা হিন্দী ভাষাও জানিবে ও তৃতীয় ভাষা ইংরেজীও জানিবে।"

আমরা মনে করি কুপোষ্য-পোষণ দোষ দূর না হইলে রাজচাকুরীতে যোগ্য লোক স্থান পাইবে না। যোগ্য লোক নিযুক্ত না হইলে সকল সমস্যাই বাড়িয়া যাইবে।

মেদিনীপুর জেলা বিভাগের অপপ্রচেষ্টা

সম্প্রতি "উৎকল সম্মিলনী"র পক্ষ হইতে মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি অংশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া উড়িষ্যার সহিত যুক্ত করিবার যে প্রস্তাব করা হইয়াছে সে সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে ১৬ই জ্যৈষ্ঠ "মেদিনীপুর পত্রিকা" লিখিতেছেন, ব্রিটিশ সরকার দুই বার এইরূপ চেষ্টা করা সত্ত্বেও সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। মেদিনীপুরে মুকুটহীন রাজা দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্ব, ক্ষুরধার যুক্তিজাল এবং অদম্য ও অনমনীয় দৃঢ়তা সকল প্রকার অপপ্রচেষ্টাকে ব্যাহত করিয়াছিল। আজ বীরেন্দ্রনাথ জীবিত না থাকিলেও মেদিনীপুরের অন্তরাত্মা আজিও জীবিত আছে। তাই বাতাসে এই অপপ্রচেষ্টার কথা শুনিবামাত্র দলমতনির্ব্বিশেষে ৪০ লক্ষ মেদিনীপুরবাসী একবাক্যে ইহার বিরুদ্ধতা করিয়াছে।

মেদিনীপুরবাসীর সমবেত প্রতিষ্ঠান "মেদিনীপুর সম্মিলনী"র ৮ম বার্ষিক সাধারণ সভায় জেলা বিভাগের সকলপ্রকার অপচেষ্টার বিরুদ্ধতা করিয়া সম্প্রতি যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া পত্রিকাটি লিখিতেছেন:

"যাঁহারা যে কোন অছিলায় মেদিনীপুর বিভাগের স্বপ্নও দেখেন তাঁহারা আশা করি সময়মত সংযত হইবেন। নচেৎ তাঁহাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, পরাধীন ভারতে মেদিনীপুরের যে ঐতিহ্য আছে স্বাধীন ভারতেও তাহার সে ঐশ্বর্য্য দেশের ডাকে কখনও ম্লান হইবে না।" আমরাও তাহা আশা করি।

বাঁকুড়ায় সরিষার তৈলে ভেজাল

"শ্রীদুর্ম্মুখ" ১৮ই জ্যৈষ্ঠ "হিন্দুবাণী"তে লিখিতেছেন, "আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছি 'তিরামিরা' বীজ নামক একজাতীয় তৈলবীজ বাঁকুড়ায় সম্প্রতি প্রায় ২৫০০ মণ আমদানী হয়েছে। এই বীজের তৈল সরিষার তৈলের সহিত ভেজাল হিসাবে মিশান চলে। আমাদের মনে হয়, এই উদ্দেশ্যেই এত প্রচুর পরিমাণ বীজ আমদানী হয়েছে। এই বিষয়ের প্রতি আমরা এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অবিলম্বে তৎপর না হলে তৈলের সাথে মেশান হয়ে যাবার সম্ভাবনাই প্রবল।"

খবর যদি সত্য হয় তবে কর্ত্তৃপক্ষের অবহিত হওয়া উচিত।

রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনে সরকারী হস্তক্ষেপ

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব একটি জাতীয় উৎসবে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু তবুও বলিতে হয় যে, বর্ত্তমানে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে যে সকল অনুষ্ঠান হয় তাহাতে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ সর্ব্বদা প্রধান স্থান পায় না। এই প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন, অধিকাংশ অনুষ্ঠানেই অনুষ্ঠানকারীদের বিলম্বিত প্রচারের গন্ধ থাকে। যে সকল অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র-সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার ব্যবস্থা সত্যই থাকে সেই সকল স্থলেও একশ্রেণীর শ্রোতাদের নিকট হইতে প্রতিবাদ আসে—বক্তৃতা নহে গান চাই। ইহা রুচির অধোগতিরই পরিচায়ক।

পত্রিকাটি লিখিতেছেন: "সম্প্রতি আবার শোনা গেল পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কিরূপভাবে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালিত হইতে পারে তাহার জন্ম উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এমন কি অনুষ্ঠানসূচীও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। অথচ ইহার কোন প্রয়োজন ছিল না। কবিগুরুকে স্মরণ করিবার নামে

এইরূপ অনাবশ্যক হস্তক্ষেপের পশ্চাতে আর যাহাই থাকুক অনুভূতির সূক্ষ্মতা নাই। ইহাতে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব পরিপূর্ণ হয় না, সংকীর্ণ হয়।" রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁহার এক জয়ন্তী অনুষ্ঠানের ভাষণে বলিয়াছিলেন, তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া দেশ যদি কোন দিক হইতে লাভবান না হইয়া থাকে তবে এই উৎসবের কোনই তাৎপর্য্য নাই। কবি, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, ঋষি, সাধক বহুতর প্রতিভার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রবীন্দ্রনাথ—কোন বাঁধাধরা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া কখনই এই বিরাট প্রতিভার সম্যক উপলব্ধি সম্ভব নহে।

বহরমপুরে নূতন উন্মাদ হাসপাতাল

"মুর্শিদাবাদ সমাচারে" ২৮শে বৈশাখের এক সংবাদে প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহরমপুরে একটি উন্মাদ হাসপাতাল খুলিতে মনস্থ করিয়াছেন। প্রস্তাবিত হাসপাতালটি বহরমপুরের প্রাক্তন জেলভবনে খোলা হইবে। বর্ত্তমানে উক্ত ভবনে এক শত জন কিশোর অপরাধী চিকিৎসাধীন আছে। ঐ স্থানে হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হইলে বহরমপুরের বোর্ষ্টাল স্কুলটি নাকি রাজ্যসরকার কর্ত্তৃক সাত লক্ষ টাকা মূল্যে ক্রীত বর্দ্ধমানের গোলাপবাগে স্থানান্তরিত করা হইবে। প্রস্তাবিত হাসপাতালে ৫০০ রোগীর অবস্থানের ব্যবস্থা থাকিবে।

বর্ত্তমানে রাঁচীতে পাগলের চিকিৎসার জন্য জনসাধারণকে প্রচুর অর্থব্যয় এবং নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রয়োজনবোধে রাঁচী হইতে পশ্চিমবঙ্গের উন্মাদকে কিছু কিছু করিয়া ফিরাইয়া আনা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে ঐরূপ হাসপাতালের বিশেষ অভাব। সেইজন্য এই প্রস্তাবটি কি ভাবে গৃহীত ও কার্য্যে পরিণত হয় সেদিকে সাধারণের মনোযোগ থাকা প্রয়োজন।

আগরতলায় জলকষ্ট

ত্রিপুরায় বিশেষতঃ আগরতলা শহরে প্রচণ্ড গ্রীষ্মাধিক্য, অনাবৃষ্টি এবং জলকষ্ট সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ২রা জ্যৈষ্ঠ "সেবক" লিখিতেছেন যে, বর্ত্তমান বৎসরে বৃষ্টি এবং পানীয় জলের অভাবে জনসাধারণ বিশেষভাবে ক্লিষ্ট হইতেছে। বৃষ্টির অভাবে চাষী ক্ষেতে লাঙ্গল দিতে পারিতেছে না। বিশুদ্ধ পানীয় জল না পাওয়ায় বলিতে গেলে প্রতিগৃহে টাইফয়েড, প্যারা-টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব হইতেছে।

পত্রিকাটি লিখিতেছেন, প্রতি বৎসরই চৈত্র-বৈশাখ মাসে আগরতলা শহরে টাইফয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। বিশুদ্ধ জলের অভাবই তাহার অন্যতম প্রধান কারণ। আগরতলায় টিউবওয়েলের জল দূষিত থাকার জন্যই এরূপ হয়। একই কারণে তথায় অধিকাংশ লোকই পেটের পীড়ায় ভোগেন। "এই প্রশ্ন ভারতীয় পার্লামেণ্টেও উঠিয়াছিল এবং খাদ্যমন্ত্রী স্বীকার করিয়াছিলেন যে, আগরতলার টিউবওয়েলে যে জল পাওয়া যায় তার শতকরা নব্বই ভাগই পেটের পীড়ার বীজাণুমিশ্রিত। মফস্বলের টিউবওয়েলের জলের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায় নাই।"

এরূপ অবস্থায় আগরতলা শহরে অনতিবিলম্বে একটি পূর্ণাঙ্গ ওয়াটার ওয়ার্কস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। আগরতলা নিউ মিউনিসিপ্যালিটি একটি ওয়াটার ওয়ার্কস স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সরকারী অর্থসাহায্য ব্যতীত ওয়াটার ওয়ার্কস স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া "সেবক" মনে করেন না। কিন্তু কাজের মন্থর গতি দেখিয়া পত্রিকাটি এ বিষয়ে বিশেষ আশান্বিত নহেন। যাহা হউক যাহাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আগরতলায় একটি পূর্ণাঙ্গ ওয়াটার ওয়ার্কস স্থাপিত হইবার ব্যবস্থা হয় সম্পাদকীয় মন্তব্যে তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

আসানসোল হাসপাতালে বসন্ত ওয়ার্ডের অভাব

"বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন, আসানসোল পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান শিল্পাঞ্চল। ঐ শহরে প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও বসন্ত মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। কিন্তু স্থানীয় এল. এম. হাসপাতালে বসন্ত রোগীদের জন্য কোন ওয়ার্ড নাই।

পত্রিকাটির সংবাদ অনুযায়ী তিন বৎসর পূর্ব্বে বসন্ত ওয়ার্ডের জন্য বর্দ্ধমান হইতে তাঁবু পাঠানো হয়। কিন্তু যে-কোন কারণেই হউক সেই সকল তাঁবু ফেরত পাঠানো হয়। অবশেষে স্থানীয় আন্দোলনের ফলে তিন বৎসর পরে পুনরায় তাঁবু আনা হয় বটে, কিন্তু সেগুলি খাটাইতে অযথা বিলম্ব করা হয়। ইতিমধ্যে রোগের প্রকোপে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে। কিন্তু গত ২৭শে মে ঝড়বৃষ্টিতে উক্ত তাঁবুগুলিও উড়িয়া যায়। হাসপাতালের কর্ম্মচারিগণের তৎপরতার ফলে অবশ্য রোগীদের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। তবে রোগী-দিগকে নাকি তাহাদের নিজ নিজ স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

"বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন: "অনেকেরই সন্দেহ জাগিতেছে যে কর্তৃপক্ষ বোধ হয় ঐ দুইটি তাঁবু দেখাইয়া small pox wardটি স্থায়ী ভাবে না করিবার মতলবে আছেন। আমরা জানি হাস-পাতালের চরম দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গের জনস্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয়ের। এই ব্যাপারে তিনি সক্রিয় হস্তক্ষেপ না করিলে হাসপাতালের নানা অভিযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। আসানসোলের মত এমন গুরুত্বপূর্ণ সহর যেখানে বসন্ত মহামারীরূপে দেখা দেয় সেখানে তাঁবু খাটাইয়া সাময়িক এবং অস্থায়ী ভাবে বসন্ত রোগের প্রতি-কারের চেষ্টা করাকে আমরা সমর্থন করিতে পারি না।" পত্রিকাটি যথেষ্টসংখ্যক শয্যাসম্বলিত একটি স্থায়ী ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠার অনুরোধ জানাইয়াছেন।

আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, পশ্চিমবঙ্গের কর্তৃপক্ষ এখনও পশ্চিমবঙ্গ বলিতে কলিকাতা ও তাহার আশপাশই বুঝেন। দামোদরের ওপার ত শুধু শস্যসংগ্রহের আকর মাত্র বলিয়া জ্ঞাত। এই অবস্থায় স্থানীয় প্রতিনিধিবর্গ যদি পরিষদে বা লোকসভায় কিছু বলেন তবে সুফল হইতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রেও যদি যোগ্যতার অভাব থাকে ত উপায় কি? আসানসোল ত পরিষদে একজন প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন। তিনি এ বিষয়ে কি বলেন?

বিহার মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের অব্যবস্থা

বিহার মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড গত দুই বৎসর যাবৎ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম দশ জনের নাম প্রকাশ করিতেছেন না। উপরন্তু যাহারা বৃত্তি পাইবার অধিকারী তাঁহাদের নামও যথাসময়ে প্রকাশিত করা হয় না। ২৬শে বৈশাখ "নবজাগরণ" পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, ১৯৫২ সনে যাহারা বিহার মাধ্যমিক বোর্ডের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় বৃত্তি অর্জন করিয়াছিল দীর্ঘ দুই বৎসর পর সম্প্রতি তাহাদের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে বোর্ডের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার সমালোচনা করিয়া পত্রিকাটি লিখিতেছেন: "বর্ত্তমান শিক্ষাবিভাগে অকর্ম্মণ্যের দল সংখ্যাগুরু হওয়ায় কত প্রতিভা অঙ্কুরে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, কত সম্ভাব্য জীবনে ছেদ পড়ে তাহার হিসাব কে রাখে? যাহারা বৃত্তি লাভ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে হয়ত অনেকেই অর্থ-অসাচ্ছল্যহেতু উচ্চতর শিক্ষায় বঞ্চিত হইয়া উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের সন্ধান পাইল না। সময়ে ইহার প্রকাশ হইলে প্রত্যেক বৃত্তিভোগী প্রথম সোপানে জয়ের গৌরব স্মরণ করিয়া উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রেরণা পাইয়া প্রতিভা স্ফুরণের অধিকতর সুযোগ পাইত।"

পরীক্ষায় যে ছাত্র বা ছাত্রী প্রথম স্থান অধিকার করে তাহাদের এবং বৃত্তিঅর্জ্জনকারী ছাত্রছাত্রীর নাম প্রকাশের ব্যবস্থা যাহাতে পরীক্ষার ফল প্রকাশের অব্যবহিত পরেই করা হয় সেই পরামর্শ দিয়া পত্রিকাটি কর্ত্তৃপক্ষের কর্ম্মপদ্ধতির পরিবর্ত্তন ও তাঁহাদের সজাগ হইবার দাবি জানাইয়াছেন।

জামসেদপুর "রবীন্দ্র-স্মৃতি তহবিলের হিসাব"

গত ২৬শে বৈশাখ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "নবজাগরণ" লিখিতেছেন, রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার্থে রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডার সৃষ্টি হইলে ১৯৪৫ সালে জামসেদপুরে টাটা কোম্পানীর তদানীন্তন জেনারেল ম্যানেজারকে লইয়া একটি রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি গঠিত হয় এবং তাঁহারা অর্থসংগ্রহও আরম্ভ করেন। পত্রিকার মন্তব্য অনুযায়ী জানা যায়, "অর্থসংগ্রহ হইয়াছিলও প্রচুর কিন্তু তাহা যে কি হইল অদ্যাবধি জনসাধারণকে জানান হয় নাই। তবে অর্থের যে অপচয় হয় নাই তাহাই বা বলি কি করিয়া যখন শুনিতে পাই পরলোকগত খানবাহাদুর প্যাটেল রীগাল সিনেমায় একটি চ্যারিটি শোর আয় কিঞ্চিদধিক দুই শত টাকা স্মৃতি-তহবিল সমিতিতে দান করেন। তাহা ব্যাঙ্কে জমা না দিয়া স্মৃতি-তহবিল সমিতির সহচর ও অনুচররা নাকি রেশন ও অন্যান্য অভাব মিটাইবার জন্য টাকাটা খাটাইতেন। এমন সময় টাটা কোম্পানীর একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী উক্ত দুই শত টাকা তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য লন, কিন্তু তাহার পর নাকি উক্ত টাকার আর পাত্তা নাই। জামসেদপুর রবীন্দ্র-স্মৃতি সমিতির নির্ব্বাচিত যুগ্ম-সম্পাদক দুই জন পদাধিকারী বিশিষ্ট বাঙালী ভদ্রলোক। জনসাধারণের মধ্যে তাঁহাদের নাম অনেকে ভুলিয়া যান নাই। রবীন্দ্র-স্মৃতি তহবিলের হিসাব জানিবার জন্য জনসাধারণ সেজন্য দাবি জানাইতেছেন। আমরা সম্পাদকদ্বয়কে অনুরোধ করিতেছি যত শীঘ্র সম্ভব রবীন্দ্র-স্মৃতি তহবিলের পূর্ণ হিসাব প্রকাশ করুন।"

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, তবে বলা দরকার যে যাঁহারা চাঁদা দিয়াছিলেন তাঁহারা যদি এদিকে দৃষ্টি রাখিতেন তবে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইত না।

ওয়াশিংটনে বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণের উদ্যোগ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বৌদ্ধগণ ওয়াশিংটনে একটি বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণে উদ্যোগী হইয়াছেন। মন্দির নির্ম্মাণের জন্য ৫০ লক্ষ হইতে এক কোটি ডলার অর্থের প্রয়োজন হইবে। প্রকাশ, থাইল্যাণ্ড সরকার এজন্য অর্থসাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। অন্যান্য স্থান হইতে অর্থসংগ্রহের কার্য্য ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে।

সানফ্রানসিসকো, লস এঞ্জেলস ও সিয়াটলেই প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক লক্ষ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা বাস করেন। বর্ত্তমানে হাওয়াই দ্বীপে ৫টি, লস এঞ্জেলসে ১৩টি, সানফ্রানসিসকোতে ৪টি এবং নিউ ইয়র্ক সিটিতে ২টি বৌদ্ধ মন্দির রহিয়াছে।

মিশিগানের অন্তর্গত অ্যান আর্ব্বারের নিকট একটি বৌদ্ধ পাঠকেন্দ্র নির্ম্মাণের জন্যও চেষ্টা চলিতেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যালয়সমূহে বর্ণবৈষম্য নীতি

গত ১৭ই মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট সরকারী বিদ্যালয়সমূহে বর্ণবৈষম্য নীতি বিধিবহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। প্রধান বিচারপতি রায়দানপ্রসঙ্গে বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানের চতুর্দ্দশ সংশোধনে নিগ্রো ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের জাতি-বর্ণনির্বিশেষে আইনের দৃষ্টিতে সমান বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে নিগ্রোদের প্রবেশাধিকার অস্বীকার করার ফলে নিগ্রোদিগকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ১৭টি রাজ্যে সরকারী বিদ্যালয়গুলি স্থানীয় আইনের বলে নিগ্রোদিগকে শ্বেতকায়দিগের সহিত একই বিদ্যালয়ে যোগ দিতে দেওয়া হয় না। তদ্ব্যতীত আরও ৪টি রাজ্যে এই পৃথকীকরণ নীতি অল্পবিস্তর বিদ্যমান রহিয়াছে।

সুপ্রীম কোর্টের সর্ব্বসম্মত রায়ে বলা হইয়াছে, "আমরা মনে করি যে সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে 'পৃথক অথচ সমান' নীতি অচল। শিক্ষাব্যাপারে পৃথক সুবিধাদান মূলতঃ অসম্পূর্ণ।

সুপ্রীম কোর্টের এই সিদ্ধান্ত মার্কিন গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত শ্বেতাঙ্গদিগের অনেকেরই মনঃপূত হয় নাই এবং ইহাকে কার্য্যক্ষেত্রে বানচাল করিবার জন্য তাঁহারা নানারূপ ফিকিরের সন্ধানে রহিয়াছেন। "মার্কিনবার্ত্তা"র সংবাদে প্রকাশ, বহু সংবাদপত্রে এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানান হইলেও "সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তটি সময়োচিত হইয়াছে কিনা, বহু সংবাদপত্র অবশ্য সে বিষয়েও গুরুতর সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। দক্ষিণাঞ্চলের বহু প্রভাবশালী সংবাদপত্র সিদ্ধান্তটিকে অনিবার্য্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন।"

পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রবাদী দেশে বর্ণ বৈষম্য দূর করিয়া প্রকৃত সাম্যের পথের নির্দ্দেশ এতদিনে দেওয়া হইল। দেখা যাউক এই প্রগতিমূলক ব্যবস্থা কিরূপে গৃহীত হয়।

শ্রুতি ও স্বরস্থান (প্রাচীন)

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়
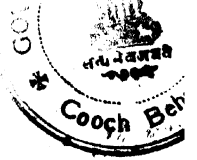
সামবেদ হইতে আমাদের সঙ্গীত স্বরগ্রহণ করিয়াছে এইরূপ একটি জনশ্রুতি আছে বটে, কিন্তু কেহই স্বরগুলির অবস্থান অর্থাৎ একটি স্বর হইতে আর একটি স্বর কতখানি উচ্চ, তৎ-সম্বন্ধে কোনরূপ আলোকসম্পাত করিতে পারেন না। এমন কি কাশীধামের বিখ্যাত সামবেদিগণও এ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কিছুই বলিতে পারেন নাই। বেদগান সুরে স্তোত্রপাঠের মতই ছিল। প্রথমতঃ তিনটি, পরে চারটি এবং শেষ পর্যন্ত সাতটি স্বরই ব্যবহার করা হইত বটে, কিন্তু সেই স্বরগুলির অবস্থান সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না।

ভারতবর্ষে আজকাল দুইটি সঙ্গীত পদ্ধতি প্রচলিত আছে—(১) হিন্দুস্থানী বা উত্তর-ভারত পদ্ধতি, (২) কর্ণাটক বা দক্ষিণ ভারত পদ্ধতি। প্রাচীনকালে মাত্র একটি পদ্ধতিই সর্বভারতে প্রচলিত ছিল, এবং ঠিক কোন্ সময় হইতে যে দুইটি পদ্ধতিতে পরিণত হইল তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। তবে কর্ণাটক পদ্ধতিতে 'শ্রুতি'র পর্যাপ্ত ব্যবহার দেখিয়া মনে হয়, প্রাচীন সঙ্গীতের যাহা কিছু এই পদ্ধতিতেই অবশিষ্ট আছে, পক্ষান্তরে (মুসলমানগণের দ্বারা আনীত পারস্য-সঙ্গীতের প্রভাবে) উত্তর-ভারতে স্বরস্থানের উপর বেশী জোর দেওয়ার ক্রমেই শ্রুতির ব্যবহার কমিয়া গিয়া বর্তমান হিন্দুস্থানী পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে।

আমাদের আলোচ্য বিষয়—শ্রুতি ও স্বরস্থান। তিনটি ভাগে আমরা এবিষয়ে আলোচনা করিব—(১) প্রাচীনকাল, (২) মধ্যযুগ ও (৩) বর্তমান কাল।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, যেমন পূর্বে ভাষা ও পরে তার ব্যাকরণ—সঙ্গীতেও তেমনি, আগে সঙ্গীত পরে তাহাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার শাস্ত্র। সঙ্গীত অগ্রগামী ও পরিবর্তনশীল। কারণ লোকরুচির উপর সঙ্গীত নির্ভরশীল। দেশ কাল পাত্রভেদে লোকরুচির যেরূপ পরিবর্তন হয়, সঙ্গীতেও সেইরূপ পরিবর্তন অনিবার্য এবং সঙ্গীতশাস্ত্রেরও আনুষঙ্গিক সংস্কার প্রয়োজন হয়।

যে-কোন সঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তাহার শুদ্ধ স্বরস্থান কি, তাহা জানা প্রয়োজন। যে কয়টি স্বর (বা শ্রুতি) সাহায্যে সঙ্গীতের অভিব্যক্তি, তাহাদের অবস্থান সপ্তকে কোথায় কোথায় তাহা জানা নিতান্ত প্রয়োজন।

ভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রের প্রাচীনতম প্রামাণ্য গ্রন্থ ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র''। তাৎকালিক বা তাহার কয়েক শত বৎসর পরবর্তীকালে লিখিত গ্রন্থে ভরতেরই মত পরিবর্তিত ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার প্রদর্শিত উপায়েই আমরা তাঁহার শ্রুতি ও শুদ্ধ স্বরস্থান বুঝিতে চেষ্টা করিব। তখনকার দিনে "ষড়জ" ও "মধ্যম" দুইটি গ্রাম বা সপ্তক দেশে প্রচলিত ছিল এবং মনে হয় প্রত্যেক শিল্পীরই দুইটি গ্রাম সম্বন্ধেই ধারণা এবং ব্যুৎপত্তি ছিল। ষড়জ গ্রাম সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :

ষড়্‌জশ্চতুঃশ্রুতির্জ্ঞেয় ঋষভস্ত্রিশ্রুতিস্তথা।
দ্বিশ্রুতিশ্চৈব গান্ধারো মধ্যমশ্চ চতুঃশ্রুতিঃ॥
চতুঃশ্রুতিঃ পঞ্চমঃ স্যাদ্ধৈবতস্ত্রিশ্রুতি স্তথা।
নিষাদো দ্বিশ্রুতিশ্চৈব ষড়্‌জগ্রামে ভবন্তি হি॥''

অর্থাৎ, ষড়জগ্রামে ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চমের চারটি করিয়া শ্রুতি, ঋষভ ও ধৈবতের তিনটি করিয়া এবং গান্ধার ও নিষাদের দুইটি করিয়া শ্রুতি হইবে। প্রত্যেক স্বর তাহার শেষ শ্রুতির উপর স্থাপিত হইবে। তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়াইবে। ২২টি শ্রুতি পর পর বসাইয়া স্বর স্থাপনা করা হইল ষড়জ গ্রাম :

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১
সা রে গা
১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২
মা পা ধা নি

মধ্যম গ্রাম সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন : "মধ্যম গ্রামে শ্রুত্যপকৃষ্টঃ পঞ্চমঃ কার্য্যঃ।" অর্থাৎ, মধ্যম গ্রামে পঞ্চম তাহার তৃতীয় শ্রুতির উপর স্থাপিত হইবে। অর্থাৎ ষড়জ গ্রামের পঞ্চম অপেক্ষা মধ্যম গ্রামের পঞ্চম ১ম শ্রুতি নিম্নে অবস্থিত থাকিবে :

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১
সা রে গা
১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২
মা পা ধা নি

"পঞ্চম শ্রুত্যুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাং যদন্তরং মার্দবাদায়তত্বাদ্ বা তৎ প্রমাণশ্রুতিঃ।'' নাট্যশাস্ত্র

অর্থাৎ, মধ্যম গ্রামের পঞ্চমকে ১ শ্রুতি উচ্চ করিয়া ষড়জগ্রামে পরিণত করিয়া বা ষড়জগ্রামের পঞ্চমকে ১ শ্রুতি নামাইয়া মধ্যমগ্রামে পরিণত করিয়া একটি শ্রুতির প্রমাণ বুঝিতে হইবে।

এইবার তাঁহার প্রদর্শিত উপায়ে আমরা দেখি, কি

করিয়া তিনি ২২টি শ্রুতি প্রমাণ করিয়াছেন এবং স্বরস্থান ও একটি শ্রুতির "মাপ" সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন।

"যথা দ্বে বীণে তুল্যপ্রমাণ-তন্ত্র্যুপ-পাদন-দণ্ড-মূর্চ্ছনে ষড়্‌জ গ্রামাশ্রিতে কার্য্যে।"

অর্থাৎ, দুইটি বীণা লও যাহাদের কাঠের ফ্রেম, তার ইত্যাদি একইরূপ (absolutely identical) এবং দুইটি বীণাই ষড়জ গ্রামের মূর্চ্ছনায় বাঁধিয়া লও। দুইটি বীণা পাশাপাশি রাখিয়া যেটি সেই ভাবেই ষড়জ গ্রামের মূর্চ্ছনায় বাঁধা থাকিবে তাহার নাম ধ্রুব বা অচল বীণা এবং যে বীণাটি পরিবর্তন করিয়া শ্রুতি প্রদর্শিত হইবে তাহাকে "চল" বীণা আখ্যা দেওয়া হইল।

"তয়োরেকতরীং মধ্যম গ্রামকীং কৃত্বা পঞ্চমস্যাপকর্ষেণ শ্রুতিম্‌॥"

অর্থাৎ, ২য় বা "চল" বীণার পঞ্চম ১ শ্রুতি নামাইয়া বীণাটি মধ্যম গ্রামে পরিণত কর।

"তামেব পঞ্চমবশ্যাৎ ষড়্‌জ গ্রামকীং কুর্য্যাৎ"

অতঃপর সেই বীণাকেই 'পঞ্চম' স্থির রাখিয়া ষড়জগ্রাম বীণায় পরিবর্তিত কর। অর্থাৎ সা, রে, গা, মা, ধা, নি প্রত্যেক স্বরকে এক এক শ্রুতি নামাইয়া লও। ইহা হইতে বুঝা যায় তখনকার দিনে একটি শ্রুতি সম্বন্ধে শিল্পীর স্পষ্ট ধারণা ছিল এবং এই প্রক্রিয়াও খুব সহজসাধ্য ছিল।

"এবং (সা বীণা) শ্রুতিরপকৃষ্টা ভবতি॥"

তাহা হইলে "চল" বীণাটি যাহা মধ্যম গ্রামে পরিণত হইয়াছিল, পুনরায় ষডজ গ্রামে পরিণত হইল। কারণ পঞ্চম ব্যতীত প্রত্যেক স্বরের একটি করিয়া শ্রুতি নামানো হইল।

"পুনরপি তদ্বদেবাপকর্ষাৎ, গান্ধার নিষাদবন্তৌ স্বরৌ ইতরস্যাং ধৈবতর্ষভৌ প্রবিশতঃ দ্বিশ্রুত্যধিকত্বাদ্‌।"

এইরূপ আর একবার পরিবর্তন করিলে "চল" বীণার গান্ধার ও নিষাদ অচল বীণার ঋষভ ও ধৈবতে প্রবেশ করিল, কারণ—ইহারা মাত্র ২ শ্রুতি উপরে ছিল।

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
ধ্রুব বীণা স্বর				সা			রে		গা				মা				পা			ধা		নি
চল্ বীণা শ্রুতি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
চল্ বীণা স্বর				সা			রে		গা				মা				পা			ধা		নি
মধ্যম গ্রাম				সা			রে		গা				মা			পা				ধা		নি
২য় পরিবর্তন			সা			রে		গা				মা				পা			ধা		নি	
৩য় „			সা			রে		গা				মা			পা				ধা		নি	
৪র্থ „		সা			রে		গা				ম।				পা			ধা		নি		
৫ম „		সা			রে		গা				মা			পা				ধা		নি		
৬ষ্ঠ „	সা			রে		গা				মা				পা			ধা		নি			
৭ম „	সা			রে		গা				মা			পা				ধা		নি			
৮ম „			রে		গা				মা				পা			ধা		নি				সা

"পুনস্তদ্বদেবাপ কর্ষাদ্বৈবতর্ষভৌ বিতরস্যাং পঞ্চম ষড়্‌জৌ প্রবিশতঃ (ত্রি) শ্রুত্যধিকত্বাৎ।"

এইরূপ আর একবার পরিবর্তন করিলে "চল" বীণার ধৈবত এবং ঋষভ "অচল" বীণার পঞ্চম ও ষড়জ হইবে। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের মতানুসারে ঋষভ এবং ধৈবত ষড়্‌জ ও পঞ্চম হইতে মাত্র ৩ শ্রুতি উপরে অবস্থিত।

"তদ্বৎ পুনরপকৃষ্টায়াং তস্যাং পঞ্চম-মধ্যম-ষড়্‌জাঃ ইতরস্যাং মধ্যম গান্ধার নিষাদবন্তঃ প্রবেক্ষ্যন্তি চতুঃ-শ্রুত্যধিকত্বাৎ।"

আর একবার এইরূপ শ্রুতি নামাইলে "চল" বীণার পঞ্চম, মধ্যম এবং ষড়জ "অচল" বীণার মধ্যম, গান্ধার এবং নিষাদ হইবে—কারণ এই স্বরগুলির পার্থক্য মাত্র ৪ শ্রুতি।

"এবং অনেন নিদর্শনেন দ্বৈগ্রামিক্যো দ্বাবিংশতিঃ শ্রুতয়ঃ প্রত্যবগন্তব্যাঃ।"

এই নিদর্শন দ্বারা, অর্থাৎ এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা দুইটি গ্রামের ২২টি শ্রুতি অবগত হওয়া যাইবে।

এখন দেখি, আমরা ইহা হইতে কি বুঝিতে পারি। ভরতের নির্দেশে দুইটি বীণার প্রত্যেকটিতে সাতটি করিয়া তার থাকিবে। তারগুলি ষড়জগ্রামের সা, রে, গা, মঃ, পা, ধা, নি-তে বাঁধিয়া লইতে হইবে; তৎপরে ষড়জগ্রামের পঞ্চমকে ১ শ্রুতি নামাইয়া মধ্যম গ্রামে পরিণত করিতে হইবে। ষড়জ ও মধ্যম গ্রামের স্বরগুলির সম্বন্ধে ধারণা না থাকিলে একটুও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের প্রশ্ন হইতেছে—ষড়জ বা মধ্যম গ্রাম কি ছিল? নাট্যশাস্ত্র-কার আশা করিয়াছেন—তাঁহার গ্রন্থের পাঠকের ষড়জ এবং মধ্যম গ্রাম সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান রহিয়াছে। পঞ্চম স্বরকে কতটুকু নামাইলে ১ শ্রুতি নামানো হইল তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা হয় নাই। এইটুকু মাত্র বুঝা যাইতেছে যে, প্রত্যেক তার একটু একটু ঢিলা করিয়া এক এক শ্রুতি করিয়া নামাইতে হইবে। তাঁহার ২য় নির্দেশে সা, রে, গা, মা, ধা ও নি-র এক এক শ্রুতি করিয়া নামাইতে হইবে। কর্ণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে "মনাক্ উচ্চধ্বনি" প্রমাণে শ্রুতি পরিবর্তনকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলা চলে না। প্রত্যেক গ্রামে বা সপ্তকে ২২টি শ্রুতি থাকিলে এবং প্রত্যেক শ্রুতি সমান হইলে তবেই ঐরূপ পরিবর্তন সম্ভব। তিনি যেভাবে প্রমাণ করিয়াছেন তাহাতে শ্রুতি যে ২২টি তাহা পূর্বেই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, প্রমাণ করা হয় নাই। কয়েক শতাব্দী ব্যবধানে আমরা তাহার শ্রুতি ব্যাখ্যার দ্বারা তখনকার দিনে প্রচলিত শুদ্ধস্বর সপ্তক কি করিয়া বুঝিব? ভরতের নিজের ব্যাখ্যা হইতে তাহা জানিবার উপায় নাই। গ্রীক বীণ্‌কার পিথাগোরাস দেখাইয়াছেন যে, যে-কোন তার বাঁধিয়া বাজাইলেই তাহার আনুষঙ্গিক উচ্চধ্বনিতে তাহারই ৫ম স্বরও বাজে। কাজেই কোন তার বাঁধিলেই তাহার ৫ম স্বর জানিতে বিলম্ব হয় না। কাজেই সমস্ত শ্রুতিগুলিই সমান মনে করিলে কোন নির্দিষ্ট গ্রাম বা সপ্তক হয় না এবং শ্রুতিও ২২টির কম হয়।

সঙ্গীতরত্নাকর প্রণেতা শার্ঙ্গদেবও ভরতের মত শ্রুতির একটা নির্দিষ্ট "মাপ" (definite unit) ধরিয়া লইয়াছেন। শ্রুতি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন :

"দ্বে বীণে সদৃশে কার্য্যে যথা নাদঃ সমোভবেৎ।
তয়োর্দ্বাবিংশতিস্তন্ত্র্যঃ প্রত্যেকং তাসু চাদিমা॥
কার্য্যা মন্দতমাধ্বানা দ্বিতীয়োচ্চ-ধ্বনির্মনাক্।
স্যান্নিরন্তরতা শ্রুত্যোর্মধ্যে ধ্বন্যন্তরা শ্রুতেঃ॥" রত্নাকর

একই আকারের দুইটি বীণা একই সুরে (নাদে) বাঁধিতে হইবে। তাহার একটিতে ২২টি তার থাকিবে (শার্ঙ্গদেবের একটি শ্রুতি-বীণা ছিল)। সর্বনিম্ন নাদ বা শ্রুতি হইতে ২য় তার একটু উচ্চ শ্রুতিতে, ৩য় তার তাহা হইতে একটু উচ্চ ধ্বনিতে এইরূপ ভাবে ২২টি শ্রুতি ক্রমশঃ উচ্চ সুরে চড়াইয়া বাঁধিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে নির্দিষ্ট করিয়া লইতে হইবে। "মন্দ্রতমধ্বানা দ্বিতীয়োচ্চ ধ্বনির্মনাক্" ব্যাখ্যা দ্বারা তাহার শ্রুতি স্থির করিয়া লইতে হইবে। এখানে প্রশ্ন উঠিবে—তিনি কি প্রথমে স্বরস্থান নির্দিষ্ট করিয়া শ্রুতি বিভাগ করিয়াছেন অথবা শ্রুতিদ্বারা স্বরস্থান নির্দিষ্ট করিয়াছেন। আমরা আগেই বলিয়াছি, পূর্বে সঙ্গীত পরে তাহাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার শাস্ত্র। তখনকার সঙ্গীতের শাস্ত্রোক্ত রূপ দর্শাইবার জন্য স্বরস্থান নির্দিষ্ট করা বিশেষ প্রয়োজন। এই স্বরস্থান শ্রুতির সাহায্যে স্পষ্ট করিবার চেষ্টাতেই যুগ-যুগান্তর ব্যাপী মতবিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। স্বরস্থান বুঝিতে হইলে তাঁহাদের মতে শ্রুতি, তাহাদের মাপ ও অবস্থান বুঝিতে হইবে। স্বরস্থান না বুঝিতে পারিলে গ্রাম, মূর্চ্ছনা ইত্যাদি লইয়া কোন আলোচনা চলে না। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :

"বক্ষ্যতে স্বরবীণাত্র তস্যামপি বিচক্ষণাঃ।
অঙ্কিত্বা স্বরদেশানাং ভাগান্ শ্রুতিমিঙ্গতে শ্রুতিঃ॥"

স্বরবীণায় (শ্রুতিবীণায় নয়) বিচক্ষণ ব্যক্তি স্বরদেশ অর্থাৎ স্বরগুলির মধ্যবর্তী স্থান অঙ্কন দ্বারা শ্রুতিবিভাগ করিয়া লইবেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, স্বরস্থান পূর্বেই নির্দিষ্ট ছিল। শ্রুতিবিভাগ দ্বারা স্বরস্থান বুঝাইবার চেষ্টাতেই প্রকৃত বিষয়টি দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। পণ্ডিত আব্রাহাম (তাঞ্জোর) বরোদা নিখিল-ভারত সঙ্গীত সম্মিলনীতে শার্ঙ্গদেবের শ্রুতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

"No Scale in which the Sruties were taken as unequal could under any circnmstances be accepted as Sarngdeva's Suddha Scale"

অর্থাৎ, কোন সপ্তক, যাহাতে শ্রুতিগুলি অসমান, শার্ঙ্গদেবের শুদ্ধস্বর সপ্তক বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। সমস্ত শ্রুতিগুলি সমান মনে করিয়া স্বরস্থাপনা করিলে কোন সপ্তক হইতে পারে না। প্রথমে স্বরস্থান নির্দিষ্ট করিয়া শ্রুতিগুলি সমান দেখানো সম্ভব নয়। কারণ মধ্যযুগে পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন :

"উত্তরোত্তর-সঙ্কোচস্তাকাশে ভবতি ধ্রুবম্।
সমভাগ প্রকল্পোহত্র ন সাধু মন্যতে বুধৈঃ॥" অনুপবিলাস

নাদ যত উচ্চ হইবে ততই উত্তরোত্তর স্থানে (আকাশ = Space) সঙ্কোচ হইবে। কাজেই স্বরগুলির মধ্যবর্তী স্থান বিষম হইতে বাধ্য। *Music Academy of Madras,* (January, 1930, Vol. I, No. 1.) পত্রিকায় ইহাদের শ্রুতি সম্বন্ধে দেখা যায় :

"How to tune the 22 srutics to their respective pitches—is the problem. The authors' (Bharat and Sangdea's) own idea as to how this is to be done has never been sufficiently brought to light and hence all the conclusions based on assumptions have been invalidated."

তাহা হইলে দেখা গেল যে, ভরত ও শার্ঙ্গদেবের শুদ্ধস্বর তাঁহাদের নির্দেশিত ব্যাখ্যা দ্বারা এখনও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় নাই। শুদ্ধস্বরসপ্তক না বুঝিতে পারিলে গ্রাম, মূর্চ্ছনা ইত্যাদির আলোচনাও অসম্ভব। এই দুইখানি বিখ্যাত শাস্ত্রগ্রন্থ লইয়া আরও গবেষণা প্রয়োজন। যদিও তৎকালে প্রচলিত সঙ্গীত হইতে আমাদের সঙ্গীত অনেক উন্নত বলিয়া মনে হয় তবুও ইঁহাদের গ্রন্থ দুইখানি লইয়া আরও গবেষণা করিলে সারা বিশ্বের সঙ্গীতের মূলসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া আমাদের ধারণা।

মধ্যযুগে চার জন পণ্ডিতের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য : (১) লোচন, (২) অহোবল, (৩) হৃদয়নারায়ণ ও (৪) শ্রীনিবাস। ইহাদের সময় ১৫০০ হইতে ১৮০০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত। লোচন-পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিণীই বর্তমান সঙ্গীতের ভিত্তিস্থাপক বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। রাগতরঙ্গিণী (লোচন), সঙ্গীত পারিজাত (অহোবল), হৃদয়প্রকাশ, হৃদয়কৌতুক (হৃদয়-নারায়ণ), রাগতত্ত্ববিবোধ (শ্রীনিবাস)—ইহাদের স্বরস্থান একই, কাজেই আমরা প্রতিনিধি হিসাবে সর্বশেষ শ্রীনিবাসের শুদ্ধস্বরস্থান আলোচনা করিব। ইঁহারা শ্রুতি অপেক্ষা স্বরস্থানের উপরই বেশী জোর দিয়াছেন। তারের দৈর্ঘ্যের উপর কোন্ স্থানে কোন স্বর বাজে তাহা দেখাইয়া সঙ্গীত-জগতের মহা উপকার করিয়াছেন। এবার আমরা শ্রীনিবাসের স্বরস্থান আলোচনা করিব :

"স্বরস্য হেতুভূতায়া বীণায়াশ্চাক্ষুষত্ততঃ।
তত্র স্বরবিবোধার্থং স্থান লক্ষণমীর্যতে ॥"

স্বরোৎপাদক বীণা প্রত্যক্ষ দেখা যায়, ইহার উপর স্বর জানিবার স্থান বলা হইতেছে।

"স্বরজ্ঞান বিহীনেভ্যো মার্গোঽয়ং দর্শিতো ময়া।
স্বরসম্বাদিতাজ্ঞানস্বরস্থাপনকারণম্ ॥"

যাহাদের উত্তম স্বরজ্ঞান নাই তাহাদিগকে এই উপায় দেখানো হইল। স্বরস্থাপনের নিমিত্ত "স্বরসম্বাদিতাজ্ঞান" অর্থাৎ ষড়জ-পঞ্চম সম্বন্ধ (সা-প) জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

"ষড়্জ-পঞ্চম-ভাবেন ষড়্জে জ্ঞেয়াঃ স্বরা বুধৈঃ"

ষড়জ গ্রামে অর্থাৎ শুদ্ধস্বরসপ্তকে উত্তরাঙ্গের স্বর পূর্বাঙ্গের স্বরের সম্বাদী অর্থাৎ ৫ম স্বর হইবে।

"সপয়ো রিধয়োশ্চৈব তথৈব গণিষা দয়োঃ।
সম্বাদ-সম্মত লোকে মসয়ো স্বরয়োর্মিথঃ ॥"

স্বরস্থাপন করিতে সা-প, রে-ধা, গা-নি, মা-সা এই সম্বন্ধ ঠিক রাখিতে হইবে।

একটি বীণার তার ৩৬ ইঞ্চি দীর্ঘ ধরিয়া লওয়া হইল। অর্থাৎ, বীণার উত্তর ও পূর্ব মেরুর মধ্যস্থানের তারের দৈর্ঘ্য ৩৬ ইঞ্চি, এই তারে ষড়জ স্বর বাজিতেছে। এখন দেখা যাক্—৩৬ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যে যদি সা স্বর বাজে তবে অন্যান্য স্বর কোথায় বাজিবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে তারের দৈর্ঘ্য যত কমিতে থাকিবে নাদ বা সুরও তত উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকিবে।

পূর্বমেরু	সা	রে	গা	মা	পা	ধা	নি	সাঁ	উত্তরমেরু
	৩৬″	৩২″	৩০″	২৭″	২৪″	২১⅓″	২০″	১৮″	৯″

সাঁ, সাঁ

"পূর্বোক্ত রয়োর্মের্বোশ্চ মধ্যে তারকঃসংস্থিতঃ।
তদর্ধে স্থাতিতারস্থ সপ্তস্বর্শস্থিতির্ভবেৎ ॥"

পূর্ব এবং উত্তর মেরুর ঠিক মধ্যস্থলে তার ষড়জ এবং তাহার অর্দ্ধস্থলে অতি তার ষড়জ বাজিবে।

তারের দৈর্ঘ্য ৩৬ ইঞ্চি ; ৩৬÷২=১৮ ; ৩৬−১৮=১৮ ইঞ্চি। এই ১৮ ইঞ্চিতে তার সা বাজিবে এবং তাহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ ৯ ইঞ্চিতে অতি তার সাঁ বাজিবে।

মা :

"মধ্যস্থানাদিমষড়্জমারভ্য তারষড়্জকম্।
সূত্রেং কুর্য্যাৎ তদর্ধে তু স্বরং মধ্যমমাচরেৎ ॥"

মধ্য ও তার ষড়জের মধ্যস্থানে মধ্যম স্বর বাজিবে। ৩৬−১৮=১৮ (এখন মাত্র ১৮ হইতে ৩৬ ইঞ্চি আমাদের আলোচ্য স্থান) ; ১৮÷২=৯ ; ১৮+৯=২৭ ইঞ্চি মধ্যমের স্থান।

পা :

"ভাগত্রয়সমাযুক্তং তৎসূত্রং ; কারিতং ভবেৎ।
পূর্বভাগদ্বয়াদগ্রে স্থাপনীয়োঽথ পঞ্চমঃ ॥"

মধ্য সা ও তার সাঁ-এর মধ্যস্থানকে ৩ ভাগ করিয়া পূর্বের ২ ভাগের অগ্রে পঞ্চম স্থাপন করিবে :

৩৬−১৮=১৮ ; ১৮÷৩=৬ ; ৬×২=১২ ; ৩৬−১২=২৪ ইঞ্চি পঞ্চমের স্থান।

গা :

"ষড়্জ পঞ্চমমধ্যে তু গান্ধারস্থানমাচরেৎ ॥"

মধ্য ষড়জ ও পঞ্চমের মধ্যস্থানে গান্ধারের স্থান আচরণ করিবে। সা হইতে প ৩৬−২৪=১২ ; ১২÷২=৬ ইঞ্চি ; ৩৬−৬ অথবা ২৪+৬=৩০ ইঞ্চি গান্ধারের স্থান (শ্রীনিবাসের অর্থাৎ মধ্যযুগের গান্ধার আমাদের বর্তমান কোমল গান্ধার)।

রে :

"ষড়্জ পঞ্চমগং স্থত্রমং শত্রয় সমন্বিতম্।
তত্রাংশদ্বয় সংত্যাগাৎ পূর্বভাগে তু রিভবেৎ॥"

ষড়জ ও পঞ্চমের মধ্যবর্তী স্থানকে তিন ভাগ করিয়া দুই ভাগ ত্যাগ করিয়া পূর্বভাগে ঋষভ হইবে ঃ

সা হইতে পা = ৩৬ − ২৪ = ১২ ; ১২ ÷ ৩ = ৪ ; ৪ × ২ = ৮ ; পা = ২৪ + ৮ = ৩২ ইঞ্চি ঋষভের স্থান

ধা ঃ

"পঞ্চমোত্তর ষড়্জাখ্য মধ্যে ধৈবতমাচরেৎ।"

পঞ্চম ও উত্তর ষড়জের মধ্যে ধৈবত আচরণ করা উচিত। মধ্যে শব্দটির দুইটি অর্থ হইতে পারে, ঠিক মধ্যস্থানে অথবা মধ্যে কোন জায়গায়।

পা থেকে সা = ২৪ − ১৮ = ৬ ; ৬ ÷ ২ = ৩ ; ১৮ + ৩ অথবা ২৪ − ৩ = ২১ ইঞ্চিতে হয়। কিন্তু ধৈবতকে ঋষভের পঞ্চম স্বর হইতে হইবে। ত্রৈরাশিকের সাহায্যে আমরা দেখি যে ধৈবত কোথায় পড়ে ঃ

সা ঃ প ঃ ঃ রে ঃ ধা অর্থাৎ ৩৬ ঃ ২৪ ঃ ঃ ৩২ ঃ ধা

অথবা $\frac{২৪ \times ৩২}{৩৬} = \frac{৬৪}{৩} = ২১\frac{১}{৩}$ ধৈবতের স্থান

নি ঃ

"পসয়োর্মধ্যভাগেস্থাৎ ভাগত্রয় সমন্বিতে।
পূর্বভাগদ্বয়ং ত্যক্তা নিষাদো-রাজতে স্বর॥"

পঞ্চম ও তার ষড়জের মধ্যস্থানকে তিনভাগ করিয়া পূর্বের দুই ভাগ ত্যাগ করিয়া নিষাদ স্বর অবস্থিত ঃ

প থেকে সা = ২৪ − ১৮ = ৬ ; ৬ ÷ ৩ = ২ ইঞ্চি ; ২ × ২ = ৪ ; ২৪ − ৪ = ২০ ইঞ্চি নিষাদের স্থান (শ্রীনিবাসের নিষাদ আমাদের বর্তমান কোমল নিষাদের সমান)।

মধ্যযুগে পণ্ডিতগণ তাঁহাদের বিকৃত স্বরগুলির অবস্থানও সহজ সরল ভাষায় নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন গ্রন্থের মতানুসারে ইঁহারাও ২২টি শ্রুতি এবং প্রত্যেক শুদ্ধস্বর তাহার শেষ শ্রুতিতে অবস্থিত স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

আধুনিক কালে স্বরস্থান প্রাচীন ও মধ্যযুগ হইতে কিছু ভিন্ন হইয়াছে দেখা যায়। কবে হইয়াছে তাহা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। তবে এইটুকু বলিতে হইবে যে, কোন কালেই কোন স্বরস্থান কেহ সৃষ্টি করেন না বা করিতেও পারেন না। সঙ্গীতে ব্যবহৃত স্বরের অবস্থান আমরা দেখাইতে পারি, সৃষ্টি করিতে পারি না। কারণ সঙ্গীত শিল্পীমনের স্বাভাবিক স্ফুরণ—সে কোন বিধিনিষেধ মানে না। এখন দেখা যাক—স্বরস্থানের কি পরিবর্তন হইয়াছে।

"বেদাচলাঙ্কশ্রুতিষু ত্রয়োদশ্যাং শ্রুতৌ তথা
সপ্তদশ্যাং চ বিংশ্যাং চ দ্বাবিংশ্যাং চ শ্রুতৌক্রমাৎ॥
ষড়্জা দিনাং স্থিতি প্রোক্তা শুদ্ধাখ্যা ভরতাদিভি ঃ
হিন্দুস্থানীয় সঙ্গীতে শ্রুতিক্রমবিপর্যয়তঃ।
এতে শুদ্ধস্বরা সপ্ত স্বস্বাদ্যশ্রুতি সংস্থিতাঃ॥"

অভিনব রাগমঞ্জরী

প্রাচীন ও মধ্যকালে শুদ্ধস্বরগুলি তাহাদের অন্তিম শ্রুতির উপর স্থাপিত হইত। কিন্তু আধুনিককালে প্রত্যেক শুদ্ধস্বর তাহার শ্রুতিগুলির আদি শ্রুতিতে স্থাপিত। এইরূপ পরিবর্তনে শুদ্ধস্বরস্থানের কিছু পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। যেমন ঃ

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
প্রাচীন				সা			রে		গা				মা				পা			ধা		নি
আধুনিক	সা				রে			গা		মা				পা				ধা			নি	

ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম পূর্বের স্থানেই আছে (বা থাকিতেই হইবে)। প্রাচীন ও মধ্যকালের গান্ধার (গা) ও নিষাদ (নি) আমাদের কোমল গান্ধার ও নিষাদের সমান। কারণ মধ্যযুগে কাফি ঠাট শুদ্ধস্বর সপ্তক ছিল। কিন্তু শুদ্ধ ঋষভ (রে) ও শুদ্ধ ধৈবত (ধা) এক এক শ্রুতি উচ্চ হইয়াছে। একটি তানপুরায় পঞ্চমের তারে পঞ্চম স্বরের সঙ্গে আনুষঙ্গিক "রে" এবং খরজের মোটা পিতলের তারে শুদ্ধ গান্ধার (গা) শোনা যাইবে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, শুদ্ধ স্বরসপ্তক কাহাকে বলা হয়। "ষড়্জ-পঞ্চম-ভাবেন ষড়্জে জ্ঞেয়াঃ স্বরা বুধৈঃ।" ষড়জগ্রামে অর্থাৎ শুদ্ধস্বরসপ্তকে ষড়জ-পঞ্চম-ভাব (relation of the 5th) ঠিক রাখিতে হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ষড়জ পরিবর্তন দ্বারা যে স্বরগুলি পাওয়া যাইবে তাহাই শুদ্ধস্বর।

যাঁহারা তানপুরায় গান করিতে অভ্যস্ত তাঁহারা জানেন যে, পঞ্চমের (পা) সঙ্গে তাহার পঞ্চমস্বর ঋষভ (রে) বাজে, রে রে সা করিলে তাহার পঞ্চমস্বর ধৈবত পাওয়া যায়। খরজের তারে গান্ধার (গা) শোনা যায়। ধৈবতকে সা করিলেও তাহার পঞ্চম গান্ধার পাওয়া যায়। গান্ধারের পঞ্চম নিষাদ পাওয়া যায়। মধ্যম দুইটি কাজেই শুদ্ধ নিষাদে তীব্র এবং কোমল নিষাদে শুদ্ধমধ্যম পাওয়া যায়, যদিও পঞ্চমকে ষড়জ মনে করিলে ষড়জ মধ্যমে পরিণত হয়।

সুতরাং স্বরগুলি শুনিয়া লইয়া তারের দৈর্ঘ্যের উপরে

(মধ্যযুগের বর্ণনানুকরণে) তাহাদের স্থান দেখানো সম্ভব ; কম্পনসংখ্যা দ্বারাও স্বরস্থান নির্দেশ করা যাইতে পারে। তারের কোন্ স্থানে কোন্ স্বর বাজিতেছে জানিতে পারিলে অঙ্কের সাহায্যে সহজেই কম্পনসংখ্যা (frequency) বাহির করা যায়। যেমন ঃ

$$\frac{\text{ষড়জের কম্পনসংখ্যা} \times \text{তারের দৈর্ঘ্য}}{\text{আলোচ্য স্বরের তারের দৈর্ঘ্য}} = \text{সেই স্বরে কম্পনসংখ্যা}$$

তারের দৈর্ঘ্য যদি ৩৬ ইঞ্চি ধরিয়া লই এবং ৩৬ ইঞ্চি লম্বা তারে যে ষড়জ ধ্বনিত হইতেছে তাহার কম্পনসংখ্যা যদি ২৪০ (প্রতি সেকেণ্ডে) ধরিয়া লই তাহা হইলে মধ্যমের কম্পনসংখ্যা কত হইবে ? তারের উপর মধ্যম-স্থানের দৈর্ঘ্য ২৭ ইঞ্চি দেখা গিয়াছে। তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়ায় ঃ

$$\frac{\text{২৪০} \times \text{৩৬}}{\text{২৭}} = \text{৩২০ প্রতি সেকেণ্ডে}$$

ইহা দ্বারা আমরা পাশ্চাত্ত্য দেশে ও আমাদের দেশে প্রচলিত স্বরস্থানের তুলনা করিয়া দেখিতে পারি। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, তারের দৈর্ঘ্য যত কম হইবে কম্পন-সংখ্যা এবং সুরের উচ্চতা (pitch) তত বৃদ্ধি পাইবে (অর্থাৎ inversely proportionate)। কম্পনসংখ্যার (আন্দোলন) সাহায্যে আমরা পাশ্চাত্ত্য স্বরগুলির সঙ্গে আমাদের স্বরগুলির অবস্থান তুলনা করিয়া দেখি। সা-এর কম্পনসংখ্যা ২৪০ মানিয়া লইলে .

তখনকার সঙ্গীত খুব দৃঢ় বা অনমনীয় (rigid) ছিল। বর্তমান সঙ্গীতে স্বরগুলি হেলাইয়া দোলাইয়া ব্যবহার করা হয়, কাজেই শ্রুতির কড়া নিয়মের বশবর্তী হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। পূর্বকালে চ্যুত ষড়জ চ্যুত পঞ্চম কাকলীনিষাদ ইত্যাদি শ্রুতি-স্বর ব্যবহৃত হইত, কিন্তু আধুনিককালে সঙ্গীতে "শ্রুতি" এই নামটুকুই মাত্র বর্তমান। স্বরের নামেই যখন সমস্ত শ্রুতিগুলি ব্যবহৃত হয়, ষড়জ ও পঞ্চম স্বর যখন অচল অর্থাৎ অবিকৃত বলিয়া গণ্য করা হয় ও কোন রাগের বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য স্বরের যে উচ্চতা বা নিম্নতা দেখাইতে হয় তাহা যখন "কণে"র (grace note) সাহায্যে করা হয় তখন ষড়জ ও পঞ্চম এক এক শ্রুতির ধরিয়া লইয়া মধ্য সা হইতে তার সাঁ পঞ্চম স্থানে অসংখ্য শ্রুতি স্বীকার করিয়া লইলেই চলিতে পারে এবং সঙ্গীতও মুক্তি লাভ করিয়া আরও দ্রুতগতিতে জয়-যাত্রার পথে অগ্রসর হইতে পারে। একটি সপ্তক (৮টি স্বর)-কে দুই ভাগে ভাগ করিলে এক এক ভাগে চারটি করিয়া স্বর হয়, ইহাকে চতুঃস্বরিক গ্রাম (scale) বা Tetrachord বলা হয়। পূর্বাঙ্গের সা, রে, গা, মা ও উত্তরাঙ্গের পা, ধা, নি সা-র অনুপাত শুদ্ধস্বর সপ্তকে সমান রাখিতে হইবে, অর্থাৎ সা হইতে রে যতটা উচ্চ পা হইতে ধা ততটা উচ্চ হইবে। সুতরাং সা ঃ পা ঃ ঃ রে ঃ ধা ; রে ঃ ধাঃ ঃ গা ঃ নি ; গা ঃ নি ঃ ঃ মা ঃ সা। অথবা সা-রে = পাধা, রেগা = ধনি ; গামা = নিসা। এইরূপে যে-কোনও শিল্পী শুদ্ধস্বরগুলির

	সা	রে	রে	গা	গা	মা	মা	পা	ধা	ধা	নি	নি	সাঁ
পাশ্চাত্ত্য	২৪০	২৫৬	২৭০	২৮৮	৩০০	৩২০	৩৩৭$\frac{১}{২}$	৩৬০	৩৮৪	৪০০	৪৩২	৪৫০	৪৮০
প্রাচ্য	২৪০	২৫৪$\frac{৫}{২৭}$	২৭০	২৮৮	৩০১$\frac{১৭}{৪৩}$	৩২০	৩৩৮$\frac{২৪}{২৭}$	৩৬০	৩৮১$\frac{৩}{২৭}$	৪০৫	৪৩২	৪৫২$\frac{৪}{৪৩}$	৪৮০

এইরূপে আমরা সহজেই পিয়ানো বা হারমোনিয়ামে বাঁধা স্বরগুলির সঙ্গে আমাদের ব্যবহৃত স্বরগুলির ব্যবধান বুঝিতে সক্ষম হইলাম। যে স্বরের কম্পনসংখ্যা তুলনায় যত বেশী সেই স্বরটির উচ্চতাও তদনুপাতে তত বেশী হইবে। আমাদের কোমল রে ও কোমল ধা পাশ্চাত্ত্য রে ও ধা হইতে একটু নিম্নে এবং শুদ্ধ গা, মা, [illegible] ধা ও শুদ্ধ নি পাশ্চাত্ত্য স্বরগুলি হইতে একটু উচ্চে অবস্থিত।

প্রাচীনকালে অত্যধিক শ্রুতির ব্যবহার দৃষ্টে মনে হয়,

ক্রমোচ্চতা বুঝিতে সক্ষম হইবেন। শুদ্ধ সাতটি ও বিকৃত পাঁচটি এই বারোটি স্বর লইয়া আমাদের সপ্তক গঠিত। ইহারা প্রত্যেকেই এক একটি করিয়া শ্রুতি। রাগে ব্যবহৃত হইবার সময়ে স্বরের নামে সমস্ত শ্রুতিগুলিই ব্যবহৃত হয়। শ্রুতির নামে সঙ্গীতের কোন কার্য্যই হয় না। তাই শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় ঃ

"সর্বাচ্চ শ্রুতয়স্তত্তদ্রাগেষু স্বরতাং গতাঃ।
রাগ হেতুত্বং এতাসাং শ্রুতি সঞ্জৈব সম্মতা॥" রাগমঞ্জরী

"মামা, ও মামা, বলি কানের মাথাটা খেয়েছ নাকি ?"

"আহা-হা, মামা ঘুমুচ্ছে, বিরক্ত করো না।"

চোখটা একটু লেগে এসেছিল, ধড়মড় করে চমকে উঠে চারদিকে তাকালাম। না, আমাকে নয়, গাড়ীর ওদিকে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে ঘিরে বসেছে নানান্ বয়সী কয়েকটি ছেলে, তাদের মধ্যেই কথা হচ্ছে। ভদ্রলোক আমার দিকে পিছন ফিরে বসেছেন, নাতি-উজ্জ্বল আলোতে চকচক করছে তাঁর প্রকাণ্ড টাকখানা।

শীতের সন্ধ্যা। আপিস-ফেরত বুড়ো ডেলি প্যাসেঞ্জার কেরাণী-দের মতই ক্লান্ত লোকাল ট্রেনটা। প্রতি পদক্ষেপেই থেমে থেমে লম্বা নিশ্বাস নিচ্ছে আর চলতে আরম্ভ করলেই সমস্ত শরীর তার থরথর করে কাঁপছে আর হাড় পাঁজরায় ঠোকাঠুকি লেগে বিকট শব্দ হচ্ছে। ঘুমের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে বিরক্ত হয়ে ভাল করে তাকালাম চারদিকে। কামরাটা যে ওয়াট সাহেবের আমলের তৈরি সেটা শুধু শব্দে নয়, ভিতরের বন্দোবস্ত থেকেও উপলব্ধি করলাম মুহূর্তমধ্যে। বেঞ্চগুলো অনেকটা ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসের সীটের মত, পিঠে পিঠ দিয়ে বসতে হয়। শুধু তফাতের মধ্যে মাঝের পার্টিশনগুলো অনেকখানি উঁচু হওয়াতে একজনের পিঠের ভার অন্য জনকে বহন করতে হয় না। বেঞ্চগুলোর দিকে চেয়ে ভাবতে চেষ্টা করলাম—পার্টিশনগুলো এত উঁচু করার দরকারটা কি ছিল, খাটো লোক বসলে ত একেবারে ঢাকা পড়ে যাবে! এটা কি শুধু কাঠের অপচয় নয়? সে যুগের বিলিতী ইঞ্জিনীয়ারদের বুদ্ধির কথা ভেবে একটু হাসি আসছিল, এমন সময় একটা প্রবল ঝাঁকুনিতে নিজের মাথাটা পেছনের দেয়ালের সঙ্গে ঠুকে যেতেই হৃদয়ঙ্গম করলাম তাঁদের সুবিবেচনা। বুঝেছি, যাত্রীদের পরস্পরের মাথা-ঠোকাঠুকি বাঁচানোর জন্যই সেগুলো তাঁরা বসিয়ে গেছেন দয়া করে। কিন্তু ছাদ থেকে ঝুলে পড়া হ্যাঙ্গারের মত ঐ কাঠগুলো? ওগুলোর প্রয়োজন?

গবেষণায় বাধা পড়ল। আবার তাদের গলা।

"আজ এত গম্ভীর কেন মামা? বড় সাহেব ডেকেছিল বুঝি? না মামী বকেছিল?"

"বলছি আজ মামাকে জ্বালিও না। মামা তোমাদের কোন্ পাকা ধানে মই দিয়েছে যে তোমরা এমনি করে কাঠি দিচ্ছ?"

"দ্যাখ ফণে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। জানিস আজকে কি হয়েছে? দুপুরে কাজ করতে করতে হঠাৎ মামার মনে পড়ে গেছে মামীর আংটিটা আনা হয় নি পাথর লাগাবার জন্যে। তাই মামার মনটা এত খারাপ। বাড়ীতে ঢুকতে পেলে হয়।"

"আচ্ছা আচ্ছা, সেজন্যে ভয় নেই। আমরা রয়েছি কি করতে? বলি একটা পান দাও না মামা।"

নেহাত মন্দ লাগল না ব্যাপারটা। দিনভর খাটুনির পরেও এদের স্ফূর্তি মরে নি—কে বলে কেরাণীদের লাইফ নেই! একটু আশান্বিত হয়ে উঠে সেদিকেই কান দিতে চেষ্টা করলাম, ট্রেনের হাড়-পাঁজরা গোণার চেয়ে এ অন্ততঃ ভাল কাজ। কিন্তু আর কিছু শোনার আগেই কানে এল এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ—'দূর শালারা। একটুও শান্তিতে থাকতে দেবে না।" চেয়ে দেখলাম ভদ্রলোক ছাতা উঁচিয়ে ধরেছেন।

"মামা মুখ খুলেছে, মামা মুখ খুলেছে।"

"জল জল। বাতাস দে একটা পাখা।"

"আচ্ছা মামা সত্যি করে বল তো কি ভাবছিলে এতক্ষণ?"

ভদ্রলোক নড়ে চড়ে ঠিক হয়ে বসলেন। আড়মোড়া ভাঙলেন। একটা পান মুখে দিলেন। তারপর বললেন, "কি ভাবছিলাম? শুনবি সেকথা? তবে শোন্। ভাবছিলাম তোদের মামীর

কথাই। সেই যখন প্রথম এসেছিল তেরো বছরের মেয়েটি, লাল চেলি পরে, কপালময় সিঁদুর লেপটে! কি টকটকে রূপ ছিল তখন, ঠিক যেন আগুনের মত।"

"আগুনের মত?"

"হ্যাঁ আগুনের মত। আমি তো ক'দিন কাছে ঘেঁষতেই সাহস পাই নি। তারপর একদিন কি মনে হতে কলেজ থেকে পালিয়ে এসে চুপিচুপি ঘরে ঢুকলাম বাড়ীর সকলের নজর এড়িয়ে। দেখি ও কনুইয়ে ভর দিয়ে বিছানায় বসে রয়েছে পেছন ফিরে। হঠাৎ মনে হ'ল চোখ দুটো টিপে ধরলে কেমন হয়। এই না ভেবে যেই…"

"হুর্‌রে।"

জয়ধ্বনি শুনে ভাল করে তাকালাম। একটা ছিপছিপে লম্বা ছেলে বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাতটা মাথার উপর তুলে চোখের নিমেষে কয়েকটা ঘুরপাক খেয়ে নিল। আমি একটু অস্বস্তি অনুভব করলাম। ছেলেটা তেইশ-চব্বিশের উপরে হবে না, যারা ভদ্রলোকের সঙ্গে রসিকতা করছে তাদের মধ্যেও ত্রিশ-বত্রিশের উপরে নেই। কেমন যেন দৃষ্টিকটু ঠেকল ব্যাপারটা।

"হতভাগা দিলি তো সব মাটি করে! মামার ফিলিং জমে উঠেছিল আর এমন সময় তুই এই কাজ করলি? তোর মরণ হয় না রে হতচ্ছাড়া? হাঁ মামা, তার পর? তার পর কি হ'ল?"

"তার পর? হাতের কাছে ছিল একটা পাখা। তাই দিয়ে চোখে এমন খোঁচাই মারলে…"

"কি সর্ব্বনাশ! এ রকম রসভঙ্গ!"

"আচ্ছা মামী তো তখন ছিল আগুনের মত। আর এখন?"

"কেন দেখিস নি বুঝি কোনোদিন? এই যে সেদিনও সকলাই মিলে নেমন্তন্ন খেয়ে এলি? এর মধ্যেই ভুলে গেলি সেকথা? নেমকহারাম সব।"

"আহা চটছ কেন? তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই মামীকে এখন কেমন দেখতে।"

"এখন? আহা সে কি রূপ আর কি গুন! হাসিলে মুক্তা ঝরে, কাঁদিলে পান্না। কল্পনা করতেই রোমাঞ্চ হয়। ওরে, ভাঙা মন্দির দেখেছিস তো?"

"সাবধান মামা, মামীর অত নিন্দে করলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। নিজে না হয় ভাঙা কুলো, তাই বলে মামীকেও ভাঙা মন্দির হতে হবে নাকি? ভাল চাও তো কথা ফেরাও, নইলে…"

পাঞ্জাবির আস্তিন গুটিয়ে উঠে দাঁড়াল সেই ছেলেটা।

"আচ্ছা আচ্ছা ফেরাচ্ছি কথা। উঃ! কে বলে আমরা স্বাধীন হয়েছি। নিজের বাড়ীতে তো দূরের কথা, রাস্তায়-ঘাটে পর্যন্ত হক কথাটা বলার জো নেই।"

"আচ্ছা এবার সুরু করো মামীর কথা।"

"সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছিলাম, দিলি কৈ বলতে! আজ সকালে বেরুবার সময় দেখি গিন্নী একখানা বাহারে শান্তিপুরী পরেছে, চুলও আঁচড়ে বেঁধেছে। মাথাটা চুলকোতে চুলকোতে বললাম, 'ভাঙা মন্দিরে যেন আলপনা আঁকা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।' গিন্নী কি উত্তর দিলে জানিস? বললে, 'মন্দিরে যদ্দিন দেবতা থাকেন তদ্দিন আলপনা আঁকলে ক্ষতি আছে কি কিছু? মন্দিরে চিড় ধরলেই বুঝি আলপনা আঁকা বন্ধ করতে হয়?' শুনে আমি তাজ্জব বনে গেলাম, কি জবাব দেবো ভেবে পেলাম না চট করে।"

"ভেবে পেলে না বলেই বুঝি সিল্কের জামাটা চড়িয়েছ এই শীতের মধ্যে।"

"দূর গাধা এটা সিল্কের কোথায়? বুড়ো বয়সে আমার মুখে কালি মাখাচ্ছিস।"

"ঠিক বলেছ মামা, এটা সিল্কের নয় গরদের বটে। তা মামা তুমি চুপ করে চলে এলে মামীর কথা শুনে? আসল কথাটাই কিন্তু বল নি। মামী কেন সেজেছিল?"

"আরে সেই কথাতেই তো এত বিপদ। আমি বললাম, 'গিন্নী, কি ব্যাপার বল তো?' অমনি গিন্নীর মুখখানা ভার হয়ে এল, বললে, তোমার সবটাতেই ইয়ার্কি।' তারপর ঝট করে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল যেন…"

"যেন সেই তেরো বছরের মেয়েটি?"

"রক্ষে কর ভগবান, সেই চোখ নিয়ে ঝাড়া তিন মাস ভুগেছিলাম, লজ্জায় কাউকে মুখ দেখাতে পারি নি। তারপর শোন্। হঠাৎ মনে পড়ে গেল ক'দিন হ'ল জামাই এসেছে বটে। তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে ওর আঁচলটা টেনে ধরে বললাম, 'হাগো, আমি কি দেখতে খুবই খারাপ? চেয়ে দেখ তো একবার ভাল করে।' সেকথা শুনে তো বলছি ভাই গিন্নী যেন দপ্‌দপে পুড়তে লাগল সারা শরীর বেয়ে। কিন্তু ও করলে কি জানিস? কোত্থেকে একটা খুন্তি নিয়ে এসে কানের নাকের উপর ঘুরিয়ে বললে, 'বুড়ো মিন্সের তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, এখনও কত ঢং! জিভের আর বাঁধন নেই।' আমি খপ্‌ করে গিন্নীর একটা হাত ধরে ফেলে বললাম 'জিভের বাঁধন থাকবে কোত্থেকে? ঠোঁট বন্ধ করার সুযোগ পেয়েছ কোনদিন?'

গিন্নী আর এক হাতে খুন্তি উঁচিয়ে বললে, 'এ সব কি হচ্ছে! ছেলেমেয়েরা বড় হয়নি নাকি?' আমি তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিলাম। অবিশ্যি ছেলেমেয়েদের ভয়ে নয় খুন্তিটার চেহারা দেখেই। পাথার বাঁটের চেয়ে ঢের শক্ত সেটা। কিন্তু কি অদ্ভুত দেখাচ্ছিল গিন্নীকে তখন। ঠিক যেন…"

"ঠিক যেন কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছে পড়শীর সঙ্গে ঝগড়া করতে।"

"ওঃ আর একটা ফার্ষ্ট ক্লাস উপমা হত্যা করলি তুই। তোকে আমি শূলে চড়াব রে হতভাগা ষ্টুপিড। বল মামা তারপর কি হ'ল?"

"গিন্নী তো হাত ছাড়িয়ে নিলে, কিন্তু চলে গেল না। দরজার কাছে গিয়ে আবার ফিরে এল। দু'হাত কোমরে রেখে একখানা

রোক্ষম ভ্রূকুটি হানলে। তাই দেখে আমার বুকটা এমন ভাবে লাফাতে লাগল যে মনে হ'ল পাঞ্জাব মেলটা যেন এইমাত্র ঠিক আমার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল হু হু করে। ওদিকে গিন্নীর চুল থেকে ভুরভুর করে গন্ধ আসছে, শান্তিপুরীর আঁচল বাতাসে উড়ছে, আবার খুন্তির মাথাটাও উঁকি মারছে পেছন থেকে। অনেকটা সেই পঁচিশ বছর আগেকার রোমান্টিক ট্র্যাজেডির মত। তারপর—"

"তারপর? তারপর?" উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল শ্রোতারা।

"তারপর বউ আস্তে আস্তে বললে, 'তোমার মনে নেই আজকে আমাদের বিয়ের তিথি?'"

"হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে, ময়ূরের মত নাচে রে।"

কি হ'ল? তাকিয়ে দেখি সেই ঢ্যাঙা ছেলেটা বসে বসেই গান সুরু করে দিয়েছে আর বাকি সবাই তাল দিচ্ছে মাথা নেড়ে আর পা ঠুকে ঠুকে। তারপর সে হঠাৎ ভদ্রলোকের গলাটা জড়িয়ে ধরল। বলল, "ওঃ তাই বলি মামা আজ এত খোশ মেজাজে কেন। হ্যাঁ মামা, তুমি কি বললে?"

"কৈ আর বললাম। একটা জুৎসই জবাব খুঁজছিলাম এমন সময় ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজল আর আমি দৌড়ে বাইরে চলে এলাম।"

একটু চুপ করলেন ভদ্রলোক। কৌটো থেকে একটা পান বের করে মুখে দিলেন। সেই অবসরে একজন প্রশ্ন করল, "যাক, এবার জামাইয়ের গল্প বল। কি রকম বুঝছ বাবাজীকে?"

"জামাই? সে ব্যাটার কথা কি আর বলব। ভগবানের পশুশালায় যত রকম বিচিত্র জীব আছে তার লিষ্ট আমার জামাইকে ছাড়া পুরো হবে না। একেবারে মেনি বেড়ালটি—রাতদিন ফিটফাট থাকবে, সেন্ট পাউডার মাখবে, কোঁচানো ফরাসডাঙা পরবে। চেহারাটা কিন্তু মেনি বেড়ালের ধারকাছ দিয়েও যায় না। লম্বায় ছ' ফুট, চওড়াও সেই অনুপাতে, রং উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ, রাত্তিরে হঠাৎ দেখলে আঁৎকে উঠতে হয়। এদিকে

সে হঠাৎ ভদ্রলোকের গলাটা জড়িয়ে ধরল। বলল, "ও তাই বলি মামা আজ এত খোশ মেজাজে কেন, হ্যাঁ মামা, তুমি কি বললে?"

আবার দাড়ি গোঁফ সব চাঁছাছোলা। নামটা কি জানেন? কিশোরীপ্রিয়। কিশোরীপ্রিয় মিত্তির। বড়বাবুটা আবার ঠিক মেয়েদের মত। আমাকে দেখলেই কেমন যেন জড়সড় হয়ে পড়ে, আমতা আমতা করে তাড়াতাড়ি খসে পড়ে অন্যদিকে। অথচ শুনেছি আমার গিন্নীর সঙ্গে নাকি বেশ কথাটথা বলে। আর মেয়ের সঙ্গে—সেটা অবিশ্যি রাতদিনই চলে সমান তালে।"

আমি নিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ্য করতে থাকি ছেলেবুড়োর মিলিত কাণ্ডকারখানা। গোড়ার দিকে সমস্তটাই একটু যেন গেঁয়ো মনে হয়েছিল, কিন্তু কখন যে মনের সবটুকু বিরূপ ভাব ঝেড়ে ফেলে নিজের অজ্ঞাতেই আমি সে দলের একজন হয়ে গিয়েছিলাম টের পাই নি।

হঠাৎ আমার বাঁ হাতে একটা মৃদু স্পর্শে চমকে উঠলাম। পকেটমার নাকি? পাশের দিকে তাকিয়ে দেখি একটা বিরাটদেহী লোক আমার একেবারে কাছে এসে বসেছে। মুখে বিহ্বল ভাব, চোখে ভয়চকিত দৃষ্টি।

"আপনার কাছে টাইম টেবিল আছে?" চাপা গলায় সে জিজ্ঞাসা করল। সে কণ্ঠস্বর শুনে আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম। কিন্তু নিজেকে সংযত করে সংক্ষেপে জবাব দিলাম, "না।" একটু সরেও বসলাম।

"তা হলে? কি উপায় এখন? কার কাছেই বা পাই?" অনেকটা যেন আপন মনেই বলল সে।

কাছাকাছি আর লোক নেই। আমরা বসেছি একেবারে পিছনের দিকে। আমাদের আগের দু'সারি বেঞ্চি একেবারে খালি।

হঠাৎ সে যেন অন্ধকারে আলো দেখতে পেল। উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, এ লাইনের ষ্টেশন আর ট্রেনের সময় সম্বন্ধে আপনি খোঁজ-খবর রাখেন নিশ্চয়ই?"

"আজ্ঞে না। জীবনে এই প্রথম এদিকে যাচ্ছি। নামব সেই শেষ মাথায়", মাথা নেড়ে জবাব দিলাম আমি। শুনে লোকটি একেবারে মুষড়ে পড়ল। মুখ শুকনো করে বসে রইল গালে হাত দিয়ে।

কি ব্যাপার? ভুল ট্রেনে উঠেছে নাকি? জিজ্ঞাসা করলাম।

অতি কষ্টে একটু হাসি টেনে এনে সে জবাব দিল, "না মশাই না, ঠিক গাড়িতেই উঠেছি কিন্তু···" কথাটা আর শেষ করল না।

আমি সহানুভূতির স্বরে বললাম, "আগে যাঁরা বসে রয়েছেন তাঁদের কাছে থাকতে পারে টাইম টেবিল। ওদিকে গিয়ে খোঁজ করতে পারেন।"

"না, সে পথ বন্ধ। সে ক্ষমতা আমার নেই।" মাথা নাড়তে নাড়তে সে বলল।

আমার কেমন যেন ব্যাপারটা ভাল লাগল না। ভুল ট্রেনে উঠে নিতান্ত টাইম টেবিল চাই—অথচ উঠে গিয়ে আর কারুর কাছে খোঁজও করবে না। ট্রেনে ষ্টীমারে অনেক রকম ঠগ জুয়াচোর গুণ্ডার কথা শোনা ছিল। লোকটার চেহারাও সন্দেহজনক। কাছাকাছি কেউ নেই, কি জানি লোকটা কি ফাঁদে ফেলে। নাঃ এখান থেকে সরে পড়াই নিরাপদ দেখছি। এই ঠিক করে মুখে বললাম, "আচ্ছা তা হলে আমিই যাচ্ছি ওঁদের কাছে, দেখি পাই কি না টাইম টেবিল।"

"না না আপনি যাবেন না, প্লীজ", চাপা গলায় অস্বাভাবিক ভাবে বলে উঠল সে। আমার একটা হাতও চেপে ধরল। "আমি ভীষণ বিপদে পড়েছি, আপনি যাবেন না—একটু বসুন দয়া করে। সব খুলে বলছি।"

আমার সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়ে সির সির করে একটা হিম-স্রোত বয়ে গেল। কিন্তু উপায় নেই, হাতটা শক্ত করে ধরে রয়েছে সে।

"আমারি নাম কিশোরীপ্রিয় মিত্র। ও ভদ্রলোক আমারই শ্বশুরমশাই।"

বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না।

একটু থেমে কিশোরীপ্রিয় বললেন, "আপনি বোধ হয় সবই শুনেছেন। কি অবস্থায় যে আমি পড়েছি সেটা আর বুঝিয়ে বলতে হবে না আশা করি। টাইম টেবিল খুঁজছিলাম এই জন্যেই যে, যদি মাঝের কোন ষ্টেশনে নেমে পড়ে পরের ট্রেনে শ্বশুরবাড়ী পৌঁছতে পারি। কিন্তু তা তো হবার নয় দেখছি। উনি গল্পে মশগুল না থাকলে যে-কোন মুহূর্তে আমাকে দেখে ফেলতে পারেন। এখন না দেখলেও নামার সময় দেখে ফেলবেনই, আর তা হলেই কেলেঙ্কারির একশেষ। আপনি একটা উপায় বাতলে দিন দাদা।" কিশোরীপ্রিয় এমনভাবে আমার দিকে চেয়ে কথাগুলো বললেন যে মনে হ'ল উপায়টা আমার হাতের মুঠোয় রয়েছে।

ধাক্কাটা সামলাতে বেশ কিছুক্ষণ গেল। তারপর বললাম, "সে তো পরের কথা মশাই। কিন্তু একই কামরায় আপনারা দু'জনে চলেছেন অথচ কেউ কাউকে দেখতে পান নি? অদ্ভুত মানুষ তো আপনারা।"

"সত্যিই অদ্ভুত। তবে আমি এসে বসেছি গাড়ী প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই, আর ওঁরা খুব সম্ভব এসেছেন গাড়ী ছাড়ার একটু আগে। তখন মাঝখানে ভিড়ও ছিল। তা ছাড়া সীটগুলো দেখেছেন তো কি রকম বিদঘুটে—হঠাৎ কাউকে নজরে পড়ে না। তার উপর আমরা দু'জনেই দু'জনের দিকে পেছন ফিরে বসেছি বলেও হয়ত কেউ কাউকে দেখতে পাই নি। অবিশ্যি গাড়ী ছাড়ার কিছুক্ষণ পরেই টের পেয়েছিলাম সব, কিন্তু ব্যাপার তখন অনেক-দূর গড়িয়েছে। সেই থেকে অনেক ভেবেছি, কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না—কি করা যায়। আপনি আমায় একটুখানি সাহায্য করুন দয়া করে।"

সাহায্য করব আমি? আকস্মিক ঘটনাসংযোগে যে নাটক ক্রমশঃ জমে উঠছে, এবং আর কিছুক্ষণের ভিতরেই যা একেবারে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছবে—কয়েক জনের কাছে সেটা মর্মান্তিক সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার কাছে স্রেফ হাস্যরস ছাড়া আর কিছু নয়। আমার দুঃখ শুধু এইটুকু যে এর পরের ঘটনাগুলো আমি আর দেখতে পাব না, জানতেও পারব না।

ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসি ফুটে উঠেছিল হয়ত।
কিশোরীপ্রিয় করুণ স্বরে বললেন, "হাসছেন দাদা!"

ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসি ফুটে উঠেছিল হয়ত। কিশোরী-প্রিয় করুণ স্বরে বললেন, "হাসছেন দাদা! আপনার কাছে হয়ত এটা হাসির ব্যাপার, কিন্তু আমার যে প্রাণ নিয়ে টানাটানি। একটু ভেবে দেখুন দেখা হয়ে গেলে কি অবস্থা হবে দু'পক্ষেরই।"

"হাঃ হাঃ হাঃ।"

কিশোরীপ্রিয়র শ্বশুর অট্টহাস্য করছেন। আর সকলেও যোগ দিয়েছে তাতে। কিশোরীপ্রিয় চমকে উঠে মাথা নীচু করে নিলেন।

"…যা বলিছিস ভাই। ওইটকু হলেই আমি যথেষ্ট মনে করব। আর উপার্জনের দিক দিয়ে কত দূর যাবে সন্দেহ। তবে ছোঁড়াটা ডাক্তার, যদি কিছু করে খেতে পারে ভবিষ্যতে।" ভদ্রলোকের গলা শোনা গেল।

"কেন ভবিষ্যতে কেন? এখন কেমন?"

"এখন শুধু বা'জানের হোটেল। মেয়ে বলে বাবাজী কাজের মধ্যে দিনরাত এখানে সেখানে আড্ডা মারে, তাস পেটে, ইয়ার বক্সীদের সঙ্গে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়, শিকারে যায় আর যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে খালি ধূমপান করে। আর হতভাগার ধূমপানেরও বলিহারি! হুঁকো সিগারেট পাইপ চুরুট চণ্ডু কো'নটাতে আপত্তি নেই। না পেলে বিড়ি বিড়িই সই। রামোঃ, মনে করতেও গা ঘিনঘিন করে।"

"তা হলে তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয় নি বড় একটা?" এক জন জিজ্ঞাসা করলে।

"কৈ আর হ'ল? হতভাগা পান খায় না শুনেই তো আমার মেজাজটা প্রথম থেকে বিগড়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া ওর মেয়েলি স্বভাবের কথা তো আগেই বলেছি—আমাকে দেখলেই পালিয়ে যায়। তাতেও কিছু এসে যেত না, আমি সব ঠিক করে নিতাম। কিন্তু আবার গিন্নী পালি পেছন থেকে চোখ রাঙায়, আমি যেন তার জামাইয়ের সঙ্গে বেশী কথা না বলি। বলছিলাম না আমরা এ'নও স্বাধীন হই নি। আর গিন্নীর সেই চোখ রাঙানিকে পরোয়া না করার কথা কল্পনাও করা যায় না। শুধু কি গিন্নীই! মেয়েটা পর্যন্ত হাতে পায়ে ধরে। শ্রীমানের সঙ্গে আমি যেন বেশী ইয়ে না করি। তা হলে নাকি বেটির আর মান-সম্মান থাকবে না শ্বশুরবাড়ীতে। শোন কথা শোন। নিজের জামাইয়ের সঙ্গে পর্যন্ত খুশীমত কথা বলতে পারব না এমনিই আমাদের স্বাধীনতা।"

কিশোরীপ্রিয়র সঙ্গে চোখাচোখি হ'ল। একটু হেসে বললেন, "শুনলেন? আমার চেহারা বা ধূমপান সম্বন্ধে উনি যা বলেছেন আমি তা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিচ্ছি, শুধু একটা বিষয় আপনাকে না জানিয়ে পারছি না। সেটা আমি এইমাত্র বুঝতে পেরেছি এতদিন পরে। আমার বিয়ে হয়েছে মাসচারেক হ'ল। বিয়ের পর এই প্রথম শ্বশুরবাড়ী আসা। এসেছি পাঁচ-ছ'দিন কিন্তু শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে পাঁচ-ছ' মিনিটের বেশী কথা হয় নি কোনদিন। একে তো উনি বেরিয়ে পড়েন সকাল আটটায় আর ফেরেন রাত ন'টায়, তার উপর যতবার ওঁর গম্ভীর মুখ আর বিরাট গোঁফজোড়ার কথা মনে হয়েছে ততবারই আলাপ জমাবার ইচ্ছে দূরে চলে গেছে, মনে হয়েছে—ভীষণ রাশভারি লোক উনি আর সত্যি সত্যিই দু' একটা কুশল-সম্ভাষণ ছাড়া আর কিছু উনি বলেন নি কখনও, আমিও তাতে মনে মনে স্বস্তি অনুভব করেছি। অথচ আসলে ব্যাপারটা যে কি তা এই এত দিন পরে বুঝতে পারলাম। মন্দ নয়! স্ত্রী আর মেয়েতে মিলে ওঁর মুখ আটকে রেখেছে আর সেই কপট গাম্ভীর্য দেখে এক দিকে আমি ওঁকে গম্ভীর প্রকৃতির ভেবে দূরে সরে রয়েছি, অন্য দিকে উনি ভাবছেন আমার স্বভাবটা মেয়েদের মত। এদিকে দুনিয়ার লোকে আমার কাছ ঘেঁষতে চায় না বেশী কথা বলি বলে। আচ্ছা, শ্বশুরমশাই এদিকে চাইছেন না তো?"

আমি দেখে বললাম, "নাঃ। আপাততঃ তার সম্ভাবনাও নেই।"

পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করতে করতে কিশোরীপ্রিয় বললেন, "কিছু মনে করবেন না স্যর, শ্বশুরের পেছনে বসে সিগ্রেট টানছি বলে। সত্যি বলতে কি, আপনাকে সব বলে ফেলে আমি যেন অনেকখানি ধাতস্থ হচ্ছি। চিন্তের ভাবনায় একটু আগে পর্যন্ত সিগ্রেটের কথা একদম ভুলে ছিলাম। অথচ পনেরো মিনিট পর পর সিগ্রেট না খেলে আমার হার্টফেল করে মারা যাবার অবস্থা হয়।

জামাইটিও তা হলে নেহাত কম যান না! গোল্ড ফ্লেকের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে দু'জনেই কান দিলাম ওদিকে।

কিশোরীপ্রিয়র শ্বশুর বলে চলেছিলেন, "ওদেশে থাকতে থাকতে ছোঁড়া বিলকুল ওদেশী হয়ে গেছে। যেমনি চেহারায় তেমনি ব্যবহারে। গিন্নী বলে—এখানে এসে অবধি বাবাজী রাতদিন চুপচাপ মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে আর সিগারেট ফোঁকে একটার পর একটা।"

কিশোরীপ্রিয়র দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, "কোথায় থাকেন আপনি?"

"তা এমন কোন মেসোপটেমিয়ায় নয়। ছেলেবেলায় ভূগোলে ফেল না করে থাকলে নামটা হয়ত শুনে থাকতে পারেন। জায়গাটা হচ্ছে ফতেগড়, কানপুর ছাড়িয়ে। বহুদিন পরে বাংলা মুলুকে এসেছি, রেলের টাইমের খবর না জেনে বেরিয়ে কি বিপদেই পড়েছি মশাই!"

"কলকাতায় গিয়েছিলেন কি উদ্দেশ্যে? শহর দেখতে নাকি?" একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলাম।

"না, অতটা আনাড়ী নই। বলে এসেছিলাম বটে কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, কিন্তু উদ্দেশ্যটা ছিল আরও একটু গভীর। রমার, মানে আমার স্ত্রীর জন্যে কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস আর কিছু বই কিনতে এসেছিলাম, কেনাকাটা শেষ করে মনে হ'ল ধূমপানের সরঞ্জাম কিছু নিয়ে গেলে মন্দ হয় না। কিন্তু পয়সা বেশী ছিল না তাই অতি অল্প…"

বলতে বলতে কিশোরীপ্রিয় পাশের একটা বস্তাপ্রমাণ নূতন কিট ব্যাগ খুললেন। প্রথমে বেরুল কয়েকখানা ধুতি সাড়ি ইত্যাদি। তার নীচে দুটো বড় বড় প্যাকেট, বুঝলাম তাতে তার স্ত্রীর জন্য টুকিটাকি জিনিষ আর বই। তারও তলায় সযত্নে রক্ষিত নানা আকারের অগুণতি কৌটো, টিন, বাক্স এবং প্যাকেট। দেখে চক্ষু জুড়িয়ে গেল। লোকটা গুণী বটে।

নাইন নাইন্টি-নাইনের একটা টিন আমার হাতে গুঁজে দিয়ে

কিশোরীপ্রিয় বললেন, "এটি হ'ল শুধু আপনার জন্তে। না না, আপনি আপত্তি করবেন না, আপনি আমার দুঃসময়ের বন্ধু, আপনি ছাড়া আর কে আছে এ বিপদে।"

টিনটার দিকে আড়চোখে চাইতে চাইতে হেসে বললাম, "আচ্ছা তা নয় হ'ল কিন্তু এখন কি করা যায় সে সম্বন্ধে কিছু ভেবেছেন কি? আর বোধ হয় বেশীক্ষণ নেই আপনার ষ্টেশন আসতে।"

"এ্যাঁ, তাই তো। তা হলে?"

"আচ্ছা মাঝখানের কোন ষ্টেশনে নেমে গেলে কেমন হয়?"

"সেকথা যে আমিও ভেবেছিলাম তা তো বলেছি আপনাকে। কিন্তু এদিককার রাস্তাঘাট বা ট্রেনের সময় সম্বন্ধে আমি একেবারে অজ্ঞ, যদি আজ পৌঁছতে না পারি তা হলেও বিপদ কম নয়। শ্বশুরমশাই বুঝেছেন আমার স্বভাবটা একেবারে মেয়েলি। আজ না পৌঁছলে বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়ে যাওয়া বা থানায় খবর চলে যাওয়া একটুও অস্বাভাবিক নয়।"

আমি খানিকক্ষণ ভেবে বললাম, "তা হলে একটা কাজ করা যাক। বাথরুমটা পাশেই আছে। আপনি বাথরুমে ঢুকে পড়ুন আর আমি···"

উৎসাহে প্রায় লাফিয়ে উঠে কিশোরীপ্রিয় বললেন, "ঠিক। তাই করি।"

কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁর উৎসাহ নিভে গেল। বিমর্ষভাবে বললেন, "কিন্তু সেখানেও যে সেই প্রশ্ন থেকে যায়। পরের ষ্টেশন কত দূরে কে জানে। রাত্তিরে না ফিরতে পারলে তো হুলস্থুল কাণ্ড। তা ছাড়া রমা এখনও ছেলেমানুষ, বেচারী কি ভাবে কাটাবে রাত্তিরটা ভেবে দেখুন। আর জিনিষগুলো কষ্ট করে বয়ে নিয়ে এসেছি শুধু ওরই জন্তে, ওকে অবাক করে দেব বলে আগে থাকতে কিছু জানাই নি। মনে মনে কত প্ল্যান করেছি সেই মুহূর্তটির জন্তে; কিন্তু সে সব তো কিছুই হবে না, মাঝখান থেকে বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াব এই মোট মাথায় করে?" করুণ চোখে কিশোরীপ্রিয় তাকালেন আমার দিকে।

এতক্ষণে সমস্যাটার গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করলাম। কিন্তু বিষয়টা যে অতি জটিল! ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। বললাম, "আচ্ছা আপনার ব্যাগের ভেতর একটা শাল দেখেছিলুম না?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—একটা আছে বটে। বেরুবার সময় রমা আমাকে জোর করে গছিয়ে দিয়েছিল। আপনাদের এখানকার শীত মশাই আমার কাছে নস্যি। তবুও ঘাড়ে বয়ে এনেছি, ওর কথাটা ফেলতে পারলাম না। যত সব···"

বাধা দিয়ে বললাম, "কখনও স্ত্রীর কথার অবাধ্য হতে নেই। ঐ শালখানাই এখন আপনাকে রক্ষা করবে। আপনি শাল মুড়ি দিয়ে বেঞ্চিতে জড়সড় হয়ে পড়ে থাকুন, লোকে ভাববে আপনি ঘুমুচ্ছেন। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে আমি বলব, আপনি আমার ছোট ভাই, জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে রয়েছেন। আপনাদের ষ্টেশন তো খুব ছোট নয়—অন্ততঃ মিনিট চার-পাঁচেক ট্রেনটা থামবেই। আপনার শ্বশুরমশাই নেমে গেলে আমি দেখতে থাকব জানালা দিয়ে। দু'তিন মিনিটের মধ্যে উনি প্ল্যাটফর্মের, অন্ততঃ দৃষ্টির বাইরে চলে যাবেন নিশ্চয়ই। উনি চলে গেলেই আমি আপনাকে ইশারা করব। আপনি তখন নিশ্চিন্ত মনে নেমে পড়বেন। আর ধরুন যদি এমনই হয় যে উনি নেমে পড়েও ঠিক এই কামরার সামনেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগলেন তবে আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে। তা হলে গাড়ী একটু চলতে আরম্ভ করে দু'দশ পা এগোলে রানিং ট্রেন থেকেই লাফিয়ে নেমে পড়তে হবে আপনাকে। পারবেন না?···"

"খুব। তা ছাড়া প্ল্যাটফর্মে একটু গড়িয়ে পড়লেও এই বিরাট বপুখানার বিশেষ ক্ষতি হবে না।"

"বেশ। আর যদি গাড়ীটা বেশী এগিয়ে যায় তবে নিশ্চিন্ত মনে এলার্ম চেন ধরে ঝুলে পড়বেন। এ গাড়ীটার এলার্ম বন্ধ রাখে নি দেখা যাচ্ছে। যদি কিছু জিজ্ঞেস-টিগ্যেস করে, বলবেন নামতে গিয়ে গাড়ীর ভেতর আছাড় খেয়ে এতক্ষণ অজ্ঞানের মত পড়ে রয়েছিলেন। আর যদি কেউ আসবার আগেই কেটে পড়তে পারেন তবে তো আরও ভাল।"

কিশোরীপ্রিয় এতক্ষণ হাঁ করে আমার কথা শুনছিলেন। এবার বলে উঠলেন, "ধন্য ধন্য। এত সহজে সবকিছুর সমাধান করে দিলেন আর আমি বোকা তখন থেকে ভেবে ভেবে মরছি। আচ্ছা আপনি কোথায় কাজ করেন বলুন তো? আই.বি.তে?"

কিশোরীপ্রিয় শুয়ে পড়লেন। আমি তাঁর সর্বাঙ্গ ঢেকে দিলাম শালখান দিয়ে। হঠাৎ কিশোরীপ্রিয় বলে উঠলেন, "কিন্তু আরও একটা মুশকিল আছে যে।"

"কি?"

"শ্বশুরমশাইকে চিনতে আপনার বাকি নেই নিশ্চয়ই। যদি উনি নামার সময় নিজেই কিছু জিজ্ঞেস করে বসেন আপনাকে?"

"তা হলে সেই কথাই বলব, ভায়ের জ্বর হয়েছে।"

"উহুঁ।" উনি আবার বাড়ীতে হোমিওপ্যাথি করেন। যদি জ্বরের কথা শুনে ব্যস্ত হয়ে নাড়ী-টাড়ী দেখতে এগিয়ে আসেন?"

ভেবে বললাম, "আচ্ছা তা হলে না হয় বলব এমনিই ঘুমিয়েছেন।"

"কিন্তু এমনিই ঘুমুলে নাক কান ঢেকে ঘুমুনো একটু অস্বাভাবিক নয় কি? বিশেষ করে এইটুকু বেঞ্চিতে?"

কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। কিন্তু একটু চিন্তা করতেই আলো দেখতে পেলাম। বলে উঠলাম, "ঠিক, আপনি আমার বউ হবেন। আপনার আর শোবার-টোবার দরকার নেই, এক কোণে শাল মুড়ি দিয়ে বসে থাকুন মুখে ঘোমটা টেনে, ব্যস।"

অভিভূতের মত আমার দিকে চেয়ে কিশোরীপ্রিয় বললেন, "সত্যি আপনি একটা জিনিয়াস। আপনার পায়ের ধুলো মাথায় নিতে ইচ্ছে হচ্ছে। এত সহজে আপনার মাথা খোলে, আশ্চর্য।"

বলতে বলতে নিজের রিষ্টওয়াচের দিকে চেয়ে চমকে উঠলেন, আর মাত্র পাঁচ মিনিট।

কিশোরীপ্রিয়কে নিখুঁতভাবে অবগুণ্ঠিত করে দিয়ে ভাবতে লাগলাম পরবর্তী প্ল্যান সম্বন্ধে। আচ্ছা কতক্ষণ লাগবে ওঁর শ্বশুরের চলে যেতে? এক মিনিট? দু' মিনিট?

চমক ভাঙল তাঁরই হাসিতে। ওদিক দিয়ে না নেমে ভদ্রলোক দেখি এদিক দিয়ে—আমাদের ঠিক পাশের দরজা দিয়েই নামবার উপক্রম করছেন। একটু ভয় ভয় হতে লাগল আমার। উদাস ভাবে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে চেষ্টা করলাম।

একটু পরেই আমার কানের কাছে শুনতে পেলাম তাঁর গলা, "আরে এটা আবার কি! চালের বস্তা? না গুড়ের কলসী?"

ভদ্রলোকের হাসির সঙ্গে যোগ দিল আরও কয়েকটা পূর্ব-পরিচিত কণ্ঠ। আমি অন্য দিকেই মুখ ফিরিয়ে রইলাম, যেন কিছুই কানে আসে নি।

"মহাশয় কি নিদ্রা যাচ্ছেন? কিন্তু আপনার চক্ষুদ্বয় তো খোলাই রয়েছে দেখছি। বলুন না মশাই, ওটাতে কি পদার্থ আছে।" এবার কথার সঙ্গে আমার কাঁধে ভদ্রলোকের করস্পর্শ অনুভব করলাম।

ফিরে তাকালাম। ভ্রূ কুঁচকে বললাম, "কি রকম ভদ্রলোক মশাই আপনি? গায়ে হাত দিচ্ছেন কেন?"

"চটে গেলেন ভায়া? এ লাইনে নতুন যাচ্ছেন বুঝি? নইলে···"

"নতুন হই, পুরনো হই তাতে আপনার কি? ভদ্রলোকের সঙ্গে যে ভদ্র ব্যবহার করতে হয় তা কি এখনও শিখাতে হবে আপনাকে?" একটু গরম হয়ে জবাব দিলাম।

"ঘাট হয়েছে মশাই। অ-সাধারণ কিছু দেখলেই লোকের কৌতূহল হয়। এই তো দেখুন না বস্তাটা এত গরমের মাঝেও কেমন অবিচলিত রয়েছে। এটা কি একটা অ-সাধারণ বস্তা নয়?"

"এখনও বলছি আপনি ভদ্রভাবে কথা বলুন। জানেন উনি আমার স্ত্রী?"

ভদ্রলোক একেবারে হকচকিয়ে গেলেন। আমতা আমতা করে বললেন, "তাই নাকি, তাই নাকি। ইয়ে আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। উনি ও রকম ভাবে ঢাকা দিয়ে বসে রয়েছেন বলেই—

"বসে রয়েছেন তো বেশ করেছেন। তাতে আপনার কি হয়েছে মশাই?" এবারে আর একটু গলা চড়ালাম।

"আমার? কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে। আপনার স্ত্রী বুঝি দশ নম্বর এলবার্ট পায়ে দেন? হাঃ হাঃ হাঃ।"

আমি স্তম্ভিত। কিশোরীপ্রিয়র বিরাট জুতোজোড়া ঠিক নীচেই পড়ে রয়েছে।

"তা ছাড়া আপনার ইস্ত্রি দেখছি সব দিক দিয়েই আপনার চতুর্গুণ। এ কোন্ দেশী ইস্ত্রি মশায়? দিশী না বিলিতী? ওরে, ব্যাপারটা তো খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না। দেখতে হচ্ছে তো ভাল করে।"

এবার ভদ্রলোক কিশোরীপ্রিয়র সামনে যেতে চেষ্টা করলেন। আমি দাঁড়িয়ে উঠে বাধা দিয়ে বললাম, "খবরদার। এক পা এগোবেন কি পুলিস ডাকব। অচেনা স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিতে যাচ্ছেন এত বড় ইতর আপনি। এর পর কোন কিছু হলে আপনি দায়ী থাকবেন—আমার স্ত্রী···"

আবার হকচকিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। কিন্তু একটু পরেই মুচকি হেসে বললেন, "আমি বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস করছি না, খুবই সম্ভব সেটা। সত্যিই কোন মুলতানী বা অষ্ট্রেলিয়ান ভগবতীকে কৌশলে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে, না এর ভেতরে কোন বহু-আকাঙ্ক্ষিত মহাপ্রভু বিরাজ করছেন সেটা দেখাই আমার উদ্দেশ্য—পরস্ত্রীর প্রতি আমার লোভ নেই বিন্দুমাত্র। ওরে, তোরা ধরে রাখ তো এ লোকটাকে।

গাড়ীর গতি প্রায় থেমে এল। আমি মরীয়া হয়ে বললাম, "খবরদার। আমি এখখুনি পুলিস ডাকছি।"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "থাক, থাক—আর কষ্ট করতে হবে না। আমরাই ডাকছি।"

তারপর কিশোরীপ্রিয়র কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "কৈ গো সখি, এত কাছে এলাম তবুও অভিমান গেল না! একবার অবগুণ্ঠন উন্মোচন কর বধূ, ক্ষণিকের তরে তোমার চন্দ্রবদন দর্শনে তৃপ্ত হই। কি? কিছু বলছ না যে? শুনতে পাচ্ছ না? না শুনবে না? তা হলে তো আমাকেই এগোতে হয় দেখছি।"

মুহূর্তমাত্র অবসর। তার পরেই এক হ্যাঁচকা টানে গোটা শালখানা উঠে গেল কিশোরীপ্রিয়র শরীর থেকে

আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে একবার তিনি তাকালেন চারিদিকে, মুহূর্তমাত্র অবসর। তার পরেই এক হ্যাঁচকা টানে গোটা শালখানা উঠে গেল কিশোরীপ্রিয়র শরীর থেকে।

পঞ্জাবের বিবাহ ও লোকগীত

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বিবাহের রীতি-নীতি বিভিন্ন হলেও অনেকক্ষেত্রে স্ত্রী-আচারগুলিতে সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়। বিবাহ-উৎসবে সমস্ত জাতির মধ্যেই খুব জাঁকজমক, গানবাজনা ও ভোজের ধুম বিশেষ আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহে উত্তর হিন্দুস্থানের অন্যত্র যেরকম, পঞ্জাবেও সেরকম গানের খুব প্রচলন আছে।

পঞ্জাবী নারীরা বিয়ের উৎসবে রাতের পর রাত গান-বাজনায় মশগুল হয়ে থাকে। ঘরে শতরঞ্চি বিছিয়ে মেয়েরা গোল হয়ে বসে। গাঢ় রঙের সাটিনের শালোয়ার পাজামা ও সূক্ষ্ম রেশমী ওড়নায় সুসজ্জিতা নারীদের নৌরোজার হাট বসে যায়। একজন বর্ষিয়সী নারী ঢোল বাজাতে থাকে, অন্য কোন একটি নারী দু'হাতে দুটা পাথর নিয়ে সেই ঢোলের গায়ে ঠক্ ঠক্ আওয়াজ করে বাজিয়ে ঢোলের সঙ্গে তাল রাখে ও গায়িকারা সমস্বরে গান গাইতে সুরু করে। বলা বাহুল্য, উত্তর হিন্দুস্থান, মধ্যভারত ও পঞ্জাব ইত্যাদি প্রদেশের নারীরা ঢোলক বাজাতে বিশেষ পারদর্শিনী।

প্রায় সব দেশেই বিয়ের পূর্ব্বে বর ও কনেকে তাদের পিত্রালয়ে আশীর্ব্বাদ করা হয়। হিন্দুস্থানীদের আশীর্ব্বাদকে সাগাই ও পঞ্জাবী আশীর্ব্বাদকে মংনী বলে। বিবাহের কথাবার্ত্তা লোক মারফত বা চিঠিপত্রে স্থির হয়। সাবেকী প্রথামত বরপক্ষের লোক কনেকে দেখতে যায় না, আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের মতামতের উপর নির্ভর করে বিবাহ স্থির করে। আমাদের দেশের মত এদেরও রাশিচক্রসহ জাত-পত্রিকা মিলিয়ে বিবাহ স্থির হয়। রাশিচক্র মিললে বিবাহ সম্বন্ধ পাকা হয় ও কনের বাড়ী থেকে ২৫৲ বা ৩১৲ বা ১০১৲ টাকা, নারকেল, চন্দন ও জাফরান একটা থালাতে রেখে বরের বাড়ীতে কনের দাদা, মামা বা দূরসম্পর্কের আত্মীয় পৌঁছে দেয়। এদেশে পণপ্রথার অত্যাচার নেই। বরপক্ষ কন্যাপক্ষের নিকট কিছুই দাবী দাওয়া করে না, কিন্তু কন্যাপক্ষ নিজের মানমর্য্যাদা বজায় রাখবার জন্য কন্যাকে যথাযোগ্য শাড়ী কাপড়, অলঙ্কার, বাসনপত্র, আসবাব যথেষ্ট দিয়ে থাকে। আত্মীয়স্বজন পাড়াপ্রতিবেশী বন্ধুবান্ধবের নিকট নিজের "ইজ্জৎ" রাখবার জন্য বেশ খরচ করে এবং পণপ্রথার জোর জবরদস্তি না থাকায় দুই পক্ষের সম্বন্ধই তিক্ত সম্বন্ধ না হয়ে মধুর সম্বন্ধে পরিণত হয়। উত্তর প্রদেশের মত এদের বিবাহে দীর্ঘকালব্যাপী আনন্দ উৎসব হয় না। বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকদিনের ভিতরেই বিবাহ উৎসব ও স্ত্রী-আচার ইত্যাদি শেষ করে দেয়। অন্যান্য দেশের মত এদের তেল-হলুদ লাগাবার নিয়ম নেই, কিন্তু বিয়ের আগের দিন বর ও কনের হাতে-পায়ে মেন্দী লাগানো হয়। সাতটি কুমারী কন্যা প্রথমে বরের বা কনের হাতে ও পায়ে মেন্দী লাগাবে, পরে একে একে অন্য সধবারা মেন্দী লাগিয়ে দেয়। মেন্দী লাগানো শেষ হলে বর বা কনে হাত উল্টিয়ে পেছনের দেয়ালে হাতের ছাপ মারবে। যেখানে দেয়ালে মেন্দীর ছাপ দেওয়া হয় সেই দেয়ালের কাছে দেবী বসে। পাঁচটা ছোট ছোট মাটির ঘটে কোনটাতে আটা, কোনটাতে গুড়, কোনটাতে মিঠাই ইত্যাদি সাজিয়ে রাখে। বর বিয়ে করে বাড়ী ফিরে কনেকে নিয়ে প্রথমে ঐখানেই বসে এবং তখন বর-কনেকে যে যার উপহার দেয়। বর আত্মীয়স্বজন ও কনের উপহারসামগ্রীসহ শ্বশুরবাড়ীর উদ্দেশে যে শোভাযাত্রা করে তাকে এদেশে "বরাত" বলে। এদেশে বর ঘোড়ায় চড়ে বিয়ে করতে যায়, শ্বশুরবাড়ী বিদেশে হলে ষ্টেশন পর্য্যন্ত ঘোড়ায় চড়ে যায় খুব ধুমধামে। দু'তিন রকমের বাজনা বাজতে থাকে ও রকমারি আতসবাজী জ্বলে, ঘোড়াকে খুব সুন্দর করে কাঁচের মালা, পুঁতির মালা ও ফুলের হারে সাজিয়ে আনে।

বরাত যাবে, বর রেশমী লংকোট আর রেশমী চুড়িদার পাজামা পরবে, মাথায় বাঁধবে রেশমী পাগড়ী আর কোমরে রেশমী চাদরে তলোয়ার, অভাবপক্ষে বড় ছুরি বাঁধবে। পঞ্জাবী বরের পোষাক খুব চটকদার হয়, অনেকটা দেশী রাজাদের পোষাকের মত। পঞ্জাবীরা বিয়ের মুকুটকে "সেহঁরা" বলে। নকল মোতির সাতটি লহর একসঙ্গে গাঁথা থাকে, বর বিয়ের পোষাকে সজ্জিত হলে কপালে এ নকল মোতির সেহঁরা বেঁধে দেয়। কপাল থেকে সাতটি মোতির লহরী মুখের উপর ঝুলে থাকে ও তাতে সবটা মুখ ঢেকে যায়। বিয়ের সময় বরের কপালে মোতির সেহঁরার উপর সুগন্ধি ফুলের সেহঁরা বেঁধে দেয়, বুক অবধি সেই ফুলের লহরগুলি ঝুলতে থাকে। বরাত যাবার আগে বর বিয়ের পোষাকে সুসজ্জিত হয়ে ঘরে একখানা বড় পিঁড়িতে বসে। মা প্রথমে এসে ছেলের কপালে চন্দন দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে, যা দিবার দিয়ে দেয়। তারপর একে একে বাবা, কাকা, দাদা, মামা, মামী, কাকী ইত্যাদি পরিবারস্থ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা শুধু এই বেলা উপহার দিয়ে থাকে। এই সময় সাধারণতঃ সবাই টাকা দেয়। যে যার সামর্থ্য ও পদমর্য্যাদানুযায়ী ২৫৲

টাকা থেকে সুরু করে ৫০১৲ টাকা পর্য্যন্ত দিয়ে থাকে। বরের আশীর্ব্বাদী পালা শেষ হলে ফুলের হারে সজ্জিত ঘোড়ার পিঠে বর চড়ে বসে ও পরিবারের অন্য অন্য আত্মীয় কুটুম্ব এবং নিমন্ত্রিত দুচার জন পুরুষ ও পরিবারের নারীরা দলে দলে চলে শোভাযাত্রা করে। ব্যাণ্ড বাজতে থাকে তুমুল ভাবে। এই শোভাযাত্রা একটা কুলগাছের কাছে গিয়ে থামে। বর কোমরের তলোয়ার বা ছুরি বের করে সবুজ পাতাভরা একটা ডাল কেটে ফেলে দেয়, তখন মা সবার হাতেই একটা পাত্র থেকে গুঁড়া চিনি অল্প অল্প বেঁটে দেয়। বরকে নিয়ে বরের বাপ, কাকা, দাদা, মামা যারা সঙ্গে যেতে চায় সবাই চলে ষ্টেশনের উদ্দেশে, বর শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করবে ওখান থেকেই। মা অন্য নারীদের সহিত নিজ বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই শোভাযাত্রার সময় সেকেলে নারীরা সুসজ্জিত ঘোড়ার বিষয়ে গান করে, গানের নাম হ'ল "ঘোড়ী" :

"বীরা, তেরি ঘোড়ী, সারে দরওয়াজে খাড়ী,
তেরে বাপ হাজারীনে মোল লী।
তেরি মাতা রাণী, ওয়ারে মোতিয়োঁদি লরী
মোতিওঁদি লরি, হীরেঁাসে জড়ি॥
বীরা তেরি ঘোড়ী, সারে দরওয়াজে খাড়ী,
তেরে চাচে হাজারীনে মোল লী
তেরি চাচী রাণী, ওয়ারে মোতিয়োঁদি লরী
মোতিওঁদি লরি, হীরেঁাসে জড়ি॥"

"বোন, বীরা, মানে ভাইকে বলছে, ভাই তোর জন্য ঘোড়া দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, তোর রাজা বাপ হাজার টাকা দিয়ে ঘোড়া কিনেছে, তোর মা রাণী, হীরা মোতি জড়ানো হার দিয়ে ঘোড়াকে আরতি করছে। ভাই, তোর ঘোড়া দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, তোর কাকা হাজার টাকা দিয়ে ঘোড়া কিনেছে, তোর কাকী রাণী, হীরা মোতি জড়ানো হার দিয়ে ঘোড়ার আরতি করছে।"

এভাবে দাদা, দিদি, মামা, মামী সবার নাম নিয়ে নিয়ে গান গায়। ঘোড়ায় চড়ে বরাত যাবার সময় আর একটা গান গায়, তার নামও "ঘোড়ী"

"ঘোল ঘোল, মরাজা ওয়ে
ঘোল ঘোল, সেহরেঁয়া ওয়ালয়া ওয়ে।
দো তুরীয়াঁ, এক ঢোল মরাজা ওয়ে,
দো তুরীয়াঁ এক ঢোল সেহরঁয়াওয়ালা ওয়ে।
তুরীয়াঁ জানজ সোহাই, মরাজা ওয়ে
তুরীয়াঁ জানজ সোহাই, সেহঁরয়াওয়ালা ওয়ে।
কেড়য়োঁ দেশোঁ আয়া, মরাজা ওয়ে
কেড়য়োঁ দেশোঁ আয়া, সেহরঁয়াওয়ালা ওয়ে
বুনয়োঁ দেশোঁ আয়া, মরাজা ওয়ে
বুনয়োঁ দেশোঁ আয়া, সেহরঁয়াওয়ালা ওয়ে
বুনেদীকে নিশানি, মরাজা ওয়ে
বুনেদীকে নিশানি, সেহরঁয়াওয়ালা ওয়ে
কঙ্গী সুর্ম্মাদানী, মরাজা ওয়ে
কঙ্গী সুর্ম্মাদানী সেহরঁয়াওয়ালা ওয়ে।"

"বরকে আরতি কর, মুকুটওয়ালাকে আরতি কর। দুই তুরী আর এক ঢোল ও মুকুটওয়ালা বর বরাতের শোভা বাড়িয়ে তুলছে। ও বর, ও মুকুটওয়ালা, আমরা কোন দেশে এলাম? ও মুকুটওয়ালা বর, আমরা পাহাড়ের নীচে সমতল-ভূমিতে এসে গেছি। ও বর, এদেশের চিহ্ন হ'ল চিরুণী আর সুর্ম্মাদানী।"

বর শোভাযাত্রা করে শ্বশুরবাড়ী চলে গেল। বরের বাড়ীর উৎসব অর্দ্ধস্থগিত হয়ে রইল। বরের সঙ্গে কনের জন্য মূল্যবান সাটিনের শালোয়ার কামিজ ও ওড়না এবং সোনার গয়না দেওয়া হ'ল। পঞ্জাবী বিয়েতে হিন্দুস্থানী বিয়ের মত মণ্ডপ বাঁধবার কোন উৎসব হয় না। উঠানের মাঝখানে মাটী দিয়ে বেশ উঁচু বেদী বাঁধানো হয়। সেই বেদীকে বরকনে সপ্ত প্রদক্ষিণ করে। পঞ্জাবী বিয়েতে শুভকাজে নাপ্তেনীর কোন দরকার করে না। পুরোহিতের নির্দ্দেশমত শুভমুহূর্ত্তে সাত পাক হয়। বিয়ের আসরের একপাশে হোমের আগুন জ্বলতে থাকে, অগ্নি সাক্ষী করে বিয়ে হয়। বরের চাদরে ও কনের ওড়নাতে গাঁটছড়া বাঁধা হয়। আগে বর পেছনে কনে এভাবে চারবার ঘুরবার পর কনে সামনে এসে যায়, বর পেছনে থাকে এভাবে তিন বার ঘুরলে সাতপাকের পালা শেষ হয়। সপ্তপ্রদক্ষিণের পর কন্যার পিতা বরের হাতে কন্যা সম্প্রদান করে ও বরকে সোনার আংটি বা ঘড়ি ও রেশমী বস্ত্র দক্ষিণাস্বরূপ দান করে।

কনের বাড়ীর বিবাহ উৎসব সমাপ্ত হয়, এবার পুত্র ও পুত্রবধূসহ পিতা নিজ বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করে। কনের বাড়ী থেকে বরের বাড়ীর জন্য তত্ত্ব যাবে। পুরুষদের জন্য যাবে রেশমী লংকোট, ইজার ও পাগড়ীর রেশমী বস্ত্র এবং পরিবারস্থ মহিলাদের জন্য যাবে শালোয়ার পাঞ্জাবী ওড়না সব মিলিয়ে পুরা পোষাকের সাটিনের কাপড়। কন্যাপক্ষ যারা একান্ত গরীব তারা সকলের জন্য পোষাক দিতে না পারলেও বরের মামা ও কাকার জন্য পুরা পোষাকের রেশমী কাপড় দিবেই। এই সঙ্গে প্রচুর মিঠাইও দেওয়া হয়। কনের বাড়ীতে বিয়ের সময় যে গান গাওয়া হয় তার নাম "সোহাগ", সংস্কৃত "সৌভাগ্য"। রূপার আংটি, কড়ি, পুঁতি ইত্যাদি একটা কালো সুতোয় গাঁথা থাকে। বর শোভা-যাত্রা করে যাবার পূর্ব্বে বরের হাতে ঐ আংটি কড়িসহ

কালো সুতো বেঁধে দেওয়া হয় এবং কনের জন্যও আর একগাছা নিয়ে যাওয়া হয়। বিয়ের দিন কনের হাতে ঐ কালো সুতো বেঁধে দেয়। বিয়ের দিন কনের হাতে হাতীর দাঁতের লাল রং করা চুড়ি, প্রায় অধিকাংশ কনেরই কনুইর নীচ থেকে সুরু করে মণিবন্ধ অবধি পরানো হয়। কনেকে "বোটি" বলা হয়।

কনের বাড়ীতে কনে যে দেয়ালে তার হাতের মেন্দী-ছাপ দিয়েছিল, সেখানে কনেকে একখানা পিঁড়িতে বসিয়ে রাখা হয়। সামনে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে, তাতে অনবরত তেল ঢালতে থাকে যাতে প্রদীপ না নিভে। কনে বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত সারাদিন ওখানেই থাকবে প্রদীপের দিকে মুখ করে। প্রদীপের দিকে সারাক্ষণ চেয়ে থাকলে নাকি পতির আদরিণী হওয়া যায়।

বরকে পঞ্জাবীরা "মরাজা" বলে। খুব সম্ভব সংস্কৃত "মর্য্য" শব্দেরই অপভ্রংশ মরাজা। মরাজাকে বিশেষ আড়ম্বর করে বাজনা বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে কনের বাড়ীতে নিয়ে আসে। মরাজার সমস্ত মুখ ফুলের পর্দ্দায় ঢাকা থাকে, বরের ঘোড়ারও অর্দ্ধেক শরীর ফুলে ফুলময় থাকে। বরকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে এনে কনে যে ঘরে সারাদিন বসে আছে, সে ঘরের দরজায় দাঁড় করায়। কনেকে কনের ভাই বা ভাইবৌ উঠিয়ে ধীরে ধীরে নিয়ে আসে বরের সামনে। বর সুদৃশ্য সুগন্ধি ফুলের মালা কনের গলায় পরিয়ে দেয় ও কনেও আর একটি সুদৃশ্য পুষ্পহার পরিয়ে দেয় বরের গলায়। এ সময় কনের মস্তক অবগুণ্ঠনশূন্য থাকে, কাজেই অনেক বরকনে এ সময়ই দৃষ্টি বিনিময় করে নেয়:

"লিম্বা পোচি মাড়ী তে পলঙ্ক বিছয়া
উত্তে চড় সুত্তা বেটিদা, বাবল, কে
নীঁদ কেঁই আয়ি হীঁ।
বাবল, তুদ কই নীঁদ পিয়ারী
সলই বেটি বর মংদী।
হুস্ত চড়েঁয়া, তেরা দাদাকে ঢুণ্ডে নগরু নগর
সবনা নগরোমে জলন্ধর নগর মেরে মন বশয়া।
বেটি, হুস্ত চড়েঁয়া তেরা বাবল
ঢুয়ে কুরম কুরম।
সবনা কুরমা বিচো ওমপ্রকাশ মেরে মন বশয়া।
হুস্ত চড়েঁয়া মেরা বীরা, ঔর
ঢুণ্ডে কাঁহান কাঁহানী
সবনা কাঁনা বিচো চান্দ মেরে মন বশয়া।"

"ঘর লেপে পুঁছে পরিষ্কার করে পালঙ্ক বিছানো হয়েছে, মেয়ের বাপ শুয়ে আছে। মেয়ে বলছে বাবা তোমার চোখে কি করে ঘুম আসছে? নিদ্রা তোমার এতই পিয়ারী যে তুমি মেয়ের বিয়ের কথাও ভুলে গেছ?

পিতা জবাব দিচ্ছে, বেটি ঘোড়ায় চড়ে তোর ঠাকুরদা নগর খুঁজে বেড়াচ্ছে। সব নগরের মধ্যে তাঁর জলন্ধর নগরই পছন্দ হয়েছে। বেটি তোর বাবা ঘোড়ায় চড়ে বেহাই খুঁজে বেড়াচ্ছে, সব বেহাইর মধ্যে ওমপ্রকাশ বেহাই সবচেয়ে পছন্দ হয়েছে। ঘোড়ায় চড়ে তোর ভাই বর খুঁজে বেড়াচ্ছে, সব বরের মধ্যে বর চাঁদই আমাদের মনের মত হয়েছে।"

বর বিবাহান্তে কনেসহ নিজ বাড়ীতে পৌঁছলে, যে দেয়ালে বরের হাতের মেন্দী ছাপ থাকে সেখানে নিয়ে প্রথমে বরকনেকে বসানো হয়। তখন নানাপ্রকার স্ত্রী-আচার ও হাসি-তামাসা হয়। কনের হাতের কড়িগাঁথা সেই কালো সুতো বর খুলবে ও কনে বরের হাতের কালো সুতো খুলবে। যাতে বরকনে অনায়াসে সুতো খুলতে না পারে সেজন্য দু'পক্ষের নারীদল বিশেষ চেষ্টা করে। একটা হাঁড়িতে দুধের মধ্যে বর ও কনের আংটি ফেলে দেওয়া হয়, বরকনের মধ্যে যে আগে আংটি বের করে তুলতে পারবে তারই জিৎ। কনের সামনে পাশাপাশি সাতখানা থালা রাখা হয়, কনে একে একে সাতটা থালা ধীরে ধীরে একের পর এক সাজিয়ে রাখবে, একটুও আওয়াজ হবে না, যদি আওয়াজ হয় তবে বুঝতে হবে যে কনের স্বভাব একটু ঝগড়াটে হবে। এভাবে নারীদের বহু আমোদ-প্রমোদের পর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের ভোজ হয়, ও যারা বরকনেকে আশীর্ব্বাদ করে উপহার দিতে চায় এই সময় দেয়। রাত্রে "সোহাগ রাত" হয়। বিয়ের উৎসব শেষ হলে, বিশেষ কোন অঘটন না ঘটলে কনে এক বৎসর শ্বশুরগৃহে কোন কাজ করে না।

বিবাহ উৎসব দেখে ও বিবাহ-পদ্ধতির বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে বেশ কয়েকটি পরিবারেই দেখতে পেলাম বর্ত্তমান যুগের বিবাহ উৎসবে সেকেলের রীতিনীতি, স্ত্রী-আচার ইত্যাদিতে অনেক শৈথিল্য এসে গেছে। বিয়েতে সেকেলে গান প্রায় উঠেই যাচ্ছে এবং তার পরিবর্ত্তে আধুনিক ব্যঙ্গগান ও সিনেমা থিয়েটারের প্রেমের গান গাওয়া হয়। সেকেলে গানগুলির বিশেষত্ব এই যে প্রাচীনকালের লোকদের রচিত গানগুলির ভিতর দিয়ে নিজ নিজ সমাজের রীতিনীতি, ভাবধারণা, মনের আনন্দ, দুঃখ অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠে।

কনের বাড়ীতে আধুনিকাদের একটি আধুনিক গানের নমুনা দিলাম:

"হাগী সাম ম্যয় ফ্যাসনাবেল, জট পল্লে পেগয়া
হায় নি মে কি করো, ও মেরা ভোগা রহা গয়া।

জট সু মে আখিয়া, পার্স লেকে দে
হায় নি মে কি করো, থইলা লেকে আগয়া।
জটসু মে আখিয়া, মোটর ল্যায়া দে
হায় নি মে কি করো, ঠেলা লেকে আগয়া।

ইত্যাদি—

"আমি ফ্যাসনাবেল মেয়ে ছিলাম, আর আমার বিয়ে হ'ল কিনা এক হাবারামের সঙ্গে। হায় আমি কি করি, আমার অদৃষ্টে এক হাবাই জুটল। হাবুকে একদিন বললাম, আমার জন্য মানিব্যাগ নিয়ে এস, কিন্তু কি আর বলব, ও নিয়ে এল একটা থলে। অপদার্থ বেকুপকে বললাম আমার জন্য একটা মোটর নিয়ে এস, ও নিয়ে এল মাল নেবার একটা ঠেলা গাড়ী। হায় আমি কি করি, আমি—ফ্যাসনাবেল মেয়ের অদৃষ্টে এই ছিল।"

এই গানটা থেকে বুঝতে পারা যায়, আজকালকার ফ্যাসনাবেল মেয়ে মনের মত পতি না পেলে সন্তুষ্ট হয় না, অপদার্থ স্বামীদের নিয়ে কিভাবে অপদস্থ হতে হয়, আধুনিকা গায়িকারা এই গান রচনা করে তাই বোঝাতে চেয়েছে। কনের বাড়ীতে বিয়ের আসরে সুসজ্জিতা, সালঙ্কৃতা আধুনিকা তরুণীরা এই গান গেয়ে বরকে জব্দ করে।

বিষব্যবসায়ী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

জীবিতকে দ্রুত মৃত করিবার গবেষণা চলিয়াছে
সাফল্যে তার বহু গৌরব আছে।
আণবিক বোমা, উদ্‌যান বোমা, নিতি—
প্রলয় এবং ধ্বংসের আনে ভীতি,
শোভনা ধরণী ঝলসিয়া যাবে
মুহূর্ত্তে তার আঁচে।

২

সর্ব্বধ্বংসী অশুভসংশী এই যে আবিষ্কার
প্রতিভা এবং মনীষার ব্যভিচার।
এই উদ্যম, শক্তির অপচয়—
জাতি ও সমাজ কুতূহলী হয়ে সয়।
মারণাস্ত্রের বীভৎস লীলা
লাগায় চমৎকার।

৩

একটি মৃতকে পারো কি করিতে পুনর্জীবন দান?
কই আগ্রহ, কই অনুসন্ধান?
জীবন এত কি তুচ্ছ এবং হেয়।
মরণ হলো কি এতই শ্রেয় ও প্রেয়।
ধরণীকে মৃত গ্রহ করিবার
চালাইছ অভিযান?

৪

মহামরণের পরিধি বাড়ায়ে কৃতিত্ব কিছু নাই,
মরণ হইতে জীবন আনাই চাই।
সঞ্জীবনী সে শক্তির অধিকারী,
হতে যে পারিবে জয়মালা জেনো তারি,
জানাইয়া দাও কিসে অমৃতের—
সন্ধান মোরা পাই।

৫

বিষব্যবসায়ী, গরল বণিক, ওকি তব উদ্যোগ!
আনিবে প্রলয় রাত্রির দুর্য্যোগ?
অপশক্তির কেন করি অর্চ্চন
বিষাক্ত করি তুলিতেছ দেহ মন?
ডাকিছ মৃত্যু মন্বন্তর
অনন্ত দুর্ভোগ।

৬

অমৃতপুত্র, অমৃতান্বেষী, অমৃতপিয়াসী নর,
মারণমন্ত্র জপে কেন তৎপর?
লক্ষ নরের বধে কেন উল্লাস?
কোটি কোটি জীব কি হেতু করিবে নাশ?
হওনা একটি মৃত পিপীলিকা
বাঁচাতে অগ্রসর।

৭

শবভূমে যাবে অকীর্ত্তিকর জয়স্তম্ভ গাড়ি'
মানবক তব আকাঙ্ক্ষা বলিহারি!
সৃষ্টিনাশক নহেন দেবতাগণ,
ব্যর্থ হবে এ অশুভ আন্দোলন,
চির-বিষহারী ভুবনেশ্বর—
এ ভুবন জেনো তাঁরি।

৮

নূতন জগৎ তোমরা গড়িবে? মুখে শান্তির কথা
বাড়িছে বুকের উদ্দাম বিষলতা।
জাতিকে জাতিকে বাঁধিবে নিবিড় করি,
মৈত্রীতে নয়—দিয়ে বিষ-বল্লরী
কুৎসিততর করিবে ধরাকে
তোমাদের কুটিলতা।

শিশুনিকেতনের শিশুদের নৃত্য

শিক্ষাব্রতী মায়ালতা সোম

শ্রীনীলিমা দত্ত

শিক্ষালাভের সার্থকতা তখনই অনুভূত হয় যখন মানবপ্রাণ থেকে স্বতঃ উৎসারিত এক আনন্দরসধারা প্রবাহিত হয় এবং অন্যকে সেই আনন্দরস পান করাবার জন্য মানুষের চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠে—মানুষ তখন জ্ঞানলাভ ও জ্ঞানবিতরণকে তার জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করে এবং অসাধারণ ধৈর্য্য, উৎসাহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে সেই ব্রত পালন করবার জন্য অগ্রসর হয়। যুগে যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরকম শিক্ষাব্রতীর আবির্ভাব হয়েছে, যাঁরা জীবন পণ করেও রেখে গেছেন পৃথিবীর বুকে এক অবিনশ্বর কীর্ত্তি, এক সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা, জাতির ইতিহাসে এক মহাকল্যাণের আশীর্ব্বাদ। এমনি একটি শিক্ষাব্রতীর জীবনের বিষয় আজ আলোচনা করব।

শ্রীহট্টনিবাসী জয়গোবিন্দ সোম মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন মায়ালতা সোম। উত্তর কলিকাতায় নিজ বাটী ১নং বলদেও পাড়া রোডে ১৮৯৫ সনের ৯ই মার্চ্চ মায়ালতার জন্ম হয়। পিতা জয়গোবিন্দ সোম মহাশয় খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাঁরা গোড়ার দিকে বি-এ পাস করেন তিনি তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি একই বৎসরে বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। বিপিনচন্দ্র পাল, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু প্রমুখ মনীষীদের তিনি সমসাময়িক ছিলেন এবং জাতীয় উন্নতিমূলক বিভিন্ন কার্য্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের সার সত্য ও হিন্দুধর্ম্মের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শবাদের উপর ভিত্তি করে তিনি একটি ভারতীয় খ্রীষ্টীয় সমাজ গঠন করবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁরই সাহায্যে ও নিজের চেষ্টায় তিনি 'ইণ্ডিয়ান খ্রীষ্টান হেরাল্ড' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে নিজে তা সম্পাদনা করেন। মাতা মনোমোহিনী অতি নিষ্ঠাবতী ও পরম স্নেহশীলা নারী ছিলেন।

মায়ালতা পিতা ও মাতার বিশেষ সদ্‌গুণসমূহের যে প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী ছিলেন তার দৃষ্টান্ত তাঁর পরবর্ত্তী জীবনে পাই। তিনি ছিলেন অবস্থাপন্ন ঘরের কনিষ্ঠা সন্তান, সুতরাং স্বভাবতঃই ছিলেন সকলের অত্যন্ত আদরের পাত্রী। ইচ্ছা

করলেই তিনি জীবনে নিরুপদ্রব আরামের পথ বেছে নিতে পারতেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে ছিল সমাজকল্যাণের এক দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা যা বারে বারে তাঁকে সহজ আরাম এবং স্বচ্ছন্দ ভোগবিলাসের কোল থেকে বাইরে টেনে এনেছে জনকল্যাণের কণ্টকময় পথে। ছোটবেলা থেকেই নিজেকে পরের কাজে নিযুক্ত করবার আগ্রহ তাঁর মধ্যে দেখা যেতে লাগল। স্নেহময়ী ধর্ম্মনিষ্ঠ মাতার সুপরিচালনায় তিনি নিজের জীবনের ভিত্তিটিকে সুগঠিত করে নেবার সৌভাগ্য

মায়ালতা সোম

লাভ করেছিলেন। তাঁর বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয় ক্রাইষ্ট চার্চ্চ স্কুলে। সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বেথুন কলেজে ভর্ত্তি হন ও আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় থেকেই নিজে যথোচিত শিক্ষালাভ করে শিক্ষা-বিতরণ করবার জন্য তাঁর মধ্যে একটা আগ্রহ দেখা যেতে লাগল। তখন উপযুক্ত শিক্ষিকার প্রয়োজন উপলব্ধি করে কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তির চেষ্টায় ব্রাহ্ম ট্রেনিং স্কুল নামে একটি ট্রেনিং বিভাগ ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে খোলা হয়। বর্ত্তমানে উহা ব্রাহ্ম ট্রেনিং কলেজ নামে পরিচিত।

মায়ালতা এই বিভাগে ১৯২০ সনে ট্রেনিং পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। অল্পদিনের মধ্যেই ঐ বিভাগের শিক্ষয়িত্রীর পদে তিনি নিযুক্ত হলেন। লোকান্তরিতা পূর্ণিমা বসাক সেই সময় ব্রাহ্ম ট্রেনিং বিভাগের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। মায়ালতা সহকর্ম্মিণীরূপে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। সেই সময় অনেক সধবা ও বিধবা মেয়ে ঐ বিভাগে শিক্ষয়িত্রী হবার জন্য ট্রেনিং নিতে আসতেন এবং অনেক সময় নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে তাঁদের শিক্ষাগ্রহণ করতে হ'ত। তিনি সাধ্যমত তাঁদের নানাভাবে সাহায্য করবার চেষ্টা করতেন। এই সময় হতেই তাঁর নারীহৃদয়ের সুপ্ত সমাজকল্যাণ রূপ বাইরে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। তিনি প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মহিলা-প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হলেন এবং যে সম্প্রদায়ের মধ্যে যে গুণটি বিশেষভাবে তাঁর চোখে পড়ত তা গ্রহণ করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। নিজের দেশের মেয়েদের সঙ্গে ত অন্তরঙ্গতার সহিত মেলামেশা করতেনই তা ছাড়া বিদেশী মেয়েদের সঙ্গেও তিনি প্রগাঢ় বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। অনেক সময় তাঁদের বিভিন্ন গুণাবলীর উল্লেখ করে বলতেন—তিনি তাদের সঙ্গে মিশে নিজেকে উপযুক্ত করে তোলবার কত সুযোগ পেয়েছিলেন।

ব্রাহ্ম ট্রেনিং বিভাগে কিছুকাল শিক্ষিকা থাকার পর শিশুশিক্ষা বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ করবার জন্য ১৯৩১ সনে নিজ অর্থে তিনি ইংলণ্ডে যান ও মাদাম মন্তেসরির নিকট হতে শিশুশিক্ষা বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাগ্রহণ করে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন। মাদাম মন্তেসরির নাম বাংলাদেশে আজ সুপরিচিত। তাঁর শিশুশিক্ষা-প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়। মায়ালতা ডাঃ মন্তেসরির কয়েকটি বক্তৃতা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে, বাংলাদেশের লোকেরা যাতে শিশুদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানবার সুযোগ পান তার ব্যবস্থা করে গেছেন। তাঁর পুস্তকখানির নাম 'মন্তেসরি বক্তৃতা'। বলা বাহুল্য, এখানি সুধীসমাজে বিশেষ আদৃত হয়েছে।

১৯৩২ সনে সোম মহোদয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে মন্তেসরি বিভাগের

প্রধানা শিক্ষয়িত্রীরূপে নিযুক্ত হন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রের নিকট সুপরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে ছিল অনাবিল সহজ সরল শিশুভাব, সেজন্য অল্পদিনের মধ্যে শিশুদের বড় আদরের 'মায়াদি' হয়ে উঠলেন। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে একটি শিশুবিভাগ পূর্ব্বেই খোলা হয়েছিল। মায়ালতা ঐ বিভাগটি মন্তেসরি শিক্ষাপ্রণালীর সাহায্যে সুগঠিত করে তুললেন। শিশুশিক্ষা-বিশারদ হিসাবে তাঁকে অগ্রণীদের মধ্যে একজন বলা যেতে পারে। শিশুদের

মাদাম মন্তেসরি

প্রতি একটা স্বাভাবিক ভালবাসা তাঁকে তাঁর কাজে এগিয়ে নিয়ে চলত। মন্তেসরি বিভাগটি ডাঃ মন্তেসরি-উদ্ভাবিত প্রণালীতে শিশুশিক্ষা দানের একটি আনন্দনিকেতন বলা যায়। এই বিভাগে শিশু নিজ শক্তি ও পছন্দমত কাজ করবার স্বাধীনতা পায়। শিক্ষয়িত্রী প্রত্যেকটি শিশুর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি রেখে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের আচরণ পর্য্যবেক্ষণ করে তাকে তার নিজ কাজে সাহায্য করেন ও তার স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহের বিকাশসাধনের দিকে দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। মায়ালতা ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে মন্তেসরি বিভাগটিতে কয়েক বৎসর শিক্ষিকারূপে থেকে শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। নিজ অভিজ্ঞতা ও কল্পনা দিয়ে স্বাধীনভাবে একটি শিশুবিদ্যালয় স্থাপন করবার ইচ্ছা অনেক সময়েই তাঁর মনে স্থান পেত। হয়ত উহা তাঁর পরবর্ত্তী জীবনের সফলতার একটু আভাস মাত্র ছিল।

খুব অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর ঐ প্রকার ইচ্ছাকে রূপ দেবার সুযোগ তিনি পেলেন। এই বিষয়ে মায়ালতার নিজ উক্তি থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করি ঃ "শিশু-প্রতিষ্ঠান গড়বার সঙ্কল্প আমার মনের ভেতর সুপ্ত অবস্থায় ছিল অনেকদিন থেকে। সুযোগ হ'ল ১৯৪২ সনে, যে সময় যুদ্ধের জন্য চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে যায়। জাপানীরা ভারত আক্রমণ করবে বলে সরকারের নির্দ্দেশমত সব স্কুল বন্ধ অথবা স্থানান্তরিত হয়ে যায়। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের শিশু-বিভাগ বন্ধ হয় ও উপরের শ্রেণীগুলি মধুপুরে স্থানান্তরিত হয়। আমি শিশুবিভাগের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ছিলাম। আমিও কলকাতা ছেড়ে কিছুদিন বাইরে যাই বহরমপুরে।"

সেখানে মিস্ উশার (Miss Usher) এল. এম. এস মিশন স্কুলটি তাঁকে একটি নার্শারি বিদ্যালয় করবার জন্য ছেড়ে দেন। তিনি কতকগুলি উদ্বাস্তু ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটি বিদ্যালয় খুললেন। কিন্তু পর বৎসর অনেক ছেলেমেয়ে অন্য জায়গায় চলে যাওয়াতে তাঁর নার্শারি স্কুলটি ঠিকমত চলতে পারে নি। ১৯৪৩ সনে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। এই বিষয়ে লিখেছেন ঃ

"১৯৪৩ সনে মে মাসে কলিকাতায় ফিরে এলাম। আমার ফিরে আসার খবর পেয়ে কয়েকজন বন্ধু তাঁদের ছেলে-মেয়েদের প্রায় জোর করে আমার কাছে পাঠাতে সুরু করলেন। এভাবে কয়েকমাস পড়াবার পর ঘটনাক্রমে সুনীতিবালা গুপ্তা মহাশয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি ঐ সময় বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের প্রধান পরিদর্শিকা ছিলেন। শ্রীযুক্তা গুপ্ত আমার সকল খবর নিয়ে আমাকে একটি নার্শারি স্কুল খোলবার পরামর্শ দেন। তাঁর প্রেরণায় আমি এই কাজে অগ্রসর হই।"

এই শিশু-বিদ্যালয়টি স্থাপন করবার সময় তাঁর দিন কাটত এক কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে। শিশু মনস্তত্ত্বের বিষয়গুলি গভীরভাবে চিন্তা করে, কেমন করে একটি আদর্শ শিশুনিকেতন গড়ে তোলা যায় তারই চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতেন। সে সময় তাঁর বাইরের সুযোগ ছিল কম, কিন্তু অন্তরের দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি ছিল প্রবল, সেজন্য সব রকম বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে তিনি এগিয়ে চললেন তাঁর অভীষ্ট পথে। বিদ্যালয়ের উপযুক্ত বাড়ী না পাওয়ায় অবশেষে ঘনিষ্ঠ

আত্মীয় ডাঃ জ্যোতিষচন্দ্র দত্ত তাঁর বসতবাড়ীর নিম্নতলা বিদ্যালয়ের জন্য ব্যবহার করতে দিতে প্রতিশ্রুত হন।

১লা মার্চ্চ ১৯৪৪ সনে মাত্র ৫টি শিশু নিয়ে নিজের শোবার ঘরে ডাঃ দত্তের বাড়ীতে নার্শারি স্কুল আরম্ভ করলেন। শ্রীযুক্তা গুপ্তকে সেই বিষয় জানিয়ে দিলেন।

ডাঃ দত্ত তাঁর বাড়ীর নিম্নতলা এপ্রিল মাস হতে নার্শারি বিদ্যালয়রূপে ব্যবহার করবার জন্য মায়ালতা সোমকে দেন বিনা ভাড়ায়। এক বৎসর বিদ্যালয়টি বিনা ভাড়ায় ছিল। বিদ্যালয়টি কিভাবে গড়ে উঠবার সুযোগ পেল সে বিষয় তিনি লিখেছেন :

"আমি একটি স্কুল করেছি জেনে আমার বন্ধুরা অর্থাৎ পুরানো ছাত্র-ছাত্রীর মায়েরা তাঁদের ছেলেমেয়ে ভর্ত্তি করে দিলেন। আমি শ্রীমতী নীলিমা দত্ত ট্রেণ্ড বি-এ, সন্ধ্যা গুপ্ত ট্রেণ্ড ম্যাট্রিক ও নীরা বসু ম্যাট্রিক গীতশ্রীকে ৬০, ৪০ ও ১০৲ টাকা মাহিনায় ১লা এপ্রিল থেকে নিয়োগ করলাম। স্কুলের শিশুদের ব্যবহারোপযোগী চেয়ার টেবিল ইত্যাদি ৫০ জন শিশুর মত প্রায় ১৬০০৲ টাকার জিনিষ স্কুলকে তখনকার মত দান করলাম। পরিচালনা করবার ব্যয়ভার সম্পূর্ণ আমারই ছিল। শিশুদের স্কুলে বেতনের হার ৫৲ টাকা ছিল, স্কুলের নাম রাখা হয় 'শিশুনিকেতন'।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে এপ্রিল মাসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠন করলাম। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত নলিন পাল, অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক হরিপদ মাইতি, ডাঃ জ্যোতিষচন্দ্র দত্ত, ডাঃ অমলানন্দ মল্লিক, শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ, শ্রীমতী নীলিমা দত্ত।"

যেদিন এই বিদ্যালয়টি স্থাপন করলেন তাঁর সেদিনকার আনন্দ ভোলবার নয়। সহায় নেই, সম্পদ নেই—অথচ সে কি উৎসাহ, সে কি উদ্যম! মায়ালতার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই ১৯২৭ সনে ছাত্রীরূপে, ব্রাহ্ম ট্রেণিং স্কুলে তিনি তখন শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। সেই সময় তাঁর উদার, স্নেহপ্রবণ, উৎসাহী মনের পরিচয় আমি পাই ও পরে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে সহকর্ম্মিণীরূপে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হই। এই সময় তাঁর কর্ম্মপ্রণালী ও চিন্তাধারার সঙ্গে মনের আদান-প্রদান করতাম। তাঁর মধ্যে যে একটা বিশেষ সৃজনীপ্রতিভা ও সমাজকল্যাণ-রূপ আছে তাও মনে মনে স্বীকার করেছি। তাই যখন ১৯৪৪ সনে তাঁর পরিকল্পিত শিশু-বিদ্যালয় "শিশুনিকেতন" নাম নিয়ে জনসমাজে আত্মপ্রকাশ করল তখন মন তৃপ্তিতে ভরে গেল। শিশুনিকেতনে সহকর্ম্মিণীরূপে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর বিশেষ গুণটির দিকে দৃষ্টি পড়ল—শিশুদের প্রতি দরদী সেই মন, যা শিশুচিত্তের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াত শিশু-কল্যাণ কামনায়। সব ছোট শিশুবিভাগটি ছিল তিন-চার বছরের শিশুদের নিয়ে। তারা নূতন বিদ্যালয়ে এসে হয়ত কাঁদতে
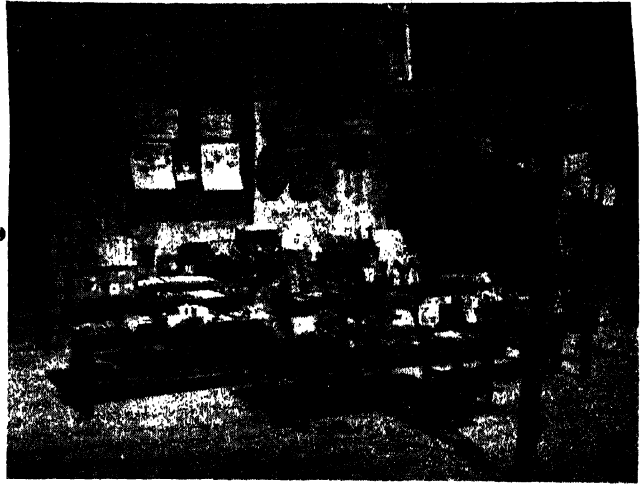
শিশুদের হাতের কাজের প্রদর্শনী

আরম্ভ করে দিত, অনেকে আবার কিছুতেই বিদ্যালয়ে থাকতে চাইত না। সেই শিশুগুলির মনোরঞ্জনের জন্য তিনি নানা উপায় অবলম্বন করতেন। কখনও হয়ত গল্প বলা, কখনও ছবির বই দেখানো, কখনও আবার তাদের লজেন্স খেতে দিয়ে তাদের সঙ্গে ভাব করে নিতেন। ভাব হয়ে গেলে তাদের কান্না বন্ধ হ'ত, তারা আনন্দ করে অন্য ছেলেমেয়েদের কাছে যেতে চাইত, পরে আস্তে আস্তে নিজের বিভাগটিতে পছন্দমত কাজ বেছে নিয়ে কাজে লেগে যেত। বিদ্যালয়টি তাদের আনন্দ-নিকেতন হয়ে উঠত।

প্রথম কয়েক বৎসর বিদ্যালয়টিকে পরিচালিত করতে মায়ালতাকে কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কিন্তু

তাঁর সদাপ্রফুল্ল মুখে কোনদিন নিরাশার রেখাপাত হতে দেখি নি অথচ তাঁকে কোনদিন আদর্শভ্রষ্ট হতে দেখি নি। স্থানাভাবের জন্য তিনি বেশী ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ে রাখবার সুবিধা করতে পারেন নি—সেজন্য আয় অপেক্ষা ব্যয়ভারই তাঁর বেশী থাকত, কিন্তু তীব্র অর্থাভাবের সময়েও দেখেছি বিদ্যালয়ের আদর্শ রক্ষা করবার জন্য তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্পের ভাবটি। ঠিক যে কয়টি ছাত্র-ছাত্রীকে ব্যক্তিগত ভাবে তত্ত্বাবধান করে সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বিদ্যালয়ে রাখা সম্ভবপর হ'ত সেই কয়টি ছাত্র-ছাত্রীই তিনি ভর্ত্তি করতেন। বেশী ছাত্র-ছাত্রী ভর্ত্তি করে হয়ত টাকার অঙ্ক তিনি বৃদ্ধি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করে টাকাকে বড় বলে কোনদিন মনে স্থান দিতে পারেন নি; তাই নীরব কর্ম্মী মায়ালতার শিশু-নিকেতনটি আজ মাত্র দশ বৎসরের মধ্যে একটি আদর্শ নার্শারি বিদ্যালয় বলে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

শিশুনিকেতনের প্রাঙ্গণে শিশুদের খেলা

আদর্শ রক্ষা করে যাওয়াই শিক্ষা-বিভাগের চূড়ান্ত সার্থকতা। শিক্ষাবিভাগ অথবা শিক্ষক-শিক্ষিকা যদি আদর্শভ্রষ্ট হন তা হলে তাঁরা অকল্যাণের পথে চালিত হন। কারণ শুধু নিজের জীবন অথবা ছাত্র-ছাত্রীর জীবন গঠনের দায়িত্বই তাঁদের নয়, সমগ্র জাতির উন্নতির মেরুদণ্ড তাঁরা। এই আদর্শবাদ মনে-প্রাণে বরণ করে নিয়েছিলেন মায়ালতা। তাঁর বিদ্যালয়—"শিশুনিকেতন"টিতে শিশুদের মনের মধ্যে সৎ হবার ইচ্ছা গানের মধ্য দিয়ে, খেলার মধ্য দিয়ে গল্পের মধ্য দিয়ে, অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তিনি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করতেন। যেমন নিম্নের গান দুটিতে পাই:

"ছোট শিশু মোরা, তোমার করুণা হৃদয়ে মাগিয়া লব,
জগতের কাজে, জগতের মাঝে আপনা ভুলিয়া রব।
ছোট তারা হাসে আকাশের গায়ে, ছোট ফুল ফুটে গাছে
ছোট বটে, তবু তোমার জগতে আমাদেরো কাজ আছে।"
—যোগীন্দ্রনাথ সরকার

"তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে, তুমিই ধন্য ধন্য হে।
আমার প্রাণ তোমারি দান, তুমিই ধন্য ধন্য হে।
পিতার বক্ষে রেখেছ মোরে, জনম দিয়েছ জননীক্রোড়ে,
বেঁধেছ সখার প্রণয়-ডোরে, তুমিই ধন্য ধন্য হে।" —রবীন্দ্রনাথ

এই গানগুলি বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করবার আগে ছাত্র-ছাত্রীরা গাইত; আজও গায়। গানের কলির ভিতর সুন্দর শব্দগুলি শিশুকে কাজে উৎসাহিত করে; মনের মধ্যে অলক্ষ্যে কাজ করে যায় ও আদর্শের প্রতি এক স্বাভাবিক মমতা শিশুকাল থেকেই শিশুচিত্তে সঞ্চারিত হতে থাকে। শিশুনিকেতনটিকে যে আদর্শে তিনি গড়ে তোলবার স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই আদর্শমত একটি 'বিদ্যালয় সঙ্গীত' শ্রীযুক্ত অমরকুমার দত্তকে দিয়ে লিখিয়ে, গীতশ্রী শ্রীমীরা বসুকে দিয়ে সুর সংযোজনা করিয়ে নিয়েছিলেন। সেই গানটি তাঁর শিশু নিকেতনের 'বিদ্যালয় সঙ্গীত' রূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

ছোট শিশুদের দল,
শিশু নিকেতনে চল;
হেসে খেলে অবিরল।
ছোট হাতে হাত ধরে
খেলা সাথে ভাব করে
চলেছি পড়ার তরে
আলোকেতে উজ্জ্বল।
চল ভাই তোরা আজ,
পরিয়া যে যার সাজ;
হাতে লয়ে নিজ কাজ।
সেথায় আপন মনে
খেলিয়া ফুলের সনে
শিখে লব জনে জনে
সব কিছু অবিকল।

বর্ত্তমানে শিশুবিদ্যালয় স্থাপন করবার জন্যে অনেকের মনে একটা উৎসাহের সাড়া পড়ে গেছে। কিন্তু স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে কেবলমাত্র অর্থোপার্জ্জনের পথ অথবা ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধিই যেন বিদ্যালয়ের কাম্য না হয়। আদর্শবাদ রক্ষার মধ্য দিয়ে যেন বিদ্যালয়গুলি বেড়ে উঠে। একথা মনে রাখতে হবে যে, আদর্শবাদী শিক্ষাব্রতীর সাধনা স্বার্থসিদ্ধিতে নয়, জনকল্যাণের আদর্শানুকূল পরিণতিতে, তার তৃপ্তি সাধনার সফলতায়। এই ভাব মায়ালতার মধ্যে দেখা গিয়েছিল সুন্দরভাবে। ১৯৫২ সনে বিদ্যালয়টির ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতিতে আনন্দপ্রকাশ করে তিনি লিখেছেন :

শিশুদের জলযোগ

"স্কুলটি এখন যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেছে ; প্রায় প্রতি মাসে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে, এমন কি কলকাতার বাইরে যেমন ডায়মণ্ডহারবার, মেদিনীপুর, হুগলী থেকে শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষার্থীরা স্কুলটি দেখতে আসেন। কখন কখন শিক্ষাবিভাগের অধিকর্ত্তা অথবা কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী প্রেরিত শিক্ষাব্রতীরা সুদূর দিল্লী, মাদ্রাজ, বোম্বাই, পাটনা ও হায়দারাবাদ হতেও স্কুলটি দেখতে এসেছেন ও খুশী হয়ে তাঁদের মন্তব্য স্কুলের খাতায় লিখেছেন।"

অত্যধিক মানসিক উত্তেজনা ও পরিশ্রমের ফলে মায়ালতা ১৯৪৭ সনে এপ্রিল মাসে হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। আত্মীয়দের বিশেষ সেবা ও চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন সত্য, কিন্তু এই সময় হতেই তাঁর অটুট স্বাস্থ্যে ভাঙ্গন ধরল। এর পর যে কয় বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন, নানাপ্রকার ব্যাধি তাঁর শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করল, কিন্তু কোনদিন তাকে তাঁর সাধনার পথ থেকে বিচলিত করতে পারে নি। যেদিন অসুস্থতার জন্য বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে পারতেন না, সেদিনও নিজের ঘরে বসে যতখানি সম্ভব বিদ্যালয়ের কাজ গুছিয়ে দিতেন লেখার সাহায্যে। তাঁর রোগযন্ত্রণাকাতর অবস্থা দেখে আমরা অনেক সময় বিচলিত হয়ে যেতাম। বলতাম—"আপনি কি করে এমন শরীরে কাজ করেন ?" তিনি বলতেন, "আমি কি করি, ভগবান তাঁর কাজ আমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন।" আমরা স্তব্ধ হয়ে যেতাম। ঈশ্বরের নিকট কি চমৎকার আত্মসমর্পণ ! নিজেকে আড়ালে রেখে সৎ কাজ করবার কি সুন্দর প্রয়াস।

শিশুনিকেতনের শিক্ষয়িত্রীদের সহিত মায়ালতা সোম
(মধ্যে উপবিষ্ট)

তাঁর মৃত্যুকালীন রোগযন্ত্রণার কষ্টকর অবস্থার মধ্যেও সেই সুন্দর শান্ত প্রফুল্ল ঈশ্বরে সমর্পিত রূপটি ফুটে উঠেছিল। এই ঈশ্বরপ্রীতির ভাবটি শিশুদের মনের মধ্যেও যাতে রেখাপাত করে সে চেষ্টা তিনি করতেন। তাঁর লিখিত 'হাতেখড়ি' নামক পুস্তিকায় "শিশুর কামনা" নামক পদ্যটির মধ্যে আমরা দেখতে পাই :

"ভাই বোন তুমি দিলে মোরে
পিতামাতা দিলে দয়া করে।
চোখ মেলে যেদিকেতে চাই
কত দয়া দেখিবারে পাই।
তাই আমি তোমায় জানাই
ভাল ছেলে হতে মোরা চাই।
ভাল কাজ নিয়ে যেন থাকি
ভোর সাঁঝে যেন তোমা ডাকি॥"

যখন তাঁকে কোন বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, দেখেছি—বাইবেল খুলে মনের অবস্থার উপযোগী অংশ পড়ে

সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করেছেন, মনে নূতন শক্তি, নির্ভরতা এনেছেন। এইপ্রকার নির্ভরতা, ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলে কোন সাধকের সাধনা সত্যরূপ ধারণ করতে পারে না। শিক্ষাব্রতীর জীবনের সাধনা আত্মঘোষণায় নয়, আত্মবিলোপের মধ্য দিয়ে।

মিসেস কেসি, মায়ালতা সোম (মধ্যে) প্রভৃতি

মায়ালতা আজীবন কুমারী অবস্থায় থেকে তাঁর আদর্শের দিকে সোৎসাহে এগিয়ে চলেছিলেন। তিনি নিজে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের মূল সত্য জীবনে পালন করবার জন্য বার বার চেষ্টা করে গেছেন। ঝি, চাকর, সহকর্ম্মিণী ও অভিভাবকদের সঙ্গে সুমিষ্ট ব্যবহার করে সকলকে আপনার করে নিতেন। সেইজন্য তিনি অনেকের কাছ থেকেই সাহায্য পেতেন। কেউ হয়ত বিদ্যালয়টির জন্যে অর্থসাহায্য করেছেন, কেউ সৎপরামর্শ দিয়েছেন, কেউ আবার ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাজের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। সহকর্ম্মিণীদের সঙ্গে কখনও মতের বিরোধ হলেও তিনি বিরুদ্ধভাব পোষণ করতেন না। প্রসন্ন মনে সকলকে ক্ষমা করতে পারতেন। সবাইকে স্নেহদৃষ্টিতে দেখে, সকলের দুঃখ দূর করবার জন্যে একটি বিশেষ প্রেরণা তাঁর মধ্যে দেখা যেত। ১৯৪৬ সনের আগষ্ট মাসের ভয়াবহ দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে অসংখ্য নরনারী দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এই সময় মায়ালতা নিজে ও তাঁর সহকর্ম্মিণী শিক্ষয়িত্রীদের নিয়ে দুর্গতদের জন্য অর্থবস্ত্রের সংস্থানে লেগে যান ও পুরানো, নূতন কাপড় সংগ্রহ করে, হাতে তৈরি কিছু খেলনা বিক্রি করে সেই টাকা শরৎ চন্দ্র বসুর রিলিফ সোসাইটিতে পাঠিয়ে দিয়ে অনাবিল আনন্দ লাভ করেন।

মায়ালতা গত ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪ তারিখে ইহধাম ত্যাগ করেন। যে আদর্শবাদের প্রদীপ তিনি আমাদের সকলের সম্মুখে, বিশেষ করে শিক্ষাজগতের সামনে জ্বেলে দিয়ে গেলেন, সেই প্রদীপ থেকে আমরা জালিয়ে নেব আমাদের প্রাণের শিখা ; মনের সমস্ত ভ্রান্ত সংস্কার দূর করে দিয়ে নিষ্কলঙ্ক শিক্ষব্রেতের উজ্জ্বল আলোকতীর্থের সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে চলব, বলব ঃ

"যে পথ এনে দেয় না জাগতিক সুখের সন্ধান, যে পথে বিছানো নেই কোমল ফুলের পাপ্‌ড়ি, যে পথে হয়ত মেলে না আত্মখ্যাতি, যে পথে আছে দুঃখ, আত্মপরীক্ষা, ধৈর্য্য, সংযম ও আত্মদান, সেই পথই হোক আমাদের চলার পথ,

প্রদেশপাল কৈলাসনাথ কাটজু, মায়ালতা ও শিক্ষয়িত্রীগণ

(শিশুনিকেতনের শিশুদের সহিত)

সেই পথ দিয়েই বয়ে নিয়ে যাব আমরা আমাদের শিক্ষা-জগতের আদর্শবাদ জাতির মহাকল্যাণের অশেষ শুভকামনার সম্ভাবনায়।"

স্বর্ণাক্ষর

শ্রীদেবাংশু সেনগুপ্ত

চতুর্থ অঙ্ক

[অঘোরনাথের বৈঠকখানা : কিন্তু পূর্ব্বেকার কোন কিছুই দেখা যায় না। সোফ', কোচ, সেক্রেটারিয়েট টেবিল, সাধারণ টেবিল, টিপয়, গদী-আঁটা চেয়ার, দামী ফুল-দানী, তাহাতে ফুল, বইয়ের আলমারী ইত্যাদিতে গৃহে তিল-ধারণের স্থান নাই। আগের জিনিসের মধ্যে সাধারণ কাঠের বেঞ্চটি মাত্র আছে। দরজায় এবং জানালায় বহুমূল্য ব্রোকেডের পর্দ্দা। দেয়ালে মহাত্মা ও নেতাজীর ফটো দুইখানা পূর্ব্ববৎই আছে, কিন্তু বাকী স্থানসমুদয় দেশী-বিলাতী অভিনেত্রীদের বাঁধানো ফটোতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেক্রেটারিয়েটের টেবিলের উপর একটি সুদৃশ্য টেবিল ল্যাম্পও রহিয়াছে। কাল—প্রায়ান্ধকার অপরাহ্ণ।

সীতার প্রবেশ। তাহারও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মুখে স্নো পাউডার, চোখে চশমা, দেহে বড় বড় ফুল আঁকা ড্রেসিং গাউন, হাতে উল বোনার সরঞ্জাম। ঘরে ঢুকিয়া সুইচ টিপিয়া প্রথমে ঘরের আলোটি জ্বালাইলেন, তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া টেবিল ল্যাম্পটিও জ্বালাইয়া বড় সোফাটিতে কিছুক্ষণ বসিলেন। কিন্তু অচিরেই অস্বস্তি প্রকাশ পাইল এবং স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া একখানা গদি-আঁটা চেয়ারে বসিয়া দুই এক ঘর বুনিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু চেয়ারের হাতলগুলি কনুইয়ে ঠেকিয়া বাধার সৃষ্টি করিতে লাগিল। অবশেষে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং ভিতর ও বাহিরের দরজা ভেজাইয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত আরামে কাঠের বেঞ্চটিতে বসিয়া পূর্ণোদ্যমে উল বুনিতে সুরু করিলেন, দেখা গেল সেটি একটি আধবোনা বড় সোয়েটার।]

সীতা। (ভিতরের দরজায় শব্দ হইতে) আঃ এদের জ্বালায় নিশ্চিন্ত মনে কোন কাজ করবার জো নেই! (বেঞ্চ হইতে ত্বরায় সোফায় বসিয়া) কে রে? কি চাই? লক্ষ্মী নাকি রে?

নেপথ্যে স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর—হ্যাঁ মা।

সীতা। কি চাস, আয়।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ। আটপৌরে বেশে মধ্যবয়স্কা ঝি। স্বভাব খুব নম্র)

লক্ষ্মী। আপনার চা এখন এনে দেব মা?

সীতা। না, না, এখন না, আগে তোর দাদাবাবু, দিদিমণি ফিরুক। আচ্ছা দিদিমণি ফিরলেই দিস। বাড়ীতে চা খাওয়া তোর দাদাবাবু তো ছেড়েই দিয়েছে। (বিরক্ত হইয়া) ছবিও বড্ড দেরী করে আজকাল! দেখ তো, আসছে দেখা যায় কি না?

লক্ষ্মী। (একবার বাহিরে গিয়া ফিরিয়া আসিল) না মা। (বাহিরের দরজা খোলা রহিল)

সীতা। আচ্ছা তুই যা। (লক্ষ্মী প্রস্থানোদ্যত) হ্যাঁরে খোকা কি করছে?

লক্ষ্মী। ভেতরের বারান্দায় খেলা করছে। (ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া ভিতরের দিকে অগ্রসর হইল)

সীতা। দেখিস, বেশী ছুটোছুটি যেন না করে, ওর শরীরটা কিন্তু এখনও ভাল হয় নি, হার্ট দুর্ব্বল। (লক্ষ্মী দরজা পার হইয়া যাইতে উচ্চৈঃস্বরে) দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস! (দরজা বন্ধ হইতে পুনরায় কাঠের বেঞ্চটার উপর গিয়া বুনিতে সুরু করিলেন।)

[বাহিরের দরজার পর্দ্দার ফাঁক দিয়া চকিতে একবার অঘোরনাথকে দেখা গেল। হাতে একটি খদ্দরের ঝোলা এবং আলগা ভাবে কম্বলে জড়ান ক্ষুদ্র একটি বিছানা। তিনি ঘরে একবার মাত্র পা দিয়াই বাহির হইয়া গেলেন]

অঘোরনাথ। (বাহির হইতে উচ্চৈঃস্বরে) বাড়ীতে কে আছেন?

সীতা। (বোনা রাখিয়া লাফাইয়া উঠিয়া) সে কি কথা! (ব্যস্ত হইয়া) ভেতরে এসো! নিজের বাড়ীতে আবার ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি কিসের! ভেতরে এস! (দরজার দিকে আগাইয়া গেলেন)

[অঘোরনাথের প্রবেশ। চেহারা ও হাবভাবে বুঝা যায় তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত এবং অসুস্থ। সীতা বিছানা ও ঝোলা তাঁহার হাত হইতে লইবার জন্য হাত বাড়াইলেন]

অঘোরনাথ। (মুখে হাসি আনিতে চেষ্টা করিয়া) ওঃ তুমি!

সীতা। (জিনিসগুলি লইয়া একপাশে নামাইয়া রাখিতে রাখিতে, লজ্জিত ভাবে) আমি না তো কে? কি যে বল! এখুনি বসে বসে তোমার জন্যে একটা সোয়েটার বুনছিলাম, এই দেখ। (বোনাটা তুলিয়া দেখাইতে গিয়া মুখোমুখি হইতে) ও মা, এ কি চেহারা হয়েছে, (উৎকণ্ঠিত হইয়া) অসুখ বিসুখ করে নি তো? চল, ভেতরে চল। জিনিসগুলি এখন থাক। (অঘোরনাথকে ভিতরে লইয়া যাইবার জন্য হাত বাড়াইলেন কিন্তু অঘোরনাথ ধীরে ধীরে একটা সোফায় উপবেশন করিয়া মাথাটা এলাইয়া দিলেন। যেন কিছু আনিতে যাইতেছেন এমন ভাবে সীতা দ্রুত ভিতরের দিকে প্রস্থানোদ্যত হইলেন।)

অঘোরনাথ। (ধড়মড় করিয়া সোজা হইয়া বসিয়া চীৎকার করিয়া) ছবি! ছবি! ছবি-ই।

সীতা। (ফিরিয়া আসিয়া) ছবি কি করবে? হাত-পা ধোও, বিছানাটা করে দি, একটু বিশ্রাম কর, কিছু মুখে দাও, ছবি ততক্ষণে এসে পড়বে। আজকে ওর একটু দেরী হচ্ছে।

অঘোরনাথ। (উঠিয়া উত্তেজনায় পায়চারি করিতে লাগিলেন)

একটু দেরী কি ? দু' ঘণ্টারও আগে শহরের সব স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। মেয়ে এখনও বাড়ী ফিরছে না, আর তুমি নিশ্চিন্ত মনে বসে উল বুনছ !

সীতা। (অঘোরনাথকে ধরিয়া বসাইয়া) বস। বলছি, শান্ত হয়ে শোন, দেখবে চিন্তার কোন কারণই নেই।

অঘোরনাথ। (কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া) বল।

সীতা। (পাশে বসিয়া) তোমার অসুখ করেছে। (কপালে হাত দিয়া) জ্বর তো বেশ অছে দেখছি।

অঘোরনাথ। অসুখ করেছে, সারছে না,সেজন্যই তো ছেড়ে দিয়েছে।

সীতা। অসুখের মধ্যে এ রকম চেঁচামেচি কর না। শহরে স্কুল কি ছাই একটাও খোলা আছে যে ছবিকে সেখানে কেউ কাজ দেবে ? ও একটা আপিসে কাজ করে, এক'শ টাকা মাইনে পায়, আবার উপরিও পায়। দেরীও করে না। দেরী হলে, সন্ধ্যে হলে, সাহেব ওকে নিজে গাড়ী করে পৌঁছে দিয়ে যায়।

অঘোরনাথ। (সন্দিগ্ধ ও ক্রুদ্ধ স্বরে) কোন্ সাহেব ?

সীতা। আমি কি ছাই সাহেবের নাম জানি, না আপিসের নাম জানি ? ঐ যে গো, সন্তোষকে যে বড়লোক করে দিয়েছে।

অঘোরনাথ। (সীতার বাধা না মানিয়া জোর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া পায়চারি করিতে করিতে মাথা চাপড়াইতে লাগিলেন) হায় ! হায় ! তবে তো আমি ভুল দেখি নি, তবে তো আমি ভুল দেখি নি, হায় ! হায় ! তবে তো আমি ভুল দেখি নি !

সীতা। (অঘোরনাথকে দুই হাতে ধরিয়া আবার সোফায় আনিয়া বসাইয়া, ভয়ার্ত স্বরে) কি হয়েছে, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না !

অঘোরনাথ। (মাথা চাপড়াইয়া) হায় ! হায় ! আমি ঠিকই দেখেছি।

সীতা। (আরও ভয় পাইয়া) কি দেখেছ ?

অঘোরনাথ। ছবিকেই দেখেছি। (উঠিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন)

সীতা। (মিনতি করিয়া) ওগো বল, কি হয়েছে ?

অঘোরনাথ। ষ্টেশন থেকে বাড়ী ফিরছি, হাঁ৷ ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ী ফিরছি। চলতে পারছি না। মিলিটারি মেসটার সামনে এসেছি দেখি ছবি।

সীতা। (পুনরায় এক রকম জড়াইয়া ধরিয়া সোফায় বসাইয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে উচ্চ স্বরে) লক্ষ্মী ! ও লক্ষ্মী ! (ভিতর হইতে সাড়া আসিল 'যাই মা') শিগ্‌গির এক ঘটি জল আর পাখা নিয়ে আয়। (অঘোরনাথকে সান্ত্বনা দিবার প্রয়াসে) তুমি ভুল দেখেছ, এ হতেই পারে না ! (আরও জোরের সহিত) কিছুতেই হতে পারে না।

অঘোরনাথ। (সীতার হাতের শুশ্রূষা এবং কথার দৃঢ়তায় শান্ত হইয়া কতক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিলেন, ইতিমধ্যে লক্ষ্মী জলের ঘটি আর পাখা লইয়া আসিয়া অঘোরনাথ ও সীতাকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অঘোরনাথ চক্ষু বুজিয়া একটু নরম স্বরে জবাব দিলেন) কিন্তু আমি নিজে দেখলাম—

সীতা। (লক্ষ্মীর ঐরূপ ভাব লক্ষ্য করিয়া) কি দাঁড়িয়ে রইলি কি, একটা তোয়ালে দিয়ে যা, তারপর আমার ঘরের বিছানাটা চাদর বদলে পেতে দে।

লক্ষ্মী। মা, চা করব ?

সীতা। হ্যাঁ, আগে বিছানাটা কর তারপর চা আর লুচি কর। (অঘোরনাথকে) দেখ, তুমি একদম কথা না বলে চুপ করে শুয়ে থাক। (লক্ষ্মীর প্রস্থান) আমি ওর মা, আমার চোখকে কি ও ফাঁকি দিতে পারবে ? তা ছাড়া ছবি তোমার মেয়ে, তোমারই আদর্শে ও মানুষ হয়েছে। ও এখুনি এসে পড়বে, দেখবে তুমি যা ভেবেছ তার কিছুই নয়। (লক্ষ্মী তোয়ালে আনিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। সীতা অঘোরনাথের মাথা ও হাত-পা মুছিয়া দিলেন। ভিতর হইতে নিজেই একখানা চিরুণী আনিয়া মাথা আঁচড়াইয়া দিয়া ধীরে ধীরে মাথায় হাওয়া দিতে লাগিলেন। অঘোরনাথ ধীরে ধীরে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইতে লাগিলেন।)

অঘোরনাথ। (বাহিরে কিসের একটু খুট্ করিয়া শব্দ হইতে চমকাইয়া উঠিয়া) কি, এসেছে ?

সীতা। না, আসবে এখুনি। বিছানা হয়েছে, ভিতরে শোবে চল। চা-লুচিও খাবে তো ? রাত্রে কি খাবে ? ডাক্তার কি বলেছে ?

অঘোরনাথ। আগে বাছাবাছি করত। এখন সব খেতে বলেছে।

সীতা। (অঘোরনাথের হাত ধরিয়া) চল, ভেতরে চল।

অঘোরনাথ। (জেদ করিয়া) ছবি আসুক।

সীতা। (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) ঐ সাহেব তোমার বন্ধু না ?

অঘোরনাথ। (সন্দেহের স্বরে) সাধুলাল আমার বন্ধু ? তাই বলেছে বুঝি ? (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) মানুষের শয়তানির আর সীমা নেই !

সীতা। সাধুলাল শয়তান ! (উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন)

অঘোরনাথ। অসিতকে যেদিন ধরে নিয়ে গেল সেদিন যে ঐ লোকটা এসেছিল তোমার মনে আছে ?

সীতা। হাঁ।

অঘোরনাথ। লোকটা সেদিন কি মতলবে এসেছিল জান ?

সীতা। কি করে জানব, তুমি কি ছাই কোন কথা আমাকে বল নাকি ?

অঘোরনাথ। প্রথম তো সন্তোষকে দিয়ে যে কাজ করাচ্ছে সেই প্রস্তাব আমাকেও দিলে, অর্থাৎ চুরির বখরার প্রস্তাব। কণ্ট্রাক্টের ছুতোয় আমার নামে টাকা চুরি করবে, অর্দ্ধেক আমার, অর্দ্ধেক তার। আর আমাকে যুদ্ধের কাজে নামাতে পারলে

আমাদের এখানকার প্রতিবোধটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। এতে যখন রাজী হলাম না তখন আর একটা কাজে আমার সাহায্য চাইল, সেটা যেমন ঘৃণ্য, তেমনি অপমানকর!

সীতা। কি সর্ব্বনাশ! তুমি কি বললে?

অঘোরনাথ। (গর্ব্বের সহিত) কি আর বলব, বললাম গেট আউট! (হাত দিয়া দরজার দিকে দেখাইয়া পরক্ষণেই নিষ্প্রভ হইয়া গেলেন) না, হাঁ, আর বলেছিলাম গর্ব্ব করে. এটা বাংলা দেশ!

সীতা। সে নিশ্চয়ই অন্য কেউ হবে। বাংলা দেশেই কি আর খারাপ লোকের অভাব আছে। ওটা না বললেও পারতে।

অঘোরনাথ। (কথা ঘুরাইয়া) আর তারক যে কি কাজ করে, চিঠিতে সব কথা লেখ, ওটা লেখ না। অথচ আমি প্রত্যেক চিঠিতে জানতে চাইছি!

সীতা। তারক এলে জানতে পারবে। আমি ওসব কথা বুঝি না। (দূরে একটা ট্রা-লা-লা-লালা স্বর শ্রুত হইল) ঐ আসছে বোধ হয়।

অঘোরনাথ। (চক্ষু মুদিয়া) ছবি তারকের সঙ্গে ফেরে না কেন?

[ট্রা-লা-লা স্বর ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া উচ্চগ্রামে শ্রুত হইতে লাগিল। অঘোরনাথের প্রশ্নের উত্তরে সীতা কি বলিলেন এই শব্দে তাহা চাপা পড়িয়া গেল। দরজা ঠেলিয়া সশব্দে তারকের প্রবেশ। তাহার পরনে সুদৃশ্য সুট। হাতে সিগারেটের টিন ও দেশলাই। ঘরটি ট্রা-লা-লা মুখরিত হইয়া উঠিল। সীতা নিঃশব্দে অঘোরনাথের প্রতি তারকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন]

তারক। (ঈষৎ ব্যঙ্গসহকারে) ও এসেছেন। (সুটের ভাঁজ না ভাঙিয়া যতটুকু নীচু হওয়া যায় হইয়া অঘোরনাথের পদধূলি লইবার ভঙ্গি করিল। সীতা অঙ্গুলিদ্বারা তারকের সিগারেটের টিনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। টিনটি আড়াল করিয়া মুখ বিকৃত করিয়া ভিতরের দিকে যাইতে যাইতে, অনুচ্চ স্বরে) ভাত দিতে পারেন না কিলোবার গোসাই, ওঃ। (অঘোরনাথ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া চোখ মেলিলেন, কিন্তু তারক ততক্ষণে ভিতরে চলিয়া গিয়াছে। অঘোরনাথ আবার চক্ষু বুজিলেন)

অঘোরনাথ। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) পরের ছেলে মানুষ করেই জীবন কাটালাম, নিজের ছেলেকে নিজের আদর্শে আনবার আর সময় পেলাম না! এখন তো মনে হচ্ছে এটা একেবারেই গোল্লায় গেছে। তবু, ডাক ওকে।

[ময়লা খাকি হাফ প্যান্ট ও কোট পরা একটি লোকের প্রবেশ]

লোকটি। কণ্ট্রাক্টারবাবু ফিরেছেন?

অঘোরনাথ। (উঠিয়া ভাল করিয়া বসিয়া তাকাইলেন) কে কণ্ট্রাক্টার?

সীতা। একটু বাইরে অপেক্ষা কর, এখুনি আসছে। (লোকটির বাহিরে প্রস্থান)

অঘোরনাথ। (এতক্ষণে সীতার বেশভূষা ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঘৃণার সহিত) তুমিও গোল্লায় গেছ। (ব্যঙ্গের স্বরে) তারক কি কাজ করে তুমি তা জান না, না? (উত্তরের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া) কি, চুপ করে রইলে যে? (সীতার হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিলেন) সীতা মাথা নত করিলেন। অঘোরনাথ দূরে সরিয়া পূর্ব্ববৎ গা এলাইয়া দিয়া চক্ষু মুদিয়া) হুঁ। চুপ করে থেকে কি আর কিছু চাপা রাখতে পারবে! এ ঘরের প্রত্যেকটি আসবাব, তারকের কোট প্যান্ট, তোমার গাউন, সবই চীৎকার করে রোজগারের কথা জানিয়ে দিচ্ছে। (আবার চোখ খুলিয়া উঠিয়া বসিয়া) চারদিকে দুর্ভিক্ষ, হাহাকার। রাস্তায় রাস্তায় নিষ্পাপ শিশুর দল এক চুমুক ভাতের ফ্যানের জন্য কেঁদে মরছে আর আমার বাড়ীতে আজ নতুন নতুন আনন্দের মহরত হচ্ছে। হে ভগবান, এ সব দেখবার আগে আমাকে অন্ধ করে দিলে না কেন, পাগল করে দিলে না কেন? (আবার এলাইয়া পড়িয়া চক্ষু বুজিলেন)

[ভিতর হইতে ড্রেসিং-গাউন-স্লিপার-পরিহিত তারকের প্রবেশ। একহাতে ফাউণ্টেন পেন ও একখানা লম্বা হিসাবের খাতা, অপর হাতে পূর্ব্ববৎ সিগারেটের টিন ও দিয়াশলাই]

তারক। (ভিতরের পর্দ্দা ফাঁক করিয়া উচ্চ স্বরে) আমার চা বাইরের ঘরে দিস লক্ষ্মী! (বাহিরের দরজা ফাঁক করিয়া অদৃশ্য কুলি ও মিস্ত্রীদের প্রতি) তোমরা একটু বোস, হিসেবটা কষে নি। আজকেই তোমাদের বাকী পাওনা সব মিটিয়ে দেব। আর সবাইকেও ডেকে নিয়ে এস। (ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিয়া সিগারেট দিয়াশলাই টেবিলে রাখিল এবং হিসাবের খাতায় মনোনিবেশ করিল। কতক্ষণ পরে অন্যমনস্ক ভাবে একটা সিগারেট মুখে দিতে গিয়া অঘোরনাথের দিকে দৃষ্টি পড়িতে আবার নামাইয়া রাখিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সীতাকে উদ্দেশ্য করিয়া একটু বিরক্তভাবে) তোমরা এখন ভিতরে যাও না মা, এখুনি সব লোকজন আসবে। (গাউনের পকেট হইতে কয়েকটি নোটের তাড়া বাহির করিয়া টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিতে লাগিল)

[অঘোরনাথ বোধ হয় একটু আচ্ছন্ন হইতেছিলেন। হঠাৎ চক্ষু মেলিয়া নোটের তাড়ার দিকে নজর পড়িতে কতক্ষণ বিস্মিত হইয়া রহিলেন। বিস্ময়ের স্থানে ক্রমশঃ ক্রোধ আসিয়া আশ্রয় লইল, কিন্তু তিনি তাহা যথাসম্ভব দমন করিয়া রাখিতেই চেষ্টা করিলেন]

তারক। (অধৈর্য্য হইয়া) মা! (হঠাৎ অঘোরনাথের নিবদ্ধ দৃষ্টি দেখিতে পাইয়া পুনরায় হিসাবে মন দিল)

অঘোরনাথ। এত টাকা কিসের?

তারক। (নির্লিপ্ততার ভান করিয়া) কণ্ট্রাক্টরীর টাকা, মানে কুলী পেমেণ্টের টাকা।

অঘোরনাথ। মিলিটারী কণ্ট্রাক্ট?

তারক। (উদ্ধত স্বরে) হ্যাঁ তাই।

অঘোরনাথ। হুঁ। আমার ছেলে হয়ে তুই মিলিটারী কণ্ট্রাক্ট করছিস তাতে আমার সম্মান বাড়ছে মনে করিস? লোকে হাসছে না? (স্বর চড়াইয়া) কার হুকুমে তুই মিলিটারী কণ্ট্রাক্ট নিয়েছিস? (তারককে ভেঙ্গাইয়া) তোমরা এখন ভিতরে যাও মা! (ক্রুদ্ধ স্বরে) তোর কথা মত এখন ভেতর বার করতে হবে? না?

সীতা। আমার মাথা খাও, অসুখ শরীর নিয়ে অমন রাগারাগি কর না। চল (অঘোরনাথের হস্ত আকর্ষণ করিলেন)।

অঘোরনাথ। (সবেগে হাত ছাড়াইয়া লইয়া) আমি কোথাও যাব না, আমি এখানেই বসব। আমি সব প্রশ্নের জবাব চাই, তবে এখান থেকে নড়ব। কি, চুপ করে রইলি যে?

তারক। (উষ্ণ না হইয়া) চুপ করে না থেকে কি করব বল? বললে তো বলতে হয়, পেটের হুকুম তামিল করছি। তুমি তো দিব্যি জেলে গিয়ে বসে রইলে। আর যাই হউক, দু'বেলা পেট ভরে খেতে পেয়েছ। আমরা এদিকে, আর উপোস—উপোস—উপোস; পেটের জ্বালা যে কি, তা কি তুমি এক দিনের জন্যেও জেনেছ?

অঘোরনাথ। (দমিত না হইয়া) মিলিটারী কণ্ট্রাক্ট ছাড়া কি কাজ ছিল না পৃথিবীতে?

তারক। ছিল হয়ত। পঁচাত্তর টাকার মাইনের একটা চাকরী আরম্ভ করেছিলাম, আমার আর ছবির দু'জনের দেড়শোর থেকে ধার শোধ করে যা থাকত, তাতে এক বেলার ভাতও···

অঘোরনাথ। (বাধা দিয়া) সেও তো মিলিটারির চাকরী, অন্য কথায় ব্রিটিশের যুদ্ধে সাহায্য করা! তোদের এতদিন তা হলে শেখালাম কি?

তারক। সবই শিখিয়েছ, শুধু না খেয়ে কি করে বেঁচে থাকতে হয় সেটা শেখাও নি।

অঘোরনাথ। মরে যেতিস, আদর্শচ্যুত হওয়ার চাইতে মরে যাওয়া ভাল।

তারক। তোমার আদর্শ যদি আমারও আদর্শ হ'ত হয়ত তা হলে তাই করতাম। কিন্তু ভেবে দেখ, তাতেও তো সমস্যা মিটত না, (মাকে দেখাইয়া) এঁদের কি হ'ত, খোকার কি হ'ত?

[ট্রে হাতে লক্ষ্মী আসিয়া অঘোরনাথ ও তারকের খাবার সাজাইয়া দিয়া গেল]

অঘোরনাথ। আমার আদর্শ যে খারাপ আমার অতি বড় শত্রুও কোন দিন বলে নি।

তারক। তোমার আদর্শ তোমার কাছে আর তোমাদের যাকে বল জাতীয়তার সৈনিকদের কাছে বড়, (মাকে দেখাইয়া) আমার আর এঁদের কাছে নয়। দূরে ছিলে তাই মনে করছ আমরা চেষ্টা করি নি, যতদিন পেরেছি আমরা আধপেটা খেয়ে উপোস করে কাটিয়েছি; তার পরে আর পারি নি। মার গয়না বিক্রি তো তুমিই আরম্ভ করেছিলে, তারপর একে একে বাসনপত্র, টেবিল চেয়ার সব গিয়েছিল। আদর্শ দিয়ে আমি কি করব, লোকে বলে আপনি বাঁচলে তবে বাপের নাম।

অঘোরনাথ। (প্রায় চীৎকার করিয়া) আর লোকে এ কথা কি কোন দিন বলেছে যে, আদর্শের জন্য যারা প্রাণ দেয় তাদের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকে?

তারক। হয়ত বলেছে, কিন্তু না খেয়ে মরা আর আদর্শের জন্য প্রাণ দেওয়া কি এক কথা। আজকের দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দিচ্ছে, তাতে কি যুদ্ধ আটকাচ্ছে? তোমরা জেলে গিয়েছ কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ করতে পেরেছ? যুদ্ধ বন্ধ কর, দুর্ভিক্ষ বন্ধ হবে, দুর্ভিক্ষ বন্ধ হলে লোক খেতে পাবে, লোক খেতে পেলে তখন নানান রকমের আদর্শের কথা ভাবতে পারবে। আমার সোজা হিসেব।

সীতা। (অঘোরনাথকে) চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, খেয়ে নেও।

অঘোরনাথ। (দৃঢ় ভাবে) না, এ চুরির টাকার খাবার আমি খাব না।

তারক। চুরির টাকা!

অঘোরনাথ। সাধুলালের সঙ্গে চুরির বখরার বন্দোবস্ত হয় নি?

তারক। কৈ না!

অঘোরনাথ। (জেরার সুরে) টাকা পেলি কোথায়?

তারক। যখন কোন উপায় ছিল না, বাড়ী বন্ধক দিয়ে টাকা যোগাড় করতে হ'ল। কণ্ট্রাক্ট না নিলেও বাড়ী বন্ধক দিতে হ'ত।

অঘোরনাথ। আমার সই ছাড়া বাড়ী বন্ধক কি রকম? (তারকের নিকট উত্তর না পাইয়া সীতাকে) আমার সই ছাড়া টাকা দিলে সে কোন মূর্খ?

সীতা। তোমার সই তো হয়েছে।

অঘোরনাথ। আমার সই হয়েছে?

সীতা। তোমার সই তারক করেছে। (পক্ষ সমর্থনে) তুমি জেলে, তোমাকে ও কোথায় পাবে? তা ছাড়া তোমাকে জানালেও তুমি নানা রকম ফ্যাকড়া বার করতে।

অঘোরনাথ। হায় ভগবান, আমাকে আর কি শুনতে হবে!

তারক। (উদ্ধত সুরে) আমাকে তুমি জেলে দিতে পার, কিন্তু আমি আমার মা-ভাই-বোনকে বাঁচাবার জন্যে যা করেছি, ঠিক করেছি। (চা ও খাবার খাইতে সুরু করিল)

অঘোরনাথ। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া) রাস্কেল, তোকে জেলে দেওয়াই উচিত! তোকে···

তারক। (বাধা দিয়া) আস্তে কথা বল, বাইরে আমার লোকজন রয়েছে।

অঘোরনাথ। (চীৎকার করিয়া) কি, তোর লোকজনকে আমি ভয় করি, আমি, আমি···(রাগে কাঁপিতে লাগিলেন)

(সীতা উঠিয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্দরের দরজা দিয়া

লক্ষ্মীর ও বাহিরের দরজা দিয়া সাধুলালের প্রবেশ। তাহারা দুই জনেই দরজার নিকট দাঁড়াইয়া রহিল। লক্ষ্মী ভীত, সাধুলাল অবিচলিত, মুখে অভ্যাসের হাসিটি লাগিয়া আছে)

সীতা। (অঘোরনাথের হাত ধরিয়া পিছনে আকর্ষণ করিয়া) সত্যিই তো ওর এখন একটা সম্মান হয়েছে, বাইরে কুলী কামলারা কি মনে করবে, চলে এস।

অঘোরনাথ। (কিছু না শুনিতে পাইয়া) না, আমি এর একটা হাস্তন্যাস্ত করব, তুমি যাও। (হাত দিয়া সীতাকে সরাইয়া দিতে গিয়া সাধুলালকে দেখিতে পাইলেন) কি, এখানে পর্যন্ত তাড়া করেছ, কি চাই ?

সাধুলাল। কি চাই ? ও, হাঁ, যেতে যেতে দেখলাম ব্লাক-আউটের অর্ডার সত্ত্বেও জানালা খোলা, বাইরে আলো পড়েছে। বন্ধুভাবে একটু ওয়ার্নিং দিতে এলাম। (আঙুল দিয়া জানালা দেখাইল)

[লক্ষ্মী ও তারক একসঙ্গে জানালার দিকে অগ্রসর হইল, এমন সময় জানালায় সন্তোষের মুখ দেখা গেল। লক্ষ্মী আগাইয়া গেলে তারক ফিরিয়া আসিল। লক্ষ্মী সন্তোষের মুখের উপরে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল] এত গোণ্ডোগোল কিসের তারকবাবু।

অঘোরনাথ। তাতে তোমার কি দরকার হে ? এ আমার বাড়ীর ব্যাপার। গেট আউট ! (বাহিরের দরজার দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিলেন)

সাধুলাল। (নির্লিপ্তভাবে) ও আচ্ছা। (অতি ধীর পদ-ক্ষেপে বাহিরের দরজার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল)

অঘোরনাথ। (মনে পড়িতে, চীৎকার করিয়া) আমার মেয়েকে তোমরা কি করেছ সাধুলাল ? আমার মেয়ে কোথায় ? তোমাদের প্রত্যেকটি মিলিটারী এক একটি স্কাউণ্ড্রেল ! আমার মেয়ে কোথায় ?

[সাধুলাল থামিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। অভ্যাসের হাসিটি এই প্রথম লুপ্ত হইয়া চোখে মুখে ক্রুরতার ছাপ ফুটিয়া উঠিল]

সাধুলাল। (আগাইয়া আসিয়া অঘোরনাথের মুখের কাছে মুখ আনিয়া আবেগকম্পিত ভাঙ্গা কণ্ঠে) আমার স্ত্রী কোথায় মাষ্টার ?

অঘোরনাথ। (হতভম্ব হইয়া দুই পা পিছাইয়া গেলেন) তোমার স্ত্রী ? তার আমি কি জানি ?

সাধুলাল। তুমি না জান, তোমার মত আর একজন মাষ্টার জানে। আমার দেশে তোমার মুলুকের মত সোনা ফলে না। আমরা যখন বাহিরে বার হই টাকা রোজগার করতে দেশে থাকে আমাদের স্ত্রী ছেলে মেয়ে, চৌকিদার, পোষ্ট মাষ্টার আর তোমার মত গোবেচারী দেখতে সব ভণ্ড মাইনর স্কুলের মাষ্টার। অন্য সময় কখনও বছরে ছ'মাস বাড়ী থাকি কখনও স্ত্রী সঙ্গে থাকে। আজকে তিন বছর আমি ঘরছাড়া, সেই সুবিধায় তোমার মত এক বেটা মাষ্টার আমার বউ নিয়ে পালিয়ে গেছে। এখন আমি যদি বলি, তোমাদের প্রত্যেকটি মাষ্টার এক একটি স্কাউণ্ড্রেল ! খুশি হয়ে নাচবে ?

অঘোরনাথ। (আস্তে আস্তে পিছাইয়া সোফায় গা ছাড়িয়া দিয়া প্রায় স্বগত) কি ভয়ানক কথা, মাষ্টার হয়ে···(একটু থামিয়া) কি ভয়ঙ্কর এই যুদ্ধ ! মানুষের ভেতরকার নরক নির্লজ্জ হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। (তর্কচ্ছলে) তবে যাই বলেন, আপনার স্ত্রীরও তো দোষ আছে ? (সীতার ভিতরে প্রস্থান)

সাধুলাল। প্রথমে আমিও সেরকম মনে করেছিলাম। কিন্তু এখন আমি নিজেকে দিয়ে বুঝতে পারি। হাজার হলেও রক্ত-মাংসের মানুষ তো ?

অঘোরনাথ। তা হলে মানুষ আর পশুর তফাৎ কি ?

সাধুলাল। (অনুনয়ের স্বরে) ভেবে দেখুন, অনেক বিষয়েই কোন তফাৎ নেই। একটু ক্ষমা করতে শিখুন মাষ্টারবাবু !

অঘোরনাথ। (অনেকটা স্বগতভাবে) ক্ষমা নিশ্চয় সদ্‌গুণ, কিন্তু পাপকে ক্ষমা, সেও কি সদ্‌গুণ ? (চিন্তামগ্ন হইয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মাথা রাখিলেন। এই সুযোগে সাধুলাল তাড়াতাড়ি বাহিরের দরজায় গিয়া হাত বাড়াইয়া ইসারা করিতে ছবি প্রবেশ করিল। তাহারও বেশভূষায় বিলক্ষণ চাকচিক্য হইয়াছে। তবে সে খদ্দর বর্জ্জন করে নাই। ঢুকিয়াই ক্ষিপ্র অথচ নিঃশব্দ পদে ঘরটি অতিক্রম করিয়া যাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সফল হইল না। অঘোরনাথ মুখ তুলিলেন) না, কখনও না, ক্ষমা, যথা ক্ষীণ দুর্ব্বলতা, হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা তোমার আদেশে ! (পলায়মান ছবিকে দেখিয়া ফেলিয়া চীৎকার করিয়া) এই, এদিকে আয় ! (অনন্যোপায় ছবি আসিয়া প্রণাম করিয়া মাথা নত করিয়া দাঁড়াইল) মুখ তোল। (দৃঢ়স্বরে) আমার চোখে চোখে তাকা। (ছবি কোনক্রমে মুখ তুলিল) কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

ছবি। (আমতা আমতা করিয়া) আমার এক বন্ধুর বাড়ী গিয়েছিলাম।

অঘোরনাথ। হু, মিথ্যে কথাও শিখেছ ! কোথায় ছিলে সেটা যদি আমি নিজের চোখে না দেখতাম, তাহলে তোমাদেরই জয় হ'ত, আমার নাকের উপর দিয়ে পাপের বেসাতি চালাতে পারতে। না, আর নয়, এ পাপের গোয়াল আমি পরিষ্কার করব। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের দরজা নির্দ্দেশ করিয়া) বের হ এখান থেকে ! (ছবি কিছুক্ষণ মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর উল্টা দিকে অর্থাৎ ভিতরের দিকে আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে লাগিল। না ওদিকে নয়। (বাহিরের দরজা নির্দ্দেশ করিয়া ক্ষিপ্তস্বরে) ওদিকে। পাপ ব্যবসা চালাবার জায়গা এটা নয়।

[ছবি আর কিছুক্ষণ মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া অবশেষে উদ্ধতভাবে বাহির হইয়া গেল। সাধুলালের ও ছবির পায়ে পায়ে দ্রুত প্রস্থান]

তারক। (অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া) মিছিমিছি গোঁয়ার্তুমি

করে লাভটা কি হচ্ছে শুনি? এই রাত্তির বেলা মেয়েটা যাবে কোথায় ভেবে দেখেছ?

অঘোরনাথ। (তারকের কথা কানে গেল না। দুই হাতে নিজের মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া পুনরায় সোফায় গা এলাইয়া দিলেন) উঃ।

(সীতার প্রবেশ)

সীতা। ছবির গলা শুনলাম মনে হ'ল। (অঘোরনাথকে) কার সঙ্গে চেঁচামেচি করছিলে? (উত্তরের জন্য প্রথম অঘোরনাথের দিকে পরে তারকের দিকে তাকাইলেন। কেহ জবাব দিল না। আবার অঘোরনাথের দিকে তাকাইয়া তাঁহার অবস্থা দেখিতে পাইলেন এবং উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার পাশে গিয়া বসিলেন) কি, মাথাটা একটু টিপে দেব? যন্ত্রণা হচ্ছে? (আকর্ষণ করিয়া) ঘরে না যাও, এখানেই একটু ভাল হয়ে শোও, মাথাটা একটু টিপে দি।

অঘোরনাথ। (সামলাইয়া লইয়া) না, আমাকে তুমি ছুঁয়ো না। (ঘৃণার সহিত) দূর হও।

তারক। আবার মার পেছনে লেগেছ? একজনকে···

সীতা। (বাধা দিয়া) যা বলুন, বলতে দে। ওর কি এখন মাথার ঠিক আছে? বরাবরই দেখিস তো কি রকম, প'ন থেকে চূণ খসবার উপায় নেই, তায় আবার অসুস্থ শরীর ও পথের পরিশ্রম। একটু বিশ্রাম করলে, রাত্তিরটা ঘুমোলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

অঘোরনাথ। (চমকাইয়া) কি ঠিক হয়ে যাবে?

সীতা। (ভুলাইবার চেষ্টা করিয়া) সব ঠিক হয়ে যাবে। একটু চুপ করে বিশ্রাম কর। (কাপ প্লেট ইত্যাদি গুছাইয়া লইয়া প্রস্থান)

অঘোরনাথ। (কতক্ষণ মৌন থাকিয়া) সাধুলালের সঙ্গে চুরির বখরা হয় নি তো, তোকে কি সেধে কণ্ট্রাক্ট দিল, না তুই দরখাস্ত করেছিলি?

তারক। না ঠিক দরখাস্ত দিতে হয় নি, সামান্য মাইনেতে চলছে না বলাতেই হয়ে গেল।

অঘোরনাথ। আর চাকরিটা হয়েছিল কি করে?

তারক। আমাদের দুরবস্থার কথা শুনে ডেকে চাকরী দিয়েছিল। দয়া বলতে পার।

অঘোরনাথ। ছবির চাকরিও ডেকে দিয়েছিল?

তারক। হাঁ।

অঘোরনাথ। দখলকরা স্কুল বাড়ীর টাকা, আর আমার ভাতার টাকা কেউ ডেকে দিল না কেন? সে তো এখনও পাওয়া যায় নি?

তারক। (বিরক্ত হইয়া) না, কি সব আইনের ফ্যাকড়া হয়েছে। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) পাওয়া যাবে হয়ত একদিন!

অঘোরনাথ। (দৃঢ়স্বরে) আমি জানতে চাইছি, মিলিটারী চাকরি, কণ্ট্রাক্ট, ওসব সাধুলালের দয়া, না আমি যা ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছি তা তোদের দিয়ে করিয়ে আমার উপর প্রতি-হিংসা নিচ্ছে। না এর সঙ্গে আরও কিছু?

(খাকি প্যাণ্ট-সার্ট পরা লোকটির পুনঃ প্রবেশ)

তারক। (লোকটিকে) হয়ে গেছে। হ'ল বলে।

অঘোরনাথ। (অধৈর্য্য হইয়া) কি আসল, তলাকার ব্যাপারটা কি?

তারক। (টাকা গুণিতে মন দিয়া) তলাকার ব্যাপার কিছু নেই।

অঘোরনাথ। (ফাটিয়া পড়িয়া) স্কাউণ্ড্রেল, তুই আমাকে ফাঁকি দিবি? তুই গাউন আর সোফা কিনবার আগে ছবিকে কেন চাকরির থেকে ছাড়িয়ে আনলি না? ছবিকে তুই সঙ্গে না এনে সাধুলাল কেন নিয়ে আসে? স্কাউণ্ড্রেল, ঐ টাকা তোর বোন বিক্রির টাকা? (অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া রহিলেন)।

তারক। (রাগান্বিত হইয়া) কি বাজে বকছ? ভেতরে যাও।

অঘোরনাথ। হুঁ। দ্যাট ইজ দি ট্রুথ? মরি, বাঁচি, এ আমি সহ্য করব না (উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন)

তারক। (ক্রোধ ও তাচ্ছিল্য সহকারে) যা করতে পার কর গিয়ে যাও!

অঘোরনাথ। (হুঙ্কার দিয়া) বটে। (অতি দ্রুত দুই হাতে টেবিলের টাকাগুলি লইয়া জানালা খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন। তারপর রাগত ভাবে তারকের দিকে আগাইয়া গেলেন, কিন্তু সে টেবিলের অপর পার্শ্বে চলিয়া গেল। অঘোরনাথ আরও বেশী কাঁপিতে লাগিলেন)

তারক। (অঘোরনাথকে এড়াইয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টায় বিফল হইয়া, অপর লোকটিকে) দাঁড়িয়ে দেখছ কি? শিগ্‌গির যাও টাকাগুলি নিয়ে এস!

(লোকটি দৌড়াইয়া বাহির হইয়া গেল)

অঘোরনাথ। আজ তোরই একদিন, কি আমারই একদিন!

(সামান্য বিরতি। লোকটির দৌড়াইয়া পুনঃ প্রবেশ)

লোকটি। (উত্তেজিত ভাবে) একটা টাকাও নাই। রাস্তা ফাঁকা!

তারক। (আর্ত্তনাদ করিয়া) অ্যাঁ!

[তারক দৌড়াইয়া বাহির হইতে গেলে অঘোরনাথ বাধা দিলেন। তারক অঘোরনাথকে প্রবল এক ধাক্কা দিয়া বাহির হইয়া গেল। অঘোরনাথ দেওয়ালের উপর পড়িয়া গিয়া মাথায় আঘাত পাইয়া জ্ঞান হারাইলেন। তারক অবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া অঘোরনাথেরই জুতা কুড়াইয়া তাঁহাকেই নির্ব্বিচারে প্রহার করিতে লাগিল এবং হুঙ্কার দিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সীতা লক্ষ্মী ও বাহিরের কুলীরা আসিয়া ঘরটি পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। সীতা তারককে

ছিনাইয়া আনিবার জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু করিলেন এবং ক্ষণকালের জন্য পারিলেনও]

সীতা। (তারককে জড়াইয়া ধরিয়া) ছি ছি, বাবার উপরে হাত তুলতে হয় ?

তারক। খেতে দিতে পারে না, সে আবার বাপ। অনেক সহ্য করেছি, আর করব না। আমার সর্ব্বস্ব ফেলে দিয়েছে। (অঘোরনাথ সম্বিৎ পাইয়া টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন) আমি আজকে খুন করব। (জুতা হাতে পুনরায় অগ্রসর হইল, সীতাকে শুদ্ধ টানিয়া লইয়া চলিল)

অঘোরনাথ। (বন্য জন্তুর মত আর্ত্তনাদ করিয়া) ওরে আমাকে মারিস নি, আমি তোর বাপ। ওরে মারিস নি, আমি তোর বাপ। (সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পাগল হইবার লক্ষণ সকল ফুটিয়া উঠিল। মাথার চুল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বাহিরের অন্ধকারে মিলাইয়া গেলেন)

সীতা। (অনুনয় করিয়া) ওরে যা এখনও ফিরিয়ে আন। (কুলীদের) ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি ওঁকে ফিরিয়ে আন। (কেহ নড়িল না) ওগো ফিরে এস। এ সব স্বপ্ন, সব ঠিক হয়ে যাবে, ফিরে এস। (বাহিরের দরজা দিয়া প্রস্থান)

[হাফপ্যাণ্ট পরা লোকটি ইশারা করিতে কুলীরা বাহির হইয়া গেল। সকলে গেলে ঐ লোকটিও তাহাদের পিছু লইল। লক্ষ্মীও বাহির হইয়া গেল। তারক কিছুক্ষণ নিশ্চল থাকিয়া চেয়ার-টেবিলগুলিকে লাথি মারিয়া উল্টাইয়া ফেলিতে লাগিল।]

(সন্তোষের প্রবেশ)

সন্তোষ। (তারককে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়া) আহা হা, কর কি ! কর কি !

তারক। (বিমূঢ়ভাবে) অ্যাঁ ?

সন্তোষ। এই সব টেবিল চেয়ার বাড়ী-ঘর এসব যে আমার সে কি ভুলে গেছ ? মানে এসব যে আমার কাছে বন্ধক আছে, সেকি ভুলে গেছ ? (তারক পুনরায় সুরু করিল) দেখ তুমি যদি না থাম ত পুলিস ডাকব।

তারক। (থামিয়া বিস্মিত ভাবে) কিসের পুলিস ?

সন্তোষ। সে যাকগে। জিনিসপত্রগুলি ভেঙ্গ না। আজকে না আমায় সুদের টাকা দেওয়ার কথা ছিল ? টাকা কোথায় ?

তারক। টাকা ? (তিক্ত হাসি হাসিয়া জানালা নির্দ্দেশ করিল) ঐ হোথায় !

সন্তোষ। কি ব্যাপার ? আমি তো কিছু জানি না, আমি তো এই আসছি।

তারক। ওঃ এই আসছ, তা শোন। তোমারই যখন বাড়ী ! (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) দেখি আর একবার।

(প্রস্থান

সন্তোষ। ছবিকে হারালাম বটে, কিন্তু বাড়ীটা পাব, এ কেউ আটকাতে পারবে না। ভাব একবার, এ বাড়ীতে একদিন আমি চাকর ছিলাম ! (এক হাতে জামার পকেট হইতে টাকার বাণ্ডিলগুলি বাহির করিতে লাগিল অপর হাতে গোঁফে তা দিতে থাকিল)

(যবনিকা)

—

পঞ্চম অঙ্ক

[ট্রেনের কামরা। প্রথম শ্রেণী, কিন্তু দুরবস্থা দেখিয়া হঠাৎ তাহা মনে হয় না। উপরে ফ্যান, ব্রাকেট লাইট কিছুই নাই। যেখানে আয়না ছিল সেখানে শুধু ফ্রেম আছে এবং ফ্রেম-সংলগ্ন তাক আছে। গদী ছিন্ন, স্প্রীঙের জাল বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কেবল উপরের বাঙ্কগুলি ঠিক আছে মনে হইতেছে।

বেশ বড় কামরা, কিন্তু লোক মাত্র দুই জন। এক জন সাধুলাল অপর জন ছবি। মেঝেয় একধারে একটা বড় ট্রাঙ্ক ও তাহার উপরে এক বড় সুটকেশ। বিছানাসমেত হোল্ড-অলটি একটি বেঞ্চের উপর বিছান। তাকের উপর রহিয়াছে গ্লাস, থারমস, জলের বোতল ও সাধুলালের টুপী।

বিছানার উপরে কাঠের দেয়ালে হেলান দিয়া, পা ছড়াইয়া সাধুলাল সিগারেট খাইতেছে এবং একখানা টাইম টেবিল পড়িতেছে। চেহারা ও বেশভূষায় তাহার কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই। ছবি তাহার উল্টাদিকের বেঞ্চে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া জানালা দিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া আছে। (আর সকল জানালা-দরজা বন্ধ)। তাহার মুখ দেখা যায় না, কিন্তু তাহার মূল্যবান শাড়ী-জুতা ও রঞ্জিত, নখশোভিত পা দুখানি দেখা যায়। পর্দ্দা উঠিবার মিনিট খানেক পরে সাধুলাল কথা কহিল।]

সাধুলাল। ছবি, তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করে এদিকে এসে বস, এখুনি একটা ষ্টেশন এসে পড়বে। (ঘড়ি দেখিল) এস।

ছবি। (ঐ অবস্থাতেই সামান্য মুখ ঘুরাইয়া) না !

সাধুলাল। তুমি আমার সোব ব্যবস্থা নষ্ট করবে, টাকা নষ্ট করবে।

[ছবি জানালা বন্ধ করিল না বটে, কিন্তু নামিয়া ঘুরিয়া বসিল। না বলিয়া দিলে এখন তাহাকে চেনা দুষ্কর। কামানো ভ্রু, রুজ লিপ্‌ষ্টিক, চুলের ষ্টাইল সব মিলিয়া বেশ একটা ছদ্মবেশ পরা হইয়াছে]

ছবি। কি সাংঘাতিক ব্যাপার ! (থামিয়া) হাজার হাজার লোক ঝুলে যাচ্ছে, আর আমরা এত বড় কামরাতে মাত্র দু'জন। কয়েকজন লোককে এ গাড়ীতে ডেকে নেওয়া উচিত।

আর এমন আশ্চর্য্য যে, সব গাড়ীতে ধাক্কাধাক্কি মারামারি হচ্ছে আর এ গাড়ীর ফুটবোর্ডে পর্য্যন্ত লোক নেই।

সাধুলাল। পৃথিবীর একমাত্র আশ্চর্য্য জিনিষ হচ্ছে টাকা, আর কিছু আশ্চর্য্য নাই। ষ্টেশনে এসে কি দেখলে? গাড়ীতে সিট নাই, পরের গাড়ী মানে যেটা কাল ছাড়বে সেটায় যান, না হয় অন্য মিলিটারি বোঝাই কামরায় যান। পাঁচটা টাকা হাতে দিলাম, ব্যস একটা গোটা কামরা এসে গেল। এসব যুদ্ধ-সময়ের ভাষা, আমার বুঝতে কষ্ট হয় না।

ছবি। হুঁ!

সাধুলাল। লোকে এ গাড়ীতে আসে না কেন শুনবে? বাইরে সব বড় বড় মিলিটারী সাহেব আর তাদের মেমদের নাম লিখিয়ে নিয়েছি। দেশী মিলিটারীরা সাহেবদের এড়িয়ে চলে আর সিভিলিয়ানরা তো মিলিটারী দেখলেই ডরায়। ব্যস।

ছবি। যে রকম লোক ঝুলছে, কিছু লোক এ গাড়ীতে উঠিয়ে নেওয়া নিশ্চয় উচিত।

সাধুলাল। হুঁ, তাই করি আর কি! একবার লোক উঠতে আরম্ভ করলে আমরাই জায়গা পাব না। এখন লোক ফার্ষ্ট-ক্লাশ সেকেণ্ড ক্লাশ মানে? যাকগে বাজে কথা, এদিকে এসে বস। (নিজের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান নির্দ্দেশ করিল)

ছবি। না।

সাধুলাল। নাঃ, এত করেও তোমার মন পেলাম না! এমন কি, আমাকে তুমি একটু 'তুমি' বললে খুশি হই তা পর্য্যন্ত বলতে চাও না।

ছবি। মন? (উষ্মার সহিত) মন দিয়ে কি হবে আপনার? আমাকে ঘর ছাড়া পর্য্যন্ত করেছেন। আমার কি এখন আর বুঝতে কিছু বাকী আছে এতদিনে? আপনি নিজেই তো কত রকম বাহাদুরী করেছেন। আরও কত কি সব, আমার ভাবতেও মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করে। আর এখন আমার ভালবাসা চাইছেন? লজ্জার কি আপনার একটুও অবশিষ্ট নেই?

সাধুলাল। লজ্জা? তা লজ্জার বদনাম আমাকে কেউ দিতে পারবে না। তবে কি জান, নাথিং ইজ আনফেয়ার ইন লাভ এণ্ড ওয়ার। 'যুদ্ধ আর প্রেমের ব্যাপারে অন্যায় বলে কিছু নেই।'

ছবি। যে পায় তার কাছে না থাকতে পারে, যে হারায় তার কাছে আছে।

সাধুলাল। 'যে পায় তার কাছে'—নাঃ, তর্ক আমার ধাতে সয় না। আমি কাজ বুঝি, এ দিকে এস।

ছবি। না। [ট্রেনখানা থামিল এবং বাহিরে প্রবল কোলাহল হইতে লাগিল]

সাধুলাল। (উঠিয়া জানালাটা বন্ধ করিয়া ছবিকে নিজের কাছে লইয়া আসিতে আসিতে) যা হবার হয়ে গেছে। ভুলে যাও। আর আমিও একবার যখন তোমাকে খাঁচায় পুরেছি তখন আর কিছুতেই ছাড়ছি না, তা তুমি যতই তর্ক কর। আর তর্কেরই বা কি দরকার, (জোর করিয়া বসাইল) আমি ত স্বীকারই করেছি যে আমিই তোমার দীনুদাকে রাতারাতি বদলি করেছি, আমি কৌশলে তোমার বাবাকে দিয়ে তোমাকে তাড়িয়েছি। অন্য যেখানে যাবে আগের মত না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে। আমার সঙ্গে একটু ভাবসাব করে থাকলে সুখে থাকবে। (ছবিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিল)

ছবি। (ছাড়াইয়া লইয়া) না, মরবার পথ আমার সবসময়ই খোলা আছে। তবে মরতে যে পারছি না!

সাধুলাল। (উচ্চ হাসি হাসিয়া) কেন মরতে পারছ না তাও অবশ্য আমি জানি।

ছবি। (উদ্ধত ভাবে) কেন?

[এমন সময় দরজায় প্রবল ভাবে আঘাত পড়িতে লাগিল। সাধুলাল ছবিকে নিঃশব্দ থাকিতে ইঙ্গিত করিল। দরজার আঘাত অল্পক্ষণ থামিয়া দ্বিগুণ শব্দে আরম্ভ হইল]

সাধুলাল। (নিম্ন স্বরে) আচ্ছা বিপদে পড়া গেল তো। কার এমন সাহস যে সাহেব মিলিটারীকে কেয়ার করে না!

ছবি। (উঠিয়া গিয়া জানালার নীচের দিকের খড়খড়ি সামান্য ফাঁক করিয়া দেখিয়া সাধুলালকে নিম্নস্বরে) পুলিস! এবার উপরের দিকের একটা খড়খড়ি তুলিয়া উঁকি দিয়াই ত্রস্তে বন্ধ করিয়া দিয়া অতিমাত্রায় বিব্রত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সাধুলাল। খুলে দাও। দরজা দেখছি ভেঙেই ফেলবে। (ছবিকে নিশ্চল দেখিয়া চেঁচাইয়া) আরে, খুলে দাও! (অবাক হইয়া নিজেই দরজা খুলিয়া দিল)

[একদিকে হাঁফাইতে হাঁফাইতে একজন পুলিস ও একজন দারোগার সহিত অসিতের প্রবেশ, অপরদিকে ছবি তাড়াতাড়ি এটা ওটা হাতড়াইয়া একটা নীল চশমা চোখে দিয়া সাধুলালের পরিত্যক্ত স্থানে বসিয়া টাইম-টেবলের আড়ালে মুখ লুকাইল। যেন কিছুই হয় নাই এইরূপ ভাবে হাসিতে হাসিতে সাধুলাল ছবির পরিত্যক্ত স্থানে আসিয়া বসিল। সঙ্গের কুলি বাক্স-বিছানা উঠাইয়া দিয়া যাইতে অসিত ও সঙ্গীরা উল্টাদিকের খালি বেঞ্চটি দখল করিল]

অসিত। (তখনও হাঁফাইতে থাকিয়া সঙ্গের দারোগাকে) আপনি তো মশাই ভয়েই অস্থির; আমি যদি জোর না করতাম তা হলে আজকের মত এই ষ্টেশনেই পড়ে থাকতে হ'ত। (সাধুলাল ও ছবিকে দেখাইয়া) এই তো মশায় আপনার সাহেব আর মেম, (হাত দিয়া গাড়ীর ফাঁকা স্থান দেখাইয়া) একেবারে গিসগিস করছে।

দারোগা। (অপ্রতিভভাবে, রুমাল দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া) বাইরে থেকে কিছু কি বুঝবার উপায় রেখেছেন এনারা? তা ছাড়া লেবেল রয়েছে।

অসিত। সাহেব-মেমদের আর যাই দোষ থাক তারা দরজা-

লণ্ডন-কায়রো বেতার-আলোচনায় কায়রোর ডক্টর হাসান আবু আল সৌদ ও মিসেস হায়ফা আল-সানাওয়ারি

বি-বি-সি'র ষ্টুডিওতে লণ্ডন-কায়রো বেতার-আলোচনায় (বাঁ দিক হইতে) ডক্টর ভিক্টর পুরসেল,
[illegible]
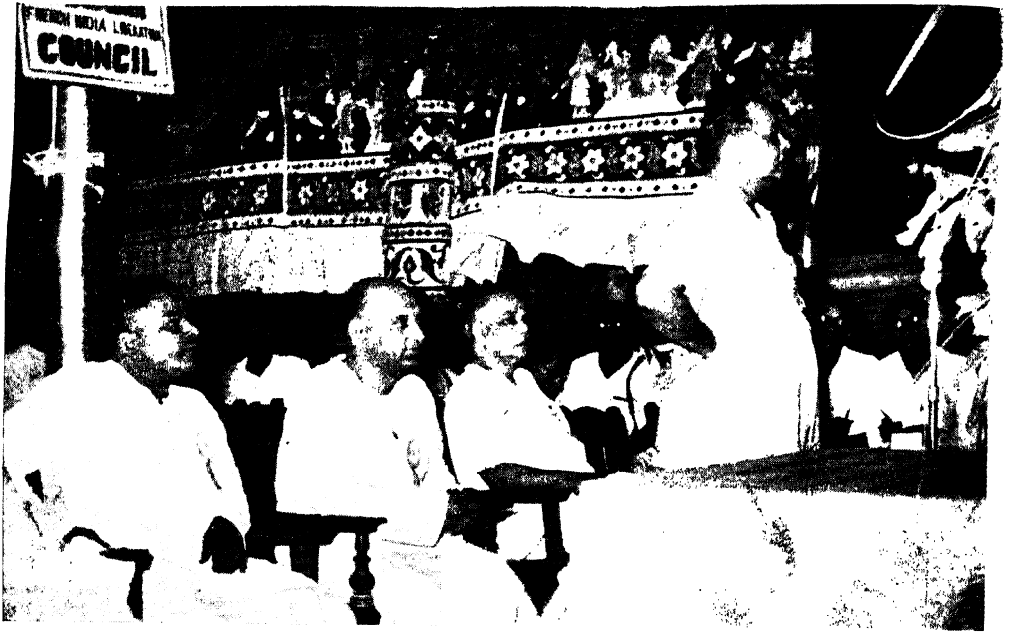
মাহকারাইয়ে ফরাসী ভারত মুক্তি-পরিষদের সভায় বক্তৃতা-প্রদান-রত পণ্ডিচেরীর প্রাক্তন মেয়র শ্রী কে. মুথ পিল্লাই। তাঁহার ডান দিকে ই. গৌবার্ট এবং বি. মুথুকুমারাপ্পা রেড্ডিয়ার

রাস্তা নির্ম্মাণ-রত একটি 'কম্যুনিটি প্রজেক্ট' অঞ্চলের গ্রামবাসিগণ

জানালা বন্ধ করে চোরের মত লুকিয়ে বসে থাকে না। (জানালা-গুলি সব একে একে খুলিয়া দিয়া, সাধুলালকে) হ্যাঁ মশায়, যদি রিজার্ভ করে থাকেন তা হলেও তো আপনার দুটি সিট মাত্র পাওনা, সমস্ত গাড়ীটা দখল করতে চান কোন আক্কেলে ?

সাধুলাল। (ব্যাপারটা হাসিয়া লঘু করিতে চেষ্টা করিয়া) বুঝলেন না, পার্টি-স্পিরিট। দেখবেন আপনিও কিছুক্ষণ পরে আমার পার্টিতে যোগ দেবেন। এটা ট্রেন-দুনিয়ার নিয়ম।

অসিত। (সাধুলালের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া সাব-ইন্সপেক্টারকে) কি মশাই, আপনি কিছু বুঝলেন ?

সাধুলাল। ট্রেন-দুনিয়ায় মাত্র দুটা দল আছে, একটা ট্রেনের ভিতরকার দল, একটা বাহিরের দল। ভিতরের দল বাহিরের দলকে না ঢুকতে দেওয়ার জন্য ঝগড়া করবে; কিন্তু বাহির থেকে একজন যদি কোন রকমে ঢুকে আসতে পারে সেও অমনি ভিতরের দল হয়ে বাহিরের দলকে ঠেলে রাখবে। এ নিয়ম জানেন না ? [ছবি ও অসিত ছাড়া অপর সকলের উচ্চহাস্য]

অসিত। না, আমি এ নিয়ম জানি না, মানি না। (দৃঢ়ভাবে) বিশেষ করে যদি জায়গা থাকে।

সাধুলাল। (সাব-ইনস্পেক্টারকে) ভদ্রলোকের মাথাটা একটু বিশেষ গরম আছে। তা আপনারা যাবেন কতদূর ?

দারোগা। এই ভদ্রলোকের জেল বদল করবার হুকুম হয়েছে। আমরা দু' ষ্টেশন পরে নামব।

সাধুলাল। (অসিতকে ইঙ্গিত করিয়া) স্বদেশী বুঝি ?

অসিত। আপনি কি বিদেশী ? বিলেত থেকে আমদানী ? তা হলে দেশে ফিরে যান, কুইট ইণ্ডিয়া !

সাধুলাল। আমি স্বদেশী পার্টির কথা বলছি। নো অফেন্স।

অসিত। স্বদেশী বললে আবার অপমান কিসের ? আপনারও তো যোগ দেওয়া উচিত।

সাধুলাল। (অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া) হে, হে, কি যে বলেন ! আমরা হলাম মিলিটারী।

অসিত : মিলিটারী হলেও দেশের লোক তো, মানুষ তো ? ছেড়ে দিয়ে যোগ দিন।

সাধুলাল। স্বদেশী করা মানে তো দেখছি জেলে গিয়ে বসে থাকা। তা হলে যুদ্ধ করবে কে ?

[একজন টিকেট চেকারের প্রবেশ। পিছনে একজন গোয়ালা, তাহার কাঁধের দুই দিকে বাঁশে ঝুলান দুইটি ভারী বড় কেরোসিনের টিন। চেকার কিছু খাইতেছেন]

চেকার। (গোয়ালাকে একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া) এইখানে রাখ। (গোয়ালা টিন দুইটি নামাইয়া রাখিল) নীচেই বসে থাকিস, উপরে উঠে বাবুদের সঙ্গে বসিস না।

সাধুলাল। (চেকারকে) এরও কি আপার ক্লাশ টিকেট ? (চেকার কোন জবাব না দিয়া নামিয়া গেলে অসিতকে) দেখছেন তো ? এখনও অন্ততঃ দরজাটা বন্ধ করুন।

[কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ছোট একটি পুঁটুলী লইয়া একজন বৃদ্ধার প্রবেশ]

পুলিস। (বৃদ্ধাকে) উতার যাও। উতার যাও। ই ফাষ্টো ক্লাশ হায়।

বৃদ্ধা। (অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে) আমাকে একটু দয়া কর বাবা, আমি বুড়ো মানুষ, কোথাও উঠতে পারছি না।

পুলিস। ইধার নেহি। (পা বাড়াইয়া দিয়া বৃদ্ধার পথ আটকাইল)

অসিত। (দৃঢ়কণ্ঠে, কনেষ্টবলকে) আসতে দাও, পথ ছাড়। (বৃদ্ধাকে) এস দিদিমা, আমার কাছে এসে বস।

বৃদ্ধা। কে তুমি বাছা, দিদিমা ডাকছ ? বুড়ো হয়েছি, চোখে ভাল দেখতে পাই নি। (অসিতের কাছে গিয়া মেঝেতে বসিতে অসিত তাহাকে উঠাইয়া পাশে বসাইল) কে তুমি বাছা ?

অসিত। (বৃদ্ধার কানের কাছে মুখ লইয়া উচ্চস্বরে) আমি তোমার একজন নাতি। পথে পাওয়া নাতি।

বৃদ্ধা। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) নাতি আমার একজন ছিল। (হাত দিয়া একটি তিন চার বছরের ছেলের মাপ দেখাইয়া) এই এতটুকু, এখন আর নেই। (একটু থামিয়া) তুমি বড় ভাল বাবা।

অসিত। (গোয়ালাকে) টিনে কি আছে ?

গোয়ালা। রসগোল্লা। (বুড়ী ও ছবি ছাড়া সকলের উচ্চহাস্য)

অসিত। দিদিমা, রসগোল্লা খাবে ? ক্ষিদে পেয়েছে ? (অসিত, বুড়ী ও ছবি ছাড়া সকলের হাস্য)

বুড়ী। আমার আর ক্ষিদে তেষ্টা পায় না বাবা, তোমরা খাও।

অসিত। (গোয়ালাকে) কত করে হে রসগোল্লা ?

গোয়ালা। বিক্রির নয় বাবু। একজন কণ্ট্রাক্টরের মেয়ের বিয়ের অর্ডার।

অসিত। তবে যে দেখলাম ঐ টিকিট বাবু খাচ্ছে ? (গোয়ালা নিরুত্তর) ও বুঝেছি, ওটা ঘুষের ব্যাপার। তা ক'টা খেলেন ?

গোয়ালা। তা বাবু আমার এত বড় একটা উব্‌গার করলেন—

অসিত। (ধমকাইয়া) ক'টা খেয়েছেন ?

গোয়ালা। তা বাবু খেয়েছেন মাত্র একটা আর—

[পুনরায় চেকারের প্রবেশ, গোয়ালা চুপ করিল। চেকার যেমন আসিয়াছিল তেমনই নামিয়া গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কুলীরা আসিয়া একের পর এক চাউলের বস্তা আনিয়া গাড়ীটি ভরাইয়া ফেলিতে লাগিল]

সাধুলাল। (চেঁচাইয়া ইনস্পেক্টরকে) দেখুন তো লোকটা গেল কোথায় ? এটা কি মালগাড়ী পেয়েছে নাকি ?

দারোগা। (জানালা দিয়া দেখিয়া লইয়া) কোথাও তো এখন টিকিটি দেখতে পাচ্ছি না।

বুড়ী। (অসিতকে) এত কিসের বস্তা বাবা ?

অসিত। চালের বস্তা।

বুড়ী। (দুই চক্ষু দিয়া জল গড়াইতে লাগিল) চাল ! এত চাল ! আর বাবা, আমার নাতিটা দু' মুঠো চালের জন্ম না খেয়ে মরল। আমাকে যম নিলে না। (কাঁদিতে সুরু করিল)

[অসিত বৃদ্ধার পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে লাগিল। এদিকে চালের বস্তা বোঝাই হইয়া গেলে কেহ বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিতে ট্রেন ছাড়িবার বাঁশী বাজিল এবং ট্রেন চলিতে আরম্ভ করিল।]

দারোগা। ট্রেন ছাড়ল তা হলে এতক্ষণে। দেখি অসিত-বাবু একটা সিগারেট দিন। [অসিতের নাম উল্লেখে সাধুলাল একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অসিতের মুখের দিকে, একবার ছবির মুখের দিকে তাকাইল। অসিত পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া দিতে সাব-ইনস্পেক্টর একটা নিজে নিল, একটা সাধুলালকে দিল। দুই জনেই সিগারেট ধরাইল।

[বৃদ্ধার ক্রন্দন একটু বাড়িয়া ধীরে ধীরে থামিয়া গেল, অসিত তবুও আরও কতক্ষণ তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিল]

অসিত। (এদিক ওদিক দেখিয়া) তাই ত ! এত চাল যাচ্ছে কোথায় ? চালের মহাজনকেও তো দেখছি না।

দারোগা। (বিজ্ঞ হাসি হাসিয়া) দেখবেন না তো ! মহাজন — মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ হয়েছেন।

অসিত। মানে ?

পুলিস। পুলিস দেখকে ভাগ গিয়া।

অসিত। কেন ?

পুলিস। (হাসিয়া) ঐসে কভি কভি ভাগতা।

অসিত। ও ব্ল্যাক মার্কেটের চাল বুঝি ! (সাব-ইনস্পেক্টর কে) তা চালটা তো মারা গেল ?

দারোগা। তা ঠিক বলতে পারি না, ওটা রেল-পুলিসের কাজ। চেকার যখন সাহায্য করছে তখন কিছু না হবারই কথা।

অসিত। (উত্তপ্ত হইয়া) বলেন কি মশাই ! দেশে যখন দুর্ভিক্ষ চলছে, লোকে এক মুঠো ভাতের জন্য হাহাকার করছে, বস্তায় বস্তায় চাল চোখের উপর দিয়ে চোরা চালান হবে, আর আপনি পুলিস হয়ে কিছু বলবেন না ? (দারোগা হাসিল) আরও আপনি হাসছেন ? কি লজ্জার কথা। লোকটাকে পেলে হ'ত একবার !

দারোগা। তা পারেন না। (দ্ব্যর্থক ভাবে) পেলে আমারও একটু কথাবার্তা ছিল।

অসিত। কি ? ঘুষের কথাবার্তা ?

দারোগা। পাওয়া যখন যাচ্ছে না, তখন এ নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করে লাভ কি ?

সাধুলাল। মশায়, এঁরা লাভ-লোকসান বোঝেন না, শুধু তর্ক বোঝেন।

অসিত। কি রকম ?

সাধুলাল। এই যে রকম একটু আগে বলছিলেন আমাকে চাকরী-বাকরী ছেড়ে আপনাদের দলে গিয়ে জেলের ভাত খেতে।

অসিত। ত্যাগের মধ্যেও যে আনন্দ আছে সে কথা আপনি কখনও শোনেন নি ?

সাধুলাল। ত্যাগ, মানে, স্যাক্রিফাইস ? আমি বলব যে আপনাদের হ'ল সখের 'ত্যাগ'। টাকার চিন্তা, পরিবারের চিন্তা যে আমাকে ঘরছাড়া করেছিল সেটা কি 'ত্যাগ' নয় ? কিন্তু যার জন্য ত্যাগ করলাম সেই আমাকে ত্যাগ করল। আপনার মতে এতে আমার আনন্দ পাওয়া উচিত ?

অসিত। আপনার স্ত্রী ?

সাধুলাল। (তিক্তভাবে) আজ্ঞে হাঁ।

অসিত। হঠাৎ একটা বিশেষ ঘটনা ঘটে যেতে পারে, সেটা বড় কথা নয়। মানুষের মধ্যে ব্যতিক্রম দু'একটা আছে।

সাধুলাল। দু'একটা ব্যতিক্রম ? যুদ্ধের পিছনকার খবর আপনি কিছুই রাখেন না মিষ্টার। ঠিক এ রকম ঘটনায় পড়ে কত সৈন্য পাগল হয়ে গেছে, কত সৈন্য আত্মহত্যা করেছে তার খবর রাখেন ?

অসিত। এ হচ্ছে আদর্শের অভাব, উভয় পক্ষেই।

সাধুলাল। আদর্শের অভাব নয় মশাই, খাদ্যের অভাব না হয় অবসর-সঙ্গিনীর অভাব। শাদা কথাকে ঘোলা করবেন না। শুকনো আদর্শে কারও পেট ভরে না।

অসিত। তা হলে মানুষ আর পশুতে তফাৎ রইল কি ?

সাধুলাল। অনেক বিষয়েই কোন তফাৎ নেই। এক এক করে ভেবে দেখুন।

অসিত। বুকে হাঁটা প্রাণী দু'পেয়ে মানুষে পরিণত হতে কয়েক কোটি বছর হয়ত পেরিয়ে গেছে। মানুষ নিজের মাথা খাটিয়ে নিয়মের শান্তিতে বাঁচবার ব্যবস্থা করেছে মাত্র কয়েক হাজার বছর। জানি না সব মানুষকে এই আদর্শে আসতে লক্ষ বছর লাগবে কিনা, কিন্তু যাঁরা এর মধ্যে পৌঁছে গেছেন, যাঁরা এই আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য জীবনপণ করেছেন তাঁরাই সভ্য মানুষ, সত্যিকারের মানুষ।

সাধুলাল। (হাসিয়া) আমি এক জনকে জানি, আপনার আদর্শে জীবনপণ করে এখন পাগল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়িয়ে খুব সভ্যতা দেখাচ্ছেন !

অসিত। (দৃঢ়তার সহিত) কত লোক হয়ত পাগল হয়েছেন, কত লোক জীবন দিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা যদি নিজের জীবন দিয়ে মানুষকে তার প্রতিজ্ঞার কথা, মানুষ-জীবনের পরম আদর্শের কথা মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে না দেন, তা হলে সভ্যতার দীপ যে নিভে যাবে ! মানুষ চতুষ্পদ জীবের পর্য্যায়ে নেমে যাবে। মানুষের জীবনে যুদ্ধের বেশে যখন ঘোর দুর্দ্দিন ঘনিয়ে আসে তখন এমনই আত্মদানের বেশী প্রয়োজন হয়।

সাধুলাল। ভীতু লোকেরাই শুধু যুদ্ধকে ভয়ানক ভাবে। পৃথিবীতে লোক বেশী হয়ে গেলে পাইকারি হারে কিছু মরবেই, সে ভূমিকম্পে হউক, মহামারী লেগে হউক, কি যুদ্ধে হউক।

অসিত। যুদ্ধে কি শুধু মানুষ মরে? মনুষ্যত্বের মৃত্যু হয়। যুদ্ধের আদর্শ খুন, চুরি, জুয়াচুরি, ডাকাতি, মিথ্যা—শান্তির সময়ে যা থাকে ঘৃণ্য এক একটা যুদ্ধের ফলে মানুষের সভ্যতা উল্টোরথে চড়ে বসে।

সাধুলাল। তার আমরা কি করতে পারি? যুদ্ধের জন্য তো আমরা সাধারণ লোক দায়ী নই।

অসিত। যতক্ষণ না কোন দেশের সাধারণ লোক যুদ্ধের জন্য পাগল হয়—অর্থাৎ তাকে পাগল করতে না পারা যায় এও বলতে পারেন—ততক্ষণ অতি বড় ডিক্টেটারও যুদ্ধ ঘোষণা করতে সাহস পায় না। জোর করে সৈন্যদলে ঢোকান যায় কিন্তু সত্যিকারের যুদ্ধ করান যায় না। জার্ম্মানীর কথাই একবার ভাবুন না?

সাধুলাল। জাপান-জার্ম্মানী যুদ্ধ করছে বলেই তো আমরাও নেমেছি। তাই তো বলছি, আমরা কি করতে পারি? শান্তির কথা তো অনেকেই বলেন কিন্তু সত্যিকারের পথ কেউ দেখাতে পারেন না।

অসিত। যুদ্ধের পথ যেমন যুদ্ধের জন্য পাগল হওয়া, শান্তির পথ তেমনি শান্তির জন্য পাগল হওয়া। এ যুদ্ধ থামলে পৃথিবীর সাধারণ লোকে যদি শান্তির জন্য পাগল হয় তা হলে আর কোন যুদ্ধবাজ যুদ্ধ বাধাতে সাহস পাবে না। অবশ্য অনেক যুদ্ধবাজ থাকবে, কিন্তু শান্তির প্রচারকারী যদি আরও বেশী উদ্‌গ্রীব হয়, শান্তির জয় নিশ্চিত।

সাধুলাল। শান্তির জন্য লোকে কেন পাগল হবে? সবাই দেখছে যুদ্ধের সময় সব কাজেই বেশী লাভ।

[ট্রেন থামিল। গোয়ালাটি তাহার টিন দুইটি কাঁধে ঝুলাইল]

সাধুলাল। ষ্টেশন নাকি?

দারোগা। হাঁ। আমরা এর পরের ষ্টেশনে নামব।

[পুলিসটি দাঁড়াইয়া দরজা দিয়া মুখ বাড়াইল]

অসিত। (জানালা দিয়া বাহিরে একবার মুখ বাড়াইয়া) কি রকম ষ্টেশন এটা। লোকজন নেই, একটা খাবারওলাও তো দেখছি না।

গোয়ালা। (জিনিষপত্র লইয়া পুলিসের পিছনে থামিয়া) সিপাই সাহেব, হাম হিঁয়া উতার যায়গা।

দারোগা। উতার যায়গা কিরে ব্যাটা, আমাদের মিষ্টি খাইয়ে যা। পয়সা পাবি।

গোয়ালা। বিক্রির না হুজুর! (পুলিসের পাশ কাটাইয়া নামিবার উপক্রম)

পুলিস। (ধমকাইয়া) এই, কিধার যাতা উল্লু! (বোঁচকা হইতে একটা ঘটি বাহির করিয়া গোয়ালার সামনে ধরিল) থানামে যানে মাংতা? এতনা মিঠাই বানানেকা চিনি কিধারসে চোরি কিয়া?

[গোয়ালা কাচুমাচু হইয়া ঘটি ভর্ত্তি করিয়া রসগোল্লা দিয়া দিল। দারোগা একটি টাকা ছুঁড়িয়া দিতে তাহা কুড়াইয়া লইয়া গোয়ালার দ্রুতপদে প্রস্থান। পুলিসটি ঘটি সামলাইতে ব্যস্ত এমন অবস্থায় তাহার পিছন দিয়া একজন মুসলমান ভিখারিণী উঠিয়া আসিল। তাহার পরনে একখানা নূতন ময়লা সাড়ি, মাথার চুল কিছু অবিন্যস্ত। বয়স বিশ-বাইশ হইবে। নজর করিয়া দেখিলে বিশেষ দুঃস্থা বলিয়া মনে হয় না।]

ভিখারিণী। (অসিতের নিকট গিয়া অতি সহজ কণ্ঠে) আমারে কিছু ভিক্ষা দেন বাবু। (হাত পাতিল)

অসিত। (দারোগাকে) একটা পয়সা থাকলে দিন তো।

ভিখারিণী। (তাড়াতাড়ি হাত পিছনে লইয়া) চাইর পয়সার কমে আমি ভিক্ষা লই না। মিলিটারী লঙ্গরখানার পিছনে গেলে অনেক ভাল ভাল খাওনের জিনিস পাওয়া যায়।

অসিত। আরে! তুমি ত বড়লোক দেখছি। তা হলে তোমাকে আমরা ভিক্ষা দি কেন?

ভিখারিণী। আপন্যারা ভিক্ষা দেন আপনেগো আখেরের লাইগ্যা।

পুলিস। (ভিখারিণীকে) এই উতরো, গাড়ী ছোড়তা। [ভিখারিণীর প্রস্থান] পুলিসটি দরজা বন্ধ করিয়া দিল (বাঁশী বাজিল ও গাড়ী ছাড়িল)

অসিত। অ্যাঁ! কি বলল?

দারোগা। বলল, আপনারা ভিক্ষে দেন আপনাদের পরকালের জন্য, তা না হলে ওনার ভিক্ষে করবার বিশেষ গরজ নেই, উনি শুধু মুখখানা দেখাতে এসেছিলেন। [সাধুলাল, দারোগা ও অসিতের উচ্চহাস্য, পুলিসটিও অর্দ্ধেক বুঝিয়া একটু দেরীতে হাসিতে সুরু করিল]

বৃদ্ধা। (বিরক্ত হইয়া) তা হলে ঢং করতে ভিক্ষের জন্য আসাই বা কেন রে বাপু?

সাধুলাল। (হাসিয়া) অভ্যাস বোধ হয়। দিনের বেলাটা তো কাটাতে হবে।

দারোগা। (অসিতকে) দেখুন; বলছিলাম না, যুদ্ধের বাজারে ভিখারীরও লাভ!

সাধুলাল। আপনার সঙ্গে ঠিক একমত হতে পারলাম না। যুদ্ধ শেষ হবার আগেই হয়ত দেখবেন এই মেয়েটাই কুষ্ঠ হয়ে রাস্তায় পড়ে আছে। আর এর মধ্যেই আর দশটা লোককেও যে মরবার সঙ্গী করে নি তাও জোর করে বলতে পারি না।

দারোগা। দু'একটা কেস হয়ত হতেও পারে, কিন্তু আর সকলে?

সাধুলাল। আর সকলের কথাই এক, কুষ্ঠ সকলেরই হবে,

দেহে কিম্বা মনে। যাদের আজকে দেখছেন নতুন গাড়ী হাঁকাচ্ছে, বাড়ী করছে, যুদ্ধের অতি-রোজগার থেমে গেলেও অতি-লোভটা যাবে না, শান্তির সময় এরা হঠাৎ লাভের বাঁকা পথ ধরবে। ক্রিমিনাল হবে।

দারোগা। বাঃ সমাজে যেন অপরাধ আর অপরাধী কোন কালে ছিল না।

অসিত। কিন্তু সাধুলোকের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। এবার অসাধুর দল সংখ্যায় অনেক ভারী হবে। এখনই দেখছেন, সমাজের যারা কোনদিন অসৎ কাজ করে নি এখন তারা রাত্রির অন্ধকারে চোর জোচ্চোরের কাছ থেকে চাল কিনছে, কাপড় কিনছে; আর এ খবর তাদের বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েদেরও অজানা থাকছে না। চোরের কেনা আর চোরের বেচা, এ দুয়ের মধ্যেকার সূক্ষ্ম পার্থক্য ভেঙে পড়তে দেরী হয় না। এরাই একদিন বড় হবে। সভ্য সমাজের বুনিয়াদ চোখের সামনেই ধ্বসে পড়ছে।

সাধুলাল। সমাজই যখন ভেঙে পড়ছে তখন চাচা আপন-প্রাণ বাঁচা নীতিই ভাল। [গ্লাসে মদ লইয়া আস্তে আস্তে খাইতে লাগিল] (দারোগাকে) চলবে নাকি একটু ?

দারোগা। না, ও অভ্যাসটা এখনও করি নি।

অসিত। গীতায় পড়েছিলাম, পৃথিবী যখন ঘুমোয় মুনিরা তখন জেগে থাকেন, পৃথিবী জাগলে তবে মুনিরা ঘুমোন। আমি মনে করি সভ্যতার শিয়রে এখন কারও কারও জেগে থাকবার প্রয়োজন আছে। আপন প্রাণ সকলের কাছে বড় নয়।

সাধুলাল। হোঃ। জেগে থেকে কাজটা কি করবে ?

অসিত। বাইবেলের গল্পে পড়েছিলাম, সমস্ত পৃথিবী যখন একবার বন্যায় ভেসে গিয়েছিল, নোয়া বলে একজন লোক পৃথিবীর সকল জীবজন্তুর নমুনা সংগ্রহ করে বাঁচিয়ে রেখেছিল। সভ্যতার বীজগুলিও যাতে নির্ম্মূল হয়ে না গিয়ে কারও কারও মধ্যে বেঁচে থাকে সে চেষ্টা করতেই হবে।

দারোগা। তা হলে আপনি স্বীকার করে নিচ্ছেন বন্যার মত যুদ্ধও কেউ ঠেকাতে পারে না।

অসিত। এ যুদ্ধ হয়ত পারবে না কিন্তু পরের যুদ্ধ নিশ্চয়ই পারবে।

দারোগা। কি করে? ওয়ার টু এণ্ড ওয়ার, এই তো চিরকাল শুনে আসছি।

অসিত। না। উদ্দেশ্য যাই হোক, যুদ্ধ সবই এক। যুদ্ধের বীভৎস রূপ সকলেই জানে কিন্তু কালের ব্যবধানে তা ভুলে যায়। নূতন রক্তের উদ্দামতা পুরনো রক্তের সাবধানতাকে ডুবিয়ে দেয়। সমুদ্র পাহাড় আর রাজনৈতিক সীমারেখা অতিক্রম করে প্রত্যেক তরুণ-তরুণীর কানে বার বার শোনাতে হবে মানুষের সভ্যতা কি দিয়ে তৈরী হয় আর যুদ্ধ তাকে কি করে ভাঙে. গল্প নয়, সত্যি-কারের বিবরণ দিয়ে। একমাত্র যুবশক্তি যদি যুদ্ধের বিরোধী হয় তবেই যুদ্ধ আর বাধবে না।

দারোগা। (জানালা দিয়া একবার বাহিরে তাকাইয়া) ষ্টেশন আসছে, এবার আমাদের নামতে হবে অসিতবাবু। যা ভিড় দেখছি, একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে।

[সাধুলাল সামান্য একটু বেসামাল হইয়াছে মনে হইল। সে ঘন ঘন একবার অসিত ও একবার ছবির দিকে তাকাইয়া গ্লাস হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল]

সাধুলাল। (অসিতের দিকে হাত বাড়াইয়া) নো অফেন্স মিষ্টার।

অসিত। (উঠিয়া সাধুলালের করমর্দ্দন করিয়া) না, অফেন্স কিসের ?

সাধুলাল। অফেন্স একটু দিতে পারতাম কিন্তু দিলাম না। আপনার শহরে আমি ছিলাম, আপনার কথা আমি সব জানি। আপনার ভাবী-পত্নীকে ফেলে এসেছেন, আপনার চিন্তা হয় না ?

অসিত। (হাসিয়া) কিসের চিন্তা ?

সাধুলাল। শহরে কত রকম লোক এসেছে, আমার স্ত্রীর মত তাকে যদি কেউ নিয়ে যায় ?

অসিত। (মুখখানি হাসিতে আরও উদ্ভাসিত হইল) তাকে আপনি জানেন না; কত সুন্দর নিষ্পাপ সে!

[দারোগা ও পুলিসটি উঠিয়া দাঁড়াইল]

দারোগা। আসুন অসিতবাবু। (জানালা দিয়া) এই কুলী।

অসিত। (বৃদ্ধাকে) এবার দিদিমা তুমি ওদিকে গিয়ে ঐ মহিলাটির কাছে বস। এখখুনি গাড়ীতে হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে। (হাত ধরিয়া অপর পাশের বেঞ্চিতে পার করিয়া দিয়া সাধুলালকে) একে একটু দেখবেন। (সাধুলাল বৃদ্ধাকে ছবি ও নিজের মাঝখানে বসাইয়া ফিরিয়া আসিল।

[একজন কুলী আসিয়া চাউলের বস্তাগুলি সরাইয়া বাক্স-বিছানা নামাইতে লাগিল। সাধুলাল ভিতরের দিকে পিছন ফিরিয়া কুলীকে সাহায্য করিতে লাগিল। দারোগা, পুলিসটি ও অসিত নামিয়া গেল। ইতিমধ্যে]

বৃদ্ধা। (ছবিকে) বড় ভাল ছেলে মা। (ছবি বৃদ্ধাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে সুরু করিল। বৃদ্ধা ছবির সাড়ি ও গহনা হাত দিয়া দেখাইয়া) এমন সুন্দর সাড়ি পরেছ, গয়না পরেছ, তুমিও কাঁদছ! তোমাকেও কি যুদ্ধে কাঁদাচ্ছে মা? (ছবিকে জড়াইয়া ধরিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। ছবি হঠাৎ বৃদ্ধাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দাঁড়াইল এবং ষ্টেশনের উল্টো দিকে নামিয়া গেল)।

সাধুলাল। (জিনিসপত্র নামান হইলে দরজার বাহিরে মুখ গলাইয়া) নমস্কার! (সাধুলাল আস্তে আস্তে ভিতরের দিকে মুখ ফিরাইতে লাগিল এমন সময়—)

(যবনিকা)

মহানগরীর জাগরণ

শ্রীকৃষ্ণধন দে

হে মহানগরী, এখনো তোমার ভাঙ্গে নি ঘুম ?
শর্বরাত্রির ঝাপ্‌সা-আঁধারে তন্দ্রাতুর ?
আকাশের মাঠে জেগেছে আলোক-তৃণাঙ্কুর,
কালো চাদরের আড়ালে মাটিতে সব নিঝুম্‌ !

চক্‌চকে পথ যেন লক্‌লকে জিহ্বা কার,
প্রাসাদের সারি সিঁড়ি-গুলা কোন্‌ দৈত্যলোক,
ম্লান আলোগুলো আধবোজা কার কুটিল চোখ,
শেষের প্রহরে ওৎ পেতে যেন খোঁজে শিকার !

ফিকে আকাশের বুকে ওড়ে ছেঁড়া মেঘের দল
সাগর-বেড়ানো হাঙরের মত আব্‌ছা রং,
গরুর গাড়ীর চাকার নেমীতে বাজে সারং,
স্কাভেঞ্জারের ঘোড়ার খুরেতে বাজে মাদল !

ভর্ত্তৃ-বিহীনা-রাত্রিজঠরে কম্পমান,
আলোকের ভ্রূণ, লজ্জায় ধরা কৃষ্ণ-নীল,
কুৎসিত-হাতে ইঙ্গিত হয়ে উড়িছে চিল,
গোপন হাসির আভায় আকাশ ধূসর-ম্লান !

পূর্ব্বাচলের দ্বার খুলি' আসে আলো-মিছিল,
বিপ্লবী-হাতে রক্তপতাকা কি সুন্দর !
দৃঢ় মুঠি দিয়ে আগে ধরে ধনী-গৃহ-শিখর,
ভোরের কুয়াসা থম্‌থম্‌ করে শঙ্কানীল !

শিরা-উপশিরা-স্নায়ু-পেশীমাঝে জাগে কাঁপন,
বন্দীশালায় সদ্য জেগেছে মহাপাগল,
ইট-কাঠ-মাটি-লোহা ও পাথরে বাঁধা শিকল—
পাশমোড়া দিতে বেজে বেজে ওঠে ঝনাৎ-ঝান্‌ !

হে মহানগরী, অতীত নিশার ছায়া-স্বপন
একে একে চোখে ভাসিছে এখনো আলো-ধাঁধায় ?
ঘোলাটে আকাশে কোন্‌ ছবি ফোটে কালো-সাদায়,
মনে কি পড়েছে যা' কিছু আঁধারে ছিল গোপন ?

ভীরু নবোঢ়ার প্রণয়স্বাদের পহেলি রাত,—
শঙ্কায় লাজে রাঙা হয়ে গেল দুটি কপোল,
দ্রুত নিঃশ্বাসে অঙ্গে জড়ায় নীল নিচোল,
মৃদু কম্পনে কাঁপিছে কাঁকন-পরানো হাত !

হে মহানগরী, প্রাণপ্রপাতের সুরোল্লাস
যামিনীবিলাসে শুনেছিলে কানে স্বপ্নাতুর ?
কত পাপ-নটিনী শ্লথ-করে তার খোলে নূপুর,
মদিরোৎসবে এলায়ে দিয়েছে অঙ্গবাস !

কুয়াসা-জড়ানো ল্যাম্প্‌-পোষ্টের মৃদু আলোক
নির্জ্জন পথে এঁকে দেয় চোখে মায়াকাজল,
অপেক্ষমাণা বারবধূটির চেলাঞ্চল
ঢাকিতে পারে না চঞ্চল দুটি তীক্ষ্ণ চোখ !

রং-মাখা-ঠোঁটে বরিছে প্রণয়ী প্রতিনিশার,
বিষকন্যার চুম্বনে নর বিষকাতর,
মৌসুমী ফুলে বাণ খুঁজে ফেরে পঞ্চশর,
ক্ষণবসন্ত ধরা পড়ে জালে মরুভূমার !

হে মহানগরী, তোমার স্বপ্ন, তোমার রাত,
বীভৎসরূপ কুহেলি আঁধারে কি পাণ্ডুর !
তোমার বিরাট্‌ প্রাসাদ-আড়ালে তৃষ্ণাতুর
জীবনযাত্রী পথ খুঁজে নিতে বাড়ায় হাত !

গভীর রাতের আঁধার ভেদিয়া জ্বলে হাপর,
কাস্তে-হাতুড়ি বানায় কামার নেশায় বুঁদ্‌,
ঠক্‌-ঠকাঠক্‌ ফুল্‌কি আগুনে ওড়ে বারুদ্‌,
কাল্‌শিরা-ওঠা হাত হয় কালো, ঘামে পাঁজর !

কোথাও বেতালা গানের গমকে বাজে ঢোলক,
—খোলার বস্তি, পচা নর্দ্দামা, অসহ রাত,
নড়বড় করে চটের পর্দ্দা, ফোকলা দাঁত,
হাসে কোথা বুড়ী, কাশে কোথা বুড়ো খকর্‌-খক্‌ !

বয়স-পাকানো মেয়েগুলো কোথা ঠুংরী গায়,
খনখনে গলা গান গেয়ে গেয়ে সাঁঝ্-সকাল,
রং-চটা-মগে মদ ঢেলে খায় পাঁড়-মাতাল,
ঘেয়ো কুকুরেরা কেঁউ-কেঁউ করে' কি কাৎরায় !

গাদা-করা আছে আস্তাবলের নোংরা খড়,
তারি একপাশে কুঁকড়ে রয়েছে ভিখারী-দল,
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে যে-মেয়েটি মোছে চোখের জল,
রেগে উঠে এসে সর্দ্দার তারে মারে চাপড় !

পাষাণ-প্রাসাদে নির্ম্মমতার লাগে ছোঁয়াচ,
বাস্তুহারারা ইষ্টিশানেই বেঁধেছে ঘর,
চোখে ভাসে শুধু দূরে সরে' যাওয়া পদ্মাচর,
মশাল-আগুনে চলেছে কোথায় পিশাচ-নাচ !

নগর-শ্মশানে নিভে আসে চিতা বহ্নিমান,
সদ্য-বিধবা শাঁখা-ভাঙা-হাতে মোছে সিঁদুর,
নদীর ওপারে ডোবে ম্লান চাঁদ শোক-বিধুর,
শেষ জোছনায় হ'ল যে তাহার মুক্তি-স্নান !

চট্‌কলে কোথা বাজে হুইসল্, জাগে শ্রমিক,
মা-মরা মেয়েটি কচি হাতে গলা ছাড়ে না তার,
বার বার করি' পুতুল আনার অঙ্গীকার,
শিরা-ওঠা হাতে বুকে চেপে তারে ধরে ক্ষণিক !

গ্রাম্যবধূটি ভোরে জানালায় দেখে শহর,
যূথী-মালতীর স্বপন-জড়ানো ডাগর চোখ,
মনে পড়ে' যায় নিকানো উঠানে চন্দ্রালোক,
বনতুলসীর গন্ধ-উতলা শেষ প্রহর !

বাতাস-কাঁপানো সজিনার ফুলে হারানো মন,
আম-বউলের নেশায় বিভোর ফাগুনরাত,
কোন্ সে ডাইনী মন্তর দিয়ে অকস্মাৎ
ইট ও পাথরে বদল করেছে শিউলিবন !

হে মহানগরী, দিনের আলোকে যারা লুকায়,
শোন নি কি কানে তাদেরি গোপন পদক্ষেপ ?
তাদের মুখোশে দেখ নি আঁধার-কালো প্রলেপ ?
শকুনের মত হিংসালু কারা ঘুরে বেড়ায় ?

প্রোষিত-ভর্ত্তা-মদিরাক্ষীর কাটে না রাত,
যৌবন তার সাপ হয়ে যেন তনু জড়ায়,
কবরীমালার নিশিগন্ধা সে ছিঁড়ে ছড়ায়,
অভিমানে ঢালে বারিধারা দুটি আঁখিপ্রপাত !

দুধের ফেনায় ছায়াপথ বুঝি হয় পিছল,
তাই অপ্সরী নামে রূপ ধরি বিদেশিনীর,
সোনালী বেণীতে দোলে অর্কিড্ অতনুতীর,
দূর্ব্বাগন্ধী কালোমাঠে ঘোরে প্রেম-পাগল !

হে মহানগরী, স্থবিরা পৃথিবী মুক্তি চায়,
দ্বিধা-সংশয়ে বন্ধন তার হয় শিথিল,
আর্ত্তরাতের ক্রন্দনে কাঁপে সারা নিখিল,
মানুষের হাটে মানুষ শুধুই কোথা লুকায় !

কোথা শোকাতুরা জননী গণিছে দণ্ডপল,
অসহ ব্যথায় মাথা কুটে কারে করে স্মরণ,
ফাঁসীর মঞ্চে সন্তান তার বরে মরণ,
আসন্ন ঊষা হেরি অন্তর হয় বিকল !

রক্ত-পিপাসু কালো বাদুড়ের পাখা-ঝাপট,
কঙ্কালরূপী সর্ব্বহারারা বকে প্রলাপ,
হিমপাণ্ডুর বিবর্ণ ঠোঁটে কি অভিশাপ,
নোঙ্গর-হারা ভাঙা তরী খোঁজে সিন্ধুতট !

হে মহানগরী, গত রজনীর স্বপ্ন শেষ,
ইন্দ্রজালের পটভূমি ধরে রূপ নূতন,
কালো-যবনিকা দূরে ফেলি ওড়ে আলো-কেতন,
জীবন-বীণায় ঝঙ্কৃত নব ছন্দ-রেশ !

শিকারী রাত্রি তোমার শিয়রে পেতেছে জাল,
এক চোখে তার জ্বলে নৃশংস হিংসানল,
আর-চোখ তার করুণামায়ায় হয় সজল,
স্ফুট-অস্ফুট ইঙ্গিত বুকে নামে সকাল !

বিদ্বদ্‌বল্লভ বসন্তরঞ্জন

শ্রীসুখময় সরকার

গত বৎসর (১৩৫৯) পূজার পাঁচ-সাত দিন পরে বেলিয়াতোড় গিয়াছিলাম। সঙ্গে ছিলেন এক বিদ্যানুরাগী বন্ধু। তিনি বলিলেন, "এই গ্রামেই বিদ্বদ্‌বল্লভ মশাইয়ের বাড়ী নয়? একবার সাক্ষাৎ করলে হ'ত।"

বেলিয়াতোড়ে আমার মাতুলালয়। এই হেতু বাল্যকালে বসন্তরঞ্জন রায়—বিদ্বদ্‌বল্লভ মহাশয়কে কয়েকবার দেখিবরে সুযোগ হইয়াছিল। মাতুলবংশের সহিত তাঁহার সম্পর্কও ছিল। শুনিতাম, রায়মহাশয় খুব পণ্ডিত লোক। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। প্রকৃত বসন্তরঞ্জনকে তখন কি চিনিতাম? কলেজে পড়িবার সময় জানিলাম, বড়ু-চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-পুথি আবিষ্কার বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা এবং বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্‌বল্লভ মহাশয় ইহার কলম্বাস। বসন্তরঞ্জন-সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মুদ্রিত সংস্করণ দেখিয়া তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও কৃতিত্বের পরিচয় পাইলাম। পুথিটি কেবল আবিষ্কার করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, উহা উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়া টীকা টিপ্পনী সহযোগে প্রকাশ করিয়াছেন। কোনও বাংলা পুথি এমন সুসম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।

সেই অবধি বসন্তরঞ্জনকে নূতন করিয়া দেখিবার একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা বহুদিন হইতেই হৃদয়ে বহ্নিশিখার মত জ্বলিতেছিল। বন্ধুর প্রস্তাবে তাহাতে যেন ঘৃতাহুতি হইল। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। রাত্রি আটটার ট্রেন ধরিয়া বাঁকুড়ায় ফিরিতে হইবে। অন্য সকল কাজ ফেলিয়া বিদ্বদ্‌বল্লভ মহাশয়ের দর্শনলাভের জন্য দুই বন্ধু মিলিয়া তাঁহার দ্বারস্থ হইলাম। দ্বারে এক কিশোর দাঁড়াইয়া ছিল। বোধ হয় বসন্তবাবুর পৌত্র। তাহাকে বলিলাম, "ভাই, বসন্তবাবুকে একটু সংবাদ দাও তো, আমরা বাঁকুড়া থেকে এসেছি, তাঁর সঙ্গে দেখা করব।"

বসন্তবাবু তখন আহার করিতেছিলেন। বয়স অধিক হইয়াছিল, সন্ধ্যাকালেই আহার সারিয়া লইতেন। শ্রবণশক্তি অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছিল। কিশোর তাঁহার কানের কাছে মুখ লইয়া খুব জোরগলায় আমাদের আগমন-সংবাদ জানাইলে তিনি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "বেশ, বেশ। বৈঠকখানায় বসতে বল।"

আমরা কয়েক মিনিট বৈঠকখানায় অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় কিশোরটি তাঁহাকে ধরিয়া ধরিয়া লইয়া আসিল। মেঝেয় শতরঞ্চী পাতা ছিল, তাহাতেই তিনি আমাদের সঙ্গে বসিলেন। বার্ধক্যশীর্ণ দেহ, দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রু, দৃষ্টি অন্তর্মুখী। পরিধেয় বস্ত্রটি অনতিপরিসর, ঊর্ধ্বাঙ্গে একটি মোটা চাদর। আমরা প্রণাম করিতেই কুণ্ঠিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আপনারা কি ব্রাহ্মণ?" কণ্ঠে এখনও
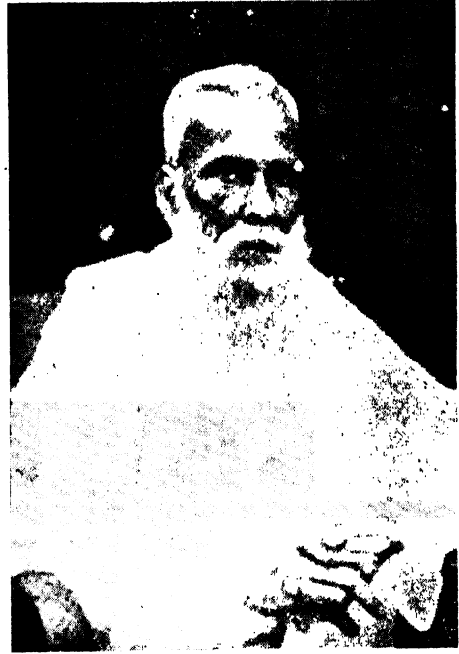
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

ওজস্বিতা আছে। বিশেষ পরিচয় না দিয়া বলিলাম, "আজ্ঞে না। আর হলেই বা কি? আপনি বর্ষীয়ান্ মনীষী, সকলেরই প্রণম্য।"

একটু হাসিয়া বলিলেন, "বর্ষীয়ান্ বটি, কিন্তু মনীষী নই। আমি এন্ট্রান্স পাস নই। তা ছাড়া আমি কি-ই বা করেছি?"

"আপনি যা করেছেন, অন্যের কাছে যাই হোক, বাংলা ভাষা আর বাংলা-সাহিত্যের অনুরাগীদের নিকটে তার মূল্য অসামান্য।"

"না, না। আমি বৈষ্ণব-বিনয়ে এ কথা বলছি না। বাস্তবিক দেশের উপকারার্থে আমি কিছুই করি নাই। করবার ক্ষমতাই বা কি? যেটুকু করেছি, তাঁরই কৃপা।" এই বলিয়া তিনি ঊর্ধ্বে হস্ত উত্তোলন করিয়া, বোধ হয় সেই অজ্ঞাত চিন্ময় পুরুষকে স্মরণ করিলেন। মনে হইল, ইনি যথার্থই বিদ্বান্। বিদ্যার ফল যে বিনয়, তাহা ইঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিলাম।

তিনি বলিলেন, "আপনারা এসেছেন, আনন্দের কথা। কিন্তু বাড়ীতে লোকজন নাই, আপনাদের যত্ন করতে পারছি না।"

আমরা বলিলাম, "না, না। সেজন্য আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না; আমরা কেবল আপনাকে দর্শন করতে এসেছি; এখনই চলে যাব। আপনার জন্মস্থান কি এখানেই?"

"হাঁ। এই বেলেতোড়ে। পিতার নাম রামনারায়ণ রায়।"

"জন্মদিবস?"

"বাংলা ১২৭২ সাল। তারিখটা ঠিক মনে নাই। সেদিন জিতাষ্টমী ছিল। জিতাষ্টমী জানেন তো?"

"আজ্ঞে, জানি। গৌণচান্দ্র আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমী; মহাষ্টমীর পূর্ব্বের অষ্টমী।"

"বটে! আপনি জ্যোতিষ-চর্চা করেন না কি?"

"আজ্ঞে না। তবে যোগেশবাবুর সাহিত্য-সাধনায় সহযোগিতা করবার সুযোগ পেয়ে কিছু কিছু শিখেছি।"

যোগেশচন্দ্রের নাম শুনিয়াই তিনি সশ্রদ্ধ যুক্তকরে বলিলেন, "বিদ্যানিধি মহাশয়ের কথা বলছেন?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তাঁকে নমস্কার করি। তিনি যথার্থ বিদ্যানিধি। তাঁর জন্য আমাদের বাঁকুড়া জেলা ধন্য হয়েছে।" একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "কিন্তু তিনি যে 'চণ্ডীদাস চরিত' পুথিখানা সম্পাদন করেছেন, ওটা জাল। আমার শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন প্রকাশিত হলে তিনি 'প্রবাসী'তে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সংশয়' লিখেছিলেন। তাঁর 'চণ্ডীদাসচরিত' প্রকাশিত হলে আমিও 'চণ্ডীদাসচরিতে সংশয়' লিখলাম।" বলিয়া তিনি উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন; প্রাণখোলা শিশুর হাসি।

আমি বলিলাম, "বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, 'চণ্ডীদাস-চরিতে' অনেক প্রক্ষেপ আছে সত্য, কিন্তু পুথিটা একেবারে জাল নয়। এতে এমন সব কথা আছে, যা ইদানীং কেউ লিখতে পারত না।' তিনি বলেন, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সম্পাদন বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের অক্ষয় কীর্ত্তি; যত দিন বড়ু চণ্ডীদাসের নাম থাকবে তত দিন তাঁরও নাম থাকবে।"

"আমাকে তিনিও 'বিদ্বদ্বল্লভ' বললেন? নবদ্বীপের ভুবনমোহন চতুষ্পাঠী আমাকে এই উপাধিটা দিয়েছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত-পণ্ডিতেরা স্বভাবতঃ অত্যুক্তিপ্রিয়। আমার বিদ্যা কারও জানতে বাকী নাই। পুরুলিয়া জেলা ইস্কুল হতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছিলাম, অঙ্কে ফেল্ল হয়ে গেলাম। আর ইস্কুলে পড়া হ'ল না। কিন্তু আমার খেয়াল হ'ল, যে বই সবাই পড়েছে, শুধু এমন বই পড়ব না; যে বই কেউ পড়ে নি এমন বই পড়তে হবে। সমস্তিপুরে রেল-আপিসে একটা চাকরি জুটেছিল। কিন্তু লেখাপড়া ছাড়ি নাই। মৈথিলী, অসমীয়া, বাংলা, উড়িয়া বাড়ীতে বসেই পড়তে লাগলাম। আর সুযোগ পেলেই গাঁয়ে গাঁয়ে পুথি সংগ্রহ করে বেড়াতাম। এ পর্যন্ত আমি আট শত পুথি সংগ্রহ করেছি, আর সবগুলিই সাহিত্য-পরিষদকে উপহার দিয়েছি। বিষ্ণুপুরের কাছে কাঁকিল্যা গ্রামে এক গৃহস্থের গোয়ালঘরের মাচায় আরও পাঁচ-ছয়টা অন্য পুথির সঙ্গে একদিন পেয়ে গেলাম বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। সেই দিনই আমার পুথি-সংগ্রহের সাধনায় সিদ্ধি।"

বাস্তবিক বসন্তরঞ্জন যদি কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিই আবিষ্কার ও সম্পাদন করিতেন, তাহা হইলেই তিনি অমর হইয়া থাকিতেন।

আচার্য যোগেশচন্দ্রের সহিত তাঁহার পত্রালাপ হইত। ১৩২৪।৩১ জ্যৈষ্ঠ তারিখে কলিকাতা হইতে যোগেশচন্দ্রকে লিখিত তাঁহার এক পত্রের কিয়দংশ অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি:

"* * * কৃষ্ণকীর্তনের পাতা উল্টাইতেছেন, অবশ্য টীকাও দেখিতেছেন, ইহাতেই শ্রম সফল জ্ঞান করিতেছি। টীকা লিখিতে কতকাল লাগিয়াছিল, কেন এ প্রশ্ন করিয়াছেন, বুঝিলাম না। দীর্ঘকাল—জীবনের অর্দ্ধেক একমাত্র প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের অনুশীলনে কাটাইয়া দিয়াছি। এ সম্পর্কে ২।১০ খানা হাতের লেখা প্রাচীন পুথি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছি। বাংলা ভাষার প্রকৃতি অবধারণের অভিপ্রায়ে প্রাকৃত এবং কোন কোন আধুনিক ভাষা তথা সাহিত্যের কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিয়াছি এমন নহে। এখন অসঙ্কোচে বলিতে পারি, বাংলা ভাষা সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতার দৌড় বড় বেশী নয়। কৃষ্ণকীর্তন-সম্পাদনে ভ্রম-প্রমাদ, ত্রুটি-বিচ্যুতি যথেষ্ট থাকিবার সম্ভাবনা। যাহা হউক, আপনাদের বক্তব্য জানিলে সুখী হইবে। * * *"

গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া পুথি সংগ্রহ করা সহজ কাজ নহে। বহু স্থানে তাঁহাকে বিপন্ন হইতে হইয়াছে, প্রাণসংশয় পর্যন্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার পুথিসংগ্রহের সাধনায় বিরতি হয় নাই। প্রাচীন পুথির মধ্যে পুরাতন, অধুনালুপ্ত শব্দগুলি

তাঁহাকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিত এবং সেগুলি তিনি সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। পুথিসংগ্রহ ও সাহিত্য-পরিষৎকে তাহা উপহার দেওয়ার জন্য পরিষদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক অতি নিবিড় হইয়া উঠে। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং দীনেশচন্দ্র সেনের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ও পরে সৌহার্দ্য জন্মে। পরিষদের তদানীন্তন সম্পাদক ত্রিবেদী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের কার্য-বিবরণীতে (১৭-বর্ষ, ১৩৩ পৃষ্ঠা) বলিয়াছিলেন,

"বসন্তবাবু পরিষদের পুথি-সংগ্রাহক। তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে পরিষদে পুথির সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এবং কতকগুলি নূতন নূতন পুথির উদ্ধার হইয়াছে। এই পুথি সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে হয়। তজ্জন্য ইঁহার খাই-খরচ আছে, বাহনের খরচ আছে; পরিষদ হইতে তিনি তাহার এক কপর্দকও লয়েন না, বা এই কার্যের জন্য পারিশ্রমিক হিসাবেও কিছু চাহেন না। * * আমি পরিষদের এই চির উপকারী সদস্যকে ইহার বিশেষ সদস্যপদে নির্ব্বাচিত করিতে প্রস্তাব করিতেছি।"

রামেন্দ্রসুন্দরের এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং বসন্তরঞ্জন কর্ম্মে অবসর গ্রহণের পরেও বিশেষ সদস্যরূপে পরিষদের সেবা করিতে থাকেন। কিছুদিনের জন্য তিনি পরিষদের পুথিশালার কর্মীরূপেও কার্য করিয়াছিলেন। সাহিত্য পরিষদের জন্মকাল হইতেই বসন্তরঞ্জন ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরিষদের পূর্ব রূপ 'বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার'-এরও তিনি সদস্য ছিলেন।

তাহার পর বসন্তরঞ্জনের জীবন-প্রবাহ এক নূতন খাতে বহিল। এতকাল তিনি শিক্ষার্থী ছিলেন, এইবার শিক্ষক হইলেন। স্যর আশুতোষের একান্ত যত্নে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু অধ্যাপক কোথায়? তখন আমাদের দেশের অধিকাংশ বিদ্বান ইংরেজী-নবীশ। একদা রামেন্দ্রসুন্দর আশুতোষের নিকটে গিয়া বলিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার আসন প্রতিষ্ঠা হইল, এখন মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবকের সমাদর কর্তব্য; বসন্তরঞ্জন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা অধ্যাপনার উপযুক্ত ব্যক্তি। আশুতোষের ন্যায় গুণগ্রাহী আর কে ছিলেন? তাঁহার মত 'লোক বাছিতে' আর কে জানিতেন? ডিগ্রীর আড়ম্বরে ভুলিবার পাত্র তিনি ছিলেন না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকপদে বসন্তরঞ্জনকে নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিলেন। আশুতোষের এক প্রিয়পাত্র ইহাতে এই বলিয়া আপত্তি জানাইয়াছিলেন যে বসন্তবাবু ইংরেজী জানেন না। বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বসন্তরঞ্জন ইং ১৯১৯ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-পদ লাভ করেন।

তিনি বলিলেন, "এক দিন কলকাতায় ট্রামে চলেছি। সেনেট হাউসের সামনে ট্রাম দাঁড়াতেই দীনেশ সেন এসে উঠলেন। আমায় দেখে বললেন, 'ইউনিভারসিটিতে আপনার চাকরি হয়ে গেছে, খবর পেয়েছেন?' আমি বললাম, 'না, আমি তো জানতে পারি নি।' সেন মহাশয় বললেন, 'কর্তার সঙ্গে একটু সাক্ষাৎ করা দরকার।' কর্তা মানে আশুতোষ। কেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে, কি বলতে হবে, কিছুই জানি না। আমরা বাঁকড়ী লোক, তোষামোদ করতেও শিখি নাই। যাই হোক, পরদিন সকালে আশুতোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। সেই কৃষ্ণবর্ণ বিরাট বপু আর সেই প্রকাণ্ড গোঁফ জোড়াটা! বাঘই বটে! আমি যেতেই উঠে দাঁড়ালেন, সাদর সম্ভাষণ করে বসতে বললেন। আমি কোন কথা বলবার পূর্ব্বেই তিনি বললেন, 'আমি কাজের ভার তো অপাত্রে অর্পণ করি নি।' আমি হাঁ-না কিছুই না বলে চলে এলাম। সেই অবধি ইং ১৯৩২ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছি।"

বাংলা ১৩৪০ এবং ১৩৪৮-৫৩ সনে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ইতিপূর্বে তিনি "বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ" সঙ্কলন করেন। ইহার বহু পূর্বে ১৩১৬ সালে তিনি 'ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল,' 'সারঙ্গ-রঙ্গদা', ১৩১৭ সালে 'কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী' এবং ১৩২৩ সালে 'চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' সম্পাদন ও প্রকাশ করেন। দীনেশচন্দ্রের সহযোগিতায় তিনি 'গোপীচন্দ্রের গান' এবং জয়নারায়ণ সেনের হরিলীলা' সম্পাদন করেন; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই দুখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। অটলবিহারী ঘোষের সহযোগিতায় তিনি 'কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন' সম্পাদন করেন। এই পুস্তক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ ১৩৩২ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করিয়াছেন।

বসন্তরঞ্জনের অন্তরে যে রসের ফল্গুধারা বহিত, পরিষৎ পত্রিকায় "ছেলেভুলানো ছড়া" সঙ্কলন করিয়া তিনি তাহার পরিচয় দিয়াছেন। যাঁহাদের সাধনায় আমরা বাংলার লোক-সাহিত্যকে মর্যাদা দিতে শিখিয়াছি এবং লোকসাহিত্যের মধ্যেও উৎকৃষ্ট সাহিত্য-রসের সন্ধান পাইয়াছি, বসন্তরঞ্জন তাঁহাদের অন্যতম।

"পুঁটু যদি গো কাঁদে,
আমি ঝাঁপ দিব গো বাঁদে।
পুঁটু যদি গো হাসে,
আমি উঠব ভেসে ভেসে।"

এইরূপ গ্রাম্য ছড়ার মধ্যে তিনি যে অকৃত্রিম বাৎসল্য-

রসাবগাঢ় মাতৃহৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি ছড়া-সঙ্কলনের প্রেরণা লাভ করেন।

সাহিত্য-সাধনার পুরস্কারস্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ইংরেজী ১৯৪১ সালে 'সরোজিনী-স্বুবর্ণপদক' দানে সম্মানিত করেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বসন্তরঞ্জন প্রাচীন পুথির পুরাতন শব্দ সঙ্কলন করিতে আরম্ভ করেন। এই কর্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কলিকাতার রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি তাঁহাকে ইংরেজী ১৯৪৪ সালে সদস্য রূপে গ্রহণ করেন। পরিষৎ পত্রিকায় তাঁহার "দ্বাদশ শতকের বাংলা শব্দ" প্রকাশিত হইয়াছিল।

ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'বাংলা ভাষা-তত্ত্বের ভূমিকা' পুস্তকে লিখিয়াছেন, "বসন্তবাবুকে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ঘুণ বলা হয়েছে। এটি তাঁর যথাযথ বর্ণনা। এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ বাংলাদেশে দ্বিতীয় ব্যক্তি আছেন বলে তো জানি না।" সুনীতিকুমারের এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত আচার্য যোগেশচন্দ্রের 'গহনা' শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়া কলিকাতা হইতে ইংরেজী ১৯২৭।৩ নবেম্বর তারিখে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি; তাহাতে তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত 'বাংলা সাহিত্যের ঘুণ' বিশেষণটি যে কতদূর সার্থক, তাহা প্রমাণিত হইবে:

"* * * 'চুড়ি' নাম নেহাৎ হালী মনে হয় না। নীচে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

বাহুতে কনক চুড়ি মুকুতা রতনে জড়ি
রতন কঙ্কণ করমূলে। কৃ. কী. পৃ. ৩৮১।
বেশর খচিত শতেশ্বরী পহিরল
চুরি কনক করকঞ্জে। বিদ্যাপতি, পৃ. ৩২৮।
শঙ্খের উপরে শোভে কনকের চুড়ি।
মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, পৃ. ৮২।

কনক কঙ্কণ চুড়ি বাহুর উপরে তাড়।
কৃত্তিবাসী—লঙ্কা, পৃ. ৫০৪।
খসিয়া পড়িল হাতের সুবর্ণের চুড়ি
বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণ, পৃ. ৯৭।
পরি দিব্য পাট শাড়ী কনক রচিত চুড়ি
দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ। কবিকঙ্কণ, পৃ. ১১৭।
শঙ্খের উপরে পরে কনকের চুড়ি। ঐ পৃ, ১৫৭।
'চুরি গুজরাতী'। আলাওলের পদ্মাবতী।
কারিকুরী করে পরে কাঞ্চনের চুড়ি।
মাণিকের ধর্মমঙ্গল।
সুবলিত ভুজে সাজে কাঞ্চনের চুড়ি।
রামেশ্বরের শিবায়ন।

আর বিস্তরে প্রয়োজন নাই। তফাতের মধ্যে গহনাটি ক্রমে বাহু হইতে করমূলে নামিয়াছে। হেমচন্দ্রের 'দেশী নামমালা' ও ধনপালকৃত 'পাইঅলচ্ছী নাম মালা'তে বলয় অর্থে চুড় শব্দ ধৃত হইয়াছে। প্রায় শত বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হৌটনের (sir G. C. Haughton) বাংলা অভিধানে 'চুড়ি' শব্দ আছে। * * *"

এক 'চুড়ি' শব্দের উল্লেখ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বসন্তরঞ্জন যে কত পুথি ঘাঁটিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে পাঠকের বিস্ময়ের অবধি থাকিবে না।

তিনি বলিলেন, "মনে করেছিলাম, পুরাতন শব্দের একটা অভিধান করে যাব। কিন্তু সেটা বোধ হয় আর হয়ে উঠল না। কালিন্দীর ওপার হতে বংশীধ্বনি শোনা যাচ্ছে।" কৃষ্ণকীর্তনের আবিষ্কর্তা যেন শ্রীরাধার সেই চিরন্তনী ভাষার প্রতিধ্বনি করিলেন:

"কে না বাঁশি বাএ বড়ায়ি
কালিনী নই কুলে।"

কি আশ্চর্য! এই কথা বলিবার পর তিনি আর এক মাস মাত্র ইহলোকে ছিলেন। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ২৩শে কার্ত্তিক তারিখে তিনি ঝাড়গ্রামে সজ্ঞানে বাঞ্ছিত ধামে গমন করিয়াছেন। কেবল আমার জননীর জন্মপল্লী বলিয়া নহে, বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের জন্মস্থান বলিয়াও বেলিয়াতোড় গ্রাম আমার নিকটে তীর্থস্বরূপ হইয়াছে।

গত পূজা-সংখ্যা "হিন্দুবাণী" পত্রিকায় আচার্য যোগেশচন্দ্রের জীবনকথা বর্ণন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলাম, 'প্রদীপের নীচেই অন্ধকার।' কিন্তু বাঁকুড়াবাসী আমরা যেন গাঢ় অন্ধকারে থাকিতেই ভালবাসি, আলোয় বাহির হইতে ভয় পাই। বাঁকুড়া জেলাও রত্ন-প্রসবিনী, একথা আমরা ভাবি না। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, বাঁকুড়ার অনেক শিক্ষিত লোকও বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের নাম পর্যন্ত শোনেন নাই। আগ্রহ থাকিলে অবশ্য শুনিতে পাইতেন, কারণ তিনি সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না। আচার্য যোগেশচন্দ্র ও বিদ্বদ্বল্লভ বসন্তরঞ্জন বাংলা ভাষাতত্ত্বের পথিকৃৎ। বাঁকুড়ার পক্ষে ইহা কম গৌরবের বিষয় নহে।

এক বৎসর হইল বসন্তরঞ্জন পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন, এ পর্যন্ত আমরা তাঁহাকে স্মরণ করি নাই। ভাবিয়াছিলাম বাঁকুড়া সাহিত্য-পরিষদ তাঁহার স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান করিবেন। কিন্তু সে ভাবনা মিথ্যা হইল। যাহা হউক, যদি বাঁকুড়া সাহিত্য-পরিষদ প্রতি বৎসর জিতাষ্টমীর দিন তাঁহার জন্মতিথি পালনের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলেও বাঁকুড়ার এই কৃতী সন্তানের পুণ্যস্মৃতি রক্ষিত হইবে এবং অনাগত ভবিষ্যতে হয় তো কেহ কেহ তাঁহার ভাবে অনুভাবিত হইতে পারিবে।*

---

* বাঁকুড়া টাউন হলে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানে পঠিত।

ট্রলার

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

যে ধরণের জাহাজের দ্বারা সমুদ্রে মৎস্য ধরা হয় তাহাকে ইংরেজীতে সাধারণতঃ ট্রলার বলা হয়। গত ১৯৫০ সাল হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এইরূপ দুইখানি জাহাজ বা ট্রলারের সাহায্যে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা সম্পর্কে বহু ব্যক্তি বিভিন্ন মতামত ও তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন, অনেকেই এই ব্যবস্থাকে "টাকার শ্রাদ্ধ" বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহাদের মতে দেশের আভ্যন্তরীণ জলাশয়গুলির সংস্কার এবং উন্নত প্রণালীতে মাছের চাষের প্রবর্তন করিয়া মাছের উৎপাদন বাড়াইতে পারিলেই দেশের মাছের অভাব পূরণ হইয়া যায়। মাছের উৎপাদন বাড়াইতে হইলে মৎস্য-জীবীদের সাহায্য এবং উৎসাহ দেওয়াও দরকার। বাস্তবিকই দুই-তিন বৎসরের মধ্যে ট্রলারের সাহায্যে ধৃত মাছের দ্বারা মাছের আমদানী তেমন বাড়ে নাই, অভাবও কিছুমাত্র পূরণ হয় নাই এবং মূল্যও আদৌ কমে নাই। এই সম্পর্কে ইহাও বলা দরকার যে, আমাদের মধ্যে বর্ত্তমানে অনেকেরই সমুদ্রের মাছের প্রতি তত অনুরাগ বা রুচি নাই। সমুদ্রের মাছের প্রতি অনুরাগ বা রুচি সৃষ্টি করাও সময়সাপেক্ষ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক বর্তমান পরিকল্পনা গৃহীত হইবার পূর্বে বাংলাদেশে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরিবার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বিত হয় নাই। তবে এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে "ইনভেষ্টিগেটার" নামক জাহাজের সাহায্যে কারপেণ্টার এবং হস্‌কিন নামক দুই শ্বেতাঙ্গ বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন প্রাণিবর্গের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার পর বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কয়েকজন জার্মানদেশীয় বৈজ্ঞানিক "ভালডিভিয়া" নামক জাহাজের সাহায্যে এ সম্বন্ধে কিছুদিন গবেষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই দুই চেষ্টার ফলাফল সম্পর্কে তেমন কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। ১৯০৮ সালে বাংলা সরকার এ সম্বন্ধে প্রথম উদ্যোগী হন এবং "গোল্ডেন ক্রাউন" নামক জাহাজের সাহায্যে ১৯০৮ সালের জুন মাস হইতে ১৯০৯ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার জন্য অভিযান করা হয়। এই অভিযানের ফলে জানা যায় যে, বৎসরের সব ঋতুতেই ট্রলারের সাহায্যে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরা সম্ভব এবং প্রায় সকল স্থানেই মাছ পাওয়া যায়; তবে কোন কোন ঋতুতে কোন কোন স্থানে মাছের পরিমাণ বেশী হয়। দশ ফ্যাদম হইতে এক শত ফ্যাদমের (এক ফ্যাদম = ছয় ফুট) মধ্যেই মাছ পাওয়া যায় এবং সাধারণতঃ বিশ হইতে ত্রিশ ফ্যাদমের মধ্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মাছ দেখা যায়। বঙ্গোপসাগরের মাছ দেখিতেও সুন্দর আস্বাদেও উৎকৃষ্ট। "গোল্ডেন ক্রাউনে"র সাহায্যে মাছ ধরার ব্যবস্থা বেশী দিন চলে নাই।

১৯৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যখন ইউরোপে গিয়াছিলেন তখন তিনি কোপেনহেগেনের মৎস্য-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এইচ. ব্লেগভ্যাডের সহিত এই বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেন এবং ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৫০ সালের মে মাসে ডেনমার্কের এক জন বিশেষজ্ঞকে এদেশে আহ্বান করেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য বিভাগের কর্মচারিগণের সহযোগে এ সম্বন্ধে প্রাথমিক অনুসন্ধান করিয়া একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে গভীর সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার জন্য দুইখানি জাহাজ (ট্রলার) এবং অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় করিবার ব্যবস্থা হয় ও মৎস্য ধরিবার জন্য

গলদা চিংড়ী

বিশেষজ্ঞ ও তাঁহাদের সহকর্মী আনিবার ব্যবস্থা হয়। এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে :

১। বর্তমান সময়ে মৎস্য ধরিবার উপযুক্ত স্থান নির্ণয় করা।

২। মৎস্য ধরিবার উপযুক্ত ঋতু নির্ধারণ করা।

৩। জলের বিভিন্ন গভীরতায় বিভিন্ন শ্রেণীর মাছ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

৪। জলের বিভিন্ন গভীরতায় মাছ ধরিবার উপযুক্ত বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রাদি নিরূপণ করা।

৫। দেশীয় ব্যক্তিগণকে গভীর সমুদ্রে জাহাজের সাহায্যে মাছ ধরিবার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য বিভাগের সচিব এবং ভারত সরকারের মৎস্য-পরামর্শদাতা দুইখানি জাহাজ ক্রয় করিবার

মাছ বাছাই হইতেছে

ও বিশেষজ্ঞগণের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে ইউরোপ যাত্রা করেন। সেখানে অবস্থানকালে ইঁহারা বহু আলোচনা এবং পরামর্শ করিয়া দুইখানি জাহাজ ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করেন। এদেশের গভীর সমুদ্রের মাছ ধরিবার উপযোগী করিবার জন্য জাহাজ দুইখানির সাজসরঞ্জামের কিছু অদলবদলও করা হয়। জাহাজ দুইখানির মোট দাম পড়ে ৫,৯১,১৭২ টাকা; জাহাজ দুইখানির বিদেশীয় নাম বদলাইয়া বাংলা নামকরণ করা হইয়াছে 'বরুণা' ও 'সাগরিকা'। বরুণাতে ৫৫ টন মাছ এবং সাগরিকায় ৬৪ টন মাছ রাখিবার ব্যবস্থা আছে। 'বরুণা' ৭২ ফুট ৭ ইঞ্চি লম্বা এবং ১৯ ফুট ৩ ইঞ্চি চওড়া; 'সাগরিকা' ৭৪ ফুট লম্বা এবং ২০ ফুট ৭ ইঞ্চি চওড়া। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'বরুণা' এবং ঐ সালের জুলাই মাসে 'সাগরিকা' নির্মিত হইয়াছিল।

দুইখানি জাহাজ পরিচালনার জন্য কর্মচারিবৃন্দের সংখ্যা, বেতন, ভাতা ইত্যাদির হার এইরূপ ছিল :

১। বিশেষজ্ঞ একজন—মাসিক বেতন ৩০০ পাউণ্ড; দৈনিক ভাতা ৩ পাউণ্ড (তীরে অবস্থানের সময়), ১ পাউণ্ড ১০ শিলিং (জাহাজে অবস্থানের সময়), বিনা ভাড়ায় সজ্জিত গৃহ।

২। অধ্যক্ষ (Skippers) দুই জন—মাসিক বেতন প্রত্যেকের ১৭৫ পাউণ্ড; দৈনিক ভাতা ৫৲ টাকা; বিনা ভাড়ায় সজ্জিত গৃহ।

৩। মাছ ধরিবার মাল্লা ছয় জন—মাসিক বেতন প্রত্যেকের ১১৪ পাউণ্ড; দৈনিক ভাতা ৫৲ টাকা; বিনা ভাড়ায় সজ্জিত গৃহ।

'বরুণা' জাহাজের ডেকে মাছের স্তূপ

গার্ডেনরীচে একটি কার্যালয় স্থাপন করা হয়; এইস্থানে জাহাজ দুইখানির কর্মচারীবৃন্দের জন্য বিশ্রামের স্থান, ছোটখাটো রকমের মেরামতের জন্য একটি কারখানা, মাছ রাখিবার স্থান প্রভৃতিও আছে।

১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসের প্রথমে জাহাজ দুইখানি ডেনমার্ক হইতে রওনা হইয়া কলিকাতায় ১২।১৩ই ডিসেম্বর পৌঁছায়। ২৬শে ডিসেম্বর জাহাজ দুইখানি মৎস্য ধরিবার জন্য প্রথম অভিযানে বাহির হয়। ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত দুইখানি জাহাজ ৪৬ বার সমুদ্রে গিয়াছে এবং ৪৭৪ দিন সমুদ্রে অতিবাহিত করিয়াছে।

এই ৪৭৪ দিনে ২৩২৪৭ মণ মাছ ধরা হইয়াছে। অর্থাৎ, দৈনিক মোটামুটি ৪৯ মণ। মাছ বিক্রয় করিয়া ৩৮৯২৪০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। প্রথম অবস্থায় মাছ বিক্রয়ের কোন সুব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। মৎস্যব্যবসায়িগণ সমুদ্রের মাছের ব্যবসা আরম্ভ করিতে দ্বিধা প্রকাশ করেন। প্রথম তিনটি অভিযানে যে মাছ পাওয়া গিয়াছিল মৎস্য বিভাগের কর্মচারিগণ কর্তৃক তাহা প্রধানতঃ নীলামে বিক্রয় করা হইয়াছিল।

জালের গিট খোলা হইতেছে

দুইটি জাহাজের সাহায্যে নিয়মিতভাবে মাছ সরবরাহ করা সম্ভব নহে, এবং বিভিন্ন স্থানে খুচরা বিক্রয় করাও লাভজনক নহে। এই কারণে একজন এজেন্ট নিযুক্ত করা হয়। বর্তমানে আর একজন এজেন্ট নিযুক্ত করা হইয়াছে। জাহাজ হইতে এজেন্ট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাছ বাহির করিয়া তাঁহার নিজের খরচে গুদামজাত করিবেন। বিভিন্ন স্থানে পাঠাইবার ও বিক্রয় করিবার ব্যবস্থাও তিনি করিবেন। বর্তমান এজেন্ট এইরূপ মূল্য দিতেছেন: ভাল মাছ প্রতি মণ ৫২॥০ টাকা, ছোট ছোট চাঁদা, ভোলা প্রভৃতি মাছ প্রতি মণ ২৪॥০ টাকা হইতে ১০৲ টাকা, এবং সার্ক, রে মাছ প্রভৃতি প্রতি মণ ৬॥০ টাকা।

ভেটকি মাছ

পরিকল্পনাটিকে এখনও পরীক্ষামূলক বলা যাইতে পারে। বিভিন্ন প্রকারের তথ্য আবিষ্কার করাই ইহার উদ্দেশ্য। সুতরাং এই পরিকল্পনা অনুসারে সমুদ্রে মাছ ধরিবার সহিত এখন পর্যন্ত লাভলোকসানের কোন প্রশ্ন নাই। তবে আশা করা যায়, যাবতীয় তথ্য অনুসন্ধানের পর গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা ব্যর্থতায় পরিণত হইবে না।*

* পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত "Harvest of the Deep Sea" পুস্তিকা অবলম্বনে লিখিত
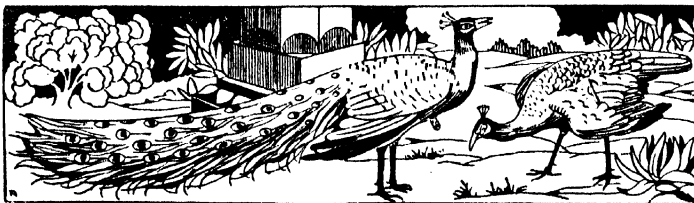
মহামুক্তি

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

ফুলের প্রথম জন্ম হয়েছিল কোন ক্ষণে, কবে কোন্ মুহূর্তে নবকিশলয়ের শীর্ষে প্রকৃতি এনেছিল তার জন্মের ইঙ্গিত, পাতার আড়াল থেকে ধীরে ধীরে কি করে সে চোখ মেলেছিল আকাশের পানে নিজের রূপরসগন্ধসৌরভ নিয়ে, মানুষ তার সংবাদ রাখে না। সংবাদ রাখে না তার নিজেকে সুন্দরতর করে তোলার সাধনার। কিন্তু যেদিন হয় তার উন্মেষ, তখন মানুষ চেয়ে থাকে তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে, খবর পৌঁছে যায় ভ্রমরের কানে। সেও জানাতে আসে গুঞ্জনধ্বনিতে বনতল মুখর করে তার বন্দনাগান। একটা—বড় জোর দুটো দিন সে দেখে নেয় চোখ মেলে পৃথিবীকে, ভ্রমরের পরাগলাঞ্ছিত পদক্ষেপের মুহূর্তে সে স্বপ্ন দেখে সৃষ্টির, দিনের সূর্য্যের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকার হয়ে আসে তার পৃথিবী—তারপর? রাতের অন্ধকারে নক্ষত্রের পানে শেষ চাওয়া চেয়ে সে ঝরে পড়ে। কেউ রেখে যায় ঝরে-পড়া বৃন্তে তার আগামীদিনের সৃষ্টির বীজ, কেউ বিনা পরিচয়েই নীরবে চলে যায়।

প্রকৃতির এই রীতি মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যে ফুল বিনা পরিচয়েই ঝরে গেল পৃথিবী থেকে—তাদের আসাও যদি সত্যি হয়, তবে নামহীন গোত্রহীন যারা চলে যায় পৃথিবী থেকে, তাদের জীবনও সত্যি—তাদের জীবনও সুন্দর। আমার কাহিনী তাদেরই এক জনকে নিয়ে।

দুপুর হয়ে গেছে। সকাল থেকে পাকা সাত ক্রোশ পথ হেঁটে এসেছি। মাঠপথ—আল টপকে নালা ঝাঁপ দিয়ে পার হয়ে নানা কসরত করে আসার জন্যে পরিশ্রম হয়েছে দ্বিগুণ। তেষ্টা মিটিয়েছি কুয়ে নদীর জলে। কালো জল ঘন অর্জ্জুনগাছের নীচে দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে গেছে, কয়েক আঁজলা মুখে-চোখে দিয়ে ঢক্‌ঢক্ করে গিলে চলেছি, শুকনো গলা ভিজল, কিন্তু পেটের জ্বলুনি থামল না। তখনও নান্নুর পৌঁছতে প্রায় তিন ক্রোশ পথ বাকী। রোদের তেজও বেড়ে উঠেছে, পথ হাঁটা যাবে না, বাধ্য হয়েই ঝাঁকড়া বটগাছতলাতে একটু গড়িয়ে নেবার যোগাড় করছি, হঠাৎ কার ডাকে ফিরে চাইলাম।

"নদীর জলে যদি পেট ভরতো তা হলে সমাই যি ভেক লিত গো?"

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত চিন্‌চিন করে ওঠে মনটা। ফিরে চাইলাম—দেখি নদীর জলে চাল ধুচ্ছে একটি মেয়ে। ধারালো ছুরির ফলার মত এক ঝিলিক হেসে বলে উঠে, "ঘর পালিয়ে এসেছ, না বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বিবাগী হইছ?"

"ওসব বালাই-ই নাই।"

জবাব শুনে নির্লজ্জের মত হাসছে মেয়েটা। মাথার উপর একরাশ এলোচুল চূড়ো করে বাঁধা, পরনে গেরুয়া রঙে ছোপানো কালোপেড়ে সাড়ী। নিটোল পরিপুষ্ট গড়ন। সন্তর্পণে এঁটেল মাটির উঁচু 'পাড়ি' বয়ে উঠে এল আমার দিকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, "কোথায় যাবা?"

—নান্নুর।

—"সী ত ঢেক পথ, শুকিয়ে থাকবা কেনে? আমাদের সঙ্গেই দু'মুঠো সিজিয়ে দোব?"

"না।" প্রতিবাদ করি দৃঢ়ভাবে।

মেয়েটির চোখে খেলে যায় হাসির একটু ঝিলিক। মাথার একরাশ চুড়োকরা চুল ভেঙ্গে গিয়ে লুটিয়ে পড়েছে কাঁধের উপর—কালো চুলের রাশ যেন ফেঁপে উঠেছে মত্ত উল্লাসে।—"জাত যাবে? পথে বার হয়ে এখনও আছে লাগছে উসব।"

বাধ্য হয়েই সত্যি কথাটা বলে এড়াবার চেষ্টা করি—"পয়সাকড়ি কিছুই নাই।" এতক্ষণে দেখি হাসির রূপ বদলেছে।

"লাজ-লজ্জা-ভয় তিন থাকতে লয়। তোমার জন্যে পথ লয় গোঁসাই, ফিরে গিয়ে সংসার করগা। চান-টান করে এস—আমি ভাত চাপাচ্ছি। উখানেই খাবে ইখেনে।" চলে গেল মেয়েটি।

দুপুরের রোদ হলদে হয়ে আসে। নির্জন নদীতীরের দু'পাশে ঘন অর্জ্জুন কাদাজাম শরঝোপ মুখর হয়ে উঠে পাখীর কাকলিতে।

"ওই, বাঃ বাহারের লোক ত তুমি, দিব্যি খেয়ে-দেয়ে সটান নাক ডাকাচ্ছ। ইদিকে বেলা যে শেষ হয়ে এল।"

লজ্জা পেয়ে গেলাম। দেখি ওদের জিনিষপত্র সব বাঁধা হয়ে গেছে দুটো থলিতে। জিনিষপত্র বলতে হুঁকোকল্কে—একটা এনামেলের হাঁড়ি, টুকিটাকি কি সব, আর একটা লাউয়ের খোলের তৈরি একতারা। আমিও উঠে পড়লাম ওদের সঙ্গে। নদী পার হয়ে আলপথ ধরে আবার সুরু হ'ল পথচলা। আগে আগে গগনদাস—মধ্যখানে কদম—পিছনে আমি।

কীর্ণাহার ইষ্টিশানে এসে দাঁড়ালাম। এদের ছেড়ে যেতে হবে এইবার। গগনদাস বলে উঠে—"পথ ত সবই সমান। চল কেনে আমারই ওখানে?"

দেখি আর একজোড়া কাজলকালো চোখ নীরব ভাষায় আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। পরক্ষণেই চোখের তারায় তারায় সেই বিদ্রূপের চমক।

—"উত যাবে নান্নুর?"

—"থাম না তুই। তা হলে তিনখানাই টিকিট করি কি বল?"

সেই থেকেই রয়ে গেলাম গগনদাসের সঙ্গে, কিসের আকর্ষণে ঠিক জানি না।

বাংলার পশ্চিম সীমান্ত, সাঁওতাল পরগণার কাছাকাছি অঞ্চল।

একদিন মোগল পাঠান সকলেরই পায়ের চিহ্ন পড়েছিল, মহাকালের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রচিত হয়ে চলেছে নূতন অধ্যায়—তাই তাদের পায়ের চিহ্নও নূতন পদচিহ্নের ভিড়ে হারিয়ে গেছে, তবু আজও ধ্বসে-পড়া প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপে, বনানীর মর্মরধ্বনিতে দূর আমলাযোড়ার পাহাড়কোল থেকে শালফুলের গন্ধমদির বাতাসে, দিগন্তসীমায় পলাশের রক্তরাগের ভাষায় মনে পড়ে সেই বিস্মৃত যুগকে। মুসলমানশাহী অত্যাচারের কঠিন পাষাণগাত্রেও ফুটে উঠেছিল দু'একটি জাফরানী রঙের ফুল, চেহোস্তর কোন ভালবাসার আমেজ লাগা গুলাবী তার নেশা, খোশবু তার দেশকালের সীমা পার হয়েও চলে এসেছে উত্তরযুগে। ওদের ধ্বংসলীলা সুফীবাদের বীজকে নিঃশেষ করতে পারে নি। চিশতী, সুরাবর্দী, কাদিরী, নক্সবন্দী প্রভৃতি প্রেমপন্থী সাধকদের উত্তরসাধক হয়ে আজও সেখানে রয়ে গেছে দরবেশ, ফকির, আউল-বাউলের দল। ওদের দেশ নাই—জাতি নাই—সমাজও নাই। বাস্তব জগতের মানুষের কাছে ওরা অসার, অনিত্য, অপব্যয়।

গগনদাস ফকির ওদেরই দলে।

বলে গগনদাস—"মরার ত কোন সামাজিক দায় নাই। মরলেই সব দায় থেকে খালাস। আমাদিকে মরাই মনে কর।"

প্রথম প্রথম আমারও ওদের কথাগুলো পাগলের প্রলাপ বলেই মনে হয়েছিল। বাতুল মানেই পাগল। কিন্তু তখনও ঠিক ওদের চিনতে পারি নি।

সন্ধ্যা নেমে আসে গ্রামের প্রান্তে গগনদাসের আশ্রমে। দু'দিকে ধানী জমি, একপাশে গ্রামের সীমানা। পশ্চিমদিকে লাল-কপিশ প্রান্তরের প্রান্তে শালবনের প্রহরা। দূরে উর্দ্ধ আকাশে দুমকার পর্ব্বতশ্রেণী আবছা অন্ধকারে মূর্ত্তিমান প্রেতাত্মার মত আকাশজোড়া তমসার ব্যূহ রচনা করেছে! ভীরু চাহনি মেলে ফুটে উঠে দু'একটা তারার রোশনাই। গ্রামের দিক থেকে ভেসে আসছে শঙ্খ-কাঁসরের শব্দ। মন্দিরে কোথায় আরতি হচ্ছে। এদের দেবতা প্রেমময় কোন নিরাকার মহাপুরুষ—যাঁর প্রেমে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়াই এদের সাধনা। গগনদাসের সুর শোনা যায়:

"ও তোর কিসের ঠাকুরঘর?
(যারে) ফাটকে তুই করলি আটক
তারে আগে খালাস কর—
মন্ত্রে তন্ত্রে পাতলি যে ফাঁদ
দেবে সে কি ধরা?
(ওরে) উপায় দিয়ে কে পায় তারে
শুধু আপন ফাঁদে মরা"

আবছা অন্ধকারে কার পায়ের শব্দে মুখ তুলে চাইলাম। কদম এসে নিঃশব্দে বসল, কয়েক দিন থেকে লক্ষ্য করেছি ওর মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন। মাঝে মাঝে ওর হাসির স্বচ্ছধারায় কোথায় যেন চিন্তার গুরুভার পাথর এসে বাধা দেয়। মনে হয় এই জীবনকে মেনে নিতে সে হয়ত পারে নি। ভ্রাম্যমাণ জীবন··· কোথাও কোন বাঁধন নেই, পৃথিবীর সমস্ত উপভোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার কেন এই সাড়ম্বর আয়োজন? তার হাতখানা অজ্ঞাতসারেই আমার হাতে এসে পড়ে। নরম একটু স্পর্শ, কেমন যেন একটা শিহরণ! তার প্রশ্নে একটু বিস্মিত হয়ে যাই, "তুমি কেন এ পথে এসেছ?"

কদমের কণ্ঠস্বরে কি যেন একটা ব্যাকুলতা! জবাব দিই "কোন পথ আর পাই নি।"

"তাই সামনে যে পথ পেয়েছ তাই ধরেই চলেছ তুমি?"

মনে মনে ভাবি হয়ত তাই। নিজের অতীত জীবনের ব্যর্থ কাহিনী আজ আমার কাছেই বড় হয়ে ওঠে।

জাত-বোষ্টমের ছেলে, জন্ম-ইতিহাস সঠিক জানি না—হয়ত কোন তিমির রহস্যাবৃত। জীবনরক্ষার প্রয়োজনে যারা ধর্ম্মের ধ্বজাধারী হয়, আমি ছেলেবেলা থেকেই তাদের আওতায় মানুষ হয়েছি। আখড়ার ফুল তুলতাম, মন্দির সাফ করতাম—মচ্ছবের সময় এঁটো পাতা পরিষ্কার করেছি। আরতির সময় খোল বাজানো কীর্ত্তনের ধুয়ো ধরা, দোয়ার্কি করা কোনটাই বাদ যায় নি। ধর্ম্মে মতি ছিল বলে মোটেই নয়, চাট্টি ভাতের জন্যে লোকে কাজ করে—আমিও তাই করেছিলাম।

"হঠাৎ সে সব ছেড়ে চলে এলে কেন? এখানে কি কাজ না করে খেতে পাবে?" কদমের কথায় বিরক্ত হয়ে উঠি। নিজের উপরও রাগ হয়।

হাতের উপর নরম চাপ পড়ে, যেন অল্প মোচড় দিচ্ছে হাতটাতে, "রাগ করলে?"

চুপ করে থাকি। অতীত দিনের ছবিগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আখড়ার শ্যাম ছায়াঘন সেই গোলাপজাম গাছগুলো, নিমগাছের ডালে ডালে মাধবীলতার গুচ্ছ, সন্ধ্যার সময় ভিজে ঘাসের সোঁদা গন্ধের সঙ্গে ঝুমকো লতার বুক থেকে ভেসে আসত মিঠে একটা সুবাস···কার দুটো কাজলকালো চোখ—শত কাজের ফাঁকেও চেয়ে থাকত আমার পানে। অনাঘ্রাতা ফুলের মত নব-যৌবনের প্রথম রসমদির একটি মন···মালতী।

"কথা কইছ না যে? সেই আখড়ায় আর কে ছিল?"

কদমের ডাকে ফিরে এলাম আবার সেই পৃথিবীতে, লাল্‌মাটির বুকে—তারাভরা আকাশের নীচে।

এমনি কত সন্ধ্যায় মধুগন্ধভারাক্রান্ত তারকিণী রাত্রির আকাশ-তলে বসে থাকতাম আমি আর মালতী। কত কথা—সে ভাষাও আজ ভুলে গেছি।

শেষদিনের কথা মনে পড়ে। আখড়ার রাঙ্গাগোঁসাইয়ের সঙ্গে তার মালাচন্দনের ঠিক হয়ে গেছে। রাঙ্গা গোঁসাই-ই হবে এর পর মোহান্ত, তার দাবিই সর্ব্বাগ্রে। সেখানে আমি মন্দিরের একটা সামান্য পেটগোরাকী চাকর ছাড়া কিছুই নই, আমার কোন কথাই ওঠে না। মালতীর চোখে জল···মনের কোণে কি তার কোন

কামনাই ছিল না আখড়ার মালিক হবার ? না হলে কেন সে চলে এল না আমার সঙ্গে—বুড়ো রাঙ্গাগোঁসাইকেই মেনে নিল ?

তবু আজও মনে পড়ে মালতীর চোখের জল, তার স্তব্ধ ক্রন্দন, আমার মনে সেইটুকুই থাক সান্ত্বনা, একজনও ভালবেসেছিল, একজনও ফেলেছিল আমার জন্যে তার চোখের জল—থাক না সে লোকচক্ষুর অন্তরালে একান্ত আমারই সান্ত্বনা হয়ে।

সেই রাত্রিই আমার ঝিল্লীখাসপুরের আখড়ার শেষরাত্রি হয়ে আছে এ কথা কদমকে বলতে পারি না।

দেখি একদৃষ্টে কদম আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। অজ্ঞাতসারে কদম কখন আরও কাছে এসে বসেছিল জানি না, তার উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার কপোলে পরশ দেয়···ওর দেহের উত্তাপ আমাকে চঞ্চল করে তোলে—উঠে পড়লাম নীরবে।

রাত্রি নেমে আসে নির্জ্জন আখড়ার বুকে। জানালার বাইরে ফুটন্ত কয়েকটি করবী ফুলের গাছের ওপাশে বাউলদের সমাজগড়ার স্মৃতিপ্রদীপটা জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে গেছে। জেগে আছে আকাশের দু' একটা তারা। চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে ভেসে আসে শিয়ালের ডাক।

ঘুম ভাঙল তখন বেলা অনেক হয়ে গেছে। সোনালী রোদ লুটিয়ে পড়েছে মহুয়া গাছের ঘনকালো পাতায়—আখড়া প্রায় জনশূন্য। গগনদাস গেছে গ্রামান্তরে মাধুকরীতে। সদ্য স্নান সেরে কদম ফিরছে ঝরণা থেকে ভিজে কাপড়ে। মিঠে সোনালী রোদে ভরে গেছে চারিদিক। গুন গুন করে একটা কলি গাইতে থাকি :

প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিনু
দিন যাবে আজি ভালো—

কদমের মুখে সেই ধারালো হাসির ঝিলিক। দাওয়াতে কলসীটা নামিয়ে রেখে ভিজে কাপড়খানা বাঁশের আলনায় মেলে দিতে দিতে বলে, "এটা বোষ্টমের আখড়া লয় গোসাই যে মালসাভোগ সাঁটবে, আর আদিরসের কেত্তন গাইবে, চল্ দিকি মুষ্টিভিক্ষায়।"

"এই কথা ! তোমার সঙ্গে আগুনেও সেঁধুতে পারি—ভিক্ষে ত সামান্য কাজ।"

কথা কইল না কদম, মুখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে আমার দিকে।

গ্রামের পথে দুজনকে একসঙ্গে দেখে অনেকেই বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। কে যেন মন্তব্য করে, "এটিকে জোটাল কোত্থেকে হে ?"

প্রতি গৃহস্থের বৌ-ঝি-ছেলেমেয়েদের মাঝে কদমের অবাধ গতি। অনেক কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে নিজেকে বিব্রত বোধ করি।

ফিরতে বেলা দুপুর গড়িয়ে যায়। তীব্র রোদের লেলিহান শিখা হাজার রেখায় নৃত্য করে বিসর্পিল গতিতে। লাল ধূলোর বুকে ঘূর্ণিহাওয়া বনতলের সাড়া আনে, ধরণীর নিঃস্বতাকে প্রকট করে তোলে বৈরাগীর একতারার উদাসী সুর।

কয়েকটা মাস কোন্ দিকে কেটে গেল জানতে পারি নি। সেদিন সন্ধ্যার সময় গগনদাসের গ্রামের কয়েকজন মাতব্বরকে নিয়ে পবন চাটুজ্যেকে আসতে দেখে সরে এল কদম। লোকটাকে দু'চোখে দেখতে পারে না সে। ইতিপূর্ব্বে পথে-ঘাটে নির্জ্জন বনের ধারে কদমকে কয়েকবারই প্রেমনিবেদন করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে, দু'চার 'মাপ' ধান সাজাবন্দোবস্ত করে দিয়ে পাকাপাকি করবার প্রস্তাবও করে নি তা নয়। হেসেছিল কদম, "আমাকে রাখতে লারবা ঠাকুর। ধান তোমার বনশূয়োরেই খাবে। তার চেয়ে বিচে-খুচে ঠাকরুণের নারকেল ফুল কিনে দিও, দোজপক্ষের গিন্নী খুশীও হবে—জিনিষটাও ঘরে থাকবে।"

সেই থেকেই পবন চাটুজ্যে কদমের নামে প্রকাশ্যেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

আজ তারাই দল বেঁধে এসেছে—আশ্রমে সামান্য কিছু সাহায্য যা করে তারই দাবিতে হুমকি দিতে এসেছে।

"ওই যে নূতন চেলাটি তোমার, ওর সঙ্গে মাধুকরী করতে দাও কেন কদমকে ?"

আর একজন বলে উঠে, "ওকে গাঁ ঢুকতে দেব না—ওর মতলব ভাল নয়—"

"কোত্থেকে এনেছ ওটিকে ?"

"হাঁ, ওই কদমই জুটিয়ে এনেছে বুঝলে না।"

অন্ধকারে মালতীগাছের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কথাগুলো শুনছিলাম। সারা শরীরে জ্বালা ধরে আসে। মনে হয় বিনা প্রতিবাদে এখান থেকে চলে যাওয়াই বোধ হয় ভাল।

গগনদাস কি জবাব দেয় ঠিক বুঝা গেল না, কদমকেও দেখি না আশেপাশে। অনর্থক আমার জন্যই তাকে এই কলঙ্কের ভাগী হতে হ'ল।

চলে যাওয়াই ভাল, এত বড় পৃথিবীতে ঠাঁই কি কোথাও হবে না। পরদিন সন্ধ্যাবেলাতে আমিই কথাটা তুললাম। গগনদাসের মুখে মলিন মধুর হাসি।

"ওরা চিরকালই ওই কথা বলবে। মানুষের দোষগুণ সবই আছে বাবা। তা নিয়েই মানুষ···এর জন্য দুঃখ করো না, দুঃখ হয়ত পাবেই, সেই পথে ভগবানকে পাওয়ার সাধনাই করতে হবে—"

চুপ করে যায় সে। অতল অন্ধকারের মতই অতল চিন্তা কি যেন তার মনে তোলপাড় করে। গুন গুন করে সে সুর ধরে উদাস দৃষ্টিতে :

"দুঃখে দুঃখে জ্বলুক রে আগুন,
পরাণ ফেটে আধার কেটে
বার হোক রে আগুন।"

সুরটা ছড়িয়ে পড়ে আঁধার আকাশের বুকে। মনের অসীম

উদার উপলব্ধির ব্যাকুল আবেদনময় সে সুর—তারই মূর্চ্ছনা ঝরাপাতার মর্ম্মরধ্বনিতে, দিকহারা বাতাসের মাঝে।

নীরব শ্রদ্ধায় মনটা ভরে ওঠে, এতদিন ঠিক চিনি নাই ওকে। ভাবতাম ঝিল্লীবাসপুরের আখড়ায় যাদের দেখে এসেছি এ তাদেরই শ্রেণীর একজন—ওই রাঙাগোসাইয়ের দলেরই, ধর্ম্মের নামে ক্ষমতা-প্রভুত্ব-বিলাসভোগীদেরই দলে, কিন্তু আজকের রাত্রির পরিচয় আমার ধারণা খানিকটা বদলে দিল।

ঘরের দাওয়ায় উঠতে যাব সামনে দেখি কদম, বলে উঠে সে-ই, "বাবাজীকে এখনও চেন নি—অমন মানুষ হয় না।"

হেসে ফেলি, "চিনতে কি ছাই তোমাকেই পেরেছি?"

এগিয়ে আসে কদম, "চেনবার চোখই তোমার নাই।"

আবছা তারার আলোতে কেমন যেন একটা শিহরণ। দূরে শালবনে যে ঝড় উঠেছে—একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস—কদমের কালো চোখের কোলে চিক চিক করে দু'ফোঁটা জল, একটা নিবিড় স্পর্শ, খোঁপায় গোঁজা মালতী ফুলের মৃদু সুবাস সবই যেন কেমন ঘুলিয়ে যায়। নিজেকে নিবিড় অন্ধকারে হারিয়ে ফেলেছি।

"ছাড়, কেউ এসে পড়বে।" কদম নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ক্ষিপ্রপদে মিলিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

রাত্রে হঠাৎ কার চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলেই অনুভব করলাম—গলার কাছে একটা কি যেন চাপ বেঁধে শ্বাসরোধ করবার উপক্রম করেছে। চোখের সামনে ঘরের চালটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। কপাটে কে ঘা দিয়ে চলেছে।

কোন রকমে কপাটটা খুলে বার হয়ে এলাম, বারান্দাটা জ্বলছে, বাঁশ ফাটার শব্দে নৈশ আকাশ মুখর, আগুনের আভায় করবী-মল্লিকা গাছগুলো আধাপোড়া হয়ে গেছে।

ছুটে আসছে কদম, মাথার চুলগুলো খুলে পড়েছে, আঁচলটা লুটোচ্ছে মাটিতে, আমাকে জড়িয়ে ধরে হাঁফাতে থাকে, "লাগে নি ত কোথাও?"

উত্তর দেবার অবকাশ নাই। কুয়ো থেকে জল তুলতে যাব, বাধা দেয় গগন, "পুড়ুক।"

থমকে দাঁড়ালাম, মুখে-চোখে তার কোন ভাবান্তর নেই। নির্ব্বিকার হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে জ্বলন্ত ঘরখানার পানে।

গ্রামের দু'চার জনও মজা দেখতে এসেছে। কে যেন বলে উঠে, "আশ্রমে পাপ স্পর্শ না করলে ব্রহ্মার কোপ হবে কেন?"

গগন কোন উত্তর দেয় না। আমি জানি কথাটা কার উদ্দেশ্যে এবং কাজটা ঘটলই বা কেন।

ভোর হয়ে আসতে দেরি নেই, লোকজন ফিরে গেছে সবাই। পোড়া ঘর—কালো ছাই—অঙ্গারের রাশি—জ্বলন্ত বাঁশের নিবু-নিবু অগ্নিশিখার পাশে শ্মশানের চিতাভস্ম আগলে বসে আছি আমরা তিন জন।

—"আবার সব গড়ে তুলব বাবাজী"

কদমের কথায় মুখ তুলে চাইল গগন। মুখে তার একটুকরো মলিন বিষণ্ন হাসির আভা। আগুনের নিবু-নিবু শিখায় দেখি তাতে যেন বিষাদ ঝরে পড়ছে।

"লাভ কি কদম? দরবেশ-দিওয়ানা-বাউল, তাদের মাথা গুঁজতে এত বড় আকাশই আছে।"

"তাই বলে ওদের ভয়ে পালাব?"

"ওরে ঝগড়া করা যে আমাদের ধর্ম্মের বাইরে। ওরা না চায় এ মাটিতে থাকবি নে। ঢের ঠাঁই আছে এই দুনিয়ায়। আর শোন্ মায়া কাটাতেই পথে নেমেছি—তবে আর এ ঘরের মায়া কেন রে?"

মাটির নিবন্ত আগুন বিস্তারলাভ করেছে পূব আকাশের কোলে—মুক্ত উদার শালবনসীমার উর্দ্ধে তমসাচ্ছন্ন আকাশের বুকে আলোর নিশানা। ঘুমভাঙা পাখীর ডাক আবছা অন্ধকার ভেদ করে কানে আসে। স্তব্ধ হয়ে পূব আকাশের দিকে চেয়ে, নূতন আলোকশিখার সন্ধানে বসে রয়েছে গগনদাস।

"কদম—"

গগনের ডাকে মুখ তুলে চাইল সে, তার চোখেও জল। কথাগুলো শুনে স্তব্ধ হয়ে যায় কদম।

"আমি একাই যাব রে—"

আর্ত্তনাদ করে ওঠে কদম, "জানি কেনে তুমি আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ। বাবাজী—শেষকালে তুমিও আমাকে সন্দেহ করলে।"

"ছিঃ, কদম। তুই-ই আমার গুরু। তুই গাইতিস মনে পড়ে:

'হৃদয়-কমল উঠছে গো ফুটে যুগ যুগ ধরি
তাতে তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা—উপায় কি করি।'

মুক্তি পেতে গেলে তাই সব বাঁধনই ছিঁড়তে হবে রে।"

আখড়ার ভস্মস্তূপের নীচে সমাধিস্থ হয়ে রইল কদমের কত স্বপ্ন-রঙীন সঙ্গীতমুখর দিন। নির্জ্জন প্রান্তরের রিক্ততা শুধু বৃদ্ধি পেল মাত্র। এক বৈশাখী ঝড়ে লাল ধুলো আর বনের ঝরাপাতা আখড়ার ভস্মস্তূপের স্মৃতিকাব্যকে বিস্মৃত করে দিল।

গগনদাস কোথায় চলে গেছে, আমি আর কদম তখন এক-চক্রাগর্ভাবাসের গ্রামসীমায় দ্বারকানদীর তীর ধরে চলেছি সীমাহীন পথরেখায় কোন্ নূতন দিগন্তের সন্ধানে!

শীতের শেষ। মাঠের সোনাধানের আস্তরণ মিলিয়ে গেছে। রিক্ত শাখার বুকে লাগে দূর আকাশসীমা হতে ছুটে আসা হিমেল হাওয়া, কোন রুদ্রসন্ন্যাসীর তীব্র নেত্রশাসন মৌনমূক নিঃস্ব করে রেখেছে ধরিত্রীকে। শিমুলগাছের ডালে তুলো ফুটতে সুরু হয়েছে, নীচের বনঝোপের মাথায় হাজারোকণা তুলোর আস্তরণ; দমকা হাওয়ায় পথের ধুলো উড়ে চলে—তারাপীঠে পৌঁছতে সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেল।

"চলো না পার হয়ে যাই, কোশতিনিক মাঠ পরেই ত মল্লারপুর ইষ্টিশান—"

অজানা পথ, যেতে চাই না। বাধ্য হয়েই অনিচ্ছাসত্ত্বেও থাকতে হ'ল কদমকে।

মন্দিরে সন্ধ্যারতি হয়ে গেছে, শঙ্খ-ঘণ্টা আর টিকারার শব্দ দ্বারকার বেণুবনসমাকীর্ণ সীমারেখা পার হয়ে মিলিয়ে গেল দূর দিগন্তে। কয়েকজন সাধু-সন্ত-তান্ত্রিক ওদিকে নানা তর্কে মত্ত; মায়াবাদ অদ্বৈতবাদ—পিঙ্গলা-সুষুম্না নাড়ীর তত্ত্বব্যাখ্যায়—তর্কে-বিতর্কে মুখর হয়ে উঠেছে মন্দির-প্রাঙ্গণ।

শুষ্ক পাণ্ডিত্য আর উৎকট আত্মপ্রতিষ্ঠার জোরালো যুক্তির চোটে মন্দিরের দর্শকযাত্রীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এমন সময় মন্দিরের পূজারী খড়ম পায়ে আসছিলেন, কদম আর আমাকে দেখেই দাঁড়ালেন। মুখে তার মৃদু হাসি,

"একটু নামগান হোক—না হোক দেহতত্ত্ব।"

প্রণাম করে হাসে কদম—"অধম আমরা, কিই বা জানি বাবা ?"

তবুও তার একতারায় বেজে উঠে রিণি রিণি সুর। ওদের তর্ক থেমে যায়। শিখাধারী তত্ত্বজ্ঞানীর দল এসে ভিড় করেছে আমাদের চারি পাশে। গেয়ে চলেছে কদম সুরেলা মিঠে গলায় :

ধন্য আমি শূন্যকুম্ভ পূর্ণকুম্ভ নই।
তাই তো তোমার জলের খেলায়
বুকের তলে রই গো সখি
বুকের তলে রই।
যারা তোমার পূর্ণকুম্ভ, তাদের রাখো গো তীরে,
কাজের লাগি লইয়া গো যাও যখন যাও ঘরে ফিরে।
আমি নাচি তোমার সাথে আনন্দনীরে।
আমায় তুমি বাঁধলা প্রেমের বাহুতে ঘিরে।
(তাই) জলতরঙ্গে (তোমার) বুকতরঙ্গে
নেচে আকুল হই।

চারিদিক নিস্তব্ধ। তার্কিক পণ্ডিতের দল মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। কদমের সারা মনে বাংলার সহজ পথের পথিকের পরম তৃপ্তির সুর। খ্যাতি প্রতিপত্তি শাস্ত্রবিধি সব হারিয়ে একেবারে শূন্যকুম্ভ হয়ে মহাবিশ্বের প্রেমলীলায় সেই পরম প্রিয়ের সান্নিধ্যলাভের একান্ত কামনার সুরই ধ্বনিত হয় তার সুরে সুরে।

কদমকে আজও চিনতে পারি নি। কোথায় যেন অসীম রহস্য ওর চারিপাশ ঘিরে রয়েছে। এত কাছে পেয়েও ওকে ধরতে পারি নি। মাঝে মাঝে নিজেকে প্রকাশ করে ও সরিয়ে নিয়ে গেছে সেই রহস্যের অন্তরালে।

ভোর হয়ে গেছে, মন্দিরের চারিপাশ খুঁজেও তাকে দেখতে পেলাম না। জিনিসপত্র সবই রয়েছে, কিন্তু সে-ই নেই। আশেপাশে খুঁজতে থাকি। রাস্তার উপরেই দ্বারকানদীর তীরভূমি। বাঁশবন, বইচি-সেঁয়াকুল, বুনো ঝাউয়ের বনে আবৃত সরু পথটা গিয়ে শেষ হয়েছে নদীতীরের শ্মশানে। কাদের কোলাহল, একটা পরিচিত কণ্ঠে কান্নার শব্দ শুনে এগিয়ে গেলাম সেদিকে।

ঝোপের এপাশ থেকে দৃশ্যটা দেখে থমকে দাঁড়ালাম। পা দুটো কে যেন আটকে রেখেছে। বছর দশবারো বয়স হবে ছেলের মৃতদেহ দাহ করতে এনেছে। কদমকে কোন দিনও কাঁদতে দেখি নি ওভাবে। কে একজন শ্মশানবন্ধুদের মধ্য থেকে বলে উঠে—"সরে যাও বাপু, মা হয়েও এতদিন ফেলে ছিলে, আজ আবার কান্না কেন ?"

বলে ওঠে কদম অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে "তোমরাই ত তাড়িয়ে দিয়েছিলে আমাকে। মায়ের বুক থেকে তোমরাই ছিনিয়ে নিয়েছিলে আমার ছেলেকে—রাখতে পেরেছ তাকে ?"

ওপাশে কে একজন নীরবে বসে ছিল। স্তব্ধ শোকাচ্ছন্ন চেহারা—সে-ই এগিয়ে আসে—"সেদিন আমিই ভুল করেছিলাম। আজ সব ভুল আমার ভেঙেছে। ফিরে চল তুমি, বল যাবে ?"

চোখের সামনে ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে—কদমের পূর্বেকার ইতিহাস। স্বামী ঘরসংসার সবই ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যই বিতাড়িত করেছিল তাকে এই সীমাহীন পথে। তারই মধ্যে সে খুঁজেছে এতদিন মুক্তির উপায় সমস্ত আঘাত নীরবে সহ্য করে।

হাতটা ছাড়িয়ে নেয় কদম, "আর তা হয় না। সবই শেষ হয়ে গেল যখন—তবে আর মিছে মায়া কেন।"

চিতায় তুলছে ছেলেটাকে হরিধ্বনি দিয়ে। চোখের জল মুছে এগিয়ে এল সে। বনের মধ্য দিয়ে ফিরে এলাম আমি কদমকে দেখা না দিয়েই।

বিস্মিত হয়ে যাই—কেন আজ সে তার আহ্বান—শান্তিনীড়ের সন্ধান প্রত্যাখ্যান করে ফিরে এল। দেহের আকর্ষণ ? তা হলে অন্য পথই ছিল তার ভাল। কিন্তু কেন ? এর উত্তর পাই নি।

হয় ত সে পেয়েছিল তার জীবনে অসীম তৃপ্তি, বিরাট বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে সেই অসীম আনন্দময় মুক্তির স্বাদ। তাই কোন বন্ধনই তাকে বাঁধতে পারে নি।

"চল, বেরিয়ে পড়ি !"

কথাটা শুনে কদমের মুখের দিকে চাইলাম। কেমন যেন একটা থমথমে ভাব।

যাত্রা করলাম দু'জনে। নদীর বালুচর পার হয়ে কাশবনের ভিতর দিয়ে মাঠের দিকে এগিয়ে চললাম...মল্লারপুর ষ্টেশনের দিকে।

সেই রাত্রিতে ষ্টেশনের বাইরে একটা ঝাঁকড়া বটগাছের নীচে বসে আছি, ট্রেন সেই রাত্রিভোরে। কদম একবারও সকালের ঘটনার সম্বন্ধে কোন কথাই বলে নি। সারাদিন আজ তার হাসির মাত্রা বেড়ে গেছে। কারণে অকারণে হাসির লহর তুলে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চায়। রাত্রির অসীম রহস্যময়ী রূপের মতই সে অজানা হয়ে উঠেছে। চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ।

"কদম !"

আমার ডাকে ফিরে চাইল ও।

"কেন তুমি ফিরে গেলে না ওদের কাছে ?"

চমকে ওঠে সে। অনুভব করি তার সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ। একটু চুপ করে থেকে বলে ওঠে—"তা হলে সবই জেনেছ তুমি ?"

নিজেকে আজ স্থির রাখতে পারি না মানুষের চিরন্তন কামনা আজ আমাকে আত্মহারা করে তোলে।

—"ফিরেই যদি না যাও, তা হলে আমাদের পথে বাধা কি থাকতে পারে ?"

কথাটা শুনে কোন জবাব দেয় না কদম, নীরবে কি যেন ভাবছে। জোয়ারের মত সমস্ত কামনা আমার উর্দ্ধমুখী হয়ে চলেছে আরও কাছে টেনে নিই তাকে—"আমরা ঘর বাঁধব কদম, তুমি পাশে থাকলে সব আমি পারব—"

—"আবার ঘর !" হাসে কদম, শান্ত বিষাদক্লিষ্ট হাসি। নিজেকে সরিয়ে নিল দূরে। ওর চোখে-মুখে কি যেন একটা শান্ত মধুর দৃঢ় ভাব।

—"রূপ দেখেই মজলে গোঁসাই, এ ছাড়া কি কিছুই দেখ নি ?"

চুপ করে থাকি। কদম কি যেন ভাবছে, গুন গুন করে অন্যমনস্কভাবে সে একটা গানের কলি গাইছে :

ডুবতে কিরে পারে সবাই
রূপতরঙ্গে যায় যে ভেসে।
মরমের পথ পাইল না যে
রূপেই ভাসায় আপনারে সে।"

সারা মনে ঝড় বয়ে চলেছে আমার। দীর্ঘ দু'বৎসর ধরে কদমকে দেখে আসছি একটা আলেয়ার মত, অন্ধকারের বুকে আলোর রেখা, কিন্তু ধরতে গেলেই সে সরে যায় রহস্যাবৃত তমসার মাঝে।

বলে ওঠে কদম, "রূপে বাধা পড়লে সাধনার পথে যে সমূহ বিপদ গোঁসাই, রূপসাগরে ভেসে বেড়ানোর মত দুর্গতি আর নাই।"

"তুমি কি কোনদিনই চাও নি কিছু ?

"ভুল হয়ত করেছিলাম, কিন্তু সেইটাই বড় করে দেখো না গোঁসাই, ভালবেসে যদি আবার সেই ফাঁদেই জড়ালাম, তা হলে ঘরসংসারই বা কি দোষ করলে ?"

আজ ওসব যুক্তি মানতে চাই না। বলিষ্ঠ বাহুর মধ্যে টেনে নিই তাকে। আজ আমি বেপরোয়া হয়ে উঠেছি। হঠাৎ তার চোখে জল দেখে বিস্মিত হয়ে যাই, ব্যাকুল কণ্ঠে অনুনয় করে সে, "আমাকে ভুল বুঝ না গোঁসাই, এ পথ আমার তোমার কারুরই পথ নয়। গগনদাসকে মনে পড়ে ?"

শান্ত হয়ে আসি। কদমের চোখের জলের অর্থ বুঝি না। ভালবেসেছিল, কিন্তু তার কোন পরিণতিই ঘটল না—তাই হয়ত এই অশ্রু।

সেই রাত্রের ট্রেনেই কদম চলে গেল পশ্চিমের দিকে—আমি পড়ে রইলাম একা। যে পথ গগনদাসকে ডাক দিয়েছিল—সেই অসীম পথই মুক্তি দিল কদমকে আমার কামনাজাল থেকে—সেই পথই আবার আমাকেও তার বুকে আশ্রয় দিল, এনে দিল মহাশান্তির বাণী।

সন্ধ্যার ছায়া নেমে এসেছে আশ্রমের বেণুবনসীমায়। নীরবে বসে রয়েছি, বৃদ্ধ বাউল তার কাহিনী শেষ করল। পাণ্ডুর নীলাভ দুই চোখে তার কি যেন মৌন ব্যথা, জীর্ণ মলিন বেশ···তবু অন্তরে কোথায় যেন কি অমৃতের সন্ধান !

"আর কদমকে দেখতে পাও নি ?"

মাথা নেড়ে একটু হাসল বৃদ্ধ, "এত বড় দুনিয়ায় কোথায় সে মিলিয়ে গেছে।"

ধীরে ধীরে বার হয়ে এলাম আশ্রম থেকে। গুলঞ্চ গাছের পত্রহীন ডালে থোলো থোলো ফুলের অমলিন হাসি, রাতের অন্ধকারে জায়গাটা হেনাফুলের সুবাসে ভরে উঠেছে, অন্ধকারের মাঝে জ্বলছে সন্ধ্যাদীপ। শান্ত স্তব্ধ পরিবেশে বৃদ্ধের জীর্ণ কণ্ঠে কোন্ চিরন্তন সুর ধ্বনিত হয়।

"হৃদয় কমল চলছে যে গো ফুটে যুগ যুগ ধরি,
তাতে তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা উপায় কি করি।"

সুরশিল্পী

শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

বাঁশেরে করেছে বাঁশী সুরোচ্ছাসী সাঁওতালী ছেলে।
বুঝি বা প্রতিজ্ঞা তার রবে না সে সুরহীন পুরে
জনতার কোলাহলে এতটুকু পথ যদি মেলে
সহসা সুরের রঙ্গে যাবে চলি' একান্ত সুদূরে।

অথবা হয়তো ক্লান্ত কোলাহলে দানি' ক্লান্ত সুর
বিমূঢ় অন্তর-রাজ্যে আনি দিবে স্বপ্নের সন্ধান,
অনুর্ব্বর মরু-বুকে দেখা দিলে শ্যামল মধুর
দুলায়ে কুঞ্চিত কেশ নব সুরে গাবে কারো গান

বাঁশ যদি বাঁশী হয়, মন কেন সুর হবে না-ক'
হৃদয় হবে না কেন প্রেম ? জনতার কলরব
কেন বা হবে না কলগীতি ? কবি, আজ সন্দ' রাখো,
প্রসন্ন বিশ্বাসে মানো আছে বিশ্বে সুরের উৎসব।

অন্তরে আশ্বাস আনো, প্রাণের পিপাসা স্বপ্নে জেলে'
চলো যেথা বাঁশী হাতে সুরশিল্পী সাঁওতালী ছেলে।

জাহ্নবী যমুনার উৎস সন্ধানে

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

বেলা তখন এগারটা—খাওয়ার তাগিদ ছিল, জানকীমাই চটিতে পুরি ভাজিয়ে নেওয়া হ'ল। ছোট্ট একটি ছেলে আটা আনল, ঘি আনল আর তার কাজ সমাপনের ভার নিল স্বয়ং ধরম সিং। কাজটি সে এক রকম জোর করেই নিল, অবশ্য অন্য উদ্দেশ্যে নয়, সময়ের অপচয় দূর করার জন্যে। গরম গরম পুরি খাওয়া যমুনোত্তরীর পথে এই আমার প্রথম—রৌপ্য মুদ্রার অভাবের জন্যে এ পর্যন্ত ধরম সিঙের হাতে গড়া শুকনো রুটিই গলাধঃকরণ করতে হয়েছে। আমার রুচি ছিল না, তাই এ জিনিষও বাধ বাধ ঠেকে—বীরবলরা বেশী করেই ভাজায় আর খায়ও বেশী। খাওয়ার পাট তখনও চলছে, এমন সময়ে একটি বাঙালী সন্ন্যাসী এসে পড়েন—পরিচয় হয়ে যায় নিবিড় ভাবে। এ পথে এই প্রথম বাঙালীর দর্শন পাওয়া, তাও সন্ন্যাসীর উত্তরীয় পরা বাঙালী। তাঁর মতে সামনের যে চড়াই এটাই এ পথের বৃহত্তম ও কঠিনতম। সাড়ে তিন মাইলের চড়াইকে মনে হবে দশ মাইলের চড়াই, চড়াই হিসেবে যার তুলনা নেই।

বললাম, "যমুনা চটির পর যে চড়াইটা পেরিয়ে এলাম, সেটা ?"

বললেন, "ওটা এর তুলনায় শিশু। চড়াই হিসেবে তারও মূল্য আছে, তবে ভৈরবঘাটি যাত্রীর প্রাণশক্তিকে যেন শুষে নেয়। তবে প্রত্যেক যাত্রীর ওপর তাঁর করুণার অভাব নেই, নচেৎ যমুনোত্তরীর মন্দিরে যেত কে ? শঙ্কার কারণ নেই, তাঁকে স্মরণে রাখবেন, তা হলেই হ'ল।"

বাঙালী মূর্ত্তি পণ্ডিত ওঙ্কারনাথের শিষ্য, হুগলী জেলায় বাড়ী। আধ ঘণ্টা কথাবার্তার পর উঠে গেলেন। আমরাও উঠে পড়ি। খরসালী গ্রামের আগে দিয়ে যে রাস্তা এসে যমুনাকে ছুঁয়ে, অপর পারে এসে পড়েছে, আমাদের চলা সুরু হয় এই পথকে সম্বল করে। আধ মাইল বড় জোর যমুনার ধার বরাবর পথ—এটি পেরুনোর পর আচমকা যমদূতের মত একটা পাহাড় মারমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে আমাদের সামনে, চড়াইয়ের সুরু এর কোল থেকে··· ভৈরবঘাটির ঐতিহাসিক চড়াই ! বিহ্বল হয়ে আমরা দাঁড়িয়ে যাই !

লাঠি মারা চড়াই—এর নাম শুনেছিলাম, পরিচয়টা হ'ল এখানে। নির্ভেজাল চড়াই···একটা বিকটাকার পাহাড় একেবারে মৃত্তিকার বুক চিরে হাউইয়ের মত আকাশের দিকে ছুটে গেছে কিসের একটা প্রচণ্ড তাড়া খেয়ে। মনে হ'ল, বর্ণনার মধ্যে ভুল থেকে গেছে—যমুনা চটির পর পাহাড়গুলোকে চড়াইয়ের দিক থেকে প্রাধান্য দিয়ে। সত্যিই তারা শিশু···পথের সামনে যা এল এর অগ্রজ হওয়ার দাবী আমার পরিব্রাজক জীবনে আর কেউ করে নি। সত্যিই এর তুলনা নেই—সমগ্র জীবনকে যেন তাল ঠুকে চোখ রাঙিয়েছে সামনের ওই পাহাড়—এই প্রাগৈতিহাসিক পাষাণ-সম্ভার !

তলা থেকেই দেখতে পাচ্ছি এক থাক্, দু'থাক্, তিন থাক যাত্রীর এক-একটি ভগ্নাংশ পাহাড়ের বিভিন্ন স্তরবিন্যাসের ভিতর পিঁপড়ের সারির মত চলেছে, দূর থেকে তাদের চলমান বিন্দুর মিছিল বলে মনে হয়। ঘোরানো সিঁড়ির মত একটি সর্পিল পথরেখা ঘুরে ঘুরে আকাশের মেঘের মধ্যে যেন হারিয়ে গেছে। চড়াইয়ের সামনে আমাদের বুক অজানিত শঙ্কায় দুরু দুরু করে ওঠে—মনে হয় তিতিক্ষার কাঠামোতে অদৃশ্য মহাশক্তির বিশাল বাহুর একটা টান পড়েছে যাতে এই মুহূর্ত্তে সে কাঠামো ভেঙে চুরে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যেতে পারে।

নিরেট একটি অখণ্ড পাহাড়···মহাকালের মত পথ রুখে দাঁড়িয়ে আছে। এর দম্ভের যেমন সীমা নেই—তেমনি নেই এর স্পর্দ্ধার দুর্গানাম স্মরণ করে মুষ্টিমেয় যাত্রীর একটি দল চড়াইয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। অগ্রসরমান এই দলের প্রথমে কাণ্ডারীর মত বীরবল হঠাৎ গেয়ে ওঠে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেই গান—'কদ

যমুনোত্তরীর চড়াই

কদম বড়াহে যা—' ওর মার কাছ থেকেই শোনা, ও এককালে মিলিটারীতে কাজ করেছে, এ গানের জন্ম সেখান থেকেই—তবে শুনি নি কোন দিন। অদ্ভুত এক আবেগ সৃষ্টি হয় এ গানে, রক্তে তার প্রভাব বুঝতে পারি। বীরবলের পেছনে আমি—তার পর মাতাজী ও রুক্মিণী—সব শেষে ধরম সিং। এক মাইলের একটা পথ—হ্যাঁ, সে পথই বটে! সেই ছায়ামাত্র, আর কোন কিছুর বালাই নেই। অসংখ্য খণ্ডবিখণ্ড পাথর ছড়ান পথের উপর—দু'ধারে ঘন জঙ্গল আর এই জঙ্গলের জঠরে স্তূপীকৃত অন্ধকারের রাজ্য—সূর্য্যের আলোর পরাভব ঘটেছে যেখানে। দশ পা কোন রকমে ওঠবার পরেই বসে পড়ি—দম নি, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ভিতর অযথা একটা বিরোধ বাধে। বীরবলের প্রাণমাতানো গান পাহাড়ের নির্জ্জনতায় একটা অবদানের সৃষ্টি করে, মনে হয় বীরবলের এ গান ভিন্ন চলতাম কি করে? জাতীয় সঙ্গীতের সুর, তাল, লয়, মান বীরবল হুবহু অনুকরণ করেছে—আজকের এই অর্ব্বাচীন পথের ওপর এ অনুকরণের মর্য্যাদা শত গুণে বেড়ে ওঠে। মোটামুটি এক মাইল এই রকম শ্বাসকষ্টকর যুদ্ধের ব্যাপারটি—তার পর এই পথটি নেমে গেছে সোজাসুজি উৎরাইয়ের সামান্য একটু সান্ত্বনার ভিতর—যার শেষে একটি ঝর্ণার ধারার উৎপত্তি আর তারই পাশে পাহাড়ের গায়ে একটি ছোট্ট চায়ের দোকান। এখানে এলাম আমরা শূন্য হয়ে, দেউলে হয়ে, রিক্ত হয়ে!

রুক্মিণীর মুখের দিকে তাকাই, দেখি ক্লান্তিতে তার মুখটি কালো হয়ে উঠেছে—পিঠের ওপর তার শিশুটিকে সে বেঁধেছে যত্ন করে নানাবিধ গরম কাপড়ের অরণ্যের ভিতর। বড় সুন্দর লাগে ওকে, বৈরাগ্যের পথে মাতৃমূর্ত্তির মহিমান্বিত রূপ! জিজ্ঞাসা করে হা হুতাশের একটি শব্দও তার কাছ থেকে পাই না। বুঝিয়ে দেয় কষ্ট না করলে ভগবান মেলে না। দুটো চোখ বসে গেছে—রুক্ষ এক মাথা চুলের বন্যা, ডুরে শাড়িপরা আহমদাবাদী অনুকরণে, দাঁতে দাঁত বসে গেছে রুক্মিণীর—তবু তৃষাতুর দুটো ঠোঁটের ওপর বিজয়িনী হাস।

বীরবলের মাতাজীও অটুট ও সঙ্কল্পে মহত্তমা···বৃদ্ধাকে এখানে গোটা হিন্দুধর্ম্মের একটা বিশেষ ধারা বলে মনে হয় আমার···বড় ভাল লাগে। বীরবলের ত কথাই নেই—আজকে সে এই ঊর্দ্ধমুখী পাহাড়ের মতই সর্ব্ব দিক দিয়ে বড় হয়ে উঠেছে···এরও তুলনা পাই না। এখানে চা ছাড়াও গরম দুধ পাওয়া যায়, দুরতিক্রম্য একটা চড়াইয়ের পর এই দুধের অবদানটিও কম নয়।

চলে আসা দু'মাইল আর এই দু'মাইল আরও ভীষণ, আরও ভয়াবহ। যে চড়াইকে ফেলে এলাম তার চতুর্গুণ দুরারোহ এই শেষের পথটুকু। এক মাইলের কৃচ্ছসাধনার পর চা ও দুধের মনোরম পরিবেশটুকু, এ আর কিছু নয়, সামনের এই দু'মাইলের "টাগ অফ ওয়ারের" আগে সান্ত্বনার একটা ছেঁড়া পাতা। ভৈরবঘাটি এই

দুই মাইলের পরীক্ষা, এর শেষও যেমন নেই, তেমনি নেই এর অর্থের ব্যাপকতা। আদিম এই পাহাড়—বর্বর এই চড়াই। যমুনোত্তরী যাত্রীর শেষের এই পরীক্ষার তুলনা ভারতভূমির কোন তীর্থের ইতিহাসে নেই। গঙ্গোত্তরী মন্দিরের আগে আর এক ভৈরবঘাটির চোখ ধাঁধান বহিঃপ্রকাশ আছে—কিন্তু সেখানে ভৈরবের রক্তচক্ষুতে মৃদু সান্ত্বনার ইঙ্গিত আছে দেখেছি, এখানে সেটির গুরুতর অভাব। ভৈরব এখানে ক্ষেপা ও উলঙ্গ···

তুঙ্গনাথ ও ত্রিযুগীনারায়ণের উপর উঠে যারা আত্মপ্রসাদে সন্তুষ্ট হন—তাঁরা যেন একবার এদিকে এসে এই শেষের দু'মাইলের শিক্ষাটি নিয়ে যান। মান্ধাতার রূপ যেমন পাহাড়ের—তেমনি অবিনাশী রূপ এই সঙ্কীর্ণ পথরেখার। সৃষ্টির এ রকম দানবীয় রূপ আর কোথাও দেখি নি আমি। সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে এক বিশাল পাহাড় ধীর গম্ভীর মূর্ত্তিতে অসীমের দিকে ধাওয়া করে গেছে···অদ্ভুত এই পাহাড়, অবিস্মরণীয় এর স্মৃতি! পথ কোথাও কৃপণতম—কোথাও সে একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে পাহাড়ের গহনতায়। পথচলা সুরু হতে মনে হ'ল আমি হারিয়ে গেলাম চিরদিনের মত—এ হারানোর থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই! কে যেন গ্রাস করে নিল সব—উদ্গীরণের পালা শেষ হয়ে গেছে এর। পথ ত প্রায় নেই—স্থানবিশেষে উপরকার ধ্বস নেমে আসার ফলে তারও ক্ষীণ পরিচয় হারিয়ে গেছে। কোথাও ন'দশ ইঞ্চির পথের হারিয়ে যাওয়ার ভিতরও পরীক্ষার এক উলঙ্গতা প্রকাশ হয়েছে···আসতে আসতে দেখা যায় পথ একেবারেই নেই, তার উপর কেবলমাত্র একটি কাঠ ফেলা। এক হাতে পাহাড়ের গা ধরে পাশের অন্তহীন খাদের দিকে একবারও না তাকিয়ে এই কাঠটিকে সম্বল করে যাত্রীদের এগোতে হয় এক পা এক পা করে—পা ফসকালেই মৃত্যু আর মৃত্যুই চরম এখানে। সেই বাঙালী সন্ন্যাসীর কথাই সত্যি—"তিন মাইলের চড়াই মনে হবে দশ মাইল। তাঁর কথা স্মরণে রাখবেন, তা হলেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন।"

কথাটা সত্যি শুধু নয়—এমন প্রামাণিক বাস্তব আর কিছু নেই। পরীক্ষাই বটে—এ পরীক্ষা ষোল আনার ওপর আঠার আনা। সর্ব্বক্ষেত্রেই এই একই সূত্র—একই ধারা। ভারতভূমির কেদারনাথ—বদরীনাথ—গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী মন্দির দর্শনের আগে অবিচ্ছেদ্য এই পরীক্ষার ইতিহাসটি প্রত্যেকটি তীর্থের সঙ্গে যুক্ত ও অবিভাজ্য। কেদারের প্রবেশপথে তুষার ঝঞ্ঝা ও প্রাকৃতিক নিরাভরণতার বৈধব্য রূপ—বদরীকার আগে হনুমান চটির পর সুবিশাল সেই দিগন্তবিস্তারী চড়াইয়ের ভ্রূকুটি আর আজকের এই ভৈরবঘাটির 'রণং দেহি' মূর্ত্তি—একটি সূত্রে গাঁথা মালার মত —একই তিতিক্ষার মর্ম্মকথাটি যেন কানে শুনতে পাওয়া যায়। মা তাঁর অবস্থানের স্বরূপটি সার্থক ভাবে দর্শন করানোর আগে সন্তানদের একটা আত্মবিশ্লেষণ রূপ বাধার সৃষ্টি করে রেখেছেন সব জায়গায়—যমুনোত্তরীর ভৈরবঘাটির এই দু'মাইলের প্রাণান্তকর পরিচ্ছেদ তারই একটা জাজ্বল্যমান উদাহরণ। তিনি এখানে প্রতিটি পাদবিক্ষেপের ভিতর দিয়ে শারীরিক ও মানসিক অবসাদের ভিতর অবগাহন স্নান করিয়েছেন যাত্রীদের, বুঝিয়ে দিয়েছেন—'কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।' এখানে মা নিঃস্ব করে নিয়েছেন যাত্রীদের, নিঃশেষ করে নিয়েছেন অধ্যবসায়ের সঞ্চয়। কেদার-বদরীর পথে যা ভেবেছিলাম হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এখানে সেই ভাবনা নতুন রূপে দেখা দিল।

এক পা, দু'পা—এমনি করে মাত্র দশটি পাদবিক্ষেপ—তার পরেই বুকের ভিতর হাতুড়ি বেজে ওঠে—স্বাভাবিক রক্তসঞ্চালনে বাধা আসে, মনে হয় মুখের ভিতর দিয়ে প্রাণের ধুকপুকুনিটা বেরিয়ে যাবে। উঃ! কি অদ্ভুত চড়াই, কি নির্ব্বিশেষ পরীক্ষা! পা আর চলে না, বিদ্রোহ করে উঠে শিরা-উপশিরা, মনে হয় ভগবান, এ কি তোমার পরীক্ষা! এ পরীক্ষার কি শেষ নেই? কাঁটার আঘাতে পা যায় ছিঁড়ে—বসে পড়ি, রক্ত মুছে নি—তবু চলা চাই। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার যে আর দেরী নেই! মধ্যাহ্নকে মনে হয় রাত্রির প্রথম প্রহর—কোটি কোটি মহীরুহের শাখাপ্রশাখার বেড়াজালে আকাশের সূর্য্যের আলো গেছে মুছে, তার আলোর প্রবেশের অধিকার এ রাজত্বে অপাংক্তেয় হয়ে গেছে। এ এক প্রাগৈতিহাসিক সৃষ্টিতত্ত্বের প্রথম পাতার পরিচয়। বিংশ শতাব্দীর সবকিছুকে এ ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে।

এমনি করে দু'মাইলের এই নিষ্ঠুর পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল—পৌঁছে গেলাম পাহাড়ের শীর্ষে—যেখানে এ কৃচ্ছ্রসাধনের শেষ। মাতাজীই আগে পৌঁছে গেলেন—তার পর আমি—তার পর বীরবল ও কর্কিনী। যে বার্দ্ধক্য ঘরে থাকার কথা নানা পরিজন শুশ্রূষার ভিতর—আজকে দেখলাম তারই জয় হ'ল প্রথম—অশীতিপর বৃদ্ধা আগেই পৌঁছে গেলেন। অদৃশ্য করুণার এও এক অত্যর্থ আশীর্ব্বাদ—বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা চলে না।

এখানে ভৈরবনাথের জীর্ণ মন্দির—শতধা বিভক্ত, প্রাচীন ইতিহাসের স্বাক্ষর আছে। ছোট্ট মন্দিরটি—রূপ নেই, বিলাস নেই, নিরাভরণ মন্দির এ। ভিতরে ঢুকে বিগ্রহ দর্শন করলাম। কালিকা মূর্ত্তি—চতুর্ভুজা নন, দ্বিভুজা। এক হাতে ত্রিশূল আর এক হাতে খণ্ডিত নরমুণ্ড। কালিকা মূর্ত্তির হাতে ভৈরবের ত্রিশূল—এর সামঞ্জস্য ভারতবর্ষের অন্য কোথাও আছে বলে জানা নেই। মাতৃমূর্ত্তিকে আমরা দেখেছি চতুর্ভুজা হিসেবে—বরাভয়দাত্রী, খড়্গধারিণী ও নৃমুণ্ডমালিনীরূপে—মায়ের পূজা সেই রূপেই। কিন্তু এ ত্রিশূল মায়ের ডান হাতের মুষ্টির ভিতর আবদ্ধ কেন? এই প্রশ্নের উত্তর প্রচ্ছন্ন হয়ে এখানেই আছে—মুহূর্ত্তের চিন্তাতেই তার স্বরূপ ধরা পড়ে। মা এখানে সাধকের দৃষ্টিতে সর্ব্বশক্তিরূপিণী—শবরূপী পুরুষের বুকের উপর মহাশক্তির আধারভূতা, তাই শিব লীন হয়ে গেছেন মাতৃশক্তিতে—ত্রিশূলের আর দ্বিতীয় সংজ্ঞা নেই, মায়ের দক্ষিণ হস্তেই সে মহাস্ত্রের সার্থকতা চরম ভাবে প্রকট রয়েছে। ভৈরবনাথের মন্দির এটি অথচ ভৈরব নেই, নিগূঢ় কোন

যমুনোত্তরী
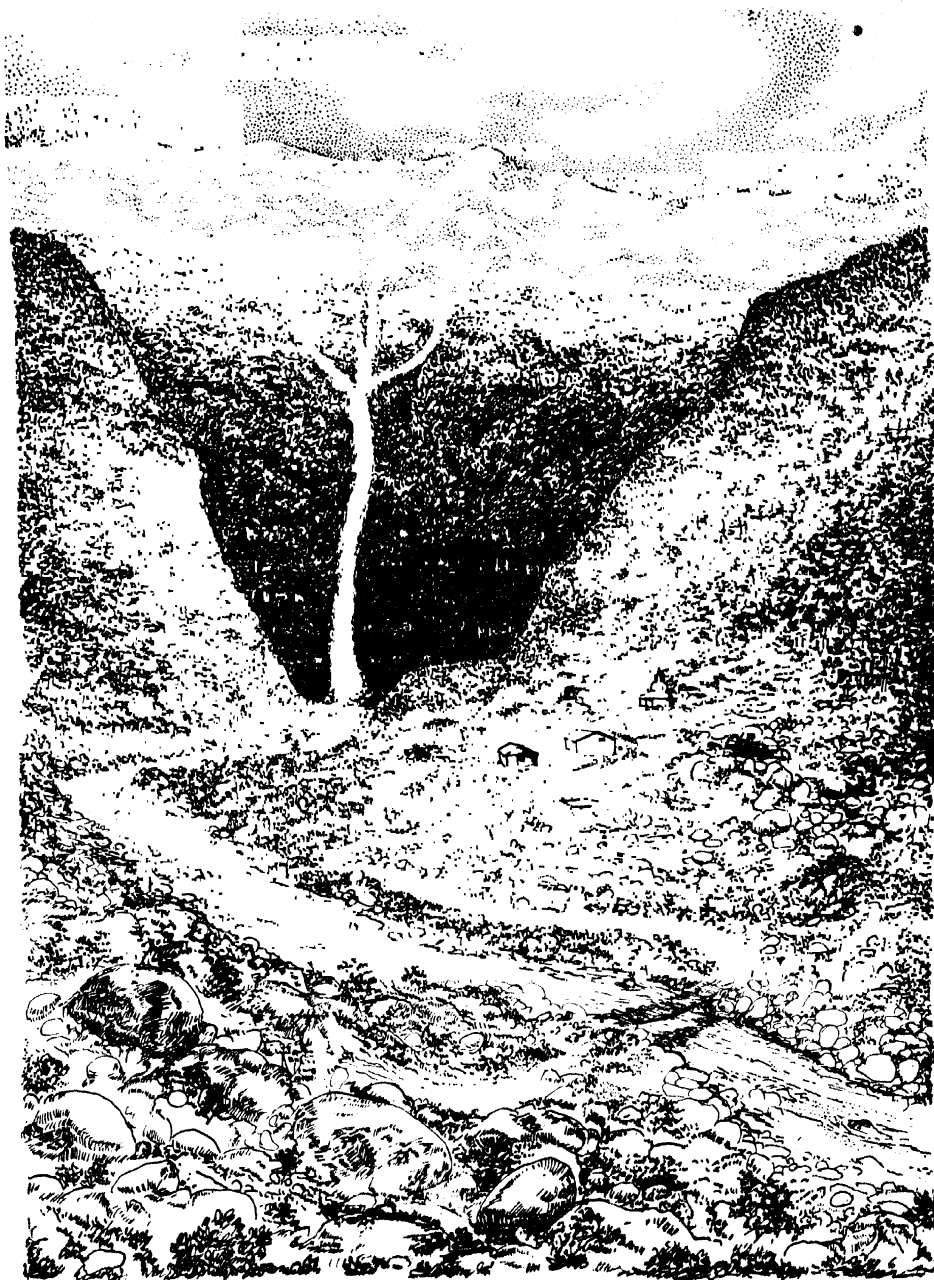
কারণে সাধকেরা এখানে প্রকৃতিকেই প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। মন্দিরের সামনেই একটি নামহীন গাছ, তাতে অসংখ্য কাপড়ের ছিন্ন অংশ বাঁধা—শোনা গেল ঐ গাছটিকেই ভৈরব বলে মেনে নেওয়া হয়। বদরীকার পথে চীরবাসা ভৈরবেরও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নেই, সেখানেও ভৈরবকে বস্ত্র-দান প্রথাকে বড় করে নেওয়া হয়েছে। সেখানে কালীমূর্তি দেখি নি, এখানে দেখা গেল। অদ্ভুত এক বিদঘুটে আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দশ হাজার ফুটের উপর এই কালীমূর্তিটির অধিষ্ঠানকে কেমন যেন অদ্ভুত বলে মনে হয়। মায়ের রূপে চতুর্ভুজেরই স্বাক্ষর মিলেছে যুগে যুগে—এখানে তারই ব্যতিক্রম। কত শতাব্দী আগে এক তাপস এ মূর্তিকে প্রতিষ্ঠা করে মাতৃসাধনা করে গেছেন কে জানে—তাঁর দেখা স্বপ্নে মা কি ভাবে এসেছিলেন তার ঐতিহাসিক তত্ত্বকে খুঁড়ে বার করা এখানে দুঃসাধ্য। আমরা এগিয়ে যাই, রেখে যাই জীবনের সশ্রদ্ধ প্রণামের একটি অঞ্জলি।

ভৈরবনাথের মন্দির থেকে আর আধ মাইল পথ, এই পথই ক্রমশঃ ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী হয়ে চলে গেছে যমুনোত্তরীর গহ্বরে। এ পথটুকুও পথ নয়—এ পথটুকুতেও ক্লান্তি আছে ষোল আনা। কখন উঠে—কখন বসে বসে, এ পাথর থেকে সে পাথরের উপর পা রেখে নেমে যেতে হয়। চোখের সামনেই গ্লেশিয়ারের তুষারশুভ্র অভ্রভেদী রূপ—তার বুক থেকে দেখা যায় মা যমুনার ক্ষীণ রূপালি ধারা নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে—এ যে কি দৃশ্য তা বোঝাই কি করে? চারিদিকের যে পাহাড়শ্রেণী তার মধ্যে দুটি পাহাড় রঙ্গমঞ্চের 'উইংসে'র মত দু'দিক থেকে তলায় নেমে গেছে—এর মধ্যে যে স্বল্প ব্যবধান, তারই সামনে বহু দূরে ঐ গ্লেশিয়ারের অন্তহীন শোভাযাত্রা। অদ্ভুত এই দৃশ্যটি! যমুনোত্তরী মন্দিরকে পাহাড়ের উপর থেকে দেখা যায় না—এ মন্দিরের অবস্থান প্রাকৃতিক গহ্বরের ভিতর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সমগ্র অঞ্চলটি কিসের যেন এক অন্তহীন লজ্জায় অধোবদনের রূপটি নিয়ে আছে—এও এক প্রাকৃতিক বিস্ময়। চারিদিকের পাহাড়ের সে উদ্ধত রূপটি আর নেই—একই ছন্দে একই তালে সকলের যেন একটুকরো ভূখণ্ডকে গহ্বরের আকার দেওয়ার জন্যে কাড়াকাড়ি। মন্দিরের এ রকম সাংস্কৃতিক আশ্চর্য রূপ ভারতবর্ষে আর কোথাও নেই। যমুনোত্তরী তীর্থের সবটাই এক রহস্য, এই আধ মাইল পথ নামতে নামতে সেই কথাটাই আবার আমার মনে হ'ল।

এ পাথর থেকে সে পাথর—ওঠা-বসার এই রকম এক পরীক্ষা শেষ করে অবশেষে পৌঁছে গেলাম যমুনার তীরে ধর্ম্মশালায়—সন্ধ্যার তখন আর বেশী দেরী নেই। গোলাকার ঝকঝকে একটি চাঁদ উঠে গেছে আকাশের নক্ষত্র নীহারিকার মায়াজালের ভিতর··· আজ পূর্ণিমা, আমার জীবনেরও পূর্ণিমা।

এ দুর্গম তীর্থেও কালীকমলীওয়ালার ধর্ম্মশালা—অবাক হয়ে যেতে হয় এই ভেবে যে ইট কাঠ পাথরের তৈরী আশ্রয়ের এ মহামূল্যবান আচ্ছাদনটুকু তৈরী হ'ল কি করে। মানুষের এও এক সার্থক জয়যাত্রা। অভিমান নিয়ে, বেদনা নিয়ে তীর্থপর্য্যটনের শেষে কমলীবাবার এই দুঃখই বেশী করে বেজে ওঠে যে তীর্থযাত্রীদের কষ্টের অবধি নেই কেবল আশ্রয়ের জন্যে, চারটে দেয়ালের আচ্ছাদনের জন্যে। তাঁর ঘরে ছিল লক্ষ্মী, টাকার তাঁর অভাব ছিল না। আর এই টাকার এক বিরাট অংশ অকাতরে ব্যয় করেছেন ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি তীর্থপ্রান্তরে—তাঁরই চেষ্টায় গড়ে উঠেছে ঘরবাড়ী ও সদাব্রত। সন্ন্যাসীদের জন্যে তৈরী হয়েছে কুটীর ও রম্য পরিবেশ। তাঁর এই বিরাট অবদান প্রত্যেক তীর্থযাত্রীর অমূল্য পাথেয়—এ অবদান তিনি সৃষ্টি না করে গেলে তীর্থমাহাত্ম্য প্রচার হ'ত না, করুণা পেত না কেউ। আজকের এই যমুনোত্তরী তীর্থে কমলীবাবার ধর্ম্মশালায় একটি ঘরের উত্তাপ পেয়ে মনে হ'ল সার্থক সেই মহাপ্রাণ মানুষ, সার্থক তাঁর দান। এ ধর্ম্মশালাটি এখানে গড়ে না উঠলে এ তীর্থে আসত না কেউ, অন্ততঃ আমাদের মত গৃহগতপ্রাণ মানুষ—নির্জ্জনতার রাজত্ব হ'ত··· যমুনোত্তরী যাত্রীর কলধ্বনি আর শোনা যেত না এখানে।

কি সাঙ্ঘাতিক শীত। পা জড়িয়ে যায়—রক্ত জমে যায় যেন তুষাররাজ্যে এসে গেছি আমরা, তাই শীতই এখানে একমাত্র আবহাওয়ার খবর। একে ঐ ভৈরবঘাটির রাক্ষুসে চড়াই পেরুনো, তার উপর এই হাড়কাঁপানি শীতের প্রকোপ, তিনখানা কম্বলের অরণ্যে শুয়েও মনে হ'ল এই বুঝি জমে যাব। কেদারে পৌঁছে গত বছর এই রকম হয়েছিল—কিন্তু সে জিনিষ এ নয়। এ শীত আদিম—উলঙ্গ, মাথা পর্য্যন্ত ঘুরে যায়। ভাবছিলাম আজ থাক, বিশ্রাম নিই, মানুষের মত হই, তার পর কাল সকালে মন্দির দেখব। কিন্তু পাণ্ডা ছাড়ে না, স্মরণ করিয়ে দেয়—"আজ ত বাবুজী পূর্ণমাসী।"

লাফিয়ে উঠি। মনে হয়, সত্যিই ত, ভুলেই গিয়েছিলাম যে আকাশে অদ্ভুত সুন্দর একখানা চাঁদ আমারই জন্যে অপেক্ষা করে আছে। গরম জামার স্তূপ হয়ে বেরিয়ে পড়ি। আমার আগেই ধরম সিং আর বীরবলরা বেরিয়ে গেছে।

যমুনোত্তরীতে পূর্ণিমা। মুঠো মুঠো তারা আর তারা—আকাশের দূর প্রান্তে একটি মাত্র ছায়াপথ, আর এই স্বর্গরাজ্যের উপর অতন্দ্র নিশাচর সাক্ষীর মত ধকধকে একখানা চাঁদ ফুটেছে। ধ্যানের পালা চলেছে আশেপাশের পাহাড়গুলোর, মনে হ'ল যোগমগ্ন সব, নিঃসীম হয়ে যেন মিশে গেছে প্রকৃতি-পুরুষের আরাধনার ভিতর। চারিদিক এত চুপচাপ, এত নিথর যে মনে হয় সুপ্তির জড়িমায় মায়ের চোখদুটি বোঁজা, এ সুপ্তির যেন শেষ নেই। কাঠের সেতুর তলা দিয়ে যমুনা পেরিয়ে গেল—অপর পারে মন্দির, মুখারবিন্দ ও তপ্তকুণ্ড। চাঁদের আলোয় ঝলমলে মা যমুনার ছলছলানি কাণে আসে—তার পর মর্ম্মে পৌঁছয় আর সে মর্ম্ম কিসের এক অনুভূতিতে অনড় হয়ে যায়, স্তব্ধ হয়ে যায়। হিমবাহজাতা যমুনার প্রস্তরখণ্ডের ধাক্কায় তাঁর ধারার সে কি উচ্ছাস, লক্ষ কোটি জলবুদ্বুদের ফেনিল আক্ষেপ আর এই উচ্ছাসের উপর নেমে এসেছে

তরল আলোর বন্যা। স্রোতস্বিনীকে দেখে মনে হয় আশেপাশে কোথাও অভ্রের খনি আবিষ্কৃত হয়েছে আর তারই মুকুট মাথায় করে মা যমুনার এই উচ্ছাসময় গতিপথের আকুলি। মুহূর্তের জন্যে অবশ হয়ে যাই—মনে হয় এখানে একটি কুটীর বাঁধি, থেকে যাই চিরকাল।

পাহাড়েরই একটি ধাপ, তারই পাশে আসল তপ্তকুণ্ডের ধকধকানি, এখানে এখন যাত্রীর ভিড় নেই। তার কারণ এই কুণ্ডের জলেই যাবতীয় আহার্য্যবস্তু পক্ক হয়ে আহারের উপযোগী হওয়ার ব্যাপারটি—জলের ভিতর আটার লেচি কিম্বা চালের পুটুলি ফেলে দিয়ে আধ ঘণ্টার মত অপেক্ষা করে থাকা, তার পরই কুণ্ড তা উদ্গীরণ করে দেবে সিদ্ধ অবস্থায়, এখানে কাঠ জ্বেলে রান্নাবাড়ার পাট নেই, ঐ তপ্তকুণ্ডের জলই সব। এই কুণ্ডের বাঁ দিকে ঐ পাহাড়ের ধাপের একাংশে বহু প্রাচীন একটি গুহা—তার ওদিকে কুণ্ডের কোল ঘেঁষে যমুনোত্তরীর মন্দির।

নিরাভরণ মন্দির—অলঙ্কারবর্জ্জিত মন্দির। ভাস্কর্য্য নেই, শিল্পীর আরাধনা নেই—নগ্ন পরিবেশের ভিতর নগ্ন মন্দির—এই রূপেই একে মানিয়েছে, দেখিয়েছে মহান্। কাঠের রেলিং দিয়ে ওপরে উঠে যেতে হয়। মন্দিরের দ্বার বন্ধ ছিল—পয়সার বিনিময়ে পুরোহিত অনুগ্রহ করে খুলে দিলেন সেটি—প্রবেশাধিকার মিলল। গঙ্গা-যমুনার মূর্ত্তি, এদিক-ওদিকে আরও কয়েকটি বিগ্রহের নামমাত্র থাকা। একটি প্রদীপ জ্বলছে উর্দ্ধমুখী হয়ে—তার আলোর সামান্য একটু প্রকাশ—মন্দিরের গর্ভগৃহে বাদবাকী অন্ধকারাচ্ছন্ন। যাত্রীদের ফিস ফিস আওয়াজ কানে আসে, মন্ত্র উচ্চারণ ও স্তবস্তুতি শুনতে পাই···আপাদমস্তক ঢেকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি এখানে কিছুক্ষণ। বিগ্রহের উদ্দেশে প্রণাম জানাই—শ্রদ্ধা জানাই। তীর্থে তীর্থে মন্দিরকেই প্রাধান্য দিয়েছে মানুষ, যা কিছু স্তবস্তুতি ঐ মন্দিরকে ঘিরে, মাথা কোটা, আকুলি-বিকুলি সব সেখানেই অর্থাৎ মন্দিরের পাষাণবিগ্রহকে ঘিরে। কিন্তু যমুনোত্তরী মন্দিরে তারই অভাব। মন্দির গড়ে উঠেছে বটে—গঙ্গা-যমুনাও সমাসীন, তবু তীর্থযাত্রীর ভিড় থাকলেও ভক্তির উচ্ছাসের ব্যাঘাত ঘটেছে। মন্দির প্রাচীন নয়, নবীন—বর্ত্তমান শতাব্দীতেই শোনা যায় এ মন্দিরের বনিয়াদ গড়ে উঠেছে আর এই গড়ে-ওঠাটুকু মনে হয় অনিবার্য্য কারণের জন্যে, যার সঙ্গে ভক্তিমার্গের সম্পর্ক কতকটা ছিন্ন হয়ে গেছে। এ তীর্থের যাবতীয় মাহাত্ম্যের ব্যাপকতা এখানকার মুখারবিন্দকে ঘিরে—ছোট্ট একটি চতুষ্কোণ গহ্বর থেকে দু'-তিনটি স্বতঃ উৎসের নামমাত্র যা ধুকপুকুনি, শোনা যায় এই কুণ্ডটুকু যমুনার উৎসের মূলসূত্র—তার হৃৎপিণ্ড। তীর্থযাত্রীদের পূজা-অর্চনা, প্রসাদ দান—ভক্তির উচ্ছাসকে এই মুখারবিন্দের ঐতিহাসিক তত্ত্ব গ্রাস করে নিয়েছে—এখানেই মানুষের জলের স্পর্শ নিয়ে জীবনকে ধন্য করার মর্ম্মান্তিক প্রয়াস। সামনের হিমবাহ থেকে নেমে আসা যমুনার অদৃশ্য ধারার প্রাণটুকু নাকি এখানেই উচ্ছলিত—তাঁর মুখ অরবিন্দের মুখ—তাই এই মুখারবিন্দের যুগব্যাপী সম্বর্দ্ধনা। চতুষ্কোণ একটি গহ্বর—এরই জন্যে আমাদের ছুটে আসা, তিতিক্ষার প্রাণান্তকর অভিযান। মন্দির হয়ে গেছে মূল্যহীন, গতানুগতিক—গহ্বরই মানুষকে দুর্ল্লভতমের বার্ত্তা ঘোষণা করেছে। পূর্ণিমার রাত্রে পূজা দিলাম—উৎসের জলে জীবন ধন্য করা হ'ল। মুখারবিন্দের কাছেই আর দুটি তপ্তকুণ্ড—এদের গহ্বর পূর্ণ হয়েছে সামনের ঐ বড় কুণ্ড থেকে, মন্দিরের পাশেই যার অবস্থিতি। জল বাধা মানে না—পাত্র পূর্ণ হলেই তার উচ্ছলতা স্বাভাবিক, এ দুটি কুণ্ড ঐ স্বাভাবিকতাতেই পুষ্ট হয়ে চলেছে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী। এখানে স্নানের ব্যবস্থা—গরম জল একটি পাত্রে করে মাথাটুকুকে ভিজিয়ে নিতে হয়, এইটাই মহিমা। আমরা তাই করলাম। সাক্ষী রইল পূর্ণিমার চাঁদ—জীবনের স্বাক্ষর হয়ে রইল সে।

এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, কেন জানি না, কেদারনাথকে বড় বেশী করে মনে হয়ে গেল। এও মহাতীর্থ, কেদারও ত তাই··· মনে হ'ল যেন স্বয়ম্ভু মহাদেবের অনন্ত জটাজালের বিস্তারের প্রভাব যাত্রিক জীবনে বড় বেশী ব্যাপক। সেখানে মন্দিরের পিচ্ছিল গর্ভগৃহের ভিতর পুঞ্জীভূত অন্ধকারের পরিবেশের মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষের যে উচ্ছাস দেখেছি তার তুলনা একমাত্র কেদারনাথেই সম্ভব। মানুষ নিজেকে যেন ঢেলে দিয়েছে অসীমতার উপলব্ধির ভিতর—ভিখারী শিবের ভিক্ষার পাত্রে পূর্ণ করে দিয়েছে যেন জীবনের পূর্ণাহুতির নৈবেদ্য। কেদারনাথে মানুষের পাগল হয়ে যাওয়া—দেউলে হয়ে যাওয়া। ধকধক করে জ্বলছে পঞ্চপ্রদীপের উর্দ্ধমুখী শিখা, তারই সামনে পাষাণ-মৃত্তিকার বুক চিরে দেবাদিদেবের অদ্ভুত প্রকাশ দেখেছি, মানুষ কাঁদছে হাউ হাউ করে—বুক দিয়ে পড়েছে শিবলিঙ্গের উপর—মানুষের সে পর্য্যায় নরোত্তমের পর্য্যায়—নর ও নারায়ণের মিশে যাওয়া যেন। এখানে সবই আছে—কিন্তু সেই অবর্ণনীয় উচ্ছাসটি নেই। এখানে এসে ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার অভিমানের কথা বলছি না—যা নেই তাই বলছি। শক্তিই যে বড় আর মহাদেবই যে শক্তির আদি—কেদারনাথের মন্দিরাভ্যন্তরে মানুষের যে প্রকাশ—সেই বিরাটত্বেরই ইতিহাস তৈরী হয়েছে সেখানে।

আমার মনে হয় যমুনোত্তরী তীর্থের চরম প্রকাশ প্রকৃতিতে—প্রকৃতিই এখানে সর্ব্বাতীতের সন্ধান দিয়েছে। দৃষ্টির সম্মুখে তুষার-শুভ্র হিমবাহ থেকে সরু রূপালি ফিতের মত যমুনার যে ধারা আর সেই ধারার দুটি পাশে আর দুটি ধারার যে সহযাত্রিক গতি-পথ—মানুষের অন্তরের অন্তরে এই প্রকৃতি এখানে আসার বৃহত্তম পুরস্কার। মনে হয় সমস্ত জীবন ধরে শুধু ঐ গ্লেশিয়ারের দিকে চেয়ে থাকি! মন্দির পড়ে থাক, মুখারবিন্দ পড়ে থাক—এক দৃষ্টে অপলকনেত্রে ঐ দৃশ্য দেখে আমার ধ্যান নেমে আসুক, আমি মগ্ন হয়ে যাই। "উইংসের" মত দুটি যে পাহাড়, তারও যেমন তুলনা নেই, তেমনি তুলনা নেই এখানকার প্রাকৃতিক নিস্তব্ধতার মায়াময় রূপের। যাত্রীর সংখ্যা এখানে অল্প,

তাই নিস্তব্ধতার নিজস্ব সত্তাটি এখানে বেঁচে আছে। এখানে প্রত্যেকটি পাহাড়ের অর্থ অজানা, ব্যঞ্জনা আলাদা, বিশেষণ আলাদা। প্রাকৃতিক গহ্বরের ভিতর ঐতিহাসিক এই মহাতীর্থ··· এর তুলনা অন্য কোথাও আছে বলে মনে হয় না আমার।

যমুনোত্তরীতে দ্বিতীয় দিনের সুরু হ'ল যমুনার মূর্চ্ছনার ভিতর। স্মরণীয় একটি দিনের শেষে আর একটি দিনের সুরু··· প্রাকৃতিক গহ্বরে আর একটি দিনের ইতিহাসের উন্মোচন।

ধরম সিং চা সংগ্রহ করে আনে—মুখ ধোয়ার জন্যে গরম জলও সংগ্রহ করে এনেছে সে। মাতাজী উঠেছেন আর জপের মালা নিয়ে বসেছেন—বীরবল রুক্মিণী তখনও অকাতরে ঘুমুচ্ছে। আমরা এখানেও একটি ঘরে আশ্রয় পেয়েছি যোগাযোগের একটি পাতার মত।

আজকেও এখানে থেকে যাব—কাল সব কিছু জানা হয় নি, বোঝা হয় নি। এত দূর এলাম, যদি আর একটি দিনের স্মৃতি সঞ্চয়ের ভাঁড়ারে না আসে তা হলে এত দূর এলাম কেন? তা ছাড়া থেকে যাওয়ার বিশেষ কারণও ছিল।

একজন বিখ্যাত পরিব্রাজকের লেখা বইয়ের ভিতর পড়েছিলাম যে তিনি এখানে এসে মন্দিরের পুরোহিতের সাহায্য নিয়ে যমুনোত্তরীর বিখ্যাত গ্লেশিয়ারের ওপর উঠে দূর থেকে চম্পা সরোবর দেখেছিলেন: তাঁর মতে ঐ সরোবরই যমুনার উৎপত্তিস্থান আর সে অঞ্চল অগম্য ও দেবতাদের আবাসভূমি। বান্দরপুচ্ছ পর্ব্বতের শেষাংশও তিনি দেখেছিলেন আর পৃথিবীর বুকে নেমে আসা তিনটি ধারার তিনি বর্ণনা দিয়েছেন অপূর্ব্বভাবে সে বইয়ের ভেতর।

হনুমান চটিতে রাত্রে শুয়ে শুয়ে সে বইয়ের কথা আমার স্মরণে যে আসে নি তা নয়, এসেছিল, আর মনের অবচেতনায় সঙ্কল্প ব্যাপকতার রূপ যে পরিগ্রহ করে নি তাও নয়: ভেবেছিলাম, যমুনোত্তরীতে পৌঁছে একবার চেষ্টা করে দেখব।

চা খাওয়া শেষ করে ধরম সিংকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি পাহাড়ের আবিষ্কারে। 'উহংস' অর্থাৎ ডানার মত যে দুটি পাহাড় যমুনার ধার বরাবর নেমে চলে এসেছে, তারও ওদিকে মন্দিরের পশ্চিমাংশে পাহাড়গুলোতে সন্ধান নিই যদি পাহাড়ের ওপরে উঠে সামনের গ্লেশিয়ারে রওনা দেওয়ার কোন সূত্র খুঁজে পাই কি না। কাঁটার ঝোপ—মহীরুহের একচ্ছত্র রাজত্ব পাহাড়গুলোতে—কত যুগ থেকে যে এ রাজত্ব গড়ে উঠেছে কে জানে? তবুও উঠে যাই কতকটা—দৃষ্টিটাকে মেলে দিই দূর দিকচক্রবালের অনন্ততায়—কিন্তু ঐ তিনটি ধারার অস্পষ্ট গতিরেখাই চোখে পড়ে, অন্য কিছু নয়। বহু দূরে গ্লেশিয়ারের পরিক্রমণ—তারই বুক থেকে নেমে আসা ঐ যমুনার ক্ষীণ ধারা, সেই ধারাই ধরাতলে নেমে এসে হারিয়ে গেছে এটুকু বেশ বোঝা যায়। কিন্তু ঐ হিমবাহ রাজ্যে যাওয়া দূরের কথা, স্বপ্ন দেখাও ত চলে না। মন্দিরের সামনেই যে যমুনা তার ভীম গর্জ্জনের প্রবাহ ঐ দুটি পাহাড়ের মধ্য দিয়ে প্রবহমাণ। পেছনেই ওই গ্লেশিয়ার, যা বহু দূরে—মানুষের যাওয়া সেখানে সাধ্যাতীত। পাহাড়ের ওপর উঠে পরিষ্কার ধারণা হয়ে গেল মনুষ্যদেহী মানুষের ও গ্লেশিয়ারের সন্ধানে চম্পা সরোবরের আবিষ্কারের নেশায় যাওয়া চলে না—ওটা অসম্ভব বলেই মনে হ'ল আমার। শুধু শুভ্র তুষারের রাজ্য সে—মানুষের যাওয়া সেখানে চলে না। তবে যমুনোত্তরীর এ তীর্থে সিদ্ধ যোগীদের নিঃশব্দ পদসঞ্চার আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই—তাঁদের ধ্যানস্থ মূর্ত্তি ওখানে থাকা অসম্ভব নয়। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায়—সাধারণের পক্ষে ওস্থান অগম্য। যমুনোত্তরীতে দ্বিতীয় দিনটি কাটে আমার শুধু পাহাড়ের আবিষ্কারের নেশায় নয়, অন্যান্য কর্ম্মতৎপরতাও ছিল। সারাটা দুপুর আর বিকেল কেটেছে মন্দিরের ধারের কাছে, যমুনার তীর বরাবর আর সুদূরপ্রসারী হিমবাহের হাতছানিতে। যাত্রী যারা এসেছে বা এল তাদের সঙ্গে পরিচয়সূত্রে সঞ্চয় তুলে নিয়েছি প্রচুর। কত দেশের মানুষ—যমুনোত্তরীর গহ্বরে এসে একাকারের পর্য্যায়ে এসে সব মিশে গেছে যেন। সকলের লক্ষ্য এক, তাই ভূমিকা গেছে লুপ্ত হয়ে—এখানে একটিমাত্র উপন্যাস, সে উপন্যাস মানুষের জয়যাত্রার উপন্যাস। এখানে মানুষের সুর এক, ছন্দ এক। অথচ নিম্নভূমির এ অশুচিতার পাতা যায় উড়ে, বর্ণ যায় মুছে, তখন এ মনুষ্যগোষ্ঠীকে আর চেনা যায় না, ধরা যায় না।

সেই বেনিয়া দম্পতি অবশেষে এসে গেছে, সেই বিপুলকায়া বোম্বাইবাসিনীকেও দেখলাম মুখারবিন্দের কাছে। কায়া বিদ্রোহী হয়েছিল, কিন্তু মন ছিল অটুট, তাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলা সার্থক হয়েছে। মুখে-চোখে একটা দিগ্বিজয়ের ছাপ—চলাফেরায় বিজয়িনীর চমক। আলাপ হয়—নিমন্ত্রণ পাই বোম্বাই গিয়ে একবার পায়ের ধূলা দেওয়ার। বললাম, "যাব—।" মনে মনে ভাবি, এখানে যে পরিচয়ের হৃদ্যতা, তা বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে হয় ত—দেখলে চিনতে পারা দুষ্কর হয় ত হবে বোম্বাইতে। দশ হাজার ফুটেরও ওপর যমুনোত্তরী, মানুষের মন উঁচু হওয়াটা এখানে স্বাভাবিক।

ঘুরি, ফিরি আর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়। কনকনে বাতাস, এ বাতাস ঐ গ্লেশিয়ারকে মুছে নেওয়া—তাই হাড়ের ভিতর গিয়ে ঢুকে আর বেরুতে চায় না। সাধু সন্ন্যাসীর খোঁজে নিরালা স্থানের খোঁজ নিই, দেখা পাই না কারুর।

সবই দেখি, সবই বুঝি কিন্তু খরসালীর সে স্মৃতি সবকিছুকে গ্রাস করে নেয় যেন, কেমন যেন বিষণ্ণ বোধ করি নিজেকে, কিছুই যেন ভাল লাগে না আমার।

এবার ফেরার পালা, তীর্থ পর্য্যটনের একটি ইতিহাস শেষ হয়ে গেল, আর একটি বাকী। তৃতীয় দিনে সকাল হতে না হতেই সুরু হ'ল গোছগাছ, মালপত্র বেঁধে নেওয়া। দুটি দিনের মাত্র স্মৃতি—এ স্মৃতি সঞ্চয় হয়ে থাক জীবনে, জপমালার ভিতর এ স্মৃতির ঐশ্বর্য্য নেমে আসুক। আসা—আসা—আসা—এসে গেলাম অবশেষে, চড়াই ভেঙে, উৎরাই ভেঙে, বন্ধুর পথরেখায় জীবনের মায়া কাটিয়ে, স্বপ্নের যমুনোত্তরীতে এসে গেলাম।

এবার ফেরার পালা, মাত্র দুটি দিন···জীবনে তাই সার্থক হয়ে

জ্বলে থাক। একটি অধ্যায় শেষ হয়ে গেল, জীবনেরও একটি পূর্ণ অধ্যায় যেন শেষ হয়ে যাওয়া। কি পেলাম আর কি হারালাম, তার কড়াক্রান্তির হিসেব জমা করে তুলে রাখি জীবনে, ভবিষ্যতের ইতিহাসে এ হিসেব হয় ত বা মূলধন হয়েই দেখা দেবে।

আসার লগ্ন এসেছিল তাই এসেছিলাম, এ লগ্ন সৃষ্টির মালিক ত আমি নই, তাই গতিবেগটাকেই বুঝেছি, অন্য কিছু নয়। এ লগ্ন শেষ হয়ে গেল, তাই ফিরে যাওয়া। পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ, একটি খসে গেল জীবনের বৃন্ত থেকে, আর একটি পরিচ্ছেদের শেষ হবে, ভাগীরথীর উৎস সন্ধানের কৃচ্ছ্র সাধনে।

তাই চলা সুরু হ'ল আবার। একটি স্বর্ণাঞ্চলের শেষে আর একটি স্বর্ণাঞ্চলের অদৃশ্য ইশারা, তারই জন্যে যাযাবর জীবনে পা দুটোকে নিবৃত্তি দেওয়ার উপায় নেই। জগদীশ্বর অনন্ত পথ দিয়েছেন আমাকে, তাই পথের প্রান্তে নেমে আসার উদ্যোগ সুরু হয়।

বীরবলদের পিছনে রেখে ধরম সিং আর আমি রওনা দিলাম। মন্দিরে ওরা শেষের পূজাটি দিয়ে যেতে চায়, তাই এই বিলম্ব। বললাম, হনুমানচটিতে দেখা হবে আবার। আমার পূজা আর দেওয়া হ'ল না, জীবনের পূজা ত দেওয়াই রইল।

প্রকৃতির গহ্বর থেকে হেঁচড়ে উঠে আসি উপরে, আধ মাইলের সমতল ভূমির মায়া কাটিয়ে দেখা হয় সেই জীর্ণ মন্দিরটির সঙ্গে, যার ঐতিহাসিক তত্ত্ব সাধারণ যাত্রীদের কাছে অজানা ও অচেনা। যমুনোত্তরীর ঐ মন্দিরের সঙ্গে এ মন্দিরের কোন কিছুর মিল না থাকলেও প্রাচীনতায় কে বড় বোঝা গেল না, হয় ত এই মন্দিরই অগ্রজ। কিছুক্ষণ আমি এখানে কালিকামূর্ত্তিকে আবার দেখি, ভাবি মা যমুনার মোহিনীমূর্ত্তির রাজত্বে ঐ ঘনশ্যামার উদ্ভব কেন? প্রণাম জানাই, তার পর আবার এগিয়ে চলি।

যে ঐরাবত অজগর পাহাড় চড়াই হিসেবে অধ্যবসায়ের শেষ কণাটুকু শুষে নিয়েছে, নেমে আসার মুখে তার সান্ত্বনার আভাসমাত্র পাই না। উৎরাই হয়েছে চড়াই আর চড়াই উৎরাই। সেই দু'তিন ঘণ্টার ধ্বস্তাধ্বস্তি পাহাড়ের সঙ্গে, থেমে যাওয়া আর দম নেওয়া, তবে এবার একটু সহজ বলে মনে হয় যেহেতু কষ্টসাধনার উপর এক পশলা বর্ষণ ত আসার মুখেই হয়ে গেছে।

জানকীমাঈ চটিতে এসে যাই সকাল সকাল, চায়ের পাত্র টেনে নিই, এখানে একটু বিশ্রাম ও কিছু আহার্য্যবস্তু গ্রহণ করা এই যা। তার পর ধীরে ধীরে পুল পেরিয়ে যাই যমুনার, সেই যমুনা, স্মৃতির ভিতর যা এ ধারার মতই বয়ে চলেছে।

পাহাড়ের ঢালু অংশে মানুষের বহু আয়াসের ফলে গড়ে ওঠা শস্যশ্যামলা ধান্যক্ষেতটি পেরিয়ে যাই, এর পর খরসালী গ্রাম এসে যায়।

আস্তে আস্তে চলি, গতিবেগে মন্থরতা নেমে আসে কি জানি কেন! সেই খরসালী—জীবনে যা অনন্ত প্রশ্ন হয়ে রয়ে গেল। এ গ্রামখানা জীবনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে জড়িয়ে গেছে যেন। বাড়ী-ঘরদোর—অনামী সেই গ্রাম্যমন্দির পেরিয়ে যাই, এসে পড়ি সেই পথটুকুতে, যা উপলব্ধির বুকের উপর সব হারানোর বিষণ্ণতার চিতা জ্বালিয়ে দিয়েছে। সেই নিস্তব্ধ নিথর পথটুকুর মায়া—এখানে থেমে যাই নিজের অগোচরে!

অবুঝ ধরম সিংকে কিছু না বললেও জীবনের উপর দিয়ে একটা যে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে আর সে ঝড়ের রুদ্রমূর্ত্তি যে এই খরসালীর গ্রামের পথপ্রান্তে প্রকাশ পেয়েছে সেটা সে বুঝেছিল! চুপচাপ একটা পাথরের উপর যখন বসে আছি তখন সে এসে যায়—তারপর পিঠ থেকে বোঝা নামিয়ে সেও আমার সঙ্গে বসে পড়ে। তারপর সুরু করে সান্ত্বনা আর প্রবোধবাক্য—বন্ধুর মত, গুরুজনের মত, পরমাত্মীয়ের মত। বাহক হয়ে উঠে মন জানা-জানির সেতু—উত্তরকাশীর বালক হয়ে উঠে আলোকবর্ত্তিকা! অথচ এ পথটুকুতে বিবর্ত্তনবাদের যে ইতিহাস তৈরি হয়ে গেল আমার জীবনে তার একটা কণাও তার জানা নেই। খেয়ালখুসিমত সে সান্ত্বনা দেয়—আমিও তাই শুনে যাই!

আর কি মায়াবিনীকে দেখা যায়? সে ফিকে সবুজ সাড়ীপরা রহস্যময়ীর সন্ধান আর কি আমি পাই? যা হারাল—তা হারাল, মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও আমি আর তা পাব না! ওসব জিনিষ আসে একবারই—দু'বার নয়! হাহাকারের শূন্যতাই জীবনে থেকে গেল···আমি যে পথের প্রান্তে ফুল দেখেছি, তাই এ অভিশাপের পসরা ও মরুভূমির দগ্ধতা।

সরু সীমন্তের উপর স্বর্ণময় টিক্‌লী···ওই স্মৃতির ভিতর রজনী-গন্ধার মত ফুটে থাক···! খরসালী থেকে ছ'মাইলের মাথায় হনুমানচটি এসে পৌঁছই দ্বিপ্রহরের আগে—আজকের মত এখানে রাত কাটানো তারপর গাংনানীর পথে পাড়ি দেওয়া। সেই হনুমান-চটি, চিন্তার স্তূপ যেখানে মনের ভিতর বাসা বেঁধেছিল, যার থেকে নিষ্কৃতি ফেরার পথেও পেলাম না। সন্ধ্যার ঝোঁকে যমুনার তীরে চলে যাই, বসে থাকি অনেকক্ষণ···যমুনোত্তরীর স্মৃতি তোলপাড় করতে থাকে মনের ভিতর। শীতের কাঁপুনি এখানেও—তাই বেশীক্ষণ বসা যায় না, উঠে পড়ি। বীরবলরা এসে গেছে···আমার ঘরেই তারা এসেছে, একসঙ্গে থাকার ব্যতিক্রম ঘটে নি, হনুমান-চটিতেও সেই উপরের ঘর···যাত্রার পথে যে ঘরটিতে কাটিয়ে গেছি। অদ্ভুত এই যোগাযোগ···ধর্ম্মশালার আন্তর্জাতিক দাক্ষিণ্যের ভিতরেও আমি ঘরের দিকে বেশী না ছুটলেও ঘরই ছুটে এসেছে আমার দিকে বেশী করে। এর বিশ্লেষণ করেও সূত্র খুঁজে পাই নি। বীরবলদের এমন এক অদ্ভুত বিশ্বাস জন্মে গেছে যে বাবাজী ধর্ম্মশালায় গেলেই ঘর পাবে, আর সে ঘর হবে উপরের ঘর, মজবুত ঘর, আভিজাত্যের পরিচয় আছে যাতে। উত্তরকাশী পর্য্যন্ত তাদের এ বিশ্বাসটি ভাঙে নি আর ভাঙে নি বলেই ওরা ঘর পাওয়া না পাওয়া নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় নি!

সকাল হতে না হতেই চলা সুরু হয়। উজলী পেরিয়ে গেল—অনামী, গোত্রহীন উজলী! উজলীর পর যমুনাচটি—এখানে এসে গেলাম ন'টার মধ্যেই। যাওয়ার মুখে যে চড়াইটা বুকে বেজেছিল,

এবার সেটা উৎরাইয়ের আকারে সুদে-আসলে আদায় করে নিয়েছে—তবে একবার অভিজ্ঞতার মধ্যে এসে গেলে সংশয় যায় কমে, ক্লান্তি আসে কম। কাজেই ও চড়াইটা আর বিরাট কিছু হয়ে আসে নি—তবে সেই জলকষ্ট, যেটি যমুনোত্তরীর পথের নিত্য সঙ্গী। ধরম সিং যমুনাচটির আগে বুদ্ধি করে কোথা থেকে যে জল নিয়ে এসে আমাকে খাওয়ায় বুঝতে পারি না! পাহাড়ী ছেলে অদৃশ্য ঝর্ণাকেও শুঁকে বার করে যেন। যমুনাচটিতে স্নান সেরে নি—চা খাই আর সেই সঙ্গে খাই গতরাত্রের হনুমানচটি থেকে আনা কিছু খাবার! কতক্ষণ থাকব এখানে? মাত্র সকাল ত ন'টা—তাই পথের প্রান্তে আবার নেমে আসি।

যমুনাচটি থেকে খারারী—তারপর সেই গাংনানী। বেলা একটার মধ্যেই পৌঁছে যাই। আজকের মত রাত্রিবাসের আয়োজন এখানে—তারপর কাল রওনা হতে হবে গঙ্গোত্তরীর দিকে।

একটি মহাতীর্থের ইতিহাস পরিক্রমা শেষে আর একটি মহাতীর্থের সংযোগস্থলে এসে গেলাম! এই নব ইতিহাসের পাতায় পাতায় আমার মত মূল্যহীন মানুষের জন্যে কি কাহিনী লিপিবদ্ধ হওয়ার নিমিত্ত উন্মুখ হয়ে আছে জানি না···! যাই থাকুক, তাকে অঞ্জলিভরে গ্রহণ করা চাই···সামান্য ভুলের জন্যে থরসালীর পথ-প্রান্তে সেই অত্যাশ্চর্য্য সম্পদের অর্ঘ্য হারানোর বিষাদসিন্ধুর উৎপত্তি না হয়।

বদরীকানারায়ণের সেই মহাপুরুষ, যিনি বলেছিলেন—"গঙ্গোত্তরী জানেসে মিল জায়গা—।"* গাংনানীর পর থেকে ভাগীরথীর ধারে ধারে সেই চরম ইঙ্গিতের ইতিহাস সুরু···।

ক্রমশঃ

* 'শ্রীশ্রীকেদারনাথ ও বদরীনাথ' দ্রষ্টব্য।

হিন্দু কোড বিল ও বিশেষ বিবাহ বিল

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

১৯৫২ সনের নির্ব্বাচনের পর ছয় মাস পরেই ৬ই মে আর জুনের শেষভাগে "ষ্টেটস্‌ম্যানে" হিন্দুকোড বিল ধামাচাপা দেওয়া সম্বন্ধে যে দুটি মন্তব্যসূচক লেখা বেরোয় তা সত্য প্রমাণ হয়ে গেছে, এতে আর দ্বিমত নেই।

এখন যা হোক কিছু ভেবে নিয়ে বিশেষ বিবাহ বিল নামে একটি বিল আমাদের সামনে আসছে। এটি শুধু বিবাহ-সম্পর্কেরই সংস্কার। সমস্ত হিন্দুজাতির পুরুষের এক-বিবাহ আর নরনারী উভয়েরই বিবাহ-বিচ্ছেদে সমান অধিকারের প্রস্তাব এতে রয়েছে। এতদিন অবধি পুরুষের ইচ্ছামত একাধিক বিবাহ হতে পারত এবং বিবাহ বিচ্ছেদ বা ত্যাগ করাটাও ছিল পুরুষেরই বিশেষ অধিকার। স্ত্রীরা পরিত্যক্তা হলেও সেই স্বামীর স্ত্রীই থেকে যেতেন।

এসব কথার আগে আর যে দু-একটি কথা এসব সম্পর্কে আমাদের মনে হয়েছে তা একটু বলি।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে আমরা মেয়েরা যে অধিকার পেয়েছি তার সঙ্গে এই হিন্দু কোড বিল চাপা দিয়ে সামান্য একটু বিবাহ সংস্কার বিল আনায় মোটেই সামঞ্জস্য নেই। কেননা, একথা সকলেই জানেন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে, সন্ন্যাসী ছাড়া আর কারো সমাজে সম্মানিত জীবন-যাপন করা সম্ভব নয়। অনুগৃহীত জীবন নরনারী কোনো মানুষেরই কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। হিন্দু কোড বিলে মেয়েরা এই অনুগৃহীত জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা থেকে খানিকটা মুক্ত হতেন। সন্তান হিসাবে তাঁরা গণ্য হচ্ছিলেন। কন্যার অধিকার বজায় ছিল বাপের সম্পত্তিতে।

এখন যে বিল আসছে তাতে সংবিধান অনুসারে মেয়েদের বিশেষ কিছুই পাওয়া হবে না। কেননা সমাজে নানা কারণে স্বভাবতঃই অসবর্ণ বিবাহ চলেছে এবং হিন্দু মতেই হচ্ছে, যদিও রেজিষ্ট্রী করে হচ্ছে এবং এই মতে বিবাহ-বিচ্ছেদও অচল নয়, তাও প্রয়োজন হলে হয়ে থাকে। তবু এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে—আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে এই বিল খানিকটা স্বৈরাচার, অনাচার, অত্যাচার বন্ধ করতে পারবে।

কিন্তু ভাল বলে মেনে নিলেও বলতে হয়, এই ভাঙাচোরা কাটা বাদ দেওয়া বিলটিও যেন আমাদের বহু-প্রচারিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মতই—মানুষের গোড়ায় দরকার, প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন এবং সমস্যাগুলি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এক সুদূর ভবিষ্যতের অবস্থাকে অনুসরণ করে কাজ করার প্রয়াস। তার লক্ষ্য যেন এ যুগের দীনদরিদ্র মানুষ নয়, আগামী যুগের মানুষ।

যখন দেশে স্বচ্ছন্দ অন্নবস্ত্র পাওয়া, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা হওয়া, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দরকার, তখন গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে বয়স্ক-শিক্ষা নিয়ে অজস্র অর্থ-ব্যয় করা হচ্ছে। অথচ তাদেরই বালকবালিকাদের পড়া-শুনার খরচ, স্কুল-পাঠশালার বেতন, বইয়ের খরচের চাপে তারা জর্জ্জরিত। বয়স্ক-শিক্ষা খুবই দরকার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার গোড়ার কথা—জাতির ভবিষ্যৎ আশা বালকবালিকা-গুলির ভাতকাপড়ের, স্বাস্থ্যের ভাবনা, বিনা মাহিনায় পড়া-শুনার আশু কি ব্যবস্থা আছে ঐ পরিকল্পনায়?

অথচ খরচ এবং করের দিকও ত যাঁরা দরিদ্র তাঁরাই বহন করছেন অর্দ্ধাশনে, অভাবের নানা কৃচ্ছ্রসাধনে। তাঁরা সন্তানদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্নবস্ত্র সহজলভ্য হলে কৃতার্থ হতেন।

আমাদের আরও মনে হয়, এই পরিকল্পনাটি রচনার সময়ে যে লক্ষ্য ছিল তার থেকে দূরে সরে যাওয়া হয়েছে। এখন যেন তার দৃষ্টির সামনে রয়েছে বিদেশের সমালোচক, দর্শক—দেশ নয়। এবং এও মনে হয় গান্ধীজী বেঁচে থাকলে দেশ ও দেশবাসী সামনে থাকত।

এই বিলেও ঐ কথাই আমাদের মনে হয় বিদেশের কাছে দেখানো হচ্ছে, অথবা প্রচার করা হচ্ছে, আমরা বিদেশী সভ্যজাতির মতই বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করছি। না হলে মানুষের অধিকার সংবিধান অনুসারে মেনে নিলে তো হিন্দু কোড বিলের নারীর বিশেষ অধিকারের কথা আর নতুন করে ওঠে না। কেননা নরনারী জাতিবর্ণনির্বিশেষে একই অধিকারভুক্ত; আইনের কাছে উভয়ের সমান অধিকার, সমান দাবি—এই কথা সংবিধানে স্পষ্ট রয়েছে।

এখন আমি গান্ধীজীরই 'উইমেন এণ্ড সোশ্যাল ইন্‌জাষ্টিস্' অথবা 'নারী ও সামাজিক অবিচার' নামক বই থেকে দু'চার কথা তুলে দিচ্ছি কংগ্রেসের সামনে।

গান্ধীজী ঐ বইয়ে 'মেয়েদের অবস্থা' নামক প্রবন্ধে বলেন, 'আমার অভিমত এই যে, মেয়েদের আইনতঃ কোন অনধিকারই মেনে নেওয়া উচিত নয়···আমি ছেলে এবং মেয়েকে সমান মনে করা উচিত মনে করি···। এ ছাড়া আমার মনে হয় এই সব অন্যায়ের মূল আরো গভীরভাবে সমাজে বা পুরুষের মনে আছে যা সকলে বুঝতে পারেন না। এটা রয়েছে পুরুষের ক্ষমতালোলুপতা যশাকাঙ্ক্ষা···ইত্যাদির মধ্যে। সম্পত্তির অধিকারিত্ব এই ক্ষমতা দেয়। এটা হওয়া উচিত নয়···। আমি কোন সময়েই আইনগত অধিকারকে সমর্থন করি না।' (পৃ. ১২) এই বইয়েরই মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতা থেকে তুলে দিচ্ছি আর একটুকু:

প্রশ্ন—অনেকের মত, বিবাহিতা মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতা দিলে সমাজ-জীবনে দুর্নীতি দেখা দেবে···। এ বিষয়ে আপনার কি মত?

গান্ধীজীর উত্তর—আমি আপনাদের পাল্টে প্রশ্ন করব। ঐ স্বাধীনতা কি পুরুষ-সমাজকে দুর্নীতিপরায়ণ করেছে? যদি বলেন, হ্যাঁ, তা হলে আমি বলব মেয়েরাও তা হতে পারেন···। (পৃ. ১০৪)

এই অমূল্য চিন্তাসম্পদ ও অভিমতবিশিষ্ট বই থেকে আর একটু তুলে দেওয়ার ছিল, যাতে সর্ব্বত্রই কি বিবাহ-ক্ষেত্র, কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্র, স্পষ্ট এবং মিতভাষণের মাল্য থেকে গান্ধীজীর সমগ্র অভিমতটুকু পাওয়া যায়, সেটা সরকারকে দেখানোর জন্য। কিন্তু সেকথা বাহুল্য হবে, কেননা, নেতারা জানেন কি করে চরকা-খদ্দরের শাঁখ-ঘণ্টা বাজিয়ে বছরে একবার মহাত্মা গান্ধীর পূজা করতে হয় এবং বাকি দিনগুলি কি ভাবে যাপন করতে হয়!

আমার শেষ কথা: যে মহাত্মা ১৭৭৪ সনে আমাদের দেশে জন্মেছিলেন এবং ধর্ম্মেকর্ম্মে সংস্কারে বহু দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিকূলতা অতিক্রম করেছিলেন আর যাঁর হৃদয়বত্তা ও মনীষা সমান ছিল, সেই মহামানব রাজা রামমোহন রায় নারীর বেঁচে থাকার অধিকার—তার নিজের প্রাণ-রক্ষার অধিকার স্বীকার করিয়ে নেন সমাজকে। স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে তাঁর অন্যান্য মন্তব্য ও রচনা থেকে দু'একটা কথা তুলে দিচ্ছি যা প্রায় দেড়শো বছর আগের কথা। তাঁর জীবনচরিতে দেখি, "স্ত্রীলোকেরা শিক্ষিতা হয়; তাহারা তাহাদের উপযুক্ত অধিকার ও সম্মান লাভ করে···প্রাচীন শাস্ত্রানুসারে তাহাদের স্ত্রীধন ও দায়াধিকার সম্বন্ধে অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হয়।" এ ছাড়া বহুবিবাহ চিরবৈধব্য জন্য সামাজিক বহু গ্লানির কথাও আলোচনা করেন। সেকথা যাক, মোটামুটি আমরা দেখতে পাচ্ছি মহামানব ও মনীষীদের চিন্তাধারা একই পথে চলে। তাঁদের চোখে নরনারী সমান, সব মানুষ একজাতি। ব্রাহ্মণশূদ্র, নরনারী, সাদাকালো—সব মানুষ সমান।

মহাত্মা গান্ধী আরও বলেন, বিচারের মানদণ্ড পুরুষের জন্য এক রকম, নারীর জন্য আর এক রকম হতে পারে না। নীতিগত নিষ্ঠা বা আনুগত্য দু'জনের সমান হওয়া উচিত। আমাদের ১৯শে এপ্রিলের সর্ব্বভারতীয় মহিলাদিবস উপলক্ষ্যে সভায় যে কয়টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে, এখন সে বিষয়ে মেয়েদের বক্তব্য এই—নরনারী সকলেই এই বিষয়টি নৈর্ব্যক্তিক ও নির্লিপ্ত পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যেন আলোচনা করেন—নর ও নারী দুই জাতি হিসাবে না করে মানুষ মনে করে'।

দাসত্ব-শৃঙ্খলিত মানবের মুক্তি

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তথাকথিত উন্নত এবং সভ্য দেশসমূহে দাসপ্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। ১৮৩৫ সনে উন্নত ইউরোপীয় জাতিসমূহের উপনিবেশে—উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায়, দাসপ্রথা খুবই চালু ছিল। এই দাসপ্রথাকে আশ্রয় করিয়া খাড়া ছিল সমাজ ও সমাজের আর্থিক কাঠামো। যাহারা এই অমানুষিক সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ চাহিত, সাধারণ অপরাধীর মত তাহাদিগকে সাজা না দিলেও, তাঁহাদিগকে সমাজবিধ্বংসী আদর্শের অনুসরণকারী বলিয়া জ্ঞান করা হইত। অথচ ইহার অৰ্দ্ধশতাব্দীর মধ্যেই সর্ব্বত্র দাসপ্রথার বিলোপসাধন হইয়া গেল।

প্রাচীন কিংবদন্তীতে দাসপ্রথার মূলের সন্ধান পাওয়া যায়। বেবিলনের প্রাচীনতম আইন অনুসারে এক জন মানুষ আর এক

এবে গ্রেগরী

জনের মালিক হইতে পারিত এবং এই সকল মানুষের উপর গরু মেষ প্রভৃতি জন্তুর মতই যথেচ্ছ ব্যবহার করিত। মিশর, গ্রীস, রোম এবং প্রাচ্যের সকল দেশে দাসপ্রথার প্রচলন ছিল। গ্রীসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এরিষ্টটল বলিয়াছেন, "নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা স্বভাবতঃই দাস। তাহাদের কল্যাণার্থে—সর্ব্বপ্রকার নিম্নশ্রেণীর জীবের জন্যই—তাহাদের উপর এক জন প্রভু থাকা বাঞ্ছনীয়।"

প্রাচীনকালে মানুষ নিজেকে কিংবা পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিকে দেনার দায়ে দাসরূপে বিক্রয় করিত। গ্রীসদেশে পাওনাদার দেনাদারকে দাসে পরিণত করিবার অধিকারী ছিল—অবশ্য এই নিয়ম পরে তুলিয়া দেওয়া হয়। তখনকার দিনে এক দেশের লোক অপর দেশের লোককে হীন মনে করিত বলিয়া দাসপ্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইতে পারিয়াছিল। 'বর্ব্বর', 'ম্লেচ্ছ' প্রভৃতি কথা হইতেই বিদেশীর প্রতি প্রাচীন জাতিসমূহের মনোভাব বোঝা যায়। বিজয়ী জাতি কেবল বিজিতের দেশ ও পশুপাল দখল করিত না, দেশের অধিবাসিগণের উপর মালিকানা পাইত। জুলিয়াস সীজার এক সময়ে ৬০,০০০ বন্দী দাসরূপে বিক্রয় করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানকালে সমাজে কলকব্জার যে স্থান, অধিকাংশ প্রাচীন সমাজে দাসেরা সেই স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। দাসেরা ছিল যেন সেকালের উৎপাদন-যন্ত্রের বিশেষ বিশেষ অংশ-স্বরূপ। মিশরের ফ্যারাওগণের বিরাট পিরামিড, রোমের বিস্তীর্ণ জলাধার এই দাসেরাই তৈরি করিয়াছিল। পুরাতন কালের জাহাজের দাঁড় বাওয়া, গ্রীস এবং রোমের খনি ক্ষেতের কাজে এই দাসদিগকে লাগানো হইত।

সকল সময়ই যে দাসেরা শোচনীয় ভাবে জীবন যাপন করিত তাহা নহে। এথেন্সে দাসেরা সুখেই থাকিত এরূপ জানা যায়। তাহারা উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ পরিত এবং একদিন তাহারা দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে পারিত। বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ পণ্ডিত রেণে গ্রুসে (Rene Grousset) বলিয়াছেন, "এথেন্সে এক জন দাস এতটা ভাল ব্যবহার পাইত যে অন্যান্য দেশে স্বাধীন মানুষও ততটা পাইত না।"

অবশ্য রোমেই এই দাসপ্রথা সবচেয়ে বেশী প্রসারলাভ করিয়াছিল। যুদ্ধজয়ের পুরস্কার হিসাবে বিজয়ী জাতির লক্ষ লক্ষ দাস লাভ হইত এবং ইহারাই রাষ্ট্রের ভিত্তি-স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। দাসেরাই ছিল চিকিৎসক, শিক্ষক, পরিবারের ভৃত্য, ক্ষেত-মজুর। নাট্যাভিনয়, দড়ির উপরে নাচের খেলা, মানুষ ও জানোয়ারের সহিত কসরৎ এ সকলও দাসশ্রেণী দেখাইত। এথেন্সের মত রোমে দাসগণের অতটা স্বাধীনতা না থাকিলেও, রোমীয় দাস নিজের রোজগার হইতে অর্থ বাঁচাইতে পারিত এবং পরে উহাদ্বারা মুক্তি অর্জ্জন করিতে পারিত।

কিন্তু প্রাচীনকাল হইতেই গ্রীস ও রোম, উভয় দেশেই দাসপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠিয়াছিল। কোন অবস্থায়ই দাস সম্পত্তির মালিক হইতে কিংবা নাগরিকের অধিকার লাভ করিতে পারিত না। দাসের পুত্রকন্যারা ছিল প্রভুর সম্পত্তি। প্রভু ইচ্ছা করিলে ইহাদিগকে বিক্রয় করিতে পারিত। একমাত্র প্রভুর মর্জ্জির উপরেই নির্ভর করিত দাসের সুখ এবং দুঃখ। দাসের জীবন মরণ ছিল তাহার প্রভুর হাতে।

পেরিক্লিসের সময়ে (খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতাব্দী) সোফোক্লিস এবং ইউরিপীডিস এথেন্সবাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, দাসও মানুষ। "যদিও দাসের শরীর দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ, তথাপি

তাহার আত্মা বন্ধনহীন বা মুক্ত"—ইহা সোফোক্লিসের উক্তি। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত কেহই দাসপ্রথার উচ্ছেদ সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, কারণ সকলেই ভাবিতেন দাসপ্রথা উঠিয়া গেলে সমাজ অচল হইবে।

রোমের ইতিহাসে অনেক 'দাস-বিদ্রোহ' হইয়াছে—খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৭৩ সনে স্পারটেকাসের নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ হয় তাহা উল্লেখযোগ্য। কাপুয়া নামক স্থানের কসরত শিক্ষালয় (School of Gladiators) হইতে পলায়ন করিয়া স্পারটেকাস বিসুবিয়াস পর্ব্বতে গমন করে এবং সেখানে তাহারই মত ৬০,০০০ পলাতক দাস-সৈনিক সংগ্রহ করে। রোম হইতে প্রেরিত সৈন্যদল দুই বৎসর ধরিয়া বার বার তাহার নিকট পরাজিত হয়। কিন্তু এই

উইলিয়াম গ্রোয়েন

বিদ্রোহ পরে দমন করা হয়। স্পারটেকাস নিহত হইল, তাহার ছয় হাজার অনুবর্ত্তীকে রোমে যাওয়ার পথে ক্রুশবিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল।

প্রাচীন খ্রীষ্টীয় প্রচারকেরা মানুষের আত্মার সাম্যের কথা ঘোষণা এবং দাসগণকে অন্যান্য সকলের তুল্য বিবেচনা করায়, দাসেরা এই নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে সময়ে খ্রীষ্টানেরা এইরূপ প্রচার করিতেছিল এবং দাসগণের উন্নয়ন-প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত ছিল, প্রায় সেই সময়ে ৩৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন সম্রাট কুয়াং-উ দাসগণের জীবনরক্ষার্থে আইন প্রণয়ন করিলেন এবং দাসের হস্তপদ বা অন্যান্য অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিলেন।

চীনা নীতির মাপকাঠিতে একজন দাসকে কঠোরভাবে তিরস্কার করিলে অপরাধের পরিমাণ এক গুণ, তাহাকে রোগে চিকিৎসা না করিলে বা অতিরিক্ত খাটাইলে অপরাধের পরিমাণ দশ গুণ, তাহাকে বিবাহিত হইতে না দিলে অপরাধ শত গুণ, আর তাহাকে মুক্তি অর্জ্জন করিতে না দিলে অপরাধ পাঁচ শত গুণ।

বহুদিন ধরিয়া মুসলিম দেশসমূহে দাসপ্রথা চলিয়া আসিতেছে এবং বিচ্ছিন্নভাবে ইহা এখন পর্য্যন্ত নানা দেশে দেখা যায়। কিন্তু মহম্মদের বাণী হইতেছে এই—"যে কেহ একজন মাত্র দাসকে মুক্তি দিবে সে নিজের সমস্ত শরীর নরকের অগ্নি হইতে রক্ষা করিবে।"

ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথার কড়াকড়ির দরুন দাসপ্রথা কখনও বিশেষভাবে প্রসারলাভ করে নাই। জাপানে দাসপ্রথা বাহ্যতঃ কখনও দেখা যায় নাই।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পরে ধীরে ধীরে ইউরোপ হইতে দাসপ্রথা উঠিয়া যায়। ইহার স্থলে মধ্যযুগীয় সার্ফ-প্রথা দেখা দেয়।

জোয়াকুইম নাবুকো

শ্রমিকের উপর প্রভুর মালিকানা রহিল না বটে, তবে সে প্রভুর কতকগুলি কাজ করিতে—বেগার খাটিতে, বাধ্য রহিল। কেহ পলায়ন করিলে প্রভু তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার অধিকারী হইল। তবে কোন স্বাধীন নগরীতে সে এক বৎসর একদিন আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারিলে আইনের বিধান অনুযায়ী তাহাকে আর গ্রেপ্তার করা চলিত না। প্রভুর হুকুম ব্যতীত সার্ফ নিজের কন্যার বিবাহ দিতে পারিত না। ইংলণ্ডে ১৩৮১ খ্রীষ্টাব্দের বিখ্যাত কৃষক-বিদ্রোহের (Peasant Revolt) পর সার্ফ-প্রথা লোপ পায়—ফরাসীদেশে লোপ পায় ফরাসী-বিদ্রোহের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। রুশদেশে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ১৮৬১ সনে চার কোটি সার্ফকে মুক্ত করিয়া দেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন ইউরোপীয়গণ প্রথম নিগ্রোদের সংস্পর্শে আসে তখন আবার দাসপ্রথা প্রচলিত হয়। ১৪৪৪ খ্রীষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা দাসব্যবসায় আরম্ভ করে, কিন্তু পর্ত্তুগীজ রাজকুমার বিখ্যাত নাবিক হেনরী এই ব্যবসা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

ইহার কিছু পরে নূতন জগৎ (আমেরিকা) আবিষ্কৃত হয়। স্পেন পর্ত্তুগাল, ইংলণ্ড এবং অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির জাহাজগুলি আফ্রিকা ও আমেরিকার সমুদ্রপথে এই ঘৃণিত মানুষ-চালান-ব্যবসা আরম্ভ করে। এরূপ অনুমান করা হয়, ষোড়শ ও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে ৩,২০,০০,০০০ নিগ্রোকে আফ্রিকা হইতে আমেরিকায় চালান দেওয়া হইয়াছিল।

প্রতি চারিটি নিগ্রোর মধ্যে একটি আমেরিকায় জীবন্ত পৌঁছিত। আফ্রিকায় যে 'মানুষ শিকার' চলিত তাহাতে কিংবা পথের কষ্টে তিন জন মারা পড়িত। যে রকম নির্ম্মমভাবে জন্তু-জানোয়ারের মত জাহাজে ঠাসাঠাসি করিয়া তাহাদিগকে সাগরপারে চালান দেওয়া হইত তাহা অবর্ণনীয়। যখন দাসব্যবসায় আইন করিয়া

উইলিয়াম উইলবারফোর্স

তুলিয়া দেওয়া হইল তখন দাসগণের দুর্দ্দশা আরও বাড়িল। সমুদ্রে সরকারী রক্ষী-জাহাজ তাড়া করিলে দাসবহনকারী জাহাজ উহার 'মানুষ-মাল'গুলি সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিত।

দাস-ব্যবসায়ের নিষ্ঠুরতার কাহিনী যতই ইউরোপীয় জনগণের কানে পৌঁছিতে লাগিল ততই মানুষের বিবেক ও বিচারবুদ্ধি ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। দাসব্যবসা-বিলোপ আন্দোলনের অগ্রদূত ছিলেন একজন ইংরেজ—পোয়েকার উইলিয়ম পেন। পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা ও বিবেকের স্বাধীনতারক্ষা এই দুই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি পেনসিলভেনিয়ায় একটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৬৯৭ সনে তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়া নিগ্রো-দাস-ব্যবসায় রোধ করিবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। তখনও দেশ তাঁহার উদার মনোভাবপ্রসূত আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হয় নাই। পরবর্ত্তী শতাব্দীতে বহু লোক পেনের মতই দাস-ব্যবসায় তুলিয়া দিবার জন্য আন্দোলন করিয়াছিল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসন দাসপ্রথার বিরোধী ছিলেন। তিনি মাত্র এক ভোটে পরাজিত না হইলে ১৭৮৭ সনের মার্কিন সংবিধানের বলেই দাসপ্রথা বাতিল হইয়া যাইত।

মোটামুটি ভাবে দাসপ্রথার বিলোপে দুইটী স্তর দেখা যায়—প্রথমে দাস-ব্যবসায় তুলিয়া দেওয়া হয় এবং পরে দাসপ্রথা বাতিল করা হয়।

১৭৭৬ সনে ইংলণ্ডের হাউস অব কমন্সে এরূপ একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়—"দাস-ব্যবসায় ভগবানের বিধান এবং মানবাধিকার-বিরোধী।" এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়, কিন্তু দাসপ্রথার আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছিল। ১৭৯২ সনে ডেনমার্ক পাশ্চাত্য দেশ-সমূহের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে দাস-ব্যবসায় বাতিল করিবার গৌরব অর্জ্জন করে।

ইংরেজ জাতির মধ্যে দাসব্যবসা-রোধ আন্দোলনে উইলিয়ম উইলবারফোর্সের (১৭৫৯-১৮৩৩) নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। বহু আয়াসের পরে ১৮০৭ সনে তিনি জয়যুক্ত হন এবং ক্রমে ইংলণ্ডের চেষ্টায় সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেও দাসব্যবসা বাতিল হইয়া যায়। ইংলণ্ডের অনুসরণ করিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ১৮০৮ সনে দাসব্যবসা অবৈধ ঘোষণা করে। হল্যাণ্ডে ১৮১৪ সনে এবং ফরাসী-দেশে ১৮১৫ সনে দাসব্যবসায় বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

'দাস-ব্যবসা' ত রোধ হইল কিন্তু 'সভ্যতার কলঙ্ক' দাস-প্রথা রহিয়া গেল। ইংলণ্ডে উইলবারফোর্স ব্যাপকভাবে আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। ছোট ছোট সংস্কারমূলক আইন পাস হইল। ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলি দাসপ্রথা আইনের বলে তুলিয়া দিল। ইহাতে ইংলণ্ডের সমাজ-সংস্কারকগণ নূতন অনুপ্রেরণা লাভ করিলেন। উইলবারফোর্সের মৃত্যুর তিন বৎসর পরে ১৮৩৮ সনে ইংরেজশাসিত দেশের দাসগণ সম্পূর্ণভাবে মুক্তি পাইল, দাসপ্রথার পুরাপুরি উচ্ছেদ হইল।

ফরাসী দেশে দাসমুক্তি-আন্দোলন নানা বৈপ্লবিক আন্দোলনের সহিত বিজড়িত ছিল। ১৭৮৮ সনে এই উদ্দেশ্যে একটি সমিতি (Societe des Amis des Novis) স্থাপিত হয়। ফরাসী জাতি বিপ্লবের মধ্যেই ১৭৯৪ সনে জাতীয় সম্মেলনে একটি ডিক্রী দ্বারা দাসপ্রথা বাতিল করে। এই সময় সর্ব্বপ্রকার অধিকার-বঞ্চিত ইহুদীগণকে নাগরিক এবং রাষ্ট্রীয় অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু ১৮০৯ সনে নেপোলিয়ান উপনিবেশসমূহে দাসপ্রথা পুনঃপ্রবর্ত্তন করেন। ভিক্টর স্কোয়েলসের নেতৃত্বে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়িয়া উঠে, ফলে ১৮৪৮ সনে দাসপ্রথা সম্পূর্ণরূপে বাতিল হইয়া যায়।

কিন্তু দাসপ্রথা বিদূরণে উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা প্রচণ্ড প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে, কারণ সেখানকার আর্থিক বনিয়াদ ছিল দাসপ্রথার ভিত্তির উপর স্থাপিত। দাস-ব্যবসা বেআইনী এবং নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও চতুর ও নিষ্ঠুর দাসব্যবসায়িগণের দাস-আমদানীর বিরাম ছিল না। ১৮২০ সনের একটি হিসাবে জানা

যায় যে, প্রতি বৎসর আমেরিকায় প্রায় ৫০,০০০ নিগ্রো দাস আমদানী করা হইত। ১৮৪০ হইতে ১৮৬০ পর্য্যন্ত এই ব্যবসায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল নিউ ইয়র্ক—বোষ্টন ও পোর্টল্যাণ্ডের স্থান ছিল ইহার নিয়ে। ১৮৫৬ সনে আনুমানিক চল্লিশখানি জাহাজ দাস আমদানীর জন্য উত্তর আমেরিকায় বন্দর হইতে যাত্রা করে এবং এই ঘৃণিত ব্যবসায়ে ১,৭০,০০,০০০ ডলার মুনাফা যোগায়।

১৮৫২ সনে 'আঙ্কল টমস কেবিন' নামক একখানি বিখ্যাত পুস্তক হেরিয়েট বিচার ষ্টোই কর্ত্তৃক লিখিত হয়। এই পুস্তক বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। মূল পুস্তক প্রকাশের দীর্ঘকাল পরে বাংলা ভাষায়ও 'টমকাকার কুটীর' নামে ইহার একখানি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। দাসপ্রথার বিলোপ-সাধনে আঙ্কল টমস কেবিন খুবই সাহায্য করিয়াছিল। দীর্ঘকালব্যাপী রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের অবসানে, আমেরিকার সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধন মঞ্জুর হইলে ১৮৬৫ সনের ডিসেম্বর মাসে দাসপ্রথা যুক্তরাষ্ট্রে চূড়ান্তভাবে বাতিল হইয়া যায়।

ইহাদের সংহতিকে বিনষ্ট করিতে পারে নাই। বহু যুদ্ধের পর কুইলম্বো বা 'নিগ্রো রিপাব্লিক' ১৬৯৭ সনে দখল করা হয় এবং ইহার নিগ্রো নেতা জুম্বী নিহত হন।

যত দূর জানা যায়, ব্রেজিলে সর্ব্বপ্রথম জেসুইট ম্যানোল ডা নেব্রেগা লিসবনে তাঁহার বন্ধুগণের নিকট পত্র লিখিয়া সেজেগা নিগ্রো দাস আমদানীর প্রতিবাদ করেন। ১৭৫৮ সনে ম্যানোল দা রোচা লিসবনে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়া দাস আমদানীর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। ক্রমে দাসেদের মুক্তির অনুকূলে প্রবল জনমতের সৃষ্টি হইতে লাগিল। ১৮৭১ সনে "ল অব রায়ও ব্রাঙ্কো" অনুসারে ক্রীতদাসের পুত্র-কন্যাগণ মুক্ত বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

১৮৮০ সনে চারিদিকে দাসমুক্তি-আন্দোলন প্রবলভাবে চলিতে লাগিল। বিখ্যাত রাষ্ট্রবিদ্ এবং বক্তা রয় বারবোসা সাহিত্যিক গঞ্জাগার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া প্রচার করিলেন—"কেহ দাস থাকিবে না, কেহ মালিক থাকিবে না, সকলের হস্ত হইবে বন্ধনহীন, সকলের মন হইবে মুক্ত।" ব্রেজিলের দাস-মুক্তি-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন জোয়াকুইম নাবুকো। পার্লামেণ্টের প্রথম বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি এখানে উদারনৈতিক দলের লোক দেখিতেছি, কিন্তু উদার নীতি দেখিতেছি না।" আন্দোলনের সূচনাতেই সহস্র সহস্র দাসকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইতেছিল। ১৮৮৮ সনে রাজ্যের কেন্দ্রীয় সরকার প্রিন্সেস ইসাবেলের আদেশে অবশিষ্ট ৬,০০,০০০ নিগ্রো দাসের মুক্তির কথা ঘোষণা করিলেন।
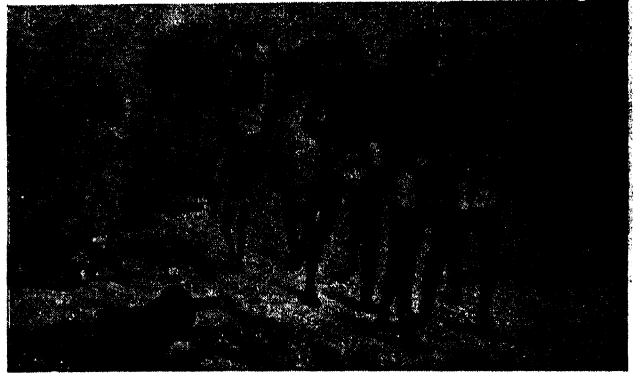
বন্দীকৃত নিগ্রোদের পায়ে হাঁটাইয়া সমুদ্রতীরে লইয়া যাওয়া হইতেছে

লাটিন আমেরিকায় কিন্তু ইহার পূর্ব্ব হইতেই দাসপ্রথা ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যাইতেছিল। ইকোয়েডর ১৮৫১ সনে দাসপ্রথা তুলিয়া দেয়। একমাত্র ব্রেজিলদেশেই দাসপ্রথা আরও কিছুদিন শিকড় গাড়িয়া ছিল।

১৫০০ সনে ব্রেজিল আবিষ্কৃত হয়। ইহার ত্রিশ বৎসর পরেই এখানে দাসপ্রথা প্রচলিত হয়। ৩০০ বৎসর ধরিয়া ব্রেজিলে দাসপ্রথা চালু ছিল—অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে এখানে দাসব্যবসা প্রবলভাবে চলিয়াছিল। কত নিগ্রো আমদানী হইয়াছিল তাহার সঠিক হিসাব না পাওয়া গেলেও, ইহাদের সংখ্যা যে বহু লক্ষ তাহাতে সন্দেহ নাই।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ব্রেজিলে যে সকল নিগ্রো-দাস আমদানী হইত তাহারা অনেকে স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ অপেক্ষা শিক্ষা-দীক্ষায় শ্রেষ্ঠ ছিল। ইহাদের অনেকেই ভাল লেখাপড়া জানিত এবং কেহ কেহ আবার আরবী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিল। এই জন্য নিগ্রোরা নির্ব্বিবাদে এই দাসত্বকে মানিয়া লয় নাই—ব্রেজিলের ইতিহাসে নিগ্রো-বিদ্রোহের অনেকগুলি দৃষ্টান্ত আছে। পলাতক দাসগণ আত্মরক্ষার্থ বিপুল সংখ্যায় একত্রিত হইয়া গভীর জঙ্গলে কুইলম্বো বা উপনিবেশ স্থাপন করিত। সপ্তদশ শতাব্দীতে উত্তর-পূর্ব্ব ব্রেজিলে এরূপ একটি কুইলম্বো গড়িয়া উঠে। বহু পলাতক দাস হাজারে হাজারে মিলিয়া প্রায় ২৪০ মাইল ব্যাপিয়া সুরক্ষিত গ্রামে ঘাঁটি স্থাপন করে। ইহারা এতই শক্তিশালী হইয়া উঠে যে সত্তর বৎসরের চেষ্টাও প্রথমে ওলন্দাজ এবং পরে পর্ত্তুগীজেরা

মানুষের ইতিহাসের কলঙ্কস্বরূপ এই অবাঞ্ছিত দাসপ্রথা খুব অল্প দিনের চেষ্টাতেই বিলুপ্ত হইয়াছে বলা চলে। এককালে এই প্রথার উচ্ছেদ ভ্রান্ত আদর্শবাদ বলিয়া উপেক্ষিত হইত। কিন্তু মহানুভব মানবদরদী ব্যক্তিগণের অধ্যবসায় ও অক্লান্ত চেষ্টার ফলে আজ সাধারণ মানুষও ব্যক্তি-স্বাধীনতার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়াছে।

প্রতি দেশেই বহু নরনারী মানুষের এই মৌলিক অধিকারের

জন্ত সংগ্রাম করিয়াছে। এই সম্পর্কে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের কীর্তি অমর হইয়া আছে। অপর যে কয়জনের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাঁহারা দেশবিদেশে বিখ্যাত না হইলেও স্বদেশে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েক জনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইতেছে :

অ্যাবে গ্রেগরি (১৭৫০-১৮৩১)। ইহার চেষ্টায় ১৭৯৪ সনে ফরাসী দেশে দাসপ্রথার উচ্ছেদের সূত্রপাত হয়।

উইলিয়ম গ্রোয়েন (১৮০১-১৮৭৬)। ইনি হল্যাণ্ডে দাসপ্রথা নিবারণের জন্ত আন্দোলন করেন।

মুক্তিলাভে ক্রীতদাসগণের উল্লাস

জোয়াকিম নাবুকো (১৮৪৯-১৯১০)। ইনি হইতেছেন ব্রেজিলের দাসপ্রথা-বিলোপ আন্দোলনের বিখ্যাত নেতা।

একদা খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রেমের বাণী দাসদিগকে উদ্বুদ্ধ করে। পরবর্তী যুগে কিন্তু খ্রীষ্টান পাদরীগণকেই দাসপ্রথার সমর্থন করিতে দেখা গিয়াছিল। অবশ্য, পরে আবার দাসপ্রথার উচ্ছেদসাধনে খ্রীষ্টীয় যুক্তি প্রদর্শিত হয়।

দাসদের উপর কি রকম অত্যাচার করা হইত, কাদার টমাস মার্কেডোর উক্তি (১৫৬২ সন) হইতে তাহা জানা যায় :

"উহাদিগকে (ধৃত নিগ্রোদিগকে) সমুদ্রতীরে ঘিরিয়া রাখা হইত এবং একজন জল ছিটাইয়া দিয়া খ্রীষ্টান করিত। ইহা ছিল অত্যন্ত বীভৎস আচরণ, কেননা খ্রীষ্টান করার পরেই ইহাদের প্রতি জানোয়ারের মত ব্যবহার করা হইত। ইহাদিগকে বাঁধিয়া শূকরের ন্যায় জাহাজের খোলের মধ্যে বোঝাই করা হইত।" ক্রীতদাসগণের উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচারের আর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করা যাইতেছে :

"বন্দীকৃত নিগ্রোগণকে তিন বা ততোধিক মাস পায়ে হাঁটাইয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত করা হইত। এই পথ অতিক্রমণই ছিল তাহাদের পক্ষে শোচনীয় ও ভয়াবহ। তাহাদের হাত দুইখানি পিছমোড়া করিয়া বাঁধা থাকিত, পশুর মত প্রত্যেকেরই গলায় দড়ি—এক দড়িতে সকলে বাঁধা। অনেক সময় মুখে ঘোড়ার লাগামের মত একটা কিছু আঁটা থাকিত। কেহ পলাইয়া যাইবে সন্দেহ করিলে তাহার ঘাড়ে চারি হস্ত প্রমাণ বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড বাঁধিয়া দেওয়া হইত—ঐ কাষ্ঠখণ্ডকে দুই দিকে লৌহশলাকা দ্বারা ঘাড়ের সঙ্গে আঁটিয়া দেওয়া হইত। বিক্রয়ার্থ এই 'মানুষপণ্য'কে কোথাও দাঁড় করাইতে হইলে চারিদিকে বেড়া দ্বারা ইহাদের সুরক্ষিত করা হইত।"

মানুষ মানুষের প্রতি যে সকল চূড়ান্ত রকমের নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছে, দাসপ্রথা তাহার অন্যতম। আজ দাসপ্রথা প্রায় নিঃশেষে লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচারের অবসান আজও হয় নাই। দুর্গতদের দুঃখমোচন করিতে গিয়া যে সকল শ্রেষ্ঠ মানব জীবনপাত করিয়াছেন তাহাদের কৃতি ও আদর্শ যদি সমগ্র মানবসমাজকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে তাহা হইলেই হিংসাদ্বেষকলুষিত, ভেদবৈষম্যপূর্ণ পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।*

* রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্ত্তৃক প্রকাশিত তথ্যাদি এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে

অন্ধকারে সেদিন নীলার মুখ দেখতে পাই নি—কিন্তু কথার সুরে মনে হ'ল ওর অধরে ফুটে উঠেছে আত্মপ্রত্যয়ের হাসি—"সব কথা মুখ ফুটে বলবার দরকার হয় না নীতীশদা ? আমিও নারী—আমার চোখ দুটো আর মন বলে একটা পদার্থ আছে। তুমি প্রতিদিন যে আকর্ষণের জাল ছাড়িয়ে দিচ্ছিলে তার সুতোয় যে কখন আমার মন জড়িত হয়ে পড়েছিল, তা তোমার মত আমিও প্রথম টের পাইনি। তোমার চলাফেরার ঝঙ্কার আমার প্রাণে দোলা দিয়েছিল। তোমার প্রতি আমার মন শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট হ'ল। তারই মুকুরে একদিন আবিষ্কার করলাম তোমার ছবি। কিন্তু এ পথও আমাদের নয়।

'তুমি আমায় ভুল বুঝ না। তোমার ভালবাসা পেয়েছি এর চেয়ে বেশী আমার আর চাইবার কিছু নেই। নিষ্কাম ভালবাসা আদর্শ বলে গ্রাহ্য হতে পারে; কিন্তু প্রতিদিনকার জীবনে তাকে প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করে দেখি নি। তবে সাধারণ মানুষ অত ভাবে না, তারা বাইরেটা দেখেই সব বিচার করে। তুমি তাদের চোখে হীন হয়ে যাবে—এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।'

নীলার উপদেশের উত্তাপ আমাকে ক্রমশঃ অতিষ্ঠ করে তুলল। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। সহ্যশক্তির সীমা যেন ছাড়িয়ে যেতে লাগল। নীলার আঙুলগুলি আমার চুলের মধ্যে তখন বিচরণ করছিল। আমি নীলার হাত চেপে বললাম, তুমি আমায় ক্ষমা কর নীলা।

নীলার কণ্ঠে আবেগের সুর, তুমি অপরাধ করলে কোথায় যে তোমায় ক্ষমা করব। তুমি কোন দোষ করো নি নীতীশদা। তুমি আমায় ভালবেসেছ। তারই আকর্ষণে আমার মনে জাগল তোমার প্রতি শ্রদ্ধা। আমিও আমার একান্ত অজ্ঞাতে তোমায় আকর্ষণ করতে লাগলাম। তুমি ক্রমেই কাছে আসতে লাগলে। মনে হয়েছিল তোমায় পেলে আমার জীবন সার্থক হবে।

তবে, তবে, কেন তুমি আজ আমায় এমনি করে প্রত্যাখ্যান করতে চাইছ নীলা !

গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে নীলা বলতে লাগল, 'কিন্তু একদিন আবিষ্কার করলাম তোমার হৃদয়ে বিপ্লবের প্রবাহ বড় সঙ্কীর্ণ। কামনা-বাসনার পাঁক জমে জমে একদিন ও পথ বন্ধ হয়ে যাবে। তোমার মনটা একটা বদ্ধ জলাভূমিতে পরিণত হয়ে, তুমি সমিতির অস্বাস্থ্যের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সেদিন থেকেই নিজের মনকে শক্ত করতে চেষ্টা করলাম। তুমি ভেবো না—আমি সেই জাতের মেয়ে যারা পুরুষের দুর্ব্বল-মুহূর্ত্তের সুযোগ নিয়ে তাদের দাবিয়ে রাখে, কর্তৃত্ব করে। এভাবে কেউ কেউ নিজেকে আকর্ষণ-যোগ্য বলে পরোক্ষে প্রচার করে আর মূল্য বাড়ায়। চুম্বক ছাড়া যেমন লোহা আকৃষ্ট হয় না, তেমনি নারীর প্রশ্রয় না থাকলে পুরুষও এগোতে সাহস পায় না। অবশ্য দুর্বৃত্তের কথা আলাদা। ওরা মনের ধার ধারে না।'

'তুমিই কেন তবে আমার মনের পাঁক ধুয়ে সরিয়ে দিয়ে আমার সাথী হও না নীলা।'

'তা আর হয় না নীতীশদা। তুমি ঘরে ফিরে যাও। বিয়ে করে সুন্দর সংসার গড়ে তোল আর সমিতির প্রতি সহানুভূতি রাখ অচঞ্চল। তাতেই হবে তোমার সবচেয়ে সার্থকতা, সমিতির সবচেয়ে বড় সহায়তা। তুমি কি জান না আমাদের কত সহানুভূতি-শীল গৃহী সভ্য আছে যারা পদে পদে সাহায্য করে আমাদের [illegible] দিচ্ছে আদর্শের পথে।'

আমার আত্মাভিমানে আঘাত লাগল। দুর্ব্বলতার [illegible] এতক্ষণ আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিল তার গতি হঠাৎ রু[illegible]। আস্তেআস্তে নীলার হাত আমার মাথার ওপর থেকে সরিয়ে [illegible] ছেড়ে উঠে বসলাম। নীলাকে বললাম, 'তুমি আমায় ভুল বুঝেছ নীলা। তুমি আমার হৃদয়ে দেখতে পেয়েছ বিপ্লবের ক্ষীণ ধারা, কিন্তু মনে রেখ তাই হবে এক দিন বিরাট নদী। যে দুর্ব্বলতার পাঁককে তুমি আজ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে তাকে ভাসিয়ে দেব বিপ্লবের বন্যায়—নিজের মনের আগুনে দেব পুড়িয়ে যা কিছু জঞ্জাল জমেছিল।

নীলা আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললে, 'তোমার জীবন সার্থক হোক এই আমার কামনা। আমার ধারণা মিথ্যা হলে আমার চেয়ে বেশী সুখী আর কেউ হবে না নীতীশদা। আমি তোমার দয়িতা হতে পারলাম না বলে মাপ কর। তবে এ তুমি নিশ্চয় জেনো যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন আমি তোমার বন্ধু—অকপট। এ শুধু আমার মুখের কথা নয়—একথা আমার অন্তর থেকেই বলছি।'

কথা শেষ করে নীলা আমার হাত ধরে আস্তে আস্তে বাইরে টেনে নিয়ে গেল। যেন যন্ত্রচালিত হয়ে চলেছি তেমনি করেই ওর সঙ্গে গেলাম। সমস্ত কথা আমার ফুরিয়ে গেছে।

কাহিনী শেষ হ'লে আমার হৃদয় মথিত করে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। বিনুদা কোন মন্তব্যই করলেন না।

আমি কি তবে সংসারে একা। আর কেউ কি আমার মত পেয়ে হারায় নি। এই যে আমার সঙ্গে চলেছে আমার সহযাত্রী, পথপ্রদর্শক, বন্ধু—যে শত সহস্র লোকের নেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত তার মনে কি কেউ কখনও এমনি করে অন্ততঃ ক্ষণেকের তরেও তীব্র আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে যায় নি ! কোন তড়িৎ-লতাই কি তার হৃদয়কে স্পর্শ করে নি। দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রীতি সবই ত বিনুদার অন্তর ভরে রয়েছে। কেবল কি নারীর প্রেমই তাকে ছুঁয়ে যেতে পারে নি। অন্ধকারে ওর মুখ দেখতে পেলাম না। কে জানে কোন ভাবের গাঙে ওর মন ডুব দিয়েছে।

বুড়িগঙ্গা ধলেশ্বরীতে গিয়ে যে আত্মসমর্পণই করেছে তা নয়, বেরিয়েও এসেছে ধলেশ্বরীর প্রবাহ থেকে। চলতে চলতে একদিন

যেন কিসের খেয়ালে গুক্তিগঙ্গাকে অন্ত পথে বইয়ে দিয়ে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এল আপন অঙ্কতলে। নদীই বোধ হয় এমনি খেয়ালী হতে পারে। মানুষের জীবনে কি এমনিধারা ঘটে। চলতে চলতে যাদের পথ আলাদা হয়ে গেল, তারা কি আবার একই মোহানায় মিলিত হয়। কিংবা জনমভোর ভিন্ন পথে চলে গুমরে মরে, বিরহ-বেদনায়!

আজ এসব লিখতে গিয়ে নীলার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এল। ও যে আমায় অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পেয়েছিল তা সেদিন স্বীকার করতে পৌরুষে বাধলেও আজ আর অস্বীকার করব কি করে!

হঠাৎ বিমুদার কথায় চমকে উঠলাম। তিনি বললেন, "দেখ মানুষের মনের সবটুকু কি কেউ দেখতে পায়—নিজেরও নয়, পরের ত নয়ই।"

আবার সব চুপচাপ। অদূরবর্ত্তী ষ্টীমারের সন্ধানী আলোর তীব্র রেখা আমাদের ওপর দিয়ে ওপারে ঘুরে গেল। বিমুদার মুখ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। চোখ দুটি কোন্ সুদূরে ডুব দিয়ে আছে কে জানে। অন্তরে কিসের ভাবনা—সমিতির না স্মৃতির!

হঠাৎ বিমুদা চিৎকার করে উঠলেন—"নীতীশ, সামলে, সামলে।" একটা বড় নৌকা ছুটে আসছে ঠিক আমাদের সামনা-সামনি। বিমুদা নিজেই ক্ষিপ্র হস্তে আমাদের নৌকার গতিপথ একটু বাঁকিয়ে দিলেন—বড় নৌকাটা তীরবেগে আমাদের নৌকার পাশ ঘেঁষে ছুটে চলে গেল। ক্রমশঃ

প্রবাসে

শ্রীকরুণাময় বসু

পারুলবনে ওঠে যখন চতুর্দ্দশীর চাঁদ,
হয়তো অনেক রাত;
তখন বসে ভাবি,
কানে হয়তো দুলিয়ে দুল, নাকে নাকছাবি,
আয়না নিয়ে দেখছ তোমার মুখ।
প্রবাসকালে এই ভাবনাই সুখ।

আবার যখন ফাঁকা মাঠের ধারে
আপন মনে বেড়াই অন্ধকারে;
হঠাৎ এলো ঝোড়ো মেঘের হাওয়া,
তখন দেখি কার দুখানি ব্যাকুল চোখের চাওয়া;
ডেকে বলল, বাবা,
বৃষ্টি আসে নদীর পারে, গলার স্বরটি কাঁপা;
চমকে দেখি আমার মেয়ে অঞ্জনারই মুখ।
প্রবাসকালে এই ভাবনাই সুখ।

শাশ্বত

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

কতবার এসেছি এ সুন্দর ধরায়,—
খেলেছি কত যে খেলা তুমি আর আমি
পাখীডাকা ছায়াঢাকা কত যে কুটীরে
নিশিদিন! মন্দস্নিগ্ধ এই গন্ধবহ,
এ মদির মায়াময় মাধবী যামিনী,
পরাণ-পাগলকরা হেনার সুবাস,
বাসকশয়নলীন দেহবল্লী তব—
বহি' আনে কোন্ পূর্ব্বজনমের স্মৃতি
জীবনের ছায়াচ্ছন্ন পরপার হ'তে!
সুনিবিড় পরিচয় তোমায় আমায়,—
এ তো নহে বটচ্ছায় মুহূর্ত্তের দেখা
দূরাগত দুটি ক্লান্ত পথিকের সনে
পরস্পর! এ যুগল হিয়ার স্পন্দন
কোটি কল্প একসাথে বাজে অনুক্ষণ!

প্রাচীন রোম-ভারত যোগাযোগের কথা

।চীনকালে ভারতবর্ষের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের যে নানা সূত্রে যোগাযোগ ঘটিয়াছিল সেকথা আজ আর কাহারও অবিদিত নাই।

রোমের বাসিলিকাস্থিত সেণ্ট পীটারের ব্রোঞ্জ মূর্তি

গ্রীক ও ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে আদান-প্রদানের নিদর্শন অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকগুলিতে ইউরোপে রোম-সাম্রাজ্য বিশেষ প্রবল হইয়া উঠে। রোমক সভ্যতা-সংস্কৃতি তখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ঐ সময় ভারতবর্ষের সঙ্গেও রোমের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তবে এই যোগাযোগ প্রধানতঃ ঘটে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে। রোমীয় মুদ্রা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষতঃ পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা উভয়ের বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা বিশেষ রূপে প্রমাণিত হয়। কিছুকাল পূর্বে আর একটি নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহার ফলে উভয়ের ভিতরকার শুধু বাণিজ্যিক নয়, সাংস্কৃতিক সম্পর্কও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এখন পাকিস্থানের অন্তর্গত। ভারতবর্ষের এই অংশ এবং ইরাণ-আফগানিস্থানেরও খানিকটা প্রাচ্য-প্রতীচ্য মিলনহেতু সভ্যতা-সংস্কৃতিতে বৈশিষ্ট্যলাভ করিয়াছিল। এখানে আবিষ্কৃত ভাস্কর্যশিল্পে গ্রীক প্রভাব সুস্পষ্ট। রোম-সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিকালেও এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে স্থলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। সে যুগে এই অঞ্চলে—গান্ধার রাজ্যের একটি সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল পুষ্কলাবতী। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান যখন এখানে আসেন তখন গান্ধারের রাজধানীরূপে পুষ্কলাবতী বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। সপ্তম শতকে পুষ্কলাবতীতে আগমন করেন দ্বিতীয় চীন পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং। তখন পর্যন্তও ইহা সগৌরবে বিরাজ করিতেছিল। ইউরোপের সঙ্গে স্থলপথে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের কেন্দ্রস্থল বলিয়াই হয়ত ইহার এত সমৃদ্ধি হয়। দশম শতক নাগাদ মুসলমান আক্রমণ ও দৌরাত্ম্যহেতু এই সমৃদ্ধিশালী নগরীটি একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। ক্রমে পূর্বনাম পরিত্যক্ত হইয়া 'চারসাদ্দা' নামে পুষ্কলাবতী অভিহিত হইতে থাকে।

এই চারসাদ্দায় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের উদ্যোগে খননকার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল। সেই সময় এখানে একটি প্রতিমূর্তি আবিষ্কৃত হয়। ইহা রোমের বিখ্যাত সেণ্ট পীটার স্ট্যেচুর

হুবহু নকল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক হইতে রোম সাম্রাজ্যের গৌরব-রবি অস্তমিত হইতে থাকে। তখন পশ্চিম-দক্ষিণ ইউরোপের অধিবাসীরা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। রোমে খ্রীষ্টান-জগতের নেতৃস্বরূপ পোপের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সেণ্ট পীটার খ্রীষ্টান-জগতের একজন প্রধান সন্ত, শ্রদ্ধেয় ও উপাস্য ব্যক্তি। রোমে

সেণ্ট পীটারের প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখ-দৃশ্য, রোম

পোপের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর পঞ্চম শতকে সেখানে সেণ্ট পীটারের একটি সুদর্শন মূর্ত্তি পরিকল্পিত ও নির্ম্মিত হয়। ইহার পূর্ব্বে সেখানকার বিখ্যাত ভূনিম্নস্থ ভজনালয়ের প্রাচীরগাত্রে তাঁহার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল।

রোম সাম্রাজ্যের গৌরবের দিনে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইহার বাণিজ্যিক যোগাযোগ যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার একটিমাত্র প্রমাণ আরম্ভেই উল্লেখ করিয়াছি। ভারতবর্ষ হইতে পরিধেয়, আহার্য্য, মশলাদি বিভিন্ন দ্রব্য রোমে রপ্তানী হইত। গলজাতির নেতা রোম লুণ্ঠন করিয়া (৪১০ খ্রীষ্টাব্দ) ভারতের আমদানী পাঁচ হাজার পাউণ্ড লঙ্কা সেখান হইতে লইয়া গিয়াছিলেন। তখন স্থলপথেই ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরেও বহু শতাব্দী যাবৎ এই ব্যবসা-বাণিজ্য উভয়ের মধ্যেই বলবৎ ছিল। বাণিজ্যসূত্রে যে শুধু মালপত্রেরই আদান-প্রদান হইত এমন নহে, ভারতবর্ষ এবং রোমের ভিতরে সাংস্কৃতিক যোগাযোগও বিস্তৃত ঘটিয়াছিল। গ্রীক-ভারত সাংস্কৃতিক যোগাযোগ শিল্প-সাহিত্য-গণিত-জ্যোতিষ নানা বিভাগেই যে ঘটিয়াছিল তাহা এখন ঐতিহাসিক সত্য। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, চারসাদ্দায় রোমের সেণ্ট পীটারের মূর্ত্তির অনুরূপ সেণ্ট পীটারের প্রতিমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হওয়ায় ইহাদের ভিতরেও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বেশ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল।

এখন এই মূর্ত্তিটি কবে নির্ম্মিত হইল, চারসাদ্দায় কি করিয়া আসিল—এই সকল বিষয় সম্বন্ধে নানাজনে নানারূপ মত প্রকাশ করিতেছেন। তবে এসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতই ধর্ত্তব্য। মূল

রোমের ভূনিম্নস্থ ভজনালয়ের প্রাচীরে সেণ্ট পীটারের চিত্র

সেণ্ট পীটারের মূর্ত্তিটি রোমে নির্ম্মিত হইয়াছিল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকেও রোম-ভারত বাণিজ্যিক যোগসূত্র অটুট ছিল। তাই কোন কোন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, হয় ষষ্ঠ শতকের শেষার্দ্ধে নতুবা সপ্তম শতকের উত্তরার্দ্ধে সেণ্ট পীটারের নকল প্রতি-মূর্ত্তিটি চারসাদ্দা বা তখনকার পুষ্কলাবতীতে আনীত হইয়াছিল। বিশেষজ্ঞদের ভিতরে অনেকের ধারণা বাণিজ্যসূত্রেই এই মূর্ত্তিটি এখানে আনয়ন করা হয়। তবে সরাসরি রোম হইতেই যে পুষ্কলাবতীতে আসে তাহা নয়; মিশর ও বাইজানটিয়ামে এটি প্রথম আনীত হয় এবং ঐ ঐ স্থল হইতেই পরে এখানে আসে। এরূপ যে হইতে পারে সে সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়াও হয়ত যুক্তিযুক্ত হইবে না। তবে আর একটি মতও ইদানীং মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে এবং তাহাতে অনেকের বিশ্বাসও জন্মিতেছে। এই কথাই এখন বলি।

ভারতবর্ষের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম্মের যোগ বহু পুরাতন, এমন কি ইহার প্রচারের আরম্ভ হইতেই। এরূপ জনশ্রুতি, যীশুখ্রীষ্টের অন্যতম অন্তরঙ্গ শিষ্য টমাস খ্রীষ্টের তিরোধানের অব্যবহিত পরেই

দক্ষিণ ভারতে মালাবারে আগমন করেন। তদবধি সেখানে ইহুদী খ্রীষ্টানগণ বসবাস করিয়া আসিতেছেন। রোমে খ্রীষ্টান-জগতের উপরে পোপের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি বিভিন্ন দেশের খ্রীষ্টান-গণকে নানা খ্রীষ্ট-নেতার অধীন করিয়া লইলেন। ইরাণ, আফগানিস্থান এবং পশ্চিম ভারতের খ্রীষ্টানগণকেও ষষ্ঠ শতকে আবাবা নামে এইরূপ এক খ্রীষ্ট-নেতার অধীন করা হইল। তিনি স্বভাবতঃই ঐ সব অঞ্চলে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে তৎপর হইয়াছিলেন। কাজেই এই সময়ে উক্ত প্রতিমূর্ত্তিটি রোমের পোপ কর্ত্তৃক এখানে প্রেরিত হইয়া থাকিবে। এ মতটিকেও সুতরাং অগ্রাহ্য করা চলে না।

চারসাদ্দায় আবিষ্কৃত সেণ্ট পীটারের প্রতিমূর্ত্তি

সেণ্ট পীটারের প্রতিমূর্ত্তি, সম্মুখ ভাগ

রোমের সেণ্ট পীটারের মূর্ত্তি এবং চারসাদ্দায় প্রাপ্ত মূর্ত্তির মধ্যে যে অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে, সেদিকেও বিশেষজ্ঞগণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। উভয়েই প্রাপ্তবয়স্ক শ্মশ্রুগুম্ফ ও ঘন কেশ সমন্বিত। মূর্ত্তির দুইখানি হাতই বক্ষস্পৃষ্ট, খ্রীষ্টীয় বিশেষ প্রতীক দুটি চাবি হাতে রহিয়াছে। চারসাদ্দায় প্রাপ্ত প্রতিমূর্ত্তিটির হাতে একটি কি দুইটি চাবি পরিষ্কার বুঝা যায় না। হয়ত দুইটি চাবিই একটির উপর আর একটি থাকায় ঠিক দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। মূর্ত্তিটি কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল; এহেতু মূল মূর্ত্তিতে যেমন বাম দিকে চাবি রহিয়াছে, সেইরূপ এখানেও ছিল, কি ডান দিকে ছিল বুঝা কঠিন। রোমের ভাটিকানে সেণ্ট পীটারের দুইটি মূর্ত্তি আছে —একটি ব্রোঞ্জের এবং দ্বিতীয়টি মার্ব্বেল পাথরের। চারসাদ্দায় প্রাপ্ত মূর্ত্তিটি ব্রোঞ্জের মূর্ত্তিটিরই অবিকল প্রতিরূপ, যদিও ইহার শিল্পকর্ম্ম আসলটির মত তেমন উচ্চাঙ্গের নহে।

বড়ই দুঃখের বিষয়, এরূপ একটি মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ মূর্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ ১৯১০-১১ সনে ইহার যে আলোকচিত্র রাখিয়াছিলেন তাহাতেই বর্ত্তমানে আমাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে। এই মূর্ত্তিটির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কেহ কেহ এ বিষয়ে পুস্তক-পুস্তিকাও লিখিয়াছেন। এগুলির মধ্যে বেঞ্জামিন রোলাণ্ড কৃত "St. Peter in Gandhara, an early Christian Statuette in India" বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই মূর্ত্তিটির গুরুত্ব সম্বন্ধে আর একজন বিশেষজ্ঞ যাহা বলিতেছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য :

"But the rude statuette of St. Peter that has come to light among the ruins of Charsadda, is not only an unhoped for, and from many points of view an extraordinary landmark in a very intricate question of mediaeval history. Its presence in Indian soil shows indeed that, in one way or another, relations with Rome did not cease entirely even after the fall of the imperial power in the West, when the Rome of the Cæsars no longer existed and all that remained was the Rome of the Popes, foretelling new glories to come. The very fact that it is a faithful copy of the great bronze statue of the Apostle, still venerated in the greatest basilica of Rome, shows that in all probability the statuette was of Roman origin, thus differentiating it from others that have been found and of which all that can be said is that in all probability they came from the Romanized lands of the Mediterranean or else are evidently of Egyptian or Syrian origin. The statuette is, therefore, of real importance, and the long series of problems it raises are of exceptional interest."

এখানেও এই মূর্ত্তিটির গুরুত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। উপরে যে সকল কথা বলা হইল তাহাতে নানা প্রমাণ সহযোগে উহার গুরুত্ব দেখানোও হইয়াছে। বর্ত্তমান আলোচনা হইতে এই কয়টি বিষয় সুস্পষ্ট জানা গেল। প্রথমতঃ খ্রীষ্টপূর্ব্ব কয়েক শতকে গ্রীক-ভারত সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিলন ঘটিয়াছিল, খ্রীষ্ট-পরবর্ত্তী শতকগুলিতে রোম-ভারত সভ্যতা-সংস্কৃতিরও সংযোগ স্থাপিত হয়। এই সংযোগের দুইটি উপায় : (১) রোমের সঙ্গে স্থলপথে ভারত-বর্ষের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং (২) ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার। রোম সাম্রাজ্যের গৌরবের দিনে এবং উহার পতনের পরও বহু শতাব্দী যাবৎ ভারতবর্ষের সঙ্গে রোমের যোগাযোগ বজায় ছিল। স্থলপথে পূর্ব্ব-দক্ষিণ ইউরোপ, সিরিয়া, ইরাণ ও আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া মালপত্র রোম ও ভারতের মধ্যে আদান-প্রদান হইত। ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম্মের আবির্ভাব সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। তবে রোমে খ্রীষ্টান-জগতের তৎকালীন নেতা পোপের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতবর্ষের সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়েও নানারূপ যোগাযোগ দৃঢ় ভাবে স্থাপিত হইয়াছিল। যেমন বাণিজ্যসূত্রে উক্ত সেণ্ট পীটারের প্রতিমূর্ত্তিটি এখানে আনীত হইয়াছিল বলিয়া এক দলের মত, তেমনি খ্রীষ্টধর্ম্মকে পশ্চিম ভারতে দৃঢ়মূল করিবার জন্যও উক্ত মূর্ত্তিটি আনীত হইয়াছিল এরূপ আর এক দল বিশ্বাস করেন। কিন্তু এ বিষয়ে সকলে একমত এবং বিশেষ ভাবে তাহা প্রমাণিতও হইয়াছে যে, রোম সাম্রাজ্য ও ভারতবর্ষের মধ্যে শুধু বাণিজ্য নহে, সংস্কৃতিক্ষেত্রেও যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল।*

য. চ. ব.

* ১৯৫৪, জানুয়ারী সংখ্যা "East and West"-এ প্রকাশিত "An Impotant Documient on the relations between Rome and India" প্রবন্ধ অবলম্বনে

স্বর্ণ-আলো

(শ্রীঅরবিন্দের "The Golden Light" অবলম্বনে)

শ্রীরবি গুপ্ত

মস্তিষ্কে আমার এলো নামি' তব আলোক স্বর্ণের
মনের ধূসর কীট করি' স্পর্শ তীব্র সবিতায়
হ'ল, এক প্রদীপ্ত উত্তর—মহাজ্ঞান রহস্যের
উঠিল বিলসি' শান্ত সমুল্লাসে—স্ফটিক-শিখায়।

কণ্ঠমাঝে এলো মোর নামি' তব আলো স্বর্ণময়,
দেবতার ছন্দে এবে ধরে মোর সকল ভাষণ,
উৎসারিত ঐকতান গাহে মোর তোমারি বিজয় ;
করি' পান অমরার সুরা মোর বিহ্বল বচন।

এলো তব স্বর্ণালোক নামি' মোর হৃদয়ের মাঝে
অন্তহারা ছন্দে তব আঘাতিয়া জীবন আমার ;
জীবন-মন্দির এবে যেথা চির দেবতা বিরাজে
সকল উল্লাস মম জানে এক তারি অভিসার।

সুবর্ণ-আলোক তব লভে আসি' আমার চরণ
পৃথ্বী মোর এবে তব লীলাস্থল তোমারি আসন।

গীতা-প্রবচন

শ্রীবিনোবা ভাবে

অনুবাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

অষ্টাদশ অধ্যায়

১

বন্ধুগণ! ঈশ্বরের অনুগ্রহে আজ আমরা অষ্টাদশ অধ্যায়ে আসিয়া গিয়াছি। জগৎ ক্ষণে ক্ষণে বদলাইতেছে। এখানে কোন সঙ্কল্প পুরা হওয়া না-হওয়া সে ঈশ্বরের হাতে। তা ছাড়া জেলের অনিশ্চয়তা ত আছেই। এখানে কোন কাজ সুরু করিয়া পুরা করা যাইবে এই ভরসা কম। আরম্ভ করার সময় এই আশা আদৌ ছিল না যে গীতা শেষ করা যাইবে। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় আমরা আজ উপসংহারে আসিয়া গিয়াছি।

চতুর্দশ অধ্যায়ে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই তিন ভাগে জীবন বা কর্মকে ভাগ করা হইয়াছে। তাহা হইতে রাজস ও তামস বাদ দিয়া সাত্ত্বিক গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা আমরা দেখিয়াছি। পরে সপ্তদশ অধ্যায়ে একথাই আর এক ভাবে বলা হইয়াছে। যজ্ঞ, দান, তপ কিংবা এক কথায় বলিলে যজ্ঞই জীবনের সার। যজ্ঞোপযোগী যে আহারাদি কর্ম, তাহাকেও সাত্ত্বিক ও যজ্ঞরূপ দিয়া গ্রহণ করিবে। যজ্ঞরূপ ও সাত্ত্বিক কর্ম্মই করার যোগ্য, অন্য সব ত্যাজ্য, এই কথা সপ্তদশ অধ্যায়ে ধ্বনিত হইয়াছে। ওঁ তৎ সৎ এই মন্ত্র কেন যে অনুক্ষণ স্মরণ করিতে হইবে তাহাও আমরা দেখিয়াছি। ওঁ মানে সাতত্য, তৎ মানে অলিপ্ততা, সৎ মানে সাত্ত্বিকতা। আমাদের সাধনাতে সাতত্য, অলিপ্ততা ও সাত্ত্বিকতা আসা চাই। তবেই না সেই সাধনা পরমেশ্বরে অর্পণ করার মত হইবে। কোন কর্ম গ্রাহ্য আর কোন কর্ম ত্যাজ্য, তাহা এই সব কথা হইতে বুঝা যায়।

গীতার শিক্ষা পূর্বাপর লক্ষ্য করিলে এই ধারণা জন্মে যে, স্থলবিশেষেও কর্ম ত্যাগ করিতে নাই। গীতা কর্ম্মফল ত্যাগের কথা বলে। কর্ম সতত করিবে, কিন্তু ফল ত্যাগ করিবে এই শিক্ষা গীতার সর্বত্র দেখা যায়। কিন্তু এ ত গেল এক দিক। অন্য দিক হইতেছে এই যে কিছু কর্ম করিবে, আর কিছু কর্ম ত্যাগ করিবে। তাই শেষটায় অষ্টাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জুন প্রশ্ন করিলেন—"একদিকে হচ্ছে, যে-কোন কর্ম ফলত্যাগ-পূর্বক করবে। আর এক দিকে বলা হচ্ছে, কিছু কর্ম্ম অবশ্যই ত্যাজ্য, আর কিছু করার যোগ্য। এ দুয়ের সামঞ্জস্য কিরূপে করা যায়?" জীবনের দিক স্পষ্ট করিয়া লওয়ার জন্য আর ফলত্যাগের মর্ম বুঝার জন্য এই প্রশ্ন। শাস্ত্রে যাহাকে সন্ন্যাস বলে তাহাতে কর্ম স্বরূপতঃ ছাড়িতে হয়। কর্মের যাহা স্বরূপ তাহা ত্যাগ করিতে হয়। ফলত্যাগে কর্ম্ম ফলতঃ ত্যাগ করিতে হয়। এখানে প্রশ্ন উঠিবে—গীতার ফলত্যাগের জন্য কর্মত্যাগের আবশ্যকতা আছে কি? সন্ন্যাসের পক্ষে ফলত্যাগের কষ্টিপাথর প্রয়োজন কি? সন্ন্যাসের সীমা কোন পর্যন্ত? সন্ন্যাস ও ফলত্যাগ এই দুইয়ের সীমা কি ও কতটা? ইহাই অর্জুনের প্রশ্ন।

২

ফলত্যাগের কষ্টিপাথর যে সার্বভৌম বস্তু এ কথা ভগবান উত্তরে সাফ করিয়া দিলেন। ফলত্যাগের তত্ত্ব সর্বত্র প্রয়োগ করা যায়। সর্ব কর্মের ফলত্যাগ আর রাজস ও তামস কর্মের ত্যাগ এই দুয়েরই মধ্যে বিরোধ নাই। কিছু কর্মের স্বরূপই এই যে, ফলত্যাগের যুক্তি প্রয়োগ করিলে তাহা আপনা হইতেই বাদ পড়ে। ফলত্যাগপূর্বক কর্ম করার অর্থই এই যে, কিছু কর্ম ত্যাগ করিতে হইবে। ফলত্যাগপূর্বক কর্ম করার কথায় কিছু কর্মের প্রত্যক্ষ ত্যাগের প্রসঙ্গ আসিয়া যায়।

কথাটা একটু গভীরভাবে বিচার করুন। যাহা কাম্য কর্ম, যাহার মূলে কামনা রহিয়াছে, ফলত্যাগপূর্বক কর একথা বলা মাত্র সে কর্মের মূলে ছাই পড়ে। ফলত্যাগের সামনে কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম তিষ্ঠিতেই পারে না। ফলত্যাগ-পূর্বক কর্ম করা—কৃত্রিম, তান্ত্রিক, যান্ত্রিক ক্রিয়া নহে। কোন্ কর্ম্ম করিতে হইবে, আর কোন্ কর্ম করিতে নাই এই কষ্টিপাথরে কষিলেই তাহা ঠিক ধরা পড়িবে। কেহ কেহ বলেন, "গীতা বলে ফলত্যাগপূর্বক কর্ম কর। ব্যস্ এই পর্যন্ত। কিরূপ কর্ম করিবে একথা বলে না।" এরূপ মনে হয় বটে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কারণ ফলত্যাগ-পূর্বক কর্ম কর—এ কথা বলামাত্র কোন্ কর্ম করার যোগ্য আর কোন্ কর্ম অযোগ্য তাহা সুস্পষ্ট হইয়া যায়। হিংসাত্মক কর্ম, অসত্যময় কর্ম, চৌর্য্যকর্ম ইত্যাদি ফলত্যাগ-পূর্বক করা যায় না। ফলত্যাগের কষ্টিপাথরে কষিতেই তাহা নাকচ হইয়া যায়। সূর্যের আলো পড়ামাত্র সব বস্তু উজ্জ্বল দেখায়; কিন্তু আঁধার উজ্জ্বল হয় কি? তাহা নষ্ট হইয়া যায়। নিষিদ্ধ ও কাম্য কর্মের অবস্থাও তদ্রূপ। ফলত্যাগের কষ্টিপাথরে কর্ম যাচাই করিয়া লইতে হইবে।

আমি যে কর্ম করিতে চাই, ফলের লেশমাত্র বাসনা না *রাখিয়া অনাসক্তিপূর্বক তাহা করিতে পারিব কিনা তাহা* আগে দেখিয়া লওয়া দরকার। ফলত্যাগই কর্ম করার কষ্টিপাথর। এই যাচাইয়ে কাম্য কর্ম আপনা হইতেই ত্যাজ্য প্রমাণিত হইবে। উহার সন্ন্যাসই বাঞ্ছনীয়। বাকি থাকিতেছে শুদ্ধ সাত্ত্বিক কর্ম্ম। তাহা অনাসক্তভাবে অহংকার ত্যাগপূর্বক করা চাই। কাম্য কর্মের ত্যাগ, তাহাও ত এক কর্মই। তাহাতেও ফলত্যাগের কাঁচি চালাও। কাম্য কর্মের ত্যাগও সহজ হওয়া চাই।

এই ভাবে তিন বস্তু আমরা পাইলাম। এক—যে কর্ম আমরা করি তাহা ফলত্যাগপূর্বক করা চাই। দুই—রাজস ও তামস কর্ম নিষিদ্ধ আর কাম্য কর্ম ফলত্যাগের কাঁচির সংস্পর্শে আপনা হইতেই বাদ যায়। তৃতীয় কথা—এত ত্যাগ করিয়াছি এমন অভিমান মনে না জন্মে, তজ্জন্য যে ত্যাগ করা হইবে তার উপরও ফলত্যাগের কাঁচি চালাইতে হইবে।

রাজস ও তামস কর্ম কেন ত্যাজ্য? কারণ তাহা শুদ্ধ নহে। শুদ্ধ নয় বলিয়া কর্তার চিত্তে ছাপ পড়িয়া থাকে। কিন্তু আরও বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, সাত্ত্বিক কর্মও সদোষ। কর্মমাত্রেই দোষ আছে। চাষ-আবাদরূপ কর্মের কথা ধরুন। তাহা শুদ্ধ সাত্ত্বিক ক্রিয়া। কিন্তু যজ্ঞময় এই স্বধর্মরূপ চাষেও হিংসা আছে। লাঙ্গল ইত্যাদি ক্রিয়ায় অসংখ্য জীব মারা যায়। কূপের ধারে কাদা না হয় এই জন্য পাথর বসাইতে গেলেও বহু জীব নষ্ট হয়। সকালে ঘরের দরজা খুলিতেই সূর্যকিরণ ঘরে প্রবেশ করে, আর অগণিত প্রাণী মারা যায়। যাহাকে আমরা শুদ্ধীকরণ বলি তাহা মারণক্রিয়া ছাড়া আর কি! সারাংশ: সাত্ত্বিক, স্বধর্মরূপ কর্মেও যদি দোষ স্পর্শে ত উপায়?

আগেই বলিয়াছি যে, সকল গুণের বিকাশ হইতে এখনও বাকি আছে। জ্ঞান, ভক্তি, সেবা, অহিংসা, এ সকলের কেবল বিন্দুমাত্র উপলব্ধি হইয়াছে। সুরুতেই সকল উপলব্ধিলাভ হইয়াছে, তাহা নহে। উপলব্ধি করিতে করিতে জগৎ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। চাষ-আবাদের কাজেও হিংসা আছে, অতএব অহিংসায় বিশ্বাসী লোকেরা তাহা করিতে পারে না। তাহারা ব্যবসা করুক। এইরূপ এক ভাব মধ্যযুগে দেখা গিয়াছিল। তাহারা বলিত—ধান বোনা পাপ, ধান বেচা পাপ নহে। কিন্তু এভাবে কর্ম এড়াইলে হিত হয় না। লোকে যদি এভাবে কর্ম সঙ্কোচ করিতে থাকে তবে শেষটায় আত্মনাশ হইবে। কর্ম হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার কথা মানুষ যত ভাবিবে কর্মের প্রসার তত বাড়িবে। আপনার ধানের ব্যবসায়ের জন্য কাহাকে কি চাষ করিতে হইবে না? সেই চাষ-বাসের হিংসার ভাগ *আপনাতে বর্তাইবে না কি? কার্পাস বুনিলে যদি পাপ* হয়, তবে সেই উৎপন্ন কার্পাস বেচাও পাপ। কার্পাস উৎপাদন করা দোষের বলিয়া এ কর্ম ছাড়িয়া দেওয়ার মধ্যে বুদ্ধি-দোষ রহিয়াছে। সকল কর্ম বর্জন করা, এ কর্ম নয়, ও কর্ম নয়, কিছুই করিও না, এই যে ভাব তাহাতে দয়ার লেশও নাই, দয়া মরিয়া গিয়াছে একথা বুঝা চাই। পাতা ছিঁড়িলে গাছ মরে না, উল্টা তাহা পল্লবিত হয়। ক্রিয়ার সঙ্কোচ করিলে আত্মসঙ্কোচ ঘটে।

৩

এখন প্রশ্ন এই, সব ক্রিয়াতেই যদি দোষ তবে সকল কর্মই কেন না ত্যাগ করিব? পূর্বে একবার এ কথার উত্তর দিয়াছি। সকল কর্মত্যাগের কল্পনা খুব সুন্দর। এই চিন্তা মনভুলানো। কিন্তু এই অসংখ্য কর্ম ছাড়ার যাহা উপায়, তাহা সাত্ত্বিক কর্মের বেলায়ও কি প্রযুক্ত? সদোষ সাত্ত্বিক কর্ম্ম হইতে বাঁচার উপায় কি? মজা হইতেছে এই যে, "ইন্দ্রায় তক্ষকায় স্বাহা" নীতি অবলম্বনে মানুষ যখন চলিতে থাকে তখন অমর বলিয়া ইন্দ্র মরে না, আর তক্ষকও মরে না, উল্টা দৃঢ় হইয়া বসে। সাত্ত্বিক কর্মে পুণ্য আছে, আর দোষও কিছু আছে। কিন্তু কিছু দোষ আছে বলিয়া এই দোষের সহিত যদি পুণ্যকেও আহুতি দাও ত, নাশ হওয়ার নয় বলিয়া পুণ্যক্রিয়া নষ্ট হইবে না, কিন্তু দোষক্রিয়া কেবল বাড়িয়া চলিবে। এরূপ গড়পড়তা নির্বিচার ত্যাগ দ্বারা পুণ্যরূপ ইন্দ্র ত মরেই না, আর দোষরূপ তক্ষক যে মরিতে পারিত সেও মরে না। অতএব উহা ত্যাগ করার উপায় কি? হিংসা করে বলিয়া বিড়াল ত্যাগ করেন ত ইঁদুর হিংসা করিবে। সাপ হিংসা করে বলিয়া সাপ দূর করিলে শত শত জীব ফসল নষ্ট করিবে। ফসল নাশ হইলে হাজারো লোক মরিবে। ত্যাগ বিচারযুক্ত হওয়া চাই।

গোরখনাথকে মচ্ছীন্দ্রনাথ বলিলেন, "এ বালককে ধুয়ে আন।" পা ধরিয়া গোরখ বালককে খুব আছড়াইল আর বেড়ার উপর শুকাইতে দিল। মচ্ছীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধুয়ে এনেছ বালককে?" গোরখনাথ বলিল, "ধুয়ে শুকাতে দিয়েছি।" এই কি বালক ধোয়ার রীতি? কাপড় ধোয়ার আর মানুষ ধোয়ার রীতি এক নয়। এই দুই উপায় ভিন্ন ভিন্ন। তদ্রূপ রাজস ও তামস কর্মের ত্যাগে আর সাত্ত্বিক কর্মের ত্যাগে ব্যবধান আছে। সাত্ত্বিক কর্ম-ত্যাগের উপায় আলাদা।

বিচারবিহীন ভাবে কর্ম করিলে কিছু উল্টাপাল্টা ত হইবেই। তুকারাম বলিয়াছেন:

ত্যাগ থেকে অন্তরে জাগে ভোগ।
বল দাতা! কি করে যাবে এ রোগ।"

ছোট ত্যাগ করিতে যাই ত বড় ভোগ মনে আসিয়া বাসা বাঁধে। তাই ঐ সামান্য ত্যাগও মিথ্যা হইয়া যায়। ছোটখাটো ত্যাগের পূর্তির জন্য বড় বড় ইন্দ্রপুরী রচনা করি। তাহা অপেক্ষা ঐ কুঁড়েই ত ভাল ছিল, পর্যাপ্ত ছিল। নেংটি পরিয়া রাজ্যের বিলাস-বৈভব আশপাশে জড়ো করা অপেক্ষা ধুতি ও সার্ট-কোট পরা অনেক ভাল। তাই ভগবান সাত্ত্বিক কর্মত্যাগের পদ্ধতিই পৃথক ভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। সাত্ত্বিক কর্মমাত্রই করিতে হইবে, কিন্তু ফল তার ফেলিয়া দিতে হইবে। কিছু কর্ম্ম ত মূলেই ত্যাজ্য। আর কিছুর ফল ত্যাগ করিতে হয়। শরীরে দাগ লাগে ত ধুইয়া ফেলা যায়। কিন্তু প্রকৃতি যেখানে কালো রং দিয়াছে, সেখানে গায়ে হোয়াইট ওয়াস লাগাইয়া কি লাভ? কালো রং আছে থাকিতে দাও। সে কথাই ভাবিও না। তাকে অমঙ্গলের মনে করিও না।

একটি লোক ছিল। নিজ গৃহ তার অশুভ মনে হইতে-ছিল। গৃহ ছাড়িয়া সে এক গাঁয়ে গেল। সেখানেও সে আবর্জনা দেখিতে পাইল। তাই গেল সে বনে। এক আম গাছের নীচে সে বসিয়াছে। একটা পাখী উপর হইতে তার মাথায় মলত্যাগ করিল! জঙ্গলও অমঙ্গল একথা বলিয়া সে নদী-জলে গিয়া দাঁড়াইল। নদীতে বড় মাছে ছোট মাছ খায়। ইহা দেখিয়া তার ঘৃণার অবধি রহিল না। সারা সংসারই অমঙ্গলে ভরা। সে ঠিক করিল মরা ছাড়া আর কোন পথ নাই। জল হইতে উঠিয়া আসিয়া সে আগুন জ্বালাইল। ওদিক হইতে এক ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন, "জীবন দেবে নাকি?" লোকটি বলিল, "কি আর করি! এ জগৎটাই অমঙ্গল।" গৃহস্থ বলিলেন, "তোমার এ দুর্গন্ধময় শরীর, এ চর্বি এখানে পোড়ালে মহা দুর্গন্ধ ছড়াবে। পাশেই আমরা থাকি। আমরা তখন যাব কোথায়? একটি চুল পোড়ে ত কি গন্ধ! আর তোমার সব চর্বি যে পুড়বে। চিন্তা করে দেখ কেমন দুর্গন্ধ ছড়াবে।" লোকটি হয়রান হইয়া বলিল, "বেঁচে থাকার সুযোগ নেই, মরারও সুবিধা নেই, এমনি এ দুনিয়া। কি করি!"

তাৎপর্য এই: অশুভ, অমঙ্গল বলিয়া সব কিছু ছাড়িলে ত চলে না। ছোট কর্ম হইতে বাঁচিতে যাইবে ত অপর বড় কর্ম কাঁধে চাপিয়া বসিবে। স্বরূপতঃ বাহির হইতে ত্যাগ করিলেই ত কর্ম ছাড়ে না। প্রবাহপ্রাপ্ত কর্মের বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য যদি কেহ শক্তি ক্ষয় করে, প্রবাহের উল্টা দিকে যাইতে চাহে ত শেষটায় ক্লান্ত হইয়া প্রবাহের দিকেই সে ভাসিয়া যাইবে। প্রবাহের অনুকূল যে কর্ম তাহা করিয়াই তাহাকে আত্ম-উদ্ধারের পথ দেখিতে হইবে। তাহার ফলে মনের মলিনতা কমিতে থাকিবে, চিত্তশুদ্ধি হইতে থাকিবে। আগে চলিতে চলিতে আপনা হইতে ক্রিয়ার শেষ হইতে থাকিবে। কর্মত্যাগ না হইয়াও ক্রিয়া লুপ্ত হইয়া যাইবে। কর্ম যাইবে না, ক্রিয়া লোপ হইবে।

ক্রিয়া ও কর্ম এই দুইয়ে ব্যবধান আছে। উদাহরণার্থ—কোথাও খুব গোলযোগ চলিতেছে আর তাহা বন্ধ করা দরকার। কোন সিপাহী আসিল আর সোরগোল বন্ধ করার জন্য নিজে জোরে চিৎকার করিল। গোলমাল বন্ধ করার জন্য উচ্চৈস্বরে বলা-রূপ তীব্র কর্ম তাহাকে করিতে হইল। অপর এক জন আসিল, স্রেফ দাঁড়াইয়া থাকিল আর অঙ্গুলি তুলিল। ব্যস্, যথেষ্ট। তাহাতেই লোক শান্ত হইয়া গেল। তৃতীয় একজনের উপস্থিতি মাত্রেই সব শান্ত হইল। একজনের করিতে হইল তীব্র ক্রিয়া, দ্বিতীয়ের ক্রিয়া অনেকটা সৌম্য, আর তৃতীয়ের ক্রিয়া সূক্ষ্ম। ক্রিয়া ক্রমশঃ কমিয়া চলিল। কিন্তু লোককে শান্ত করার কর্ম ছিল সমান। যেমন যেমন চিত্তশুদ্ধি হইতে থাকিবে, ক্রিয়ার তীব্রতা তেমন তেমন কমিতে থাকিবে। তীব্র হইতে সৌম্য, সৌম্য হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হইতে শূন্য হইতে থাকিবে। কর্ম এক, ক্রিয়া আর এক। কর্তার যাহা ইষ্ট তাহাই কর্ম—ইহাই কর্মের সংজ্ঞা। কর্মে প্রথমা ও দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় ত ক্রিয়ার জন্য এক স্বতন্ত্র ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিতে হয়।

কর্ম ও ক্রিয়াতে যে ব্যবধান তাহা বুঝিয়া লউন। চটিয়া গেলে কেহ বহু চিৎকার করিয়া আর কেহ আদৌ কিছু না বলিয়া রাগ প্রকাশ করে। জ্ঞানী পুরুষ লেশমাত্রও ক্রিয়া করেন না। কিন্তু অনন্ত কর্ম করেন। তাঁহার অস্তিত্বমাত্রই অপার লোকসংগ্রহ করিতে সক্ষম। জ্ঞানী পুরুষের উপস্থিতিই যথেষ্ট। তাঁহার হাত-পা কার্য না করিলেও তিনি কাজ করেন। ক্রিয়া যত সূক্ষ্ম হইতে থাকে কর্ম তত বাড়িতে থাকে। বিচারের এই ধারা যদি আরও অগ্রসর করিয়া দেন আর চিন্তা পরিপূর্ণ শুদ্ধ হইয়া যায়, তবে অন্তে ক্রিয়া শূন্যময় হইয়া অনন্ত কর্ম হইতে থাকিবে, একথা বলা চলে। প্রথমে তীব্র, পরে তীব্র হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে শূন্য, এইভাবেই ক্রিয়া শূন্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু তখন অনন্ত কর্ম আপনা হইতে হইতে থাকিবে।

উপর উপর দূর করিলে কর্ম দূর হওয়ার নয়। নিষ্কামতা-পূর্বক করিতে করিতে আস্তে আস্তে সে উপলব্ধি হইবে। কবি ব্রাউনিং 'কপটাচারী পোপ' নামে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। পোপকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,

"তুমি সাজগোজ কর কেন? এই সব আঙ্গরাখা কেন? ওপরের এ ঢং কেন? কেনই বা এ গম্ভীর মুদ্রা?" পোপ বলিলেন, "কেন যে করি তা বলি। এ অভিনয় করতে করতে অজ্ঞাতেই সম্ভবতঃ শ্রদ্ধার ছোঁয়াচ লাগবে।" তাই নিষ্কাম ক্রিয়া করিয়া যাইতে হইবে। আস্তে আস্তে নিষ্ক্রিয়তা আয়ত্ত হইয়া যাইবে।

৪

তাৎপর্য এই, রাজস ও তামস কর্ম অবশ্য ত্যাগ করিতে হইবে আর সাত্ত্বিক কর্ম করিতে হইবে এবং এই বিচার জাগ্রত হওয়া চাই যে, যে সাত্ত্বিক কর্ম সহজ প্রবাহে আসে, সদোষ হইলেও তাহা ত্যাজ্য নহে। দোষ আছে থাক। তুমি নাককাটা। হইলেই বা। কাটিয়া সুন্দর করিতে যাইবে ত আরও অধিক বিশ্রী তাহা হইবে। তাহা যেমন আছে তেমনই ভাল। সাত্ত্বিক কর্ম সদোষ হইলেও সহজ প্রবাহপ্রাপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিতে নাই। তাহা করিতে হইবে, কিন্তু ফল তার ত্যাগ করিতে হইবে।

আর এক কথা বলা দরকার। যে কর্ম সহজ স্বাভাবিক-রূপে প্রাপ্ত নহে, তাহা উত্তমরূপে করা যাইবে মনে হইলেও করিতে যাইও না। যাহা প্রবাহপ্রাপ্ত তাহা কর। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, দৌড়-ঝাঁপ করিয়া অন্য নূতন কর্মের চক্রে পড়িতে যাইও না। যে কাজ স্পষ্টতঃই তোড়জোড় করিয়া করিতে হয়, যতই ভাল হোক, তাহা হইতে দূরে থাক—তার মোহে পড়িও না। সহজ-প্রাপ্ত কর্মের কেবল ফল-ত্যাগ করা যাইতে পারে। এ কর্ম ভাল, ও কর্ম ভাল এই লোভে যদি মানুষ চারিদিকে দৌড়াইতে থাকে তবে আর ফলত্যাগ কি করিয়া হইবে? সারা জীবনটাই নাশ হইবে। ফলের আশায় সে পরমধর্মরূপ কর্ম করিতে চাহিবে, আর ফলও হাত হইতে খোয়াইয়া বসিবে। জীবনে কোনরূপ স্থিরতাই তার লাভ হইবে না। মনে ঐ কর্মের আসক্তি জড়াইয়া যাইবে। সাত্ত্বিক কর্মেরও যদি লোভ জন্মে ত সে লোভ দূর করিতে হইবে। ঐ নানাবিধ সাত্ত্বিক কর্ম যদি করিতে যাও ত তাহাতে রাজস ও তামস ভাব আসিবে। তাই যাহা তোমার সহজ-প্রাপ্ত সাত্ত্বিক স্বধর্ম তাহাই তুমি কর।

স্বধর্মে স্বদেশী ধর্ম, স্বজাতীয় ধর্ম ও স্বকালীন ধর্ম থাকে। এই তিনে মিলিয়া স্বধর্ম। আমার বৃত্তির পক্ষে কি অনুকূল ও অনুরূপ, কিরূপ কর্তব্য আমি পাইয়াছি, স্বধর্ম নির্ধারণ করার সময় এ সব দেখিতে হয়। তোমাতে 'তুমিত্ব' বলিয়া কিছু আছে আর তাই ত তুমি "তুমি"। প্রত্যেকেরই বিশেষ কিছু থাকে। ছাগ থাকাতেই ছাগের বিকাশ। ছাগ থাকিয়াই উহাকে নিজ বিকাশ করিয়া লইতে হইবে। ছাগ যদি গরু হইতে চায় ত তাহা সম্ভব নহে। স্বয়ংপ্রাপ্ত ছাগত্ব ত্যাগ সে করিতে পারে না। তাহার জন্য তাহাকে শরীর ত্যাগ করিতে হইবে। নবধর্ম, নবজন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু এ জন্মে ঐ ছাগত্বই তাহার পক্ষে পবিত্র। বলদ ও ব্যাঙের গল্প আছে না? ব্যাঙের বড় হওয়ার একটা সীমা আছে। ব্যাঙ যদি বলদের সমান হইতে যায় ত মরিবে। অপরের রূপ নকল করিতে যাওয়া ঠিক নহে। তাই পরধর্মকে ভয়াবহ বলা হইয়াছে।

স্বধর্মের আবার দুই ভাগ। এক বদলায়, আর এক বদলায় না। আজিকার আমি আগামী কালের আমি নহি, কালের আমি পরশুর নহি। আমি নিরন্তর বদলাইতেছি। বাল্যকালের স্বধর্ম কেবল সংবর্দ্ধন। যৌবনে আমাতে কর্ম-শক্তি ভরপুর থাকিবে আর তদ্দ্বারা আমি সমাজসেবা করিব। প্রৌঢ়াবস্থায় অপরে আমার জ্ঞানের ফল পাইবে। কতক-গুলি স্বধর্ম এইভাবে বদলাইয়া থাকে, আর কতকগুলি আদৌ বদলায় না। পুরাতন শাস্ত্রীয় সংজ্ঞায় বলিলে বলিব, "মানুষের স্বধর্ম দ্বিবিধ—বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম। বর্ণধর্ম বদলায় না। আশ্রমধর্ম বদলায়।"

আশ্রমধর্ম বদলায় মানে, ব্রহ্মচারীপদ পূর্ণ করিয়া গৃহস্থ হই, গৃহস্থ হইতে বানপ্রস্থী, আর বানপ্রস্থী হইতে সন্ন্যাসী। আশ্রমধর্ম এইভাবে বদলাইলেও, বর্ণধর্ম বদলানো যায় না। নিজ নৈসর্গিক সীমা আমার পক্ষে লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়। সেই প্রযত্নই মিথ্যা। তোমাতে যে তুমিত্ব রহিয়াছে তাহা ছাড়ার সাধ্য নাই, এই কল্পনার উপর বর্ণধর্ম প্রতিষ্ঠিত। বর্ণধর্মের কল্পনা মধুর। বর্ণধর্ম একেবারেই অপরিবর্তনীয় কি? ছাগীর যেমন ছাগীত্ব, গাভীর যেমন গাভীত্ব, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্বও কি তদ্রূপ? একথা আমি স্বীকার করি যে, বর্ণধর্ম এরূপ অনড় নহে। তবে উহার মর্ম বুঝা চাই। সামাজিক ব্যবস্থার উপায়-স্বরূপে যখন বর্ণধর্মের ব্যবহার হয়, তখন উহার ব্যতিক্রম অবশ্যই হইবে। এরূপ ব্যতিক্রম গৃহীত বলিয়া ধরিতে হইবে। এই ব্যতিক্রম গীতা স্বীকার করিয়াছেন। তাৎপর্য এই—এই দ্বিবিধ ধর্ম চিনিয়া লওয়ার পরে, অবান্তর ধর্ম সুন্দর ও মনোহর মনে হইলেও তার ফাঁদে পড়িবে না।

৫

ফলত্যাগ-কল্পনার যে ব্যাখ্যা আমরা এ পর্যন্ত করিয়াছি তাহা হইতে নিম্ন অর্থ পাওয়া যায়ঃ

১। রাজস ও তামস কর্মের পূর্ণ ত্যাগ।

২। সেই ত্যাগেরও ফলত্যাগ। উহার অহংকার যেন না থাকে।

৩। সাত্ত্বিক কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ না করিয়া কেবল ফলত্যাগ।

৪। সাত্ত্বিক কর্ম সদোষ হইলেও তাহা ফলত্যাগ-পূর্বক করা।

৫। ফলত্যাগপূর্বক ঐ সব কর্ম সতত করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইবে এবং তীব্র হইতে সৌম্য, সৌম্য হইতে সূক্ষ্ম আর সূক্ষ্ম হইতে শূন্য—এই ভাবে যাবতীয় ক্রিয়া লোপ পাইবে।

৬। ক্রিয়া লুপ্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু কর্ম—লোক-সংগ্রহরূপ কর্ম চলিতেই থাকিবে।

৭। সাত্ত্বিক কর্মের মধ্যে যে কর্ম স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত তাহা করিতে হইবে। যাহা সহজপ্রাপ্ত নহে, যতই ভাল মনে হোক, তাহা হইতে দূরে থাকিতে হইবে। তার মোহ যেন না হয়।

৮। সহজপ্রাপ্ত স্বধর্ম আবার দুই প্রকারের। এক বদলায়, আর এক বদলায় না। বর্ণধর্ম পরিবর্তিত হয় না। আশ্রম-ধর্ম বদলায়। পরিবর্তনশীল স্বধর্মের পরিবর্তন হইতে থাকা চাই। তাহা হইলে প্রকৃতি বিশুদ্ধ থাকিবে।

প্রকৃতির বহিতে থাকা চাই। ঝরণা যদি না বহে তবে তাহা হইতে দুর্গন্ধ আসিবে। আশ্রম-ধর্ম সম্বন্ধেও ঐ কথা। প্রথমে মানুষ পায় পরিবার। আত্মবিকাশের জন্য সে নিজেকে পরিবারের বন্ধনে বাঁধে। তাহা হইতে নানা অভিজ্ঞতা লাভ করে। কিন্তু পারিবারিক বন্ধনে যদি সে বরাবরের মত জড়াইয়া যায় ত তার বিনাশ হয়। পরিবারে ভুক্ত হওয়া যাহা একসময়ে ধর্মরূপ ছিল, তাহা তখন অধর্মরূপ হইবে। কারণ সেই ধর্ম বন্ধনের হেতু হইয়া গিয়াছে। পরিবর্তনশীল ধর্ম যদি আসক্তি হেতু না ছাড় ত তার পরিণাম ভয়ানক হইবে। ভাল জিনিষেও যেন আসক্তি না জন্মে। আসক্তি হইতে ঘোর অনর্থ ঘটে। ক্ষয়ের জীবাণু ফুসফুসে প্রবেশ করিলে সারা দেহটাই ভিতরে ফোকলা করিয়া দেয়। সাত্ত্বিক কর্মে আসক্তির জীবাণু যদি অসাবধানতাবশতঃ প্রবেশ করিতে দাও ত স্বধর্মে পচন ধরিবে। সেই সাত্ত্বিক স্বধর্মে রাজস ও তামসের দুর্গন্ধ জন্মিবে। তাই পরিবার-রূপ পরিবর্তনশীল স্বধর্ম সময়মত খসিয়া পড়া চাই। দেশধর্ম সম্বন্ধেও ঐ কথা। দেশধর্মে যদি আসক্তি আসে, আর কেবল নিজ দেশের কথাই যদি আমরা ভাবিতে থাকি তবে দেশভক্তি ভয়ঙ্কর বস্তু হইবে। তার ফলে আত্মবিকাশ বন্ধ হইয়া যাইবে। চিত্তে আসক্তি ঘর বাঁধিবে আর অধঃপাত সুরু হইবে।

৬

সারাংশ—জীবনের ফলিত পাইতে চাও ত ফলত্যাগরূপী চিন্তামণির শরণ লও। তাহা তোমায় পথ দেখাইবে। ফল-ত্যাগের তত্ত্ব নিজ সীমাও নির্দেশ করে। এই দীপ নিকটে থাকিলে কি করিতে হইবে, কি করিতে হইবে না, কখন কি বদলাইতে হইবে এ সবই বুঝা যাইবে। কিন্তু আর একটি বিষয় বিচার করিয়া দেখা যাক। সম্পূর্ণ ক্রিয়া-লোপের যে অন্তিম স্থিতি তার দিকে কি সাধকের লক্ষ্য রাখা দরকার? ক্রিয়া না করিলেও অসংখ্য কর্ম হইতে থাকে, জ্ঞানী পুরুষের এই যে স্থিতি তার দিকে কি সাধকের দৃষ্টি রাখিতে হইবে?

বস্তুতঃ তাহা নহে। এখানেও ফলত্যাগের কষ্টিপাথর ব্যবহার কর। আমাদের জীবনের স্বরূপ এমনই সুন্দর যে, যাহা আমাদের প্রয়োজন তার দিকে দৃষ্টি না রাখিলেও তাহা আমাদের লাভ হইবে। জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় ফল মোক্ষ। ঐ মোক্ষ, ঐ অকর্মাবস্থা তাহাতেও লোভ করিও না। ঐ স্থিতি অজ্ঞাতেই লাভ হইবে। সন্ন্যাস বস্তুটি এরূপ নয় যে অকস্মাৎ দুই পাঁচ মিনিটে আসিয়া যাইবে; সন্ন্যাস যান্ত্রিক বস্তু নহে। তোমার জীবনে তাহা কি ভাবে বিকশিত হইতে থাকিবে, তুমি টেরও পাইবে না। তাই মোক্ষের চিন্তা ছাড়।

ভক্ত সদা ভগবানকে বলে, "এ ভক্তিই আমার যথেষ্ট। ঐ মোক্ষ, ঐ অন্তিম ফল তা আমি চাই না।" মুক্তি মানে একপ্রকারের ভুক্তিই বটে। মোক্ষ একপ্রকারের ভোগই বটে—এক ফলই বটে। এই মোক্ষরূপ ফলের উপরও ফল-ত্যাগের কাঁচি চালাইবে। কিন্তু তাহাতে মোক্ষ হাত-ছাড়া হওয়ার নয়। কাঁচি ভাঙ্গিবে, ফল অধিক দৃঢ় হইবে। মোক্ষের বাসনা ছাড়িয়াছ ত অজ্ঞাতেই মোক্ষের দিকে অগ্রসর হইয়াছ। সাধনাতে এমন তন্ময় হইয়া যাও যে, মোক্ষের কথাই যেন মনে না থাকে আর মোক্ষ তখন তোমায় খুঁজিয়া তোমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইবে। সাধক সাধনাতেই মজিয়া যাইবে। 'মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি'—অকর্মদশার, মোক্ষের আসক্তি রাখিও না—একথা ভগবান আগেই বলিয়াছেন। এখন অন্তে আবার বলিতেছেন:

'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ'

আমি মোক্ষদাতা, সমর্থ। মোক্ষের ভাবনা ভাবিও না। তুমি সাধনার কথাই ভাব। মোক্ষের কথা ভুলিয়া গেলে সাধনা উৎকৃষ্ট হইবে আর মোক্ষ বশীভূত হইয়া তোমার কাছে আসিবে। মোক্ষনিরপেক্ষ বৃত্তিতে একমাত্র সাধনায় তন্ময় হইলে মোক্ষলক্ষ্মী সাধকের গলায় মাল্যদান করেন।

সাধনার যেখানে পরাকাষ্ঠা সেখানে সিদ্ধি করজোড়ে দণ্ডায়মানা। যাহাকে বাড়ী যাইতে হইবে, সে গাছের তলে বসিয়া যদি 'বাড়ী বাড়ী' বলিতে থাকে তবে বাড়ী দূরেই থাকিয়া যায়, আর তার জঙ্গলে থাকার পালা আসিবে।

বাড়ীর কথা ভাবিতে ভাবিতে যদি রাস্তায় বিশ্রাম করিতে থাক তবে ঐ অন্তিম বিশ্রামস্থান হইতে দুরেই থাকিবে। চলার চেষ্টা আমায় করিতে হইবে। বাড়ী তখন একেবারে সামনে আসিয়া যাইবে। মোক্ষের নিশ্চেষ্ট স্মরণে, আমার প্রযত্নে, আমার সাধনায় শিথিলতা দেখা দিবে আর মোক্ষ দুরে চলিয়া যাইবে। মোক্ষ উপেক্ষা করিয়া সতত সাধনা করা মোক্ষ হাতে পাওয়ার উপায়। অকর্মাবস্থার—বিশ্রামের—লালসা রাখিও না। সাধনার প্রেমে মজ, মোক্ষ আসিবেই আসিবে। উত্তর-উত্তর করিয়া চিৎকার করিলে প্রশ্নের উত্তর মেলে না। উহার যে উপায় আমি পাইয়াছি তাহা দ্বারা ক্রমশঃ উত্তর মিলিবে। সে উপায়ের যেখানে সমাপ্তি সেখানে উত্তর তোমার অপেক্ষায় হাজির। সমাপ্তির পূর্বে কিরূপে সমাপ্তি হইবে? উপায়ের আগে উত্তর কি করিয়া পাওয়া যাইবে? সাধকের অবস্থায় সিদ্ধাবস্থা কিরূপে পাওয়া যাইবে? জলে হাবুডুবু খাইতে খাইতে অপর পারের মজার কথায় মশগুল হইলে কিরূপে চলিবে। সে অবস্থায় এক এক হাত করিয়া জল কাটিয়া আগে যাওয়াই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া চাই। তাহাতে সারা শক্তি লাগানো চাই। সাধনা পূর্ণ কর, সমুদ্র লঙ্ঘন কর, মোক্ষ আপনা হইতে আসিয়া হাজির হইবে।

৭

জ্ঞানী পুরুষের অন্তিম অবস্থায় সকল ক্রিয়া লুপ্ত হইয়া যায়, শূন্যরূপ হইয়া যায়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ঐ অন্তিম অবস্থায় ক্রিয়া হইবেই না। তাহা দ্বারা ক্রিয়া হইবে আবার হইবেও না। এই অন্তিম অবস্থা অতীব রমণীয়, উদাত্ত। এই অবস্থায় যাহা কিছু হইবে তাহার ভাবনা তাহার থাকে না। যাহা কিছু হইবে, শুভ ও সুন্দর হইবে। সাধনার পরাকাষ্ঠা অবস্থায় তখন সে উপস্থিত। এ অবস্থায় সবকিছু করিয়াও সে কিছু করে না। সংহার করিয়াও সংহার করে না। কল্যাণ করিয়াও কল্যাণ করে না।

এই অন্তিম মোক্ষাবস্থা বলিতে সাধকের সাধনার পরাকাষ্ঠা বুঝায়। সাধকের সাধনার পরাকাষ্ঠা মানে সাধকের সহজ অবস্থা। আমি কিছু করিতেছি এ বোধ পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকে না। অথবা এই দশাকে আমি সাধকের সাধনার 'অনৈতিকতা' বলিব। সিদ্ধাবস্থা নৈতিক অবস্থা নহে। ছোট শিশু সত্য কথা বলে। কিন্তু তাহা নৈতিক নহে। কারণ অসত্য যে কি তা সে জানেই না। অসত্যের জ্ঞান হওয়ার পরে সত্য বলে ত তাহা নৈতিক কর্ম। সিদ্ধাবস্থায় অসত্য বলিয়া কিছু থাকে না। সেখানে একমাত্র সত্যই আছে। তাই সেখানে নীতি নাই। যাহা নিষিদ্ধ তার সেখানে ঠাঁই নাই। যাহা শোনার মত নয় তাহা কানে প্রবেশ করে না। যাহা দেখার মত নয় তাহা চোখ দেখে না। যাহা করার যোগ্য হাত তাহা করে। চেষ্টা করিতে হয় না। যাহা করার অযোগ্য তাহা বর্জন করিতে হয় না। আপনা হইতেই তাহা দূরে থাকে। এরূপই এই নীতিশূন্য অবস্থা। সাধনার এই যে পরাকাষ্ঠা, সাধনার এই যে সহজ অবস্থা অথবা অনৈতিকতা বা অতিনৈতিকতা যাহাই বলুন, সে অতি নৈতিকতায় নীতির চরমোৎকর্ষ রহিয়াছে। 'অনৈতিকতা' শব্দ আমার ভাল লাগিয়াছে। অথবা এই অবস্থাকে 'সাত্ত্বিক সাধনার নিঃসত্ত্বতা'ও বলা যাইতে পারে।

এ দশার বর্ণনা করা যায় কিরূপে? গ্রহণের আগেই যেমন বেধ* লাগে তদ্রূপ দেহান্তের পরে যে মোক্ষদশা লাভ হইবে তাহার আভাস দেহপাতের পূর্বেই দেখা দেয়। দেহাবস্থায়ই ভাবী মোক্ষাবস্থার উপলব্ধি হইতে থাকে। এই যে স্থিতি তার বর্ণনা করিতে বাণী থতমত খায়। যত ইচ্ছা হিংসা করিলেও সে কিছু করে না। তাহার ক্রিয়া এখন কোন মাপকাঠিতে মাপা যাইবে? যা কিছু সে করিবে সবই হইবে সাত্ত্বিক কর্ম। সকল ক্রিয়া ক্ষয় হইয়া গেলেও সারা বিশ্বের লোকসংগ্রহ সে করে। কি ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা যায় তা নির্ণয় করা কঠিন।

এই অন্তিম অবস্থায় তিন ভাব হয়। এক ত বামদেবের দশা। "এ বিশ্বে যা কিছু রহিয়াছে, সে আমি" তাঁহার এই প্রসিদ্ধ উক্তির কথা ধরুন। জ্ঞানী পুরুষ নিরহংকার হইয়া থাকে। তাহার দেহাভিমান থাকে না। সকল ক্রিয়া শেষ হইয়া যায়। তখন সে এক ভাবাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ঐ অবস্থার ঠাঁই এক দেহে হয় না। ভাবাবস্থা ক্রিয়াবস্থা নহে। ভাবাবস্থা মানে ভাবনার উৎকটতার অবস্থা। এই ভাবাবস্থার উপলব্ধি ক্ষুদ্রাকারে আমাদের সকলেরই হয়। পুত্রের দোষে মাতা দোষী, আর গুণে গুণী হইয়া থাকে। পুত্রের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হইয়া থাকে। মার এই ভাবাবস্থা পুত্রেতেই সীমাবদ্ধ। সন্তানের দোষ সে নিজ দোষ বলিয়া মানিয়া লয়। জ্ঞানী পুরুষও ভাবনার উৎকর্ষ হেতু সারা জগতের দোষ নিজের উপর লইয়া থাকে।

ত্রিভুবনের পাপে সে পাপী, আর পুণ্যে পুণ্যবান। আর তাহা সত্ত্বেও ত্রিভুবনের পাপ-পুণ্যের ছোঁয়াচমাত্রও তার লাগে না। রুদ্র-সূক্তে ঋষি বলেন নাই কি:

"যবাশ্চ মে তিলাশ্চ মে গোধূমাশ্চ মে"

আমাকে যব দাও, তিল দাও, গম দাও। এইরূপ যে বলে সেই ঋষির পেট কত বড়? কিন্তু ঐ প্রার্থনাকারী সাড়ে তিন হাত দেহধারী ছিলেন না। তাহার আত্মা বিশ্বাকার হইয়া বলিতেছে। ইহাতে আমি "বৈদিক

* বেধ—গ্রহণের পূর্বেকার আট বা বার ঘণ্টা কাল।

বিশ্বাত্মভাব” বলি। বেদান্তে এই ভাবনার পরমোৎকর্ষ দেখা যায়। গুজরাটের সাধু নরসী মেহতা কীর্তন করিতে করিতে বলিয়াছেন :

"বাপজী পাপ মেঁ কবণ কীধাঁ হশে.
নাম লেতাঁ তারুঁ নিদ্রা আবে।"

"ভগবান, কি পাপ করেছি যে, কীর্তন করিতে থাকিলেই আমার নিদ্রা আসে?" —ঘুম কি নরসী মেহতার আসিত? ঘুম আসিত শ্রোতাদের। কিন্তু শ্রোতাদের সহিত একরূপ হইয়া নরসী মেহতা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ইহা তাঁহার ভাবাবস্থা। জ্ঞানী পুরুষদের এইরূপই ভাবাবস্থা হয়। এই ভাবাবস্থায় সকল পাপ-পুণ্য তাহা দ্বারা হইতেছে এরূপ আপনাদের মনে হইবে। সে নিজেও তেমন মনে করিবে। ঐ ঋষি বলিয়াছেন না কি, "করার অযোগ্য কত কর্মই না আমি করেছি, করছি আর করব।" এই ভাবাবস্থা প্রাপ্ত হইলে আত্মা পাখীর মত উড়িতে থাকে। পার্থিবতার ঊর্দ্ধে তাহা উঠিয়া যায়।

এই অবস্থার মত জ্ঞানী পুরুষের এক ক্রিয়াবস্থাও আছে। জ্ঞানী পুরুষ স্বভাবতঃ কি করিবেন? যাহা কিছু তিনি করিবেন তাহা সাত্ত্বিক হইবে। যদিও দেহের সীমায় আজও তিনি আবদ্ধ তথাপি তাঁহার সমস্ত শরীর, সকল ইন্দ্রিয় সাত্ত্বিক হইয়া গিয়াছে, আর তাহার ফলে তাঁহার সকল ক্রিয়া সাত্ত্বিকই হইবে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দেখেন ত সাত্ত্বিকতার চরম সীমা তাঁহার ব্যবহারে দেখা যাইবে। বিশ্বাত্মভাব হইতে দেখেন ত মনে হইবে ত্রিভুবনের সকল পাপপুণ্য যেন তিনি করিতেছেন। আর তাহা হইলেও তিনি অলিপ্ত। কারণ প্রলেপের মত লেপটানো এ দেহ তিনি উপড়াইয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। ক্ষুদ্র দেহ নিক্ষেপ করিলে না তিনি বিশ্বরূপ হইবেন।

ভাবাবস্থা ও ক্রিয়াবস্থা ছাড়া জ্ঞানী পুরুষের তৃতীয় আর এক অবস্থা আছে। তাহা হইতেছে জ্ঞানাবস্থা। এ অবস্থায় তিনি না করেন পাপ সহ্য, না করেন পুণ্য সহ্য। ঝাপটা দিয়া সবকিছু ফেলিয়া দেন। এই ত্রিভুবনকে আগুন ধরাইয়া জ্বালাইয়া দিতে তিনি প্রস্তুত হইয়া যান। একটি কর্মের দায়িত্ব লইতেও তিনি প্রস্তুত নহেন। তাহার স্পর্শ পর্যন্ত তাঁহার কাছে অসহ্য। এই যে তিন অবস্থা তাহা জ্ঞানী পুরুষের মোক্ষদশায়, সাধনার পরাকাষ্ঠা-দশায়ই সম্ভব।

এই অক্রিয়াবস্থা, এই অন্তিম দশা, এ দেহে আয়ত্ত করার উপায়? আমরা যে কর্মই করি না কেন, তাহার কর্তৃত্ব নিজেতে আরোপ না করার অভ্যাস করা। মনে করিবে আমি নিমিত্ত মাত্র, কর্মের কর্তৃত্ব আমার নহে এই অকর্তৃত্ব-বাদের ভূমিকা আগে নম্রভাবে গ্রহণ কর। কিন্তু তাহা হইলেই সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লোপ পাইবে, তেমন নহে। আস্তে আস্তে এই ভাবনার বিকাশ হইতে থাকিবে। আমি অতি তুচ্ছ, তাঁহার হাতের পুতুল, তিনি যেমন নাচান তেমন নাচি এ ভাব প্রথমে জন্মিতে দাও। তারপরে এ-কথা মনে করার প্রযত্ন কর যে, যত কিছু কর্ম তাহা এই দেহের। তাহার সহিত আমার সম্পর্ক মাত্র নাই। এ সকল ক্রিয়া এ শবের। আমি শব নহি, আমি শিব। একথা মনে করিয়া দেহ-প্রলেপের সহিত লেশমাত্র লিপ্ত হইও না। তাহা হইলে, দেহের সহিত যেন কোন সম্পর্ক নাই—এই যে জ্ঞানী পুরুষের অবস্থা তাহা প্রাপ্ত হইবে। ঐ অবস্থায় পুনরায় উপরে বর্ণিত তিন অবস্থা হইবে। এক, তাহার ক্রিয়াবস্থা, যাহাতে অত্যন্ত নির্মল ও আদর্শ ক্রিয়া তাহা দ্বারা হইবে। দুই—ভাবাবস্থা, যাহাতে ত্রিভুবনের সকল পাপ-পুণ্য আমি করি এরূপ অনুভব হইবে, অথচ তাহাতে তার ছোঁয়াচ পর্যন্ত লাগিবে না। তিন—তাহার জ্ঞানাবস্থা, যে অবস্থায় কর্মের লেশও তিনি নিজের কাছে রাখিবেন না। সকল কর্ম ভস্মসাৎ করিয়া দিবেন। এই তিন অবস্থা দ্বারা জ্ঞানী পুরুষের বর্ণনা করা যাইতে পারে।

৮

এই সব বলার পরে ভগবান অর্জুনকে বলিলেন—"আমি তোমায় এই যে সব বললাম, তা তুমি মনোযোগ দিয়ে শুনেছ ত? এবার আগাগোড়া বিচার করে যা তোমার ভাল মনে হয় কর।" ভগবান উদার চিত্তে অর্জুনকে স্বাধীনতা দিলেন। ভগবদ্গীতার বিশেষত্বই এই। কিন্তু ভগবানের আবার দয়া হইল। যে ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য দিয়াছিলেন তাহা তিনি ফিরাইয়া লইলেন। বলিলেন—"অর্জুন, তোমার ইচ্ছা, তোমার সাধনা সবকিছু ফেলে দাও, আমার শরণ লও।" নিজের শরণ লইতে বলিয়া যে ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য তিনি দিয়াছিলেন তাহা স্বয়ং কাড়িয়া লইলেন। এর অর্থ এই যে—"নিজ মনে তুমি স্বাতন্ত্র্য-ইচ্ছা আসতে দিও না। আপন ইচ্ছা নয়, তাঁর ইচ্ছা চলুক, এভাব অবলম্বন কর।" স্বাতন্ত্র্যে আমার দরকার নাই, এরূপ আমায় ভাবিতে দাও। আমি নাই, সবকিছু তুমি, এরূপ হোক। ঐ বকরী জীবিত দশায়—"মেঁ মেঁ মেঁ···" করে, অর্থাৎ "আমি আমি আমি" বলে। কিন্তু মরার পরে উহার তাঁত যখন পিঞ্জনে পরানো হয় তখন দাদূ বলেন—"তুহী তুহী তুহী—সে তুহী তুহী তুহী বলে।" তখন ত সব "তুহী···তুহী···তুহী।"

রবিবার, ১৯. ৬. '৩২

কালিদাসের রস-পরিবেশন

[বিদূষকের মাধ্যমে]

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের হাস্যোদ্দীপক চরিত্রের সঙ্গে [buffoon] সংস্কৃত সাহিত্যের বিদূষক চরিত্রের মৌলিক পার্থক্য এইখানে যে, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ঈদৃশ চরিত্র মৌলিক নাট্যবস্তুর সঙ্গে অতি হাল্কা ভাবে থাকে সংলগ্ন, তাকে পরিত্যাগ করলেও নাটকীয় বস্তুর পরিণতির তেমন ব্যাঘাত ঘটে না। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের বিদূষকের সঙ্গে নাটকীয় ঘটনা থাকে পূর্ণ সংশ্লিষ্ট। বিদূষকের প্রভাব সর্ব্বত্র হয় প্রতিফলিত। বিদূষক নায়কের বন্ধু এবং বহুল ক্ষেত্রে নানাপ্রকার সঙ্ঘটনের উপায় উদ্ভাবক। নাটকের ভবিষ্য ফল তারই বুদ্ধির প্রখরতার উপরে নির্ভর করে।

সংস্কৃত নাটকের মধ্যে অধুনালব্ধ প্রাচীনতম গ্রন্থ অশ্বঘোষের সারিপুত্রপ্রকরণ ও অন্য দুটি বৌদ্ধধর্ম্মমূলক নাটক। এর মধ্যে সারিপুত্রপ্রকরণে ও অন্য একটি নাটকেও বিদূষকের অবতারণা আছে। এমন কি, শান্তরসসংশ্রয় আধ্যাত্মিক গ্রন্থেও বিদূষকের অবতারণা থেকে এ স্বতঃই মনে হতে থাকে যে, আরও বহু পূর্ব্ব রচিত যে সব সংস্কৃত নাটক কালের কবলগ্রস্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে সব কয়টি বা অনেকগুলিতে অন্ততঃ বিদূষক একটি বলিষ্ঠ চরিত্র-স্বরূপে নিশ্চয় ছিলেন। সারিপুত্র প্রকরণ গ্রন্থে দেখতে পাই বিদূষক স্বীয় বন্ধু মৌদ্গল্যানকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হতে বারণ করছেন। তাঁর যুক্তি অসামান্য। বুদ্ধদেব নিজে ছিলেন ক্ষত্রিয়, কাজেই ক্ষত্রিয়-প্রচারিত ধর্ম্মে ব্রাহ্মণের দীক্ষিত হওয়া অতি অধর্ম্ম ও অ-শাস্ত্রীয় ব্যাপার। অন্য নাটকের বিদূষকের নাম কৌমুদগন্ধ—ফুলের নামানুসারে নাম। অবশ্য এই গ্রন্থ এত খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া যায় যে, বিদূষকের চারিত্রিক পরিপূর্ত্তি সম্বন্ধে এত স্বল্প সামগ্রী অবলম্বনে কিছুই মন্তব্য করা যেতে পারে না।

জয়দেব কবিতার প্রসন্নরাঘবে ভাসকে 'হাস' বলে বর্ণন করেছেন। ফলতঃ ভাসের অঙ্কণে বিদূষকের চরিত্র বড় সমুজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণের ও স্বপ্নবাসবদত্তের বসন্তক, অবিমারকের সন্তুষ্ট, এবং চারুদত্তের মৈত্রেয় অনবদ্য সৃষ্টি। মূর্খতাব্যঞ্জক চাতুর্য্য পরিবেশনে সন্তুষ্ট নাট্যামোদিগণের সন্তোষবিধানে সমর্থ। এদের পরবর্ত্তী কবি শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকের মৈত্রেয় নাট্যরসিকগণের চিরমিত্র, এত অপূর্ব্ব হাস্যোচ্ছলিত মধুরিমাময় চিত্র কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। কালিদাসের কাব্যমহিমা রূপে, রসে, গন্ধে পরিপূরিত। সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ প্রতীক তাঁর কাব্যরূপ। তরলতার ইতর রূপের স্থান তাতে নেই। ফলে কালিদাসের বিদূষকগণ অতি সুরুচিসম্পন্ন, তাদের হাবভাব চালচলনে একটা চাপা হাসি আছে, উল্লাস আছে, ঢলঢলে থলথলে পান খাওয়া মুখের তরল রসিকতা তাতে নেই। মালবিকাগ্নিমিত্রের গৌতম, বিক্রমোর্ব্বশীর মাণবক এবং শকুন্তলার মাধব্য—এরা সকলেই অপূর্ব্ব সৃষ্টি এবং স্ব-স্ব গৌরবে মহীয়ান্।

কালিদাস অভিজাত Romantic কবি। চরম সৌন্দর্য্যসৃষ্টি তাঁর একমাত্র অভিপ্রেত। জগতের কদর্য্য নগণ্য জিনিষ নিয়ে হাস্যোদ্দীপন তাঁর অভিপ্রেত হতেই পারে না। আলঙ্কারিকের নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞানুসারে তিনি তাঁর তিনটি নাটকেই বিদূষকের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন বটে—কিন্তু অলঙ্কারের অস্থিপঞ্জরের উপরে তিনি তাঁর অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তির প্রভাবে কেবল রক্তমাংসই সঞ্চারিত করেন নি, প্রত্যেকটি বিদূষককেই নব নব প্রাণোন্মাদনায় চির সজীব করে গেছেন। অলঙ্কারের সংজ্ঞানুসারে মালবিকাগ্নির গৌতম, বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের মাণবক এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলের মাধব্য সকলেই ব্রাহ্মণ, নায়কত্রয়ের সহচর এবং সকলের আনন্দবর্দ্ধনে সুচতুর। অবশ্য জাতিতে ব্রাহ্মণ হলেও এই বিদূষকত্রয় কার্য্যতঃ ব্রহ্মবন্ধু—বিদ্যাচর্চ্চার দিকে কারও কোন উৎসাহ নাই। সকলেরই অঙ্গ বিকৃত, বেশভূষা ব্যবহার চালচলন সকলেরই হাস্যের উদ্রেক করে। ভোজন-বিলাস এবং কর্ম্মবিমুখতা, বিদূষকগণের যা স্বভাবসম্মত, তা এই তিন জন বিদূষকের ক্ষেত্রেই বিলক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়।

তা হলেও, অলঙ্কার-নির্দ্দিষ্ট আইনকানুনের দিক্ থেকে এই তিন জন বিদূষকের সঙ্গে অন্যান্য নাটকের বিদূষকের সামঞ্জস্য থাকলেও, মহাকবি কালিদাসের অপূর্ব্ব সৃষ্টিকৌশলে এরা যেন নব পর্য্যায়ের নব রস পরিপূরিত বিদূষক—স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্ব স্ব মহিমায় প্রোজ্জ্বল। এই তিনটি বিদূষক একে অন্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। মালবিকাগ্নিমিত্রের গৌতম—অত্যন্ত বিচক্ষণ, ধূর্ত্ত, উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন এবং নানা রকম উপায় উদ্ভাবনে সুপটু। তার প্রত্যেকটি চিন্তাধারা—প্রত্যেক নায়কের কোন না কোন কার্য্যোদ্ধারের নব পরিকল্পিত সুষ্ঠু উপায়ের উদ্ভাবক মাত্র। বিক্রমোর্ব্বশীর মাণবক অত্যন্ত মূর্খ। কার্য্যপন্থা তার ভ্রমপরিপূর্ণ। তার কথাবার্ত্তা অনেক সময় প্রলাপসদৃশ। যদিও বহুস্থলে তার কথার মধ্যে বুদ্ধিমত্তা লুক্কায়িত ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তবুও তার কর্ম্মপ্রচেষ্টায় গ্রন্থের নায়কের অনিষ্ট ব্যতীত কোন স্থানে ইষ্ট সম্পাদিত হয় নি। অভিজ্ঞানশকুন্তলের মাধব্য পাশ্চাত্ত্য নাটক সাহিত্যের প্রকৃত পরিহাসক (buffoon); নাট্যরসের ঘনীভূত পরিবেশন কল্পে অতি সঙ্কটময় স্থলে তার প্রাদুর্ভাব হয়, অল্পক্ষণের জন্য তাতে তরল ভাবের সঞ্চার, কঠোর হয় সুকুমার, উচ্ছ্বাস প্রসাদময় প্রশ্বাসে আত্মপ্রকাশ করে।

এই তিনটি বিদূষক-চরিত্রের সৃষ্টিতে কালিদাসের কবিমানসের একটি প্রকৃষ্ট চিত্র আমাদের মানসপটে প্রতিফলিত হয়। মালবিকাগ্নিমিত্র থেকে বিক্রমোর্ব্বশীর মাধ্যমে অভিজ্ঞানশকুন্তলের সুবর্ণপ্রকোষ্ঠে যখন প্রবেশলাভ করি, তখন কেবলই মনে হতে থাকে

বিদূষকচরিত্রের প্রতি কালিদাসের প্রশংসনীয় মনোভাব ক্রমেই যেন ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়েছে। মালবিকাগ্নিমিত্রের বিদূষক গ্রন্থের নায়ক না হলেও প্রায় নায়কের সমান স্থান অধিকার করে আছে, ঘটনার পরিপূর্ত্তি তার উপরেই সম্যক্ ভাবে নির্ভর করে। তার পাশে গ্রন্থের নায়ক অগ্নিমিত্রও যেন ম্লান ভাব ধারণ করে। বিক্রমোর্ব্বশীয় নাটকে বিদূষকের এত উচ্চস্থান আর নেই। বিদূষকের সম্বন্ধে কালিদাসের পূর্ব্ব মনোভাব পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে। বিক্রমোর্ব্বশীয় গ্রন্থে এইটি সুস্পষ্ট যে, বিদূষক মাণবক ভ্রমে প্রমাদে সাধারণ ব্যক্তির মতই জীবন-পথে অগ্রসর হচ্ছে। প্রবীণতা, পটুতা, কোন ক্ষেত্রেই সুপ্রকট নয়। তাই শুধু নয়, নায়কের গতিপথে সে বাধাস্বরূপ। কালিদাসের কবিপ্রতিভা যখন চরম সীমায় উপনীত, তখন অভিজ্ঞানশকুন্তলের সৃষ্টি, এই গ্রন্থের বিদূষক কেবল হাস্যপরিবেশক মাত্র; নাট্যের মূল বস্তুর সঙ্গে তার সংযোগ অত্যন্ত শিথিল, নাট্যের দ্রুত গতি তার উপরে মোটেই নির্ভর করে না এবং কবি যখনই ইচ্ছা করেন তখন নির্ব্বিবাদে বিদূষক মাধব্যকে ঘটনাস্থল থেকে বহুদূরে সরিয়ে দেন।

মালবিকাগ্নিমিত্রের গৌতম

গৌতম কালিদাসের বিদূষকগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, কালিদাসের অনবদ্য প্রতিভা তাকে নাট্যরসিকগণের নিকট অমর করে রেখে গেছে। তার প্রত্যেক কর্ম্মপন্থা পরিণামকুশল। অথচ ক্ষুরধার বুদ্ধি ও হাস্যরসিকতা যুগপৎ ভাবে তার কর্ম্মপটুতার সহায়তা করে।

অনেকের মতে কালিদাস গৌতম-চরিত্র সৃষ্টিতে অনেকটা পক্ষপাতিত্ব করেছেন। যার ফলে গৌতমের পার্শ্বে এমন কি নাটকের নায়ক অগ্নিমিত্রকেও পরিম্লান দেখা যায়। আবার অনেকে মনে করেন আলঙ্কারিকের সুনির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞার চারিধারে ক্ষুদ্র কবিদের মত নিরন্তর ঘোরাফেরা করা কালিদাসের মত শ্রেষ্ঠ কবির পক্ষে সম্ভবপর নয়, কাজেই তিনি সর্ব্বতোভাবে সুনিপুণ এবং সুপরিপুষ্ট একটি বিদূষক-চরিত্র জীবনের প্রথম গ্রন্থে সৃষ্টি করেছেন। এই বিষয়ে মালবিকাগ্নিমিত্র গ্রন্থের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করলে —নিরপেক্ষ ভাবে আমাদের বলতে হয়, কালিদাস জীবনের প্রথম ভাগে, যখন তিনি ভাস, কবিপুত্র ও সোমিলের কাব্যপ্রতিভায় অত্যন্ত বিমুগ্ধ তখন তিনি বহুলাংশে সাময়িক ইতিহাসের সাহায্যে স্বীয় কাব্যপ্রতিভার মহিমময় প্রকাশ করে গেছেন—মালবিকাগ্নিমিত্র গ্রন্থে। মালবিকার মত নায়িকার পাণিগ্রহণ অগ্নিমিত্রের ন্যায় দুর্ব্বল-চরিত্র নৃপতির পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়। ভূতপূর্ব্ব কবিগণের পদাঙ্ক অনুসরণে তিনি স্বকীয় নব নাট্যগ্রন্থে বিদূষক-চরিত্রের অবতারণা করেছেন, কিন্তু তাঁর ভবিষ্য অপূর্ব্ব কাব্যপ্রতিভার পূর্ণদ্যোতক মালবিকার সংপ্রাপ্তি বিষয়ে পরিপূর্ণ সহায়করূপে এই বিদূষককে তিনি গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন—ফলে গৌতম কার্য্যকুশলতায়, বুদ্ধিমত্তায়, হাস্যরসের ক্ষণিকালোকে, কার্য্যসাফল্যে সকলের চিত্তহরণে নিপুণতা অর্জ্জন করেছে। কার্য্যতঃ গৌতম বিদূষক হলেও, স্বীয় নামানুসারে হাস্যরস পরিবেশন তার কর্ত্তব্য হলেও, মালবিকার প্রেমার্জ্জনে প্রকৃষ্ট হেতু গৌতম নিজে।

যদিও পূর্ব্ব ঘোষণানুসারে মালবিকা অগ্নিমিত্রের পত্নী হিসাবে নির্দ্দিষ্টা হয়েছিলেন এবং সেই হিসাবে কালিদাস ক্রমান্বয়ে তাঁদের মিলন দেখাবার পথে অগ্রসর হতে পারতেন তা হলেও অগ্নিমিত্র অত্যন্ত দুর্ব্বল ও ভীরু প্রকৃতির লোক ছিলেন বলেই কালিদাসকে বাধ্য হয়ে বিদূষকের চরিত্র একাধারে নায়কোচিত ও বিদূষকোচিত করে অঙ্কিত করতে বাধ্য হয়েছেন।

ফলে বিদূষক হয়েছেন একাধারে বুদ্ধিমান্ ও মূর্খ, চালাক এবং বোকা, নবীন উপায়োদ্ভাবক অথচ জ্ঞানহীন, মূর্খ হয়েও প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী। বিদূষকরূপে তার চরিত্র কারো কারো চোখে নায়কোচিত বলে অনেক সময় বিসদৃশ ঠেকলেও খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, তার বিদূষকজনোচিত মূর্খতা, স্বকপোলকল্পিত সত্যের উদ্ভাবন এবং হাস্যচ্ছলে গূঢ় অভিপ্রায় সংসাধন এই সমস্ত প্রকৃষ্ট বিদূষকের পরিচায়ক। উদাহরণক্রমে বলা যেতে পারে যে, যদিও সঙ্গীতজ্ঞ গণদাস বিদূষকের সম্বন্ধে কোন উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না তা হলেও মালবিকাগ্নিমিত্রের ১ম অঙ্কে বিদূষক নিজের কথার চাতুর্য্যে ও স্বকীয় কুশল প্রভাবে রাজার সঙ্গে মালবিকার প্রথম দর্শন রূপ অভিপ্রায় সাধন করবার জন্য যে যুক্তিজাল বিস্তার করেছিল তাতে গণদাস বিমূঢ় হয়ে যায়। গণদাসের সঙ্গে অন্য সঙ্গীতজ্ঞ হরদত্তের যে কলহ সে বাধিয়ে দেয় তাতেই তার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। রাণী ধারিণী রাজার সঙ্গে মালবিকা সন্দর্শনের বিরোধী হয়ে যে তর্কবিতর্কের সৃষ্টি করেন গৌতম কৌশলক্রমে সে সমস্ত যুক্তির অবতারণা এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে করেন যে রাণী ধারিণী বিদূষকের সঙ্গে যুক্তিতর্কে কিছুতেই জয়লাভ করতে পারলেন না। মালবিকা যখন রঙ্গমঞ্চে অবতারণা করলেন তখন বিদূষক কৌশলক্রমে তাঁকে দীর্ঘক্ষণ আটক করে রাখলেন। যদিও প্রাজ্ঞা কৌশিকী এবং রাজা নিজে বিদূষকের অভিপ্রায় এবং উপায় প্রয়োগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞাত ছিলেন তা হলেও বিদূষক এত সুনিপুণ ভাবে অনায়াসে জয়লাভ করবে সেটা তাঁদেরও যেন ধারণা হয় নি।

অতঃপর মালবিকার সঙ্গে গৌতমের প্রথম নিবিড় পরিচয় সংগঠনেও গৌতমের কৌশল উদ্ভাবনের অন্ত নাই। মূর্খতাব্যঞ্জক ভাবে সে ধারিণীকে দোলা থেকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার বাঁ পা ক্ষত করে দেয়। ফলে বসন্ত উৎসবের সমস্ত কার্য্যক্রম উল্টে যায়। ধারিণী মালবিকাকে নিজের পরিচারিকারূপে নিযুক্ত করে রক্তাশোকের দোহদের নিমিত্ত তাঁর পাদঘাত প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। এরূপে মালবিকার প্রমোদবনে যাবার সুযোগ সৃষ্টি করে গৌতম দোলাগৃহে ইরাবতীর সঙ্গে রাজার নিবিড় পরিচয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। গৌতম যে উপায়ে মালবিকার কারাগার থেকে বন্ধনমুক্তির ব্যবস্থা করে তা অতি চমকপ্রদ। সে নিজে এমন ছল করে যেন রাণী ধারিণীর জন্য পুষ্পোদ্যানে ফুল তুলতে গিয়ে নিজে সর্পদষ্ট হয় এবং কাতরে চীৎকার করে এমন করুণ পরিবেশের সৃষ্টি করে যাতে রাণী

ধারিণী দয়াপরবশ হয়ে নিজের হাতের অঙ্গুরীয় বিদূষকের হাতে দিয়ে দেন। সেই অঙ্গুরীয়ক মুদ্রা ব্যতীত মালবিকাকে কারাগার থেকে উদ্ধার করবার আর উপায় ছিল না। কৌশলক্রমে ঐ মুদ্রা রাণী থেকে গ্রহণ করে গৌতম মালবিকার উদ্ধার সাধনপূর্ব্বক রাজার সঙ্গে পূর্ণ মিলনের পথ সুগম করে দেয়।

গৌতম এক দিকে মূর্খতার ছল করে রাণীকে বলেন—"দেবি! চলুন, আমরা ভেড়ার যুদ্ধ দেখি, যদি যুদ্ধই না করবে তবে এ ভেড়া পোষণের ফল কি?" অন্য দিকে গণদাসের প্রতি লক্ষ্য করে রাণী ধারিণীর কথাগুলি গৌতম এমন কৌশলে ব্যাখ্যা করে দেয়—যে ব্যাখ্যা অন্যের পক্ষে সম্ভবপর নয়। সে রাণীর কথা গণদাসকে এরূপ বুঝিয়ে দিলে যে, গণদাসের মনে ধারণা হ'ল রাণী চান যেন রঙ্গমঞ্চে স্বীয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয়স্বরূপ মালবিকাকে নৃত্যে নিয়োজিত করে নিজের শিক্ষাদানের প্রশংসা তিনি অর্জ্জন করে নেন। গৌতম বললে—"রাণী চান যাতে তুমি তোমার মান রক্ষা কর—সেই জন্যই তিনি হয়েছিলেন রাজার উপর অসন্তুষ্ট—কারণ তিনি সুষ্ঠুভাবে জানেন যে কোনও শিক্ষক বিশেষ পণ্ডিত হয়েও অধ্যাপনায় সুচতুর না হতেও পারেন।" ফলে গণদাস মালবিকাকে রঙ্গমঞ্চে আনয়ন করে নিজের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদান কৌশলের প্রমাণ দিতে উদ্যত হন।

গৌতম একবার নিজে অত্যন্ত মূর্খতার পরিচয় দেয়—যখন সমুদ্রগৃহে রাজা অগ্নিমিত্র এবং মালবিকা প্রেমালিঙ্গনে ব্যাপৃত তখন সে দ্বাররক্ষণকারী। হঠাৎ সে ঘুমিয়ে পড়ে—এবং স্বপ্নে মালবিকার নাম উল্লেখ করে—ইড়াবতী ঘটনাক্রমে সে স্থলে এসে পড়ে। ইড়াবতীর পরিচারিকা বিদূষকের সর্পাকৃতি দণ্ডটি ভয় পাওয়ার জন্য তার গায়ের উপর ফেলে দেয়—বিদূষক হঠাৎ লাফিয়ে উঠে "একটি সাপ, একটি সাপ আমাকে দংশন করেছে"১ বলে চীৎকার করে উঠে। যা হোক এ ভাবে অপ্রস্তুত হয়েও সে নিজের অহঙ্কার ভুলতে পারে না, কারণ এই ঘটনার ব্যাখ্যাস্বরূপ সে বলছে "কেতকী কণ্টকের দ্বারা নিজের অঙ্গুলি ক্ষত করে সর্প দ্বারা আহত হয়েছি বলে আমি ইতঃপূর্ব্বে অভিনয় করেছিলাম—এ তারই প্রতিদান"২। তার উচ্চহাস্য থেকে বুঝা যায় কি করে সে রাণী ধারিণীর অঙ্গুরীয়ক মুদ্রা আহরণের জন্য স্বকীয় অঙ্গুলির উপর সর্প দংশনের প্রমাণ উপস্থাপিত করতে সমর্থ হয়েছিল। এই সব থেকে প্রমাণিত হয় গৌতম স্বকীয় বুদ্ধিমত্তা এবং কার্য্যকুশলতার প্রভাবে স্বীয় বন্ধু দুর্ব্বল রাজা অগ্নিমিত্রের পরম হিতসাধনে সমর্থ হয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নাট্যামোদীদেরও প্রচুর আনন্দের উপাদানস্বরূপ হয়েছিল।

মাণবক

মাণবকের সঙ্গে গৌতমের চরম পার্থক্য এই, মাণবকের বিদূষক রূপে মূর্খতার যে অবতারণা তা কার্য্য সাধনের জন্য ছলমাত্র নয়, তা সত্যই মূর্খতা। গৌতম বিদূষকরূপে বিচক্ষণতার অবতার, কিন্তু মাণবক সত্যই বোকা। নিজের মূর্খতার ফলে সে বিক্রমোর্ব্বশীয় গ্রন্থের নায়ক পুরুরবাকে বহুবার বিপন্ন করেছে। নিজের বোকামির সঙ্গে অবশ্য কালিদাসের সৃষ্টি রূপে তার মধ্যে চমকপ্রদ ভণ্ডামির একটি রূপ রয়েছে—যার দ্বারা সে পরম হাস্যরসের উদ্দীপনা করতে সমর্থ হয়। পুরুরবার মঙ্গলপথে বাধাস্বরূপ হলেও আবার ঘটনাচক্রে কি করে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা হয়ে যায় এবং পুরুরবার উর্ব্বশী লাভ ঘটে তা অতি কৌতুকপ্রদ ঘটনা।

মাণবক নিজের পেটের ভিতর কোন কথা লুকিয়ে রাখতে পারে না। সে তা বলে ফেলবার জন্য হাঁসফাঁস করে। তাই পরিচারিকার সন্দর্শনমাত্র সে নিজের মনের কথা বলে দেয় এবং এই রূপেই ধূর্ত্ত পরিচারিকার হাতে সে বিপর্য্যস্ত হয়। মিতাক্ষ মূর্খের মত প্রেমপত্র হারিয়ে সে রাণীর হাতে আর একবার নিজেকে বিপন্ন করে তোলে।

উর্ব্বশী ভূর্জ্জপত্রে রাজার জন্য প্রেম স্বীকার করে পত্র দেয়—রাজা সংরক্ষণের জন্য তা মাণবকের হাতে দেয়—উর্ব্বশী হঠাৎ সে স্থানে এসে উপস্থিত হওয়ায় মূর্খ মাণবক তার রূপে এত বিমুগ্ধ হয় যে, সে হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকে এবং ভুলক্রমে ভূর্জ্জপত্রের চিঠিখানা হাত থেকে মাটিতে ফেলে দেয়।

মাণবক সত্যই এত বোকা যে, তার অসম্ভব বোকামি হাস্যরসের উদ্রেক করে। রাজা যখন অত্যন্ত প্রেমপ্রপীড়িত, তখন সে রাজাকে একান্ত গাম্ভীর্য্যসহকারে বলছে—চল, আমরা রান্নাঘরে যাই। সেখানে নানারূপ জিনিষের প্রস্তুতি দু'চোখ ভরে দেখলে আমাদের আর কোন কষ্ট থাকতে পারে না। রাজা যখন তার সুবুদ্ধি গ্রহণ করলেন না এবং রাজানুরোধে সে প্রমোদ-উদ্যানে যেতে বাধ্য হ'ল আর রাজা তাকে স্বীয় হৃদয়ের দুঃখ বিদূরণ করার নিমিত্ত উপায় উদ্ভাবনের জন্য অনুরোধ করলেন তখন সে পুনরায় গভীর ভাবে সমাধিতে নিমগ্ন হয়ে গেল। সমাধি ভঙ্গের পরে অতি সত্য উপায় উদ্ভাবনের উল্লেখ করে সে বলল,—"তুমি নিদ্রায় অভিভূত হয়ে তোমার প্রেমিকার স্বপ্ন দেখ: অথবা তার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করে তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাক।" পুনরায় সে চিত্রলেখাকে উর্ব্বশী বলে ভ্রম করে এবং বলে "উর্ব্বশী কোথায়", এই সত্যই উর্ব্বশী না চিত্রলেখা—ও রাজা প্রেমপত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে সে উত্তর দেয়, "প্রেমপত্র কোথায় গেছে আমার জানা নেই। মনে হয় উহা উর্ব্বশীর পথে চলে গেছে।"

পরিহাসরসিক বিদূষক অনেক সময় স্বীয় অজ্ঞতাসূচক উপহাস পরিত্যাগ করেও সাক্ষাৎ বস্তু বিষয়ক বা ব্যক্তিগত পরিহাসের অব-

১। অবিহা, অবিহা ভো বয়স্স, সপ্পো মে উবরি পড়িদো (অবিধা, ভো বয়স্য! সর্পো মে উপরি পতিতঃ)"

২। কহং দণ্ড কট্ঠ এদম্ অহং উর্জাণে জং ময়ে কেদইকণ্টএহি দংসং করিয় সপ্পস্স ইব দংসো কিদো তং মে ফলিদিত্তি (কথং দণ্ডকাষ্ঠম্ এতৎ। অহং পুনর্জানে যন্ময়া কেতকীকণ্টকৈঃ দংশং কৃত্বা সর্পস্যেব দংশঃ কৃতঃ, তন্মে ফলিতমিতি)।

ধারণা করে সকলের আনন্দবর্দ্ধন করে। প্রেমপত্র হাতে করে রাণী যখন উপস্থিত হন এবং রাজা ও বিদূষক হাতে হাতে ধরা পড়ে গেলেন তখন মাণবক বলছে—"জিনিষপত্রসহ চোর ধরা পড়ে গেলে তার আর উত্তর দেওয়ার কি থাকতে পারে ?" রাণীকে সম্বোধন করে বলছে—"তাড়াতাড়ি রাজার ভোগ্যবস্তু দিয়ে দিন—যাতে তাঁর পিত্ত না হয়।" ৩য় অঙ্কে তার দুটো মজার পরিহাস আছে। উর্ব্বশী এবং তার সঙ্গিনীকে উদ্দেশ্য করে গৌতম জিজ্ঞাসা করছেন—"তোমরা দুই জন এখানে উপস্থিত হলে পরে সূর্য্যাস্ত হ'ল, না আগেই সূর্য্যদেব অস্ত গেছেন ?" এই পরিহাসের গূঢ়ার্থ এই যে, সূর্য্য অস্তমিত হয়েছেন এবং রাজা ও উর্ব্বশী যথাকাম আচরণ করতে পারেন। পরে অন্য স্থলে দেখা যায়—উশীনরী নিজের স্বামীকে যখন তাঁর নূতন প্রেয়সীর হস্তে সমর্পণ করছেন তখন বিদূষক বলছে—"মাছ যখন পালায়, তখন জেলে বলে, মাছ ছেড়ে দেওয়া আমার ধর্ম্ম"; রাণীকে সম্বোধন করে সে বলছে—"দেবি ! রাজার মূল্য কি এতই বেশী যে তুমি এত সহজে ওঁকে ছেড়ে দিচ্ছ ?"

নিজেকে নিয়ে উপহাস করেও বিদূষক মাণবক হাস্য পরিবেশনে সুচতুর। "পুরুষদের মধ্যে আমি যেমন সুন্দর, লোকোত্তরা উর্ব্বশীও কি নারীদের মধ্যে তেমনি সুন্দরী ?" এবং এ ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্য স্মর্ত্তব্য এই বিদূষকই তরুণ রাজপুত্রের কাছে নিজেকে বানর বলে বর্ণনা করেছিল। অন্য স্থলে উদীয়মান চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে সে বলছে—"হা, হা, সখে ! ব্রাহ্মণপতি চন্দ্র এখন উদিত হচ্ছেন—দেখে মনে হচ্ছে যেন চিনির গোলা।" এখানে প্রকারান্তরে চন্দ্রকে ব্রাহ্মণপতি এবং চিনির গোলা বলায় এই বলা হ'ল—প্রত্যেক ব্রাহ্মণই চিনি ; তাই তাঁরা এত মিষ্টপ্রিয় এবং ব্রাহ্মণের পতি মিষ্ট মণ্ডায় পরিপূর্ণ।

ভুল করেও তা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার প্রয়াসে বিদূষকের বাহাদুরি আছে। গোপন সত্য প্রচার না করা বিষয়ে সব ঠিক আছে কিনা রাজা জিজ্ঞাসা করলে সে তখনই স্মরণ করল যে পরিচারিকার কাছে সে সত্য কথা বলে ফেলেছে তজ্জন্য সে গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল—"আমি আমার জিহ্বা এমনি করে চেপে রেখেছি যে তোমার কাছেও চট করে উত্তর দিতে পারছি না।"

এ ভাবে গৌতম চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত হয়েও, পুরূরবার হিতসাধনে অসমর্থ হয়েও বিদূষক মাণবক নিজের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি, পরের প্রতি পরিহাসোক্তি এবং মূর্খতা বিষয়ে মূর্খতা প্রকাশ করে এমন একটি হাস্যোদ্দীপক পরিবেশের সৃষ্টি করতে পারে, যা কেবল কালিদাসের সৃষ্টিতে সম্ভব।

শকুন্তলায় মাধব্য

শকুন্তলায় মাধব্যকে আমরা দেখি কণ্ব ঋষির আশ্রমের নাতিদূরে মালিনীতীরে যখন গ্রীষ্মে সকলে প্রপীড়িত তখন সে নিজের কপালকে ধিক্কার দিচ্ছে। আকৃতিখানা তার প্রবল স্রোতোবেগে নিষ্পিষ্ট বেতসলতার মত নিজের দণ্ডের উপর নির্ভর করে সে দণ্ডায়মান এবং তার নিজের কথায় রাজার শকুন্তলা-সন্দর্শন ব্যাপার সে যেন "গণ্ডের উপর পিণ্ডের উৎপত্তি"।১ ফলতঃ শকুন্তলা সম্বন্ধে মাধব্যের কোনও উৎসাহ নেই—সমগ্র শকুন্তলা নাটক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রয়োজনস্থলে মাধব্য পলায়নতৎপর অথবা সম্পূর্ণ নিরুৎসাহ। সে রাজপরিবেশ, রাজসাজসজ্জা, ভূষণ ভোজন পছন্দ করে, ইঙ্গুদি ফলের রসসিক্ত এবং সুদীর্ঘ দাঁড়িবিশিষ্ট আশ্রমস্থ প্রাণিনিচয়ের জন্য তার কোন প্রশংসা যে নেই শুধু নয়, সে তাদের অত্যন্ত ঘৃণা করে। মাধব্য পরিপূর্ণ ভাবে বিদূষক। কালিদাসের চিত্ত ক্রমে ক্রমে বিদূষকের চরিত্র অতি গুরু থেকে অতি লঘু, অতি উন্নত থেকে প্রায় মর্য্যাদাহীন করে অঙ্কিত করেছেন।

মাধব্যের চরিত্র শকুন্তলা নাটকের স্বল্পপরিসর মাত্র পরিগ্রহ করেছে। নিছক পরিহাস সৃষ্টির জন্য তার উপজীব্যতা। নায়িকার দিক থেকে সে থাকলে বা না থাকলে বিশেষ যেন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। ফলতঃ অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে তাকে আমরা স্বল্পমাত্রই দেখতে পাই, অবশ্য সে যা বলে তা অত্যন্ত সুন্দর, কালিদাসের শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভার পূর্ণ দ্যোতক। তবে শকুন্তলা বিষয়ে মাধব্যের উৎসাহহীনতা অন্যান্য বিদূষকের সঙ্গে তার চরিত্রের পূর্ণ পার্থক্য সূচনা করে। বলতে কি, শকুন্তলায় মাধব্যের কোন প্রয়োজন নেই। প্রকৃত শকুন্তলাকে সে কোন দিন চোখেও দেখে নি।

অন্যান্য বিদূষকের মত মাধব্য ভোজনলোলুপ, রাজা যখন তাকে মৃগয়া থেকে পরিত্রাণ দিয়ে অন্য একটি বিষয়ে সহায়তা করার অনুরোধ জানালেন তখন সে বলছে "কি মোদক খাদন বিষয়ে ? তা হলে আমি একাই রাজী আছি।"২

দুষ্মন্ত যে কোন অরণ্যবাসিনীর সঙ্গে প্রেমাসক্ত হবে সেটা মাধব্য ভাবতেই পারে না—সে যেন প্রচুর খর্জ্জুর ভোজনের পরে তেঁতুলের প্রতি আসক্তির মত, তবে সত্যই সে যদি সুন্দর হয়, তা হলে দুষ্মন্তের হাতে পড়ে ইঙ্গুদী তৈলসিক্ত মস্তকবিশিষ্ট কোন সন্ন্যাসীর হাতে পড়া থেকে শকুন্তলা রক্ষা পেলেই ভাল।

দুষ্মন্ত যখন শকুন্তলার প্রেম সম্বন্ধে তখনও সন্দেহ ছাড়তে পারেন নি, তখন মাধব্য হালকা করে বলছে, "তুমি ভাবতে পার না যে তোমাকে দেখা মাত্রই সে কোলে চড়ে বসবে।"৩ দুষ্মন্তের শকুন্তলার ব্যাপারটা মাধব্যের গোড়া থেকে অপছন্দ। সে বলছে, "যত পার চেষ্টা কর, এবং এই তপোবনকে প্রমোদোদ্যানে পরিণত কর।"৪ রাজার যখন আশ্রমে যাওয়া প্রয়োজন তখন রাজস্ব আদায়

১। তদো গণ্ডস্স উপরি পিণ্ডও সংবুত্তো (ততো গণ্ডস্য উপরি পিণ্ডকঃ সংবৃত্তঃ) অর্থাৎ একটি বড় ফোঁড়ার উপর আর একটি ছোট ফোঁড়া।

২। কিং মোদঅখজ্জিআএ। তেণ হি অঅং সুগহীদো জণো (কিং মোদকখাদিকায়াম্। তেন হি অয়ং সুগৃহীতো জনঃ)।

৩। ন ক্খু দিট্‌ঠমেত্তস্স তুহ অঙ্কং সমারোহদি নে (খলু দৃষ্টমাত্রস্য তব অঙ্কং সমারোহতি)।"

৪ কিদং তুএ উববণং তবোবণং ত্তি পেক্খামি (কৃতং ত্বয়া উপবনং তপোবনমিতি প্রেক্ষে)।

করার ছল করে যাবার জন্য মাধব্য তাঁকে উপদেশ দিচ্ছে।১ সৌভাগ্য-ক্রমে যখন আশ্রমবাসীদের কাছ থেকে তপোবন গমনের আহ্বান এল, তখন রাজা মাধবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "শকুন্তলাকে দেখবার তোমার কোন অভিলাষ আছে কি?"২ তখন বিদূষক বলছে, "পূর্ব্বে পূর্ণমাত্রায় ছিল, এখন অসুরদের নাম শুনেছি, সুতরাং দেখবার তিলমাত্র অভিলাষ নাই।"৩

যখন মাতৃকৃত্যে যোগদান করবার জন্য রাজা দুষ্মন্তের আহ্বান এল, তখন কোন্ দিকে অগ্রসর হবেন রাজা মনস্থির করতে না পেরে তাকে জিজ্ঞাসা করছেন, কোন পথে যাব? বিদূষক নির্বিকার চিত্তে বলে দিল, "ত্রিশঙ্কুর ন্যায় মাঝপথে ঝুলে থাক।" তার পর অভিজ্ঞানশকুন্তলে দীর্ঘকাল আমাদের সঙ্গে বিদূষকের দেখা নাই, রাজদরবারে তাকে দেখবার আভাসমাত্র পাই, কিন্তু নির্মম কবি সেখান থেকেও তাকে বিতাড়িত করে দিয়েছেন। হংস-পাদিকার পরিচারিকাগণের নির্মম পরিগ্রহ থেকে তার উদ্ধার আমাদের আকাঙ্ক্ষিত, কিন্তু সেই উদ্ধার "অপ্সরার হাত থেকে মুনির উদ্ধার পাওয়ার মত।"

অতঃপর গণ্ডের উপর পিণ্ডের মত শকুন্তলা যখন বিষম ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে তখন রাজাকে উদ্ধার করবার জন্যে বিদূষকের প্রযত্ন করতে দেখতে পাই। তার মতে বসন্তক লীন চূতপুষ্প রাজার সব ব্যাধির কারণ এবং লাঠি ছুড়ে আম্রপুষ্প নষ্ট করলেই ব্যাধির উপশম হয় এবং সে সেই প্রচেষ্টায় রত। অতঃপর রাজা যখন শকুন্তলার চিত্র অঙ্কিত করে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে হস্তদ্বয় সংযোগে বদন আবৃত করে দণ্ডায়মানা শকুন্তলার চিত্র অঙ্কন করে গভীর চিন্তায় রত, তখন সে নিজের ভাবেই নিজে উক্তি করছে—"এই শালা মধুকর বাঁদীর বেটা, এই শালা যত দুঃখের কারণ।" অতঃপর শাস্তি স্বরূপে রাজা যখন মধুকরের পদ্ম-কারা গৃহে নির্ব্বাসন দণ্ড ঘোষণা করলেন তখন রাজা সানুমতী এরা সকলেই ভ্রমরের আস্পর্দ্ধার বিষয় ভেবে বিব্রত, কি করে সে রাজাজ্ঞা উপেক্ষা করে। তখন বিদূষক উচ্চহাস্য করে বলছে, "নিশ্চয় রাজা পাগল হয়ে গেছে এবং তাঁর ছোঁয়া লেগে আমিও খানিকটা তাই হয়েছিলাম। সত্যই এ ছবি মাত্র।" অতঃপর মাতলি কর্তৃক ভিন্নমান বিদূষকের দুরবস্থা আমাদের দৃষ্টির গোচরীভূত হয়, "অব্রাহ্মণ্যং অব্রাহ্মণ্যং" ঘোষণায় ইক্ষু-দণ্ডের মত তার বিক্রম ভাব প্রাপ্তি এবং ত্রিখণ্ডে পরিণত হওয়ার কথা আমরা জানতে পারি। রাজা সেইস্থানে উপস্থিত হলেও তিনি বিদূষককে দেখতে পাচ্ছেন না। সে বলছে, "হায় হায় আমি তোমাকে দেখছি, আর তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ না, আহা বিড়ালের মুখের ইন্দুরের মত আমার রক্ষা পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।" এর পর সে যে বিদায় নিল, তার সঙ্গে আর দেখা সাক্ষাৎ আমাদের হ'ল না।

মাধব্য এমনি করে নাটকের প্রায় অবান্তর চরিত্র রূপে আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করে—নিজের পরিহাসপটুতায়, ভোজনপ্রীতিতে, ভীতি-প্রকটনে। অন্যান্য বহুলাংশে সে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিসৃষ্ট বিদূষকের মতই তুল্যাকার, কিন্তু নায়কের প্রেম বিষয়ে বৈরাগ্য তার একলার সম্পদ।

সে সন্ন্যাসীকে ভালবাসে না কিন্তু নায়কের প্রেমাসক্তি বিষয়ে সে যেন চির-সন্ন্যাস গ্রহণ করে বসে আছে। এই পটভূমিকায় পরিহাসপটু নদীতটস্থ বেতসাকৃতি মাধব্য আমাদের চিত্তে একটি প্রশস্ত স্থল অধিকার করে রয়েছে।

কালিদাসের সৃষ্ট বিদূষক অন্যান্য কবিদের সৃষ্ট বিদূষক থেকে ভিন্ন। অন্যান্য বিদূষকের মত তাদের অনিবার্য্য ভোজনস্পৃহা, ব্রাহ্মণ্যগর্ব্ব প্রভৃতি সবই আছে, কিন্তু স্বকীয় আভিজাত্য, স্ব স্ব চরিত্রের নবীনতায়, স্ব স্ব ক্ষেত্রে অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য ব্যঞ্জনায় তারা অতুলনীয়।

কালিদাসের অঙ্কিত তিনটি বিদূষক চরিত্রই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মহাকবি কালিদাস অনেক চরিত্রের প্রতি অনেক সময় প্রয়োজনবোধে উপেক্ষা করেছেন, কিন্তু বিদূষকের প্রতি নয়। তাঁর বিচারগৌরবে তিনটি বিদূষকই স্ব স্ব মহিমময় প্রোজ্জ্বল দীপ্তিতে পূর্ণ ভাস্বর, পূর্ণ দ্যুতিমান।

১। কো অবরো অবদেসো তুম্হাণং রাআণং। নীবারচ্ছট্‌ঠভাঅং অম্হাণং উবহরন্তি (কোপরোঽপদেশো যুষ্মাকং রাজ্ঞাম্। নীবারষষ্ঠভাগম অস্মাকমুপহরন্ত ইতি)।

২ মাধব্য অপ্যস্তি শকুন্তলাদর্শনে কুতুহলম্।

৩ পঢমং সপরিবাহম্ আসি। দাণিং রক্খস বুত্তন্তেন বিন্দুবি ণাবসেসিদো (প্রথমং সপরিবাহম্ আসীৎ। ইদানীং রাক্ষস-বৃত্তান্তেন বিন্দুরপি নাবশেষিতঃ)।

রূপান্তর

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ

আপিস থেকে সবে ফিরেছে মণিমালা। ভিজে জুবড়ি হয়ে গেছে গরমের জামা, সাড়ী, ব্লাউজ। পায়ের জুতোজোড়ার অবস্থা হয়েছে আরও শোচনীয়। শুধু অকালবর্ষণ নয়। রীতিমত দুর্যোগ সুরু হয়েছে শীতের সন্ধ্যায়। থামতে আর চাইছে না কিছুতেই প্রকৃতির আকস্মিক উন্মাদনা। কাপড় বদলে ভিজে সাড়ীটা নিংড়াতে যাচ্ছিল ও। মেয়ে কুন্তলা সন্তর্পণে এসে কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। বড় করুণ ভাবে চাইল একবার মায়ের পানে। মাত্র সাত বছর বয়স মেয়েটার। কিন্তু সাংসারিক সুখ-দুঃখ বোঝবার জাগ্রত চেতনা নিয়েই যেন জন্মেছে সে। সন্ত্রস্ত অনুচ্চ কণ্ঠে বললে, দাদার আবার দুপুর থেকে জ্বর এসেছে মা। তুমি আসতে দেরি করছ। পিসিমা কিছুতেই থামাতে আর পারে না। কেঁদে কেঁদে এই একটু আগে ঘুমিয়ে পড়েছে।

চমকে উঠল মণিমালা। আবার জ্বর! কিসের একটা ভয় যেন সরীসৃপের মত স্নায়ুগুলোকে স্পর্শ করল আচমকা। ভিজে সাড়ী পড়ে রইল মেঝেয়। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল মণিমালা মেঝেয় পাতা বিছানাটার কাছে। হাত দুটো জলে ভিজে ঠাণ্ডা হয়েছে অসম্ভব রকম। ঝুঁকে পড়ে ছেলের কপালে বুকে গাল ঠেকিয়ে তাপ অনুভব করলে বারকয়েক। গা পুড়ে যাচ্ছে ছেলের জ্বরের তাপে। ঘুমোয় নি ছেলে। জ্বরের ঝোঁকে হুঁস নেই যেন আর বাছার। ছেলে ওর রোগা—দুর্বল। প্রায় আড়াই মাস ভুগে দিনকতক হ'ল পথ্য পেয়েছিল সবে। আবার এ কি বিপত্তি!

মেয়ে ফিস ফিস করে বললে—বিকেলে ডাক্তার বাবুকে ডেকে এনেছিলাম মা। কত কি বললেন। পিসিমা সব শুনেছে। তুমি কিন্তু কাল আর আপিস যেও না মা।

মেয়েটা ছোট হলেও অনুভূতি ওর প্রখর। সব কথা না বুঝলেও—ডাক্তারের মুখ চোখের ভাব লক্ষ্য করে বেশ বুঝেছে—দাদার আবার জ্বর হওয়ায় ভয়ের কারণ কতখানি। মা সর্ব্বক্ষণ কাছে থাকলে দাদা অত ঘ্যান ঘ্যান করত না হয় ত। জ্বরও আর আসত না নিশ্চয়ই। সত্যি তাই। ন'দশ বছরের ছেলে মণ্টু। ভুগে ভুগে বয়স যেন ওর কমে গেছে কত! কোলের খোকার মত মায়ের সান্নিধ্য চায় এখন সর্ব্বক্ষণ। চায় ক্ষণে ক্ষণে মায়ের স্নেহমমতার স্পর্শ—আদর সোহাগ। কত করে ভুলিয়ে, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে—কত আদর করে তবে যেতে পায় ও রোজ আপিসে। না হলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে একটানা—অনেকক্ষণ ধরে। গায়ে আবার জ্বর দেখা দেয় যদি—সে ভাবনাও কম ছিল না। আপিসে সে কাজই করে সত্যি। মন কিন্তু রোগা ছেলের কাছে পড়ে থাকে সর্ব্বক্ষণ। ভুল হয় কাজে। সাজ্ঘাতিক ভুলও করে বসেছিল একদিন। উপরওয়ালার কাছে কৈফিয়ত দিতে গিয়ে শুধু আরক্ত হয়েই ওঠে নি, নারীত্ব মাটিতে মিশে যেতে চেয়েছিল সেদিন। সত্যি লজ্জায় ধিক্কারে মাতৃসত্তা মণিমালার সঙ্কুচিত হয়ে আসছে যেন দিনে দিনে।

দূর সম্পর্কের বিধবা দিদি সামনে এসে দাঁড়ালেন। রান্নাবান্নার কাজে এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন তিনি। মণিমালার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। ওঁকে দেখে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন রুদ্ধ হয়ে গেল মণিমালার। অস্ফুট আর্ত্তনাদ যেন বেরিয়ে এল বুক চিরে—'কি হবে দিদি?' কি যে হতে পারে—তা দিদির অজানা নয়। তবু ঝঞ্ঝা-ঝাপটে দিদির বুক কাঁপে না আর। ছোট-বড় পাঁচটি সন্তান, স্বামী, শেষ অবলম্বন ছোট ভাইটি—অকালে একে একে সকলকে তুলে দিয়েছেন উনি চির নিশ্চিন্তের হাতে। নিজেরই হৃৎপিণ্ড পুড়েছে যেন বারে বারে চিতার আগুনে। বুকের দহনজ্বালা শান্ত প্রশমিত হয়ে এসেছে আস্তে আস্তে। নিজের অস্তিত্বকে সঁপে দিয়েছেন অবশ্যম্ভাবীর হাতে—ভবিতব্যের পাদমূলে। তিন কুলে সম্পর্কের একটিমাত্র সূত্র এই মণিমালা আর তার ছেলেমেয়ে দুটি। এদেরই অবলম্বন করে ওঁর পৃথিবী এখন আবর্ত্তিত হয় অনিশ্চিতের পথে। তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে মণ্টুর কপালে হাত রাখলেন দিদি। চমকে উঠলেন যেন একটু। সত্যি—বিকেলের চেয়ে তাপ যেন বেড়েছে দ্বিগুণ। শান্ত অবিচলিত কণ্ঠে বললেন শুধু—ভয় নেই, অধীর হ'স নে মণি। ডাক্তার বলেছে—কাল-পরশুর ভেতরেই জ্বর নেমে যাবে।

কথাটা হয়ত নিতান্ত সান্ত্বনাবাক্য। ডাক্তার সবকিছু খুলে না বললেও—ভয়াবহ একটা পরিণতির আভাস ছিল যেন তাঁর কথায় আর ইঙ্গিতে। দিদি বোঝেন সব—এমন অনেক দেখেছেন শুনেছেন জীবনে। কিন্তু ছেলের মাকে সব কথা না শোনানোই ভাল। মণিমালার মন বোঝেন উনি। নামে শিক্ষিতা ও। মন কিন্তু ওর অবলম্বনহীন। একেবারে ভেঙ্গে পড়বে আবার তা হলে।

বাইরে যেন দুর্য্যোগ বেড়েই চলেছে। ছেলের গায়ের তাপও যেন বাড়তে লাগল রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। মাঝ রাত থেকে ছেলে প্রলাপ বকতে লাগল জ্বরের ঝোঁকে। এক বুলি হ'ল ছেলের—আমি মার সঙ্গে যাব—মা কেন আমায় নিয়ে গেল না আপিসে।—তার সঙ্গে সেই একটানা বায়না ধরার মত কান্না।

এ কিন্তু বায়না নয়। ভুল বকছে ছেলে জ্বরের ঝোঁকে। ভয়ে কাঠ হয়ে গেল মণিমালা। চোখ ছাপিয়ে জল এল দুর্ব্বার বেগে। দিদি ছেলের গায়ে মাথায় হাত বুলাচ্ছিলেন। শান্ত করবার চেষ্টা করছিলেন তাকে। সহজ গলায় বললেন—ভয় নেই।

চোখের জল ফেলিস নে অমন করে। মা মঙ্গলচণ্ডীকে ডাক এক-মনে। মা যেন শীগগির ভাল করে তোলেন বাছাকে।

হাঁ করে তাকিয়ে রইল মণিমালা দিদির মুখের পানে। মা মঙ্গলচণ্ডী! কে তিনি—কেমন করে ডাকলে সাড়া দেন তিনি—বরাভয় মূর্ত্তি তাঁর কেমনতর—এ সব তো জানা নেই মণিমালার! এ সব জানবার প্রয়োজন হয় নি তার জীবনে কোন দিন। কোথায় বা তার সেই নারীসুলভ ভক্তিনিষ্ঠ মন। সে মন নিষ্পিষ্ট হয়ে, নির্জ্জীব হয়ে গেছে চিরদিনের মত। কাজের লাগাম-পরা যান্ত্রিক জীব হয়ে উঠেছে সে এই ক'বছরের মধ্যেই। দৈনন্দিন দশটা-পাঁচটার টানাপোড়েন—আপিসের কাঁড়ি কাঁড়ি ফাইল ঘাঁটা—উপরওয়ালাদের মন জোগানোর প্রাণান্তকর প্রয়াস—উঃ! ভাবতে গেলে, ওর স্নায়ুগুলিই শুধু বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে না—অভিশাপজর্জ্জরিত করে দিতে চায় সে পৃথিবীকে—নিজেকে—নিজের ভাগ্যবিধাতাকে। সত্যি—কক্ষচ্যুত হয়েছে যেন মণিমালা চিরদিনের মত। সংসারের সনাতন কল্যাণভূমি সরে যাচ্ছে পায়ের তলা থেকে। বাঁচার নামে পদে পদে অপমৃত্যু ঘটছে এখন তার। যে নারী মঙ্গলময়ী—বধূ জায়া জননী—তাঁকে যেন খুঁজে পায় না আর মণিমালা নিজের মধ্যে।

জলভরা ঝাপসা চোখে চায় সে ছেলের দিকে। ওর মনে পড়ে হঠাৎ নিজের মায়ের কথা। মা ছিলেন চির-কল্যাণের প্রতীক। স্নেহ-ভালবাসা আদর-যত্ন, কল্যাণ-দাক্ষিণ্যের অফুরন্ত উৎস যেন। সেই উৎসনিঃসৃত আনন্দরসধারার স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠত প্রতিদিনের সংসার। কি শুচি স্নিগ্ধ মন ছিল তাঁর! বেশ মনে পড়ে—কারও অসুখ-বিসুখ হলে কত ভক্তি-ভরে দেবদেবীর নাম করে কপালে তার পয়সা ছুঁইয়ে রাখতেন মা। মানত করতেন মনে মনে। ঠাকুরদেবতার নাম ধরে ডাকতেন অস্ফুটে। মনে বল পাবার জন্যেই হয় ত বা করতেন ও সব। তেমনি করে আজ মা মঙ্গলচণ্ডীকে মণিমালা ডাকতে পারবে কি? সেই মায়েরই মেয়ে ও সত্যি। কিন্তু মায়ের সেই মনোধর্ম্মে দীক্ষা পায়নি ও কোন দিন। কিশোর বয়সে ওর মনের ভিত গড়ে উঠেছিল বাবার খেয়ালখুশিমত। ঠাকুরদেবতা মানতেন না তিনি। মায়ের ভক্তিপ্রবণতার বহর দেখে জ্বলে উঠতেন পদে পদে। প্রাচীন সংস্কারের কাঠামোগুলোকে ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দেবার উদগ্র ঝোঁকই ছিল শুধু তাঁর। নূতনের কল্যাণময় রূপের স্বপ্ন দেখেন নি কোন দিন, শুধু চাকচিক্যময় নূতনের প্রতি ছিল এক ধরণের মোহ। মায়ের মন ছিল কিন্তু দুর্ভেদ্য দুর্গের মত। সে মনের ভিত টলাতে পারেন নি তিনি শত চেষ্টাতেও।

হাল ছেড়ে দিয়ে গোঁ ভরে তাই মেয়েকে নিয়ে পড়েছিলেন। স্কুল ছাড়বার পর মায়ের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে পড়িয়েছিলেন কলেজে। কিন্তু সে হ'ল তোতাপাখীর মত বুলি কপচানোর ব্যর্থ প্রয়াস। চারটে বছর কেটেছে এই ভাবে। অনেক বয়স পর্য্যন্ত ফ্রক আর হিল-উঁচু জুতো পরিয়ে—সভা-সমিতিতে, খেলার মাঠে সর্ব্বত্র ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতেন তিনি—আধুনিকা বানাবার চেষ্টা। মায়ের অনুযোগের আর অন্ত ছিল না এর জন্যে। পুণ্যিপুকুর, শিবপূজা, ব্রতব্রত পালন, সংসারের সেবাধর্ম্ম, কিছুই শিখল না মেয়ে। ক্ষোভে দুঃখে এক দিন অনেক-কিছু শুনিয়েও দিতেন তিনি স্বামীকে। মেয়েটার মাথা খাচ্ছ তুমি বাপ হয়ে। যার ঘর করতে যাবে ও এর পর—তাকে পেয়ে হয় ত সুখী হবে না সে জীবনে, সংসারে সার্থক হয়ে ফুটতে পারবে না কোনদিন। ঠিক এই কথাগুলি না বললেও—এমনি ভাবেরই কত কি বলতেন তিনি। সত্যি তাই। আজও মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করে সে কথার সত্যতা কতখানি। যার সঙ্গে তার চিরজীবনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল বিবাহ-অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে, অদৃষ্টদোষে সে মানুষটি তার মনের মত হয় নি। তাকে আপনার বলে ভাবতে পারে নি সে কোনদিন। স্বামী সাধারণ মানুষ হলেও অন্তরের সবটুকু ভালবাসা দিয়ে জীবনকে সার্থক করে তোলার যে তপস্যা তা ছিল না ওর।···

ছেলেটা যেন শান্ত হয়েছে একটু। দিদি অবিচলিত চিত্তে তার গায়ে মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। ঘরের আবহাওয়ার মধ্যে কাল যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে স্থাণুর মত। হঠাৎ স্তব্ধতার বুকে মৃদু তরঙ্গ তুলে দিদি বললেন, দিনকতক আর আপিসে যাস নে তুই। মণ্ট তোকে কাছে চায় সর্ব্বক্ষণ। বায়না ধরে কেঁদে কেঁদেই গায়ে জ্বর ডেকে এনেছে ছেলে। ছেলের প্রাণটা আগে। তারপর তোর চাকরিবাকরি—আর যা কিছু সব।

সত্যি তাই। ছেলে বাঁচলে তবে না আর সবকিছু। নাড়ী-ছেঁড়া ধন এই সন্তান। বড় হবে, মানুষ হবে। শতদলের মত ফুটে উঠবে একটু একটু করে। পাপড়ি মেলে সৌরভ ছড়িয়ে বরেণ্য হয়ে উঠবে একদিন—তবে না ওর সৃজন-সাধনা হবে সার্থক! কিন্তু মায়ের সে সোনার স্বপ্ন মিলিয়ে যাচ্ছে ছায়াছবির মত। তার সাধনা এখন নিছক বাঁচার সাধনা। জন্তুর মত, আদিম মানুষের মত—শুধু জীবনকে টিকিয়ে রাখবার মর্ম্মান্তিক প্রয়াস! এ বুঝিবা অপমৃত্যুরই নামান্তর। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেহকে টেনে নিয়ে যেতে হয় রোজ আপিসে। অন্তরের বিদ্রোহ-বিক্ষোভকে সে প্রকাশ পেতে দেয় না বাইরে। ভিতরটা কিন্তু ওর ক্ষয়ে ক্ষয়ে ক্ষীণ হয়ে আসছে ক্রমশঃ। উঃ, আপিস ত নয়! যেন শয়তানের কারখানা। অন্ততঃ ওর তাই মনে হয় এখন। বিচিত্র পৃথিবীর অদ্ভুত জীব যেন সব। মেয়ে টাইপিষ্ট, মেয়ে-কেরানীদের লক্ষ্য করে কি অদ্ভুত রসিকতাই না করে পুরুষগুলো নির্ব্বিচারে। চোখের দৃষ্টিও যেন কেমনতর। ধিক এদের শিক্ষাদীক্ষায়। আপিসের উপরওয়ালা মনিবটিও নামে আর চেহারায় মানুষ। কাজের ছুতো ধরে মণিমালাকে প্রায়ই ডাকে নিজের কক্ষটিতে। কাগজ-পত্র ফাইল ইত্যাদি নাড়তে নাড়তে আবশ্যক অনাবশ্যক অনেক-কিছু উত্তরও দিতে হয় তাকে। ছাড়তে আর চায় না যেন কিছুতেই লোকটা! মণিমালাকে সামনে পেলে তার কাজে যেন আসক্তি বাড়ে দ্বিগুণ। চোখে চোখ পড়ে প্রায়ই।

বয়স হলে কি হবে, দৃষ্টি দিয়ে সে যেন ওর সর্ব্বাঙ্গ লেহন করতে চায়। হায় রে—এই মানুষই ওর ভাগ্যবিধাতা! কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতি-অবনতির রেখা টানবার মালিক। দুর্ভেদ্য বর্ম্ম দিয়ে মনকে আগলে রাখতে হয় মণিমালার। বিধবা সে—ছেলেমেয়ের মা। লোকটা জানেও সব। প্রসাধনের সযত্ন স্পর্শ দিয়ে দেহকে আর রূপকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করে না মণিমালা কোন দিন। সেজে-গুজে খানিকটা শ্রীময়ী হতে হয় অবশ্য ওকে নিত্য আপিস যাবার মুখে। রেহাই নেই কিন্তু তাতেই। লোকটার সামনে সে যেন লজ্জায় মাটিতে মিশে যায়। জীবনে এ কি বিড়ম্বনা! কান্না পায় ওর মাঝে মাঝে। বয়স ওর ত্রিশ পেরিয়েছে সবে। লাবণ্যের নদীতে জোয়ার থেমেছে-সত্যি—ভাঁটার টান কিন্তু সুরু হয় নি এখনও। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে চেয়ে চমকে উঠে ও মাঝে মাঝে। সত্যি আজও অপরূপা সে—বুঝি-বা অতুলনীয়া। ছেলেমেয়ে কাছে থাকলে আয়নার সামনে বসতে—চুলের গোছা নিয়ে আঁচড়াতে বিনুনি বাঁধতে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হয় ওর আজকাল।

এই তো সেদিনের কথা। ব্যাপারটা ভাবলে শুধু লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়েই উঠে না সে, যেন একেবারে মরমে মরে যায়। মণ্ট তখন জ্বরে পড়ে নি। বরাহনগরে গঙ্গার ধারে একটা বাগানবাড়ীতে ওদের আপিসের লোকেরা মিলে জলসার ব্যবস্থা করেছিল। গান এক সময়ে বেশ ভালই গাইত মণিমালা। এখন কিন্তু গায় না আর। সুরের সমাধি হয়ে গেছে ওর জীবনে চিরদিনের মত। জলসায় ও যাবে না কিছুতেই। হাজার অনুরোধ করুক না কেন ওরা। একটা কিছু অসুখ-বিসুখের অজুহাত দেবে—এমনি সঙ্কল্প নিয়েই ও বসেছিল বাড়ীতে নির্দ্দিষ্ট দিনটিতে। কিন্তু অকস্মাৎ অল্পবয়সী অফিসার দু'জন একেবারে মোটর নিয়ে হাজির ওর বাসাবাড়ীতে। অপ্রত্যাশিত আগমন। কিসের আকর্ষণে এসেছিল ওরা তা ওর অজানা নয়। পুরুষের অনুনয়বিনয়, পুরুষের সাধ্যসাধনা, সবকিছুকে উপেক্ষা করবার মত শক্তি আছে ওর মনে। চাকরির খাতিরেই—হাঁ তাই—চাকরির জন্যেই শুধু অনুরোধ এড়ানো যেন দুঃসাধ্য হয়েছিল সেদিন ওর পক্ষে। আপিসে সচল থাকতে গেলে—একটু উন্নতির মুখ দেখতে হলে—এদের মন জোগাতে হয় বই কি? এ ত আকছার দেখছে আপিসে। অফিসার দু'জনই ওর প্রায়—সমবয়সী। কি কৌতুকোচ্ছল ওরা। অল্প একটু সঙ্কোচ জাগে নি যে তা নয়। কিন্তু বসন্তবাতাসে বোঁটা-খসা পাতার মত উড়ে গিয়েছিল সে সঙ্কোচটুকু হঠাৎ। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটু প্রসাধন করবার দুরন্ত লোভকেও দমাতে পারে নি সেদিন—কেন কে জানে! চমকে উঠেছিল সে অঙ্গরাগরঞ্জিত নিজের রূপ-ঐশ্বর্য্য দেখে। ছিঃ, ছিঃ ছেলেমেয়ের মা, বিধবা সে। ওর সাড়ী পরার ধরন দেখে ছোট মেয়েটা পর্য্যন্ত অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল তাকে—কোথায় যাবে মা তুমি? যারা মোটরে করে এসেছে ওরা কারা?

দিদি ওর গতিবিধির দিকে নজর দিতেন না বড় একটা। যাকে অবলম্বন করে ভাসছেন তিনি—সে উজান বেয়ে উঠছে, কি ভাঁটায় নামছে—তা দেখবার প্রয়োজন ছিল না যেন তাঁর। আর মণ্ট! মণ্ট কথা কয় নি একটিও। শুধু জানলার কাছে দাঁড়িয়ে কেমন করে যেন তাকিয়ে ছিল নীরবে। মোটরে দুটি সম্পর্কহীন যুবকের পাশে গিয়ে বসতে হয়েছিল ওকে। কি মর্ম্মভেদী দৃষ্টি দিয়ে দেখছিল মণ্ট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য। দৃষ্টি যেন কেমনতর। ক্ষোভ, দুঃখ, কান্না, ঘৃণা—সে দৃষ্টির মধ্যে সবকিছুরই প্রকাশ ছিল যেন। সেদিন ফিরতে ওর রাত হয়েছিল একটু। ছেলেমেয়ে দুটি ঘুমিয়ে পড়েছিল তখন। মণ্টটা কিন্তু ছটফট করেছিল সারা রাত—দুঃস্বপ্নের ঘোরেই সম্ভবতঃ। পরদিন সকালে—ছেলেমেয়ের মুখের দিকে তাকাতে আর পারে না সে কিছুতেই। কেমন যেন লজ্জা লেগেছিল মণিমালার। মণ্টর দৃষ্টি যেন ভর্ৎসনায় ভরা। ছেলের সে দৃষ্টির ভিতর দিয়ে সমস্ত সংসার যেন তাকে ধিক্কার দিয়ে উঠেছিল।…ভাবতে ভাবতে হঠাৎ অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে উঠল মণিমালা। দিদি চমকে উঠে বললেন, কি হ'ল রে—গড়িয়ে নে তুই একটু। সারাদিন খেটেছিস আপিসে। রাত কত হ'ল দেখ দেখি।

টাইমপিসটার দিকে তাকাল একবার মণিমালা। রাতের তৃতীয় প্রহর এগিয়ে চলেছে মন্থরগতিতে। সারা অঙ্গ জুড়ে ওর ক্লান্তি নেমেছে। মন গ্লানিভারে অবসন্ন। কিন্তু চোখ বুজবে কেমন করে মণিমালা। বাইরের দুর্য্যোগ হাঁক পাড়ছে তখনও মাঝে মাঝে। অন্তরের মধ্যেও তার ঝঞ্ঝার প্রমত্ততা সুরু হয়েছে যেন। ঘুমন্ত মেয়েটা পাশ ফিরল। কোলের উপর এসে পড়ল মেয়ের হাতখানা। কি যেন ভেঙে পড়ার শব্দ হ'ল বাইরে। উৎকর্ণ হয়ে উঠল মণিমালা। বুকটা কেঁপে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। আকুলভাবে আঁকড়ে ধরল ঘুমন্ত মেয়েকে। মনে হ'ল শুধু ঝঞ্ঝা নয়, ঝঞ্ঝার সঙ্গে উন্মাদ তরঙ্গ তুলে এগিয়ে আসছে যেন কিসের সর্ব্বগ্রাসী কুটিল স্রোতোধারা। খসে খসে ভেঙে ভেঙে পড়ছে সবকিছু স্রোতের মুখে। শাশ্বত মহিমা সমস্ত শক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছে তার ভিত্তিভূমি। কিন্তু কি দুর্নিবার এই স্রোতের গতিবেগ! মাথা নুইয়ে হেলে পড়ে—আর্ত্তনাদ তুলে একে একে খসে ভেঙে বিলুপ্ত হচ্ছে মহিমময় অস্তিত্ব। বুকের মধ্যে—অন্তরের মধ্যেও সক্রিয় হয়ে উঠেছে সে স্রোতোবেগ। ভাঙন সুরু হয়েছে দুর্ব্বারভাবে মানুষের মর্ম্মভূমিতে। মাতৃহৃদয়ের পুঞ্জীভূত মহিমা, নারী-জীবনের যুগযুগান্তর-লালিত ঐশ্বর্য্য—সবকিছু ধ্বসে ভেঙে নিশ্চিহ্ন হচ্ছে স্রোতের মুখে—তরঙ্গের তাড়নায়। বুকটা ওর কেঁপে উঠল আবার। ওর নিজেরও মাতৃসত্তার ভিত্তিভূমিতে ফাটল ধরবে বুঝি! বিলুপ্ত হবে হয়ত ওরও অন্তরের মহিমান্বিত ঐশ্বর্য্য! বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে যেন ছেলেমেয়ের সঙ্গে অন্তরের যোগসূত্র। চোখ ফেটে জল এল ওর। এ স্রোত কোথায় নিয়ে চলেছে তাকে—অজানার অভিসারে অকূলের আবর্ত্তে। মানুষের কল্যাণতীর্থ যেন দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমশঃ।

তন্দ্রাভরে যেন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে সবকিছু। দিদি ঢুলছেন ওপাশে। ছেলেটাও এবার ঘুমিয়ে পড়েছে যেন। অস্থিরতা থেমেছে তার। কেন কে জানে—দুর্যোগঘন লগ্নে কানে ভেসে এল হঠাৎ নহবতের প্রসন্নমধুর আলাপ ! ইমনের রেশ থেমে গিয়ে সুরু হ'ল যেন সুললিত সাহানাবাগ। বিনিয়ে বিনিয়ে বাজতে লাগল সানাই। পাড়ার কোন উৎসবের আনন্দঘন অভিব্যক্তি নয় এ। অতীতের পথ থেকে ভেসে আসছে রোশনচৌকির ক্ষীণ স্বরতরঙ্গ। গ্রামের পথ ধরে চতুর্দ্দোলায় চড়ে বরকনে চলেছে। কনে এই মণিমালা। লোকে লোকারণ্য পথ। কতবার নামতে হ'ল পথের পাশে দেবদেবীর স্থানে। হোক সংস্কার তবু মাথা নুইয়েছিল সেদিন মণিমালা সব দেবতার কাছেই। সিদ্ধেশ্বরীতলা, বুড়ো শিবতলা, শেতলাবাড়ী, হরিসভা, সত্যপীরের ঠাঁই, পুরুষোত্তমের মন্দির, সব জায়গার ধূলিস্পর্শ নিয়ে—সব দেবতার আশীর্ব্বাদ কুড়িয়ে তবে নাকি নববধূ প্রথম পদার্পণ করে চিরদিনের গৃহপ্রাঙ্গণে। যুগযুগ ধরে পল্লীতে এমনি করেই নাকি প্রতি গৃহে গৃহলক্ষ্মী এসে প্রথম পা দিয়ে দাঁড়ান দুধ-আলতার থালায়। এই চিরমঙ্গলের পথে মণিমালারও পদচিহ্ন পড়েছিল এক দিন।

চৌধুরীবাড়ী, রাজবাড়ী ও অঞ্চলের। নববধূ হয়ে ও এল যেদিন—ভাঙন সুরু হয়েছে তখন বনেদি বাড়ীর ভিতে ভিতে। ভিতরটা অন্তঃসারশূন্য হয়ে এসেছে পুরোপুরি। বাইরেও ফাটল দেখা দিয়েছে স্পষ্টভাবে। বনেদিয়ানার ঠাট বজায় রাখার জন্যে কি বিপুল প্রয়াস চলেছে তখনও! সামান্য এক ভগ্নাংশের মালিকেরাও অসামান্য আভিজাত্য আঁকড়ে ছিল তখনও—চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ার ভয়েই সম্ভবতঃ। প্রজাদের সামনে, প্রতিবেশীদের সামনে নিজেদের রাজমাহাত্ম্য প্রচার করবার সর্ব্বনাশা প্রতিযোগিতারও অন্ত ছিল না শরিকদের মধ্যে। বড় অংশীদারেরা গ্রাম ছেড়েছে তখন অনেকেই। দরদালানে দেউড়িতে দেউড়িতে ঝাঁট পড়ে না আর তখন। কড়িবরগা, ঝাড়লণ্ঠন, সব একে একে আর্ত্তনাদ তুলে খসে ভেঙে পড়ছে। আস্তাবল বাড়ীর উঠোন, রোয়াক শেয়ালকাঁটা আর বনতুলসীতে ছেয়ে গেছে। চামচিকে চরছে তোশাখানা, বালাখানা আর হেঁসেলবাড়ীতে। গৃহদেবতার মন্দিরের ভগ্নদশা হয়েছে আরও মর্ম্মান্তিক। দ্বাদশ শিবের মন্দিরগুলোও অশথ-বটের শিরস্ত্রাণ পরেছে সব। ফুল জল পান না আর তখন ভিতরের শিবসুন্দর। চকমেলানো বাড়ীর পাশেই দীঘি। কাকচক্ষু জল দেখা যায় না আর তখন। মজে-হেজে শ্রীহীন হয়ে গেছে দীঘির সারা অঙ্গ। ফাটলধরা ধ্বসেপড়া শানবাঁধানো ঘাটগুলো লতাগুল্মের আস্তরণ জড়িয়ে পড়ে আছে হতভাগার মত। ভাঙনের লক্ষণ সর্ব্বত্র। তবু বুনিয়াদীর সব বাঁধন এলিয়ে যায় নি যেন তখনও। ওর নিজের সৎ-শাশুড়ীকে ডাকলে তখনও রাণীমা বলত। এ বাড়ীর সব নতুন বউই নাকি বৌরাণী। ঐ সম্বোধনে মণিমালাও সম্মানিত হয়েছিল দিনকয়েক। আন্তরিক না হোক মৌখিক মর্য্যাদা মিলত তখনও এদের অনেকের।···

আরও আবরণ সরে গেল বছরকয়েক ওবাড়ীতে ঘর করবার পর। রাজবাড়ীর ভিতরের ভগ্নদশা আরও প্রকট হয়ে উঠল। স্বামী—নারীজীবনের সেরা অবলম্বন—পরম সম্পদ। অদৃষ্টদোষে সেই স্বামী মানুষটি ছিল ওর অপদার্থ। দেড় পাইয়ের মালিক। ভাঙতে ভাঙতে কোথায় এসে পড়েছে—চেতনা নেই তখনও তার। যথাসর্ব্বস্ব বাঁধা পড়েছে। শেষ সম্বল স্ত্রীর গয়না—তাতেও হাত পড়তে সুরু করেছে। তখনও মকারের সাধনায় মত্ত লোকটা। ও বংশের নাকি ওই ধারা। কলকাতার বাড়ীতে পড়ে থাকত। কালেভদ্রে দেশে ফিরত। মণিমালাকে আসবাবের সামিল ভাবত। ব্যবহারও ছিল তেমনি। এ মানুষকে ভালবাসতে পারে নি ও কোন দিন। প্রেম নাকি পরশমণি। প্রেমের ছোঁয়া লাগলে মন নাকি সোনা হয়। ভালবাসলে এমন মানুষ সোনা হয়ে উঠত কিনা—কে জানে। সব কথা ভাবলে—ওর চোখ ছাপিয়ে জল আসে এখনও। বাবা আজ স্বর্গত। তবু রাগ হয় তাঁর উপর। ওদের বাইরের চটকের কথাই শুধু শুনেছিলেন তিনি। ভিতরের ভাঙন লক্ষ্য করবার মত দৃষ্টি ছিল না তাঁর। সম্প্রদান করেন নি—বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন তিনি। বিয়ের সময় মা বেঁচে থাকলে এমনটি ঘটত না নিশ্চয়ই। মা মারা যাবার পর বাবা যেন অবলম্বন হারিয়েছিলেন। মনে প্রাণে পালটে গিয়ে ভিন্ন মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন একেবারে।

তার পর বছরকয়েকের মধ্যেই কত কি বিপর্য্যয় ঘটল। শুধু বিপর্য্যয় নয়—আমূল পরিবর্ত্তন যেন জীবনের। স্বামী মারা গেলেন হঠাৎ। ছেলে মেয়ে নিয়ে অকূলে ভাসল মণিমালা। গ্রামের পরিবেশ ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে এখানে ওকে। নীলামে যথাসর্ব্বস্ব গেছে তখন। মানসম্ভ্রম বাঁচানোর কথা—ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ—সবকিছুই ভাবতে হয়েছে ওকে। এ ছাড়া আর উপায় ছিল না বুঝি বা। সৎশাশুড়ী সত্যিই সৎ ছিলেন। নিঃসন্তান তিনি। ছাড়তে চান নি মণ্ট আর কুন্তীকে। মণিমালা কিন্তু তাঁর বারণ মানে নি।

এক জীবনেই জন্মান্তর ঘটে গেল যেন। বনেদী জমিদারবাড়ীর বৌ ছিল মণিমালা। স্রোতের মুখে পড়ে ভাসতে ভাসতে আজ এসে পড়েছে সে কোথায়, শহরতলীর এই অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, কোটরের মত ভাড়া-করা দুখানি অপরিসর ঘর—এই এখন তার আশ্রয়। সেদিনের বধূরাণী—হারিয়ে গেছে যবনিকার আড়ালে। জীবনমঞ্চে দৃশ্যপট বদলেছে। কেরানী মণিমালা—ডেলিপ্যাসেঞ্জারী করে এখন। যান্ত্রিক জীব যেন। বাবা তাকে লেখাপড়া শিখেয়েছিলেন কি এই ভাবে তিলে তিলে ক্ষয় হবার জন্যে। চোখ ছাপিয়ে ওর ধারা নামল। ভাসতে ভাসতে নেমে এসেছে নিম্নমধ্যবিত্তদের ভিড়ের মধ্যে।

হ্যারিকেনের আলোয়—অস্পষ্ট সবকিছু। স্বপ্নের ঘোর তখনও কাটে নি। ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে আঁতকে উঠল মণিমালা। কুন্তী যেন বড় হয়েছে। ছেলেমেয়ের মা হয়েছে। শ্রমিকদের সঙ্গে

বস্তির বীভৎস পরিবেশের মধ্যে জীবনের জের টেনে চলেছে পরম তৃপ্তিতে—কুন্তি আর তার ছেলেমেয়েরা।

উচ্ছিষ্টজীবী যেন সব। যন্ত্রযুগের সম্মোহনে পড়ে মনুষ্যত্ব হারিয়েছে পুরোপুরি। উঃ—একি ভয়াবহ পরিণতি—ভবিষ্যতের রূপ। আবার আতকে উঠল মণিমালা। দূরের চটকলে প্রথম বাঁশী বেজে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। ভোর হয়ে এসেছে এরই মধ্যে। বাইরে প্রকৃতির প্রমত্ততাও থেমেছে কখন। 'দিদি ছেলের পাশটায় একটু কাত হয়ে চোখ বুজেছেন ইতিমধ্যে। ঝিমঝিম করছে মণিমালার মাথার ভেতরটা। চিন্তার চাপে স্নায়ুগুলো নিষ্পেষিত হয়েছে অসম্ভব রকম। দেহ আর বইতে পারছে না ক্লান্তিভার। ঘুমের ঘোরে মেয়েটা অস্ফুট একবার 'মা' বলে ডাকল যেন। তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে মণিমালাও চোখ বুজল তাড়াতাড়ি।

দিদির ডাকে ঘুম ভাঙল মণিমালার। দুর্যোগের রাত কেটে গেছে তখন। পূবদিকের জানালা দুটো খুলে দিয়েছেন কখন দিদি। দিনের যাত্রা সুরু হয়েছে খানিক আগে। জ্যোতির্ময়ের রূপ ফুটেছে অনন্ত আকাশের কোলে। আকাশে-বাতাসে গ্লানি-বিক্ষোভের চিহ্ন নেই আর কোন রকম। প্রসন্নতার ইঙ্গিত সব দিকে। ছেলেটা ঘুমুচ্ছে তখনও। সব কাজ ফেলে—তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এল মণিমালা। ভক্তিভরে ছেলের কপালে পয়সা ছুঁইয়ে তুলে রাখলে কুলুঙ্গিতে। মনে মনে মানত করলে বোধ হয়। মা মঙ্গলচণ্ডীকে ডাকল যেন কয়েকবার অস্ফুটে। বুকে বল এল হঠাৎ—সনাতন ভক্তিপথ ধরে। মায়ের মঙ্গলদৃষ্টি ঘিরলে ছেলেকে রক্ষাকবচের মত।

তৃপ্তির নিশ্বাস ছেড়ে তাড়াতাড়ি চিঠি লেখার প্যাড নিয়ে লিখতে বসল মণিমালা। চাকরিতে ও ইস্তফা দেবে—আজই—এখনই। রাতের দুর্যোগ—রাতের দুশ্চিন্তারাশি—ওর মনে নূতন এক সঙ্কল্প জাগিয়ে গেছে। দিদি এসে ঘরে ঢুকলেন। অবাক হলেন একটু। বললেন—সকালে সব ফেলে চিঠি লিখতে বসলি কাকে রে?

লিখতে লিখতেই বললে মণিমালা—চাকরি আর করব না ঠিক করেছি দিদি। তাই চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছি আপিসে। স্তম্ভিত হয়ে বললেন দিদি—সে কি রে!—কিন্তু এতগুলো পেট চালাবি কি করে?—হাসলে মণিমালা। প্রশান্ত সুন্দর হাসি। বললে—সে ব্যবস্থাও করছি দিদি। আমরা সবাই আবার গ্রামে ফিরে যাব—সংশাশুড়ীর কাছে। তাঁকেও লিখব এখুনি। তাঁর নিজের নামে সামান্য যা জমিজমা আছে—তাতে আমাদের ক'টা পেট চলে যাবে কষ্টেসৃষ্টে। তুমি সবই ত দেখছ দিদি। তুমিও ছেলে-মেয়ের মা। এখানে আর পড়ে থাকলে—এভাবে চললে—জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ খোয়া যাবে আমার হয় ত। আমি নিঃস্ব হয়ে যাব চিরদিনের মত। তুমি আশীর্ব্বাদ কর দিদি—ছেলেমেয়ের হাত ধরে আমি যেন আবার গাঁয়ে শ্বশুরের ভিটেয় ফিরে যেতে পারি।

পাগলের মত কি সব বকছে মেয়েটা। দিদি অত শত বোঝেন না। বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তিনি—জানালার বাইরে—দূর আকাশে—বুঝিবা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পানে। নিজের ভাগ্যের ভাঙন দশা নতুন করে ভাবিয়ে তোলে যেন ভাগ্যহীনাকে।

তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে দিদি—বলে মণিমালা মুখ ফেরাল। দিদি চাইলেন ওর মুখের পানে। এক রাতের মধ্যেই বদলে গেছে যেন মণিমালা। রূপান্তর ঘটেছে যেন ওর—বুঝিবা জন্মান্তর। যেন দৃঢ় একটা অবলম্বন পেয়েছে বুকের কাছে। চোখে মুখে ফুটে উঠেছে সন্তানবতীর প্রসন্ন কল্যাণ দীপ্তি।

আমাদের সাহিত্য

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য শব্দটা "সহিত" শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সহিতের ভাব "সাহিত্য", সহিত শব্দের অর্থ সঙ্গ। "হরি রামের সঙ্গে যাইতেছে" আর "হরি রামের সহিত যাইতেছে", এই দুটি বাক্যই একার্থবাচক। যাহা আমাদের সমাজে, আমাদের জীবনে বা আমাদের ধর্ম্মের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত তাহাই আমাদের সাহিত্য। আমাদের সমাজের বা জীবনের চিত্র দুই প্রকারে প্রকাশ করিতে পারা যায়। এই দুই প্রকার হইতেছে—"চিত্রশিল্প" এবং "ভাষাশিল্প"। চিত্রশিল্পের সাহায্যে শিল্পীরা সমাজের, ব্যক্তির বা ঘটনাবিশেষের বাহ্যরূপ প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু চিত্রের দ্বারা অন্তরের রূপ প্রকাশ করিতে পারা যায় না। অন্তরের রূপ প্রকাশ করিতে হইলে ভাষার সাহায্য লইতে হয়।

এক জন সুদক্ষ চিত্রকর তুলিকার সাহায্যে কোনও ব্যক্তির ক্রোধ, হিংসা, স্নেহ দয়া প্রভৃতি চিত্রের চোখে, মুখে ও ভঙ্গিতে প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু সেই ক্রুদ্ধ বা দয়াবান ব্যক্তির অন্তরে কেন ক্রোধ অথবা দয়ার উদ্রেক হইল, তাহা ভাষার সাহায্য ব্যতীত প্রকাশ করিতে পারা যায় না। চিত্রের মুখের ভঙ্গি দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে, চিত্রাঙ্কিত ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ক্রোধের কারণ কি তাহা ভাষায় ব্যক্ত না করিলে বুঝিতে পারা যায় না।

পৃথিবীর সকল সভ্য সমাজেই সেইজন্য ভাষা-সাহিত্য সমাদৃত হইয়া থাকে। আমরা রামায়ণ পড়িয়া বুঝিতে পারি—রামায়ণের যুগে সমাজ কিরূপ ছিল। রাজারা কিরূপে রাজ্যশাসন ও পালন করিতেন, প্রজারা কেন রাজাকে নররূপী দেবতা বলিয়া ভক্তি করিত, আবার অনেক সময় সেই নররূপী দেবতারা সন্তানবৎ স্নেহাস্পদ প্রজাদের দ্বারা কেন সিংহাসনচ্যুত, এমন কি নিহত পর্য্যন্ত হইয়াছেন, তাহা তৎকালীন ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি। তুলিকা ও রঙের সাহায্যে সে কারণ প্রকাশ করা যায় না। যে গ্রন্থে সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, গার্হস্থ্যনীতি প্রভৃতি এককালীন বহুলাংশে বর্ণিত আছে, সেই সব গ্রন্থ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সেই সকল গ্রন্থকার মহাকবিরূপে সাহিত্যক্ষেত্রে চিরস্থায়ী আসন লাভ করিয়া থাকেন। বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস, সেক্সপীয়র, মিল্টন এবং রবীন্দ্রনাথ এইজন্যই মহাকবি রূপে গণনীয় হইয়াছেন।

আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধের নাম দিয়াছি, "আমাদের সাহিত্য"। অর্থাৎ আমি বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আমার মনোভাব পাঠকবর্গকে জানাইতে ইচ্ছা করি। আমার মনে আজকাল মধ্যে মধ্যে এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, আমাদের বাংলা-সাহিত্যের গতি বর্ত্তমানকালে "উর্দ্ধমুখী" না "নিম্নমুখী"। আমাদের কৈশোরে এবং যৌবনকালে আমরা যে সকল পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যতালিকার বহির্ভূত পুস্তকাদি পাঠ করিয়াছিলাম, তাহার তুলনায় এখনকার ঐ শ্রেণীর পুস্তক আমার মতে যথেষ্ট অবনত হইয়াছে। অবশ্য আমি সকল পাঠ্য-পুস্তককেই অবনত শ্রেণীতে ফেলিতেছি না। মধ্যে মধ্যে এমন দুই-চারিখানি পাঠ্যপুস্তক আমার দৃষ্টিগোচর হয়, যাহা পাঠে ছাত্রগণ প্রকৃত উপকারলাভে সমর্থ হইতে পারে। আমি বিশেষ দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, সেকালের অর্থাৎ ষাট-সত্তর বৎসর পূর্ব্বেকার লেখকেরা ভাষার বিশুদ্ধতার প্রতি যেরূপ দৃষ্টি রাখিতেন, বর্ত্তমানকালের পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতারা সেরূপ দৃষ্টি রাখেন না। হয়ত সেরূপ দৃষ্টি দিবার ক্ষমতাও তাঁহাদের নাই। আমি দৃষ্টান্তস্বরূপ কোনও পুস্তকের নাম উল্লেখ না করিয়া মাত্র কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করিতেছি। অনেক পাঠ্যপুস্তকে দেখিয়াছি, গ্রন্থকার অকারণে বহুবচনে বাহুল্য দেখাইয়া থাকেন। অনেকে বহুবচনবোধক পদ বিশিষ্ট শব্দের পূর্ব্বে এবং পরে এক সঙ্গেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। "ঐসকল বালকগণ", "এই সমস্ত বক্তারা" প্রভৃতি পদ ব্যবহার করেন। কেহ-বা লেখেন, "বালকগণেরা"। সংস্কৃত এবং ইংরেজীতে এইরূপ double plural অবশ্য-ব্যবহার্য্য। ব্যবহার না করিলে ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়। ইংরেজীতে "all those boys" বা সংস্কৃতে "তৌ দ্বৌ নরৌ" না লিখিয়া this boys বা সঃ দ্বৌ নরঃ লিখিলে ব্যাকরণ শুদ্ধ হয় না। কিন্তু বাংলা ব্যাকরণে সে নিয়ম নহে। সংস্কৃত ভাষা বাংলা-ভাষার জননী বা মাতামহী হইলেও উহা সংস্কৃত হইতে পৃথক। এই পার্থক্য কিছুতেই লঙ্ঘন করা উচিত নহে।

লেখকদের একটা কথা মনে রাখা উচিত যে, খাঁটি বাংলা শব্দে ব্যাকরণে সন্ধি হয় না। সন্ধিটা সংস্কৃত ব্যাকরণ মতেই হইয়া থাকে। সংস্কৃত দুইটা শব্দ পাশাপাশি থাকিলে তাহাদের মধ্যে সন্ধি হইতে পারে, যথা—রাম+অভিধান=রামাভিধান, কিন্তু বাংলাভাষায় পাকা+আমড়া সন্ধি করিয়া "পাকামড়া" হয় না। একটা বাংলা বা সংস্কৃত শব্দের সহিত কোনও বিদেশীয় শব্দেরও সন্ধি হয় না। তবে বর্ত্তমান বাংলাভাষায় এরূপ সঙ্কর সন্ধি দু'-একটা প্রচলিত হইয়াছে। যথা: "ইংলণ্ডেশ্বর"। তবে "ইংলণ্ড" শব্দটা দেশের নাম বলিয়া এবং উহা অকারান্ত বলিয়া এই সন্ধি চলিয়া গিয়াছে! কিন্তু রুশিয়া+ঈশ্বর="রুশিয়েশ্বর" অথবা জার্ম্মানী+ঈশ্বর="জার্ম্মানীশ্বর"—বাংলাভাষায় এরূপ ব্যবহার হয় না। আমরা বাল্যকালে যখন প্রথম বাংলা ব্যাকরণে সন্ধিসূত্র পাঠ করিয়াছিলাম, তখন আমরা কৌতূহলবশে ব্যাকরণে পাণ্ডিত্যপ্রকাশ করিবার জন্য বলিতাম, "এ বৎসর যদ্যপ্যাটচালা (যদ্যপি+আটচালা) করিতে নাও পার, তথাপ্যেকচালা (তথাপি+

একচালা) খানা করিতেই হইবে। দুঃখের বিষয় এরূপ অদ্ভুত সন্ধি অনেক সময় আজকাল আমার নয়নগোচর হয়। আর একটা ব্যাকরণদুষ্ট শব্দ আজকাল অনেক পুস্তকে ও সংবাদপত্রে দেখিতে পাই, অনেকে লিখেন, "আবশ্যকীয়"। তাঁহারা মনে করেন যে, "প্রয়োজন" হইতে যখন "প্রয়োজনীয়" হয়, তখন "আবশ্যক" হইতে "আবশ্যকীয়" হইবে না কেন? তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, "প্রয়োজন" শব্দ বিশেষ্য, উহা হইতে বিশেষণ হইয়াছে "প্রয়োজনীয়"। কিন্তু "আবশ্যক" শব্দ বিশেষ্য নহে, বিশেষণ। উহা "অবশ্য" হইতে হইয়াছে। একটা বিশেষ্যকে উপর্যুপরি দুইবার বিশেষণ করা অসঙ্গত। ইংরেজী "use" হইতে বিশেষণ হইয়াছে "useful"। কিন্তু "আবশ্যকীয়" শব্দকে ইংরেজী করিতে হইলে লিখিতে হয় "usefulable"।

ব্যাকরণ সম্বন্ধে আর একটা কথা বলিয়া ব্যাকরণের পালা শেষ করিব। আজকাল অনেক লেখকের লেখায় দেখিতে পাই, তাঁহারা লেখেন, "না বলিয়া পারি না", "না দেখিয়া পারি না"। এইরূপ অসমাপিকা "বলিয়া"র পর "পারি না" লিখিলে তাহার কোনও অর্থ হয় কি? ইংরেজীতে হয়ত এরূপ লেখা চলে। "I could not but hear" ইংরেজী ভাষার ভঙ্গী। বাংলায় উহা চলে না। "না বলিয়া যাইতে পারি না", "না দেখিয়া থাইতে পারি না"—এইরূপ লেখা উচিত। তাহা না লিখিলে ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘিত হয়। অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, অনেক খ্যাতনামা লেখকও এইরূপ ব্যাকরণদুষ্ট বাক্য লিখিয়া থাকেন। একটু সাবধান হইয়া লিখিলে ভাষার এই অশুদ্ধতা অনায়াসে দূর করিতে পারা যায়।

অনেক দিন পূর্ব্বে আমি যখন "হিতবাদী"র সেবায় নিযুক্ত ছিলাম তখন একজন খ্যাতনামা গ্রন্থকারের পুস্তকে দেখিয়াছিলাম, "বদান্যবতী মহিলা"। এই লেখক বাংলা-সাহিত্য চর্চ্চার জন্য "রায়সাহেব" উপাধি পাইয়াছিলেন এবং তিনি উপর্যুপরি কয়েক বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষার বাংলাভাষার পরীক্ষকও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বোধ হয় এই লেখকের ধারণা ছিল যে, যদি "লাবণ্যবতী" শব্দ চলে তবে "বদান্যবতী" চলিবে না কেন? "লাবণ্য" শব্দ বিশেষ্য আর "বদান্য" শব্দ বিশেষণ। "জ্ঞানবান ব্যক্তি" বলা চলে, কিন্তু "জ্ঞানীবান্" লেখা চলে কি? আর একজন বিখ্যাত লেখকের কথা বলি, ইনিও সাহিত্যচর্চ্চার জন্য সরকারের নিকট হইতে "রায়বাহাদুর" উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহার লেখা একখানি পুস্তকে দেখিয়াছিলাম, "ভগবতী কালীর বরাভয়প্রদ হাতখানি"। আমরা সকলেই জানি "খানি" "খানা" শব্দ একবচনে ব্যবহৃত হয়। কালী চতুর্ভুজা, তাঁহার উপরের দুই হস্তের একটিতে 'অসি' একটিতে 'অভয়'। আর নীচের দুই হস্তের একটিতে 'নরমুণ্ড', আর একটিতে 'বর'। অভয় দিবার সময় হাত তুলিয়া হাতের তালু দেখাইতে হয়। কিন্তু বর দিবার সময় বা আশীর্ব্বাদ করিবার সময় হাত নীচু করিয়া এবং সেই হস্তের তালু নিম্নে রাখিয়া বর দিতে হয়। সুতরাং একখানি হাত একই সময়ে 'বর' এবং 'অভয়' দিতে পারে না। এই দুই জন গ্রন্থকারই অধুনা-পরলোকগত। আমার বক্তব্য এই যে, যে সকল খ্যাতিমান লেখকের পুস্তক ছাত্রদিগের পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাঁহারা ছাত্রদের উপকার করিয়াছেন, কি অপকার করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন।

অলঙ্কারশাস্ত্রে "গুরুচণ্ডালী দোষ" একটা গুরুতর দোষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। "গুরুচণ্ডালী" অর্থে বিশুদ্ধ সাধুভাষার সহিত কথিত প্রাকৃত ভাষা যোগ করিয়া একটি বাক্য গঠন করা। আমরা যখন স্কুলে পড়িতাম, তখন আমাদের শিক্ষক মহাশয় এই দোষের যে উপমা আমাদিগকে দিয়াছিলেন, তাহা আমার এখনও মনে আছে। তিনি বলিয়াছিলেন, "রুদ্ধশ্বাসে ধাবমান মহেশচন্দ্র সহসা পদস্খলিত হইয়া বাতাহত কদলীর ন্যায় ধপাং কোরে পোড়ে গিয়ে কাদায় মাখামাখি হোলো"। এই বিশুদ্ধ ভাষার সহিত কথিত ভাষার সংযোগ "গুরুচণ্ডালী" বলিয়া অভিহিত হয়। নাটক বা উপন্যাসে ব্যক্তিবিশেষের কথোপকথনে এইরূপ ভাষা মার্জ্জনীয় হইতে পারে। কিন্তু লেখক যেখানে সাধুভাষায় লেখনী-মুখে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করিতেছেন, সেখানে কিছুতেই "গুরুচণ্ডালী" দোষ থাকা সমীচীন নহে। যে যেরূপ স্তরের লোক, তাহার মুখে সেই স্তরের ভাষাই শোভনীয়। বহুকাল পূর্ব্বে আমি একখানি নাটকে পড়িয়াছিলাম, রাণী তাঁহার দাসীকে আহ্বান করিলে—দাসী রাণীর সম্মুখে গিয়া করজোড়ে বলিল, "অয়ি ভর্ত্তৃদারিকে, দাসী উপস্থিত।"। আর এক স্থলে রাজার গুরু রাজার নিকট কোনও বহু-সন্তানবতী মহিলার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, "মাগীর একপাল ছেলে দেখে মনে হয়—মাগীর যেন ছারপোকার বিয়ান"। দাসীর মুখের ভাষা এবং রাজগুরুর মুখের ভাষার এই পার্থক্য দেখিয়া লেখকের বিচারশক্তির প্রশংসা করিতে হয় কি? কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকাল অনেক পুস্তকেই এইরূপ অদ্ভুত বিচারশক্তির পরিচয় পাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার শিশু পৌত্রদের জন্য একখানি শিশুপাঠ্য ছবির বই কিনিয়াছিলাম। সেই পুস্তকে ভূতের গল্পে দেখিলাম, লেখক ভূতের রূপবর্ণনাকালে বলিতেছেন, "ভূতের গায়ের রং যেন ধানসেদ্ধ হাঁড়ি—"। লেখকের বক্তব্য বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু "হাঁড়ির তলা" না বলিয়া তিনি যে শব্দটা ব্যবহার করিয়াছেন, সেরূপ শব্দ কোন বালকবালিকার মুখে শুনিলে তাহাদের অভিভাবকগণ তাহাদিগকে কঠোর শাসন করিয়া বলিয়া থাকেন, "ও কথা মুখে আনিতে নাই। ওরূপ অশ্লীল শব্দ ইতর লোকের মুখে শুনা যায়, খবরদার ওকথা মুখে আনিতে নাই।"

আজকাল গুরুচণ্ডালী দোষের এতই বাহুল্য হইয়াছে যে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, এদিকে কোন কোন লেখকের দৃষ্টির বড়ই অভাব। আমি আজই প্রাতঃকালে একখানি শিশুপাঠ্যপুস্তক পড়িতেছিলাম। সেই পুস্তকের বিজ্ঞাপনে দেখিলাম, লেখক "সত্য"র পরিবর্ত্তে

"সত্যি", "মিথ্যার" পরিবর্তে "মিথ্যে" "বাহিরের" পরিবর্তে "বাইরে", "ভিতরের" পরিবর্তে "ভেতরে" এইরূপ অনেক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অবশ্য গল্পে বর্ণিত কোনও লোকের মুখে এরূপ ভাষা চলিতে পারে, কিন্তু পুস্তকের বিজ্ঞাপনে কেন? বালক-বালিকাদিগকে এইরূপ ভাষা শিখাইলে কি তাহাদের ভাষাজ্ঞানের সাহায্য করা হয়? আমি অবশ্য একথা বলি না যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "সীতার বনবাসে" লিখিত "এই গিরির শিখরদেশ সতত সঞ্চরমাণ নবজলধরপটলসংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত হইয়া আছে" চালু হউক। এককালে এইরূপ সংস্কৃতবহুল, সমাস-সন্ধিতে সমাকীর্ণ ভাষার আদর ছিল। হয়ত কতকটা প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুগ বহুকাল হইল অতীতের অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। বঙ্কিম-যুগের প্রথম অবস্থায়ও কিছুকাল এইরূপ ভাষার প্রভাব ছিল। বঙ্কিমবাবুর রচিত প্রথমকালের পুস্তকগুলির সহিত তাঁহার শেষ বয়সের পুস্তকের ভাষার তুলনা করিলে উভয়প্রকার ভাষার পার্থক্য বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

সমাজের গতির সহিত ভাষার গতি অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। রামমোহন রায়ের গদ্য এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্য এক নহে। আবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্য এবং বঙ্কিমবাবুর গদ্য একরূপ নহে। কালক্রমে জটিল ভাষা ক্রমশঃ সরল ভাষায় পরিণত হয়। ভাষার এই গতি অনিবার্য। ইংরেজী সাহিত্যে, ফরাসী সাহিত্যে ও যাবতীয় সভ্যদেশের সাহিত্যে এইরূপ পরিবর্তনের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যে ভাষার এইরূপ পরিবর্তন হয় না, সে ভাষাকে "জীবিত ভাষা" বলা চলে না। তাহা "Dead Language" বা মৃত ভাষা। সংস্কৃত, জেন্দ, হিব্রু, গ্রীক্, লাটিন এ সমস্তই মৃত ভাষা। ঐ সকল ভাষার সাহিত্যে অমূল্য ও অপূর্ব্ব রত্নরাজি আছে সত্য, কিন্তু সেই সকল রত্ন প্রাচীন মৃত ভাষাকে জীবন্ত ভাষায় পরিণত করিতে পারে না। সংস্কৃত ভাষা সমাজের পরিবর্ত্তনের সহিত বদলাইয়া প্রাকৃত ও পালি ভাষার মধ্য দিয়া অবশেষে বর্ত্তমান বাংলা, উড়িয়া, মরাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি আধুনিক ভাষায় পরিণত হইয়াছে।

আজকাল অনেকের মুখে শুনিতে পাই, "প্রগতি সাহিত্য" বলিয়া একটা কথা প্রচলিত হইয়াছে। যখন ভাষামাত্রেই গতিশীল, তখন ভাষার পূর্ব্বে "প্রগতি" বিশেষণ ব্যবহারের সার্থকতা কি? আমরা কি কখনও বলি, "নদীতে তরল জল আছে"? জল বলিলেই ত তাহার তরলতা সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়। আজ যাহা "প্রগতি সাহিত্য", শত বৎসর পরেও কি তাহা "প্রগতি-সাহিত্য" বলিয়া বিবেচিত হইবে? তবে একটা কথা আমার মনে হয় যে, "প্রগতি সাহিত্য"ওয়ালাদের মধ্যে অনেকে আপনাদের অজ্ঞতা ঢাকিবার জন্য ব্যাকরণ-দুষ্ট শব্দকে প্রগতি-সাহিত্যের ভাষা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বহুকাল পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, ভাষা-সরস্বতী দেবতা, কঠোর সাধনা ভিন্ন কোনও দেবতার অনুগ্রহ লাভ হয় না। সুতরাং ভাষাশিক্ষার জন্যও কঠোর সাধনার প্রয়োজন। আমি যাহা লিখিব, তাহাই সাহিত্যে স্থান পাইবে, এ আশা দুরাশা মাত্র। যাহার অক্ষর-পরিচয় হইয়াছে সে অনায়াসে সকল কথাই লিখিতে পারে, কিন্তু তাহার লিখিত সকল কথাই কি সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য? দেবী-সরস্বতী কেবল যে জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাহা নহে; তিনি সঙ্গীতেরও দেবতা। তাই তিনি "বীণাপুস্তকরঞ্জিতহস্তা"; তাঁহার এক হস্তে পুস্তক, অন্য হস্তে বীণা। বীণার তারে অঙ্গুলি স্পর্শ করিবামাত্রই একটা ঝঙ্কার উঠে। কিন্তু যিনি বীণা বাদনে দক্ষ নহেন, তিনি বীণার তার স্পর্শ করিয়া ঝঙ্কার তুলিতে পারেন, কিন্তু তাহা সঙ্গীত নহে—তাহাতে রাগরাগিণীর চিহ্নমাত্রও থাকে না। বীণা-বাদন শিখিতে হইলে কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করিতে হয়। সেইরূপ সাদা কাগজে কালীর আঁচড় কাটিয়া কিছু লিখিলেই তাহা সাহিত্য হয় না, ইহার জন্যও কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা চাই।

যা দিনকাল পড়েছে তাতে প্রতিটি পয়সা বুঝে না খরচ করে উপায় নেই—সংসার চালানো এক দায়। সম্প্রতি আমার স্বামীর হঠাৎ একদিন বাজার করবার শখ হলো। ফিরলেন যখন তখন আমার ত মাথায় হাত! একটা বড় ডালডা বনস্পতির টিন এনে হাজির করেছেন!

আমি কিসে দুপয়সা বাঁচে তাই ভেবে সংসারের সব জিনিষ, মায় রান্নার জন্য স্নেহপদার্থ অবধি, সস্তায় খুচরো কিনছি, আর এদিকে ব্যবসাদার স্বামী আমার কিনে আনলেন বড় একটিন ডালডা বনস্পতি। বেহিসেবী আর কাকে বলে!

কিন্তু স্বামী ঠিক কাজই ক'রেছিলেন। পরে তাঁর সব কথা শুনে বুঝলাম যে রান্নার স্নেহপদার্থ সম্বন্ধেও অনেক কিছু শেখবার আছে…

"দেখ", স্বামী বললেন, "সংসারে আমাদের কাছে আমাদের তিনটি ছেলেমেয়ের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই। তাদের স্বাস্থ্যের দামই আমাদের কাছে সব চেয়ে বেশী। খোলা অবস্থায় খুব দামী স্নেহপদার্থেও ভেজাল চলতে পারে। তা ছাড়া তাতে ধুলোবালি ও মাছি, ময়লা পড়ার দরুণ তা দূষিত হয়ে যেতে পারে।"

"রান্নার ব্যাপারে শুধু একটি কাজ করলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, সেটি হচ্ছে শীলকরা টিনে স্নেহপদার্থ কেনা, তার ভেতর বীজাণু ঢুকতে পায় না, তাই তা সর্ব্বদা খাঁটি ও তাজা থাকে।" স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলাম "তা বেছে বেছে **ডালডা বনস্পতি** কিনলে কেন?" তিনি বললেন যে ডালডা বনস্পতির প্রস্তুতকারীরা বিশ বছর ধরে এই জিনিষ তৈরী করে হাত পাকিয়েছে। একেবারে উৎকৃষ্ট জিনিষ ছাড়া আর কিছুই ডালডা তৈরীর কাজে ব্যবহার হয় না। প্রতিটি জিনিষ আগে পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়, আর তা উৎকৃষ্ট না হ'লে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। ডালডা বনস্পতিতে এখন ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' দেওয়া হচ্ছে।

আপনাদের সুবিধার জন্য ডালডা বনস্পতি ১০, ৫, ২ ও ১ পাউণ্ড বায়ুরোধক শীলকরা টিনে বিক্রি করা হয়। ডালডা বনস্পতি সর্ব্বদা তাজা ও বিশুদ্ধ অবস্থায় পাবেন আর এতে সবরকম রান্নাই চমৎকার হয়, খরচও কম।

আমার স্বামী জোর দিয়েই বললেন "যে জিনিষ পেটে যায় তা নিশ্চিত বিশুদ্ধ হওয়া চাই।" আমাদের বাড়ীতে এখন শুধু ডালডা বনস্পতিই ব্যবহার হয়—আপনিও তাই করুন।

আপনার দৈনিক খাদ্যে স্নেহপদার্থের কি দরকার?

বিনামূল্যে খবর জানবার জন্য আজই লিখুন:

দি ডালডা
এ্যাডভাইসারি সার্ভিস
পোষ্ট বক্স ৩৫৩, বোম্বাই ১

গাছ মার্কা টিন দেখে কিনবেন

ডালডা বনস্পতি

রাঁধতে ভালো - খরচ কম

HVM. 211-X52 BG

নেতাজীর জীবনবাদ—অনিল রায়। অগ্রগামী সংস্কৃতি পরিষদ, ৪৭-এ রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা-২৬। পৃষ্ঠা ১০৬। মূল্য ১।০।

ভারতের মর্ম্মবাণী, ভারতীয় সাম্যবাদ, নেতাজীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ, ফ্যাসীবাদ, নেতাজী এবং নেতাজীর জীবনবাদের পটভূমিকা—এই পাঁচটি অধ্যায়ে বইখানি শেষ হইয়াছে। মহাত্মাজীর সহিত নেতাজীর মতভেদ এবং তদানীন্তন ঘটনাবলীর দরুন ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, নানা কারণে অনেকে নেতাজীকে ভুল বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু নেতাজীর প্রতি মহাত্মাজীর স্নেহ এবং মহাত্মাজীর প্রতি নেতাজীর শ্রদ্ধা শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। ভারতের ইতিহাসে নানা আদর্শের ঘাতপ্রতিঘাত চিরদিনই হইয়াছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামে এই বিচিত্র আদর্শ-সঙ্ঘাত গুরুত্বপূর্ণ। যুগসন্ধিক্ষণে নেতাজীর মত শক্তিমান পুরুষ এই বিভিন্নমুখী আদর্শের সমন্বয়বিধান করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তরুণ ভারতের নিকট তাঁহার জনপ্রিয়তা অতুলনীয়। সুভাষচন্দ্রের নিকট বিশ্বমানবতা খুবই প্রিয় ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি প্রাচীন ভারতের শাশ্বত আদর্শ বর্জ্জন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। মার্ক্সবাদের ঐহিক হিতসাধন যেরূপ তাঁহার জীবনবাদে সুস্পষ্ট, তেমনি মহাত্মাজীর আধ্যাত্মবাদও তাঁহার জীবনে স্থায়ী রেখাপাত করিয়াছে। আবার ফ্যাসীবাদীর শক্তিসাধনা এবং জাতীয়তাবাদও তাঁহার কর্ম্মসূচীতে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু এই সকল বিভিন্ন মতবাদ ও আদর্শের কোনটিই তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিতে পারে নাই। এইখানেই তাঁহার স্বকীয়ত্ব। সুভাষচন্দ্রের জীবনবাদে জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার বিশ্বপ্রেম স্বদেশপ্রেমের পরিণতি মাত্র।

"সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রদর্শনে একদিকে রয়েছে নাৎসীবাদের কতকগুলি উপাদান যথা: জাতীয়তাবাদ, সামরিক শৃঙ্খলা, স্বেচ্ছাসেবক-সংগঠন প্রভৃতি। তেমনি অন্যদিকে রয়েছে মার্ক্সবাদেরও উপাদান, যথা: সমাজতন্ত্র। এ ছাড়া রাষ্ট্রপ্রবর্ত্তিত সমাজ-পরিকল্পনা বা প্ল্যানিং একনায়কী রাষ্ট্র বা একদলীয় রাষ্ট্রশাসন, ভিক্টোরীয় গণতন্ত্রে আস্থাহীনতা প্রভৃতি মতবাদগুলি ফ্যাসীবাদ ও মার্ক্সবাদ এই দু'য়ের থেকে নেওয়া। এই সব উপাদানের সমন্বয় করে সুভাষ তাঁর রাষ্ট্রদর্শন গড়েছেন।" সুভাষচন্দ্রের মধ্যে যে ঐহিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় দেখা যায় তাহাকে মডার্নিজম ব আধুনিকতা বলা যায়। নেতাজী প্রত্যেক 'বাদ'কেই যথাযথ মূল্য দিয়াছেন, কোনটিকে পুরাপুরি বর্জ্জন বা গ্রহণ করেন নাই। এই সমন্বয়ের ভিত্তির উপরেই তিনি ভারতের সার্ব্বভৌম স্বাধীনতা-সৌধ গড়িতে চাহিয়াছিলেন। লেখক বলিয়াছেন, "মার্ক্সবাদ, গান্ধীবাদ, ফ্যাসীবাদ সকল মতবাদের আতিশয্যকে ছেড়ে ভারতবর্ষকে নেতাজীর পথে নূতন সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে। ই সমন্বয়ই এযুগের বাণী। এই বাণীই মনুষ্যত্বের বন্ধনমুক্তি ঘটাতে পারে নেতাজীর জীবনবাদই এই বন্ধনমুক্তির যুগ-দর্শন।

সুভাষচন্দ্র গান্ধীযুগের বিদ্রোহী তরুণসম্প্রদায়ের আপোষহীন মুক্তি-সংগ্রামের অপরাজেয় সৈনিক। স্বাধীন ভারতের তরুণেরা তাঁহার আদর্শে দেশগঠনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে নেতাজীর স্বপ্ন সফল হইবে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

১। ভাষাতত্ত্ব মঞ্জরী। ২। বেদপুরাণকাব্যে (পৃথিবী ও ভারতের ইতিহাস)—অধ্যাপক শ্রীরামপ্রসাদ মজুমদার, এম্-এ। গুমাডাঙ্গী রজনী গ্রন্থাগার, গুমাডাঙ্গী, পোঃ মুন্সিরহাট, হাওড়া। মূল্য যথাক্রমে এক টাকা ও দুই টাকা।

বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী, আর্যভাষার শাখা, বৈদিক ও পরবর্ত্তী সংস্কৃত, প্রাকৃত ও আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা, ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়মাবলী, রূপতত্ত্ব নানা ভাষার শব্দসাদৃশ্য—ভাষাতত্ত্ব সংক্রান্ত এই কয়টি বিষয়ের আভাস প্রথম পুস্তিকাখানিতে দেওয়া হইয়াছে। আভাসই বলিব, আলোচনা নহে;

লা ই ফ ব য়
সা বা ন

প্রতিদিন ময়লার বীজাণু
থেকে আপনাকে রক্ষা করে

ভারতে প্রস্তুত

L. 248-X52 BO
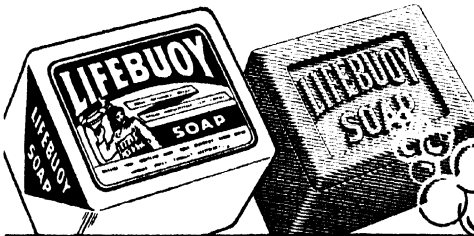
কতকটা তাড়াতাড়ি 'নোট' টুকিয়া রাখার মত। আশা করি, লেখক সুসংবদ্ধ বিস্তৃত আলোচনায় মনোনিবেশ করিবেন।

দ্বিতীয় পুস্তিকার বিষয়ও কৌতূহলোদ্দীপক। লেখক পড়াশুনা করিয়াছেন, কিন্তু ধৈর্য ধরিয়া বক্তব্য বিষয় গুছাইয়া বলিতে চেষ্টা করেন নাই। দশ পৃষ্ঠায় গ্রন্থের প্রথমাংশ সমাপ্ত; তাহার সহিত ভিন্ন আকারের আর কয়েকখানা পৃষ্ঠা কোনমতে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বিষয়ের গুরুত্ব এবং নির্ধারিত অর্থমূল্য (দুই টাকা) উভয় দিক বিবেচনা করিয়াই লেখকের রচনা ও পুস্তিকার বহিঃসৌষ্ঠবের প্রতি আরও যত্নবান হওয়া উচিত ছিল।

ভাবরূপা—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ২৲।

গ্রন্থকার নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন: "শ্রীমতী রাধা-বিষ্ণুপ্রিয়া-মীরা-করমেতি ও যশোধরা চরিত্রের ভাব লইয়াই তাহাকে রূপ দেওয়া হইল।" ইহাদের ভগবৎ প্রেমের আদর্শ কবির অন্তরে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে, তাই ইতিহাস ও ধর্মের প্রসঙ্গ কবিত্বমণ্ডিত হইয়াছে। রচনায় পরিণতিবান্ চিত্তের পরিচয় পাই।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে—স্বপনবুড়ো। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী। কলিকাতা-১২। দাম আড়াই টাকা।

১৩৫৯ সালে ভিয়েনাতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সম্মেলনে ভারতের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে আমন্ত্রিত হইয়া লেখক কে. এল. এম বিমানযোগে ইউরোপে যান। সমালোচ্য পুস্তকে তিনি ইটালী, অষ্ট্রিয়া এবং সুইজারল্যাণ্ড এই তিনটি দেশে তাঁহার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ছোটদের উপযোগী সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে দুইটি জিনিষ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের প্রতি লেখকের অনুরাগ, আর মানুষের উপর তাঁর ভালবাসা। অল্প কথায় এমন চমৎকার ভাবে তিনি নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, মনে হয় যেন সেগুলি নিপুণ হাতে হাল্কা তুলির টানে আঁকা ছবির মালা। কোথাও অপরিমিত রেখার বাহুল্য নাই, অনাবশ্যক রঙের প্রলেপে চমক লাগাইবার প্রয়াস নাই। বিদেশে শুধু গৃহে অথবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নয়, পথে ঘাটে ট্রেনে ট্রামে যেসকল নরনারীর সঙ্গে তাঁহার আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল তাহাদের কথাও তিনি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদির পার্থক্য সত্ত্বেও মানুষ যে মানুষের পরমাত্মীয়, দরদী মন থাকিলে পরকে আপন করিয়া লইতে যে বেশী সময় লাগে না, লেখকের পথের সঙ্গীদের আলাপে ও আচরণে তাহাই পরিস্ফুট হইয়াছে। বিশেষতঃ, স্নেহপরায়ণা 'অষ্ট্রিয়ার মাসিমা'কে তো আমাদের একান্ত আপনার জন বলিয়া মনে হয়।

শিশুর মত খোলা মন ও জাগ্রত কৌতূহল লইয়া লেখক বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। বিদেশী শিশুদের কথা বলিয়াছেন তিনি গভীর দরদের সহিত,
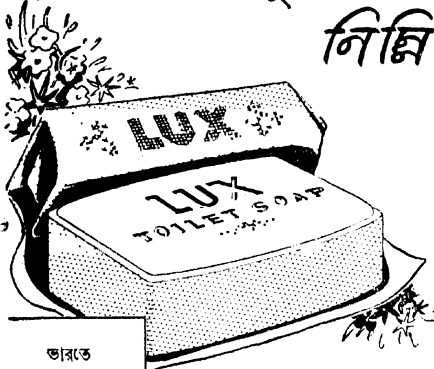
তাহাদের সঙ্গে মিশিয়াছেন তিনি তাহাদেরই একজন হইয়া, সেইজন্যই তাঁহার রচনায় যে আন্তরিকতার ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা মনকে মুগ্ধ করে। ভিয়েনার হাসপাতালে ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় চিকিৎসা-প্রণালীর বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি আমাদের দেশের শিশুদের চিকিৎসা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য।

বিদেশে গিয়াও লেখক দেশের ছেলেমেয়েদের ভুলিতে পারেন নাই, মাঝে মাঝে "সব পেয়েছির আসরে"র সোনার কাঠিদের স্মরণ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি লেখক আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের হাতেই তুলিয়া দিয়াছেন। যে আনন্দের প্রেরণায় তিনি এই ভ্রমণকথা রচনা করিয়াছেন, তাহা ছোটদের মনে সঞ্চারিত হইবে, ছবির রসে তাহারা তন্ময় হইয়া যাইবে। লেখকের বাহাদুরি এইখানে যে পুস্তকখানি ছেলে বুড়া সকল শ্রেণীর পাঠকের পক্ষেই উপভোগ্য হইয়াছে। অনেকগুলি পূর্ণপৃষ্ঠা ছবি এই পুস্তকের সৌষ্ঠব-বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

আরেক আকাশ—শ্রীঅমলা দত্ত। গ্রন্থাগার, পি-৩৮, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা-২৯। মূল্য ২৸০ আনা।

অধ্যাপক-স্বামী লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্‌সে কাজ করিতে চলিয়াছেন, লেখিকাও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে চলিয়াছেন—আড়াই বৎসরের মধ্যে পড়াশুনা সাঙ্গ করিয়া দেশে ফেরেন। এই সময়ের মধ্যে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউরোপের নাম-করা দেশগুলির বিশ্ববিদ্যালয়, তথাকার অধ্যাপকগণের শিক্ষাপ্রণালী, ইউরোপীয় ছাত্রগণের পাঠাভ্যাস এবং অধ্যাপক-ছাত্রের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। গৌণ উদ্দেশ্য—লণ্ডন সহ গোটা ইউরোপের জীবনধারার সহিত পাঠকের পরিচয় করাইয়া দেওয়া। 'পথের পাঁচালী' নামক প্রথম অধ্যায়ে আছে কলিকাতা হইতে বোম্বাই হইয়া এডেন ও পোর্ট সৈয়দ ছাড়াইয়া ভূমধ্যসাগর অতিক্রমপূর্ব্বক সোজা টিলবেরীতে পৌঁছনো এবং তথা হইতে টেনযোগে লণ্ডনে গিয়া লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে ডেরা স্থাপনের বর্ণনা। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়, তথা সারা ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপক, ছাত্র, পাঠাগার, শিক্ষাদান-প্রণালীর বর্ণনাপ্রসঙ্গে লেখিকা ক্লাসের 'লেকচার' অপেক্ষা টিউটো-রিয়াল ক্লাসগুলির প্রাধান্যের ও উৎকর্ষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'টার্ম্মের একদিনে'র কথা; 'ঋতুচক্রে' বিভিন্ন ঋতুর পরিবর্ত্তনে লণ্ডনের জীবনযাত্রার পরিবর্ত্তনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

'ইউরোপাও'-এ সুইজারল্যাণ্ডের আল্পস পাহাড়ের জেনেভা, লজান, ইণ্টারলাকেন প্রভৃতি বিলাস-আবাসগুলির বর্ণনা পড়িয়া রস পাঠকের চোখে অপরূপ রূপলোকের ছবি ভাসিতে থাকে। 'কাফে-রেস্তোরাঁ'য় ইউরোপের খাওয়া-দাওয়ার বর্ণনা, 'দোকান-পসারে' ইউরোপের দোকান-পাট চালানোর ব্যাপারে বিস্ময়কর নৈপুণ্য, 'লণ্ডনে ভারতীয়' নামক অধ্যায়ে ইউরোপে ভারতীয়গণের জীবনযাত্রাপ্রণালী নিখুঁতভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। 'মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারি' নামক অধ্যায়ে ইউরোপের শিল্পানুরাগ ও সৌন্দর্য্যপ্রীতি অকুণ্ঠিত প্রশংসার দাবি করে। 'স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার শিল্প ও ভাস্কর্য্যে' গ্রন্থকর্ত্রী লিখিতেছেন, ফ্রান্স ও ইটালী চিরদিনই শিল্পীর স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা দেশ, কিন্তু নরওয়ে ডেনমার্ক সুইডেনের শিল্পও কিছুমাত্র পশ্চাদ্‌পদ

দ্রুত-ফেনিল সানলাইট

না আছড়ে কাচলেও সাদা ও ঝকঝকে ক'রে দেয়

স্বামী হিসেবে সত্যিই আমি ভাগ্যবান কারণ আমার স্ত্রী আমার কাপড়-চোপড়ের বিশেষ যত্ন নেন—সানলাইট সাবানের সাহায্যে। সানলাইট সাবানের দ্রুত-উৎপাদিত ফেনা কাপড়ের সব ময়লা বার করে দেয়, **কাপড় আছড়াবার দরকার হয় না**। তার মানে আমার পয়সা বাঁচে, কারণ আমার কাপড়-চোপড় টেঁকে বেশী দিন।

সানলাইট সাবান দিয়ে সহজে ও তাড়াতাড়ি কাপড় কেচে আপনার আমোদ প্রমোদের অবসর বাড়ান। সানলাইট সাবানের কার্যকরী ফেনা কাপড়ের ময়লাকে ঝেঁটিয়ে বার করে দেয়, আর রঙীন কাপড়কে উজ্জ্বল ও ঝকঝকে করে তোলে।

S. 220-X52 BG

বলা যায় না। 'জনশিক্ষা'য় বলেন, মিউজিয়াম, চিত্রশালা, গ্রন্থাগার, খবরের কাগজ ও রেডিওর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকল্পে ইউরোপের অপরিসীম অধ্যবসায় ও কর্তব্যবুদ্ধি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক লাস্কির অধ্যাপনা ও পরিহাসপ্রিয়তা, ইণ্ডিয়া হাউসে উচ্চ পদে ভারতীয়গণের এবং কেরানী ও আর্দালির পদে ইংরেজের সংখ্যাধিক্যের প্রসঙ্গ, ইউরোপে প্রবাসী আগা খাঁর সহিত এভিয়-লে-বেয়ঁাতে লেখিকার সাক্ষাৎ ও আলাপ উপভোগ্য। লিখনভঙ্গী ও বর্ণনাকৌশলে গ্রন্থখানি উপন্যাসের মতই সুখপাঠ্য। প্রচ্ছদপটের চিত্রটিতে শিল্পীর দৃষ্টিতে ইউরোপের রূপ পরিকল্পিত হইয়াছে।

রক্তকমল—শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী। বিমলা পাবলিশিং হাউস, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ। মূল্য ১।০।

যীশুখ্রীষ্টের জীবনের কতিপয় প্রধান প্রধান ঘটনা অবলম্বনে রচিত কয়েকটি সুললিত ও সুমধুর কবিতার সমষ্টি। হীনতম মানবসন্তানও মানুষের চোখে ঘৃণ্যতম পাপীর প্রতি অনন্ত প্রেম এবং অনুরাগই মহামানব খ্রীষ্টকে কোটি কোটি হৃদয়ের রাজা করিয়াছে। যুগোপযোগী ভাবে ও সুরে অনুপ্রাণিত কবিতাগুলি পড়িলে চিত্ত এক মহান উন্নত ভাবরসে আপ্লুত হয়। 'কুঞ্চিকা'য় খ্রীষ্ট সম্বন্ধে বাইবেলোক্ত ঘটনা ও কাহিনীগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া গ্রন্থকার পাঠকের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। কবি ইতিপূর্বে 'যুগশঙ্খ' 'বিরহী মাধব' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ লিখিয়া কবিপরিচিতি লাভ করিয়াছেন। এই কাব্যগ্রন্থখানি পড়িয়াও পাঠক পরিতৃপ্ত হইবেন।

কাব্যকাকলি—শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক। সাহিত্যতীর্থ, ৬৭ পাথুরিয়াঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ১৲।

সাহিত্যজগতে নবাগত তরুণ উদীয়মান কবিকে স্বাগত অভিনন্দন জানাইতেছি। তাঁহার কাব্য পুরাতন ছন্দে ও সনাতন ভাবধারায় রচিত হইলেও ইহাতে আধুনিকতম প্রগতিবাদী সুর প্রতিধ্বনিত হইতেছে, নূতন ও পুরাতন দুইয়ের সমন্বয়ে কবি পাঠককে তাঁহার প্রথম সৃষ্টি উপহার দিয়াছেন। কিন্তু বর্ণবিন্যাসে, শব্দচয়নে ও ভাবপ্রকাশে একটি ত্রুটি চোখে পড়িল। কবিতাগুলিতে আধুনিকতম কৃতিত্ব দেখাইতে গিয়া স্থানে স্থানে অস্বাভাবিক দোষ আসিয়া পড়িয়াছে, ভবিষ্যতে কবি ইহা কাটাইয়া উঠিবেন আশা করি। তাঁহার কাব্য উত্তরোত্তর নব নব সুরে ও ছন্দে সম্পূর্ণতালাভ করুক ইহা বাঞ্ছনীয়।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

দিনে দিনে আরও নির্ম্মল, আরও লাবণ্যময় ত্বক্

ক্যাডিলযুক্ত রেক্সোনাকে আপনার জন্যে এই যাদুটি করতে দিন

রেক্সোনার ক্যাডিল্‌যুক্ত ফেনা আপনার গায়ে আস্তে আস্তে ঘ'ষে নিন ও পরে ধুয়ে ফেলুন। আপনি দেখবেন দিনে দিনে আপনার ত্বক্ আরও কতো মস্‌ণ, কতো কোমল হচ্ছে—আপনি কতো লাবণ্যময় হ'য়ে উঠছেন।

* ত্বকপোষক ও কোমলতাপ্রদ কতকগুলি তৈলের বিশেষ সংমিশ্রণের এক মালিকানী নাম

R.P. 118-50 BG

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারী লিঃএর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত

ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দশ আনা।

বাংলা ১২৭১ সালের ২৬শে বৈশাখ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা, পরে আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে 'ব্রহ্মবন্ধু সভা'র অধিবেশনে উক্ত বিষয়ে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতাটি পূর্ব্বেও অন্যত্র মুদ্রিত হইয়াছে; সম্প্রতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এখানি পুনরায় স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করিয়া পাঠক-সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। নামেই প্রকাশ, ব্রাহ্মসমাজের প্রথম পঁচিশ বৎসরের বৃত্তান্ত ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। এই বৃত্তান্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষীভূত, কাজেই স্বল্পপরিসরে হইলেও পুস্তিকাখানির ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। 'জ্ঞান-প্রীতি-অনুষ্ঠান' ব্রাহ্মধর্ম্মের এই নূতন আদর্শ দ্বারা সেযুগের যুবকগণ উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। "হিন্দু ধর্ম্মকেই উন্নত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে পরিণত করিতে হইবে", "ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশকে একত্রিত করিবার জন্য সংস্কৃত-রজ্জু চাই"—প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বেকার এই সব উক্তির যাথার্থ্য আজও আমরা অনুভব করি। পুস্তিকাখানি বাঙালী মাত্রেরই পঠনীয়।

সমবায় নীতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিক্ষা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭। মূল্য যথাক্রমে আট আনা এবং তিন টাকা।
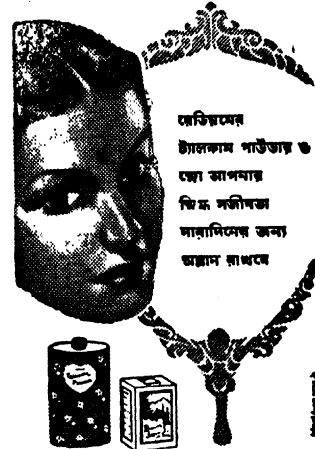
রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর স্মৃতি-পূজা হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান বৎসরেও হইয়া গিয়াছে। বাঙালী-সাধারণের মধ্যে, কি বঙ্গদেশে কি অন্যত্র ক্রমশঃ যেরূপ ভাবে এই রবীন্দ্র-পূজা ব্যাপ্তিলাভ করিতেছে তাহাতে অনেকে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন। কেহ কেহ ইহাকে 'রবীন্দ্র-বিলাস' বলিয়াও উক্তি করিয়াছেন। আমরা কিন্তু এরূপ ব্যাপ্তিলাভে আদৌ বিস্ময়াবিষ্ট হই নাই, কিংবা 'রবীন্দ্র-বিলাস' বা ঐরূপ কোন ব্যঙ্গোক্তিরও সমর্থন করি না। রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শ যতই

সাধারণ্যে প্রকটিত ও প্রচারিত হইবে, বাঙালী জাতি যত বেশী করিয়া ইহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবে ততই রবীন্দ্র স্মৃতি-পূজা ব্যাপকতা লাভ করিবে। কারণ রবীন্দ্র-প্রতিভা শুধু কাব্য, উপন্যাস, গল্প বা নাটকেই নিবদ্ধ নয়—অবশ্য এ সমুদয়ের ভিতর দিয়াও তিনি বঙ্গচিত্তকে উদ্বোধিত করিয়াছেন, কিন্তু জাতির প্রতিটি সমস্যা, প্রতিটি অভাব, প্রতিটি দুর্গতি তাঁহার জীবন-বীণার তারে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। আর এসকলের সমাধানে এবং নিরাকরণে তাঁহার সমুদয় শক্তি—বিশেষ করিয়া মননশক্তি সর্ব্বপ্রকারে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। আধুনিক পরিভাষায় যাহাকে বলে 'রচনাত্মক কার্য্য', রবীন্দ্রনাথ লেখনীমুখে তাহার ভাবাদর্শ ব্যক্ত করিয়াছেন; আর এই ভাবাদর্শ ব্যক্ত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, স্বীয় সাধ্যমত তাহা কর্ম্মে রূপায়ণেও তিনি প্রতিনিয়ত তৎপর ছিলেন। তিনি কবি, কিন্তু তিনি শুধু ভাবের আকাশে উড়িয়া বেড়ান নাই; ওয়ার্ডসওয়ার্থের চাতক পাখীর মত মর্ত্ত্যের দিকেও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। এই কারণেই তিনি জাতির চিত্তকে জয় করিয়াছেন, সাধারণের সঙ্গে একাত্ম হইয়া উঠিতেছেন। যতই দিন যাইবে ততই এই একাত্মতা বেশী করিয়া পরিস্ফুট হইবে।

আলোচ্য পুস্তক দুইখানি রবীন্দ্রনাথের এই 'রচনাত্মক' দিকটির প্রতিই বিশেষভাবে আলোকপাত করিতেছে। সম্প্রতি 'সমবায়' আন্দোলনের জয়ন্তী হইয়া গেল। কিন্তু যখন এদেশে সমবায়ের কথা কেহ ভাবে নাই, কর্ম্মে রূপায়ণ তো দূরের কথা, সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথ এবিষয়ে লেখনী-ধারণ করিয়াছিলেন এবং নিজ জমিদারীতে ইহার প্রবর্ত্তনে তৎপর হইয়াছিলেন। 'সমবায়' পুস্তিকাখানিতে বিভিন্ন সময়ে সমবায়ের উপর লিখিত রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি প্রবন্ধ (পরিশিষ্ট সমেত) সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি পূর্ব্বেও হয়ত বিভিন্ন পত্রিকায় অনেকে পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু একত্র সমাবেশহেতু 'সমবায়' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত, বাংলার জনসাধারণ—কৃষকশ্রেণীর মধ্যে ইহার বহুল প্রচারে তাঁহার আগ্রহ, বিভিন্ন দেশের তুলনায় এখানে ইহার অত্যাবশ্যকতা প্রভৃতি নানা বিষয় স্বল্প সময়ে জানিবার সুযোগ ঘটিয়াছে; বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহের শততম গ্রন্থরূপে এখানি প্রকাশ করিয়া বিশ্বভারতী বাংলাভাষী মাত্রেরই প্রশংসা অর্জ্জন করিলেন। স্বাধীন ভারতে সমবায়ের আদর্শ পল্লীগত হইলে আশু মঙ্গল। আজকাল যে 'কম্যুনিটি প্রোজেক্ট'-এর কথা শোনা যাইতেছে, তাহারও বীজ রবীন্দ্রনাথের কোন কোন লেখায় পাইতেছি।

দ্বিতীয় গ্রন্থ—'শিক্ষা' সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা আবশ্যক করে না। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সত্যকার শিক্ষাব্রতী। ১৮৯২ সন হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি বাঙালী তথা ভারতবাসীর শিক্ষা সম্বন্ধে শুধু আলোচনাই করেন নাই, ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, শ্রীনিকেতন প্রভৃতি স্থাপন করিয়া স্বীয় ভাবাদর্শ—যাহা ছিল ভারতীয় ভাব ধারণারই সুষ্ঠ প্রকাশ—কর্ম্মে রূপায়িত করিয়া গিয়াছেন। 'শিক্ষা' প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩১৫ সালে। এখানি ইহার পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। ইহাতে বাংলা ১২৯৯ সাল হইতে ১৩৪৩ সাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়ে রচিত ও প্রদত্ত তেইশটি প্রবন্ধ এবং ভাষণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এগুলির মধ্যেও কেহ কেহ কোন কোনটি বা অনেকগুলি ইতিপূর্ব্বেই হয়ত পড়িয়া থাকিবেন। কিন্তু ইহার

সমুদয় বা কোন কোনটি এখন নূতন করিয়া পাঠ করিলেও আমাদের উপলব্ধি হইবে যে, প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা আমাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন, আজিও তাহা সম্পূর্ণ নিরাকৃত হয় নাই। বরং কোন কোনটি বিশাল সমাজ-দেহকে বিষাক্ত করিয়া নিয়ত ক্ষয়ের দিকেই লইয়া যাইতেছে। শিক্ষার আদর্শ এবং প্রণালী আমাদের ছেলেমেয়েদের 'মানুষ' করিয়া তুলিবার পক্ষে নিতান্তই অনুপযুক্ত ও অযথেষ্ট। মানসিক শক্তির বিকাশ, চরিত্রগঠন, সমাজ-কল্যাণ—যে শিক্ষায় এবংবিধ বিষয়সমূহের স্ফূর্ত্তিলাভ না হইল তাহা শিক্ষার পর্য্যায়েই পড়ে না। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমরা নিজেদের একাত্ম করিয়া ভাবিতে শিখি নাই। জাতির বর্ত্তমান প্রধানতম সমস্যা—শিক্ষার আদর্শ স্থাপন এবং প্রণালী নির্দ্ধারণ। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা আমাদের বিশেষ কাজে আসিবে নিঃসন্দেহ। রবীন্দ্রনাথ-কথিত বিশেষ বিশেষ বিষয়—যেমন শিক্ষার বাহন প্রভৃতি আলোচনার যোগ্য তো বটেই, কিন্তু আজ বেশী করিয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে ঐ দুইটি। আর সময় নাই; আজই আমাদের শিক্ষার হালচাল পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিতে হইবে। জাতির কিশোরসমাজ আমাদের নিকট আজ এই দাবিই করিতেছে। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শ আমাদের পথনির্দ্দেশক হোক্। 'শিক্ষা'র বহুল প্রচার কাম্য। অ-বঙ্গ-ভাষীও যাহাতে ইহার বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচয় লাভ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

নবযুগের বাংলা (প্রথম অংশ, দ্বিতীয় অংশ)—বিপিনচন্দ্র পাল। যুগযাত্রী প্রকাশক লিঃ, ৪১-এ বলদেও পাড়া রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য প্রতি অংশ এক টাকা।

'বিপিনচন্দ্র রচনাবলী'র অন্তর্গত উক্ত পুস্তক ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম অংশে—বাংলার বৈশিষ্ট্য, যুগ-প্রবর্ত্তক রামমোহন ও ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগ: যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য; এবং দ্বিতীয় অংশে—ব্রাহ্মসমাজ ও দেবেন্দ্রনাথ, ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রহ্মানন্দ, ব্রাহ্মসমাজ ও স্বাধীনতার সংগ্রাম (প্রথম অধ্যায়) ও ঐ (দ্বিতীয় অধ্যায়) প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি প্রথমে মাসিকপত্রে বাহির হইয়াছিল। সকল প্রবন্ধই, মায় গিরিশচন্দ্রের নাট্য-প্রতিভা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঁচ অংশে পাঁচ মাসের মধ্যে বাহির করিতে প্রকাশকগণ মনস্থ করিয়াছেন। মনস্বী বিপিনচন্দ্র পালের বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ বিভিন্ন মাসিক পত্রে ছড়াইয়া আছে। এসমুদয় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে একটি সত্যিকার অভাব বিদূরিত হইবে, সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মনন-সাহিত্যও বিশেষ সমৃদ্ধ হইবে। পুরাতন মাসিক পত্র দুষ্প্রাপ্য, সাধারণের পক্ষে সহজে পড়িতে পাওয়া একরূপ অসম্ভব। এরূপ অবস্থায় বাঙালী পাঠকমাত্রেই এই প্রয়াসকে অভিনন্দিত করিবেন। বিপিনচন্দ্রের মনস্বিতা কত প্রগাঢ় ও ব্যাপক, তাঁহার প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে তাহা সম্যক্ উপলব্ধি হয়। বাংলাভাষী পাঠকসমাজ 'বিপিনচন্দ্র রচনাবলী'র অন্তর্গত পুস্তকসমূহ পাঠে অবহিত হইলে আমরা নিজেদের জানিতে বুঝিতে পারিব। ইহা বর্ত্তমানে একান্ত আবশ্যক। আত্মপ্রত্যয় এবং দেশজ্ঞান স্বাধীনতা পথ-যাত্রীদের প্রধানতম সম্বল। এই রচনাবলীর বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। একটি কথা সঙ্কলয়িতাদের সবিনয়ে নিবেদন করিব। কোন্ প্রবন্ধ কোন্ মাসিক-পত্রে কবে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার নির্দ্দেশ থাকিলে ভাল হয়

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

দেশ-বিদেশের কথা

আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির সম্বর্দ্ধনা

গত ১৭ই বৈশাখ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিষ্ণুপুর শাখার কতিপয় সভ্য বাঁকুড়া গিয়া আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়কে সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে আচার্য্য যোগেশচন্দ্রকে একটি মানপত্র দেওয়া হয়। ঐ দিনই তাঁহার সম্মতিক্রমে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখার মিউজিয়মটির নামকরণ করা হয়—"যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন।" পুরাকৃতি ভবন কথাটি আচার্য্য বিদ্যানিধি মহাশয় কর্তৃক উদ্ভাবিত। উক্ত মিউজিয়মে সংরক্ষণের জন্য আচার্য্য যোগেশচন্দ্র একটি "সূর্য্যমূর্ত্তি" দান করেন।

ক্ষিতীশ মূক-বধির বিদ্যালয়, রাঁচি

রাঁচির ক্ষিতীশ মূক-বধির বিদ্যালয় একটি বিশিষ্ট জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। বিহার প্রদেশে মূক-বধিরের সংখ্যা প্রায় ২৬০০০,

রাঁচি মূকবধির বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র ও কর্ম্মীবৃন্দ। মধ্যস্থলে সম্পাদক শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দত্ত এম-এসসি (উপবিষ্ট বাম দিক হইতে তৃতীয়)

তন্মধ্যে কয়েক হাজার মূক-বধির বালক বালিকা বিদ্যালয়ে প্রেরণযোগ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সরকার ইহাদের উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আশানুরূপ অবহিত নন। ১৯৩৮ সনে স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল ছোটনাগপুর মূক-বধির বিদ্যালয়। বর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত ক্ষিতীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের নামানুসারে ইহার নূতন নামকরণ হইয়াছে। মন্ত্রী মহোদয়গণ, শাসন-অধিকর্ত্তা, শিক্ষা-অধিকর্ত্তা, কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, বিদ্যালয়ের পরিদর্শক প্রভৃতি এই প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়া

রাঁচি ক্ষিতীশ মূক-বধির বিদ্যালয়ের শিল্পবিভাগ

এখানকার কর্ম্মপ্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ছোটনাগপুর আদিবাসী-সম্প্রদায়ের শ্রীসহরাই টিরকী নামক জনৈক আদিবাসী শিক্ষক ১৯৩৮ সন হইতে এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে মূক-বধির শ্রীমতী থুলিয়া টোপো অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতেছেন। বর্ত্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যা ৩০ জন। লেখাপড়া ছাড়া ছাত্রগণকে কাটা কাপড়ের কাজ, তাঁতবোনা, সূতাকাটার কাজ, কাঠের কাজ ও চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দেওয়া হয়। ক্ষিতীশচন্দ্র বসুর সহকর্ম্মী শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দত্ত, এম-এসসি মহাশয়ের অক্লান্ত ও নিঃস্বার্থ কর্ম্মপ্রচেষ্টায় এই বিদ্যালয়ের একটি নিজস্ব গৃহনির্ম্মাণ সম্ভব হইয়াছে।

সমগ্র ছোটনাগপুর বিভাগে ইহাই মূক-বধিরদের একমাত্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, কিন্তু বিহার সরকার ও রাঁচি পৌরসভার নিকট হইতে ইহা যে সাহায্য পাইয়া থাকে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম।

সরকার এবং জনসাধারণ সকলেরই এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে মনোযোগী হওয়া উচিত।

প্রবাসী বাঙালী সম্মেলন পাঠাগার, কসৌলী

হিমালয় পর্ব্বতের উপরিস্থিত ক্ষুদ্র ফৌজী ষ্টেশন কসৌলীতে প্রবাসী বাঙালীর সংখ্যা নগণ্য, তথাপি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির

কসৌলী, বাঙালী সম্মেলন পাঠাগারের উৎসবে সমবেত মহিলা, পুরুষ ও বালক-বালিকাগণ

সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবার জন্য কসৌলীতে 'প্রবাসী বাঙালী সম্মেলন পাঠাগার' নামক প্রতিষ্ঠানে গত বারো বৎসর ধরিয়া

কসৌলী-প্রবাসী বাঙালী শিল্পী-নির্ম্মিত সরস্বতী মূর্ত্তি

চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের গ্রন্থরাজিতে সমৃদ্ধ, সাময়িকপত্রাদিও এখানে নিয়মিত ভাবে রাখা হয়। কসৌলী-প্রবাসী বাঙালী সম্মেলন পাঠাগারের উত্তোগে "বাণী অর্চনা" উৎসব সুষ্ঠু ভাবে উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে।

পূর্ণিমা সম্মেলন

গত ৫ই বৈশাখ সন্ধ্যায় বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী হলে বাণীমন্দির সঙ্গীত সমাজ, সাহিত্যসভা ও তরুণসঙ্ঘের উত্তোগে পূর্ণিমা সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু প্রথমে মাঙ্গলিক উচ্চারণ করিয়া সভার উদ্বোধন করেন। ইহার পর শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তৃতার পর সভাপতি মহাশয় সময়োপযোগী একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। তিনি তাঁর ভাষণে বর্ত্তমান সাহিত্য ও শিল্পের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া বাঙালী তরুণ-সম্প্রদায়কে সৃজনধর্মী সাহিত্যসৃষ্টির জন্য আবেদন জানান। অতঃপর বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ সান্যাল ধ্রুপদ ও ধামার গাহিয়া সকলের তৃপ্তিবিধান করেন, তাঁহার বৈশিষ্ট্য এবং মাধুর্য্যপূর্ণ সঙ্গীত সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করে। সঙ্গীত-আসরে বহু গায়ক এবং বাদক যোগদান করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। সকলের সহযোগিতায় পূর্ণিমা সম্মেলনের অনুষ্ঠানটি বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়।

পূর্ণিমা সম্মেলনের অধিবেশন। মাইকের সামনে উপবিষ্ট শ্রীমন্মথমোহন বসু, তাঁহার বাম পার্শ্বে—সভাপতি শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি

চিত্রশিল্পী শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়

সম্প্রতি মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত "অল ইণ্ডিয়া খাদি, স্বদেশী এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এগজিবিশনে"র কলাবিভাগে প্রদর্শিত "অবসরপ্রাপ্ত কাপ্তান" নামক প্রতিকৃতি-চিত্রের জন্য মাদ্রাজপ্রবাসী শিল্পী

শিল্পী শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন রায় প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ইনি প্রখ্যাত ভাস্কর ও শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর একজন কৃতী ছাত্র। শ্রীহট্ট জেলার সমিপুর গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান।

হাটের পথে [শিল্পী—মণীষী দে
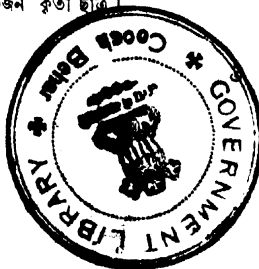
ভ্রম সংশোধন

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১ : রঙীন চিত্র "শ্রীচৈতন্য ও বাসুদেব সার্ব্বভৌম"-এর শিল্পী 'শ্রীবীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়' স্থলে 'শ্রীবীরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়' পড়িতে হইবে।

: ১৫৯ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ৩য় পংক্তির "*" হইবে না। "*" চিহ্নিত নিম্নের পাদটীকাও বর্জ্জনীয়।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

প্রবাসী
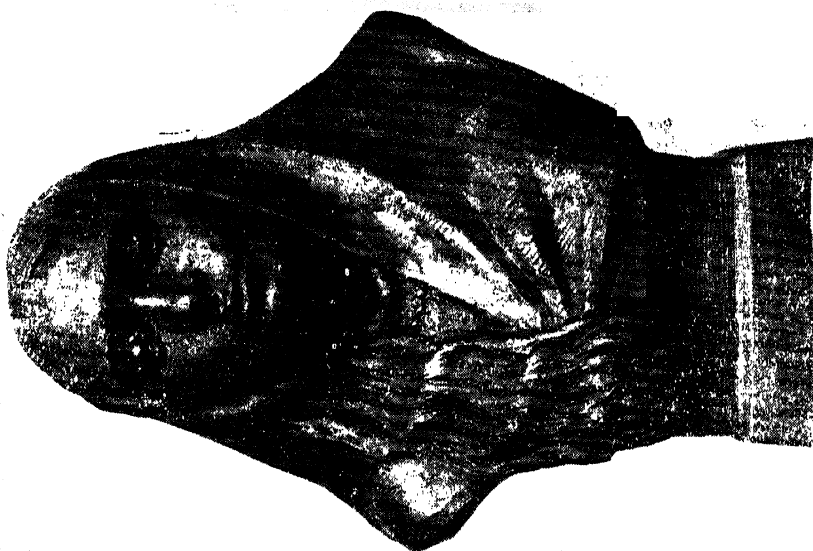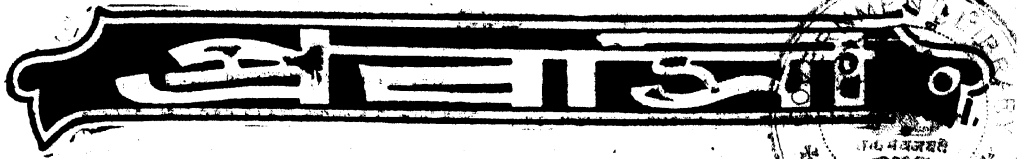
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৪শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৬১

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভাক্রা-নাঙ্গাল

ইতিহাসের স্রোতের মধ্যে অবস্থিত যাহারা তাহাদের পক্ষে স্রোতের গতি, লক্ষ্য বা পরিমাণ অনুমান করা দুরূহ। আমরা—ভারতবাসীরা—কতকটা সেইরূপ অবস্থায় রহিয়াছি। বর্ত্তমান বা অতি-নিকট ভবিষ্যতের বাহিরে দৃষ্টিক্ষেপ করিবার অবসর, ক্ষমতা ও বিচারবুদ্ধি আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেরই আছে। আজিকার ব্যক্তিগত সমস্যাই আমাদের এরূপ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে যে, দূরস্থ বা ভিন্ন ক্ষেত্রস্থ সমস্যা ও তাহার সমাধানের চিন্তাই আমাদের আয়ত্তের বাহিরে। ইহার নিদর্শন আমরা সম্প্রতি পাইয়াছি।

পঞ্জাবের দুইটি প্রধান উর্দ্দ দৈনিক "মিলাপ" ও "প্রতাপ" দেশবিভাগের পর লাহোর হইতে ভারতে চলিয়া আসে এবং আসিবার পর হইতেই পণ্ডিত নেহরুর মন্ত্রীসভার কার্য্যাবলীর তীব্র সমালোচনা, নিন্দা ও বিদ্রূপ সমানে চালায়। মাঝে ঐ মন্তব্য এতই বিষাক্ত হয় যে, ঐ দুই পত্রিকার উপর কর্ত্তৃপক্ষ কঠোর হস্তক্ষেপ করেন। অবশ্য সেই হস্তক্ষেপ স্থায়ী হয় নাই, কেননা সংবাদপত্র-জগৎ ঐরূপে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপে চঞ্চল ও মুখর হইয়া উঠে ও ফলে ঐ দুইটি সংবাদপত্রের মতামত প্রকাশের বাধা সরাইতে কর্ত্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়াছিলেন।

সম্প্রতি ভাক্রা-নাঙ্গাল বাঁধ ও সেচপ্রণালীর প্রথম অংশের উদ্বোধন হইয়াছে। উক্ত বাঁধ ও সেচপ্রণালী এবং তাহার আনুষঙ্গিক বিদ্যুৎ-উৎপাদন ব্যবস্থার পূর্ণ বিবরণ, যাহা পূর্ব্ব-পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভীমসেন সাচার তাঁহার বক্তৃতায় দিয়াছেন, আমরা অন্যত্র দিলাম।

ভাক্রা-নাঙ্গালের সেচপথে জল চলিবার সঙ্গে সঙ্গেই "মিলাপ" ও "প্রতাপ" সুর বদলাইয়াছেন। দুই পত্রিকাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে পঞ্জাব, পেপসু ও রাজস্থানের সর্ব্বাপেক্ষা জটিল, মরণ-বাঁচনের সমস্যার এইরূপ সমাধান পণ্ডিত নেহরুর শাসনতন্ত্র কোনও দিনই করিতে পারিবে। "মিলাপ" লিখিয়াছেন, "যখন পণ্ডিত নেহরু কোণঠাসা হইয়া আবেদন করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে দশ বৎসর সময় দেওয়া হউক, তখন আমরা বিদ্রূপ করিয়া ঐ আবেদনকে উড়াইয়া দিয়াছিলাম। আজ সাত বৎসরও পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু যাহা দেখিতেছি তাহা স্বপ্নাতীত।" ভাক্রা-নাঙ্গাল অঞ্চল পূর্ব্ব-পঞ্জাবের অন্তর্গত, অথচ ঐ প্রদেশেরই দুই প্রধান সংবাদপত্র এইরূপে বিস্মিত হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায় আমাদের কূপমণ্ডুক অবস্থার প্রকৃত রূপ।

ভাক্রা-নাঙ্গাল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অংশমাত্র। ঐ পরিকল্পনা পূর্ণ রূপ ধারণ করিলেই যে দেশের ও দশের সকল সমস্যার সমাধান হইবে এ কথা কেহই বলে না। তবে যাঁহারা শুধুমাত্র নেতিবাদ ও নিন্দাবাদের আশ্রয় লইয়া উচ্চকণ্ঠে নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়া থাকেন ভাক্রা-নাঙ্গাল তাঁহাদের অজ্ঞতার কিছু প্রমাণ দিয়াছেন।

জগদ্বিখ্যাত মার্কিন বৈজ্ঞানিক টমাস এলভা এডিসন বলিয়াছিলেন, "মানুষের জগতে এমন কোনও সমস্যা আসিতে পারে না যাহার সমাধান মানুষ উদ্যোগ, পরিশ্রম ও বুদ্ধির সাহায্যে করিতে পারে না।" ভাক্রা-নাঙ্গাল ঐ উক্তির উপর আলোকপাত করিতেছে।

দেশবিভাগের পূর্ব্বে পূর্ব্ব-পঞ্জাব অঞ্চল খাদ্যশস্য ইত্যাদিতে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল না। বরঞ্চ সেখানে কিছু অভাবই ছিল। অথচ আজ পূর্ব্ব-পঞ্জাবে গম নয় টাকা মণ, ডাল এগার টাকা হইতে তের টাকা মণ, খাঁটি ঘি সাড়ে তিন টাকা সের, সরিষার তৈল এক টাকা চারি আনা সের, দুধ টাকায় সওয়া ছয় সের। অর্থাৎ, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় ঐ দেশ খাদ্যপূর্ণ ও সস্তার অঞ্চল। ইহার পিছনে আছে পঞ্জাবী—বিশেষতঃ পশ্চিম-পঞ্জাব হইতে আগত উদ্বাস্তু পঞ্জাবী—চাষী ও শ্রমিকের পরিশ্রমশীলতা, আত্মনির্ভরতা ও উদ্যোগ। ভিক্ষাবৃত্তি তাহাদের নিকট ঘৃণ্য। সুতরাং ভাক্রা-নাঙ্গালের জলসেচ ও বিদ্যুৎ-সরবরাহ তাহাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিয়া দিবে তাহারা বিশ্বাস করিতেছে এবং ঐ বিশ্বাসের প্রতিচ্ছায়া আমরা পাই "মিলাপ" ও "প্রতাপে"র সম্পাদকীয় স্তম্ভে।

ভাক্রা-নাঙ্গালের সার্থকতার আর একটি প্রমাণ পাকিস্থানী মুসলীম লীগ সরকারের তীব্র গাত্রদাহ। ঐ বাঁধ, সেচ-প্রণালী ও বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র যখন পূর্ণ রূপ ধারণ করিবে তখন উত্তর-ভারত কিরূপ সবল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে তাহার পরিচয় উহাতেই পাওয়া যায়। ভাক্রা-নাঙ্গাল সমস্ত ভারতের আলোকস্তম্ভ।

চু-এন-লাই-নেহরু আলোচনা

গত মাসে রাজনৈতিকক্ষেত্রে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। একটি নয়াদিল্লীতে অন্যটি ওয়াসিংটনে। নয়াদিল্লীর আলোচনাই ভারতের ভবিষ্যৎ হিসাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। চীনের প্রধানমন্ত্রীর এদেশে আগমন ও দীর্ঘকাল আলোচনা করা এই দুই ব্যাপারই বিশ্ব-পরিস্থিতির উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। তবে তাহার প্রত্যক্ষ ফল আমাদের গোচরীভূত হইবার সময় হয়ত এখনও আসে নাই।

চু-এন-লাই-নেহরু আলোচনা সম্পর্কে যে যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ইন্দোচীনের যুদ্ধ-বিরতি সম্পর্কে জেনেভা আলোচনায় যে কিছু অগ্রগতি হইয়াছে, উভয় প্রধানমন্ত্রী সন্তোষসহকারে তাহা লক্ষ্য করেন। তাঁহারা ঐকান্তিকতার সহিত আশা করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবে এবং উহার ফলে উপরোক্ত অঞ্চলের সমস্যা-সমূহ সম্পর্কে একটা রাজনৈতিক মীমাংসা হইবে।

উভয় প্রধানমন্ত্রীই প্রস্তাব করেন যে, ইন্দোচীনে রাজনৈতিক মীমাংসার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, সুসংহত ও স্বতন্ত্র রাজ্যসমূহ গঠন করা। এই রাজ্যগুলিকে আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইবে না এবং এই রাজ্যগুলিতে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া চলিবে না।

তিব্বতীয় বাণিজ্য লইয়া উভয় দেশের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির পাঁচটি ধারাই উভয় প্রধানমন্ত্রী সমর্থন করেন। উক্ত পাঁচটি ধারায় নিম্নের নীতিগুলি স্বীকৃত হইয়াছে: পারস্পরিক আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্ব্বভৌমত্বের প্রতি পরস্পরের সম্মান প্রদর্শন; অনাক্রমণ; পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা; সমতা ও পারস্পরিক উপকার সাধন এবং শান্তির সহিত একত্রে অবস্থান। তাঁহারা মনে করেন যে, এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্র তথা বিশ্বের অন্যান্য অংশের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারেও এই নীতিগুলি মানিয়া চলা উচিত।

উভয় প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করেন যে, এশিয়া তথা বিশ্বের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরণের সামাজিক ও রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রচলিত। কিন্তু উল্লিখিত নীতিগুলি যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয় এবং কোনও দেশ যদি অপর দেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে, তাহা হইলে এই প্রভেদ শান্তি স্থাপনের পথে অন্তরায় হইবে না, অথবা কোনও সংঘর্ষেরও সৃষ্টি করিবে না।

প্রধানমন্ত্রীদ্বয় বিশেষভাবে এই আশা প্রকাশ করেন যে, উপরোক্ত নীতিগুলি ইন্দোচীনের সমস্যাসমূহ সমাধানের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হইবে।

যুক্ত বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে যে, উভয় প্রধানমন্ত্রী ভারত ও চীনের সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বহু বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা এবং জেনেভা সম্মেলনে ইন্দোচীন সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনার গতি-প্রকৃতি উভয় প্রধান-মন্ত্রীর আলাপে বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে।

উভয় প্রধানমন্ত্রীর আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল, জেনেভায় এবং অন্যত্র শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য যে সকল চেষ্টা হইতেছে, তৎসমূহে যথাসম্ভব সাহায্য করা। তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, পরস্পরের সহিত এবং অন্যান্য দেশের সহিত সহযোগিতা করিয়া শান্তিরক্ষার কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য পরস্পরের মনোভাব আরও ভাল করিয়া বুঝা।

যুক্ত বিবৃতিতে আরও প্রকাশ, উভয় প্রধানমন্ত্রীর এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এশিয়ার সমস্যাসমূহ আরও বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য এবং এই সকল সমস্যা ও অনুরূপ অন্যান্য সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে বিশ্বের অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত একযোগে শান্তিপূর্ণভাবে চেষ্টার কার্য্যকে অগ্রসর করিবার জন্য।

উভয় প্রধানমন্ত্রীই স্বীকার করেন যে, উভয় দেশের মধ্যে যাহাতে পারস্পরিক বুঝাবুঝি পূর্ণমাত্রায় চলিতে থাকে, তজ্জন্য তাঁহাদের উভয় দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষিত হওয়া আবশ্যক।

ভারত ও চীনের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের যুক্ত বিবৃতির পূর্ণ বয়ানের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে, "চীনা জনগণের রিপাব্লিকের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ চু-এন-লাই দিল্লীতে আগমন করেন ভারতীয় রিপাব্লিকের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরুর আমন্ত্রণে: তিনি তিন দিন এখানে অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে উভয়ে চীনের সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বহু বিষয়ে, বিশেষতঃ দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় শান্তি স্থাপনের সম্ভাবনা এবং জেনেভা সম্মেলনে ইন্দোচীন সংক্রান্ত আলোচনার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। ইন্দোচীন পরিস্থিতি এশিয়ায় তথা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; এইজন্যই জেনেভা সম্মেলনে এবং অন্যত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল প্রচেষ্টা চলিতেছে, উভয় প্রধানমন্ত্রী সাগ্রহে তাহার সাফল্য কামনা করেন।

সম্প্রতি চীন ও ভারতের মধ্যে তিব্বতীয় বাণিজ্য সম্পর্কে সম্পাদিত চুক্তিতে পারস্পরিক অনাক্রমণ, আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা প্রভৃতি পূর্ব্বোল্লিখিত যে পাঁচটি নীতি গৃহীত হইয়াছে, উভয় প্রধানমন্ত্রী পুনরায় তাহা সমর্থন করিয়া সর্ব্বত্র এই সকল নীতির প্রয়োগ কামনা করেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক ও সামাজিক পদ্ধতি বিদ্যমান থাকিলেও উপরোক্ত নীতিগুলি মানিয়া চলা হইলে উক্ত পদ্ধতিগত শুভেচ্ছাগুলি শান্তির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে না অথবা সংঘর্ষের সৃষ্টি হইবে না। পারস্পরিক আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্ব্বভৌমত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করা হইলে এবং অনাক্রমণের নীতি মানিয়া চলিলে বিভিন্ন দেশ শান্তিতে পাশাপাশি বাস করিতে পারিবে। ইহাতে উত্তেজনা হ্রাস পাইবে এবং শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি হইবে।

ইন্দোচীনের ব্যাপারে এই সকল নীতি মানিয়া চলা হইলে

ইন্দোচীন রাজ্যত্রয়ের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসিবে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সহিত তাহাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহা ছাড়া, এই নীতিগুলি মানিয়া চলিলে যে "শান্তি অঞ্চল" গড়িয়া উঠিবে, ক্রমশঃ তাহার আরও পরিসর সাধন করা যাইবে এবং সমগ্র পৃথিবীতে যুদ্ধের সম্ভাবনা হ্রাস পাইবে, শান্তির আদর্শ আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিবে।

উভয় প্রধানমন্ত্রীই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চীন-ভারত মৈত্রীর উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন।

চীনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চু-এন-লাই এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু উভয়েই পরস্পরের সহিত সাক্ষাতের এবং বিভিন্ন বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় মতবিনিময়ের সুযোগ হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ তাঁহাদের মতে এই সাক্ষাৎকার ও মতবিনিময় পরস্পরের মনোভাব আরও স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার কার্য্যে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সহযোগিতাকার্য্যে বহুল পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে ও করিবে।"

খাদ্য বিনিয়ন্ত্রণ

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে, একেবারে না হওয়ার চেয়ে বিলম্বে হওয়া ভাল। ভারতে খাদ্য বিনিয়ন্ত্রণ বহুদিন আগেই হওয়া উচিত ছিল এবং স্মরণ থাকিতে পারে যে, মহাত্মা গান্ধী ইহার জন্য বহু পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। সুখের বিষয়, কর্ত্তৃপক্ষের শেষকালে সুবিবেচনা হইয়াছে এবং খাদ্য বিনিয়ন্ত্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে ১৯৪৫ সালে, আর খাদ্য নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হইয়াছিল ১৯৫৪ সালের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর নয় বৎসর পর্য্যন্ত কৃষিপ্রধান দেশে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হইয়াছিল এবং ইহা নিশ্চয়ই কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। সুতরাং খাদ্য বিনিয়ন্ত্রণে কর্ত্তৃপক্ষের কৃতিত্ব দাবী করিবার মত কিছু নাই—অক্ষমতার অবসান হইয়াছে মাত্র।

খাদ্য বিনিয়ন্ত্রণ আকস্মিক ভাবেই করা হইয়াছে, যদিও অবশ্য ইহা অপ্রত্যাশিত ছিল না। কয়েকটি ঘটনা খাদ্য বিনিয়ন্ত্রণকে ত্বরান্বিত করিয়াছে, যথা—ভারত-ব্রহ্ম চাউল চুক্তি, উড়িষ্যা ও আসামে অতিরিক্ত চাউল উৎপাদন এবং ব্রিটেনে খাদ্য বিনিয়ন্ত্রণ। ব্রহ্মদেশের সঙ্গে চাউল আমদানীর চুক্তি যে ভারতের পক্ষে বিরাট ক্ষতির কারণ হইয়াছে সে কথা সরকার নিশ্চয়ই আজ বুঝিতে পারিয়াছেন। দেশের উৎপাদনই যখন অতিরিক্ত হইয়া যাইতেছে তখন বিদেশ হইতে চাউল আমদানী করিবার পিছনে সত্যকার কোন যুক্তি নাই এবং সরকারী যুক্তি-অযুক্তিতে ভরা। ব্রিটেনের খাদ্য বিনিয়ন্ত্রণ ভারত-সরকারকে নিশ্চয়ই লজ্জা দিয়াছে। খাদ্য সরবরাহের জন্য ব্রিটেনকে বেশীর ভাগই আমদানীর উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়, তাই ব্রিটেনের বিনিয়ন্ত্রণ আন্তর্জাতিক খাদ্য সরবরাহে সচ্ছলতার পরিচায়ক। আর ভারতের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হাস্যকর, দেশবাসীর অকর্ম্মণ্যতার পরিচায়ক।

আর বাংলাদেশ কি করিয়াছে? মাদ্রাজ বহু আগে খাদ্য বিনিয়ন্ত্রণ করিয়াছে, তার পরে করিয়াছে বোম্বাই এবং তার পরে বাংলাদেশ। এমন একদিন ছিল যখন বাংলাদেশ আজ যাহা চিন্তা করিত ভারতবর্ষ কাল তাহাই চিন্তা করিত। বর্ত্তমানে হইয়াছে ঠিক ইহার বিপরীত, অর্থাৎ বাংলাদেশ এখন ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নির্দ্দেশের দিকে তাকাইয়া থাকে। খাদ্য বিনিয়ন্ত্রণ ব্যাপারেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

ভারতীয় পাটকলের কার্য্যকাল বৃদ্ধি

ভারতীয় জুটমিল সমিতি সম্প্রতি ঠিক করিয়াছেন যে, পাটকলসমূহের কার্য্যকাল সপ্তাহে সাড়ে বিয়াল্লিশ ঘণ্টা হইতে পঁয়তাল্লিশ ঘণ্টায় বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে। পরে জুটমিলের সাপ্তাহিক কার্য্যকাল আটচল্লিশ ঘণ্টা করা হইবে। বর্ত্তমানে প্রত্যেক মিলের শতকরা সাড়ে বারো ভাগ তাঁত বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে কাঁচা পাটের অভাবে। জুটমিলের কার্য্যকাল বৃদ্ধির ফলে অপেক্ষাকৃত ভাল মিলগুলি এবং যে সকল মিল আধুনিক যন্ত্রপাতি বসাইয়াছে তাহারা তাহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারিবে, উৎপাদন খরচ হ্রাস পাইবে এবং ফলে বিক্রয় বৃদ্ধি পাইবে। পাটের আন্তর্জাতিক ব্যবসা বজায় রাখিতে হইলে জুটমিলগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা থাকা অবশ্যপ্রয়োজনীয়, বিশেষতঃ যখন ইউরোপীয় জুটমিলসমূহ সঙ্ঘবদ্ধভাবে ভারতীয় প্রতিযোগিতাকে সর্ব্বতোভাবে ঠেকানোর চেষ্টা করিতেছে। সম্প্রতি বেলজিয়াম, ইটালী, পূর্ব্ব-জার্ম্মানী, ফ্রান্স এবং নেদারল্যাণ্ডসের জুটমিলগুলি একটি অধিবেশনে ঠিক করিয়াছে যে, ভারতীয় প্রতিযোগিতাকে ঠেকানোর জন্য ইহারা নিম্নলিখিত উপায় গ্রহণ করিবে। এই পাঁচটি দেশের পাট বোনা সমিতি তাহাদের দেশের গবর্ণমেণ্টকে আবেদন করিবে যাহাতে তাঁহারা পাকিস্তানকে তাহার পাট রপ্তানী কর তুলিয়া লইতে অনুরোধ করেন। ইহাতে ইউরোপীয় জুটমিলগুলির উৎপাদন খরচ অনেক কম হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ইহারা বিলাতের জাহাজ কোম্পানীগুলিকে অনুরোধ করিবে যাহাতে তাহারা পাট বহন করিবার ভাড়া হ্রাস করিয়া দেয়। তৃতীয়তঃ, ব্রিটেন যাহাতে এই পাঁচটি দেশের সঙ্গে এক হয়, পাট ব্যবসায়ে তাহার চেষ্টা করা হইবে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, ইউরোপীয় জুটমিলগুলি একত্রিত হইতেছে পাটের আন্তর্জাতিক বাজার দখল করিবার জন্য। দুইটি জিনিষ তাহাদের সহায়ক—সস্তায় পাকিস্থানী পাট আমদানী এবং উন্নততর যন্ত্রপাতি যাহার দ্বারা উৎপাদন খরচ কম হইবে। সুতরাং ভারতীয় পাটের ব্যবসাকে কঠিনতর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইবে। এই বিষয়ে তাহাদের দুইটি বাধা আছে—প্রথমতঃ, পুরানো যন্ত্রপাতি, যাহাতে উৎপাদন খরচ অধিক পড়ে এবং দ্বিতীয়তঃ, উৎকৃষ্টতর পাট পাকিস্থান হইতে আমদানী করিতে হইবে অধিক মূল্যে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় পাটের মূল্য স্বভাবতঃই বেশী থাকিবে যাহার দরুণ রপ্তানী হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা আছে।

১২ই জুলাই হইতে ভারতীয় জুটমিলগুলি সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টা

করিয়া ক্রমে ক্রমিয়ে ফলে উৎপাদন পরিমাণ প্রায় শতকরা দুই ভাগ হিসাবে বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ, এই বৎসরের এপ্রিল-মে মাসের গড়পড়তা উৎপাদন হারের ভিত্তিতে প্রায় ৪,৩০০ টন অতিরিক্ত পাটজাত দ্রব্য মাসে উৎপন্ন হইবে। ইদানীং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যখন ভারতীয় হেসিয়ান আমদানী করিতেছে, অষ্ট্রেলিয়া থলি আমদানী করিতেছে এবং আর্জেন্টিনা কলিকাতা পাটের বাজারে অর্ডার পাঠাইতেছে, তখন আশা করা যাইতেছে যে এই অতিরিক্ত উৎপাদন কাটতি হইয়া যাইবে।

এই অতিরিক্ত পরিমাণ পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন করিবার জন্য ভারতীয় জুটমিলগুলির কাঁচা পাট সরবরাহে পাওয়ার কোন অসুবিধা হইবে না। ৪,৩০০ টন পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন করিবার জন্য মাসে প্রায় ২৪,৯৪০ গাঁইট কাঁচা পাট প্রয়োজন, অর্থাৎ বৎসরে প্রায় ২৯৫,৬০০ গাঁইট কাঁচা পাট প্রয়োজন। আগামী বৎসর কাঁচা পাট উৎপাদন বেশী হওয়ার সম্ভাবনা। ১৯৫৪-৫৫ সালে পাকিস্থানে ৬০ লক্ষ গাঁইট কাঁচা পাট উৎপাদন হইবে ও ভারতে হইবে ৪০ লক্ষ গাঁইট। পাকিস্থানে গত বছরের উদ্বৃত্ত পাট আছে ১২ লক্ষ গাঁইট এবং গত বৎসরে ইহার মোট রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৪৮ লক্ষ গাঁইট। পৃথিবীর কাঁচা পাটের চাহিদা হইতেছে মোট ৯০ লক্ষ গাঁইট এবং আগামী বৎসরে মোট সরবরাহের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১১২ লক্ষ গাঁইট, সুতরাং উদ্বৃত্ত যথেষ্ট থাকিয়া যাইবে।

তবে পাকিস্থানী জুট রপ্তানী নীতি কি হয় তাহার উপর ভারতের পক্ষে পাকিস্থানী পাট পাওয়া অনেকখানি নির্ভর করিবে। পাকিস্থান কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, পাট লাইসেন্স ফী আবার আরোপ করা হইবে। ভারতবর্ষ গত বৎসর পাকিস্থানের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে যে, তিন বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষ পাকিস্থান হইতে ১৮ লক্ষ হইতে ২৫ লক্ষ গাঁইট পাট আমদানী করিবে। গত বৎসর কিন্তু আমদানীর পরিমাণ ছিল মোট ১২ লক্ষ গাঁইট, কারণ ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী হ্রাস পাইয়াছিল। সুতরাং ভারতবর্ষ পাকিস্থান হইতে কাঁচা পাট প্রয়োজনমত আমদানী করিতে পারিবে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ

ভারতবর্ষে ৫,৫৮,০৮৯ গ্রাম আছে এবং মাত্র ৩,০১৮ শহর আছে। মোট জনসংখ্যা হইতেছে ৩৫·৬৯ কোটি, তন্মধ্যে ২৯·৫০ কোটি বাস করে গ্রামে। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের গ্রাম্যশাসন পঞ্চায়েৎ প্রথা দ্বারা চালিত হইয়াছে। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল এবং গ্রাম তথা তার সম্পদের মালিক ছিল গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ। বাস্তবক্ষেত্রে পঞ্চায়েৎ ছিল গ্রাম্যশাসনের ভিত্তিস্বরূপ এবং সে ভাবধারা আমাদের বর্তমান সংবিধানে বজায় রাখা হইয়াছে। ভারতীয় সংবিধানের ৪০ ধারায় বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র পঞ্চায়েৎ গঠনের জন্য যথোচিত বন্দোবস্ত করিবে এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের শাখা হিসাবে কার্য্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ইহাদের দেওয়া হইবে।

সম্প্রতি সিমলাতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রীদের একটি অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে পঞ্চায়েৎ প্রথার বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচ্য বিষয়গুলি ছিল এইরূপ:

(১) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পঞ্চায়েতের স্থান; (২) গ্রাম্য পঞ্চায়েতের খরচের সংস্থান; (৩) পঞ্চায়েৎকে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া; (৪) বিভিন্ন পঞ্চায়েতের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা, ইত্যাদি।

অধিবেশনে নূতন সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি হিসাবে পঞ্চায়েতের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে এবং বিচারভার ও কার্য্যকরী ক্ষমতা দিয়া পঞ্চায়েতের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার কথা বলা হইয়াছে। গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করার ভার পঞ্চায়েতের উপর থাকিবে এবং কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ব্যাপারগুলি গ্রাম্য সমবায় সমিতির উপর থাকিবে, যেমন ক্রয়-বিক্রয়, দাদন দেওয়া, কাঁচা মাল ক্রয় করা প্রভৃতি। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে পঞ্চায়েৎরা যথেষ্ট দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য করিতেছে, যদিও তাহাদের টাকার যথেষ্ট অভাব। জমি সংরক্ষণ, বৃক্ষ রোপণ, জ্বালানি রক্ষণ, শিক্ষা বিতরণ প্রভৃতি কার্য্যে পঞ্চায়েতের প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয় হইয়াছে। পঞ্চায়েতের সাহায্যে উন্নতধরণের বীজ রক্ষণ এবং উন্নত ধরণের কৃষিকার্য্যও সহজসাধ্য হইবে, অধিবেশনে এই অভিমতই প্রকাশ করা হইয়াছে।

প্ল্যানিং কমিশন প্রাদেশিক সরকারসমূহকে জানাইয়াছেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রাম এবং জেলাগুলিকে লইয়া সুরু হইবে। অর্থাৎ, প্রত্যেক পরিবারের উন্নতি এবং গ্রামোন্নতি অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত থাকিবে। গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার কার্য্যতালিকা এমন ভাবে করা হইবে যাহাতে প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব উন্নতি হয়। কৃষি ও বিকল্পিক ব্যবসা সমবায় সমিতির দ্বারা কার্য্যকরী করা হইবে এবং প্রত্যেক পরিবার যাহাতে সমবায় সমিতির সভ্য হয় তাহার চেষ্টা করা হইবে। ব্যক্তিগত উন্নতির সঙ্গে গ্রামের সামগ্রিক উন্নতি জড়িত থাকিবে। তবে কর-রাজস্ব দ্বারা পঞ্চায়েতের আয় বৃদ্ধি করিবার আর কোন উপায় নাই। বর্তমান কর-রাজস্ব হইতে পঞ্চায়েতের জন্য আয় বৃদ্ধি করা সম্ভবপর নয় এবং পঞ্চায়েতের জন্য আর নূতন কর বসানোও বাঞ্ছনীয় নয়। গ্রামে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও লোক্যাল বোর্ডের জন্য অনেক রকম কর দিতে হয়, তাহার উপর আবার পঞ্চায়েতের জন্য নূতন কর স্থাপন করিতে গেলে গ্রামের অর্থনৈতিক জীবনের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়িবে। অধিকন্তু একই ব্যাপারে দুই বার করিয়া কর দিতে হইবে। পঞ্চায়েতের দায়িত্ব এবং কার্য্য বৃদ্ধি পাইলে ইহাদের জন্য রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক সাহায্য অবশ্যম্ভাবী। লোক-প্রতিষ্ঠান (public utility) সংক্রান্ত বিষয়ে পঞ্চায়েৎ যে কার্য্য করিবে তাহার জন্য প্রয়োজনীয় মাল কিংবা মালের খরচ রাষ্ট্র বহন করিবে। প্রদেশগুলি তাহাদের বাজেট হইতে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, সমাজ-সেবা প্রভৃতি বিষয়ের জন্য টাকা বরাদ্দ করিবে এবং তাহা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে খরচ হইবে। পঞ্চায়েৎ বিনা খরচে শ্রমিক ও অন্যান্য কর্ম্মী যোগাইবে।

স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রীদের লইয়া একটি কার্য্য-পরিষদ গঠন করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। পঞ্চায়েৎ এবং প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিবে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড। পঞ্চায়েতের সঙ্গে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড সংযোগ রক্ষা করিবে এবং তাহাদের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্যরা প্রধানতঃ পরোক্ষভাবে নির্ব্বাচিত হইবেন গ্রাম্য পঞ্চায়েৎমণ্ডলী হইতে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড নির্ব্বাচনের জন্য গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ হইবে নির্ব্বাচকমণ্ডলী। দল হিসাবে পঞ্চায়েতে নির্ব্বাচন করা উচিত হইবে না এবং সামগ্রিকভাবে গ্রামের সকল জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া পঞ্চায়েৎ গঠিত হইবে।

অধিকাংশ প্রদেশেই গ্রাম্য জনসাধারণ গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্যদের নির্ব্বাচন করে। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের কার্য্য গ্রাম্য এলাকাতেই সীমাবদ্ধ এবং ইহাদের উভয়ের আয়ের উৎস প্রায় একই; তাহার জন্য ইহাদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা অবশ্যপ্রয়োজনীয় যাহাতে দ্বৈত কর-ব্যবস্থা এবং দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা না হয়। দ্বৈত ব্যবস্থা পরিহার করার সহজ উপায় হইতেছে—ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে জেলার সমস্ত পঞ্চায়েতের কার্য্য সংযোগ করিবে এবং তত্ত্বাবধান করিবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও পঞ্চায়েতের কার্য্যাবলীর মধ্যে পরিষ্কারভাবে সীমারেখা টানিয়া দিতে হইবে এবং রাজস্ব উৎসেরও পরিষ্কার বণ্টন-ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

বর্ত্তমানে পঞ্চায়েতের রাজস্বের এবং বিচারক্ষমতার বিস্তৃতি প্রয়োজন। কয়েকটি প্রদেশ ইতিপূর্ব্বেই পঞ্চায়েতের উপর রাজস্ব আদায়ের ভার দিয়াছে এবং তাহার জন্য পঞ্চায়েৎ কিছু কমিশন পায়। ইহাতে ফল ভাল হইতেছে। কয়েকটি প্রদেশে পঞ্চায়েতের উপর বিচারভার দেওয়া হইয়াছে; এই পঞ্চায়েৎ আদালত কয়েকটি পঞ্চায়েৎ দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়। গ্রামে কৃষিবিভাগ এবং পঞ্চায়েতের মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন যাহাতে উন্নত ধরণের বীজ এবং কৃষি প্রতিযোগিতা করা সম্ভবপর হয়। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের অধীনে ট্রাক্টর এবং অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি থাকিবে। ইহারা চাষীদের ভাড়া দিবার ব্যবস্থা করিবে। এই ব্যবস্থায় চাষীদের সুবিধা হইবে, কারণ সকল চাষীর পক্ষে ট্রাক্টর ক্রয় করা সম্ভবপর হইবে না। ছোট ছোট সেচকার্য্য—যথা, দীঘি, খাল, কূপ ইত্যাদির ভার পঞ্চায়েতের উপর থাকিবে। বর্ত্তমানে গ্রাম্য ঋণ সমিতিগুলি এবং কৃষি ক্রয়-বিক্রয় সমিতিগুলি প্রাদেশিক সমবায় বিভাগের তত্ত্বাবধানে কাজ করে। কিন্তু নূতন ব্যবস্থায় ইহারা পঞ্চায়েতের অধীনে কাজ করিবে। মিউনিসিপালিটির কাজ যথা—জনস্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণ, পঞ্চায়েত করিবে এবং ইহারা পাহারা ও চৌকিদারীরও বন্দোবস্ত করিবে। নূতন পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চায়েতের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। ভারতবর্ষে সমবায় প্রথা প্রায় ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। সমবায়ের কাজ যদি পঞ্চায়েৎ দ্বারা করানো যায় তাহা আনন্দের কথা। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জনসাধারণের সাহায্য এবং সহযোগিতা প্রয়োজন। তাহার জন্যও পঞ্চায়েৎ প্রথার বিস্তৃতি বাঞ্ছনীয়।

ভাক্রা-নাঙ্গাল বাঁধ ও খাল

ভাক্রা খালের উদ্বোধন সম্পর্কে পূর্ব্ব পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের সারাংশ এইরূপ :

জলন্ধর, ৭ই জুলাই—আগামীকল্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু নাঙ্গালে যে ভাক্রা খালের উদ্বোধন করিবেন, তদুপলক্ষে অদ্য 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র জলন্ধর কেন্দ্র হইতে বেতার বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব্ব-পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসাচার ভাক্রা খাল সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া বলেন, "এই বিরাট প্রচেষ্টার ইতিহাস হইতেছে নিষ্ক্রিয়তার উপর প্রগতিশীল শক্তির, সন্দিগ্ধতা ও হতাশার উপর আস্থার এবং ঔদাসীন্যের উপর সহযোগিতা ও যুক্ত প্রচেষ্টার বিজয়ের ইতিহাস। এই প্রচেষ্টা হইতে প্রমাণিত হয় যে, একটি সংহত জাতিরূপে আমরা বড় বড় কার্য্য করিতে পারি। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের এখনও আরও বড় বড় কার্য্য করিতে হইবে। এই শুভ দিবসে আমরা প্রত্যেকে যদি মাতৃভূমি ও স্বদেশবাসীর সেবা করিবার প্রতিশ্রুতি নূতন করিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলেই আমাদের পক্ষে বড় বড় কাজ করা সম্ভব হইবে।"

ভাক্রা-নাঙ্গাল খাল খননের বিরাট পরীক্ষামূলক কার্য্যের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "৮ই জুলাই আমাদের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কারণ এই দিন আমাদের দীর্ঘকালের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতেছে। প্রায় সাত বৎসর পূর্ব্বে ভারত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে, কিন্তু খাদ্যোৎপাদন ও শিল্পোৎপাদন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন প্রভৃতি করিয়া অভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতঃ স্বাধীনতা অর্জ্জন এখনও বাকী আছে। আমাদের প্রিয় নেতা শ্রীনেহরুর হস্তে ভাক্রা খালের উদ্বোধন এই সকল অভাবের প্রতি একটা জবাবস্বরূপ। এই প্রকার আরও অনেক পরিকল্পনা দেশের বিভিন্ন স্থানে কার্য্যকরী করিবার চেষ্টা হইতেছে।

"দেশ-বিভাগ আমাদিগকে চূড়ান্ত আঘাত হানিয়াছে। আমরা অতি সামান্যসংখ্যক খালই পাইয়াছি। শুষ্ক মরুভূমিপ্রায় রোটাক, হিসার প্রভৃতি জেলায় ও বিকানীর সংলগ্ন অঞ্চলে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। যে সকল অঞ্চল লইয়া আজ পূর্ব্ব-পঞ্জাব গঠিত, তাহার অধিকাংশই অতীতে বিদেশী শাসকদের আমলে তাচ্ছিল্যের বস্তু ছিল।

"এই কারণেই আমাদের জাতীয় সরকার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অংশস্বরূপ প্রকাণ্ড ভাক্রা-নাঙ্গাল খাল পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অনেক পূর্ব্বেই এই পরিকল্পনা বিবেচিত হইলেও ইহার প্রতি কার্য্যতঃ বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর। এই দেশের এবং সম্ভবতঃ পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম এই খাল পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল সেচকার্য্য ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য শতদ্রু নদীর জলরাশির সদ্ব্যবহার করা। এই পরিকল্পনার বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশগুলি হইল ভাক্রা বাঁধ, নাঙ্গাল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং বিস্তৃত সেচব্যবস্থা।"

"৮ই জুলাই ভাক্রা খালের উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে এই পরি-

কল্পনার সেচব্যবস্থায় বিরাট সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে। এই খাল সম্পূর্ণ হইলে মোট প্রায় এক কোটি একর জমিতে জলসেঁচন সম্ভব হইবে। ইহার মধ্যে প্রধান ভাক্রা খাল পরিকল্পনায় যে ৫৮৮৩৭০৫ একর জমি এবং শিরহিন্দ পরিকল্পনা অনুযায়ী যে ৩৭২৫০৬৪ একর জমিতে জলসেচন সম্ভব হইবে, তাহাও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। প্রধান খাল ও উহার শাখাগুলির দৈর্ঘ্য ৬৭৭ মাইল এবং উহা হইতে যে সকল শাখা প্রশাখা বাহির হইয়া জমিতে জল সরবরাহ করিবে, সেগুলির দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৯৫৮ মাইল। সংযুক্ত খাল ও শাখাগুলির দৈর্ঘ্য ৩৪১ মাইল।

"এই সিঞ্চিত এলাকায় আনুমানিক ১৩২ কোটি টাকা মূল্যের শস্যাদি উৎপন্ন হইবে। তন্মধ্যে প্রতি বৎসরে খাদ্যশস্য জন্মিবে ১১·৩ লক্ষ টন, ইক্ষু পাঁচ লক্ষ টন, ডাল ও তৈলবীজ এক লক্ষ টন, শুষ্ক ও কাঁচা পশুখাদ্য তৃণাদি পনর লক্ষ টন, তুলা আট লক্ষ গাঁট। ইহার ফলে এই রাজ্যের রাজস্ব ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইবে, এই অর্থ অন্যান্য উন্নয়ন কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারিবে।

"প্রধান ভাক্রা খাল ও উহার শাখাগুলি ১৯৫৫ সনে এবং নারোয়ানা শাখা ও দোয়াব খাল ১৯৫৬ সনে সমাপ্ত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমাদের ইঞ্জিনীয়ারদের ও কারিগরদের তৎপরতার ফলে এই কার্য্য অনেক পূর্ব্বে সমাধা হইয়া গিয়াছে এবং দ্রুত কার্য্য সমাপ্তির ফলে সাড়ে তিন কোটি টাকা খরচ বাঁচিয়া গিয়াছে।"

"যখন বিবেচনা করা হয় যে, কঠিন পার্ব্বত্যভূমির মধ্য দিয়া এবং বহু পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী পার হইয়া এই খাল খনিত হইয়াছে, তখন এই কার্য্যের তাৎপর্য্য আরও গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

"এককথায় বলিতে গেলে, আশ্চর্য্য এক কার্য্য সাধিত হইয়াছে, ইহাতে দেশবাসী আশ্চর্য্য ফলও পাইবে। পঞ্জাব, পেপস্থ ও রাজস্থানের উষর অঞ্চলগুলি শীঘ্রই হরিৎ শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইবে। ইহাতে শুধু যে আমাদের বৈষয়িক সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত করিবে তাহা নহে, ইহার ফলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জাতীয় জীবনের নূতন মাপকাঠি প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

ভাক্রা খাল ও পাকিস্থান

সম্প্রতি ভারত-সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, পাকিস্থান বিশ্ব-ব্যাঙ্কের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করায় তাঁহারা সম্পূর্ণ দায়মুক্ত হইয়াছেন। বিশ্বব্যাঙ্কের প্রস্তাব ও তাহার প্রত্যাখ্যানের সংবাদ এইরূপ :

"২৬শে জুন—খালের জল লইয়া ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যে বিরোধ চলিতেছে, তাহার মীমাংসার জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক যে প্রস্তাব করিয়াছিল, পাকিস্থান তাহা অগ্রাহ্য করায় একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল।

সিন্ধু নদ অববাহিকায় যে সব ভারতীয়, পাকিস্থানী ও বিশ্ব-ব্যাঙ্কের ইঞ্জিনীয়ার কাজ করিতেছিলেন, সমস্যার সমাধানের জন্য এই সেদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা দিল্লী, করাচী ও ওয়াশিংটনে ছুটাছুটি করিতেছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধিগণ এক বিস্তৃত পরিকল্পনা পেশ করিয়াছিলেন।

এই পরিকল্পনায় সুপারিশ করা হয় : (১) পশ্চিমাংশের নদীগুলি, যথা—সিন্ধু, বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার জল একমাত্র পাকিস্থানই ব্যবহার করিতে পারিবে, কেবল সামান্য জল কাশ্মীরের ভাগে পড়িবে। (২) পূর্ব্বাংশের সমস্ত নদী, যথা—ইরাবতী, বিপাশা ও শতদ্রুর জল একমাত্র ভারতই ব্যবহার করিবে, তবে কিছুদিন, অন্ততঃ পাঁচ বৎসর ভারত পাকিস্থানকে এই সব নদীর জল ব্যবহার করিতে দিবে। কারণ নদীর গতি পরিবর্ত্তন ও নূতন যোগাযোগের জন্য এই সময় প্রয়োজন। (৩) যে দেশের ভাগে যে কাজ পড়িবে, সে দেশ উহা সম্পাদন করিবে এবং ইহাতে যে দেশ উপকৃত হইবে, সে দেশই কাজের ব্যয়ভার বহন করিবে। যৌথভাবে উভয় দেশের উপর কোন কাজের ভার না দিলেও ভারত হইতে জল সরবরাহ বন্ধ করার জন্য পাকিস্থানে বিভিন্ন খালের যে নূতন যোগাযোগ করিতে হইবে, ভারতই তাহার ব্যয়ভার বহন করিবে।"

গুয়াতেমালা

পশ্চিম গোলার্দ্ধের মধ্যে মধ্য ও দক্ষিণ-আমেরিকা বিদ্রোহ এবং বিপ্লববাদের জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু সম্প্রতি গুয়াতেমালায় যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে বিশ্ব-শক্তিপুঞ্জের দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর লীলা-খেলারই পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্রোহী দল ঝটিকা যুদ্ধে এত দ্রুত জয়লাভ করিল কিভাবে তাহার একটি মাত্র কৈফিয়ত পাওয়া যায়। আরম্ভ ত বহির্দ্দেশ হইতে রীতিমত যুদ্ধ অভিযানের মতই চালিত হয়। তাহার বিবরণ এইরূপে প্রকাশিত হয় :

"নিউইয়র্ক, ১৯শে জুন—আজ যে সব সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, পার্শ্ববর্ত্তী হণ্ডুরাস হইতে আক্রমণকারী সৈন্যবৃন্দ জল ও স্থলে আক্রমণ চালাইয়া সীমান্তবর্ত্তী কয়েকটি শহর ও ক্যারিবিয়ান উপকূলে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর দখল করিয়া লইয়াছে।

গুয়াতেমালা বিমান বাহিনীর নির্ব্বাসিত প্রাক্তন বড়কর্ত্তা কর্নেল ক্যাষ্টিলো আরমাসের নেতৃত্বে পাঁচ হাজার ব্যক্তি গুয়াতে-মালার বামপন্থী সাত হাজার সরকারী সৈন্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতেছে। আক্রমণকারীদের বিমানবহর গুয়াতেমালা শহর, সান জোসে পিওর্ত্তো বারিয়সের উপর হানা দেয়। গুয়াতেমালা বেতারের এক খবরে বলা হইয়াছে যে, প্রেসিডেণ্ট জেকব আরবেনজের সরকার প্রেসিডেণ্টের রক্ষী-বাহিনীর ব্যারাকের উপর বোমা বর্ষণের পর শহরে নিষ্প্রদীপের আদেশ দিয়াছেন।

কলিকাতায় দুর্ব্বৃত্তের উপদ্রব

এতদিনে কলিকাতায় শান্তি শৃঙ্খলার অবস্থার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিপাতের অবসর হইয়াছে। ব্যবস্থা ত হইতেছে, তবে ফলেন পরিচিয়তে।

কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিং হইতে ২৭শে আষাঢ় প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের এক প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, কলিকাতা শহরের কোন কোন অংশে সম্প্রতি গুণ্ডামি ও হাঙ্গামা সৃষ্টি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই সমস্ত সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপ দমনের উদ্দেশ্যে

কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য জনপ্রতিনিধিগণ গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন।

এই ধরণের অপরাধ সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কলিকাতা পুলিস ইতিপূর্ব্বেই একটি স্বতন্ত্র বিভাগ সৃষ্টি করিয়াছেন। দ্রব্যাদি কাড়িয়া লওয়া, পটকা নিক্ষেপ, ইষ্টক নিক্ষেপ এবং নারীর উপর অত্যাচার প্রভৃতি অপরাধ এই বিভাগের আওতায় পড়ে। গত চার সপ্তাহে ৪৯১ জন দুষ্ট প্রকৃতির লোক এবং ১৯ জন গুণ্ডার প্রতি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। কলিকাতা পুলিস এই সকল হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালাইবেন। এই বিভাগের ভার শ্রীউপানন্দ মুখুজ্যের উপর থাকিবে। শ্রীযুত মুখুজ্যে বিভিন্ন থানা পরিদর্শন করিয়া স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করিবেন। পুলিস প্রতি অঞ্চলের গুণ্ডা প্রকৃতির লোক-সমূহের এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তাহাদের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য পুলিসের বিশেষ টহলের ব্যবস্থা করা হইবে। কাহাকেও অন্যায় কার্য্যকলাপে লিপ্ত হইতে দেখিলে তাহার সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

স্পেশাল অফিসারের পরিদর্শন তালিকা নিয়মিতভাবে ঘোষিত হইবে এবং যাঁহারা এই ধরণের অপরাধ নিবারণ চাহেন, তাঁহারা স্পেশাল অফিসারের নিকট তথ্যাদি পেশ করিতে পারিবেন।

ধলভূমের পশ্চিমবঙ্গভুক্তির জন্য রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের নিকট ধলভূমবাসীদের আবেদন

রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের নিকট এক স্মারকলিপিতে ধলভূমের অধিবাসীবৃন্দ ধলভূমকে পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত করিবার জন্য দাবি জানাইয়াছেন। স্মারকলিপিতে বলা হইয়াছে যে, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, ভাষাগত এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সকল দিক হইতেই এই দাবির যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হয়।

ভৌগোলিক দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, ধলভূম বাংলার সমতলভূমির একটি অংশ এবং উহার সংলগ্ন। কোনমতেই উহাকে ছোটনাগপুরের মালভূমির একটি অংশ বলা যায় না। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ধলভূমের গড় উচ্চতা ৪০০ হইতে ৬০০ ফুটের মধ্যে এবং পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির উচ্চতার সমরূপ। ধলভূম পরগণাটির আয়তন প্রায় ১১৬৪.৮৪ বর্গমাইল এবং ইহার সীমা : উত্তরে, মানভূমের সদর মহকুমা যাহা সম্পূর্ণরূপে একটি বঙ্গভাষাভাষী এলাকা ; দক্ষিণে, অধুনা উড়িষ্যার সহিত সংযুক্ত ময়ূরভঞ্জ যাহা একটি ওড়িয়াভাষী অঞ্চল ; পূর্ব্বে, পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলা, পশ্চিমে ওড়িয়াভাষী-অধ্যুষিত সেরাইকেল্লা মহকুমা। অতএব দেখা যাইতেছে ঐ পরগণার কোন সীমানাই হিন্দীভাষী এলাকার সংলগ্ন নহে।

ধলভূমের প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করা কঠিন। আইন-ই-আকবরী হইতে জানা যায় যে, উহা তৎকালীন সুবে বাংলার অংশ-বিশেষ মান্দারণ মহলের অন্তর্গত ছিল। ধলভূম ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে একটি স্বতন্ত্র পরগণা হিসাবে ছিল ; সিংভূমের অংশ ছিল না। ধলভূম পূর্ব্বে বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমানের জঙ্গল মহলের অংশ ছিল। পরে জঙ্গল মহল জেলা ভাঙ্গিয়া ধলভূমকে বাংলাদেশের মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত করা হয় এবং ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহা মেদিনীপুরের অংশরূপেই থাকে। তারপর শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য উহাকে বাংলাদেশের নবসৃষ্ট মানভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৩৬-৩৭ সনে সিংভূম বিভাগ গঠিত হয় এবং ১৮৪৬ সনে মানভূম হইতে ধলভূমকে সিংভূম বিভাগে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু ১৮৭৬ সনের ১৯শে ডিসেম্বর সরকারী নির্দ্দেশে ধলভূম পরগণার একটি অংশ সিংভূমের অধীন হইতে পুনরায় মেদিনীপুরের সহিত সংযুক্ত করা হয়। ঐ অংশ এখনও পর্য্যন্ত মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে ; ফলে দ্বিধাবিভক্ত ধলভূম পরগণার একটি অংশ সিংভূম এবং অপর অংশ মেদিনীপুরের অন্তর্গত রহিয়াছে।

স্মারকলিপিতে বলা হইয়াছে, "বর্ত্তমান সিংভূম জেলার অপর দুইটি পরগণা পোড়াহাট, অথবা কোলহান এবং প্রকৃতপক্ষে মূল বিহার ভূখণ্ডের কোন অঞ্চলের সহিতই ধলভূম পরগণার অধি-বাসীদের ভাষাগত, সংস্কৃতিগত এবং সমাজবিধিগত কোন সমতা নাই। ভাষাগত ও জাতিগত ক্ষেত্রেও সিংভূম জেলার সদর এবং ধলভূম মহকুমা দুইটির পার্থক্য সম্পূর্ণ বিপরীতধর্ম্মী (১৯৩১ সনের লোকগণনা রিপোর্ট—২৪১ পৃষ্ঠা)।"

ভাষাগত দিক হইতে বিচার করিলেও দেখা যায় যে, ধলভূমের অধিকাংশ অধিবাসী বাংলাভাষাভাষী। স্মারকলিপিতে দেখানো হইয়াছে যে, জামসেদপুর ব্যতিরেকে ধলভূমের শতকরা প্রায় ৬২ জন অধিবাসী বাংলাভাষাভাষী, যেহেতু ধলভূমের ১,৪১,০১০ জন অধিবাসীর ৬৪,০১০ জন আদিবাসী বিকল্পভাষা হিসাবে বাংলা ভাষায় কথা বলিয়া থাকেন। ১৯৩১ সনের আদমসুমারীর হিসাবমত ধলভূমের শতকরা ৩৬ জনের মাতৃভাষা বাংলা এবং বাংলাই ধলভূমের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা। ধল-ভূমে ভূমিজ, সাঁওতালী ও হো এই তিনটি আদিবাসী ভাষা প্রচলিত। ১৯৩১ সনের আদমসুমারীর হিসাব হইতে দেখা যায়, প্রতি দশ হাজার ভূমিজের মধ্যে ৬০৭৪ জন বাংলা এবং মাত্র সাত জন হিন্দুস্থানী বিকল্প ভাষা হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রতি দশ হাজার সাঁওতালের মধ্যে ৩৭৭২ জন বাংলা এবং মাত্র ৩৩ জন হিন্দুস্থানী ভাষা ব্যবহার করে। উক্ত সেন্সাস রিপোর্টে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, "জামসেদপুর ব্যতিরেকে বাংলাই ধলভূমের সর্ব্বপ্রধান ভাষা ; ওড়িয়ার স্থান কোনমতে দ্বিতীয় এবং খুবই লঘিষ্ঠ সংখ্যায় হিন্দুস্থানী তৃতীয় স্থান অধিকার করে।"

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধলভূমে বাংলা ভাষা জনসাধারণের ভাষা হিসাবে প্রচলিত ছিল। ইতিহাস হইতে তাহার বহু নজীর মিলে। সর্ব্বপ্রাচীন যে দলিলসমূহ ধলভূমের রাজসেরেস্তায় রহিয়াছে তাহা বাংলায় লিখিত এবং ধলভূমের যে দলিলপত্রাদি সিংভূমের ডেপুটি কমিশনারের দলিলাগারে রহিয়াছে সেগুলি হয় বাংলায় অথবা ইংরেজীতে লিখিত। ধলভূম-রাজাকে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে যে তহশীলনামা দান করা হইয়াছিল তাহাও বাংলা ভাষায় ছিল। প্রাচীনকাল হইতে রাজা এবং জমিদারগণ খাজনার রসিদ

বাংলাতেই দিয়াছেন। "১৯০৭-০৮ এবং ১৯৩৫-৩৬ সনে পরগণার সেটেলমেণ্ট স্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে মালিকানা ইত্যাদির জন্য যে দলিল রচিত হইয়াছিল তাহা বাংলায়।"

কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও পরগণার আদালতে বাংলা ভাষাই ব্যবহৃত হইত। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জনসাধারণের প্রবল বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করিয়া বলপূর্ব্বক হিন্দীকে আদালতের ভাষা নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে এবং বাংলাকে বিকল্পভাষা করা হইয়াছে। সিংভূমের একজন প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনার এবং জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ জে. ই. স্কট, আই-সি-এস যিনি সিংভূমের সাবজজ হিসাবে বহুকাল যাবৎ দেওয়ানী মামলার বিচার করিয়াছিলেন, তিনি বিহারের জনশিক্ষা অধিকর্ত্তার নিকট ১৯২৪ সনে এক পত্রে লেখেন, "সিংভূম ওড়িয়াভাষাভাষী জেলা নহে এবং নামমাত্র কয়েকজন ব্যতীত কোনস্থল হইতেই ওড়িয়া ভাষা শিক্ষার জন্য প্রকৃত দাবি করা হয় নাই। সর্ব্বসাধারণ বাংলা ভাষার মাধ্যমেই চিঠিপত্রাদি লিখিয়া থাকেন।" তিনি আরও লেখেন : "ধলভূম সম্পূর্ণরূপে বাংলাভাষাভাষী।"

স্মারকলিপিতে ১৯৩১ সনের আদমসুমারীর তথ্যাদি উদ্ধৃত করিয়া দেখানো হইয়াছে যে, বাঙালীরাই ধলভূমের একক সংখ্যা-গরিষ্ঠ সম্প্রদায়। উহাতে বলা হইয়াছে যে, "ধলভূমে যাহারা হিন্দী-ভাষাভাষী তাহারা প্রধানতঃ ঘাটশীলা, নরসিংগড়, চাকুলিয়া, হলুদ-পুকুর প্রভৃতি শহরের মারোয়াড়ী ব্যবসায়ী। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, তাহারা সকলেই বাংলায় সহজভাবে দ্রুত কথা বলিয়া থাকে এবং ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে ধলভূম একটি সম্পূর্ণ বাংলাভাষাভাষী এলাকা।"

"ধলভূমের সাঁওতালদিগের সহিত পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া, সন্নিহিত এই জেলা দুইটির সাঁওতালদিগের বিবাহগত সম্বন্ধ রহিয়াছে।"

স্মারকলিপিতে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ধলভূম এবং পার্শ্ববর্ত্তী বাঁকুড়া জেলায় বহুসংখ্যক সাঁওতাল রহিয়াছে অথচ সিংভূমের কোলহান ও পোড়াহাট পরগণায় সাঁওতাল এবং ভূমিজ প্রায় নাই বলিলে চলে।

জামসেদপুর শহরেও সম্ভবতঃ বাংলাভাষীরাই একক সংখ্যা-গরিষ্ঠ হইবে। ঐ শহরে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক বাস করেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে মারোয়াড়ী, গুজরাটী, পঞ্জাবী প্রভৃতিদের বাদ দেওয়া হইলে হিন্দীভাষীরা নিতান্তই সংখ্যালঘিষ্ঠ। জামসেদপুর ছাত্রছাত্রীদের যে বিভিন্ন ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার হার : বাংলা ১২,৫০০ ; হিন্দী ১০,০৬৪ ; উর্দ্দু ৩,২০০ ; ওড়িয়া ২,৩০০ ; অন্যান্য ভাষা ২,১০০।

স্মারকলিপিতে আরও বলা হইয়াছে যে, ধলভূমের অধিকাংশ অধিবাসীর আচার-ব্যবহার এবং রীতিনীতি বাংলাদেশের অধি-বাসীদের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রহিয়াছে, কিন্তু জেলার অবশিষ্ট অঞ্চলের সহিত তাঁহাদের কোন সমতা নাই।

অতঃপর, বিহারে বাংলাভাষাভাষীদের উপর যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হইতেছে, স্মারকলিপিতে সে সম্পর্কে রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। প্রথমে বাংলা ভাষাকে হটাইয়া ওড়িয়া ভাষা প্রচলনের ব্যর্থ চেষ্টা হয়। তাহার পর সুরু হয় হিন্দী ভাষা চাপাইবার অপচেষ্টা। "আদালতের ভাষা পরিবর্ত্তন, শিক্ষাদানে হিন্দী মাধ্যমের প্রচলন, যে সমস্ত বিদ্যালয়ে হিন্দী প্রচলন করা হয় নাই তাহাদের অনুমোদন না দেওয়া এবং আরও বহু-প্রকার অনাচারের সুরু হয়। এই সমস্ত দমনমূলক অনাচার ক্রমশঃ সহের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।"

বিহার সরকারের নীতির ফলে তথায় বাঙালীদের অস্তিত্বই আজ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্পর্কে বিহার শিক্ষাবিভাগের ব্যবহার প্রবাসী বাঙালীদের নিকট দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিষ্ট্রারের ১৯৫১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে এক সার্কুলারে বলা হইয়াছে যে, ১৯৫৬ সনের পর ভাষা ব্যতীত সমস্ত বিষয়ে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ হিন্দীতেই হইবে। এই ব্যবস্থার প্রতি রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া স্মারকলিপিতে বলা হইয়াছে যে, জনসংখ্যার অধিকাংশই বঙ্গভাষাভাষী। স্থানীয় আদিবাসীরা বিকল্প হিসাবে বাংলা ভাষা ব্যবহার করে এবং তাহাদের কোন নিজস্ব লিপি নাই। এই অবস্থায় সেনেটের যে প্রস্তাবমতে উপরোক্ত সার্কুলার প্রচারিত হইয়াছে তাহার দ্বারা ধলভূমের বিপুলসংখ্যক অধিবাসী যাহাদের নিজস্ব লিপি ও সংস্কৃতি রহিয়াছে তাহাদের উহা সংরক্ষণের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে, যে অধিকার সংবিধানের ২৯ ধারায় স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ধলভূমবাসী বিভিন্ন সভাসমিতি মারফত বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন ; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় নির্ব্বাক রহিয়াছেন। যদি এই সার্কুলার প্রত্যাহৃত না হয় তবে বাঙালীদের সন্তানসন্ততি মাতৃ-ভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবে এবং ক্রমে তাহারা মাতৃভাষাও ভুলিতে থাকিবে ; বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতিও লোপ পাইবে। ইহা ব্যতীত অর্থনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই বাঙালীদিগকে পঙ্গু করিয়া রাখা হইয়াছে। বাঙালীরা বংশপরম্পরায় ধলভূমের অধিবাসী হইলেও সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে তাহাদের নিকট ডোমিসাইল সার্টিফিকেট দাবি করা হয় এবং বাঙালীদের পক্ষে এই ডোমিসাইল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা প্রায়শঃই বিশেষ দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে। বাংলাভাষা এবং বাঙালী জাতিকে ধ্বংস করিবার প্রচেষ্টায় বিহার সরকার যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন স্মারকলিপিতে তাহাতে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত হইবার জন্য ধলভূমবাসীর ব্যগ্রতার উল্লেখ করিয়া স্মারকলিপিতে বলা হইয়াছে যে, ধলভূম এবং বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অন্যান্য অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের নিকট প্রত্যার্পণের প্রশ্নটি ভাবপ্রবণতার ব্যাপার নহে। "ইহা অসংখ্য বাঙালীর নিকট জীবন-

মরণের প্রশ্ন। ইহা সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় অধিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রশ্ন; শিল্পাঞ্চলের নিছক ভাসমান জনগণের কথা নহে। ধলভূমের প্রায় প্রতিটি অধিবাসী তাহাদের ভাষা, সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং রাজনৈতিক জীবন বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যই বাংলার শাসনাধীনে প্রত্যাবর্তন প্রার্থনা করে এবং ইহার জন্য বারংবার তাহারা চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। এমন একটি গবর্ণমেণ্ট যাহার সহিত এখানকার অধিবাসীদের কোন মিল নাই তাহার অধীনে ইহাদের ধরিয়া রাখা অন্যায় কার্য্য হইবে এবং উহাতে অবাঞ্ছনীয় পরিণাম ঘটিবে ও উহাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হইবে।

"যদি আপনাদের কমিটি মানভূম অথবা অন্ততঃ ইহার সদর মহকুমা পশ্চিমবঙ্গে এবং সেরাইকেল্লা ও খরসওয়ান উড়িষ্যায় যাইবে এরূপ সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ করেন তবে ধলভূম বিহার হইতে সকল দিকেই বিচ্ছিন্ন এলাকায় পরিণত হইবে কারণ তখন ধলভূমের পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমানায় থাকিবে উড়িষ্যা এবং পূর্ব্ব ও উত্তর সীমান্ত হইবে পশ্চিমবঙ্গ। এই কারণেও ধলভূম পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যর্পিত হওয়া উচিত যাহা কিছুদিন পূর্ব্বেও পশ্চিমবঙ্গের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ ছিল।"

স্মারকলিপিতে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, যদি রাজ্যপুনর্গঠন কমিশন ধলভূমকে পশ্চিমবঙ্গের সহিত সংযুক্ত করেন তবে যেন ইহাকে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার সহিত সংযুক্ত করিয়া একটি নূতন জেলা গঠন করা হয়; কারণ মেদিনীপুর এখনও একটি খুবই বৃহৎ জেলা এবং উহাকে আরও বড় করিয়া তুলিলে শাসনতান্ত্রিক ও অন্যান্য অসুবিধা দেখা দিতে পারে। ("নব-জাগরণ" বিশেষ সংখ্যা, ৯ই আষাঢ়)

ভারত-রাষ্ট্রে বাংলা সাহিত্যের স্থান

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ "সম্মেলনী" পত্রিকায় এক প্রবন্ধে ভারতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্থান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিতেছেন, "সাহিত্যই জাতিগঠনের, জাতিকে মহীয়ান্ ও গরীয়ান্ করিবার অনুপ্রেরণা যোগায়। এ যুগে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের শক্তি ও স্পৃহা এক শতাব্দী ব্যাপিয়া বাংলা সাহিত্যই উদ্বোধিত করিয়াছে। কবি রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাতেই মহামানব গোষ্ঠী সৃষ্টির কল্পনা দিয়া গিয়াছেন। বহু শতাব্দী ধরিয়া বৈষ্ণব গীতকাব্য প্রেম-রসের বন্যা, সবারই উপর মানব এই চেতনা সমগ্র ভারতে বহাইয়া দিয়াছে। এযুগের গদ্য ও কথাসাহিত্য ভারতে বিভিন্ন সাহিত্যেরই আদর্শ ও অনুকরণীয় হইয়া আছে। ইংরেজী সাহিত্যে যে বিশাল ভাবধারা প্রবাহিত তাহা বাংলা সাহিত্যের মধ্যেই ভারতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

"বাংলার বহু মনীষীর সাধনাতে বাংলা সাহিত্য পুষ্টিলাভ করে এবং তাহাই সমগ্র ভারতকে নবজাগরণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন সাহিত্য স্রষ্টারা বাংলার সে অবদান প্রাণ ও মন দিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।···

···"গুজরাটি সাহিত্য পরিষদ, নাগরী প্রচারিণী সভা প্রভৃতি সাহিত্য প্রতিষ্ঠানগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেরই আদর্শ ও নিয়মে গড়িয়া উঠে। নানা সাহিত্যে বাংলারই উপন্যাস, গল্প ও কবিতা লেখকেরই সাধনার ফল ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত হয়! স্বাধীনতার উন্মাদন মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' ও "জনগণমন" ভারতের জাতীয় সঙ্গীত রূপে স্বীকৃতি লাভ করে।"

কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতের স্বাধীনতালাভের পর বঙ্গসাহিত্যের সে অবদানকে অস্বীকার করিবার একটি প্রবল ঝোঁক দেখা দিয়াছে! অতি উৎসাহী প্রচারকের দল হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠা করিবার আগ্রহের বাংলাসহ অন্যান্য ভাষাসমূহের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারে লাগিয়াছেন এবং ভারতে ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে, বাংলায় অনেক লেখক মনীষী ও সাংবাদিক এই নূতন সাম্রাজ্যবাদের প্রতি নতি স্বীকার করিয়া বাংলা সাহিত্যের ও ভাষার প্রসারের গতি ব্যাহত করিতেছেন।

লেখক বলিতেছেন যে, ভারতীয় সংবিধানে কোন ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা অথবা জাতীয় ভাষার মর্য্যাদা দেওয়া হয় নাই। শাসন-তন্ত্রে বাংলাসহ ১৪টি ভাষাকে সমান মর্য্যাদা দান করা হইয়াছে। অবশ্য ৩৫৩ ধারায় ১৫ বৎসর পরে ইংরেজী স্থানে নাগরী অক্ষরে হিন্দীর ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে যে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা দেওয়া হয় নাই স্বয়ং পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন মহাশয় তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

ভারতীয় রাষ্ট্রনায়কগণ মনে করেন যে, ভারতের বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর বোধগম্য একটি সর্ব্বভারতীয় ভাষার ব্যবহার রাষ্ট্রের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবে। সেই জন্যই ১৫ বৎসরের মধ্যে সকল ভাষা হইতে সরল শব্দ চয়ন করিয়া সকল ভাষাভাষীর বোধগম্য "হিন্দী" নামধেয় একটি ভাষা গঠনের ভার বিভিন্ন ভাষাভাষী বিশেষজ্ঞদের লইয়া গঠিত একটি সমিতির উপর অর্পিত হইয়াছে। গত মে মাসে পুণাতে যে ভারতীয় ভাষা মহাসম্মেলন হয় তাহার সভাপতি মহা-মহোপাধ্যায় কানে মহাশয় ভারতীয় সংবিধানের ভাষা ও সাহিত্যের অধিকার ধারাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে হিন্দীর স্থান ও অধিকার রাষ্ট্রভাষা রূপে নয়, প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ভাষাসমূহই শিক্ষা ও রাষ্ট্র পরিচালনার বাহন।

সকল ভারতবাসীর নিকট সহজবোধ্য একটি সর্ব্বভারতীয় ভাষার সৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সাহায্য যে একান্ত প্রয়োজন তাহা অনেক অবাঙালী ভারতীয় মনীষীও স্বীকার করিয়াছেন। এমনকি স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদও বলিয়াছেন যে, উত্তর ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করিলে, সেই কল্পিত জাতীয় ভাষা গঠনের পথ সুগম হইবে এবং সেই ভাষা সমৃদ্ধিশালী হইবে।

লেখক মনে করেন যাহাতে বাংলাভাষা ও সাহিত্য স্বাধীন ভারতে আপন মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে সে বিষয়ে বাঙালী সাহিত্যিকদিগেরও বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে।

আসাম-ত্রিপুরা-মণিপুর সাহিত্য সম্মেলন

গত ১৯শে ও ২০শে জুন করিমগঞ্জ কলেজ হলে আসাম-ত্রিপুরা-মণিপুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়। ভারত-সরকারের অর্থ-বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং বিখ্যাত সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে আসাম, ত্রিপুরা ও মণিপুর হইতে দুই শতাধিক প্রতিনিধি এবং ন্যূনাধিক দুই সহস্র দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

দুই দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত ঐ সম্মেলনে মোট এগারোটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। আরও স্থির হয় যে, সম্মেলনের পরবর্তী অধিবেশন শিলচরে অনুষ্ঠিত হইবে।

গৃহীত প্রস্তাবসমূহে আসামে বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতির বলপূর্ব্বক সঙ্কোচননীতির নিন্দা করিয়া বলা হইয়াছে যে, ঐরূপ সঙ্কীর্ণ নীতির ফলে কেবল যে বঙ্গভাষাভাষী সম্প্রদায়ের ক্ষতি হইতেছে তাহা নহে, "উহাতে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট, জাতীয় সমৃদ্ধি ব্যাহত ও জাতীয় ভাব ক্ষুণ্ণ হইতে চলিয়াছে।" গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগীয় পরীক্ষায় প্রশংসনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াও বাঙালী ছাত্রগণ সরকারী বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হন। এমনকি রাজ্যের উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাঁহাদের প্রবেশাধিকার পর্য্যন্ত অন্যায়ভাবে সঙ্কুচিত করা হইতেছে। একটি প্রস্তাবে এই বৈষম্যমূলক ব্যবহারের প্রতি রাজ্য-সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

আসামের বিভিন্ন অঞ্চলের বঙ্গভাষাভাষী প্রধান বিদ্যালয়গুলিতে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার উপর সরকারী বিরূপতার সমালোচনা করিয়া আসাম সরকারকে বাঙালীদের কোণঠাসা ও নাজেহাল করিবার এই নীতি অবিলম্বে বর্জ্জন করিবার জন্য অনুরোধ জানানো হইয়াছে। অপর একটি প্রস্তাবে আসামে আগত পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তদের পুনর্বাসনের অব্যবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে।

আসামে বাঙালী এবং অসমীয়া ভিন্ন অন্যান্য ভাষাভাষীদের প্রতি সর্ব্বক্ষেত্রে যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় কয়েকটি প্রস্তাবে তাহার তীব্র সমালোচনা করা হয়। একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে,"এই বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য শুধু যে আসাম সরকারই দায়ী তাহা নয়, কেন্দ্রীয় সরকারও ইহাতে সহযোগিতা করিয়া যাইতেছেন।"

ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সুকৌশল পরিকল্পনা চলিতেছে একটি প্রস্তাবে সে সম্পর্কে ত্রিপুরাবাসী ও ত্রিপুরা রাজ্য-সরকারকে প্রতিরক্ষামূলক সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। অপর একটি প্রস্তাবে বিহারের মানভূম অঞ্চলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য লোকসেবক সঙ্ঘ যে সংগ্রাম চালাইতেছেন তাহাকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া তাহার সাফল্য কামনা করা হয়।

দশ নম্বর প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, "১৯৫১ ইংরেজীর আদমসুমারীতে আসাম রাজ্যে বঙ্গভাষাভাষী ও পার্ব্বত্য অধিবাসীদের যে জনসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করিতে এই সম্মেলন প্রস্তুত নহেন।"

সর্ব্বশেষ ও একাদশ প্রস্তাবে "আসাম-মণিপুর-ত্রিপুরার বাংলাভাষা এবং বাংলাভাষাভাষীদের সহিত সংযোগ স্থাপন, সাহিত্যের পুষ্টি ও বিকাশ সাধন এবং এই অঞ্চলের অন্যান্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির সহিত যোগাযোগ, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও ভাবের আদান-প্রদান দৃঢ়তর করিবার উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী সংস্থা গঠন করার জন্য" শ্রীবিধুভূষণ চৌধুরীকে আহ্বায়ক করিয়া একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়। "উক্ত প্রস্তুতি কমিটি ২১শে জুনের মধ্যে স্থায়ী সংস্থা গঠনের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া 'আসাম-ত্রিপুরা-মণিপুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সমিতির' কর্ম্মকর্তা ও কার্য্য-পরিষদের সভ্যদের নাম ঘোষণা করিবেন।"

"উক্ত সমিতি বঙ্গভাষাভাষীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক চেতনা ও কর্ম্মতৎপরতা উদ্দীপিত করিবার জন্য একটি সাংস্কৃতিক মুখপত্র প্রকাশের এবং বিভিন্ন শহরে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' শাখা স্থাপনের নিমিত্ত যাবতীয় প্রারম্ভিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।" ("যুগশক্তি", ১০ই আষাঢ়)

সম্মেলনের এই সকল সমালোচনা ও প্রস্তাব ইংরেজী ও হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া সমস্ত সংবাদপত্রে ও কেন্দ্রীয় লোকসভার সকল সভ্যকে প্রেরণ করা উচিত। বাঙালীর পরিচালনায় যে সকল ইংরেজী সংবাদপত্র আছে তাহাদের এ বিষয়ে দায়িত্ব রহিয়াছে আমরা মনে করি।

আসামে ডোমিসাইল সম্পর্কিত নিয়মাদি

আসামের ডোমিসাইল সম্পর্কিত আইনের সমালোচনা করিয়া এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে "বাতায়ন" লিখিতেছেন, আসামে আসাম একজিকিউটিভ ম্যানুয়েলের ৩০৭ (২) অনুচ্ছেদে ডোমিসাইল সম্পর্কিত নিয়ম বিধিবদ্ধ রহিয়াছে। 'উক্ত নিয়মমতে যে ব্যক্তি আসামের 'নেটিভ' বা দেশজ নহেন, তিনি যদি আসামে নিজস্ব গৃহাদি অর্জ্জন করিয়া সেই গৃহে অন্ততঃপক্ষে দশ বৎসর কাল বাস করিয়া থাকেন, এবং আমৃত্যু সেই গৃহে বাস করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন, তবেই তিনি 'ডোমিসাইল্‌ড' (বাসিন্দা) বলিয়া পরিগৃহীত হইবার উপযুক্ত হইবেন।" পত্রিকাটির অভিমতে এই নিয়ম ভারতীয় সংবিধানের ১৬(১) ও (২) ধারার স্পষ্টতঃ বিরোধী এবং ১৩(১) ধারা মতে স্বভাবতঃই অসিদ্ধ (void)।

কিন্তু তথাপি আসাম সরকার শুধু উহাকে আঁকড়াইয়া থাকিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই: ১৯৫৩ সনের ৩০শে জুলাই এক গোপন সার্কুলারে আসাম সরকারের নিয়োগ বিভাগ এই সম্পর্কে কতকগুলি অতিরিক্ত নিয়ম জারী করিয়াছেন। "বাতায়নে"র সংবাদ অনুযায়ী তাহাতে বলা হইয়াছে যে, "শ্রীহট্টের যে সমস্ত

'দেশজ' বা বাসিন্দা অথবা আসামের 'নেটিভ' (দেশজ) বা 'ডোমিসাইল্ড' (বাসিন্দা) হিসাবে চাকুরীতে গৃহীত হইয়াছিলেন ও ভারত বিভাগের পর ভারতে চাকুরীর ইচ্ছাও (opt) গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের সন্ততিগণ চাকুরী প্রার্থনার পূর্ব্বে বিভাগোত্তর আসামে 'অন্ততঃ দশ বৎসর' কাল ধরিয়া যদি বাস করিয়া থাকেন এবং আমৃত্যু তথায় বাস করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন তাঁহাদিগের পিতা কর্ত্তৃক অর্জ্জিত গৃহে, তবেই তাঁহারা নূতন আসামের দেশজ বা বাসিন্দা হিসাবে গৃহীত হইতে পারিবেন। এই নিয়ম অনুসারে এইরূপ চাকুরীয়ার পুত্রেরা ১৯৫৭ সনের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে তো কোন চাকুরীর প্রার্থীই হইতে পারিবেন না! আর যে সমস্ত ব্যক্তি প্রাক্-বিভাগ যুগে শ্রীহট্টের দেশজ বা বাসিন্দা ছিলেন তাঁহারা বিভাগোত্তর আসামে দেশজ বা বাসিন্দা হিসাবে গৃহীত হইবেন, শুধু যদি তাঁহারা ভারত বিভাগের পূর্ব্বে বিভাগোত্তর আসামের কোন স্থানে গৃহাদি অর্জ্জন করিয়া বসবাস স্থাপন করিয়া থাকেন এবং তদবধি সেখানে বাস করিতে থাকেন।..."

উক্ত নিয়মানুযায়ী বাস্তুহারাদিগকে কেবলমাত্র তখনই চাকুরীতে লওয়া হইবে যখন আসামের 'দেশজ' বা 'বাসিন্দা'দিগের মধ্য হইতে কোন উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যাইবে না।

আসাম সরকারের এই বৈষম্যমূলক আচরণ বিচারালয়ে নিন্দিত হওয়া সত্ত্বেও সরকারের চৈতন্যোদয় হয় নাই। "শ্রীহট্ট সমুদ্ভূত ও শ্রীহট্ট সমাগত দুই জন অধ্যাপকের প্রতি বিসদৃশ ব্যবহার সাম্প্রতিক কালে আসাম হাইকোর্ট কর্ত্তৃক বিধিবহির্ভূত বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে এবং উক্ত অধ্যাপকদ্বয় স্ব স্ব চাকুরীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার আদেশ পাইয়াছেন।..."

উপসংহারে "বাতায়ন" আসাম সরকারকে তাঁহাদের এই বৈষম্যমূলক আচরণ পরিত্যাগ করিয়া সংবিধানসম্মত আইন প্রচলন করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

কুচবিহারের তামাক চাষ

কুচবিহার অপেক্ষাকৃত একটি ছোট জেলা; আয়তন মাত্র ১৩০০ মাইল। জেলার প্রধান দুইটি উৎপন্ন দ্রব্য হইল পাট ও তামাক। তবে জেলার অর্থনীতিতে তামাকের প্রাধান্যই বেশী, কারণ পাট অপেক্ষা অধিক মূল্যের তামাক উৎপন্ন হয়। ইংরেজী সাপ্তাহিক "ওয়েষ্ট বেঙ্গল" পত্রিকায় কুচবিহারে তামাক চাষ সম্পর্কে এক প্রবন্ধে শ্রী জে. এন. মহলানবীশ লিখিতেছেন, কুচবিহারের মাথাভাঙ্গা ও দিনহাটা এই দুইটি বিভাগেই প্রধানতঃ তামাকের চাষ সীমাবদ্ধ। প্রায় ২৭,৮০০ একর জমিতে তামাকের চাষ হয়। মাথাভাঙ্গাতে বৃহত্তর ক্ষেতে তামাকের চাষ হয় তবে দিনহাটায় উৎপন্ন তামাকই গুণে শ্রেষ্ঠতর।

উৎপন্ন তামাক দুই প্রকারের—জাতি ও মতিহারী। জাতি তামাক প্রধানতঃ ধূমপানের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং মতিহারী তামাক প্রধানতঃ চিবাইয়া খাওয়া হয়। দেশীয় চুরুট তৈয়ারী করিবার জন্যও জাতি তামাক ব্যবহৃত হয়। বর্ত্তমানে মতিহারী তামাকের দর প্রতি মণ ১২০ হইতে ১৬০ টাকা এবং জাতি তামাকের দর প্রতি মণ ৮০ হইতে ১২৬ টাকা। যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধোত্তর যুগে তামাকের মূল্য খুবই বৃদ্ধি পায়। ১৯৫২ সনের মার্চ্চ মাসে মূল্যহ্রাসের লক্ষণ প্রকাশ পায়; তবে সাম্প্রতিক কালে মূল্যমানের ঊর্দ্ধগতি দেখা দিয়াছে এবং আশা করা যায় যে দেশের আভ্যন্তরীণ কৃষি-অর্থনীতির কোন হঠাৎ পরিবর্ত্তন না ঘটিলে তামাকের মূল্যমান স্থির থাকিবে।

অনুমান করা হয়, কুচবিহারে আড়াই লক্ষ মণ তামাক উৎপন্ন হয়; তন্মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ জাতি এবং অবশিষ্ট মতিহারী। তামাকের মূল্য প্রতি মণ ১০০ টাকা করিয়া ধরিলেও ইহার দ্বারা প্রতি বৎসর কুচবিহারের ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা আয় হয়।

দেশবিভাগের ফলে কুচবিহারে উৎপন্ন তামাকের চাহিদায় বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। দেশবিভাগের পূর্ব্বে অধিকাংশ জাতি তামাক পূর্ব্ববঙ্গে যাইত। কিন্তু দেশবিভাগের পর সেখানে আর কুচবিহার হইতে তামাক যায় না; ফলে জাতি তামাকের একটি প্রধান বাজার নষ্ট হয় এবং জাতি তামাকের দর পড়িতে থাকে। সাম্প্রতিক কালে আসামে কুচবিহারের জাতি তামাকের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতি তামাকের মূল্য কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপরপক্ষে দেশবিভাগের পর পূর্ব্ববঙ্গ হইতে মতিহারী তামাক আমদানী বন্ধ হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে মতিহারী তামাকের মূল্য সবিশেষ বৃদ্ধি পায়। ফলে মতিহারী তামাকের চাষ বাড়িয়াছে এবং জাতি তামাকের চাষ হ্রাস পাইয়াছে।

শ্রীযুক্ত মহলানবীশ লিখিতেছেন যে, কুচবিহারের মাটি এবং আবহাওয়া উভয়ই তামাকচাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত তথায় উন্নত ধরণের তামাক চাষের কোন সুসংবদ্ধ প্রয়াস হয় নাই। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় তামাক কমিটি দিনহাটার নিকট একটি তামাক উৎপাদন গবেষণা-কেন্দ্র খুলিয়াছেন। সেখানে কোন্ প্রকারের তামাকের চাষ কুচবিহারে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ফলপ্রসূ হইবে সে সম্পর্কে গবেষণা চলিতেছে।

যদিও তামাক কুচবিহারের অর্থনীতিতে একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তথাপি তামাকচাষীরা নিতান্ত দুরবস্থায় রহিয়াছে। কারণ বিশ্লেষণ করিয়া লেখক বলিতেছেন যে, তামাক বিক্রয়ের কোন সুবন্দোবস্ত না থাকায় মহাজন এবং ধনী ব্যবসায়ীরাই লাভের অধিকাংশ ভোগ করে। যে জমিতে তামাক চাষ হয় তাহার অধিকাংশই জমিদার এবং জোতদারদের হাতে; তাহারা চাষীদের নিকট ভাগে জমি বন্দোবস্ত দেয়। গরীব কৃষকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঋণগ্রস্ত হওয়ায় তাহারা জমিদার, জোতদার এবং মহাজনদের নিকট উৎপন্ন তামাক অতি নিম্নমূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

তামাকের মূল্য নির্দ্ধারণ ব্যবস্থাও ত্রুটিপূর্ণ। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ৯৩ তোলাতে এক সের ধরা হয়। সেইজন্য অজ্ঞ দরিদ্র

চাষীদের পক্ষে মূল্য নির্দ্ধারণ বিশেষ কষ্টকর হয়। তাহা ছাড়া উৎপাদক কৃষককে বিক্রীত প্রতি মণ তামাকের সহিত সকল ক্ষেত্রেই দেড় সের হইতে আড়াই সের তামাক বিনামূল্যে দিতে হয়।

তামাক কাটার অব্যবহিত পরে তামাকের মূল্যমান হ্রাস পায়; কিন্তু দরিদ্র কৃষকের পক্ষে তামাক বেশী দিন ধরিয়া রাখা সম্ভব নয় বলিয়া তাহাকে অল্প দামেই তামাক বিক্রয় করিতে হয়। উপরন্তু তামাক গুদামজাত রাখাও বিশেষ কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়সাপেক্ষ। কিছুদিন পর যখন তামাকের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে তখন ব্যবসায়ীরা উচ্চমূল্যে তামাক বিক্রয় করিয়া প্রভূত লাভ করে।

এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া মহলানবীশ লিখিতেছেন যে, তামাকচাষীরা যদি সমবায় পদ্ধতিতে তামাক বিক্রয়ের জন্য সচেষ্ট হয় তবে তাহাতে তাহারা বিশেষ উপকৃত হইতে পারে। তবে প্রথমদিকে তাহাদের হাতেই সবকিছু ছাড়িয়া দিলে সফলতার আশা সুদূরপরাহত; কারণ অজ্ঞ, দরিদ্র কৃষকের পক্ষে সমবায় পদ্ধতিতে চলিতে হইলে সময়ের প্রয়োজন এবং ততদিন শিক্ষিত লোকদের তাহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে।

মুর্শিদাবাদের গজদন্ত শিল্প

বিগত দুই শতাব্দী যাবং মুর্শিদাবাদ জেলার গজদন্ত শিল্পের খ্যাতি এককালে বহুদূর বিস্তৃত ছিল। বহরমপুরের গজদন্ত-শিল্পীরা সমগ্র ভারতের মধ্যে গজদন্তশিল্পের শ্রেষ্ঠ কারিগর হিসাবে পরিগণিত হইতেন। মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ ও বহরমপুর পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম গজদন্ত-শিল্পকেন্দ্র রূপে বিখ্যাত ছিল। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে ৪৫ বৎসর এই শিল্প ভালই চালু ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এই শিল্পের সমৃদ্ধি বিশেষরূপেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে এই শিল্প ধ্বংসোন্মুখ।

গজদন্ত-শিল্পীদের ভাস্কর নামে অভিহিত করা হয়। বর্তমানে মুর্শিদাবাদে দশ ঘর ভাস্করও রুজি-রোজগারের জন্য গজদন্তশিল্পের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেন কিনা সন্দেহ। "মুর্শিদাবাদ সমাচার" লিখিতেছেন যে, "বহরমপুরে যে তিন-চার ঘর এখনও হাতির দাঁতের জিনিষপত্র ও প্রতিমূর্তি নির্ম্মাণ করেন, তাঁহাদের অপরাপর আয়ের পথ না থাকিলে এতদিন বাধ্য হইয়া এই শিল্প পরিত্যাগ করিতেন।"

গজদন্ত শিল্পের বর্তমান দুরবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিয়া পত্রিকাটি লিখিতেছেন যে, ক্রেতার অভাবেই গজদন্ত শিল্প বর্তমান দুর্দ্দশার সম্মুখীন হইয়াছে। পূর্ব্বে রাজা-মহারাজা এবং জমিদারগণ গজদন্তের সামগ্রী ক্রয় করিতেন। অপেক্ষাকৃত দুর্মূল্যতা হেতু সাধারণ লোক কখনই এই সকল দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিত না। বর্তমানে রাজা-মহারাজা ও জমিদারশ্রেণীর অবস্থার অবনতি ঘটায় এবং সাধারণ লোকের আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় গজদন্ত সামগ্রীর ক্রেতা প্রায় নাই বলিলেও চলে। দেশীয় ধনিক সম্প্রদায় এই শিল্পকে কোন পৃষ্ঠপোষকতা করেন না বলিলেই হয়। তা ছাড়া বিদেশী বাজারে এই শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের কোন সুবন্দোবস্ত না থাকাতে গজদন্ত-শিল্পীদের বাধ্য হইয়া বহু কালের জাতব্যবসা পরিত্যাগ করিতে হইতেছে।

তাহার উপর রহিয়াছে কাঁচা মালের অতিরিক্ত চড়া মূল্য। "মুর্শিদাবাদ সমাচার" লিখিতেছে, "দেশের গজদন্ত-শিল্পীর ব্যবসা চলুক আর নাই চলুক শুনিয়াছি যাহারা হস্তীদন্ত বিদেশ হইতে আমদানী করে, তাহাদের লাভের পরিমাণ যথেষ্ট এবং হস্তীদন্ত আমদানীর কারবার শঙ্খ আমদানীর কারবারের মত এক বিশেষ শ্রেণীর একচেটিয়া। সরকারী হস্তক্ষেপে যদি হস্তীদন্ত আমদানীর একচেটিয়া কারবার বন্ধ হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ গজদন্ত-শিল্পীবর্গ কাঁচা মাল অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে পাইতে পারে। কিন্তু এ যাবং সেরূপ কোনও চেষ্টা হয় নাই।"

এ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও যথেষ্ট কর্তব্য আছে বলিয়া পত্রিকাটি মনে করেন। "দক্ষিণ-ভারত বা দিল্লী-জয়পুরের গজদন্ত-শিল্পীরক্ষা সম্বন্ধে সেই দেশের রাজা-সরকার ইতিমধ্যেই অবহিত হইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ-সরকারও এই শিল্পটি সংরক্ষণে অতঃপর অগ্রসর না হইলে কোনও উপায় নাই।" (২৫শে জ্যৈষ্ঠ)

জঙ্গীপুর মহকুমার সমস্যাবলী

'ভারতী' এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জঙ্গীপুর মহকুমার সমস্যাবলীর প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অনুরোধ জানাইয়াছেন যাহাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে ঐ সকল সমস্যা নিরসনের চেষ্টা হয়।

পত্রিকাটি লিখিতেছেন, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সর্বাপেক্ষা অবজ্ঞাত সীমান্তবর্তী মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে জঙ্গীপুর মহকুমা আনুপাতিকভাবে আরও বেশী অবজ্ঞাত। প্রথম পরিকল্পনায় ন্যাশনাল হাইরোড ছাড়া আর কিছু ঐ মহকুমার ভাগ্যে পড়ে নাই।

জঙ্গীপুরের প্রধান সমস্যা যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব। 'ভারতী' লিখিতেছেন, "ন্যাশনাল হাইরোড ও জঙ্গীপুর-লালগোলা রোড দ্বারা কিছু সুরাহা হইলেও পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের সহিত যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা না হইলে গ্রামবাসীদের যাতায়াতের অসুবিধা থাকিয়া যাইবে। মহকুমার বিশিষ্ট ব্যবসাকেন্দ্র ধুলিয়ান রেলপথ হইতে বিচ্ছিন্ন। ট্রেনের অব্যবস্থার জন্য এই অঞ্চলের অধিবাসীদের কলিকাতা এবং অন্যান্য জায়গায় যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে।"

ফরাক্কাতে গঙ্গার উপর একটি বাঁধ না দেওয়ার ফলে বৎসরের অর্দ্ধেক সময় গঙ্গার বুকে চড়া পড়িয়া থাকে। অবিলম্বে ঐ স্থানে বাঁধ না দিতে পারিলে "উত্তরবঙ্গের সহিত যোগাযোগ রক্ষা হইবে না এবং এই অঞ্চলের বিস্তৃত এলাকা জুড়িয়া শিল্প ও কৃষির উন্নতি সম্ভব হইবে না।"

ঐ মহকুমার অপর একটি প্রধান সমস্যা হইল জলকষ্ট। গ্রীষ্মকালে তিন-চার মাইল দূর হইতেও পল্লীবধূগণ পানীয় জল সংগ্রহ করিতে পারেন না। নলকূপের অভাবে বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রায় পাওয়া যায় না বলিলেও চলে। ফলে কলেরা, আমাশয় প্রভৃতি

রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। "যদিও গত কয়েক বছর এ অঞ্চলে বন্যার প্লাবন দেখা যায় নাই তবুও ফরাক্কা-সমসেরগঞ্জ অঞ্চলে শিরা-পাহাড় তেঘরী, গোবিন্দপুর এলাকায় দুর্জ্জনখালি, দয়ারামপুর, লালগোলা অঞ্চলে চিলাকুঠির ডাঁরা ইত্যাদি বর্ষার সময়ে গ্রামস্থ মানুষকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখে।"

জঙ্গীপুরে ছোটখাট সেচ-পরিকল্পনারও বিশেষ অভাব রহিয়াছে। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি ব্লকও নাকি মুর্শিদাবাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। বীরভূম সীমান্তে হিলোরা-জাজিগ্রাম ব্যতীত সরকারী থানা বা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ইউনিট ঐ মহকুমায় নাই। মহকুমার কুটীরশিল্পের অবস্থাও বিশেষ সুবিধার নয়। রেশমশিল্প লুপ্তপ্রায় এবং কাংস্যশিল্প ও তাঁতশিল্পও অচল অবস্থার সম্মুখীন।

ত্রিপুরা সরকারের পুনর্ব্বাসন বিভাগের গাফিলতি

৫ই আষাঢ় এক সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রসঙ্গে "সেবক" লিখিতেছেন যে, ত্রিপুরা সরকারের পুনর্ব্বাসন বিভাগের গাফিলতির জন্য রুদ্র-সাগরস্থ ছয় শত মৎস্যজীবী পরিবারের পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ত্রিপুরাতে অবস্থিত তিন-চার লক্ষ উদ্বাস্তুদের মধ্যে রুদ্রসাগরের এই ছয় শত মৎস্যজীবী পরিবারই প্রকৃত পুনর্ব্বাসন পাইয়াছিল। সরকার এই মৎস্যজীবী পরিবারদিগের জন্য সর্ব্বসমেত পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে একটি স্লুইস গেটের অভাবে সরকারের রুদ্রসাগর ফিসারি পরিকল্পনা বানচাল হইয়া যাইতেছে। এইরূপ একটি গেটের অভাবে বর্ষাকালে লক্ষ লক্ষ পোনা চলিয়া যায় এবং উদ্বাস্তুদের হাজার হাজার মণ বোরো ফসল নষ্ট হয়। গত দুই বৎসরের সকল আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও এই ব্যাপারে সরকারী উদাসীনতার অবসানের কোন সূচনা দেখা যায় নাই।

উক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য অনুযায়ী ভারত-সরকার স্লুইস গেটটি নিম্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে সবিশেষ আগ্রহান্বিত। তাঁহারা নাকি বরাবর ত্রিপুরা সরকারের নিকট গেট নিম্মাণের ব্যয়ের একটি এষ্টিমেটের জন্য তাগাদা দিয়াছেন; কিন্তু ত্রিপুরা সরকার এষ্টিমেট দাখিল করেন নাই। পূর্ত্তবিভাগ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন এবং পুনর্ব্বাসন বিভাগও পূর্ত্তবিভাগের উপর এজন্য কোন চাপ দেন নাই। কারণ, পত্রিকাটির ভাষায়, "স্লুইস গেট নিম্মাণ হইয়া গেলে এই ছয় শত পরিবার সম্পূর্ণ পুনর্ব্বাসন পাইয়া যায়। ...উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসনকার্য্য যদি সম্পন্ন হইয়া যায় তাহা হইলে বিভাগটির দরজা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা তো আছেই।"

ত্রিপুরায় বন্যা

"সেবক" পত্রিকার ১৩ই জুন সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, সপ্তাহব্যাপী প্রবল বারিপাতের ফলে ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চল বন্যার জলে জলমগ্ন হওয়ায় যানবাহন এবং ডাক চলাচল ব্যবস্থায় বিলম্ব ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। বিমানঘাঁটিতে জল উঠায় কৈলাসহর ও কমলপুরে বিমান চলাচলে অসুবিধা ঘটে। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, সরকারী কর্ম্মচারিগণের পক্ষেও আর মফস্বল পরিদর্শনে যাওয়া সম্ভব হইতেছে না। তদুপরি ডাক বিভাগীয় বেতারযন্ত্র বিকল হওয়ায় মফস্বল হইতে টেলিগ্রাম আদান-প্রদান বন্ধ হইয়াছে। প্রবল বারিপাতের ফলে হাওড়া নদীর বাঁধ ভাঙিয়া আগরতলা জলমগ্ন হইয়া যায়।

আসাম-আগরতলা সড়কটি বর্ষার আগমনে বিশেষ সঙ্কটজনক অবস্থায় পড়িয়াছে। উক্ত পত্রিকার ২৭শে জুন সংখ্যায় ষ্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত বিবরণীতে প্রকাশ যে, ১লা জুলাই ত্রিপুরা সরকারের নিকট ঐ রাস্তাটি আসাম পি-ডব্লিউ-ডি কর্ত্তৃক হস্তান্তরিত হইবার কথা ছিল। কিন্তু আসামের পূর্ত্তবিভাগ সময়োপযোগী কার্য্য সম্পাদন না করায় তাহা সম্ভব হইবে না। উক্ত রিপোর্টারের সংবাদ অনুযায়ী "ঐ সড়কটির কাজ সহসা সম্পূর্ণ হইবার বিশেষ লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।" ঘন ঘন ঠিকাদার পরিবর্ত্তন ও এক-জনের পদ আর একজনকে দিতে গিয়াই নাকি এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।

ত্রিপুরায় প্রায় প্রতি বৎসরেই বন্যার প্রকোপে বিশেষ ক্ষতি হয়। এই সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "সেবক" লিখিতেছেন, রাজ্যের প্রধানতম নদীগুলির জল বহন করিবার ক্ষমতা লোপ পাওয়ার ফলেই এইরূপ বন্যা ঘটিয়া থাকে। লোকসংখ্যা এবং বসতিবৃদ্ধির ফলে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু বনসম্পদ নষ্ট হইয়াছে। এখন বৃষ্টি হইলেই জল কোথাও বাধাপ্রাপ্ত না হওয়ায় সহসা গড়াইয়া আসিতে পারে; ফলে বহু অঞ্চল হঠাৎ জলমগ্ন হইয়া যায় এবং বন্যা দেখা দেয়।

কিন্তু ঐরূপ ক্ষতি সত্ত্বেও ত্রিপুরার জল ত্রিপুরায় থাকে না। "একদিকে যেমন বন্যার জলে ফসল নষ্ট হয় অন্যদিকে জল আটকাইয়া রাখার ব্যবস্থা না থাকায় জলাভাবে কৃষিকার্য্যও ব্যাহত হয়।" বাঁধ বাঁধিয়া জল আটকাইয়া রাখিলে তাহাতে কৃষিকার্য্যেরও প্রভূত সাহায্য হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সস্তায় জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যাইবে, যাহার সাহায্যে ত্রিপুরায় উন্নয়ন কার্য্য বহুলাংশে ত্বরান্বিত করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে যাহাতে ত্রিপুরার এই একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাটি উপেক্ষিত না হয় সেজন্য উক্ত পত্রিকা অনুরোধ জানাইয়াছেন।

নেপা মিল পরিকল্পনা

ভারতে বর্ত্তমানে কোন নিউজপ্রিণ্ট উৎপন্ন হয় না। ভারতে প্রতি বৎসর ৭৫,০০০ টন নিউজপ্রিণ্ট ব্যবহৃত হয়, উহার জন্য প্রায় বার্ষিক ছয় কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করিতে হয়। যাহাতে ভারতে নিউজপ্রিণ্ট উৎপন্ন করা যায় তজ্জন্য মধ্যপ্রদেশের নেপা-নগরে একটি নিউজপ্রিণ্ট কারখানা স্থাপনের কার্য্য চলিতেছে। উক্ত কারখানা হইতে প্রতি বৎসর ৩০,০০০ টন নিউজপ্রিণ্ট উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ইহাতে ভারতের প্রতি বৎসর প্রায় দুই কোটি টাকা মূল্যের বিদেশী মুদ্রা বাঁচিয়া যাইবে।

প্রস্তাবিত মিল স্থাপনের কার্য্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। ৩রা জুলাই "হিতবাদ" পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ যে, আনুমানিক মোট ব্যয় ৫ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকার মধ্যে ইতিমধ্যেই প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে এবং কার্য্যতঃ প্রায় সমুদয় যন্ত্রপাতি বসানোর কাজও সম্পন্ন হইয়াছে। আগামী অক্টোবর মাস হইতেই উক্ত মিলে দৈনিক ২৫ টন নিউজপ্রিন্ট উৎপাদন আরম্ভ করা হইবে।

উক্ত পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী ভারত-সরকার অদ্যাবধি ঐ পরিকল্পনার জন্য এক কোটি টাকা ঋণ দিয়াছেন; মধ্যপ্রদেশ সরকার ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ঋণ হিসাবে দিয়াছেন এবং শেয়ার ক্যাপিটাল হিসাবে দিয়াছেন ৬৫ লক্ষ টাকা। মূলধন হিসাবে জনসাধারণের নিকট হইতে তোলা হইয়াছে ৭৫ লক্ষ টাকা।

নির্ভরযোগ্য সূত্র হইতে জানা গিয়াছে যে, মধ্যপ্রদেশ সরকার নাকি উক্ত পরিকল্পনার জন্য ভারত-সরকারের নিকট আরও সোয়া এক কোটি টাকা ঋণ প্রার্থনা করিয়াছেন। কিন্তু ভারত-সরকার আপাততঃ সেই ঋণ দান স্থগিত রাখিয়াছেন। গত বৎসর কেন্দ্রীয় সরকার তিন জন লইয়া গঠিত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটিকে নেপানগরে পাঠান সেখানকার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য। ঐ বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে কেন্দ্রীয় সরকার নূতন ঋণ দান সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন।

সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশ রাজ্য-সরকারের আমন্ত্রণক্রমে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখ নেপা মিল পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। নাগপুর পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, নেপা মিলের কার্য্য এখনও অর্দ্ধ-সমাপ্ত; এখনও অনেক যন্ত্রপাতি বসানো বাকি রহিয়াছে, অর্থাভাবে তাহা করা যাইতেছে না।

মধ্যপ্রদেশ সরকার শ্রীদেশমুখের এইরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

ভারতে কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

কোন দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হইলেও উহার অধিবাসীরা দরিদ্র হইতে পারে—বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও কারিগরি কুশলতার অভাবে। ভারত এই আপাতবিরোধী পরিস্থিতির প্রকৃত দৃষ্টান্তস্থল। কাজেই ভারতে উন্নত ধরণের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজন যে কত বেশী তাহা বুঝাইয়া দেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডাঃ জে. সি. ঘোষ আকাশবাণীর জাতীয় কার্য্যসূচী পর্য্যায়ে সম্প্রতি প্রদত্ত এক মনোজ্ঞ ভাষণে। ঐ বেতার ভাষণের সারমর্ম্ম দেওয়া হইল :

"মানুষের জীবন-ধারণের জন্য সর্ব্বত্রই কতকগুলি জিনিষ অত্যাবশ্যক যেমন, জমি, বায়ু, জল, উপত্যকার নদীনিচয়, পৃথিবীর উপরিভাগের সবুজ গাছপালা এবং অন্তস্তরের খনিজ সম্পদ। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি মানুষ খুঁড়িয়া বাহির করে, কতকগুলি চাষ করে, কোনও কোনটা তৈয়ার করে বা প্রয়োজনমত শোধন করে। এই কাজে যাহারা যতটা সাফল্যলাভ করে তাহারা ততটা সমৃদ্ধিশালী হয়। জ্ঞান ও উদ্যমের উপরই এই সাফল্য নির্ভর করে।

অজ্ঞানতা ভগবানের অভিশাপ, জ্ঞানরূপ ডানায় ভর করিয়াই আমরা স্বর্গদ্বারে পৌঁছাই—ইহা শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবির উক্তি। কবির দেশের লোকেরা বাস্তব জীবনে কবির উক্তির তাৎপর্য্য সপ্রমাণ করিয়াছেন। অজ্ঞানতা ও আলস্যই দুর্দ্দশার প্রসূতি, ইহা অনেকদিন আগেই তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন। বিদ্যা ও তাহার সার্থক প্রয়োগের ফলে ধন উৎপাদন করা যায়। কেহ কেহ এমন কথা পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, কর্ত্তব্য সম্পাদন উপাসনারই নামান্তর।

ইংলণ্ডে নদী-উপত্যকা অঞ্চলগুলিতে কিছু ভাল জমি আছে, আর মাটির নীচে আছে প্রচুর কয়লা। তথাকার অধিবাসীরা ষ্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কার করিল এবং এইরূপে শক্তি উৎপাদনের জন্য কয়লা ব্যবহারের উপায় করিল। খনিজ লৌহ ও কয়লা হইতে ব্যাপক ভাবে ইস্পাত উৎপাদনের একটি প্রক্রিয়া তাহারা উদ্ভাবন করিল। সূতাকাটা ও বস্ত্রবয়নের যান্ত্রিক পদ্ধতি তাহারা অবলম্বন করিল। রেলওয়ে ও বাষ্পীয় জাহাজ তৈয়ার করিয়া তাহারা স্থলপথে ও জলপথে পরিবহন ব্যবস্থার যুগান্তর আনয়ন করিল। রাসায়নিক সার ও উন্নত ধরণের কৃষিপদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া তাহারা পূর্ব্বের চেয়ে পাঁচগুণ বেশী শস্য উৎপাদন করিতে সক্ষম হইল। এক জন লোক অন্য দেশের দশ জন লোকের সমান দক্ষতায় কাজ করিতে লাগিল। ফল হইল এই যে, যে সকল দেশের লোকেরা জীবিকার জন্য কেবল মাংসপেশীর শক্তি এবং আদিম নিপুণতার উপর নির্ভর করিত সেই সকল দেশের এক জন লোকের তুলনায় ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে এক জন ইংরেজ দশ গুণ সম্পদ উৎপাদন ও ভোগ করিতে লাগিলেন।

সাম্প্রতিকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরও আগাইয়া গিয়াছে। গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে লিঙ্কন মানুষের দাস ব্যবসার অবসান করেন। আজ এক একজন আমেরিকানের শতাধিক দাস রহিয়াছে—তবে সে দাস মানুষ নহে, যন্ত্র। প্রশ্ন হইতে পারে, এই যান্ত্রিক দাসগুলি কি করিতে পারে? নিপুণ প্রভুর পরিচালনায় ইহারা মৃত্তিকা খনন করে, জমি চাষ করে, শস্য বপন করে এবং পাকা ফসল ঘরে তোলে; স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে তাহারা মানুষ ও দ্রব্যসামগ্রী পারাপার করায়; নানাপ্রকার শিল্পোপকরণ দ্বারা তাহারা মানুষের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য তৈয়ার করে, অবিশ্বাস্য অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের পরস্পরের মধ্যে সংযোগ ঘটায়।

এইজন্যই যুক্তরাষ্ট্রের জীবন-ধারণের মান অত্যন্ত উন্নত। সেখানে সকলেই ভাল খায়, ভাল ভাল কাপড় জামা পরে এবং ভাল ঘরে থাকে। সেখানকার স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা এত ভাল যে, সে দেশের লোকের গড়পড়তা আয়ু ৭০ বৎসর—ভারতের লোকের গড়পড়তা আয়ু কিন্তু মাত্র ৩০ বৎসর। চার জন লোকের ছোট একটি পরিবারেরও আছে একটি মোটরগাড়ী, একটি টেলিফোন ও একটি রেডিও। সেই দেশের ১৬ কোটি অধিবাসী যে স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য্যের মধ্যে বাস করে তাহা জগতের ঈর্ষার বস্তু। অথচ মাত্র ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে সেই দেশ ছিল পথঘাটহীন একটি বিরাট জঙ্গল।

সেক্সপীয়র ইংরেজদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন আমেরিকানদের তাহাই বলিলেন, অবশ্য অন্য ভাষায়। তিনি প্রচার করিলেন যে, প্রাকৃতিক জ্ঞান বৃদ্ধি ছাড়া মানুষের উন্নতির আর কোনও নিশ্চিত পথ নাই। আমেরিকানরা তাঁহার উপদেশ মানিয়া লইল। নূতন জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য, নূতন পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য, নূতন নূতন এবং উন্নত ধরণের দ্রব্য প্রস্তুত করার জন্য, জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় উন্নত ধরণের গাছপালা ও পশুপক্ষীর জন্ম সম্ভব করিবার জন্য সমানে অবিরাম চেষ্টা চলিতেছে।

প্রাকৃতিক সম্পদে কোনও দেশ সমৃদ্ধ হইতে পারে—কিন্তু ঐ দেশেরই অধিবাসীরা দরিদ্র হইতে পারে—ঐ সম্পদ নিজেদের কাজে লাগাইবার জ্ঞানের অভাবে। আজকাল যে-কোনও দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও কারিগরি নিপুণতা। প্রাকৃতিক সম্পদের ন্যায় এই সম্পদ ব্যবহারে কমিয়া যায় না—বাড়ে, আর অন্যকে ইহার অংশ দিলে ইহা আরও বাড়ে।

এই সত্য যে দেশ উপলব্ধি করিয়াছে সেই দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে খাট হইলেও সমৃদ্ধ হইতে পারে। যেমন সুইজারল্যাণ্ড। আধুনিক শিল্পের পক্ষে যে সমস্ত জিনিষ অপরিহার্য্য বলিয়া গণ্য হয় যেমন, কয়লা, ইস্পাত, তামা প্রভৃতি—কিছুই সেখানে নাই। অথচ সুইজারল্যাণ্ডে উৎপন্ন বড় বড় বৈদ্যুতিক যন্ত্র পৃথিবীর বাজারে সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। সুইস কারিগরেরা ঘড়ি নির্ম্মাণে যে কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিয়াছে তাহার তুলনা নাই—এইজন্য তাহারা যথার্থই গর্ব্ববোধ করিয়া থাকে।

ভারত দরিদ্র-অধ্যুষিত সম্পৎশালী এক অতি বিচিত্র দেশ। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধুনদের অববাহিকায় যখন প্রথম সভ্যতার উন্মেষ ঘটে তখন ভারতবাসীর জীবিকানির্ব্বাহের মান যাহা ছিল আজও প্রায় তাহাই আছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে বেশী দূর যাইতে হইবে না। ভারতের শতকরা ৮০ জন লোক সেই আদিম প্রথায় কৃষিকার্য্যের উপরেই নির্ভর করিয়া আছে এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইতেছে—অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও অপুষ্টি। পল্লীবাসীর শোচনীয় আত্মতুষ্টি এবং ভাগ্যের উপর নির্ভরশীলতা দূর করিয়া তাহার স্থলে মানুষের চেষ্টা ও শক্তির উপরে বিশ্বাস জাগ্রত করিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে উন্নত জীবনধারণের বাসনা উদগ্র করিয়া তুলিতে হইবে।

আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা সেই বিশ্বাস ও বাসনা জাগাইয়া তুলিতে পারে। এই কারণেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য্যের মধ্যে নিদারুণ দারিদ্র্যের বিচিত্র সমস্যা সমাধান করিতে পারে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা। তাঁহার বিশ্বাস ভারতের সাধারণ মানুষ ইউ-রোপের সাধারণ মানুষের তুলনায় অধিক বুদ্ধি ধারণ করে। আধুনিক বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি ও কারিগরি জ্ঞান থাকিলে তাহারাও সুন্দরতর জীবনধারণের প্রয়াস পাইত।

স্বাধীনতালাভের পর হইতেই সরকার বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা এবং জ্ঞান প্রসারের পরিকল্পনাকে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রাধিকার দিয়াছেন। গত ছয় বৎসরে আমাদের কারিগরি শিক্ষা যত বিস্তার-লাভ করিয়াছে দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্ব্বর্ত্তী ২১ বৎসরেও তাহা সম্ভব হয় নাই। ভারত-সরকার সম্প্রতি মোট দুই কোটি টাকা ব্যয়ে সতরটি কারিগরি শিক্ষালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

ভবন ও সাজসরঞ্জাম থাকিলেই শিক্ষায়তন গড়িয়া উঠে না। সেখানে যাহারা কাজ করে তাহাদের গুরুত্বই বেশী। যুদ্ধের পর হইতেই বহুসংখ্যক শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার জন্য বিদেশে প্রেরণ করা হইতেছে। অনেকেই মনে করেন, বিদেশে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণ পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হয় নাই। আমি এই মত সমর্থন করি না। যাঁহারা বিদেশ হইতে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা সকলেই গুরুত্বপূর্ণ পদে সুনামের সহিত কাজ করিতেছেন। উচ্চতর কারিগরি শিক্ষা প্রসারের উপরেও যথেষ্ট জোর দেওয়া হইতেছে। বাঙ্গালোরের বিজ্ঞান গবেষণা মন্দির বিপুলাকারে সম্প্রসারিত করা হইয়াছে।

যে সকল তরুণ বর্ত্তমানে বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত আছেন এবং উচ্চতর কারিগরি শিক্ষা গ্রহণে উৎসুক তাঁহাদের সুবিধার জন্য সন্ধ্যা-বেলায় ক্লাস বা দিনের বেলায় পার্টটাইম ক্লাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইংলণ্ডেও এইরূপ ব্যবস্থা আছে। সেখানে দিনের বেলায় পুরাপুরিভাবে ৩৯ হাজার ছাত্র কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করে, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা ও পার্টটাইম ক্লাসে শিক্ষার্থী ছাত্রের সংখ্যা ২২ লক্ষ; ভারত-সরকার ইহার জন্য ২০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। আমার মনে হয়, আগামী পাঁচ বৎসরে এই টাকার পরিমাণ অন্ততঃপক্ষে আরও ২০ গুণ বাড়ানো উচিত।"

লাল ফিতার দৌরাত্ম্য

"বাতায়ন" পত্রিকায় আসামের সরকারী বিভাগে লাল ফিতার দৌরাত্ম্য সম্পর্কে সম্প্রতি যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিতান্তই করুণ এবং মর্ম্মস্পর্শী। ধুবড়ীর পি-ডব্লিউ-ডি আপিসের কেরাণী দেওয়ান খুশনুর আলী ১৯৫১ সনের মে মাসে যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত বলিয়া ধরা পড়ে। রোগ ধরা পড়িবার পর চিকিৎসার জন্য সরকারী নির্দ্দেশ প্রার্থনা করিলে এক বৎসর পর ১৯৫২ সনের মে মাসে সেই নির্দ্দেশ আসে এবং খুশনুর শিলং যাইয়া সেখানকার যক্ষ্মা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আশ্রয় লয়। কিন্তু "সরকারী খরচে চিকিৎসার নিয়ম সত্ত্বেও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কার্য্যাধ্যক্ষ রোগীর স্বতন্ত্রভাবে ফী দাবী করেন—ফী না পেয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে কয়েক দিন পরেই রোগীকে ২৪ ঘণ্টার নোটীশে স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিত্যাগ করতে বলেন, এই অজুহাতে যে রোগী ছয় মাসের বেশী বাঁচতে পারে না বলে সেখানে আর তার চিকিৎসা চলবে না।" অবশ্য তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়া যে রোগীকে ভর্ত্তি করা হয় সে নাকি এক পক্ষকাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মারা যায়।

খুশনুর নিজের চেষ্টায় মাদ্রাজের কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্থানলাভের অনুমতি পাইয়া সরকারের অনুমোদনের জন্য ১৯৫৩ সনের জুলাই মাসে চিঠি দেয়। "দু-মাসের মধ্যে সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্থান খালি ছিল—কিন্তু সরকার তরফের কোন জবাব না আসাতে সেই স্থানটি হারালো খুশনুর—লালফিতার বেড়াজাল পেরিয়ে সরকারী অনুমোদন এল এক বছর পরে '৫৪ সালের এপ্রিল মাসে।" তাহার পর কোন হাসপাতালে স্থান লাভ করিবার পূর্ব্বেই ৬ই মে খুশনুর পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করে।

"এই সুদীর্ঘ তিন বৎসর রোগভোগের মধ্যে ধ্বড়ী পি-ডব্লিউ-ডি অফিসে খুশনুর তার হকের 'সফর ভাতা', যক্ষ্মারোগীদের (সরকারী কর্ম্মচারী) জন্য সরকারনির্দ্দিষ্ট রেশন ভাতা, তার পাওনা ছয় মাসের গড়পড়তা বেতন এবং প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকা বার বার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও পেল না। কালরোগের চিকিৎসার সামান্যতম সুযোগও লাভ করতে পারলো না—এমন কি তার মৃত্যুর পর তার শ্রাদ্ধের জন্য পুত্রশোকাতুরা বিধবা মাতার আবেদন সত্ত্বেও তার পাওনা অল্প টাকা বা প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের একটি টাকাও দেওয়া হ'ল না।"

২০শে জুন পর্য্যন্ত এই সংবাদের কোন সরকারী প্রতিবাদ হয় নাই।

কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির সভ্যসংখ্যা

মস্কো হইতে প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীর এমন কোন দেশ নাই যেখানে প্রকাশ্য বা গোপন কম্যুনিষ্ট পার্টি নাই। পুস্তিকাটি রুশ কম্যুনিষ্টদের ব্যবহারের জন্য প্রণীত। তাহাতে বিভিন্ন দেশের পার্টিগুলির যে সভ্যসংখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা এইরূপ: কোরিয়া ১০ লক্ষ, ভিয়েৎনাম ৭ লক্ষ; ফ্রান্স ৮ লক্ষ (বর্ত্তমানে ৫ লক্ষ—স.প্র.); ইটালী ২১ লক্ষ ২০ হাজার; ব্রিটেন ৩৫,০০০; বেলজিয়ম ২ লক্ষ; হল্যাণ্ড ৫০,০০০; ডেনমার্ক ৫০,০০০; সুইডেন ৬০,০০০; ফিনল্যাণ্ড ৫০,০০০; জাপান ১ লক্ষ; ভারত ৬০,০০০ (বর্ত্তমানে ৭০,০০০—স.প্র.)।

পুস্তিকাটিতে যে সভ্য-সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা ১৯৪৮-৫০ সনের। কেবল ভারতের ক্ষেত্রে ১৯৫৩ সনের সভ্য-সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

সোভিয়েট দেশে কালিদাসের রচনাবলী

"তাস" কর্ত্তৃক প্রকাশিত একটি বিশেষ প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে, ভারতীয় সাহিত্যের মধ্য হইতে "দর্শনশাস্ত্রমূলক কাব্য" ভগবদ্‌গীতা সর্ব্বপ্রথম রুশ ভাষায় অনূদিত হইয়া ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মস্কো হইতে প্রকাশিত হয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রসিদ্ধ রুশ লেখক, প্রাবন্ধিক এবং ইতিহাসবেত্তা কারামজিন মহাকবি কালিদাসের নাটক 'অভিজ্ঞানশকুন্তলমে'র ১ম ও ৪র্থ অঙ্ক রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন। ঐ অনুবাদ ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ভাষান্তরিত সংস্করণের নাম দেওয়া হয় "ভারতীয় নাটক শকুন্তলার কতিপয় দৃশ্য"। অনূদিত গ্রন্থের ভূমিকাতে কারামজিন লেখেন: কাব্যরস-মাধুর্য্যের চরমোৎকর্ষ আমি আজ খুঁজিয়া পাইয়াছি। সে অনুভূতি এত কোমল এত সুললিত যাহা বলিবার নহে। এ যেন এক নিথর নিস্তব্ধ বৈশাখী রজনীর অনির্ব্বচনীয় সুন্দর কমনীয়তা, অননুকরণীয় প্রকৃতির পরম পবিত্রতা এবং কলার চরমোৎকর্ষ। হোমারের কাব্যগুলিকে যেমন প্রাচীন গ্রীসের চিত্রাবলী বলিয়া অভিহিত করা হয় তেমনি কালিদাসের কাব্যগুলিকে প্রাচীন ভারতের অনন্যসুন্দর চিত্রাবলী বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে, যেগুলির মধ্যে রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে তথাকার তদানীন্তন অধিবাসীদের চরিত্র, আচার ও ব্যবহার। আমার বিবেচনায়, মহিমায় কালিদাস হোমারের সমতুল। উভয়েই প্রকৃতির হস্ত হইতে তুলিকা উপহার পাইয়াছেন এবং উভয়েই প্রকৃতিকে চিত্রায়িত করিয়াছেন।

১৮৭৯ সনে সমগ্র অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকটি সংস্কৃত ভাষা হইতে সরাসরি অনুবাদ করিয়া মস্কো হইতে প্রকাশ করেন আলেকসী পুতিয়াতা। ১৮৯০ সনে কালিদাসরচিত অভিজ্ঞান-শকুন্তল, রঘুবংশ মহাকাব্য এবং রসপ্রধান মেঘদূত "সংস্কৃত কাব্যমালিকা" নামক গ্রন্থাকারে ভলোগদা হইতে প্রকাশিত হয়। ঐ অনুবাদ করেন এন. ভলোৎস্কি। ১৯১৬ সনে রুশ কবি বালমন্ত কালিদাসের তিনখানি নাটক—মালবিকাগ্নিমিত্র, শকুন্তলা এবং বিক্রমোর্ব্বশী—রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন। ঐ অনুবাদ কালিদাসের নাটকসমূহের রুশ সংস্করণগুলির মধ্যে সৌন্দর্য্যের দিক হইতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছে।

রুশ ভাষা ব্যতীত সোভিয়েটের অন্যান্য ভাষাতেও কালিদাসের রচনাবলী অনূদিত হইয়াছে। ১৯২৮ সনে বিখ্যাত সংস্কৃতবিদ্ আচার্য্য পি. রিত্তার কাব্যচ্ছন্দে উক্রেইনীয় ভাষায় মেঘদূত কাব্যের অনুবাদ প্রকাশ করেন। আচার্য্য রিত্তারই সর্ব্বপ্রথম রুশ ভাষায় কালিদাসের কুমারসম্ভব ও রঘুবংশের অনুবাদ করেন।

রুশিয়ার সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিতগণ কালিদাসের রচনাবলী বিশেষ আগ্রহের সহিত আলোচনা করিয়াছেন এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার প্রধান পাঠ্য পুস্তক হিসাবে কালিদাসের রচনাবলীই পড়ানো হয়। লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে কালিদাসের সাহিত্য লইয়া বিশেষ ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করা হইয়াছে। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব ও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত বক্তৃতামালায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে কালিদাসের রচনাবলী।

মধ্যযুগের ভারতীয় কাব্য-সাহিত্যে বর্ণনার জন্য যে মাধ্যম ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা কতকটা অসাধারণ এবং সে মাধ্যম বুঝিবার জন্য রুশ পাঠকের বিশেষভাবে নিজেকে প্রস্তুত করা দরকার। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সোভিয়েট দেশের জনসাধারণের মধ্যে কালিদাসের রচনাবলী সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়।

কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

স্বাধীনতা লাভ করিবার পর ভারত এক সার্ব্বভৌম প্রজাতন্ত্রী দেশ রূপে স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে, ইহার আদর্শ ও কার্য্যক্রম জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র অনুসারী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুও বহুবার ঘোষণা করিয়াছেন যে, কল্যাণমূলক রাষ্ট্রগঠনই ভারতের লক্ষ্য। বাৎসরিক হিসাব-নিকাশের সময় দেখা গিয়াছে, প্রায় প্রতিটি রাজ্য-সরকারই ক্রমাগত বিরাট ঘাটতির সম্মুখীন হইতেছেন এবং অধুনা সমাজকল্যাণ খাতে অধিকতর অর্থব্যয় হইতেছে বলিয়াই সরকারপক্ষ ঘাটতি বজেটকে সরাসরি সমর্থন করিতেছেন। অতএব কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র সম্বন্ধে এবং তাহার লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপায় ও পথের সম্ভাব্য বাধাবিঘ্নের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পিগু বলিয়াছেন, অর্থনীতিশাস্ত্রের চর্চ্চা করার প্রধান উদ্দেশ্য, মানুষের সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা-লাভ। অতএব তাঁহার মতে, অর্থ-বিজ্ঞানও সাধারণ না হইয়া ফলিত বিজ্ঞান হওয়া উচিত। যাহা হউক, এখন দেখিতে হইবে 'কল্যাণ' বলিতে প্রকৃতপক্ষে কি বুঝায়। অর্থনীতিক্ষেত্রে 'কল্যাণ' বা 'welfare' বলিতে মোটামুটি তাহাই বুঝায় যাহা অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা যায়। এই কল্যাণের হ্রাসবৃদ্ধি তখন বুঝি যখন দেখা যায়, এক বা একাধিক ব্যক্তি অপরের স্বাচ্ছন্দ্যলাভে বিঘ্ন সৃষ্টি না করিয়াও নিজেরা আর্থিক ক্ষেত্রে কমবেশী শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। মার্কেণ্টাইলিষ্ট বা ফিজিওক্রাট নামীয় গোষ্ঠীর অর্থনীতিবিদ্‌গণ ও বিখ্যাত অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিত এডাম স্মিথও 'জাতীয় কল্যাণ'কে তাঁহাদের স্ব স্ব আলোচনাক্ষেত্রে পুরোভাগে স্থান দিয়াছিলেন, যদিও এই কল্যাণের লক্ষ্যে উপনীত হইবার পথ ছিল তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

সমাজ-বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখা যায়, অতীতে জনগণের অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হইত না। রাষ্ট্রের কার্য্যকলাপ তখন কেবলমাত্র পুলিশী ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য জনসাধারণও রাষ্ট্রের প্রয়োজন ইহার বেশী অনুভব করিত না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন শিল্প বিপ্লব সুরু হয়, তখন সারা দুনিয়ার পুরাতন সমাজব্যবস্থা একেবারে ওলটপালট হইয়া যায়। ইহার ফলে দেখা দেয় পুঁজিবাদের সূত্রপাত। ইংলণ্ডে তখন গণতন্ত্র বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ফরাসী বিপ্লবের মন্ত্র সমগ্র ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিতে প্রায় একই সঙ্গে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ বাড়িয়া উঠিতে থাকে। আজিকার জগতের যত অসাম্য ও যত 'বাদে'র উদ্ভব, সকলের মূলেই সেই শিল্প-বিপ্লব। নানারূপ কলকব্জা আবিষ্কারের ফলে কারখানা-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হয়। যাহারা মালিক, তাহাদের হাতে প্রভূত ধনসম্পদ আসিয়া জমা হইতে থাকে। যাহারা কারখানার মজুর বলিয়া পরিগণিত হইল, তাহারা আর্থিক দৈন্যে দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। এইরূপে সমাজে দুইটি পৃথক শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং উভয়ের মধ্যে নানারূপ বৈষম্য দিন দিন বাড়িয়াই চলে। অতঃপর ধীরে ধীরে কারখানা-ব্যবস্থার নানারূপ কুফল সমাজে দেখা দিতে সুরু করে। মূলতঃ এই বৈষম্য ও গলদ দূরীকরণের জন্যই সমাজ-ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। এদিকে পুঁজিবাদের জয়রথ পূর্ণোদ্যমে আগাইয়া চলিল এবং বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ও বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন সত্ত্বেও ইহার কুফলগুলি সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইল না। কার্ল মার্ক্স আসিয়া পুঁজিবাদের কুফলগুলি একেবারে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইলেন। জন সাধারণের মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র উত্তরোত্তর অধিকতর ক্ষমতা লইয়া আর্থিক কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিতে উদ্যোগী হইল। রাজনীতি ও অর্থনীতি পরস্পরের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল এবং দারিদ্র্য একটি সামাজিক অভিশাপ বলিয়া স্বীকৃত হইল। এই অভিশাপ হইতে মুক্তিলাভের জন্য অতঃপর দুনিয়ার সর্ব্বত্র তোড়-জোড় সুরু হয়।

'কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র' সম্বন্ধে বর্ত্তমানে নানা ক্ষেত্রে আলোচনা হইতেছে এবং বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে এই শব্দ যুগলের ভাষ্য রচনা করিতেছেন। ফলে, এক্ষেত্রেও নানারূপ মতদ্বৈধ ও বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। বস্তুতঃ কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের মূল কথা—জাতীয় সম্পদ উৎপাদনের উপকরণসমূহ সুষ্ঠু বণ্টনের মূল দায়িত্বভার রাষ্ট্র নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিবে। এই সুষ্ঠু বণ্টন হইবে জনগণের অত্যাবশ্যক প্রয়োজন—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান ও জীবিকার উপায়াদি উদ্ভাবনকল্পে। এই সঙ্গে আরও কতকগুলি বিশেষ দায়িত্ব রাষ্ট্রের রহিয়াছে, যথা: বেকার-বীমা,

সামাজিক নিরাপত্তা বীমা, বার্দ্ধক্য-বৃত্তি ও অপরাপর কল্যাণকর ব্যবস্থা। এইগুলি বর্ত্তমানে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের সাধারণ কর্ম্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রের মূল কথা—ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও বর্ত্তমান মূল্যব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং যাহারা উদ্যমশীল তাহাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মারফত ভাগ্যোন্নয়নে উৎসাহ প্রদান করতঃ সমাজের সকলের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা করা। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উন্নতির ফলে রাষ্ট্র লাভবান হইবে। ফলতঃ, ইহা আমেরিকা-অনুসৃত ব্যক্তিগত উদ্যম-নীতিরই মূল কথা। দ্বিতীয়তঃ, কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের আর একটি সমাজতান্ত্রিক রূপ আছে। ইহা ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে চালু হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে, "সামাজিক ন্যায়বিচারের মূলনীতি ও অর্থনীতিক্ষেত্রের স্থায়িত্ব বজায় রাখিবার" সম্পূর্ণ দায়িত্ব হইবে রাষ্ট্রের এবং অবশিষ্ট আর্থিক কার্য্যকলাপ ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত হইবে। তৃতীয় পর্য্যায়ের কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের নীতি অনুসারে দেখা যায়, অর্থনীতিক্ষেত্রে রাষ্ট্রই হইবে যাবতীয় কার্য্যকলাপের একমাত্র ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তা। দেশের সমুদয় শিল্পসংস্থা রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ও পরিকল্পনানুযায়ী অর্থনীতিক ব্যবস্থা পরিচালনা এই রাষ্ট্রনীতির মূল বৈশিষ্ট্য। এইরূপ রাষ্ট্রের উদাহরণ বর্ত্তমান জগতে একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়া।

ইহা হইতে স্বভাবতঃই প্ল্যানিং বা পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা আসিয়া পড়ে। দুঃখের বিষয়, বিশেষজ্ঞ এবং অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যেও প্ল্যানিং বা পরিকল্পনা সম্বন্ধে কদাচিৎ মতৈক্য দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, একথা সত্য যে, পুঁজিবাদী বা সমাজবাদী উভয় রাষ্ট্রব্যবস্থায়ই পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্ভবপর। জি. ডি. এইচ. কোল, বাবারা উটন্ প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ পরিকল্পনা-প্রণয়নের গোঁড়া সমর্থক, পরন্তু ডাঃ হায়াক ও জিউক্‌স্ প্রভৃতি মনীষিগণ ইহার ঘোর বিরোধী। সুতরাং প্রথমেই ইহার অর্থ বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। যদি প্ল্যানিং বলিতে রাষ্ট্রের সকল কার্য্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সর্ব্বময় কর্তৃত্বই বুঝায়, তবে নিশ্চয়ই তাহা জনসাধারণের মনঃপূত হইবে না। কিন্তু প্ল্যানিং যদি সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খল কার্য্যপ্রণালী হয়, তবে আশা করা যায়, তাহা নিঃসন্দেহে অধিকাংশ লোকের সমর্থন লাভ করিবে। পরিকল্পনা-রচয়িতারা সর্ব্বদাই রাষ্ট্রের কার্য্যক্ষমতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন এবং উদাহরণস্বরূপ রাশিয়ার পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাগুলির সাফল্য চোখের সামনে তুলিয়া ধরেন। পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যবস্থায় যে একচেটিয়া ব্যবসায়-সংস্থার উদ্ভব হয় এবং মানুষে মানুষে আয়ের ক্ষেত্রে যে আশমান-জমিন ফারাক সৃষ্টি করে, পরিকল্পনামূলক অর্থনীতিতে সে সব কুফল সম্ভব নহে। অধিকন্তু যে ব্যক্তিগত উদ্যমকে উৎসাহ দিয়া এত দীর্ঘদিন জীয়াইয়া রাখা হইয়াছে, বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত অবস্থায় তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিবারও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। অধিকাংশ দেশেই সাধারণ মানুষের জীবিকার মান এত নিম্নে যে, অর্থনৈতিকক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে তাহাদের ভাগ্যোন্নয়নের কোন আশাই নাই। জাতীয় সম্পদ উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও বিনিময় ব্যবস্থার মধ্যে যে গরমিল রহিয়াছে, রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ফলে তাহাও দূরীভূত হইবে। আধুনিককালে মুদ্রাব্যবস্থা ও আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য যে পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতেও পরিকল্পনা প্রণয়ন অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক কথায়, পরিকল্পনা-রচনার মূল উদ্দেশ্য বৈষয়িক ক্ষেত্রে জনগণের অবস্থার উন্নয়ন এবং ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোন বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছানো।

অপর একদল বিশেষজ্ঞ আবার প্ল্যানিং সম্বন্ধে অত্যন্ত বিরূপ ধারণা পোষণ করেন। ডাঃ হায়াকের মতে 'ইহা নিম্নবিত্তদের নির্যাতনের জন্য রাষ্ট্রনায়কদের হাতে এক অস্ত্র-বিশেষ'। বেলক বলিয়াছেন, 'অর্থ-উৎপাদন-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে গেলে সমগ্র সমাজ-জীবনকেই নিয়ন্ত্রণের নিগড়ে বাঁধিয়া ফেলিবার আশঙ্কা থাকে'। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ কার ইহার নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন, 'সমগ্র সমাজের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার কল্পনা হইতেই শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রিকর্তৃত্বের উদ্ভব হইয়াছে।' বিরোধীরা আরও বলেন, পরিকল্পনার ধর্ম্মই এই যে, হয় ইহা চূড়ান্তরূপে সফল হইবে নয় ত সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইবে। সবচেয়ে বড় বিপদের কথা এই, ইহাতে নাগরিকগণের অর্থনীতিক বা রাজনীতিক স্বাধীনতা একেবারে লোপ পাইবে। আরও বলা হয়, ইহার ফলে সমাজের স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য বলিয়া কিছু আর থাকিতে পারে না। তা ছাড়া জাতীয় অর্থনীতি-ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার পথ সঙ্কুচিত হইয়া আসিবার সম্ভাবনা আছে খুবই। ফলে, রাজনীতিক্ষেত্রেও সহযোগিতার পথ রুদ্ধ হইবে। অথচ সকলেই জানেন, নয়া দুনিয়া গড়িয়া তুলিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মূল্য আজ কতখানি। সেজন্যই আধুনিক যুগের পণ্ডিত অধ্যাপক মীড ও অধ্যাপক রবিন্‌স উভয়েই এই ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। ম্যাক্‌গ্রেগর আবার বলিতে চাহেন, গণতন্ত্রসম্মত সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্ত্তন করিয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়ও সকল সমস্যার সুরাহা সম্ভব। অধ্যাপক রবিন্‌স এ অভিমত স্বীকার

করেন না। তাঁহার মতে শান্তিপূর্ণ সময়ে রাষ্ট্রে বর্ত্তমানের ন্যায় মূল্যব্যবস্থা অবশ্যই বজায় থাকিবে এবং রাষ্ট্র-পরিচালিত পরিকল্পনা বা নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে অন্যায় ভাবে বিতাড়িত না করিয়া তাহার সহিত সহযোগিতার ভিত্তিতে পাশাপাশি অবস্থান করিতে পারিবে। আবার এ কথাও বলা যায়, বর্ত্তমানে ব্যক্তিগত উদ্যমের যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি বা কুফল দেখা গিয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে সংশোধন করিয়া বা দূরীভূত করিয়াও পরিকল্পনা কিংবা রাষ্ট্রকর্ত্তৃত্বের প্রয়োজন মেটানো যাইতে পারে।

এই দুই দল ব্যতীত আর এক দল আধুনিক পণ্ডিত আবার মিশ্র অর্থনীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ধনতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ—এই দুইটি পরস্পরবিরোধী অর্থ নৈতিক মতবাদের প্রত্যেকটি হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া মিশ্রণের সাহায্যে একটি আধুনিক মতবাদের সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহারই নাম মিশ্র অর্থনীতি। সম্পূর্ণভাবে মিশ্রণের দ্বারা সৃষ্ট বলিয়া মিশ্র অর্থনীতি এখনও কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে নাই। ধনতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ উভয়ের মধ্যে দীর্ঘকালীন বিরোধ বা সংগ্রামের ফলে উভয়েই আজ ক্ষতবিক্ষত। এই সংগ্রাম হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য উভয়ে উভয়ের কাছ হইতে কিছু কিছু সারাংশ লইয়া নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য আজ সচেষ্ট। ইহার মূলকথা, অর্থনীতি-ক্ষেত্রের কর্ত্তৃত্ব অধিকাংশই রাষ্ট্রের হাতে থাকিবে, তবে দেখিতে হইবে যে, নাগরিকগণের স্বার্থ যেন তাহার ফলে বিন্দুমাত্র বিঘ্নিত না হয়। ব্যক্তিগত উদ্যমকেও যথোচিত মর্য্যাদাসহকারে স্বীকার করিতে হইবে এবং যাহাতে ইহা সর্ব্বতোভাবে জনগণের কল্যাণসাধনে নিয়োজিত হয় তজ্জন্য উৎসাহ দিতে হইবে। জন জিউকৃস বলেন, দুনিয়ার প্রত্যেকটি সুষ্ঠু অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাই মোটা-মুটি ভাবে মিশ্র অর্থনীতি। সুতরাং একথা বলা চলে না, কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রগঠন কেবলমাত্র কোন এক বিশেষ অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থায়ই সম্ভব। যে-কোন ব্যবস্থায়ই ইহার লক্ষ্য এক, কিন্তু লক্ষ্যে উপনীত হইবার পথ আলাদা আলাদা।

কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহারা খুব বেশী আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে নাম করিতে হয় লর্ড বিভারিজের। তাঁহার মতবাদকে মোটের উপর নিরপেক্ষ বলা চলে। তিনি সমাজতন্ত্রবাদ বা পুঁজিবাদ কোন দিকেই বিশেষ ঝোঁক দেখান নাই। তাহার পরি-কল্পনার ভিতর প্রতিটি নাগরিকের জন্য ন্যূনতম কল্যাণ-বিধানের ব্যবস্থা আছে। একথা ঠিক, বর্ত্তমানে একজন উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির উপর অপরের নির্ভরপরায়ণতা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়াছে। ইহাদের শৈশবের ও বার্দ্ধক্যের সকল দায়িত্বই রাষ্ট্রকে লইতে হইবে। ইহা ছাড়াও অভিভাবক-হীনতা, বৈধব্য, আধিব্যাধি, পঙ্গুতা, দুর্ঘটনা, বেকার-সমস্যা ও অন্যান্য অপ্রত্যাশিত দুর্বিপাক ত আছেই। শিল্পভিত্তিক সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এই সব দুর্বিপাকের মাত্রাও উত্তরোত্তর বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া যাইতেছে। সামাজিক অভাববোধ হইতে মুক্তিলাভের বাসনায় সর্ব্বত্র মানুষের মনে সামাজিক নিরাপত্তার স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে রাষ্ট্রই সাধারণের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান; প্রতিটি মানুষের কল্যাণ-সাধনকল্পে উপযুক্ত সংস্থার মাধ্যমে জনগণকে নানাপ্রকার বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্রই একমাত্র দায়ী।

সামাজিক নিরাপত্তা বলিতে সাধারণতঃ আয়ের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বা অভাবের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বুঝায়। রোগ, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, আলস্য, অভাব—মানবকল্যাণের পথে এই পঞ্চদানব সর্ব্বত্রই সক্রিয়ভাবে বিরাজমান। এই সব দানবের কবল হইতে আত্মরক্ষা করা সমাজের অবশ্যই কর্ত্তব্য এবং সামাজিক নিরাপত্তাও বিশদ অর্থে এই সকল দুর্দ্দৈব হইতেই আত্মরক্ষা। বিভারিজ পরিকল্পনায় একটা বীমা-ব্যবস্থার কথা আছে। বিশেষ করব্যবস্থার দ্বারা আদায় করিয়া এই বীমার অধিকাংশ টাকা রাষ্ট্রকেই প্রদান করিতে হইবে। যে পরিমাণ অর্থ ইহাতে দেওয়া হইবে তাহার বিনিময়ে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার পরিমাণ স্থিরীকৃত হইবে। প্রশ্ন উঠিতে পারে, ইহার ফলে লোকের কর্ম্মশক্তি যথেষ্ট পরিমাণে শিথিল হইয়া পড়িতে পারে কিনা। কিন্তু ইহাতে কেবলমাত্র ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থাই আছে, উচ্চতম নহে। পরিকল্পনায় রাষ্ট্রের অধীনে একটি জাতীয় স্বাস্থ্যবিভাগ খুলিবারও কথা আছে। সকল ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ইহা সমাজ-নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়—ইহাই বিভারিজের সুপারিশ। ব্যাপকতা, নিয়মতন্ত্রানুযায়ী রচনা, নাগরিকগণের শ্রেণীবিভাগ করণ, বাঁধাবাঁধি হারে তহবিলে অর্থপ্রদান ও তদনুসারে ক্ষতিপূরণ লাভ—সকল দিক হইতেই পরিকল্পনাটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে, "বিবর্ত্তনমূলক অভিযানে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরিধি অতি বিস্তৃত।" সাধারণতঃ ইহা দুই প্রকারে দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ, সামাজিক সহায়তা; দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক বীমা। সামাজিক সহায়তা-ব্যবস্থা দুঃস্থদিগকে সাহায্যকল্পে রাণী এলিজাবেথের সময় হইতেই ইংলণ্ডে আরম্ভ হয় এবং তদনুসারে ১৬০১ সনে ইংলণ্ডে প্রথম দুঃস্থ আইন (Poor Law) বিধিবদ্ধ হয়। পরবর্ত্তীকালে অবশ্য ইংলণ্ডে এই উদ্দেশ্যে আরও অনেকগুলি

আইন পাস হয়। এখানে বলা প্রয়োজন যে, সে সময় দারিদ্র্যমোচন ব্যবস্থাকে সর্ব্বত্র অবজ্ঞার চোখে দেখা হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে দারিদ্র্য একটি সামাজিক অভিশাপ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং এই গণতন্ত্রের যুগে এতাদৃশ মনোভাবও গড়িয়া উঠিয়াছে। বার্দ্ধক্য-ভাতা দেওয়ার জন্য নানারূপ আইন পাস হইয়াছে। প্রথমে ইহা ১৮৯১ সালে ডেনমার্কে আরম্ভ হয়, পরে নিউজীল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স ও গ্রেট-ব্রিটেন এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বর্ত্তমানে কোথাও নগদ টাকায়, কোথাও বা কাজের বিনিময়ে বেকারভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইংলণ্ডে সাধারণতঃ নগদ টাকায় বেকারভাতা দেওয়া হয়। আমেরিকা আবার পূর্ত্তকার্য্যের মাধ্যমে বেকারদিগকে কাজ করাইয়া তবে ভাতা দিয়া থাকে। ইহাকে সাধারণতঃ 'মজুরি রোধ' ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করা হয়, অর্থাৎ বেকার ব্যক্তি স্বাভাবিক কাজে নিযুক্ত থাকিলে যে মজুরি উপায় করিতে পারিত, এ অবস্থায় তাহা অপেক্ষা অনেক কম মজুরি পাইবে। তাহার ফলে বেকার শ্রমিকগণ দীর্ঘদিন রাষ্ট্র-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে না। সর্ব্বদা উপযুক্ত কর্ম্মের সন্ধানে সচেষ্ট থাকিবে। মোট কথা, স্বেচ্ছাকৃত বেকার হওয়া বা আলস্যের প্রশ্রয় নিবারণই ইহার আসল লক্ষ্য। পরিবারের স্বাভাবিক আয় বৰ্দ্ধিত করার জন্য যাহা প্রয়োজন, সেই হারে পরিবারভাতা দেওয়ার ব্যবস্থাও হইয়াছে। সামাজিক সহায়তা ব্যবস্থা অনুসারে দরিদ্রদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রসূতিভাতা আইন, ১৯৪৫ সালের বিলাতের পরিবারভাতা আইন ও ১৯৪৪ সালের কানাডার অনুরূপ আইন—সবই সামাজিক সহায়তা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে রচিত।

১৯১১ সালে ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ কর্তৃক জাতীয় বীমা-আইন পাস হইবার পর হইতে সমাজবীমা-নীতি জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতে থাকে। অবশ্য এই বীমানীতি গত শতাব্দীতে বিসমার্ক কর্তৃক জার্ম্মানীতে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার পর বিলাতে স্বাস্থ্য-বীমার কাজ আরম্ভ হয়। বীমাকারী শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত থাকাকালীন প্রতি সপ্তাহে কিছু চাঁদা দিতে হয়। ইহার সহিত মালিকের দেয় চাঁদা ও সরকার হইতে অবশিষ্ট চাঁদা লইয়া এই বীমা-ভাণ্ডার পূর্ণ করিত হইতেছে। এই তহবিল হইতে রোগাক্রান্ত বা পঙ্গু ব্যক্তিক ও প্রসূতি নারীদিগকে নগদ টাকায় সাহায্য দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত বার্ষিক ৪২০ পাউণ্ডের নিম্নে যাহাদের আয়, কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত সেই সব শ্রমিকের জন্য বেকার বীমার ব্যবস্থা আছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ইংলণ্ডের শ্রমিক সরকার শাসনক্ষমতা লাভ করিবার পর এক 'শ্বেতপত্র' প্রকাশ করিয়া ঘোষণা করেন যে, দেশে পূর্ণনিয়োগ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিবার সমস্ত দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করিবেন। এখানে এ কথা মনে রাখা দরকার, যদিও সমাজবীমা-ব্যবস্থা বেকার বা রোগাক্রান্ত অবস্থায় শ্রমিকদের মস্ত বড় অবলম্বন, তথাপি ইহা এখনও পুরাদস্তুর বা একমাত্র অবলম্বন হইয়া উঠিতে পারে নাই।

আমেরিকায় অবশ্য যথেষ্ট সমাজ-কল্যাণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। রুজভেল্টের সময়ে 'নয়া ব্যবস্থা'র মারফত এসব বন্দোবস্ত চরম পর্য্যায়ে পৌঁছে। প্রথমতঃ চতুর্ব্বিধ পরিকল্পনা লইয়া 'নয়া ব্যবস্থা' রচিত হয়, যথা—রোগ বা বার্দ্ধক্যের জন্য যাহারা কর্ম্মচ্যুত হইবে তাহাদের রক্ষাকল্পে সমাজ-কল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন; শ্রমিক যাহাতে ন্যায্য মজুরি পায় তজ্জন্য তাহাকে যথোপযুক্ত পরামর্শ ও সাহায্যদান; কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা প্রণয়ন; একচেটিয়া ব্যবসায়-সংস্থাসমূহের নিয়ন্ত্রণ। আমেরিকার ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিও সমাজকল্যাণ ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে।

সোভিয়েট রাশিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক। সেখানে সকলেরই কাজ করিবার এবং অবসর উপভোগ করিবার অধিকার আছে। রাষ্ট্রের পরিচালনাধীনে আসার ফলে ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাণিজ্যচক্রের অবসান হইয়াছে এবং ব্যক্তিগত উদ্যমের বা মূলধনের পারিশ্রমিক বলিয়া কথিত লাভ অথবা সুদের কোন স্বীকৃতি নাই। বৈদেশিক বাণিজ্য তিন সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে তিন পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া তাহাদের পরিচালনাভার কিছু কেন্দ্রীয় সরকার, কিছু রাজ্য-সরকার ও কিছু স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে ন্যস্ত হইয়াছে। রাশিয়ার ব্যাপার যেমন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তেমনি তাহার সমস্যাবলীও একেবারে ভিন্ন ধরণের।

এ সকল দেশের কল্যাণমূলক ব্যবস্থার আলোচনা করিয়া বুঝা যাইতেছে, সমাজকল্যাণ-ব্যবস্থার প্রকৃতি কিরূপ ও উহার ত্রুটি-বিচ্যুতি কোনখানে। বলা বাহুল্য, সামাজিক দুর্ব্বিপাক হইতে রক্ষাকল্পে যেসব কল্যাণমূলক ব্যবস্থা এ যাবৎ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, বিভিন্ন দেশে তাহার বিভিন্ন রূপ। কোন দেশের জন্য ব্যাপকভাবে কল্যাণমূলক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে সেই দেশের সমস্যাবলী ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত হওয়া প্রয়োজন। তা ছাড়া, কল্যাণমূলক ব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলি সমস্যা লুকায়িত থাকে, সেগুলি সর্ব্বপ্রযত্নে পর্য্যালোচনা করা দরকার।

'কল্যাণ' বা 'welfare' শব্দটি যদিও আজ সর্ব্বত্রই জনপ্রিয় হইয়াছে, তথাপি ইহা হইতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়া

বিচিত্র নহে। কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র যে কেবল জনগণের জীবিকা-সংস্থানেই নিয়োজিত থাকিবে তাহা নহে। কোন দেশের জীবিকার মান সাধারণতঃ সেই দেশের মোট উৎপাদন হইতে মূলধন খাতে বিনিয়োগ-যোগ্য ও রপ্তানীযোগ্য দ্রব্যাদি বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহার উপর নির্ভরশীল। উপরে যে সকল কল্যাণমূলক ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে, তাহা মোটেই উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য নহে। বস্তুতঃ উৎপাদনের সহিত উহাদের লেশমাত্র সম্পর্ক নাই। তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য—অবস্থানির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিক যাহাতে তাহার ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইবার জন্য দেশের উৎপাদনের অংশ পায় তাহার ব্যবস্থা করা। ইহাতে দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর এই নীতির যে কিছু অপ্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া না হইতেছে তাহা নহে। অধ্যাপক কেন্ট বলেন, কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে ব্যবসাবাণিজ্যক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক চাহিদা কমিয়া গিয়াছে। অবশ্য তজ্জন্য কেবলমাত্র কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের উপর দোষারোপ করা চলে না। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, সমস্যাটা হইতেছে লাভ-লোকসানের ক্ষমতা আনয়ন করা। কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম অবস্থায় উৎপাদন ব্যাহত হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয় এবং উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে কোনরূপ সুফললাভও অনিশ্চিত। সুতরাং প্রারম্ভেই এই অসুবিধার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করা প্রয়োজন। একথাও সত্য, সমাজ-কল্যাণ-ব্যবস্থার সুফল দ্বারা নাগরিকদের উন্নতিবিধানের জন্য রাষ্ট্রের কর্ম্মপ্রচেষ্টা বর্দ্ধিত হইবে এবং শিল্পপতিদের সুবিধা-অসুবিধা বা লাভালাভের কথা যথোপযুক্ত ভাবে বিবেচিত হইলে শিল্পক্ষেত্রেও কর্ম্মপ্রচেষ্টা বৃদ্ধি হইবে। যে দেশে জনসংখ্যা বিপুল বেগে বাড়িয়া যাইতেছে এবং জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্নমুখী, সেখানে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার পরিণাম অত্যন্ত গুরুতর।

শিল্পপ্রধান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে, পূর্ণাবয়ব কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে সর্ব্বক্ষণ মুদ্রাস্ফীতি বিদ্যমান থাকিবার আশঙ্কা আছে। কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে এই বিপদের ভয় আরও বেশী। অতএব কল্যাণমূলক ব্যবস্থার জন্য যে তহবিল প্রয়োজন তাহা অতি সতর্কতার সহিত গড়িয়া তুলিতে হয়। কল্যাণ করিতে গিয়া জনসাধারণকে যেন নূতন করভারে প্রপীড়িত করা না হয়। সাধারণের সঞ্চয়স্পৃহা বা মূলধনসৃষ্টি যেন বাধাপ্রাপ্ত না হয়। ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া কল্যাণ-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিলে ফললাভ কতকটা ত্বরান্বিত করা যায়। ফরধাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফ্রেডরিক বেইরওয়াল্ড বলিয়াছেন:

"যেখানে বেকার-সমস্যা স্থায়ীভাবে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে, কোনরূপ নিরাপত্তা বা কল্যাণমূলক ব্যবস্থাই সেখানে সুচারুরূপে কার্য্যকরী হওয়া সম্ভব নহে। অতএব সমাজকল্যাণ-ব্যবস্থা সার্থক রূপে প্রবর্ত্তন করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন এমন একটি বিনিয়োগব্যবস্থা যাহাতে শ্রমিক মহলে কোনরূপ অসন্তোষের অবকাশ থাকিবে না। ইহা সফল হইলে দীর্ঘমেয়াদী সমাজ নিরাপত্তা পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হইবে, আর ব্যর্থ হইলে আইন করিয়াও সর্ব্বগ্রাসী মন্দা ঠেকানো যাইবে না।" পূর্ণ নিয়োগব্যবস্থার তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ যেন মনোরম পরিবেশে সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকে। এক কর্ম্ম হইতে অন্য কর্ম্মে স্থানান্তরিত হইতে যেন মোটেই বিলম্ব না হয়। স্থানান্তর বা কর্ম্মান্তরের তাগিদ ন্যূনতম অঙ্কে স্থিরীকৃত হইবে অথচ জীবনযাত্রার মান সম্পূর্ণরূপে অব্যাহত থাকিবে। ব্রিটিশ 'শ্বেতপত্রে' পূর্ণনিয়োগ ব্যবস্থা বজায় রাখিবার জন্য তিনটি অত্যাবশ্যক উপায়ের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে—(১) মূল ব্যয়ের অঙ্ক অপরিবর্ত্তিত রাখা, (২) উৎপাদন উপকরণসমূহের সুষ্ঠু বণ্টন অব্যাহত রাখা ও (৩) মজুরিহার ও মূল্যমান সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন রাখা। এ বিষয়ে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ লর্ড কেইন্‌স বা মীড্ যেসব উপদেশ দিয়াছেন তাহা প্রকৃতই মূল্যবান।

ইহা ব্যতীত কল্যাণময় রাষ্ট্রে উৎপাদনবৃদ্ধি ও অবাঞ্ছনীয় ধনবৈষম্য লোপের কথাও বিবেচনার যোগ্য। বর্ত্তমানকালে সর্ব্বত্রই অন্য ব্যবস্থা বাদ দিয়া মুদ্রানীতির রদবদল করিয়া এই গলদ দূর করিবার চেষ্টা চলিতেছে। তজ্জন্য আয়কর ও অন্যান্য প্রধান প্রধান প্রত্যক্ষ করের উপর বর্ত্তমানে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। কিন্তু এই ব্যাপারে খুব সতর্কতার প্রয়োজন এইজন্য যে, এই সম্পর্কীয় কোন ব্যবস্থাই যেন সাধারণের সঞ্চয়-প্রবৃত্তি বা বিনিয়োগস্পৃহা কিংবা মূলধনগঠনের পথে অন্তরায় হইয়া না দাঁড়ায়।

এতক্ষণ আমরা কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের নানারূপ সম্ভাব্য সমস্যাবলী লইয়া আলোচনা করিলাম। এখন ভারতে ঐ সব সমস্যা কতটা বিদ্যমান এবং উহাদের প্রকৃতি বা স্বরূপ কিরূপ তাহা লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, ভারতকে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করিবার নীতি ঘোষণার ফলে আমাদের সমস্যার গুরুত্বও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। দেশকে প্রকৃতই কল্যাণব্রতী করিতে আজ সকলেই উৎফুল্ল ও আগ্রহান্বিত।

স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে যেসব সমস্যা আমাদের সম্মুখে প্রকট হইয়া উঠে, তাহাদের মধ্যে প্রধানতঃ দেশ-

বিভাগ, মুদ্রাস্ফীতি, উৎপাদন-ঘাটতি ও গঠনমূলক কাজে মূলধনের অভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অসহায় শ্রমিকদের দুঃখ লাঘব করিবার জন্য ১৯২৩ সনে ভারতে প্রথম শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন পাস হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের জন্য শ্রী বি. পি. আদারকর একটি স্বাস্থ্যবীমা পরিকল্পনা সরকারের নিকট দাখিল করিয়াছেন। এই বীমা তহবিলে চাঁদা দেওয়া বাধ্যতামূলক করিবার জন্য তিনি সুপারিশ করিয়াছেন। সরকার অবশ্য এখন পর্য্যন্ত কোন সামাজিক বীমা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই, তথাপি আজ দেশের সর্ব্বত্রই ইহার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে। খনি অঞ্চলের নারী শ্রমিকদের জন্য ১৯৪১ সনে খনি মাতৃমঙ্গল আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৯৪৮ সনের রাষ্ট্রবীমা আইনটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। সমাজ-বীমাক্ষেত্রে ইহা অভিনবত্ব দাবি করিতে পারে। ইহাতে স্বাস্থ্যবীমা সমেত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ ও আসন্নপ্রসবা নারীদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা আছে। শিক্ষা ও চিকিৎসাক্ষেত্রে নানারূপ উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। কৃষিপ্রধান ও নিরক্ষর অধিবাসী-প্রধান দেশের সঙ্কট পদে পদে এবং এই সঙ্কট উত্তীর্ণ হইবার জন্য বিচক্ষণ ও ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের প্রয়োজন।

কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র-গঠনের উচ্চাভিলাষ লইয়া অতি ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে হয়। তাড়াহুড়া করিলে পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইতে বাধ্য। সাত বৎসর পূর্ব্বে স্বাধীনতালাভ করিলেও বৈষয়িক ক্ষেত্রে এখনও আমরা আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারি নাই—এই কথা মনে রাখিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মসূচী স্থিরীকৃত হওয়া প্রয়োজন। বস্তুতঃ ভারতের বৈষয়িক অবস্থা আজ অত্যন্ত শোচনীয়। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা আনয়ন করিতে না পারিলে সাধারণ মানুষ হয় ঋণভারে জর্জ্জরিত। কিন্তু এ ব্যাপারে ঋণগ্রস্ত সরকারের ভয় নাই, কারণ নিত্যনূতন করের মারফতে জনসাধারণকে দেউলিয়া বানাইবার ক্ষমতা তাঁহাদের অফুরন্ত। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে অর্থাৎ ১৯৫৪-৫৫ সনে কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাটতির পরিমাণ ২৬ কোটি ৬ লক্ষ টাকা, আর গত বৎসর পশ্চিমবঙ্গে ঘাটতি ছিল ১২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা, বিহারে ৩০ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা, উড়িষ্যায় ৭৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা, আর আসামে ২ কোটি টাকা। এক কথায় কেন্দ্রীয় সরকার হইতে সুরু করিয়া রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে যেন ঘাটতির প্রতিযোগিতা সুরু হইয়া গিয়াছে। মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর উপর করের বোঝা এমন জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়াছে যে, তাহা লাঘব করিবার নামগন্ধও নাই। তদুপরি কেন্দ্রীয় সরকার আবার এ বৎসর সিমেন্ট, সাবান, জুতা, মিহি কাপড়, সুপারি ও প্লাষ্টিকের দ্রব্য প্রভৃতি অত্যাবশ্যক জিনিষের উপর কর বসাইয়াছেন। অসহায় দেশবাসীকে কি ভাবে ও কত রকমে নিঃস্ব করা যায় তৎপ্রতি সরকারের দৃষ্টি যেন লাগিয়াই আছে। সরকার বলিতেছেন, জনসাধারণের বৈষয়িক উন্নয়নের জন্যই এত সব করিতে হইতেছে। ডেভেলপমেণ্ট প্ল্যান বা উন্নতি-পরিকল্পনা দ্বারা তামাম দেশ তাঁহারা কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বা 'ওয়েলফেয়ার ষ্টেট' রূপে গড়িয়া তুলিয়া দেশের চেহারা আমূল বদলাইয়া দিবেন। কিন্তু তজ্জন্য প্রতিবৎসর বোঝার উপর শাকের আটির ন্যায় ক্রমবর্দ্ধমান করভার চাপাইবার ফলে জনসাধারণের পৃষ্ঠদেশ এমনিতেই বাঁকিয়া গিয়াছে এবং অচিরেই যে তাহাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িবে একথা মনে রাখা দরকার।

কেন্দ্রীয় বজেট অনুসারে দেখা যায় রাজস্বের হিসাব বাদে এককালীন ব্যয়, লগ্নী এবং ঋণখাতে চলতি বৎসরে ঘাটতি ১১১ কোটি টাকা এবং আগামী বৎসরে ২২৪ কোটি টাকা। আলোচ্য দুই বৎসরে ঋণ ও এককালীন আদায় খাতে যথাসম্ভব আয় বাদ দেওয়ার পরে এই ঘাটতির অঙ্কগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে। আর বজেট অনুসারে চলতি বৎসরের সংশোধিত হিসাব ও আগামী বৎসরের প্রাথমিক হিসাব মিলাইয়া রাজস্বখাতে ঘাটতি দেখানো হয় ৪৩ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশমুখ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এই দুই বৎসরের মোট ঘাটতি ৩৭৮ কোটি টাকার মধ্যে ৩৬ কোটি টাকা প্রারম্ভিক তহবিল হইতে এবং ১২ কোটি টাকা আগামী বৎসর কতকগুলি পণ্যের উপর উৎপাদন-কর স্থাপন করিয়া ও চলতি করভার বৃদ্ধি করিয়া আদায় করিয়া লইবেন। বলা অনাবশ্যক, এই করভারের বোঝা অধিকাংশই পড়িবে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুর্ব্বল স্কন্ধে। বাকী ৩৩০ কোটি টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিয়া কর্জ্জ লওয়া হইবে স্থির হইয়াছে। কিন্তু এ প্রস্তাবের পিছনে মুদ্রাস্ফীতির বিপজ্জনক সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবে দেখা যায়, ১৯৫০ সনের ডিসেম্বর মাসে ১১৪৪ কোটি টাকার, ১৯৫১ সনের ডিসেম্বর মাসে ১১৪১ কোটি টাকার, ১৯৫২ সনের ডিসেম্বরে ১০৯০ কোটি টাকার ও ১৯৫৩ সনের ডিসেম্বর মাসে ১১২১ কোটি টাকার নোট চালু ছিল। অর্থাৎ, গত চার বৎসরে বাজারে চালু নোটের পরিমাণে তেমন কিছু ইতরবিশেষ ঘটে নাই। কিন্তু অর্থসচিব স্থির করিয়াছেন, আগামী মার্চ্চ মাসের মধ্যে বিদেশে ৭৫ কোটি টাকা ও দেশের মধ্যে নূতন নোট ছড়াইয়া মোট ২৫৫ কোটি টাকা পর্য্যন্ত ঘাটতি খরচ করিবেন। কিন্তু গত যুদ্ধের সময় হইতে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহাতে মনে হয়,

এইভাবে টাকার বাজার ফাঁপিয়া উঠিলে মুনাফাখোর ও মজুত-দারগণ জনসাধারণকে শোষণ করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ পায়।

বজেট ঘাটতির আর একটি বিপদ এই যে, যে-কোন উপায়েই হউক, জনসাধারণের ট্যাক হইতেই অর্থ বাহির করিয়া এই ঘাটতি পূরণ করিতে হয়। অধিকাংশ রাজ্যের অর্থসচিবগণ বলিতেছেন, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ অর্থ জনকল্যাণমূলক খাতে বরাদ্দ করিবার ফলেই এবার তাঁহারা বিপুল ঘাটতির সম্মুখীন হইয়াছেন। ইহা আশার কথা। পণ্যমূল্য কতকটা নিম্নমুখী হইয়াছে, খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িয়াছে—এ সবই সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের আয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে, বেকারসমস্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য মন্দার সম্মুখীন হইতেছে—ইহাও সমান সত্য।

দুই দিকের এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, করভারের অতি পীড়ন ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার বিস্তার সত্ত্বেও সরকারী হিসাবে ঘাটতি এবং দেশবাসীর আর্থিক ক্রমাবনতি—এ সবে মিলিয়া দেশে এক ভয়াবহ এবং উদ্বেগ-জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। একদিকে নিদারুণ অভাব, অন্যদিকে এই অভাব দূরীভূত করিবার জন্য উন্নয়ন-মূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন—এই দুইয়ের সামঞ্জস্যবিধান করিতে হইলে বিপুল অর্থসংগ্রহ প্রয়োজন। ইহার জন্য ভবিষ্যতে নূতন করবৃদ্ধির পন্থা আবিষ্কার করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। কিন্তু জনসাধারণ আজ এমন দৈন্যদশায় উপনীত হইয়াছে যে, সেদিক দিয়া বিশেষ ভরসা নাই, লোকে বেকার ও ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। অন্যদিকে সরকারও তেমনি ঘাটতির দায়ে জর্জ্জরিত। ক্রমবর্দ্ধমান আর্থিক দৈন্য এবং ক্রমবর্দ্ধমান উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ঘাটতির পুনরাবৃত্তি—এই দুইয়ের সমন্বয়-সাধন কতদিনে হইবে তাহা বলা কঠিন। এই অবস্থার অবসান ঘটাইতে হইলে দেশে যেরূপ শিল্পবাণিজ্য ও উৎপাদনের প্রসার আবশ্যক—এবারকার কোন বজেটেই তাহার বিশেষ আভাস পাওয়া যায় নাই। গত কয়েক বৎসরে উন্নয়ন পরিকল্পনা সত্ত্বেও জনসাধারণ এবং সরকারের অর্থসমস্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি নাই, জীবিকার নূতন পন্থা আবিষ্কার হয় না, খাদ্যশস্যের মূল্য হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণের তাহা কিনিবার সামর্থ্য নাই। এই অবস্থার উন্নতি হইবে কি প্রকারে? উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হইলে আসল সমস্যার সমাধান হইবে না। এক-দিকে উন্নয়ন পরিকল্পনা আগাইয়া চলিতেছে, অন্যদিকে মানুষের অভাব দিন দিন বাড়িতেছে এই অদ্ভুত রহস্যের উদ্‌ঘাটন কবে সম্ভব হইবে আজ ইহাই জিজ্ঞাস্য। এই প্রশ্নের উত্তর বজেট-বর্ণিত কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ টাকার হিসাবের মধ্যে পাইতে গিয়া লোকে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আর ইহার সন্তোষজনক উত্তর না পাইলে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে কল্যাণ হইবে কাহার?

আমার কবিতা

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার কবিতা আজি লিখে যাই আকাশের গায়
গ্রহ-উপগ্রহ আর চন্দ্র-সূর্য, তারার অক্ষরে ;
চিরন্তন হয়ে থাক অন্তহীন মহাশূন্য 'পরে,
আন্তর আকুতি মোর জ্যোতিষ্কের জ্যোতির্ম্ময়তায়।

অতৃপ্ত আত্মার ক্ষোভ এ দিনের মর্ম্মান্ত-হেলায়
আলোর স্পন্দনে যেন রাত্রি-দিন কাঁদে আর্ত্তস্বরে ;
নিষ্করুণ বঞ্চনার সত্য যেন সবার উপরে
উদয়াস্ত জাগে বসি নিষ্পলক পুত্রশোক-প্রায়।

আনন্দের অবসরে কোনো দিন মুহূর্ত্তের ভুলে
বারেকের তরে যদি যুক্তকরে উর্দ্ধমুখে চেয়ে
স্তব্ধতার তলাতলে হারাইয়া ফেলো আপনারে,
স্মরণের সরোরুহ নয়নের সুনীল স্নকূলে
বিকশিবে বন্ধ টুটি' ; কবিতার ভীরু আলো পেয়ে
তৃণাঙ্কুর-শিহরণ গুঞ্জরিবে সন্ধানি আমারে।

ক্ষোভ

শ্রীমানবেন্দ্র পাল

বসন্ত বাড়ী ফিরল সেদিন রাত দশটায়। এপাশে ওপাশে সব বাড়ীতেই তখন কর্মচঞ্চলতা থেমে গেছে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সারি সারি মশারি ফেলা। কেউ-বা তখনও রেডিও শুনছে, কেউ পড়ছে নভেল। ঠুং-ঠাং করে বাসন রাখার শব্দ আসছে নীরেনবাবুর বাড়ী থেকে। বোধ হয় খাওয়া-দাওয়ার পাট সাঙ্গ হ'ল।

বসন্ত এসে দরজায় ধাক্কা দিল সন্তর্পণে। কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। এবার কড়া নাড়ল। তবু সাড়া নেই।

বসন্ত এবার ডাকল, খোকন!

উত্তর না দিয়ে দরজা খুলে দিল শোভা।

বসন্ত বললে, বাবাঃ, এর মধ্যেই একেবারে ঘুমে অচেতন!

ঘর অন্ধকার। বসন্ত নিজেই আলো জ্বাললে। দেখল, খাওয়া-দাওয়ার পাট সবার চুকে গিয়েছে। তার জন্যে আলাদা করে খানকয়েক রুটি থালা ঢাকা রয়েছে।

কিন্তু বসন্ত 'সেন্টিমেণ্টাল' নয়। সে জানে, আগেকার কালের ভক্তিমতী স্ত্রীদের যুগ কেটে গিয়েছে। ভক্তি হয়ত ঠিকই আছে, কেবল তার প্রকাশটার ঘটা নেই। কি করবে? সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর আর সংসারের দুশ্চিন্তা পুষতে পুষতে আধুনিক স্ত্রীরা আজ আর ভক্তির প্রকাশ ঘটা করে দেখাবার সুযোগ পায় না। তাই স্বামীর পথ চেয়ে ক্ষুধার্ত পাকস্থলীকে নিপীড়ন করে রাত জাগা এ কালের স্ত্রীদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বসন্ত তা বোঝে। কিন্তু তবু অন্য একটা কিছু আশা করে বৈকি। একটু মিষ্টি হাসি—একটু সহানুভূতি, তার সঙ্গে অসীম আগ্রহ, সব জড়িয়ে এমনি একটি পারিবারিক শান্তিই যে তার ক্ষতবিক্ষত সত্তাকে মধুময় করে তুলতে পারে।

কিন্তু শোভা যেন দিনে দিনে সেই অনুভূতির জগৎ থেকে সরে যাচ্ছে দূরে—অনেক দূরে। এক এক সময়ে সেই চিন্তাটাও বসন্তকে আঘাত করে বসে বড় নির্মমভাবে। তবু বসন্ত হাসে, ঠাট্টা করে—হাল্কা আনন্দ দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চায়।

আজও বসন্ত তাই ঠাট্টা করে বললে, কি, সব খেয়ে-দেয়ে বসে আছ?

শোভা গম্ভীরভাবে বললে, হ্যাঁ, সারাদিন খাটব-খুটব আবার রাত জেগে তোমার পথ চেয়ে না খেয়ে বসে থাকব, আমার দ্বারা তা সম্ভব হবে না।

অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল বসন্ত নিজের কাছেই। ঠিক এভাবে সে ত প্রশ্ন করে নি। ভুল বোঝাবুঝির একটা সমস্যা আছে সকল ক্ষেত্রেই। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও আছে, প্রণয়ী-প্রণয়িনীর মধ্যেও আছে, বন্ধুবান্ধবেরাও বাদ যায় না। কিন্তু দীর্ঘদিনের দাম্পত্য-জীবনের মধ্যে পরস্পরকে অনুভব না করার যে ব্যর্থতা তার আঘাত যে নিদারুণ!

আজ শোভা অকস্মাৎ বসন্তর সেই বিশ্বাসের উপর আঘাত হানল। বসন্ত গুম হয়ে গেল।

কিন্তু বসন্ত বোঝে গিঁটের উপর গিঁট দিলে বন্ধন জটিল হয়ে যায়। তাই হেসে বললে, এত মেজাজ! আমার অপরাধ কি আজ সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে শোভা?

শোভা উত্তর দিল না। ষ্টোভ জ্বালিয়ে ছোট ছেলেটার জন্যে দুধ গরম করতে লাগল।

বসন্ত হাসল আবার। বললে, কি গো কথা বন্ধ করে বসে রইলে যে!

—তোমার সঙ্গে কথা বলতে ঘেন্না করে!

—ওরে বাবাঃ! এত বড় আক্রমণ! অপরাধটা কি?

শোভা এক মুহূর্তের জন্য বসন্তর উপর অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করে বললে, অপরাধ কি, নিজে তা জান না?

বসন্ত গম্ভীর গলায় বললে, না।

—না! আপিসের পর এমন কোথায় রোজ আড্ডা মারতে যাও, যে বাড়ীর কথা মনে থাকে না?

—আড্ডা মারবার কি দেখেছ শুনি?

—তবে রোজ রোজ তোমার ফিরতে এত দেরি হয় কেন? আমার বাবা কি কখনও আপিস করেন নি? না আর কেউ করে না? সব বাড়ীতে ছ'টার মধ্যে আপিস থেকে ফিরে আসে, আর যত কাজ তোমার? সংসারে আর কিছু দায়িত্ব তোমার নেই?

বসন্ত একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে, সব সময়ে তুমি আমার কাছে কৈফিয়ত চাও কেন?

শোভা বললে, কৈফিয়ত চাইতে হয় বৈ কি! পুরুষ-মানুষের দায়িত্ব যদি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয়, তা হলে আর লজ্জার সীমা থাকে না। তুমি আমাকে দিনের পর দিন সেই লজ্জায় ডুবিয়েছ। আজ তাই ত মুখ ফুটে কথা বলতে হয়।

বসন্ত বললে, তুমি জান, আপিস ছাড়াও আমার অনেক কাজ আছে, যার সম্বন্ধে তোমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই ?

শোভা ভ্রূকুটি করে বললে, রোজই তোমার এমন কাজ যে ফিরতে ফিরতে রাত দশটা ? অবাক করলে !

বসন্ত চীৎকার করে ওঠে—কাজ না থাকলে কি আড্ডা মেরে বেড়াই ? আর যদি আড্ডাই মারি তা হলে বেশ করি। সারাদিন আপিসের খাটুনির পর আমার যা খুশি তাই করব। তার জন্যে কাউকে কৈফিয়ত দেবো না।

শোভা তার কোনও জবাব না দিয়ে সহসা ক্ষিপ্রগতিতে উঠে দাঁড়াল। তারপর মশারি তুলে ঘুমন্ত খোকনের পা ধরে টানতে টানতে মাটিতে আছড়ে ফেলল। হাতের কাছে ছিল একটা পাখা. সেই পাখার বাঁট দিয়ে নির্মমভাবে প্রহার সুরু করলে শোভা। চীৎকার করে কেঁদে উঠল খোকন।

শোভার কণ্ঠস্বর তখন কাঁপছে—হতভাগা ছেলে, পড়া নেই, শোনা নেই, রাত দশটা বাজতে না বাজতেই ঘুম ! আয় তোর চোখে কত ঘুম আছে তাই আজ দেখি।

দেখতে দেখতে পিঠ ফুলে উঠল খোকনের। চোখের জলে ভেসে গেল গাল। মাটিতে পড়ে উপুড় হয়ে কাঁদতে লাগল ডুকরে ডুকরে।

শোভা চীৎকার করে উঠল—যাও শীগ্‌গির মুখ ধুয়ে পড়তে বস গে। লেখাপড়া শিখবে না, চিরকাল মুখ্যু হয়ে থাকবে ?

নিঃশব্দে বসন্তর হাতে সিগারেট পুড়ে চলল। সামনে থালা-ঢাকা রুটি পড়ে রইল একান্ত অবহেলায়।

শোভা তখনও চীৎকার করছে—যাও পড়তে বস গে। বাপ দেখবে না, মাষ্টার রাখবে না—এতখানি বয়স হ'ল তবু স্কুলে ভর্তি করলে না। কি হবে এ অপোগণ্ড পুষে ? দেব একদিন ছেলে দুটোর গলা টিপে শেষ করে। দুষ্টু গরুর চেয়ে আমার শূন্য গোয়াল ভাল।

কথা বলতে বলতে অকস্মাৎ শোভার দুই চোখ বেয়ে নামল অশ্রুধারা। ফুঁপিয়ে উঠে মুখ লুকোল বালিশে।

দূরে পাথরের মূর্তির মত নির্বাক নিশ্চল বসন্ত তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। যেন এসব ঘটনা রঙ্গমঞ্চে ঘটা কোন এক শোচনীয় অধ্যায়।

কিন্তু এটুকু বুঝল বসন্ত শোভার অভিমান কোথায়। অথচ সে অভিমানের কোনও সান্ত্বনা নেই। যে আঙ্‌লটায় ফোস্কা পড়েছে সেই আঙ্‌লের উপর অভিমান করে খুন্তি ধরতে গেলে আঙ্‌ল জ্বলে উঠবেই। বসন্তও জ্বলছে। কিন্তু এতে কি অভিমান যায় ?

অনেক সমস্যার মধ্যে বসন্তর জীবনে এই মুহূর্তে আর একটি দারুণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে খোকন।

যতদিন খোকন ছোট ছিল ততদিন বসন্তকে আলাদা ভাবতে হয় নি কিছু। দশটা-পাঁচটা আপিস করেছে ; মাস গেলে মাইনে পেয়েছে। গত মাসের দেনা চুকিয়ে বাকি টাকায় সংসার চালিয়েছে। যখন অচল হয়েছে তখন আবার হাত পেতেছে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে।

এ হাত পাতায় লজ্জা নেই তার। কারণ এটুকু না করলে সংসার চলবে না।

তা ছাড়া ধার করে না কে ? বৃত্তাকারে দেনা পরিশোধের চক্র ঘুরে চলেছে সমস্ত মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর উপর দিয়ে। আজ ধার করা গেল একজনের কাছে, কাল অন্য জনের কাছ থেকে চেয়ে সেই দেনা শোধ হ'ল। আজ ধার করে আনা গেল দশ টাকা, কালে বিকেলে খবর নিয়ে জানা গেল স্ত্রীর কাছ থেকে পাশের বাড়ীর বৌ দু' টাকা ধার নিয়ে গেছে।

এই পরস্পর-নির্ভরতা আজ পূর্ণবেগে চলেছে। আর চলেছে বলেই সমস্ত মধ্যবিত্ত সমাজটা রয়েছে বেঁচে। কিন্তু যে মুহূর্তে ঘটে কোথাও ছন্দপতন, তখনই টলে ওঠে গোটা সংসার—দেড়শত টাকা মাইনের কেরাণীর সুখ-দুঃখে গড়া তাদের ঘর।

বসন্তর অদৃষ্টে এখন শনির দশা। দেনার পরিমাণ এত বেশী বেড়ে উঠেছে যে মাইনে থেকে পুরোপুরি শোধ করলে সংসার চলে না। তাই তাকে ঘুরতে হয়।

ঘুরতে হয় বৈ কি পাঁচটার পর এখানে-ওখানে, যদি মিলে এক-আধটা টিউশন—যদি মিলে কোন পার্টটাইমের কাজ কিংবা অন্য যে কোন উপায়ের পথ।

দপ্তরীর কাছে কিছুকাল শিখছিল ফর্মা ভাঁজাই। কিন্তু তাও সুবিধে হ'ল না। কাদের মিঞা হেসে বললে, বাবু, আপনারা হলেন ভদ্দরলোক, চেয়ার-টেবিলে বসে কাগজ-কলম নিয়ে কাজ-কাম। আপনারা এসব পারবেন কি করে ?

একরকম ভদ্রভাবেই কাদের মিঞা জবাব দিয়ে দিল। মাথা নীচু করে চলে এল বসন্ত সরকার।

মোড়ের মাথায় আসতেই হঠাৎ একটি ছেলে এসে হেঁট হয়ে বসন্তর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললে, কেমন আছেন স্যার ?

ত্রিশ বছর বয়স বসন্ত সরকারের। এ যুগেরই যুবক। তবু বিশ্বাস হয় না, একালেও এমন কোন ছাত্র আছে নাকি যে পথের মধ্যে হঠাৎ পায়ের ধুলো নিতে পারে তিন বছর আগেরকার এক গৃহশিক্ষকের ?

আশীর্বাদ করা হ'ল না। বসন্ত সরকার মুহূর্তখানেক

তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, কে কল্যাণ? কেমন আছ?

—ভাল স্যার।

—পড়াশুনো 'কনটিনিউ' করছ?

—থার্ড-ইয়ারে পড়ছি।

—বেশ বেশ! পিঠ চাপড়াল বসন্ত।

এমনই করে ঘুরতে ঘুরতে কখন যে ন'টা বেজে যায়, খেয়াল থাকে না। যেদিন সংসার একান্ত অচল হয় সেদিন চলে আসে পুরনো মেসে। এর-ওর সঙ্গে গল্প করে, শুধু পেটে দু' কাপ চা খেয়ে ফেরার সময় হয়ত ওকে চাইতে হয় পাঁচটা টাকা।

—দিতেই হবে অসীম, বিশেষ দরকার। বলতে লজ্জা নেই, পকেট একেবারে শূন্য। কবে দেব? ঠিক পয়লা। এই সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা-আটটা।...

মাইনে পেয়েই বসন্ত আসে। কিন্তু এসেই ত আর টাকা শোধ করে যেতে পারে না? তা হলে জীবনটা আর বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কটা যেন মহাজন আর দেনাদারের মত স্থূল হয়ে দাঁড়াবে।

তার চেয়ে হাসতে হাসতে এসে বন্ধুদের কাছে চা খেয়ে, সিগারেট ফুঁকে পলিটিক্স থেকে আলোচনা সুরু করে প্রেমের কবিতা পর্যন্ত আওড়ে চলে যাবার সময় অসীমের হাতে পাঁচ টাকার একটা নোট গুঁজে দিয়ে যাবার ভেতর আর যাই থাকুক দীনতার আঁচ থাকে না। এইটেই যথেষ্ট।

খোকনকে নিয়ে সমস্যা এত দিন ছিল না। কিন্তু কবে যে খোকনের সাত বছর গিয়েছে—কবে যে তার প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ শেষ হয়ে স্কুলে যাবার যোগ্যতালাভ হয়েছে—দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে ঘামাতে সে খবর বসন্ত রাখে নি। রাখে নি নয়, রাখতে পারে নি।

মেসের কোণের ঘরে বসে এক পেয়ালা চা আর সিগারেটের ধোঁয়ার রিং ছুঁড়তে ছুঁড়তে বসন্ত যখন হাল্কা হাসিগল্পর ভেতর দিয়ে কিভাবে পাঁচটা টাকা চাইবে চিন্তা করত, তখন সেখান থেকে তিন মাইল দূরে মধ্য-কলিকাতার কোন এক 'বাই লেনে'র অন্ধকার অল্পপরিসর ঘরে ছেঁড়া মাদুর পেতে খোকন দুলে দুলে পড়ত—ঐক্য বাক্য কুবাক্য। সামনে বসে শোভা। অটুট গাম্ভীর্য তার মুখে। বসন্তর তখনকার সে হাস্যোচ্ছ্বাসের এক কণাও শোভার কাছে এসে পৌঁছত না।

তাই যেদিন শোভা আত্মগর্বে হাসতে হাসতে বললে, খোকনকে এবার ইস্কুলে ভর্তি না করলেই নয়, সেদিন বসন্তও হাসতে হাসতে খুব হাল্কা সুরে বললে—তাই নাকি?

—তবে? খবর রাখ, ছেলে কত দূর এর মধ্যে পড়ে ফেলেছে? একেবারে ক্লাস থ্রিতে ভর্তি করতে হবে।

বসন্ত একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে বললে, যাক বাঁচা গেল।

শোভা হঠাৎ এই বেঁচে যাওয়ার অর্থ ধরতে পারল না। বললে, তার মানে?

—মানে আর কি, ছেলে ত সাবালক হয়ে উঠল। এবার আমার দুর্ভাবনাও ঘুচবে। আর দু' বছর পরে যা হোক একটা কাজে লাগিয়ে দেব—হয় চায়ের দোকানে, নয় তো মুদির দোকানে।

—আহা কি কথার ছিরি!

শোভা ঠাট্টা ধরতে পারল না। মুখ গম্ভীর করে উঠে চলে গেল।

শোভা উঠে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বসন্তকেও উঠতে হ'ল। তাকে এখখুনি একবার যেতে হবে বেহালা। এক বন্ধু কিছু টাকা যোগাড় করে দেবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। দশ-পাঁচ টাকা নয়, অন্ততঃ গোটা পঞ্চাশ। এর জন্যে অবশ্য সুদ দিতে হবে।

তাই সই—তাতেই রাজী। পঞ্চাশ টাকার আশু প্রয়োজন। সামনে শীত। লেপগুলোর যা দশা হয়েছে—তা ছাড়া গায়ে দেবার মত কোন গরম কাপড়ই নেই। ছেলে দুটোর সোয়েটার না হলে নিউমোনিয়ায় মরবে। তা ছাড়া গত মাসের ডাক্তারের বিলটা এখনও শোধ হয় নি। সুতরাং টাকাটারই দরকার আগে, সুদের চিন্তা পরে।

বসন্ত বেরিয়ে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে মুছে গেল ছেলেকে ভর্তি করার কথা। ও আলোচনাটা যেন সকালবেলায় চা খাওয়ার মুখে বেশ একটা রুচিকর বিষয়। ছেলে বড় হচ্ছে...।

এর চেয়ে বেশী ও বিষয়কে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। বই কেনার খরচ, তার উপর মাসে মাসে স্কুলের মাইনে। হয়ত আবার প্রাইভেট টিউটরও লাগবে। এ খরচ চালানো তার এখন সাধ্যের বাইরে।

খোকনের মুখের উপরকার মারের দাগগুলো পরের দিনও মিলায় নি। রাত্রিবেলার সেই নিষ্ঠুর মার বসন্ত দেখে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য, এতটুকু বাধা দেয় নি, প্রতিবাদটুকু পর্যন্ত করে নি। আর করে নি সে দুটো জিনিষ স্পর্শ সে রাত্রে। শোভার হাত আর তার হাতে-তৈরি রুটি। একরকম সমস্ত রাতটা বসন্ত সিগারেট ফুঁকে কাটিয়ে দিল মশারির বাইরে আধ-শোওয়া অবস্থায়।

পরের দিন আপিসফেরতা তেমন কোন কাজ ছিল না।

ইচ্ছে করলেই ছ'টার মধ্যে বাড়ী ফিরতে পারত। কিন্তু ফিরল না। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে শেষেএকটা সিনেমায় গিয়ে ঢুকল।

তারপর রাত দশটায় যখন বাড়ী ফিরল তখন আগের দিনের মতই দেখা গেল প্রতিবেশীদের মশারি সারি সারি ফেলা ; কেউ-বা তখনও রেডিও শুনছে, কেউ পড়ছে তন্ময় হয়ে বই। ঠুংঠাং করে শব্দ আসছে নীরেনবাবুর কলতলা থেকে।

কেবল ব্যতিক্রম—তার ঘরের দরজা আজ খোলা। আলো জ্বলছে। মশারির ভেতর ঘুমুচ্ছে তার দুই পুত্র। আর শোভা সযত্নে খোকনের পড়ার বইগুলোতে মলাট লাগাচ্ছে।

আজও কেউ কারও সঙ্গে বিশেষ কথা বললে না। শোভার খাওয়া হয়ে গিয়েছে কিনা বোঝা গেল না। ও শুধু উঠে একটা আসন পেতে দিলে।

কিছুদিন পর অকস্মাৎ একদিন বসন্ত রাত ন'টার সময় ফিরল উৎসাহে আর আনন্দে চঞ্চল হয়ে।

শোভা তখনও খোকনকে আঁক কষাচ্ছিল। সামনে এক ঘটি জল। ঢুলুনি এলেই শোভা খোকনের চোখে জল দিয়ে দিচ্ছিল। এমনই সময় বসন্ত ঢুকল হাসতে হাসতে। ধুপ করে এক ঠোঙা মাংস মাটিতে ফেলে বললে, নাও রাঁধো। আজ থেকে কিছুদিনের জন্যে কপাল ফিরল।

শোভা এ রকম একটা মুহূর্তের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। একদিকে স্বামীর এই অপ্রত্যাশিত স্ফুর্তি, আর এক দিকে সদ্য কিনে আনা মাংস, দুটোই সমান বিস্ময়ের। কোন্‌টার কারণ আগে জিজ্ঞাসা করবে স্থির করার আগেই বলে ফেলল, এত রাত্রে মাংস! তোমার কি আক্কেল বল ত!

—তা হোক। না হয় সারা রাত জেগেই আজ মাংস খাব।

—তুমি না হয় সারা রাত জেগে মাংস খেলে, কিন্তু খোকনটা? ও কি রকম মাংস খেতে ভালবাসে বল দিকি!

ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে বসন্ত বললে, তাই নাকি? তা ত খেয়াল ছিল না। আচ্ছা, ওর জন্যে না হয় আর এক-দিন নিয়ে আসব। কিছুদিনের জন্যে এখন আমি রাজা।

শোভা একটু ম্লান হাসল। বললে, কি জানি, তোমার উৎসাহ দেখে আমার বড় ভয় করছে। নিশ্চয়ই একটা কিছু ঠাট্টা করবে।

বসন্ত হেসে বললে, না ঠাট্টা নয়, একটা টিউশ্যন পেয়েছি। ক্লাস থির একটি ছেলেকে পড়াতে হবে, কুড়ি টাকা করে দেবে।

বসন্ত একটু থামল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে, আজই একবার টেষ্ট করে দেখলাম। বুদ্ধিমান ছেলে। বছর সাতেক বয়স। এত বুদ্ধিমান, এত চটপটে, ও যদি ভাল মাষ্টারের হাতে পড়ে তা হলে জোরগলায় বলতে পারি, ও একজন স্কলার হয়ে উঠবে। তা ছাড়া—

শোভা অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। দুই চোখের দৃষ্টি যেন নিবে গেল। ধীরে ধীরে উঠে বাইরে চলে যাচ্ছিল—ব্যস্ত হয়ে বসন্ত ডাকল—এ কি, উঠে যাচ্ছ!...তা কুড়ি টাকা মন্দ কি? যে ক'দিন যা পাওয়া যায় তাই লাভ।

শোভা ফিরে দাঁড়াল। ধীর সংযত কণ্ঠে বললে, ওই টাকাটার অর্ধেক আমায় দেবে?

হঠাৎ এমনিতর একটা প্রস্তাবের জন্যে বসন্ত প্রস্তুত ছিল না। একটু ইতস্ততঃ করে বললে, অর্ধেক!

—হ্যাঁ, দশ টাকা।

বসন্ত আরও একটু চিন্তা করে বললে, আচ্ছা, দেব।

—কিন্তু সে টাকার হিসেব তুমি চাইতে পারবে না।

বসন্ত ভেবে উত্তর দিলে—বেশ চাইব না। কিন্তু আর ঝগড়া করবে না ত?

শোভা বিস্মিত হ'ল। বললে, ঝগড়া! আমি বুঝি আগে ঝগড়া করি?

—ঝগড়া না কর, মুখখানা হাঁড়িপানা করেও থাকতে পারবে না, এই সর্ত।

—আচ্ছা।

খোকন ঢুলছিল। শোভা কাছে এসে ওর হাত ধরে তুলে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, খোকন শোওগে, আজ তোমার ছুটি।

"নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ"- মানুষের দশা চক্রনেমির ন্যায় নীচে এবং উপরে যায়।

অনেককাল আগে কালিদাস পড়বার সময় বসন্ত কথাটা মুখস্থ করে রেখেছিল। মুখস্থ করার কারণটা ঠিক পরীক্ষা পাস নয়, এমন অনেক কথা আছে যার অর্থ অনেক সময় পরীক্ষা-পাসের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে মানুষের অনুভূতিকে নিয়ে যায়।

জীবনের পরীক্ষায় পাস-ফেলে কত বার যে সান্ত্বনার প্রয়োজন হয় তার কি কোন হিসাব আছে? তাই কেউ কেউ অমূল্য উক্তি খুঁজে ..চায়—ভাণ্ডার পূর্ণ করে রাখতে চায় এমন মহাসঞ্চয়ে যা সারা জীবন ধরে যোগাবে পাথেয়।

'বসন্ত আজ তাই দীর্ঘ আট মাস পর যখন অকস্মাৎ তার কুড়ি টাকা মাইনের টিউশ্যনটা খোয়াল তখন তার সর্বাগ্রে মনে পড়ল কালিদাসের উক্তি।

কিন্তু বসন্ত সান্ত্বনা পেলেও তার এমন কোন সঞ্চয় নেই যা দিয়ে শোভাকে সান্ত্বনা দিতে পারে।

শোভা যে মনে মনে এই ক্লাস থির ছেলেটির উপর অপরিসীম ভরসা করে ফেলেছিল এবং সেই ভরসার উপর নির্ভর করে এই জানুয়ারীতে বসন্তকে না জানিয়েই ছেলেকে ভর্তি করে দিয়েছিল একেবারে ক্লাস ফোরে।

বসন্ত যখন শুনল তখন রাগের চেয়ে আশ্চর্যই হ'ল বেশী।

—খোকনকে ক্লাস ফোরে নিলে!

—নেবে না? কম পরিশ্রম করেছি ওর পেছনে? তুমি ত একটা দিনও ছেলেটাকে দেখলে না। কেবল পরের ছেলে মানুষ করেই গেলে।

বসন্ত হেসে বললে, পরের ছেলে মানুষ করার বিনিময়েই ত নিজের ছেলের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠছে, এটা ভোল কেন?

শোভা তা কোন দুর্বল মুহূর্তেও ভোলে নি এবং ভোলে নি বলেই পরের ছেলের গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের সঙ্গে নিজের ছেলের ভবিষ্যতের একটা যোগসূত্র রচনা করে ফেলেছিল।

কিন্তু আজ—

শোভা নিরুপায় হয়ে শুধু একবার জিজ্ঞেস করলে, ওরা ছাড়িয়ে দিলে কেন?

—আরে বলো না আর। যা অবস্থা। মাসের শেষে টাকা দিত ধার-কর্জ করে। শেষাশেষি বললে, মাষ্টারমশাই, আর ত পারি নে। হয়ত ছেলেটার পড়াশোনাই বন্ধ করে দিতে হয়।—প্রৌঢ় ভদ্রলোক কেঁদে ফেললেন। কি আর করি। নমস্কার করে চলে এলাম।

—আহা, ছেলেটার সঙ্গে দেখা করলে না?

—নাঃ, ও আর আমার সামনে বেরোয় নি। আমারও মনটা কেমন খিঁচড়ে গেল। চলে এলাম।

শোভার বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল—আহা!

—কিন্তু নিজের ছেলের উপায় এখন কি হবে? মাইনের টাকা থেকে একটা আধলা বেশী খরচ করবার উপায় নেই, কোন টিউশনও আপাতত জুটছে না। আর জুটলেও ওরকম গরীবের বাড়ী আর পড়াব না।

একটু কি ভেবে শোভা বললে, আচ্ছা দেখি কতদূর কি করতে পারি।

কিন্তু শোভার একার সাধ্য আর কতদূর? বসন্তর কাছ থেকে প্রতি মাসে যে দশটা করে টাকা নিয়েছে তা থেকে ছেলের স্কুলের মাইনে, বই, খাতা, পেন্সিল কিনে এবং সংসারের টুকিটাকি প্রয়োজন মিটিয়ে যা অবশিষ্ট ছিল তা থেকে চলল আর তিন মাস।

স্কুলে আগষ্ট মাসের মাইনে বাকি পড়ল। বাকি পড়ল সেপ্টেম্বর মাসেরও। পুজোর ছুটি অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে।

খোকন এর আগে দু'তিন বার এসে বলেছে মাইনের জন্যে। বলেছে, মাষ্টারমশাইরা রোজ জিজ্ঞেস করেন, আজ মাইনে এনেছ? আমি কিছু বলতে পারি না মা।

শোভাও উত্তর দিতে পারে নি। নিঃশব্দে শুধু ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে। আর—

আর বসন্ত এলে অতি সঙ্কোচে আবেদন করেছে—

হ্যাঁ গো, দুটো টাকা অন্তত দিতে পার এই মাসে?

বসন্ত নিঃশব্দে মাথা নেড়েছে।

নিরাশ হয়ে শোভা বলেছে, এদিকে মাইনে বাকি পড়ে যাচ্ছে। স্কুলে মানও থাকে না।

বসন্ত সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে মনে মনে কি হিসেব করে নেয়। বলে, পুজোর ছুটির আগে একেবারে তিন মাসের মাইনে মিটিয়ে দেবো।...

অক্টোবর এল।

খোকন একদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে বললে, মা, মাষ্টারমশাই আমায় বলে দিয়েছেন, যেদিন ইস্কুল বন্ধ হবে সেদিন সমস্ত মাইনে দিয়ে দিতেই হবে।

একটু বিরক্ত হয়ে শোভা বললে, আচ্ছা আচ্ছা হবে। তারপর নীচু গলায় জিজ্ঞেস করলে—তোদের ক্লাসের সবাই মাইনে দিয়েছে?

খোকন মাথা নেড়ে বললে, হ্যাঁ, কবে! কেবল আমিই—

শোভা ছেলেকে কাছে টেনে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললে, কবে তোদের ইস্কুল ছুটি হবে?

—পরশু দিন।

—পরশু দিন! মনে মনে শোভা যেন কি ভেবে নিল।

বসন্ত আপিস থেকে ফিরলে সেই দিনই শোভা বললে, হ্যাঁ গো, গোটাকতক টাকা ত খোকনের ইস্কুলে দিতেই হয়।

—কি করে সম্ভব?

মেজাজটা রুক্ষ হয়ে উঠল শোভার। বললে, সম্ভব নয় কেন?

বসন্ত বললে, পাওনাদাররা সব সামনে পুজো বলে হাঁ করে আছে। তাদের দেনা ত আগে শুধতে হবে।

—কিন্তু খোকনের নাম যদি কেটে দেয়?—শোভার কণ্ঠস্বর কেমন যেন কেঁপে উঠল।

বসন্ত বললে, পুজোর পর ফাইন-টাইন দিয়ে যা হোক ব্যবস্থা করব।

শোভা বললে, তবু কাল একটু আপিসে চেষ্টা করো, যদি টাকা যোগাড় করতে পার।

বসন্ত তার আর কোন উত্তর দেয় নি।

পরের দিন ছটার মধ্যেই বাড়ী ফিরল বসন্ত। শোভা খোকনের একটা শার্ট প্যান্ট আজ সাবান দিয়ে কেচে দিয়েছিল। এখন ইস্ত্রি করে দিচ্ছে।

কাল ইস্কুল হয়েই পূজোর ছুটি হয়ে যাবে। এই দিন পড়াশুনা নয়, শুধু হাসি গান কলকাকলি। ছেলেরা যাবে যে যার ভাল কাপড়-জামা পরে। স্কুল-বাড়ী সাজাবে ফুলে পাতায় রঙীন কাগজে। ঠোঙা ঠোঙা খাবার নিয়ে সব কাড়াকাড়ি করবে।

এই আনন্দে যদি কেউ বাদ পড়ে তবে সে একান্ত হতভাগ্য। ছেলেরা মনে মনে কামনা করে, এই পরম শুভ দিনটি কবে আসবে, তাদের শিশুমনে এই ব্যাকুলতার মুহূর্তে থাকে না কোন গ্লানি, কোন মলিনতা। নবেম্বরের শেষে তারা তাদের বার্ষিক পরীক্ষার বিভীষিকার কথাও ভুলে যায়। তাদের সামনে যে তখন কেবল ছুটির আনন্দ—দীর্ঘদিনের হাসিখুশিতে ভরা পূজোর বাজনা-বাজা রঙীন দুর্লভ মুহূর্তগুলি।

শোভাও তাই তার ছেলের আনন্দের অংশ গ্রহণ করবার জন্যে আজ মনপ্রাণ দিয়ে লেগে পড়েছে। কাল এই শার্ট প্যান্ট পরে খোকন স্কুলে যাবে, তার জীবনের এই প্রথম শুভসম্মেলনে।

বসন্ত ঘরে ঢুকতেই খোকন ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে বললে, বাবা, জান আমাদের ইস্কুলটা কি সুন্দর সাজিয়েছে।

—তাই নাকি ?

নির্লিপ্ত কণ্ঠে ছোট্ট একটা প্রশ্ন করে বসন্ত জামা খুলতে লাগল।

খোকন আরও কি বলতে যাচ্ছিল, কি একটা আকুল প্রশ্ন অতি সঙ্কোচে শোভারও কণ্ঠ ঠেলে বেরিয়ে আসছিল, কিন্তু বাধা পড়ল।

বাইরে থেকে কচি গলায় এই সময়ে কে ডাকল, খোকন আছিস ?

গলাটা খোকনের খুবই পরিচিত। উৎসাহে একলাফে খোকন বাইরে এসে দাঁড়াল।

—কে রে নন্তু ? আয় আয়। ও মা, আমার সেই বন্ধু নন্তু এসেছে।

শোভা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে নন্তুকে ডাকল—এস, এস। লজ্জা কি ?

বেশ ছেলেটি। ফুটফুটে চেহারা। পরনে সাদা হাফ প্যান্ট, হাল্‌কা নীল রঙের হাফ শার্ট। পরিপাটী করে সিঁথিকাটা, কালো কোঁকড়ানো চুলে ভরা মাথা।

নন্তু একটু লাজুক। তাই বেশী পরিচয় করতে পারল না কারও সঙ্গে। একপাশে দাঁড়িয়ে খোকনের হাত ধরে দোলা দিয়ে বললে, কাল কিন্তু খুব ভোরে ইস্কুল যাস। আমিও যাব। তোর আর ভাবনা কি ভাই, বাড়ীর কাছে ইস্কুল। আর আমায় আসতে হবে কতদূর থেকে।

খোকন বললে, আমার কিন্তু ভাই বড্ড ভয় করছে, যদি ঘুম না ভাঙ্গে !

নন্তু বললে, ভয় আমারও করছিল, কিন্তু দিদি বলেছে তুলে দেবে। তোদের এলার্ম দেওয়া ঘড়ি নেই ?

খোকন এলার্ম দেওয়া ঘড়ির নামই জানে না। তাই নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

নন্তু বললে, আমাদের আছে।

এমনি সময়ে শোভা এল ছোট্ট রেকাবিতে একটা রসগোল্লা নিয়ে, আর এক হাতে খোকনের ছোট্ট গেলাস ভরে জল।

কিছুতেই খাবে না নন্তু। শোভা বললে, তাই কি হয় বাবা, তুমি খোকনের সঙ্গে পড়—খোকনের বন্ধু। এই প্রথম এলে—

নন্তু নিরুপায় হয়ে মিষ্টিটা তুলে নিয়ে খোকনের সঙ্গে বাইরে এসে দাঁড়াল।

তারপর যাবার সময় বলে গেল—কাল ভোরবেলায় তোকে ডাকব। আমি না ডাকা পর্যন্ত যাস নে যেন।

খোকন মাথা নেড়ে বললে—না না।

শোভা আর চুপ করে থাকতে পারল না। নন্তু চলে যাবার পরেই বললে কাঁপা গলায়—হ্যাঁ গো, খোকনের মাইনেটা ---

খুব সহজভাবে বসন্ত বললে, নাঃ, কিছুতেই যোগাড় করতে পারলাম না।

শোভার মাথাটা এক মুহূর্তের জন্যে যেন কি রকম ঘুরে উঠল, দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, তখনই চৌকির উপর বসে পড়ল।

খোকনও কখন এসে বাবার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল—তার মনে তখন অনেক আশা, অনেক আনন্দ। কিন্তু হঠাৎ বাবার মুখের ঐ একটা কথা থেকেই ও যেন সব বুঝে নিলে। মুখ শুকিয়ে গেল।

বসন্তও যেন মাতাপুত্রের ব্যথাটা অনুভব করতে পারলে। বললে, ঠিক আছে। অত ভাবনা কি ? কাল আমি একটা চিঠি লিখে দেব হেডমাষ্টারকে। যে ক'মাসের মাইনে বাকি আছে সব স্কুল খুললেই মিটিয়ে দেব। যদি দরকার হয়ত ফাইনও দেব।

হ্যাঁগো, আমার লেটার-হেড প্যাডটায় দু'একটা পাতা আছে ত ?

শোভা যেন কি রকম বিকল হয়ে পড়েছে। কোন-রকমে মাথা নেড়ে সায় দিল মাত্র।

•

পরের দিন ভোরে যদিও খোকন ফর্সা শার্ট প্যান্ট পরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'ল তবুও যেন তার সমস্ত শিশুমন ছেয়ে কি এক নিদারুণ বিষাদ ঘনিয়ে রইল। অতি প্রত্যুষে শোভা ঘুম থেকে উঠে ষ্টোভ জ্বালিয়ে খোকনের জন্যে মোহনভোগ আর চা তৈরি করে দিলে বটে, কিন্তু তার মাতৃ-হৃদয়ের কোন্ গোপন অন্তঃপুরে কি একটা বেদনা গুমরে উঠতে লাগল।

আর বসন্ত—যে কোন দিনই সাতটার আগে ঘুম থেকে উঠে না, সে-ও আজ স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে ভোর চারটায় বিছানায় উঠে বসেছে।...

বর্ষা কেটে গেছে। আশ্বিনের শেষ। থেকে থেকে সির্ সির্ করে উঠছে গা। কোথায় যেন শিউলি ফুটেছে। মৃদু গন্ধ আসছে তার। বসন্ত একটা চাদর গায়ে দিয়ে বাইরের একফালি বারান্দায় এসে বসল।

কাল রাত্রেই হেডমাষ্টারকে চিঠিখানা লিখে রেখেছিল। তার অনেক দিন আগেকার দামী কাগজে ভাল ছাপার অক্ষরের লেটার-হেডে শুদ্ধ ইংরেজীতে লেখা একটি আকুতি-ভরা আবেদন।

আজ প্রত্যুষে সেই চিঠিখানার ভাষাই বারে বারে তার মনকে বিভ্রান্ত করে তুলতে লাগল।

চা মোহনভোগ খেয়ে শার্ট আর প্যান্ট পরে খোকন যখন প্রস্তুত হ'ল—যখন শোভা তার পুরনো ট্রাঙ্কের তলা থেকে মরচে-ধরা একটা কৌটো বার করে নিজের আঁচল দিয়ে খোকনের মুখে পাউডার মাখিয়ে দিতে লাগল; তখন বাইরের বারান্দায় বসে বসন্ত সহসা ডাকল—খোকন!

সে কণ্ঠস্বর শুনে শোভা যেন চমকে উঠল!

মা আর ছেলে এসে দাঁড়াল সামনে। বসন্ত নিঃসঙ্কোচে একবার হাতটা বাড়িয়ে বললে, চিঠিখানা দেখি।

তাড়াতাড়ি খোকন বুকপকেট থেকে বের করে দিল দামী কাগজে লেখা বাবার জরুরি পত্রখানা।

চিঠিখানা কয়েকবার নিবিষ্ট চিত্তে পড়ে বসন্ত বললে, নাঃ, এ চিঠি দেওয়া যায় না।

বলে তখনি চিঠিখানা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিল রাস্তায়।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল শোভা আর খোকন। মুখে তাদের ভাষা নেই। দৃষ্টি অচঞ্চল।

—না শোভা, খোকনকে ইস্কুলে যেতে হবে না আজ। যাওয়ার আনন্দের চেয়ে ঢের বেশি লজ্জা ওকে পেতে হবে। সে লজ্জা ও সারাজীবনে ভুলবে না।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে যখন পেছন ফিরল বসন্ত, তখন সেখানে আর কেউ দাঁড়িয়ে নেই।

কিন্তু সামনে তখন আর একটি কিশোরমূর্ত্তি সেই আবছা আলো-আঁধারে এসে দাঁড়িয়েছিল—সে নন্তু।

নন্তু ডাকতে যাচ্ছিল খোকনকে, কিন্তু তার আগেই নিঃসঙ্কোচ গাম্ভীর্যে বসন্ত বললে, খোকন যাবে না। ওর আজ অসুখ করেছে।

সিগারেটের পর সিগারেট ধ্বংস করে চলেছে বসন্ত সরকার। শরতের এই স্বল্প আলো-আঁধার-মেশানো প্রত্যুষে সহসা সে যেন হারিয়ে ফেলেছে নিজের সত্তা। যেন সে ভুলে গিয়েছে কলকাতার এই অল্পপরিসর কক্ষ—এই স্ত্রীপুত্র, এই সংসার—এই বেদনা-নৈরাশ্যের সকরুণ অভিনয়।

আজ ক্ষণকালের জন্যে তার বস্তুবাদী মন এই লৌহ-কপাট উন্মোচন করে ছুটে গেছে দূরে, বহু দূরে তার ফেলে-আসা শৈশবের কোন্ বিস্মৃতির অতল-তলে!

সেও ছিল শরতের এমনি এক মধুর প্রভাত। পুজোর ছুটির স্কুলমাতানো রমণীয় উৎসবের দিন। নিজের হাতে সাজিয়েছিল সেদিন স্কুলের কক্ষ ফুলে-পাতায়, রঙীন কাগজে। সকলের মুখে সেদিন সে কি উজ্জ্বল দীপ্তি—সকলের বুকে সে কি উদ্দাম কলরোল!

...দেড়শো টাকা মাইনের বসন্ত সরকার আজ সহসা এ কি শিশুমনের অতলে তলিয়ে গেল! কোথায় গেল তার উদ্ধত যোদ্ধমন—কোথায় গেল তার হাত পাতার নিঃসঙ্কোচ নৈপুণ্য?

বসন্তর অন্তঃস্থল থেকে আর এক ক্ষতবিক্ষত শিশুমন সহসা যেন আজ কেঁদে উঠল। লক্ষ টাকার বিনিময়েও খোকনের সাত বছর বয়সের এই প্রথম উৎসাহের উৎসব-মুহূর্ত্তটি আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

এ কথা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, গত শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমরা আত্মস্থ হইতে উদ্বুদ্ধ হই। তখন দেবভাষা সংস্কৃতের ব্যাপক অনুশীলনের সূচনা হয়। ইংরেজী ভাষা-সাহিত্যের মোহন স্পর্শে দেশ-ভাষাসমূহেরও নিজ নিজ প্রচ্ছন্ন শক্তির উন্মেষ হইতে থাকে। বাংলা ভাষা-সাহিত্য ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যে অনেকটা উন্নত ছিল। গত শতাব্দীর প্রথমেই বহুভাষাবিৎ উইলিয়ম কেরী ইহাকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষা-সাহিত্য সে যুগের বিভিন্ন সভা-সমিতির মারফত প্রকর্ষ লাভের সুযোগ পায়।

জে. ই. ডি. বেথুন

এই সকল সভা-সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রথমে ১৮১৭ সনে আরব্ধ কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির নাম উল্লেখ করিতে হয়। তবে নাম হইতেই প্রকাশ, এই প্রতিষ্ঠানটি নব্যশিক্ষার উপযোগী নূতন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়াদিতে পঠন-পাঠনের নিমিত্ত পুস্তক প্রকাশে নিয়োজিত ছিলেন। বাংলা ভিন্ন ইংরেজী ও অন্যান্য দেশীয় ভাষার পুস্তক প্রকাশেও তাঁহারা রত হন। কলিকাতার গৌড়ীয় সমাজও (প্রতিষ্ঠাকাল ১৮২৩) দেশীয় সংস্কৃতি এবং সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার অনুশীলনে মনোযোগী হইয়াছিলেন। এই সমাজ দ্বারা বাঙালী সাহিত্যিকবৃন্দ সে যুগে বিশেষ অনুপ্রাণিত হন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তত্ত্ববোধিনী সভার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাবধি (১৮৩৯) স্বদেশীয় ভাষা-সাহিত্যের চর্চ্চায় উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা দিতেছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ করিয়া বাংলা সাহিত্যের অনুশীলনে সবিশেষ তৎপর হন। তবে এই সভা বিশিষ্ট ধর্ম্মভাব প্রচারকল্পেই ভাষার সহায়তা লইয়াছিলেন। ট্রাক্ট সোসাইটি বা ক্রিশ্চিয়ান নলেজ সোসাইটি, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতিও নিজ নিজ উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভাষা-সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন। তাহাতে বাংলাভাষী নরনারীর সাধারণ পাঠোপযোগী পুস্তকের অভাব মেটানো সম্ভব ছিল না।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তখনও সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে দেশী-বিদেশীর সম্মিলিত ভাবে

কার্য্য করিবার সুযোগ-সম্ভাবনা একেবারে লোপ পায় নাই। বস্তুতঃ উপরি-উক্ত অভাব স্থানীয় ইংরেজ ও বাঙালী মনীষিগণ সমানভাবেই অনুভব করিতেছিলেন। সে যুগের সংবাদ পত্র হইতে জানিতেছি, এই অভাব বিদূরণের নিমিত্ত উত্তরপাড়ার জনহিতব্রতী জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং হাওড়ার সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট হজসন প্রাট সমান উদ্যোগী হইয়াছিলেন।* ইহার পূর্ব্বেই যে লণ্ডনের 'পেনি ম্যাগাজিনে'র

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

আদর্শে এখানে একখানি স্বল্পমূল্যের বাংলা মাসিকপত্র প্রকাশের জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল তাহাও জানা যাইতেছে।† কাজেই মনে হয়, সাধারণ গৃহস্থ-পাঠ্য পুস্তকের অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে উদ্যোগ-আয়োজন ১৮৫০ সনের মাঝামাঝি হইতে চলিয়া আসিতেছিল। এই আয়োজন একটি স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে ১৮৫০ সনের ডিসেম্বর মাসে। আর ইহার নামকরণ হইল "Vernacular Literature Society" বা "Vernacular Literature Committee"। ইহা প্রথম "Vernacular Translation Society" বা "Committee" নামেও অভিহিত হইয়াছিল। এই কমিটি বা সোসাইটির ক্রমে বাংলা নামকরণ হইল "বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ", আরও পরে সংক্ষিপ্তাকারে মাত্র "অনুবাদক সমাজ"।

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের প্রতিষ্ঠাকাল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ভ্রান্ত মত রহিয়াছে দেখিতেছি। যতদূর মনে হয়, লং কৃত বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ইংরেজী রিটার্নগুলি হইতেই এরূপ ভ্রম হইয়া থাকিবে। আদতে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫০ সনের ডিসেম্বর মাসে। ১৪ই ডিসেম্বর ১৮৫০ তারিখের "সত্যপ্রদীপ" এই সমাজ-প্রতিষ্ঠার সংবাদ দিয়া ইহার উদ্দেশ্য এবং কর্ম্মকর্ত্তৃগণের বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ২৮শে ডিসেম্বর সংখ্যা 'সত্যপ্রদীপে' সমাজের অনুষ্ঠানপত্র সবিস্তারে প্রকাশিত হয়। কাজেই বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের প্রতিষ্ঠাকাল 'ডিসেম্বর ১৮৫০' বলিয়া নিঃসন্দেহে ধরিয়া লইতে পারি। অনুষ্ঠানপত্রখানি হইতে এই সমাজের উদ্দেশ্য, কমিটির সদস্য, অনুবাদের জন্য প্রস্তাবিত পুস্তকসমূহ, আদায়ীকৃত চাঁদা ও চাঁদাদাতার নাম প্রভৃতি বিষয়ক নানা কথা জানা সম্ভব হইয়াছে। ২৮শে ডিসেম্বর ১৮৫০ দিবসীয় 'সত্যপ্রদীপ' হইতে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের অনুষ্ঠানপত্রখানি এখানে তুলিয়া দেওয়া গেল:

"বঙ্গভাষার পুস্তক অনুবাদার্থ সভা।

"বর্ত্তমান মাসের ১৪ তারিখে সত্যপ্রদীপে অনুবাদার্থ যে সভা-বিষয়ক বৃত্তান্ত প্রকাশ হয়, এইক্ষণে তাহার অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশ করিতেছি।...

"নিম্নের লিখিত মহাশয়েরা ইঙ্গরাজীতে সর্ব্বলোকেরদের পাঠ্য ও উত্তম২ পুস্তক বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশার্থ সভাস্থাপন করিয়াছেন।

"শ্রীযুত অনারিবল জে ই ডি বীটন সাহেব।
শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীযুত এ গ্রোট সাহেব।
শ্রীযুত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
শ্রীযুত পাদরি ডবলিউ কে সাহেব।
শ্রীযুত ডাক্তর লাম সাহেব।
শ্রীযুত জে সি মার্শমান সাহেব।
শ্রীযুত এচ প্রাট সাহেব।
শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত।
শ্রীযুত ই এ সামুয়েলস সাহেব।
শ্রীযুত সিটনকার সাহেব।
শ্রীযুত উডরো সাহেব।
শ্রীযুত এস প্রাট সাহেব। } সেক্রেটারী।
শ্রীযুত টৌনসেণ্ড সাহেব। }

---

* "বেঙ্গল হরকরা" 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' হইতে এই সংবাদটি অনুবাদ করিয়া ১৮৫০, ১৯শে নবেম্বর সংখ্যায় প্রকাশ করেন:

"Vernacular Society—We hear that Baboo Joykissen Mookerjee, zemindar of Uttarpara and Mr. Pratt, Asst. Magistrate of Howrah, are the principal promoters of the intended Vernacular Society,

† ঐ, ৯ই নবেম্বর ১৮৫০
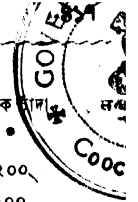
"ট্রাক্ট সোসাইটি কিম্বা খ্রীষ্টান নলেজ-সোসাইটি কি ইস্কুল বুক সোসাইটি কিম্বা আসিয়াটিক সোসাইটি চতুষ্টয় সভার নিয়মমতে সর্ব্বসাধারণের পাঠ্য উত্তম২ যে সকল পুস্তক প্রকাশ করিতে পারেন না তাহা উক্ত কমিটির সাহেবেরা প্রকাশ করিবেন।

"উক্ত সাহেবেরা আপনারদের মুখ্যাভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থ যে পুস্তক প্রকাশ করিতে মনস্থ করেন সেই পুস্তকের রচনা বঙ্গদেশীয় লোকের মতানুসারে কিঞ্চিং২ পরিবর্ত্তন করিয়া অনুবাদ করিবেন।

"উক্ত সাহেবেরা প্রথম বৎসরে ৫০০০ টাকা পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিলে নিম্নের লিখিত গ্রন্থ ভাষান্তর করিয়া প্রকাশ করিবেন।

"রবিনসন ক্রুসো। বেকন সাহেবের প্রবন্ধ বাক্য। ইতিহাসের সমকালীন ঘটনা। আবরক্রাম্বি সাহেবের রচিত মনোগুণ। চেম্বার্স ও নাইট সাহেবের ও পেনি মাগাজিনের প্রকাশিত নানাবিধ বিদ্যা বিবরণাদি সংগৃহীত এক পুস্তক। মহাপীটরের আয়ুর বিবরণ। কলম্বসের আয়ুর বিবরণ। ক্লাইব সাহেব ও ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেবের বিষয়ে মাকালি সাহেবের প্রবন্ধ বাক্য।

"কমিটির সাহেবেরা আবশ্যক ধন সংস্থাপনার্থ এই নিয়ম করিয়াছেন বঙ্গদেশীয় লোকেরদের স্বেচ্ছামতে পাঠ্য বঙ্গভাষীয় ও কর্ম্মণ্য পুস্তক প্রস্তুত করণার্থ এই দেশীয় লোকেরদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যাঁহারা সাহায্য করিতে চাহেন তাঁহারা অন্যূন পঞ্চাশ টাকা বার্ষিক চাঁদা দেন; তদ্ভিন্ন যাঁহারা যাহা চাঁদা দিতে চাহেন তাহা গ্রাহ্য হইবেক।

"যে কোন মহাশয় পঞ্চাশ অবধি টাকা দেন তিনি আপনার দত্ত মুদ্রাক্রমে কমিটির প্রকাশিত তৎতুল্য মূল্যের পুস্তক ঐ পুস্তক প্রকাশ করণের দরে পাইবেন। যথাসাধ্য অল্পব্যয়ে পুস্তক প্রকাশ হইবেক।

"কমিটির সাহেবেরা আপনারদের কার্য্যের বৃত্তান্ত প্রতি বৎসরান্তে প্রকাশ করিবেন।

"যে কোন ব্যক্তি পাঁচ শত টাকা দেন তিনি যে কোন পুস্তক অনুবাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিবার পরামর্শ দেন যদি কমিটির বিবেচনায় সেই পুস্তক সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযুক্ত হয় এবং যে প্রকার পুস্তক প্রকাশ করণে তাঁহাদের অভিপ্রায় থাকে তাহার বিপরীত প্রকারের পুস্তক না হয় তবে তাহার অনুবাদ করণের উপায় করিবেন।

"যদ্যপি উপযুক্ত সংখ্যক টাকা প্রাপণপ্রযুক্ত সভার ক্ষতি না করিয়া ছয় পুস্তকের অধিক বর্ত্তমান বৎসরে প্রকাশ করা যাইতে পারে এবং কমিটির সাহেবেরা উত্তরকালে আরো বিস্তারিতরূপে কার্য্যসিদ্ধির উপায় করিতে পারেন তবে তাঁহারা সাধারণ মহাশয়েরদের কৃত সাহায্যের উপযুক্ত ভাবমতে আপনারদের কার্য্য চালাইবেন এই প্রতিজ্ঞাতে বদ্ধ হইয়াছেন। মহাশয়েরা ঔদার্য্যপূর্ব্বক এই কার্য্যের সাহায্য করিবেন কমিটির এই আশা হইতেছে এবং এই দেশীয় লোকেরদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মহাশয়েরা যথেষ্ট সাহায্য করেন এই নিবেদন।

"নীচের লিখিত টাকা পাওয়া গিয়াছে।

	দান	বার্ষিক চাঁদা
"শ্রীযুত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখুয্যা ও রাজকৃষ্ণ মুখুয্যা ...		১২০০৲
" ডাক্তর লাম সাহেব	১০০৲	২০০৲
" এম ওয়াইলি সাহেব	৫০৲	৫০৲
" এচ উডবো সাহেব	৫০৲	৫০৲
" এচ প্রাট সাহেব	৫০৲	৫০৲
" ই এ সামুয়েল সাহেব	৫০৲	৫০৲
" বাবু রসময় দত্ত	৫০৲	৫০৲
" এ গ্রোট সাহেব	৫০৲	৫০৲
" পাদরি ডবলিউ কে সাহেব	১০০৲	৫০৲
" এ জে এম মিলস সাহেব	৫০৲	৫০৲
" এম টৌনসেণ্ড সাহেব	৫০৲	৫০৲

প্রসন্নকুমার ঠাকুর

"উপরে লিখিত কএক পুস্তকের অনুবাদ করণ অগৌণে আরম্ভ হইবেক। যাঁহারা এতৎকার্য্যার্থ কোন টাকা দিতে মনস্থ করেন তাঁহারা সেক্রেটারী সাহেবেরদের কিম্বা কমিটির কোন মহাশয়ের নিকটে টাকা প্রেরণ করুন। কলিকাতা ১৮৫০ সাল'।

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ স্থাপিত হইল। অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশের অব্যবহিত পরেই সমাজ-কমিটি বা অধ্যক্ষ-সভা কার্য্যে

নিবিষ্ট হইলেন। যে কার্য্যের জন্য মূলতঃ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা সত্বর সুরু করিতে তাঁহারা মনস্থ করিলেন। ১৮৫১ সনের প্রথম দিককার ইংরেজী-বাংলা সংবাদপত্রে সমাজের অধিবেশন এবং ইহার নানা সঙ্কল্পের কথা প্রকাশিত হইতে লাগিল। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৮৫১ তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা' 'সত্যপ্রদীপ' সাপ্তাহিক হইতে একটি সংবাদের মর্ম্ম প্রদান করিয়া জানান যে, বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ প্রস্তাবিত পুস্তকসমূহের কিঞ্চিৎ রদবদল করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ৭ই এপ্রিলে 'বেঙ্গল হরকরা' এই মর্ম্মে লেখেন, 'রবিন্সন ক্রুসো'র অনুবাদ কার্য্য শেষ হইয়াছে, 'পীটার দি গ্রেট' ও কলম্বসের জীবনীর অনুবাদও অনেকটা অগ্রসর। লণ্ডন হইতে ছবির প্লেট আসিয়া না পৌঁছায় 'পেনি ম্যাগাজিনে'র

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

আদর্শে সঙ্কলিত মাসিক পত্রিকাখানির প্রকাশে বিলম্ব ঘটিতেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ব্লকের কাজ তখনই এদেশে খানিকটা চালু ছিল, তথাপি বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ নিজ পুস্তক ও পত্রিকার উপযোগী ব্লক বিলাত হইতেই আনাইবার ব্যবস্থা করেন। উহার অধিকতর উৎকর্ষই হয়ত ইহার কারণ।

প্রতিষ্ঠাবধি বর্ষাধিককাল পর্য্যন্ত সমাজের কি কি কাজ হইয়াছিল তাহার একটি ফিরিস্তি ইহার প্রথম রিপোর্ট হইতে পাওয়া যায়। এই রিপোর্টের সারমর্ম্ম ১৮৫৩, ১৭ই জানুয়ারী সংখ্যা 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সারে' প্রকাশিত হয় এত দেরীতে প্রকাশিত হওয়ায় মনে হইতেছে, বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের অন্যূন প্রথম দেড় বৎসরের কার্য্য-বিবরণ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই বিবরণ হইতে জানা যায়, শ্রীরামপুরের পাদ্রী জে. রবিন্সন 'রবিন্সন ক্রুসো', ড. রোয়ার 'ল্যামস টেলস্ ফ্রম সেক্সপীয়র' এবং হরচন্দ্র দত্ত মেকলের 'লাইফ অফ্ ক্লাইব' বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন; এ তিনখানি পুস্তকই যন্ত্রস্থ হইয়াছে। আরও জানা যাইতেছে যে, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র যথাক্রমে কলম্বস, পীটার দি গ্রেট এবং শিবাজীর জীবনী অনুবাদ-কার্য্যে রত হইয়া ইহাতে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন। পাদরী লঙ্ বাংলা সাময়িকপত্র হইতে যে সঙ্কলন করিতেছিলেন তাহাও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের প্রথম বৎসরের একটি প্রধান কার্য্য—রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকাশ। বাংলা ১২৫৮, কার্ত্তিক মাস হইতে ইহা চিত্র-শোভিত হইয়া প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয় বিলাতের 'পেনি ম্যাগাজিনে'র আদর্শে। প্রত্যেক সংখ্যায় ষোল পৃষ্ঠা এবং তিনখানি চিত্র প্রদত্ত হইতে থাকে। সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র সমাজের নিকট হইতে প্রতি মাসে আশী টাকা করিয়া পাইতেন। পত্রিকার উদ্দেশ্য এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল: "যাহাতে বঙ্গদেশস্থ জনগণের জ্ঞান বৃদ্ধি হয় এমৎ সৎ ও আনন্দজনক প্রস্তাব সকল প্রচার করা উক্ত [বঙ্গভাষানুবাদক] সমাজের মুখ্য কল্প, এবং ইংরাজী ভাষায় 'পেনি মেগাজিন' নামক পত্রের অনুবর্ত্তিত এতৎপত্রে তদভিপ্রায় সিদ্ধার্থে অবিরত সম্যক চেষ্টা করা যাইবেক। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের পাঠযোগ্য করণার্থে উক্ত পত্র অতি কোমল ভাষায় লিখিত হইবেক, এবং তত্রত্য প্রস্তাবিত বস্তু সকলের বিশেষ পরিজ্ঞানার্থে তাহাতে নানাবিধ ছবি থাকিবেক।" এই পত্রিকার মূল্য প্রতি সংখ্যা দুই আনা এবং বার্ষিক দেড় টাকা।

সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রথম সংখ্যায়ই সম্পাদকীয় নিবেদনে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের কথা এইরূপ লিখিয়াছেন:

"বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে এই পত্র স্থাপিত হইল, অতএব তৎসমাজস্থ মহোদয়গণের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। উক্ত সমাজস্থ মহাশয়েরা বঙ্গভাষাদ্রোহি জনগণের উপহাস সহ্য করত শুদ্ধ পরোপকারার্থে এতদ্দেশীয় ভাষার উন্নতি চেষ্টায় প্রবর্ত্ত হইয়াছেন, এবং বিপুলার্থ ব্যয় করিয়া নানাবিধ উত্তম গ্রন্থ সকল প্রস্তুত করাইতেছেন, অতএব ভদ্র সমাজে উঁহারা অবশ্য

সমূহ প্রশংসার পাত্র হইবেন, এবং এতদ্দেশস্থ সকলেই যে ইঁহাদের ধন্যবাদ করিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

বিলাত হইতে ব্লক আনাইবার বিষয় এই বিবরণে বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হয়। পত্রিকা এবং পুস্তকাদি চিত্রশোভিত করিবার নিমিত্ত সমাজ ইতিমধ্যেই বিলাতে এক হাজার টাকা মূল্যের ব্লকের অর্ডার দিয়াছিলেন। সমাজের অন্যতম প্রধান উৎসাহী অধ্যক্ষ ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন লণ্ডনের বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক চার্লস নাইটের নিকট হইতে সাতাশিখানা ব্লক বিনামূল্যে আনাইয়া সমাজের পত্রিকা ও পুস্তকাদির ব্যবহারের জন্য দেন। তবে ব্লক-দাতা নাইটের নামোল্লেখ করিয়া ঋণ স্বীকার করিতে হইবে—এরূপ কথা থাকে। এই বিবরণ হইতে আরও জানা যায়, উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নিজ গ্রন্থাগারের যাবতীয় মুদ্রিত বাংলা পুস্তক সমাজকে দান করেন। ড. রোয়ার ও হরচন্দ্র দত্ত বিনা দক্ষিণায় পূর্বোল্লিখিত পুস্তকদ্বয় অনুবাদ করিয়াছিলেন। বাঙালী পাঠক-পাঠিকার মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান বিতরণের জন্যই এই সমাজের প্রতিষ্ঠা। এ কারণ কর্তৃপক্ষ পাঠক সাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি বিশেষরূপ যাচ্ঞা করেন।

অনুষ্ঠানপত্রে যে সব পুস্তকের অনুবাদ প্রকাশের কথা রহিয়াছে, এই বিবরণ হইতে জানা যায় তাহার কয়েকখানি পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং তাহার স্থলে কয়েকখানি নূতন পুস্তক অনুবাদ, সঙ্কলন ও প্রকাশের প্রস্তাব হইয়াছে। এ সময়কার অধ্যক্ষ সভায়ও কয়েকজন বাঙালী এবং বিদেশীর নাম নূতন দেখিতেছি, যথা—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, পাদ্রী লঙ্ ও ড. স্প্রেঙ্গার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবারকার অধ্যক্ষ-সভায় ছিলেন না। সম্পাদক মাত্র এইচ্ প্রাট। বেথুন সাহেব ১৮৫১, ১২ই আগষ্ট মৃত্যুমুখে পতিত হন। সমাজ উক্ত রিপোর্টে এজন্য বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন। তাঁহার স্থলে প্রধান সভ্য দেখিতেছি জে. আর. কলভিন্‌কে। বড়লাট লর্ড ডালহৌসী বঙ্গ-ভাষানুবাদক সমাজের 'পেট্রন' বা পৃষ্ঠপোষক হইলেন।

এই বিবরণে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের নিমিত্ত যাঁহাদের নিকট হইতে চাঁদা পাওয়া গিয়াছিল তাঁহাদেরও একটি তালিকা প্রদত্ত হয়:

লর্ড ডালহৌসী	৫০০৲
জে ই ডি বেথুন	১,০০০৲
জয়কৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ মুখুয্যে	১,০০০৲
ডাঃ ল্যাম্ব	৩০০৲
এম্ ওয়াইলি	১০০৲
এ গ্রোট	১০০৲
জে সি মার্শমান	১০০৲
লেঃ বেকন	৫০৲
এম টাউনসেণ্ড	৫০৲
এইচ উড্রো	৫০৲
রসময় দত্ত	১০০৲
পাদ্রী জে লঙ	৫০৲
ডবলিউ সিটন-কার	৫০৲
জে ডবলিউ ডালরিম্পল	১০০৲
এফ জে হেলিডে	৫০৲
ড. বেলি	৫০৲
এ স্কন্স	৫০৲
জে জে ওয়ার্ড	৫০৲
গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী	৫০০৲*
জে ডবলিউ কল্‌ভিন	১০০৲
লর্ড বিশপ	১০০৲
প্রসন্নকুমার ঠাকুর	৫০০৲
পাদ্রী ডবলিউ কে	১৫০৲
	৪,৬০০৲

সমাজের কার্য্য—বাংলা-ভাষায় অনুবাদ পুস্তক এবং পত্রিকা প্রকাশ—সোৎসাহে চলিতে লাগিল। ইহার উদ্দেশ্যও ক্রমশঃ ব্যাপকতর হইল। এ বিষয় পরে আলোচ্য।

* গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী কোম্পানীর কাগজে পাঁচ শত টাকা অর্পণ করায় মোট হিসাবে ইহা ধরা হয় নাই।
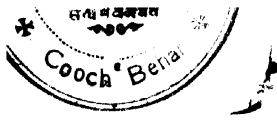
কচুরিপানা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

অন্যান্য বহু প্রকার স্থলজ ও জলজ উদ্ভিদের ন্যায় কচুরিপানারও বীজ এবং কাণ্ড হইতে নূতন গাছ জন্মে ; আমাদের দেশের আবহাওয়া বিপরীত থাকায় বীজ অপেক্ষা ভাসমান কচুরিপানার কাণ্ড হইতেই অধিক পরিমাণে নূতন গাছ জন্মে। প্রসঙ্গক্রমে ইহা জানিয়া রাখা দরকার যে, কাণ্ড হইতে উদ্ভূত গাছের বীজ কম উৎপন্ন হয়।

কচুরিপানা গাছের জন্মবৃত্তান্ত এবং বৃদ্ধি একটি চিত্তাকর্ষক বিষয়। প্রত্যেক বৃক্ষের যেরূপ গাঁট থাকে তেমনি কচুরিপানা-গাছেরও গাঁট আছে। কচুরিপানা-গাছের ঐরূপ প্রত্যেক গাঁট হইতে একটি করিয়া কুঁড়ি বাহির হয় ; ইহা কিন্তু ফুলের কুঁড়ি নহে, নূতন গাছের ভ্রূণ অবস্থা। কুঁড়িটি ফুটিলে একটি নূতন এবং পৃথক গাছ জন্মাইবে। প্রথম অবস্থায় কুঁড়িটি কাণ্ডের সহিত লাগিয়া থাকে ; কিন্তু কুঁড়িটির ক্রমবৃদ্ধির সহিত উহার একটি বোঁটা জন্মায় এবং তাহা বাড়িয়া সাত-আট ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয় ; ইহার ফলে বোঁটা সমেত কুঁড়িটি মূল গাছ হইতে দূরে সরিয়া আসে এবং উহা হইতে কাণ্ড ও পাতা বহির্গত হয়। কুঁড়িটি পৃথক হইবার পর উহার তলদেশ হইতে শিকড় বাহির হইতে থাকে ; পরে মূল গাছ হইতে বোঁটাটি ভাঙিয়া গেলে উহা একটি পৃথক এবং স্বাবলম্বী গাছে পরিণত হয়। এইরূপে প্রত্যেক গাঁট হইতে উদ্ভূত কুঁড়ি হইতে পৃথক পৃথক গাছ জন্মলাভ করে। কচুরিপানার ডাঁটা বায়ুপূর্ণ "ব্লাডারে"র ন্যায় স্ফীত হওয়ায় ইহা জলের উপর অনায়াসে ভাসিয়া থাকিতে পারে ; ইহার উপর উহার পাতা নৌকার পালের মত কাজ করায় অল্প বাতাসে অথবা স্রোতে উপরোক্ত ভাবে উৎপন্ন গাছ বহুদূর পর্যন্ত নীত হইয়া নিজেদের বংশ বৃদ্ধি করে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, কচুরিপানার একটি ছোট অংশ হইতে বৎসরের মধ্যে দশ হাজার বর্গগজ ব্যাপী কচুরিপানার ঘন দল সৃষ্টি হইতে পারে।

কচুরিপানার কাণ্ড শুষ্ক আবহাওয়া দীর্ঘকাল সহ্য করিতে পারে। ঐরূপ নীরস আবহাওয়ায় কচুরিপানার কাণ্ডের জীবনীশক্তি বিনষ্ট হয় না ; কেবলমাত্র অল্পমাত্রায় নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং আবার উপযুক্ত আবহাওয়া পাইলে তাহা কচুরিপানার বংশবৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বোঁটা ভাঙ্গিয়া নবোদ্ভূত গাছ যে সকল সময়েই মূল গাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে তাহা নহে ; অনেক সময় মূল গাছের সহিত যুক্ত থাকিয়া তাহারা বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে। এইরূপ এক একটি ঘন দল বহুদূরে অনায়াসে ভাসিয়া গিয়া ক্রমান্বয়ে বংশ-বৃদ্ধি করে।

বীজ হইতে কি প্রকারে কচুরিপানার বংশবৃদ্ধি হয় তাহাও জানিয়া রাখা দরকার। সাধারণতঃ বৎসরে দুই বার কচুরিপানার ফুল হয় ; একবার চৈত্রের মাঝামাঝি হইতে বৈশাখের শেষ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় বার শ্রাবণ মাসের মধ্যভাগ হইতে অগ্রহায়ণ মাসের শেষাশেষি কচুরিপানার গাছ ফুল ধারণ করে। তবে বর্ষায় ফুলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ভোরবেলাতেই ফুল ফুটিয়া থাকে এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহা শুকাইয়া যায়।

অগ্রভাগে একটি দণ্ডের উপর কচুরিপানার ফুল উৎপন্ন হয়। ফুলের পুরুষ-কেশরের পরাগ গর্ভকেশরের উপর পতিত হইলে ফুলগুলি শুকাইয়া গিয়া ফুলসমেত দণ্ডটি বাঁকিয়া জলের নীচে চলিয়া যায়। জলের গভীরতা কম হইলে অথবা ডাঙ্গায় কাদা-মাটিতে উৎপন্ন হইলে উহা মাটিতে ঢুকিয়া যায়। জলের নীচেই ফুল হইতে ফল ও বীজ উৎপন্ন হয়। ইহা মনে রাখা দরকার যে, সকল ফুলের পরাগ গর্ভকেশরের সহিত মিশ্রিত হয় না, আবার যাহাদের হয় তাহাদের মধ্যে অনেক ফুল হইতে ফল ও বীজ উৎপন্ন হয় না এবং সব ফলের সকল বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হয় না। বিশেষ অবস্থায় আবহাওয়ার আনুকূল্যে জলের উপরেও ফল হইতে বীজ জন্মায়।

জলের নীচে ফলগুলি পাকিয়া ফাটিয়া গেলে বীজগুলি জল অপেক্ষা ভারী হওয়ায় জলতলস্থিত মাটিতে ছড়াইয়া পড়ে। বৃষ্টিপাত এবং বায়ুর আর্দ্রতার উপরই ফুল হইতে বীজ এবং ফল উৎপাদন নির্ভর করে। বাংলাদেশে অন্যান্য সময় অপেক্ষা আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি হইতে অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি যে সকল ফুল ফোটে তাহা হইতেই ফল ও বীজ উৎপন্ন হয়।

কচুরিপানা যে রকম ধ্বংসশীল তেমনি এর জীবনবৃত্তান্তও জটিলতায় পূর্ণ। ইহার বীজ ছয় মাস পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় ত থাকেই, অনেক ক্ষেত্রে তার বেশী সময়ও নিষ্ক্রিয় থাকিতে দেখা যায়। বীজ জলের নীচে থাকে বলিয়া প্রয়োজনীয় আলো-উত্তাপের অভাবে সময় মত অঙ্কুরিত হইতে পারে না। কচুরিপানার জীবনীশক্তির প্রাচুর্য্য অত্যধিক, একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত ইহা জলের নীচে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকিতে পারে ; এবং তৎপরে উপযুক্ত আবহাওয়া পাইলে অঙ্কুরিত হয়। কচুরিপানার বীজের এত দেরিতে অঙ্কুরিত হইবার আরও একটি কারণ ইহার উপরকার শক্ত আবরণ। শক্ত আবরণ বর্তমান থাকায় জলের ভিতর থাকাকালীন উপযুক্ত পরিমাণ বাতাস উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

যে সকল জলাশয়ে কচুরিপানা উৎপন্ন হয় সেগুলি গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া গেলে পর মাটির উপরিভাগে যে বীজগুলি থাকে তাহা রৌদ্রে শুকাইতে থাকে ; অল্প বৃষ্টিপাতে বীজ আরও অনাবৃত হইয়া পড়ে। তখন সরস আবহাওয়ায় তাহা অঙ্কুরিত হয়। কিন্তু যে সকল বীজ মাটির তলদেশে থাকে তাহাদের একটু একটু করিয়া উপরিভাগে আসিয়া অঙ্কুরিত হইতে যথেষ্ট সময় লাগে। সুতরাং
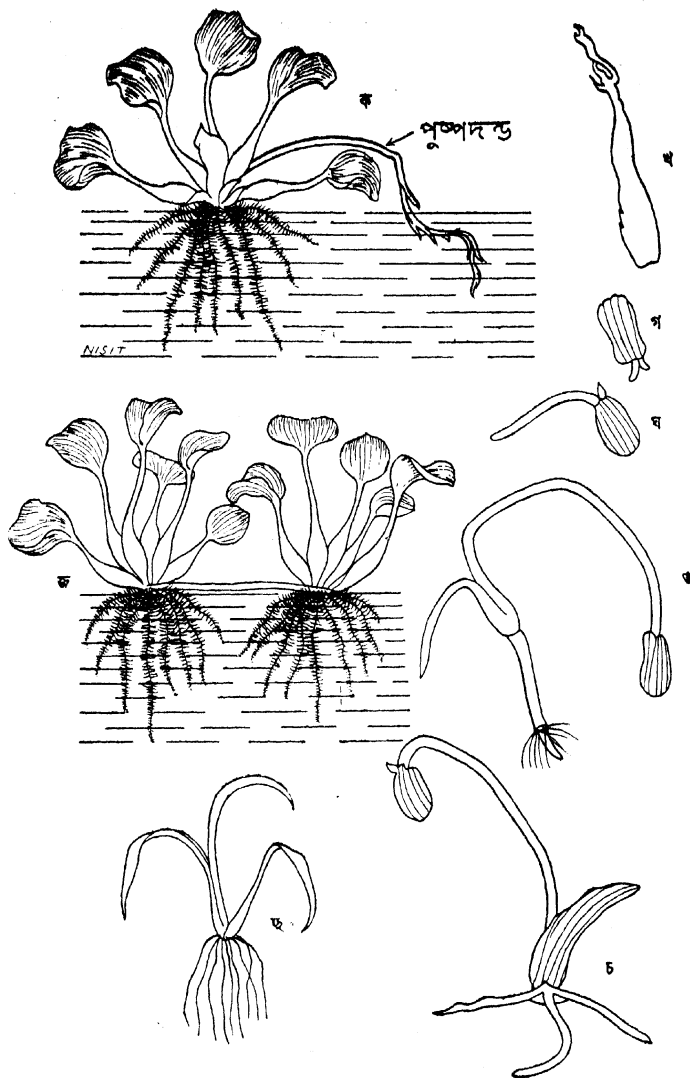
কচুরিপানার বীজ উৎপাদন ও বীজ হইতে বংশ-বিস্তারের বিভিন্ন স্তর
(ক) কচুরিপানার পুষ্পদণ্ড পরাগ সংযোগের পর জলের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে ; (খ) কচুরিপানার ফল ; (গ) বীজ ; (ঘ) বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইতেছে ; (ঙ) অঙ্কুরের দ্বিতীয় স্তর ; (চ) অঙ্কুরের তৃতীয় স্তর ; (ছ) কাদায় আবদ্ধ অবস্থায় চারাগাছের বৃদ্ধি ; (জ) চারাগাছ বড় হওয়া এবং উহার কাণ্ড হইতে নূতন গাছের উৎপত্তি

ইহার প্রতি দীর্ঘকাল সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। এক্ষেত্রে ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কচুরীপানার বীজ জীবনী-শক্তিসম্পন্ন থাকে।

যে সকল জলাশয়ের পাড় খুব উচ্চ এবং খাড়া সে সকল জলাশয়ে বৃষ্টির জল ছড়াইয়া পড়িবার অবকাশ না পাওয়ায় সেগুলি অতিরিক্ত জলে পূর্ণ হইয়া যায়, সুতরাং ঐরূপ জলাশয় কচুরিপানার দ্রুত বিস্তারের প্রতিকূল; কিন্তু ঢালু পাড়-সম্পন্ন জলাশয় কচুরিপানা জন্মাইবার এবং বৃদ্ধির পক্ষে আদর্শ জায়গা, কারণ বৃষ্টির জল পুকুরের চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ায় অধিক জল জমিতে পারে না। সুতরাং শুষ্ক এবং অগভীর জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে জল প্রবেশ করাইয়া দিলে বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না।

বীজ অঙ্কুরিত হইবার পর প্রচুর জল এবং উর্ব্বর মাটি পাইলে কচুরিপানা গাছ দ্রুত বর্দ্ধিত হয়, এইরূপ ক্ষেত্রে পাতাগুলি উপরের দিকে সোজা উঠিতে থাকে; ঐরূপ অবস্থার অভাব ঘটিলে পাতা উপর দিকে না উঠিয়া জলের উপর সমান্তরাল ভাবে ছড়াইয়া থাকে। কেবলমাত্র উপর দিকে উত্থিত পাতাসম্পন্ন কচুরিপানাই শিকড় ছিঁড়িয়া জলের উপর ভাসিতে থাকে। সমান্তরাল পাতাসম্পন্ন গাছ কদাচিৎ জলের উপর ভাসিয়া উঠে। সাধারণতঃ সকাল ৭টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত এবং অপরাহ্ণ ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৮টা পর্য্যন্ত জলের উপর কচুরিপানার গাছের ভাসিয়া উঠিবার সময়।

কচুরিপানা জলজ উদ্ভিদ হইলেও জমিতে অঙ্কুরিত বীজ গাছে পরিণত হয়; শুষ্ক জলাশয়ে অল্প রসের সন্ধান পাইলেই কচুরিপানার বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে; ঐরূপ শুষ্ক জলাশয়ের কচুরিপানার শিকড় রসের সন্ধানে জমির বহু নীচে চলিয়া যায়; সুতরাং জলাশয়ের পাড়ে কচুরিপানা জন্মাইলেও তাহা ধ্বংস করিয়া ফেলা দরকার।

আর একটি বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিত। শুষ্ক জলাভূমিতে কচুরিপানার বীজ পড়িয়া থাকে, উক্ত ভূমিতে পশু-পক্ষী ইত্যাদি আসিলে তাহাদের দ্বারা বীজ বহুদূরে নীত হয় এবং প্রয়োজনীয় আবহাওয়ায় তাহা অঙ্কুরিত হয়।

কচুরিপানা আমাদের সমৃদ্ধিলাভের পথে একটি বিশেষ অন্তরায়—ইহা সকলকে মানিয়া লইতেই হইবে। বাংলা দেশের যে কোন গ্রামে গেলেই ইহার ভয়াবহ ধ্বংসলীলা পরিলক্ষিত হইবে। সুতরাং কচুরিপানার দ্রুত বিনষ্টকরণ প্রয়োজন। কচুরিপানার জন্ম এবং বৃদ্ধির মূলে যে কাণ্ডের কার্য্য সমধিক তাহা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। সুতরাং এই কাণ্ডটিকে এমন ভাবে মারিয়া ফেলা উচিত যাহাতে উহা আর নূতন গাছের জন্মদান না করিতে পারে। যদিও বীজ হইতে কচুরিপানার বৃদ্ধিসাধন বিশেষ হয় না তথাপি বীজ হইতে উৎপাদিত একটি গাছ কিরূপ অনিষ্টসাধন করিতে পারে তাহা স্মরণে রাখিয়া বীজোৎপাদন বন্ধ করিতে হইবে; এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাহাতে ভাসিয়া না যাইতে পারে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখাও আবশ্যক।

কচুরিপানা ধ্বংসের সাধারণ এবং সহজ পদ্ধতি হইতেছে উহার জন্মস্থান হইতে উহাকে উচ্ছেদ করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে মারিয়া ফেলা, অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও এই পদ্ধতি জনপ্রিয় হইয়াছে। ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য যে, সমবেত প্রয়াস ব্যতীত একক ভাবে এই ব্যবস্থা অবলম্বন অসম্ভব।

বৎসরের যে কোন সময়েই কচুরিপানা বিনষ্ট করিয়া ফেলা যাইতে পারে, তবে আশ্বিন হইতে বর্ষার পূর্ব পর্যন্ত সময়ই সুবিধা-জনক; কাণ্ড এবং বীজ উভয়কেই যদি নষ্ট করিবার অভিপ্রায় থাকে তাহা হইলে ফুল ফুটিবার পূর্বে অর্থাৎ আশ্বিন মাসের পূর্ব হইতেই এই কার্য আরম্ভ করা প্রয়োজন। কচুরিপানা গাছ উঠাইয়া তাহাকে পোড়াইয়া পচাইয়া অথবা সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়া নষ্ট করা উচিত।

কচুরিপানা বিনষ্ট করিবার বিভিন্ন পন্থা আছে; এইগুলি নির্ভর করে কচুরিপানার জন্মস্থান এবং তাহার প্রকৃতির উপর। ছোট ছোট নালা, খাল, ডোবা ইত্যাদিতে যেখানে কচুরিপানা ঘনভাবে বিস্তৃত হইতে পারে না এবং যেখানে নিকটেই উঁচু জমি আছে সেখানে কচুরিপানা নষ্ট করিতে গেলে যে নির্দেশ মানিতে হইবে উহার বিপরীত অবস্থার কচুরিপানার ধ্বংসসাধনে অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

প্রথমোক্ত স্থানের কচুরিপানা বিনষ্ট করিতে গেলে সর্বপ্রথম কচুরিপানার গাছ, গাছ হইতে বিচ্ছিন্ন কাণ্ড, শিকড় ইত্যাদি উত্তোলন করিয়া পাড়স্থিত উঁচু ডাঙ্গা জমিতে গাদা করিয়া রাখিয়া রৌদ্রে শুকাইতে হইবে, উপযুক্ত ভাবে শুষ্ক হইলে পর তাহা সম্পূর্ণ-রূপে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে হইবে। কাণ্ডের জীবনীশক্তি অসীম; ইহা রৌদ্রে বিনষ্ট হয় না, এমনকি উত্তমরূপে না পোড়াইলে উহা আবার ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারে। এক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখা কর্তব্য যে ডাঙ্গা জমিটি যেন জলাশয় হইতে দূরে অবস্থিত হয় নতুবা উত্তোলিত কচুরিপানা জলের সংস্পর্শ পাইলে বিনষ্টকরণের পরিকল্পনা বানচাল করিয়া দিবে। যে সকল কাণ্ড পোড়ানোর পরে শক্ত থাকিবে সেগুলিকে দুই-তিন হাত গভীর গর্ত করিয়া মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে।

ইহা ব্যতীত অন্য আর একপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে। উহাকে গাদা করিয়া পচানো; প্রথমে উহার একটি স্তর করিতে হইবে এবং উহা ভাল করিয়া চাপিয়া দিতে হইবে; গাদার ভিতর চূণ এবং গোবর সন্নিবেশিত হইলে উহা শীঘ্র পচিয়া যায়।

প্রথম স্তরটি পচিলে উহার উপর আর একটি স্তর করিয়া তাহাতেও গোবর-চূণ নিক্ষেপ করিতে হইবে; এইরূপে একটি স্তরের উপর আর একটি স্তর করিতে পারা যায় এবং সবচেয়ে শেষের স্তরের উপর গোবর লেপিয়া দেওয়া দরকার। স্তরগুলির আশ-পাশে নূতন গাছ বাহির হইলে তাহাকেও স্তরের ভিতর গাদিয়া দিতে হইবে। কেবলমাত্র কচুরিপানার স্তর না করিয়া উহার

উপর ঘাসজঙ্গলের স্তর করিলে ভাল হইবে। একটি গোবরের স্তরের উপর ঘাসজঙ্গলের স্তর, তাহার উপর কচুরিপানার স্তর এইরূপে পর্যায়ক্রমে স্তরনির্ম্মাণ করিতে হইবে। প্রত্যেক স্তর ভাল করিয়া চাপিয়া দিতে হইবে। এই স্তরগুলি পচিয়া এত উত্তাপের সৃষ্টি করে যে নূতন গাছ আর জন্মিতে পারে না। এই স্তরগুলি পচিয়া অতি উত্তম সারে পরিণত হয়।

এ সম্বন্ধে ব্রহ্মদেশের পরীক্ষার ফলাফল খুবই শিক্ষাপ্রদ। সেখানে আশ্বিন-কার্তিক মাসে কচুরিপানা উঠাইয়া উহার সহিত গোবর, কাদা ইত্যাদি মিশ্রিত করা হয়। মাটিতে একটি গর্ত্ত করিয়া উক্ত মিশ্রিত কচুরিপানার একটি স্তর তৈয়ারী করা হয়। এইরূপে তিনটি স্তর উপর্য্যুপরি করিয়া সর্বশেষ স্তরের উপর মাটি লেপিয়া দেওয়া হয়। এক মাস এইরূপ রাখিবার পর স্তরটিকে ওলট-পালট করিয়া দিতে হয়, যাহাতে সর্বাংশে হাওয়া প্রবেশ করিতে পারে। ওলট-পালট করিয়া উহার দ্বারা একটি স্তূপ করা হয়। দ্বিতীয় মাসের শেষের দিকে উহা সম্পূর্ণরূপে পচিয়া একটি মূল্যবান সারে পরিণত হয়; এই সার প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, দুই-তিন বৎসর ধানের ফলন খুব বেশী হয়।

যে স্থলে উঁচু জমি নাই এবং কচুরিপানা খুব ঘনভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে সেই অঞ্চলে উপরোক্ত প্রকারে বিনষ্টসাধন খুবই শ্রমসাধ্য। এইরূপ ক্ষেত্রে জলের মধ্যেই পচাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথমে একটি ঘন দল বাছিয়া লইয়া তাহার উপর একের পর এক কচুরিপানার স্তর নির্ম্মাণ করিতে হইবে। স্তূপগুলি যখন খুব ভারী হইয়া যাইবে তখন ভিত্তিস্বরূপ কচুরিপানার যে দল ছিল তাহা মাটিতে যাইয়া ঠেকিবে এবং তাহার উপরিস্থিত স্তরগুলিও জলের নীচে চলিয়া যাইবে। স্তূপ জলের নীচে না থাকিলে উহা পচিবে না। যাহাতে ভিত্তি ও তাহার উপরের স্তরগুলি ভাসিয়া না যায় তাহার জন্য উহার চারিধারে বাঁশের বেড়া দিতে হইবে।

যেখানে জলাশয় অতিমাত্রায় প্রশস্ত এবং কচুরিপানার ঘন-বিস্তৃতিও অধিক সেই সকল স্থানে কচুরিপানার ঘন দলকে কয়েক ভাগে ভাগ করিয়া বাঁশের খোঁয়াড় প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর কচুরিপানা পচাইবার ব্যবস্থা পূর্বোক্ত প্রণালীতে করিতে হইবে। যদি খোঁয়াড় প্রস্তুত সম্ভব না হয় তাহা হইলে এক এক ভাগে বাঁশ পুতিয়া তাহার চারি ধারে খড়ের গাদার ন্যায় কচুরিপানার গাদা করিতে হইবে। ইহার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই গাদা পচিতে আরম্ভ করিবে। উপরের পানা কিন্তু সহজে পচে না, সুতরাং উপরের পানাগুলিকে পচা-গাদার মধ্যে ঠাসিয়া দিতে হইবে। জলের মধ্যে পচা কচুরিপানার গাদার উপর লাউ, কুমড়ো, ঢেঁড়স প্রভৃতির চাষ করা যায়। জলের ভিতর কচুরিপানা পচাইতে গেলে কতকগুলি কচুরিপানা একত্র করিয়া তাহার উপর আরও কয়েকটি কচুরিপানার স্তর করিতে হইবে যাহাতে পাঁচ জন লোক তাহার উপর দাঁড়াইতে পারে। এই ভাসমান কচুরিপানার স্তূপটিকে তখন অনায়াসে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে চালনা করিয়া লওয়া যায়। চালনার সময় আশপাশের কচুরিপানা তুলিয়া স্তূপটিকে বড় করা যায়। স্তূপটির পরিসর বৃদ্ধি পাইলে উহার মধ্য দিয়া একটি বাঁশ চালাইয়া যে-কোন স্থানে স্তূপটিকে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়। এই অবস্থায় আবদ্ধ স্তূপের পরিমাণ কমিতে থাকিলে উহার উপর আরও নূতন কচুরিপানার স্তর নির্ম্মাণ করা চলিতে পারে।

যে সকল স্রোতসম্পন্ন নদীতে কচুরিপানার প্রাবল্য দেখা যায় সেখানে কচুরিপানাকে স্তূপীকৃত করিয়া নদীর স্রোতের মুখে আনিয়া দিলে উহা বড় নদী অথবা সমুদ্রে নীত হয়। ইহা অসম্ভব হইলে বেড়া দিয়া কচুরিপানাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া পরে উহা উঠাইয়া পোড়াইয়া বা পচাইয়া ফেলিতে হইবে।

কচুরিপানা যখন বড় বড় নদীর মধ্য দিয়া ভাসিয়া যায় তখন উহা বিশেষ অনিষ্টকারক নয়; কিন্তু বন্যা বা প্লাবনের সময় নদীর জল যখন কুল ছাপাইয়া গ্রামস্থ জলাশয়, ডোবা ইত্যাদিতে আসিয়া পড়ে তখন তাহার সহিত কচুরিপানা আসিয়া অনিষ্টসাধন করিতে সুরু করে। ইহা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে জলাশয়গুলির যে স্থান দিয়া কচুরিপানা আসিয়া পড়ে তাহা বেড়া দিয়া বন্ধ করিতে হইবে। নদী ও খালের জল যেখানে পাড় ছাপাইয়া জমিতে আসিয়া পড়ে সেই জমির আইলের উপর ধঞ্চে, হিজল, অড়হর প্রভৃতি গাছের বেড়া দিলে সস্তায় কচুরিপানার আক্রমণ কতক পরিমাণে নিবারণ করিতে পারা যায়।

পরিশেষে কচুরিপানার ধ্বংসলীলা হইতে দেশকে বাঁচাইতে হইলে জনসাধারণকেও বিশেষ ভাবে সতর্ক থাকিতে হইবে। কচুরিপানার বিস্তার রোধ করিবার জন্য জনসাধারণের প্রথম করণীয় হইতেছে জলাশয় ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া নিশ্চিত হইয়া বসিয়া না থাকা। দুই-একটি কচুরিপানা উৎপন্ন হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ সমূলে উৎপাটন করা দরকার। মাছ ধরিবার বেড়াজাল বন্ধ করিতে হইবে, নতুবা বেড়ার গায়ে কচুরিপানা আটকাইয়া থাকিয়া বংশবিস্তার করিবে। ইহা ছাড়া খাল নালা নদীতে বাঁশ, জঙ্গল, ডুবানো নৌকা ইত্যাদি রাখা উচিত নহে, কারণ তৎসমূহে কচুরিপানা আটকাইয়া বিস্তারলাভ করিতে থাকিবে। ঐ একই কারণে কচুরিপানার চাপান দিয়া পাট পচানোর প্রক্রিয়া বন্ধ রাখিতে হইবে।

উপরোক্ত প্রণালী কয়টির দ্বারা কচুরিপানা দূরীকরণ যে খুবই শ্রমসাধ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশের শ্রী এবং স্বাস্থ্যের জন্য আমাদের তাহা না করিয়া উপায় নাই।

কাণ্ডের ও পাতার সংযোগস্থলের কুঁড়ি হইতে নূতন গাছের জন্ম

(ক) জলে গাদা করিয়া কচুরিপানা পচাইবার প্রণালী ; (খ) কচুরীপানার ভাসমান ভেলা

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি রবীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভা ছোটগল্পের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের যে একটি অনাবিষ্কৃত দিক আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার সম্যক্ পরিচয় লইতে হইলে আমাদিগকে কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে প্রথমে অবহিত হইতে হইবে। আমরা প্রথমে দেখিব—সাহিত্য-শিল্প হিসাবে ছোট গল্পের এমন কি একটি বিশিষ্ট পরিচয় রহিয়াছে যাহার জন্য সাহিত্য-প্রতিভার এক বিশিষ্ট রূপ আমাদের নিকট ধরা পড়ে; দ্বিতীয়তঃ বাহিরের ও অন্তরের কি অনুবর্ত্তনে এবং প্রবর্ত্তনায় রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা গল্প-সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। এই বিষয় দুইটি আমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিলে আমরা রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলির যথাযথ পরিচয় লইতে পারিব।

সাহিত্য-শিল্প হিসাবে ছোট গল্পের পরিচয় কি এবং তাহার মূল্য কতখানি এ প্রসঙ্গে সুধীরা অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। যে-কোন ছোট গল্পেরই রসের আবেদন বিশ্লেষণ করিলে এই কথাটিই মুখ্য হইয়া উঠে যে, জীবনের একটি খণ্ডাংশের মধ্যে জীবনের একটি অখণ্ড রূপের পরিচয় দেওয়াই ছোটগল্পের কাজ। সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগগুলি যেন মুক্ত প্রাঙ্গণ, যেখান হইতে আমরা জীবনের আকাশকে একটা বিশাল পরিসরের মধ্যে দেখিতে পাই। ছোট গল্পগুলি যেন ক্ষুদ্র বাতায়ন, সেই বাতায়ন হইতেও জীবনের বিরাট আকাশকে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু দেখিবার স্থানটি সেখানে স্বল্প পরিসরের মধ্যে বদ্ধ। আমাদের জীবনে সব সময়ে মহাকাব্যের উপাদান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কোন অনির্ব্বচনীয় বাণী তাহার ব্যাপ্তি ও গভীরতা লইয়া আমাদের জীবনের মধ্যে ধরা পড়ে না। কিন্তু তবু কখনও কখনও জীবনে এমন এক একটি পরিবেশ গড়িয়া উঠে যেখানে আমাদের জীবনের মধ্যে অনির্ব্বচনীয়তা আপনাকে আভাসিত করিয়া যায়। "ছোট গল্প" নামক একটি গল্পে কবি বলিয়াছেন—"মানুষের জীবনটা বিপুল একটা বনস্পতির মত। তার আয়তন, তার আকৃতি সুঠাম নয়। দিনে দিনে চলছে তার মধ্যে এলোমেলো ডালপালার পুনরাবৃত্তি। এই স্তূপাকার একঘেয়েমির মধ্যে হঠাৎ একটা ফল ফলে ওঠে, সে নিটোল, সে সুডোল, বাইরে তার রঙ রাঙা কিম্বা কালো, ভিতরে তার রস তীব্র কিম্বা মধুর। সে সংক্ষিপ্ত, সে অনিবার্য্য, সে দৈবলব্ধ, সে ছোট গল্প।"

মহাকাব্যের কথা ছাড়িয়া দিই, আমাদের সাধারণ বস্তুগত জীবনে উপন্যাসের অবকাশও রচিত হয় না। কিন্তু ছোট গল্পের অবকাশ আমাদের জীবনে মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়। দৈনন্দিন জীবনের গতানুগতিক তুচ্ছতার মধ্যেই আমাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-অশ্রুর ছোট ছোট প্রকাশগুলি ঝরণার আঘাতে উপলখণ্ডের মত বাজিয়া উঠে। সেই ধ্বনিতে বিশ্বসঙ্গীতের সুর হয় ত সব সময় ধরা পড়ে না, কিন্তু তাহার মধ্য দিয়াও জীবনের সঙ্গীত আর এক ভাবে শুনিতে পাই। সেই ক্ষুদ্র সঙ্গীতকে যে বীণকার তাঁহার তন্ত্রীতে বাঁধিয়া লন, তিনিই ছোট গল্পের শিল্পী।

আমাদের জীবনের এই ক্ষুদ্র খণ্ড প্রকাশগুলির মধ্যে ছোট গল্পের শিল্পী রসলোকের সন্ধান পান, তাঁহার প্রতিভা আমাদের জীবনের এই ক্ষুদ্র বাতায়নগুলিকে সন্ধান করিয়া ফেরে। তাহার জন্য তাঁহাকে আমাদের সাধারণ জীবনের স্তরে নামিয়া আসিতে হয়। আমাদের এই সাধারণ জীবনের সহিত শিল্পী যদি দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলেন, তবে তিনি ছোটগল্পের উপকরণ হইতে বঞ্চিত হন। তাই ছোট গল্পের যিনি রচয়িতা, আমাদের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের সহিত তাঁহার যোগটি খুব ঘনিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন। এই ঘনিষ্ঠতায় তিনি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের পরিচয় লাভ করেন।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনায় এই ছোটগল্পের অবকাশ কি ভাবে রচিত হইয়াছিল তাহা ভাবিয়া দেখা যাক।

রবীন্দ্রনাথের যে সাহিত্য-প্রতিভা আপনার সূক্ষ্ম ভাবানুভূতিগুলি লইয়া আপন হৃদয়-সমুদ্র-মন্থনে মগ্ন ছিল এবং কাব্য-জীবনের প্রথম পর্ব্বে কবি যখন আপনার "হৃদয়-অরণ্যে"র গহনে পথ হারাইয়া ফেলিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহাকে জমিদারীর কার্য্য পরিচালনার নিমিত্ত শিলাইদহে ও পদ্মার তটে আসিয়া বাসা বাঁধিতে হয়। এই সূত্রে বাহিরের পৃথিবীর সহিত কবিচিত্তের একটি নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কবি যেমন এক দিকে প্রকৃতির কোলের মধ্যে আসিয়া বসিলেন, তেমনি আর এক দিকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নাট্যমঞ্চের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এখন এক দিকে কবির কাব্যে যেমন বিশ্বজীবনের উপাদান আসিয়া উপস্থিত হইল, বিচিত্র ঋতুবসন-পরিধানা শ্যামলা বসুন্ধরাকে কবি যেমন মাতৃমূর্ত্তিতে দেখিলেন এবং মহাদেশ ও মহাকালব্যাপী অখণ্ড জীবন-প্রবাহের স্রোতে কবির জীবনের সোনার তরীটি ভাসিয়া চলিল, তেমনি আর এক দিকে লোকালয়ের সুখ-দুঃখের খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলি কবিমনকে এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দে ভরাইয়া তুলিল। 'সোনার তরী' কাব্যে এক দিকে যেমন এই বিশ্বানুভূতির প্রকাশ দেখি, বিভিন্ন ছোটগল্পগুলির মধ্যে অপর দিকে তেমনি পল্লীজীবনের সেই ছোট ছোট চিত্রগুলির প্রকাশ দেখিতে পাই। 'চিত্রা' কাব্যের যুগে পৌঁছিয়া যে [illegible]-চেতনার মধ্যে কবি-মানসের এই দুই ধারা আসিয়া একত্রিত হইয়াছে, 'মানুষের ধর্ম্ম' গ্রন্থে আমরা তাহারই একটি উল্লেখ পাই। কবি সেখানে বলিয়াছেন—"বর্ষার সময় খালটা থাকত জলে পূর্ণ। শুকনোর দিনে লোক চলত তার

উপর দিয়ে। এপারে ছিল একটা হাট, সেখানে বিচিত্র জনতা। দোতলার ঘর থেকে লোকালয়ের লীলা দেখতে ভাল লাগত। পদ্মায় আমার জীবনযাত্রা ছিল জনতা থেকে দূরে। নদীর চর—ধূ ধূ বালি, স্থানে স্থানে জলকুণ্ড ঘিরে জলচর পাখি। সেখানে যে-সব ছোট গল্প লিখেছি তার মধ্যে আছে পদ্মাতীরের আভাস। সাজাদপুরে যখন আসতুম চোখে পড়ত গ্রাম্য জীবনের চিত্র, পল্লীর বিচিত্র কর্ম্মোদ্যম। তারই প্রকাশ 'পোষ্টমাষ্টার', 'সমাপ্তি', 'ছুটি' প্রভৃতি গল্পে। তাতে লোকালয়ের খণ্ড খণ্ড চলতি দৃশ্যগুলি কল্পনার দ্বারা ভরাট করা হয়েছে।

"দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে সেদিন দেখছিলাম, সামনের আকাশে নববর্ষার জলভারনত মেঘ, নীচে ছেলেদের মধ্যে দিয়ে প্রাণের তরঙ্গিত কল্লোল। আমার মন সহসা আপন খোলা দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে সুদূরে। অত্যন্ত নিবিড় ভাবে আমার অন্তরে একটা অনুভূতি এল; সামনে দেখতে পেলাম নিত্যকাল-ব্যাপী একটি সর্ব্বানুভূতির অনবচ্ছিন্ন ধারা, নানা প্রাণের বিচিত্র লীলাকে মিলিয়ে একটি অখণ্ড লীলা। নিজের জীবনে যা বোধ করছি, যা ভোগ করছি, চারদিকে ঘরে ঘরে জনে জনে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যা কিছু উপলব্ধি চলেছে—সমস্ত এক হয়েছে একটি বিরাট অভিজ্ঞতার মধ্যে। অভিনয় চলেছে নানা নটকে নিয়ে, সুখ-দুঃখের নানা খণ্ড প্রকাশ চলছে তাদের স্বতন্ত্র জীবযাত্রায়, কিন্তু সমস্তটার ভিতর দিয়ে একটা নাট্যরস প্রকাশ পাচ্ছে এক পরম দ্রষ্টার মধ্যে যিনি সর্ব্বানুভূঃ। এত কাল নিজের জীবনে সুখ-দুঃখের যে সব অনুভূতি একান্ত ভাবে আমাকে বিচলিত করেছে, তাকে দেখতে পেলাম দ্রষ্টারূপে এক নিত্য সাক্ষীর পাশে দাঁড়িয়ে।

"এমনি করে আপনা থেকে বিবিক্ত হয়ে সমগ্রের মধ্যে খণ্ডকে স্থাপন করবামাত্র নিজের অস্তিত্বের ভার লাঘব হয়ে গেল। তখন জীবনলীলাকে রসরূপে দেখা গেল কোন রসিকের সঙ্গে এক হয়ে।"

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন, "সেদিন হঠাৎ অত্যন্ত নিকটে জেনেছিলুম, আপন সত্তার মধ্যে দুটি উপলব্ধির দিক আছে। এক, যাকে বলে আমি, আর তারই সঙ্গে জড়িয়ে মিশেয়ে যা-কিছু, আমার সংসার, আমার দেশ, আমার ধনজনমান, এই যা কিছু নিয়ে মারামারি, কাটাকাটি ভাবনা-চিন্তা। কিন্তু পরমপুরুষ আছেন সেই সমস্তকে অধিকার করে এবং অতিক্রম করে, নাটকের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা যেমন আছে নাটকের সমস্তটাকে নিয়ে এবং তাকে পেরিয়ে।"

প্রথম দিকটি, যে দিকটি আত্মার রহস্য ও সৌন্দর্য্য—সেই রহস্যের ও সৌন্দর্য্যের রসাস্বাদন অনুভব করি কবির কাব্যে, সঙ্গীতে, রূপক নাটকগুলিতে; আর যেখানে এই বাহিরের সংসার, যাহা লইয়া মারামারি, কাটাকাটি, ভাবনা-চিন্তা, তাহারই প্রকাশ দেখি কবির উপন্যাসে, নাটকে এবং ছোটগল্পে। বলাই বোধ হয় বাহুল্য যে, এই দ্বিতীয়ের মধ্যে প্রথমেরও আভাস পাওয়া যায়।

কবি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে এই বাহিরের সংসার কি ভাবে স্থান লাভ করিয়াছে তাহা দেখা যাক। ইহার জন্য বাহিরের সংসারের সহিত কবির যোগটি কিরূপ তাহা বুঝিয়া দেখিতে হয়। কবি বলিয়াছেন, "দোতলার ঘর থেকে লোকালয়ের লীলা দেখতে ভাল লাগত।" রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাহিত্য-সাধনায় বাহিরের লোকালয়কে অনেকাংশে এই 'দোতলার ঘর' হইতে দেখিয়াছেন। প্রতিভার সহিত অ-প্রতিভার যে একটি মানসিক দূরত্ব থাকে, সেই মনোজীবনের দূরত্বের জন্যই নহে, আরও একদিক দিয়া সাধারণের দৈনন্দিন জীবনের কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হওয়া কবির পক্ষে সম্ভব ছিল না। কবি ছিলেন পল্লীর জমিদার, জমিদারীর কার্য্যোপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলেও তাঁহার সহিত পল্লীবাসীর একটি সসম্ভ্রম দূরত্ব রচিত হইয়া থাকিত। কবি পল্লীর লোকালয়ের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তিনি দেখিয়াছিলেন হাটের পথে লোকের আনাগোনা, খেয়াঘাটের পারাপার, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিচিত্র দৃশ্যপট। কিন্তু সে দৃশ্যের একেবারে কেন্দ্রস্থলে গিয়া উপস্থিত হইতে পারেন নাই বা উপস্থিত হইতে চাহেন নাই। হাটের শেষে যে হাটুরেরা গৃহের দিকে ফিরিয়াছে, খেয়াঘাটের যে যাত্রীরা পারঘাটের দিকে চলিয়াছে, তাহাদিগকে কবি কিছুদূর পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে একেবারে তাহাদের ঘরের দাওয়ায় আসিয়া বসিতে পারেন নাই। সে ক্ষেত্রে কবি তাঁহার কল্পনাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

তাই লোকালয়ের লীলাকে কবি শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে লোকালয়ের মধ্যে রাখিয়াই দেখেন নাই, সে লীলাকে তিনি শেষ পর্য্যন্ত অনুসরণ করিতে পারেন নাই। একস্থানে আসিয়া লোকালয়ের লীলা কবির দৃষ্টি হইতে সরিয়া গিয়াছে এবং কবি তখন সেই লীলার সহিত অন্যতর কি এক জীবন-লীলা যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। শুধুমাত্র ছোটগল্প রচনায় বাহিরের সংসারের উপাদান হিসাবে লোকালয়ের লীলা-প্রসঙ্গেই নয়, জীবনের অন্য যে-কোন কাহিনীই কবি রচনা করিতে চাহিয়াছেন সেখানেই আমাদের সাধারণ জীবন-লীলার সহিত এই এক নবতর জীবন-লীলা আসিয়া মিশিয়াছে। অর্থাৎ, ছোটগল্প রচনায় কবিকল্পনা বাহিরের সংসারের উপকরণের অভাবের জন্যই প্রযোজিত হয় নাই, কবির শিল্পসৃষ্টির একটি অন্তর্গূঢ় নিয়ম ও প্রেরণাবশতঃই তাহা নিয়োজিত হইয়াছে। কবি তাঁহার শিল্পসৃষ্টির সকল ক্ষেত্রেই বাহিরের সংসারের নাট্য-লীলার সহিত অন্য একটি নাট্যলীলা যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। কোন ক্ষেত্রে বাস্তব সংসারের উপকরণ অধিক পরিমাণে পাইয়াছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে সেগুলির কিছু অভাব ঘটিয়াছে। তবে মোটের উপর আমরা বলিতে পারি যে, বাহিরের সংসারের উপকরণগুলির সহিত কবির পরিচয় ঘটিয়াছে বলিয়াই, তাঁহার সাহিত্যসাধনায় ছোটগল্পের আবির্ভাব। একদিকে কবি-কল্পনা, আর একদিকে বাস্তব জীবনের উপকরণ—ইহারই টানা-পোড়েনে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলি রচিত। এই টানা-পোড়েনের বুনানি দেখিবার পূর্ব্বে কবি-

কল্পনা ও বাস্তবজীবন উভয়কে পৃথকভাবে চিনিয়া লইতে হইবে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বাস্তবজীবনের উপকরণ সম্বন্ধে বলিয়াছি। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন, "আমি একদা বাংলাদেশের নদী বেয়ে তার প্রাণের লীলা অনুভব করেছিলুম, তখন আমার অন্তরাত্মা আপন আনন্দে সেই সকল সুখ-দুঃখের বিচিত্র আভাস অন্তঃকরণের মধ্যে সংগ্রহ করে মাসের পর মাস বাংলার যে পল্লীচিত্র রচনা করেছিল তার পূর্ব্বে আর কেউ করে নি।" এই পল্লীচিত্রের বাস্তব উপাদান সম্বন্ধে অনেকে আশানুরূপ সন্তোষ প্রকাশ করেন না। সে প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো ঘটে নি। যা কিছু লিখেছি, নিজে দেখেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। গল্পে যা লিখেছি তার মূলে আছে অভিজ্ঞতা, আমার নিজের দেখা। তাকে গীতধর্ম্মী বললে ভুল করবে। 'কঙ্কাল' কি 'ক্ষুধিত-পাষাণ'কে হয়ত খানিকটা বলতে পার কারণ সেখানে কল্পনার প্রাধান্য, কিন্তু তাও পুরোপুরি নয়।"

অর্থাৎ, কবির অভিজ্ঞতার সীমা যেমনই হউক না কেন, বাস্তব জীবনই কবির ছোটগল্পের উপাদান। কিন্তু আমরা বলিব, এই বাস্তব উপাদানগুলির সহিত এক কবি-কল্পনা আসিয়া মিশিয়াছে। এই কবি-কল্পনা অর্থে কবিত্বময় কল্পনা নহে, নিছক রোমান্টিসিজম্ অথবা গীতিধর্ম্মিতাও নহে; ইহার একটি বিশিষ্ট অর্থ এবং তাৎপর্য্য রহিয়াছে।

এই কবি-কল্পনা একটি বিশিষ্ট জীবন-দর্শনকে অবলম্বন করিয়া আছে। ইতিপূর্ব্বে 'মানুষের ধর্ম্ম' গ্রন্থ হইতে যে উদ্ধৃতির উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে কবি যে আপন সত্তার মধ্যে দুইটি উপলব্ধির কথা বলিয়াছেন, এই কবি-কল্পনা তাহারই একটি হইতে উদ্ভূত। তাহা হইল কবির আত্মদর্শনের দিক। কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আত্মদর্শন বা আত্মানুভূতি রসসৃষ্টির উপাদান হইয়া উঠিয়াছে এবং সেইজন্যই তাহা হইতে উৎসারিত কবি-কল্পনা একটি বিশিষ্ট শিল্প-প্রেরণা লাভ করিয়াছে। অতঃপর কবির যখন বিশ্বানুভূতি ঘটিয়াছে, তখন তাহা হইতে কবি যে শিল্পোপকরণ লাভ করিয়াছেন, তাহাতে এই সৃষ্টিধর্ম্মী কবি-কল্পনা মিশিয়া গিয়া শিল্পের একটি নূতন রূপ দান করিয়াছে। কবির আত্মদর্শনের বিষয়টি যদি রসসৃষ্টির উপাদান হইয়া না উঠিত, তাহা হইলে এই কবি-কল্পনা ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিত না এবং শিল্পসৃষ্টিতে তাহা সহায় না হইয়া বাধা হইয়া দাঁড়াইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লোকালয়ের জীবনের সহিত নিগূঢ়তর সংযোগের অভাবে ছোটগল্প রচনায় কবির পক্ষে এই কল্পনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এই কল্পনা সৃষ্টিধর্ম্মী হওয়ায় কবির পক্ষে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করা শিল্পের দিক হইতে হানিকর হয় নাই।

এই কবি-কল্পনার ধর্ম্ম ও উপাদান কি? কবি রবীন্দ্রনাথের আত্মজিজ্ঞাসা হইতে যে একটি জীবনতত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, কবি-কল্পনা সেই জীবনতত্ত্বকে গভীর হইতে গভীরে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। সেই জীবনতত্ত্বটি হইল সংক্ষেপে এই যে—মানুষের দায় মহামানবের দায়, অন্তহীন সাধনার ক্ষেত্রে তার বাস। মানুষের সত্য এই অন্তহীন তপস্যার মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। মানুষের ধর্ম্ম বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা মানুষকে অর্জ্জন করিতে হয়। মানুষের এই মনুষ্যত্বের পরিচয় রহিয়াছে এক সর্ব্বজনীন, সর্ব্বকালীন মানবমনের ভূমিকায়। কিন্তু মানুষের মধ্যে দুইটি ভাব আছে, একটি জীবভাব আর একটি বিশ্বভাব; এই বিশ্বভাবের মধ্যে মানবধর্ম্মের সার্থক পরিচয়। মানুষ এই জীবভাব হইতে বিশ্বভাবের দিকে আপন আপন অন্তরের আহ্বানকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। মানুষ আপনার স্বার্থের দ্বারা, অহঙ্কারের দ্বারা, লোভ ও ভেদবুদ্ধির দ্বারা এই জীবভাবের মধ্যে বদ্ধ থাকে; কিন্তু বৃহত্তর মানবধর্ম্ম প্রেমের দ্বারা, মঙ্গল-বোধের দ্বারা, আনন্দবোধের দ্বারা তাহাকে কেবলই ক্ষুদ্র জীবন হইতে বৃহত্তর জীবনের দিকে লইয়া যাইতে চায়।

কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজিজ্ঞাসা হইতে আমাদের জীবনের মধ্যে এই বৃহত্তর জীবনের দ্বন্দ্বকে এবং তাহারই ভূমিকায় এক মানবধর্ম্মকে আবিষ্কার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনা এই বৃহত্তর জীবনকে আশ্রয় করিয়া আছে। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ জীবনের দ্বন্দ্বকে একটি বিশেষ দিক হইতে দেখিয়াছেন—তাহা হইল এক কথায় জীবভাবের সহিত বিশ্বভাবের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বকে কবি আপনার মধ্যে অনুভব করিয়াছেন এবং বাহিরের সংসারে তাহাকে আবিষ্কার করিয়াছেন। এই দ্বন্দ্বের প্রকৃতি হইতেই বুঝিতে পারি, এই দ্বন্দ্বকে আশ্রয় করিয়া আছে যে কবি-কল্পনা, আমাদের মানবজীবনই সেই কবি-কল্পনার উপাদান। আমাদের জীবনের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের প্রকারও বিভিন্ন, প্রকাশও বিচিত্র; তাই কবি-কল্পনা সহজেই বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভ করিতে পারিয়াছে।

এই দ্বন্দ্বকে আশ্রয় করিয়া কবি-কল্পনা যে অংশে আত্মদর্শনে ও আত্মজিজ্ঞাসায় নিয়োজিত, সেখানে কেমন করিয়া তাহা কাব্য-সৃষ্টির কারণ হইয়া উঠে, 'অন্তর্যামী' কবিতায় কবি তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে যে 'কবি-কল্পনা' তাহা আর কবির কল্পনা নহে, কবির অন্তরের মধ্যে আর একজন যে কবি বসিয়া আছেন, যিনি রবীন্দ্রনাথকে জীবভাব হইতে বিশ্বভাবের দিকে লইয়া যাইতেছেন, ইহা সেই কবির কল্পনা। এই কবিকল্পনা সৃষ্টিধর্ম্মী। তাহা শুধু কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনকেই একটি বিশিষ্ট রূপ দিতেছে না, তাঁহার কাব্যকেও তাহা নূতন রূপে গড়িয়া তুলিতেছে। এই কবি-কল্পনা রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে মাত্র, কবি ইহার রহস্যকে বুঝিতে পারেন না। একদিকে যেমন কাব্য-রচনা-প্রসঙ্গে কবি এই সৃষ্টিধর্ম্মী কবিকল্পনার উল্লেখ করিয়াছেন, অপর দিকে ছোট গল্প রচনার ক্ষেত্রেও এই কবি-কল্পনারই সক্রিয় প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই। ছোট গল্প রচনার ক্ষেত্রে বাহিরের সংসারের সহিত কবি-চিত্তের সংযোগ আর একভাবে ঘটিয়াছে এবং বাহিরের

সংসারের উপকরণগুলি লইয়া কবি-কল্পনা ছোট গল্পের বিশিষ্ট শিল্প-মূর্ত্তিগুলি গড়িয়া তুলিয়াছে।

একদিকে বাস্তব সংসারের উপকরণ, আর একদিকে কবি-কল্পনা, ইহারই টানা-পোড়েনে রচিত ছোটগল্পগুলিকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করিতে পারি। প্রথম পর্য্যায়ের ছোট গল্পগুলি হইল তাহাই যেগুলিতে বাস্তব উপকরণের পরিমাণ অল্প এবং কবি-কল্পনা অপেক্ষাকৃত অধিক। শিল্প-ভঙ্গীর দিক দিয়া এই সকল গল্প রোমান্স বা কল্পকথার পর্য্যায়ে ফেলিতে পারা যায়। এখানে যেটুকু উপকরণ মাত্রে কবি-কল্পনা জীবনের একটি ফ্রেমে আবদ্ধ থাকিতে পারে, সেইটুকু মাত্র জীবনের ক্ষেত্র হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই কবি-কল্পনা যেন কাহিনীকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে এবং তাহারই আবেগে দৃশ্য-পটের স্থূলতা দূর হইয়া গিয়া জীবন যেন একটি নানা বর্ণে চিত্রিত সূক্ষ্ম জালের আকার লাভ করিয়াছে। জীবনকে তখন যেন আর বাস্তব বলিয়া, সত্য বলিয়া বোধ হয় না, তখন তাহা কল্পকথা হইয়া দাঁড়ায়। সেগুলি যেন জীবনের স্রোত হইতে আপনার অন্তঃস্থিত ভাবের আবেগে বুদ্বুদের মতন ভাসিয়া উঠে; সেই বুদ্বুদগুলির বাহিরের উপাদান খুবই সূক্ষ্ম, তাহাদের উপর বিভিন্ন বর্ণবৈচিত্র্যই লক্ষ্য করিবার বিষয়, বাস্তব উপাদান খুঁজিতে গেলে সেখানে তেমন কিছু পাওয়া যাইবে না। এই শ্রেণীরই এক গল্পের শেষভাগে নায়কের মুখে কবি যাহা বলিয়াছেন তাহা এই গল্পগুলি সম্বন্ধে প্রযোজ্য: "এই সূর্য্যালোকিত অনাবৃত জগৎদৃশ্যের মধ্যে সেই মেঘাচ্ছন্ন কাহিনীকে আর সত্য বলিয়া মনে হইল না। আমার বিশ্বাস আমি পর্ব্বতের কুয়াশার সহিত আমার সিগারেটের ধূম ভূরি পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া একটি কল্পনাখণ্ড রচনা করিয়াছিলাম—সেই মুসলমান ব্রাহ্মণী, সেই বিপ্রবীর, সেই যমুনাতীরের কেল্লা, কিছুই হয়ত সত্য নহে।"

প্রথম পর্যায়ের ছোট গল্পগুলিতে বাস্তবজীবনের উপকরণ যাহা রহিয়াছে, তাহা এই পর্ব্বতের কুয়াশার মত, তাহা কবি-কল্পনার কাছে বাধা হইয়া দাঁড়ায় না, কবি-কল্পনা তাহাকে লইয়া যেমন খুশি মূর্ত্তিদান করিতে পারে। প্রথম পর্য্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে দালিয়া, একরাত্রি, জয়-পরাজয়, মহামায়া, অসম্ভব কথা, ক্ষুধিত পাষাণ, দুরাশা প্রভৃতিকে গণ্য করা যায়।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের ছোটগল্পগুলি হইল তাহাই যেগুলিতে বাস্তব উপকরণই একান্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং কবি-কল্পনা আপনাকে তেমন অধিক পরিমাণে প্রকাশ করে নাই। এগুলিকে গল্পের খাতিরে গল্প বলিতে পারি। এখানে কাহিনীই সর্ব্বস্ব। প্রথম পর্য্যায়ের গল্পের উপকরণকে যদি পর্ব্বতাদেশের কুয়াশার সহিত তুলনা করা যায়, তবে এই পর্য্যায়ের গল্পের উপকরণ পাহাড়ের পাথরের সহিত তুলিত হইতে পারে। এখানে উপাদানগুলি গুরুভার, কবির বিশিষ্ট বাচনভঙ্গীতে ও শিল্পকৌশলে রসসৃষ্টির উপকরণ হইয়া উঠিয়াছে। কবির ব্যঙ্গ ও হাস্যরসাত্মক গল্পগুলি এবং আরও অন্যান্য কতকগুলি গল্প এই পর্য্যায়ভুক্ত। গিন্নি, তারাপ্রসন্নের কীর্ত্তি, মুক্তির উপায়, খাতা, আপদ, মানভঞ্জন, ঠাকুর্দ্দা, পুত্রযজ্ঞ, ডিটেকটিভ, অধ্যাপক, রাজটীকা, সদর-অন্দর দর্পহরণ, তপস্বিনী প্রভৃতি গল্পকে এই শ্রেণীভুক্ত করা যায়।

তৃতীয় পর্য্যায়ের ছোটগল্পগুলি হইল তাহাই যাহাতে বাস্তব-জীবনের উপাদান এবং কবি-কল্পনা দুইই সমভাবে আসিয়া মিশিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অবিশিষ্ট ছোটগল্পগুলিকে এই পর্য্যায়ের মধ্যে গণ্য করা যায়। এখানে কবি আমাদের জীবন-লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং কবি-কল্পনা সেই জীবন-লীলার মধ্যে আর একটি বৃহত্তর জীবন-লীলাকে আবিষ্কার করিয়াছে। কবি যে বলিয়াছেন, "জীবন-লীলাকে রসরূপে দেখা গেল কোন রসিকের সঙ্গে এক হয়ে" সেকথা এই গল্পগুলির সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য।

এখন, এই যে-কোন এক রসিকের সঙ্গে এক হইয়া কবি আমাদের জীবন-লীলাকে প্রত্যক্ষ করিলেন, ইহাতে কবি দেখিলেন কি, জীবনের কোন্ রসরূপ তাঁহার নিকট উদঘাটিত হইয়া গেল?

কবি দেখিলেন, এক 'আবেগময়ী' প্রেম আমাদের জীবনের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া আমাদের জীবনের মধ্যে অভিনব দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে একটি বৃহত্তর সীমার মধ্যে লইয়া যাইতে চাহিতেছে। এই প্রেমই আমাদের মধ্যে সুন্দরের পূজার আয়োজন গড়িয়া তোলে, সত্যের প্রতি আমাদের নিষ্ঠা জাগাইয়া রাখে এবং চেতনাকে উদ্বোধিত করিয়া একটি আত্মোপলব্ধির ভূমিকা রচনা করিয়া দেয়। এই প্রেম 'আবেগময়ী', ইহার মধ্যে এক দিকে যেমন একটি গতি রহিয়াছে, অপর দিকে তেমনি একটি শ্রী, হ্রী ও ধী রহিয়াছে। ইহা জীবনকে রূপ হইতে রূপান্তরে—একটি বৃহত্তর রূপে লইয়া যাইতেছে—কখনও তাহার পথ মৃত্যুর মধ্য দিয়া, কখনও বা অমৃতের মধ্য দিয়া, কখনও জয়ের মধ্য দিয়া, কখনও বা পরাজয়ের মধ্য দিয়া, কখনও আশার মধ্য দিয়া, কখনও বা দুরাশার মধ্য দিয়া। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ইহার মধ্যে একটি গতির আবেগ রহিয়াছে এবং এই আবেগের অন্তে একটি না-পাওয়ার ভূমিকা আছে।

"মানুষের ধর্ম্ম" গ্রন্থে কবি যাহাকে নিত্যকালব্যাপী একটি সর্ব্বানুভূতির অনবচ্ছিন্ন ধারা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, আমাদের জীবনে তাহাই এই 'আবেগময়ী প্রেম' রূপে আবির্ভূত হয়। জীবনের সেই সর্ব্বানুভূতির অনবচ্ছিন্ন ধারার পিছনে একটি বিরাটের ভূমিকা রহিয়াছে, সেই বিরাট পরমদ্রষ্টা, তিনি সর্ব্বানুভূঃ। আমরা যখন অহং-এর ঐকান্তিকতায় এই বিরাট হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখি, তখন সেই সর্ব্বানুভূতির ধারা একটি আবেগময়ী প্রেমরূপে আমাদের জীবনে বিচিত্র দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে সুখে-দুঃখে আন্দোলিত করিতে থাকে; আর যখন আমরা নিজেকে সেই বিরাটের সহিত যুক্ত করিয়া দেখি, তখন সেই আবেগময়ী প্রেম আমাদের মধ্যে আনন্দময় আত্মোপলব্ধি জাগাইয়া তুলিয়া মুক্তিস্বরূপ হইয়া উঠে।

২

শিল্প-প্রেরণা ও শিল্প-সৃষ্টির বিশিষ্ট রহস্য অনুসন্ধান করিয়া আমরা রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের যে তিনটি শ্রেণীবিভাগ করিলাম তদনুযায়ী কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গল্পের পরিচয় লইব।

প্রথম পর্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে 'দুরাশা' ও 'ক্ষুধিত পাষাণ' উল্লেখযোগ্য। 'দুরাশা' গল্পটির বিষয়বস্তু এক যবনদুহিতার আকুল প্রণয়াভিযান। এই প্রণয় এক আদর্শের প্রতি প্রণয়; সেই আদর্শের ধ্যানে তাহার জীবন নানা সুখ-দুঃখ বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া বিকশিত হইয়া একটি নবতর রূপলাভ করিয়াছে,—যবনদুহিতা অন্তরে-বাহিরে কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণ হইয়া উঠিয়াছে। আপন অন্তরের আহ্বানে জীবনের এই যে একটি বৃহত্তর রূপবিকাশ, কবি রবীন্দ্রনাথের ইহা একটি অন্যতম শিল্প-প্রেরণা। আমাদের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে এই আহ্বান সব সময়ে আসিয়া উপস্থিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ সুকৌশলে জীবনের এমন একটি পরিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছেন যেখানে আদর্শের এই আহ্বানটি সহজ হইয়া দেখা দিয়াছে। অথচ সেই আদর্শের পথে চলিবার একটি বাধাও অপসারিত হয় নাই। একদিকে অসূর্য্যম্পশ্যা অন্তঃপুরচারিণী কোমলপ্রাণা নবাবদুহিতা, অপর দিকে নির্ভীক নির্লিপ্ত ব্রহ্মচারী কেশরলাল। উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। অন্তরের মধ্যে প্রেমের আবেগ জাগাইয়া তুলিয়া এবং একটি ঐতিহাসিক ঘটনার অবতারণায় সুকৌশলে বাহিরের পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া রবীন্দ্রনাথ সেই অসূর্যম্পশ্যা নবাবপুত্রীকে সংসারবিরাগী ব্রহ্মচারীর দিকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছেন। বলিতে চাহিয়াছেন, "নবাব-অন্তঃপুরের বালিকার পক্ষে বাহিরের সংসার একান্ত দুর্গম বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহা কাল্পনিক; এক বার বাহির হইয়া পড়িলেই একটা চলিবার পথ থাকেই। সে-পথ নবাবি পথ নহে, কিন্তু পথ; সে পথে মানুষ চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে—তাহা বন্ধুর বিচিত্র সীমাহীন, তাহা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত, তাহা সুখে-দুঃখে বাধাবিঘ্নে জটিল, কিন্তু তাহা পথ।"

এই পথকে নবাবদুহিতা সাধারণ মানুষের পথ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, কিন্তু আমরা জানি, দুঃখের দ্বারা দীপ্ত, মৃত্যুর দ্বারা মার্জিত এই পথ একটি বৃহত্তর জীবনের পথ। রবীন্দ্রনাথ নৈপুণ্য-সহকারে নবাবদুহিতার বাস্তব-জীবন-সাধনার মধ্য দিয়া আমাদের কাছে সেই বৃহত্তর জীবনকে বাস্তবরূপে উপস্থিত করিতে চাহিয়াছেন। ইহার মধ্যেই তাঁহার শিল্প-সৃষ্টির বিশিষ্ট রহস্যটি ধরা পড়িয়াছে।

নবাবদুহিতার সহিত পাঠকের পরিচয়সাধনে রবীন্দ্রনাথ সুনিপুণ শিল্পচাতুর্য দেখাইয়াছেন। তিনি যদি সহসা আমাদের কাছে সেই বিলুপ্ত-ইতিহাস নবাব-আমলের কাহিনী উপস্থিত করিতেন, তাহা হইলে আমাদের বাস্তববুদ্ধি পীড়িত হইয়া ইহাকে সহজেই ছেলেভুলানো রূপকথা বলিয়া ধার্য করিত, ইহার সহিত আমরা আমাদের জীবনবোধকে সহজে যুক্ত করিতে পারিতাম না। কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন নির্জন ক্যালকাটা রোডে রোরুদ্যমানা সন্ন্যাসিনীর সহিত লেখকের প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপাত্মক বাক্যালাপ পরিবেশটিকে খুব সহজ করিয়া তুলিয়াছে। আমরাও কৌতুকের সহিত উভয়ের কথোপকথন লক্ষ্য করিতেছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে লেখক বলিলেন, "নবাবজাদীর ভাষামাত্র শুনিয়া সেই ইংরেজ-রচিত আধুনিক শৈল-নগরী দার্জিলিঙের ঘন কুজ্ঝটিকাজালের মধ্যে আমার মনশ্চক্ষের সম্মুখে মোগল সম্রাটের মানসপুরী মায়াবলে জাগিয়া উঠিতে লাগিল, শ্বেতপ্রস্তররচিত বড়ো বড়ো অভ্রভেদী সৌধশ্রেণী, পথে অশ্বপুচ্ছ অশ্বপৃষ্ঠে মছলন্দের সাজ. হস্তীপৃষ্ঠে স্বর্ণঝালর খচিত হাওদা, পুরবাসি-গণের মস্তকে বিচিত্র বর্ণের উষ্ণীষ, শালের রেশমের মসলিনের প্রচুর প্রসর জামা-পায়জামা, কোমরবন্ধে বক্র তরবারি, জরির জুতার অগ্রভাগে বক্রশীর্ষ—সুদীর্ঘ অবসর, সুলম্ব পরিচ্ছদ, প্রচুর শিষ্টাচার।"

ইহার পর যখন নবাবপুত্রী তাহার কাহিনী আরম্ভ করিয়াছে তখন আমরা আর কোন প্রশ্ন করি নাই, আমরাও যে কখন মায়াবলে দার্জিলিঙের ক্যালকাটা রোড হইতে মোগল আমলে চলিয়া গিয়াছি, তাহা জানিতেও পারি নাই।

এই নবাবপুত্রীর আত্মকাহিনী যেমন বিচিত্র, তাহার বিবৃতির জন্য রবীন্দ্রনাথ তেমনি উপযুক্ত ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই ভাষার মধ্যে এমন একটি গতি রহিয়াছে, যাহা সেই আবেগমণ্ডিত জীবনের গতিশীল কাহিনীকে সমবেগে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে—অপরদিকে সেই গতিশীল জীবনের গাম্ভীর্য ও মাধুর্যকে নিপুণ শব্দসম্ভারের দ্বারা সমানভাবে প্রকাশ করিতে পারে। এখানে তাহারই একটি নমুনা উদ্ধৃত করিলাম—"আকাশের চন্দ্র, যমুনা-পারের ঘনকৃষ্ণ বনরেখা, কালিন্দীর নিবিড় নীল নিষ্কম্প জলরাশি, দূরে আম্রবনের ঊর্ধ্বে আমাদের জ্যোৎস্নাচিক্কণ কেল্লার চূড়াগ্রভাগ, সকলেই নিঃশব্দ গম্ভীর ঐকতানে মৃত্যুর গান গাহিল; সেই নিশীথে গ্রহচন্দ্রতারাখচিত নিস্তব্ধ তিনভুবন আমাকে একবাক্যে মরিতে কহিল, কেবল বীচিভঙ্গবিহীন প্রশান্ত যমুনাবক্ষোবাহিত একখানি অদৃশ্য জীর্ণ নৌকা সেই জ্যোৎস্নারজনীর সৌম্যসুন্দর শান্ত-শীতল অনন্তভুবনমোহন মৃত্যুর প্রসারিত আলিঙ্গনপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমাকে জীবনের পথে টানিয়া লইয়া চলিল। আমি মোহস্বপ্নাভিহিতার ন্যায় যমুনার তীরে তীরে কোথাও বা কাশবন, কোথাও বা মরুবালুকা, কোথাও বা বন্ধুর বিদীর্ণ তট, কোথাও বা ঘনগুল্মদুর্গম বনখণ্ডের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম।"

নবাবপুত্রীর জীবনের এই বিচিত্র অভিযান এক দুরাশার মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। নবাবপুত্রী তাহার আদর্শকে অনুসরণ করিয়া মনেপ্রাণে ব্রাহ্মণ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু যাহার জন্য এত ত্যাগস্বীকার সেই কেশরলালকে সহসা মেকী বলিয়া বুঝা গেল, কেশরলালের ব্রাহ্মণ্যকে নকল বলিয়া জানা গেল। কিন্তু সেই মেকী ব্রাহ্মণ্যের জন্য আর একজনকে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে! জীবনের সমস্ত সাধনা যদি এমনই একটি

শূন্যতায় আসিয়া শেষ হয় তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা ট্র্যাজেডির বিষয় আর কি আছে। নবাবপুত্রীর জীবনে এই ট্র্যাজেডি আনিয়া রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে তাহার সুখদুঃখের অংশভাগী করিয়া তুলিয়াছেন।

'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের আর একটি শ্রেষ্ঠ গল্প। কবিকল্পনা এখানে কোন বৃহত্তর জীবনসাধনার কথা বলে নাই, তাহা একটি রহস্যময় সৌন্দর্যলোক সৃজনে নিয়োজিত হইয়াছে। ইহার মূলেও একটি বৃহত্তর সৌন্দর্যধ্যান রহিয়াছে, যে সৌন্দর্যধ্যান প্রাকৃতজগতে সম্ভব নহে, তাহার জন্য আমাদিগকে অতিপ্রাকৃত-জগতে উঠিয়া আসিতে হয়। এখানেও কাহিনীর পরিবেশ হইল প্রাচীন মোগল আমল। মোগল হারেমের যে বাসনা-বিক্ষুব্ধ, বিলাসচঞ্চল জীবনপ্রবাহ তাহার সকল সৌন্দর্য, মাধুর্য ও রসাবেগ লইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে স্বপ্নের ন্যায় মনোরম এবং কল্পকাহিনীর ন্যায় রোমাঞ্চকর নাট্যলীলা রচনা করিয়া চলিত, কবি-কল্পনা তাহারই একটি রমণীয় অধ্যায়কে মহাকালের জীর্ণ প্রস্তরভিত্তির শাসনপাশ হইতে উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে তাহা প্রত্যক্ষ করাইয়াছে। ইহার জন্য কবি আমাদের মনে এক অপূর্ব বিভ্রম সঞ্চারিত করিয়াছেন এবং সুকৌশলে আমাদিগকে এক রহস্যলোকে লইয়া গিয়াছেন। এই রহস্যলোকে সুন্দরের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটাইয়া দেওয়াই কবি-কল্পনার উদ্দেশ্য। সৌন্দর্য এখানে অশরীরী। কিন্তু অশরীরী বলিয়া সেই সৌন্দর্য কিছু ম্লান হইয়া যায় নাই, পরন্তু দেহের মধ্যে রূপ লাভ করিলে যাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিত, দেহের অভাবে তাহাই অপরিস্ফুট থাকিয়া আমাদিগকে অধিকতর আকৃষ্ট করে। সৌন্দর্যের দেহহীনতা সৌন্দর্যের সহিত আমাদের একটি ব্যবধান গড়িয়া তোলে এবং তাহাতে তাহা আমাদের মধ্যে একটি ব্যাকুল তৃষ্ণা জাগাইয়া তুলিয়া অধিকতর রমণীয় হইয়া উঠে।

'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে তাই অতিপ্রাকৃত ঘটনা ও সৌন্দর্য-চিত্র অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া আছে। অতিপ্রাকৃতের বিষয় এবং সৌন্দর্যের বিষয় এখানে পৃথক নহে। এখানে রসের ব্যঞ্জনাটি সৌন্দর্যলোকের প্রতি, কিন্তু তাহার উপায়টি অতিপ্রাকৃত-বোধের মধ্য দিয়া। তাই অভাবনীয়তার চমক এবং সৌন্দর্যবোধের আনন্দ উভয়ের মিশ্রণে আমাদের চিত্তে একটি অভিনব রসাবেশের সৃষ্টি হয়।

চিত্তবৃত্তির এই যে রাসায়নিক মিশ্রণ, ইহা একেবারে অসম্ভব নহে। সৌন্দর্যের অনুভূতির সহিত ভয়ের অনুভূতির কোথায় যেন একটি সূক্ষ্ম যোগ রহিয়াছে। পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের মধ্যে এক প্রকার অভাবনীয়তা দেখা যায়, আমরা যাহাকে 'বিউটিফুল' বলি, তাহাকে অনেক সময় 'ওয়াণ্ডারফুলও বলি। বিউটির পরিপূর্ণতা হইতে ওয়াণ্ডারেরও পরিপূর্ণতা আসে এবং ওয়াণ্ডারের পরিপূর্ণতায় একপ্রকার ভয়ের বোধ জন্মে। ইংরেজ কবি কোলরিজ তাঁহার কাব্যে যেখানে অতিপ্রাকৃতের অবতারণা করিয়াছেন, সেখানে সেই সঙ্গে সৌন্দর্যের অবকাশও রচনা করিয়াছেন। একটি অপরটির পরিপন্থী না হইয়া পরিপূরক হইয়া উঠিয়াছে। 'Rime of the Ancient Mariner' কবিতায় যেখানে অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটিতেছে, সেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশটিও অতীব মনোরম। 'Christabel' কবিতার অতিপ্রাকৃত রমণী রূপে অতুলনীয়া। কিন্তু কোলরিজ অতিপ্রাকৃত বিষয় ও সৌন্দর্যের বিষয় উভয়ের দুই পৃথক আবেদন স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন, উভয়ের এক রাসায়নিক মিশ্রণ ঘটাইতে পারেন নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উভয়কে একীভূত করিয়া দিয়াছেন, যাহা ভয় দেখাইতেছে, তাহাই একই কালে মুগ্ধও করিতেছে। 'ক্ষুধিত পাষাণে' দেখি—"আমি সেই দীপহীন জনহীন প্রকাণ্ড ঘরের প্রাচীন স্তম্ভশ্রেণীর মাঝখানে দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইলাম—ঝর ঝর শব্দে ফোয়ারার জল সাদা পাথরের উপর আসিয়া পড়িতেছে, সেতারে কি সুর বাজিতেছে বুঝিতে পারিতেছি না, কোথাও বা স্বর্ণভূষণের শিঞ্জিত, কোথাও বা নূপুরের নিক্কণ, কোথাও বা বৃহৎ তাম্রঘণ্টায় প্রহর বাজিবার শব্দ, অতি দূরে নহবতের আলাপ, বাতাসে দোদুল্যমান ঝাড়ের স্ফটিকদোলকগুলির ঠুন্ ঠুন্ ধ্বনি, বারান্দা হইতে খাঁচার বুলবুলের, বাগান হইতে পোষা সারসের আমার চতুর্দিকে একটা প্রেতলোকের রাগিণী সৃষ্টি করিতে লাগিল।" এখানে দেখি, শরীরী হইলে যে সকল বিষয় সুরলোক রচনা করিতে পারিত, সেইগুলিই অশরীরী হইয়া প্রেতলোক রচনা করিয়াছে। কিন্তু এ প্রেতলোকে ভয়ের কিছু নাই। এখানে "লাইফ ইন্ ডেথ" নাই, মৃতদেহ এখানে প্রাণ পাইয়া জাগিয়া উঠিয়া ভয় দেখায় না। এখানে—"সেই স্বপ্নখণ্ডের আবর্তের মধ্যে এই ক্বচিৎ হেনার গন্ধ, ক্বচিৎ সেতারের শব্দ, ক্বচিৎ সুরভিজলশীকরমিশ্র বায়ুর হিল্লোলের মধ্যে একটি নায়িকাকে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎশিখার মত চকিতে দেখিতে পাইতাম। তাহারই জাফরাণ রঙের পায়জামা এবং দুটি শুভ্র রক্তিম কোমল পায়ে বক্রশীর্ষ জরীর চটি পরা, বক্ষে অতিপিনদ্ধ জরীর ফুলকাটা কাঁচলী আবদ্ধ, মাথায় একটি লাল টুপী এবং তাহা হইতে সোনার ঝালর ঝুলিয়া তাহার শুভ্র ললাট এবং কপোল বেষ্টন করিয়াছে। সে আমাকে পাগল করিয়া দিয়াছিল। আমি তাহারই অভিসারে প্রতি রাত্রে নিদ্রার রসাতল রাজ্যে স্বপ্নের জটিল পথসঙ্কুল মায়াপুরীর মধ্যে গলিতে গলিতে কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি।"

এই সৌন্দর্যলোকে ও রহস্যলোকে কবি আমাদিগকে অবলীলাক্রমে লইয়া গিয়াছেন, কোলরিজের 'Ancient Mariner'এর মত এখানেও একজন বক্তা রহিয়াছে, কিন্তু পূর্বের বক্তাকে যেমন রহস্যমণ্ডিত ও অতিপ্রাকৃত জগতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া মনে হয়, এখানে কাহিনীর বক্তাকে তাহার চেয়ে আরও অনেক সহজ লোক ও কাছের মানুষ বলিয়া মনে হয়। বক্তা সহসা অতিপ্রাকৃতের অবতারণা করে নাই, হাস্যকৌতুকের মধ্য দিয়া কাহিনী সুরু করিয়াছে এবং অতিপ্রাকৃতের বিষয় সম্বন্ধে তাহার অবিশ্বাসও আমাদের জানাইতে চাহিয়াছে। এইরূপে তাহার দৃষ্টি এবং শ্রবণের উপর আমাদের একটা আস্থা জন্মিয়া গিয়াছে এবং তাহাকে অনুসরণ

করিয়া তাহার অনুভূতিগুলিকে আমরা আপনার করিয়া লইয়াছি। কাহিনীর শেষে যখন জিজ্ঞাসার সময় আসিয়াছে তখন লেখক তাহাকে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে একেবারে অপসারিত করিয়া আমাদের সকল প্রশ্নকে মূক করিয়া রাখিয়াছেন।

"ক্ষুধিত পাষাণ" গল্পের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হইল ইহার ভাষার ব্যঞ্জনা ও বর্ণনাকৌশল। যাহা অবিশ্বাস্য, যাহা নাস্তি, ভাষার সাহায্যে মনোরম বর্ণনায় কবি তাহাকে বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাকে এত প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিয়াছেন যে তাহার অস্তিত্বের যেন আর কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। আমরা যেন তাহাকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি। বক্তার মুখে আমরা শুনিতে পাই—"দেখিতে পাইলাম, আয়নায় আমার প্রতিবিম্বের পার্শ্বে ক্ষণিকের জন্য সেই তরুণী ইরাণীর ছায়া আসিয়া পড়িল—পলকের মধ্যে গ্রীবা বাঁকাইয়া তাহারঘ নকৃষ্ণ বিপুল চক্ষুতারকায় সুগভীর আবেগতীব্র বেদনাপূর্ণ আগ্রহকটাক্ষ পাত করিয়া সরসসুন্দর বিম্বাধরে একটি অস্ফুট ভাষার আভাসমাত্র দিয়া, লঘু ললিত নৃত্যে আপন যৌবনপুষ্পিত দেহলতাটিকে দ্রুতবেগে উর্দ্ধাভিমুখে আবর্ত্তিত করিয়া—মুহূর্ত্তকালের মধ্যে বেদনা, বাসনা ও বিভ্রমের, হাস্য, কটাক্ষ ও ভূষণজ্যোতির স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করিয়া দিয়া দর্পণেই মিলাইয়া গেল।" এই বর্ণনায় আমরা আর বস্তুগত অস্তিত্বের অভাব অনুভব করি না।

আমরা অতঃপর রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্যায়ের ছোটগল্পগুলি—যেগুলি মূলতঃ হাস্যরসাত্মক, সেই পর্যায় হইতে একটি গল্পের আলোচনা করিব। ইতিপূর্বে বলিয়াছি, এই শ্রেণীর গল্পে কবি-কল্পনার প্রকাশের সুযোগ অল্প। এখানে কাহিনীই মুখ্য এবং কাহিনীর বিষয়বস্তুও সামান্য। এখানে আমাদেরই সাধারণ জীবনের চিত্র লইয়া নিপুণ বাগবিন্যাসে বিশুদ্ধ হাস্যরসের অবতারণা করাই কবি-প্রতিভার কাজ।

'মুক্তির উপায়' গল্পটি এই পর্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম। গম্ভীর প্রকৃতির ফকিরচাঁদের জীবনের যে বিড়ম্বনার কথা বলা হইয়াছে, তাহা আমাদের সহজ সামাজিক পটভূমিকায় গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া বিষয়টিকে আমরা যথেষ্ট আনন্দের সহিত উপভোগ করিতে পারি। সংসারের তাড়নায় এই যে অবিবেচক ব্যক্তির সন্ন্যাসী হইয়া যাওয়া, এ কাহিনী আমাদের সংসারে খুবই সুপরিচিত। সন্ন্যাসগ্রহণের এই কারণটি সহজেই আমাদের চিত্তে রসসঞ্চার করে। অতঃপর আর এক জনের গৃহে আর এক নূতন সংসারের অধিকারী হইয়া ফকিরচাঁদকে যে নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা আমরা সহাস্য কৌতুকে উপভোগ করি। ষষ্ঠীচরণ মাখনলাল ভ্রমে ফকিরকে ধরিয়া আনিয়াছেন। পুত্র যখন গৃহে থাকিতে চাহিতেছে না, তখন আমাদের সমগ্র বঙ্গ-পরিবার ও সমাজ কি গভীর উৎকণ্ঠায় তাহাকে ধরিয়া রাখিতে চায় এবং বিষয়টি ক্ষেত্রবিশেষে কিরূপ প্রহসনের সৃষ্টি করে, ফকিরচাঁদের প্রতি মাখন-লালের গৃহের এবং গ্রামের ব্যবহার হইতে তাহা অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রহসন হিসাবে বিষয়টি তাই খুবই উপযোগী। ইহার পিছনে আমাদের সমাজমানসের একটি ভূমিকা রহিয়াছে। মাখনলালের দুই স্ত্রী, তাহার পিতা ও পুত্রকন্যাগণ, দুই পক্ষের শ্যালক ও শ্যালিকা, প্রতিবাসীরা, এমন কি গ্রামের জমিদার পর্যন্ত এই সামাজিক প্রহসনের বিষয়ীভূত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের দিক হইতে মাখনলাল ভ্রমে ফকিরচাঁদকে ধরিয়া রাখা কোমলতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু লেখক তাহাদের লক্ষ্যের কেন্দ্রটিকে সরাইয়া দিয়া মুমুক্ষু ফকিরচাঁদের উপর তাহাদের সকল প্রচেষ্টাকে ন্যস্ত করিয়া সমস্ত বিষয়টিকে হাসির ফোয়ারায় পরিণত করিয়াছেন। ফলে যাহা আমাদের স্বভাবে ও জীবনে রহিয়াছে তাহাকেই কবি হাসির কারণ করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাতে কাহারও ক্ষতি নাই, কাহারও অসম্মান নাই, কারণ মূলে একটি ভ্রান্তি। সেই ভ্রান্তিটুকু ঘুচিয়া গেলে আবার সবকিছু স্বাভাবিক হইয়া উঠিবে।

হাস্যরস সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের এই একটি বিশেষ ভঙ্গী দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাকে লইয়া হাসিতে হইবে তাহাকে সোজাসুজি আক্রমণ না করিয়া তাহাকে এমন একটি পরিবেশের অধীন করিয়া তোলেন, যে পরিবেশের অসঙ্গতি হইতে হাস্যরসের উদ্ভব হয়। ইহাতে ব্যক্তি আঘাত পায় না, কারণ সাময়িকভাবে পরিবেশের অধীন হইলেও ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিবেশকে অতিক্রম করিয়া প্রকাশ পায়। অতঃপর ব্যক্তি যখন পরিবেশ হইতে মুক্তি পায় তখন সে নিজেও নিজেকে লইয়া হাসিতে পারে। কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়—রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিকে লইয়া হাসেন না, ব্যক্তিকে একটি বিশেষ পরিবেশের অধীন করিয়া এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে তাহার উর্দ্ধে জাগাইয়া তুলিয়া, পরিবেশের অধীন যে ব্যক্তি তাহাকে লইয়া হাস্যরসের সৃষ্টি করেন। হাস্যরসের সৃষ্টিতে জীবনের অসঙ্গতিকে তিনি পরিবেশের অধীন করিয়া দেখিয়াছেন, সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিত্বের অধীন করিয়া দেখেন নাই। ইহাতে ব্যক্তি নিজেও আপনার সেই সাময়িক পরিবেশের অধীন ব্যক্তিসত্তাকে দেখিয়া আমাদের সহিত সমানভাবে হাসিতে পারে। আলোচ্য গল্পে মাখনলালের যে দুরবস্থা আমরা উপভোগ করিতেছি, পরিবেশ হইতে মুক্ত হইলে মাখনলালও তাহা সমভাবে উপভোগ করিবে, তাহার মনে কোন তথাকথিত অসম্ভ্রমের গ্লানি থাকিবে না।

আমরা অতঃপর রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় পর্য্যায়ের গল্পগুলি হইতে কয়েকটি গল্পের পরিচয় গ্রহণ করিব। এই গল্পগুলির মধ্যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সহিত এক বৃহত্তর জীবনকথা প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের জীবনের মধ্যে এই বৃহত্তর জীবনকথাটি রচনা করিতে কবি-কল্পনা ও শিল্প-নৈপুণ্যের যে অভিনবত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই এখানে বিশেষ লক্ষণীয়। এখানে আমরা এই পর্যায়ে 'ঘাটের কথা', 'পোষ্টমাষ্টার', 'কাবুলিওয়ালা', 'দান-প্রতিদান', 'স্ত্রীর পত্র', 'দৃষ্টি-দান' ও 'নষ্টনীড়' এই কয়টি গল্পের আলোচনা করিব।

'ঘাটের কথা' গল্পে একটি পল্লী-বালবিধবার প্রেমের কথা বলা

হইয়াছে। কুসুম তরুণ সন্ন্যাসীকে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু সেই প্রেমে তাহার অধিকার ছিল না, সে বালবিধবা। কুসুম তরুণ সন্ন্যাসীকে ভক্তি করিত, তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিত। সামাজিকভাবে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর প্রতি বিধবা নারীর অন্তরের এই শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনে কোন বাধা বা অপরাধবোধের স্থান ছিল না। নিষ্কাম ভক্তি সেখানে দেবপূজারই নামান্তর। কিন্তু কুসুমের চিত্ত এই শুদ্ধাভক্তি লইয়াই রহিল না, তাহার অন্তরে ভক্তির পাত্রকে লইয়া এক স্বপ্নের অবকাশ রচিত হইয়া গেল—যে স্বপ্ন দেবতাকে প্রিয় করে, হৃদয়ের স্বামী বলিয়া দেখে, যে স্বপ্নে চিত্ত শুধু প্রণাম করিয়াই চরিতার্থ হয় না, তাহা একটি প্রেম-উদার করস্পর্শ লাভ করিয়া ধন্য হইতে চায়।

এই প্রেমের আকাঙ্ক্ষা সামান্য, বাসনা খুব সূক্ষ্ম; কিন্তু বিশুদ্ধ ভক্তির সম্মুখে দাঁড়াইলে ইহা যেন ভীত হইয়া পড়ে, ইহার মধ্যে যেন পাপের বোধ জাগিয়া উঠে।

সব শুনিয়া সন্ন্যাসী কুসুমকে বলিলেন যে, তাহাকে ভুলিতে হইবে, সেই ভুলিবার জন্য সাধনা করিতে হইবে।

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। কুসুমের সাধনা সুরু হইল। দেহের সহিত, মনের সহিত কুসুমের প্রেমের বিবাদ বাধিয়া গেল। সেই বিবাদকে কুসুম অতিক্রম করিয়া গেল মৃত্যুকে বরণ করিয়া।

এই যে কুসুম কথাটি না বলিয়া কালোজলের গভীরে তলাইয়া গেল ইহাই তো প্রেমের সাধনা। তাহার প্রেম বড় বলিয়াই তাহা অশুদ্ধ দেহ ও মনকে বিসর্জন দিয়া আপনার বিশুদ্ধতাকে প্রচার করিয়া গিয়াছে। দেহে বাঁচিয়া থাকিলে প্রতি পদে তাহার প্রেমের, তাহার প্রিয়ের অসম্মান ঘটিত, তাহার নবোন্মেষিত প্রেমের পক্ষে তাহার এই জীবন বড়ই দীন, আধার বড়ই তুচ্ছ। মৃত্যুর কাছে বৃহত্তর জীবন কামনা করিয়া কুসুম তাহার এই দীন জীবনের অবসান ঘটাইয়াছে। সেই বৃহত্তর জীবনের কোন বাস্তব রূপ নাই, এই দীন জীবনের জ্বালা হইতে অব্যাহতিলাভই তাহার স্বরূপ। কুসুমের মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়া সেই বৃহত্তর জীবনসাধনার কথা রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, এই সাধনার অবলম্বন হইল তাহার প্রেম।

আর সেই তরুণ সন্ন্যাসী? পাষাণে ঘটনা অঙ্কিত হয় না; যদি হইত তাহা হইলে তাঁহার অন্তরের মধ্যে কি এই ঘাটের কথা লিপিবদ্ধ হইয়া যাইত? 'ঘাটের কথা' কি তাহারই কথা হইয়া উঠিত?

'পোষ্ট মাষ্টার' গল্পে একটি নগণ্য পল্লীগ্রামের সামান্য বেতনের পোষ্টমাষ্টার ও তাহার সেবিকা রতনের কথা বলা হইয়াছে। এই কাহিনীটির মধ্যে ছোট গল্পের ধর্মটি বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাহিনীর মধ্যে অভিনবত্ব তেমন কিছু নাই। উলাপুর গ্রামের পোষ্ট মাষ্টার তাহার প্রবাসের দুঃখ অন্তরে বহন করিয়া যখন নিরানন্দ দিনগুলি যাপন করিতেছিল, তখন সময় কাটাইবার জন্য সে তাহার সঙ্গী হিসাবে পাইয়াছিল পিতৃমাতৃহীনা অনাথা বালিকা রতনকে। রতন সাধ্যমত তাহার দাদাবাবুর কাজ করিয়া দিত এবং পোষ্ট মাষ্টার রতনকে বর্ণ-পরিচয় পড়াইত। পোষ্ট মাষ্টারের অসুখের সময় রতন তাহার মনিবের সেবা করিয়া তাহাকে আরও আপন করিয়া পাইল। কিন্তু কিছুদিন পরেই পোষ্ট মাষ্টার উলাপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। রতন একবার অবোধের মত তাহার সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু পোষ্ট মাষ্টারের কাছে সে প্রস্তাব অসঙ্গত বলিয়াই বোধ হইল। পোষ্ট মাষ্টার চলিয়া গেল; রতন তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়-বেদনা ও ক্ষীণ আশা লইয়া সেই পোষ্ট-আপিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কাহিনী সামান্যই, কিন্তু ইহার মধ্যে ছোটগল্পকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। রতন এক সামান্য পল্লীবালিকা, তাহার হৃদয়াবেগের মূল্য আরও সামান্য। এই পৃথিবীতে যে জীবনস্রোত নিত্য বহিয়া চলিয়াছে, রতনের ক্ষুদ্র হৃদয়াবেগ তাহার মধ্যে স্বল্পতম কালে সঙ্কীর্ণতম স্থানও অধিকার করিবে না, ইহাকে নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র বেদনা সেই বালিকার পক্ষে ত অসহ্য হইয়া উঠিল; সে যে অশ্রুজলে ভাসিয়া তাহার প্রভুর ছাড়িয়া যাওয়া গৃহের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহার কারুণ্যও ত উপেক্ষার বিষয় নহে এমনই একটি দুঃসহ হৃদয়বেদনার সহিত আমরা পরিচিত ছিলাম না। রবীন্দ্রনাথ নগণ্য গ্রাম্যবালিকা রতনের মধ্যে সেই হৃদয়বেদনাকে আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমাদের যে আশা আকাঙ্ক্ষাগুলি বহির্জীবনে বাধা পাইয়া, বাহ্যবিকাশের দিকে প্রতিহত হইয়া অন্তরের মধ্যে মুকুলিত হয় ও সেখানে গোপন মধুচক্র রচনা করে, রবীন্দ্রনাথ নিজ ছোটগল্পগুলির মধ্যে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইবার অবসর দিয়াছেন। বাস্তবজগতের রিক্ততার মধ্যে যে ভাবসম্পদ কবিচক্ষুর প্রতীক্ষায় আত্মগোপন করিয়া আছে তিনি সেই ছদ্ম আবরণ ভেদ করিয়া তাহাদের স্বরূপ অভিব্যক্ত করিয়াছেন।" 'পোষ্ট মাষ্টার' গল্পটির ক্ষেত্রে এই উক্তি বিশেষভাবে প্রযোজ্য, বালিকার সেই বেদনা লোকচক্ষুর অগোচরে কুসুমিত হইয়াছে, কাহিনী হইতে তাহার মধ্যে আমরা মানবহৃদয়ের চিরন্তন বেদনার সন্ধান পাই। যে প্রেম কেবলই বন্ধন স্বীকার করিতে ও স্বীকার করাইতে চাহিতেছে, তাহারই ব্যাকুল ক্রন্দন পরিবেশের তুচ্ছতার আবরণ ভেদ করিয়া আমাদের নিকট ধরা পড়ে। রতনের একটি সলজ্জ সসঙ্কোচ অনুরোধে তাহা বাজিতে থাকে—"দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ী নিয়ে যাবে?"

'কাবুলিওয়ালা' গল্পেও রবীন্দ্রনাথ এইরূপ লোকচক্ষুর অন্তরালে বহমান প্রেমের একটি ক্ষীণ অথচ বেগবতী ধারাকে বাহিরের সংসারে মুক্তি দিয়াছেন। সুদীর্ঘদেহী কাবুলিওয়ালা তাহার মস্ত ঢিলা জামার মধ্যে যে একটি ক্ষুদ্র হাতের পাঞ্জার ছাপ সযত্নে বহন করিয়া ফিরিতেছে, সেকথা আমাদের জানা ছিল না।

আমরা কাবুলিওয়ালাকে বাহির হইতেই দেখিয়াছি, তাহাকে বঞ্চক ও নিষ্ঠুর বলিয়াই জানি ; কিন্তু সে যে শুধুমাত্র কাবুলি মেওয়া-ওয়ালাই নয়, সে যে তাহার প্রবল পিতৃস্নেহ লইয়া আর একটি অন্তর পরিচয়ের অধিকারী, যে পরিচয়ের নিয়মে তাহার সহিত একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় বাঙালীর কোন প্রভেদ নাই—রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে সেকথা বুঝাইয়া দিলেন।

কাবুলিওয়ালা মিনির মুখে তাহার সেই পর্ব্বতবাসিনী কন্যার মুখচ্ছবি দেখিতে পাইয়াছে। তাহারই আকর্ষণে সে তাহার সামান্য মেওয়া উপহার লইয়া এই শিশুর মনটিকে জয় করিতে চাহিয়াছে। এই দুই অসমবয়সী বন্ধুর সরল হাস্যালাপ অনাবিল আনন্দলোকের সৃষ্টি করিয়াছে।

জেল হইতে খালাস পাইয়াই কাবুলিওয়ালা তাহার 'খোকী'কে দেখিতে আসিয়াছে। তাহার এই পিতৃস্নেহকে কবি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিতে পারেন নাই। শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্রকিরণে কলিকাতার এক গলিতে বসিয়া রহমত আফগানিস্থানের এক মরুপর্ব্বতের যে স্বপ্ন দেখিতেছিল, কবি সেই স্বপ্নলোক হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখেন নাই। তাহাকে কন্যার কাছে প্রেরণ করিয়া উৎসবের মঙ্গল-আলোককে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছেন।

'দান-প্রতিদান' গল্পটিতে একান্নবর্তী বাঙালী পরিবারের একটি সুখ-দুঃখের কাহিনী বলা হইয়াছে। যে প্রেমের বন্ধন একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে কাম্য অথচ যাহাকে আমরা স্বার্থের দ্বারা, ভেদবুদ্ধির দ্বারা ক্ষয় করিয়া ফেলি, সেই প্রেমের কথাই কবি এখানে বলিয়াছেন। বিষয়টি আমাদের নিকট তাই সহজেই আবেদন জানায়।

রাধামুকুন্দ ও শশিভূষণ সহোদর ভাই না হইলেও ইহাদের পরস্পরের প্রীতিবন্ধন সহোদর ভাইয়ের চেয়ে কিছু কম নহে। এই ভ্রাতৃস্নেহ পারিবারিক কলহের সম্মুখীন হইয়াছে, স্বার্থ তাহার নখদন্ত বিস্তার করিয়া ইহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতে চাহিয়াছে, রাসমণির আত্মসম্মান ইহাকে ধিক্কার দিতে চাহিয়াছে, কিন্তু তথাপি এই বন্ধন কোথাও এতটুকু শিথিল হয় নাই। ইহা ত স্বার্থপরতার বন্ধন নয়, পরান্নপ্রত্যাশীর সুচতুর ছদ্মবেশ নয়, ইহার মূল জীবনের আরও গভীরে ; সেখানে দুইটি বালক দুইটি লতার ন্যায় একে অপরকে জড়াইয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে, আজ তাহাদের বাহির হইতে পৃথক করিবার উপায় নাই!

তবু বাহির হইতে আঘাত আসিয়া পড়ে। দুই ভায়ের মধ্যে আর্থিক অসাম্য দেখা দেয় এবং সেই বাহিরের আঘাতই বড় হইয়া উঠিয়া দুই জনকে দুই দিকে ঠেলিতে থাকে। এই বাহিরের প্রভেদ ঘুচাইবার জন্য রাধামুকুন্দ একটি ঘটনার সৃষ্টি করিয়াছে, শশিভূষণের দেয় সদর খাজনা লুঠ করাইয়া তাহার সম্পত্তি নীলাম করাইয়াছে। কিন্তু তাহার মূলে শশিভূষণের সহিত প্রেমের সম্বন্ধটি অটুট রাখিবার বাসনা ছাড়া অন্য কোন স্বার্থের দুরভিসন্ধি ছিল না। শশিভূষণের মৃত্যুকালে যখন রাধামুকুন্দ তাহার অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিল, তখন আমরা জানিলাম শশিভূষণ পূর্ব্বেই রাধামুকুন্দের অপরাধের কথা জানিতে পারিয়া তাহাকে ক্ষমা করিয়াছে। রাধামুকুন্দ শশিভূষণকে তাহার হৃত সম্পত্তি দান করিতে চাহিয়াছিল, শশিভূষণ তাহার ক্ষমা দিয়া উপযুক্ত প্রতিদান দিয়াছে। এই ক্ষমা না পাইলে রাধামুকুন্দের দান করিবার অধিকারই জন্মিত না। ভ্রাতৃপ্রেমের এই দান-প্রতিদানের কাহিনীটি একটি বৃহত্তর জীবনের পরিবেশ রচনা করিয়াছে। আমাদেরই ঈর্ষাবিক্ষুব্ধ, কলহমুখর সাধারণ পারিবারিক জীবনের মধ্যে এই একটি বৃহত্তর জীবনের চিত্র দেখিয়া আমরা আনন্দিত হই।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পটিতে বাঙালী বধূর জাগ্রত আত্মবোধের সহিত সঙ্কীর্ণ বাঙালী জীবনের দ্বন্দ্বের চিত্রটি রবীন্দ্রনাথ নিপুণভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। মৃণাল যে কোন বাঙালী গৃহের শুধুমাত্র মেজবউ নয়, জগৎ ও জগদীশ্বরের সহিত তাহার যে অন্য সম্বন্ধও রহিয়াছে—যে সম্বন্ধে মানুষ আপনার আত্মার পরিচয় লাভ করে, যে সম্বন্ধে মানুষ কোনপ্রকার ক্ষুদ্রতার বন্ধন স্বীকার করে না, যাহাতে জীবনের মহিমা অনুভব করিয়া আপনাকে বড় বলিয়া চিনিতে পারে—মানুষের সেই পরিচয়টি নানা দুঃখের আঘাতে, আত্ম-অবমাননার দহনে, পরিপার্শ্বের হীন বিরোধিতায় এবং পরিশেষে মৃত্যুর শিক্ষায় মৃণালের জীবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই যে জাগ্রত ব্যক্তিচেতনার সহিত সঙ্কীর্ণ সমাজ-মনের দ্বন্দ্ব, যে দ্বন্দ্বে সমাজের সঙ্কীর্ণতাকে অতিক্রম করিয়া ব্যক্তি আপনার মহিমাকে তাহার ঊর্দ্ধে প্রকাশ করে, ব্যক্তিত্বের এই দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের একটি অন্যতম শিল্প-প্রেরণা। বাঙালী বধূর যে জীবনের ধারা আমাদের সমাজ ছক কাটিয়া ঠিক করিয়া দিয়াছিল, তাহার জন্য যে সকল আদর্শকে প্রচার করিয়া আসিতেছিল, গল্পের মৃণাল বাঙালী বধূর সেই বাঁধাধরা পথে চলিতে পারিল না। তাহাতে তাহার আত্ম-মর্য্যাদা প্রতি পদে পীড়িত হইতে লাগিল। বাঙালী সমাজ সর্ব্বতোভাবে তাহাকে বাঙালী বধূ করিয়া রাখিতে চাহিয়াছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা দিয়া, সত্যের প্রতি নিষ্ঠা দেখাইবার সুযোগ দিয়া, জীবনের প্রতি প্রেম প্রকাশের অবকাশ দিয়া তাহাকে মানুষের পরিচয় গ্রহণ করিতে দেয় নাই। কিন্তু যাহার মধ্যে মনুষ্যত্ব রহিয়াছে, সে কখনও 'মেজবউ' এই সঙ্কীর্ণ আবরণের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না, সেই আবরণ বিদীর্ণ করিয়া সে একদিন বাহির হইয়া পড়ে।

আমাদের বৃহত্তর জীবনের একটি দ্বন্দ্বের বিষয়কে রবীন্দ্রনাথ একটি সাধারণ বাঙালী বধূর জীবনের দ্বন্দ্ব করিয়া তুলিয়া শিল্প-ভাবনার অভিনবত্বের পরিচয় দিয়াছেন। মেজবউয়ের জীবনে খুব সাধারণ বিষয়ের মধ্য দিয়াই এই মহান্ দ্বন্দ্বটি দেখা দিয়াছে এবং দ্বন্দ্বের কারণ ও দ্বন্দ্বের প্রকৃতিকে কবি অত্যন্ত সহজভাবে আঁকিয়াছেন। বিন্দুর প্রতি মেজবউয়ের স্নেহ বাধার সম্মুখীন হইয়াছে, অবলা নারীর প্রতি সমস্ত সংসারের নিদারুণ অত্যাচার তাহার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়াছে ; অবশেষে বিন্দুর মৃত্যু তাহার কাছে নব-

জীবনের বিশ্বাস আনিয়া দিয়াছে। পৃথিবীতে কেহ যে কাহাকেও বাঁধিয়া রাখিতে পারে না, কোন অত্যাচার অবিচারই যে জীবনকে চিরদিন ধরিয়া পীড়া দিতে পারে না, মৃত্যু আসিয়া জীবনকে অসম্মান হইতে রক্ষা করে, জীবনের এই বৃহত্তর সত্যের সহিত মেজবউয়ের পরিচয় হইয়াছে। এই পরিচয় লাভ করিয়া সে চারিদিক হইতে বন্ধন খসাইয়া ফেলিল, 'মেজবউ' হইতে 'মৃণাল' হইয়া উঠিল।

এই আত্মোপলব্ধির বিষয়টি আত্মবিবৃতির মধ্য দিয়া অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে দ্বন্দ্বের প্রকৃতিটি মানসিক, বাহিরের ঘটনা হইতে দ্বন্দ্বটিকে সব সময় বুঝা যাইবে না। এখানে তাই ঘটনাগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয়টি দিতে হইবে। পত্রের আকারে বিবৃতির মধ্য দিয়া শিল্পের সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে।

'দৃষ্টিদান' গল্পটিও একটি অন্ধ পতিব্রতা বধূর জীবন-দ্বন্দ্বের কাহিনী। এখানে তাহার প্রতিপক্ষ সমগ্র সমাজ নহে, এখানে প্রতিপক্ষ তাহার স্বামী। কুমু স্বামীলাভের জন্য দেবপূজা করিয়াছিল। সে দেবতার মত স্বামী চাহিয়াছিল, কিন্তু তেমনটি পায় নাই। তাহার স্বামী আপনার অহঙ্কারের দ্বারা, লোভের দ্বারা, সঙ্কীর্ণ হৃদয়বৃত্তির দ্বারা আপনাকে বার বার ছোট করিয়া ফেলিয়াছে। এই ক্ষুদ্রতার সহিত কুমুকে অহরহ সংগ্রাম করিতে হইয়াছে এবং অনেক খেসারত তাহাকে দিতে হইয়াছে। সে তাহার চক্ষু দুইটি দান করিয়াছে, কিন্তু এই দৃষ্টিদানেও তাহার স্বামী সমৃদ্ধ হয় নাই; স্বামীর সহিত সে অচ্ছেদ্য ধর্মবন্ধনে জড়িত, সেই ধর্মকে তাহার স্বামী বারবার লাঞ্ছিত করিয়াছে এবং তাহাকেও বারবার ছোট করিয়াছে। মৃণালের ক্ষেত্রে গোটা সমাজই বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল, তাই সমাজ ত্যাগ না করিয়া, স্বামীকে ত্যাগ না করিয়া মৃণাল মুক্তি পায় নাই। কিন্তু কুমু স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারে নাই, ত্যাগ করিতে চাহেও নাই। স্বামীকে সে শোধন করিয়া লইয়াছে। স্বামী যখন তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বিবাহ করিতে চলিল, সে তখন স্বামীকে বলিয়াছে—"আমার বুকের ভিতর চিরিয়া দেখ? আমি সামান্য রমণী, আমি মনের মধ্যে সেই নববিবাহের বালিকা বই কিছু নই; আমি বিশ্বাস করিতে চাই, নির্ভর করিতে চাই, পূজা করিতে চাই; তুমি নিজেকে অপমান করিয়া আমাকে দুঃসহ দুঃখ দিয়া তোমার চেয়ে আমাকে বড় করিয়া তুলিও না—আমাকে সর্ব্ব বিষয়ে তোমার পায়ের নীচে রাখিয়া দাও।"

কুমু যে জীবনের কথা বলে তাহা দেবীত্ব নয়, তাহা পৃথিবীর ধূলির জগৎ ছাড়িয়া কোন এক অতিলৌকিক জগৎ নয়; তাহা এই পৃথিবীরই উপর একটি বৃহত্তর জগৎ; তাহার স্বামী আপনাকে ছোট করিয়া সেই জগৎ হইতে নির্বাসিত হইয়াছেন। তাই তাহার ও কুমুর মধ্যে ব্যবধান।

আপনার আদর্শকে হৃদয়ের মধ্যে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, সর্বপ্রকার দীনতাকে ও তুচ্ছতাকে জীবনে জয় করিবার জন্য নারী-হৃদয়ের এই একটি মৌন সংগ্রামকে রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব শিল্পরূপ দান করিয়াছেন। এখানেও কাহিনীটি বিবৃতির আকারে প্রকাশ করা হইয়াছে, তবে ঘটনাসংস্থান ও চরিত্রচিত্রণে অত্যন্ত নিপুণতা দেখানো হইয়াছে; সর্বোপরি কুমুর অন্তর্দ্বন্দ্বের যে আবেগ প্রকাশ পাইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহার উপযুক্ত ভাষা তৈয়ারী করিয়াছেন। একদিকে অন্ধের শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় পৃথিবীকে তিনি বর্ণনার মধ্য দিয়া নিপুণভাবে উপস্থিত করিয়াছেন, অপরদিকে অন্ধ নারীর মূক বেদনাকে উপযুক্ত ভাষা দিয়াছেন।

'নষ্টনীড়' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের আর একটি শ্রেষ্ঠ গল্প। অমল চারুর দূরসম্পর্কীয় দেবর। উহার প্রতি চারুর প্রীতি উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া অবশেষে তাহা প্রণয়ে পরিণত হইয়াছে। প্রীতির এই প্রণয়ে পরিণতির একটি সুন্দর মনস্তাত্ত্বিক চিত্র রবীন্দ্রনাথ আঁকিয়াছেন। জীবন কোন না কোন একটা অবলম্বনের মাধ্যমে আপনাকে প্রকাশ করে। চারুর স্বামী স্বামিত্বের অন্যান্য কর্তব্য পালন করিতেন, কিন্তু চারুর চিত্তবিনোদনের কোন চেষ্টাই করিতেন না। তাহার যে কোন প্রয়োজন আছে, চারু যে তাঁহাকে লইয়াই একটি নূতনতর মনোজগৎ গড়িয়া তুলিতে পারে, সংসারের কর্তব্যগুলি পালন করিতে করিতে সেকথা তাঁহার ভাবিয়া দেখিবার অবসর হয় নাই। এদিকে অমল তাহার হাস্যালাপে, আবদারে অভিমানে, কলহে, কৌতুকে চারুর সময়টি ভরাইয়া রাখিত; অমলকে না হইলে চারুর চলিত না। অমল এইরূপে চারুর জীবনে ক্রমে একান্ত হইয়া দাঁড়াইল এবং ইতিমধ্যে নন্দার মারফতে চারুর অন্তরে ঈর্ষার সঞ্চার হওয়াতে অমলকে বিশেষভাবে আপনার করিয়া পাইবার জন্য চারুর মনে একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। এতদিন অমলের যে সান্নিধ্য সে কামনা করিত, তাহার সহিত সাহিত্য-বিলাস, উদ্যান-পরিকল্পনা এবং অমলের ফাইফরমাস খাটিয়া দেওয়ার মমতা মিশিয়াছিল। কিন্তু এখন ঈর্ষার সঞ্চার হওয়াতে অন্যান্য বিষয়গুলি তুচ্ছ হইয়া গিয়া অমলকে সে অমলের জন্যই চাহিতে লাগিল। এই ঈর্ষা হইতে অভিমান জাগিয়া উঠায় অমলকে সে বিশেষ করিয়া আপনার বলিয়া ভাবিতে লাগিল এবং সেই অভিমান পরিতৃপ্ত না হওয়াতে অমলের জন্য তাহার অন্তরে ধীরে ধীরে একটি তৃষ্ণার বোধ জাগিয়া উঠিল। চারুর মনের এই অবস্থায় লেখক সুকৌশলে অমলকে চারুর নিকট হইতে সরাইয়া লইয়াছেন এবং চারুর নবজাগ্রত তৃষ্ণার জ্বালা সম্মুখে অন্য কোন উপকরণ না পাইয়া চারুকেই দগ্ধ করিয়াছে।

ভ্রাতৃজায়া ও দেবরের এই যে অসামাজিক প্রণয়ের চিত্র, আমাদের সমাজবোধে এই প্রণয়সম্বন্ধ গর্হিত, তাই আমরা ইহাকে শিল্পের বিষয় বলিয়া মর্যাদা দিতে চাই না। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে শিল্পায়িত করিয়া যুগোপযোগী মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ চারুর দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা এমনভাবে আঁকিয়াছেন যে, আমরা চারুর প্রণয়কে নীতিজ্ঞান লইয়া বিচার করিতে প্রবৃত্ত

...না, তাহার অন্তর্দাহ দেখিয়া আমরা তাহার প্রতি সহানুভূতিই ...ভব করি। বিশেষ করিয়া এই অবৈধ প্রণয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ...বৃত্তিকে এমন সংযত করিয়া রাখিয়াছেন যে তাহা বিক্ষুব্ধ বাস-...র তাড়নায় নির্লজ্জ নগ্নতা প্রকাশ করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ ...ক নিজেও তাহার এই প্রণয়কে অশ্রদ্ধা করে নাই। অমলের ...দ্দেশে সে বলিয়াছে, "আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পদার্থ তুমিই ফুটাইয়াছ, আমার জীবনের সারভাগ দিয়া প্রতিদিন তোমার পূজা করিব।"

জীবনের এমন একটি দ্বন্দ্বের চিত্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে আমরা প্রথম দেখিলাম। চিত্রটি যেমন করুণ, তেমনি সুন্দরও। বিশ্লেষণাত্মক বলিয়া এখানে বাচনভঙ্গী খুব সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট।

এইভাবে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির আলোচনা করিয়া আমরা দেখি, তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভা আমাদের দৈনন্দিন সাধারণ জীবনের নাট্যলীলার মধ্যে কেমন ভাবে আর একটি বৃহত্তর জীবনের নাট্যলীলাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং সেই বৃহত্তর জীবনের দ্বন্দ্ব আমাদের জীবনকে যেভাবে তরঙ্গায়িত করিয়াছে, তাহারই চিত্রগুলি কবি কেমন অনবদ্য ভাবে আঁকিয়াছেন। এইরূপে আমাদের জীবনের একটি বৃহৎ অংশ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে এবং বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে নিজস্ব আসনে সগৌরবে অধিষ্ঠিত হইয়াছে।

দেহাত্মবাদ

শ্রীকালিদাস রায়

জ্ঞানের মর্য্যাদা বুঝি শৌর্য্য-বীর্য্য রূপের গৌরব,
ধর্ম্মের মহিমা বুঝি, বুঝি কর্ম্মবলের বৈভব,
মানবের সভ্যতার উচ্চস্তরে ক্রম আরোহণ।
তাও বুঝি, মনে হয় সবি মিথ্যা মায়ার স্বপন,
যখনই ভাবিয়া দেখি—সমস্তই করেছে আশ্রয়
পরের দুর্ব্বল দেহে। শত শত রোগের নিলয়
যে দেহ ভঙ্গুর ক্ষীণ, আজ আছে কাল নাই আর,
চারিদিকে অস্ত্র হানে শত শত অরাতি যাহার,
যে দেহ প্রকৃতি হস্তে খেলানার পুতুলের মত,
দুঃখ শোকে অবসন্ন ভীতিমূঢ় ত্রিতাপে বিক্ষত,
সেই তুচ্ছ মৃত্যুভয়ে জর্জরিত শিথিল পঞ্জর
দেহেরে যা যুগে যুগে একমাত্র করেছে নির্ভর,
গৌরব মর্য্যাদাময় হোক যত, তার কিবা দাম?
যাহারে করিবে শূন্য বহ্নিময় শেষ পরিণাম।

এত বড় পরিহাস করি তুমি দেহের বিধাতা,
তব নামে নোওয়াইতে চাহ দীন দেহীদের মাথা?
যে কণ্ঠ টিপিয়া ধরি একদিন হরিবে পরাণ
সেই কণ্ঠে শুনিবারে চাহ তুমি তব স্তব গান?
সেই বক্ষ পদাঘাতে চূর্ণ তুমি করিবে হে বাম,
সেই বক্ষে তব কীর্ত্তি ধ্যানলগ্ন র'বে অবিরাম!
নরসিংহনখে চিরি যেই ফুল দলিবে চরণে
সেই ফুল মধুগন্ধে ও চরণ পূজিবে কেমনে?
এরি তরে কৃতজ্ঞতা ভক্তিপূজা চাহ দেহাতীত,
দেহের অধীন রাখি দেহীদের করি প্রবঞ্চিত?
নিজে দেহমুক্ত রহি চিরদিন ভাঙ্গি আর গড়ি
করিছ পুতুলখেলা, হে নিষ্ঠুর তোমা নাহি ডরি।
মনে হয় চাও নাক তুমি নিজে ভক্তি আরাধনা,
দুর্ব্বলে দেখায়ে ভয়, এইটুকু আছে বিবেচনা।

মানুষ নিজেরই স্বার্থ সাধিবারে হইয়া প্রণত
তোমারে বানাল ভক্তিপূজালোভী নিজেদেরই মত।
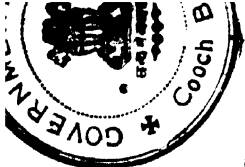
হারজিৎ

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

বিপিন যখন গ্রামের স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পাস করিয়া দশ টাকার জলপানি পাইল, তখন সারা গ্রামে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। গ্রামস্থ বৃদ্ধগণ, স্কুলের শিক্ষকগণ ও অভিভাবকেরা সকলেই বিপিনকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন—এত দিনে গ্রামের মুখ উজ্জ্বল হইল। কয়দিন বনমালীর বাড়ীতে পাড়ার ছেলেমেয়েদের ও গ্রামস্থ ভদ্রব্যক্তিগণের যেমন ভিড় হইতে লাগিল, তেমনি নানা প্রকার উপদেশও বৃদ্ধ বনমালী এবং বিপিনের উপর বর্ষিত হইল। কেহ বলিল—বনমালীদা, তোমার এমন সোনার চাঁদ ছেলেকে যেমন করেই হোক কলেজে পড়াও, এ ছেলে দেখো ভবিষ্যতে দশ জনের একজন হবে। সোজা কথা নয়, কত হাজার হাজার ছেলের মধ্যে জলপানি পাওয়া কি চাড্ডিখানি কথা।—বনমালী মৃদুহাস্যে সমস্তই শুনিতে লাগিলেন। পুত্রের প্রশংসায় গর্ব্বে যেমন বুক ফুলিয়া উঠিল, মনে আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল—তেমনি অন্য দিকে দুঃখের সাগর যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বনমালীর শুধু আজ মনে পড়িতে লাগিল, মৃত পত্নীর কথা। আজ যদি বিপিনের মা বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে কতই না সুখের ব্যাপার হইত! আজ তাঁহার ছেলে পাস করিয়াছে, জলপানি পাইয়াছে—লোকে কত প্রশংসা করিতেছে। ইহার মত সুখ, ইহার মত আনন্দ, পিতামাতার নিকট আর কি হইতে পারে!

সকলের অলক্ষিতে বনমালীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। বনমালী বলিলেন, ভাই আমার অবস্থা ত জান। রেজেষ্ট্রী আপিসে দলিল লিখে সংসার চালাই। ছেলেকে কলেজে পড়ানোর মত অবস্থা আমার নয়। তবুও এক বেলা খেয়ে না খেয়ে ওকে মানুষ করেছি। আর ও যাতে লেখাপড়া শিখতে পারে সেদিকেও আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নি। আমার ঐ একটি মাত্র ছেলে। হায়, আজ যদি ওর মা বেঁচে থাকত—। বৃদ্ধ বনমালীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। ধরা গলায় বলিলেন, কি কষ্টে যে ছেলেকে মানুষ করেছি, তা আমি জানি, আর জানেন ভগবান। রাতে ঘুমুই নি, কোনদিন এক বেলা খেয়েছি, কোলে পিঠে করে, চব্বিশ ঘণ্টা কাছে কাছে, রেখে বড় করেছি। এখন তোমাদের পাঁচ জনের আশীর্ব্বাদে যদি ওকে পড়াতে পারি। নইলে আমার আর সাধ্য কি বল—

রাত্রে যখন চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ হইয়া গেল, গ্রামের ঘরে ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ হইল, আলো নিবিয়া গেল, কোথাও এতটুকু জীবনের লক্ষণ নাই, তখন বৃদ্ধ বনমালী উঠিয়া, ঘরের নিবন্ত প্রদীপের সলতেটি উস্কাইয়া দিয়া, বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। পার্শ্বে পুত্র বিপিন গাঢ় ঘুমে মগ্ন। পুত্রের কপালের উপর হইতে অতি ধীরে ধীরে কেশগুচ্ছ সরাইয়া দিয়া পরম স্নেহে পুত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিলেন। সম্মুখে দেয়ালে টাঙ্গানো লোকান্তরিতা পত্নীর ফটোখানি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেই ফটোখানির দিকে চাহিয়া বনমালী আবেগপূর্ণ স্বরে বলিলেন—ওগো, তোমার খোকাকে বড় কষ্টে মানুষ করেছি। সেই খোকা বড় হয়েছে—একটা পাস দিয়ে জলপানি পেয়েছে, একবার চেয়ে দেখ।—বৃদ্ধ সেই অস্পষ্ট ফটোখানির দিকে, নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার দুই শীর্ণ চক্ষুর কোণ বাহিয়া দু' ফোঁটা জল গালের উপর গড়াইয়া আসিল। নিদ্রিত বিপিনের মাথার উপর হাত রাখিয়া অস্ফুট স্বরে বনমালী আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। আজ তাঁহার আনন্দের সীমা নাই, কিন্তু একটা ভাবনায় মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। কি করিয়া বিপিনকে কলেজে পড়াইবেন এবং পুত্রকে বিদেশে রাখিয়া তিনি নিজেই বা কি করিয়া একা একা থাকবেন।

গালে হাত দিয়া বনমালী অনেকক্ষণ ভাবিলেন, তার পর আস্তে আস্তে উঠিয়া এক কলিকা তামাক সাজিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে গভীর ভাবনায় ডুবিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ চিন্তার পর স্থির করিলেন, এখানকার বাসা উঠাইয়া, শহরে বাসা ভাড়া করিয়া সেখানে বাস থাকিবেন। শহরে গেলে দলিলপত্র লিখিয়া এখানকার চেয়ে বেশী উপার্জ্জন হইতে পারে। বনমালী অনেক রাত পর্য্যন্ত, তামাক খাইতে খাইতে কত কথাই ভাবেন। এই বাড়ীখানির ভার গ্রামের কাহারও উপর দিবেন, আর যে সামান্য জমি আছে তাহাও ভাগচাষে বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। সম্পত্তি বলিতে ত এই। গ্রামের উপর যে আকর্ষণ, যে মায়া-মমতা ছিল, তাহা যেন বিপিনের মায়ের মৃত্যুর পর হইতেই ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। শুধু বিপিনের পড়ার জন্যই এই ভিটা আঁকড়াইয়া পড়িয়া ছিলেন। এখন ত আর এখানে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। নিজের গোনা দিন ত শেষ হইয়া আসিতেছে। এখন বিপিনকে কোনমতে সংসারী দেখিয়া দুই চোখ বুঁজিতে পারিলে সে-ই পরম শান্তি।··· ক্রমশঃ রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হয়, গ্রাম্য চৌকিদার বাঁশের লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে ও এক-একবার প্রচণ্ড হাঁক পাড়িতে পাড়িতে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলিয়া যায়। রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করিয়া মাঝে মাঝে কচিৎ কোন কুকুরের চীৎকার-শব্দ, নৈশ বাতাসে ভাসিয়া আসে। গ্রাম ঘুমাইতেছে—মানুষ সুখে নিদ্রা যাইতেছে। সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতি, তাহার অসংখ্য জীবজন্তু গাছ-পালা লইয়া নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রে গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন। শুধু মাত্র বৃদ্ধ বনমালীর চক্ষেই ঘুম নাই। ঘরের নিবু নিবু প্রদীপের আধো আলো-ছায়ার মাঝে, ঘুমন্ত পুত্রের পাশে নিঃশব্দে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকেন।

সেদিন সকালবেলায় বনমালী নিজের ঘরে বসিয়া চোখে চশমা লাগাইয়া একখানি দলিল লিখিতেছিলেন। দলিলখানি আজই লিখিয়া শেষ করিতে পারিলে কিছু টাকা আয় হইবে। এমন সময় শব্দ হইল, নমস্কার হই মশাই—বনমালী ঘাড় তুলিয়া দেখিলেন এক জন অপরিচিত ব্যক্তি, সন্তর্পণে পায়ের সাদা ক্যাম্বিসের জীর্ণ জুতা-জোড়াটি খুলিয়া, বাঁশের মোটা লাঠিগাছটি ঘরের কোণে কাত করিয়া রাখিয়া নিজেই আসন গ্রহণ করিতেছে। বনমালী কলম রাখিয়া বলিলেন, বসুন—বসুন। কোথা থেকে আসছেন? দলিল হবে বোধ করি। অপরিচিত ব্যক্তিটি হাসিয়া বলিল—না পালমশাই, দলিল-টলিল নয়। তবে এও ঐ দলিলের মতই গুরুতর কাজ। আমি পঞ্চানন ঘটক। আমার নাম শোনেন নি বুঝি? শরডাঙ্গার পঞ্চানন ঘটকের নাম ওদিগের সকলেই জানে। লোকে বলে, আমি নাকি অঘটন ঘটাতে পারি। কিন্তু মশাই—অঘটন ঘটানো আমার কাজ নয়, তবে বাঁকাকে সোজা করতে পারি। ঐ চৌধুরীদের মেজো ছেলের বিয়ের সময়ে কি হ'ল তা জানেন না বুঝি? বলছি সবই কিন্তু পালমশাই, তার আগে তামাক চাই কিন্তু—।

বৃদ্ধ বনমালী অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া নিজেই হাত-মুখ ধোয়ার জল দিয়া, তামাক সাজিয়া ব্রাহ্মণের হুঁকাটি যত্নে ধুইয়া মুছিয়া পঞ্চানন ঘটকের হাতে দিলেন। পঞ্চানন হাত মুখ ধুইয়া, বেশ জুৎ করিয়া আসন গ্রহণ করিল এবং দুই চোখ বন্ধ করিয়া অনেক ক্ষণ ধরিয়া তামাক টানিয়া বলিল, তার পর পালমশাই, শুনলাম আপনার ছেলে জলপানি পেয়ে একটা পাস করেছে। বাবাজী এই অল্পবয়সে যে রকম পাস দিয়েছে, সে ত সামান্য কথা নয়। ওইটুকু ছেলে ঐ ত রাস্তায়ই পরিচয় পেলাম—দেখলাম আপনার ছেলেকে। খাসা ছেলে—চমৎকার ছেলে—একেবারে রত্ন। বয়স ত ওই, এখনও দুধের ছেলেই বলা চলে। আশপাশের সব গাঁয়ে ধন্যি ধন্যি পড়ে গিয়েছে মশাই। তাই ত, কাল ক্ষীরপুরের মেজো-বাবু বললেন, পঞ্চানন, 'ওই ছেলেকে আমি চাই'। বৃদ্ধ বনমালী বোধ হয় কথাটার অর্থ বুঝিলেন না, তাই জিজ্ঞাসুনেত্রে পঞ্চাননের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ঘটক বলিল, ক্ষীরপুরের দে-বাবুদের নাম শুনেছেন ত। মস্ত ঘর—মস্ত বড়লোক—আর বনেদী বড়লোক মশাই। এ হালের ফুটো বাবু নয়। বাড়ীতে মস্ত পুজোবাড়ী—দোল-দুর্গোৎসব হয়, কত অতিথি, ফকির, গরীবগুরবো খায়—হাঁ, আর দান-ধ্যানও তেমনি। ইদিকে, চাষ-আবাদ, মহাজনী, জমিদারীতে মা লক্ষ্মী উপচে পড়ছেন। মেজোকর্ত্তা কাল আমায় তাঁর খাস-কামরায় ডেকে বসালেন, বসিয়ে বললেন, 'পঞ্চানন বড় মেয়ে টুনুর জন্যে এ ছেলে চাই। ছেলেকে আমি কলেজে পড়াব—চাই কি বিলেত পর্য্যন্ত পাঠাব। তুমি যাও, সম্বন্ধ ঠিক করে এসে এই মাসের মধ্যেই দু'হাত এক করে দেবার ব্যবস্থা কর'। মেজোবাবুর তাড়াতেই ত সেই ভোরে উঠে আসছি—নইলে কোমরের বাতের ব্যথাটায়—। বৃদ্ধ বনমালী অবাক হইয়া বলিলেন, বলেন কি ঘটক-মশাই। ক্ষীরপুরের বাবুরা, ওরা যে মস্ত ঘর—মস্ত বড়লোক। সেই ঘরের মেয়ে আমি আনব এই ভাঙা ঘরে। এ যে ভাবতেও পারি নে। আমি গরীবমানুষ, কোনরকমে ছেলেটাকে মানুষ করেছি। আমার মত গরীবের কি তাঁদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করা সম্ভব?—পঞ্চানন ব্যস্ত হইয়া, বাধা দিয়া বলিল, আহা, তার জন্যে ভাবতে হবে না পালমশাই। তিনি বিয়ে দেবেন আপনার ছেলের সঙ্গে, আপনার ঘরের সঙ্গে ত নয়। ওসব কথা রাখুন। মানে আপনার ছেলেটিকে মেজোকর্ত্তার ভারি মনে ধরেছে। আর মেয়ের রূপের কথা কি বলব পালমশাই। যেন সাক্ষাৎ ডানাকাটা পরী। গায়ের রং কি! তেমনি চোখ-মুখের গড়ন পেটন। আপনি ব্যস্ত হবেন না—একে একে সব কথা বলছি। আমি পঞ্চানন ঘটক—আমি মাঝে থাকতে আপনার কোন চিন্তা নেই পালমশাই। ঐ এক ছেলের জন্যে রাজার হালে থাকবেন, বুড়ো বয়সে আর খেটেখুটে খেতে হবে না। কোন ভাবনা নেই—সব ঠিক করে দেব। কিন্তু এখন একটু চায়ের ব্যবস্থা যে করতে হয় পালমশাই। চা চিনি পেলে আমি নিজের হাতেই সব করে নিচ্ছি—এ ভারী বদ নেশা বুঝলেন কিনা—ভাত একবেলা না হলেও চলে। কিন্তু এই চা—এটি নইলে মশাই মনে হয় পৃথিবী শূন্য।—এই বলিয়া পঞ্চানন হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিল।

ইহার পর পঞ্চানন ঘটক আরও বারকয়েক যাওয়া-আসা করিল। মেয়ে সত্যই পরমাসুন্দরী। পাঁচ দণ্ড দেখিবার মত। ঠিক হইল, মাঝের একটি মাস বাদ দিয়া আগামী ফাল্গুন মাসেই শুভকার্য্য সমাধা হইবে। কন্যাপক্ষ নগদ যৌতুক, গহনাপত্র ও অন্যান্য দান-সামগ্রী দিবে এবং বিপিনকে কলেজে পড়াইবার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবে। বিপিনকে মানুষের মত মানুষ করিতে বিপিনের হবু শ্বশুর-মশায় যে দৃঢ় পণ করিয়াছেন, একথা পঞ্চানন ঘটক বার বার বন-মালীকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিল, আর কেন পালমশাই, ছেলের ত রাজার ঘরে সম্বন্ধ হ'ল, আপনার আর চিন্তার কারণ কি? বলেছিলাম না, পঞ্চানন ঘটক যখন মাঝে আছে তখন আর ভাবনা চিন্তা কি? তবে পালমশাই, আমার কথাটা যেন আপনার স্মরণ থাকে।—বৃদ্ধ বনমালী বলিলেন, না ভুলব না। কিন্তু একটা কথা শুধু কাল থেকে ভাবছি।—পঞ্চানন তাড়াতাড়ি বলিল, এর মধ্যে ভাবাভাবির আর কি আছে? এমন সম্বন্ধ, এমন মেয়ে আর পাবেন না। বলে, অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা আপনার ছেলের হাতে তুলে দিলাম। এখন আর ভাবাভাবির কি আছে—

বনমালী বলিলেন, টাকাকড়ি বা পাওনা-গণ্ডার কথা ভাবছি নে ঠাকুরমশাই। ভাবছি শুধু ছেলের কথা। যে ছেলেকে আজ এই যোল-সতের বছর ধরে কত কষ্টে মানুষ করলাম, সেই ছেলে বড়লোক শ্বশুর পেয়ে আর ধন-দৌলত বিষয়-আশয় দেখে আমায় যদি ভুলে যায়, শুধু এই কথাটি ভাবছি ঘটকমশাই। বিপিনের মা মরবার সময় আমার হাতে ওকে দিয়ে বলে গিয়েছিল, 'বিপিনকে মানুষ করো, বড় করো। আমি বড় আশা নিয়ে চলে যাচ্ছি, আমার আশা যেন অপূর্ণ না থাকে।' ঘটকমশাই, আমি

সাধ্যমত তার সে আশা পূর্ণ করবার চেষ্টা করেছি। স্বর্গে গিয়ে সে সবই দেখছে। কিন্তু আজ ভাবছি, বিপিন ছেলেমানুষ, নতুন শ্বশুরবাড়ীর ধন-দৌলত দেখে, ও ছেলেমানুষ সব ভুলতে পারে, শেষে যদি আমাকেও ভুলে যায়। তাই যদি হয়, তবে কোন আশায়, কার মুখ চেয়ে এই বুড়ো বয়সে বাঁচব বলতে পারেন ঘটকমশাই? উচ্চ হাস্য করিয়া পঞ্চানন বলিল, সব মিথ্যে আশঙ্কা—কিছু ভাববেন না। এখন শুভ কাজটা সমাধা হয়ে যাক্, এই শুধু প্রার্থনা করুন।—বনমালী বলিলেন, ও মানুষ হোক, আমার অবর্তমানে যেন কোন কষ্ট না পায় এই প্রার্থনাই ভগবানের চরণে দিনরাত জানাচ্ছি ঘটকমশাই।

মানুষ কত আশা লইয়া কত স্বপ্ন রচনা করে। কিন্তু তার সব স্বপ্ন, সকল আশা মহাকালের এক ফুংকারে সমূলে ধ্বংস হইয়া যায়। বৃদ্ধ বনমালীরও তাহাই হইল। হঠাৎ কোথা হইতে সামান্য সর্দ্দিজ্বর দেখা দিল, ক্রমশঃ রোগ কঠিনতর হইল। একদিন অশ্রুসজল নিষ্পলক নেত্রে পুত্রের মুখ দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধ শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কত কি বলিবার ছিল, কত কি জানাইবার ছিল, কিন্তু কিছুই হইল না। মৃত্যুর দুই-তিন দিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহার কথা বন্ধ হইয়া গেল। তবুও অমানুষিক চেষ্টায় বনমালী বিপিনকে দুই হাতে বুকের কাছে টানিয়া অস্ফুট ভগ্নকণ্ঠে কি বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুই বুঝা গেল না। বনমালী নিজেও বুঝিতে ছিলেন যে, তাঁহার কথা বিপিন বুঝিতে পারিল না। তাই সকল ক্ষোভ, সকল ভাবনা-চিন্তা, দুঃখ-বেদনা অশ্রু-আকারে চক্ষের কোণ বাহিয়া ঝরিতে লাগিল। এই নির্ব্বান্ধব পৃথিবীতে আত্মীয়হীন, বন্ধুহীন কঠিন সংসারে প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে যে নিতান্ত একেলা রাখিয়া অপার রহস্যময় অজানা দেশে যাত্রা করিলেন এই দুর্ভাবনা বৃদ্ধকে আরও অস্থির করিয়া তুলিল, দুঃসহ যন্ত্রণা ও চিন্তার মাঝে বনমালীর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ হইল।

মাসখানেক পর বনমালীর শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষ হইলে পঞ্চানন ঘটক আসিয়া বলিল, বাবাজী যা হবার তা তো হয়েই গেল। আহা, এমন মানুষ আর হয় না। কিন্তু বাবাজী, শোকে মুহ্যমান হয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। সংসার-ধর্ম্ম সবই তো করতে হবে। এখন বাবুরা, গিন্নীমারা তোমায় একবার দেখতে চান। তুমিও পাত্রী দেখে পছন্দ করে আসবে। এ ত একদিনের ব্যাপার নয়, এটা চিরকালের। জানই তো, পালমশায় একরকম সবই পাকা করে গেছেন, এখন শুধু দুই হাত এক হতে বাকি।—বিপিন বলিল, এত তাড়াতাড়ি কিসের। এই তো সেদিন বাবা গেলেন, আরও দু-চার মাস যাক্ না।—পঞ্চানন বলিল, আহাঃ, তার জন্যে কি আটকাচ্ছে। উপস্থিত ওঁরা যখন একটু দেখতে চান তাতে আর দোষ নেই তো বাবাজী। শুভকার্যটা না হয় দু'এক মাস পরেই হবে, কিছু ক্ষেতি নেই—

শুভদিন দেখিয়া পঞ্চানন ঘটক বিপিনকে লইয়া ক্ষীরপুরে যাত্রা করিল। সেখানে আদর-আপ্যায়ন প্রভৃতি ঘটা করিয়া হইল। একবাড়ী স্ত্রী-পুরুষ ও কর্ত্তাদের সম্মুখে বিপিন যেন নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পড়িল। একমাত্র সঙ্গী ঘটকমশাই, কিন্তু তিনিও যেন সময় বুঝিয়া অন্তরালে গিয়াছেন। স্ত্রী-পুরুষের জোড়া জোড়া চক্ষের সম্মুখে বসিয়া রীতিমত পরীক্ষার মতই নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে বিপিনের মনে হইল, ইহার চেয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা অনেক সহজ ছিল। হঠাৎ এক সময় কে যেন বলিল, ঘাড় তোল ত বাবা। এই আমার মেয়ে টুনু, দেখ, ভাল করে দেখ। বিপিন ঘাড় তুলিতেই দেখিল, একটি তের-চৌদ্দ বছরের মেয়ে তাহার সম্মুখস্থ চেয়ারে আসিয়া বসিল। পঞ্চানন ঠিকই বলিয়াছে, মেয়ের গায়ের রং দুধে-আলতায় মেশানো। কথাটা মিথ্যা নয়। আর রূপও চমৎকার, দেখিলেই চোখ ফেরানো যায় না। কিন্তু বিপিন ইতিপূর্ব্বে এমন সামনাসামনি কোন অনাত্মীয়া মেয়েকে দেখে নাই, তাহার অত্যন্ত সঙ্কোচবোধ হইল, তাই একবার মাত্র তাকাইয়াই ঘাড় নীচু করিল। বিপিনের চোখমুখ রাঙা হইয়া উঠিল, কপালে মৃদু ঘাম ফুটিয়া উঠিল। তাহার বার বার মনে হইতে লাগিল, কোনক্রমে চলিয়া যাইতে পারিলে সে বাঁচিয়া যায়। কে একজন বলিল, হাঁ বাবা, মেয়ে পছন্দ তো। ঘাড় কাত করিয়া বিপিন অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে বলিল, হাঁ—

বাড়ীর একজন গিন্নী বলিলেন, কিরে তোর বর কেমন লাগল? মনে ধরেছে তো। এইবার পরিষ্কার কণ্ঠে টুনু বলিল, বলেছি তো আগেই—গরীবদের আমি ঘেন্না করি। এইটুকু মেয়ের মুখে এমন পাকা কথা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। অত্যন্ত অপমানে বিপিন উঠিয়া দাঁড়াইল। কন্যাপক্ষ বিপিনের হাত ধরিয়া কত কি বুঝাইল, কিন্তু বিপিন শুনিল না। শুধু বলিল, না, আর হয় না।

পাত্রীর এমন অশোভন আচরণে পঞ্চানন ঘটক পর্য্যন্ত অবাক হইয়া গিয়াছে। এমন অভাবনীয় ব্যাপার পঞ্চানন কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। পাত্রপক্ষ পাত্রী দেখিতে আসিলে কন্যা একরূপ মুখই তোলে না, কথা তো দূরের কথা। কিন্তু মেজবাবুর এই মেয়েটি একেবারে সৃষ্টিছাড়া। পঞ্চানন বলিল, দেখ বাবাজী, আমার মনে হয় এ ভালই হ'ল। ভগবানের ইচ্ছে নয় যে এই বিবাহ হয়। ও-মেয়ে অনেক দুঃখ পাবে, এ আমি বলে রাখলাম। কিন্তু উপস্থিত পঞ্চানন অনেক দুঃখ পাইয়াছে। বিপিনের সহিত বিবাহটা ঘটাইয়া দিতে পারিলে তাহার তো অনেককিছুই লাভ হইত। এই লোকসানে পঞ্চানন যেন উগ্র হইয়া উঠিল। তাই ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলিল, দেখি ও মেয়েকে কেমন করে মেজবাবু পার করেন। তুমি ভেব না বাবাজী, এ ভালই হয়েছে। আমি ভাল মেয়েই ঠিক করে দিচ্ছি। তোমার যেমন অপমান হ'ল, তেমনি অপমান আমারও হয়েছে। এ অপমান শীঘ্র ভুলতে পারব না, ভুলতে সময় লাগবে—

বনমালীর মৃত্যুর পর, বনমালীর দূরসম্পর্কীয়া এক বিধবা

আত্মীয়া আসিয়া সংসারের সকল ভার ঘাড়ে তুলিয়া লইয়াছিলেন। বিধবার সংসারে কেহই ছিল না। নিজের ভাইয়ের বাড়ীতে কোনরূপে কাল কাটাইতেছিলেন। এক্ষণে বনমালীর মৃত্যুর পর বিপিনের কাছে আসিয়া বলিলেন, বাবা, আমি তোমার পিসীমা হই। ভাইয়ের ওখানে দাসীবৃত্তি করতাম, দিনান্তে একমুঠো ভাত খেতাম। কিন্তু তাতেও কত কথা শুনতে হ'ত। বিপিন বলিল, পিসীমা আপনি গুরুজন। আমার মা নেই, বাবাকেও হারালাম। আপনি আমার মায়ের মত এই সংসারে থাকুন। সেই হইতে বিধবা সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্মের ভার নিজের মাথায় তুলিয়া লইলেন।

কিন্তু বিপিনের আর পড়া হইল না। কলেজে পড়িবার আকাঙ্ক্ষা, কত স্বপ্ন বিলীন হইয়া গেল। কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া রহিলে তো সংসার চলিবে না। বিপিন পড়ার চেষ্টা না করিয়া চাকরির চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কোন ভাল চাকরি না পাওয়াতে অগত্যা গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঁয়ত্রিশ টাকা বেতনে শিক্ষকতার কাজ লইয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াইতে লাগিল। বিপিন ভাবিল, এই ভাল। অবসর সময়ে নিজ হাতে বাগান কোপাইয়া সে তরিতরকারী উৎপন্ন করিতে লাগিল। ক্ষেতের তরকারি, জমির ধান ও মাসান্তে পঁয়ত্রিশ টাকা—বিপিনের মনে হইল এই বেশ। এই জীবনই তো কাম্য—বিদেশে থাকিয়া ইহার উহার মন রাখিয়া কথা বলিতে হইবে না। আপিসের বড়বাবু ও উপরওয়ালার কথা শুনিতে হইবে না। নিজ গৃহে থাকিয়া এই স্বচ্ছ, সুন্দর ও সরল জীবনই শ্রেয়ঃ।

বিপিনের পিসী মাঝে মাঝে বলিতেন, বাবা বিপিন, এইবার বিয়ে থা কর। বউ নিয়ে আয়, তোকে সংসারী দেখে সাধ-আহ্লাদ মেটাই। ইতিমধ্যে যে পিসী গোপনে গোপনে পঞ্চানন ঘটককে মেয়ে দেখিবার জন্য বলিয়াছিলেন, ইহা বিপিন জানে না। এক দিন পঞ্চানন আসিয়া বলিল, কই গো পিসীমা। বিপিন বলিল, আসুন। পঞ্চানন আসন গ্রহণ করিয়া বলিল, বসছি বাবাজী। এবার সব ঠিকঠাক। নিজের চোখে মেয়ে দেখে এস। কালই শুভদিন, বুঝলেন পিসীমা, আমি বলি, এই মাসেই শুভকার্য্য হয়ে যাক্। মেয়েটি বড় ভাল, বড় লক্ষ্মী। আপনি যেমনটি চেয়েছিলেন, ঠিক তেমন মেয়েই পেয়েছি। আর শুনেছেন—ক্ষীরপুরের মেজ-বাবুর মেয়েরও নাকি এই মাসে বিয়ে। কলকাতার খুব বড় ঘরে বিয়ে হচ্ছে। কিন্তু এ আমি বলে রাখলাম, ও মেয়ের কপালে অনেক দুঃখ আছে।

বিধাতার কি আশ্চর্য্য বিধান, যেদিন বিপিনের বিবাহ সেই দিনেই ক্ষীরপুরের মেজবাবুর মেয়েরও দিন স্থির হইল। বিপিনদেরই গ্রামের রেল-ষ্টেশনে বহু বরযাত্রীসহ যখন বর ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে নামিল, তখন নানারকম বাজী পুড়িতে লাগিল ও বাজনা বাজিয়া উঠিল। বাজী-বাজনা-বোম-হাউই প্রভৃতিতে সমস্ত গ্রাম সচকিত হইয়া উঠিল, লোকজনের কোলাহলে ও নানাপ্রকার ধুমধামে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার ঘুম ভাঙিয়া গেল। উহারা মহাসমারোহে চলিয়া যাইবার পর, বিপিন পাল্কীতে চড়িয়া এবং দুইখানি গরুর গাড়ীতে পুরোহিত ও বরযাত্রীসহ গ্রামান্তরে বিবাহ করিতে চলিল। ইহাদের বাজী নাই, আলো নাই, বাজনা নাই। মৃদু লণ্ঠনের আলোতে, গরুর গাড়ী ধীর গতিতে গ্রাম্য পথ ভাঙিয়া, মাঠের ভিতর দিয়া, কখনও নিবিড় জঙ্গল ও লোকালয়ের পাশ দিয়া চলিতে লাগিল।

নির্ব্বিঘ্নে বিপিনের বিবাহ শেষ হইয়া গেল, বধূ লইয়া বিপিন বাড়ী চলিয়া আসিল। গ্রামের নিরীহ স্কুলমাষ্টারের বৌ—অপরূপ সুন্দরীও নহে—তেমন কিছু যৌতুক বা দানসামগ্রীও বিপিন পায় নাই।

প্রতিবেশীরা ক্ষীরপুরের মেজবাবুর মেয়ের বিবাহে গিয়াছিল, তাহারা আসিয়া বিবাহের বর্ণনা দিল। কি বিরাট ব্যাপার—কি ধুমধাম—কি সে সমারোহ আর ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য। যেমন দানসামগ্রী, তেমনি কন্যার সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কারের রাশি। পিতল কাঁসার বাসন—রূপার বাসনকোসন, খাট, টেবিল, চেয়ার, আয়না—কত যে জিনিষ, তাহা আর বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। একজন আক্ষেপ করিয়া বলিল, আহা, এ সবই বিপিনের হ'ত গো—কিন্তু সবই কপাল—।

প্রতিবেশীরা চলিয়া যাইবার পর বিপিন তাহার কিশোরী বধূকে কাছে টানিয়া লইল। বধূ সুন্দরী নহে বটে, তবুও মুখখানি এত সুকুমার, এত কাঁচা ও কচি যে, সংসারের কোন কিছু তাহাকে যেন স্পর্শ করে নাই। সে যে যৌবনে পা দিতে চলিয়াছে—এই খবরটিও যেন তাহার অন্তরে পৌঁছায় নাই। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতে-ছিল, স্নিগ্ধ নিভৃত পল্লীর উপর সন্ধ্যার স্নিগ্ধ ছায়া প্রসারিত হইতে-ছিল। চৈত্রের শস্যশূন্য, দিগন্তপ্রসারিত ধূসর মাঠের মধ্যে সূর্য্যাস্তের শেষ আবীর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রাখালেরা রাস্তার ধূলি উড়াইয়া, গরুর পাল লইয়া ফিরিতেছে, ঘরে ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিতেছে। সেই নিভৃত নিঃশব্দ শান্তির মধ্যে, কিশোরী বধূ শান্তির হাতে হাত রাখিয়া বিপিনের মন একটা অনাবিল আনন্দে ভরিয়া উঠিল, সে দুই চক্ষু মুদ্রিত করিল। তাহার মনে হইল, এই তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সংসার-সাগরের এক পাশে, এই নিভৃত নিরালা পল্লীতে, আজ যে নূতন জীবন আসিয়া তাহার জীবনের সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহাকে লইয়াই তাহার জীবন যেন চির-কালের মত সুন্দর ও সহজ হয়। সন্ধ্যার স্নিগ্ধ হাওয়ার সহিত আম্রমুকুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিয়া সেই অখণ্ড শান্তিকে যেন আরও নিবিড় ভাবে আবিষ্ট করিয়া তুলিল। তাহার মনে হইল, এই ত বেশ। তাহার বড়লোক হইবার বাসনা নাই—ঐশ্বর্য্য সে চাহে না। টুনুর সহিত বিবাহ না হইয়া ভালই হইয়াছে। ঐশ্বর্য্য ও প্রাচুর্য্যের জ্বালা হইতে সে পরিত্রাণ পাইয়াছে।

ইহার পর দেড় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

বিপিনের জীবন ঠিক সেই ভাবেই চলিতেছে। সেই গ্রামের স্কুলে, সামান্য বেতনে শিক্ষকতা করিয়া সংসার চালাইতেছে। ইতি-মধ্যে বিপিনের একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে। সুখে-দুঃখে সংসার চলিয়া যাইতেছে।

অভাবের সময় ধার করে, আবার হাতে টাকা আসিলে শোধ করিয়া দেয়। মাহিনা পাইলে শান্তির জন্য এক গজ সস্তা ছিট, অথবা একখানি রঙীন তাঁতের সাড়ি কিনিয়া তাহার হাতে দেয়। শান্তি হাসিমুখে সাড়িখানি লইয়া বলে, বাঃ ভারি চমৎকার পাড় ত—তা বাপু, আমার জন্যে কেন? তোমার ত কাপড় সব ছিঁড়ে গেছে, তোমার একখানা ধুতি কিনলেই পারতে।—বিপিন শুধু হাসে। ছেলেটিকে কোলে লইয়া আদর করিতে থাকে। পিতার আদরের আতিশয্যে শিশু দুই রাঙা ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিয়া উঠে। শান্তি তাড়াতাড়ি ছেলেকে কোলে লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলে, আবার কাঁদালে ত। এখন আমার কত কাজ পড়ে রয়েছে। দেখ দেখি কি জ্বালাতন—। শান্তি সকোপে বিপিনের দিকে তাকায়।

স্কুল হইতে ফিরিয়া বিপিন বাগানে কাজ করিতে থাকে। কোদাল দিয়া মাটি কোপায়—শান্তি ঘড়া ঘড়া জল আনিয়া গাছে ঢালে। ছুটির দিনে দুপুরে বিপিন মেঝের উপর শুইয়া শুইয়া খবরের কাগজ অথবা পুরাতন কোন মাসিক পত্রিকা পড়িতে থাকে। পাশে শিশুপুত্রটি ঘুমায়। শান্তি যত রাজ্যের ছেঁড়া কাপড়-চোপড় দিয়া, ছোট ছোট কাঁথা সেলাই করিতে থাকে। কোন দিন হাঁড়ি হাঁড়ি ধান সিদ্ধ করে, বিপিন উঠানের রোদে ধান ছড়াইয়া দিয়া পাহারা দেয়। এমনি সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অজস্র ছোট বড় কাজের মধ্যে উভয়কে ভালবাসিয়া, বিশ্বাস করিয়া, জীবনের পথে তাহারা চলিতে থাকে। সংসারে অভাব নিত্য লাগিয়াই আছে, কিন্তু তবুও কোন অশান্তি নাই—ঝগড়া নাই।

সেবার স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার পর বিপিন একবার কলিকাতায় গেল। ইচ্ছা—গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক ও খাতা পেনসিল প্রভৃতির ব্যবসা করিবে। এই ব্যবসাটি সাময়িক হইলেও বেশ কিছু আয় হয়। তাই প্রকাশকদের সহিত কমিশন প্রভৃতির ব্যবস্থা পাকা করিবার জন্য বিপিন কলিকাতায় আসিয়াছিল। সেদিন দুপুরের রোদে এখানে ওখানে টো টো করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত পদে হাঁটিতেছিল। ভাবিল, কোন এক চায়ের দোকানে ঢুকিয়া এক কাপ চা ও কিছু খাবার খাইয়া শরীরটাকে চাঙ্গা করিয়া লইবে। সেই উদ্দেশ্যে ফুটপাথ হইতে নামিয়া অন্য ধারে যাইবার জন্য রাস্তায় পা দিয়াই পিছাইয়া আসিল। একখানি মোটর একেবারে তাহার গা ঘেঁষিয়া থামিয়া পড়িল। বিপিন অবাক হইয়া দেখিল, এক সুন্দরী তরুণী মোটর চালাইতেছেন। তরুণীটি বলিল—চিনতে পারেন—পারেন না? আশ্চর্য্য—দেখুন দেখি ভাল করে। এই বলিয়া তরুণীটি টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।—বিপিন অবাক বিস্ময়ে, নিষ্পলক নেত্রে শুধু চাহিয়া রহিল। তরুণীটি আর কোন কথা না বলিয়া, বাঁ হাত দিয়া দরজাটি খুলিয়া বলিল, আসুন—পরিচয় দিচ্ছি—আসুন—ভয় নেই। আমি টুনু—ক্ষীরপুরের—আর বলিতে হইল না—এইবার বিপিন বেশ চিনিয়াছে।

কিন্তু একি ব্যাপার? সেই ক্ষীরপুরের প্রগলভা মেয়ে। টুনু, যে একদিন তাহার প্রতি অপমানসূচক উক্তি করিয়াছিল, আজ সে রাস্তার মাঝে নিজে সাদরে ডাকিয়া তাহারই মোটরে একেবারে নিজের পাশে বসাইল। গ্রাম্য স্কুলের পাঠশালার দরিদ্র শিক্ষক অবাক হইয়া গেল। কিন্তু সেই টুনু—সেই ক্ষীরপুরের মেয়ে টুনুর সহিত আজ এই টুনুর কত তফাৎ। যে হীরা ছিল খনির ভিতর ধুলা-মাটির সহিত, সেই হীরককে কে যেন কাটিয়া ছাঁটিয়া ঘসিয়া মাজিয়া নূতনভাবে তৈয়ারি করিয়াছে। টুনুর সর্ব্বাঙ্গ দিয়া উগ্র রূপের আগুন যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছে। বিপিন অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল। টুনু মোটর চালাইতে লাগিল, তাহার এলো খোঁপার উপর হইতে কাপড় খসিয়া গিয়াছে, হাতের সরু সোনার চুড়ি দামী হাত-ঘড়ি চিক্‌চিক্ করিতেছে। বাতাসে টুনুর চুল উড়িতেছে—আঁচল উড়িতেছে। মোটর দ্রুতবেগে সম্মুখে ছুটিয়া চলিতেছে। বাতাসে টুনুর ঘন চুলের গুচ্ছ হইতে দু'একটি চূর্ণ কুন্তল মুখের এদিকে-সেদিকে দোলা খাইতেছে—একটা মৃদু সুগন্ধ বার বার বিপিনের নাকে আসিয়া লাগিতে লাগিল। বিপিন আড়ষ্টভাবে কাঠ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। রাস্তায় টুনু আর কোন কথা বলিল না।

অবশেষে মোটরখানি আসিয়া থামিল একটি অভিজাত হোটেলের সম্মুখে। টুনু বলিল, আসুন বিপিনবাবু।···একখানি টেবিলের দুই ধারে মুখোমুখি দুই জনে বসিল। টুনুই চা আর খাবারের হুকুম করিল। বিপিন সেখানকার আভিজাত্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য করিল এবং নিজের ময়লা জামা-কাপড়ের দিকে আড়চোখে তাকাইয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। টুনুই বলিল, চা খান বিপিনবাবু। বিপিন চা খাইতে সুরু করিল। টুনু হাসিয়া বলিল, আচ্ছা আপনার বৌ কেমন হ'ল বিপিনবাবু। আমার মত—না আমার চেয়ে সুন্দরী? বিপিন লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, অস্ফুট স্বরে কি যে বলিল, তাহা যেন নিজেও শুনিতে পাইল না। চায়ে চুমুক দিয়া টুনু বলিল, খুব মুশকিলে পড়েছেন না? ভাবছেন একদিন যে মেয়ে মুখের ওপর কথা শুনিয়েছিল—আজ সে যেচে এত খাতির করছে কেন? তা নয়—হাজার হোক, দেশের লোক যে আপনি, এখানে দেশের লোকের মুখ দেখলে বড় ভাল লাগে, মনে হয় এরা আমার সবচেয়ে আপনজন। সিগারেট খান তো? বেয়ারাকে আনতে বলি, খান না—বাঃ বেশ। তাহার প্রগলভতায় বিপিন আশ্চর্য্য হইয়া গেল। অবাক বিস্ময়ে বিপিন হাঁ করিয়া টুনুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। টুনু মৃদু হাসিতে লাগিল বলিল, আচ্ছা বিপিনবাবু আপনার বৌ যদি শোনে এই সব—তবে কি ভাববে বলুন তো—বেচারা বোধ করি কেঁদেই আকুল হবে, না? টুনু খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসি থামাইয়া টুনু বলিল, ভাল কথা—কি জন্যে কলকাতা

কথাকলি নৃত্যের একটি ভঙ্গী
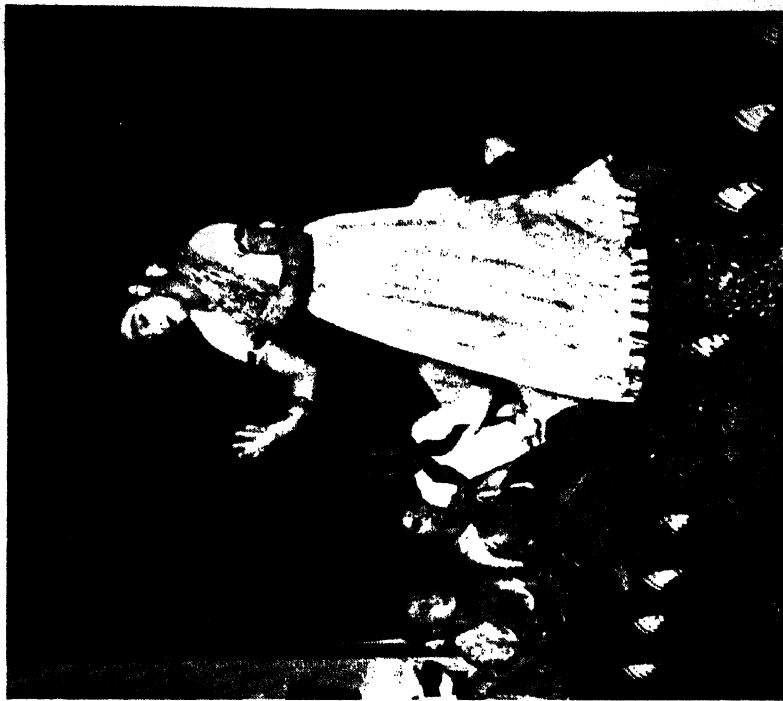
কথাকলি নৃত্যানুষ্ঠান—মুদ্রা-রচনা

ম্যালেরিয়া-নিয়ন্ত্রণ-কার্য্যে রত একটি ম্যালেরিয়া 'ইউনিটে'র কর্ম্মিগণ
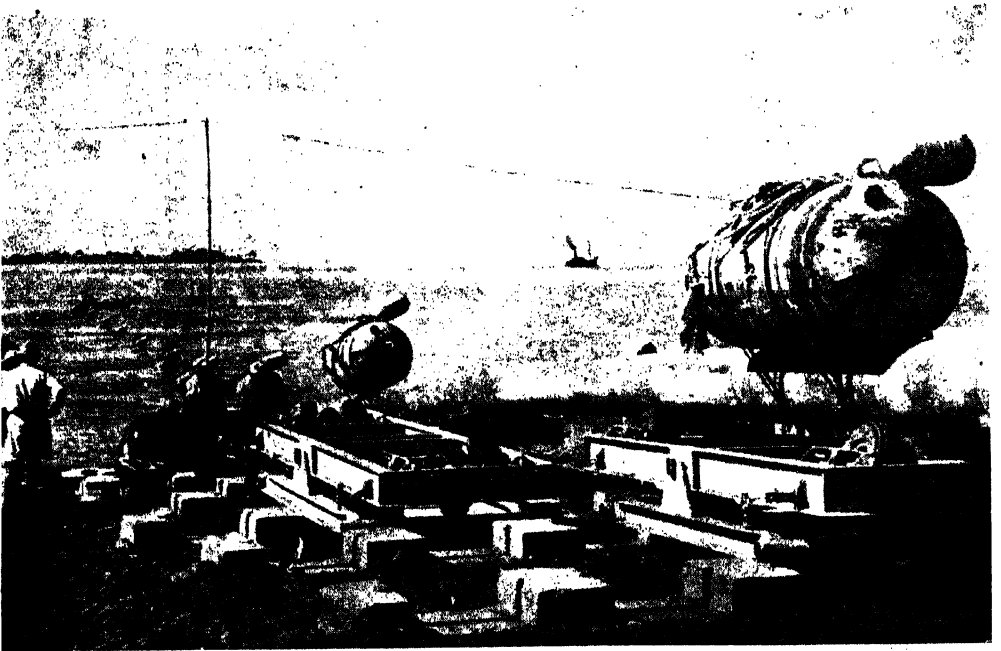
ব্র্যাম্বে, তৈলবিশোধনাগার ও বুচার আয়ল্যাণ্ডে'র মধ্যে যোগস্থাপনকারী সাবমেরিণ তৈলনালীর একাংশ

এসেছেন, তা তো বললেন না? চাকরি-বাকরির খোঁজে নাকি?

বিপিন বলিল, না এই স্কুলের একটু কাজে।

ওঃ। স্কুলের কাজে? স্কুল—সেই তো পাঠশালা। গুরুগিরি আর কতদিন করবেন। ওতে চলে? তার চেয়ে অন্য চাকরি করেন না কেন? করবেন? ওঁকে বললেই হয় কিন্তু—

বিপিন বলিল, ইয়ে—শম্ভুবাবু কোথায়?

—তিনি? তিনি তাঁর ব্যবসায় নিয়ে মেতে আছেন। লোহার কারবারী, মনটাও তাই লোহার মতন। কোন রসকষ নেই—খালি টাকা আর টাকা। বুঝলেন বিপিনবাবু। ওঁর টাকা আছে—কিন্তু হৃদয় নেই। আবার যাদের হৃদয় আছে তাদের টাকা নেই। পৃথিবীর এটাই মজা। পুরো মানুষ পাবার উপায় নেই। আপনার ছেলেপুলে কি? এক ছেলে—বাঃ। এর মধ্যেই ছেলের বাবা হয়েছেন। কিন্তু আর না। রাত ন'টায় ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে হবে—চলুন। বিপিন বলিল, ডিরেক্টর? কিসের—। সহাস্যে টুনু বলিল, বাঃ! জানেন না বুঝি। আমি যে সিনেমায় নেমেছি। 'ঝড়ের শেষে' বই দেখেন নি বুঝি। আর একখানা নতুন বইয়ে নামব, তারই কনট্রাক্ট আজ হবে। কাল থেকে যান বিপিনবাবু, আমার অভিনয় দেখে যান।

বিপিন বলিল, নাঃ এ যাত্রা আর হ'ল না। স্কুল কামাই হবে। টুনু ও বিপিন মোটরে উঠিয়া বসিল। টুনু বলিল, কোথায় নামবেন বলুন। নামিয়ে দিয়ে যাব। বিপিন বলিল, থাকি এক বন্ধুর বাসায়। বৌবাজারের মোড়ে নামিয়ে দিলেই হবে। কিন্তু এখন কোথায় যাবেন?

সবিস্ময়ে টুনু বলিল, কে, আমি? আমি এখন কত জায়গায় যাব, তার কি ঠিক আছে। কেন বলুন তো—

বিপিন বলিল, না—মানে, একা একা যাবেন তো।

হিঃ হিঃ করিয়া হাসিয়া টুনু বলিল, তা ছাড়া সঙ্গী পাচ্ছি কোথায়? বললাম তো সঙ্গী হোন—কিন্তু রাজী হচ্ছেন না—

হঠাৎ কি ভাবিয়া বিপিন বলিয়া ফেলিল, শম্ভুবাবুর সঙ্গে যাওয়াই ভাল—

টুনু মোটরের বেগ আরও বাড়াইয়া দিয়া বলিল, ওঃ তিনি? বাঃ বেশ সঙ্গীর নাম করেছেন আপনি। তিনি আছেন তাঁর দোকানে, তা ছাড়া এসব তিনি পছন্দ করেন না—

—তাই নাকি? তবে স্বামীর অমতেই এসব করছেন। এ তো ভাল নয়—

টুনু যেন জ্বলিয়া উঠিল, ভাল নয়? কেন নয়? আমি কি মানুষ নই—আমার সাধ-আহ্লাদ, স্বাধীনতা বলে কি কিছুই নেই। কি ভাবেন আপনারা মেয়েদের বলুন তো। তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ এই—তিনি স্বামী, আমি স্ত্রী। আমি সে সম্বন্ধ হতে মুক্তি নিচ্ছি বিপিনবাবু। ডাইভোর্স—যাকে বলে বিবাহ-বিচ্ছেদ করব।

বিপিন যেন আকাশ হইতে পড়িল—কোনমতে শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, বিবাহ-বিচ্ছেদ? বলেন কি—

—হাঁ। ওই ত বললাম বিপিন বাবু—যার টাকা আছে, তার হৃদয় নেই—আর যার হৃদয় আছে, তার টাকা নেই। টাকা আর হৃদয়—মনের আর মতের মিল—এ সব এক সঙ্গে পাওয়া যায় না—ভারি দুর্লভ—এটাই বড় মুশকিলের কথা। একটা কথা বলি, একদিন আপনাকে মুখের ওপর কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার জিৎ হয় নি, বরং হারই হয়েছে—।

মোটর দ্রুত গতিতে ছুটিয়া চলিল—। বিপিন টুনুর দিকে চাহিয়া, শুষ্ক মুখে কি যেন ভাবিতে লাগিল।...

পরের দিন, বিপিন যখন গ্রামের ষ্টেশনে নামিল, তখন বৈকাল-বেলা। অকালে আকাশ ভাঙিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে। গ্রাম্য রাস্তা কাদায় জলে একহাঁটু—চারিদিক ইহারই মধ্যে অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষুদ্র রেল ষ্টেশনে ট্রেন মুহূর্তখানেক থামিয়া আবার সেই জল মাথায় করিয়া ছুটিয়া চলিল। বিপিন জীর্ণ ছাতাটি মেলিয়া, জলে-ডোবা রাস্তায় নামিল। বৃষ্টিতে পথ-ঘাট খাল মাঠ ডুবিয়া গিয়াছে—রাস্তার উপর বাঁশঝাড় নুইয়া পড়িয়াছে। বিপিন জল কাদা ভাঙিতে ভাঙিতে হাঁটিতে লাগিল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার শেষে বিপিন ঘরে আসিল। স্বল্পরিসর বিছানা—এক পাশে খোকা ঘুমাইতেছে। তখনও তেমনি ঝম ঝম শব্দে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। এলোমেলো সজল হাওয়া বহিতেছে—আকাশে গুরু গুরু করিয়া মেঘ ডাকিতেছে—মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিতেছে। ঘরের ভিতর হ্যারিকেনের আলোটি স্তিমিতভাবে জ্বলিতেছে। শান্তির এখনও রান্নাঘরের কাজ শেষ হয় নাই। বিপিন আনমনে শুধু টুনুর কথাই ভাবিতেছিল। তাহার বার বার মনে হইতেছিল—আহা টুনু শেষে দুঃখ পাইবে। বিপিনের মনে পড়িল, টুনুর কথাগুলি—তার উগ্র রূপের প্রখরতা—আর দ্রুত মোটর চালাইবার ইচ্ছা—। ঐ রূপ—ঐ যৌবন লইয়া, সে যে পথে ছুটিয়া চলিয়াছে—উহাতে পরিণামে কি সুখ-শান্তি আসিবে? আজ এই বর্ষণমুখর নিভৃত অন্ধকার রাত্রিতে বিপিন বার বার টুনুর কথাই ভাবিতে লাগিল। এক দিন সে তাহাকে অপমান করিতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই—আজ সে-ই তাহাকে যাচিয়া, সাদরে কাছে টানিয়া কি যেন বলিতে চাহিয়াছিল—কিসের বেদনা যেন প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিল। বিপিন ভাবিয়া দেখিল, টুনুর সেই কথা ভুলিতে পারে নাই। যে একদিন অবহেলা করিয়াছিল, যে তাহার তরুণ জীবনে বেদনা দিয়াছিল—ব্যথা দিয়াছিল, প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছিল; কৈ তাহার স্মৃতি ত একেবারে নিঃশেষে অবলুপ্ত হয় নাই, বরং হৃদয়ের অতি নিভৃতে এক-প্রান্তে স্থান জুড়িয়া টুনুর আসন পাতা ছিল। আজ সময়ের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে দুই জনে পরস্পরের কাছাকাছি আসিয়াছিল, খানিক সান্নিধ্যের পর আবার দুই জনে বিপরীত দিকে চলিয়া গেল।

হঠাৎ খট করিয়া শব্দ হইতেই বিপিন সজাগ হইয়া দেখিল, শান্তি হাসিমুখে খোকার দুধ লইয়া ঘরে ঢুকিতেছে। বৃষ্টির ছাটে শান্তির কাপড় ভিজিয়াছে—মাথা হাত মুখ সবই জলে ভাসিয়া গিয়াছে। শান্তি বলিল, কি গো—বসে বসে কার ধ্যান করছ?

বিপিন কি মনে ভাবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া জামার পকেট হইতে একগাছি ফুলের মালা বাহির করিয়া শান্তির গলায় পরাইয়া দিল।

সবিস্ময়ে শান্তি বলিল—বাঃ এ আবার কি—

বিপিন বলিল, কলকাতা থেকে কিনে এনেছি। আজকের তারিখটা মনে নেই বুঝি। আজ যে আটাশে, আমাদের বিয়ের দিন—।

হায়দর আলি এবং তাঁহার ইউরোপীয় সেনানীবর্গ

অমৃজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

হায়দরের পিতা ফতে মহম্মদ মহীশুর রাজ্যের জনৈক ফৌজদার বা অধস্তন সেনানায়ক ছিলেন। সাহবাজ বা ইস্মাইল নামে হায়দরের দুই বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ এক ভ্রাতাও ছিল। নিতান্ত অল্প বয়সে ভ্রাতৃদ্বয়ের পিতৃবিয়োগ হয়। নাবালক পুত্র দুটিকে লইয়া তাহাদের জননীর দুর্দ্দশার অন্ত রহিল না। নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর সাহবাজ মহীশুরী সেনাবিভাগে প্রবেশ করে। তখনকার দিনে উৎসাহী কৃতী ব্যক্তির পদোন্নতিতে বিলম্ব ঘটিত না। দেবানপল্লী অভিযানে (১৭৪৯ খ্রীঃ) ভ্রাতৃদ্বয়ের কৃতিত্ব দর্শনে প্রীত হইয়া মহীশুরের দলবাই বা প্রধান সেনাপতি নন্দিরাজ* জ্যেষ্ঠকে বাঙ্গালোর প্রদেশ জায়গীর এবং কনিষ্ঠকে অধস্তন সেনানায়কের পদ দিয়াছিলেন। কর্ণাটক সমরকালে নিজাম নাসিরজঙ্গের সাহায্যার্থ মহীশুর হইতে যে সৈন্যদল প্রেরিত হইয়াছিল ভ্রাতৃদ্বয়ও তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সমরাবসানে স্বদেশে ফিরিবার পথে হায়দর পণ্ডিচেরী দেখিতে যান। তথায় ফরাসীদের দুর্গ, বন্দর, সৈন্যদল, নৌবহর, অস্ত্রশস্ত্র, শিল্প-বাণিজ্য—বিশেষতঃ অদ্ভুতকর্ম্মা দুপ্লেকে দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। পাশ্চাত্ত্য সমরপদ্ধতির উৎকর্ষই যে ইউরোপীয়দের প্রতিষ্ঠার মূল কারণ, তাহা তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং মহীশুরে ফিরিয়া সাহবাজকে সকল কথা বুঝাইয়া ইউরোপীয় সৈনিকলাভে সমুৎসুক করিয়া তুলিয়াছিলেন। মালাবার উপকূল হইতে ক্রমে বিভিন্ন প্রদেশীয়, ইউরোপীয় প্রায় ত্রিশ জন মাল্লা সংগৃহীত হয়। উহাদের হস্তে হায়দর তাঁহার তোপখানার ভার দিয়াছিলেন। ঐ সময় বোম্বাই-সরকারের নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্র কিনিবার জন্য ভ্রাতৃদ্বয় জনৈক পার্সী ব্যবসায়ীকে নিযুক্ত করেন। ঐ ব্যক্তি উহাদের নিকট হইতে ছয়টি মেঠো তোপ এবং ২০০০ সঙ্গীন সমেত বন্দুক ক্রয় করিয়াছিল। সুতরাং সাহবাজ এবং হায়দরকেই আমরা প্রথম ভারতীয় সর্দ্দার বলিতে পারি যাঁহারা বন্দুক-বেয়নেটে সজ্জিত সিপাহী-সেনা এবং ইউরোপীয় গোলন্দাজদল সংগঠন করিয়াছিলেন।

দুপ্লের প্ররোচনায় ইহার অল্পকাল পরেই নন্দিরাজ তাঁর মিত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া ফরাসীপক্ষ অবলম্বন করিলেন। এরূপ কার্য্যের প্রধান কারণ, ত্রিচিনপল্লী প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া মহীশুরী সাহায্য লাভ করা সত্ত্বেও নবাব মহম্মদ আলি প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় তিনি তাঁহার প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছিলেন এবং এবারকার অভিযানের নেতৃত্ব হায়দরকে প্রদত্ত হইয়াছিল। যুদ্ধের বিবরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। হায়দর ফরাসীদের যতখানি সম্ভব কাছাকাছি শিবির স্থাপন করিতেন। ইহাতে বিরক্ত হইয়া ফরাসীরা নন্দিরাজের নিকট অনুযোগ করিলে তিনি কৈফিয়ত দিয়াছিলেন যে, উহাদের নিকট হইতে সামরিক জ্ঞানলাভের জন্য তিনি তাদের সান্নিধ্যকামী, তদ্ভিন্ন তাঁর অপর কোন উদ্দেশ্য নাই। বাস্তবিক হায়দর ফরাসী সৈনিকগণের যাবতীয় কার্য্যকলাপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। উহাদের অনুকরণে তিনি নিজ সিপাহীদিগকে ড্রিল এবং প্যারেড শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অনভ্যাসবশতঃ যখন উহারা হাস্যোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গীর সহিত ঐ সকল কার্য্য করিত তখন ফরাসীদের আমোদের সীমা থাকিত না। এইরূপে হায়দর পাশ্চাত্ত্য সমরপদ্ধতিতে কাজ চালাইবার মত জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। ফরাসী-কর্ত্তৃপক্ষ কিন্তু তাঁহার একটি কার্য্য প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। প্রলোভন দেখাইয়া তিনি বহু ফরাসী সৈনিককে নিজের দিকে ভাঙ্গাইয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু হায়দরকে হাতে রাখা তখন তাঁদের নিতান্ত প্রয়োজন, এমন কি অপরিহার্য্য ছিল বলিয়া উহারা সে বিষয়ে বাঙনিষ্পত্তি করেন নাই। হ্বেনেট নামক জনৈক ফরাসী সৈনিক এই সময় (১৭৫৩ খ্রীঃ) হায়দরের নিকট কার্য্য গ্রহণ করে। ঐ ব্যক্তি ফরাসীরাজের ভার্সাই-রাজপ্রাসাদের রক্ষী "সুইস গার্ড" নামক রেজিমেণ্টের একজন সৈনিকের পুত্র ছিল। ত্রিচিনপল্লী অবরোধের সময় সে কর্ণেল জ্যাক ল'য়ের দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দেও উহাকে মহীশুরী বাহিনীতে গোলন্দাজ-দলের ক্যাপ্টেন পদে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়।

---

* নেপালরাজ্যের মত মহীশুরে এই সময় সেনাপতিই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন; রাজা শুধু নামেই রাজা থাকিতেন।

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অপুত্রক সাহবাজের মৃত্যু হইলে হায়দর তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তির, মায় সামরিক জায়গীর, দুর্গ, সেনাদল প্রভৃতির অধিকারী হইয়াছিলেন। প্রধানমন্ত্রীও তাঁহাকে ভ্রাতার শূন্যপদে মহীশুরী বাহিনীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সময় হায়দরের সম্পূর্ণরূপে আজ্ঞাবহ নিজস্ব সেনাদলে ১৫০০০ অশ্বারোহী, ৩০০০ পদাতিক এবং দুই শতেরও অধিক ইউরোপীয় সৈনিক ছিল। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক, হায়দর আলি এবং টিপু অন্যান্য সমসাময়িক রাজগণের মত ইউরোপীয় অফিসারবৃন্দ কর্ত্তৃক গঠিত পাশ্চাত্ত্য সমর-পদ্ধতিতে শিক্ষিত সিপাহীবাহিনী গঠনে যত্নবান ছিলেন না। অশ্বারোহী, পদাতিক অথবা গোলন্দাজ ইউরোপীয় সৈনিক-লাভেই তাঁহারা আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং সেজন্য যথেষ্ট অর্থব্যয়ও করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এক সময়ে মহীশুরী সেনাদলে ইউরোপীয় সৈনিকের সংখ্যা আট শতেরও অধিক ছিল। ফরাসী শিল্পীদের সাহায্যে হায়দর স্বীয় প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানাও স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ-হস্তে পণ্ডিচেরীর পতনের পর বহু ফরাসী সৈনিক শত্রুর হাত হইতে কোনমতে আত্মরক্ষা করিয়া অপর কোন আশ্রয়স্থলের অভাবে হায়দর-সকাশে আগমন করিয়াছিল। প্রখ্যাতনামা মেজর আর্লে, কর্ণেল হুগেল, দেলাতুর, রাসেল এবং সম্ভবতঃ কনিষ্ঠ লালীও এই সময় তাঁহার কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ডম এণ্টনিও নরোনহার কথা বলা প্রয়োজন। উহার প্রথম জীবন, ভারতবর্ষে আগমনের কারণ বা সময় সবকিছুই অজ্ঞাত। নামেমাত্র বিদ্যমান এসিয়া মাইনরের অন্তঃপাতী হালিকার্নাসাসের (আধুনিক নাম Budrun) তিনি নাকি বিশপ ছিলেন। উক্ত পদ তাঁহাকে কে দিয়াছিল জানা যায় নাই। পণ্ডিচেরীর উপকণ্ঠে উল্গালগারেট নামক স্থানে তিনি কিছুকাল বাস করেন এবং তথা হইতে পাওনাদারের তাগাদায় উত্যক্ত হইয়া দেশের অভ্যন্তরভাগে ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্বেষণে গিয়াছিলেন। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে সাভানুরে মজঃফরজঙ্গ নামক জনৈক ব্যক্তির অতিথিরূপে উঁহাকে বাস করিতে দেখা যায়। ঐ ব্যক্তি প্রথমে পর্ত্তুগীজ সেনাদলে একজন সাধারণ সিপাহী ছিল, পরে কতকগুলি অনুচর সংগ্রহ করিয়া সে এক দস্যুসর্দ্দার বা বৈদেশিক ভাগ্যান্বেষী সৈনিকে পরিণত হইয়াছিল—যদৃচ্ছা লুণ্ঠন অথবা অর্থ-বিনিময়ে পরের জন্য যুদ্ধ করা—ইহাই ছিল তাহার পেশা। 'রতনেই রতন চেনে!' অল্পদিনেই উভয় বন্ধুতে মিলিয়া নিকটবর্ত্তী জনপদসমূহ উৎসাদিত করিয়া ফেলিলেন। নরোনহার এই সময়ে একটি দেশীয় নামকরণ হইয়াছিল দিলবর জঙ্গ। তিনি সর্ব্বত্র প্রচার করিলেন যে, গোয়া এবং পণ্ডিচেরীর কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে, যে-কোন নৃপতি বা সর্দ্দার অর্থবিনিময়ে ফিরিঙ্গী সৈনিক লাভ করিতে চাহেন তাহাকেই তিনি উহাদের নিকট হইতে সহস্র সহস্র সৈনিক সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন। গুটির মরাঠা-সর্দ্দার মুরারি রাও তাঁহাকে এক হাজার পর্ত্তুগীজ সৈনিক যোগাড় করিয়া দিবার ভার দিলে নরোনহা গোয়া গিয়াছিলেন (ফেব্রুয়ারী ১৭৫৬)। বলা বাহুল্য, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। শূন্য হস্তে ফিরিতে সাহস না হওয়ায় তিনি পুনরায় পণ্ডিচেরীতেই গমন করিলেন। পথিমধ্যে আওরঙ্গাবাদে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী সেনাপতি বুশীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পাওনাদারদের হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধক্রমে গভর্ণর দে লেরিটের নামে একখানি পত্র তাঁহার নিকট হইতে লিখাইয়া লইয়াছিলেন।

সপ্তবর্ষব্যাপী সমরে ইংরেজ সেনা কর্ত্তৃক পণ্ডিচেরী অবরুদ্ধ হইলে স্বদেশ হইতে কোন প্রকার সাহায্যপ্রাপ্তির আশা নাই দেখিয়া লালী নরোনহাকে দেশীয় দরবারসমূহ হইতে সাহায্যলাভের জন্য চেষ্টা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। কড়াপানাথমের মরাঠা সর্দ্দার বিশ্বজী পন্থ এককালে ফরাসীদিগের অনুগত ছিলেন। তাঁহাকে পুনরায় সপক্ষে আনিবার জন্য সচেষ্ট হইতে নরোনহা আদিষ্ট হইলেন। ঘনান্ধকার নিশীথে পোতারোহণে অবরুদ্ধ নগরী পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর শ্যেনদৃষ্টি কোনমতে এড়াইয়া তিনি দিনেমার অধিকৃত ট্রাঙ্কুইবারে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং অদূরে সংস্থিত কর্ণেল পেষ্টনের বাহিনীর পাশ কাটাইয়া কুম্ভকোনমের সন্নিকটে কাবেরী নদী উত্তীর্ণ হইয়া দশম দিনে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইলেন। কিন্তু মহম্মদ আলির চরেরা তৎপূর্ব্বেই তথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল এবং সর্দ্দার যাহাতে ফরাসীপক্ষ অবলম্বন না করেন তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। অতঃপর দুই দলে দরকষাকষি আরম্ভ হইল। নরোনহা অর্দ্ধ লক্ষ টাকা দর দিতে চাহিলে অপর পক্ষ পাঁচ লক্ষ টাকা হাঁকিল। ফরাসী রাজভাণ্ডার তখন শূন্য, নরোনহা নগদ দর আর বাড়াইতে না পারিয়া থিয়াগার দুর্গ পাল্লায় চাপাইলে প্রতিপক্ষ দশ লক্ষ টাকা দর হাঁকিয়া বসিল। তিনি সুবিখ্যাত গিঞ্জি দুর্গের দর বাড়াইলে উত্তরে অপর পক্ষ কুড়ি লক্ষ টাকা হাঁকিল। ইহার পর আর কথা চলে না। বিশ্বজী জানাইলেন ফরাসীদিগকে সাহায্য করিতে তিনি অপারগ। নরোনহা আর পণ্ডিচেরী ফিরিলেন না। তখন পণ্ডিচেরী প্রত্যাবর্ত্তন আর ইংরেজের কারাগারে গমন একই কথা। আগমনকালে প্রায় দেড় শত সৈনিক এবং শিল্পী, যথা—কামার, ছুতার, মিস্ত্রী, অস্ত্রনির্ম্মাতা নরোনহার অনুগামী হইয়াছিল, খাদ্যাভাবে লালী উহাদিগকে অবরুদ্ধ নগরী হইতে বিদায় দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে লালী রসদ সংগ্রহ করিবার জন্য থিয়াগার এবং পার্ব্বত্য অঞ্চলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে মেজর আর্লে (Alain) এবং ক্যাপ্টেন হুগেলের (Hugel) নেতৃত্বে একদল সৈন্য রাখিয়াছিলেন। থিয়াগার দুর্গমধ্যেও একদল ফরাসী-সৈন্য রক্ষিত ছিল। লালীর অনুরোধে হায়দর পণ্ডিচেরীতে অবরুদ্ধ ফরাসীদিগের সাহায্যের জন্য তাঁহার শ্যালক এবং অন্যতম সুদক্ষ সেনানায়ক মখদুম আলি খাঁকে পাঠাইলেন। পথিমধ্যে আর্লে হুগেলের দল এবং থিয়াগা দুর্গের ফরাসী সেনা তাঁহার সহিত যোগদান করিল। পণ্ডিচেরীর অদূরে আসিয়া ক্ষুৎপীড়িত অবরুদ্ধ নগর-

বাসিগণের জন্য তিনি বহুবিধ আহার্য দ্রব্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু লালীকে তিনি কোনমতে নগর পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিতে সম্মত করাইতে পারেন নাই। দীর্ঘ দুই মাস কাল এই ভাবে কাটিয়া গেলে তিনি প্রত্যাবর্তন আরম্ভ করিলেন। বাধা-বিঘ্নসঙ্কুল পথে পতনোন্মুখ নগরীতে ফিরিয়া গিয়া ইংরেজের কারা-বরণ অপেক্ষা অসিহস্তে যশ ও অর্থের সন্ধানে মহীশুরে গমন করিয়া ভবিষ্যতের আশা-সমুজ্জ্বল ভাগ্যান্বেষী সৈনিক-বৃত্তি অবলম্বন শ্রেয়স্কর বিবেচনায় ফরাসীরাও তাঁহার অনুগামী হইয়াছিল। এই তিন বিভিন্ন দলে প্রায় দেড় শত ফরাসী পদাতিক, আড়াই শত অশ্বারোহী সৈনিক, শতাধিক সুদক্ষ শিল্পী ও মিস্ত্রী এবং কতকগুলি দেশীয় সিপাহীও ছিল। বলা বাহুল্য, এক সঙ্গে এতগুলি নূতন ফিরিঙ্গী সৈনিক লাভ করিয়া হায়দর সবিশেষ উৎফুল্লই হইয়াছিলেন, কারণ খণ্ডেরাও নামক জনৈক মরাঠা সর্দ্দারের চক্রান্তে তাঁহার সমস্ত ইউরোপীয় সৈনিক এই সময় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রতিপক্ষকে আশ্রয় করিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি এককালে হায়দরের কর্ম্মচারী ছিলেন, নিরক্ষর হায়দর শাসন-সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে উঁহার উপর নির্ভর করিতেন, তিনিই উঁহার সকল উন্নতির মূল, তাঁহারই চেষ্টায় মহীশুরাধিপতি উঁহাকে দলবা বা প্রধানমন্ত্রীর পদ দিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ পদে অধিষ্ঠিত হইয়া খণ্ডেরাও প্রধান সেনাপতির পদ হইতে হায়দরকে বিতাড়িত করিবার জন্য তৎপর হইলে উভয়ে বিরোধ বাধিল। খণ্ডেরাও পুণাদরবারকে সাহায্যার্থে আহ্বান করিলে মরাঠারা মহীশুর রাজ্য আক্রমণ করিল। এদিকে খণ্ডেরাওয়ের নিকট অধিকতর বেতনলাভের প্রলোভনে হায়দরের পর্তুগীজ এবং ফরাসী সৈনিকগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া উঁহার নিকট গমন করিল। তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য অন্যত্র যুদ্ধনিরত, এমন সময় শত্রুপক্ষ কর্তৃক সহসা আক্রান্ত হইয়া হায়দর তাঁহার শিবিরস্থ যাবতীয় দ্রব্যাদি, মায় স্বীয় পরিজনবর্গকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক কোনমতে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সুতরাং এই বিপদের দিনে অতগুলি শিক্ষিত নূতন সৈনিক-লাভে হায়দর যে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু বিশেষ কোন যুদ্ধবিগ্রহ হইল না। পণ্ডিচেরীর পতনের (১৭৬১ খ্রীঃ) সংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরাপথে পাণি-পথের কালসমরে মরাঠাদের শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল এবং উহারা সে সময়ে মহীশুর পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের রাষ্ট্ররক্ষা করিতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। তখন নিশ্চিন্ত এবং নববলে বলীয়ান হইয়া হায়দর খণ্ডেরাওয়ের সহিত বলপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই, কারণ খণ্ডেরাওয়ের সৈনিকগণকে তিনি প্রলোভনে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন; শুধু উহার দেহরক্ষীরা সামান্য বাধা দিয়াছিল। ইহাতে মেজর আর্লের দল নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইবার সুযোগ পাইল। উহারা প্রতিপক্ষের শিবিরের উপর আপতিত হইল এবং একটি প্রাণীরও প্রাণ বিনাশ ব্যতিরেকে তত্রস্থ যাবতীয় দ্রব্যাদি এবং তোপখানা অধিকার, মায় ফিরিঙ্গী গোলন্দাজ দল ও যে সকল ইউরোপীয় সৈনিক ইতিপূর্ব্বে হায়দরের নিকট হইতে তাঁহার দলে আসিয়াছিল তাহাদের সকলকেই ধৃত করিল।

যে সকল ইউরোপীয় ইতিপূর্ব্বে তাঁহার অথবা তাঁহার ভ্রাতার দলে ছিল তাহাদের তিনি সম্মুখে আসিবার আদেশ দিয়াছিলেন। উহাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া এবং প্রত্যেককে এক ঘা মারিয়া তিনি সকলকে শিবির হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। বলিয়াছি, তাঁহার সমগ্র সৈন্যবাহিনীর মধ্যে একমাত্র উহারাই তাঁহার এবং তাঁহার ভ্রাতার নিকট হইতে যথেষ্ট পরিমাণেই অনুকম্পা লাভ করা সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে দ্বিধামাত্র করে নাই। সেই জন্যই তিনি উহাদের বিরুদ্ধে এরূপ কঠোরতা অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছিলেন। পণ্ডিচেরী হইতে নবাগত ফরাসী সৈনিকগণ এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে এবং ইহা সমর্থনের ভানও করিয়াছিল। তখন আবার দুই দলে মিলিয়া একদলে পরিণত হইল। হায়দর প্রধান সেনাপতি-পদের সহিত দলবা বা প্রধানমন্ত্রী-পদও প্রাপ্ত হইলেন। খণ্ডেরাওকে এক লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া প্রকাশ্য স্থানে রাখা হইল। তাঁহার মৃত্যু ঘটিলেও জীর্ণ অস্থিগুলি দীর্ঘকাল ধরিয়াই ঐ ভাবে প্রদর্শিত হইতে থাকিল।

মেজর আর্লে, ক্যাপ্টেন হুগেল এবং দেলাতু'র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। প্রথম দুই জন ফরাসী সেনাবিভাগের উচ্চ-পদস্থ অফিসার ছিলেন—দেখা যায়। কিছুকাল পরে আর্লে অবসর লইলে হুগেল দলের অধ্যক্ষতা লাভ করেন। তিনি আলশাস প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন, সেই জন্য তাঁর নাম এই প্রকার জর্ম্মন ধরণের। প্রায় তিন বৎসর কাল তিনি হায়দরের কর্ম্মে নিরত ছিলেন এবং বহু অভিযানে স্বীয় কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে সাভানুরের অদূরে একটি যুদ্ধে কড়াপা, কুনুল এবং সাভানুরের পরাক্রান্ত পাঠান নবাবত্রয়ের পরাজয় সমধিক উল্লেখযোগ্য।*

স্বদেশে সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে পর্য্যুদস্ত করিবার পর হায়দর মরাঠাদের পাণিপথজনিত দুর্ব্বলতার সুযোগে সমীপবর্ত্তী অঞ্চলসমূহে, বিশেষতঃ কৃষ্ণাতটপ্রান্তে মহীশুরী অধিকার বিস্তারে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সে সকল অভিযানের কথা বলা এখানে অনাবশ্যক। নিজামের ভ্রাতা গুণ্টুর-আদোনির জায়গীরদার বসালৎজঙ্গও এই সুযোগে দাক্ষিণাত্যে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজপাট স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহার জায়গীর এবং মহীশুর রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী সিরা জনপদ মরাঠাদের দুর্ব্বলতার সুযোগে হস্তগত করিতে সমুৎসুক হইয়া তিনি সিরাদুর্গ অবরোধে (জুন ১৭৬১) প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অচিরেই তিনি দেখিলেন, উক্ত সুদৃঢ় দুর্গাধিকার তাঁহার সাধ্যের বাহিরে। তখন তিনি হায়দরের নিকট সাহায্যকামী হইলেন। নিজের সুবিধা ভিন্ন তাঁহাকে বিনা স্বার্থে সাহায্য করিতে যাইবার পাত্র

*Wilks:—*History of Mysore*, Vol. I, p. 459.

হায়দর অবশ্য একেবারেই ছিলেন না। বসালৎজঙ্গকে বাধ্য হইয়াই তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল। অন্যথায় অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া লজ্জাবনতমস্তকে প্রত্যাবর্তন করা ব্যতীত তাঁহার গত্যন্তর ছিল না। স্থির হইল, সিরা অধিকৃত হইলে তিন লক্ষ টাকার বিনিময়ে উক্ত সুবার নবাবীপদ হায়দর পাইবেন এবং কামান, গোলাবারুদ ইত্যাদি সমর ও রসদসম্ভার এবং অন্যান্য বহনোপযোগী দ্রব্যাদি বসালৎজঙ্গ লইবেন। অর্থাৎ বাঘ মারিবার পূর্ব্বেই তাহার চামড়া চর্ব্বি নখ দন্ত ভাগ হইয়া গেল। হায়দরের আক্রমণের এক মাসের মধ্যেই সিরার পতন হইল (নভেম্বর ১৭৬১)। বলা বাহুল্য, ইউরোপীয় গোলন্দাজগণের দ্বারা পরিচালিত তোপখানার জন্যই তাহা সম্ভবপর হইয়াছিল। কর্ণাটক প্রদেশে সিরা ছিল মরাঠাদের সমরসম্ভার এবং রসদের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র। দে লা তুর নিজেই বলিয়াছেন, ভারী কামানসমূহ অথবা অন্যান্য যাহাকিছু দ্রব্য তিনি স্বয়ং গ্রহণের অভিলাষী ছিলেন তৎসমুদয় গোপনে সরাইয়া ফেলিয়া অথবা ভূগর্ভে পুতিয়া ফেলিয়া মাত্র চার-পাঁচটি ভাঙ্গা কামান সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়া তিনি বসালৎজঙ্গকে বিজয় লাভের জন্য অভিনন্দিত করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন।*

নরোনহা ইহার পর আরও কিছু কাল হায়দর-সকাশে অবস্থান করেন। পাদ্রীপুঙ্গব হইলেও লোকটির ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনুরাগ অপেক্ষা সমরবিদ্যায় দক্ষতা অধিক ছিল। মরাঠা এবং তেলেঙ্গা পলিগড়গণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁহার সামরিক জ্ঞান ও পরামর্শ হায়দরের পক্ষে সবিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল। উহাকে তিনি বিপক্ষের দুর্গাধিকারের এক নূতন পন্থা শিখাইয়াছিলেন। এযাবৎ মহীশুরী সেনা সনাতন পদ্ধতিতে সুদীর্ঘ মইযোগে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করতঃ দুর্গাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দুর্গ অধিকারের চেষ্টা করিত, কিন্তু এতদঞ্চলের সুদৃঢ় গিরিদুর্গসমূহের বিরুদ্ধে সে উপায় বিশেষ কার্য্যকরী হইত না। তৎপরিবর্ত্তে দুর্গপ্রাকারের তলদেশে সুড়ঙ্গ খননপূর্ব্বক তন্মধ্যে বারুদ প্রোথিত করিয়া উহাতে অগ্নিসংযোগে বিস্ফোরণের ফলে প্রাচীরের একাংশ চূর্ণ করিয়া রন্ধ্রপথে সম্মুখ আক্রমণে নরোনহা মদকসিরা এবং চিক্কাবালাপুরের সুদৃঢ় দুর্গদ্বয় অধিকার করিয়া নিপুণ সেনাপতিত্ব ও প্রকৃত নির্ভীকতার পরিচয় প্রদান করেন। প্রথমটিতে হায়দরের সহিত তিনিও শত্রুপক্ষকে সম্মুখে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং যেখানেই সংগ্রামের জটিলতা সেখানেই তাঁহাকে দেখা গিয়াছিল। মধ্যে একবার সৈনিকগণ পশ্চাৎপদ হইবার ভাব দেখাইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার জলন্ত উৎসাহবাক্যে এবং অমিত সাহসের দৃষ্টান্তে সকলে অনুপ্রাণিত হইয়া পুনরায় আক্রমণে অগ্রসর হইলে সে বেগ রোধ করিতে অসমর্থ শত্রুসৈন্য রণে ভঙ্গ দিল। দ্বিতীয় যুদ্ধটিতে তিনি ভগ্ন প্রাকারপথে স্বীয় মুষ্টিমেয় অনুচরবৃন্দসহ প্রবেশ করিয়া মূল আক্রমণকারীদল আসিয়া না পৌঁছানো পর্য্যন্ত উহা বেদখল করিয়া রাখিয়াছিলেন।

* Wilks:—*History of Mysore*, Vol. I, p. 437; A. C. Banerji:—*Madhava Rao*, p. 36.

নরোনহার পক্ষে দীর্ঘকাল হায়দরের নিকট অবস্থান করা সম্ভবপর হইল না। উভয়েই গর্ব্বিত, দাম্ভিক, উদ্ধত এবং একান্ত ভাবে প্রতিবাদ-অসহিষ্ণু। মদকসিরার দরবার মধ্যে ইহাদের দুই জনের বালকোচিত চাপল্যের দীর্ঘ বিবরণ পিয়েক্সোটো* লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নরোনহা মহীশুর রাজ্য পরিত্যাগ করিতে চাহিলে তাঁহাকে অনুমতি এবং তজ্জন্য একটি গাইডও সঙ্গে দেওয়া হইল। উহাকে হায়দর গোপনে আদেশ দিয়াছিলেন যে অন্য পথে ঘুরাইয়া নরোনহাকে পুনরায় মহীশুর রাজ্যেই যেন সে ফিরাইয়া আনে। ধূর্ত্ততায় নরোনহাও বড় কম যাইতেন না, এরূপ কিছু যে ঘটিতে পারে তাহা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়া লইয়া তিনি অর্থপ্রদানে পথপ্রদর্শককে বশীভূত করিয়া তাহার সাহায্যে গোয়ায় গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এখানে আসিয়াই তাঁহার মনের মত একটি কাজ জুটিয়া গেল। গোয়া এবং সালসিতির নিরাপত্তার জন্য পর্ত্তুগীজ-কর্ত্তৃপক্ষ সমীপবর্ত্তী পোণ্ডা এবং জামবৌলিস নামক দুইটি অঞ্চল দীর্ঘকাল হইতে আত্মসাৎ করণের অভিলাষী ছিলেন। নরোনহা যখন গোয়ায় আসিয়া পৌঁছিলেন তখন (১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভ)† ডোমিঙ্গো ফ্রান্সো বেলিকো দি ভেলাস্কো নামে জনৈক সেনানীর নেতৃত্বে পশ্চিম হইতে একটি সামরিক অভিযান যাত্রার আয়োজন করিতেছিল। নরোনহাও নামে না হইলেও কার্য্যতঃ ভেলাস্কোর সহকারী এবং পরামর্শদাতা রূপে এই দলের সহিত চলিলেন। সুণ্ডা এবং ভোঁসলা রাজারা পর্ত্তুগীজদের সাহায্য করিবেন বলিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যকালে উহারা কিছুই করিলেন না। উহাদের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই ভেলাস্কো মাত্র ৭০০ সৈনিকসহ শত্রুরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রমাদ গণিয়া তিনি পশ্চাৎপদ হইবার চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে নরোনহার সাহসে এবং সামরিক কৃতিত্বে সকল দিক রক্ষা পাইল। সৈন্যদলের পরিচালনাভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া এবং পশ্চিম হইতে আরও ৪০০ জন দেশীয় সিপাহী চাহিয়া পাঠাইয়া তিনি পূর্ব্বকৃত ব্যবস্থামত যেন কিছুই ঘটে নাই সেই ভাবে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। কয়েক

* পর্ত্তুগীজ ভাষায় রচিত সন্দর্ভের পাণ্ডুলিপি ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে (Br. Mu. Addl. Mss. 1287.

† Dom Eloy gose borrea Eloy Piexoto হায়দরের একজন পর্ত্তুগীজ ভাগ্যান্বেষী সৈনিক। তাঁহার রচিত "হায়দর আলি খাঁর অভ্যুত্থানের কাহিনী" একখানি উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ। উহাতে হায়দর এবং তাঁহার নানা যুদ্ধাভিযান সম্বন্ধে বহু তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে। অন্যান্য সূত্র হইতেও পরিজ্ঞাত তথ্যসমূহের সহিত তাহাদের বিশেষ কোন তারতম্য দৃষ্ট হয় না। নরোনহা সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইল তাহা উক্ত গ্রন্থ হইতেই গৃহীত। লোকটি তাদৃশ শিক্ষিত ছিল না। উক্ত গ্রন্থের এক অপ্রকাশিত ইংরেজী অনুবাদের পাণ্ডুলিপি চার্লস ফিলিপ ব্রাউন নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে (No. Eur, D. 295) সংরক্ষিত আছে।

মাসের মধ্যে জেলা দুইটি অধিকৃত হইলে তথাকার শাসনভার তাঁহার হস্তেই প্রদত্ত হইয়াছিল (আগষ্ট ১৭৬৩ খ্রীঃ)। মরাঠা আধিপত্যের বিরুদ্ধে সমীপবর্ত্তী সর্দ্দারবৃন্দকে অভ্যুত্থানে প্ররোচিত করিতে তিনি আদিষ্ট হইয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় ছিল এইরূপে তাঁহাদের রাজ্য-সীমা আরও দক্ষিণে এবং পূর্ব্বদিকে বিস্তার করা। এ কার্য্য নরোনহার খুবই রুচিকর ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু কার্য্যভার গ্রহণের পূর্ব্বেই হুগেলের গোয়াতে আগমন-সংবাদে তাঁহাকে তথায় ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। তাহার কারণ যথাস্থানে বলা যাইবে।

কিরূপে সামান্য হায়দর নায়েক নিজ কর্ম্মক্ষমতা এবং শক্তি-বলে ক্রমে মহীশুর রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর এবং প্রবল প্রতাপান্বিত হায়দর আলি খাঁ বাহাদুরে পরিণত হইয়াছিলেন সে ইতিহাস অন্যত্র দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার দরবারে ভাগ্যান্বেষণ নিরত ইউরোপীয় সৈনিকগণের কাহিনী-প্রসঙ্গে সাধারণ ভাবে কিছু কিছু বলা যাইতেছে মাত্র। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে হায়দর বেদনুর রাজ্য জয় করেন। এই বিজয়লাভ তিনি তাঁহার পরবর্ত্তী সকল সাফল্যের মূল সোপান বলিয়াই বিবেচনা করিতেন। বেদনুর রাজভাণ্ডারের দীর্ঘকাল-সঞ্চিত অতুলনীয় ধনরাশি তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। তিনি নাকি শুধু স্বর্ণ এবং রৌপ্যই ১২২ কোটি টাকার পাইয়াছিলেন। অভিযান-সংশ্লিষ্ট ফরাসী সৈনিকগণের কাহিনী হইতে প্রকাশ—জহরৎ এবং মুক্তার পরিমাণ এত অধিক ছিল যে আরব্যোপন্যাস-বর্ণিত কাহিনীর মতই তাহা শস্য মাপিবার পাত্রে করিয়া ওজন করিতে হইয়াছিল।

বেদনুর-অধিপতিগণের দুর্ব্বলতার সুযোগে পর্ত্তুগীজরা উহার কতক অংশ গ্রাস করিয়াছিল। হায়দর প্রথমে উহাদিগকে ভদ্রভাবে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় না দেখিয়া তিনি বাহুবল প্রয়োগে যত্নবান হইলেন। কারবার জেলা দখল করিয়া তাঁহার সৈন্যগণ রামগড় দুর্গ অবরোধ করিল। উহা হস্তগত হইলে পর্ত্তুগীজদের অধিকৃত জনপদমধ্যে প্রবেশপথ উন্মুক্ত হইল, কিন্তু হায়দরের ফরাসী সৈনিকগণ কিছুতেই অপর এক ইউরোপীয় জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে সম্মত হইল না। এমনকি তাঁহার পরমস্নেহভাজন হুগেল পর্য্যন্ত স্পষ্ট ভাবে জানাইলেন যে, অধিক পীড়াপীড়ি করিলে বরং তাঁহারা বিপক্ষ-শিবিরে আশ্রয় লইবেন তথাপি কোনমতেই উহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন না! অতঃপর হায়দর পর্ত্তুগীজদের সহিত একটা রফা করিয়া নিজ রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিঙ্গী গোলন্দাজরা যুদ্ধ না করিলে যে সুদৃঢ় রামগড় দুর্গ অধিকার করা সম্ভবপর নয় তাহা তিনি জানিতেন। এই ঘটনা এবং অন্যান্য আরও দুই-একটি ঘটনা হইতে হায়দর ভাল করিয়াই বুঝিলেন যে, যদি না সে সময় ইউরোপে সেই জাতির সহিত ফরাসীদের সমরানল প্রজ্জ্বলিত থাকে ত কোন ইউরোপীয় জাতির সহিত যুদ্ধ বাধিলে, তাঁহার ফরাসী সৈন্যদিগের নিকট হইতে তিলমাত্র সাহায্যপ্রাপ্তিরই আশা নাই।

ইহার স্বল্পকাল পরে হুগেল হায়দর আলির কর্ম্মত্যাগ করিয়াছিলেন। মাদুরার সুবেদার ইউসুফ খাঁ যখন ইংরেজদিগের এবং তাঁহাদের মিত্র আর্কটের নবাব মহম্মদ আলির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন তখন তিনি হুগেলের দলটিকে হাতে পাইবার জন্য সমুৎসুক হইয়া ম্যালেট নামক তাঁহার অধীনে কর্ম্মরত জনৈক ফরাসীকে বহু অর্থ দিয়া উহাদের আনিতে পাঠাইয়াছিলেন। হায়দর যে সহজে হুগেলকে ছাড়িয়া দিবেন না তাহা বুঝিয়াই ম্যালেট গোপনে তাঁহার সহিত পত্রব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু হায়দরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করা সহজ ছিল না। তিনি সকল কথা জানিতে পারিয়া হুগেলকে মহীশুর রাজ্য পরিত্যাগ না করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে ইউরোপে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে সমরবিরতির সংবাদ এদেশে আসিয়া পৌছিল। অতঃপর ফরাসীদের নিকট হইতে বিশেষ কিছু আর আশা করিবার নাই বুঝিয়া তখন তিনি হুগেলকে বিদায় দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি যাহাতে ইংরেজেরা তাঁহার আচরণে অসন্তোষের কিছু না পান তজ্জন্য সোজাপথে উহাকে মাদুরা যাইতে না দিয়া গোয়ায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইউসুফ খাঁ প্রদত্ত অর্থে মুক্তিলাভ করিয়া দুই শত অনুচরসহ গোয়ায় আসিয়া পৌছিলেও (জানুয়ারী ১৭৬৪ খ্রীঃ) হুগেলের কিন্তু তাঁহার নিকট যাইবার কোন আগ্রহ দৃষ্ট হইল না।

নরোনহা কিন্তু নূতন এডভেঞ্চারের নামে মাতিয়া উঠিলেন। গবর্ণরের নিকট হইতে একখানি সমরপোত চাহিয়া লইয়া ট্রাঙ্কুইবার পর্য্যন্ত তিনি বিনা বাধায় আসিয়া দেখিলেন যে, ইংরেজ সেনা যেভাবে চতুর্দ্দিক হইতে মাদুরা পরিবেষ্টন করিয়াছে এবং যেরূপ সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে তাহাতে কাহারও পক্ষে মাদুরায় গমন সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইহার পর নরোনহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। সৈনিকগণের প্রয়োজনীয় ব্যয়নির্ব্বাহের কোন প্রকার ব্যবস্থা করিতে অসমর্থ হইয়া তখন হুগেল ইউসুফ খাঁর পক্ষে যোগ না দেওয়ার মূল্যস্বরূপ ইংরেজদিগের নিকট ফরাসী ভারতের নবনিযুক্ত গবর্ণর ব্যারণ জাঁ ল দিলরিস্ট আসিয়া না পৌছানো পর্য্যন্ত তাঁহার দলের যাবতীয় ব্যয়ভার দাবি করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তাহার কোন প্রত্যুত্তর প্রদান করাও আবশ্যক বোধ করেন নাই।

অতঃপর হুগেল দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন দেশীয় দরবারে কর্ম্মলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আশানুরূপ কার্য্য কোথাও না পাইয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেখানেও অধিক দিন থাকিতে ভাল না লাগায় তিনি পুনরায় পুরাতন কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসেন (১৭৬৯ খ্রীঃ)। কিন্তু ভগবান তাঁহাকে আর এ পৃথিবীতে বেশী দিন রাখেন নাই। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে মরাঠাদের সহিত সমরে চেরকুলি বা চিনাকুরালির যুদ্ধে (১৭৭১ খ্রীঃ) সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়া কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন।

বেদনুর হস্তগত করিবার পর হায়দরের পক্ষে পার্শ্ববর্ত্তী জনপদসমূহ অধিকারে সচেষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল।

মালাবার দেশ এই সময় বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র-বৃহৎ নায়ার সর্দ্দারের আধিপত্যে বিভক্ত ছিল। এই সময় নায়ারদিগের সহিত মোপলাদিগের প্রায়ই বিরোধ লাগিয়া থাকিত। সুতরাং ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী হায়দরকে অনতিদূরে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া মোপলারা সবিশেষ আনন্দিত হইয়াছিল। এই সময় উভয় জাতিতে পুনরায় বিরোধ বাধিলে কানানোরের মোপলাসর্দ্দার আলি রেজা খাঁ হায়দরকে স্বধর্ম্মাবলম্বীদের সাহায্যার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহাতে ঔদাসীন্য দেখাইবার পাত্র হায়দর ছিলেন না। জামোরিণের নিকট তাঁহার কিছু অর্থপ্রাপ্তি বাকি ছিল। পুরাতন দাবির অজুহাতে তিনি সসৈন্যে মালাবার প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে তখন মাত্র ১২০০০ সৈন্য এবং ইউরোপীয় 'কোর' (corps) ছিল। পক্ষান্তরে নায়ারদের সৈন্যসংখ্যা লক্ষাধিক ছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। উহাদেরও ইউরোপীয় এবং ফিরিঙ্গী গোলন্দাজবাহিনী ছিল। সংক্ষেপে বলা দরকার যে মালাবার জয়ে হায়দরকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই।

উপকূলভাগের আধিপত্য লাভ করিয়া হায়দর একটি নৌবহর গঠনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। আলি রেজার নিজের একটি সুন্দর নৌবহর ছিল। হায়দর তাঁহাকে স্বীয় বহরাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অনতিকাল পরে আলি রেজা মালদ্বীপপুঞ্জ জয় করিয়া তথাকার নৃপতিকে বন্দী এবং অন্ধ করিয়া হায়দর-সকাশে আনিয়াছিলেন—সম্ভবতঃ মনে করিয়াছিলেন তাঁহার কার্য্যে হায়দর সন্তুষ্ট হইবেন। হায়দর কিন্তু স্বভাবতঃ একান্ত নিষ্ঠুর ছিলেন না। পরাজিত শত্রুর এইরূপ অযথা নিগ্রহে তাঁহার ক্ষোভ ও বিরক্তির অবধি রহিল না। তাঁহার নিকট বারংবার ক্ষমা-প্রার্থনাপূর্ব্বক যথাসম্ভব স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তিনি আলি রেজাকে পদচ্যুত এবং ষ্ট্যানেট নামক জনৈক ইংরেজকে বহরের অধ্যক্ষতা প্রদান করিলেন।

তখন বর্ষাকাল সমাগতপ্রায়। মালাবারের নিদারুণ বর্ষা সর্ব্বজনবিদিত। নবজিত জনপদের অদূরে বর্ষাযাপন করা মনস্থ করিয়া হায়দর কৈম্বাটুরে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তথা হইতে ছয় ক্রোশ দূরে মদগিরি নামক স্থানে চাঁদ সাহেবের পুত্র রাজা সাহেবের অধীনে অগ্রগামী এক দল সৈন্য রক্ষিত ছিল। তিনি এই সময় মহীশুর দরবারে ভাগ্যান্বেষণনিরত ছিলেন। হায়দর হয়ত মনে ভাবিয়াছিলেন যে অতঃপর মালাবার প্রদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, নায়ারেরা আর কোন উৎপাত করিবে না, কিন্তু তাঁহার সে ধারণা অচিরেই ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের তিন মাসের মধ্যেই নায়ারেরা অধীনতাপাশ মোচনার্থ অভ্যুত্থান করিল (মে ১৭৬৪)। মদগিরির অদূরে পুদিচেরি নামক গ্রামে একদল মহীশুরী প্রহরী-সেনা অবস্থিত ছিল। সহসা একদিন গ্রামবাসিগণ অস্ত্রধারণ করিয়া তাহাদের প্রাণবধ করিল। পরদিবস মাহে হইতে পাঁচ জন পলাতক ফরাসী সৈনিক এসব কথা না জানিয়াই হায়দরের কর্ম্ম গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। উত্তেজিত জনতার হস্ত হইতে তাহারাও রক্ষা পাইল না। দেখিতে দেখিতে সমগ্র মালাবার উপকূলে বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া পড়িল।

নায়ারেরা তাহাদের দেশের ঘোর বর্ষায় অভ্যস্ত। উহারা আশা করিয়াছিল, হায়দরের আগমনের পূর্ব্বেই তাহারা কালিকট পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইবে। এরূপ সতর্কতার সহিত তাহারা সকল আয়োজন করিয়াছিল যে, রাজা সাহেব বা হায়দর কেহই কোন কথা ঘুণাক্ষরে জানিতে পারেন নাই। কালিকট এবং পাণিয়ানি নগরদ্বয় আক্রান্ত হইবার পরে রাজা সাহেব নায়ারদের অভ্যুত্থানের সংবাদ পাইয়াছিলেন। পাণিয়ানির অবরুদ্ধ কিল্লাদার কর্ত্তৃক প্রেরিত জনৈক পর্ত্তুগীজ জাতীয় নাবিক তাঁহার নিকট এই সংবাদ আনিয়াছিল। দুর্গাধ্যক্ষ উহাকে সুপ্রচুর পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া উক্ত বিপজ্জনক কার্য্যে পাঠাইতে পারিয়াছিলেন। নায়ারদিগের ভয়ে দিবাভাগে যাইতে সাহসী না হইয়া ঐ ব্যক্তি শুধু রাত্রিযোগে মাত্র একটি ছোট পকেট-কম্পাস সম্বল করিয়া হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যমধ্যে প্রবাহিত শত্রুসমাকীর্ণ দীর্ঘ নদীপথ বাঁশের ভেলায় একাকী পাড়ি দিয়া মদগিরিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।

অনন্তর হায়দর চতুর্দ্দিক হইতে নিজ বিক্ষিপ্ত সেনাবল সংহত করিয়া বিদ্রোহদমনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পণ্ডিচেরী এবং কলম্বো হইতে সদ্যসমাগত তিন শত ইউরোপীয় সৈনিক এই সময় তাঁহার দলে যোগদান করিয়াছিল। হুগেলের প্রস্থানের পর তাঁহার শ্বেতকায় সৈনিকগণের সংখ্যা নিতান্ত হ্রাস পায়। উহাদের আগমনে সে ক্ষতি তাঁহার অতঃপর পূর্ণ হইয়াছিল। লে মেত্র দে লা তুর নবাগত সৈনিকগণের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার প্রথম জীবন সম্বন্ধে কোন কথা জানা যায় নাই। অপরাপর বহু ভাগ্যান্বেষীর মত তিনিও সর্ব্বপ্রথম ফরাসী সৈনিকের বেশে এদেশে আসিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। তখন দারুণ বর্ষা—সমস্ত দেশ জলপ্লাবিত। মহীশুরীদের কোথাও বা একবুক জল ঠেলিয়া, কোথাও বা সাঁতার কাটিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। হায়দর যে অত শীঘ্র আসিয়া দেখা দিবেন নায়ারেরা তাহা মনে ভাবে নাই। পণ্ডিয়াগড়ি নামক স্থানের অদূরে উহারা শত্রুপক্ষকে বাধাদানে দাঁড়াইল। হায়দর নিজ সেনাদল তিন অংশে বিভক্ত করিয়া বামপ্রান্তের ভার জনৈক ইংরেজ সেনানায়ককে এবং দক্ষিণপ্রান্তের ভার গোয়া হইতে সমাগত একজন পর্ত্তুগীজ জাতীয় লেফটেনাণ্ট কর্ণেলকে* দিয়া স্বয়ং কেন্দ্র-

* প্রুসিয়াধিপতি ফ্রেডারিক দি গ্রেট কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত সামরিক ব্যায়ামের উৎকর্ষ জন্য ইউরোপের অন্যান্য সকল রাষ্ট্র তাহা গ্রহণ করিয়াছে শুনিয়া হায়দর তাহা নিজ সৈন্যদলে প্রবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক হইয়া গোয়া, পণ্ডিচেরী, মান্দ্রাজে উপযুক্ত শিক্ষকের জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। ইহার ফলে গোয়া দরবার ঐ ব্যক্তিকে হায়দর-সমীপে পাঠাইয়া দিয়াছিল। যুদ্ধে উহার অযোগ্যতা দর্শনে হায়দর তাহার প্রতি নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। পরদিবস কোন কারণে উভয়ের মধ্যে বচসা হয়। ইহাতে নিজেকে অপমানিত বিবেচনা করিয়া কর্ণেল কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

দেশে মূল বাহিনী লইয়া স্থানগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে রিজার্ভ সেনাদল ও ইউরোপীয়গণ অবস্থিত ছিল। উভয় সেনাদলের মধ্যে একটি অপ্রশস্ত খাতের ব্যবধান। হায়দরের নিকট হইতে শত্রুসেনাকে আক্রমণ করিবার আদেশ পাইয়া পর্ত্তুগীজ সেনানায়ক নিজ সৈনিকগণকে ঐ নালার প্রান্ত পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সেই পর্য্যন্ত গিয়া তাঁহার সকল সাহস বিলুপ্ত হইল, তিনি আর অধিক অগ্রসর হইতে সাহসী না হইয়া সেইখান হইতেই উহাদিগকে প্রতিপক্ষের উপর গুলি চালাইবার আদেশ দেন। সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল হইতে মুষলধারে গুলিবৃষ্টি করিয়া নায়াররা উন্মুক্ত স্থানে অবস্থিত মহীশুরীদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া এই হত্যাকাণ্ড চলিতে থাকে। অকারণ লোকক্ষয়ে হায়দরের ক্রোধের সীমা রহিল না। কর্ত্তব্যের খাতিরে তিনি লক্ষ সৈনিকের দেহত্যাগে কাতর হইতেন না; কিন্তু তেমনি একটি লোকেরও অকারণ মৃত্যু তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। দে লা তুর এযাবৎ স্বীয় কৃতিত্ব দেখাইবার কোন সুযোগ পান নাই। তিনি হায়দরের নিকট ইউরোপীয়গণ ও রিজার্ভ দলসহ সিপাহীদের নেতৃত্ব লইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ফরাসীরাও মদগিরিতে নিহত সহযোগীবৃন্দের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। উহারা মহোৎসাহে দ্রুত ধাবনে ব্যবধান-পথ, মধ্যবর্ত্তী খাত অতিক্রম করিয়া ভীমবেগে শত্রুসেনার উপর আপতিত হইয়াছিল। সে আক্রমণের বেগ রোধ করার সাধ্য নায়ারদের হইল না। ফিরিঙ্গীদিগের বীরত্বে ও সাহসে অনুপ্রাণিত হইয়া সমগ্র মহীশুরী-বাহিনী শত্রুকে আক্রমণে অগ্রসর হইল, কিন্তু নায়াররা আর তাহাদের বাধা দিতে দাঁড়াইতে পারে নাই।

হায়দর সৈনিকগণের কৃতিত্বে পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। দে লা তুরকে তিনি "বাহাদুর" উপাধিসহ দশহাজারী মনসবদারী এবং তোপখানার অধ্যক্ষপদ দিয়াছিলেন। প্রত্যেক সৈনিককে তিনি ৩০ টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন। আহতদিগকে ইহার দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ দেওয়া হইয়াছিল। ফিরিঙ্গীদের দুঃসমসাহসিক কাণ্ডে মালাবারীদের প্রাণে বিষম আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। সুযোগ বুঝিয়া হায়দর তাহাতে ইন্ধন প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি চারিদিকে প্রচার করিয়া দিলেন যে, ফিরিঙ্গীস্থান হইতে শীঘ্রই তাঁহার বহু সৈন্য আসিবে এবং উহারা নরমাংসলোলুপ দুর্দ্দান্ত জীব! নায়ারেরা শীঘ্র বশ্যতাস্বীকার না করিলে তিনি উহাদের হস্তে তাহাদিগকে শায়েস্তা করিবার ভার দিবেন। বৈরনির্য্যাতনপরতন্ত্র ফরাসী সৈনিকগণ যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল তাহা হইতে জনসাধারণের মনে হায়দরের সকল কথা সত্য বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। অতঃপর তাহারা অবাধ্যতাচরণ হইতে নিরস্ত হইয়া মহীশুরী শাসন স্বীকার করিয়া লইল।

দে লা তুর এই সময়কার কতকগুলি কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। এস্থলে সকলগুলি প্রদান করা সম্ভব নহে; সংক্ষেপে শুধু দুই-একটিরই উল্লেখ করা যাইতে পারে। নায়ারদের সহিত যুদ্ধকালে হায়দর চমরাও নামক একজন মরাঠা সর্দ্দারকে চার হাজার বর্গী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিবার ভার দিয়াছিলেন। লোকটি নিতান্ত কৃপণ ও অর্থগৃধ্ন ছিল। আবশ্যকমত অর্থব্যয় না করায় তাহার সৈনিক-সংগ্রহে বহু বিলম্ব ঘটে, ধীর মন্থরগতিতে প্রায় বৎসরকাল পরে মরাঠারা যখন আসিয়া দেখা দিয়াছিল তখন আর তাহাদের কোন প্রয়োজনই ছিল না। উহাদের না ছিল অস্ত্রশস্ত্র, না ছিল সামরিক শিক্ষাদীক্ষা। সৈনিক না বলিয়া উহাদের একদল লুণ্ঠন-লোলুপ দস্যু বলাই অধিকতর সঙ্গত। উহাদের দেখিয়াই হায়দরের চক্ষুস্থির। তিনি তাহাদের বলিয়াছিলেন, যে সময়টা তাহারা অকারণ নষ্ট করিয়াছে, সে সময়ের বেতন তিনি দিবেন না। বলা বাহুল্য, এ ধরণের কথা শুনিতে মরাঠারা অভ্যস্ত ছিল না। তাহারা সক্রোধে জানাইয়াছিল যে, এক ঘণ্টার মধ্যে তাহাদের দাবি মেটানো না হইলে তাহারা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করিবে।

হায়দরের নিকট তখন মাত্র পাঁচ শত এবং দে লা তুরের দলের ত্রিশ জন সৈনিক ছিল। উহাদের লইয়া চারি হাজার উত্তেজিত বর্গীর মহড়া লওয়া যে কিরূপ কঠিন ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়! সৌভাগ্যক্রমে মরাঠারা মুখে আস্ফালন করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিল। তাহারা সহসা কিছু করিতে সাহস করিল না। বাহুবলে উহাদের নির্জ্জিত করা একেবারে অসম্ভব না হইলেও সে কার্য্য শান্তভাবে সাধিত হয় তাহা হায়দরের অভিপ্রেত ছিল। দে লা তুরকে তিনি সেকথা বলিয়া বর্গীদের শান্ত করিবার ভার দিয়াছিলেন। "ফরাসী সেনাপতি—হায়দর তাঁহার প্রতি যে বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়াছিলেন নিজেকে তাহার উপযুক্ত প্রমাণ করিতে সমুৎসুক হইয়াছিলেন এবং কীদৃশ গুরুভার তাঁহার প্রতি সমর্পিত হইয়াছে তাহা বুঝিলেও মহোৎসাহে তাহা সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।" মদগিরির ফৌজদারকে যত অধিক সম্ভব টোপাসী* সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবার এবং তাঁহার ফরাসী সৈনিকদের তথা হইতে যথাসম্ভব কৈম্বাটুরে আসিবার আদেশ দিয়া তিনি মরাঠা সর্দ্দারের সহিত একবার সাক্ষাৎ কামনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহাদের নিজেদের অবস্থাও কোনমতে উহাদের অপেক্ষা ভাল নহে; কারণ নায়ারদিগের সহিত যুদ্ধকালে তাঁহারা মহীশুরে আসিয়াছিলেন বলিয়া তখন নবাবের সহিত তাঁহাদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন কথা হয় নাই। সুতরাং নিজেদের স্বার্থরক্ষাকল্পে ফরাসীরা ও মরাঠারা যদি একযোগে কাজ করে তাহাতে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল হইবে। নবাব তাহাদের সম্বন্ধে কি স্থির

* টোপাসী কথাটির প্রকৃত অর্থ টুপীপরিহিত ব্যক্তি। বর্ণসঙ্কর পর্ত্তুগীজদের ইউরোপীয় টুপীর জন্য উক্ত আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে টোপাসীদের দলে বিভিন্ন শ্রেণীর বহু ব্যক্তি স্থান পাইত। উহাদের সকলের ইউরোপীয় উৎপত্তি সন্দেহস্থল। তোপখানার ভার প্রধানতঃ টোপাসীদের হস্তে থাকিত।

করিলেন তাহা জানিবার জন্য তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্যগণ দুই-এক দিনের মধ্যে কৈম্বাটুরে আসিবে ; যত দিন না তাহারা আসিয়া দেখা দেয় ততদিন চুপ করিয়া থাকাই সঙ্গত। ইতিমধ্যে তিনি একবার নবাবের নিকট কথাটা পাড়িয়া দেখিবেন বলিলেন। মরাঠারা তাঁহার সকল কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল।

মদগিরিতে তখন প্রায় চারি শত ইউরোপীয় সৈনিক ছিল। পরদিবস প্রায় সারাদিন ধরিয়া উহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া কৈম্বাটুরে আসিতে লাগিল। প্রত্যেক দলই আসিয়া বলিল যে মূল বাহিনী তাহাদের পিছনে আসিতেছে। সন্ধ্যার পর বাদ্যভাণ্ড-সহকারে টোপাসীরা আসিয়া দেখা দিল। অন্ধকারে তাহাদের টুপি এবং ব্যাণ্ড হইতে মরাঠারা ভাবিল বুঝি-বা এইবার প্রধান দলই আসিল। উহাদের পক্ষে ফিরিঙ্গীদের প্রকৃত সংখ্যা অবগত হওয়া সম্ভব ছিল না। মরাঠারা উহাদের বাস্তবিক সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী বলিয়াই মনে ভাবিল।

পরদিবস দে লা তুর চমরাজকে বলিলেন যে হায়দরের সহিত তিনি দেখা করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহাকে যে সর্ত্ত দিয়াছেন তাহা অসঙ্গত মনে না হওয়ায় তাহাতে সম্মত হইয়া আসিয়াছেন এই আশায় যে মরাঠাদের মত বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কখনও অবুঝ হইবেন না। বলা বাহুল্য, তিনি হায়দর-প্রদত্ত পূর্ব্বেকার সর্ত্তগুলির পুনরুক্তি করিলেন মাত্র। ইহাতে বিরক্ত হইয়া মরাঠারা দরবার হইতে প্রস্থান করিল। গভীর নিশীথে লালী নামক দে লা তুরের জনৈক এডজুটান্ট তাঁহার আদেশে কয়েকটি কামানসহ মরাঠা-শিবিরের অদূরে স্থান পরিগ্রহ করিলেন। সকালে উঠিয়া কামান-সমূহের পার্শ্বে বর্ত্তিকাহস্তে ফরাসী গোলন্দাজদের দেখিয়াই মরাঠাদের সকল সাহস বিলুপ্ত হইল। হায়দর এইরূপে তাঁহার ইউরোপীয় সেনাপতির কৌশলে অনায়াসে একদল অপদার্থের জন্য অহেতুক অর্থব্যয় হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন এবং স্বীয় প্রীতির নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহাকে দেহরক্ষী-দল গঠনের অনুমতিসহ তজ্জন্য কুড়িটি সুন্দর ঘোটক উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। বক্সীকে তিনি ফরাসীদের বেতনাদি প্রদানের ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন। দে লা তুর বলেন যে, উহাদের দাবি অত্যধিক মনে হওয়ায় বক্সী তাহা দিতে অসম্মত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রদত্ত অর্থ অত্যল্পবোধে ফরাসীরা তাহা লইতে চাহে নাই। এ সংবাদে হায়দর নাকি উহাদের নিজ সমক্ষে ডাকাইয়া আনিয়া বলিয়াছিলেন, "শুনিলাম বক্সীর সহিত তোমাদের মতভেদ হইয়াছে? ইহাতে আমি নিতান্ত দুঃখিত। তোমরা আমাকে সকল কথা বল নাই কেন? তোমরা কি জান না তোমরা আমার কত প্রিয়? আমার যাহা কিছু আছে সবই আমি তোমাদের দিতে পারি।" অনন্তর তিনি বক্সীকে উহাদের নির্দ্দিষ্ট হারে বেতন দিতে আদেশ দিয়াছিলেন এবং পরদিবস স্বীয় আবাসে এক ভোজে উহাদের সংবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।*

এবারে দ্বিতীয় কাহিনীটির উল্লেখ করা যাইতেছে। মেকুইনেজ নামক হায়দরের একজন পর্ত্তুগীজ জাতীয় সৈনিক ছিল। দীর্ঘকাল পরম বিশ্বস্তভাবে প্রভুর পরিচর্য্যা করিয়া মরাঠাদের সহিত এক যুদ্ধে ঐ ব্যক্তি নিহত হইয়াছিল। কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ হায়দর তদীয় বিধবা পত্নীকে তাহার মৃত্যুর পর কর্ণেল পদসহ রেজিমেণ্টের অধ্যক্ষতা দিয়াছিলেন। মাদাম সৈন্যগণের সহিত সর্ব্বত্র যাইতেন, উহাদের কুচকাওয়াজাদি নিয়মিত ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, তাহাদের বেতন তাঁহার হস্তেই প্রদত্ত হইত। কিন্তু যুদ্ধের সময় রেজিমেণ্টের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ তাহাদের পরিচালনা করিতেন। হায়দর আদেশ দিয়াছিলেন—মৃত মেকুইনেজের নাবালক-পোষ্যপুত্র প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া অবধি এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে।

এখনকার মত তখনকার দিনেও স্ত্রীলোকেরা স্বামীদের অগোচরে সংসার-খরচের টাকা হইতে কিছু কিছু জমাইতে ভালবাসিত। ইউরোপীয় বা খ্রীষ্টান মহিলারা সঞ্চিত অর্থ নিজেদের কাছে না রাখিয়া সাধারণতঃ পাদ্রীদের নিকট উহা গচ্ছিত রাখিত। স্বামী বা অপরাপর আত্মীয়বর্গ ঐ টাকার কথা অনেক সময় কিছুই জানিত না, সুতরাং দৈবক্রমে কাহারও মৃত্যু হইলে পাদ্রীমহাশয়ই লাভবান হইতেন। তবে সাধারণতঃ উহাদের বিশ্বাস ভঙ্গ করিতে দেখা যাইত না। মাদাম মেকুইনেজও স্বীয় অর্থালঙ্কারাদি জনৈক পর্ত্তুগীজ জেসুইট পাদ্রীর নিকট ন্যস্ত রাখিয়াছিলেন। পর্ত্তুগালাধিপতি স্বীয় অধিকার-মধ্যে জেসুইট-সম্প্রদায়কে নিরোধ করিবার আদেশ দিলে উক্ত পাদ্রী রাজভক্তি দেখাইবার জন্য মহীশুর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তন-মানসে গোয়ায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন। মাদাম তাঁহার নিকট গচ্ছিত সম্পত্তি দাবি করিলে তিনি তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন যে, আসিবার সময় তিনি জিনিসগুলি জেভিয়ার পল্লীয়ম নামক স্থানের পাদ্রীর নিকট রাখিয়া আসিয়াছেন। বিবি মেকুইনেজ তাঁহাকে ঐগুলি প্রত্যর্পণ করিতে বলেন, কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না বলিলেন। মাদাম নবাব সরকারে অভিযোগ করিলে হায়দর দে লা তুরের হস্তে বিচারের ভার দিয়াছিলেন। ক্রমশঃ

* এ সকল কথা কিন্তু সত্য বলিয়া মনে হয় না। উত্তর কালে হায়দরের লালীকে বেতন দানে এ প্রকার দাক্ষিণ্যের পরিবর্ত্তে যথেষ্ট কার্পণ্যের পরিচয়ই পাওয়া যায়।

জাহ্নবী যমুনার উৎস সন্ধানে

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

সিলকিয়ারার পাহাড় থেকে নেমে আসার পর গাংনানীর আগে ছোট্ট একটি ঝর্ণার ধারার সন্ধান মেলে—তার ওপর একটি কাঠের সেতু আর ঐ সেতুটি পেরুলেই গাংনানী জনপদের এক্তিয়ার। এবার পথের সুরু ঐ সেতু পেরিয়ে নয়, তারই ধার বরাবর দুটি পথরেখার সন্ধিস্থলের পাশে। একটি পথ উল্টোমুখে চলে গেছে ধরাসুর দিকে, আর একটি পথ চলে গেছে গঙ্গোত্তরীর দিকে। ঐ পুলের কিছুটা দূরে সাধারণ যাত্রীদের জন্যে বিজ্ঞপ্তি—'গঙ্গোত্তরী কো সড়ক।'

. এখান থেকেই প্রকৃত পক্ষে আর একটি মহাতীর্থের প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম পাতাটির আবিষ্কার···পুণ্যলোভাতুর যাত্রীদের এই বার্তাফলকই নূতন জীবনের তথা নূন্যতম অভিজ্ঞতার আহ্বান জানিয়েছে।

ধরাসু থেকে যাত্রার প্রারম্ভে যাত্রীসংখ্যা ছিল দশ-বার জন, অদৃশ্য এক সংখ্যাতত্ত্বের মন্থনে সেই ন্যূনতম সংখ্যা যে কি করে বাইশে দাঁড়াল তা ভেবে পাই না। অচেনা মুখ দেখতে পাই—অচেনা দল চোখে পড়ে। এরা রাতারাতি যমুনোত্তরী তীর্থ শেষ করে কি করে যে গাংনানীর ধর্মশালায় এসে গেছে তার হিসেব আমার কাছে নেই—সব এসে গেছে এই যা! স্রোতের মুখে কুটোর মত সব এরা, ভাসতে ভাসতে চলে এসেছে, আর এই চলে আসাটাই সত্যি। জানি, অচেনা বলে যাদের মনে হ'ল, একাকারের ঘূর্ণিবায়ুতে সে সব যাবে উড়ে···আমরা সব মিশে যাব একটি ধারায়···একটি প্রবাহিণীতে। এ পুণ্যরাজ্যে চেনা-অচেনার কুহেলিকা মাত্র একটি মুহূর্তের—অপরিচিত বলে যাদের মনে হচ্ছে, পথ চলার গতিবেগে সে মনে হওয়া শূন্য অঙ্কে নেমে আসবে।

ঝর্ণার সেই ধারাকে বাঁ দিকে রেখে পথ চলেছে এঁকেবেঁকে, প্রায় এক মাইলের মাথায় সেই পথটি একটি চায়ের দোকানের সামনে এসে শেষ হয়ে গেল। বোঝা গেল—চায়ের দোকানটির অস্তিত্ব এখানে সাঙ্ঘাতিক—সামনেই চড়াই—তারই পরিচয়ের বার্তা জানিয়েছে।

সত্যি তাই, সিঙ্গুটের বিখ্যাত চড়াইটা এর পর থেকেই সুরু। গাংনানীর ধর্মশালায় যাত্রীদের মুখে মুখে যার কাহিনী আমার শোনা।

শোনা গেল, চড়াইটা একটানা ছ'মাইল—উৎরাই তিন মাইল।

বেদের বাঁশী শুনে গোখরো সাপ বেরিয়ে এসে ফণা উঁচিয়ে দাঁড়ায়, গান শোনে। সেখানে বাঁশী, তাই তার বিষের হাত থেকে বেদের নিষ্কৃতি। কিন্তু এখানে বাঁশী কৈ? যে সর্পিল পথ কুণ্ডলী পাকিয়ে এই পাহাড়ী ময়াল সাপকে বেষ্টন করে আছে—তাকে থামাই কি করে? কাজেই সাপকেই গ্রাহ্য করে নিতে হয়, এগুতে হয় এক পা এক পা করে। সিঙ্গুটের চড়াইটা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে গরীয়ান্, এ তীর্থভূমির কোন চড়াইয়ের সঙ্গে তার মিল নেই। যমুনোত্তরীতে যাওয়া ও ফিরে আসার মধ্যে যতগুলো চড়াই পাওয়া গেছে—এ চড়াইটা তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে নি। চড়াই কখন পাহাড়কে বেষ্টন করে অথবা এ পাহাড় শেষ হয়ে অন্য পাহাড়ে—কিন্তু সিঙ্গুটের এ চড়াই পথ একেবারে ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের শীর্ষ দিয়ে উঠে তার ক্রমোচ্চ গতিকে শেষ করেছে, তার পর তার উৎরাই অভিযান। এ রকমটি অন্য কোথাও নেই। কিছু দূর ওঠার পর পাইনের ছড়াছড়ির শেষ—এ অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে নিম্নভূমির মায়াই হ'ল পাইনের মূলধন, উচ্চতার মাপকাঠিতে সে মায়াও আর নেই, সে মূলধনও হারিয়ে গেছে। চড়াই ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে পাইনের সে নয়নাভিরাম দৃশ্যের বদলে দেখা দিল অনামী মহীরুহের দ্বীপ ও উপমহাদেশ—লতাগুল্মের ঘেরাটোপের ভিতর ছায়াচ্ছন্ন বনানীর আত্মপ্রকাশের কুহেলিকা। বিজন পথ ও নিঃশব্দ আবেষ্টনীর সঙ্গে শারীরিক ক্লান্তির একটা দ্বন্দ্ব বেধে যায়। কত রকমের গাছ যুগযুগান্তের সাক্ষীর মত পাষাণ মৃত্তিকার বুক চিরে জেগে আছে—এ সব গাছের পরিচয় নেই, এরা গোত্রহীন। ঐরাবত সিঙ্গুটের পাহাড়—যাত্রার সুরুতেই এক নির্বিশেষ পরীক্ষার ভূমিকা হয়ে আছে যেন।
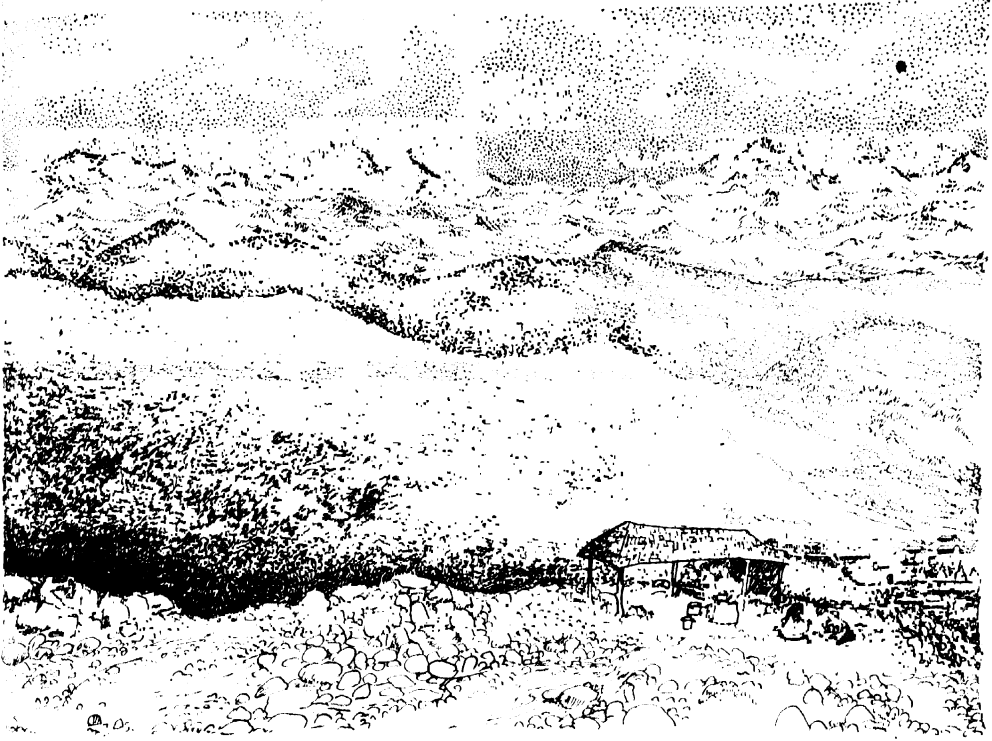
তুষারাচ্ছন্ন গিরিশ্রেণীর অন্তহীন শোভাযাত্রা—সিঙ্গুট

সিলকিয়ারার পাহাড়, যমুনা চটির পর চড়াইয়ের দাপাদাপি, তার পর ভৈরব ঘাটির সেই অমানুষিক পরিশ্রম—সবই ত পেরিয়ে এলাম, কাজেই বুকের রক্ত জল করে সিঙ্গুটকেও হারিয়ে দি,' একেবারে পাহাড়ের চূড়োতে গিয়ে উঠি—লাটিমের পাকের মত পাকদণ্ডী পথ পাহাড়ের মাথায় গিয়ে যার শেষ হয়েছে। ক্রমোচ্চ পথটি শেষ করে যখন পাহাড়ের ওপর উঠলাম তখন বেশ বোঝা গেল আমি নিঃশেষ হয়ে গেছি। পাহাড়ের শীর্ষদেশ ঠিক সেলাইয়ের ছুঁচের আকৃতি নয়, এখানে মৃত্তিকার সামান্য দাক্ষিণ্য আছে—খানিকটা সমতলভূমি যাত্রীসমারোহকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে যেন। এখানেও একটি চায়ের দোকান, নিঃশেষিত প্রাণশক্তিকে ফিরিয়ে আনার জন্যেই যেন এর সৃষ্টি! একেবারে পাহাড়ের চূড়ায় এরকম চায়ের বিজ্ঞপ্তি পরিব্রাজক জীবনে অন্য কোথাও খুঁজে পাই নি। দোকানটি দেখে মনে হ'ল যাক্, সভ্যতা এখনও বেঁচে আছে···আমরা এখনও হারিয়ে যাই নি। গুটি গুটি এখানে হাজির হই এক ভাঁড় চায়ের আশায়।

সিঙ্গুটের এই পাহাড়টির ওপর উঠবার পর চারিদিকের দৃশ্যাবলী যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করে তার তুলনা যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরীর ইতিহাসে অন্য কোথাও নেই। এ রকমটি যে দেখব আশা ছিল না বা বুঝিও নি। সাড়ে আট হাজার ফুটের এই পাহাড়ের আকাশমুখী অভিযান—অসমাপ্ত উপন্যাসের মতই এর স্বরূপ! ধূ ধূ করছে চারিদিক—আবহাওয়া যেন দৈব আবহাওয়া। দৃষ্টির বাধা নেই এখানে—গোটা পৃথিবীটাই যেন উন্মুক্ত হয়ে গেছে চোখের সামনে। শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে জীবন কেটে যায় যেন। মনে হয় এই মৃত্তিকার এইটুকু দাক্ষিণ্যের ভেতর ছোট্ট একটি কুটীর বাঁধি—আর সমস্ত দিনরাত কেবল এই অসীমতার ও শূন্যতার মায়ার ভেতর দৃষ্টিটাকে মেলে রাখি···আর কিছুর দরকার নেই এখানে, শুধু চেয়ে থাকতে পারলেই ব্যক্তিবিশেষের জীবন ধন্য হয়ে যাবে।

সমগ্র পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে কেন্দ্র করে দিকচক্রবালের মেখলায় তুষারাচ্ছন্ন গিরিশ্রেণীর অন্তহীন শোভাযাত্রা, মনে হ'ল ভস্মাচ্ছাদিত মহাদেবের গলায় একটি হীরের মালা জড়ান রয়েছে। ফুলের স্তবকের মত একটির পর একটি গ্লেশিয়ারের ফুটে থাকা—দৃষ্টির সামনে এই মহিমার রূপবর্ণনা করি কি করে? এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পূর্ব্ব প্রান্তে যে গিরিশৃঙ্গ চোখে পড়ে ওটা কেদারনাথের, যা গত বছরে দেখে এসেছি। তারই পাশে যমুনোত্তরী হিমবাহের শুভ্র গিরিশৃঙ্গ, যা দেখে এলাম, যা স্মৃতিতে এখনও জাগরূক

হয়ে আছে। তার পাশে একটি সমান্তরাল রেখায় গঙ্গোত্তরী গ্লেশিয়ারের অস্ফুট এক হাতছানি, যার আকর্ষণে আজকের এই মহাযাত্রা। দূরে সরু ক্ষীয়মান একটা ধারা দেখতে পাচ্ছি, ইনিই গাংনানীর মা যমুনা, যাঁর দর্শনে ধন্য হয়ে এলাম। আমার ডান দিকে বিন্দুর মত ছোট ছোট ঘর বাড়ী, ওই হ'ল স্বপ্নের উত্তর কাশী, যেখানে পৌঁছতে আর দেরী নেই—এই বিন্দুর সারির পাশে আর একটা প্রবাহিণীর সন্ধান মেলে; ধরম সিং পরিচয় করিয়ে দেয় ওই মা ভাগীরথী, যাঁর পাশে পাশে আমাদের যাত্রা হবে সুরু। সারা দিগন্ত জুড়ে যে গিরিশ্রেণীর যুগব্যাপী পরিক্রমা—সামনের ওই গঙ্গোত্তরী হিমবাহের পেছনেই কৈলাসশৃঙ্গ আর মান্ধাতার অবস্থিতি। যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু পাহাড় আর পাহাড় আর তার জঠরের ভেতর মর্ত্যের মানুষের ছোট ছোট সংসারের জনপদের আকুলি। এধার থেকে ওধার—পরমাশক্তির এক অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টি-তত্ত্বের প্রকাশের ভেতর দিয়ে মানুষের অন্তরে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের স্তূপ নেমে আসে। এ দৃশ্য সার্থক দৃশ্য—এ দৃশ্যের তুলনা নেই।

সিঙ্গুটের পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বড় বেশী করে চেনা যায় কেদারনাথকে আর যমুনোত্তরীকে, আর এ দেখা অনুভূতিকে নূতন রূপ যে দেয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গত বছরের দেখা কেদারের সে মহিমামণ্ডিত শাশ্বত অবিনাশী শৈলরাজি যে চোখের সামনে আবার ফুটে উঠবে তা জানা ছিল না, তাই দেখার ভেতর দিয়ে আনন্দের আর এক উচ্ছাস সৃষ্টি হ'ল এখানে। যমুনোত্তরীকে দেখা এই ত ক'দিনের—আবার তারই রূপ দেখলাম আর এক সৃষ্টির অধ্যায়ে, এখানে তার একক রূপটি নেই—বহুর ভেতরেই সে হিমবাহের নবজন্মের রূপ। গঙ্গোত্তরীর হিমবাহকে এখনও দেখা হয় নি, তাই এ দেখাও চরম দেখা। কৈলাসকে এখান থেকে দেখা না গেলেও বুঝা যায় যে, এই শোভাযাত্রার পেছনে আর একটা সুপ্রাচীন তীর্থভূমি অদৃশ্য হয়ে জেগে আছে। এখানে এসে ক্লান্তি গেল দূর হয়ে—শ্রান্তি হ'ল নিঃশেষ। আমরা নীচেকার মানুষ, তাই ছোট প্রবৃত্তির ছোট হাতার পরিবেশনে সন্তুষ্ট থেকে যাই···উঁচুতে আমরা উঠি না, তাই আমাদের আধ্যাত্মিক সঞ্চয়ে এত ক্ষয় ও ক্ষতি। এখানে তাই উঠে আসার পর ব্যক্তিবিশেষের তলাকার ফেলে আসা মাটির কথা মনে থাকে না, সাময়িক হলেও এ দৈব ভাবের স্পর্শটি বড় মধুর। দার্শনিক হয়ে ওঠে মন—গণ্ডী যায় লুপ্ত হয়ে। পাহাড় এখানে শুধু পাহাড় নয়—মানুষী প্রবৃত্তির যা কিছু মহৎ, যা কিছু মহান্ তাই যেন উর্দ্ধমুখে উঠিয়ে নিয়ে গেছে ···পাহাড়ের বিরাটত্বের সঙ্গে, মনের বিরাটত্বেরও তাই সহজ সম্বন্ধ আছে এখানে। ইটকাঠ পাথরের মধ্যে দৃষ্টির যে বিরোধ, তার বিরোধ আত্মারও সঙ্গে, জীবনের বৃহত্তর কল্যাণের সঙ্গেও—কিন্তু এখানে যে অনন্ত প্রসারিত দৃষ্টির সুযোগ ভগবান করে রেখেছেন, তার সঙ্গে মানুষের নারায়ণে রূপান্তরিত হওয়ারও সুযোগ আছে। পাহাড়ের গুহায়, পর্ব্বতের উর্দ্ধদেশে তাই তাপসের বাঘছাল পাতা ···সাধকের হোমাগ্নির আগুন তাই সেখানে জ্বলে।

আমার পাশ দিয়েই বীরবলরা নেমে উৎরাইয়ের পথ ধরলে, অপেক্ষা তারা করল না, সিঙ্গুটের ধর্ম্মশালায় যদি না উঠে সোজা নাকুরীতে গিয়ে উঠি সেই ভয়ে আমাকে তারা ছাড়বে না। ধরম সিং আর আমি এখানে অনেকক্ষণ থাকি—প্রায় এক ঘণ্টা। এ অল্পপরিসর স্থানটুকু আমার কাছে কাব্য হয়ে ওঠে, সম্পদ হয়ে ওঠে ···দেখে দেখে আর আশ মেটে না। কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাস নেমে আসে এই ভেবে যে এই কাব্য প্রাত্যহিক জীবনের কাব্য নয়—এ কাব্যের আয়ু মাত্র এক ঘণ্টা।

এবার নামা। যেমন ওঠার ব্যাপারটি, তেমনি অবতরণেরও একেবারে খাড়াই পথ নেমে গেছে টানা তিন মাইল। উঁকি মেরে তাকিয়ে দেখলাম বহুদূরে সমান্তরাল রেখায় পিঁপড়ের সারির মত মানুষের যাতায়াত—উৎরাইয়ের ইতরবিশেষের ভেতর যেটি সম্ভব নয়। এ পাথর আর সে পাথর—এ গাছের কাণ্ড আর ও গাছের শাখা-প্রশাখার প্রান্ত ভাগ এই ধরে ধরে নামতে নামতে তিন মাইলের এই পরীক্ষাটুকুও পার হওয়া গেল। পাহাড়ের তলাতেই সিঙ্গুট—একটি ধর্ম্মশালা আর তৎসংলগ্ন একটি মাত্র দোকান। ব্যস! এই নাকি সিঙ্গুট যার জন্যে আমরা ন'মাইলের এই ভীষণ ব্যাপারটি শেষ করে এলাম। আজকে এইখানেই আমাদের রাত্রিবাস।

বেলা তখন একটা—শুয়ে আছি, ঘরে মাতাজী আর রুক্মিণী, বীরবল আর ধরম সিং নেই, ওরা গেছে চাল-ডালের জোগাড় করতে। হঠাৎ একটা গুঞ্জরণ উঠল তলাকার দোকান থেকে। ব্যাপার কি? উঠে এসে বারান্দা থেকে দেখলাম বীরবল ভীষণ হাত-পা ছুঁড়ে মিলিটারি কায়দায় দোকানীকে কি সব বোঝাচ্ছে, আশেপাশে দশ বার জন যাত্রী, তারাও বীরবলের দলে বলে মনে হ'ল। ভাল করে কান পেতে বীরবলের হাত-পা ছোঁড়ার অর্থ বোঝা গেল। আটার সের চৌদ্দ আনা, বাইশ জনের যাত্রীর দল দেখেই দোকানী টাকায় উঠে গেছে—তাই বীরবলের এই প্রতিবাদের ঝড় তোলা। দশ-বার মিনিট এই যুদ্ধ, তার পর শান্তি, ঐ চৌদ্দ আনা সেরদরের আটাই বীরবল আর ধরম সিং আদায় করে নিয়ে এল। ও যে মিলিটারিতে এক দিন ছিল তারই প্রমাণ পাওয়া গেল এখানে।

খাওয়া-দাওয়া সারতেই পাঁচটা বেজে গেল, তার পর এ অঞ্চলে যে রকম হয়, দেখতে দেখতে অন্ধকার নেমে এল। রাত আটটা পর্য্যন্ত লোকজনের কথাবার্ত্তার আওয়াজ যা কানে আসে, তারপরেই নিথর হয়ে যায় ধর্ম্মশালা, একটানা নিস্তব্ধতার রাজত্ব হয়ে ওঠে। কান পেতে শুধু ঝিঁঝিঁপোকার শব্দ শুনি আমি···।

এবার উত্তর-কাশীর পথে। সকাল হয়ে যায়, চলাও সুরু হয়। আজকেও সেই ন'মাইলের ব্যাপার।

শোনা গেল এ ন'মাইলের মধ্যে সিঙ্গুট পাহাড়ের মত একটা প্রতিবন্ধকের পাঁচিল তোলা নেই—এ পথ সোজা পথ—সরল পথ। ধর্ম্মশালার তলায় নেমে আসি, চা খাই তার পর বাণ্ডিল ব্যাগ

কাঁধের ওপর তুলে নি···নেমে আসি পথের প্রান্তে। চোখ খোলার পরেই মনের ভেতর আনন্দের বন্যা নেমেছে আজ··· উত্তরকাশীতে আজ পৌঁছব। একটু দেরী করেই রওনা দি'··· ভিড় যে আমার সইবে না!

যে উৎরাইটা নেমে এসে সিঙ্গুটে শেষ হয়েছে তারই জের চলে গেছে এক মাইল পর্য্যন্ত। দু'মাইল একটু চড়াইয়ের ভাব—তার পরেই নাকুরী।

ভাগীরথীলাঞ্ছিতা নাকুরী, ওদিকে যেমন যমুনালাঞ্ছিতা গাংনানী। ফিকে সবুজ সাড়ীর বাহার আর নেই—মার এখানে তপস্বিনীর মূর্ত্তি—সারা অঙ্গে তাঁর গৈরিক উত্তরীয়। রঙের এই পরিবর্ত্তনটি আনল কে? গাংনানীতে এসে যমুনাদর্শনে যে আনন্দের মূর্চ্ছনা—এখানেও তাই। সেখানে এক ভাব, এখানে আর এক ভাব। যে গঙ্গাকে এখানে প্রথম দেখা, এরই রূপের মহিমা জপতে জপতে যেতে হবে গঙ্গোত্তরী আর তারও ওদিকে গোমুখ।

জাহ্নবীর রূপ এখানে মাতৃরূপিণী, তাঁর নিঃশব্দ আশীর্ব্বাদই আমাদের সঞ্চয়, আমাদের সবকিছু। এখানে এসে প্রবাহিণীকে দেখে মনে হ'ল কতদিন আমাদের ছাড়াছাড়ি, কতদিনের আমাদের বিচ্ছেদ। দেখা হ'ল আমাদের নূতন এক আবেশের ভেতর··· অনুভূতির ভেতর। এ মিলন শুধু চোখের মিলন নয়, এ মিলন যেন জীবনের সঙ্গে জীবনের। মা বসেছিলেন, পুত্র শুনছিলেন—দীর্ঘ প্রবাসের অবসাদে দেউলে হয়ে আমি এসেছি—তিনি কোলে তুলে নিলেন···আমি পূর্ণ হয়ে গেলাম, ধন্য হয়ে গেলাম।

ভাগীরথী এলেন যাত্রাপথের ডানদিকে—তিন মাইলের নাকুরী পেরিয়ে গেলাম, উত্তরকাশীর সোজা সড়কটা চোখে পড়ল—ছ' মাইলের একটানা পথ। গাংনানীর পর যমুনা যেমন অদৃশ্যা মায়াবিনী, এ পথে মা গঙ্গার ধারায় সে সুদূরের হাতছানি নেই: সর্ব্বসময়ের জন্যেই তিনি···কখন দেখছি কাছে, কখন দূরে।

উত্তরকাশীর পথে এ ছ' মাইলের হিসেবে কোন লাভ-লোকসানের ব্যাপার নেই, এ পথটুকুতে পাহাড়ের কোলে কোলে ক্ষেতখামারের শ্যামলিমা, সবুজ ও হলদে রঙের মায়াজাল। মানুষের এ অঞ্চলে বাঁচবার চেষ্টা, ফসল বুনে গৃহস্থালীকে সার্থক করবার শুভবুদ্ধি। এই শুভবুদ্ধির সঙ্গে পাহাড়গুলোরও সাদৃশ্য আছে—তারা তাদের বৃহৎ অবয়ব দিয়ে বাধার আগড় টানে নি। পাঁচ মাইল পেরিয়ে যাওয়ার পর দূর থেকে দেখা গেল মুনিঋষিদের ছোট ছোট কুটিরশ্রেণী, বৈরাগ্যের সাধনা চলছে তাঁদের। এ সব পেরিয়ে যাই, শুধু চোখের দেখাই সার্থক হয়ে থাকে। শেষের এক মাইলের পরিচয়ে বাংলাদেশের আবহাওয়া—দেখা গেল কলাগাছের ঝাড় ও পেয়ারা গাছের সারি। মনে হ'ল ফেলে আসা দেশের একটা ছেঁড়া পাতা এখানে হাওয়ায় উড়ে এসেছে যেন।

এই এক মাইলের পথটুকুও শেষ হয়ে যায়, এসে যাই উত্তরকাশীতে···বিশ্বনাথের রাজত্বে, পরমপুরুষের আশীর্ব্বাদের ভেতর।

পথটা একটা হ্যাঁচকা টান মেরে ওপরে উঠে গেছে, সামনেই একটা ল্যাম্পপোষ্ট পথের ওপর অর্ব্বাচীনের মত দাঁড়িয়ে—ধরম সিং বুঝিয়ে দেয় এই পোষ্টটাই উত্তরকাশীর সীমানাকে নির্দ্দেশ করেছে, এর পর থেকেই শহরের সুরু।

সিঙ্গুট ছাড়ানোর পর ধরম সিঙের ভাবান্তর সুরু। ও এখন অন্য মানুষ, অনামী মানুষের পংক্তিতে ও আর পড়ে না। তার সাধের উত্তরকাশী এসে যাচ্ছে, যার মৃত্তিকার আশীর্ব্বাদেই ওর আঠারোটা বৎসর গড়ে উঠেছে। এখানেই ওর জন্ম, তার বড় হয়ে ওঠা। হৃষিকেশ থেকে পেয়েছি আমি ওকে, যমুনোত্তরী শেষ হয়ে গেছে···পথচলার ইতিহাসের পাতায় ধরম সিঙের অবদান বড় কম নয়, বাহক হলেও তাকে পেয়েছি সখ্যের ও অন্তরঙ্গতার ভেতর। অনেক আগেই সে আমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছে যে, উত্তরকাশীতে পৌঁছে তার বাড়ীতে আমি যাব আর একটা রাত আমার সেখানে কাটবে।

সেই স্বপ্নের উত্তরকাশী তার এসে গেল। ধরম সিং এখানে ঢুকল বীরের মত, আলেকজাণ্ডারের থেকে কোন অংশে সে কম নয় আজ। মুখেচোখে খুশী তার উপচে পড়ছে—একগাল হাসি নিয়েই ওর এখানে প্রবেশ। যাকে ফেলে এসেছি পেছনে, সেই আজ আমার আগে আগে উত্তরকাশীতে ঢোকে, শিশুর পায়ের নাচন ওর পা দুটোয়। যে দু'একটা দিন এখানে আমার থাকার কথা, সবই যেন ওর—আমার কিছুই করার নেই এখানে। সিলকিয়ারা, গাংনানীর ধরম সিং ও নয়, পরিচয় বদলে গেছে ওর—আজ একান্তভাবেই ধরম সিং উত্তরকাশীর।

এখানে দুটি ধর্ম্মশালা। কালীকমলীবাবার ত আছেই, তা ছাড়া বিড়লার তৈরী একটি প্রাসাদোপম ধর্ম্মশালাও এখানে তৈরী হয়েছে। ধরম সিং জিজ্ঞাসা করে কোনটা আমার পছন্দ। কোটি-পতি বিড়লা আমার সহ্য হয় না—যে কোটিপতি দানে নিঃস্ব হতে পেরেছে তাঁকেই বেছে নি। বেলা দশটার ভেতরেই ধর্ম্মশালায় পৌঁছে যাই। ইট-কাঠ-পাথরের তিনমহলী বাড়ী, কমসে কম একশটা ঘর—ধরম সিং জানায় উত্তরাখণ্ডের পথে এত বড় যাত্রী-নিবাস আর কোথাও নেই।

ধর্ম্মশালার চৌকীদার ত ধরম সিঙের দেশোয়ালী—পরিচয়ের সখ্য দু'জনের, তাই ভাল ঘর পেতে বেগ পেতে হয় না। দোতলার ওপর একটা চমৎকার ঘর জুটে যায়, যার দু'দিকেই টানা বারান্দা চলে গেছে। ভাবলাম, যাক বাঁচা গেল, দু' একদিন আরাম করে কাটানো যাবে। সামনেই গঙ্গার প্রবাহিণী—বড় সুন্দর দৃশ্যটি। গোটা পরিবেশটুকুকে মনে-প্রাণে বরণ করে নি। বীরবলদের খোঁজ পাই না। বৃহৎ অট্টালিকার গর্ভে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে ওরা। ভাবি, পরে খুঁজে নেওয়া যাবে। উপস্থিত একটা ঘরেই আমার একলার আধিপত্য।

এই ত মাত্র দশটা, একটু ঘুরে আসা যাক। এই একটু ঘুরে

আসার তাৎপর্য্যটা ধরম সিং বুঝত। বিনা বাক্যব্যয়ে সে বলে—"চলিয়ে মহারাজ।"

ধর্ম্মশালার কিছু দূরেই একটা চায়ের দোকান। বৃদ্ধ দোকানী, দেখে বড় ভাল লেগে গেল। এখানে চা খাই আর তার দীর্ঘ দিনের অবস্থানের সুযোগ নিয়ে কথাবার্ত্তার ভেতর দিয়ে এখানকার সাধুসন্তদের খবরগুলো জেনে নি। ধরম সিঙের এ সব জানা, তাই দু'জনের চোখের ভেতর দিয়ে অব্যক্ত ইঙ্গিতের একটা বুঝা-পড়া হয়। বৃদ্ধের মতে—গঙ্গার ধারে উত্তরকাশীর একটু দূরে পশ্চিমাংশে একজন মহামানব থাকেন, নাম বিষ্ণুদত্ত। তাঁর দর্শনই সেরা দর্শন, তাঁর পাওয়া আশীর্ব্বাদই ব্যক্তিবিশেষের জীবনে চরম··· অন্য কোথাও ঘুরে না বেড়িয়ে ওঁর কাছেই যাওয়া দরকার, সুকৃতির অঞ্জলিতে অশেষ সম্পদ এসে যেতে পারে।

বৃদ্ধের কথা মেনে নি। ধরম সিংকে বলি—"চল, বহোত দের হ্যায়, থোড়া উধার সে, ঘুমকে চলে আয়েঙ্গে।" সঙ্গে দোকানীর কথামত একটা পাত্রে কিছু দুধ আর চিনি নি।'

যে পথকে উত্তরকাশীতে ঢোকবার আগে ফেলে এসেছি, ওই পথটাই উত্তরদিকে সীমন্তের মত গঙ্গার ধারে ধারে চলে গেছে। জনবহুল উত্তরকাশীর আওতার বাইরে এ পথের নির্দ্দেশ। তাই দু'একজনকে না জিজ্ঞাসা করে নিলে এ পথের ঠিক মত হদিস মিলবে না। পথটি অনুসরণ করে এসে দেখা গেল তা দুটি কুটীরের সামনে এসে শেষ হয়ে গেছে। বেশ বোঝা যায় এর পর পথের সঠিক পরিচয় আর নেই।

দুটি কুটীর···নগ্ন ও অনাদৃত। একটির সামনে বাঁশের আনলার ওপর গৈরিক রঙের একটা ল্যাঙট ঝুলছে, দোর খোলা, হাঁ হাঁ করছে। জনমানবহীন···শুধু মানুষের থাকার ঐ একটামাত্র পরিচয়, গৈরিক ল্যাঙট। বুঝলাম, আর কোন ভুল নেই, এখানেই বিষ্ণুদত্ত থাকেন। সব শেষ হয়ে গেছে যাঁর, ত্যাগের পূর্ণকলসে যাঁর আত্মার জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ, দুনিয়ায় তাঁর কেবলমাত্র সম্বল ঐ ল্যাঙট, আবার তারও রং গেরুয়া। সব মিলে গেল, কোন ভুল নেই। নির্জ্জন পরিবেশ, শান্ত সমাহিত আবহাওয়া, কুটীর দুটির সামনেই গঙ্গা···উঁচু পাড়, ধারাকে এখান থেকে দেখা যায় না, কিন্তু শব্দটুকু শোনা যায়। এখানেই অপেক্ষায় বসা যাক, হয় ত কোথাও গেছেন!

শূন্য কুটীর দুটির সামনে বসে বসে অনেক কিছুই ভাবছিলাম, এমন সময়ে আজানুলম্বিত গৈরিকবসন-পরিহিত এক মূর্ত্তির আবির্ভাব। আমাদের প্রত্যাশা করেন নি, তাই তাঁর গলার স্বরে বিস্ময়ের ভাবটা ফুটে ওঠে। জিজ্ঞাসা করেন—কোথা থেকে আসছি আমরা, কি চাই। উত্তর দিই যথামত। উত্তরে নিজের পরিচয় দেন। বলেন, কুটীর দুটির মধ্যে একটি তাঁর, বিষ্ণুদত্ত তাঁরই গুরু। দর্শনের ঔৎসুক্য প্রকাশ করাতে বলেন—"উনকা সাথ দর্শন মিলনা বড়া মুসীবত হ্যায়, কেঁও কি উয়ে গঙ্গাজীকা উপর পূজামে ব্যস্ত হ্যায়। দোপহর কে দো বজে কে আগে তো অধিকতর গঙ্গাজী সে নহী উঠতে।"

কি রকম একটা অদ্ভুত জেদ চেপে যায় আমার। না খাওয়া, না দাওয়া···বিকেলের দিকে এলেও ত চলে, তবু যখন এসেছি তখন দর্শন আমার চাই। বলি—"তিনি না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করব, যখন এসেছি তখন দেখে যাব—।" তিনি আবার ঐ কথারই জের টানেন—"দূর হী সে পরণাম কিজীয়ে গা। উসী সে ফলপ্রাপ্তি হোগা।"

আমি যখন ওঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত, তখন দেখি সামনের ঐ উঁচু পাড়টার ধার ঘেঁষে সম্পূর্ণ একটি উলঙ্গ মূর্ত্তি আস্তে আস্তে উঠে আসছেন এদিকে। আসছিলেন নিজের ভাবে, হঠাৎ আমাকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন প্রস্তরমূর্ত্তির মত, তারপর খানিকক্ষণ একদৃষ্টে আমাকে দেখে নিলেন ঘাড় ঘুরিয়ে, আর দেখার পর বিনা বাক্যব্যয়ে আবার গঙ্গার গর্ভে নেমে গেলেন। বুঝলাম ইনিই বিষ্ণুদত্ত—উত্তরকাশীর সাধনমার্গের মধ্যমণি। উলঙ্গ মূর্ত্তি, বস্ত্রের একটি টুকরোও শরীরে কোথাও নাই, অনাবৃত মাথাটির ওপর সাদা সাদা চুলের রেখা···জটাবিহীন। মূর্ত্তিটিকে দেখে মনে হ'ল, আমি যা চাইছিলাম তার ষোল আনার ওপর আঠার আনা সামঞ্জস্য আছে এঁর ভেতর। ওঁর প্রস্থানপর্ব্বটির ভেতর কিসের একটা ইঙ্গিত ছিল। মনে হ'ল এখানে অপেক্ষা না করে ওদিকটায় যাওয়া যাক, তিনি এখানে আসবেন না এখন। দুধের পাত্রটি শিষ্যটির হাতে সমর্পণ করে গঙ্গার পাড়ের ওপর এসে যাই, দেখি বিভোর হয়ে উলঙ্গ বিষ্ণুদত্ত অর্দ্ধনিমজ্জিত অবস্থায় সূর্য্যের দিকে চেয়ে আছেন, হাত দুটি প্রণামের ভঙ্গীতে বুকের ওপর জড়ো করা। একটি নগ্ন শিশু যেন—জাহ্নবীর বুকের ওপর একটা গোটা ঐতিহ্যের মত দাঁড়িয়ে আছেন। স্তব করছেন সূর্য্যের··· পৃথিবী গেছে লুপ্ত হয়ে। আমাদের দিকে ওঁর শরীরের পশ্চাদ্-ভাগ···একটা পাথরের ওপর ঝপ করে বসে পড়ি আমি—দূর থেকেই অতিমানুষটির কার্য্যকলাপ দেখে যাই, তাতেই জীবন ধন্য হয়ে যাবে।

স্তব শেষ হয়, দেখি—সামনের গঙ্গার তীরভূমির ওপর ছড়ানো কয়েকটি বিশেষ পাথরের ওপর অঞ্জলি ভরে জল ছিটোতে সুরু করেন। বিষ্ণুদত্ত কয়েকটি বিশেষ পাথর—কালো রঙের পাথর জল ছিটিয়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছেন, তারাও বিষ্ণুদত্তের হাতে স্নানের পর্ব্বে গরীয়ান্। এ পর্ব্বটির মধ্যেও ওঁর অদ্ভুতভাবে বিভোর হয়ে যাওয়া! সূর্য্যের স্তব আবার ঐ পাথরগুলির ওপর জল সিঞ্চন এই চলতে থাকে সমানে—এমনি করেই ব্যয় হয় সময়ের এক বৃহৎ ভগ্নাংশ।

আমি শুধু নির্নিমেষ হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখি একটি শিশুর খেলা। একদল পাহাড়ী মেয়েছেলে ওঁর কিছু দূরে স্নান করতে নামে···বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। কে এল আর কে গেল তাতে তাঁর কি? আমরাও যে পেছনে এসে বসে আছি সে খেয়ালও ওঁর ছিল না।

পেছন ফিরে তাকাই, দেখি ওঁর শিষ্যটি আমাদের অনুসরণ করে কখন যে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন বুঝতে পারি নি। বলি—"ঐভাবে পাথরগুলোকে স্নান করানোর অর্থ কি?" বল্লেন—"জব তক্ উয়ে স্নান ঔর সুরজদেবকী পূজা মেঁ লগে রহতে হৈঁ, তবতক দেবতাওঁ কে আবির্ভাব উন্হী পথ্থরো পর হোতা হৈ। হামলোগো কো তো নহী দীখতা, পরন্তু বে তো হৈঁ সিদ্ধ যোগী—যোগকে পরভাওয়সে উন্হেঁ সব দিখাই দেতা হৈ। উন পথ্থরোকী কিমাৎ উনকে লিয়ে তো উনকে প্রাণ সে ভী অধিক হৈ। ইসী লিয়ে ওয়হ ভগওয়ানজী কী বেদী ঔর যিন্ সব পথ্থরো কে যে স্নান করাতে হৈ। কোই কিসী প্রকার কী অপবিত্রতা উন পর ফৈলাতা হৈ তো জরুর উনকী কোই বড়ী—দুর্গতী হোতী হৈ।" অদ্ভুত তথ্য। কিন্তু বিশ্বাস করি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে। চোখের সামনে যে অতি-মানুষকে বিশ্বসংসার-ভোলা অবস্থায় দেখছি, তাঁর উপাসনার মহেন্দ্রক্ষণে সাক্ষাৎ শঙ্কর এসে যে পাথরগুলোকে বেছে নেবেন আপন বেদী হিসেবে, তাতে আর অবিশ্বাসের কি আছে? এ সব মানুষ অতীন্দ্রিয় সত্তায় লীন হয়ে গেছেন, এঁদের বিচার বস্তুতান্ত্রিক চোখ দিয়ে চলে না…এঁদের জীবন-ইতিহাসে সবই সম্ভব। শিষ্যটি আবার বলেন—"আপ পরনাম ইয়হী সে কর লিজীয়ে। লাখ কোশিশ পর ভী বে তো গঙ্গাজী সে নহী উঠেঙ্গে, ঔর নহি বোলেঙ্গে।" আমার চোখের সামনেই ওঁর পেছন দিক। ভাবি, উনি মুখ না ফেরালে প্রণাম করি কি করে? শিষ্যটিকে জানাতে তিনি দূর থেকে প্রণাম করার অনুরোধই জানান।

যে মুহূর্তে প্রণাম জানাই, ঠিক সেই মুহূর্তেই তিনি চকিতে ফিরে তাকান, যেন আমার প্রণামটির সঙ্গে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সম্বন্ধ আছে। হাত দুটিকে তিনি আশীর্বাদের ভঙ্গীতে উর্দ্ধাকাশে তুলে ধরেন।

এ রকমটি যে হবে, প্রণামের অঞ্জলিতে যে একজন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ঘুরে দাঁড়াবে এটা জানা ছিল না…অভিজ্ঞতার শিহরণে আমি যেন পাথর হয়ে গেলাম।

বিষ্ণুদত্ত যে কি জিনিষ, কত দূরদূরান্তে যে এ মানুষটির গতিবিধি তার প্রমাণ মিলে গেল। দূর থেকে পেছন ফিরে যে প্রণামকে বুঝতে পারে, সে মানুষের বিশ্লেষণ করি কি করে?

বিষ্ণুদত্ত…উত্তরকাশীর সম্পদবিশেষ…একটি বিশেষ ইতিহাসের মূর্ত্তমান প্রতীক…আধ্যাত্মিক সাধনার পূর্ণকুম্ভ যেন। বিভোর হয়ে উঠে আসি গঙ্গার তীর হতে। দুটি বাহুর আশীর্বাদই জীবনের সঞ্চয় হয়ে থাক: কথা নাই বা হ'ল, যা পেলাম তাই সার্থক, তাই পুণ্যময়!

চলে আসার সময় শান্তমূর্ত্তি শিষ্যটি বলে দেন—"ঔর এক সিদ্ধ মহাত্মাজী ইয়হী উন কে সাথ রহতে থে—বিলকুল নঙ্গে। উয়ে অব ইয়হাঁ নহী রহতে হৈঁ অব উয়ে গঙ্গোত্তরী মন্দির কে উল্টী পার ভারী জঙ্গল মে রহতে হৈঁ। বড়ে বিরাট পুরুষ হৈঁ উয়ে—অগর আপকী সুকৃতি হৈ তো উনকা দর্শন মিলনা অসম্ভব নহী হৈ। অগর উনকী আশীর্ব্বাদ মিলে তো সমঝিয়ে কি ঈশ্বর আপ পর প্রসন্ন হৈ—।

বলি—"আচ্ছা।"

ধর্ম্মশালায় ফিরে আসি যখন তখন বেলা দেড়টা। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ, ঠিক যেন বাংলাদেশের আবহাওয়া। বিষ্ণুদত্তের কথা চিন্তা করতে করতেই সময় পার হয়ে গেছে, খাওয়াদাওয়ার কথা মনেই ছিল না। ধরম সিং স্মরণ করিয়ে দেয়, বিকেলে ওদের বাড়ীতে যাওয়ার কথা—ভাইয়ের মারফত সে অনেক আগেই খবর পাঠিয়ে দিয়েছে তাদের গ্রামে। আজকের রাত্রে আমি নাকি ওদের সম্মানীয় অতিথি। তাও ত বটে! বলি—"রান্নাবাড়া যা হোক দুটো করে নে—সাড়ে তিনটের ভেতরেই রওনা হব, ভয় নেই।"

কালীকমলীওয়ালা ধর্ম্মশালার লাগোয়া প্রশস্ত ঘাট—নাম রাজঘাট। অপরপারে মনিকার্ণিকা, কেদারঘাট। কাশীরই স্মৃতি বহন করছে উত্তরকাশী। ওদিকে ত্রিবেণী-বরুণা ও অসি সেখানে মিলেছেন। যে অসি-বরুণার সন্ধান পাই বারাণসীতে—এখানেই সে দুটি ধারার সার্থক পরিচয়। রাজঘাটের ব্যবস্থাটি বড় সুন্দর, যে ব্যবস্থার দ্বিতীয় রূপ আর কোথাও নেই। গঙ্গার খরস্রোতকে পাথরের বৃত্তের ভেতর বন্দী করা হয়েছে আর ধর্ম্মশালার অন্দরমহল থেকেই পাকা বাঁধানো সিঁড়ি নেমে এসেছে গঙ্গার জল পর্য্যন্ত। স্নানার্থীদের জন্যে সিঁড়ির দু'পাশে লোহার শেকল শক্ত করে বাঁধা। এখানে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে স্নান সেরে নি।

কিন্তু পরিতৃপ্তি স্নানেরই হ'ল শুধু, থাকার নয়। ঘরে আসার দশ মিনিটের মধ্যেই গৈরিকবসনপরিহিত একটি ভোজপুরী মানুষের অবাঞ্ছিত উপস্থিতিতে একলা থাকার আরামটুকু কর্পূরের মত উবে গেল। বিষ্ণুদত্তেরই ধ্যানে ছিলাম, ছিঁড়ে গেল তা। ঘরের ভেতর ঢুকলেন হুড়মুড়িয়ে, যেন আমি কেউ নই। কৈফিয়ত তলব করবার আগেই পরিচয় দিলেন চড়া গলায় যে তিনিই মূর্ত্তিমান কালীকমলীওয়ালা, যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরী পথের সমুদয় ধর্ম্মশালার তিনিই মালিক, তিনিই যাবতীয় বিষয়ের একচ্ছত্র কাণ্ডারী। অদ্ভুত দম্ভের সুর গলায়, হাত-পা নেড়ে কথা বলার ভেতর আশ্চর্য্য এক নাটকীয় ভাব। জানতে চাইলেন, তাঁর অনুমতি না নিয়ে এ ঘর কে আমাকে দিয়েছে?

রাগে সমস্ত শরীর আচমকা যেন বিষিয়ে ওঠে, লোকটির ওপর অশ্রদ্ধা কেমন যেন বেড়ে যায়। তারই সুর হুবহু অনুকরণ করে বলি যে, চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী চৌকিদারের কাছ থেকেই ঘর নেওয়া হয়েছে। অন্যায় কিছু করা হয় নি। উত্তরে বল্লেন—"ওসব বাত ছোড়দো। [illegible]রা দেনে ন দেনে কা মালিক তো খুদ বহী হৈ—। চৌকিদার কৌই নহী হৈ। ইস কমরে মে অকেলা রহনা তো হোগা নহী—কমসে কম ঔর চার যাত্রী মেরে ইস কমরে মে আয়েঙ্গে।"

এরপর আর কিছু বলাও চলে না, অন্ততঃ এ মানুষের সঙ্গে।

ধরম সিংকে ডাকি, বলি বিছানাপত্র বেঁধে নাও—এ ঘরে থাকা চলবে না। ধরম সিং বোঝে তার অনুপস্থিতিতে গুরুতর একটা কিছু ঘটেছে। বিনাবাক্যে সে সব গুছিয়ে নেয় আর আমিও দ্বিরুক্তি না করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। কালীকমলীওয়ালা ধর্ম্মশালায় থাকা এইখানেই আমার ইতি। লোকটি শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় আমার দিকে ভীরুর মত। এখান থেকে সোজা চলে আসি বিড়লার ধর্ম্মশালায় যেখানে কোন কিছুর অভাব আমার হয় নি। শাপে আমার বর হয়ে গেল। পরে শুনেছিলাম, বীরপুঙ্গবটির ঔদ্ধত্যের পরিচয় উত্তরকাশীর সকলেরই জানা। অর্থের লালসা একে অমানুষ করেছে, অধর্ম্মকে ধর্ম্মের খোলস পরাতে এরকম ওস্তাদ মানুষ এখানে খুব কমই আছে। কমলীবাবার মহান্ যাত্রীবাসের বুকের ওপর এ বসে আছে জগদ্দল পাথরের মত। সকলেই চায় এ এখান থেকে সরে যাক্—যাত্রী-নিবাসে শৃঙ্খলা ও ন্যায় নেমে আসুক।

খাওয়াদাওয়া শেষ হ'ল, ধরম সিঙের হুকুমও সুরু হ'ল। এখানে আমি কেউ নই, বিছানার ভেতর থেকে বার করল পাতলা ধবধবে কাপড়, সেই সঙ্গে কাচানো একটা জামা। আলোয়ানটা ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে নেয়, চোখের গগ্‌লসটা ঠিক করে রাখে। আমার যাত্রাপথের চিরন্তন পোশাককে খুলে নেয় সে—আজকে সে আসল বাঙালী সাজেই আমাকে দেখতে চায়। বালকের আবদারটুকু অমূল্য বলে মনে হয়, তার সব অনুরোধগুলো মেনে নি। পরে নি কাপড়, কাচানো গেঞ্জী ও পাঞ্জাবী—আলোয়ান সেই ছোট ছুটি হাত দিয়ে আমার শরীরে জড়িয়ে দেয়। গগ্‌লসটা চোখে দি, তার মতে এতে নাকি আমাকে ভীষণ মানায়। হাতে লাঠিটা পুরে দেয়, জুতো ছুটোকে ঝেড়েঝুড়ে সেই পরায়। উত্তরকাশীর পথে যখন চলতে সুরু করি তখন মনে হয় তামাম দুনিয়া জয় করে ফিরছি আমি, আর পুরো-ভাগে চলেছেন আমার প্রধান সেনাপতি। ধরম সিঙের সে কি খুশী ভাব—যাকেই সামনে পায় তাকেই বলে, "কলকাত্তাসে আয়া হ্যায়···বাঙালী বাবু—মেরা মোকামমে যাতা।"

একটা খাড়াই পাহাড়ের ওপর ধরম সিংদের বাড়ী, গাঁয়ের নাম বোংওয়ারী। উঠতে পরিশ্রম হ'ল কম নয়, কিন্তু ওপরে উঠে পরিশ্রমের এক কণাও পড়ে রইল না আমার। পাহাড়ের শীর্ষে একটি নরম ঘাসের আস্তরণ বিছনো যেন, দূর থেকে দেখলাম পাহাড়ী তরুণীরা মাথায় করে জিনিষপত্র বয়ে নিয়ে চলেছে আর একটি সুরে গানও শুনি তাদের। এত ভাল লাগে যে কি বলব। এই 'লনের' শ্যামলিমায় ছোট ছোট কুটীরের সমারোহ···এ পাশে পাহাড়, ওপাশে পাহাড়, তারই মধ্যে এ পার্ব্বত্য গ্রামের মায়াময় অবস্থান···এত সুন্দর পরিবেশের ভেতর যে ধরম সিঙের বাড়ী জানা ছিল না। ভেবেছিলাম, উত্তরকাশী জনপদের ভেতরেই ওর বাড়ী; কিন্তু এখানে এসে বুঝলাম ধরম সিং কেন এত নির্মল, কেন এত সুন্দর। যে পরিবেশের ভেতর ও মানুষ হয়েছে তার ষোল আনা সার্থকতা পেয়েছে ও, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আমার আসার সংবাদ যে এ গ্রামে ধরম সিঙের ভাই মারফত ভাল ভাবে পরিবেশিত হয়েছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ রইল না, ঢোকার মুখেই পেলাম সম্বর্দ্ধনা—রাজকীয় কায়দাকানুন। অনেকে জড়ো হয়েছে, স্ত্রী-পুরুষ, শিশুর দল। "কলকাতার বাঙালীবাবু"র এ গ্রামে আসা যে বিশেষ সম্মান জনক ব্যাপার সেটা জানা ছিল না। তাই যা পেলাম তাই আমার কাছে অবিশ্বাস্য। ধরম সিঙের বাড়ীতে যখন পৌঁছলাম তখন পেছনে দেখি সারা গ্রামের লোক জড়ো হয়েছে।

ছোট্ট একটি কাঠের বাড়ী, মাত্র ছুটি ঘরের সংস্থান। একটি ঘরে আমার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে, ধবধবে একটি বিছানা পাতা, আর তারই একটি কোণে রান্নাবান্নার ব্যাপার। ধরম সিঙের ভাই ছাড়াও একটি বোন আছে, নাম সোনা। বড় সুন্দর দেখতে। ওর মাকে দেখি, আতিথেয়তার আর সেবার সম্রাজ্ঞী মনে হ'ল তাঁকে! কি অদ্ভুত সরল মন—আমাকে তিনি কি ভাবে নিলেন তার গভীরতা মাপা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। একটি রাত আর এক বেলা তাঁর আদর-আপ্যায়ন ধন্য হলাম আমি। এঁকে ভোলা যাবে না কোন দিন। রাত্রে গ্রামের প্রধানেরা এলেন, ধরম সিং পিতৃহীন, তাই আমার অসুবিধার কথা চিন্তা করেই তাঁদের আসা। অনেক কথাবার্ত্তা হ'ল এঁদের সঙ্গে, সুখদুঃখের ও হাসিকান্নার। সরলতার প্রতীক এঁরা—মানুষের মত মানুষ। অনেক রাত্রে খাওয়া শেষ হয়, আজকে সে ডাল-রুটির অদ্ভুত ব্যাপারটি নেই, মাতৃস্বরূপার হাতের নানাবিধ রান্না খেলাম আজ, যা অনেকদিন আমার ভাগ্যে জোটে নি।

কোথাকার মানুষ কোথায় আমার রাত কাটানো···হৃষিকেশের ধরম সিং, সেই আজ পরম সুহৃদ, মনুষ্যত্বে যে আমার থেকেও বড়। অদ্ভুত আবেষ্টনী ও পরিবেশ···পরিচয়হীন একটি পরিবারের সঙ্গে যে এমন করে মিশে যাব জানা ছিল না। রাত্রে যখন শুলাম তখন দেখা গেল আমারই পায়ের তলায় ধরম সিং, সোনা আর তার ভাই একটি লাইনে শুয়ে পড়েছে। ও ঘরে ওর মা—এ ঘরে আমরা। আমিই বা কে? ওরাই বা কারা? মানুষের সহজাত শুভবুদ্ধির আবর্ত্তে পংক্তিভাগ উড়ে গেছে, সারল্য ও বিনয়ের অঞ্জলিতে লোকলৌকিকতা কোথায় ভেসে গেছে। এরা পাহাড়ের মানুষ, অতিথিকে তাই এরা ভগবান বলে মেনে নেয়। অখ্যাত ও অনামী এরা—তাই তথাকথিত সভ্যতার নোংরামি এরা পায় নি।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়, ঘরের বাইরে চলে আসি নিঃশব্দে কাউকে না জাগিয়ে। কেন যে আচমকা ঘুম ভেঙে গেল বুঝি না। কুটীরের সামনে যে একফালি বারান্দা তারই একটা কাঠের খুঁটি ধরে হঠাৎ থেমে যাই।

নিশুতি ও নিস্তব্ধ রাত···ঘন অন্ধকারে অবলুপ্তপ্রায় প্রপঞ্চজগৎ। পাহাড়গুলোর অবয়ব চোখে পড়ে না, তাদের চূড়ো-

দরম সিঙের গ্রামের পথে (উত্তরকাশী)

গুলো যেন বর্শাফলকের মত উর্দ্ধাকাশে উঁচিয়ে আছে, অন্ধকারের ভেতর তাদের ছায়ামাত্র দেখতে পাই, আর কিছু নয়। মধ্যরাত্রের ঠাণ্ডা বাতাস···চাদরটাকে গায়ে টেনে নি আমি।

অখণ্ড একটা আকাশ। সপ্তর্ষিমণ্ডলের দুটি বৃহৎ তারা ওদিকটার পাহাড়ের ওপর জলজল করে জ্বলছে···নীহারিকার জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ গেছে মুছে···অতন্দ্র মায়াময় ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসে শুধু ঐ দুটি তারার প্রহর-জাগা, আর সব যোগনিদ্রায় লীন হয়ে গেছে যেন। মনে হ'ল দুটিমাত্র তারা অনন্ত এক জপমালা গুণে চলেছে কিসের এক আরাধনায়। আজকের রাত্রে ওরাই প্রাণময়—বাদবাকী মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন যেন।

অনুভূতির পর অনুভূতি···সে সব যায় লুপ্ত হয়ে, লীন হয়ে···শাশ্বত হয়ে যে মহাতত্ত্বটি জেগে ওঠে প্রদীপের উর্দ্ধশিখার মত তার তুলনা পাই না। বিশেষ স্থানে বিশেষ আত্মানুসন্ধানের পাতা উল্টে যায় আমার···।

ও দুটি তারার ত ঘুম নেই, ওরাই বা অমন করে প্রহর গুণছে কেন? ওরা কারা?

একটি নয়, দুটি—একটি তারাকেই বা দেখি না কেন? এর অর্থ কি? এ যোগের ব্যঞ্জনা কোথায়?

জপের মন্ত্রের ভেতর দিয়ে চিন্তার আচ্ছন্নতার বেদীতে ও দুটি তারাকে আর তারা বলে মনে হয় না। মনে হয় মাথার ওপর আশীর্ব্বাদের মত প্রকৃতি ও পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। একটি পরমশক্তি আর একটি পরমাশক্তিরূপিণী—একটি শিব আর একটি মহামায়া। গাংনানীর যমুনার তীরে সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রবাহিণীর ফিকে সবুজ রঙের ভেতর আজকের এই ভাবটির প্রথম পরিচ্ছেদ উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল আমার কাছে, এখানে সেই ভাবটির ভাস্বর রূপ আরও বেশী করে প্রকট হয়ে ওঠে। নিস্তব্ধ হয়ে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পিতৃসত্তা ও মাতৃসত্তার চরম যুক্ত বিকাশকে যেন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পারি। যেখানে প্রকৃতি সেইখানেই পুরুষ, যেখানে পুরুষ সেইখানেই প্রকৃতি।

জলজলে ও দুটি তারা আর কেউ নয়—আমার বোধেরও প্রকৃতি-পুরুষ।

মানুষের আরাধনা শুধু একটিমাত্র শক্তিকে ঘিরে নয়, আরাধনায় সবকিছু যুক্তশক্তির বেদীতে। মাতৃসত্তাকে অগ্রাহ্য করে শক্তিকে জাগান যায় নি কোন কালে, সাধনার সর্ব্বোচ্চ স্তর দুটি শক্তিকে ঘিরেই। সূর্য্যের চারিধারে যেমন পৃথিবীর পরিক্রমণ, তেমনি সাধনমার্গের পরিক্রমা পুরুষ-প্রকৃতিতে। মাতৃগর্ভে সৃষ্টির সম্ভাবনায় শুধু মাই সব নয়, সেখানে পুরুষের অমোঘ অবদান আছে। শক্তিপূজায় দীক্ষিত সাধকের তপস্যায় একটি শক্তিকে আবাহন করা হয় নি, সেখানে সাধিকার প্রয়োজন হয়েছে যুগে যুগে। শ্রীকৃষ্ণের লীলাখেলায় রাধা আছেন, গোপিনীরা তাই সেখানে দুয়ে দুয়ে চার মিলে যাওয়ার মত। তান্ত্রিকদের শব সাধনায় ভৈরবীর প্রয়োজন হয়েছে, ভৈরব সেখানে একা নয়। পুরুষের দেহ সেখানে শবের মত যেখানে তার বুকের ওপর কালিকা-মূর্ত্তির ঘনশ্যামা মূর্ত্তিটি নেই। বরাভয়দায়িনীকে তখনই আনতে পারা যাবে, যখন শিবের পূজোয় আমরা বিভোর হয়ে যাব। চিন্ময়ী মায়ের বিকাশ ভিখারী মহাদেবের ভিতর, আবার মহাদেবের সকল সার্থকতা অন্নপূর্ণার মহাদানে।

সকালবেলা ধরম সিং নিয়ে যায় একটি সাধুর কাছে। গ্রামের তিনি প্রাণস্বরূপ। এঁর কথা ও আমাকে বহু বার বলেছে।

গ্রামের শেষ কুটীরটি শেষ হয়ে গেল, পাহাড়ের খানিকটা ঢালু জমি, তার পর নানাবিধ গাছপালার ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশ, এরই মধ্যে অনামী একটি কুটীর—এইখানেই তিনি থাকেন। ভিতরে ঢুকে দেখলাম ঘরের মধ্যে বিরাট একটি বাঘছাল পাতা। একপাশে কমণ্ডলু আর চিমটে—আর এই বাঘছালটির ওপর তিনি বসে আছেন আসনের ভঙ্গীতে। বসে পড়ি একপাশে, তারপর হাতটা বাড়িয়ে দি' প্রণামের উদ্দেশ্যে। প্রণাম তিনি নেন, একটু হাসেন, তারপর ডান হাতটা আশীর্ব্বাদের ভঙ্গীতে উর্দ্ধাকাশে তুলে ধরেন। মনে হ'ল, এ ভিন্‌গাঁয়ে আমার মত একটা 'বাঙালী বাবুর' আসার খবর লোকমারফত আগেই তিনি পেয়েছেন। আমার সঙ্গে ধরম সিংকে দেখে তাঁর বিস্ময় জাগে, কৌতূহল ফুটে ওঠে। বিনা ভূমিকাতেই জিজ্ঞাসা করেন ধরম সিংকে দেখিয়ে—"আরে, উন্‌সে আপ কিধার মিলে?" এ জিজ্ঞাসা তিন-চারবারই তিনি আমাকে করেন। বুঝিয়ে দি তাঁকে সব ইতিহাস, হৃষিকেশ থেকে সুরু করে যমুনোত্তরী ঘুরে ধরম সিংকে কি ভাবে পেয়েছি, কি ভাবে সে আমাকে সাহায্য করেছে তার সব কিছুই তাঁকে শোনাই। শোনার পর মন্তব্য হয়, "আপ বহুত আচ্ছে আদমী মিলে, মেরে সাথ এ লেড়কা সগরু গিয়া। আপকা পুণ্য—পরতাপ হী ইসে মিলা দিয়া। মেরে সাথ চার যাত্রী ঔর থে—উনমে সে কোই ভী নহী সহ সকে—ইস বালককে দ্বারা ওয়হ সম্ভব হুয়া থা—।"

ছাঁত করে ওঠে মনটা। মনে পড়ে সব। সগরুর বহু গল্প ধরম সিং পথে যেতে যেতে বলেছে: জানিয়েছিল সগরু সেই জায়গা যেখানে সাধু দেখার ষোলকলা পূর্ণ হয়ে যায়। দুর্গম দুরারোহ এ তীর্থ, সবাই যেতে পারে না, যারা পারে তাদের অশেষ কল্যাণ হয়, না পাওয়ার তাদের কিছু থাকে না। ধরম সিঙের চলতি গল্প কতক শুনেছি,কতক শুনি নি—কতক বিশ্বাস করেছিলাম, কতক অবিশ্বাসের পর্য্যায়ে থেকে গেছে। কিন্তু এখানে এই সাধু-মূর্ত্তির মুখে যা শুনি—তাতে ধরম সিঙের ওপর শ্রদ্ধা আমার বেড়ে যায়, মনে হয় একে পাওয়া যোগাযোগের পাওয়া।

ভাটোয়ারী থেকে বেশ কিছু দূরে গঙ্গার পূর্ব্বদিকে পাহাড়-পর্ব্বতের বেড়াজালের ভিতর সগরু তীর্থ, সিদ্ধ যোগীপুরুষদের আবাসভূমি, তাঁদের সাধনার পীঠস্থান। সগর রাজার নাম

থেকে সগরু শব্দের উৎপত্তি, সে তীর্থ তুষারতীর্থ, সাধারণ যাত্রীদের কথা মানুষের কাছে সগরু, 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে—.' নানা কথাবার্তার মধ্যে ঐ তীর্থ-উপাখ্যানটি বড় হয়ে ওঠে, ব্যাপক হয়ে ওঠে। বুঝতে পারি ধরম সিঙের ধার্ম্মিক জীবনে তিতিক্ষার উৎকর্ষতা—তাঁর আশীর্ব্বাদই সে শুধু পায় নি, সঙ্গী হিসেবে যাওয়ার বিরাট সম্মানটুকুও সে পেয়েছে। সগরুর কথা আমি এর আগে অন্য কোথাও পাই নি, বা পড়ি নি। যেটুকু কথা ইনি পরিবেশন করেন, তাতে মনে হয় যে তীর্থভূমি মহাপুণ্যের, মহাভাগ্যের। বলেন, গঙ্গোত্তরী শেষ করে ফেরার পথে আমার যদি যাওয়ার ইচ্ছে হয় তা হলে তিনি আমার সঙ্গী হতে পারেন। নানা কারণে এ যাওয়া আমার ঘটে ওঠে নি। সগরু যাওয়ার গল্প আমার কাছে আলেয়াই থেকে গেছে। যে সগর বংশের ধ্বংসের ফলে ভাগীরথীর উৎপত্তি, ভগীরথ যে শাপ খণ্ডনের জন্যে মহাতপস্যায় রত ছিলেন—সেই ইতিহাস-আকীর্ণ 'সগরু'কেই দেখা হয় নি। এই সাধুটি আমাকে যোগাযোগের পথ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে আমি সেই যোগাযোগকে বরণ করে নিতে পারি নি।

ধরম সিঙের মা ছাড়েন না—গরম গরম ভাত, আলুর তরকারি চাটনি ইত্যাদি খেতেই হ'ল। মাতৃস্নেহ অসীম, সে যে কোন নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়—তার জলজ্বলে প্রমাণ পাই এঁর ভেতর। ধরম সিঙের মত ছেলের তিনি মা—তাই রত্নপ্রসবিনী। আগের রাত্রে আমার আসাকে উপলক্ষ্য করে ভুরিভোজনের যে প্রমাণ পেয়েছি তাও মনে থাকার কথা। কাছে বসিয়ে খাইয়েছেন, আমি খেয়েছি আর সেই সঙ্গে এও বুঝেছি সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মাতৃমূর্ত্তি সমান। ধরম সিঙের বাবা তিনি অনেকদিন আগেই মারা গেছেন। এখানে এসে আর একবার বুঝে গেলাম যে, দারিদ্র্যের সংসারে বেশী করে মায়া থাকে, স্নেহ থাকে, মানুষের আত্মা এখানে অবমানিত হয় না। যেখানে অর্থের অভিমান নেই, সেখানে মনুষ্যত্বটা বড় বেশী করে বেঁচে থাকে। দীনদরিদ্র ধরম ও তার পরিজন ; তাই ভগবান আশ্রয় নিয়েছেন এদের ভিতর।

এখান থেকে বিড়লার ধর্ম্মশালায় ফিরে আসি বেলা এগারটার ভিতর। চলে আসার সময় সে করুণ দৃশ্য ভোলবার নয়।

বিকালবেলা বেরিয়ে পড়ি উজলীর দিকে। ওখানে নাকি সাধুসন্তদের আস্তানা, খবর দেয় ধরম সিং। বিষ্ণুদত্তকে দেখার পর অবশ্য অন্য মানুষ দেখার প্রয়োজন ছিল না, তবু কেমন যেন ঔৎসুক্য জেগে ওঠে ; মনে হয় একবার ঘুরেই আসি। ব্যাপারটা একবার নিজের চোখে দেখে আসা দরকার।

উজলী উত্তরকাশীর পৌরশাসনের এলাকার বাইরে, বেশ খানিকটা দূরে। জনপদ সেখানে ফুরিয়ে গেছে, গঙ্গার ধারে নিস্তব্ধ পরিবেশের মধ্যেই উজলীর পরিচয়। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ওখানে পৌঁছে যাই।

এসে দেখি, আস্তানাই বটে—বিস্তীর্ণ এক এলাকা জুড়ে সাধু-সম্প্রদায়ের অতি আধুনিক ঘরবাড়ীর সমন্বয়ে এক বিরাট উপনিবেশ। এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত লম্বা এক পাঁচিল, তার ভিতরে নানা মানুষের সাধনমার্গের দুস্তর পরীক্ষা। যত মানুষ তত মত ও পথ। সাধুদের আনাগোনা দেখি—ফিটফাট, পরিষ্কার করে দাড়ি-গোঁফ কামান ও মুণ্ডিত মস্তক···মনে হয় সবেমাত্র প্রাত্যহিক ক্ষৌরকার্য্যের পালা যেন শেষ হয়েছে এঁদের। গৈরিক বসনকে কেতাদুরস্তভাবে পরা হয়েছে—কোথাও এতটুকু ময়লা বা দাগ নেই—যেন ধোপারবাড়ী থেকে ওগুলো সবেমাত্র এসেছে। ভিতরে ঢোকার আগে এদের দোখ আর মনের ভেতর এক বিজাতীয় মনস্তত্ত্বের উদ্ভব হয়। উজলী আর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না, মনে হয়, না এলেই যেন ভাল হ'ত। ভাবি গঙ্গার ধারে একটু বসি, তারপর সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেই উঠে যাব।

"ও মশাই শুনুন।"—পাঁচিলের ওদিকটা থেকে কে যেন ডাক দেন। চমকে তাকাতেই দেখি একজন হাত তুলে আমাকে ডাকছেন। পরিষ্কার বাঙালীর কথা, কোন ভুল নেই। এ উপনিবেশের মধ্যে তা হলে বাঙালীও আছেন! ভিতরে ঢুকে বিস্ময় সুরু হয়। হালফ্যাসানের ছোট ছোট বাড়ী, প্রত্যেকটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। বাড়ীর রং আগাগোড়া গেরুয়া—বৈরাগ্যের রঙকে ইটকাঠ পাথরের মধ্যেও টেনে আনা হয়েছে। আমার আসা দেখে ঐসব বাড়ীঘরের-দোরের সাধুমালিকরা তটস্থ হয়ে উঠলেন, আমি কখন তাদের প্রণাম করব তারই যেন সকরুণ প্রতীক্ষা। যিনি আমাকে ডাকলেন—তাঁর বাড়ীতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠি। সামনে ছোট্ট একটু বাগান—কলাগাছ ও উচ্ছেগাছকে বহু আয়াসে পোঁতা হয়েছে। বুঝলাম, সাধনমার্গে গৃহস্থালীও পাল্লা দিয়েছে ষোল আনা। ঝকঝকে তকতকে কয়েকটি ঘর, একটি লম্বা দালান, দালানের এক কোণে রাশীকৃত বইপত্রের স্তূপ। বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়। আসল কথার আড়ালে সুদূর বাংলাদেশের ফেলে আসা সংসারের খুঁটিনাটি কথাও এসে পড়ে তাঁর। বলেন—"কিছু কি করবার আছে, এই ত দেখুন না কলকাতা থেকে মেয়ে চিঠি লিখেছে, জামাইয়ের অসুখ, টাকা চাই। সে মনে করে তার বাবার এখানে জমিদারী, তার থেকে টাকা পেয়ে পেয়ে আমার সিন্দুক গেছে ভরে। আর পারি নে মশাই, এদিক সামলাই না ওদিক সামলাই।"

—"কলাগাছ আর উচ্ছেগাছ পুঁতেছে কে? আপনি?"

—"সে আর বলতে। স্রেফ আলু আর আলু, এ ছাড়া কি এদের দেশে আর কিছু আছে? মুখ ত বদলান চাই। ফেরার মুখে আসবেন একবার, উচ্ছে খাওয়াব।"

এই সব কথার মধ্যেই এক ঘণ্টার উপর কেটে গেল—এতে ক'রে তৃপ্তি হয় না। দেখেশুনে মন ঘুলিয়ে ওঠে···একরকম জোর করেই পালিয়ে আসি। উপনিবেশের আর সব বিংশ-শতাব্দীর সাধুরা চেয়েছিলেন আমি তাদের কাছে বসি আর তত্ত্বকথা
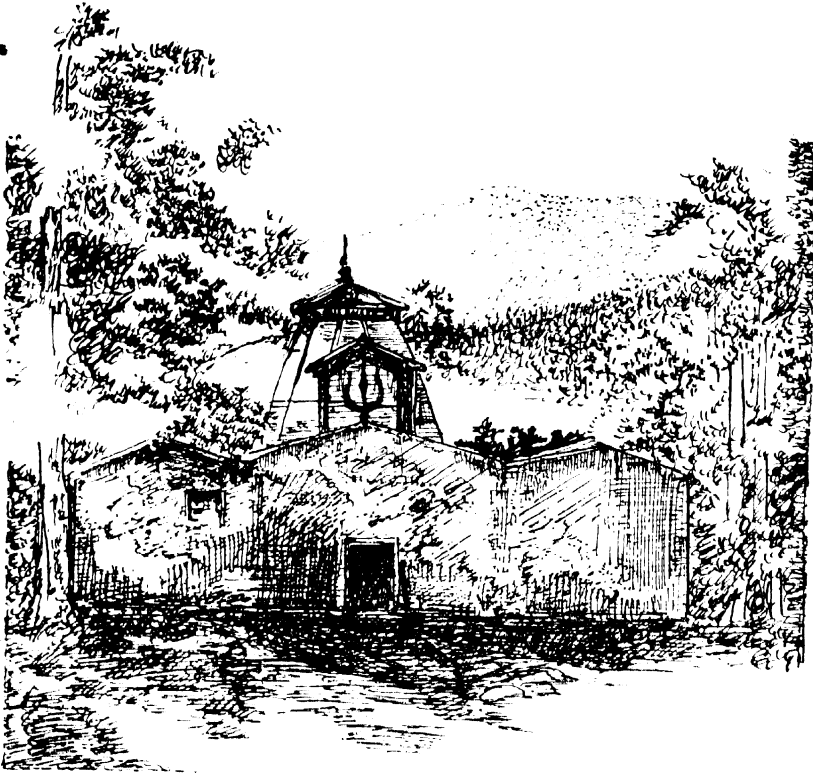
উত্তরকাশীর শিবমন্দির ও ত্রিশূল

শুনি। আমার ক্ষমতায় কুলোয় নি তা। মানুষ এখানে বৈরাগ্যের পথ ধরে নি, তাকে শিখণ্ডী করে এক অন্তহীন প্রবঞ্চনার সাধনা চলেছে এখানে···এখানে না এলেই যেন ভাল হ'ত।

আজকের রাত ফুরুলেই উত্তরকাশীতে থাকা শেষ হয়ে যাবে—সুরু হবে নতুন পথ ও নতুন অভিজ্ঞতা। যেটি আসল, যার জন্যে উত্তরকাশীর সকল মহিমা ও সকল ঐতিহ্য, বিষ্ণুদত্তের যোগমগ্নতা যাঁকে ঘিরে সেই ভগবানের ভগবান বিশ্বনাথকেই আমার এখনও দেখা হ'ল না। উজলী থেকে ফেরার পথেই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, ভাবি অন্ধকারের ভিতরই শঙ্করকে দেখে আসি একবার। আলোর ভিতর ভগবানকে দেখি নি, সেই যেন ভাল হয়েছে। আমি আর ধরম সিং পা চালিয়ে দি'—আরতির সময়ও ত হয়ে এল।

বারাণসীর বিশ্বনাথ আর উত্তরকাশীর এই বিশ্বনাথ—তফাং শুধু ব্যাপক নয়, বহুধা। সেখানে বিরাট শহরের স্থানবিশেষের গরিমা—সারবন্দী দোকান আর পুণ্যলোভাতুর মানুষের সংমিশ্রণে পাণ্ডাদের মিছিল। সেখানে দেবাদিদেব যেন হারিয়ে গেছেন ভিড়ের ভিতর, তাঁকে যেন চেনা যায় না···তাঁর স্পর্শ পেতে পেতেই যাত্রী নিঃস্ব হয়ে যায়, দেউলে হয়ে যায়। এখানে মন্দিরের বৃত্তের ভিতর প্রবেশ করেই মনে হ'ল দৈবভাবের ভিতর জীবনের সত্তা যেন গেঁথে যেতে বসেছে।

নিরাভরণ মন্দির। অলঙ্কারের আতিশয্য নেই, ভাস্কর্যের অতি সাধারণ বন্ধনের একটি পাষাণপ্রাচীরকে কেন্দ্র করে তিনটি সমসূত্রে গাথা মন্দিরের অবস্থিতি গবাক্ষহীন, একটিমাত্র প্রবেশপথ দিয়েই যাত্রীসাধারণের আসা-যাওয়া। মধ্যে অল্পপরিসর একটি নাটমন্দিরের ইঙ্গিত, তার ওদিকে পাষাণবেদীর ওপর স্বয়ম্ভূ মহাদেবের উদ্ভব। তার পাশে উত্তরকাশীর সুবিখ্যাত অষ্টধাতুর ত্রিশূল, যার প্রাচীনতা ত্রিকালকেও হার মানিয়েছে।

ভাবে বিভোর হয়ে এখানে যখন এসে যাই তখন আরতি সুরু হয়েছে। পাহাড়ী কিশোরদের হাতে বেজে ওঠে বাজনার অদ্ভুত সম্বর্দ্ধনা। ঠিক সময়েই এসেছি আমি···

পূজারী বৃদ্ধ, হাঁটুর ওপর কাপড়, একটি শুভ্র গরম আলোয়ান মুক্ত দেহের ওপর জড়ানো—গোটা জীবন এঁর সংযমের মধ্যেই ত কেটেছে। বাঁ-হাতে তাঁর ঘণ্টা, ডান-হাতে কর্পূরের দীপাধার··· আরতি সুরু হয় ক্ষেপা মহাদেবের। বিশ্বযোনির প্রকাশকে দেখা যায় না, মাতৃশক্তি এখানে ভূগর্ভে প্রোথিতা।

মন্দিরের আশেপাশে রাত্রির অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না মন্দিরাভ্যন্তরে সামান্য আলোর যা একটু প্রকাশ—বাদবাকী বিশ্বসংসারকে কে যেন অন্ধকারের অবগুণ্ঠন পরিয়ে দিয়েছে।

শিবের পূজো যে সুরু হয়েছে, তাই প্রকৃতি সুষুপ্তিতে মগ্না, বিশ্বচরাচর তাই স্তব্ধপ্রায়। কুমারসম্ভবের ক'টি লাইন আমার মনে পড়ে যায়ঃ

নিষ্কম্প বৃক্ষম্, নিভৃত দ্বিরেভম্
মূকাণ্ডজম শান্তমৃগপ্রচারম্;
তচ্ছাশাষণাৎ—কাননমেব সর্ব্বম্
চিত্রার্পিতারম্ভ ইবা বতস্থে।

মুখের ওপর আঙ্গুল রেখে নন্দী যেন বলছেন—'মা চপলায়।' যেহেতু উমা শঙ্করের পূজায় বসেছেন, তোমরা চপল হইও না। এখানে উমা নেই, কিন্তু মানুষ আছে, আজকে তার পূজাও বড় কম নয়। কর্পূরের ধোঁয়ায় মন্দিরের আবহাওয়া ভারী হয়ে ওঠে। পূজারীর বহুবিধ মুদ্রার ভিতর দিয়েই এ আরতির প্রকাশ···শিব-লিঙ্গের বুকের ওপর দীপাধার যেন জ্বলে জ্বলে ঘুরতে থাকে। উত্তর কাশীতে লিঙ্গমূর্ত্তি সোজা ওঠেন নি, দেবাদিদেবের পূর্ব্বদিকে বঙ্কিম-ভাবে তাঁর অবস্থান।

কর্পূরের আরতির পর পঞ্চপ্রদীপের আরতি···বোধের বুকের ওপরেও যেন আমার আরতি হতে থাকে। এ যে কি তা আমি বুঝাই কি করে। প্রদীপের পর দর্পণ, তার পর চামর, তার পর শঙ্খ···সর্ব্বশেষে পুষ্পের অঞ্জলিতে বিল্বপত্রের আবাহন।

পূজারী আরতিতে যতক্ষণ বিভোর ততক্ষণ নাটমন্দিরের প্রায়ান্ধকারের ভিতর মাড়বার-দুহিতাদের সমস্বরে গান শোনা যায়, শঙ্করাচার্য্যের প্রসিদ্ধ শিবস্তোত্রম্।

কতবার এ স্তোত্র শুনেছি, কিন্তু স্থানবিশেষের মহিমায় এ স্তোত্রের অর্থ অমূল্য হয়ে ওঠে। এক দিকে কাঁসরঘণ্টার গুরু-গম্ভীর আওয়াজ—এক দিকে আরতির সজ্জারাম আর তার সঙ্গে এই স্তোত্রের অপার্থিব আধ্যাত্মিক মূল্যের যোগাযোগ···সবকিছু মিলিয়ে বিশ্বনাথের মন্দির মরকতরাজ্য হয়ে ওঠে। ত্রিনেত্র মহাদেব মানুষকে এখানে ভক্তিমার্গের সোনার কাঠির স্পর্শ বুলিয়ে নরোত্তম করে তুলেছেন···তাঁর সৃষ্ট জীব অন্ততঃ এই সময়টুকুতে মহত্তম ও দ্বিজোত্তম।

কেদারের পথে গুপ্তকাশীতেও এই অনুভূতি পেয়েছিলাম—এখানেও সেই অব্যক্ত অনুভূতিতত্ত্বের আর এক অধ্যায়। ওদিকে কাশীর বিশ্বনাথ—এদিকে গাড়োয়ালরাজ্যের পাহাড়-পর্ব্বতের গহ্বরে গুপ্তকাশী আর উত্তরকাশী···কাশী নামেই এক অপূর্ব্ব দৈবভাবের সমন্বয়। এখানে বসে বসে রক্তের ভিতর যে রোমাঞ্চের সাড়া পাই তার তুলনা নেই। এ কেন? কিসের এই সাড়া? ঐ ত একখণ্ড পাথর—তাকে ঘিরেই মানুষের জীবনের চরম বন্দনা, চরম আরাধনা···কেন এরকম হয়, কেনই বা মনে হয় নিরাভরণ মন্দিরের এই স্বল্পপরিসর স্থানটুকুর ভিতর জীবনের বাকী ক'টা দিন পড়ে থাকি। ভগবানকে যদি না দেখা যায়, তবে কেন এই প্রাণের আকুলি-বিকুলি—কেন এই সর্ব্বাতীতের আবিষ্কারের চোখের জল!

মাড়বার-দুহিতাদের মনে হয় স্বর্গ থেকেই ওরা নেমেছে, পৃথিবীর মানুষ ওরা নয়। বিরাট একটি প্রদীপ দীর্ঘদণ্ডের ওপর জ্বলছে—তার ঊর্দ্ধমুখী শিখাকে মনে হয় জীবনের সকল বৃদ্ধির সকল আত্মতত্ত্বেরও শিখা যেন, যা অবিনাশী, যা চিরজ্যোতির্ম্ময়···। কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ শুনি আর শুনি অপূর্ব্ব স্তোত্রের স্বরঃ

গিরিরাজ-সুতান্বিত-বামতনুম্
তনুনিন্দিত-রাজিত-কোটিবিধুম্।
বিধি-বিষ্ণু-শিবস্তুত পাদযুগম্।
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥

আরতি শেষ হয়ে যায়···উঠে পড়ি ধরম সিংকে নিয়ে, সে-ও ভাবের ঘোরে বিভোর, তার সরল মুখের বড় বড় চোখ দুটিও তৃপ্তিতে বুঁজে গেছে যেন। মন্দিরের চত্বর ছাড়িয়ে পথের প্রান্তে নেমে আসি, তবু বাতাসে যেন ভাসতে থাকে—

নয়নত্রয়ভূষিত-চারুমুখম্,
মুখপদ্মবিরাজিত-কোটি-বিধুম্।
বিধুখণ্ড বিমণ্ডিত ভালতটম
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥

ক্রমশঃ

দ্রষ্টব্যঃ গত বৈশাখ সংখ্যায় যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরীর উদ্দেশে যাত্রার তারিখ দেওয়া হয়েছে—'জুনের বাইশে, বাংলার এগারই বৈশাখ।' এতে অসঙ্গতি রয়েছে। ইংরেজী তারিখ হবে—'২৪শে এপ্রিল।

—লেখক
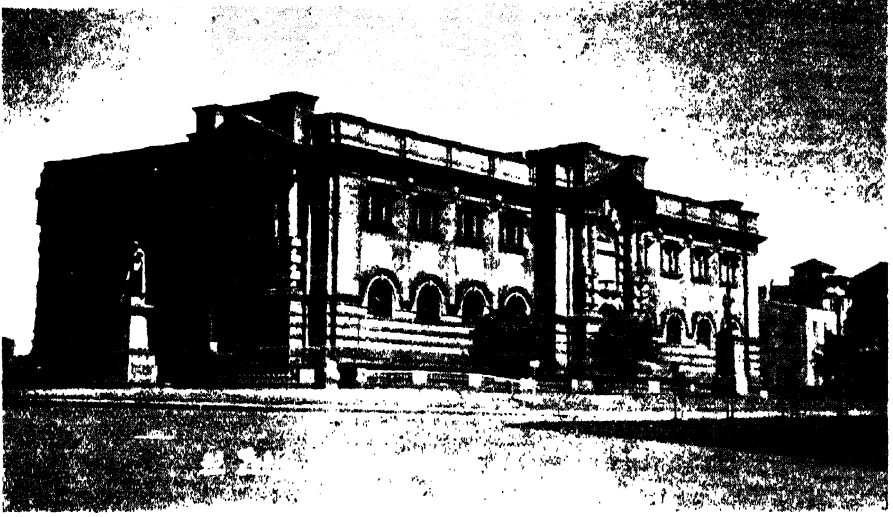
পাবলিক লাইব্রেরী—সিডনি

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া গ্রন্থাগার সম্মেলন

শ্রীবিমলকুমার দত্ত

১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাস। ভারত-সরকারের শিক্ষাদপ্তর থেকে অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগ দেবার নির্দ্দেশ এল, আর তারই দু'একদিন পরে দিল্লীস্থ অষ্ট্রেলিয়ান রাজদূতের আমন্ত্রণ এসে হাজির হ'ল অষ্ট্রেলিয়ান সরকারের তরফ থেকে।

এই সম্মেলনের ব্যবস্থা হয়েছিল কলম্বো পরিকল্পনানুযায়ী এবং সম্মেলনের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন অষ্ট্রেলিয়ান সরকার। ভারত, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ার গ্রন্থাগারিকগণ যোগদান করেছিলেন—পাকিস্থানেরও প্রতিনিধি প্রেরণের কথা ছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা আর হয়ে উঠে নি। এঁদের সঙ্গে ছিলেন অষ্ট্রেলিয়ার গ্রন্থাগারিক—রথী-মহারথী।

আজকের পৃথিবীতে শিক্ষা-দীক্ষায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া অনেকটা পিছিয়ে পড়ে আছে। গ্রন্থাগার-উন্নয়ন-পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সারা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় কি করে শিক্ষা-দীক্ষার মান অধিকতর সার্থক ও সম্পূর্ণ করা যায়—এই ছিল সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য।

ভারত-সরকার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার হতে ছয় জন প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন। দিল্লী ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু'জন; জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে একজন; আসাম ও হায়দরাবাদ সরকারী গ্রন্থাগার থেকে দু'জন এবং দিল্লীস্থ কৃষি গবেষণা মন্দির হতে একজন—এই ছ'জন। দমদম বিমানঘাঁটি থেকে ২২শে ফেব্রুয়ারী মধ্যরাত্রে বি. ও. এ. সি. বিমানে আমরা অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম।

দীর্ঘ চার মাস ধরে এই সম্মেলনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়েছিল অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন প্রদেশের রাজধানীতে।

অষ্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরা—দিল্লীর মত ছড়ানো শহর। আশে-পাশে পাহাড়ের চূড়া দেখা যায় আর দূরে ছোট্ট নদী। ক্যানবেরা নামটা কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ানদের দেওয়া নয়; এ নামটা দিয়েছিল ওদেশের আদিম অধিবাসীরা। কথাটার মানে হচ্ছে—মিলনক্ষেত্র। কবে কে এই নামকরণ করেছিল কে জানে, কিন্তু স্থানটি সার্থকনামা হয়েছে। এই ক্যানবেরাতেই সুরু হ'ল আমাদের প্রথম অধিবেশন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশস্ত সভাকক্ষে। সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন অষ্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। সভায় যাঁরা ভাষণ দেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীদলীপ সিংজী। ছোট্ট সারগর্ভ বক্তৃতায় তিনি ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটা ছবি সকলের চোখের সামনে তুলে ধরলেন। ক্রিকেটের মত বক্তৃতায়ও যে তিনি সুনিপুণ তা আগে জানা ছিল না।

এরপর থেকেই ঠিক "দেওয়া নেওয়ার" কাজ সুরু হ'ল। ধারাবাহিকভাবে অষ্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকগণ তাঁদের কার্য্যকলাপের একটা ফিরিস্তি আমাদের দিনসাতেক ধরে শোনালেন।

বাকি সাতদিন ঘোরাফেরা দেখাশুনা খানাপিনার ফাঁকে ফাঁকে সময় করে ঐ ফিরিস্তির সূক্ষ্ম আলোচনা চলল। দেখে এবং শুনে আশ্চর্য্য হলাম মাত্র একশ' বছরের মধ্যে একটা মরুভূমিকে কেমন সোনার দেশ করে তুলেছে সবদিক থেকে। মনে পড়ে পনের দিন ক্যানবেরায় অবস্থান করে ছেড়ে আসবার আগেকার দিন অষ্ট্রেলিয়ান পার্লামেন্টের খানাঘরে মিঃ কেসী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কেমন দেখছেন এই দেশ ও তার গ্রন্থাগার?" উত্তরে বলেছিলাম, "যতই দেখছি ততই আশ্চর্য্য হচ্ছি। বাহাদুরি বটে আপনাদের!"

সম্মেলনের যোগদানকারী গ্রন্থাগারিবৃন্দ—ডানদিকে সর্ব্বশেষে লেখক

ক্যানবেরা থেকে আমরা এলাম এডেলেডে। এডেলেড দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার রাজধানী, ছোট্ট চৌকা ঝকঝকে শহর। এখানে আমাদের কাজ হ'ল ইউনিভার্সিটি ও ষ্টেট পাবলিক লাইব্রেরি দেখা। এরা এত অল্প দিনের মধ্যেই সমাজ-জীবনে যোগ্য স্থান দিয়েছে গ্রন্থাগারকে। গ্রন্থাগারের সব কিছু নিখুঁত ও সুন্দর করবার একটা অক্লান্ত চেষ্টা চলেছে। সবচেয়ে যেটা ভাল লাগল সেটা হচ্ছে শহর থেকে দূরে বাস করেন যে সব ছাত্র বা নাগরিক—তাদের কাছে বিনা খরচায় ডাকযোগে বই পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা।

এডেলেড আমাদের ভাল লেগেছিল, সেখানকার লোকেরা আমাদের ভালবেসেছিল। ছেলেবুড়ো স্ত্রীপুরুষ সকলের আমাদের দেশের কথা জানবার কি আগ্রহ! এডেলেড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ধরে বসলেন—বিশ্বকবি ও বিশ্বভারতী সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে। বক্তৃতা হ'ল জনপূর্ণ ওয়াই-এম-সি-এর সভাকক্ষে। বক্তৃতার পর হাজারো প্রশ্নের জবাব দিতে হ'ল—তাদের ঔৎসুক্যের প্রশংসা করি। একজনের কথা বিশেষ করে মনে পড়ে—মিস জিন হোয়াইট—ভারতের উপর তার কি গভীর শ্রদ্ধা।

আর একদিন। রবিবার সকালে কাজকর্ম্ম নেই সেই ফাঁকে একটু ঘুরতে বেরিয়েছি—দেশী পোশাকে। অসংখ্য কৌতূহলী চোখ এড়িয়ে সদর রাস্তার চৌমাথায় এসে সবেমাত্র পৌঁছেছি। হঠাৎ চমকে উঠলাম পেছন থেকে এক পুলিসের কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনে—উইল ইউ ফলো মি টু দি পুলিশ ষ্টেশন, প্লিজ।" বিনা বাক্যব্যয়ে মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে থানায় এসে হাজির হলাম। প্রায় আধঘণ্টা একটা ওয়েটিং রুমে বসে থাকবার পর দেখি স্বয়ং পুলিস ইন্‌স্পেক্টর এসে হাজির। আমার হাত ধরে ক্ষমা চেয়ে বললেন—"মাপ করবেন, আমরা অত্যন্ত লজ্জিত। এই মূর্খ কনষ্টেবলটি জানে না যে এই আপনাদের জাতীয় পোশাক। আমি তার হয়ে আবার ক্ষমা চাচ্ছি।" এতক্ষণে পুলিসে ধরার কারণটা স্পষ্ট হ'ল।

এডেলেডে প্রায় দশ দিন কাটিয়ে আমরা এলাম ভিক্টোরিয়ার রাজধানী মেলবোর্ণে। এত দিন বেশ চলছিল—খুব ঠাণ্ডা কোথাও পাই নি, কিন্তু এখানে ত বরফ পড়তে সুরু হয়েছে, তার উপর কনকনে ঝোড়ো হাওয়া।

মেলবোর্ণ অষ্ট্রেলিয়ার অন্যতম বৃহৎ শহর। যে সমস্ত ভাগ্যান্বেষী একশ' বছর আগে সোনার খোঁজে ইউরোপ থেকে এদেশে পাড়ি দিয়েছিল তাদের চেষ্টায় এই শহরের পত্তন হয় এবং তাদের দৌলতেই এর যা কিছু বাড়বাড়ন্ত। সোনা হয়ত এখন আর পাওয়া যায় না, কিন্তু চারদিকে একটা সোনালী পরিবেশ আজও চোখে পড়ে।

মেলবোর্ণে ভিক্টোরিয়া ষ্টেট লাইব্রেরী বিরাট ব্যাপার। একে ব্রিটিশ মিউজিয়মের একটা ছোট সংস্করণ বলা যায়। সঙ্গে বিরাট ও সমৃদ্ধ আর্ট গ্যালারি।

শহর থেকে মাইল দুয়েক দূরে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রী আমাদের যত্নের ত্রুটি করেন নি, কিন্তু পথের দূরত্ব কমাবার জন্য ইউনিভার্সিটি ও ষ্টেট লাইব্রেরীর কাছে বিখ্যাত হোটেল—ভিক্টোরিয়া প্যালেসে আস্তানা নিলাম।

এইবার পুরাদমে কাজ চলল। তন্ন তন্ন করে ইউনিভার্সিটি ও ষ্টেট লাইব্রেরির প্রতিটি দপ্তর দেখা—বিশেষ করে তাদের কাজের পদ্ধতি আলোচনা করা। এক এক দপ্তরে প্রায় দু'তিন দিন ধরে কাজ চলত। কাজের চাপ খুব বেশী, তা সত্ত্বেও তাঁরা প্রত্যেকে খুব যত্ন ও আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের কাজ বুঝিয়ে দিতেন ও আমাদের কাছ থেকে যদি কিছু নেবার থাকত তা গ্রহণ করতেন। অসংখ্য দপ্তর, অসংখ্য কর্ম্মচারী আর দিনরাত স্রোতের মত পাঠকের যাতায়াত এই সব গ্রন্থাগারে, কিন্তু কোথাও টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই; কঠিন শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠু কর্ম্ম পদ্ধতির ছাপ যেন

ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী সিড্‌নি

প্রায়ই সন্ধ্যার পর আমাদের হোটেলে এসে আড্ডা জমাতেন।

কাজের চাপে দিনগুলো কোথা দিয়ে কেটে গেল জানি না। দেখতে দেখতে মেলবোর্ণে এক মাস অতিবাহিত হ'ল। আমরা এবার নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের রাজধানীর সিড্‌নি রওনা হলাম। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে তৃতীয় নগরী হিসাবে সিড্‌নির খ্যাতি আছে। এই হ'ল আমাদের শেষ ঘাঁটি, কাজ সেরে এখান হতে দেশে রওনা হব।

সিডনি শহরে এসে এখানকার ষ্টেট মিউনিসিপ্যাল ও ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী দেখার পর সুরু হ'ল আমাদের দেনা-পাওনার হিসাব। দেখার পর্ব্ব যখন চুকল তখন কি দেখলাম, কি নিলাম ও কি দিলাম তার ফিরিস্তি দিতে হ'ল প্রত্যেককে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। অনেক কিছুই পেয়ে এয়েছি। দু'হাত ভরে নিয়ে এসেছি, কিন্তু দিতে পেরেছি কতটুকু।

ফেরবার আগে সিড্‌নি শহরের মেয়র আমাদের সকলকে চায়ের আসরে নিমন্ত্রণ করে বিদায়-সম্ভাষণ জানালেন। তাঁর শেষের কথাকয়টি আজও মনে আছে—"আপনাদের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার বন্ধুত্ব দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হউক।"

সব জায়গায় লেগে আছে। মেলবোর্ণ ইউনিভার্সিটিতে অনেক ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হ'ল। এখানকার শিক্ষার মান অত্যন্ত উঁচু, সেজন্য অনেক ভারতীয় আজকাল ইউরোপে না গিয়ে ঐ দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যাচ্ছেন। মেলবোর্ণে আমাদের সঙ্গে এক জন আমেরিকান গ্রন্থাগারিক মিঃ বিহাইমার আলাপ হয়। তিনি এদেশে 'লেকচার টুরে' এসেছিলেন—ভারি অমায়িক ও ভদ্র।

মোহভঙ্গ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

আমি হেথা বসে আছি অন্যমনে একান্ত একাকী,
নিঃসঙ্গ সে মেঘখানি ভেসে যায়, দূরে ভেসে যায়,
কখন যে অকস্মাৎ নীল তার নীলিমা হারায়,
দিগন্ত মলিন, তবু প্রতীক্ষায় শূন্যে চেয়ে থাকি।
এস—এস—এস বলি' বার বার কারে আমি ডাকি ?
সীমাহীন ধূসরতা, মন শুধু করে হায় হায়,
সুন্দর কোমল কালো—চিত্ত মোর তোমারেই চায়,
তোমার করুণা দিয়ে আমার আকাশ দাও ঢাকি'।

বিদ্যুৎ চমকি যায়, বজ্র হাঁকে, হা-হা করে হাওয়া,
ধূসর নৈঃশব্দ ভাঙি' দুরন্তের জাগিল বিদ্রোহ,
ঝর-ঝর বারিধারা, এর সাথে যায় গান গাওয়া,
পূর্ণ হয়ে গেল প্রাণ, চূর্ণ হ'ল দারুণ সম্মোহ,
যে ছিল অনেক দূরে তারে যেন কাছে গেল পাওয়া,
ভাল লাগে ঘন-ঘটা, শ্রাবণের এই সমারোহ।

সুজাতার শোক

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

গভীর মনোযোগের সঙ্গে কি একখানা বই পড়ছিলেন ডাক্তার সোমনাথ অধিকারী। সম্ভবতঃ কোন ডাক্তারী বই। হাসপাতালের ডিউটি সেরে কতক্ষণ হ'ল বাড়ী ফিরেছেন তিনি এবং ফিরেই পোশাক-আশাক ছেড়ে বইখানা টেনে নিয়ে বসেছেন। চিকিৎসা-ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব দীর্ঘদিনের নয়—মাত্র এক বছর আগে পাস করে বেরিয়েছেন। নূতন ডাক্তার। এখনো হাসপাতালেই আবদ্ধ হয়ে আছেন। নিজে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন নি এখনো। না করে ভালই করেছেন। একটা প্রবচন আছে—শতমারী ভবেৎবৈদ্যঃ সহস্রমারী চিকিৎসকঃ! সুতরাং ও কাজটা হাস-পাতালে চুকিয়ে নেওয়াই সুবিধাজনক, নইলে আখেরে পসারের বিঘ্ন হতে পারে। হাসপাতালের এলাহী কাণ্ড—উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে হাত পাকাবার সেখানে বিশেষ অসুবিধা নেই। কিন্তু গোল বাধিয়েছেন ডাক্তার অধিকারীর আত্মীয়-পরি-জনেরা। তাঁরা তাঁকে হাত পাকাবার অবসরটুকুও দিতে রাজী নন। একটুকু শারীরিক অসুস্থতা আর কেউ বরদাস্ত করতে চান না। কারো একটু মাথা দপ্ দপ্, কিংবা পেট ভুটভাট করলেই ডাক পড়ে ডাক্তার সোমনাথের। কার ছেলের সর্দি হয়েছে, রাত্রে ঘুমুতে ঘুমুতে আবার একবার কাশির ভাব হয়েছিল—ওষুধ দিতে হবে সোমনাথ ডাক্তারকে। অমুকের খিদে হয় না—অমুকের ছেলে কেবল খাই খাই করে এমনিতর হাজার জনের হাজার রকম ব্যাপারের ব্যবস্থা করতে হয় ডাক্তার অধিকারীকে। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এসব করতেই হয় তাঁকে। তা ছাড়া নতুন বিদ্যা প্রকাশ করবারও একটা মোহ আছে।

ইতিমধ্যে বাড়ীর দরজায় একটি নেমপ্লেটও লাগানো হয়েছে—ডাঃ সোমনাথ অধিকারী, এম-বি। কিন্তু চিকিৎসার ক্ষেত্র এখনো আত্মীয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। অবশ্য এজন্যে ডাক্তার অধিকারী বিশেষ দুঃখিত নন্। সুদিনের জন্যে অপেক্ষা করার ধৈর্য্য তাঁর আছে।

মাস দুই থেকে একটি নূতন রোগী তাঁকে বড়ই বিব্রত করে তুলেছে। পাশের বাড়ীর বলরামবাবু তাঁদের আত্মীয়েরই সামিল। দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করাতে উভয় পরিবারের মধ্যে একটা মধুর ঘনিষ্ঠতা জন্মে গেছে। বলরামবাবুর বড় মেয়ে সুজাতাকে ডাক্তার অধিকারী অত্যন্ত স্নেহ করেন। সম্প্রতি সেই সুজাতারই ছেলের নিত্য নূতন অসুখ নিয়ে তিনি অতিশয় বিব্রত হয়ে পড়েছেন এবং ক্রমেই তাঁর স্নেহের উপর যেন অত্যাচার সুরু করে দিয়েছে সুজাতা। সুজাতার ইচ্ছে—ডাক্তারকাকা সব কাজ ছেড়ে ছুড়ে দিন-রাত তার ছেলের কাছে হাজির থাকুন। যেন কোন ফাঁক দিয়ে কোন রোগ এসে না তার ছেলেকে আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু তাও কি সম্ভব? ডাক্তার অধিকারী কি ডাক্তারি পাস করেছেন শুধু সুজাতার ছেলেকে চিকিৎসা করবার জন্যে? মাঝে মাঝে ভারি বিরক্তি বোধ হয় তাঁর। স্পষ্টই বলে ফেলেন, তোমার ছেলের জন্যেই শেষ পর্য্যন্ত আমায় দেশছাড়া হতে হবে দেখছি। অত রোগই বা রোজ রোজ আসে কোত্থেকে ছেলের?

সুজাতা লজ্জা পায়। চোখ দুটো ছল ছল করে আসে তার। আস্তে আস্তে মুখ নীচু করে বলে, অসুখ করে, তার আমি কি করব।—বলেই অভিমানে ঘাড় বাঁকিয়ে ডাক্তার অধিকারীর সামনে থেকে দ্রুত চলে যায়। কিন্তু চলে গেলেই ত আর সব গোল মিটে গেল না। এখখুনি যদি কোনক্রমে সুজাতার কাকীমার, অর্থাৎ ডাক্তার অধিকারীর সহধর্ম্মিণী মায়া দেবীর কানে এই সামান্য খবরটুকুও পৌঁছয় তা হলে আর উপায় থাকবে না। মায়া দেবীর সঙ্গে সুজাতার ভারি ভাব। দিনের অধিকাংশ সময় মায়া দেবীর কাছেই অতিবাহিত হয় সুজাতার। সুজাতার ছেলের জামা-প্যাণ্ট সাজ-পোশাক সবই প্রায় মায়ার তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়। ছেলের ব্যাপারে মায়ার পরামর্শ সুজাতার পক্ষে অপরিহার্য্য। দিনরাত ওই ছেলেটিকে নিয়েই দু'জনের কাটে। কাজেই সুজাতা রাগ করে চলে গেলেও ডাক্তার অধিকারীর রাগ করে বসে থাকা চলে না! তাঁকেও সুজাতার অনুসরণ করতে হয়। অনুসরণ করতে হয় বাধ্য হয়েই। নইলে মায়ার মুখ ভার হবে, চোখে হয়ত জল আসবে সুজাতার দুঃখে।

বাস্তবিক, ডাক্তার অধিকারীকে ক্রমেই অতিষ্ঠ করে তুলেছে ওরা দু'জনে। বলরামবাবু মাঝে মাঝে তামাশা করে বলেন, সোমনাথ ভায়ার ডাক্তারী বিদ্যেটা আমার নাতির কল্যাণেই দেখছি পাকাপোক্ত হয়ে গেল। এখন ভায়া তুমি স্বচ্ছন্দে হাসপাতাল ছেড়ে ওকে আগলেই বসে থাকতে পার—তাতে তোমার শিক্ষাকে কাজে লাগানোর কোন অসুবিধে হবে না।

সোমনাথ হাসেন। হেসে বলেন, তা যে হবে না সে আমিও বিশ্বাস করি। তবে কথা কি জানেন—সুজাতার শ্বশুরকে বলে করে আমার কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে দেন তা হলে আমি না হয়—

—অর্থাৎ তুমি ভিজিটের কথা বলছ ত? এটা কিন্তু সুজাতারই ব্যবস্থা করা উচিত।

সুজাতা সেকথা শুনতে পেলে হয় নীরবে স্থান ত্যাগ করে, নয় ভ্রূ কুঁচকে বলে, ওঁকে দিয়ে যে ওঁর নাতির চিকিৎসা করাই এই তো যথেষ্ট! তার আবার ভিজিট!

—বটে! আচ্ছা, এবার ছেলের অসুখ করলে ডাকতে যেয়ো! ডাক্তার অধিকারী চোখ পাকিয়ে তাকান সুজাতার দিকে। সান্নি-পাতিকই হোক আর—

ডাক্তার অধিকারীর কথায় সুজাতা যেন চমকে ওঠে। তাড়াতাড়ি ছেলেকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে সে চলে যায় সেখান থেকে। হয়ত মনে মনে বলতে বলতে যায়—বালাই ষাট! কেন অসুখ করবে। ও রোগ শত্তুরের হোক! হয়তো ডাক্তার কাকার কথাটা কাকীমার কানে পৌঁছে দেবার জন্যে তৎক্ষণাৎ পাশের বাড়ীর উদ্দেশেই পা বাড়ায়।···

ডাক্তার অধিকারী স্তব্ধভাবে সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকেন আকাশপাতাল। সুজাতার কাছে সংসারে একমাত্র তার ছেলে ছাড়া আর কিছুরই যেন অস্তিত্ব নাই। ছেলে ছেলে করে সে যেন একেবারে পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু ডাক্তার অধিকারীর কেন এ কর্ম্মভোগ। সুজাতার ছেলের জন্যেই না শেষ পর্যন্ত তাঁকে দেশান্তরী হতে হয়! পোড়া ছেলের—রোগও কি জোটে যত বিদ্‌ঘুটে বিদ্‌ঘুটে! তার উপর এক দাগ ওষুধে কিংবা একটা ট্যাবলেটে যদি অসুখ না সারে তা হলে আর উপায় নেই। মায়াতে আর ওই সুজাতায় তাঁর ডাক্তারী-বিদ্যার নিকুচি করে ছাড়বে। তা ছাড়া শুধু রোগের চিকিৎসা করেই নিষ্কৃতি নেই তাঁর, রোগীর শুশ্রূষাও তাঁকেই করতে হবে। আবার বিরক্ত হলে চলবে না—হাসিমুখে সব করতে হবে। মায়া বলে, দাদামশাই যখন হয়েছ—বিরক্ত হলে চলবে কেন? কৈ আমি তো বিরক্ত হই না! কত অত্যাচার তো আমার উপর করে। ওর ছেলেটাকে নিয়েই তো আমার দিন কাটে। কাচ্চাবাচ্চা ঘরে না থাকলে কি মানায়। সুজাতার ছেলেটা আছে তাই—

কাচ্চাবাচ্চা বড্ড ভালবাসে মায়া। ডাক্তার অধিকারীই কি কম বাসেন! কিন্তু তাই বলে কাচ্চাবাচ্চার অত্যাচার কাহাতক সওয়া যায়। মায়া সেকথা কানেই নেয় না। বলে, ভালবাসার অত্যাচারই যদি না সইতে পারলে ত সে আবার ভালবাসা নাকি? ছেলের ধকল বড় ধকল গো! ওইখানেই ভালবাসার যাচাই হয়ে যায়।

ডাক্তার অধিকারী বলেন, কিন্তু সব জিনিসেরই তো সীমা থাকা উচিত। এ যে—

—সীমা! সীমা আবার কিসের? বিশ্বের বিস্ময় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে মায়ার চোখে-মুখে। বলি, ভালবাসার কি আবার সীমা আছে নাকি গো?···না, আপন-পর আছে? এ যদি তোমার নিজেরটি হ'ত? তা হলে কি এমনি বিরক্ত হতে পারতে?

—না না, নিজের পরের প্রশ্ন নয়—মানে—

—থাক্, আর মানে বুঝাতে হবে না।

অপ্রস্তুত ডাক্তারের মুখের উপর একটা কঠিন কটাক্ষপাত করে মায়া সশব্দে স্থানত্যাগ করে।···

•

সত্যিই ডাক্তার অধিকারীর অবস্থাটা যেন সাপে ছুঁচো গেলার মত হয়েছে। গিলতেও পারছেন না, ফেলতেও পারছেন না। তা ছাড়া শুধু তো রোগের চিকিৎসা করিয়েই সুজাতা খুশী নয়—বায়না যে অনেক রকম! সুজাতার ছেলেটিকে সব সময় যদি তিনি কোলেপিঠে নিয়ে ঘুরে বেড়ান তা হলেই যেন ভাল হয়। সারাক্ষণ ডাক্তারের ছোঁয়ায় রোগের আশঙ্কা আর তা হলে বুঝি থাকে না ছেলের। অবশ্য সুজাতার ছেলে—তাঁর আদরের। ভালও লাগে তাঁর, কিন্তু তাই বলে সব সময়? তাঁর কি সময়ের কোন দাম নেই? মায়া এবং সুজাতা এ সব কথা শুনতেই চায় না—বুঝতেই চায় না। কিছু বললেই সুজাতার অমনি চোখ ছল ছল করে আসবে—মায়া ঝঙ্কার দিয়ে উঠবে। বিপদ আবার এইখানেই শেষ নয়। তাঁর দিক থেকে যদি স্নেহের এতটুকু বাড়াবাড়ি কোন মুহূর্তে ভ্রমক্রমেও আত্মপ্রকাশ করে, তা হলে আবার মায়ার তরফ থেকে হাসি, টিটকারি ঠাট্টার অন্ত থাকবে না।

এই তো ক'দিন আগেই একটা কাণ্ড ঘটে গেল, যার জের এখনো চলছে। সেদিনও ঘরে বসে একখানা বই নিয়ে পড়ছিলেন তিনি। গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ছিলেন। হঠাৎ এক সময় চমক ভাঙল তাঁর এবং তিনি আবিষ্কার করলেন—তাঁর কোলের পাশে সুজাতার ছেলেকে। বোধ করি কখন সুজাতাই তাকে এই ভাবে শুইয়ে রেখে গেছে।

অনেকক্ষণ ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি নির্নিমেষ চোখে। ঘটা করে সাজানো হয়েছে ছেলেকে। কাজল-টাজল পরিয়ে বেড়ে দেখতে হয়েছে কিন্তু। কখন অন্যমনস্কের মত তাকে কোলে তুলে নিলেন তিনি। একটু আদরও করেছিলেন হয়তো। তার পর টেবিলের উপর তাকে বসিয়ে খেলা সুরু করেছিলেন। আড়াল থেকে মায়া আর সুজাতা যে সব লক্ষ্য করছে তিনি তা জানতেই পারেন নি। হঠাৎ চমকে উঠলেন তাদের কলহাস্যে। অপ্রস্তুতের একশেষ আর কি! তাড়াতাড়ি ছেলেটাকে নড়া ধরে টেবিল থেকে নামিয়ে পাশে শুইয়ে দিতেই মায়া সহাস্য বিদ্রূপের স্বরে বলে উঠলেন—না না, লজ্জার কি আছে! অমন হয় গো হয়। দাদু-নাতি সম্বন্ধ যে! নাও, ওকে তুলে নিয়ে ওর সঙ্গে খেলা কর—আমরা চলে যাচ্ছি। বলেই তেমনি হাসতে হাসতে সুজাতাকে নিয়ে মায়া অদৃশ্য হয়ে গেল। একটা গুরুতর অপরাধ করে ধরা পড়ে গেলে মানুষের যে অবস্থা হয় ডাক্তার অধিকারীর অবস্থাও ঠিক যেন তেমনি হ'ল। তিনি মুখখানাকে যতদূর সম্ভব গম্ভীর করে চুপচাপ বসে রইলেন।

এ ঘটনার পর থেকেই ডাক্তার অধিকারী সুজাতা এবং তার ছেলের সম্বন্ধে রীতিমত সাবধান হয়ে চলছিলেন। পাছে কোন রকম দুর্ব্বলতা প্রকাশ হয়ে মায়ার কাছে হাস্যাস্পদ হন এই ভয়ে ক'দিন ওদের খোঁজখবরই করেন নি। কিন্তু তিনি খোঁজখবর না করলেও ওরা ছাড়বে কেন।

সুজাতাকে ডাক্তার অধিকারী সত্যিই অত্যন্ত স্নেহ করেন—সুজাতার উপর রাগ করে থাকাও তাঁর পক্ষে কষ্টকর। কিন্তু মুশকিল সুজাতার হয়েছে ওই জন্মরোগী ছেলেটাকে নিয়ে।

সুজাতার প্রতি তাঁর এবং মায়ার ভালবাসা দেখে বাড়ীর সকলে ঠাট্টা করে। বলে—সুজাতা আজ না হয় বাপের বাড়ী আছে, দুদিন পরে শ্বশুরবাড়ী গেলে তোরা থাকবি কি করে?—কথাটা সত্যিই ভাববার।

সুজাতার বিষণ্ণ মুখ, ছল ছল চক্ষু ডাক্তার অধিকারীর অসহ্য। ডাক্তার কাকার ফাইফরমাশ খাটতে তেমনি সুজাতারও আগ্রহের অবধি নেই। ডাক্তার ভাবেন, মেয়েটার সব ভাল, কেবল ছেলেটাই যত বিভ্রাটের মূল!

ক'দিন যে কারণেই হোক সুজাতা তাঁর সামনে আসে নি। আর তিনিও তাকে ডাকেন নি বা তার খোঁজ করেন নি। অন্তরে কেমন একটা বেদনা বোধ করছিলেন। একটা দুশ্চিন্তাও পাক খাচ্ছিল মনের মধ্যে। ছেলেটার কি আবার কোন গোলমেলে অসুখ বিসুখ করল নাকি? একবার না হয় গিয়ে দেখে এলে হয়। অভিমান করে হয়ত সুজাতা ডাকে নি তাঁকে। মায়ার কাছে কি খবরটা একবার নেবেন?

এই সব পাঁচ রকম চিন্তা ক'দিন ধরেই করছিলেন তিনি। হঠাৎ সমস্ত চিন্তার অবসান হয়ে গেল।—

ভবানীপুরে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে সকালে রোগী দেখতে গিয়েছিলেন তিনি। যখন ফিরলেন তখন বেলা আড়াইটে প্রায়। ফিরে সবে মাত্র পোশাক পরিবর্ত্তনের যোগাড় করছেন এমন সময় কাঁদতে কাঁদতে সুজাতা এসে আছাড় খেয়ে পড়ল তাঁর সামনে। তারই সঙ্গে সঙ্গে আবার মায়াও এসে জুটল তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য।

—আরে, আরে! কি হ'ল—কি হ'ল তোর? ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন ডাক্তার অধিকারী। কি করবেন, কি বলবেন কিছুই যেন স্থির করতে পারলেন না। এমন ফ্যাসাদেও মানুষ পড়ে। সুজাতার কান্না তাঁর অসহ্য। তাড়াতাড়ি সুজাতার হাত ধরে তাকে সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন, কি হয়েছে বল না? কাঁদছিস কেন?

—আমার ছেলে—আর কোন কথা সুজাতার মুখ থেকে বেরুল না—কান্নায় সব কথা মিলিয়ে গেল।

অধিকারী বললেন, তোর ছেলে? কি হয়েছে? বল ভাল করে—অসুখ করেছে? পড়ে গেছে?

—না গো—

—না গো, তবে কি?

কোন কথা না বলে সুজাতা আরও আকুল হয়ে কেঁদে উঠল। ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত মায়ার মুখেই প্রকাশ পেল। মায়া যা বললে তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে, আজ পরেশনাথ বেরিয়েছিল। সুজাতার ছোট ভাই দুলাল কাউকে কিছু না বলে ওর ছেলেকে নিয়ে পরেশনাথ দেখতে যায়, কিছুক্ষণ আগে দুলাল ফিরে এসেছে, কিন্তু ওর ছেলেকে আনে নি। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর দুলাল বললে, কাদের রকে বসে বসে একমনে প্রসেশন দেখছিল সে, পাশেই ছিল ছেলে, হঠাৎ নজর পড়তেই দেখলে কে নাকি ছেলেটাকে তুলে নিয়ে চলে গেল। তার পর অনেক সন্ধান করেও আর ছেলেকে পেলে না।

সর্ব্বনাশ! ডাক্তার অধিকারী বললেন: আচ্ছা, তুই চুপ কর সুজাতা—কাঁদিস নি! আমি তোর ছেলেকে খুঁজে আনছি। পোশাক পরিবর্ত্তন আর হ'ল না ডাক্তার অধিকারীর। তিনি সেই অবস্থায়ই ছেলে খুঁজতে বেরুলেন। কর্ম্মভোগ আর কাকে বলে!

বহু অনুসন্ধানের পর সন্ধ্যা নাগাদ তিনি বাড়ী ফিরলেন। ফিরলেন অবশ্য সুজাতার ছেলে নিয়েই। সুজাতারই এক বান্ধবীর কাছে ছেলেটিকে পেলেন তিনি। সেই মজা করবার জন্যে ছেলেটাকে নিয়ে গিয়েছিল।

ছেলে পেয়ে তবে সুজাতার মুখে হাসি ফুটল। ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে ছেলেটার একটা হাতে চোট লেগেছিল, ডাক্তারকাকার দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করে ছেলের মা ব্যাকুল হয়ে কেঁদে উঠল। ছেলের যন্ত্রণাটা নিজের ভেতরই যেন অনুভব করলে সে। ডাক্তার অধিকারী তাড়াতাড়ি ছেলেটার হাতে ভাল করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। ওষুধ খাওয়ালেন, ইন্‌জেকশন দিলেন। এই সব নিয়ে প্রায় রাত দশটা পর্য্যন্ত কাটল তাঁর। ছেলের চেয়ে ছেলের মায়ের অস্থিরতাই তাঁকে বিব্রত করে তুলেছিল বেশী। সুজাতাকে সামলাতেই তাঁর প্রাণ কণ্ঠাগতপ্রায়। তার সেই অস্থিরতা দেখে মায়া পর্য্যন্ত হেসে ফেলেছিল। মেয়েটা কি ছেলে ছেলে করে পাগল হয়ে যাবে নাকি! এতটা বাড়াবাড়ি কিন্তু ভাল নয়। তার সেই অস্বাভাবিক ব্যাকুলতা দেখে বাড়ীর লোকেরাও বিরক্ত হয়ে উঠেছিল।

যাই হোক, তার পর রাত্রিটা নির্ব্বিঘ্নেই কাটল।

সকালেই ডাক্তার অধিকারী হাসপাতালের কাজে বেরিয়ে পড়েছিলেন। সেখানে একটা রোগীকে নিয়ে সমস্ত দিন ভয়ানক ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল তাঁকে। এই এতক্ষণে নিষ্কৃতি পেয়ে বাড়ী ফিরেছেন এবং ফিরে পোষাক-আশাক ছেড়ে একখানা বই টেনে নিয়ে আরাম করে বসেছেন। হাসপাতালে আজ তাঁর ভারি খাটুনি গেছে। কিন্তু সহস্র কাজের ভিড়েও থেকে থেকে মনে পড়েছে গত রাত্রে সুজাতার সেই কাতরতা তার ছেলের জন্যে। ভেবেছেন—এখন সুজাতা কি করছে? কি করা সম্ভব? ছেলেকে নিয়ে হয়ত খুব ব্যস্ত হয়ে আছে। হয় ত ছেলের হাতের ব্যাণ্ডেজ আলগা হয়ে গেছে—যন্ত্রণা সুরু হয়েছে হয়ত এতক্ষণ! জ্বরও আসতে পারে। ডাক্তারকাকার জন্যে হয় ত সে আকুলি-বিকুলি করছে। কিংবা মায়ার কাছে তাঁর নামে অনুযোগ করছে, 'ডাক্তারকাকা কিছু জানেন না কাকীমা। এই দেখ আমার ছেলের হাতখানার কি হাল করেছে। আমারও যেমন মতিবুদ্ধি—মোড় থেকে তখন জগৎ ডাক্তারকে ডেকে একবার দেখালেই হ'ত; তা নয়—এখন আমি ছেলেকে বাঁচাই কি করে?'

এমনি কত কথাই আজ সারা দিন ভেবেছেন ডাক্তার অধিকারী।

ডাক্তার অধিকারী বইখানা পড়ছিলেন কিনা কে জানে—তবে দৃষ্টিটা তাঁর সেই দিকে নিবদ্ধ ছিল। হঠাৎ ঠক ঠক করে পাশে একটা শব্দ হতেই চমকে উঠলেন তিনি, চোখ তুলে তাকাতেই দেখলেন মায়া। মায়া তাঁর চা এবং জলখাবার এনে টেবিলের উপর রাখছে। একটু যেন বিস্মিত হলেন তিনি। বিস্মিত হবার কারণ অন্য কিছু নয়—এই সব ছোট-খাটো কাজগুলো তাঁর সুজাতাই করে থাকে—চা এনে দেওয়া, জলখাবার, আহারাদির পর পান বা মশলা এনে দেওয়া, সুজাতা ছাড়া এগুলি আর কারও করবার উপায় থাকে না। ডাক্তার কাকার কাজ করতে সুজাতা ভালবাসে। না বাসবেই বা কেন? ডাক্তার কাকা তার ছেলের জন্যে অত করেন!

এখন তাই সুজাতার পরিবর্তে মায়াকে তাঁর চা-জলখাবার আনতে দেখে তিনি ভুরু কোঁচকালেন। বাড়ী এসেই সুজাতাকে দেখতে পাবেন এই আশাই করেছিলেন। সুজাতার ছেলের খবরটা জানা বিশেষ দরকার। কিন্তু—

মায়ার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করলেন তিনি:—সুজাতা কোথায়?

—বাড়ীতে।

—এখানে আসে নি?

—এসেছিল বৈকি। এই ত দু'মিনিট আগে এসে তোমার খবর নিয়ে গেছে। বলে গেছে—তোমার জলখাওয়া হলেই একবার অবিশ্যি অবিশ্যি যেন যাও। ওর ছেলের হাতের ব্যাণ্ডেজ খুলে গেছে—জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। এখন তার মাথায় আইস-ব্যাগ দিতে হচ্ছে।

—মায়া একটু থামল। আঁচলের খুঁট দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে বললে, ভারি ভয় পেয়ে গেছে মেয়েটা! বললে, ছেলের অবস্থা দেখে হাত পা তার পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে—ছেলে এখন বাঁচলে হয়!

—বল কি?

—হ্যাঁ। তুমি এখন চট্ করে চা খেয়ে নাও। নিয়ে ছেলেটাকে একবার দেখে এস। আর ওষুধ ইনজেকশন সব সঙ্গে করে—

মায়ার কথা শেষ হ'ল না। ঠিক সেই মুহূর্তেই সুজাতার বিলাপ শোনা গেল। হায় হায় করতে করতে ছুটে আসছে সে। উভয়েই চমকে উঠলেন তাঁরা।

—কি—কি—কি হ'ল। বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন দু'জনে।

এই বাড়ীর উঠানে এসে একেবারে বসে পড়েছে সুজাতা। সুজাতার ছেলের কোন অকল্যাণ হয়েছে ভেবে আঁতকে উঠেছেন তাঁরা, বাড়ীর আর আর সকলেও।

ডাক্তার অধিকারীকে দেখে সুজাতা কান্নাজড়ানো সুরে বলে উঠলেন, কাকু, আমার ছেলের···সে একেবারে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

—কি হয়েছে—কি হয়েছে? চল দেখি।

—আর কি দেখবে—উ—উ—খোকার—এ—এ—

অবশেষে অনেক চেষ্টার পর যেটুকু জানা গেল তা এই: সুজাতা ঘরের মেঝের বসে তার জ্বরাক্রান্ত ছেলের মাথায় আইস-ব্যাগ দিচ্ছিল। পাছে ছেলের ঠাণ্ডা লাগে এই ভয়ে ঘরের জানলা কপাট বন্ধ করে দিয়েই ছেলের শুশ্রূষা করছিল সে। এমন সময় কোথা থেকে তার বাবা বলরামবাবু ঘরে এসে তার ছেলের···আর কিছু সে বলতে পারল না—কান্নায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

সর্বনাশ! চমকে উঠলেন ডাক্তার অধিকারী। তবু তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা—কাঁদিস নি। ও কিছু নয়—সব ঠিক হয়ে যাবে। মালিশের ভাল ওষুধ—

—আর কি ঠিক করবে একেবারেই যে···। বলেই তেমনি কাঁদতে কাঁদতে সুজাতা পিতার পাদুকাপিষ্ট, ছেলের ভগ্ন আলুর পুতুলটা ডাক্তারের পায়ের কাছে ফেলে দিলে।

এতক্ষণে আশ্বস্ত হলেন ডাক্তার অধিকারী আর তাঁর স্ত্রী। ওঃ, খোকার তা হলে কিছু হয় নি—ক্ষতি যা হয়েছে সে ওর পুতুলের। কিন্তু যা ব্যাপার করে তুলেছিল সুজাতা, তাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে তো রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। ছেলের প্রতি সুজাতার অন্ধ স্নেহের কথা ডাক্তার অধিকারী জানতেন। কিন্তু তা যে এতটা বাড়াবাড়িতে, একেবারে অস্বাভাবিকত্বের পর্য্যায়ে পৌঁছেছে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি।

সুজাতাকে সান্ত্বনা দিয়ে স্বামী-স্ত্রী বাড়ী ফিরে এলেন। "বুঝলে মায়া", ডাক্তার অধিকারী বললেন, "একেই বলে ফেটিশ বা কোনকিছুর প্রতি অত্যাসক্তি এবং তাই নিয়ে বাড়াবাড়ি। ছেলের প্রতি অন্ধ স্নেহ সুজাতাকে এমনি মোহাচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে, তার কাছে ছেলের খেলার পুতুলটা পর্য্যন্ত সজীব প্রাণীর সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাই তার এ শোক। সুজাতার আচরণ তোমাদের নিকট হয়তো অস্বাভাবিক ঠেকবে। তার কাছে কিন্তু খোকার পুতুলের শোক পুত্রশোকের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।"

মায়া কোন জবাব দেয় না—শোকবিহ্বলা সুজাতার করুণ মুখচ্ছবি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কেরলের কথাকলি নৃত্যশিল্পীবৃন্দ

কথাকলি

শ্রী এম্‌. মুকুন্দ রাজা

অভিনয়, নৃত্য ও গীত—এই তিনটি চারুকলার জটিল সমন্বয়ে কথাকলির সৃষ্টি। কথাকলি নৃত্যে শিল্পীর গান করার এমন কি, কথা বলারও অধিকার নেই। শুধু অঙ্গ ও মুখভঙ্গি এবং হাতের রূপক মুদ্রার মাধ্যমে তাকে নৃত্যের বিষয়বস্তু ও ভাবকে রূপায়িত করতে হবে। নৃত্যকলা-অনভিজ্ঞ সাধারণ লোকের মনেও তার প্রতিধ্বনি জেগে উঠবে। মূক অথচ ভাবমুখর প্রকাশ-পদ্ধতিই কথাকলির বৈশিষ্ট্য। এই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল, বিচিত্র সুন্দর নৃত্যকলা কেরলের অনন্যসাধারণ অবদান।

উৎপত্তি: এই নৃত্যকলার উৎপত্তি নিয়ে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কবে এর উৎপত্তি—এই প্রশ্নে সমালোচক এবং বিদগ্ধজন একমত হতে পারেন নি। কোজি খোদ অঞ্চলে প্রবাদ আছে, জামোরিণের এক রাজা প্রথম কৃষ্ণ নাট্যম্‌ নামে ধর্মীয় নাট্যাভিনয় সংগঠন করে তোলেন। এই অভিনয় খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং ক্রমে এই অভিনয়ের প্রতি ত্রিবাঙ্কুরের অন্তর্গত কোটটারাক্কারার রাজার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কোটটারাক্কারার রাজা জামোরিণের রাজাকে তাঁর অভিনয়কুশলী দলকে পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ করেন। এঁদের দু'জনের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। সেই কারণে ঈর্ষান্বিত হয়ে জামোরিণের রাজা তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। কোটটারাক্কারার রাজা এর উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবার জন্য নিজেই উদ্যোগী হয়ে রাম নাট্যম্‌ নামে সম্পূর্ণ নূতন এক ধরণের অভিনয়-দল গড়ে তোলেন। পরে এরই নাম হয় কথাকলি। উত্তর কেরলের জনশ্রুতি এই রকম।

আবার এর ঠিক বিপরীত কাহিনীও প্রচলিত আছে দক্ষিণ কেরলে। তাঁরা বলেন, রাম নাট্যম্‌ বা কথাকলির জন্মই আগে, পরে অনুরূপ একই কারণে কৃষ্ণ নাট্যমের উদ্ভব। কিন্তু কৃষ্ণ নাট্যমের গ্রন্থকার নিজেই নাটকের শেষে একটি শ্লোকে এর রচনাকাল উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, কলির ১৭,৩৬,৬১২ সালে এটি রচিত। খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে এই সময় ১৬৫৩ সাল। পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলে জানা যায়, রাম নাট্যমের রচয়িতা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। [illegible]ব সম্ভব সিংহাসনে আরূঢ় থাকার সময়েই, ১৪৮৩ সাল থেকে ১৪৯১ সালের মধ্যে তিনি এটি রচনা করেন। এতে রাম নাট্যমের আনুমানিক রচনাকাল জানা যায়, কিন্তু এ থেকে কথাকলির উৎপত্তি কোন সময়ে তা অনুমান করা সম্ভব নয়।

রামনাট্যম্ নিঃসন্দেহে কথাকলি-সাহিত্যের অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ। কিন্তু কথাকলি আরও অনেক বেশী প্রাচীন বলেই মনে হয়। কথাকলির নিখুঁত নৃত্যকলা, অভিনয়-ভঙ্গী এবং সাজ-পোশাকের বৈচিত্র্য মাত্র দুই এক শতাব্দীর মধ্যে গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। কথাকলির উৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রী জি. ভেঙ্কটাচলম যা বলছেন এক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মত—কথাকলি একটি জাতির ঐতিহ্য, জাতির মতই তা সুপ্রাচীন।

কেরল কলামণ্ডলম্ : এই সেদিন পর্য্যন্তও কথাকলি কেরলে খুবই জনপ্রিয় ছিল। অভিজাত-পরিবার মাত্রেই কথাকলি দল রাখতেন এবং সর্ব্বপ্রকারে এই কলার উৎসাহ দিতেন। জনসাধারণও সেই সঙ্গে কথাকলির সমঝদার হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু পশ্চিমী শিক্ষার প্রভাব তরুণদের মধ্যে তীব্র হয়ে দেখা দিলে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। যাঁরা শিক্ষিত বলে গর্ব্ব করতেন, প্রাচীন শিল্প-কলার প্রতি নাসিকাকুঞ্চনই ছিল তাঁদের উচ্চশিক্ষার মানদণ্ড। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের আজ আবার মনের পরিবর্ত্তন ঘটেছে। গৌরবময় অতীতের উজ্জ্বল সম্পদ—শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনে আজ আবার সাড়া জেগে উঠেছে। তবে এর জন্য কেরলের মহাকবি ভাল্লাথোলের নিকট ঋণ স্বীকার করতেই হয়। তিনিই ১৯৩০ সালে কয়েকজন বন্ধুর সাহায্য ও সহযোগিতায় বর্ত্তমানের সুবিখ্যাত কেরল কলামণ্ডলম্ কথাকলি ইনষ্টিটিউট সংস্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের অনলস প্রচেষ্টায় কথাকলির প্রতি কেরলের তথা ভারতের জনসাধারণের মনোভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়। কিছুকাল পূর্ব্বেও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যেমন, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের মহারাজা, কাদাথানাত্তের রাজার উদ্যোগে কয়েকটি কথাকলি শিক্ষাকেন্দ্র পরি-চালিত হ'ত; আজ মাত্র দুটির অস্তিত্ব কোন গতিকে রক্ষিত হয়েছে। একটি হ'ল কেরল কলামণ্ডলম্, অপরটি বৈদ্যরত্নম পি. এস. ওয়ারিয়েরের প্রতিষ্ঠিত 'কোট্টাকাল'।

প্রাচীন কথাকলি সাহিত্য : কথাকলির প্রাচীনতম সাহিত্য হ'ল কোট্টারাক্কারার রাজার রচনা রামনাট্যম্। রামায়ণ কাহিনীর মূল কাঠামোর উপর তিনি এই নাট্যগ্রন্থ রচনা করেন। এটি পুরোপুরি অভিনয় করতে আট রাত্রি লাগে। তাঁর পরে কোট্টায়মের পাঝাসি রাজা, উন্নায়ী ওয়ারিয়ের, ইরিয়িম্মান, তাম্পি প্রমুখ বিশিষ্ট কবি অনেকগুলি নাট্যগ্রন্থ রচনা করেন।

মোট দেড় শতের মত কথাকলি-নাট্যের কথা আমরা জানি; তবে এগুলির মধ্যে বিশ-চল্লিশটি নাটকই বিশেষ জনপ্রিয় এবং প্রচলিত। আধুনিক মালয়ালম্ সাহিত্যসৃষ্টির মূলে কথাকলি নাট্য-গ্রন্থের অবদান যথেষ্ট এবং এগুলির সাহিত্যমূল্যও কম নয়।

সাজসজ্জা : কথাকলি নাট্যের কাহিনী রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ থেকে গৃহীত। তাই প্রতিটি নাট্য-চরিত্র সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক গুণের প্রতীক। চরিত্রের গুণ অনুযায়ী সাজ-সজ্জার পরিকল্পনা করা হয়, আধুনিক নাটকাভিনয়ের বাস্তবমুখী নীতি এখানে অচল। সজ্জা-পরিকল্পনার পিছনে দীর্ঘকালের পর্য্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষার অভিজ্ঞতা বিদ্যমান। যাঁরা বাস্তববাদী তাঁরা হয়ত এই সাজসজ্জাকে অস্বাভাবিক ও অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিতে পারেন।

কবি ভাল্লাথোলের উক্তিতে এই সব বাস্তববাদী সমালোচকের উত্তর মিলবে। তিনি বলেছেন, "যে কলা চরম উন্নতির আসনে সমাসীন, তার রূপ—এই সব সমালোচক যে অর্থে 'বাস্তব' শব্দের ব্যবহার করে থাকেন, তদনুরূপ হতেই পারে না। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ-দের কাছ থেকে আমরা যে সঙ্গীতকলা লাভ করেছি তাও মূলতঃ প্রকৃতির অনুকরণেই সৃষ্টি! মানুষের মনেই সঙ্গীত রূপ পরিগ্রহ করেছে। কবিতাও তাই। বহু শতাব্দীর সংস্কৃতির স্রোতধারায় কলার নিজস্ব রীতি ও ধরণ গড়ে ওঠে এবং প্রায়শঃই তা হয় অতি উচ্চাঙ্গের প্রতীকধর্ম্মী। এই কারণেই মহৎ ভাব প্রকাশের তা সম্পূর্ণ অনুকূল। মহাকাব্যে উল্লিখিত চরিত্রগুলি কে কি পোশাক পরতেন তার সবিস্তার উল্লেখ কোথায়ও নেই। কলার আদর্শ ও রূপ অবিকৃত রেখে সাজসজ্জার রীতি আমাদের সৃষ্টি করে নিতে হয়।"

কথাকলির সবকয়টি চরিত্রই মহাকাব্যের বা পুরাণের, তাই তাদের সাজসজ্জা ও দেহ-চিত্রণ বাস্তবমুখী হবে এটা আশা করা যায় না। কল্পনার আশ্রয় নিতেই হয়। চরিত্র বহু এবং বিচিত্র, সাজসজ্জার রীতিও বিচিত্র এবং জটিল। তৎসত্ত্বেও চরিত্রের রূপ-দানে সাজসজ্জার প্রভাব সহজ এবং প্রত্যক্ষ।

নৃত্যনাট্য : কথাকলি একাধারে নৃত্য ও নাটক। তবে অভিনয়ই এর মুখ্য অংশ। কথাকলির অভিনয় স্বতন্ত্র জিনিষ, নাটকের অভিনয়ের তুলনায় এ অভিনয় অনেক উচ্চাঙ্গের। পূর্ব্বেই বলেছি, কথাকলি বাস্তবধর্ম্মী কলা নয়, ভরতমুনি-কথিত কল্পক চারুকলা। প্রতিটি ভাবকে আদর্শে রূপায়িত করে মুখভঙ্গীর মাধ্যমে মূর্ত্ত করে তোলা হয়। মুখের কথার চাইতে এর আবেদন অনেক বেশী স্বতঃস্ফূর্ত্ত, তীব্র। নৃত্যের তাল এবং সঙ্গীতের সুরও থাকে সেই ভাব প্রকাশের অনুকূল। তাই দর্শকের উপর তার প্রভাবও হয় সহজ, সুন্দর, মর্ম্মস্পর্শী।

কথাকলি নৃত্য দেখে উদয়শঙ্কর একবার মন্তব্য করেন—মূক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে কথাকলি-শিল্পীরা যেভাবে যুদ্ধ ও হত্যার বীভৎসতা, প্রেমের বিচিত্র ভাব এবং বিরহের বেদনা প্রকাশ করেছেন তা সত্যই আশ্চর্য্যের। বিভিন্ন প্রতীক্-মুদ্রা ছাড়াও শুধু মুখভঙ্গীর মাধ্যমেও শিল্পীরা দর্শকের মনে যথার্থ ভাব প্রতিফলিত করে তুলতে পারেন।

অভিনয় : মানব-হৃদয়ের বিচিত্র ভাব প্রকাশ করাই কথা-কলির অভিনয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। অভিনয়ের মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে পরিবেশ অর্থাৎ চারিদিকের লোকজন, দৃশ্য প্রভৃতিও পরিস্ফুট করে তুলতে হবে। কথাকলি-শিল্পী যখন কোনও কিছু বোঝাতে চান তিনি নিজেই যেন আকার ও ভাবে তার রূপ পরি-গ্রহ করেন। একজন গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে চলেছে, অরণ্যের

প্রতিটি দৃশ্য ও শব্দ তার মনে বিচিত্র ভাবের সৃষ্টি করছে। শিল্পী এক দিকে যেমন এই অরণ্যচারীর মনোভাব প্রকাশ করছেন অপর দিকে, তেমনি তাঁর অভিনয় ও নৃত্যকলার মাধ্যমে অরণ্যের সেই রহস্যময় শব্দ ও দৃশ্য দর্শকের চক্ষে প্রতিভাত করে তুলছেন। এক বার তিনি নিরীহ শিকারের পশ্চাত ধাবমান ক্ষুধার্ত সিংহের রূপ ধারণ করছেন, আবার কুজনরত বিরহী কোকিলের বেদনা নিবেদন করছেন, কিংবা গগনভেদী পাহাড়ের পাদদেশে ঘুমন্ত হ্রদের শান্ত তরঙ্গ-হিল্লোল সৃষ্টি করছেন। এখানেই কথা-কলির কাব্য ও দৃশ্যময় প্রকাশমাধুর্য্য।

মুদ্রা :—কথাকলির সবচেয়ে আশ্চর্য্য জিনিষ হ'ল তার মুদ্রা—কথিত ভাষার প্রতীক্। পর্দ্দার পেছন থেকে গায়ক অভিনীত চরিত্রের বক্তব্য গেয়ে চলেছেন, আর শিল্পী মঞ্চের উপরে মুখভঙ্গী, দেহভঙ্গী এবং মুদ্রার মাধ্যমে তার হুবহু রূপদান করছেন। সঙ্গীতের সঙ্গে তাল রেখে তিনি নাচছেন ও অভিনয় করছেন, আবার সেই সঙ্গে গীত বিষয়ের ভাবও ফুটিয়ে তুলছেন। মুদ্রা অবশ্য নৃত্য ও অভিনয়েরই অপরিহার্য্য অঙ্গ।

'হস্ত-লক্ষণ-দীপিকা' গ্রন্থের উপর ভিত্তি করেই কথাকলির মুদ্রার উদ্ভব। এই গ্রন্থে মাত্র চব্বিশটি মুদ্রার কথা উল্লেখ করা আছে। কিন্তু কয়েক শতাব্দীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে আজ কথা-কলি অন্যূন সাত শতাধিক মুদ্রা সৃষ্টি করে নিয়েছে। জীবিতদের মধ্যে মুদ্রা ও অভিনয়কলার শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ হলেন নাট্যাচার্য্য পি. কে. কুঞ্জুকুরুপ; তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে গোপীনাথ, মাধবন, আনন্দ শিব-রাম ও কৃষ্ণ নায়ার দেশ-বিদেশে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। দিল্লীর ভারতীয় কলাকেন্দ্র অথবা 'সঙ্গীত নাটক একাদামী' যদি কথাকলি মুদ্রার একটি অভিধান রচনা করেন তবে এই কলার উন্নয়নে সেটি বিশেষ সহায়ক হবে। পৃথিবীর কোথাও এইরূপ সুবিস্তৃত প্রতীকী কলার অস্তিত্ব নেই। যুদ্ধের সময়ে (১৯৪০-৪৩) ভারত সরকারের ফটোগ্রাফার শ্রীমতী ষ্টান হার্ডিং একটি মোটামুটি রকমের সচিত্র অভিধান রচনা করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯৩০ সাল থেকে তিন বৎসর কাল তিনি কেরলে কথাকলি শিল্পীদের মধ্যে অতি-বাহিত করেন। আমি যতদূর জানি, অর্থের অভাবে এবং ভাল প্রকাশক না পাওয়ায় অভিধানখানি আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নি।

নৃত্য : অনেক বিদেশীই কেরলে এসে থাকেন। কেউ আসেন বিচিত্র কলা কথাকলির অভিনয় দেখতে, কেউ আসেন কথা কলি-কলা আয়ত্ত করতে। তাঁদের অধিকাংশই নৃত্যকলায় বিশেষ আগ্রহী বলে শুধু নৃত্যের অংশটুকু গ্রহণ করেই মুগ্ধ হন। কথাকলির অপর দিক তাঁদের কাছে উপেক্ষিত। তাই প্রায়ই তাঁরা বলেন, সাজপোশাকের আড়ম্বর কমিয়ে শিল্পীর শরীরের আরও খানিকটা উন্মুক্ত করে নৃত্য-সৌন্দর্য্য প্রকাশলাভের পথ সহজতর করে তোলা উচিত। নৃত্যের শারীরিক সৌন্দর্য্য-বিচারে এটি অবশ্যই অতি
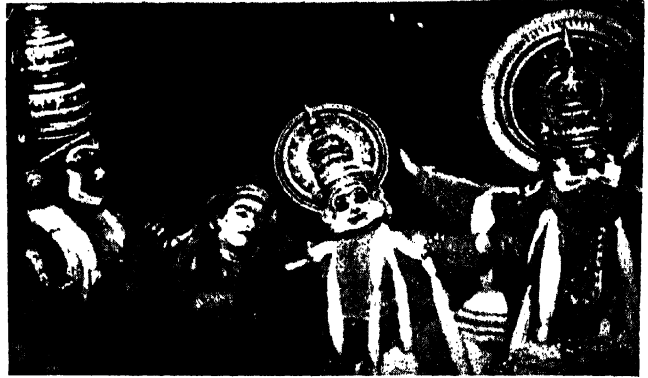
মুখোসপরা কথাকলি নৃত্যাভিনয়

উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু কথাকলির বিচারে এর সম্পূর্ণ বিপরীত মতই ব্যক্ত করতে হয়। কারণ নৃত্য, অভিনয় ও সঙ্গীতের সমান-সংমিশ্রণেই কথাকলির সৃষ্টি। কথাকলি শব্দের অর্থ কাহিনী-নাট্য। তাই প্রতিটি চরিত্রের সাজ-সজ্জাও সম্পূর্ণ চরিত্রানুগ। নৃত্য ভাব-প্রকাশের এবং দর্শকের চিত্তজয়ের অব্যর্থ অস্ত্র।

সঙ্গীত : সঙ্গীতও কথাকলির অপরিহার্য্য অঙ্গ। সম্মিলিত সঙ্গীতসৃষ্টির জন্য থাকেন দু'জন কণ্ঠসঙ্গীত-শিল্পী—একজন কাঁসি-জাতীয় বাদ্যযন্ত্র 'চেংগালা' এবং অপর জন করতাল-জাতীয় 'এলাথালাম' বাজিয়ে গান করেন। আর থাকেন দুইজন বাদ্য-যন্ত্রী—একজন চেন্দা (ঢোল-জাতীয়) অপর জন দাক্ষিণাত্যের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মৃদঙ্গ মাদ্দালাম বাজান। কাহিনীর কথোপকথন কাব্যে রচিত। দুইজন কণ্ঠসঙ্গীত-শিল্পী সেগুলো গেয়ে চলেন। কথা-কলির সঙ্গীত কর্ণাট-সম্প্রদায়ের খাঁটি মার্গসঙ্গীত।

কথাকলি কলার কাঠামো খুবই আঁটসাট—একটি অংশের সঙ্গে আর একটি অংশ মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। কিছু না কিছু ক্ষতি না করে একটির থেকে আর একটি বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব, যেমন অসম্ভব দেহ থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে জীবনের মত কলারও প্রতি মুহূর্ত্তেই পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন। চলতি যুগের রুচি ও প্রবণতার সঙ্গে তাকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

কেরলের নিজস্ব সম্পদ : কথাকলি কেরলের স্বতন্ত্রতাপূর্ণ ঐতিহ্যগত সম্পূর্ণ নিজস্ব কলা। এই কলার মধ্য দিয়েই কেরলের শ্রমজীবী মানুষ, করুণাময়ী নারী, তাদের সরলতা, ভক্তি, রমণীয় ভূমির গর্ব্বে গর্ব্বিত হৃদয় যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। কথাকলি অভি-নয় দর্শনের পর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যে উক্তি করেছিলেন এখানে তার উল্লেখের সবিশেষ প্রয়োজন আছে। তিনি বলেছিলেন: আমাদের মধ্যে যাঁরা উত্তর ভারতের অধিবাসী এবং খাঁটি ভারতীয় নৃত্যকলার স্মৃতি যাঁদের মন থেকে মুছে গেছে, তাঁরা কেরলের এই বিস্ময়কর কলা 'কথাকলি' দেখে আনন্দে অভিভূত হবেন। ভারতের এই প্রাচীন কলা যে তার শক্তি, সৌন্দর্য্য ও সুষ্ঠু প্রকাশমাধুর্য্য নিয়ে এখনও বর্ত্তমান তার জন্য গর্ব্ববোধ করছি।

গান

স্বরলিপি—শ্রীওঙ্কারনাথ চট্টোপাধ্যায়

স্থায়ী :— বিনতি কা করিয়ে বাত যো পিয়াকে হসরস গরবা লাগে ॥

অন্তরা :— আপনি মৈ কা করুঁ বাত রী সজনী, পুছত নাহি সবরঙ্গ* পিয়াবিনে বাত ॥

জয়জয়ন্তী খাম্বাজ অঙ্গের রাগ, বাদী স্বর রে ও সংবাদী পা, আরোহণে গান্ধার (গা), নিষাদ (নি) শুদ্ধ। অবরোহণে নিষাদ ও গান্ধার (নি্, গা্) কোমল। কোমল গান্ধার এক বিশেষ প্রকারে ব্যবহৃত হয়, যথা :—ম গ, রে গা্ রে

আরোহণ (বক্রগতি) :—সা ধ্ নি্ রে গ ম প ম গ রে, ম প নি র্সা।

অবরোহণ :—র্সা নি্ ধ প, ম গ রে গা্ রে সা ॥

জয়জয়ন্তী—তেতালা

0 | ১ | + | ৩
নি্ধ নি্ গরে — | মগ রেগ, ম প | ম গ ম গরে | গ রে সা — I
বি ন তি — কা — ক রি য়ে — — বা - — ত যো —

0 | ১ | + | ৩
সাপ্ প্ প্রে রে | রে গ ম প | ধ গগ — মগ | রে গা্ রে সা I
পি য়া — কে হ স র স গ র - — বা - লা — গে —

+ | ৩ | 0 | ১
গম প নি্প, নি | — র্সা — র্সা | র্সা —, নি র্সা | র্সা, র্রে — ধ I
আ প নি, মৈ — কা — ক রুঁ — বা — ত রী — —

+ | ৩ | 0 | ১
নি্ধ নি্ধ (নি্) প | — — — প | র্রে র্রে, র্রেনি র্সা | র্রে ধ নি্ ধ I
স জ নী — — — — পু ছ ত না হি স ব রং গ

+ | ৩ | 0 | ১
মগ মগরে, গা্ রে | নিসা রেসা, নি্ ধ্ | নি্ধ নি্ গরে — | মগ রেগ, ম প I
পি য়া - - বি নে বা - - - ত — বি ন তি — কা — ক রি

+ | ৩ | 0 | ১
ম ম ম ম | মগ রেগ রেসা নিসা | রেরে সারি, সাধ —নি | রে — —, গম I
এ — — —

+ | ৩ | 0 | ১
পনি ধপ, র্সানি র্সারে | ধনি র্সা,ধ নিসা মগ | রেগ রেসা, নিসা ধনি্ | রে— ধনি্ রে— ধনি্ I

+ | ৩ | 0 | ১
রে — — — | নিসা রেসা নি্ ধ্ | নি্ধ নি্ গরে — | মগ রেগ, ম প II
এ এ - - সোঁ — বি ন তি — কা — ক রি

* এই গানটি ওস্তাদ গোলাম আলি খাঁ সাহেব রচনা করিয়াছেন, তাঁহার রচনার মধ্যে "সবরঙ্গ" এই উপনাম দেওয়া থাকে।

কালিদাস-সাহিত্যে রূপবর্ণনা

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

রূপবর্ণনা, বিশেষতঃ নারীর রূপবর্ণনা সকল দেশের, সকল কবির অতি প্রিয় বিষয়। কোনও কোনও কবি এমন সুন্দরভাবে উপমাবলীর সাহায্যে নারীর রূপবর্ণনা করিয়াছেন যে, যে-কোনও পাঠক পড়িয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন। মহাকবি কালিদাসের কাব্য-নাটকে নারীর, এমন কি পুরুষেরও রূপবর্ণনা বহু স্থানে পাওয়া যায়, এখানে তাহাদের কয়েকটি দেখানো গেল।

প্রথমে মহাকবির তরুণ বয়সের রচনা, তাঁহার প্রথম কাব্য 'কুমারসম্ভবে'র শ্লোক হইতে পার্ব্বতীর রূপবর্ণনার আলোচনা করিব। একে নবীন কবি, তায় জীবনের প্রথম রচনা, পার্ব্বতীর রূপবর্ণনা তাই তরল উচ্ছ্বাসে পূর্ণ এবং তাঁহার টীকাকার মল্লিনাথের মতে স্থানে স্থানে অতিশয়োক্তির অভাব নাই। তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা 'রঘুবংশে' নায়িকাদের রূপবর্ণনায় গাম্ভীর্য্য ও সংযম পাঠকের মন মুগ্ধ করিয়া দেয়।

পার্ব্বতী পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা, রূপের তাঁহার তুলনা ছিল না। মহাকবি অতি নিপুণ ভাবে, কেবল নিপুণ ভাবে নয়, যেন নিখুঁত ভাবে তাঁহার প্রতি অঙ্গের রূপের বর্ণনা করার চেষ্টা করিয়াছেন। বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া পার্ব্বতীর যখন নব যৌবন আরম্ভ হইল, মহাকবি বলিতেছেন, তখন তাঁহাকে দেখাইতে লাগিল যেন 'একখানি তুলিকা দ্বারা অঙ্কিত চিত্র,' যেন, 'একটি সূর্য্যকিরণে প্রস্ফুটিত পদ্ম।' পর পর সতেরটি শ্লোকে তিনি পার্ব্বতীর রূপবর্ণনা করিয়াছেন। মল্লিনাথ বলেন, 'পার্ব্বতী দেবী, মানবী নহেন, তাই ধার্ম্মিক লোকেদের নিয়ম অনুসারে মহাকবি তাঁহার রূপের বর্ণনা তাহার চরণ হইতে আরম্ভ করিয়াছেন, মানবী হইলে আরম্ভ করিতেন কেশের বর্ণনা দিয়া।'

তাঁহার চরণের সৌন্দর্য্য কিরূপ ছিল? মহাকবি বলিতেছেন, 'তাঁহার চরণযুগলের রক্তিম আভা যেন বাহিরে ফুটিয়া বাহির হইত, মনে হইত বুঝি দুইটি স্থলপদ্ম পৃথিবীর উপর চলিয়া বেড়াইতেছে।' তাঁহার চলার সাবলীল ভঙ্গী দেখিলে মনে হইত যেন, 'রাজহংসেরা বুঝি তাঁহার নিকট হইতে চলিবার আরও উৎকৃষ্ট ভঙ্গী শিখিবার জন্যই তাঁহাকে তাহাদের মত গতিভঙ্গী শিক্ষা দিয়াছে।' তাঁহার জঙ্ঘা দুইটি? মহাকবি তাহাদের বর্ণনা দিতেছেন :— তাঁহার সে সুগোল, নাতিদীর্ঘ, মনোহর জঙ্ঘা দুইটি সৃষ্টি করার সময় মনে হয়, বুঝি বিধাতা তাঁহার সঞ্চিত যত কিছু সৌন্দর্য্য সমস্তই নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাই তাঁহার অপর অঙ্গগুলির সৃষ্টির সময় আবার তাঁহাকে নূতন করিয়া সৌন্দর্য্য আহরণ করিতে হইয়াছিল। কলাগাছের সহিত উরুর উপমা প্রাচীন কবিদের অনেক কাব্যে পাওয়া যায়, মহাকবিও পার্ব্বতীর রূপবর্ণনা-প্রসঙ্গে তাঁহার উরুর উপমা দিয়াছেন কদলী, এবং হস্তীশুণ্ডের সহিত। তিনি বলিতেছেন, 'ঐরাবত হস্তীর শুণ্ড বা রামরম্ভার মত কদলীবিশেষের নিজেদেরকে সুন্দর দেখাইবার ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও পার্ব্বতীর উরুযুগলের সহিত উপমিত হইবার মত সৌন্দর্য্য তাহারা কিছুতেই ধারণ করিতে পারিল না।' তাঁহার নিতম্বের বিশেষ কোনও বর্ণনা মহাকবি দেন নাই, কেবল বলিয়াছেন, 'গিরীশের অঙ্কে যে নিতম্ব ছাড়া আর অন্য কোনও নিতম্ব কখনও স্থানলাভ করিতে পারে নাই, তাহা যে কত সুন্দর তাহা অনুমান করা কঠিন নয়।' তারপর বক্ষ-বর্ণনায় বলিতেছেন, 'সেই কমল-নয়নীর বক্ষের গড়ন এরূপ সুপুষ্ট যে তাহাদের মধ্যে মৃণালসূত্রও বুঝি স্থানলাভ করিতে পারে না।' বাহু দুইটির বর্ণনায় মহাকবি বলিয়াছেন, 'আমার মতে তাঁহার বাহুযুগল শিরীষ পুষ্প অপেক্ষাও কোমল, কারণ হরের নিকট পরাজিত হইয়াও মদন উমার বাহু দুইটিকে তাঁহারই কণ্ঠবন্ধনের রজ্জু করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন।'

'কণ্ঠে যখন তিনি মুক্তার হার পরিয়া থাকিতেন, এবং যে হার তাঁহার বক্ষের উপর লম্বমান হইয়া থাকিত, দেখিলে মনে হইত যেন উভয়ের সৌন্দর্য্যে উভয়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।' মুখ-সৌন্দর্য্য বর্ণনায় মহাকবি বলিতেছেন, 'লোকে বলে শোভা চঞ্চলা, চন্দ্রকে যখন আশ্রয় করে, পদ্ম তখন থাকে অনাদৃত, আবার পদ্মকে যখন অনুগৃহীত করিতে থাকে, চন্দ্র তখন পর হইয়া যায়, উমার মুখে কিন্তু পদ্ম ও চন্দ্রের শোভা একই সঙ্গে প্রীতিপ্রসন্ন মনে অবস্থান করিয়া রহিল।' ঐ অতুলনীয় সুন্দর মুখে—যে মুখে এক সঙ্গে পদ্ম ও চন্দ্রের শোভা বিরাজ করিত, সংসারে যাহা দেখিতে পাইবার কোনও উপায় নাই, যখন তিনি হাসিতেন, তখন কিরূপ দেখাইত? মহাকবি বলিতেছেন, 'নব পল্লবের উপর প্রস্ফুটিত পুষ্প, কিংবা সুন্দর প্রবালের পাশে বসানো

মুক্তা দেখিলে, মনে হইবে, তাহারা বুঝি তাঁহার রক্তবর্ণের অধরের উপর ঈষৎ বিকশিত শুভ্র দন্তরাজিযুক্ত বিশুদ্ধ মৃদু হাস্যের অনুকরণ করার চেষ্টা করিতেছে।'

তাঁহার মুখের বাক্যগুলি কম মধুর ছিল না, মহাকবি তাই বলিতেছেন, 'যখন তিনি কথা কহিতেন, তখন তাঁহার অমৃতের মত মনোহর স্বর ও মধুর বাক্যগুলি শুনিলে কোকিলার স্বরও লোকের কর্ণে অসমবদ্ধ তন্ত্রীর শব্দের মত কেবল বেদনা উৎপাদন করিত।' পার্ব্বতীর চাহনির বর্ণনা দিতে গিয়া মহাকবি বলেন, 'তাঁহার সে মনোরম চঞ্চল দৃষ্টি দেখিয়া বায়ুসঞ্চালিত পদ্মকে মনে পড়িয়া যাইত এবং বুঝা যাইত না যে, এ চাহনি তিনি হরিণীদের নিকট শিখিয়াছেন, না হরিণীরাই তাঁহার নিকট শিক্ষা করিয়াছে।' ইহার পর মহাকবি তাঁহার ভ্রূযুগলের বর্ণনা করিতেছেন, 'তাঁহার সে আয়ত নয়নের সুঠাম বঙ্কিম ভ্রূযুগল দেখিলে মনে হইত, বিধাতা বুঝি তুলিকা দিয়া অতি নিপুণভাবে সেগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন, আর রতিপতিও যেন সেদিকে চাহিয়া আপনার পুষ্পধনুর সৌন্দর্য্যগর্ব্ব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।'

কেশের বর্ণনায় মহাকবি বলেন, 'ইতর প্রাণীদের যদি লজ্জা থাকিত, তবে একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, পর্ব্বত-রাজকন্যার কেশকলাপ দেখিয়া চমরীদেরও পুচ্ছপ্রীতি শিথিল হইয়া যাইত সন্দেহ নাই।' যত রকমে পাধা যায় উপমা দিয়া পার্ব্বতীর রূপবর্ণনা করিয়াও মহাকবি যেন তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, তাই তিনি শেষে বলিতেছেন, 'তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, বিশ্বস্রষ্টা বুঝি জগৎ-সংসারের মাঝে উপমা দিবার মত যত কিছু সুন্দর বস্তু আছে, তাহাদের সবগুলিকে একত্র দেখিতে পাইবেন, এই আশা লইয়াই অতি যত্ন সহকারে, যেখানে যেমনটি দিলে মানায়, তেমনি করিয়া তাঁহার দেহখানি নির্ম্মাণ করিয়াছেন।'

পার্ব্বতীর রূপবর্ণনা এই খানেই শেষ হয় নাই। মদন যেদিন মহেশ্বরকে 'সম্মোহন' নামক পুষ্পবাণের আঘাতে বিচলিত করিয়া পার্ব্বতীকে বিবাহ করাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া নিজেই ভস্মীভূত হইয়া গেলেন, পার্ব্বতী সেদিন প্রতিদিনের মত শিবার্চ্চনা করিতে গিয়াছিলেন। সহসা সেদিন আশ্রমে অসময়ে বসন্তের নানাবিধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে দেখিয়া তাঁহার সখীরা তাঁহাকে পুষ্পের আভরণে সাজাইয়া দিয়াছিলেন। তখন তাঁহাকে কিরূপ দেখাইতেছিল, মহাকবি তাহার বর্ণনা দিতে গিয়া বলিতেছেন, তাঁহাকে দেখাইতেছিল 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব' (কু-৩।৫৪), যেন একটি পুষ্পিতা লতা সজীব হইয়া চলিয়া বেড়াইতেছে।'

এতক্ষণ মহাকবি গৌরীর যে রূপ দেখাইয়াছেন তাহা রাজকন্যার রূপ, পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের রাজপ্রাসাদে বিলাস-বৈভবে প্রতিপালিতা আদরিণী কন্যার রূপ। 'কুমারসম্ভবে'র পঞ্চম সর্গে তিনি তাঁহার 'তপস্বিনী-রূপ' দেখাইয়াছেন। তপস্বিনীর রূপবর্ণনা করা হয়ত চলে না, তাই তিনি যেটুকু না বলিলেই নয়, যেন সেইভাবে সামান্য কিছু বলিয়াছেন। পার্ব্বতী যখন তপস্যা করিতে যাইবার জন্য মহামূল্য বস্ত্র, আভরণ প্রভৃতি খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া পরিলেন বৃক্ষের বল্কল, মস্তকে বাঁধিলেন জটা, তখন? মহাকবি বলিতেছেন, 'জটা ধারণ করিলেও তাঁহার মুখখানি কেশবিন্যাসের পর যেরূপ সুন্দর দেখাইত, সেইরূপ মনোহর দেখাইতে লাগিল। পদ্মের উপর কেবল যে ভ্রমর বসিয়া থাকিলেই তাহার শোভা বৃদ্ধি হয়, তাহা নহে, শৈবালের সাহচর্য্যেও তাহার সৌন্দর্য্যের কোনও হানি হয় না' (কু-৫।৯)। ঠিক এই ধরণের উপমা 'অভিজ্ঞান শকুন্তলে'ও পাওয়া যায়। মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে বল্কলধারিণী শকুন্তলাকে দেখিয়া রাজা দুষ্মন্তও বলিয়াছিলেন, 'সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবালেনাপি রম্যং—শৈবাল অর্থাৎ শেওলা লাগিয়া থাকিলেও পদ্মের শোভা সমান রমণীয় থাকে', কারণ, তিনি বলিতেছেন, 'কিমিবহি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতানাং', অর্থাৎ—মধুর যাহার আকৃতি, যাহা কিছু তাহাকে পর[illegible] যায়, তাহাই তাহার ভূষণ হইয়া পড়ে, তাই বল্কল পরিয়া থাকিলেও শকুন্তলাকে এত সুন্দর দেখাইতেছিল।

ছদ্মবেশী শিব তপস্যারতা গৌরীকে বলিতেছেন, 'যদুচ্যতে পার্ব্বতি পাপবৃত্তয়ে ন রূপমিত্যব্যভিচারি তদ্বচঃ', অর্থাৎ, 'পার্ব্বতি, লোকে যে বলে অতি সুন্দর যার মুখখানি, সে যে কোনও পাপ করে নাই, একথা মিথ্যা হইতে পারে না।' এ কথা বলার উদ্দেশ্য—'তোমার ঐ অনুপম সুন্দর মুখখানি দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, জীবনে তুমি কোনও পাপ কর নাই, তবে আর এ কঠোর তপস্যা করার উদ্দেশ্য কি?' গৌরীর মুখখানি যে অতি সুন্দর ছিল, তাহা শিবের কথায় বেশ বুঝা যাইতেছে। তারপর তিনি আবার বলিতেছেন, 'কেন তুমি এ নবীন যৌবনে দেহের সমস্ত আভরণ খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া, যা বৃদ্ধকে শোভা পায়, সেই বল্কল পরিয়া রহিয়াছ? নিশার আকাশ যখন চাঁদের জ্যোৎস্নায় ও তারার মালায় সুশোভিত থাকে, কাহারই-বা তখন ইচ্ছা হয় তাহার অরুণোদয়ের সময়কার রিক্তাবস্থার কল্পনা করিতে? অর্থাৎ, রাত্রিতে যখন আকাশ চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় ও নক্ষত্রপুঞ্জের শোভায় হাসিতে থাকে, তখন কি কাহারও ভাবিতে ইচ্ছা হয়, আকাশের ভোরবেলার অবস্থা—চাঁদ যখন ম্লান হইয়া পড়ে, উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি মিলাইয়া যায়, এ অতুলনীয় নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্য আর থাকে না।"

পার্ব্বতীর মুখখানি সুন্দর ছিল বটে, তবু অনশনে ক্লিষ্ট

হওয়ায় দেখাইতেছিল যেন, 'শশাঙ্ক লেখামিব পশ্যতো দিনা', অর্থাৎ, সকালে উদিত চন্দ্রের মত ফ্যাকাশে।

পার্ব্বতীর শুভবিবাহের দিন তাঁহার বধূবেশ-রূপ মহাকবি কি ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, দেখা যাক। হিমালয়ের বন্ধুবান্ধবদের স্ত্রীরা ও তাঁহার আত্মীয়স্বজনদের বাড়ীর পতিপুত্রবতী মেয়েরা—যাঁহারা পার্ব্বতীকে কনে' সাজাইবার ভার লইয়াছিলেন, যখন প্রথমে হিমালয়ের স্নানাগারে—যাহার মেঝে ছিল মরকতমণি দিয়া নির্ম্মিত ও মুক্তার দ্বারা বিচিত্রিত, লইয়া গিয়া সোনার কলসীতে তুলিয়া রাখা জলে বেশ করিয়া স্নান করাইয়া শুভ্র একখানি বস্ত্র পরাইয়া দিলেন, তখন 'বৃষ্টির ধারায় স্নাতা ও প্রস্ফুটিত কাশপুষ্পে শোভিতা ধরণীর ন্যায় তাঁহার দেহে অতি রমণীয় শ্রী ফুটিয়া উঠিল।' তারপর যখন স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে সাজাইবার জন্য 'কৌতুকবেদীর' উপর পূর্ব্বমুখ করিয়া বসাইলেন, তখন মহাকবি বলিতেছেন, 'পার্ব্বতীকে তাঁহারা সাজাইবেন কি, তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেবল নিষ্পলক নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়াই রহিলেন, তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল, এ রূপের কাছে আবার অলঙ্কার? তবু না সাজাইলে নয় বলিয়া তাঁহারা সাজাইতে বসিলেন।'

পরিপাটি করিয়া যখন তাঁহার বেণীবন্ধন করিয়া দেওয়া হইল তখন সকলের মনে হইতে লাগিল যে 'পদ্মের উপর কালো ভোমরা বসিয়া থাকিলে অথবা চন্দ্রের বিম্বের ঠিক উপরটিতে এক ফালি কৃষ্ণমেঘ লাগিয়া থাকিলে তাহাদের যে শোভা হয়, সে শোভার উল্লেখও এ শোভার কাছে করা চলে না। কেশবিন্যাসের পর যখন তাঁহার মুখে লোধ্র-পুষ্পের পরাগ মাখানো হইল, তখন তাঁহার বর্ণের ঔজ্জ্বল্য এত বৃদ্ধি পাইল যে, তাঁহার মুখের দিকে একবার যে চায়, তাহার আর চক্ষু ফিরাইয়া লইবার ক্ষমতা থাকে না।' যাঁহার উপর কাজল পরাইবার ভার ছিল, 'গৌরীর চক্ষুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনি মুগ্ধ নয়নে তাঁহার নয়নের দিকে চাহিয়াই রহিলেন। শেষে অবশ্য পরাইয়া দিলেন কাজল, চক্ষুর সৌন্দর্য্য বাড়িবে বলিয়া নয়, বিবাহে এ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান না করিলে নয় বলিয়া পরাইয়া দিলেন। তারপর যখন তাঁহাকে বিবিধ রত্নালঙ্কারে বিভূষিত করা হইল, তখন 'প্রস্ফুটিত কুসুমশোভিতা লতার ন্যায়', 'নক্ষত্রপুঞ্জে বিভূষিতা রাত্রির ন্যায়', 'পক্ষিশোভিতা স্রোতস্বিনীর ন্যায়' তাঁহাকে পরম রমণীয় দেখাইতে লাগিল।

বিবাহ-সভায় বধূবেশধারিণী উমাকে কিরূপ দেখাইতে-ছিল, মহাকবি তাঁহার সে রূপেরও বর্ণনা দিয়াছেন,—ঠিক মুখ্যভাবে নয়, যেন গৌণ ভাবে। তিনি বলিতেছেন, হিমালয় যখন উমার হাতখানি শিবের হাতে সম্প্রদান করিতেছিলেন, দেখিয়া মনে হইতেছিল, 'যেন মহেশ্বরের ভয়ে ভীত মদন উমার দেহে পরম নিশ্চিন্ত হয়ে লুকাইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার হাতখানি যেন মদনের প্রথম অঙ্কুর।' এখানে মহাকবি বুঝাইতেছেন যে, সেদিন উমার রূপ কেন যে এত বেশী দর্শনীয় ও আকর্ষণীয় হইয়াছিল, তাহার কারণ এই হইতে পারে যে, হয়ত রতিপতি মনে করিলেন, যেখানেই তিনি আশ্রয় লন না কেন, মহেশ্বরের ক্রোধাগ্নি সেখানে গিয়া তাঁহাকে ভস্ম করিয়া ফেলিবে। তাই ত্রিভুবনের আর কোথাও থাকিবার নিরাপদ স্থান না পাইয়া অবশেষে নিরুপায় হইয়া গৌরীর দেহে লুকাইয়া রহিলেন এই ভরসায় যে, মহেশ্বর যদি জানিতেও পারেন, তবু পার্ব্বতীর দেহে আশ্রয় লইয়াছেন বলিয়া তাঁহার কোনও অনিষ্ট করিতে পারিবেন না, কারণ তাঁহাকে ভস্ম করিতে গেলে গৌরীকে ভস্ম করিতে হয়।

বিবাহের পর স্বামীগৃহে থাকাকালীন পার্ব্বতীর রূপের বর্ণনা দিয়াছেন মহাকবি। কৈলাসের 'শিবালয়ে' রত্নময়ী সভার মাঝে স্বর্ণময় পাদপীঠবিশিষ্ট, ও মহামূল্য মণিকাঞ্চন-খচিত বিচিত্র 'ভদ্রাসনে' মহেশ্বর বসিয়াছিলেন, ক্রোড়ে পার্ব্বতী। 'শিবের শুভ্র উন্নত দেহের উপর পার্ব্বতীর নবীন স্বর্ণলতার ন্যায় দীপ্তিমান লীলায়িত তনুটি, দেখাইতেছিল যেন শরতের শুভ্র মেঘকে সৌদামিনীর উজ্জ্বল ছটা আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে।'

'মেঘদূতে' যক্ষপত্নীর রূপবর্ণনার বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার রূপের বর্ণনা করিতেছেন তাঁহারই বিরহে কাতর প্রবাসী স্বামী, সুতরাং বর্ণনায় যে কিছু বাড়াবাড়ি হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবু মহাকবি যতটা পারিয়াছেন সংযতভাবে বর্ণনা দিয়াছেন। রামগিরিতে নির্ব্বাসিত যক্ষ, গুহ্যক, তাহার প্রিয়ার বিরহ-বেদনা কয়েক মাস অতি কষ্টে সহ্য করিয়া পয়লা আষাঢ়ে সম্মুখে নূতন মেঘ দেখিয়া যখন আর ধৈর্য্যের বাঁধন রাখিতে পারিল না, তখন সেই চলন্ত মেঘকেই নিজের একটা সংবাদ অলকায় তাহার পত্নীর নিকট দিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বসিল। কিন্তু মেঘ ত যক্ষের স্ত্রীকে কখনও দেখে নাই, সুতরাং যাহাতে তাহার সেই 'তন্বী শ্যামা শিখরীদশনা' পত্নীকে চিনিয়া লইতে কোনও অসুবিধা না হয়, তাই যক্ষ বলিতেছে, 'সে কৃশাঙ্গী, যৌবন তার সারা দেহে উছলে উঠেছে, পাকা বিম্বফলের মত রাঙা তার অধরটি, দাঁতগুলি কিছু উঁচু, চাহনি তার হরিণীদের মতই চকিত, নাভিদেশ নীচু, নিতম্বের ভারে সে চলিতে পারে না, আর সুপুষ্ট বক্ষের ভারে কিছু নত হয়েই থাকতে হয় তাকে, দেখলে তোমার নিশ্চয়ই মনে হবে, যেন বিধাতার সৃষ্টির সেই বুঝি প্রথম তরুণী।'

ইহার পর যক্ষপত্নীর 'বিরহিণী-রূপের' বর্ণনা দেওয়া

পরীক্ষা দিবার জন্য মালবিকা যখন পরিক্ষার্থিনী হইয়া মঞ্চের উপর অভিনয় করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া অগ্নিমিত্র বলিতেছেন, 'অনিন্দনীয় এঁর রূপ, যেমন দীর্ঘ টানাটানা চোখ, তেমনি শরৎকালের চন্দ্রের মত সুন্দর মুখ-কান্তি; হাত দুখানি যেন স্কন্ধকে নত করিয়া রাখিয়াছে, আর সুপুষ্ট বক্ষের নিবিড়তা হৃদয়কে একেবারে ক্ষীণ করিয়া ফেলিয়াছে, কটিদেশও কি ক্ষীণ! মনে হয় বুঝি, হাতের মুঠার মধ্যে ধরিয়া রাখা যাইতে পারে, অথচ জঘন কি বিশাল। পায়ের অঙ্গুলিগুলি কেমন বাঁকা, দেখিলে মনে হয় এঁর দেহটি যেন নৃত্যশিক্ষকের নৃত্যছন্দের মানসী-প্রতিমার অনুরূপে সৃষ্ট হইয়াছে।'

মালবিকাকে চাক্ষুষ দেখার পূর্ব্বে অগ্নিবর্ণ তাঁহার চিত্র দেখিয়াছিলেন, তারপর যখন তাঁহার বাস্তব রূপ দেখার সুযোগ আসিল তখন তাঁহার মনে হইল, 'চিত্রকর এঁর রূপ ঠিকমত অঙ্কিত করিতে পারে নাই।' অভিনয়ের পর যখন বিদূষকের রসিকতায় সকলে হাস্য করিতেছিলেন, মালবিকাও মৃদু হাস্য না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সে সময় তাঁহার মুখখানি ও ঈষৎ অভিব্যক্ত দন্তরাজি দেখিয়া অগ্নিবর্ণের মনে হইল, যেন 'ঈষৎ বিকশিত পরাগযুক্ত একটি প্রফুল্ল কমল শোভা পাইতেছে।'

এবার আমরা 'রঘুবংশ' হইতে রূপবর্ণনার আলোচনা করিব। 'রঘুবংশে' প্রথমে মহারাজ দিলীপের কথা—রাজার যৌবন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, পত্নী সুদক্ষিণাও আর তরুণী নাই, তাই যখন দিলীপ তাঁহার পাটরাণী সুদক্ষিণাকে পাশে বসাইয়া রথে চাপিয়া কুলগুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে যাইতেছিলেন তখন মহাকবি মহারাণীর রূপবর্ণনার চেষ্টা করেন নাই; কেবল পাশাপাশি উপবিষ্ট রাজা-রাণীকে কিরূপ দেখাইতেছিল তাহাই উপমা দিয়া বলিয়াছেন, যেন 'চন্দ্রের পাশে চিত্রা নক্ষত্র, যেন ঐরাবতের পাশে বিদ্যুৎ', এই পর্য্যন্ত।

তারপর দিলীপের পুত্র দিগ্বিজয়ী রঘুর পত্নী সম্বন্ধে মহাকবি যাহা বলিয়াছেন, তাহা যেন কেবল নিয়মরক্ষা হিসাবে কিছু না বলিলে নয়, তাই বলিয়াছেন। রঘু যখন যৌবনে পদার্পণ করিলেন, কালিদাস বলিতেছেন, 'তাঁহার গুরু (পিতা দিলীপ) 'গোদান' অর্থাৎ কেশ-সংস্কারের পর তাঁহার বিবাহ দেওয়াইলেন, দক্ষরাজার কন্যারা চন্দ্রকে পতি পাইয়া যেমন সুশোভিতা হইয়াছিলেন, রাজ-কন্যারাও তেমনি রঘুর মত স[illegible]তের সহিত মিলিতা হইয়া নিজেদের শোভাবৃদ্ধি করিয়া লইলেন। রঘুর পুত্রলাভের সময় মহাকবি বলিতেছেন, 'তাঁহার দেবী (পত্নী) পুত্র প্রসব করিলেন।' কিন্তু দেবীর নামটি যে কি, কোন্ রাজার কন্যা, কেমন রূপসী ছিলেন, তিনি সে সম্বন্ধে পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করার কোনও চেষ্টা করেন নাই। রঘুর পত্নী অথবা পত্নীদের সম্বন্ধে কিছু না বলার ত্রুটি যেন মহাকবি রঘুর পুত্র অজের পত্নীর বর্ণনায় পরিপূর্ণভাবে সারিয়া লইয়াছিলেন। কারণ অজের জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনা, তাঁহার বিবাহ, পত্নীর ইন্দুমতীর স্বয়ংবর, অকালমৃত্যু ও তাঁহার পত্নীশোক, যেন অজের সম্বন্ধে কোনও কিছু বলিতে গেলে তাঁহার পত্নীর কথাও কিছু বলিতে হয়, পত্নীকে বাদ দিয়া কিছু বলা চলে না।

ইন্দুমতীর অনেক কথাই 'রঘুবংশে' পাওয়া যায়। প্রথমে তাঁহার দেখা পাই বিদর্ভনগরের 'স্বয়ংবর সভায়'। শিবিকায় বসিয়া যখন তিনি বিবাহবেশে মনোমত পতি বরণ করার জন্য সভায় আনীতা হইলেন তখন তাঁহাকে কিরূপ দেখাইতেছিল? মহাকবি বলিতেছেন, 'উপস্থিত রাজন্যবর্গের শত শত নেত্রের একমাত্র লক্ষ্য, বিধাতার সেই অপূর্ব্ব সৃষ্ট নারী-মূর্ত্তির দিকে তাঁহাদের অন্তঃকরণগুলি চলিয়া গেল, আর নিস্পন্দ দেহগুলি সিংহাসনের উপর পড়িয়া রহিল।'

মহাকবি এখানে ইন্দুমতীর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা না করিয়া, অথবা সুন্দর সুন্দর বস্তুর সহিত তাহাদের উপমা না দিয়া কেমন একটি কথায় তাঁহার রূপবর্ণনা করিয়াছেন, 'বিধাতৃবিধানাতিশয়ে', অর্থাৎ 'বিধাতার নির্ম্মাণকৌশলের পরাকাষ্ঠা' যে নারীমূর্ত্তিটি তাহার দিকে উপস্থিত রাজগণের চক্ষু এমন নিবিষ্টভাবে নিপতিত হইল যে, মনে হইল যেন তাঁহাদের সমস্ত সত্তা, মন, ইন্দ্রিয়ানুভূতি সবকিছুই বুঝি দেহ ছাড়িয়া চক্ষুর ভিতর দিয়া সেই 'পতিংবরা ক্লৃপ্ত বিবাহবেশা' তরুণীর নিকট চলিয়া গেল আর নিস্পন্দ দেহগুলি আসনের উপর অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিল। সুতরাং ইন্দুমতী যে কি অপূর্ব্ব রূপসী ছিলেন তাহা তাঁহার প্রতি অঙ্গের বর্ণনা দিলে ইহা অপেক্ষা কি অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইত?

ইন্দুমতীর রূপবর্ণনা কালিদাস আরও এক স্থানে করিয়াছেন। স্বয়ংবর সভায় রাজকুমার অজের সম্মুখে দণ্ডায়মানা লজ্জায় নিস্পন্দ রাজকুমারীর হাত দুইটি ধরিয়া যখন তাঁহার ধাত্রী সুনন্দা লোহিত পুষ্পের 'বরণ মালা'টি অজের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন, এবং যখন তাঁহাদের যথারীতি বিবাহ দেওয়াইবার জন্য ভোজরাজ শোভাযাত্রা করিয়া স্বয়ংবরসভা হইতে রাজপ্রাসাদের বিবাহ-সভায় বরবধূকে আনিতেছিলেন তখন যে সমস্ত পুরনারী নিজেদের কাজকর্ম্ম ফেলিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া আসিয়া বর-কনে দেখিতে লাগিলেন, তাঁহাদের মুখ দিয়া মহাকবি বলিতেছেন, 'যেন নারায়ণের সহিত পদ্মার (লক্ষ্মীর) মিলন'; 'এমন স্পৃহনীয় শোভাযুক্ত বর-কনেকে যদি মিলিয়ে না দিতেন প্রজাপতি, তা হলে তাঁর এত 'রূপবিধান যত্ন' অর্থাৎ এত যত্নের রূপসৃষ্টি ব্যর্থ

হয়ে যেত।' কেহ বলিলেন, 'এরা পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয়ই মদন আর রতি ছিল, নইলে দেখলে না, মেয়েটা কেমন সহস্র সহস্র রাজাদের মাঝে নিজের স্বামীটিকে বেছে নিলে, পূর্ব্বজন্মের ভালবাসা—ও কি ভুলবার।' এখানে পুরনারীরা 'পদ্মা' এবং 'রতি'র সহিত ইন্দুমতীর উপমা দিয়া তাঁহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যখ্যাতির যেন পুনরুক্তি করিয়াছেন। অবশ্য, অজের সৌন্দর্য্যও যে অল্প ছিল না, তাহাও নারীদের কথা হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

তারপর বিবাহ-সভা। 'কুমারসম্ভবে' মহাকবি উমার বধূবেশের যেমন বর্ণনা দিয়াছেন, 'রঘুবংশে' বধূবেশিনী ইন্দুমতীর তেমন কোনও বর্ণনা দেন নাই। কেবল বলিয়াছেন, রাজকুমার অজ যখন বধূ ইন্দুমতীর হাতখানি ধরিয়া রহিলেন, দেখাইল যেন 'সহকার তরু তাহার পল্লব দিয়া অশোকলতার পল্লব গ্রহণ করিয়া লইল।' বিবাহ হইয়া যাইবার পর অজ যখন তাঁহার নবপরিণীতা পত্নীকে লইয়া অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন তখন যে সব রাজারা ও রাজপুত্রেরা ইন্দুমতীকে বিবাহ করার আশায় বিদর্ভনগরের স্বয়ংবরসভায় আসিয়া নিরাশ হইয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন, তাঁহারা প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া সকলে পরামর্শ করিলেন, ইন্দুমতীকে তাঁহার স্বামীর হাত হইতে সবলে কাড়িয়া লইবেন। এই অভিপ্রায়ে একজোট হইয় তাঁহারা পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অজ আসিবামাত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। তারপর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অজ যখন আবার অযোধ্যার দিকে চলিতে লাগিলেন তখন তিনি ইন্দুমতীকে রথের উপর নিজের পাশটিতে বসাইয়া লইলেন, মহাকবি বলিতেছেন, ইন্দুমতীকে তখন দেখাইতেছিল যেন অজের 'বিজয়লক্ষ্মীটি'।

অজের পুত্র রাজা দশরথের প্রায় একই সঙ্গে কোশল, কেকয় ও মগধ দেশের তিন রাজকন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু মহাকবি 'রঘুবংশের' কোথাও কৌশল্যা, কৈকেয়ী বা সুমিত্রাদেবীর রূপ সম্বন্ধে একটা কথাও বলেন নাই।

'রঘুবংশে' যেমন রাজা দশরথের পত্নীদের রূপবর্ণনার কোনও প্রয়াস নাই, তাঁহার পুত্রবধূদের সম্বন্ধেও অনেকটা তাই। এক শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতা ছাড়া আর কাহারও—উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী বা শ্রুতকীর্ত্তির রূপ সম্বন্ধে মহাকবি কোথাও কোনও কথা বলেন নাই। হরধনু ভঙ্গ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতাকে লাভ করার যোগ্যতা অর্জ্জন করিলেন, মিথিলাধিপতি জনক তখনই 'লক্ষ্মীর মত রূপবতী' ('রূপিণীং শ্রিয়ামিব') কন্যা সীতাকে আনাইয়া রামের হস্তে সম্প্রদান করিয়া দিলেন। তারপর রাম যখন পিতৃসত্য পালন করার জন্য বনে গমন করিতেছিলেন, আর সীতা তাঁহার পিছনে পিছনে চলিতেছিলেন, মহাকবি সে দৃশ্যের উপমা দিয়া বলিতেছেন, 'সীতাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন রাজলক্ষ্মীই বুঝি রামের গুণে মুগ্ধা হইয়া কৈকেয়ী কর্ত্তৃক নিষিদ্ধা হইয়াও, বনে বনে তাঁহার অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন।' মহাকবি দুই স্থানেই সীতার প্রসঙ্গে দুই বার 'লক্ষ্মী' উপমা প্রয়োগ করিলেন। 'রঘুবংশের' চতুর্দ্দশ সর্গেও মহাকবি বলিতেছেন, পিতৃরাজ্য ফিরিয়া পাইয়া রাম যখন অযোধ্যায় সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন, তখন সীতার সাহচর্য্যে তাঁহার দিনগুলি সুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল, মনে হইতে লাগিল, 'যেন লক্ষ্মীই বুঝি সীতার চারু দেহ আশ্রয় করিয়া রামের সহিত মিলিত হইয়াছেন'। এখানেও সীতার বেলায় সেই এক উপমা—'লক্ষ্মী'। যেন সীতার রূপবর্ণনার প্রসঙ্গে লক্ষ্মী ছাড়া আর অন্য কোনও উপমা মহাকবির মনঃপুত হয় নাই, যেন সীতার আকৃতি ও প্রকৃতিতে যে এক শান্ত, স্নিগ্ধ, নয়নরঞ্জন পবিত্র ভাব ছিল, যাহার দিকে চাহিলে মানুষের মনে একটি প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভাব আসিয়া পড়ে, সেই ভাবটি বর্ণনা করার উপযুক্ত উপমা লক্ষ্মী ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না, ইহাই ছিল মহাকবি কালিদাসের মত।

'রঘুবংশে'র এক স্থানে (চতুর্দ্দশ সর্গে), শ্রীরামচন্দ্র যখন শোভাযাত্রা করিয়া অযোধ্যা নগরীতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন তখন তাঁহার রথের পশ্চাতে একখানি 'স্ত্রীবহনযোগ্য' ক্ষুদ্র রথে বসিয়া সীতা আসিতেছিলেন। তখন তাঁহাকে কিরূপ দেখাইতেছিল? মহাকবি বলিতেছেন, অনসূয়া তাঁহাকে এমন দীপ্তিশালী অঙ্গরাগে সাজাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে দেখিয়া লোকের মনে হইতেছিল, 'রাম বুঝি তাঁহাকে পরীক্ষা করার জন্য আবার একবার অগ্নির মধ্যে বসাইয়া দিয়াছেন।' অর্থাৎ, সীতাকে এমন উজ্জ্বল বর্ণের বেশভূষায় ও দ্যুতিময় অলঙ্কারে এবং প্রসাধনে সজ্জিতা করা হইয়াছিল যে তাঁহার দেহে সেদিন অগ্নির মত একটা অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যাহার দিকে ভাল করিয়া চাহিতে পারা যায় না, চাহিলে চোখ ঠিকরাইয়া যায়।

তারপর সীতার বনবাস। বনবাসে অর্থাৎ মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে থাকাকালীন আশ্রমকন্যাদের মত জীবনযাপন করার ফলে তাঁহাকে কিরূপ দেখাইত, তাহার আভাস মহাকবি দিয়াছেন 'রঘুবংশে'র পঞ্চদশ সর্গে। শ্রীরামচন্দ্র যখন লব-কুশের মুখ হইতে তাঁহার চরিত্র অবলম্বনে রচিত সুমধুর রামায়ণ গান শুনিয়া গানের রচয়িতা মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, মহামুনি তখন সীতাকে, সেখানে আনাইয়া লইলেন। সম্মুখে দণ্ডায়মানা সীতাকে দেখিয়া রামের মনে হইল যেন 'মহর্ষির তপস্যার সিদ্ধি' অর্থাৎ, মহর্ষি বাল্মীকির ঐকান্তিক তপস্যার সিদ্ধি বুঝি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছেন।

ইহার পর মহর্ষি যখন সীতাকে রামচন্দ্র কর্তৃক পুনর্গৃহীতা করাইবার আশায় তাঁহাকে ও লব-কুশকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যায় আসিয়া কৌতুহলী লোকে পূর্ণ রামচন্দ্রের সভায় প্রবেশ করিলেন, তখন দেখাইল যেন 'সংস্কারপূত গায়ত্রী বুঝি সূর্য্যের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।' সীতার উপমা দেওয়া হইল একস্থানে মহর্ষি বাল্মীকির 'তপস্যার সিদ্ধির' সহিত, আর একস্থানে 'সংস্কারপূতা গায়ত্রীর' সহিত—পুষ্পিতা লতা, পল্লব বা পদ্ম চন্দ্রের সহিত নহে। তারপর মহাকবি বলিতেছেন, সীতার তখন পরনে ছিল রক্তাম্বর, দৃষ্টি ছিল নত, চরণের উপর নিবদ্ধ, তাঁহার সে 'শান্ত দেহ', পবিত্র মুখ দেখিয়া মনে হইল, যেন ইনি 'সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধা' অর্থাৎ যেন এঁর পবিত্রতার পরীক্ষার জন্য আর অন্য কোনও প্রমাণের আবশ্যক নাই, তাঁহার দেহের পবিত্র ভাবই তাঁহার চরিত্রের বিশুদ্ধির সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। সীতা-চরিত্র বর্ণনার সময় মনে হয় যেন মহাকবি দেখাইতে চাহেন যে প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী, পরজীবনে মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা।

হোত্র

শ্রীজীবনময় রায়

আজি এ প্রভাতে নয়ন মেলিয়া নভে
পেয়েছি মা তব নয়নের পরসাদ ;
হে দেশজননি ! আবার মাভৈঃ রবে
ডাকো সন্তানে—দূর করো পরমাদ।
দুর্ভাগা নহে আমার জন্মভূমি
ষড়ৈশ্বর্যময়ী যে জননী তুমি,
প্রকাশো বিভূতি দূর করো অবসাদ।

স্ব-কৃত পাপের পঙ্ককুণ্ড হতে,
আহ্বানি' লও তোমার আলোকমাঝে ;
শতদল মেলি' জাগুক জীবন-পথে,
পঙ্কশয্যা ভেদিয়া দীপ্ত সাজে।
তোমার চরণে অর্ঘ্য-পূজার ফুল—
সার্থক হোক এ জীবন প্রতিকূল
ঘুচাও জননি ! সকল দৈন্য-লাজে।

দেখেছি তোমারে ছিন্নমস্তারূপে
আপন হস্তে আপন মুণ্ড ছেদি'
করিতেছ স্নান, তপ্ত রক্ত-কূপে ;
উঠিছে শোণিত-উৎস হৃদয় ভেদি' ;
ছিন্ন মুণ্ড করিছে রক্তপান,
উঠে অমা ভেদি' শিবাক্রন্দন তান ;
শ্মশানে মশানে রচিতেছ শব-বেদী।

দেখেছি তোমারে মহাকাল রুদ্রাণী,
নিজ সন্তানে [illegible]নিছ তীক্ষ্ণ অসি,
নৃমুণ্ডমালা বক্ষে—আ[illegible] পাণি—
কুন্তল ভেদি' নাগিনীরা উঠে শ্বসি' ;
প্রলয়ঙ্করী ঝঞ্ঝা, রজনীরূপা,
নিজ মঙ্গলে দলিছে মথিছে দু' পা
সর্বনাশের প্রলয়-অতলে পশি'।

কোথা মা তোমার সেই প্রচণ্ড লীলা,
বিবশ নয়নে কেন মা রয়েছ চেয়ে ?
বুকের মাঝারে বহে কি অন্তঃশীলা
দুখের অশ্রু, গোপন মর্ম বেয়ে ?
শৃঙ্খল তব চূর্ণ—তবু মা কেন,
শোকের প্রতিমা হেরি গো তোমারে হেন ?
ঝরিছে করুণা সকল অঙ্গ ছেয়ে।

জানি মা তোমারে করিয়াছে বঞ্চনা,
সন্তান তব, মুক্তির ছল ধরি' ,
চলেছে সরবে ধনিকের অর্চনা
ক্ষণিকের মদে অধমে রিক্ত করি।
অজ্ঞানতার তিমিরে ডুবায়ে রাখি',
অক্ষম তব সন্তানে দেয় ফাঁকি,
অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য মুক্তি হরি'।

উঠ মা জননি ! ত্যজ এই শোকসাজ,
তোমার খড়্গ দাও সন্তানকরে,
বীর্য তোমার সঞ্চারো প্রাণে আজ
ভ্রাতৃঘাতীরে হানিতে বক্ষ 'পরে।
মুক্তি-যজ্ঞ হবে না ত সমাপন
বিনা নরবলি না দিলে শোণিত পণ।
সঞ্চারো প্রাণ মূর্ছিত অন্তরে।

ভৈরবী ভীমা, উগ্র মা চণ্ডী সাজে,
জ্বালাও বহ্নি, জাগো গো ঝঞ্ঝাসম ;
বজ্র তোমার হানো সুষুপ্তি মাঝে,
বিচূর্ণ করো মৃত্যুতুহিন-তমঃ।
ঘুচাও অলস হানিয়া দীপ্ত রোধ
জাগুক চমকি, শুনি' তব নির্ঘোষ
হানো প্রেম তব সুকঠোর নির্মম।

ফিয়াট ফ্যাক্টরির পঞ্চান্ন বৎসর

ফিয়াট কারের ক্রমোন্নতি, ইহার প্লান্ট, সংস্থা প্রভৃতির কাহিনী বিংশ শতাব্দীর তুরিনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বৎসরের পর বৎসর ফিয়াটের যে সমস্ত প্রধান মডেল তৈরি হইয়াছে, পাঠকের চোখের সামনে সেগুলি তুলিয়া ধরাই এই কাহিনী-বর্ণনার শ্রেষ্ঠ উপায়। এই দিক দিয়া খুব অল্প চেষ্টাই হইয়াছে। অবশ্য মিঃ বিসকারেত্তির জ্বলন্ত উৎসাহে সম্প্রতি তুরিনে একটি মোটরকার মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু মোটরকারের কোন প্রণালীবদ্ধ তালিকা পাওয়া কঠিন।
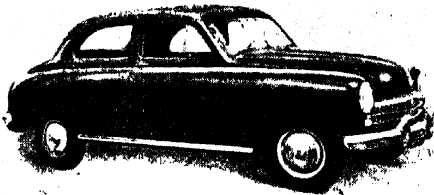
ফিয়াট ১৪০০

পূর্ব্বনির্ম্মিত কার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে এক এক জন পরিকল্পনাকারী এক একবার এক একটি করিয়া কার তৈয়ারী করিয়াছেন, ক্রেতাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের মডেল তৈরি হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ফিয়াট কার সম্পর্কিত আলোচনা প্রথম তেত্রিশ বৎসরের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইবে।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে করসো দান্তে ফ্যাক্টরিতে নির্ম্মিত ফিয়াট কারটি দুইটি আসনবিশিষ্ট, ইহাতে ষ্টীয়ারিং হাতল আছে। ইহার এঞ্জিন দুইটি সমান্তরাল সিলিণ্ডারযুক্ত এবং পিছনদিকে জুড়িয়া দেওয়া। ইহার চাকা প্রতি মিনিটে ৭০০ বার আবর্ত্তিত হইত এবং ভাল রাস্তায় ইহা ঘণ্টায় ২০।২২ মাইল বেগে চলিতে পারিত।
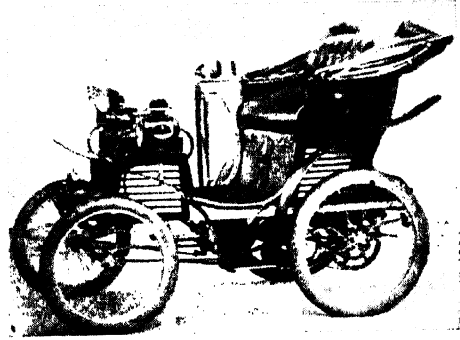
১৮৯৯ সালের প্রথম ফিয়াট কার

১৯০১ সালে নির্ম্মিত কারেই প্রথম আকৃতিগত উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। এই মডেলের অধিকাংশই এখনও দুইটি সমান্তরাল সিলিণ্ডারযুক্ত, কিন্তু এগুলি অধিকতর শক্তিশালী।

ফিয়াট কারের ইতিহাসে ১৯০২ সালটি স্মরণীয়, কেননা এই বৎসরেই প্রথম চার-সিলিণ্ডার এঞ্জিন উদ্ভাবিত হয়। ইহার দরুন কারের গড়নের অদল-বদল হইয়া যায় এবং কয়েক বৎসর এই আকৃতিই বজায় থাকে। ইহার এঞ্জিন সামনের দিকে।

ইটালী-ভ্রমণের জন্য ১৯০১ সালেই ফিয়াট কর্ত্তৃক আর একটি বিশেষ ধরণের কার নির্ম্মিত হয়। গীয়ারহীন অবস্থায় ইহার গতি ছিল ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল এবং গীয়ারযুক্ত অবস্থায় ইহা ঘণ্টায়

পঞ্চাশ মাইল বেগে ছুটিতে পারিত। তখনকার দিনে মোটরকারের এরূপ দ্রুতগামিতা ছিল অবিশ্বাস্য।

১৯০২ সালে যে চার-সিলিণ্ডার 'রেস-কারের' উদ্ভব হয় তাহারই ক্রমবিকশিত রূপ বর্ত্তমান ১৪০০ ফিয়াট। ইহার সিলিণ্ডার ২৪-অশ্বশক্তিসম্পন্ন। এই কার বিখ্যাত ইটালীর পার্ব্বত্য দৌড়-প্রতিযোগিতা—সুসা মনসেনিসিউতে, ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে ছুটিয়া অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী মোটরকারগুলিকে পিছনে ফেলিয়া নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে। ১৯০৩ সালে 'সুপারকম্প্রেশন' এবং 'ফোর-স্পীড-গীয়ার' জুড়িয়া দিয়া ১৯০২-এর উক্ত রেসি-কারের গতিবেগ বাড়ানো হয়। পুরনো কারের এই নব সংস্করণ ঘণ্টায় নব্বই মাইল বেগে চলিয়া পৃথিবীতে গতিবেগের নূতন রেকর্ড স্থাপন করে।
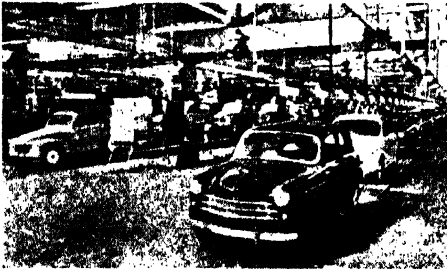
ফিয়াটের 'এসেম্‌ব্লিং ওয়ার্কসের' অভ্যন্তরভাগের দৃশ্য

এই সমস্ত তথ্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, গত পঞ্চাশ বৎসরে মোটরগাড়ীর উৎকর্ষসাধন যে কিরূপ দ্রুত গতিতে হইয়াছে, তাহা যিনি এ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নহেন তেমন লোকের ধারণার অতীত। প্রথম চারি বৎসরের মধ্যেই ফিয়াট কারের ভাবী চরমোৎকর্ষের গোড়াপত্তন হয়। সর্ব্বত্রই ইহা পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ করে। ফলে বিদেশী ক্রেতাদের মধ্যে ফিয়াট কার সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

এমনি ভাবে ফিয়াট কারের উৎকর্ষ সাধিত হইল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহার উৎপাদন-ব্যয়ের সমস্যা দেখা দিল। ইহার সমাধানের একমাত্র উপায় হইল—আমেরিকায় "মাস" অথবা 'এসেম্বলি লাইন প্রোডাকশন' (যন্ত্র সাহায্যে বহুল পরিমাণে উৎপাদন, নামক যে সকল অভিনব পদ্ধতি প্রচলিত সেগুলি অবলম্বন করা। এই পদ্ধতিতে প্রস্তুত মোটরকারগুলি প্রত্যেকটি ছিল একই আকারের। কাজেই একটির স্থান অপরটি পূর্ণ করিতে পারিত। ফিয়াট ফ্যাক্টরিতে এই পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হওয়াতে ফল ভালই হইল। ইহাতে ফিয়াট কারখানাগুলির বাজারে দাঁও মারিবার এবং বিদেশে চালান দিয়া ক্রমোন্নতিশীল বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত তীব্র মূল্য-প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল।

১৯০৪ সালে প্রথম ট্রাক এবং বাসের আবির্ভাব হইল। তখনও এগুলির ড্রাইভারের সীট ছিল সরাসরি সামনের দিকে, কিন্তু চার সিলিণ্ডারযুক্ত এঞ্জিন ইহার নীচে ঢাকা থাকিত। ইহার মাল-বহন-ক্ষমতা ছিল ৮০ হন্দর। তখন ইহার টায়ার ছিল লোহার তৈরি, কেননা তৎকালে রবার এই রকম গুরুভার বহনের পক্ষে উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইত না। বিভিন্ন শহরের মধ্যে যাতায়াতকারী বাসগুলি ছিল দোতলা (double-deckers), উপরের তলায় ছাদ ছিল না, বাহিরের দিকে লাগানো একটি সুন্দর সিঁড়ির সাহায্যে উপরের তলায় উঠিতে হইত। ইহা একখেপে ছত্রিশ জন লোক বহন করিতে পারিত, ইহার চাকায় ছিল টিউবহীন রবারের টায়ার এবং ইহা ঘণ্টায় কুড়ি মাইল চলিতে পারিত।

চার সিলিণ্ডার মটরযুক্ত, অভিনব, ছয়টি সীটওয়ালা সিডান প্রথম প্রস্তুত হয় ১৯০৪ সালে। ইহা তিন সারিতে সংস্থাপিত ছিল—প্রতি সারিতে দুইটি করিয়া সীট। এদিকে আসনদ্বয়-বিশিষ্ট (Two seater) রেসিং-কারেরও প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হইল—ঘণ্টায় ইহার গতিবেগ হইল ১০০ মাইল। ইহার চক্রাবর্ত্তনের সংখ্যা মিনিটে ১০০ বার। ১৯০৫ সালে এই একই শ্রেণীর একটি মোটরকার, 'অটোমবাইল' রেস প্রতিযোগিতার ইতিহাসে প্রথম ঘণ্টায় ১২৫ মাইল বেগে ছুটিয়া আর একবার নূতন রেকর্ড স্থাপন করিল।

১৯০৬ এবং ১৯০৭ সালে আরও নানা দিক দিয়া মোটরকারের উৎকর্ষ সাধিত হইল। চক্রাবর্ত্তনের সংখ্যা এবং ক্ষমতা আরও বাড়িল। হালকা, অধিকতর দ্রুতগামী এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যের কারের দিকেই লোকের ঝোঁক বেশী দেখা গেল।

১৯০৮ সালে মডেলের সংখ্যা কমিল বটে, কিন্তু মোটরকারগুলি অধিকতর সুনির্দ্দিষ্ট আকার লাভ করিল।

১৯১৩ সালে আবির্ভূত "থ্রি বিজ আমেরিকা"য় প্রথম বৈদ্যুতিক ষ্টার্টার সংশ্লিষ্ট হইল। ১৯১৪ সালে চালু-হওয়া একটি রেসিং ২২১২ লিটার কারে প্রথম একজোড়া সম্মুখের ব্রেক পরিলক্ষিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়—ট্রাক, প্লেন মোটর, ম্যারিন এঞ্জিন, প্ল্যাণ্ট এবং সামরিক যানবাহন ইত্যাদির উদ্ভব হইল। সেই সময় প্রকৃতপক্ষে "৭০" এবং "২" এই দুইটি মাত্র মডেলই ছিল ইটালীর বাজারে প্রাপ্তব্য মোটরকার।

১৯১৯ সালের শেষভাগে আবির্ভাব হইল "৫০১"-এর। ইহা মোটরকারের ক্ষেত্রে নূতন ইতিহাস রচনা করিতে সক্ষম হইল। যুদ্ধের সময়েই ইহার পরিকল্পনা করা হয় এবং যুদ্ধবিরতির অব্যবহিত পরেই ইহার পরীক্ষণ এবং বিভিন্ন অংশের সংযোজনাদি কার্য্য শেষ হয়। এই কার সহসা আপন বৈশিষ্ট্যে সকলের তাক লাগাইয়া দেয়। ইহার আবির্ভাবের পর বাজারে যেন নূতন হাওয়া বহিল। এই কার মোটর-উৎপাদন-প্রচেষ্টার অগ্রগতির পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছিল। ইহা ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মিটাইতে সক্ষম হইল, ইহার দৌলতে ইটালীতে এবং ইটালীর বাহিরে মোটর-বিহার

অধিকতর জনপ্রিয় হইল—অন্যান্য বহুল-প্রচলিত মডেলগুলি ইহার সহিত প্রতিযোগিতায় পিছু হঠিতে বাধ্য হইল। বংসরের পর বংসর পার হইয়া চলিল, অবশেষে "৫০১" কিছু অদলবদলের ফলে নবকলেবর ধারণ করিল। "৫০৩" অধিকতর সৌষ্ঠবসম্পন্ন এবং কার্য্যোপযোগী হইয়া প্রায় দশ বংসরকাল নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বিস্ময়করব্রূপে বজায় রাখিয়া চলিয়াছিল। ইহার উৎকর্ষের কথা লোকমুখে প্রায় রূপকথার পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই মোটরকারের জন্মের পর তেত্রিশ বংসর অতিবাহিত হইয়াছে, আজও পর্য্যন্ত ইহার অনেকগুলি নব নব সংস্করণ বাজারে প্রাধান্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছে।

"৫০১" মডেল ফিয়াট ছিল তখনকার দিনের হালকা, চার সিলিণ্ডার এবং পার্শ্ব বালব (side valves) যুক্ত মোটরকার। ইহার চাকা মিনিটে ২৮০০ বার ঘুরিত এবং ইহা ২২-অশ্বশক্তি-সম্পন্ন ও চারিটি স্পীড গীয়ারযুক্ত ছিল। ইহার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৪৬ মাইল। ইহাই 'ষ্টার্ট'-সম্বলিত পুরোপুরি বৈদ্যুতিক প্ল্যাণ্টযুক্ত প্রথম মোটরকার। ১৯২৩ সালে আরও উৎকৃষ্টরূপে নির্ম্মিত "৫০২" মডেল ছিল ইহা অপেক্ষা কতকটা আলাদা রকমের এবং ইহা বিশেষভাবে ট্যাক্সি হিসাবে ব্যবহৃত হইত। "৫০৩"-এর জন্ম হইল ইহার পরের বছর—ইহা ছিল আয়তনে কিছু বড় এবং ইহার চারিটি চাকাতেই ব্রেক জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল।

যুদ্ধের পর ৫০১-এর পাশাপাশি একটি অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর কার ("৫০৫") নূতন আকারে বিকাশলাভ করিল। ইহাও চারিটি সিলিণ্ডারযুক্ত, চক্রাবর্ত্তনের সংখ্যা মিনিটে ২৬০০ বার। তিন বংসরের মধ্যে ইহাই সম্মুখের ব্রেকযুক্ত ৫০৭-এ পরিণত হইয়া নূতন রূপ পরিগ্রহ করিল। ৬ সিলিণ্ডারযুক্ত, ৪৪-অশ্বশক্তিসম্পন্ন এবং ঘণ্টায় ৫৫ মাইল গতিবেগবিশিষ্ট "৫১০"-ও এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। মোটরকারের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকারকারী ষ্ট্রাস-বুর্গ মডেল ১৯২২ সালে এবং 'মোনৎজা টু লিটার্স' ১৯২৩-এ চালু হইল। শেষোক্তটি এই বংসরেই মোনৎজা প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়।

ক্ষুদ্রাকৃতি কারের উপযোগিতা সম্বন্ধে একদা অনেক বাদানুবাদ, অনেক লেখালেখি হইয়া গিয়াছে। প্রতিকূল মত অগ্রাহ্য করিয়া, বহু প্রত্যাশার পর ১৯২৫ সালের শরৎকালে ফিয়াট মোটর-জগতে যুগান্তকারী আর একটি কার—"৫০৯" উৎপাদন করে। বহু-প্রত্যাশিত এই ছোট, স্বল্পমূল্যের স্বয়ং-গতিশীল (automobile) চক্রযানটি জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়া ফিয়াটের প্রচেষ্টাকে সাফল্য-মণ্ডিত করে। ইহার চক্র মিনিটে আবর্ত্তিত হয় ৩৪০০ বার—ইহা ২২-অশ্বশক্তিসম্পন্ন, ৩টি স্পীড গীয়ার বিশিষ্ট। ইহার ওজন ১৭০০ পাউণ্ড, ইহাতে চার জন বসিতে পারিত। চারিটি চাকাই ছিল ব্রেকযুক্ত এবং ইহার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৫২ মাইল। সংখ্যাধিক্য এবং ঘনসন্নিবিষ্ট সূক্ষ্ম অংশগুলির নূতন আকৃতির জন্য বহুল-উৎপাদনে (Mass production) ইহার আকারসাম্য (uniformity) আংশিকভাবে ব্যাহত হইল। কিছু কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও এই কার অনেক মোটর-বিলাসীর মন জিতিয়া লইল।

গিয়াভান্নি এগনেল্লি ও হেনরি ফোর্ড

পরবর্ত্তী কয়েক বংসরে "৫০৯" তাহার ছোটখাটো যান্ত্রিক ত্রুটিগুলি শোধরাইয়া লইতে সক্ষম হইল এবং বস্তুতই: তাহার বিজয়-ভেরী-নিনাদে সমগ্র পৃথিবী মুখরিত হইয়া উঠিল। সেই ধ্বনির রেশ এখনও পুরাপুরি মিলাইয়া যায় নাই।

এই ক্ষুদ্র যানটি—যাহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে :

"এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়
দেখিয়া বিশ্বের লাগে পরম বিস্ময়"—

অনেকের বিরূপ সমালোচনার বিষয়ীভূত হইয়া দাঁড়াইল। আমেরিকান কারের পক্ষপাতীদের পছন্দসই ছিল—আরামদায়ক, অপেক্ষাকৃত ভারী, অধিকতর প্রশস্ত, অনায়াসে চালনা করা যায় এবং কম খরচ পড়ে এমন এঞ্জিনযুক্ত মোটরকার। এই প্রতিক্রিয়ার ফলে উদ্ভাবিত হইল ছয় সিলিণ্ডারযুক্ত, ৪৬-অশ্বশক্তিসম্পন্ন, ২৬০০ পাউণ্ড ওজনবিশিষ্ট "৫২০"কার। এইটিই ছিল প্রথম বাম-হস্ত চালিত ফিয়াট কার এবং পরবর্ত্তী সকল কারই ইহার চিহ্নিত পথ অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিল। ইহার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য হইতেছে: (১) চারিটি চাকায়ই স্বতশ্চালিত ব্রেক, (২) আরামদায়ক গদী-আঁটা সীট এবং (৩) প্রত্যেক দিকে তিনটি কাচের সার্সিবিশিষ্ট, কামরার ধাঁচের দেহ।
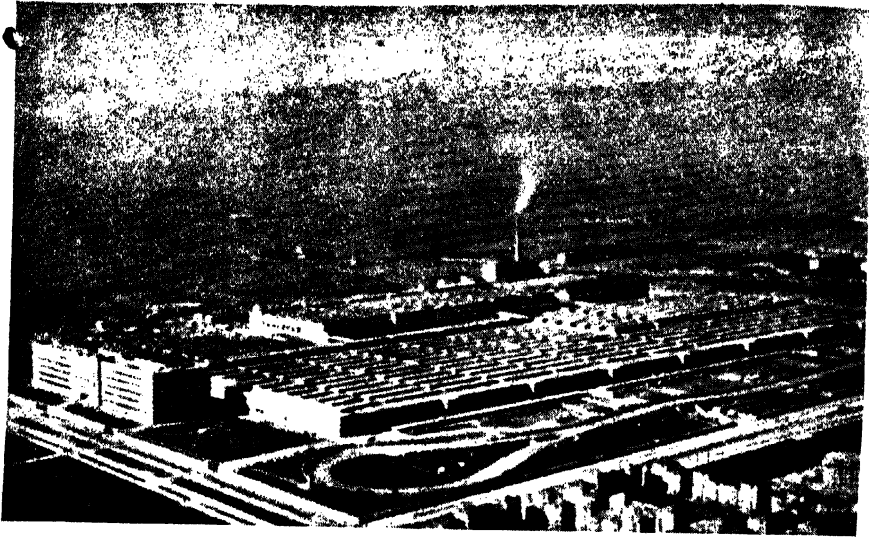
আকাশ হইতে ফিয়াট ফ্যাক্টরীর দৃশ্য

ইহার উন্নত সংস্করণ "৫২১" "৫২২" এবং "৫২৪"-এ ষ্টীয়ারিং সাসপেন্‌স এবং ব্রেকের উৎকর্ষ সাধিত হইল, পাঁচ জনের জায়গায়

ফিয়াট ১৯০০

সাত জনের বসিবার স্থান হইল—এবং পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসর এই কারই বাজারে প্রাধান্য বজায় রাখিয়া চলিল।

১৯২৮ এবং ১৯২৯ সালে আরও দুইটি অনুরূপ কারের উদ্ভব হইল—"৫২৫" ও "৫১৪" এবং যদিও পরবর্ত্তী বৎসরে "৫১৫" এই আখ্যায় দৃঢ়তর এবং অধিকতর আরামদায়করূপে "৫১৪"-র পুনরাবির্ভাব হইল, যদিও ১৯৩১ সনে ইহাতে হাইড্রলিক ব্রেক জুড়িয়া দেওয়া হইল, তৎসত্ত্বেও কিন্তু ইহা বাজারে তেমন সুবিধা করিতে পারিল না। মোটরের বাজার তখনও ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ৫০১ এবং ৫০৯-এর মুঠোর মধ্যে। চার বৎসর পরে ফিয়াট এমন একটি শ্রেষ্ঠ অথচ ছোট কার উৎপাদন করিল যাহা জনপ্রিয়তায় ইহার পূর্ব্বোৎপাদিত সকল কারকে ছাড়াইয়া গেল।

১৯৩২ সালে ১৬০০ পাউণ্ড ওজনবিশিষ্ট "বালিলা" খ্যাতির একেবারে শীর্ষস্থানে আরোহণ করিল। ছোট, ঠাসবোনা, দ্রুত-গামী, স্বল্পমূল্যের ইটালিয়ান বেলিলা কার প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মোটরজগতে যুগান্তর সৃষ্টি করিল এবং ফিয়াটের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলিয়া গণ্য হইল। একুশ বৎসর পরে আজও সে তাহার আদর্শে তৈরি মোটরকারসমূহের মাধ্যমে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিয়াছে।

এই বৎসরেই ফিয়াট কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত আর একটি কার (আরদিতা) অপেক্ষাকৃত কম সাফল্যলাভ করে, কেননা ৬-সিলিণ্ডার এঞ্জিন-বিশিষ্ট, ১৯৩৪-এর ১৫০০ মডেল অতিক্রান্ত ইহাকে কোণঠাসা করিয়া দেয়। যাবতীয় যান্ত্রিক সমস্যার সমাধান-নৈপুণ্যের জন্য ফিয়াটের উৎপাদন-ক্ষেত্রে ১৫৩০ মডেলকে যথার্থই একটি ল্যাণ্ডমার্ক

বা সীমানানির্দ্দেশক অভিজ্ঞান বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে ইহা ইটালীর মোটরকার-শিল্পের ঐতিহ্য এবং ক্রেতাদের রুচির মোড় ফিরাইয়া দেয়।

স্থানাভাবে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আর কেবলমাত্র বহুল-পরিমাণে উৎপাদিত টুরিষ্ট কার এবং আরও দু'একটি ছাড়া অন্য কোন মডেলের কথা উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে। অপর একটি ল্যাণ্ডমার্ক স্থাপনকারী মোটরকারের কথাও উল্লেখ করা হইতেছে, তাহা ছোট, আরামদায়ক—"৫০০"কার। এই কারের অগণিত মালিক এবং অনুরাগীরা ইহার নূতন নামকরণ করেন—টপোলিনো বা মিকি-মাউস। ১৯৩৫ সালে ইহার আবির্ভাব এবং এখনও ইহার অগ্রগতি অব্যাহত রহিয়াছে।

ফিয়াটের উৎপাদিত সর্ব্বশেষ মোটর ১১০০-র পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪০০ মডেল শুধু বাহ্য দৃশ্যের দিক দিয়াই নহে, ভিতরকার যন্ত্রসমূহের সূক্ষ্মতম খুঁটিনাটির দিক দিয়াও অভিনব। ইহা আমেরিকার আদর্শে পরিকল্পিত—যেমন অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়সাধ্য তেমনি অধিকতর আরামদায়ক।

এমনিভাবে ইটালীর মোটরকার-শিল্প ধাপে ধাপে ক্রমোন্নতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে। পরবর্ত্তী কালের অগ্রগতির কাছে আগেকার উৎকর্ষ-সাধন-প্রচেষ্টা নিতান্ত নিষ্প্রভ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। এমন কি এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফল ১৪০০ মডেলকেও হাইড্রোলিক জয়েন্টযুক্ত ১৯০০ টাইপের কাছে হার মানিতে হইয়াছে। ফিয়াটের এঞ্জিনীয়াররা মোটর-শিল্পের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাফল্যলাভের আশায় অক্লান্তভাবে কাজ করিয়া চলিতেছেন।

ন. ভ.

হাটের পথে

শিল্পী : শ্রীমনীষী দে

বিশ্বকবির কৌতুক

শ্রীপুষ্প দেবী

আজকে কবিগুরুর যে গল্প পাঠকদের কাছে বলব, মনে হয়, তা শুনে পাঠক-পাঠিকারা খুশী হবেন। শ্রদ্ধেয় জগদানন্দ রায়ের বিষয়ে ভারি সুন্দর একটি গল্প শুনেছিলাম পিতৃবন্ধু যতিনাথ ঘোষ মশায়ের কাছ থেকে। কোন একটা ছুটিতে তিনি সপরিবারে ভাগলপুর যাচ্ছিলেন। ইণ্টার ক্লাসে বেজায় ভিড়, তারই মধ্যে প্রথম দেখেন জগদানন্দ রায় মহাশয়কে। মানুষটির বাইরের চেহারা সাধারণ বাঙালীর মতই, রংও বেশ কালো। তবু তিনি যে সাধারণের সঙ্গে এক শ্রেণীর নন তার পরিচয় দিচ্ছিল—তাঁর প্রতিভাদীপ্ত দুটি চোখ। যতিনাথবাবু জগদানন্দের পরিচয় পেয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিনয় প্রকাশ করে বলেন—আপনার লেখা বই পড়ে সত্যি সত্যিই উপকৃত হয়েছিলাম। শুনে হেসে জগদানন্দবাবু বল্লেন, তবে শুনুন এই বই লেখার জন্মকথা :—

তখন বয়স অল্প, সবে বি-এ পাস করেছি কিন্তু সংসারের অবস্থা একান্তই অচল। কাজেই ঠাকুর ষ্টেটে জমিদারীর গোমস্তার কাজ আরম্ভ করলাম। সামান্য তিরিশটি টাকা মাইনে, নিজে রাঁধি-বাড়ি খাই। কিন্তু পেটের ক্ষিধে মিটলেও তাতে মনের ক্ষিধে মেটে না। সেখানে একমাত্র আকর্ষণ ছিল বাবুমশায়ের জন্যে আসা বিজ্ঞানের পত্রিকাগুলি। হঠাৎ একদিন তলব পড়ল আমার—খোদ

বাবুমশায়ের কাছ থেকে। আমার তো শঙ্কা উপস্থিত। গিয়ে দেখি বৈঠকখানা ঘরে বাবুমশাই বসে আছেন। মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। আমায় বসতে বললেন, ভয়ে ভয়ে তো বসলাম। বাবুমশাই বলেন, "দেখুন আপনাকে দিয়ে জমিদারীর কাজ তো চলবে না। এর আগে কোন জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করেছিলেন আপনি?" সবিনয়ে নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হই। তখন বাবুমশাই বলেন, "এমন কি, খাতা লিখতেও আপনি জানেন না—তবে কি সাহসে এখানে চাকরিতে ঢুকলেন? কেই বা বহাল করল আপনাকে?" জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে চেয়ে থাকেন। আমার তখনকার অবস্থা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না কি অপরাধে এত অসন্তুষ্ট তিনি হলেন? মনের ভেতর নানা ভয় আশঙ্কা। কিন্তু সব ছাপিয়ে বারে বারে মনে হচ্ছিল যদি এ চাকরি যায় তবে কি দশা আমার হবে! মাসান্তে যে পনের-কুড়িটা টাকা পাঠাই বাড়ীতে তাও বুঝি বন্ধ হ'ল। চোখে প্রায় জল আসার উপক্রম। আবার সেই জলদ-গম্ভীর সুরে বাবুমশাই বলেন, "দেখুন আজ সাত পুরুষ ধরে এই জমিদারীর খাতায় পিতা বানান লেখা হচ্ছে পয়ে দীর্ঘ-ই করে। আপনি এসে বদলে দিলেন লিখে পয়ে হ্রস্ব-ই। তারপর চিরদিন লেখা হচ্ছে 'গৃহিতা' আপনি এসে তাকে লিখলেন 'গ্রহীতা', কাজেই আপনাকে দিয়ে জমিদারী সেরেস্তার কাজ হওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া না বলে অপরের জিনিষ নেওয়ার অভ্যাসটাও বড় ভাল নয়—সেটাও আপনার আছে।

এবার আমার অবস্থা সত্যিই চরমে পৌঁছয়; এমন কি, আমার লেখা বানান দুটিই যে ঠিক তাও বলার মনে কথা পড়ে না। আবার শুনি—'কাজেই জমিদারী সেরেস্তার কাজে আপনার জবাব হয়ে গেল। আরও এক মাসের মাইনে আপনাকে দেওয়া হবে, তবে ও কাজের সত্যিই আপনি অনুপযুক্ত। তা ছাড়া শুনি দিবারাত্তির আপনি বই পড়েন। মন যদি আপনার এত বিক্ষিপ্ত হয়, তা হলে একাজ আপনি করবেন কি করে? আমি দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ্য করেছি, আমার নামে যেসব বৈজ্ঞানিক কাগজপত্র আসে তা সবই প্রথমে দু'চার দিনের জন্যে অন্তর্দ্ধান হয়ে যায় এবং তা হয় আপনার দ্বারাই, বলুন তা সত্যি কি না?" এবার আমি সত্যিই লজ্জিত হই এবং নিজের অপরাধ স্বীকার করে বলি, আমায় এবারের মত মাপ করুন আর কখনও এ রকম দোষ হবে না। বিশ্বাস করুন সত্যিই একটা সংসার অচল হয়ে যাবে আমার এই চাকরিটুকু গেলে। সত্যিই না খেয়ে মরে যাব।

সামনে আরশি ছিল না, নিজের মুখে তখন কি ভাব হয়েছিল বলতে পারব না। কিন্তু এবার যেন তাঁর মুখে পরিবর্ত্তন দেখলাম, চোখের কোণে মৃদু কৌতুকের হাসি যেন ঝিলিক মেরে গেল। গম্ভীর স্বরে বললেন, "তা হলে কি বলেন আপনার ভুলের জন্য কি আপনার খাওয়ার ভার আমায়ই নিতে হবে? বেশ! কাল থেকে আপনি আমার সঙ্গেই খাবেন আর আমার ছেলে রথীকে পড়াবেন, মাইনে হ'ল পঞ্চাশ টাকা করে। রথীকে প'এ দীর্ঘ ইকার পিতা বানান শেখানো সত্যি সত্যিই আমি চাই না। তবে আরও একটা কাজ আপনাকে করতে হবে, শুনুন— ঠিক ছোট ছেলেদের উপযোগী করে বিজ্ঞানের বিষয় লিখতে সুরু করে দিন; আমার সমস্ত লাইব্রেরী খোলা রইল আপনার জন্যে, তা ছাড়া যখন যা বই দরকার আমায় জানালেই পাবেন।" আনন্দে যে মানুষের কথা বলার শক্তি চলে যায় তা সেইদিনই প্রথম আমি জানলাম। অনেক কষ্টে শক্তি সংগ্রহ করে বলি, "কিন্তু লিখতে আমি ঠিকমত পারব কি?" এবার আর ভুল নয়, সন্দেহ নয়—বৈঠকখানা ঘর ছাপিয়ে উঠল তাঁর সরল কণ্ঠের হাসি; বললেন, "ভয় হচ্ছে বানান ভুল হবার? না না ঐ বানানই চলবে, লিখুন লিখুন, আমি না হয় দেখে দেবো ভয় কি?"

এর পর থেকেই আমার এই নবজন্মগ্রহণ। মনের সাধে যা খুশি লিখি, দিনরাত বই পড়ি আর বাবুমশায়ের সঙ্গে খাই চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয়—রাজকীয় রাজভোগ—যা সত্যি সত্যিই একদিন আগেও আমার ধারণার অতীত ছিল। কাজেই আমার লেখার দ্বারা সত্যিই যদি কেউ উপকৃত হয়ে থাকেন, তা কবির জন্যেই—নইলে জমিদারী সেরেস্তার খাতার তলায় যে এর সমাপ্তি ঘটত তার সন্দেহ নেই।

অশরীরী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ত্যক্ত বিশাল ভগ্ন ভবন—
ঘন জঙ্গল মাঝে,
সেথানে সতত আলো আঁধিয়ার,
ঝিঝির ঝাঝর বাজে।
ছিন্ন সৌধমালা,
স্মৃতির বন্দীশালা,
তোরণে তাহার কুতুহলী হয়ে
পঁহুছিনু এক সাঁঝে।

২

ডাকিলাম জোরে, 'কোথা পুরবাসী ?
কোথা ওগো পুরবাসী ?
লও ডেকে লও, অতিথি তোমার
দ্বারে যে দাঁড়ালো আসি।'
ধ্বনিত হইল গেহ,
আসিল না কই কেহ ?
শুধু পেচকের কর্কশ রব
সাড়া দিল উপহাসি'।

৩

দ্বিতলের সব কক্ষে কক্ষে
বায়ু বহি' সন্‌সনি'
গত-গৌরব গম্বুজগৃহে
তুলিল প্রতিধ্বনি।
কে যেন বলিছে 'আজও
আছ কি তোমরা আছো ?
শতাব্দী পর শতাব্দী ধরে
আমরা যে দিন গণি।'

৪

সুবৃহৎ বট রচি' মণ্ডপ,
'নামালে'র পাকে পাকে,
রয়েছে দাঁড়ায়ে, হোয়েন্থ সাঙ
হয়তো দেখেছে তাকে।
দম্‌কা বাতাস লাগি,'
শিলা-ছবি উঠে জাগি,'
বলে 'আমাদের ভরা ঘুমে কে রে
গায়ে হাত দিয়া ডাকে ?'

রঞ্জিত যেন হয়েছে যাড়ারা
যুগের যুগের কশে,
ডালিম গাছেতে ডালিম ধরেছে
ফেটে পড়ে রূপে রসে।
ফুটিয়াছে হয়ে ফুল ?
কাহারা হয় যে ভুল ?
মানুষ মরে কি ফুল ফল হয় ?
আমি ভাবি হেথা বসে।

৬

ভগ্ন স্তূপে উঠেছে যে সব
বলিষ্ঠ তরু-লতা,
ভালবাসি তাদের উদ্দাম গতি,
আরণ্য সরসতা।
যাহাদের এই ঘর,
এরা কি তাদের পর ?
পায়নি কি রূপ এতেই—তাদের
বক্ষের ব্যাকুলতা ?

৭

হাজার বছর আগে এ আবাসে
ছিল যারা পরিজন,
অনিন্দ্য শত মুখচ্ছবি যে
করছি নিরীক্ষণ।
সুমুখে ঘুরিছে তারা,
জরা ও মৃত্যু হারা,
রূপ যে অমর, যুগে যুগে তার
নাহি পরিবর্ত্তন।

৮

কণ্ঠের স্বর তেমনি—সুর যে
অবিনশ্বর ভবে,
গুণী মহাকাল মধুরতা তার
কেমনে কাড়িয়া লবে ?
সুরভিত চারিপাশ
করে কস্তূরী বাস,
সুবাসিত যাহা করিত সুদূর
অতীত মহোৎসবে।

৯

হাজার বছর কয়টা বা দিন
কয়টা বা নিঃশ্বাস ?
হাজার বছর ত্র্যম্বকের যে
একটা অট্টহাস।
মাটির প্রদীপে হায়—
একটা দীপালী যায়,
নিরঞ্জন ত নব বোধনের
কেবল পূর্ব্বাভাস।

১০

এখানে জমেছে কালের কুহেলি
ঘন যবনিকাপ্রায়,
রহস্যময় করি চরাচর
আবরি' রাখিতে চায়।
মোরা ধরণীর প্রাণী—
ধরাই আসল জানি,
তাহাকেই যেন ছায়া মনে হয়
এ ভবন আঙিনায়।

১১

এখানে যা শুনি তাহাই ত ধ্বনি,
প্রতিধ্বনি ত নয়.
আমরা যা বলি তাহাদেরি কথা
নাহি তাতে সংশয়।
স্পন্দন তাহাদের,
এই বুকে পাই টের,
তাহাদের দুখ দুশ্চিন্তাই
হয়ে আছে অক্ষয়।

১২

আসল ভুবন কোনটা ? তারা'ই
জানে বুঝি সন্ধান,
তাদের জগৎ স্থির—আমাদের
সদা দোদুল্যমান।
ভাবি মোরা যাবো যেথা,
উহারা রয়েছে সেথা,
যে সুধার মোরা পিয়াসী—তারা ত'
আগেই করেছে পান।

১৩

কর্ম্মতাদের দিয়ে চলে গেছে
লভিবারে বিশ্রাম,
সেই সে আদিম ভীতি ও ভাবনা
মোরা সহি' অবিরাম।
সেই চলাপথে চলি,
সেই বলা-কথা বলি,
মোদের সাধনা পূর্ণ করিছে
তাদেরি মনস্কাম।

১৪

তাদের খবর অধিক কি পাবো
মাটি ও পাথর খুঁড়ে,
এখন তাহারা বসত করিছে
নিখিল ভুবন জুড়ে।
ডাকিয়া বলিছে "আজও
আছ কি তোমরা আছো ?
দেবতার কাছে আছি বটে—নাই
তোমাদের বেশী দূরে।"

তড়িৎ-লতা
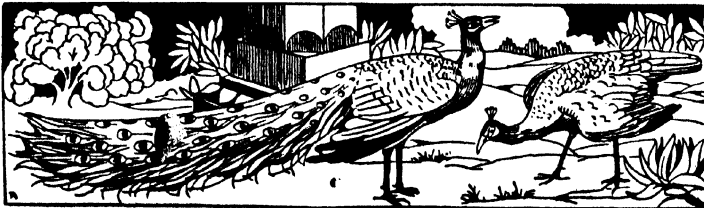
শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

১০

অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলাম দূরে টিম্ টিম্ করে আলো জ্বলছে। ষ্টীমারের সার্চ্চ-লাইট বা সন্ধানী আলোতে দেখতে পেলাম একটা খাল এসে পড়েছে নদীতে একটু দূরেই। তারই মুখে আছে একটা বড় নৌকো, তার গায়ে লেগে আছে ছোট-মাঝারি আরও গোটা-কয়েক।

'ঐ নৌকোগুলো দেখেছো'—বিনুদার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

দেখেছি ওটা হচ্ছে গিয়ে তোর ষ্টপ-বোট, এটা হ'ল চলতি কথা। আসল ব্যাপার এটাও একটা থানা—জল-পুলিশের থানা। ডাঙ্গায় যেমন চোর ডাকাত ধরবার ব্যবস্থা, জলেও তেমনি এসব ব্যবস্থা। ঐ যে ছোট-বড় নৌকো বাঁধা ওগুলো হচ্ছে কোনটা ছিপ, কোনটা বা এমনি সাধারণ ডিঙ্গি। এই পথে বা আশ-পাশ দিয়ে যারা যায় তাদের উপর এরা দৃষ্টি রাখে। সন্দেহ হলে ধরে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেয়—ভয় দেখিয়ে পয়সা নিয়ে ছাড়ে, কাউকে বা এমনিতেও ছেড়ে দেয়। এই ডিঙ্গি বা ছিপের সাহায্যে চারদিকে পেট্রল করে বেড়ায় সন্দেহজনক নৌকোর খোঁজে বা যারা এমনিতে আসবে না তাদের ধরে আনবার এই ব্যবস্থা!

সন্ধানী আলো আমাদের উপর পড়ায় বড্ড ক্ষতি হ'ল, আমাদের নিশ্চয় ওরা দেখেছে। এমনিতে না যাই, ধরে নিয়ে যাবে। এমনিতে গেলে হয়ত বিনা তল্লাসীতেও রেহাই পেতে পারি, কিন্তু ধরে নিয়ে গেলে সব ওলটপালট করে ছাড়বে। মানে মানে যাওয়াই ভাল।

'রিভলবার আর কাগজ'

'ওগুলো কোমরে বেঁধে নিয়ে চল। তেমন তেমন হলে হয় গুলি করে, নয় জলে লাফিয়ে পড়ে যা-হোক করে পালাবার ব্যবস্থা করা যাবে'খন।'

আমাদের নৌকো এসে ষ্টপ বোটের সামনে ভিড়ল। এতক্ষণে দেখলাম একখানা ছোট ছিপ আমাদের পিছন পিছন আসছিল। এখানে ভিড়তে দেখে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। বিনুদা বললেন, 'দেখলি ত কেমন পিছু নিয়েছিল!'

বোটের পাটাতনের উপর দারোগাবাবু চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন। একটু দূরে একটা গ্যাস-লাইট জ্বলছে। যত রাজ্যের উই-পোকা ওর গায়ে মাথা খুঁড়ে মরছে।

দুটো পুলিশ একটা জেলে নৌকো থেকে মাছ তুলছে দুটো ছিপ বোটের আর এক পাশে বাঁধা।

আমাদের এগোতে দেখে একটা পুলিশ খেঁকিয়ে উঠল, 'এই তোরা কারা।'

'আজ্ঞে এই দারোগাবাবুকে সেলাম দিতে এলাম'—জবাব দেয় বিনুদা।

এদিকে জেলে-নৌকো থেকে জেলেরা বলছে, 'আজ্ঞে কর্ত্তা আজ আর জালে তেমন পড়ে নি—আর একদিন না হয় বেশী নেবেন।'

একটা পুলিশ ধমকে বলল, 'থাম, তোদের ঐ এক কথা রোজই লেগে আছে। সরকার তোদের মাছ ধরবার সুযোগ দেয় কিনা তাই তোদের এই আস্পর্দ্ধা। নে, নে, তোল···'

বিনুদার উপস্থিতবুদ্ধি দেখে অবাক হলাম। ফস করে বললেন, 'আরে মিঞা, এদের মেহেরবানীতে করে খাও। দিয়ে দাও, দিয়ে দাও। হুজুরকে খুশি রাখলে দু'পয়সা বাড়তি রোজগার হবেই।

দারোগাবাবুর দৃষ্টি দেখলাম এবার আমাদের উপর পড়ল। এতক্ষণ তিনি নীরবে জেলেদের নিমকহারামী লক্ষ্য করে—দিনকাল যা হয়েছে, সে বিষয় চিন্তা করে জেলে-ব্যাটাদের উচিতমত শিক্ষা দেওয়ার কথা চিন্তা করছিলেন। বিনুদার কথায় তাঁর মেজাজটা যেন একটু শান্ত হ'ল, তিনি প্রায় ধমকের সুরেই বললেন, 'এই তোরা আবার কি চাস'—তেমন চড়া নয় সুর।

বিনুদা এতক্ষণে পাটাতন খুলে কাছিমটি বার করে ফেলেছেন। ওটাকে ষ্টপ বোটের পাটাতনের উপর রেখে বললেন, 'আজ্ঞে সন্ধ্যার পর পড়েছে, ভাবলাম আপনার ছিচরণে দিয়ে যাই।'

দারোগাবাবু—কত চাস?

বিনুদা জিব কেটে বললেন, কি যে বলেন হুজুর! পরাণটা চাইল, যাই দারোগাবাবুকে সালাম দিয়ে আসি।, এর জন্য আবার পয়সা কি?

'হু, তোদের বাড়ী কোথায়'—দারোগাবাবুর কথায় মুরুব্বিয়ানার সুর।

'আজ্ঞে হোথা, ঐ চরে।'

তোদের চরেও এবার অনেক তরমুজ হয়েছিল—কৈ দেখি নি ত তখন তোকে।

'আজ্ঞে আমার খেতেরটা তেমন সুবিধে হয় নি তাই কর্ত্তাকে পান খেতে দিতে সাহস হ'ল না। হুজুরের হুকুম হলে সব হয়।'

'হুঃ।'

বিনুদা বোটের ধার ছেড়ে দিলেন। আমাদের নৌকো ভাসতে লাগল। একটা পুলিস বলল, 'এই ব্যাটারা তরমুজ জরুর আনবি কিন্তু।'

একটু তাড়াতাড়ি নৌকো চালিয়ে মাঝগাঙ্গে এসে পড়লাম। বিনুদা বললেন, 'দেখলি তোর অযাত্রা কেমন যাত্রাপথ সুগম করে দিল। ওটা না থাকলে আজকে লাঞ্ছনার একশেষ হ'ত।'

আর একটা পুরনো কথা আজ আবার নতুন করে ধরা

পড়ল—চোখ, কান খোলা আর বুদ্ধিটা ক্ষুরধার না রাখলে আমাদের এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

ঢেউয়ের দোলায় মনে হ'ল আমরা ধলেশ্বরীর চওড়া বুকে এসে পড়েছি। গতি তীক্ষ্ণ হলেও অচঞ্চল—ঢেউ বিশাল হলেও সুবিন্যস্ত, ছন্দোময়, গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে গুরুগম্ভীর মেজাজে।

মাঝখানে থাকা আর নিরাপদ নয় মনে করে আমরা আস্তে আস্তে বাঁ পাড়ের দিকে এগোতে লাগলাম। সামনেই যেন মনে হ'ল লোকালয়।

'আমরা কোথায় এলাম বিনুদা ?'

'আর একটু এগোলেই আমরা বক্তাবলী চরের কাছে এসে পড়ব। জানিস ত এ জায়গাটার খুব বদনাম, এখানে হামেশাই ডাকাতি লেগে আছে। যাত্রী-নৌকো এখানে একেবারেই নিরাপদ নয়। নিরীহ লোকই চিরকালের মত, এখানেও বেশী মরে।'

'কিন্তু তোমার ঐ যে ষ্টিপ বোট, ছিপ নৌকো, আর জল-পুলিস এরা তবে কি জন্যে আছে।'

'ওসব ব্যবস্থা ভাই আমাদের জন্যে কেবল। কিন্তু দেখলি ত, ওদের নাকের ওপর দিয়েই বেরিয়ে এলাম। এমনি করেই সবাই যায়। ওদের দাপট কেবল নিরীহ যাত্রী-নৌকো, কিংবা গরীব ব্যবসায়ীর ওপর। এই ব্যবস্থা করে ঘুষ আদায়ের আর এক ফন্দী বার করেছে। অত্যাচারীর সত্যিকারের সন্ধান যদি ওরা করত বা করতে চাইত তবে ত দেশ মহাসুখে বেড়ে উঠত ভাই।'

'যদি আমাদের নৌকো কেউ আক্রমণ করে'—আমি আশঙ্কা প্রকাশ করলাম।

'আমাদের নৌকোর উপর কোন হামলা হবে না। আর যদি একান্ত হয়ই তবে এই অন্ধকার যাত্রাপথে আবার আর এক নতুনের আস্বাদ পাব, তাতে বিপদের চেয়ে মজাই বেশী হবে।' সহজ করে জবাব দিলেন বিনুদা।

কিছুক্ষণ আবার সব চুপচাপ। আমাদের নৌকো চলেছে ঢেউয়ের দোলায়—আশঙ্কায় নয়—ছন্দে—আনন্দে।

নদীর ঢেউ আস্তে আস্তে ভেঙ্গে যাচ্ছে। কান পেতে থাকলে মনে হবে যেন নদীর বুক চিরে দীর্ঘনিশ্বাস উঠছে। এতক্ষণ কর্মচঞ্চলতার পর এই মুহূর্তে যেন সব নীরব নিথর মনে হতে লাগল। অগণিত ঢেউয়ের দীর্ঘনিশ্বাস, একটানা জলস্রোতের মৃদু ছল্ ছল্ আওয়াজ, কিছুই যেন রাতের তপস্যা ভাঙ্গতে পারছে না। এসব কিন্তু সত্যই শব্দ, না নিস্তব্ধতার সুর! ঐকতান সঙ্গীতে বাজে নানান ঢঙের, নানান সুরের বাদ্য, কিন্তু আশ্চর্য্য এরা সবাই হারিয়ে ফেলে নিজস্ব সত্তা,সবাই বিলীন হয়ে যায় একটি মাত্র সুরে—একটি মাত্র সঙ্গীতে। এরাও যেন আজ রাতের নীরবতার সুরকে মধুময় গভীর করে তুলেছে।

নীরবতা ভঙ্গ করলেন বিনুদা, তাঁর কণ্ঠের শান্ত গম্ভীর আওয়াজ। আজকের এই অপূর্ব্ব পরিবেশের মধ্যে দুনিয়ার সারা মানুষের সঙ্গে নূতন করে পরিচয় হ'ল। এই মুহূর্তের এই বিরাট একাকিত্বকে দূরে ভাসিয়ে দিয়ে সবাই যেন আমার চার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে হাতে হাত ধরে। সবাইকে পেতে ইচ্ছে হচ্ছে একেবারে কাছে, গা ঘেঁষে। যাকে দেখেছি, যাকে দেখি নি সবাই যেন আমার আপন একান্তভাবে। যাকে ভাল লেগেছে, যাকে ভাল লাগে নি কেউ আর আজ দূরে নেই। যে প্রাণে দাগ কেটে গভীর আঁধারে বিলীন হয়ে গেছে, যার সঙ্গে জীবনে আর কোন দিনই হয়ত দেখা হবে না, কিংবা যার সঙ্গে আবার দেখা হবে—সবাইকে পেতে ইচ্ছে হচ্ছে একেবারে বুকের কাছে। বিনুদা হঠাৎ থেমে গেলেন। মনে হ'ল নিজের কথাগুলিই বুঝি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছেন।

বিনুদা হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'বড্ড বেশী কাব্য হয়ে গেল যে, বাঙালীর ভাববিহ্বল বলে যে বদনাম আছে তা দেখছি একেবারে মিথ্যে নয়।'

'তুমিও ত মানুষ বিনুদা।'

'ঠিক বলেছিস ; এমনি মানুষের মন নিয়ে দরদ দিয়ে যদি সকলকে বিচার করতে পারি। সবার সেবায় জীবনের স্রোত বইয়ে দিতে পারি, তবে না জন্ম সার্থক।'

কিসের ইঙ্গিত বিনুদার মনকে টেনে নিয়ে এসেছে নূতন দরদের সন্ধানে তার যেন আভাস এতক্ষণে পেলাম। ভাবের স্রোত বোধ হয় ছোঁয়াচে। আমি গা না ভাসিয়ে দিয়ে থাকতে পারলাম না, 'সত্যিই বিনুদা, এমনি অভিজ্ঞতা আমার জীবনেও এই প্রথম। তুমি সেই রাতের ডাকাতির কথা বলছ ত ? সত্যিই ত অদ্ভুত। চোখ-ধাঁধানো রূপ আর মন-ভোলানো ব্যবহার। জানি না ওর কথাই আজ তুমি বলছ কিনা—কিন্তু আজও আমি ওকে ভুলতে পারি নি।' আমার মুখে আর কথা এল না। বিনুদাও নীরব। মনে হ'ল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

তারপর আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, 'তোকে বলতে আমার বাধা নেই···, তাকে ভুলব কিরে—তার স্মৃতি আমার যাত্রাপথে নূতন অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেছে। মানুষের চাই এগিয়ে যাবার ভরসা—এমনি প্রেরণা।

নীলার স্মৃতি আজ আমায় উদ্বেলিত করেছিল, কিন্তু বিনুদার কথায় যেন নিজের মনে শান্তি খুঁজে পেলাম। আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলাম—যে বন্যায় মানুষের মন হাবুডুবু খায় তাকে বিনুদা বেঁধে ফেলেছেন। আর তারই সঞ্চিত জল বইয়ে দিয়েছেন ছোট ছোট জলধারায় নানান পথে ধরণীকে শস্য শ্যামলা করতে।

কিছুক্ষণ যাবৎ লক্ষ্য করছিলাম যেন একটা ছিপ নৌকো আমাদের দিকেই আসছে। কাছাকাছি আসতে নৌকোর গতি অনেক কমল। আওয়াজ এল—'ও মাঝি, আগুন আছে কল্কে ধরাব।'

আমার মুখ থেকে 'না' জবাবটি প্রায় বেরিয়ে এসেছিল। আমার বলবার আগেই বিনুদা উত্তর দিলেন, 'না মিঞা, আমরাও আগুন খুঁজছি। কল্কে অনেকক্ষণ ধরে শুকনো।'

ঐ নৌকো থেকে জবাব এল, 'খুব যে বাহাদুর !'

বিনুদা প্রত্যুত্তর দিলেন, 'রতনই রতন চেনে।'

ঐ নৌকো থেকে—'দেব নাকি শালাদের দুই ঠোক্কর দিয়ে।'

বিনুদা একটু হেসে বললেন, 'তা' মন্দ হ'ত না মিঞা, কাঠে কাঠে ঠোকাঠুকি ; নদীর বুকে আগুন জ্বলত বৈকি !

বক্ বক্ করতে করতে নৌকোটা দূরে চলে গেল।

আমার সবকিছুতেই অবাক হতে হয়। নিত্য-নূতন অভিজ্ঞতা যেন আমার প্রাত্যহিক জীবনকে সরস করে তুলছে ! 'একি হ'ল বিনুদা, এর কিছুই যে বুঝতে পারলাম না।'

'এ হ'ল ডাকাতের নৌকো।'

'তুমি বুঝলে কি করে।'

কল্কেতে আগুন ধরাবার ছল করেই এরা নৌকোর ধারে আসে। তারপর সুযোগ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে নেয়। এই হ'ল ওদের সাধারণ পদ্ধতি।

সত্যই আমরা একটা বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলাম তা জানতে পেরে মনটা মুহূর্ত্তের জন্য শঙ্কিত হল কি হতে পারত ভেবে।

'আচ্ছা, যদি ওরা আক্রমণ করত।'

'তবে এমন শিক্ষাই ওদের দিতাম, যেন জীবনে আর কারুর কাছে আগুন চাইবার দরকার না হয়।'

নিজের সম্পর্কে সাবধান হতে বিনুদাকে কোন দিনই দেখলাম না।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ নারীকণ্ঠের চীৎকারে আমরা দু'জনেই সচকিত হয়ে উঠলাম। আবার—আবার! কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করলাম, আওয়াজ কোন দিক থেকে আসছে। আমরা বক্তাবলীর চরের প্রায় পাশ ঘেঁষেই যাচ্ছিলাম। জলের বুক থেকে কিনারা খানিকটা উঁচু। অদূরে চরটা যেন ঘুরে গেছে বলে মনে হয়। সেই বাঁকের ওধারেই যেন কিছু ঘটছে বলে মনে হ'ল।

বিনুদা একটু নীরব থেকে বললেন, 'নিশ্চয় কোন যাত্রী-নৌকা আক্রান্ত হয়েছে। আর একটু সময়ও আমাদের নষ্ট করা উচিত নয়। চট্ করে নৌকোর পালটা খুলে ফেল ; আর দ্রুত নৌকো চালিয়ে—যদি কিছু করতে পারি।'

নূতন এক উত্তেজনায় যেন নৌকো দুলে উঠল। তীরবেগে ছুটে চললাম। চরের বাঁক ঘুরতেই লক্ষ্য করলাম—একটা ছইওয়ালা নৌকোর পাশে আর একখানা ছিপ নৌকো আর ধুপধাপ চেঁচামেচি। আমরা খুব তাড়াতাড়ি নৌকো বেয়ে গিয়ে ঐ ছইওয়ালা নৌকোর পাশে লাগিয়ে বিভলবার থেকে এলোপাথারি গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আক্রান্ত নৌকোয় লাফিয়ে উঠলাম।

আমাদের এগোতে দেখে ডাকাতেরা চেঁচিয়ে উঠেছিল—'কোন্ শালারা আসছে রে এদিকে, প্রাণে বাঁচতে চাস ত এদিকে আসবি নে।' আমাদের সত্যি সত্যি নৌকোয় ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে আর গুলির আওয়াজ শুনে ওরা মনে করেছে নিশ্চয় জল-পুলিশ ওদের আক্রমণ করেছে। ওরা ভয়ে চারিদিকে লাফিয়ে পড়তে লাগল। কেউ কেউ আমাদের নৌকোয় কেউ-বা জলে, আবার কেউ কেউ ওদের নিজেদের নৌকোয়।

চক্ষের নিমেষে লোকগুলি আমাদের আর ওদের নৌকো নিয়ে পালিয়ে গেল। আক্রান্ত নৌকো যে আমাদের এখন একমাত্র ভরসা তা অনুভব করলাম উত্তেজনার প্রথম বেগ কাটলে।

'যাক, কেউ যে গুলির ঘায়ে মরে নি এটাই বাঁচোয়া, খুনোখুনি হলে আবার কিসের হাঙ্গামায় জড়াতে হয় তা কে জানে'—স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন বিনুদা।

'কেন ডাকাত মারলে, আর কি হয়েছে !'

'ওতে ভাবনা আছে বৈ কি ! গুলি কারা মারলে ডাকাত না সমিতির লোক ! পুলিশের মনে সন্দেহ জাগালে আমাদেরই যে বিপদ ভাই।

আমাদের নৌকো তখন স্রোতের বেগে ঘুরতে ঘুরতে চলেছে। বিনুদাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, আমাদের নৌকো ত ডাকাতে নিয়ে পালাল, এখন কি করি বল ত !'

'কি আর করবি বল, যে নৌকোয় দাঁড়িয়ে আছিস তাতেই ভাসতে থাক, কিনারা মিলবেই।'

আমরা নৌকোর যে পাশটায় লাফিয়ে উঠেছিলাম সেই দিকটার একেবারে শেষে দুটো লোক জড়াজড়ি করে পড়েছিল। আমরা নিজেদের উত্তেজনায় ওদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করি নি। হঠাৎ ওদের গোঁ গোঁ শব্দ কানে এল। ডাকাতদের দুটোই কি তবে রয়ে গেল নাকি। ওরা কে তবে !

বিনুদা ধমকের সুরে বললেন, 'এই তোরা কে !' কোন জবাব নেই। 'কিরে, কোন শব্দ করছিস না কেন !' তবু কোন সাড়া নেই।

'যদি ডাকাত হয় তা হলে কি করবে বিনুদা !'

'কি আর করব, ওদের ফেলে দিয়ে যাব ঐ চরে। তুই দেখ ত ওদের শরীর ভাল করে তল্লাস করে।' আর লোক দুটোকে লক্ষ্য করে বললেন, 'দেখ তোরা চুপ করে থাকবি। নড়েছিস কি গুলি করে মেরে ফেলব।'

ওদের দিকে ঝুঁকে পড়ে বসে লোক দুটোর চেহারা আন্দাজ করতে চেষ্টা করলাম। এবারে ওরা কেঁদে ফেলল—'দোহাই বাবু, দোহাই কত্তা, আমাদের মারবেন না, দোহাই আপনাদের ; আমরা কিছু জানিনে কত্তা।'

'হুঁঃ, কিছু জানেন না, ন্যাকা চৈতন। চেপে ধরলে চিঁ চিঁ করি, ছেড়ে দিলে লাফ মারি ! এখন বেকাদায় পড়ে—কিছু জানেন না'—ধমক দিয়ে উঠে বিনুদা।

'দোহাই ধম্মাবতার, আমরা কিছু জানি নে। তেনাদেরকে নিয়ে আমরা নৌকো বেয়ে চলছি, কোত্থেকে এই শালার-পোয়েরা নৌকায় লাফিয়ে উঠে আমাদেরকে বেঁধে ফেলল। তারপর কত্তা আপনারা ত সব জানেন। দোহাই ধম্ম, আমাদের কোন দোষ নেই কত্তা।'

ওদের কথা শুনে ভাল করে তাকিয়ে দেখি ওদের কথা সত্যি বটে। বিনুদাকে বললাম। বিনুদার কথায় ওদের বাঁধন খুলে দিতে ওরা উঠেই আমার পা চেপে ধরল, 'দোহাই হুজুর আমরা কিছু জানি নে।'

'নে আর চেঁচাস নে, নৌকোর ছইটা অনেক জায়গায় দুমড়ে গেছে, ডাকাতদের ধস্তাধস্তিতে, এটা আগে ঠিক করে ফেল দিকিন,' ধমক দিলেন বিনুদা। ওরা কাঁপতে কাঁপতে ছইয়ের দিকে এগিয়ে গেল। বিনুদা পুনরায় বললেন, 'একজন বরং আগে বাতিটা জ্বাল আর একজন ছই ঠিক কর। আমি হাল ধরছি। নৌকো এমন ভারি লাগছে কেন রে!' কথা শেষ করেই নৌকার এক ধারে চাপ দিয়ে বললেন, 'ও অনেক জল উঠেছে নৌকায়! সেঁচে ফেল তাড়াতাড়ি।'

মাঝিদের একজন ছই সারাতে লাগল, আর একজন খুঁজে পেতে দেশলাই বার করে আধা ভাঙ্গা একটা লণ্ঠন জ্বালাল।

ওর আলো জ্বালা শেষ হলে বিনুদা বললেন, 'আয় এখন হালে বস এসে, নৌকো চালা দেখি।'

'কোন দিকে যাব কত্তা।'

'যে দিকে যাচ্ছিলি।' আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'দেখ প্রথম ধাক্কা সামলানো গেল। দেখ ত লক্ষ্য করে ঐ দূরে যেন কতগুলি নৌকো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না! ওরা যেন এদিকে সেদিকে ঘুরছে!'

বিনুদার আঙুল যেদিকে সেই নিশানায় ভাল করে চেয়ে দেখলাম ওর অনুমান সত্য।

বিনুদা বললেন, 'দেখ ওগুলো নিশ্চয় ডাকাতদের নৌকো নয়। কেননা ওরা ফিরে আসতে সাহস পাবে না। মনে হচ্ছে হয়ত জল-পুলিশের নৌকোই রিভলবারের গুলির শব্দে আকৃষ্ট হয়ে ব্যাপারটার অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করছে। যাই হোক সাবধান হওয়া প্রয়োজন। প্রথম কাজ, আমাদের বেশ পরিবর্তন করে ফেলা। ভদ্রবেশী যাত্রী সাজতে না পারলে একটু মুশকিল হতে পারে।'

যে মাঝিটা ছই ঠিক করছিল তার কাজ মোটামুটি ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। তাকে লক্ষ্য করে বিনুদা বললেন, 'এই মাঝি, যা তুই এখন দাঁড় ধর গিয়ে।' আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আয় দেখি ছইয়ের মধ্যে—কি আছে।'

ঐ কালী-ভর্ত্তি লণ্ঠন নিয়েই ছইয়ের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। লণ্ঠনটা উপরে তুলে ধরে ঢুকছি। ক্ষীণ আলোতে লক্ষ্য করলাম, দু'জন স্ত্রীলোক মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে! কারও মুখ ভাল করে দেখা যায় না; উবু হয়ে পড়ে আছে। ভাল করে লক্ষ্য করতে দেখলাম একটি যুবতী, অপরটি বৃদ্ধা। যতটা দেখা গেল তাতে বৃদ্ধার শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই, শুধু যুবতীটির মাথায় আঘাত লেগেছে বলে মনে হ'ল।

গোছা গোছা কালো চুল এলোমেলো ছড়িয়ে পড়ে আছে। পায়ের কাছেও দু' এক গোছা এসে পড়েছে। ওগুলি হাত দিয়ে সরিয়ে বিনুদা আমায় বললেন, 'ওদিকে তুই একটা ন্যাকড়া নিয়ে বুড়ীর চোখে মুখে জল দে, এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে। মনে হয় ও ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। আমি একে দেখছি।'

এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা ছোট ঘটি করে জল নিয়ে এসে বিনুদা পাটাতনের উপর বসে পড়লেন। এমনি করে বসলেন যেন হাওয়া ছইয়ের ভিতর ঢুকতে অসুবিধা না হয়। যুবতীর মাথাটা একটু উপরে তুলে রাখার প্রয়োজন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোন নরম জিনিষ না পেয়ে আস্তে আস্তে ওর মাথাটা নিজের কোলের উপর রাখলেন। মুখে-চোখে সঙ্কোচের ভাব। আবাল্য-সংস্কার আর সমিতির কঠিন শিক্ষায় বিনুদা মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারলেন না। তিনি ক্রমাগত চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দিতে লাগলেন।

নদীর ঝিরঝিরে হাওয়া আর বিনুদার পরিচর্য্যায় যেন ওর জ্ঞান ফিরে আসতে লাগল। যুবতী পাশ ফিরল। কয়েক সেকেণ্ড পরেই ধপ করে উঠে বসে—'কে রে! পাজী, বদমাস দেখিয়ে দেব না'—বলতে বলতে হাত মুষ্টিবদ্ধ করলে।

ততক্ষণে উভয়ের চোখোচোখি হয়েছে। যুবতী তার আয়ত চোখ দু'টি গোল করে বললে—'এ্যাঃ, তুমি, এখানে!'

মনে হ'ল বিনুদাও যেন ক্ষণেকের জন্য আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন—'তুমি, কোথায়···'

মুহূর্তমধ্যে যেন সব ভেল্কিবাজী খেলে গেল। সঠিক যেন কোন কিছুই ভাবতে পারা যাচ্ছে না।

বিনুদা তার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে—ছিঃ ছিঃ, এমন করতে নেই!—তারপর যেন নিজের মনেই বলতে লাগলেন, আশ্চর্য্য বিধাতা! যার লুঠ করেছি আর যে লুঠ করল এই যাদের পরিচয়, তাদের আবার আজ আর এক পরিবেশের মধ্যে ফেলে দিয়ে তিনি কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছেন কে জানে!

'ওগো, না, না, তুমি অমন করে বলো না। পরিচয় এক দিনের নয়—এক দিনের নয়। তোমায় আমি চিনি, জন্ম—জন্মান্তর থেকে। তুমি আমায় ক্ষমা করো না!'

বিনুদার বুক ভেদ করে গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে এল। শক্ত হও, এখন ভাববিলাসের সময় নয়। একটু ভদ্রস্থ হওয়ার মত কাপড় দিতে পারবে। মনে হয় না পুরুষের কাপড় তোমাদের সঙ্গে আছে। সরু পাড়ের সাদা সাড়ী হলেও আপাততঃ চলে যাবে।' কথা শেষ করে বিনুদা যুবতীর হাত ধরে তাকে বসিয়ে দিলেন। যুবতী যেন মাথা উঁচু করতে সাহস পাচ্ছিল না।

'কৈ, আছে কাপড়-চোপড়।'

'হ্যাঁ, পুরুষের ধুতিই বোধ হয় দিতে পারব। একটু অপেক্ষা করুন।' কথা শেষ করে বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'দিদিমার কি জ্ঞান ফিরে এসেছে'—কথা শেষ করেই বুড়ীর দিকে ঝুঁকে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন আস্তে আস্তে ফিস ফিস করে বলল। মনে হ'ল বুড়ীর জ্ঞান অনেকক্ষণ আগেই ফিরে

এসেছে, বোধ হয় এমনিতেই চুপ করে পড়েছিল। যুবতীর গলার আওয়াজ পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'কি বললি, পুরোনো কাপড়ের পুঁটলিটাও চাই ওদের। সব ত নিয়েছিস বাবা ; ওটাতে দু'চারখানা ছেঁড়া কাপড় নিয়ে যাচ্ছি কাঁথা সেলাই করব! তাও চাই ওদের। দিয়ে দে, দিয়ে দে, শমী।'

বুড়ী আবার চেঁচিয়ে উঠল—ওরা আমাদের কোথায় নিয়ে চলল রে শমী।

বিনুদা পরিহাস সম্বরণ করতে পারলেন না। হেসে বললেন, 'যেখানে তোমরা নিয়ে যেতে বলবে সেখানেই যাব। তোমায় আর কোথায় ছেড়ে দেব বল। এই মাঝগাঙ্গে ত নয়ই—শেষে কি তোমার অপমৃত্যু হবে নাকি! নাতি হয়ে কি তা আমি সইতে পারব!'

বুড়ী এবার কেঁদে ফেলল। বিনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগল, 'কি ঘেন্না, কি ঘেন্না ; পোড়াকপাল আমার। অদেষ্টে এও লেখা ছিল। আমি হলাম গিয়ে ডাকসাইটে বংশের মেয়ে। কত লেঠেল দেখেছি, কত সড়কিওয়ালা ছিল আমাদের। বাপ-খুড়োদেরও দেখেছি লাঠি-সড়কি চালাতে—দশ-গাঁয়ের লোক তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না। দেখতাম ওরা বেরিয়ে যেতো বড় বড় ছিপে। ওঁদের শরীরেও দেখেছি কত লাঠি-সড়কির আঘাতের চিহ্ন। বাড়ীর ত্রিসীমানায় হাঁটলে লোকে সেলাম দিত—দশ মাইলের মধ্যে কারুর সাধ্যি ছিল না, বখরা না দিয়ে যায়। যে বংশের লোক লাঠি সড়কির জোরে জমিদারী পাকা করল, সেই বংশের মেয়ে হয়ে আজ কিনা আমার নৌকোয় ডাকাতি—আর আমাকে নিয়ে ঠাট্টা।'

'আঃ, কি বকছ দিদিমা, চুপ কর না।'—লজ্জার রেখা ফুটে উঠে যুবতীর মুখে।

'কি বললি, চুপ করব, কেন করব, আমার গাঁয়ে ডাকাতি, আর আমিই থাকব চুপ করে। কেবল দাখানা বাগিয়ে ঠিক করে ধরেছিলাম। বাতের কাঁপুনিতে পড়ে গেলাম। নইলে দিতাম বসিয়ে এক কোপ। আমি সেই বংশেরই মেয়ে কিনা যে চুপ করে সয়ে যাব।

'দিদিমা, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি একটু শুয়ে বিশ্রাম কর।' বিনুদাকে লক্ষ্য করে বললে, 'জানেন আমার দিদিমার খুব সাহস।'

বুড়ীর মুখে যেন হাসি ফুটে উঠল। খুশী হয়ে বলল, 'তাই বল।'

কথাবার্ত্তার ফাঁকে যুবতীটি পুঁটলি থেকে দুখানা পুরোনো কাপড় বের করে দিল।

বিনুদা একখানা কাপড় ফিরিয়ে দিলেন। আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'দেখ নীতীশ দু'জন এক সঙ্গে ভদ্রলোক সাজা উচিত হবে না। কিছুক্ষণের জন্য বাইরে বোস্। ওরা আমাদের কাছে এলে তখন তুইও মাঝির সঙ্গে দ্বিতীয় দাঁড়ে বসে যেতে পারবি। তোকে বোধ হয় আর অপেক্ষা করতে হবে না। ঐ দেখ দুখানা নৌকো আসছে আমাদের দিকে। তুই চট্ করে দাঁড় বেঁধে বসে পড়।'

'কিন্তু ওরা এগোলে কি আমরাই প্রথম গুলি করব?'

'না, গুলি করলে আমাদের পালিয়ে যাওয়া মুশকিল হবে। আর তা ছাড়া পেট্রোল বোট হলে ত কথাই নেই। ওদের সঙ্গে রাইফেল থাকে। আমাদের রিভলবারে কুলোবে না। আমি ছইয়ের মধ্যেই থাকব। উপস্থিতমত সব দেখা যাবে'খন।'

নৌকো দুখানা আস্তে আস্তে এসে আমাদের নৌকোর দু'পাশে লাগল। পেট্রোল বোটই বটে।

'কারা যায়'—একটা পুলিশ চেঁচিয়ে উঠল।

'এরা আবার কে রে শমী,' জিজ্ঞাসা করে বুড়ী।

'তুমি শুয়ে থাক। উঠবার দরকার নেই—পুলিশের নৌকো।' পেট্রোল বোট লক্ষ্য করে বললে, 'আপনারা কি চান।'

নারীকণ্ঠের আওয়াজ শুনে মনে হ'ল পুলিশের লোকেরা একটু লজ্জিত হ'ল। 'ও, আপনারা মেয়েরা যাচ্ছেন। তা আপনাদের কোথায় যাওয়া হবে।'

'বেলগাঁ।'

'আপনারা আসছেন কোত্থেকে।'

'শহর থেকে।'

'আপনাদের সঙ্গে কি কোন পুরুষ আছে, না আপনারাই যাচ্ছেন।'

'আমি, আমার বুড়ী দিদিমা, আর উনি অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছেন। ডেকে দেব।'

পুলিশের নৌকোয় যিনি কর্ত্তাব্যক্তি, তিনি বললেন, 'দরকার নেই। এই নদীতে ডাকাতের খুব ভয়। মাঝিদের বলুন সাবধানে নৌকো চালিয়ে নিয়ে যেতে। আচ্ছা, আপনারা কি এই আশেপাশে গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন?'

'আওয়াজ শুনেছি বটে, কিন্তু তা কিসের অনুমান করতে পারি নি। আমি রোগীর পাশেই বসেছিলাম মাঝিরা ভয় পেয়েছিল—ওরা খুব তাড়াতাড়ি নৌকো বাইতে সুরু করে দিলে।'

মাঝিদের উপর তখন প্রশ্নবাণ সুরু হ'ল। 'এই ব্যাটারা, তোরা কি শুনেছিস, কিছু দেখতে পেয়েছিস।'

বড় মাঝি হাত জোড় করে বলতে লাগল—'দোহাই ধর্ম্মাবতার, আমরা গরীব মাঝি, আমাদের কোন দোষ নেই। মাঠানকে জিজ্ঞেস করুন।'

পেট্রোল-বোটের কর্ত্তা মনে হ'ল একজন এসিষ্টান্ট সাব ইন্সপেক্টর। ওর বয়সও কম। বোধ হয় সবে এ লাইনে ঢুকেছে। মাঝিদের ধমক দিয়ে বললে, 'চুপ কর, বেকুফ কোথাকার। তোদের কথা কে বলছে। সাবধানে নৌকো চালিয়ে নিয়ে যাবি। চরের পাশ দিয়ে যাবি নে।'

পেট্রোল-বোট দুটো আমাদের নৌকো ছেড়ে চলে গেল। আমি দাঁড় ছাড়লাম, বিনুদা উঠে বসলেন।

যুবতী একটু মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলে—'একটা কৌতূহল কিন্তু এখনও মিটল না—আপনারা এ নৌকোয় এলেন কি করে। এবারও কি বীরপুরুষেরা কেবল স্ত্রীলোক দেখেই ঘাবড়ে গেলেন নাকি!'

'তা যে রকম কথার ধার, তাতে ঘাবড়াবার কারণ আছে বৈকি!'

'কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব এখনও পাই নি।'

মনে হ'ল মাঝিরা মন দিয়ে শুনছিল। বড় মাঝি বললে, 'মাঠান, সত্যি করে বলব, একটা নৌকো কাছ ঘেঁষে আসতে আসতে জিজ্ঞেস করলে—আগুন আছে মাঝি, কল্কে ধরাব। এই কথা বলতে বলতে ওরা এসে আমাদের নৌকোর পাশে ভিড়ল, তারপর নৌকোয় লাফিয়ে পড়ে আমাদের হাতে পায়ে বেঁধে নৌকার গায়ে বেঁধে রাখল। আমরা ত ভাবলাম, আর প্রাণে বাঁচব না। তা খোদা ওদের পাঠিয়ে দিলেন—ওরাই নৌকোয় এসে আমাদের বাঁচিয়ে দিলে। নইলে ডাকাতরা আজ আমাদের সবাইকে কেটে ফেলত!'

মাঝি চুপ করলে, যুবতী বললে, 'আপনাদের আবির্ভাবের কাহিনী শুনলাম—কিন্তু এই মাঝগাঙ্গে, এই গভীর রাত্রে কি অবস্থায় এলেন তার জবাব পেলাম না।'

'আমরা এমনি ভাবেই আবির্ভূত হয়ে থাকি। এই ধর যদি এই জলের মাঝখান থেকেই উঠে এসে থাকি ঠিক তোমাদের নৌকোর উপর।'

'এটা জবাব নয়।'

'যদি বলি রাক্ষসের হাত থেকে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে।'

রূপকথার শেষ আছে। জীয়নকাঠি মরণকাঠি ছুঁইয়ে রাজকন্যাকে বাঁচিয়ে কি রাজপুত্র চলে গেল নিজের দেশে, না রাজকন্যাকেও সঙ্গে নিয়ে গেল। আগের দিনের রাজপুত্তুররা ত কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে যেত। কিন্তু তোমাদের ত আলাদা বিচার'—যুবতীর কথায় কৌতুকের সুর।

'কিন্তু তোমার নামটি জানতে পারি নি। বুড়ী বলছিল শমী।'

'ওটা শম্পার অপভ্রংশ'।

'একটা কথা বোধ হয় এতক্ষণে বুঝতে পেরেছ শম্পা যে এবার পীড়িতের আর্ত্ত চীৎকারই আমাদের টেনে এনেছে। কোথা থেকে এলাম, তার খবর এখানে নয়, আর কোথায় যাব তার খবর তোমরাই ভাল জান।' তার পর আবার পরিহাস করে বললেন, 'তোমাদের বুড়ী দিদিমা সেই থেকে চুপ করে পড়ে আছে, বেচারীকে একটু ভরসা দাও।'

'ও দিদিমা, ও দিদিমা, চোখ খোল। তোমার ভরসায় এলাম, আর তুমিই চোখ বুজে আছ।'

'ভয়, ভয় আবার কিসের। শুধু বাতের ব্যথায় মাথাটা তুলতে পারছিলাম না।' তারপর শম্পাকে মুখের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'ডাকাত হলে কি হয়—মুখ দেখলে মায়া হয়, আদর করতে ইচ্ছে হয়।'

'তুমি বুড়ী হয়ে মজে গেলে, আর আমি কি করব দিদি!

বিনুদা নাটকীয়ভাবে বুড়ীর পা ধরে প্রণাম করে বললে, 'নাতির গলায় দা বসাতে চাও ত দাও বসিয়ে, দিলাম গলা বাড়িয়ে—নইলে বাড়ী গিয়েও যে জ্বালাতন করব, খাবার চাইব—এটা দাও, ওটা দাও করব।'

এবার বুড়ী সত্যিই হেসে ফেলল—'বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। সুমতি সুবুদ্ধি ফিরে আসুক।' শম্পার দিকে তাকিয়ে বলল—'দেখলি ডাকাত হলেও এরা মানুষ চেনে—কেমন মিষ্টি এদের কথা।'

'এবার চুপ কর দিদিমা, ডাকাত ডাকাত করে চীৎকার করলে আমাদেরই বিপদ হবে।'

নৌকো ততক্ষণে এসে পড়েছে একটা খালের মুখে। মাঝি ভরসা দিয়ে বলল, 'আর দেরি নেই মা-ঠাকরুণ, এসে পড়লাম বলে।'

বাইরে পূব আকাশে তখন আলোর নিমন্ত্রণ। আঁধার পাতলা হতে সুরু করেছে। কাটবে এই রাত্রি—আসবে অরুণের থালা নিয়ে উষা।

ক্রমশঃ
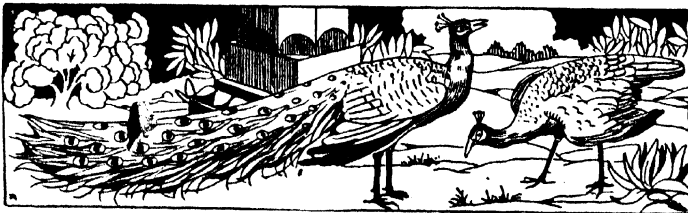
দেশ-বিদেশের কথা

আড়াই মাইল দীর্ঘ সাবমেরিন তৈলনালী স্থাপন

'বুচার দ্বীপ ম্যারিন টার্মিন্যাল এবং ত্রম্বেস্থিত ২ লক্ষ টন বন্মা শেল তৈল বিশোধনাগারের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী সাবমেরিন তৈলনালী (Pipe line) প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্ব্ব সমাপ্ত হইয়াছে। এই ২০,০০০ ফুট দীর্ঘ ইস্পাতের নালী—তন্মধ্যে ১২,০০০ ফুটই জলের নীচে—'বুচার আয়ল্যাণ্ড' হইতে মূল তৈলক্ষেত্র পর্য্যন্ত প্রসারিত। অবিশোধিত (Crude) তৈল এবং তৈরি মাল (finished products) রপ্তানীর জন্যও ইহা ব্যবহৃত হইবে।

অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্যে কাজ করিয়া "দি বোম্বে পোর্ট ট্রাষ্ট কণ্ট্রাক্টরগণ অবশেষে একটি বারো ইঞ্চি এবং দুইটি ষোল ইঞ্চি তৈলনালী বসাইতে সমর্থ হন। পরিকল্পিত যে সাতটি ইস্পাতের নালী ম্যারিন অয়েল টার্মিন্যালের সহিত ত্রম্বেস্থিত দুইটি বিশোধনাগারের যোগস্থাপন করিবে তন্মধ্যে এই তিনটি মাত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। আশা করা যায় যে, বর্ষার অবসানে একটি আট ইঞ্চি এবং তিনটি চব্বিশ ইঞ্চি তৈলনালী বসানো হইবে।

এই সমস্ত নালী বসানো বড়ই দুরূহ কাজ এবং কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে যথেষ্ট চিন্তা ও গবেষণার প্রয়োজন হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যে খালটি মূল তৈলক্ষেত্র হইতে 'বুচার আয়ল্যাণ্ড'কে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে ; তৈলনালী স্থাপনের আগে তাহার প্রবল বাত্যা, স্রোত, প্রবাহের গতিপ্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে সুনির্দ্দিষ্ট জ্ঞানলাভ করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়। অতঃপর, সমুদ্রগর্ভে স্থাপনের পূর্ব্বে নালীগুলিকে সাময়িকভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠে বসাইবার কালে, 'ইকোমিটার' নামক যন্ত্রের সাহায্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষণকার্য্য চালানো হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণধাম, আলমোড়া

আলমোড়া হিমালয়ের ক্রোড়ে অবস্থিত। গ্রীষ্মকালে বহু সাধু-সন্ন্যাসী এবং অন্যান্য তীর্থযাত্রীরা কৈলাস যাত্রাপথে আলমোড়ায় আসিয়া উপস্থিত হন। এখানকার শ্রীরামকৃষ্ণধামের কর্তৃপক্ষ ইঁহাদের আহার, বাসস্থান এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই আশ্রমে নিয়মিত ভাবে ধর্ম্মতত্ত্বের ক্লাস পরিচালিত হয় এবং রামনাম, শ্যামনাম, শিবনাম, দেবীনাম ও ভজন ইত্যাদি গীত হইয়া থাকে। এই সমস্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়া সাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হয়

আশ্রমের সীমাবদ্ধ শক্তি অনুযায়ী দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্য করাও হইয়া থাকে।

মৌমাছি-পালন বিশেষ লাভজনক শিল্প। খাদ্য সম্বন্ধে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইতে হইলে মৌমাছি-পালনের গুরুত্ব যে কতখানি সে সম্বন্ধে দেশবাসীকে আজ অবহিত হইতে হইবে। এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষাদান হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যাহারা মৌমাছি-পালনে আগ্রহশীল তাহাদিগকে বিনামূল্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া আলমোড়া শ্রীরামকৃষ্ণধামের কর্তৃপক্ষ এই শিল্পের যাহাতে উৎকর্ষ সাধিত হয় সে বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। আশ্রমের লাইব্রেরিতে ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থের সঙ্গে মৌমাছি-পালন সম্পর্কিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহও স্থান পাইয়াছে।

আশ্রম এবং মধুমক্ষিকা-নিকেতনের কার্য্যের সম্প্রসারণ একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে কিছু জমি ক্রয় করিতে হইবে। দর্শকদের উপকারার্থে একটি প্রদর্শন-গৃহ নির্ম্মাণ করাও অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আশ্রমের যে সমস্ত পরিকল্পনা আছে সেগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে অন্ততঃ দশ হাজার টাকার প্রয়োজন। আশ্রম ইহার জন্য সর্ব্ব-সাধারণের নিকট সাহায্যপ্রার্থী। সকলেরই সাধ্যমত অর্থসাহায্য করিয়া আশ্রমের বহুমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার চেষ্টা করা উচিত। টাকাকড়ি নীচের ঠিকানায় প্রেরিতব্য: স্বামী পরব্রহ্মানন্দ প্রেসিডেণ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ ধাম, আলমোড়া, হিমালয়, উত্তর-প্রদেশ।

দিল্লীতে আশ্রমিক সঙ্ঘের রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

গত ৮ই মে দিল্লী-প্রবাসী বাঙালীদের উদ্যোগে, শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের দিল্লী শাখার পরিচালনায় শ্রীচিন্তামন্ দেশমুখের পৌরোহিত্যে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ একটি বাণী প্রেরণ করেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের প্রসঙ্গে তিনি বলেন—গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন শুধু এই দেশের মানুষের নয়, সমগ্র পৃথিবীর শিক্ষিত লোকেদের পক্ষেই পরম শুভদিন। গুরুদেব তাঁহার রচনার মাধ্যমে সমগ্র মনুষ্য-সমাজকে নূতন প্রেরণা দিয়া গিয়াছেন।

রাষ্ট্রপতির বাণী পঠিত হইবার পর শ্রীঅনাথনাথ বসু এবং শ্রীঅনিলকুমার চন্দ রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেন। শ্রীমৈথিলী-

আবার গরম প'ড়লো—
গা বড্ডবেশী চটচটে আর নোংরা বোধ হ'চ্ছে কি?
ময়লার বীজাণু থেকে প্রতিদিনই আপনার অসুখের সম্ভাবনা আছে
লাইফবয় মেখে এই সব বীজাণু ধুয়ে ফেলে প্রতিদিন নিজেকে রক্ষা করুন
লাইফবয়ের "রক্ষাকারী ফেনা" আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখে
লাইফবয় সাবান
প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে আপনাকে রক্ষা করে
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY
SOAP
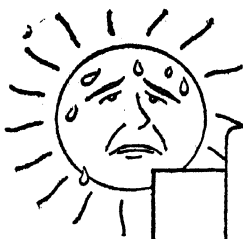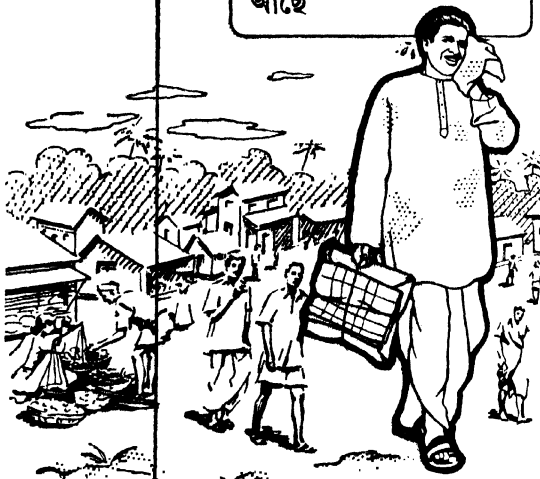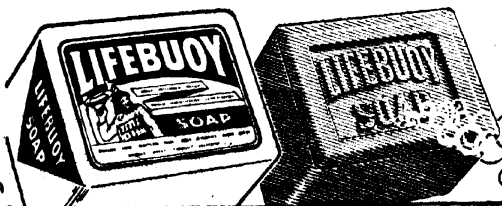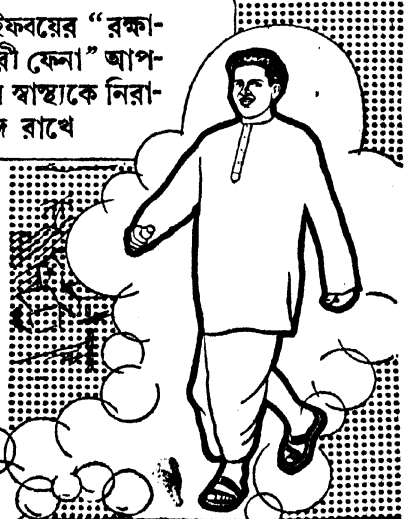
শরণ গুপ্ত এম-পি কর্তৃক স্বরচিত একটি হিন্দী কবিতা পঠিত হয়। ১৯১৪ সালে ইংরেজ ছাত্রদের উপর এবং অসহযোগের আমলে, বিশেষতঃ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পরে পঞ্জাবে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্পর্কে দেওয়ান চমনলাল এম-পি একটি ব্যক্তিগত স্মৃতিমূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীদেশমুখ কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি-স্বরূপ নিজে যে সমস্ত সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়াছেন সেগুলি এবং রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি বাংলা কবিতা তাঁহার চিত্তাকর্ষক ভাষণ-প্রদানের সময় আবৃত্তি করেন। অতঃপর আশ্রমিক সঙ্ঘের সভ্য ও সভ্যাগণ কতকগুলি রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাহিয়া অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলেন।

কাঁঠালপাড়া, বঙ্কিমভবন

বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের উদ্‌গাতা, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত নৈহাটী-কাঁঠালপাড়াস্থ বৈঠকখানাটির জীর্ণ দশা দেখা দিলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্, নৈহাটী শাখার সম্পাদক শ্রীঅতুল্যচরণ দে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তদানীন্তন মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ও শিক্ষা-মন্ত্রীর দৃষ্টি তৎপ্রতি আকর্ষণ করিয়া বঙ্কিম-ভবনটি সংগ্রহশালারূপে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আবেদন জানান। মন্ত্রীদ্বয়ের সহিত বহু চিঠিপত্রের আদান-প্রদান ও সাক্ষাতের ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহাকে পুরাকীর্ত্তি সংরক্ষণ আইন অনুসারে (Ancient Monument Preservation Act) রক্ষিত কীর্ত্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে উহার নৈহাটী শাখার সম্পাদক শ্রীঅতুল্যচরণ দে'র অক্লান্ত চেষ্টায় পরিষদ্-সম্পত্তি বঙ্কিম-ভবনটির দলিল রেজেষ্ট্রি করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দান করা হয়। ১৩৫৯ সালের ২৩শে আষাঢ় তারিখে নৈহাটী শাখা-পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভার অধিবেশনে, সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি বঙ্কিম-ভবনটির ভার তদানীন্তন মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহের হস্তে অর্পণ করেন। বঙ্কিম-ভবনকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা নামে ঘোষণা করা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন। কালে ইহা একটি গবেষণাগারে পরিণত হইবে। একটি পরিচালন সমিতির উপর এই গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার দৈনন্দিন কার্য্যভার ন্যস্ত হইয়াছে। কমিটির সভাপতি-বারাকপুরের মহকুমা হাকিম, সম্পাদক-শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এল-এ, যুগ্মসম্পাদক—শ্রীঅতুল্যচরণ দে।

ব্যায়ামবীর শ্রীনীতিন মণ্ডল

শ্রীযুত নীতিন মণ্ডল বাল্যকালে অত্যন্ত রুগ্ন ও দুর্ব্বল ছিলেন। কলিকাতায় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যায়ামবীরের ব্যায়াম-প্রদর্শন দেখিয়া তাঁহার মনে শরীরচর্চ্চার ইচ্ছা জাগে। কিছুকাল নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করিবার পর ইনি স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চয় করেন এবং ১৯৪৭ সালে মাণিকতলা, বীরাষ্টমী শ্রেষ্ঠ দেহী-প্রতিযোগিতায় প্রথম

ব্যায়ামবীর নীতিন মণ্ডল

স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হন। ১৯৪৮ সালে আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেষ্ঠ দেহী-প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান, এবং ১৯৫০ সালে উক্ত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিশেষ পুরস্কার পান। সম্প্রতি ইনি নেপালের মহারাজা এবং কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীবিশ্বেশ্বর-প্রসাদ কৈরালার বাড়ীতে যোগ-ব্যায়াম, ওসাধারণ ব্যায়াম শিক্ষা দিতেছেন।

দ্রুত-ফেনিল সানলাইট

না আছড়ে কাচলেও সাদা ও ঝকঝকে ক'রে দেয়

"সানলাইট দিয়ে কাচলে কেমন সহজে কাপড়ের ভেতর থেকে ময়লা বেরিয়ে আসে দেখুন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনার রুমাল থেকে আরম্ভ ক'রে বিছানার ছাদর পর্য্যন্ত সব সাদা কাপড়ই নতুনের চেয়ে আরও সাদা হ'য়ে যায়। আর সানলাইটে কাচা কাপড় আরও বেশীদিন পরা চলে।"

"এ কথা মনে গেঁথে রাখবেন যে আর কিছুতেই না, না সত্যিই আর কিছুতেই রঙিন জিনিষ অত সুন্দর ঝকঝকে তক-তকে হয় না যেমন সানলাইট সাবানে হয়। এর দ্রুত উৎপাদিত ফেনা সব ময়লা উড়িয়ে দিয়ে কাপড়ের রঙকে জীবন্ত ক'রে তোলে, আর না আছড়াতেই তাই হয়।"

ভারতে প্রস্তুত

S. 222-X52 BG

প্রবাসী বাঙালী বালিকার কৃতিত্ব

দিল্লী-প্রবাসী সাহিত্যিক শ্রীদেবেশ দাশ আই-সি-এসের অষ্টম-বর্ষীয়া কন্যা শ্রীমতী অনুরাধা কথক নৃত্যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া

শ্রীঅনুরাধা দাস

প্রবাসী বাঙালী সমাজের নাম উজ্জ্বল করিতেছে। জয়পুরে নিখিল-ভারত সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রদর্শিত তাহার নৃত্যটি ফিল্মস ডিভিসন ১৯৫৩ সনের শ্রেষ্ঠ ঘটনাবলীর অন্যতম বলিয়া চলচ্চিত্রে তুলিয়া সারা ভারতে দেখাইয়াছে। কথক নৃত্য দুরূহ ও বহু সাধনা-সাপেক্ষ। বাঙালী নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে ইহার বিশেষ প্রচলন নাই।

শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তন

উত্তর কলিকাতায় হালসিবাগানে (১০৫।২, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট) শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তন ভবনের চারিতলা সম্প্রতি সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদিন দ্বিতলে চৌদ্দটি রোগীকে রাখিয়া বিনাব্যয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। উপরের দুইটি তলা সম্পূর্ণ হওয়ায় ফলে আরও পঁচিশটি বেড খোলা যাইবে।

দরিদ্রবান্ধব ভাণ্ডারের পরিচালনায় প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে সেবায়তনে রোগী ভর্ত্তি করা আরম্ভ হয়। এখানে বিনাব্যয়ে প্রাথমিক রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। তা ছাড়া সেবায়তনের চিকিৎসকগণ প্রয়োজনমত রোগীর বাড়ীতে গিয়া চিকিৎসা করেন এবং বিনামূল্যে ফল, দুধ, দামী ঔষধ ও ইনজেকশন প্রভৃতি দেওয়া হয়। সেবায়তনের কার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থ এবং অন্যান্য জিনিষপত্রের প্রয়োজন। নগদ টাকা-কড়ি অথবা হাসপাতালের উপযোগী জিনিষপত্র (যথা রোগীর শয্যা, আসবাব, রেফ্রিজারেটর, পাখা, বিজলীর সরঞ্জাম প্রভৃতি) নীচের ঠিকানায় প্রেরিতব্য:

শ্রীচন্দ্রশেখর গুপ্ত, সম্পাদক, দরিদ্রবান্ধব ভাণ্ডার, ৬৫।২বি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

পরলোকে ডক্টর যোগীশচন্দ্র সিংহ

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে কাটদহ (বর্ত্তমান নাম পোড়াদহ) গ্রামে যোগীশচন্দ্র সিংহের জন্ম হয়। গ্রামের স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা-লাভান্তে কলিকাতায় আসিয়া তিনি হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং ১৯০৯ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

যোগীশচন্দ্র সিংহ

হন। ১৯০৯ হইতে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন। ছাত্রজীবনে স্যার জে. সি. কয়াজী এবং অধ্যাপক গিলখ্রাইষ্টের সংস্পর্শে আসিবার পর তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা অধিকতর বলবতী হয়। ১৯১৫ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম-এ উপাধি লাভ করেন এবং উক্ত বৎসরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির মিন্টো অধ্যাপকের সহকারী রূপে নিযুক্ত হন। গবেষণার কৃতিত্বের জন্য যোগীশচন্দ্র প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি (১৯২০-২৩) ও মৌএট স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ১৯১৬ হইতে ১৯২৩ সন পর্য্যন্ত যোগীশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির লেকচারার ছিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯৩২ সন পর্য্যন্ত তিনি ইহার রীডার এবং

অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির প্রধান অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২৭ সনে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পিএইচ-ডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩২ সনে ডক্টর সিংহ ঢাকা হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসেন। তিনি অর্থনীতির সিনিয়র অধ্যাপকরূপে প্রেসিডেন্সী কলেজে যোগ দেন এবং বাংলা সরকারের অর্থনীতির উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। আঠার বৎসর কাল তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে কাজ করেন। মধ্যে ছয় মাসের জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষতাও করিয়াছিলেন।

১৯৫০ সনে ডঃ সিংহ প্রেসিডেন্সী কলেজের কর্ম্ম হইতে অবসর লন এবং ঐ বৎসরেই মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মভার গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাস্থ্যহানি হওয়ার দরুন দুই বৎসর পরে ঐ কাজ ছাড়িয়া দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য পরিচালনায় ব্যাপৃত থাকা-সত্ত্বেও ড. সিংহের অধ্যয়নানুরাগ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। অবসর-সময়ে গভীর অভিনিবেশের সহিত তিনি অর্থনীতিবিষয়ে গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। ১৯২৭ সনে "ইকনমিক এনালস অব বেঙ্গল" নামক তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহাতে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের অর্থনীতিক জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে কারেন্সি এবং ব্যাঙ্কিং-এর সমস্যার প্রতি ডক্টর সিংহ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। এই বিষয়ে 'সংখ্যা' পত্রিকায় তাঁহার কতকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯৩১ সনে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান (Indian Banking Enquiry) ব্যাপারে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারী কমিটির সভ্যরূপে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ১৯৩৭ সনে যোগীশচন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত স্যার কিকাভাই প্রেমচাঁদ রীডারশিপ বক্তৃতামালা—১৯৩৮ সনে 'Indian Currency Problems in the Last Decade 1926-36" এই নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ভারতীয় কারেন্সি সমস্যা সম্পর্কে ইহা একখানি অমূল্য গ্রন্থ।

উপরোক্ত দুখানি গ্রন্থ ছাড়া ডক্টর সিংহ বেঙ্গল ইকনমিক জার্ণাল, জার্ণাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, মডার্ণ-রিভিউ প্রভৃতি নানা পত্র-পত্রিকায় অনেকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বেঙ্গল জুট এনকোয়ারি কমিটি, ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশন প্রভৃতি কতকগুলি সরকারী অনুসন্ধান সমিতির সভ্য ছিলেন। জুট এনকোয়ারি কমিটির সদস্যরূপে তিনি যে স্বতন্ত্র মত প্রদান করেন তাহা সুচিন্তিত এবং ভারতীয় স্বার্থের অনুকূল। ইহা লইয়া তখন বিশেষ আন্দোলন হয়।

গত ১০ই মে তারিখে কলিকাতায় এক শোচনীয় দুর্ঘটনায় ডক্টর সিংহের মৃত্যু হইয়াছে। কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে তিনি অবহিত থাকিতেন। ডক্টর সিংহ সহজ সরল এবং সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যবর্জ্জিত মানুষ ছিলেন। জ্ঞানের সাধনায় তিনি জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমা শতবর্ষজয়ন্তী "উদ্বোধন"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহধর্ম্মিণী মাতাঠাকুরাণী শ্রীশ্রী সারদামণি দেবীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত 'উদ্বোধন' পত্রিকার শ্রীশ্রীমা শতবর্ষ জয়ন্তী সংখ্যাখানি কি রচনাসম্ভার, কি চিত্র-সম্পদ, কি মুদ্রণ-পারিপাট্য সকল দিক দিয়াই অনবদ্য হইয়াছে। একদিকে যেমন স্বামী বিবেকানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া মায়ের বহু সন্ন্যাসী ভক্ত ও শিষ্যের রচনা, অন্যদিকে তেমনি মায়ের জীবন এবং তপস্যাপূত চরিত্র সম্বন্ধে বাংলা-সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বহু লেখক-লেখিকার রচিত প্রবন্ধ ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই পুস্তকে পরিবেশিত প্রাচীন ভারতের নারীজাতি সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধাবলীও বিশেষ মূল্যবান। শ্রীশ্রীমায়ের কতকগুলি অপ্রকাশিত চিত্র এই পুস্তকের অন্যতম আকর্ষণ। প্রবাসী কার্যালয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত, নন্দলাল বসু প্রমুখ শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অঙ্কিত রঙীন চিত্র এই পুস্তকের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। চরিত্র-মাহাত্ম্যে এবং আধ্যাত্মিক শক্তিবলে শ্রীশ্রীমা বর্ত্তমান যুগের নারী-সমাজে শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকার জয়ন্তী সংখ্যায় এই মহীয়সী মহিলার চরিত্রকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে প্রদর্শনের এবং তাঁহার জীবনসাধনার স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রয়াস সার্থক হইয়াছে।

"বাংলার কৃষক-বিপ্লব"

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলায় নীল-আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। একদিকে প্রবল-প্রতাপ 'স্বাধীন' ইউরোপীয় নীলকর সমাজ এবং অন্যদিকে দরিদ্র পরাধীন বাঙালী নীলচাষীগণ। নীলচাষী প্রজাকুল সঙ্কল্প করে—প্রাণ গেলেও তাহারা আর নীলচাষ করিবে না। তাহাদের উপর সরকারী কর্ম্মচারীদের সহায়ে ইউরোপীয় নীলকরেরা অনেক অত্যাচার-উৎপীড়ন করে, কিন্তু কৃষকগণ শেষ পর্য্যন্ত সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকে। এই আন্দোলনের গুরুত্বকে হ্রাস করিবার জন্য স্বার্থপর লোকেরা ইহাকে 'নীল-হাঙ্গামা,' 'নীল-বিদ্রোহ' প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছে। কিন্তু ইহা যে সত্যসত্যই একটি সার্থক সমাজ-বিপ্লবের সূচনা, কলিকাতাস্থ 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-পত্রিকা সম্পাদক সুবিখ্যাত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তখনই তাহা সভ্য-জগতের গোচরীভূত করিয়াছিলেন। এই সময়ে, ১৮৬০ সনে, যশোহর হইতে যুবক শিশিরকুমার ঘোষ উক্ত 'হিন্দু পেট্রিয়টে' 'M.L.L.' ছদ্মনামে ছয়খানি এবং কোন নাম না দিয়া আরও ছয়খানি, একুনে বারখানি পত্র লেখেন। এগুলি উহাতে পর পর যথারীতি প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর ফাইল হইতে এই পত্রগুলি উদ্ধার করিয়া সম্প্রতি *Peasant Revolution in Bengal* (ভারতী লাইব্রেরী, ১৪৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬) শীর্ষক একখানি পুস্তকে গ্রথিত করিয়াছেন। এই পত্রগুলি সর্ব্বপ্রথম একসঙ্গে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া যোগেশবাবু নীল-আন্দোলনের বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়ের উপর প্রচুর আলোকপাত করিয়াছেন। আচার্য্য ড. যদুনাথ সরকারের একটি মনোজ্ঞ অথচ তথ্যপূর্ণ ভূমিকা সন্নিবেশিত হওয়ায় পুস্তকখানির গৌরববৃদ্ধি হইয়াছে। বর্ত্তমানে স্বাধীনতার ইতিহাস রচনাকালে এ বইয়ের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হইবে।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী

গত ১লা আষাঢ় শুভ স্নানযাত্রার দিন পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ৫ই আষাঢ় পর্য্যন্ত কয়দিন ব্যাপী মন্দিরের উৎসব চলিয়াছিল। ১লা আষাঢ় প্রাতে উদ্বোধন-সভায় পৌরোহিত্য করেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বিখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। এই দিন মন্দিরে রাণী রাসমণির যে প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত হয়, তাহার আবরণ উন্মোচন করেন ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী এম-এ, ডি-ফিল, এফ-এ-এস।

৪ঠা আষাঢ় শনিবার অপরাহ্নে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বাংলার প্রসিদ্ধ গায়ক-গায়িকাদের সঙ্গীত এবং বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পীদের নৃত্য প্রদর্শিত হয়। ৫ই তারিখের সভায় খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ডক্টর

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ও প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে সভাপতি এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

এই উপলক্ষে বাংলার খ্যাতনামা লেখক-লেখিকাদের রচনা সংবলিত 'দক্ষিণেশ্বর মন্দির' (শতবার্ষিকী সংখ্যা) নামে একটি পুস্তকও প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানি সম্পাদনা করেন সাহিত্যিক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়।

প্রথম সারিতে উপবিষ্ট : ডান হইতে বামে—ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

আলোচনা

দ্বিজ রায়বসন্ত ও দ্বিজ রামপ্রসাদ

শ্রীমঞ্জুলা সানা

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে শ্রীযুত পূর্ণেন্দু গুহ রায়ের 'পদাবলী সাহিত্যে রায়বসন্ত' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়িলাম। যশোহর-রাজ বসন্তরায় সম্পর্কে কোন আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া দ্বিজ রায়-বসন্ত ও তাঁহার সহিত তুলনামূলকভাবে উল্লিখিত দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্পর্কে দু-একটা কথা বলিব। যশোহররাজ বসন্ত ও দ্বিজ রায়-বসন্তের পার্থক্যে পূর্ণেন্দুবাবু সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

বাংলা সাহিত্যে বসন্তরায় সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন, "রায়বসন্ত নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য। শেষবয়সে ইনি বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন এবং জীবগোস্বামীর পত্র লইয়া গৌড়ে একবার শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট আসিয়াছিলেন।...ইহাকেই পদকর্ত্তা 'দ্বিজ বসন্তরায়' বলিয়া বোধ হয়; যশোহরনিবাসী কায়স্থ 'রায় বসন্তের' নাম ইদানীং প্রবন্ধাদিতে পাইয়া থাকি, কিন্তু কোনও প্রাচীন পুস্তকে উক্ত পদকর্ত্তা সম্বন্ধে প্রমাণ আমাদের হস্তগত হয় নাই। একটি প্রাচীন পদে দৃষ্ট হয়, গোবিন্দদাস কবি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। কিন্তু রায়বসন্তের পদে প্রতাপাদিত্য কিম্বা যশোহরের কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য) 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-কার ডঃ শ্রীসুকুমার সেন লিখিয়াছেন—"গোবিন্দদাস কবিরাজের সুহৃদ রায়-বসন্ত নরোত্তম দাসের শিষ্য ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।...পদকল্পতরুতে রায়-বসন্তের অনেকগুলি ব্রজবুলি ও বাঙ্গালাপদ সঙ্কলিত হইয়াছে। তিনটি পদে রায়-বসন্তের ও গোবিন্দদাসের যুক্ত ভণিতা দেখা যায়। কর্ণানন্দের মতে রায়-বসন্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহা সত্য না হইলে ইঁহাকে প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসন্ত-রায় মনে করিতে ইচ্ছা হয়, বিশেষ করিয়া যখন গোবিন্দদাসের দুই-একটি পদের ভণিতায় 'প্রতাপ-আদিত'-এর উল্লেখ রহিয়াছে এবং '(নৃপ) উদয়াদিত্য' ভণিতায়ও পদ পাওয়া যাইতেছে।"

'যশোহর-খুলনার ইতিহাস'-লেখক সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের অভিমত পূর্ণেন্দুবাবুর প্রবন্ধে অনুসৃত হইয়াছে।

এক্ষণে আমাদের বক্তব্য : 'ঠাকুর' উপাধির বলেই কায়স্থ বসন্তরায়ের 'দ্বিজ' ভণিতা হইতে পারে না। বৈষ্ণব সাহিত্যে কায়স্থ নরোত্তম দত্ত তো নরোত্তম ঠাকুর নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভণিতায় কোথাও 'দ্বিজ নরোত্তম' পাওয়া যায় কি? 'যবন' হরিদাসও হরিদাস ঠাকুর নামে অভিহিত হইতেন। পূর্ণেন্দুবাবু পদকর্ত্তা গোবিন্দদাসের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু একমাত্র গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীই কেবল দ্বিজ ভণিতা প্রয়োগ করিয়াছেন। নিঃসন্দেহে অব্রাহ্মণ, এমন কোন কবির 'দ্বিজ' ভণিতা প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে সচরাচর দেখা যায় না।

তাঁহার মন্তব্যে নজীর স্বরূপ দ্বিজ রামপ্রসাদের উল্লেখ করিয়া পূর্ণেন্দুবাবু ভুলের মাত্রা বৃদ্ধিই করিয়াছেন। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ছাড়াও বাঙ্গালা সাহিত্যে একাধিক দ্বিজ রামপ্রসাদ আছেন। কলিকাতা সিমলানিবাসী এক কবিওয়ালা দ্বিজ রামপ্রসাদ ছিলেন। পূর্ববঙ্গে এক বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধক ও সঙ্গীত-রচয়িতা দ্বিজ রামপ্রসাদ ছিলেন। তাঁহার বহু গান কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের পদাবলীতে স্থান পাইয়াছে। সত্যনারায়ণ, সুবচনীর পাঁচালী প্রভৃতি রচয়িতা দ্বিজ রামপ্রসাদও আছেন।

নৃত্যের তালে তালে...

সত্যিই কি আনন্দ যে হয়েছিল যখন দর্শকদের হাততালি আর হর্ষধ্বনির মধ্যে আমার নাচ শেষ হ'লো। উৎসাহ আর উত্তেজনায় মনে হচ্ছিল সারা রাত নাচতে পারি। তারপর যখন প্রথম পুরস্কার সোনার মেডেল নিতে গেলাম, তখন মনে হ'লো আমার মতো সুখী কেউ নেই। আর আমার নাচের গুরুর কি আনন্দ! মাকে বললেন: "কে বলবে এই মেয়েই দুবছর আগের সেই রুগ্ন নিস্তেজ মেয়ে?" মাও আনন্দে, উত্তেজনায় নির্বাক।

গুরু ঠিকই ব'লেছিলেন। দু বছর আগে পনেরো মিনিট এক সঙ্গে নাচতে পারতাম না, আর কি ক্লান্তই লাগত। মা তো ভেবেই অস্থির, ডাক্তারকেও দেখালেন। "ভাববার কিছুই নেই" ডাক্তার বললেন, "মেয়ের খাওয়াদাওয়ার দিকে নজর দিন। সমন্বয়যুক্ত খাবারের ব্যবস্থা করুন। দেখবেন যেন এর খাবারে আমিষজাতীয় খাবার, শর্করাজাতীয় খাবার, খনিজপদার্থ, ভিটামিন, আর সবের সঙ্গে স্নেহপদার্থ থাকে। খাঁটি, তাজা স্নেহপদার্থ প্রত্যহ আমাদের প্রত্যেকের খাবারে থাকা চাইই, কারণ এর থেকেই আমরা আমাদের দৈনিক শক্তি সামর্থ পাই।"

মা পরের দিন দোকানে গিয়ে দোকানদারের কাছে রান্নার জন্য খুব ভালো স্নেহপদার্থ চাইলেন। দোকানদার তক্ষুনি একটিন ডালডা বনস্পতি বার করে বললে "এর চেয়ে ভালো জিনিষ পাবেন না।"

ডালডায় রান্না খাবার খেয়েই আমার ক্ষিদে ফিরে এলো। ডালডা বনস্পতি সব রকম খাবারের নিজস্ব স্বাদ গন্ধ ফুটিয়ে তোলে। শীগ্গীরি সেই আগেকার ক্লান্ত, নিস্তেজ ভাব কেটে গেলো, আর অল্প দিন পরেই তিন ঘণ্টা ধরে নাচ শেখা, নাচের মহড়া চলতে লাগল। শক্তি দিতে ডালডা বনস্পতির চেয়ে ভালো আর কিছুই নেই। ডালডায় এখন ভিটামিন এ ও ডি দেওয়া হয়। ডালডা বনস্পতি বায়ুরোধক, শীলকরা টিনে সর্বদা তাজা ও খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যায়। ডালডায় খরচও কম। আজই একটিন ডালডা কিনে আপনার সংসারের সব রান্না এতেই করতে আরম্ভ ক'রে দিন।

শরীর গঠনকারী খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা

বিনামূল্যে উপদেশের জন্য আজই লিখুন:
দি ডালডা এ্যাডভাইসারি সার্ভিস
পোঃ, আঃ, বক্স নং ৩৫৩, বোম্বাই ১
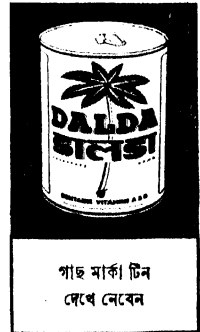
গাছ মার্কা টিন দেখে নেবেন

১০, ৫, ২ ও ১ পাউণ্ড টিনে পাবেন।

ডালডা বনস্পতি

রাঁধতে ভালো - খরচ কম

HVM. 216-X52 BG

সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকখানি বাংলা বৌদ্ধ গ্রন্থ

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশে বৌদ্ধ শাস্ত্রালোচনার দৈন্য সম্পর্কে দুঃখ করিয়াছিলেন এবং এই দিক দিয়া বাংলা সাহিত্যের কলঙ্ক মোচন করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছিলেন। এই কলঙ্ক এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ভাবে দূর হয় নাই সত্য, তবে সুখের বিষয় এই যে ধীরে ধীরে বাংলা দেশে বৌদ্ধ শাস্ত্রের প্রচার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক বহু বৌদ্ধ গ্রন্থ বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। এই জাতীয় কিছু কিছু গ্রন্থের পরিচয় এই পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে—যেমন, বুদ্ধবংশ, ধম্মপদার্থ কথা (শ্রাবণ, ১৩৪২), সুত্তনিপাত (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২), মহাপরিনিব্বানসুত্ত (কার্ত্তিক, ১৩৫৩), বোধিচর্য্যাবতার (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১, ফাল্গুন, ১৩৪২, বৈশাখ, ১৩৫৬)।

সম্প্রতি প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে বিশ্বভারতীর 'বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাহিত্য' ও 'ধর্ম্মপদ পরিচয়'* বই দুইখানি মূলতঃ বিবরণাত্মক। প্রথমখানিতে স্বল্পপরিসরের মধ্যে অনেক মূল্যবান তথ্যের সমাবেশ করা হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইহা পাঠ করিয়া যথেষ্ট উপকৃত হইবেন—বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ হইবেন।

ইহাতে বৈভাষিক সৌত্রান্তিক মাধ্যমিক যোগাচার বজ্রযান সহজযান প্রভৃতি বৌদ্ধদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মোটামুটি বিবরণ দেওয়া হইয়াছে—বৌদ্ধ সাহিত্যের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে মূল গ্রন্থ ও প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেশে তিব্বতী, চীনা, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে। অনুবাদগ্রন্থগুলি নানা দিক দিয়া বিশেষ মূল্যবান্। অনূদিত অনেক গ্রন্থের মূল এখন আর পাওয়া যায় না। অনেক স্থলে অনুবাদের সাহায্যে মূল গ্রন্থ উদ্ধার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মের ব্যাপকতা ও বৌদ্ধ সাহিত্যের বিশালতার জীবন্ত সাক্ষী।

এই সাহিত্যের অঙ্গীভূত ধম্মপদ সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য 'ধম্মপদ পরিচয়' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উপনিষদ, গীতা ও ধম্মপদকে গ্রন্থকার 'ভারতবর্ষের' ত্রিরত্ন আখ্যা দিয়াছেন এবং ইহাদিগকে 'বিশ্ববিজয়ের প্রস্থানত্রয়' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যেহেতু 'এই তিন মহারত্নই ভারতবর্ষকে বিশ্বসমাজে শ্রদ্ধার আসনে বসাইয়াছে। শুধু বৌদ্ধধর্ম্মের নয়, সারা ভারতের মর্ম্মবাণী ধম্মপদের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বীদের গীতার মত এই গ্রন্থের সমাদর আজ বিশ্বব্যাপী। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইহা সমগ্র এশিয়ার বৌদ্ধ সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই দিক দিয়া ইহার প্রচার গীতার অপেক্ষা বেশি। দেশে বিদেশে যুগে যুগে ধম্মপদের প্রচার ও বিভিন্ন ভাষায় ইহার নানা রূপান্তরের চিত্তাকর্ষক কাহিনী এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। 'ইহার ধম্মপদ প্রচয়' শীর্ষক অধ্যায়ে ধম্মপদের সারভূত কতকগুলি বাছাই করা শ্লোকও বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

এই ভূমিকামাত্রে সন্তুষ্ট না হইয়া যিনি বাংলার মধ্য দিয়া সমগ্র ধম্মপদ গ্রন্থের রসাস্বাদ করিতে চাহেন তাঁহাকে ধম্মপদের সামগ্রিক অনুবাদের আশ্রয় লইতে হইবে। এইরূপ দুইখানি অনুবাদ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।* ভিক্ষু শীলভদ্রের অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় মনে হয় ইহা পাঠক সমাজে কথঞ্চিৎ সমাদর লাভ করিয়াছে। ইহার মূল্য সুলভ—আকার ও আয়তন সাধারণের ব্যবহারোপযোগী। তবে অনুবাদের ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই নির্দ্দোষ ও স্পষ্ট নহে। প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির ও ভিক্ষু অনোমদর্শীর 'ধম্মপদ' অধিকতর তথ্যসমৃদ্ধ। ইহাতে প্রতি শ্লোকের পরিচিতি, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। সর্ব্বত্র বুদ্ধঘোষের ভাষ্য অনুসৃত হইয়াছে। কোন্ শ্লোক কোন্ উপলক্ষ্যে বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক উচ্চারিত হইয়াছিল তাহার কাহিনী পরিচিতি প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। তবে বৌদ্ধদর্শনের সহিত অপরিচিত পাঠকের পক্ষে এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ উপযোগী হইবে মনে হয় না। তাহা ছাড়া, নানা কারণে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা অনেক স্থলে দুর্ব্বোধ্য ও মূলের অর্থ বিশদ করিতে অসমর্থ। আশা করি, ভবিষ্যতে এই শোভন সংস্করণখানিকে সকল দিক দিয়া পাঠকের উপযোগী করিবার চেষ্টা করা হইবে।

[বৌদ্ধধর্ম্ম] ও সাহিত্য—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, [২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রী]ট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

* [ধর্ম্মপদ পরিচয়]—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম [চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিক]াতা। মূল্য আট আনা।

* ধম্মপদ—ভিক্ষু শীলভদ্র। প্রকাশক, মহাবোধি সোসাইটি, ৪ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য এক টাকা।

ধম্মপদং—আচার্য্য শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির ও ভিক্ষু অনোমদর্শী, এম্. এ. সুত্ত-বিশারদ। প্রজ্ঞালোক প্রকাশনী, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে চার টাকা।
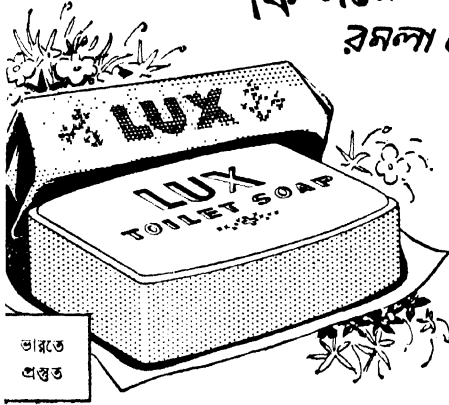
বাংলার উচ্চশিক্ষা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ১০৪। পৃষ্ঠা ৬০। মূল্য আট আনা।

কেবল গবেষণা-পুস্তকের সংখ্যাবৃদ্ধি হইলেই সমষ্টিগতভাবে কোন সমাজের তদনুপাতে জ্ঞানবৃদ্ধি হয় না। গবেষণার পরিণত ফল মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজভাবে পরিবেশিত না হইলে পাণ্ডিত্য ফলপ্রদ হয় না।

বিশ্বভারতীর 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' পরিকল্পনা নানাবিধ বিদ্যার সারবস্তুর সহিত বাঙালীকে পরিচিত করাইবার অভিনব প্রয়াস। ইহার লেখকগণ প্রত্যেকেই আপন আপন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত; প্রত্যেকেই শক্তিশালী লেখক। ইঁহারা পণ্যকর্ম করিতেছেন।

বাংলার উচ্চশিক্ষার ইতিহাস রচনা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল যে যোগ্যতম ব্যক্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি বৈজ্ঞানিক প্রথায় মৌলিক দলিল, দস্তাবেজ, সমসাময়িক সংবাদপত্র ও সাহিত্যের আলোচনা করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ, চিন্তাধারা, চরিত্র এবং প্রধান পুরুষদের জীবনী সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ ও কয়েকখানি প্রামাণিক পুস্তক লিখিয়া বাঙালী গবেষকদের মধ্যে পুরোভাগে আসনলাভের অধিকার অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার অনুশীলন ও পরিশ্রম বিস্ময়কর। তিনি পেশায় 'সংবাদপত্রসেবী (Journalist) হইলেও ধর্মতঃ সিদ্ধ ঐতিহাসিক (Historian)। তিনি এই বিষয়ে আচার্য যদুনাথের শিষ্য এবং পরলোকগত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুজ।

ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন, "উচ্চশিক্ষা বলিতে আমরা এখানে ইংরেজী শিক্ষাই বুঝিব।" ইহাতে হিন্দুকলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা (১৮১৬) হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (১৮৫৭) পর্যন্ত বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষার ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার যোগেশবাবু আলোচনা করিয়াছেন। অধ্যায় ভাগগুলি এইরূপ: উচ্চশিক্ষার আয়োজন; গবর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতি; ইংরেজী শিক্ষার প্রসার; শিক্ষার অবস্থা ও শিক্ষার বাহন নির্দ্ধারণ; সরকারী শিক্ষা-নীতির মৌলিক পরিবর্তন; উচ্চশিক্ষা, খ্রীষ্টানী-বিরোধী আন্দোলন ও সরকার; উচ্চশিক্ষার নূতন পর্ব; উচ্চশিক্ষার ফলাফল।

ভূমিকা ও নির্দ্দেশিকা সহ এতগুলি প্রয়োজনীয় অধ্যায় মাত্র ৬০ পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ করিয়াছেন: পাকা হাত না হইলে ইহা সম্ভবপর হয় না। "উচ্চশিক্ষার ফলাফল" সম্পর্কিত আলোচনা তাঁহাকে বাধ্য হইয়া পাঁচ পাতায় সারিতে হইয়াছে। ৫০তম পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ একটি সিদ্ধান্তের প্রতি আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সমীচীন বিবেচনা করি। আমরা উহা উদ্ধৃত করিলাম, কারণ উহা আর সংক্ষিপ্ত করা যায় না—অত গুছাইয়া বলাও কঠিন:

"তবে ভারতবাসী তথা বাঙালীরা যে উচ্চশিক্ষার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিতেছিল, সে কিসের জন্য? ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইংরেজী শিক্ষার উদ্দেশ্যে হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন হয়, তখন সরকারী চাকুরিতে খুব কম বাঙালীই নিয়োজিত হইতেন। সরকারী কোন কোন বিভাগে এদেশীয়দের নিয়োগ একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। ইংরেজি শিখিয়া উচ্চ রাজকার্যে নিয়োজিত হইবেন—একমাত্র এ ধারণার বশবর্তী হইয়াই যে তাঁহারা তখন ইংরেজী শিক্ষায় প্রয়াসী হইয়াছিলেন এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না। আইন-আদালতেও তখন ফারসি ভাষার চল। তবে ব্যবসাক্ষেত্রে ও অন্যান্য রাজকার্যে ইংরেজের সংস্পর্শে বাঙালীদের প্রতিনিয়ত আসিতে হইত।

উচ্চমনা ইংরেজেরও তখন অভাব ছিল না। তাঁহাদের মারফত ইংরেজি সাহিত্যের ... এবং ইংরেজ-চরিত্রের সদ্গুণাবলী উপলব্ধি করিয়াও ইহার দিকে বাঙালী-প্রধানেরা আকৃষ্ট হইয়া থাকিবেন। ইংরেজের সঙ্গে বিদ্যা-বুদ্ধিতে সমান তালে চলিতে হইলে ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান আয়ত্ত করা দরকার একথাও হয়তো তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন। বিশেষতঃ রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজ-সংস্পর্শ এবং তাঁহার অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের ইংরেজি শিক্ষাদান-প্রণালী ইহাই সূচিত করে।"

এই ইতিহাসে আর একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয়—পাশ্চাত্ত্য-বিদ্যার প্রতি সনাতনপন্থী হিন্দুসমাজের উদার দৃষ্টি এবং শিক্ষাকে কালোপযোগী করিবার প্রশংসনীয় উদ্যম। মোল্লাসমাজ তখনও ইসলাম ও বাদশাহীর দোহাই দিয়া মুসলমানকে আরবাফারসির 'খোঁয়াড়ে' আগলাইয়া রাখিয়াছে; উচ্চশিক্ষায় বাঙালী-মুসলমানকে পিছনে ফেলিয়া রাখিবার জন্য ইহারাই দায়ী। দ্বিতীয় কথা—হিন্দুকলেজ স্থাপনার ব্যাপারে রামমোহন গা ঢাকা না দিলে কার্যই পণ্ড হইত, সেকালের সাহেবেরা রামমোহনকে ভুল বুঝেন নাই; হালে আমরাই ভুল বুঝিতেছি।

আমরা এই 'পুস্তিকা'খানি পাঠ করিয়া উপকৃত হইয়াছি। এইটি রচনা করিতে লেখককে যে কি কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে তাহা ইহার ক্ষুদ্র আকার দেখিয়া বুঝা যাইবে না। হয়ত 'নির্দেশিকা' ও স্বীকৃতিতে চোখ বুলাইলে কতকটা আন্দাজ হইবে। পুস্তিকাখানি বাছাই করা তথ্যে একেবারে ঠাসা, তথাপি বাগল মহাশয়ের সিদ্ধ লেখনীগুণে কোথাও নীরস হয় নাই। ইহা কেবল অনুসন্ধিৎসু সাধারণ পাঠকগণের নয়, সকল শিক্ষাব্রতীর এবং আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্রদের reference-book হিসাবে প্রয়োজন হইবে। বইখানিতে ছাপার ভুল নাই বলিলেই চলে।

৪এর পৃষ্ঠায় চতুর্থ পংক্তিতে একটি ভুল চোখে পড়িল। ১৯১৫ স্থলে নিশ্চয়ই ১৮১৫ হইবে।

প্রচ্ছদপটের ছবিটিও উল্লেখযোগ্য।

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

দৃষ্টিধারা—শ্রীআনন্দ। ইণ্টার ন্যাশনাল পাব্লিকেশন কন্সার্নস্, ৬৭, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা-২৯। পৃ ১১৫। মূল্য দুই টাকা।

অ্যালেকজাণ্ডার কুপ্রিন 'য়্যামা দি পিট' লিখিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। পতিতা-জীবনের এমন নিপুণ আলেখ্য বিশ্ব-সাহিত্যে বিরল বলিলেই হয়। বইখানি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষায় অনূদিত হইয়া এক সময়ে সাহিত্য-জগতে রীতিমত আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহারই প্রভাব 'দৃষ্টিধারার' কাহিনীর মধ্যে পড়িয়াছে। রুশ লেখক তাঁহার বিরাট গ্রন্থে সেই সমস্যাকে ব্যাপক-ভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং পতিতা-জীবনের বহু দিক লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়াছেন। আলোচ্য স্বল্প-পরিসর উপন্যাসখানিতে লেখক সেই জীবনের একটি দিকে সামান্যমাত্র আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পটভূমি বা গল্পের পরিসর সঙ্কীর্ণ বলিয়া চরিত্রবিকাশের তেমন সুযোগ ঘটে নাই। তাহা ছাড়া এটি গল্পের প্রথম খণ্ড; পরবর্তী খণ্ডগুলিতে হয়তো বা গল্পটি সম্পূর্ণতা লাভ করিবে। তথাপি যে নারী-চরিত্রটি লইয়া গল্পের পরীক্ষা—সেটিতে তুলির শেষ টান দিয়াছেন লেখক। সুতরাং এই চরিত্রটি তাঁহার সমস্যা-সঙ্কুল গল্পাংশকে কতখানি সার্থক করিয়াছে তাহা মোটামুটি ভাবে বলা যায়। ঐ পতিতা-চরিত্রটির পটভূমিকা স্বচ্ছ নয়। মধ্য-পর্বে ঘর-বাঁধার বিবরণ এবং শেষ পর্বে ··দিক পরিবর্তনের রূপ—কোনটিই সূক্ষ্ম মনোবৃত্তির ক্রিয়াকে পরিস্ফুট করিতে পারে নাই। গল্পে আর একটি চরিত্র আছে—মিঃ চৌধুরী। ইনি একাধারে সমালোচক ও লেখক; গল্পের হয়তো সূত্রধারও তিনি। কিন্তু তাঁহার মন্তব্যগুলি গল্পের গতিকে একটুও সাবলীল করে নাই। কোন কোন সমালোচনায় বাস্তবের নির্ভীক প্রকাশ আছে, কিন্তু গল্পের সঙ্গে সে সবের যোগসূত্র ক্ষীণ। নূতন বলিয়া ঘোষণা করিলেও দৃষ্টিধারার কাহিনীতে বা প্রকাশভঙ্গীতে নূতনত্ব কিছু চোখে পড়ে না। অবশ্য 'ইতিকথা'য় কতকটা চমক লাগাইবার প্রয়াস আছে; কিন্তু গল্প পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় সেটি সেই জাতীয় চমক—যাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন-ভাবে প্রচারতত্ত্বই নিহিত থাকে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

কর্মবাদ ও জন্মান্তর—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রাপ্তিস্থান :—১৩৯বি, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

বঙ্গভাষায় যাঁহারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পরলোকগত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে কর্মবাদ ও জন্মান্তর—এই দার্শনিক সমস্যা দুইটির সমাধান সরলভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্র এবং আধুনিক দার্শনিক গ্রন্থাদি আলোচনা করিয়া পক্ষপাতহীন দৃষ্টিতে গ্রন্থকার নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। গ্রন্থখানি যে বাঙালীপাঠক সমাজে সমাদার লাভ করিয়াছে, তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশই তাহার প্রমাণ। তত্ত্বানুসন্ধিৎসুরা ইহা পড়িয়া লাভবান হইবেন

শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর

বাংলার বিপ্লববাদ—শ্রীনলিনীকিশোর গুহ। এ. মুখার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ। ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। পৃ. ১,+৩৬৭। মূল্য ছয় টাকা।

বঙ্গের বিপ্লব-আন্দোলন সম্পর্কিত এই মূল্যবান্ পুস্তকখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সনের মে মাসে। ইহার ছয় বৎসর পরে ১৯২৯ সনে এখানির দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছিল। আলোচ্য খণ্ড ইহার পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ বলিয়া গ্রন্থকার 'নিবেদনে' উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার মতে, "যাহাকে ইতিহাস বলে তাহা আমি লিখি নাই। আমি লিখিয়াছি—অন্ততঃ লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি—বিপ্লব আন্দোলনের মর্ম্মকথা। আমার বক্তব্যের সমর্থনে ঘটনার ও ব্যক্তির পরিচয় অনেক স্থানে উপস্থিত করিয়াছি।"

পুস্তকখানি যিনিই পাঠ করিবেন তিনিই লেখকের এই উক্তির তাৎপর্য্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বাংলার বিপ্লববাদের মূল কথা, অর্থাৎ ইহার ভাবাদর্শ গ্রন্থকার যেরূপ সরল ভাষায় পরিষ্কার করিয়া বিবৃত করিয়াছেন, ইদানীন্তন প্রকাশিত বিপ্লববাদের অন্য কোন বইয়ে প্রায়ই তেমনটি পাই না। গ্রন্থকার স্বয়ং বিপ্লবী; ১৯০৮ সনে স্বদেশীর মরশুমে কলেজে অধ্যয়নকালে ধৃত হইয়া বন্দী হন। ইহার পর দীর্ঘকাল তিনি বন্দীজীবন যাপন করেন। ১৯৪৭ সনে স্বাধীনতা-লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলাদেশে, বঙ্গেতর প্রদেশসমূহে এবং বিদেশে বিপ্লবাত্মক যতবিধ আন্দোলন, প্রয়াস বা কার্য্য হইয়াছে,সে সকলের সঙ্গে কখনও সাক্ষাৎভাবে কখনও পরোক্ষভাবে, তিনি যুক্ত ছিলেন। বর্ত্তমান পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ একারণ একদিকে যেমন তথ্যবহুল হইয়াছে, তেমনি বর্ণিত বিষয়াদির সঙ্গে লেখকের ঐকান্তিক পরিচয় হেতু বর্ণনার-কৌশলে তাহা পাঠক-হৃদয়েও গাথিয়া যাইতেছে। বিপ্লব-আন্দোলনের ইতিহাস না হইলেও, পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস-রচনার পক্ষে ইহাতে প্রচুর মালমশলা পরিবেশিত ও সংরক্ষিত হইয়াছে।

বিপ্লব-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আমরা একটি কথা সচরাচর ভুলিয়া যাই। কংগ্রেস যখন সর্ব্ব-ভারতীয়ের পক্ষে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন চালাইতেছিল, তখন বিপ্লব-প্রচেষ্টার সার্থকতা কি ছিল? কংগ্রেস প্রথমাবধি নিয়মানুগ আন্দোলন পরিচালনা করিতেছিল। কিন্তু কোন পরাধীন-জাতির পক্ষে স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে শুধু নিয়মানুগ কার্য্যই যথেষ্ট নয়, জাতির অন্ততঃ একাংশের শক্তিসাধনায় প্রবৃত্ত হওয়াও আবশ্যক। গত শতাব্দীর শেষ দশকেই বাঙালী মনীষা ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল। আর বর্তমান শতকের প্রারম্ভ হইতে বিপ্লব-প্রয়াসের মধ্যে এই শক্তিসাধনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকল্পে এই শক্তিসাধনা যে একান্ত আবশ্যক ছিল, মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত 'আগষ্ট বিপ্লব' তথা 'ভারত-ছাড়' আন্দোলন এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন দ্বারা বাহির হইতে ব্রিটিশশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনায় তাহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থকার পুস্তকখানিতে শুধু বিপ্লব-প্রয়াসের বহিরঙ্গের কথাই বলেন নাই, বাংলা তথা ভারতের এই শক্তিসাধনার ভাবাদর্শের উপরেও বিশেষ আলোকপাত করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি প্রত্যক্ষীভূত ঘটনার সমবায়ে বিশেষ মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। আমরাও এই সকলের সান্নিধ্যলাভজনিত হৃদয়াবেগে আপ্লুত হই।

অনেকের ধারণা, বাংলার বিপ্লববাদ সাধারণে সুনজরে দেখিতে পারে নাই। হয়ত কোন কোন স্থলে সাধারণের সমর্থন ইহাতে পাওয়া যায় নাই, বিশেষতঃ ডাকাতি ও খুনখারাপির ফলে এক শ্রেণীর লোক বিপ্লবীদের উপর বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ব্রিটিশ-বিদ্বেষ যে এসকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল, আমরা কৈশোরে প্রথম যুদ্ধের সময় সুদূর পল্লীগ্রামে বসিয়াই তাহা বুঝিতে পারিতাম। মাতা এবং ভগিনীগণই বিপ্লবীদের প্রধান অবলম্বন ও সহায় ছিলেন একথা নলিনীবাবু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া ভালই করিয়াছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কার বার্লিন কমিটি এবং দ্বিতীয় যুদ্ধকালে আজাদ হিন্দ স[illegible]সাম্রাজ্যবাদীদের আশ্রয়ে থাকিলেও তাঁহারা যে নিজ বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই কার্য্য করিতেন, গ্রন্থকার এ বিষয়টির দিকেও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বিপ্লবীদের মধ্যেও বহু দল; কিন্তু তিনি নিরপেক্ষ ভাবে সকল দলের কৃতিত্বের কথাই বইখানিতে উল্লেখ করিয়াছেন। এখানির বহুল প্রচার হইবে নিশ্চয়।

বিপ্লবের পদচিহ্ন—শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত। সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯ বঙ্কিম চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃ. ১/০+৩৮১। মূল্য চারি টাকা।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত জীবনের শ্রেষ্ঠতম অংশ—প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ বিপ্লবকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়া নানারূপ নির্য্যাতন, অত্যাচার এবং অকথ্য দুঃখ-কষ্ট নীরবে সহ্য করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানিতে মোটামুটি ১৯১৫ সন হইতে ১৯২৮ সনের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত নিজ স্মৃতি-কথা বর্ণন-ব্যপদেশে বিপ্লবকর্ম্মের ইতিবৃত্ত ভূপেন্দ্রবাবু প্রদান করিয়াছেন। পুস্তকে বর্ণিত কতকগুলি ঘটনা বিশেষ রোমাঞ্চকর। প্রথম দিন তাঁহার গ্রেপ্তারকালে এস্‌প্লানেডে পুলিসের লোকের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি, রাজবন্দীদের প্রতি সরকারী দুর্ব্যবহারের নিরোধের জন্য আটাত্তর দিনব্যাপী অনশন-ব্রত, এবং আরও নানা কাহিনী পাঠকের মন বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিবে। রায়পুর জেলে ডাঃ মোদী, সেখ গণ্টু ও চন্দ্রিকাপ্রসাদের যে দরদী চিত্র লেখক আঁকিয়াছেন তাহা পাঠকমাত্রেরই হৃদয় স্পর্শ করিবে। পুস্তকখানিতে নিজ স্মৃতি-কথা-প্রসঙ্গে বিপ্লব-প্রচেষ্টার আদর্শ, গতি-প্রকৃতি, বিভিন্ন দলের কার্য্য-কলাপ প্রভৃতি সম্বন্ধেও তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন—কখনও আনন্দ, কখনও বা বিশেষ দুঃখের সঙ্গে। কোন কোন বিপ্লবী দলের প্রতি কটাক্ষপাত এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে সমালোচনা করিতেও তিনি ছাড়েন নাই। তাঁহার মতামতের সঙ্গে হয়ত অনেকের মতভেদ থাকিবে। তথাপি নিজের দিক হইতে তাঁহার বক্তব্য বেশ পরিষ্কার করিয়াই বলিয়াছেন। লেখক বিপ্লবী, কিন্তু আদতে তিনি একজন উঁচুদরের সাহিত্যিক। নিজ স্মৃতি-কথা তিনি এমন সরল করিয়া বলিয়াছেন যে এমনটি এধরণের বইয়ে কচিৎ দেখা যায়।

সাহিত্যিক গুণপনা ছাড়া আরও কয়েকটি বিশেষত্বের কথা শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র গুহ ইহার ভূমিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন: "এই পুস্তকের প্রধান বিশেষত্বই হ'ল—গোপন ষড়যন্ত্র থেকে গণ-আন্দোলনের পথ, বিদ্রোহ থেকে বিপ্লবের পথ, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা থেকে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক স্বরাজলাভের পথ গ্রহণের ক্রমবিকাশকে ব্যাখ্যা করা। এই হ'ল এ গ্রন্থের দার্শনিক তত্ত্ব,—এই গ্রন্থের মধ্যমণি। গ্রন্থের যে অংশ প্রকাশিত হচ্ছে, সেখানেই এর শেষ নয়, আরম্ভ মাত্র।" গ্রন্থের প্রচ্ছদপট সুরুচিসম্মত। কয়েক জন উৎসর্গীকৃতপ্রাণ নিরলস বিপ্লবকর্ম্মীর চিত্রও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

রক্ত-বিপ্লবের এক অধ্যায়—[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়। বসন্ত-কুটীর, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর। পৃষ্ঠা ॥৶০+১৫৪+৮। মূল্য দুই টাকা।

এই পুস্তকখানিতে লেখক চন্দননগরের অন্তর্গত গোন্দলপাড়াকে কেন্দ্র করিয়া যে বিপ্লব-প্রচেষ্টা দীর্ঘকাল যাবৎ চলিয়াছিল তাহার একটি তথ্যমূলক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। গোন্দলপাড়া নানা কারণে প্রাচীনকাল হইতে বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিয়াছিল। এখানে বাংলা-সাহিত্য সেবার বিশেষ আয়োজন হয়। আর এই সাহিত্য-চর্চ্চার মাধ্যমে যুবকগণ স্বদেশসেবায় এবং ক্রমে বিপ্লব-প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হন। এখানকার একজন অধিবাসী বিখ্যাত বিপ্লবী সাহিত্যরসিক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুবিখ্যাত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয়দ্বয় ভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী হইয়াও এই পল্লীর সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত হইয়াছিলেন। গোন্দলপাড়ার কথা বলিতে গিয়া সমগ্র বিপ্লব-প্রয়াসের উপরেও নানা দিক হইতে আলোকপাত করা হইয়াছে। কারণ এ অঞ্চলটি সেই বৃহৎ প্রচেষ্টারই অঙ্গরূপে গণ্য। এইরূপ বিভিন্ন অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ বিপ্লব-প্রয়াস আলোচিত হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই পূর্ণ প্রচেষ্টা সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব। বিখ্যাত বিপ্লবী ও স্বদেশপ্রেমিক শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা পুস্তকখানির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

বাংলার একটি বিস্মৃত রত্ন—শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ। ৯ সত্যেন দত্ত রোড, কলিকাতা-২৯ হইতে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬৬। মূল্য এক টাকা।

লেখক স্বীয় পিতৃদেব স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র ঘোষের (১৮৬৫-১৯১২) মূল্যবান জীবনকথা এই পুস্তকখানিতে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। যশোহরের নড়াল মহকুমার সমীপবর্ত্তী ভদ্রবিলা গ্রামে একটি ভদ্র অথচ দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারে গোপালচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব ও কৈশোরেই তাঁহার বিস্ময়কর প্রতিভা সংস্কৃত ও অঙ্কশাস্ত্রের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়। তিনি দুই বার ডবল প্রোমোশন পাইয়া একেবারে পঞ্চম শ্রেণী হইতে নবম শ্রেণীতে উন্নীত হন। নবম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে গ্রে'র বিখ্যাত Elegy'র পদ্যচ্ছন্দে সংস্কৃত অনুবাদ করেন। নড়াল স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ এই কবিতা মুদ্রিত করাইয়া স্কুলে স্কুলে বিতরণ করিয়াছিলেন। [illegible] সময়কার বঙ্গবাসী, সময়, এডুকেশন গেজেট প্রভৃতি সংবাদপত্রে ইহার বিশেষ প্রশংসা বাহির হয়। প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণকালে তিনি সংস্কৃত পদ্যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রেও তিনি গভীর মনীষার পরিচয় দেন। বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রধান শিক্ষকের পদে কর্ম্ম করেন। কিন্তু তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি বিখ্যাত *Self-Culture*-পুস্তকখানির বাংলা অনুবাদ করিয়া পুরস্কৃত হন। এখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। গোপালচন্দ্র মাত্র উনপঞ্চাশ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। বাংলাদেশের এরূপ একটি রত্নকে বিস্মৃত হইতে দেওয়া উচিত নহে। গোপালচন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র ডঃ জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ নিজে এই পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশের ভার লইয়া বাঙালী-মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। গোপালচন্দ্রের একটি সুন্দর চিত্র পুস্তকের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ লাহা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

নিউ দিল্লীতে চীন রিপাবলিকের প্রধানমন্ত্রী চু-এন-লাইয়ের সহিত করমর্দ্দনরত ভারতের
উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর এস. রাধাকৃষ্ণন
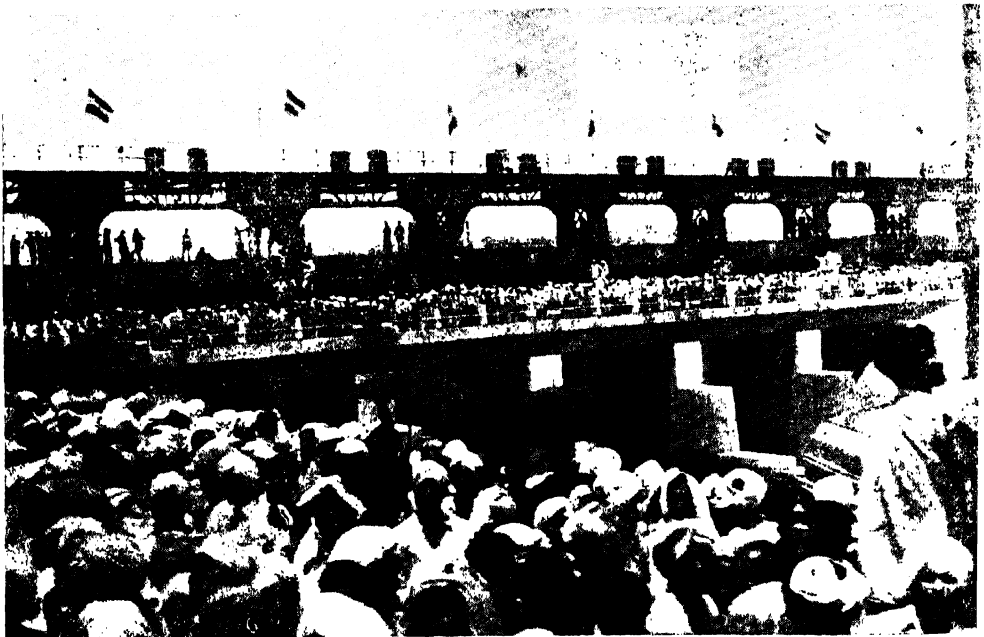
প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু কর্ত্তৃক আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর নাঙ্গাল
হাইডেল চ্যানেলে প্রবাহিত শতদ্রু নদীর জলরাশি দর্শন-রত জনতা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৪শ ভাগ ১ম খণ্ড | ভাদ্র, ১৩৬১ | ৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

স্বাধীনতা দিবস

ভারতের স্বাধীনতার সাত বৎসর পূর্ণ হইল। বহুদিন পরে এইবার কলিকাতায় স্বাধীনতা দিবসের শোভাযাত্রা, জলসা, সম্মেলন ইত্যাদি বিনা গণ্ডগোলে সম্পন্ন হয়। তাহার দুইটি কারণ শোনা যায়। প্রথমতঃ দেশে অন্নবস্ত্রের কষ্ট কিছু লাঘব হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ কোন বিশেষ রাষ্ট্রনৈতিক দলের বিদেশী প্রভুরা আদেশ দিয়াছেন ঐ দিনে যেন অশান্তির সৃষ্টি করা না হয়। যদি উহা যথার্থ হয় তবে প্রথম কারণ আনন্দের বিষয়, দ্বিতীয়টি লজ্জার।

কেননা এই দিন শুধু আনন্দের দিন নহে, উহা আত্মজিজ্ঞাসার দিন, অন্তরের হিসাব-নিকাশের দিন। স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হইবার যোগ্যতা, স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষমতা আমরা কতটা অর্জ্জন করিয়াছি, এই দিন সেই সকলের বুঝাপড়া করিবার দিন।

দেশে অভাব-অনটন এখনও যথেষ্ট রহিয়াছে। বেকার সমস্যা বাড়িয়াই চলিতেছে। তাহার ফলে সমাজের যে স্তর এই স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলি ও আহুতি দিয়াছে সেই মধ্যবিত্ত স্তরই আজ বিশেষ ভাবে ক্লিষ্ট, ভারাক্রান্ত ও ধ্বংসপ্রায়। জগতের প্রত্যেক স্বাধীন দেশের প্রত্যেক প্রগতি অভিযানের নায়ক ও অগ্রগামী দল এই স্তরই যোগাইয়াছে ও এখনও যোগাইতেছে। অদৃষ্টের পরিহাসই হউক বা মানব-সমাজের বুদ্ধিভ্রংশই হউক কোনও অজানা কারণে এই মধ্যবিত্তই আজ এদেশে সর্ব্বাপেক্ষা দলিত ও অবহেলার পাত্র।

এদেশের শাসনতন্ত্রের অধিকারীদিগের কাণ্ডজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তাঁহারা বুঝিবেন যে, সমাজের বুনিয়াদ গঠিত এই মধ্যবিত্ত স্তরেরই রক্তমাংস ও কঙ্কালে। এবং দেশের সকল সমস্যা পূরণ নির্ভর করে ঐ স্তরের সম্বিৎ ফিরাইয়া আনার উপর।

শোনা যায়, স্বাধীন ভারত কল্যাণমূলক রাষ্ট্র, যাহাকে ইংরেজীতে বলে 'ওয়েলফেয়ার ষ্টেট'। রাষ্ট্রচালনার যে নিদর্শন দিল্লী, কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে আমাদের চক্ষুগোচর হইয়াছে তাহাতে মনে হয় সরকারী কর্ম্মচারী, অধিকারিবর্গের দলীয় পোষ্যবর্গ এবং মুষ্টিমেয় সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক, অর্থাৎ সবশুদ্ধ দেশের জনসংখ্যার শতকরা এক ভাগ মাত্র ঐ "কল্যাণ" ভোগের অধিকারী।

এই অবস্থার পরিবর্ত্তন নিতান্তই প্রয়োজন। নচেৎ স্বাধীনতা দিবসের কোনই অর্থ হয় না।

সুরেশচন্দ্র মজুমদার

দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ও অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য যাঁহার সঙ্গে জড়িত, সেরূপ নিতান্ত স্বজনের মৃত্যুর পর তাঁহার বিষয় লেখা অত্যন্ত দুরূহ, বিশেষতঃ যেখানে বন্ধুবিয়োগ এমনি আকস্মিকরূপে ঘটে। সে কারণে আমরা আমাদের এই চিরসুহৃদের আত্মার শান্তি ও কল্যাণ কামনা এবং তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

সুরেশচন্দ্র ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণনগরে শিক্ষালাভ করেন। তিনি অত্যন্ত দীনভাবে জীবন আরম্ভ করিয়া কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়া সাফল্য অর্জ্জন করেন। তিনি ১৯২২ সনে আনন্দবাজার পত্রিকার পরিচালনভার গ্রহণ করেন। তাঁহার পরিচালনায় হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ও দেশ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সুরেশচন্দ্র কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করিয়া একাধিক বার কারাবরণ করেন। তিনি এককালে উত্তর কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। গত নির্ব্বাচনে তিনি ভারতীয় রাষ্ট্র পরিষদে কংগ্রেসী সদস্য রূপে নির্ব্বাচিত হন। তিনি নিখিল-ভারত সংবাদপত্র সম্মেলন এবং ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইষ্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্য এবং নিখিল-ভারত রবীন্দ্র স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক ছিলেন। বাংলা মুদ্রণ-শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁহার বিশিষ্ট দান প্রথম বাংলা লাইনো-টাইপের প্রবর্ত্তন করেন—সুরেশচন্দ্র অকৃতদার ছিলেন।

১৯১০ সনে গোয়েন্দা পুলিশ পুলিশ-সুপার সামসুল হুদাকে হত্যার অভিযোগে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্যদের সহিত সুরেশচন্দ্রকেও গ্রেপ্তার করে। জেলে থাকার সময় যতীন্দ্রনাথ ও তাঁহাকে হাওড়া রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র মামলায়ও জড়িত করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯১১ সালে তাঁহারা সকলেই মুক্তি পান।

তরুণ বয়স হইতেই মুদ্রণ-শিল্পের প্রতি সুরেশচন্দ্রের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। কারামুক্তির পর ১৯১২ সালে তিনি ইরাসমাস এণ্ড জোন্স কোম্পানীর অধুনালুপ্ত ক্যাম্বিয়ান প্রেসে যোগদান করেন। কিন্তু এই প্রেসের সীমিত পরিধির মধ্যে তাঁহার প্রতিভা বেশী দিন আবদ্ধ থাকিতে পারিল না। ১৯১৪ সালে তিনি

কলিকাতার একটি ক্ষুদ্র গৃহে প্রেস খুলিয়া বসিলেন, উহাই বর্ত্তমানে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে পরিণত হইয়াছে। সামান্য মূলধনে প্রতিষ্ঠিত এই ক্ষুদ্র প্রেসে তাঁহার কল্পনা ও প্রতিভা স্বচ্ছন্দে বিকাশ লাভ করিতে লাগিল। কয়েক বৎসর পরে এইখানেই তিনি বাংলা লাইনো-টাইপ উদ্ভাবনের কল্পনা করেন। দীর্ঘ ছয় বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তিনি বাংলা লাইনো-টাইপ কী-বোর্ড উদ্ভাবন করেন। বাংলা ভাষার ৬ শত অক্ষরকে কমাইয়া মাত্র ১২৪টি করা হইল। ১৯৩৭ সালে বাংলা লাইনো-টাইপ মেশিনে আনন্দবাজার পত্রিকা মুদ্রিত হইতে লাগিল। মুদ্রণ-শিল্পে ইহা একটি বিস্ময়কর বৈপ্লবিক উদ্ভাবন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

সুরেশচন্দ্র মুদ্রণ ও সংবাদপত্র ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়াও দেশের জাতীয় আন্দোলনের সব পর্য্যায়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯২৭ সাল হইতে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের জন্য গ্রেপ্তার হইয়া কারাগারে আটক ছিলেন। গান্ধীজীর এই নূতন আন্দোলনে তাঁহার বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রগুলি সর্ব্বতোভাবে সমর্থন জানাইয়াছিল এবং তৎকালীন প্রেস আইনের প্রতিবাদস্বরূপ কিছুকালের জন্য পত্রিকা প্রকাশ স্থগিত ছিল।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল।

১৯৪৫ সালে তিনি রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক হন। এই কমিটি পরে রবীন্দ্র ভারতীতে পরিণত হইয়াছে।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতে সুরেশচন্দ্র তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও সংবাদপত্রের প্রভাবে ক্রমশঃ বাংলার কংগ্রেসের স্তম্ভস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১৯৪৭ সালে তিনি কংগ্রেস প্রার্থীরূপে গণপরিষদে নির্ব্বাচিত হইয়া সংসদের কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। সংসদে প্রবেশ তাঁহার কর্ম্মজীবনের নূতন অধ্যায় রচনা করিল। স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী ভারতের সংবিধান রচনায় তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত গ্রহণের জন্য তিনি যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেশবাসী তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত চিরদিন স্মরণ করিবে।

১৯৫২ সালে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচনের দ্বারা যখন রাজ্য আইনসভা ও ভারতীয় সংসদ গঠিত হইল, তখন তিনি কংগ্রেসপ্রার্থী হিসাবে রাজ্যপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

গোয়া

১৫ই আগষ্ট, ভারতের স্বাধীনতা দিবসে দুই দল স্বেচ্ছাসেবক ভারতীয় জাতীয় পতাকা লইয়া পর্ত্তুগীজ সীমানা অতিক্রম করিয়া গোয়া অঞ্চলে প্রবেশ করেন। ইঁহারা সকলেই গোয়ানিবাসী। ভারতীয় কেহই গোয়া প্রবেশ করিতে পায় নাই। ভারতীয় পুলিসে বাধা দিয়াছে। এই গোয়া সত্যাগ্রহ অভিযানের ফলাফল বিচারের সময় এখনও আসে নাই। তবে বিগত সপ্তাহের সংবাদগুলি প্রণিধানযোগ্য।

"১০ই আগষ্ট—ভারতে অবস্থিত পর্ত্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চল গোয়া, দমন ও দিউ-র অবস্থা "নিরপেক্ষভাবে পর্য্যবেক্ষণ ও তৎসম্পর্কে রিপোর্ট দাখিলে"র জন্য পর্ত্তুগীজ সরকার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ভারত সরকার সেই প্রস্তাবকে অভিনন্দিত করিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

ভারত সরকার "নিরপেক্ষ পর্য্যবেক্ষণ ও রিপোর্ট দাখিলে"র প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লইলেও পর্ত্তুগীজ সরকারের নোটে উল্লিখিত কয়েকটি প্রস্তাব এবং অভিযোগাদির ও ভ্রান্ত তথ্যের বিস্তৃত ফিরিস্তিকে অবাস্তব ও অনুপযোগী বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এই কারণে নিরপেক্ষ পর্য্যবেক্ষণের নীতি কার্য্যে প্রযুক্ত করার পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের সহিত আলাপ-আলোচনার জন্য ভারত সরকার পর্ত্তুগীজ সরকারকে আবিলম্বে প্রতিনিধি নিয়োগের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আজ দ্বিপ্রহরে পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রী আর. কে. নেহরু ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়া দিল্লীস্থ পর্ত্তুগীজ দূত ডাঃ ভাসকো গারিথের নিকট এক লিপি অর্পণ করিয়াছেন।

ভারত কর্ত্তৃক তিনটি এবং পর্ত্তুগাল কর্ত্তৃকও তিনটি বিদেশী রাষ্ট্র মনোনয়নের যে প্রস্তাব পর্ত্তুগীজ নোটে করা হইয়াছে, সেই প্রশ্ন আপাততঃ উঠে না। অতএব ভারত সরকার কূটনৈতিক পন্থাই অবলম্বন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

বিশিষ্ট কূটনৈতিক মহল মনে করেন যে, প্রাপ্ত সাহায্যে বলীয়ান পাকিস্থান জগদ্বাসীর দৃষ্টি গোয়ার দিকে আকৃষ্ট হওয়ার সুযোগে স্বার্থ সিদ্ধি করিবার পূর্ব্বেই ভারত সরকার ভারতে অবস্থিত পর্ত্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চলগুলির সমস্যা সমাধান করিতে একান্ত আগ্রহান্বিত।

১০ই আগষ্ট,—ভারতে পর্ত্তুগীজ ছিটমহলসমূহে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে নিরপেক্ষ পর্য্যবেক্ষণ এবং অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্টদানকল্পে পর্ত্তুগাল যে প্রস্তাব করিয়াছে, ভারত সরকার তাহাতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু পর্ত্তুগাল এই ব্যাপারে যে কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণের প্রস্তাব করিয়াছে, তাহা ভারত সরকার ও "কার্য্যের অনুপযোগী" বলিয়া মনে করেন। এই কারণে ভারত সরকার নিরপেক্ষ পর্য্যবেক্ষণের নীতি বাস্তবে রূপায়িত করার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার জন্য অবিলম্বে উভয় সরকারের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক আহ্বানের সুপারিশ করিয়াছেন।

পররাষ্ট্র দপ্তরের সচিব শ্রী আর. কে. নেহরু অদ্য নয়াদিল্লীস্থ পর্ত্তুগীজ দূত ডাঃ ভালোগারিনের নিকট ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত সম্বলিত একটি লিপি প্রদান করেন। গত রবিবার পর্ত্তুগালের পক্ষ হইতে ভারত সরকারকে একটি পত্র দিয়া মঙ্গলবার বেলা চারিটার মধ্যে উত্তর দিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল।

পর্ত্তুগীজ ছিটমহলসমূহে অদ্ভুত অবস্থা এবং উহার নিকটবর্ত্তী ভারতীয় এলাকার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তৎসম্বন্ধে রিপোর্ট দিবার জন্য যে সকল দেশের সহিত উভয় রাষ্ট্রেরই কূটনৈতিক সম্পর্ক

আছে সেই সকল দেশ হইতে পর্য্যবেক্ষক নিয়োগ করার জন্য পর্তুগাল প্রস্তাব করিয়াছিল। ভারত ও পর্তুগাল উভয়েই প্রত্যেকে তিনটি করিয়া দেশ মনোনীত করিবে।

ভারত সরকার সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহারা কেবলমাত্র নিরপেক্ষ পর্য্যবেক্ষণের নীতি স্বীকার করিতেছেন, উহার কার্য্যপদ্ধতি স্বীকার করিতেছেন না, পরবর্ত্তী ব্যবস্থা পর্তুগালের উপরই নির্ভর করে।

কারোয়ার, ১১ই আগষ্ট—যে সমস্ত লোক কারোয়ারে চলিয়া আসিতেছে তাহাদের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, গোয়ার অভ্যন্তরে সীমান্তের নিকটে প্রায় তিন মাইল স্থানে অসামরিক ব্যক্তিদের প্রবেশ নিষেধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

গোয়া সরকার অদ্য হইতে সীমান্তবর্ত্তী পথে পথচারীদের যাতায়াতও বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং পথচারীদের সতর্ক করিয়া দিবার জন্য বিভিন্ন ঘাটিতে শক্তিশালী লাউডস্পীকার লাগান হইয়াছে।

জাতীয় কংগ্রেস মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, গোয়ায় বিভিন্ন শহরের জনসংখ্যার অর্দ্ধেকেরও বেশী লোক নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে চলিয়া গিয়াছে অথবা ভারতে চলিয়া গিয়াছে।

সীমান্তবর্ত্তী উক্ত তিন মাইল স্থানের সমস্ত বাড়ী ও দোকানের লোক সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বোম্বাই, ১০ই আগষ্ট—বোম্বাইস্থিত গোয়া যুক্তফ্রন্টের ওয়ার্কিং কমিটি ১৫ই আগষ্ট যুগপৎ দমন ও গোয়ায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

সুরাটের এক সংবাদে প্রকাশ যে, গুজরাটের প্রজা-সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীঈশ্বরলাল ছোটভাই দেশাই ১৫ই আগষ্ট পর্তুগীজ অধিকার-ভুক্ত দমনে এক সহস্র সত্যাগ্রহীকে পরিচালিত করিয়া লইয়া যাইবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। তিনি পর্তুগীজ সরকারকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছেন: "সাম্রাজ্যবাদী সরকার আমার দেশের সুনাম মসীলিপ্ত করিবে, স্বাধীন ভারত করজোড়ে বসিয়া তাহা দেখিতে পারে না।" তিনি দমনের গবর্ণরের নিকট প্রেরিত এক স্মারকলিপিতে "স্বাধীন জনগণের যে নবসমাজ ঔপনিবেশিক যুগের অবসানের পর অবধারিতভাবে রূপ গ্রহণ করিতে যাইতেছে, তাহাতে সহযোগিতা করিতে" পর্তুগীজ সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।

গোয়া যুক্তফ্রন্টের সভাপতি ও মুক্তিফৌজের সর্ব্বাধিনায়ক মিঃ মাসকারেনহাস যীশু খ্রীষ্টের নামে পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ সালজারের নিকট "শেষ মুহূর্ত্তের" আবেদন জানাইয়া তাহাতে "আপনার নাগরিকগণের মৃত্যুর পরোয়ানা যাহাতে স্থগিত থাকে এবং প্রাচ্যের জনগণের মনে আপনার দেশের জনগণের জন্য যে সদিচ্ছা আছে, তাহা যাহাতে মুছিয়া না যায়, তাহার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে" বলিয়াছেন। তিনি আবেদনে আরও বলিয়াছেন: "শেষ মুহূর্ত্ত অতিক্রান্ত হইলেই কেবল সংগ্রামের পথ খোলা থাকিবে এবং ভগবান আপনাকে ও আপনার লোকদিগকে কৃপা করুন।"

ইন্দোচীন

গত জুলাই মাসের শেষে জেনেভায় ইন্দোচীনে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব গৃহীত হয়। জেনেভায় ফরাসী প্রধান মন্ত্রী ও চীনের প্রতিনিধি মন্ত্রী এই দুই জনের সংসাহস ও রাষ্ট্রনীতিজ্ঞান এবং শ্রীনেহেরুর প্রতিনিধি শ্রীমেননের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাহার পর নয়া দিল্লীতে তদারকী কমিশনের প্রথম অধিবেশন বসে। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ:

নয়াদিল্লী, ১লা আগষ্ট—ইন্দোচীন অস্ত্র সংবরণ তদারকী কমিশনের সদস্য-রাষ্ট্র পোলাণ্ড, কানাডা এবং ভারতের প্রতিনিধিদের সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়া আজ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন যে, এই কমিশন শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার মনোভাব লইয়া কাজ করিবেন এবং এই কমিশনের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে তাঁহারা তাহা পালন করিবেন বলিয়া তিনি আশা করেন। এই কমিশনে কানাডা ও পোলাণ্ডের সহিত একত্র কার্য্য করিবার এবং এই গুরুতর দায়িত্ব পালনের অধিকার লাভে ভারত নিজেকে সম্মানিত বোধ করিয়াছে। শ্রীনেহেরু বলেন যে, তাঁহাদের উপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যভার অর্পণ করা হইয়াছে। এই কর্ত্তব্য সম্পাদনে এই কমিশনের সকল সদস্যের এবং যে সকল রাষ্ট্রের সহিত এই কমিশনের কার্য্য করিতে হইবে সেই সকল রাষ্ট্রের নিষ্ঠতম সহযোগিতা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন। মিশনের সদস্যদের নিকট হইতেই শুধু নয়, সংশ্লিষ্ট সকল রাষ্ট্রের নিকট হইতেই যে পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাইবে, সে বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। একান্ত আশা হিসাবেই তিনি এই মনোভাব প্রকাশ করিতেছেন না, জেনেভা সম্মেলনের আলোচনা হইতে তাঁহার যে ধারণা হইয়াছে সেই ধারণা হইতেই তিনি ইহা বলিতেছেন। এই সম্মেলনে পরস্পরের সহিত সহযোগিতার, পরস্পরের অসুবিধা ও মনোভাব বুঝিতে চেষ্টা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রত্যেক পক্ষই কোন একটি মীমাংসায় পৌঁছিবার মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্যই জেনেভা সম্মেলনে সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ সম্ভব হইয়াছে। সেই দিক হইতে জেনেভা সম্মেলনকে অভূতপূর্ব্ব বিবেচনা করা যাইতে পারে বলিয়া তিনি মনে করেন।

ভারতে ফরাসী এলাকা

ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মঁসিয়ে মঁদে-ফ্রাঁস যেরূপ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সমস্যাগুলির সমাধানের পথ খুঁজিতেছেন, তাহাতে আশা করা যায় যে, এদেশস্থ ফরাসী উপনিবেশগুলি শীঘ্রই স্বাধীন ভারতে যুক্ত হইবে। কিন্তু এখনও আলোচনা মাত্রই চলিতেছে।

সংবাদপত্রে এবিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার চুম্বক এইরূপ:

প্যারিস, ৫ই আগষ্ট—ভারতে অবশিষ্ট ফরাসী অধিকৃত এলা[illegible] সম্পর্কে ফ্রান্স ও ভারতের মধ্যে পুনরায় সরকারী-ভাবে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। এ সম্পর্কে অদূরভবিষ্যতে এক চুক্তি সম্পাদনের দ্বারা আলাপ-আলোচনার অবসান হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কিন্তু ১৪ই আগষ্টের মধ্যে ফরাসীদের ভারত ত্যাগের যে আশা পোষণ করা হইতেছে, তাহা অতিমাত্রায় বেশী বলিয়া কূটনৈতিক মহল মনে করেন।

৪ঠা জুন প্যারিসে ফরাসী-ভারত আলোচনা ফাঁসিয়া যাইবার পর হইতেই নয়াদিল্লীতে ফরাসী রাষ্ট্রদূত ভারত সরকারের সহিত সংযোগরক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

প্যারিসের আলোচনায় পণ্ডিচেরী, কারিকল, মাহে ও ইয়ামন এই চারটি উপকূলবর্তী এলাকা সম্পর্কে বিবেচনা করা হয়। ১৬ই জুলাই মাহের শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ায় এবং মাসখানেক পূর্ব্বে ইয়ামন "মুক্ত" হওয়ায় বর্ত্তমান আলোচনাটি কেবল পণ্ডিচেরী ও কারিকল সম্বন্ধেই সীমাবদ্ধ থাকে।

ফরাসী এলাকার তিন লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে বেশীর ভাগই পণ্ডিচেরী ও কারিকলে বসবাস করে। পঞ্চম উপনিবেশ চন্দননগর ১৯৫১ সনের গণভোটের পর ভারতভুক্ত হয়।

প্যারিস, ১০ই আগষ্ট—ফরাসী উপনিবেশমন্ত্রী মঃ রবার্ট বুরো অদ্য বলেন যে, পূর্ব্বাহ্ণে স্থানীয় অধিবাসীদের সহিত আলোচনা না করিয়া ভারতের ফরাসী উপনিবেশসমূহের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হইবে না।

জাতীয় পরিষদে সদস্যদের প্রশ্নের উত্তরে মঃ বুরো বলেন যে, ১৭৬৩ এবং ১৮১৪ সনের আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী এইসব উপনিবেশে সামরিক বলপ্রয়োগের কোন অধিকার ফ্রান্সের নাই। কিন্তু ভারতের পর্তুগীজ উপনিবেশসমূহের অবস্থা অন্যরূপ।

জাতীয় পরিষদে টিউনিসিয়ায় সরকারী নীতির পূর্ণাঙ্গ আলোচনার তারিখ নির্দ্ধারণকল্পে বিতর্ককালে ভারতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে উপনিবেশমন্ত্রী উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

মঃ বুরো প্রস্তাব করেন যে, ২৭শে আগষ্ট টিউনিসিয়া প্রসঙ্গ আলোচনাকালে ভারতের সম্পর্কেও আলোচনা হইতে পারে। ইহাতে কোন সদস্য আপত্তি করেন নাই।

উপনিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার সময় অদ্য গলপন্থী সদস্য মঃ রেমো ভারতের মনোভাবের নিন্দা করেন এবং মঃ পিয়ের মেদে ফ্রান্স আত্মঘাতী নীতি অনুসরণ করিতেছেন বলিয়া মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, "গোয়া সম্পর্কে পর্তুগীজ সরকার যে দৃঢ় মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন, ফরাসী সরকার তাঁহাদের উপনিবেশ সম্পর্কে নয়াদিল্লীর প্রতি কেন সেইরূপ দৃঢ় মনোভাব অবলম্বন করিতেছেন না ?"

আরও দুইজন বামপন্থী সদস্য ভারত সম্পর্কে সরকারী মনোভাবের নিন্দা করিয়া সরকারকে পর্তুগালের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে বলেন।

পরের খবরে, ১৪ই আগষ্টে, জানা যায় যে, ফরাসী সরকার উপনিবেশগুলি সম্পর্কে আলোচনা করিতে প্রস্তুত।

টিউনিসিয়াতে ফরাসী সন্ত্রাসবাদ

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ ফ্রেনার ব্রকওয়ে সম্প্রতি টিউনিসিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিবার উদ্দেশ্যে তথায় গিয়াছিলেন। ২৪শে জুলাই "ভিজিল" পত্রিকায় এক প্রবন্ধে তিনি লিখিতেছেন যে, উপর হইতে টিউনিসকে শান্ত দেখাইলেও সেখানে প্রবল অসন্তোষ এবং হিংসা রহিয়াছে।

প্রায়ই টিউনিসের রাস্তায় ফরাসী সৈন্যদের মার্চ্চ করিয়া যাইতে দেখা যায়। তাহারা বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া খানাতল্লাসী করে পুস্তক-পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত ও লোককে গ্রেপ্তার করে। সশস্ত্র ফরাসী গুণ্ডার দল আরব অধিবাসীদিগকে নির্ব্বিচারে গুলি করিয়া মারে। প্রথম দিকে টিউনিসিয়গণ প্রত্যুত্তর দিতেন না, কিন্তু গুণ্ডাদের নিপীড়ন বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন তাঁহারা প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

বর্ত্তমানের এই সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ সুরু হয় গত জুন মাসের প্রথম দিকে। কায়রুওয়ানের নিকটে জাতীয়তাবাদী কৃষক হাফুজ ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যা করা হয়। হত্যার জন্য কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। ১৩ই জুন জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে নির্ব্বাচনের সময় চারি জন আরব ভোটদাতা নিহত হন। পরদিন মঃ পিক নামে এক জন ফরাসীকে হত্যা করা হয়। তারপর রেডসে দুই জন আরবকে হত্যা এবং চার জনকে আহত করা হয়। প্রতিশোধ হিসাবে এক জন ফরাসী নিহত এবং পাঁচ জন আহত হন। ফেরেল বুঁ জেলখানাতে ফরাসীরা তিন জন টিউনিসিয়কে হত্যা এবং সাত জনকে আহত করিয়া উহাদের উপর প্রত্যাঘাত করে।

গত বৎসর টিউনিসিয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ফারহাত হাসাদকে হত্যা করা হয়। হত্যার জন্য কেহই গ্রেপ্তার হয় নাই। অবশ্য টিউনিসিয়দিগকে হত্যার জন্য কোন দিনই কোন ফরাসীকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। হাসাদের মৃত্যু এখনও রহস্যাবৃত রহিয়াছে। সরকার সত্য ঘটনা প্রকাশ করিতে সাহসী হয় নাই, কারণ তাহা হইলে সরকার স্বয়ং লোকচক্ষে হেয় হইবে।

মিঃ ব্রকওয়ে লিখিতেছেন যে, প্রায় ষোল শত টিউনিসিয় বিনাবিচারে আটক রহিয়াছেন। সন্দেহবশে স্বল্পকালের জন্য যে কত লোককে বন্দী করা হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা জানা যায় না। তবে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে, টিউনিসিয়ার জেলখানাগুলি পরিপূর্ণ রহিয়াছে এবং যে ঘরে পূর্ব্বে আশী-নব্বই জনের স্থান সঙ্কুলান হইত বর্ত্তমানে সেই ঘরে দেড় শত হইতে এক শত ষাট জন লোককে রাখা হইয়াছে। বিচারে পরে যে কত নর-নারীকে বন্দী করা হইয়াছে তাহাও অজ্ঞাত। জাতীয়তাবাদী নেতা মিঃ মঙ্গী স্লিম মিঃ ব্রকওয়েকে বলেন যে, টিউনিসে অবস্থিত সামরিক আদালতের অধিবেশন সপ্তাহে তিন বার করিয়া হয় এবং প্রতি অধিবেশনে পঁচিশ হইতে ত্রিশ জনকে শাস্তি দেওয়া হয়। এই হিসাবে বিচারপ্রাপ্ত বন্দীদের সংখ্যা প্রায় এক হাজার হইবে।

দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি

গত ২৩শে শ্রাবণ বঙ্গবাসী কলেজে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতির উনত্রিংশং অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক নির্ম্মলকুমার ভট্টাচার্য্য বলেন যে, এই দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি আজ সঙ্কটের সম্মুখীন। দেশ ও সমাজ-জীবনের বিভিন্ন স্তরে আজ ঘুণ ধরিয়াছে এবং তাহার ফলেই এই সঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছে। চোরাকারবারী ও অন্যান্য সমাজ-বিরোধীরা দেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুরবস্থার সুযোগ লইয়া নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করিতেছে; অন্যদিকে দেশের সাধারণ মানুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতি দিন দিন ক্ষুণ্ণ হইতে চলিয়াছে।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক নির্ম্মলকুমার ভট্টাচার্য্য বলেন, আজিকার দিনের প্রয়োজন যদি বিশ্ববিদ্যালয়কে মিটাইতে হয়, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক, জাতীয় ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া উচ্চশিক্ষার্থীদের মধ্যে বিস্তৃত করিতে হইবে। গণতান্ত্রিক শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য বলেন যে, ইংরাজ ভারতবর্ষে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, তাহাতে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়ার ফলে ইংরেজী এবং ইংরেজী না-জানা জনসাধারণের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছিল। উচ্চ, নিম্ন ও মধ্যবিত্ত দেশের কৃষক-মজুর শ্রেণী হইতে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এক শ্রেণীর অন্যের দুঃখ কষ্ট আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন সংবাদ রাখিত না। সত্য কথা বলিতে কি, পরস্পর-পরস্পরকে বুঝিতই না। কিন্তু আজিকার দিনের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাই শিক্ষার বুনিয়াদ সম্পূর্ণভাবে পাল্টাইয়া গণতান্ত্রিক শিক্ষার বিস্তার অবিলম্বে প্রয়োজন।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে কলেজীয় শিক্ষার প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া সভাপতি বলেন যে, গত তিন বৎসরের মধ্যে আণ্ডার-গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে যে তথ্য উদঘাটিত হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক।

অতঃপর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত রিপোর্টে যেখানে ছাত্রদের দুরবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার বহুলাংশ উদ্ধৃত করেন।

কলেজীয় শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধির উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ১৯৪৯ সনের পর হইতে এ রাজ্যে ছাত্রদের ফি বহুভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ বিষয়ে উপাচার্য্য ড. জি সি. ঘোষের উক্তি উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য বলেন যে, কলিকাতার সরকারী কলেজগুলি বাদ দেওয়া হইলে দেখা যাইবে কলেজসমূহের মোট ব্যয়ের শতকরা নব্বই ভাগ ছাত্রদেরই ফি হইতে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্প্রতি যে ফি বৃদ্ধি করা হইয়াছে, তাহার পুনর্বিবেচনা অত্যন্ত জরুরী।

শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন সম্বন্ধে তিনি বলেন, মাতৃভাষাকে শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন করিতেই হইবে। তবে ক্রমে ক্রমে এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়া দরকার। যথাশীঘ্র এ কাজ যে আরম্ভ করা দরকার, সে কথাও তিনি বলেন।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের মতামতের অধিকাংশই আমরা যথার্থ মনে করি। কিন্তু সংবাদপত্রে তাঁহার ভাষণের যে [illegible] দেখিয়াছি তাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদিগের মধ্যে যে নিদারুণ যথেচ্ছাচারের স্পৃহা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার, এবং সে বিষয়ে অধ্যাপক সমিতির কর্ত্তব্য কি তাহারও কোন উল্লেখ পাইলাম না। দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সবকিছুই নির্ভর করে শিক্ষার্থীদিগের চরিত্র গঠনের উপর। সেইখানেই আজ বাংলার চরম নৈরাশ্যের কারণ দেখা দিয়াছে।

ললিতকলা আকাদমী

সংস্কৃতি সম্পর্কিত সংস্থা গঠনে ভারত সরকার উদ্যোগী হইয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। নয়াদিল্লীতে যে অনুষ্ঠান ৫ই আগষ্ট হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:

নয়াদিল্লী, ৫ই আগষ্ট—"আজ ললিতকলা আকাদমীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুলকালাম আজাদ তাঁহার ভাষণে বলেন, কলিকাতায় অখিল-ভারত চারুকলা সম্মেলনে আমি জানাইয়াছিলাম যে, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার তিনটি আকাদমী স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। একটি ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে, একটি দৃশ্যকলা ও স্থাপত্য সম্বন্ধে এবং আর একটি সঙ্গীত, নাটক ও নৃত্যকলা সম্বন্ধে। ১৯৫৩ সনে সঙ্গীত নাটক আকাদমী স্থাপন করা হয়। গত মার্চ্চ মাসে সাহিত্য আকাদমী স্থাপিত হইয়াছে। আজ ললিতকলা আকাদমী উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সংস্কৃতি সংস্থা স্থাপনের কর্ম্মসূচী সম্পূর্ণ হইল।

"সম্মেলনের একটি সুপারিশ ছিল, আঞ্চলিক ভিত্তিতে লোক-কলা, চিত্রকলা, স্থাপত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে সমীক্ষা গ্রহণ করা এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়া তথ্যমূলক পুস্তক প্রকাশ করা। ভারত সরকার এই সুপারিশ গ্রহণ করিয়া মাদ্রাজ, বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা এবং জম্মু ও কাশ্মীরের শিল্পকলা সম্বন্ধে সমীক্ষা গ্রহণের জন্য সাড়ে তিন হাজার টাকা মূল্যের পাঁচটি বৃত্তি দিয়াছেন।

ললিতকলা আকাদমী স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত কলা সম্পর্কে পরামর্শ দিবার জন্য সরকার ভারতকলা সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। সমিতি ভারতীয় ললিতকলার ইতিহাস রচনার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা মুঘল চিত্রকলা ও সমকালীন চিত্রকলার এলবাম প্রকাশের কাজে হাত দিয়াছেন। এলবামগুলি এই বৎসরের শেষে প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। অজন্তা হইতে আধুনিক যুগের চিত্রকলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া একটি এলবাম প্রকাশের কথা সমিতি বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্যোগে অজন্তার চিত্রাবলী প্রকাশের কার্য্যে আমরা সাহায্য করিয়াছি।"

"সম্মেলনের সুপারিশ অনুযায়ী একটি জাতীয় ললিতকলা তহবিল গঠন করা হইয়াছে।

"আমার বিশ্বাস, ললিতকলার ক্ষেত্রে সরকারী প্রচেষ্টার স্থান

মুখ্য হইতে পারে না। ললিতকলার উন্নয়নের জন্য সরকার অবশ্যই চেষ্টা করিবেন; তবে শক্তিশালী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ ছাড়া ললিতকলার যথার্থ উন্নয়ন সম্ভব নয়। ঠিক এই কারণেই ললিতকলা আকাদমী স্থাপন করা হইতেছে। সরকার কর্তৃক স্থাপিত হইলেও ইহা স্বশাসিত সংস্থা হিসাবে পরিচালিত হইবে এবং ইহার কার্য্যে সরকার কোনও প্রকারে হস্তক্ষেপ করিবেন না।"

আমরা শিক্ষামন্ত্রীর ঐ শেষ মন্তব্য সমর্থন করি। ললিতকলার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য প্রয়োজন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার উন্নয়ন ও প্রসার রসবেত্তা এবং রসগ্রাহী সাধারণের চেষ্টা ও ইচ্ছা ভিন্ন সম্ভব নহে।

ঐ অনুষ্ঠানে শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী বলেন :

"ভারতে সরকারের উদ্যোগে এই প্রথম এই দেশে একটি জাতীয় ললিতকলা আকাদমী প্রতিষ্ঠা হইল। আমাদের দেশের ললিতকলার শক্তি বৃদ্ধি, কলাবিদদিগকে উৎসাহ দান প্রভৃতি যে সকল মহদুদ্দেশ্য লইয়া এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে সেই সকল যাহাতে পূরণ হয় আমরা শিল্পীরাই সেই বিষয়ে দৃষ্টি দিব। এই আকাদমীর সাফল্যই আমাদের চরম সার্থকতা।

"বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী ও খেয়ালী শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করা কত কঠিন তাহা আমি জানি। কিন্তু ক্ষুধার্ত হইলে অথবা যশঃস্পৃহা পরিতৃপ্ত না হইলেই মানুষ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। একটু সহানুভূতি একটু সমাদর মানুষের জীবনের গতি পরিবর্তন করিতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমার নিজের জীবনের একটি কথা বলিতেছি। এক দিন সৌভাগ্যক্রমে আমার প্রথম ছবিটি তিন টাকায় বিক্রয় করিতে পারিয়া আমি অশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। ক্রেতা মহাশয় আমাকে উৎসাহ-বাণীও শুনাইলেন। তাঁহার এই প্রশংসা ও উৎসাহমূলক বাণীই আমাকে বড় হইতে সাহায্য করিয়াছে।"

উত্তরবঙ্গে প্লাবন

উত্তরবঙ্গে এ বৎসর আবার বন্যার বিভীষিকা দেখা দিয়াছে। জলপাইগুড়ি কুচবিহার ইত্যাদি অঞ্চলের অধিবাসিগণ অত্যন্ত দুর্গত হইয়াছে। তাহাদের সাহায্যের জন্য যে আবেদন করা হইয়াছে তাহার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া হইল।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনকে চেয়ারম্যান করিয়া "উত্তরবঙ্গ বন্যা সাহায্য সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতির পক্ষ হইতে বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের জন্য জনসাধারণের নিকট এক আবেদন প্রচার করা হইয়াছে।

উক্ত আবেদনে বলা হইয়াছে, "উত্তরবঙ্গে সাম্প্রতিক বন্যায় যে ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলপ্লাবিত হইয়াছে এবং ঐ অঞ্চলের নদী ও খালগুলিতে জলস্ফীতি দেখা দিয়াছে। রেলপথ ও স্থলপথে যানবাহন চলাচল বিপর্যস্ত হইয়াছে। বাসগৃহ, শস্য ও গবাদি পশুর প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে, কৃষিকার্য্যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে কৃষিজীবী ও অন্যান্য শ্রেণীর শ্রমিকগণ বেকার হইয়া পড়িয়াছে। এই সব দুর্গত অঞ্চলের অধিবাসীরা এক অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হইয়াছে। ব্যাপক অনশন ও মহামারীর প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনা রহিয়াছে। কেবল সরকারী সাহায্যে এই ধরণের বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হওয়া সম্ভব নহে। এইরূপ জরুরী অবস্থায় জনসাধারণের নিকট হইতে প্রচুর সাহায্য ও সহযোগিতা আসা একান্ত প্রয়োজন। সাহায্যকার্য্য চালাইবার জন্য যথোপযুক্ত তহবিল গঠনের উদ্দেশ্যে উক্ত সাহায্য সমিতি গঠিত হইয়াছে। যাবতীয় সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পেরিতব্য :

১। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মিনিষ্টারস কোয়ার্টার, "রাজভবন", কলিকাতা-১; অথবা শ্রী এন. পি. রায়, কোষাধ্যক্ষ, এস কে. ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোম্পানী, ৯, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

কংগ্রেস তথা সরকারী শিল্পনীতি

কংগ্রেস পার্টি ভারতীয় আইন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, সুতরাং তাহাদের দলীয় নীতি সরকারী নীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। কংগ্রেস কমিটির আজমীর অধিবেশনে তাই আশা করা গিয়াছিল যে, সরকারী শিল্পনীতির একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। সরকারী শিল্পনীতি সম্বন্ধে দেশে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে; কারণ সরকারী নীতি গোঁজামিল ও অনিশ্চিয়তায় ভরা। কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের প্রস্তাবগুলি বৃহত্তর গতানুগতিক মঙ্গল কামনায় পূর্ণ মাত্র—বাস্তবতার কষ্টিপাথরে ম্লান হইয়া উঠে। ফলে প্রস্তাবগুলি গ্রহণের পর তাহাদের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে কেহ আর মাথা ঘামায় না। ভরসা ছিল যে, কংগ্রেসের আজমীর অধিবেশন জাতীয়তাকরণ, জাতীয়তাকরণের জন্য ক্ষতিপূরণ, বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পস্বার্থের সমন্বয় সাধন, জমি দখলের পরিমাণ নির্দ্ধারণ ইত্যাদি জাতীয় সমস্যাগুলি সম্বন্ধে সুষ্ঠু নির্দ্দেশ দিবে, কিন্তু এই সকল ব্যাপারে আজমীর অধিবেশন নিরাশ করিয়াছে। গতানুগতিক আদর্শবাদের আকাশ-কুসুম কল্পনায় আজমীর অধিবেশনের প্রস্তাবগুলি ভরা; বাস্তব কার্য্যকারিতার স্থান তাহাতে নাই।

শিল্পনীতি সম্বন্ধে বড় সমস্যা হইতেছে যে, মিশ্রনীতির কোন পরিবর্তন অথবা পরিবর্দ্ধন প্রয়োজন কিনা। ব্যক্তিগত অর্থনীতির ক্ষেত্রকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহারা যে আশ্বাস চায় সে আশ্বাস তাহারা পায় নাই। মিশ্রনীতিতে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে, কিন্তু সেই নিয়ন্ত্রণের পরিধি কতখানি? নিয়ন্ত্রণ যদি জাতীয়তাকরণে পরিসমাপ্তি লাভ করে তাহা হইলে শিল্পপতিরা আপত্তি জানাইবে। তাহাদের বক্তব্য এই যে, জাতীয়তাকরণ করা হইবে না, এ আশ্বাস না পাইলে শিল্পপতিরা নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠায় তেমন আগ্রহ প্রকাশ করিবে না। তাহাদের দাবি অবশ্য যুক্তিহীন ও অবাস্তব। ভারতীয় রাষ্ট্র অল্পবিস্তর সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় শিল্পপতিরা কোনরূপেই নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা পাইতে

পারেন না, অর্থাৎ তাঁহারা যত অন্যায়ই করুন না কেন, রাষ্ট্র তাঁহাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় হাত দিতে পারিবে না এ দাবি আজকাল অচল।

আজমীর অধিবেশনের শিল্পনীতি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, দেশের সম্পদ নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হইবে, বর্ত্তমান ব্যক্তিগত শিল্পগুলিকে জাতীয়করণের জন্য জাতীয় সম্পদ নিয়োজিত করা হইবে না। এই আশ্বাস শিল্পপতিদের স্বপক্ষেই যায়। কিন্তু এই প্রস্তাবের পরেই বলা হইয়াছে যে, জাতীয় স্বার্থের খাতিরে ব্যক্তিগত শিল্পগুলিকে জাতীয়করণ করা যাইতে পারে। আর ইহাতেই শিল্পপতিদের আপত্তি; কারণ জাতীয়তাকরণের হুমকি যখন বর্ত্তমান থাকিতেছে তখন ব্যক্তিগত শিল্পপ্রসার ব্যাহত হইতে বাধ্য। অবশ্য পণ্ডিত নেহেরু আশ্বাস দিয়াছেন যে, অর্থনৈতিক অযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয়করণ করা হইবে না। কিন্তু তাহা হইলে সুপরিচালিত স্বাবলম্বী ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করার কোন প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ, বাস্তবক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থের বিরোধী না হইলে কোন ব্যক্তিগত শিল্পকে রাষ্ট্র জাতীয়করণ করিবে না। কিন্তু শিল্পনীতির জাতীয়তাকরণ ধারার অস্তিত্বই নাকি শিল্পপতিদের ভীতির কারণ এবং ইহার জন্য শিল্পপ্রসার আশানুরূপ হইতেছে না।

এই সমস্যার সমাধানের দুইটি উপায় আছে। রাষ্ট্র যদি মনে করে যে, নিজেই প্রয়োজনীয় সকল নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে এবং সেই সঙ্গে দেশের বেকার-সমস্যারও সমাধান হইবে তাহা হইলে আর শিল্পপতিদের উপর ভরসা রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। সেই অবস্থায় কিন্তু পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো অবশ্যম্ভাবী এবং মনে-প্রাণে ভারত সরকারকে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। দুই নৌকায় পা দিয়া থাকিলে চলিবে না। ধনীতোষণ নীতি পরিহার করিতে হইবে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত শিল্পের অস্তিত্ব নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু ভারত সরকার তথা কংগ্রেস পার্টি যদি পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক আদর্শ বর্ত্তমানে গ্রহণ করিতে অপারগ হন, তাহা হইলে মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোকে শুধু স্বীকার করিলেই চলিবে না, তাহাকে বাস্তবে কার্য্যকরী করিবার জন্য তৎপর হইতে হইবে। ভারত সরকার যদি মনে করেন যে, তাঁহারা নিজেরা প্রয়োজনীয় সকল শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে অসমর্থ এবং দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যক্তিগত শিল্পের সাহায্য প্রয়োজন, তাহা হইলে শিল্পপতিদের অযথা ভীতিপ্রদর্শন করিয়া লাভ নাই। জাতীয়তাকরণের ধারাটি শিল্পনীতির প্রস্তাব হইতে তুলিয়া লইলেই যদি শিল্পসম্প্রসারণ ঘটে তবে তাহা আনন্দের কথা। সুতরাং ভারত সরকারের এই ধারাটি তুলিয়া লইতে আপত্তি থাকার কোন কারণ থাকিতে পারে না। যদি কোন শিল্প জাতীয়তাবিরোধী কার্য্য করে (বহু ব্যক্তিগত শিল্পই জাতীয়তাবিরোধী কার্য্য করিতেছে) তাহা হইলে সরকার বর্ত্তমান "শিল্প বিবর্দ্ধন ও নিয়ন্ত্রণ" আইনের সাহায্যেই সেই শিল্পকে জাতীয়করণ করিতে পারেন।

কংগ্রেসের শিল্পনীতির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পণ্ডিত নেহেরু বলিয়াছেন যে, যেখানে শিল্পসম্পদ সীমাবদ্ধ, সেখানে এ[illegible] কি নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত হইবে, না ইহার দ্বারা পুরনো প্রতিষ্ঠান ক্রয় করা হইবে? যদি নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রপরিচালিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমশঃ বিবর্দ্ধিত হইবে এবং ব্যাপ্তি লাভ করিবে। তিনি বলিয়াছেন, কিন্তু যদি পুরনো প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা হয় তাহা হইলে জাতীয় সম্পদের বদলে রাষ্ট্র কতকগুলি পুরনো এবং ভাঙ্গাচোরা যন্ত্রপাতি পায় মাত্র। নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠা দ্বারা অধিকতর উৎপাদন সর্ব্বদাই কাম্য। কিন্তু পুরনো প্রতিষ্ঠান দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি না পাইয়া একই হারে বর্ত্তমান থাকে, তাহাতে জাতীয় ক্ষতি হয়। নিঃসন্দেহে ইহা খুবই সুচিন্তিত অভিমত এবং মিশ্রঅর্থনীতির পরিপোষক। তবে শুধু একটি কথা জিজ্ঞাস্য। ভারতীয় বিমানপথ জাতীয়তাকরণের সময়ে জাতীয় সম্পদের বিনিময়ে কতকগুলি পুরানো এবং ভাঙ্গাচোরা বিমান ক্রয় করা হইয়াছে কেন? এই বিমানগুলির অধিকাংশের মূল্য পুরনো লোহার চেয়ে অধিক ছিল না। ইতিমধ্যেই কয়েকটি বিমান দুর্ঘটনায় নষ্ট হইয়াছে—ইহাতে শুধু জাতীয় সম্পদের অপচয় হইয়াছে। পণ্ডিত নেহেরুর উপরি-উক্ত চিন্তা তখন কোথা ছিল যখন পুরনো বিমানগুলি সোনার দরে ক্রয় করা হইয়াছিল। এই সকল পুরনো অযোগ্য বিমান ক্রয় না করিয়া নূতন বিমান ক্রয় করিয়া ভারতীয় বিমানপথ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন।

শিল্পনীতির আর একটি সমস্যা হইতেছে, বৃহদায়তন ও স্বল্পায়তন শিল্পের মধ্যে সীমা-নির্দ্ধারণ। সীমানা পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা বৃহদায়তন শিল্পগুলির বিপক্ষে। যেমন মিল-বস্ত্র উৎপাদন হ্রাস করিয়া এবং তাহার উপর কর বসাইয়া তাঁত-বস্ত্রকে সাহায্য করা হইতেছে। অনেকক্ষেত্রে বৃহদায়তন শিল্পের স্বার্থকে বলি দিয়া স্বল্পায়তন অযোগ্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা হইতেছে। ভারতীয় মিলবস্ত্র এখন যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানী হইতেছে, কিন্তু মিলবস্ত্রের রপ্তানী হ্রাস করিয়া দেওয়াতে রপ্তানী ব্যবসায়ের ক্ষতি হইতেছে। সুতরাং শিল্পের শ্রেণীবিভাগে ক্ষতি বই লাভ হয় নাই। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে শিল্পনীতি সম্বন্ধে প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া বলেন যে, শিল্পের বর্ত্তমান শ্রেণীবিভাগ অবাঞ্ছনীয়। তবে সরকার উৎপাদন-ক্ষেত্র ভাগ করিয়া দিতে পারেন বিভিন্ন প্রকার শিল্পের মধ্যে। কুটির-শিল্পের স্বরূপ কি রকম হইবে বৃহদায়তন ও স্বল্পায়তন শিল্পের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করিবার দায়িত্ব মুখ্যতঃ সরকারের, কংগ্রেস কমিটির নয়।

কংগ্রেস দলই অবশ্য শাসনভার পাইয়াছেন, কিন্তু আইন-পরিষদের মধ্যে কংগ্রেস দল ও আইন-পরিষদের বাহিরে কংগ্রেস দলের মধ্যে তফাৎ অনেক। আইন-পরিষদের কংগ্রেস দল দেশের বৃহত্তম স্বার্থের জন্য দায়ী এবং তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী দলীয় না হইয়া জাতীয় হওয়া

…উচিত। ব্রিটেনে যখন শ্রমিক দল শাসনভার পাইয়াছিলেন তখন ঠিক [illegible] উঠিয়াছিল যে, শ্রমিক গবর্মেণ্ট শুধু দলীয় ফতোয়া শুনিবেন না, সামগ্রিকভাবে আইন-পরিষদের কথা শুনিবেন। শেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, শ্রমিক গবর্মেণ্ট শুধু দলীয় নির্দ্দেশ শুনিতে বাধ্য নয়—ইহার দৃষ্টিভঙ্গী জাতীয় এবং স্বার্থ সার্ব্বজনিক। আমাদের দেশের কংগ্রেস সরকার দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও কতকগুলি দলীয় বাতিক কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। বৃহদায়তন ও স্বল্পায়তন শিল্পের মধ্যে শুধু উৎপাদন সীমানা নির্দ্ধারণ করিলেই চলিবে না—স্বল্পায়তন শিল্পের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নততর উৎপাদন প্রণালী, গবেষণার বন্দোবস্ত, বিক্রয়-সংস্থা স্থাপন প্রভৃতি প্রয়োজন। শুধু কুটীরশিল্পে দৃষ্টিভঙ্গী আবদ্ধ রাখিলে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির গতি নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে—যেমন ছিল এত দিন পর্য্যন্ত।

শিল্প বিবর্দ্ধন কর্পোরেশন

ভারতে শীঘ্রই একটি শিল্প বিবর্দ্ধন কর্পোরেশন সরকারী মূলধন লইয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে। পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশগুলিতে ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট নামক বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে যাহারা শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গোড়ার রচনা-কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। শিল্পোন্নতির সহায়ক হিসাবে প্রাথমিক রচনা কার্য্য অবশ্যই প্রয়োজনীয় এবং তাহার জন্য বিশেষ ধরণের মূলধন-সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। ভারতীয় ফাইন্যান্স কর্পোরেশন যখন প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন ইহা ঠিক ছিল যে, এই কর্পোরেশন প্রথম রচনা-কার্য্যে সহায়ক হইবে এবং সেই সংক্রান্ত ধারা ইহার সংবিধানে নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল, দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ না দিয়া ইহা কেবল মাত্র কার্য্যকরী মূলধন সরবরাহ করিতে লাগিল। গত বাৎসরিক সভায় ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান নূতন সংজ্ঞা দ্বারা ব্যাখ্যা করিলেন যে, ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের কাজ প্রাথমিক রচনা নয়, ইহার কাজ কার্য্যকরী মূলধন সরবরাহ করা। ভারত সরকার এই ব্যাখ্যা নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইলেন—যদিও ফাইন্যান্স কর্পোরেশন আইনের ২৩ (গ) ধারা অনুসারে পরিষ্কার নির্দ্দেশ দেওয়া আছে যে, কর্পোরেশন প্রাথমিক রচনা-কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবে। ভারতীয় কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলিই শিল্পসমূহকে কার্য্যকরী মূলধন দিয়া সাহায্য করে এবং সেই কার্য্যের জন্য ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের কোন প্রয়োজন ছিল না। এই কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক রচনা-কার্য্য সম্পাদন করা।

ভারতে প্রাথমিক রচনা-কার্য্যের জন্য প্রতিষ্ঠানের খুবই প্রয়োজন। প্রস্তাবিত শিল্প-বিবর্দ্ধন কর্পোরেশনের প্রধান কাজ হইবে প্রাথমিক রচনা। প্রতিষ্ঠানটি সর্ব্বতোভাবে সরকারী হইবে, যদিও ইহার বোর্ড অব ডিরেক্টারদের মধ্যে বেসরকারী প্রতিনিধি থাকিবেন। এই কর্পোরেশন ভারতের শিল্পোন্নতির গতি দ্রুত করিবে। ইহার মূলধন হইবে মাত্র এক কোটি টাকা এবং এই টাকার সবটাই ভারত সরকার দিবেন। কর্পোরেশন প্রাথমিক রচনা-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পরে সেই শিল্পের শেয়ার অংশ বিক্রয় করিয়া দিবে; কিংবা ইচ্ছা করিলে সরকার নিজেই বিশেষ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের অংশ নিজের অধিকারে রাখিতে পারেন এবং সেই সঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাও নিজেরা করিতে পারিবেন।

তবে প্রাথমিক লেখনীর দায়িত্ব অনেক এবং তাহাতে কিছু পরিমাণ বিপদের সম্ভাবনা আছে। কর্পোরেশন সাধারণতঃ সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যাপারেই সাহায্য করিবে; কিন্তু ব্যক্তিগত শিল্পপ্রতিষ্ঠান ব্যাপারেও সাহায্য করিতে পারেন। এবং এইখানেই ব্যক্তিগত স্বার্থের সহিত সরকারী স্বার্থের সঙ্ঘাত অবশ্যম্ভাবী। সরকারী মূলধন দ্বারা যেখানে প্রাথমিক রচনা-কার্য্য সম্পন্ন করা হইবে সেখানে সরকারের সর্ব্বৈব দায়িত্ব—যাহাতে প্রতিষ্ঠানটি চালু হয় এবং লাভজনক হয়, তাহা না হইলে সরকারী মূলধন বজায় থাকিবে না। এবং সেইজন্য প্রয়োজন হইলে ব্যক্তিগত শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা সরকারী কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিতে হইবে। তখনই শিল্পপতিরা চীৎকার করিবেন যে, তাঁহাদের স্বার্থ সরকার উপেক্ষা করিলেন এবং দেশে অর্থনৈতিক ব্যক্তিস্বাধীনতা রহিল না।

এই সঙ্ঘাত পরিহার করিতে হইলে প্রয়োজন যে, এই কর্পোরেশন শুধু সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যাপারেই সাহায্য করিবে। বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের সাহায্যে ও আমেরিকার মূলধনে যে আর একটি ডেভেলাপমেণ্ট কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হইবে তাহার উপরই প্রাথমিক রচনার ভার দেওয়া উচিত। সরকারী কর্পোরেশন সম্বন্ধে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে ইহাকে প্রাইভেট কোম্পানী হিসাবে রেজেষ্টারী করা হইবে। উদ্দেশ্য এই যে, ইহার দৈনন্দিন কাজের উপর ভারতীয় আইন-পরিষদের কোন কার্য্যকরী ক্ষমতা থাকিবে না। ইহার ভাল মন্দ দুইটি দিকই আছে। ভাল দিক এই যে, কর্পোরেশন নির্ব্বিবাদে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারিবে, আইন-পরিষদের দলীয় রাজনীতির সঙ্ঘাতে আসিবে না। কিন্তু মন্দ দিকটি এই যে, সরকারী অর্থের নির্ব্বিবাদে অপচয় হইবার সম্ভাবনা আছে। আর অডিট রিপোর্টে যদি দোষ দেয় তাহাতে ভাবিবার মত কিছু নাই। কারণ অডিট রিপোর্টে সরকারী অর্থের অপচয় ভারত-শাসনের একটি স্বাভাবিক ব্যাপার হিসাবেই সরকার তথা জনসাধারণের গা সহা হইয়া গিয়াছে।

বর্দ্ধমান হাসপাতালে অব্যবস্থা

৭ই শ্রাবণ সংখ্যা "দামোদর" পত্রিকায় বর্দ্ধমান ফ্রেজার হাসপাতালে রোগী ভর্ত্তি ও তাহাদের চিকিৎসাব্যাপারে চরম অবহেলা ও উদাসীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রিকাটির সংবাদে প্রকাশ যে, গত ১৭ই জুলাই সকাল ১০॥টার সময় জনৈক দরিদ্র গ্রামবাসী শ্রীঅনাথ চক্রবর্ত্তী তাহার দুই বৎসর বয়স্ক পুত্রকে ফ্রেজার হাসপাতালে ভর্ত্তি করেন। ছেলেটির রক্তবমি ও বাহ্য হইতেছিল এবং সেই সময়েই ছেলেটির নাড়ী প্রায় পাওয়া যাইতেছিল না।

উক্ত পত্রিকার সংবাদে আরও প্রকাশ, "শিশুকে যে সীট দেওয়া হয়, তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি শিশুকে মৃত অবস্থায় পড়িয়া

থাকিতে দেখা যায়। ইহাতে শিশুর পিতামাতা শঙ্কিত হইয়া পড়েন।"

প্রকাশ, উক্ত মৃত শিশুদ্বয় পূর্ব্বরাত্রি হইতে ঐরূপ অবস্থায় পড়িয়া ছিল এবং বেলা ১২টার সময় তাহাদের মৃতদেহ অপসারিত করা হয়।

কিন্তু রুগ্ন শিশুটির চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় তাহার পিতামাতা বেলা প্রায় ১টার সময় তাহাকে হাসপাতাল হইতে লইয়া গিয়া শহরে অন্য চিকিৎসকের নিকট যায়। কিন্তু সকল প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া শিশুটি পরদিন ভোরে মারা যায়।

পত্রিকাটির সংবাদদাতা হাসপাতালের অব্যবস্থার দৃষ্টান্তস্বরূপ আরও বলিতেছেন: "গত ৫ই জুলাই ১নং ওয়ার্ডের ৯নং রোগী রাত্রি ৯টায় মারা যায়, কিন্তু তাহার মৃতদেহ পরদিন বেলা ২টার সম উক্ত সিট হইতে অপসারিত হয়। উক্ত ওয়ার্ডের অন্যান্য রোগীরা ঘৃণা ও আতঙ্কে দিন যাপন করিতে বাধ্য হয়।"

এই শোচনীয় ঘটনার সমালোচনা করিয়া মন্তব্য প্রসঙ্গে "নূতন পত্রিকা" ১৩ই শ্রাবণ লিখিতেছেন: "শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্ত্তির তুই ঘণ্টা পরও কোন চিকিৎসক তাহাকে পরীক্ষা পর্য্যন্ত করিলেন না, কোনরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থাও পর্য্যন্ত হইল না। এই অবহেলার জন্য দায়ী কে?"

পত্রিকাটি বলিতেছেন যে, হাসপাতালে রোগীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের দৃষ্টান্ত এই একটি মাত্র নহে, ঔষধপথ্য, রোগীদের প্রতি ব্যবহার এবং নানারূপ দুর্নীতিমূলক ব্যাপারে জনসাধারণের অভিযোগের অন্ত নাই। এই সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলা হইয়াছে, "আমরা আশা করি কর্তৃপক্ষ উল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কে যথাবিহিত তদন্ত করিয়া জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে তাহা প্রকাশ করিবেন।"

উক্ত হাসপাতালে দুর্নীতি যে কত ব্যাপক ৩০শে জুলাইয়ের অপর এক সংবাদে "দামোদর" পত্রিকা তাহা প্রকাশ করিয়া লিখিতেছেন, রোগীদিগকে অধিকাংশ দিনই পাউডার গোলা দুধ খাওয়ান হয়, যদিও হাসপাতালের মধ্যে মহিষ রহিয়াছে। রোগীদিগকে যে চাউল খাইতে দেওয়া হয় তাহা নাকি বাজারের সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।

পত্রিকার সংবাদদাতা লিখিতেছেন, হাসপাতালের মহিষগুলিকে নাকি অন্ধকারে দোহন করা হয়। "অন্ধকারের সময় যে বালতিতে দুধ দোহন করা হয় তাহাতে পূর্ব্ব হইতে কিছুটা করিয়া জল রাখা হয় এবং তাহার উপরেই দুধ দোহন করা হয়। সাধারণভাবে যে দুধ হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়, তাহাতে প্রতি বেলায় প্রায় মণ হিসাবে জল মিশানো হয়। ঐ দুধের মণ বর্ত্তমানে ৩০্ টাকা হিসাবে দেওয়া হয়। প্রকাশ, ঠিকাদারকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের প্রত্যেককে, এমনকি দারোয়ানদিগকেও বিনা পয়সায় খাঁটি দুধ দিতে হয়।"

"দামোদর" পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলী নিজেরা রোগীদিগকে প্রদত্ত চাউলের নমুনা হইতে দেখিয়াছেন যে, তাহা বা[illegible] সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। "হাসপাতালের রোগীদের জন্য [illegible]কেন্দ্রের জন্য যে সরিষার তৈল সরবরাহ করা হয় তাহা একরূপ নহে। পূর্ব্বের একটি হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, যখন নার্সদের জন্য ২্ টাকা সেরের তৈল সরবরাহ করা হইত সেই সময় রোগীদের জন্য ১৷০ টাকা সেরের তৈল দেওয়া হয়। বর্ত্তমানেও একই ব্যবস্থা চলিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।"

এই সকল অভিযোগের অবিলম্বে তদন্ত করিয়া সত্যমিথ্যা নিরূপণ আশু প্রয়োজন। বর্দ্ধমান হাসপাতালে অব্যবস্থা সম্পর্কে প্রায়ই বহু সংবাদ আমাদের গোচরে আসে। আমরা পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

বৰ্দ্ধমানে মেডিক্যাল কলেজ

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার জানাইয়া দিয়াছেন যে, বর্দ্ধমানে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের পক্ষপাতী তাঁহারা নহেন। সরকারের এই সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনার আবেদন জানাইয়া "দামোদর" পত্রিকায় পরপর কয়েকটি সংখ্যায় কলেজ স্থাপনের যুক্তির সমর্থনে একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধটিতে বলা হইয়াছে যে, বাঁকুড়ায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হওয়ায় বর্দ্ধমানে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার যুক্তির সারবত্তা প্রমাণিত হইয়াছে।

বর্দ্ধমান মেডিক্যাল স্কুলের শেষ ছাত্রদল এই বৎসর পরীক্ষার পর চলিয়া গেলে স্কুলটি একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক ও ছাত্রদিগের সেবা ও সাহায্যে বর্দ্ধমান জেলার হাসপাতালের যেটুকু কর্ম্মদক্ষতা এবং সুনাম ছিল তাহাও ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইবে, কারণ পূর্ব্বের ন্যায় এখন হইতে স্কুলের প্রয়োজনের জন্য জেলার বাহির হইতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আনা হইবে না।

প্রবন্ধটিতে বিস্তৃত আলোচনার সাহায্যে দেখান হইয়াছে যে, চিকিৎসাশাস্ত্রের তিনটি বিভাগ (১) মেডিসিন অর্থাৎ রোগনির্ণয় ও তাহার চিকিৎসা, (২) সার্জ্জারী অর্থাৎ শল্য চিকিৎসা এবং (৩) মিডওয়াইফারী বা ধাত্রীবিদ্যা—এই তিনটি বিভাগ যথাযোগ্যরূপে পরিচালিত করিতে পারেন এরূপ শিক্ষক বর্দ্ধমান মেডিক্যাল স্কুলে ছিলেন বা আছেন। স্কুলের অনেক শিক্ষকই বর্ত্তমানে কলিকাতার স্যার নীলরতন সরকার কলেজে অধ্যাপনা করিতেছেন। তাহা ছাড়া বর্দ্ধমানে বড় বড় ডাক্তারদের পসারেরও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আছে যেজন্য অনেক বড় ডাক্তারই বর্ত্তমানে বর্দ্ধমান ছাড়িয়া যাইতে বিশেষ সম্মত নহেন।

'কলেজ-ভবনের' সমস্যাও অপেক্ষাকৃত সরল। বর্ত্তমান মেডিক্যাল স্কুল ভবনটিকে সামান্য বর্দ্ধিত করিলেই কলেজের উপযোগী স্থান সঙ্কুলান হইবে। তাহা ছাড়া মেডিক্যাল ছাত্রদের জন্য বর্দ্ধমান স্কুলের নিজস্ব ছাত্রাবাস ত রহিয়াছেই। প্রয়োজন হইলে সরকার অধিকৃত অদূরবর্ত্তী বিস্তীর্ণ বর্দ্ধমান রাজের সুরম্য গোলাপবাগকে এজন্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। বর্দ্ধমানে নার্সদের শিক্ষণ-

...হওয়ায় তাহাদের জন্য বিরাট আবাসগৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। অতএব ...সেই ইমারত সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

শিক্ষার সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সম্বন্ধেও বিশেষ অসুবিধা হওয়ার কারণ নাই। কলিকাতার বাহিরে মফঃস্বল মেডিক্যাল স্কুলগুলির মধ্যে বর্দ্ধমানের মেডিক্যাল স্কুলটির সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি শ্রেষ্ঠ; সেগুলিকে সামান্য পরিমাণে বৃদ্ধি করিলেই কাজ চলিবার মত হইবে। বাঁকুড়া কলেজের জন্য সকল যন্ত্রপাতিই নূতন কিনিতে হইবে; কিন্তু বর্দ্ধমানকে তাহা করিতে হইবে না।

উক্ত প্রবন্ধে আরও বলা হইয়াছে যে, মেডিক্যাল কলেজের উপযুক্ত সুবৃহৎ হাসপাতাল মফঃস্বলের মধ্যে একমাত্র বর্দ্ধমানেই আছে। হাসপাতালের প্রকাণ্ড ত্রিতল বাটীতে বর্ত্তমানে বর্দ্ধমান, হুগলী, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং বিহারের মানভূম ও সাঁওতাল পরগণা জেলার রোগীরা চিকিৎসালাভের সুযোগ পায়। হাসপাতাল-ভবনকে সামান্য বিস্তৃত করিলেই কাজ চলিবে এবং ছাত্রদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য কোন শ্রেণীরই রোগীর অভাব হইবে না।

সর্ব্বশেষে বর্দ্ধমানে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে পল্লী-অঞ্চলের দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের মধ্য হইতে প্রতিভাবান ছাত্রদের পক্ষে ডাক্তারী পড়া সাধ্যায়ত্ত হইবে; যাহাদের পক্ষে কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে অবস্থানের ব্যয়বহন সম্ভব নহে তাহারা অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে বর্দ্ধমানে পড়াশুনা করিতে পারিবে। "পল্লী-অঞ্চলের ছাত্ররা শিক্ষালাভের সুযোগ পাইলে নিভৃত পল্লী-অঞ্চলে তাহারাই থাকিবে। ধনী ও শহরে লালিত-পালিত ছাত্রগণ চিকিৎসা বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া পল্লী-অঞ্চলে যাইবে না।"

আমরা বর্দ্ধমানের কলেজের সপক্ষে সবই মানিতে রাজী, কিন্তু বাঁকুড়ার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন কেন?

বাঁকুড়ায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন সম্পর্কে "দামোদর" যাহা বলিয়াছেন তাহা ভুল। সেখানেও মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনে সরকারী বাধা চলিতেছে। বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমানে কলেজ হইলে নাকি এতই ডাক্তারের ছড়াছড়ি হইবে যে কলিকাতার ডাক্তারেরা বেকার হইয়া পড়িবেন। এদিকে গ্রামে ও জেলায় ডাক্তারের অভাব!

বাঁকুড়া সদর হাসপাতাল সম্পর্কে অভিযোগ

বাঁকুড়া সদর হাসপাতালে রোগীদের প্রতি অবহেলার অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে "শ্রীদুর্মুখ" লিখিতেছেন যে, রোগীদের হাসপাতালে ভর্ত্তি করার ব্যাপারে যথেচ্ছ ঔদাসীন্য দেখান হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নাকি সীট থাকা সত্ত্বেও রোগীকে ভর্ত্তি করিতে অনর্থক ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেরী করা হয়। দুই-একটি ক্ষেত্রে রোগীকে প্রত্যাখ্যানও করা হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহার ক্ষেত্রবিশেষে আপত্তিজনক হইয়া দাঁড়ায়! তিনি এই সকল অভিযোগের প্রতি সিবিল-সার্জ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লিখিতেছেন, "এই সমস্ত অভিযোগের পশ্চাতে কৈফিয়ৎ যাই থাকুক না কেন লোকে সেগুলি শোনা অপেক্ষা প্রতিকারই অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করে।"

তিন বৎসরের উপর হইয়া গেল, পশ্চিমবঙ্গের কর্ত্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, বাঁকুড়ায় পাঁচ শত রোগীর শয্যাযুক্ত হাসপাতাল তাঁহারা চালু করিয়া দিবেন। আজও সেই আকাশকুসুমই বাঁকুড়াবাসীর সম্মুখে রাখা হইতেছে।

বাঁকুড়ার গ্রামাঞ্চলে অনাহারে মৃত্যু

পাক্ষিক "হিন্দুবাণী"র ২৫শে শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায় যে, বাঁকুড়া জেলার তালডাংরা থানা অঞ্চলে ধান চাউলের দর অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐ অঞ্চলের বহু দরিদ্র অধিবাসী অনাহারে এবং ঘাস-পাতা প্রভৃতি দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিয়া জীবনধারণ করিতেছে। উক্ত সংবাদে আরও প্রকাশ যে, ঐ থানার অন্তর্গত রাধামোহনপুর গ্রামের দামিনী খয়রানী নাম্নী জনৈকা স্ত্রীলোক নাকি গত ১২ই শ্রাবণ অনাহারে মারা গিয়াছে। উক্ত স্ত্রীলোকটি নাকি কিছুদিন যাবৎ কাজ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া নানা রকম শাকপাতা খাইয়া দিন কাটাইতেছিল। অনাবৃষ্টির ফলে গ্রামবাসীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হওয়ায় তাহাদের নিকট হইতেও সে কোন সাহায্য পায় নাই।

বাঁকুড়া মহকুমা হিন্দু-মহাসভার সম্পাদক শ্রীশক্তিপদ বরাট ২২শে শ্রাবণ উক্ত গ্রাম পরিদর্শন করিয়া গ্রামবাসীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উক্ত স্ত্রীলোকের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করেন। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে এক বিবৃতি মারফত তিনি জানাইতেছেন যে, স্ত্রীলোকটি প্রকৃতই অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তিনি বলেন, "ধান-চালের দাম বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় চাষীরা অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াও ধান-চাল কিনিতে পাইতেছে না। শ্রমজীবীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কৃষিঋণ এবং রিলিফের ব্যবস্থা না হইলে অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিবে।"

"হিন্দুবাণী"র উক্ত সংখ্যার অপর এক সংবাদে প্রকাশ যে, বাঁকুড়া জেলার সর্ব্বত্র অনাবৃষ্টির ফলে আগামী শস্যের অবস্থা অনিশ্চিত হওয়ায় প্রতিদিন ধান-চাউলের দর বাড়িয়া যাইতেছে। নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা প্রত্যাহারের সময় চাউলের দর ছিল বার-তের টাকা মণ; তাহা বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমানে সতর-আঠার টাকায় উঠিয়াছে। বড় বড় ব্যবসায়ীরা নাকি এই অবস্থার সুযোগ লইয়া চাউল মজুত করিতেছেন। সরকার আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, চাউলের মূল্যবৃদ্ধি হইতে দিবেন না; বর্ত্তমানে চাউলের দর দেড় গুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই প্রতিশ্রুতি পালনের সময় আসিয়াছে।

উক্ত সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, বাঁকুড়ার খাদ্যবিভাগের হাতে প্রায় এক লক্ষ মণ চাউল মজুত আছে। জেলার চাষীদের কাছেও ধান-চাউলের অভাব নাই, কিন্তু ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার দরুন তাঁহারা ধান-চাউল বিক্রয় করিতেছেন না। এমতাবস্থায় যাহাতে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাহিরে না চলিয়া যায় সেজন্য সরকারকে তৎপর হইয়া অবিলম্বে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ধান-চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবার অনুরোধ করা হইয়াছে।

জঙ্গীপুর মহকুমায় ডাক-চলাচলে অব্যবস্থা

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর ও রঘুনাথগঞ্জ পোষ্ট-আপিসে কলিকাতা হইতে আগত ডাক বিলি এবং তথা হইতে কলিকাতায় প্রেরিত চিঠিপত্রাদি যাওয়ায় যে অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটে এবং তাহার ফলে জনসাধারণকে যে অসুবিধা ভোগ করিতে হয় ২০শে শ্রাবণ "ভারতী" পত্রিকায় এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে তৎপ্রতি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। কলিকাতা হইতে বিকাল সাড়ে তিনটায় যে সকল চিঠি আসিয়া পৌঁছায় তাহা বিলি হয় পরদিন বেলা দশটার সময়। কলিকাতাগামী ডাক স্থানীয় পোষ্ট-আপিসে চব্বিশ ঘণ্টা পড়িয়া থাকে এবং পরদিন ট্রেনে যায়।

"ভারতী" লিখিতেছেন, "যাহাতে চিঠিপত্র তাড়াতাড়ি বিলি হয় ভারত-সরকার তজ্জন্য গ্রামাঞ্চলেও পোষ্ট-আপিস স্থাপন করিয়াছেন এবং কলিকাতা সহরে ভ্রাম্যমাণ পোষ্ট-আপিস চালু করার ব্যবস্থাও করিতেছেন। অথচ জঙ্গীপুরের মত একটি মহকুমা সহরে ১৫।১৬ ঘণ্টা ধরিয়া চিঠিপত্র বিলি না হইয়া পড়িয়া থাকায় এই অঞ্চলের জনসাধারণের বিশেষতঃ ব্যবসাদারদের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। অনেক সময় জঙ্গীপুর পোষ্ট-আপিস বলিয়া রঘুনাথগঞ্জের চিঠি আসিলে আরও ২৪ ঘণ্টা পরে সেই সব চিঠি বিলি হয়; অথচ পোষ্ট-আপিস দুইটি নদীর ঠিক এপার, ওপারে অবস্থিত।...আবার টেলিগ্রামও এখান হইতে পাকুড় ঘুরিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা থাকায় ইহাও চিঠির পর্য্যায়ে দাঁড়াইয়াছে..."

জঙ্গীপুর মহকুমায় স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ফলাফল

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও মালদহ এই দুইটি জেলা শিক্ষা-ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর। বর্ত্তমান বৎসরে যে স্থলে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় শতকরা ৫৬.৫৭ ভাগ ছাত্র পাস করিয়াছে, মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর মহকুমা কেন্দ্র হইতে সে স্থলে মাত্র শতকরা চল্লিশ জন ছাত্র পাস করিয়াছে। মেয়েদের ফলই অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছে।

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় জঙ্গীপুর মহকুমার ছাত্রগণ যে ফলাফল দেখাইয়াছে তাহাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া "ভারতী" ৩০শে আষাঢ় এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন যে, কেবলমাত্র শিক্ষক ও ছাত্রদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিয়া এই অবস্থার উন্নতি সম্ভব নহে। প্রধানতঃ কৃষিজীবী অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলায় শিক্ষার সুযোগও এতদিন বিশেষ ছিল না। বিশেষতঃ গ্রামবহুল জঙ্গীপুর মহকুমায় স্কুল বলিতে জঙ্গীপুর, নিমতিতা, কাঞ্চনতলা ও বাড়ালা হাই স্কুল ব্যতীত আর কোন স্কুলই ছিল না। অন্যান্য বিদ্যালয়-গুলি স্বাধীনতার পর গড়িয়া উঠিয়াছে। উপরন্তু যাহারা পড়শুনা করিত তাহারাও ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিবার পর সাধারণতঃ আর অগ্রসর হইত না; পড়াশুনা ছাড়িয়া গ্রামে গিয়া জমিজমা দেখাশুনা, প্রয়োজন হইলে গোমস্তাগিরি কিংবা গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকতা করিয়া বাকী জীবন কাটাইয়া দিত। পত্রিকাটির অভিমতে "মহকুমায় শিক্ষার প্রধান অন্তরায় জমিজমার উপর নির্ভরশীল অলস অনায়াসলব্ধ (?) জীবনযাত্রা।"

"ভারতী" লিখিতেছেন, শিক্ষার উন্নতি করিতে হইলে জীবন-ধারণের উপযুক্ত বেতন দিয়া যোগ্য মেধাবী ছাত্রদিগকে শিক্ষকতার প্রতি আকৃষ্ট করিতে হইবে এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ ও সুস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করিতে হইবে। স্কুল কমিটিগুলিকেও অনেক ক্ষেত্রে সংস্কার করা প্রয়োজন। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সভ্যগণ বিদ্যালয়ের উন্নতির কথা চিন্তা না করিয়া নিজ নিজ দল ভারী করিতেই ব্যাপৃত থাকেন। বিদ্যালয়-গুলিতে প্রশস্ততর স্থান সঙ্কুলান করা আশু প্রয়োজনগুলির অন্যতম। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে উপযুক্ত সংখ্যক ঘর নাই; অধিক ছাত্র এক ক্লাসে গাদাগাদি করিয়া বসায় পড়াশুনার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে।

জঙ্গীপুর মহকুমার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ফলাফল হইতে আর একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য জানা যায়; তাহা হইতেছে এই যে বুদ্ধি-জীবীদের ছেলেরাই অধিক হারে ফেল করিতেছে। পত্রিকাটি লিখিতেছেন যে, শিক্ষিত অভিভাবকেরা নিজেরা দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রহণ না করিলে এই ক্রমাবনতি রোধ করা সহজসাধ্য হইবে না।

উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের পরিস্থিতি (NEFA)

আসাম রাজ্যের পার্ব্বত্য অঞ্চলের আট লক্ষ অধিবাসী সহ তেত্রিশ হাজার বর্গমাইল লইয়া উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত এজেন্সী (NEFA) গঠিত। ভারত-সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন এই এজেন্সী ছয় ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেকটি ভাগের ভার ন্যস্ত রহিয়াছে এক জন করিয়া পলিটিক্যাল অফিসারের উপর। ইহাদের ক্ষমতা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অপেক্ষাও অনেক বেশী। এই ছয় জন পলিটিক্যাল অফিসারের সহিত সতর জন সহকারী পলিটিক্যাল অফিসার আছেন। আসামের রাজ্যপাল ভারত-সরকারের এজেন্ট রূপে নিজে এই অঞ্চল শাসন করেন।

১৯৪৭ সনের পূর্ব্বে এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের অতি অল্প অংশই ভারত-সরকারের নিয়মিত শাসন-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; এবং এই অঞ্চলের অভ্যন্তর ভাগেও শাসনযন্ত্রের বিস্তার হইয়াছে এবং শিক্ষা, চিকিৎসা-সাহায্য, কৃষি, যোগাযোগ প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কাজের প্রসার হইয়াছে। ১৯৪৭ সনে যে-স্থলে মাত্র পাঁচ হাজার বর্গমাইল পরিমিত স্থানে নিয়মিত শাসন-ব্যবস্থা চালু ছিল বর্ত্তমানে সে-স্থলে পঁচিশ হাজার বর্গমাইল স্থান নিয়মিত শাসন-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবই এই অঞ্চলের প্রধান সমস্যা। সেইজন্য সরকার রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের দিকেই প্রথমে মনোনিবেশ করেন; ফলে বর্ত্তমানে তিন শত মাইল রাস্তা নির্ম্মাণ সম্পন্ন হইয়াছে। ১৯৫৬ সনের মধ্যে দুই হাজার মাইল রাস্তা নির্ম্মাণের পরিকল্পনা রহিয়াছে।

অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা কৃষিকার্য্য। কৃষির উন্নতিকল্পে সেখানে স্থায়ীভাবে ধান-চাষের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; অর্থকরী

... চাষও আরম্ভ হইয়াছে। উপজাতীয়দের কুটীর-শিল্পের উন্নতি... বিধ-ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। ভূমি উন্নয়নের জন্ম সরকার আজ পর্যান্ত পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

এই অঞ্চলের উন্নয়নকল্পে সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তিন কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। উক্ত কার্য্য আশানুরূপ হইতেছে। বর্তমানে ঐ অঞ্চলে ১৮টি হাসপাতাল, ৪৪টী ডিসপেনসারী, ২৫টি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয় এবং ৩০টি চিকিৎসা-কেন্দ্র আছে।

বর্ত্তমানে ঐ অঞ্চলের ১৭০টি বিদ্যালয়ে ৬৫০০ উপজাতীয় বালক ও বালিকা অধ্যয়ন করিতেছে। উপজাতীয়দিগকে তাহাদের মাতৃভাষা এবং হিন্দী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। যোগ্য ছাত্রদিগকে সরকারী তহবিল হইতে বিনামূল্যে পুস্তক, খাদ্য ও বস্ত্র সরবরাহ করা হয়।

১৫ই স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রচারিত একটি বিশেষ সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উপরোক্ত তথ্যাদি দিয়া বলা হইয়াছে যে, উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে উপজাতীয়দের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যাহাতে কাজ খুব ভাল হয় তজ্জন্য ভারত-সরকার বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ মিঃ ভেরিয়ার এল্‌উইনকে উপজাতীয় বিষয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা নিযুক্ত করিয়াছেন।

'সরকারী কাজেও উপজাতীয়গণকে লওয়া হইতেছে। একজন পলিটিক্যাল অফিসার এবং ছয় জন সহকারী পলিটিক্যাল অফিসার উপজাতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সম্প্রতি কুমারী হারালু নামক একজন স্থানীয় শিক্ষিতা মহিলাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতি তর্পণে বাধা

৯ই জুলাই সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রসঙ্গে আসামের 'ক্রনিকল' পত্রিকা দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিতেছেন যে, হাইলাকান্দি সরকারী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ কেন যে ছাত্রগণ কর্ত্তৃক শ্যামাপ্রসাদের স্মৃতিতর্পণে বাধা দিয়াছেন তাহা তাঁহাদের বুদ্ধির অগম্য। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে এরূপ আচরণ করিতে পারেন তাহাতে তাঁহারা বিস্মিত হইয়াছেন। ইহা কি শিক্ষা, না অদৃষ্টের পরিহাস?

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহের আসাম ভ্রমণের জের

সাপ্তাহিক "যুগশক্তি"র ৬ই আগষ্ট সংখ্যার এক সংবাদে প্রকাশ, আসাম ভ্রমণকালে ভারত-সরকারের অর্থদপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহের কয়েকটি মন্তব্য এবং করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্মেলন সম্পর্কে আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর নিকট এক পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রে নাকি অভিযোগ করা হয় যে, আসামের সংহতি নাশের উদ্দেশ্যেই করিমগঞ্জে বাংলা-সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারত-সরকারের একজন মন্ত্রী হইয়া শ্রীগুহ এতৎসম্পর্কিত আন্দোলনে উৎসাহ দিয়াছেন বলিয়াও নাকি অভিযোগ কর হইয়াছিল।

"প্রকাশ, শ্রীনেহরু শ্রীগুহকে এই পত্রের কথা জানাইলে শ্রীগুহ বলেন, এই সম্মেলন নিছক একটি বাংলা সাহিত্য সম্মেলন। নূতন রাজ্যগঠনের সহিত ইহার কোনই সম্পর্ক নাই। সম্মেলনে গৃহীত ১১টি প্রস্তাবের একটিতেও রাজ্যগঠনের দাবীর উল্লেখ নাই।"

প্রস্তাবাদিতে বাংলা ভাষা সম্পর্কে আসাম সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে। [গত সংখ্যা প্রবাসীতে প্রস্তাবগুলির সারমর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছিল—স. প্র.]

শ্রীনেহরু শ্রীগুহের উত্তরে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে এবং সেখানেই ব্যাপারটির নিষ্পত্তি হইয়াছে।

শ্রীমেধীর অভিযোগ-পত্র সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে "যুগশক্তি" লিখিতেছেন যে, আসামের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট হইতে এই ধরণের অভিযোগ আসিতে পারে তাহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত আসাম-ত্রিপুরা-মণিপুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া ভারতের নেতৃস্থানীয় বহু ব্যক্তিই (তন্মধ্যে ভারত-সরকারের মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সেক্রেটারী, হাইকোর্টের বিচারপতি প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিও আছেন) শুভেচ্ছা বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। একমাত্র আসাম জাতীয় মহাসভার নেতা শ্রীঅম্বিকাগিরি রায় চৌধুরী ব্যতীত আর কেহই এরূপ কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, এই সম্মেলন জাতীয় সংহতির বিরোধী। গৌহাটি হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী ডেকা তাঁহার বাণীতে এইরূপ আশা প্রকাশ করেন যে, প্রদেশের জনসাধারণের সৌহার্দ্দ্য প্রসারে উক্ত সম্মেলন সহায়ক হইবে। বস্তুতঃ দেখা যায়, সম্মেলনে গৃহীত অন্যতম প্রস্তাবানুযায়ী যে স্থায়ী সংস্থা গঠিত হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য আসাম-ত্রিপুরা-মণিপুর এলাকায় বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টি ও বিকাশ সাধন এবং এই অঞ্চলের অন্যান্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও ভাবের আদান-প্রদান দৃঢ়ীকরণ। এমতাবস্থায় আসামের মুখ্যমন্ত্রীর গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত শ্রীমেধী করিমগঞ্জের সম্মেলন সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই সম্মেলন উদ্বোধন করার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্যের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন তাহা সঙ্গত বা শোভন হয় নাই বলিয়াই আমরা মনে করি।" (২১শে শ্রাবণ)

ভারতের খাদ্যসমস্যার সমাধান

ভারতের খাদ্যসমস্যার সমাধান এবং খাদ্যবিনিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টায় সরকারী সাফল্য সম্পর্কে একটি বিশেষ প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাদ্যোৎপাদন আশাতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৫-৫৬ সনের মধ্যে ভারতে খাদ্যোৎপাদন ৭৬ লক্ষ টন বৃদ্ধির কথা ছিল; কিন্তু সুখের বিষয় ১৯৫৩-৫৪ সনের মধ্যেই ৯৫ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সনের তুলনায় ১৯৫৩-৫৪ সনে ভারতে খাদ্যোৎপাদন শতকরা ৩৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধান, গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে যথাক্রমে, শতকরা ৩৪, ১২'৫ ও ৪১ হারে।

১৯৪৩ সন হইতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে রেশনিং প্রথা চালু

হয় এবং ১৯৫১ সনের ১লা এপ্রিল তারিখে রেশনিং ব্যবস্থার অধীন লোকের সংখ্যা দাঁড়ায় এক কোটি বাইশ লক্ষ। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ সুরু হয় ১৯৫১ সন হইতে। কিন্তু ১৯৫০ সনে দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যা ও নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে দেশে খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ নিতান্ত হ্রাস পায়। বিদেশ হইতে প্রচুর খাদ্যশস্য আমদানী করিয়াও খাদ্যের ঘাটতি এবং মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত বিভিন্ন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ায় ১৯৫২ সন হইতে খাদ্য-সমস্যার মোড় ঘুরিতে আরম্ভ করে। ১৯৫২-৫৩ সনে দেশে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ না দেখা দেওয়ায় খাদ্য ঘাটতি দূর হয় এবং ঐ বৎসরেরই জুন মাসে মাদ্রাজ হইতে রেশনিং প্রথা প্রত্যাহৃত হয়।

মাদ্রাজের নীতির ক্রমান্বয়ে সাফল্যের ফলে অন্যান্য প্রদেশ হইতেও রেশনিং ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হইতে থাকে। ১৯৫৩ সনের ২৩শে মার্চ কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রী রফি আহমেদ কিদোয়াই বোম্বাইয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্যসমস্যার আশু সমাধানের ইঙ্গিত জানান।

১৯৫৩-৫৪ সনে দেশে পর্য্যাপ্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হওয়ায় খাদ্যমূল্য দ্রুত হ্রাস পাইতে থাকে। ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে গমের পরিমাণমূলক বাধানিষেধসমূহ প্রত্যাহৃত হয় এবং নবেম্বর মাসে ভারতের সকল রাজ্যে গম ও অন্যান্য মোটাদানার শস্য বিনিয়ন্ত্রিত করা হয়। তবে অবশ্য ঐগুলির রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে সরবরাহ সম্পর্কে কিছু কড়াকড়ি থাকে। খাদ্যমূল্যের ক্রমশঃ নিম্নগতি দেখিয়া ১৯৫৪ সনের জানুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় সরকার গমের আন্তঃ-রাজ্য চলাচলের উপর বিধিনিষেধ রহিত করেন। অবশেষে ১০ই জুলাই ভারতের সর্ব্বত্র চাউলের নিয়ন্ত্রণও তুলিয়া লওয়া হয়।

১৯৫১ সনে বিদেশ হইতে ভারতে ৪৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে বাৎসরিক ৩০ লক্ষ টন বিদেশী খাদ্যশস্য আমদানীর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ১৯৫৩ সনে তৎস্থলে মাত্র ২০ লক্ষ টন আমদানী করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরের জুন মাস পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে প্রায় এক লক্ষ ৬৫ হাজার টন খাদ্যশস্য আমদানী করা হইয়াছে—তবে উহা চলতি বৎসরের জন্য ব্যয় করিতে হইবে না—ভবিষ্যতের জন্য মজুত রাখা হইবে।

ইতিমধ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যশস্যের মূল্যমানও হ্রাস পায়। ১৯৩৯ সনের আগষ্ট মাসের তুলনায় ১৯৫০ সনের অক্টোবর ও ১৯৫৪ সনের জুলাই মাসে ভারতে খাদ্যবস্তুর পাইকারী মূল্যমান ছিল যথাক্রমে ৪৯৫ এবং ৩৭৭.৩।

ভারতের ডাকঘর

একটি সরকারী বিবৃতি হইতে জানা যায়, ভারতে বর্ত্তমানে ৪০ হাজার ডাকঘর রহিয়াছে। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট মোট ডাকঘরের সংখ্যা ছিল ১৮,১২১। দুই হাজার অধিবাসী সমন্বিত প্রতিটি গ্রামে ডাকঘর খুলিবার রূপায়ণে ডাক-বিভাগ সাফল্যলাভ করিয়াছে। যে সকল গ্রামের লোকসংখ্যা অন্যূন পাঁচশত সেখানে সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করিয়া ডাক বিলি করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নূতন ডাকঘরগুলি এমনভাবে স্থাপন করা হইবে যেন ডাকঘরে যাইতে পাঁচ মাইলের বেশী পথ হাঁটিতে না হয়। নূতন নীতির আরও একটি দিক হইল এই যে, প্রতি তহশীল, তালুক ও থানার সদরে একটি করিয়া ডাকঘর স্থাপন করা হইবে। তবে বৎসরে ডাকঘর পিছু ক্ষতি ৭৫০৲ টাকার বেশী হইলে চলিবে না। অনুন্নত অঞ্চলে ইহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারিবে। আসামের সীমান্ত অঞ্চল ও পার্ব্বত্য অঞ্চল, ত্রিপুরা, ছোটনাগপুর সাঁওতাল পরগণা, হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান, বিন্ধ্যপ্রদেশ, কচ্ছ, বোম্বাইয়ের ব্রোচ জেলা, উত্তর-প্রদেশের তেহরি-গাড়োয়াল, সিকিম ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এইরূপ অনুন্নত অঞ্চল বলিয়া গণ্য হইবে।

এই নূতন নীতি অনুযায়ী ১৯৫৬ সনের ৩১শে মার্চের মধ্যে ১০,১৩৫টি ডাকঘর স্থাপন করা যাইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। তাহার মধ্যে ৪১৩টি হইবে অনুন্নত অঞ্চলের ডাকঘর। ১৯৫৬ সনে ভারতের প্রতি ২২ বর্গমাইলে একটি করিয়া ডাকঘর থাকিবে, ১৯৫২ সনে প্রতি ২৮ বর্গমাইলে একটি করিয়া ডাকঘর ছিল। ১৯৫৬ সনে ভারতে মোট ডাকঘরের সংখ্যা দাঁড়াইবে ৪৬,৬৩৯।

মেদিনীপুরের রাস্তা-ঘাটের দুরবস্থা

১লা শ্রাবণ এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে "মেদিনীপুর পত্রিকা" মেদিনীপুর জেলার রাস্তা-ঘাটের চরম দুরবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন যে, যদিও সরকারী প্রচার-বিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত তথ্য হইতে দেখা যায়, ঐ জেলায় দুই কোটিরও অধিক অর্থব্যয় হইতেছে, তথাপি সাধারণ লোক কিন্তু এই অসাধারণ প্রচেষ্টার কোন পরিচয় পায় নাই। পত্রিকাটির অভিমতে জেলার প্রয়োজনীয়তার সামগ্রিক দিকের প্রতি নজর না দিয়া কোন ব্যক্তিবিশেষ, গোষ্ঠিবিশেষ বা দলবিশেষের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার দিকে ঝোঁক রাখিয়া কাজ করিলে এইরূপ অবস্থা ঘটাই স্বাভাবিক।

উপসংহারে "মেদিনীপুর পত্রিকা" লিখিতেছেন, "আমরা সমগ্র জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে সর্ব্বপ্রকার রাস্তা-ঘাট সম্বন্ধীয় অভাব অভিযোগ আহ্বান করিতেছি। সমগ্রভাবে একটি পরিকল্পনা সরকারের নিকট পেশ করিয়া 'প্রায়রিটি' সম্পর্কে একটি যুক্তিসহ নিরপেক্ষ দাবি এই অব্যবস্থার প্রতিকারের একমাত্র উপায় সে সম্বন্ধে সকলকেই অবহিত হইবার জন্য এবং সর্ব্বপ্রকারে দাস-মনোভাব মুক্ত হইবার জন্য আহ্বান জানাইতেছি।"

কলিকাতায় রাষ্ট্রীয় পরিবহন

পশ্চিমবঙ্গের পরিবহন বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেল শ্রী জে. এন. তালুকদার, আই-সি-এস, সাপ্তাহিক "পশ্চিমবঙ্গ" পত্রিকায় এক প্রবন্ধে রাজ্যের যানবাহন-ব্যবস্থায় সরকারী প্রচেষ্টার একটি বিবরণী-প্রসঙ্গে লিখিতেছেন যে, জনসাধারণের স্বার্থের কথা চিন্তা

করিয়াই সরকার পরিবহন-ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমানে ভাবে যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা সরকারী কর্ম্মপ্রচেষ্টার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে, আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে কলিকাতা নগরীর সকল রুটে বাস চলাচলের ভার সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন। শ্রীতালুকদার লিখিতেছেন যে, সরকার দুইটি উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছেন: (১) দেশের যুবকদের জন্য নূতন কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা; এবং (২) কলিকাতার নাগরিকদের জন্য ভারতের প্রধানতম নগরীর উপযুক্ত যানবাহন-ব্যবস্থার প্রচলন করা। রাষ্ট্রীয় পরিবহন-সংস্থাকে তাই কেবলমাত্র ব্যবসায় সংস্থা হিসাবে না দেখিয়া এবং কেবলমাত্র লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে উহার অস্তিত্বের সমালোচনা না করিয়া উপরোক্ত দুইটি উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করিবার জন্য তিনি অনুরোধ জানাইয়াছেন।

কলিকাতার মহানগরীর যানবাহন সমস্যার কথা আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীতালুকদার লিখিতেছেন, গত ২০ বৎসরের মধ্যে কলিকাতার লোকসংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ক্রমেই অধিকতর সংখ্যায় যানবাহনের প্রচলন হইতেছে, অথচ নগরীর আয়তন সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই। উপরন্তু কলিকাতা নগরীর ন্যায় দ্রুতগামী ও মন্দগামী যানবাহনের এত বিচিত্র সমাবেশ অনুরূপ কোন নগরে দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্তমানে কলিকাতায় প্রায় ৫৫,০০০ দ্রুতগামী এবং ১৮,০০০ মন্দগামী যান রহিয়াছে। তাহার উপর আবার নগরীর বাহির হইতে প্রত্যহ ২,২৫,০০০ ডেলি প্যাসেঞ্জারের আগমনের ফলে নগরীর যানবাহন-ব্যবস্থার উপরে অসম্ভব চাপ পড়িয়াছে।

এতদিন পর্যন্ত যানবাহন ব্যবস্থার এই সমস্যার সমাধান হিসাবে সকলেই রেলপথের উন্নতিসাধন এবং নগরীর অভ্যন্তরে রেল-সংযোগের বিস্তার করিয়া আরও ঘন ঘন এবং অধিকতর দ্রুতগামী ট্রেন চলাচল প্রবর্ত্তনের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। সাম্প্রতিক কালে যে সকল বিশেষজ্ঞ কমিটি এই সমস্যার আলোচনা করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কেবলমাত্র রেলপথের উন্নতিসাধন দ্বারা এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে। যাত্রীচলাচলের এই বিরাট সমস্যা সমাধানের জন্য সাধারণ পরিবহন-ব্যবস্থার উন্নতি অবশ্য প্রয়োজন।

কলিকাতায় বর্তমান যাত্রীচলাচলের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যহ প্রায় দশ লক্ষ লোক ট্রামে এবং আট লক্ষ লোক বাসে চলাচল করে। সকল ট্রাম একটি কোম্পানী পরিচালনা করে, কিন্তু বাসগুলির মালিকানা বিভিন্ন লোকের মধ্যে ছড়াইয়া রহিয়াছে। সরকারী পরিবহন-বিভাগের পরিচালনাধীনে ২৩৫টি বাস রহিয়াছে। বাকি ৫৫২টি বাসের মালিক ৩২৪ জন, ইহাদের অধিকাংশেরই একখানি অথবা দুইখানি করিয়া বাস আছে, আরও সঠিকভাবে বলিতে গেলে দেখা যায় যে, ২৩২ জন মালিকের একটি করিয়া বাস আছে; ৪৮ জন মালিকের দুইটি করিয়া বাস আছে এবং কেবলমাত্র দুইজন মালিকের যথাক্রমে ১৫টি এবং ২০টি করিয়া বাস আছে। এই অগণিত বাস-মালিকদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার কুফল সাধারণ যাত্রীরা বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছেন।

পুলিস কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য যে সকল কমিটি যানবাহন চলাচল-সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বাস-পরিচালনার ভার একটি সংস্থার উপর ন্যস্ত করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। দেশ-বিভাগের পূর্ব্বে সরকার কলিকাতার জন্য একটি যাত্রী-পরিবহন বোর্ডের উপর ট্রাম ও বাস পরিচালনার ভার অর্পণ করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলেন। ১৯৪৪ সনের ডিসেম্বর মাসে বিধানসভায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এই মর্ম্মে একটি বিবৃতিও দিয়াছিলেন। দেশ-বিভাগের পর উহা ধামাচাপা পড়ে।

ডিজেল গাড়ী প্রবর্ত্তিত হইবার পর সাম্প্রতিককালে যাত্রীবহন কার্য্যের বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। সর্ব্বাধুনিক মডেলের ডিজেল বাসগুলিতে পেট্রলচালিত বাস অপেক্ষা শতকরা ৩০ হইতে ১০০ ভাগ অধিক যাত্রী সহজেই বহন করা যায়। ফলে পেট্রল বাসের পরিবর্ত্তে ডিজেল বাসের প্রচলন হইলে ভিড়ের চাপ কতক অংশে প্রশমিত হইতে পারে। ইউরোপ এবং যুক্তরাজ্যে এখন কেবল ডিজেল বাসই ব্যবহৃত হয়। লণ্ডনে এমন কি ট্রামেরও পরিবর্ত্তে ডিজেল বাস চালু করা হইয়াছে। কিন্তু এই বাসগুলির ব্যয়ভার অত্যধিক এবং ইহাদের সযত্ন সংরক্ষণের সম্যক ব্যবস্থা করা কলিকাতায় যে সকল ক্ষুদ্র বাস-পরিচালক রহিয়াছে তাহাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। উদাহরণস্বরূপ, একটি একতলা ডিজেল বাসের মূল্য ৫০ হাজার হইতে ৬০ হাজার টাকা এবং একটি ডবলডেকার বাসের মূল্য ৭০ হাজার হইতে ৮০ হাজার টাকা। কলিকাতার অধিকাংশ বাস-পরিচালকই মহাজনদের নিকট হইতে চড়া সুদে টাকা ধার লইয়া ব্যবসা চালায়; কাজেই তাহাদের উপর ভরসা করিয়া থাকিলে নগরীর যানবাহন-ব্যবস্থার উন্নতির আশা সুদূরপরাহত হইবে। এই সকল কথা বিবেচনা করিলে রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীনে বাস-চলাচলের ব্যবস্থা সমস্যা নিরসনের সঠিক পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে।

১৯৪৮ সনের ৩১শে জুলাই ১৮টি বাস লইয়া রাষ্ট্রীয় পরিবহন-ব্যবস্থার পত্তন হয়। তখন হইতেই সরকারের একটি সুনির্দ্দিষ্ট নীতি ছিল মধ্যবিত্ত যুবকদিগকে এই কার্য্যের দিকে আকৃষ্ট করা। ফলে প্রথম দিকে অভিজ্ঞতার অভাবের দরুন কাজকর্ম্মের কিছু অসুবিধা দেখা যায়। সরকারকে অপর যে একটি বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তাহা হইতেছে যথোপযুক্ত গ্যারেজের অভাব। তিন বৎসরের মধ্যে সরকার একটি কেন্দ্রীয় কারখানা এবং দুইটি ডিপো নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ডিপোগুলির প্রত্যেকটিতে ১৫০টি গাড়ী থাকিতে পারে।

কেন্দ্রীয় কারখানাটিতে যে কেবল পরিবহন বিভাগের গাড়ীগুলিই সারান যাইতে পারে তাহা নহে, সরকারের অন্যান্য দপ্তরের

গাড়ীও সেখানে মেরামত করা যাইতে পারে। ডিপো দুইটি লণ্ডন ট্রান্সপোর্টের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তথায় সকলপ্রকার আধুনিক যন্ত্রপাতি রহিয়াছে। কারখানা এবং ডিপোগুলিতে কাজ শিখাইবার জন্য শিক্ষানবিশও গ্রহণ করা হয়। অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিঙে উন্নততর ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষাপ্রদানের জন্য একটি কারিগরি শিক্ষণ-পরিকল্পনা আরম্ভ করার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। ড্রাইভার এবং কণ্ডাক্টরদিগকে শিক্ষাদানের জন্য একটি শিক্ষণ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

কর্তৃপক্ষ কর্ম্মচারীদের কল্যাণের জন্যও বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন এবং সেজন্য অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেন নাই। কর্ম্মের ঘণ্টা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বৎসরে ৮৯ দিন বেতনসহ ছুটীর ব্যবস্থা আছে। কর্ম্মচারীদিগকে বিনাখরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে; টিকিট বিক্রয় করিয়া অধিকতর অর্থসংগ্রহের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থাও আছে। কর্ম্মচারীদের মধ্যে খেলাধূলা এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থায় উৎসাহ দেওয়া হয়।

প্রত্যেক ডিপোতে একটি করিয়া হারানো দ্রব্যের আপিস আছে। বাসে কেহ কোন মূল্যবান দ্রব্য ফেলিয়া গেলে তাহা সেখানে জমা দেওয়া হয়। কণ্ডাক্টরদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সততার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমানে রাষ্ট্রীয় পরিবহন বিভাগে ২৮৫টি গাড়ী আছে এবং তথায় প্রায় ৩৩০০ লোক কাজ করে। ইহাদের অধিকাংশই উদ্বাস্তু বা মধ্যবিত্ত যুবক যাহারা পূর্ব্বে কখনও এ ধরণের কাজ করে নাই।

ভারতে কারিগরি শিক্ষা

ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ "উইকলি ওয়েষ্ট বেঙ্গল" পত্রিকার ২৯শে জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লিখিতেছেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আধুনিক বিজ্ঞানের নানাবিধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রভুত উন্নতিসাধন করিয়াছে। কিন্তু ভারত আজিও প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার সিন্ধুনদ উপত্যকার সভ্যতার স্তর হইতে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ভারত প্রচুর সম্পদের অধিকারী হইলেও ভারতবাসী চিরদারিদ্র্যগ্রস্ত। ইহার কারণ ভারতের শতকরা আশী জন এখনও আদিম প্রথায় চাষবাস করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। কিন্তু জাতির অগ্রগতি কামনা করিলে অদৃষ্টের উপর নির্ভরশীল আমাদের গ্রামের জনসাধারণের এই আত্মসন্তুষ্টি দূর করিয়া তাহাদের মধ্যে মানবিক প্রচেষ্টার উপর আস্থা এবং উন্নততর জীবনযাত্রার একটি আগ্রহ সৃষ্টি করিতে হইবে।

আধুনিক বিজ্ঞান এবং যন্ত্রশিল্প এই বিশ্বাস ও আগ্রহ সৃষ্টি করিতে পারে। সেইজন্যই ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেশের অভাব-মোচনের জন্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উপর এত জোর দেন। ভারতে কারিগরি শিক্ষা প্রসারের জন্য সরকারী-প্রচেষ্টার বিবরণপ্রসঙ্গে ড. ঘোষ লিখিতেছেন যে, স্বাধীনতা লাভের পর সরকার বৈজ্ঞানিক শিক্ষাবিস্তার এবং কারিগরি দক্ষতা বিকাশের স[illegible]টাকেই উচ্চ অগ্রাধিকার দিয়া পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। বিগত ছয় বৎসরে ভারতে কারিগরি শিক্ষার যে অগ্রগতি হইয়াছে দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী একুশ বৎসরেও তাহা হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকার দুই কোটি টাকা ব্যয়ে সতরটি কারিগরি প্রতিষ্ঠানকে উন্নততর করিবার পরিকল্পনা কেবলমাত্র রূপদান করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠান-গুলি ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে। ছাত্রগণ পাঠসমাপনান্তে এই সকল প্রতিষ্ঠান হইতে ডিগ্রী লাভ করে। যাহাতে শিক্ষকগণ উপযুক্ত পারিশ্রমিক পান সেজন্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতি বৎসর অতিরিক্ত সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। শিক্ষক-ছাত্রের একটি অনুমোদিত হারও মানিয়া চলিবার ব্যবস্থা আছে। যুদ্ধোত্তরকালে যে-সকল ভারতীয় বিদেশে কারিগরি উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন তাঁহারাই এই সকল প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ড. ঘোষের মতে যাঁহারা মনে করেন যে, কারিগরি শিক্ষালাভের জন্য বিদেশে ছাত্র পাঠান অনুচিত তাঁহারা ভুল করেন। এই ব্যবস্থার সুফল সম্পর্কে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে।

আণ্ডার-গ্রাজুয়েট ক্লাসের পরে উচ্চতর কারিগরি শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থার প্রতিও যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গালোরে অবস্থিত ভারতীয়-বিজ্ঞান-মন্দির ১,৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সম্প্রসারিত করা হইয়াছে। প্রতি বৎসর কেন্দ্রীয় সরকার ঐ প্রতিষ্ঠানকে ২০ লক্ষ টাকা করিয়া দিবেন। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্ত্তী সময়ে ঐ বিজ্ঞান-মন্দিরের বার্ষিক আয় ছিল গড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা। ইঞ্জি-নীয়ারিঙের বিভিন্ন শাখায় আলোচনা ও গবেষণা করিবার জন্য সেখানে ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভারতীয় কারিগরি বিদ্যামন্দিরের (Indian Institute of Technology) নির্ম্মাণকার্য্য দ্রুত সম্পন্ন হইতেছে। বিদ্যা-মন্দিরটি নির্ম্মাণের জন্য ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা নিয়োগ করা হই-তেছে। সেখানে ১,৫০০ আণ্ডার-গ্রাজুয়েট ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। সেখানকার পাঠ্যক্রমের মধ্যে নৌগঠন (naval architecture) ফলিত খনিবিদ্যা, জিওফিজিক্স প্রভৃতি অনেক নূতন নূতন বিদ্যার আলোচনা সংযুক্ত হইয়াছে।

১৯৫২ সনের গোড়ার দিকে স্থির হয় যে, পরবর্ত্তী ধাপের কথা চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। নিখিল-ভারত কারিগরি শিক্ষা-সংসদের সাত জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি কমিটি পরিকল্পনা কমিশনের সভ্যদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আলোচনার ফলে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কারিগরি শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা ৬·৬ কোটি টাকার উপর আরও [illegible]·৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

সাধারণভাবে স্থির করা হইয়াছে যে, যে-সকল কলেজকে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে সেগুলি ছাড়া পূর্বাঞ্চল হইতে ১৪টি প্রতিষ্ঠান, দক্ষিণের ১৬টি প্রতিষ্ঠান, পশ্চিমের ৫টি এবং উত্তরের

...প্রতিষ্ঠানকে মোটামুটি অর্থসাহায্য দেওয়া হইবে যাহাতে সে... মানে পৌঁছাইতে পারে।

ড. ঘোষ মনে করেন যে, বিভিন্ন শিল্পকর্ম্মে নিযুক্ত যে সকল যুবক সন্ধ্যায় অথবা দিনে আংশিক সময় ক্লাস করিয়া উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিতে চায় তাহাদের কথা বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে। ইংলণ্ড আমাদের অপেক্ষা অনেক ধনী দেশ হইলেও সেখানে কারিগরী এবং ব্যবসায়ী বিদ্যায়তনগুলিতে দিনে ও সন্ধ্যায় আংশিক সময়ে শিক্ষার্থী ছাত্রের সংখ্যা প্রায় ২২ লক্ষ। সেই তুলনায় দিনের বেলা নিয়মিত ক্লাসে মাত্র ৬৯,০০০ ছাত্র পড়ে। এই উদ্দেশ্যে সরকার যে ২০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন ড ঘোষের মতে আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাহা ২০ গুণ বৃদ্ধি পাওয়া দরকার। মধ্যবিত্ত যুবকগণ যাহাতে সহজে তাহাদের জীবন গড়িয়া তুলিতে পারে সেজন্য "শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উপার্জ্জনকর" পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের প্রবর্ত্তন হওয়া উচিত বলিয়া ড. ঘোষ মনে করেন।

স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণা কয়েকটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে সীমাবদ্ধ রাখা ড. ঘোষ অনুচিত মনে করেন। যে স্থলেই গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে সক্ষম অভিজ্ঞ অধ্যাপক রহিয়াছেন সেই স্থলেই উক্ত অধ্যাপককে কেন্দ্র করিয়া গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে উৎসাহ দিবার জন্য ড. ঘোষ পরামর্শ দিয়াছেন।

শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ম্যানেজারদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং ম্যানেজারদের শিক্ষার ব্যবস্থা করাও আশুপ্রয়োজন। খড়্গপুর ইনষ্টিটিউটে ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল ইঞ্জিনীয়ারিং এবং শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত কয়েকটি ক্ষেত্রে রিফ্রেশার কোর্সের সাফল্যে এই সকল বিদ্যার আলোচনার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা করিতে সরকার উৎসাহিত হইয়াছেন। খড়্গপুর এবং বোম্বাইয়ে এইরূপ পাঠের ব্যবস্থা করা হইতেছে। নিম্নতর কর্ম্মচারীদের শিক্ষার জন্য আগামী জুলাই হইতে কলিকাতার নিখিল-ভারত সমাজকল্যাণ এবং ব্যবসায় পরিচালন মন্দিরে পাঠের ব্যবস্থা হইবে। একটি এডমিনিষ্ট্রেটিভ ষ্টাফ কলেজের জন্য সরকার এবং শিল্পপতিগণ যে যুক্ত প্রচেষ্টায় সম্মত হইয়াছেন তাহাকে ড ঘোষ একটি সঠিক পদক্ষেপ বলিয়া বিবেচনা করেন।

ড. ঘোষ লিখিতেছেন যে, এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে ছাত্রকে কেন্দ্র করিয়া—ছাত্র বা ছাত্রীর ব্যক্তিগত প্রবণতার বিকাশই ছিল শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য। ড. ঘোষ মনে করেন, যদি পরিকল্পনা দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে হয়, বেকার সমস্যার যদি সমাধান চাওয়া হয় তবে শিক্ষাব্যবস্থাকে অধিকতর "সমাজ-বিন্যস্ত" (community structured) করিতে হইবে—অর্থাৎ উহাকে এমনভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহাতে দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞানলাভ হয়। বাস্তব সম্পর্কহীন জীবনযাত্রার জন্য শিক্ষালাভ করা অপেক্ষা কোন ব্যক্তি বা জাতির পক্ষে অধিকতর ক্ষতিকারক আর কিছুই হইতে পারে না।

নিখিল-ভারত মানসিক স্বাস্থ্য-মন্দির

৮ই আগষ্ট এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে "হিন্দু" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, বাঙ্গালোরে নিখিল-ভারত মানসিক স্বাস্থ্য-মন্দিরের উদ্বোধন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রাজকুমারী অমৃত কাউরের বিবৃতি অনুযায়ী ব্রিটেন অপেক্ষা ভারতে মানসিক রোগীর সংখ্যা কম হইতে পারে; কিন্তু ইহা খুবই সম্ভব যে, পরিসংখ্যান সংগ্রহের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থার ফলে আমরা সঠিক তথ্য অবগত নহি। এইরূপ একটি জ্ঞান-মন্দির যুগসন্ধিক্ষণে উপনীত জাতির জীবন গঠনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। ভারতবাসী চিরকালই মানসিক সবলতার উপর জোর দিয়াছে। মানসিক শান্তি, সকল জীবের সহিত শান্তি স্থাপন সর্ব্বদাই ধর্ম্ম, দর্শন এবং সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রার আদর্শ হিসাবে অগ্রাধিকার পাইয়াছে। কিন্তু বিশ্বশক্তিসমূহের চাপে আদর্শ, মূল্যবোধ এবং জীবনের গতিরও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। অতীত জীবনযাত্রার সহিত বর্ত্তমানের এই বিরাট পার্থক্যের ফলে নানারূপ অসঙ্গতি এবং ব্যাপকক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জীবনে মানসিক অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। এইরূপ সন্ধিক্ষণে গঠনমূলক মানসিক স্বাস্থ্য সৃষ্টিক্ষম শারীরিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে সর্ব্বোচ্চ স্তরে আলোচনা ও গবেষণা পরিচালনা করিবার জন্য অনুরূপ একটি জ্ঞান-মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা স্বতঃস্ফূর্ত্ত। নূতন ইনষ্টিটিউট সঙ্গতভাবেই বাঙ্গালোর মানসিক হাসপাতালের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখিয়া কার্য্য পরিচালনা করিবে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য (এক্ষেত্রে মহীশূর) সরকারের উদ্যম ও সম্পদ যুক্ত করিয়া কার্য্য করিবার এক প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত এই ইনষ্টিটিউট।

ভারতে পাক গুপ্তচর চক্র

পাকিস্থানের হাই কমিশনারের সামরিক উপদেষ্টা কর্ণেল নাসের আহম্মদ খান কয়েকজন ব্যক্তির সহায়তায় ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেছিলেন বলিয়া সম্প্রতি যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে সেই সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে পাক্ষিক "হিন্দুবাণী" ২৮শে আষাঢ় লিখিতেছেন যে, হয়ত কর্ণেল নাসের কিছু কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিতে সমর্থও হইয়াছেন। তবে হঠাৎ ঐ তথ্য ফাঁস হইয়া যাওয়ায় তিনি করাচী চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। এই সম্পর্কে কর্ণেল নাসেরের সহকারী বলিয়া কথিত বাইবেল সোসাইটির কেরাণী রহমৎ মাসিম, সদর বিমান দপ্তরের কর্পোরাল বঙ্গিয়া এবং পাকিস্থানের গোয়েন্দা অফিসার বলিয়া কথিত জন ম্যাথু গিল তিন ব্যক্তিকে নাকি গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, এবং তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত হইতেছে।

"হিন্দুবাণী" লিখিতেছেন, "ঘটনাটি সকলের তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ না করিলেও ইহার যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে। কোন কোন শ্রেণীর লোকেরা ভারতের গুপ্তচরের কাজ করিতেছে তাহা লক্ষ্যণীয়। ভারতের সামরিক বিভাগ এবং তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যাহাদের নিকট তথ্যাদি সংগ্রহ করা মোটেই কষ্টকর নয়। এই ছিদ্রগুলি বন্ধ করা না হইলে কোন লাভ হইবে না।"

জিতাষ্টমী

শ্রীসুখময় সরকার

বাঙালী হিন্দু-সমাজে যে কত পূজা, কত পার্বণ প্রচলিত আছে, তাহার সংখ্যা হয় না। প্রত্যেক পর্বের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে—কোনও দুইটি পর্ব একপ্রকার নহে। প্রাচীনেরা জীবনকে উপভোগ করিতে জানিতেন এবং করিতে পারিতেন। উৎসবের মধ্য দিয়া তাঁহাদের জীবনের আনন্দরসধারা ক্ষরিত হইত। অদ্যাপি তাহার নিদর্শন প্রত্যেক পার্বণের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু বিনা কারণে কোনও পর্ব বা উৎসব প্রবর্তিত হয় নাই। প্রত্যেক পর্বের উৎপত্তির মূলে গূঢ় কারণ ছিল। আমরা কোনটার কারণ বুঝিতে পারি, কোনটার পারি না। এক একটা পর্ব যে কত সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রচলিত আছে, তাহা স্মরণ করিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। ইহাদের উৎপত্তির কাল ও কারণ চিন্তা করিলে যে সমস্ত তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইবে তাহা দ্বারাই আমাদের দেশের প্রাচীন ও সত্য ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হইবে। এখানে বাঁকুড়া জেলায় প্রচলিত একটি পর্বের, জিতাষ্টমী পর্বের, বিবরণ দিয়া তাহার উৎপত্তি চিন্তা করিতেছি।

মুখ্য চান্দ্র ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী অথবা গৌণ চান্দ্র আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমীর নাম জিতাষ্টমী। বাঁকুড়ার লোকে এই দিনে 'জিতা-পরব' করিয়া থাকে। অপরের নিকটে যাহাই হউক, বাল্যকালে আমার নিকটে এই পর্ব যেমন বিস্ময়কর ও রহস্যজনক, তেমনই হর্ষজনক মনে হইত। সেই বিস্ময় ও হর্ষের ঘোর অদ্যাপি কাটে নাই; তাই কাগজ-কলম লইয়া ইহার বিস্ময়-রসের উৎস উদ্‌ঘাটন করিতে বসিয়াছি।

শৈশবে গ্রামে 'জিতা-পরব' যেমনটি দেখিয়াছি, তাহার অবিকল বর্ণনা লিখিতেছি। বাঁকুড়ার গ্রামে চণ্ডীমণ্ডপকে 'দুর্গামেলা' বলে। আমাদের গ্রামের দুর্গামেলার সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ; নিকটে একটা পুরাতন অশ্বত্থ বৃক্ষ অসংখ্য শাখাবাহু বিস্তার করিয়া সস্নেহে প্রাঙ্গণটিকে ছায়াচ্ছন্ন করিয়াছে। জিতাষ্টমীর দিন প্রাঙ্গণে একটা চতুষ্কোণ কুণ্ড কাটা হইয়াছে। কুণ্ডের মধ্যে কয়েকটা ধান্য, কচু ও হরিদ্রার গাছ এবং ঠিক মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ বটশাখা প্রোথিত হইয়াছে। শাখা হইতে অগণিত শালুক-ফুল ঝুলিতেছে। কুণ্ড-খনিত মৃত্তিকায় চতুর্দিকে বেদী নির্মিত হইয়াছে। প্রদোষকালে গ্রামের বধূ ও বর্ষীয়সীগণ দলে দলে পিত্তল-ঘট কক্ষে লইয়া আসিয়া সেই বেদীর চতুর্দিকে সাজাইয়া রাখিতেছেন। ইহারা সকলেই ব্রতধারিণী, সমস্ত দিন উপবাসিনী আছেন। ঘটের মধ্যে সজল মটর অথবা ছোলা কলাই আছে। প্রত্যেক পরিবারে যত জন, তত সের বা তত পোয়া কলাই। ঘটের মুখ আবৃত, মুখে একটি করিয়া শশা। কুণ্ডের পশ্চিম দিকে পশ্চিমমুখে স্থাপিত একটি কাঁচামাটির প্রতিমা। এই দেব-প্রতিমার নাম জীমূতবাহন। যে শিল্পী আমাদের দুর্গা-প্রতিমা গড়িত, আমরা তাহাকে 'ওস্তাদ' বলিতাম; সেই ওস্তাদই জীমূতবাহন প্রতিমা গড়িয়া দিয়াছে। ইঁহার বাহন হস্তী, হস্তে বজ্র, শিরে ছত্র। অদ্য ইঁহারই পূজা। বেদীর চতুর্দিকে ব্রতিনীগণ মৃন্ময় শৃগাল-শকুনি সাজাইয়া রাখিয়াছেন।

রাত্রি এক প্রহর হইতে চলিয়াছে। পুরোহিত আসিয়া পূজা আরম্ভ করিলেন। চতুর্দিকে ব্রতধারিণীগণ ভক্তিপ্লুত চিত্তে ধরাসনে বসিয়া আছেন। দুই এক জন প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ দুর্গামেলার দ্বার-পিণ্ডে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। কৃষ্ণ-পক্ষের অষ্টমী তিথি, রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত ঘোর অন্ধকার। চারি প্রহরে চারি বার জীমূতবাহনের পূজা। ব্রতিনীগণ সেখানেই বিনিদ্র রজনী যাপন করিবেন। কাহারও বা ঘৃতদীপ 'মানসিক' আছে। চারি প্রহরের মধ্যে নিভিবার জো নাই, স্বামী-পুত্রের অকল্যাণ হইবে। অতএব তিনি সে স্থান ত্যাগ করিতে পারেন না। আহা, কি নিষ্ঠা, কি অবিচলিত বিশ্বাস! রাত্রি গভীর এবং অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেছে। শিশির-সিক্ত মৃদু পবনহিল্লোলে শরীর শিহরিত হইতেছে। অশ্বত্থবৃক্ষে আশ্রিত পাখীগুলা মধ্যে মধ্যে কলরব করিয়া প্রহর ঘোষণা করিতেছে। ব্রতধারিণী-গণ সমস্ত দিন উপবাসে অবসন্ন দেহে এলাইয়া পড়িয়াছেন। নিদ্রা যাইবার জো নাই, কিন্তু তন্দ্রা আসিতে ছাড়ে না। এই সুযোগে তাঁহাদের বাড়ীতে বাড়ীতে যে উৎপাত ঘটে, তাহাই হর্ষজনক ব্যাপার। কিশোরেরা চন্দ্রোদয়ের পূর্বেই দুই-তিন জন একত্র হইয়া রামের বাগানে গিয়া আঁচল ভরিয়া পেয়ারা পাড়িল, সেই পেয়ারা নিজেরা না খাইয়া শ্যামের দুয়ারে ঢালিয়া দিল। আবার শ্যামের বাগান হইতে যত পারিল শশা তুলিয়া রামের দুয়ারে রাখিয়া আসিল। নন্দরাণী বাড়ীর উঠানে কয়েকটা পুঁইগাছ করিয়াছে; তাহারা সমূলে উৎপাটিত হইয়া কিরণবালার রন্ধনশালার সম্মুখে পড়িয়া রহিল। আবার কিরণবালার মাচার ঝিঙা কয়টা স্থানচ্যুত হইয়া নন্দরাণীর আঙ্গিনায় নিক্ষিপ্ত হইল। জ্যোৎস্না-প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত এইরূপ উৎপাত চলিতে থাকে। ইহাকে বাল্যকালে আমরা 'চোখচাঁদা' বলিতাম। পঞ্জিকায় ইহার নাম নষ্টচন্দ্র। প্রভাতে উঠিয়া বাগানের মালিক

[illegible]বতঃই ক্রুদ্ধ হইয়া দুষ্কৃতকারিগণকে অকথ্য কটুভাষায় গালি [illegible]কে। কিশোরেরা মনে মনে হাসে। বিশ্বাস আজ গালি দিলে 'লাগে না'; বরং পরমায়ু বৃদ্ধি হয়।

প্রাতঃকালে শৃগাল-শকুনি বিসর্জন এবং ব্রতান্ত স্নান। ব্রতধারিণীগণ জলাশয়ের তীরে সমবেত হইয়া মৃন্ময় শৃগাল-শকুনিগুলি জলে ফেলিয়া দেন এবং পূজার প্রসাদী শশাটি লইয়া জলে ডুব দেন; সেই নিমজ্জিত অবস্থায় শশাটি কামড়াইয়া জল হইতে উঠিয়া চিঁড়া-দই 'ফলার' করেন। এইরূপে পর্ব সমাপ্ত হয়।

জননীকে জিজ্ঞাসা করিতাম, "মা, জিতা-পরব কেন হয়?"

জননী বলিতেন, "ওসব ঋষিরা ব্যবস্থা করে গেছেন; আমরা তাই পালন করি।"

"কিন্তু ঋষিরা কেন আজকের দিনেই এই পরব করলেন, বল না, মা।"

"তা' জানি নে, বাবা। বড় হলে অনেক লেখাপড়া শিখবে। তখন এ সব ভাল করে বুঝতে পারবে।"

বড় হইয়াছি। লেখাপড়াও কিছু শিখিয়াছি। কিন্তু কৈ, জিতাষ্টমীর কেন, অধিকাংশ পর্বেরই ত উৎপত্তির কারণ যথাযথভাবে জানিতে পারি নাই। আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় এ সব শিক্ষার কোনও স্থান নাই। একটা সমাজ, সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতন সমাজ, কত কাল ধরিয়া কত প্রকার আচার, কত প্রকার ধর্মানুষ্ঠান পালন করিয়া আসিতেছে, তাহাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে গবেষণার প্রয়োজন কাহারও মনে উদিত হয় নাই। এ শিক্ষা যে অসম্পূর্ণ, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। মহাপ্রাজ্ঞ আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের সহিত পরিচয় আমার জীবনে এক অতি স্মরণীয় ঘটনা। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সাহিত্য-সাধনায় সহযোগিতা করিবার সুযোগ পাইয়া, বিশেষতঃ তাঁহার বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণায়ক প্রবন্ধাবলী রচনাকালে আমি আমাদের বহু পূজা-পার্বণের ইতিহাস জানিতে পারিয়াছি। যোগেশচন্দ্রের "পূজা-পাবণ" গ্রন্থে বহু পর্বের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি জিতাষ্টমীর উৎপত্তি চিন্তা করেন নাই। তাঁহারই আবিষ্কৃত সূত্র অবলম্বন করিয়া আমি এই পর্বের মূল অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইতেছি।

জিতাষ্টমীর রাত্রিতে যে দেবতার পূজা হয়, তিনি জীমূত-বাহন। জীমূতবাহন ইন্দ্র। জীমূত শব্দের অর্থ—গর্জনকারী জলবর্ষী মেঘ। ইন্দ্রের বাহন হস্তী জলদ মেঘের দ্যোতক। বৈদিককালে ইন্দ্রই আর্যগণের বহু-পূজিত প্রধান দেবতা ছিলেন। কারণ ইন্দ্র বৃষ্টিদান করেন। বৃষ্টি ব্যতীত শস্য জন্মে না, শস্য ব্যতীত প্রাণধারণ হয় না। অতএব ইন্দ্রের কৃপায় আমরা প্রাণধারণ করি। এই জন্যই তিনি বৈদিক যুগে শ্রেষ্ঠ দেবতারূপে গণ্য হইয়াছিলেন। ভারতের, তথা জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্‌বেদ-সংহিতায় ইন্দ্রের মহিমা কত ভাবে, কত ছন্দে, কত কবিত্বপূর্ণ পুষ্পিত ভাষায় যে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

আমরা সকলেই জানি, সূর্যের দক্ষিণায়ন আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি সুরু হয়। এই জন্য আচার্য যোগেশচন্দ্র ইন্দ্রদেবের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন, "সূর্যের যে শক্তি দক্ষিণায়ন আরম্ভে বৃষ্টি আনয়ন করেন, তিনিই ইন্দ্র।" সম্পূর্ণ সংস্কার-মুক্ত হইয়া পৌরাণিকদের পল্লবিত ভাষায় রচিত কাব্যের ইন্দ্রজাল ছেদনপূর্বক বৈদিক ঋষি-কবিগণের উৎপ্রেক্ষা-উপমার দুর্ভেদ্য দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিলে দেখা যাইবে ইন্দ্রদেবের এই সংজ্ঞা অভ্রান্ত ও ত্রুটিহীন। প্রাচীনেরা দক্ষিণায়নকালে ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে যজ্ঞ করিতেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জীমূতবাহনের পূজা প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনকালের ইন্দ্রযজ্ঞের অনুবর্তন। যজ্ঞের নিমিত্ত কুণ্ড খনিত হইত; এখনও জীমূতবাহনের পূজায় কুণ্ড খনিত হইতেছে। কিন্তু এই কুণ্ডে সমিধ ও ঘৃতাহুতির পরিবর্তে মন্ত্রপাঠ করিয়া দেবতার উদ্দেশে জলসেচন ও ফলপুষ্পাদি অর্পিত হইতেছে।

অম্বুবাচীর সময় (দক্ষিণায়ন আরম্ভে) পৃথ্বী জলসিক্ত হইলে শস্যবীজ বপন করিতে হইবে; তাহাতে উত্তম অন্ন উৎপাদিত হইবে। জিতাষ্টমীর ব্রতে নারীরা যে পরিবারের প্রত্যেক জনের জন্য শস্যবীজ জলসিক্ত করিয়া অঙ্কুরিত হইতে দেন এবং পূজার কুণ্ডে যে ধান্য, কচু ও হরিদ্রার গাছ রোপিত হয়, ইহা পূর্বকালের শস্যবীজ বপনের আয়োজনের অনুকল্প।

বেদে প্রসিদ্ধি আছে, বৃত্র নামক এক অসুর বৃষ্টি রোধ করিয়া রাখিয়াছিল, ইন্দ্র তাহাকে বজ্র দ্বারা হত্যা করিয়া বৃষ্টি মোচনপূর্বক যজমানের কল্যাণার্থে পৃথিবীতে বর্ষণ করিয়াছিলেন। পুরাণের এই ঘটনা অবলম্বনে কত বিচিত্র উপাখ্যান রচিত হইয়া গিয়াছে। ইন্দ্রের সহিত বৃত্রের যুদ্ধে নিশ্চয় বহু অসুর নিহত হইয়াছিল। তাহাদের মৃতদেহ ভক্ষণ করিবার জন্য শৃগাল-শকুনির প্রয়োজন। এই নিমিত্ত জিতাষ্টমীর ব্রতিনীগণ পূজাবেদীর চতুর্দিকে মৃন্ময় শৃগাল-শকুনি রাখিয়া থাকেন।

এই সকল বৃত্তান্ত হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, আমরা যে জিতাষ্টমী পর্বের অনুষ্ঠান করিতেছি, ইহা অতি প্রাচীন-কালের এক দক্ষিণায়ন দিনের স্মৃতি। আমরা জানি না—অজ্ঞাতসারে সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া সেই স্মৃতি রক্ষা করিয়া চলিতেছি। এই স্মৃতি কত কালের তাহার একটা মোটামুটি হিসাব করিতে পারা যায়। এখানে সামান্য জ্যোতির্গণিতের সাহায্য লইতেছি, নচেৎ কালগণনা অসম্ভব।

আমরা দেখিতেছি, বর্তমানে ৭।৮ আষাঢ় সূর্যের দক্ষিণায়ন হয়, অম্বুবাচী হয়। আর যেকালে জিতাপর্বের আরম্ভ হইয়াছিল, সেকালে গৌণচান্দ্র আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমীতে দক্ষিণায়ন হইত, অম্বুবাচী হইত। ধরা যাক, আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমী আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহে পড়ে (অবশ্য কিছু আগে বা পরেও পড়িতে পারে, একটা স্থূল গণনার জন্য এই সময় ধরা যাইতেছে)। আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহ হইতে আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত তিন মাস। অতএব যেকালে জিতাষ্টমীতে দক্ষিণায়ন হইত, সেকাল হইতে দক্ষিণায়ন-দিন তিন মাস পিছাইয়া আসিয়াছে। যাঁহারা অল্প-স্বল্প জ্যোতির্গণিত চর্চা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন—প্রায় দুই সহস্র বৎসরে অয়ন-দিন এক মাস পিছাইয়া আসে। এখন যদি ৭।৮ আষাঢ় দক্ষিণায়ন হয়, দুই সহস্র বৎসর পূর্বে নিশ্চয় ৭।৮ শ্রাবণ এবং চারি সহস্র বৎসর পুর্বে ৭।৮ ভাদ্র দক্ষিণায়ন হইত। আচার্য যোগেশচন্দ্র দেখাইয়াছেন, আমরা যে জন্মাষ্টমী (ভগবান কৃষ্ণের জন্মতিথি, ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী) পালন করি, তাহাও এককালের দক্ষিণায়ন-দিনের স্মৃতি। সুতরাং এই ক্রমে গণিয়া বলিতে পারা যায়, অদ্য হইতে প্রায় ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে, খ্রী-পূ ৪০০০ অব্দে জিতাষ্টমীর দিন দক্ষিণায়ন হইয়াছিল। প্রায় ছয় সহস্র বৎসর ধরিয়া আমরা একটা পর্বের মধ্য দিয়া সেই স্মৃতি বাঁচাইয়া রাখিয়াছি। যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মতানুসারী হইয়া মনে করেন, ভারতে আর্য-কৃষ্টির বয়স সার্দ্ধ-ত্রিসহস্র বৎসরের অধিক নহে, তাঁহারা সহজে ইহা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। কিন্তু পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই নাই। কারণ গণিত দ্বারা এই অনুমান সমর্থিত হইতেছে।

জিতাষ্টমীর এই যে কাল নির্ণীত হইল, ইহা অবশ্য স্থূল। ঠিক কোন্ বৎসরে এই পর্বের আরম্ভ হইয়াছিল বলা সহজ নহে। তথাপি অব্দটি যথাসম্ভব সূক্ষ্মভাবে নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছি।

প্রাচীনকালে বহুপ্রকার বৎসর-গণনা-রীতি প্রচলিত ছিল। বৎসর শব্দের তিনটি প্রতিশব্দ বিখ্যাত—হিম, শরৎ, বর্ষ। অতিশয় প্রাচীনকালে হিম অর্থাৎ শীত ঋতুতে, তাহার পরবর্তীকালে শরৎ ঋতুতে এবং তাহার পরবর্তীকালে বর্ষা ঋতুতে বৎসর আরম্ভ হইত বলিয়া বৎসরের এই সকল নাম হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল ঋতুর যে-কোন সময়ে বৎসর আরম্ভ হইত না। একটা উল্লেখযোগ্য জ্যোতিষিক যোগ না ঘটিলে যে-সে দিন নববর্ষ আরম্ভ করা চলে না। বেদ-বিদ্যায় প্রবেশ করিতে হইলে যে ষড়বেদাঙ্গে ব্যুৎপত্তি লাভের প্রয়োজন হয়, জ্যোতিষ তাহাদের অন্যতম। জ্যোতিষের আলোচনা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়, শীত ঋতুতে উত্তরায়ণ-দিনে, শরৎ ঋতুতে জল-বিষুব-দিনে এবং বর্ষা ঋতুতে দক্ষিণায়ন দিনে বৎসর-গণনা আরম্ভ হইত। এককালে [illegible]ষ্টমীর দিনেও যে বৎসরারম্ভ হইত, তাহার সপক্ষে কতকগুলি যুক্তি আছে। নববর্ষ দিবসটিকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য বহুবিধ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল, অদ্যাপি আছে। আচার্য যোগেশচন্দ্র দেখাইয়াছেন, এককালে আশ্বিন পূর্ণিমায় দক্ষিণায়ন ও নববর্ষ হইয়াছিল; কোজাগরী লক্ষ্মীপূজায় তাহার স্মৃতি রক্ষিত আছে। সেদিন রাত্রি জাগরণ করিয়া দিনটি স্মরণীয় করা হইয়াছে। জিতাষ্টমীর দিনেও রাত্রি-জাগরণ বিহিত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, এক-কালে সেদিন নববর্ষ ধরা হইত।

আর একটা কথা। জিতাষ্টমীর রাত্রে যে গালি খাইবার জন্য নষ্টচন্দ্র করা হয়, ইহার কারণ কি? শুনিলে পাঠক বিস্মিত হইবেন, কিন্তু ইহাও নববর্ষোৎসবের একটি লক্ষণ। উত্তর-ভারতের সর্বত্র অদ্যাপি দোল-পূর্ণিমায় নববর্ষ আরম্ভ করা হয়। সেদিন নববস্ত্র পরিধান, উত্তম ভোজ্য ভক্ষণ ইত্যাদির সঙ্গে নির্লজ্জ নারীর মুখে অশ্লীল গালি শ্রবণের প্রথা প্রচলিত আছে। বহু প্রাচীনকাল হইতে লোকের বিশ্বাস, বৎসরের প্রথম দিনে অশ্লীল গালি দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয় অপবিত্র করিয়া রাখিলে সে বৎসর আর যমে ছুঁইবে না। আমাদের গ্রামে আমি দুর্গাপ্রতিমা ও কালীপ্রতিমা বিসর্জনের পর একটি লোককে ভূত সাজিয়া এইরূপ অশ্লীল গালি দিতে শুনিয়াছি। দুর্গোৎসব যে নববর্ষোৎসব তাহা বিদ্যানিধি মহাশয় অকাট্য যুক্তি দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই লক্ষণ দ্বারা আমরা অনুমান করিতে পারি, জিতাষ্টমীর দিনে এককালে নববর্ষ আরম্ভ হইত। অবশ্য নববর্ষের সকল লক্ষণ জিতাষ্টমীতে নাই। না থাকিবারই কথা। কতকালের স্মৃতি! কতক পরিত্যক্ত হইয়াছে, কতক বা যোজিত হইয়াছে। পরবর্তীকালে জিতাষ্টমীতে যখন আর নববর্ষ ধরা হইত না, তখন উক্ত দিনে নববস্ত্র-পরিধান, উত্তম ভোজ্যগ্রহণাদি পরিত্যক্ত হইয়াছে। আবার পরে পরে দুই-একটা অনুষ্ঠান সংযোজিত হইয়াছে; যেমন জলে ডুবিয়া শশা কানড়ানো। ইহার উৎপত্তি বুঝিতে পারি নাই। তবে মনে হয়, সম্পূর্ণ শুদ্ধাচারে ব্রতের পারণা আবশ্যক, এই ধারণা হইতে উক্ত অনুষ্ঠানের উৎপত্তি হইয়াছে।

এখন দেখা যাক, খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দের নিকটবর্তী কালে কোন্ বৎসরে এমন জ্যোতিষিক যোগ ঘটিতে পারে, যে বৎসর হইতে আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমীতে নববর্ষ আরম্ভ ধরা যাইতে পারিত। কেবল গণিতের কর্ম নয়, শাস্ত্রে ইহার কোনও উল্লেখ আছে কিনা, সর্বাগ্রে তাহার অন্বেষণ কর্তব্য।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে একটি অদ্ভুত উপাখ্যান আছে। একদা প্রজাপতি স্বীয় রোহিতরূপিণী কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া স্বয়ং মৃগরূপ ধারণপূর্বক তাঁহাতে সক্ত হইয়াছিলেন। দেবগণ প্রজাপতির এই দুষ্কৃত দেখিয়া তাঁহাকে শাস্তি দিতে মনস্থ করিলেন। দেবগণের দেহ হইতে অত্যুজ্জ্বল রূপধারী এক পুরুষের উদ্ভব হইল। ইঁহার নাম ভূতবান্। ভূতবান্ দেবগণের আদেশে প্রজাপতিকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করিলেন। বাণবিদ্ধ মৃগরূপী প্রজাপতি আকাশে উৎপতিত হইলেন। আচার্য যোগেশচন্দ্র দেখাইয়াছেন, ব্যাপারটা স্বর্গের। প্রজাপতি বর্ষপতি বা যুগপতি। আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র লুব্ধক-ই (প্রাচীন নাম মৃগব্যাধ, ইংরেজী Sirius) ভূতবান্; নিকটস্থ কালপুরুষ বা মৃগ (ইংরেজী Orion) নক্ষত্রই মৃগরূপী প্রজাপতি এবং রক্তবর্ণ রোহিণী নক্ষত্রই প্রজাপতির রোহিতরূপিণী কন্যা। উপাখ্যানটির ফলিতার্থ এই যে, ঋষিগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, কাল মৃগনক্ষত্র হইতে রোহিণী নক্ষত্রে সংসপিত হইলেন, অর্থাৎ এতকাল মৃগনক্ষত্রে মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতেছিল, এখন রোহিণীতে মহাবিষুব আরম্ভ হইল। ইহা কোন্ কালের কথা? বিদ্যানিধি মহাশয় সূক্ষ্ম জ্যোতিষিক গণনায় পাইয়াছেন, খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫৬ অব্দে জ্যৈষ্ঠ শুক্লা দশমীতে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। এই অব্দ হইতেই দশহরা পালিত হইতেছে। রঘুনন্দন 'তিথিতত্ত্বে' বলিয়াছেন, "দশহরা এক সম্বৎসরের মুখ।" ইহা হইতে তিন চান্দ্রমাস ও তিন তিথি পরে ভাদ্র শুক্লা ত্রয়োদশীতে নিশ্চয় সূর্যের দক্ষিণায়ন হইয়াছিল। পঞ্জিকায় ইহার পূর্বদিন, ভাদ্র শুক্লাদ্বাদশীতে, শক্রধ্বজোত্থান উৎসব বিহিত হইয়াছে। ইহাও সেই খ্রী-পূ ৩২৫৬ অব্দের কথা। আজ পর্যন্তও বাঁকুড়া জেলার খাতড়া (ক্ষত্রা, ক্ষত্রভূমি) গ্রামে তথাকার রাজবংশীয়গণ 'ইন্দ পরবে' এই স্মৃতি রক্ষা করিতেছেন। ভাদ্র শুক্লা ত্রয়োদশী হইতে আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমী ১০ দিন = ⅓ মাস। অতএব খ্রী-পূ. ৩২৫৬ অব্দের আরও পূর্ববর্তীকালে জিতাষ্টমীতে দক্ষিণায়ন হইয়াছিল। দুই সহস্র বৎসরে অয়ন এক মাস পশ্চাদ্গত হয়। অতএব ⅓ মাসে ২০০০ × ⅓ = ৬৬৬⅔ বৎসর অয়ন পিছাইয়া আসিয়াছিল। অর্থাৎ জিতাষ্টমীতে দক্ষিণায়ন খ্রী-পূ ৩২৫৬ + ৬৬৬⅔ = খ্রী-পূ ৩৯২২⅔ অব্দের, স্থূলতঃ কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ ৩৯০০ অব্দের কথা। কিন্তু এই অব্দে নববর্ষের কোন শাস্ত্রীয় উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইহাতে অনুমান হয়, এই স্মৃতি ধরিয়া উৎসবটি খ্রী-পূ ৩২৫৬ অব্দ হইতে চলিয়া আসিতেছে।

কতকালের পুরাতন স্মৃতি আমরা একটা ক্ষুদ্র উৎসবের মধ্য দিয়া রক্ষা করিতেছি, একবার ভাবিয়া দেখুন। পূজা-পার্বণগুলা কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিবার নহে। ইহাদের মধ্যে আমাদের দেশের ইতিহাস আত্মগোপন করিয়া আছে। অনুসন্ধান করিলে আমরা প্রায় সকল উৎসবের মধ্যেই এই প্রাচীন ইতিহাসের অব্যর্থ ইঙ্গিত দেখিতে পাইব।

শরৎ-লক্ষ্মী

শ্রীকরুণাময় বসু

চাঁপার বরণ রৌদ্র মাখানো
অলস বনের মায়া;
ঘুঘু পাখী ডাকে পল্লব ফাঁকে,
দীঘি জলে কাঁপে ছায়া।
শিশিরসিক্ত শিউলি ফুলের রাশি
বনতলে পড়ি' কখন হয়েছে বাসি;
মোহিনী সুরেতে বাজে রাখালের বাঁশি
মাঠ ঘাট প্রান্তরে;
দূরের মানুষ চেনা পথ ধরে
হঠাৎ এলো কি ঘরে?

বনে বনান্তে রঙের ঝর্ণা
ঘাসে প্রজাপতি ওড়ে;
মনে আনে কোন্ পুরাতন স্মৃতি
নবীন সুধায় ভ'রে।

ছলছল নদী ভরা স্রোতে যায় চলে,
ভরি' দেয় স্নেহ দুই তীর-অঞ্চলে;
ফুলে ফুলে ভরা মালঞ্চলতা দোলে,
করে কতো কানাকানি।
পাখির গানেতে ভরেছে বাগান,
আনে সুধামাখা বাণী।
শরতের রোদ চিকণ সোনায়
মায়ামরীচিকা বোনে;
আলোসম্পাতে মুগ্ধ ছায়াতে
স্বপ্ন ঘনায় মনে।
ভাবনা আমার পাল তুলে যায় ভেসে
কোন খেয়াপারে অকূল নিরুদ্দেশে;
মধুকর আসে ক্লান্ত দিনের শেষে
পাখাগুলি আন্দোলি'।
অলস বনের কলস ভরেছে
রৌদ্রের অঞ্জলি।

পূজা-সংখ্যা

(একাঙ্কিকা, কৌতুক-নাটিকা)

শ্রীকৃষ্ণধন দে

[স্থান, "উল্লম্ফন" মাসিক পত্রিকার কার্যালয়। সম্পাদক চেয়ারে উপবিষ্ট, সম্মুখের টেবিলে রাশীকৃত কাগজপত্র ও ইংরেজী বাংলা কয়েকটি অভিধান। এক পার্শ্বে টেলিফোন। মাথার উপরে এক পয়েণ্টে পাখা ঘুরিতেছে। বাম হস্তে একখানি কাগজ ও দক্ষিণ হস্তে ধূমায়িত বর্মা-চুরুট ধরিয়া সম্পাদক মহাশয় একমনে কি ভাবিতেছেন। তাঁহার বয়স ও চেহারার বর্ণনা না করাই ভাল, মিলিয়া গেলে মানহানির মামলা হইতে পারে। যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা সেইভাবে তাঁহাকে কল্পনা করিয়া লইতে পারেন।]

সম্পাদক। (কাগজ দেখিতে দেখিতে উচ্চ কণ্ঠে হাঁকিলেন) রুদ্রাক্ষ—রুদ্রাক্ষ—

[পার্শ্বের ঘর হইতে সহকারী সম্পাদক রুদ্রাক্ষ রুদ্র প্রবেশ করিলেন। বয়সে তরুণ, চেহারা দোহারা, মাথায় লম্বা চুল, চোখে চশমা, হাসিভরা মুখ।]

রুদ্রাক্ষ। ডাকছেন সার্?

সম্পাদক। হাঁ, দেখ, এবার আমাদের "উল্লম্ফন" পত্রিকার পূজা-সংখ্যায় মল্লিকা মল্লিকের কবিতার ঠিক পাশেই বসুন্ধরা বসুর এই কবিতা যাবে। এখনি প্রেসে পাঠিয়ে দাও।

রুদ্রাক্ষ। এটা আবার কখন এল সার্? ডাকে এলে ত আমার হাতেই আগে পড়ত।

সম্পাদক। সে খোঁজে তোমার কাজ কি? যা বলি তাই করো।

রুদ্রাক্ষ। বুঝেছি। আপনি ঐ বসুন্ধরা বসুর বাড়ীতে কাল নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন না?

সম্পাদক। তাতে হয়েছে কি? কাল বসুন্ধরার জন্মতিথিতে আমার নিমন্ত্রণ ছিল।

রুদ্রাক্ষ। আমাকে ত আগে কিছু বলেন নি সার্।

সম্পাদক। সেখানে আমার একটু তাড়াতাড়ি যাওয়ার দরকার ছিল, আর তা ছাড়া তারা নিমন্ত্রণ করেছিল আমাকে, আমার ষ্টাফকে ত নয়।

রুদ্রাক্ষ। যাক্ গে সার্; আমরা ত চিনির বলদ, কবিতার প্রুফ দেখেই দিন কাটে। আপনি ত তবু এখানে-ওখানে রসগ্রহণ করে থাকেন।

সম্পাদক। হাঃ হাঃ, কথাটা বলেছ বেশ, রুদ্রাক্ষ। কিন্তু কৈ, "উল্লম্ফনে"র পূজা-সংখ্যার জন্য ভাল লেখা ত আসছে না। সময়ও এদিকে বেশী নেই। গত সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিয়েছি, বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনাসম্ভারে পূজা-সংখ্যা "উল্লম্ফন" সমৃদ্ধ হবে। কিন্তু এখন দেখছি—

রুদ্রাক্ষ। কিছু ভাববেন না সার্, আমি সব ঠিক করে ফেলেছি। আমার আজকালকার তরুণ বন্ধুবান্ধবদের লেখাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের লেখা। 'উল্লম্ফনে'র পূজা-সংখ্যা তাদের লেখা দিয়েই ভরিয়ে দেব।

সম্পাদক। লোকে গল্পই বেশী পড়বে। ভাল গল্প না থাকলে কাটতি হবে কেমন করে?

রুদ্রাক্ষ। সে আমি ম্যানেজ করে নেব সার্। একটু ঘুরিয়ে, গল্পচ্ছলে, ঐ যে কি বলে, (মাথা চুলকাইয়া) জৈব আকর্ষণ থাকলেই গল্পের পাঠক-পাঠিকা বাড়বে। তার উপর যদি পুরুষের লেখা ঐ সব গল্প মেয়েদের নাম দিয়ে বার করতে পারেন তবে ত সোনায় সোহাগা।

সম্পাদক। আর কবিতা? (মৃদু হাস্য)

রুদ্রাক্ষ। সেজন্যেও ভাববেন না। আমার আধুনিক নামকরা কবিবন্ধুদের বলে এসেছি, তারা কবিতা নিয়ে আসবে।

সম্পাদক। বেশ। এবার আমি তোমাদের বন্ধুবান্ধবের লেখাই ছাপব। কিন্তু যদি পত্রিকার কাটতি না হয়, তা হলে তুমিই দায়ী।

রুদ্রাক্ষ। দায়টা আমার ধরলেন, কিন্তু আয়টা?

সম্পাদক। (মৃদু হাসিয়া) হলে ত?

রুদ্রাক্ষ। নিশ্চয় হবে। এটা যে আধুনিক যুগ। অনেককেই লেখা আনতে বলেছি, এখন ছাপা না ছাপা আপনার হাত।

সম্পাদক। ভাল লেখা হলে নিশ্চয়ই ছাপব।

রুদ্রাক্ষ। যুগটা বদলাচ্ছে কিনা, তাই এ যুগের—

[নেপথ্যে "ভিতরে আসতে পারি?" কণ্ঠস্বর শোনা গেল।]

সম্পাদক। কে? আসুন।

[কবি সরসিজ সরখেলের প্রবেশ]

সরসিজ। নমস্কার। রুদ্রাক্ষবাবুর অনুরোধে একটা কবিতা এনেছি "উল্লম্ফনে"র পূজা-সংখ্যার জন্যে। খাতাই এনেছি, ইচ্ছে হয় বেছে নিতে পারেন আপনি।

সম্পাদক: আপনার নাম?

সরসিজ। সরসিজ সরখেল।

সম্পাদক। কোথায় কোথায় লিখেছেন?

সরসিজ। কতক লিখেছি বসে শ্বশুরবাড়ীতে, কতক নিজের বাড়ীতে।

সম্পাদক। না, না, তা নয়। কোন্ মাসিকে পাঠান?

সরসিজ। আমার মাসী নেই, মাঝে মাঝে আমার এক বান্ধবীকে পাঠিয়ে থাকি।

সম্পাদক। আপনি কবিই বটেন!

[illegible]। (গর্ব্বিত মৃদু হাস্যে) আজ্ঞে লোকে তাই বলে।

সম্পাদক। আপনার খাতা থেকে একটা কবিতা পড়ুন ত। যদি চলে, নিশ্চয়ই ছাপব।

রুদ্রাক্ষ। চলবে সার্, ঠিক চলবে। ওঁর কবিতার আদর আজকাল খুব।

সরসিজ। শুনুন তবে। (খাতা হইতে কবিতাপাঠ)

ধাঙ্গড়-বউ

বর্ষা এসেছে।
আকাশের মুখ নয় ত, যেন কালো হাঁড়ি।
ও যেন বেকার ছোক্‌রা, মুখ কালো করে'
চোখের জলে, রাতদিন সইছে বাড়ীর গঞ্জনা।
নয় ত, বৌ পালানো কেরাণী-স্বামী
উনানের কালো ধোঁয়ায়
একলা বসে সেঁকছে রুটি।
হয় ত হতেও পারে ও
কালো-বাজারের কালো দালাল,
মুনাফার কড়ি ভাওতায় খুইয়ে
কালো মুখে বসে আছে।

সম্পাদক। (হাস্যমুখে) বাঃ! বর্ষার আকাশের এমন উপমা কালিদাসও দিতে পারেন নি।

সরসিজ। আজ্ঞে আরও শুনুন।

বর্ষার ভোরে ধাঙ্গড়বউ বেরিয়েছে কাজে,
থম্‌-থমে কালো আকাশ।
নির্জ্জন রেড রোডের পাশে বাদামগাছের নীচে
দাঁড়ায় সে আনমনে।
কালো আকাশের মতই মন তার হয় কালো।
ও যেন অলকাপুরীর বিরহিণী যক্ষিণী।
হু হু করে আসে ঝোড়ো হাওয়া,
গড়ের মাঠের সবুজ ঘাস কাঁপিয়ে,
শিরীষগাছের ডাল নাচিয়ে,
বাদামগাছের পাতা দুলিয়ে।
দূরে দেখা যায় ভিক্টোরিয়া মেমোর‍্যাল,
কালো আকাশের নীচে সাদা গম্বুজ।
ধাঙ্গড়বউ যায় কাজ ভুলে।
ভিজে ঘাসের গন্ধভরা আলো-আঁধারি সকাল,
মন তার যায় হারিয়ে
ত্রিচিনপল্লীর কোন এক অজানা গাঁয়ে।
সেখানে নারকেলপাতা ছুঁয়ে যায় উড়ন্ত মেঘ,
আর এখানে ধাঙ্গড়বউ নিয়ে থাকে দুরন্ত তৃষা।

রুদ্রাক্ষ। দেখছেন সার, কি vivid বর্ণনা!

সম্পাদক। আচ্ছা রেখে যান আপনার কবিতা। এখন তবে আসুন। নমস্কার।

[সরসিজ সরখেলের প্রস্থান ও পরক্ষণেই কবি বাগীশ্বর বাগচির প্রবেশ]

রুদ্রাক্ষ। ইনিই সার্, কবি বাগীশ্বর বাগচি, আমার বিশেষ বন্ধু।

সম্পাদক। আসুন।

বাগীশ্বর: একটা কবিতা এনেছি আপনাদের পূজা-সংখ্যা "উল্লম্ফনে"র জন্যে।

সম্পাদক। বেশ, বেশ,—আচ্ছা পড়ুন আপনার কবিতা।

বাগীশ্বর। শুনুন তবে—(কবিতাপাঠ)

ব্যাঙাচি

ব্যাঙের ছানা, নাম ওদের ব্যাঙাচি।
ছোট্ট কালো দেহ আর পুচকে ল্যাজ নিয়ে
কিলবিল করে ওরা ডোবার জলে।
ডোবার পাড়ের বাঁশঝাড়ের পাতা
উড়ে এসে পড়ে ঘুরতে ঘুরতে।
ব্যাঙাচির দল উঠে বসে সে পাতায়,
জটলা করে, খেলা করে
সকালের ঝিকিমিকি রোদে।
ওদের ব্যাঙ-বাপ গেছে কোথায় পালিয়ে,
ব্যাঙ-মায়ের সঙ্গেও দেখা নেই।
ওরা যেন অনাথ-আশ্রমের বাসিন্দা সব।
দখিনপাড়ার ক্ষেন্তী আর সুবাসী আসে জলকে,
ওরা জলে নামতেই ব্যাঙাচিরা দেয় ছুট।
ক্ষেন্তী বলে—কি যে ব্যাঙাচি ভাই!
সুবাসী বলে—এ বছর খুব বর্ষা হবে দেখিস।
দু'জনে হেসে ওঠে খিল-খিল,
ঘড়ায় জল নিয়ে ফিরে যায় ঘরপানে।
পথে যেতে যেতে সুবাসী দেখে—
ঘড়ার জলে ছোট্ট একটা ব্যাঙাচি!
ও যেন বাপ-মা-হারা, একটু স্নেহের ভিখারী,
তাই এসেছে ওর সঙ্গে।
সুবাসী ঘড়ার জল খানিকটা ফেলে দেয়,
তার সঙ্গে ব্যাঙাচিও।
আহা বেচারা!

রুদ্রাক্ষ। দেখছেন সার্, ব্যাঙাচির কি সাইকোলজি!

সম্পাদক। আচ্ছা রেখে যান আপনার কবিতা, পরে খবর পাবেন।

[বাগীশ্বর বাগচির প্রস্থান ও গল্পলেখক বটকৃষ্ণ বটব্যালের প্রবেশ]

রুদ্রাক্ষ। আসুন, আসুন। (সম্পাদকের দিকে ফিরিয়া) ইনিই প্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক বটকৃষ্ণ বটব্যাল মহাশয়।

সম্পাদক। ওঃ! নমস্কার, আসুন।

বটকৃষ্ণ। রুদ্রাক্ষবাবুর অনুরোধে একটা গল্প এনেছি পূজা-সংখ্যার জন্যে।

সম্পাদক। বেশ, বেশ। পড়ে শোনান ত। অবশ্য যদি নিজে পড়ে শোনাতে আপত্তি না থাকে।

বটকৃষ্ণ। আপত্তি আর কি! শুনুন—

"আঁতুরের গন্ধ গায়ে মেখে ছিদাম মুদী গলির স্যাংসেঁতে অন্ধকার ঘর আছে যেন ঝিমিয়ে।

শবরী জেগে ওঠে দশ দিনের শিশুকে বুকে জড়িয়ে।

স্বপনেশ বলে: ডাকব না কি বেয়ারা কি আয়াকে? যাবে লেকে হাওয়া খেতে ক্রিসলার হাঁকিয়ে?

শবরী হেসে উঠে। যেন আদমের পতনে ইভের হাসি। বলে সেদিনের কথা তোল কেন স্বপনেশ? সে শবরী অনেকদিন হ'ল মরে গেছে।

স্বপনেশ এগিয়ে যায় শবরীর পাশে। বলে—হতে পারতে হয়ত তুমি কোন জমিদার কি ব্যাঙ্কার কি ব্যারিষ্টারের ঘর-আলো-করা বউ, আমি শুধু গানের মাষ্টার, কি-ই বা দিতে পারি তোমায়?

দশ দিনের ছোট্ট শিশু ঘুমুতে ঘুমুতে হাই তোলে।

শবরী বলে। যদি পুলিস এখানকার সন্ধান পেয়ে সত্যিই তোমাকে ধরে?

স্বপনেশ বলে: তুমিই ত সাক্ষী হয়ে বাঁচাবে আমায়।

শবরী খিল খিল করে হেসে উঠে, জলতরঙ্গ হাসি। মোনালিসার মত নির্ব্বাক হাসি নয়, ড্যালাইলার মত মোহময় নিষ্ঠুর হাসি।

স্বপনেশ বলে। চল এদেশ ছেড়ে অন্য কোন দেশে পালিয়ে যাই। তোমার জড়োয়া গহনাগুলো বিক্রী করলে ত অনেক টাকা হবে।

শবরী গাঢ় স্বরে বলে, উঁহু, দেশের মাটি ছেড়ে আমি কোথাও যাব না, বন্দেমাতরম!"

সম্পাদক। একেবারে বন্দেমাতরম? তারপর শেষে হ'ল কি?

বটকৃষ্ণ। পড়েই দেখবেন। ইনক্লাব জিন্দাবাদ, নারীপ্রগতি, পুনর্ব্বাসন সমস্যা, হিন্দু কোড বিল,—কিছুই বাদ দি' নি। গল্পটা পপুলার করবার জন্যে আঁতুরঘরে শবরীর মুখে হিন্দী সিনেমার গান পর্য্যন্ত দিয়েছি।

রুদ্রাক্ষ। এ গল্পটা কিন্তু আমাদের পূজা-সংখ্যার ফার্ষ্ট পেজে দিতে হবে স্যার্।

সম্পাদক। বেশ ত। আচ্ছা আপনি এখন আসুন বটকৃষ্ণবাবু।

[বটকৃষ্ণের প্রস্থান ও দ্বিতীয় গল্পলেখক তরণী তরফদারের প্রবেশ]

তরণী। নমস্কার।

রুদ্রাক্ষ। আসুন। (সম্পাদকের দিকে ফিরিয়া) ইনিই কথা-সাহিত্যিক তরণী তরফদার। তিন মাসে এঁর বই "তরণী তরফদারের গল্প-তরঙ্গ" বাজারে খুব নাম করেছে, তিনটে এডিশন হয়েছে।

সম্পাদক। বটে! বেশ, বেশ, কি গল্প এনেছেন পড়ুন।

তরণী। বলছেন যেকালে পড়তে, শুনুন তবে—

"নদী চলে যেন নারীর ভালবাসা। এক কূল ভেঙে আর এক কূল গড়তে চায়। চন্দনার মনেও কত ঢেউ জাগে! একদিকে গরীব কেরাণী-স্বামী, অন্যদিকে ঘর ছেড়ে সিনেমা-ষ্টার হওয়ার বিপুল সম্ভাবনা। সত্যই কি সে এক কূল ভেঙে আর এক কূল তুলবে গড়ে?

মেঘলা দুপুরবেলাটা ভাল লাগে না চন্দনার। সামনের পার্কে পামগাছটা যেন ওর জীবনের মতই দুলছে। আকাশটা যেন ওর বর্ত্তমানের মতই কালো মেঘভরা।

আর ভাবতে পারে না চন্দনা। বিকাল যেন পা টিপে টিপে এগিয়ে আসে। কেরাণী-স্বামীর জন্যে প্রতীক্ষার ভান তার নেই। কিন্তু "অভিসারিকা ফিল্ম কোম্পানী"র পুলক-দা? চন্দনার চোখের সামনে যেন ফুটে ওঠে রূপালী পর্দ্দায় তার নিজের ছবি। কানে শোনে যেন জনতার করতালিধ্বনি।

কিন্তু করতালিধ্বনি না উঠে, উঠল দরজায় কড়া-নাড়ার ধ্বনি।

'দোর খোল গো—' স্বামী নকুড়বাবু হাঁকেন।

চন্দনা শক্ত হয়ে বসে থাকে। না, খুলবে না সে দরজা।

কোথায় আসবে পুলক দা, না, এল তার কেরাণী-স্বামী?

—"ওগো শুনছ, দোর খোলই না ছাই!

চন্দনা যেন পাথর। নাঃ, আজই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক্।

—'ওগো—'

চন্দনার হাত-পা যেন মেঝের সঙ্গে পেরেক দিয়ে আঁটা। চন্দনা নড়ে না। চেঁচাক ও যত পারুক।

এবার আর চেঁচানি নেই, কড়ানাড়ার শব্দও নেই।

চন্দনা মনে মনে হাসে, যাক্ না ফিরে, নদীর ঢেউ তার ভাঙবার কূল বেছে নিয়েছে।

অনেক কষ্টে রাস্তার দিকের জানালার ভাঙা গরাদের ফাঁক দিয়ে গলে এসে নকুড়বাবু চন্দনার সামনে দাঁড়ান, বলেন, ব্যাপার কি? আমার ডাক কি শুনতে পাও নি? আমারই বাড়ীতে আমাকে কিনা ভাঙা গরাদে সরিয়ে চোরের মত ঢুকতে হ'ল?

চন্দনা কঠিন হয়ে ঝেঁজে ওঠে। 'মনের দরজা যদি কোনদিন তোমার জন্যে খুলতে না পারি, ঘরের দরজা খুলে লাভ কি?'

সম্পাদক। থাক্, থাক্, আর পড়তে হবে না। গল্পটা রেখে যেতে পারেন।

তরণী। শেষটা শুনবেন না? শেষের দিকে ভয়ঙ্কর রোমান্স।

সম্পাদক। নিশ্চয় পড়ে দেখব। আচ্ছা আপনি তবে আসুন। নমস্কার।

[তরণী তরফদারের প্রস্থান ও পরক্ষণেই বাঁধানো-খাতা হস্তে রিসার্চ স্কলার খগেন খাস্তগীরের প্রবেশ]

খগেন। নমস্কার।

রুদ্রাক্ষ। আসুন আসুন খগেনবাবু। (সম্পাদকের প্রতি)

ইনিই বিখ্যাত গবেষণাকারী খগেন খাস্তগীর মহাশয়। রিসার্চে এ[illegible]ড়া নাম।

সম্পাদক। আসুন, নমস্কার। পূজা-সংখ্যার জন্যে প্রবন্ধ এনেছেন নিশ্চয়।

খগেন। এনেছি। এ প্রবন্ধ আমার গভীর গবেষণার ফল।

সম্পাদক। বেশ, বেশ, "উল্লম্ফনে"র দিকে আপনারা ঝোঁক না দিলে চলবে কি করে? একটু পড়ুন না শোনা যাক্।

খগেন। শুনুন। প্রবন্ধের নাম "লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পনখার প্রেমের গভীরতা"।

সম্পাদক। বলেন কি মশায়, সূর্পনখার প্রেম?

খগেন। আজ্ঞে হাঁ, কিছুটা শুনুন তবে—

"সূর্পনখার প্রেমের গভীরতা কে বুঝিবে? নিতান্ত নাক-কান-কাটা না হইলে এ প্রেম উপলব্ধি করা যায় না। মানব ও রাক্ষস পরস্পর ভিন্ন নেশান্। এই ইণ্টারন্যাশানাল প্রেম বিশ্বধর্ম্মী। প্রেমের গণ্ডী শুধু একটা দেশ বা জাতির মধ্যে নিবদ্ধ থাকিলে সে প্রেম হয় অপ্রসারী, স্থাবর ও স্থবির। বিভিন্ন জাতির প্রেমের সংমিশ্রণে যে মহাজাতির সৃষ্টি হইবে তাহা দুর্দ্ধর্ষ, অপরাজেয় ও তীব্র মননশক্তিসম্পন্ন। সূর্পনখা ইহাই বুঝিয়াছিলেন। আর বুঝিবেন না-ই বা কেন, তিনি যে রক্ষঃকুলপতি রাবণ-ভগ্নী। তাই সূর্পনখা চাহিয়াছিলেন নিবিড় বনের পটভূমিতে স্যাভেজ-প্রেম। লাজুক লক্ষ্মণ অগ্রজ ও অগ্রজ-ঘরণীর সম্মুখে সে কেভ্ম্যান্-স্পিরিট দেখাইতে পারেন নাই, সূর্পনখার নাককান কাটিয়া তবে ছাড়িয়াছিলেন। পাছে হাটে হাঁড়ি ভাঙিয়া যায় এই ভয়ে পরম সাধ্বী স্ত্রী যেমন স্বামীর সম্মুখে হঠাৎ ধৃত নিশাচোরকে তাড়না করে, লাঞ্ছনা করে ও আস্ফালন করিয়া তাহার নাক-কান কাটিতে চায়, লক্ষ্মণও সেইরূপ করিয়াছিলেন এবং সত্যই সূর্পনখার নাক-কান কাটিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে প্রকারান্তরে লক্ষ্মণের প্রচ্ছন্ন গভীর প্রেম প্রকাশ পাইতেছে। একশ্রেণীর প্রেম আছে যাহা প্রেমাস্পদকে শারীরিক যন্ত্রণা দিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করে। লক্ষ্মণের প্রেম সেই জাতীয়। কিন্তু সূর্পনখার প্রেম আরও গভীর। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাহার নাক-কান কাটিয়া যদি প্রিয়তম সুখী হয় তবে তাহাই হউক। এ প্রেম জগতে দুর্লভ। নাসিকা-কর্ণ-বিহীনা সূর্পনখাই আদর্শ প্রেমিকা।"

সম্পাদক। আরও আছে নাকি?

খগেন। নিশ্চয়ই। এর পরে সূর্পনখার সাইকো-এনালিসিস আছে। তাহার অন্তরের নিগূঢ় মণিকোঠায় যে বুভুক্ষু অবচেতনা—

সম্পাদক। থাক্, আর আপনাকে এখন কষ্ট করে বুভুক্ষু অবচেতনা বোঝাতে হবে না। আমি পড়ে নোব'খন। আপনার প্রবন্ধ রেখে যান। নমস্কার।

[খগেন খাস্তগীরের প্রস্থান ও পরক্ষণেই চক্রপাণি চাকলাদারের প্রবেশ]

চক্রপাণি। নমস্কার।

সম্পাদক ও রুদ্রাক্ষ। নমস্কার।

রুদ্রাক্ষ। ইনিই বিখ্যাত সিনেমা-গল্পলেখক চক্রপাণি চাকলাদার।

চক্রপাণি। একটা বাংলা সিনেমা-গল্পের সিনপ্সিস এনেছি আপনাদের পূজা-সংখ্যার জন্যে।

সম্পাদক। বেশ ত, যদি কিছু মনে না করেন তবে খানিকটা পড়ে শোনালে বাধিত হব।

চক্রপাণি। অবশ্য আসল গল্পটা একটু বড় হবে। শুধু সিনপ্সিসটুকুই শুনিয়ে দিচ্ছি এখন—

"ছায়াচিত্রটির নাম 'দিল্লী-কা-লাড্ড'। নামে দিল্লীর উল্লেখ থাকিলেও, স্থান বাংলাদেশের কোন একটি সুদূর পল্লীগ্রাম। পিতা নিতান্ত দরিদ্র, মাতা চিররুগ্না, সুতরাং সুন্দরী বয়স্থা কন্যাকে নদীর ঘাট হইতে জল আনিতে হয়, পাড়াপড়শীর বাড়ী হইতে জিনিষ চাহিতে হয়। মেয়েটির নাম তেলেনা।

হাল-ফ্যাসানের দামী সাড়ী-ব্লাউজ পরিয়া তেলেনা ঘড়া-কাঁখে জল আনিতে যায়। মনে রাখিবেন তেলেনার বাপ গরীব হইলেও সিনেমা কোম্পানী গরীব নহেন। সুতরাং দরিদ্র হইয়াও তেলেনা যে দামী সাড়ী-ব্লাউজ পরিবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে! নির্জ্জন নদীর ঘাটে সে বনফুল তুলিল, ঘড়া মাজিল, ঘাটের সিঁড়িতে বসিয়া নদীর জলে পা নাচাইল এবং তাহার পর মাদ্রাজী নাচ নাচিয়া ইংরিজিতে গান গাহিল।

হঠাৎ সেখানে আবির্ভাব ঘটিল কলিকাতার জমিদারপুত্র কোট-প্যাণ্ট-পরিহিত বন্দুকধারী গবেন্দ্রভূষণের। পল্লীগ্রামে বুনো-হাঁস শিকারে আসিয়া নদীর ঘাটে তেলেনার রূপ দেখিয়া তিনি একেবারে আনম্যানেজেবল হইয়া পড়িলেন।—এই স্থানে তাঁহার সহিত তেলেনার সংলাপ খুব আপ-টু-ডেট স্মার্ট মেয়ের মত হইবে।

নদীর ঘাটেই গবেন্দ্র তেলেনাকে বন্দুক ছুড়িবার কৌশল শিখাইল। বড়ই দেরি হইয়া যাইতেছে, সুতরাং তেলেনাকে জল লইয়া গৃহে ফিরিতেই হইবে। সাময়িক বিদায় লইয়া গবেন্দ্র শিস দিতে দিতে চলিয়া গেল। সজল চক্ষে তেলেনা তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। যাইবার সময় ছাপানো ভিজিটিং কার্ডে গবেন্দ্র তাহার ঠিকানা রাখিয়া গেল।

দরিদ্র পিতা-মাতা জ্ঞাতি-পুত্র ঘটোৎকচের সহিত তেলেনার বিবাহ স্থির করিলেন। নারীত্ব সম্বন্ধে সচেতনা তেলেনা বিবাহ-সভায় ঘটোৎকচকে চড় মারিয়া পল্লীপথে আঁকিয়া-বাঁকিয়া ছুটিয়া চলিল কলিকাতায় গবেন্দ্রের সন্ধানে। ট্রেনে চড়িয়া তরুণ টিকিট-চেকারের সঙ্গে স্মার্ট সংলাপ ও চলতি ট্রেনের শব্দের তালে তালে জানালায় মুখ বাড়াইয়া তাহার গান—"ওগো, আমার শ্যামল মাটি—" ইত্যাদি।

কলিকাতায় আসিয়া গবেন্দ্রের খোঁজ করিতে গিয়া তেলেনা পড়িল বিখ্যাত গুণ্ডা-সর্দ্দার ভজুয়ার হাতে। ভজুয়া তাহাকে আটকাইয়া রাখিল তাহার আড্ডা চালতাবাগানে। সেখানে পিয়ারী

নাম্নী অন্ধ একটি তরুণীর সহানুভূতি। তেলেনা চুলের কাঁটা হাতে বিঁধিয়া সেই রক্তে সাড়ীর ছেঁড়া আঁচলের টুকরায় গবেন্দ্রকে লেখিল—তুমি এস, আমি বন্দিনী। পিয়ারীর হাতে লিপন পাঠাইয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া তেলেনা রুদ্ধ কক্ষে বোম্বাই নাচ নাচিয়া গান গাহিল—'প্রিয় আজ কতদূরে --" ' ইত্যাদি।

সম্পাদক। থাক, থাক, আর কষ্ট করে পড়তে হবে না—

চক্রপাণি। এর পরে কিন্তু অনেক ব্যাপার আছে। লিপন পাইয়া গবেন্দ্রের পুলিস লইয়া ভজুয়ার আড্ডায় অভিযান, গবেন্দ্রের হাত হইতে অবলা পল্লীবালা তেলেনার রিভলভার কাড়িয়া লইয়া পলায়নপর ভজুয়ার পথরোধ। ভজুয়া গ্রেপ্তার। আরও অনেক থ্রিল ও সাসপেন্স আছে। শেষে সানাইয়ের শব্দে দর্শকেরা জানিলেন গবেন্দ্রের সহিত তেলেনার বিবাহ। চড়-খাওয়া জ্ঞাতিপুত্র ঘটোৎকচের সহিতও পিয়ারীর বিবাহ। বাসরঘরে তেলেনা ও গবেন্দ্রের দ্বৈত সঙ্গীত।

সম্পাদক। আচ্ছা, আচ্ছা, ওটা আপনি রেখে যান। নমস্কার।

[চক্রপাণি চাকলাদারের প্রস্থান ও পরক্ষণেই গুন্ গুন্ করিতে করিতে নন্দন নন্দীর প্রবেশ]

রুদ্রাক্ষ। এই যে আপনি নিজেই এসেছেন, আসুন, আসুন,—

নন্দন। নমস্কার।

সম্পাদক। নমস্কার।

রুদ্রাক্ষ। ইনিই সুবিখ্যাত তরুণ গায়ক নন্দন নন্দী। আজকাল প্রায় সব গানেই সুর দিয়ে থাকেন। আর তা ছাড়া নিজেও গান রচনা করে মেয়েদের গানের টিউশনি করেন। আমাদের পূজা-সংখ্যায় নিজের রচিত গান স্বরলিপি দিয়ে বের করতে চান ভদ্রঘরের মেয়েদের শেখবার জন্যে। একথা আমাকে উনি আগেই জানিয়েছেন।

নন্দন। অবশ্য নিজের মুখে বলতে নেই, আমার রচিত গান আজকাল খুব পপুলার হয়েছে। আমার গান ছাড়া মেয়েরা আর কোন গানই পছন্দ করে না।

সম্পাদক। বটে!

নন্দন। সুর দিয়ে, দরদ দিয়ে গানকে এমন এফেক্টিভ করে তুলতে হবে যাতে মানুষের মনের বনজ্যোৎস্না হারিয়ে যায় কোন্ এক বাদল রাতের স্বপ্ন-বীথিকায়—

সম্পাদক। ভাল, ভাল, এবার আপনার গানটা পড়ে শুনিয়ে দিন ত একবার।

নন্দন। শুনুন—

"ঘন-বরষা-মুখর মধু-অভিসার-রাতি রে!
মম নিরালা কুটীরে এলে না'ক আজো সাথী রে।
আকাশের কোণে চমকে চপলা ঐ,
গুরু-গুরু দেয়া, সাথী কৈ, সাথী কৈ?
আমি বন-যূথিকার মালা কত আর গাঁথি রে!
চাঁদ মেঘে ঢাকা, হারায়েছে শুকতারা,
যৌবন মম কামনায় দিশাহারা,
আজি নিঠুর পবনে নেভে বাতায়নে বাতি রে!
ঘন-বরষা-মুখর মধু অভিসার-রাতি রে!"

সম্পাদক। বলেন কি! এ রকম গান ভদ্রঘরের মেয়েরা গাইবে?—'যৌবন মম কামনায় দিশাহারা!'

নন্দন। আধুনিক গান কিনা, হৃদয়ের আবেদন না থাকলে গান জমে না। আর তা ছাড়া গানের বাণীতে ওসব থাকা চাই।

সম্পাদক। হুঁ। আচ্ছা রেখে যান আপনার গান ও স্বরলিপি। এখন তবে আসুন, নমস্কার।

[নন্দন নন্দীর প্রস্থান]

সম্পাদক। রুদ্রাক্ষ—

রুদ্রাক্ষ। আজ্ঞে স্যর্—

সম্পাদক। এবার আমি ঠিক করে ফেলেছি।

রুদ্রাক্ষ। কি স্যর্?

সম্পাদক। পূজা-সংখ্যার সম্পাদনায় আর আমার নাম দোব না, তুমিই হবে এর সম্পাদক।

রুদ্রাক্ষ। (হাস্যমুখে) সত্যি বলছেন স্যর্?

সম্পাদক। হাঁ রুদ্রাক্ষ।

(শেষ)

ভাষা-সঙ্কট

শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়

ভাষা মানুষের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। একটু অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে যে, আমরা যখন একান্তে আপন মনে বসিয়া চিন্তা করি তখন জটিল বাগ্‌যন্ত্রের কোনও অংশের ব্যবহার না করিলেও আমরা অনুচ্চারিত ভাষার সাহায্যে চিন্তা করি। সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাবের আদান-প্রদান ভাষার সাহায্যেই হয় এবং আমাদের সমস্ত সমাজের সম্মিলিত কাজকর্ম্মের ভিত্তি হইতেছে ভাষার সাহায্যে ভাবের আদান-প্রদান। আচার্য্য দণ্ডী 'গো' অর্থাৎ বাক্যকে বলিয়াছেন কামদুঘা অর্থাৎ সর্ব্বার্থপ্রদায়িনী। চিন্তা ও ভাষার মধ্যে এই ঘনিষ্ঠতা লক্ষ করিয়া শাস্ত্রকারগণ বাক্য ও অর্থের মধ্যে একটা নিত্য সম্বন্ধের কল্পনা করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীস এবং তাহার সভ্যতার উত্তরাধিকারী আধুনিক ইউরোপেও 'Logos' কথাটির অতি উচ্চ সম্মান।

ভাষা এক দিক দিয়া মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও আর এক দিক দিয়া নানা সঙ্কটের কারণ। দেখা যায়, যুগে যুগে ক্ষেত্রবিশেষে মানুষ ইহাকে আত্মাভিমান, ভেদনীতি ও স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছে।

ভাষার এক বিপত্তি হইতেছে যে, ইহা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। দেশে দেশে, কালে কালে ইহার বিভিন্ন রূপ। ইংরেজী ও জার্ম্মান এক-গোত্রের ভাষা হইলেও কালক্রমে এত বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে যে, আজ এক জন জার্ম্মান ও এক জন ইংরেজ পরস্পরের কথা বুঝে না। মূলতঃ এক-বর্গের ভাষা হইলেও সিন্ধী ভাষা বাঙালীর পক্ষে প্রায় অবোধ্য। একই ভাষা প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে; এই পরিবর্ত্তন কতকটা অলক্ষ্য হইলেও লিপিবদ্ধ সাহিত্যের সাহায্যে সহজেই ধরা পড়ে। সেক্‌সপীয়র পড়িলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, সে ভাষা আধুনিক ইংরেজী হইতে অনেকটা ভিন্ন রূপ। চসারের ভাষা বুঝা আরও কঠিন এবং এংলো-স্যাক্‌সন বিউল্‌ফ কাব্য সাধারণ দৃষ্টিতে স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়াই মনে হয়।

বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান রহিয়াছে অথবা চর্য্যাপদের সঙ্গে বর্ত্তমান বাংলা গদ্যের যে পার্থক্য বিদ্যমান, সে আলোচনা না হয় বাদই দেওয়া গেল, কিন্তু প্রথম যুগের বাংলা গদ্যের সঙ্গে আজিকার গদ্যের তুলনা করিলেও ভাষার অনেকখানি প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। তা ছাড়া আবার একই সময়ে একই ভাষার মধ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ভাষার বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। একই পল্লীতে ভদ্রপাড়ার 'কোথায় গিছলে'—দু'চার পা হাঁটিয়া কৃষকপাড়ায় গেলেই 'কনে গেয়েলে' হইয়া যায়। বিলাতের নিম্নশ্রেণীর 'A hae nane'র অর্থ হইতেছে—ভদ্র ভাষায় 'I have not got any'।

একই ভাষার আবার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ। খাস ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে ইংরেজীর প্রায় ত্রিশটি আঞ্চলিক রূপ আছে এবং অনেক ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের ভাষা আর এক অঞ্চলের লোকের পক্ষে বুঝা কঠিন। বিদেশের কথা বাদ দিয়া আমাদের নিজেদের আঞ্চলিক ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। রাঢ়ের একটু বেশী অভ্যন্তরভাগে প্রবিষ্ট হইয়া ইট মারিতে হইলে 'হিট্টাল মারি দিবক' বলিতে হইবে; নহিলে লোকে ইষ্টক দ্বারা প্রহৃত হওয়ার আগে পর্য্যন্ত বুঝিবে না। ভাষার ক্ষেত্রে বিপত্তি অধিক হইলে হাতমুখ নাড়িয়া কতকটা সঙ্কটত্রাণ হইতে পারে। কিন্তু ক্ষেত্র নিতান্ত সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং সেই সীমায়িত ক্ষেত্রের মধ্যেও বিপত্তির সম্ভাবনা থাকে। তিব্বতে অভ্যাগতকে জিহ্বা প্রদর্শন করা সম্মানসূচক; মালয় অঞ্চলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনের অর্থ উদ্দিষ্ট ব্যক্তির শক্তি ও কুশলতাকে স্বীকার করা। আমাদের দেশের নেতিমূলক শিরঃসঞ্চালন তামিল দেশে সম্মতিজ্ঞাপক। সুতরাং বিপত্তি নানা দিকে ও নানা আকারে।

ভাষাতাত্ত্বিকগণের ব্যাখ্যা ও নির্দ্দেশসত্ত্বেও লোকেরা নিজ নিজ ভাষা, উচ্চারণ ও শব্দপ্রয়োগ-পদ্ধতিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে। আগেকার দিনে ভারতের উত্তর এবং পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা বলিতেন, পূর্ব্বদেশীয় লোকের নিকট আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিও না; ইহারা শতায়ুঃ স্থানে হতায়ুঃ বলিবে। হিন্দুস্থানীরা বাঙালীর 'জল খাব' শুনিয়া হাসিয়া আকুল হয়। 'ঘর'কে ইহাদের 'কামরা' শব্দ ব্যবহার করিয়া বুঝাইতে হয়। আবার ইহাদের মুখে পর পর দুইটি অকার বিবর্জ্জিত 'উপ্‌কার' বা 'উপ্‌দেশক্‌' শুনিয়া আমাদের কর্ণ পীড়া উপস্থিত হয়। 'স্কুল'কে ইহারা 'সকুল' বলে, 'ষ্টুল'কে 'সটুল' বলে, কিন্তু আমরা যে 'ইস্কুল' এবং 'টুল' বলি সে কথা মনে আসে না। 'কচ্ছে' 'হচ্ছে' ইহাদের অদ্ভুত লাগে; আমরাও ভাবি ইহারা অনবরত 'হায়' 'হায়' করে কেন। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া এই সমুদয় বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা মনে রাখিলে এই ভাষাগত বৈষম্যকে লঘুভাবেই গ্রহণ করা যায়।

কিন্তু মানুষের অহমিকা ও স্বার্থবুদ্ধি অনেক সময়ে এই ভাষাভেদকে ব্যক্তিগত অথবা জাতিগত প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার এবং স্বার্থসিদ্ধির উপায়স্বরূপ ব্যবহার করে। তখনই দাঁড়ায় প্রকৃত ভাষা-সঙ্কট। বৈদিক যুগের ঋষি বঙ্গ ও মগধকে ভাষাহীন পক্ষীজাতির সহিত উপমিত করিয়াছিলেন। Barbarian কথাটি মূলতঃ গ্রীকদের দেওয়া, অর্থ babblers বা প্রকারান্তরে—উক্ত বৈদিক ঋষির কথারই প্রতিধ্বনি—ভাষাহীন জীব-বিশেষ। আগেকার আমলের সুসভ্য স্লাভ ও স্বভাবতঃ উদার চীনারাও অন্য ভাষাভাষীদের সম্বন্ধে অনুরূপ মনোভাব পোষণ করিত। এই অহমিকা হইতেই এক ভাষার লোকের মনে অন্য ভাষার প্রতি অবজ্ঞার সৃষ্টি হয়, ফলে ভাষা হইয়া দাঁড়ায় জাতিতে জাতিতে বিরোধের কারণ। ইংরেজ, ফরাসী, স্প্যানিয়ার্ড সকলেই ভাবে তাহাদের ভাষার মত ভাষা আর নাই এবং অন্য সব ভাষা নগণ্য। জার্ম্মান ভাষা ঘোড়ার ভাষা এবং ইংরেজী হাঁসের ভাষা—এই সব প্রচলিত কথার মূলে নিজেদের ভাষার শ্রেষ্ঠত্ববোধজনিত ঐ অহমিকা।

সঙ্কট আরও ঘনীভূত হইয়া আসে যখন এক জাতি আর এক জাতিকে জয় করিয়া বিজিত জাতির ভাষা ও সাহিত্যকে দমন ও তাহার উপর নিজের ভাষা ও সাহিত্য চাপাইবার প্রয়াস পায়। দেশের মধ্য হইতেও এই জাতীয় বিপত্তির সৃষ্টি হইতে পারে যদি দেশের মধ্যে বিভিন্ন ভাষা থাকে এবং এক সম্প্রদায় তাহাদের ভাষা অন্য সম্প্রদায়ের উপর আরোপিত করিবার জন্য উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতা দেখায়।

ইংলণ্ডে যত দিন ফরাসী-প্রভাব প্রবল ছিল ততদিন পার্লামেণ্টের কাজকর্ম্ম নরমান-ফরাসী ভাষার সাহায্যে হইত। পরে ফরাসী প্রভাবের হ্রাসপ্রাপ্তি ও জাতীয়তার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ভাষা প্রাধান্যলাভ করে। ১৩৬৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইংরেজী ভাষায় পার্লামেণ্টের কাজকর্ম্ম আরম্ভ হয় এবং বিভিন্ন আদালতে ফরাসী ভাষা ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। জারের আমলে রাশিয়ার পোলিশ, লেটিস, লিথুয়ানিয়ান, ফিনিশ প্রভৃতি সংখ্যালঘুদের ভাষাগুলি নির্ম্মমভাবে নিষ্পেষিত হইত। অধুনা মেক্সিকোতে বিজ্ঞাপনাদি প্রচারের উদ্দেশ্যে বিদেশী ভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ। আয়ার্লণ্ডে ভাষা লইয়া বিবাদই স্বাধীনতা-সংগ্রামকে একটা বিশিষ্ট রূপ দেয়। পর্ত্তুগীজরা স্পেনিশ ভাষা সম্বন্ধে অসহিষ্ণু। অধুনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আচরণে স্থানে স্থানে স্পেনিশ ভাষাকে কোণঠাসা করিবার স্পষ্ট চেষ্টা দেখা যায়। ফলে স্পেনিয়ার্ডরাও নিজেদের অধিকার রক্ষার্থে উল্টা চাপ দিতে কসুর করে না।

একই দেশের মধ্যে বিভিন্ন ভাষা লইয়া অন্তর্বিরোধের উদাহরণও বিরল নয়। মধ্যযুগে ইউরোপে Lingua Latina ও Lingua Romana Rustica'র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আধুনিক যুগে মুসোলিনী জাতীয় একত্ব-বিধানের উৎকট আগ্রহে ইটালীর বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাগুলির ব্যবহার খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আধুনিক স্পেনে কাতালান ও বাস্ক ভাষায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা নিষিদ্ধ। ফ্রান্সও এই দোষ হইতে মুক্ত নয়। সে-দেশে 'ব্রেতন' ভাষায় চিঠির ঠিকানা লেখা নিষিদ্ধ এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুর ভাষাগুলির উপর রাষ্ট্রশক্তি নানা আকারে খড়্গহস্ত। এ সম্বন্ধে প্রকাশ্যে স্বীকৃত তত্ত্বটি হইতেছে—স্বাধীন ফরাসীদের ভাষা ফরাসী ক্রমে সর্ব্বজনের ভাষা হইবে ; সুতরাং ইতিমধ্যে ইহা সমগ্র ফ্রান্সের ভাষা হউক। তত্ত্বটি বিশেষ সরল সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষে ভাষা-সঙ্কটের ইতিহাস প্রাচীন। সংস্কৃত ভাষা যখন ধীরে ধীরে উত্তর-ভারতে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল তখন বিভিন্ন অঞ্চলে তাহার অ-পাণিনীয় রূপ নানা আকারে দেখা দিতে লাগিল। ক্রমে দেশীয় ভাষাগুলির সহিত অল্প বা অধিক পরিমাণে মিশ্রিত হইবার ফলে নানা শ্রেণীর প্রাকৃতের উদ্ভব হইল—"তদ্ভবস্তৎসমো দেশীত্যনেকঃ প্রাকৃত-ক্রমঃ"। দেশভেদে আবার মহারাষ্ট্র শূরসেন গৌড় ও লাট প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাকৃত ভাষা বিভিন্ন রূপ ধারণ করিল। এককালে মহারাষ্ট্র দেশে প্রাকৃতের প্রচুর সাহিত্য-সমৃদ্ধি ও মর্য্যাদা ছিল। শৌরসেনী প্রাকৃত এককালে উত্তর-ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রসারলাভ করিয়াছিল। কাল-ক্রমে এই সব প্রাকৃত হইতে বিভিন্ন অপভ্রংশ ভাষা এবং সেগুলি হইতে উত্তর-ভারতের আধুনিক ভাষাগুলির সৃষ্টি হয়। অষ্ট্রিক-গোষ্ঠীর ভাষাগুলি ক্রমে সঙ্কুচিত হইতে থাকে। দক্ষিণাপথে দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর ভাষাগুলি সংস্কৃতের শব্দ-ভাণ্ডার হইতে ঋণ গ্রহণ করিলেও নিজ নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। পাণিনির প্রভাবে সংস্কৃত ভাষা স্থায়ীভাবে একটা নির্দ্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে। ইহা সর্ব্বভারতের অভিজাতশ্রেণীর মনোভাব প্রকাশের বাহন এবং বিভিন্ন প্রদেশে রাজকার্য্যের শীর্ষভাগের ভাষা হইয়া দাঁড়ায়। সংস্কৃত নাটকে দেখি—রাজা, মন্ত্রী, রাজপুরোহিত, ঋষি, মুনি ইত্যাদি পাত্রগণ সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতেছেন। অন্যান্য পুরুষ এবং রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া সকল নারী কথা কহিতেছেন প্রাকৃতে ; সংস্কৃত ভাষার সম্মান সর্ব্বোচ্চ ; ইহা দৈবী বাক্।

সংস্কৃত ভাষার প্রতি এই অতিরিক্ত আগ্রহের ফলে এবং কতকগুলি রাজনৈতিক কারণে, সম্ভবতঃ গুপ্তযুগে এক ভাষা-সঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই সময়ে সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থ লিখিত ও পুনর্লিখিত হয় এবং বহু প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় লিখিত গ্রন্থ সংস্কৃত-রূপ ধারণ করে। ফলে

এই সব ভাষায় লিখিত মূল গ্রন্থগুলি চিরতরে বিলুপ্ত হয়। গুণাঢ্যের বৃহৎ-কথা লোপ পাইয়া গিয়াছে, মহারাষ্ট্র-প্রাকৃতের রত্নরাজি আজ চিরবিস্মৃতির গর্ভে বিলীন। জয়দেবের কাব্যের প্রাচীন রূপ ছিল, সম্ভবতঃ প্রাকৃত বা অপভ্রংশ ভাষায়। বোধ হয়, আজ আমরা আসল হারাইয়া নকল পাইয়া তৃপ্ত থাকিতে বাধ্য হইতেছি। অনাদরে ও বিরুদ্ধ শক্তির প্রতিকূলতায় সে সব রত্নরাজি চিরদিনের জন্য অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ভাষা-সঙ্কটের সে ইতিহাস কেহ লিখিয়া রাখে নাই।

আমাদের দেশে দ্বিতীয় আর এক দফা ভাষা-সঙ্কট উপস্থিত হয় মুসলমান-যুগের শেষের দিকে। সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে চিরদিনই এমন এক প্রবল দল ছিলেন যাঁহারা দেশীয় ভাষাগুলির উপর মোটেই প্রসন্ন ছিলেন না।

> অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
> ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।

অথবা বাংলাদেশের—

> কাশীদেশে, কৃত্তিবেসে,
> আর বামুন-ঘেঁসে
> এই তিন সর্ব্বনেশে।

এ সকল কথা সেই মনোভাবের প্রকাশ। গোস্বামী তুলসীদাস যখন 'রামচরিতমানস' রচনা করেন তখন এই মনোবৃত্তিসম্পন্ন পণ্ডিতেরা প্রবল আপত্তি তুলিয়াছিলেন। এই সব কারণে মুসলমান-যুগে উত্তর-ভারতে হিন্দু-সম্প্রদায়ের চলিত ভাষাগুলি এরূপ উন্নত বা সমৃদ্ধ হইতে পারে নাই যাহার দরুন বিজেতা বিজিতের ভাষা গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। ফলে মুসলমান-যুগে দিল্লী-অঞ্চলের প্রচলিত ভাষা ক্রমে উত্তর ভারতের এক বিস্তৃত অঞ্চলের বাজার-চল্‌তি ভাষা হইয়া দাঁড়ায়। এই ভাষার নাম হয় 'খড়ী বোলী' অর্থাৎ যে ভাষা আপনার শক্তিতে দাঁড়াইয়া আছে। পরে মুসলমান-যুগের শেষের দিকে ঐকান্তিক চেষ্টা এবং এক রকম জবরদস্তি করিয়া এই ভাষায় অজস্র ফারসী এবং আরবী শব্দ ঢুকাইয়া এক নূতন ভাষার সৃষ্টি করা হয় যাহা প্রধানতঃ সহর-অঞ্চলের মুসলমান ও মুসলমান রাজ-সরকারের আশ্রিত মুষ্টিমেয় হিন্দুর ভাষা হইয়া দাঁড়ায়। এই ভাষা জনসাধারণের মধ্যে কোনদিন প্রসারলাভ করিতে পারে নাই; অথচ ইহাই হয় উত্তর-ভারতের রাজ-সরকারের ভাষা। উত্তর-ভারতে যে সাহিত্য ও চিন্তার প্রকাশে একটা নূনতা দেখা যায় তাহার জন্য অনেকখানি দায়ী এই কৃত্রিম ভাষা।

বর্ত্তমানে স্বাধীন ভারতে আর এক দফা ভাষা-সঙ্কট উপস্থিত। ভাষার ইতিহাসে দেখা যায়—এক দল যখন রাজশক্তির প্রভাবে বলীয়ান হইয়া অন্য দলের ভাষাকে কোণঠাসা করিতে চায় তখন কিছুকাল সে চেষ্টা কার্য্যকরী হয় বটে, কিন্তু কালক্রমে প্রভুত্বকারী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ঠিক উল্টা ফল আরম্ভ হয়। ভাষার এই অভিযান তখন বিপরীত মুখে চলিতে থাকে।

বর্ত্তমান ফারসী এবং তুর্কী ভাষা হইতে আরবী ও অন্যান্য বৈদেশিক শব্দগুলিকে নির্ব্বাসিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ঠিক অনুরূপ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে উত্তর-ভারতে হিন্দী ভাষার মারফত। হিন্দী ও উর্দু উভয়েরই ব্যাকরণ খড়ী বোলী। হিন্দীকে আজ সংস্কৃতানুগ করিবার কি প্রাণান্তকর চেষ্টাই না চলিতেছে! চিঠির বাক্স বা ডাকবাক্স 'পত্রমঞ্জুষা' নাম লইয়া সেকালের মালবিকা ও মাধবিকার মণিমঞ্জুষার পার্শ্বে স্থানপ্রার্থী। নিজেদের পূর্ব্বকৃত অবিবেচনার এই বিপরীত ফল দেখিয়া উর্দু-প্রেমীরা আজ প্রমাদ গণিতেছেন। সঙ্কটের শুধু এইখানেই শেষ নয়। বিহার হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্ব-পঞ্জাব এবং রাজপুতানা ও আগেকার মধ্যভারত লইয়া এই বিরাট ভূখণ্ডে হিন্দীই একমাত্র ভাষা—ইদানীং এই বার্ত্তা উচ্চরবে বিঘোষিত হইতেছে। কিছুদিন আগে অল-ইণ্ডিয়া রেডিও হইতে প্রকাশিত এক পুস্তিকায় বলা হইয়াছে যে, এই বিরাট অঞ্চলের প্রচলিত ভাষাগুলি হিন্দী ভাষার বিভিন্ন প্রান্তীয় ভাষা (dialects) মাত্র। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া এই মতবাদ কোনক্রমেই বিচারসহ নহে। মানভূম ও সিংভূম অঞ্চলে হিন্দী-প্রচারের উৎসাহ ঔচিত্যের মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। মিথিলা ও ভোজপুর অঞ্চলের লোকেরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছেন। রাজপুতানায় সাহিত্যিকেরা স্বদেশের প্রাচীন গৌরবময় সাহিত্য 'মরু'ভাষার অনাদর দেখিয়া ক্ষুণ্ণ। তামিল ভাষা হইতে সংস্কৃত শব্দের বিতাড়নের পালা ক্রমেই জমিয়া উঠিতেছে। দ্রাবিড়-বর্গের অন্যান্য ভাষা-গুলিতেও সংস্কৃতের আধিপত্য সম্বন্ধে প্রতিকূল মনোভাব প্রবল। ইহাই ভারতের ভাষা-সঙ্কটের বর্ত্তমান রূপ।

অন্যের ভাষাকে বিচারবুদ্ধি লইয়া শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা অতি-আধুনিক মনোভাবসঞ্জাত এবং ভাষাতাত্ত্বিকগণের প্রচুর চিন্তা ও গবেষণার ফল। স্বার্থের বাধা কাটাইয়া এই মনোভাব সমাজে প্রচারিত হইতে এখনও বিলম্ব আছে। অধিকাংশ মানুষই না ঠেকিয়া শিখিতে পারে না। আমাদের কিছুদিন এখন সেই শিক্ষার অপেক্ষায় থাকিতে হইবে।

হালিসহর

শ্রীপূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা হইতে মাত্র ছাব্বিশ মাইল দূরে, ভাগীরথীতীরে হালিসহর নামক অতি প্রাচীন গ্রামটি অবস্থিত। হাবেলীসহর (যাহা হইতে হালিসহর নামের উৎপত্তি) একটি পরগণার নাম। পূর্ব্বে ইহা নদীয়ার রাজবংশের জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। এই পরগণার কেন্দ্রস্থল ছিল কুমারহট্ট। কুমারহট্ট কালক্রমে পরগণার নামে হালিসহর বলিয়া পরিচিত হয়। কুমারহট্ট নামেরও একটু ইতিহাস আছে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বজরা করিয়া গঙ্গায় ভ্রমণ

শিবের গলি (রামপ্রসাদের বাস্তুভিটা)

করিতে করিতে হালিসহরে আসিয়া উপস্থিত হন। মাঝিরা বজরা ঘাটে বাঁধিয়া বিশ্রাম করিতে থাকে। ইত্যবসরে মহারাজ দেখেন যে একটি নিম্নশ্রেণীর লোক ঘাটে স্নানান্তে স্তোত্রাদি পাঠ করিতে করিতে উঠিয়া যাইতেছে। তিনি লোকটির সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া প্রশ্ন করেন—"কস্ত্বম" ? উত্তরে সে বলে—"রজকোহহম্"। মহারাজা আশ্চর্য্য হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করেন—"বাপু হে, তুমি কি সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছ ?" তখন লোকটি বলে—"হালিসহর গ্রামে বহু ব্রাহ্মণের বাস এবং বহু টোল আছে যেখানে ব্রাহ্মণ-কুমারেরা প্রত্যহ সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁহাদের স্তোত্রাদি পাঠ শুনিয়া আমি সংস্কৃত উচ্চারণ এবং সংস্কৃত ভাষাও কিছু কিছু শিখিয়াছি এই মাত্র।" অতঃপর মহারাজা বজরা হইতে নামিয়া গ্রামমধ্যে গমন করেন এবং রজকের কথা যে সত্য তাহা অবগত হন। এখানে সংস্কৃতের ও শাস্ত্রের এত চর্চ্চা হয় এবং এত ব্রাহ্মণ-কুমার অধ্যয়ন করেন দেখিয়া মহারাজা সন্তুষ্ট হইয়া এই হাবেলীসহর পরগণার কেন্দ্রস্থলের নাম দেন কুমারহট্ট।

ভাগীরথীতীরস্থ এই পবিত্র হালিসহর গ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর গুরু ঈশ্বরপুরীর আশ্রম ছিল। সন্ন্যাস গ্রহণান্তর মহাপ্রভু একদিন এই হালিসহরে শ্রীগুরুপাট দর্শন করিতে আসেন এবং নৌকা হইতে তীরে নামিয়াই গঙ্গামৃত্তিকা মস্তকে স্পর্শ করিয়া বলেন—"এখানে কুকুরও আমার প্রণম্য যেহেতু ইহা গুরুস্থান"। ধন্য তাঁহার গুরুভক্তি, আদর্শ গুরুপ্রেম ; শ্রীপাট দর্শনান্তর মহাপ্রভু ভক্তিভরে তথাকার মৃত্তিকা তাঁহার বহির্বাসে বাঁধিয়া লইয়াছিলেন—চৈতন্য-ভাগবতে একথা লিখিত আছে। হালিসহরে ঈশ্বরপুরীর বাস্তভিটা "চৈতন্য ডোবা" নামে পরিচিত। শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস বাবাজী নামে এক ব্রজবাসী বৈষ্ণব এই বাস্তুভিটা সহ ডোবাটি ক্রয় করিয়া তথায় বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছেন এবং ঐ আশ্রমের নাম হইয়াছে "শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর পাট"। প্রতি বৎসর দোলের সময় এই পুণ্যস্থানে মেলা বসে।

শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিত বসবাসের জন্য এখানে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপ হইতে হালিসহরে আসিয়া থাকিতেন। পদাবলী-রচয়িতা

রামপ্রসাদের স্মৃতিমন্দির

বাসুদেব ঘোষ, কীর্ত্তনীয়া মাধব এবং গোবিন্দানন্দও হালিসহরে বাস করিতেন। চৈতন্যভাগবত-প্রণেতা বৃন্দাবনদাস প্রভু কুমারহট্ট বা হালিসহর-নিবাসী। পূর্ব্বে 'চৈতন্য-ভাগবতে'র 'চৈতন্যমঙ্গল' নামকরণ করা হইয়াছিল। কোন কারণে সেই নাম পরিবর্ত্তিত হয়। এই 'চৈতন্যমঙ্গল' পাঠ করিয়াই কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার 'চৈতন্য চরিতামৃত' রচনা করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাসের মাতা নারায়ণী দেবী শ্রীচৈতন্যের পরিকর শ্রীনিবাস আচার্য্যের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন। শ্রীনিবাস যখন হালিসহরে বাস করিতেন তখন তিনিও তথায় থাকিতেন।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে আমরা হালিসহর নামের উল্লেখ দেখিতে পাই:

"বামদিকে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী"
দু'কুলের জপতপে কিছুই না শুনি।
লক্ষ লক্ষ লোক এক ঘাটে করে স্নান
বাস হেম তিল ধেনু দ্বিজে করে দান।"

ইহা হইতেই সে যুগে হালিসহর কিরূপ বহুজনাকীর্ণ, সমৃদ্ধিশালী ও নিষ্ঠাবান লোকদিগের বাসভূমি ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিপিনবিহারী গুপ্ত

হালিসহরে বৈষ্ণব ও শৈব-শাক্ত ধারার অপূর্ব্ব মিলন ঘটে। এখানে শৈব ও শাক্ত ধারার প্রাধান্য খুব বেশী। শুধু প্রাধান্য নয়, শৈব-শাক্ত ধারার প্রাচীনত্বও স্বীকার করিতে হয়। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে হালিসহর অঞ্চলে যে শৈব-শাক্ত ধর্ম্ম ও অন্যান্য লৌকিকধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। এখনও সেই প্রাধান্যের খর্ব্বতা দৃষ্ট হয় না। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রায় দুই শত বর্ষ পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে হালিসহরে তান্ত্রিক সাধক রামপ্রসাদ আবির্ভূত হন। গঙ্গাতীর হইতে অনতিদূরে শিবের গলি নামক রাস্তার পার্শ্বে সাধকপ্রবরের সাধনাস্থলে 'পঞ্চমুণ্ডী' ও 'পঞ্চবটী' বর্ত্তমান আছে। বহু ভক্তজন উহা দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন। ঐস্থানে গ্রামবাসীরা কালী-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কালীপূজার সময় তথায় 'প্রসাদমেলা' বসিয়া থাকে। তখন এখানে বহু লোকসমাগম হয়।

হালিসহরের অধিকাংশ পুরাতন মন্দিরই শিবমন্দির। শিব ছাড়াও এখানে একাধিক শাক্ত-দেবীর পূজা হয়, যেমন—হালিসহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিদাঘাটার সিদ্ধেশ্বরী, খাসবাটীর শ্যামাসুন্দরী, শ্মশানঘাটের শ্মশানকালী ইত্যাদি। ধুমধামের সহিত কার্ত্তিকপূজা, মনসাপূজা, চড়কপূজা, শীতলাপূজা এবং পবনদেবের পূজাও স্থানে স্থানে হয়। রামপ্রসাদ শুধু সাধনায় নয়, কাব্যে, সঙ্গীতেও বাংলাদেশে একটা নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহাকে বাংলার অন্যতম খাঁটি জাতীয় কবি বলা যায়। তাঁহার সময়ে হালিসহরে আজু গোঁসাই নামে এক গ্রাম্য কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি রামপ্রসাদের কতকগুলি গানের ব্যঙ্গাত্মক অনুকৃতি (parody) রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐগুলির রচনাতে তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতেই তিনি স্মরণীয় হইয়া আছেন।

গীত-রচনা ব্যতীত রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থ, কালীকীর্ত্তন এবং কৃষ্ণকীর্ত্তন পদাবলীও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে তিনি বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। কিন্তু উহা তাঁহার ক্ষেত্র না হওয়ায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। পরে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর জনপ্রিয় হয় ও সুখ্যাতি লাভ করে।

রামপ্রসাদের পরবর্ত্তী সময়েও বাংলার সারস্বত ইতিহাসে হালিসহরের নাম সর্ব্বাগ্রে করিতে হয়। গঙ্গার পূর্ব্বতীরে যে সমস্ত পণ্ডিত-সমাজ প্রতিষ্ঠালাভ করে তন্মধ্যে কুমারহট্টের পণ্ডিতসমাজই ছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রায় দুই শত-আড়াই শত বৎসর ধরিয়া এখানে নব্য-ন্যায়শাস্ত্রের পঠনপাঠন হইত এবং শুধু বাংলাদেশ নহে ভারতের নানা প্রদেশ হইতে বহু ছাত্র বিদ্যার্জ্জনের জন্য এখানে আসিতেন। ১৬২০ শকাব্দে কুমারহট্টবাসী রাম তর্কবাগীশ বিদ্যাসুন্দর কাব্যের কালীপক্ষে ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন। কোলব্রুক সাহেব গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া উহার একখণ্ড সংগ্রহ করিয়া বিলাতে লইয়া যান। ব্রিটেনের প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক অভিধানের প্রাচীন সংস্করণে হালিসহরের সমৃদ্ধির সম্বন্ধে লেখা আছে—"Halisahar famous for Sankrit College"। একে "City of Palaces" বা 'প্রাসাদপুরী' আখ্যাও দেওয়া হইয়াছিল।

দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দী ধরিয়া বাংলার ইতিহাসে হালিসহর তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব লইয়া বিরাজ করিতেছে। পূর্ব্বে মূলাজোড়, আটপুর, জগদ্দল, ভাটপাড়া, কাঁটালপাড়া, নৈহাটি, গরিফা, কোলা, হালিসহর আর কাঁচড়াপাড়া গ্রাম লইয়া দীর্ঘ ১০ মাইল পরিধি-বিশিষ্ট একটি মাত্র মিউনিসিপালিটি ছিল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহার দক্ষিণদিকের কিয়দংশ লইয়া ভাটপাড়া পৌরসভা স্থাপিত হয়। বর্ত্তমান হালিসহর পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৩ সনে। অধ্যাপক কিশোরীলাল গুপ্ত ও তমলুকপ্রবাসী ব্যবহারজীবী শ্রীযুত তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাণপণ চেষ্টায় এই কষ্টসাধ্য কার্য্য সাধিত

হইয়াছিল। ইহার প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন জি. ই. জোন্স। এখন চারটি ওয়ার্ডে বার জন কমিশনার পৌরসভার কাজকর্ম্ম পরিদর্শন করেন। পৌরসভার আয়তন ৫'৫০২ বর্গমাইল। বর্ত্তমান সেন্সাস অনুযায়ী ইহার বর্ত্তমান লোকসংখ্যা ৩৫,৮৩৪ জন। উদ্বাস্তু আসিয়াছেন ১০,০০০ হাজার।

স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী জমিদার সাবর্ণ-চৌধুরীদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে সারস্বত সাধনার এই পীঠস্থানে বহু পণ্ডিতের অভ্যুদয় হইয়াছিল। বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক এবং পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীও
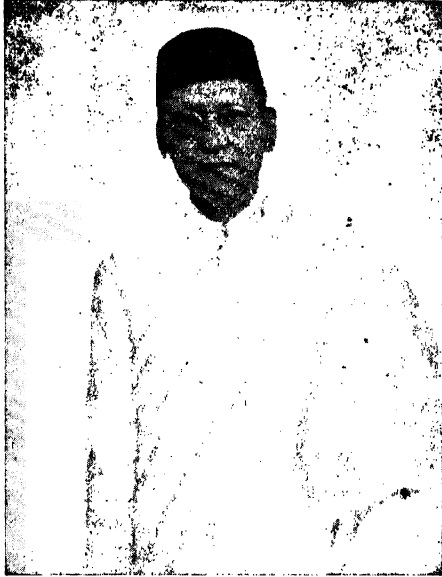
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। গুপ্তকবি কাঁচড়াপাড়ার অধিবাসী হইলেও কাঁচড়াপাড়া হালিসহরেরই সংলগ্ন এবং হালিসহর পরগণার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া তাঁহাকে আমরা হালিসহরেরই বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকি। ব্রাহ্মধর্ম্ম আন্দোলনের সময় ভাই উমানাথ গুপ্ত ও ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু কেশবচন্দ্রের প্রচারক-দলে প্রবেশ করেন। উমানাথ গুপ্ত "সুলভ সমাচারে"র প্রথম সম্পাদক। মহেন্দ্রনাথ বসু বাংলা ভাষায় দুই খণ্ড নানকের জীবনচরিত প্রণয়ন করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে হালিসহর হইতে "হালিসহর পত্রিকা" নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হইত। এই গ্রামের জানকীনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক ছিলেন। 'হক কথা' শিরোনামায় সাময়িক প্রসঙ্গ উপলক্ষে এই পত্রে যে সমস্ত বিদ্রূপাত্মক টিকাটিপ্পনী প্রকাশিত হইত তাহা সাধারণে বিশেষ উপভোগ করিতেন। দুই-তিন বৎসর পরে ইহা সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। সাপ্তাহিক রূপেও এখানি বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল। "হালিসহর পত্রিকা" উঠিয়া গেলে ঐ গ্রামের গিরিশচন্দ্র রায়ের চেষ্টায় "হালিসহর প্রকাশ" নামে আর একখানি পত্রিকা বাহির হইয়াছিল।

দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ছিলেন। 'নাট্যভারত', 'ভারতী' প্রভৃতি মাসিকে তাঁহার প্রবন্ধ নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইত। কর্ম্ম উপলক্ষে বোম্বাইয়ে থাকার সময় তিনি সাধু তুকারামের জীবনকথা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার এক জীবন-চরিত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজীতেও অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। হালিসহর খাসবাটী পল্লীর চট্টোপাধ্যায় বংশের মহিলা লক্ষ্মীমণি দেবী অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'বিজনবাসিনী'র কথাই আমাদের মনে পড়ে। অন্যগুলি 'শতদলবাসিনী দেবী' এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র তিনি একজন নিয়মিত লেখিকা ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সতীর্থ ও সহকর্ম্মী সাবর্ণ বংশের অতুলচন্দ্র

ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত

রায়, এম-এ, বিলাতে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া "গো জাতির উন্নতি" সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লেখেন। তিনি "Short History of Calcutta" নামে ইংরেজী গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাগিনেয় রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রচারে'র সম্পাদক-পদে বৃত হন। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকীল শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যও ছিলেন বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক। তিনি 'সাধারণী' পত্রিকায় নিয়মিত লিখিতেন। তাঁহার অনেকগুলি প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দু ছাত্রদের সদাচার শিক্ষা দিবার জন্য "পুত্রের প্রতি উপদেশ" নামে একখানি পুস্তক তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে সংসার-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ প্রকৃত সাধুর ন্যায় যোগ-সাধনে রত হইয়া পুরীতে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য পরমানন্দ তীর্থস্বামী নাম গ্রহণ করেন। ২০শে অক্টোবর ১৯৩৩ সনে ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে তিনি কাশীধামে মৃত্যুমুখে পতিত হন। হাইকোর্টের এডভোকেট শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য শিবপ্রসন্নবাবুর অন্যতম পুত্র।

বহু বাংলা সংবাদপত্রের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সম্পাদক ও গ্রন্থকার পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় হালিসহরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় মননশীল ও ব্যঙ্গ-রচনানিপুণ লেখক ইদানীং বিরল। তাঁহার সম্পাদিত দৈনিক পত্রিকা 'নায়ক' পড়িবার জন্য জনসাধারণের কিরূপ আগ্রহ ছিল তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কবি বলদেব পালিতেরও পৈত্রিক নিবাস হালিসহরের কোনা পল্লীতে। তাঁহার পিতা বিশ্বনাথ পালিত বাঁকিপুর-প্রবাসী হন। বলদেব বাঁকিপুরে শিক্ষালাভ ও সরকারী কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে দানাপুর মিলিটারী পে আপিস হইতে অবসর গ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে যে বিদ্যালয়টি দানাপুরে বলদেব একাডেমী নামে পরিচিত তাহা তিনিই ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি কাব্যমঞ্জরী, কাব্যমালা, ললিত কবিতাবলী, ভর্ত্তৃহরি কাব্য এবং কর্ণার্জ্জুন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ১৯০০ সনের ৭ই জানুয়ারী তিনি গতাসু হন।

সাহিত্যসেবী সিবিলিয়ান জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত হালিসহরের অধিবাসী। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রের সহিত এক সময়ে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। পরে 'মনীষা' নামে একখানি নাটক লিখিয়াও তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। দেশীয় সিবিলিয়ানদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম কলিকাতার পৌরসভার চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন। সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। "Foundation of National Progress—Agriculture in West Bengal" নামে ইংরেজীতেও একখানি পুস্তক তিনি লিখিয়াছিলেন। কিছুদিনের জন্য তিনি ডুমরাও ষ্টেটের ম্যানেজার হইয়াছিলেন। স্বনামধন্য রমেশচন্দ্র দত্তের এক কন্যার সঙ্গে তিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। রমেশচন্দ্রের একখানি ইংরেজী জীবনীগ্রন্থও তিনি লিখিয়াছিলেন। ১৪ই জুন ১৯৪৭ সনে আটাত্তর বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল কালীপদ গুপ্ত, আই-এম-এস হালিসহর-নিবাসী। ধর্ম্মে তিনি ছিলেন খ্রীষ্টান। তিনি হালিসহরবাসীদের জন্য রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, হাসপাতাল স্থাপন এবং পুষ্করিণী খনন করাইয়া দেন। হালিসহর স্কুলেও তিনি প্রচুর অর্থ দান করিয়াছিলেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে গৌরবময় ছাত্রজীবন অতিবাহিত করিবার পর তিনি বিলাত গমন করেন আই-এম-এস পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত। এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি সরকারী কার্য্যে প্রবিষ্ট হন। বহুকাল তিনি বাংলা সরকারের ডেপুটী স্যানিটারি কমিশনারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার লিখিত 'স্যানিটারি হাইজিন' গ্রন্থ পূর্ব্বে এফ-এ ক্লাসের ছাত্রদের পাঠ্য ছিল। হালিসহর পৌরসভায় ১৯০৫ সনে তিনিই প্রথম ভারতীয় চেয়ারম্যান হন। ২৭শে আগষ্ট ১৯১১ সনে কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত, আই-সি-এস, বঙ্গের বহু জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট পদে কাজ করার পর কয়েক বৎসরের জন্য হ্যামবার্গ ও লণ্ডনে ট্রেড কমিশনার হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি স্বনামধন্য সিবিলিয়ান স্যার অতুল চট্টোপাধ্যায়ের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল গুপ্তের আর এক পুত্র শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম-এ (অক্সন), বার অ্যাট-ল, কলিকাতায় প্রথম মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

গণিতশাস্ত্রের বিখ্যাত অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্তের নিবাস এই গ্রামে। তাঁহার প্রণীত পাটীগণিত অনেকেই পড়িয়াছেন। ১৯৩৫ সনে ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সী কলেজের ফিজিক্স থিয়েটারে তাঁহার প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করা হয়। সে সময় অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু বাল্যবন্ধু হিসাবে, আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সহকর্ম্মী হিসাবে, ব্যারিষ্টার শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে এবং রায়বাহাদুর গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অধীনস্থ কর্ম্মচারী হিসাবে বিপিনবাবুর জীবনের নানা দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সর্ব্বশেষে শ্রীবিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, মহাশয় যে প্রবন্ধটি পাঠ করেন তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

"অসামান্য প্রতিভাবলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদয় পরীক্ষায় বিশেষ

কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সী কলেজের গণিতের অধ্যাপনার কার্য্যে তিনি ব্রতী হন। তখনকার সময়ে ভারতীয় বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ যুবকের পক্ষে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক হওয়া সহজ ছিল না। কেবলমাত্র আপনার প্রতিভাবলেই তিনি এই উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। দীর্ঘ ১৮ বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজে কৃতিত্বের সহিত অধ্যাপনা করিয়া তিনি ছোটনাগপুরের ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস হন এবং তথা হইতে ১৯০১ সনে কটক কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া আট বৎসর তথায় অবস্থান করেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় কটক কলেজের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হয়। উড়িষ্যার শিক্ষা-প্রচেষ্টার ইতিহাসে তাঁহার নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে। উড়িষ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনার বীজ তিনি বপন করেন। সেজন্য উড়িষ্যা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। কটক কলেজ হইতে তিনি হুগলী কলেজে বদলি হন। হুগলী কলেজে যে যুবক একদিন বিদ্যার্থী হইয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন তিনিই অবশেষে এই কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া আসিলেন। তাঁহারই চেষ্টার ফলে সরকারী কলেজে কর্তৃপক্ষ নির্দ্দিষ্টসংখ্যক দরিদ্র

জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ছাত্রকে বিনা বেতনে পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আপন শক্তির উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং সেই বিশ্বাসের বলে তিনি জীবনে বহু প্রতিকূল ঘটনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া উন্নতির উচ্চ আসনে সমাসীন হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় অকপট, সরল, শিষ্টাচারী, বিনীত, স্নেহপ্রবণ ব্যক্তি বাঙালীর মধ্যে কেন, যে-কোন সমাজে বিরল।"

হুগলীর সরকারী উকীল রায় মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বাহাদুর সি-আই-ই মহাশয়ও হালিসহরের অধিবাসী। বহু বৎসর ধরিয়া তিনি হালিসহর ও হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টাতেই হুগলী-চুঁচুড়ায় জলের কল ও বৈদ্যুতিক আলো আনীত হয়। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়া তিনি সরস্বতী নদীর সংস্কার ও নদীতে মিলের সেফটিক ট্যাঙ্কের ময়লা নিষ্কাশন বন্ধ করিবার জন্য বিশেষ আন্দোলন করিয়াছিলেন। জনহিতকর কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ গবর্ণমেণ্ট ১৯১১ সনে তাঁহাকে 'রায় বাহাদুর' এবং ১৯২৮ সনে সি-আই-ই খেতাব দেন। তিনি ১৯২৮ সনের মে মাসে পরিণত বয়সে পরলোকগমন করেন। হাইকোর্টের প্রাক্তন ট্রান্সলেটর কালিকারঞ্জন মিত্র এই বংশেরই সন্তান। তিনি হালিসহর স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন। তাঁহার সময় স্কুলের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

বঙ্গীয় পুলিস সার্বিসের স্বর্গত হরিগোপাল মুখোপাধ্যায়ও বঙ্গ-ভারতীর একজন সেবক ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া-

রাজলক্ষ্মী দেবী

ছিলেন। তন্মধ্যে 'দারোগাবাবুর প্রহসন' বইখানি খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। ফার্সি, উর্দ্দু, হিন্দী এবং সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বেশ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি বহুদিন হালিসহর ও নৈহাটী বেঞ্চে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। হালিসহর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান এবং ভাইস-চেয়ারম্যান রূপেও তিনি বহু বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯৩৪ সনের ডিসেম্বর মাসে সাতাশী বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার অন্যতম পুত্র অবসরপ্রাপ্ত পুলিস অফিসর শ্রীহরারাধন মুখোপাধ্যায় একজন ভক্ত ও সাহিত্যসেবী। তাঁহার লিখিত একখানি পুস্তকে সাধক এবং ধর্ম্মবন্ধুদের সম্বন্ধে অতি মনোরম ও শিক্ষাপ্রদ বিবরণ পাওয়া যায়।

সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্ম্মী ও বিপ্লবী নেতা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর পৈতৃক আবাস এই হালিসহর গ্রামে। তিনি পল্লীর উন্নয়নের

জন্য নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি কয়েকবার কলিকাতার পৌরসভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। গত সাধারণ নির্ব্বাচনে তিনি বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু বিগত ১৪ই জানুয়ারী তারিখে অকস্মাৎ তাঁহার জীবনাবসান হওয়ায় দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী দেব

রায়সাহেব ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ বহু বৎসর যাবৎ ভাগলপুর পুলিস ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ফৌজদারী আইন সম্বন্ধে একখানি ইংরেজী পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পরে তিনি হাওড়ায় ডি-এস-পি হইয়া আসেন। তিনিও হালিসহরবাসী। অবসর গ্রহণের পর দেশে আসিয়া তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

বাঁকুড়ার দুই জন কৃতী চিকিৎসক ডাক্তার দুর্গাদাস দাসগুপ্ত এম-বি (পিতা দ্বিজদাস গুপ্ত) এবং ডাক্তার অনাথবন্ধু রায় এম-বি হালিসহরের লোক। তাঁহারা দুই জনেই বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুলের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। তাঁহাদের চিকিৎসার খ্যাতি মেদিনীপুর, বৰ্দ্ধমান, মানভূম, রাঁচি এবং হাজারিবাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উকীল জীবনকৃষ্ণ গাঙ্গুলীরও পৈতৃক নিবাস হালিসহরে। তিনি মুঙ্গেরে বহুদিন যাবৎ আইন-ব্যবসায় করিয়া ধন, মান ও যশের অধিকারী হইয়াছেন।

প্রসিদ্ধ সাংবাদিক তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় হালিসহরনিবাসী। জীবনের প্রথম-ভাগে তিনি বহু কবিতা এবং নাটক লিখিয়াছিলেন, তবে সাংবাদিক হিসাবেই তাঁহার খ্যাতি বেশী। তিনি বহু সাময়িক পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন—যথা, প্রভাতী, বঙ্গনিবাসী, হিতবাদী, প্রজাবন্ধু, সাধারণী এবং নবজীবন। বহুদিন যাবৎ তিনি সুখ্যাতির সহিত বাংলা দৈনিক 'প্রভাতী'র সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। সুরভি ও পতাকা, প্রজাবন্ধু, দর্শন এবং দৈনিক সমাচার চন্দ্রিকাতেও তিনি প্রায়ই সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিতেন। শেষ জীবনে তিনি 'বসুমতী'র পরিচালন-কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আশী বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার পুত্র। তিনিও দীর্ঘকাল স্যার সুরেন্দ্রনাথের অধীনে "বেঙ্গলী"র সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষায় তিনি ভাল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তিনি ছয় বৎসরকাল কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য ছিলেন। সংস্কৃতেও তাঁহার খুব পাণ্ডিত্য ছিল এবং সেইজন্য নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে "বিদ্যাবারিধি" উপাধি দেন। ১৯৩৮ সনের ১১ই জানুয়ারী তিনি পরলোকগমন করেন।

ভূতপূর্ব্ব 'সময়' পত্রের সম্পাদক, প্রবীণ সাহিত্যসেবী পরলোকগত প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিবাস হালিসহরে। বাংলার পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেণ্টের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রায়সাহেব ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়েরও বাড়ী হালিসহরে। তিনি সাবরডিনেট সার্বিস হইতে ইম্পীরিয়াল সার্বিসের ইঞ্জিনিয়ার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন এবং ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার সমিতিরও সদস্য ছিলেন। তিনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে স্যানিটরি ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ের উপাধ্যায় (Lecturer) ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ঐ বিষয়ে পরীক্ষকও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ইংরেজীতে দুইখানি পুস্তক তিনি লিখিয়াছেন। উহাদের নাম—"Indian Waterworks Practice এবং "Surface Drainage"। ঢাকা শহরের জলের কল স্থাপনের ও ভূগর্ভস্থ নর্দ্দমা তৈরির ভার তাঁহার উপর ছিল। হালিসহরে জলের কল স্থাপনের সময় স্থানীয় মিউনিসিপালিটির আর্থিক অবস্থা এত শোচনীয় ছিল যে, ইঞ্জিনিয়ারের পরিদর্শন-ব্যয় ৭০০০৲ টাকা দিবার মত ক্ষমতা ছিল না। ক্ষিতীশচন্দ্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন পারিশ্রমিক না লইয়া এবং নিজ হইতে রাহাখরচ দিয়া নিয়মিত ভাবে কলিকাতা হইতে আসিয়া কল নির্ম্মাণ-কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন। তাঁহার এরূপ সহায়তার দরুনই হালিসহরে জলের কল স্থাপন সম্ভব হইয়াছিল।

হালিসহরের আশুতোষ মুখোপাধ্যায় টিকারী ষ্টেটের সহকারী ম্যানেজার ছিলেন। ঐ সময় উহা কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের অধীনে ছিল। সেখানে ১৯০০ সনে প্লেগ রোগের আবির্ভাবে ভীষণ মড়ক দেখা দেয়। সে সময় তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া ঔষধপথ্যসহ বাড়ী বাড়ী গিয়া রোগীদের সেবাশুশ্রূষা ও শবসংকারের ব্যবস্থা করিয়া সর্ব্বসাধারণের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ৫ই ডিসেম্বর, ১৯০০ সালের "বেহার হেরাল্ড" পত্রিকায় তাঁহার এই জনসেবার

কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার পুত্র ভোলানাথবাবুও হালিসহরে ওয়ার্ড কমিশনার হিসাবে অনেক জনহিতকর কাজ করিয়াছেন।

মুসলমান-রাজত্বে কাশীর মন্দির ও বিগ্রহাদি যখন বিচূর্ণিত হইয়াছিল তখন সেগুলির পুনর্গঠনের জন্য নানা দেশ হইতে স্থপতি ও ভাস্করগণ কাশীতে আনীত হইয়াছিলেন। এই সম্পর্কে হালিসহরবাসী নয়ন ভাস্করের নামও কবি জয়নারায়ণের কাশীখণ্ডে ও ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

তমলুকের বিখ্যাত উকীল শ্রীতারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদিনিবাস এই গ্রামে। তাঁহার পিতার নাম দ্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ওকালতী ব্যবসা করিতেন বটে; কিন্তু মিথ্যা হইতে দূরে থাকিতেন। লোকের উপকার করা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশ দানে ব্যয় হইত। ১০ই শ্রাবণ, ১৩৩০ সনে তাঁহার দেহান্তর ঘটে।

১৯৪৯, মার্চ্চ মাসের প্রথমভাগে বাংলার তদানীন্তন রাজ্যপাল ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু অন্নপূর্ণা বালিকা-বিদ্যালয় নামে যে বালিকা-বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন তাহা হালিসহরের বিদ্যোৎসাহী ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। তিনি কয়েক বৎসর হালিসহর পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁহার পরলোকগতা স্ত্রীর নামে এই উচ্চ ইংরেজী বালিকাবিদ্যালয়টি স্থাপন করিয়া তিনি দেশের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের সহায়তা করিয়াছেন।

হালিসহরনিবাসী উমাচরণ মুখোপাধ্যায় 'ক্যামেল কোর' নামক পল্টনের গোমস্তা হইয়া বহু দেশ ("বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" দেখুন) ভ্রমণান্তর নিজ গ্রামে ফিরিয়া জনসেবায় নিযুক্ত হন। "গুড-উইল ফ্রেটার্নিটি" নামক পল্লী-উন্নয়ন সমিতির তিনি প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। সরকারী কার্য্যে লিপ্ত থাকার সময় উমাচরণ পঞ্জাব, শিয়ালকোট প্রভৃতি স্থানে কালীবাড়ী নির্ম্মাণে যথেষ্ট ব্যয় করেন এবং তজ্জন্য সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বিদ্যোৎসাহী রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় বহু বৎসর যাবৎ জম্মু স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। রাজেন্দ্রবাবুর পুত্র শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ এখন দেশে থাকিয়া নানা জনহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। তিনিও কিছুদিন স্থানীয় পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। কলিকাতার কিং কোম্পানীর সুবিখ্যাত ডাক্তার বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের আদি নিবাস এই গ্রামে।

রাণী রাসমণি

বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী ও সাংবাদিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত হালিসহরের প্রসিদ্ধ গুপ্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন, কর‍াচী-হেরাল্ড, ফিনিক্স, ট্রিবিউন ও লীডার পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। পঞ্জাব হইতে বাংলায় আসিয়া তিনি কিছুকাল 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। নগেন্দ্রবাবু মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর ও পরে স্যার দোরাব টাটার সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি আমৃত্যু বাংলা ভাষার চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। 'আরাতামা', 'ব্রজনাথের বিবাহ', 'জয়ন্তী'—তিনখানিই তাঁহার লিখিত উৎকৃষ্ট উপন্যাস।

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের মাতা ভুবনমোহিনী দেবী হালিসহরের গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের কন্যা। এই পরিবারেই পূর্ব্বোক্ত বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় এবং কথাসাহিত্যিক শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী রাজলক্ষ্মী দেবীও হালিসহরের বিখ্যাত চৌধুরী-পরিবার-সম্ভূতা। তাঁহার সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এক স্থানে লিখিয়াছেন : "একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশী রকমের—আমার

পরিবারের। আমার জীবনী লিখিতে হইলে তাঁহারও লিখিতে হয়। তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম বলিতে পারি না। আমার যত ভ্রমপ্রমাদ তিনি জানেন আর আমি জানি।"

সাংসারিক উন্নতির বাসনা ত্যাগ করিয়া যিনি হালিসহর স্কুলের জন্য জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন তাঁহার নাম এ স্থলে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হইলেন আশুতোষ মিত্র। তাঁহার স্বার্থ-ত্যাগ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্যই হালিসহরের স্কুলের অস্তিত্ব এখনও বজায় রহিয়াছে। জীবনে উন্নতির অনেক সুযোগ তাঁহার আসিয়াছিল। শুধু পল্লীমাতার মুখ চাহিয়াই তিনি সে সব ত্যাগ করিয়া একনিষ্ঠভাবে দেশের স্কুলের সেবা করিয়া গিয়াছেন। স্কুলের আর্থিক অবস্থা যখন অতীব শোচনীয় হইয়া উঠে তখন তিনি শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থানের খ্যাতনামা এবং সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাক্তন ছাত্রদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া স্কুলটিকে টিকাইয়া রাখিয়াছিলেন। এইরূপ সরল, নিরভিমান এবং অক্লান্ত কর্ম্মী শিক্ষক এযুগে খুব কমই দৃষ্ট হয়। ১৯৩৮, আগষ্ট মাসে ঊনসত্তর বৎসর বয়সে তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের চীফ একাউণ্টেণ্ট শ্রীযুক্ত পরিতোষ মিত্র এম-এসসি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র।

ই. আই. রেলওয়ের অবসরপ্রাপ্ত চীফ অডিটার অমূল্যচরণ মুখোপাধ্যায়ের আদিনিবাস হালিসহরে। বেঙ্গল জুডিসিয়াল সার্বিসের স্বর্গত ভবচরণ মুখোপাধ্যায় তাঁহার পিতা। ১৯৪১ সনের ২রা ফেব্রুয়ারী ছাপান্ন বৎসর বয়সে অমূল্যবাবুর দেহাবসান হয়।

রাজেন্দ্রলাল গুপ্ত একজন প্রাচীন ও বিচক্ষণ শিক্ষাব্রতী ছিলেন। তিনি বহু বৎসর দার্জিলিং গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বঙ্গের অনেক কৃতবিদ্য ও উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তি তাঁহার ছাত্র। তিনি গ্রামে আসিলে স্থানীয় স্কুল পরিদর্শনে গিয়া পঠন-পাঠনের ধারা দেখাইয়া দিতেন। তিনি কয়েক বৎসর এই স্কুলের সেক্রেটারীও ছিলেন।

কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ডাক্তার শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত এম-ডি হালিসহরের অধিবাসী। তিনিও বাণীর একজন সেবক। "Truth" নামে একটি পত্রিকা তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবন হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩৩৪ সনে নলিনীরঞ্জন দ্বিতীয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সনাতন ধর্ম্মসম্মেলনের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। তাঁহার পিতা অধ্যাপক কিশোরীমোহন সেন হুগলী কলেজে গণিত-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। তিনি স্থানীয় পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান এবং উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী ছিলেন। কিশোরীবাবুর ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন। তিনি "গুড়-উইল ফ্রেটারনিটি" নামক পল্লী-উন্নয়ন সমিতির ও স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন এবং পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। অন্য এক ভ্রাতা উপেন্দ্রমোহন ডেপুটি হইয়াছিলেন, কিন্তু স্বাধীন-চেতা বলিয়া তাঁহাকে সরকারী চাকরি ত্যাগ করিতে হয়। তিনি অতঃপর ধর্ম্মালোচনা ও সাধনভজনে জীবনাতিপাত করেন। সর্ব্ব-কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ একজন লেখক ও সাহিত্যিক। শ্রীশ্রীগীতা তত্ত্ব সমাহারঃ, গীতোক্ত 'গুহ্যকথা'র তাৎপর্য্য বিবৃতি, ভারতের স্বাধীনতা, বৈদ্যজাতির বর্ণ ও গৌরব, বৈদ্যজাতির বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বহু পুস্তক তিনি লিখিয়াছেন।

ডাক্তার শান্তিরাম চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘকাল যাবৎ অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে নিয়মিতভাবে হালিসহর দাতব্য চিকিৎসালয়ের সম্পাদক-রূপে ইহার সেবা করিয়া আসিতেছেন। অধুনা তিনি কলিকাতা-বাসী হইলেও হালিসহরেই তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান। ১৯০৯ সনে ইনি ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১২ হইতে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত মেয়ো হাসপাতালে যথাক্রমে হাউস-সার্জ্জন, এনাস্থেটিষ্ট ও প্যাথলজিষ্টরূপে কাজ করেন। কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল এবং হাসপাতাল স্থাপন ও পরিচালনের সহিত ইঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। ১৯২১ সন হইতে বহুকাল ইনি কলিকাতা মেডিক্যাল ক্লাবের সম্পাদক ছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর কলিকাতা পৌরসভার সদস্য ছিলেন। সেই সময় স্বাস্থ্য ও ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত কতকগুলি প্রবন্ধ "কর্পোরেশন গেজেটে" প্রকাশিত হইয়াছিল। ইনি ১৯০৫-এর স্বদেশী-আন্দোলনের সময় হইতে দেশসেবামূলক কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। গ্রামের সর্ব্ববিধ উন্নতিবিধানে তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট।

পল্লীমাতার আর একজন কৃতী সন্তান খ্যাতনামা ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি অতি সরল, নিরহঙ্কার ও পরো-পকারী ব্যক্তি ছিলেন। যখনই দেশে আসিতেন বিনামূল্যে ঔষধপথ্য দিয়া রোগীদের চিকিৎসা করিতেন। তিনি ১৮৯০ সনে বেঙ্গল মেডিক্যাল সার্বিসে প্রবিষ্ট হন এবং একত্রিশ বৎসরকাল বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন জেলায় প্রশংসার সহিত কার্য্য করিবার পর ১৯২১ সনে অবসর গ্রহণ করেন। অবসরগ্রহণ কালে তিনি পোর্ট-ব্লেয়ারে এসিষ্ট্যাণ্ট মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন। আন্দামানে যাইবার পূর্ব্বে কিছুকাল তিনি সিবিল-সার্জ্জনরূপেও কার্য্য করিয়া-ছিলেন। কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে আফগান যুদ্ধের সময় তিনি বেলুচি স্থানে চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৭ই জুলাই ১৯৪২ সনে আশী বৎসর বয়সে অবিনাশচন্দ্র পরলোকগমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অবসরপ্রাপ্ত সিবিল সার্জ্জন মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং কনিষ্ঠ পুত্র নেপাল গবর্ণমেন্টের ডাক্তার নীরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়। অকিঞ্চন প্রবন্ধকারও তাঁহার এক পুত্র।

পঞ্জাব ঝিন্দ ষ্টেটের চীফ মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় এফ-আর-সি-এসও হালিসহরনিবাসী। অবসর গ্রহণান্তর এখন তিনি স্বগ্রামে বাস করিতেছেন এবং নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত আছেন। হালিসহর দাতব্য হাসপাতালের চিকিৎসক ডাক্তার শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় তাহার অন্যতম পুত্র।

হালিসহরনিবাসী হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হুগলীর প্রসিদ্ধ সরকারী উকীল ছিলেন। জীবনে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তিনি প্রায় সমস্তই জনহিতে দান করিয়া যান।

সর্বশেষে হইলেও হালিসহরের শ্লাঘার পাত্রী প্রাতঃস্মরণীয়া দানশীলা রাণী রাসমণির নাম উল্লেখ না করিলে প্রত্যবায় হইবে। তিনি অত্রস্থ কোণা পল্লীর কৈবর্ত্তকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এই গ্রামকে ধন্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম হরেকৃষ্ণ দাস; কৃষি ছিল তাঁহার জাতব্যবসা। রাণী রাসমণির অসাধারণ চারিত্রিক বল, ধর্ম্মবল ও বিচারবুদ্ধি আদর্শস্থানীয়। দক্ষিণেশ্বরে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও অসংখ্য অনাথ-আতুরকে অন্নদান হইতেই তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণতা ও হৃদয়বত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

হালিসহরে রামপ্রসাদ স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হালিসহরের আধুনিক দ্রষ্টব্যের মধ্যে স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী দেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মঠ উল্লেখযোগ্য। স্বামীজী ১৯৩৫, ২৯শে নবেম্বর কলিকাতায় দেহরক্ষা করেন। পরদিবস তাঁহার দেহাবশেষ গঙ্গাতীরস্থ এই মঠে আনিয়া সমাধি দেওয়া হয়। ১৯৫০ সনে পুণ্যক্ষেত্র হালিসহরে রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্তবৃন্দ শঙ্করস্বরূপ যোগমঠ নামে আর একটি মঠ স্থাপন করিয়াছেন। হালিসহরের অধিবাসীরা ঈশ্বরপুরী ও সাধক রামপ্রসাদের স্মৃতিবিজড়িত এই পুণ্যধামে জন্ম-গ্রহণ করিয়া নিজেদের সত্যই সৌভাগ্যবান মনে করিতে পারেন।

পঁচিশ বছর পরে

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

পৃষ্ঠদেশে হঠাৎ চড়াৎ করে একটা চাপড় খেয়ে প্রাণনাথ চমকে উঠল। মাদ্রাজের সমুদ্রতীরে সন্ধ্যা-বায়ুসেবীর অন্ত নেই। প্রাণনাথ একপ্রান্তে নিশ্চিন্তমনে সমুদ্রের ঢেউয়ের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে বসে ছিল। বিদেশে চপেটাঘাত বসিয়ে দেবার মত বান্ধব প্রত্যাশা করে নি।

আরে জ্যোতি যে! তুই এখানে কবে এলি?

ঠিক আমারও ঐ প্রশ্ন—তুই কবে এলি। আমি জানতুম তুই গিয়েছিলি পুণায়। তার পর যে কোথায় পাড়ি দিলি, তার আর পাত্তা পাই নি।

হ্যাঁ, পুণা থেকে পাড়ি দিয়েছি অনেক দিকে। প্রথমে গেলাম অজন্তা আর এলোরায়। দেড় হাজার বছর আগে একটা জাত আস্ত পাহাড় কেটে কেটে শতাব্দীর পর শতাব্দী নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করে এই রকম একটা অপূর্ব্ব সৃষ্টি করে রেখে যেতে পারে, চোখে না দেখে তার কোন ধারণা করতে পারবি না। এ এক অচিন্তনীয়, কল্পনাতীত কীর্ত্তি। এর কাছে, সৌন্দর্য্যে নয়, সৃষ্টির ব্যাপারে তাজমহল কিছুই না! বোস না, দাঁড়িয়েই রইলি যে! ভয় নেই, বালির ওপর বসলে কাপড় ময়লা হবে না। ঝেড়ে ফেললেই সাফ।

যাক্! ভয়টা সত্যিই এবার গেল। সম্বিৎ ফিরেছে দেখছি। আমি ভাবলাম অজন্তার ভূত অজান্তে তোর স্কন্ধে চেপে বসেছে ক্ষুধিত পাষাণ হয়ে—আর বুঝি রেহাই দেবে না। তা যাক্। আমি কাল মেলে যাচ্ছি, তুইও আমার সঙ্গে চল্।

জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমে বাংলাদেশে?

—নয় কেন?

সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে আম কুড়োবার ধুম।

সবই ত তোদের পাকিস্থানে পড়ে রইল। আম কুড়োবার বাগান কি তোর কলকাতার পোস্তায় নাকি? যাক, হ্যাঁ তবে তোর সঙ্গে এই যাত্রাটা একটু লোভনীয় বটে। কতকাল তোর সঙ্গে পথে বেরোই নি। শেষ বোধ হয় সেই মার্ব্বল রক্‌স দেখা। জব্বলপুরের স্মৃতিটা এখনও খুব তাজা রয়েছে।

সুখস্মৃতি যত বাসি হবে ততই দানা বাঁধবে। ওটা কিসের মত জানিস? মাটীর ভাঁড়ে রাখা কমলামধুর মত।

২

জ্যোতি বললে—ইঃ! এই মেলে চড়ে ভুল করেছি। নইলে—এটা কোন্ ষ্টেশন রে?

প্রাণনাথ দেখছিল যে গাড়ীটা একটা ষ্টেশনে ঢুকছে। ওর "নইলে"—টা কানে ঢোকে নি। বললে—

ভিজিয়ানাগ্রাম।

ভিজিয়ানাগ্রামের নাম শুনেই প্রাণনাথ গলাটা বার করে দিয়ে বলল—আরে 'ভিজি'র দেশ? বটে!

কিন্তু জ্যোতির কানে এবার সে কথা ঢুকল না। কেন জানি, সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। তার চিন্তাটা ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গেই ছুটল। তার মনে পড়ল ভিজিয়ানাগ্রামের পরে আসবে চিপুরুপল্লী। ওঃ! কতকাল আগে এই ছোট্ট সহরে বছর দুই সে কাটিয়ে গেছে। সে কত আগে! কুড়ি বছর? না, আরও বেশী, পঁচিশ। হ্যাঁ তাই ত, দেখতে দেখতে সিকি শতাব্দী কেটে গেছে। না জানি এতকালে কত পরিবর্ত্তন হয়েছে। যে বাড়ীটায় থাকত সেই বাড়ীটা কি এখনও আছে? আর সামনের বাড়ীর সেই তিন বছরের খোকা। এত দিনে সে যদি বেঁচে থাকে, তা হলে সে আজ ২৮ বছরের যুবক। কি করে যেন ঐ শিশু টের পেয়েছিল দেশে ও তার এক বছরেরই পুত্রকে রেখে এসে মনঃকষ্টে আছে। তাই

প্রথম দিন থেকেই ওর ন্যাওটা হয়ে পড়েছিল—ওকে তার খেলার সাথী করে নিয়েছিল।

পাড়াটায় কেবল ওদের ঘরটাই ছিল তালপাতায় ছাওয়া। আর সবই ছিল পাকা বাড়ী—পাথর ও ইটের গাঁথুনী। বড়ই গরীব ছিল ওরা। বোধ হয় তাই ওদের দিকে কেউ বড় তাকাত না। সকাল-বিকাল পাড়ার মেয়েরা দল বেঁধে বেরুত জল আনতে। একটার উপর একটা, তার উপর আর একটা ভরা কলসী পর পর মাথার উপর সাজান, যেন ব্যালান্স রেশ দিয়ে চলেছে সব। স্থির অথচ দ্রুত। মেয়েদের এই পুতুল-বাজীর ছবি এখনও লেগে রয়েছে জ্যোতিপ্রকাশের চোখে। তালপাতার ঘরটির ছায়ায় বসে শিশুটি একটি হাত প্রসারিত করে ওদের দিকে তাকিয়ে ডাকত "ঐ ঐ"! কিন্তু তাদের সেদিকে তাকাবার বা কান দেবার সময় কৈ? ছায়াবাজির মত সারি সারি চলে যেত সব।

কিন্তু পৌষসংক্রান্তির 'পঙ্গলে'র দিনে পাড়ার চেহারা ফিরে গেল। এই পঙ্গল অর্থাৎ পর্ব্বের বিশেষত্ব হ'ল এই যে, যে বাড়ীতে ছোট শিশু, সেই সেই বাড়ীতে পাড়ার মেয়েরা গিয়ে যত মাঙ্গলিক আচার সম্পন্ন করে আসে। সারা বছরে "পৌষ পঙ্গল" অন্ধ্র দেশের সেরা পর্ব্ব। তাই ঐ উপেক্ষিত নগ্ন শিশুর অঙ্গে আজ উঠেছে রঙীন অঙ্গবাস। কত আদর, কত সোহাগ ওকে নিয়ে সেই সব মেয়ের আজ। পঁচিশ বছর আগেকার দেখা সেই দৃশ্য আজও চোখের সামনে জ্বল্ জ্বল্ করছে।

আরে এসে গেছে! ঐ ত চিপুরুপল্লীর ডিসট্যান্ট সিগন্যাল! মেল ট্রেন এখানে থামে না। থামত যদি, একবার পুরানো জায়গাটা—ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ ট্রেনের গতি মন্দা হয়ে এল আর দেখতে দেখতে থেমেই গেল মাঠের মাঝখানে। একজন যুবক জানলা দিয়ে মাথা বার করে বললে—"সিগন্যাল ডাউন হয় নি। জ্যোতিপ্রকাশ বাইরের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "প্রাণনাথ শীগগির নেমে পড়।"

একেবারে মিলিটারি ষ্টাইলে যেমনি হুকুম অমনি তামিল। দুই বন্ধুর সামান্য লটবহর নিয়ে তাড়াহুড়ো করে ওরা নেমে পড়ে। গাড়ীসুদ্ধ সকলের চেঁচামিচির দিকে কর্ণপাত না করে হন্ হন্ করে ছুটে চলে চিপুরুপল্লীর দিকে। সূর্য্য তখন পশ্চিম পাহাড়টার পাশে আপন সুখশয্যা খুঁজতে আসত।

প্রাণনাথ বললে, নিয়মের বরাদ্দে যা পাই তাতে প্রাণ নেই, উপরি পাওনাটাতেই অপ্রত্যাশিতের উল্লাস। এতদিন যে বেড়ালাম আজকের এই এমনি রসটুকু কোথাও পাই নি। বেশ মজা লাগছে। কিন্তু ব্যাপার কি বল্ ত? এখানে কোথায় নেমে পড়লি?

জ্যোতিপ্রকাশ বললে, এইটি হচ্ছে চিপুরুপল্লীর ডিসট্যান্ট সিগন্যাল। চল একবার দেখি গিয়ে সিকি শতাব্দীতে পল্লীর পরিবর্ত্তন কতটা হ'ল।

—ও তোর সেই চিপুরুপল্লী! তাই বল!

—এই দেখ, এই নারকেল গাছটা। এটা ছিল তখন আমার সবে বুকের সমান উঁচু। সেইটে কত বড় হয়েছে। আরে! সেই তালপাতার ছাউনি এখনও আছে দেখছি! আর কেউ ওখানে এসে বাসা বেঁধেছে নাকি?

জ্যোতিপ্রকাশের আগ্রহান্বিত স্নেহকোমল দৃষ্টি পাতার ঘরখানির উপর গিয়ে পড়ল।

৩

ডাক দিতেই বেরিয়ে এল ঘরের ভেতর থেকে ২৫।২৬ বছরের একটি সৌম্যমূর্ত্তি যুবক, আর তারই পিছনে এক অশীতিপর বৃদ্ধা। কথা চালাবার মত তেলুগু ভাষা তখনও ভোলে নি জ্যোতি।

সে যুবকের দিকে তাকিয়ে বললে, 'মৃত্যুঞ্জয় গারুর এই বাড়ী?'

তার উত্তরে যুবক মাথাটা এমন ভাবে দোলাতে লাগল যে প্রাণনাথ ঠিক উল্টো বুঝল। কিন্তু জ্যোতি ঠিক বুঝল না, ঐ মাথা নাড়ার মানে—হ্যাঁ, এই বাড়ীটাই। অন্ধ্র দেশের মাথা দোলানোর চাল তার অজানা ছিল না। তার পর জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমিই তাঁর নাতি?' সেই ভাবে মাথা নাড়ার সঙ্গে তেলুগু ভাষায় সে বললে, 'হাঁ, আমিই।'

এই বার কুতূহলী বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললে, 'আমায় চিনতে পারলেন না ত? পঁচিশ বছর আগে সামনের ঐ বাড়ীটাতে এক বাঙালী বাবু ছিলেন মনে পড়ে?'

বৃদ্ধা হঠাৎ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন—'কে? এ্যাঁ, রায় গারু! রায় গারু!* এত দিন পরে? এত দিন কোথায় ছিলেন বাপ? এস, এস ভিতরে এসে বস।'

তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওরে চিনা† প্রণাম কর্, প্রণাম কর্। এই সেই রায় গারু, তোকে নিজের ছেলের মত ভালোবাসতেন। যাবার দিন তোর যাতে লেখাপড়া ভাল হয়, তার জন্যে তোর দাদামশায়ের কাছে এক হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন।'

প্রাণনাথ কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে জ্যোতির দিকে চাইলে। জ্যোতি সংক্ষেপে বললে, পরে বলব।

যুবক একেবারে সাষ্টাঙ্গে পড়ে গেল জ্যোতির পায়ে। জ্যোতি তাকে দুই হাতে জড়িয়ে তুলে নিয়ে বললে, 'কি বাবা! কত দূর পড়াশুনা করেছ?'

যুবকটি বিনয়ে মাথা নীচু করে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। বৃদ্ধাটি জবাব দিলেন, 'তা, আপনার টাকা বিফলে যায় নি রায় গারু। আমার বড় দুই নাতি ত মূর্খ হয়েই রইল। কিন্তু এই ছোটটি আপনার আশীর্ব্বাদে লেখাপড়া শিখেছে। একটা ইস্কুল করেছে। সকালবেলা দেখবেন কত ওর শিষ্য।'

---

* তেলুগু "গারু" কথার মানে মহাশয়।

† তেলুগু "চিনা" মানে ছোট খোকা।

বৃদ্ধা এইবার প্রাণনাথের দিকে তাকাতে জ্যোতিপ্রকাশ বললে, 'উনি আমার বন্ধু। বাঙালী। আমাদের কথাবার্ত্তা উনি বুঝতে পারছেন না।'

তারপর জিজ্ঞাসা করলে, 'মৃত্যুঞ্জয় গারু?'

বৃদ্ধা একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আজ পাঁচ বছর হ'ল তিনি চলে গেছেন। যাবার আগে, মৃত্যুশয্যায় শুয়ে শুয়ে আপনার কথা কতই না বলতেন—রায় গারুর ঠিকানাটা জানা গেল না। এই কথাই বার বার বলতেন।'

জ্যোতি জিজ্ঞাসা করলে, 'বড়, মেজ দুই ছেলে কোথায়?'

বৃদ্ধা বললেন, 'বড়টি শ্রীকাকুলামে একটা সদাগরী আফিসে কেরানী, আর মেজটিকে উনিই রেলে ঢুকিয়ে গেছেন, এখন সীমাচলমের ইষ্টেশনের টিকিট বাবু।'

জ্যোতিপ্রকাশের দৃষ্টি আবার পড়ল যুবকের উপর। তার পিঠ চাপড়ে সস্নেহে বললে, 'লছমীনরসিংহম! দেখ তোমার নাম ঠিক মনে রেখেছি—তা তোমরা ত সব ভাই-ই রোজগার করছ, আর তোমার ত শুনছি অনেক শিষ্য—ঘরখানা সেই পাতারই রেখেছ কেন,বাবা?' জ্যোতি বাংলা করে কথাটা প্রাণনাথকে বুঝিয়ে দিলে।

যুবক মৃদু হাসতে থাকে, কোন জবাব দেয় না। জবাব দিলেন বৃদ্ধাই, 'সে কথার ও কি জবাব দেয় জানেন? ও বলে রায় গারু আমায় ঐ পাতার ঘরে দেখেই অত ভালোবেসেছিলেন, তাঁর যত দিন সন্ধান না পাব ততদিন ও ঘর ওই রকমই থাক।'

জ্যোতি এবার ইংরেজীতে কথাটা প্রাণনাথকে বুঝিয়ে দিল। এতক্ষণে যুবকের মুখে কথা ফুটল। পরিষ্কার ইংরেজীতে বললে, 'এইবার পাকা বাড়ী তুলব, রায় গারু—মাকে বড় কষ্ট পেতে হয় পাতার ঘরে।'

জ্যোতিপ্রকাশের মনে হ'ল—সেই পঁচিশ বছর ধরে কথা ফুটি ফুটি করে এত দিনে ফুটল। প্রাণনাথের দিকে তাকিয়ে বললে, 'দুই ছেলের পর এরা একটি মেয়ে চেয়েছিলেন, তাই এরা 'লছমী' কথাটা নামের আগে জুড়ে দিয়েছিলেন। তারপর লছমীর দিকে ফিরে ইংরেজীতে বললে, 'এইবার পাকা বাড়ী তোল আর একটা বড় চাকরীর সন্ধান দেখ।'

প্রাণনাথ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'খবরদার খবরদার! অমন কাজও করো না। ঐ ছেলে পড়াচ্ছ যে ঐটেই হ'ল সবচেয়ে বড় কাজ। মানুষ গড়ে তুলতে থাক। চল তোমার বিদ্যামন্দির দেখব।'

অল্প দূরে একটা মস্ত পাকা বাড়ীতে বিদ্যালয়, মানে বিরাট একটা টোল। সেই সঙ্গে ইংরেজী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে তেলুগু ভাষাতে। নানা জায়গা থেকে ছেলেরা এসেছে পড়তে। আরও কয়েকজন শিক্ষকও আছেন। ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদারদের কাছ থেকে দান পাওয়া গেছে। ছাত্রাবাসও হয়েছে। পাকা বাড়ী। শুধু লছমিনরসিংহমই তার মাকে নিয়ে আজও সেই তালপাতার ছাউনিতেই পড়ে আছে। দেখে দুই বন্ধুর চোখে জল এল।

৪

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর দু'জনে শুতে গেল। ছাত্রাবাসের একটা ঘরে দুই বন্ধুর শোবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল লছমী।

প্রাণনাথ বললে, এবার বল ব্যাপারটা কি। তুই ওর পড়ার জন্যে টাকা দিয়েছিলি না কি?

—হ্যাঁ। তবে শোন। জানিস ত শরীর আমার কোনকালেই বিশেষ ভাল ছিল না। তাই এত দূরদেশে চাকরী নেওয়া সকলেরই অমত ছিল। কিন্তু মাইনে ভাল আর কাজও মোটামুটি হালকা বলে আমি জিদ করেই চলে এসেছিলাম। ঐ যে দোতলা পাকাবাড়ীটা ওদের কুটীরের পাশে দেখেছিস ত? ওটা তখন একতলা ছিল। এ বাড়ীটাতে কোম্পানী আমায় কোয়াটার্স দিয়েছিল। আমি একলাই ঐ বাড়ীতে থাকতাম আর কুকারে রেঁধে খেতাম। একটা চাকর ছিল সে অন্য সব কাজ করত; কিন্তু রান্নার কাজ তার হাতে ছেড়ে দিতে আমার প্রবৃত্তি হ'ত না।

যাই হোক, দু' একদিনের মধ্যেই এ শিশুটি আমাকে একদিন পথে দেখে ওর দাদামশায়ের কোল থেকে ঝাঁপিয়ে আমার কোলে চলে এল। আমার ছেলেও তখন প্রায় অত বড়। তাকে কলকাতায় রেখে এসে আমার মনটা ভাল ছিল না—সর্ব্বদাই মনটা হু হু করত। ব্যস, একেবারে আমাকে অধিকার করে বসল লছমী।

'বিদেশীর-বেগাতির' বলেই হোক বা লছমীর মুকদৌত্তোর জোরেই হোক ক্রমেই আমি ওদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগলাম। লছমীর মা তিনটি পুত্রসন্তান নিয়ে বিধবা হয়েছিল কয়েকমাস আগে। বড় ছেলের বয়স তখন দশ, মেজোর আট আর লছমী সবে এক বছরের।

থাকতে থাকতে আমার সঙ্গে সাবিত্রীর পর্দ্দার ব্যবধান আর রইল না। লছমীর কান্না না থামাতে পারলে বা সংসারের কাজের অসুবিধা হলেই সাবিত্রী ছেলেকে আমার কাছে রেখে যেত। অত গরীব হলেও বোধ হয় আমার অসহায় অবস্থার প্রতি করুণা করেই ওদের রান্না কিছু কিছু নিয়ে এসে আমাকে খাইয়ে যেত। বারণ করলেও শুনত না। আমি যে তেলুগু ভাষা অত শীগগির আয়ত্ত করতে পেরেছিলাম তার প্রধান কারণই সাবিত্রী এবং বুড়ীর সঙ্গে সর্ব্বদা কথাবার্ত্তা বলে। লছমীকে আমি আমার রুচিমত পোষাক, খেলনা, বিস্কুট, লজঞ্জুষ, কমলা, বেদানা দিয়ে, তাকে নিয়ে খেলা দিয়ে আমার পুত্রবিরহ অনেকখানি শান্ত রাখতাম। প্রায়ই একটা কোন অজুহাতে খাবার তৈরী করে দিতে অনুরোধ করে এবং ক্রমে ক্রমে পরে অকারণেও ঘি, ময়দা, চাল, ডাল, ফল, সবজী প্রভৃতি দিয়ে আমি ওদের সাহায্য করতাম। ওরা এত বেশী গরীব ছিল যে ওদের আপত্তি আমি সহজেই খণ্ডন করতে পেরেছিলাম।

সাবিত্রীর মত এমন নীরব, শান্ত, পরিশ্রমী, সেবাপরায়ণ বধূ জীবনে দেখি নি। জল তোলা, বাসন মাজা, ঘরদোর লেপা, পরিষ্কার করা, কাঠ কাটা, সেলাই করা, কাপড় কাচা—সে যেন কাজের নিরবচ্ছিন্ন একটা বন্যাস্রোত। ওরই মধ্যে মাঝে মাঝে এসে

আমার ঘর-দোর গুছিয়ে, চাকরকে বিছানা করা, মশারী টানানো, চা তৈরি করা সব শিখিয়ে দিয়ে যেত। বারণ করলে শুনত না—বলত, আপনি একলা পুরুষ মানুষ আমাদের কাছে থেকে কষ্ট পাবেন সে বড় লজ্জার কথা। আপনার স্ত্রী আমাদের বলবেন কি? আপনি বারণ করবেন না।

সেই দূর বিদেশে সমস্ত অপরিচিত দিশাহারা পরিবেশের মধ্যে এ যেন আমার কাছে মরূদ্যানের মত মনে হ'ত। বৃদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় তখন অধিকাংশ সময় আমার বাড়ীতেই থাকতেন। তিনি তামাক এনে 'পিকা' তৈরি করতেন। পিকা ওদেশের একরকম চুরোট (সিগার)। ঐতেই কায়ক্লেশে তাঁদের সংসার চলত।

সন্ধ্যের আগেই ওদের সংসারের কাজ, খাওয়া-দাওয়া সব শেষ করতে হ'ত। নইলে আলোর খরচ বহন করার সামর্থ্য ওদের ছিল না। সন্ধ্যের পরও আমার অনুরোধেই মৃত্যুঞ্জয় আমার ঘরে আমার আলোর সাহায্যে তাঁর পিকা তৈরি করতেন। আমি প্রায়ই সন্ধ্যের পর বেড়াতে যেতাম। কখন কখন ছেলেরাও আমার সঙ্গে যেত। সাবিত্রী এসে আমার কুকার চড়াত—আমার কাছেই শিখে নিয়েছিল—খাবার টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখত। প্রায়ই দেখতাম সে নিজের বাড়ী থেকে কিছু না কিছু আমার জন্যে তৈরি করে এনে রেখে যেত। আমি ফিরলেই সে ছেলেদের নিয়ে চলে যেত। এমন একটা পরিতৃপ্তির সুন্দর হাসি তার মুখে দেখতাম যে মনে হ'ত যেন সে এইমাত্র পূজা শেষ করে উঠল।

আমার সামান্য অসুখ হলে সাবিত্রী আর তার শ্বশুর-শাশুড়ী ক্রমাগত আমার খোঁজ নিতেন। অত কাজের মধ্যেও সে আমার কফি তৈরি করে, দুধ জ্বাল দিয়ে, ফল কেটে দিয়ে, গরম জল করে দিয়ে আমার প্রবাসে আত্মীয়ের অভাব ভুলিয়ে রাখত।

সাবিত্রী সুন্দরী ছিল না। কিন্তু এমন একটা স্নিগ্ধতা তার চেহারায় ছিল এবং তার ঈষৎ আয়ত চোখের মধ্যে দিয়ে এমন একটি অকপট বিশ্বাস, একটি শান্ত সরলতা প্রকাশ পেত যে নিজের অজ্ঞাতেই মুগ্ধ হয়ে গিয়ে থাকব এবং নিজের অজ্ঞাতেই সে আমাকে মুগ্ধ করেছিল। দেখ প্রাণনাথ, ওরকম চোখ পাকাবার কিছু নেই। প্রেমে যে পড়িনি তা প্রায় হলফ করেই বলতে পারি; কারণ দু' তিন দিন উপরি উপরি সস্তুর মার চিঠি না এলে আমি একেবারে মুষড়ে পড়তাম। সাবিত্রীর কাছে আমার অস্থিরতা কিন্তু লুকানো থাকত না। দেখতাম, সে লছমীকে নিয়ে বার বার আমার কাছে আসত, তাদের দেশের গ্রামের বাবা-মার, বুড়ী ঝির, পেয়াদাদের (তার বাপের বাড়ী বেশ অবস্থাপন্ন ছিল) অনেক গল্প করে করে আমাকে অন্যমনস্ক রাখতে চেষ্টা করত। ছেলেমানুষকে যেমন গল্প দিয়ে ভোলায় ঠিক তেমনি করে।

প্রেমে পড়িনি, কিন্তু তার স্বভাবের চরিত্রের সেবার মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছিলাম, তার আর কোন সন্দেহ নেই। আরও একটা কারণে বোধ হয় আকৃষ্ট হয়েছিলাম—সে জিনিসটির কোন বেগবান প্রকাশ ছিল না কিন্তু একটা গভীর প্রভাব ছিল—সে হচ্ছে আমার মত প্রায় অপরিচিত এবং সমবয়স্ক পুরুষের প্রতি তার একটি সঙ্কোচবিহীন স্বচ্ছ গভীর স্নেহ এবং বোধ হয় নির্ভর। তার মৃত্যুর দিনের আগে কিন্তু সে কথা জানতে পারি নি।

লছমীর যখন তিন বছর বয়স তখন সাবিত্রী দারুণ কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়। তিন দিন তিন রাত্রি অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে সে ভগবানের শান্তিময় ক্রোড়ে চিরবিশ্রাম লাভ করলে। আমার সাধ্যমত সেবাযত্ন অর্থব্যয় কিছুরই ত্রুটি করি নি—কিছুতে তাকে রাখতে পারলাম না। অসুখের সময় সারাক্ষণই আমি তার কাছে ছিলাম। দেখতাম নিশ্চয় মরণের মুখেও তার আশ্চর্য নিশ্চিন্ততা। শেষদিন আমাকে বললে, ঘরে তখন আর কেউ ছিল না—ভগবানের কি অসীম দয়া যে তোমাদের রেখে আমাকে নিলেন। একবার বললাম, কেন এমন বলছ? তুমি গেলে লছমীর আর কে থাকবে?

বললে—লছমীর জন্যে আমার কোন চিন্তা নাই। তার দাদা দিদির কাছে সে যত্নেই থাকবে। আর তুমি রইলে—দেখো ও যেন মূর্খ না হয়। এটি একমাত্র আমার প্রাণের কামনা ছিল। কিন্তু তুমি রইলে বলে আর আমার কোন চিন্তা নেই।

আমি আর চোখের জল সামলাতে পারলাম না। উঠে বাইরে চলে গেলাম। সেই রাত্রেই সাবিত্রী মারা যায়।

তার পরের দিনই আমি কাজে ইস্তফা দিই এবং আসবার দিন লছমীর দাদামশায়ের হাতে লক্ষ্মীর শিক্ষার জন্যে আমার সেখানকার সঞ্চয়ের সমস্ত অর্থ এক হাজার টাকা দিয়ে আসি। আজ আমার প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হয়েছে। সাবিত্রী যে আমার উপর এরকম একান্ত নির্ভর করেছিল লছমী আজ তা সার্থক করে তুলেছে।

৫

বিদায়-দিনে ছোট ষ্টেশনটাতে যেন হুলুস্থুল পড়ে গেল। দুই বন্ধুকে বিদায় দিতে নরসিংহমের সঙ্গে তার সব ছাত্রদল এসেছে। বাইরের লোকে কেউ বলছে, মিনিষ্টার! কেউ বলছে হাকিম। ঘণ্টা পড়ল, বাঁশী বাজল। ছেলের দল একে একে নমস্কার করে পিছিয়ে গেল। গাড়ী ছাড়ার আগের মুহূর্তে সকলকে প্রতিনমস্কার করে দুই বন্ধু গাড়ীতে গিয়ে উঠল। নরসিংহম সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে জ্যোতিপ্রকাশের পায়ে সাষ্টাঙ্গে পড়ে প্রণাম করে পদধূলি গ্রহণ করলে। গাড়ী ছেড়ে দিল। জ্যোতিপ্রকাশ ব্যস্ত হয়ে লছমীকে তুলে ধরে বললে, "নাম শীগ্‌গির—নেমে পড়।"

তাকে নামিয়ে দিয়ে দুই বন্ধু জানালার ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে শেষ বিদায় নিয়ে বসল। কোথা থেকে যেন মিষ্টি ফুলের গন্ধ এসে কামরা ভরিয়ে দিল। প্রাণনাথ বললে, ছুটন্ত গাড়ীতে এত ফুলের গন্ধ কি করে আসছে? নিশ্চয় ওরা একটা মালা-টালা ফেলেছে গাড়ীতে। "দেখি ত"; হঠাৎ নীচু হয়ে জ্যোতির পায়ের কাছ থেকে প্রাণনাথ সুন্দর রুমালে বাঁধা একটা পুঁটলী তুলে ধরে বললে, "আরে, এই ত! এটা কি?"

খুলে দেখে একরাশ চামেলী ফুল, আর তার তলায় একটা খামে দু' হাজার টাকার নোট!

মহাত্মাজীর আহ্বানে

শ্রীক্ষেমঙ্করী রায়

আনন্দবাজার পত্রিকায় কয়েক মাস পূর্ব্বে 'পশ্চিমবঙ্গ পরিক্রমা' শীর্ষক প্রবন্ধে ১৯৩০ সনের নরঘাটের বিবরণ পাঠ করিয়া বিগত পঁচিশ বৎসরের ঘটনাবলী একে একে আবার স্মৃতিপথে ছবির ন্যায় একটির পর একটি উদিত হইল। সেই মহামূল্য দিনগুলি জীবনে যে রেখাপাত করিয়াছিল তাহা এখানে যৎসামান্য বিবৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

মহাত্মাজী তাঁহার ডাণ্ডি অভিযান, আইন-অমান্য আন্দোলন, লবণ-আইন ভঙ্গ প্রভৃতি ব্যাপারে দেশমাতৃকার সেবায় সকলেরই সমান অধিকার আছে—ইহা জানাইয়া দিলেন এবং আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে অহিংসার সত্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, উৎসাহ-উদ্দীপনা দান করিয়া, সকলকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে আহ্বান করিলেন। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়া আমার ন্যায় সাধারণ গৃহস্থঘরের বধূও ঝাঁপাইয়া পড়িল।

অনেকেই তখনকার প্রকৃত ঘটনা জানেন না, অথবা ভুলিয়া গিয়াছেন। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে বয়স ছিল অল্প, তখন তরুণী বধূ। শিশুকাল হইতেই দেশমাতৃকাকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিলাম। বাঙ্গালী জাতি—আমরা, পরাধীন। আমাদের জননীকে শৃঙ্খল-মুক্ত করিতে হইবে ইহাই ছিল শৈশবের প্রতিজ্ঞা।

গোখলে, বালগঙ্গাধর তিলক, কৃষ্ণকুমার মিত্র, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীঅরবিন্দ, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন বসু, চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রমুখ দেশপ্রেমিক এবং রাষ্ট্র-নেতাদিগের দেশের জন্য আত্মত্যাগ ও কারাবরণের কথা সাগ্রহে শুনিতাম। ইঁহারাই ছিলেন আমার জীবনের আদর্শ ও পথপ্রদর্শক। উপরন্তু ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল, সত্যেন বসু প্রভৃতির ফাঁসিকাষ্ঠে আত্ম-বলিদান আমাকে এবং আমার কয়েকটি বন্ধুকে আরও প্রেরণা যোগাইয়াছিল।

তার পর দীর্ঘকাল কাটিয়া গেল। ভগবান কখনও কাহারও সদিচ্ছা অপূর্ণ রাখেন না। ১৯৩০ সনে যে আহ্বান আসিল তাহাতে সানন্দে পরমোৎসাহে যোগদান করিয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করিলাম।

১৯৩০, মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে মহাত্মাজীর ডাণ্ডি অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্ব্বত্র লবণ-প্রস্তুতি ও ১৪৪ ধারা নিষিদ্ধ পুস্তক-পাঠ প্রভৃতি আইনভঙ্গমূলক কার্য্য আরম্ভ হয়। আমাদের অভিযান সুরু হইল প্রথম মহিষবাথানে। সেখানেই প্রথমে লবণ-আইন ভঙ্গ করা হইল। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত এই কেন্দ্রের ভার প্রাপ্ত হইলেন। সেখানে তৈয়ারী লবণ আনা হইল শ্রদ্ধানন্দ পার্কে, সভায় এক মোড়ক লবণ পাঁচ হইতে পঁচিশ টাকায় বিক্রয় হয়। শত শত দেশপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবক ও সেচ্ছাসেবিকা প্রচণ্ড লাঠির আঘাত সহ্য করিয়াও হাসিমুখে লবণ প্রস্তুত করিয়াই চলিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়া স্বহস্তে প্রস্তুত লবণ-সংযোগে একত্র বসিয়া ডাল-ভাত গ্রহণ করিলাম। তাহা অমৃততুল্য বোধ হইল। কৌমার্য্যব্রতধারিণী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরও দুইটি গৃহস্থবধূ ছিলেন—সরলা গঙ্গোপাধ্যায় ও বর্ত্তমান লেখিকা। সে যে কি আনন্দ পাইয়াছিলাম স্মরণ করিতে আজও হৃদয়মন ভরিয়া উঠে। অল্পক্ষণ পরেই পুলিসের অত্যাচার আরম্ভ হইল। লবণ-প্রস্তুতের সাজসরঞ্জামাদি ভাঙ্গিয়া, জনতার উপর লাঠি চালাইয়া, ফুটন্ত লবণজল স্বেচ্ছাসেবকদের গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া তাহারা আপন আপন কার্য্যসিদ্ধিজনিত আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিল।

রক্তাক্ত কলেবর একাদশ বর্ষীয় বালক-ক্রোড়ে জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় ও দুই জন সঙ্গিনী

এইবার আরম্ভ হইল কলিকাতার বাহিরে বিভিন্ন কেন্দ্রে এক একজন নেতার অধীনে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ দ্বারা আইন অমান্য আন্দোলনকে শক্তিশালী করা। কলিকাতার পার্কে পার্কে সভা চলিতে লাগিল। নেতাদিগকে মাল্যচন্দনে ও কুঙ্কুমে ভূষিত করিয়া, তাঁহাদের কপালে জয়তিলক আঁকিয়া দিয়া স্বাধীনতা-যুদ্ধে পাঠানো হইত। ইঁহাদের মধ্যে উত্তর-কলিকাতার তখনকার কংগ্রেস-কর্ম্মী শ্রীহেমন্তকুমার বসু, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য।

উত্তর-কলিকাতার চাবের পল্লীর কর্ম্মিবৃন্দ তখন প্রবল উৎসাহে ও আগ্রহে কার্য্য করিয়া যাইতেছিল। জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন চাবের পল্লীর প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী শ্রীরতন বন্দ্যো-পাধ্যায়। আমি ছিলাম কার্য্যকরী সমিতির সভ্যা এবং জ্যোতির্ম্ময়ীর সহকর্ম্মিণী।

জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন আমার শিক্ষাগুরু। বেথুন বিদ্যালয় ও কলেজে তাঁহার নিকট হইতে সুশিক্ষা পাইয়াছিলাম। শুধু তাহাই নহে, তিনি জ্যেষ্ঠা ভগিনীর প্রাণঢালা স্নেহ দিয়া আমায়

স্নেহপাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে রাজনীতিক্ষেত্রেও তিনি আমায় শিষ্যারূপে গ্রহণ করিলেন। পশ্চিমবঙ্গ পরিক্রমার উভয়ে একত্র রওনা হইলাম। তখন কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানগুলি বেআইনী ঘোষিত হইয়াছে। সমস্ত কংগ্রেস আপিসের দ্বার তালা-বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোনও কোনও আপিসে এবং কাগজপত্র ইত্যাদিতে অগ্নিসংযোগও করা হইতেছে।

শুনিলাম তমলুক, কাঁথি ও মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে আইন-অমান্যকারী এবং সাধারণ দরিদ্র বাসিন্দাদিগের উপর ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দ্দেশানুসারে অমানুষিক অত্যাচার চলিতেছে। সকলে নীরবে অত্যাচার সহ্য করিতেছেন বটে, কিন্তু নিপীড়িত হইয়া অহিংস-নীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে চাহিতেছেন না। সেখানে এমন কাহারও যাওয়া প্রয়োজন, যিনি মনেপ্রাণে অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত এবং এই নীতির তাৎপর্য্য ও তাহার ফল ইঁহাদের উত্তমরূপে বুঝাইয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে উৎসাহিত করিবেন।

উত্তর-কলিকাতা কংগ্রেস কমিটি হইতে জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় ও বর্ত্তমান লেখিকা আমন্ত্রণ পাইলেন। ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৩০ সালে তমলুক যাত্রা করিবার নির্দ্দেশ আসিল।

সকালের ট্রেণে আমরা তমলুক রওনা হইলাম। বেলা এগারটা আন্দাজ কংগ্রেস সেক্রেটারী স্বর্গত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করা হইল। বাড়ীর মহিলারা আত্মীয়নির্ব্বিশেষে আমাদের যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন করিলেন। বিশ্রামের পর আমাদের তমলুক হইতে ২০।২৫ মাইল দূর নরঘাটে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। সেখানে লবণ-আইন ভঙ্গ করা হইতেছে। সেক্রেটারী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরঘাটে ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে, আপনারা যাইবেন কি?"

জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, আমি ও শ্রীযুক্তা চারুশীলা দেবী তিন জনে একখানি ট্যাক্সিতে করিয়া নরঘাটে উপস্থিত হইলাম। সাধারণ পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জনতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। ইঁহাদের সংখ্যা প্রায় হাজার দুই তিন হইবে। তাহারা আইন অমান্য করিতে আসিয়াছে জীবনপণ করিয়া। স্ত্রীলোকদিগের দেহ বলিষ্ঠ, মণিবন্ধে কাংস্যবলয়, সীমন্তে সিন্দূর, পরিধানে মোটা গড়। অহিংসা-নীতি তাহাদের বুঝাইয়া দেওয়া হইল এবং স্থির শান্তভাবে অপেক্ষা করিতে বলা হইল। ইতিমধ্যে পুরুষদিগের উপর লাঠি চলিতে লাগিল। তখন তাহাদের স্ত্রীদিগকে ঠেকাইয়া রাখা দায় হইল। তাহারা কোমর বাঁধিয়া বলিতে লাগিল, "আমাদের স্বামীর গায়ে আঘাত লাগিবে আমরা সইতে লারবো।"

যাহা হউক, আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সকলেই স্থিরভাবে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল এবং অহিংসা-নীতি মানিবে প্রতিজ্ঞা করিল।

লবণ তৈয়ারির কেন্দ্রে প্রচণ্ড কোলাহল শুনিলাম। ছুটিয়া গিয়া দেখি তৈয়ারী লবণ, লবণ-প্রস্তুতের সাজসরঞ্জাম সব ভাঙিয়া নষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে এবং নির্ম্মমভাবে লাঠি চালানো হইতেছে। কাহারও মাথা ফাটিয়া অজস্রধারে রক্ত বহিতেছে, কাহারও পৃষ্ঠদেশ চাবুকের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত। ক্ষুব্ধ জনতা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, কেহ পলাইবার চেষ্টামাত্র করিতেছে না।

পূর্ব্বদিকের কেন্দ্রে একটা ভীষণ গণ্ডগোল বাধিয়াছে। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখি, একাদশবর্ষীয় এক দরিদ্র কৃষক-বালককে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব চাবুক দ্বারা শায়েস্তা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহার নাসিকা হইতে দরবিগলিতধারে রক্তপাত হইতেছে। তাহার অপরাধ সে লবণ জ্বাল দিতেছিল। আমরা তিন জনে তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলাম। তখন সে জ্ঞানহীন। চোখেমুখে ঠাণ্ডা জলের ধারা দিবার পর তাহার জ্ঞান হইল, কিন্তু রক্তপড়া বন্ধ হইল না। জ্ঞান হইবার পর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি আবার লবণ তৈয়ারি করিতে আসিবে?" তেজস্বী নির্ভীক বালক উত্তর দিল, "একটু ভাল হইলেই আবার আসিব এবং আবার চাবুক খাইব সাহেব।"

সেদিন ছিল ২৪শে ডিসেম্বর (Chrismas Eve)। শ্রদ্ধেয়া জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া "Another Crucifixtion" শিরোনামায় এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহা সাগ্রহে *Modern Review*-তে আমাদের ক্রোড়ে শায়িত বালকটির একখানা ফটোসহ ছাপাইয়াছিলেন। বিলাত ও আমেরিকার গ্রাহকগণ সেই মাসের মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকা দেখিয়া সরকারের অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তমলুক হইতে নরঘাট অন্ততঃ পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূরে। ইতিমধ্যে বালকটিকে হাসপাতালে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, অথচ শহর হইতে গাড়ী বা ট্যাক্সি আনা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার গাড়ী দিতে চাহিলেন, আমরা ধন্যবাদসহ তাহা প্রত্যাখ্যান করিলাম। অবশেষে আমাদের ভাইয়েরা কাপড়ের ষ্ট্রেচার তৈয়ারি করিয়া এবং পালাক্রমে বদলী হইয়া বালকটিকে রামকৃষ্ণ মিশনের হাসপাতালে লইয়া আসিলেন।

তাহাকে সুব্যবস্থাধীনে রাখিয়া আমরা তমলুক শহরে আসিলাম। সেখানে বড় সভার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল ১৪৪ ধারা জারী হওয়া সত্ত্বেও। কিন্তু তাহা ভঙ্গ করিয়া প্রথমে জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় বক্তৃতা করিলেন, পরে আমি বক্তৃতা করিয়া চলিলাম। লাঠি ও চাবুকবৃষ্টি হইতে লাগিল, কিন্তু কেহই পশ্চাৎপদ হইলেন না। অজ্ঞাতে কি এক ঐশ্বরিক শক্তি কার্য্য করিতে প্রেরণা দিয়াছিল। তমলুকের কার্য্য আমাদের এখানেই শেষ হইল। সভায় বলিয়াছিলাম, "আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমাদের ভ্রাতা ও পুত্রস্থানীয়েরা মা-বোনেদের উপর লাঠিচালনা করিয়া শক্তির পরিচয় দিতেছে।"

আমরা তমলুক হইতে চলিয়া আসিবার পর শুনিলাম, অনেক

উচ্চপদস্থ পুলিস কর্ম্মচারী এমন কি এস-ডি-ও পর্য্যন্ত কাজে ইস্তফা দিয়া দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

এইবার আমরা মেদিনীপুরে আসিলাম। মেদিনীপুর শহর হইতে ভিতরের গ্রাম মধুবনী, পিছাবনী প্রভৃতি স্থানে গৃহে গৃহে পুলিসের অমানুষিক অত্যাচারের চিহ্ন জাজ্বল্যমান দেখিলাম। ঝাড়েশ্বর মাঝির সপ্তমবর্ষীয় শিশুপুত্র সজল নেত্রে আসিয়া জানাইল তাহার বই ইত্যাদি পুলিসে পোড়াইয়া দিয়াছে, শ্লেট ভাঙিয়া দিয়াছে। ঘরের মুড়ি-চিঁড়া প্রভৃতি খাদ্য, কড়ায় জ্বাল দেওয়া দুধ, গাছের ডাব নারিকেল সব প্রতিদিন কতক খাইয়া কতক নষ্ট করিয়া পুলিস পলাইয়া যায়। তাহারা ঝাড়েশ্বর মাঝির পুত্রবধূকে মাথার ঘোমটা খুলিয়া অপমানিত করিয়াছে। উঠানে গোলাভর্ত্তি ধান ছিল, তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে, ধান পুড়িয়া একেবারে কালো-ঝামাতে পরিণত হইয়াছে। তাহা কতকটা সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। পরে মহাত্মাজীকে দেখানো হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই হতভাগ্য বাংলাদেশের সুনাম তবুও শোনা যায় নাই! সেবার কংগ্রেসে বোম্বাই ও মান্দ্রাজের শতমুখে প্রশংসা শোনা গেল যে, তথাকার নরনারী প্রবল অত্যাচার সহ্য করিয়াছে এবং দক্ষতার সঙ্গে কাজ করিয়াছে। কিন্তু তমলুক, মেদিনীপুরের নামোল্লেখ মাত্র হয় নাই।

এবার আমাদের পুনরায় মেদিনীপুর যাইবার আহ্বান আসিল। তথাকার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মন্মথবাবুর বাড়ীতে আমরা আতিথ্য গ্রহণ করি। নাড়াজোলের রাজবাটীতে আমাদের থাকিবার স্থান হইল।

১৪৪ ধারা সত্ত্বেও সন্ধ্যায় সভা আরম্ভ হইল। পুলিসকে লাঠি চালাইবার ও জনতা ছত্রভঙ্গ করিবার আদেশ দেওয়া ছিল। কিন্তু বক্তৃতার মধ্যে তাহারা আমাদেরই জাত-ভাই হইয়া আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মা-বোনেদের উপর নির্ম্মম আচরণ করিতেছে, এইরূপ কথা শুনিয়া তাহারা লাঠি চালানোয় বিরত হয়। কিন্তু পরে কর্ত্তৃপক্ষের চাপে নির্ব্বিচারে ডাইনে ও বামে যে লাঠিচালনা করে তাহা হইতে আমরা কেহই অব্যাহতি পাই নাই।

ইহার পর আমাদের কাঁথি যাইবার জন্য আমন্ত্রণ আসিল। নদীর উপর দুই পার্শ্বে গরুর গাড়ী দিয়া তাহার উপর বাস চালানো হইল—কারণ পুলিস পোল ভাঙিয়া দিয়াছিল। তরিতরকারী, মাছ প্রভৃতি বিক্রয়ের উপর দ্বিগুণ কর ধার্য্য করিয়া গরীব চাষীদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলা হইতেছিল। পিটুনি কর অনাদায়ে জিনিসপত্র নষ্ট করিয়া দিতেছিল। কাঁথির জাতীয় বিদ্যালয়ে আমাদের স্থান দেওয়া হইল। সেখানে আমাদের শত শত ভাই লবণ-আইন ভঙ্গ করিতে গিয়া অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিয়াছে, তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম। ফুটন্ত লবণজল কড়া উল্টাইয়া কাহারও গায়ে ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের সারা গায়ে ফোস্কা পড়িয়াছে, কি অসহ্য জ্বালা! কাহারও বুকের উপর বুটশুদ্ধ নৃত্য করায় তাহার বক্ষের অস্থি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহারা নীরবে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে। কাহারও চশমার কাঁচ ভাঙিয়া চক্ষের তারায় লাগায় জন্মের মত চক্ষু হারাইয়াছে। কিন্তু কাহাকেও পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে শুনিলাম না। অহিংসা-নীতির জয়জয়কার দেখিলাম স্বচক্ষে। এখানেও ১৪৪ ধারা সত্ত্বেও আমাদের নেতৃত্বে যে মিছিল বাহির হইল তাহাতে নির্ভীক চিত্তে আবালবৃদ্ধবনিতা যোগদান করিলেন। মিছিল নগরের রাজপথ, বাজার প্রভৃতির মধ্য দিয়া যত অগ্রসর হইতে লাগিল, ইহার আয়তন ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কংগ্রেস আপিসে পৌঁছিলে অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতাদি হইল। বলা বাহুল্য, পুলিসবাহিনী ধরপাকড় করিয়া লাঠি ও চাবুক ব্যবহারপূর্ব্বক তাহাদের কার্য্য যথারীতিই করিয়া যাইতেছিল।

কাঁথি হইতে কয়েক মাইল দূরে এক গ্রামে পঞ্চদশবর্ষীয় একটি বালককে দুই হস্তে পাঁচ পাঁচ দশ সের পাথর চাপাইয়া কোমর ও পদযুগল শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তাহার অপরাধ সে কোনও দলের নেতা। তাহার নিকট হইতে সঙ্গীদের নাম জানিবার জন্য এই শাস্তির ব্যবস্থা। ইহার পর মহিলা-সমিতির অনুরোধে আমরা আরও দুই দিন কাঁথিতে রহিয়া গেলাম সমিতির উন্নতি-পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে। পরলোকগত বিশ্বম্ভর দিনদার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। যাঁহাদের গৃহে অতিথি হইয়াছিলাম, যে সকল স্বেচ্ছাসেবকের 'দিদি' ডাক শুনিয়াছিলাম, যাঁহাদের সঙ্গে একত্রে কাজ করিয়া বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, তাঁহারা কে কোথায় আছেন জানি না! কেহ কেহ হয়তো পরলোকে, কিন্তু প্রতিদিন সকলকে স্মরণ করি এবং শেষজীবনে সেই দিনগুলির মধুর স্মৃতি এখনও আমাকে সঞ্জীবিত করে।

পশ্চিমবঙ্গ পরিক্রমা সমাপ্ত করিয়া কলিকাতা আসিয়া অন্যান্য কার্য্যে ব্যস্ত থাকাকালে শুনিলাম ম্যাজিষ্ট্রেট পেডি সাহেবকে হত্যা করা হইয়াছে। শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম।

জাহ্নবী যমুনার উৎস সন্ধানে

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

সকাল হতে না হতেই উঠে পড়ি—সাড়ে চারটের সময় ঘুম ভেঙে যায়। ধরম সিংকে বলাই ছিল, পাঁচটার পরই আমরা বেরিয়ে পড়ি ধর্মশালা থেকে। বীরবলরা কালকেই রওনা হয়ে গেছে—ওরা কমলীবাবার ধর্মশালাতেই উঠেছিল। গঙ্গোত্তরীতে আবার দেখা হবে এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে ওরা চলে গেছে, না হলে আর একটা দিন ওরা আমার অপেক্ষায় থাকত। অনেক বুঝিয়ে ওদের পাঠিয়েছি। যাওয়ার পথে মনে হ'ল বিশ্বনাথকে একবার দেখে যাই।

মন্দিরের সামনে তিনটি ছোট কুটীর—মধ্যের কুটীরের বুক ভেদ করে একটি বিরাট ত্রিশূল ঊর্ধ্বাকাশে উঠে গেছে। এত বিরাট ত্রিশূল কেউ কখন দেখেছে বলে মনে হয় না। মানুষের জন্যে যে এ নয়, এ যে স্বয়ং মহাদেবের, তাই প্রথম দর্শনে মন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। বদরিকার পথে গোপেশ্বরের মন্দিরে যে ত্রিশূল দেখেছিলাম তার সঙ্গে এই ত্রিশূলের অমিল অনেকটা; তার দণ্ডটি ছোট কিন্তু ফলাটি অতি বৃহৎ, দেখলে সম্ভ্রমে মাথা নত হয়ে আসে। গোপেশ্বরের ত্রিশূলের মালিক পরশুরাম—এ ত্রিশূলের মালিক স্বয়ং শিব, সেইজন্যে আকৃতি ও প্রকৃতির পার্থক্যটা অতি সহজেই চোখে পড়ে। বহু প্রাচীন এ ত্রিশূল···কোন অনাদিকাল থেকে এ যেন মাটিতে প্রোথিত হয়ে আছে। উত্তরকাশীর বহুদূর থেকে এটি চোখে পড়ে আর মনে হয় শিবের রাজত্বে এসে পড়েছি। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে অষ্টধাতুর এই মহা অস্ত্রটির স্পর্শ নিই ও প্রণাম করি। অন্নপূর্ণার মন্দির কাছেই, চিন্ময়ী মায়ের দর্শন নিতে ভুলি না। আর একবার বিশ্বনাথের সামনে এসে দাঁড়াই।

উত্তরকাশী শেষ হয়ে গেল। তিনটে দিন মাত্র থাকা—দেখা বা জানার দিক থেকে এ আর কতটুকু! মধ্য-হিমালয়ের এ বৃহৎ জনপদের ইতিহাস এত বিরাট, এত ব্যাপক যে তিনটি দিনের অবস্থিতি এখানে 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম'। একমাত্র বিষ্ণুদত্তকে নিয়েই ত জীবন কেটে যাওয়ার কথা, কতটুকুই বা জানলাম তাঁকে, কতটুকুই বা অঞ্জলিভরে নিতে পারলাম? একটি মাত্র সন্ধ্যার আরতির অনুভূতি যা বিশ্বনাথের মন্দিরে, ঐ পূজারীর মত যদি আমার গোটা জীবনটা কেটে যেত পূজার ষোড়শোপচার নৈবেদ্য দিতে দিতে, তা হলে বুঝতে পারতাম, যা হোক কিছু হ'ল, খুদকুঁড়ো যা হোক কিছু পেলাম! কিন্তু তাও ত হ'ল না; না পেলাম দেখার পূর্ণতম তৃপ্তি, না দিতে পারলাম পূর্ণতম অঞ্জলি। তাই অভিমান রইল বুকে।

ছায়ার মত পথ জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে, তাই আমার বসার উপায় নেই···লাঠিটা চেপে ধরে ক্ষুব্ধচিত্তে তাই পথের প্রান্তে নেমে আসি···সোনার উত্তরকাশী তাই শেষ হয়ে যায়···।

উত্তরকাশী শেষও হ'ল, গঙ্গোত্তরী পথের অর্দ্ধেক পথও শেষ হয়ে গেল। ওদিকে যেমন গাংনানী এসে যাওয়ার পর যমুনোত্তরীর হদিস মেলে, এদিকে তেমনি উত্তরকাশী। লক্ষ্যবস্তু যে আর বেশী দূরে নয়, এ জনপদ শেষ হয়ে গেলেই তা বেশ বুঝা যায়। রাত্রিবাস আর তিনটি স্থানে, তার পরেই ভগীরথের সাধনার মর্ম্মস্থলে পৌঁছে যাব।

উত্তরকাশীর আড়াই মাইল দূরে অসিকে পেলাম। এদিকে শহরে ঢোকার আগে আড়াই মাইল দূর দিয়ে ত্রিবেণীতে বরুণা মিশেছেন, তেমনি ঐ একই বৃত্তকে নিয়ে অসির পরিক্রমণ। উত্তরকাশীকে মানুষ পঞ্চকোশী হিসেবে চিনেছে ঐ জ্যামিতিক বিচার দিয়ে। তাই এই গোটা শহরকে নিয়ে এই উত্তরকাশীর পঞ্চকোশী নাম।

সহজ পথ—সুন্দর পথ! অসিকে পেরিয়ে যাই, আবার মা গঙ্গার স্নেহাঞ্চল এসে পড়ে। একাই চলেছি—মনে নূতন পথের নূতন মাদকতা। ধরম সিং দূরে। চলতে চলতে দূর থেকে দেখি গৈরিকবসনাবৃত দুটি সাধু চলেছেন আমার আগে আগে। পাহাড়ী রাস্তায় দূর থেকে বৈরাগ্যের ও রংটি বড় ভাল লাগে, পথে আর কোন যাত্রী নেই, পাশাপাশি ওঁরা চলেছেন শুধু। জোরে পা চালিয়ে দি—ওঁদের সঙ্গে পরিচয়ের ইচ্ছেটি প্রবল হয়ে উঠে। দেখলাম চলতে চলতে ওঁরা একটি দোকানে ঢুকে পড়েন, বুঝলাম

একটি চায়ের দোকান। আমিও এসে যাই আর বিনা বাক্যব্যয়ে দোকানে ঢুকে পড়ি। উদ্দেশ্য আলাপ ও সেই সূত্রে কিছু তথ্য-সংগ্রহ, অবশ্য তথ্যসংগ্রহটুকু যদি যোগাযোগের খাতায় থাকে।

দুটি মূর্ত্তিই বাঙালী···আবিষ্কারের আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠি। চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হই আমরা। একজন আর একজনের গুরুভাই, দু'জনেই উত্তরকাশী-বাসী। সংসার ত্যাগ করেছেন এঁরা, বৈরাগ্যকে জীবনের সারবস্তু বলে মেনে নিয়েছেন। যার জন্যে আমার ঐকান্তিক আগ্রহ সেই অপরিহার্য্য সাধু-প্রসঙ্গ টুকরো কথাবার্ত্তার মধ্যে চলে আসে। বিমলানন্দ যাঁর নাম তিনি জিজ্ঞাসা করেন,"কারুর সন্ধান পেলেন?"

উত্তরকাশীর বিষ্ণুদত্তের কথা বলি। শুনেই তিনি চমকে উঠেন; বলেন, "ঠিক মানুষকেই দেখেছেন আপনি। তাঁর দেখা পেয়ে আশীর্ব্বাদ নিয়ে যখন আসতে পেরেছেন, তখন কোন ভাবনাই ত আপনার নেই। উত্তরকাশীর ঐ একটি সম্পদ, যার তুলনা নেই ···বাদবাকী সব ভুয়ো, মিথ্যে।"

একটু থেমে বিমলানন্দ বলতে থাকেন, "ঐ বিষ্ণুদত্তের সঙ্গে আর একজন মহাসাধক দিগম্বর সাধু থাকতেন উত্তরকাশীতে—গত বৎসর এলেও দেখা পেতেন তাঁর। এখন তিনি গঙ্গোত্তরীতে থাকেন। যেখানে ভগীরথ-শিলার নির্দ্দেশ, তার অপর পারে জঙ্গলের মধ্যে তিনি থাকেন। যদি সুকৃতির সঞ্চয় থাকে, তা হলেই তার দর্শন মিলবে, নচেৎ নয়। নাম রামানন্দ—বিরাট, বিশাল পুরুষ—হাতে থাকে তাঁর দীর্ঘ যষ্টি। সন্ধান নেবেন!"

বলতে বলতে বিমলানন্দের চোখে-মুখে সুদূরের দৃষ্টি ঘনিয়ে আসে—কিছুক্ষণের জন্যে তিনি থেমে যান—তারপর চরম বোঝা-পড়ার ভাব নিয়ে আমার দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে আচমকা জিজ্ঞাসা করেন, "পারবেন যেতে?" কিছু না ভেবেই বলি, "কেন পারব না--!"

একটা অটল বিশ্বাসের সুরে বলতে থাকেন উত্তরকাশীবাসী বিমলানন্দ, "রামানন্দ ছাড়া আরও একজন মহাসাধু সিদ্ধপুরুষ ও অঞ্চলে থাকেন। তাঁর নাম, গঙ্গাদাস। গঙ্গোত্তরী মন্দির ছাড়িয়ে গোমুখের পথেই তিনি থাকেন। যদি ও পথে যান তা হলে সঙ্গ-লাভের চেষ্টা করবেন—জীবন ধন্য হয়ে যাবে। যাত্রী-সাধারণের জন্যে গোমুখের যে পথ তার উল্টো দিকেই তিনি থাকেন। দুরারোহ সে পথ, তিতিক্ষার চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে, তাঁর দেখা পাবেন না। আমাকে তিনি চেনেন, বলবেন আমার নাম, তা হলেই হবে—।"

একটু থেমে যান বিমলানন্দ, তারপর বলেন, "খুব বড় ঘরের ছেলে তিনি, অল্প বয়সেই সংসার ছেড়েছিলেন···। এদিকে বিষ্ণু-দত্ত আর ওদিকে রামানন্দ ও গঙ্গাদাস। গঙ্গোত্তরী মার্গে এই তিন জনই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত ফুটে আছেন···এঁদের তুলনা হয় না।"

বিমলানন্দের মুখে এ কথাগুলো শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠি, তবে কি সত্যিই পেলাম? তবে কি যোগাযোগের সবটুকু এসে গেল? বদরিকার মন্দির প্রাঙ্গণে যাঁকে দেখেছিলাম, সেই বালক-সাধু, যিনি আমাকে বলেছিলেন একটি মাত্র কথা···'গঙ্গোত্তরী জানেসে মিল যায়গা'—সেই তিনিই কি ঐ গঙ্গাদাস? একটা অপূর্ব্ব অনুভূতি মনের ভেতর দাগ কেটে যায়। গত বৎসরের তাঁর দেওয়া ঐ ইঙ্গিতটুকুর জন্যেই ত আমার এই তীর্থ পর্য্যটন, আমার এই মাথা খুঁড়ে মরা! সম্বলপুর মহারাজার একমাত্র সন্তান তিনি—ভগবান তাঁকে সব দিয়েও কিছু দেন নি, তাঁর ঘরের বন্ধন গেছে ঘুচে, মাত্র আট বৎসর বয়সেই সংসার ছেড়ে পরম পুরুষের তত্ত্বে বিলীন হয়ে আছেন। সেই বালকটিই কি ঐ গঙ্গাদাস? বদরিকায় তাঁকে যে অবস্থায় দেখেছি তা সিদ্ধির চরম অবস্থা। এও জানি, যোগের পরিপূর্ণ অবস্থায় শরীর পরিবর্ত্তনের অধিকার আসে—তাঁকে ত যোগের চরম অবস্থাতেই দেখে এসেছিলাম! কাজেই এই গঙ্গাদাস সেই বালকের আর এক রূপান্তর নয় ত! বিমলানন্দ এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে বলেন—'কি হ'ল আপনার?'

'কিছু না'···বলে উঠে পড়ি। ওঁদের প্রণাম জানিয়ে বলি—'আমার মহা উপকার করলেন। আশা করি, তাঁদের দেখা আমি পাব···।' ধরম সিং কখন এসে পড়েছে জানি না। সেও এ সব কথাবার্ত্তা শুনেছে, সেও বাদ গেল না।

এর পর বিপুল গতিবেগ এসে যায় পায়ে। একটা মহা আবিষ্কারের আশায় তীরের মত ছুটতে থাকি গঙ্গোত্তরীর দিকে। তিপ্পান্ন মাইল আমি তিন দিনে শেষ করি ঐ গঙ্গাদাসের জন্যে—. বদরিকার সেই মহাসাধু গঙ্গাদাস কিনা—সে আলোচনা এখন থাক। এখানে এইটুকু বলে রাখি, গঙ্গোত্তরী ছুটেছিলাম আমি উল্কার মত একটা চরম প্রাপ্তির নেশায়।

অসির সন্ধান পাওয়া গেল উত্তরকাশী থেকে আড়াই মাইলের মাথায়—এখান থেকে মনোরী সাত মাইল। অতি সুন্দর ও সহজ রাস্তা···যমুনোত্তরীর দিকে এ রকম পথের ঔদার্য্য মাথা খুঁড়লেও মিলবে না। দেওদার অথবা পাইন গাছ আর চোখে পড়ছে না। ধরম সিং জানায়, এদের নাকি সন্ধান পাওয়া যাবে হরশীলা ছাড়ানোর পর। পথে ক্লান্তি নেই ত বটেই—বরঞ্চ তৃপ্তিতে মন ভরে ওঠে। মা গঙ্গাকে সব সময়েই দেখতে দেখতে চলেছি। মনোরীতে এসে গেলাম একটার আগে। ধর্ম্মশালায় এসে সাময়িক বিশ্রাম, কিছু খেয়ে নেওয়া—তার পর আবার চলা। এই মনোরী থেকে আঠার মাইল দূরে ডোবিতাল হ্রদ—অসি যেখান থেকে নেমে এসেছেন। শুনেছিলাম হ্রদের আশে-পাশে দু'একজন সিদ্ধ যোগী তপস্যায় মগ্ন হয়ে আছেন। যাওয়ার ইচ্ছে ছিল ষোলআনা, কিন্তু যেতে পারি নি নানা কারণে। সাধারণ যাত্রীদের এই মনোরীতে রাত কাটানোর কথা—কেননা এ সব অঞ্চলে ন' মাইল পথ চলেই ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে বিশ্রাম নেয়। যমুনোত্তরীর পথে গাংনানী ছাড়ানোর পর উপায় নেই বলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চৌদ্দ-পনেরো মাইল একটানা পথ হেঁটে যেতে হয়েছে।

এদিকে মা জাহ্নবী তাঁর প্রবাহের ধারে ধারে মানুষকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ দিয়েছেন, তাই ন'মাইল পথ হেঁটেই মানুষ আর চলতে চায় না। বিমলানন্দর সঙ্গে যদি দেখা না হ'ত, তা হলে আমিও মনৌরীতে থেকে যেতাম। কিন্তু আমার থামার উপায় নেই—অবিশ্রান্ত আমাকে ছুটতে হবে গঙ্গাদাসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবার জন্যে। এখানে একটা দিনের ক্ষতি মানে একটা বৎসরের ক্ষতি।

তাই মনৌরীতে থামা হয় না আমার—এখানে নামমাত্র বিশ্রামই জোটে শুধু···।

মনৌরীর পর মাল্লা, ভাটোয়ারীর আগে অখ্যাত একটি চটি। স্থানের রঙের জৌলুস না থাকলেও এখানকার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। গঙ্গা এখান থেকে বিস্তৃত এক স্থান নিয়ে বেষ্টনীর আকারে পূর্ব্ব দিকে বয়ে গেছেন। মাল্লার যে অংশকে নিয়ে প্রবাহের গতিপথ—তার দক্ষিণ কোণ ঘেঁসে একটি পথ সীমন্তিনীর সিঁথিরেখার মত চলে গেছে—এ পথ হ'ল কেদারের পথ, অর্থাৎ এই পথই বিখ্যাত পাওয়ালীর চড়াই পেরিয়ে ত্রিযুগীনারায়ণে গিয়ে মিশেছে···গঙ্গোত্তরী ফেরতা কেদারবদরী যাত্রীরা এই পথ ধরেই চলে যায়—উত্তরকাশীর দিকে তারা আর আসে না। পথটি যেন রহস্যময় হাতছানি দিয়ে পাহাড়-পর্ব্বতে অদৃশ্য হয়ে গেছে···দূর থেকে এ পথকে দেখে আমার বদরিকেদারের জলজ্বলে ছবিটা আবার মনে পড়ে গেল।

ভাটোয়ারী এসে যাই বিকেলের আগেই। ধর্ম্মশালা একটি নয়, দুটি—আর দুটিতেই স্থানসঙ্কুলানের যথেষ্ট সুবিধা—একটিকে বেছে নিই। একটি নিভৃত বারান্দা আবিষ্কৃত হয়, যেখানে যাত্রী-দের হৈ চৈ নেই। দোতলার ওপর বারান্দা—সামনেই কুড়ি-বাইশ হাত দূরে গঙ্গা, চত্বরের ওপর একটি অশ্বত্থ গাছের মনোরম লতাপাতার সমারোহ—ধরম সিং এখানেই বিছানাটাকে ছড়িয়ে দেয়। অবহেলিত ধর্ম্মশালার এ বারান্দার নিভৃতিটুকু যেন আমার জন্যই তৈরি হয়েছিল···ঘরের সুযোগ সুবিধা এর কাছে নগণ্য হয়ে ওঠে। এখানে শুয়ে শুয়েই প্রবাহিণীকে সমস্ত রাত ধরে দেখা যাবে।

আজ ষোল মাইল পথ হেঁটেছি—কি করে যে হেঁটে এলাম তা আমি নিজেই জানি না। বিস্তীর্ণ এক ভূভাগ অতিক্রম করা গেল—মনে হয়েছে এক রাজ্য পেরিয়ে আর এক রাজ্যে ছুটে এলাম। যাত্রিক জীবনে অন্ততঃ এ অঞ্চলে এই ষোল মাইলের হিসাবই দীর্ঘতম—এত পথ যে হাঁটতে হয় জানতাম না। উত্তরকাশীর পথপ্রান্তে বিমলানন্দ কি যে কলকাঠি নেড়ে দিলেন বুঝি না, যার ফলে কেমন যেন রূপান্তরিত হয়ে গেলাম আমি, এই দীর্ঘ পথের হিসেব তাই হিসেব বলে মনে হয় না: মনে হয় এখানে না থেমে আরো এগিয়ে গেলে ভাল হ'ত।

চুপ করে পড়ে থাকি, আর একমাত্র সম্বল জপের মন্ত্রটিকে মনের ভেতর আঁকড়ে ধরি। ধরম সিংকে বলে দিয়েছি যত তাড়াতাড়ি পারে সে যেন রান্নাবান্নাগুলো সেরে নেয়, আজকে কোথাও আমার যাওয়ার নেই।···কাজের ভেতর শুধু বারান্দাটুকুকে আশ্রয় করে অনড় অচল হয়ে পড়ে থাকা আর গঙ্গার কলগান শোনা! আজকে মা গঙ্গাকে যত কাছে পেয়েছি, অন্য কোনদিন তা পাই নি।

কেমন যেন শীত শীত ভাব—সামনের অশ্বত্থগাছটার স্তূপীকৃত ডালপালা নড়ছে···ওদিকে ভাগীরথীর বালুচরের আহ্বান···চুপচাপ পড়ে থাকি!

চোখের সামনে আর একটি ধারাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, সেটি গঙ্গার সঙ্গে এসে মিশেছে। ধারাটি বৃহৎ ও বেগবতী, আর তারই পাশ দিয়ে সরু একফালি রাস্তা গঙ্গার অপর তীরে বিরাট বিরাট পাহাড়গুলোতে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ধরম সিং বলে দেয় ঐ একফালি রাস্তাটাই সগরুর রাস্তা, আর ঐ ধারাটি সগরু থেকে নেমে এসেছে। যে পথটিকে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে তার পরিচয় সামান্য, বিদঘুটে পাহাড়গুলোর অর্দ্ধেক অবয়বের ভেতরেই সে পরিচয় গেছে হারিয়ে—সগরুতে পৌঁছতে গেলে বনজঙ্গল ভেঙ্গে পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙোতে হয়। উপরে তুষারভূমি ও গোটা তীর্থের ঐতিহ্য জনমানবহীনতার অন্তহীন নৈঃশব্দ্যের ভেতর গড়ে উঠেছে। ধরম সিং অনেকক্ষণ ধরে সগরুর গল্প করে, কেননা ও তীর্থের সাক্ষী সে নিজেই। নানা কথাবার্ত্তার ভেতর দিয়ে ধরম সিং সেই ইচ্ছারই পুনরাবৃত্তি করে—উত্তরকাশী ফিরে তার গ্রামের সেই সাধুটিকে সঙ্গে করে আমি যেন একবার সগরু যাই—বাহক হিসেবে সেও বাদ যাবে না।

কিন্তু···এই কিন্তুটাই বড় হয়ে রয়ে গেছে। আমার যাওয়া হয় নি···। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা বাজতে না বাজতেই ভাটোয়ারীর ধর্ম্মশালা নিথর হয়ে আসে, যাত্রীকোলাহল থেমে যায়, নেমে আসে পাহাড়ী তমিস্রা, যা হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায়। ধর্ম্মশালায় কোনরকমে পৌঁছে ডাল ও রুটি পাকিয়ে নেওয়া, তারপর এক লোটা জল গলাধঃকরণ করা···খানিকক্ষণ বাসন মাজার ঘষ ঘষ আওয়াজ, তারপর একছুটে কম্বলের তলায় আশ্রয় নেওয়া। শুয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ সুখদুঃখের কথাবার্ত্তার মৌতাত, আগামীকালের অনাগত চড়াই-উৎরাইয়ের জল্পনা-কল্পনা, তারপরই কম্বলের ভেতর নাসিকা-গর্জ্জন···উনত্রিশটা দিন ত এই দেখতে দেখতেই কেটে গেল! মানুষের এ ভগ্নাংশকে এখানে চেনাও যায় না, বোঝাও যায় না—এ যেন অপাংক্তেয় এক গোষ্ঠীসমাজের ছেঁড়া পাতা দমকা হাওয়ায় উড়তে উড়তে চলেছে। যাদের দেখতে দেখতে বড় হয়েছি—এরা যেন তাদের সগোত্র নয়। যন্ত্রের অনিবার্য্য পাকের মত ন' দশ মাইলের একটা পাক—তারপর সে গ্রন্থির ভেতর একটু আলগা-ভাবের সমন্বয়—তারপরেই প্রবহমাণ ধারার পাকের ভেতর আবার জড়িয়ে পড়া—না আছে বৈচিত্র্য, না আছে জীবনের উত্তাপ! মানুষ এখানেও সবকিছু বাঁচিয়ে চলেছে, একটা কণাও তার মুষ্টি

থেকে খসে পড়ছে না। যেটুকু আধ্যাত্মিক সঞ্চয়, তার মেয়াদও বা কতটুকু? শুধু স্থানবিশেষের দৌলতে একটু বা শিহরণ, একটু অসীমকে বোঝার তখনই বা প্রয়াস। তারপর আবার সেই পথ, আর সেই ফেলে আসা সংসারের মায়া ও গ্লানির স্তূপে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া। এই দেখতে দেখতে চলেছি আজ উনত্রিশটা দিন ও রাত। রাত আটটাও বাজল, ভাটোয়ারীর ধর্মশালাও নিস্তব্ধ হয়ে এল। কেবল ছল ছল করে জাহ্নবীর জল, সামনেই অশ্বত্থবৃক্ষের সুনিবিড় স্তব্ধতা—ওপারের বালুচরের বুক চিরে আদিম পাহাড়গুলোর অতন্দ্র প্রহর গোনা···আমি শুধু জেগে থাকি।

সকাল হয়ে যায়—পথের প্রান্তে আবার নেমে আসি। এবার গাংনানী, একটানা ন' মাইলের মাথায় ও স্থানটির সন্ধান পাওয়া যাবে, তার আগে মাথা খুঁড়লেও জায়গা মিলবে না। এবার সুরু হ'ল বন্ধুর ও অসমান পথ। উত্তরকাশী থেকে ভাটোয়ারী পর্য্যন্ত যে ভাবে চলে এসেছি, এখান থেকে তার বিরতি, আর এ কতকটা চলল গঙ্গোত্তরীর মন্দির পর্য্যন্ত। আমরা যে আর একটি মহাতীর্থের সান্নিধ্যে এসে যাচ্ছি—পথের এ রূপ পরিবর্ত্তনই তার ইঙ্গিত।

পতিতপাবনী মা গঙ্গা আবার বাঁদিকে এলেন—ডানদিকের গতিপথের হ'ল পরিবর্ত্তন। তপস্বিনী মাকে ভাটোয়ারী পর্য্যন্ত যে ভাবে দেখেছি, তার মধ্যে ক্ষমাই ছিল বেশী, অর্থাৎ প্রবাহের না ছিল বেগ, না ছিল তার উচ্ছ্বাসের আকুলতা। দু'এক মাইল আসার পর দেখা গেল সেই ক্ষমার ভেতর কেমন যেন রুদ্ধ আক্রোশ ফুটে উঠছে, প্রবাহের বেগ যাচ্ছে বেড়ে। বড় বড় পাথরের স্তূপ গঙ্গার বুকের উপর দিয়ে গড়িয়ে যেতে দেখছি—মনে হচ্ছে মা যেন হঠাৎ চণ্ডিকা হয়ে উঠেছেন অকারণে। এই মূর্ত্তির চরম প্রকাশ ক্রমশঃ ক্রমশঃ দেখেছি যত মূল ধারার সন্ধানে পথ চলেছি, যাত্রার লক্ষ্য যত নিকটবর্ত্তী হয়ে এসেছে। গৈরিক রঙের ভেতর দিয়ে বৈরাগ্যের যে চিরন্তন আহ্বান তার ষোল আনা বজায় থাকলেও মা জাহ্নবীর বুকের ভেতর কে যেন ডমরু বাজিয়ে দিয়েছে, তাই এ প্রবাহের দুকূল ছাপানো ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি!

ধ্যানের ভেতর দিয়েই পথ চলা যেন: এ ধ্যানের মূলে জপের যে যোগসূত্র তা জোর করে আনা নয়, এ পথের ভেতর এমন দৈবভাব যে সবকিছুই নিঃশব্দে মনের ভেতর বাসা বেঁধে ফেলে। নিস্তব্ধ পথ—বিজন পাহাড়পর্ব্বত—মনে হচ্ছে এ অঞ্চলের এই পথের প্রান্তে যুগযুগান্তের আমিই একমাত্র সাক্ষী হয়ে চলেছি, বিশ্বে আর কেউ নেই—আমিই একা। সৃষ্টির মন্থনভূত চিরন্তন আমি এক তীর্থপথযাত্রী, আর কেউ কোনকালে আসে নি এ পথে।

পথের সম্পদ আর নির্জ্জনতার অর্থ খুঁজতে খুঁজতে ছ'মাইল পেরিয়ে যায়, এই পথটুকু মোহাবিষ্টের মত চলা, কেমন করে যে এই দীর্ঘ পথ নিঃশেষ হয়ে আসে বুঝি না। যমুনোত্তরী মার্গে এইরকম ভাবে চলেছিলাম, যমুনাচটির পর এ অঞ্চলে এই আচ্ছন্ন ভাবটি সুরু হ'ল ভাটোয়ারীর পর থেকে আর এই ভাবটি সার্থক রূপ নেয় গঙ্গোত্তরী মন্দিরের আবহাওয়ার পরিবেশে ও সেই সার্থকতার চরম অবস্থা নেমে আসে গোমুখের পথে। আমরা যে আর একটি সব চাওয়ার মণিকর্ণিকার কাছাকাছি এসে গেছি—এই আচ্ছন্ন ভাবটিই তার প্রমাণ।

গাংনানীর আগে দুটি ধারা পেরিয়ে যাই, কোনখান থেকে কি ভাবে নেমে এসেছে, আর কি ওদের নাম জানি না। শুধু বুঝি ওদের শক্তিরূপিণীর মধ্যে আত্মবিসর্জ্জনের ভাব, এ অঞ্চলে সব ধারাই ত গঙ্গাতে মিশেছে! এক মাইল পথ আরো পেরিয়ে যায়—চোখের সামনে ভেসে ওঠে গাংনানীর ঝোলা তারের পুল, দূর থেকে সে দৃশ্যটি নয়নাভিরাম। নীচে গঙ্গার উন্মাদিনী ভাব—তার ওপর এই পুল—এক পা এক পা করে সকলকে এগিয়ে যেতে হয়। শঙ্কা জাগে এই ভেবে যে, সামান্য একটু ভুলের জন্যে জীবনের একটা 'এদিক-ওদিক' না হয়। সাবধানতার সঙ্গে পুল পেরিয়ে, যাই—এসে যাই গাংনানীতে। জনপদের আগেই বিখ্যাত ঋষিকুণ্ড, গরম জলের নর্ত্তন চলেছে একটি গহ্বরকে কেন্দ্র করে। এখানে ঝোলাঝুলি নামিয়ে স্নান সেরে নি। হিমবাহ থেকে নেমে আসা গঙ্গার হিমশীতল প্রবাহের পাশেই এই তপ্তকুণ্ডের আবির্ভাব। মনে হ'ল পথক্লান্ত মুমূর্ষুপ্রায় যাত্রীদের সাময়িক তৃপ্তিদানের জন্যেই ভগবান এ বিস্ময়কর বস্তুটি এখানে সৃষ্টি করে রেখেছেন।

যমুনোত্তরীর পথেও গাংনানী, আবার এদিকেও সেই নামের আর একটি জনপদ। এও ন'মাইলের মাথায়, তাই বিশ্রাম আর রাত্রিযাপনের সমুদয় বন্দোবস্ত আছে এখানে। ধর্মশালা আছে, দোকানপাটও কম নয়, লোকের বাসও প্রচুর। একটি চায়ের দোকানের সামনে খানিক বিশ্রামের অবসর জোটে আমার আর ধরম সিঙের—তারপর আবার এগিয়ে যাই। শক্তি ও সামর্থ্যের যতটুকু সঞ্চয় তার সবকিছু ব্যয় করে চলতে হবে, কেননা যে বেগ রয়েছে মনের ভেতর তার সমাপ্তি হবে গঙ্গোত্তরীতে, এখানে থামা মানেই অমূল্য একটি দিনকে ক্ষয় করে ফেলা। রামানন্দ ও গঙ্গাদাস আমাকে টানছেন—আমার যে থামার উপায় নেই! চার মাইলের মাথায় লোহারীবাগ—মধ্য-হিমালয়ের তথাকথিত নগণ্য ও অনামী চটিবিশেষ, না আছে ঔজ্জ্বল্য, না আছে গাম্ভীর্য্য: দু-চার-খানা ঘরবাড়ী, দু'একটি দোকান আর কতকগুলো মান্ধাতার আমলের পাহাড়। তবে নামটি বেশ—লোহারীবাগ। চলার পথেই স্থানটি পেরিয়ে যায়।

এবার সুকী—টানা পাঁচ মাইল। পথ সুন্দর, মধ্যে মধ্যে দেওদার বন সুরু হয়েছে, তের মাইল পার হয়ে এলাম, ক্লান্তি থাকলেও পথের ঐন্দ্রজালিক মাদকতা সব মুছে নিচ্ছে, বুঝতেই পারছি না যে এতদূর হেঁটে এলাম। ধরম সিঙেরও ক্লান্তি নেই, সেও চলেছে সমানে: মুখে সেই সরল হাসি। সরু পথের দু'পাশে শুধু পাহাড় আর পাহাড়—চড়াইও নেই বা উৎরাইয়ের পরিচয় নেই। মা জাহ্নবী সমানে চলেছেন পাশে পাশে রাজরাজেশ্বরীর মত, দক্ষিণ-হস্তের উদার আশীর্ব্বাদ আমরা পেতে পেতে যাচ্ছি।

বেশ আসছিলাম, কিন্তু সুক্কীর কাছাকাছি এসে বোকার মত দাঁড়িয়ে গেলুম। চলে এসেছি সোজা পথে, মনে করেছিলাম এই ভাবেই চলব, কিন্তু হ'ল না···সামনেই একটি বৃহৎ পাহাড়, এটি টপকাতে হবে, না হলে সুক্কী পৌঁছানো যাবে না। পাহাড়ের তলাতেই একটি চায়ের দোকান, যার পাশ দিয়ে ঘুটি পথ ওপরে উঠে গেছে—একটি পাকদণ্ডী আর একটি পাহাড়ী চড়াইয়ের পথ। চায়ের দোকানদার বুঝিয়ে দেয় পাকদণ্ডীর পথে নেমে এলে সুবিধে হবে, যাওয়ার সময় তথাকথিত পাহাড়ী চড়াইয়ের পথটি ধরাই বুদ্ধিমানের কাজ। তথাস্তু। আধঘণ্টার ওপর দোকানটিতে বসে বসে চা খাই আর বিশ্রাম করি। তার পর সামনের ঐ পাহাড়টিতে হারিয়ে যাই! শোনা গেল তিন মাইলের এই চড়াই।

এ চড়াইটাও বড় কম নয়—অনেক সময়ে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকে সহজ ও সরল করে নেওয়ার জন্যে পাহাড়ী দেওদারের গায়ে পিঠ দিয়ে বসে পড়তে হয়, এবড়োখেবড়ো পথ। কর্কশ পাহাড়গুলোর বুকে দেওদার ছাড়াও বড় বড় গাছ দেখতে পাই, এগুলো বুনো আখরোটের গাছ। ঝর্ণার আভাসমাত্র নেই, সারা পথটুকুতেই নিদারুণ জলকষ্ট। ঘু' ঘণ্টার ওপর লাগে এই তিন মাইল পথ পার হতে। পাহাড়টার ওপরেই সুক্কী গ্রাম—ধর্মশালা আর বাড়ী ঘরদোর।

এখানেই আজ থাকার কথা, জানতামও তাই, কিন্তু হ'ল না। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে যখন পৌঁছলাম তখন দেখা গেল এক-মেবাদ্বিতীয়ম এই ধর্মশালাটি সমাগত যাত্রীদের স্থানসঙ্কুলানের পক্ষে নিতান্তই অপরিসর। ছোট ছোট মাত্র চারখানি ঘর—একফালি বারান্দা, লোক গিজগিজ করছে। চেষ্টাচরিত্র করলে থাকলেও থাকা যায়, তবে সে বাসনা পরিত্যাগ করলাম এই ভেবে যে আজকের বিশ্রামটুকু পুরোপুরি হওয়া চাই, অন্যথায় সতের মাইলের পথ হাঁটাটা বিরাট বোঝার মত চেপে শরীরের সামর্থ্যকে নিঃশেষিত করে ফেলবে। খবর সংগ্রহ করল ধরম সিং যে ঘু' মাইলের মাথায় ঝালা, ওখানে ভিড় নেই, আরামে থাকা যাবে। সেই ভাল—ত্বরিতপদে নেমে এলাম এখানে। গঙ্গা-বিধৌত ঝালা, অদ্ভুত নিভৃত নির্জ্জনতা, একটি নগণ্য জনপদ, আশ্রয় মিলল এখানে।

সকাল থেকে হাঁটা সুরু করে বিকেল নাগাদ ঝালায় প্রবেশ। গাংনানীতে রাত্রে থাকার কথা, থাকি নি—মনের বেগই বড় হয়ে গেছে। যা ভাবা যায় না, তাই হয়ে গেল। কোথা থেকে যে শক্তি এল, কে শক্তি যোগাল, তার চুলচেরা হিসেব এখানে বৃথা। বুঝলাম, বেগই বড় আর সে বেগের ভেতর যদি যোগাযোগের ইঙ্গিত থাকে। অনুভূতির ভেতর এই সত্যিটাই থেকে যাচ্ছে যে গঙ্গোত্তরীর রহস্যময় অঞ্চল থেকে কে যেন জাল ফেলে দিয়েছে, আমি তাতে অসহায়ের মত আটকা পড়েছি। কাছিতে পড়েছে টান—তাই এই বেগ, তাই এ ছোটা!

ঝালার ধর্মশালায় একজনের সঙ্গে আলাপ হয়, ইনি একজন ডাক্তার। মন্দির খোলার আগে এসেছেন আর থাকবেন যতদিন না তার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাত্রীদের পুণ্য অর্জ্জনে ভাঁটা পড়ে। সামনেই প্রাকৃতিক এক বিরাট বাধা, এই বাধা অতিক্রমের চেষ্টায় যাত্রীদের বিপদ আছে, ভয় আছে—তাই এখানে এই ডাক্তারটির অবস্থিতি। হাত-পা ভেঙে বা মাথা ফেটে যাতে একটা] বিভ্রাট না বাধে তার জন্যেই সরকার একে এখানে মোতায়েন রেখেছেন। বেশ মানুষটি, বয়সে তরুণ—আলাপ হয়।

বাধার মত বাধা। গঙ্গার বিস্তীর্ণ বালুশয্যা ধূ ধূ করছে, মূল ধারাকে দেখা যায় না, শুধু বালি আর বালি। ঝালা ধর্মশালার পেছনদিককার স্তূপীকৃত পাহাড়গুলো থেকে নেমে এসেছে একটি বৃহৎ ধারা, কি নাম কে জানে। নদী আখ্যা তাকে না দেওয়া গেলেও ধারাটি প্রচণ্ড বেগবতী আর তার বৈশিষ্ট্যও বড় কম নয়। চোখের সামনেই যে বিস্তীর্ণ বালুশয্যা তাতে ঐ ধারাটি মিশেছে বিরাট বাধার সৃষ্টি করে, তাকে অতিক্রম করে ওপারে গিয়ে ওঠাটা যাত্রীর কাছে মরণ-বাঁচনের প্রশ্ন। ধারাটি আবার স্থানবিশেষে একটি প্রবাহ নিয়ে গঙ্গায় মেশে নি—বহুধাবিভক্ত হয়েই তার মিশে যাওয়া। কি প্রচণ্ড বেগ এই প্রবাহসমূহের। গভীরতা বেশী নেই, হেঁটেই পার হতে হয়—পুল তৈরির কথা কল্পনাও করা যায় না এখানে।

ঝালায় রাত কাটল, সকাল হ'ল আর যাত্রাও সুরু হ'ল আবার। গোটা বিকেল আর সন্ধ্যার আগে পর্য্যন্ত ধর্মশালায় বসে বসে ভেবেছি কালকের এই পার হওয়ার ব্যাপারটি ভালোয় ভালোয় কেটে গেলে হয়। ডাক্তারটির কাছে শুনলাম আগের দিনে একটি বৃদ্ধা ভেসে গিয়েছেন খরস্রোতের আবর্ত্তে পড়ে, তাঁর দেহ কোথায় যে চলে গেছে কেউ জানে না। সকালের দিকে কাঠ পেতে যাতায়াতের বিপদকে কমানোর চেষ্টা করলেও বিকেলে তা কোথায় যে হারিয়ে যায় তা বোঝার উপায় নেই। গঙ্গার জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে এই প্রবাহের বেগের হ্রাসবৃদ্ধির সম্পর্ক আছে, তাই মানুষের চেষ্টা বৃথা।

আর বৃথা বলেই ভগবানকে স্মরণ করে আমি আর ধরম সিং এই বালুচরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। বেরুতে বেলা হয়ে গেছে আমাদের, সূর্য্যদেব আকাশের ওপর অনেকটা উঠে পড়েছেন যেন। জুতো খুলে নি, এটি এখান থেকেই পরিত্যাজ্য।

ঠিক এ ধরণের পরীক্ষা গঙ্গোত্তরী পথে অন্য কোথাও নেই—চড়াই-উৎরাই বা পাহাড়ের ভ্রূকুটি, এ সবের অর্থ বুঝতে পারা যায়—মানুষ একরকম তাদের মেনে নিতেও পেরেছে কিন্তু এবারে যে বাধাটির সম্মুখীন হওয়া গেল তার দম্ভ এত বেশী যে, ভয় হয় ওপারে আস্ত শরীরটা নিয়ে ওঠা যাবে কিনা। এপার থেকেই দেখা গেল যে সব যাত্রী ইতিমধ্যেই এই কয়েকটি ধারা পেরিয়ে ওপারে গিয়ে উঠেছে, তারা আনন্দের বা বিপদ কেটে যাওয়ার উচ্ছ্বাসকে কাটাতে পারে নি—দেখলাম দিব্যি বালির ওপর হাঁড়ি-কুঁড়ি বসিয়ে রান্নাবান্না চাপিয়ে দিয়েছে তারা।

কি অসম্ভব কনকনে ঠাণ্ডা জল—পা দিতেই মনে হ'ল পা

হরশিলার পথে

দুটোকে কে যেন কেটে নিল। হাঁটুর ওপর জলের উর্দ্ধগতি, কিন্তু তা হলে কি হয়, দুর্ব্বার গতিতে সে বয়ে চলেছে···পা দুটোকে ঠিক রাখা মুশকিল। জলের প্রচণ্ড গতির মধ্যে বড় বড় পাথর, ন্যূনতম এই বাধাতেই জলের সে কি উচ্ছাস! কোনরকমে পেরিয়ে যাই শরীরের সমস্ত শক্তিকে সংহত করে—ভগবানের দয়ায় বেঁচে যাই, বিপদ ঘটে না। এক একটি ধারা আর খানিকটা বালির 'বেড়', তারপর আর একটি ধারা ও বালির প্রান্তর। শেষ ধারাটি উত্তীর্ণ হওয়ার সময় আচমকা একটা হৈ হৈ ওঠে, দাঁড়িয়ে যাই। দেখি হুড়হুড় গড়গড় করে একটা বিরাট পাথরের স্তূপ জলের স্রোতের ভেতর আছাড় খেতে খেতে বেরিয়ে গেল। কোথা থেকে পাহাড় ধ্বসেছে কে জানে—চোখের সামনে দিয়ে সেটা নীচুর দিকে চলে গেল। ওপারে গিয়ে যখন উঠি—তখন মনে হ'ল পা দুটোর আর

অস্তিত্ব নেই, সম্পূর্ণ অবশ হয়ে গেছে। ডবল গরম মোজা আর জুতোর ভেতর পা ঢুকিয়েও অনেকক্ষণ ওদের সাড় ফেরে না যেন।

বিপদের শেষে সেই পরম সান্ত্বনা···অর্থাৎ চায়ের দোকান একটি—পরপর দু' কাপ চা খেয়ে তবে ধাতস্থ হই। ধরম সিং এসে যায় মাথায় মোট নিয়ে—এই বোঝা নিয়ে সে কি করে এল সে-ই জানে।

বিস্তীর্ণ এই বালুচরের এক প্রহেলিকা, এরই পর একটি রাস্তা পাহাড়ের বুকের ওপর উঠে গেছে—এটি পেরিয়ে গেলেই হরশিল্পা।

স্থান হিসেবে হরশিল্পার মাহাত্ম্য আছে—গ্রামে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই এ মাহাত্ম্যটুকু মনের ভেতর ধরা পড়ে। এদিকে-ওদিকে ঘরবাড়ী, লোকজন আর এখানকার লক্ষ্মীনারায়ণের প্রাচীন মন্দির। নারায়ণই হরি—তাই হরশিল্পা। গ্রামের ভেতর স্থানীয় লোকজন ছাড়াও তিব্বতীদের ছোটবড় দল চোখে পড়ে। এরা ব্যবসায়ী—কম্বল আর পশুর লোম নিয়ে এসেছে নেলাং পাশ হয়ে এদিকে। যাত্রীদের কাছে কিছু কিছু মালপত্র বিক্রী করে তার থেকে যা পায় তাই এদের যথেষ্ট। চলতে চলতে দেখি আর এদের অপরিচ্ছন্নতা দেখে শিউরে উঠি। ঐ ত পথ আর পথের এদিকে-ওদিকে যা কিছু ঘরবাড়ী; কিন্তু সবকিছুই আকীর্ণ হয়ে গেছে এদের নিক্ষিপ্ত আবর্জনায়। এত সুন্দর গ্রাম অথচ মালিন্যে ভরা। যাযাবরের পর্য্যায়ভুক্ত এরা—আজ এখানে কাল ওখানে, তাই স্থানীয় অধিবাসীদের একমাত্র সান্ত্বনা যে এরা একদিন চলে যাবে, এদের গায়ের বোটকা গন্ধ স্থায়ী নয়। তবে যাত্রীদের যাতায়াত যতদিন চলতে থাকে, ততদিন নাকি এরা এখান থেকে নড়তে চায় না।

দু'মাইল—তারপর ধরালী। অপূর্ব্ব স্থান—বিস্তীর্ণ সেই গঙ্গার বালুচরের রহস্যময় হাতছানি—তার ওপারেই কমলীবাবার ধর্ম্মশালা। তার সামনেই গঙ্গার প্রবাহ—অপর পারে মুখবা গ্রাম··· গঙ্গোত্তরী মন্দিরের পাণ্ডাদের গ্রাম এটি। মন্দিরের সবকিছু যখন তুষারে ঢেকে যায় তখন এই মুখবা গ্রামে মন্দিরের যাবতীয় জিনিষপত্রের ঠাঁই হয়। ধর্ম্মশালাটি বড় ভাল লাগে—এ রকমটি, ঠিক এই রহস্যময় বালুচরের ভেতর অন্য কোথাও পাই নি। এখানেই মধ্যাহ্নের আহার সমাপন—একটু উপরে দুটি ছোট ছোট শিব-মন্দির, দর্শন করতে ভুলি না।

গঙ্গার যে বালিয়াড়ী রাস্তা থেকে সুরু—শেষ হয়েছে ধরালীতে। মূল ধারা ছাড়া আরও অগণিত ধারা এসে মিশেছে গঙ্গায়···তিনিই আদি, তাই কারুর সম্পূর্ণ প্রবাহিণীর রূপ এখানে নেই···ছোট বড় সকলকেই তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। ধরালীর পর থেকে গঙ্গা কেন্দ্রীভূত হয়ে এসেছেন—বালুচরের এই উদার আহ্বান আর নেই। এরপর থেকে জাহ্নবীর যে রূপ তাকেই যায় প্রকৃত রূপ বলা চলে। গঙ্গোত্তরীর আর দেরী নেই, গোমুখও অদূরবর্ত্তী! ধরালী থেকে গঙ্গোত্তরী আর সেখান থেকে গোমুখ—এই কয়েক মাইলের ব্যবধানের মধ্যে তপস্বিনী মা বয়ে এসেছেন সম্পূর্ণতার সজ্জা নিয়ে। মা এই ধরালীর পর মহীয়সীর রূপ নিয়ে উপর থেকে নেমে এসেছেন।

আজকেই গঙ্গোত্তরী পৌঁছব—আজকেই আর একটি মহাতীর্থের আশ্রয়ে জীবন সার্থক করা। যমুনোত্তরী শেষ হয়ে গেছে—গঙ্গোত্তরীও সমাপ্তির পথে। ধরালীর পর জঙ্গলা তারপর ভৈরবঘাটির বিখ্যাত চড়াই—তার পর দু' মাইলের পথ, তার পরেই ভগীরথের গঙ্গোত্তরী—পুরাকালের আর একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের উদ্‌ঘাটন। স্বপ্নের ভেতর ছিল যমুনোত্তরী গঙ্গোত্তরী, একটিকে দেখে জীবনের সাধ ও আকাঙ্ক্ষার অঞ্জলি গেছে ভরে—আর একটিও এল···আর দেরী নেই। কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি কানে···মায়ের আরতি দেখার আর দেরী নেই···।

ধরালীও ছাড়াল আর দেওদারও সুরু হ'ল···ঘন ঘাসে ছাওয়া, পথের উপর পাতার ছায়া পড়েছে···মধ্যাহ্নের আলোতেও কেমন যেন আলো-আঁধারির সংমিশ্রণ। এই দেওদারের নিরবচ্ছিন্ন সমারোহ গঙ্গোত্তরী পথের এক ইতিহাস···এ পথ দিয়ে যাঁরা হেঁটে যাবেন তাঁদের উপলব্ধিতে এই সত্যটাই ধরা পড়বে যে এই দেওদারশ্রেণীরও আধ্যাত্মিক সঞ্চয়ের দান বড় কম নয়···মনে হয় মূক এরা নয় কোনকালেই, পুণ্যকামী যাত্রীদের এরা পাতার আস্তরণ দিয়ে নিঃশব্দ আশীর্ব্বাদের ছায়া দিয়ে চলেছে। গাছেরও যে ভাষা আছে, তার বিশেষণ আছে, ব্যঞ্জনা আছে তা বোঝা যায় এই ধরালীর পর। যমুনোত্তরী পথে পাইনের সমারোহ—এখানে দেওদার, আর এ চলল গোমুখের আগে ভুজবাসা পর্য্যন্ত। তিন মাইলের মাথায় জঙ্গলায় এসে গেলাম ছায়াচ্ছন্ন পথ দিয়ে, নেশায় বিভোর হয়ে। এ পথটুকু ভোলাবার নয়, এর স্মৃতি অবিস্মরণীয় ও অমর। পাখী ডাকছে দেওদারের মাথায়—নির্জ্জনতার মধ্যে ওরাই যা বাস্তবের রূপ, এ ছাড়া পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে গেছে। পায়ের তলায় নরম পাতার আস্তরণ—সোজা পথটুকু—কতকটা আচ্ছন্ন অবস্থায় এসে গেলাম জঙ্গলায়···গঙ্গোত্তরী পথের এক অনামী চটি এটি। সামনেই গঙ্গার অনন্ত প্রবাহ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে অসংখ্য পাথরের গায়ে উচ্ছ্বাস জাগিয়ে ধরাতলে ছুটে চলেছেন। প্রবাহের সামনেই ছোট্ট একটি দোকান আর এই দোকান মানেই চটি। এখানে দেওদারের ছায়ায় বসে চা খাওয়ার যে তৃপ্তি তা ভুলব না কোনদিন।

ভৈরবঘাটি এখানেও—যমুনোত্তরীর আগে ভৈরবঘাটির চড়াই এখনও মনে আছে। সে চড়াইটা ভয়ঙ্কর—এ চড়াইটার কথা ধরালীর পর হরদম শুনে আসছি। প্রকৃতপক্ষে জঙ্গলায় ভাগিরথী অতিক্রমণের পর ভৈরবঘাটির চড়াই সুরু হয়ে গেল। মাত্র দু' মাইল চড়াইয়ের সামান্য ইতরবিশেষ—অর্থাৎ, এই দু'মাইলই মানুষকে সান্ত্বনার আভাস দেয়—এর পর যে চড়াই তাতে সান্ত্বনার লেশমাত্র নেই।

চলার পথে জাঠ গঙ্গা এসে মিশেছেন জাহ্নবীতে। নেলাং পাশের দূরদূরান্তে জাঠ গঙ্গার জন্ম তিব্বতের হিমবাহ থেকে, তার সঙ্গম এই ভাগীরথীতে—এখানে দুটি ধারার সংঘাতের উন্মত্ততার যে ভয়ঙ্কর রূপ তা ভুলবার নয়। লড়াই বেধেছে যেন। এই সংঘর্ষে যে প্রচণ্ড ধ্বনির উৎপত্তি—পাহাড়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার প্রতিধ্বনির এক নাটকীয় পরিস্থিতি বুঝা যায়। এই সঙ্গমের উপর একটি ঝোলার পুল সেটি পেরুলেই ভৈরবঘাটির দণ্ডবৎ চড়াই-এর সুরু।

পুলটি পেরিয়ে যেতে যেতে ঊর্দ্ধাকাশে চোখে পড়ল একটা পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে দুটি বৃহদাকার দড়ির পুলের অগ্রাংশ, জাঠ

চলার পথে জাঠ গঙ্গা এসে মিশেছেন জাহ্নবীতে

গঙ্গার অপর পাড়ে আর একটি পাহাড়ের চূড়ায় ঝোলা অবস্থায় শূন্যে দোদুল্যমান···শোনা গেল বহু বৎসর আগে ঐ পুলের উপর দিয়েই যাত্রীসাধারণের যাতায়াতের পথ ছিল। জঙ্গলার পাশ দিয়ে সরু একটি পাকদণ্ডী পথ পাহাড়ের উপর উঠে যেতে দেখেছি ; ঐ পথই ছিল আগেকার পথ···এখন সে পথও নেই, সে পুলও নেই, কেবল-মাত্র ইতিহাসের অমোঘ স্বাক্ষরের মত ও দুটি দড়া শূন্যে ঝুলে আছে। আজকের পথের বহু ঊর্দ্ধে ও পুলটির অস্তিত্ব—সঙ্গমের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কি রকম যেন মনে হয় উপর দিকে তাকাতে। ঐ খাড়াই পাহাড়, তার উপর প্রাচীন যাত্রাপথের এক ছেঁড়া পাতা যেন হাওয়ায় দুলছে।

ক্রমশঃ

বল্লালসেনের নবাবিষ্কৃত লিপি

ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

বাংলার সেনরাজ বংশ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কর্ণাট দেশ হইতে আসিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার রাঢ় অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। এই বংশের বিজয়সেন (আনুমানিক ১০৯৫-১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দ) এবং তাঁহার পুত্র বল্লালসেন (আ. ১১৫৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) ও পৌত্র লক্ষ্মণসেন (আ. ১১৭৯ ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ) পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। বিজয়সেন প্রথম জীবনে বাংলা-বিহারের পালবংশীয় সম্রাটের সামন্তরূপে রাঢ় দেশের কিয়দংশ শাসন করিতেন বলিয়া বোধ হয়। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি পাল-সম্রাটকে পরাজিত করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ক্রমে তিনি বর্ম্ম-বংশীয় জনৈক নরপতির হস্ত হইতে পূর্ব্ববাংলা অধিকারপূর্ব্বক বিক্রমপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। জীবনের অন্তিমভাগে বিজয়সেন পালবংশীয় সম্রাট মদনপালের (আ. ১১৪৪-৬১ খ্রীষ্টাব্দ) অধিকার বিলুপ্ত করিয়া উত্তর-বাংলায় আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হন। এই ঘটনা মদনপালের রাজত্বের অষ্টম বর্ষ অর্থাৎ আনুমানিক ১১৫১ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্ত্তী বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। অতঃপর মদনপাল ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ দক্ষিণ-বিহারে রাজত্ব করিতে থাকেন। বিজয়সেনের সমসাময়িক নান্যদেব (আ. ১০৯৭-১১৪৭ খ্রীষ্টাব্দ) নামক অপর একজন কর্ণাট-বীর ১০৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মিথিলা অর্থাৎ উত্তর-বিহারে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। বিজয়ের দেওপাড়া লিপি হইতে জানা যায় যে, এই নান্যদেবের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। এই লিপিতে আরও দেখা যায়, তাঁহার নৌবাহিনী গঙ্গা বাহিয়া পশ্চিমদিকের রাজ্যসমূহ আক্রমণ করিতে গিয়াছিল। ইহা বিজয়সেনের সহিত মদনপাল কিংবা নান্যদেবের সংঘর্ষের দ্যোতক হইতে পারে। বিজয়ের পুত্র বল্লালসেনের জয়কীর্ত্তির কোন উল্লেখ তাম্রশাসনাদিতে দেখা যায় না। কিন্তু বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণসেন তাঁহার কতিপয় তাম্রশাসনে দাবি করিয়াছেন যে, তিনি বাল্যাবস্থায় (সম্ভবতঃ পিতামহের রাজত্বকালে) গৌড়েশ্বর অর্থাৎ পালবংশীয় সম্রাটকে পরাজিত করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন এবং তদীয় উত্তরাধিকারিগণের লেখমালা হইতে জানা যায় যে, তিনি কাশীর গাহড়বাল-বংশীয় নরপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এবং বারাণসী ও প্রয়াগে জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলন। ইহা হইতে বিহার অঞ্চলে লক্ষ্মণসেনের অন্ততঃ সাময়িক প্রভুত্ব অনুমান করা যাইতে পারে।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তদ্ব্যতীত বিহারের কোন অংশে বাংলার সেনবংশীয় রাজগণের আধিপত্য-বিস্তার সম্পর্কিত আর কিছু তথ্য সেনবংশের লেখাবলী হইতে জানা যায় না। কিন্তু মিথিলার সহিত সেনরাজগণের সম্পর্ক বিষয়ক কতকগুলি কিংবদন্তী আছে। "লঘুভারত" নামক গ্রন্থানুসারে, বল্লাল মিথিলা বিজয় করিতে অগ্রসর হইয়া পথিমধ্যে পুত্র লক্ষ্মণসেনের জন্মসংবাদ পাইয়াছিলেন। এই ঘটনাটি বিজয়সেনের রাজত্বকালীন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। "বল্লালচরিত" নামক গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, বল্লালসেন পিতার সহিত মিথিলায় অভিযান পরিচালিত করেন এবং সেখানে যুদ্ধে জয়ী হন। আবার এই পুস্তকে বল্লালের রাজ্যের অন্তর্গত যে পাঁচটি প্রদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একটির নাম মিথিলা। অবশ্য এই সময়ে নান্যদেব এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ মিথিলায় রাজত্ব করিতেছিলেন; সুতরাং মিথিলাবিজয়ে বিজয়সেন ও বল্লালসেনের সাফল্যের পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন। মিথিলায় প্রচলিত লক্ষ্মণসেন সংবতের সহিত সেনবংশীয় নরপতি লক্ষ্মণসেনের স্মৃতি বিজড়িত। প্রকৃতপক্ষে সেনরাজ লক্ষ্মণসেন এই সংবতের প্রতিষ্ঠাতা না হইতে পারেন; কিন্তু মিথিলার লোকে যে ইহাকে তাঁহার রাজত্বের সহিত সম্পর্কিত মনে করিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ ঐ সংবৎ সম্পর্কিত লক্ষ্মণসেনকে অনেকস্থলে সম্রাট এবং কখনও বা গৌড়েশ্বর বলা হইয়াছে। পূর্ব্বভারতে লক্ষ্মণসেন নামক অপর কোন সম্রাট ছিলেন বলিয়া জানা যায় না।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে, তাম্রশাসনাদি এবং কিংবদন্তীতে বল্লালসেনের সহিত দক্ষিণ-বিহারের কোন সম্পর্কের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। কিন্তু চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই ইঙ্গিতমূলক একটি কিংবদন্তীর উল্লেখ করিয়াছিলেন, যদিও ঐতিহাসিকেরা কেহই তাঁহার সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন নাই। "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস", রাজন্যকাণ্ডে, (৩২৪-২৫ পৃষ্ঠা) বসু মহাশয় উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা হইতে "বল্লালপূজিতো ভূত্বা বটোঽভূন্মগধেশ্বরঃ" এই বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন, "উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে, উত্তর রাঢ়াগত সুদর্শনমিত্রের ৬ষ্ঠ পুরুষ অধস্তন বটেশ্বরমিত্র বল্লালকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া মগধের শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ভাগলপুরের তিন ক্রোশ দূরে কাহালগাঁয়ে

ব...শ্বরনাথ নামক প্রসিদ্ধ শিবমন্দির অদ্যাপি বটেশ্বরমিত্রের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। উপরোক্ত স্থানের পরিচয় হইতে মনে হয়,...পশ্চিম মগধের পূর্ব্বাংশ পর্য্যন্ত বল্লালসেনের অধিকারভুক্ত ছিল।" অবশ্য বসু মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমপ্রমাদশূন্য নহে। প্রথমতঃ, বটেশ্বর-শিবের মন্দির কহলগাঁয়ে নহে. উহা হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী বটেশ্বরস্থান বা পাথরঘাটা নামক গ্রামে; আবার ভাগলপুর হইতে কহলগাঁয়ের দূরত্ব তিন ক্রোশ নহে, দশ ক্রোশ। দ্বিতীয়তঃ, পাথরঘাটার বটেশ্বরনাথ শিব বল্লালসেনের সমসাময়িক কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কারণ পাথরঘাটাতে প্রাপ্ত অষ্টম-নবম শতাব্দীর একখানি শিলালিপিতে এই বটেশ্বর শিবের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং বটেশ্বর বল্লালসেনের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই পাথরঘাটাতে পূজা পাইতেছিলেন। তবে পূর্ব্ব-বিহারে যে, বল্লালের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার একটি অকাট্য প্রমাণ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গত শীতকালে নূতন শিলালেখাদির অনুসন্ধানে আমি বিহারের নানাস্থানে পর্য্যটন করিতেছিলাম। সেই সূত্রে আমাকে ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কয়েক দিন ভাগলপুর শহরের কুড়ি মাইল পূর্ব্বে কহলগাঁও রেলষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ডাকবাংলোতে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। এই অঞ্চলে অনুসন্ধানকার্য্য চালাইতে কহলগাঁওবাসী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় এবং নিকটবর্ত্তী কসড়ীগ্রামের অধিবাসী শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মিশ্র ও তৎপুত্র শ্রীমান জানকীনাথ মিশ্র আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ১১ই ফেব্রুয়ারী আমি কহলগাঁও হইতে আঠার মাইল দূরবর্ত্তী বেলনীগড় নামক স্থানে কতিপয় শিলালিপি পরীক্ষা করিতে যাই। বেলনীগড়ের পথে কহলগাঁও হইতে প্রায় দশ মাইল দূরে সনোখার (বা সনোখারবাজার) নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানে শুনিলাম যে, কিছুকাল পূর্ব্বে গ্রামের একটি পুষ্করিণীর জীর্ণোদ্ধারকালে উহার গর্ভ হইতে কতকগুলি প্রাচীন মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একটি পিত্তল বা অষ্টধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তি নাকি একটা তাম্রপাত্র দ্বারা ঢাকা অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। ঐ পাত্রটির গায়ে প্রাচীন লিপি খোদিত আছে বলিয়া শুনিলাম। বেলনীগড় হইতে ফিরিবার পথে আমি সনোখারবাসী শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ টেকরীওয়ালার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। আহারাদির পর টেকরীওয়ালা মহাশয় আমাকে স্থানীয় মন্দিরে লইয়া গিয়া উল্লিখিত মূর্ত্তি এবং পাত্রটি দেখাইলেন। মূর্ত্তি দেখিয়া বুঝিলাম, উহা ক্ষুদ্রাকারের একটি সূর্য্য-প্রতিমূর্ত্তি। তাম্রপাত্রের গায়ে দ্বাদশ শতাব্দীর গৌড়ীয় অক্ষরে উৎকীর্ণ এক পঙ্‌ক্তি লিপি দেখিলাম। দুঃখের বিষয়, উত্তমরূপে পরিষ্কার না করিয়া উহা পাঠ করা সম্ভব ছিল না। শ্রীমান জানকীনাথ মিশ্রের চেষ্টায় টেকরীওয়ালা মহাশয়ের নিকট হইতে পাত্রটি বাহির করিয়া সঙ্গে লওয়া সম্ভব হইল। কহলগাঁয়ে ফিরিয়াই আমাকে ভাগলপুর চলিয়া যাইতে হয়। সেখান হইতে আমি সুলতানগঞ্জ, তারাপুর, মুঙ্গের, বেগুসরাই এবং লক্ষ্মীসরাই ঘুরিয়া ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বিহার শরীফ পৌঁছি। এতদিন কর্ম্মব্যস্ততায় তাম্রপাত্রটি পরিষ্কার করিয়া লিপির পাঠোদ্ধারের সময় পাই নাই। বিহার শরীফে থাকিতে একদিন সেই সুযোগ পাওয়া গেল। লিপিটি পাঠ করিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম; কারণ উহাতে দেখা গেল যে, সম্রাট বল্লালসেনের রাজত্বের নবম বর্ষে, অর্থাৎ— আনুমানিক ১১৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ঐ পাত্রটি সনোখার গ্রামের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত সূর্য্যদেবতার উদ্দেশ্যে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহাতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্ব্ব-বিহারের ভাগলপুর অঞ্চলে সেন-অধিকার বিস্তারের অকাট্য সাক্ষ্য পাওয়া গেল।

দ্বাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ-বিহারের পালরাজগণ আধুনিক উত্তরপ্রদেশের গাহড়বালবংশীয় নরপতিদিগের দ্বারা বার বার আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং ইহার ফলে পাটনা-গয়া অঞ্চলে গাহড়বাল-অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১১২৪ খ্রীষ্টাব্দে গাহড়বাল-রাজ গোবিন্দচন্দ্র (আ. ১১১৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) পাটনা জেলায় ভূমিদান করিয়াছিলেন। ১১৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মুদ্গগিরি অর্থাৎ মুঙ্গের নগরে অবস্থানের প্রমাণ পাওয়া যায়। এদিকে, পালবংশীয় মদনপাল তদীয় রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে (অর্থাৎ আনুমানিক ১১৪৬ খ্রীষ্টাব্দে) পাটনা জেলায় এবং চতুর্দ্দশ ও অষ্টাদশ বৎসরে (আনুমানিক ১১৫৭ ও ১১৬১ খ্রীষ্টাব্দে) মুঙ্গের জেলায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মদনপাল গোবিন্দচন্দ্রকে বিহার হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মদনপালের উত্তরাধিকারী গোবিন্দপাল (আ. ১১৬১-৬৫ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁহার রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে অর্থাৎ আনুমানিক ১১৬৪ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা-গয়া অঞ্চলে রাজত্ব করিতেছিলেন; কিন্তু ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই গাহড়বালেরা ঐ অঞ্চল অধিকার করেন এবং সম্ভবতঃ গোবিন্দপাল নিহত হন। অতঃপর গোবিন্দপালের উত্তরাধিকারী পলপাল (আ. ১১৬৫-১২০০ খ্রীষ্টাব্দ) মুঙ্গের অঞ্চলে রাজত্ব করিতে থাকেন। দ্বাদশ শতাব্দীর অবসানকালে পলপালের রাজ্য তুর্কী মুসলমানদিগের দ্বারা বিজিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বেই গাহড়বাল-রাজগণের শাসনাধীন পাটনা-গয়া অঞ্চল মুসলমান-কবলিত হইয়াছিল।

আলোচ্য সমোখার লিপি হইতে দেখা যায়, ১১৬৬ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে পূর্ব্ব-বিহারের ভাগলপুর অঞ্চল সেনবংশীয় বল্লালসেনের অধিকার স্বীকৃত হইত। ঠিক এই সময়েই পাটনা-গয়া অঞ্চল হইতে পালবংশীয় গোবিন্দপাল গাহড়বালরাজগণ কর্ত্তৃক উৎখাত হন। ইহাতে মনে হয় যে, এই সময় গাহড়বাল এবং সেনবংশীয়েরা একযোগে দক্ষিণ বিহারের পালরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। পালপাল গাহড়বালদিগের হস্ত হইতে পাটনা-গয়া অঞ্চল পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তবে রাজ্যের পূর্ব্বাংশ হইতে সেনদিগকে বিতাড়িত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইতেও পারে। কারণ তবকাৎ-ই-নাসীরী প্রণেতা মিনহাজুদ্দীন তুর্কী মুসলমান দ্বারা লক্ষ্মণসেনের রাজ্যের পশ্চিমাংশ অধিকারের যে কাহিনী লিখিয়াছেন, তাহা হইতে বিহারের কোন অংশ লক্ষ্মণসেনের রাজ্যভুক্ত ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

পল্লী-দার্শনিক

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কভু র'ন নব জলধর পানে চেয়ে
নয়ন যুগল অশ্রুতে যায় ছেয়ে।
বন-বিহগেরা কাছে আসে তাঁর উড়ে,
জানায় স্বর্গ নাই যেন বেশী দূরে।
মোরা ভাবি, তাঁরে করি যবে দর্শন,
দেহের ক্ষয়েতে বলিষ্ঠ হয় মন!
শুনি সদা তাঁর কাছে
ভুবন এবং ভুবনেশ্বর
এক হয়ে হেথা আছে।

২

প্রসাদী পদ্ম শুষ্ক হয়েছে হায়,
এখন কেবল পুণ্য গন্ধ তায়।
জ্ঞানে বড় নন, বৃহৎ মহৎ প্রাণ
রয়েছেন লয়ে ভাব আর ভগবান।
উক্তিতে তাঁর যুক্তি হয়তো কম,
ভক্তিতে সব হয়ে ওঠে অনুপম।
হৃদি তাঁর নিষ্পাপ—
যা বলেন তাতে আমরা যে দেখি
আছে সত্যের ছাপ।

বলেন 'রয়েছে ওকি লাবণ্যে ঘেরি'
বিস্ময় জাগে ও বিশ্বরূপ হেরি।
শোভিছে ভুবন কোটি জ্যোতিষ্কসহ
ভাব করিয়াছে ও রূপ পরিগ্রহ।
এই যে প্রবাহ পবনে গগনে জলে,
উহার তালেই জীবনের ধারা চলে।
এই যে ক্ষুদ্র বুক—
গোটা বিশ্বের স্পন্দন ধরে,
তাই করে ধুক্‌ধুক্।

৪

পাপ পঙ্কেও হরির করুণা জোটে,
ভক্তি এবং পঙ্কজ সেথা ফোটে।
কয়লাতে জাগে হীরকের ঝিকিমিকি,
রত্নাকর যে ধীরে হয় বাল্মীকি।
পরশমাণিক মানুষের এই মন,
যাহা ছোঁয় তাই করে দেয় কাঞ্চন।
তুচ্ছ ধূলির কণা—
তাহারও রয়েছে গুরু গৌরব
বিরাট সম্ভাবনা।

৫

সব জীব এক শ্রীভগবানের চোখে,
মানুষ মানে না অতি-দর্পের ঝোঁকে।
শুধু মানুষের দারুণ অহঙ্কার,
রুদ্ধ করেছে মুক্ত স্বর্গদ্বার।
তাহাকে অমৃত করিতে দেয় নি পান
কেবল তাহার দুর্জ্জয় অভিমান।
জড়ের স্থূলতা নিয়া—
হয় যে তাহার অধঃপতন
একটু ঊর্দ্ধে গিয়া।

৬

মানব ক্ষমতা লভিলে অপরিমেয়,
দানব হওয়াই ভাবে প্রেয় আর শ্রেয়।
যন্ত্রেতে ধরা পড়ে ঝরা-গান সব,
ঝরা-প্রাণ ধরা রবে না অসম্ভব।
স্বর্ণলঙ্কা পোড়াইল হনুমান,
ধরাকে দহিবে অণু আর উদ্‌যান।
এ ধরণী সব সয়
বীর, বীভৎস, রৌদ্র রসের
কত হয় অভিনয়।

৭

যত শক্তিরই অধিকারী হোক নর,
রক্ষা করেন সৃষ্টিকে ঈশ্বর।
নরের গর্ব্ব বটে অভ্রংলিহ,
সে শুধু যন্ত্র—নহে তো স্বয়ংক্রিয়।
এসেছে গিয়াছে কতই বিপর্য্যয়,
ক্ষয়েও পৃথিবী হয়ে আছে অক্ষয়।
তারা ধিক্কৃত মৃত,
যাহারা করিছে এ জীব-জগৎ
নিত্য উদ্বেজিত।

৮

মানব-বুকের উদগ্র ব্যাকুলতা
মেঘকে জ্বালায় হয়ে বিদ্যুল্লতা।
সর্পদশনে নাহি মোর সংশয়,
হিংসা তরল গরল হইয়া রয়।
স্নেহ, প্রেম, মণি, মুক্তা ও মৃগনাভি
সমগোত্রে ও জাতিত্বে করে দাবি।
অজ্ঞেয় কৌশলে—
জড়ে ও চেতনে ভাবে আর রূপে
অদল বদল চলে।

৯

মানুষ হইলে বিশুদ্ধ অন্তর,
সহজেই হতে পারে সে জাতিস্মর।
দেখিতে সে পায় দৃশ্য বস্তুবৎ
অনাদি অতীত, সুদূর ভবিষ্যৎ।
চাহে না সে তাহা—তাহার আকর্ষণ
করিছে মাটির সহস্র বন্ধন।
অমৃতপুত্র হায়—
সুখে আছে লয়ে মৃত্যু বেসাতি,
গরলের ব্যবসায়।

১০

দেবত্বে যদি মানুষের সাধ জাগে,
নিষ্কাম তারে হতে হবে সব আগে।
অনলে সঁপিয়া সকল শ্যামিকা তার,
বিশুদ্ধ হয় স্বর্ণ পুনর্ব্বার।
হতে বিগ্রহ অনিন্দ্যসুন্দর—
ছেনীর আঘাতে বহু ত্যজে প্রস্তর।
পড়ে কি নয়নপথে
দারু কতখানি ত্যাগ করে তার
দারুব্রহ্ম হতে?

তড়িৎ-লতা

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

১১

আমাদের নৌকো এসে ঢুকল একটা চওড়া খালের মুখে। মনে হচ্ছিল যেন একটা ছোট নদী এসে নিজেকে ঢেলে দিয়েছে আর এক বড় নদীতে। রাতের আঁধার ফিকে হয়ে এসেছে, কিন্তু আলোও তখন পর্যন্ত এসে জুড়ে বসে নি তার স্থান।

দুই-একখানা নৌকো আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল বড় নদীর বুকে। এর মধ্যেই মাঝিদের দিনের কর্মচাঞ্চল্য সুরু হয়ে গেছে। সারা রাতের উত্তেজনায় এতক্ষণ আমরা কেউই লক্ষ্য করতে পারি নি একটা রাত এমনি করে চলে গেছে। ভোরের ঝিরঝিরে হাওয়া যে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল তা উপভোগ করছিলাম সকলেই, কিসের একটা মধুর অলস আবেশে আমরা সবাই কিছুক্ষণের জন্য আচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম।

সজাগ হয়ে উঠলাম, যখন লক্ষ্য করলাম—একখানা নৌকো পাশ কাটিয়ে চলছিল, সামলাতে না পেরে আমাদের নৌকোর উপর এসে পড়ল, আমি ধাক্কা বাঁচাবার জন্য আমাদের নৌকোর ধারে গিয়ে অপর নৌকোটাকে ঠেলে দিলাম। আরও লক্ষ্য করলাম আমাদের সমিতির আর এক যুবককে নৌকোর মধ্যে। আমার আর কথা বলবার সুযোগ হ'ল না—বিনুদাই এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে শম্ভু, তুমি!

শম্ভু বললে, হাঁ, আমিই সেটা নিয়ে যাচ্ছি নবগ্রামে।

বিনুদা বললে, কিন্তু যাবে কি করে, ওই যে ওটা দেখছ না!

শম্ভু বললে, তাই ত? জল-পুলিস যদি তল্লাস করে! কি করা যায় এখন!

বিনুদা বললে, তুমি ওটা আমাদের কাছে দাও। তোমার সঙ্গে কিছু না পেলেই হ'ল।

এবার যেন সবাইকে শোনাবার জন্যই বিনুদা একটু জোরে জোরে বললেন, "তোমাদের সঙ্গে কিছু খাবার আছে? থাকে ত দিয়ে যাও না কিছু, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

শম্ভু বললে, নীলাদির সেদিকে ভুল হবার জো নেই। পেট-ভরে খাইয়ে আবার সঙ্গেও কিছু দিয়েছেন। তিনি দুঃখ করলেন, নীতীশদাকে কিছুই খাওয়াতে পারলেন না। বিনুদা, কপালে থাকলে খণ্ডায় কে? সেই খাবারই নীতীশদারও জুটল না গিয়েও!

নীলার নাম শুনে আমি উৎকর্ণ হলাম। আবার নীলা! মনে হ'ল, অদৃষ্ট যেন আমার সঙ্গে পরিহাস করছে!

দুটো টিনের কৌটো শম্ভু বিনুদার হাতে দিল। শম্ভুকে তিনি বললেন, ওদের খবর দিও আমি এখন বেলগাঁ যাচ্ছি। ঠিক সময়ে দেখা হবে।

শম্ভু বললে, যদি তারা জিজ্ঞাসা করেন, বেলগাঁয়ে কোন ঠিকানায়।

বিনুদা শম্পা দেবীর দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চাইতে না চাইতে শম্পা দেবী বললেন, বলে দিন চৌধুরীবাড়ী, ও গ্রামের সবাই চেনে।

ঐ কৌটো দুটোকে নাড়ুর কৌটো বলে ভুল করলে দোষ দেওয়া যাবে না। কৌটো দুটো তুলে নিয়ে বিনুদা শম্পা দেবীর হাতে দিয়ে দুটো কৌটাকে সাবধানে দু'জায়গায় রাখতে বললেন। শম্পা দেবীর চোখে ফুটে উঠল হাসি। প্রশ্ন স্বাভাবিক—"যদি এক জায়গায় রাখি!"

"তবে এত কাণ্ড করে সারা রাত না বাঁচলেও চলত। কেবল যে নৌকোখানাই যাবে তা নয়, সবাই যাবে! "সমিতিরও ক্ষতি হবে খুবই।"

শম্পা দেবী উদাসকণ্ঠে কতকটা যেন আপন মনেই বললেন কাউকে উদ্দেশ না করে—"আমার তাতে ক্ষতি হ'ত না কিছুই। বরং নতুন জীবনের সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা হয়ত থাকত।

বিনুদা শুধু বললেন, "কি হ'ত কে জানে! তা যাক্", আমাকে সম্বোধন করে বললে, "দেশলাইটা সরিয়ে রাখ। তুই দেখিস মাঝিরা তামাক খেয়ে জ্বলন্ত কল্কেটা যাতে নিরাপদ স্থানে রাখে। বরং প্রত্যেকবার নিজেই সকলের শেষে তামাক খাবি, তা হলেই কল্কেটা ঠিক জায়গায় রাখতে পারবি। ওদের কিছু না বলে নিজেই বুদ্ধি খাটিয়ে সব করবি।"

বিনুদা আস্তে আস্তে ছইয়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন আর আমাকেও তার মধ্যে ঢুকতে বললেন। শম্পা দেবীকে বললেন তার দিদিমাকে নিয়ে ছইয়ের বাইরে গিয়ে নৌকোর পাটাতনের উপর একটু বসতে। অভ্যাসবশে আমি আদেশ মানলেও শম্পা দেবীর চোখে জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছে। বিনুদার চোখ এড়ায় নি। তিনি পুলিসের ভাসমান থানা-ষ্টিপ বোট দেখিয়ে বললেন, "দেখছ না, সামনে ওটা। নৌকোয় মেয়েরা আছে দেখলেই চলবে। সন্দেহের উদ্রেক করবে না।" সদাজাগ্রত চেতনা নিয়ে দেশসেবায় আত্ম-নিয়োগ করেছেন বলেই বোধ হয়, অনায়াসে বিনুদা নেতৃত্বের আসনে।

ষ্টিপ-বোটটা আমরা ভালয় ভালয় পেরিয়ে গেলাম—অর্থাৎ, জেরা কিংবা তল্লাসীর বালাই আর আমাদের পোহাতে হয় নি। দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করে শম্ভুদের নৌকোও ছেড়ে দিল জল-পুলিস। খালের কালো জল চলেছে আমাদের উল্টো দিকে গড়িয়ে গড়িয়ে। ধারে ধারে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে বসেছে ছিপ নিয়ে রোজগার মাছ সংগ্রহের আশায়—কেউবা ছোট ডিঙ্গির উপর বসেছে। জেলেরা

ডাল হ্রদ, শ্রীনগর, কাশ্মীর

শ্রীনগরের শালামার বাগের একটি দৃশ্য

বোম্বাইয়ে ইউ. এস ইনফরমেশন সার্ভিসের একটি অনুষ্ঠানে উচ্চশিক্ষার্থ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রযাত্রী ভারতীয় ছাত্রছাত্রীগণ
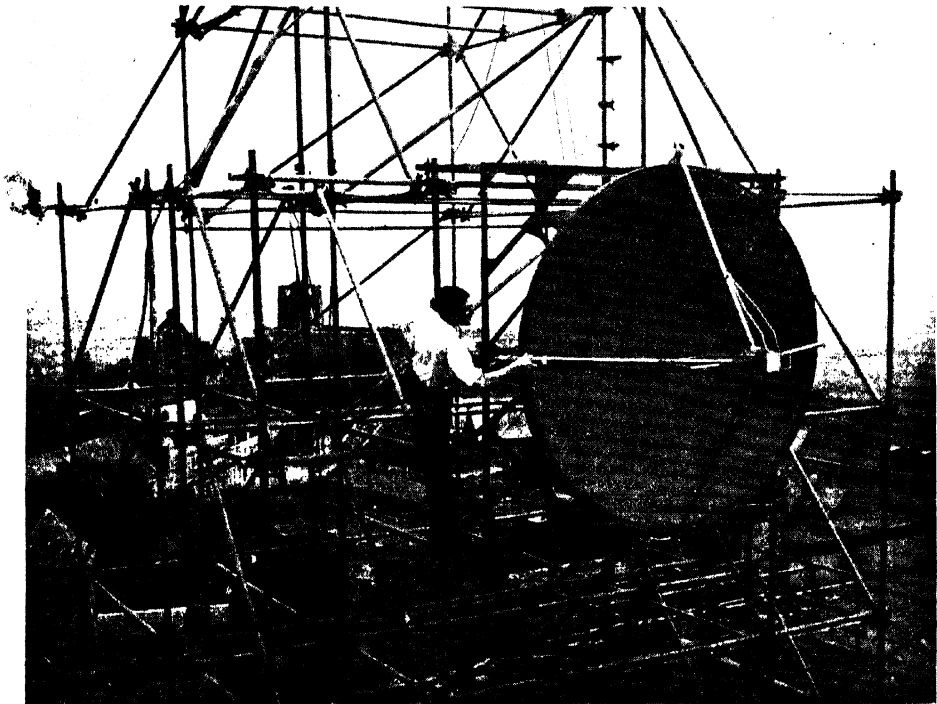
উত্তর ফ্রান্সের কাসেলে ফ্রান্স-ব্রিটেন 'টেলিভিশন রিলে লিঙ্ক এরিয়েলে' কর্ম্মরত একজন বি-বি-সি ইঞ্জিনীয়ার

পেতেছে 'ভেল'—খালের চওড়ায় অনেকটা জুড়ে কয়েকটা বাঁশ পোঁতা আর তাদের সঙ্গে বাঁধা আছে দুটো মোটা আর লম্বা বাঁশ আর তারই সঙ্গে জোড়া আছে জাল, সমস্ত মিলে হয়েছে ত্রিভুজাকৃতি। ঐ ত্রিভুজের এক কোণে বাঁশ দুটোর সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে জেলে জালের সম্মুখভাগ ডুবিয়ে দিচ্ছে জলে—আবার কিছু পরেই তাকে তুলে নিচ্ছে।

আমরা তখন 'ভেল'টা অতিক্রম করছি, 'ভেলে' তখন কিছু মাছ উঠেছে আন্দাজ করে দিদিমা বললেন, "দেখ শমি, ওটা কি একটা 'ভেল' নয়? কিছু মাছ পড়েছে যেন। কিছু মাছ নিয়ে নে। বাড়ী গিয়ে আবার বাজার পাবি কোথায়? ডাকাত ছোঁড়ারা ত খাবার জন্য মাথা ছিঁড়ে খাবে'খন।' দেখছিস না ক্ষিদেয় এদের পেট জ্বলে যাচ্ছে, আবার কার নৌকোর থেকে কি খাবার চেয়ে নিলে! ডাকাত-ছোঁড়াদের পেটে যেন আগুন জ্বলছে! কিছু মাছ কিনে সঙ্গে নে, নইলে আর রক্ষে রাখবে না!'

শম্পা বলল, "আঃ দিদিমা, কতবার তোমায় বলব বল ত? ফের ডাকাত ডাকাত বলে চেঁচামেচি করবে ত ওদের এখানেই নাবিয়ে রেখে দিয়ে যাব।

বিনুদাও রসিকতায় যোগ দিয়ে বললেন, "মাঝি, ও মাঝি, এখানে খালের ধারে নৌকো ভিড়াও ত। আমরা নেবে যাচ্ছি। দিদিমা আমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছেন।"

মাঝিরা রসিকতার ধার ধারে না। নৌকো তীরে লাগাবার জন্য তৈরি হতে শম্পা দেবী মাঝিদের নৌকো চালিয়ে যেতে ইঙ্গিত করলেন, দিদিমাকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে বললেন, "নাও এবার সামলাও, ওরা এখানেই নেবে যাবে, বলছে তুমি ওদের তাড়িয়ে দিচ্ছ।

"আঃ মলো যা, মুখপোড়াদের কথা শোন একবার। আমি আবার কখন যেতে বললুম ওদের। তুই-ই ত সেকথা বললি! যত রাগ এই বুড়ীর ওপর।"

একটু থেমেই আবার বলতে লাগলেন, 'তা, আর হবে না ও মুখের দিকে তাকালে আমারই রাগ পড়ে যায় আর ঐ ছোঁড়াদের কথা বলব কি!'

নৌকোর মধ্যে হাসির রোল উঠল। হাসি থামলে দিদিমা আবার বলতে লাগল, 'যারা জীবন বাঁচাল, মান রাখল—তাদের একবেলা না খাইয়ে ছেড়ে দিলে অধম্ম হবে যে!'

'তা, যা বলেছেন মা-ঠান। এনারা এসে গুড়ুম গুড়ুম করে গুলি না ছুড়লে আমাদের কারুর জান বাঁচত না।'

কেবল বারে বারে গুলি-গোলা আর ডাকাতির কথা ঘুরে-ফিরে এসে নৌকোর মধ্যে একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়া ছড়িয়ে দিচ্ছে। মাঝিদের এ ব্যাপারে হুঁসিয়ার করার বিপদ অনেক, অথচ এ প্রসঙ্গ বন্ধ না করলেও নয়, কি যে করব মনে মনে তাই ভাবছিলাম। বিনুদার মনেও একই প্রশ্ন আন্দোলিত হচ্ছে, বুঝতে পারলাম ওঁর কথায়।

'দিদিমা কিন্তু ভারি একচোখো! আপনি কেবল নাতিদেরই ভাল দেখলেন, আর ঐ মাঝিরা যে সারা রাত নৌকো বেয়ে আমাদের নিয়ে এল সেটা আর বুঝি কিছু নয়! ওরা রাতভর কষ্ট না করলে কি আমরা আসতে পারতাম।'

'শোন একবার কথা, মাঝি, মুটে, মজুর, যারাই আসুক বাড়ীতে আমাদের কাজে, তাদের একবেলা পেট ভরে না খাইয়ে কোন দিন বিদেয় করেছি বলে ত মনে পড়ে না! এঁরা এসেছে বিদেশ থেকে, এঁদের না খাইয়ে দিলে বদনাম হবে যে গো। শমি, ওদের বুঝিয়ে বল ত—আমরা সহুরে নয় যে, যাকে কাজ করতে বলব তার কাজ ফুরিয়ে গেলে পয়সা গুণে দিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হ'ল বলে মনে করব। আজকাল ত অনেক এমন হয়েছে জল চাইলে কেবল জলই দেবে, দুখানা বাতাসা তার সঙ্গে দেওয়া ওরা দরকার মনে করে না।'

মাঝি বলল, বুড়ো মা-ঠাকরুণ ঠিক বলেছেন, গ্রাম-দেশের মা-ঠাকরুণদের সে বিবেচনা আছে, না খাইয়ে যেতে দেন না।

নৌকোর ভিতরে একখানা গামছা পড়েছিল। হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে বিনুদা কোমরে জড়াতে জড়াতে বললেন, 'মাঝি ভাইরা, এখনও ত খুব ফর্সা হয় নি। তোমরা একটু বিশ্রাম কর, বসে বসে তামাক খাও, আমি হালে বসছি।' আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'ও দাঁড় বাইবে'খন।'

বিনুদা হালের মাঝির হাত থেকে বৈঠা নিয়ে বসে গেলেন। আমি দাঁড় টানতে লাগলাম।

মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার ছেলেমেয়ে ক'টি?"

"আজ্ঞে ভগবানের দয়ায় তিনটি মেয়ে দুটি ছেলে।"

"বাড়ীতে আর কে আছে—"

"আজ্ঞে দুই জরু।"

আমি বললাম, "তুমি দুটি বিয়ে করেছ! গরীব-মানুষ!"

মাঝিও আশ্চর্য্য হয়ে হুঁকোর টান বন্ধ রেখে বলতে লাগল, "আজ্ঞে তা নইলে চলে কি করে? কত কাজ তারা করে। বাড়ীঘরের কাজ ত আর অল্প নয়। বাড়ীতে হাঁস, মুরগী, গরু আছে—দুই-এক ফালি জমিও বাপ-দাদা রেখে গেছেন। কিছু কিছু ধানও উঠে। চাকর রেখে তদারক করা ত আর আমাদের পোষায় না। মেয়ে-ছেলেরাই ধান-পান তোলে, ঝাড়ে, ধান ভানে, ঢেঁকিতে পাড় দেয়, ঘরবাড়ী রক্ষে করে। কত কাজ করে। সারা দিনই মেহনত করে। ওরা আজ্ঞে, পটের বিবি সেজে ঘরে বসে থাকতে পারে না।"

"ধানজমি আছে, হাঁস মুরগীও পাল, তবে আর নৌকো চালাও কেন?"

"নৌকো কি আর সাধে বাই, ওতে ঐ সামান্য জমিতে পেট ভরে না কত্তা। ওতে কত্তা বছরের খোরাকই জোটে না—তা কাপড়-চোপড় কিনি কি দিয়ে।

"নৌকো বেয়ে কি রকম রোজগার হয়!"

"বেশী কি আর হয়—বেশীর ভাগ ত মালিকই নেয়।"

"কেন, এ নৌকো তোমার নয় !"

"আজ্ঞে, কি যে বলেন ! নৌকো কেনবার জন্ম এক সঙ্গে এত পয়সা পাব কোথায় ! দু'বেলা দু'মুঠো ভাত আর নেংটি এই জোটাতেই কত মেহনত করতে হয় । তা নৌকো একেবারে যে ছিল না তা নয়—সেটা ওবার তুফানে পড়ে নদীতে ডুবে গেল ।"

"অসুখ-বিসুখ হলে কর কি ।"

"কিছু না ! ও অমনিতেই সারে । ডাক্তার ডাকা, ঔষধ কেনা—এসব কথা ভাবতেই পারি না । খুব এখন-তখন হলে ওঝা-বৈদ্যি ডেকে ঝাড়ফুঁক করাই, বা একটু জলপড়া দেই—ওতেই সারে । নইলে বরাত মন্দ থাকলে মরে যায় । সবই বরাত কত্তা—ওর জোর থাকলে এমনিতেই সারে—নইলে কে আর বাঁচাতে পারে ।"

বিনুদা এই ঠিক সময় মনে করে বললেন, "মাঝি ভাই, একটা কথা বলব, কাল রাতের সেই ডাকাতের হাঙ্গামার কথা, আমাদের আসার কথা, গুলি ছোঁড়ার কথা—কোন কথাই কারুর কাছে বলো না । এতে শুধু পুলিশ-হাঙ্গামা বেড়ে যাবে, ডাকাতির পর আবার পুলিশ-হাঙ্গামা ! পুলিশ নিরীহদের টানা-হেঁচড়া সুরু করবে । ডাকাত যা ধরতে পারবে তা ত বুঝতেই পারছ ।"

মাঝি জিভ কেটে বললে, "আজ্ঞে তা কি পারি । আপনাদের আমরা চিনতে পেরেছি, নইলে পরের জন্য বুকভরা এত দরদ কার আছে, নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে পরের প্রাণ রক্ষার সাহসই বা কার আছে । আপনারা স্বদেশীবাবুরাই ত আমাদের প্রাণে ভরসা জাগিয়েছেন । কারও কাছে কিছু বলব না—বুঝলি রে ভাইটি"—বলে নিজের ছোট ভাইকে সাবধান করলে ।

একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে মাঝি বললে, "তবে কত্তা মনে একটা দুঃখ থাকবে—এমন একটা ধম্মের কাহিনী—নিজের পরাণ দিয়ে মানুষ পরের জানটা বাঁচায়—এমন একটা পুণ্যের কাহিনী দশ জনেরে ডেকে বলতে পারলাম না ।"

বিনুদা বললেন, "এখনও সে সময় আসে নি, বলার সময় এক দিন আসবে । এখন থাক সে কথা । গল্প করতে গিয়েও কারু কাছে কিছু বলে ফেল না কিন্তু । আর আমাদের স্বদেশীবাবু বলে ধরে নিলে কি করে তাই ভাবি ।"

মাঝি বললে, "বাবু, আমরা লেখাপড়া না শিখলেও বেকুফ নই । মানুষ চিনতে পারি । শত্রু-মিত্র চিনি ।

বিনুদা আর মাঝির কথা থামল, নৌকো ধীরে ধীরে চলতে লাগল । সেই সুযোগে শম্পা দেবী দিদিমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, কাল রাতের ডাকাতির কথা—এদের কথা যেন কারুর কাছে গল্পচ্ছলেও বলো না দিদিমা ! তবে কিন্তু পুলিশের হাঙ্গামার আর সীমা থাকবে না । তা ছাড়া তোমাকে আমাকে থানা-পুলিশ করতে হবে, মায় আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে, জেরা হবে । সে আমি সইতে পারব না ।"

"তোর আর বক্তিমে দিতে হবে না । তিন দিনের ছুঁড়ী, তার কাছে শিখতে হবে এখন পুলিশের ব্যাপার । ওদের কথা মনে হলে গায়ে ঘেন্না লাগে । ওবারে আমাদের বাড়ীতে চুরি হ'ল । তারপর চোরও ধরা পড়ল—কিন্তু হলে কি হয় তোর দারুর আর হেনস্তার সীমা রইল না ।"

এতক্ষণ আমরা চলেছিলাম জনহীন ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ; খাল ক্রমশঃ সরু হয়ে আসছে, আর লোকালয়ও খালের দু'ধারে দেখা যাচ্ছে ।

লোকালয়ের চিহ্ন নজরে পড়তেই বিনুদা মাঝিদের হাতে বৈঠা দিয়ে ভদ্রবেশ ধরলেন—আমাকেও ধরালেন ।

ভোর হয়েছে গাঁয়ের বধূর কাজের অন্ত নেই—ঘর নিকানো, বাসন মাজা, কলসী করে খালের ঘাটে জল আনতে যাওয়া । কলসীর কানায় দু'হাত দিয়ে জল ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মুখ ডুবিয়ে দিচ্ছে জলে—ঢক্ ঢক্ করে জল ঢুকছে কলসীতে । ভিন্‌দেশী নৌকো যাচ্ছে, তাদের সামনে বেহায়াপনা দেখানো কি ভাল ! গায়ের কাপড়টা ঠিক করে ঘোমটা টেনে দিচ্ছে কেউ কেউ—কিন্তু তাই বলে কি কেমন ধরণের লোক যাচ্ছে এই নৌকো করে তা আর ওরা দেখবে না ! নিশ্চয় দেখবে, বাঁহাতে ঘোমটা টেনে ধরেছে আগন্তুকের চোখ এড়িয়ে ।

শাঁখের আওয়াজ ও উলুধ্বনি কানে এল । খালের বাঁক ঘুরতেই দেখলাম একটা ঘাটে বেশ ভিড় জমেছে । ঘাটে বড় নৌকো বাঁধা । বাসন-কোসন, বিছানাপত্র বাক্স-পেঁটরা উঠছে নৌকোয় । অদূরে পাল্কী এসে থেমেছে—বরকনে বেরিয়ে এসেছে, গাঁটছড়া এখনও বাঁধা—বধূ চলেছে মাটির দিকে চেয়ে বরের পিছু পিছু ।

বর উঠল নৌকোয়—পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে নবপরিণীতাকে হাত বাড়িয়ে দিল সাহায্য করতে ।

নৌকোর বাঁধন খুলে যায় । ডুগ ডুগ করে ঢোল বেজে ওঠে—সানাই বিদায়ের করুণ সুর বাজায়, মেয়েরা উলুধ্বনিতে জলের ঘাট করে তোলে মুখরিত ।

আস্তে আস্তে বরকনের নৌকো বাঁক ঘুরে চোখের অন্তরাল হয়ে গেল । পাড়ের লোক তখনও দাঁড়িয়ে আছে খালের ঐ বাঁকটার দিকে তাকিয়ে ।

মাঝিরা বৈঠার ঘায়ে আমাদের নৌকো কাঁপিয়ে তুলল । বিনুদা হেসে বললেন—দেখ নীতীশ, এ যাত্রা ভাবিস নে কেবল বরকনের জীবনের পরম মুহূর্ত্ত ।

শম্পা দেবী যেন বিনুদার কথা শুনে চমকে উঠলেন । তার পক্ষে এটা যেন একটা নূতন আবিষ্কার ! তিনি গোপন না করে মন্তব্য করলেন—'এদিকেও তোমাদের চোখ আছে দেখছি । লোকে বলে তোমরা নাকি দেবতা । আমিও ভাবতুম হয়ত বা তাই, কিংবা অন্য কোন জগতের মানুষ তোমরা । হিতের আকাঙ্ক্ষা করো কিন্তু আত্মীয় হবার চেষ্টা নেই ! কিন্তু আজ যে তোমাদের মুখে নতুন কথা শুনছি—বিয়ে, সন্তান, পরিবার । এদের কথা ভাববার তোমাদের অবসর কোথায় !'

"ভুল করলে শম্পা—সমাজের জীব হিসেবেই আমাদের জন্ম, পরিবারের আওতার মধ্যেই বেড়ে উঠেছি এত বড়টি হয়ে। ভুই-ফোঁড় কিংবা উড়ে এসে জুড়ে বসি নি তোমাদের মধ্যে।"

শম্পা দেবী পরিহাসের হাসি হেসে বললেন—"কিন্তু তোমরা ত সমাজকে অস্বীকার করে চলছ।"

"একেবারে মিথ্যে কথা!...তোমার বুদ্ধি আছে, বিচার করবার ক্ষমতাও পেয়েছ, সমাজে আছে তোমার প্রতিষ্ঠা—পালন করতে হবে কর্ত্তব্য স্বামী সন্তান আর সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রতি। তোমাকে এর চেয়ে বেশী বলার প্রয়োজন মনে করি নে।"

শম্পা দেবীর বুক হতে যেন দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল। ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি টেনে বললেন—"আমি! আমার কথা! তোমাদের এই সমাজ, মানুষ সবার বা'র আমি। আমার সঙ্গে কারুর তুলনা হয় না!"

বিনুদা একটু যেন আশ্চর্য্য হলেন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তাই ত! ভুলেই গিয়েছিলাম, তোমার ছেলে কোথায়? তাকে দেখছি না ত?'

'যাদের ছেলে তাদের কাছেই আছে।'

'তার মানে! বুঝলাম না ত কিছুই?'

'আর বুঝে কাজ নেই। দেশের জন্য জীবন দেওয়ার পণ করলেই যে সব জিনিষ বোঝবার ক্ষমতা জন্মায় তা নয়। যা কিছু বলি না কেন, এখনি শুনতে হবে দেশ আর সমাজের সপক্ষে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা। অন্তর দিয়ে তোমরা কিছুই বুঝতে চাও না।'

বিনুদা কি বলতে যাচ্ছিলেন, তাকে থামিয়ে শম্পা দেবী ঝাঁজের সহিত পুনরায় বললেন—"কি বোঝ! কি জান! কতকগুলি বইয়ের কথা মুখস্থ ছাড়া! আর তাই বিলিয়ে দাও কালে-অকালে, মনে কর তোমাদের কর্ত্তব্য শেষ হ'ল। রাখতে চাও কি মানুষের হাসি কান্নার খবর। বলতে পার আজ এই বধূর চোখে কেন জল—অনাস্বাদিত-আনন্দের না সত্যিকারের পাষাণচাপা বেদনার।'

বিনুদা নৌকোর পাটাতন খুটতে খুটতে বললেন—'এ তোমার রাগের কথা। না জেনে তোমার মনে যদি আঘাত দিয়ে থাকি তবে ক্ষমা কর।'

শম্পা দেবী এ কথায়ও নরম হলেন না, পূর্ব্বের মত তীক্ষ্ণস্বরেই বললেন—"তুমি আমায় কি আঘাত দেবে, কি দুঃখ দেবে।"

আরও কি বলতে চাইছিলেন শম্পা দেবী। কিন্তু আর বলতে পারলেন না। চোখ-মুখ লাল, গলার স্বর কাঁপছে। তাড়াতাড়ি ছইয়ের ভেতর ঢুকে এটা সেটা নিয়ে টানাটানি করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ বাদে শম্পা দেবী ছইয়ের বাইরে এসে চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দিয়ে সহজ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বিনুদার কাছে এসে তার হাত ধরে বললেন—'তুমি আমায় ক্ষমা কর। মাঝে মাঝে আমার মাথার মধ্যে যেন কেমন করে ওঠে। আমি আর কিছুতেই ঠিক থাকতে পারি নে।'

বিনুদা শম্পা দেবীর হাত ছাড়িয়ে তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন—'ছিঃ, রাগ করব কেন। তোমার ওপর কি আমি রাগ করতে পারি। এ কথা কি তুমি আজও বুঝতে পার নি।'

শম্পা দেবীর ঠোঁটে তৃপ্তির হাসি। 'আমার উপর কেন, তুমি দুনিয়ার কারুর উপরই রাগ করতে জান না—সে আমি ভাল করেই জানি। তুমি শুধু একা আমার অধিকারে নও যে একথা ভেবে আমার বুকে আনন্দের ঢেউ খেলে যাবে।'

আবার সব চুপচাপ। নৌকো আবার ঘুরল আর একটা বাঁক। শম্পা দেবী যেন হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠলেন। 'আর দেরি নেই, তোমরা সবাই তৈরি হয়ে নাও। ঐ যে দূরে আমাদের ঘাট দেখা যাচ্ছে।'

১২

নৌকোতে মালপত্র বিশেষ কিছুই ছিল না, কাজেই গোছাতে সময় বিশেষ লাগে নি। মালগুলি গুছিয়ে শম্পা দেবী ছইয়ের বাইরে এসে দাঁড়ালেন ঘাট লক্ষ্য করে।

যেখানে ঘাট সেখানটায় খাল বেশ খানিকটা চওড়া। শম্পা দেবীর মুখে শোনলাম ওটাকে নাকি এক সময় কাটানো হয়েছিল। আজ আর অবশ্য তার কোন পরিচয় নেই—শুধু সেখানটা মনে হবে অকারণে কলেবর বাড়িয়ে নিয়েছে। বুঝা যায় ঘাট বাঁধানো ছিল, কিন্তু এখন তা ব্যবহারের প্রায় অযোগ্য।

উপরের দিকে তাকালেই চোখে পড়ে ছোট মন্দির। চুণ-বালি খসে পড়েছে—দরজার একটা পাট নেই, বাঁদিকের পাটটাও ঝুঁকে আছে সামনের দিকে—যে-কোন মুহূর্ত্তে খসে পড়ে যেতে পারে। দরজার ঠিক উপরে শ্বেত পাথরের ফলকে কি লেখা আছে—দূর থেকে পড়া যায় না।

মন্দিরের পেছনে প্রকাণ্ড বটগাছ। অসংখ্য ঝুরি নেমেছে যেন মৌনী সন্ন্যাসীর অসংখ্য জটা। বাঁয়ে গভীর জঙ্গল—তেঁতুল, আম, বেল এমনি আরও কত গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘাটের কাছে নৌকো এসেছে জানতে পেরে দিদিমা ছইয়ের বাইরে চলে এলেন। তিনি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। শম্পা দেবী জিজ্ঞেস করলেন, "কি দেখছ দিদিমা।"

"অনেক দিনের কথা! কেন তুই আমাকে নিয়ে এলি আবার এই পুরীতে। একদিন যার নাম ডাকে চারদিক সচকিত থাকত, তার স্মৃতি আজ প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে এ আমি চোখে দেখতে পারি নে শমি। এ আমি সইতে পারি নে।"

দিদিমা আর কিছু বলতে পারলেন না। আমরাও চুপ করে রইলাম। আস্তে আস্তে নৌকো এসে ঘাটে ভিড়ল। ঘাটের মাটি স্পর্শ করে তিন বার হাত কপালে ঠেকালেন। হাতে করে খানিকটা জল নিয়ে নিজের মাথায় দিলেন, শম্পা দেবীর মাথায়ও ছিটিয়ে দিলেন। অস্পষ্ট স্বরে কি যেন মন্ত্র পাঠ করে জোড় হাত মাথায় ঠেকালেন আকাশের দিকে তাকিয়ে।

শম্পা দেবীর হাত ধরে দিদিমা নৌকো থেকে নামলেন। পরে

আমরা নামলাম। মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি মন্দিরের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন—আমরাও তার অনুসরণ করলাম। মন্দিরের এই ভাঙা অবস্থা দেখে দিদিমার চোখে জল এল।

শ্বেতপাথরের ফলকে দেখলাম লেখা আছে "৺সর্ব্বমঙ্গলাদেবীর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁহার আশ্রিত প্রজাবৃন্দ ও গুণমুগ্ধ গ্রামবাসী কর্ত্তৃক এই মন্দির স্থাপিত হইল।"

আমার ও বিনুদার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি পড়ল শম্পা দেবীর উপর। তিনি বললেন, "এই মহীয়সী নারীকে দেখবার সৌভাগ্য হয় নি; বহু পুরনো কাহিনী—আমার জন্মের অনেক আগেকার, শুনেছি দিদিমার কাছে শুধু দিদিমা কেন গাঁয়ের প্রতিটি লোকের মুখে মুখে।

"সর্ব্বমঙ্গলা দেবীকে বিয়ে করবার কিছুদিন পরেই তার স্বামী দেহত্যাগ করেন হঠাৎ রোগের আক্রমণে।

বিশাল জমিদারী—সর্ব্বমঙ্গলা দেবী নাবালিকা বললেই চলে। চারদিকে কুচক্রী লোক মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। কালনেমির লঙ্কা-ভাগের মত এঁরাও করে রেখেছিল সমস্ত বিষয়সম্পত্তি ভাগা-ভাগি।

বৃদ্ধ দেওয়ানজী বলেছিলেন, "কি হবে মা-ঠাকরুণ!" তার উত্তরে তিনি নাকি বলেছিলেন, "কোন ভয় নেই, অবিচলিত থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে কর্ত্তব্য সম্পাদন করে যান—কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"

কিছু দিনের মধ্যে সবাই বুঝতে পারল যে, এই জমিদারী কাণ্ডারীবিহীন হয়ে পড়ে নি। শুধু কি তাই, নিজগুণে তিনি সমস্ত প্রজাদের হাত করে ফেললেন। সবাই সুখী।

হঠাৎ একদিন সবাই দেখল, পাইক পেয়াদা সঙ্গে করে গাঁয়ের মধ্যে ইংরেজ ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই গাঁয়ে নাকি নীলের চাষ হবে। নীলকুঠির সাহেবদের অপকীর্ত্তির কথা কারুর জানতে বাকি ছিল না সারা বাংলায়।

গ্রামবাসী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। ঝি বউ আর সম্মান নিয়ে ঘরে থাকতে পারে না।

সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর সাহসের কথা সবাই জানত। কোন বিপদেই তিনি বিহ্বল হয়ে পড়তেন না। জমিদারী নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা মাঝে মাঝেই বাধত। সর্ব্বমঙ্গলা হুকুম দিয়ে দুর্বৃত্ত সাহেবকে নিজের কাছারিতে ধরে আনলেন। হয় নাকে খত দিতে হবে, নয় ত এই অঞ্চল ছেড়ে তখনই চলে যেতে হবে—এই হ'ল বিচার। ইংরেজের বাচ্চা দ্বিতীয় পথ বেছে নিল।

দিকে দিকে সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর জয়ধ্বনি উঠল। কিছুদিন পরে জমিদারীর কাজে তিনি কোথায় গিয়েছিলেন পানসীতে। ওদিকে নীলকুঠির সাহেবরা প্রতিশোধ-গ্রহণের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। মফস্বলে সুবিধা পেয়ে, তাঁরই এক বিশ্বাসঘাতক আমলার সাহায্যে তাঁকে ধরে নেবার জন্য তারা তাঁকে আক্রমণ করল পাইক বরকন্দাজ নিয়ে। তিনি আত্মসমর্পণ করবার পাত্রী ছিলেন না। আত্মরক্ষা করতে গিয়ে তিনি সাংঘাতিক রূপে আহত হলেন। ফিরে এসে যখন এই ঘাটে নামলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর মৃত্যু হ'ল। তাই এ ঘাটকে সবাই সর্ব্বমঙ্গলা ঘাট বলে জানে।

দুই মাঝি আর আমরা ভাগাভাগি করে বাক্স-পেটরা আর মালপত্র নিয়ে শম্পা দেবীদের বাড়ীতে এসে উঠলাম।

জনহীন পুরী। বাড়ীর চারিদিক ঘিরে ছিল একদিন প্রকাণ্ড দেয়াল—সব ভেঙে গেছে, তবু কোথায় কোথায় এর সাক্ষী রয়েছে ভাঙা দেয়ালের টুকরো, এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে—শেওলায় ঢাকা। যেখানটা দিয়ে বাড়ী ঢুকলাম সেখানে এককালে ছিল প্রকাণ্ড ফটক—ভিত্তি এখনও আছে!

বাড়ী ঢুকেই প্রকাণ্ড দীঘি—খানা-ডোবার মত ভরে আছে কলমী-দাম আর কচুরিপানায়। দীঘির উঁচু পাড় দিয়ে অন্দরমহল পৌঁছবার রাস্তা দু'দিকে হাঁটুর ওপর পর্য্যন্ত জঙ্গলে চারাগাছে ঢাকা, তার মধ্য দিয়ে সাবধানে চলতে হয়। জনবিরল পথ!

একটু এগিয়ে ডাইনে ঘুরলে ঠাকুরদালান—কষ্ট করে বুঝতে হয়, আজ শুধু সাপ খোপের বাসস্থান। অন্দরমহলের প্রকাণ্ড দালান ছাড়া আজ আর কিছুই নেই। তারই বারান্দায় উঠে আমরা মালপত্র নামিয়ে দাঁড়ালাম। এরই এক কোণে দেখলাম একটা মাটির প্রদীপ—তেল-চিটচিটে, রোজ সন্ধ্যায় মনে হ'ল কে এসে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে যায়।

মনে করেছিলাম বাড়ী ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই লোকজন এসে ভিড় করবে, অভ্যর্থনার গুঞ্জরণে আমরা বিব্রত হয়ে উঠব। নিরাশ হলাম বৈকি!

দরজা তালাবন্ধ—ঘরে ঢোকবার উপায় নেই। সবাই আমরা একরকম অসহায়ের মত মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম—শম্পা দেবী যেন কি বলতে যাচ্ছিলেন—হঠাৎ কি মনে করে থেমে গেলেন। ওর চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে বাইরে তাকিয়ে দেখি এক বৃদ্ধ লাঠি-ভর করে এগিয়ে আসছে—বাঁ-হাতের মুঠোতে একটা চাবির গোছা।

ঠুক্ ঠুক্ করে বুড়ো উঠে এল বারান্দায় হাঁপাতে হাঁপাতে, মাথা কাঁপছে। অতি কষ্টে লাঠিটি রেখে বাঁ-হাত থেকে চাবির গোছাটা নামিয়ে দু হাত মাটিতে ভর দিয়ে মাথা ঠেকাল মেঝেয়। আস্তে আস্তে মাথা তুলতে তুলতে বলল, "পেন্নাম হই মা-ঠাকরুণ, পেন্নাম হই বাবুমশাইরা। এসো, এসো তোমরা"—কিসের আবেগে যেন তার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসতে লাগল।

বৃদ্ধের চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। একটু থেমে আবার বলতে লাগল, "আমরা ত কোন অপরাধ করি নি, তবে কেন আমাদের এমনি করে ছেড়ে চলে গেলে—কার অভিশাপে কর্ত্তাদের এমনি দশা হ'ল, তা'কি ভগবান কোনদিন বুঝিয়ে দেবেন না! মা-ঠাকরুণ, তোমরা আবার ফিরে এসেছ—আবার ফিরে আসুক সেই দিন। আমি হয়ত বেঁচে থেকে দেখতে পাব না।"

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল শম্পা দেবীর বুক চিরে।

চাবির গোছাটা কুড়িয়ে নিয়ে দরজা খুলে ঢুকে কিছু সময়ের মধ্যে ফিরে এলেন। কোমরে আঁচল জড়ানো—হাতে পুরোনো ঝুর-ঝুরে একটা ঝাঁটা। হেসে একরকম আমাদের সবাইকে উদ্দেশ করে মন্তব্য করলেন—"এসে যখন পড়েইছ তখন একটু হাঙ্গামাও পোয়াতে হবে বৈ কি! আমি ঘরগুলো একটু গুছিয়ে নিচ্ছি, তার পর মালপত্র ঘরে নেওয়া যাবে'খন..."

বিনুদা ওর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, "অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছ বাইরেটা ভদ্রস্থ করবার ভার রইল আমাদের ওপর। বেশ মেনে নিলাম।"

শম্পা দেবী সরাসরি এর কোন জবাব না দিয়ে মুচকি হেসে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন নিজের কাজে।

বিনুদা আমায় বললেন, "দেখ দেখি একটা কোদাল-টোদাল পাওয়া যায় কিনা।" আশেপাশে চোখ বুলিয়ে কিছুই নজরে পড়ল না। বুড়ো বললে, "ও আর পাবেন কোত্থেকে কর্তা, আমার সঙ্গে যদি দয়া করে আসেন তবে আমার দা, কোদাল নিয়ে আসতে পারবেন।"

অগত্যা তাই করতে হ'ল। তাড়াতাড়ি হাঁটবার উপায় নেই, বুড়োর গতি ধীর মন্থর। এই বাড়ীরই একেবারে শেষ সীমায় ছোট ছোট ছখানা ঘর, একখানা টিনের ছাউনি—পুরনো মরচে ধরে গেছে, আর একখানা খড়ের চাল, অনেক দিন তার সংস্কার হয় নি। ছোট্ট উঠোন ঝাড়ো-মোছা-পরিষ্কার। ঘরে নিয়ে বসাবার জন্য বৃদ্ধ ব্যস্ত হয়ে উঠল। ওর স্ত্রী বেরিয়ে এল মাথার কাপড় টানতে টানতে—বয়েস বুড়োর চেয়ে অনেক কম—এখনও বেশ শক্ত আছে বলেই মনে হ'ল। ছোটখাটো মানুষটি।

আমাদের বসবার উপায় নেই। কোদাল আর দা নিয়ে চলে এলাম। প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসতে হ'ল আর একদিন যাব বলে।

এসে দেখি ততক্ষণে শম্পা দেবী গোটা দুই ঘর কোনরকম থাকবার উপযোগী করে ফেলেছেন। কপালে কয়েক গাছি চুল এসে পড়েছে, ঘামে আটকে গেছে, এতক্ষণের কায়িক পরিশ্রম চোখেমুখে উঠেছে ফুটে।

চললাম ত কাঠের খোঁজে গাছে চড়ে শুকনো ডাল কুড়াবার জন্য, কিন্তু পা বাড়াতে ভয় হয়। বড় বড় ঘাস ঢেকে আছে মাটি—ছোট ছোট আগাছা আশে পাশে প্রচুর। বিনুদাই আগে আগে চললেন লম্বা লম্বা পা বাড়িয়ে।

এ গাছ ও গাছের দিকে তাকিয়ে বিনুদা একটায় তর তর করে উঠে গেলেন। মড় মড় ডাল পড়তে লাগল। কাঠগুলি জড়ো করে বারান্দায় নামিয়ে রেখে বিনুদা শম্পা দেবীকে উদ্দেশ করে বললেন, "আঁশ নিরিমিষ দুটোই তোমার রান্না করে কাজ নেই, তুমি আজ কর, আর আমি করি দিদিমার জন্য।"

তৎক্ষণাৎ নিজেই নিজের কথার প্রতিবাদ করে বললেন, "না, তার দরকার নেই। দিদিমা আমার ছোঁয়া খাবেন না, আমি কোন্ জাতের তা ত ঠিক নেই! তুমি দুটোই কর, আমি সাহায্য করব।

শম্পা দেবীর চোখে মুখে আপত্তি ফুটে ওঠে, কিন্তু বিনুদার মুখের দিকে তাকিয়ে এ কথা উড়িয়ে দেওয়ার মত নয় দেখে মুচকি হেসে ঘরে ঢুকে গেলেন।

আমার ওপর হুকুম হ'ল কোদাল দিয়ে উঠান ও আশপাশ সাফ করা। পুরাদমে কাজ সুরু হয়ে গেল। বিনুদা এক সময়ে শম্পা দেবীকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, 'তোমরা ভাব ঘর বাঁধতে কেবল মেয়েছেলেরাই পারে—পুরুষেরাও যে সে কাজে অপটু নয় তাই আজ প্রমাণ করব।'

বিনুদা আরও বললেন, 'জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব কাজই আমাদের জানা থাকা দরকার, কখন কি অবস্থায় পড়ব তার কিছুই ঠিক নেই, সব কাজ যে করতে হয় আমাদের নিজেদেরই। এ সব কাজের জন্য ত আর শম্পা দেবীদের আমরা পাই নে, কি করেই বা পাব।'

'শম্পা দেবীদের অভাব নেই, তারা তৈরি হয়েই আছে, এখন দেবতারা বিশ্বাস স্থাপন করলেই হয়।'

'অবিশ্বাস করার অভিযোগ ত তুমি করতে পারবে না শম্পা। পুরো চব্বিশ ঘণ্টাও পার হয় নি, এর মধ্যেই ত তোমাকে অন্ততঃ বার দুই বিশ্বাস করতে হয়েছে, নির্ভর করতে হয়েছে। এ দু'বারই তোমরা সাহায্য করেছ আমাদের পথকে নিরাপদ করতে। কাজেই তোমাদের ওপর নির্ভর করি নে বা করতে হয় না এ কথা হলফ করে বলব কি করে।'

'তবে আমাদের সঙ্গী করে নাও না কেন।'

'অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয় বলে, অনেক হাঙ্গামা পোয়াতে হয় বলে।'

'নিত্যকার সংসারের বাইরে থেকে থেকে সবার চোখ এড়িয়ে অস্বাভাবিক জীবন যাপন করে করে তোমাদের মনের মধ্যে অনেক গাঁট বাঁধা হয়ে গেছে—কোনটা সোজা কোনটা বাঁকা—তা আর আজ তোমাদের চোখেও ধরা পড়ে না। তার পর হঠাৎ এক দিন তোমাদের কারুর কারুর মাথা নুয়ে পড়ে যায়—তোমরা অবাক হয়ে যাও। কিন্তু পেছন দিকে চেয়ে দেখলে জানতে পারতে—এ ভেঙে পড়ার সূত্রপাত হয়েছে—তোমাদের একান্ত অজান্তে। এগুলোকে সহজ করে নাও, নইলে তোমাদের মঙ্গল নেই।'

'অভিশাপ দিচ্ছ।'

'মোটেই নয়, সহজ কথা সহজ করে বুঝতে বলছি। কেবল নীতির কথা পড়ে, নীতিবাক্য আওড়ে আওড়ে মনের ওপর পড়েছে সবকিছুকে কঠিন করে দেখবার একটা কালো পর্দা। সোজা বোঝ-বার দিনের আলোর ঠাঁই নেই!'

বিনুদা দৃঢ়তার সহিত বললেন, 'নীতিবাক্যগুলো অনুসরণ না করলে আমাদের ভরাডুবি নিশ্চয়। সুনীতি না থাকলে তার স্থান অধিকার করবে দুর্নীতি।'

মাঝিদের যত্ন করে খাইয়ে তাদের পাওনাগণ্ডার অনেক বেশী দিয়ে ওদের বিদেয় করে দেওয়া হ'ল। হাতের গামছা কাঁধে ফেলে

যে হাসির রেখা মুখে ফুটিয়ে পয়সা গুনতে গুনতে চলে গেল তা সত্যই উপভোগ করার মত।

দিদিমাকে তাড়া দিলে তিনি মাথা ঘোরাতে ঘোরাতে জানালেন, 'তোরা সব বসে যা, আমার এখনও অনেক দেরি। পূজো আহ্নিক অনেক বাকী।'

বিনুদা শম্পা দেবীকে উদ্দেশ করে বললেন,'দিদিমার কথা শুনে মনে হচ্ছে খাওয়ার দেরি অনেক। তার জন্য ভাবনা নেই কিন্তু একটা জিনিষ এ বাড়ী এসে খোঁজ করি নি। ও জিনিষ দুটি সাবধানমত রেখেছ ত! না আবার বিপদ ঘটাবে।'

'এখন পর্য্যন্ত ক'বার বিপদ ঘটালাম বলত! সম্পদ বাড়াতে যেমন সুযোগের প্রয়োজন হয়, তেমনি বিপদ ঘটাতেও চাই সুযোগ—এর কোনটাই এখন পর্য্যন্ত পাই নি!'

'তোমার ইতিহাস আমার জানা নেই, কিন্তু আমাদের মনের যে স্বাভাবিক বিচারের মাপকাঠি আছে, তা দিয়ে তোমার শক্তির পরিমাপ করে ফেলেছি! তোমার উপর সব বিষয়ে একান্ত নির্ভর করা যায় এটুকু নিশ্চয় বুঝতে পেরেছি।'

'এত অল্প সময়ের মধ্যে এতটা ভাল নয়'—শম্পা দেবীর চোখে-মুখে তৃপ্তির দীপ্তি আর খুশির ঝলমলানি।

এতক্ষণকার হাসি আনন্দের স্বচ্ছ হাওয়া যেন মুহূর্ত্তে বিষাদের কালো পর্দার অন্তরালবর্ত্তী হয়ে গেল। বিনুদার হাসিমুখ যেন গাম্ভীর্য্যের আবরণে ঢাকা পড়ল। তিনি এগিয়ে এসে শম্পা দেবীর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

আবহাওয়াকে আরও হাল্কা করার জন্য বিনুদা বললেন, 'সুখ দুঃখ নিয়েই মানুষের জীবন। সবকিছুকেই সহজ করে হাসিমুখে নেওয়াই হচ্ছে শান্তিলাভের উপায়। যাক এসব কথা, এখন খাওয়া-দাওয়ার কাজ সেরে ফেলা যাক, ক্ষিধে পেয়েছে।'

'তোমরা দু'জনে ও কাজটা সেরে ফেল—আমার জন্য ভেব না।'

বিনুদা বললেন. 'না, আর আমরা দু'জন নই। আমরা তিন জন। আমরা তিন জনই বসব যে, খাওয়ার আগে স্নানের পর্ব্ব, সেটা চল চট-পট সেরে নেওয়া যাক। খাওয়ার পর্ব্ব শেষ করে আজ দুপুরবেলা বেশ একটু বিশ্রাম নিতে হবে। কেননা সূর্য্যাস্তের পর একটু অন্ধকার হতেই বেরুতে হবে—যাবও একটু দূরে।'

'আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই চলে যাবে!' শম্পা দেবীর কথায় ফুটে উঠে বেদনা আর নৈরাশ্য।

'না, না, একেবারে চলে যাব না—রাত্রি ভোর হওয়ার আগেই আসব ফিরে। রাত্রিতে আহার নিদ্রা সম্ভব হবে কিনা বলতে পারছি নে।'

ক্রমশঃ

আমাদের সাহিত্য

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

২

আমাদের বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের বাহ্যরূপ সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বে প্রবাসীতে কিছু আলোচনা করিয়াছি। ভাষাই সাহিত্যের বাহ্য রূপ। এবারে আমি সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমার অভিমত প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। সমাজের রুচি ও নীতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং, বিদ্যাসাগর-যুগের সাহিত্য আর বঙ্কিম-যুগের সাহিত্য এই উভয়ের মধ্যে যেমন পার্থক্য বিদ্যমান, সেইরূপ বঙ্কিম-যুগের সাহিত্যের সহিত বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যের পার্থক্য থাকিবেই। আমি বলিয়াছি যে বর্ত্তমান যুগের অনেক লেখক অজ্ঞতাবশতঃই হোক্, আর ইচ্ছা করিয়াই হোক্ ভাষাকে নানা দোষে দুষ্ট করিতেছেন। সেই দোষের উল্লেখ করিলে তাঁহাদের একমাত্র যুক্তি এই যে, এটা প্রগতি-সাহিত্যের যুগ। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, সাহিত্যমাত্রেই প্রগতিশীল অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং "সাহিত্য" শব্দের পূর্ব্বে "প্রগতি" শব্দ ব্যবহার করা সমীচীন বলিয়া আমি মনে করি না। কেহ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জল চাহিবার সময় তো বলে না "আমাকে এক গ্লাস তরল জল দাও।" কারণ জলমাত্রেই তরল। জলের সহিত তরলতার সম্বন্ধ যেরূপ অবিচ্ছেদ্য, সাহিত্যের সহিত প্রগতির সম্বন্ধও সেইরূপ অচ্ছেদ্য।

গত আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে "আমাদের সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারে আমি "প্রগতি-সাহিত্যে"র উল্লেখ করিয়াছি। এই প্রগতি-সাহিত্য সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি আরও দু'একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। প্রগতি-সাহিত্য-লেখকগণের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ—তাঁহারা যেন ব্যাকরণ-দুষ্ট, অশুদ্ধ বাক্য ব্যবহার করিয়া ভাষা-শিক্ষার পথে বাধা সৃষ্টি না করেন। অল্পবয়স্ক এবং অপরিণতবুদ্ধি পাঠক-পাঠিকারা ছাপার অক্ষরে ঐ রকম ভাষা দেখিলে সহজেই মনে করিতে পারে—এইরূপ ভাষাই বুঝি আদর্শ ভাষা। তাহাতে ভাষায় উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতিই হইয়া থাকে। প্রগতির দোহাই দিয়া কোন কোন লেখক এরূপ ভাষা ব্যবহার করেন যে, দু'তিন বার না পড়িলে লেখকের বক্তব্য বুঝিতে পারা যায় না। উহাতে ভাষার স্বচ্ছতা নষ্ট হইয়া আবিলতারই প্রাদুর্ভাব হয়। আমাদের মতে ভাষা যত স্বচ্ছ হয়, ততই ভাল। কয়েক মাস পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গের মফস্বলের কোন মহকুমা-সহর হইতে প্রকাশিত একখানি সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে দেখিয়া-

ছিলাম, সম্পাদক মহাশয় অতিবৃষ্টির বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—সমস্ত মগ্নময় হইয়া গেল। আমার মুখে সেই কথা শুনিয়া আমার কোন লেখক-বন্ধু মন্তব্য করিলেন, "জলময়", "অগ্নিময়" এসব সেকেলে ভাষা; প্রগতি-সাহিত্যের ভাষায় হইবে—"মগ্নময়", "দগ্ধময়"।

অনেক সময় আমার মনে হয় যে, বর্ত্তমানকালে আমাদের সাহিত্যে অসার ও আবর্জ্জনার স্তূপ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এখন হইতে ষাট-সত্তর বৎসর বা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা আমাদের সাহিত্যের কলেবর পুষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা অত্যধিক ছিল না। একালে গ্রন্থকার ও লেখকের সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের লেখকদের মধ্যে কয়জনের লেখায় আমরা এমন কিছু দেখিতে পাই, যাহাতে স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের সাহিত্যের সত্য-সত্যই উন্নতি হইতেছে? বর্ত্তমান লেখকদের মধ্যে কয়জনের লেখা বঙ্গ-সাহিত্যে স্থায়ী-আসন প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইবে? সেকালের অক্ষয়-কুমার দত্ত, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি লেখকগণ যে প্রবন্ধাদি লিখতেন, আজকাল কয়জন লেখকের লেখনী হইতে সেইরূপ সুচিন্তিত লেখা বাহির হইতেছে? আমি ইচ্ছা করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিতেছি, কারণ তাঁহারা অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহাদের লেখনীনিঃসৃত অনেক কথা শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বিশ্ব-সাহিত্যে সুদৃঢ় আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কিন্তু এখন বাংলায়, বিশেষতঃ কলিকাতার মুদ্রাযন্ত্র হইতে মুদ্রিত হইয়া যে সকল লেখকের পুস্তক প্রকাশক-দের সাহায্যে বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে, তাহাদের মধ্যে কয় জনের লেখা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিতে সমর্থ হইবে? গ্রন্থকারেরা নিজেদের কাল ও নিজেদের সমাজের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই গ্রন্থ রচনা করেন। সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠকেরা বুঝিতে পারেন যে, সেই লেখকের সময়ে সামাজিক অবস্থা ও শিক্ষা-দীক্ষা কিরূপ ছিল। রামায়ণ, মহাভারত হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী-কালের কালিদাস, মাঘ, ভারবি প্রভৃতির রচনায় আমরা তাঁহাদের সময়ের সামাজিক চিত্র বেশ সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে দীনবন্ধু মিত্র যে সকল নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সমসাময়িক দেশের অবস্থা ও সমাজের নানা দিকের চিত্র যেরূপ সুন্দররূপে আমরা জানিতে পারি, বর্ত্তমান লেখকদের মধ্যে কয়জনের গ্রন্থে আমরা সেরূপ জানিতে সমর্থ হই?

সেকালের লেখকেরা অর্থের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখিয়া দেশের ও সমাজের উন্নতির জন্য লেখনী চালনা করিতেন। কিন্তু মনে হয়, এখনকার অনেক গ্রন্থকারেরই দৃষ্টি যাহাতে সমাজের কল্যাণ হইতে পারে সেই দিকে নাই, ইঁহাদের দৃষ্টি অর্থের দিকে নিবদ্ধ। গ্রন্থ-প্রকাশকেরাও অনেকে ঠিক এইভাবে পরার্থ অপেক্ষা স্বার্থের প্রতি সমধিক দৃষ্টি রাখিতেছেন। সাময়িক পত্রের সম্পাদকেরাও এ দোষ হইতে সকলে মুক্ত নহেন। আমি একটা দৃষ্টান্ত দিয়া আমার এই মন্তব্যের সমর্থন করিতেছি। কয়েক মাস পূর্ব্বে আমার কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধু একটি প্রবন্ধ লিখিয়া কোন সাময়িক পত্রের আপিসে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। চার-পাঁচ দিন পরে সেই প্রবন্ধটি আমার লেখক-বন্ধুর কাছে ফেরত আসিল। উক্ত সাময়িক পত্রের সম্পাদক মহাশয় প্রবন্ধের সহিত একখানি পত্রও পাঠাইয়াছিলেন। সেই পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, "আপনার প্রত্যেকটি রচনাই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পড়িলাম। কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আপনি যে সকল বিষয়-বস্তু লইয়া লিখিয়াছেন, তাহা আজকালকার পাঠকেরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে অক্ষম। ইহা আপনার লেখার দোষ নহে, ইহা পাঠকদের দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল রুচিরই দোষ। আমাদের পত্রিকা যখন সাময়িক পত্রিকা, তখন সেই রুচির সহিত তাল রাখিয়া আমাদের চলিতে হয়। আজকালকার পাঠকদের মনোভাব বুঝিয়া অন্য কোনও রচনা যদি পাঠান, অনুগৃহীত হইব।"

যদি উক্ত সম্পাদক মহাশয় পত্রে জানাইতেন যে লেখাটি তাঁহাদের মনোনীত হয় নাই, তাহা হইলে আমি বিস্মিত বা দুঃখিত হইতাম না। কারণ ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচি। আমার যাহা ভাল লাগিল, তাহা অপরের ভাল না-ও লাগিতে পারে। কিন্তু প্রবন্ধটি প্রকাশ না করিবার জন্য তিনি যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহাতেই আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। সংবাদপত্র সকল সভ্য-সমাজেই লোক-শিক্ষার বাহন বলিয়া বিবেচিত হয়। যিনি সেই লোক-শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন, পাঠকগণের রুচি উন্নত করাই তাঁহার কর্ত্তব্য।

সেকালের হিতবাদীর একটি বিখ্যাত মোকদ্দমার বিষয় এখনও হয়ত অনেকের সুবিদিত। অধুনালুপ্ত হিতবাদীর সম্পাদক কালী-প্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় তৎকালীন হিন্দু-সমাজে প্রচলিত যে সকল প্রথাকে সমাজের অনিষ্টকর বলিয়া মনে করিতেন, তাহারই প্রতি-কারের জন্য হিতবাদীতে "রুচি-বিকার" নামে কয়েকটি ব্যঙ্গ-কবিতা প্রকাশ করেন। সেই সময়কার উন্নতিশীল সমাজ ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া কাব্যবিশারদ মহাশয়ের বিরুদ্ধে আদালতে মানহানির মোকদ্দমা আনয়ন করেন। আদালতে মোকদ্দমার শুনানি আরম্ভ হইলে কাব্যবিশারদ মহাশয়ের ব্যারিষ্টার তাঁহাকে বলেন, "আপনি ক্ষমাপ্রার্থনা করিলে ব্যাপারটি সহজেই মিটিয়া যায়। আমার মতে আপনার ক্ষমাপ্রার্থনা করাই ভাল।" এই কথা শুনিয়া কাব্য-বিশারদ মহাশয় দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "আমি যাহা আমার সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া মনে করি, তাহার প্রতিকার-চেষ্টা যদি অপরাধ হয়, আমি সেই অপরাধে অপরাধী,—ইহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইব কেন? বিচারক যদি আমাকে দণ্ড দেন, আমি সে দণ্ড হাসিমুখে গ্রহণ করিব।" সেকালের লোকেরা জানেন যে ঐ মোকদ্দমায় কাব্যবিশারদ মহাশয়ের নয় মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছিল। তিনি দণ্ডাদেশ শুনিয়া বিচারপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং আদালতে সমবেত তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণের সহিত হাসিমুখে করমর্দ্দন করিয়া কারাগারে গমন করেন।

তখনকার দিনে সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা যে জনসাধারণের নিকটে লোক-শিক্ষক বলিয়া সম্মানলাভ করিতেন, তাহার একটা উদাহরণ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে পাঠকগণের গোচরীভূত করিতেছি। "হিতবাদীর" সম্পাদকীয় বিভাগের ভার আমার হাতে থাকাকালে, সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডক্টর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মাতৃবিয়োগ হয়। মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিদ্যাভূষণ মহাশয় শতাধিক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায়ের ব্যবস্থা করেন। এই উপলক্ষে 'হিতবাদীর' সম্পাদক রূপে আমাকেও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের প্রাপ্য একখানি নিমন্ত্রণপত্র দিয়াছিলেন। আমি শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত হইয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে বলিয়াছিলাম, "আপনি ভুল করিয়া আমাকে পত্র দিয়াছেন। আমি ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক নই। সুতরাং ব্রাহ্মণপণ্ডিতের প্রাপ্য সম্মান বা বিদায় আমি লইতে পারি না।" আমার কথা শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি ভুল করিয়া আপনার নামে পত্র দিই নাই, আমি ইচ্ছা করিয়াই আপনাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি। অধ্যাপক পণ্ডিত মানে কি? যাঁহারা সমাজের শিক্ষক, সমাজে শিক্ষাবিস্তারে যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাহায্য করাই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। আপনি ব্রাহ্মণ-সন্তান এবং সমাজে শিক্ষা-বিস্তারের কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। সুতরাং আপনি কেন বিদায় লইবেন না?" অগত্যা আমি তাঁহার কথায় সম্মত হইলাম। ইহার পর কলিকাতা বড়বাজারের রাজবাড়ীতে "অধ্যাপক-বিদায়ের নিমন্ত্রণপত্র এবং বিদায়"ও পাইয়াছিলাম। সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা সমাজে কেন সম্মানলাভ করেন, তাহার কারণ বোধ হয় পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন।

আর একটা বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। সাময়িকপত্রের সম্পাদক, পরিচালক ও স্বত্বাধিকারীদের মধ্যে অনেকেই কেবল ব্যবসায়বুদ্ধি লইয়া—পত্রিকাদি প্রকাশ করেন, অর্থাৎ লাভ লোকসানের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখাই আপনাদের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। ইহার ফলে অনেক সাময়িক পত্রের গুরুত্ব হ্রাস পাইয়াছে। তখনকার দিনে বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদিত "বঙ্গদর্শন", দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী এবং স্বর্ণকুমারীর কন্যা সরলা দেবী সম্পাদিত "ভারতী", সুরেশচন্দ্র সমাজপতির "সাহিত্য", এবং "আর্য্যদর্শন", "কল্পদ্রুম" প্রভৃতি মাসিকপত্রে যেরূপ গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ, মৌলিক অথচ সরল প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত এখন অতি অল্পসংখ্যক মাসিক পত্রেই সেইরূপ দেখিতে পাই।

বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যে যে অবনতি হইতেছে তাহার আর একটা প্রধান কারণ, গ্রন্থ-প্রকাশকদিগের স্বার্থবুদ্ধি। কলিকাতায় পুস্তক-প্রকাশকের অভাব নাই। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আপনাদিগকে গ্রন্থ-সমালোচকের আসনে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, যেরূপ লেখা থাকিলে পুস্তক অধিক বিক্রয় হইবে, সেইরূপ পুস্তক, নিকৃষ্ট হইলেও তাঁহারা প্রকাশ করিবেন। গ্রন্থকারগণের মধ্যে অনেকেই দরিদ্র অথবা মধ্যবিত্তশালী গৃহস্থ। এখনকার এই দুর্ম্মূল্যতার দিনে কয়জন লেখক নিজ ব্যয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারেন? কাজেই তাঁহাদিগকে প্রকাশকদের শরণাপন্ন হইতে হয়। শুনা যায় প্রকাশকদের কেহ কেহ কখনও কখনও বিধি-বহির্ভূত পন্থা গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। এই ব্যাপার পুস্তক-ব্যবসায়ের বাজারে হয়ত নূতন নহে। আমার যতদূর মনে পড়ে, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনে পুস্তকের বাজারে এইরূপ বিধিবহির্ভূত পন্থা অনুসরণের দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার জীবিতকালের শেষদিকের সংস্করণগুলিতে নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া দিতেন। তাঁহার স্বহস্তে লিখিত "B. C. Chatterjee" পুস্তকের প্রচ্ছদপটে আমি দেখিয়াছি।

যেদিন হইতে পুস্তক-প্রকাশকগণ সমালোচকের আসন গ্রহণ করিয়া পুস্তকের দোষগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই দিন হইতেই বাংলা সাহিত্যের উন্নতি বহুলাংশে ব্যাহত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের সে গৌরবময় যুগ আর নাই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির ন্যায় কবি আজকাল কোথায়? বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রশেখর বসু, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির ন্যায় প্রবন্ধলেখক আজকাল কয়জন আছেন? দীনবন্ধু মিত্র, মনোমোহন বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, রাজকৃষ্ণ রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতির মত নাট্যকার ও প্রহসনকার আজকাল কোথায়? সেকালের সহিত একালের তুলনা করিলে আমার মত অশীতিপর বৃদ্ধদিগকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে, এখনও যে দুই চারি জন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক বাংলার সাহিত্যাকাশে দীপ্যমান আছেন, তাঁহারা অস্তাচলে গমন করিলে আমাদের সাহিত্য-গগন কি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাইবে?

হাইড্রোজেন বোমার তেজস্ক্রিয়তার আতঙ্ক

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

গত ১লা মার্চ্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক প্রশান্ত মহাসাগরে হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষণ-জনিত তেজস্ক্রিয়তার কুফল পরিলক্ষিত হওয়ায় জাপানে বিশেষ আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। জাপানের ইতিহাসে তৃতীয় বার এই বিপৎপাত হইল।

এই ঘটনার তাৎপর্য্য এরূপ গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহার প্রতিক্রিয়া এরূপ সুদূরপ্রসারী যে, ইহার দরুন মানবজাতির জ্ঞানবুদ্ধিকে আবার একবার কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

১লা মার্চ্চ তারিখে ফুকুরিয়ু মারু জাহাজের মৎস্যশিকারী নাবিকেরা হঠাৎ দেখিল—আকাশ তীব্র আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ফোরণের প্রচণ্ড গর্জ্জনে তাহাদের কানে তালা লাগিয়া গেল।

ফুকুরিয়ু মারুর দুর্ঘটনার পর মাছের বাজারে সমুদ্রের মৎস্যগুলিকে পরীক্ষা করা হইতেছে

তিন ঘণ্টা পরে তাহাদের উপর সাদা ছাই পড়িতে লাগিল এবং মাছ ধরিবার ক্ষুদ্র জাহাজটি পরমাণু-ধূলিতে (Atomic dust) আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

ইহারা বাড়ীতে ফিরিবার পর দেখা গেল যে, তেজস্ক্রিয়তার প্রতিক্রিয়ার দরুন ইহাদের সকলেরই শরীর অল্পবিস্তর দগ্ধ হইয়াছে। অবশ্য মার্কিন সরকার ইহাদের চিকিৎসার যথোচিত ব্যবস্থা করিলেন।

২০শে মার্চ্চ তারিখে বৈদেশিক মন্ত্রণাপরিষদে প্রদত্ত নির্দেশিকা (note) অনুসারে, ১৯শে মার্চ্চ হইতে বর্ত্তমান

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে তেজস্ক্রিয়তার দরুণ গুরুতর রূপে অসুস্থ একটি নাবিককে পরীক্ষা করা হইতেছে

বৎসরের প্রায় শেষভাগ পর্য্যন্ত বিপজ্জনক অঞ্চলের যে নূতন পরিবর্ত্তিত সীমানা নির্দ্ধারিত হইল, তাহা এ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা হইতে কয়েক গুণ বৃহত্তর।

এই ব্যবস্থার ফলে মৎস্য শিকারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষ হইতে অভিযোগ উত্থাপিত হইল যে, ইহার দরুন সমুদ্রগামী মৎস্যশিকারী জাপানী জাহাজগুলিকে যথাস্থানে যাইতে হইলে অনেকটা ঘুরপথে যাইতে হইবে এবং তার মানেই অতিরিক্ত ব্যয়বৃদ্ধি।

ফিশারি এজেন্সি হিসাব করিয়া দেখাইল যে, বিপজ্জনক অঞ্চলের সম্প্রসারণের দরুন প্রশান্ত মহাসাগর হইতে লব্ধ মৎস্যের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াইবে শতকরা এক। ১লা মার্চ্চের ঘটনা মৎস্য-শিল্পের উপর ইতিমধ্যেই মোক্ষম আঘাত হানিয়াছিল, হিসাবের ফলে দেখা গেল, ক্ষতির পরিমাণ ৫০ লক্ষ ইয়েন।

এদিকে, বৈদেশিক উপমন্ত্রী কাৎসুজু ও কুমুরা রাষ্ট্রদূত এলিসনের হস্তে এক স্মারকলিপি প্রদান করিলেন। তাহাতে

দৃঢ়তার সহিত বলা হইল যে, ১লা মার্চের ঘটনার সকল দায়িত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।

৬ই এপ্রিল জাপ গবর্ণমেণ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিকট ফুকুরিয়ু মারুর শোচনীয় দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করা সাব্যস্ত করিলেন।
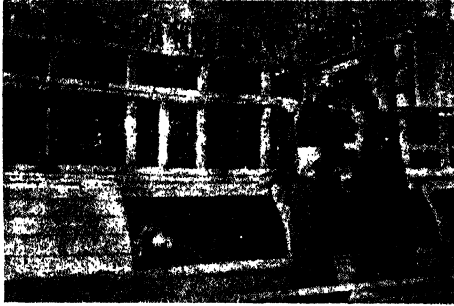
ফুকুরিয়ু মারু জাহাজে তেজস্ক্রিয়তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পরীক্ষারত স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ম্মচারিগণ

এই সিদ্ধান্ত এখনও সরকারী ভাবে ঘোষিত হয় নাই বটে, কিন্তু ওয়াকিবহাল মহলের মতে ক্ষতির পরিমাণ নিম্নলিখিত রূপ :

জাহাজের ক্ষতি ১৫ লক্ষ ইয়েন, মাছ ধরিবার সাজ-সরঞ্জাম এবং নাবিকদের ব্যক্তিগত জিনিষপত্রের ক্ষতি ২ লক্ষ ইয়েন, ধৃত মাছের ক্ষতি ১ লক্ষ ইয়েন, বিষক্রিয়ায় অসুস্থ মৎস্যশিকারীদের চিকিৎসার খরচ মাথাপিছু ১৫০,০০০, ইয়েন, মৎস্যশিকারীদের এবং তাহাদের পরিবারভুক্তদের প্রত্যেকের মাসিক খরচ ৩০,০০০ ইয়েন। আমেরিকান পরমাণুতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ আইসেনবাড জাপানী অনুসন্ধানীদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, উক্ত মৎস্য-শিকারীদের মূত্র রেডিও কেমিক্যাল বিশ্লেষণ দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া এ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনার অবসান হউক।"

এই সম্পর্কে রাষ্ট্রদূত এলিসন এক বিবৃতিতে বলেন :

এই পরীক্ষণ-পদ্ধতির (যাহার সুযোগ-সুবিধা জাপানে নাই) দ্বারা তেজস্ক্রিয়তার দরুন অসুস্থ ব্যক্তির দেহের টিস্যুতে কি পরিমাণ রেডিও কেমিক্যাল জমা হইয়াছে তাহার পরিমাণ নির্ণয় সম্ভবপর হয়।

রাষ্ট্রদূত আরও বলেন—"আমেরিকায় পরীক্ষার্থ লইয়া যাইবার জন্য আইসেনবাডের নিকট দুইটি রোগীর মূত্রের নমুনা দেওয়া হয়। পরীক্ষণের ফলে দেখা যায়, রেডিও কেমিক্যালের নিঃসরণ এত স্বল্প পরিমাণ যে, ঐ দুই জন রোগীর টিস্যুতে জমা হওয়া রেডিও আইসোটোপ সম্পর্কে মাথা ঘামানো অন্ততঃ চিকিৎসাশাস্ত্রের দিক দিয়া ভিত্তিহীন।

এই বিষয়টি লইয়া জাপান এবং আমেরিকার সরকারী মহলে খুব আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। ইহার ফলাফল
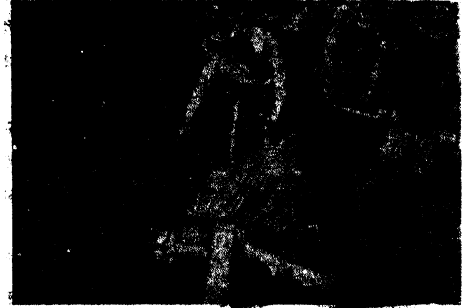
যে সকল মৎস্যের উপর তেজস্ক্রিয়তার প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইয়াছে সেগুলিকে সমুদ্রে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে

যাহাই হউক না কেন, তেজস্ক্রিয় ভস্মের (Radio active ashes) দরুন তেইশ জন জাপানী মৎস্যশিকারীর দেহে যে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ত স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

এই হাইড্রোজেন বোমা নিয়ন্ত্রণের জন্য আশু যদি যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন না করা যায়, তাহা হইলে ইহার পরিণাম ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। স্যর উইন্‌ষ্টন চার্চিল একবার বলিয়াছিলেন যে, এইচ-বোমার আবিষ্কারের চেয়ে ইহার নিয়ন্ত্রণ ঢের বেশী কষ্টসাধ্য হইবে।

সম্প্রতি অনেক দেশে যখন পরমাণু-বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষণ চলিতেছে, তখন ঐ সকল দেশের পক্ষে যে-কোন সময় ভয়াবহ পরমাণু-ধূলি দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিয়া গিয়াছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের দ্বারা পরমাণুশক্তি নিয়ন্ত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে বৈদেশিক মন্ত্রণা-পরিষদসমূহের কর্ত্তৃপক্ষ নৈরাশ্যপূর্ণ মনোভাব পোষণ করেন, কেননা যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে এই সম্পর্কে গভীর মতানৈক্য বিদ্যমান।

সম্প্রতি জাপানের পররাষ্ট্রসচিব ওকাজাকি ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহার সরকার "বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য" পরমাণু-শক্তি-নিয়ন্ত্রণ-ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক।

তাঁহার সিদ্ধান্তের ভিত্তি এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষাশক্তি বিশ্বনিরাপত্তার পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক এবং একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে জাপানের পক্ষে আমেরিকার সহিত সহযোগিতা করা অত্যাবশ্যক।

The Mainichi Over Seas Edition অবলম্বনে।

মহাত্মা গান্ধী

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মহাত্মা গান্ধীর জীবন একটা মহাকাব্যের মত। এই মহাকাব্যের পর্ব্বে পর্ব্বে প্রেমের, সত্যানুরাগের এবং মহাবীর্য্যের অমর কাহিনী। কাহিনীগুলি যুগ যুগ ধরে মানুষের চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকবে। গান্ধীজীর এই স্মরণীয় মৃত্যু-দিবসে তাঁর জীবনের ও বাণীর তাৎপর্য্য উপলব্ধি করবার একটা বিপুল সার্থকতা আছে। আত্মজীবনীর শেষ অধ্যায়ে গান্ধীজী লিখেছেন: সত্যই ঈশ্বর আর সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে হলে দরকার দীনের থেকে যে দীন তাকেও আত্মবৎ ভালবাসা। প্রাণীমাত্রকেই যে ভালবাসতে চায়—একান্ত আত্মকেন্দ্রিক জীবন যাপন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সত্যানুরাগ আমাকে রাজনীতির ক্ষেত্রে টেনে এনেছে; আর একথা আমি অসঙ্কোচেই বলতে পারি, ধর্ম্মের সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক আছে বলে যাঁরা স্বীকার করেন না তাঁরা ধর্ম্ম বলতে কি বোঝায় তা জানেন না।

দীনতম ভারতবাসীও গান্ধীর কাছে ছিল অমৃতের পুত্র। তাঁর অন্তরের সর্ব্বগ্রাসী কামনা ছিল দেশবাসীর মুক্তি। জড়তা থেকে মুক্তি, ভীরুতা থেকে মুক্তি, সর্ব্বপ্রকারের বিদ্বেষবুদ্ধি থেকে মুক্তি। তিনি দেখেছিলেন—স্বদেশের কোটি কোটি নরনারী অন্নাভাবে হয়ে আছে জীবন্ত নরকঙ্কাল, শিক্ষার ও সংস্কৃতির অভাবে নেমে গেছে মানবেতর প্রাণীর পর্য্যায়ে। আরও দেখেছিলেন, দুর্ভাগা দেশের কোটি কোটি নর-নারায়ণ সমাজে হয়ে আছে অস্পৃশ্য, হিন্দু আর মুসলমান একই 'জাতি'র (নেশন) অন্তর্ভুক্ত হয়েও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন; নারীজাতি পুরুষের সমান হয়েও পর্দ্দার অন্তরালে হয়ে আছে খেলাঘরের পুতুল। কোটি কোটি অমৃতের পুত্রের এই দুর্গতি দেখে গান্ধীর করুণ কোমল হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হয়ে গেল। জীবনকে তিনি নিঃশেষে নিবেদন করে দিলেন স্বদেশকে সর্ব্বতোভাবে শৃঙ্খলমুক্ত করবার মহাযজ্ঞে।

নর-নারায়ণের সেবায় এই আত্মনিবেদন গান্ধীকে শেষ পর্য্যন্ত টেনে আনল রাজনীতির রণপর্ব্বে। রাজনীতি প্রত্যেকটি ভারতবাসীর জীবনকে জড়িয়ে রেখেছে পাকে পাকে অজগর সাপের মত। শত চেষ্টাতেও এই নাগপাশ থেকে নিষ্কৃতির কোন উপায় নেই। গান্ধী দেখলেন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি জনসাধারণের শোষণের উপরে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব মানে ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক সর্ব্বনাশ। এই সর্ব্বনাশকে ঠেকাতে হলে বৈদেশিক শাসনের শৃঙ্খলকে ছিন্ন করবার প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। যুগদেবতার আহ্বানে দরিদ্র নারায়ণকে ভালবেসে, উৎপীড়িত স্বদেশের বিক্ষুব্ধ আত্মার প্রতিমূর্ত্তি হয়ে গান্ধী অবতীর্ণ হলেন রাজদ্রোহীর ভূমিকায়। জালিয়ানওয়ালা বাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ভারতের আকাশ-বাতাস মুখরিত করে বেজে উঠল অহিংস অসহযোগের পাঞ্চজন্য।

যারা ছিল শতধাবিচ্ছিন্ন, গান্ধীর আহ্বানে তারা মন্ত্রমুগ্ধের মত সমবেত হ'ল কংগ্রেসের পতাকাতলে। যে কংগ্রেসের কার্য্যকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল সহরের শিক্ষিতের গণ্ডীর মধ্যে, গান্ধী তার শিকড়কে চালিয়ে দিলেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে জনসাধারণের মর্ম্মের গভীরে। এই সঙ্ঘবদ্ধ জনসাধারণের হাতে গান্ধী দিলেন সত্যাগ্রহের অনুপম অস্ত্র। দাসত্বের মূলে ছিল ভয়; কারণ বিপ্লবের পথ বিঘ্নসঙ্কুল। মৃত্যুর অগ্নিমন্ত্রে গান্ধী তাই মরণভীরু জাতিকে দিলেন দীক্ষা। মেঘমন্দ্রস্বরে ঘোষণা করলেন তিনি: নূতন জীবনের প্লাবন আসে মরণের গর্ভ থেকে। দুঃখের অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ না দিয়ে ইতিহাসে কোন পরাধীন জাতিই আজ পর্য্যন্ত উন্নত হয় নি।

সত্যাগ্রহের পথ হাসিমুখে চরম দুঃখকে বরণ করার পথ। ভয় এবং ক্রোধ উভয়কেই অতিক্রম করে সাধারণ মানুষ স্বাধীনতার জন্যে নিঃশব্দে প্রাণ দিতে পারে—একথা কেউ কেউ বিশ্বাস করত না। চরিত্রবল জনকয়েক মহাপুরুষের একচেটিয়া সম্পত্তি—এই ধারণাকে গান্ধী উল্টে দিলেন। গান্ধীর বিশ্বাস ছিল মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বে। বিপথগামী দুর্ব্বলচেতা মানুষ নিজের প্রবৃত্তিকে সংযত করতে পারে—অন্তরে এই দৃঢ় প্রত্যয় না থাকলে গান্ধী কখনও জনসাধারণকে নিয়ে নিরুপদ্রব আইন অমান্য আন্দোলনে বারংবার ঝাঁপ দিতে সাহস করতেন না। দক্ষিণ আফ্রিকায় জেনারেল স্মাটসের বিরুদ্ধে গান্ধী কুড়ি বৎসর ধরে যে লড়াই চালিয়েছিলেন—সে ত এই বিশ্বাসেরই জোরে। বার্দ্দোলি সত্যাগ্রহ সম্পর্কেও একই কথা। সাধারণ মানুষকে এমন করে বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন বলে তারাও এমন ভাবে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে অকুতোভয়ে মরণের সম্মুখে দাঁড়াতে পেরেছিল। গান্ধীর কারবার ছিল রক্তমাংসের অতি-সাধারণ মানুষ নিয়ে। তাদের মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন আত্মার অনির্ব্বাণ শিখাকে।

অহিংস গান্ধীর আত্মার শক্তির কাছে গর্ব্বোদ্ধত চার্চিলের বাহুবলের শক্তি শেষ পর্য্যন্ত হার মানল, চার্চিল সমস্ত শক্তি

লোকের নজরে এটা পড়ে না; ক্রমশঃ স্তরের পর স্তর ধুয়ে যায় এবং অবশেষে এমন একটি স্তর এসে পড়ে যাকে সম্পূর্ণ অনুর্ব্বর বা উষর বলা যায়। এই স্তরে উদ্ভিদের খাদ্য থাকে না বললেই চলে।

প্রশ্ন। আচ্ছা জলস্রোতের সঙ্গে যে সকল মূল্যবান পদার্থ থাকে এবং জমির উপরিভাগের ক্ষয়প্রাপ্ত মাটি নদী-নালায় পড়লে নদী-নালার কিছু ক্ষতি হয় কি ?

বৃক্ষে জল সিঞ্চনের জন্য ডাঃ আর আহমেদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর হাতে জল ঢালিয়া দিতেছেন

উত্তর। আপনার এ প্রশ্নও খুব প্রয়োজনীয়। এর ফলে আমাদের ঘোরতর সর্ব্বনাশ হয়েছে ও হচ্ছে; স্রোতের সঙ্গে মিশ্রিত পদার্থসমূহ নদী-নালায় সঞ্চিত হয়ে তাদের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ করে দেয় এবং নদী-নালাগুলো ক্রমশঃ হেজে মজে যায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নদীর তলদেশ উত্থিত হয়ে প্লাবনের সৃষ্টি করে। অনেকের মত এই যে অরণ্য এবং বৃক্ষের অভাবেই আজ দামোদরের অবস্থা এই রকম হয়েছে এবং এর সংস্কারের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হচ্ছে। অবশ্য এই মত সম্পূর্ণ ঠিক কিনা বলতে পারি না।

প্রশ্ন। জলস্রোতের ফলে জমির আর কোন রকম ক্ষতি হয় কি ?

উত্তর। জলস্রোতের ফলে আর একটা ভীষণ ক্ষতি হয়। সেই ক্ষতিটা হচ্ছে জমি ধুয়ে ধুয়ে জমিতে অসংখ্য নালার সৃষ্টি হয়। এই সকল নালা ১৮।২০ ফুট পর্য্যন্ত গভীর হয়। আমাদের দেশে অনেক স্থানেই এইভাবে গভীর নালার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে অনেক স্থানেই প্রস্তরাকীর্ণ ভূমির উদ্ভব হয়েছে।

প্রশ্ন। কৃষির পক্ষে অনুকূল পদার্থসমূহ মাটিতে সঞ্চিত করবার উদ্দেশ্যে এবং জমির ক্ষয় নিবারণ করবার জন্যই কি কেবল বৃক্ষরোপণের দরকার ?

উত্তর। এটাও একটা দরকারী প্রশ্ন; আমরা সকলে জানি গাছপালা, বনানীর ওপরই বৃষ্টিপাত নির্ভরশীল। সময়মত বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ওপরেই আমাদের দেশের কৃষি প্রধানত নির্ভর করে। এটা স্থির জেনে রাখুন বন-উপবন না থাকলে বৃষ্টিপাত কম হয়। সুতরাং মুন্সী সাহেব যা বলেছিলেন সে কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তিনি বলেছিলেন গাছ থেকে জল, জল থেকে খাদ্য এবং খাদ্য থেকে জীবন। সেইজন্য বৃক্ষরোপণ আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িত আছে বলে আবহমান কাল থেকেই বৃক্ষরোপণকে আমাদের অতি পুণ্য কাজ বলে গণ্য করা হয়। ইহা আমাদের জীবনের একটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।

প্রশ্ন। বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব তো বোঝা গেল; আমাদের দেশে বন-জঙ্গলের কত অভাব আছে বলতে পারেন কি ?

উত্তর। বিশেষজ্ঞরা বলেন, দেশে অন্ততঃ ২৫ ভাগ বন-জঙ্গল থাকা দরকার; কিন্তু আমাদের দেশে ১০।১২ ভাগের বেশী সংরক্ষিত বন-জঙ্গল আছে কিনা সন্দেহ। সুতরাং আমাদের আরও ১৫ ভাগ বন-জঙ্গল বাড়ানো দরকার। আমাদের দেশে মোটামুটি ১৪।১৫ লক্ষ একর জমি পতিত পড়ে আছে। অনেকে বলেন, এই ১৪।১৫ লক্ষ একর জমি সংস্কার করে চাষের উপযোগী করতে পারলে আমাদের দেশের খাদ্যসম্ভার বেড়ে যাবে। আবার অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন যে, এই ১৪।১৫ লক্ষ একর জমিতে চাষ-বাসের পত্তন না করে বন-জঙ্গলের পত্তন করলে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে, জমির ক্ষয়-নিবারিত হয়ে তার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পাবে এবং তার ফলে শস্যের উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বেড়ে যাবে।

প্রশ্ন। আপনার কথা মোটামুটি বুঝলাম। এখন আপনি বলতে পারেন কি, আমরা প্রত্যেকে যেমন এলো-মেলো ভাবে ২।৪টা যা-তা গাছ পুঁতছি তাতে কি বৃক্ষরোপণের উদ্দেশ্য সফল হবে ? তরুলতায় সমাকীর্ণ অঞ্চলে বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা আছে কি ? আমার ত মনে হয় বৃক্ষ রোপণের জন্য বিশেষ বিশেষ অঞ্চল নির্ব্বাচন করা দরকার। অর্থাৎ, যে সকল অঞ্চলের জমি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে অনুর্ব্বর হয়ে পড়েছে অথবা যে সব অঞ্চলে জলাজমির প্রাচুর্য্য বেশী সেই সব অঞ্চলেই বৃক্ষরোপণের সার্থকতা বেশী।

উত্তর। আপনি ঠিকই বলেছেন, এলোমেলো ভাবে ২।১০টা গাছ পোঁতার কোন সার্থকতা নেই। এতে ব্যক্তিগত লাভ হতে পারে, কিন্তু সমষ্টিগত উপকারের সম্ভাবনা কম।

পশ্চিমবঙ্গে জলা বা উষর জমির অভাব নেই; এই সব জমিকে উর্ব্বরা করতে হলে ঐ সকল অঞ্চলে বৃক্ষ-রোপণের ব্যাপক আয়োজন করা উচিত এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত রাষ্ট্রের সহযোগিতায় একটি কার্য্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করাও আবশ্যক।

প্রশ্ন। অনেকেই বলেন যে, বনমহোৎসব একটি হুজুগ মাত্র। ভি-আই-পি'দের খুশী করবার জন্তেই বন-মহোৎসবের সময় লোকে ২।১০টা গাছ পোঁতে। কিন্তু পরে তারা সে সব গাছের যত্ন করে না; সবই প্রায় মরে যায়। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি আমার এলাকাতেও এই রকম অবস্থা ঘটেছে। যাই হোক আপনি কি বলতে পারেন গত বৎসর বন-মহোৎসবের সময় জনসাধারণ যে গাছ পুঁতেছিল তার কি কোন হিসাব আছে? বিভিন্ন স্থানে কত গাছ পোঁতা হয়েছিল, কত গাছ বেঁচে আছে?

উত্তর। নিশ্চয়ই হিসেব আছে, আমি কয়েকটা জেলার কথা বলছি:

	বৃক্ষ রোপণের সংখ্যা	কত বেঁচে আছে	বাঁচার শতকরা হার
২৪ পরগণা	১০৬,৩১২	৮৭,৯৪৫	৮২·৭
নদীয়া	৭৩,২০৬	৪৩,৭৫১	৫৯·৭
মুর্শিদাবাদ	২৪,১৪৭	১৩,৪৪৫	৫৫·৬
বীরভূম	৩৪,৩৪২	১৪,৫৩০	৪২·৩
বাঁকুড়া	৩৫,৩৬১	১৫,৭৯৮	৪৪·৬
হুগলী	৭৫,৩৬৬	৪৭,৮৬৪	৬৬·৫
হাওড়া	৯৩,৪৫৬	৫১,৯৬৯	৫৫·৬
পঃ দিনাজপুর	২৩,০৫৭	১৭,২৮৫	৭৪·৯
কুচবিহার	১৪,৮৪১	১০,৮৬১	৭৩·১

প্রশ্ন। আপনার হিসেবে দেখা যাচ্ছে মোটামুটি ফল ত ভালই হয়েছে। এদিকে লোকের একটু আগ্রহ বাড়লে ফল আরও ভাল হবে। আপনাকে আর ২।১টা প্রশ্ন করব। গাছপালা লাগাবার মোটামুটি সাধারণ নিয়ম কি?

উত্তর। গর্ত্ত করে চারাগাছ রোপণ করতে হয় এবং সাধারণতঃ ৯ ফুট থেকে ১২ ফুট দূরত্বে ছোট ছোট গাছ, ১২ ফুট থেকে ২০ ফুট দূরত্বে মাঝারি আকারের গাছ এবং ২০ ফুট থেকে ৪০ ফুট দূরত্বে বড় বড় গাছ পুঁততে হয়। কিন্তু গাছের বৃদ্ধি এবং জমির উর্ব্বরতার উপরই প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক রকম গাছের পরস্পরের মধ্যে কত দূরত্ব থাকা উচিত তা নির্ভর করে। মোট কথা, একটা গাছ থেকে আর একটা গাছ এমন দূরত্বে রোপণ করা উচিত যেন সেগুলি পূর্ণভাবে বাড়লে পরস্পরের ডাল-পাতার মধ্যে অন্ততঃ কয়েক ফুট ব্যবধান থাকে। কারণ তা না হলে প্রত্যেক গাছের শেকড় স্বাভাবে সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত হতে পারবে না, এক গাছের শিকড় আর এক গাছের শিকড়ের সঙ্গে লেগে যেতে পারে। বিশেষ উর্ব্বর নয়, এই রকম জমিতে একই রকমের গাছ যত ব্যবধানে রোপণ করা যায় উর্ব্বর জমিতে তার

রাজ্যপাল ডঃ শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় চারাগাছ রোপণ করিতেছেন

অপেক্ষা বেশী ব্যবধানে পোঁতা উচিত। কারণ উর্ব্বর জমিতে গাছের বৃদ্ধি আরও বেশীভাবে হবে, আর সেই কারণেই পরস্পরের মধ্যে বেশী পরিমাণ দূরত্ব থাকা উচিত।

সোজা লাইনে এবং সমান দূরত্বে গর্ত্ত প্রস্তুত করা দরকার, বিভিন্ন শ্রেণীর গাছের জন্তে বিভিন্ন ধরণের গর্ত্ত করা উচিত। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, কয়েক ইঞ্চি গভীর এবং কয়েক ইঞ্চি চওড়া ছোট ছোট গর্ত্তে চারাগাছ পুতলে চারাগাছের শিকড় গর্ত্তের চারপাশের শুকনো ও শক্ত মাটি সহজে ভেদ করে বিস্তৃত হতে পারবে না এবং এ-কারণ চারাগাছ উপযুক্ত বৃদ্ধির জন্তে প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করতে পারবে না। ফলে উপযুক্ত ভাবে বাড়াও সম্ভব নয়। সাধারণতঃ ছোট ছোট গাছের জন্তে ৩ ফুট গভীর আর ৩ ফুট চওড়া এবং বড় বড় গাছের জন্তে ৪ ফুট গভীর ও ৪ ফুট চওড়া গর্ত্ত করা দরকার। গাছ রোপণের এক মাস কি দু'মাস আগে গর্ত্ত খুঁড়ে রাখা চাই। গর্ত্ত থেকে উঠানো মাটির সঙ্গে এক ঝুড়ি পচা পাতার সার, এক ঝুড়ি গোবর এবং উপযুক্ত পরিমাণ বালি মিশিয়ে তা দিয়ে পুনরায় গর্ত্তটাকে ভরাট করে রাখতে হবে। বালি মিশাবার কারণ হচ্ছে যে তার ফলে মাটির মধ্যেকার কাদার মত চটচটে ভাবটা নষ্ট হয়ে যাবে, আর মাটি থেকে সহজেই জল চুঁয়ে যাবে। যদি পাওয়া যায়, তবে এক ঝুড়ি হাড়ের গুঁড়া গর্ত্ত ভরাট করার আগে গর্ত্তে দিলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। মাটিতে কাদার ভাগ বেশী মনে হলে গর্ত্তের মাটির সঙ্গে এক ঝুড়ি কাঁকর বা খোয়া দেওয়া ভাল। এই ভাবে গর্ত্ত ভরাট করবার পর

গর্ত্তের মুখ চেপে গর্ত্তের মাটি শক্ত করে দেওয়া উচিত। সম্ভবপর হলে গর্ত্ত জলে ভাল করে ভিজিয়ে দিলে গর্ত্তের মাটি শক্ত হবে।

প্রশ্ন। আমার আর বেশী প্রশ্ন নেই। আর একটা প্রশ্ন করছি, আপনারা জুলাই মাসেই বনমহোৎসবের আয়োজন করেন কেন? পাঁজিতে ত দেখা যায় বারো মাসই বৃক্ষ রোপণ করার কথা আছে।

উত্তর। বৃক্ষরোপণ নির্ভর করে স্থানীয় মাটি ও আবহাওয়ার উপযুক্ততার ওপর। আবার বিভিন্ন রকমের গাছ বিভিন্ন সময়ে রোপণ করতে হয়। জুলাই মাসে বন-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃক্ষ রোপণের প্রয়োজনীয়তার দিকে জনসাধারণের সমবেত মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে একটা প্রচেষ্টার সূচনা করা, আর একটা কথা জুলাই মাসেই রথযাত্রা হয়; আমাদের জাতীয় জীবনে রথযাত্রার সময়েই বৃক্ষ রোপণের প্রশস্ত সময় বলে গণ্য করা হয়। মোট কথা, স্থানীয় মাটি ও আবহাওয়ার অবস্থানুযায়ী বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন গাছ স্বচ্ছন্দেই পোতা যায়।

প্রশ্ন। আপনি কি সকল রকম বৃক্ষ রোপণ করবার জন্যে জনসাধারণকে উপদেশ দেন?

উত্তর। হাঁা, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে সকল রকম বৃক্ষের অভাব ঘটেছে। ফলমূলের অভাবে আমাদের স্বাস্থ্যের যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে। আগেই বলেছি জ্বালানি কাঠের অভাবে আমরা নাস্তানাবুদ হয়ে পড়েছি—আর অনেক কাজের জন্যে উপযুক্ত কাঠের অভাব হয়েছে। আমার মতে সবরকম কাজের উপযোগী বৃক্ষ লাগানো খুবই উচিত; মোটের উপর, যার যে রকম সুবিধে আছে সে সেই রকম গাছ লাগাবে।

প্রশ্ন। তা হলে মোটামুটিভাবে বলতে পারা যায় যে, অরণ্য এবং বৃক্ষের অভাবে আমাদের দেশে বর্ষার অভাব ঘটেছে, বন্যার এবং প্লাবনের প্রবলতা বেড়েছে, জমির উর্ব্বরতাশক্তি হ্রাস পেয়েছে, জমির ক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, জ্বালানি এবং ঘরবাড়ী প্রস্তুতের জন্য এবং অন্যান্য কাজের জন্য উপযুক্ত কাঠের অনটন উপস্থিত হয়েছে, ফলমূলের অভাব ঘটেছে।

উত্তর। হ্যাঁ, আপনি মোটামুটি ঠিকই বলেছেন। এ সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করবার উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ প্রতি বৎসর শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান অতি পবিত্রভাবে সম্পন্ন করতেন। এই উৎসবকে তিনি জাতির "কল্যাণ-উৎসব" বলতেন। তাঁকে প্রণাম করে, তাঁর কথা মনে রেখে আমরা যেন "বনমহোৎসবকে" সাফল্যমণ্ডিত করতে পারি।

তোমার সে দান রহিবে জীবনে আঁকা

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

বন্ধু গো তুমি ভরে রেখেছিলে প্রতি যে সকালটিরে
নিত্য নূতন ফরমাশী নানা কাজে,
আজিকে আমার অলস প্রভাত রয়েছে আমারে ঘিরে
পুরনো দিনের স্মৃতিখানি মনে বাজে।
কত যে প্রশ্ন, কত জিজ্ঞাসা, সীমা কিছু ছিল নাকো,
প্রতিটি নিমেষে মুখরিত তব বাণী,
যবে বলিতাম 'আর পারি না যে, প্রশ্ন তোমার রাখো'
বিজয়-গর্ব্বে হাসিটো উঠিতে জানি।
শরতে ও শীতে বর্ষা-নিদাঘে ছিল যে গো মনোরম;
প্রতিটি সকাল তোমার পরশে হায়,
কত আনন্দ, প্রীতির কুসুম ফুটিত হৃদয়ে মম,
আজ তারা কই—সকাল বহিয়া যায়।

তখন তোমার কাজের ভিড়েতে খুঁজিতাম অবসর,
মনে আঁকিতাম নিঃসীম অবকাশ,
আজি অবসর তবু কেন মনে বেদনার মর্ম্মর!
পাওয়ার মাঝেতে না-পাওয়ার পরিহাস!
এত অবসর ভাল যে লাগে না, বন্ধু গো শোন আজ,
এত অবকাশ কোথায় রাখি যে আমি,
কোথা তুমি আজ এসো গো বন্ধু, নিয়ে তব শত কাজ,
আমি ক'রে যাই, ক'রে যাই দিবাযামী।
আজ কাছে নাই, দূরে গেছ তুমি দিয়ে শত অবকাশ,
ভাল যে লাগে না, মনে হয় বড় ফাঁকা,
ভ'রে তোল তুমি শূন্য এ ক্ষণ নিয়ে শত উচ্ছ্বাস,
তোমার সে দান রহিবে জীবনে আঁকা।

বিচিত্র জীবনকথা

শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায়

ভাগীরথীর এক শাখা মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছু দূর এগিয়ে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেছে।

দুয়ের মধ্যিখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সুবিস্তীর্ণ চর।

বর্ষাকালে যখন ঢল নেমে ভাসিয়ে নিয়ে যায় চরকে, তখন মূল প্রবাহ আর শাখার মাঝে সীমা নির্দ্দেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। শীতের সুরুতে সবুজ ঘাসে ভরা চর আবার ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করে জেগে ওঠে।

এপারে বিস্তীর্ণ জঙ্গল, দুর্ভেদ্য বললে বেশী বলা হবে না। ঝাউ, বাবলা, কুল, পলাশ, শিমুল, শিরীষ প্রভৃতি অসংখ্য জানা অজানা গাছের অরণ্য এমন ঘন হয়ে জমাট বেঁধেছে যে, সেখানে বসবাস ত দূরের কথা চাষ-আবাদের চিন্তা পর্য্যন্ত কেউ মনে স্থান দেয় নি। নদীর কিনারায় ঝাউ বাবলা আর শিরীষ গাছের অগণিত শাখা-প্রশাখা একেবারে জলের উপর ঝুঁকে পড়েছে। বেড়ী, ভাঁট, শর আর বনশিউলির জঙ্গল পাড়ের মাটিতে চাপ হয়ে বসেছে। নদীর বুকে ঝুঁকে-পড়া বাবলা-শিরীষের ডালে ডালে জড়িয়ে থাকে উদ্যত শমন। তীরের ভিজে মাটিতে শ্যাওড়া-ভাঁটের জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে বদ্ধ হয়ে থাকে ভীমরাজ, সূর্য্যমণি আর শঙ্খচূড়ের উত্তপ্ত নিশ্বাস।

কিন্তু অরণ্যের সবচেয়ে বিস্ময়ের বস্তু হ'ল এক বিপুল বটবৃক্ষ। সে যে কতকালের কেউ তা জানে না। তার স্তম্ভের মত বিপুল-পরিধি ঝুরির সংখ্যা যে কত সে সম্বন্ধে কারও কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। শাখা-প্রশাখা সমেত, অরণ্যের প্রায় অর্দ্ধেকটা জুড়ে রয়েছে এই বিরাট মহীরুহ। হিন্দুরা ভক্তি করে, দূর থেকে মাথা নোয়ায়, বলে ওখানে মাটির তলায় পোঁতা আছে শিবলিঙ্গ। এ কথা তারা শুনে আসছে তাদের পিতৃ-পিতামহের মুখ থেকে। এ সম্পর্কে কারও মনে কোনদিন লেশমাত্র অবিশ্বাসের ছায়াপাত হয় নি বরং কালের গতির সঙ্গে সে বিশ্বাসের ভিত্তি ক্রমশঃ দৃঢ়তর হয়ে উঠছিল। মুসলমানরা বলে—ওখানে আমাদের পীরের আস্তানা, মণিরুদ্দি মোল্লা নিজে চোখে তাঁকে একদিন ঘোড়ায় চড়ে বনের চার পাশে টহল দিতে দেখেছে। হিন্দুরা তাতে আপত্তি করে নি, কারণ বাবার আস্তানা আছে বলে যে পীরের আস্তানা থাকবে না এমন ত কোন কথা নেই। মোট কথা গ্রামের সকলেরই কাছে ওই বৃক্ষটি ছিল এক পরিপূর্ণ রহস্য। অবশ্য গ্রাম এখান থেকে অনেক দূরে, অন্ততঃ দু' ক্রোশের কম নয়।

গ্রামের জমিদার উমাপতি বাবু সজ্জন লোক। নদীর ধারে বিরাট অরণ্য তাঁরই দখলে। সেখান থেকে অর্থাগমের বিশেষ কোন উপায় ছিল না বলে এত দিন ও সম্পর্কে প্রায় উদাসীনই ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন আবার নতুন করে উত্থাপিত হ'ল সেই অরণ্যঘটিত প্রশ্ন। কেন হ'ল তাই বলছি।

এক দিন জনকয়েক ভিন্‌দেশী লোক কাছারীর সামনেকার বারান্দায় এসে জমিদারবাবুর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলে। উমাপতি বাবু কাছারীতেই ছিলেন, বেরিয়ে এসে ওদের মুখের পানে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, কি চাই?

আগন্তুকদের গা খালি, পরণে মোটা কাপড়, মুখে বন্য রুক্ষতার সঙ্গে সারল্যের স্পর্শ। সম্মুখের লোকটির চেহারায় এমন একটা বৈশিষ্ট্যের ছাপ ছিল যে, সবার মাঝে থেকেও সে যেন স্বতন্ত্র। দেহখানা যেন পাথর কুঁদে তৈরি, মুখে কঠিন সঙ্কল্পের ছাপ, বয়স বোধ হয় পঞ্চাশের কাছাকাছি। উমাপতিবাবু বেরিয়ে আসতেই সবাই মাথা নীচু করে নমস্কার করলে। তার পর সম্মুখের লোকটি যা নিবেদন করলে তার মর্ম্ম হচ্ছে মোটামুটি এই:

মারেং বলে যাযাবরদের একটা গোষ্ঠী ঘুরতে ঘুরতে নদীর ধারে জঙ্গলের কাছে এসে আর এগোবার কোন সম্ভাবনা না দেখে সেইখানেই তাঁবু ফেলে। রাতে তাদের সর্দ্দার মংলু স্বপ্নে দেখে—বাবা মহাদেব তাকে ডেকে বলছেন, 'তোরা আমার আশ্রয়ে এসেছিস, নির্ভয়ে বাস কর। দূরে ওই বটগাছের তলায় আমার আস্তানা। তোরা আমার পূজা দিবি, মানত দিবি, সেবা করবি। আমার ওপর যতদিন তোদের ভক্তি অটুট থাকবে ততদিন তোদের কোন অকল্যাণ হবে না।'

ঘুম ভাঙ্গতেই সর্দ্দার দলের সবাইকে ডেকে তার স্বপ্নের কথা জানায়। সবাই মেনে নিয়েছে বাবার আদেশ।

বৃদ্ধ উমাপতিবাবু হেসে বলেন, বেশ ত, তা না হয় হ'ল, কিন্তু তোরা আমায় দিবি কি?

মংলু সর্দ্দার বলে, তুকে আর আমরা কি দিব রাজাবাবু। দেখছিস ত আমরা গরীব মানুষ, জীব জানোয়ার মারি খাই! মানুষজনের বাড়ী তাগাতাবিজ বিলাই, তাতে কেউ বা খুশী হয়্যা দু'মুঠা চাউল দিলেক। পয়সা কড়ি আমাদের নাই। তবে তু হলছিস মোদের জমিদার, ধরম বাপ, তুকে মোরা বাপের মত ভক্তি করব, আর আমরা হলছি গিয়ে তুর পেজা, তু মোদের বেটার মত ভালবাসবি; ব্যাস, ইয়ার সাথে টাকাকড়ির কারবার কুথাও নাই।

উমাপতিবাবু হেসে বললেন, কিন্তু দেখিস, শেষে যেন্ মালিককে অস্বীকার করিস নে।

সর্দ্দার জিব কেটে বললে, আরি বাস রে, উ কথা বুলিস না রাজাবাবু। মাথার উপর ভগমান্ নাই? পায়ের তলে মা বসুমতী নাই? মারেং কুলের ইজ্জত নাই? একটা কথা মনে রাখি দিস রাজাবাবু, আমরা গরীব হতে পারি, কিন্তুক নিমকহারাম নই।

পুনরায় নত হয়ে নমস্কার করে সবাই ফিরে যায়।

মড় মড় করে মাটি কাঁপিয়ে ভূতলশায়ী হচ্ছে বিরাট বিরাট

বনস্পতি। চতুর্দ্দিক থেকে শব্দ উঠছে ঠক্ ঠক্, মড় মড়। পুরাতন, নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে প্রাণভয়ে ছুটে চলেছে জীবজন্তুর দল। দিগ্বিদিগজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে দাঁতাল শূয়োর, তাকে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছে মানুষ আর কুকুরের দল। বুনো খরগোস ভয়ে মুখ লুকিয়েছে উলুঘাসের জঙ্গলে। শ্লথগতি গোসাপ তীরের ঘায়ে পেরেক-আঁটা হয়ে বসে যাচ্ছে মাটিতে। পশু-জগতে সর্ব্বত্র আতঙ্কের সঞ্চার হয়েছে, নীড়ভ্রষ্ট পক্ষিকুল উড়ে চলেছে ঝাঁকে ঝাঁকে, কলকণ্ঠে বনভূমি মুখরিত করে। অরণ্য কেটে নগর বসাচ্ছে মানুষ।

তাঁবুর জায়গায় উঠেছে উলুখড়ে ছাওয়া মাটির ঘর, ভবঘুরেরা হয়েছে স্থায়ী বাসিন্দা। নিশ্চিন্ত গতানুগতিক জীবনযাত্রার মোহ ভুলিয়ে দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ জীবনের আনন্দ। তাই ওদের পূর্ব্ব-পুরুষদের মানা আছে, এক ঠাঁইয়ে তিন দিনের বেশী আস্তানা গাড়িস না, মাটির নেশা একটি বার পায়ে বসলে তাকে বিনাশ করার ক্ষ্যামতা কারও নাই।—চিরপ্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম ঘটাল বাবার আদেশ।

বটগাছের চারপাশের জঙ্গল নির্ম্মূল করে দিয়েছে মারেংরা। বনস্পতির ঘন পত্রাচ্ছাদনে আলো-বাতাসের গতি রুদ্ধ হওয়ায় তার নীচে অরণ্য সৃষ্ট হবার অবকাশই পায় নি। দিনের বেলায়ও বনস্পতির সীমানার বাইরে দাঁড়িয়ে ভেতরদিকে দৃষ্টি চলে না। মারেংরা বলে, বাবার আদেশে হোথাকে পবনের পবেশ নাই, বিরিক্ষির সব কয়টি পত্তর রবেক থির হয়্যা। বিরিক্ষির তলে পশু-পক্ষীতে বিষ্ঠি ত্যাগ করতে লারবে, একটিও শুকনা পত্তর পড়ি থাকতে লারবে। গোবর-নিকানো উঠানের মত ধব ধব করতে থাকবেক সারাটা আঙন। দিনমণি পাটে যাবার সাথে সাথে বাবারে জাগায়ে দিয়া যায় শিয়ালের হাঁক, পেঁচাদিগের ডাক, আর কালো বাদুড়গুলানের পাখার ঝটপটানি। বাবার অঙ্গের নাগ-নাগিনীগুলা আলস ভেঙ্গ্যা ফণা দোলাতে থাকে, বুড়া বটগাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায় লাগে ঝড়ের মাতন, বাইরের পিথিমীতে তার পরশ লাগে না। আলেয়ার সাথে সাথে তাধিয়া ধিয়া নাচি ফিরে বাবার অনুচর ভূত পেরেতের দল।

প্রতি সন্ধ্যায় সবাই বৃক্ষের সীমানায় জড়ো হয়ে প্রার্থনা করে—

"হেই গো বাবা, শরণ লিইছি তুমারি চরণে
দোষ হইলে ক্ষ্যামা দিও আপুনারি গুণে।
শ্মশানে মশানে ফেরো অঙ্গে মেথ্যা ছাই
লয়ন দুটি ঢুলু ঢুলু লেশাতে সদাই—
সর্ব্বাঙ্গে জড়ায়ে থাকে বিষহরির কণ্ঠে
লিজ কণ্ঠে লিলেক বিষ তিভুবনের জন্যে।
বিষের লেশায় চোপর দিন মত্ত হয়্যা থাকো
হেই গো বাবা পায়ে পঁড়ি রোষ করিস নাকো।"

বছর দশেক কেটে গেছে।

অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে যাযাবর-গোষ্ঠীতে এই দশ বছরের মধ্যে। বাচ্চারা ডাঁটো হয়ে উঠেছে, ছোকরারা জোয়ান হয়ে উঠেছে, পুরোনো সবাই প্রায় বিদায় নিয়েছে, বাকি আছে শুধু মংলু সর্দ্দার নিজে আর বুড়ো গুণীন ভোদো।

সর্দ্দারের ইস্পাত-কঠিন দেহেও এসেছে বার্দ্ধক্যের ছাপ। দেহে নেই আগেকার সেই মত্ত হস্তীর বল, চোখে নেই আগেকার সেই চিতাবাঘের দৃষ্টি, বহুকালের পুরোনো সিংদরজার ভিত টলেছে, হেলে পড়েছে। পাথরের মত শক্ত ইটেও নোনা লেগেছে।

কেবল বদলায় নি সেই বুড়ো গুণীন ভোদো। আজকের লোক নয় এই ভোদো। সে মারেং-গোষ্ঠীর পুরোনো গুণীন, মন্ত্রসিদ্ধ। যাযাবরদের আস্তানার চারপাশে তার গণ্ডী দেওয়া আছে। দেব-দানব, ভূত-প্রেত, যক্ষ-রক্ষ, পিশাচ-কিন্নর, ডান-ডাকিনী যিনিই হোন না কেন, কারও প্রবেশ-অধিকার নেই এই গণ্ডীর ভেতর। সাপে কাটা, উপরি হাওয়ার স্পর্শ, দুরারোগ্য ব্যাধি সবকিছুরই প্রতি-বিধান করার ক্ষমতা রাখে এই বুড়ো গুণীন। সে জানে না এমন কোন বিদ্যা থাকতে পারে, একথা মারেংদের কাছে অবিশ্বাস্য। কিন্তু আশ্চর্য্য এই মানুষ, যার বয়েসের হিসেব কেউ রাখে না, দলের ভেতর থেকেও সে দলছাড়া। থাকে মারেংপাড়ার একপ্রান্তে, সংসারে থাকার মধ্যে আছে একমাত্র মেয়ে ভামিনী। সম্বলের মধ্যে আছে একটা পুঁটলী, তার ভেতরে একগাদা গাছ-গাছড়া, জড়ী-বুটি, নানা আকারের ছোটবড় পাথরের টুকরো, গোটাকয়েক মাদুলী, আর আছে ধনেস পাখীর ঠোঁট, চিতাবাঘের নখ, সিঁদুরমাখানো পেঁচার মাথার খুলি, কালো বেড়ালের হাড়। বুড়োর ভাবলেশহীন মুখের পানে চাইলে মনে হয় মৃতের মুখ। কেবল ঘন শুভ্র ভুরুর তলায় ছুরির ফলার মত ধারালো দুটো কোটরগত চোখই একমাত্র বহন করে জীবনের সাক্ষ্য।

ঈশান কোণে দেখা দিয়েছে কালো মেঘের রেখা—

মেঘের বরণ দেখেই চিনেছে মংলু সর্দ্দার। একটু বাদেই সুরু হবে কালবৈশাখীর মাতন।

সর্দ্দারের চোয়ালের পেশী স্ফীত হয়ে ওঠে। জোয়ানদের ভেতরে যে একটা চাপা অসন্তোষ দিবারাত্র গুঞ্জন করে ফিরছে এ খবর তার অজানা নয়। পুরানো সর্দ্দারে তাদের রুচি নেই, তারা চায় নতুন। বয়েসটা তাদের নতুন, তাই পুরানো সবকিছুরই উপরে তাদের নিদারুণ অবজ্ঞা আর উপেক্ষা। কিন্তু সেজন্য তার কোন আক্ষেপ নেই, তার আক্ষেপের কারণ হচ্ছে তারা চায় তারই নিজের বেটা বিষাণকে।

—নিজের বেটা, সর্দ্দার হাসে। সে হাসিতে উপচে পড়ে বিজাতীয় ঘৃণা।

—নিজের বেটা, সবাই তাই জানে বটে। কিন্তু সত্যিসত্যিই ওর নিজের বেটা হলে ক্ষোভের কোন কারণ থাকত না। আজও চোখ বুজলেই মংলুর চোখের সামনে ভেসে ওঠে বছর পঁচিশ আগে-কার একখানা ছবি।...

নদীর ধারে পড়েছে যাযাবরদের তাঁবু। পাশেই কুমোরথালির বিখ্যাত হাট, উপরেই গ্রাম। হাট বসবে পরের দিন। এদের মতলব সকালবেলা হাটে তাগা-তাবিজ মাদুলি বিক্রি করবে। দুপুরবেলা এদের মেয়েরা গেরস্তবাড়ী ঘুরে ঘুরে অথর্ব্ব গৃহিণীদের দেবে বাতের ওষুধ, স্বামী-পরিত্যক্তাদের শেখাবে বশীকরণমন্ত্র, আর রিকেটগ্রস্থ শিশুদের ঝাড়ফুঁক করে অপদেবতার নজর থেকে মুক্ত করবে। পরিবর্ত্তে চেয়ে নেবে গৃহিণীদের পরনের পুরানো সাড়ী, মোটাগোছের সিধে, চাই কি কখনও কখনও দু'একটা নগদ টাকাও মিলে যেতে পারে। এ ব্যবসা এদের নতুন নয়, অনেক কাল থেকেই চলে আসছে।

সেদিন ছিল শিব-চতুর্দ্দশীর রাত্রি, কালরাত্রি।

দ্বিতীয় প্রহরের শেয়াল ডেকে গেছে। বাইরে নিশ্ছিদ্র কালরাত্রি। চারদিকে একটা থমথমে ভাব, গাছের একটা পাতা পর্য্যন্ত নড়ছে না।

বাঘিনীর মত পা টিপে টিপে তাঁবুর ভেতরে ঢুকল রূপমতী, সর্দ্দারের সাঙা, কোলে নিয়ে এক সদ্যোজাত শিশু।

কঠিন হয়ে উঠল সর্দ্দারের মুখ। চাপা গর্জ্জন করে বলে, কুথা হতে লিয়ে আলি ইটারে?

ঝিলিক দিয়ে ওঠে, তাতে তুর কি কাম আছে রে বট?

তার পর শিশুর মুখের পানে খানিক নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, চোখের দৃষ্টিতে আসে ভাবালুতা। সহজ কণ্ঠেই বলে চলে—

দুপুরবেলা জড়ীবুটি লয়ে গেইছিলাম উই হোথাকার পাকা লাল বাড়ীটায়। গিয়া শুনলাম তাদিগের ছোট বউটার ছাওয়াল হইছে। উঠানের এক পাশে ছেঁচা বেড়ার ঘের দিয়া আঁতুরঘর বানাইছে। বাতার ফাঁক দিয়া খোকাডার পানে লজর পড়তে দিষ্টি ফিরাতে লারলম। সোনার বরণ ছাওয়ালডারে দেখ্যা পরাণের ভিতরটা যেন মুচড় দিয়া উঠল। সন্জে লাগতেই চুপিসারে গিয়া দেখি ছাওয়ালডারে কোলের কাছে লিয়া উয়ার মা নিদ্যা যাইছে, শিয়রে জ্বলছে একটা কেরোচিনের কুপি, আশপাশে কেউ কুথাকেও নাই। পায়ে পায়ে আগায়ে গিয়া ছাওয়ালডারে কোলে তুল্যা লিয়া, বাতিটারে এক ফুয়ে লিবায়ে দিয়া সিধা ছুটতে লাগলাম। এক ছুটনে ডেরায় এস্যা হাজির হলছি।

এখনও হাঁপাচ্ছে রূপমতী। নিঃসন্তানের চোখে মাতৃত্বের ক্ষুধা জ্বল জ্বল করে।

উপায় নেই, কোন উপায় নেই। ক্রোধে, ক্ষোভে মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে সর্দ্দার। হঠাৎ কি ভেবে কঠিন কণ্ঠে বলে, ইটারে এই বেলা গাঙের জলে ভাসায়ে দে।

ক্যানে? গর্জ্জে ওঠে রূপমতী, কিসের তরে ইয়ারে গাঙের জলে ভাসায়ে দিব? আজ থেক্যা উ আমার বেটা। মাথার উপরে ভগমান আর পায়ের তলে মা বসুমতী সাক্ষী রইছেন, আজ হতে উ আমার ছাওয়াল। খবরদার ইসব কথা আর মুখে আনিস না, ভাল হবেক না বুল্যা দিছি।

বাঘিনীর চোখের মত ধ্বক ধ্বক করে রূপমতীর চোখ।

উপায় নেই, বাঘিনীর কোল থেকে শাবককে ছিনিয়ে আনতে পারে এমন হিম্মত কারও নেই।

নিষ্ফল ক্রোধে বাইরে বেরিয়ে আসে মংলু সর্দ্দার। চাপা কণ্ঠে হাঁকে, আস্তানা উঠাও।

এমন প্রায়ই ঘটে থাকে, কেউ কোন প্রশ্ন করে না।

পরের দিন মারেং-গোষ্ঠীতে খবর ছড়িয়ে পড়ে, সর্দ্দারের ছাওয়াল হইছে গো, রাঙা টুকটুকে ছাওয়াল।

তাই জানে সবাই।

ছেলেটাকে তখন থেকে আগলে আগলে ফিরছিল রূপমতী, বাঘিনী যেমন করে আগলে ফেরে নিজের সন্তানকে। সেই রূপমতী মারা গেছে আজ তিন বছর, বিষাণ এখন জোয়ান মরদ।

—নিজের বেটা, বিকৃত হয়ে ওঠে মংলু সর্দ্দারের মুখ অপরিসীম ঘৃণায়।

কিন্তু কেন যে এই বিজাতীয় আক্রোশ, সর্দ্দার নিজেই এক এক সময় ভেবে কূলকিনারা করতে পারে না।

রূপমতী যদি হাড়ি, ডোম বা ঐ রকম কোন নীচজাতীয় পরিবার থেকে শিশু চুরি করে আনত, তা হলে হয়ত শিশুটির উপর সর্দ্দারের মন বিরূপ হ'ত না। কিন্তু তা না করে সে চুরি করেছিল ভদ্র-পরিবার থেকে, যারা সামনে এদের দেখলে ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে চলে যায়। এই 'ভদ্দর লোকের' জাতটাকে এরা দু'চক্ষে দেখতে পারে না। শত চেষ্টাতেও একথা সর্দ্দার ভুলতে পারে না যে বিষাণ হচ্ছে তাদেরই একজন। তেলে-জলে মিশ খায় না কোন কালে, কিন্তু ডোবার জলে আর পুকুরের জলে সব সময়েই মিশ খায়।

কপাটের মত চওড়া বুক, শালগাছের মত ঋজু-কঠিন দেহ, চোখে একটা অনমনীয় দৃপ্ত ভঙ্গিমা, ঠোঁটের ডগায় তাচ্ছিল্যভরা হাসির টুকরো। সব জড়িয়ে তার ভেতর এমন একটা কিছু ছিল যার সামনে সব মারেং যুবকই মাথা নোয়ায়।

আর একটা খবর সর্দ্দারকে চিন্তিত করে তুলেছে। ভোদো গুণীনের মেয়ে ভামিনীর সঙ্গে বিষাণের আশনাই।

এ রকম আশনাই নতুন কিছু নয় মারেং-কুলে, হামেশাই ঘটে থাকে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এ আশনাই হচ্ছে কালনাগের সঙ্গে কালনাগিনীর আশনাই, মেঘের সঙ্গে বিজলীর আশনাই।

তাই এত ভয়।

আশ্চর্য্য মেয়ে এই ভামিনী, যেন আগুনের শিখা। তার আষাঢ়ের জলভরা মেঘের মত কালো চোখে যখন বিজলী চমকায় মারেং জোয়ানদের বুকের ভেতরে তখন তুফান ওঠে। এক টুকরা পাহাড়ী ঝরণার মত উচ্ছল আনন্দে নেচে কুঁদে ছুটে চলেছে, কাউকে ভ্রূক্ষেপ করে না। যে সর্দ্দারের মুখের সামনে চোখ তুলে কেউ তাকাতে পারে না, ও তার সামনে হেসে গড়িয়ে পড়ে, তীরের ফলার

মত ধারালো বাক্যবাণে বি ধতে কসুর করে না। বাঁদরের মত নাচিয়ে ফেরে মারেং জোয়ানদের।

তাই এত ভয়। ঝড়ের সঙ্গে আগুনের আশনাই, শমনের সঙ্গে নিয়তির আশনাই।

সন্ধ্যে হতেই আড্ডা বসে পাড়ায় ছেলেছোকরাদের এই ওস্তাদের বাড়ীর উঠানে। সে আসর ভাঙ্গে দ্বিতীয় প্রহরের শেয়াল ডাকার পর। আসরের মধ্যমণি হচ্ছে বিষাণ আর ভামিনী। এক হাত মাথায় আর এক হাত কোমরে রেখে সারা অঙ্গ হিল্লোলিত করে নাচতে থাকে ভামিনী, নাচতে নাচতেই ছড়া কাটে—

হায় গো হায়, মনের কথা বুলতে নারি লাজে,

বিষাণ তাল দিতে দিতে মিলিয়ে দেয়—

সি কথাটাই শুনার তরে নিদ্যা ছাড়েছি যে।

ভামিনীর চোখে বিজলী ঝিলিক দিয়ে ওঠে, আবার ছড়া কাটে—

হায় গো হায়, কুল ত্যজেছি তুমারি কারণে।

বিষাণ মৃদু হেসে ওর নৃত্যরত পা দুটোর দিকে আঙুল দেখিয়ে মিলিয়ে দেয়—

উ রাঙা চরণ দিও জেবনে মরণে।

হো হো করে হাসির ফোয়ারা ছোটে। সে হাসির রেশ বাতাসে ভর করে সর্দ্দারের কানে এসে পৌঁছায়।

সর্দ্দারের মুখের পেশী কঠিন হয়ে ওঠে। রাহুর মত এদের দু'জনের আবির্ভাব ঘটেছে তার জীবনে।

সারা মারেংপাড়াটা থম থম করছে: দিঘাইয়ের ছোট ছেলেটাকে সাপে কেটেছিল কাল রাতে, আজ সকালে মারা গেল। সারা রাত ধরে ঝাড়-ফুঁক করেছে বুড়ো গুণীন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। বুড়ো কপাল চাপড়ে বললে 'নেয়ত'।

সবার মুখে আষাঢ়ের মেঘ। মৃত্যুর জন্যে নয়. মৃত্যু এদের কাছে নতুন নয়: বন্যপশুর হাতে বন্য যাযাবরের মৃত্যু অহরহই ঘটে থাকে। কিন্তু এ মৃত্যু হচ্ছে নাগদংশনে মৃত্যু, সে নাগ হচ্ছে বাবার অঙ্গের ভূষণ, মা বিষহরির কন্যা। নাগকুলের মত এরাও হচ্ছে বাবার আশ্রিত, তাই সম্পর্কে তারা গুরুভাই। আজ দশ বছর তারা পাশাপাশি বাস করে আসছে, কোন দিন বিবাদ হয় নি। তবে আজ কেন ঘটল নাগ-দংশনে মৃত্যু।

বৃক্ষের সীমানায় সবাই গোল হয়ে বসে ভাবে কেন? কেন?

বাবার রোষ? কিন্তু বাবাই ত তাদের দিয়েছেন অভয়।

তবে কি বাবার চরণে কোন্ অপরাধ ঘটল? কিন্তু কি সে অপরাধ?

হঠাৎ মেঘের মত গর্জ্জে উঠল সর্দ্দারের কণ্ঠ।

পাপ, পাপ অর্শাইছে মারেং-গুষ্ঠীর পরে, মেইয়া লোকের পাপ। পাপিনী হলছে উই বুড়া গুণীনের কন্যে ভামিনী। বাবার আশ্রয়ে বাবার পেজা হয়া বাস করিছে মনে নাই। বাবার চরণতলে বাস কর্যা পরপুরুষের সাথে করতেছে আশনাই, শরম নাই। ই পাপের বিচার হবেক না বাবার থানে?

সবাই গর্জ্জে ওঠে, হবেক, আলবৎ হবেক।

খিল খিল করে হেসে ওঠে ভামিনী মুখে কাপড় চাপা দিয়ে। বলে, ক্যানে গো সর্দ্দার শরম কিসের, ই ব্যাপার ত মারেং-কুলে আজ লতুন লয় গো। কুন কালে এমনটা ঘটে নাই আমারে বুলতে পার? তুমাদের কালে হয় নাই মারেং মেইয়াদের সাথে পরপুরুষদের আশনাই? হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্গব নাকি গো খ্যাষটায়।

মংলুর সঙ্গে রূপমতীর আশনাই; সেকালের কথা, কিন্তু একালেও সকলেই জানে। ছেলেছোকরাদের ভেতর একটা চাপা হাসির ঢেউ খেলে যায়।

অপমানে কালো হয়ে ওঠে সর্দ্দারের মুখ, কিন্তু নিঃশব্দে হজম করে সবকিছু। মনে জানে এবার সে যে আঘাত হানবে ভামিনীর শিরে তা বজ্রের মতই ভয়ানক, তাকে রোধ করার সাধ্য কারো নেই।

মেঘমন্দ্র স্বরে সর্দ্দার বলতে থাকে, কাল রাতে স্বপনে দেখলম বাবা আসিছেন, আসি বুল্ ছেন, রাজার পাপে হয় রাজ্যিনাশ আর মেইয়া লোকের পাপে হয় কুলনাশ। উই মেইয়াটার পাপ অর্শাইবে তুদের মারেং-গুষ্ঠীর পরে, সি পাপে হবেক তুদের কুলের বিনাশ। পেরাচ্চিত্তি করতে হবেক উয়ারে। কাল থেক্যা উ হবেক আমার সেবাদাসী, আমার বিরিক্ষির তলে হবেক্ উয়ার বাস। সকাল সন্‌ঝে দু'বেলা করবেক আমার আরাধন, মন-পান সমপ্পন করবেক আমার চরণে। পরপুরুষের চিন্তার ঠাঁই হবেক না উয়ার অন্তরে। ত ছাড়া অপর কারো মুখের পানে চোখ তুল্যা চাবেক না। অপর কেউ আসতে লারবে উয়ার আস্তানায়।

ই হলছে উয়ার পেরাচ্চিত্তি।

সবাই সমস্বরে বলে, ঠিক ঠিক।

এক কথায় নির্ব্বাসন। যাযাবরদের সমাজ থেকে, সংসার থেকে, মনের মানুষের সান্নিধ্য থেকে বহুদূরে নির্ব্বাসন। ভামিনীর মত মেয়েরও চোখ ফেটে জল আসে।

কিন্তু উপায় নেই, এ আদেশ অচল, অটল, স্বয়ং বাবা ভোলানাথের আদেশ। একে রদ করার সাধ্য কারো নেই।

কিন্তু সর্দ্দারের মনে ছিল আরও গূঢ় উদ্দেশ্য। প্রাচীন বটবৃক্ষের নিরাপদ আশ্রয়ে নিরুপদ্রবে বাস করছে অসংখ্য নাগনাগিনী। সাক্ষাৎ শমনের সঙ্গে একত্র বাস। বিধি নেহাত বাম না হলে সবকিছুরই হবে স্বাভাবিক পরিণতি।

সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। সর্দ্দারের অন্তরের কথা বিষাণের অজানা নয়, কিন্তু উপায় নেই, যাযাবরদের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত করলে প্রলয় ঘটে যাবে।

নিষ্ফল আক্রোশে ওর চোখ দুটো জ্বলতে থাকে।

মাচলা খুঁটির গায়ে হেঁচা বেড়ার দেওয়াল দিয়ে তৈরি হ'ল ছোট ঘর ; মাথার উপর রইল উলুখড়ে ছাওয়া চাল। ঢাক আর কাঁসি বাজিয়ে মহাসমারোহে ভামিনীকে পৌঁছে দেওয়া হ'ল সন্ধ্যার আগেই।

সবাই ফিরে গেছে। বাইরে আস্তে আস্তে আঁধার ঘনিয়ে আসছে। আগড়টা টেনে দিয়ে নিথর হয়ে বসে থাকে ভামিনী, পলকহীন চোখে বাইরের পানে চেয়ে।

পালাবার উপায় নেই এখান থেকে, ধরতে পারলে মারেংরা কেটে কুচিয়ে ফেলবে। সর্দ্দার তাদের এমন জায়গায় ঘা দিয়েছে যেখানে যুক্তিতর্কের আবেদন নিষ্ফল। তাদের আজন্ম সংস্কারের বিরুদ্ধাচরণ করলে তারা ক্রোধে হয়ে উঠবে উন্মত্ত। বন্য পশুর চেয়েও ভীষণ বুনো মারেংদের ক্রোধ।

পরের দিন সকাল হতেই সর্দ্দার এসে হাজির হয়। ভামিনী তার মুখের পানে চেয়ে বাঁকা হাসি হেসে কণ্ঠে ব্যঙ্গ মিশিয়ে বলে, তুমার কপালটাই মন্দ গো সর্দ্দার, নতুবা এই যে সাতসকালে এস্থা হাজির হলে বুকে কত আশা লিয়ে যে গিয়া দেখব বিষের জ্বালায় জর জর মানুষটা পড়ি রইছে নীল বরণ হয়্যা, তা লয় এস্থা দেখলে কিনা যে মানুষটা দিব্যি কথাবাত্তা বুলছে। হায় হায় গো, ইই কি বাবার বিচারের ধরণ ?

হঠাৎ যেন বদলে যায় মেয়েটা। মুখখানা হয়ে ওঠে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত লাল টকটকে, চোখের দৃষ্টিতে উপচে পড়ে ঘৃণা—বলতে থাকে, এক জায়গায় গলদ থেক্যা গিছে গো সর্দ্দার, রাগের বশে খেয়াল রাখ নাই যে মুই ভোদো গুণীনের মেইয়া, যারে ভূত পেরেত, দত্যি-পিচাশ, ডান-ডাকিনী সবাই ডরায়, যার চোখের পানে নজর পরলে কালনাগিনী ফণা গুটায়ে লয়, সিই ভোদো গুণীনের মেইয়া।

হঠাৎ থেমে গিয়ে ঘরের এক কোণ থেকে টেনে বার করে গোবর-নিকানো এক বেতের ঝাঁপি। ঝাঁপির ঢাকনায় দুটো টোকা দিয়ে ঢাকনাটা খুলতেই ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে বিরাট এক ভীমরাজ গোখরো।—বাস রে, বলে লাফ দিয়ে পেছিয়ে যায় মংলু সর্দ্দার।

নাগিনী ততক্ষণে রুদ্ধ আক্রোশে মাটিতে ছোবল দেয়।

খল খল করে হেসে ওঠে ভামিনী। চোখের দৃষ্টিতে অবজ্ঞা মিশিয়ে সকৌতুকে বলে, ডর লাগছে নাকি গো ?

তারপর নাগিনীর লেজে একটা টান দিয়ে হাতের মুঠি ঘুরিয়ে গান ধরে,

> লাচোরে কালনাগিনী কালকে যে তুর বিয়া,
> লাচোরে কালনাগিনী গোঁন্থা ছাড়ি দিয়া।
> অঙ্গভূষণ হয়্যা থাকো কারো অঙ্গের 'পরে
> কারে দাও গো মরণ-কামড় লোহার বাসরঘরে।

তারপর সর্দ্দারের পানে চেয়ে বলে, ঠিক লয় গো সর্দ্দার ?

একটু থেমে আবার বলে, হাত দুখানা খুলা থাকলে ভোদো গুণীনের মেইয়া কালনাগেরে ডরায় না গো সর্দ্দার।

মুখ কালো করে বেরিয়ে যায় মংলু সর্দ্দার। যাতে দাঁত ঘষে বলে, গলদ গোড়ায় হল্ছে তা মানি, কিন্তুক গলদ শুধরাতেও জানে মংলু সর্দ্দার।

নদী পেরিয়ে, চর পেরিয়ে ওপারের মিলের বাজার থেকে এসেছে দারোগা-পুলিস, চুরির তদন্তে। দারোগা-পুলিস দেখেই সর্দ্দারের মুখের পেশী কঠিন হয়ে উঠে ক্ষণেকের জন্যে, পরক্ষণেই দারোগাবাবুর দিকে চেয়ে বিনীত হাসি হেসে বলে, গরীবের কুঁড়েয় বাবুমশায়ের পদার্পন ঘটল কিসের লেগে গো।—উত্তরের অপেক্ষা না করেই হাঁক দেয়, কই রে, একখানা চাটাই লিয়ে আয় না ইধারে, বাবুমশায় বসবেক, আর কখান চাটাই বিছায়ে দে বাকি কয় জনার তরে।

চুরি হয়েছে গৃহস্থের বাড়ীর বাসন। ছিঁচকে চুরির জন্যে বিখ্যাত এই যাযাবর-গোষ্ঠী। দিনের বেলা লোকের বাড়ী বাড়ী যায় তাগা-তাবিজ বেচতে, নজর করে আসে কোথায় কোন দামী জিনিষ রয়েছে ছড়ানো। রাতের বেলা গিয়ে সিঁদ দেয়, বাসন-কোসন যা পায়, সামনে নিয়ে আসে। তারপর জড়ী-বুটির ঝোলার ভেতর দুখানা একখানা করে নিয়ে যায় কাছে-পিঠের হাটে-বাজারে। সেখানে থাকে চোরাই মালের বাঁধা খদ্দের। সবকিছু সুসম্পন্ন হয়ে যায় এমন নিঃশব্দে যে বাইরের কাক-পক্ষীতেও টের পায় না কিছু। পুলিস কোন রকমে খোঁজ পেলে চক্ষের নিমেষে সবকিছু পুঁতে ফেলে কোন একটা বিশেষ গাছের গোড়ায়। পুলিসের খোঁজাই হয় সার।

তাই কোথাও চুরিচামারি হলে পুলিসের সকলের আগে দৃষ্টি পড়ে আশপাশের এই যাযাবরদের আস্তানায়।

মুখের সৌজন্যে ভোলবার লোক নন দারোগাবাবু। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চার দিকে চেয়ে বলেন তোদের ঘরদোরগুলো আমি এক-বার দেখব সর্দ্দার।

অমায়িক হাসি হেসে মংলু সর্দ্দার বলে, বেশ ত দেখ্যা যা না সব্বত্তর আতি পাঁতি কর্যা, কিন্তুক ই মুই আগে থেক্যা বুলে রাখছি শুধু খুঁজাই সার হবেক। বাইরের কুটাটিও কুথাকে মিলবেক না।

দারোগাবাবু জানেন এ এদের বাঁধা বুলি তাই বিশ্বাস না করে সর্ব্বত্র খুঁজে দেখেন। কিন্তু সর্দ্দারের কথাই ঠিক, বাইরের একটা কুটোও কোথাও মিলল না।

বিস্মিত হয়ে দারোগাবাবু হঠাৎ চোখ তুলে চান বিষাণের মুখের পানে, ক্ষণেকের তরে তার চোখে খেলে যায় একটা গভীর ইঙ্গিত। দারোগাবাবুর দৃষ্টিকে অনুসরণ করে সর্দ্দারও তাকিয়েছিল বিষাণের মুখের পানে। সে ইঙ্গিতের ভাষা বুঝতে তার দেরি হ'ল না। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না।

দারোগাবাবু উঠলেন, বললেন, ওই দেবদারুগাছের গোড়াটা আমি একবার দেখব। অনুচরদের আদেশ দিলেন খুঁড়তে।

সর্দ্দারের মুখ কালো হয়ে উঠল। শাবল বসাতেই উঠে আসে

নরম ঘাসের চাপড়া—কোপানো মাটির উপর চেপে চেপে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল কৃত্রিম উপায়ে। দু'চার কোপ মাটি তুলতেই ঠং করে আওয়াজ উঠল।

দারোগাবাবু সর্দ্দারকে দেখিয়ে বললেন, বাঁধ ব্যাটাকে, আজ ওর একদিন কি আমার এক দিন।

সর্দ্দার কেঁদে পড়ল পা জড়িয়ে, হেইগো বাবু, ইবারটির মত ছাড়ি দে, তুর চরণ ছুঁয়্যা বুলছি এমুন করম আর কথুনো হবেক না। হেই গো বাবা।

সভ্যজগতের আইন-শৃঙ্খলার নামে এরা আঁতকে ওঠে। দারোগাকে ভাবে সাক্ষাৎ শমন, পুলিসকে ভাবে যমদূত আর থানা-গারদকে ভাবে মূর্ত্তিমান নরক।

তাই মংলু সর্দ্দারের মত দুর্দ্দান্ত সিংহও ভেড়া বনে যায় থানা-পুলিসের নামে। লাথি মেরে পা ছাড়িয়ে দারোগা বলেন, ওঠ ব্যাটা, আগে থানায় চ, নাকিকান্না কাঁদিস পরে।

শুধু সর্দ্দারকেই নিয়ে গেলেন, জানেন মাথা বাদে দেহটার কোন মূল্য নেই।

সন্ধ্যের পর ফিরল সর্দ্দার। সর্ব্বাঙ্গে প্রহারের চিহ্ন। দারুণ মার খেয়েছে থানায়। শেষে হাতে পায়ে ধরে, কান মলে নাকে খত দিয়ে রেহাই পেয়েছে।

দারোগা-জমাদাররাও জানে এদের জেলে ঢোকানো মানে ভিড় বাড়ানো, বনের বাঘকে খাঁচায় ঢোকালেই সে নিরামিষাশী বনে যায় না।

গুম হয়ে বসে থাকে সর্দ্দার দু'হাঁটুর মাঝে মাথা গুঁজে।

দাঁতে দাঁত ঘষে। নিঃশ্বাসে বইছে যেন আগুনের ঝড়। সারা অঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে; প্রহারের আঘাতে নয়, অপমানের আগুনে।

প্রতিশোধ চাই, নিদারুণ প্রতিশোধ।

দুটো জানোয়ার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে। একটি একটু অসতর্ক হলেই অপরটি লাফ দিয়ে টুঁটি টিপে ধরবে।

নদীর পাড়ের জলা-বন থেকে উঠে এসেছে এক দাঁতাল শূয়োর। চঞ্চল হয়ে উঠেছে মারেংপাড়া। মরদরা যে যার টাঙ্গি, সড়কি, তীর-ধনুক নিয়ে হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়ল।

গোল করে বেড় দিয়েছে সবাই শূয়োরটাকে ঘিরে। যেদিক দিয়ে সে বেরুতে চায়, সেদিকেরই লোকজন হৈ হৈ করে তাড়া করে আসে। তখন ছোটে উল্টো দিকে, কিন্তু সেদিকেও সেই অবস্থা।

উন্মত্ত ক্রোধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষুরের আঘাতে মাটি খোঁড়ে।

ইতিমধ্যে সুকৌশলে বেড়টাকে ছোট করে এনেছে মারেংরা। পাল্লার মধ্যে এলেই অস্ত্র হানবে।

সাঁ করে ছুটে আসে তীর সর্দ্দারের ধনুক থেকে। পরমুহূর্ত্তেই লাফ দিয়ে সরে দাঁড়ায় বিষাণ। সে দাঁড়িয়ে ছিল বেষ্টনীর অপর দিকে, সর্দ্দারের ঠিক সামনাসামনি। তীরের ফলাটা তার গা ঘেঁষে বেরিয়ে গিয়ে আমূল বসে যায় পেছনের এক শিমুলগাছের গুঁড়িতে।

বুকে লাগলে কলজেটা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যেত।

হায় হায় করে ওঠে সকলে, আর একটুকুন হলে আপুন বেটাকে খুন করি ফেলাইতে গো সর্দ্দার, ভগমান বাঁচাইছেন উয়ারে। সর্দ্দারের হাত থেক্যা তীর ফস্কায়েছে জেবনে এই পেথম।

সর্দ্দার বিড় বিড় করে বলে, হুঁ, জেবনে এই পেথম।

বিষাণের চোখ দুটো জ্বলে উঠেই নিভে যায়। বাঘের চোখের ভাষা বাঘেই পড়তে পারে।

মারেংপাড়ায় মহামারী সুরু হয়েছে।

নদী পেরিয়ে, চর পেরিয়ে মারেংরা যায় ওপারে মিলের বাজারে তাগা-তাবিজ মাদুলি বেচতে। হাতে কাঁচা পয়সা পেলে ওদের জ্ঞান থাকে না, পেট পুরে খেয়ে নেয় খাদ্যাখাদ্য বিচার না করে। তাই ওদের মধ্যে কেউ যদি বয়ে নিয়ে আসে কালব্যাধির বীজ, তাতে বিস্ময়ের কি আছে?

কালব্যাধি কলেরা—

দলে দলে লোক মরছে, ফেলবার কেউ নেই। চারদিক থেকে উঠছে শেয়াল কুকুর আর শকুনের কোলাহল, মৃতদেহ নিয়ে চলছে কাড়াকাড়ি। সবার মুখে পড়েছে আতঙ্কের কালো ছায়া।

সবাই জড়ো হয়েছে বাবার আস্তানার সামনে। অপরাধ হয়েছে বাবার চরণে, মারাত্মক অপরাধ। তাই বাবার রোষদৃষ্টি পড়েছে মারেং-কুলের উপর, লেগেছে মড়ক। এবার কারো নিস্তার নেই।

কিন্তু কি সে অপরাধ?

সবার চোখেই প্রশ্ন, মুখে কারো ভাষা নেই।

উঠে দাঁড়াল সর্দ্দার। চার পাশে একবার চেয়ে নিয়ে বলতে সুরু করল, গোড়ায় দোষ হলছে মোদেরি; যখুনি জানতে পারলম তখুনি পাপিনীটারে বিনাশ করি নাই ক্যানে। বুঝা উচিত ছিল নাগিনী আপুন পেকিতি ছাড়তে নারে। বাবার চরণে নিজেকে সমপ্পন করা্যা, বাবার সেবাদাসী হয়্যা, বাবার সাথে শঠতা করলে অপরাধ হবেক না? সি পাপের ভাগ মারেং-কুলে অর্শাইবে না? কাল রাতের বেলায় সন্দ হ'ল, ভাবলম দেখি আসি মেইয়াটা কি করছে। গিয়া দেখি যা ভাবেছিলাম ঠিক তাই। একটুকুন একটুকুন চাঁদের আলো আসি পড়িছে বেড়াটার গায়ে, উতে হেলান দিয়া গপ্প করছে দু'জনায়। হাতের মুঠায় সড়কি থাকলে একসাথে গাঁথি ফেলতাম দু'জনারে। কিন্তুক ছাওয়ালটারে বেশী দোষ দিই না। উ হলছে বেটাছেলে, বয়সটা মন্দ, মেইয়াটার পিছু পিছু ঘুরছে চোখের নেশায়। দোষ সব উই মায়াবিনী মেইয়াটার, উই বেড়ালছে ইরে নাচায়ে। বিচার হবেক উয়ারী।

সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠে, হ হ বিচার হবেক উয়ারী।

সর্দ্দারের চোখ দুটো জ্বলে ওঠে, ভুল শোধরাবে এবার।

বলতে থাকে, বাবা কাল আমারে স্বপন দিছে, এই মেইয়াটায় পাপ থেক্যা হবেক তুদের মারেং-কুলের বিনাশ। কাল সনজে-বেলা হাত-পা বাঁধি ফেলি দিয়া যাস উয়ারে আমার বিরিঞ্চির তলে। সিথানে উয়ার বিচার হবেক।

শিউরে ওঠে বিষাণ, আতঙ্কে ওর মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। সর্দ্দারের মনের ভেতরটা ওর চোখের সামনে হয়ে গেছে দিবা-লোকের মত স্বচ্ছ। সুপ্রাচীন জীর্ণ বনস্পতির দেহে সৃষ্ট হয়েছে অসংখ্য কোটর, তার ভেতরে আশ্রয় নিয়েছে নানা জাতের অসংখ্য নাগ-নাগিনী। দিনের বেলা লুকিয়ে থাকে অন্ধকার বিবরে, রাতের আঁধারে নীচে নেমে আসে শিকারের সন্ধানে। সেখানে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকলে দেবতারাও রক্ষা করতে পারেন না। শৃগালের মত ধূর্ত্ত, আর চিতাবাঘের মত শয়তান এই সর্দ্দার। জানে হাত দুখানা খোলা থাকলে ভোদো গুণীনের মেয়ে কাল-নাগিনীদের ডরায় না। তাই আগে থেকে আটঘাট বেঁধে রেখেছে।

উন্মাদের মত ছুটে আসে বিষাণ, মাটিতে পা ঠুকে বলে, মিছা কথা, আগাগোড়া সব মিছা কথা। উ বিরিঞ্চে ভগমান নাই, বাবা তুকে কথুনো স্বপন দেয় নাই; ই-সব তুর কারসাজি রে বুড়া।

হা হা করে হেসে ওঠে মংলু সর্দ্দার, বলে, পেমান চাই ভগমান আছে কি না? কাল সকালে উঠি দেখি আসিস বট বিরিঞ্চির তলে, বাবার বিচারের লমুনা; পেমান পায়ে যাবি হাতে হাতে।

বিষে নীলবরণ হয়ে গিয়েছিল ভামিনীর দেহ, চোখ দুটো আতঙ্কে ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল।

বটগাছের সীমানা ঘিরে কঠিন পাহারা ছিল সেদিন সারা-রাত। অক্ষম ক্ষোভে বিষাণ উন্মাদের মত ছুটে বেরিয়েছে বনে-জঙ্গলে।

তারপর প্রতিটি রাত্রি হা-হা করে ঘুরে বেরিয়েছে সেই বট-গাছের তলে, সারারাত বিনিদ্র নয়নে অপেক্ষা করে থেকেছে কোন কালনাগিনীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার প্রত্যাশায়। শেষে ব্যর্থ হয়ে হাত ভরে দিয়েছে প্রতিটি কোটরে, কিন্তু আশ্চর্য্য, কোন নাগ-নাগিনীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় নি, কেউ তাকে দংশন করে নি।

নিষ্ফল হয়ে মাথা ঠুকেছে বটগাছের গুঁড়িতে।

বিষাণের মনে ছিল না সেদিন রাতে ভামিনী বলেছিল, মনের মানুষ গো, এই যে রাতবিরেতে আঁধারে আলে বাবার থানে, কাজটা ভাল কর নাই। হেথায়-হোথায় চতুর্দ্দিকেই ছড়ায়ে রয়েছে বাবার অঙ্গের ভূষণ। আঁধারে দিশা-বিশা না পায়ে কথুন কার অঙ্গে পা দিয়া ফেলবেক, দিবেক ডংশায়ে।

তারপর নিজের বাহু থেকে একটা ছোট মাদুলি খুলে নিয়ে ওর বাহুতে পরিয়ে দিয়ে বললে, ই মাদুলিটারে তু রাখে দে।

মাদুলিটা থেকে বেরুচ্ছিল একটা উগ্র কটুগন্ধ।

তারপর কি ভেবে ঘরের কোণ থেকে সেই ঝাঁপিটা টেনে নিয়ে বললে, দাঁড়া তুকে একটা মজা দেখায়ে দি।

দুটো টোকা দিয়ে ঝাঁপির ঢাকনাটা খুলে দিতেই ফোঁস করে ফণা তুলে দাঁড়াল সেই ভীমরাজ গোখরো। ওর আতঙ্কিত মুখের পানে চেয়ে খিল খিল করে হেসে মাদুলিভরা হাতের মুঠিটা এগিয়ে দিল সেই উদ্যত ফণার সমুখে। বিস্তৃত ফণা আস্তে আস্তে গুটিয়ে ছোট হয়ে গেল, তার পর সাপটা এলিয়ে পড়ল মৃতের মত হাতের মুঠার ওপরেই।

সাপটাকে ঝাঁপিতে ভরে রেখে ওর বাহুতে মাদুলিটা পরিয়ে দিয়ে বলেছিল, মুই হলছি গুণীনের বেটী, মোর তরে তু ভাবিস না। হাত দুখান খুলা থাকলে কালনাগেরে মুই ডরাই না। কিন্তুক তু ইসব জানিস না, মাদুলিটা তু রাখে দে। ই অঙ্গে থাকলে লাগ-লাগিনী কাছে ঘিঁসতে লারে, ফণা উঠালে মুখের সামনে ধরলে ফণা গুটায়ে লিবেক।

সেই মাদুলি ছিল ওর অঙ্গে, তাই নাগনাগিনীর দেখা মেলে নি।

প্রতিশোধ নিয়েছে মংলু সর্দ্দার, বড় ভীষণ প্রতিশোধ।

মিল বসবে নদীর ধারে।

উমাপতিবাবু সর্দ্দারকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, বললেন, রাজার তরফ থেকে দখল করে নিচ্ছে ও জমি, কল বসাবে। রাজার আইনের ওপর হাত নেই কারও। আমি নিরুপায়।

সর্দ্দার বলে, আমরা কুথাকে যাব রাজাবাবু?

মহামারীতে প্রায় নির্ম্মূল হয়ে গেছে মারেং-কুল। দশ-পনেরটা পরিবার এখনও টিকে আছে কোনরকমে। তাদের রক্তে নেই আগেকার সেই ভ্রমণের নেশা। নতুন করে ঘর বাঁধার মত আগ্রহ বা উৎসাহ কোনটাই আর তাদের অবশিষ্ট নেই। তাই মাটির সঙ্গে বিচ্ছেদের আশঙ্কায় ওদের প্রতিটি রক্তবিন্দু কাঁদে। এত-দিনের আশ্রয় ত্যাগ করে যাবার কথা ওরা ভাবতে পারে না।

উমাপতি বাবু উত্তর দেন, সেকথা তাদের আমি বলেছি। তারা বলেছে কারখানায় খাটবার জন্যে কুলীকামিনেরও ত দরকার আছে, তোরা না হয় সেই কাজই করবি। তোরা খাটবি, মাইনে পাবি, থাকার জন্যে ঘর পাবি। এর বেশী তারা আর কি দিতে পারে বল?

সর্দ্দার একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, হাঁ। তারপর আকাশপানে চেয়ে হাত দুখানা কপালে ঠেকিয়ে বলে, জাতি গিছে, কুল গিছে, ইবার ধরম যাবে; হেই গো বাবা তুমার মনে কি আছে ইই ছিলো।

কিন্তু সর্দ্দার তখনও ভাবতে পারে নি, এর চেয়েও বড় আঘাত অপেক্ষা করছে তাদের জন্যে।

কয়েক দিন পরে জনকয়েক দিনমজুর নিয়ে একজন বাবু এসে পৌঁছলেন। বললেন, সরকারের হুকুম ওই বটগাছ কাটতে হবে।

মাথার ওপর আকাশখানা ভেঙ্গে পড়লেও বোধ হয় কেউ এতটা বিস্মিত হ'ত না।

হুঙ্কার দিয়ে উঠল সর্দ্দার, খবরদার, উ কথা আর কথুনো মুখে

আনিস না বাবুমশায়। উ বিরিক্ষে বাস করেন দেবাদিদেব মহাদেব, যাঁর জটার ভিতর বাস করেন সুরধুনী, যাঁর সব্বাঙ্গে জড়ায়ে থাকে লাগলাগিনী, যাঁর চরণভারে পিথিমী করে টলমল, যাঁর দিষ্টির আগুনে পুড়্যা ছাই হয়্যা যায় তিভুবনের পাপ, যাঁর চারপাশে লাচি ফিরে ভূত পিরেতের দল। উ বিরিক্ষে হাত দিবেক যে জন, সে জন মরবেক মুখে রক্ত উঠায়ে।

বিদেশী জনমজুরদের ভেতর উঠেছে একটা মৃদু গুঞ্জন। তাদের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে এসে বললে, এ কাজ হবে না তাদের দিয়ে।

বাকি সবাই মাথা নেড়ে সমর্থন করে তাকে।

হঠাৎ মারেংদের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে বিষাণ, বলে, মিছা কথা বাবুমশায়, বুড়ার আগাগোড়া সব মিছা কথা; উ বিরিক্ষে ভগমানের অধিষ্ঠান নাই কুনকালে।

বাজের মতো ফেটে পড়ে সর্দার, এ্যাইও—

আশপাশের লোকজন চমকে ওঠে, পাখীরা কলরব করে গাছের ডাল ছেড়ে আকাশে ওড়ে।

সর্দারের মুখের পানে একটা তাচ্ছিল্যভরা দৃষ্টি হেনে বিষাণ মজুরদের পানে চেয়ে বলে, দে দিকিনি একখান কুড়ালি, তুদের দেখায়ে দিই দেবতার বসত আছে কি নাই।

একজনের হাত থেকে একখানা কুড়ুল নিয়ে বলে, আসো মোর পিছু পিছু। উত্তেজনায় ওর চোখ দুটো জ্বলতে থাকে।

সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত ওকে অনুসরণ করে।

গাছের গোড়ায় পৌঁছে পরণের ছোট কাপড়টাকে মালকোঁচা দিয়ে পরে। এক হাতে কুড়ুল নিয়ে আর এক হাতে বটের ঝুরি ধরে, পা দুখানা খাঁজে খাঁজে বসিয়ে দিয়ে বিচিত্র কৌশলে উঠে পড়ে মাটি থেকে প্রায় বিশ হাত উঁচু একটি ডালে।

এই ডালটারই একটু পেছনে আর একটু উঁচু দিয়ে চলে গেছে আর একখানা ডাল। সেটার গায়ে হেলান দিয়ে নীচেরটায় পা রেখে ঋজু হয়ে দাঁড়ায় কুড়ুলখানা হাতে নিয়ে।

উত্তেজনায় সারা দেহ থর থর করে কাঁপে।

সবাই নিশ্বাস রুদ্ধ করে অপেক্ষা করে।

কুড়ুলের কোপ পড়ে নীচের ডালটায়, এক, দুই, তিন।

হঠাৎ ভারসাম্য বজায় রাখতে না পেরে উল্টে পড়ে বিষাণ, ঘুরপাক খেয়ে সজোরে আছড়ে পড়ে কঠিন মাটিতে। নাকমুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত গড়িয়ে পড়ে। হৃৎপিণ্ডটা ফেটে গিয়েছে।

পাশব উল্লাসে নৃত্য করে ওঠে মারেংরা। দেবতার অস্তিত্বে অবিশ্বাসের অলঙ্ঘনীয় পরিণতি।

সহর থেকে সাহেবরা এসেছে, বনস্পতিকে ওড়াবে ডিনামাইট দিয়ে।

দূরে নিশ্বাস রুদ্ধ করে অপেক্ষা করে মারেংরা কানে আঙুল দিয়ে। সাহেবরা বলে দিয়েছে শব্দ হবে, প্রচণ্ড শব্দ।

একসঙ্গে যেন হাজারটা বাজ গর্জ্জে ওঠে। পৃথিবী টলছে, বাসুকি ফণা দোলাচ্ছে। দূরে খানিকটা অংশ ফেটে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে গেল। মড়মড় শব্দে মাটি কাঁপিয়ে আর্ত্তনাদ করে ভূপতিত হ'ল বিরাট মহীরুহ অতিকায় দৈত্যের মত।

হা হা করে বুক চাপড়ে কেঁদে ওঠে মারেংরা।

বাজের মত চীৎকার করে ওঠে সর্দার, গুটাও, আস্তানা গুটাও, মা বসুমতী সইতে লারবেন এত পাপের বোঝা, মারেং-গুষ্ঠী পুড়্যা ছাই হয়্যা যাবেক সি পাপের আগুনে।

ছুটে চলে যাযাবররা, সাজানো সংসার ফেলে রেখে। ছুটে চলে অনিশ্চিতের পানে দেবতার রোষের আগুন থেকে নিজেদের বাঁচাতে।

যায় নি শুধু সেই বুড়ো গুণীন। পরিত্যক্ত শ্মশানের ওপর দাঁড়িয়ে, আকাশপানে চেয়ে, হাত দুখানা মাথার উপর তুলে বিড় বিড় করে কি বকে সে আপন মনে।

হায়দর আলি এবং তাঁহার ইউরোপীয় সেনানীবর্গ

অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরদিবস মাদাম বিচার-সভায় নিতান্ত কাতরভাবে আসিয়া উপস্থিত হইয় ছিলেন। জেসুইট পাদ্রির বিশ্বাসভঙ্গ যে তাঁহাকে দুর্ভাগ্যের চরম সীমায় নিক্ষেপ করিয়াছে সেজন্য তাহাদের উদ্দেশ্যে বহু কটুকাটব্য বর্ষণ করিয়া তিনি স্বীয় অনুকুল একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় সৈনিকদিগের অনেকে তাঁহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া মনে মনে জেসুইটদিগের নিপাত কামনা করিতে লাগিল। যষ্টিবৎসর-বয়স্ক বৃদ্ধ ইটালিয়ান পাদ্রি দে লা তুরকে স্বীয় বক্তব্য একান্তে বলিবার জন্য ডাকিয়া লইয়া গিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম এই প্রকার ছিল : "মহাশয়, নিতান্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ সম্প্রদায়-মধ্যেও কখন কখন জুডাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে যাহার জন্য আমরা এই বিপদে পড়িয়াছি তাহাকেও উক্ত আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ঐ ব্যক্তি গোয়া যাইবার পূর্ব্বে আমি উহার সম্বন্ধে অপযশকর কিছু শুনিয়া তাহাকে সবিশেষ ভৎসনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় না হওয়াতে উহার সকল কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে আরম্ভ করি। গোয়া যাইবার অভিপ্রায়ে সে মাঙ্গালোর গিয়াছে শুনিয়া আমিও সেখানে গিয়াছিলাম এবং ফৌজদারের সাহায্যে তাহাকে আটক করিয়া সাধারণ্যে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলাম যে, উহার বিরুদ্ধে কাহারও কোন দাবি থাকিলে সে যেন কালবিলম্ব না করিয়া তাহা জানাইতে উপস্থিত হয়। দাবিদারগণের মধ্যে মাদাম মেকুইনেজও ছিলেন। তিনি চুণী-বসানো একজোড়া বালা, একছড়া মুক্তার মালা এবং নগদ দুই হাজার টাকা ফেরত লইয়া গিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজ-কুঠিতে এ বিষয়ে দলিলপত্র লিখিত হইয়াছিল। ফরাসী ও পর্ত্তুগীজ কুঠিয়াল তাহার সাক্ষী ছিলেন। আমি মাঙ্গালোরের পর্ত্তুগীজ-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উক্ত রসিদের নকল চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা উহা দিতেছেন না। আপনার পক্ষে সুবিচারের জন্য উহা পাওয়া আবশ্যক। নবাবের নামে কোন ফরাসী কর্ম্মচারীকে এ কার্য্যে পাঠাইবেন এবং তাহাকে বলিয়া দিবেন যেন সে পর্ত্তুগীজদের কোন আপত্তিতে কান না দেয়। সকল কার্য্য সঙ্গোপনে করা প্রয়োজন, নবাবের সমর-সচিব নরীমরাও (?) যেন কোন কথা জানিতে না পারে, নতুবা তাহার নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া পর্ত্তুগীজ কুঠিয়াল সব কাগজপত্র গোয়ায় সরাইয়া ফেলিবেন। আমার বিশ্বাস, নবাবের উক্ত মন্ত্রী, পর্ত্তুগীজ কুঠিয়াল, জেসুইট পাদ্রি এবং মাদাম মেকুইনেজ এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন।"

পরদিবস মাদাম আসিলে দে লা তুর তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "ছি ছি! এ তুমি কি করিয়াছ? স্বেচ্ছায় এ বিপদ কেন ডাকিয়া আনিলে? নবাবের দয়ায় ত তোমার অর্থের অভাব নাই। তবুও একজন বিধর্ম্মী এবং একজন ভণ্ড পাদ্রির সহিত হেয় চক্রান্তে লিপ্ত হইয়া "চার্চ্চের" সম্পত্তিতে লোভ করিতে তোমার এতটুকু বাধিল না? এখনও যদি সত্য কথা স্বীকার কর তবে আমি তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে পারি। সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। মাঙ্গালোর হইতে ফরাসী ও পর্ত্তুগীজ কুঠিয়ালদ্বয় এখানে আসিতেছেন। যদি বাঁচিবার বাসনা থাকে, এখনও সত্য কথা স্বীকার কর। নবাবের ন্যায়নিষ্ঠা তোমার অজানা নয়। তোমার জুয়াচুরি ধরা পড়িলে তিনি কি ভীষণ শাস্তি দিবেন তাহাও একবার ভাবিয়া দেখ!"

মাদাম এরূপ পরিণতির আশঙ্কা করেন নাই। ভয়ে তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি সকল কথা স্বীকার করিলেন, বলিলেন নরীমরাও এবং জেসুইট মিশনরীর পরামর্শে তিনি ঐ কার্য্য করিয়াছিলেন। বিবাদী ফাদার বৃথা অপবাদ হইতে রক্ষা পাইয়া প্রথমে পরম পিতার উদ্দেশ্যে প্রণতি জানাইয়া দে লা তুরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, 'যেন তিনি নবাবের নিকট সকল কথা প্রকাশ না করেন, কারণ তাহাতে স্ত্রীলোকটিকে বড় বিপদে পড়িতে হইবে।' দে লা তুরের নিকট গোলমাল মিটিয়া যাইবার সংবাদ পাইয়া হায়দর বলিয়াছিলেন, "মাননীয় ফাদারগণের বিরুদ্ধে ইহা চক্রান্ত বলিয়া মনে হয়। শুনিয়াছি বিবির স্বভাবচরিত্র ভাল নয়, তিনি এখনও সাবধান না হইলে পরে আবার নূতন কোন বিপদে পড়িতে পারেন। তোমরা যখন উহাকে মার্জ্জনা করিয়াছ তখন আমি আর কিছু করিব না।"

হায়দরের কথাই ফলিয়াছিল : মাদাম কিছুকাল পরে একজন ফিরিঙ্গী-পর্ত্তুগীজ সার্জ্জেণ্টকে বিবাহ করেন। ইহাতে হায়দর তাঁহাকে সার্জ্জেণ্ট-পদ হইতে নামাইয়া দিয়া তদুপযোগী বেতন দিবার জন্য বক্সীকে আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভুভক্ত বীর সৈনিক মেকুইনেজের বিধবা যাহাতে অভাবগ্রস্তা না হন সে বিষয়ে অবহিত থাকা তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু মাদাম তাঁহার পরলোকগত স্বামীর স্মৃতির মর্য্যাদা রক্ষা না করায় অতঃপর উঁহার সম্বন্ধে তাঁহার আর কোন দায়িত্ব ছিল না।

এই সময় দে লা তুরের পরামর্শে হায়দর এক কোর গ্রিনেডিয়র বা পাশ্চাত্য ধরণের পদাতিক সেনা গঠন করিয়াছিলেন। উহাতে দশ ব্যাটেলিয়নে মোট পাঁচ হাজার সৈনিক ছিল। তন্মধ্যে শুধু দুইটি ব্যাটেলিয়ন টোপাসী বা মেটে ফিরিঙ্গী লইয়া গঠিত হইয়াছিল। প্রত্যেক ব্যাটেলিয়ন আবার চারিটি কোম্পানীতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক কোম্পানীর নেতৃত্বে একজন ইউরোপীয় এডজুটাণ্ট বা সার্জ্জেণ্ট-মেজর এবং প্রত্যেক ব্যাটেলিয়নের অধ্যক্ষ-পদে একজন কমিশনপ্রাপ্ত অফিসর নিযুক্ত হইতেন। সাধারণ সিপাহীদের মাসে আট টাকা বেতন দেওয়া হইত, কিন্তু গ্রিনেডিয়রদের বেতন

ছিল মাসিক দশ টাকা। তদ্ভিন্ন উহাদের আরও কয়েকটি বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইত। তাহাদের কোন কঠিন শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে অথবা সান্ত্রীর প্রহরা দিতে হইত না। আদেশ-প্রাপ্তিমাত্রে গমনাগমনের সুবিধার জন্য প্রতি সাত জন সৈনিকের জন্য একজন পাচক, ভৃত্য এবং আবশ্যক ভারবাহী বলীবর্দ্দ থাকিত। প্রত্যেক কোম্পানীতে সাত জন করিয়া শিক্ষানবীশ সৈনিক থাকিত। দলের সকল প্রয়োজনীয় কার্য্য এবং নিহত ব্যক্তিগণের স্থলাধিকার করিবার জন্য উহারা রক্ষিত হইত। সকালে সিপাহীরা অফিসরদের কাছে লক্ষ্যভেদ করিতে শিখিত; বৈকালে তিনটা হইতে ছয়টা অবধি দে লা তুর পালা করিয়া ব্যাটেলিয়নগুলিকে কাওয়াজ করাইতেন। তাহার পর দুই ঘণ্টাকাল তাহারা মার্চ করিতে বাধ্য হইত। যাইবার সময় যে পথ তাহারা সহজ গতিতে যাইত, ফিরিবার সময় সেই পথ তাহাদের দ্রুতধাবনে অতিক্রম করিতে হইত। এইরূপে অনতিকালমধ্যে হায়দর এমন একটি বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন যাহাদের আশু গতি উত্তরকালে তাঁহার অনেক সাফল্যের কারণ হইয়াছিল।

টার্ণার নামে হায়দরের একজন আইরিশ সৈনিক ছিল। মাদ্রাজের গবর্ণর বুর্শীয়ের অনুরোধে তিনি উহাকে কাজ দিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি প্রথম ব্যাটেলিয়নের অধ্যক্ষ ছিল এবং মালাবারের যুদ্ধে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল। নবাব তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং বিশ্বাস করিয়া অনেক দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার উহাকে দিতেন। টার্ণার কিন্তু সে বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখে নাই। ইংরেজ গবর্ণর কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সুপারিশ করা লোককে কর্ম্মে গ্রহণ করা নবাবের উচিত হয় নাই। হায়দর প্রতিমাসের পাঁচ তারিখে সৈন্যদের বেতন দিতেন; ব্যাটেলিয়নের অধ্যক্ষের হস্তে তাহা দেওয়া হইত, তিনি সকলকে নিজ নিজ প্রাপ্য মিটাইয়া দিতেন। এই সময় একবার সিপাহীরা টার্ণারের নিকট বেতন আনিতে গেলে সে উহাদের পরদিন সকালে আসিতে বলিল, জানাইল—মুন্সী না থাকায় তখন টাকা দেওয়া সম্ভব নহে। রাত্রি সমাগত হইলে টার্ণার উক্ত অর্থ এবং নিজ যাবতীয় মূল্যবান সম্পত্তি সহ পলায়ন করিল। সুইডেন হইতে আগত জনৈক তরুণ সৈনিক তাহার সহগামী হইয়াছিল। ভৃত্যদের বলিয়া গিয়াছিল যে তাহারা কৈম্বাটুরে প্রধান সেনাপতির ভবনে নৈশ ভোজনে যাইতেছে। তাহার অল্প পরে কয়েকজন অফিসর সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়া টার্ণারের গৃহে আসিয়াছিল এবং ভৃত্যগণের নিকট তাহার কৈম্বাটুর গমনের সংবাদ পাইয়া তাহারাও তথায় গমন করিয়াছিল। উহারা মনে ভাবিয়াছিল, পথিমধ্যে টার্ণারের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু কৈম্বাটুরে আসিয়া সকলকে সুপ্তিমগ্ন দেখিয়া উহাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল। দে লা তুরের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া উহারা তাঁহাকে সকল কথা জানাইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘাটিতে ঘাঁটিতে সন্ধান লইবার জন্য আদেশ দিলেন। কিছু পরে সংবাদ পাওয়া গেল যে, প্রায় তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে দুই জন ইউরোপীয়কে অশ্বারোহণে কোচিনের পথে যাইতে দেখা গিয়াছে। কাপ্তেন মিনার্ভা নামক একজন আইরিশ অফিসার পঞ্চাশ জন ইউরোপীয় সৈনিকসহ উহাদের অনুসরণে প্রেরিত হইলেন। পর-দিবস প্রাতঃকালে কোচিন রাজ্যের সীমানার অদূরে এক পরিত্যক্ত কুটীরমধ্যে পলাতকযুগলকে সুপ্তিমগ্ন অবস্থায় ধৃত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তিনি কৈম্বাটুরে আনিয়াছিলেন।

অনুরূপক্ষেত্রে ফিরিঙ্গীস্থানে যাহা হইয়া থাকে হায়দর সেইমত উহাদের বিচারের আদেশ দিয়াছিলেন। কোর্ট মার্শালের বিচারে বিনা অনুমতিতে দল হইতে পলায়ন এবং সরকারী তহবিল তছরূপ অপরাধে উহাদের প্রতি অবমাননার সহিত পদচ্যুতি এবং তৎপরে প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। সুইডিস সৈনিক নিতান্ত অল্পবয়স্ক ছিল এবং সে রাজকোষের অর্থ অপহরণ করে নাই, শুধু বিনা অনুমতিতে সেনাদল পরিত্যাগ করিয়াছিল; তাহাও আবার টার্ণার কর্ত্তৃক প্রভাবান্বিত হইয়া করিয়াছিল—এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া সামরিক আদালত নবাবকে উহার প্রতি দয়াপ্রদর্শন করিতে অনুরোধ করিলে তিনি তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বিধান করিয়াছিলেন। বিচারকালে টার্ণার কতকগুলি অদ্ভুত স্বীকারোক্তি করিয়াছিল;—বলিয়াছিল যে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট নিজামের সহযোগিতায় হায়দরকে আক্রমণ করিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তজ্জন্য গোয়েন্দাগিরি করিবার নিমিত্ত কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে পাঠাইয়াছিলেন। মৃত্যুদণ্ডই যে তাহার একমাত্র উপযুক্ত শাস্তি তাহা মানিয়া লইয়া টার্ণার বিচারকগণকে অনুরোধ করিয়াছিল যে, তাহার স্বীকারোক্তির গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া তাঁহারা যেন ফাঁসির পরিবর্ত্তে তাহাকে গুলি করিয়া মারিবার আদেশ দেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারা উহার এ শেষ প্রার্থনা রক্ষা করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে টার্ণার মিনার্ভাকে অন্তিম স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ স্বীয় অসি ও ঘড়ি উপহার দিয়াছিল এবং নিজ অর্থাদি—যে সকল সৈনিকের উপর তাহাকে বধ করিবার ভার প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছিল। বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম সকলকে দেখাইবার জন্য মৃতদেহ পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। টার্ণারের আচরণ যত নিন্দনীয় হউক না কেন মৃত্যুকালে সে যথেষ্ট নির্ভীকতার ও সততার পরিচয় দিয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত সুইডিস সৈনিককে হায়দর কিছুকাল পরে বলিয়াছিলেন যে বিবি মেকুইনেজকে সে বিবাহ করিতে সম্মত হইলে তাহাকে পুনরায় পূর্ব্বপদে গ্রহণ করা হইবে। কিন্তু সে প্রস্তাব ঐ ব্যক্তি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়া জানাইয়াছিল যে উহার মত হীনচরিত্র স্ত্রীলোককে বিবাহ করার পরিবর্ত্তে সে সহস্র বার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত। তাহার সাহস ও চিত্তের দৃঢ়তায় প্রীত হইয়া হায়দর তাহাকে মুক্তি দিয়াছিলেন।

হায়দরের বিরুদ্ধে ত্রিশক্তি-সম্মিলন কেন সম্ভব হইয়াছিল বুঝিতে হইলে, কিছু পূর্ব্বকথা বলা আবশ্যক। তাঁহার দ্রুত উন্নতি নিজাম, মরাঠা বা ইংরেজ কাহারও পক্ষে প্রীতিকর হয় নাই

পাণিপথের যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের ফলে মরাঠাদের শক্তিহীনতা হায়দরের অভ্যুদয়ের অন্যতম কারণ ছিল। মরাঠারা তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যে নিজেদের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার অন্তরায় বলিয়া বিবেচনা করিত। ইতিপূর্ব্বে উভয়পক্ষে যে দুই একবার শক্তি পরীক্ষা হইয়া গিয়াছিল তাহাতে মরাঠারাই বিজয়লাভ করিয়াছিল।

মোগলসম্রাট শাহ আলমের নিকট হইতে বঙ্গদেশের দেওয়ানী লইবার কালে (১৭৬৫ খ্রীঃ) ইংরেজরা উত্তর সরকার প্রদেশের দেওয়ানী লইয়াছিলেন। সপ্তবর্ষব্যাপী সমরকালে তাঁহারা ফরাসীদের নিকট হইতে উহা জয় করিয়াছিলেন। বুশীর সেনাদলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নিজাম সালাবং জঙ্গ ঐ প্রদেশ ফরাসীদের জায়গীর দিয়াছিলেন। নিজাম আলির উহা তাহাদের দিতে ইচ্ছা ছিল না। ইংরেজরা তাঁহার নিষেধ না মানিয়া বাদশাহের নিকট হইতে উহা লওয়াতে তিনি ক্রুদ্ধচিত্তে হায়দর ও মরাঠাদের সহিত উহাদের বিরুদ্ধে দল সংগঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভীত হইয়া ক্লাইভ মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টকে মিত্রভেদের চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন দেশীয় রাজন্যবর্গ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারেন যে সে কার্য্য কিছুমাত্র আয়াসসাধ্য হইবে না।

ইংরেজরা পূর্ব্ব হইতে হায়দরের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি খর্ব্ব করিতে সমুৎসুক ছিলেন। এক্ষণে সুযোগ বুঝিয়া নিজামের নিকট সেই প্রস্তাব করিলেন। হায়দর ইংরেজ বা মরাঠা কাহারও প্রতি নিজাম আলি প্রসন্ন ছিলেন না। তিনি সকলকারই উচ্ছেদ একই ভাবে কামনা করিতেন। "কণ্টকেনৈব কণ্টকম্"—নীতি অনুসরণ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি সানন্দে ইংরেজদিগের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পেশবা মধুরাওয়ের মত সুচতুর ব্যক্তির চক্ষে ধূলি প্রদান করা নিজামের পক্ষে সম্ভব হইল না। মিত্রগণের সখ্যের প্রকৃত মূল্য বুঝিয়া উহারা রঙ্গভূমে দেখা দিবার পূর্ব্বেই লঘুগতি বর্গীসেনাসহ তিনি মহীশুর রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন (জানুয়ারী ১৭৬৭)। হায়দরের সীমান্ত প্রদেশের সিরার ফৌজদার তাঁহার ভগিনীপতি বিশ্বাসঘাতক আলি রাজা খাঁ মরাঠাদের আগমনমাত্রে উহাদের দলে যোগ দিয়াছিল। ইহা হায়দরের পক্ষে প্রচণ্ড আঘাত-স্বরূপ হইয়াছিল। তিনি উহাকে বিশেষভাবেই বিশ্বাস করিতেন এবং অনেকে তাঁহাকে উহার সম্বন্ধে সাবধান করিলেও সে সকল কথায় কর্ণপাত করেন নাই। সীমান্ত প্রদেশের দুর্গসমূহ অবাধে শত্রুহস্তগত হওয়াতে হায়দর যে ভাবে প্রতিপক্ষকে বাধাদানের আয়োজন করিতেছিলেন, অতঃপর তাহা আর সম্ভবপর নহে দেখিয়া রাজধানীতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে তৎপর হইলেন। তাঁহার আদেশে মধ্যবর্ত্তী জনপদ উৎসাদিত করা হইল—কূপসমূহের জল বিষযুক্ত, হ্রদ তড়াগাদির বাঁধ ভাঙিয়া দেশ জলপ্লাবিত এবং অধিবাসিগণকে নিজ নিজ আবাস পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে আসিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। দে লা তুর বলেন, ইহাতে কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই, নবাব সকলকার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, সকলে হাসিমুখে দুঃখকষ্ট বরণ করিয়াছিল।

মীর্জ্জার সৈনিকগণের সকলেই যে তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছিল তাহা নহে। তাঁহার শতাধিক ইউরোপীয় গোলন্দাজ ছিল। উহারা তাঁহার আদেশ অবহেলা করিয়া শ্রীরঙ্গপত্তনে হায়দার-সকাশে ফিরিয়া গিয়াছিল। কথিত আছে, একজন অফিসার যাইবার সময় তাঁহাকে বলিয়াছিল, "মনে করিবেন না আমরাও আপনার মত নবাবের নিমকহারামী করিব। আমরা তাঁহার হইয়া যুদ্ধ করিব, তাঁহার বিপক্ষে কখন নহে। অতএব বিদায়।" হায়দর এই প্রভুভক্ত সৈনিকগণকে বহু অর্থদানে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। অফিসরদের তিনি সুবর্ণকঙ্কণ দিয়াছিলেন। মার্কসিরা এবং মদগিরি বা মধেরী দুর্গের রক্ষী সেনাদল মীর্জ্জার আদেশ অমান্য করিয়া প্রাণপণে আক্রমণকারীদিগকে বাধাদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ফলতঃ উহাদের পথরোধের জন্য মরাঠাদের অগ্রগতির বেগ মন্দীভূত হইয়াছিল এবং হায়দর আত্মরক্ষার্থ আয়োজন করিতে কিছু অবসর পাইয়াছিলেন। উহাদের প্রভুভক্তি ও বীরত্বে প্রীত হইয়া পেশবা দুর্গাধিকারের পর প্রচুর পুরস্কারসহ উহাদের যদৃচ্ছ গমনের অনুমতি দিয়াছিলেন।

এক সঙ্গে তিন পক্ষের সহিত যুদ্ধ করা সম্ভব নহে দেখিয়া হায়দর সুপ্রচুর অর্থদানে মরাঠাদিগের সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। মধুরাও নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পূর্ব্বতন সুহৃদগণ তাঁহার নিকট লাভের অংশ দাবি করিলে তিনি সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন।* অতঃপর হায়দর নিজামের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। মরাঠাদের যুদ্ধ পরিত্যাগের সংবাদে নিজাম আলি বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। বিপক্ষের অশ্বারোহীদের জন্য তাঁহার শিবিরে রসদ প্রাপ্তিতে যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। নিজাম-দরবারে হায়দরের সুহৃদবর্গের অভাব ছিল না। সুযোগ বুঝিয়া তাহারা তাঁহাকে ইংরেজপক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক হায়দরের সহিত মিত্রতা করিবার পরামর্শ দিতে লাগিলেন। নিজামেরও তাহা মনঃপূত হইয়াছিল। এইরূপে যে মিত্রতার উপর আশা করিয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সুখস্বপ্ন দেখিতে বিভোর ছিলেন, হায়দর তাহা সুকৌশলে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন যুগপৎ শত্রুসৈন্য এবং ভূতপূর্ব্ব মিত্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া ইংরেজ সেনাপতি কর্ণেল স্মিথ প্রমাদ গণিলেন। "অতঃপর আত্মদোষক্ষালনার্থ মাদ্রাজ সরকার ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট দিবার জন্য কৈফিয়তের সন্ধান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং সবকিছুর দায়িত্ব ফরাসীদের ষড়যন্ত্রের প্রতি আরোপ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ফরাসীদের কোন সম্পর্ক ছিল না। সত্য কথা বলিতে হইলে আমার বলা আবশ্যক যে, হায়দর এবং নিজামের মধ্যে সন্ধি-বন্ধনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি বা আমার কোন সৈনিক উহাদের সহিত কোন পত্র ব্যবহার করি নাই। ঐ ঘটনার পরে নবাব নিজে একটি এবং

*When Colonel Zod went to the Peshwe to demand a share of the spoil for the Nizam, his application was treated with ridicule—Wilks, vol. II., p. 16.

রাজাসাহেব একটি চিঠি পণ্ডিচেরীর গবর্ণরকে লিখিয়াছিলেন এবং হায়দর আলির অনুরোধে আমি নিজেও একখানি চিঠি লিখিয়া পত্র তিনখানি যথাস্থানে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।"

দে লা তুরের সুদীর্ঘ পত্র এখানে উদ্ধৃত করিবার স্থানাভাব। সংক্ষেপে তাহার সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল। প্রথমে তিনি মিত্রদ্বয়ের এবং ইংরেজগণের বলাবল সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দিয়া বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজদিগের যে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অন্যান্য বারের মত এবারে সাগরোপ-কূল-সন্নিকটবর্ত্তী অথবা নদীতটবর্ত্তী প্রদেশে যুদ্ধ না হইয়া দেশের অভ্যন্তরভাগে যুদ্ধ হওয়াতে ইংরেজরা তাহাদের নৌবহরের সাহায্যে আবশ্যকমত রসদাদি পাওয়া হইতে বঞ্চিত হইবে। তদ্ভিন্ন এ যুদ্ধ ঐ কারণে প্রধানতঃ অশ্বারোহী সেনাদলের উপর নির্ভর করিবে, কিন্তু ইংরেজদের ঐ ধরণের সৈন্যদল আদৌ নাই। তাঁহারা যদি নৈশ আক্রমণ, অতর্কিত আক্রমণ, সেনানায়কবর্গের বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি ব্যাপারের উপর নির্ভর করেন তাহা হইলে তাঁহারা ঠকি-বেন। সৈন্যদলের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকায় তিনি প্রথম দুইটি সম্ভাবনার বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন এবং মহিশুরী বাহিনীতে জায়গীর-প্রথার প্রচলন না থাকাতে সকলে হায়দরকে তাহাদের একমাত্র প্রভু বলিয়া জানে, সেজন্য কাহারও পক্ষে বিশ্বাস-ভঙ্গ করা সম্ভব নহে। এই সকল কথা বলিয়া দে লা তুর গবর্ণর ল'কে আরও বলিয়াছিলেন যে, আসন্ন সমরে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করা সমীচীন হইবে না', কারণ উহা কোন পক্ষকেই সন্তুষ্ট করিবে না। সাময়িক ভাবে হায়দরকে সামান্য সাহায্য পাঠাইয়া ভবিষ্যতে বড় রকম সাহায্য করিবার আশ্বাস দিতে বলিয়াছিলেন এবং জানাইয়াছিলেন যে প্রতিকূল বায়ুর জন্য ইউরোপ হইতে পোত আসিতে বিলম্ব হইতেছে এই অজুহাত পরে দিলেই চলিবে। পণ্ডিচেরীর সৈন্যসংখ্যা অল্প বলিয়া তথা হইতে বিশেষ সাহায্য পাঠানো সম্ভব না হইলেও তিনি পলাতক সৈনিকের বেশে কয়েকজন অফিসর ও গোলন্দাজ পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। উহাতে ইংরেজদের সহিত বিজড়িত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকিবে না এবং ইংরেজরা যাহাতে কতকটা দাবে থাকে, তাহাও ফরাসীদের স্বার্থ। অতঃপর দে লা তুর—হায়দর-চরিত্র তাঁহার সুপরিজ্ঞাত ছিল বলিয়া, রাজভক্ত ফরাসী প্রজারূপে ল'কে পণ্ডিচেরী নগর সাধ্যমত সুরক্ষিত অবস্থায় রাখিবার পরামর্শ দিয়া-ছিলেন, কারণ যদি কখনও দৈবক্রমে নবাব উহার নিকটে যাইয়া পড়েন, তখন নগরের অরক্ষিত অবস্থা দেখিয়া তিনি তৎকৃত পূর্ব্ব-সাহায্যের মূল্যস্বরূপ ফরাসীদের নিকট হইতে সমগ্র তোপখানা এবং অপর যাহা কিছু মূল্যবান বিবেচনা করিবেন সবই বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া লইতে যত্নবান হইতে পারেন। তবে সে অবস্থা দেখা দিলে, সেনাপতি মহাশয় একথাও সঙ্গে সঙ্গে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি অথবা তাঁহার সৈনিকগণ কখনই ফরাসী পতাকার অবমাননা সহ্য করিবেন না।

ফ্রান্স হইতে কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ইংলণ্ডের সহিত বিরোধ বাধিতে পারে এরূপ কোন কার্য্য না করিতে আদেশ দিয়াছেন; সেজন্য তাঁহার পক্ষে উহাদের কথামত কার্য্য করা সম্ভব হইবে না একথা গবর্ণর ল' যথেষ্ট সৌজন্যসহকারে হায়দর আলি ও রাজাসাহেবকে জানাইয়াছিলেন, কিন্তু দে লা তুরকে লিখিত পত্রের সুর অন্যরূপ ছিল। নবাবদ্বয়ের লিখিত চিঠি তাঁহাকে পাঠাইয়া ইংরেজদের সহিত বিরোধ বাধিতে পারে এরূপ কার্য্যের মধ্যে ঠেলিয়া দেওয়ার জন্য ল' তাঁহাকে প্রথমে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছিলেন এবং জানাইয়াছিলেন যে, ফরাসী সরকারের তখন যে প্রকার অবস্থা তাহাতে ঐরূপ পত্র লেখা হইতে বিরত হইলে সেনাপতি জন্মভূমির মহদুপকার সাধন করিবেন সেকথা যেন মনে রাখেন। ইউরোপীয় জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে এদেশীয়গণের শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে স্বীয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বলিতে পারেন যে, আসন্ন সমর পূর্ব্বোক্ত নবাবদ্বয়ের পক্ষে তাদৃশ অনুকূল হইবে না। উহাদের কোনরূপ সাহায্য করা তাঁহার পক্ষে যে সম্ভব নহে সেকথা যথাসাধ্য মোলায়েম করিয়া তাঁহাদের জানাইতে এবং ভবিষ্যতে তাঁহাকে সরাসরি চিঠি-পত্র না লিখিয়া সাঙ্কেতিক ভাষায় মঁশিয়ে ম—র মধ্যবর্ত্তিতায় লিখি-বার জন্য দে লা তুরকে ল' আদেশ দিয়াছিলেন।

হায়দরের নিকট এ সময় প্রায় সাড়ে সাত শত (৭৫০) ইউরোপীয় সৈনিক ছিল; তন্মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ গোলন্দাজ সৈন্য। অফিসারগণ বাদে অবশিষ্ট সামান্যসংখ্যক সৈনিকদের দ্বারা ইংরেজ-দিগের মহড়া লইবার উপযুক্ত পদাতিক বাহিনী গঠন সম্ভব নহে দেখিয়া দে লা তুর উহাদের লইয়া দুই কোম্পানী অশ্বারোহী পল্টন গঠন করিয়াছিলেন।

হায়দরের নৌবাহিনীর কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। মালাবার উপকূল অধিকৃত হইবার পর হায়দর একটি শক্তিশালী বহর গঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, উপযুক্ত নৌশক্তি ব্যতীত উপকূলভাগ রক্ষা করা বা পাশ্চাত্য-জাতিসমূহের, বিশেষতঃ তাঁহার চিরশত্রু ইংরেজদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করার আশা বৃথা। কিন্তু এ কার্য্যে তিনি বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। এযুগে পাশ্চাত্য সমরপদ্ধতির নিকট স্থলপথে সনাতন ধরণে পরি-চালিত ভারতীয় সেনাদল যেরূপ বার বার পর্য্যুদস্ত হইত, জলপথেও তেমনই ইউরোপীয় নৌবলের নিকট ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের নৌশক্তি নিতান্ত নগণ্য ছিল। পাঠান বা মোগল রাজগণ কেহই নৌ-বাহিনীতে প্রবল ছিলেন না। মগ, আরাকানী বা ফিরিঙ্গী জল-দস্যুদের অত্যাচার মোগল-সম্রাটগণ তাঁহাদের সর্ব্বোত্তম গৌরবো-জ্জ্বল দিনেও শত চেষ্টা করিয়াও রোধ করিতে পারেন নাই। ইংরেজ বণিকদের সহিত বিরোধ বাধিলে ও তাহারা সুরাট বন্দর অবরুদ্ধ করিলে এবং জলপথে হজযাত্রা বন্ধ করিলে অতবড় প্রতাপ-শালী আলমগীর বাদশাহও উহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হন নাই। নৌবহর বিধ্বস্ত করিয়া ঘেরিয়া আংগ্রেদিগের সুবর্ণ-দুর্গ অধিকার করিতে অর্থাৎ মরাঠা নৌশক্তি বিচূর্ণ করিতে ইংরেজদিগের

বড় বেশী বেগ পাইতে হয় নাই। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক ডঃ শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অবশ্য তাঁহার *History of Indian Shipping*" গ্রন্থে মোগল এবং মরাঠা নৌবলের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেও উহা কোনকালেই তাদৃশ গুরুত্বসম্পন্ন ছিল না।

হায়দরের পক্ষে ইউরোপীয়গণের সমকক্ষ নৌশক্তির অধিকারী হওয়াতে অসুবিধা অনেক ছিল। তজ্জন্য উপযুক্তসংখ্যক শিল্পী, কারিগর এবং ইঞ্জিনীয়ার প্রাথমিক প্রয়োজন। তাহা তিনি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। যে সকল ব্যক্তি তাঁহার নিকট ভাগ্যান্বেষণে আসিয়াছিল তাহারা নিম্নশ্রেণীর মাল্লা। সমরপোত-নির্ম্মাণ অথবা দূর সমুদ্রে নৌবহরের পরিচালনা করা সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। উপযুক্তরূপ শিল্পী অথবা নৌ-সৈনিক যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করা হায়দর অথবা অপর কোন দেশীয় নৃপতির পক্ষে সম্ভবপর নয়। এ সকল নানাবিধ অসুবিধা এবং বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও হায়দর অল্পকালের মধ্যেই এমন একটি নৌবাহিনী সংগঠনে সমর্থ হইয়াছিলেন যাহার জন্য ইংরেজ, পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি সকল ইউরোপীয় জাতিকেই কতকটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। জনৈক পর্ত্তুগীজ লেখক এই সময় তাঁহার নৌবল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতে মনে হয় যে, ইংরেজ ঐতিহাসিক-দ্বয়—কর্ণেল উইলক্‌স এবং লেফটেনাণ্ট লো হায়দরের নৌশক্তিকে যতটা নগণ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন উহা প্রকৃতপক্ষে ততটা অকিঞ্চিৎকর ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন, "হায়দরের নৌশক্তি যেভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে তাহা হইতে মনে হয় যে অচিরেই তিনি জলপথে প্রবলপরাক্রান্ত হইয়া উঠিবেন। যদি ভাগ্য তাঁহার প্রতি অনুকূল হয় তাহা হইলে হয়ত আমাদের এবং অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিসমূহের সর্ব্বনাশসাধনে তিনি সমর্থ হইবেন।"

আলি রাজার পর জোসেফ ষ্টেনেট নামক জনৈক ইংরেজকে তিনি তাঁহার নৌবহরের অধ্যক্ষ-পদ প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি প্রথমে কোম্পানীর "Bombay Marine Force" দলে কর্ম্মনিযুক্ত ছিল। পরে দেশীয় দরবারে ভাগ্যান্বেষণে গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়া হোনাভার নামক স্থানে অবস্থিত কোম্পানীর রেসিডেণ্ট জন ষ্ট্রাচি প্রদত্ত এক সুপারিশপত্র সহ হায়দরসকাশে গমন করিলে তিনি উহাকে মাঙ্গালোরে তাঁহার জাহাজ-নির্ম্মাণ-কারখানায় অধ্যক্ষপদ দিয়াছিলেন (১৭৬৫ খ্রীঃ)। চুক্তিপত্রে একটি বিশেষ সর্ত্ত রহিল যে, ষ্টেনেটকে কোন কারণে কখন পোত-যোগে সমুদ্রযাত্রা করিতে হইবে না, তাঁহার কাজ স্থলপথে পোত-নির্ম্মাণকার্য্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং যখনই তিনি কর্ম্মত্যাগ করিতে চাহিবেন তখনই তাঁহার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিতে হইবে। ষ্টেনেট বলেন, এসকল কথা এক লিখিত দলিলে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল এবং স্বাক্ষী হিসাবে ষ্ট্রাচি উহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে হায়দর দিনেমারদিগের নিকট হইতে একখানি বড় যুদ্ধ-জাহাজ কিনিয়াছিলেন। তাহায় বত্রিশ কামানবাহী ফ্রিগেট (frigate) তিনটি এবং চৌদ্দ কামানবাহী রণতরী আঠারখানি এবং ক্ষুদ্রায়তন জাহাজ আরও কিছু ছিল। হায়দরের মাল্লার অভাব না থাকিলেও উপযুক্ত নৌসেনানীর একান্ত অভাব ছিল। ষ্টেনেটই ছিলেন একমাত্র উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী যাঁহার পোতচালনা-কৌশল জানা ছিল। মালাবার প্রদেশে যুদ্ধকালে মাঙ্গালোর বন্দরে হায়দরের নৌবহর, ছোট-বড় মিলাইয়া সর্ব্ব-সমেত বিয়াল্লিশখানি রণপোত উপস্থিত ছিল। এই অভিযানে স্থলসেনা এবং নৌসেনার সমবেত সহযোগিতা অপরিহার্য্য ছিল। হায়দর ষ্টেনেটকে বহরাধ্যক্ষ বা এডমিরালের পদ দিয়া নৌবহরকে মাঙ্গালোর নদীমুখ হইতে বাহির করিয়া সমুদ্রে আনিতে আদেশ দিলে ঐ ব্যক্তি সেই কার্য্য করিতে সম্মত হইল না; চুক্তির উল্লেখ করিয়া জানাইল যে, সুলতান বেশী জিদ করিলে সে সর্ত্তানুসারে তাহার ইস্তফা গ্রহণের দাবি জানাইবে। হায়দরের মত প্রতাপশালী ব্যক্তির পক্ষে এ ধরণের উত্তরে সন্তুষ্ট হওয়া সম্ভবপর নয়। ষ্টেনেট ধৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। দুই দিন সামান্য চাপাটি এবং জল খাইয়া ক্ষুদ্র একটি কুঠরিতে কাটানোর ফলে ষ্টেনেটের চৈতন্যোদ্রেক হইল। অতঃপর সে প্রভুর সর্ব্ববিধ আদেশ পালন করিতে সম্মত হইয়াছিল।

এ ধরণের বশ্যতার বিপদ সম্বন্ধে হায়দর অজ্ঞ ছিলেন না। ক্রুদ্ধ ও অপমানিত ইংরেজ নাবিক শত্রুতা-সাধনোদ্দেশ্যে যে সাগরগর্ভে আত্মপোত-নিমজ্জন, স্বেচ্ছায় চড়ায় জাহাজ আটকাইয়া দেওয়া অথবা জাহাজ লইয়া পলায়ন ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে নৌবহরের ক্ষতি করিতে পারে, সে আশঙ্কা তাঁহার ছিল। সেই কারণ তিনি মাঙ্গালোরের ফৌজদার মীর্জ্জা মিঞাকে আমীর-অল-বহর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নৌবিদ্যা সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই ছিল না, সুতরাং পূর্ব্বের মতই সবকিছু চলিতে লাগিল, শুধু পার্থক্যের মধ্যে ষ্টেনেটের মাথার উপর একজন উপরওয়ালা জুটিলেন যিনি সর্ব্বদা তাঁহাকে যন্ত্রণা দিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন।

মাঙ্গালোর বন্দর হইতে নিষ্ক্রমণকালে, দৈবক্রমে অথবা ষ্টেনেটের কারসাজিক্রমে বলিতে পারা যায় না, দুইখানি "ঘুরাব"-জাহাজ বালুর চড়ায় আটকাইয়া যায়। বহুল আয়াসে একটির উদ্ধারসাধন সম্ভবপর হইলেও অপরটি বানচাল হইয়া জলমগ্ন হইয়াছিল। মীর্জ্জা এবং ষ্টেনেট পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিয়া বিরোধ বাধাইল। মীর্জ্জা বলিলেন, দুর্ঘটনার সময় ষ্টেনেট কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া স্বীয় কেবিনে গাঢ় নিদ্রামগ্ন ছিলেন। ষ্টেনেট বলিলেন, ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আকস্মিক, তাঁহার কোন ত্রুটি হয় নাই। হায়দরের নিকট সংবাদ গেলে তিনি আদেশ দিলেন—যেখানে জাহাজ ডুবিয়াছে দাগাবাজ ফিরিঙ্গী বহরাধ্যক্ষকে পায়ে নোঙর বাঁধিয়া ঠিক সেইখানে ডুবাইয়া দাও! ষ্টেনেটের সৌভাগ্যক্রমে আদেশ যখন আসিয়া পৌঁছিল, নৌবহর তখন বন্দর ছাড়াইয়া দূর সমুদ্রে চলিয়া গিয়াছে। মীর্জ্জাও সঙ্গে ছিলেন। যদি বা কোনমতে তাঁহাকে হায়দরের আদেশ জানানো সম্ভব হইত, তাহা হইলেও তাহা পালনে তাঁহার

সাহস হইত না ; কারণ ফিরিঙ্গী নৌ-সৈনিকের পোতচালন-দক্ষতা তাঁহার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য ছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও উহাকে বিব্রত করিতে তাঁহার কিছুমাত্র বাধে নাই। তেল্লীচেরীর অদূরে বাড়িঘেরা নামক স্থানে ওলন্দাজদিগের একখানি জাহাজ দৃষ্ট হইল। মীর্জ্জা ষ্টেনেটকে উহা দখল করিতে আদেশ দিলেন। তিনি উহাতে প্রথমটা স্বীকৃত হন নাই ; কিন্তু মীর্জ্জা স্বীয় অসি নিষ্কাশিত করিয়া জানাইলেন—আর একবার "না" বলিলে তাঁহার ছিন্ন মস্তক পরমুহূর্ত্তে মাটিতে লুটাইয়া পড়িবে। তখন ষ্টেনেট বাধ্য হইয়া উক্ত ডচ বাণিজ্যপোতটি আক্রমণ এবং হস্তগত করিয়া বন্দরে আনিয়াছিলেন। এই ঘটনাস্থলের অদূরে ইংরেজদিগের একটা কুঠি ছিল। কুঠিয়াল সদলে ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করিলেও তাঁহারই একজন স্বদেশবাসী যে ঘটনার নায়ক তাহা বুঝিতে পারেন নাই। ষ্টেনেট নিজেই পরে উহাকে সকল কথা লিখিয়াছিলেন।

কালিকটে আসিবার পর ষ্টেনেটকে ডাকিয়া পাঠাইয়া হায়দর আদেশ দিলেন তাঁহার Flag ship—দিনেমারদিগের নিকট ক্রীত পূর্ব্বোল্লিখিত জাহাজটি বোম্বাইয়ে লইয়া গিয়া কোম্পানীর ডক হইতে মেরামত করিয়া আনিতে হইবে। ষ্টেনেটের ইহাতে আনন্দের অবধি রহিল না। প্রথমে তিনি কথাটা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, মনে করিয়াছিলেন ইহার মধ্যে কোন প্রকার কূটনীতি আছে। অপর কাহাকেও না পাঠাইয়া, বিশেষ করিয়া তাঁহাকে পাঠাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হায়দর বলিয়াছিলেন যে বাঙ্গালোরে তাঁহার পরিজনবর্গ তাঁহার সদাচরণের প্রতিভূস্বরূপ থাকিতে পারিবে ; অপর কাহারও পরিবার সেখানে নাই !

দেশীয়া রমণী এবং তদ্‌গর্ভজাত সন্তানবর্গের চিন্তা ষ্টেনেটকে আদৌ বিব্রত করে নাই। বোম্বাই পৌঁছিয়াই তিনি গবর্ণরের নিকট নিজ দুঃখের কাহিনী জানাইয়া এক আবেদনপত্র দাখিল করেন এবং ইংলণ্ডীয় পতাকাতলে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া হায়দরের কর্ম্ম হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দিতে অনুরোধ জানান। গবর্ণর ক্রমেলিন উঁহাকে জানাইলেন, ব্রিটিশ প্রজা হিসাবে তিনি সর্ব্বদাই প্রাণরক্ষার জন্য আশ্রয়লাভে অধিকারী হইলেও হায়দরের কর্ম্মচারীরূপে স্বীয় কার্য্যের জন্য তাঁহার নিকট বাধ্য, একমাত্র হায়দরই তাঁহাকে নিজ কার্য্য হইতে বিদায় দিতে পারেন। এ বিষয়ে তাঁহাকে কোনপ্রকার সাহায্য করিতে গবর্ণর অসমর্থ। জাহাজ মেরামত সম্পর্কিত সকল হিসাব নিকাশ বোম্বাই পরিত্যাগের পূর্ব্বে তিনি স্বীয় প্রভুর সহিত করিতে বাধ্য থাকিবেন। অতঃপর ষ্টেনেট হায়দরের নিকট মুক্তি প্রার্থনা করেন, কিন্তু তিনি আর সেকথার কোন জবাব দেন নাই, বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, স্ত্রীপুত্রের জন্য ফিরিঙ্গী সৈনিক বাঙ্গালোরে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইবে। এমন সময় ইংরেজদিগের সহিত হায়দরের সমর বাধিয়া উঠিলে সকল সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। হায়দরের সমরপোতখানি ইংরেজরা বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন। ষ্টেনেট তাঁহার চাকরি হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। মহীশুরী প্রতিনিধি ইতিপূর্ব্বে জাহাজখানির দখল লইলেও পোতপরিচালনে সমর্থ অধ্যক্ষের অভাবে উহা বোম্বাই বন্দর হইতে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয় নাই। হায়দর বরাবর এই ঘটনা ইংরেজদিগের দাগাবাজির অন্যতম নিদর্শন বলিয়া মনে করিতেন।

দেখিতে দেখিতে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল (আগষ্ট ১৭৬৫)। ইংরেজ সেনাপতি শত্রুরাজ্যে প্রবেশ করিয়া কয়েকটি দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালোর হইতে বাইশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত কৃষ্ণগিরির পার্ব্বত্য দুর্গ আক্রমণ করিতে গিয়া তিনি ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তথাকার কিল্লাদার কনষ্টাণ্টাইন নামক জনৈক জর্ম্মানজাতীয় সেনানী প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিয়া তাঁহার আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিল।*

ইহার পর চেঙ্গামা নামক স্থানে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ (২।৯। ১৭৬৭) হইয়াছিল। 'নিজামের উজীর বিশ্বাসঘাতক রুকুনৌদ্দৌলা তাঁহাদের আগমন-সংবাদ পূর্ব্বাহ্ণে শত্রুশিবিরে প্রেরণ করায় হায়দরের পক্ষে স্মিথকে অতর্কিতে আক্রমণ করা সম্ভব হইল না।

* কনষ্টাণ্টাইন কলোন প্রদেশের আণ্ডারনেক নগরের অধিবাসী। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সে প্রথম এদেশে আসে। তাহার পর্ত্তুগীজজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাতা অসামান্যা রূপসী একটি কন্যা ছিল। অর্থের বিনিময়ে কনষ্টাণ্টাইন-দম্পতি বালিকাকে হায়দরের হস্তে প্রদান করিতেছে জানিয়া তাহার ক্রুদ্ধ সহকর্ম্মিগণ একজন ইউরোপীয়ের পক্ষে একান্ত অবমাননাকর উক্ত কার্য্যের প্রতিবিধানে সমুদ্যত হইয়াছিল। সৈন্যাধ্যক্ষ হুগেল তাহাকে ঐ কথা সত্য কিনা প্রশ্ন করিলে সে সকল কথাই অস্বীকার করে। জনৈক তরুণবয়স্ক সৈনিক তাহার কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিলে কনষ্টাণ্টাইন মুখে খুব কৃতজ্ঞতার ভাব দেখাইয়াছিল, কিন্তু গোপনে হায়দরের নিকট হইতে অর্দ্ধ লক্ষ টাকা লইয়া তার স্ত্রী-কন্যাকে সানন্দে ও সাগ্রহে নবাবের অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দেয়। ইহার পর আর উহাদের পক্ষে স্বজাতীয়গণের সাহচর্য্যে বাস করা সম্ভব হইবে না বুঝিয়া হায়দর কনষ্টাণ্টাইনকে বাঙ্গালোরে ইউরোপীয় সমাবেশিত অঞ্চল হইতে দূরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কৃষ্ণগিরির যুদ্ধের পর সমীপবর্ত্তী স্থলের অধিবাসিবৃন্দ শত্রুসেনার লুণ্ঠন-ভয়ে তাহাদের যাবতীয় মূল্যবান দ্রব্যাদি নিরাপত্তার জন্য উহারই রক্ষণাবেক্ষণে দুর্গ মধ্যে গচ্ছিত রাখিয়াছিল। সুযোগ বুঝিয়া কনষ্টাণ্টাইন একদিন সেই সমস্ত ন্যস্ত ধন লইয়া গোপনে দুর্গ ত্যাগ করিল। গোয়া ও বোম্বাইয়ের পথে স্বীয় চৌর্য্য-বৃত্তিলব্ধ ধনরত্নাদিসহ স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করা তাহার পক্ষে কিছুমাত্র আয়াসসাধ্য হয় নাই। দে লা তুর লিখিয়াছেন যে, নবাবের ফরাসী-জাতীয় চিকিৎসকের নিকট তিনি শুনিয়াছিলেন যে ঐ বালিকাটি তাঁহার নিকট বলিয়াছিল, নবাবের নিকট বিক্রীত হওয়াতে সে নিজেকে কৃতার্থ বিবেচনা করিতেছে, যেহেতু তাহার অর্থপিশাচ পিতামাতা শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে লইয়া কি যে না করিতে পারিত তাহা কিছুই বলা যায় না।

স্মিথ সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র পশ্চাৎপদ হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পথশ্রান্ত সৈনিকদের মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রামের অবকাশ না দিয়া হায়দর মহাবেগে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। আক্রমণের সমস্ত বেগ গ্রেনেডিয়ারদের উপর পড়িয়াছিল। ইংরেজরা প্রাণপণে তুমুল যুদ্ধ করিয়া তবেই উহাদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ইউরোপীয় অফিসরদের পরিচালনায় গ্রেনেডিয়ার সিপাহীরা যে প্রচণ্ড তেজের সহিত লড়িয়াছিল, তাহাতে বিস্মিত শত্রু সেনাপতি এদেশীয়গণের সামরিক যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্ব ধারণা পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পর দিবস মহীশুরীরা আবার প্রত্যাবর্ত্তন-নিরত শত্রুসেনার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। ইউরোপীয় অশ্বারোহীরা দলের পুরোভাগে অবস্থিত ছিল। উহারা ইংরেজ সেনার বহু রসদ ও সমরসম্ভার হস্তগত করিতে সমর্থ হইলেও তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না। স্মিথ কোনমতে ত্রিণমালাইয়ে পৌঁছিয়া সেখানে আশ্রয় লইয়া প্রাণে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

এই অভিযানে দে লা তুরের কৃতিত্বে প্রীত হইয়া হায়দর নিজামকে বলিয়া কহিয়া তাঁহাকে দেবীকোটা অঞ্চলে বার্ষিক আট লক্ষ টাকা আয়ের একটি জায়গীরের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ইহাতে অনেকের, বিশেষ করিয়া রাজাসাহেবের খুবই ঈর্ষ্যা জন্মিয়াছিল, তিনি তখনও কর্ণাটক প্রদেশের নবাবী প্রাপ্তির আশা মন হইতে বিসর্জ্জন দিতে পারেন নাই। চক্রান্তকারীর অভাব হইল না। কিছুকাল হইতে দে লা তুর হায়দরকে পণ্ডিচেরীর অনতিদূরে অবস্থিত কুদ্দালুরে ইংরেজর ফোর্ট সেন্ট ডেভিড দুর্গ অধিকার করিবার পরামর্শ দিতেছিলেন। তিনি স্বয়ং অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া মান্দ্রাজ নগরের প্রান্ত অবধি সমগ্র জনপদ উৎসাদিত করিয়া ফেলিবেন বলিয়াছিলেন। ষড়যন্ত্রকারিগণ নবাবকে বুঝাইল যে ফরাসী গবর্ণর তাঁহার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ফরাসী সৈনিকদের পণ্ডিচেরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আদেশ দিয়াছেন। সে জন্য কুদ্দালুরের নামে তথায় পলায়ন করাই ফরাসীদের আন্তরিক অভিপ্রায়। ফরাসী গবর্ণর যদি হায়দরের প্রস্তাব স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করিবার পরিবর্ত্তে কতকটা আশা দিয়াও পত্রোত্তর দিতেন তাহা হইলে ইংরেজদের মনে এতটা প্রভাব বিস্তার সম্ভব হইত না। যে কারণেই হউক, হায়দর ফরাসীদের পণ্ডিচেরীর অত নিকটে যাইতে দিতে সাহস করিলেন না। টিপু তখন পর্য্যন্ত কোন কৃতিত্ব দেখাইবার অবকাশ পান নাই, এইবার একদল সেনাসহ তাহাকে মান্দ্রাজ নগরের প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদয় জনপদ ধ্বংস করিতে পাঠানো হইল। মহীশুরী দরবারে ইংরেজদের গুপ্তচরের অভাব ছিল না। একজন ফরাসী সৈনিক অর্থলোভে তাঁহাদের এখানকার সকল সংবাদই সরবরাহ করিতেছিল। ঐ ব্যক্তি টিপুর মান্দ্রাজ অভিমুখে যাত্রার সংবাদ ইংরেজদিগকে দিলেও তিনি যে এত তাড়াতাড়ি আসিয়া পৌঁছিতে পারিবেন, সে কথা তাঁহারা মনে করেন নাই। অতি অল্পের জন্য গবর্ণর, প্রধান ইঞ্জিনিয়র কর্ণেল কল, নবাব মহম্মদ আলি ও তাঁহার পুত্র টিপুর হস্তে বন্দিত্ব হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। উহারা তখন নগরোপকণ্ঠে উদ্যানবাটিকায় বাস করিতেছিলেন, প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইবার জন্য প্রতিদিনকার মত অশ্বারোহণের আয়োজন করিতেছেন এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাসঘাতক ফরাসী-সৈনিক-প্রেরিত একজন লোক আসিয়া তাঁহাদিগকে টিপুর অদূরে আসিয়া উপনীত হইবার সংবাদ দিল। এরূপ তৎপরতার সহিত তাঁহারা পলায়ন করিয়াছিলেন যে, গবর্ণর বাহাদুর স্বীয় টুপী ও তরবারি পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে ভুলিয়া গেলেন। খাদ্যদ্রব্যাদি যেমনকার যেমন তেমনই সাজানো রহিল।

টিপুর আগমনে মান্দ্রাজ সহরে নিদারুণ আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। দলে দলে উপকণ্ঠবর্ত্তী স্থানসমূহের অধিবাসিবৃন্দ আশ্রয়লাভার্থ রাজধানীতে প্রবেশ করায় নগরমধ্যে বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের অন্ত রহিল না। এই সময় টিপু অনায়াসে মান্দ্রাজ অধিকার করিতে পারিতেন। তথায় মাত্র দুই শত গোরা এবং ছয় শত দেশীয় সিপাহী ছিল। টিপু তখন অষ্টাদশবর্ষীয় বালক মাত্র, সামরিক কোন অভিজ্ঞতাই তাঁর ছিল না, সকলে তাঁহাকে বুঝাইল হায়দর তাহাদের দেশ ধ্বংস করিতেই বলিয়াছেন, মান্দ্রাজ অধিকার করিতে বলেন নাই, তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে ইংরেজদের তোপের মুখে নবাবজাদার প্রাণ বিপন্ন করিতে দিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইবেন, সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে অনুমতি আনাইয়া পরে নগর অধিকারের চেষ্টা করাই সঙ্গত। দে লা তুর বলেন যে, তিনি হায়দরকে মান্দ্রাজ অধিকার করিয়া অগ্নিযোগে ভস্মসাৎ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন বলিয়া চক্রান্তকারীদের প্ররোচনায় এই অভিযানে প্রেরিত হন নাই। কারণ তাহাতে অকারণ যুবরাজকে বিপদের সম্মুখীন করা হইত।

ইতিমধ্যে ত্রিণোমালাইয়ে (২৬।৯।১৭৬৭) উভয় পক্ষে আবার একটা ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। চেঙ্গামার মত এ যুদ্ধেও হায়দর পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে লিখিত দেখা যায়, কিন্তু সত্য কথা বলিতে হইলে বলা আবশ্যক যে, সম্মিলিত মহীশুরী ও নিজামী ফৌজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কর্ণেল স্মিথ মহা বীরত্বের সহিত আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। "ফরাসী সৈনিকরা অসমসাহসে শত্রুসেনাকে বারংবার আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সুতীব্র অগ্নিবৃষ্টিতে তিষ্ঠিতে না পারিয়া প্রত্যেক বারই পিছু হটিতে বাধ্য হইয়াছে। মিত্রপক্ষে প্রায় চারি শত লোক মারা যায়। একজন পর্ত্তুগীজ অফিসর আহত হইয়া শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছিল। যুদ্ধের পর নবাবী ফৌজদ্বয়, বিশেষতঃ নিজামের সৈন্যগণ অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়ে, অনন্তর উভয় নৃপতি পশ্চাৎপদ হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইংরেজরা তাঁহাদের বাধা দিবার কোন চেষ্টা করিল না। সেরূপ করিবার মত তাঁহাদের তখন অবস্থাও ছিল না।"

ইহার পর প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল ভাণিয়ামবাড়িতে ইংরেজ সেনার পরাজয়। "ইউরোপীয় সেনাপতি সামান্য আহত হইয়াছিলেন বলিয়া হায়দর তাঁহাকে কিছুতেই রাত্রে তোপমঞ্চ বাঁধা পর্য্যবেক্ষণ করিতে দেন নাই, তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে পাঠাইয়া

দিয়া তিনি স্বয়ং মিস্ত্রীদিগের কাজ দেখিতে লাগিলেন। সারারাত্রি ধরিয়া মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি পড়িয়াছিল এবং বায়ুও যথেষ্ট আর্দ্র ছিল। তৎসত্ত্বেও তিনি সমস্ত রাত্রি বৃক্ষতলে কাটাইয়াছিলেন। বিপক্ষের গোলাগুলিতে কয়েকজন সৈনিক নিহত হইয়াছিল; হায়দর কিন্তু ঈষন্মাত্র ভয় পান নাই, বরং নানাপ্রকার কৌতুকাবহ গল্পগুজবের দ্বারা সকলকে সমুৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।" তোপমঞ্চ বাঁধা শেষ হইলে আক্রমণকারিগণ দুর্গের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। শীঘ্রই প্রতিপক্ষের তোপ বন্ধ হইয়া গেল। দুর্গাধ্যক্ষ কাপ্তেন রবিন্সন আত্মসমর্পণ করিলেন। দে লা তুর বলিয়াছেন, এই যুদ্ধে প্রায় এক সহস্র সিপাহী, ত্রিশ জন ইউরোপীয় অফিসর, ষোলটি কামান এবং প্রচুর সমরসম্ভার বিজেতৃগণের হস্তগত হইয়াছিল। দুর্গ প্রাচীর ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও ধ্বংস হয় নাই এবং দুর্গমধ্যে তাহা সংস্কার করিবার মত লোকেরও অভাব ছিল না; তথাপি ইংরেজ সেনা কেন যে অত সহজে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল ঠিক বলা যায় না। রবিন্সন এবং অন্যান্য ইংরেজ সৈনিকগণ উক্ত সমরকালে আর অস্ত্র-পরিগ্রহ করিবেন না। এবংবিধ অঙ্গীকার করিলে হায়দর তাঁহাদের যদৃচ্ছা গমনের অনুমতি দিয়াছিলেন, কিন্তু মিথ্যাচারী ইংরেজ সেনাপতি স্বীয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে দ্বিধা করেন নাই,—যথাস্থানেই সেকথা বলা যাইবে।

ক্রমশঃ

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

চতুর্থ অধ্যায়

অনুবাদক—শ্রীচিত্রিতা দেবী

[আচার্য্য শঙ্কর যে কয়খানি প্রসিদ্ধ উপনিষদের ভাষ্য করেছেন, শ্বেতাশ্বতর তাদের অন্যতম। কিন্তু তা সত্ত্বেও একে অনেকেই অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালের বলে মনে করেন। এমন কি, অনেকে শঙ্করাচার্য্যকেও এর ভাষ্যকার বলে মানতে রাজী নন। তাঁদের মতে শঙ্করের নামের আড়ালে তাঁর শিষ্যসম্প্রদায়ের কেউ হয়ত এখানি লিখেছেন। যাই হোক, শঙ্করের ভাষ্যাবলীর মধ্যে শ্বেতাশ্বতরো-পনিষদের টীকাভাষ্য যথেষ্ট বড় জায়গা জুড়েই রয়েছে।

উপনিষদগুলি যদিও বিভিন্ন সময়ে রচিত, তবু তাদের মধ্যে একটা মূলগত ঐক্য আছে। এই ঐক্যের ইঙ্গিত বিশ্বের অন্তর্নিহিত অখণ্ড ঐক্যের দিকে।

এই ঐক্যবোধের উপরেই অদ্বৈত দর্শনের ভিত্তি। অদ্বৈত অর্থাৎ দ্বৈত নয়। এই যে অহরহ পরিবর্ত্তনশীল অনন্ত উৎসারিত কোটি বিচিত্র বিশ্ব, এর অন্তর্নিহিত মূল তত্ত্বটি এক। একই চিৎ-শক্তি সূর্য্য চন্দ্র তারা থেকে তৃণধূলি পর্য্যন্ত এ বিশ্বের সমস্ত জড়বস্তু ও প্রাণবস্তুকে পরিব্যাপ্ত করে নিরন্তর আনন্দ-দোলায় দুলছে। তারই দোলায়, তারই লীলায় বিশ্ব মুহুর্মুহু নানারূপে বিকশিত হয়ে উঠছে। সেই বিশ্বরূপিণী শক্তিই প্রতি মানবের চিত্তে অধিষ্ঠিত থেকে তাকে সেই বিশেষ মানব রূপে ফুটিয়ে তুলছে। এই শক্তিই 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।' কাজেই বিশ্বের অন্তর্নিহিত সত্য আর মানবের অন্তর্গূঢ় তত্ত্ব এক। একই ব্রহ্ম অথবা পরমাত্মা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত করেও মানুষের বুদ্ধির গহন গুহায় নিমজ্জিত হয়ে রয়েছেন। একই ব্রহ্ম সমগ্র জগতের বিচিত্র রূপে রূপে প্রতি-ফলিত হচ্ছেন—কাজেই জগৎ রূপে যাকে দেখছি তিনি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। বস্তুতঃ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই সত্য নয়। আমাদের এই সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা তাঁরই ভাববিলাস। তিনিই একমাত্র চিরন্তন সত্ত্ব। ত্রিকাল-অতীত হয়েও সমগ্র কালকে তিনি তাঁর মানস-লোকের মধ্যে আহরণ করছেন। রজ্জুতে সর্পভ্রমের মত আমরা সেই একমাত্র পরম ব্রহ্মে জগদবিভ্রম দর্শন করে থাকি। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলেই এই মিথ্যা অভিমান দূর হয়ে যায়। যেমন রজ্জুকে চিনতে পারা মাত্র সর্পরূপ অবস্তু দূর হয়ে যায়—তেমনি তাঁকে চিনতে পারলেই এই জগৎ একান্ত অসার অবাস্তব ছায়ার মত মিলিয়ে যাবে, রাত্রিশেষে যেমন করে মিলিয়ে যায় স্বপ্ন।

উপনিষদগুলির মধ্য থেকে নানা সমর্থক বাক্যের দ্বারা শঙ্কর তাঁর এই 'অদ্বৈত দর্শন' ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এই সঙ্গেই উপনিষদগুলির মধ্যে আর একটা ভাবধারা নিগূঢ় হয়ে আছে, যার উপরে ভিত্তি করে পরবর্ত্তীকালে বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি বেদান্তের বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠেছে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই ভাবধারার অভিব্যক্তি আর একটু স্পষ্ট। বিশ্বময় একই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-সত্তা বিরাজমান সত্য, কিন্তু এই সত্তার দুইটি প্রধান ভাব বা অংশ অথবা দিক আছে। এই দুই দিকই সত্য—এই দুইয়ের মধ্যেই তাঁর পরিচয়। তা হলে জগৎ মিথ্যা নয়—ব্রহ্মেরই অংশ। এক অংশে তিনি স্থির অচঞ্চল, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প গুণাতীত অভোক্তা সাক্ষী। অন্য অংশে তিনি সতত পরিবর্ত্তনশীল, রূপে রূপে দৃশ্যমান, সদাচঞ্চল, গুণময়, কর্ম্মকারী এবং ফলভোগী।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র সংহত রূপের মধ্যেও তাঁর এই দুই ভাব। একটি তাঁর স্থূল ভাব, বা দৃশ্যমান। যে ভাবে, যে রূপে, তিনি অরণ্য-পর্ব্বত নদী-সমুদ্র তরুলতা পশুপক্ষীর মধ্যে নিত্য প্রকাশিত। তাঁর অন্য ভাবটি অরূপ অপ্রমেয় নিরপেক্ষ সাক্ষী। সমগ্র জড় ও প্রাণসমষ্টির অন্তর্লীন স্বভাব, সেই অরূপ তত্ত্বই এই বিশ্বসংহতির অন্তরতম সত্য।

সেই সত্যকে, নির্গুণ, রূপ রস গন্ধ স্পর্শের অতীত, এও বলা যায়, আবার এও বলা যায় যে, তাঁর মধ্যেই এই সকলের মিলন। সকল ইন্দ্রিয়, সকল বোধ, সকল জ্ঞান, সকল গুণ তাঁরই মধ্যে সংহত হয়ে রয়েছে। সেই সচ্চিদ্ অথবা সত্য চেতনাই এই জগৎ সৃষ্টির মূলে। দেশকালাতীত সেই অজ্ঞেয় অদৃশ্য চেতনার মধ্যেই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ধাবমান এই বিরাট কালচক্র আবর্ত্তিত হচ্ছে। এ তাঁরই শক্তি, এ তাঁরই ইচ্ছা, তাঁরই কল্পনা। এ যদি মায়া হয়, এ তাঁরই মায়া। অনন্ত ব্রহ্মের অনন্ত মায়া। সেই নির্গুণ, অথবা গুণসংহত ব্রহ্মই দুঃখ সুখ ভোগ বাসনায় জীবরূপে এবং জগৎরূপে নিজেকে প্রকাশিত করছেন।

কবি যেমন তার রচনায় নায়ক-নায়িকার মুখে নিজের কথাই বলে যান, তাদের জন্যে সুখ-দুঃখের কল্পলোক সৃজন করে তার মধ্যে নিজেকেই উপলব্ধি করেন, তেমনি সেই সর্ব্বদর্শী বিশ্বকবি নিজ রচনার মধ্যে দিয়ে নিজেকেই ভোগ করেন।

"নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ"—

তিনি অকারণে, দেহ-উপবনে,
জীবভাবে হয়ে মুগ্ধ,
নব দ্বারপথে, (নিজ মনোরথে)
বিষয় লভিতে লুব্ধ—

এঁরই কথা কবি বলেছেন—

"আমার চক্ষে তোমার বিশ্বছবি,
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি।"

সমষ্টিগত ভাবে বিশ্বের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তাঁর এই দুই রূপ প্রতি সৃষ্টিতে, ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতি বস্তু ও প্রাণের মধ্যে একই জোড়-বিজোড়ের দ্বন্দ্বে অহর্নিশি দোলায়িত হচ্ছে।

দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥"

একই ডালে বসে আছে দুই পাখী—একই শরীরকে আশ্রয় করে। একটি এই ডালের মায়ায় আবদ্ধ, পাকা ফলটির দিকেই তার লোভ। সে কেবলই চেখে চেখে দেখছে—বাসনা হতে ভোগ ও ভোগ হতে বাসনায় নিরন্তর বিবর্ত্তিত হতে হতে সে কেবলই জীর্ণ হয়ে চলেছে। কিন্তু তার অন্তরতম সত্য তেমনি নির্ব্বিকার। কিছুতেই তার পরিবর্ত্তন নেই। বাসনার দহন, দুঃখের জ্বালা তাকে বিকৃত করতে পারে না। সেই নিরাসক্ত পাখী কেবল দেখে। সে শুধু দ্রষ্টা—এই ফলভোগীকে সেই অভোক্তা রাত্রিদিন তার বন্ধনহীন শিবদৃষ্টি মেলে দেখছে। সেই দৃষ্টিতে কি করুণার অবকাশ আছে? মুক্ত প্রেমের আভায় কি সেই নয়নের আলো ঐ ফলভোগী পাখীটাকে বার বার আকর্ষণ করে? নিরন্তর তিক্তকষায় মিঠে ফলের মধ্যে মুখ গুজে থেকে সে কি হঠাৎ কখনও কার আকর্ষণে মুখ তুলে তাকায় সেই তার দিকে যে নিরন্তর নিরাসক্ত শিবদৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে শুধু তারই দিকে?—শত পাপের উত্তাপের মধ্যেও যে কখনও তাকে ছেড়ে যায় না। ফলের রসে আবিল আচ্ছন্ন দৃষ্টি দিয়ে তাকে দেখা যায় না, হয়ত মিথ্যা অহঙ্কারের অভিমানে দেখতে চাইও না। সে কিন্তু নিরভিমান, চেয়ে বসে আছে—কবে এই ভোগী দৃষ্টি স্বচ্ছ করে তার দিকে চোখ তুলে চাইবে। তাকে দেখতে পেলেই সব ভেদজ্ঞান আপনি দূর হয়ে যাবে। সত্য দর্শনে, সত্যের সঙ্গে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলনে কোন মিথ্যার বাধা রইবে না।

এই মিলনই ভক্তিবাদের প্রথম এবং শেষ কথা। দ্বন্দ্বের মধ্যে, দ্বৈতের মধ্যে এর সুরু। অখণ্ডের মধ্যে অদ্বৈতের মধ্যে এর শেষ অথবা বিশ্রাম। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেই বোধ হয় প্রথম ভক্তির নাম পাই। ভক্তি ও প্রার্থনার অপার্থিব ঐক্যতানের প্রথম সূচনা বোধ হয় এই উপনিষদেই।

"য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তি যোগাৎ
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি—

অদ্বিতীয় অবর্ণ পরম সত্য এক হয়েও এই কোটি বিচিত্র বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সেই তাঁর বিশ্বসত্য প্রতি প্রাণিদেহে নিগূঢ় সাক্ষী রূপে বিরাজমান। স্বরূপকে দ্বিধাখণ্ডিত করে তিনি এই চিরচঞ্চলা বিচিত্রাকে জন্মমরণের পথে পথে অনন্ত যাত্রায় পাঠিয়েছেন। তিনি নিজেই তাকে ঘরছাড়া করেছেন, তবু প্রতীক্ষা করে আছেন, কবে সে তাঁর কোলের মধ্যে ফিরে আসবে। সেই একটুখানি ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়ে, এই দ্বৈতের মায়া সৃষ্টি করেছেন অদ্বৈতকে উপলব্ধি করবার জন্যেই। অবিদ্যার জাল পেতেছেন—সে জাল ছিঁড়ে মানুষ আপন দৃষ্টিকে শুদ্ধ মুক্ত করবে বলে। সেই অশেষ কল্যাণগুণাকর পরমাত্মা ভুবন ভরে মিথ্যার আর অকল্যাণের ফাঁদ পেতে রেখেছেন—সে ফাঁদ এড়িয়ে মানুষ আপন অন্তর্নিহিত শুভবুদ্ধিতে ফিরে যেতে পারবে বলে:

"দুঃখখানি দিলে মোর তপ্ত ভালে থুয়ে,
অশ্রুজলে তারে ধুয়ে ধুয়ে,
আনন্দ করিয়া তারে ফিরায়ে আনিয়া দিই হাতে,
দিনশেষে মিলনের রাতে।"

এতকাল উপনিষদ বলেছেন, ব্রহ্মকে জ্ঞানের মধ্যে উপলব্ধি করাই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য।

"য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি"—যারা তাঁকে জানে তারাই অমৃত হয়। যদিও এ জানা কেবল বুদ্ধির জানা নয়, শুধু তর্ক বিচার দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না।

"নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া"—অনুভবের মধ্যেই তাঁকে জানতে হবে। হৃৎপদ্মেই সেই বিশ্বব্যাপিনী শক্তিকে আপন স্বরূপ বলে উপলব্ধি করতে হবে। কিন্তু তবু এও অদ্বৈত সাধনা। ভক্তি-সাধনায় দ্বৈতের প্রয়োজন। দুইয়ের মধ্যে দিয়েই একের প্রকাশ।

যে ভক্তিসাধনা গীতায় পুষ্ট হয়ে পরবর্ত্তী কালে বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে চরম অভিব্যক্তি লাভ করেছিল, যে সাধনা ভক্ত ও ভগবান উভয়কেই স্বীকার করে চরম আত্মনিবেদনে এক অখণ্ড মিলনের

মধ্যে বিলীন হয়ে যায়, তারই সূত্রপাতের আভাস যেন পাওয়া যায় এই উপনিষদে। আর পাওয়া যায় আত্মার চিরন্তন অমলিন প্রার্থনার বাণী।

যজ্ঞ ও মন্ত্রের মাধ্যমে একদা পার্থিব সুখের কামনাই ছিল মানুষের প্রার্থনা। ক্রমে উপনিষদের যুগে এল ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, জ্ঞান-পিপাসা। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই ভক্তি ও প্রার্থনার প্রথম আগমনী ধ্বনিত হ'ল।

পার্থিব সুখের প্রার্থনা নয়, নচিকেতার মত জ্ঞানের প্রার্থনা নয়। নিবেদনের প্রার্থনা। আমাকে তোমার সঙ্গে যুক্ত কর। আমি ক্ষুদ্র, আমি ভোগী, আমি নিত্য বাসনাচঞ্চল। আমার মধ্যে অবিদ্যার অন্ধকার। তুমি নিত্য বুদ্ধ শুদ্ধ রূপ, তুমি চিরজ্যোতি। তোমার অনাসক্ত কল্যাণের পথে, তোমার মঙ্গলের সঙ্গে, শিবের সঙ্গে, শুভের সঙ্গে আমাকে যুক্ত কর—

ধন নয় মান নয়—স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।]

য একোঽবর্ণোবহুধাশক্তিযোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থোদধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥১

নিগূঢ় কারণে, যে পরম এক সৃজন করেন,
বহু বিচিত্র শক্তির যোগে বহু বিচিত্র রূপ।
যাঁহাতে রয়েছে বিশ্বের স্থিতি,
প্রলয়ে আবার যাঁহার মাঝারে স্তব্ধ নিথর
মৃত্যুতে নিশ্চুপ।
জ্যোতিস্বরূপ নির্বিশিষ্ট সেই সে পরম
মুক্ত,
(আপনার সাথে) শুভবুদ্ধিতে করুন
মোদের যুক্ত ॥১

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ু
স্তদুচন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদাপস্তৎ
প্রজাপতিঃ ॥২

তিনিই অগ্নি, তিনিই সূর্য্য, তিনি তারা
আর তিনিই চন্দ্র আকাশে।
তিনি প্রজাপতি, এ বিশ্বপ্রাণ, তিনি জল,
আর তিনিই বহেন বাতাসে ॥২

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং
কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি
ত্বং জাতো ভবসি
বিশ্বতোমুখঃ ॥৩

তুমিই পুরুষ, তুমি নারী,
আর তুমিই কুমারকুমারী
দণ্ডহস্তে স্খলিত চরণে, বৃদ্ধের রূপে যাও।
পুনঃ নব নব বিচিত্র রূপে
নবীন জন্ম নাও ॥৩

নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তড়িদ্-গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা ॥৪

রক্তচক্ষু শুকসারী তুমি,
নীল ভ্রমরেও তোমারি সুনীল আভা,
বিজলীগর্ভ মেঘ তুমি আর
ঋতু সমস্ত সপ্তসাগরপ্রভা।
অনাদিস্বরূপ, সকল ব্যাপিয়া, তবুও
সর্বাতীত।
তোমারি মাঝারে বিশ্বভুবন নিত্য-
উৎসারিত ॥৪

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃপ্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥৫

বহু প্রজাবতী ত্রিবর্ণা মায়া,
জীব অনুরাগে ভজে,
(জীবন্মুক্ত) যে জন, সে তারে
অনায়াসে যায় ত্যজে ॥৫

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥৬

সদাসুমিলিত সমনামধারী
দুইটি সমান পাখী,
আশ্রয় করে বসেছে দু'জনে,
একই বৃক্ষের শাখী।
তাদের মধ্যে একটি সেবিছে
স্বাদু পিপ্পল ফল,
অন্য পক্ষী, কেবল সাক্ষী
অভোক্তা অচপল ।।৬

সমানে বৃক্ষে পুরুষোনিমগ্নোঽনীশয়া।
শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-
মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥৭

দেহে আসক্ত যে জীব, সে জন
দুঃখদৈন্যে পীড়িত মুহ্যমান।
চিত্তমাঝারে, যে দেখে তাঁহারে
অশোক সে জন দুখ হতে পায় ত্রাণ ।।৭

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
য ইত্তদ্বিদুস্তইমে সমাসতে ॥৮

ব্রহ্মস্বরূপ যে পরম ব্যোমে,
বেদ ও দেবতা আশ্রয় করে রহে।
তাঁরে যে জানে না, তার তরে বেদ,
কোন্ ফল আনে বহে ?
যে তাঁরে এরূপে জেনেছে তাহার
সার্থক ইহজন্ম।
অরূপ সত্তা চিত্তে তাহার
জ্বলিছে বিনিষ্কম্প ।।৮

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি
ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি
অস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ
তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥৯

তাঁহারি প্রকাশ বেদপ্রচারিত
ব্রত যজ্ঞ ও ছন্দ।
নিজ মায়াবলে সেই মায়াধীশ
রচেন বিশ্বানন্দ।
মোহপাশে ঘিরে নিজেরে আবার
জীবরূপে হন বন্ধ ।।৯

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু
মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং
জগৎ ॥১০

প্রকৃতিরে জেনো মায়া আর
জেনো মায়াধীশ ভগবান।
তাঁরি অঙ্গের বিচিত্র রূপে
নিখিল বিত্তবান্ ।।১০

য যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
যস্মিন্নিদং সং চ বিচৈতি সর্বম্।
তমীশানং বরদং দেবমীড্যং
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥১১

এক হয়ে যিনি কারণে কারণে
করেন অধিষ্ঠান।
যাঁহার মাঝারে বিশ্ব আবার
নিঃশেষে লীয়মান
বরণীয় সেই পূজনীয় দেবে,
চিত্তে যে জন দেখেছে,
অপার শান্তি পরমানন্দ
সে জন নিত্য লভেছে ।।১১

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানং
স নো বুদ্ধ্যাশুভয়া
সংযুনক্তু ॥১২

যাঁহার মাঝারে দেবতা জন্ম
যাঁহাতে অভ্যুদয়,
পরম রুদ্র বিশ্বের প্রভু, তিনি
সব জ্ঞানময়।
জায়মানা এই প্রাণশক্তিরে
যিনি দেখেছেন মানসে,
যুক্ত করুন মোদের বুদ্ধি,
তিনি কল্যাণরসে ॥১২

যো দেবানামধিপো
যস্মিল্লোঁকা অধিশ্রিতাঃ
য ঈশে অস্যদ্বিপদশ্চ চতুষ্পদঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা
বিধেম ॥১৩

দেবতাগণের প্রভু, আর যিনি
ত্রিলোকের আশ্রয়,
শাসন করেন মৃগ ও মানুষ
যিনি এ ভুবনময়।
চিরভাস্বর আনন্দরূপ, সেই কোন
দেবে আজ।
চরু পুরোডাশ হবি দিয়ে পূজি
বিশ্বভুবনমাঝে ॥১৩

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা শিবং
শান্তিমত্যন্তমেতি ॥১৪

সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্ম গহন সংসারমাঝে,
নিত্য সাক্ষী যিনি,
বিচিত্র রূপে হন প্রতিভাত
বিশ্বস্রষ্টা তিনি,
চিত্ত বাহির ঘিরিয়া তাঁহার
কল্যাণময় রূপ,
যে দেখে, সে লভে পরমা শান্তি,
অন্তরে অপরূপ ॥১৪

স এব কালে ভুবনস্য গোপ্তা
বিশ্বাধিপঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ
তমেব জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাং
শ্ছিনত্তি ॥১৫

কল্পারম্ভে রক্ষা করেন যিনি
এ ভূমণ্ডল।
সর্বভূতের মর্মগহনে, নিগূঢ় অচঞ্চল
সব ঋষি আর সকল দেবতা
যাঁর মাঝে মিলে রয়।
মৃত্যুর পাশ ছিন্ন করিও
তাঁরে জেনে হৃদিময় ॥১৫

ঘৃতাৎ পরং মণ্ডমিবাতিসূক্ষ্মং
জ্ঞাত্বা শিবং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥১৬

ঘৃতের উপরে মণ্ডের মত,
সূক্ষ্ম ও সারভূত,
আত্মা রয়েছে সর্বভূতের
মর্মে নিগূঢ় স্থিত।
বিশ্ব ঘেরিয়া পরিবেষ্টিত
জ্যোতিস্বরূপ শক্তি
যে জানে সে জন, লভে বন্ধনপাশ হতে
চিরমুক্তি ॥১৬

এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ
হৃদা মনীষা মনসাঽভিকৢপ্তো
য এতদ্বিদুর মৃতাস্তে ভবন্তি ॥১৭

বিবেকশুদ্ধ জ্ঞানের মানসে,
তাহার মুক্ত প্রকাশ ঝলসে,
বিশ্বকর্মা মহাত্মা দেব
সদা মানবের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট
যে তারে জেনেছে, অমৃত সে জন,
নয় সে দুঃখে ক্লিষ্ট ॥১৭

যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি র্ন
সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ
তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী ॥১৮

নাইকো সেথায় দিবসরাত্রি অবিদ্যাঘেরা তমসা,
তিনি অক্ষয়, রবিরও পূজ্য বিশ্বচিত্তভরসা।
সৎ ও অসৎ দুয়েরই অভাব, শুদ্ধ স্বভাব রূপ।
শাশ্বত এই জ্ঞানেরও উৎস, তাঁহারি মর্মকূপ ॥১৮

নৈনমূর্ধ্বং ন তির্যঞ্চং ন মধ্যে
পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম
মহদ্‌যশঃ ॥১৯

অধঃ ও ঊর্দ্ধ কিম্বা বক্রকোণে,
কেহ কভু তাঁরে না পারে ধরিতে মনে।
সর্বব্যাপ্ত মহৎ কীর্তি এই নাম আছে যাঁর।
কোথায় উপমা, কোথায় প্রতিমা তাঁর ॥১৯

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষাপশ্যতি কশ্চনৈনম্
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনমেবং
বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥২০

চোখের দেখায় তাঁহারে তো
দেখা যায় না—
কোন ইন্দ্রিয় তাঁরে প্রকাশিতে
পায় না।
বিচারশুদ্ধ জ্ঞান সাধনায়,
যে পারে জানিতে, তাঁহার স্বরূপ,
গূঢ় মর্মের চেতনায়
ধন্য সে জন মরজন্মেই
অমৃত জীবন পায় ॥২০

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্‌ভীরুঃ
প্রপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্ ॥২১

জন্মবিকার ভয়ে ভীরু আমি,
এসেছি তোমার অজ অমৃতশরণে,
রুদ্র তোমার দক্ষিণ মুখে, ত্রাণ কর
মোরে, নিত্য (দুঃখ প্লাবনে) ॥২১

মা নস্তোকে তনয়ে
মান আয়ুষি—
মা নো গোষু মানে অশ্বেষু রীরিষঃ।
বীরান্ মা নো রুদ্র
ভামিতোঽবধীর্হবিষ্মন্তঃ
সদমিত্ত্বা হবামহে ॥২২

হে রুদ্র, তুমি আমাদের প্রতি
কোর না কোর না রোষ।
কোর না জীবন নাশ।
পুত্র পৌত্র গরু ঘোড়া দাস,
মরণের মাঝে কভু,
হরণ কোর না প্রভু।
হবি ও যজ্ঞ ক্রিয়া উপহারে,
আমরা তোমারে নিত্য।
আহ্বান করি ব্যগ্র হৃদয়ে,
ভরিয়া ব্যাকুল চিত্ত ॥২২

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

মুক্তিকামী রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅমরকুমার দত্ত

মানবসমাজের এবং বিশেষ করে আমাদের দেশের এক দল মুক্তিপিপাসুদের সাধারণ ধারণা হচ্ছে যে, জগৎ-সংসারের মায়াপ্রপঞ্চ হতে দূরে থেকে নির্ব্বিকার মনে বৈরাগ্য সাধনই মানবাত্মার মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় এবং এই পথই একমাত্র পথ। অতএব মুক্তিকামী সাধক-জীবনের সামনে "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"—আর কোন পথ নাই। অতীন্দ্রিয়-বাদী মরমিয়া (mystic) কবি ও সাধক সম্প্রদায়ও এই মত পোষণ করে থাকেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের কলকোলাহল থেকে দূরে সরে গিয়ে তাঁরা অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অরূপ বীণার সুরলহরী শোনবার প্রত্যাশায় ব্যগ্র হয়ে থাকেন এবং এই ভাবেই "সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিমাঝে" জীবন অতিবাহিত করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একদিকে মুক্তিসাধক ও অন্য দিকে মরমী কবি হয়েও একদিন শুভ সুপ্রভাতে প্রার্থনা করলেন :

"মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে তোমার বিশ্বের সভাতে,
আজি এ মঙ্গল প্রভাতে।
... ...
বাহির কর তব পথের মাঝে, বরণ কর মোরে তোমার কাজে ;
নিবিড় আবরণ কর বিমোচন, মুক্ত কর সব তুচ্ছ শোচন,
ধৌত কর মম মুগ্ধলোচন তোমার উজ্জ্বল শুভ্র রোচন
নবীন নির্মল বিভাতে।"

একেবারে উল্টো কথা। পথের মাঝে বাহির করার ডাক, কাজে বৃত হওয়ার ডাক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বের দরবারে গিয়ে দাঁড়াবার ডাক। তা হলে তিনি কি মুক্তিকামী ছিলেন না? ছিলেন না কি তিনি তা হলে মরমিয়া কবি? হ্যাঁ, তিনি দুই-ই ছিলেন এবং উপরন্তু ছিলেন তিনি উপনিষদের "সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম"-বিশ্বাসী। সত্যরূপে, জ্ঞান রূপে সেই অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম এই জগতে বিরাজিত তা তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর অন্তরে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—এই জগতের যাহা কিছু সকলই তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত হচ্ছে। তাই সেই স্রষ্টার কাছে পৃথিবীর পথ তাঁরই পথ, সংসারের কাজ তাঁরই কাজ, বিশ্বের সভা তাঁরই সভা। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন :

"প্রকৃতি তাহার রূপরসবর্ণগন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধিমন, তাহার স্নেহপ্রেম লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে—সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না, সেই মোহকে আমি নিন্দা করি না। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে। জগতের সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া, প্রিয়জনের মাধুর্য্যের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদের টানিতেছেন—আর কাহারও টানিবার ক্ষমতাই নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই ত আমি মুক্তির সাধনা বলি।"

উপনিষদ জ্ঞান-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই মুক্তি-সাধনার শক্তিতেই মুক্তিকামী মরমী কবি রূপরসগন্ধময় জগতের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত থেকেও ছিলেন নির্লিপ্ত। এরই আলোকোদ্ভাসিত চেতনায় ও প্রেরণায় তিনি অরূপ-বীণার সুরের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন বিশ্ব-বীণার সুর। এই মুক্তি-সাধনার উপলব্ধিতেই তিনি একদিন বিশ্ববাসীকে ডেকে বললেন :

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়।
... ...
ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।"

এই সাধনার অন্তর্নিহিত সুরেই কবি বেঁধে নিলেন তাঁর জীবন-বীণার তার, এবং তারই মূর্চ্ছনার সুরে সুরে তাঁর বন্ধনময় মুক্তির আনন্দরাগিণী ছড়িয়ে পড়ল আকাশের আলোয় আলোয়, ধরণীর ধূলায় ধূলায়, তৃণে তৃণে। তিনি গাইলেন :

"আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে,
আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে।
দেহমনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে,
গানের সুরে আমার মুক্তি ঊর্দ্ধে ভাসে।
আমার মুক্তি সর্ব্বজনের মনের মাঝে,
দুঃখবিপদ-তুচ্ছ-করা কঠিন কাজে।
বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা, আত্মহোমের বহ্নিজ্বালা—
জীবন যেন দিই আহুতি মুক্তি-আশে।"

অর্দ্ধ শতাব্দীকাল আগে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব্বে ও পরে দেশের "সর্ব্বজনের মনের মাঝে" তাঁর মুক্তির ডাক এসেছিল। সেদিন তিনি "দুঃখবিপদ-তুচ্ছ-করা কঠিন কাজে" আপনাকে ব্রতী করেছিলেন এবং "আত্মহোমের বহ্নি" জ্বেলে দেশমাতৃকার মুক্তির আশায় নিজ জীবন আহুতি দিয়েছিলেন। সেদিন তিনি ব্রহ্মপরিব্যাপ্ত এই রূপরসময়

জন্মভূমিকে মাতৃসম্বোধনে ডেকে সকলকে বলেছিলেন, "একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক জগতজনের শ্রবণ জুড়াক।" সেদিন তিনি বন্দিনী মায়ের সকল ধর্ম্মের, সকল শ্রেণীর সন্তানগণকে এক মাতৃমন্ত্রে ডেকে পরিয়ে দিয়েছিলেন সকলের হাতে রাখীবন্ধনের রাখী, আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন :

"বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন,
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।"

"আত্মহোমের অগ্নি" জেলে, বাংলার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি তরঙ্গায়িত করে, সেদিন তিনি বাংলা তথা ভারতে নিয়ে এলেন এক নবজাতীয়তার ভাগীরথীধারা, সেদিন তিনিই হলেন "স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্ত্তি"। তাঁর কণ্ঠে জাতীয়তার নব সামগান ধ্বনিত হয়ে উঠল নিবিড় নিশীথ অন্তে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে। তাঁর জীবন-বীণার তারে তারে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল দীপক রাগিনীর সুর। সেই সুরে বাংলার জনগণ, পথঘাট আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে গেয়ে উঠলেন :

"দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব-জন-পশ্চাতে?
লউক বিশ্বকর্ম্মভার মিলি সবার সাথে।
প্রেরণ কর, ভৈরব তব দুর্জ্জয় আহ্বান হে.
জাগ্রত ভগবান হে।"

স্বদেশের মুক্তি-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেদিন চেয়েছিলেন স্বদেশ-আত্মার মুক্তি। তিনি রাজনীতিক ছিলেন না, ছিলেন জাতীয় গৌরবে গৌরবান্বিত জাতীয়তাবাদী ভারতসন্তান, জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তিকামী সাধক ও পথ-প্রদর্শক। দ্বেষ, হিংসার উপর জাতীয়তার ভিত্তি না গড়ে, তিনি গড়তে চেয়েছিলেন তার সুদৃঢ় ভিত্তি ধর্ম্মবোধ, আত্ম-নির্ভরশীলতা ও আত্মমর্য্যাদার উপর। জাতির অগ্রগতি ও কল্যাণের জন্যে তাঁর হৃদয় হতে নিয়ত প্রার্থনা উঠেছে :

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গনতলে দিবস শর্ব্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি;
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালিরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি;
পৌরুষেরে করে নি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব্ব-কর্ম্ম-চিন্তা আনন্দের নেতা;
নিজ হস্তে নির্দ্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।"

জাতিকে তিনি ভালবাসতেন এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাইতেন তার পূর্ণ গৌরবে। তাই দেখতে পাই জাতির আত্মমর্য্যাদার উপর যখনই কোন আঘাত এসেছে বাহির থেকে তখনই তিনি এগিয়ে এসেছেন তাঁর নির্ভীক প্রতিবাদ নিয়ে। আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে, নির্ভীক চিত্তে দুরূহ কাজে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বানই ছিল তাঁর কাছে স্বদেশ-আত্মার মুক্তি-আহ্বান।—তাই তাঁর নির্ভীক চিত্ত গেয়ে উঠল :

"সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান,
সঙ্কটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মান।
মুক্ত করো ভয়,
আপনা মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়।
ধর্ম্ম যবে শঙ্খ রবে করিবে আহ্বান,
নীরব হয়ে, নম্র হয়ে পণ করিয়ো প্রাণ।
মুক্ত করো ভয়,
দুরূহ কাজে নিজেরই দিয়ো কঠিন পরিচয়।"

কিছুকাল পরে রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের সাধনপথের এই উত্তর-সাধককে দেখি বোলপুর শান্তিনিকেতনে "শান্তম্-শিবমদ্বৈতমে"র উপাসক তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনপীঠে—সপ্তপর্ণ বৃক্ষের শান্ত ছায়ায়। "বিশ্বধাতার যজ্ঞ-শালা"য় এবার তাঁর ডাক পড়েছে জাতির জ্ঞান-যজ্ঞের বেদীমূলে। কারণ তিনি দেখেছিলেন যে, "ভারতবর্ষের বুকের উপর যত কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটিমাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্ম্মবিরোধ, কর্ম্মজড়তা, আর্থিক দৈন্য—সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে।" তাই জ্ঞানশিক্ষা কার্য্যের মধ্যে এই মুক্তি-সাধক আবার আত্মহোমের অগ্নি জ্বাললেন এবং নিজেকে নিঃশেষে আহুতি দিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে এখানে তিনি রচনা করলেন নিখিল মানবমনের মুক্তিবেদী। তার নাম রাখলেন বিশ্ব-ভারতী। ভারতের শাশ্বত বাণীর মর্ম্মকথা উচ্চারিত হ'ল এই বেদীমূলে—ছড়িয়ে পড়ল তা নিখিল বিশ্বে। অচিরে এই শিক্ষামন্দির প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জ্ঞানী মনীষীদের এক সুষ্ঠু মিলন-মন্দিরে রূপান্তরিত হয়ে উঠল। এই প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে তিনি বলেছেন—"সকল জাতির সকল সম্প্রদায়ের আমন্ত্রণে এখানে আমি শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত রাখবার শুভ অবকাশ ব্যর্থ করি নি। বার বার কামনা করেছি :

"য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ
বর্ণাননেকান নিহিতার্থো দধাতি
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।"

'যিনি এক ও বর্ণহীন, যিনি বহুধা শক্তিযোগে বহুবর্ণের মানুষের কল্যাণ করছেন তিনি আমাদের শুভবুদ্ধি প্রেরণ করুন।' এই শিক্ষাক্ষেত্রকে তিনি চিরাচরিত বিদ্যালয় না

করে একটি অভূতপূর্ব্ব জ্ঞানোন্মেষক বিদ্যাশ্রম করে গড়ে তুললেন এবং এর বীজমন্ত্র দিলেন "শান্তং শিবমদ্বৈতম্"। তিনি এর আদর্শ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন ঃ

"আমি আশ্রমের আদর্শরূপে বার-বার তপোবনের কথা বলেছি। সে তপোবন ইতিহাস বিশ্লেষণ করে পাই নি। সে পেয়েছি কবির কাব্য থেকেই। তাই স্বভাবতই সেই আদর্শকে আমি কাব্যরূপেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি। বলতে চেয়েছি পশ্য দেবস্য কাব্যং, মানবরূপে দেবতার কাব্যকে দেখ। আবাল্যকাল উপনিষদ আবৃত্তি করতে করতে আমার মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে মানতে অভ্যাস করেছে।"

এই "বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতা"র অখণ্ড সত্তার কাছে আত্মসমর্পণ করে তিনি তাঁর জীবনের বহুবিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রে কাজ করে গেছেন এবং এই বিচিত্র কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে আত্মনিয়োগ করেই তিনি তাঁর মুক্তির সন্ধান ও সাধনা করে গেছেন। তাঁর সাধনা তাঁকে শতকর্ম্মের মধ্যে রেখেও তাঁকে রেখেছিল তার ঊর্দ্ধে, শত কর্ম্মের পাকে জড়িয়েও তাঁকে রেখেছিল মুক্ত ও সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। তিনি সকল বন্ধনকে, সকল দুর্ব্বিপাক ও আঘাতকে ভগবানের হাতের দান বলে বিশ্বাস করে নিয়ে তাঁরই মধ্যে ডুবে যেতে পারতেন। বন্ধনকেই তিনি মুক্তির সোপানস্বরূপ জ্ঞান করে এসেছেন— হয় সাংসারিক কর্ম্মবন্ধন, নয় পরমাত্মার সঙ্গে বন্ধন, হয় সীমার তীরের বন্ধন, নয় অসীম অকূলের সঙ্গে বন্ধন। বন্ধনই নিয়ে আসে আমাদের কর্ম্মপথে এবং সে পথের অন্তে মুক্তি দেয় আমাদের তাঁরই মাঝে। সেই বন্ধন-মুক্তির সুর বেজে উঠল তাঁর চিত্তবীণায় ঃ

"আমায় মুক্তি যদি দাও বাঁধন খুলে,
আমি তোমার বাঁধন নেব তুলে।
যে পথে যাই নিরবধি সে পথ আমার ঘোচে যদি
যাব তোমার মাঝে পথের ভুলে।
যদি নেবাও ঘরের আলো,
তোমার কালো আঁধার বাসব ভালো ;
তীর যদি আর না যায় দেখা, তোমার আমি হব একা
দিশাহারা সেই অকূলে।"

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনে কোনদিন কর্ম্ম হতে বিশ্রাম বা মুক্তি চান নি। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন উপনিষদের সেই অমৃতবাণী—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি।"

'আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম হতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, তাঁহা দ্বারাই জীবিত রহে এবং শেষে তাঁহারই কাছে গমন করে।' তিনি বিশ্বাস করতেন ঃ

"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"

"তাঁহার আনন্দরূপ অমৃতরূপ আমাদের কাছে প্রকাশ পাইতেছে। তিনি যে আনন্দিত, তিনি যে রসস্বরূপ ইহাই আমাদের নিকট প্রকাশমান।··· যিনি সর্ব্বজগদ্‌গত ভূমা তাঁকে উপলব্ধি করবার সাধনায় এমন উপদেশ পাওয়া যায় যে, 'লোকালয় ত্যাগ করো, গুহাগহ্বরে যাও, নিজের সত্তাসীমাকে বিলুপ্ত করে অসীমে অন্তর্হিত হও।'···আমার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহানপুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে—তিনি নিখিল মানবের আত্মা।···মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলাম কেন। · জীবনদেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক করে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি।"

সেই চিরজাগ্রত, চিরপ্রকাশমান আনন্দময় সত্তার কাছে তিনি চাইতেন তাঁর নিজ সত্তাকে প্রকাশ করতে কর্ম্মের মধ্য দিয়ে—কর্ম্মই আনন্দ কারণ সে আমাদের অদৃশ্য সত্তাকে দৃশ্য করে। তিনি বলছেন—"মানুষ যতই কর্ম্ম করছে, ততই সে আপনার ভিতরকার অদৃশ্যকে দৃশ্য করে তুলছে, ততই সে আপনার সুদূরবর্ত্তী অনাগতকে এগিয়ে নিয়ে আসছে। এই উপায়ে মানুষ কেবলই আপনাকে স্পষ্ট করে তুলছে—মানুষ আপনার নানা কর্ম্মের মধ্যে, রাষ্ট্রের মধ্যে, সমাজের মধ্যে আপনাকেই নানা দিক থেকে দেখতে পাচ্ছে। এই দেখতে পাওয়াই মুক্তি। অন্ধকার মুক্তি নয়, অস্পষ্টতা মুক্তি নয়।" তাই দেখি সেই মুক্তিকামী পুরুষকে মৃত্যুর মাঝে, বিপর্য্যয়ের মাঝে, নিন্দা-অপবাদের মাঝে কর্ম্মে নিরলস থাকতে আনন্দস্বরূপে নিমগ্ন হয়ে। শারীরিক মানসিক কোন ক্লেশই তাঁকে বিচ্যুত করতে পারি নি সেই আনন্দস্বরূপ থেকে। তাঁর ছোট্ট কবিতার মধ্যেও ঝরে পড়ে সেই অমৃতময় বাণী যা তাঁর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় অতি সত্য হয়ে উঠেছিল ঃ

"মৃত্যু কহে পুত্র নিব, চোর কহে ধন,
ভাগ্য কহে সব নিব যা কিছু আপন,
নিন্দুক কহিল লব তব যশোভার,
কবি কহে কে লইবে আনন্দ আমার।"

ঘরের আলো নিভে গেলেও তিনি আঁধারকে ভালবেসেছেন। দিশাহারা অকূলে ভগবানের সঙ্গে হয়েছে তাঁর সাক্ষাৎ যোগ। এই সাধক বিশ্বাস করতেন যে আমাদের জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য সেই আনন্দস্বরূপ অপেক্ষা করছেন এবং সেই পরিপূর্ণতার দিকেই তিনি নিয়ত আমাদিগকে নিয়ে যাচ্ছেন কারণ আমাদের না হলে তাঁর আনন্দের লীলা চলে না। আমাদের দেহের প্রতি অঙ্গ তাঁরই আনন্দের দান, আমাদের চেতনার সকল চিৎশক্তিই তাঁর আনন্দের বিকাশ। সেই আনন্দস্বরূপের সহিত যোগযুক্ত হওয়াই মানব-জীবনের পরিপূর্ণতা বা মুক্তি। তিনি বলছেন ঃ

"আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে—সেই আনন্দ, সেই প্রেম আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমার বুদ্ধিমন, আমার নিকট প্রত্যক্ষ এই বিশ্বজগৎ, আমার অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ পরিপ্লুত করিয়া আছে। এ লীলা ত আমি কিছু বুঝি না, কিন্তু

আমার মধ্যেই নিয়ত এই এক প্রেমের লীলা। আমার চোখে যে আলো ভালো লাগিতেছে, প্রভাত সন্ধ্যায় যে মেঘের ছটা ভালো লাগিতেছে, তৃণ তরুলতায় যে শ্যামলতা ভালো লাগিতেছে, প্রিয়জনের যে মুখচ্ছবি ভালো লাগিতেছে—সমস্তই সেই প্রেমলীলার উদ্বেল তরঙ্গমালা। তাহাতেই জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখের, সমস্ত আলো-অন্ধকারের ছায়া খেলিতেছে।"

এই উপলব্ধিতেই তিনি গাইলেন ঃ

"তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছ নীচে !
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে !
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা, আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনের বিচিত্ররূপ ধরে তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।
তাই ত তুমি রাজার রাজা হয়ে তবু আমার হৃদয় লাগি,
ফিরচ কত মনোহরণ বেশে, প্রভু, নিত্য আছ জাগি ;
তাই ত প্রভু যেথায় এল নেমে তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে,
মূর্ত্তি তোমার যুগল সম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।"

যে জীবনের বিচিত্র কর্ম্মধারার মধ্যে, চিন্তাধারার মধ্যে আমরা মানবজীবনের পূর্ণতার প্রকাশ ক্ষণে ক্ষণে দেখতে পেয়েছি, সেই অনন্যকর্ম্মা মুক্তিসাধক বলছেন—"আমি ভালবেসেছি এই জগৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে যে মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে। আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে, যিনি "সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।"

আমরা তাঁর জীবনকে লক্ষ্য করে যেন কর্ম্মের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে পারি সেই পরম লক্ষ্যে, সেই মহামুক্তিতে, এই আশীর্ব্বাদ তাঁর অমর আত্মার কাছে আমরা প্রার্থনা করি। সত্য যেন আমাদের জীবনে প্রতিদিন প্রতি কর্ম্মে প্রতিভাত হয়ে ওঠে প্রভাতসূর্য্যের মত, পরমানন্দের প্রকাশ হয় যেন আমাদের জীবনের প্রতিক্ষেত্রে। আমরাও যেন জীবনের উত্থানপতনে বলতে পারি "আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি।" তাঁরই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আজ বলি—"আমাদের শক্তি যদি ক্ষীণ হয়, আমাদের আকাঙ্ক্ষা যদি সত্য না হয়, তবে আমরা শেষ পর্য্যন্ত কবে গিয়ে পৌঁছিব জানি না কিন্তু মহাপুরুষদের জীবন যেদিন আলোচনা করিতে বসিব, সেদিন যেন সেই শেষ লক্ষ্যের কথাটাই সম্মুখে রাখি—তাঁহাদের স্মৃতি যেন আমাদিগকে পারের ঘাটের আলো দেখায়। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত আমাদিগকে বন্ধন হইতে উদ্ধার করিয়া দিবে, পরবশতা হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে, আমাদিগের নিজের সত্য শক্তিতে, সত্য চেষ্টায়, সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবে ; আশ্রয় দিবে না, অভয় দিবে ; অনুসরণ করিতে বলিবে না, অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিবে।" সত্য, শিব ও সুন্দরের পূজারী, অদ্বিতীয় একের একনিষ্ঠ সেবক সেই সত্যাশ্রয়ী মহাপুরুষের সঙ্গে আজ প্রতিজ্ঞা করি ঃ

"মোরা সত্যের পরে মন আজি করিব সমর্পণ,
জয় জয় সত্যের জয় !
মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য, খুঁজিব সত্যধন,
জয় জয় সত্যের জয় !
যদি দুঃখে দহিতে হয়, তবু মিথ্যা চিন্তা নয়,
যদি দৈন্য বহিতে হয়, তবু মিথ্যা কর্ম্ম নয়,
যদি দণ্ড সহিতে হয়, তবু মিথ্যা বাক্য নয়,
জয় জয় সত্যের জয়।"

চলার গান

শ্রীনিরুপমা দেবী

আঁধার বাধা যদি
তোদের পথ ছায়,
পথের যত কাঁটা
দলিতে হবে পায় !
কঠিন বাধা যত রচিতে চাহে শিলা
রুধিতে নিবারের প্রাণের গতিলীলা,
জলের ধারা তত
উছল বহে যায়—
পথের কাঁটা দলি'
কে তোরা যাবি আয় !

না যদি আসে কেউ
না যদি শোনে ডাক,
পিছনে টানে ঢেউ
পিছায়ে পড়ে থাক।
আঁধার যত বেশী নিবিড় ঘন কালো
প্রদীপ-শিখা তত উজল ঢালে আলো ;
সে শিখা জ্বালা তোরা
তপের সাধনায়—
পথের কাঁটা দলি
কে তোরা যাবি আয় !
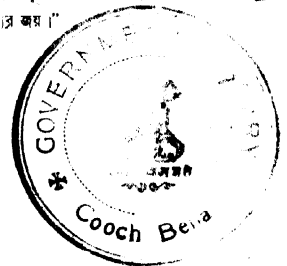
ইটালীর চলচ্চিত্র, অভিনয় ও নৃত্য

সাম্প্রতিক কালে ইটালীর চলচ্চিত্রের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে। ইটালিয়ান চলচ্চিত্রে নব্য বাস্তবতার স্রষ্টা রোসেলিনির প্রতিভাবদান চলচ্চিত্রামোদীদের মনে নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছে। চলচ্চিত্রে বাস্তবতার প্রয়োগের দিকে চিত্র-পরিচালকদের বিশেষ ঝোঁক দেখা যাইতেছে। নব্য বাস্তবতাই (Neo realism) হইতেছে ইটালীর সাম্প্রতিক চলচ্চিত্রের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বাস্তবতার প্রতি এই অনুরাগ সত্ত্বেও কিন্তু ইটালীর চলচ্চিত্র রোমান্টিসিজম এবং পুরাতনের প্রতি মোহকে বর্জন করিতে পারে নাই। ভিসকন্তির 'সেন্স' নামক চিত্রনাট্যের মধ্যে বাস্তবতা এবং রোমান্টিসিজম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রহিয়াছে।

ইউলিসিসের চিত্ররূপায়ণকালে পরিচালক মারিও কামেরিনি অভিনেতা কার্ক ডগলাসের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন

প্রাচীন মহাকাব্যাদি হইতে যে সকল আধুনিক চলচ্চিত্রের কাহিনী গৃহীত হইয়াছে তন্মধ্যে ইউলিসিসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সিল্‌ভানা মাঙ্গানো ইটালীর স্বনামধন্যা চিত্রতারকা মাম্বো ফিল্মের চিত্র-রূপায়ণকালে তিনি এন্‌থনি কুইনের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন

সোফোক্লিসের "ইডিপাস" নাটকের দৃশ্যপট পরিকল্পনা এবং অভিনেতা-অভিনেতৃদের রূপসজ্জা দর্শকবৃন্দের দৃষ্টির সমক্ষে প্রাচীন যুগকে যেন জীবন্ত করিয়া তোলে

ইটালীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা এই চিত্রাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। কার্ক ডগলাস ছাড়া ইহাতে আছেন—পেনেলোপ ও সার্সির যুগ্ম ভূমিকায় সিল্‌ভানা, মাঙ্গানো, পোডেষ্টা প্রভৃতি।

ইটালীর অভিনয়কলার মধ্যেও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ক্লাসিক্যাল নাটকের অভিনয়ের জন্য ইটালীর 'সাইরেকিউস গ্রীক থিয়েটারে'র প্রসিদ্ধি আছে।
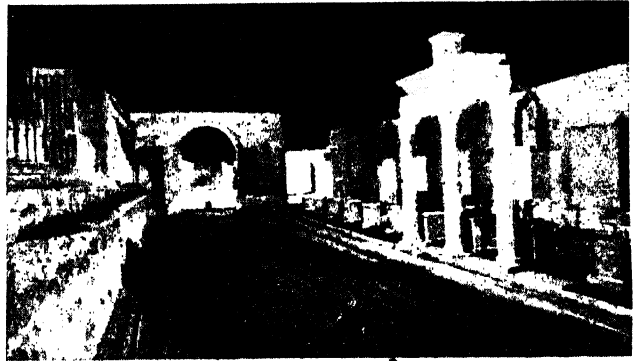
কোন্ সুদূর অতীতে ভিসুবিয়াসের অগ্ন্যদ্গারের ফলে পম্পি নগরী ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছিল। সুদীর্ঘকাল
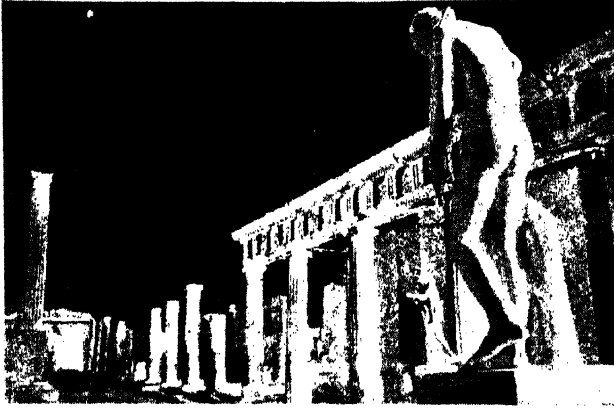
ধরিয়া ইহার খননকার্য্য চলিতেছে, আজও খননের ফলে প্রতি বৎসর নব নব প্রত্নসম্পদ আবিষ্কৃত হইতেছে। পৃথিবীর নানা দেশ হইতে যে সকল বৈদেশিক পর্য্যটক নেপল্‌সে আসেন, তাঁহাদের নিকট ইহা আজ তীর্থক্ষেত্রের সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পম্পির ধ্বংসাবশেষের গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে ইটালিয়ান ক্লাসিক্যাল নৃত্যের ভঙ্গীটি মনোরম।

ন. ভ.

অন্তঃশীলা

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ

ফের চোপা করিস ত, জিব ছিঁড়ে দোব জন্মের মত—রা কাড়তে পারবি নে আর—তা বলে রাখছি কিন্তু”—দুর্ব্বাসার মেজাজে বলে সাতকড়ি। আরও বলে, “ফের যদি শুনি—পথে-ঘাটে মস্করা করেছিস গোবিন্দর সঙ্গে—তা হলে ওর দফা ত নিকেশ করে দেবই—তোরও হাল কি করি দেখিস ক্যানে।”

স্ত্রীর উত্তরটা আর শোনা হয় না। মুখুজ্যেদের গোয়ালঘরে জাতসাপ সেঁদিয়েছে একটা। ধরবার জন্যে ডাক পড়েছে সাতকড়ির। মুখুজ্যেমশায় নিজে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বাইরে ওর অপেক্ষায়। দেরি করা চলে না আর। উটকো সাপ—পালাবে আবার তা হলে। গজ গজ করতে করতে বেরিয়ে পড়ে সাতকড়ি গামছাখানা কাঁধে ফেলে।

স্ত্রী ঈশানী ভয় খায় না আর ওকে মোটেই। সমানে চোপা করে সে এখন সাতকড়ির সঙ্গে। প্রথম প্রথম ঘর করতে এসে কি ভয়ই না ও করত ওই লোকটাকে। গুণীন মানুষ—সাপ ধরে, সাপ খেলায়। তুকতাক অনেককিছু জানেও। কত ফলন্ত গাছকে বাণ মেরে দু'দিনে জ্বালিয়ে দিয়েছে সাতকড়ি। স্বচক্ষে দেখেছে ও। গুণতুক করে সর্ব্বনাশ করেছে কত লোকের। দশাসই ভীম জোয়ান মানুষ—ধড়ফড়িয়ে মরছে পথে-ঘাটে। ঝলকে ঝলকে মুখ দিয়ে রক্ত তুলে—কেউ বা গ্যাঁজলা ভেঙে। এ সব দেখলেই অনুমান করা যায়—কাজ ওই সাতকড়ির। ভয় খায় সবাই। নিজের দাওয়ায় বসে খড়ি দিয়ে দাগ কেটে মূর্ত্তির মত আঁকে। কি সব ‘মন্তর-তন্তর’ আওড়ায়। ধুলো ছিটিয়ে মারে। ছুরির দাগ বসায় খড়ির দাগের উপর। ভিন্‌গাঁয়ে, কি দশ বিশ ক্রোশ দূরে উদ্দিষ্ট মানুষটা কাটা পাঁঠার মত মাটিতে পড়ে ছটফট করে মরে। ‘কেটে ফেললে রে’—‘জ্বলে মলুম রে’—বলে নাকি আকাশ-বাতাস ফাটিয়ে চীৎকারও করে। চোখে না দেখলেও এমনও শুনেছে ঈশানী। ওর আগের বউটাকেও নাকি সাবাড় করেছিল সাতকড়ি নিজেই। বউটাকে সাপে কেটেছিল সত্যি। কিন্তু তার আসল ইতিহাস জানে পাড়ার অনেকে। ভর-পোয়াতী ছিল নাকি তখন বউটা। অলস দেহটা নিয়ে চটপট কাজ করতে পারত না আর তেমন। সামান্য একটা কাজের ত্রুটি নিয়েই নাকি বচসা হয়েছিল এমনই একদিন স্বামী-স্ত্রীতে। রক্তের তেজ ছিল তখন সাতকড়ির। রক্তও অল্পেই চড়ত মাথায়। ভাবলে গা শিউরে উঠে ওর। বউটার গায়ে নাকি সদ্য-ধরা কালকেউটে ছেড়ে দিয়েছিল লোকটা রাগের মাথায়। এমন সব কথা শুনলে সে কি আর বিয়ে করত এই শয়তানটাকে!

বছর সাতেক আগে সাতকড়ির গলায় মালা দিয়েছিল ঈশানী—কতকটা যেন সম্মোহিত হয়ে। সাক্ষাৎ যম-স্বরূপ ওই সব বিষাক্ত সাপ নিয়ে নাড়াচাড়া করে মানুষটা কেমন অবাধে, নিঃশঙ্কচিত্তে। সাপে-কাটা তিন দিনের বাসি মড়াকে নাকি ‘মন্তর’ আউড়ে খাড়া করে দেয়। তা ছাড়া গুণতুকের রাজা সাতকড়ি। জুড়ি নেই ওর চার তল্লাটে। শুধু সম্মোহিতই হয় নি ঈশানী, মনে নেশাও ধরেছিল যেন সেদিন। এমন মানুষের ঘর করতে পারা ভাগ্যের কথা। জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার জোর চাই নিশ্চয়ই। ইচ্ছে করেই দোজবরে বয়স্ক মানুষটাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিল ঈশানী। না হলে, বিয়ের আগের দিনেও ত চম্পট দিতে পারত গোবিন্দর সঙ্গে। ভর-সন্ধ্যাবেলায় জোড়া তালগাছের কাছে দাঁড়িয়ে কত সাধাসাধি করেছিল গোবিন্দ। প্রত্যাখ্যান করেছিল ও গোঁভরে গোবিন্দর সব প্রস্তাব—সব অনুনয়বিনয়। সত্যি—সম্মোহিতই হয়েছিল যেন ও সেদিন। অত বড় গুণীনের বউ হবে—এই লোভেরই জয় হয়েছিল। বয়সে ওর চেয়ে কুড়ি-বাইশ বছরের বড় হবে সাতকড়ি। তা হোক। দেশের সেরা-গুণীন সাতকড়ি। নামের যেন মোহ ছিল একটা। কি এক ধরণের আকর্ষণ যেন। ঈশানীর মন থেকে সে মোহ ঘুচেছে এখন। উগ্র সরীসৃপের মত লিকলিকে চেহারা হয়েছে এখন সাতকড়ির। দৃষ্টি বিষধরের মতই তীক্ষ্ণ। সন্দেহ করে এখন ঈশানীকে। সন্দেহ করে গোবিন্দকে নিয়ে। তাকে নিয়েই বচসা সুরু হয়েছিল এই একটু আগে। সাতকড়ির ঘর করে ও সত্যি, কিন্তু স্বামীর সান্নিধ্যকে যেন ঘৃণা করে ঈশানী। ঘরের একটেরে পড়ে থাকে ও রাতে। বেশী দিনের কথা নয়। নেশার ঝোঁকে এক এক দিন রাতে সাতকড়ি এসে ওর কাছ ঘেঁষে বসত। গায়ে হাত দিত। কালকেউটের স্পর্শ যেন। দেহ-মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইত সে তখন সাতকড়ির কবল থেকে। আকুলভাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাত—বাজ পড়ুক ওর মাথায়। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক সব। কতদিন ভেবেছে, রায়দীঘির জলে ডুবে মরে সকল জ্বালা জুড়ুবে। সে সুযোগও এসেছিল একদিন। ডুবতেই যাচ্ছিল ও, কিন্তু বিধি সেধেছিলেন বাদ। না হলে—ফুরিয়ে যেত এত দিনে তার জীবনের লেনদেন। বেশী দিনের কথা নয়। মাত্র বছর দুই আগেকার ব্যাপার।

ফাগুনের দুপুর। কেমন যেন ফাকা ফাকা মনে হচ্ছিল ঈশানীর। সাতকড়ি হাটে গেছে সেই কোন্ সকালে। ফেরে নি তখনও। সংসারে আর দ্বিতীয় লোক নেই। সমবয়সী বউ-ঝি কেউ নেই কাছেপিঠে যে দুটো মনের কথা বলে তাদের সঙ্গে। আর দুলোর জায়গায় আছেই বা কে ?···খানিকটা তপ্ত উদাস হাওয়া জামগাছের কচি পাতাগুলোকে নাড়িয়ে দিয়ে সিগ্ সিগ্ শব্দ তুলে ওধারের বাঁশবনের গায়ে এলিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ল যেন। হাই তুলতে তুলতে ঈশানীও কখন গড়িয়ে পড়েছিল দাওয়ার উপর। বেহুঁস ঘুমে মড়ার মত হয়ে পড়েছিল কতক্ষণ কে জানে! গা ঠেলে ঠেলে ডাকছে কে। ভাবলে, হাট থেকে ফিরেছে বোধ হয় লোকটা। মাথায় আঁচল টেনে ধড়ফড় করে উঠে বসল ঈশানী। চমক ভাঙতেই চেয়ে দেখলে, সাতকড়ি নয়! মিট মিট করে হাসছে গোবিন্দ।

“আচ্ছা ঘুম ত তোর! চারদিকে বাঁশবন। দিন-দুপুরে কোনদিন শ্যালে টেনে নিয়ে যাবে তোকে—টেরও পাবি নে। হ্যাঁ রে, বোনাই কোথা ?”—হাসতে হাসতে বলেছিল গোবিন্দ।

এই গোবিন্দ ওদের পাড়ার মাহিন্দ পাগের ছেলে। বয়সে ওর চেয়ে বছর তিনেকের বড়ই হবে বোধ হয়। বাবরি চুল, টানা টানা চোখ, কষ্টিপাথরের মত কালো রঙ। দেহ যেন পাথরে কোঁদা। গোবিন্দ ওর সম্পর্কে কেউ নয়। তবু ও যেন জন্ম-জন্মান্তরের আপনজন। ছোটবেলায় ঈশানী ছিল গোবিন্দর খেলার সঙ্গী। বাগানে-বাগানে আম-জাম কুড়ুচ্ছে গোবিন্দ—বিলে জলায় ঝিনুক, গুগলি কি শাপলা-শালুক তুলতে গেছে—সোনামতীর হাটে গেছে বাঁশের বাঁশী কিনতে—যাত্রা কি তরজা শুনতে যাচ্ছে ইষ্টিশানের ধারে আড়তদারদের বাড়ী—সব সময়ই গোবিন্দের সঙ্গে ঘুর ঘুর করত খড়কেড়ুরে শাড়ীপরা একটি মেয়ে। সে ওই ঈশানী। সেবার গাঙ্গে বড় বান এসেছিল। সাঁতার জানত না ভাল ঈশানী। স্রোতের মুখে পড়ে গিয়ে ভেসে যাচ্ছিল। আর একটু হলেই তলিয়ে যেত নিশ্চয়ই। গোবিন্দ একরাশ জল খেয়ে কি করে যে ওকে পাড়ে টেনে এনেছিল—ওর তা মনে হলে বুক ঢিপ ঢিপ করে এখনও। ও একটু বড়সড় হয়ে উঠতে ওদের বাগ্দীপাড়ার সবাই নানা কথা বলত ওর ঠাকুরমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে। হোক বাপ-মা মরা আদুরে মেয়ে—তা বলে ছেলেটা পেছনে টো টো করে ঘুরবে দিন-রাত এ আবার কি! গোবিন্দ যে ওর বর হবে একদিন—এমন সম্পর্ক ধরে নিয়ে কত ঠাট্টা করত ওকে পাড়ার বুড়ীরা। বড় হবার পর ওর দেহে-মনে হঠাৎ একরাশ লজ্জা এসে জড়ো হ'ল একদিন। গোবিন্দর কাছ থেকে পালিয়ে যেতে পারলে ও যেন বাঁচত তখন। গায়ে অসুরের মত বলই যা ছিল। না হলে কি বোকা ছিল ওই গোবিন্দ। ওর বাড়ন্ত গড়নটাও যেন নজরে ঠেকত না গোবিন্দর। এমনি বেহায়ার মত ব্যবহার ছিল ওর। সে সব ভাবলে—সত্যি কেমন যেন লজ্জা লাগে ওর আজও। পরের বউ হয়েছে যে ও এখন—সে জ্ঞানটাও কি থাকতে নেই! বয়স হয়েছে। বিয়ে হলে ছেলের বাপ হ'ত এত দিনে। গায়ে হাত দিয়ে ঠেলতে লজ্জা হ'ল না ওর একটুও! বয়সই বেড়েছে শুধু—স্বভাব কিন্তু বদলায় নি একটুও। হাসি এসেছিল ঈশানীর। এমনি স্বভাবের জন্যেই কিন্তু গোবিন্দকে কেমন যেন ভাল লাগে ওর। মাথার ঘোমটাটা সরিয়ে নিয়ে খোঁপাটা ভাল করে জড়াতে জড়াতে বলেছিল ঈশানী—তাই ভাল! আমি ভাবছিলাম আর কেউ বুঝি! তা বোনাইয়ের খোঁজ কেন? বোনাই ত তোর শত্তুর।

শত্তুরই বটে। কেউ জানে না গোবিন্দর কি সর্বনাশ করেছে সাতকড়ি। ঈশানীর ওপর দাবি ওর চিরকালের যেন। ওকে বেহাত করেছে এই সর্বনেশে সাতকড়িটা। সেবার ঝাঁপানের সময় মধুখালিতে সাপ খেলাতে গিয়েছিল সাতকড়ি। কেউটে গলায় জড়িয়ে দু'হাতে দুটো গোখরো নিয়ে মাচানের ওপর সে কি নাচ সাতকড়ির। জিভ বার করে নাচছে ও। মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ ফণিনী ছোবল মারছে ওর জিভের ওপর। রক্ত পড়ছে জিভ দিয়ে। লোকটা যেন নীলকণ্ঠ। বিষ কাজ করে না ওর দেহে। ভিড়ের মধ্যে বিস্ময়-উৎসুকভরা চোখে দাঁড়িয়েছিল গোবিন্দ আর ঈশানী পাশাপাশি। তের চৌদ্দ বছরের মেয়েটা একেবারে সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিল। সাতকড়ি এক নজরে দেখে নিয়েই ঈশানীকে গুণ করেছিল যেন। পরের দিন সাপের ঝাঁপি নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরল সাতকড়ি। সাপ খেলালে। ঈশানীও নাওয়া খাওয়া ছেড়ে ঘুরল সঙ্গে সঙ্গে। বছর আষ্টেক আগে বউ মরেছিল সাতকড়ির। বাড়ন্ত গড়নের ঈশানীকে দেখে সংসার পাতবার লোভ হ'ল ওর নতুন করে। খোঁজ নিয়ে জানলে মেয়ে ওদেরই জাতের। তেঁতুলেবাগ্দী। সাতকড়ি ঘুরল দিনকতক মধুখালিতে বাগ্দীপাড়ায়। গুণতুক করে ঈশানীর ঠাকুমাকেও হাত করেছিল সম্ভবতঃ শয়তানটা। না হলে—বলা নেই কওয়া নেই—পাড়ার পাঁচ জনে জানল না—শুনল না ভাল করে, সাত-কড়ির সঙ্গে হঠাৎ একদিন বিয়ে হয়ে গেল ঈশানীর। বাগে পেলে ছাড়বে না গোবিন্দ সাতকড়িকে। গুণীনই হোক আর যেই হোক। ওর জীবন থেকে আলোবাতাস সরিয়ে নিয়েছে লোকটা। ক্ষমা নেই এর। গম্ভীর হয়ে বলেছিল গোবিন্দ ঈশানীকে—তুইও কম শত্তুর নোস। না হলে এখনও ওই নেশাখোর শয়তানের ঘর করিস!

কথা শুনে হেসে ফেলেছিল ঈশানী। ও বোঝে গোবিন্দর জ্বালা কিসের। পরক্ষণেই হঠাৎ চমকে উঠেছিল ও। এতক্ষণ দৃষ্টি পড়ে নি ভাল ভাবে কেন কে জানে। গোবিন্দ যেন রোগা হয়ে গেছে অনেকটা। রুক্ষ চুল। গায়ে ময়লা চাদর। গলায় ঝুলছে ন্যাকড়ার ফালিতে বাঁধা একটা চাবি। চমকে প্রায় কাঁদকাঁদ হয়ে বলেছিল ঈশানী—ওমা, একি হয়েছে রে তোর গোবিন্দ!

গোবিন্দ গম্ভীর হয়েছিল আরও একটু। আস্তে আস্তে বলেছিল সব কথা। বাপ গত হয়েছে দোলের দিন রাতে। সংসার সংসারে থাকবে না আর গোবিন্দ। চাকরি করবে এবার। মান-কুণ্ডুর খাঁ বাবুরা ডেকে পাঠিয়েছে ওকে। চাকরি দেবে। বাপ মাহিন্দর পাগের নাম ডাক ছিল ওখানে। বাপের কাজ মিটলেই চলে যাবে ও মধুখালি ছেড়ে। খবরটা দিতে এসেছে তাই ঈশানীকে—দিদির বাড়ী যাবার পথে।

সব শুনে ঈশানীর চোখ দুটো আবার ছল ছল করে এসেছিল যেন। বলেছিল—মধুখালি ছেড়ে থাকতে পারবি তুই?

মধুখালির খাল বিল জলা জঙ্গল ক্ষেতখামার পথঘাট মধুময় হয়ে উঠত যার অস্তিত্ব আর অনুরাগের ছোঁয়াচ লেগে—তার দিকে বড় করুণ ভাবে তাকাল এক বার গোবিন্দ। সে চাউনির সামনে হঠাৎ লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছিল যেন ঈশানী। হাজার হোক পরের বউ এখন সে। তাড়াতাড়ি কাপড়টা টেনে দিয়েছিল মাথায়। তাকিয়ে তাকিয়ে আর আশ মেটে না গোবিন্দর। চোখদুটো স্বপ্নাতুর হয়ে উঠেছিল যেন একটু। খপ করে ঈশানীর হাতখানা ধরে বড় অনুনয়ের সুরে বলেছিল সেদিন নিলর্জ্জের মত—পালিয়ে চল ঈশানী আমার সঙ্গে—এখানে থাকলে মরে যাবি তুই। আয়নায় আর মুখ দেখিস না বুঝি? কত রোগা হয়ে গেছিস দেখ দেখি—বলে চিবুকটা হাত দিয়ে তুলে ধরেছিল একটু।

গোবিন্দর এ প্রস্তাব শুধু সেদিনের নয়। বছরপাঁচেক হবে, তখন ঘর করছে ও সাতকড়ির সঙ্গে। এর মধ্যে কত বার কত ছুতো করে গোবিন্দ এসেছে ওর কাছে। ওই এক প্রস্তাব ওর। ধমক খেয়েছে, গাল খেয়েছে সে কত ঈশানীর কাছ থেকে। সাতকড়ি কানে না শুনলেও, চোখে না দেখলেও অনুমানে জেনেছে সব। গোবিন্দর সর্ব্বনাশ করবার জন্তে অনেককিছু করেও ছিল সাতকড়ি। গোবিন্দ কিন্তু অটল। সাতকড়ির মন্তর তন্তর ক্রিয়া করে নি তাই রক্ষে। না হলে, মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত ওঠে, কি দিন দিন শুকিয়ে দড়ি হয়ে গোবিন্দর এতদিনে আর অস্তিত্ব থাকত না মোটেই। গোবিন্দ নির্লজ্জ, হ্যাংলা, বোকা একটু বেশী। তা হোক, গোবিন্দর সঙ্গে ঈশানীর যেন প্রাণের বাঁধন আছে কোথায়। গোবিন্দর উপর ওর নিজস্ব একটা দাবি আছে যেন। তা ছাড়া গোবিন্দকে পাবার জন্তে তলে তলে কি এক ধরণের মোহ আছে যেন। গোবিন্দর প্রতি প্রীতি তার অন্তঃশীলা। তার আকর্ষণ দুর্নিবার।

ঈশানী পরের বউ এখন। চমকে ওঠে সে। মনে যাই থাক, তা বলে দিনদুপুরে এমন ভাবে আসা এই বা কেমন! ভাগ্যিস আর কেউ ছিল না ঘরে! না হলে···বুকটা ওর যেন টিপ টিপ করে। সাতকড়ির নামটার মধ্যে ছিল একদিন সম্মোহন। সে মোহ কেটেছে। গোবিন্দর কথায় আর স্পর্শে আছে যৌবনের যাদু। গোবিন্দর হাত থেকে হাতখানা তাই ছাড়িয়ে নেয় নি সেদিন ঈশানী। ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলেছিল—পরের বউয়ের উপর টাঁক তোর। সর্ব্বনেশে মতলব কিন্তু। কোনদিন খুন হবি, নয়ত জেলে যাবি গোবিন্দ। বোনাই তোর লোক ভাল নয়, জানিস ত? তার চেয়ে বলি শোন, এ মতলব ছাড়। বে-থা কর। নারাণ সাঁতরা মেয়ে দেবার জন্তে ঝুলোঝুলি করছে। এই সেদিন বলছিল তার বোন। মেয়ে দেখিছি আমি। টিকোলো নাক। টানা টানা চোখ। একটু বা রোগা রোগা। তা হোক। চৌদ্দ পেরিয়ে পনেরয় পা দিয়েছে। পাকা গিন্নীদেরও হার মানায় শুনেছি। কাজেকম্মে বুদ্ধিতে দড়। নাকে দড়ি দিয়ে তোকে ঘানি ঘোরাতেও পারবে।—বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল ঈশানী হাসিতে ভঙ্গিতে।

কথার মাঝে হঠাৎ ভূত দেখার মত চমকে উঠেছিল দু'জনেই। উঠোনের দিকে দৃষ্টি পড়ে নি এতক্ষণ। সাতকড়ি এসে পা দিয়েছে কখন উঠানে। ঈশানীর হাতটা যত্ন করে ধরেছিল তখনও গোবিন্দ। অকস্মাৎ ঝটকা মেরে হাতটা সরিয়ে নিলে ঈশানী।

ওদিকে এই দৃশ্য দেখে বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে পড়েছিল সাতকড়ি। এতদিন ঘর করছে ও ঈশানীকে নিয়ে। এমন করে উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসতে দেখে নি ও ঈশানীকে কোনদিন। অনুরাগের স্পর্শ পেয়ে খুশী উপচে পড়ছিল যেন মুখ-চোখ দিয়ে। শুধু তাই নয়। ঈশানীর হাতখানা গোবিন্দর মুঠোর মধ্যে ছিল একটু আগে—স্বচক্ষে দেখেছে ও।

হঠাৎ লিকলিকে মানুষটা হাড়ে মজ্জায় কঠিন হয়ে উঠেছিল নিমেষের মধ্যে। দেহে-মনে শিরায়-স্নায়ুতে আগুন জ্বলে উঠেছিল বুঝি বা দাউ দাউ করে। কলাগাছ-কুঁচোনো ধারালো কাস্তেখানা দাওয়ার ওদিক থেকে সাজ্যাতিক কিছু ইঙ্গিত করেছিল সম্ভবতঃ। নির্ব্বাক সাতকড়ি দাওয়ায় উঠে কাস্তেখানা তুলে নিয়ে প্রায় বিদ্যুৎ-গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঈশানীর উপর। ধড় থেকে ঈশানীর মুণ্ডটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত আর একটু হলেই। অদ্ভুত গোবিন্দর ক্ষিপ্রকারিতা। সাতকড়ির দুটো হাতই মুচড়ে ধরেছিল মুহূর্ত্তের মধ্যে। বাঁহাতের কব্জির কাছটায় কেটে গিয়েছিল ঈশানীর। সাদা শাড়ীর খানিকটা আরক্ত হয়ে উঠেছিল শুধু। তারপর খণ্ড-যুদ্ধ। লিকলিকে রোগা মানুষটার শরীরে যে এত ক্ষমতা ছিল তা জানা ছিল না ঈশানীর। সাজোয়ান গোবিন্দ জান-কবুল ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করেও সাতকড়ির হাত থেকে কাস্তে ছাড়াতে পারে নি। ঈশানীর গায়ের রক্ত দেখে গোবিন্দরও মাথায় খুন চেপে গিয়েছিল সেদিন। লিকলিকে মানুষটাকে মাটির উপর চেপে ধরে সব শেষ করে দেবার জন্তে সে কি নির্মম প্রয়াস! প্রাণপণ বলে কাস্তের ডগাটার উপর চেপে ধরেছিল ও সাতকড়ির কাঁধের কাছটা। দেহের মধ্যে কাস্তের মুখ ইঞ্চিখানেক বসতেই সাতকড়ি কেমনভাবে যেন গেঙিয়ে উঠেছিল এক বার। রক্ত দেখে আঁতকে উঠেছিল ঈশানী। আকাশ ফাটিয়ে আর্ত্তনাদ করেছিল বারকয়েক। তারপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি আর ঈশানী। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই চোয়ালের সমস্ত শক্তি দিয়ে গোবিন্দর হাতের উপর কামড় বসিয়ে দিতে দিতে সংজ্ঞা হারিয়েছিল ও। জ্ঞান ফিরল যখন—প্রলয় তখন থেমে এসেছে অনেকটা। উঠানে পাড়ার লোক জড় হয়েছে। প্রতিবেশিনী হারুর মা ওর মুখে মাথায় জল দিয়ে বাতাস করছে তখনো। গোবিন্দর হাতের রক্তের লোনা-স্বাদ লেগে রয়েছে তখনো দাঁতে-জিভে। সাতকড়িকে গরুর গাড়ীতে তোলা হয়েছে। বাঁচাতে হলে এখনি নিয়ে যেতে হবে তাকে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হাসপাতালে। শুধু কাঁধ নয়—পাঁজরের কাছটাও তার কেটেছে অনেকখানি। পাড়ার দু'জন গেছে পুলিসে খবর দিতে। আর আসামী গোবিন্দ তার বুকের জ্বালা খানিকটা মিটিয়ে উধাও হয়েছে কখন। ধরা যায় নি তাকে!

সে এই দিনই ডুবে মরতে যাচ্ছিল ঈশানী। বিকেল তখন। বাইরের পরিবেশ খানিকটা শান্ত হলেও—ভিতরের প্রলয় তখনও থামে নি। কাস্তে উঁচিয়ে সাতকড়ি কি ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওর উপর তাই ভাবতে ভাবতে ঘড়া কাঁধে নিয়ে বেরুতে যাচ্ছিল ও। জল আনতে গিয়ে ফিরবে না আর রায়দীঘি থেকে। সংকল্প স্থির। ছেলেপুলে নেই ওর। সংসারে বাঁধন ওর যে মানুষটার সঙ্গে—তার জন্তে মায়া নেই আর একটুও।

পুলিসের লোক এসে শুধু ক্যাকড়া বাধিয়েছিল সেদিন। এজাহার দিতে দিতেই বিকেল গড়িয়ে গেল। তারা চলে যেতেই পাড়ার কে এক জন খবর আনলে সঙ্গে সঙ্গে—সাতকড়ির অবস্থা

খারাপ। শেষ দেখা দেখতে চায় ঈশানীকে। এখনি যেতে হবে। মরা আর তাই হয় নি সেদিন। কিসের টানে কে জানে—চোখের জল মুছতে মুছতে হারুর মার সঙ্গেই ঈশানী সেদিন হাসপাতালেই রওনা হয়েছিল।

তার পর পুরো দুটি বছর কেটেছে কিনা সন্দেহ। এর মধ্যে ঘটেছে অনেককিছু। মাসকয়েক জেল খেটেছে গোবিন্দ। কাঠ-গড়ায় দাঁড়িয়ে ঈশানী মায়া-দয়া করে নি কোনরকম। খোলসা করে জানিয়ে দিয়েছিল গোবিন্দর অপরাধের মূল কোথায়। সাজ্যাতিক আঘাত পেয়েছিল সাতকড়ি। কাটা ঘা নিয়ে ভুগেছিল তিন মাসেরও উপর। সেই থেকে লোকটা জখম হয়ে গেছে যেন চিরদিনের মত। একান্ত অনুগত হয়েছে এখন ঈশানীর। মাস-তিনেক ধরে অতিসারে ভুগে ভুগে দড়ি হয়ে গেছে যেন একেবারে। ভাল না বাসলেও মানুষটার উপর কেমন যেন একটা মায়া জন্মে গেছে ঈশানীর। পাঁচ বাড়ীর ধান ভেনে, গোয়ালের কাজ করে—কোনরকমে বাঁচিয়ে রেখেছে লোকটাকে। মাস দুই হ'ল উঠেছে, হাঁটছে সাতকড়ি। হাটেও বেরুচ্ছে ঠুক্‌ঠুক করে। গাজনের দিন বুড়োশিবতলায় সাপ খেলাবে এবার। তারও যোগাড়যন্ত্র করছে আস্তে আস্তে। দু'তিনটে গোখরো কেউটে ধরে এনেছে ইতি-মধ্যে। পচ ধরে চালের খড়ের আর অস্তিত্ব নেই। ঠাঁই ঠাঁই গোঁজা-গাজা দিয়ে গত বছর কেটেছে কোন রকমে। এ বর্ষায় যা হোক একটা 'পয়ার' করতেই হবে। গরুবাছুর, পেতল-কাঁসার বাসন—ঘুচেছে সব। মানুষটা দেহে একটু বল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন দেখে এখন ঈশানী। সচ্ছলতার স্বপ্ন। গতর 'পেষাই' করে খাটতে হবে না হয়ত আর তাকে এর-ওর বাড়ীতে। ঝাড়-ফুঁক তুক-তাকের জন্যে এক-আধজন আনাগোনা করতেও সুরু করেছে সাতকড়ির কাছে।

অপস্রিয়মাণ মেঘের আড়াল থেকে কিন্তু সূর্য্যের প্রসন্ন হাসি ফুটল কৈ? দুষ্টগ্রহ দেখা দিয়েছে আবার আজ সকালে। গাজন হবে। ভাঙড়ভোলার বিয়ে কাল। বুড়োশিবতলায় যাত্রা হবে আজ রাতে। কাল সন্ধ্যায় মধুখালির নিমাই অধিকারীর দল এসে গেছে এখানে। তার সঙ্গে দু'কান-কাটা নির্লজ্জ গোবিন্দটাও এসেছে। যাত্রা করার সখ ওর অনেক দিনের। পাইক-পেয়াদা সাজে বরাবর।

খুব সকাল সকাল আজ ঘোষালদের বাড়ীতে গোয়ালের কাজ সারতে যাচ্ছিল ঈশানী। বুড়োশিবতলা দিয়েই পথ। ফরসা ফরসা হচ্ছে সবে। কাকেরা আস্তানা ছেড়ে একটি-দুটি করে বেরুতে সুরু করেছে। যাত্রাদলের লোকেরা নাট-মন্দিরে গড়াগড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে তখনো। মুখপোড়া গোবিন্দ যেন ওৎ পেতে ছিল পথের ধারে। পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল ঈশানী, কিন্তু পথ আগলে দুষ্টগ্রহ এমন করে দাঁড়াল যে না থেমে আর পারলে না ঈশানী। বেহায়ার মত হাসতে হাসতে বলেছিল গোবিন্দ, 'বকুলতলা দিয়ে আসছিস যখন—দূর থেকে চলন দেখেই আন্দাজ করেছি—আর কেউ নয়, তুই।' আবার একটু মুচকে হেসে বললে, আজ যাত্রা শুনতে আসবি ত ঈশানী? 'উত্তরা' বই হবে। আমি পাণ্ডবসেনা সাজব, ঠাউরে দেখিস একটু।

পাথরের মত কঠিন মুখ তুলে একবার চেয়েছিল ঈশানী গোবিন্দর পানে। গোবিন্দ চমকে উঠেছিল সে চাউনি, সে মুখ দেখে। সে ঈশানী নেই যেন আর। দেহে মনে পালটে গেছে যেন ঈশানী। বিস্ময়ের সুরে বলেছিল, কি বিশ্রী চেহারা হয়েছে রে তোর! বুড়ী হয়ে গেছিস যেন! বোনাই শালা খেতে দেয় না বুঝি?

কথা শুনে জ্বলে উঠেছিল ঈশানী সঙ্গে সঙ্গে। বলেছিল, —আমার চেহারা নিয়ে তোর কি আসে যায় শুনি? পথ ছাড় না হলে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব এখুনি।

হাসতে হাসতে বলেছিল গোবিন্দ—তাতে শুধু অপবাদ বাড়বে তোর। আমার আর কি বল। ব্যাটাছেলে, গায়ে তো আর ফোস্কা পড়বে না। তুই পরের বউ। মাঝ থেকে কলঙ্ক রটবে তোরই। বোনাই আবার এক হাত নেবে হয়ত তোকে।

গায়ে মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছিল ঈশানীর হতচ্ছাড়া গোবিন্দর কথা শুনে। কিসে কার কলঙ্ক রটে সে জ্ঞান হয়েছে এখন দিব্যি! সে খোকা নেই আর গোবিন্দ। হাজার হোক বয়স ত বাড়ছে।

গোবিন্দ কিন্তু থামে নি। মনের সব সোহাগ ঢেলে বলেছিল, তোকে শুধু একটা কথা বলব বলে দাঁড় করিয়েছি—মাইরি বলছি। গায়ে তোর হাত দেব না, ভয় নেই—বলে হঠাৎ উচ্ছসিত হয়ে ও বলেছিল অনেককিছু। কাল পল্টনে নাম লিখিয়েছি ঈশানী। মধুখালি আর ভাল লাগে না সত্যি বলছি। কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। লড়াই বেধেছে জানিস ত। সেপাই হয়ে যুদ্ধে যাব। দেশ ছাড়িয়ে—কালাপানি পেরিয়ে—পিত্থিবীর একদিকে চলে যাব। লড়াইয়ে হাত পা যায় ত সরকার মাসোহারা দেবে—মেডেল দেবে। আর মরি ত আমার আর কাঁদতে কঁকাতে কে আছে বল?

অনাবশ্যক এ সব কথা। সম্পর্কের কেউ নয় গোবিন্দ যে, কান পেতে শুনতে হবে এমন সব কথা। সাতপুরুষের 'নাউখোলা' ও। কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঈশানী। পা বাড়াতে সাহস হ'ল না ওর। বিশ্বাস নেই গোবিন্দকে। এমন সময় প্রতিবেশিনী হারুর মা এসে উদ্ধার করলে ওকে। হাটবার। বুড়ী সকাল সকাল হাটে যাচ্ছিল। গোবিন্দকে দেখেই চিনতে পারলে মুহূর্তে। ঈশানীর উদ্দেশ্যে বললে, গলায় দড়ি তোর বউ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সোহাগ করছিস মুখপোড়ার সঙ্গে।

পাশ কাটিয়ে সরে পড়ল গোবিন্দ। ঈশানীও হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন। কিন্তু সে শুধু তখনকার মত। বুড়ী বিকালে সাতকড়িকে পথে ডেকে পাঁচ কাহন করে জানিয়ে দিলে বউয়ের কীর্ত্তিকলাপ। তাই ভরসন্ধ্যাতেই স্বামী-স্ত্রীতে সুরু হয়েছিল আজ বচসা। মুখুজ্যেমশায় নিজে এসে সাপ ধরার জন্যে ডাকাডাকি না করলে তড়িঘড়ি বা হোক একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ত আজ সাতকড়ি। ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বলে উঠেছিল ওর আজ ঈশানীর মুখে মুখে চোপা করার ধরণ দেখে।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে মুখুজ্যেবাড়ী থেকে ফিরল সাতকড়ি। হাতে নতুন হাঁড়ি একটা। মুখে তার সরা চাপা। তার মধ্যে সদ্যধরা গোখরো সাপটা মৃদু গর্জ্জন করে উঠল যেন একবার। নেশা করেছিল কি না সাতকড়ি কে জানে। একটিও রা কাড়লে না আর লোকটা রাতে। খেলে না কিছু। খাবার জন্তে অন্য দিনের মত অনুরোধও করলে না ঈশানী। অনেকদিন পরে ওরও ভেতরটায় চাপা আগুন ধিক ধিক করে জ্বলে উঠেছিল যেন। সাত-পাঁচ কত কি ভাবতে ভাবতে একেবারে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল কখন ঈশানী দাওয়াতেই। ঘুম ভাঙল হঠাৎ। প্রহর ডাকছিল তখন শিয়ালগুলো একেবারে নিকটেই। উঠে দেখলে চারদিক। কেরোসিনের ডিবেটা অনাবশ্যক জ্বলে জ্বলে নিবে গেছে কখন। মানুষটা দাওয়ায় নেই। এত রাতে গেল কোথায়! ঘরে ঢুকে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে একবার ঈশানী। না—বিছানাতে নেই সাতকড়ি। তবে কি যাত্রা শুনতে গেল বুড়োশিবতলায়! তাই হবে। আবার দেখলে ঘরের এদিক-ওদিক। নতুন সাপের হাঁড়িটাই বা গেল কোথায়!…একটা পেঁচা বিকট সুরে ডেকে উঠল ছাতিমগাছের মাথায়। কি এক অজানা আশঙ্কায় বুকটা ওর কেঁপে উঠল একটু, অভুক্ত ক্ষীণজীবী মানুষটার জন্তে মন কেমন করতে লাগল যেন।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরল সাতকড়ি। দাওয়াতেই চাটাই বিছিয়ে মুড়িসুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল তাড়াতাড়ি। ঈশানী কথা কইলে না একটাও। মাদুর বিছিয়ে ঘরের মেঝেয় শুয়ে পড়ল সে। কত কি চিন্তার ফাঁকে ঘুম এসে আচ্ছন্ন করেছিল আবার ঈশানীর দেহ মন। অনেক লোকের ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি শুনেই আবার তন্দ্রা ভাঙল ওর। সাতকড়িকেই ডাকাডাকি করছে সকলে। যাত্রার দলের একজনকে সাপে কেটেছে। সাজঘরের একধারে হোগলার বেড়া ঘেঁষে পা রেখে একটু গা এলিয়ে দিয়ে বিড়ি টানছিল লোকটা। গ্যাসের আলোটা আড়াল পড়েছিল নাকি সেদিকটায়। সাপটা যেন ওপর দিক থেকে পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছোবল মেরেছে। সাংঘাতিক বিষাক্ত সাপ। মানুষটা ঢলে পড়েছে। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা ভাঙতেও সুরু করেছে। ধীর মন্থর গতিতে সাতকড়ি উঠে উঠানে নামল। ধরাধরি করে এনে শুইয়ে দিলে ওরা মানুষটাকে উঠানে তুলসীতলার কাছে—যেখানটা রোজ নিকোয় ঈশানী নিপুণ যত্ন দিয়ে। হারিকেনের আলোয় হঠাৎ মানুষটাকে দেখে ঈশানী যেন কাঠ হয়ে গেল। সাপে কেটেছে অন্য কাকেও নয়, মধুখালির গোবিন্দকে। সংজ্ঞা নেই আর তার তখন। বাঁধন পড়েছে দু-তিনটে পায়ের উপর। কামড়েছে একেবারে বুড়ো আঙুলের শিরায়। বুঝতে দেরি হ'ল না ঈশানীর যে এ কাজ কার। চরম প্রতিশোধ নিয়েছে আজ শয়তানটা সুযোগ পেয়ে।…

মধুখালির গোবিন্দর শৈশব-কৈশোরের নিত্যসঙ্গিনী সম্বিৎ হারিয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। কবে কোথায় কেন প্রথম ভাল লেগেছিল গোবিন্দকে—ভাসা ভাসা মনে পড়ল যেন ঈশানীর। কত ছোট তখন ওরা দুটিতে। আজও বেশ মনে পড়ে—সেই ভাল লাগার ছোঁয়ায় কেমন করে ওর কিশোর-মনে রঙ ধরেছিল একটু একটু করে। ফুলের কুঁড়ির ধীরে ধীরে রূপ-রস-গন্ধ-বিস্তারের মত—গোপন মনের সে এক অপরূপ বিকাশ-লীলা। অনুরাগের রঙে রাঙানো দিনগুলো বড় করুণ ভাবে যেন অতীত ছবি মেলে ধরল চোখের সামনে। সাতকড়ির নাম ওর কচি-মনকে মোহগ্রস্ত, বিভ্রান্ত করেছিল একদিন। গোবিন্দর সঙ্গে ওর সম্বন্ধ কিন্তু অবিচ্ছেদ্য। কোন্ অনাদিকাল থেকে এ সম্বন্ধের সুরু—কে জানে? অনন্ত ভবিষ্যতেও যেন এ সম্পর্কের ছেদ নেই। গোবিন্দ ওর জীবনের আলো বাতাসের সামিল। বুকের গহনতলে অন্তঃশীলা ক্ষীণস্রোতা প্রেমধারা হঠাৎ যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল দুর্ব্বার আবেগে। ভুলে গেল ঈশানী যে সে আর এক জনের বিবাহিতা স্ত্রী। বধূ-জীবনের সব সরমসঙ্কোচের খোলস খসে গিয়ে মধুখালির গোবিন্দর প্রাণের দোসর জেগে উঠল নতুন করে। স্থির সঙ্কল্প নিয়ে সকলকার দৃষ্টিকে সচকিত করে ঈশানী এগিয়ে গেল গোবিন্দর কাছে। সাতকড়ি তখন তার অনিচ্ছার মন্ত্র—বিষহরির আজ্ঞে—আউড়ে চলেছে ওস্তাদি কায়দায়। 'গোবিন্দ, তোর কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে'—এমনি ধরণের একটা বুকফাটা চীৎকার মর্ম্মস্থল মথিত করে বেরিয়ে আসতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। মুহূর্ত্তে ভয়ঙ্করী হয়ে উঠল ঈশানী। সাতকড়ির দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে বললে—সর শীগগির—শেষ করে ত এনেছ। লোকদেখানো ঝাড়ফুঁকে আর হবে না কিছু। সর বলছি।' বজ্রকঠিন নির্দ্দেশের মত শোনাল যেন তা। মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে কাণ্ডজ্ঞানহীনা নারী হঠাৎ তল্লাটের সেরা গুণীনকে অবাক করে দিয়ে ঝুঁকে পড়ল গোবিন্দর পায়ের ওপর। ক্ষত-স্থানটা দাঁত দিয়ে কেটে বড় করে দিলে খানিকটা। তার পর গোবিন্দর গায়ের রক্ত প্রাণপণে চুষে চুষে ফেলতে লাগল ঈশানী মাটিতে। এমনি প্রক্রিয়ায় সাপে-কাটা মড়া কবে কোথায় যেন বেঁচে উঠেছিল—এ ধরণের কথা শুনেছিল ঈশানী কার মুখে। হাঁ হাঁ—করে চেঁচিয়ে উঠবার চেষ্টা করেছিল একবার সাতকড়ি। পাড়ার লোকও চেঁচাতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল শুধু। আধ ঘণ্টা ধরে কসরত করলে ঈশানী প্রাণপণে। জীবন দিয়ে জীবনসঞ্চার করার সে কি মর্ম্মান্তিক প্রয়াস। ঘোমটাটা খসে পড়ল মাথা থেকে। কবরী খসে এলিয়ে পড়ল বেণী। অসম্বৃত দেহটার হুঁস রইল না আর স্থান কাল পাত্রের। ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে এল স্নায়ুবন্ধন। সাধনায় সিদ্ধি মিলল অপ্রত্যাশিত ভাবে। বিষহরি দেখা দিলেন বরদাবেশে। বিষ কখন ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়েছিল ঈশানীর দেহের রক্তের মধ্যে। সংজ্ঞাহীন গোবিন্দর দেহের পাশে ঈশানীও ঢলে পড়ল আস্তে আস্তে—নির্ব্বাক স্তম্ভিত সাতকড়ি উঠানের দৃশ্যপট থেকে চোখ তুলে চাইলে একবার আকাশের দিকে। নক্ষত্রখচিত ব্যোম আকাশ যেন সন্নত হয়ে মাথার কাছে নেমে এল অনেকখানি। একটা জ্বলন্ত উল্কা আকাশের দূর প্রান্ত থেকে বিদ্যুদ্বেগে ছুটে এসে এ পাড়ার বাঁশবনের ঠিক মাথার কাছেই ছাই হয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেল চিরদিনের মত।

জৈন গুরু নেমিনাথ

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা

নেমিনাথ জৈনদিগের দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর নামে খ্যাত। তীর্থ বা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া তাঁহাকে তীর্থঙ্কর বলা হইত। তাঁহার অপর নাম ছিল অরিষ্টনেমি। ক্ষত্রিয় শিক্ষাগুরু এবং চিন্তাধারার প্রবর্তক নেমিনাথের বহু শিষ্য ও শিষ্যা তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিত। জৈনধর্মে বিশ্বাসী নেমিনাথ সর্বদা সত্যের উপলব্ধি করিতেন। তিনি ধর্মজ্ঞ ও শুদ্ধাচারী ছিলেন। তিনি সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া ঘৃণা দূর করেন। তিনি কঠোর নিয়ম পালন করিতেন এবং জগতের কাহাকেও আঘাত দেন নাই। তিনি জ্ঞানী, পরিশ্রমী, শান্ত এবং আত্মসংযমী ছিলেন এবং আত্মা সম্বন্ধে চিন্তা করিতেন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অজ্ঞানতা, শৈত্য, তাপ প্রভৃতি দ্বাবিংশ প্রকার কষ্ট তিনি জয় করেন। তিনি পাপ-বিনির্মুক্ত ছিলেন, আত্মাকে বশীভূত করিয়াছিলেন। চৌর্য্য, মিথ্যা, কাম, মদ্যপান ও প্রাণিহত্যা হইতে বিরত ছিলেন। তিনি মোহ, অহঙ্কার, শঠতা ও লোভ হইতে মুক্ত ছিলেন! কাম হইতে বিরত হইয়া তিনি মুক্তিলাভ করেন।

মৃত্যুর পর তীর্থঙ্করগণ নির্বাণলাভ করিতেন। তাঁহাদের সম্মানার্থ মন্দির স্থাপিত হইয়াছে এবং মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত তাঁহাদের মূর্তিগুলি অদ্যাপি পূজিত হয়। জৈনগণ বলেন যে, তাঁহাদের ধর্ম অনন্ত ও সুপ্রাচীন। তাঁহাদের মতে মহাবীরের পূর্বে কমপক্ষে ২৩ জন তীর্থঙ্কর বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হন এবং ইঁহারাই জগতের মুক্তিলাভের জন্য প্রকৃত ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। চতুর্বিংশ তীর্থঙ্করের পূজা জৈনধর্মের একটি প্রধান নীতি! তীর্থঙ্করগণের মধ্যে ঋষভ, শান্তিনাথ, নেমিনাথ, পার্শ্বনাথ, ও মহাবীর হইতেছেন সর্বপ্রধান।

যমুনাতীরে শৌরিপুর নামক সুবিশাল নগরে সমুদ্রবিজয় নামে এক বিখ্যাত নরপতি বাস করিতেন। রাণী শিবাদেবীর গর্ভে অরিষ্টনেমি নামে একটি পুত্র জন্মলাভ করে। অরিষ্ট-নেমির এইরূপ নামকরণের মূলে ছিল যে, রাণী স্বপ্নে দেখেন —রিষ্ট প্রস্তরে নির্মিত চক্রের নেমিগুলি আকাশমার্গে ধাবিত হইতেছে। গির্ণার বা রৈবতক পর্বতে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বহু সদ্‌গুণের এবং অপরিসীম জ্ঞানের অধিকারী। কণ্ঠস্বর ছিল সুমিষ্ট এবং তাঁহার দেহে ১০৮টি সুলক্ষণ ছিল। তাঁহার গায়ের রং ছিল কাল। দেহটি বৃক্ষের মত বলিষ্ঠ এবং ইস্পাতের মত শক্ত। তাঁহার সুগঠিত দেহ বেশ উচ্চও ছিল। রাজা সমুদ্রবিজয়ের সমুদয় উল্লেখযোগ্য রাজলক্ষণ ছিল। তাঁহার নয়টি কনিষ্ঠ ভ্রাতার মধ্যে সর্ব-কনিষ্ঠের নাম ছিল বসুদেব। বহু ধনবান নরপতি ও উচ্চ-বংশীয় ব্যক্তি তাঁহার রূপ ও সদ্‌গুণ দেখিয়া তাঁহার সহিত আপন কন্যাদের বিবাহ দেন। বসুদেবের বহু পত্নীর মধ্যে রোহিণী ও দেবকীর গর্ভে বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন।

শৌরিপুরের নিকটে মথুরা নামক একটি বৃহৎ নগরীতে কংস নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি এত নিষ্ঠুর ছিলেন যে, তিনি তাঁহার পিতাকে পর্যন্ত কারারুদ্ধ করেন এবং নানাভাবে নির্যাতন করেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব কংসকে নিহত করিয়া রাজা উগ্রসেনকে সিংহাসনে বসাইয়া-ছিলেন। আপন জামাতা কংসের মৃত্যুতে শক্তিমান রাজা জরাসন্ধ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তারপর উগ্রসেন সপরিবারে রাজ্যত্যাগ করেন। কাথিয়াবাড়ে পৌঁছিয়া সমুদ্রতীরে তিনি দ্বারকা নামে একটি বৃহৎ নগরী নির্মাণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ এতই বলবান ছিলেন যে তিনি দ্বারকার রাজা হন। বৃহৎ অট্টালিকা ও মন্দির নির্মিত হয় এবং বিপণি স্থাপিত হয়। এই নগরী সুন্দর দেখাইত। শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রাগারটি সর্বাপেক্ষা সুন্দর ছিল। একদা বন্ধুবর নেমিনাথের সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে কৃষ্ণ অস্ত্রাগারে আসেন। নেমিনাথ একটি শঙ্খ দেখিয়া বাজাইতে ইচ্ছুক হইলেন। দ্বাররক্ষকের অনুরোধ না শুনিয়াই তিনি জোরে শঙ্খধ্বনি করেন। ইহাতে সকলেই চিন্তিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ বিস্মিত হইলেন। নেমিনাথ শঙ্খধ্বনি করিয়াছেন শুনিয়া তিনি তাঁহার শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। নেমিনাথ এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু প্রস্তাব করিলেন তাঁহারা উভয়েই প্রতিপক্ষের প্রসারিত বাহু অবনত করিতে চেষ্টা করিবেন! নেমিনাথ কৃষ্ণের বাহু সহজে অবনত করেন কিন্তু কৃষ্ণ নেমিনাথের বাহু নোয়াইতে পারেন নাই। ইহা দেখিয়া কৃষ্ণ বিশ্বাস করেন যে নেমিনাথ তাঁহার অপেক্ষা বলশালী।

বিবাহের জন্য মাতাপিতা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া নেমিনাথ বলেন যে উপযুক্ত পাত্রী পাইলেই তিনি বিবাহ করিবেন। রাজা উগ্রসেনের সুন্দরী, ধর্মশীলা, ও সুলক্ষণা কন্যা রাজিমতী একমাত্র উপযুক্ত পাত্রী বলিয়া বিবেচিত হয়। নেমিনাথের বিবাহের আয়োজন চলিল। সমগ্র নগরীটি সুসজ্জিত হইল।

রাজিমতী সুপুরুষ নেমিনাথকে দেখিয়া আনন্দিত হন ও আপনাকে ভাগ্যবতী বলিয়া মনে করেন। নেমিনাথ রত্ন-অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সাড়ম্বরে উচ্চ সমারোহে রাজপ্রাসাদ হইতে বিবাহের জন্য যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বহু পিঞ্জরাবদ্ধ এবং ভীত ও দুঃখিত প্রাণী দেখিয়া সারথিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন এতগুলি প্রাণীকে এভাবে রাখা হইয়াছে। সারথি বলিল, বিবাহ উপলক্ষে এই সব প্রাণী বহুলোকের খাদ্য যোগাইবে। এইরূপে বহু প্রাণী বধের কারণ জানিয়া তাঁহার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হয়। তিনি ভাবিলেন—আমার জন্য যদি এতগুলি প্রাণী নিহত হয়, তবে কিরূপে আমি পরজন্মে সুখলাভ করিব? তিনি সম্পূর্ণরূপে পরজন্ম বিশ্বাস করিতেন। অতঃপর তিনি সারথিকে অলঙ্কারাদি দান করেন এবং সংসার ত্যাগ করিতে মনস্থ করেন। তিনি দ্বারকা ত্যাগ করিয়া রৈবতক পর্বতে স্থিত সহসম্রবন নামক উদ্যানে গমন করেন, এখানে মুনিব্রত গ্রহণ করিয়া মুক্তিলাভ করেন। যে মুহূর্তে চন্দ্র চিত্রা নক্ষত্রের সহিত মিলিত হয়, তখনই তিনি গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করেন। তিনি তাঁহার কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ ছিঁড়িয়া ফেলেন। জ্ঞান, বিশ্বাস, সদাচার, ক্ষমা, সম্যকজ্ঞান বৃদ্ধি করিতে তিনি উৎসুক ছিলেন। তাঁহার ভক্তবৃন্দ তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া দ্বারকা নগরীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

মুক্তিজ্ঞান লাভের পূর্বে নেমিনাথ পার্থিব ব্যাপারে অনাসক্ত থাকিয়া ভিক্ষু হন। তিনি আত্মীয়গণের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়া উঠেন। আহার ও পোষাক পরিচ্ছদে তিনি নিতান্ত সাদাসিদে ছিলেন। সুখে ও দুঃখে তাঁহার তুল্য অনুভূতি ছিল। তিনি সর্বজনের হিতৈষী ছিলেন। তিনি যাহা বলিতেন সবই সত্য হইত। পবিত্র জীবন যাপনের জন্য তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেন। এই মুক্তিজ্ঞান লাভের লক্ষ্য ছিল—সত্যলাভ এবং সকল পার্থিব বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান লাভ।

জিন অরিষ্টনেমির ভিক্ষুব্রত গ্রহণের কথা শুনিয়া রাজিমতী শোকে অভিভূত হইলেন। তাঁহার সখীগণ এজন্য তাঁহাকে দুঃখ প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন এবং অচিরে তিনি তাঁহার উপযুক্ত স্বামী লাভ করিবেন, এ কথাও আশ্বাস দেন। কিন্তু রাজিমতী এরূপ অশুভ উক্তি উচ্চারণ করিতে বারণ করেন, কারণ নেমিনাথ তাঁহার স্বামী। তিনি অন্য কোন পতি নির্বাচন করিবেন না এ কথাও জানাইয়া দেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—'ধিক আমার জীবনে, কারণ তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমার পক্ষে ভিক্ষুণী হওয়াই শ্রেয়ঃ'। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি তাঁহার কেশগুচ্ছ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সঙ্ঘে যোগদান করেন। তিনি তাঁহার বহু আত্মীয় স্বজন, ভৃত্য, ও অপরাপর বহু ব্যক্তিকে সঙ্ঘে যোগদান করিতে বলেন। তাঁহার রৈবতক পর্বতের দিকে গমনকালে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তাঁহার বস্ত্রাদি ভিজিয়া যাওয়াতে তিনি গুহায় প্রবেশ করিয়া অন্ধকারে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া নগ্নদেহে রহিলেন। নেমিনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রথনেমি ইতিপূর্বেই গুহার মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাজিমতীকে সেই অবস্থায় দেখিয়া তিনি তাঁহার নিকট কুপ্রস্তাব করেন। রাজিমতী তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখান করিয়া বলিলেন, 'আমি ভোজরাজকন্যা আর তুমি অন্ধকবৃষ্ণি। সদ্‌বংশে জন্মিয়া তোমার উচিত আত্মসংযমী হওয়া।' রাজিমতীর এই উক্তি শ্রবণ করিয়া রথনেমি পুনরায় ধর্মে মতিস্থাপম করেন। চিন্তায়, বাক্যে, কর্মে সংযত হইয়া তিনি সারাজীবন আদর্শ ভিক্ষুর ব্রত পালন করেন। রাজিমতী ও রথনেমি উভয়েই কেবলিন অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী হন এবং কঠোর নিয়ম পালন করিয়া কর্মের ধ্বংসসাধন করিয়া শ্রেষ্ঠ স্তরে উপনীত হন।

প্রত্যেক তীর্থঙ্করের একটি বিশিষ্ট লাঞ্ছন বা চিহ্ন ছিল। নেমিনাথের চিহ্ন ছিল শঙ্খ আর বর্ণ ছিল শ্যাম। তিনি হরিবংশসম্ভূত ছিলেন। কথিত আছে, মহাবীরের নির্বাণলাভের ৮৪ হাজার বৎসর পূর্বে নেমিনাথ দেহত্যাগ করেন। গোমেধ ও অম্বিকা ছিল তাঁহার সহচর। ভদ্রবাহু-বিরচিত কল্পসূত্রের মতে, নেমিনাথ এক সহস্র বৎসর জীবিত ছিলেন। প্রভাসপুরাণ মতে তিনি ছিলেন একজন জিন এবং তিনি রৈবতক পর্বতে মুক্তিলাভ করেন। তিনি কুরু ও পাণ্ডবদিগের সমসাময়িক ছিলেন।

মুক্তিজ্ঞান লাভ করিয়া নেমিনাথ জনগণকে এইরূপে শিক্ষা দেন—(১) সকলের সহিত বন্ধুত্ব করিবে ; (২) সদা সত্য ও সুমিষ্ট বাক্য বলিবে ; (৩) পরের দ্রব্য গ্রহণ করিও না ; (৪) শীল রক্ষা করিবে ; (৫) সর্বদা সন্তুষ্ট থাকিবে ; (৬) দয়াবান হইবে ; (৭) জীবনের চেয়ে ধর্মের মূল্য অধিক ; (৮) প্রয়োজন হইলে ধর্মের জন্য জীবনদান করিবে।

নেমিনাথের উপদেশ শ্রীকৃষ্ণপ্রমুখ বহু ব্যক্তি পালন করেন। গৃহস্থ থাকিয়াও বহু নরনারী পবিত্র জীবন যাপন করিতে লাগিল। রাজিমতী পার্থিব বস্তুসমূহে উদাসীন থাকিয়া পবিত্র জীবন যাপন করেন। তিনি সম্পূর্ণভাবে নেমিনাথের উপদেশ পালন করিয়া অবশেষে মুক্তিলাভ করেন।

জগতের ত্রাণকর্তা মুনিশ্রেষ্ঠ নেমিনাথ দ্বারবতী নগরীর

মধ্য দিয়া রেবতিক উদ্যানে গমন করেন এবং অশোক বৃক্ষতলে অবস্থিতি করেন। সেখানে আড়াই দিন উপবাস করিয়া তিনি একখানি দিব্যবস্ত্র পরিধান করেন এবং এক হাজার ব্যক্তির সম্মুখে মাথার চুল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেন। দিগম্বরগণের বিশ্বাস যে অন্যান্য তীর্থঙ্করের ন্যায় নেমিনাথ নগ্ন সাধু ছিলেন; তিনি নাকি ৫৪ দিন শরীরের কোন যত্ন লন নাই। ইহার পর সাড়ে তিন দিন নিরম্বু উপবাস করিয়া তিনি একটি বেতসবৃক্ষের নীচে কেবল জ্ঞান (শ্রেষ্ঠজ্ঞান) লাভ করেন। বিবিধতীর্থকল্পের মতে, তিনি মিথিলায় শুধু প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন নাই, শ্রেষ্ঠজ্ঞান লাভ করেন।

গির্ণার পর্বতচুড়ায় অবস্থান করিয়া নেমিনাথ দুইটি যুগের প্রবর্তন করেন: একটি বংশসম্পর্কীয় যুগ, অপরটি মানসিক অবস্থা সম্পর্কিত যুগ। তিনি তিন শত বৎসর রাজপুত্র, সাত শত বৎসরের কম কেবলিন, পূর্ণ সাত শত বৎসর ছিলেন শ্রমণ এবং ৫৪ দিন শ্রেষ্ঠ স্তরের নিম্নে অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাজকুমার গৌতম সংসার ত্যাগ করিয়া নেমিনাথের সাহায্যে জৈন ভিক্ষু হন। বারবাই নগরীতে নেমিনাথ উপস্থিত হইলে মল্লকী, উগ্র, ভোজ, ক্ষত্রিয় ও লিচ্ছবিগণ তাঁহাকে সাদরে সম্বর্ধনা করেন। শ্রীবন উদ্যানে অজিতের সহিত নেমিনাথের সাক্ষাৎ হয়। ব্রাহ্মণ সৌমিলের উপর ক্রোধ পোষণ না করিতে নেমিনাথ কৃষ্ণকে অনুরোধ করেন। আপন শ্বশ্রূ দেবকীর ন্যায় রাণী পদ্মাবতী অরিষ্টনেমি বা নেমিনাথের পূজা করিতেন। দ্বারবতীর ধ্বংস কিরূপে হইবে এ কথা কৃষ্ণ জানিতে চাহিলে নেমিনাথ বলিলেন যে বায়ু, অগ্নি এবং দ্বৈপায়ন—এই তিনটি ধ্বংসের মূল হইবে। •এই বাক্য শুনিয়া কৃষ্ণ যে ব্যথিত হইয়াছেন তাহা নেমিনাথ বুঝিলেন। ইহার পর কৃষ্ণ কি ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন এবং কোথায় তাঁহার আবার জন্ম হইবে, এ বিষয়ে জানিতে উৎসুক হইলেন। নেমিনাথ ইহার উত্তরে বলিলেন, দ্বৈপায়নের ক্রোধে, অগ্ন্যুৎপাতে ও যাদবগণের মদ্যপানের দরুন দ্বারবতী ধ্বংস হইলে, কৃষ্ণ বলরামসহ দাক্ষিণাত্যে পাণ্ডু মথুরায় গমন করিবেন। সেখানে তিনি যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবগণের সমক্ষে কুশাম্ববনে বটবৃক্ষতলে এক প্রস্তরখণ্ডের উপর পীতবস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া অবস্থিতি করিবেন। জরাকুমারের ধনু হইতে একটি তীক্ষ্ণ শর তাঁহার বামপদ বিদ্ধ করিবে। এইভাবে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন এবং পুনরায় নরকে জন্মগ্রহণ করিবেন। অতঃপর ভারতবর্ষে জম্বুদ্বীপে পুণ্ড্রক্ষেত্রে শতদ্বার নগরে তাঁহার পুনর্জন্ম হইবে। তিনি দ্বাদশ জিন হইবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন।

দ্বারবতী নগরীর আসন্ন ধ্বংসের কথা ভাবিয়া কৃষ্ণ সকলকেই সংসার ত্যাগ করিয়া অরিষ্টনেমির সঙ্ঘে যোগদান করিতে বলেন। তাঁহার অনুরোধে পদ্মাবতী-প্রমুখ তাঁহার রাণীগণ এবং যুবরাজ শাম্বের দুইটি স্ত্রী ভিক্ষুণী হন এবং ধর্ম পালন করিয়া মুক্তিলাভ করেন।

জৈন সাহিত্যে কৃষ্ণ কাহিনীর এরূপ বর্ণনা আমরা পাই। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ সাহিত্যে যে বর্ণনা আছে তাহার সহিত ইহার কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। জৈন উপাখ্যানগুলির উদ্দেশ্য—দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর অরিষ্টনেমির প্রভাবে সমগ্র যাদব বংশ মুক্তি পাইয়াছিল এ বিশ্বাস স্থানীয় লোকদিগের মনে আনিয়া দিয়া পশ্চিম ভারতে জৈনধর্মের জনপ্রিয়তা আনয়ন করা। উপনিষদের মতে, কৃষ্ণ ঘোর আঙ্গিরসের ধর্মোপদেশ পালন করিয়া পার্থিব বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন।

জৈনধর্মের মতে, তৃষ্ণার্তকে জলদান (পানপুণ্য) করিলে শ্রেষ্ঠ ফল পাওয়া যায়। সাধারণ ব্যক্তিকে অসিদ্ধ জল দিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু ভিক্ষুকে উত্তপ্ত জল অবশ্য দিতে হইবে। রাজা শঙ্কর এবং তাঁহার স্ত্রী যশোমতী কয়েকজন তৃষ্ণার্ত ভিক্ষুকে জলদান করেন। পরজন্মে ইহার পুণ্যফলে রাজা এবং তাঁহার স্ত্রী নেমিনাথ ও সুরাষ্ট্রের রাজকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। এ জন্মে তাঁহাদের বিবাহ স্থির হইলেও বিবাহ হয় নাই। বিবাহদিবসে তাঁহারা ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী হন এবং পরে মুক্তিলাভ করেন। জৈনমতে বাক্যের দ্বারা অপরের মনোভাব ক্ষুণ্ণ না করিলে পুণ্য অর্জ্জন করা যায়।

দ্বারকার রাজা কৃষ্ণ একদা নেমিনাথকে ধর্ম প্রচার করিতে দেখেন এবং তিনি অনুভব করিলেন যে তিনি ভিক্ষু জীবনের কষ্ট সহ্য করিতে পারিবেন না। তিনি প্রজাবর্গকে জৈন ধর্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন এবং তাহাদের পরিবারবর্গের ভার গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন।

নেমিনাথের ১৮টি গণ এবং ১৮টি গণধর ছিল। দিগম্বরদিগের মতে তাঁহার ১১টি গণ এবং বরদত্তের নেতৃত্বে ১১টি গণধর ছিল। নেমিনাথের সঙ্ঘে বরদত্তের নেতৃত্বে ১৮,০০০ শ্রমণ, আর্যা যক্ষিণীর নেতৃত্বে ৪০,০০০ ভিক্ষুণী, নন্দের নেতৃত্বে ১,৬৯,০০০ উপাসক, মহাসুব্রতার নেতৃত্বে ৩,৩৬,০০০ উপাসিকা ছিল। দিগম্বরগণের মতে, তাঁহার এক লক্ষ উপাসক এবং তিন লক্ষ উপাসিকা ছিল। এতদ্ব্যতীত নেমিনাথের সঙ্ঘে অবধিজ্ঞানসম্পন্ন ৪০০ সাধু, ১৫,০০০ কেবলিন, আপনাদিগকে রূপান্তরিত করিতে সমর্থ এমন ১৫,০০০ মুনি, ১,০০০ মহাজ্ঞানী, ৮০০ অধ্যাপক, শেষজন্মে মুনি ছিলেন এমন ১৬০০ ব্যক্তি এবং শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন

এমন ১৫০০ শিষ্য ও ৩,০০০ শিষ্যাও ছিলেন। নেমিনাথ বৃষ্ণিবংশীয় দ্বাদশ যুবরাজগণকে জৈনধর্মে দীক্ষা দেন।

নেমিনাথের চতুর্বিধ কর্ম সমাপ্ত হইল এবং অবসর্পিণী যুগে দুঃসমা-সুষমা কাল সম্পূর্ণ হইল। অতঃপর গ্রীষ্মের চতুর্থ মাসের একটি মধ্যরাত্রে চন্দ্র চিত্রা নক্ষত্রে অবস্থিতি করিলে নেমিনাথ ৫৩৬ জন মুনির সহিত একমাস কাল নিরম্বু উপবাস করিয়া গির্ণার পর্বতের চূড়াদেশে সর্বদুঃখ মুক্ত হইয়া নির্বাণ লাভ করেন।

নেমিনাথের বিরাট মন্দির কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত শত্রুঞ্জয় নামক অন্যতম পবিত্র পর্বতে নির্মিত হইয়াছে। প্রাচীন গিরিনগর বা গির্ণার বর্তমানে জুনাগড় নামে পরিচিত। ইহা নেমিনাথের পুণ্যস্পর্শে পবিত্র। শ্রীনেমির পাদস্পর্শে পূত অবলোকন পর্বতচূড়া দেখিলে সমগ্র কামনা পূর্ণ হয়। বিবিধতীর্থকল্পের মতে গির্ণার পর্বতোপরি অবস্থিত শ্রীনেমির মূর্তি পরে শিলাফলকের দ্বারা গঠিত হইয়াছিল। ইহা কাশ্মীর হইতে আনীত রত্নের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। নেমিনাথের মুক্তি-প্রস্তর জগদ্বিখ্যাত। ছত্রশীলার নিকটস্থ রৈবতকগিরিতে নেমিনাথ দীক্ষিত হন। কেবলজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি অবলোকন পর্বতশিখরে মুক্তিলাভ করেন। নেমিনাথের নিকট মুক্তিস্থানের কথা জানিতে পারিয়া কৃষ্ণ মুক্তিলাভের পর সিদ্ধবিনায়ক স্থাপন করেন। সৌরাষ্ট্রে এই পর্বতোপরি পশ্চিমদিকে নেমিনাথের একটি উচ্চ চূড়াযুক্ত মন্দির আছে। পূর্বদিকে নেমিনাথের একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। গুর্জরদেশে জয়সিংহদেব নেমিনাথের একটি নূতন মন্দির নির্মাণ করেন। ১০৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সৌরাষ্ট্রের মণ্ডলিক নামে এক নৃপতি গির্ণার পর্বতোপরি অবস্থিত নেমিনাথের মন্দিরটির সংস্কার করেন।*

* এই প্রবন্ধ প্রণয়নকালে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি হইতে আমরা সাহায্য পাইয়াছি—হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণি; মহাপুরুষচরিত্র; নেমিস্তবস্মরণ; বৃহৎ হরিবংশ পুরাণ; নেমিনাহচরিয়ু; নেমিদূত; নেমিনির্বাণ; ত্রিষষ্টিশলাকা-পুরুষচরিত; হরিবংশ পুরাণ; প্রভাস পুরাণ; কল্পসূত্র; উত্তরাধ্যয়ন সূত্র; অন্তকৃতদসাঙ্গ; অন্তগড়দসাও; অনুত্তরববাইয়দসাও; বিবিধতীর্থকল্প; আচারঙ্গ সূত্র; দসবৈকালিক সূত্র; ব্রহ্মপুরাণ; ইসীভাসিয় সঙ্গহনী M. Stevenson, *Notes on Modern Jainism*; *Indian Antiquary* XXXII; *Cambridge History of India*, Vol. I; Shah *Jainism in Northern India*; *Winternitz, History of Indian Literature*, Vol. II; H. R. Kapadia, *A History of the Canonical Literature of the Jainas;* J. C. Jain, *Life in Ancient India as depicted in the Jain Canons;* G. Buhler, *The Indian Sect of the Jainas;* H. R. Kapadia, *The Jain Religion and Literature*, Vol. I; Hastings, *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol. VII; Stevenson, *Heart of Jainism*; *Jain Sutras, S.B.E.*, Pt. II; Law, *Some Jain Canonical Sutras*; Law, *Mahavira—His life and teachings*.

মহিলা-সংবাদ

প্রবাসী বাঙালী ছাত্রীর কৃতিত্ব

লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী প্রখ্যাতনামা ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীযুত কালিকারঞ্জন কানুনগো মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা, শ্রীমতী অঞ্জলির এই বৎসর ইউ-পি বোর্ডের আই-এ পরীক্ষায়, প্রায় ত্রিশ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করিয়াছেন। শ্রীমতী অঞ্জলি সেতার বাজনায়ও বিশেষ পারদর্শিনী।

শ্রীঅঞ্জলি কানুনগো

আসা-বরদার

সমারসেট মম্
অনুবাদক : শ্রীবিমলকুমার শীল

নেভিল স্কোয়ারের সেণ্ট পিটার্স গির্জ্জায় সেদিন বিকালে নাম-করণের অনুষ্ঠান. এলবার্ট এডওয়ার্ড ফোরম্যান আসা-বরদারের সেই পুরনো পোষাকটাই গায়ে চড়িয়েছিল। নূতন পোষাকটাকে সে কোন সংকার বা বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য (অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা সেণ্ট পিটার্স গির্জ্জায়ই এসব করা বেশী পছন্দ করে) পরিপাটিভাবে ভাঁজ করে রেখে দেয়, সেটা দেখলে মনেই হয় না যে এটা আলপাকার জামা—মনে হয় বুঝি ওটা ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি। সেদিনের সেই সাধারণ দিনে এলবার্ট তার পুরনো পোষাকগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভাল পোষাকটাই পরেছিল। এই পোষাক পরে তার বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব হয়, কেননা এই পোষাকেই তার কাজের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বাড়ী যাবার সময় যখন সে পোষাক খুলে ফেলে আলাদা জামা কাপড় পরে তখন তার নিজেকে যেন কেমন পরিচ্ছদবিহীন বলেই মনে হয়। সত্যই সে পোষাকের খুবই যত্ন করে, নিজে হাতেই সে এসব ভাঁজ করে ইস্ত্রি চালায়। প্রায় ষোল বছর ধরে সে এই গির্জ্জার বিশপের আসাধারী রূপে বহাল রয়েছে : এই ষোল বছর ধরে অনেক গাউনই সে পেয়েছে, কিন্তু পুরানো হয়ে গেলেও কোন দিনই সে সেগুলি ফেলে দেয়নি—সমস্তই সে তার শোবার ঘরের পোষাকের আলমারীর ভিতর ব্রাউন কাগজে পরিপাটি করে মুড়ে রেখে দিয়েছে।

আসা-বরদার ধীরে সুস্থে নিজের কাজ করে যাচ্ছিল। মার্বেল পাথরের তৈরি গির্জ্জার পবিত্র জলাধারের উপরে কারুকার্য্য করা কাঠের ঢাকনাটা চাপা দিয়ে রেখে দিল, এক অথর্ব্ব বৃদ্ধার জন্য একটা চেয়ার আনা হয়েছিল সেটাকেও সে সরিয়ে রাখল। তারপর পুরোহিতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। গির্জ্জার বাসনপত্রের হিসাব তাকে বুঝিয়ে দিলেই তার কাজ শেষ, তারপর সে স্বচ্ছন্দে বাড়ী যেতে পারে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরোহিতকে বেদীর ওধার থেকে আসতে দেখে গেল। বেদীর সামনে এসে একবার হাঁটু গেড়ে বসলেন তারপর নেমে এলেন দর-দালানের উপর।

আসাধারী আপন মনেই গজগজ করতে লাগল, "আঃ, কি যে করছেন! আমার যে চা খাবার সময় হয়ে এল সেদিকে খেয়াল নেই!"

নূতন এসেছেন এই পুরোহিত। লাল টকটকে মুখ, চল্লিশ বছর প্রায় বয়স, খুবই উৎসাহী। কিন্তু এলবার্ট এডওয়ার্ডের এখনও পুরনো পুরোহিতের কথা স্মরণ হলেই মনে দুঃখ জাগে। আগের পুরোহিত ছিলেন সেকেলে ধরণের। ধীর গম্ভীর উদাত্ত স্বরে তিনি ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, অভিজাত শ্রেণীর যজমানদের বাড়ীর ভোজনের নিমন্ত্রণে প্রায়ই যেতেন। চার্চ্চে যে যার কাজ ঠিকমত করুক এ অবশ্যই তিনি চাইতেন, কিন্তু তার জন্য কখনও বৃথা হৈ চৈ করতেন না, নূতন পুরোহিতের মত প্রত্যেক ব্যাপারেই নাক গলাতেন না। যাই হোক, এলবার্ট এডওয়ার্ড এসবই সহ্য করে থাকত। বেশ অভিজাত পল্লীর মধ্যে সেণ্ট পিটার্স গির্জ্জার অবস্থান এবং এর যজমান-পল্লীর লোকেরাও খুব চমৎকার ভদ্রলোক। নূতন পুরোহিত ইষ্ট এণ্ড থেকে এসেছেন, সেই জন্যই তিনি এখানকার সম্ভ্রান্ত আচার-ব্যবহারে চট করে ধাতস্থ হয়ে উঠবেন এটা আশা করা যায় না।

এলবার্ট এডওয়ার্ড আবার আপনমনেই বলে, "হুঁ, যত সব ঝঞ্ঝাট! যাক্, সময়ে আপনা থেকেই শিখবে।"

পুরোহিত খানিকটা এগিয়ে এসে এমন জায়গায় থামলেন যেখান থেকে উপাসনার সময়ের কণ্ঠস্বরের চেয়ে অনুচ্চ স্বরেই আস-বরদারকে ডাকা যায়, তারপর ডাকলেন, "ফোরম্যান, তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে, একবার ভাঁড়ারঘরে এক মিনিটের জন্যে আসবে?"

"আচ্ছা, স্যার।"

তার আসা পর্য্যন্ত পুরোহিত সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর দু'জনেই গির্জ্জার দালান ধরে হাঁটতে লাগলেন।

"আজকের অনুষ্ঠানটি চমৎকার হ'ল স্যার। একটি জিনিষ কি মজার, আপনি যখনই ছেলেটাকে কোলে নিলেন অমনি তার কান্না থেমে গেল।"

পুরোহিত স্মিত হাস্যে জবাব দিলেন, "আমি এরকম ব্যাপার প্রায়ই লক্ষ্য করেছি। মোটকথা, এ বিষয়ে আমার বেশ ভালই অভ্যেস আছে।"

পুরোহিত যখন এলবার্ট এডওয়ার্ডকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন তখন ঘরের ভিতর চার্চ্চের দু'জন পরিদর্শনকারী অধ্যক্ষকে দেখে এলবার্ট একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল। এর আগে কোন দিন সে এদেরকে আসতে দেখে নি। তাঁরা মাথা নেড়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন।

"নমস্কার স্যার, নমস্কার স্যার," দু'জনকেই এলবার্ট একে একে অভিবাদন জানাল।

এলবার্ট এডওয়ার্ড যতদিন ধরে এখানে কাজ করছে প্রায় ততদিন থেকে তাঁরাও এই গির্জ্জার পরিদর্শক নিযুক্ত হয়ে আছেন এবং এরা দু'জনেই বয়স্ক ব্যক্তি। একটা সুশ্রী খাবার ঘরের টেবিলের উপর তাঁরা বসেছিলেন, পুরোহিতও তাঁদের মাঝখানে একটা খালি চেয়ারে বসে পড়লেন। পুরনো পুরোহিত অনেক বছর আগে এই টেবিলটি ইটালী থেকে আনিয়েছিলেন। এলবার্ট এডওয়ার্ড তাঁদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে লাগল কি ব্যাপার। অর্গানবাদক যে বেশ একটু গণ্ডগোলে পড়েছিল এবং তখনকার

মত ব্যাপারটিকে চাপাও দেওয়া গিয়েছিল সেই কথাটাই তার কেবলই মনে হতে লাগল। কিন্তু নেভিল স্কোয়ারের সেন্ট পিটার্স গির্জ্জায় ত এরকম কেলেঙ্কারী চলতে দিতে পারা যায় না। পুরোহিতের মুখে কেমন যেন একটি দৃঢ় সহানুভূতির রেখা চকচক করছে কিন্তু অপর দু'জনের মুখে বেশ একটু বিব্রত ভাব ফুটে উঠেছে।

আপনমনেই আসা-বরদার ভাবতে লাগল, "মনে হচ্ছে পুরুত যেন এদেরকে কি বুঝিয়ে এদেরকে দিয়ে কি একটা করাতে চায়, কিন্তু এরা সে কাজটিকে যেন ঠিক পছন্দ করতে পারছেন না। ব্যাপারটি নিশ্চয়ই এই রকমের একটি কিছু হবে।"

কিন্তু এলবার্ট এডওয়ার্ডের ভাবলেশহীন মুখে মনের কথা কিছুই ফুটে উঠল না। সে শ্রদ্ধানত মুখেই দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু তার ব্যবহারের মধ্যে কোথায়ও দাসমনোবৃত্তি ছিল না। সে এই চার্চ্চে ঢোকবার অনেক আগে থেকেই অনেক বড় বড় ঘরে কাজ করে এসেছে আর প্রত্যেক জায়গায় তার চালচলনও ছিল নিখুঁত।

প্রথমে এক বিরাট ব্যবসাদারের বাড়ীর চাকররূপে তার কাজের হাতেখড়ি হয়। এর পর সে ধীরে ধীরে চতুর্থ শ্রেণীর বরকন্দাজ থেকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হয়। তারপর এক লর্ডের বিধবা পত্নীর কাছে বছরখানেক ধরে একাকীই খানসামার সমস্ত কাজ করে। এর পরও এখানে এই সেন্ট পিটার্সে ঢোকবার আগেই এক অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতের বাড়ী খানসামার কাজ করে, শুধু তাই নয়, সেখানে তার খবরদারিতে দু'জনকে কাজ করতে হ'ত। কৃশ, দীর্ঘকায় এই আসা-বরদারের মুখে গাম্ভীর্য্য ও মার্জ্জিত রুচির ছাপ সুপরিস্ফুট। তাকে দেখলে ঠিক ডিউক বলে মনে না হলেও, অন্ততঃ কোন ডিউকের চরিত্রের অভিনেতা বলে অবশ্যই মনে হবে। কর্ম্ম-দক্ষতা, দৃঢ়তা, আত্মপ্রত্যয় এসব গুণই তার আছে। তার চরিত্রের মধ্যেও কোন রকমের দোষ ছিল না।

পুরোহিত বেশ ধীরে-সুস্থেই তাঁর বক্তব্য আরম্ভ করলেন, "দেখ ফোরম্যান, তোমার সম্বন্ধে কিছু অপ্রিয় কথা বলবার আছে। তুমি এখানে অনেক দিন ধরেই আছ, আর আমার মনে হয় তোমার কাজে যে সবাই সন্তুষ্ট এ সম্বন্ধে পরিদর্শকগণও আমার সঙ্গে একমত হবেন।"

তত্ত্বাবধানকারী অধ্যক্ষগণ ঘাড় নেড়েই এই কথায় সায় দেন।

"কিন্তু সেদিন একটা বড় অদ্ভুত জিনিষ লক্ষ্য করলাম আর আমার মনে হয় তত্ত্বাবধায়কগণকে এ বিষয়ে জানানো আমার কর্ত্তব্য। ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি বেশ আশ্চর্য্য হয়ে দেখছি যে তুমি না জান পড়তে, না জান লিখতে।"

আসা-বরদারের মুখে কিন্তু কোন রকমেরই বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পেল না। শান্ত কণ্ঠেই জবাব দিল, "আগের পুরোহিতও এটা জানতেন স্যার। তিনি ত বলেছিলেন ওতে কিছু এসে যায় না। তিনি সব সময় বলতেন, এখনকার লোকগুলো লেখাপড়া নিয়ে যেন বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি করে।"

প্রধান তত্ত্বাবধায়কটি বলে উঠলেন, "এ ত বড় অদ্ভুত কথা শুনছি। তুমি কি বলতে চাও ষোল বছর ধরে এই চার্চ্চে আছ অথচ লিখতে পড়তে কিছুই জান না?"

"আমি বার বছর বয়স থেকেই চাকরি করতে ঢুকি স্যার। প্রথমেই এক রাঁধুনী আমাকে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ও আমার ভালও লাগত না, নানান কাজের ঝঞ্ঝাটে বিশেষ সময়ও পেতাম না। তা ছাড়া কোন দিন লেখাপড়া শেখার দরকারও বোধ করি নি। আমি ত ভাবি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যতক্ষণ পড়াশুনা করতে সময় নষ্ট করে ততক্ষণে তারা অনেক ভাল ভাল কাজ করে ফেলতে পারত।"

"কিন্তু তুমি কি জগতের খবরাখবরও জানতে চাও না? কোন দিন কাউকে চিঠি লিখতেও চাও না?" অপর পরিদর্শনকারীটি এবার প্রশ্ন করেন।

"না হুজুর। লেখাপড়া ছাড়াও আমার বেশ কাজ চলে যায়। এখন ত কাগজে যে সব ছবি বেরোয় তাই থেকেই বেশ বুঝতে পারি কি ঘটনা ঘটছে। আর চিঠি লেখবার পক্ষে আমার বৌ ভালই লেখাপড়া জানে, চিঠি লেখবার দরকার হলে তাকে দিয়েই লিখিয়ে নি।"

তত্ত্বাবধায়ক দু'জনে আসা-বরদারের দিকে একবার বিব্রতভাবে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলেন টেবিলের উপর।

"আচ্ছা বেশ ফোরম্যান, আমি এ বিষয়ে এদের সঙ্গে কথা বলেছি আর ব্যাপারটা যে বেশ অদ্ভুত এ সম্বন্ধে এরাও আমার সঙ্গে এক মত। নেভিল স্কোয়ারে সেন্ট পিটার্সের মত গির্জ্জায় লেখা-পড়া না জানা আসা-বরদার ত আমরা রাখতে পারি না।"

এলবার্ট এডওয়ার্ডের শীর্ণ, পাংশু মুখ রক্তিম হয়ে ওঠে এই কথায়, অস্বস্তির সঙ্গে সঞ্চালন করতে থাকে তার পদদ্বয় কিন্তু মুখে সে কিছুই উত্তর করে না।

"ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা কর, ফোরম্যান, তোমার বিরুদ্ধে আমার কোন রকম অভিযোগ নেই। তোমার কাজকর্ম্ম তুমি বেশ ভালভাবেই কর। তোমার চরিত্র আর ক্ষমতা সম্পর্কেও আমার উচ্চ ধারণাই আছে। কিন্তু তোমার নিরক্ষরতার জন্য হঠাৎ একটা কিছু বিপদ হয়ে যাবার ঝুঁকি ত আর আমাদের নেবার অধিকার নেই। নীতির দিক দিয়েই বল আর সাবধানতার দিক দিয়েই বল এ ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার।"

প্রধান তত্ত্বাবধায়ক জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু তুমি কি লেখাপড়া শিখে নিতে পার না, ফোরম্যান?"

"না স্যার, এখন ওসব আর পারব না। এখন যে আমি যুবা নেই এ ত দেখতেই পাচ্ছেন। আর যখন ছোট থাকতেই আমার মাথায় ওসব কিছু ঢোকে নি তখন এখন যে কিছু শিখতে পারব সে আমার মনে হয় না।"

পুরোহিত আবার বলেন, "দেখ ফোরম্যান, আমরা তোমার উপর নির্দ্দয় হতে চাই না। কিন্তু আমি আর পরিদর্শনকারী দু'জন

দিলে ঠিক করেছি যে, আমরা তোমাকে তিন মাস সময় দেব। তবে তার মধ্যেও যদি তুমি পড়তে বা লিখতে না পার তা হলে বোধ হয় তোমাকে কাজ ছাড়তে হবে।"

এলবার্ট এডওয়ার্ড এই নূতন পুরোহিতকে কোন দিনই পছন্দ করে নি। যখনই একে সেণ্ট পিটার্সের ভার দেওয়া হয়েছে তখন থেকেই সে বলেছে লোকে খুব ভুল করেছে একে নিযুক্ত করে। উপাসনা-সভার আগের পুরোহিতের মত যে রকম লোক দরকার এ মোটেই সে রকম নয়।

আসা-বরদার তাই ঋজু হয়েই দাঁড়াল তাদের সামনে। সে তার নিজের গুরুত্ব বোঝে, এই জন্যই সে কারও কাছে নত হয়ে থাকতে রাজি নয়। অকুণ্ঠিতভাবেই সে বলে, "দুঃখিত স্যার, ওতে যে কিছু হবে তা আমার মনে হয় না। নূতন কিছু শেখবার বয়স আমার অনেক দিনই পেরিয়ে গেছে। এত বছর ধরে আমি লেখা-পড়া না জেনেই কাটিয়ে এসেছি। এখন আমি নিজের গর্ব্ব করতে চাই না—গর্ব্ব করাটা কিছু গৌরবের নয়—কিন্তু এটুকু বেশ বলতে পারি ভগবানের দয়ায় আমি যে কাজ পেয়েছি তা লেখাপড়া না শিখেও ভালভাবেই করে এসেছি। লেখাপড়া শেখবার চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু শিখতে যদি পারতাম ত তখনই পারতাম।"

"কিন্তু ফোরম্যান, এ রকম অবস্থায় আমার মনে হয়, তোমাকে কাজ ছাড়তেই হবে।"

"আচ্ছা, বুঝেছি স্যার। তা আমার জায়গায় অন্য লোক পেলেই খুশী মনে আমি কাজ থেকে বিদায় নেব।"

পুরোহিত ও তত্ত্বাবধায়কগণ চলে যাবার পরেই সে তার স্বাভাবিক অচঞ্চলচিত্তে চার্চ্চের দরজা বন্ধ করে দেয় বটে, কিন্তু দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে সে আর তার এত দিনের অবিচলিত গাম্ভীর্য্য রক্ষা করতে পারে না। যে আঘাত সে পেয়েছে তারই বেদনায় ঠোঁট দুটি তার কেঁপে উঠে থর থর করে।

ধীরপদে সে ভাঁড়ার ঘরে ফিরে গিয়ে আসা-বরদারের পোষাকটি ঠিক জায়গায় টাঙ্গিয়ে রেখে দিল। পুরানো দিনের সমারোহপূর্ণ সংস্কার ও বিবাহ উৎসবের কথা মনে পড়ে বুক ভেঙ্গে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস। প্রত্যেকটি জিনিষ নিখুঁতভাবে সাজিয়ে রাখল সে। তারপর তার নিজের কোটটি পরে ও টুপিটি হাতে নিয়ে দালান ধরে বেরিয়ে এল আস্তে আস্তে। চার্চ্চের দরজায় তালা দিয়ে যখন বাগানের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এল তখন তার মন গভীর বিষাদে অবসন্ন। চিন্তাগ্রস্ত মনে সে তার বাড়ীর পথ না ধরে এগিয়ে চলল আলাদা পথ দিয়ে। বাড়ীতে ফিরে গিয়ে চা খাবার কথা আর খেয়ালই রইল না। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে এগিয়ে যেতে লাগল ধীরে ধীরে।

এই রকম গণ্ডগোলে যে পড়তে হবে এ সে কোন দিন ভাবতেও পারে নি। সেণ্ট-পিটার্সের আসাধারীরা রোমের পোপের মতই আজীবন কাজ করে যায়। কাজ করতে করতে প্রায়ই সে, তার মৃত্যুর পরের প্রথম রবিবারের সান্ধ্যসঙ্গীতের সময় পুরোহিত কি রকমভাবে পরলোকগত আসা-বরদার এলবার্ট এডওয়ার্ড ফোরম্যানের বিশ্বস্ততার ও চরিত্রের আদর্শ সম্বন্ধে প্রশংসা করবে, তারই সুখস্বপ্নে মগ্ন হয়ে যেত। আবার তার বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে গভীর দীর্ঘশ্বাস। এলবার্ট এডওয়ার্ড সাধারণতঃ তামাক খেত না এবং অন্য কোন রকমের নেশাও ছিল না। অবশ্য এর কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছিল, যেমন ডিনার খাবার সময় এক গেলাস বিয়ার পেলে সে খুশিই হ'ত এবং খুব যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ত তখন এক-আধটা সিগারেটও টানত।

চলতে চলতে তার মনে হতে লাগল কেবল একটা জিনিষই তার মনকে এখন শান্তি দিতে পারে এবং তার সঙ্গে তা না থাকায় সে কাছেপিঠে কোন দোকান থেকে এক প্যাকেট গোল্ড ফ্লেক কিনতে পারবে তার জন্য চারদিক দেখে নিল। কাছাকাছি কোন দোকানই দেখতে পেল না। তার জন্য আগিয়ে গেল খানিকটা। বেশ দীর্ঘ রাস্তা, অনেক রকমের দোকান রয়েছে সেই রাস্তায় কিন্তু কোথাও একটা সিগারেটের দোকান নেই।

"আশ্চর্য্য ত," আপন মনেই বলল এলবার্ট এডওয়ার্ড।

রাস্তাটা ধরে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল সে, যদি ওধারে কোন দোকান থাকে। নাঃ, সত্যিই কোন সিগারেটের দোকান নেই এ রাস্তায়। দাঁড়িয়ে পড়ল সে, এদিক-সেদিক চাইতে চাইতেই সে ভাবতে লাগল, "নিশ্চয়ই শুধু আমি নয়, আমার মত অনেক লোকই এই রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে সিগারেট খেয়ে চাঙ্গা হতে চায়। এখানে যদি কেউ তামাক আর কিছু মিষ্টির ছোট্ট একটা দোকান করে ত সে নিশ্চয়ই বেশ ভাল ভাবে দোকান চালাতে পারবে।"

হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যায়।

আপন মনেই বলে, "হুঁ, ঠিক হয়েছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যে জিনিষটা আশা করতে পারা যাচ্ছে না ঘটনাচক্রে তা কেমন আমাদের কাছে এসে যায়।"

এর পর সে বাড়ী ফিরে এসে যথারীতি চা পান করে।

তার স্ত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করে, "এলবার্ট, তুমি আজ এত চুপচাপ কেন?"

"হুঁ, ভাবছি একটা জিনিষ।"

ব্যাপারটাকে সে সমস্ত দিক দিয়েই বেশ করে ভেবে দেখে। পরের দিন আবার সেই রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকে। ভাগ্যক্রমে তার মনের মতন ভাড়া করবার ছোট দোকানও পেয়ে যায়। এর পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সে দোকানটা ভাড়া নিয়ে নেয়। নেভিল স্কোয়ারের সেণ্ট পিটার্স গির্জ্জা থেকে চিরতরে বিদায় নেবার পর প্রায় এক মাস কেটে যায়, এলবার্ট এডওয়ার্ড ফোরম্যান এখন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ তামাক-ব্যবসায়ী ও সংবাদপত্রের ডিলার।

প্রথম প্রথম তার স্ত্রী সেণ্ট পিটার্সের বিশপের দণ্ডধারী থেকে তামাক-ব্যবসায়ী হওয়ার জন্যে আক্ষেপ করত। কিন্তু এলবার্ট তাকে বুঝিয়েছিল সময়ের সঙ্গে তাল রেখেই সবাইকে চলতে হবে

আর তা ছাড়া চার্চের আগের সে গৌরবও আর নেই, সেই জন্য সে সময়ের মূল্য বুঝেই চলছে। এলবার্ট এডওয়ার্ডের ব্যবসা বেশ ভালই চলছিল এবং প্রায় বছরখানেকের মধ্যেই তার উপার্জনটা এমন হ'ল যে—সে আবার ভাবতে লাগল, ম্যানেজার রেখে আর একটা দোকান চালাবে কিনা।

সে এমন আর একটা রাস্তার খোঁজ করতে লাগল যেখানে কাছাকাছি কোন তামাকের দোকান নেই এবং এরকম রাস্তায় দোকান ঘর ভাড়া পাওয়া মাত্রই সে আবার একটা দোকান খুলে বসল। এটাতেও তার ব্যবসা বেশ লাভজনক ভাবেই চলতে লাগল। তখনই তার মনে হ'ল যখন সে দুটো দোকান চালাতে পারছে তখন আধ ডজন দোকানও চালাতে পারবে। তখন থেকেই তার আরম্ভ হ'ল লণ্ডনের পথে পথে ঘুরে বেড়ানো এবং যেখানেই লম্বা একটানা কোন রাস্তায় একটাও তামাকের দোকান দেখতে পেত না সেখানে দোকানঘর ভাড়া পেলেই সঙ্গে সঙ্গে ভাড়া নিয়ে নিত। এই রকম করে দশ বছরের মধ্যে সে কমসে-কম দশখানা দোকানের মালিক হয়ে উঠল এবং দু'হাতে টাকা উপার্জ্জন করতে লাগল। প্রতি সোমবারে সে নিজে এই সব দোকানে গিয়ে এক সপ্তাহের বিক্রীর টাকা নিয়ে এসে ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দিত।

এক দিন সকালে সে যথারীতি ব্যাঙ্কে এক বাণ্ডিল নোটের তাড়া আর ব্যাগ-ভর্ত্তি রুপোর মুদ্রা জমা দিচ্ছিল। সেই সময় ক্যাশিয়ার জানাল যে, ম্যানেজার তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ম্যানেজারের ঘরে তাকে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি 'হ্যাণ্ডশেক' করে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন।

"মিঃ ফোরম্যান, আপনি আমাদের ব্যাঙ্কে যে টাকা জমা রেখেছেন তার সম্বন্ধেই দু'একটা কথা বলতে চাই। কত টাকা আপনি জমা রেখেছেন তা আপনি জানেন।"

"দু'এক পাউণ্ড নিশ্চয়ই নয়। বেশ মোটা টাকাই আমার জমা আছে।"

"আজকে সকালে যে টাকা জমা দিলেন সেটা ছাড়াই আপনার ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের কিছু বেশী জমা আছে। জমা রাখার পক্ষে এটা বেশ মোটা টাকা। তাই আমার মনে হয় অন্য কিছুতে টাকাটা খাটালে আপনার ভালই হবে।"

"দেখুন মশাই, আমি কোনরকমের ঝুঁকি নিতে চাই না। আমার মতে ও টাকা ব্যাঙ্কে জমা থাকাই বেশ নিরাপদ।"

"কিছু ভাবতে হবে না আপনাকে। আমরাই আপনাকে কতকগুলো মোক্ষম সিকিউরিটির পথ বাৎলে দেব, তাতে করে আপনার কোন ক্ষতি হবার ভয় থাকবে না। আর তাতে এমনি ব্যাঙ্কে জমা রেখে যে সুদ পান তার চেয়ে ঢের বেশী সুদ পাবেন।"

মিঃ ফোরম্যানের অভিজাত মুখশ্রীতে উৎকণ্ঠার রেখা ফুটে উঠল। মুখে বলল, "দেখুন, ষ্টক শেয়ারের কারবার ত কোনদিন করি নি। ওসব করতে হলে আপনার হাতেই সব ভার দিতে হয়।"

ম্যানেজার স্মিতহাস্যে বলল, "আমরা সবকিছুই করে দেব। কেবল এর পরের বার যখন আসবেন তখন কাগজপত্রে আপনাকে সই করে দিতে হবে।"

এলবার্ট সন্দিগ্ধভাবেই বলল, "সে আমি ঠিক করে দিতে পারব, কিন্তু কি ব্যাপারে সই করছি তা আমি কি করে বুঝব?"

এবার ম্যানেজার একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠেই উত্তর দিল, "আপনি পড়তে জানেন নিশ্চয়ই।"

ফোরম্যান নিতান্ত অসহায়ের মত হাসল একবার।

"কিন্তু গণ্ডগোলটা সেইখানেই যে—পড়তে আমি মোটেই পারি না। বেশ বুঝছি—আমার একথা শুনলে হাসবেন, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, খালি নামটা সই করা ছাড়া লেখাপড়ার আর কিছুই জানি না, তাও ব্যবসা করতে নেমেই নামটা সই করতে শিখেছি।"

ম্যানেজার বিস্ময়ে প্রায় চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন।

"এরকম অসাধারণ ব্যাপার আমি এই প্রথম শুনছি।"

"দেখুন মশাই, ব্যাপারটা হয়েছে কি গোড়ার দিকে আমি লেখাপড়ার কোন সুযোগই পাই নি। তারপর যখন অনেক দেরিতে সুযোগ এল তখন আমি গোয়ার্ত্তুমি করেই [illegible] শিখতে চাই নি।"

ম্যানেজার যেন কোন প্রাগৈতিহাসিক [illegible] দানবের দিকে দেখছেন এই রকম ভাবে তার দিকে চেয়ে রইলেন।—"তা হলে কি আপনি বলতে চান যে, কিছু লেখাপড়া না শিখেই এই রকম একটা ব্যবসা ফেঁদেছেন আর তাতে করে ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের ওপর রোজগার করেছেন? উঃ, কি আশ্চর্য্য! কিন্তু আপনি লেখাপড়া জানলে পরে এখন হতেন কি?"

মিঃ ফোরম্যানের আভিজাত্যপূর্ণ মুখমণ্ডলে এতক্ষণে মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে। স্মিতহাস্যেই সে জবাব দেয়, "সে আপনাকে অনায়াসেই বলতে পারি মশাই। তা হলে আমি সেণ্ট পিটার্স গির্জ্জায় বিশপের দণ্ডধারী হয়ে থাকতাম এখন।"

আলোচনা

শ্রীচৈতন্য ও বাসুদেব সার্বভৌম

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

গত জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে শ্রীবীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত "শ্রীচৈতন্য ও বাসুদেব সার্বভৌম" নামক রঙীন চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে। চিত্রের ভঙ্গিতে সার্বভৌম বাসুদেব ভট্টাচার্যের নিকট শ্রীচৈতন্যের বেদান্ত-শ্রবণের কাহিনী সুপরিস্ফুট। সার্বভৌম মহাশয়ের সঙ্গে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মিলন হয় পুরীতে যৌবনের মধ্যভাগে। তখন তিনি সন্ন্যাসীবেশ-পরিহিত দণ্ড-কৌপীনধারী এবং মুণ্ডিতমস্তক। চৈতন্যভাগবত অন্ত্য খণ্ড তৃতীয় অধ্যায়ে সার্বভৌমের এই উক্তি আছে:

পরম সুবুদ্ধি তুমি হইয়া আপনে।
তবে তুমি সন্ন্যাস করিলা কি কারণে?

প্রত্যুত্তরে চৈতন্যদেব বলিয়াছেন:

প্রভু বোলে শুন সার্বভৌম মহাশয়।
'সন্ন্যাসী' আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহিরে হইলুঁ শিখাসূত্র মুড়াইয়া ॥
'সন্ন্যাসী' করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি।
কৃপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি ॥

চৈতন্যচরিতামৃতেও (মধ্যলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে) সার্বভৌমের এই উক্তি পাওয়া যায়:

সহজেই পূজ্য তুমি আরে ত সন্ন্যাস।
অতএব জানিহ তুমি আমি তব দাস ॥

মহাপ্রভুর প্রত্যুত্তর—

শুনি মহাপ্রভু কৈল শ্রীবিষ্ণু স্মরণ।
ভট্টাচার্য কহে কিছু বিনয় বচন ॥
তুমি জগদ্গুরু সর্বলোক হিতকর্তা।
বেদান্ত পড়াও সন্ন্যাসীর উপকর্তা ॥
আমি বালক সন্ন্যাসী ভালমন্দ নাহি জানি।
তোমার আশ্রয় নিল গুরু করি মানি ॥

*　　*　　*

ভট্টাচার্য কহে ইঁহার প্রৌঢ় যৌবন।
কেমনে সন্ন্যাস ধর্ম হইবে রক্ষণ ॥
নিরন্তর ইঁহাকে আমি বেদান্ত শুনাব।
বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাব ॥

*　　*　　*

ভট্টাচার্য্য সঙ্গে তাঁর মন্দির আইলা,
প্রভুরে আসন দিয়া আপনে বসিলা ॥
বেদান্ত শ্রবণে এই সন্ন্যাসীর ধর্ম।
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ ॥
প্রভু কহে মোরে তুমি কর অনুগ্রহ।
সেই সে কর্তব্য মোর যেই তুমি কহ ॥
সপ্তদিন পর্যন্ত ঐছে করেন শ্রবণে।
ভালমন্দ নাহি কহে বসি মাত্র শুনে ॥

সার্বভৌম গুরুর নিকট যুবক সন্ন্যাসী-শিষ্যের এই বেদান্ত-শ্রবণ সপ্তাহাধিককাল চলিয়াছিল। এই বিষয়ের বিশদ বর্ণনা মহাপ্রভুর জীবন-লীলাজ্ঞাপক বহু গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও চিত্রশিল্পী বক্ষ্যমাণ চিত্রে মহাপ্রভুকে দীর্ঘকেশী, উপবীতধারী এবং বলয়পরিহিত বালকের বেশে সাজাইবার চেষ্টা কেন করিয়াছেন তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। চিত্ররচনায় সত্য ঘটনা যাহাতে বিকৃত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার।

লা ই ফ ব য় সা বা ন

প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে আপনাকে রক্ষা করে

ভারতে প্রস্তুত

L. 248-X52 BG
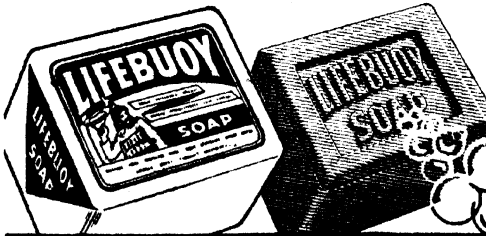
বেদান্ত দর্শন (অদ্বৈতবাদ : দ্বিতীয় খণ্ড)—ড শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ ৵+৪৪০। মূল্য ১০৲।

দার্শনিক সূক্ষ্ম বিচার বহু জাতির সারস্বত জীবনকে অদ্যাপি সভ্যজগতে সৎপথে পরিচালিত করিতেছে। ভারতবর্ষে ষড়দর্শনের চর্চ্চায় তাহা পরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। মূলতঃ সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ ষড়দর্শনের বিপুল গ্রন্থরাশি সম্যক্ অধিগত করা এখন প্রায় অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রখ্যাত দার্শনিক ও অধ্যাপক ড. শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার জীবনব্যাপী তপস্যার ফল বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া বাংলা সাহিত্যের দর্শন-বিভাগকে সমৃদ্ধির পথে প্রসারিত করিয়াছেন। এ জাতীয় বাংলা গ্রন্থের সংখ্যা অদ্যাপি মুষ্টিমেয়। বর্ত্তমান খণ্ডে অত্যন্ত দুরধিগম্য প্রমাণরহস্য বিশদভাবে এবং প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। বেদান্তমতে প্রমাণসংখ্যা ছয়—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি। অদ্বৈতমতে এই সকল প্রমাণের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শাস্ত্রী মহাশয় অন্যান্য দর্শনেও তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন এবং স্থলে স্থলে পাশ্চাত্য দর্শনের অভিমত তুলনার জন্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। গ্রন্থশেষে স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ ও অপ্রমা-পরিচয় নিপুণভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা আশা করি, ভারতীয় দর্শনের মুকুটমণি অদ্বৈতবেদান্তের ভিত্তিস্থানীয় এই প্রমাণখণ্ড বাংলার প্রত্যেক পাঠাগারে সংগৃহীত হইয়া প্রমাণশাস্ত্রব্যবসায়ী বাঙ্গালীজাতির প্রাচীন গৌরবকে বিস্মৃতির অন্ধকার হইতে রক্ষা করিবে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

অর্ধেক মানবী তুমি—শ্রীদেবেশ দাস। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স, ১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

বইখানির নামের মধ্যে কাব্যোচিত সৌরভ থাকিলেও বইখানি কবিতা-পুস্তক নহে, পরন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস—যাহার অঙ্গে রঙ্গের মধু এবং ব্যঙ্গের কাঁটা উভয়ই আছে। ইংরেজীতে যাহাকে স্যাটায়ার বলে অর্ধেক মানবী তুমি সেই শ্রেণীর উপন্যাস। বর্তমান যুগের বাঙালী-জীবনে যে-সকল দোষ এবং দুর্বলতা আছে, যাহা সব সময়ে আমাদের চোখে পড়ে না, লেখক সেগুলিকে পাঠক-চক্ষুর সম্মুখে টানিয়া আনিয়া প্রচলিত মামুলি ভঙ্গীতে কশাঘাত করেন নাই, পরন্তু কশাঘাতের চেয়েও ফলপ্রদ ভাবে তাহার কৌতুকের দিকটা লইয়া টানাটানি করিয়া রসসৃষ্টি করিয়াছেন। এ জিনিসটা সহজ নহে, কঠিন। গভীর রসের ঘন পোঁচের মধ্যে অনেক ত্রুটি আপনা-আপনিই চাপা পড়িয়া যায়, কৌতুকরসের হাল্‌কা পোঁচের কিন্তু সে আবরণ নাই; সেখানে তুলির পরিচ্ছন্ন টান না দিতে পারিলে সকলই ব্যর্থ। দেবেশচন্দ্র তুলিকার নিপুণ হস্তের পরিচয় দিয়াছেন।

'অর্ধেক মানবী তুমি' নূতন সালের আমদানি। এইরূপ কৌতুকশ্লেষাত্মক উপন্যাস বাংলা-সাহিত্যে যদিই বা দুই-একটি থাকে, সার্থকতার অপ্রশস্ত ক্ষেত্রে তাহা একান্ত বিরল। এ জন্য দেবেশচন্দ্র বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

উপন্যাসখানির ঘটনাস্থাপন ও চরিত্র-অঙ্কনে লিপিকুশলতার পূর্ণ পরিচয় আছে। ভাষা স্বচ্ছ, সাবলীল এবং বর্ণনীয় বস্তুর ধর্ম অনুসারে কখনও চপল, কখনও চাপা।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা—স্বপনবুড়ো। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম দুই টাকা চার আনা।

নামেই প্রকাশ—এখানি কৌতুকগল্পপুস্তক। বইখানিতে সাহিত্য-সভা, হিট-পিকচার, পঞ্চশরের পরাজয়, হ্রস্ব-দীর্ঘ, শারদীয় রস-সৃষ্টি, অবশেষে, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, প্রতিক্রিয়া, চিনে বাদাম, টোটকা, নবোদিত সিনেমা তারকার একদিন, ড্রপ ওঠার আগে প্রভৃতি ষোলটি গল্প আছে। স্বপনবুড়ো শিশু-সাহিত্য জগতে সুপরিচিত; তাই তিনি মুখবন্ধে প্রথমেই বলিয়া রাখিয়াছেন, গল্পগুলি বয়স্কদের জন্য রচিত হইয়াছে, ছোটদের জন্য নয়। গল্পের কোনটিতে ব্যঙ্গ, কোনটিতে বিদ্রূপ, কোনটিতে রঙ্গ, কোনটিতে পরিহাস প্রাধান্য পাইয়াছে। কিন্তু সবগুলি গল্পই কৌতুকের নয়। প্রথম গল্প 'সাহিত্য-সভা' সভাপতিত্বের মাল্য-লোভী সাহিত্যিক সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক রচনা। 'হিট-পিকচারে' পরলোকগত তিসির কারবারী পিতার উত্তরাধিকারী নব্য-যুবক ঝিল্লিকের সিনেমা-ব্যবসায়-বাতিকের পরিণাম প্রদর্শিত হইয়াছে। 'অবশেষে' গল্পে চিত্র-শিল্পী, সুর-শিল্পী, জুয়েলার, ইম্প্রেসারিও, চিত্রপরিচালক প্রভৃতিকে হতাশ করিয়া সুকণ্ঠী তরুণী গায়িকা বিখ্যাত লৌহ-ব্যবসায়ীর কণ্ঠে মাল্যদান করিল। 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' গল্পের সঙ্গে ছবিগুলি অত্যন্ত মানানসই হইয়াছে। 'হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট' গল্পের 'অভিনব প্যাক্টের অধি-

সন্ধি মহাত্মা গান্ধীও আজীবন তপস্যায় আয়ত্তে আনিতে পারেন নাই।' কিন্তু 'হ্রস্ব-দীর্ঘ' গল্পের জাত আলাদা। ইহাতে পরিহাস আছে বটে, কিন্তু তাহা নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস। এইরূপ ভিন্নশ্রেণীর দু'একটি গল্প ছাড়া অন্যগুলি কৌতুকরসসিক্ত। পাঠকবর্গ বইখানি পড়িয়া রঙ্গও উপভোগ করিবেন, আবার ভঙ্গ বঙ্গদেশের চিত্রও দেখিতে পাইবেন।

অভিজ্ঞান শকুন্তলা—শ্রীকুড়ারাম ভট্টাচার্য্য। এ. কে. সরকার এণ্ড কোং, ৬।১, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

ইহা কাব্যে অভিজ্ঞান শকুন্তলা, নাটকের অনুবাদ নয়। কালিদাসের নাটকের গল্পাংশ এবং শব্দসম্পদ অবলম্বন করিয়া যে কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাতে লেখকের কৃতিত্ব আছে। কালিদাসের অপূর্ব্ব নাটকখানি তিনি বিশেষরূপে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া কাব্যে এরূপ স্বাচ্ছন্দ্য আসিয়াছে। রাজা দুষ্মন্ত মৃগের অনুসরণ করিয়া কণ্বমুনির আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন,

> অতি মনোরম মুনি-আশ্রম লতাগুল্মেতে ভরা,
> মৃদু গুঞ্জনে উঠে সামগান চিত্ত আকুল করা।
> কাননে আজিকে একি আলোড়ন!
> গন্ধে মাতিছে দখিনা পবন ;
> ঝরু ঝরু ঝরে ফুলরেণুকণা শ্যামল দূর্ব্বাদলে ;
> ক্লান্ত হরিণী ঘুমায়ে রয়েছে বনতোষিণীর তলে।

দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রথম সাক্ষাৎ,

> প্রথম প্রেমের পরশ-মধুর-অপাঙ্গ-দিঠিপাতে—
> হেরিল রূপসী বাঞ্ছিত জনে সন্ধ্যারি আঙিনাতে।

সপ্তম সর্গে আছে,

> নন্দন-ফুল-গন্ধে আকুল মন্দাকিনীর পথে
> ফিরিছেন রাজা দানব-বিজয়ী মাতলি-চালিত রথে।

লেখকের কবিত্ব আছে। কথাকাব্যের প্রবাহ সাবলীল। ছন্দের গতি কোথাও ব্যাহত হয় নাই। শব্দ ও ছন্দের উপর অধিকার আছে বলিয়াই লেখক কালিদাসের নাটককে এইরূপ সুললিত কাব্যে রূপান্তরিত করিতে পারিয়াছেন। বইখানি সুমুদ্রিত। প্রচ্ছদপট শিল্পী শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী অঙ্কিত। ভিতরেও ছবি আছে। রসজ্ঞ পাঠক "অভিজ্ঞান শকুন্তলা" কাব্যে কালিদাসের নাটকের আস্বাদ পাইয়া আনন্দলাভ করিবেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

অমর মিলন—ডাঃ শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, ১, জয় ভট্টাচার্য্যের লেন, কলিকাতা-৫। মূল্য ১৸০ টাকা।

১৯৪৬-এর অক্টোবরের পটভূমিকায় লেখক পূর্ব্ববঙ্গের একটি গ্রামের চিত্র আঁকিয়াছেন। সেই সঙ্গে স্বদেশী-আন্দোলনের (১৯০৫) কিছু আভাসও দিয়াছেন। এই একটি গ্রামের মধ্য দিয়া গোটা পূর্ব্ববঙ্গের প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের শোণিত-কলঙ্কময় ইতিহাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। অতঃপর অসংখ্য বাস্তুত্যাগীর দুঃখ-দুর্দ্দশা-বেদনায় বহু সমস্যা ঘনাইয়া উঠিয়াছে; অভিজ্ঞ ও দরদী চিত্ত লইয়া লেখক তাহার সমাধানের প্রয়াসও পাইয়াছেন। সেবাধর্ম্মে যে সত্যকারের মানব-কল্যাণ নিহিত এই তত্ত্বটি তিনি গল্পের মাধ্যমে পরিবেশন করিয়াছেন। লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু কাহিনী-জগতের একটি দাবি আছে, সেটি তিনি পূরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি যে পরিমাণে আদর্শে উজ্জ্বল হইয়াছে—মাটির পৃথিবী হইতে সেই পরিমাণে দূরে সরিয়া গিয়াছে।

মশাল—শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১২, বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২৲ টাকা।

১৯৫০ সনে বিভক্ত বাংলায় যে সাম্প্রদায়িকতা আত্মপ্রকাশ করে—'মশাল' নাটকে তাহারই বিষক্রিয়া যথাযথভাবে চিত্রিত হইয়াছে। নাটকে সাধারণতঃ একটি কিংবা দুইটি চরিত্রের (নায়ক-নায়িকা) হৃদয়-দ্বন্দ্ব অথবা জীবন-সংগ্রামের কাহিনী নানা বিচিত্র মানুষ ও ঘটনার সংঘাতে জীবন্ত হইয়া উঠে। নাটকের মানুষগুলি হাসিকান্না, প্রেম-ভালবাসা, ঘৃণা-নিষ্ঠুরতা প্রভৃতির আবর্ত্ত রচনা করিয়া নিজেরা পাক খায় ও দর্শকচিত্তকে অভিভূত করিয়া দেয়; মশালে কিন্তু ঘটনার বিস্তার নাই, পাত্র-পাত্রীর বাহুল্য নাই কিংবা সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের প্রয়াস নাই এবং লেখকের সবচেয়ে কৃতিত্বের কথা কোন ঘটনাকে সৃষ্টি করিয়া রস জমাইবার কৌশলও নাই। ভারত-বিভাগের পর সমগ্র দেশে সাম্প্রদায়িকতার যে বিষ ছড়াইয়াছে তাহারই সর্ব্বনাশা রূপটিকে স্পষ্টতর করিবার জন্য কয়েকজন দরদী শ্রমিক, দুই একটি প্রতিক্রিয়াশীল ধনিক, তাঁহাদের আশ্রিত গুণ্ডার দল, বিশ্বাসহন্তা দালাল, বিভ্রান্ত শ্রমিক এবং একটি মাত্র সর্ব্বরিক্ত নারীচরিত্র বাছিয়া লইয়াছেন লেখক। স্বল্প-পরিসরে স্বল্পকালের ঘটনায় এই সজীব চরিত্রগুলি ভারত-বিভাগের অভি-শাপকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছে। ইহাদের মুখে বহু অপ্রিয় সত্য কথা লেখক বলাইয়াছেন এবং বহু গলদ ও গভীর ক্ষতের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশও করিয়াছেন। যদিও ১৯৫০ সনের আয়ু ফুরাইয়াছে—যে সমস্যায় পীড়িত ছিল সেদিনের মুহূর্ত্তগুলি, তাহার গুরুত্ব কতকটা হ্রাস পাইয়াছে হয়ত, কিন্তু পারস্পরিক সন্দেহ-অবিশ্বাসের গাঢ় ছায়া হৃদয়ক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়াছে কি? এই কলুষ দূরীভূত হয় নাই বলিয়াই এই ধরণের নাটক-রচনার প্রয়োজনও আজ ফুরায় নাই। অবশ্য অভিনয়েই নাটকের সার্থকতা। মশালের অভিনয় যদি সাময়িক উন্মত্ততা ও বিভ্রান্তিকে জয় করিবার প্রেরণা যোগাইয়া জনচিত্তকে সুস্থ করিয়া তুলিতে পারে, তবেই নাটক রচনার সার্থকতা প্রতিপন্ন হইবে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

গণতান্ত্রিক সমাজবাদ (বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয়)—শ্রীঅশোক মেহতা। অনুবাদক—শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত। প্রাচী প্রকাশন, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২২০, মূল্য দেড় টাকা।

বিখ্যাত সমাজতন্ত্রী নেতা অশোক মেহতা ছাত্রগণের মধ্যে "গণতন্ত্রী সমাজবাদ" সম্বন্ধে নয়টি বক্তৃতা প্রদান করেন। বিষয়বস্তু—সমাজবাদের পটভূমি, সমাজবাদের রাজনীতি, সমাজবাদের অর্থনীতি, সমাজবাদ ও সংস্কৃতি। এই বক্তৃতাগুলিই বর্ত্তমান পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রীজয়-

প্রকাশ নারায়ণ ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ধনতন্ত্রী ব্যবস্থার ব্যর্থতা আজ সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। যে সামাজিক এবং আর্থিক ব্যবস্থায় সকলের মঙ্গল সম্ভব নহে, আজিকার জগতে কোন সমাজকল্যাণকামী চিন্তাশীল ব্যক্তি সে সমাজ-ব্যবস্থাকে অন্ধভাবে মানিয়া লইতে ও সমর্থন করিতে পারেন না। সুতরাং নূতন কোন্ ব্যবস্থা গ্রহণীয় ইহাই প্রশ্ন। গণতন্ত্রের লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ। মানুষের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের জন্যই ইহা অত্যাবশ্যক।

মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে বিনষ্ট করিয়া মানুষকে বড় করা যায় না, এ কথা নীতির দিক দিয়া অবশ্যস্বীকার্য্য। কিন্তু সাম্যবাদী বা কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কার্য্যতঃ মানুষের ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তিসত্তার বিলোপসাধন করা হইতেছে। তথাকথিত সমষ্টির উন্নতির জন্য সেখানে ব্যক্তি বা ব্যক্তিস্বাধীনতার বিনষ্টি হইতেছে। ফলে সেখানকার আপাতঃ দৃশ্যমান সকল উন্নতি কেবল বাহ্যিক, স্বতঃস্ফূর্ত নহে। সে উন্নতি স্বাধীন মানুষের দ্বারা হইতেছে না, হইতেছে মানুষ-যন্ত্র দ্বারা। ইহা অনেকটা বন্দী-শালার শিল্পোৎপাদনের মত।

চিন্তাশীল নেতা অশোক মেহতা এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, গণতন্ত্রকে বজায় রাখিয়া সমাজ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তাঁহার প্রত্যেকটি যুক্তি তিনি ঐতিহাসিক ও সম-সাময়িক ঘটনার আলোকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অনেক সমসাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে তিনি নিজের মতামত জোর করিয়া চাপাইয়া দিবার গোঁড়ামি দেখান নাই, পাঠককে নিজ নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বলিয়াছেন। কম্যুনিজম কেন ভারতীয়গণের গ্রহণীয় নহে এবং কি কারণে ইহা ভারতীয় প্রকৃতি ও সংস্কৃতির পরিপন্থী বক্তৃতাগুলিতে তাহা সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিষয়টি এরূপভাবে সুপরিস্ফুট করা বিশেষ ক্ষমতার পরি-চায়ক। নানা 'বাদ' বা 'ইজম' সম্বন্ধে আমরা পরস্পরবিরোধী মতবাদ শুনি, যুক্তি অপেক্ষা ভাবপ্রবণতা ইহাতে খুব বেশী থাকে। কিন্তু অশোক মেহতার রচনায় ভাবালুতার পরিবর্তে যুক্তি ও বিশ্লেষণের নৈপুণ্য যুক্তিবাদী পাঠকের আনন্দবর্দ্ধন করিবে। এই পুস্তকপাঠে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ সম্বন্ধে পাঠকের মনে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিবে। আমরা শিক্ষিত-সমাজে এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

অনুবাদের দিক দিয়া পুস্তকখানিতে যৎসামান্য ত্রুটি যাহা আছে তাহা পরবর্ত্তী সংস্করণে দূর করিলে বইখানি অধিকতর উপযোগী হইবে। অনেকগুলি ছাপার ভুল নজরে পড়িল।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

মেঘলা আকাশ—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসো-সিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩, হেরিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য ২।০ আনা।

উপন্যাস। হরিশ স্কুল মাষ্টার। দরিদ্র কিন্তু উন্নত-চরিত্র আদর্শবাদী। গ্রামের একটি স্কুলে শিক্ষকতা-কার্য্য করেন। শিক্ষক-জীবনের আদর্শকে পূর্ণ-ভাবে পালন করিতে গিয়া আপন পরিবারবর্গকেও তিনি এক কঠিন জীবন-সংগ্রামের অংশীদার করিয়া লইলেন। কায়ক্লেশে দিন একই ভাবে চলিয়া যাইতেছিল। অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিল সমরানল। সে আগুনে পুড়িয়া গেল মানুষের সততা। সত্য, সুন্দর ও সুনীতির সমাধি-রচনা হইল। দেখা দিল অন্নকষ্ট—কণ্ট্রোল। আর এই সুযোগে মুনাফালোভীর দল সৃষ্টি করিল চোরাবাজার। দুর্নীতিতে দেশ ছাইয়া গেল। হরিশ বিস্মিত হইলেন—হৃদয়ে বেদনা অনুভব করিলেন। চতুর্দ্দিকের নৈতিক অধঃপতনের মাঝখানে দাঁড়াইয়া অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত এই আদর্শবাদী নির্লোভ মানুষটি কতকটা বিহ্বল হইয়া পড়েন, তাঁহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। সেই বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটে তার নানা আচরণ ও কাজের মধ্য দিয়া। নিজেকে বড় অসহায় মনে করেন হরিশ যখন তাঁরই হাতে গড়া প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যেও এই মারাত্মক ব্যাধির প্রকাশ দেখেন। ছেলেদের পড়াইতে তাঁর ভাল লাগে না। মন বলে, নিশ্চয় তাঁরা কর্ত্তব্যচ্যুত হইয়াছেন। যেদিকে চোখ ফেরান সব অন্ধকার। সবটুকু আলো যেন মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে। কিন্তু হরিশ মাষ্টারের দৃষ্টি ঊর্দ্ধপানে নিবদ্ধ, আশা—যদি মেঘ কাটিয়া যায়। মোটামুটি ঘটনাটি এইরূপ।

কলিকাতার প্রবীণ ঔপন্যাসিক রাবণবাবুর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। সুমিষ্ট ভাষা, সুন্দর সংলাপ, অপূর্ব বর্ণনাভঙ্গী ও চিত্তাকর্ষক ঘটনা-বিন্যাস উপন্যাসখানিকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছে।
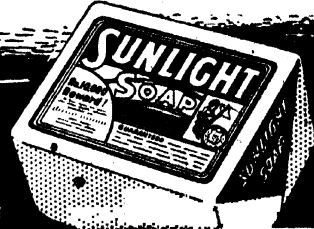
বর্তমানে নানা সমস্যাপূর্ণ বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিয়াছে শিক্ষাক্ষেত্রে—কি ছাত্রসমাজে, কি শিক্ষকসমাজে। সেখানে সংস্কার আবশ্যক এবং এই অত্যাবশ্যক বিষয়ের উপর লেখক প্রচুর আলোকপাত করিয়াছেন। পুস্তকখানি শুধু রসোত্তীর্ণ নয়, সময়োপযোগীও হইয়াছে।

আকাশ পাতাল—(প্রথম পর্ব্ব)

ঐ (দ্বিতীয় পর্ব্ব)

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য যথাক্রমে পাঁচ টাকা এবং সাড়ে পাঁচ টাকা।

কলিকাতার এক অতি পুরাতন ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে কৃষ্ণকিশোর। বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ ঘটায় মাতা কুমুদিনীর সতর্ক ও সযত্ন তত্ত্বাবধানে ধীরে ধীরে সে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সংসর্গদোষে ছেলে বিগড়াইয়া না যায় সেদিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। ইহার কারণও ছিল। প্রলোভন আর চাটুকারিতা, কানভাঙানি আর আত্মীয়-পরিজনের শত্রুতাকে তিনি অত্যন্ত ভয় করিতেন। কিন্তু কুমুদিনীর এত সাবধানতা শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইল।

পড়াশুনায় ছেলের মন নাই। গানবাজনা এবং অন্যান্য বহুদিকে তার আকর্ষণ বেশী। বাড়ীতে হিন্দুয়ানীর চূড়ান্ত, এই গণ্ডীর বাহিরে ভিন্ন সমাজের মধ্যে কৃষ্ণকিশোরের অবাধ সঞ্চরণ। মার নিষেধ সত্ত্বেও সে পিসিমার দুই বখাটে ছেলে জহর আর পান্নার সঙ্গে গোপনে মেলামেশা করে। পিসিমার চরিত্র কলুষহীন নহে। পিসেমশাইয়ের ত কথাই নাই। তিনি থাকেন অন্যত্র। স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে মত্ত অবস্থায়। পুত্রের গতিবিধির কথা মাতার কর্ণগোচর হয়। তিনি শঙ্কিত হইয়া উঠেন। চোখ কান তাঁহার আরও সজাগ হইয়া উঠে। কিন্তু কৃষ্ণকিশোরের উপর কোনপ্রকার প্রভাব বিস্তার করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে না। উপরন্তু কৃষ্ণকিশোরের মন সংস্কৃত ভাষার গণ্ডী ছাড়াইয়া মিশনরীদের প্রদত্ত শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। বন্ধুত্ব হয় দেশী খ্রীষ্টান নর্মান অরুণেন্দ্র মুখার্জ্জির সহিত। নর্মানের বোন লিলিয়ানের সহিত হয় গভীর অন্তরঙ্গতা। ডালিমের মত তার রাঙা ঠোঁট আর চোখে সম্মোহনী দৃষ্টি। কৃষ্ণকিশোরের তরুণ মনে রঙের ছোপ লাগে। কিন্তু লিলিয়ান বেশীদিন বাঁচিল না। তাহার অকালমৃত্যুতে কৃষ্ণকিশোর আঘাত পাইল। অতঃপর আরও বহু বিচিত্র ঘটনা-প্রবাহের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে একসময় কৃষ্ণকিশোর সঙ্গীতজ্ঞ বসির মিঞার পাল্লায় পড়িয়া জহরার আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়িল। কৃষ্ণকিশোর মদ্যপায়ী হইয়া চরিত্র হারাইল। বাড়ী ফিরিল মত্ত অবস্থায়। গৃহে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গকে লইয়া ফুটবল খেলিল। কুমুদিনী এ অনাচার সহ্য করিতে পারিলেন না। রাগে, ক্ষোভে, অপমানে তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। জীবিতাবস্থায় আর এ গৃহে প্রবেশ করিবেন না এই তাঁর পণ। এই ঘটনার কিছুদিন পরে পিসিমার মধ্যস্থতায় ও অনুরোধে কৃষ্ণকিশোর রাজেশ্বরী নামে একটি ধনীর দুলালীকে বিবাহ করিল। প্রথম পর্ব্বের এইখানেই শেষ।

সমালোচ্য পুস্তকখানিতে লেখক সেকালের বিত্তশালী বাঙালী-সমাজের একটি চিত্র আঁকিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ভাষা কবিত্বপূর্ণ। কয়েকটি পার্শ্ব-চরিত্র নিতান্ত অনাবশ্যক ভাবে দেখা দিয়াছে, কিন্তু মূল চরিত্রগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রাজেশ্বরী অপূর্ব্ব সুন্দরী। কৃষ্ণকিশোর চাহিয়া চাহিয়া দেখে। রাজেশ্বরীর রূপ তার মনে মোহজাল বিস্তার করে। কিন্তু জহরার নাগপাশ হইতে সে মুক্ত হইতে পারে না, বরং ধীরে ধীরে সে তাকে একেবারে পরিপূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া বসিল। রাজেশ্বরী সরল প্রকৃতির মেয়ে। সব খবর তার কানে আসে। সে দুঃখ পায়—ছটফট করে, কিন্তু কি করিবে বুঝিয়া পায় না। কৃষ্ণকিশোর তার ধনভাণ্ডার ঢালিয়া দেয় জহরার পায়ে। অজস্র অর্থব্যয় করে তার বিড়ালের বিবাহে।

অবশেষে একদিন রাজেশ্বরীর মত নিরীহ মেয়েরও ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙিয়া যায়। স্বামীকে সে কয়েকটি অত্যন্ত সত্য কড়া কথা শুনাইয়া দেয়। কৃষ্ণকিশোর সেইমাত্র জহরার গৃহ হইতে ফিরিয়াছে। জহরার স্মৃতি তখন তার চিত্তলোকে প্রবল। সে উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং স্ত্রীকে বন্দুক আনিয়া পর পর বারকয়েক গুলি করিয়া হত্যা করিল। কাহিনীর এইখানে যবনিকাপাত হইয়াছে।

রাজেশ্বরীকে গুলি করা হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিশকে প্রলোভনে বশীভূত করা পর্য্যন্ত কৃষ্ণকিশোরের আচরণগুলি অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

ক্যানসার চিকিৎসা—রাজবৈদ্য প্রাণাচার্য্য কবিরাজ প্রভাকর চট্টোপাধ্যায় এম. এ. ডি, এস্, সি। মূল্য পাঁচ টাকা।

কবিরাজ মহাশয় এই গ্রন্থে ক্যানসার সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। বইখানা পড়লে সাধারণ লোকেরও এই রোগ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মে। মানবদেহে কত বিভিন্নরূপে, বিভিন্নভাবে যে এই রোগের আবির্ভাব হয় সে সব লিপিবদ্ধ করে তিনি প্রত্যেকেরই রোগের প্রথম অবস্থায় সতর্ক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। গ্রন্থকার একজন ভূয়োদর্শী চিকিৎসক। রোগের বিভিন্ন লক্ষণে তিনি আয়ুর্বেদোক্ত যে যে ঔষধ প্রয়োগ করে ফল পেয়েছেন এই বছরে তার বিস্তৃত তালিকা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই দুরারোগ্য ব্যাধি সম্পর্কে তিনি যে নূতন আলোকসম্পাত করেছেন তাতে কবিরাজ মাত্রেরই এই রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসায় সুবিধা হবে। ক্যানসার অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও কষ্টসাধ্য ব্যাধি। তাঁর প্রদর্শিত চিকিৎসায় রোগীর রোগমুক্তি এমনকি কষ্টের লাঘব হলেও তা শুধু গ্রন্থকারের নয় আয়ুর্বেদেরই গৌরব ঘোষণা করবে। এ সম্পর্কে আরও প্রচুর গবেষণার প্রয়োজন। গ্রন্থকার যে গবেষণা করেছেন তার জন্য দেশবাসী তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

স্তবকুসুমাঞ্জলি—শ্রীসদানন্দ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত এবং জেলা হুগলী, পোঃ ডুমুরদহ—শ্রীশ্রীরামাশ্রম হইতে চিত্রশিল্পী শ্রীমুকুল দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৮৩২+২০৭ পৃষ্ঠা, মূল্য পাঁচ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি দেবদেবীর স্তবের বই নহে, উহা প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবসাধকদের অন্যতম শ্রীশ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথের দ্বিষষ্টিতম জন্মতিথিতে তাঁহার শিষ্য, ভক্ত ও অনুরক্ত নরনারীগণ কর্ত্তৃক সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী ত্রিবিধ ভাষায় গদ্যপদ্যাকারে রচিত প্রশস্তি-কুসুমে পরিপূর্ণ অঞ্জলি। বিভিন্ন রচনায়—লোক-কল্যাণকারী, তারকব্রহ্মনাম-প্রচারক, নামগানে মাতোয়ারা, প্রেমিক পুরুষ ওঙ্কারনাথের জীবনলীলা-মাধুরী সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ওঙ্কারনাথের লেখা তেইশটি পত্রও গ্রন্থে পরিবেশিত হইয়াছে; এগুলির ভিতরে শিক্ষণীয় বহু উপদেশ আছে। এই প্রেমিক সিদ্ধপুরুষ কেবল নামকীর্ত্তনকারীই নহেন, তিনি যেমন সুগায়ক, তেমন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, কবি, সাহিত্যিক, গ্রন্থকার, ধর্ম্মব্যাখ্যাকারী, পরদুঃখকাতর, দাতা, উচ্চস্তরের সাধক এবং ধর্ম্ম-পিপাসু বহু নরনারীর পরম আশ্রয়। শ্রদ্ধাঞ্জলির আকারে বহুজনের নিপুণ তূলিকায় এহেন মহজ্জীবনালেখ্য যেরূপ চিত্রিত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে দেশবাসী নরনারীর সাগ্রহে অনুধাবনযোগ্য। অনুরাগীদের প্রতি তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপদেশ হইতেছে, "উঠতে-বসতে, খেতে-শুতে, সুখে-দুঃখে, অভাবে-সাচ্ছল্যে, হেলায়-শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে-অভক্তিতে, বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে, সজনে-বিজনে, স্বপনে-জাগরণে নাম কর, তা হলেই সব হবে। নামের শক্তি বস্তুশক্তি অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। অতএব অশ্রদ্ধা-অবিশ্বাস করিয়াই নাম কর—কাজ আপনিই হইবে।" গ্রন্থমধ্যস্থ দশখানা চিত্র এবং তারকব্রহ্ম নামাঙ্কিত সুচিত্রিত বহিরাবরণ গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীসারদা দেবীর জীবনকথা—স্বামী বেদান্তানন্দ। উদ্বোধন কার্য্যালয়। ১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩। ২+১৪৪ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্ম্মিণী—যিনি নগণ্য পাড়াগাঁয়ের নিতান্ত গরীব-ঘরের নিরক্ষরা মেয়ে, যিনি দেশবিদেশের অগণিত নরনারীর ধর্ম্মমাতা, স্বামী যাঁর পরম ইষ্ট এবং যিনি স্বামীর পরমা ইষ্টদেবী, যাঁহার জীবন সংযম, সত্যবাদিতা, সরলতা, দয়া, ক্ষমা, ধৈর্য্য, তেজস্বিতা, ত্যাগ, তপস্যা, সেবা প্রভৃতি সদ্গুণের মূর্ত্ত আদর্শ, যিনি আধুনিক শিক্ষাসভ্যতার কোনই ধার না ধারিয়া আদর্শ মানবোচিত সকল শিক্ষা-সভ্যতার আধারভূতা, সেই রামকৃষ্ণ-ভক্ত জননী শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবীর জীবনকথা গ্রন্থকার প্রাণের দরদ দিয়া সহজ সরল ভাষায় তরুণ-তরুণীদের উপযোগী করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য শতবার্ষিকী মহোৎসবের শুভক্ষণে সাহিত্য-ভাণ্ডারে এই জীবনকথা একটি উল্লেখযোগ্য দান বলিয়া গণ্য হইবে। গ্রন্থের জীবনী-অংশ—পিতৃপরিচয় বা জন্ম হইতে শেষকথা পর্য্যন্ত উনবিংশতি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ; পরিশেষে বিংশতি অধ্যায়ে শিক্ষণীয় চল্লিশটি উপদেশ পরিবেশিত হইয়াছে। সংক্ষেপে, শ্রীমাকে সম্যক্ জানিবার ও বুঝিবার পক্ষে এই গ্রন্থ বেশ উপযোগী হইয়াছে। মায়ের ও ঠাকুরের ছবি দুইটি এবং মলাটের চিত্র মনোজ্ঞ।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দেশ-বিদেশের কথা

কাশ্মীরের ডাল হ্রদ ও শালামারবাগ

কাশ্মীরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে ডাল হ্রদ ও শালামারবাগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডাল হ্রদ দৈর্ঘ্যে পাঁচ মাইল এবং প্রস্থে দুই মাইল। শিকারায় চড়িয়া এই হ্রদে বেড়াইতে পারা যায়। ইহার দৃশ্য রমণীয়। ডাল লেকের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের উপরে নেহরু পার্ক অবস্থিত। ইহার একটু পিছনে 'কবুতরখানা'।

ডাল লেক হইতেই শিকারায় করিয়া মোগল আমলের বিখ্যাত উদ্যানগুলি দেখিতে যাওয়া যায়, বাসেও যাওয়া চলে।
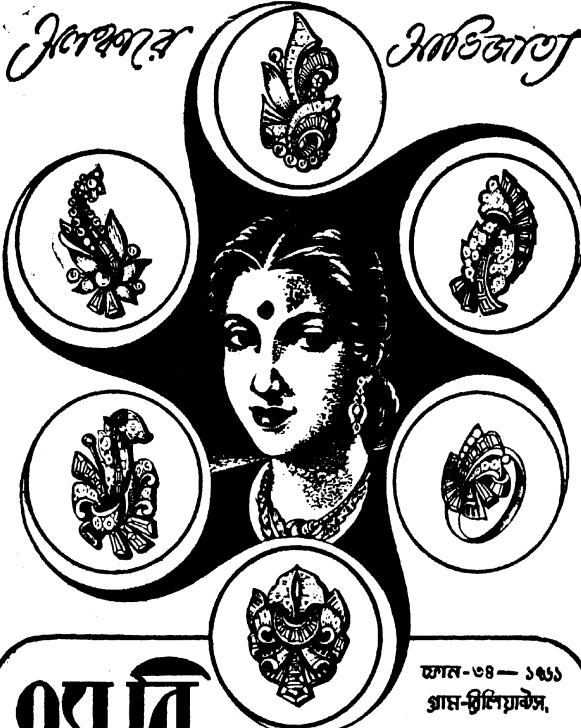
শ্রীনগর হইতে পাঁচ মাইল ব্যবধানে চশমাশাহী, চশমাশাহী হইতে নিশাতবাগের দূরত্ব আড়াই মাইল।

ডাল হ্রদের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে নিশাতবাগ হইতে দুই মাইল দূরে শালামারবাগ (প্রণয়-নিকেতন)। উদ্যানের মাঝখান দিয়া প্রবাহিত একটি খাল, ইহাকে ডাল হ্রদের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে।

ডাল হ্রদের পূর্ব্বদিকে, শ্রীনগর হইতে ছয় মাইল দূরে নাসিমবাগ, সেখানে অনেকগুলি পুরনো চিনার গাছের সারি স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ডাল গেটের নিকটে বিখ্যাত চিনার-বাগ।

আসাম এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে নূতন রেললাইন স্থাপন সম্পর্কিত বিবৃতি

গত ৬ই এবং ৭ই মার্চ নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত "দি ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি"র বার্ষিক সাধারণ সভায় বি. সি. ঘোষ যে বিবৃতিটি উপস্থাপিত করেন তাহার সারাংশ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে:

ভারতের চায়ের শতকরা আশী ভাগেরও অধিক উৎপন্ন হয় উত্তরবঙ্গ এবং আসামে। ভারতের পাটেরও শতকরা আশী ভাগ পশ্চিম-বঙ্গের উত্তর অঞ্চলের জেলাসমূহে এবং আসাম-রাজ্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দেশবিভাগের পূর্ব্বে একটি ব্রডগেজ রেললাইনের দ্বারা কলিকাতার সহিত উত্তর-বঙ্গ ও আসামের যোগাযোগ রক্ষা হইত।

ইহার মারফতে মোট উৎপন্ন চা এবং পাটের শতকরা ষাট ভাগ চালান আসিত এবং বাকী চল্লিশ ভাগ ষ্টীমার দ্বারা বাহিত হইত।

কিন্তু দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার উপরকার হার্ডিঞ্জ ব্রিজ উক্ত ব্রডগেজ লাইনের বৃহত্তর অংশ সহ পাকিস্থানের নিকট হস্তান্তরিত হইল। ইহার দরুন ভারতরাষ্ট্রের পাট এবং চা-শিল্পের পরিবহন-ব্যবস্থায় একটা বড় সমস্যা দেখা দিল। এই সমস্যার সমাধানকল্পে প্রশংসনীয় দ্রুততার সঙ্গে আসাম রেললিঙ্ক নির্মিত হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের উপরকার পূর্ব্বতন ব্রডগেজ লাইনের তুলনায় আসাম রেললিঙ্কের পরিবহন-ক্ষমতা অত্যন্ত কম। আসাম হইতে প্রতি বৎসর ষাট লক্ষ মণ চা এবং ষাট লক্ষ মণ পাট কলিকাতায় আমদানী হয়, আর কেবলমাত্র চা-শিল্পের জন্যই উত্তরবঙ্গ এবং আসামে কয়লা, সিমেন্ট, লোহা ইস্পাত ইত্যাদি নানা দ্রব্য চালান যায় ২,২০,০০০ টন। ইহার মধ্যে আসাম রেললিঙ্কের দ্বারা শতকরা কুড়ি ভাগের অধিক পরিবাহিত হয় না। বাকী আশী ভাগের জন্য পাকিস্থানের অন্তর্গত জলপথে যাতায়াতকারী বিদেশী ষ্টীমার কোম্পানির জলযানসমূহের উপর ভারতরাষ্ট্রকে নির্ভর করিতে হয়। ভারতের দুইটি প্রধান শিল্প—চা ও পাটের আন্তঃ-প্রাদেশিক পরিবহন-ব্যবস্থায় মোটা অংশ থাকায় বৈদেশিক ষ্টীমার কোম্পানীগুলি বৎসরে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা মাশুল আদায় করিতেছে। বৈদেশিক কোম্পানীগুলির এই লাভের পথ বন্ধ করিতে হইলে লিঙ্কের পরিবহন-ক্ষমতা প্রভূত পরিমাণে বাড়াইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত নির্দ্দেশগুলি গ্রহণযোগ্য—

১। আসামের ধুবড়ী হইতে জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুর-দুয়ার পর্য্যন্ত মিটার গেজ যুগ্ম লাইন স্থাপন করিতে হইবে।

২। আলিপুর দুয়ার হইতে এই যুগ্ম লাইন দুইটি শাখায় বিভক্ত হইবে। অর্থাৎ শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত প্রসারিত, চালু আসাম রেললিঙ্ক হইবে একটি শাখা এবং আর একটি নূতন কর্ড লাইন জলপাইগুড়ি জেলার ফালাকাটা, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি ও দোমোহানী হইয়া সরাসরি পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া যাইবে। তার পর পাহাড়-পুরের নিকট তিস্তা অতিক্রম করিয়া বেলাকোবা বা শিলিগুড়িতে চালু রেললাইনের সহিত গিয়া মিশিবে। সেখান হইতে আবার যুগ্ম লাইনরূপে কাটিহার হইয়া মণিহারীঘাট পর্য্যন্ত চলিয়া যাইবে।

নরসিংহদাস বাংলা পুরস্কার, ১৯৫৩

কয়েক বৎসর হইল কলিকাতার শ্রীনরসিংহদাস আগরওয়ালার প্রদত্ত অর্থে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের মারফতে, বিজ্ঞান এবং সাহিত্য বিষয়ে বাংলা পুস্তক-প্রণেতা এবং থীসিসের লেখকদের উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে "নরসিংহদাস পুরস্কার" নামে একটি বাংলা পুরস্কার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ১০০০৲

মূল্যের এই পুরস্কার পর্য্যায়ক্রমে সাহিত্য এবং বিজ্ঞানবিষয়ক রচনার জন্ম প্রদত্ত হইয়া থাকে। ১৯৫৩ সনের পুরস্কার বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনার জন্ম দেওয়া হইবে।

যে বৎসরের জন্ম পুরস্কার ঘোষিত হয়, সেই বৎসরে প্রকাশিত রচনাসমূহের মধ্যে যে লেখকের রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাকেই পুরস্কার দেওয়া হইবে। বাংলাভাষায় বৈজ্ঞানিক পুস্তকের লেখক, প্রকাশক এবং লেখকের অনুরাগীদের অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন ১৯৫৩ সনের ৩০শে জুনের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থসমূহের প্রত্যেকটির আটখানি কপি, ১৯৫৪ সনের ৩১শে আগষ্টের পূর্ব্বে কমিটির বিবেচনার্থ পাঠাইয়া দেন। পুস্তকাদি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার টি. পি. এস. আইয়ারের নিকট, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী-৮, এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

প্রবাসী বাঙালী ছাত্রের কৃতিত্ব

লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী প্রখ্যাতনামা ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীসুধীন্দ্রনাথ কানুনগো এই বৎসর লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। শ্রীসুধীন্দ্রনাথের দুই অগ্রজ, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ কানুনগো (অধ্যাপক বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়) এবং শ্রীনরেন্দ্রনাথ কানুনগোও

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ কানুনগো

(অধ্যাপক, আগ্রা সেণ্টজনস কলেজ) লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদ্

বিগত ৩১শে জুলাই কলিকাতার রাজভবনে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদের সমাবর্ত্তন উৎসবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে সুযোগ্য পরিচালনার গুণে বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদ্ যে প্রকার উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। তিনি বলেন, পরিষদের পরীক্ষার্থী ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া তিন হাজার হইতে পাঁচ হাজারে দাঁড়াইয়াছে। ভারতের সর্ব্বত্র পরিষদের পরীক্ষা-কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়িতেছে। পরিষদের সভাপতি, বিচারপতি ডক্টর শ্রীবিজনকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, পরিষদের বাসভবন বর্ত্তমানে কলিকাতার অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন অঞ্চলে অবস্থিত। বৃদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীকে মাসিক এক শত টাকা হারে বার্দ্ধক্য-বৃত্তি প্রদানের কথা উল্লেখপূর্ব্বক তিনি বলেন, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বঙ্গীয় সরকার প্রতিশ্রুতিসত্ত্বেও এতাবৎকাল এই বৃত্তি প্রদান করেন নাই। তিনি শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি কথা বলেন। পরিষদের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বলেন, সংস্কৃত-সাহিত্যপুষ্ট এই বঙ্গদেশই সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উপযুক্ত স্থল। বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ দেওয়া কঠিন নহে। শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু মহাশয় বলেন, তাঁর আন্তরিক অভিলাষ যেন বঙ্গদেশে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় অচিরেই স্থাপিত হয়।
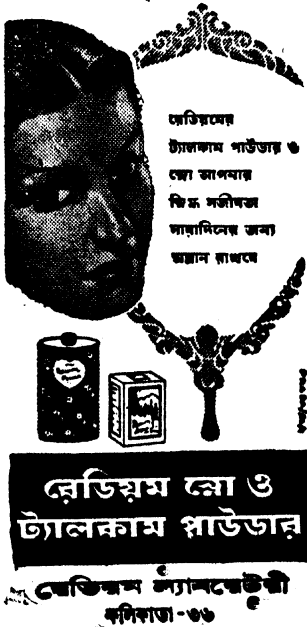
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

দশহরা শোভাযাত্রা, মহীশূর

চেন্নাকেশব মন্দির, বেলুড়

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৪শ ভাগ ১ম খণ্ড | আশ্বিন, ১৩৬১ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

আর্ত্তত্রাণ

বন্যা-প্লাবন বাঙালীর কাছে কিছু নূতন নহে। নদীমাতৃক অঞ্চলের ত কথাই নাই, উত্তরবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গেও বন্যা-প্লাবন প্রায় প্রত্যেক জেলায়ই ঘটে, কোথাও কম কোথাও-বা বেশী। দামোদর, কাঁসাই, তিস্তা, আত্রাই সব কয়টি নদ-নদীই এ বিষয়ে কুখ্যাত, পদ্মার ভাঙ্গন ত আছেই।

সেই সঙ্গে সঙ্গে বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের আর্ত্তজনের ত্রাণ ও সহায়তার ব্যাপারেও বাঙালীর একটা খ্যাতি ছিল। বাঙালী স্বেচ্ছাসেবক ও সেবিকার সেবাপরায়ণতা এবং সাহস আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ এ কারণে সারা ভারতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। বাঙালী জনসাধারণও ঐরূপ দৈববিপর্য্যয়ে দুর্দ্দশাগ্রস্তের সেবা ও সাহায্যের জন্য মুক্তহস্তে দান বহুদিন যাবৎ করিয়া আসিতেছে।

এবারকার উত্তরবঙ্গ, বিহার ও আসামের বন্যা প্রলয়তুল্য ভয়ানক। আমাদের লিখিত ইতিহাসে এইরূপ প্রচণ্ড সর্ব্বগ্রাসী প্লাবনের প্রায় কোনও ইতিবৃত্ত নাই। প্রকৃতপক্ষে ঐ কারণেই আমরা এই বন্যার ধ্বংসলীলা সম্যকরূপে অনুভব করিতে পারিতেছি না।

পূর্ব্ব পাকিস্থানে ত স্থানীয় সরকার বন্যার ফলে অভিভূত হইয়া অসামর্থ্য ও একান্ত অসহায় অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া মার্কিন সরকারের নিকট ব্যাপক ও সর্ব্বতোমুখী সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছেন।

আমাদেরও বন্যার ক্ষতি অতি ভয়ঙ্কর, যদিও তাহার প্রতিকার আমাদের সামর্থ্যের অতীত নহে। কিন্তু সমগ্র দেশ ও সকল জাতি যদি অবহিত হইয়া প্রতিকারের চেষ্টা করে তবেই তাহা যথাযথ ও সম্পূর্ণ হইতে পারে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এখনও দেশে এ বিষয়ে যে কোন সাড়া পড়িয়াছে তাহা বুঝা যায় না। বরং বোম্বাইয়ের জনসাধারণ কিছু জাগ্রত হইয়াছে। হয়ত আগেকার মত ডাক দিবার লোক নাই, হয়ত-বা লোকের মনে আগেকার মত দরদ জাগে না।

শুধু গলাবাজী করিয়া সরকারকে গালি দিয়াই কি আমাদের সকল কর্ত্তব্য শেষ ও সকল দুঃখের অবসান হইবে? আর্ত্তত্রাণে কি আমাদের সকলেরই দায়িত্ব নাই?

ভূমি সংরক্ষণ ও বন্যা নিবারণ

এবারকার বিধ্বংসকারী বন্যার রূপ দেখিয়া মনে হয় যে, ভারতীয় নদী পরিকল্পনাসমূহের যোগ ও পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। বন্যার সঙ্গে ভূমিক্ষয়ের (Soil erosion) ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তীরহীন ভ্রাম্যমাণ নদী ভারতের একটি প্রধান সমস্যা। চীনদেশে অবশ্য তীরহীন ভ্রাম্যমাণ নদীর ধ্বংসলীলা অত্যন্ত ব্যাপক ছিল; মাও-সে-তুং সরকার তাহা কতকাংশে নিবারণ করিয়াছেন। পদ্মা ও কোশী নদীই ছিল ভারতের নামকরা তীরহীন ভ্রাম্যমাণ নদী, এবারে তাহার সঙ্গে যোগ দিয়াছে ব্রহ্মপুত্র। বন্যার কারণ প্রধানতঃ দুইটি—ভূমিক্ষয় ও কৃত্রিম পাড় সৃষ্টি। ভূমিক্ষয় হয় প্রকৃতির দ্বারা এবং মানুষের দ্বারা; প্রাকৃতিক ভূমিক্ষয় হয় বন্যা বৃষ্টি এবং বাতাসের দ্বারা, আর মানুষ যখন তাহার কুঠারের যথেচ্ছাচার ব্যবহারে বৃক্ষ সকল কাটিয়া ফেলে তখন ভূমির উপরিভাগ আলগা হইয়া পড়ে, ফলে বর্ষাকালে এই সকল মাটি ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং নদীর প্লাবন ব্যাপক হয়। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে আসাম প্রদেশ ও দার্জ্জিলিং এলাকার বৃক্ষসকল ব্যাপক ভাবে উৎখাত করা হইয়াছে এবং হইতেছে, ফলে কয়েক বৎসর ধরিয়া এই সকল এলাকায় বর্ষাকালে পাহাড় ধ্বসিয়া পড়িতেছে ও ব্যাপক বন্যা হইতেছে। প্রত্যেক দেশের অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ (অর্থাৎ মোট জমির শতকরা ২৫ ভাগ) ভূমি বনসমাচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন। ভারতবর্ষে মোট ভূমির শতকরা ১৪ ১৫ ভাগ বনভূমি, অর্থাৎ প্রাকৃতিক প্রয়োজনের অনেক কম।

কোশী নদীর কৃত্রিম পাড়বাঁধ উহার বন্যার জন্য বহুলাংশে দায়ী। বিহারের ভূতপূর্ব্ব প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন জি, এফ, হল বলিয়াছেন যে, উত্তর-বিহারের পক্ষে বন্যা শুধু অবশ্যম্ভাবী নয়, প্রয়োজনীয়ও বটে। তবে কৃত্রিম পাড়বাঁধ ও বন্যাকে বিধ্বংসকারী করিয়া তুলিতে পারে। আমেরিকার টেনেসী নদী, মিসিসিপি নদী ও চীন দেশের ইয়াংসি নদীতে বাঁধ দেওয়ার ফলে বন্যায় অনেক ক্ষতি হইয়াছে। এখন বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, বন্যার সময় নদীর প্লাবন যে পলিমাটী বহন করিয়া আনে তাহার দ্বারাই প্রাকৃতিক বাঁধ সৃষ্টি হয় যাহা ভবিষ্যতে কূলপ্লাবী বন্যাকে সংযত রাখে। কিন্তু কৃত্রিম বাঁধ সৃষ্টির ফলে বন্যাবাহিত পলিমাটি নদীবক্ষেই থাকিয়া যায় এবং তাহার জন্য নদীগর্ভগুলি ক্রমশঃ ভরাট হইয়া আসে ও উচ্চ হইয়া

উঠে। বন্যার যখন ঢল নামে তখন অগভীর নদীবক্ষ সমস্ত জল ধরিয়া রাখিতে পারে না, ফলে নদীর দুই কুল প্লাবিত হইয়া নদীর জল দেশ ভাসাইয়া দেয়। প্রাকৃতিক ভাবেই পলিমাটিকে বাঁধ-গঠন করিতে দেওয়া উচিত এবং সেই সঙ্গে ভূমি-সংরক্ষণের জন্য বন-ভূমির বিস্তার অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

যেখানে দেশরক্ষার জন্য বাঁধ দেওয়া অত্যাবশ্যক, সেখানে বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষার পরে বাঁধ ও পাড়বাঁধ দেওয়া উচিত। শুধু কৃত্রিম পাড়বাঁধ বাঁধিলে উপকার হওয়ার সম্ভাবনা কম।

কেন্দ্রে এবং পশ্চিমবঙ্গে বন্যা নিবারণী বোর্ড গঠিত হইয়াছে। কিন্তু রাজধানীতে বসিয়া দালান-কোঠার অভ্যন্তরে বন্যা নিবারণের জল্পনা-কল্পনা যেন বনমহোৎসবের প্রহসনে পরিণত না হয়। আশু কার্য্যকরী পন্থা সকল অবিলম্বে গ্রহণ করা উচিত।

এবারের বন্যা অবশ্য অশ্রুতপূর্ব্ব ভয়ানক প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়। তিব্বত, ভুটান ইত্যাদি হিমালয় অঞ্চলে ইহার আরম্ভ ও পূর্ব্ব-হিমালয়ের পাদদেশে ইহার তাণ্ডবলীলার রুদ্ররূপের প্রকাশ। বিহার, আসাম, উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের জীবিত কোন লোকে স্মৃতিতে এরূপ প্লাবনের কথা নাই। সুতরাং এরূপ দুর্ঘটনা প্রতি বৎসর হইবে না আশা করা যায়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উহার প্রতি-কারের জন্য যে ব্যবস্থার প্রয়োজন তাহা উক্ত অবকাশের মধ্যেই হওয়া আবশ্যক।

লোকসভায় বন্যার আলোচনার বৃত্তান্ত সংবাদপত্রে এইভাবে দেওয়া হয়:

"৩রা সেপ্টেম্বর—আজ লোকসভায় সেচ ও পরিকল্পনাসচিব শ্রীগুলজারিলাল নন্দ বন্যা-পরিস্থিতি এবং উহার প্রতিকারের জন্য সরকারী ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ পেশ করেন, তাহাতে এই বৎসরের বন্যায় বিপুল ক্ষতি, ধনপ্রাণহানি এবং জনসাধারণের দুঃখ-দুর্ভোগের ভয়াবহ একটি চিত্রই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সাম্প্রতিক কালের মধ্যে এইরূপ বন্যা আর হয় নাই।

শ্রীনন্দ বলেন যে, দেশের এবং জনসাধারণের সামর্থ্য ও সম্পদ যদি সার্থকভাবে নিয়োজিত করা সম্ভব হয়, তবেই স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থার দ্বারা ভারতের বন্যা-সমস্যার সমাধান সম্ভব। তিনি ঘোষণা করেন যে, প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে একটি কেন্দ্রীয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এবং আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর-বিহার ও উত্তরপ্রদেশের জন্য একটি করিয়া রাজ্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠিত হইবে।

শ্রীনন্দ বলেন—বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও উত্তরপ্রদেশের বন্যার তাণ্ডবে দুই শত সাতচল্লিশ জনের জীবনহানি ঘটিয়াছে এবং ২৫ হাজার ৬ শত ৫০ বর্গমাইল এলাকা ও ৯৫ লক্ষ লোক এই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ৭ হাজার ৭ শতেরও অধিক গবাদি পশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ১ শত ৩৭ লক্ষ একর জমির যে ফসল নষ্ট হইয়াছে উহার আনুমানিক মূল্য ৪০ কোটি টাকা। বহু-সংখ্যক গৃহ ধ্বসিয়া গিয়াছে। বহু মূল্যবান জমি ভাঙনের ফলে ও পলি পড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পথঘাট, রেলপথ এবং সেতু ও বাঁধের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। ইহার ফলে যোগাযোগ-ব্যবস্থা এমনভাবে ভাঙিয়া পড়িয়াছে যে, ইতিপূর্ব্বে এইরূপ আর কখনও হয় নাই।

শ্রীনন্দ বলেন যে, দুর্গত এলাকায় অবিলম্বে সর্ব্ববিধ সাহায্য প্রেরণের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। বন্যার্ত্তদের সাহায্যার্থে ৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যে পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ১৯৬ লক্ষ টাকা খয়রাতি সাহায্য এবং ৩২১ লক্ষ টাকা কৃষি-ঋণের জন্য দেওয়া হইয়াছে। রাজ্য সরকারগুলির এই দায়িত্বের অংশ গ্রহণে কেন্দ্রীয় সরকার সম্মত হইয়াছেন।

শ্রীনন্দ বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, অতীতেও বন্যা হইয়াছে কিন্তু এইরূপ ব্যাপক ও ভয়াবহ বন্যা ইতিপূর্ব্বে কখনও হয় নাই। এই বন্যা প্রতিরোধের জন্য যথাযথভাবে কোন ব্যাপক চেষ্টা হয় নাই। জলবিজ্ঞান সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে এই অবাঞ্ছিত অবহেলা দেখা গিয়াছে। অথচ এই তথ্য ভিন্ন নির্ভরযোগ্য কোন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব নহে। অবশ্য এই ত্রুটি সং-শোধনের জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। তবে এখনও বহু কাজ করিবার রহিয়াছে।

শ্রীনন্দ বলেন—বন্যা সম্পর্কে সরকার মৌলিক তথ্য সংগ্রহ ও আবশ্যক তদন্তের কাজকে অগ্রাধিকার দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বন্যা নিয়ন্ত্রণের সমস্যা তিন পর্য্যায়ে সমাধানের চেষ্টা করা হইবে—(১) নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত, ধরুন দুই বৎসরের জন্য আশু সাহায্য দান, (২) স্বল্পমেয়াদী, ধরুন ৭ বৎসরের জন্য এবং (৩) তৃতীয় পর্য্যায়ে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা। জল ধরিয়া রাখার জন্য আধার নির্ম্মাণ ও বিভিন্ন পথে জল চালান দেওয়া বন্যা-নিয়ন্ত্রণের প্রকৃষ্ট ব্যবস্থাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশের তিনটি বিধ্বংসী নদী দামোদর, মহানদী ও কোশীর বহুমুখী উন্নতি পরি-কল্পনার কাজ শেষ হইবার পর বন্যার তাণ্ডব হইতে এক বিরাট এলাকা রক্ষা পাইবে।

তিনি আরও বলেন যে, শতদ্রুর উপর ভাকরা বাঁধ, রিহান্দ বাঁধ এবং চম্বলে গান্ধীনগর বাঁধ বহুমুখী উন্নতি পরিকল্পনার পরিচায়ক।

শ্রীনন্দের বিবৃতিতে আমরা ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা ইত্যাদির নাম পাই নাই। সেগুলিরও ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর বিবৃতিতে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের নাম আসিয়াছে। অন্য দিকেও তাঁহার কথায় কতকটা আশার আভাস পাওয়া যায়।

তাঁহার বিবৃতি এইরূপে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়:

"নয়াদিল্লী, ৭ই সেপ্টেম্বর—দেশে অভূতপূর্ব্ব বন্যার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু জনগণকে তাহার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হইয়া শান্ত এবং দৃঢ়চিত্তে এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে তিন দিন ব্যাপী সফরের পর এক বিবৃতিতে শ্রীনেহরু বলিয়াছেন যে, আগামী বর্ষাকালে যাহাতে এইরূপ বিরাট ক্ষতি না হয় সেজন্য

অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে, গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র এই দুইটি নদীর জন্য দুইটি প্রধান নদী-উপত্যকা কমিশন গঠন করার ব্যবস্থা হইতেছে। ইহা ছাড়া এই দুইটি কমিশনের কার্য্যের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান এবং কমিশনের কার্য্যাবলীর তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করা হইতেছে।

শ্রীনেহরু এই বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, এই দুইটি কমিশন অতীত ও বর্ত্তমান সম্পর্কে যথাসম্ভব তথ্য সংগ্রহ করিবেন। বন্যার ফলে ভূমির যে উন্নতি সাধন হয় তাহা বন্ধ না করিয়া অথবা প্রাকৃতিক শক্তিগুলির স্বাভাবিক কার্য্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়া এই কমিশন ভবিষ্যতে বন্যার ফলে যাহাতে বিরাট ধ্বংস ও জনগণের দুর্ভোগ বন্ধ হয় সেই উদ্দেশ্যে প্রধান পরিকল্পনাগুলি প্রণয়ন করিবেন। এইগুলি হইবে সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থা। ইহা ছাড়া, আগামী বর্ষাকালে যাহাতে বিরাট ধ্বংস না হইতে পারে সেজন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ আগামী আট নয় মাসের মধ্যে এ বিষয়ে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেই হইবে। এই ব্যবস্থা অবশ্য আংশিক হইবে, তবে ইহা বিরাট ক্ষতি বন্ধে সাহায্য করিবে। আগামী আট-নয় মাসের মধ্যে যে ব্যবস্থাগুলি গৃহীত হইবে, যে প্রধান পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যবস্থা হইতেছে সেইগুলি তাহারই অংশ হইবে। এই উদ্দেশ্যে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।

বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের পূর্ণ সহযোগিতার জন্য আবেদন জানাইয়া প্রধানমন্ত্রী এই বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, উপযুক্ত ইঞ্জিনীয়ারদের পরামর্শ, অধিকতর তথ্য এবং সরকার ও জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অনেক কিছু করা যে সম্ভব হইবে সে বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, বন্যার্ত্তদের সাহায্যের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল উপায় হইতেছে হয় সাহায্য তহবিলে অর্থদান অথবা কাপড় কিংবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রেরণ।"

এখন ঘরের কথায় আসা যাউক। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় উত্তরবঙ্গে প্লাবনের ধ্বংসলীলা সম্পর্কে যে আলোচনা হয় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ :

"শ্রীআনন্দগোপাল মুখার্জ্জি (কংগ্রেস) তাঁহার প্রস্তাবে উত্তরবঙ্গে বন্যার ফলে যে বিরাট ক্ষতি হইয়াছে তজ্জন্য সরকারকে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন : (১) সরকার অবিলম্বে দুর্গত এলাকায় নানাবিধ রিলিফ, অর্থসাহায্য ও ঋণ দিবার এবং বিধ্বস্ত অঞ্চলে যাতায়াত ব্যবস্থা পুনঃসংস্থাপনের জন্য উপায় অবলম্বন করুন; (২) রিলিফ ও পুনর্ব্বাসনের সমস্ত ব্যয় বহনের নিমিত্ত ভারত সরকারের নিকট সাহায্য ও ঋণের জন্য আবেদন করুন এবং (৩) ভারত সরকার যাহাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় বন্যানিরোধ সংক্রান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তজ্জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারের নিকট তদ্বির করুন।

প্রস্তাবটি উত্থাপন প্রসঙ্গে শ্রীমুখার্জ্জি বন্যার ধ্বংসলীলার বিশদ বিবরণ প্রদান করিয়া বলেন যে, এই ধরণের বন্যা পূর্ব্বে আর দেখা যায় নাই। উহাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা হইয়াছে ও আনুমানিক ২০ কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে এবং হাজার হাজার বিঘা জমির ক্ষতি হইয়াছে। সুতরাং দুর্গত ব্যক্তিদের অবিলম্বে রিলিফ ও অন্যান্য সাহায্যাদি এবং ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। তিনি অভিযোগ করেন যে, বিধ্বস্ত অঞ্চলে যাতায়াত-ব্যবস্থা চালু করার জন্য যেরূপ তৎপরতা দরকার রেল-কর্ত্তৃপক্ষ নাকি সেইরূপ তৎপরতার সহিত কাজ করিতেছেন না। তাঁহার মতে রেল-কর্ত্তৃপক্ষের এই ব্যাপারে আরও তৎপর হওয়া দরকার।

শ্রীআনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক উত্থাপিত এবং শ্রীশচীন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সংশোধিত বেসরকারী প্রস্তাবটি সমর্থন করিতে উঠিয়া খাদ্য ও সাহায্য মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন বলেন যে, উত্তরবঙ্গে বন্যার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার প্রতি দেশের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যেই শ্রীমুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন।

সরকারী সাহায্য বন্যাবিধ্বস্ত এলাকাসমূহে যথারীতি পৌঁছায় নাই বলিয়া বিরোধীপক্ষ যে সমালোচনা করেন, তাহার উত্তরে শ্রীসেন বলেন যে, বন্যার ফলে যখন উত্তরবঙ্গে বহু স্থান বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তখন সম্ভবতঃ এই সকল বিচ্ছিন্ন এলাকায় বার ঘণ্টা, চব্বিশ ঘণ্টা অথবা কয়েক দিন পর্য্যন্ত সরকারী সাহায্য পৌঁছাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই। তাহার কারণ, দ্বিতীয় বারের বন্যার ফলে রেল-ব্যবস্থা পর্য্যন্ত ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। তাহাতে বহু সরকারী কর্ম্মচারীও আটকাইয়া পড়েন। কিন্তু তিনি সভার সদস্যগণকে এই আশ্বাস দিতে পারেন যে, বর্ত্তমানে সব জায়গায় সরকারী সাহায্য পৌঁছিয়াছে এবং নানা অসুবিধা সত্ত্বেও যেভাবে সরকারী কর্ম্মচারী, দমকলকর্ম্মী, কংগ্রেস ও রেডক্রস কর্ম্মীরা উত্তর-বঙ্গের বন্যাবিধ্বস্ত এলাকাসমূহে সরকারী সাহায্য পৌঁছাইয়া দিয়াছেন শ্রীসেন তাহার সপ্রশংস উল্লেখ করেন। কারণ রাস্তার অসংখ্য জায়গা ভাঙা অবস্থায় রহিয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত নয়টি বৃহৎ সেতু এবং পঁয়তাল্লিশটি ছোটখাট সেতুর মেরামতির কাজ বাকি রহিয়াছে।

বন্যার ফলে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় বহু চাষের জমিতে বালি স্তূপীকৃত হওয়ার ফলে চাষে যে বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করার পর তিনি বলেন যে, মালদহ জেলায় কিন্তু এই অবস্থা নহে; চাষের জমিতে পলিমাটি পড়ার ফলে জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সেজন্য সেখানে বেশী করিয়া কৃষিঋণ দেওয়া হইয়াছে। সরকার এবং সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় রিলিফের কাজ চালাইবার যে প্রস্তাবটি করা হয়, সে সম্পর্কে সাহায্যমন্ত্রী বলেন যে, সরকারী পরিচালনাধীনে থাকাই সঙ্গত, কারণ কোন সংস্থাকে এই কাজ করিতে দেওয়া হইলে সকলকেই ইহার সুযোগ দেওয়া উচিত এবং রাজনীতি, সমাজসেবা, ধর্ম্মীয় প্রভৃতি নানা দিক হইতে এত অসংখ্য প্রতিষ্ঠান আছে যে, সকলকে এই সুযোগ দেওয়া একান্ত অসম্ভব। তবে, কেন্দ্রীয় এক উপদেষ্টা কমিটি গঠনের কথা সরকার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

বন্যার্ত্তদের সাহায্যের জন্য সরকারের পরিকল্পনা সম্পর্কে শ্রীসেন বলেন যে, অক্টোবরের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত প্রায় নয় লক্ষ লোককে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইবে এবং ছিয়াত্তর লক্ষ আশী হাজার টাকা ব্যয় হইবে। ইহার পর নিতান্ত শিশু ও অসুস্থ লোক ছাড়া সকলকে কিছু কিছু ষ্টেট রিলিফের কাজ দেওয়া হইবে। শিশুদের দুধ ও অন্যান্য খাদ্যের জন্য সাত লক্ষ আটষট্টি হাজার টাকা ব্যয় হইবে; বন্যার ফলে যাঁহাদের গৃহাদি নষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য এক কোটি বাইশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে; টিউবওয়েল ও ইঁদারার জন্য ছয় লক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা ব্যয় করা হইবে। কোচবিহারে এক শত টিউবওয়েল নির্ম্মাণের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। অক্টোবরের শেষের দিকে যে ষ্টেট রিলিফ কাজ আরম্ভ হইবে, সে বাবদ সরকার দেড় কোটি টাকা ব্যয় করিবেন। ছোট ছোট সেচের মেরামতের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে, গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য দেড় লক্ষ টাকা, বীজের জন্য ছয় লক্ষ টাকা, রোগের প্রতিষেধক বাবদ এগার লক্ষ সাতাশ হাজার টাকা এবং মিউনিসিপালিটি ও জেলা বোর্ডের রাস্তা মেরামত বাবদ পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। উত্তরবঙ্গের শহরগুলিকে বাঁচাইবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে যে তিন কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ টাকা ঋণ চাওয়া হইয়াছে, তিনি তাহার কথাও বলেন। তিনি জানান যে, বন্যার্ত্তদের সাহায্যের জন্য সরকার প্রায় নয় কোটি একান্ন লক্ষ টাকার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সরকারী বিভাগে দুর্নীতি সম্পর্কে যে সকল অভিযোগ করা হয়, তিনি তাহা অস্বীকার করেন।"

ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদের দাবি

ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারীদের বেতন সম্বন্ধে জিজিভাই কমিটি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাহা ভারত সরকার কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তনের ফলে ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারীদের মধ্যে ভারতব্যাপী বিক্ষোভ সুরু হইয়াছে। শ্রমমন্ত্রী শ্রীগিরির পদত্যাগে ব্যাপারটি আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে, ফলে গবর্মেণ্ট বিব্রত হইয়াছেন এবং আইন-পরিষদের বিপক্ষদল এক সঙ্গে জোট বাঁধিয়াছেন। ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদের প্রতি দরদের চেয়ে ভবিষ্যৎ নির্ব্বাচনে ভোট সংগ্রহের সংস্থানই তাঁহাদের এ বিষয়ে প্রধান উদ্দেশ্য। শ্রীগিরির পদত্যাগ সত্যই আকস্মিক এবং বিস্ময়কর। তিনি প্রকৃতই ট্রেড ইউনিয়ন নীতিতে বিশ্বাসবান্, কারণ তিনি সালিশী এবং মিটমাটে আস্থা রাখেন। কিন্তু যে আদর্শ এবং নীতি তিনি এতদিন পর্য্যন্ত প্রচার করিয়া আসিরাছেন, তাঁহার পদত্যাগ উহার বিরুদ্ধতাই করিয়াছে।

একটি সাব-কমিটির অনুমোদন অনুসারে ভারতীয় মন্ত্রী-পরিষদ জিজিভাই কমিটির সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। ব্যাঙ্কের মুনাফা বৃদ্ধি, আমানত বৃদ্ধি ও কার্য্যক্ষেত্র বৃদ্ধি হইতেছে ব্যাঙ্কের শ্রীবৃদ্ধির পরিচায়ক। ১৯৪৮ সন হইতে ১৯৫৩ সন পর্য্যন্ত ভারতীয় ব্যাঙ্কের মুনাফা ক্রমশঃই হ্রাস পাইয়াছে। যদিও ব্যাঙ্কসমূহের মোট আয় ইদানীং বৃদ্ধি পাইয়াছে তথাপি তাহাদের মোট মুনাফার পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪৮ সনে ভারতীয় সিডিউল্ড ব্যাঙ্কসমূহের মোট আয় ছিল ২৯.৭৩ কোটি টাকা, ১৯৫২ সনে ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ৩৪.২৮ কোটি টাকায় এবং ১৯৫৩ সনে ৩৪.৩৮ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পায়। মোট মুনাফার পরিমাণ ৮.০৭ কোটি টাকা হইতে ৬.৫১ কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছে। এই মুনাফার পরিমাণ হইতে আয়কর এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ আবার বাদ যাইবে। ক্ষয়িষ্ণু মুনাফার জন্য দুইটি কারণ দায়ী। প্রথমতঃ, আমানতের উপর সুদের হার বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয়তঃ, সংস্থান খরচ (establishment expenses) বৃদ্ধি। আমানতের উপর সুদের পরিমাণ ৬.৯৮ কোটি টাকা হইতে ৮.৯০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সংস্থান খরচ পূর্ব্বেকার সালিশী সিদ্ধান্ত অনুসারে ৯.৫০ কোটি টাকা হইতে ১৩.২৫ কোটি টাকায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারীদের প্রতিনিধিরা ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করিতেছেন যে, ব্যাঙ্কের কতিপয় উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী অনেক টাকা মাহিনা পায় এবং তাহার জন্যই সাধারণ সংস্থান খরচ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইঁহারা যদি বিনা বেতনেও কাজ করিতেন তাহা হইলেও সমস্যার সমাধান হইত না। আর এই সকল কর্ম্মচারী যেমন অধিক মাহিনা পান তেমনি তাঁহাদের অধিক হারে করও দিতে হয়। নিম্ন মাহিনার কর্ম্মচারীদেরই ইদানীং অধিক সুবিধা হইয়াছে। ১৯৪৮ সনে ইঁহারা যে মাহিনা পাইতেন বর্ত্তমানে তাহার উপর শতকরা ৪৬ টাকা হিসাবে ইঁহাদের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের আয় শতকরা ২৪ টাকা হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিদেশী এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক ও নন্-সিডিউল্ড ব্যাঙ্কসমূহের মুনাফাও হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪৯ সনে এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের মোট মুনাফা ছিল ৪.৬১ কোটি টাকা, ১৯৫৩ সনে ইহা হ্রাস পাইয়া দাঁড়ায় ২.৬২ কোটি টাকায়। নন্-সিডিউল্ড ব্যাঙ্কসমূহের মোট মুনাফার পরিমাণ ১৯৪৯ সনে ছিল ৪২.৬ লক্ষ টাকা এবং ১৯৫৩ সনে ইহা দাঁড়ায় ৩৩ লক্ষ টাকায়।

দেশে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাওয়ার ফলে সিডিউল্ড ব্যাঙ্কসমূহের আমানত হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪৮ সনে আমানতের মোট পরিমাণ ছিল ১০৪২.১৬ কোটি টাকা এবং ১৯৫৩ সনে ইহা নামিয়া আসে ৯০৫.৮৬ কোটি টাকায়। ব্যাঙ্কসমূহের সংস্থান খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রাম্য এলাকা ও অন্যান্য এলাকায় ইহাদের শাখা বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হইতেছে না, ফলে আয়বৃদ্ধিও যথোচিত হারে হইতেছে না। ১৯৪৮ সনে সিডিউল্ড ব্যাঙ্কসমূহের মোট শাখা ছিল ২৯৬৩; ১৯৫৩ সনে ছিল ২,৬৮৫। নন্-সিডিউল্ড ব্যাঙ্কসমূহের শাখা ১,৭১১টি হইতে ১,২৬৮টিতে হ্রাস পাইয়াছে। এই অবস্থায় কেহই জোর করিয়া বলিতে পারিবেন না যে, ব্যাঙ্কসমূহের খরচ বৃদ্ধি পাইলে তাহাদের সমূহ ক্ষতি হইবে না।

যদি জিজিভাই কমিটির সিদ্ধান্ত হুবহু মানিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে ১২টি ব্যাঙ্ক তাহাদের প্রায় ২৪১টি শাখা বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইবে যাহার ফলে প্রায় ২,৫৪৯ কর্ম্মচারীর চাকরী যাইবে। ইহাতে কাহার মঙ্গল হইবে? কর্ম্মচারীদের? ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারীর এবং

তাঁহাদের সমর্থকেরা ভুলিয়া যান যে ভারতবর্ষ মুখ্যতঃ কৃষি-প্রধান দেশ হওয়ায় এখানে কার্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ।

ভারতবর্ষে অন্যান্য শিল্পের যখন প্রসার হইতেছে, তখন ব্যাঙ্কগুলি সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার প্রধান কারণ তাহাদের সংস্থান খরচ অত্যধিক। ১৯৪৮ হইতে ১৯৫৩ সনের মধ্যে ব্যাঙ্ক-সমূহের সংস্থান খরচ প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যাঙ্কগুলি শেয়ারের উপর সাধারণতঃ শতকরা তিন টাকা হইতে পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত লভ্যাংশ দেয়, ইহা এমন কিছু বেশী নয়। আর শুধু কর্ম্মচারীদের স্বার্থ দেখিলেই চলিবে না, অংশীদার এবং আমানতকারীদের স্বার্থও দেখিতে হইবে। ভারতীয় ২৬টি প্রধান ব্যাঙ্ক যাহাদের আমানতের পরিমাণ পাঁচ কোটি টাকার উপর, তাহাদের কর্ম্মচারীর সংখ্যা মোট ৩০,২৭৭; কিন্তু তাহাদের আমানতকারীর সংখ্যা হইতেছে ২৩,১৯,৩৫৯ এবং অংশীদারদের সংখ্যা হইতেছে ১,১১,৪৬৬। কর্ম্মচারীদের প্রায় ৭৭ ভাগ হইতেছে আমানতকারীর সংখ্যা।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারীরা সরকারী কর্ম্মচারীদের সমান মাহিনা পায় এবং অনেকক্ষেত্রে বেশীও পায়। তবে ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাঁহারা অতি অল্প মাহিনা পান তাঁহাদের মাহিনা অবশ্যই বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইবে এবং যাঁহারা অতি উচ্চ হারে পান তাঁহাদের মাহিনা হ্রাস করিয়া দিতে হইবে। কোন কোন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সাত-আট হাজার টাকা মাহিনা পান—ইহার কিছু হ্রাস করা দরকার। তবে ইহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। গবর্ন্মেণ্ট এ সম্বন্ধে নূতন যে কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন সেই কমিটির কার্য্য-তালিকা ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন যাহাতে এই ব্যাপারটির সম্পূর্ণ সমাধান হয়।

এই ত গেল নিখিল-ভারতের ব্যাঙ্কের কথা। বাঙালীর ব্যাঙ্কের কথা বলা আরও দুঃখকর। প্রথম দিকে লোভী ও দুর্নীতিপরায়ণ পরিচালকের দোষে ত বহু ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া বাঙালী মধ্যবিত্তের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এখন যদি তাহার উপর বাঙালী কর্ম্মচারীর আত্মঘাতী নির্ব্বুদ্ধিতা তাহার সঙ্গে জড়িত হয় তবে বাঙালীর ব্যাঙ্ক বলিতে কিছুই থাকিবে না। ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীর মধ্যে অধিকাংশই বিদ্যা-বুদ্ধি যথেষ্ট রাখেন। হুজুগের মধ্যে পড়িয়া তাঁহারা যেন নিজের পায়ে কুড়ুলের কোপ না মারেন। তাঁহাদের স্থান একমাত্র বাঙালীর ব্যাঙ্কে, মাদ্রাজী, পঞ্জাবী, গুজরাটি ইত্যাদি অন্য শত স্থলে স্থান পাইবে। কেন্দ্রীয় কমিটির নিম্নোক্ত নির্দ্দেশ তাঁহারা যেন অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করেন :

"নাগপুর ৯ই সেপ্টেম্বর—নিঃ ভাঃ ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটি ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারিগণকে আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর দেশের সর্ব্বত্র একদিনের জন্য 'প্রতিবাদ ধর্ম্মঘট' করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন।

কেন্দ্রীয় কমিটির দুই দিনব্যাপী অধিবেশনের শেষে অদ্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, গবর্ন্মেণ্ট যদি ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদের সমস্যা সম্পর্কে পুনরায় বিচার-বিবেচনা না করেন তাহা হইলে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্ম্মঘটের ব্যবস্থা করা হইবে এবং উহা বর্ত্তমান বৎসরের ১৫ই নভেম্বরের মধ্যেই করা হইবে।

কেন্দ্রীয় কমিটির ১৮ জন সদস্যের মধ্যে ১৬ জনই এই জরুরী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা

সম্প্রতি ফিলিপাইন দ্বীপের ম্যানিলা নগরে যে আন্তর্জ্জাতিক গবেষণা ও চুক্তির জন্য জমায়েত হয় সে সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর মতামত নিম্নে উদ্ধৃত সংবাদে পাওয়া যায় :

"৯ই সেপ্টেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা সম্পর্কে ভারতের প্রতিক্রিয়া সরকারীভাবে ব্যাখ্যা করিয়া এই চুক্তিকে 'আন্তর্জাতিক ব্যাপারে জোট বাঁধা' বলিয়া অভিহিত করেন এবং বলেন যে, ইহার ফলে ইন্দোচীনে শান্তি স্থাপন প্রচেষ্টার ক্ষতি হইবে এবং অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পাইবে।"

প্রেস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে জিমখানা ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক ভোজসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি এই মন্তব্য করেন এবং বলেন যে, 'আনজাস', 'নাটো', 'সীটো' জাতীয় গোষ্ঠীগত চুক্তির ফলে অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে—কারণ, ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে যেসব শক্তির স্বার্থ রহিয়াছে তাহারাই এইরূপ চুক্তির ব্যাপারে জোট বাঁধিতেছে। ইহাতে ঔপনিবেশিক আধিপত্যের অধীন দেশগুলির সমূহ ক্ষতি হইতেছে—কারণ এই শক্তিগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রচলিত অবস্থা বহাল রাখার জন্যই আগ্রহান্বিত। ইহার ফলে ঔপনিবেশিক শাসন হইতে মুক্তিলাভের বিঘ্ন ঘটিতেছে। ইহা রাষ্ট্রসঙ্ঘ সনদের বিরোধী। অথচ এইরূপ গোষ্ঠীগত চুক্তির সময় রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহান্ সনদের দোহাই দেওয়া হইতেছে। চিন্তায় এবং কথাবার্তায় 'দুমুখো নীতি' অনুসরণ করা হইতেছে—অর্থাৎ, মুখের কথায় এবং প্রকৃত মনোভাবে কোন সামঞ্জস্য থাকিতেছে না।

গোয়ার ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্য পর্ত্তুগাল 'নাটো'কে অনুরোধ করায় তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন।

পি. টি. আই ও ইউ. পির বিবরণে প্রকাশ, শ্রীনেহরু দঃ পূঃ এশিয়া চুক্তির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ইহাতে শান্তি সুনিশ্চিত না হইয়া বিপন্ন হইবে। এইরূপ চুক্তির সময় কেবল এশিয়ার সমস্যা, এশিয়ার নিরাপত্তা ও এশিয়ার শান্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় না, প্রধানতঃ অ-এশীয়রা মিলিয়া এই সকল ব্যাপারে চুক্তিও করিয়া ফেলেন। ইহা একটা বিসদৃশ ব্যাপার। সমস্বার্থসম্পন্ন দেশগুলির পক্ষে প্রতিরক্ষার ব্যাপারে দল বাঁধা ইতিহাসের স্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়াই ধরা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে আর একটি বিসদৃশ ব্যাপার এই যে, যেসব দেশ যোগ দেয় নাই, তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য এশিয়ার বাহিরের কতকগুলি দেশও দল বাঁধিয়া বসে। ইহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। যেসব দেশ তাঁহাদের আশ্রয় চাহে না তাহাদেরও ইহারা রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর।

শ্রীনেহরু আরও বলেন, ইন্দোচীনে এবং দঃ পূঃ এশিয়ায়

যখন নূতন পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে—জনসাধারণ যখন ক্রমেই বেশী করিয়া শান্তির কথা ভাবিতেছে তখন তাহার বিপরীত একটা কিছু করিয়া বসা আমার নিকট দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিয়াই মনে হয়। আমার আশঙ্কা—এই 'সীটোর' ফলও কার্য্যতঃ এইরূপ হইবে।

আক্রমণ প্রতিরোধ এবং শান্তি বা নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থায় কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু যে ব্যবস্থা করা হইল তাহার ফলে নিরাপত্তার ভাব দৃঢ়তর হইল কি না তাহাই বিচার্য্য। এক্ষেত্রে তাহা হইয়াছে বলিয়া তাঁহার মনে হয় না। আমার মতে ইহার ফলে জনসাধারণের মনে অনিশ্চয়তার ভাব বৃদ্ধি পাইবে।

প্রধানমন্ত্রী 'নাটো'র (উত্তর অতলান্তিক চুক্তি গোষ্ঠীর) উল্লেখ করিয়া বলেন যে, প্রথমে ইহার উদ্দেশ্য ছিল অতলান্তিক গোষ্ঠীকে রক্ষার ব্যবস্থা করা, এখন উহার উদ্দেশ্য সম্প্রসারিত হওয়ায় 'নাটো'র সদস্যদের সাম্রাজ্যিক স্বার্থরক্ষাও ইহার কাজে দাঁড়াইয়াছে। এই সম্পর্কে তিনি গোয়ার ব্যাপারে পর্ত্তুগাল কি ভাবে নাটোকে জড়িত করিতে চাহিয়াছে তাহারও উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, ইহার জন্য ভারতের চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নাই। কিন্তু নাটোর মূল উদ্দেশ্য ক্রমেই যে ভাবে সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছে তাহাতে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন।

মনে এবং মুখে দুই প্রকার ভাব পোষণের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহরু বলেন, এই বিষয়ে পৃথিবীর সংবাদপত্রগুলি কতটা সাহায্য করিতেছে তাহা সভায় উপস্থিত দেশীয় ও বৈদেশিক সংবাদদাতারা যেন ভাবিয়া দেখেন।"

ম্যানিলায় যাহা ঘটিয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নোক্ত সংবাদে পাওয়া যায়। ইহাতে বিশেষ দ্রষ্টব্য—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াস্থিত রাষ্ট্র নহে।

"ম্যানিলা, ৮ই সেপ্টেম্বর—দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় যাবতীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া আটটি রাষ্ট্র অদ্য দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছে।

চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী আটটি রাষ্ট্র হইতেছে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্থান, থাইল্যাণ্ড এবং ফিলিপাইনস। এই আটটি রাষ্ট্র মনে করে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কোন সশস্ত্র আক্রমণ ঘটিলে তাহাদের শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন হইবার আশঙ্কা। উক্ত অঞ্চলে অথবা সংশ্লিষ্ট কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ হইলে আটটি রাষ্ট্র 'তাহাদের সাধারণ বিপদের বিরুদ্ধে' দণ্ডায়মান হইবে বলিয়া চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে।

চারিটি 'কলম্বো' শক্তি—ভারত, ব্রহ্ম, সিংহল এবং ইন্দোনেশিয়া ম্যানিলা অধিবেশনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে এবং এইরূপ চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাবে আপত্তি জানায়। পাকিস্থান সম্মেলনে যোগদান করিলেও চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবে কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ জাফরউল্লা খাঁ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে মিঃ রিচার্ড কেসি চুক্তিপত্রে প্রথম স্বাক্ষর করেন। অতঃপর ফ্রান্স ও পাকিস্থানের পক্ষ হইতে চুক্তিতে স্বাক্ষর করা হয়।

পাকিস্থান এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করায় পূর্ব্ব অথবা পশ্চিম পাকিস্থান আক্রান্ত হইলে চুক্তি অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

চুক্তিবদ্ধ আটটি রাষ্ট্র যে সকল রাষ্ট্রকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে মনোনীত করিবে, সেই সকল রাষ্ট্র আক্রান্ত হইলে সংশ্লিষ্ট সরকারের অনুরোধক্রমে তাহাদের সাহায্য করা হইবে। সম্ভবতঃ ইন্দোচীনের তিনটি রাষ্ট্র—লাওস, কম্বোডিয়া এবং দক্ষিণ ভিয়েৎমিন প্রথম এইরূপ রাষ্ট্রের তালিকাভুক্ত হইবে।

ব্রিটেন চুক্তিতে স্বাক্ষর করায় সকল ব্রিটিশ উপনিবেশ চুক্তি এলাকার অন্তর্ভুক্ত হইবে। সুতরাং ব্রিটিশ বোর্ণিও এবং মালয় চুক্তি সংস্থাভুক্ত হইবে।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া সম্মিলিত প্রতিরক্ষা চুক্তির সহিত একটি 'প্রশান্ত মহাসাগরীয় সনদ' যুক্ত হইয়াছে। এই সনদে চুক্তি এলাকাভুক্ত যে কোন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষা ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রচেষ্টায় সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে।

সশস্ত্র আক্রমণ ব্যতীত অন্য কোন ভাবে চুক্তিবদ্ধ কোন দেশের বিপদাশঙ্কা দেখা দিলে পারস্পরিক পরামর্শের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া চুক্তি অনুযায়ী স্থির হইয়াছে। একটি কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে। এই কাউন্সিলের বৈঠক যে কোন সময়ে হইতে পারিবে।

মার্কিন পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ডালেস বলেন, "এই চুক্তি আমাদের শক্তিশালী করিয়া তুলিতে সাহায্য করিবে।"

চীনা ভাষ্যকারের মন্তব্য

"লণ্ডন, ৬ই সেপ্টেম্বর—অদ্য নয়াচীন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের জনৈক ভাষ্যকার ম্যানিলায় আটটি রাষ্ট্রের সম্মেলনকে 'এশিয়াবাসীদের দাসত্বনিগড়ে' আবদ্ধ করার এবং এশিয়ার শান্তি নষ্ট করার প্রচেষ্টা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খসড়া চুক্তিপত্রে প্রমাণিত হয় যে, তথাকথিত প্রতিরক্ষা সম্মেলনে প্রধানতঃ ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ যোগ দিয়াছে।

চুক্তি স্বাক্ষর হইবার পর পাকিস্থান হইতে একটি অদ্ভুত সংবাদ আসে। তাহাতে বলা হয় যে, পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাফরউল্লা খাঁর উহাতে স্বাক্ষর করার কথা ছিল না। তিনি নিজের বিচারে উহা করিয়াছেন। এইরূপ সংবাদের অর্থ কি আমরা বুঝিতে অক্ষম।

যাহাই হউক, এইরূপ চুক্তির ফলে ভারতের বিপদাপদের সম্ভাবনা বাড়িতে পারে, কিন্তু উহা হইতে সরিয়া থাকায় ভারতীয়দিগের আত্মসম্মান বৃদ্ধি পাইবে।

মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

অনেকপ্রকার জোড়াতালি দিয়া পশ্চিমবাংলার মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ গঠিত হয়। কিছুদিন পরে উহার কার্য্যাবলী সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা চলে। শেষে উহা বাতিল করা হয়। সম্প্রতি বিধান-

সভায় উহার সাময়িক ব্যবস্থা সম্পর্কে যে আলোচনা হয় তাহার শেষ ফল নিম্নের সংবাদে দেওয়া হইল :

"বিরোধীপক্ষের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও মধ্যশিক্ষা (সাময়িক ব্যবস্থা) বিল ১৫ই ভাদ্র বিধানসভায় গৃহীত হইয়াছে। এই বিলের আলোচনায় বুধবার যতটা উন্নত ধরণের বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় সচরাচর তাহা দুর্লভ। বিরোধীপক্ষের যে কয়জন বক্তা এই দিন দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের বলার ভঙ্গীতে যেমন জোর ছিল, তেমনই তথ্য এবং বিন্যাসেও যথেষ্ট যত্নের লক্ষণ দেখা যায়।

যদিও কংগ্রেসপক্ষের শ্রী জে. সি. গুপ্ত সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদকীয় হইতে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়া পর্ষৎ বাতিল করার সপক্ষে জনমতের সমর্থন দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তবু প্রকৃতপক্ষে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ই তাঁহার জোরালো এবং বিরোধীপক্ষের প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষপূর্ণ বক্তৃতার দ্বারা সরকারী সিদ্ধান্তের সপক্ষে দৃঢ়তম সওয়াল পেশ করেন।

তিনি একথা অস্বীকার করেন যে, পর্ষৎ বাতিল করার ব্যাপারে কোনও চক্রান্ত ছিল এবং পর্ষতের সভাপতি তাঁহার নিকট গোপন রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন। পর্ষৎ সভাপতি যে রিপোর্ট শিক্ষামন্ত্রীর নিকট পেশ করেন, সরকারীভাবে তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গত।

সরকার অ-গণতান্ত্রিক কাজ করিয়াছেন, এই সমালোচনার জবাবে তিনি বলেন যে, গণতন্ত্রের বন্যা তিস্তা কিংবা তোর্সা অথবা জলঢাকা নদীর বন্যার চেয়ে আরও খারাপ। কেননা গণতন্ত্রের বন্যায় কেবল বর্তমান দেশবাসী নয়, ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রচুর বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ডাঃ রায় বিশ্বাস করেন যে, সরকার এখন যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের আদর্শ ও উন্নততর শিক্ষার ভূমিকামাত্র এবং শীঘ্রই অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরণের কোনও পদ্ধতি তাঁহারা এই সভার সম্মুখে পেশ করিতে পারিবেন বলিয়াও তিনি আশা করেন।"

ঐরূপ ফল যে হইবে তাহার ইঙ্গিত পূর্ব্বদিনের (১৪ই ভাদ্র) আলোচনাতেই বোঝা যায়।

"বিধানসভায় মঙ্গলবারের বৈঠকে সমস্তক্ষণ আলোচনা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা (সাময়িক ব্যবস্থা) বিলের ধারাওয়ারী আলোচনা মাত্র শেষ হয়।

প্রথম দিন বিরোধীপক্ষের তীব্র সমালোচনার পর মুখ্যমন্ত্রী এই বিলের সমর্থনে প্রধানতম অংশ গ্রহণ করিবেন, ইহা স্পষ্টই বুঝা গিয়াছিল। এই দিন তিনি মধ্যশিক্ষা পর্ষতের কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ অভিযোগের তালিকা পেশ করিয়া বলেন যে, এই প্রতিষ্ঠানের হাতে কিছু বেশী পরিমাণ গণতান্ত্রিক অধিকারই দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা উহার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারেন নাই। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, পর্ষৎকে বাতিল করিয়া দিয়া তিনি অনুতপ্ত নন।

শিক্ষক ধর্মঘটের পর সরকার মধ্যশিক্ষার অবস্থা পর্য্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎসমূহের গঠনপদ্ধতি কি হইবে, সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টও সরকার গত জানুয়ারী মাসে পাইয়াছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে যখন পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষতে কতকগুলি গুরুতর গলদ দেখা দেয়, তখন স্বভাবতঃই সরকার মনে করেন যে, পর্ষতের ব্যাপারে কিছুটা পিছাইয়া আসা দরকার। মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার নূতন একটি মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ গঠন করিবেন এবং সেই উদ্দেশ্যে নূতন একটি বিলও প্রণয়ন করা হইবে, বক্তৃতায় তিনি এই আভাস দেন।"

কলিকাতা পুলিস

সম্প্রতি দৈনিক সংবাদপত্রে নিম্নের সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ ট্রাফিক বিভাগে হাত দিয়াছেন ইহা আশার কথা। কিন্তু পুলিসের যাবতীয় ব্যাপারে, শুধু কলিকাতায় নয়, বহুদিন হইতেই তদন্তের ও তত্ত্বাবধানের অভাব লক্ষিত হইতেছে। উপরোক্ত সংবাদটি এইরূপ :

"কলিকাতা পুলিসের ট্রাফিক বিভাগে নানাপ্রকার দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তদন্ত করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। দুর্নীতি দমন শাখা (এন্টি-করাপশান) ও এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ যুক্তভাবে তদন্ত করিতেছেন এবং তদন্তের প্রাথমিক ফলাফল অনুযায়ী ইতিমধ্যেই চার জন ইনস্পেক্টর, বারো জন সার্জেণ্ট এবং চল্লিশ জন কনষ্টেবলকে এই বিভাগ হইতে অপসারণ করা হইয়াছে।

ইহা ভিন্ন কয়েকদিন পূর্ব্বে লালবাজারে ট্রাফিক পুলিসের অফিসের মধ্যে ঘুষ লইবার সময় একজন কনেষ্টবলকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ট্রাফিক বিভাগে তদন্তের প্রাথমিক পর্য্যায়েই নানাপ্রকার দুর্নীতি ও নিয়মবহির্ভূত বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

কলিকাতা পুলিসের হেড কোয়ার্টার্স বিভাগের একটি শাখা, ট্রাফিক পুলিসে নানারকম দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ উত্থাপনের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা করেন। তদনুযায়ী এই শাখার সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করা হইতেছে। প্রকাশ, তদন্তের ফলে দেখা গিয়াছে একই অপরাধে যেখানে বহুক্ষেত্রে অপরাধীর সাজা দেওয়া হইয়াছে সেখানে আবার বহু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। আরও দেখা গিয়াছে, বহু মামলার বিষয় আদালতে প্রেরণ করা হইয়াছে বলিয়া কাগজপত্রে লিখিত রহিলেও প্রকৃতপক্ষে মামলাগুলি আদালতে প্রেরিত হয় নাই। মধ্যপথেই অজ্ঞাতকারণে বিষয়গুলির নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। দেখা গিয়াছে, নির্দিষ্ট কতকগুলি গাড়ী বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয় নাই। প্রতিদিনই তদন্তের ফলে দুর্নীতি ও নিয়মবহির্ভূত কার্য্যকলাপ ধরা পড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া প্রকাশ।"

কিরণশঙ্কর রায়ের অকালমৃত্যুর পর পুলিস ও দেশের শান্তিশৃঙ্খলার ব্যাপারে কোনও যোগ্য লোক পৃথকভাবে মন্ত্রী নিযুক্ত হন নাই। মুখ্যমন্ত্রী একাই আরও পাঁচটা দপ্তরের কাজের

সহিত এই দপ্তর চালাইতেছেন। ঐ ব্যবস্থা আমরা কোনদিনই আশাপ্রদ মনে করি নাই, আজও একেবারেই করি না। এই দপ্তরে একজন অতি কর্ম্মঠ ও যোগ্য মন্ত্রীর চব্বিশ ঘণ্টার পরিশ্রমের কাজ আছে।

প্রথম আণবিক শক্তিচালিত কারখানা

আণবিক শক্তি শুধু যে ধ্বংসের অস্ত্র নহে, উহা মানুষের উপকারেও লাগাইতে পারা যায় তাহার প্রমাণ বোধ হয় প্রত্যক্ষ ভাবে এতদিনে পাওয়া যাইবে। মার্কিনবার্ত্তা নিম্নলিখিত সংবাদ পাঠাইয়াছেন :

"সিপিংপোর্ট, ৭ই সেপ্টেম্বর—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আণবিক শক্তি-চালিত প্রথম কারখানাটির উদ্বোধন সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উহাতে যে পরমাণবিক চুল্লী ব্যবহৃত হইবে তাহার ডিজাইন করিয়াছেন ওয়েষ্টিংহাউস ইলেকট্রিক কর্পোরেশন। ঐ চুল্লীর সাহায্যে যে বাষ্প উৎপন্ন হইবে তাহা দিয়া ডুকেন লাইট কোম্পানীর কারখানা চালান হইবে। মার্কিন আণবিক শক্তি কমিশনের এক চুক্তি অনুসারে এখানে ৪৷ কোটি ডলার ব্যয়ে ঐ কারখানাটি নির্ম্মিত হইতেছে।

কি ভাবে ঐ পরমাণবিক চুল্লীর সাহায্যে বাষ্প উৎপাদন করা হইবে তাহা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ওয়েষ্টিংহাউসের কর্ত্তৃপক্ষ বলেন যে, চুল্লীর কেন্দ্রস্থলে ইউরেনিয়াম অণুবিভাজনের সাহায্যে তাপ উৎপাদন করা হইবে। ঐ তাপের সাহায্যে উত্তপ্ত গরম জলকে কতকগুলি ইস্পাতের নলের মধ্য দিয়া চারিটি তাপ-বিনিময় কক্ষের মধ্যে লইয়া যাওয়া হইবে। ঐ কক্ষের মধ্যে অতি উত্তপ্ত জলবাহী ঐ সকল ইস্পাতের নলের গা দিয়া আরও জলস্রোত প্রবাহিত করা হইবে। উত্তপ্ত ইস্পাতের নলের সংস্পর্শে আসিয়া ঐ জলস্রোতও উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে এবং অপেক্ষাকৃত কম চাপের ফলে সহজেই বাষ্পে পরিণত হইবে। ঐ বাষ্পের সাহায্যে যে চাকা ঘুরিবে তাহা আবার বিদ্যুৎ-উৎপাদন যন্ত্রটিকে চালাইবে এবং উহার সাহায্যে ন্যূনপক্ষে ৬০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে।

ওয়েষ্টিংহাউস কর্ত্তৃপক্ষ আরও বলিয়াছেন, ভূনিম্নে ইস্পাত ও কংক্রিট নির্ম্মিত একটি কক্ষে পরমাণবিক চুল্লীটিকে স্থাপন করা হইবে।"

মার্কিন চলচ্চিত্র ও ভারত

মার্কিনবার্ত্তা এই সংবাদটিও দিয়াছেন :

"হলিউড, ৮ই সেপ্টেম্বর—ভারতীয় চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ শ্রীমোহন ভবনানী মনে করেন যে, বিদেশে প্রদর্শনের জন্য অধিকতর সতর্কতার সহিত চলচ্চিত্র নির্ব্বাচন করিলে বিদেশে আমেরিকা সম্পর্কে আরও ভাল ধারণার সৃষ্টি হইবে। শ্রীযুক্ত ভবনানী সম্প্রতি "লস এঞ্জেলেস টাইমসে"র প্রতিনিধির নিকট উপরোক্ত অভিমত প্রকাশ করেন।

ভারত সরকারের ফিল্মস ডিভিসনের প্রধান শ্রীমোহন ভবনানী বলেন যে, আমেরিকার চলচ্চিত্র সমিতির সভাপতি এরিক জনসনের নিকট তিনি ইতিমধ্যেই এরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন।

তিনি "লস এঞ্জেলেস টাইমসে"র প্রতিনিধিকে বলেন, 'কতকগুলি চলচ্চিত্র যদি বিদেশে, বিশেষ করিয়া দূরপ্রাচ্যে প্রেরণ করা না হয়, তাহা হইলে আমেরিকা সম্পর্কে বিদেশে উন্নততর ধারণার সৃষ্টি হইবে।

শ্রীযুক্ত ভবনানী বলেন, 'আমেরিকায় প্রস্তুত যে সকল চলচ্চিত্রের কাহিনী অপরাধ ও নৃশংসতামূলক, সেগুলি বিকৃত ধারণার সৃষ্টি করে। অন্যান্য চিত্রসমূহের মধ্যে যৌন-আবেদনপূর্ণ ছবিগুলি ভারতে বিশেষ সমাদর লাভ করে না।'

তিনি বলেন যে, ভারতে চিত্র রপ্তানীর ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় রাশিয়া অনেক কম সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। গত ৪ বৎসরে ভারতে তিনটিমাত্র রাশিয়ান চলচ্চিত্র প্রদর্শনের কথা তিনি স্মরণ করিতে পারেন, অথচ প্রতি বৎসর শতাধিক মার্কিন চলচ্চিত্র ভারতে প্রদর্শিত হয়।

তিনি মন্তব্য করেন, 'রুশ চলচ্চিত্রগুলি সর্ব্বদাই প্রচারমূলক হয়। কোন চলচ্চিত্রে কোনরূপ প্রচার থাকিলে হয় সেই অংশ কাটিয়া বাদ দেওয়া হয়, নতুবা ভারতীয় সেন্সর বোর্ড ঐ চিত্র ভারতে প্রদর্শনের অনুমতি দেন না।'

শ্রীভবনানী বলেন যে, কিছুকাল বেসরকারী চলচ্চিত্র প্রযোজকরূপে কার্য্য করার পর তিনি ১৯৪৯ সনে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন। তাঁহার মতে সরকার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত চলচ্চিত্রগুলি ভারতে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে, কারণ এগুলির সাহায্যে জনগণকে দ্রুত শিক্ষাদান করা যায়।

টাইমসের সংবাদে জানা যায় যে, ভবনানী দম্পতি সম্প্রতি মার্কিন চিত্রনাট্যকার রবার্ট হার্ডি অ্যাণ্ডজের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিঃ অ্যাণ্ডজ গত বৎসর ভারত সফরকালে শ্রীভবনানীর সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন।

শ্রীভবনানীর বিবৃতিতে দুই-তিনটি ভুল আছে, তাহা ভিন্ন উহা খুবই ঠিক। মার্কিন কাহিনীমূলক (ফিচার) চলচ্চিত্র প্রায় অধিকাংশই রোমাঞ্চকর বা যৌন-আবেদনপূর্ব্ব এবং সেইজন্য এদেশে মার্কিনদেশ সম্বন্ধে বিকৃত ধারণা হয় ইহা সত্য। কিন্তু ঐ জাতীয় চিত্র যে এদেশে "সমাদর" লাভ করে না এই ধারণা ভুল। সন্ত কবীরের বাণী—

"সাঁচে কো ন পতিজায়ে ঝুঠে জগপতিয়ায়"
"গলি গলি গোরস ফীরৈ মদিরা বৈঠি বিকায়"

আজও ভারতে ধ্রুব সত্য এবং যতদিন মানুষের মধ্যে পাশবিক প্রবৃত্তি ও উত্তেজনার আকাঙ্ক্ষা থাকিবে ততদিন উহা থাকিবেই। তবে ঐরূপ পাশববৃত্তি ও উত্তেজনার সৃষ্টিকারক চলচ্চিত্রের সমাদর অবাঞ্ছনীয় ইহা সত্য।

রুশ সরকার সম্প্রতি এদেশে প্রায় ৫০খানি উৎকৃষ্ট কাহিনীমূলক দীর্ঘ চলচ্চিত্র পাঠাইয়াছেন। সেগুলির মধ্যে এতাবৎ যে কয়খানি সেন্সর বোর্ডে আসিয়াছে, তাহার অধিকাংশই প্রচারমূলক নহে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থসংগ্রহ

সম্প্রতি প্ল্যানিং কমিশন সমস্ত প্রাদেশিক সরকারকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য কি পরিমাণ অর্থ যোগাড় করিতে পারিবেন তাহার একটি খসড়া প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। আভ্যন্তরিক ভাবে অর্থসংগ্রহ করিবার জন্য প্ল্যানিং কমিশন জোর দিয়াছেন। দুইটি বিষয় সম্বন্ধে কমিটি জোর দিয়াছেন: জাতীয় পরিকল্পনাগুলি সামগ্রিকভাবে ২৫ বৎসরে গড়-পড়তা মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ করিবে এবং দ্বিতীয়তঃ, দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য বিদেশী অর্থসাহায্যের পরিমাণ যৎসামান্য হইবে। প্ল্যানিং কমিশন হিসাব করিয়াছেন যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে, অর্থাৎ ১৯৫৬ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে ভারতের জমা ষ্টার্লিং ব্যালান্স যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইবে, নোট প্রচলনের জন্য যে পরিমাণ প্রয়োজন, শুধু সেই পরিমাণ থাকিবে। দ্বিতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য বহুল পরিমাণে যে বিদেশী মুদ্রা প্রয়োজন তাহার আয়ের অন্য ভাবে বন্দোবস্ত করিতে হইবে। যদিও কর অনুসন্ধান কমিটি এ সম্বন্ধে তাঁহাদের সুচিন্তিত অভিমত দিবেন, তথাপি প্রত্যেক প্রদেশ কি উপায়ে নিজেদের আয় বৃদ্ধি করিতে পারে সে সম্বন্ধে সচেষ্ট হওয়া উচিত। রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য প্ল্যানিং কমিশন কতকগুলি অভিমত দিয়াছেন, যথা—ভূমি রাজস্ব, জলকর, বিবর্দ্ধন কর, জেলা কিংবা স্থানীয় কর বৃদ্ধি করা এবং কৃষি আয়কর বৃদ্ধি করা। জেলা কিংবা স্থানীয় কর বৃদ্ধির দ্বারা স্থানীয় পরিকল্পনাগুলির খরচ যোগাড় করা উচিত। নূতন নূতন রাজস্ব নির্দ্ধারণের জন্য প্ল্যানিং কমিশন জোর দিয়াছেন। কিন্তু মধ্যবিত্তশ্রেণী বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ করভারে বিব্রত, তাই নূতন কোন করভারে তাহারা এবং তাহাদের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িতে বাধ্য। প্রদেশগুলিকে তাই নূতন রাজস্ব সংগ্রহ ব্যাপারে সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে।

দেশের আয় বৃদ্ধি এখনই হইতে পারে যদি কর দেওয়ায় ফাঁকি ও কর আদায়ে দুর্নীতি দূর হয়। মধ্যবিত্তশ্রেণী মুখ বুজিয়া কর দিয়া যায় ও আদায়ের জুলুম সহ্য করে। কিন্তু দেশের অধিকাংশ ছোটবড় ব্যবসায়ী আয়কর, বিক্রয়কর ইত্যাদি ফাঁকি দিয়া রেহাই পায়।

তৈল পরিশোধন শিল্প

ব্যক্তিগত শিল্পক্ষেত্রে তৈল পরিশোধন শিল্প সম্প্রতি একটি প্রধান স্থান অধিকার করিতেছে। এই শিল্পে প্রায় ৫৫ কোটি টাকা নিয়োগ করা হইয়াছে এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বেসরকারী শিল্পে ইহাই বৃহত্তম মূলধন যাহা আজ পর্য্যন্ত নিয়োজিত হইয়াছে। শুধু ইহাই নয়, ভারতীয় শিল্পের জন্য একটি অতীব প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। ষ্ট্যানভাক কোম্পানীর বোম্বাই-স্থিত পরিশোধন শিল্পটি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। ইহার মূলধন ১৭৷৷ কোটি টাকা এবং ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ইহাই বৃহত্তম আমেরিকান মূলধন যাহা একটি মাত্র শিল্পে খাটানো হইতেছে। বোম্বাইয়ের ট্রম্বেতে বার্ম্মা-শেল কোম্পানী আর একটি তৈল-পরিশোধনাগার স্থাপন করিতেছে। ইহাতে ২৭ হইতে ৩০ কোটি টাকার মত মূলধন নিয়োজিত হইতেছে এবং ইহার উৎপাদন-ক্ষমতা হইবে বৎসরে ২০,০০,০০০ লক্ষ টন। বার্ম্মা-শেলের পরিশোধনাগার হইবে ভারতের বৃহত্তম। ১৯৫৬ সনে ক্যালটেক্স কোম্পানী বিশাখাপত্তনমে তৃতীয় পরিশোধনাগার স্থাপন করিবে।

আগামী বৎসরে ভারতে পেট্রোল পরিশোধন-ক্ষমতা ৩৭,০০,০০০ লক্ষ টনে দাঁড়াইবে। ইহা সত্ত্বেও ভারতবর্ষকে কিছু পরিমাণ পরিস্রুত পেট্রোল ও কেরোসিন আমদানী করিতে হইবে। ভারতের বৎসরে প্রায় ৭০,০০,০০০ টন পেট্রোল-জাতীয় তৈলাদি প্রয়োজন। ভারতে তৈল পরিশোধন হওয়াতে আমাদের ইহার দরুন প্রায় ৭ হইতে ১০ কোটি টাকার মত বিদেশী মুদ্রার খরচ বাঁচিয়া যাইবে। অধিকন্তু, এই পরিশোধনাগার হইতে কর-রাজস্ব বহুল পরিমাণে আয় হইবে। এই তিনটি পরিশোধনাগারে মোট যে পরিমাণ তৈল পরিস্রুত হইবে তাহার প্রায় অর্দ্ধেক উৎপাদিত হইবে বার্ম্মা-শেলের পরিশোধনাগারে। ষ্ট্যানভাকের কারখানায় বর্ত্তমানে ৫০০ ভারতীয় শ্রমিক ও ৪০ জন আমেরিকান টেকনি-সিয়ান কাজ করিতেছে। বার্ম্মা-শেলের কারখানায় ৫০০ জন ভারতীয় শ্রমিক ও ২৪ জন বিদেশী কাজ করিবে।

বাঁকুড়া শহরে বিদ্যুৎ কোম্পানীর অকর্ম্মণ্যতা

মফস্বল শহরগুলির বিজলী সরবরাহ ব্যবস্থার নানারূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রায়ই আমাদের গোচরে আসে। বর্ত্তমান সংখ্যাতেও স্থানান্তরে বর্দ্ধমানে বিদ্যুৎ সরবরাহ লইয়া যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে সে সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। পাক্ষিক "হিন্দুবাণী"র বিক্ষুব্ধ সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে দেখা যায় যে, বাঁকুড়া শহরে বিদ্যুৎ-সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানটিও কোন প্রকারেই যোগ্যতার সহিত কার্য্য চালাইয়া যাইতে পারিতেছে না। প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, বিজলী কোম্পানীর দুইটি বয়লার বিকল হইবার ফলে গত ২৯শে আগষ্ট হইতে শহরে বিদ্যুৎ-সরবরাহব্যবস্থা বানচাল হইয়া আছে। একটি বয়লারের সাহায্যে কোনপ্রকারে সরকারী চাহিদা এবং সামান্য পরিমাণে বেসরকারী চাহিদা মিটাইবার চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু শহরের সকল কাজকর্ম্মই বিদ্যুতের অভাবে বন্ধ প্রায়। "হিন্দুবাণী" লিখিতেছেন, "বিদ্যুৎ সরবরাহ আইন অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টার অধিককাল সরবরাহ বন্ধ রাখা চলতে পারে না। যদি তা হয়, তবে লাইসেন্সের সর্ত্ত অনুযায়ী উহা অবিলম্বে বাতিল হতে বাধ্য। কোটিপতি ইহুদি কোম্পানী আইনকে বহু দিন থেকেই কদলী দেখিয়ে আসছে। নচেৎ লাইসেন্স বাতিলযোগ্য বহুবিধ বেআইনী কাজ করেও তারা কারবার চালায় কি করে?"

গোলযোগের কৈফিয়ত স্বরূপ কোম্পানীর পক্ষ হইতে নাশকতা-মূলক কার্য্যের যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে সেই সম্পর্কে আলোচনা

প্রসঙ্গে পত্রিকাটি লিখিতেছেন যে, ১৯৫০ সনেও কোম্পানী বিপাকে পড়িয়া সাবোতাজের 'সাজেশ্যান' দিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। "আমরা সরকারের কাছে সুস্পষ্টরূপে এই দাবি জানাতে চাই, বৈদ্যুতিক কোম্পানীকে উহা প্রমাণের জন্য আহ্বান করা হউক। 'সাজেশ্যান' মিথ্যা প্রমাণিত হইলে সরকার এঁদের বিরুদ্ধে কোন পন্থা অবলম্বন করবেন, আমরা সাগ্রহে লক্ষ্য করব।"

পত্রিকাটি লিখিতেছেন, বয়লার ত্রুটির একাংশ স্ফীত হওয়ার দরুনই বিদ্যুৎ-সরবরাহে বাধা ঘটে। বয়লারের স্ফীত অংশগুলি স্বভাবতঃই কোন কারণে অন্যান্য অংশ অপেক্ষা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কোম্পানী বেশী লাভের মোহে প্রথম শ্রেণীর কয়লার পরিবর্ত্তে নিজেদের ক্রীত কোলিয়ারির নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাথুরিয়া কয়লা বয়লারে ব্যবহার করে। এইরূপ কয়লা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে হয় এবং কয়লার-গাত্রে যে গন্ধক থাকে, তাহা প্রচণ্ড উত্তাপে বয়লার-গাত্রে আয়রন সালফাইড সৃষ্টি করে। ইহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর ইস্পাতও নষ্ট হইতে বাধ্য। ইহার উপর কোম্পানী সরাসরি নদী হইতে কাদামিশ্রিত জল বয়লারে ব্যবহার করায় উহাতে ক্যালসিয়ম ও ম্যাগনেসিয়মের ডিপোজিট পড়িয়া বয়লারের কর্ম্মক্ষমতা হ্রাস পায়। বয়লারের সেফটি-ভাল্‌ভ, ব্লো-পাইপ ভাল্‌ভগুলি ভাল থাকিলেও বয়লার-গাত্রে স্ফীতি দেখা দিতে পারিত না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কমার্স ডিপার্টমেন্টের নিকট একটি কমিশন গঠন করিয়া বাঁকুড়া ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করিবার অনুরোধ জানাইয়া বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে বাঁকুড়াতে ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের পরিচালক হিসাবে যাহাদের সহিত জনসাধারণ পরিচিত তাহাদের মধ্যে কেহই ইঞ্জিনীয়ার নহেন। রেসিডেন্ট ইঞ্জিনীয়ারের কোন ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী নাই। বি. সি. রায় ও সেম্মুন নামক দুই ব্যক্তি মাঝে মাঝে খবরদারীর জন্য বাঁকুড়া যান। যদিও বি. সি. রায় কনসালটিং ইঞ্জিনীয়ার নামে পরিচিত, তথাপি গত ২৩শে আগষ্ট পাবলিক কো-অর্ডিনেশন কমিটির ইলেকট্রিক সংক্রান্ত সাব-কমিটির সম্মুখে ভদ্রলোক নিজেই স্বীকার করেন যে, বয়লার বা চিমনী সম্পর্কে তিনি বিশেষ কিছু জানেন না, কয়লা সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞান সীমাবদ্ধ।" সেম্মুন জাতভাই হিসাবে ইলিয়াসদের একজন কর্ম্মচারীমাত্র। কাজেই এই তিন মূর্ত্তি কিভাবে বয়লারের স্ফীতিকে 'সাবোতাজ' বলে প্রচার করেন?"

বাঁকুড়া ত দামোদরের ওপারে। সেখানে যে পশ্চিমবাংলার কিছু আছে সেকথা এক নির্ব্বাচন ও চাউল যোগাড়ের সময় কর্ত্তৃপক্ষের মনে পড়ে। বাকি সময় "যস্তুবিষ্যতি তস্তবিষ্যতি!

বর্দ্ধমানে বিজলী কোম্পানীর স্বৈরাচার

বর্দ্ধমান শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের অব্যবস্থা সম্পর্কে অভিযোগ বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশিত প্রায় সকল পত্রিকাতেই পুনঃপুনঃ প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। তাহার কোন কোন সংবাদ "প্রবাসী"র পাঠকগণও জানেন। সম্প্রতি বিভিন্নপত্রে যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই।

"দামোদর" পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী গত ১২ই আগষ্ট বর্দ্ধমানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বিজলী কোম্পানীর জনস্বার্থবিরোধী কার্য্যকলাপের সমালোচনা করা হয় এবং অবিলম্বে বর্দ্ধমান হইতে উক্ত কোম্পানীর অপসারণ দাবি করা হয়। বর্দ্ধমান পৌরসভার এক বিশেষ অধিবেশনে ২৫শে আগষ্ট সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবেও বিজলী কোম্পানীর লাইসেন্স বাতিল করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানান হয়। ১৭ই আগষ্ট বর্দ্ধমান টাউন হলে এক নাগরিক সভায় এক মাসের সময় দিয়া বিজলী কোম্পানীকে একটি চরমপত্র দিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মুখ্যমন্ত্রীকে এই প্রস্তাবের মর্ম্ম জানাইয়া এক পত্র দেওয়া হয় এবং তাঁহার নির্দ্দেশমত গত ২৮শে আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডেভেলপমেণ্ট বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার ডাঃ দত্ত এ বিষয়ে তদন্ত করিতে যান। তিনি পৌর-কর্ত্তৃপক্ষ একশন কমিটি, জেলাশাসক প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং কোম্পানীর উৎপাদনকেন্দ্রও পরিদর্শন করেন।

বর্দ্ধমানে বিজলী সরবরাহের অব্যবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে পার্লামেন্টের কংগ্রেসী-সদস্য জনাব আবদুস সাত্তার সম্পাদিত "বর্দ্ধমান বাণী" লিখিতেছেন, "আলোর যা অবস্থা তাহাতে রাত্রে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ হইয়াছে, রাস্তায় বাতি অন্ধকার ঘনীভূত করিতেছে, জল সরবরাহ মন্থর হইয়াছে। কোম্পানী ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা না করিয়া প্রত্যহ নূতন নূতন গৃহে সংযোগ দিয়া লাভের অঙ্ক স্ফীত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া আছে। যে সরকারী কর্ম্মচারী তদন্ত করিয়া গিয়াছেন তিনি এই সমস্ত অবস্থা দূরীকরণের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহা জানিবার জন্য শহরবাসী আগ্রহান্বিত।"

আমরা জানিলাম শেষের সংবাদে যে, সরকার বর্দ্ধমান বিজলী কোম্পানী নিজ হাতে লইবার মনস্থ করিয়াছেন।

বর্দ্ধমান পুলিসের আচরণ

"বর্দ্ধমানবাণী" (২৮শে ভাদ্র) সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন, বর্দ্ধমানের মহকুমা শাসক মেমারির চার জন ব্যক্তিকে ২৩শে আগষ্ট এক নির্দ্দেশনামায় জানান যে, ২৫শে আগষ্ট তাহাদিগকে বর্দ্ধমানে অবশ্যই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। চারি জনের মধ্যে দুই জন তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান। অপর দুই জনের মধ্যে এক জন বহুকাল মৃত বলিয়া জানা যায় এবং চতুর্থ জন কলিকাতায় রহিয়াছেন বলিয়া জানান হয়।

পত্রিকাটি লিখিতেছেন যে, নিশ্চয়ই কোন বিশেষ গুরুতর কার্য্যে প্রয়োজন না হইলে মহকুমা-শাসক এভাবে উক্ত ভদ্রমহোদয়দিগকে ডাকিয়া পাঠাইতেন না। কিন্তু সেজন্য যে সময় দেওয়া হইয়াছিল তাহা নিতান্তই অপ্রতুল। নির্দ্দেশ-পত্রটি স্বাক্ষরিত হয় ২৩শে আগষ্ট, স্পষ্টতঃই ২৪শে আগষ্টের পূর্ব্বে উহা জারী হয় নাই। "কোন কারণে যদি নোটিশপ্রাপ্ত ব্যক্তি দুইটি ঐ দিন কোথাও

যাইতেন এবং একদিন বিলম্ব করিয়া ফিরিতেন তাহা হইলে মহকুমা-শাসকের নির্দ্দেশ অমান্য করার অপরাধে ইহাদিগকে যে জেল হাজতে আশ্রয় লইতে হইত ইহা ধরিয়া লইতে কষ্ট হয় না, কারণ ব্যাপারটি এমন সঙ্গীন করিয়াই দেখান হইয়াছে।...

"মহকুমা-শাসক পরবর্ত্তী অনুসন্ধানে জানিয়াছেন সত্যই এক ব্যক্তি লোকান্তরিত এবং অপর ব্যক্তি স্থানান্তরে বাস করে। স্থানান্তরে যিনি বাস করেন তাঁহার উপর নোটিশ জারি হইতে পারে, কারণ পুলিস হয়ত মনে করিতে পারে ব্যক্তিটি দূর হইতে উস্কানি দিয়া থাকেন। কিন্তু যে ব্যক্তিটি লোকান্তরিত পুলিসের রিপোর্টে তাহার নাম আসিল কি প্রকারে? তাহা হইলে কি ধরিয়া লইব মেমারির পুলিস না দেখিয়া-শুনিয়া স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের পরামর্শে ও ইঙ্গিতে এই রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য অথবা সংবাদ প্রদান করিলে আইনের চোখে তাহা অপরাধ ও দণ্ডনীয়। আমরা সবিনয়ে প্রশ্ন করিব পুলিস মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করিয়া কি সেই অপরাধ করে নাই?..."

বর্দ্ধমানে ২৪জন অফিসার অভিযুক্ত

১০ই ভাদ্র সংখ্যা "দামোদর" পত্রিকার এক সংবাদে প্রকাশ, বর্দ্ধমান জেলার ২৪ জন গেজেটেড সরকারী অফিসারের বিরুদ্ধে নানাবিধ দুর্নীতির অভিযোগ দুর্নীতি দমন বিভাগ কর্ত্তৃক আনীত হইতেছে বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে। অভিযুক্ত অফিসারদের মধ্যে বর্দ্ধমান উদ্বাস্তু ঋণদান আপিসের কয়েকজন অফিসার রহিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

পত্রিকাটির সংবাদ অনুযায়ী বর্দ্ধমানের পূর্ব্বতন জেলা রিলিফ অফিসারের দুই ভাগিনেয় শ্রীসুভাষ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রভাত চট্টোপাধ্যায়ের নামে ৩৭৫্ হিসাবে গৃহ নির্ম্মাণ লোন বাহির করা হইয়াছে এবং উক্ত অফিসারের ভগিনী ও অপর দুই জনের মাতা শ্রীমতী লাবণ্য চট্টোপাধ্যায়ের নামে বর্দ্ধমান শহরের বালিডাঙ্গায় একটি সরকারী প্লট দেওয়া হইয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, উক্ত মহিলা পাকিস্থানে বাস করিতেছেন এবং সুভাষ ও প্রভাত চট্টোপাধ্যায় কোথাও গৃহ নির্ম্মাণ করেন নাই।

"উক্ত অফিসার বর্দ্ধমানে থাকাকালীন আসানসোল মহকুমার কাঁকসা ক্যাম্পের জঙ্গল পরিষ্কারের জন্য ৩৯,০০০্ টাকা ব্যয় করিয়াছেন এজন্য তদন্ত হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বর্ত্তমানে পদোন্নতি হইয়া উক্ত অফিসার পশ্চিম বাংলার পুনর্ব্বাসন বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর হইয়াছেন।"

যদি "দামোদর" পত্রিকার সংবাদ সত্য হয় তবে এ বিষয়ে বিশেষ তদন্তের প্রয়োজন। বাংলায় উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের প্রধান অন্তরায় ঐরূপ দুর্নীতি। যাহারা সাহায্য প্রাপ্তির যোগ্য তাহারা অভাবেই মরে এবং জুয়াচোর ও বাস্তুঘুঘুর কপাল খোলে, এই ত ঐ দপ্তরের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ।

মফস্বলে ডাকাত

বর্দ্ধমান জেলার জামালপুর থানার দক্ষিণ অঞ্চলে উপর্য্যুপরি কয়েকটি ভয়াবহ ডাকাতি সঙ্ঘটিত হইবার সংবাদ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "দামোদর" লিখিতেছেন যে, ডাকাতদল নিয়মিত ভাবে কেমন করিয়া ঐ অঞ্চলে আক্রমণ চালাইয়াছে তাহা দেখিবার বিষয়। গত ৬ই জুন জাড়গ্রাম ইউনিয়নের সাতঘরিয়া গ্রামে একটি ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। পুলিস এ সম্পর্কে পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু কয়েকদিন পরই তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহার পর গত ২রা ও ৩রা জুলাই যথাক্রমে জ্যোৎশ্রীরাম ইউনিয়নের শিয়ালী ও জাড়গ্রাম ইউনিয়নের দাসপুর গ্রামে দুইটি ডাকাতি সংঘটিত হয়। তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে সংশ্লিষ্ট রায়না থানা এলাকার গোডান ইউনিয়নের তৈলাড়া গ্রামে এক ভীষণ ডাকাতি হয়।

এইরূপ উপর্য্যুপরি কয়েকটি ডাকাতির পর উক্ত অঞ্চলে প্রহরা দিবার জন্য কয়েকজন সশস্ত্র বন্দুকধারী পুলিস মোতায়েন করা হয়। "দামোদর" লিখিতেছেন, "কিন্তু গত ৩রা আগষ্ট আঁটপাড়া ডাকাতির সময় তাহাদের যেরূপ কর্ম্মতৎপরতা দেখা গিয়াছে, তাহাতে ঐ অঞ্চলের জনসাধারণ নিজদিগকে নিরাপদ মনে করিতে পারিতেছে না।" আঁটপাড়া ডাকাতির সময় মুহুর্মুহু হাতবোমা এবং বন্দুকের আওয়াজে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীরাও জাগরিত হয় এবং দলবদ্ধ ভাবে ডাকাতদের প্রতিরোধে অগ্রসর হয়। "এই ব্যাপারে মধ্য রাত্রিতে দারুণ গোলমালে ঐ অঞ্চলের প্রতিটি গ্রাম শুনিতে পাইল, কিন্তু বন্দুকধারী পুলিসবাহিনী মাত্র এক মাইল দূরবর্ত্তী একটি গ্রামে পাহারা দিতে গিয়া কি অবস্থায় ছিল যে তাহাদের কর্ণকুহরে এত হট্টগোল প্রবেশ করিল না?"

পত্রিকাটি লিখিতেছেন যে, জামালপুর থানা এলেকায় যে সমস্ত 'কেস' রহিয়াছে তাহাতে থানা অফিসারের পক্ষে এই সকল ডাকাতি সম্পর্কে বিশেষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন সম্ভব নহে। সম্পাদকীয় মন্তব্যে জেলা পুলিসের অধ্যক্ষকে এ বিষয়ে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ জানাইয়া বলা হইয়াছে, "দক্ষিণ জামালপুরের আতঙ্কিতদের ধন, প্রাণ আজ বিপন্ন। অবিলম্বে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়া ঐ অঞ্চলকে আতঙ্ক ও সঙ্কটমুক্ত করিতে হইবে। এ বিষয়ে পুলিস এ পর্য্যন্ত কি করিয়াছেন তাহাও প্রকাশ করা প্রয়োজন।"

মফঃস্বলে শান্তিরক্ষার জন্য সশস্ত্র পুলিস ও গ্রামরক্ষীদের মধ্যে যোগ সুদৃঢ় করা প্রয়োজন।

যথেচ্ছ গাড়ীচালনা ও দুর্ঘটনা

সম্প্রতি বিদ্যালয় হইতে গৃহপ্রত্যাগমনরত জনৈক বালককে আসানসোল জি. টি. রোডে একটি মোটর লরী প্রচণ্ড বেগে চলিয়া চাপা দেওয়ায় বালকটির মৃত্যু ঘটে। বালকটির এই শোচনীয় অকালমৃত্যুতে ক্ষুব্ধ "বঙ্গবাণী" এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন, যদিও বালকের মৃত্যুর জন্য প্রধানত লরীচালকই দায়ী তথাপি "বিরুদ্ধ আইন থাকা সত্ত্বেও যাহারা আসানসোলের জি. টি. রোডের মত

জনাকীর্ণ রাস্তার উপর দিয়া প্রচণ্ড বেগে গাড়ী চালাইতে দেয়, প্রতিকারের উপায় ও ক্ষমতা হাতে থাকা সত্ত্বেও যাহারা ইহার প্রতিকার করে না তাহারাও কি পরোক্ষভাবে এই বালকের মৃত্যুর জন্য দায়ী নহে ?"

পত্রিকাটি আরও লিখিতেছেন, পথের ধারে একটি করিয়া সাইনবোর্ডে গতি কমাইবার কথা লিখিয়া দিয়াই পুলিস আপন কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছে, কিন্তু প্রতিনিয়তই যে সেই আদেশ ভঙ্গ করা হইতেছে সে বিষয়ে কেহ দেখিয়াও দেখিতেছে না। তাহা না হইলে থানার সম্মুখ দিয়াই উদ্দামবেগে গাড়ীগুলি চলিবার সাহস কোথা হইতে পায় ? "মাসে speed limit বা গতিবেগ ভঙ্গ করার জন্য কয়জনকে পুলিস ধরিয়াছে তাহা কেহ জানাইবেন কি ?" পত্রিকাটি প্রশ্ন করিতেছেন।

দায়িত্বশীল সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া সরকারী গাড়ীগুলিও যে গতিনিয়ন্ত্রণ ভঙ্গ করিয়া শহরের মধ্য দিয়া অনিয়ন্ত্রিতবেগে ছুটিয়া চলে তাহা যুগপৎ লজ্জা ও দুঃখের বিষয় বলিয়া পত্রিকাটি মনে করেন।

এই প্রকার শোচনীয় ঘটনার যাহাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য উপসংহারে আসানসোলের এস. ডি ও. এবং পুলিস কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের যে অংশ আছে, তাহাতে বিশেষ পুলিস বসাইয়া লরীচালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। উহার খরচ লরীগাড়ীর উপর বিশেষ ট্যাক্স বসাইয়া আদায় করা উচিত। টোলগেট বসাইয়া লরী হইতে মোটা টাকা লওয়া উচিত।

মেদিনীপুর জেলায় দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বাভাস

১৬ই ভাদ্র এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে "মেদিনীপুর পত্রিকা" অনাবৃষ্টির ফলে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানের দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ঝাড়গ্রাম, ঘাটাল, তমলুক, সদর ও কাঁথি প্রভৃতি প্রত্যেকটি মহকুমা হইতেই বহুপ্রকারের দুঃসংবাদ তাহাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "ইতি-মধ্যেই কয়েকস্থানে দুর্ভিক্ষ সুরু হইয়া গিয়াছে।...এতদ্ব্যতীত কয়েকস্থান হইতে এরূপ সংবাদও আসিতেছে যে, সরকারী সাহায্য-ব্যবস্থা পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া প্রতীত হইতেছে। যে সকল এলাকায় নাকি কংগ্রেসপ্রার্থী জয়লাভ করে নাই অথবা যেখানে কংগ্রেসের জয়লাভের আশা নাই সেখানকার অধিবাসীরা নাকি সর্ব্বপ্রকার সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইয়াছে।"

এইরূপ সংবাদে কর্ত্তৃপক্ষের অবহিত হওয়া উচিত। অবশ্য ঐ সংবাদ বাহির হইবার পরে নানাস্থলে বৃষ্টিপাতের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং দুর্ভিক্ষের আশঙ্কাও কমিয়াছে শুনিয়াছি। কিন্তু সরকারী সাহায্যে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ থাকা উচিত নহে। উহা ভিত্তিহীন কিনা সে বিষয়ে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

করিমগঞ্জ কংগ্রেসে অন্তর্বিরোধ

২৪শে ভাদ্রের "যুগশক্তি" সংবাদ দিতেছেন, করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস আপিস হইতে খাতাপত্রাদি চুরির মামলার উপর সম্প্রতি যবনিকাপাত হইয়াছে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত ১৯৫২ সনের ৩১শে অক্টোবর নিখিল-ভারত কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের পূর্ব্বরাত্রিতে করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস কমিটির আপিসের দরজা ও আলমারী ভাঙ্গিয়া কংগ্রেস সদস্যদের নামের তালিকা, সীল ও অন্যান্য খাতাপত্র চুরি গিয়াছে বলিয়া কংগ্রেস-সম্পাদক শ্রীমনোরঞ্জন দেব পুলিসে সংবাদ দেন। কংগ্রেস আপিস গৃহের বারান্দায় যে সমস্ত উদ্বাস্তু থাকে তাহাদের কেহ কেহ আসামীদিগকে সনাক্ত করে ও বলে যে আসামীরা ঘরে ঢুকিয়াছিল। অতঃপর কুশিয়ারা নদীতে ভাসমান অবস্থায় ৫।৫। মাইল ভাঁটিতে এই সমস্ত কাগজপত্র দেখিতে পাওয়া যায় এবং জনৈকা পাগলী নদী হইতে তাহা উদ্ধার করে।

ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার রায়ে বলেন, মামলাটি সম্পূর্ণ সাজান। বিরোধী দলভুক্ত আসামীদিগকে এ. আই. সি. সি.র নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে না দিবার উদ্দেশ্যে অফিসিয়াল কংগ্রেস গ্রুপ কাগজপত্র লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। খাতাপত্রাদি চুরির অভিযোগ সত্য নহে। বাদীপক্ষের ১নং সাক্ষী শ্রীমনোরঞ্জন দেবের সাক্ষ্যে জানা যায় যে, ইদানীংও জেলা কংগ্রেসের কাগজপত্র ও সীল অনুরূপভাবে অপসারিত হওয়ায় প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদককে আসিয়া এ সম্পর্কে তদন্ত করিতে হয় এবং পরে তাহা বাহির হয়। আসামীদিগকে মুক্তি দিয়া যাঁহারা এই মামলা দায়ের করিয়াছিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁহার অভিমতে ঐ মামলায় আসামীদিগকে অনর্থক হয়রান করা হইয়াছে এবং পুলিস ও আদালতের সময়ের অপব্যয় করান হইয়াছে।

এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, প্রথমে যখন ঐরূপ অভিযোগ আনা হয় তখন করিমগঞ্জের সিনিয়র ই-এ-সি শ্রীরমেশচন্দ্র দেব চৌধুরী ফরিয়াদি পক্ষ যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থিত না করায় উক্ত আসামীদিগকে ডিসচার্জ করেন। ফরিয়াদি পক্ষ তখন অতিরিক্ত দায়রা জজের নিকট আবেদন করিলে তিনি বিচারের আদেশ দেন।

এই ব্যাপার সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ঐ তারিখের "যুগশক্তি" লিখিতেছেন, "যাঁহারা এই মামলা দায়ের করিয়াছিলেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে সুবিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু পরিষ্কার ভাষায় কাহারও নাম উল্লেখ করেন নাই এবং মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের কোন সুপারিশ দান করেন নাই। তবে উক্ত মামলার ব্যাপারে প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিলেও স্থানীয় কংগ্রেসের কর্ম্মকর্ত্তা দুই-এক জনের স্বরূপ যেভাবে উদঘাটিত হইয়াছে তাহাতে উহাদের সম্পর্কে কংগ্রেসের ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ একেবারে নীরব বা নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারিবেন কি ?"

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সম্পর্কে তদন্ত

"নিশানা" পত্রিকা ১৪ই আগষ্ট এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন, তাঁহারা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছেন যে, নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি হইতে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস পরিচালনার ব্যাপারে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কিন্তু "কোনও অজ্ঞাত কারণে অন্যান্য পত্রিকা এমন কি জাতীয়তাবাদী (?) দৈনিক পত্রিকাগুলিও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মৌনাবলম্বন করিয়া আছে।" পত্রিকাটির সংবাদ অনুযায়ী বেসরকারীভাবে অনুসন্ধানের কার্য্য নাকি ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছে এবং পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা বুঝা গিয়াছে। অনতিবিলম্বেই কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড কর্ত্তৃক আনুষ্ঠানিক অনুসন্ধান সুরু হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষ সহজে অল্প কয়েকজনের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করিবার যে সহজ পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার ফলস্বরূপ কংগ্রেসের সৎ ও শুভানুধ্যায়ী কর্ম্মিগণের মধ্যে যে বিক্ষোভ দেখা দেয় এই অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত তাহারই পরিণতি। এই কংগ্রেস কর্ম্মিবৃন্দ যেসব অভিযোগ করেন তাহাদের মধ্যে কয়েকটি হইতেছে :

১। কংগ্রেস ভবন কিভাবে পাওয়া গিয়াছে? উহার দলিল কোথায় এবং তাহাতে কি আছে?

২। "জনসেবক" কাগজখানির উপর কংগ্রেসের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হিসাবে কোনও কর্ত্তব্য আছে কিনা?

৩। পান্নালাল সারাওগী পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের Finance sub-committee-র চেয়ারম্যান হইল কি জন্য এবং কোন্ গুণের দোহাই দিয়া?

উড়িষ্যায় পচা চাউল, চিনির কারবার, West Bengal Relief Committee, কল্যাণীর টিকিট ও অন্যান্য ব্যবস্থা, জুপিটার প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রভৃতি সম্পর্কেও নাকি কতকগুলি অভিযোগ করা হইয়াছে।

যাহাতে সকলেই এই তদন্তের ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করেন সম্পাদকীয় মন্তব্যে সেজন্য বিশেষ অনুরোধ জানান হইয়াছে।

"নিশানা" যে সংবাদ দিয়াছেন তাহার সত্যাসত্য আমাদের জানা নাই। তবে ঐরূপে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকিলে তাহার প্রকাশ্য উত্তর দেওয়া উচিত। নহিলে কংগ্রেসের খ্যাতি নষ্ট হইতে দেরী হইবে না।

ভারত সীমান্তে পাকিস্থানী হানা

২১শে ভাদ্র "হিন্দুবাণী" পত্রিকা লিখিতেছেন, "পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভায় শ্রীরাখহরি চট্টোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে সরকার পক্ষ হইতে জানান হয়, ১৯৫৩ সন হইতে ১৯৫৪ সনের মার্চ মাস পর্য্যন্ত পাকিস্থানীরা পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে ১২৯ বার হানা দিয়া নানাপ্রকারের উৎপাত করিয়াছে। ইহাতে ছয় জন নিহত ও বার জন আহত হইয়াছে। ১২২৩টি গবাদি পশু, নৌকা, লাঙ্গল প্রভৃতি অপহৃত হইয়াছে। সম্পত্তিরও ক্ষতি হইয়াছে। সরকার পক্ষ হইতে জানান হয় যে, হানাদারদের বিতাড়িত করিবার জন্য পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। পাক-সরকারকে প্রত্যেক বারই ঘটনার পর সংবাদ দেওয়া প্রভৃতিতে ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক পর্য্যায়ে দাঁড়াইয়াছে এবং আগামী বৎসরেও প্রশ্নোত্তরে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যাইবে।"

হিন্দুবাণীর আশঙ্কা অমূলক নহে মনে হয়। সীমান্ত অঞ্চলে সুগঠিত ও সশস্ত্র রক্ষীদল থাকা উচিত। ইচ্ছা থাকিলে উহা কিছুই অসম্ভব নহে। দুঃখের বিষয়, রক্ষীদল গঠনে এখন আর সেরূপ সরকারী উৎসাহের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না।

উত্তরপ্রদেশে মুস্লিম সাম্প্রদায়িকতার পুনরভ্যুত্থান

"পিপল" পত্রিকার লক্ষ্ণৌস্থিত বিশেষ সংবাদদাতা প্রদত্ত সংবাদে প্রকাশ যে, উত্তরপ্রদেশে মুস্লিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ পুনরায় মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে। স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর ভীত সাম্প্রদায়িক নেতারা কিছুদিন চুপচাপ ছিল, কিন্তু এক বৎসর যাবৎ তাহাদের তৎপরতা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বরাবাঁকি হইতে প্রাপ্ত সংবাদে দেখা যায় যে, একদল মুসলমান তবলিঘ (Tabligh) কার্য্যে উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছেন। কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান জমিয়তে ইসলামী বিশেষ তৎপর হইয়া বিভিন্ন জেলায় শাখা-প্রতিষ্ঠান খুলিতে সুরু করিয়াছে। আলিগড়ে সাম্প্রদায়িক কার্য্যকলাপের নয়াটকেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

সম্প্রতি বরাবাঁকি, গোরখপুর, আজমগড়, কানপুর প্রভৃতি স্থানে যে সকল সভা-সমিতির অনুষ্ঠান হয় তাহাতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টির প্রচেষ্টা সুপরিস্ফুট হইয়াছে।

দিল্লী এবং কানপুরের কয়েকটি পত্রিকা এইরূপ সাম্প্রদায়িকতা প্রসারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। ইহা ভিন্ন পাকিস্থান হইতে কয়েকটি সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র আমদানী করিয়া এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করিবার চেষ্টা হইতেছে। উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে "পাঠচক্র" স্থাপন করিয়া তথায় করাচী হইতে আমদানীকৃত পাকিস্থানী পত্রিকাগুলি হইতে বিভিন্ন "তথ্যে"র সাহায্যে কর্ম্মীদিগকে "শিক্ষিত" করিয়া তোলা হইতেছে।

পঞ্জাব (ভারত) হইতেও তবলিঘ আন্দোলনের যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও স্পষ্ট দেখা যায় যে, সেখানেও সাম্প্রদায়িকতাবাদ নূতন করিয়া প্রভাব বিস্তার করিতেছে। মেওয়াট অঞ্চলে কয়েকটি তবলিঘ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং শিক্ষা দিবার জন্য ২০০ স্বেচ্ছাসেবকের নাম সংগৃহীত হয়। বিভিন্ন বক্তা মুসলমানদিগকে কোরবাণীর "অধিকার" কায়েম করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে বলেন। কয়েকজন বক্তা মুসলমানদিগকে কেবলমাত্র মুসলমানদিগের দোকান হইতেই জিনিষপত্র ক্রয় করিতে আহ্বান করেন।

বিশেষ সংবাদদাতা আরও লিখিতেছেন যে, কেবলমাত্র যে মুসলমানদিগের মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতার পুনরভ্যুত্থান দেখা দিতেছে তাহা নহে, হিন্দুদের মধ্যেও সেইরূপ মনোভাব প্রকট হইয়া উঠিতেছে। তিনি লিখিতেছেন যে, অবিলম্বে এই সকল সাম্প্রদায়িক ধারাগুলিকে বিনষ্ট না করিলে কালক্রমে তাহারা দেশের এবং জাতির ঐক্যের পথে বিশেষ বিপজ্জনক রূপ ধারণ করিতে পারে।

আমরা জানি আলিগড়কে কেন্দ্র করিয়া এইরূপ একটি ষড়যন্ত্র বহুদিন যাবৎ চলিতেছে। অথচ দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ এ বিষয়ে নিস্পন্দ নিশ্চল।

আসানসোলে শ্মশানস্থানের অব্যবস্থা

উপযুক্ত শ্মশানস্থানের অভাবে আসানসোল ও নিকটবর্ত্তী কয়েকটি স্থানের অধিবাসীবৃন্দকে যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে, ২৬শে শ্রাবণ এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে "বঙ্গবাণী" সেই বিষয়ে আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি এবং আসানসোল মাইন্‌স বোর্ড অব হেলথের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহা নিরসনের অনুরোধ জানাইয়াছেন।

শ্মশানস্থানটি আসানসোলের কোন কোন স্থান হইতে আড়াই মাইল হইতে তিন মাইল দূরে মিউনিসিপ্যাল এলাকার বাহিরে অবস্থিত। সর্ব্বপ্রকার আলোকব্যবস্থা-বিবর্জ্জিত, সেই স্থানে কোন কাষ্ঠাদি পাওয়া যায় না, জলের কোন সুবন্দোবস্ত নাই, শ্মশান-কৃত্যাদি সম্পন্ন করিবার উপযুক্ত পুরোহিতও নাই। শবদেহবহন-কারীদের কয়েক ঘণ্টা অবস্থানের উপযুক্ত কোন ব্যবস্থাই সেখানে নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে রাত্রিকালে কোন আসানসোলবাসীর মৃত্যু ঘটিলে মৃতের আত্মীয়স্বজনের দুর্গতির সীমা থাকে না।

এই বিষয়ে মিউনিসিপালিটির বিশেষ দায়িত্বের কথা উল্লেখ করিয়া সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে যে, শ্মশানস্থান মিউনিসি-পাল এলাকার বাহিরে অবস্থিত, অতএব পৌরকর্ত্তৃপক্ষের কোন দায়িত্ব নাই বলিয়া যে কৈফিয়ত দেওয়া হয় তাহা গ্রাহ্য নহে। পৌরকর্ত্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা করিতে অক্ষম হইলে শ্মশানস্থানটিকে পৌর-এলাকায় কোন উপযুক্ত জায়গায় স্থানান্তরিত করা উচিত। শ্মশানস্থানটি উপযুক্তরূপে পরিচালিত করিবার যে বিশেষ দায়িত্ব আসানসোল মাইন্‌স বোর্ড অব হেলথের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে সে বিষয়ে বোর্ডকেও স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আসানসোলের ন্যায় বহুজাতি-অধ্যুষিত শহরে একটি উপযুক্ত মৃত্যু-তালিকা (Death Register) রাখিবার প্রয়োজনীয়তার প্রতিও সম্পাদকীয় মন্তব্যে সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

খড়গপুরে নূতন মিউনিসিপালিটি

মেদিনীপুর জেলার এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান শিল্পকেন্দ্র খড়গপুরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি মিউনিসিপালিটি স্থাপনের যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন সেই সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে নব-প্রকাশিত "সমাজ" লিখিতেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিদ্ধান্ত-গুলির কিয়দংশ যে কিরূপ ভিত্তিহীন নিরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহারই একটি দৃষ্টান্ত হইল খড়গপুরের সাম্প্রতিক মিউনিসিপালিটি।

খড়গপুর মিউনিসিপালিটির আয়তন ১৮ বর্গমাইল। ইহার মধ্যে শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সাড়ে বারো বর্গমাইল আয়তন-বিশিষ্ট রেলওয়ে কলোনীটি মিউনিসিপালিটির আওতার বাহিরে। খরিদা এবং ইন্দা এই দুইটি ইউনিয়ন লইয়া মিউনিসিপালিটিটি গঠিত। "সমাজ" লিখিতেছেন, এই অঞ্চলগুলির লোকসংখ্যা অনু-পাতে অর্থনৈতিক মান হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, অধিকাংশই দরিদ্র মধ্যবিত্ত, শ্রমিক এবং কৃষকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ঐ অঞ্চলে মাত্র পাঁচটি উচ্চ বিদ্যালয় রহিয়াছে। কিন্তু অর্থাভাবে তাহাদের অবস্থা বিশেষ শোচনীয়। উহাদের মধ্যে একটিমাত্র বালিকা-বিদ্যালয় অর্থাভাবে গৃহ-নির্ম্মাণে অপারগ হইয়াছে। অধিবাসীর সংখ্যা সত্তর হাজার। দুইটি ইউনিয়নের চৌকিদারী ট্যাক্স ১৪ হাজার টাকাও সম্পূর্ণ আদায় হয় না। এই অবস্থায় মিউনিসি-পাল কর ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা দরিদ্র জনসাধারণ কিভাবে বহন করিবে পত্রিকাটি সেই প্রশ্ন করিয়াছেন।

ব্যবসার কেন্দ্রস্থল গোলবাজার রেলওয়ে মার্কেট নূতন পৌর-সভার আয়ত্তের বাহিরে। "সমাজ" লিখিতেছেন, "এক্ষেত্রে পৌরসভা কতখানি কার্য্যকরী হইবে এবং উন্নতির কতখানি আশা আছে তাহা একরূপ দুর্ব্বোধ্য। আমাদের মনে হয় এরূপ ছিটমহল লইয়া পৌরসভা গঠন না করিয়া রেলওয়ে এলাকাটিকে সম্প্রসারিত করিয়া দেওয়া হউক। তাহা না হইলে রেলওয়ে কলোনীটিকে পৌরসভার আয়ত্তে আনিয়া উক্ত ছিটমহলগুলিকে উহার সহিত সংযোগ করিয়া দিয়া পূর্ণাঙ্গ পৌরসভা গঠন করা হউক।...কারণ রেলওয়ে কলোনী বাদ দিয়া যে পৌরসভা তাহা একটি রোগীর হৃৎ-পিণ্ড বাদ দিয়া বৃথা বাঁচাইবার চেষ্টার তুল্য।"

বিকল্পে রেলওয়ে কলোনীকে বাদ দিয়া ঐ দরিদ্র অঞ্চলগুলিকে কেন্দ্রীয় সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অথবা রাজ্যসরকারের অধীনে Rural Township Project-এর অন্তর্ভুক্ত করিলে দেশবাসীর সত্যকার উপকার সাধন হইত বলিয়া পত্রিকাটি মনে করেন। উপসংহারে পত্রিকাটি লিখিতেছেন,"বৃথা অর্থব্যয় এবং জনসাধারণের অসন্তোষের আশঙ্কায় রাজ্যসরকারকে আমরা এবিষয়ে পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানাই।"

পাটচাষীর উপর নূতন কর

৯ই ভাদ্র "নূতন পত্রিকা" 'কথাপ্রসঙ্গে' লিখিতেছেন, "প্রতি বৎসর মোটা অঙ্কের টাকা ঘাটতি দিতে দিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'বিশেষজ্ঞগণ' এবার রাজস্ব ঘাটতি পূরণের জন্য বিভিন্ন পথ অনু-সন্ধান করিয়া অবশেষে পাটচাষীর নিকট হইতে আরও টাকা বাহির করিবার মতলব আঁটিয়াছেন। কাঁচা পাটের উপর সেস মণপ্রতি ৵০ হইতে ।০ করিবার প্রস্তাব আসিয়াছে। অবশ্য এবারের সাড়ে তের কোটি টাকা ঘাটতির মধ্যে এই খাতে তেত্রিশ লক্ষ টাকার

বেশী পাওয়া যাইবে না। লক্ষণীয় যে, পাটের বাজার যখন মন্দা তখনই এই করভার বসানোর পরিকল্পনা করা হইয়াছে। অথচ যখন ১৯৫০-৫১ সনে ও পরে দেশী-বিদেশী প্রভুরা বিদেশী বাজারে অগ্নিমূল্যের সুযোগে কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠন করিল, এমনকি কেন্দ্রীয় সরকার পর্য্যন্ত রপ্তানী শুল্ক বাবদ কয়েক কোটি টাকা আয় করিলেন তখন আমাদের এই সব পণ্ডিত ব্যক্তি কোথায় ছিলেন? মন্দার বাজারে এই করভার পাটচাষীর উপরই পড়িবে। অথচ যখন তেত্রিশ লক্ষ টাকা কেন, কয়েক কোটি টাকা আয় হইতে পারিত এবং চাষীরও গায়ে লাগিত না তখন চুপ করিয়া থাকার কারণ কি?"

ভূদান সংগ্রহ ও বণ্টন

অখিল-ভারত সর্ব্বসেবা সঙ্ঘের দপ্তরসচিব শ্রীকৃষ্ণরাজ মেহতার বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, ৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে মোট ৩৪ লক্ষ ৫০ হাজার ২০০ একর জমি ভূদান আন্দোলন মারফত সংগৃহীত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে ৭২,৬৯৪ একর জমির বণ্টনকার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। বিহার হইতে সর্ব্বাধিক ভূমি সংগৃহীত হইয়াছে; ভূমির পরিমাণ ২০ লক্ষ ৯৯ হাজার একর। তাহার পরই উত্তর-প্রদেশ হইতে সংগৃহীত ৫,০৫,৯৪৫ একর জমি উল্লেখযোগ্য। রাজস্থান ও হায়দরাবাদ হইতে সংগৃহীত ভূমির পরিমাণ যথাক্রমে ৩,৩১,৯২২ একর এবং ১,০০,৮৭৬ একর। পশ্চিমবঙ্গ হইতে ৩,৩১৫ একর ভূমি সংগৃহীত হইয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জমি বণ্টিত হইয়াছে উত্তরপ্রদেশে—৪৬,৬৬৬ একর। বণ্টন ব্যাপারে হায়দরাবাদের স্থান দ্বিতীয় ১৪,৬১৩ একর এবং রাজস্থানের স্থান তৃতীয়—৫,৩৮৯ একর। পশ্চিমবঙ্গে কোন জমিই বণ্টন করা হয় নাই।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ভূদান সংগ্রহের যে বিবরণী ২১শে আগষ্ট "হরিজন পত্রিকা"য় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত সংগৃহীত ভূমির পরিমাণ ৪,৫৩৭ একর (৩,৩১৫ নহে) দেখান হইয়াছে। তাহা হইতে আরও জানা যায় যে ২৪ পরগণা জেলার ৬টি পরিবারের মধ্যে ৮ একর ভূমি বিতরিত হইয়াছে।

ভারত ও জাপানে মন্ত্রীদের মাহিনা

শ্রীবালজী গোবিন্দজী দেশাই "হরিজন পত্রিকা"য় এক ক্ষুদ্র নিবন্ধে লিখিতেছেন, আয়কর বাদ দিয়া জাপানের প্রধান মন্ত্রী মাসিক ৫৫০ টাকা পান। "জাপানে মাথাপিছু যত আয় ভারতে আমাদের মাথাপিছু আয় তাহার অর্দ্ধেক, কিন্তু জাপানীরা টোকিওর মন্ত্রীকে যত টাকা দেয় আমাদের মন্ত্রীকে তাহার পাঁচ গুণ অধিক দিতে হয় অর্থাৎ মাথাপিছু আয়ের অনুপাতে আমাদের মন্ত্রীদের বেতন জাপানী মন্ত্রীদের দশ গুণ।"

বিহার সরকারের বাংলা ভাষা দমননীতি

"নবজাগরণ" পত্রিকার ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি লিখিত উক্ত পত্রিকার ৯ই শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, যদিও বিহার সরকার মুখে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বড় বড় কথা বলিয়া থাকেন, তথাপি প্রকৃতপক্ষে বিহার সরকারের নীতি হইতেছে বিহার হইতে সর্ব্ব-প্রকারে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উচ্ছেদ সাধন করা।

উক্ত প্রতিনিধি লিখিতেছেন যে, বিহারের বহুস্থানে বাংলা স্কুল তুলিয়া দিয়া তৎস্থলে হিন্দী বিদ্যালয় স্থাপন করা হইতেছে। ছেলের অভাবে হিন্দী বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, কিন্তু সরকারপক্ষের নির্দেশ রহিয়াছে ছাত্র না থাকিলেও হিন্দী স্কুল চালাইয়া যাইতে হইবে এবং তজ্জন্য সরকার নিয়মিতভাবে শিক্ষক-দের মাসিক বেতন যোগাইবেন বলিয়া আশ্বাসও দেওয়া হইয়াছে। ফলে কোন কোন স্থলে মাত্র ৩।৪ জন হিন্দী ছাত্র লইয়া বিদ্যালয় চালাইয়া যাওয়া হইতেছে আর এইভাবে সরকারী অর্থের প্রভূত অপব্যয় হইতেছে এবং অপরপক্ষে অসংখ্য গরীব বাঙালী ছাত্র মূর্খ হইতে বসিয়াছে।

পটকা থানার ধীরোল গ্রামে একটি প্রাইমারী স্কুল বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল; কিন্তু বিহার সরকারের হিন্দী সাম্রাজ্য-বাদী নীতি অনুযায়ী ঐ বাংলা স্কুল তুলিয়া দিয়া সেস্থলে একটি হিন্দী স্কুল স্থাপন করা হইয়াছে। মাত্র ৮।১০ জন ছাত্র লইয়া হিন্দী ট্রেনিং পাস স্থানীয় একজন শিক্ষক শিক্ষকতা করিতেছেন। তিনি বহু চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণ কেহই ঐ স্কুলে ছাত্র পাঠাইতেছেন না।

গোয়ায় অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর পটভূমিকা

"প্রাভদা" পত্রিকায় ১৭ই আগষ্ট প্রকাশিত এক প্রবন্ধে এম. আফোলিন লিখিতেছেন, "ভারতের পর্ত্তুগীজ-অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বার্থে তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা সুষ্ঠু বোঝা-পড়ার উদ্দেশ্যে উপায় নির্দ্ধারণের জন্য ভারত বারবার পর্ত্তুগালের নিকট প্রস্তাব পাঠাইয়াছে এবং পর্ত্তুগীজ সরকারও বারবার সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে, ও স্পষ্টতঃ গোয়ার জনগণের স্বার্থ স্বীকার করিতে গররাজী হইয়াছে। শুধু ইহাই নয়, গত কয়েক মাস যাবৎ ভারতের বিরুদ্ধে তাহার শত্রুতাপূর্ণ কার্য্যকলাপ দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে।"

পর্ত্তুগীজ সৈন্যাধ্যক্ষ এবং কূটনৈতিকদের এই রণোদ্যমের পিছনে রহিয়াছে ভারতের পর্ত্তুগীজ অঞ্চলগুলি সম্পর্কে আমেরিকার ক্রমবর্দ্ধমান আগ্রহ। আমেরিকার আক্রমণাত্মক পরিকল্পনায় এই অঞ্চলগুলির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং বিদেশী সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ হইতে জানা যায় যে, ঐ অঞ্চলগুলিতে মার্কিন সৈন্যাধ্যক্ষদের তত্ত্বাবধানে সামরিক ঘাটি নির্ম্মাণকার্য্য সুরু হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ভারতের বিরুদ্ধে পর্ত্তুগাল সরকারের সামরিক চক্রান্তে পাকিস্থান সরকার পর্ত্তুগীজ যুদ্ধজাহাজগুলিকে করাচী বন্দরে জ্বালানী এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইবার সুযোগ দিয়া যে সকল সাহায্য করিতেছেন, আফোলিন তাহারও উল্লেখ করেন।

পর্ত্তুগাল ১৫৬২ সনে অনুষ্ঠিত ইঙ্গ-পর্ত্তুগীজ চুক্তির উল্লেখ করিয়া ভারতে পর্ত্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চলগুলির উপর পর্ত্তুগালের দাবির ন্যায্যতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে। পর্ত্তুগীজ প্রধানমন্ত্রী সালাজা ন্যাটোর রক্ষণাধীন এলাকা ভারতে পর্ত্তুগীজ অঞ্চলগুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া দাবি করিয়াছেন। আফোলিন লিখিতেছেন, "পর্ত্তুগীজ সরকার কর্ত্তৃক বারবার ন্যাটো চুক্তির ধারাগুলির ও ইঙ্গ-পর্ত্তুগীজ চুক্তির উল্লেখে ভারত-সরকার সঙ্গত রূপেই স্পষ্ট ভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ভারত সেই চুক্তির কোনই মূল্য দিবে না যে চুক্তি তাহাকে বাদ দিয়া সম্পাদিত হইয়াছে।"

পর্ত্তুগীজ পক্ষ পর্য্যবেক্ষক প্রেরণের যে প্রস্তাব করে ভারত তাহা গ্রহণ করে। কিন্তু "স্বার্থসংশ্লিষ্ট মিত্রদের নিকট হইতে আশ্বাস পাইয়া পর্ত্তুগীজ পক্ষ সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের বিরুদ্ধে রাশি পরিমাণ অভিযোগ আনিয়া হাজির করে এবং বলিতে থাকে যে ভারত চালাকি করিতেছে—তাহার মতলব অসাধু, সে তদন্তকার্য্যে বিলম্ব ঘটাইতেছে ইত্যাদি। ন্যাটোর সহিত যুক্ত কয়েকটি পশ্চিমী রাষ্ট্র পর্ত্তুগাল সরকারের এই দাবির সমর্থনে স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করিয়াছে। ভ্যাটিকান রাষ্ট্রও ভারতবিরোধী প্রচারে যোগ দিয়াছে।

ভারতের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের সংগঠিত রূপ এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় মার্কিন ব্লক গঠনের পরিকল্পনার সহিত তাহার সরাসরি সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আফোলিন লিখিতেছেন, "বিদেশী পর্য্যবেক্ষকদের মতে, ভারতবিরোধী এই আন্দোলনকারীদের মতলব হইল মার্কিন অভিভাবকতায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় সামরিক জোট গঠনের প্রতি ভারতের প্রতিকূল মনোভাব এশিয়ার দেশগুলির উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এক দিক দিয়া তাহাকে দুর্ব্বল করা এবং অন্য দিক দিয়া ভারত যাহাতে এই সামরিক জোটের মধ্যে আসে সেই উদ্দেশ্যে তাহার উপর চাপ দেওয়া।

"গোয়াকে কেন্দ্র করিয়া ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখিলে দেখা যায় আমেরিকা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় অবিলম্বে একটি সামরিক জোট গঠনের উদ্দেশ্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, এবং এই উদ্দেশ্য সাধনে সে তাহার হাতের সব ক'টি হাতিয়ারই প্রয়োগ করিতেছে। একটি সামরিক জোট গঠন সম্পর্কে আক্রমণকারীদের এই ব্যস্ততার কারণ হইল যে, যত দিন যাইতেছে আমেরিকার আক্রমণাত্মক পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জনমত তত দানা বাঁধিতেছে।"

সুয়েজ-ঘাঁটি ও ভবিষ্যৎ যুদ্ধ

সুয়েজ-ঘাঁটি হইতে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণের জন্য সম্প্রতি মিশর এবং ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহার সমর্থনে এক প্রবন্ধে ব্রিটেনের এয়ার চীফ মার্শাল স্যর ফিলিপ জুবার্ট লিখিতেছেন, আণবিক বোমা এবং হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের ফলে সমরবিশারদগণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, ভবিষ্যৎ যুদ্ধের প্রকৃতি হইবে বিগত যুদ্ধগুলি হইতে সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। ভবিষ্যৎ যুদ্ধে সহস্র সহস্র সৈন্যের সংঘর্ষ আর হইবে না। আণবিক যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করিয়া সৈন্যদের ছড়াইয়া রাখা, চলাচলের জায়গা রাখা এবং বিমানবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করার উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। এখন কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে বিপুলসংখ্যক সৈন্য মোতায়েন রাখা মোটেই নিরাপদ নয়।

এয়ার চীফ মার্শালের অভিমতে ব্রিটেন যে মধ্যপ্রাচ্যে কোন বড় রকমের যুদ্ধে লিপ্ত হইবে এরূপ সম্ভাবনা খুবই কম। সর্ব্বাধুনিক মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত তুরস্কের সৈন্যবাহিনী মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিরক্ষায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবে। কিন্তু তাহার ফলে যে মিশরের গুরুত্ব হ্রাস পাইয়াছে তাহাও নহে। তবে "অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘাঁটির প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এবং এইটুকু বুঝা গিয়াছে যে, যুদ্ধকালে মিশরীয় জনসাধারণের বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা না থাকিলে ব্রিটেন সুয়েজ ঘাঁটিকে বিশেষভাবে কাজে লাগাইতে পারিবে না।"

আগামী যুদ্ধে বিমানবহরের কার্য্যতৎপরতা অনেক বৃদ্ধি পাইবে এবং দূরপাল্লার রকেট ও আণবিক অস্ত্র ব্যবহারের আশঙ্কাও খুব সম্ভব বাস্তবে পরিণত হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন। "ভবিষ্যতের বোমারু বিমানগুলির গতিবেগ শব্দ অপেক্ষাও অনেক বেশী হইবে এবং রকেটগুলির পাল্লা হইবে ১৫০০ মাইল বা আরও অধিক। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সুয়েজ ঘাঁটির গুরুত্ব বিচার করিলেই ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা যাইবে।

"গত ৭০ বৎসর ধরিয়া ব্রিটিশ সামরিক ও বেসামরিক কর্ত্তারা মিশরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি-প্রচেষ্টায় অনেক সাহায্য করিয়াছেন। সুতরাং মিশর হইতে তাঁহাদের অপসারণ কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়। অবস্থা বিচার করিয়া মনে হয় যে, চীফ অব ষ্টাফদের উপদেশ অনুসারে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট সুয়েজ ঘাঁটি হইতে সৈন্য অপসারণের যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার ফলেই সৈন্য মোতায়েন রাখার অপেক্ষাও ভালভাবে মধ্যপ্রাচ্যে মিত্রশক্তির স্বার্থ রক্ষিত হইবে।"

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে প্রবাসী কার্য্যালয় ১৭ই আশ্বিন (৪ঠা অক্টোবর) হইতে ৩০শে আশ্বিন (১৭ই অক্টোবর) পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা খুলিবার পর হইবে।

এই সূত্রে জানানো যাইতেছে যে, গ্রাহক, বিজ্ঞাপন, ঠিকানা-পরিবর্ত্তন, প্রবাসী-অপ্রাপ্তি—এতদ্‌বিষয়ক চিঠিপত্র "ম্যানেজার প্রবাসী" এই নামে প্রেরিতব্য।

কর্ম্মাধ্যক্ষ, প্রবাসী

অগস্ত কঁত ও প্রত্যক্ষবাদ

ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

আধুনিক দর্শনের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখতে গিয়ে ঊনবিংশ শতকের দর্শনশাস্ত্রীরা একথা বারবার ভেবেছেন যে, এ আলোচনা কাকে দিয়ে শেষ করতে হবে—হেগেল না কঁত ? এ সম্বন্ধে মতভেদের অন্ত নেই। কেউ কেউ মনে করেন যে, কঁতকে দিয়েই এ ইতিহাসের শেষ করা দরকার ; কেননা কঁত জীবনবিচারের এক নূতন পদ্ধতি আমাদের দিয়েছেন। আবার কারও কারও মতে হেগেলই হলেন নব চিন্তার দিগ্‌দর্শক। কাজে কাজেই তাঁকে দিয়েই আধুনিক দর্শন-ইতিহাসের ইতি করা সমীচীন। জেমস্ হাচিসন ষ্টার্লিং বেশ জোরের সঙ্গে হেগেলের সপক্ষে রায় দিলেন। তিনি বললেন :

"I hold schwegler to be perfectly right in closing the history of philosophy with Hegel and not with Comte."

অর্থাৎ, 'সোয়েগ্‌লার তাঁর দর্শনেতিহাসের বিবরণী হেগেলীয় দর্শনের আলোচনা করে যে শেষ করেছেন, এটা আমি খুবই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি। কঁতের দর্শন আলোচনা করে এই ইতিহাস শেষ করা ঠিক হ'ত না।' এখানে অনেকেই হয়ত ষ্টার্লিংপন্থী হবেন। অবশ্য বিরুদ্ধ-বাদীদের সংখ্যাও যে নগণ্য নয়, একথাও সত্য। সে যাই হোক্, একথা অনস্বীকার্য যে আধুনিক দর্শনের ইতিহাসে কঁতের দান অসামান্য। সেই অসামান্যতার জন্যই এই ধরণের বিতর্ক উঠেছে। হেগেলের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে কঁতের নাম করা হয়েছে। আমাদের মতে এই বাদানুবাদের মাধ্যমে আমরা কঁতকে যোগ্য সম্মানই দিয়েছি।

লিউস বললেন যে, বিজ্ঞানগুলোকে পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে দেওয়া এবং ইতিহাস-বিবর্তনের আইনগুলোকে বিধিবদ্ধ করে দেওয়া হ'ল দার্শনিক কঁতের বহুমূল্য গবেষণার ফল। এই অমূল্য দানের জন্য দার্শনিক কঁত বিশ্বজনের কাছে চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন। তিনি ত্রিকালজয়ী হবেন।—লিউসের এই ভবিষ্যদ্বাণী কতখানি সফল হ'ল তার বিচার আরও অনেক পরে। আমরা আজকের দিনে এটুকুই বলতে পারি যে, তাঁর মূল্যনিরূপণ বহুলাংশে বাস্তবানুগ। দার্শনিক মিল এমনি ধরণের কথাই বলেছিলেন কঁত সম্বন্ধে। তাঁর কথা উদ্ধৃত করে দি'। 'ওয়েষ্টমিনষ্টার রিভিয়ু'তে মিল লিখছেন :

"The fundamental merits attributed to Comte are two in number—(*a*) His arrangement of the sciences and (*b*) his so-called law of historical evolution—the metaphysical, the theological and the positive."

দার্শনিক কঁতের মুখ্য গুণ হ'ল দুটো। বিজ্ঞানগুলোকে ব্যাপ্তি-গুণ হিসেবে সাজিয়ে দেওয়া এবং ইতিহাস-বিবর্তনের আইনগুলো আবিষ্কার করা। তাঁর মতে ইতিহাস-বিবর্তন ঘটছে তিনটি কানুনের অনুশাসন মেনে। এই আইন তিনটিকে বলা হয়েছে ধর্মপ্রধান, দর্শনপ্রধান ও প্রত্যক্ষবাদী। কঁতের এই ব্যাখ্যা চিন্তানায়কদের নূতন করে সমাজদর্শনের সমস্যাগুলোকে ভেবে দেখার প্রেরণা জুগিয়েছে। এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। কার্ল মার্ক্স, ফ্রয়েড এঁরা এই একই কারণে আমাদের স্মরণীয়। এঁদের গবেষণার ফলের চেয়ে গবেষণার পদ্ধতি চিন্তাশীল মানুষের অনেক উপকার করেছে। নূতন করে ভাববার, নূতন পথে চলবার প্রেরণা এসেছে এঁদের কাছ থেকে। চিন্তার জগতে তার দাম কম নয়। কঁতও এ ব্যাপারে এঁদের সমানধর্মা। কঁত নূতন পথের দিশারী।

আমরা আজকের দিনে 'S ciology' বা সমাজ-দর্শন নিয়ে অনেক গবেষণা করছি। একথা স্মরণ করা দরকার যে, দার্শনিক কঁত বিজ্ঞানসম্মত পথে সমাজ-দর্শন আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি সমাজবিবর্তনের রীতিপদ্ধতি ও সমাজসংস্থা গঠনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করলেন। ডবলু. কে. রাইট তাঁর দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে কঁতের দানের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বললেন :

"Comte did a valuable service in the introduction of the new science of sociology. He probably has the best claim of anyone to be regarded as its founder and many points to which he was perhaps the first to call attention have become part of the stock in trade of every investigator in the field."

দার্শনিক কঁত এক নূতন সমাজ-দর্শনের অবতারণা করে চিন্তাশীল মানুষের অশেষ কল্যাণ করেছেন। এই নব্য দর্শনের জনক হিসাবে তাঁর দাবি সর্বাগ্রগণ্য। তিনি যে সমস্ত তত্ত্বের ও তথ্যের কথা আমাদের শুনিয়েছেন সেগুলো পরবর্তী যুগের পণ্ডিতেরা অনেকেই অসঙ্কোচে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের তত্ত্বালোচনার প্রারম্ভিক সূত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন। সেদিক থেকে তাঁর দান কম নয়। আপনার

বলিষ্ঠ চিন্তাভঙ্গী ও মৌলিকতার প্রসাদগুণে কঁত দর্শনের ক্ষেত্রে নিজ আসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কঁতের প্রত্যক্ষবাদকে শুধু দর্শন বললেই সবটুকু বলা হ'ল না। এটা তন্ত্রও বটে। একে সংহিত্য বললে ঠিক বলা হ'ল না, একে সমন্বয়ী সংস্থিতিও বলতে হবে। মানুষের বহুমুখী অভিজ্ঞতার বিস্তীর্ণতা ও প্রক্ষিপ্ততাকে সংহত করতে হবে একটি চিন্তাসূত্রে গ্রন্থনের ভিতর দিয়ে একথা কঁত বুঝেছিলেন। তাই ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবনকে প্রত্যক্ষবাদের সামগ্রিক দৃষ্টিতে তিনি দেখেছেন, বিচার করেছেন এর সমস্যাগুলোকে এক নূতন মানদণ্ডের অবতারণা করে। মানুষের বহুধাবিভক্ত জীবনের বিভিন্ন ধারণাগুলোকে সমন্বিত করা হ'ল আমাদের সমাজ-জীবনের অন্যতম বৃহৎ সমস্যা। এই সমন্বয়-সাধন ব্যতিরেকে সমাজের স্থিতি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা অসম্ভব। রুগ্ন সমাজ-জীবনকে সুস্থ করে তুলতে হলে সামাজিক সমস্যাগুলোর সুষ্ঠু সমাধান করতে হবে এবং তা তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা বুদ্ধি দিয়ে জীবনকে বিচার করব। ব্রিজেস এই বুদ্ধিধর্মী আন্দোলন ও সামাজিক সঙ্কটের একটা মিলন ঘটিয়ে দেবার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন। "General View of Positivism" গ্রন্থের ভূমিকায় কঁতের প্রত্যক্ষবাদ সম্বন্ধে তিনি লেখেন :

"It will offer a general system of education for the adoption of all civilized nations and by this means will supply in every department of public and private life fixed principles of judgment and of conduct. Thus the intellectual movement and the social crisis will be brought continually into close connection with each other."

অর্থাৎ, প্রত্যক্ষবাদ একটা সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করবে সমস্ত সভ্য মানুষের মধ্যে। মানুষের চিন্তা ও আচরণের কতকগুলো সুনির্দিষ্ট বিধি প্রণয়ন করে দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে কঁতের প্রত্যক্ষবাদ শৃঙ্খলা আনয়ন করবে। প্রত্যক্ষবাদ যে কেবলমাত্র আমাদের বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলোকে ব্যাপকতর ও বিস্তৃততর ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠা করেছে তাই নয় আমাদের সামাজিক জীবন-রীতিকেও সংহত করেছে। প্রত্যক্ষবাদ প্রচার করেছে প্রেম, শৃঙ্খলা ও প্রগতির কথা, মানুষকে দিয়েছে মহত্তর মানবতার ধারণা। কঁত-প্রবর্তিত এই আন্দোলন প্রথম সুরু হয় ফরাসী দেশে। তারপরে ক্রমে ক্রমে সে আন্দোলন পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বুদ্ধি-আশ্রয়ী প্রত্যক্ষবাদ জীবনকে আশ্রয় করেছে, মানুষের মূল্যবোধের রূপান্তর ঘটিয়ে দিয়েছে আপনার আন্তর-শক্তির গুণে।

উনবিংশ শতকের কোন ফরাসী দার্শনিক কঁতের সমকক্ষ নন, একথা অনেকেই স্বীকার করেছেন। ফলকেনবার্গ বলছেন :

"Among the French philosophers of this century none can compare in far-reaching influence, both at home and abroad with Auguste Comte, the creator of positivism."

প্রত্যক্ষবাদের জন্মদাতা অগস্ত কঁত যেভাবে আপনার প্রভাব ব্যাপ্ত করেছেন, তার সঙ্গে কোন ফরাসী দার্শনিকের কীর্তি তুলিত হতে পারে না।

এই প্রথিতযশা দার্শনিক ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মন্তপেলিয়ার নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সরকারী রাজস্ব-বিভাগের সামান্য কর্মচারী। তিনি ছিলেন ধর্মবিশ্বাসে ক্যাথলিক এবং অতিশয় রাজভক্ত প্রজা। বিশ্বাস করাটাই জীবনের পরম কাম্য ; সে বিশ্বাস রাজার উপর অথবা ভগবানে ন্যস্ত করা কর্তব্য, এটা তিনি মনেপ্রাণে প্রত্যয় করতেন। বালক-কঁত স্থানীয় বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস সুরু করলেন। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মার্জিত রুচি অচিরেই শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। মেধাবী ছাত্র হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। এইখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, মহাদার্শনিক হেগেল ছাত্রাবস্থায় কঁতের মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন না—অন্ততঃ তাঁর সে খ্যাতি ছিল না। ছাত্রজীবনে হেগেল ছিলেন অতি-সাধারণ আর কঁত ছিলেন অনন্যসাধারণ। মাত্র পনর বৎসর বয়সে কঁত প্যারিসের পলিটেকনিক বিদ্যায়তনে প্রবেশপ্রার্থী হলেন। বয়স কম বলে কর্তৃপক্ষ আপত্তি করায় সে বছর আর তাঁর বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ঘটে নি। পরের বছর তিনি বিদ্যালয়ে যোগ দিলেন। গোড়া থেকেই মন দিয়ে পাঠাভ্যাস সুরু করলেন। এখানে তিনি তখনকার দিনের প্রখ্যাত অধ্যাপকদের কাছে গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা অধ্যয়ন করতে লাগলেন। এদিকে ওয়াটারলুর যুদ্ধ আসন্ন। কঁত এবং অন্যান্য ছাত্রেরা জাতীয় সামরিক রক্ষা-ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করবার আবেদন জানিয়ে নেপোলিয়নের কাছে পত্র পাঠালেন। সে আবেদন মঞ্জুর হয়েছিল। ব্যবহারিক জীবন ও মানুষের জীবন-দর্শনের মধ্যে যে একটি আত্মিক যোগ থাকা দরকার, একথা কঁত বাল্যকাল থেকেই বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি কর্মে বিশ্বাস করতেন, অলস জীবন-বাদে তাঁর আস্থা ছিল না। কাজের সময় তাই কঁতকে 'হাতীর দাঁতের মিনারে' বসে দার্শনিক সাজতে কখনও কেউ দেখে নি। কাজের ডাক যখন এসেছে, কঁত তখন এগিয়ে

এসেছেন সবার পুরোভাগে, জনসমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। তাঁর দর্শন হ'ল জীবনশিল্পীর দর্শন—যে দর্শন জীবনকে শিল্প করে তোলে এবং শিল্পকে জীবনের রসে সঞ্জীবিত করে। তাই জাতীয় প্রয়োজনের দিনে কঁতকে আমরা কর্মীর আসনে দেখেছি। অক্ষম বুদ্ধিজীবীর জীবন-দর্শন তাঁকে কখনও মোহগ্রস্ত করতে পারে নি। চলমান মানুষের বলিষ্ঠ জীবনবাদ হ'ল কঁতের। তিনি ছিলেন উপনিষদের 'চরৈবেতি' মন্ত্রের উপাসক। চলাই হ'ল জীবন, কর্মই হ'ল মানুষের প্রাণ।

আর একটি ছোট ঘটনার কথা বলি। এ ঘটনাটি বালক কঁতের চরিত্রের আর একটি দিককে উদ্ঘাটিত করেছে। নেপোলিয়নের পতনের পর আবার বুরবোঁ রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হ'ল। এই নয়া সরকার পলিটেকনিক বিদ্যায়তনটিকে ভাল চোখে দেখতেন না। তাঁদের ধারণা ছিল যে, এটি একটি সাধারণতন্ত্রী দলের আড্ডা। এই বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক এক দিন আরাম-কেদারায় শুয়ে সামনের টেবিলে পা দুটো তুলে দিয়ে ক্লাসে পড়াচ্ছিলেন। কঁত তখন এই শ্রেণীতেই পড়ছিলেন। শিক্ষকের এই অমর্যাদাকর ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। শিক্ষক যখন তাঁকে আবৃত্তি করার জন্য নির্দেশ দিলেন তখন কঁত ঐ শিক্ষকের অনুকরণে ঠিক ঐ ভাবে বসে বসে আবৃত্তি করতে লাগলেন। শিক্ষক মশায় অত্যন্ত রেগে গিয়ে কঁতকে ভর্ৎসনা করলে কঁত যা বললেন তার মর্ম হচ্ছে এই:—'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও'! তিনি আর বেশী গোলমাল করলেন না, তখনকার মত নিরস্ত হলেন। কিছুদিনের মধ্যেই অন্য একটা অজুহাতে কঁত বিতাড়িত হলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো বৎসর। সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থার আর কোন সুযোগই তিনি জীবনে পেলেন না। এর পরে গ্রন্থাগার থেকে বই নিয়ে আর সাধারণের জন্য প্রদত্ত বক্তৃতাগুলো শুনে শুনে তিনি আপনার চেষ্টায় জ্ঞান অর্জন করতে লাগলেন। জ্ঞানলাভের এই পথটি অত্যন্ত জটিল এবং দুরূহ। তবু কঁত দমলেন না। ভাগ্যের বিড়ম্বনা তাঁর পুরুষকারকে উদ্দীপিত করে তুলল। এই অবাঞ্ছিত আঘাত কঁতকে মনুষ্যত্বের পথে নূতন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করল। কঁত সর্বস্ব পণ করে জ্ঞানলাভের জন্য কঠোর সাধনায় ব্রতী হলেন। সহায়হীন, সম্পদহীন তরুণ কঁতের সে কি অক্লান্ত প্রয়াস! সাধনার দীপ জ্বলল লক্ষ শিখার অনির্বাণ জ্যোতিতে। দুঃখ, দারিদ্র্য, অনশন—এরা হ'ল এই জ্ঞানসাধকের নিত্যসঙ্গী।

এই সময়ে কঁতের জীবনে হ'ল সাধু সাইমনের আবির্ভাব। সাইমনকে তিনি গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করতেন। সাইমন তাঁকে প্রিয় শিষ্যের স্থান দিয়েছিলেন। কঁতের কিছু কিছু লেখা প্রকাশিত হ'ল সাইমনের কাগজে। [illegible]৪ খ্রীষ্টাব্দে সাইমন সম্পাদিত "Worker's Political Catechism"-এ কঁতের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ল। প্রবন্ধটির নাম—"A plan for the scientific work necessary to reorganise society". এই প্রবন্ধটি কঁতকে বিদ্বৎসমাজে পরিচিত করল। ভাবীকালের দার্শনিক কঁত সেদিন প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন প্রতিভাবান মানুষের গৌরব নিয়ে।

এর কিছুদিনের মধ্যেই কঁতের জীবনে প্রিয়ার আবির্ভাব হ'ল। ক্যারোলিন ম্যাসিন ভালবাসলেন কঁতকে। পরম আগ্রহে তিনি তাঁর জীবনের প্রথম নারীকে কাছে টেনে নিলেন। সমাজের প্রান্তিক পথে দুটি নরনারীর প্রেম সার্থক হ'ল পরিপূর্ণ মিলনে। ক্যারোলিন ছিলেন পিতৃমাতৃহীনা। তাঁর চরিত্রে কলুষ-কালিমা ছিল, যেমন ছিল সে যুগের প্যারিসে অনেক ছেলেমেয়ের। তবু কঁত তাঁকে বিবাহ করতে এতটুকু ইতস্ততঃ করেন নি। কারণ তিনি জানতেন যে, ক্যারোলিন তাঁকে সত্যসত্যই ভালবেসেছিলেন। ক্যারোলিনও বিবাহের পরে কোনদিন অবিশ্বাসিনী হন নি। যখন কঁতের স্নায়ু-রোগ হ'ল, ক্যারোলিন তখন অবিশ্রান্ত সেবাশুশ্রূষার দ্বারা তাঁকে আবার সুস্থ করে তুললেন। এই সেবাপরায়ণা প্রেমময়ী নারীর কথা কঁত জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গভীর শ্রদ্ধা ও নিবিড় মমতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। ছাড়াছাড়ির পরেও অক্ষুণ্ণ ছিল তাঁদের প্রীতির সম্পর্ক। উভয়ে উভয়কে সাহায্য করেছেন যখনই তার প্রয়োজন হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ঘুচে গেলেও বন্ধুত্বের, প্রীতির সম্পর্কটি অক্ষুণ্ণ ছিল। বরাবর ক্যারোলিন কঁতের সুখদুঃখের খবরদারি করেছেন, আর কঁতও ক্যারোলিনকে সাহায্য করেছেন তাঁর সামান্য আয়ের বেশ একটা মোটা অংশ দিয়ে। উত্তরকালে কঁতের জীবনে অন্য নারীর আবির্ভাব ঘটলেও ক্যারোলিনকে তিনি বিস্মৃত হন নি। ক্যারোলিন ছিলেন তাঁর দুঃখের দিনের বন্ধু প্রিয়সখী ও সচিব।

১৮৪৪ সনে কঁতের জীবনে আর এক নারীর আবির্ভাব হ'ল। মাদাম ক্লোতিলদ ছিলেন রূপসী এবং ধনশালিনী। তাঁর স্বামী জুয়াচুরি করে ফেরার হয়েছিল। পুলিস তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তাই স্বামীর পক্ষে আর প্যারিসে ফেরা সম্ভব হয় নি। অনাশ্রিতা রূপসী নারীর প্রেমে ডুবে গেলেন কঁত। সেযুগের ফরাসী আইনে বিবাহ-বিচ্ছেদের চল না থাকায় কঁত ক্লোতিলদকে বিবাহ করার প্রস্তাব করতে পারলেন না। আর ক্লোতিলদ ছিলেন ধর্মপরায়ণা। তিনি কঁতকে

চেয়েছিলেন বন্ধুভাবে ; তিনি তাঁকে প্রীতির ডোরে বাঁধতে চেয়েছিলেন, প্রেম দিয়ে জয় করতে চান নি। কঁতের প্রতিভা আকৃষ্ট করেছিল কবি ও রসিক ক্লোতিলদকে। ক্লোতিলদ কবিতা ও উপন্যাস লিখেছেন। অবশ্য সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতিলাভ তিনি করেন নি। ক্লোতিলদের এই সংযম এই পবিত্রতা কঁতকে মুগ্ধ করল, তাঁকে একেবারে অভিভূত করে ফেলল। ক্লোতিলদের মৃত্যুর পরে কঁত তাঁকে ভুলতে পারেন নি। তিনি তাঁর প্রিয়ার সমাধি-ভূমিতে সপ্তাহ শেষে একবার করে যেতেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

ক্লোতিলদের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ কঁতের দার্শনিক মতবাদকেও প্রভাবান্বিত করেছিল। জীবন-সায়াহ্নে তিনি এক নূতন ধর্মের প্রবর্তন করার জন্য প্রয়াসী হলেন। ক্যাথলিক ধর্মানুরাগীর ধর্মবোধ ও জীবন-দর্শনকে তিনি শ্রদ্ধা করতে শিখলেন। এর মধ্যেও যে অনেকখানি সত্য আছে সেকথা তিনি স্বীকার করে নিলেন। অবশ্য ক্যাথলিক ধর্মের অনুশাসন এবং অধিকাংশ তত্ত্বগুলোকে তিনি বিশেষ আমল দেন নি। তিনি এগুলোকে বর্জনের পক্ষপাতীই ছিলেন। বিরাট, আদর্শ মানুষের ধারণাকে তিনি ভগবানের সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন। মানুষ ভগবানের স্থান অধিকার করল। মাতা মেরীর পরিবর্তে কল্যাণরূপিণী প্রেয়সী নারীর ধ্যানরূপকে তিনি বেশী মর্যাদা দিলেন—সেই চিন্ময়ী প্রিয়ার ধ্যানে বিভোর হতে শিক্ষা দিলেন মানুষকে। তিনি বললেন যে, মানুষের জীবন-দর্শন শুধু বুদ্ধিকে আশ্রয় করে বাঁচতে পারে না—তার জন্য প্রেম, অনুভূতি আর ভক্তির দরকার আছে। কঁতের মুখে এ ধরণের কথা একটু বিস্ময়কর। এ কথাগুলো কঁতের দার্শনিক প্রত্যক্ষজাত বলে অনেকেই মনে করেন না। তাই কঁতের মৃত্যুর পরে তাঁর অনুগামীদের মধ্যে দুটো দল হয়ে গেল। যাঁরা কঁতের আগেকার মতগুলোকে সত্য বলে মনে করতেন তাঁরা রইলেন এক দলে, আর অন্য দলে রইলেন কঁতের পরিবর্তিত মতের সমর্থকেরা। তাঁর দ্বিতীয় বিখ্যাত গ্রন্থ "The Positive Polity" প্রকাশিত হ'ল ১৮৫১ সনে। চার খণ্ডে বিভক্ত এই সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশিত হ'ল পুরো চার বছর ধরে। এই গ্রন্থে তাঁর পরিবর্তিত মতের কথা সবাই জানতে পেল। এক ধরণের ধর্মের ছোঁয়াচ লাগল কঁতের যুক্তিবাদী প্রত্যক্ষবাদে। কঁতের গোঁড়া শিষ্যেরা এই ধরণের পরিবর্তনকে ঠিক ভাল চোখে দেখতে পারেন নি, যদিও তাঁর মূল দার্শনিক প্রত্যয়ের সঙ্গে এই মতের বিশেষ কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। একটু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে এই মতগুলোকে দার্শনিক কঁতের মূল তত্ত্বকথার পরিপূরক হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। কঁতের এই নূতন ধর্মবোধ তাঁর দার্শনিক তত্ত্বের বিরুদ্ধে যায় নি বলেই আমরা বিশ্বাস করি।

১৮৩০ সন থেকে ১৮৪২ সনের মধ্যে কঁতের সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ "Positive Philosophy" প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থখানি ছয় খণ্ডে বিভক্ত। নির্জনে বেড়াবার সময় কঁত এই গ্রন্থে পরিবেশিত তত্ত্বগুলি ভাবতেন, তার পরে সেগুলি সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে বক্তৃতা করতেন। সবশেষে সেগুলি লিপিবদ্ধ হ'ত। এই ভাবে লেখা চলল। সৃষ্টি হ'ল চিন্তার নব নব ক্ষেত্র। কঁত বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে এই কথাই বললেন যে, আমাদের জ্ঞানের পরিধির মধ্যে রয়েছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনাগুলো এবং তাদের সম্পর্ক। এর বাইরে আমরা কিছুই জানতে পারি না। অতীন্দ্রিয় লোকের কথা কবি-কল্পনা। স্বর্গ, আত্মা, অমরতা—এ সব হ'ল যুক্তিবাদী দার্শনিকের গ্রাহ্যের বাইরের বস্তু। যা ঘটছে তার বাইরে আমরা কিছুই জানি না। নিরীক্ষণ (Observation), পরীক্ষা (Experiment) ও উপমা (Comparison)—এই তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা জগৎকে দেখি এবং বুঝি—বিভিন্ন ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করি, পরস্পরের মধ্যেকার সম্পর্কটুকু অনুধাবন করি। ঘটনাপরম্পরার মধ্যে যেটুকু স্থায়ী সম্পর্ক, সে সম্পর্কটুকু ঘটনাগুলির ধারাবাহী ও সাদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই স্থায়ী সম্পর্কগুলিকে আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম প্রণয়নের ভিত্তিভূমি হিসাবে ব্যবহার করি।

কাজেকাজেই জ্ঞানকে আপেক্ষিক বলা হয়েছে। অনাপেক্ষিক জ্ঞান কবি-কল্পনা। আমরা শুধু দেখি ঘটনা-স্রোতের প্রবাহ—দেখি ঘটনাপারম্পর্য। ক ও খকে অনিবার্য যোগসূত্রের দ্বারা গ্রথিত দেখি। খ ক-কে অনুসরণ করে। যখনই ক-এর আবির্ভাব ঘটে তখনই খ-এর আবির্ভাবও অনিবার্য কারণেই ঘটে। এই সদা পুরোগামী ঘটনাটিকে অনুগামী ঘটনাটির কারণ রূপে অভিহিত করা হয়। এই কার্য-কারণ সম্বন্ধটির জ্ঞান আবার ব্যবহৃত হয় আমাদের প্রাত্যহিক জীবন ও মননের প্রয়োজনে। আমরা যখন কোন কার্যের কারণ অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করি, তখন হয় আমরা ভবিষ্যতে সেই কার্যটিকে অতি দ্রুত সম্পন্ন করতে চাই অথবা তার আবির্ভাবকে ব্যাহত করতে চাই। কার্য-কারণ সম্বন্ধটির সঠিক ধারণা না থাকলে এর কোনটি করাই সম্ভবপর নয়। কখনও কখনও কার্যটির যথার্থ আবির্ভাবের সময়টুকু আমাদের ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটানোর ব্যাপারে অনেকখানি সহায়তা করে। ঘটনা-পারম্পর্যের উপর আমাদের প্রভুত্ব তখনই আসতে পারে যখন—যে নিয়মের বশবর্তী এই ঘটনাগুলো, সেই কানুনগুলো

আমাদের জ্ঞানগোচর হয়। কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত ঘটনা-প্রবাহের এই জ্ঞান অনাপেক্ষিক জ্ঞান নয়—এ হ'ল আপেক্ষিক। বেকন ও দেকার্ত-বর্ণিত অনাপেক্ষিক তত্ত্বে কঁত বিশ্বাস করেন নি। পরম সত্যের অনাপেক্ষিক জ্ঞানের ধারণা কঁতকে কখনই প্রলুব্ধ করে নি। সদাজাগ্রত তীক্ষ্ণ বাস্তববোধ কঁতকে এক দিকে বেকন ও দেকার্তের 'আইডিয়ালিজম্', অন্য দিকে দার্শনিক হিউমের 'এম্পিরিসিজম্'-এর প্রভাব থেকে মুক্ত করেছে। কঁতের প্রত্যক্ষবাদ ঘটনাপারম্পর্যের সত্যতাকে মেনে নিয়ে স্বীকার করেছে সেই সর্বব্যাপী প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে যাদের বশবর্তী হয়ে বিশ্ব-সংসারে লীলা চলেছে অহরহ।

কঁতের মতে বিজ্ঞানের জীবনেতিহাস তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করে। ধর্মপ্রধান, দর্শনপ্রধান ও প্রত্যক্ষধর্মী স্তর। এই স্তর তিনটিকে বলা হয়েছে বিজ্ঞানের শৈশব, কৈশোর ও যৌবন। বিজ্ঞানের প্রথম অবস্থায় মানুষ বিশ্বাস করে অতিপ্রাকৃত দৈবী ব্যক্তিত্বে। প্রকৃতির সবকিছুতে মানুষ দেবত্বের আরোপ করে। বৃক্ষে, প্রস্তরে, বর্ষণে, বিদ্যুতে সে দেবতাকে প্রত্যক্ষ করে। এ দেবতা পূজায় পরিতুষ্ট হন, আবার অবহেলিত হলে মানুষের মতই রুষ্ট হন। এই দেবতাদের খেয়ালখুশিতেই প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো ঘটে। তার পরে মানুষের বুদ্ধির পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এই বহুদেববাদ একেশ্বরবাদে পর্যবসিত হয়। মানুষ বিশ্বাস করে একটি দেবতার অবিচ্ছিন্ন মহিমায়, তাঁর অপ্রতিহত প্রভুত্বে। এই দেবতা হলেন মানুষের পরিণত বুদ্ধির আবিষ্কার।

তার পরে এল দর্শন-অবস্থা। দেবতারা ছুটি নিলেন। মানুষ কল্পনা করল একটা নৈর্ব্যক্তিক সত্তার। কঁত একে বলেছেন 'force' বা 'power'—আবার কখনও এই ঐশী শক্তিকে 'Nature' বা প্রকৃতি বলা হয়েছে। এই প্রকৃতি কতকগুলো নির্দিষ্ট আইন মেনে বাঁধা পথে চলে। কোন খেয়ালখুশির অবকাশ নেই প্রকৃতির রুটিনবাঁধা জীবনে। মহাদার্শনিক আরিস্টটল যাকে 'Vegetative soul' আখ্যা দিয়েছেন তা হ'ল কঁতের এই 'দর্শন-অবস্থা'র শক্তিটুকু। সবশেষে প্রত্যক্ষধর্মী বা 'পজিটিভ' স্তর এল। কোন ব্যক্তি অথবা নৈর্ব্যক্তিক শক্তির কল্পনা এখানে নেই। এই 'পজিটিভ' অবস্থায় বিজ্ঞান বিশ্বাস করে অপরিবর্তনীয়, অপ্রতিরোধ্য প্রকৃতির নিয়মের অস্তিত্বে। এ আইনগুলো নির্ভর করে সাক্ষাৎকার ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর। এখানে কল্পনার কোন স্থান নেই। তবে কঁত একথা স্বীকার করেছেন যে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যাখ্যা করা যায় না। এই মৌলিক কানুনগুলোর ব্যাখ্যা করতে হলে যেন-তেন-প্রকারেণ মানুষের অভিজ্ঞতাকে উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই। এই ভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞানের অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে—এই স্তরত্রয়ীর মধ্য দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করছে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান।

আবার মানুষের মনোবিবর্তনও ঘটছে এই পথেই। মানুষের মন পরিণতিলাভ করছে এই তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে। প্রথম সে শক্তিশালী দৈব ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করে তার অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করে; তার পর নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব আশ্রয় করে; সর্বশেষে মানুষের মন অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত যে বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক নিয়ম তাকে আশ্রয় করে জীবনকে ও জগৎকে বুঝতে চেষ্টা করে। কঁত বলেছেন—বিজ্ঞানবিবর্তন ও মানুষের মনোবিবর্তন একই ধারাকে, একই রীতিকে আশ্রয় করে। কোন্ বিজ্ঞান কোন্ স্তরকে আশ্রয় করে আছে এ সম্বন্ধে কঁতের মত খুবই সুস্পষ্ট। এই মানদণ্ডের সাহায্যে কঁত বিজ্ঞানগুলির শ্রেণীবিভাগ করেছেন—যেগুলিকে তিনি 'abstract' বিজ্ঞান বলেছেন। কঁতের মতে এই ধরণের ছয়টি বিজ্ঞান আছে এবং তিনি তাদের এই ভাবে সাজিয়েছেন—(১) গণিতশাস্ত্র, (২) জ্যোতির্বিদ্যা, (৩) পদার্থবিদ্যা, (৪) রসায়নশাস্ত্র, (৫) শারীরতত্ত্ব, (৬) সমাজ-বিজ্ঞান। এই শ্রেণীবিভাগে জটিলতর বিজ্ঞানগুলিকে পিছন দিকে স্থান দেওয়া হয়েছে। প্রথম স্থান পেয়েছে গণিতশাস্ত্র। কঁতের মতে এই শাস্ত্রটিই হ'ল সরলতম এবং অন্যান্য বিজ্ঞানকে এটির সাহায্য নিতে হবে। এই ভাবে ঐ শ্রেণীবিভাগে যে বিজ্ঞানটি যত বেশী মৌলিক (Fundamental) এবং সরল সে বিজ্ঞানটি তত আগে স্থান পেয়েছে। কঁত মনস্তত্ত্বকে এই শ্রেণীতে স্থান দেন নি। তিনি মনস্তত্ত্বকে শারীরতত্ত্বের অংশ হিসাবে দেখেছেন। তাই তার জন্য পৃথক আসনের বন্দোবস্ত হয় নি। নীতিশাস্ত্রকেও এই শ্রেণীবিভাগ থেকে কঁত প্রথম বাদ দিয়েছিলেন। অবশ্য পরবর্তী কালে তাঁর "Positive Polity" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে তিনি সপ্তম বিজ্ঞান হিসাবে নীতিশাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন।

এখন কঁতের সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে দু' কথা বলি। কঁতের সমাজবিজ্ঞানের দুটো অংশ—Statics এবং Dynamics—স্থাবর এবং জঙ্গম। স্থাবর অংশে আমরা সমাজের স্থিতির কথা শুনি। সমাজ-শৃঙ্খলা কেমন করে রাখতে হবে, কেমন করে সমাজ-জীবনকে সুস্থ ও সবল করে তুলতে হবে, তাকে সুদৃঢ় ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এ সব তত্ত্ব আমরা শিখি এই অংশে। মানুষের ধর্ম, কলা, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি ও শিল্পনীতিকে একটা সমন্বয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে

হবে। মানুষের মননধারার এই বিভিন্ন প্রকাশকে অঙ্গাঙ্গি ভাবে সম্বন্ধ হিসাবে গণ্য করতে হবে। এদের যে-কোন একটিতে বিপ্লব ঘটলে অন্যটিতে তার ঢেউ এসে লাগে। একথা ইতিহাস বারে বারে বলেছে। যে-কোন একটি বিভাগে ভারসাম্যের অভাব ঘটলে মানুষের জীবন বিপর্যস্ত, বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মানুষের সমস্ত কর্মের যাচাই হবে সমষ্টির কল্যাণের কষ্টিপাথরে। প্রত্যক্ষবাদ এই অনুশাসন জানায় যে, প্রত্যেকটি মানুষকে অপরের কল্যাণের জন্য, অপরের মঙ্গলের জন্য ভাবতে হবে, কাজ করতে হবে। একথা আমাদের সব সময়ে স্মরণ রাখতে হবে যে, 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

'জঙ্গম' অংশে সমাজের বিবর্তনকে, প্রগতিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সমাজকে একটি সুমহান্ বৃহৎ ব্যক্তিরূপে কল্পনা করা হয়েছে এবং এই 'সমাজ-ব্যক্তি'র অগ্রগতি তখনই সম্ভব হয়েছে যখন মানুষের পশুভাব দেবভাবের কাছে নতি স্বীকার করেছে। তখনই সমাজ এগিয়েছে যখন মানুষের কাছে পশু-জীবন-রীতির মূল্য গেছে কমে, যখন মানুষ আদর্শের জন্য সর্বস্ব পণ করেছে। এই অগ্রগতিকে সম্ভব করেছে মানুষের শুভবুদ্ধি। মানুষের মহৎ প্রচেষ্টার আনুকূল্যে মানুষেরই কল্যাণ সাধিত হয়েছে এবং এই মহান্ প্রয়াসের সঙ্গে মানুষের শুভবুদ্ধির যোগ হ'ল অবিচ্ছেদ্য। এই 'ইনটেলেক্ট' মানুষকে শুভের পথে যেতে সহায়তা করেছে। কেবলমাত্র ভাবাবেগ কখনই কল্যাণপ্রসূ হতে পারে না। তার সঙ্গে বুদ্ধি যুক্ত হওয়া দরকার। ব্যক্তি-জীবনে ও সমাজ-জীবনে কঁত এই বুদ্ধি ও হৃদয়াবেগের সর্বাঙ্গীণ সুষ্ঠু সংযোগকে মানুষের কল্যাণের অগ্রদূত হিসাবে দেখেছেন। জন ষ্টুয়ার্ট মিলও বুদ্ধি এবং হৃদয়াবেগের এই মিলনের প্রশস্তি গেয়েছেন। তিনি তাঁর "Auguste Comte and Positivism" শীর্ষক গ্রন্থে ভাব (Idea) এবং হৃদয়াবেগকে (Feeling) তরণীর কর্ণধার ও বাষ্পাবেগের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কর্ণধার যেমন করে উত্তালতরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রপথে তরীকে চালনা করে ঠিক তেমনি করে মানুষের বুদ্ধি মানুষের জীবনতরণীকে নিরাপদে সমস্যাসঙ্কুল সংসারসমুদ্রে পরিচালনা করে। হৃদয়বৃত্ত যেন বাষ্পাবেগ। গতি আসে সেখান থেকে। সে গতি অন্ধ। তাকে চক্ষুষ্মান করে বুদ্ধি। তাই কঁত তাঁর সমাজ-দর্শনে বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির সুষ্ঠু সংযোগকে সমাজকল্যাণের ও ব্যক্তি-কল্যাণের পক্ষে অপরিহার্যরূপে গণ্য করেছেন। কঁতের এ তত্ত্ব পরবর্তী যুগের প্রায় সকল দার্শনিকই অভ্রান্ত সত্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এখানে মতভেদের অবকাশ নেই।

অবনীন্দ্রনাথ

শ্রীকালিদাস রায়

যে ধন লভিলে তুমি করি চিরসুন্দরের ধ্যান
তার কাছে তুচ্ছ সব প্রজ্ঞান-বিজ্ঞান।
অপরূপে দিলে তুমি অভিনব রূপ।
সুন্দরের শ্রীমন্দিরে তোমার জীবন ছিল ধূপ,
মন্দির উত্তরি গন্ধ আমোদিল আকাশ বাতাস,
সুরভি করেছে তাহা মোদেরো নিশ্বাস।

যে আনন্দ ক্ষরিয়াছে সহস্র ধারায়
শিবজটা সমতুল্য তব তুলিকায়
তায় অবগাহি' মোরা লভিয়াছি মুক্তির আস্বাদ
তাই ত এ মর্ত্যভূমে অমৃত প্রসাদ
সুন্দরের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ।

ভারতের রসময়ী রূপাশ্রিতা সংস্কৃতির ধারা
মরুবালুকার তলে হয়েছিল হারা।
তাহারে উদ্ধারি' পুন বহাইলে তুমি কলস্বনে
বর্ণ-রেখা তটের বন্ধনে।
তার কলধ্বনি
যত রসপিপাসুর হ'ল আমন্ত্রণী।
যাহা ছিল ভারতের বিশ্বের হইল তাহা আজ
তাই তোমা পূজে ঋষি সার্ব্বভৌম রসিকসমাজ।
মহাকবি, কাব্য তব সার্ব্বভৌম ভাষায় রচিত
বাগ্দেবীর কিরীটে তা মণিসম রহিল খচিত।

দিবসের অর্দ্ধভাগ প্রদীপ্ত করিল যবে রবি,
তুমি তার স্নেহপ্রভা লভি',
স্নিগ্ধ অমৃতাংশু হয়ে উজলিলে বাকি অর্দ্ধভাগে
হৃদয়-কুমুদ লক্ষ বিকশিল তড়াগে তড়াগে,
মোরা ভাগ্যবান্
ভুঞ্জিয়াছি প্রাণ ভরি' উভয়েরই দান।

মেজ জামাইবাবু বাড়ী এলেই প্রথম জিজ্ঞাসা করতেন, "কৈ পিসীমা কোথায় ?"

আর যেখানেই থাকুন পিসীমা, কাছে থাকলে সামনে দাঁড়িয়ে, আর দূরে থাকলে হাঁক পেড়ে—বলতেন, "এই যে, যাই, বাবা যোগীন,—ও নয়নতারা, যোগীনকে চৌকিখানা পেতে দে। আর বলে দে ঝুপ্ করে যেন চলে না যায় ; আমার কথা আছে।"

কথা কি তা মেজ জামাইবাবুর জানা। পিসীমা না আসা পর্য্যন্ত তাঁর নড়বার সাধ্য নেই। (ধীর শান্ত প্রকৃতির মানুষ। হোমিওপ্যাথি প্রাকৃটিস করেন। দোহারা চেহারা, পরিপুষ্ট অবয়ব ; ভরন্ত দুটো চোখে মানবতার দীপ্তি, হাস্য-সমুজ্জ্বল মুখ। ভরা গালের ওপর খুব ছোট করে ছাঁটা সপ্তম এডওয়ার্ডের দাড়ি। হাসলে হাসি ঝরে পড়ত মুখে, চোখে, সমগ্র পরিবেশটিতে। গায়ে সাদা লংক্লথের পাঞ্জাবীর উপর কাশী-সিল্কের চাদর পাট করে রাখা। হাতে রূপার সিংহমুখ-বসানো মোটা লাঠি। পায়ে বাদামী ফুলস্লিপার। প্রশস্ত ললাট, টাক নেই। তবে মাথার মাঝখানটিতে ফাঁকা ; চেহারার মধ্যে মনভরা সদাপ্রিয় ভাবটি আছে।)

পিসীমার কথার উত্তর দেওয়া মেজ জামাইবাবুর দরকার ছিল না। তিনি জানতেন পিসীমা যথারীতি আসবেন—আসবেনই। তিনি বলবেন তাঁর রোগের কথা। রোগও গত বিশ বৎসর যাবৎ একই। চিকিৎসাও এই মেজ জামাইবাবুই করছেন ; এবং তিনিই করতে পারেন। বিশ বৎসর চিকিৎসার পরেও রোগের উপশম নাই। কিন্তু পিসীমা বলতেন, "যোগীন, ও ধন্বন্তরী"।

বাড়ীতে এসেই তিনি ঠাকুরদালানের সামনেটায় তাঁর পেটেন্ট চৌকিখানায় বসতেন। পাঞ্জাবী আর চাদর খুলে রাখতেন থামে বাঁধা তারের উপর। লাঠিটা অবশ্য লুকিয়ে রাখতেন। বড়দাদার ছেলেরা সারাদিন ঘোড়ার অপেক্ষায় থাকত। ঐ লাঠিটি পেলে তাদের ঘোড়ায় চড়ার সখ মিটবে। কি করে জানি না, ওরা অমন মুখব্যাদান-করা কেশরীর মুখটাতে ঘোড়ার প্রতিচ্ছবি দেখত। সিংহে চড়াটা যে সভ্যতার বিরোধী, তা ওরা বুঝতে পেরে ঐ একখানি রূপালি মুখের দৌলতে ঘোড়ায় চড়ার রসাস্বাদন করত।

ফলে বেচারি জামাইবাবুর লাঠি যথাসময়ে খুঁজে পাওয়া দুর্ঘট হ'ত। রাত ন'টায় ঘোড়সওয়ারেরা নিদ্রাগত। তাদের কল্পলোকের রাজবাড়ীর আস্তাবল যে কোথায় তা আবিষ্কার করা বিশেষ দুরূহ ব্যাপার। তাই লাঠিটাকে তিনি যেমন যত্ন করে সাবধানে রাখতে ছাড়তেন না, লাঠিটাও তেমনি সময়মত অশ্বত্ব লাভ করে পলাতক হতে ছাড়ত না। গায়ের নিমাটি সন্তর্পণে খুলে চেয়ারের পিঠটায় শুকোতে দিয়ে আদুল গায়ে বসতেন উঠান 'আলো' করে।

বসতে না বসতেই আট-দশটি ছেলেমেয়ে জড়ো হ'ত—"পিসেমশাই গল্‌কো বল।" হাসির ফোয়ারা ছুটত কারুর মুখে ; "কি বোকা গো ! শুনছ পিসেমশাই, রাণু দপোল্‌কে গল্‌কো বলে !"..."সেদিনের সেই কুমীরের ল্যাজ চুরিরটা বল।"..."না-না, শ্যাল্ পণ্ডিতের টোলটা।"...

এর পরেই বড়বৌদির আগমন।

"কি গো তোমার কি খবর ?" মেজ জামাইবাবু জিজ্ঞাসা করেন বড়বৌদির কোল থেকে মীনুকে নিয়ে।

—"কৈ মাথা ধরাটা ত যাচ্ছে না ; সন্ধ্যে হলেই মাথা ভন্ ভন্ করতে থাকে।"

"কর্তাকে বল টিপে দিতে !" হাসির ফোয়ারা ছোটে।

রাগত স্বরে বৌদি বলেন, "আপনার খালি ঠাট্টা—আমার বলে..." ততক্ষণে আর একজন এসে গেছে।

"শ্যামা যে। ক'দিনের জন্য এলে? থাক্ থাক্ প্রণাম করতে হবে না। কেমন আছ? শ্বশুরবাড়ীর খবর ভাল? রাজেশ কেমন আছে?"

বৌদি বলেন, "ক'দিন আর কি; ক'মাস বলুন।"

একগাল হেসে বলেন মেজ জামাইবাবু, "ও! খোকা কোলে করে ফিরবে। হ্যাঁ, মা বলছিলেন বটে।"

এর মধ্যে মা এসে পড়েছেন। "যোগীন, তোমার ভরসাতেই শ্যামাকে আনা। ওকে দেখে শুনে একটা ওষুধ দাও।"

শ্যামাদি জড়োসড়ো হয়ে পালিয়ে যায়।

মা বলেন, "আদিখ্যেতা মেয়ের। শরীরের কথা হচ্ছে, মেয়ে পালাল, মরে যাই; লজ্জার কি ছিরি মা!"

হাল্কা নরম সুরে সয়ে নেওয়া হাসিতে মন ভাসিয়ে মেজ জামাইবাবু বলেন, "আহা যাক যাক, প্রথমটায় লজ্জা হবে বৈ কি! বেশ, বেশ, দেব ওষুধ। আপনার ব্যথা কেমন?"

মা চটে যান, "চিতায় যেদিন চড়ব সেদিন কাঠের গুঁতোয় সারিও এ ব্যথা।"

হা-হা-হা করে হাসতে থাকেন মেজ জামাইবাবু। যেন ছোট ছেলে বকুনি খেয়ে হাসছে।

হঠাৎ অন্ধকারের দিকে চেয়ে হাঁক পাড়েন, "কৈ গো, অন্ধকারে পানকৌড়ির মত ডুব মারছ কেন? এগিয়ে এস।"

মেজবৌদি একটু নিরালা খুঁজছিলেন, "দিন না জামাইবাবু একটা কিছু। সন্ধ্যে হতে না হতে ঘুম পেলেই গেরস্তর বৌর চলে? এই নিয়ে নিত্যি জ্বালা···কত সয়?"

জামাইবাবুর কাছে সব রোগের দাওয়াই। এ রোগেরও দাওয়াই আছে "সে হবে। আপাততঃ একটা মজা হয়েছে। বায়স্কোপের পাস পেয়েছি—সেকেণ্ড শো। পারবে কত্তাকে রাজী করাতে?"

"হেই জামাইবাবু, আপনি মাকে বলুন জামাইবাবু—"

"কিন্তু যদি ঘুমিয়ে পড়···" দুষ্টুমিভরা চোখে তাকান হোমিওপ্যাথ ডাক্তার।

"যান্ ভারি দুষ্টু ত;" লজ্জা পেয়ে চলে যান মেজবৌদি।

ছেলেদের দলের কিচির মিচির। কারুর কান পেকেছে; কেউ সন্ধ্যে হতে না হতে চেঁচায়, 'পোকা কামড়াচ্ছে'—সবই এই মেজ জামাইবাবুর দায়িত্ব।

তিনি কিন্তু ততক্ষণ ফাঁকে ফাঁকে গল্প বলে চলেছেন,

"···না-না-শ্যালটা ভয় পাবে কেন? কাইজারের বাগানের শ্যাল—জর্ম্মান-সম্রাটের বাড়ীতে চুরি করত, সে কখনও ভয় পায়?"

"তার ল্যাজ কত মোটা ছিল পিসেমশাই?"

"কি রং ছিল তার?"

"···বলছি বলছি—সব বলছি। এ বাড়ীর বৌয়েদের চুলের মত মোটা ল্যাজ। আর রং ছিল নারদের দাড়ির মত! কথা কইত যখন, তখন সবাই ভাবত চীনের ড্রাগনই বুঝি বা···"

বড়বৌদি রান্নাঘরে। মেজবৌদি মার কাছে গিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর করছেন। শ্যামা বাক্স গোছাচ্ছে।

মেজ জামাইবাবু উঠি উঠি করছেন। কৈ পিসীমা, আমি আজ উঠি।"

"এই যে, এসু বাবা—এসু।···হেই মা, গেল গেল—যা!" আর্তনাদ উঠল পিসীমার কণ্ঠস্বরে।

মেজ জামাইবাবু বললেন, "কি হ'ল পিসীমা, কি হ'ল। ও ছোটবৌ দেখ দেখ, ভাঁড়ার ঘরে পিসীমার কি হ'ল?"

"হবে আবার কি! হয়েছে আমার কপাল। এই আঁধারে কানামানুষ, দেখতে পাই? দিনু আচারের হাঁড়িটা উল্টে। ঈ-ই-শ! এক হাঁড়ি তেল গা! কি অপ্‌চো, কি অপ্‌চো!"

মার গলা শোনা গেল, "মরতে আলোটা নিবিয়ে রেখেই বা কাজ কেন?" আলো জ্বেলে কাজ করার ধাত ছিল না পিসীমার। বেশী কাজ অন্ধকারেই সারতেন। আজকালকার ঝি-বৌদের কথায় কথায় আলো টেপা যেন এক আদিখ্যেতা।

সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দৃশ্য দেখে মা এত জোরে হেসে উঠলেন যে সঙ্গে সঙ্গে পিসীমার মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল।

মা বললেন, "মর ঢুলে ঢুলে কাজ করে; গেল ত এখন সব?"

পিসীমার আঁতে ঘা লাগল। "হিঁ গো, আমি ত ঢুলছি; ভারি ঢুলুনি দেখছ আমার। বিমি বামনি না থাকত ত বুঝতে। যোগীনেরও যেমন তাড়ার অন্ত নেই। সেই থেকে পিসীমা আর পিসীমা। ইস্—আমার ছোড়দার হাড়-ভাঙা তেল গা! তেল রে, মশলা রে, এত খাটা খাটনি রে, সব গেল।"

বলছেন, আর হাতে করে তেল তুলে তুলে হাঁড়িতে রাখছেন।

পাছে আচার অপবিত্র হয়ে যায় তাই একখানা গামছা পরে অন্ধকারে পিসীমা আচার গোছাচ্ছিলেন। সত্যিই ত ঐ বেশে কেউ আলো জ্বেলে কাজ করতে পারে না!

কাজলের কালি তোলার জন্য' ভাঁড়ারের এক কোণে একটা নতুন সরায় কালি পাড়া ছিল। তাতে হাত লেগে তেলে-কালিতে হাত ভরতি। তারই দাগ পিসীমার সারা মুখে। আচমকায় গামছাখানা আলগা হয়ে যাওয়ায় মাটিতে চেপে বসে পড়েছেন তিনি। হাত জোড়া; উঠতে পারছেন না—মা সামলে দিলেন। সামনেটায় হাঁড়িটা উল্টানো। মেঝেময় তেল। গোলমালে বেড়ালটা লাফ মেরে পালাতে গিয়ে বেলের মোরব্বা-রাখা বড় পাথুরে গামলাখানায় আটকা পড়েছে। মোটা চটচটে রসে চার পা একত্র করে পিঠটা ধনুকের মত বাঁকিয়ে উপরে তুলে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করছে। ঘাবড়ে গিয়ে পালাতে পারছে না।

হঠাৎ তার দিকে নজর পড়াতে পিসীমার যত রাগ পড়ল গিয়ে তার উপর। কি একটা ভারি জিনিষ তুলে যাই তাকে মারতে গেলেন—সেটা দিলে উঠ্-কিস্তি, আর আর হাতের নোড়াটা গিয়ে পড়ল পিছনের দিকে রাখা জালাটায়। ভেঙে গেল সেটা। জলে থৈ থৈ হয়ে গেল এই নিমেষের কুরুক্ষেত্র।

"হাবাতি ঐ বেড়ালটা খালি তক্কে তক্কে ঘুরছে। হাঁড়ি ওল্টানোর ভয়ে তুই অমন ঐ টোঙ্গ থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়বি ত পড় আমার কপালখানায়। গেল ত মোরব্বাগুলো। সব্বনাশী, সব্বনাশীকে আজই গঙ্গার ওপারে রেখে এস যোগীন।"

হাসতে হাসতে মা চোখের জল মুছছেন। একঘর লোক জড়ো। বাচ্চারা কিলিবিলি লাগিয়েছে। মা বললেন, "আবার ওটা ছুঁড়ে মারতে গেলে কেন?"

"মারবে না, আদর করবে!...যাও, যাও; ভারি হাসি তোমাদের! আমার মরণ নেই। রাতের পর রাত মনিষ্যির ঘুম না থাকলে মনিষ্যি কি করবে? করছি এই ঢের।"

মা ততক্ষণ হাত ধরে তুলেছেন পিসীমাকে। "নাও, ঢের করেছ। এখন যাও। তোমার ঘুমের ওষুধ নাও গিয়ে যোগীনের কাছে, নৈলে ও চলে যাবে।"

মার হাতে ভাঁড়ার ছেড়ে আসতে আসতে বললেন, "পার সামলাতে সামলাও। তবে তা হচ্ছে না। এই বিমি বামনি ছাড়া কারুর সাধ্যি নেই এই রাবণের ভাঁড়ার সামাল দেয়।"

"হ্যাঁ ঢের ত সামাল দিয়েছ। এখন জামাইয়ের কাছে যাবার আগে রূপ ঢেকে যাও।"

পিসীমা গামছাখানার উপরেই একখানা কাপড় জড়িয়ে চললেন জামাইবাবুর কাছে। "হ্যাঁ যাবে বৈ কি! যোগীন

হি গো, আমি ত ঢুলছি; ভারি ঢুলনি দেখেছ আমার।
বিমি বামনি না থাকত ত বুঝতে

আর আমার জন্যে থাকবে কেন? পিসীমা ত ওদের চোখের শূল!"

জামাইবাবু উঁচু গলায় হাসতে হাসতে বললেন, "সে কি কথা, সে কি কথা। কি হ'ল আপনার? আসুন দেখি। সত্যি এত খাটাতেও পারে এরা আপনাকে। বৌগুলো কোন কম্মের নয়—জানেন পিসীমা। অথচ রোগটা যে কতখানি হয়েছে আপনার কেউ ধারণা..."

"তার আর নতুন কি? তোমার ওষুধগুলো মা-গঙ্গার গর্ভে ফেলে দিয়েসো যোগীন। কাল চোপর রাত্তি ঘুম হয় নি। আজ পাঁচ বছরের মধ্যে যে মনিষ্যি ঘুমুল না তার শরীলে কি কোন পদাথ্থ থাকে?"

অনিদ্রা পিসীমার হাড়ের রোগ। সারাদিন কাজ করেন আর ঢোলেন। ফলে কত যে লোকসান হয় আর কত যে রসের সৃষ্টি হয়, তার ইয়ত্তা নেই। কত দিন তাঁর পূজার আসনের সুমুখ দিয়ে, তাঁর ধ্যান-নিমীলিত আঁখির সামনে দিয়ে কোশাকুশী, মায় পিতলের রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি পর্য্যন্ত সরে

গিয়েছে তার আর ঠিক নেই। চোখ চেয়ে হাউমাউ করে উঠেছেন, "ঐ ছোড়দার কাণ্ড, আর কারুর নয়।"

বাবা বলতেন, "ঠাকুর জাগ্রত পূজারী দেখে বৈকুণ্ঠে সীট রিজার্ভ করতে গেছেন।"

কতদিন গঙ্গার ঘাটে সূর্য্যপ্রণাম করতে গিয়ে আর ওঠেন না। খেতে বসে মাখা ভাতে হাত দিয়ে বসে বসে ঢুলুনি। সাবানকাচা করতে গিয়ে ঢুলুনি! কি ভাগ্যি গঙ্গায় ডুব দিতে গিয়ে কখনও ঘুমিয়ে পড়েন নি। তবে পথ চলতে চলতে ঢুলুনি ছিল; ফলে ষাঁড়ের গুঁতো, দেয়ালে কপাল ঠুকে যাওয়া, পথচারীর ধাক্কা এবং গাল খাওয়ার অন্ত ছিল না।

সারাদিন ঢুলতেন। অথচ রাত্রে ঘুম নেই। গা পেতে শুলেই সজাগ হতে হয়, "ঐ যাঃ, রবির সকালের জলখাবারটা বোধ হয় ঢাকা দিয়ে আসি নি।" উঠতে হয়।

জামাইবাবু ওষুধ দিয়ে উঠলেন। বলে গেলেন, "আজ জবর ওষুধ। খুব ঘুম হবে। কিন্তু রাত করবেন না খেতে। দশটার সময় খেয়ে নেবেন, বাকী রাত দিব্যি ঘুমুবেন।"

ঔষধের মোড়কটি আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে বললেন, "মুখে তোমার ফুল-চন্নন পড়ুক বাবা; তোমার ওষুদ-না-ধন্বন্তরি। আমিই আবাগী, কপালখানা আমার। ওষুদই যদি কাজ করবে তা হলে ওষুদ কি আর কম হয়েছিল? তবে আর সাত-সকালে সব খোয়ালাম কেন?"

পিসীমার নয় বৎসর বয়সের বৈধব্য নিয়ে তিনি এমন আপশোশ বজায় রেখেছেন এতকাল ধরে। পিসেমশায়কে তাঁর ততটা মনে নেই অবশ্য।

ওষুধ দিয়ে জামাইবাবু চলে যান।

হাঁক পেড়ে পিসীমা বললেন, "ও ছোটবৌদি, ভাই, রাত দশটায় মনে করিয়ে দিও না!"

রান্নাঘরে কথাটা শুনতে পেয়ে সবাই মুখটেপাটেপি করে হাসল, চাপা গলায় মা ধমকে দিলেন, "ও কি তোদের বল ত! টের পেলে এখুনি গরর্ গরর্ করবে।" গলা উঁচু করে বললেন, "হাঁ দেব ঠাকুরঝি। যত্ন করে রেখ।"

খাওয়াদাওয়া সেরে সবার শুতে শুতে রাত এগারোটা পেরিয়ে গেল। ওষুধের কথা তৃতীয় বারের মত স্মরণ করিয়ে, মা নাতিকে সকালে দুধ খাওয়াবার বাটি-ঝিনুক নিয়ে উপরতলায় চলে গেলেন। পিসীমা মনে মনে বললেন, অর্থাৎ, আপনার মনে জোরে জোরে বলে চললেন (মার ভাষায় গরর্ গরর্) "বড়দা চৌষট্টি যোগিনীর জপ সেরে আসবেন মাঝরাত পেরিয়ে। ধম্মের আর শেষ নেই। আমারই যত অধম্মো। রেখে যাব খাবারটুকু, পোড়াকপালে বেড়াল কোত্থেকে এসে দস্যিপনা করে যাবে'খুনি। নিশ্চিন্দি হবার জো কি? বামুনকে খিদিত্তি রেখে ত আর রাঁড়ি-মানুষ কতক ওষুদ গিলতে পারি নি। সে ত এঁটো দেয়াই হ'ল। তোমরা সব ভাগ্যিমতী, তোমাদের কথাই আলাদা। খেলে দেলে ঘুমুতে চললে।"

সদরে নাড়া পড়ল। ঘড়িতে বারটা বাজল। জ্যেঠা-মশায়ের খড়মের শব্দ পাওয়া গেল। হাঁক এল নীচে থেকে— "জেগে আছ নাকি কেউ?" অর্থাৎ, জ্যেঠামশায় আর উপরে উঠবেন না। নীচের শিবদালানেই থাকেন উনি। রাতের জলপানি, অর্থাৎ, দু-চার কুচি ফল আর একটু দুধ নীচে নামিয়ে দিতে হবে।

পিসীমা বললেন, "যাই! হ'ল পুজো? ধন্যি পুজো! কত পাপই করেছিলেন জম্মো জম্মো। এ জম্মটা ধুয়ে ধুয়েই খইয়ে দিলেন।"

...হঠাৎ সিঁড়ির মধ্যে চেঁচিয়ে উঠেন, "উহু উহু।" বড্ড লেগেছে বোধ হ'ল।

নীচে এসে বাটি রেকাব রেখে বললেন, "বড্ড হোঁচট খেয়েছি গা। যা উঁচু চৌকাঠ সিঁড়িটার। গেছে নখের চাকলাটা উড়ে, এখন এই পেরার কদ্দিন চলল কে জানে!"

জ্যেঠামশায় বললেন, "ভালই হ'ল, গহনা হবে।"

"গহনা হবে না ছাই!" বলে শিবের মন্দিরের প্রদীপ থেকে খানিকটা তেল গড়িয়ে নিয়ে ক্ষতস্থানটায় টিপে টিপে দিতে লাগলেন।

আস্তিক জ্যেঠামশায় বললেন, "মরবে কুষ্ঠ হয়ে। শিবের প্রদীপের তেল পায়ে দিচ্ছ, সাহসও হয় তোমাদের!"

পিসীমা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "আমার কুষ্ঠ হবে না, হবে ঐ আপনার শিবের। দেখতে পায় না শিব আপনার? তিনটে ত চোখ! আমার ত মোটে একটা। (ছেলে-বেলায় বসন্তে পিসীমার একটা চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।) চোপর দিন রাবণের গুষ্টি সামলাচ্ছি। মুখে ফ্যাকা উড়ে যায় খাটতে খাটতে। হ'ত আপনার শিবকে এই হ্যাপা সামলাতে, বাঘছালখানা ফেলে ছুটে পালাতে পথ পেত না। বসে বসে রাজভোগ খাচ্ছেন আর পিদিমের তেল পোড়াচ্ছেন। নিলাম ত নিলাম, কাজে লাগল। উনি বোঝেন না কিছু; বুড়ো-হাবড়া, ন্যাকা।"

"উঃ কি সুভাষিণী তুমি; আর কি ধর্ম্মপ্রাণা!...আর বেদাঙ্গচর্চ্চা থাক। শিবের মাথায় পা চাপাও তুমি। এখন যাও, শোও গে।"

রেকাব আর বাটি তুলে নিয়ে জায়গাটায় গোবরন্যাতা

বুলুতে বুলুতে বললেন, "হ্যাঁ শোব ; একেবারে শোব সেই কাঠে, তার আগে নয়। মলাম এখন হোঁচট খেয়ে। দপ্-দপানিতে মরব কতক্ষণ কে জানে!" গরর্ গরর্ করতে করতে উপরে চলে গেলেন।

চারতলা বাড়ীর সবাই তখন ঘুমুচ্ছে। জেঠামশায় দালানের আলো নিবিয়ে দিলেন। ঘড়িতে তখন একটা বাজে। পিসীমার শোবার ব্যবস্থা করা দরকার। চারখানা কুশাসন ভাঁড়ারের সামনের বারান্দায় পেতে তার উপর পাট করে দুখানা ছেঁড়া কাপড় বিছালেন। তার পর বসলেন পা ছড়িয়ে মন্ত্র আওড়াতে—"ঔষধে চিন্তয়েৎ বিষ্ণুঃ..." বলতেই ঔষধের কথা মনে পড়ে গেল। 'তাই ত! ওষুদটা খাওয়া হয় নি ত।' সে কাপড়খানা আবার রেখে এসেছেন দক্ষিণের ঘরে। সেখানে এখন ওরা হয়ত খিল দিয়েছে।

উঠলেন পিসীমা। দোর খোলা। বাচ্চারা সব শুয়েছে। আর শুয়েছে শ্যামা। ভূতো, নেবু, চন্নন সবাই শুয়ে আছে। "ওমা, চন্ননাটা ত এখুনি বিশের ঘাড় মটকাবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দস্যি মেয়ে ঘুমুলে আর কারুর নয়।" ওদের ছাড়িয়ে দিয়ে সোজা করে শুইয়ে দিলেন। "ভূতোর গা-টা ছম্‌ছম্ করছে অথচ আদুড় গায়ে শুয়ে আছে দেখ না, জর এল বলে। তখন 'যা বিমি বামনি সাবু আন্' 'যা বিমি বামনি ডাক্তার আন্।'...বৌগুলো যেন আজকাল কি। শুবি বাপু নিজেদের-তা নিয়ে থুয়ে শো'না। তা নয়, এক ঘরে চালান করে দিয়েছে।...হতেও কসুর নেই, হেনস্তা করতেও কসুর নেই। যেটের বাছারা সব। কত জনার বুক হা-হা করছে এই সোনা বুকে না ধরতে পেরে।" কোথাও পেলেন না ভূতোর জামা। আবার গেলেন তেতলার ঘরে, সেজবৌকে তুলে ভূতোর জামা নিয়ে ভূতোকে পরিয়ে দিলেন; ভূতোর কান্না থামালেন। ইতিমধ্যে মীনুটা দিলে মাঝখানটা ভিজিয়ে। "আচ্ছা, শোয়াবার সময় তোরা মায়েরা একটু দেখে শুনে শোয়াতে পারিস না? এখন উপায় কি করা যায় বল্ ত?" মীনুকে সরিয়ে একটা জামা ছাড়িয়ে, আর একটা পরিয়ে, কাঁথা একটা পাট করে পেতে তার উপরে শুইয়ে দিলেন।

ওষুধটা কাপড় থেকে খুলে পরনের খানায় আবার বেঁধে যখন বাইরে এলেন তখন সপ্তর্ষি ঢলে পড়েছে তাল গাছটার আড়ে। দুটো বাজে; সির্ সির্ করে বাতাস দিচ্ছে। উঠান পার হয়ে বারান্দায় শুতে যাবেন; আবছা আলোয় চোখে পড়ে গেল জল ভরবার পাইপটা পড়ে আছে।

পিসীমা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "আমার কুঠ হবে না, হবে ঐ আপনার শিবের..."

বাসনমাজার পরে ঝি-মহারাণী আর বেঁধে দিয়ে যাবার ফুরসত পান নি। সেই ভোরে জল আসবে। চৌবাচ্চাটি ভরে না থাকলে সকালে যে হা-হন্যে লেগে যাবে। তখন কি মুখ হাত পা ধোবে সব হাওয়ায়? বাঁধতে লাগলেন সেই জলের পাইপ। কলটা খুলে দিয়ে পাইপের অপর মুখ চৌবাচ্চার সঙ্গে বেঁধে দিয়ে চললেন শুতে।

বিছানায়...অর্থাৎ সেই বিছানায় বসলেন পা ছড়িয়ে। একটু পা দুটো টিপলেন। আকাশপানে চাইলেন। পোড়া চাঁদও আজ আগেভাগে সরে পড়েছে। কপালখানা আর কি। সবার বিশ্রাম আছে, নেই এই বিমি বাম্‌নির।

চাঁদের কথায় মনে পড়ে যায়। "ওমা কাল ত শীতলা-অষ্টমী। সকালবেলায় দাদার শেতলার নৈবিদ্যি চাই। বামনের ঘরে জন্মানো গেরো...ছোলা ভেজানো হয় নি যে। হায়রে ভাগ্য!" চললেন পিসীমা ভাঁড়ারে। ঢুকতেই সেই আচারের তেল-ছড়ানো মেঝেয় পা হড়কে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিলেন গুড়ের হাঁড়িটা ধরে। গুড়গুলো

গড়িয়ে পড়ে গেল। নেহাত পেতলের হাঁড়ি তাই ভাঙল না। এসব পিসীমার সওয়া ব্যাপার। একে ইনি গ্রাহ্য করেন না। ছোলা বার করে ধুয়ে বাটিতে ভিজিয়ে চাপা দিয়ে শুতে যাবেন।

"যোগীন দিয়ে গিয়েছিল ওষুদ। রাতে ঘুম নাই আজ তিন মাস। ওষুদ দিচ্ছেও, খেয়েও যাচ্ছি ; ঘুম আর হয় না..."

এইবার রাত আর নেই। বৈকুণ্ঠ বাবাজীর আখড়ায় পাগলটা চেঁচাতে সুরু করেছে—"রামনাম লাড্ড গোপাল-নাম ঘিউ ; কৃষ্ণনাম কটোরিয়া ঘোরঘার পিউ।" শুয়ে পড়লেন গা এলিয়ে পিসীমা। শুয়ে শুয়ে মনে পড়ে গেল "ঐ যাঃ, বড়দা ত সদর বন্ধ করেন নি বোধ হয়। মরুকগে আর যেতে পারি না। ওদের তা ওরা ভুগবে, আমি আর কত দেখব।" পাশ ফিরে শুলেন পিসীমা, কিন্তু ঘুম আসে না। আবার উঠলেন। গজর গজর করতে করতে নীচে নামলেন। সদর দিতে গিয়ে দেখেন, সদর বন্ধ। উঠে যাচ্ছিলেন। জ্যেঠামশায় ডাক দিলেন, "কে!" পিসীমা বললেন, "আমি। সদরটা দিয়েছেন যে বড়? কোনদিন ত দেওয়া হয় না, আজ দয়া হল যে বড়!"

শুয়ে শুয়ে জ্যেঠামশায় উত্তর দিলেন, "একটু আগে উঠেছিলাম, দেখি তোমার হুঁস হয় নি তাই দিয়ে দিলাম। অপরাধ হয়ে থাকে বল, খুলে দিচ্ছি।"

"এই সব কথাতেই ত পিসীমার রাগ হয়। আচ্ছা দিয়েছিলে ত দিয়েছিলে। হাঁক পেড়ে বলতে ত পারতে কথাটা। তা হলে ত আর এই তেতলার সিঁড়ি ভাঙতে হ'ত না।" বাবা পা দুটো যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। উপরে গিয়ে একটু জিরুলেন। তারপর পাখাখানা নিতে গেলেন পাশের ঘরে।..."দেখেছ মেজ-বৌমার কাণ্ড! তুলোটুকুনি দেওয়া হয়েছিল সলতে ক'টা পাকিয়ে রাখতে। ভোরের আরতি যখন ছোড়দা করতে নামবেন তখন কি ঐ বুড়োমানুষ সলতে পাকাতে বসবেন? একটু যদি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানগম্যি থাকে আজকালকার ঝি-বোয়ের।...কেবল সাজনগোজন আর কি সব সিনেমা-বায়স্কোপ।"

বসলেন পিসীমা রাত সাড়ে তিনটায় সলতে পাকাতে। শেষ করলেন চারটেয়। উপরের ঘরের শেকল খুলল। বাবা বেরুলেন। কেদারের মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বেজে উঠেছে, শোনা যাচ্ছে। বাবা উঠে সোজা ছাদের পূবধারে গিয়ে গঙ্গার পানে চেয়ে প্রণাম করলেন।

সিঁড়ি নামতে নামতে জিজ্ঞাসা করলেন, "ও কি বিমি, এই ভোরে জল খাচ্ছ, শরীর ভাল আছে ত?"

পিসীমা বললেন, "পোড়া কপাল শরীরের। যোগীন দিয়ে গিয়েছিল ওষুদ। রাতে ঘুম নেই আজ তিন মাস। ওষুদ দিচ্ছেও, খেয়েও যাচ্ছি ; ঘুম আর হয় না। সেই ওষুদটুকু খেলাম।"

—বলে পিসীমা তাঁর প্রসিদ্ধ বিছানায় গড়িয়ে পড়লেন। ঘুমুতে লাগলেন বোধ হয়।

বাবা একটু হাসলেন। খানিকটা পরে এসে একখানা চাদর দিয়ে পিসীমার শরীরটা ঢেকে দিলেন।

ভোরের বাতাসে হিম।

বাবা আরতি সেরে গঙ্গায় চললেন প্রাতঃস্নান করতে।

মেসাঞ্জোর বাঁধ

শ্রীবিদ্যাধর রায়বর্মণ

মনে হয় মায়াপুরীতে পৌঁছে গেছি। দু'ধারেই পাহাড়। বাঁ-দিকে উঠে গেছে পাঞ্জন পাহাড়ের উঁচু চূড়া—এই পাহাড়ের নিম্নতর অংশে গড়া হয়েছে এই পুরী। এখান থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তা নেমে গেছে প্রাকারের অভিমুখে। ডানদিকে চলেছে সাতবর পাহাড়ের সারি। দুই পাহাড়ের সারিকে পৃথক করে মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে ক্ষুদ্র এক স্রোতস্বতী—ময়ূরাক্ষী।

মেসাঞ্জোরে ময়ূরাক্ষী নদীতে বাঁধ তৈরি হচ্ছে। সাঁওতাল পরগণার প্রধান শহর দুমকা হতে প্রায় বার মাইল দক্ষিণ পূর্ব দিকে ছোট্ট গ্রাম মেসাঞ্জোর। আসবার মুখে একটা হাট দেখলাম, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের একটা ইন্স্পেকশন বাংলোও আছে। আজ এই মেসাঞ্জোরের নাম লোকের মুখে মুখে। গ্রাম বাঁধের পিছন দিকে—বাঁধের নির্মাণ-

ভূ-বিদ্যার ছাত্র পাথর ভাঙ্গিতেছে
ফটো—শ্রীতুষার সিংহ

কার্য্য শেষ হলে গোটা গ্রামকে গ্রাম জলের তলায় ডুবে যাবে। তাই লোকেদের এখান থেকে সরানো হচ্ছে। অনেকে ইতিমধ্যেই অন্যত্র চলে গেছে। বহু ঘর খালি পড়ে আছে। যেগুলিতে লোক আছে, সেগুলিও শ্রীহীন। হাট এখনও হয়—কিন্তু হাটের জলুস নেই। চালাগুলি ভেঙে পড়েছে। বাঁধের বুকে নামের স্বাক্ষর রেখে কত যুগের পুরনো এক গ্রাম চিরতরে অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

শুধু মেসাঞ্জোর নয়, সব মিলিয়ে প্রায় গোটা নব্বই গ্রাম এই ভাবে জলের তলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অপসারিত লোকেদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হচ্ছে অন্যত্র। কৃষকদের জমির বদলে জমি বা টাকা দেওয়া হচ্ছে। নূতন জমির মোট উৎপাদন-ক্ষমতা সমান হবে—সুতরাং জমি উৎকৃষ্টতর হলে তার পরিমাণ কম হবে, অপকৃষ্ট হলে বেশী। প্রথম প্রথম অপসারিত লোকেদের কষ্ট হচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই তবে সেচ-অঞ্চলের সুযোগ-সুবিধা তারা পাবে বলে

বাঁধ তৈরির পাথর
(সাদিপুরের পাহাড় হইতে গৃহীত দৃশ্য)
ফটো—শ্রীতুষার সিংহ

শেষ পর্যন্ত তাদের অবস্থা আরও ভালই হয়ে উঠবে। নূতন জায়গায় বসতিস্থাপনও ততটা কষ্টকর নয়, যতটা হচ্ছে বাপ-পিতামহের ভিটে এবং জমিজমা চিরকালের জন্য ছেড়ে যাওয়া।

দুমকা হতে মেসাঞ্জোর আসার রাস্তাটির অবস্থাও অতি শোচনীয়। পাথর-বের হওয়া এবং ছোট বড় গর্তে ভরা রাস্তায় গাড়ী চালানো প্রাণান্তকর ব্যাপার। নদী ধরে বাঁধের পিছন দিকে দুমকার প্রায় দু'তিন মাইলের মধ্যে গিয়ে জল জমে উঠবে। রাস্তাটি ডুবে যাবে বলে তার আর যত্ন নেওয়া হচ্ছে না—পাথর কেটে একটা নূতন রাস্তা তৈরি হচ্ছে দুমকার দিকে।

বাঁধ তৈরির উপযুক্ত জায়গা এটি। ডাইনে-বাঁয়ে পাহাড়, এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড় পর্যন্ত বেঁধে দিলেই নদীর ধারা আটকা পড়ে। দৈর্ঘ্যে খুব বেশী নয়—বাঁধের উপরকার রাস্তাটি হবে মাত্র ২০৬৭ ফুট। তা হলেও, রিজার্ভয়ারের (জলাধারের) ক্ষেত্রফল কম নয়। গ্রীষ্ম ঋতুতেই তা হবে প্রায় পাঁচ বর্গমাইল—বর্ষার দিনে বেড়ে যাবে আরও প্রায় তিন গুণ। আশপাশের ৭১৮ বর্গমাইল পরিমিত স্থান থেকে জল এসে এই জলাধারে জমবে।

ময়ূরাক্ষী-পরিকল্পনায় জলসেচের ফলে যে যে জেলা উপকৃত হবে তার মধ্যে প্রধান হ'ল বীরভূম। তার পরেই মুর্শিদাবাদ, তা ছাড়া বর্দ্ধমানেরও কিছু অংশ। এদিকে সাঁওতাল পরগণাও কিছু পরিমাণে জলসিঞ্চিত হবে।

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের জলসেচ-পরিকল্পনাগুলির মধ্যে ময়ূরাক্ষী-পরিকল্পনাই বৃহত্তম। মোট ব্যয় পড়বে সাড়ে পনর কোটি টাকা—ছ'লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা হবে। সেচ-অঞ্চলের ধান এবং অন্যান্য রবিশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে শতকরা একশ' ভাগ। শুধু তাই নয়, ৪০০০ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ-শক্তিও উৎপন্ন হবে এর পাশাপাশি।

মেসাঞ্জোর বাঁধ—সম্মুখভাগ হইতে
ফটো—শ্রীডি. ভি. কাম্বে

অল্প খরচে এই বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও সাঁওতাল পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে। জলপ্রবাহ-নিয়ন্ত্রণের ফলে লোকের বন্যাভীতিও দূর হবে। উৎপাদনবৃদ্ধি ও বিদ্যুৎ-সরবরাহের দৌলতে, আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে এই সকল অঞ্চল সমৃদ্ধিশালী হবে।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ভূ-বিদ্যার ছাত্র আমরা এখানে এসেছি ভূতাত্ত্বিক অভিযানে। আমাদের অধ্যাপক ডক্টর সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় এখানে 'চার্ণকাইট' নামক এক জাতীয় শিলা আবিষ্কার করেছেন। খালি চোখে এই শিলা কৃষ্ণ-ধূসর, গ্রিজের মত চকচকে। এই জাতীয় শিলা প্রথম হল্যাণ্ড সাহেব আবিষ্কার করেন দক্ষিণ ভারতে। সেখানে চার্ণকাইট 'প্রাথমিক' বা 'আগ্নেয় শিলা'—ভূগর্ভ হতে উত্থিত স্থানীয় শিলায় (country rock) অণুপ্রবিষ্ট গলিত ম্যাগমা জমে উৎপন্ন। এখানে কিন্তু চার্ণকাইট 'পরিবর্তিত' (metamorphic) শিলা—আগে অন্য ধরণের ছিল, পরিবর্তনের ফলে চার্ণকাইটে পরিণত হয়েছে। বাঁধ তৈরির পর এর অনেকটা জায়গা জলে ডুবে যাবে, তাই সময় থাকতে পাথর সংগ্রহের চেষ্টাতেই বিশেষ করে আমাদের এখানে আসা।

এখানকার ইঞ্জিনীয়াররা আমাদের সঙ্গে যে সহৃদয় ব্যবহার করেছেন, তা ভুলবার নয়। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাঁধের ইঞ্জিনীয়ারিং তথ্য ও তত্ত্ব তারা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয় এস্-ডি-ও মিঃ চক্রবর্তীর কথা। বাঁধের কাজে প্রয়োজনীয় পাথর যে সব খাদ থেকে আনা হচ্ছে আমরা সেগুলি পরিদর্শন করবার জন্য তাঁদের কাছ থেকে 'পিক-আপ' এবং তাঁদের সাহচর্য দুই-ই পেয়েছি।

বলেছি এখানকার শিলা পরিবর্তনজাত। মাইক্রোস্কোপ ও অন্যান্য পরীক্ষায় তা ত ধরা পড়েই—এখানে এসে মাঠের মধ্যেই আমরা যা প্রমাণ পাই তাও বড় কম নয়। খাদের মধ্যে অনেক জায়গায় কৃষ্ণবর্ণের শিলা এবং হাল্কা রঙের শিলার সংযোগ দেখা যায়। অনেক জায়গায় সাদা গ্র্যানাইট বা ফেলস্পার-মিনারেল-বাহী পদার্থ শিরা-উপশিরার মত কৃষ্ণশিলার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এগুলি হ'ল গ্র্যানাইটীকরণ বা ফেলস্প্যাথীকরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তলা থেকে গ্র্যানাইট-বাহী এবং ফেলস্পার-বাহী তরল পদার্থের ইনজেকশন হয়েছে, যা শিলার আদি প্রকৃতিতে পরিবর্তন আনতে চেয়েছে। এখানকার শিলার বৈশিষ্ট্যের ঘন-ঘন পরিবর্তনও তাদের পরিবর্তিত প্রকৃতির সাক্ষ্য দেয়। খালি চোখেই বুঝা যায়, সামান্য দূরে দূরেই শিলার রঙ এবং মিনারেল সমাবেশ অল্পবিস্তর পরিবর্তিত হচ্ছে। এখানকার শিলা প্রথমে অসমস্বত্ব পাললিক শিলা ছিল মনে হয়, তাই পরিবর্তিত হওয়ার পরও তাদের অসমস্বত্বতা কিছু কিছু রয়েই গেছে। খাদের মধ্যে আজকের কঠিন কেলাসিত (crystalline) শিলার ভাঁজও (fold) লক্ষ্য করা গেল। কেলাসিত শিলায় চাপ পড়লে তা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তাতে ভাঁজ পড়ে না। ভাঁজ পড়ে পাললিক শিলার স্তরে। সুতরাং বর্তমান শিলা ভাঁজ-পড়া পাললিক শিলা হতেই পরিবর্তিত হয়ে উৎপন্ন হয়েছে, কিন্তু আদি শিলার গঠন-প্রকৃতি বজায় রয়ে গেছে। মাঠের মধ্যে এসব জিনিষ দেখা খুবই চিত্তাকর্ষক। ভূতাত্ত্বিককে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাটির উপরের শিলা দেখেই অনেক কিছু অনুমান করতে হয়, মাটির ভিতরে এত সামনাসামনি দৃষ্টিনিক্ষেপ করবার সুযোগ খুব কম ঘটে। খাদগুলি থাকায় সে সুবিধাটুকু হ'ল।

যাক্ সে কথা। এখানকার পাথরগুলি কিন্তু বেশ শক্ত। ফলে সুবিধা হয়েছে এই যে, বাঁধের কাজে প্রয়োজনীয় পাথর আনতে দূরের কোন জায়গার উপর নির্ভর করতে হয় না—কোন খাদই বাঁধ থেকে পাঁচ মাইলের বাইরে নয়। কাজে লাগাবার আগে এই সব পাথরের কঠিনতা, আপেক্ষিক গুরুত্ব ইত্যাদি গুণ পরীক্ষা করে নেওয়া হয়েছে।

এবার বাঁধের কথা বলি। বাঁধটি দু'ভাগে বিভক্ত—একদিকে একুশটি স্পিলওয়ে, আর একদিকে ছ'টি স্লুইস দরজা। বাঁধের সামনের দিকে দুই অংশের মাঝামাঝি উপর থেকে নীচে পর্যন্ত পাঁচিল এই উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছে

যেন স্পিলওয়ের জল স্লুইসের দিকে না আসে। স্পিলওয়ে-গুলি হচ্ছে জল উপচে পড়ার জন্য। বর্ষায় জল যথেষ্ট উঁচুতে উঠলেই উপর দিয়ে বয়ে যাবে। বাকী অংশে জল কখনও উপচে পড়বে না—স্লুইস দরজা দিয়ে নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখে জলকে ছাড়া হবে। স্লুইসের দিকে বাঁধের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪০৮ ফুট। স্পিলওয়ের মাথার উচ্চতা ৩৮৮ ফুট। ৪০৮ ফুট লেভেলে বাঁধের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ১৮ ফুটের এক রাস্তা চলে যাবে। স্পিলওয়ে অংশে স্পিলওয়ে আর রাস্তার মধ্যে ফাঁক থাকবে। গরমের দিনে রিজার্ভয়ারে জলের উচ্চতা হবে ৩৪৯ ফুট, বর্ষায় ৩৯৮

ময়ূরাক্ষী ভবন—তীরচিহ্নিত

ফটো—শ্রীতুষার সিংহ

ফুট। সুতরাং বর্ষায় স্পিলওয়ের উপর প্রায় দশ ফুট উঁচু জলরাশি বয়ে চলবে। স্লুইস দরজাগুলির আকার ৪´৬´´×৪৮´৬´´ এবং স্পিলওয়েগুলির ৩০´×১৫´। স্লুইস দরজা-গুলি দিয়ে সেকেণ্ডে ১৩০০০ ঘন ফুট এবং স্পিলওয়েগুলি দিয়ে সেকেণ্ডে ২২৬,২০০ ঘনফুট জল নিষ্কাশিত হতে পারে।

সমস্ত বাঁধটি একসঙ্গে গড়ে তোলা হচ্ছে না—খণ্ড খণ্ড করে কয়েকটা ব্লকে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক ব্লকের চারপাশে বাইরের খানিকটা অংশ শুধু কংক্রিটের গাঁথুনি—ভিতরে পাথরের চাংড়া সিমেন্টের সঙ্গে জমিয়ে বসানো হচ্ছে। দুটো ব্লক যেখানে জোড়া লাগবে সে জায়গায় উপর-নীচে চওড়ামত কয়েকটি খাঁজ রয়েছে যেন তারা পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে থাকে!

জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করার জন্য স্লুইস দরজাগুলির মাঝ-খানে দুটি পেনষ্টক পাইপ রয়েছে। এগুলির মধ্য দিয়ে জল বেগে এসে পড়ে টারবাইন ঘোরাবে—যা থেকে উৎপন্ন হবে জলবিদ্যুৎ। পাইপ দুটির ব্যাস ৬ ফুট এবং দুই মুখে তাদের লেভেলের পার্থক্য প্রায় ১৫ ফুট।

মিঃ চক্রবর্তী আমাদের ইনস্পেকশন গ্যালারীর মধ্যে নিয়ে গেলেন। এটি একটি ৫´×৮´ সুড়ঙ্গ বাঁধের তলদেশ দিয়ে দৈর্ঘ্যের সমান্তরাল এ পাশ থেকে ও পাশ পর্যন্ত চলে গিয়েছে। সব বাঁধেই এই ধরণের একটা গ্যালারী থাকে।

মেসাঞ্জোর বাঁধ—পিছন দিক হইতে

ফটো—শ্রীতরুণকমল বর্মা

ইঞ্জিনীয়াররা নিয়মিত ভাবে এই গ্যালারীর মধ্য দিয়ে বাঁধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। যদি দেখা যায়, কোন জায়গা দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ছে, তবে সেখান দিয়ে উচ্চ চাপে সিমেণ্ট পাঠানো হয় ছিদ্র বন্ধ করার জন্য। গ্যালারীর রাস্তার ধারে ধারে কতকগুলি পাইপ মাথা বের করে রয়েছে দেখা গেল। এই পাইপগুলি উচ্চ চাপে জলীয় বাষ্প এবং সিমেণ্ট পাঠানোর কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ভিত্তি খোঁড়া হয়, কঠিন শিলা পাওয়া যায়, কিন্তু তাতেও ত অনেক সূক্ষ্ম-স্থুল ফাটল থাকে। উচ্চ চাপে জলীয় বাষ্প পাঠিয়ে আগে সেই-গুলি ধুয়ে নেওয়া হয়, তারপর উচ্চ চাপের সাহায্যেই সিমেণ্ট পাঠানো হয়—ফলে সমস্ত ভিত্তিমূলই নিরেট হয়ে উঠে। নদীগর্ভ থেকে ভিত্তি প্রায় পঞ্চাশ ফুট গভীর। ভিত্তিমূল থেকে বাঁধের উচ্চতার সর্বোচ্চ পরিমাণ ১৫৫ ফুট। কাজে-কাজেই বাঁধের প্রায় ১০০ ফুট উঁচু জল আটকে রাখবার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। ভিত্তি যখন তৈরি হচ্ছিল তখন নদীতে একটা অস্থায়ী মাটি-পাথরের বাঁধ বেঁধে নদীর জল অন্য একটা খাল দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

মেসাঞ্জোর বাঁধ! আয়তনে ছোট, কিন্তু এর সর্বাঙ্গীণ সৌষ্ঠব-সম্পাদনের জন্য কি বিপুল আয়োজন চলেছে! হাজার হাজার কুলি অনবরত কাজ করে চলেছে, মিস্ত্রী এবং ইঞ্জি-নীয়ারদেরও কাজের বিরাম নেই। বাঁধের প্রাথমিক কাজ সুরু হয়েছিল ১৯৪৯ সনে, আর এর নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হবে ১৯৫৫ সনের জুলাইয়ে। দৈনিক আট ঘণ্টা করে কাজ। বড় পাথরের চাংড়া এবং সংমিশ্রিত সিমেণ্ট-বালি আনীত হচ্ছে বড় বাঁধের তলায়। সেখান থেকে ক্রেনে বা বৈদ্যুতিক-

শক্তিচালিত বাকেটে সেগুলি উঠে যাচ্ছে বাঁধের মাথায়। দূরে দূরে ছড়িয়ে-থাকা পাথরের খাদগুলিতে ড্রিলিং-মেশিন দিয়ে গর্ত্ত করে পাথরের গায়ে পোরা হচ্ছে বারুদ, তারপর তা ফাটানো হচ্ছে। সারাদিন ধরে ভাঙা-পাথরগুলো মজুরেরা মাথায় বয়ে উপরে তুলবে আর জমা করবে খাদের ধারে। পাহাড়-সমান জমে উঠছে পাথর। এখান থেকে ট্রাকে করে বা রেললাইন বিছিয়ে সেগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাঁধে। ওদিকে পাঞ্জন পাহাড়ের গায়ের উপর দিয়ে ডুমকার দিকে যাবার জন্য রাস্তা তৈরি হচ্ছে। এখানেও চলছে পাথর-কাটা

কৃষ্ণস্তরশিলার মধ্যে সাদা-ফেলস্‌পারবাহী পদার্থের ইন্‌জেকশন্
ফটো—শ্রীঅমল বন্দ্যোপাধ্যায়

আর রাস্তা নির্মাণ। রাস্তার লেভেল অনেক সময় পাহাড়ের লেভেল থেকে ষাট ফুট নীচে পর্য্যন্ত কাটতে হচ্ছে। এই সব জায়গা দিয়ে সুড়ঙ্গ করা চলত, কিন্তু ষাট-সত্তর ফুট নীচেও মাটির ফাঁকে জল ঢোকার দরুন পাথরের গা এমনভাবে ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়েছে যে পাথরের নিরেটত্ব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। প্রায় বিশ-ত্রিশ ফুট ব্যাসের বড় বড় পাথর তাদের চারপাশে পেঁয়াজের খোলার মত মাটির স্তর জড়িয়ে পড়ে রয়েছে (underground exfoliation)। আগে সমস্তটাই একটানা কঠিন পাথরের আকারে ছিল। যে যে পথে জল গেছে, সেই সেই পথ ফুলে ফেঁপে কঠিনতা হারিয়ে মাটির মত নরম ঝুরঝুরে হয়ে উঠেছে। কাজেই এগুলির মধ্যে দিয়ে সুড়ঙ্গ করা যায় না।

বাঁধ তৈরির প্রতি পদে খুব সূক্ষ্ম হিসাব করে চলতে হচ্ছে। মেসাঞ্জোর বাঁধ যে শ্রেণীতে পড়ে সেই শ্রেণীর বাঁধগুলির স্থায়িত্ব নির্ভর করে—তাদের ওজন অর্থাৎ সমস্ত বাঁধের উপর পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তির উপর। বাঁধের প্রতিটি বিন্দুতে কোন্ দিক থেকে কত অনুভূমিক বা উল্লম্ব চাপ পড়বে—পাথরের, জলের, মাটির ও বায়ুর চাপ এবং তার প্রতিরোধের জন্য বাঁধের কোন্ অংশে ভিত্তি কতটুকু গভীর এবং কতটা চওড়া হওয়া দরকার—সব সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা হয়েছে।

প্রথম প্রথম এখানে ইঞ্জিনীয়ারদের জন্য টিনের শেড্ দেওয়া অস্থায়ী বাসগৃহ তৈরি হয়েছিল। আজ তাদের জন্য সুন্দর সুন্দর বাড়ী হয়েছে। পাহাড়ের গায়ে মেসাঞ্জোরের এই কলোনীর নাম হিলটপ। প্রায় বিশটি পরিবার থাকবার মত বাড়ী হবে। সব বাড়ীরই দেওয়াল পাথরের গাঁথুনি। বাড়ীগুলি এক লেভেলে নয়; মনে হয়, উঁচু-নীচু লেভেলে যেন বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এখানকার সব থেকে বড় এবং মনোরম অট্টালিকাটির নাম "ময়ূরাক্ষী-ভবন"—জাহাজ-প্যাটার্ণের দোতলা বাড়ী—অঙ্গনে নুড়ি-পাথর বিছানো। বাড়ীটি পাহাড়ের একেবারে লাগাও। এইটিই এখানকার ইন্‌স্পেকশন বাংলো।

জলাধার তৈরি হলে বিস্তীর্ণ স্থান জলে পূর্ণ হয়ে যাবে, এই জল হিলটপের পাদদেশ ছুঁয়ে যাবে। এই অঞ্চলে যত ছোট ছোট পাহাড় আছে তাদের মাথা জেগে থাকবে জলের বাইরে—আর সেই সব জায়গায় রচিত হবে মনোরম উদ্যান। এক উদ্যান থেকে আর এক উদ্যানে ঘুরে বেড়োবার জন্য থাকবে ষ্টীমলঞ্চ।

হিলটপে তিন দিন কাটিয়ে একদিন সকালবেলায় আমরা বেরিয়ে পড়লাম সেখান হতে। আমাদের নিয়ে যাবার জন্য ডুমকা থেকে রিজার্ভ-করা বাস এসেছিল—এখানে পৌঁছানোর পর দেখা গেল বাস খারাপ। ইঞ্জিনিয়ার মিঃ চক্রবর্ত্তী বাসটিকে পাঠিয়ে দিলেন এখানকার ওয়ার্কশপে জোড়া-তালি দেবার জন্য। ততক্ষণে আমাদের বাঁধ-কর্ত্তৃপক্ষেরই এক জীপে চড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সঙ্গে এসেছেন মুখুজ্জে মশাই। আমাদের নিয়ে তিনি চললেন আরও দুটি পাথরের খাদ দেখাতে। স্থির হ'ল, বাসটি মেরামত হবার পর আমাদের অনুসরণ করবে এবং রাস্তায় আমাদের তুলে নেবে। আমরা দুটি পাহাড় দেখলাম, মাঠ-পাহাড়ী এবং সাদিপুরের এক পাহাড়। মাঠ-পাহাড়ীতে কাজ করছে মাদ্রাজী শ্রমিকেরা—তাঞ্জোর, রামনাদ প্রভৃতি জেলা থেকে এসেছে প্রায় চল্লিশ জন শ্রমিক। এখানকার পাথরগুলি আয়তাকার ও সমতল করে কাটা হচ্ছে। বাঁধের "ফেসওয়ার্কে" সেগুলি ব্যবহৃত হবে। স্পিলওয়ে অংশে জল যেখানে নীচে পড়বে, বাঁধ সেখানে বাঁকানো হাতীর দাঁতের মত মাটির কাছে নেমে আবার খানিকটা উপরে উঠে গেছে। এই অংশের নাম "বাকেট" এবং বাকেটেরই উপরিভাগে এখানকার কাটা পাথরগুলো বসানো হচ্ছে।

সাদিপুরের পাহাড় দেখা শেষ হতেই জীপখানা হঠাৎ অচল হয়ে পড়ল। ওদিক থেকে আমাদের বাস এসে পড়েছে। বাসে চড়ে বসলাম। ইঞ্জিনীয়ার মিঃ মুখার্জী রাস্তার পাশে একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে পড়লেন—হাত নেড়ে তাঁর কাছ থেকে আমরা বিদায় নিলাম। আমাদের বাস সামনের দিকে এগিয়ে চলল। আমরা চলেছি সাঁওতাল পরগণার দিকে—রাজমহল লাভা-প্রবাহের দেশে।

কালিদাস-সাহিত্যে পিতাপুত্র

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

মহাকবি কালিদাসের কাব্যনাটকগুলির স্থানে স্থানে পিতা-পুত্রের নানা বিবরণ পাওয়া যায়, এখানে তাহাদের কয়েকটি দেখান গেল।

অপুত্রক পিতার কাছে পুত্র যে কি দুর্লভ বস্তু, মহাকবি তাঁহার 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে মহারাজ দিলীপের চরিত্রে তাহা দেখাইয়াছেন। উত্তরকোশলেশ্বর দিলীপের রাজ্য ছিল সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত, প্রজারা ছিল রাজভক্ত, ঐশ্বর্য্যের তাঁহার সীমা ছিল না, তবু সকল প্রকার সুখভোগের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সন্তান না থাকায়, মনে তাঁহার সুখ ছিল না। তাই কিরূপ ব্যবস্থা করিলে পুত্রলাভ হইতে পারে তাহার নির্দ্দেশ লইবার জন্য একদিন পাটরাণী সুদক্ষিণাকে সঙ্গে লইয়া তিনি কুলগুরু বশিষ্ঠদেবের আশ্রমে গেলেন। নিঃসন্তান রাজার হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনা মহাকবি কি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

তিনি বলিতেছেন, "রাজ্যে যে আমার অকালমৃত্যু নাই, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি কখনও হয় না, প্রজারা নির্ভয়ে বাস করে, এ কেবল আপনার ব্রহ্মতেজের মাহাত্ম্য। কিন্তু আপনার এই পুত্রবধূ আজ পর্য্যন্ত আমার মনের মত একটি পুত্র উপহার দিতে পারেন নাই বলিয়া রত্নপ্রসবিনী সদ্বীপা বসুন্ধরাও আমায় সুখ দিতে পারে না।" দুঃখ যে কেবল তাঁহার একার জন্য তা ত নয়, তাঁহার পিতৃপুরুষের কথা ভাবিয়াও তাঁহার দুঃখ, তিনি বলিতেছেন, "যখন আমি পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে জল উৎসর্গ করি, আমার মনে হয় যেন, আমার পর আর তাঁহাদিগকে জল দিবার কেহ থাকিবে না ভাবিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তাঁহারা আমার হাত হইতে জল নেন, তাঁহাদের সে দীর্ঘনিঃশ্বাসে জলও উষ্ণ হইয়া যায়।"

তারপর তিনি বলিতেছেন, "তপস্যা দান প্রভৃতি সৎ-কর্ম্মের ফলে পরলোকে সুখ পাওয়া যায়, কিন্তু সৎপুত্র লাভ করিতে পারিলে, ইহলোকেও সুখ, পরলোকেও সুখ।" তাই তিনি আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিতেছেন, "আশ্রমের যে বৃক্ষটিকে সস্নেহে স্বহস্তে জল দিয়া বড় করিয়াছেন, তাতে যদি ফল ফুল কিছুই না ধরে, তাহা হইলে হে বিধাতা, মনে যেরূপ কষ্ট হয়, আজন্মকাল আমাদের মঙ্গল কামনা করিয়া আসিয়া, আজ আমাদেরকে নিঃসন্তান দেখিয়া সেই রকম দুঃখ কি হয় না আপনার?" তিনি জানিতেন পুত্র না হইলে পিতৃপুরুষদের ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় না, তাই তিনি বলিতেছেন, "হে ভগবন, যে গজ স্নান করিতে উৎসুক, তাহার পক্ষে তাহার বন্ধনস্তম্ভ যেমন পীড়াদায়ক, তেমনি এই পিতৃঋণ হইতে মুক্ত না হইতে পারাও আমার পক্ষে তেমনই অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে।" এর প্রতিকারের জন্য, অর্থাৎ কি করিলে তাঁহাদের সন্তান হয়, তাহার নির্দ্দেশ লইবার জন্য বলিতেছেন, "বলুন পিতা, কি করিলে আমাদের পুত্র হয়, ইক্ষাকুকুলের কেহ কোন অভীষ্ট নিজের সামর্থ্যে লাভ করিতে না পারিলে, সে সিদ্ধিলাভ করাইয়া দিবার ভার ত আপনারই।"

বশিষ্ঠদেব সমস্ত শুনিলেন, তারপর যখন বলিলেন, রাজাকে গো-সেবা করিতে হইবে, কামধেনু সুরভির কন্যা নন্দিনীকে মাঠে মাঠে চরাইয়া বেড়াইতে হইবে, দিলীপ সাগ্রহে সম্মত হইলেন। গুরুদেবের নির্দ্দেশে একুশ দিন কি কঠোর নিয়মে তাঁহাকে অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। তাঁহার মত পরাক্রান্ত সম্রাটকেও রাজপ্রাসাদের ভোগ ও আরাম ত্যাগ করিয়া পর্ণশালায় কুশের শয্যায় শয়ন করিতে হইত, বনের ফলমূল খাইতে হইত, আর সারাদিন গরুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া রাখালের মত গরু চরাইয়া বেড়াইতে হইত। ভাল কচি ঘাস দেখিলে সেগুলি তিনি নিজের হাতে তুলিয়া নান্দনীকে খাওয়াইতেন, গায়ে মশা কি মাছি বসিলে তাড়াইয়া দিতেন, গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেন, চলিলে চলিতেন, বসিলে বসিতেন, জল পান করিলে তবে তিনি জল পান করিয়া লইতেন, ছায়াটির মত তিনি তাহার অনুসরণ করিয়া চলিতেন। কেবল একটি পুত্রলাভের আশায় তাঁহাকে সস্ত্রীক এই কৃচ্ছ্র সাধন করিতে হইয়াছিল।

তারপর যখন জানা গেল মহিষী অন্তঃসত্ত্বা এবং তাঁহার প্রসবের সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, বৃষ্টি-পতনোন্মুখ মেঘযুক্ত আকাশের দিকে মানুষ যে ভাবে চাহিয়া থাকে, দিলীপ প্রিয়ার দিকে সেই ভাবে চাহিয়া থাকিতেন, যেদিন তাঁহার পুত্রের জন্ম হইল, প্রথম যখন তিনি পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে পাইলেন, মহাকবি সে ক্ষণটির বর্ণনায় বলিতেছেন, "বায়ুহীন স্থানের পদ্মের মত স্থিরনয়নে চাহিয়া থাকিয়া তিনি পুত্রের মুখসুধা পান করিতে লাগিলেন; সম্মুখে চন্দ্রকে উদিত হইতে দেখিলে মহা-সমুদ্রের জলরাশি যেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তেমনি হৃদয় তাঁহার আনন্দের আতিশয্য যেন ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।" তারপর যখন তিনি পুত্রকে ক্রোড়ে

দুলিয়া-লইয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিতে পাইলেন, পুত্রের স্পর্শ তাঁহার দেহে যেন অমৃত সিঞ্চন করিতে লাগিল, তিনি নয়ন মুদ্রিত করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া সে সুখের আস্বাদন করিতে লাগিলেন (রঘু—৩।২৬)। পুত্র রঘুর বিদ্যাশিক্ষার জন্য যদিও দিলীপ তাঁহাকে গুরুগৃহে পাঠাইয়াছিলেন, অস্ত্রশিক্ষার ভার তিনি নিজের উপর রাখিলেন। পিতার শিক্ষায় পুত্র যখন একজন রণকুশলী যোদ্ধা হইয়া উঠিলেন, 'বায়ুর সহায়তায় অগ্নি যেমন দুঃসহ হইয়া উঠে, দিলীপ তেমনি রঘুর সহায়তায় দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন।' পুত্রের সাহায্যে তিনি পরপর নিরানব্বইটি অশ্বমেধ যজ্ঞও সমাপন করিয়া ফেলিলেন। শততমের বেলায় শতক্রতু দেবরাজ ইন্দ্র অপকৌশলে যজ্ঞাশ্ব হরণ করায় রক্ষী রঘুর সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিল, যুদ্ধে ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারেও রঘুর কিছুই হইল না। বক্ষে সেই বজ্রাঘাতের ক্ষত বহিয়া রঘু যখন অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন, স্নেহশীল বৃদ্ধ পিতা 'হর্ষজড়েন পাণিনা' অর্থাৎ আনন্দে অবশ হস্তদ্বারা পুত্রের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। তারপর তিনি উপযুক্ত পুত্রকে রাজছত্র প্রভৃতি সমস্ত রাজচিহ্নের সহিত রাজ্য সমর্পণ করিয়া শেষ জীবনটা 'তপোবনের তরুচ্ছায়ায়' কাটাইয়া দিলেন।

রঘুর জীবনীতেও পুত্রস্নেহের অভিব্যক্তি বড় অল্প দেখা যায় না। রঘুর একমাত্র পুত্র অজ হইয়াছিলেন তাঁহার পিতারই অনুরূপ। রঘুরই মত উন্নত দেহ, তাঁহার মত বীর্য্য, তাঁহার মত সাহস—"পিতাপুত্রকে দেখিলে দুইজনের মধ্যে কোনও প্রভেদ লক্ষিত হইত না, যেমন একটা প্রদীপ হইতে আর একটা দীপ জ্বালাইয়া লইয়া পাশাপাশি রাখিয়া দিলে তাহাদের মধ্যে কোনও প্রভেদ লক্ষিত হয় না।"

অজের যখন বিদর্ভ নগর হইতে রাজভগিনী অনিন্দ্যসুন্দরী ইন্দুমতীর 'স্বয়ংবর' সভায় যোগদান করার জন্য নিমন্ত্রণ আসিল, রঘু পুত্রকে সৈন্যসামন্ত সঙ্গে দিয়া বিদর্ভ নগরে পাঠাইয়া দিলেন, সেখানে ইন্দুমতীকে বিবাহ করিয়া অজ যখন অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিতেছিলেন, যে সমস্ত রাজা ও রাজপুত্র ইন্দুমতীকে লাভ করিতে আসিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহারা সকলে প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া অজের পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। সম্মুখযুদ্ধে বিপক্ষ রাজাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া অজ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। পিতা রঘু তাঁহার বিজয়-গৌরবের সংবাদ পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার 'শ্লাঘ্যপত্নীসমেত বিজয়ী' পুত্রকে অভিনন্দিত করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, এবার পুত্রের হস্তে তাহার পত্নী পালনের ভার দিয়া তিনি শান্ত-মার্গের যাত্রী হইবেন, কারণ পুত্র উপযুক্ত হইলে সূর্য্যবংশীয় রাজারা গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে চাহিতেন না। সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া রাজা 'পুত্রের মনোহর বিবাহসূত্রধারী হস্তেতেই বসুধাকে তাঁহার পত্নী দ্বিতীয় ইন্দুমতীর মত সমর্পণ করিয়া দিলেন' (রঘু—৮।১)। তারপর মহাকবি বলিতেছেন, "যদিও রাজ্যলোভে কোন কোন রাজপুত্র 'দুষ্কার্য্য' করিয়া অর্থাৎ 'বিষপ্রয়োগাদি নিষিদ্ধ উপায়ে' (মল্লিনাথ) সিংহাসন হস্তগত করে, অজের কিন্তু রাজ্যভোগের উপর লোভ ছিল না, তিনি কেবল পিতার আদেশ পালনের জন্য রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন" এবং অতিশয় কৃতিত্বের সহিত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

পুত্রের প্রজাপালনে কৃতিত্ব লক্ষ্য করিয়া রঘু তাঁহাদের কুলপ্রথামত শেষজীবন 'বৃক্ষের বল্কল পরিহিত সংযমী পুরুষদের মত অতিবাহিত করিয়া দিবেন, স্থির করিয়া ফেলিলেন'। অজ যখন শুনিলেন পিতা রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া বনে গিয়া শেষজীবন যাপন করার জন্য উৎসুক হইয়া পড়িয়াছেন, যাত্রার আয়োজনও সম্পূর্ণ, তিনি আর থাকিতে না পারিয়া পিতার নিকট আসিয়া 'মুকুটশোভিত মস্তক' দ্বারা তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া 'আমাদের ছাড়িয়া যাইবেন না' এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। 'পুত্রবৎসল রঘু' পুত্রের চোখে জল দেখিয়া বিচলিত হইয়া পড়িলেন, বনে যাওয়ার সঙ্কল্প তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইল, তিনি পুত্রের প্রার্থনা পূরণ করিলেন। বনে যাওয়া তাঁহার হইল না বটে, কিন্তু সর্প যেমন একবার তাহার খোলস পরিত্যাগ করিলে দ্বিতীয় বার আর তাহা গ্রহণ করে না, তিনিও তেমনি পরিত্যক্ত রাজ্যসম্পদ আর গ্রহণ করিলেন না।

মহাকবি এখানে পুত্রস্নেহের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি দেখাইয়াছেন। বৃদ্ধ রাজা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের কুলপ্রথা অনুযায়ী উপযুক্ত পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সংসারের উপর বীতস্পৃহ হইয়া শেষজীবন বনে গিয়া ভগবচ্চিন্তায় অতিবাহিত করিবেন স্থির করিয়া অরণ্য যাত্রার আয়োজন করিয়াছেন, ইতিমধ্যে পুত্র আসিয়া যখন অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহার চরণ দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া প্রার্থনা করিলেন, পিতা যেন তাঁহাকে ছাড়িয়া বনে না যান, রঘুর মত দৃঢ়চিত্ত দিগ্বিজয়ী বীর—যিনি তরুণ বয়সে দেবরাজ ইন্দ্রকেও যুদ্ধে আহ্বান করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই, মহাবীর নেপোলিয়নের আল্পস পর্ব্বত উল্লঙ্ঘনের ন্যায় মহেন্দ্র পর্ব্বত টপকাইয়া কলিঙ্গদেশে গিয়াছিলেন, হিমালয় পর্ব্বতের উপর অশ্বসৈন্য লইয়া কুচ করিয়া চলিয়াছিলেন, সেই দুর্জ্জয়সঙ্কল্প বীরেরও সঙ্কল্প পুত্রস্নেহের আতিশয্যে টলিয়া গেল; বনে যাওয়া তাঁহার আর হইল না, তিনি রাজধানীর বাহিরে

আশ্রম স্থাপন করিয়া সন্ন্যাসীদের মত বাস করিতে লাগিলেন, আর 'পুত্রভোগ্যা রাজ্যলক্ষ্মী পুত্রবধূর মত তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন' অর্থাৎ তাঁহার জন্য নিয়মিতভাবে ফলজল পুষ্পাদি পাঠাইয়া দিতেন (মল্লিনাথ)।

এই সময়টা পিতা কি ভাবে ও পুত্র কি ভাবে জীবন যাপন করিতেন, মহাকবি তাহার সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন, এখানে তাহার অনুবাদ দেওয়া গেল।

"মোক্ষকামী পূর্ব্বরাজা রঘু ও উন্নতিশীল নূতন রাজা অজকে দেখাইতে লাগিল যেন, আকাশের এক পাশটিতে চন্দ্র অস্তাচলে গমন করিতেছেন, আর অপর পাশে সূর্য্য নূতন উদ্গমে উদিত হইতেছেন। যতি-বেশধারী রঘুকে ও রাজবেশধারী রাঘবকে (রঘুপুত্র অজকে) দেখিয়া লোকের মনে হইত, স্বয়ং ধর্ম্ম বুঝি দুই মূর্ত্তিতে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন, একজন তাঁহার 'নিবৃত্তি' অপরে তাহার 'প্রবৃত্তি' মূর্ত্তি। রাজ্য বিশালতর করার আকাঙ্ক্ষায় অজের কাজ হইল নীতিবিশারদমন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করা, আর মোক্ষলাভে উৎসুক রঘুর কাজ হইল তত্ত্বজ্ঞানী যোগীদের উপদেশ লওয়া। প্রজাদের অভিযোগ শুনিয়া বিচার করার নিমিত্ত যুবক অজ বসিতেন ধর্ম্মাসনে, আর চিত্তের একাগ্রতা লাভের প্রচেষ্টায় বৃদ্ধ রঘু নির্জ্জনে কুশাসনে বসিয়া দিন কাটাইতেন। একের চেষ্টা হইল কি করিয়া অপর সকল রাজাদের বশে আনা যায় তাহার ব্যবস্থা করা, আর অপরের চেষ্টা হইল, কি করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণবায়ুগুলিকে আয়ত্তে আনা যায়, তার সাধনা করা। নিজের পরাক্রম দ্বারা নবীন রাজা শত্রুরাজদের সমস্ত কর্ম্ম-প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিতে লাগিলেন, আর জ্ঞানাগ্নি দ্বারা অপর জন নিজের কর্ম্মফল ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। ফলাফল সম্যকরূপে বিচার করিয়া অজ প্রয়োগ করিতেন সন্ধি বিগ্রহ প্রভৃতি ছয়টি নীতি, আর সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ সাম্যাবস্থায় আনার চেষ্টায় রঘু হইলেন 'লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে সমদর্শী।' স্থিরকর্ম্মা তরুণ অজ যে কাজে হাত দিতেন, তাহা সফল না হওয়া পর্য্যন্ত ছাড়িতেন না, আর স্থিরচিত্ত বৃদ্ধ রঘু পরমাত্মাকে দর্শন না করিয়া যোগাসন ছাড়িয়া উঠিতেন না। এইরূপে মোক্ষকামী ও উন্নতিকামী দুই জনে, একে ইন্দ্রিয়ের ও অপরে শত্রুর বৃদ্ধি সম্বন্ধে নিরন্তর জাগরূক থাকায়, উভয়েরই সিদ্ধিলাভ হইল, একের লাভ হইল উন্নতি, আর অপরের লাভ হইল মোক্ষ।"

এইভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়া রঘু হয়ত শীঘ্রই 'সাজুয্য' লাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু মহাকবি বলেন, কেবল অজের ইচ্ছায় ও তাঁহার অনুরোধে তিনি আরও কয়েক বৎসর এইভাবে কাটাইলেন, তারপর একদিন যোগ ও সমাধির বলে তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া সেই মায়ার অতীত পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইলেন। অজের নিকট যখন পিতার দেহরক্ষার সংবাদ আসিল, তিনি বহুক্ষণ নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে গেলেন। শেষজীবনে রঘু সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মৃতদেহে অগ্নিসংস্কার করা হইল না, সন্ন্যাসীদের সাহায্যে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হইল, অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের মত তাঁহার মৃতদেহ ভূগর্ভে সমাহিত করা হইল (মল্লিনাথ)। সন্ন্যাসীদের পুত্রের দেয় পিণ্ডের আবশ্যক হয় না, শ্রাদ্ধকার্য্যও শাস্ত্রবিধি নয়, তবু 'পিতার প্রতি ভক্তিবশত' অজ রীতিমত ঘটা করিয়া পিতার শ্রাদ্ধকার্য্য সমাপন করাইলেন।

অজের জীবনীতে যেমন অসাধারণ পিতৃভক্তি ও অসাধারণ পত্নীপ্রেম দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি পুত্রের প্রতি স্নেহও যে তাঁহার সাধারণ ছিল না, তাহাও মহাকবি স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। পুত্র দশরথ যখন অল্পবয়স্ক বালকমাত্র, সেই সময় সহসা প্রিয়তমা পত্নী ইন্দুমতীকে হারাইয়া অজ যখন শোকে আকুল হইয়া জীবনের উপর সকল মমতা হারাইলেন, কোনও প্রকার সুখভোগের প্রতি আর তাঁহার আকর্ষণ রহিল না, মৃত্যু হইলেই যেন বাঁচিয়া যান, এইরূপ যখন তাঁহার মনোভাব হইল, তিনি বাঁচিয়া রহিলেন কেবল তাঁহার মাতৃহীন নাবালক পুত্রের মঙ্গলকামনায়। মহাকবি বলেন, "পুত্র নেহাৎ বালক বলিয়া তিনি আটটা বৎসর পুত্রের মুখে প্রিয়ার মুখের সাদৃশ্য দেখিয়া, তাঁহার চিত্রের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া, ও স্বপ্নে তাঁহার মিলন লাভ করিয়া, কোনও রূপে কাটাইয়া দিলেন।" তারপর পুত্র 'বর্ম্মধারণের উপযোগী' হওয়া মাত্র তাঁহার হস্তে প্রজারক্ষার ভার অর্পণ করিয়া অজ গঙ্গাযমুনার সঙ্গমতীর্থে গিয়া 'অনশনব্রত' অবলম্বনে দেহত্যাগ করিয়া সকল জ্বালার সাঙ্গ করিলেন।

রাজা দশরথের পুত্রপ্রীতি এত সুপরিচিত যে তাহা আর নূতন করিয়া বলার আবশ্যক হয় না। বিশ্বামিত্র মুনি যখন তাঁহার নিকট আসিয়া রামলক্ষ্মণকে রাক্ষসবধ করিয়া তপোবনের বাধাবিঘ্ন দূর করার জন্য লইয়া যাইবার প্রার্থনা জানাইলেন, দশরথ স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু বিদায়-মুহূর্ত্তে? মহাকবি বলেন, "পুত্রেরা দুই জনে যখন ধনুর্দ্ধারণ করিয়া পিতার চরণে প্রণাম করিলেন, ভূপতি তাঁহাদের মস্তকের উপর অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, 'পিতার নয়নজলে পুত্রদের কেশ সিক্ত হইয়া গেল।' স্নেহময় পিতার পুত্রস্নেহ যেন অশ্রুরূপ ধারণ করিয়া বিগলিত হইতেছিল। তিনি 'ঋষির অভিলাষ অনুসারে পুত্রদের সঙ্গে কোনও রক্ষী দিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিলেন, যাহা তাহাদের অমোঘ রক্ষাকবচ হইয়া রহিল', (রঘু-১১।৬)। তারপর পুত্রের রাজ্যাভিষেকের দিনে পত্নীর চক্রান্তে পূর্ব্বে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করিবার নিমিত্ত যখন রামকে ও তাঁহার সঙ্গে লক্ষ্মণ ও সীতাকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য তিনি বনে পাঠাইতে বাধ্য হইলেন, তাঁহার মন দুঃখ ও অনুশোচনায় এমন ভরিয়া গেল যে, তিনি তাহার প্রতিক্রিয়া হইতে নিস্তার পাইলেন না, প্রিয় পুত্রের শোকে বৃদ্ধ পিতা মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়া পুত্রস্নেহের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেলেন।

'বিক্রমোর্ব্বশী' ও 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা'য় পিতাপুত্রের বিবরণ যাহা পাওয়া যায়, তাহা কতকটা এক রকমের বলিয়াই মনে হয়। উভয় নাটকেই প্রকৃত পরিচয় পাইবার

পূর্ব্বে পিতা জানিতেন না বালকটি তাঁহারই পুত্র, পুত্রও জানিত না যে, অপরিচিত ব্যক্তি তাহার পিতা।

মহামুনি দুর্ব্বাসার অভিসম্পাতে রাজা দুষ্মন্তের মন হইতে যখন শকুন্তলা ও তাঁহাকে বিবাহ করার সকল স্মৃতি নিঃশেষে মুছিয়া গেল, এবং কণ্বমুনির দ্বারা প্রেরিত গর্ভবতী শকুন্তলাকে চিনিতে না পারিয়া তিনি অপমান করিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখন তাঁহার মাতা অপ্সরা মেনকা আসিয়া কন্যাকে সঙ্গে করিয়া মারীচ মুনির আশ্রমে রাখিয়া আসিলেন। সেখানে সর্ব্বদমন নামে শকুন্তলার একটি পুত্র জন্মিল। পুত্রের বয়স যখন চার কি পাঁচ বৎসর, সেই সময় একদিন রাজা দুষ্মন্ত হিমালয় পর্ব্বতের উপর দিয়া আসিতে আসিতে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে মহামুনি মারীচের আশ্রমে আসিয়া পড়িলেন, দেখেন সম্মুখে একটি সুদর্শন বালক এক সিংহশাবকের কেশর ধরিয়া তাহার মাতৃস্তন হইতে জোর করিয়া মুখ ছাড়াইয়া লইয়া বলিতেছে, 'হাঁ কর রে সিংহশিশু, হাঁ কর, দাঁতগুলি তোর গণে দেখি।'

দুষ্মন্ত তখন জানিতেন না, এই বালকটি তাঁহারই বিবাহিতা পত্নী—অকারণে প্রত্যাখ্যাতা—শকুন্তলার গর্ভে জন্মিয়াছে, তবু বালককে দেখিয়া তাঁহার মনে অপত্যস্নেহের ভাব আসিল, তিনি মনে মনে বলিলেন, 'এই বালককে দেখিয়া কেন আমার মনে নিজের ঔরসজাত সন্তানের প্রতি যে রকম স্নেহ জন্মে, তেমনই স্নেহের সঞ্চার হইতেছে।'

মহাকবি এখানে এক আশ্চর্য্যজনক মনস্তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। পিতা জানেন না, তাঁহার সম্মুখের ঐ ক্রীড়মান বালকটি তাঁহার সন্তান, তবু তাহাকে দেখিয়া মন তাঁহার পুত্রস্নেহে ভরিয়া গেল! প্রকৃতির কি ইহাই নিয়ম, না ইহা মহাকবির নিছক কল্পনা, না মহর্ষি মারীচের আশ্রমের মাহাত্ম্য?

তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া দুষ্মন্ত ভাবিতেছেন, 'হয়ত আমি নিঃসন্তান, তাই মনে এই স্নেহের সঞ্চার হইতেছে'; তারপর তাঁহার মনে হইতেছে, 'আহাঃ ঐ বালক, অকারণে যখন হাস্য করিতেছে, দাঁতগুলি কেমন দেখাইতেছে, আর অস্ফুট বাক্যগুলি কি মিষ্ট শুনাইতেছে। ধন্য সেই পিতা, ক্রোড় যাহার এই পুত্রটিকে তুলিয়া লইলে ধূলায় মলিন হইয়া যায়।'

তারপর তিনি যখন বালকটিকে একবার ক্রোড়ে উঠাইয়া লইলেন, তখন তাঁহার মনে হইল, 'পরের ছেলে, তাহাকে স্পর্শ করিতে পাইয়া আমার মনে যখন এমন সুখের সঞ্চার হইতেছে, তখন না জানি যে পুণ্যবান্ নর ইহার পিতা, সে যখন এর দেহ স্পর্শ করে কি অনির্ব্বচনীয় সুখ না লাভ হয় তার।'

বালক সর্ব্বদমনও জানিত না, এই অপরিচিত ব্যক্তি তাহার পিতা, তবু যখন দুষ্মন্ত তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, তাহার মত অত দুরন্ত বালক, যাহাকে কেহই শান্ত করিতে পারিত না, সেও কেবল দুষ্মন্তের কথাতেই শান্ত হইয়া গেল। কেন যে শান্ত হইল, তাহার কারণ মহাকবি যেন বলিতে চাহেন, পিতার স্পর্শের প্রভাব, যে প্রভাব পুত্রের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তাহার মনের উপর কোন এক রহস্যজনক ভাবে কার্য্যকরী হইয়াছিল।

'বিক্রমোর্ব্বশী'র নায়ক প্রতিষ্ঠানপুরের রাজা পুরুরবা জানিতেন না যে তাঁহার প্রিয়া অপ্সরা উর্ব্বশী তাঁহার পুত্রের জননী। একদিন যখন অপ্রত্যাশিতভাবে একটি তীর তাঁহার হাতে আসিল, তখন তিনি সেই শরের উপর খোদিত নাম পড়িয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, কারণ তাহাতে লেখা ছিল, 'উর্ব্বশীর গর্ভজাত ঐলের পুত্র ধনুর্দ্ধারী শত্রুহন্তা কুমার আয়ুর বাণ।' পুরুরবার বংশনাম 'ঐল', সুতরাং উর্ব্বশীর গর্ভজাত ঐলের পুত্র বলিলে তাঁহারই সন্তান বুঝিতে হয়, অপুত্রক পিতার বিস্মিত হইবার কথা। কিন্তু তাঁহার প্রিয় বয়স্য বিদূষক যখন বলিলেন, 'উর্ব্বশীতে মানুষীধর্ম্ম প্রত্যাশা করা চলে না, এবং দেবরহস্য অচিন্তনীয়', তখন তাঁহার মনে পড়িল, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যেন একবার কয়েক দিনের জন্য তিনি উর্ব্বশীর মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ ও শীর্ণ হইতে দেখিয়াছিলেন, যেন 'গর্ভলক্ষণ'। কিন্তু কেন সে পুত্রজন্ম গোপন রাখিল মনে মনে তাহার কারণ জানিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় চ্যবন মুনির আশ্রম হইতে মহর্ষির ভগিনী তাপসী ভার্গবী এক শিষ্য ও একটি বালককে সঙ্গে লইয়া রাজসভায় আসিলেন; বালকটিকে দেখিয়া বিদূষকের মনে হইল, এই বালকটি নিশ্চয়ই সেই কুমার আয়ু যাহার নিক্ষিপ্ত বাণ মহারাজের হাতে আসিয়াছে, এবং যাহার মুখে তিনি মহারাজের সাদৃশ্য যেন স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইতেছেন।

বালককে দেখিয়া পুরুরবা তাঁহার বন্ধু বিদূষককে বলিতেছেন, "ওই বালকের দিকে চাহিতে চক্ষু আমার জলে ভরিয়া গিয়াছে, হৃদয়ে একটা বাৎসল্য ভাব আসিতেছে, মনটা উৎসুক হইয়া উঠিতেছে, ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙিয়া যাইতেছে, কেবলই মনে হইতেছে, আমার এই আনন্দকম্পিত বক্ষে একবার উহাকে নির্দ্দয় ভাবে চাপিয়া ধরি (বিক্রম-৫ম অঙ্ক)।

এই সময় চ্যবন মুনির ভগিনী তাপসী ভার্গবী মহারাজকে জানাইলেন, এই বালক তাঁহার পুত্র। উর্ব্বশী তাঁহার সদ্যপ্রসূত পুত্রকে তাঁহাদের আশ্রমে রাখিয়া লালনপালন করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। এতদিন তাঁহারা বালকটিকে তপোবনে রাখিয়াছিলেন, আজ একটি পক্ষীকে বাণ দিয়া বিদ্ধ করায় তাহার আশ্রমবিরুদ্ধ কার্য্যের

জন্য, তাহাকে আর আশ্রমে রাখা চলিবে না, তাই উর্ব্বশীর হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে আসিয়াছেন, এবং কুমার আয়ুকে বলিলেন, 'পিতাকে প্রণাম কর'। পিতার দিকে চাহিয়া আয়ুরও চোখে জল আসিল, তিনি করজোড়ে পিতাকে প্রণাম জানাইলেন। তারপর পুরুরবা যখন পুত্রকে স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, পিতার সেই প্রথম স্পর্শ পাইয়া স্পর্শসুখ অনুভব করিতে করিতে কুমার আয়ু মনে মনে বলিতেছেন, "ইনি আমার পিতা, আমি উঁহার পুত্র, কেবল এই কথা শুনিয়াই যদি মনে অমন আনন্দের সঞ্চার হয়, তবে যে সকল বালক জন্মাবধি তাহাদের পিতামাতার ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইয়াছে, পিতামাতার প্রতি তাহাদের কত ভালবাসা জন্মে তাহা ভাবা যায় না।"

আশীর্ব্বাদের পর পিতা বলিতেছেন, "এস বৎস, চন্দ্রকান্তমণিকে চন্দ্রকিরণ যে ভাবে শীতল করে তুমিও তোমার স্পর্শ দিয়ে আমায় সেইভাবে আনন্দিত কর।"

'মালবিকাগ্নিমিত্রে'—পিতা পুষ্পমিত্র যিনি নিজেকে সেনাপতি বলিতে ভালবাসিতেন. এবং পৌত্র বসুমিত্রকে সঙ্গে লইয়া 'রাজযজ্ঞ' অর্থাৎ অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হইয়া রাজধানী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি অশ্বের ভ্রমণান্তে যজ্ঞশালা হইতে বিদিশায় পুত্র অগ্নিমিত্রকে চিঠি লিখিতেছেন। পুত্রের নিকট প্রেরিত পিতার সেই চিঠিখানি এখানে দেখান গেল :

"স্বস্তি, যজ্ঞশালা হইতে সেনাপতি পুষ্পমিত্র বিদিশায় অবস্থিত পুত্র আয়ুষ্মান্ অগ্নিমিত্রকে স্নেহবশতঃ আলিঙ্গন দিয়া জানাইতেছে। জ্ঞাত হউক, আমি 'রাজযজ্ঞে ব্রতী হইয়া একশত রাজপুত্র সঙ্গে দিয়া বসুমিত্রকে অশ্বরক্ষা করার আদেশ দিয়া অশ্বকে এক বৎসরের জন্য তাহার ইচ্ছামত বিচরণ করার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। অশ্ব যখন সিন্ধুর দক্ষিণতীরে বিচরণ করিতেছিল, সেই সময় এক যবন অশ্বারোহী সৈন্যদলের সহিত আসিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখে। অতঃপর উভয় সৈন্যদলের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ বাধিল, বসুমিত্র ধনু লইয়া যুদ্ধ করিয়া শত্রুসৈন্য পরাজিত করিয়া বিক্রমের দ্বারা আমার অপমানিত অশ্বরাজকে উদ্ধার করিয়া আনে। আমি এখন অংশুমানের সাহায্যে সগরের মত পৌত্রের সাহায্যে অশ্ব ফিরিয়া পাইয়া যজ্ঞ সমাপন করিব। অতএব আপনি কালবিলম্ব না করিয়া প্রসন্নমনে বধূগণের সহিত যজ্ঞকার্য্য সুসম্পন্ন করাইবার জন্য আসিবেন।"

বন-কঙ্কাল

শ্রীকৃষ্ণধন দে

হে মহাবনানী, বন্দিনী রবে অন্ধকূপে
সম্বিৎহারা লক্ষযুগের হে কঙ্কাল ?
কবে এ ধরায় মহাখাণ্ডববহ্নিরূপে
অঙ্গার করি রাখিয়াছ বুকে অতীতকাল ?
মাটির আড়ালে জাগিছ গোপনে জাতিস্মর,
ভ্রূণের মতন ধরার গর্ভে শক্তিহীন,
আর্ত্তনাদের স্তর হ'য়ে গেছে কালো পাথর,
সবুজ প্রাণের শেষ স্পন্দন কোথায় লীন !

অগ্নিগিরির বুকফাটা লাভা-নিঃসরণে
ধূসর আকাশ ক্ষণে ক্ষণে যেথা আরক্তিম,
ঝঞ্ঝা-উতল সিন্ধু-প্লাবন পড়ে কি মনে,
—দিনের উগ্ররৌদ্র রাতের অসহ হিম ?
ডাইনোসরের বিপুল দেহের আস্ফালন,
টেরোডক্‌টীল আকাশে মেলেছে বিপুল পাখা,
দাঁতাল বাঘের সঙ্গে ম্যামথ করিছে রণ,
ব্রন্টোসরাস লাঙুলে ভাঙিছে গাছের শাখা !

আরো পরে যবে আদিম মানব চেতনা লভি'
পশুজীবনের গণ্ডী কাটিল ধরার বুকে,
নববিস্ময়ে হেরিল তারকা-চন্দ্র-রবি,
ধরণীর পানে রহিল চাহিয়া কি কৌতুকে !
অস্ত্র গড়িল ল'য়ে লতা আর ভাঙ্গা পাথর,
দাবানল হেরি' অগ্নি জ্বালিল কাষ্ঠে তার,
তরু-বল্কলে আবরিল দেহ অতঃপর,
নারীর নয়নে প্রথম নামিল লজ্জাভার !

গুহা হ'তে গুহা, বন হ'তে বন, নদীর তীর,—
যাযাবর হ'য়ে ঘুরিল মানব রাত্রিদিন,
নারীরে লইয়া কত হানাহানি মাখি' রুধির,
হিংসাদ্বেষের অনলে জীবন তৃপ্তিহীন !
একদা সহসা এল প্রকৃতির বিপর্য্যয়,
রুদ্রলীলায় মাতিল অগ্নিগিরির দল,
সাগরে তুফান, বনভূমি হ'ল অগ্নিময়,
ভূমিকম্পের তাড়নে কাঁপিল ভূমণ্ডল !

ধ্বসে' গেল বন হাজার হাজার যোজন জুড়ে',
মাটির ভিতরে লভিল তাহার শেষ কবর !
কত যুগ গেল, কত যুগ পুনঃ আসিল ঘুরে,
মাটির উপরে জাগিল কত-না নূতন থর !
নূতন পৃথিবী পুরাতনে কবে গিয়াছে ভুলে,
ইতিহাস শুধু পড়ে আছে বুকে কালো ফসিল,
সভ্যতা আজো চলে নব নব কেতন তুলে',
নব নরনারী নূতন আলোকে গড়ে মিছিল !

কোটি বৎসর ঘুমায়েছ তুমি বন্দী সাজে,
কোটি বৎসর অন্তর-দাহে হয়েছ কালো,
হারানো অতীত ফিরাইতে বুঝি তোমার মাঝে
সঞ্চিত রবি-কিরণ এ যুগে আবার জ্বালো ?
তব-অন্তর-মণি-কোটরের লুকানো মণি
ছুটে যায় নর অঙ্গারবুকে অন্বেষিতে,
অগ্নি-শিখায় শোনে মর্ম্মর পত্রধ্বনি,
সুদূর অতীত ফিরে আসে যেন আচম্বিতে !

বন্দিনী তুমি কঠিন পৃথ্বী-আস্তরণে,
রুদ্ধ ব্যথায় হুঙ্কারি' উঠ অকস্মাৎ !
ধ্বংসলীলায় মেতে উঠ তুমি বিস্ফোরণে,
সভ্যতামূলে কর মুহূর্ত্তে অশনিপাত !
তবু সভ্যতা তোমার চরণে নোয়ায়ে মাথা
কাঙালের মত করুণার কণা মাগিয়া ফিরে,
ধ্বংস-সৃষ্টি তোমারি বক্ষে রয়েছে গাঁথা,
অগ্নিমুকুট পরায়েছে নর তোমার শিরে !

তোমারি বক্ষে রেখে গেছে এঁকে চিহ্ন তার
আদিম ধরার সৃজন-ব্যাকুল প্রতি-প্রহর,
জাগে অতীতের আকাশ-সাগর-নদী-পাহাড়,
—নিবিড় বনের ঝঞ্ঝা-কাঁপানো সে-মর্ম্মর !
শুনেছ কি তুমি নারীর প্রথম প্রণয়বাণী,
শিশুর প্রথম জননীরে-ডাকা আকুল স্বর,
চন্দ্র-রবির উদ্দেশে আদি মন্ত্রখানি,
মানব-মনের প্রথম প্রশ্ন—"কে ঈশ্বর ?"

বহুকাল পরে যেদিন পূর্ণ মানবদেহে
এল যৌবন, মনে পড়ে সেই আদিম কথা ?
নর-প্রতি নারী, নারী-প্রতি নর পরম স্নেহে
রহিল চাহিয়া, ভুলে গেল বন-বর্ব্বরতা !
সেদিন দুলিল নারীর অলকে প্রথম ফুল,
সেদিন নয়নে প্রথম নামিল লজ্জাভার,
সেদিন প্রথম দখিনা-বাতাসে হ'ল আকুল,
প্রথম রচিল তরুপল্লবে কাঁচলি তার !

সদ্য-নিহত পশুর চর্ম্মে আবরি' কায়,
দক্ষিণকরে আস্ফালি' তার শিলা-লগুড়
বাহিরিয়া এল গুহা-নর তার পশুতৃষায়,
দীর্ঘ-লোমশ, বীভৎস-মুখ হিংসাতুর !
যাযাবর দলে আদিম নারীরে সবলে ধরি'
আপন গুহায় বন্দিনী করি' রাখিতে চায়,
মুক্তি লভিতে আঁচড়-কামড়ে অঙ্গ ভরি'
অবশ্যা নারী লগুড়-আঘাতে জ্ঞান হারায় !

কবে ছিঁড়ে গেল মহাপ্রকৃতির ঋতু-বয়ন,
সুদূর অতীতে হিম-বাহ যুগ আসিল নামি',—
অর্দ্ধ-পৃথিবী লভিল শুভ্র হিম-শয়ন,
নদ-নদী-হ্রদে হিল্লোল গেল সহসা থামি' !
গিরিগুহা বন হিম আবরণে রহিল ঢাকা,
আদিম মানব দেশ হ'তে গেল দেশান্তরে,
হে মহাবনানী হিমে হিমে তব ভরিল শাখা,
লিখিলে মরণ-ইতিহাসখানি শ্বেতাক্ষরে !

যে জগৎ আর দেয় না তোমারে রবির কর,—
যে জগৎ আর তোলে না নাচায়ে তোমার প্রাণ,
তারি কল্যাণ-কামনায় ভরা ও-অন্তর,
কর' যুগে যুগে জগতের হিতে আত্মদান !
বিগত-আগত-অনাগত যুগ তোমারি গড়া,
পৃথ্বী তোমারে আগলি' রেখেছে পরমস্নেহে,
সভ্যতা তব কষ্টিপাথরে পড়েছে ধরা,
নিরিখ-পরখ চলে তার তব নিকষ-দেহে !

বিহারের লোকগণনায় বাংলাভাষী

শ্রীঅশোক চৌধুরী

১৮৮১ হইতে ১৯৩১ সন পর্য্যন্ত প্রত্যেক সেন্সাস রিপোর্টে মানভূম, ধলভূম প্রভৃতি স্থানগুলি বাংলাভাষী অঞ্চল বলিয়া প্রমাণিত ও স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। যুদ্ধকালীন অবস্থার জন্য ১৯৪১ সনের সেন্সাস রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নাই এবং নানাপ্রকার ত্রুটির জন্য ইহা প্রামাণ্য হিসাবে গৃহীত হয় না।

দেশ স্বাধীন হইবার পর ১৯৫১ সনে প্রথম সেন্সাস গ্রহণ করা হয়। সেই হিসাবে ১৯৫১ সনের সেন্সাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির প্ররোচনায় ক্ষেত্রবিশেষে যেরূপ দায়িত্বহীন ভাবে বিকৃত করা হইয়াছে, তাহা আমাদের জাতীয় কলঙ্কস্বরূপ।

বিশিষ্ট উদারনৈতিক নেতা এবং রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশনের অন্যতম সদস্য পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু নিখিল-ভারত আদিবাসী উন্নয়ন সম্মেলনের লোহারডাঙ্গা অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ দান-প্রসঙ্গে ১৯৫১ সনের সেন্সাস সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্বয়ং এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলিকে উদ্দেশ করিয়া পণ্ডিত কুঞ্জরু বলেন যে, ১৯৪১ সনের সেন্সাসে সমগ্র ভারতে আদিবাসীদের সংখ্যা যেখানে ২ কোটি ৪১ লক্ষ দেখানো হইয়াছে সেই স্থলে ১৯৫১ সনের সেন্সাসে আদিবাসীদের সংখ্যা দেখানো হইতেছে ১ কোটি ৭৮ লক্ষ মাত্র, অর্থাৎ দশ বৎসরের মধ্যে আদিবাসীদের সংখ্যা প্রায় ৬৩ লক্ষ হ্রাস পাইয়াছে। এই সংখ্যাহ্রাসের সমর্থনে কর্তৃপক্ষ যে সকল যুক্তি ও তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন, পণ্ডিত কুঞ্জরু তাহা গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন নাই। এই সংখ্যাহ্রাসের দ্বারা আদিবাসীদের স্বার্থ বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া তিনি এই সম্পর্কে পূর্ণ তদন্তের উদ্দেশ্যে একটি কমিশন নিয়োগের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবি জানাইয়াছেন।

আদিবাসীদের প্রসঙ্গ অবতারণা করিয়া পণ্ডিত কুঞ্জরু ১৯৫১ সনের সেন্সাস সম্পর্কে যে মন্তব্য ও আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, বিহারের বাংলাভাষী অঞ্চলসমূহের গত সেন্সাস সম্পর্কে ঐ সকল মন্তব্য ও আশঙ্কা সমভাবেই প্রযোজ্য। সঙ্কীর্ণ ভেদবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া বিহারের কর্তৃপক্ষমণ্ডলীর তরফে ১৯৫১ সনের সেন্সাসে বিহারের বাংলাভাষী অঞ্চলসমূহে বাংলাভাষীর সংখ্যাহ্রাস ও হিন্দীভাষীর সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য যে সকল অপকৌশল অবলম্বিত হয় তাহার সহিত ১৯৪১ সনের সেন্সাসে মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধি ও হিন্দুর সংখ্যাহ্রাসের উদ্দেশ্যে বাংলার তদানীন্তন মুসলীম লীগ গবর্ণমেন্টের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিজনিত অপকৌশলসমূহের তুলনা চলে। মানভূম প্রভৃতি বাংলাভাষী অঞ্চলের সেন্সাস রিপোর্টের প্রতিটি ছত্রে ঐ মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলের আদমশুমারি হিন্দীভাষার সঙ্কীর্ণ স্বার্থে বিকৃত করিবার প্রস্তুতি ১৯৪৮ সন হইতে সুরু হয়। শাসনযন্ত্রের পূর্ণতম সুযোগ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে এবং সরকারী লিখিত বা অলিখিত নির্দ্দেশাদি অধস্তন কর্ম্মচারিগণ কর্তৃক যাহাতে বিনা বাক্যব্যয়ে পালিত হয় সেইজন্য মানভূমের সমস্ত বাংলাভাষী পদস্থ কর্ম্মচারী স্থানান্তরিত করা হয়। জেলার শাসনকর্তার পদ হইতে সুরু করিয়া শাসন ও বিচারবিভাগ, পুলিস, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বন, সমবায়, জনকল্যাণ, প্রচার প্রভৃতি অন্যান্য সমস্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী হইতে পেয়াদা, আর্দ্দালী পর্য্যন্ত নিম্নতম পদগুলিতে কেবলমাত্র হিন্দীভাষীদের বহাল করা হয়। এই সকল বিভাগ ও বিভাগীয় কর্ম্মচারীর সাহায্যে সমগ্র জেলাব্যাপী হিন্দী প্রচার ও বাংলাভাষা দমন একই সঙ্গে চলিতে থাকে।

১৯৪৯ সনে মানভূম এডুকেশন কাউন্সিল নামে একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় এবং জেলার ডেপুটি কমিশনার ও ডিষ্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস যথাক্রমে ইহার সভাপতি এবং সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই কাউন্সিলের অধীনে প্রায় চারি শত হিন্দী প্রাথমিক স্কুল খুলিয়া এইগুলির পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই স্কুলগুলির কোনও অস্তিত্ব ছিল না—কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়ত একটি নামমাত্র স্কুলগৃহ ছিল—কিন্তু ছাত্র থাকিত না; তবে স্কুলের একাধিক হিন্দী পণ্ডিত মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর নিয়মিতভাবেই বেতন পাইয়া যাইতেন এবং 'যথারীতি' শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিদর্শনাদিও হইত।

এই সকল হিন্দী পণ্ডিতের একমাত্র কর্ত্তব্য ছিল স্থানীয় পরিস্থিতি ও অধিবাসিগণের সহিত পরিচিত হওয়া এবং তাহাদের দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করা। হিন্দী-প্রচারের অনুকূল অবস্থাসৃষ্টির জন্য তাঁহাদের কার্য্যের বিশেষ ধারা ছিল—স্থানীয় সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের সঙ্ঘবদ্ধ করা এবং তাহাদের পূর্ণ আনুগত্যলাভের জন্য কৃষিঋণ, জলসেচের নিমিত্ত সরকারী সাহায্য, সরকারী ঠিকা প্রভৃতির নামে সরকারের যাবতীয় খয়রাতি টাকা ইহাদের মধ্যে বণ্টন করা। আদিবাসী উন্নয়ন, হরিজন উন্নয়ন প্রভৃতি সরকারী উন্নয়ন-বিভাগগুলির সহিত যোগাযোগে আদিবাসী ও হরিজনদিগের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি ইঁহাদের প্রচারের অন্যতম ধারা ছিল এবং উচ্চবর্ণ বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের বিষয়-সম্পত্তি বেদখল করিবার জন্য ইঁহারা আদিবাসী ও হরিজনদের উত্তেজিত করিতেন। অনুন্নত শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরও সরকারের খয়রাতি টাকার কিছু কিছু অংশ দিয়া এবং তাহাদের সন্তানদিগের শিক্ষার জন্য সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে কার্য্যতঃ সরকারের বিশেষ পক্ষপাতী করিয়া তোলা হইল। ১৯৫১ সনের সেন্সাসে সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিহার সরকার এডুকেশন

কউন্সিলের স্কুল, হিন্দী-প্রচার, অধিক ফসল ফলাও, জলসেচ, কৃষি-ঋণ, উন্নয়ন প্রভৃতি বাবদ একমাত্র মানভূম জেলাতেই এক কোটির অধিক টাকা সরকার খয়রাতি দিয়াছেন।

একদিকে যেমন হিন্দী-প্রচার অব্যাহত থাকে, অন্যদিকে তেমনি বাংলাভাষাকে দমন করিবার জন্য সরকারী দণ্ড সর্ব্বদাই উদ্যত রাখা হয়। মানভূম জেলাবোর্ড ও লোকাল বোর্ডসমূহের অধীন বাংলা স্কুলগুলি এবং অন্যান্য বেসরকারী বাংলা স্কুলের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চলে; আর স্কুলগুলির সরকারী সাহায্য বন্ধ করিয়া, মঞ্জুরি প্রত্যাহার করিয়া কিংবা মঞ্জুরীর জন্য হীন সর্ত্তাদি আরোপ করিয়া এবং আরও নানা উপায়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়। বনরক্ষার নামে মানভূমের সমস্ত বনসম্পদ উজাড় করিয়া জঙ্গল আইনের নামে গ্রামবাসীদের জঙ্গলে অনধিকারপ্রবেশ, বিনা অনুমতিতে গাছ কাটার মিথ্যা মামলা প্রভৃতি উপায়ে জনসাধারণকে লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। এই ভাবে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ আতঙ্ক ও ত্রাসসঞ্চারের জন্য উদ্যোগী হইয়া উঠে। তাহার পর চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, দাঙ্গা, জঙ্গল আইন ভঙ্গ, শান্তিভঙ্গ প্রভৃতি অভিযোগে নানা প্রকার মিথ্যা মামলা দায়ের করিয়া মানভূমের শত শত রাজনৈতিক কর্ম্মী এবং গঠনমূলক সমাজসেবীকে গ্রেপ্তার, জেল, জরিমানা প্রভৃতি নানা উপায়ে দণ্ডিত ও লাঞ্ছিত করা হয়। ১৯৫১ সনের সেন্সাসের কার্য্য সুরু হইবার পূর্ব্বেই এইপ্রকার দমননীতির দ্বারা মানভূমের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিবার প্রয়াস সুরু হয়।

উপরোক্ত পরিস্থিতির মধ্যে মানভূমের সেন্সাসের কার্য্য আরম্ভ হইল। লোকগণনার কাজে যতদূর সম্ভব হিন্দী পণ্ডিত এবং সরকারের অনুগৃহীত সমাজ-বিরোধী ব্যক্তিগণকেই নিয়োগ করা হয়। হরিজন, আদিবাসী, কুর্ম্মী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের হিন্দীভাষী-রূপে গণনা করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া এবং যে সকল বাঙালী গণনাকারী অন্যায় ভাবে বাংলাভাষীকে হিন্দীভাষীরূপে লিপিবদ্ধ করিতে ইতস্ততঃ করিতেন, তাঁহাদের ভাষা সম্পর্কিত স্তম্ভটি খালি রাখিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। পুলিস, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সরকারী কর্ম্মচারিগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া আতঙ্ক সৃষ্টি করিতে থাকেন—যাহাতে সকলেই নিজেদের নাম হিন্দীভাষীরূপে লিপিবদ্ধ করাইতে বাধ্য হয়। এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বহু অভিযোগ করিলেও অবস্থার কোনও উন্নতি ঘটে নাই। লোকগণনার কাজ সমাপ্ত হইয়া যাইবার পরেও সেন্সাসের কাগজ-পত্র লইয়া নানা গোলমালের সংবাদ পাওয়া যায়, যাহার ফলে বিহার সেক্রেটারিয়েট হইতে সেন্সাস সম্পর্কিত মানভূমের কাগজপত্র রহস্যজনক ভাবে অদৃশ্য হয়।

প্রাচীন কাল হইতে মানভূম, ধলভূম প্রভৃতি অঞ্চলের অধি-বাসিগণের মাতৃভাষা বাংলা হওয়ায়, স্বভাবতঃই বাংলাই এই সকল স্থানের আদালতের ভাষা, শিক্ষার মাধ্যম প্রভৃতি হিসাবে স্বীকৃত হয়। ১৭৯৩ সনের ১৯ নং রেগুলেশন অনুসারে বাংলা মানভূম ও ধলভূমের আদালতের ভাষা হিসাবে স্বীকৃত হয় এবং যাবতীয় দলিল, রেজিষ্ট্রী প্রভৃতি বাংলায় সম্পাদিত হয়। দশসালা বন্দোবস্ত ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কবুলিয়ত; ১৮৮৪ সনে মুন্সী নন্দজীর সম্পাদিত ঘাটোয়ালী সংক্রান্ত যাবতীয় দলিল; পঞ্চকোট, বরাহভূম প্রভৃতি রাজের প্রদত্ত সনদ—এই সকলই বাংলায় লিপিবদ্ধ। এই অবস্থাই অবিসংবাদিত ভাবে চলিয়া আসার পর ১৯১৩ সনে ধান-বাদ মহকুমায় এবং ১৯৩৩ সনে ধলভূম মহকুমায় হিন্দীকে আদালতের অন্যতম ভাষা হিসাবে চালাইবার চেষ্টা করা হয়। বিহার ও উড়িষ্যা স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হইবার পর হইতেই লুবী, ম্যাক্-ফার্সন প্রমুখ জনকয়েক ইংরেজ সিবিলিয়ান রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে অভিযান চালান। সেই সূত্র ধরিয়া ১৯৩৭ সনে বিহারের প্রথম কংগ্রেস-মন্ত্রিত্বের আমলে এই বাংলা-বিরোধী আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। সেই সময় অবস্থা এমন জটিল হইয়া উঠে যে, সমস্যাটির সমাধানের জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদের উপর ভার অর্পণ করিতে হয়। ইহার ফলে অবস্থার বিশেষ কিছু উন্নতি না হইলেও, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাওয়ার দরুন এই আন্দোলন স্বভাবতঃই চাপা পড়িয়া যায়। কিন্তু ১৯৪৭ সনে দেশ স্বাধীন হইবার পর, বিহারে পুনরায় এই বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। ইহার কোনও মীমাংসা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। ১৯৫১ সনের সেন্সাসের বিকৃতি এই বিরোধেরই লজ্জাজনক পরিণাম।

১৯৫১ সনের আদমশুমারিতে কি পরিমাণ বিকৃত তথ্য পরি-বেশিত হইয়াছে এবং ঐমিথ্যার জাল কি ভাবে বয়ন করা হইয়াছে—তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে পূর্ব্বেকার আদমশুমারির সহিত তুলনা করা প্রয়োজন। আলোচনার সুবিধার জন্য ১৯৩১, ১৯৪১ ও ১৯৫১ সনের সেন্সাস রিপোর্টের তথ্যাদি এখানে প্রদত্ত হইল। এই বিশ বৎসরের মধ্যে মানভূমে হিন্দীভাষীর সংখ্যা কি অস্বাভাবিক হারে বাড়ানো হইয়াছে এবং বাংলাভাষীর সংখ্যা কত দূর অন্যায় ভাবে কমানো হইয়াছে তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যাইবে। হিন্দীভাষীর সংখ্যাবৃদ্ধি ও বাংলাভাষীর সংখ্যাহ্রাস করাইবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত উপায়গুলি সাধারণ ভাবে অনুসৃত হইয়াছিল:

(ক) যত দূর সম্ভব বাংলাভাষীর সংখ্যা কম দেখানো;

(খ) বাংলাভাষীকে যত দূর সম্ভব হিন্দীভাষীরূপে গণনা করা;

(গ) বাংলাভাষী আদিবাসী বা হরিজনদের হিন্দীভাষীরূপে গণনা করা;

(ঘ) দ্বিভাষী অথবা হিন্দী জানে এইরূপ আদিবাসীদের হিন্দী-ভাষীরূপে গণনা করা; ইত্যাদি।

উপরোক্ত কৌশল অনুযায়ী লোকগণনার ফলে ১৮৯১ হইতে ১৯৪১ সন পর্য্যন্ত সমগ্র মানভূমে বাংলাভাষীর সংখ্যা গড়ে যেখানে শতকরা ৬৯ জন ছিল, ১৯৫১ সনের লোকগণনায় তাহা মাত্র শতকরা ৪৩'৪ জনে দাঁড়াইল! আর গত

পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া যে হিন্দীভাষীর সংখ্যা মানভূমে গড়ে শতকরা মাত্র ১৬ জন ছিল—তাহা দশ বৎসরের মধ্যেই শতকরা ৪৩ জন অর্থাৎ বাংলাভাষীদের প্রায় সমান সংখ্যায় দাঁড়াইল। যথা :

মানভূম : ১৮৯১-১৯৫১

সেন্সাসের বৎসর	মোট জনসংখ্যা	বাংলাভাষী	মোট জনসংখ্যার শতকরা	হিন্দীভাষী	মোট জনসংখ্যার শতকরা
১৮৯১	১০,৫৮,২২৮	৮,২০,৮৭৯	৭৮·৪	১,০৯,৭৮১	১০·৩
১৯০১	১৩,০১,৩৬৪	৯,৬০,০০০	৭২·০	১,৬৩,৮০০	১২·৬
১৯১১	১৫,৪৭,৫৭৬	৯,৮৩,৩৮৩	৬৩·৫	৩,২৬,৩৬৩	২১·০
১৯২১	১৫,৪৮,৭৭৭	১০,৩৫,৩৮৬	৬৬·৮	২,৮৯,৩৫৬	১৮·৬
১৯৩১	১৮,১০,৮৯০	১২,২২,৬৮৯	৬৭·৫	৩,২১,৬৯০	১৭·৭
১৯৪১	২০,৩২,১৪৬	১৩,৫৭,২৮৪	৬৭·৩	৩,৫৭,০৭৫	১৭·৫
১৯৫১	২২,৭৯,২৫৯	৯,৯১,১২৬	৪৩·৪	৯,৭৮,০৪৬	৪৩·০

মানভূমের সাঁওতাল সম্প্রদায় সম্পূর্ণভাবে বাংলাভাষী। নিজেদের মাতৃভাষা সাঁওতালী তাহারা গৃহে ব্যবহার করিলেও ব্যবহারিক জীবনে বাংলাভাষাই তাহাদের দ্বিতীয় মাতৃভাষা। সুতরাং সাঁওতালগণ সর্ব্বতোভাবে বাংলাভাষীরূপে গণ্য হইবার যোগ্য; ফলে মানভূমে বাংলাভাষীর সংখ্যা শতকরা আরও ১১ হইতে ১৩ জন বৃদ্ধি পাইবে।

মানভূমের স্থায়ী অধিবাসিগণের মধ্যে মাতৃভাষা হিন্দী এইরূপ ব্যক্তির সংখ্যা খুবই সামান্য। মানভূমের কয়লা-খনি অঞ্চলে বহু হিন্দীভাষী শ্রমিক কাজ করে এবং তাহারা অধিকাংশই বহিরাগত হওয়ায় মানভূমের হিন্দীভাষীদের সংখ্যা কয়লা-শিল্পের তেজিমন্দির উপরই বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইয়া থাকে। ১৯৪১ সন হইতে দশ বৎসরের মধ্যে কয়লা-শিল্পের এমন কিছু শ্রীবৃদ্ধি ঘটে নাই যাহাতে মানভূমের সাড়ে তিন লক্ষ হিন্দীভাষীর সংখ্যা একেবারে পৌনে দশ লক্ষ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। আবার হিন্দীভাষীর সংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে বাংলাভাষীর সংখ্যাহ্রাসের কি যুক্তি থাকিতে পারে?—১৯৩১ হইতে ১৯৫১ সনের আদমশুমারির তুলনামূলক বিচার করিলে বাংলাভাষীদের কি পরিমাণ কোণঠাসা করা হইয়াছে তাহা বোধগম্য হইবে। যথা :

১৯৩১-৪১

সেন্সাসের বৎসর	মোট জনসংখ্যা	বাংলাভাষী	সাঁওতালী	হিন্দীভাষী
১৯৪১	২০,৩২,১৪৬	১৩,৫৭,২৮৪	২,৬৭,৬১৯	৩,৫৭,০৭৫
১৯৩১	১৮,১০,৮৯০	১২,২২,৬৮৯	২,৪২,৯৯১	৩,২১,৬৯০
হ্রাস (—) বা বৃদ্ধি (+)	+২,২১,২৫৬	+১,৩৪,৫৯৫	+২৪,৬২৮	+৩৫,৩৮৫

১৯৪১-৫১

সেন্সাসের বৎসর	মোট জনসংখ্যা	বাংলাভাষী	সাঁওতালী	হিন্দীভাষী
১৯৫১	২২,৭৯,২৫৯	৯,৯১,১২৬	২,৬২,৫২৬	৯,৭৮,০৪৬
১৯৪১	২০,৩২,১৪৬	১৩,৫৭,২৮৪	২,৬৭,৬১৯	৩,৫৭,০৭৫
হ্রাস (—) বা বৃদ্ধি (+)	+২,৪৭,১১৩	—৩,৬৬,১৫৮	— ৫,০৯৩	+৬,২০,৯৭১

১৯৩১-৪১ সন পর্য্যন্ত মানভূমের মোট জনসংখ্যার এবং আনুপাতিক হারে বাংলাভাষী, সাঁওতালী ও হিন্দীভাষীদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী দশ বৎসরে (১৯৪১-৫১ সন) মোট জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি অব্যাহত থাকিলেও বাংলাভাষীদের সংখ্যা ৩,৬৬,১৫৮ ও সাঁওতালীদের সংখ্যা ৫০৯৩ জন হ্রাস পাইয়াছে, আর হিন্দীভাষীদের সংখ্যা এই দশ বৎসরে ৬,২০,৯৭১ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯৪১ সনের সেন্সাস যদি নির্ভরশীল ও গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়াই বিবেচিত হয় তাহা হইলে ১৯৩১ ও '৫১ সনের সেন্সাস রিপোর্টের তথ্যাদি হইতেও মোটামুটি একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে। যথা :

১৯৩১, ১৯৫১

সেন্সাসের বৎসর	মোট জনসংখ্যা	বাংলাভাষী	সাঁওতালী	হিন্দীভাষী
১৯৫১	২২,৭৯,২৫৯	৯,৯১,১২৬	২,৬২,৫২৬	৯,৭৮,০৪৬
১৯৩১	১৮,১০,৮৯০	১২,২২,৬৮৯	২,৪২,৯৯১	৩,২১,৬৯০
হ্রাস (—) বা বৃদ্ধি (+)	+ ৪,৬৮,৩৬৯	— ২,৩১,৫৬৩	+ ১৯,৫৩৫	+ ৬,৫৬,৩৫৬

অর্থাৎ, ১৯৩১ ও '৫১ সন, এই দুই সেন্সাসের অন্তর্বর্তী কালে জনসংখ্যা স্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাইলেও নানা অপকৌশল দ্বারা বাংলাভাষীর সংখ্যা ২,৩১,৫৬৩ জন হ্রাস করানো হইয়াছে এবং হিন্দীভাষীর সংখ্যা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া ৬,৫৬,৩৫৬ জন বৃদ্ধি করা হইয়াছে। সাঁওতালীভাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও স্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায় নাই। গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির অনুপাতে দুই সেন্সাসের মধ্যবর্তীকালে হিন্দীভাষীর সংখ্যা শতকরা ১০ জন হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু ১৯৪১-৫১ সনের মধ্যে তাহা হঠাৎ শতকরা দুই শতেরও অধিক হারে বৃদ্ধি পাইল! কয়লা-খনি-সমৃদ্ধিতে ধানবাদ অঞ্চলে হিন্দীভাষীদের সংখ্যাবৃদ্ধির স্বাভাবিক সম্ভাবনা থাকিতে পারে—যদিও তাহা অবাস্তব স্তরে লইয়া যাওয়ার পশ্চাতে কোনও যুক্তি থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু সদর মানভূমে হিন্দীভাষীদের সংখ্যা বৃদ্ধির কোনও সুদূর কল্পনাপ্রসূত সম্ভাবনাও নাই। অথচ সদর মানভূমে হিন্দীভাষীদের সংখ্যা বৃদ্ধি না করাইতে পারিলে মানভূমকে হিন্দীভাষী অঞ্চলরূপে প্রমাণ করা সম্ভব নহে। সুতরাং সদর মানভূমেও হিন্দীভাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি করাইবার জন্য মিথ্যা এবং অবাস্তব তথ্য কতদূর নির্লজ্জ ভাবে পরিবেশিত হইতে পারে, নিম্নের পরিসংখ্যানটি তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত :

মোট জনসংখ্যার অনুপাতে বাংলাভাষী ও হিন্দীভাষীর
হ্রাস (—) বা বৃদ্ধি (+)
১৯৩১, '৫১

	বাংলাভাষীদের সংখ্যা শতকরা	হিন্দীভাষীদের সংখ্যা শতকরা
সমগ্র মানভূম	—১৯	+২০৪
সদর মানভূম	—২৩	+৭০৬·৯৬
ধানবাদ মহকুমা	+৫·৭	+ ৪৩·৩১

অর্থাৎ, গত ২০ বৎসরের মধ্যে সমগ্র মানভূমে বাংলাভাষীর সংখ্যা শতকরা ১৯ জন হ্রাস পাইয়াছে এবং হিন্দীভাষীর সংখ্যা শতকরা ২০৪ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। একমাত্র ধানবাদ মহকুমায় বাংলাভাষীর সংখ্যা ৫·৭ জন এবং হিন্দীভাষীর সংখ্যা শতকরা ৪৩·৩১ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর লোকগণনার চরম কারসাজি পরিলক্ষিত হয় সদর মানভূমে, যেখানে বিশ বৎসরে বাংলাভাষীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে শতকরা ২৩ জন এবং হিন্দীভাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র শতকরা ৭৭ জন! পৃথিবীর কোনও দেশে কোনও কালে মাত্র ২০ বৎসরের মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মে এই হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে কিনা গবেষণার বিষয়।

বিহার-সরকার নিজ গরজে লোকগণনার নামে না হয় যাহা খুশি তথ্য পরিবেশন করিতে পারেন, কিন্তু ঐ সকল তথ্য ভারত-সরকারের সেন্সাস রিপোর্টেও কি ভাবে সন্নিবেশিত হয় তাহাই আশ্চর্য্য! ততোধিক আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই অদ্ভুত তথ্য পরিবেশনের সমর্থনে কেন্দ্রীয় সেন্সাস কর্তৃপক্ষ বিহার-সরকারের "যুক্তি"রই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। সেন্সাস রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, মানভূমে এতদিন হিন্দী শিক্ষার কোনও ভাল ব্যবস্থা ছিল না—সুতরাং সকলকে বাংলা শিখিতে হইত, কিন্তু সম্প্রতি (অর্থাৎ, ১৯৪১ এর পর হইতে) হিন্দী শিক্ষার যথেষ্ট সুব্যবস্থা হওয়ায় মানভূমের হিন্দীভাষীরা এখন নিজেদের মাতৃভাষা হিন্দীর মাধ্যমেই শিক্ষালাভ করিতেছে, ফলে হিন্দীভাষীদের সংখ্যায় স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। অর্থাৎ, ১৯৪১ সন হইতে মানভূমে এডুকেশন কাউন্সিলের অধীনে চারি শতাধিক তথাকথিত হিন্দী স্কুল খুলিবার ফলে মাত্র দুই-তিন বৎসরের মধ্যেই পুরুষানুক্রমে যাহারা বাংলাভাষী তাহারা হিন্দীভাষী হইয়া পড়িল এবং তাহার জন্যই মানভূমে হিন্দীভাষীর সংখ্যা সাড়ে তিন লক্ষ হইতে একেবারে পৌনে দশ লক্ষ হইয়া গেল!

যে সকল অপকৌশল দ্বারা বাংলাভাষীদের সংখ্যাহ্রাস ও সেই অনুপাতে হিন্দীভাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি করানো হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে দ্বিভাষিত্ব (bi-lingualism) অন্যতম। লোকগণনায় ভাষাগত তথ্যের ক্ষেত্রে দ্বি-ভাষীরূপে একটি শ্রেণীবিভাগ করা হয়। নিজেদের মাতৃভাষা ছাড়াও ব্যবহারিক জীবনে অন্য কোনও একটি বিশেষ ভাষাকে যাঁহারা দ্বিতীয় মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করেন, তাঁহাদের দ্বি-ভাষীরূপে গণ্য করা হয়। ভাষাগত এই বিশেষ শ্রেণীবিভাগের সুযোগ লইয়া ১৯৫১ সনের সেন্সাসে মানভূমে বাংলাভাষীর সংখ্যা কিভাবে হ্রাস করানো হইয়াছে এবং সেই অনুপাতে হিন্দীভাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা নিম্নের পরিসংখ্যান হইতে বুঝা যাইবে :

মানভূমের দ্বিভাষীর সংখ্যা (১৯৫১)

পুরুলিয়া সদর				
ক।	বাংলাভাষী	৮,০৫,০৬৩	দ্বিভাষী	৮১,২৫৬
			হিন্দী	৬৭,১৬৪
			সাঁওতালী	৬,৩৫২
খ।	হিন্দীভাষী	৫,০২,৫০২	দ্বিভাষী	২,২২,৮৯৬
			বাংলা	২,১০,১৫৫
			সাঁওতালী	৯,৫৭৫
গ।	সাঁওতালী	২,১৩,৩২১	দ্বিভাষী	১,২৯,৯১১
			বাংলা	১,০৫,৭৬২
			হিন্দী	২২,৭৯০
ধানবাদ				
ক।	হিন্দীভাষী	৪,৭৫,৫৪৩	দ্বিভাষী	৭১,৬০০
			বাংলা	৬৬,৮২৭
			সাঁওতালী	২,৬২১
খ।	বাংলাভাষী	১,৮৬,০৬৩	দ্বিভাষী	৬২,৩৮৬
			হিন্দী	৫৯,৫৬৩
			সাঁওতালী	২,৬২১
গ।	সাঁওতালী	৪৯,২০৫	দ্বিভাষী	২৬,৬৫৮
			বাংলা	৮,৬০০
			হিন্দী	১৭,৮৩১

কেবলমাত্র বাংলা, হিন্দী ও সাঁওতালী এই তিনটি প্রধান ভাষার হিসাব উপরে দেওয়া হইল। দ্বিভাষীরূপে শ্রেণীবিভাগের ধূম্রজালে প্রায় চারি লক্ষ বাংলাভাষীর অস্তিত্ব লোপ করা হইয়াছে। যথা :

পুরুলিয়া সদরে হিন্দীভাষীরূপে গণিত বাংলা দ্বিভাষীর সংখ্যা ২,১০,১৫৫

ধানবাদে	ঐ	ঐ	১,০৫,৭৬২
পুরুলিয়া সদরে সাঁওতালীভাষীরূপে		ঐ	৬৬,৮২৭
ধানবাদে	ঐ	ঐ	৮,৬৮০
		মোট	৩,৯১,৪২৪

অনুরূপভাবে হিন্দীভাষীর সংখ্যা ১,৬৭,৪০৮ জন অধিক দেখানো হইয়াছে।

মানভূমের ক্ষেত্রে যাহা ঘটিয়াছে, তাহারই পুনরাবৃত্তি ধলভূম, সাঁওতাল পরগণা, পূর্ণিয়া প্রভৃতি বাংলাভাষী অঞ্চল এবং হাজারিবাগ ও রাঁচির বাংলাভাষী-অধ্যুষিত অঞ্চলেও ঘটিয়াছে। মানভূমের ভূমিজ, সরাক, দেশোয়ালী মাঝি, খেড়িয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা বাংলা। ইহারা দ্বিভাষীও নহে। কিন্তু ইহাদেরও বাংলাভাষীরূপে গণনা করা হয় নাই। ঠিক অনুরূপভাবে পূর্ণিয়ার সিরিপুরীয়া, সাঁওতাল পরগণার মালপাহাড়ী, রাঁচি ও ধলভূমের সরাক প্রভৃতি সম্প্রদায়ও সম্পূর্ণরূপে বাংলাভাষী। রাঁচি, হাজারিবাগ ও মানভূমে প্রচলিত কুর্মালী ভাষায় হিন্দীর কিছু টান থাকিলেও এই কথ্য ভাষাটি প্রকৃতপক্ষে বাংলা। ড. গ্রিয়ার্সনের ন্যায় সুপণ্ডিত ভাষাতত্ত্ববিদ্ ইহা বাংলাভাষারই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ১৯৫১ সনের সেন্সাসে বিহারের এই সমস্ত বাংলাভাষী সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়া বাংলাভাষীর সংখ্যা নিম্নলিখিতভাবে হ্রাস করা হইয়াছে :

বিহার (১৯৫১)

বাংলাভাষী—	
সিরিপুরীয়া (পূর্ণিয়া)	৬,০৩,৬২৩
কুর্মালী (মানভূম)	১,৭৩,৫২৪
ঐ (রাঁচি)	৮১,০০০
ঐ (হাজারিবাগ)	৩৫,০০০
ভূমিজ (মানভূম)	১,০৬,৮৮৭
ঐ (ধলভূম)	২৩,০০০
সরাক (রাঁচি)	৫৪,৮৬০
ঐ (মানভূম)	১৬,৩৩৬
ঐ (ধলভূম)	৬,৮৮৯
দেশওয়ালী মাঝি (মানভূম)	৪০,২২৪
মালপাহাড়ী (সাঁওতাল পরগণা)	১২,৮০১
খেড়িয়া (মানভূম)	২,৭৬০
মোট	১১,৫১,০৫৬

অর্থাৎ, সমগ্র বিহারে কমপক্ষে সাড়ে এগারো লক্ষ বাংলাভাষীর অস্তিত্ব লোপ করা হইয়াছে।

মাতৃভাষা হিসাবে হিন্দী বিহারের অতি নগণ্যসংখ্যক লোকে বলে। মৈথিল, মগহী ও ভোজপুরী—এই তিনটি হইল বিহারবাসীর মাতৃভাষা। উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব বিহারে মৈথিল, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভোজপুরী এবং দক্ষিণ-বিহারে মগহী ভাষা প্রচলিত। মৈথিল ও ভোজপুরী ভাষীরা নিজ নিজ ভাষা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। তবে মৈথিল, মগহী ও ভোজপুরী যাহারা বলে, তাহাদের অধিকাংশ লোকেই সাহিত্যের ও শিক্ষার ভাষারূপে হিন্দীকে মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু এই যুক্তিতে তাহাদের ভাষাগত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ করিয়া ১৯৫১ সনের সেন্সাসে তাহাদের কেবলমাত্র হিন্দী-ভাষীরূপেই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সেন্সাস রিপোর্টে ইহার সমর্থনে বলা হইয়াছে যে, মৈথিল, মগহী ও ভোজপুর-ভাষীরা নিজেদের হিন্দীভাষীরূপে গণনা করাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করা হইয়াছে। অর্থাৎ, লোকগণনা-সংক্রান্ত কার্য্যে বিজ্ঞানসম্মত নীতির কোনও বালাই নাই—হিন্দীর দোহাই দিয়া যাহা খুশি করা চলে। হিন্দীর স্বার্থে, কর্ত্তৃপক্ষের এই খেয়াল ও খুশির খেসারত বিহারের বাংলাভাষীদের কিভাবে দিতে হইয়াছে তাহা ১৯২১ হইতে ১৯৫১ পর্য্যন্ত ত্রিশ বৎসরের তুলনামূলক হিসাব হইতে বুঝা যাইবে :

বিহারের বিভিন্ন ভাষাভাষীর সংখ্যা

ভাষা	১৯২১	১৯৩১	১৯৫১
হিন্দী (মৈথিল, মগহী ও ভোজপুরী)	২,৪৯,৬৪,০৬৭	২,৭৫,৮৮,২১৭	৩,৪৮,১৭,১৩৩
মুণ্ডা (আদিবাসী)	১৮,৮৩,২২০	২৬,৪০,২১০	৩৩,৫৭,৯২১
বাংলা	১৫,৭৭,৮৬৯	১৮,৬২,৪২৫	১৭,৫৯,৭১৯

স্বাভাবিক নিয়মে বিহারের মৈথিল, মগহী ও ভোজপুরী-ভাষী এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেকেরই বংশ-বিস্তার তথা লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি আনুপাতিক হারে ঘটিয়াছে এবং গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু ১৯৩১ সন হইতে কেবলমাত্র বিহারের বাংলাভাষীদেরই এমন এক "ক্ষয়রোগ" ধরিয়াছে যে, বংশবৃদ্ধি ত দূরের কথা, চক্রবৃদ্ধি হারে তাহাদের সংখ্যা কমিয়াই চলিয়াছে!
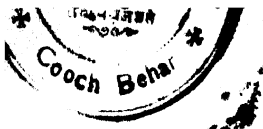
অজোপাখ্যান

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

যখন দেশে ছিলেন—তখন থেকেই মনোরমার সাধ ছিল একটি দুগ্ধবতী ছাগী পোষেন।

একদিন শাশুড়ীর উদ্দেশ্যে স্বগতোক্তিও করেছিলেন; ময়রা-বউ কত করে বলছে একটা বাচ্চা নে, একটা বাচ্চা নে। ছেলেপুলের ঘর দুধের সাশ্রয় হবে কত। এই আক্রা-গণ্ডার বাজারে টাকা টাকা সেরেও খাঁটি দুধ মেলে না—গোয়ালারা এখন সেয়ানা হয়েছে কত! ওরা দুধে আর জল মিশোয় না—বাতাসা মিশোয় না, টিনের গুঁড়ো দুধ গুলে খাঁটি দুধ করে টাকা টাকা সের বেচে। টাকার শ্রাদ্ধ, অথচ ভাল জিনিস না খেয়ে খেয়ে বাছারা হচ্ছে প্যাঁকাটির মত। তাই ইচ্ছে করে একটা ছাগল পুষি—তবু দুধটা ত খাঁটি পাওয়া যাবে। শুনলাম গরু পোষার মত অত ঝঞ্ঝাট নেই, খরচও কম। পাতের-নাতের দুটি ভাত দাও, একটু ফ্যান দাও, হ'ল গিয়ে বা দু' ডাল কাঁটালপাতা অশ্বত্থপাতা এনে দিলে, এ ছাড়া দিনরাত বনে-বাদাড়ে চরে বেড়াবে। একটুও ঝক্কি নেই—খরচ নেই।

অদূরে ঠাকুরঘরে শাশুড়ী বসেছিলেন পূজায়। পূজা শেষ করে সবে জপের মালাটি ঘুরাতে সুরু করেছেন—মনোরমার দীর্ঘ স্বগতোক্তির প্রতিটি কথা তাঁর শ্রুতিগোচর হ'ল। সংখ্যাপূরণের জন্য জপ চলল দ্রুত—কোন উত্তর দিলেন না তিনি। কথার অর্থ গ্রহণ করে মন যে ভাবেই উদ্বেল হোক, জপে বসে তা প্রকাশ করা বিধি নয়। এটি অবশ্য লঘু জপের বেলা প্রযোজ্য নয়। তখন মালা হাতে করে এ-ঘর ও-ঘর করা চলে, উনুনে তরকারি চাপিয়ে সে দিকে একাগ্র-চক্ষু হলেও ক্ষতি নেই, সংসার সম্বন্ধে কোন উপদেশ—ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি ছুটো কথা বলতেও বাধা নেই, কিন্তু পূজার আসনে বসে ইষ্টমন্ত্র জপের সঙ্গে এ সব শোভা পায় না। হাজার হোক বিধবা তিনি, বর্ষীয়সীও। মনটা উসখুস্ করলেও বাঙ্নিষ্পত্তি করলেন না। বাচিক প্রতিবাদ করলেন পরে—ঠাকুরঘর থেকে বার হয়ে।

এই মাত্তর কি যেন বলছিলে বউমা? হিঁদুর ঘরে—বামুনের ঘরে ছাগল পোষা? ছিঃ! ঘর-দুয়োর নোংরা করতে ওর মত দুটি জানোয়ার নেই। আর গরু পোষার ঝঞ্ঝাটই বা কি! একটু শানি মেখে দেওয়া—দু'চার আঁটি বিচিলী কাটা কি গোয়াল পরিষ্কার করা বৈ ত নয়। গোবরে চোনায় বাড়ীঘর শুদ্ধ হয় কত। ভগবতীর সেবা করলে পুণ্যি হয়। আর ছাগল? ইহকাল-পরকাল দুই নষ্ট। কথায় বলে:

পাগলে কি না বলে,
ছাগলে কি না খায়!

মনোরমা বাঙ্নিষ্পত্তি করলেন না—মনের সাধ মনে রেখে ঘরের কাজ করতে লাগলেন।

ছেলেরা বড় হচ্ছে, গ্রামের ইস্কুলে ওদের পড়াশোনা ভালমত হচ্ছে না—এমন কেউ পুরুষ-অভিভাবক নেই ওদের দেখাশোনা করে, আদ্যনাথ স্থির করলেন—শহরে বাসা করবেন।

মা বললেন, বউমাকে নিয়ে তুই বাসায় যা, যে ক'টা দিন বাঁচি ভিটে ছেড়ে কোথাও যাব না আমি।

অগত্যা ছেলেমেয়েদের নিয়ে আদ্যনাথ শহরযাত্রা করলেন। ট্রেনে বসেই মনোরমার মনের কোণ থেকে বেরিয়ে এল পুরনো সাধ। বললেন, শহরে শুনেছি খাঁটি দুধ পাওয়া যায় না—ভাবছি একটি ছাগল পুষব।

ছাগল! বিস্ময়ে বিস্ফারিত হ'ল আদ্যনাথের দুই চোখ।—বল কি! এ তোমার পাড়াগাঁর বাড়ী নয় যে মেলাই খোলা-মেলা জায়গা। নিজে যদি ছেলেমেয়ে নিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুতে পাও ভাগ্যি বলে মেনো।

কেন, ছাগল না হয় বারান্দায় থাকবে—না হয় উঠোনে থাকবে।

বারান্দা? উঠোন? হেসে উঠলেন আদ্যনাথ। ভাড়াটে বাড়ীর ঘরই আছে ভাড়াটেদের জন্যে, ছাদ বারান্দা উঠোন ওসব ভুলে যাও। শহরে ল্যাজা মুড়ো বাদ দিয়ে মাছ বিক্রী হয়, জান?

আচ্ছা আচ্ছা, আগে পৌঁছই ত তার পর দেখা যাবে।

পৌঁছে দেখলেন—আদ্যনাথ কিছুমাত্র অত্যুক্তি করেন নি। ঘর ছাড়া এ বাড়ীতে নিজস্ব কিছু নাই। বারান্দা সাধারণের। কলতলায় যেটুকু শান-বাঁধানো জায়গা রয়েছে তাকে উঠোন বলতেও বাধে—তাও সাধারণের। ছাদের হিস্যা বাড়ীওয়ালার। তাঁর বিনা অনুমতিতে ওখানে কারও প্রবেশাধিকার নাই। এ বাড়ীতে একটুও ফালতু জায়গা নেই, সবটাই দাগে দাগ মিলিয়ে ভাগ করা—পয়সা দিয়ে কিনে নেওয়া।

এই বাড়ীতেই দুটি বছর কায়ক্লেশে বাস করলেন

মনোরমা। ছেলেদের ভাল দুধ খাওয়াবার সাধ মনের সাধেতেই থিতিয়ে রইল।

দু' বছর বাদে—পশ্চিমের শহরে বদলি হলেন আদ্যনাথ। মনোরমাকে বললেন, ভাবছি বাড়ীতেই রেখে যাব তোমাদের।

মনোরমা বললেন, আমাদের নিয়ে যেতেই বা তোমার অসুবিধে কি? বাড়ীতে গেলে ছেলে কি একটিও মানুষ হবে ভেবেছ?

কিন্তু কাশী গেলে—

সেখানে আমাদের চোখের উপরেই থাকবে—বিগড়াতে পারবে না। মাকেও বরঞ্চ কাশী নিয়ে চল।

সেই মত চিঠি লেখা হ'ল দেশে।

উত্তরে মা জানালেন শ্বশুরের ভিটে কাশীর চেয়ে বড়—দেশ ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

গাড়ীতে বসেই জিজ্ঞাসা করলেন মনোরমা, হ্যাঁ গা, কাশীতে নাকি জিনিসপত্তর খুব শস্তা?

ছিল তো আগে, এখন কি হয়েছে ভগবানই জানেন।

—তা বলে পোড়া বাংলাদেশের চেয়ে ভাল। শুনেছি ওখানে টাকায় দু'সের খাঁটি দুধ পাওয়া যায় এখনও।

জিনিসপত্রের শস্তা হলেও বাসাটি তেমন সুবিধার নয়। গলির মধ্যে গলি—তার মধ্যে আকাশ-মুখো বাড়ী। সদর দরজা পেরিয়ে হাত দুয়েকের একটা কলতলা—তার গা দিয়েই উপরে উঠবার সিঁড়ি। মাটির সঙ্গে সম্পর্ক নাই। একখানি ঘর দোতলায়—আর আছে একখানি তেতলায়। তেতলার ছোট ছাদ আছে—সিঁড়ির ঘর আছে, আর আছে টিনে ঘেরা একফালি রান্নাঘর। কলও আছে জলের, কিন্তু সেটা আছে ঐ পর্য্যন্তই। প্রথম দর্শনে ভাড়াটে আশ্বস্ত হলেও শেষ পর্য্যন্ত অস্বস্তিতে ভরে উঠে মন। জল সেই একতলায়—উপরের তলায় টেনে তুলতেই হয়। কিন্তু এ ছাড়া গতিই বা কি।

বাংলার তুলনায় দুধটা শস্তাই, এবং খাঁটিও। তথাপি মনোরমার দীর্ঘকাল সঞ্চিত মনোবাসনা পূরণ করবার সুযোগ করে দিলেন বিশ্বেশ্বর।

দোতলার একাংশ ভাড়া নিয়ে বাস করছিলেন প্রৌঢ় নগেনবাবু। এক সময়ে বাংলার কোন্ পল্লীতে যেন ওঁদের জন্মভিটা ছিল—এখন চাকরির জোয়ারে পশ্চিমের এক শহরের ঘাট থেকে অন্য শহরের ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—দেশের স্মৃতি মুছে গেছে মন থেকে। আদ্যনাথরা আসবার মাসখানেক পরে মীরাটে বদলি হবার হুকুমনামা এল তাঁর।

বললেন সখেদে, বুঝলেন আদ্যবাবু, ওদের মতলবটাই আগাগোড়া খারাপ। লেখাপড়া শিখে ছেলেগুলো মানুষ হোক—এ ওঁরা চান না। ভাবে শিক্ষিত হয়ে পাছে স্বদেশী বাবুদের দল ভারি করে। তা দুম্বু সেই চিরজীবনটা তো এই করে করেই গেল! বদলির বাসায় গাছ পুঁতে এলাম, সে গাছে ফল খেল অন্য জন। বদলির দেশে মানুষের সঙ্গে ভাবসাব করাও কি কম ঝকমারি! চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাসা ছাড়া, মনটি কোন আশ্রয় পায় না।

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, একটি উপকার করেন তো বলি।

বেশ তো বলুন না।

দেখছেন তো আমার একটা ছাগল আছে—পাটনাই ছাগল। পঁচিশ টাকায় কিনেছিলাম দাঁওয়ে। একটানে দুধ দেয়—এক সের। ভাল করে খাওয়াতে পারলে আরও আধ সের কোন্ না দেবে। এখন মুশকিল হয়েছে—ওটিকে কোথায় রেখে যাই! যে দূর দেশ—ওকে ভাড়া দিয়ে নিয়ে যেতে হলেই ত ঢাকের দায়ে মা-মনসা বিকিয়ে যাবেন! ভারি শান্ত ছাগল মশায়, খায়ও কম।

না-না—ছাগল রাখ—তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে উঠলেন আদ্যনাথ।

বেশ তো না-ই রাখেন যদি কি আর করব। আর কাউকে না হয় বিলিয়ে দেব'খন। কিন্তু ভয় হয় পাছে কসাইয়ের হাতে পড়ে। এতদিন খাইয়ে দাইয়ে যত্নআত্তি করে···মায়া তো পড়েছে—শেষকালে কিনা···আচ্ছা ভেবে দেখবেন একবার কথাটা। দিন এক সের খাঁটি দুধ পাবেন, দিন এক টাকা করে বেঁচে যাবে।

নগেনবাবু চলে গেলে অন্তরাল থেকে বার হয়ে এলেন মনোরমা। বললেন, হাঁগা—ওকি বুদ্ধি তোমার! কথায় বলে, 'যাচা কন্যে আর কাচা কাপড়।' এ'কখনও ছাড়তে আছে? দিন এক সের করে দুধ—বলে এস ছাগল আমরা রাখব। যাও বলে এস—

কথাটা পাকা করেই ফেললেন আদ্যনাথ।

মনোরমা বললেন, যাই চট করে গঙ্গায় একটি ডুব দিয়ে বাবা বিশ্বেশ্বরের মাথায় দুটো বেলপাতা দিয়ে আসি। উনি ছাড়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন এমন দেবতাই বা ত্রিভুবনে কোথায়।

নগেনবাবু সপরিবারে চলে গেলেন মীরাটে, ছাগল এসে উঠল—তিনতলার চিলে কোঠার ঘরে।

দশাসই ছাগল—মনোরমার চোখে কান্তিমানও। চল্লিশ বছরের জীবনে বহু ছাগলই দেখেছেন মনোরমা—কিন্তু মনে হ'ল এমনটি আর দেখেন নি। এ ছাগল তো বাইরের রূপ নিয়ে দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী হয় নি, এ যে মনের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষায় তিলে তিলে বর্দ্ধিত হয়েছে—দীর্ঘদিন ধরে শাখাপল্লবে পরিপুষ্ট হয়ে ছেয়ে ফেলেছে মনোভূমি। সাদা-

কালো পাটকিলে রঙের অপূর্ব্ব মিশ্রণে গড়া ওর লোমশ দেহ, চওড়া-লোটানো ছুটি কান—ড্যাবডেবে চোখের পাশ বেয়ে নেমে এসেছে গলার কাছে, হরিণের মত সরু ও সুগঠিত চারখানি সাদা পা, পাটকিলে রঙের চারখানি খুর—সদ্য কাচা মোজার উপর পালিশ-করা জুতোর মত শোভা পাচ্ছে। খুরের খুট খুট শব্দ তুলে ছাদের উপর ও যখন পাদচারণা করে—মনোরমার মন পূর্ণ হয়ে উঠে পুলকে।

প্রথম দিন একটি গামলা নিয়ে দোহনকার্য্য সম্পন্ন করলেন মনোরমা। উবু হয়ে বসার কালে অসুবিধা বোধ হ'ল—কিন্তু শূন্য পাত্রে অজা-স্তন্য-নিঃসৃত দুগ্ধধারার শব্দ তাঁর কানে সুর-সুধা বর্ষণ করল। পাত্র কানায় কানায় ভরে উঠার সঙ্গে মনোরমার মনও পূর্ণ হয়ে উঠল। দুধের গামলাটা আদ্যনাথের সামনে এনে বললেন, দেখ—দেখ কতখানি দুধ দিয়েছে। এই দুধ দিয়ে আজ চা করব।

চায়ের রং আর স্বাদ হ'ল চমৎকার। আদ্যনাথ প্রশংসা করলেন মনোরমার। ভাগ্যিস তুমি বলেছিলে!

আমি যে কতদিন প্রার্থনা করেছি, হে ভগবান—তুমি সাধ দিয়াছ যদি—তুমিই পূর্ণ কর। তাই ত বাবা বিশ্বেশ্বরকে কালাকাঁদ দিয়ে ভাল করে পূজো দিয়ে এলাম কাল।

ছাগীদুগ্ধ পান করে সকলেই পরিতুষ্ট হ'ল—সবাই ভাগ করে নিল—ছাগচর্য্যার ভার।

ছেলেরা এখান-ওখান থেকে পাতা সংগ্রহ করে আনতে লাগল, নিজের নিজের পাতের ভাত ক্ষুধা-মান্দ্যের অজুহাতে ছাগলকে খাওয়াতে লাগল। এমন কি আদ্যনাথও একদিন পাঁচ সের ছোলা এনে বললেন, শস্তায় পেলাম, চাট্টি চাট্টি খেতে দিও ওকে।

ছোট মেয়ে কোথা থেকে গুটি পাঁচ ছয় দূর্ব্বাঘাস এনে বলল, মা, ভগবতীকে দেব?

কাশীতে লাওয়া বলে, এবং শাশুড়ী এক দিন বলেছিলেন যে গরু হচ্ছে মা ভগবতী—ওর সেবা করলে পুণ্য হয়—এই সব হেতু মিলিয়ে মনোরমা ছাগলের নাম রেখেছেন ভগবতী।

এক দিন মনোরমা বললেন, ভাবছি ওকে আর পাতা খাওয়াবো না—ওতে দুধে গন্ধ হয়। তুমি বরঞ্চ কিছু ভুষা এনে দিয়ো তাই খাবে। খরচের জন্য ভেব না—মাছের তেলে মাছ ভাজব আমি। এক পো করে দুধ ভাবছি দত্ত দিদিকে দেব—চার আনা পেলি, ওই চার আনার ভুষা হলে ওর হেউ ঢেউ।

আমাদের দুধে কম পড়বে না?

ভাল খেতে পেলে বেশী করে দুধ দেবে। সেই বাড়তি দুধটাই বেচে দেব। ভাল হবে না?

এই সুব্যবস্থায় আপত্তি করবেন কেন আদ্যনাথ?

আপত্তির সূত্রটি খুঁজে পেলেন মাস দুই পরে।

উত্তম আহার্য্য পেয়েও অজা তখন দুগ্ধ বিতরণে কার্পণ্য করতে সুরু করেছেন। দোষ অবশ্য ওরও নয়—বাচ্চা বড় হলেই দুধের পরিমাণ যে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়—এ তথ্য সংসারী মাত্রেই জানেন। শুধু এ বাড়ীর কেউ বুঝতে চাইলেন না। প্রকৃতির নিয়ম অন্য প্রাণীর বেলায় যাই হোক—ভগবতীর বেলায় ব্যতিক্রম হবে এইটেই যেন ওঁদের আশা। কারণ ভগবতীর পরিচর্য্যা চলছে পূর্ণোদ্যমে—তার প্রতিদানে ও কেন নিরুৎসাহ করবে প্রতিপালকদের? ওর পশুজীবনেও কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ ছাড়া উচিত?

দুধের পরিমাণ যখন খুবই কমে এল তখন মনোরমা বললেন, ছাগলটা আজকাল দুধ চুরি করতে শিখেছে—জান? যখনই দুইতে যাই—গায়ে হাত ঠেকেছে কি গড় গড় শব্দ করে অমনি দুধ টেনে নেয়।

আদ্যনাথ বললেন, না না—বাচ্চা বড় হলে দুধ কমে যায়। গরুর বেলায় দেখ নি?

দেখেছেন বৈ কি মনোরমা, কিন্তু লোকসানটা তিনি প্রসন্নমনে মেনে নিতে পারছেন না। দোহনকালে ছাগলটার গায়ে কিল চাপড়ও পড়তে লাগল।

ছেলেরাও কখনও কান ধরে, কখনও লেজ টেনে, কখনও বা পিঠের ওপর চেপে কৃতঘ্নতার শাস্তি দিতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই কি অবোধের জ্ঞান সঞ্চার হ'ল! দুধের পরিমাণ ক্রমশঃ কমতে লাগল। চরম দণ্ডবিধান করে মনোরমা অতঃপর কাঁচি চালালেন ওর আহার্য্য-বরাদ্দের উপর। প্রতিদানে ছাগলও করল অসহযোগ। এক দিন দোহনপাত্রে বিন্দুমাত্র দুগ্ধবর্ষণ করল না সে।

ঘরের মেঝেতে বসে দাড়ি কামাচ্ছিলেন আদ্যনাথ—খালি গেলাসটা তাঁর সামনে আছড়ে ফেলে মনোরমা বললেন, এই নাও তোমার ছাগল আজ জবাব দিয়েছে, আর দুধ দেবে না সে।

গঙ্গার ঢালু তীর বেয়ে এক নিমেষে নেমে গেল জোয়ারের জল, কাদা আর ঢেলা আর গর্ত্ত নিয়ে জেগে উঠল চরভূমি।

মনোরমা বললেন, আজকাল তোমার ছাগলের কত গুণ হয়েছে শুনবে? পরশু কাপড় মেলে দিয়েছিলাম—একটা খুঁট ছিল চিলে ঘরের পেরেকে। কাপড় কেচে এসে দেখি গুণনিধি সেই খুঁট দিব্যি চিবুচ্ছেন! সময়ে না দেখতে পেলে কাপড়ের আধখানা ওর গর্ভে যেত।

দু'দিন পরে আর একটি ব্যাপার ঘটল—এর চেয়ে মারাত্মক। ছোট খোকা খেলা করছিল একটা ফুলকপি নিয়ে। খেলা করতে করতে কখন সে কপিসমেত এসেছে

ছাগলটার কাছে। ছেলে বাড়িয়েছে হাত—ছাগল বাড়িয়েছে গলা! ছেলের হাত থেকে কপি উঠেছে ছাগলের মুখে। বহুদিন পরে এমন রসনাতৃপ্তিকর ভোজ্য পেয়ে ছাগলটা ছাগগ্রাসে (গরু হলে অবশ্য গোগ্রাসে বলা যেত) কয়েক মিনিটের মধ্যে সেটি নিঃশেষ করে ফেলেছে। এত শীঘ্র খেলা শেষ হবে ভাবতে পারেনি খোকা। ও চেঁচিয়ে উঠল, মা—ও মা, কপি খেয়ে ফেলল ভগবতী।

কাণ্ড দেখে মনোরমার আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। রান্নার জন্য যে চেলা কাঠ পড়েছিল তাই না উঠিয়ে ছাগলটার পিঠে দুদ্দাড় করে ঘা বসাতে লাগলেন। তারস্বরে চীৎকার করে উঠল ছাগল।

আদ্যনাথ বললেন, আরে কর কি, মরে যাবে যে!

যাক—আপদ যাক। আমি আর পারি না।

এমন চক্ষে চাইলেন আদ্যনাথের পানে যেন ছাগল পোষার সমস্ত অপরাধটা তাঁরই।

আদ্যনাথ সেইদিনই চিঠি লিখলেন নগেন বাবুকে ; কবে আসিয়া আপনার ছাগলটিকে লইয়া যাইবেন জানাইবেন। এ বাড়ীতে ছাগল রাখার অসুবিধা হইতেছে, কেহই আর রাখিতে চায় না।

পত্রপাঠ জবাব দিলেন নগেনবাবু, ছাগল সঙ্গে আনিবার উপায় থাকিলে আনিতাম। ওটি তাই আপনাকে দিয়া আসিয়াছি—ছেলেমেয়েরা দুধ খাইবে বলিয়া। নিতান্ত যদি অসুবিধা বোধ করেন কাহাকেও বিলাইয়া দিবেন।

চিঠি পেয়ে আদ্যনাথ বললেন, বিলিয়ে দেব ছাগলটাকে।

কার দায় পড়েছে তোমার বুড়ো ছাগল নেবে। ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন মনোরমা।

অমনি দিলে কত মিঞাই নেবে।

বহু চেষ্টা করেও কিন্তু সমস্যামুক্ত হতে পারলেন না আদ্যনাথ।

পাশের বাড়ীর কালু ঘোষ বলল, দুধ দিলে কি আর ছাগল বিলিয়ে দিতে দাদা?

কিন্তু দুধ দেবে তো পরে। আদ্যনাথ প্রতিবাদ করলেন।

না-ও দিতে পারে। খনার বচনে আছে— বাইশ বলদা, তের ছাগলা। মাত্তর তের বছর বাঁচে ছাগল। তা নগেন বাবুর কাছেই তো এটি রয়েছে দশ-এগারো বছর। বুড়ো বয়সে কি বাচ্চা হয় ছাগলের!

বেশ তো নিয়ো না। রাগ করে চলে এলেন আদ্যনাথ।

রমণীর মাকে বলতেই বলল, রক্ষে কর বাবু—নাতিনাতনীদের আর দুধ খেয়ে কাজ নেই, ছাগল পুষে শেষকালে কি পাগল হব!

অবশেষে একজন লোক রাজী হ'ল।

তার চেহারা দেখে আদ্যনাথ বললেন, তোমাকে দেব না বাপু।

কেন বাবু, আমাকে দিলে ছাগল আপনার খুব যত্নে থাকবে। লোকটা মিনতি করল।

তা আর থাকবে না? তোমাকে তো দশাশ্বমেধ বাজারে মাংসর দোকানে দেখেছি। সরে পড়।

মনোরমা কাঁদ-কাঁদ গলায় বললেন, হ্যাঁগা, তা হলে কি হবে? এ যে দেখছি সাপে ছুঁচো গেলা হ'ল! একে সংসার চলে টায়েটোয়ে, তর ওপর ওই ছাগল—

আদ্যনাথ হেসে ফেললেন, অবশ্য মনে মনে। মুখে শুধু বললেন, বাবা বিশ্বেশ্বরকে পূজো দাও ভাল করে, যাতে এ দায় থেকে উদ্ধার হতে পার।

দায় যেন আমারই! আমি একাই যেন ওর দুধ খেয়েছি! ফোঁস করে উঠলেন মনোরমা।

আদ্যনাথ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করলেন না। কিন্তু এ ভাবে তো সমস্যা মেটে না। উপায় একটি বার করতেই হবে। তবে কি খুব ভোরে কাক-কোকিল ডাকবার আগে ওটাকে দড়ি ধরে রাস্তায় বার করে দিয়ে আসবেন? সঙ্গে সঙ্গে দশাশ্বমেধ ঘাটের মাংসের দোকানীকে মনে পড়ল। বেওয়ারিশ ছাগল পেলে ওরা কি আর ছেড়ে দেবে। শিউরে উঠলেন আদ্যনাথ। কাশীতে এসে লোকে কত দানধ্যান পুণ্যকর্ম্ম করে—আর তিনি করছেন এই সব পাপ চিন্তা? আহা অবোলা প্রাণী—ওর কি দোষ!

অনেক রাত্রি অবধি জেগে জেগে চিন্তা করতে লাগলেন—কেমন করে সঙ্কট-মুক্ত হবেন।

রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেছিলেন কি না—কে জানে, ভোর বেলাতে ঘুম ভেঙে যেতেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন আদ্যনাথ। চীৎকার করে ডাকলেন মনোরমাকে, ওগো শুনছ? শীগগির এদিকে এস। আরে গেলে কোথায় গো? শুনছ?

একতলায় নেয়ে এসে দোতলায় কাপড় ছাড়ছিলেন মনোরমা। ডাকের উপর ডাক শুনে ছুটতে ছুটতে তেতলায় উঠে এলেন। বললেন, কি জ্বালা—অত চেঁচাচ্ছ কেন? বাড়ীতে কি ডাকাত পড়েছে, না লটারীতে ফার্ষ্ট প্রাইজ পেয়েছ?

ফার্ষ্ট প্রাইজ পেয়েছি—শীগ্‌গির দশটা টাকা বার করে দাও তো।

টাকা! আকাশ থেকে পড়লেন মনোরমা। আজ

মাসের ক' তারিখ মনে আছে ? বাক্সোয় মাত্তর আড়াইটে টাকা পড়ে আছে। আজ, কাল, পরশু তিন দিন চালাতে হবে। তার মধ্যে আমার র‍্যাশনও আনা আছে।

চুলোরি র‍্যাশন! টাকা না থাকে তোমার রুলি খুলে দাও—বাঁধাছাঁদা দিয়ে যেমন করে হোক—দশটা টাকা আমার চাই। আজই চাই।

অবাক হয়ে গেলেন মনোরমা—এমন মূর্তি আদ্যনাথের কখনও তো দেখেন নি। বললেন, কি বলছ তুমি? তোমার কি মাথা খারাপ হ'ল ?

মাথা খারাপ হয় নি—বরঞ্চ বুদ্ধি খুলে গেছে। শোন তবে। ওই টাকা দিয়ে মীরাটে একটা জিনিস পাঠাব। জ্যান্ত লগেজ—রেলের মাশুল গুণে। আরে, তবুও অবাক হয়ে চেয়ে রইলে ? বলি একটু একটু খুঁচিয়ে কাটা ভাল, না এক কোপে সাবাড় করা ভাল ? এই যে ছাগল পুষে মাস মাস খরচ গুনে মরছি... অথচ একবার যদি থোকথাক কিছু খরচ করি তো দায় থেকে খালাস হব কি না ? ওই টাকা দিয়ে যার ছাগল তারই কাছে পাঠিয়ে দেব—বুঝলে ? একবারই খরচ হবে—মাস মাস তো জের টানতে হবে না।

মনোরমার মুখখানি মনে হ'ল—সকালবেলাকার পূব-দিককার আকাশ—সুদীর্ঘ রাত্রির অবসান হয়ে যা সূর্য্যোদয়ের সম্ভাবনায় ঝলমল করে উঠে।

দু'হাত জোড় করে তিনি কাকে যেন প্রণাম জানালেন। বললেন, ওর থেকে দুটি টাকা আমায় দিও—বাবা বিশ্বনাথকে ভাল করে পূজো দিয়ে আসব।

শাশ্বত স্বাধীনতা

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

ঐক্যে বাঁধা বক্ষ যাদের স্বাধীন তারাই মুক্ত
তাদের লাগি নেই আলাদা সরকার,
ভয়-ভাবনাশূন্য তারা শৌর্যের সাথে যুক্ত
শাসন তাদের হয় না কভুই দরকার।
প্রত্যেকেরি চিত্ত তাদের নিষ্পাপ এবং সরল
নির্লোভ এবং হিংসাবিহীন মনপ্রাণ,
সন্দেহ নেই পরস্পরে বক্ষেতে নেই গরল
সুরক্ষিত প্রত্যেকেরি ধনমান।
কাজেই তাদের নিজের মাঝে নেইক কোনই দ্বন্দ্ব
সমস্যা নেই সংসারে একরত্তি,
সবার সমান স্বার্থ তাদের প্রাণভরা কি ছন্দ
পবিত্র সেই স্বাধীনতাই সত্যি।
হয় না তাদের নিজের সাথে বিষয় নিয়ে ঝগড়া
পরস্পরে হয় না কভু দংশন,
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষেতে হাওড়া থেকে মগরা
পালায় না কেউ জলাজ্ঞলি আসন।
পবিত্র সেই স্বাধীনতায় সবাই সমান অংশী
কাজেই তাতে নেইকো চোরাকারবার,
বঞ্চনা কে করবে কাকে ? বিশ্বপ্রেমের বংশী
আনন্দেতে বাজায় তারা বারবার,
সবাই থাকে নিজের দেশেই নিজের ভিটের বক্ষে
বিপদকালে সবাই তারা একপ্রাণ,
এই একতাই লাখ বিপদে তাদের করে রক্ষে
বিশ্বে সবাই তাদের গাহে জয়গান।
তারাই নিজের দেশের মালিক তারাই নিজে সরকার
আনন্দ সুখ তাদের কাছে বন্দী,
ভাত কাপড়ের ভাবনা তাদের হয় না কভু দরকার
জীবন তাদের নিত্য চলে ছন্দি'।
থোড়াই তারা গ্রাহ্য করে বিঘ্ন-বিপদ ভয়কে
মৃত্যু স্বয়ং তাদের কাছে তুচ্ছ,
ঐক্যে যাদের সখ্য বাঁধা বক্ষে বাঁধি জয়কে
বিশ্বে তাদের শিরটি চির উচ্চ।
ইচ্ছাতে যার শক্তি বাঁধা চিত্তে বাঁধা বিদ্যুৎ
প্রত্যেকেতে সত্যে যারা বেগবান,
শিব তাহাদের বক্ষে এবং স্বয়ং তারা শিবদূত
এই পৃথিবীর পথ তাহাদের দেরবান।
সংসার এবং রাষ্ট্র যারা বাঁধল একই সঙ্গে
নিজেই নিজের পুলিস এবং নিজেই নিজের সৈন্য
সত্যিকারের স্বাধীন তারাই থাকবে বেঁচে রঙ্গে
তাদের মহান্ স্বাধীনতাই অমর এবং ধন্য।
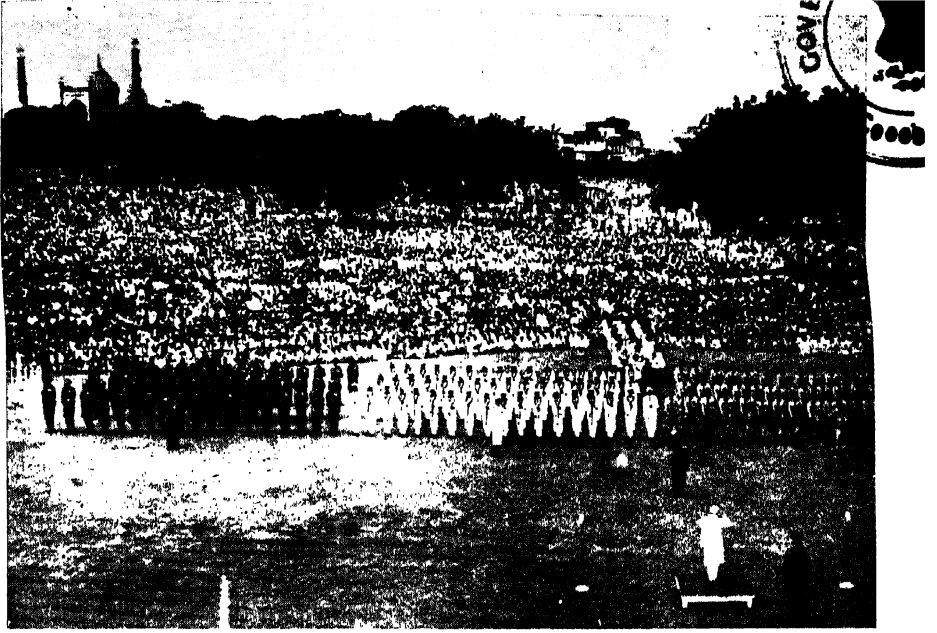
স্বাধীনতা দিবসে, দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল নেহরু কর্ত্তৃক 'গার্ড অব অনারে'র অভিবাদন গ্রহণ !

নিউ দিল্লীতে ইন্দোচীনের আন্তর্জাতিক কমিশনের কানাডা, পোলাণ্ড এবং ভারতীয় সদস্যগণের সভা
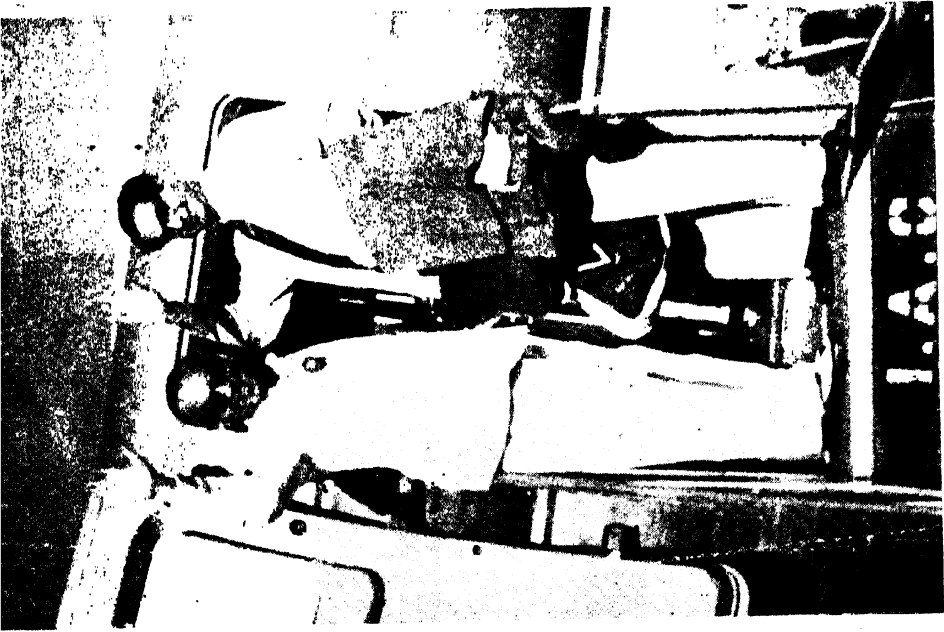
ইন্দোচীন যাত্রাকালে পালাম বিমানঘাটিতে
শ্রীএম. জে. দেশাই ও শ্রী ডি. পি. পার্থসারথি

পাঁচমারি, 'সমাজসেবা শিক্ষা-শিবিরে'র 'গার্ল ক্যাডেট'গণ
কর্তৃক একটি পীড়িত শিশুকে প্রাথমিক সাহায্য প্রদান

হায়দর্ আলি এবং তাঁহার ইউরোপীয় সেনানীবর্গ

অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুর্ব্বলচিত্ত নিজাম আলি ইহার অল্পকাল পরে হায়দরকে পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। পূর্ব্বতন সন্ধিপত্র এই নূতন সন্ধির মূলভিত্তি হইলেও কয়েকটি বিষয়ে দুইটির মধ্যে গুরুতর পার্থক্য ছিল। তন্মধ্যে হায়দরকে পরস্বাপহারী ঘোষণা করিয়া মিত্রদ্বয়ের নিজেদের খেয়ালমত তাঁহার রাজ্য আপনাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইবার সর্ত্তটির সত্যই তুলনা মেলা ভার!

ইহার কিছুকাল পরে (৮।১২।১৭৬৭) একটি খণ্ডযুদ্ধে দে লা তুর ইংরেজদিগের হস্তে নিপতিত হন, কিন্তু সে ইতিহাস প্রদানের পূর্ব্বে শ্লেভালিয়ে দি সেণ্ট লুর্ব্যা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ভাগ্যান্বেষী সৈনিক বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় তিনি ঠিক সে জাতীয় না হইলেও, একজন সুচতুর রাজনৈতিক (adventurer) ছিলেন এবং দীর্ঘ দশ বৎসরেরও অধিককাল স্বীয় নানাবিধ ষড়যন্ত্রের বলে এদেশের বিভিন্ন দরবারকে সন্ত্রস্ত ও উদ্বিগ্ন রাখিয়াছিলেন। পেলেবো (Paillebeau) দি সেণ্ট লুর্ব্যা ইহার প্রকৃত নাম, ইতিহাসে তিনি শ্লেভালিয়ে দি সেণ্ট লুর্ব্যা নামে পরিচিত; উক্ত উপাধিটি তাঁহার স্বয়ংসিদ্ধ। প্রথম জীবনে ফরাসী সৈনিকরূপে তিনিও এদেশে আসিয়াছিলেন এবং কাউণ্ট লালীর দলভুক্ত ছিলেন বলিয়া দে লা তুর উল্লেখ করিলেও এক্ষণে জানা গিয়াছে সেকথা ঠিক নহে। প্রথম জীবনে নরসুন্দররূপে পণ্ডিচেরী নগরে তাঁহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল এবং কাউণ্ট লালীর যুদ্ধের সময় তিনি নাপিতের কাঁচি ও ক্ষুর ছাড়িয়া সার্জ্জনের কাঁচি ও ছুরি ধরিয়াছিলেন। প্রায় তিন বৎসরকাল ফরাসী সেনাবিভাগে সার্জ্জনের সহকারীরূপে কাজ করিবার পর পণ্ডিচেরীর পতন হইলে অপরাপর যুদ্ধবন্দীর সহিত তিনিও ইউরোপে প্রেরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্যান্বেষণের অপরিসীম ক্ষেত্র ভারতবর্ষের মোহ তাঁহাকে ছাড়ে নাই। সমরাবসানে মুক্তিলাভের পর তিনি আবার এদেশে ফিরিয়া আসিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষে দৌত্যবিভাগে কোন কর্ম্ম তাঁহাকে দিবার জন্য তিনি মন্ত্রিসভাকে অনুরোধ উপরোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। লোকটির কল্পনা এবং রসনার অন্ত যে কোথায় তাহা বোধ হয় স্বয়ং অন্তর্যামীরও অজ্ঞাত! নৌবিভাগীয় মন্ত্রী সার্তিনকে তিনি লিখিয়াছিলেন, সৈনিকরূপে ভারতবর্ষে গমন করিলেও স্বল্পকালের মধ্যে সুচতুর রাষ্ট্রনীতিকুশল ব্যক্তিরূপে তিনি এরূপ অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন যে, কাউণ্ট লালী ইংরেজদিগের কলিকাতা নগরকে দুর্গাদি দ্বারা সুরক্ষিত করার পরিকল্পনা অপহরণের সুকঠিন এবং বিপজ্জনক কার্য্যভার তাঁহার প্রতি ন্যস্ত করিয়াছিলেন এবং ঐ কার্য্য তিনি সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ভাবেই সম্পন্ন করেন—অর্থাৎ শুধু প্ল্যান চুরিই নহে, ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়রকেও তিনি ভুলাইয়া ধরিয়া আনিয়াছিলেন এবং এই ভাবে শত্রুপক্ষের দুর্গনির্ম্মাণকার্য্য তিন বৎসরকাল পিছাইয়া দিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এরূপ ঘোর মিথ্যা কথাও কর্ত্তৃপক্ষ বিশ্বাস করিয়াছিলেন এবং পরবৎসর ১৭৬৪ সনে সেণ্ট লুর্ব্যা আবার ভারতবর্ষে তাঁহার অনন্যসাধারণ রাজনৈতিক জ্ঞান পরিপক্ব করিয়া যাহাতে ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের সহিত সমর বাধিলে তিনি পূর্ণভাবে দেশের সেবা করিবার অবস্থায় প্রস্তুত থাকিতে পারেন, তজ্জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন।

স্থলপথে পারস্য এবং আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া ১৭৬৬ সনে লুর্ব্যা যখন কালিকটে আসিয়া উপনীত হইলেন তখন তিনি সম্পূর্ণ নিঃসম্বল এবং নিঃস্ব। মাহের ফরাসী কুঠিয়াল পিকটের নিকট তিনি কর্ম্মপ্রার্থী হইলে তাঁহার নিজের পক্ষে কিছু করা সম্ভবপর না হওয়াতে কুঠিয়াল হায়দরের ফরাসী সেনাপতি দে লা তুরের নিকট উঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ১৭৬৭ সনে হায়দর যখন কৈম্বাটুরে সদলবলে অবস্থান করিতেছিলেন তখন সেণ্ট লুর্ব্যা তাঁহার নিকট আগমন করেন। হায়দরের নিকট তিনি ফরাসী গোলন্দাজ বাহিনীর কাপ্তেন এবং Ordre Royale de St Louis নামক মহামান্য রাজকীয় সম্মানের শ্লেভালিয়ে বা নাইট বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন, ইউরোপ হইতে সার্থবাহকুলের সহিত তিনি স্থলপথে এদেশে আসিয়াছেন এবং পণ্ডিচেরী তাঁহার গন্তব্যস্থল। পিকটের পত্রের জন্য দে লা তুরের মনে উঁহার সততা সম্বন্ধে অনুমাত্র সন্দেহ জন্মে নাই। উঁহার সরলতা ও ন্যায়নিষ্ঠার এবং একটি বাহ্যিক আড়ম্বরে মুগ্ধ হইয়া তিনি হায়দরকে অনুরোধ করিয়া মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতনে এক ব্যাটালিয়ন সিপাহীর অধ্যক্ষপদ উঁহাকে দিয়াছিলেন। এখানে লুর্ব্যা সম্বন্ধে যাহা বলা যাইতেছে তাহা প্রধানতঃ দে লা তুরের গ্রন্থ হইতে গৃহীত। পূর্ব্বোক্ত সম্মানচিহ্ন ক্রশটি ভিন্ন অনেকেরই দুর্ভাগ্যের হেতুস্বরূপ উঁহার মানবচিত্তাকর্ষণের একটি স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল। দৈনন্দিন জীবনযাপনের পক্ষে অপরিহার্য্য কোনকিছুই উঁহার তখন ছিল না। দে লা তুর তাঁহাকে আহার্য্য, বস্ত্র, বাসস্থান, যানবাহন, অর্থাৎ সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ভদ্রভাবে থাকিবার পক্ষে যাহা কিছু প্রয়োজন সমস্তই দিয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষে এক্ষেত্রে একথা মনে করা খুবই স্বাভাবিক যে, ঐ ব্যক্তি উপকারকের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং শ্রদ্ধাসম্পন্ন নিশ্চয়ই হইবে। কিন্তু লোকটি এতাদৃশ নীতিজ্ঞানবিবর্জ্জিত এবং বিশ্বাসঘাতক ছিল যে, তিন মাসের মধ্যেই সে কর্ম্মচ্যুত এবং কারারুদ্ধ হইতে বাধ্য হইল। তাহার কারণ কি দে লা তুর স্পষ্ট করিয়া সেকথা বলেন নাই এবং পিয়েস্কোটো কতকটা রহস্যজনকভাবেই এইটুকু মাত্র বলিয়াছেন, "উঁহার স্বাভাবিক প্রবণতাসমূহ অসাধারণ।" ইহার অর্থনির্ণয় করা সম্ভবপর

নহে। মশিয়ে মার্টিন নামে হায়দরের একজন ফরাসী সার্জ্জন ছিল, ঐ ব্যক্তি লালীর সেনাদলে উহার সহকর্ম্মী থাকায় প্রথম দর্শনেই চিনিতে পারিলেও সে সময় উহার অনুরোধে তাহার মুখোশ খুলিয়া দেওয়া হইতে বিরত থাকেন। মার্টিনের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে হায়দর লুর্ব্যাকে শুধু যে কারাগার হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন তাহা নহে, পরন্তু সৈন্যদলমধ্যে সার্জ্জনরূপে কার্য্য করিবার অনুমতিও দিয়াছিলেন। ভিক্ষোপজীবীতে পরিণতপ্রায় শ্বেভালিয়ে এইরূপে ভিষকে পরিবর্ত্তিত হইয়া সকল কার্য্যসাধনক্ষম তাহার সেই ক্রশ-চিহ্নটির সাহায্যে এবার পর্ত্তুগালদেশীয় রাজসম্মান "Order of the Christ" পদবীধারী হইয়াছিল! উহার স্বর্ণনির্ম্মিত ক্রশটি কিন্তু সত্যই ফরাসী সেণ্ট লুই-অর্ডারের ক্রশই ছিল। উহার একটি দিক একেবারে প্লেন এবং অপর দিকের মিনা করা সেণ্ট লুইয়ের প্রতিকৃতি তুলিয়া ফেলিয়া অপেক্ষাকৃত ছোট মাপের একটি ক্রশ তাহার উপর বসানো ছিল। ইহার কারণ-স্বরূপে সে বলিত, পর্ত্তুগালে বাসের সময় কতকটা ফরাসী ধাঁচ দিবার জন্য সে ক্রশটি এই ভাবে গড়াইয়াছিল। যাহা হউক, তাহাকে ঐ ক্রশটি ধারণ করিতে নিষেধ করা হয়। তখন সে তাহার পরিধেয় বস্ত্রাদিতে সুপ্রচুর জরির কাসদানী কার্য্য ব্যবহার আরম্ভ করিল। উহা কিন্তু আর নিষিদ্ধ হয় নাই। আগমনের দ্বিতীয় দিনেই লুর্ব্যা নিজেকে উক্ত পর্ত্তুগীজ সম্মানচিহ্নের নাইট বলিয়া পরিচয় দেয়। যেরূপ সহজভাবে সে ঐ সকল সম্মানে নিজেকে বিভূষিত করিত, লিসবনে তাহার দীর্ঘ অবস্থান (এই স্থান হইতে ফাঁসির ভয়ে তাহাকে পলাইতে হইয়াছিল!) এবং একটি সনদ যাহা পরে জাল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে—এই সকল কারণে তাহার উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই করা যায় না!

কিন্তু অনুতিকালমধ্যেই পুনরায় আর একটি চাতুরি খেলিতে গিয়া লুর্ব্যা কারারুদ্ধ হইল। এবারও মার্টিন এবং পিয়েস্কোটোর অনুরোধে হায়দর তাহাকে মার্জ্জনা করিলেন। চিরদিনের মত মহীশূর পরিত্যাগ করিবার অঙ্গীকার করাতে লুর্ব্যাকে পণ্ডিচেরী গমনের অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছিল। কাপ্তেন ম্যাকেঞ্জি এবং লেফটেনাণ্ট মণ্টগোমারি নামক দুই জন ইংরেজ অফিসার সেই সময় বন্দী-বিনিময়ে মুক্তিলাভ করিয়া মাদ্রাজ ফিরিতেছিলেন। লুর্ব্যাকে ইঁহাদের সহিত গমনের অনুমতি দেওয়া হয়। বারে বারেই কিন্তু এই বিশ্বাসহন্তা দুষ্ট লোকটিকে এতটা বিশ্বাস করা উচিত হয় নাই। কথায় বলে, 'মানুষ একসঙ্গে সকল কথা ভাবিতে পারে না।' তা ভিন্ন এরূপ একটি অপদার্থের কবল হইতে নিষ্কৃতিলাভের বাসনাই মনের মধ্যে প্রবল ছিল। লুর্ব্যার নিকট হইতে যে আশঙ্কার কোন কারণ ঘটিতে পারে, তাহা কেহ মনেও ভাবে নাই। পথিমধ্যে লুর্ব্যা সত্যমিথ্যা মিলাইয়া নানাবিধ কাহিনীর সৃষ্টি করিয়া কাপ্তেন ম্যাকেঞ্জির মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। হায়দরের নিকট পরাজিত এবং বন্দী হওয়ার জ্বালা তখনও তাঁহার মন হইতে মিলায় নাই। পথিমধ্যে লুর্ব্যা তাঁহাকে যাহা কিছু বলিয়াছিল, তিনি সবই প্রত্যয় অথবা অর্দ্ধপ্রত্যয় করিয়াছিলেন, বলা যায় না। লুর্ব্যা বলে, হায়দরের সৈনাবল সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া তাহার এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, ইউরোপীয় অফিসার এবং সৈনিকগণই হইতেছে উহার সকল শক্তির কেন্দ্র। উহারা ছাড়া তাঁহার পতন অনিবার্য্য। আলাপ করিয়া তিনি বুঝিয়াছেন, উহারা সকলেই নবাবের চাকরিতে, বিশেষতঃ অধ্যক্ষ দে লা তুরের প্রতি একান্তরূপেই বীতস্পৃহ। একটু চেষ্টাচরিত্র করিলেই তিনি উহাদের সকলকে ভাঙ্গাইয়া আনিতে পারেন এবং তাঁহার সুহৃদ সার্জ্জন মার্টিনের মধ্যবর্ত্তিতায় এ কার্য্য সহজসাধ্য হইতে পারে। তবে কথা এই যে, তজ্জন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উহাদের সকলকে তাঁহাদের কর্ম্মে গ্রহণ এবং যথোচিত পুরস্কার অঙ্গীকার করা প্রয়োজন।

কথাটা ম্যাকেঞ্জির মনে ধরিয়াছিল। মাদ্রাজে আসিয়া তিনি লুর্ব্যাকে গবর্ণর বুর্নিয়ে প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, এই প্রস্তাবে ইংরেজ সরকার হাতে স্বর্গ পাইয়াছিলেন। মহীশূর হইতে বিতাড়িত ভবঘুরে একজন ভাগ্যান্বেষী সৈনিক সহসা একেবারে ইংরেজ গবর্ণর এবং আর্কটের নবাব মহম্মদ আলির পরম প্রিয়পাত্রে পরিণত হইয়া গেল!

এই সময়ে জনৈক ফরাসী সৈনিক পণ্ডিচেরী হইতে ইংরেজদের কর্ম্ম গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে মাদ্রাজ নগরে আসিয়াছিল। যে কারণে হউক না কেন, ধারণা হইয়াছিল ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করিতেছেন না; ইংরেজরা তাহাকে প্রস্তাবিত ষড়যন্ত্রের কথা জানাইয়া বলিলেন যে, ঐ কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিলে পলাতকগণকে লইয়া যে দল গঠিত হইবে লেফটেনাণ্ট-কর্নেল পদসহ তাহার অধ্যক্ষতা তাঁহাকে উহাঁরা দিতে সম্মত আছেন। অনন্তর ঐ ব্যক্তি হায়দর-সকাশে গিয়াছিল। এ দেশে উহার আত্মীয়স্বজনবৃন্দ যে প্রকার কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল, সম্ভবতঃ সেই কারণে লব্ধ তাহার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়া নবাবের ইউরোপীয় সেনাপতি (অর্থাৎ দে লা তুর স্বয়ং) পূর্ব্ব হইতে তাহার প্রতি কতকটা অনুকূলভাবাপন্ন ছিলেন; সুতরাং তাহাকে দেখিয়া অতঃপর একজন সহকারী মিলিল ভাবিয়া তিনি হৃষ্ট হইয়াছিলেন। রাজা সাহেব তাহাকে দরবারে পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন: তিনি পূর্ব্ব হইতে উহাকে চিনিতেন। কিন্তু সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল যে হায়দর তাহাকে দেখিয়া স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। অথচ একটি ইউরোপীয় সৈনিক লাভ করিলে তাঁহার যে খুশির সীমা থাকে না, সে কথা ত অজানা নয়। মথদুম ইতিপূর্ব্বে লালীর সময়ে উহাকে পণ্ডিচেরীতে দেখিয়াছিলেন। সে যে অত্যন্ত ভীরু কাপুরুষ তাহা তিনি জানিতেন এবং সেকথা হায়দরকে বলিয়াছিলেন। এক কোম্পানী Hussar পল্টনের ক্যাপ্টেন-পদ উহাকে দিতে দে লা তুর ইচ্ছুক ছিলেন, সম্পূর্ণ নিরক্ষর একজন লেফটেনাণ্ট উহাদের পরিচালন করিতেছিলেন। কিন্তু নবাবকে কোনমতে সম্মত করা গেল না। তাঁহার আপত্তির প্রকৃত কারণ

সেনাপতির জানা না থাকায় তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে শত্রুরাই অকারণ নবাবের কান ভারী করিয়াছেন। উক্ত ব্যক্তির প্রতি স্বীয় আন্তরিকতা দেখাইবার জন্য এবং পরামর্শপ্রাপ্তির আশায় তিনি তাহার নিকট প্রস্তাবিত কুদ্দালুর অভিযানের কথা বলিয়াছিলেন। বিশ্বাসঘাতক পূর্ব্বাহ্ণে ইংরেজদিগকে সংবাদ পাঠাইয়া কিরূপে তাহাদিগকে সতর্ক এবং গবর্ণর-প্রমুখ উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণকে বন্দীদশা হইতে রক্ষা করিয়াছিল সে-কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

"ত্রিণমালাইয়ের যুদ্ধে অশ্বারোহীদলের অফিসারগণ দে লা তুরের অনুমতি লইয়া উহাকে তাহাদের পরিচালনাভার লইতে আহ্বান করিয়াছিল। কিন্তু সে তাহাতে সম্মত না হইয়া বরাবর হায়দর আলির পিছনেই অবস্থিতি করিত। Hussar পল্টনের সহিত অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহাকে সমাসীন দেখিয়া নবাব বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং একজন মৃত পিণ্ডারী সৈনিকের ঘোড়া দেখাইয়া দিয়া তাহাকে তাহাতে আরোহণ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। এ চূড়ান্ত অবমাননাতেও উহার বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ হয় নাই।

এই যুদ্ধের পর ফরাসীদের মধ্যে প্রথম অসন্তোষের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। এ যাবৎ উহারা স্বর্ণমুদ্রায় বেতন লইত, অতঃপর তৎপরিবর্ত্তে সকলে রৌপ্যমুদ্রায় বেতন দাবি করিয়াছিল। বাট্টার হারের জন্য ইহাতে তাহাদের কিছু অধিক লাভের সম্ভাবনা ছিল। যোগ্যতা না দেখাইয়াও অধিক বেতন দাবি করার জন্য দে লা তুর সকলকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে বিগত যুদ্ধে তাহাদের ব্যর্থতার কথা তুলিয়াছিলেন। তাহার সুযোগ লইয়া ষড়যন্ত্রকারীরা সৈনিকগণকে অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য উত্তেজিত করিতে আরম্ভ করিল। একদিন সকলে মিলিয়া সহসা শিবির পরিত্যাগপূর্ব্বক রামচন্দ্ররাও নামক জনৈক মরাঠা সর্দ্দার-সমীপে চলিয়া যায়। ঐ ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে হায়দর কর্ত্তৃক বিতাড়িত বহু ইউরোপীয়কে কর্ম্মপ্রদান করিয়াছিল। নবাবের বিরাগের আশঙ্কায় এবারে ইহাদের গ্রহণ করিতে তাঁহার আর সাহস হইল না। এদিকে সেনাপতি সিপাহীসেনা লইয়া পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া বিদ্রোহীরা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিল। শাস্তিস্বরূপ সকলেই কয়েকদিন শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিবার পর হায়দর কর্ত্তৃক পুনরায় প্রতিগৃহীত হইয়াছিল। অবশ্য ইউরোপে এই কার্য্যটি কোনমতে যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইত না, কিন্তু নবাবের এবং প্রধান সেনাপতির অবস্থা স্মরণে রাখাই কর্ত্তব্য। হায়দর ইউরোপীয় সৈনিকবর্গের উপর তাহাদের যথার্থ মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্য আরোপ করিতেন এবং উহাদের অস্তিত্বের উপরেই সেনাপতির নিজের অস্তিত্বও নির্ভর করিত। তদ্ভিন্ন এ ধরণের অবাধ্যতা বা বিদ্রোহ এদেশে সৈনিক-জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গরূপেই বিবেচিত হইত। ইহাতে কেহই বিশেষ বিচলিত হইত না।

কয়েকদিন বেশ শান্তিতে কাটিয়া গেল। তাহার পর শুনা গেল সৈন্যদলে পুনশ্চ ষড়যন্ত্র দেখা দিয়াছে। চক্রান্তকারীদের নেতা কাহারা তাহা স্থির করিতে না পারিয়া এবং ঐরূপ ভাসা ভাসা খবরের উপর নির্ভর করিয়া কোন কিছু আকস্মিকভাবে করা সম্ভব ছিল না বলিয়া দে লা তুর ভাবিয়াছিলেন যে, সুপবিত্র বাইবেল এবং ক্রুশের নামে নবাবের প্রতি অবিচল আনুগত্য, বিদ্রোহ বা অসন্তোষের আভাসপ্রাপ্তি মাত্র তাহা যথাস্থানে জ্ঞাপন এবং বিনা অনুমতিতে কোথাও না যাইবার শপথ সকলকে গ্রহণ করানো ভিন্ন তখনকার মত তাঁহার আর কিছুই করিবার নাই। সাধারণ সময়ে হয়ত ইহাই যথেষ্ট হইত, কিন্তু ইংরেজেরা সহজে নিরস্ত হইবার পাত্র ছিল না। উক্ত শপথের জন্য সৈনিকগণের মধ্যে তাদৃশ সাফল্যলাভ করিতে না পারিয়া ষড়যন্ত্রকারীরা মাদ্রাজ-কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিল, তাঁহারা যেন মহীশুর-দরবারস্থিত জেস্যুইট ধর্ম্মপ্রচারকগণকে ফরাসী গবর্ণরের নাম জাল করিয়া এমন একখানি পত্র লেখেন যে, তিনি যাবতীয় ফরাসী সৈনিককে পণ্ডিচেরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আদেশ দিতেছেন। অচিরেই অভীপ্সিত পত্রখানি আসিয়া পৌঁছিল। উহাতে লিখিত ছিল—বিধর্ম্মীর নিকট কৃত ধর্ম্মীয় শপথের বা প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য নাই; রাজা বা রাজপ্রতিনিধির আদেশে তাহা অনায়াসেই ভঙ্গ করা চলে, উহাতে পাপ স্পর্শে না। পাদ্রিপুঙ্গবগণ সম্পূর্ণরূপেই ইংরেজদিগের হাতের মুঠার মধ্যেই ছিল, উহাদের কোন আজ্ঞা লঙ্ঘনের সাধ্য তাহাদের ছিল না। তাহারাও এইরূপ হীনতাজনক আদেশ সমর্থন করিয়া ঐরূপ পত্র লিখিয়াছিল। পত্রখানি সেনাপতিকে দেখাইতে বা তাঁহাকে এ সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরেও কোন কথা জানাইতে নিষেধ করা হইয়াছিল। ঐ মর্ম্মে একখানি পত্র যে সৈনিকগণকে দেখানো হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, সেকথা সকলেই জানে। প্যারিস নগরে এখনও অনেক লোক আছেন যাঁরা এ বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবেই সাক্ষ্যদান করিতেও পারেন। পত্রখানি কিন্তু আসলে জাল পত্র। গবর্ণরের উহা সেনাপতির নিকট হইতে গোপন করিবার কোন হেতুই ছিল না। উঁহার স্বহস্তলিখিত বহু পত্র সেনাপতির নিকট সংরক্ষিত ছিল। হস্তাক্ষর মিলাইলে পত্রখানি জাল অথবা আসল তাহা নির্ণয় করা খুবই সহজ হইত।"

লুব্যাঁর প্রদত্ত কোড বা সাঙ্কেতিক পদ্ধতিমত ইংরেজ সেনাপতি কর্ণেল স্মিথ তদীয় সুহৃদ সার্জ্জন মার্টিনের সহিত পত্রব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং এইরূপে গোপনে গোপনে দে লা তুরের সৈনিকগণকে বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। স্থির হইল ৮ই ডিসেম্বর ১৭৬৭ তারিখে উহারা পলায়ন করিবে। তাহাদের আগমনের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য অতঃপর কর্ণেল স্মিথ ভেল্লোর হইতে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। আম্বুরের অদূরে ভানিয়ামভাড়ী নামক স্থানে হায়দরকে তিনি আক্রমণ করিয়াছিলেন। হায়দর কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহার হস্তে নিপতিত জনৈক বন্দী ইংরেজ অফিসারের মারফত মাদ্রাজ-সরকারের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া

পাঠাইয়াছিলেন। সেজন্য তিনি কতকটা অপ্রস্তুত অবস্থায় ছিলেন। শত্রুসেনাকে বাধা দিবার জন্য মখদুম খাঁর অশ্বারোহী-বাহিনী এবং দে লা তুরের সওয়ার পল্টনকে পাঠাইয়া মূল বাহিনীসহ তিনি নিজে পশ্চাৎপদ হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। "আমাদিগের অশ্বারোহী ইউরোপীয় পল্টন* দ্রুতধাবনে বিপক্ষের কেন্দ্রদেশ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছিল। অকস্মাৎ তাহাদের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে শত্রুর কামান গার্জ্জিয়া উঠিল। ইহাই ছিল পলায়নের সঙ্কেত। সঙ্গে সঙ্গে দুইটি অশ্ব পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া আরোহীসহ ধরাশায়ী হইল; তন্মধ্যে একটি প্রধান সেনাপতির। ভূপৃষ্ঠ হইতে উঠিয়া তিনি নিজেকে ইংরেজ সওয়ার পল্টন কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত এবং স্বীয় সৈনিকগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত দেখিয়াছিলেন। তাঁহাকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করার পরিবর্ত্তে ইউরোপীয় অফিসারগণ তাঁহার উপর আপতিত হইল এবং করায়ত্ত করিয়া সকলে ইংরেজদিগের দলে চলিয়া গেল। ইংরেজসেনা তৎক্ষণাৎ অস্ত্রসংবরণ করিল, এমন কি মূল বাহিনীসহ হায়দরের প্রত্যাবর্ত্তনে তাহারা কোন বাধাও দেয় নাই।

পতনকালে দে লা তুরের জঙ্ঘাদেশে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল; ক্রমে উহা দুষ্ট ক্ষতে পরিণত হইল। সেজন্য প্রায় তিন মাস কাল তাঁহাকে মান্দ্রাজ নগরে শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। কর্নেল স্মিথ তাঁহার বন্দীর প্রতি যথেষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নিজ শিবিরে স্থান দিয়াছিলেন। দে লা তুরকে তিনি বলেন যে, তাঁহার ফরাসী সৈনিকগণকে ভাঙ্গাইয়া লইবার জন্য তাঁহারা অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন এবং উহাদের পলায়নের সুবিধা করিয়া দেওয়া ভিন্ন সেদিনকার অভিযানের অপর কোন উদ্দেশ্যই ছিল না। উহাদের উপর অস্ত্রনিক্ষেপে তাহার বিশেষরূপেই নিষেধ ছিল, তবে দক্ষিণপ্রান্তের অধিনায়ক কর্নেল লীনকে ভ্রান্তিবশতঃ সে আদেশ প্রদত্ত না হওয়াতে একটা কামান হইতে গোলা বর্ষিত হইয়াছিল মাত্র।

ব্যবস্থামত সবকিছুই ঘটিয়াছিল, শুধু লুর্ব্যা-কথিত সৈনিক-সংখ্যা ইংরেজগণ লাভ করিতে পারেন নাই। সমগ্র ইউরোপীয় অশ্বারোহী পল্টনের পরিবর্ত্তে মাত্র নয় জন মাত্র অফিসার এবং পঁয়ষট্টি জন সৈনিক দলত্যাগ করে। ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ উহাদিগকে তাঁহাদের নিয়মিত সেনাদলে গ্রহণ করেন নাই। উহাদের লইয়া একটি Foreign corps গঠিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ ধরণের দল তাঁহাদের আরও কয়েকটি ছিল। ইংরেজ সরকারের কর্ম্মনিরত থাকিলেও উহাদের বেতন নবাব মহম্মদ আলির তহবিল হইতে প্রদত্ত হইত। লুর্ব্যা পূর্ব্বোক্ত গুপ্তচর-দলের অধ্যক্ষতা, 'কমিসার' এবং মার্টিন 'সার্জ্জন-মেজর' পদ পাইয়াছিলেন। দলের সৈনিক-সংখ্যা নিতান্ত অল্প হওয়াতে লুর্ব্যা প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যেভাবে দলটি গঠিত হইয়াছে সেইভাবে ক্রমশঃ উহার সংখ্যা বর্দ্ধিত করা হউক, অর্থাৎ শুধু বিভিন্ন দেশীয় দরবার নহে, ফরাসী, পর্ত্তুগীজ, দিনেমার, ওলন্দাজদিগের অধিকারসমূহ হইতে সৈনিক ভাঙ্গাইয়া আনিতে তিনি চাহিয়াছিলেন। ইংরেজদিগের তাহাতে আপত্তির কারণ ছিল না। পণ্ডিচেরী হইতেও সৈনিক ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিতে তাঁহার বিবেকে বাধে নাই। অবশ্য বিবেক বলিয়া কোন পদার্থ ঐ ব্যক্তির ছিল কিনা সন্দেহ। উক্ত কার্য্য তাঁহার কাছে ইংরেজের নিকট হইতে অর্থপ্রাপ্তির উপায় মাত্র অর্থাৎ ব্যবসায়ের সামিল ছিল। তাঁহার জনৈক দালাল এই কার্য্য করিবার কালে পণ্ডিচেরীতে ধরা পড়ে, বিচারকালে সে আত্মপক্ষসমর্থনে বলিয়াছিল যে উক্ত কার্য্য সে আন্তরিকতার সহিত করিতেছিল না, তাহার মুরুব্বি লুর্ব্যা যাহাতে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে দালালি আদায় করিতে পারেন সেজন্য সে সৈন্য ভাঙ্গাইবার অভিনয়মাত্র করিতেছিল!

উক্ত দলটি অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। অচিরেই উহাতে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল। অনেকে নূতন ভাগ্যান্বেষণ-ক্ষেত্রের সন্ধানে অন্যত্র গিয়াছিল, অনেকে আবার পুরাতন কর্ম্মস্থানেই ফিরিয়া গিয়াছিল, হায়দর তাহাদের পুনর্গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন কি উহাদের দ্বারা অপহৃত অশ্বগুলিও তিনি পুনরায় মূল্য দিয়া কিনিয়া লইয়াছিলেন। ঐ দলের নূতন অধ্যক্ষও অধিক দিন সুখে কাটাইতে পারে নাই। তাহার নবীন প্রভুদের হস্তেই তাহার শাস্তিবিধান হইয়াছিল। কোর্ট মার্শালের বিচারে ঐ ব্যক্তি অবমাননার সহিত পদচ্যুত এবং বহিষ্কৃত হয়।

সেণ্ট লুর্ব্যার স্বরূপও অচিরেই প্রকাশ হইয়া পড়িল। দে লা তুরের কথা পক্ষপাতদোষদুষ্ট বিবেচিত হইতে পারে; সেজন্য ইংরেজ লেখক কর্নেল উইলক্সের লেখার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল: '১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে হায়দর আলির সহিত সমর চলিবার সময় শ্যেভালিয়ে সেণ্ট লুর্ব্যা নামে স্বয়ং-অভিহিত এক ব্যক্তি ইংরেজদের নিকট আসিয়াছিলেন। উহাদের নিকট তিনি বলেন যে, ইউরোপ হইতে স্থলপথে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন এবং হায়দরের দরবারে পরম সমাদরে সংবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন; তাঁহার যাবতীয় পরিকল্পনা ও বলাবল সম্বন্ধে তাঁহার নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে এবং দেশীয় বা ইউরোপীয় মহীশুর দরবারের যাবতীয় রাজকর্ম্মচারীর উপর তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তিও রহিয়াছে। লুর্ব্যার সকল কথাই এখানে সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। ইংরেজ গবর্নমেণ্ট তাঁহাকে তাঁহাদের সৈন্যদলের সহিত পথপ্রদর্শক এবং প্রধান পরামর্শদাতারূপে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহাদের সকল কার্য্য ও ব্যবস্থার উপর উঁহার অগাধ প্রভাব ছিল। তাঁহার পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন কিছুই নিষ্পন্ন হইত না। এখানে বিস্তারিতভাবে তাহার ফলাফল সম্বন্ধে বলা অনাবশ্যক। তাঁহার পরামর্শমত চলিয়া এবং পদে পদে ঠকিয়া ইংরেজরা বুঝিয়াছিলেন যে, উহার সমস্ত কথাই মিথ্যা এবং লোকটি আসলে একটি ভণ্ড-প্রতারক।'*

---

* Monsieur Aumont ইহাদের অধিনায়ক ছিলেন। কর্নেল উইলক্সও এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন—"History of Mysore", vol. 1, p. 559

* "History of Mysore," vol. I, p. 337

ইহার পর সেণ্ট লুর্ব্যা ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে ফিরিয়া যান। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ভারতবর্ষে উহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

দে লা তুর ইংরেজ-হস্তে নিপতিত হইলে গবর্ণর বুর্শিয়ে হায়দরকে মাদ্রাজ নগর অধিকার করিয়া অগ্নিযোগে ভস্মসাৎ করিবার পরামর্শ দিবার অপরাধে তাঁহার বিচারের আদেশ দিয়াছিলেন। "কিন্তু ইংরেজদিগের গুপ্তচরগণের সাক্ষ্য ভিন্ন অপর কোন বিশ্বস্ত প্রমাণ তাঁহার বিরুদ্ধে ছিল না। ন্যায়বিচার সম্বন্ধে সর্ব্ববিধ প্রচলিত ধারণা এবং ইংরেজদিগের এই আন্তর্জাতিক আইনবিরোধী কার্য্য, ভারতবর্ষে তাহাদের স্বেচ্ছাচারের অন্যতম প্রকৃষ্ট নিদর্শন" বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা নাই। ইংরেজদিগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি আর হায়দরের কর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। বেরকুলির যুদ্ধের সময় (৫।৩।১৭৭১) তিনি এদেশে থাকিলেও হায়দরের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন না বলিয়া নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন (পৃ. ২৪৯)।

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস নগরে তাঁহার লিখিত, "Histoire de Hyder-ally" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তখন আবার ইংরেজদিগের সহিত হায়দর আলির এবং ফরাসীদের তুমুল যুদ্ধ চলিতেছিল। ফ্রান্সের জনসাধারণের মনে উক্ত ভারতীয় নৃপতি সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার স্বাভাবিক কৌতূহল দেখিয়া এবং হায়দর আলির প্রামাণিক ইতিহাস নামে বহু অসার গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া দে লা তুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে ইতিবৃত্ত সঙ্কলনের অভিপ্রায়ে লেখনী ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি তখন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন দেখা যায়।

"সত্যের মর্য্যাদা রক্ষাকল্পে নিরপেক্ষভাবেই ইতিহাস রচনার আবশ্যকতা" সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "কাহারও অযথা তোষামোদ বা অকারণ পরিবাদ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া তিনি এই গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। যে বিষয়ে লেখকের কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া নিরর্থক বিবেচনায় তিনি তাঁহার আগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ঘটনাবলী সম্পর্কে বিশেষ কিছুই উক্ত গ্রন্থে লেখেন নাই। ইংরেজগণ যদি দেখেন লেখক গ্রন্থমধ্যে তাঁহাদের ছাড়িয়া কথা ক'ন নাই, তথাপি উঁহারা তাহাকে মিথ্যাসৃষ্টির অপবাদ দিতে পারিবেন না! হিন্দুস্থানে ইংরেজ শাসনের যে নমুনা গ্রন্থকার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা হইতে উহার বিরুদ্ধে অনেক কিছুই তিনি বলিতে পারিতেন। লেখকের পক্ষে স্বদেশবাসিগণের অপকর্ম্ম সম্বন্ধে নীরব থাকা সম্ভব হয় নাই। তবে ফ্রান্সে তাহাদের পরিজনবর্গের কথা মনে করিয়া তিনি গ্রন্থমধ্যে উহাদের নামোল্লেখ হইতে বিরত রহিয়াছেন। ইহার অতিরিক্ত কোন প্রকার দয়াপ্রদর্শন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই।" সকলেই বলিবেন, ঐ দুষ্ট প্রকৃতি আত্মীয়বৃন্দের মনে ব্যথা দেওয়ার চিন্তা দে লা তুরকে অতটা বিচলিত না করিলেই ভাল হইত। তাহা হইলে পরবর্ত্তী যুগের ঐতিহাসিকগণের পক্ষে মহীশুর-দরবারের ভাগ্যান্বেষী ফরাসী সৈনিকবৃন্দের যথার্থ পরিচয়প্রাপ্তি অধিকতর সুসাধ্য হইতে পারিত।

দে লা তুরের বন্দীত্বে সমস্যের অবসান অবশ্য হয় নাই। সে সকল কাহিনীর সুদীর্ঘ বিবরণ এখানে দেওয়া অনাবশ্যক। ঐ সকল ঐতিহাসিক বিবরণ ইতিহাসজ্ঞের সুবিদিত। কিছুকাল পরে ক্যাপ্টেন নিক্সন পরিচালিত একদল ইংরেজ সৈন্য হায়দরের হস্তে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এবারকার যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে পূর্ব্ববৎসরের ভানিয়ামবাড়ির মুক্ত-বন্দী ক্যাপ্টেন রবিন্সনও ছিলেন। তিনি বোধ হয়, মনে ভাবিয়াছিলেন দায়ে ঠেকিয়া প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোন প্রয়োজনই নাই। হায়দর প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারী সৈনিককে ফাঁসি দিয়াছিলেন।* অতঃপর তিনি আর কোন বন্দীকে কখনও মুক্তি দেন নাই।

অনন্তর হায়দর ইংরেজদিগকে সন্ধিস্থাপনে বাধ্য করাইবার জন্য এক চাল চালিয়াছিলেন। অসম্ভব ক্ষিপ্রগতিতে তিন দিনে ১৩০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তিনি অকস্মাৎ মাদ্রাজ নগরের অদূরে আসিয়া দেখা দেন। তাঁহার আগমন-সংবাদে রাজধানীতে বিষম হুলস্থূল পড়িয়া গেল। আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ হায়দরের সহিত বাধ্য হইয়াই সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন (৪।৪।১৭৬৯)। স্থির হয়, উভয় পক্ষ স্ব-স্ব বিজয়-লব্ধ অধিকৃত স্থানসমূহ প্রত্যর্পণ করিবেন এবং ভবিষ্যতে একপক্ষ কোন শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে অপর পক্ষ তাঁহাকে সাহায্য করিতে বাধ্য থাকিবেন। এই সময় হায়দর ইংরেজদিগের সহিত মিত্রতা আন্তরিকভাবেই কামনা করিতেন। বাস্তবিক তিনি এই সময় যে প্রকার সুন্দর সমরকৌশল এবং রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন, রাজোচিত যে ধৈর্য্য এবং সংযম দেখাইয়াছিলেন, তাহার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। পক্ষান্তরে মাদ্রাজ গবর্নমেণ্ট যে প্রকার হঠকারিতা, অপ্রকৃতিস্থমতিত্ব এবং দায়িত্ব-জ্ঞানের অভাব প্রদর্শন করেন, তাহারও তুলনা সহজে মেলে না —সে কথাও বলা প্রয়োজন।

ইহার দুই বৎসর পরে হায়দর আলির সহিত মরাঠাদের আবার যুদ্ধ বাধিল। পাণিপথের শোচনীয় পরাজয়ের দশ বৎসর পরে বিনষ্ট শক্তি কতকটা সম্বদ্ধ করিয়া লইয়া মরাঠারা ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে আবার নবোৎসাহে যুগপৎ আর্য্যাবর্ত্তে এবং দাক্ষিণাত্যে অভিযান আরম্ভ করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে উহারা চেরকুল্লি বা চিনাকুরালির ভীষণ যুদ্ধে (৫।৩।১৭৭১) মহীশুরী বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত এবং বিধ্বস্ত করিয়াছিল।† হায়দরের সৈনিকগণের মধ্যে অনেকেই

* কর্নেল উইলক্স বলেন, কারাগারে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছিল; ফাঁসিতে হয় নাই। Ibid, vol. I. p. 655

† ইহা পেশবা মাধব রাওয়ের চতুর্থ কর্ণাটক অভিযান। চেরকুল্লির মেলুকোটে অথবা "মতি-তালাওয়ে"র যুদ্ধ নামেও পরিচিত। যুদ্ধের দুই দিন পরে মরাঠা-সেনানায়ক ত্র্যম্বক রাও

নিহত হইয়াছিল; যাহারা জীবিত ছিল তাহারা একান্ত ভীত হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়নে তৎপর হইল। একটি মাত্র গ্রিনেডিয়র টোপাসী ব্যাটালিয়ন কোনমতে শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া উচ্চ এক ভূখণ্ডে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। লেনে নামক ওয়েষ্টফেলিয়া প্রদেশের অধিবাসী জনৈক জর্ম্মন উহাদের অধ্যক্ষ ছিল। ভারতবর্ষের প্রায় সকল দেশীয় ভাষায় উহার দখল ছিল। সেজন্য দে লা তুর তাহাকে প্রথম দোভাষীরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, পরে গ্রিণেডিয়র বাহিনী গঠিত হইলে উহাকে একটি ব্যাটালিয়নের অধ্যক্ষতা প্রদান করেন। যুদ্ধে যথেষ্ট সাহস দেখাইয়া ঐ ব্যক্তি সাংঘাতিকরূপে আহত হয় এবং কিয়ৎকাল পরে উক্ত উচ্চ ভূখণ্ডের আশ্রয়ে তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়। অনন্তর দলের মধ্যে একমাত্র জীবিত অফিসার মামু নামক মাল্টাদেশের অধিবাসী জনৈক তরুণবয়স্ক সৈনিক কোনমতে উহাদিগকে শ্রীরঙ্গপত্তনে ফিরাইয়া লইয়া যায়। ঐ ব্যক্তি নিজেও স্কন্ধদেশে বিশেষরূপ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পণ্ডিচেরী হইতে নবাগত কতকগুলি ফরাসী অফিসার এই যুদ্ধে উপস্থিত থাকে। উহাদের মধ্যে একজন নিহত এবং প্রায় সকলেই আহত হইয়াছিল। কর্নেল ছুগেল দারুণ আঘাত পাইয়া কয়েকদিন পরে ট্রাঙ্কুইবার নগরে পরলোকগমন করেন। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় হায়দরের সেনাদলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। হায়দর নিজেও আহত হইয়া কোনমতে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হন।

দে লা তুর বলেন, এ দেশে যুদ্ধে সাধারণ সিপাহী বা অধস্তন সেনানীগণকে কেহ বন্দী করে না। সে কারণ উহাদের মধ্যে অধিকাংশই অচিরেই অশ্ব বা অস্ত্রবিহীন অবস্থায় হায়দর-সকাশে ফিরিয়া আসিয়াছিল। অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি নিজ অর্থবলে তাঁহার বাহিনীকে পুনঃসম্বদ্ধ এবং পূর্ব্বাপেক্ষা বলবত্তর করিয়া তুলিয়াছিলেন। একথা অনেকেই বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না যে মরাঠাদের নিকট হইতেই তিনি স্বীয় হস্তচ্যুত অশ্ব বা অস্ত্রশস্ত্রের অধিকাংশ পুনরায় খরিদ করিয়া লন। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই, যেহেতু এদেশে প্রচলিত ফিউডাল ব্যবস্থামত লুঠের মাল প্রাপকের সম্পূর্ণ নিজস্ব হইয়া যায় এবং যদৃচ্ছ তাহার বিলিব্যবস্থা করিতে সে অধিকারী। দে লা তুর নিজে এ সময় ভারতবর্ষে থাকিলেও হায়দরের সেনাদলভুক্ত ছিলেন না; হায়দরের জনৈক উচ্চপদস্থ সৈনিকের নিকট হইতে শুনিয়া তিনি এই যুদ্ধের বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছিলেন।

এবার জন ষ্টুয়ার্টের কথা বলিতেছি। নাম হইতেই প্রকাশ এই ব্যক্তি জাতিতে স্কচ ছিলেন। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে এক সম্ভ্রান্ত বংশে ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতামাতা পুত্রের শিক্ষাবিধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাতে বিশেষ সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে উনিশ বৎসর বয়সে জন এ দেশে আসেন। 'প্রাচ্যদেশে অগাধ ধনসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া তদ্দ্বারা ভূপর্য্যটন এবং মানবজাতির সুখদুঃখের কারণ অনুসন্ধানের স্পৃহা মিটাইবেন, ইহাই ছিল তাঁহার এদেশে আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু দুই বৎসর কোম্পানীর অধস্তন কেরানীর কার্য্যে মান্দ্রাজ এবং মসলিপত্তন নগরে অতিবাহিত করিয়া তিনি বুঝিলেন যে, ঐ পথে স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা কোনকালেই নাই। উহাতে অর্থার্জ্জন ত বহু দূরের কথা কোন মতে ভদ্র ভাবে বাঁচিয়া থাকাই কষ্টেসৃষ্টে চলিতে পারে মাত্র। তখন তিনি ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্বেষণে ক্ষেত্রান্তরে গমনে সচেষ্ট হইলেন। ষ্টুয়ার্টের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি, পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি এবং সকল বিষয়েরই সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, শুধু বাণিজ্য লইয়া ব্যাপৃত থাকার পরিবর্ত্তে কোম্পানী যে ভাবে দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহার ফলে বিশেষরূপে শিক্ষিত এবং রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন যথেষ্টসংখ্যক উদ্যমী, পরিশ্রমী, তরুণ-বয়স্ক কর্ম্মচারীর তাঁহাদের নিতান্তই প্রয়োজন আছে, এমন কি একান্ত অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে ইহার অভাবে কোম্পানীর কার্য্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। ইহার মাত্র দুইটি স্বাভাবিক পরিণতি সম্ভব—কোম্পানীর পক্ষে চাহিদা মিটাইবার ব্যবস্থা নিজে-দেরই সর্ব্বপ্রযত্নে করা অথবা কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটাইয়া ইংলণ্ডেশ্বরের নিজ হস্তে দেশের শাসনভার গ্রহণ করা। ফল উভয় ক্ষেত্রেই এক—অর্থাৎ, দেশীয় ভাষাসমূহে ব্যুৎপন্ন এবং দেশীয় দরবার-সমূহের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, কর্ম্মঠ, অনলস ইংরেজ যুবকবৃন্দের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল। আর্বী ফার্সী এবং উর্দ্দু ভাষাবিদ ষ্টুয়ার্টের প্রথম গুণটি ছিল; তিনি অতঃপর দ্বিতীয়টি অর্জ্জনে সমুৎসুক হইলেন।

ইহার পর ষ্টুয়ার্ট দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ আরম্ভ করিলেন। নিজ সামান্য পুঁজির জন্য কোন প্রকার যানবাহন সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। পর্য্যটনের জন্য তাঁহাকে স্বীয় চরণযুগলের উপরেই নির্ভর করিতে হইয়াছিল এবং 'Walking

---

কর্ত্তৃক লিখিত বিবরণের জন্য Selections from Peshwe's Daftar, XXXVII, p. 226 দ্রষ্টব্য। হায়দরের পক্ষভুক্ত জনৈক সৈনিক লিখিত বিবরণের নিমিত্ত Orme Mss. No. 8. pp. 51-54 দ্রষ্টব্য। জন ষ্টুয়ার্ট বা Walking Stuart নামক জনৈক স্কচ জাতীয় ভাগ্যান্বেষী সৈনিক এই যুদ্ধে এক সৈন্যদল পরিচালনা করে। তাঁহার লিখিত বিবরণ Asiatic Journal, vol IV-এ প্রকাশিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন Piexoto এবং দে লা তুরের গ্রন্থেও ইহার বিবরণ প্রদত্ত আছে। Col. Wilks-এর History of Mysore, vol. I, p. 383, II, p. 147 এইপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। ফারসী ভাষায় বিরচিত "নিশান-ই-হায়দারী"-র (Col. Miles কর্ত্তৃক ইংরেজীতে ভাষান্তরিত) বিবরণের সহিত ইহাদের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। আধুনিক যুগে এই সকল সূত্র অবলম্বনে প্রণীত হায়দর আলি বা পেশবা মাধব রাওয়ের জীবনীসমূহ পশ্য।

Stuart' তাঁহার এই অদ্ভুত নামকরণের ইহাই কারণ। হায়দরাবাদ, আদোনি, কড়াপা, কুর্ণুল, গুটি প্রভৃতি স্থানে তিনি গিয়াছিলেন এবং যাহা কিছু চোখে পড়িয়াছিল অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টি দ্বারা সবকিছুই পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। গুটি হইতে তিনি মহীশুর যাত্রা করেন। পথিমধ্যে যে সকল সামন্ত নৃপতি বা পলিগড়গণের জনপদের মধ্য দিয়া গিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে নিজেদের সেনাবিভাগে প্রবেশের জন্য সবিশেষ পীড়াপীড়িও করিয়াছেন, তখন এদেশের অবস্থা এইরূপই দাঁড়াইয়াছিল। উহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য ষ্টুয়ার্ট সকলকেই জানাইয়াছিলেন যে, হায়দর আলির বিশেষ আমন্ত্রণে তিনি তাঁহার নিকট চলিয়াছেন, নতুবা উহাদের কথামত কার্য্য করিতে তাঁহার কোনই আপত্তি ছিল না। ইহাতে তাঁহার ঈপ্সিত ফল ফলিল বটে, কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। সর্দ্দারেরা কেহ আর বাঙনিস্পত্তি করিতে সাহস করিল না সত্য, কিন্তু হায়দর আলির অনুগৃহীত ব্যক্তিকে সকলে সযত্নে তাঁহার নিকটে পৌঁছাইয়া দিল। ষ্টুয়ার্ট কি আর করেন, পলাইবার বা অস্বীকার করিবার উপায় ত নাই। তিনি হায়দরের নিকট অনুরোধ জানাইলেন যেন কোনপ্রকার বে-সামরিক কার্য্যভার তাঁহাকে দেওয়া হয়। মাদ্রাজ-দরবারে মহীশুরী উকীল বা প্রতিনিধি-পদ দিবার কথাটা তিনি বিশেষ ভাবেই জানাইলে হায়দর বলিয়াছিলেন, পূর্ব্ব হইতেই তথায় তাঁহার দুইজন প্রতিনিধি আছে, তৃতীয় ব্যক্তি নিষ্প্রয়োজন, বরং তাঁহার সমরবিদ্যানিপুণ যোদ্ধার আবশ্যক। ষ্টুয়ার্ট প্রমাদ গণিলেন, কাকুতিমিনতি করিলেন, যুদ্ধবিদ্যার তিনি কোন ধার ধারেন না, জীবনে কখনও বন্দুক স্পর্শ করেন নাই, এ সকল কথাও তিনি সবিশেষে বলিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। হায়দর তাঁহার কোন কথাই বিশ্বাস করিলেন না। হাস্যসহকারে বলিলেন, 'টোপিওয়ালাদিগের যুদ্ধবিদ্যাজ্ঞানে তিনি কখনও সন্দেহ করেন না।' হায়দরের এই উক্তি তখনকার দিনের ভারতবর্ষীয়গণের মনোভাবের অতি সুন্দর পরিচায়ক। গাত্রবর্ণ সাদা অথবা মেটে এবং মাথায় ধুচুনির মত একটা বিলাতী টুপী থাকিলেই হইল। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে,—ধোপা, নাপিত, গৃহভৃত্য, কেরানী, জাহাজের পলাতক মাল্লা, সাধারণ সিপাহী, পাদ্রি, ভবঘুরে ভ্রমণকারী, আতসবাজিওয়ালা সকলেই সমরনীতিবিশারদ এবং সেনাবাহিনী সংগঠনে ও পরিচালনে সমর্থ।

বিগত সমরকালে মহীশুর রাজ্যের সহিত সুগন্ধি মশলা, চন্দন-কাষ্ঠ-তৈল এবং হস্তীদন্ত প্রভৃতি দ্রব্যের প্রনষ্ট-বাণিজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে সিবাল্ড এবং চার্চ নামক দুই জন ইংরেজ প্রতিনিধি এই সময় হায়দর সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন। নিরুপায় হইয়া ষ্টুয়ার্ট উহাদের শরণ লইলেন এবং মাদ্রাজ সরকারকে তৎপর হইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। তাঁহাদের যাহা সাধ্য তাহা তাঁহারা করিবেন, ষ্টুয়ার্টকে উঁহারাও সেই আশ্বাস দিয়াছিলেন, তবে মাদ্রাজ-কর্ত্তৃপক্ষের লিখিত কোন পত্র না আসা পর্য্যন্ত, অধিকতর কোন বিপৎপাতের আশঙ্কায়, হায়দরের আদেশ-পালন যে তাঁহার পক্ষে শ্রেয়স্কর এ কথা উক্ত ভদ্রলোক দুই জন তাঁহাকে জানাইয়াছেন। সুতরাং ঘটনাচক্রে পড়িয়া অনিচ্ছায় ষ্টুয়ার্ট মহীশুরী সেনাদলে ভাগ্যান্বেষী সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অপরাপর সমবৃত্তিসম্পন্ন ভাগ্যান্বেষী সৈনিকগণের সহিত তাঁহার এইখানেই পার্থক্য।

ষ্টুয়ার্টকে এক ব্যাটালিয়ন সিপাহী সেনার শিক্ষাবিধানের ভার দেওয়া হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে তিনি নিজে লিখিয়া গিয়াছেন: "ঐ কার্য্যে আমাকে সাহায্য করিবার জন্য আমি একজন ফরাসী সার্জ্জেণ্টকে নিযুক্ত করি। উহার অভিজ্ঞতা এবং আমার অভিনিবেশের বলে আমি সৈনিকবৃন্দের এরূপ উৎকর্ষসাধন করিয়াছিলাম যে, হায়দর আলি আমার প্রতি তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস পূর্ণরূপেই ন্যস্ত করিয়াছিলেন।"

এদিকে সিবাল্ড ও চার্চের পত্র মাদ্রাজ-সরকার পাইয়াছিলেন। হায়দরকে সরাসরি কিছু লিখিতে তাঁহাদের সাহসে কুলায় নাই, ষ্টুয়ার্টকে পাঠাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া মহীশুরী উকীলকে দিয়া তাঁহারা এক পত্র লিখাইয়াছিলেন। কিন্তু এই কৌশল খাটিল না, হায়দর জানাইলেন, 'শ্রীরঙ্গপত্তন নগরে উক্ত নামের এবং বর্ণনার সহিত মিলে এরূপ কোন ব্যক্তি নাই।' এবার ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিলেন। মাদ্রাজ শহরে ষ্টুয়ার্টের এক ভগিনীপতি বাস করিত, উহার ভৃত্যকে তাঁহারা ষ্টুয়ার্টকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পাঠাইলেন। ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে সন্ধান করিয়া এবং সঙ্গে লইয়া গিয়া প্রকাশ্য দরবারমধ্যে তাহাকে প্রদত্ত আদেশ অনুসারে উহার মুক্তি কামনা করিয়া বসিল। সর্ব্বসমক্ষে 'মিথ্যাবাদী' প্রতিপন্ন হইলে কে আর সন্তুষ্ট হয়? বলা বাহুল্য যে, এ ঘটনায় হায়দরের ক্রোধের অবধি রহিল না। সমস্ত ক্রোধানল পতিত হইল ষ্টুয়ার্টের উপরেই। তিনি ভাবিলেন সে আসলে ইংরেজদিগের গুপ্তচর, বাহিরে তাঁহার কর্ম্মনিরত থাকিয়া উহাদের খবরাখবর দিতেছে। দীর্ঘ আট মাস কাল কোন কার্য্য না করিয়াও তাঁহার নিকট হইতে বহুবিধ অনুকম্পা লাভ করা সত্ত্বেও তাঁহার বিপদের সময় যখন মরাঠারা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে তখন ভীরু কাপুরুষ নিমকহারাম দাগাবাজটা পলাইতে চাহে। ফিরিঙ্গীরা বিশ্বাসের মর্য্যাদা এই ভাবেই রাখে! তিরস্কারের উত্তরে ষ্টুয়ার্ট জানাইলেন, তিনি গুপ্তচর বা বিশ্বাসঘাতক নহেন, সুলতানের ঐরূপ অভিযোগের তিনি কোন কারণ রাখিবেন না। স্কচ যুবক স্বীয় প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি যথেষ্ট সাহস এবং কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। চেরকুলির যুদ্ধে তিনি শরীরের সাতটি স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং শত্রুকরে নিপতিত হইয়াও কোনমতে পলায়ন করিতে সমর্থ হন। তাঁহার লিখিত ঐ যুদ্ধের বিবরণ 'প্রত্যক্ষদর্শীর রচনা' বলিয়া অতিশয় মূল্যবান। উহার একাংশ মাত্র এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া সম্ভবপর হইল—"দুই ঘণ্টা ধরিয়া ভীষণ হত্যাকাণ্ডের পর মরাঠারা রণস্থলের আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। হায়দরের

সমগ্র তোপখানা, রসদাদি বহু সমরসম্ভার, বহু বিশিষ্ট কর্ম্মচারী এবং পঞ্চাশ জন শ্বেতাঙ্গ সৈনিক উঁহাদের হস্তগত হইল।* হত্যা করিতে করিতে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াই সম্ভবতঃ মরাঠারা নিজেদের প্রতি 'দয়া' করিয়া উঁহাদের প্রাণ বধ করে নাই।" মহীশুরী হাকিমগণ দেশীয় সৈনিকগণের মাত্র চিকিৎসা করিতেন, ইউরোপীয় অথবা ফিরিঙ্গী আহতগণের জন্য কোনরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় নাই! ষ্টুয়ার্টের একটি বালক-ভৃত্য জল গরম করিয়া তাঁহার ক্ষত স্থানগুলি সমস্ত দিনে তিন-চারবার ধুইয়া দিত মাত্র।

অতঃপর ষ্টুয়ার্ট মুক্তি কামনা করিলে তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছিল। তিনি ইহার পর কিছুদিন কর্ণাটের নবাব মহম্মদ আলির সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করেন। কিন্তু সে কার্য্য বেশী দিন তাঁহার ভাল লাগে নাই। দেশপর্য্যটনের অভিপ্রায়ে তিনি স্থলপথে আফগানিস্থান এবং পারস্যের ভিতর দিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরে তিনি কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিভ্রমণও করিয়াছিলেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী রাজধানীতে কবি ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ আলির নিকট হইতে বক্রী বেতনের যাবতীয় দাবির নিষ্পত্তিস্বরূপ কোম্পানী তাঁহাকে দশ সহস্র পাউণ্ড দিয়াছিলেন। ইহার নয় বৎসর পরে লণ্ডন নগরে তাঁহার দেহান্ত হয়। জনৈক আত্মীয় কর্ত্তৃক লিপিত তাঁহার জীবনচরিত এবং ষ্টুয়ার্টের নিজের লেখা মরাঠা-যুদ্ধের বিবরণের পাণ্ডুলিপি ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। ষ্টুয়ার্ট আটটি বিভিন্ন ভাষাতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

অতঃপর বিপন্ন হায়দর পূর্ব্বকৃত সন্ধিসর্ত্তানুসারে ইংরেজদিগকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু মাদ্রাজ গবর্নমেণ্ট বিপদে পড়িয়া সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হন, তাহা পালন করিতে তাঁহাদের আদৌ আগ্রহ ছিল না। ইংরেজদিগের এই বিশ্বাসভঙ্গ হায়দর জীবনে কখনও মার্জ্জনা করেন নাই। উঁহারা যে নিজেদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অসঙ্কোচে ভাঙ্গিতে পারেন, তাহা তিনি স্বপ্নেও ধারণা করেন নাই। ইহার পর হইতে ক্রমশঃই তিনি উঁহাদের প্রতিদ্বন্দী ফরাসীজাতির প্রতি সম্পূর্ণ অনুরক্ত হইয়া পড়েন।

কর্নেল হুগেলের পর মশিয়ে 'রাসেল' ইউরোপীয় দলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাসেল নামটি ইংরেজী নাম, সুতরাং কাউণ্ট লালী, জাঁল এবং জ্যাক ল ভ্রাতৃদ্বয়, এডমিরাল ম্যাকনামারা, মার্শাল ম্যাকডোনাল্ড, মার্শাল ম্যাকমেহান, ব্যারণ হাইড, কর্ণেল কনওয়ে প্রমুখ বহু বিখ্যাত ফরাসীদের পূর্ব্বপুরুষগণের মত তাঁহার পূর্ব্বপুরুষও ইংলণ্ডে ষ্টুয়ার্ট রাজবংশের পতনের পর জন্মভূমির মায়া কাটাইয়া ফ্রান্সে গিয়া বসতিস্থাপন করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রথম জীবনে সম্ভবতঃ ফরাসী সৈনিকরূপে রাসেল এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নাই। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সৈন্যদলের অবস্থা সম্বন্ধে ফরাসী ভারতের তদানীন্তন গবর্নর-জেনারেল ব্যারণ জাঁ ল' দি লরিস্ত নিম্নলিখিত অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন:

"এদেশে ফরাসীজাতীয় ভাগ্যান্বেষী সৈনিকগণের সংখ্যা খুব বেশী করিয়া ধরিলে আমার বিশ্বাসমত আন্দাজ আট শত সংখ্যক দাঁড়াইতে পারে। দেশের অভ্যন্তরভাগে ভারতীয় রাজন্যবৃন্দের নিকট সুকঠিন বা সুসম্বদ্ধ কোন ফরাসী সৈন্যদল নাই। হায়দর আলির নিকট মশিয়ে রাসেলের পরিচালনাধীনে বর্ত্তমানে সামান্য এক 'কোর' অশ্বারোহী মাত্র আছে। উহারা সংখ্যায় প্রায় এক শত হইবে, তন্মধ্যে অধিকাংশই ফরাসী। স্বয়ং হায়দর আলির নির্ব্বাচনানুসারে তিনি তদীয় কর্ম্মে মৃত হুগেলের স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার অধীনে তিন-চারি জন অফিসার আছেন। উভয় নবাবের মধ্যে যে ঈর্ষ্যা, অথবা সত্য কথা বলিতে হইলে বলা উচিত—যে অদম্য ঘৃণা বিরাজ করিতেছে সেজন্য এযাবৎ আমি মহম্মদ আলির নিকটে এই দলটিকে স্বীকার করিয়া লইতে সাহসী হই নাই। এই 'কোর'টি ফরাসী রাজ্যসরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত। কিন্তু তাঁহারা ইহাদের সম্বন্ধে আমাকে বিশেষ করিয়া কিছুই বলেন নাই। অধ্যক্ষ এবং অফিসারগণ সকলেই ফরাসীরাজের নিকট হইতে কমিশনপ্রাপ্ত। হায়দর আলির কৃত প্রস্তাবসমূহ রিপোর্ট করিবার জন্য এবং তাঁহার ও মাহে বন্দরের সমীপবর্ত্তী অন্যান্য নরপতিগণের সহিত যাহাতে আমাদের স্বার্থসম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকে সেজন্যও বটে, আমি বরাবরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মশিয়ে রাসেলের সহিত পত্র-ব্যবহার রাখিয়াছি। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহম্মদ আলির দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় বলিয়া এবং ইংরেজদের যাহাতে ঈর্ষ্যা উদ্রেকের কোন কারণ না ঘটে সেজন্যও বটে আমি কখনও এই 'কোর'টি সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনিতে পাওয়া যায় তাহাতে সাক্ষাৎভাবে লিপ্ত থাকা সমীচীন বিবেচনা করি নাই। এ সম্বন্ধে আমার অভিমত আমি কয়েকবার মন্ত্রীমহাশয়কে জানাইয়াছি। তাঁহার নীরবতা হইতে মনে হয়, তিনি উহা অনুমোদন করিয়াছেন। রাসেলের প্রতি এইপ্রকার বাহ্যতঃ ঔদাসীন্য দেখাইলেও আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট সৈন্যপ্রেরণ এবং আমার উপর যে দায়িত্বসমূহ পড়িয়াছে সেগুলির যথাসম্ভব প্রতিপালন করা হইতেও প্রতিনিবৃত্ত হই নাই।"*

রাসেল সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল লালী নিজাম দরবার হইতে হায়দর আলি সন্নিধানে আগমন করেন এবং ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার ইউরোপীয় সৈনিকদিগের অধ্যক্ষতা করেন।

---

* ত্র্যম্বক রাওয়ের রিপোর্টে প্রকাশ ৪৫টি কামান, প্রায় ৮০০০ অশ্ব, কুড়ি-পঁচিশটি হস্তী এবং অন্যান্য বহু দ্রব্য তিনি পাইয়াছিলেন।

* Etat Politique de l'Inde en 1777, pp. 142-43
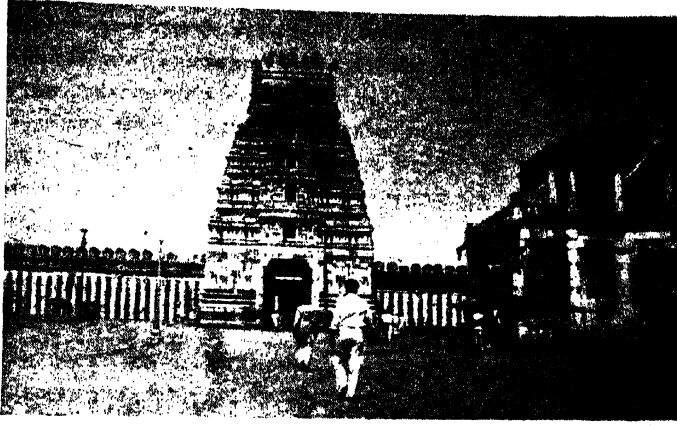
'চামুণ্ডী' পাহাড়ের উপর চামুণ্ডার মন্দিরের দৃশ্য

সুদূরের পথে

শ্রীরঘুমণি ভট্টাচার্য্য, এম-এ

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের ইচ্ছা আমার বহু দিনের। আমার বিদ্যালয়-জীবনের শিক্ষাগুরু বর্ত্তমানে কর্ম্মোপলক্ষে থাকেন বাঙ্গালোরে। সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে আসার জন্যে তাঁর সস্নেহ আহ্বানও আসছিল উপর্য্যুপরি কয়েকবার। শারদীয় অবকাশে আমার বাসনা-পূরণের সুযোগ উপস্থিত হ'ল। কিন্তু একা দূর-পথে যাত্রা করতে সাহসে কুলোচ্ছিল না। ভ্রমণ-বিলাসী সহকর্ম্মী বন্ধুবর সুখময় বাবু একাধারে সহযাত্রী ও গাইড হবেন এইরূপ আশ্বাস দিয়ে যথাকলে ভঙ্গ দিলেন। প্রথমটা একটু হতোদ্যম হয়ে পড়লাম, কিন্তু দূর-দূরান্তের আহ্বান হৃদয়কে উতলা করে তুলল। অবশেষে সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ত্যাগ করে আশ্বিনের শুক্লা ত্রয়োদশীর পুণ্যক্ষণে মাদ্রাজ মেলে গিয়ে উঠলাম।

একদিকে নিঃসঙ্গ যাত্রার সম্ভাবিত আশঙ্কা, অপর দিকে অজানাকে জানবার ঔৎসুক্য যুগপৎ আমার হৃদয়ে তুলেছিল এক অপূর্ব্ব আলোড়ন। গাড়ীতে উঠে অসহায়তার ভাব অনেকটা কেটে গেল, উদ্বেগও স্তিমিত হয়ে এল। ভিড় নিতান্ত কম ছিল না, তবে সহৃদয় দু'এক জন সহযাত্রীর আনুকূল্যে বসবার জায়গা একটু পাওয়া গেল। ভিতরের দিকে যাত্রীর সংখ্যা সাত জন। চার জনের জন্যে নির্দ্দিষ্ট পাশাপাশি দুটি বেঞ্চির একটি কলকাতার জনৈক বিহারী বণিক ও তাঁর এক অনুচর কর্ত্তৃক অধিকৃত; অপরটিতে চার জন কলকাতা থেকে বসে আসছেন। আমি নিরুপায়ভাবে সেখানে দাঁড়াতেই একটি যুবক নিজের স্বল্প-পরিসর স্থানে আরও সঙ্কুচিত হয়ে বসে আমাকে একটু জায়গা করে দিলেন। যুবকটির নাম চেদিরাজ, জাতিতে ব্রাহ্মণ, বাড়ী মহীশূরের অন্তর্গত 'সুরধাম' গ্রামে। তাঁর সদা-স্মিত-হাস্যমণ্ডিত, সরলতাপূর্ণ আলাপে অত্যল্প-কাল মধ্যেই তিনি আমাকে সৌহৃদ্যপাশে আবদ্ধ করলেন। পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হলে জানতে পারলাম, তিনি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনীয়ার, চাকরির ইণ্টারভিয়ুর জন্য কলকাতা গিয়েছিলেন। পথে অগ্রজের কর্ম্মস্থল ব্যাঙ্গালোরে দিনকয়েক অবস্থান করে দেশে ফিরবেন। আমি তাঁর জন্মভূমি পরিক্রমায় চলেছি জেনে খুব খুশী হলেন ও সর্ব্বপ্রকার সহায়তাদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সহযাত্রীদের মধ্যে একজন মধ্যবয়স্ক বাঙালীও ছিলেন। আলাপে জানলাম তিনি হায়দ্রাবাদ-প্রবাসী। সেখানকার কোনও কলেজে অধ্যাপনা করেন। আমাদের সহযাত্রী বিহারী যুবকদ্বয় দেখলাম, অধিকাংশ সময়ই পূর্ব্বোক্ত শেঠের সঙ্গে নানা আলোচনায় নিরত। চেদিরাজ আর আমার মধ্যে দেশের শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা চলছিল। কথাবার্ত্তার ফাঁকে হঠাৎ বাইরের দিকে একবার দৃষ্টি পড়ল। চোখ আর ফেরাতে পারলাম না। বাংলার দিগন্তপ্রসারী শ্যামল ক্ষেত্রে শরতের শুভ্র জ্যোৎস্না যেন স্বপ্ন-কুহেলি বিস্তার করেছে। ক্রমে বাংলার সীমা ছাড়িয়ে বাষ্পীয় যান উড়িষ্যাদেশের উষর প্রান্তরে প্রবেশ করল। সুবর্ণরেখার ক্ষীণ রেখা ক্ষীণতর হয়ে পশ্চাতে পড়ে রইল। ইতিমধ্যে বিহারী যুবকদ্বয় উপরের মোটঘাট সরিয়ে অপেক্ষাকৃত আরামে রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। আমাদের তিন জনের বসে বসে রাত কাটানো ছাড়া গত্যন্তর রইল না। স্থান-সমস্যার সমাধান হওয়ার পরে দৃষ্টিকে আবার প্রকৃতির রাজ্যে স্বাধীন বিচরণের অবকাশ দিলাম। উপরে অনন্ত অম্বরে শারদলক্ষ্মী বিছিয়ে রেখেছেন তাঁর দুগ্ধ-শুভ্র আস্তরণ, নীচে অনুচ্চ

গিরিশ্রেণী রাত্রির নিস্তব্ধতার সাক্ষ্য বহন করছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। চাঁদের উচ্ছল কিরণরাশি জলাভূমির পাশে সূচীভিন্ন কেতকীর বনে, আপক্ব শস্যশীর্ষে ও অগণিত নারিকেলকুঞ্জে আলোকের ঝিকিমিকি জাগিয়ে বিশ্ব-প্রকৃতিকে এক মহাব্যাকুল রূপ দান করেছে। এই অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে কখন নিদ্রাভিভূত হয়েছিলাম জানি না। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হতে দেখি গাড়ী একটা জংশনে এসে দাঁড়িয়েছে। এখানেই মুখ-হাত ধুয়ে জলযোগ সেরে নেওয়া গেল।
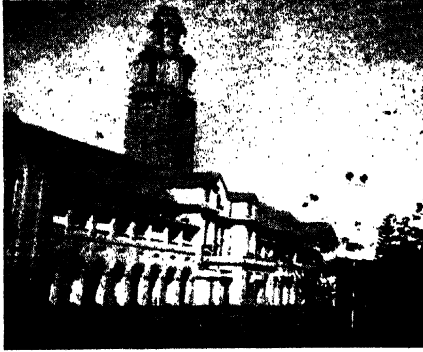
বাঙ্গালোর 'ভারতীয় বিজ্ঞান-মন্দির'

অন্ধ্ররাজ্যের বিস্তীর্ণ প্রান্তর অতিক্রম করে গাড়ী চলেছে দ্রুত বেগে। রাতের অস্পষ্ট আলোতে ছোট ছোট নীলবর্ণ পর্ব্বতে সে যেন এক ধ্যানগম্ভীর মায়া—দিনে রৌদ্র-ছায়ার আলো-আঁধারের লীলা তাদের মধ্যে সঞ্চার করল আর এক অভিনব শ্রী। তাদের শিখরকে আশ্রয়স্বরূপ অবলম্বন করেছে বর্ষণক্লান্ত শুভ্র মেঘগুলি। মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বে ট্রেন ওয়ালটেয়ারে এসে পৌঁছাল। রেস্তোরাঁটিকে এখানেই বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। তাই যাত্রীদের মধ্যে মধ্যাহ্নভোজন সেরে নেওয়ার তাড়া পড়ে গেল। স্নানাহার সমাপন করে আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে বসলাম। ইতিমধ্যে যাত্রীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। নূতন আরোহীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন পক্বগুম্ফমণ্ডিতানন এক মন্দ্র-বৃদ্ধ। পক্ব-গুম্ফের অন্তরালে মৃদুহাস্য সহকারে অপরের অধিকৃত স্থানে তাঁর জায়গা করে নেওয়ার কৌশলের তারিফ না করে পারা যায় না। নিজ কার্য্যের সমর্থনে আবার গীতার শ্লোক আবৃত্তি করলেন 'অব্যক্তাদীনি ভূতানি'···ইত্যাদি, 'সমোক্ত জায়গার জন্যে বাদ-বিসংবাদ করে কি হবে?' সুগভীর তত্ত্বের এই অভিনব ব্যাখ্যায় হাস্য-সংবরণ করা কঠিন। মুখ ফিরিয়ে নিতে হ'ল।

ওয়ালটেয়ার ছেড়ে গাড়ী আবার চলতে সুরু করেছে। নবাগত মন্দ্র-বৃদ্ধ ও চেদিরাজ উচ্চকণ্ঠে রাজনৈতিক আলোচনা চালিয়েছেন। বৃদ্ধ প্রত্যেকটি সরকারী নীতিতেই গলদ দেখাতে চান, চেদিরাজ দেশবাসীর অসাধুতার দোহাই দিয়ে সে দোষ স্খালন করতে চান। প্রসঙ্গক্রমে মান্দ্রাজে মাদকদ্রব্য-বর্জ্জন-সংক্রান্ত আইনের কথা এসে পড়ল। বৃদ্ধ এই আইন-সম্পৃক্ত গুরুদায়িত্বসম্পন্ন এক কর্ম্মচারীর নামের উল্লেখ করলেন। কর্ম্মচারীটি নিজে সমুদ্রে জাহাজের মধ্যে গোপনে সুরাপান করে আসতেন। মাত্রাধিক্য হওয়াতে একদিন ধরা পড়ে গেলেন। সরকারী কর্ম্মচারীর হাতেই সরকারের সৃষ্ট বিধানের অবমাননার এমন প্রাঞ্জল দৃষ্টান্তের সামনে চেদিরাজের যুক্তিতর্ক ম্লান হয়ে গেল। আরোহীদের অধিকাংশই বৃদ্ধের দলে, সরকারের নিন্দায় সবাই পঞ্চমুখ। রাজনীতির সূক্ষ্ম তর্কের মীমাংসা আমার সাধ্যাতীত। তাই তাঁদের সে আলোচনায় যোগদান না করে প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করে চেদিরাজকে বৃদ্ধের কবল থেকে কোনমতে রক্ষা করলাম।

মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, এর মধ্যে ছোট ছোট দু'একটা জংশন ছেড়ে এসেছি। পথের দু'ধারে ধান্যক্ষেত্র, ইক্ষুক্ষেত্র, কোথাও বা অকর্ষিত বিশাল প্রান্তরে বাবলাগাছের সারি। অঞ্চলগুলি বসতি-বিরল। স্থানে স্থানে কৃষাণদের কুটীরের সারি জনহীনতার বিরুদ্ধে অসহায় বিদ্রোহ তুলেছে। তালপাতার তৈরি কুটীরগুলির নির্ম্মাণ-নৈপুণ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি পবল হতে জল সিঞ্চন করে অনুর্ব্বর প্রান্তরকে এই কৃষাণেরা করে তোলে শস্য-শ্যামল। কর্ম্মক্লান্ত হয়ে দিনান্তে কুটীরে প্রবেশ করে, বাহ্য জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক এরা দেয় চুকিয়ে। 'শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি'র এক করুণ চিত্র চোখের সামনে ভেসে উঠল।

অপরাহ্নে ট্রেন রাজমহেন্দ্রী জংশনে এসে পৌঁছল। যাত্রীদের মধ্যে একজন বললেন, এর পর গোদাবরী। আবাল্য যে নামের সঙ্গে পরিচিত, কল্পনার ত্রিদিবে অপূর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিত যার ছবি, সেই গোদাবরীকে নয়ন-সম্মুখে দেখতে পাব ভেবে মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। উন্মুখ হয়ে নিমেষ গুনতে লাগলাম রঘুকুলরবি রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতার করুণমধুর স্মৃতি-বিজড়িত এই পুণ্য সরিৎকে প্রত্যক্ষ করার জন্যে। ট্রেন ধীরে ধীরে নদীর সেতুতে আরোহণ করল। অস্তায়মান সূর্য্যের লোহিতচ্ছটা পশ্চিম দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। তার ছায়া পড়েছে নদীর স্বচ্ছ জলে। মনে পড়ল, জানকীর লাজরক্ত আনন। এই গোদাবরীতীরে ভ্রমণ করতে এসে জানকী মুগ্ধ নয়নে হংস-হংসীদের ক্রীড়া দেখতে দেখতে কুটীরে ফিরে যাওয়ার কথা ভুলে যেতেন। এদিকে প্রিয়তম লতাবিতানের মধ্যে আকুল হয়ে তাঁর আগমন-পথ চেয়ে থাকতেন নির্নিমেষ নয়নে। ক্রীড়াদর্শনের শেষে কুটীরে ফিরে যাওয়ার কথা মনে পড়ে গেলে জানকী পদ্ম-কোরকের মত অঞ্জলিপুটে প্রণাম নিবেদন করে অপরাধিনী মুগ্ধাবালার মত প্রিয়তমের পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করতেন।*

* অস্মিন্নেব লতাগৃহে ত্বমভবস্তন্মার্গদত্তেক্ষণঃ
সাহংসৈঃ কৃতকৌতুকা চিরমভূদ্ গোদাবরী-রোধসি।
আয়ান্ত্যা পরিদুর্ম্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্য বদ্ধস্তয়া
কাতর্য্যাদরবিন্দকুড্মলনিভঃ মুগ্ধঃ প্রণামাঞ্জলিঃ॥ উত্তররামচরিত

যুগপৎ মানসপটে উদিত হ'ল সীতাবিয়োগবিধুর রামচন্দ্রের নয়ন-সলিলে স্ফীতধারা এই গোদাবরীর এক করুণ চিত্র। নদী-নীরে কমল-কানন দেখে রামচন্দ্রের ভ্রম হয়েছিল—'বুঝি বা পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতাকে পদ্মবনে লুকিয়ে রেখেছেন।' পুণ্য-করুণ-স্মৃতির ভাবমোহে মুগ্ধ-বিহ্বল চিত্তে শ্রীরাম, জানকী ও লক্ষ্মণের স্মৃতিপূত এই স্রোতস্বতীর উদ্দেশ্যে যুক্তকর মস্তকে স্থাপন করলাম।

নদী ছাড়িয়ে গাড়ী বহু দূর চলে এসেছে। 'নত আঁখি সন্ধ্যা' ধীরে নেমে এল। পূর্ব্ব-গগনে পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়ে শূন্যে, জলে, স্থলে কৌমুদীরাশির প্লাবন বইয়ে দিল। মনে পড়ল আজ কোজাগরী। আমার দৃষ্টি ছুটে গেল চেদিরাজের নির্দ্দেশিত অদূরে রজতমূর্ত্তি স্রোতস্বতীর দিকে। অজিনাবৃত মুনিযুগ্মের মত দুটি কৃষ্ণ শৈল দাঁড়িয়ে রয়েছে তার দু'পাশে। তাদের পদ বিধৌত করে কলস্বনা নদীটি বয়ে চলেছে ধীরে। চেদিরাজ বললেন—এটি দাক্ষিণাত্যের আর এক প্রধান নদী কৃষ্ণা।

নদী পেরিয়ে ধানের ক্ষেত বড় একটা চোখে পড়ল না। এই সব জায়গায় সিগারেটে ব্যবহৃত তামাক, কফি ও লঙ্কার চাষ হয়। স্বচ্ছ চন্দ্রালোকে সদ্যরোপিত চারাগুলিকে স্পষ্ট দেখা গেল।

রাত্রি ন'টার সময় ট্রেন বেজওয়াদা জংশনে এসে পৌছাল। জংশনটি বেশ বড়, এখান থেকে হায়দ্রাবাদ, গুণ্টুর প্রভৃতি জায়গায় যাওয়া যায়। অধ্যাপক মশায় এখানে বিদায় নিলেন। পরদিন প্রভাতে গাড়ী মাদ্রাজে পৌছবে, তাই আমরাও রাতটুকু কোন রকমে কাটানোর অপেক্ষায় রইলাম। নিদ্রায় জাগরণে রাত্রি প্রভাত হয়ে এল। ভোরের আলোয় দেখলাম, আমরা সমুদ্রের কাছাকাছি জায়গায় এসে পড়েছি। তালীবনের মর্ম্মরের সঙ্গে ভেসে এল সাগরের কলোচ্ছ্বাসময় অস্পষ্ট গীতি। খানিকটা পথ অতিক্রম করতে সহসা এক জায়গায় বনঝাউ ও অগণিত তালীবৃক্ষের অন্তরালে দিগন্তচুম্বী সাগরের জল দৃষ্টিপথে আসতে না আসতেই অদৃশ্য হয়ে গেল। ক্রমে মাদ্রাজের দূরত্ব কমে এল। এখানে দেখলাম পথিপার্শ্বে সমুদ্রের জল থেকে প্রস্তুত লবণ স্তূপাকারে স্থানে স্থানে পড়ে আছে। অদূরে মাদ্রাজ ষ্টেশন দেখা যেতে লাগল। যাত্রীরা অবিন্যস্ত মালপত্র গোছাতে ব্যস্ত হলেন। তাঁদের এই ত্রস্ততার মধ্যে ট্রেন ষ্টেশনে প্রবেশ করল।

ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে জিনিসপত্র বেয়ারার জিম্মায় রেখে প্রাতঃকৃত্য সেরে নেওয়া গেল। দাক্ষিণাত্যের গুরুত্বপূর্ণ শহর মাদ্রাজ। তারই উপর দিয়ে যাব দাক্ষিণাত্যের অন্য নগরে, আর তাকেই উপেক্ষা করে যাব—মন এতে সায় দিচ্ছিল না। অথচ, চেদিরাজ বিব্রত হবেন ভেবে তাঁকেও আমার মনোভাব জানাতে ইতস্ততঃ করছিলাম। আমার কুণ্ঠিত ভাব দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কিছু বলবেন কি? সসঙ্কোচে বললাম—মাদ্রাজ শহরটি আমাকে একটু দেখিয়ে নিয়ে আসতে হবে। সানন্দে সম্মতি দান করে তিনি বললেন—আপনি আমার দেশের অতিথি, আপনার প্রীতি-বিধান করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, এ আর বেশী কথা কি? তাঁর আন্তরিক সৌজন্যে মুগ্ধ হলাম। সত্যিই—

'ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।'

কবিগুরুর এই উক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় পেয়ে ধন্য হলাম। আমার মাদ্রাজ দেখার ঔৎসুক্যে চেদিরাজ কিন্তু দ্বিপ্রহরের ট্রেনে বাঙ্গালোর যাওয়ার পরিকল্পনা বর্জ্জন করতে বাধ্য হলেন।
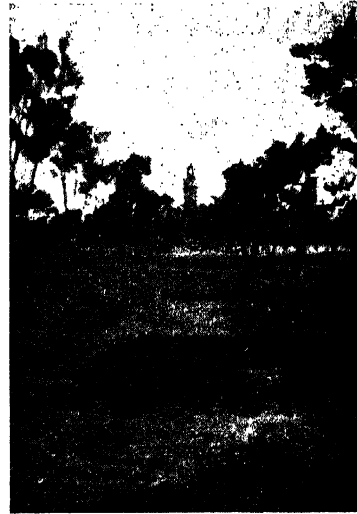
বৃক্ষলতার অন্তরালে 'বিজ্ঞান মন্দিরে'র গম্বুজ

দু'জনে ষ্টেশনের বাইরে এসে বাসে উঠে একটা হোটেলের সামনে গিয়ে নামলাম। বেলা তখন প্রায় দশটা। আহারাদি সেরে পদব্রজে সমুদ্রের দিকে রওনা হলাম। মাদ্রাজ শহরটি ছোট, কিন্তু কলকাতার মত ট্রামে, বাসে, ফুটপাথে ভিড়ের চাপে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠে না। এখানে যানবাহনে যাত্রীর সংখ্যা-নিয়ন্ত্রণ-ব্যাপারে নিয়মানুগত্য বিশেষ লক্ষণীয়। মিনিট পনর হাঁটবার পর আমরা সমুদ্রের তীরে এসে পৌছলাম। আমার সমুদ্র-দর্শনের প্রথম অভিজ্ঞতা পুরীতে। সেখানে সমুদ্রকে দেখে মনে হয়েছিল—'এ যে অজগর গরজে সাগর ফুলিছে।' কিন্তু মাদ্রাজে সমুদ্রের এক অভিনব রূপ আমার নয়ন-সম্মুখে উদঘাটিত হ'ল। না আছে তার মেঘমন্দ্র ধ্বনি—না আছে তার তরঙ্গের উচ্ছলতা। এখানে যেন যোগাসনে উপবিষ্ট ধ্যান-মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করলাম সমুদ্রের। এক একটা ঢেউ মাঝে মাঝে বেলাভূমিতে আঘাত করে যেন তার অতল গভীর প্রশান্তিতে অবগাহন করার জন্যে অব্যক্ত আহ্বান জানাচ্ছে। বেলাভূমি দিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরেই উপকূলভাগে সমুদ্রের সঙ্গে সমান্তরাল সুরম্য সৌধশ্রেণী চোখে পড়ল। সঙ্গী বান্ধবের

কাছে জানলাম, মাদ্রাজ শহরের মধ্যে সবচেয়ে মনোরম স্থান হ'ল সমুদ্রের উপকূল। বিদ্যাভবন, উচ্চ আদালত ও সরকারের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ আপিস এখানেই অবস্থিত। সৌধশ্রেণীর পাশ দিয়ে চলে গেছে একটি প্রশস্ত রাজপথ। যেখান থেকে প্রাসাদের সারি আরম্ভ হয়েছে, ঠিক তারই বিপরীত দিকে রাস্তার অপর পার্শ্বে বৃক্ষ-লতা-বেষ্টিত এক নিভৃত কুঞ্জ স্থানটিকে অপরূপ সৌন্দর্য্য দান করেছে। রাজপথ ধরে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরই মধ্যাহ্ন-রবির খরতাপে সন্তপ্ত হয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রামলাভের আশায় আমরা ফিরে এসে ঐ ছায়াঘেরা কুঞ্জে প্রবেশ করলাম।
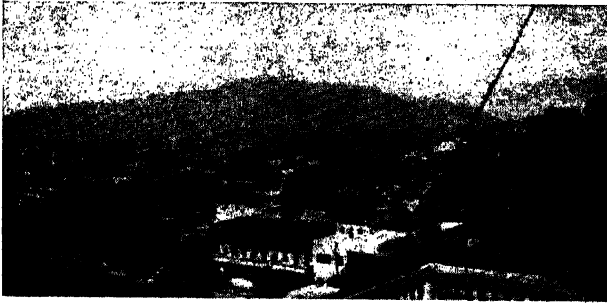
মহীশূরের একটি দৃশ্য

বেলা পড়ে এল—সূর্য্যের কিরণ মন্দীভূত হয়েছে। দ্বিপ্রহরে যে স্থানটি ছিল জনবিরল, অপরাহ্নে যানবাহনের শব্দে সে স্থানটি হয়ে উঠল কলমুখর। সৌন্দর্য্যপিপাসু ও স্বাস্থ্যান্বেষীরা দলে দলে এসে ভিড় জমাতে লাগলেন।

উপকূলের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করার সময় আর ছিল না। সন্ধ্যায় বাঙ্গালোরের ট্রেনে উঠতে হবে, বন্ধুবর তাড়া দিতে লাগলেন। সৌধশ্রেণীর উপর কনকাঞ্জলি বর্ষণ করতে করতে সূর্য্য অস্তাচলে নামলে দু'জনে ষ্টেশনগামী একটা বাসে উঠে মিনিট পনরর মধ্যেই ষ্টেশনে এসে পৌছলাম। বাঙ্গালোর মেল প্লাটফর্মে অপেক্ষা করছিল। জিনিষপত্র নিয়ে গাড়ীতে উঠলাম। যথাসময়ে গাড়ী ছেড়ে দিল। স্মৃতির ভাণ্ডারে শুধু সঞ্চয় হয়ে রইল মাদ্রাজের সমুদ্র ও তার উপকূল।

ধরিত্রীর বুকে 'স্রস্ত-স্বর্ণাঞ্চলা তন্দ্রালসা' সন্ধ্যা ধীরে নেমে এল। কৃষ্ণা-প্রতিপদের চন্দ্র উদিত হয়ে ধরণীর তিমিরাবগুণ্ঠন উন্মোচিত করে দিল। যত দূর দৃষ্টি যায় শ্যামল ভূখণ্ড চোখে পড়ল না। এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত খুব কম। কোথাও সেচব্যবস্থায় বহু আয়াসে চীনা-বাদাম ও আখের চাষ করা হয়েছে। স্থানে স্থানে শ্রেণীবদ্ধ তালীবন যেন এই সব অঞ্চলকে পাদপবিহীনতার অখ্যাতি থেকে রক্ষা করার ব্যর্থ প্রয়াসে নিরত। উষর প্রান্তর অতিক্রম করে ট্রেন ত্বরিতগতিতে চলেছে, এক সময় দেখলাম দূরে এক নীল গিরিশ্রেণীর অবিচ্ছিন্ন রেখা। সঞ্জীবচন্দ্র পর্ব্বতশ্রেণীর সঙ্গে যে 'বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গমালা'র সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন তার যাথার্থ্য উপলব্ধি করলাম এই পর্ব্বতমালা দেখে। ক্রমে মাদ্রাজের সীমানা ছাড়িয়ে ট্রেন মহীশূর রাজ্যে প্রবেশ করল। বৃক্ষে, লতায়, শস্য-ক্ষেত্রে সবুজের রেখা দেখতে পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। চেদিরাজের কাছে শুনলাম, এই সব অঞ্চলে তালের রস থেকে মদ্য প্রস্তুত হয়। মাদ্রাজে মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়াতে সেখান থেকেও পানাসক্তেরা মহীশূরের এই সব অঞ্চল পর্য্যন্ত আনাগোনা করে। এ রাজ্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল, সেটি হ'ল তিন্তিড়ী বৃক্ষের বাহুল্য। ক্রমে আমাদের যান স্বর্ণখনির জন্য প্রসিদ্ধ 'কোলার' প্রভৃতি অঞ্চল অতিক্রম করল। রাত্রি গভীর হয়ে এল। গত দু'রাত্রির মত গাড়ীতে আজ ভিড় ছিল না। দু'জনে দুটি বাঙ্ক অধিকার করে শুয়ে পড়লাম। ভোরে কোকিলের কুহুস্বরে চমকিত হয়ে জেগে উঠে দেখি গাড়ী এসে পৌঁছেছে বাঙ্গালোরে।

প্লাটফর্ম্মে নেমেই দেখলাম মাষ্টারমশাই আমার জন্যে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন। অভিবাদন, আশীর্ব্বচন ও কুশলপ্রশ্ন বিনিময়ের পর চেদিরাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলাম। চেদিরাজের ঠিকানা নিয়ে আমরা দু'জনে একটা টাঙ্গায় উঠলাম। কথা রইল দ্বিপ্রহরে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে নগরপরিক্রমায় বেরনো যাবে। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে 'মনিরড্ডিপলায়াম' নামে এক পল্লীতে টাঙ্গা এসে থামল। এখান থেকে মিনিট দশেক হেঁটে মাষ্টার মশায়ের বাসায় পৌঁছলাম। সেখানে আমার জন্য প্রতীক্ষারত কয়েকজন ভদ্রলোককে বসে থাকতে দেখলাম। এঁরা সবাই মাষ্টার মশাইয়ের সহকর্ম্মী—তাঁর মুখে আমার আসার সংবাদ পেয়ে সকলে আমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। এক জন বঙ্গবাসীর আগমন বাংলার এই প্রবাসী সন্তানদের কাছে যেন কত কামনার বস্তু। বাঙ্গালোরে অবস্থিতিকালে এঁদের সৌজন্য ও পারস্পরিক সম্প্রীতির যে পরিচয় পেয়েছিলাম তা জীবনে ভুলবার নয়।

আহারাদির পরে শহর দেখতে বেরুলাম। সঙ্গে ছিলেন মাষ্টারমশাই আর তাঁর এক বন্ধু, নাম শ্রীহরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বাড়ী ঢাকা জেলায়, দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ যুবক। এঁর সাহচর্য্য না পেলে অল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গালোরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখা সম্ভব হয়ে উঠত না।

বাঙ্গালোর শহর প্রকৃতপক্ষে দ্বিধাবিভক্ত—একটা প্রাচীন শহর, আর অপরটি সেনানিবাসকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। প্রাচীন শহরটিতে বাড়ী-ঘরের বৈশিষ্ট্য তেমন কিছুই নেই। তবে নূতনতর অঞ্চল-গুলি নগর-নির্ম্মাণে স্থাপত্য-শিল্পের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত রুচির পরিচয় দেয়। ভারতে বিমান-নির্ম্মাণের একমাত্র কেন্দ্ররূপে স্থানটির গুরুত্ব বেড়েই চলেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে শহরের দুটি অংশের

ব্যবধান দূর করে এক অখণ্ড মহানগরী সৃষ্টির বিরাট সম্ভাবনা রূপায়িত হয়ে উঠেছে। শহরের চতুষ্পার্শ্বের উঁচুনীচু জমিগুলি সব্জীতে ভরা। পথের দু'ধারে গাছগুলি ছেয়ে আছে নানা রঙের ফুলে। তাদের সৌরভে আকুল বিহঙ্গকুল কলকাকলী-ধ্বনিতে যেন এই চিরবসন্তের রাজ্যের জয়গানে বিভোর।

শহরের অধিবাসীদের মধ্যে কানাড়ীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, কথ্যভাষা কানাড়ী। পথ দিয়ে যেতে যেতে এদেশের আরও দু'একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল। পুষ্প এদেশের মহিলাদের কেশবিন্যাসের একটি অপরিহার্য্য উপকরণ। এখানকার মহিলাদের সঙ্গে বাংলাদেশের মহিলাদের সাজসজ্জায় রুচির পার্থক্য কোন কোন ক্ষেত্রে কৌতুকের উদ্রেক করে। তরুণীদের তুলনায় বর্ষীয়সী মহিলাদের রঞ্জিত বসন পরিধানে প্রীতি এই রুচিগত পার্থক্যের একটি দৃষ্টান্ত।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা রাসেল মার্কেটের কাছে চেদিরাজের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। চেদিরাজ আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর সঙ্গে বাসে উঠে লালবাগের উদ্দেশে রওনা হওয়া গেল। মিনিট পনেরর মধ্যে বাস আমাদের লালবাগের সামনে নামিয়ে দিল।

'লালবাগ' একটি উদ্যানের নাম। এটিকে 'শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে'র ক্ষুদ্রতর সংস্করণ বলা চলে। সকলে মিলে খানিকক্ষণ উদ্যানে ঘুরে বেড়ানো গেল। অদৃষ্টপূর্ব বিচিত্র বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ও বনস্পতি উদ্যানটিকে অপরূপ শোভায় মণ্ডিত করে রেখেছে। নানা রঙের ফুল ফুটে স্থানটিকে রূপে-সৌরভে সমৃদ্ধ করেছে। সম্প্রতি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এর মধ্যে একটি উদ্যান-কর্ষণ বিভাগ (Horticultural Department) খোলা হয়েছে।

'কৃষ্ণরাজসাগর' বাঁধ ও বৃন্দাবন উদ্যানের প্রথম স্তরের অংশবিশেষের দৃশ্য

উদ্যানের শোভা দেখতে দেখতে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে এক জায়গায় এসে আমি থমকে দাঁড়ালাম। গুল্মশ্রেণীর কতকগুলি গাছকে ছেঁটে উদ্যতচক্র সর্প, নৃত্যরত ময়ূর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জীব-জন্তুর রূপ দান করা হয়েছে। সহসা দৃষ্টিপথে পতিত হলে এগুলি জীবন্ত বলে ভ্রম উৎপাদন করে এবং শিল্পীর শিল্পকৌশলের উৎকর্ষের পরিচয় দেয়। উদ্যানের এক পাশে একটি ঝিল ও অপর পাশে একটি ছোট পাহাড়। ব্রিটিশ আমলের কোন রাজপুরুষ এই পাহাড়ের উপর একটি মানমন্দির স্থাপিত করে, একটি প্রস্তর-ফলকে স্থানটিকে উত্তরকালের বাঙ্গালোরের সম্ভাব্য সীমা বলে নির্দিষ্ট করেছিলেন। বর্ত্তমানে শহরটি তাঁর নির্দিষ্ট এই সীমা অতিক্রম করে আরও বহুদূর অবধি বিস্তৃত হয়েছে। পাহাড় থেকে অবতরণ করে বাসে উঠে আমরা বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। চেদিরাজ রাসেল মার্কেটে নেমে গেলেন। বাড়ীতে পৌঁছে নৈশ-ভোজনের পর শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করে চেদিরাজের কথাই ভাবতে লাগলাম।

প্রভাতে সুনিদ্রার পরিতৃপ্তি নিয়ে শয্যাত্যাগ করে দেখি বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হয়েছে। বাংলাদেশে শরতের নির্ম্মল রৌদ্রকরোজ্জ্বল আকাশ দেখতে আমরা অভ্যস্ত। অকালবর্ষণ মনটাকে বিষণ্ণ করে তুলল। মাষ্টার-মশায়ের কাছে শুনলাম, এখানকার আবহাওয়া এ রকমই। ও অঞ্চলে বৃষ্টি হয় দু'বার—একবার বর্ষাকালে, আর একবার শীতের প্রারম্ভে। স্থানটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বহু উচ্চে অবস্থিত। তাই এখানে শীত বা গ্রীষ্ম কোনটিরই আধিক্য অনুভূত হয় না।

সকালে টাটা ইনষ্টিটুট, কার্বন-পার্ক প্রভৃতি দেখব বলে স্থির করেছিলাম, তাই বৃষ্টি হওয়ায় নিরাশ হলাম। সৌভাগ্যক্রমে দ্বিপ্রহরের দিকে বৃষ্টিটা হঠাৎ থেমে গেল। কালক্ষেপ না করে, বেরিয়ে সোজা চেদিরাজের গৃহে উপস্থিত হলাম। সেখান থেকে দু'জনে মাষ্টার-মশায়ের আপিসের দিকে যাত্রা করলাম। প্রশস্ত পথ, কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, দু' পাশে সারিবদ্ধ কনকচাঁপা এবং অন্যান্য নানা ফুলের গাছ। একটির থেকে আর একটি বেশ ব্যবধান রেখে দাঁড়িয়ে আছে। বৃক্ষরাজির অন্তরালে সুরম্য বাস-গৃহগুলি নির্ম্মাণকৌশলে পথিকদের নয়ন-মন হরণ করে। এগুলির অধিকাংশই উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের বাসভবন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা টাটা ইনষ্টিট্যুটের সন্নিহিত মাষ্টার-মশায়ের আপিসে গিয়ে পৌঁছলাম।

মাষ্টার-মশাই আমাদের সঙ্গে নিয়ে চললেন ইনষ্টিট্যুটের অভি-মুখে। হরেনবাবুও আমাদের সঙ্গে জুটে গেলেন। প্রথমে আমরা ইনষ্টিট্যুটের আদি অট্টালিকায় উপস্থিত হলাম। এই গবেষণাগার স্থাপন জামসেদজী টাটার অন্যতম কীর্ত্তি। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মৌলিক গবেষণার জন্য ভারতের সকল প্রদেশের ছাত্রছাত্রীদের এই বিজ্ঞান-মন্দিরে নেওয়া হয়। প্রাসাদের সম্মুখে জামসেদজীর মূর্ত্তি স্থাপিত। প্রাসাদের মধ্যস্থিত একটি গম্বুজের চূড়া থেকে দেখলে শহরটিকে চিত্রার্পিতের মত মনে হয়। প্রধান অট্টালিকার চতুষ্পার্শ্বে আরও অনেক সদ্যসমাপ্ত, সমাপ্তপ্রায় ও নির্ম্মীয়মাণ সৌধ দৃষ্টি-

গোচর হ'ল। স্বাধীন-ভারতে বিজ্ঞানের প্রসারকল্পে সরকারের সংপ্রচেষ্টার সুস্পষ্ট ছবি দেখলাম এই বিজ্ঞানাগারে।

ইনষ্টিট্যুট দর্শনান্তে মাষ্টার-মশাই বাড়ী ফিরলেন। আমরা তিন জন ম্যাজেষ্টিক সার্কলগামী একটা বাসে উঠলাম। মিনিট কুড়ি পরে সেখানে নেমে কার্বন-পার্কের দিকে অগ্রসর হওয়া গেল। এক একটি বিশিষ্ট হর্ম্মের নামানুসারে এক একটি অঞ্চলের নামকরণ করা এদেশের একটা রীতি, যেমন, 'ম্যাজেষ্টিক্ সার্কল,' 'ইনষ্টিট্যুট সার্কল' ইত্যাদি। ম্যাজেষ্টিককে বাঙ্গালোরের মেট্রো বলা যেতে পারে। এটি এখানকার সেরা চলচ্চিত্রগৃহ।
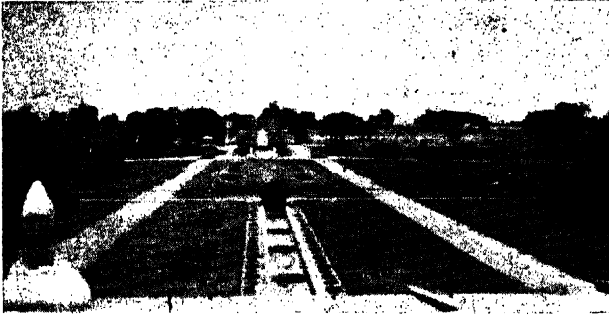
'বৃন্দাবনে'র দ্বিতীয় স্তরের একটি মনোরম-দৃশ্য

কিছু দূর এসে আমরা কর্বন-পার্কের মধ্যে প্রবেশ করলাম। কার্বন-পার্ক বাঙ্গালোরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম। পার্ক বলতে আমরা যা বুঝি তার সঙ্গে এর আসল পার্থক্য হ'ল আয়তনে। কয়েক শত বিঘা জুড়ে এই পার্কটি অবস্থিত—তার মধ্যে অগণিত সৌধশ্রেণী। সমগ্র মহীশূর রাজ্যের শাসনকার্য্য পরিচালিত হয় রাজধানী বাঙ্গালোর থেকে, আর কার্বন-পার্কের অধিকাংশ প্রাসাদই শাসন-ব্যবস্থার কোন-না-কোন দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

ক্রমে দিনের আলো মিলিয়ে এল, কর্ম্মব্যস্ততার কোলাহলও সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ হয়ে এল। প্রাসাদগুলিকে দেখে মনে হ'ল যেন প্রচ্ছায়-সঘন বৃক্ষরাজির অন্তরালে আত্মগোপন করে দিনান্তে তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে। মাঝে মাঝে সান্ধ্য-বিহারার্থীদের শকটগুলি নিস্তব্ধতাকে চকিত করে ঘন কুঞ্জের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

পার্কের মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা চলেছি—ইতিমধ্যে আকাশের অবস্থা যে কখন খারাপ হয়েছে তা টের পাই নি। চেয়ে দেখলাম চারিদিক মেঘে ঢেকে গেছে। হঠাৎ টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়ে ক্রমে তা মুষলধারায় পরিণত হ'ল। তিন জনে একটি অট্টালিকার বারান্দায় উঠে আশ্রয় নিলাম। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পরও যখন বৃষ্টি থামবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তখন বাসে উঠে বাড়ী ফিরে যাবার সঙ্কল্প করে আমরা রাস্তার পাশে দাঁড়ালাম। মিনিটদুয়েক পরেই একটা বাস আসতে তাতে উঠতে গেছি, কণ্ডাক্টার 'সীট নেই' বলে হটিয়ে দিল। এমনি করে পর পর তিনটে বাস চলে গেল, প্রত্যেকটির অবস্থা একই রকম। ততক্ষণে আমাদের জামা-কাপড় দিয়ে জল ঝরছে। পথে অন্য কোনও যানবাহনের চিহ্নও নেই। উপায়ান্তর না দেখে চার মাইল হেঁটে সেই শীতেও ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে বাড়ীতে পৌঁছলাম।

চেদিরাজের আহ্বানে সকালে ঘুম ভেঙ্গে গেল। এত সকালে তাঁর আসার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন যে, আজ তিনি মহীশূর যাবেন। আমাকেও সেজন্য প্রস্তুত হবার জন্য বলতে এসেছেন। তাঁর সঙ্গ না নিলে হয় ত মহীশূর দেখা আর ভাগ্যে ঘটে উঠবে না এই ভেবে অসমাপ্ত পরিচয়ের খেদ বক্ষে নিয়ে বাঙ্গালোর-ত্যাগের উদ্যোগ করতে হ'ল। মনে পড়ল আমার এখানে আসার সিদ্ধান্ত শুনে, যাত্রাকালে সহব্রতী সুহৃদ 'দেবাদিদেব' পরিহাসের ছলে বলেছিলেন, "হরিদ্বার, বারাণসী প্রভৃতি পুণ্যতীর্থগুলি আপন আপন মাহাত্ম্যে পুণ্যালোভাতুরদের আকর্ষণ করে জানি, কিন্তু বাঙ্গালোরের কি এমন আকর্ষণ আছে, যার জন্যে সেখানে ধাওয়া করছেন? দেখবেন, বাঙ্গালোর শেষে না লোর বইয়ে ছাড়ে। তাঁর এই পরিহাস-বিজল্পিত যে মর্ম্মান্তিক সত্যের রূপে দেখা দেবে তা কে জানত? কি ভাবে আমার বিদায়ের পালা সত্য সত্যই মর্ম্মান্তিক হয়ে উঠল, তাই বলছি। শিক্ষাগুরুর বাসভূমি হিসাবে এ আমার নিকট পীঠস্থান। স্বল্পকালের অবস্থিতির মধ্যেও গুরু এবং গুরুপত্নীর অমিত স্নেহ লাভ করে চিত্ত আমার নিবিড় মাধুর্য্যে ভরে উঠেছে, তাঁর বন্ধু ও বন্ধু-পত্নীদের মধুর ব্যবহারে পেয়েছি গভীর আন্তরিকতার স্পর্শ। আমাকে বিদায় দেওয়ার সময় দেখতে পেলাম তাঁদের মুখে বিষণ্ণতার সুস্পষ্ট ছবি। এত সত্বর আমাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য তাঁরা কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু চেদিরাজের সঙ্গ ছেড়ে দিলে আমার মহীশূর যাওয়া হবে না, তাই তাঁদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে বিদায় নিতেই হ'ল। শত অতৃপ্তির মধ্যে যাত্রা করে শূন্য মনে ষ্টেশনে এসে পৌঁছলাম।

চেদিরাজ আগের থেকে ষ্টেশনে এসে বসেছিলেন। দু'জনে মহীশূরের গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। ট্রেন ছেড়ে দিল।

মহীশূরের পথে

মহীশূর রাজ্যের অসমতল প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে গাড়ী চলেছে। এ অঞ্চলের ছোট ছোট পাহাড়গুলিকে নীরস শিলাময় স্তূপ বলা যেতে পারে। পর্ব্বতগাত্রের অনুর্ব্বরতার সঙ্গে তুলনা করলে শস্য-ক্ষেত্রগুলির শ্যামলিমা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এই ভূখণ্ডগুলি খুবই উর্ব্বর, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক সঙ্গে দু'তিনটি ফসল উৎপন্ন হয়। ক্ষেত্রগুলির কোনটি খুব উঁচু, কোনটি বা খুব নীচু। নিম্নতম ক্ষেত্র-গুলি থেকে উচ্চতম ক্ষেত্রগুলির ব্যবধান একতলা থেকে দোতলায়

উঁচবার সিঁড়ির মত ক্রমোচ্চ স্তরসমূহে পরিব্যাপ্ত। স্থানে স্থানে ইক্ষুবন, নারিকেলকুঞ্জ ও কদলীর উদ্যান প্রকৃতির শ্যামল অঙ্গে আভরণের শ্রী সম্পাদন করছে। এই বিচিত্র শোভা দেখতে দেখতে চলেছি, ট্রেন অপরাহ্ণে কাবেরী অতিক্রম করে শ্রীরঙ্গপত্তনে এসে পৌঁছল। নির্ভীক, স্বাধীনচেতা টিপু সুলতানের দুর্গটি এবং পুর-পরিখার অবলুপ্তপ্রায় অংশ দৃষ্টিগোচর হ'ল। করুণার প্রবাহ কাবেরী নয়ন-মনোহর বৃত্তাকারে নগরটিকে বেষ্টন করে রেখেছে। নদীটির বিস্তৃতি কৃষ্ণা ও গোদাবরীর তুলনায় অনেক কম—অগণিত উপলখণ্ডের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ধারাগুলি শুধু এর অস্তিত্বের ক্ষীণ সাক্ষ্য বহন করছে। তবে কি দিগ্বিজয়ী রঘুর সৈন্যদের সম্ভোগে কাবেরী সরিৎপতির অবিশ্বাসিনী হয়েছিল বলেই পতি-শাপে তার গতি উপল-ব্যথিত হয়েছে ?* প্রকৃতির বিচিত্র লীলার যথার্থ হেতু কে নির্দ্দেশ করবে ?

শ্রীরঙ্গপত্তন ছেড়ে কয়েক মাইল অতিক্রম করার পর সন্ধ্যারবির কিরণে উজ্জ্বল, অদূরে দৃশ্যমান সুরম্য হর্ম্ম্যাবলীর প্রতি চেদিরাজ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। মহীশূরে পৌঁছতে পৌঁছতেই সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকার তার উপর রহস্যের যবনিকা বিছিয়ে দিল।

ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে একটি হোটেলে জিনিষপত্র রেখে দু'জনে বৃন্দাবন-উদ্যানের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। বৃন্দাবন মহীশূর রাজবংশের এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। মহীশূর ষ্টেশন থেকে আট মাইল দূরবর্ত্তী কৃষ্ণরাজ-সাগর ষ্টেশন। সেখান থেকে এক মাইল হেঁটে এই উদ্যানে পৌঁছানো যায়। মহীশূর থেকে বাসেও বৃন্দাবন যাওয়ার ব্যবস্থা আছে, তবে বাসের সংখ্যা অল্প—সময় অনিয়ন্ত্রিত। তাই আমরা ট্রেনেই যাত্রা করলাম। সন্ধ্যা প্রায় সাতটায় কৃষ্ণরাজসাগরে নেমে উদ্যানের দিকে অগ্রসর হলাম। অর্দ্ধপথ অতিক্রম করার পর উদ্যানস্থ আলোকমালা দৃষ্টিগোচর হওয়ায় হৃদয় উল্লসিত হয়ে উঠল। ত্বরায় সেই স্বপ্নলোকের মায়া-বিস্তারী আলোকোজ্জ্বল উদ্যানে প্রবেশ করবার ঔৎসুক্যে দ্বিগুণ উৎসাহে হাঁটতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই বহুবাঞ্ছিত উদ্যানের প্রবেশ-দ্বারের কাছে এসে পৌঁছে যা দেখলাম তাতে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। প্রায় এক মাইল জুড়ে কাবেরীর বিরাট বাঁধ। রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ কৃষ্ণরাজের নাম অনুসারে বাঁধটির নাম হয়েছে কৃষ্ণরাজসাগর। নদীটি এখানে অর্দ্ধবৃত্তাকারে বেঁকে গেছে। বাঁধটি বৃত্তচাপের মত দুটি প্রান্তকে সংযুক্ত করেছে। সুদৃশ্য জল-তরণী—'কৃষ্ণরাজ' আর 'বৃন্দাবন' নাম শুনে এই জল-তরণীতে যেন সেই বৃন্দাবন-বিহারীর 'নৌকা-বিলাস' প্রত্যক্ষ করলাম। স্বপ্নাবিষ্টের মত চেদিরাজের পিছনে পিছনে চলেছি। ঊর্দ্ধে নক্ষত্রপুঞ্জখচিত শারদীয় আকাশকে বিভক্ত করেছে শুভ্রছায়া-পথ। আলোকমালাসজ্জিত উদ্যানের মধ্যে এই বাঁধটিকে দেখে মনে হ'ল যেন এটি ছায়াপথের সৌন্দর্য্য অনুকরণ করেছে। উদ্যানের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে বিরহকাতরা মত কাবেরী। বাঁধের গায়েই উদ্যানে অবতরণ করার পথ। প্রবেশ করে, তার সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কুবেরের 'চৈত্ররথ' তো কল্পলোকের বস্তু, কিন্তু মানুষের গড়া উদ্যান যে এত সুন্দর হতে পারে তা ছিল কল্পনারও অতীত।

উদ্যানের তিনটি স্তর—প্রত্যেকটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রথম স্তরটি বাঁধের কয়েক গজ নিম্নে অবস্থিত। বিচিত্রবর্ণের পুষ্পের সুরভি-সম্পৃক্ত পবনের গতি হয়েছে এখানে মন্থর। সুসন্নিবেশিত জল-যন্ত্রের উৎসধারাগুলিতে আলোক প্রতিফলিত হওয়ায় মনে হ'ল যেন তরল মুক্তা অজস্র ধারায় ঝরে পড়ছে। এক প্রান্তে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি এক অপরূপ পবিত্র দিব্য বিভা বিস্তার করে স্থানটিকে মহিমামণ্ডিত করে রেখেছে। যুগলমূর্ত্তি দেখে মনে হ'ল—বুঝি প্রেমের দেবতাযুগল এই অভিনব বৃন্দাবনের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে এখানে এসেছেন বিহার করতে, আর তাঁদের লীলাভূমি সমৃদ্ধ করতে 'নন্দনের দ্বার' খুলে এসে চিরবসন্ত এখানে বিরাজ করছে। 'বৃন্দাবন বাগান' নাম সার্থক সন্দেহ নাই, ভূলোকের নন্দনকানন বললেও বুঝি এতটুকু অত্যুক্তি হয় না।
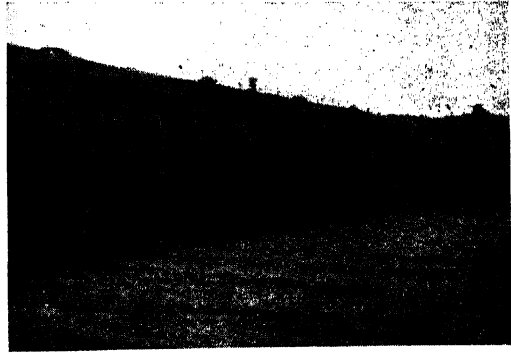
কৃষ্ণরাজসাগর—কাবেরী বাঁধ

উদ্যানের দ্বিতীয় স্তরটি কাবেরীতটের সঙ্গে সমোচ্চ। প্রথম স্তরটি থেকে অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে এটি অবস্থিত। সোপানের সাহায্যে আমরা এখানে নেমে এলাম। লতাগুল্ম ও শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত প্রভৃতি বিচিত্র পুষ্পের এবং আলোকমালার বর্ণালী বৈচিত্র্যে এই

* স সৈন্য পরিভোগেন গজদান সুগন্ধিনা।
কাবেরীং সরিতাং পত্যুঃ শঙ্কনীয়ামিবাকরোৎ ॥ রঘুবংশ ৪।৪৫

...টিকে পূর্ব্বস্তর থেকে আরও মনোরম বলে বোধ হ'ল। জলযন্ত্রগুলির সঙ্গে লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি নানা রঙের বৈদ্যুতিক আলো সংশ্লিষ্ট থাকায় তাদের বিচ্ছুরিত ধারাগুলি দ্রবীভূত মরকত, পদ্মরাগ ও বৈদূর্য্যমণির শোভা হরণ করেছে। এই প্রস্ফুটিত নিকুঞ্জবনটি শেষ হয়েছে কাবেরীর তীরে এসে। নদীতে অবতরণ করার জন্য শিলা-নির্ম্মিত একটি প্রশস্ত ঘাট আছে। তার দু'পাশে দুটি কৃত্রিম হস্তীর মুখ দিয়ে জলধারা উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে সহস্রধারায়। দূর থেকে দেখে মনে হ'ল যেন তারা নদীতে জলক্রীড়া করতে নেমেছে।

নদী পার হয়ে উদ্যানের তৃতীয় স্তরে যেতে হয়। সাড়ে ন'টায় সময় মহীশূরে ফেরবার ট্রেন ধরতে হবে। তাই এই স্তরটি আর আমাদের দেখা হ'ল না। এখানেও সেই সহব্রতী সুহৃদ দেবাদিদেবের অভিশাপ ফলে গেল নাকি। তৃপ্তির মধ্যেও যে অতৃপ্তি নিয়ে ফিরতে হ'ল। উদ্যান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে কৃষ্ণরাজসাগর ষ্টেশনের দিকে রওনা হলাম। মহীশূরে ফিরে হোটেলে রাতটুকু কাটিয়ে দেওয়া গেল।

সকালে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে প্রাতরাশ সেরে দু'জনে হেঁটে চামুণ্ডী পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলাম। হোটেল থেকে পাহাড়টির দূরত্ব তিন মাইল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছলাম। প্রায় এক হাজার সিঁড়ি ভেঙে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করা যায়। একটি সর্পিল পথ পাহাড়টিকে বেষ্টন করে চূড়া পর্য্যন্ত উঠেছে। এই পথ দিয়ে মোটর যাতায়াত করে। দু'জনে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছে বেশ শ্রান্ত হয়ে পড়লাম। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে আবার উঠতে সুরু করলাম। চূড়ায় পৌঁছতেই পথের শ্রান্তি দূর হয়ে গেল। সে এক অপরূপ দৃশ্য! পাহাড় থেকে নগরটি দেখতে-ছবির মতই মনোরম। শিখরের অনেকটা জায়গা জুড়ে সমতলভূমি। তারই উপর চামুণ্ডা দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দির প্রতিষ্ঠাও রাজবংশের অন্যতম কীর্ত্তি। উচ্চতায় পুরী বা ভুবনেশ্বরের মন্দিরের সমকক্ষ না হলেও ভাস্কর্য্যের নিদর্শনরূপে মন্দিরটি এগুলির কোনটির থেকেই ন্যূন নয়। প্রবাদ আছে, মহিষাসুরকে বধ করে দেবী মহিষমর্দ্দিনী এই পর্ব্বতের উপর বিশ্রাম করেছিলেন। তাঁরই নামান্তর (চামুণ্ডা) লোকমুখে বিকৃত হয়ে 'চামুণ্ডী'তে (পাহাড়ের এই নামে) পরিণত হয়ে থাকবে।

গোপুরম্ অতিক্রম করে মন্দিরের প্রধান অংশে প্রবেশ করলাম। সারিবদ্ধ কয়েকটি পিতলের দ্বার অতিক্রম করে মন্দিরের অভ্যন্তরে দেবীর অধিষ্ঠানস্থল। সাধারণের সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ। দর্শনার্থীদের নাটমন্দির থেকেই মূর্ত্তি দর্শন করতে হয়। দেবীর পূজার জন্য মহারাজার বৃত্তিভোগী কয়েকজন ব্রাহ্মণ আছেন। মন্দিরটি যেমন রূপৈশ্বর্য্যের শিখরে সমাসীন, তেমনই এই রাজবংশের দেবতার প্রতি অচলা ভক্তিরও নিদর্শন। প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে ও সায়াহ্নে মহারাজা এই মন্দিরে এসে দেবীর প্রতি তাঁর ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন— প্রসন্না মহামায়া যেন সতত তাঁর কল্যাণ ও বিপুল শ্রী-বিধানে নিরতা।

মূর্ত্তি-দর্শনান্তে আমরা মন্দির থেকে বেরিয়ে নীচে নামতে আরম্ভ করলাম। উঠতে যে সময় লেগেছিল তার অর্দ্ধেকেরও কম সময়ে পর্ব্বতের পাদদেশে পৌঁছলাম। সূর্য্যদেব তখন আকাশের মধ্য-পথে।

একটি টাঙ্গাতে করে দু'জনে হোটেলে ফিরে এসে মধ্যাহ্নের আহার সেরে নেওয়া গেল।

সহযাত্রীদের নিকট বিদায়ের পালা ঘনিয়ে এল। সন্ধ্যায় চেদিরাজ ফিরে যাবেন তাঁর জনকজননীর স্নেহময় ক্রোড়ে আর আমারও নিঃসঙ্গ যাত্রা সুরু হবে গৃহাভিমুখে। পথের সাথীর কাছ থেকে আসন্ন বিচ্ছেদের কল্পনায় ঘরে ফেরার ঔৎসুক্যও যেন আমার ম্লান হয়ে গেল। আমার মত একজন ভিন্নদেশবাসী অজ্ঞাত, অপরিচিতকে ক্ষণেকের মধ্যেই যে অন্তরঙ্গ করে ফেলেছেন তাতে এই কানাড়ী তরুণের অন্তরের শুভ্রসমুজ্জ্বল ছবি দেখেই আমার চিত্ত হয়ে উঠেছে বিস্ময়বিহ্বল। নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করে সুদূরাগত এই পান্থের সর্ব্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে তাঁর নিরন্তর যত্নের অবধি ছিল না। সহযাত্রীর অকৃত্রিমতার মধ্যে আমি যেন জন্মান্তরের কোন হারানো সুহৃদের সুমধুর স্পর্শ অনুভব করছিলাম।

বিদায়ের ক্ষণ সমাগত হ'ল। চেদিরাজ ষ্টেশন পর্য্যন্ত আমাকে ট্রেনে তুলে দিতে এলেন। কি বলে যে বিদায়-সম্ভাষণ জানাব সে ভাষা খুঁজে পেলাম না। চেদিরাজের দিকে তাকিয়ে দেখলাম —তাঁর সদাহাস্যময় মুখমণ্ডল বর্ষণোন্মুখ জলদের মত গম্ভীর। পুঞ্জীভূত বেদনা মানস-লোকে উত্তাল তরঙ্গ তুলেছে, বাইরে উভয়েই নির্ব্বাক্—নিস্পন্দ। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে গাড়ীতে উঠলাম। গাড়ী ছেড়ে দিল। বাতায়ন থেকে যতক্ষণ দেখা গেল দেখলাম চেদিরাজের অশ্রুসজল দৃষ্টি—যুক্তকর মস্তকে স্থাপন করে মনে মনে বললাম—

"হে পথের সাথী, হৃদয়ে লভিলে ঠাঁই,
লালন করিব এ স্মৃতি যতনে
যেতে হয়, তাই যাই।"

"রায়বাঘিনী"র কথা

শ্রীঅজিতকুমার ভট্টাচার্য্য
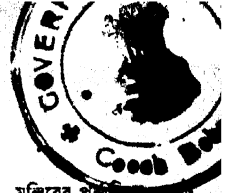
পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে বীরাঙ্গনা রাণী রায়বাঘিনীর বীরত্বগাথা গ্রামে গ্রামে ছড়া ও গল্পের মধ্য দিয়া প্রচারিত হইয়া আছে। পল্লীর অন্তঃপুরিকাদের নিকটও রাণী অপরিচিতা নহেন। মুঘল-সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের একটি বাঙালী রমণীর অতুলনীয় শৌর্য্য ও সাহসের নিদর্শন এখনও হুগলী এবং হাওড়া জেলার একাংশে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। বাল্যকালে এই বীরত্বের কাহিনী আমার মনে স্বপ্নের যে ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছিল, তাহা আজও ভুলিতে পারি

খুঁড়িগাছি গ্রামে কাপালিক-প্রতিষ্ঠিত ডাকাত কালীর মন্দির

নাই। পূর্ব্বতন 'ভুরস্নুট' রাজ্যের শ্রেষ্ঠ পরিচালিকার কীর্ত্তি স্বচক্ষে দেখিবার জন্য কয়েক মাস পূর্ব্বে এক দিন বাহির হইয়া পড়ি। তখন পেঁড়ো, কাঠ-শাঁকড়া, গড়ভবানীপুর, উদয়নারায়ণপুর, খুঁড়িগাছি, দোগাছিয়া, রাজবলহাট, বাগুড়ী, ছাওনাপুর প্রভৃতি গ্রাম পরিদর্শন করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল।

ভুরস্নুট রাজ্যটি হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার অংশ-বিশেষ লইয়া গঠিত ছিল। একটি ব্রাহ্মণ-রাজবংশ পাঁচ শত বৎসর যাবৎ এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহাদের রাজ্য বর্দ্ধমান-রাজ ও নাড়াজোল-রাজ এই দুই ভূস্বামীর অধিকারে আছে। ভুরস্নুট রাজবংশ সদানন্দ মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্রাহ্মণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি জনৈক তান্ত্রিক কাপালিক কর্ত্তৃক ফুলিয়া হইতে আনীত ও প্রতিপালিত চতুরানন নিয়োগীর কন্যা তারা-দেবীকে বিবাহ করেন। হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া থানার অন্তর্গত খুঁড়িগাছি গ্রামে উক্ত কাপালিক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি ডাকাতে কালীর মন্দির আছে। ইহা ছাড়াও কাপালিক নিকটবর্ত্তী দিলাকাশ গ্রামে ভৈরবী-মূর্ত্তিরও পূজা করিতেন। দুইটি মন্দিরই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সংস্কৃত হইয়াছে। খুঁড়িগাছি গ্রামে তৎকালীন কাপালিক-সহচরদের চাড়াল বংশধরগণ এখনও বিদ্যমান এবং কালী-মন্দির তাহাদেরই অধিকারে আছে। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একটি মজা দীঘি অতীতের সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

রাজবলহাটের রাজবল্লভী দেবীর মন্দির

সদানন্দ রাজবলহাট নগর পত্তন করিয়া রাজবল্লভী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটি আধুনিককালে সংস্কৃত হইয়াছে। নিকটেই গুলিটা গ্রামে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভিটায় একটি প্রাচীন দালান বর্ত্তমান। ভিটার উপর কবির স্মৃতিরক্ষার জন্য ১৩৪৫ সনের ২রা বৈশাখ একটি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়; কিন্তু আর কোনও কাজ হয় নাই। রাজবলহাটে কবির স্মৃতিরক্ষাকল্পে প্রতিষ্ঠিত 'হেমচন্দ্র পাঠাগার'টি গ্রন্থ-সম্পদে সমৃদ্ধ। ইহা ব্যতীত, অমূল্যচরণ বিদ্যা-ভূষণ মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে এখানে একটি প্রত্নদ্রব্যশালাও রহিয়াছে।

সদানন্দের পত্নী তারাদেবী রাজবলহাট ও আঁটপুর গ্রামের মধ্য-বর্ত্তী রাণীবাজার গ্রাম প্রতিষ্ঠা করিয়া সিদ্ধেশ্বরী মূর্ত্তি স্থাপন করেন এবং মন্দিরের উভয় পার্শ্বে দুইটি বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করান। সিদ্ধেশ্বরীর মূর্ত্তিটি অষ্টধাতু নির্ম্মিত। মূর্ত্তিটি ছোট, এক হস্ত-পরিমিত। বিগ্রহের চারিটি হস্ত। মন্দিরের অবস্থা শোচনীয়, উপরে একটি বটবৃক্ষ মন্দিরগাত্রে শিকড় চালাইয়া দিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী লোহা-গাছি গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশ বিগ্রহের পূজা করেন। ইঁহারা রাণী রায়বাঘিনীর গুরু হরিদেব ভট্টাচার্য্যের বংশধর বলিয়া পরিচিত।

সদানন্দ ও তারাদেবীর দুইটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ভবানীপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া থানাকুল-কৃষ্ণনগর ও জাঙ্গীপাড়া-কৃষ্ণনগর নামে দুইটি গ্রামের পত্তন করেন। এই বংশের এক রাজা উদয়নারায়ণের নামে হাওড়া জেলার উত্তর প্রান্তে উদয়নারায়ণপুর নামক একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম বর্ত্তমান আছে। সদানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমন্ত পেঁড়োতে রাজধানী স্থাপন করেন। এখানে শ্রীমন্তের বংশধর কবিবর রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র আনুমানিক ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নরেন্দ্রনারায়ণ ও বর্দ্ধমানের মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর মধ্যে বিবাদ বাধিয়া উঠায় তাঁহাদের রাজ্য হস্তচ্যুত হয় এবং ভারতচন্দ্র অন্যত্র যান। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই বংশের শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ রায় কবিবরের উপযুক্ত

রাজবলহাট 'অমূল্য প্রত্নশালা'র কয়েকটি প্রাচীন সংগ্রহ

স্মৃতিরক্ষার জন্য সচেষ্ট আছেন। কথিত আছে, এই বংশের রাজীব-লোচন একটি মুসলমান-তরুণীর প্রেমে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করেন এবং আয়মা-পাহাড়পুর নামে একটি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রামটি মার্টিন কোম্পানীর হাওড়া-চাঁপাডাঙ্গা রেলপথের পিয়াসাড়া ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী এবং মুসলমান-অধ্যুষিত। রাজীবলোচন 'কালাপাহাড়' নাম গ্রহণ করিয়া উড়িষ্যা জয় করিতে যাইবার পথে বহু হিন্দুমন্দির ধ্বংস করেন। কিন্তু ভুরসুট রাজ্যের কোনও মন্দিরে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র দেবনারায়ণ রাজধানীর বহু উন্নতিসাধন করেন। তিনি এক সন্ন্যাসীর প্রেরণায় ১৩০৬ শকের (১৭৮৪ খ্রীঃ) ২১শে শ্রাবণ একটি কারুকার্য্যময় মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া 'মণিনাথ' শিবের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। অপর একটি বিরাট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের শক্ত গাঁথুনি ও নিখুঁত কারুকার্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহা ব্যতীত রাজধানীর সিংহদ্বার, নর্ত্তকীথানা, রাজারঘাট, ফুলপুকুর, জোড়াবাংলো, স্বয়ম্ভুনাথের বটবৃক্ষ-কবলিত বিলীয়মান মন্দির প্রভৃতি অতীতের বহু সাক্ষ্য বহন করিতেছে। তৎকালে পেঁড়ো ও ভবানীপুর উভয় রাজধানীই গড় দ্বারা সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। দেবনারায়ণের পর যথাক্রমে দর্পনারায়ণ, উদয়নারায়ণ, সত্যনারায়ণ, শিবনারায়ণ ও রুদ্রনারায়ণ রাজত্ব করেন। রাণী রায়বাঘিনী উক্ত রুদ্রনারায়ণের দ্বিতীয়া পত্নী ছিলেন।

রাজা রুদ্রনারায়ণের আমলে বাংলাদেশে প্রবলভাবে মুঘল-পাঠান বিরোধ আরম্ভ হয়। রাজা বহু চিন্তার পর মুঘলপক্ষে যোগ দেন; ফলে পাঠানরাজ দায়ুদ খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে যান। রাজা নিজ রাজধানী গড়-ভবানীপুর সুরক্ষিত করিবার জন্য দামোদর ও দ্রোণ নদীবক্ষে

রাণীবাজারের সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দির। বামদিকের অপর একটি ভগ্ন মন্দিরগাত্রে '১৩১০ শকাব্দ ১১৯৫ সন' খোদাই করা আছে

রণতরী সজ্জিত করিলেন। রাজ্যসীমান্তের থানাকুল, ছাওনাপুর, আমতা, উলুবেড়িয়া, তমলুক প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি দুর্গও নির্ম্মাণ করাইলেন। রাজবলহাটের নস্করডাঙ্গায় কিছু সৈন্য রাখা হইল। ইহার ফলে মুঘল-পাঠান যুদ্ধ রাজধানী হইতে দূরে গড়-মান্দারণের ময়দানে সীমাবদ্ধ রহিল। মুঘল-সম্রাটের প্রতিনিধি কুমার জগৎ সিংহের সহিত যোগ দিয়া রাজা রুদ্রনারায়ণ পাঠান-প্রতিনিধি কতলু খাঁকে নিহত করেন। পাঠান-সেনাপতি ওসমান যুদ্ধে পরাজিত হইয়া উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন। কুমার জগৎ সিংহ আহত অবস্থায় বিষ্ণুপুর-রাজের আশ্রয় লইলেন। ভুরসুট-রাজ্যের বীরত্বের কাহিনী দূরদূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িল।

কিন্তু রাজা রুদ্রনারায়ণের মনে সুখ ছিল না। প্রৌঢ় বয়সাবধি প্রথমা পত্নীর গর্ভে কোনও সন্তানাদি না হওয়ায়, তিনি রাজধানী ছাড়িয়া আমতা নিকটবর্ত্তী কাঠশাকড়া গ্রামের শিব-মন্দিরে পূজায় নিরত হলেন। মন্দিরের পার্শ্বে একটি বকুলবৃক্ষ জায়গাটীর শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। দক্ষিণে সুবৃহৎ রায়পুকুর, পূর্ব্বে সিপাইবেড় নামক স্থানে সিপাহীদের আড্ডা। বর্ত্তমানে পুরাতন মন্দিরের পরিবর্ত্তে একটি অপেক্ষাকৃত নূতন মন্দির রহিয়াছে। কাঠশাকড়া গ্রামে

অবস্থানকালে দেবীপুর হইতে রাজগুরু হরিদেব ভট্টাচার্য্যের আহ্বানে তিনি গুরুগৃহে গিয়া দ্বিতীয় বার বিবাহের নির্দ্দেশ পান এবং পেঁড়োর জনৈক ব্রাহ্মণ, দীননাথ চৌধুরীর কন্যা ভবশঙ্করীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া যে অপূর্ব্ব কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা উল্লেখযোগ্য।

দীননাথ চৌধুরী কন্যাকে বাল্যকাল হইতে অস্ত্রবিদ্যা ও অশ্বারোহণ শিক্ষা দেন। ভবশঙ্করী যোগ নদীর তীরবর্ত্তী জঙ্গলে প্রায়ই শিকার করিতে যাইতেন। রাজা রুদ্রনারায়ণ গুরুদেবের নিকট হইতে

গড়-ভবানীপুরের 'মণিনাথ' শিবের মন্দির

দ্বিতীয় বিবাহের নির্দ্দেশ লইয়া নৌকাযোগে ফিরিবার কালে নদী-তীরের জঙ্গলে ভবশঙ্করীকে অমিতবিক্রমে কয়েকটি বন্য মহিষকে বর্শাবিদ্ধ করিতে দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং তাঁহার পরিচয় লইয়া দীননাথ চৌধুরীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করেন। ভবশঙ্করীর প্রতিজ্ঞা ছিল —যে বীরপুরুষ তাঁহাকে অসিযুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিবেন, তিনি তাঁহারই কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করিবেন। রাজগুরু হরিদেব ভট্টাচার্য্য রাজার প্রৌঢ় বয়সের কথা স্মরণ করিয়া দ্বন্দ্ব যুদ্ধের পরিবর্ত্তে অন্য পথ ঠিক করিয়া দিলেন। ঠিক হইল যে, রাজবলহাটের রাজবল্লভী মূর্ত্তির সম্মুখে উভয়ে দুইটি বলি করিবেন। প্রত্যেককে একসঙ্গে দুইটি মহিষ ও একটি মেষ বলি দিতে হইবে। বিরাট জনতা ও উৎসবের মাঝে উভয়ে বলি দিলেন। ভবশঙ্করী রাজার ললাটে রক্ততিলক ও কণ্ঠে রক্তজবার মাল্য দিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। বীর রাজার সহিত বীরাঙ্গনার মিলন হইল।

রাণী রাজ্যের শাসনকার্য্যে রাজার সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন। প্রথমেই তিনি সৈন্যাবাসগুলির সংস্কার করাইলেন। বিশেষ ভাবে বর্দ্ধমান রাজ্যসীমান্তের নিকটবর্ত্তী ছাওনাপুর দুর্গের ভিত্তি সুদৃঢ় করিলেন। রাণীর অধস্তন কয়েক পুরুষ পরে বর্দ্ধমানরাজ কীর্ত্তিচন্দ্র

ছাওনাপুর দুর্গের ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া প্রাপ্ত পাথরের খিলান

এই ছাওনাপুর দুর্গ বিধ্বস্ত করিয়া ভুরশুট রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করিয়া লন। ছাওনাপুর গ্রামের উত্তর-প্রান্তে একটি উচ্চ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান। প্রায় বার-তের বৎসর পূর্ব্বে উক্ত স্থানের তৎকালীন মালিক হাওয়াখানা গ্রামের হীরালাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় ধ্বংসস্তূপ খনন করিয়া প্রচুর ইট পান। সেই সময় মৃত্তিকার
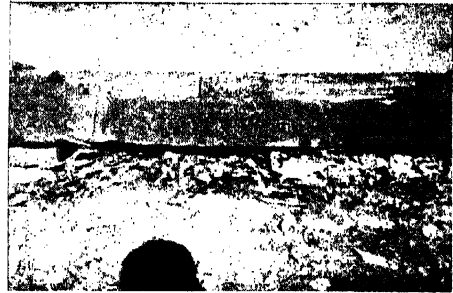
খিলানগাত্রে প্রাচীন বাংলালিপির প্রতিলিপি

অভ্যন্তর হইতে ছেনির কাজ-করা একটি পাথরের খিলান বাহির হয়। খিলানটি ছয় ফুট দীর্ঘ। উহার গাত্রে প্রাচীন বাংলা লিপিতে কিছু লেখা আছে। খিলানটি এখনও সেখানে রহিয়াছে। রাণী অতঃপর ছাওনাপুরের পার্শ্ববর্ত্তী বাগুড়ী গ্রামের ভবানী মন্দির ও ন'পাড়া গ্রামের দরাই-মনসার মন্দির সংস্কার করেন। রাজবলহাট ও আঁটপুরের তাঁতশিল্প এবং অন্যান্য কুটিরশিল্পের দিকে তিনি দৃষ্টি দেন এবং কৃষির উন্নতির জন্যও বহু চেষ্টা করেন।

বিবাহের দুই বৎসর পরে রাজপরিবারে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করায় আনন্দের সীমা রহিল না। রাজগুরু স্বয়ং রাজ-পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষার ভার গ্রহণ করেন। কয়েক বৎসর পরে রুদ্র-নারায়ণের মৃত্যু হইলে নাবালক পুত্র প্রতাপনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। রাণী স্বামীর সহমৃতা হইবার সঙ্কল্প করিলেও

গুরুদেবের আক্রমণে নিবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু রাজধানী ত্যাগ করিয়া স্বামীর মতই পূর্ব্বোক্ত কাঠশাঁকড়া মন্দিরে কয়েকজন সহচরী

কাঠশাঁকড়া গ্রামের শিবমন্দির। বামদিকে বকুলগাছের শাখা দেখা যাইতেছে

সহ বসবাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই নাবালকের রাজত্বে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল। সেনাপতি চতুর্ভুজ চক্রবর্ত্তীর মনে রাজা হইবার দুরভিসন্ধি জাগিল। তিনি পরাজিত পাঠান-সেনাপতি ওসমানের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। চতুর্ভুজের পরামর্শে ওসমান পূজানিরতা রাণীকে অতর্কিতে অপহরণের ব্যবস্থা করিলেন। রাজগুরু হরিদেব ভট্টাচার্য্য গুপ্তচর মারফত আমতা বাজারে কয়েকজন ছদ্মবেশী বিদেশীর উপস্থিতির সংবাদ পাইয়া রাণীকে সতর্ক করিয়া দেন। ফলে রাণীকে অপহরণ

বাগুড়ী গ্রামের আধুনিক কালের ভবানী মন্দির

করিতে আসিয়া তাঁহার বীরসহচরীদের অস্ত্রে নিহত অনুচরদের হারাইয়া ওসমান পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করেন। অতঃপর

ছাওনাপুর দুর্গের জঙ্গল-পরিবৃত ধ্বংসাবশেষের উপর দণ্ডায়মান লেখক

গুরুদেবের আদেশে রাণী বৈরাগ্য ত্যাগ করিয়া নাবালক-পুত্রের অভিভাবিকা রূপে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তিনি অতঃপর রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিবার কার্য্যে মনোনিবেশ করেন।
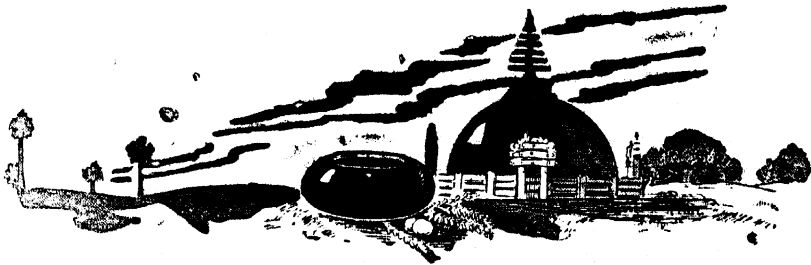
শিক্ষার মান

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

সম্প্রতি ইংলণ্ড ও ইউরোপ যাবার সুযোগ ঘটেছিল। লণ্ডনে থাকার সময় ওদেশে ভারতীয় ছাত্রদের কি লেখাপড়ার সুবিধা আছে সে সম্বন্ধে খোঁজখবর নেবার আগ্রহ তো স্বতঃই ছিল। তা ছাড়া আমার উপর ভার ছিল বিশেষ করে একটি ছাত্রের ভবিষ্যৎ লেখাপড়ার কি সুযোগ হতে পারে সে সম্বন্ধে খোঁজ করার। ছাত্রটি খুব অল্পবয়স্ক, এবার কলিকাতায় ম্যাট্রিক দেবে। মোটামুটি ছাত্র ভাল, অঙ্কে ও বিজ্ঞানে আগ্রহশীল। তাঁর বাবা ভাবছেন, বি-এসসি পাস না করে শুধু ম্যাট্রিক পাস করে ওদেশে পাঠিয়ে দিয়ে আণ্ডার-গ্রাজুয়েট কোর্স হতে ওখানে পড়ালে কেমন হয়। তাতে আরও ভাল ফল হয় কি না। সেই খোঁজখবর নিতে গিয়ে ওখানকার ম্যাট্রিকুলেশন—যার বর্তমান নাম জেনারেল সার্টিফিকেট পরীক্ষা ও আনুষঙ্গিক খোঁজখবর নিতে হ'ল। তাতে জানলাম এখন জেনারেল সার্টিফিকেট পরীক্ষা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কাউন্সিলের হাতে। কিন্তু এবার ওর জন্য একটি আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিল হবে এবং তাতে লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ছাড়াও অক্সফোর্ড প্রভৃতি অন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরাও আসবেন। কিন্তু সে কথা যাক্। যে জিনিষটি আমার মনে রেখাপাত করেছিল এবং যে কথাটা বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সেটা হ'ল ঐ পরীক্ষার মান। তার খবর শিক্ষাবিদেরা হয় ত সকলেই জানেন, কিন্তু তাঁরা ছাড়াও আমাদের দেশের সকলেরই তা জানার দরকার আছে। কারণ তা হতে স্পষ্ট বোঝা যায়, অন্য ক্ষেত্রে যদি বা সর্ব্বনিম্ন মান চলতে পারে (তাও চলে না, অন্ততঃ চলা উচিত নয়), শিক্ষার ক্ষেত্রে তা একেবারে অচল।

জেনারেল সার্টিফিকেট পরীক্ষার তিনটি স্তর আছে—সাধারণ স্তর বা Ordinary level, উঁচু স্তর বা Advanced level এবং স্কলারশিপ স্তর বা Scholarship level। যারা এদেশের সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষায় সম্মান বা credits পেয়ে উত্তীর্ণ হয় তারা ঐ পরীক্ষার সাধারণ স্তরে পাস করেছে বলে গণ্য হয়। এদেশে সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষার পর উচ্চ-বিদ্যালয় সার্টিফিকেট (Higher School Certificate) Overseas বলে আরও একটি পরীক্ষা হয়—তার প্রধান বিষয়গুলিতে যারা পাস করে তারা ওখানকার advanced level-এ পাস করেছে বলে গণ্য হয়। এখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব নিয়মকানুন আছে তাতে ঐ Certificate এখানে ম্যাট্রিক পাস ছেলেদের কলেজের থার্ড ইয়ারে গিয়ে পড়ে। অর্থাৎ, ওখানকার উঁচু স্তরে পাস আমাদের থার্ড ইয়ারের তুল্য হয়ে দাঁড়ায়।

এখন জেনারেল সার্টিফিকেট পরীক্ষার পাঠ্য তালিকার কিছু কিছু নমুনা দিচ্ছি। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বিষয়ের ১৯৫৪ সালের রেগুলেশন থেকে উদ্ধৃত করছি। যেমন অর্থশাস্ত্র। Ordinary level-এর বিষয়বস্তু হ'ল এই :

A description of the main feature of present-day economic structure and activity of the United Kingdom, in conjunction with the elements only of the theory of demand and supply.

Population : Size, Sex and age-distribution. Geographical and occupational distribution.

The location of some major industries and the reasons determining it.

The division of labour and the advantages of international trade. Imports and exports; their character and geographical distribution.

Production for the market. How price changes affect demand and supply.

Large and small firms. Private and public enterprise. Specialisation among firms. The stages in the flow of goods and services to the final consumer.

The different forms of money. The functions of a bank. The Bank of England. The Stock Exchange.

The main kinds of taxes: and the main objects of public expenditure.

এর পর হ'ল উঁচু স্তর তার পাঠ্য তালিকা তুলে দিচ্ছি। তিন ঘণ্টার প্রশ্নপত্র, এরকম দুটি প্রশ্নপত্র :

The Economic Structure of the United Kingdom

Population : Size, Sex and age-distribution. Geographical and occupational distribution.

Industrial Structure: relative size of main industries, their location and organisation including agriculture, coal, steel, textiles.

The Labour Market: trade unions and collective bargaining.

International Trade: visible and invisible imports and exports.

National Income and Output: meaning, composition and distribution.

Public Finance: the main sources of revenue and types of expenditure.

Financial Organisation: the commercial banks. The Bank of England. The capital market.

Some Elements of Economic Analysis

Division of Labour. The Factors determining average income per head. Causes of Location of Industry. Advantages of International trade.

An outline of the functions and the price-mechanism; supply and demand in relation to the allocation of resources.

Causes and effects of changes in demand for and supply of goods and factors. Elasticities of demand and supply. The effects of maximum and minimum prices. The incidence of direct and indirect taxes. Causes and effects of monopoly.

এর উপর আর একটি প্রবন্ধ নিয়ে হ'ল Scholarship level.

অঙ্কের পাঠ্য তালিকার কিছু কিছু নমুনা দিচ্ছি। Pure mathematics-এর advanced level-এ বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে "The theory of quadratic function and of quadratic equations, permutations and combinations, including simple applications to probability, the geometry of similar figures, similitude, plane trigonometry" ইত্যাদি পড়ান হয়। Applied Mathematics-এর মধ্যে "Newton's law of motion kinetic energy and work. balancing of forces, Torques, relative velocity and accelaration, elementary ideas of statistics, frequency diagram" ইত্যাদি পড়ান হয়।

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। যাঁরা বিস্তারিত জানতে চান তাঁরা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাঠ্য তালিকা আনিয়ে দেখতে পারেন। শোনা গেল, সাম্প্রতিক যেসব বদল কাউন্সিলে হচ্ছে তাতে নাকি পরীক্ষার মান আরও বাড়বে।

২

এই সব দেখে শুনে আমার একটি কথা মনে হ'ল। আমাদের দেশে, বিশেষতঃ বাংলায়, আমরা নানাবিধ শিক্ষা-সংস্কার করে চলেছি বটে, কিন্তু শিক্ষার মান বাড়ছে বলে মনে হয় না। বরং সাহস করে বললে বলা যায়, শিক্ষার মানের যথেষ্ট অবনতিই ঘটছে। কয়েক বছর আগে আমি একবার বি-সি-এস পরীক্ষার অর্থশাস্ত্র বিষয়ের পরীক্ষক ছিলাম। আন্দাজ একশ' পঁচিশখানি খাতা ছিল। তার মধ্যে আট-দশখানি খাতা ছাড়া বাকী সবগুলিতেই বিষয়-বস্তুর ভুলের চেয়ে ইংরেজীর ভুল, বিশেষতঃ ইংরেজী ব্যাকরণের ভুল, দেখতে দেখতেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতে হয়েছিল। সাধারণতঃ কৈফিয়ত দেওয়া হয়ে থাকে, ইংরেজী তো আমাদের মাতৃভাষা নয়। ঠিক কথা, কিন্তু তা হলে ইংরেজী শিখি কেন? তাতে পরীক্ষা দেবার বিধিই বা আছে কেন? ইংরেজী চলবে, অথচ তা ভাল করে শিখব না, এ কেমন ধারা কথা? আর তা ছাড়া এ পরীক্ষা ত ম্যাট্রিক পরীক্ষা নয়—বি-এ পাসের পর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা—ভালভাবে পাস করলেই এর ছাত্রেরা ডেপুটি হয়ে রাজ্যচালনার কর্ণধার হয়ে বসবেন। এঁদের বেলায় শ্রেষ্ঠ মান আশা করব না তো কার বেলায় করব? কিন্তু এই পরীক্ষারই এই অবস্থা। ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুল ফাইনালের তো কথাই নেই। ইংরেজীর কথা ছেড়েই দিলাম—কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় প্রত্যেক বিষয়েই ছেলেরা যেরকম কাঁচা থাকে তাতে ফেল করার সংখ্যা তো বাড়েই, এমন কি যারা পাস করে তারাও পরবর্ত্তী পাঠ্যগুলির জন্য তৈরি হতে অনেক সময় নেয়। কলেজের কাজ সেইজন্য ব্যাহত হয়। গোড়া কাঁচা হলে তা শোধরানো বড়ই কঠিন। তা ছাড়া আমরা বহুকাল থেকেই শতকরা ত্রিশ নম্বর পেলেই পাসের ধুয়ো চালিয়ে আসছি। আমি শতকরা ত্রিশ পেয়ে পাস করেছি—আবার আমার প্রদত্ত বিদ্যার শতকরা ত্রিশ পেয়ে আমার ছাত্রেরা পাস করল—এইভাবে দুধে ক্রমাগত জল ঢালতে থাকলে দুধের আর কোনও চিহ্ন থাকবে কি? আবার এর উপরেও শোভাযাত্রা, হরতাল, ভীতিপ্রদর্শন করে আরও কম নম্বরে পাস হবার চেষ্টা আছে। ছাত্রেরা আমাদের দেশে নানা অসুবিধার মধ্যে পড়াশোনা করে, তাদের বহু অসুবিধা ও অভাব আছে এ কথা সত্য। তার মধ্যে তারা সব সময়েই অন্য কোনদিকে মন না দিয়ে শুধু লেখাপড়াই করে যাবে তা হয়ত আজ আমাদের সমাজে ঘটে উঠছে না। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও সত্য যে জগতে জীবনের যুদ্ধে লড়বার জন্য আমরা যদি ভাল সৈনিক না গড়তে পারি তা হলে আজকের ছাত্রেরা যে অসুবিধা ভোগ করছে জীবনে, তাদের ছেলেরা তাদের ছাত্রাবস্থায় আরও ঢের বেশী দুরবস্থায় পড়বে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আজকের দিনের বাপেরা তাঁদের ছেলেদের তবু বা যেটুকু সামাজিক ও আর্থিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যে রাখতে পেরেছেন আজকের দিনের ছেলেরা যদি ততটুকুও গড়ে না ওঠে তা হলে তারা নিজেদেরও জীবন-সংগ্রামের জন্য তেমন করে গড়তে পারবে না, তাদের ছেলেদেরও ততটুকু সুখস্বাচ্ছন্দ্যও দিতে পারবে না। জাতি গড়বে কি করে? অর্থ নৈতিক উন্নতি হবে কি করে? একজন জবাহরলাল নেহরু থাকলেই তো আর মন্ত্রবলে সারা দেশটা পাল্টে যাবে না। তা হলে উপায় কি?

৩

উপায় সম্বন্ধে আমার দুটি বক্তব্য আছে। অনেক লোক আছেন যাঁরা মনে করেন শিক্ষাতেই শিক্ষার শেষ এই কথার অর্থ হ'ল চলতি জীবনের সমস্ত ছোঁয়াচ এড়িয়ে কেবল একমনে বইপড়া ও পরীক্ষায় ভাল ফল করা। আমি সে

মতে সায় দিতে পারিনে। যাঁরা শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিত বা গবেষক হবেন তাঁদের বেলায় হয়ত একথা খাটে। কিন্তু সাধারণ লোকের বেলায় শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল জীবিকার সংস্থান ও তার সঙ্গে মানুষ ও জাত গড়ে তোলা। অথবা মানুষ ও জাত গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার সংস্থান। বস্তুতঃ ও দুটি এপিঠ ওপিঠ। এর সফলতা শুধু শিক্ষাবিদের উপর নির্ভর করে না। সামাজিক কাঠামো ও ব্যবস্থার কথাও ভাবতে হবে। ধরুন, এখনকার স্কুলের বদলে আমরা সর্ব্বত্র হাতে-হেতেরে শিক্ষা দিতে লাগলাম। দেশময় লক্ষ লক্ষ মিস্ত্রি ফিটার তৈরি হ'ল। কিন্তু তারা কাজ পাবে কি? এইখানেই সমাজের কথা এসে পড়ে। সুতরাং সমাজের ব্যবস্থার কথা না ভেবে শুধু শিক্ষার কথা ভাবা চলে না।

কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও সত্য যে, শুধু সমাজসংস্কার করেই শিক্ষাসংস্কার হবে না। শিক্ষার সংস্কারের কথাও আলাদা ভাবতে হবে। বর্ত্তমানে কি কি দিকে বদল হওয়া দরকার সে সম্বন্ধে শিক্ষাব্রতীরা ভাবুন। বারান্তরে এ প্রসঙ্গ আলোচনার ইচ্ছে রইল। কিন্তু যে কথাটা সকলের আগে ভাবতে হবে সেটা হ'ল এই যে, জগতের বিভিন্ন জাত কেবলই মান উঁচু করে চলবে, উৎকর্ষের পর আরও উৎকর্ষের অবিরাম চেষ্টা প্রাণপণ করে চলবে, আর আমরা কেবল দুধে জল ঢালতে থাকব—তা হলে আমরা দাঁড়াব কি করে?

আলুর চাষ

শ্রীদীপ্তি পাল

অনেক সময় দেখা যায়, রীতিমত যত্ন করেও গাছপালার ঠিক উন্নতি যেন হচ্ছে না—হয় গাছের ঠিকমত বাড় নাই; নয়ত পাতার রঙ গেছে পাল্‌টে, অথবা গাছের ফল হ'ল ছোট—কষ্ট করে বাগান করাই সার, ভোগে লাগে না কিছু। নানা কারণে এই সব হতে পারে—পোকামাকড়, জলের অভাব, বেশী বা কম রোদ, মাটির দোষ ইত্যাদি। এদের মধ্যে পোকামাকড়ের শত্রুতা সহজেই ধরা যায়—জল বা সূর্য্যের ক্রিয়াকলাপও বোঝা কঠিন নয়। যা বোঝা কঠিন, অথচ যার উপর আমাদের শাকসব্জীর ভালমন্দ বার আনাই নির্ভর করে সেই মাটির কথাই ভেবে দেখা যাক।

খুব খরচ করে সরকারী গুদাম থেকে আলুবীজ কিনে আপনি আলু লাগিয়েছেন। মালীকে খাটিয়ে জমি ঠিক করলেন—নিজেও খাটাখাটনি করে জলটল ঢালছেন। কিন্তু গাছের যেন বাড় নাই—খাড়া একটি ডাঁটা সবেধন নীলমণি হয়ে বসে আছে—ডালপালা মেলবার কোন উদ্যোগই দেখা যায় না; নয়ত পাতাগুলি কেমন যেন শুকিয়ে গুটিয়ে যাবার যোগাড় হয়েছে। কিংবা গাছটা হয়ত বেশ ভালই হয়েছিল—হঠাৎ কি রকম শুকিয়ে যাচ্ছে। আর এ সব কিছুই যদি না হয় ত গাছের বেশ বাড়বাড়ন্ত হয়েছে—মনে মনে আপনি বেজায় খুশী। যেদিন ঝুড়িঝোড়া, বস্তা ইত্যাদি নিয়ে আলু তুলতে এলেন সেদিন—সেদিনের কথা আর না বলাই ভাল। বস্তাগুলি যেমন এসেছিল তেমনই ফিরে গেল—দুই-একটা মাত্র ঝুড়ি ভর্ত্তি হয়েছে। আলুর কি 'সাইজ', মরি মরি! মালী প্রচণ্ড বকুনি খেল—কপাল নেহাত মন্দ বলে বেচারির চাকরিটাও বোধ হয় গেল। আর সেই দিনই আপনি প্রতিজ্ঞা করলেন—আর আলুর চাষ নয়; ঢের হয়েছে আলু কিনেই খাব।

এই আশাভঙ্গের বেদনা দুই এক বার আমাদের সকলকেই পেতে হয়। যাঁরা অধৈর্য্য তাঁরা 'দুত্তোর' বলে আলুর পাট তুলে দিয়ে সেখানে বাড়ী করার প্ল্যান করেন, আর যাঁরা দরদী চাষী তাঁরা নূতন উদ্যমে আবার আরম্ভ করেন। এই হতাশার হাত থেকে বাঁচতে গেলে সকলের আগে আমাদের জানা দরকার যে আলুগাছের কি কি জিনিস প্রয়োজন—অর্থাৎ জমি থেকে সে কোন জিনিস টেনে নিতে চায়। প্রধানতঃ তার দরকার নাইট্রোজেন, ফস-ফরাস, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও পটাসিয়াম।

আলুগাছের পক্ষে নাইট্রোজেন বিশেষ প্রয়োজন—ভাল বীজ-আলুর মধ্যে নাইট্রোজেন প্রচুর থাকে; আবার গাছের পাতায় এর রূপান্তর দেখা যায় ক্লোরোফিল রূপে। নাইট্রোজেনের এমন একটা গুণ আছে যে তা গাছের নূতন সতেজ অংশে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করে দিতে পারে। এই জন্যই এর অভাবে গাছ একেবারেই বাড়তে পারে না।

অভাব খুব বেশী হলে গাছের লিকলিকে একটা ডাঁটা হয়—ডালপালা প্রায় থাকেই না। লতার রঙ হয় ফিকে সবুজ আর পুরনো পাতা প্রায়ই হলদে হয়ে যায়। প্রায় সব জাতীয় জমিতেই অল্পাধিক নাইট্রোজেনের অভাব ঘটতে পারে। বেলে জমিতে আলু হয় ভাল, কিন্তু এই জমিতেই নাইট্রোজেনের অভাব হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। এই অভাব ঘুচাবার জন্যে আলু লাগাবার আগে বর্ষার মুখে জমিতে ধঞ্চে চাষ করা ভাল।

এই হিসাবে ফসফরাসের প্রয়োজনীয়তা নাইট্রোজেনের চেয়েও বেশী; কারণ বীজ-আলুতে এর যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন নাইট্রোজেন হজমের কাজে। ফসফরাসের অভাবে নাইট্রোজেনের কার্য্যকারিতা কমে যায় বলেই বোধ হয় দুয়েরই অভাব গাছে একরূপেই দেখা যায়। কেবল ফসফরাসের অভাবে আলুলতার ধারগুলিও বিবর্ণ হয়ে গুটিয়ে আসে।

গাছপালায় ক্যালসিয়াম প্রধানতঃ থাকে পাতায়। ক্যালসিয়ামের অভাবে গাছের মধ্যে যে জৈব পদার্থ ও খনিজ লবণ থাকে তা সহজেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে—এর ফলে গাছের সমূহ ক্ষতি হয়। সাধারণতঃ ক্যালসিয়ামের অভাব আলুগাছের কচিপাতাগুলিতেই প্রথম দেখা যায়। পাতাগুলি আকারে খুব ছোট হয়। এর পর পাতার মাঝের শিরবরাবর সেগুলি কুঁকড়ে যায়। গাছের নীচে শিকড়ে আর আলুর উপর এর প্রভাব হয় অপরিসীম। ক্যালসিয়ামের অভাব খুব বেশী হলে আলু একেবারেই না হতে পারে অথবা দেখা যায় খুব ছোট ছোট টিকটিকির ডিমের মত আলু হয়েছে; কিন্তু সেগুলি রেঁধে খাওয়ার অযোগ্য। এর কোন স্বাদ হয় না।

ম্যাগনেসিয়ামের অভাব গাছের পাতায় সর্ব্বাগ্রে দেখা যায়। কারণ ক্লোরোফিল বলে যে পদার্থটির জন্যে গাছের পাতা সবুজ হয় ম্যাগ্নেসিয়ামকে তার প্রস্তুতকারক বলা চলে। এই জন্যই ম্যাগ্নেসিয়ামের অভাব হলেই গাছের পাতায় হলুদ রং দেখা যায়—এই বিবর্ণতা কখনও সারা পাতায়ই হয় আর শেষ পর্য্যন্ত শুকিয়ে ঝরে পড়ে। কখনও পাতার ধারগুলি সুন্দর সবুজ থাকলেও মধ্যে হয় হলুদ রং, কখনও বা পাতার উপর বরাবর বিবর্ণতা ছড়িয়ে পড়ে। গাছের এই অবস্থাকে ইংরেজিতে বলা হয় "ক্লোরোটিক"। ম্যাগ্নেসিয়ামের সঙ্গে ক্যালসিয়ামের একটা মূলগত পার্থক্য এই যে, ম্যাগ্নেসিয়াম সহজেই উদ্ভিদ-দেহে চলাচল করতে পারে; ক্যালসিয়াম কিন্তু পারে না। এই জন্যেই অভাব হলে গাছের কচি ডাঁটা ও পাতা সবটুকু ম্যাগ্নেসিয়াম টেনে নেয়। ফলে প্রথম অভাবের চিহ্ন ফুটে ওঠে পুরনো পাতায়; ক্যালসিয়ামের অভাবে গাছের কচি পাতা ও ডাঁটা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নাইট্রোজেন ইত্যাদির মত পটাসিয়ামের প্রকৃতি ও ক্রিয়া বোঝা সহজ নয়। তবে পটাসিয়াম সম্বন্ধে এইটুকু সবাই স্বীকার করেছেন যে, উদ্ভিদ-দেহের কোন একটি স্থানে এটা অচল হয়ে বসে থাকে না। এর অভাব অত্যধিক হলে চারা গাছটিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এমন কি মরেও যেতে পারে। সাধারণতঃ বেলে মাটিতে পটাসিয়ামের অভাব হয় বেশী। এঁটেল মাটিতে কদাচিৎ এই অভাব দেখা যায়। এর অভাব বেশী হলে আলুগাছ বাড়তে পারে না, পাতার রং উজ্জ্বল সবুজের পরিবর্ত্তে হয় নীলচে ফিকে সবুজ। পাতার ধার ও ডগা ক্রমশঃ লালচে হয়ে যায় আর তারই সঙ্গে দেখা যায় ছোট ছোট রঙীন দাগ। পাতার উপরটা লালচে হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি কুঁকড়ে যায়—তারপর পাতা ঝরা আরম্ভ হয়। অনেক সময় গাছের ডালগুলিও শুকিয়ে যায়। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় গাছের আলু সংখ্যায় বা আকারে উল্লেখযোগ্য হয় না।

উপরে রুগ্ন আলুগাছের বিভিন্ন অবস্থার যে বর্ণনা দেওয়া হ'ল তার থেকে আলুর জমিতে কি কি জিনিসের ঘাটতি আছে তা সহজেই বোঝা যায়। জমির রোগনির্ণয় করতে পারলে তার চিকিৎসা কিছু কঠিন হয় না। এইভাবে রোগ বুঝে ওষুধ প্রয়োগ করতে পারলে আলুর ক্ষেতে সুফল ফলার আশা করা যেতে পারে।

রাখীবন্ধন ও কাজরী গান

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

উত্তর ও মধ্য ভারত অঞ্চলের একটি বিশেষ উৎসব রাখীবন্ধন। এ উৎসব শ্রাবণের শেষ পূর্ণিমা তিথিতে হয়, অনুষ্ঠানটি ভাই-বোনকে নিয়ে। বোন ভাইয়ের হাতে রাখী বেঁধে দিয়ে মঙ্গলকামনা করে, ভাই বোনকে যথাশক্তি উপহার দেয়। এ উৎসব সমস্ত জনসাধারণের, এতে ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ নেই, সবাই এ উৎসব বিশেষ আনন্দের সহিত পালন করে।

রাখীবন্ধনের পবিত্র দিনে বোন স্নান করে সেজে গুজে চলে ভাইয়ের হাতে রাখী বাঁধতে। একখানা থালাতে সাজিয়ে নেয় রকমারি মিষ্টি আর নারকেল, তার পর ভাইয়ের হাতে বেঁধে দেয় সুদৃশ্য রাখী। কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে মঙ্গলকামনা করে ভগবানের কাছে, "ভাই আমার সুখী হোক, বেঁচে থাক।" ভাইও শক্তি অনুযায়ী অর্থ বা বস্ত্রালঙ্কার দিয়ে বোনকে আশীর্ব্বাদ করে—বোন চিরসুখী হোক। বৎসরে এক দিন ভাই-বোনের এই প্রাণের যোগাযোগ বড় মধুর। বছরের পর বছর ভাই-বোনের এই গভীর স্নেহসম্বন্ধ রক্ষা হচ্ছে রাখীবন্ধনের ভিতর দিয়ে।

এক পরিবার অন্য পরিবারের সহিত সম্পর্ক পাতাতে ইচ্ছুক হলে, এক পরিবারের কন্যা অন্য পরিবারের ছেলের হাতে বেঁধে দেয় রাখী। আর সেই রাখীবাঁধা ছেলেটি ধর্ম্মবোনের সম্বন্ধ আজীবন মেনে নেয়। দুই পরিবারে হয় গভীর সম্প্রীতি, আপদে-বিপদে একে অন্যের সহায় হয়।

সারা শ্রাবণ মাস পল্লী কাজরী গানে মুখরিত থাকে। রাখীপূর্ণিমা হ'ল শেষ ঝুলন-রাত। তাই মাঝরাত অবধি রাখীপূর্ণিমার কাজরী গান চলতে থাকে পাড়ায় পাড়ায়। মেয়েরা গাইতে থাকে :

"চান্দা"

সাতো ভাইয়া বিদেশ গয়ে, ঐ লায়ে সুরযহারওয়ানা,
ছটায়ে মাস বাদে লোটে ভাইয়া
ভিতরমে বাট, কি রাম রসুইয়া
বহিন পহের না সুরযহারওয়া, ।
পহেরী ওর ঠারি এহি বহিন,
উনকে সাত ভাইয়া কথৈ ওমরিয়া।
হামারী পিছোয়ারে পণ্ডিত ভাইয়া মিতোয়া,
ভাইয়া চান্দাকো গওনা বিচারওনা।
আজ একাদশী, কাল দোয়াদশী
তেরশকা বানা গওয়ানা।
পহেরী ওড়ি চান্দা গয়ী শশুরালী
উনকে স্বামী মাংগে লোটা পাণি।

"হাতকা লোটা রাণিয়া ভুঁইয়া ধর দে
কাঁহা পায় সুরযহারওয়ানা ?"
"সাত মোর ভাইয়া গয়ে বিদেশ না
স্বামী, ওহি লায়ে সুরযহারোয়ানা"
"কহনা শুনা এক না মানা
রাণিয়া, তুমসে কিরিয়া হাম লেবোনা"
"মোরে পিছাওরে নওয়া ভাইয়া মিতোয়া
ভাইয়া মোরে বিরণকা খবর জানাওনা।
বঢ়াই ভাইয়া মিতোয়া
ধরমকে লাকুড়ী চির দেও না।
মোর পিছাওয়া লোহার ভাইয়া মিতয়ানা
ভাইয়া, ধরম কড়াইয়া গঢ়ি দেও না।
মোর পিছাওয়া তেলিয়া ভাইয়া মিতোয়া
ধরম খানি পের দেও না"।
এক ওর ঠাহে মোরে শশুরকে লোঁগওয়া,
এক ওর সাত মোরে ভাইয়ানা
"জিতী হোঁ তো মোরি বাহিনী, ভোলি কান্দাওবে না
হারি হোঁ তো গাঢ়োয়া খোদাওবে না।"
জলে লাগি লাকড়ী, খক্‌খক্‌নে লাগে তেল
মোর বহিনকে লেথে জুড় পানিইয়া।
মুঁহমে রুমালিয়া দৈকে রোয়ে শশুরকে লোগ,
রাম জিতি তিরিয়া, নাইহর যেহইনা।
হাত মে রুমাল লৈকে হাসে নাতো ভাইয়ানা,
বহিনে ভাল পথ রাখে ও হামারী।

সাত ভাই বিদেশ থেকে ছ'মাস পরে ফিরে এসেছে, বোনের জন্য নিয়ে এসেছে সূর্য্যহার। ডাকছে—"বোন চান্দা তুমি কোথায়, ভিতরে কি রান্নাঘরে ?"

বোন ছুটে এল, ভাইদের দেওয়া সূর্য্যহার গলায় দিয়ে বাইরে দাঁড়াল। ভায়েরা দেখলে, ছোট বোনটি বেশ বড় হয়ে গেছে। পাশের বাড়ীর বন্ধুপণ্ডিতকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, বোন চান্দা কবে শ্বশুরবাড়ী যাবে ?

পণ্ডিত এসে বললে, "আজ একাদশী, কাল দ্বাদশী, ত্রয়োদশীর দিন বোন চান্দাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাও।"

হার গলায় দিয়ে সাড়ী কাপড়ে সেজে চান্দা শ্বশুরবাড়ী গেল। চান্দার স্বামী এক ঘটি জল চাইলে চান্দা যখন জলের ঘটি নিয়ে এল, স্বামী স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললে, "রাণী, হাতের ঘটি মাটিতে রাখ, আগে বল, তুমি গলায় এই হার কোথায় পেলে ?"

চান্দা উত্তর করলে, "স্বামী, সাত ভাই বিদেশ থেকে এসেছে, আমার জন্য নিয়ে এসেছে এই সুরবহার।"

স্বামী বললে, "আমি তোমার কথা শুনব না রাণী, তোমার কিরা শপথও মানব না।"

চান্দা তখন উপায় না দেখে পড়শী নাপিত-ভাইকে ডেকে পাঠালে, বললে, "ভাইয়া, তুমি আমার ভায়েদের শীগগির খবর পাঠাও।"

চান্দা পড়শী ছুতোর-ভাইকে ডেকে পাঠালে, বললে, "ছুতোর ভাই, আমাকে ধর্ম্মের লাকড়ী চিরে দাও।" পড়শী লোহারকে ডেকে বললে, "লোহার ভাই, তুমি আমাকে ধর্ম্মের কড়াই বানিয়ে দাও।" পড়শী তেলী-ভাইকে ডেকে বললে, "ও ভাই তেলি, আমাকে ধর্ম্মের তেল এনে দাও।"

এভাবে চান্দা সব প্রতিবেশীর কাছ থেকে লাকড়ি, কড়াই, তেল সংগ্রহ করলে, এবার তার কঠিন ধর্ম্মপরীক্ষা হবে। এক দিকে শ্বশুরবাড়ীর লোক সারি দিয়ে দাঁড়াল, অন্য দিকে চান্দার সাত ভাই, মধ্যভাগে পরিক্ষার্থিনী চান্দা।

ভায়েরা বললে, "বোন্, তুমি যদি ধর্ম্মের পরীক্ষায় জয়ী হও, তবে পাল্কী সাজিয়ে তোমাকে নিয়ে যাব, যদি হেরে যাও তবে মাটির নীচে পুঁতে ফেলব।"

লাকড়ী দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল, তেল টগবগ করে ফুটতে লাগল, ভায়েরা বললে, "বোনের জন্য এ ফুটন্ত তেল শীতল 'পানি' হয়ে যাক।"

মুখে রুমাল রেখে শ্বশুরবাড়ীর লোক অপমানে অশ্রু বিসর্জ্জন করতে লাগল। পরীক্ষায় জয়ী হয়ে স্ত্রী সগৌরবে বাপের বাড়ী চলে যাচ্ছে। সাত ভাই রুমাল হাতে নিয়ে হাসতে লাগল, "বোন আমাদের মান রেখেছে।"

গ্রাম্য নারীরা বিশেষ আনন্দের সহিত সাত ভাইয়ের বোন চান্দার গান দোলনায় দুলতে দুলতে গাইতে থাকে। এই গানটিতে আমরা বোনের প্রতি ভায়েদের গভীর স্নেহ দেখতে পাই। এটি দেহাতী গ্রাম্য-সঙ্গীত, কিন্তু এই সব গ্রাম্য-সঙ্গীত একেবারে অর্থহীন নয়। এই সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে গ্রাম্য-সমাজের চিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। বেশী দিনের কথা নয়, সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের এক গ্রামে এমনি এক অগ্নিপরীক্ষা দিতে গিয়ে এক অভাগিনী নারী জীবন হারিয়েছে।

কাজরী গান শুধু ভাই-বোনের স্নেহপ্রীতি দিয়ে রচিত নয়, রকমারি কাজরী গানের ভিতর দিয়ে স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিক-প্রেমিকার মনোভাব ও মান-অভিমান ব্যক্ত হয়েছে। ৩

কাজরী গান—

"শাওনকে মাহিনা, কাজরীয়া খেলে
যাওয়ে ননন্দী, ঘেরি আওয়রে কালিবাদর
যে ননন্দী"

ভ্রাতৃবধূ ব্যাকুল হয়ে বলছে, "শ্রাবণ মাসে কাজরী খেলতে এলাম, ও ননদী, চারদিকে কালো বাদল ঘিরে এসেছে।"

"ঝিম্‌ঝিম্, ঝিম্‌ঝিম্ মেও বরষে
ভিজে মোর চুনরিয়া রে ননন্দী
ক্যাইসে যাউঁ কাজরীয়া খেলে শাওন মে
রে ননন্দী।"

"রিম্‌ঝিম্ মেঘ ঝরছে, আমার ওড়না ভিজে গেছে, ও ননদী আমি শ্রাবণের কাজরীয়া খেলে কি করে ঘরে যাই।"

তরুণী বধূ, কন্যা, সবাই যে যার উৎকৃষ্ট বসন-ভূষণে সেজে এসেছে, ঝুলন ঝুলবে, কাজরী গাইবে। পরনে রঙবেরঙের চুনটকরা ঘাঘরা, ঘাঘরার জরির পাড়, চলতে-ফিরতে ঝলমলিয়ে উঠে, পায়ের 'পায়েল' বেজে উঠে রুনুঝুনু। মিহিরঙীন ওড়না দোলার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় উড়ে। হাতভরা গয়না, গলায় মোটা হার, পায়ে পায়েল, আঙ্গুটি, কোমরে রেশমী রঙীন ঘাঘরার উপর চন্দ্রহার, কালো কুচকুচে চুলের লম্বা বেণী জরির ফিতেয় বাঁধা, সাপের মত রঙীন ওড়নার নীচে পিঠে ছড়িয়ে আছে। সিঁথির কাছে কপালে সোনার ফুল। দু'পাশে সোনার পাত, চুলের দু'দিক ঘিরে পেছনে আটকানো। কপালে সিন্দুরের ফোঁটা, পানে রাঙা ঠোঁট, আর কাজল দেওয়া ডাগর চোখের পুলকিত দৃষ্টি তরুণীদের মনের উল্লাস প্রকাশ করছে। ব্রজের গোপিনীদের মত দলে দলে তরুণীরা, কিশোরীরা, গাছের ডালে ডালে ঝুলানো দোলনায় দুলতে দুলতে কাজরী গাইতে সুরু করে।

"হরিরাম চলি যাত আঠিলাতে
পিয়াকে সঙ্গ গোরীয়ে হরি
গলে উনকি তিলরি শোঁহে
ঔর মখমলকী চোলি।
চন্দ্রবদন ছিপি যায়
হাসত মুখ মোরি রে হরি।"

"প্রেমিক-প্রেমিকা দু'জনে চলেছে সগৌরবে, কৃষ্ণ আর রাধা। পিয়ার গলায় তিল শোভা পাচ্ছে, গায়ে মখমলের চোলী, সাজ-সজ্জায় চন্দ্রবদন আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে, পিয়া হাসিমুখে চলেছে।"

"বেলাফুলে আধিরাত,
চামেলী ভিনসারে
সোনেকে থালি, জেওন পরশি। সঁইয়া ভোওয়ে আধিরাত
দেওর ভিনসারে।"

"বেলীফুল মাঝরাত পর্য্যন্ত সুবাস ছড়ায়, প্রভাতে চামেলী। রাধা সোনার থালায় মাঝ-রাতে প্রেমিককে খাবার পরিবেশন করছে, দেবরকে প্রভাতে।"

এগুলি দেহাতী সঙ্গীত, গ্রাম্য নারীরা রাধাকৃষ্ণের প্রেম অবলম্বন করে গীতগুলি তৈরি করেছে, আর প্রেমিকা রাধার মুখ দিয়ে নানা মান-অপমানের পালা সৃষ্টি করেছে। গানগুলি শুনতে

শুনতে এবং সুসজ্জিতা তরুণীদের দোলায় দুলতে দেখে কল্পনায় কাব্যে বর্ণিত ব্রজের অভিসারিকা রাধা, আর তার সখীর দল চোখের সামনে ভেসে উঠে। যুগে যুগে প্রেম তার মোহনকাঠির স্পর্শে মানুষের মনে এক মায়াজাল বুনে যায়। প্রত্যেক মানব-মানবীর অন্তরের অন্তরতম দেশে লুকিয়ে আছেন শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীরাধা। প্রকৃতির অপূর্ব্ব পরিবেশের মধ্যে কোন বিশেষ মুহূর্ত্তে প্রেম এসে চোখে মোহের অঞ্জন পরিয়ে যায়, প্রেমিক হয়ে উঠে প্রেমিকার চোখে অপূর্ব্বসুন্দর। তখন প্রেমিকা রাধার জলে স্থলে সর্ব্বত্র শ্যাম, জগৎ শ্যামময়।

'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' নবজলধর দেখে বিরহী যক্ষও আপন প্রিয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, ভাসমান মেঘের ভিতর দিয়ে তার বিরহী হৃদয়ের আকুল-বার্ত্তা পাঠিয়েছিল বিরহিণী প্রিয়ার কাছে। আষাঢ়ের সজল বরিষণে, গগনে ঘনঘটায় বিরহী মানবমন এক অজানা ব্যথায় ব্যাকুল হয়ে প্রিয়ের পাশে ছোটে। শ্রাবণের কালো আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঝির ঝির করে বারি ঝরছে, বিরহিণী প্রিয়া কাজরী গানে নিজের ব্যথা প্রকাশ করছে—

"টুটি যায় মুংগা, বিথরি যায় মোতি
বিচ্ছুরি যায় ননন্দী, তোর বিরণা।"

"প্রবাল ভেঙ্গে গেছে, মোতি খুলে ঝরে পড়েছে, ও ননন্দী তোর ভাই আমাকে ভুলে গেছে।"

বাড়ী বাড়ী, মাঠে মাঠে, বড় বড় আম নিম বট গাছে ছোট বড় হাল্‌কা নানা রকমের দোলা ঝুলছে। ভারী দোলনায় এক সঙ্গে চার পাঁচ জন তরুণী বসে দুলতে দুলতে গান গাইছে, নীচে সখীরা দাঁড়িয়ে পাল্টা গানে তার প্রত্যুত্তর দিচ্ছে। দোলা আর কাজরী গানের ভিতর দিয়ে ননদ-ভ্রাতৃজায়ার উত্তর প্রত্যুত্তর চলছে, গানগুলির মাধ্যমে ননদের ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতৃজায়ার আসক্তি ও মান-অভিমান প্রকাশ পাচ্ছে। সখী বলছে :—

"কৌণে রং মুংগা, কৌণে রং মোতি
কৌণে রং ননন্দী তোর বিরণা
লাল রং মুংগা, শফেদ রং মোতি
শ্যাওল রং ননন্দী, তোর বিরণা
টুটি যায় মুংগা, বিথরি যায় মোতি—
বিছুর যায় ননন্দী, তোর বিরণা।
বিন লেদে মুংগা, বটোর লেব্দী মোতি।
মানায়ে লাও ননন্দী তোর বিরণা।
কাঁহা শোঁহে মুংগা, কাঁহা শোঁহে মোতি
কাঁহা শোঁহে ননন্দী, তোর বিরণা
নাকে শোঁহে মুংগা, গলে শোঁহে মোতি,
সেজরিয়া শোঁহে ননন্দী, তোর বিরণা।

"প্রবালের কোন রং, মোতির কোন রং। ও ননন্দী তোর ভায়ের কি রং?

লাল রঙের প্রবাল, সাদা রঙের মুংগা—ও ননন্দী, তোর ভায়ের রং শ্যামল।

প্রবাল ভেঙ্গে গেছে, মুংগা খুলে পড়ে গেছে, ও ননন্দী তোর ভাই আমাকে ভুলে গেছে।

প্রবাল গাঁথব, মোতি কুড়াব, ননন্দী, তোর ভায়ের মান ভাঙব।

প্রবাল কোথায় শোভা পায়? মোতি কোথায় শোভে? ও ননন্দী, তোর ভাই কোথায় শোভা পায়?

নাকে শোভে প্রবাল, গলায় মোতি, ও ননন্দী তোর ভাই শয্যায় শোভা পায়।

সুন্দর চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত প্রান্তরে, প্রাঙ্গণে তরুণীরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাজরী গান গাইতে গাইতে দোলনায় দুলতে থাকে, কারণ আজই ঝুলন-উৎসবের শেষ পূর্ণিমারাত্রি। উৎসব-রজনীতে তারা ভুলে যায়—তাদের দুঃখ-দৈন্যপ্রপীড়িত সংসারের কথা, ক্ষণিকের জন্য তারা যেন কল্পলোকবাসিনী হয়ে উঠে। আনন্দ-উচ্ছ্বসিত দেহ আর মোহভরা হৃদয়ে তারা বৎসরের মত ঝুলন-উৎসব সমাপ্ত করে গৃহে ফেরে।

তমসা

শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রেমানন্দ বৈরাগী টিলাটার উপরে নতজানু হয়ে বসে পড়ল। ব্রাহ্মমুহূর্ত, পূব আকাশে উষার সঙ্কেত হয় হয়—চড়াই, শালিক আর বনটিয়ে অশ্রান্ত কলরবে নিকটের অশ্বত্থ গাছটাকে ঘিরে উড়ে বেড়াচ্ছে। সামনে পিছনে দিগন্তপ্রসারিত শুকনো মাঠ, পশ্চিম রাঢ়ের পাষাণ-অহল্যা। শেষরাত্রের পাণ্ডুর আলোতে দেখলে নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মত চোখের সামনে ভাসতে থাকে গোটা মাঠটা—এক বিরাট মহাদেশের মত।

হাঁটু পর্য্যন্ত গেরুয়া, হাতে একটা খঞ্জনি, বসে আছে নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে প্রেমানন্দ। যেন সমুদ্রের মাঝে বিন্দু পরিমাণ একটি প্রবালদ্বীপ। সূর্য্য উঠবে এখনি, প্রণাম করবে সর্ব্বপাপঘ্ন দিবাকরকে। বিশ্বের তমসা হরণ করেন যিনি, তাঁর স্পর্শে অন্তরের কালিমা ঘুচে যাবে, সব অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। যখনই সংসারের দুঃখকষ্ট অন্তরকে ব্যথিত করে তোলে, প্রেম-সাধনার অন্তরায় হয়ে ওঠে, এমনি করে সে টিলাটার মাথার উপর চলে আসে নিজেকে তমসান্তক প্রাতঃসূর্য্যের কাছে উৎসর্গ করে দেবার জন্যে।

অন্ধকার নেমে এসেছে এবার তার ছোট সংসারটিতেও। পরশু দুপুর রাত্রে ইচ্ছে করে ঝগড়া বাধিয়ে ছেড়ে চলে গেছে তার স্ত্রী নন্দরাণী। মাত্র মাসকয়েক আগে এই অনাথা বৈষ্ণব-মেয়েটাকে কেবলমাত্র দয়া করে আশ্রয় দেবার জন্যেই কণ্ঠি বদল করে বিয়ে করেছিল এই শেষবয়সে।

জাত-বৈষ্ণব প্রেমানন্দ, গৃহী হয়েও সে সন্ন্যাসী। তিন প্রহর রাতের সময় ওঠে, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় খঞ্জনি নিয়ে নাম করে বেড়ায় সোনারপুরের একটি পল্লীর অলিতে-গলিতে; রায়বাড়ীর গোবিন্দ-জীউর প্রসাদ পায়, বাঁধা বৈষ্ণব বলে। এক প্রসাদেই দু'জনেরই চলে যাবে কোনরকমে, এই ভরসাতেই প্রেমানন্দ আত্মহারা। একটা দিন পার হয়ে গেলেই যথেষ্ট, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ভাববেন আবার আগামী কালের কথা। কিন্তু নন্দরাণী এ যুগের মেয়ে, ভিক্ষে করা দানের শাক-অন্ন ঘৃণা করল সে।

—মরদ মানুষ, খেটে পেতে পার না? মাত্র দিনকয়েক আগে এমনিধারা বলতে আরম্ভ করেছিল নন্দরাণী।

প্রেমানন্দের মুখে বৈষ্ণবের সেই শান্ত হাসি, আমরা জাতে বোষ্টম; নাম করি প্রসাদ পাই, এতে লজ্জা কিসের?

—ভিক্ষে, ভিক্ষে, ও ভিক্ষে ছাড়া কিছু লয়। তুমি ত এতো নেকাপড়া জানা বোষ্টম গো। তোমার নজ্জা করে না?

—লজ্জা? সাত পুরুষের এই ত ধর্ম্ম আমাদের। শ্রীকৃষ্ণের নামগান করি, এর চেয়ে সম্মানের কাজ কি আছে?

—ই সব ছেঁদো কথা আমি ঢের বুঝি। তুমার মুরদ নাই, তাই বল।

বুঝতে চায় নি নন্দরাণী, রুখে উঠেছিল একদম মারমুখী হয়ে। তারপর তার বর্ত্তমান আকর্ষণের একটু ইঙ্গিত দিয়ে বলেছিল, কেনে, ঐ ত জোয়ান মনিষ্যিরা সব দামুদরের বাঁধ বাঁধতে যায়, কলে খাটতে যায়; নগদ টাকা রোজগার করে। কলের আলো, কলের জল, ছিনেমা, বায়ুসকোপ—ই তুমার ভিখমাঙ্গা ব্যবসা রাখো তুমি।

একটু ধাক্কা লেগেছিল বৈরাগী প্রেমানন্দের মনে। কল বসেছে দামোদরের ওপারে, মায়া ও মোহ ছড়িয়েছে এপারেরও মানুষের মনে। জীবনের আদর্শ, রীতি-নীতি, সবকিছু ওলট-পালট করে দিচ্ছে দানবরূপী কলগুলো। এক যুগ আগেকার সহজ এবং অনাবিল চিন্তাধারা উপেক্ষা আর উপহাসের বস্তু হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। একালের ছেলেমেয়েরা জীবনে ও গানে প্রেমোন্মাদকে নাম দিয়েছে নিছক আত্মবঞ্চনা। কৃষ্ণ অঙ্গভ্রমে কুসুমলতা আলিঙ্গন, একদৃষ্টে ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠ নিরীক্ষণ, এসব এখন হয়ে পড়েছে একটা শুষ্ক যুগের ভ্রমময় আত্মবিস্মৃতি।

ভাগবত পড়েছে সে তার বাপের কাছে, সে এক অমর কাহিনী। কৃষ্ণ-অনুরাগে ভক্তের হৃদয় সদাই আকুল; কৃষ্ণের নাম শুনলে পর্য্যন্ত অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়েছে। যদি কেউ 'রাধা' বলে শব্দ করে উঠেছে, অমনি অশ্রুর ধারা ঝর ঝর করে ঝরে পড়েছে! নন্দরাণীকে উদ্ধার করে প্রেমানন্দ ভেবেছিল, তার নজর পালটে দেবে এমনিভাবে, তার অন্তরের মালিন্য চোখের জলে ঝরে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু নন্দরাণীর নয়নে যে চাহনি পরিষ্কার ফুটে উঠল, সে আর এক জিনিষ। নতুন আমদানি কলের বিলিতী আলোর ঝলকানি লেগেছে তার চোখে, সে অন্ধ হয়ে গেছে।

প্রেমানন্দ আর এক যুগের মানুষ। পিতৃপুরুষের মিঠা-সংস্কৃতির অকৃত্রিম জল-হাওয়ায় পাড়াগাঁয়ের একটি সবুজ গাছের মত বেড়ে উঠেছে সে। বৈষ্ণবদের মোড়ল ছিল বাবা, তার আদর্শে প্রেমানন্দও ঘরকে বার করতে শিখেছিল, ঘর-বারের মানুষজনকে আপনার মত ভালবাসতে পেরেছিল। চৈতন্যচরিতামৃত শুনেছে সে কত শতবার গোবিন্দজীউর চত্বরে বসে, যুগধর্ম্মের নাম-সঙ্কীর্ত্তন সে চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে। "ভক্তি দিয়া নাচাইমু এ তিন ভুবন।" কথাগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে প্রেমানন্দের, নিজেই একতারা তুলে ধরে উর্দ্ধবাহু হয়ে নেচেছে আত্মভোলা বৈরাগী।

কিন্তু পারল না জাত-বৈষ্ণব প্রেমানন্দ নন্দরাণীকে ভক্তির বাঁশিতে নাচাতে। নবযুগের মুরলী দামোদরের ওপার হতে বেজে উঠেছে, প্রাণ-চমকানো কলের বাঁশি। ঘরে থাকবে না নন্দরাণী। প্রেমানন্দ জানতে পেরে তাকে বোঝাতে গিয়েছিল শেষবারের মত সেইরাত্রে, চিদানন্দের কথা—সত্যিকার মরমী প্রেমের মধু-আস্বাদ।

খলখল হেসে প্রথমটায় লুটিয়ে পড়ল নন্দরাণী ; তু একটা পাগল বটোগো ! কে জানতক এমনি পারা, তা হলে কি তুমাকে কণ্ঠি দিতম।

প্রেমানন্দ—পাগলই বটি আমি। পাগল হয়ে নাম-গান করি, টহল দিয়ে বেড়াই।

নন্দরাণী—থাক তুমার নাম নামগান। আমি তুর ঘর করব নাই।

পাথরের মত নীরস হয়ে উঠেছিল প্রেমানন্দের মুখ, কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল, বাবুলালের ঘর করবি? মেয়ে ভুলিয়ে ওপারে বিক্রি করা যে বাবুলালের ব্যবসা, যাবি মরতে সেই বাবুলালের কাছে?

বিভ্রান্ত মেয়েটা ক্রোধে, গর্ব্বে ফেটে পড়েছিল সঙ্গে সঙ্গে, মরি মরব ; কিন্তুক তুকে মেরে পর মরব।

—আমাকে তুই মারবি? আর তারপর মরবি ঐ জানোয়ারটার হাতে?

—সি তবু ত মরদ ছকরা বটে।...

চলে গেছে নন্দরাণী, ঘৃণাভরে দম দম করে পা ফেলে। কোথায় গেছে তাও জানে প্রেমানন্দ, রামলাল বাগ্দীর ছেলে বাবুলালের কাছে...সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পথে বসবে দু'দিন পরে।

গ্রামের জমিদার-বাড়ীর আটপৌরে 'লগদি' রামলাল, তার পিতৃপুরুষ বংশপরম্পরায় মল্লরাজের লাঠিয়াল ছিল। সে রাজত্ব অন্ধকারে ডুবে গেছে। রামলাল কিন্তু আজও লাঠিয়াল, রায়বংশের সামান্য নির্দ্দেশে মল্লভূমের নীরস লালমাটি ভিজিয়ে দিয়েছে বহুবার তাজা মানুষের গরম রক্তে। গাঁটে গাঁটে রূপোর মজবুতি বসানো পাঁচ হাত লাঠি হাতে দৈত্যাকার রামলালকে দেখলে ভয় খায় না, এ তরফে এমন লোক নেই আজকাল। তেঁতুলে-বাগ্দী, জাত ঠেঙ্গাড়ে।

তার ছেলে বাবুলাল, সত্যিই ঠেঙ্গাড়ের ছেলে, কিছু করতে পিছ-পা হয় না। হাতচারেক লম্বা ধপ্ধপে সাদা গোখরো তাড়া খেয়ে গর্ত্তে ঢুকে পড়ছিল, বাবুলাল ল্যাজটা ধরে মাথার উপর সাঁই সাঁই করে বারকয়েক ঘুরিয়ে রাম-আছাড় দিল বাসুকি-নন্দনকে। ধূর্ত্তামি করে অন্ধকার পথে শুইয়ে রাখল মৃত সাপটাকে পথের উপর। বিষে গরগর অজগরের মত চেহারাখানা, সাপিনীদের নিয়েই কারবার জমিয়েছে। দু'দিন পরেই একটা বস্তু তার কাছে পুরানো হয়ে যায়, দামোদরের অপর পারে তখন ছেড়ে দিয়ে আসে বাবুলাল নির্ব্বিষ, অচল, অচেতন পদার্থটাকে। হাত-খরচা আদায় হয়।

নূতন কলে আবার কাজ জুটিয়েছে একটা, কাঁচা টাকা আর চটকদার সজ্জা নিয়ে সোনারপুর আসে ঘন ঘন, সাপিনীর সন্ধানে। মরচে-পড়া গ্রামে আকর্ষণের ঝিলিক দিতে বেগ পেতে হয় না একটুও, কত লোক ত ওপার হতে চাঁদির ঝমঝমানি শব্দেই চলে গেছে সেখানে। শুকনো, রোদে-পোড়া, ফাটল-ধরা জমির মায়ায় ম্যালেরিয়ায় ধুঁকবে আর কে! শুধু আছে গোবিন্দজীউ, আর তার সেবক প্রেমানন্দ, এখনও বিরল-বসতি গ্রামের অলিতে-গলিতে নামগান গেয়ে টহল দিয়ে বেড়ায় শেষরাত্রে।

পূবের দিগন্তরেখা হঠাৎ কতকটা রাঙা হয়ে উঠল, উপরের আকাশটায় কে যেন মুঠো মুঠো আবির ছড়িয়ে দিল। সহস্র গোপিনী রঙের পিচকারি ছুঁড়ছে—পূব আকাশে এ সময়টায় এ এক নিত্যনূতন হোলিখেলা। সমুদ্রের মত সুবিস্তীর্ণ মাঠটার উপরের অন্ধকার মিলিয়ে গেল, আনন্দের স্বচ্ছ ঢেউ বয়ে গেল সমস্ত ভূভাগটায়। নতজানু প্রেমানন্দ স্তব করে প্রণতি জানাল। অনেকক্ষণ হাতজোড় করে বসে রইল তেমনিভাবে, বলতে লাগল, প্রণাম করি তোমায়, হে দিবাকর, সব পাপ হরণ কর, অন্ধকার দূর কর।

কতক্ষণ পর উঠে দাঁড়িয়ে খঞ্জনিটি তুলে নিল, সব দুঃখ ভুলে গেছে বৈরাগী প্রেমানন্দ।

কে?

পেছনে একটা মস মস শব্দ, সেই লাঠি-হাতে রামলাল। প্রেমানন্দ যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না।

বিমূঢ় প্রেমানন্দকে হতবাক করে দিয়ে নমস্কার করল রামলাল, তেলে-পাকা লালচে লাঠিটা মাটিতে ফেলে দিয়েছে সে।

—আমি বাবাজী, চিনতে নারছ নাকি? নরম হাসি দেখা গেল রামলালের দীর্ঘ গোঁফের পাশে : নামগান, দোওয়া-ভক্তিই কর শুধু, কিন্তুক নিজের বউকে ঠিক রাখতে পারলে না!

—হাঁ, রামলাল।

কথাটা আটকে গেল প্রেমানন্দের গলায়, কিন্তু আত্মস্থ হ'ল মুহূর্ত্ত পরে। নিষ্পাপ মনের সরলতা ফুটে উঠল বৈরাগ্যদীপ্ত মুখের উপর, বলল, সব জানি, রামলাল। গায়ের জোরে তবু সবকিছুই হয় না। তোমার ছেলেকে লাঠির ডগায় পোষ মানাতে পেরেছ? মালিক সেই মহাপ্রভু নিত্যানন্দ, আমরা কে?

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল রামলাল। প্রেমানন্দ স্তম্ভিত হয়ে দেখল, গোখরো সাপটা একটা ছোবল পর্য্যন্ত মারল না, নিস্তেজ ছেলের মত শান্ত হয়ে তাকিয়ে আছে বৈরাগীর দিকে। মুখের উপর অসহায় দৃষ্টি, এমনটি কখনও দেখে নি প্রেমানন্দ। বলল, দুঃখ করো না রামলাল, ভগবানকে ডাক।

আবার একটু হাসল রামলাল, আমরা মুখ্যু মানুষ বাবা, অপরাধ লিও না। কিন্তুক ভগবান লাই, এ ঘোর কলিকাল। ছুটো কত্তা কি হুকুম দিয়েচে শুনো বাবাজী। তুমার বউ জমিদারবাড়ীতে কাজ কত্তোক ; আমার ছেলে যদি তাকে ফিরিয়ে দিয়ে লা যায়, ত আমার লোকরী খতম।

অর্থপূর্ণভাবে ভ্রূ-দুটো কুঁচকে ঘাড় নাড়ল রামলাল, প্রকাণ্ড দেহের উপর লম্বা রকমের ছোট মাথাটা ডানদিকে ফেরাল একটু। লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে বলল, সর্দ্দার মোড়লের মেয়ের সঙ্গে বিয়া ঠিক করেছিলম ছেলেটার, ছ'কুড়ি টাকা পণ দিতক। রামলাল বাপ হোক, ঠেঙ্গাড়েও বটে। সি খুনেড়ে বটি বাবা, লাঠির মওড়ায় খুন

করি লেঠেল আর বদমাসকে। এই লাঠি নিয়ে চললাম, ফিরিয়ে উঁদিকে নিয়ে আঁসব, এই কথা বললম বাবাজী।

—সে তুমি পারবে না রামলাল ; শুধু শুধু—

—ই কথা বলো না বাবাজী লেঠেল রামলালকে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল রামলাল।

প্রেমধর্ম্মের অন্ত্যেষ্টি হয়ে গেছে প্রেমানন্দের জীবনে। তবু সে অন্তর ভরে ক্ষমা করেছে নন্দরাণীকে, কুটিলস্বভাব বাবুলালকে। আর সবার উপরে ক্ষমা করেছে ছোট জমিদার হীরুবাবুকে। পঙ্কিল ভোগের প্রাচুর্য্যে এবং বৈচিত্র্যে এই বয়সেই তিনি একটি কুৎসিত, বিকৃতপ্রায়, গতিশক্তিহীন মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছেন। তাঁর সেই ছোট চোখ দুটির লোলুপ দৃষ্টি, দেখে স্বৈরিণী পর্য্যন্ত শুকিয়ে ওঠে অন্তরে, প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ছুটে পালায় অন্য দেশে। নন্দরাণী তবু নখ বাড়িয়ে, দাঁত খিঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিল অনেক দিন, মনের মানুষের সঙ্গে সরে পড়েছে এবার।

এতটুকু দুঃখ নেই তবু প্রেমানন্দের মনে। দু'শ বছরেরও আগে, রাজা গোপাল সিংহের আমলে তার পূর্ব্বপুরুষ দীক্ষা নিয়েছিল প্রেম ও ভক্তির ধর্ম্মে, মন্দাকিনীর মত সে ধারা আজও বয়ে চলেছে তার ধমনীর মধ্যে। জীবনকে দান করেছে, অন্তর সঁপে দিয়েছে নবঘনশ্যামের রাঙা পায়ে। কোন দুঃখ, কোন ক্ষোভই বোধ করে না সে নিজের জন্যে। মন্থর গতিতে পা বাড়াল বাড়ীর দিকে। এক দিন এক রাত্রি হ'ল নন্দরাণী চলে গেছে। তার মন বাদ সাধছিল, বলছিল, ফিরবে না, সে আর কখনও ফিরবে না ; প্রেম কিন্তু বলল, সে ফিরবে।···

বাবাজী!

চমকে উঠল ঠাকুরবাড়ীর পাচক প্রেমানন্দকে দেখে।

বেলা প্রায় দুপুর গড়াতে চলেছে, পুকুরে স্নান করে বৈরাগী মাথায় ভিজে কাপড়টা ঢাকা দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে জমিদার-বাড়ীর দেউড়িতে, নিয়মমত প্রসাদ পাবে। গোবিন্দজীউর বাঁধা নিমন্ত্রিত বৈষ্ণব প্রেমানন্দ। আজ আর বাড়ী ফিরতে মন সরে নি তার, প্রয়োজনও বোধ হয় মিটে গেছে। এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়িয়েছে এতক্ষণ। খঞ্জনিটা নামিয়ে খেতে বসতে যাবে, তাকাল ব্রাহ্মণ-পাচকের দিকে সংশয়-ভরা চোখ তুলে—দুটো দেন ঠাকুর।

ঠাকুর দাঁড়িয়ে রইল বোকার মত।

—ভোগ শেষ হয়ে গেছে নাকি? কেমন সন্দেহ জাগল প্রেমানন্দের মনে, প্রশ্ন করল ঠাকুরকে।

—ছোটবাবু হুকুম দিয়েছেন আজ, ইতিউতি করতে লাগল বুড়ো ব্রাহ্মণ : সুখন দারোয়ান নতুন বোষ্টম ধরে এনেছে এক জন, ঐ মাতাল তিলকদাসটাকে। বাবু নিজে এসে আমাকে বলে গেলেন—

পরিষ্কার করে আর বলতে পারল না সে।

প্রেমানন্দ খঞ্জনিটা কুড়িয়ে নিয়ে শান্তভাবে হাসল একটু, বাইরের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, তা বেশ, ঠাকুরমশাই। আপনি আর কি করবেন। নিতাই যেখানে অন্ন বন্ধ করে দিলেন। হরিবোল!

নিরীহ ঠাকুর তো চাকর বৈ কিছু নয়, আদেশ শুনে অবধি বিমর্ষমুখে গুমরে গুমরে সময় কাটিয়েছে রান্নাঘরের একান্তে। এত দিন অকৃপণ হস্তে অন্ন পরিবেশন করে এসেছে কত দুঃখীজনকে, প্রেমানন্দকে পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাইয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছে বছরের পর বছর। বৈশাখের খরতাপে, বর্ষার অশ্রান্ত ধারায়, শীতের কনকনে বাতাসে গোবিন্দজীউর নিয়ম-বাঁধা বৈরাগীর জন্যে এই ধর্ম্মভীরু ঠাকুরটি অপেক্ষা করেছে ঐকান্তিক আন্তরিকতা নিয়ে। আজ তাকে ক্ষুধার সময় না বলতে হ'ল, বাইরে যাবার পথ দেখিয়ে দেবার কড়া নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে তারই উপর।

অপরাধীর মত হাত দুটো কচলাতে কচলাতে আসতে লাগল ঠাকুর পেছনে পেছনে, বলল আমতা আমতা করে : ছোটবাবু আমাকেও ধমকে উঠে বললেন, বাগ্দীর সঙ্গে যার বৌ চলে যায়, সে বোষ্টম নয়। সে জাত হারিয়েছে, ঠাকুরের প্রসাদ পাবার তার আর কোন অধিকার নেই। ও রকম অপদার্থ লোককে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে।

সরল মনে বলে যেতে লাগল নিরীহ ব্রাহ্মণ, এক একটা কথা আগুনের টুকরোর মত প্রেমানন্দের গায়ে এসে পড়তে লাগল। দেউড়ি পার হয়ে সে কিন্তু তেমনি স্নিগ্ধ স্বরে বলল, আপনার কি দোষ ঠাকুর।

আর একটু এগিয়ে এসে ঠাকুর বলল, তুমি কি এখন বাড়ীতে যাবে বাবাজী?

—হাঁ, কেন?

—এরা সব লোক খারাপ বাবা। হীরুবাবু আরও কি সব বলছিল লগদি সুখনটাকে, আমার ভাল লাগল না কথার ধরণ। ওটা তো ডাকাতি করে খায়, আর এরা সব পারে। ঘরে আগুন দিতে পারে, গোখরো সাপ ছেড়ে দিতে পারে। তার পর হঠাৎ তার হাতটা চেপে ধরে অনুরোধের সুরে ঠাকুর বলে ফেলল, তুমি চলে যাও বাবা অন্য কোথাও।

—তা হয় না ঠাকুরমশায়, আমি বাড়ীতেই যাব। নারায়ণ যা কপালে লিখে দিয়ে গেছেন, তার বেশী মানুষ তো আর কিছু করতে পারবে না! তোমার ভয় কি?

উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল ভয়ের কথাটা প্রেমানন্দ, তবু মনটা ছ্যাৎ করে উঠল। যাবার সময় পরশু রাতে নন্দরাণীও কেউটের বাচ্চার মত গর্জ্জন করে উঠেছিল, বলেছিল, তুই নিকম্মা মরদ, তুকে বিষ খাইয়ে তুর মা মেরে ফেলে নাই কেনে? সাপের বিষ?···

প্রেমানন্দকে সহ্য করতে পারে না নন্দরাণী। কেন যে সে তার মৃত্যুকামনা করে তার কোন মানে খুজে পায় না নিরীহ বৈষ্ণব।

চলতে চলতে মনে পড়ল, আজকের শেষ রাতে যেন স্বপ্ন দেখেছিল এমনি একটা। তার জানালার পাশে কয়েকটা বেল-

ফুলের গাছ, তার পাশে কে যেন ফিস ফিস করছিল ঠিক কাল-নাগিনীর গলায় : এত দেরি না করে মিনসের গলাটা টিপে দিতে পারিস না বাবুলাল ? মরে গেলে আমরা যে বাঁচি !—ধড়মড় করে জেগে উঠেছিল প্রেমানন্দ, কিন্তু বুঝতে পারল না সেটা নিছক স্বপ্নই কিনা। দরজা খুলে রোয়াকে এসে দাঁড়াল, দেখল, নিথর রাত, আকাশে শুধু লাল রঙের শুকতারাটা জেগে আছে। খঞ্জনিটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল তখনই, নির্দিষ্ট সময়ের বেশ একটু আগেই।

আরও পা কয়েক চলতে ভয়ের ভারটা হালকা হয়ে গেল, নানা এলোমেলো চিন্তায় প্রায় ভুলে গেল কথাটা।

ধর্ম্মে বৈষ্ণব, পেশায় বাউল। অতীত বলে তার নেই কিছু, বর্ত্তমান অনিশ্চিত, ভবিষ্যতের কথাই অবান্তর। তবু নিশ্চিত স্বাচ্ছন্দ্যে চলে দিনের পর দিন। জীবন দিয়েছেন যিনি, আশ্রয় দিয়েছেন তিনি, খাওয়াবার মালিকও তিনি। সব রকমের আকাঙ্ক্ষাকে ভক্তির মন্ত্র দিয়ে জয় করেছে সাধক প্রেমানন্দ। সে নামকরা শ্যামানন্দ বৈরাগীর ছেলে, বাড়ীতে তার তালপাতায় লেখা পুরনো পুঁথি আছে।

বাপের কাছে শিখেওছিল প্রেমানন্দ কম নয়। সেই শিক্ষায় পেয়েছে শুধু ভক্তির সুধা—জীবনকে সে জয় করেছে, তমসার মধ্যেও আলো দেখে তাকে বন্দনা জানিয়েছে। এগিয়ে চলেছে সে ভাগবতের নিরুদ্বিগ্ন, নিরাভরণ মনের শুভ্র কঠিন নির্লিপ্ততা নিয়ে, হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর মাঝেই, আকাঙ্ক্ষা-বিষে নীল হয়ে ওঠা সমাজের সরু একটু গলিপথ দিয়ে।

কায়া এবং কামনার উপরে ওঠবার শক্তি ছিল না নন্দরাণীর। কাঞ্চন নয়, কাঁচের রঙীন ঠুনকো চুড়ি ভালবাসল সে : নতুন যুগের চটকদার কল-কব্জা, দোকান-পসরা তাকে বিভ্রান্ত করল। রক্ত-মাংসে-গড়া নন্দরাণী দামোদরের 'হড়পা' বানে ভেসে গেল। হয়ত উঠবে সে এক ঘাটে, কিন্তু সেখানে দ্বাপর যুগের বাঁশরী নেই, আছে কলিযুগের কলের বাঁশী। সে বাঁশীর মদির-সম্মোহনে ঘুরবে সে এখন কত ঘাটে, অন্তরের আগুন দাবাগ্নি হয়ে উঠবে ; তারপর এক দিন ঝরবে নয়নের অশ্রু, নিভবে সে আগুন। মাংস তখন শিথিল হয়ে গেছে, রক্ত হয়েছে স্পন্দহীন, হিমশীতল। সেই মরণ, তিলে তিলে সঞ্চিত বিষাক্ত অপমৃত্যু। হাহাকার করবে নন্দরাণীর আত্মা সেদিন, শেষ হবে জীবনব্যাপী দুঃস্বপ্ন, তারপর বিদ্যুৎচঞ্চল চোখদুটো দামোদরের বর্ষার জলের মত ঘোলা হয়ে উঠে স্থির হয়ে যাবে সেদিন।

সময়টা কাটাবার জন্যে গ্রামের ভিতর দিকে না গিয়ে প্রান্তিক পথ ধরল প্রেমানন্দ। বাউরীপাড়ার শেষ এ দিকটা, বড় বট-গাছটার ছায়ায় কালো কালো ছেলেমেয়ে পরম আনন্দে খেলা করছে, গান করছে, বাঁশী বাজাচ্ছে। রাগ হ'ল নিজের উপর, সাধনায় সে ব্যর্থ হয়েছে। সিদ্ধিলাভ করতে পারলে নিশ্চয়ই নন্দরাণীও তার প্রেমের ছায়ায় আনন্দে গান করত, শীর্ণ, একটা নিরবলম্ব তালগাছের নীচে ছুটে চলে যেত না। নিঃশব্দে বাড়ীতে এবার সাধনাই করবে সে, খঞ্জনি দিয়ে নয়, একতারা নিয়ে। একটি তারে শুধু একটি সুর উঠবে, জগৎ-ভোলানো প্রেমের সুর।

বোষ্টমপাড়া।

চোখ কান বন্ধ করে প্রেমানন্দ তার কুঁড়েতে গিয়ে উঠল। দিন পড়ে এসেছে, পূবদিকের আকাশ হতে অন্ধকার স্তরে স্তরে ঘন হয়ে নেমে আসছে। কিন্তু বাইরের গোবরমাটি দিয়ে নিকানো অঙ্গনটুকু চকচক করছে এখনও। বৈষ্ণবের কুটিরের নির্ম্মলতা ছড়িয়ে আছে উঠানের উপর, কে বলবে এ গৃহের লক্ষ্মী ঘর ছেড়ে চলে গেছে। উঠানে খেজুরপাতার বেড়া দেওয়া, তারপর রোয়াক। হলদে কলকে ফুলের গাছটা পাঁশুটে আকাশের নীচে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেমন যেন। তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বলে নি, বেল-ফুলের চারাগুলো সন্ধ্যার সময় জল পায় নি আজ এক আঁজলা।

ঘরের শেকলটায় হাত রাখতেই ঝনাৎ করে খুলে গেল, চমকে উঠল প্রেমানন্দ।

—কে রে, পেমা এলি ?

প্রেমানন্দের একমাত্র আত্মীয়া, বুড়ী পিসীমা পাশের বাড়ী হতে ডাকছে দরজা খোলার শব্দে, আয় বাবা ! সে হারামজাদী সব লুটেপুটে নিয়ে গেছে কখন ভোর রাতে—

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই স্তম্ভিত হয়ে গেল প্রেমানন্দ, ঘরের যা-কিছু সামান্য বাক্স ইত্যাদি জিনিষপত্র তছনছ করে ছড়ানো। অন্ধকারে ঠাওর করতে পারে নি, ওল্টানো বাক্স একটায় হোঁচট খেয়ে উল্টে পড়ল প্রেমানন্দ। কড়কড় করে টিনের বাক্সটা ভাঙা গলায় আর্তনাদ করে উঠল। আর সেই কর্কশ শব্দের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অন্ধকার ঘরের কোণ থেকে কি একটা যেন ফোঁস করে উঠল ! নন্দরাণী লুকিয়ে ভয় দেখাচ্ছে নাকি ? যা খেয়ালী মেয়ে, বলা যায় না। কেমন হয়ত মন পালটে গেছে, শ্রীচৈতন্য তার সুমতি দিয়েছেন।

মন বলেছিল আসবে না, প্রেম বলেছিল আসবে। কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে ভুল বুঝতে পারল প্রেমানন্দ। নন্দরাণী আসে নি, ভুল শুনেছে কি একটা।

সবকিছুই ওলট-পালট, শুধু একতারাটিতে হাত দেয় নি নন্দরাণী। আবছা অন্ধকারে দেখল, সেটি তেমনি দেয়ালে টাঙানো। রাত্রিবেলা অন্ততঃ একটিবার এটি না বাজালে প্রেমানন্দ ঘুমুতে পারে না, একথা জানে নন্দরাণী।

পাকা লাউয়ের খোল একটা, বাঁশ একখণ্ড আর একটু তার। প্রেমানন্দর নিজের হাতে তৈরি। হাত বাড়িয়ে পাড়তে গেল, কেমন যেন ভারী ভারী, খোলের উপর কি যেন একটা ঢাকনা দেওয়া। টেনে নামাবার ঝটকায় ছিটকে পড়ল ঢাকনাটা, ফোঁস করে লাফিয়ে পড়ল কালো কেউটের একটা বাচ্চা।

বুড়ী সাড়া না পেয়ে আস্তে আস্তে এসে দাঁড়াল রোয়াকের

কাছে। প্রেমানন্দ পড়ে আছে মাটিতে, একতারাটা দরজার কাছে গড়িয়ে এসেছে। তারটা ছেঁড়া।

বেতো রোগী বুড়ী, উঠতে পারে না। কষ্টে পা-টা তুলে প্রশ্ন করল, ও পেমা, কি হ'ল রে, ও—

পায়ে কেমন করে চেপটে গিয়েছে সাপটা, পড়ে পড়ে মাথা নাড়ছে। চোখের সামনে চকচক করতেই আঁতকে চেঁচিয়ে উঠল বুড়ী, ওরে পেমা সাপ রে! তোকে কামড়ালো নাকি রে! ওগো বাবুলালের কাজ গো—আজ শেষ পহর রাতে খুদনের মা তাকে এখানে দেখেছে গো—

বাইরের নিরাপদ জায়গায় থেকে পাড়া মাথায় করল পিসীমা। তখন ঝিম ঝিম করছে প্রেমানন্দর সর্ব্বশরীর, তার উপর সারাটা দিন নিরম্বু উপবাস। তমসা নামছে তার দুটি চোখে, মনে হ'ল যেন কালিদহের বিষাক্ত বাষ্প ঘরটায় জমাট বেঁধে উঠেছে। পাখী একটা উড়ে যেতে যেতে পড়ে গেল দম বন্ধ হয়ে সেই কালীদহের কালো জলে, কয়েকটা গরু সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে আছে দহের তীরে। কিন্তু কে যেন নীরন্ধ্র অন্ধকার আলো করে ঝাঁপ দিল পাড়ের ঐ কদমগাছটা হতে। পুকুরের জল টলমল করে কেঁপে উঠল। তারপর জল থেকে উঠে এল এক চিকণ কালো ছেলে—সে বালক-শ্রীকৃষ্ণ। আলো হয়ে গেল পুকুরটা, অন্ধকার দূর হয়ে গেছে সব জায়গা থেকে।

নিবো-নিবো প্রদীপের আলোর মত ক্ষণিকের তরে স্নিগ্ধ হয়ে উঠল প্রেমানন্দর মুখমণ্ডল। দম ফেলল সে। বুঝতে পারল এ কার কাজ। বাবুলাল তাকে ভালবাসে না, প্রেমানন্দ জানে।

সম্ভাবনা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

থাকি সুমেরুর স্বর্ণ-আলোর দেশে,
সত্যকে আমি আনি স্বপ্নের বেশে।
কহি সুন্দর শীর্ণ লতারে
মুছায়ে নেত্রজল,
বক্ষে তাহার গুচ্ছে গুচ্ছে
ফলিবে দ্রাক্ষাফল।
বলি ভুজঙ্গে মাণিকের কথা,
শুক্তিকে মুক্তার;
মোর কাছে পায় হীরার খপর,
খনির সে অঙ্গার।
মৃগকে জানাই পাবে তুমি মৃগনাভি,
আছে সুরভির ভাণ্ডারে তব দাবি।

২

কহি চুপে চুপে তৃণ-কুসুমের কানে,
পারিজাত তারে আত্মীয় বলে জানে।
আমি অনাগত সুর সরিতের
কল্লোল আনি ধীরে,
রাজ-কিরীটের পরিবেশ দিই
অপরিচিতের শিরে।
শুভ প্রভাতের অরুণিমা আমি,
সুধা-সাগরের কণা,
সাধককে বলি 'আসিছে সিদ্ধি,
সার্থক আরাধনা।'
আমি যে শোনাই পাষাণ-'অহল্যায়',
মানবী হবার আসে দিন পুনরায়।

৩

ভাব রূপ পায় চিরদিন এই ভবে,
হিংসা ও দ্বেষ জন্মান্তর লভে।
জতুগৃহের শিল্পীরা পুনঃ
হইয়াছে সক্রিয়,
তাহারা চাহিছে সমগ্র ধরা
করিতে জতুগৃহ।
নেত্রাচ্চিতে ভস্মীভূত সে—
সগর-তনয়গণ
ফিরেছে, ভুবন-ভস্ম করার
লইয়া কঠিন পণ।
বিরাট যখন হইয়া আসিছে অণু,
মানব আবার হয়তো হইবে হনু।

মুষল করেছে যদুবংশের নাশ,
এখনো কিন্তু মেটে নি তাহার আশ।
সাম্রাজ্য ও কৃষ্টি নাশিছে,—
নাশিছে অনুক্ষণ,
ব্যাবিলন চেয়ে বেশী দূর তার,
নয় ওয়াশিংটন।
দম্ভীর দলে বলে সে ডাকিয়া
'য' দিন পারিস চেঁচা,
আকাশচুম্বীসৌধ ফাটালে
ডাকিবেই কালপেঁচা।'
আসিবে বাসনা পূর্ণ হয় নি যার,
কে বলিতে পারে আসিবে না হিটলার?

৫

বিভেদে, ধ্বংসে, ক্ষয়ে যাহাদের মতি,—
অতি প্রবলেরা হইবে ক্ষুদ্র অতি।
রক্তলোলুপ সমরাকামী,
যারা জগতের ত্রাস,
যক্ষ্মা জীবাণু হইবে, করিবে
বিষাক্ত চারি পাশ।
কথায় যাদের মেদিনী কাঁপিছে
খেলিতেছে খেলা ক্রূর,
ডাকিবে পঙ্কশয্যায় পড়ি
হয়ে ছোটো দর্দুর।
স্তম্ভিত ভীত ধরণী যাদের দাপে—
কীটাণু হইয়া দেখি তারা দিন যাপে।

৬

সলিল প্রপাত ভয়াল 'নায়াগ্রা'র
লুকাবে নিম্নে শঙ্কিত সিকতার।
হয়তো হইবে লোহিত-সাগর
শ্বেত-সাগরেতে লীন,
তপ্ত মরুর উটপাখী হবে
মেরুর পেন্‌গুইন।
ক্ষীণ জলৌকা, সফরী হইবে
হয়তো হাঙর তিমি,
কূটনীতিবিদ্ হইয়া আসিবে
'শকুনি' ও 'কালনিমি'।
সরীসৃপেও রাজিবে জাতির তেজ,
'ডলার' বাজাবে র‍্যাটেল্ সাপের লেজ।

৭

গ্রহ তারা সাথে ঘোরে ধরা অনিবার,
গঠন এখনো শেষ হয় নাই তার।
উন্নত-তর রূপ সে পাইবে,—
চলে পরিবর্ত্তন,
স্বর্গ তাহারে নিকটে ডাকিছে,
করিছে আকর্ষণ।
মানুষ লভিবে দিব্য জীবন
বিশুদ্ধতর দেহ,
ভুবনেশ্বর ভুবন যে এক,
কুরূপ রবে না কেহ।
অমৃত-পুত্র পাবে অমৃতের স্বাদ,
সদা কানাকানি হতেছে এ সংবাদ।

৮

পুণ্য গড়িবে ধরণী কান্তিমতী,
সব হবে সৎ, রহিবে না ক্ষয়ক্ষতি।
অপূর্ণ সব, তাহারি লাগিয়া
গতিময় চারি ধার,
সবাই সতত সঙ্গ খুঁজিছে
সে পরিপূর্ণতার।
হইতেছে যাহা, হতে পারে যাহা
স্থির হয়ে গেছে আগে,
বক্ষে আমার সে সুধার ঢেউ
অনুভূতি হয়ে জাগে।
পাথর হতেছে দেবতা— দেবতা শিলা,
অচিন্তনীয় শ্রীভগবানের লীলা।

"কৃষি-পণ্ডিত"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কৃষিবিষয়ে আই. এসসি ইন এগ্রিকালচার এবং বি. এসসি ইন এগ্রিকালচার পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহারা কৃষিবিষয়ে উচ্চতর এবং উচ্চতম পরীক্ষা যেমন এম. এসসি ইন এগ্রিকালচার, ডি. ফিল ইন এগ্রিকালচার এবং ডি. এসসি ইন এগ্রিকালচার পরীক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন ও সেই সম্পর্কে প্রত্যেক পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত পাঠ্য বিষয় নির্দ্ধারিত হইতেছে, নিয়মাবলীও প্রস্তুত হইতেছে। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, কৃষিশিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে উন্নত ও বৈজ্ঞানিক কৃষির ব্যাপক প্রসারের জন্যই তাঁহারা এইরূপ প্রয়াস করিতেছেন। দেশের কৃষির উৎকর্ষ সাধনের এবং বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রণালীর ব্যাপক বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নাই, থাকিতে পারে না। তাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাধু প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করিতেছি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

যাঁহারা কৃষি বিষয়ে এম. এসসি, ডি. এসসি বা ডি. ফিল. উপাধি লাভ করিবেন সাধারণতঃ তাঁহাদিগকে "কৃষি-বিশেষজ্ঞ" বা "কৃষি-পণ্ডিত" বলা যাইতে পারে। কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে বলা যায় যে, বিদেশ হইতে প্রত্যাগত উচ্চ-এমনকি উচ্চতম বৈজ্ঞানিক কৃষিশিক্ষাপ্রাপ্ত দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তিগণের (অর্থাৎ কৃষি-পণ্ডিতগণের) দ্বারা কৃষির উৎকর্ষ এবং বৈজ্ঞানিক কৃষির বিস্তার তেমন উল্লেখযোগ্য ভাবে ঘটে নাই। প্রধানতঃ সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-সমূহে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইঁহারা নিজ নিজ বিভাগীয় পরিকল্পনা অনুসারে কৃষি-প্রণালীর উৎকর্ষ সাধনের ও উন্নত প্রণালী প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। ইহার ফলে সমষ্টিগতভাবে কৃষক সম্প্রদায় কতটা উন্নত ও বৈজ্ঞানিক কৃষি সম্বন্ধে কি পরিমাণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন দেশের কৃষির অগ্রগতি কতদূর হইয়াছে সকলেই জানেন। এমন দৃষ্টান্ত খুবই বিরল (নাই বলিলেই হয়) যে ক্ষেত্রে এইরূপ উচ্চ উপাধিধারী কৃষি-পণ্ডিতগণ নিজের হাতে লাঙ্গল ধরিয়াছেন (কিংবা লাঙ্গল চালাইতে জানেন) এবং মাটি হইতে সোনা ফলাইয়াছেন। কিন্তু অপর দিকে এমন দৃষ্টান্ত আছে যে ক্ষেত্রে যাঁহারা তথাকথিত কৃষি-পণ্ডিত নহেন তাঁহারা নিজেদের হাতে লাঙ্গল ধরেন, লাঙ্গল চালাইতে জানেন এবং মাটি হইতে সোনা ফলাইতেও পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি যে, গত কয়েক বৎসর হইতে যাঁহারা আশাতীত, এমন কি, অবিশ্বাসযোগ্য পরিমাণে ধান, গম, আলু উৎপাদন করিয়া রাষ্ট্র কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত পুরস্কার লাভ করিতেছেন, এবং 'কৃষি-পণ্ডিত' উপাধি পাইতেছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহই কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী কৃষি-পণ্ডিত নহেন; তাঁহারা অল্পবিস্তর শিক্ষাপ্রাপ্ত সাধারণ কৃষক। খুবই বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এইরূপ উপাধিধারী কৃষি-পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত সরকারী কৃষি-ক্ষেত্রেও এত অধিক পরিমাণ ফলন পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং কৃষির উৎকর্ষ সাধনের এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীর বিস্তার সাধনের জন্য কি ধরণের কৃষিশিক্ষার প্রয়োজন তাহা গভীরভাবে চিন্তা করিতে হইবে। বিদেশের কৃষিশিক্ষার পদ্ধতি অনুসরণ করিলে এবং গতানুগতিক পথে চলিলে কিছুই ফল পাওয়া যাইবে না। তবে এ কথা বলিতেছি না যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত উচ্চতর বা উচ্চতম 'উপাধি' পরীক্ষারও আবশ্যক নাই। ইহার আবশ্যকতা নিশ্চয়ই আছে। তাঁহাদের এই সাধু প্রচেষ্টাকে পূর্ব্বেই অভিনন্দিত করিয়াছি।

কৃষির সহিত বহু বিজ্ঞান জড়িত আছে। সম্পূর্ণ ভাবে উচ্চতর বা উচ্চতম কৃষিশিক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে কোন বিজ্ঞানকেই বাদ দেওয়া যায় না। কিন্তু একজনের পক্ষে কৃষির সহিত জড়িত সকল বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য বা পারদর্শিতা লাভ করা সম্ভব নহে। সুতরাং এক এক জন এক এক বিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন, এইরূপ এক এক জনকে আমরা কৃষির সহিত জড়িত এক এক বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত বা গবেষক বলিতে পারি, কিন্তু তাঁহাকে কৃষি বিষয়ে অভিজ্ঞ বা 'কৃষি-পণ্ডিত' বলিতে পারি না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এম. এসসি ইন এগ্রিকালচার (অর্থাৎ কৃষি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ) পরীক্ষা দিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইলে একজন পরীক্ষার্থীকে, হয় কৃষি বিষয়ে বি. এসসি (বি. এসসি ইন এগ্রিকালচার) হইতে হইবে, কিংবা কোন বিজ্ঞানে বি. এসসি (সম্মান) হইতে হইবে। বর্ত্তমানে প্রস্তাবিত বিধিটি হইতেছে—Any candidate who has passed the Bachelor's Degree Examination in Science

in agriculture or in Science with Honours in an allied subject may be admitted to the M. Sc (Ag.) Examination। কৃষি সম্পর্কীয় উদ্ভিদ বিজ্ঞানে (Ag. Botony) যাঁহারা কৃষি বিষয়ে এম. এসসি পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক তাঁহারা কৃষিবিষয়ে বি. এসসি এগ্রিকালচার হইতে পারেন, কিংবা উদ্ভিদবিদ্যায় বি. এসসি (B. Sc with Honours in Botany) হইতে পারেন; সেইরূপ যাঁহারা কৃষি সম্পর্কীয় রসায়ন কিংবা মৃত্তিকা বিজ্ঞানে (Agricultural Chemistry and Soil Science) কৃষি বিষয়ে এম. এসসি পরীক্ষা (M. Sc. Ag.) দিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে কৃষি বিষয়ে বি. এসসি এগ্রিকালচার কিংবা রসায়নে বি. এসসি (B. Sc with honours in Chemistry) হইতে হইবে। স্বীকার করিয়া লইলাম যাঁহারা কৃষিবিষয়ে আই এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃষি বিষয়ে বি. এসসি উপাধি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ব্যবহারিক কৃষি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং কৃষিক্ষেত্রে হাতে কলমে কাজ করিয়াছেন, লাঙ্গল ও অন্যান্য কৃষিযন্ত্র চালাইতেও তাঁহারা সক্ষম। তাঁহারা যদি কৃষি সম্পর্কীয় কোন বিজ্ঞানে এম. এসসি বা উচ্চতর উপাধি লাভ করেন তাঁহাদিগকে কৃষি-পণ্ডিত বা কৃষি-বিশেষজ্ঞ বলিতে তত আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা কোন কৃষিক্ষেত্রে হাতে কলমে কাজ করেন নাই, লাঙ্গল ও অন্যান্য কৃষিযন্ত্রের ব্যবহারের সহিত যাঁহাদের তেমন কোন পরিচয় নাই, কেবল কোন বিজ্ঞানে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং কৃষির সহিত জড়িত কোন এক বিজ্ঞানে এম. এসসি উপাধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কি করিয়া কৃষি পণ্ডিত বা কৃষি-বিশেষজ্ঞ বলিতে পারি? অবশ্য বিধি অনুসারে এম. এসসি ইন এগ্রিকালচার পরীক্ষার্থিগণকে কিছু কিছু ব্যবহারিক কৃষিশিক্ষা অর্জ্জন করিতে হইবে, কিন্তু তাহা বাস্তবক্ষেত্রে বিশেষ কার্য্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয় না। অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি এবং বহু দৃষ্টান্ত দিতেও পারি যে, রসায়নে সুপণ্ডিত কিংবা উদ্ভিদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যবহারিক কৃষির ক, খ, গ জানেন না। এইরূপ সুপণ্ডিতগণ কৃষি বিভাগের অধিকর্ত্তার পদে কিংবা এইরূপ কোন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন (এবং এখনও আছেন); এমন কি, কৃষির অতি সাধারণ বিষয়গুলি যথা ভূমি কর্ষণ, বিবিধ শস্য বপনের সময়, কর্ত্তনের সময়, বীজের হার, ফসলের পরিমাণ প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহারা অজ্ঞতাই প্রকাশ করিতেন। নিজে দেখিয়াছি কৃষি বিভাগের এইরূপ একজন অধিকর্ত্তার পকেটে একখানি "শস্যবপন পঞ্জিকা" থাকিত; কৃষি সম্পর্কে তাঁহাকে কোন সাধারণ প্রশ্ন করিলেও তিনি পঞ্জিকাখানি দেখিয়া প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তাঁহার সৎসাহসের প্রশংসা করিতেই হইবে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা অন্যায় হইবে না যে, তাঁহার ব্যবহারিক কৃষি সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা খুবই অল্প। সুতরাং এইরূপ অজ্ঞ অধিকর্ত্তা নিয়োগ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিবেই। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় কৃষি সম্পর্কীয় কোন বিজ্ঞানের উপাধিধারীকেই অধিকর্ত্তার পদে বা এইরূপ কোন উচ্চ পদে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। এই রীতি ও নীতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মোটকথা, যাঁহারা কেবল কৃষি বিষয়ে বি. এসসি (এগ্রিকালচার) পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাইবেন তাঁহারাই কৃষি বিষয়ে এম. এসসি ও উচ্চতর উপাধির অধিকারী হইতে পারেন। এবং এইরূপ কৃষি-বিশেষজ্ঞকেই কৃষি বিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত করা উচিত। কৃষির সহিত জড়িত কোন এক বিজ্ঞানে এম. এস-সি বা উচ্চতর ডিগ্রীধারী ব্যক্তিগণকে এম. এসসি ইন এগ্রিকালচার বা ডি. এসসি ইন এগ্রিকালচার বলিবার সার্থকতা কি? এইরূপ উপাধিধারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিষয়ে গবেষণায় নিযুক্ত থাকিতে পারেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহোদয় কৃষির উন্নতি-বিধায়ক বহু গবেষণা ও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি বৈজ্ঞানিক ছিলেন, তাঁহাকে বৈজ্ঞানিকই বলা হইত। কৃষি-পণ্ডিত বা কৃষি-বৈজ্ঞানিক আখ্যা তিনি পান নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান উপাচার্য্য ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও কৃষি রসায়নে বহু গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহাকে কি কৃষি-পণ্ডিত বা কৃষি-বিশেষজ্ঞ বলা যায়? এইরূপ বহু বৈজ্ঞানিকের নাম করিতে পারি, যাঁহাদের গবেষণার ফলে কৃষি সম্পর্কিত অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগকে কৃষি-বিশেষজ্ঞ বলা যায় না।

সাধারণতঃ কৃষি বলিতে আমরা কি বুঝি? বিভিন্ন শস্যের জন্য ভূমি নির্ব্বাচন, বিভিন্ন ফসলের জন্য উপযুক্ত ভাবে ভূমি কর্ষণ, বিভিন্ন ফসলের বপন-প্রণালী, বিভিন্ন শস্যের জন্য বিভিন্ন প্রকারের সার ও তাহাদের পরিমাণ এবং প্রয়োগ প্রণালী, বিভিন্ন ফসলের বীজের পরিমাণ ও বপন-প্রণালী, বিভিন্ন ফসলের পরিচর্য্যা, ফসলের পরিমাণ, কর্ত্তন-প্রণালী, পোকা-মাকড়, রোগ প্রভৃতি দমনের উপায় ইত্যাদিই বুঝিয়া থাকি; এবং যাঁহার এই সকল বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান ও বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে তাঁহাকেই কৃষি-বিশেষজ্ঞ বা কৃষি-পণ্ডিত বলিয়া থাকি। বিজ্ঞানে বি. এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বর্ত্তমান প্রস্তাবিত বিধি অনুযায়ী কোন একজন এম. এসসি ইন এগ্রিকালচার, যাঁহাকে আমরা চলতি কথায় কৃষি-পণ্ডিত আখ্যা দিব, তাঁহার কি উপরোক্ত

সাধারণ বিষয়গুলি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা থাকিবে ? আদৌ থাকিবে না। কিন্তু যাঁহারা কৃষিবিষয়ে এম. এসসি বা উচ্চতর উপাধি লাভ করিবেন তাঁহাদের কি এই সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকার আবশ্যকতা নাই ?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। এই সম্পর্কে ইহাও উল্লেখ করিতেছি যে, কৃষি বিষয়ে আই. এসসি এবং বি. এসসি পরীক্ষায় ব্যবহারিক কৃষি শিক্ষার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা বিশেষ প্রয়োজন। এইরূপ শিক্ষা দিতে হইবে, যাহার ফলে পরীক্ষার্থিগণ কৃষিকর্ম্মকে সম্মানজনক এবং লাভজনক বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন। কৃষি বিষয়ে বি. এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর কোন কৃষিক্ষেত্রে অন্ততঃ এক বৎসর শিক্ষানবিশ রূপে অবস্থান করাও বাঞ্ছনীয়।

সোহাগ-সিন্দূর

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

সোহাগ-সিন্দূরে রাঙা হৃদয় আমার।
যৌবনের বহ্ন্যুৎসব কবে হ'ল শেষ
পড়ে' আছে চারি দিকে ভস্ম কামনার।
রূপের ইতির কথা, রসের নির্দ্দেশ।

কভু মিলে সরমের চকিত দর্শন
অস্তিমের অভিমানে। মরমের তলে
স্মরণের স্নিগ্ধতায় হয়ত কখন
স্তিমিত শিখায় প্রেম-মণি-দীপ জ্বলে।

ইতি-উতি চাহনিতে পড়ে যবনিকা।
শয়ন-সংলাপে শেষ অঙ্ক অভিনয়।
মনের নিভৃত কোণে যে কাহিনী লিখা,
রসোত্তীর্ণ সে সবার হয় কি বিলয় ?

রূপের অভাব অবলুপ্ত রূপান্তরে।
সোহাগ-সিন্দূর আঁকা রহিল অন্তরে।

সনেট

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

এই সেই পল্লীপথ, সেই ত এ গৃহ !
তোমার হাসিটি হেথা স্নিগ্ধ, রমণীয়
আছে ফুটে শুভ্র কুন্দ কুসুমের মত
অনিন্দ্যসুন্দর ! মন্দ পবন নিয়ত
অঙ্গের সুরভি তব করিছে বহন
রঙ্গভরে ! বাতায়নে ভাসে অনুক্ষণ
পূর্ব্বজন্মস্মৃতিসম সেই ভুলে-যাওয়া
পরাণ-পাগল-করা ও চোখের চাওয়া !
কপোত-কূজনে হেথা তব কণ্ঠস্বর
আকুল, উদাস করে স্তব্ধ দ্বিপ্রহর—
জাগায়ে স্মৃতির ব্যথা। এ সরসীজল
ধৌত করিবারে তব চরণ-কমল
ছলকিছে লীলাভরে। শুধু তুমি নাই—
'পিউ কাঁহা' ডাকে পাখী আজি কি গো তাই ?

তড়িৎ-লতা

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

স্নান করবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। এ বাড়ীর পুকুর, দীঘি সবই ত খানাডোবার মত অচল। আশেপাশে কোথায় পুকুর আছে তাও জানা নেই। শেষ পর্য্যন্ত হাজির হলাম আবার সেই বুড়োর বাড়ীতে।

বুড়োর বাড়ীর মধ্যে ঢুকে দেখি কয়েক জন লোক দাওয়ায় বসে চাপা উত্তেজিত গলায় কি আলোচনা করছে। আমাদের দেখেই তারা থেমে গেল। বুড়ো তখন কল্কে ধরাচ্ছিল—আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য শুনলে।

দীঘির ঘাটে আসতে আসতে বুড়ো বললে, "যদি অপরাধ না নেন কত্তা, তবে একটা কথা বলি—আমরা এই তিনপুরুষ কত্তাদের আশ্রয়ে।

"আজকাল যেমন কথায় কথায় লোক থানা-পুলিস আর আদালত করে, কত্তাদের আমলে তেমন দেখি নি। ভাল করলে যেমন কত্তারাই পুরস্কার দিতেন তেমনি অন্যায় করলে তাঁরাই সাজা দিতেন—মামলা-মোকদ্দমার হাঙ্গামা ছিল না। কি যে দিন গেছে—আমাদের দশা দিন দিনই খারাপের দিকে চলছে। শাস্তরে নাকি বলে, সব জিনিষেরই উঠতি-পড়তি আছে—কিন্তু ভগবান কি আমাদের পানে মুখ তুলে চাইবেন?" কথাগুলো বলেই বুড়ো থামল। ক্ষণকাল ভেবে একটু গলা নামিয়ে বলল, "আবার শুনছি যারা এই জমিদারী খরিদ করে নিয়েছে তারা নাকি আমাদের উৎখাত করে দেবে। এদ্দিন তাদের চোখে দেখি নি—আজ যদি দেবতা চোখের সামনে এসেছেন তবে⋯"

বুড়োর কথা শুনে মনে মনে না হেসে পারলাম না। বিনুদা জবাব দিলেন, "তোমাদের ভয় নেই—আমরা সেই লোক নই। তোমরাই এ জমির মালিক—একজোট হয়ে বাধা দিলে কেউ তোমাদের তাড়াতে পারবে না।"

"ঠিক, ঠিক বলেছেন বাবু, দুঃখী লোকে একজোট হলে ভগবান তাদের পক্ষে নিশ্চয় থাকবেন—এ ত শাস্তরেই লেখা আছে।"

ফিরে এসে দেখি খাবার তৈরি। আমাকে আর বিনুদাকে খাবার দিয়ে শম্পা দেবী নিজের খাবার থালায় সাজাচ্ছেন—বারান্দাটা খোলামেলা বলেই আজকের মত খাবার ব্যবস্থা ওখানেই করা হয়েছে।

সিঁড়ি বেয়ে কে উঠে আসছে। নোংরা ছেঁড়া কাপড় পরা। মুখে অনশনের ছাপ। শেষ সিঁড়ি উঠেই বললে, "খাবার দাও মা-ঠান, সারাদিন খাই নি, কালও কিছু জোটাতে পারি নি। তোমরা আমায় চিনবে না। তোমাদেরই জমিজেরাত ভোগ করে এসেছি চিরকাল। মনিবরা বাড়ী ছেড়ে গেল। ওলাউঠায় গেল আমার পরিবারের সব—নিজেও সেবার কঠিন ব্যামোয় পড়লাম। ভেবেছিলাম—বুঝি চললাম। কিন্তু বরাতে কষ্ট অনেক ছিল তাই রক্ষে পেলাম। কিন্তু বাঁ হাতটা হারালাম, ও দিয়ে কোন কাজই আর করতে পারি নে। জমি যাদের হাতে দিলাম তারাই করল গ্রাস, আজ ভিক্ষে ছাড়া আর উপায় নেই।"

শম্পা দেবী তার ভাতের থালা তুলতে হাত দিয়েছেন, বিনুদা অমনি মন্তব্য করলেন, "উহু ওটি চলবে না।"

"আমার জন্য কিছু ভেবো না। তোমরা খেয়ে নাও। আমি যা হোক কিছু খেয়ে নেব। নিদেনপক্ষে দুটো ভাত ফুটিয়ে নিতে কতক্ষণ।"

"তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই—কিন্তু তার দরকারও নেই কিছু। তুমি আপত্তি করবে জানি।"

"তা হলে কি ওকে অভুক্ত ফিরিয়ে দেব।"

বিনুদা হেসে বললেন, "না তারও দরকার নেই। ওকে যা দিচ্ছ তা দাও—কিন্তু আমাদের দু'জনের জন্য যা খাবার রেখেছ—তাই আজ তিন জনে ভাগ করে খাব। আগেই ত তোমায় বলেছি—এখন আর আমরা দু'জন নই—তিন জন। আর তুমি দেখছি নিজেই আমাদের আলাদা ভাগ করে দিচ্ছ।"

শম্পা দেবী গাঢ় স্বরে ধীরে ধীরে বললেন, "জানি নে তুমি মন থেকে কথাটা বলছ কিনা। সত্য হলে আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু কপাল আমার তেমন ভাল নয়—তাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, তুমি বলেছ এই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

"তোমাকে বিশ্বাস করেছি, কাজেই লুকোবার কিছুই নেই। তুমি বোধ হয় জান না যে, একমাত্র সমিতির স্বার্থে শত্রুপক্ষের কাছে প্রয়োজন হলে মিথ্যে বলি—তা ছাড়া মিথ্যে কথা কখনও বলি নে।

শম্পা দেবী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে বিনুদাকে প্রণাম করলেন পা ছুঁয়ে। বিনুদা বিব্রত হয়ে উঠল।

ঘরের ভেতর আমাদের জন্য মাদুর পাতা ছিল, তাতে আমি আর বিনুদা গড়াচ্ছি। শম্পা দেবী তখনও নিজের কাজ শেষ করতে পারেন নি। কিছুক্ষণ বাদে দেখলাম, তিনি পান চিবোতে চিবোতে একখানা পাখা হাতে আমাদের কাছে বসেই হাওয়া করতে লাগলেন, বললেন, "তোমরা ঘুমিয়ে পড়, আমি এখখুনি উঠে যাচ্ছি।"

"তোমার উঠে গিয়েও কাজ নেই; পাখার হাওয়া বন্ধ করলেই বরং খুশী হব। আমরা শুয়ে থাকব, আর তুমি বসে বসে হাওয়া করবে এতে আমার অস্বস্তিই বাড়বে, বাতাসে দরকার নেই,

আমাদের অভ্যাস নেই, হয়ত তাতে খুষই হবে না। তুমি তার চেয়ে গল্প বল, আমরা শুনি।"

"আমি তোমাদের কি গল্প শোনাব বল ত। আমার জীবনের কাহিনী বলবারও নয়, শোনবারও নয়। ওতে তোমাদের কোনই লাভ হবে না।"

"লাভালাভের প্রশ্ন নয়। তোমাকে চিনি, কাজেই তোমার প্রতিদিনকার পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। কিন্তু তবু তুমি জান মানুষের কৌতূহল দুর্নিবার। তোমার কতকগুলি ভাঙা ভাঙা কথা—এ জনহীন পুরীতে সন্তানকে ছেড়ে চলে আসা—এ সমস্তই মনে জাগিয়েছে কৌতূহল। তুমি ভাবছ, এ কৌতূহল আমার একান্ত অনুচিত বা অহেতুক। তোমায় সত্য বলছি বিশ্বাস কর, আমার কিন্তু কৌতূহলের চাইতে মনটা বিষাদে ভরে উঠছে। তোমার যেন কোথায় কি ঘটেছে যা তুমি আমাদের কাছ থেকে এখন পর্য্যন্ত লুকিয়ে রেখেছ। বলতে পার, তোমার ব্যক্তিগত খবরাখবর জানবার অধিকার পেলাম কোথায়। আরও অনেক ব্যাপারের মত এতেও ধরা-বাঁধা কোন আইন নেই। অত্যন্ত অজান্তেই এই দাবি যেন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তাই ত এমনি করে সহজভাবে তোমায় প্রশ্ন করতে পারলাম।"

শম্পা দেবী বললেন,"নইলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জেনে নিতে বুঝি।"

"হয়ত তাই।"

"কি তুমি জানতে চাও বল, তোমার অজানা কিছুই থাকবে না, থাকবার কোন কারণও নেই। এমন সহজ ভাবে এগিয়ে আসতে বুঝি তুমিই পার—তাই ত তোমায় এত শ্রদ্ধা করি।"

ঘর হঠাৎ নীরব হয়ে গেল। শম্পা দেবী আস্তে আস্তে পাখা চালাচ্ছেন। হঠাৎ যেন মনে হ'ল, আমার উপস্থিতি শম্পা দেবীকে বাধা দিচ্ছে তার মনের সবকিছু মেলে ধরতে বিনুদার কাছে। সব কথা বলতে পারলে হয় ত ওর মনের ভার অনেক লাঘব হতে পারে। যদিও শম্পা দেবীর জীবনকাহিনী শোনবার জন্ম মনের ভিতরে আগ্রহ ছিল প্রবল, কিন্তু তবুও ভাবলাম আমার যাওয়াই উচিত।

আমি উঠে বসলাম। বিনুদা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রে, উঠে বসলি কেন?"

"ভাবছি বাড়ীর এদিক-ওদিক ঘুরে বাড়ীটার সঙ্গে পরিচয় করে নিই।"

বিনুদা বললেন, "তোর এই ঝাড়জঙ্গলে কোথাও গিয়ে কাজ নেই। তুই শুয়ে থাক, শম্পা দেবীর যদি কোন কিছু বলতে ইচ্ছে হয়ে থাকে তা তিনি আমাদের দু'জনের সামনেই বলতে পারেন।"

আমি বললাম, "না, তবুও ভেবে দেখুন।"

বিনুদা বললেন, "আমি ভেবে দেখেই বলছি। একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার মানুষের থাকতে পারে। কিন্তু আমরা এক পথেরই পথিক—একে অন্যের সাথী, আমাদের কারুর সাথীর কাছে গোপন করার কিছুই থ কতে পারে না। পাপবোধ থাকলেই মানুষ কোন একটা বিশেষ কথা কিংবা ব্যাপার গোপন করতে চায়, কিন্তু তাতে তার ক্ষতি হয় আরও বেশী, সেই পথেই হয় তার পতন।"

শম্পা দেবী হেসে বললেন, "ওরে বাপ রে! তোমাদের কোন ছেলে কোন মেয়েকে ভালবাসলেও তা গোপন রাখতে পারবে না।"

"না, তার কোন প্রয়োজন নেই ত। কালিমা না থাকলে গোপন করে রাখবার প্রয়োজন কোথায়।"

"তোমাদের সবই অদ্ভুত! যদি এমনি করে চলতে পার তা হলে দুনিয়ায় নূতন মানুষ তৈরি করতে পারবে। তবে আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের অভিজ্ঞতাতে এইটুকু বুঝেছি যে মহাপুরুষেরা কঠোর নিয়মের মধ্যে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের বেঁধে রেখে, পবিত্রতা রক্ষার মন্ত্র তাদের কানের কাছে সদাসর্ব্বদা আওড়েও কিন্তু বেশী দিন চালাতে পারেন নি। কিছুদিন পরেই সব ভেঙে পড়েছে।"

"তার কারণ তাঁরা মানুষের স্বভাবকে অস্বীকার করেছেন। অস্বাভাবিক কিছুই বেশী দিন চলে না। কোন কৃত্রিম বন্ধনই মানুষ বেশীদিন স্বীকার করে নেয় না। যে বাঁধনে সহজ, সরল, স্বাস্থ্যপ্রদ মুক্তির আস্বাদ নেই তাকে ছিঁড়বার জন্ম মন বিদ্রোহী হবেই। এ আস্বাদ মানুষ পায় শুধু বিপ্লবী আদর্শ অনুসরণের মধ্যে।"

আমি ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছি। শম্পা দেবী বললেন, "বোস নীতীশদা, তোমাকে যেতে হবে না। তোমাদের মধ্যে যখন গোপন কিছু নেই তখন আমারও লুকিয়ে রাখবার কিছুই নেই।"

১৩

পান চিবুতে চিবুতে শম্পা দেবীর ঠোঁট দুটি লাল হয়ে উঠেছে, মুখে যেন এক ঝলক রক্ত এসে ছড়িয়ে দিয়েছে রক্তিম আভা—নিজের জীবনকাহিনী বলবার সঙ্কোচ আর উত্তেজনাকে দমাবার শেষ চেষ্টা করলেন ঘরের এদিক-ওদিক তাকিয়ে। তার চোখের পাতা এল বুজে—

"মেয়েরা রাগ করে বাপের বাড়ী চলে আসে, তার প্রমাণের অভাব নেই, কিন্তু সন্তানকে ছেড়ে আসার কাহিনী অবশ্যই কম। তবে এটা গোড়াতেই বলে রাখা ভাল যে, এ আমার বাপের বাড়ী নয়, কাজেই চলে আসার পিছনে নিছক অভিমানের ইতিহাস লুকিয়ে নেই সে কৈফিয়ত বোধ হয় না দিলেও চলবে!

"এ আমার মাতামহের বাড়ী। দিদিমার কাছেই শুনেছি ওদের দেহে বইছে ডাকাতের রক্ত, তারই প্রতাপে ওরা জমিদারী বাড়িয়েছে। গাঁয়ের লোক আর তার পাশের লোকও এদের ভয়ে শঙ্কিত থাকত কখন কি হয়।

"বাঘে-ছাগলে যে প্রতাপে এক ঘাটে জল খায়, এদের শাসন তার চেয়ে কিছু কম ছিল না। একমাত্র রাজাই নাকি ছত্রধারণ করে, তার নকলেই বোধ হয় জমিদারেরা তাদের বাড়ীর চতুঃসীমার মধ্যে কাউকে ছাতা মাথায় দিয়ে যেতে দিত না—ওতে নাকি শাসকের অসম্মান হয়।

"কিন্তু যতই শাসন, শোষণ আর নিপীড়ন থাক না কেন লোকগুলোকে ত আর দেয়াল দিয়ে ঘিরে রাখতে পারেন নি কিংবা

লেখাপড়ার আওতা থেকে একেবারে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন নি। নয়া দুনিয়ার খবর এদের কানে এসে পৌঁছতে থাকে, মন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

"লোকগুলোর বরাত ভাল। জেলার শাসনকর্ত্তা হয়ে এল এক জবরদস্ত ইংরেজের বাচ্চা। বিষদাঁত ভেঙে গেল বাবুদের।

"বাবুদের ছেলেরা জমানো কড়ি ভাঙতে লাগল। সুরাপাত্রে যেমন একদিকে ঘর ভরে উঠতে লাগল, তার ঠিক উল্টো পথে সিন্দুক খালি হতে লাগল। শুধু কি মদ? তার আনুষঙ্গিক বজায় রাখতে জমিদারীর সীমানা সঙ্কুচিত হয়ে আসতে লাগল। ভাটার স্রোত তখন প্রবল, তাকে রোধ করবার শেষ চেষ্টা করলেন সর্ব্বমঙ্গলা দেবী। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভাটার টান রুখতে আর কেউ পারলে না।

"আত্মাভিমান তখনও কারুর কারুর মনকে চেপে রেখেছিল জমিদারীর আওতার মধ্যে, কিন্তু ওর মধ্যে যারা সংস্কারকে দূরে সরিয়ে দিতে পেরেছিল তারা বেরিয়ে পড়ল দেশ-বিদেশে। বাবুদের বংশ একরকম লোপ পেলই বলা চলে।

"এই পুরীর আনাচে-কানাচে আজ যারা পড়ে আছে তাদের সঙ্গে বাবুদের সম্পর্ক খুব দূরের বললেই হয়। কোনরকমে মাথা গোঁজবার ঠাঁই মিলেছে এটাই এরা ভাগ্য বলে মেনে নেয়—আজ যেমন আমি এসেছি একেবারে সর্ব্বহারা হয়ে। কাজেই বুঝতে পারছ, যাদের আত্মীয় হয়ে বাস করবার জন্য এলাম এখানে তাদের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্র বার করতে হলে কুলীন-সমাজের সমস্ত কুলশাস্ত্র, কুলপঞ্জিকা আর ঘটক-কারিকা তন্ন তন্ন করে খুঁজতে হবে। কোন লতার কোন বাহু কাকে আশ্রয় করে এ পর্য্যন্ত এসে পৌঁছেছে তার মূল আজ আর দৃষ্টির সীমায় নেই।

"এই যে আমার বুড়ী দিদিমা—যিনি আজও গৌরব বোধ করেন তাঁর পিতৃপুরুষের কাহিনী স্মরণ করে, তিনিও আজ একান্ত অসহায়, আশ্রয়হীন, তাঁকে সহায় করেই আজ এসেছি এখানে আবার আশ্রয়ের সন্ধানে, দেখি ঠাঁই মেলে কি না!"

বিমুদা মাঝখানে ওকে থামিয়ে বললেন, "যেমনি আমরা এসেছি তোমার আশ্রয়ে—ঘরছাড়া সর্ব্বহারা হয়ে!"

কাহিনীর স্রোতে বাধা পড়লেও শম্পা দেবীর মুখে বিরক্তির চিহ্ন পরিলক্ষিত হ'ল না—তবে তিনি বিমুদাকে বলতেও ছাড়লেন না—এ তোমাদের অতিবিনয়। আর যারাই বলুক না কেন, এ তোমাদের মুখে শোভা পায় না, যারা স্বেচ্ছায় ছেড়েছে ঘর—প্রিয় পরিজনকে ছেড়ে এসে আজ যারা সর্ব্বহারা হয়ে সব মানুষকে করেছে আপন, তাদের মুখে এমনি কথা পরিহাসের মত শোনায়!

শম্পা দেবীর কথার ঝাঁজে আমি খুব লজ্জা বোধ করলাম। বিমুদা জবাব দিলেন, "আমার প্রশ্ন শুনে তুমি রাগ করেছ তাই এর সত্যিকারের অর্থ তোমার মনকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছে। আসল কথা কি জান—আমরা ঘর ছেড়েছি পরের জন্য, কিন্তু পরে ভরসা পায় না আমাদের এক দিনের তরেও ঠাঁই দিতে।"

শম্পা দেবী লজ্জিত হলেন তার ভুল বুঝতে পেরে। বিমুদার কথায় বেদনায় যে সুরটি বেজে উঠেছে তা মনে হ'ল শম্পা দেবীর মনকে ব্যথিত করেছে। একটু থেমে মুখে ম্লান হাসি টেনে বললেন, "আমার কথায় ব্যথা পেয়েছ জানতে পেরে আমি নিজেও দুঃখ পেলাম। কিন্তু তুমি ত জান সব কথা খুলে না বললে বুঝতে পারি না।"

মনে হ'ল বিমুদা এ বাদানুবাদ আর বাড়তে দিতে প্রস্তুত নয়। বললেন, "কথায় কথায় তোমার বলাই যে থেমে গেল, এবার কিন্তু আমি সত্যিই চুপ করলাম।"

বিমুদা থামলেন। সব চুপচাপ। মনে হ'ল যেন শম্পা দেবী পুরানো কথার সূত্র যেখানে ছিন্ন হয়েছে তার সন্ধান করছেন। আবার আস্তে আস্তে বলতে সুরু করলেন। এবার কিন্তু গলার স্বর অনেকটা সহজ। এইটুকু সময়ের কথা-কাটাকাটির মধ্যে শম্পা দেবী যেন উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, এদের কাছে নিজের ব্যথার কাহিনী বলার মধ্যে কোন দৈন্য নেই, নিজেকে ছোট করা হয় না।

"যাক্, এই ত গেল এই জমিদারীর মুখবন্ধ। এদের কাহিনী আর বাড়াব না। যেখানে তোমরা আমায় আবিষ্কার করলে তার পরিচয় কিছু দি'। ও গাঁয়েই ছিল আমার বাপের বাড়ী—"

বিমুদার ভ্রূ কুঞ্চিত হ'ল। মনে হ'ল তার মনে যেন কিসের খটকা লেগেছে। তিনি বললেন, "এখন তোমার বাপের বাড়ী কোথায়।"

শম্পা দেবী হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতেই বললেন, "বলতে যখন সুরু করেছি, তখন আর মাঝপথে থামব না—সবই শুনতে পাবে। অত উতলা হলে আমি যে খেই হারিয়ে ফেলব।

"সেই পুরাতন কাহিনী! বড়লোক ও গরীবের সম্পর্ক। আমরা ও গাঁয়েরই গরীব বামুন-পরিবার। আমাদের পরিবারটি ছোট হলেও আমার পিতার আয়ের কোন সুগম পথ না থাকায় দুঃখকষ্টের অবধি ছিল না। তবে এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও একটা কথা বাবার মুখে শুনে শুনে আমাদের বিশ্বাস হ'ল যে আমরা হলাম শ্রেষ্ঠ কুলীনবংশ।

"এইটুকু সম্বল করেই পিতৃদেব বুক ফুলিয়ে চলতেন, আমাদেরও জীবনটা অনেক সহজ মনে হ'ত। কিন্তু হলে কি হয়, প্রতিদিনকার ঘাতপ্রতিঘাতকে এড়িয়ে চলে মনকে মুক্ত রাখবার ক্ষমতা বোধ হয় কারুরই নেই। কাজেই আমার বাবাও পারলেন না এড়িয়ে চলতে।

"অভাবের তাড়নায় তাঁর মন ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে আসতে লাগল। কারুর কোন কথাই আর তিনি সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারতেন না। কেউ সহানুভূতি প্রকাশ করলে ত আর রক্ষে নেই। এ সবই আমাদের পরিবারের দারিদ্র্যকে কটাক্ষ করে, তাই তার মনকে করত সব চেয়ে বেশী আঘাত। অন্নের অভাব তিনি ঢাকতে চাইতেন বংশমর্য্যাদাবোধকে বড় করে তুলে ধরে।

"নিজের রূপের কথা বলছি! ভেবো না তার জন্য আমায় বিমু-

মাত্র অহঙ্কার আছে। লোকের মুখে অনেক শুনেছি তাই বলছি। আমরা দুটি বোন আমি আর চম্পা। আমাদের শরীরে রূপ ঢেলে ভগবান ভাঙা ঘরে চাঁদের হাট বসিয়ে ছিলেন। গরীবের ঘরে সুন্দরী মেয়ে জন্মালে তাদের আর বাপমায়ের যে কি দুর্গতি হয় সেকথা হয়ত তোমাদের অজানা নয়।

"আমরা বাড়ী থেকে বড় একটা বেরুতাম না। তা হলে কি হয়। আমরা বড় হতে লাগলাম। শৈশবের কুঁড়ি কৈশোরের আধ-ফোঁটা ফুলটির মত গন্ধের রেণু বাতাসে ছড়িয়ে দিতে সুরু করেছে। তবু ভাগ্যিস কুলীন ছিলাম, কাজেই এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে না দিয়েও বাবার মাথা কাটা যায় নি। ভাল ছেলের খবর নিয়ে যে ঘটক আসে নি তা নয়, তাঁরা মেয়ে দেখে চলে যাবার মুখে বাবাকে আশ্বাস দিয়ে যেতেন—আপনার মেয়েদের জন্য আর ভাবনা কি, অমন সুন্দরী মেয়ে লুফে নেবে। কিন্তু মজা এই—লোফা ত দূরের কথা তারা আর দু'পয়সা খরচ করে অনিচ্ছার সংবাদও দেয় নি—হয় ত এই ভেবে যে চিঠিতে যদি আস্কারা পেয়ে বাবা একেবারে ধর-পাকড় করে বিনাপণে মেয়ে গছিয়ে দেন।

"বিনাপণে শুধু রূপলালসায় লুফে নেওয়ার মত যে লোক আসে নি সেও সত্য নয়, কিন্তু বাবা তাদের দিলেন ফিরিয়ে—তাদের লুব্ধ দৃষ্টি পড়ে রইল আমাদের আঙিনা ঘিরে।

"বিশাল গাছের মত বাবা সবকিছুর তাপ থেকে আমাদের বাঁচিয়ে চলছিলেন। কিন্তু ঈশান কোণে যে মেঘ জমে আসছিল তার খবর আমরা কেউ এতদিন টের পাই নি। গাঁয়ের জমিদারের নজর পড়ল আমার উপর অবশ্য তাঁর নিজের জন্য নয়, তাঁর একমাত্র বংশধরের জন্য।

"হয়ত তোমরা ভাবছ, এতে আর শঙ্কিত হওয়ার কি আছে! বাবার ত আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠাই উচিত ছিল। কিন্তু বাবুদের শাস্ত্রীয় কৌলীন্য ঘুচেছিল অনেক দিন আগেই। সে হিসেবে ওদের কোন নির্দ্দিষ্ট আসনই ছিল না। আর আমরা! আমরা ছিলাম একেবারে সবার ওপরে। কিন্তু শাস্ত্রীয় শাসন চ'ল গিয়ে পুরোনো পুঁথির, সামাজিক শাসনেই ওর মর্য্যাদা রক্ষা হ'ত। কিন্তু সামাজিক শাসন ঢিলে হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ওর স্থান ঠিক হতে লাগল পয়সা আর ব্যক্তিগত প্রাধান্যের ওপর।

"বাবুদের বেলায়ও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি। পয়সা দিয়ে কেনা অনেক কুলমর্য্যাদার চিহ্ন ওরা লাগাত ওদের নামের সামনে পিছনে। নষ্ট গৌরব এমনি করেই ওরা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করল। ফিরিয়ে আনল কৌলীন্যের গৌরব। সবাই মানলেও বাবা কিছুতেই মেনে নিলেন না।

"স্বভাবতঃই কর্ত্তার রোষকষায়িত দৃষ্টি পড়ল। বাবা ঋণে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন। আমাদের বাস্তুভিটেও বাঁধা ছিল। তিনি ঐ দলিলগুলি সব গোপনে কিনে নিলেন পাওনাদারদের কাছ থেকে। কর্ত্তা সবদিকের আটঘাট বেঁধে তার একমাত্র পুত্রের সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। আনন্দে গদগদ না হয়ে বাবা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। নেপথ্যে কলরব উঠল—আস্পর্দ্ধা ত কম নয়—আচ্ছা!

"বাবার রাজী না হওয়ার দুটি কারণ। একটি হ'ল ওরা কৌলীন্যের দিক থেকে আমাদের অনেক নীচে; দ্বিতীয়তঃ, ওর ছেলে একটা আকাট মূর্খ। শুধু কি তাই, এমন কোন দোষ নেই যা থেকে ও মুক্ত ছিল। প্রতি বছর একটা সময় যেত যখন ও পাগল হয়ে যেত। হাত-পা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে হ'ত। তার পর আস্তে আস্তে ভাল হ'ত, তখন আর পাগল বলে চেনা মুশকিল। বছর ঘুরলেই আবার তেমনি।

"কর্ত্তার পরামর্শদাতার অভাব নেই। সবাই উপদেশ দিতে লাগল যে, সুন্দর দেখে বউ ঘরে আনলে ওর পাগলামি হয়ত ঘুচবে, ওতে রথ দেখা কলা বেচা দুটোই হবে। বংশরক্ষাও ত চাই। কেউ কেউ বলেছিল চরিত্রও নাকি শুধরে যেতে পারে! পারিষদরা ত হেসেই খুন, আরে ব্যাটাছেলের ওটা আবার একটা দোষ নাকি।

"যাই হোক, এসব নীতির জন্য আমাদের মাথা ঘামাবার কিছুই থাকত না যদি না ভগবান আমাকে এমনি করে রূপবতী করে গড়তেন।

"বাবা শান্তভাবেই অমত জানিয়ে পাঠালেন। কিন্তু প্রবলের কাছে দুর্ব্বলের মতামতের কোন মূল্যই নেই। প্রচুর অর্থ, দালান-কোঠা—আজীবন দুঃখের অবসান, কত প্রলোভন ছড়াতে লাগল কর্ত্তা বাবার সামনে—সবই ব্যর্থ হতে লাগল। সোজা পথে কাজ হচ্ছে না দেখে তিনি বাঁকা পথ ধরলেন। আত্মীয়-স্বজন আমার বাবা মায়ের সামনে আজীবন দুঃখ-যন্ত্রণার অবসানের নানা সুন্দর ছবি তুলে ধরতে লাগলেন। তাঁদের মন টলল না—মন যেন তাঁদের আরও শক্ত হয়ে উঠতে লাগল।

"আগেই বলেছি ঋণের দায়ে আমাদের বসতবাটী পর্য্যন্ত বাঁধা ছিল। ওটাও বাবার উপক্রম হ'ল। কিন্তু আমাদের বাস্তুহারা করলে কর্ত্তার স্বার্থসিদ্ধি হয় না, তাই বোধ হয় উনি দয়া করে ওটা করলেন না। তবে বাস্তুহারা হবার ভয়টাও সামনে তুলে ধরলেন।

"একে একে সমস্ত বাণই লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল দেখে কর্ত্তা রাগে ফুলতে লাগলেন। কিন্তু এদিকে কিছুদিনের মধ্যেই আমার নামে কলঙ্ক রটতে লাগল, যেমন বয়স্থা অনূঢ়া মেয়ের নামে গ্রামদেশে রটে, বিশেষতঃ তারা যদি গরীব হয়। তার উপর জমিদারের খোশামুদে পারিষদদের ইঙ্গিত ও প্রশ্রয় ত আছেই। কিন্তু জমিদারকর্ত্তা এতটা চান নি। তাঁর ভাবী পুত্রবধূর নামে এ জাতীয় কলঙ্ক-রটনা তিনি পছন্দ করলেন না। তিনি এসব বন্ধ করতেও চেষ্টা করলেন। কিন্তু এ বড় ঝামেলা, একবার সুরু হলে...। যথাসময়ে আমার বাবার কানেও এসে পৌঁছল। বাবা নিষ্ফল ক্রোধে ফেটে পড়লেন, মা অন্নজল পরিত্যাগ করে ঘরের কোণে নীরবে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। শুভাকাঙ্ক্ষী স্ত্রী-পুরুষ কেউ কেউ আমাদের বাড়ীতে স বাবা মাকে সহানুভূতি জানিয়ে পরামর্শ দিয়ে গেলেন যে, এ

'যেখানেই হোক অবিলম্বে মেয়ের বিয়ে দাও। আর দেরি নয়, জাত, ধর্ম্ম সব গেল। পারলে দুটোকেই বিদেয় কর।'

"জমিদার আমাদের বিরুদ্ধে আছে জেনে গ্রামের সকলেরই যেন সাহস বেড়ে গেল। গ্রামের দুর্বৃত্ত ছোকরারা ইসারা, ইঙ্গিত, সুরু করলে। সেটা বেশী দিন চলল না।

"ঘটক-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব বেড়ে উঠল। এরা বাবাকে বোঝাতে লাগল যে, বাবা যতই বলুন না কেন, তাঁর পিতৃকুল আসলে খুব উঁচু নয়। আমরা যদিও আদিতে খুব নির্দ্দোষ নৈকষ্য-কুলীন ছিলাম, কিন্তু ক্রমে এত দোষ জমেছে যে, এখন আর কুলীনই বলা চলে না।

"ক্রমশঃ অত্যাচার বেড়ে উঠতে লাগল আমার বাবার উপর, আমাদের সমস্ত পরিবারকে লক্ষ্য করে। প্রতিদিনকার অভাব-অনটনের দুঃখ-বেদনা এর তুলনায় ম্লান হয়ে গেল। বাবা-মার মুখের দিকে তাকাতে পারতাম না।

"এক এক সময় মনে হ'ত গলায় দড়ি দিয়ে সব দুঃখকষ্টের অবসান করে দিই। মনকে ভাল করে বুঝে দেখলাম সাহসের অভাব নেই। ভাবলাম দেখি এক বার পরীক্ষা করে, আমার জীবন্ত সমাধিতে সমস্ত দুঃখকষ্টের অবসান হয় কিনা।

"বাবাকে প্রায়ই কাছারিবাড়ী ডেকে নিয়ে যাওয়া হ'ত; জমিদারদের ডেকে আনাই ছিল ধরে আনা। যখন ফিরে আসতেন তাঁর দিকে তাকাতে পারতাম না। সেখানে কি হ'ত তার বিশদ বিবরণ কেন, সামান্য মাত্র ঘটনার কথাও বাবা কোনদিন মুখ ফুটে বলেন নি। না বললে কি হয়, তাঁর দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা শতমুখে নীরব ভাষায় জানাত সেখানকার কাহিনী।

"বার্দ্ধক্য, অনটন, আর অত্যাচার ক্রমে বাবাকে যেন পঙ্গু করে ফেলল। বাবার প্রতিরোধ-ক্ষমতা ভেঙে যেতে লাগল। এক দিন জমিদার নোটিশ দিলেন বাস্তুভিটা ছেড়ে দিতে হবে, পরদিন সকাল বেলায় পাইক, পেয়াদা, বরকন্দাজ যাবে সবাইকে বের করে দিতে। আমাদের কি হবে ভেবে বাবা আকুল হলেন।

"তাঁর মত তেজস্বী লোকেরও শেষ পর্য্যন্ত পরাজয় বরণ করতে হ'ল—একা আর তিনি কতদিনই বা ঠেকাতে পারেন। বাবা শেষ পর্য্যন্ত সায় দিলেন।

"শুভস্য শীঘ্রম। পাত্রপক্ষ কালবিলম্ব না করে বিয়ের আয়োজন করে ফেলল। বরকে আসতে হবে আমাদের বাড়ীর আঙ্গিনায় মালাবদল করতে। কিন্তু আমাদের বাড়ী-ঘরের চেহারা কর্ত্তাদের মর্য্যাদা বাড়াবার মোটেই অনুকূল ছিল না। হঠাৎ দেখলাম যেন ভুঁই ফুড়ে লোকজন, মালমশলা যোগাড় হ'ল। চালে টিন উঠল, বেড়া নতুন হ'ল। মোটামুটি ভালই দেখায়। এতদিন যারা এ বাড়ীর পাশ দিয়েও হাঁটে নি তারা উপযাচক হয়ে এসে অনাগত সুখ-সম্পদের ইঙ্গিত দিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে যেত। মনে হ'ত ওরা বলতে চায় লোকের বরাত এমনিই খোলে!

"বিয়ের দিন পাকাপাকি হয়ে গেল। শেষরাত থেকে শানাইয়ের সুর যেন আমাদেরকে ব্যঙ্গ করতে লাগল। পাড়াপ্রতিবেশীর বউরা এসেছে ভোরের মাঙ্গলিক কার্য্য সমাধা করিয়ে দিতে, উলু-ধ্বনিতে বাড়ী কাঁপতে লাগল।

"সকাল থেকেই লোকজন হাঁক-ডাক। হালুইকর মিঠাই তৈরি করছে, জেলে দিয়ে পুকুর হতে মাছ ধরা হচ্ছে। বড় বড় রুই আর কাতলা। তিন-চারটা বঁটী নিয়ে কচাকচ তরকারি কাটা হচ্ছে। এ সবের পেছনেই যে আমার ভাবী-শ্বশুরের পয়সা চক্‌চক্ করছে তা বোধ হয় আর বলতে হবে না।

"সারা দিনমান আমার মা বারে বারে চোখের কোণে কাপড় চেপে ধরে উদ্গত অশ্রু মোচন করছিলেন। বাবা উপবাসী, বৈদিক ক্রিয়ায় ব্যস্ত। চম্পা সারাদিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াল। আমার সামনাসামনি পড়লেই কেমন যেন থতমত খেয়ে যেত। মনোভাব গোপন করতে গিয়ে মুখে হাসি টেনে কোন কাজের অছিলা করে পালিয়ে যেত। সেই সুরু হ'ল আমার একলা জীবনের চলার পালা।

"রাত্তিরে ঘটা করে বর এল। হেজাক-বাতির আলোয় উঠোন জল জল করছে। সাড়ী, জরি, বাসন-কোসন, জিনিষপত্তর উঠোনময়। অপরের মনের কথা বলতে পারি নে, আমার মনে হচ্ছিল যেন এ সবই উপহাস। যাই হোক, শাস্ত্রীয় শুভলগ্ন উপস্থিত হ'ল। আমার হাত ধরে উঠোনে নিয়ে এল।

"যথারীতি বরের চারদিকে আমায় সাত পাক ঘোরাল। শুভদৃষ্টির সময় মুখ তুলে চাইতে পারলাম না। অনুমান করতে পারি বরের নির্ব্বোধ পাষণ্ডের মত দৃষ্টি আমায় গিলছিল, কিন্তু দৃষ্টিবিনিময় হ'ল না।

"বিয়ের হাঙ্গামা চুকতে বেশ রাত হ'ল। একই গাঁয়ে বিয়ে, কাজেই বরযাত্রীরা যে যার সরে পড়ল। এয়োরা ক্লান্ত হয়ে পড়ল এলিয়ে। আমি বাসরঘরে একা পড়লাম। ভয়ে বুক দুরু দুরু করতে লাগল। ঘরের এককোণে চুপটি করে বসে রইলাম। বর অনেক সাধ্য-সাধনা করল ওর পাশে গিয়ে বসতে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যেন ওর উৎসাহ উবে গেল। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

"কিছুক্ষণের মধ্যেই বর অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল। আমিও মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে নিদ্রার কোলে ঠাঁই নিলাম। দু'তিনবার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল সে রাত্রে কিসের শব্দে। প্রতিবারই নিজের সারা দেহের দিকে তাকিয়ে, ঘরের কোণে স্তিমিতপ্রায় মঙ্গল-প্রদীপ দেখে কেমন যেন একটা বেদনায় জর্জ্জরিত হচ্ছিলাম। আমার বান্ধবীদেরও কারুর কারুর বিয়ে আমার অনেক আগেই হয়ে গিয়েছে। তাদের লজ্জারক্ত মুখের 'পরে ভাবী সুখের যে ইঙ্গিত ফুটে উঠত আমার মুখে তেমন কোন চিহ্নই ফুটে উঠে নি। তা কি কেউ বুঝবে।

পর দিন যথারীতি সমস্ত মাঙ্গলিক কাজ শেষ হওয়ার পর বিকেলের দিকে শ্বশুরবাড়ী রওনা হলাম পাল্কী চড়ে। এক গাঁয়েই বিয়ে, কাজেই আমিও আর দূরে চলে যাচ্ছি নে, তবু মা

আশীর্ব্বাদ করতে গিয়ে আর চোখের জল রোধ করতে পারলেন না। সবাই মাকে বলল, এখন এমনি অলক্ষুণে কাজ করা ঠিক নয়! চারদিকে উলুধ্বনিতে কানে তালা লেগে যায়। আমি আর আমার স্বামী বাবাকে প্রণাম করলাম। বাবা নীরব। কি আশীর্ব্বাদ করলেন জানি না—আশীর্ব্বাদ করলেন কিনা তাও সেদিন বুঝতে পারলাম না।

"সবাই এসে একে একে আশীর্ব্বাদ করে গেল, কেউ-বা হাসি-মুখে বিদায় দিয়ে গেল। কেবল দেখতে পেলাম না চম্পাকে। মনে হচ্ছিল যেন ওকে অনেক কথা বলবার আছে। কিন্তু আজ চিন্তা করে দেখছি, সেদিন যাওয়ার মুখে ওর সঙ্গে দেখা হলে কিছুই বলতে পারতাম না। যাই হোক সেদিনকার ক্ষোভের মূল্য আজ আর বিচার্য্য নয়।

"শানাই, ঢোল, আর শাঁখ বেজে উঠল। পাল্কী এসে আমার শ্বশুরের প্রকাণ্ড অন্দরমহলের বাড়ীর আঙ্গিনায় থামল। যদিও একই গাঁয়ে বাড়ী তথাপি বাবার সঙ্গে বাবুদের মনকষাকষি থাকার দরুন ও বাড়ীর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না।

"চারদিকে লোক গিজ গিজ করছে। আলো দিয়ে সুন্দর করে বাড়ী সাজানো। পাল্কী থেকে নামব ত নিশ্চয়, কিন্তু নেমে যাব কোথায়! পাল্কীর পর্দা সরে গেল। কে যেন একজন বর্ষীয়সী মহিলা আমার হাত ধরে বললেন, নেমে এস মা।

"একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম সুন্দর করে চিত্রিত এক পিঁড়ের উপর, পাশের তেমনি আর একটা পিঁড়ের উপর দাঁড়াল আমার স্বামী। অনেক রকম স্ত্রী-আচার হ'ল। তার ফাঁকে ফাঁকে অনেক রকম মন্তব্যই কানে এল। কেউ বললে, বউ আনতে হয় ত এমনি। বাবুর চোখ আছে। কেউ বললে, একেবারে অবাক হওয়ার মত নয়। ঐ ত ধিঙ্গি মেয়ে, ছোটখাটো বউটি আসবে তবে না মানায়! আরও কত কি, আজ আর সব মনে নেই!

"নানান রকম হৈচৈয়ের মধ্যে রাত বেড়ে চলল। ক্রমশঃ বাড়ী নিঝুম হয়ে আসতে লাগল, আমার মন কেমন একটা আশঙ্কায় দুলতে থাকল। আমি যে ঘরে বসেছিলাম অনেক নারী-পরিবৃতা হয়ে সেখানেই আমারও খাওয়ার আয়োজন হ'ল। একসঙ্গে এত ভাল জিনিষ কেউ খায়, কিংবা খেতে পারে তার কোন ধারণাই আমার ছিল না। কিন্তু আমি সেদিন এক মুঠো ভাতের বেশী খেতে পারলাম না। খাওয়া শেষ হ'ল।

"আস্তে আস্তে মেয়েরাও সরে পড়তে লাগল। এক সময় আমার বৃদ্ধ শ্বশুর এসে ঘরে ঢুকলেন, তাঁর পিছনে পিছনে এলেন সেই মহিলাটি যিনি আমার হাত ধরে পাল্কী থেকে নামিয়েছিলেন। আবার আমার শ্বশুর এলেন কেন। মনে বড়ই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। ঐ মহিলার নির্দ্দেশে শ্বশুরকে প্রণাম করে মাথা নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম নির্দ্দেশের অপেক্ষায়।

"আমার ঘোমটা প্রায় চিবুক পর্য্যন্ত ঝুলে পড়েছিল। শ্বশুর তা কপাল পর্য্যন্ত টেনে দিলেন। আমি ঘেমে উঠলাম। তিনি আমার চিবুক ধরে মুখখানা তুলে ধরে বললেন, আমার দিকে তাকিয়ে দেখ মা। আমি তোমার অভাগা সন্তান।

"আমার আর বিস্ময়ের অবধি রইল না। মনে মনে ভাবলাম এই কি সেই বৃদ্ধ যার অত্যাচার আমার বাবাকে করেছে সঙ্কল্পচ্যুত। আমি স্বপ্ন দেখছি না ত! কিন্তু আমার অবাক হওয়ার পালার তখন কেবলমাত্র সুরু।

"তিনি বলতে লাগলেন, তোমাকে বরণ করে ঘরে তুলতে আমি ছাড়া আজ আর কেউ নেই। তোমার শাশুড়ী গত হওয়ার পর থেকে আমি একান্ত অসহায় হয়ে আছি। বাড়ীতে চাকর-বাকর, পাইক-পেয়াদা, আশ্রিত আত্মীয়-আত্মীয়ার অভাব নেই, কিন্তু ওরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। তারপর আমার ছেলে, তার কথা আর তোমায় কি বলব মা, বেঁচে সে আছে, কিন্তু তার সেই বেঁচে থাকাটাই যেন আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ! তুমি যে তেজস্বী বাপের মেয়ে আমার একান্ত বিশ্বাস তুমি পারবে তাকে মানুষ করতে।

"আজ থেকে আমি তোমার আশ্রিত। এখনও আমার বলা শেষ হয় নি মা। এই নাও চাবির গোছা। কথা শেষ করে বুড়ো আমার হাতে গুঁজে দিলেন প্রকাণ্ড বড় একটা চাবির গোছা। একটু থেমে আবার আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, আজ থেকে আমি, আমার ঐ অপদার্থ সন্তান আর যা-কিছু সামান্য ধন-সম্পত্তি পিতৃপুরুষ রেখে গিয়েছেন সবকিছুর দেখাশুনো আজ থেকে তোমাকেই করতে হবে মা।

"বৃদ্ধ আর কিছু বলতে পারলেন না। সাহস করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি তাঁর মুখ আবেগে আরক্ত। তাঁর কথার এক বর্ণও অবিশ্বাস করবার উপায় নেই। মনে হতে লাগল কে যেন বিশাল বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে।

"বৃদ্ধ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বললে, 'আজ অনেক রাত হয়ে গেছে, এবারে তুমি বিশ্রাম কর মা। আজ যে আমার কি আনন্দের দিন, কি সুখের দিন তা যদি তোমায় বুক চিরে দেখাতে পারতাম! দেখি আজ থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারি কি না।'

"কথা শেষ করেই উনি চলে গেলেন আস্তে আস্তে। মহিলাটিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি দরজার পাশেই দাঁড়িয়েছিল মধ্যবয়সী একটি বিধবা। সে ঘরে ঢুকে আমায় বলল, আসুন বৌঠাকুরাণী, আপনার শোবার ঘরে নিয়ে যাই!

"দু'তিনটা ঘর পার হয়ে একটা প্রকাণ্ড ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম। ঝাড় লণ্ঠনে ঘর আলোকিত। ঘরের মধ্যে বিশাল পালঙ্ক, তার ওর ধবধবে সাদা বিছানা। ঘরের আসবাবপত্র, দেয়ালে টাঙ্গানো নানাপ্রকার ছবি সবকিছুই আমার কাছে নূতন —সবকিছুই অদ্ভুত।

"বিধবাটি ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল। একটা প্রকাণ্ড বড় আলমারি দেখিয়ে বলল, 'বৌঠাকুরাণী ওটার মধ্যে কাপড়-

চোপড় আছে, বদলে নিন। আর রাত করবেন না। আপনি ভয় পাবেন না, আমি এ ঘরেই নীচে বিছানা পেতে শোব।'

"একটা কথা ভেবে আমার মন অনেকটা হাল্কা হ'ল এই যে, সেদিন ছিল কালরাত্রি, সুতরাং আমার স্বামীদেবতাটির সঙ্গে দেখা হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই আর দেরি না করে আলমারির পাট খুললাম। চোখে যেন ধাঁধা লাগল। যাই হোক, কোন রকমে কাপড় একটা বার করে নিয়ে এলাম। পাশের একটা ছোট ঘরে গিয়ে শাড়ী বদলে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

"হঠাৎ মনে পড়ল, শ্বশুরের দেওয়া চাবির গোছাটা আগেকার শাড়ীতেই বাঁধা আছে। চট করে উঠে গিয়ে ওটা খুলে আবার শাড়ীতে বেঁধে নিলাম। মনে মনে বিরক্ত হলাম—এ আবার কিসের শিকলে বাঁধা পড়লাম। ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন ভোর হয়ে গিয়েছে।

"কালরাত্রি প্রভাতের মাঙ্গলিক সমাধা করবার জন্য সবাই প্রস্তুত। সেদিন রাতেই হ'ল আমার ফুলশয্যা। সেই থেকেই সুরু হ'ল আমার ব্যথার কাহিনী—মনে হ'ল আমার নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ফেললাম···।"

"বল কি চম্পা ?" অবাক হয়ে মন্তব্য করলেন বিনুদা।

শম্পা দেবী দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে মুখে হাসির রেখা টানবার চেষ্টা করে বললেন, "তাই বটে! একের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে টাকার জোরে, গায়ের জোরে কোন রকম মন্ত্র পড়তে পারলেই যদি বিয়ে সিদ্ধ হয় তবে আর আমার বলবার কিছু নেই। কিন্তু যেখানে নেই মনের মিল, শ্রদ্ধার বাষ্পও যেখানে নেই, ভালবাসার কথা নাই বা তুললাম, সেখানে দেহের সম্পর্ক মিথ্যার উপরই প্রতিষ্ঠিত। জানি না তোমাদের শাস্ত্র কি বলে।

"তাই বলে মনে কর না আমি বলছি কামনা-বাসনা জলাঞ্জলি দিতে হবে। তা বিসর্জ্জন দেওয়া সহজও নয়, স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের লক্ষণও নয়। মানুষ হয়ে দেহধর্ম্মকে অস্বীকার করতে বলি নে। ভক্তি-শ্রদ্ধা, প্রেম-ভালবাসা যার মাধ্যমে জৈব ক্ষুধার নিবৃত্তি অপরিসীম তৃপ্তি লাভ করতে পারে, ঠিক তারই অভাব মানুষকে পশুর সঙ্গে সমান আসনে নামিয়ে আনে।

"যে লোককে আমি এক মুহূর্ত্তের জন্য একান্ত অজান্তেও শ্রদ্ধা করতে পারি নি, শ্রদ্ধা কিংবা প্রেমের সঙ্গে যার এক বিন্দু সম্পর্ক নেই তার সঙ্গে মন্ত্র পড়ে বিয়ে হলেও কোন দিন স্বপ্নেও তাকে স্বামী বলে ভাবতে পারি নি। কাজেই তারই স্ত্রী হয়ে বাস করাকে আমার নারী সত্তার অপমান বলেই আমি মনে করেছি। যেখানে পরস্পর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নেই সেখানে আবার বিয়ে কি ?"

শম্পা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল। বিনুদা বললেন, "হাসলে যে শম্পা! কি হ'ল ?"

শম্পা—"না হেসে কান্না পাওয়াই স্বাভাবিক ছিল। এইরূপ ক্ষেত্রে তাই হয়। তবে আমি বোধ হয় সংসারের বাইরের একটা অদ্ভুত জীব!

"আমার হাসি পেল এই ভেবে যে এ আমি কি করছি। এ যেন আমার ক্ষুব্ধ হৃদয়ের জ্বালা মিটাচ্ছি সমাজ, পরিবার ও আমার স্বামীর উপর তীব্র ভাষায় অভিযোগ জানিয়ে। যোর জীবনে ভরা-ডুবি হয়েছে তার নৈরাশ্যভরা হৃদয়ের প্রকাশ দুই রকমে হয়—হা-হুতাশ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, নতুবা কঠিন ভাষার কড়া কথায় সকলকে তুচ্ছ করে।

"আমি কিন্তু নিজের মনের সঙ্গে প্রথম থেকেই লড়াই করে আসছি। আমার মনের নৈরাশ্য, ক্ষোভ, ব্যর্থতাবোধ, অভিযোগ—সমস্ত আমি দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করলাম। যে যে ঘটনার ফলে যা যা ঘটেছে তা ঘটতই—এ ছিল অপ্রতিরোধ্য এই সমাজে, এই পরিবারে; এই রকম শিক্ষা-দীক্ষায় এরূপ ঘটনা ঘটলে আশ্চর্য্য হতে নেই। আমার নিজের মনের সঙ্গে সামান্য একটু বোঝাপড়া করতেই মন আমার শান্ত ধীর স্থির হয়ে এল। মনের ভিতরেই সব অর্গলবদ্ধ থাকুক এই স্থির করেছিলাম। আর বললে বুঝবেই বা কে বল। কিন্তু আজ সহানুভূতি ও প্রেমের যাদুস্পর্শে মন আমার উথলে উঠল, অর্গলমুক্ত হয়ে সব কথা বেরিয়ে এল।

"আমার কথা অনেক বললাম, বাবা, মা, চম্পা এদের কাহিনীও তোমাদের শোনাব। অবস্থার বিপাকে পড়ে বাবা আমার এই বিয়েতে সম্মতি দিয়েছিলেন। তাঁর অভাব অনটনও ঘুচল। কিন্তু তাঁর মনে ছিল না বিন্দুমাত্র শান্তি। আমার বিয়ের দু'তিন দিন পরেই এক রাতে চম্পা বাড়ী থেকে পালিয়ে যায়। খবরটা বাবা, মা কিছুদিন চাপা দিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু কোথাও আর ওকে খুঁজে পাওয়া গেল না। নানা রকমের কানাঘুষা চলতে লাগল। এজন্য পরোক্ষভাবে এক রকম সবাই বাবাকে দোষী করল। সকলেরই মত এই যে বিয়ে না দিয়ে বয়স্থা মেয়ে বাড়ীতে পুষে রাখলে এ রকমটা ঘটবেই।

"এর পরে বাবা একেবারে গম্ভীর হয়ে গেলেন। একথা সেকথা ভাবেন, মাঝে মাঝে ভ্রূ কুঞ্চিত করেন। এক রকম অদ্ভুত হাসি হেসে মুষ্টিবদ্ধ হাত শূন্যে ছুড়তেন,। দু'একবার মাকে বলতেন, 'দেখ কেমন সুখে আছি! অভাব-অনটন ঘুচল, বাড়ী-ঘর ঠিক রইল, কেবল মেয়ে দুটোকেই হারালাম—একটাকে দিলাম জ্যান্ত কবর, আর একটা যে কোথায় গেল।' মা কেঁদে বললেন, 'ও যে কোথায় গেল, বেঁচে আছে কিনা কে জানে।'

"বাবা বললেন, 'চম্পা! ও ঠিক আছে। ও বেঁচে গেছে! মরে গিয়ে থাকলেও বেঁচে গেছে।'

"বাবা দিনকয়েক কোথায় ঘোরাফেরা করলেন, তারপর একদিন আমার শ্বশুরের কাছে এসে বললেন, 'তোমার মত লোকের কাছে কোন দিক দিয়েই আমি ছোট থাকব না। এই নাও তোমার টাকা, এই নাও আমার বাড়ীর দলিল—এ আমি তোমাকে রেজেষ্ট্রি করে দিয়েছি। তোমার জন্য মেয়ে দুটোকে হারালাম, এখন সবই তোমার পেটে যাক।' বলে বাড়ী ফিরে এসে বললেন, 'সব শেষ করে দিয়ে এলাম।'

"মা তখন রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'পরে শুনবখ'ন রান্না হয়ে গেছে, তুমি স্নান করে এসে খাও।'

"বাবা মায়ের হাত ধরে বললেন, 'না, এ বাড়ীতে জলস্পর্শ করব না, এ বাড়ী আমার নয়। চল এই মুহূর্ত্তেই বেরিয়ে পড়ি।' বাবা আমার মায়ের হাত ধরে একবস্ত্রে দেশান্তরী হয়ে গেলেন।

"খবর শুনে অবধি সেদিন অনেকক্ষণ কেঁদেছিলাম। সারাদিন কিছু খাই নি। কিন্তু এই ভেবে সান্ত্বনা পেলাম যে, যে অপমানের কাছে তিনি মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছিলেন তাকে ঝেড়ে ফেলবার শক্তি আবার ফিরে পেয়েছেন। অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি হারিয়ে ফেলেন নি।

"শুনে খুব আশ্চর্য্য হলাম যে, আমার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ শ্বশুর নিজের কাছারিতে সকলের সামনে অপমানিত হয়েও একটা কথা বলেন নি। মাথা নীচু করেছিলেন।"

বিনুদা জিজ্ঞাসা করলেন, "ওরা এখন কোথায় আছেন?"

"তা জানিনে। জানবার জন্য মন খুবই উতলা ছিল। কিন্তু কে তাদের খোঁজ করবে, কি করেই বা সন্ধান মিলবে তার যেন কোন হদিসই করতে পারলাম না। ভগবানকে ডাকা ছাড়া আর কোন সহায়ই যেন মনে মনে খুঁজে পেলাম না।

"মেয়েদের বিয়ের পথেই আসে জীবনের পরম সার্থকতা। আমার বেলায় হ'ল গিয়ে তার ঠিক উল্টো। এর সূত্রপাত থেকে যে পথ মসীলিপ্ত তার শেষ মাথায় এসেও হারালাম সব—এমনকি নিজের সত্তাকেও। মা-বাপ হারালাম—হারালাম আমার সবকিছুর সাথী—আমার স্নেহের বোন চম্পাকে। কিন্তু তার বদলে পেলাম কি? পেলাম মানুষের দেহধারী একটা পশু, এক প্রবল-প্রতাপশালী জমিদার আর তার জমিদারীর উপর কর্তৃত্ব।

"চম্পার জন্য মনে মনে আমি বড়ই শঙ্কিত ছিলাম। আমি আমার গাঁয়ের বাইরে বিয়ের আগে কোন দিনই যাই নি। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যেই যে নিদারুণ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম তাতেই যেন মনকে পৃথিবীর বিরুদ্ধে বিশেষ করে পুরুষের বিরুদ্ধে তিক্ত করে তুলেছিল। দিবারাত্রি ভগবানকে ডাকতাম তিনি যেন সকল বিপদ থেকে চম্পাকে রক্ষা করেন।

"ভগবান আমার প্রার্থনা শুনেছিলেন কিনা জানি না। তবে এক দিন খামে করে এল আমার নামে একখানা চিঠি। আমার কাছে ত কেউ চিঠি লেখে না! হাতের লেখা চিনতে পারলাম না। তবে কি বাবা-মার খবর আছে এর মধ্যে মনের মধ্যে কত কি তোলপাড় করতে লাগল। তাড়াতাড়ি নিজের শোবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

"খামটা ছিঁড়ে ফেলে চিঠিটা খুলে ধরলাম। দীর্ঘ চিঠি। শেষের পাতাটা খুলে নীচের দিকে তাকিয়ে খুশিতে মন ভরে উঠল। এ যে চম্পা!"

"কি লেখা ছিল চিঠিতে"—জিজ্ঞেস করলেন বিনুদা।

"চিঠিটার সব কথা আজ আর আমার মনে নেই, তবে যা ও প্রকাশ করতে চেয়েছিল তার সবটুকুই আজও জ্বল জ্বল করছে—ও লিখেছিল: জীবনের একটা দিন পর্য্যন্ত—অর্থাৎ আমার বিয়ের আগের দিনটি পর্য্যন্ত—আমাদের এক দিনের তরেও ছাড়াছাড়ি হয় নি। হয়ত মনে আছে নিভৃতে আমাদের কথা হ'ত—আমরা আশঙ্কায় ব্যাকুল হতাম, যদি আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়। হয়ত তখন অলক্ষ্যে বিধাতা হাসতেন!

"কিন্তু বিয়ে হ'ল—সুরু হ'ল ছাড়াছাড়ির পালা। যে অবস্থার ঘূর্ণপাকে পড়ে মালা বদল হ'ল তাতে আমার মত মেয়ে সুখী হতে পারে না বলেই তার বিশ্বাস।

"আমাদের এই পচা পুরোনো সমাজের পরিবেশে, মেয়ে হয়ে জন্ম নিয়ে নিজেরাই যে কেবল ভাগ্যহীনের তালিকায় পড়ে গিয়েছি তা নয়, বাপ-মাকেও ফেলে দিয়েছি অসীম দুঃখকষ্টের মধ্যে। মেয়ের বাপ হয়ে তারা যেন দুনিয়ার কাছে মাথা বেচে দিয়েছে।

তবে ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলেই মানি যে এমন বাপ-মা পেয়েছিলাম। আমাদের জন্যই তাদের এই দুর্ব্বিপাক। কিন্তু একটা দিনের তরেও তাদের মুখে বিরক্তির আভাস দেখি নি। বরং লজ্জিত হতেন আমাদের আর দশ জনের মত সুখে রাখতে পারেন নি বলে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস তাঁদের আশীর্ব্বাদ আমাদের সকল বিপদে সাহস যোগাবে।

"আমরা কি অবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষ হয়েছি! নিদ্রায় জাগরণে একটা অসহায়ের ভাব বিরাজ করত। কৌলিন্য গৌরবের আমরা যতই ঢাক পেটাই না কেন, মনে মনে কেমন একটা আর্থিক দীনতার ভাব আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখত। তখন অস্পষ্টভাবে মনে হ'ত যে এর থেকে মুক্তি নেই। এসব কথা সে লিখেছিল।

"কিন্তু মুক্তির ইঙ্গিত এল আমার বিয়ের মধ্য দিয়ে। মনে মনে স্থির করে ফেললাম যে নিজেকে আর অবস্থার দাস করে রাখব না। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাব, লড়াই করব এর ঊর্দ্ধে উঠব। তার জন্য পালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল কি। তার উত্তরে সে লিখেছিল যে, যে পরিবেশের মধ্যে বাস করছিল তার বিরুদ্ধে মনে মনে গজ গজ করা যায়, কিন্তু বিদ্রোহ করা সহজ নয়।

"বিয়ের দিন সকাল থেকেই সে তার নিজের মনের সঙ্গে বোঝা-পড়া করে ফেলল।

"সে আরও লিখেছিল যে বিয়ে যদিও আমাকে ফেলে দিয়েছে গভীর অন্ধকারে, কিন্তু তারই অপরিসীম বেদনা তাকে ঠেলে দিয়েছে মুক্তির আলো হাতে দিয়ে।

"বাইরের দুনিয়াটা বড়ই অদ্ভুত। গাঁয়ের সবকিছু ছিল চেনা। বেরিয়ে সে দেখল এদেশ যেন সবই অচেনা। জমিদার আর প্রজার সম্পর্কই শুধু গাঁয়ের মধ্যে পাক খায়। পরিধি সীমাবদ্ধ। কিন্তু বাইরের দুনিয়ায় আছে অসংখ্য পরস্পরবিরোধী স্বার্থ।

"সে বলেছিল যে সে কি করছে তা প্রকাশ করবার দিন তখনও আসে নি। যদি অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয় ত নিশ্চয় জানাবে। তবে এইটুকু জানিয়েছিল যে 'আজ মনে হচ্ছে আজ যেন এক নূতন

জীবনের সন্ধান পেয়েছি। সেই দিকেই ছুটে চলেছি, জানি না শেষ পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছুতে পারব কিনা।"

"সে বিয়ে তখনও করে নি। যদিও বিয়ে করতে তার আপত্তি নেই, কিন্তু মানুষ যাচাই করেই বিয়ে করবে বলেছিল মনে মনে ইচ্ছা—আমার আশীর্ব্বাদ চেয়েছিল সেইজন্য।

"সে লিখেছিল, এক দিন ছিল যখন কারুর ঘরের বউ হয়ে জীবন কাটাব—স্বামীদেবতা কেমন হবে বা হবে না এই ছিল ভাবনা। কিন্তু আজ চোখের সামনে দেখছি যেন কিসের আলো—এক নয়া আদর্শ। ঐ আলোর দেশে যাওয়ার জন্য যাদের সাথী রূপে, বন্ধুরূপে পেয়েছি তারাও বড় অদ্ভুত। জীবনের সবকিছু সুখভোগের কামনা ত্যাগ করেই এরা এগিয়ে চলেছে, এরা সুখ-দুঃখকে সমানভাবে গ্রহণ করে। মনে এমন দুর্ব্বার বাসনা নিয়ে ঐ আলোর দেশে পৌঁছুতে পারব কি।

" 'হয়ত গাঁয়ের মধ্যে আমার নামে নানা রকম কানাঘুষা চলছে, তোর কানেও হয়ত তা পৌঁছেছে। বাবা-মার জন্যই কষ্ট হয় সবচেয়ে বেশী। ওরা হয়ত কত লাঞ্ছনা ভোগ করছেন এজন্য। কিন্তু কি করব বল। তোর অমন অবস্থা দেখে নিজে আর কিছুতেই ঠিক থাকতে পারলাম না।'

" 'কলঙ্কের কথা ভাবি নে, কেননা আর যে যাই বলুক না কেন, বিশ্বাস করুক না কেন, তুই কিছুতেই কোন দিন আমার সম্পর্কে এমনি কুৎসিত ধারণা করতে পারবি নে।

" 'যদি ভগবান দিন দেন তবে আবার তোদের কাছে এসে উপস্থিত হব নতুন দিনের খবর নিয়ে।' চিঠিটা পড়েই ছিঁড়ে ফেলতে বলেছিল। বাড়ী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সবকিছু পেছনে ফেলে দিয়েছে মায় নামটা পর্য্যন্ত। চম্পা বললে কেউ যাতে চিনতে না পারে।

"এই পর্য্যন্তই চম্পার ইতিহাস। এর পর আর কোন দিন ওর চিঠি পাই নি। আজও বেঁচে আছে কিনা তাও জানি নে। মনে হয় তোমরা ওর কোন খবর রাখতে পার। তোমাদের সমিতি ছাড়া এমন আশ্রয় আর কোথায় পাবে। মানুষ হওয়ার পথ এত উন্মুক্ত আর আছে কোথায়? সত্যি করে বল বিনুদা, ওর কোন খবর তোমরা রাখ না কি? জানলে গোপন কর না।"

"এমনতর কোন মেয়ের খবর তো জানি নে। বিশাল এই দেশ, তার কোথায় লুকিয়ে কে কাজ করে যাচ্ছে কে জানে। তবে এমন মেয়ে এই সমিতিতে থাকা অসম্ভব নয়। আমি যাদের চিনি তারা কেউ হয়ে থাকলে জানা সহজ হবে। নতুবা কঠিন। সমিতির প্রয়োজন ছাড়া একে অন্যের খোঁজ করাও আমাদের নিষিদ্ধ। ওর মত মেয়ে যে কোন সমিতিরই গৌরবের বিষয় বোন"—মন্তব্য করলেন বিনুদা।

—"তাই যেন হয়, তাই তোমরা আশীর্ব্বাদ কর। আমার জীবন ব্যর্থ হোক, কিন্তু ও নিজের সৌরভে পৃথিবী মাতিয়ে তুলুক এই আমার আকুল প্রার্থনা।

"সেদিন চিঠি পড়া শেষ করে অনেকক্ষণ নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেঁদেছিলাম। আমাদের সমস্ত পরিবারের উপর ভগবানের এই কি অপরিসীম অভিশাপ!"

ক্রমশঃ

পশ্চিমবঙ্গের ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে দুই-একটি কথা

শ্রীশিবশঙ্কর দত্ত

১৯৫১ সনের আদমশুমারির হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে শহরের সংখ্যা ১১৪টি। শহরের লোকসংখ্যা ৬১,৫৩,০০০। সমগ্র লোকসংখ্যার প্রায় সিকি ভাগ শহরবাসী। শহরবাসীদের মধ্যে শতকরা ২৯ জন ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। অথচ মাত্র ৪০টি শহরে ব্যাঙ্ক আছে। লোকসংখ্যা হিসাবে শহরের সংখ্যা ও ব্যাঙ্কের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল:

লোকসংখ্যা	শহরের সংখ্যা	যে কয়টি স্থানে ব্যাঙ্ক আছে	ব্যাঙ্কের সংখ্যা
এক লক্ষ বা তাহার উপর	৭*	৩	১৬৭
৫০,০০০—১ লক্ষ	১৪	১০	২০
১৫,০০০—৫০,০০০	২২	৯	২৮
১০,০০০—২৫,০০০	৪৫	১৪	১৬
৫,০০০—১০,০০০	১৫	৩	৩
৫,০০০ এর কম	১১	১	২
অন্যান্য		৩	৩

* বর্ত্তমানে টালিগঞ্জ কলিকাতা পৌরশাসনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় শহরের সংখ্যা কমিয়া ৬ হইয়াছে।

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, বহু শহরে ব্যাঙ্ক নাই—এমনকি যেখানে এক লক্ষর উপর অধিবাসী, এইরূপ তিনটি স্থানেও একটি ব্যাঙ্ক নাই। আবার যেখানে ব্যাঙ্ক আছে সেখানে কলিকাতা বাদ দিয়া দুটি-তিনটি ব্যাঙ্ক আছে।

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার সহিত ব্যাঙ্কের (মায় শাখা সমেত) সংখ্যার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ১,৩৫,০০০ লোকপিছু একটি ব্যাঙ্ক আছে। পশ্চিমবঙ্গে সে তুলনায় প্রতি ১,৪৪,০০০ লোকপিছু একটি ব্যাঙ্ক বা তাহার শাখা আছে। বোম্বাই, মাদ্রাজ, পঞ্জাব এমন কি মধ্য ভারত, মহীশূর, পেপসু, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনও পশ্চিমবঙ্গকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

মাথাপিছু ডিপজিটের বা আমানতের পরিমাণ পশ্চিমবঙ্গে ৭০.৯ টাকা। এদিক দিয়া একমাত্র বোম্বাই পশ্চিমবঙ্গকে ছাড়াইয়া

গিয়াছে। বোম্বাইয়ে মাথাপিছু ডিপজিট ৭৫·৫ টাকা। আর মাথাপিছু এডভান্সের পরিমাণ পশ্চিমবঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—৪৯·৭ টাকা—বোম্বাইয়ে মাথাপিছু ৪৫·১ টাকা। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কেবল কারবারী লোকেই ব্যাঙ্কে টাকা রাখে ও ধার লয়। জনসাধারণ ব্যাঙ্কে টাকা তেমন জমা রাখে না।

সমগ্র ভারতে ও পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্কের (শাখা সমেত) সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

	ইম্পীরিয়ল ব্যাঙ্ক	এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক	তপশীলী ব্যাঙ্ক	অন্যান্য	মোট
ভারতে	৪২২	৬৫	২,২০৫	১,৩৪৪	৪,০৩৬
পঃ বঙ্গে	২২	২০	১৫৭	৬২	২৬১

এই প্রসঙ্গে সমগ্র ভারতের ব্যাঙ্ক সম্পূর্কিত একটি পরিসংখ্যান পাঠকগণের গোচরে আনিব। পশ্চিমবঙ্গে আলাদা পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। ৫৫৭টি ব্যাঙ্কের মধ্যে ২০৪টি ব্যাঙ্কে unclaimed deposit (দাবিদারহীন আমানত) পড়িয়া আছে। এই দাবিদারবিহীন আমানতের পরিমাণ ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা। কাহারা টাকাটা ফেলিয়া রাখিয়াছে তাহা নিম্নের পরিসংখ্যান হইতে বুঝা যাইবে :

	একাউন্টের সংখ্যা	টাকার পরিমাণ লক্ষে	একাউন্ট প্রতি গড় টাকা
কারেন্ট একাউন্ট	৪৫,৬৭৮	৩২	৭০
সেভিংস ,,	১,১৮,২১৯	৭২	৬১
স্থায়ী জমার ,,	৭২১	৩৪	৪৭২০
অন্যান্য ,,	৪,৮৯৩	৬	১২

তপশীলী ও তপশীলী-বহির্ভূত ব্যাঙ্কে ব্যক্তিগত একাউন্টে যে টাকা জমা রাখা হয় তাহা কারেন্ট একাউন্ট ও সেভিংস একাউন্ট এবং টাইম ডিপোজিট হিসাবে বিভক্ত। এই বিভিন্ন প্রকার ডিপজিটের অঙ্ক অনেক ভাবিবার খোরাক যোগাইয়া দেয় :

	তপশীলী ব্যাঙ্কে টাকা লক্ষে	শতকরা	তপসীলী বহির্ভূত ব্যাঙ্কে টাকা লক্ষে	শতকরা
কারেন্ট একাউন্ট	১১২,৯৬	১৩	২,৫৬	৪
সেভিংস ,,	১৩৩,৩১	১৬	৮,৮০	১৭
টাইম ডিপজিট	১৪১,০৭	১৭	১৯,৯৯	৩৮
সর্ব্বপ্রকারের ডিপজিট	৮২৩,০৮		৫২,৬২	

সেই তুমি

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

দেখেছি তোমার অপূর্ব্ব রূপ,
আননে মধুর হাসি,
দেখেছি চরণে ঝরিয়া পড়িতে
শুভ্র কুসুমরাশি।
উর্দ্ধে দেখেছি অসীম নীলিমা,
অম্বরতলে তোমার প্রতিমা,
গোধূলি-প্রভাতে শুনেছি তোমার
সন্ধ্যা-আরতি বাজে,
দেখেছি তোমারে আনন্দময়
শান্ত মাধুরী মাঝে।

ভেবেছি শুধুই শ্যামল শষ্পে
রেখেছ চরণরেখা,
ভেবেছি শুধুই স্বর্ণশস্যে
লিখেছ সোনার লেখা।
অজস্র ওই জ্যোৎস্নাধারায়
কোন্ দিগন্তে চিত্ত হারায়,
ভেবেছি চন্দ্রালোকিত রাত্রে
তোমার আবির্ভাব,
সুন্দর যাহা তাহার মাঝারে
হেরেছি তোমার ভাব।

পেয়েছি আলোকে, খুঁজি নি তোমায়
যেথায় অন্ধকার,
ভয়ঙ্করের দিক হ'তে মুখ
ফিরায়েছি বার বার।
তোমারে হেরেছি পুষ্প-বিকাশে,
তোমারে হেরেছি শারদ আকাশে,
দুর্ব্বার যাহা, যাহা দুরন্ত,
তাহার মাঝারে নয়,
ছোট ছোট সুখ-দুঃখ-মিশানো
শুধু সেই পরিচয়।

হেরিলাম—এ কি তোমার মূর্ত্তি !
লোক-লোকালয় ভাসে,
দিকে দিকে বহে প্রবল বন্যা
প্রলয়-কলোচ্ছ্বাসে।
মানুষ নিঃস্ব, আশ্রয়হীন,
এতটুকু তার আশা নাই ক্ষীণ,
ডোবে জনপদ পল্লী নগর,
স্রোতোনিমগ্ন ভূমি।
কোথায় শান্ত প্রসন্ন হাসি,
এ কি তুমি, সে-ই তুমি ?

গঙ্গোত্রী যমুনার উৎস সন্ধানে

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

যমুনোত্তরীর পথে জানকীমাঈ চটি ছাড়বার পর ভৈরবঘাটির চড়াইটা যেমন আচমকা সামনে এসে দাঁড়ায়—গঙ্গোত্তরীর পথে এ ভৈরবঘাটির চড়াইটা ঠিক সে রকম নয়। সঙ্গম পেরিয়ে যাই—ভাগীরথী বামে এসে পড়েন। সঙ্গমের পর কিছু দূরে একটি বার্ত্তা-ফলক, তাতে লেখা আছে 'রোড টু নেলাং'—হরশিলায় যে তিব্বতীদের দেখে এসেছি তাদের আসা এই পথ দিয়ে। একটি সরু সীমান্তরেখার মত রাস্তা জাটগঙ্গার ধার বরাবর লামাদের দেশে চলে গেছে, দূর থেকে সেই পথের হাতছানি ক্ষণিকের জন্যে উন্মনা করে তোলে। এই বার্ত্তাফলকও পেরিয়ে এসে পড়লাম আসল ভৈরবঘাটির চড়াইয়ের মুখে।

এই চড়াই প্রসিদ্ধ চড়াই—দেয়ালের গায়ে লাঠিকে দাঁড় করিয়ে তা দিয়ে সরাসরি উঠে যাওয়াও যা, আমাদের সামনের ভৈরব ঘাটির উপরে উঠে যাওয়াও তাই।

তবে ভগবানের রূপ যেমন দুর্য্যোগের ঘনঘটার মধ্যে তেমনি তাঁর রূপে ত বরাভয়ও আছে—সেই ত সান্ত্বনা, সেই ত মানুষের সকল দুর্য্যোগ এড়িয়ে যাওয়ার একমাত্র সম্বল। মানুষকে যেমন জাল ফেলে জড়িয়েছেন তেমনি তার থেকে মুক্তির পথও খোলা রেখেছেন তিনি। তা না হলে এ সব চড়াই, এ সব বাধা আমরা পেরিয়ে যেতাম কি করে? দুর্ঘটনার সম্ভাবনা যেখানে পদে পদে, বুকের রক্ত জল হওয়ার আশঙ্কা যেখানে ব্যাপক, সেখানে কৈ দুর্ঘটনা ত ঘটে না। চড়াইয়ের বাধাও ত পেরিয়ে যাই। কোনো কোনো যাত্রীর ভেতর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর স্পর্দ্ধা এবং দুঃসাহস এসে যায়, অনুভূতির সবটুকু দিয়ে বোঝা যায় বিপদের পর স্বর্গলাভ, যুদ্ধের পর জয়মাল্যের পুষ্পসম্ভার।

তাই যেমন করে বুকে হেঁটে যমুনোত্তরীর ভৈরবঘাটি পেরিয়েছিলাম তেমনি কখনও বসে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে, ভৈরবঘাটি পাহাড়ের উপরে গিয়ে উঠি। তিন মাইলের এই দুরারোহ চড়াই অতিক্রম করতে আর এক দফা চরম পরীক্ষা দিতে হয়। মাতৃস্বরূপিণীর আশীর্ব্বাদে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই···শেষ হয়ে যায় চড়াই। আমাদের আশা সফল হয়। তীর্থযাত্রাকে উপলক্ষ্য করে পুণ্যসঞ্চয়ের ঝাঁপিতে পুষ্পস্তবক স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে।

চড়াই ভেঙে এই প্রসিদ্ধ পাহাড়টির উপর যখন উঠলাম তখন মনে হ'ল যাক্—এসে গেছি। ভয় নেই আর, ঝালা থেকে যখন রওনা হই তখন মনে সঙ্কল্প ছিল, একটানা হেঁটে ভৈরবঘাটিতে গিয়ে উঠব, আর সেখানেই রাত্রিটা কাটাব। ভৈরবঘাটির অদ্ভুত নির্জ্জনতার কথা যেন কোন বইয়ে পড়েছিলাম, তাই ইচ্ছে ছিল যদি স্থান সঙ্কুলান হয়, তা হলে সেই নির্জ্জনতার ছবিকে আমিও গ্রহণ করব সমস্ত অন্তর দিয়ে, তাই ভৈরবঘাটির আকর্ষণ বড় কম ছিল না। কিন্তু উপরে উঠে এসে দেখি রাত্রিবাসের কোন উপায় নেই। চটি নেই—অর্থাৎ যা আছে তাকে বলা চলে চটির ছায়ামাত্র। এক ফালি টিনের তলায় সঙ্কীর্ণ আশ্রয়টুকুতে মাথা গুঁজে থাকার কল্পনা বৃথা। এটি ছাড়া টিমটিমে চায়ের দোকান চোখে পড়ে···চা ছাড়া গরম দুধও এখানে মেলে। আধ ঘণ্টা এখানে বসি।

এখান থেকে গঙ্গোত্তরীর মন্দির ছ'মাইল। একটানা রাস্তা—চলার ভেতর না আছে ক্লান্তি, না আছে অবসন্নতা···শুধু লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে গেলেই হ'ল। সেই দেওদার আর তার পত্র-গুচ্ছের স্নিগ্ধ ছায়া···এটুকু পথ যেন উড়তে উড়তে যাওয়া। যমুনোত্তরীর শেষ পথটুকু যেমন গহ্বরের ভেতর ঢুকে গেছে—গঙ্গোত্তরীর আগে এই ছ' মাইলের ভেতর সে রকম বন্ধুরতার নাম-গন্ধও নেই। চার মাইলের মাথায় পাহাড়ের এক অদ্ভুত রূপ চোখে পড়ে—এ রূপটি প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মা-গঙ্গা দুটি পাহাড়ের পাশ দিয়ে এমন ভাবে বেঁকে চলে গেছেন যে মধ্যেকার বিস্তীর্ণ এক ভূখণ্ড জঙ্ঘার আকার ধারণ করেছে। দূর থেকে দেখলে মানুষের জঙ্ঘাই মনে হবে, অন্য কিছু নয়। গঙ্গার অপর নাম জাহ্নবী···জহ্নুমুনির জঙ্ঘা থেকেই তিনি প্রবহমাণা,

তাই ঐ নাম। বেশ বোঝা যায়, গঙ্গার মূল প্রবাহ এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে পুরাকালে বয়ে গিয়েছিল—এখন যে ভূখণ্ড পড়ে রয়েছে তারই অতীত ঐতিহ্যের ছায়া বলা যায়···প্রবাহ অনেক দূর দিয়ে চলে গেলেও জজ্বার আকৃতিটি রেখে গেছে। এখানে অনেকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যুগযুগান্তরের গঙ্গার উৎপত্তির ইতিহাসটি যেন মনের ভেতর ছবির মত ফুটে ওঠে। আমার দেখাদেখি আরও অনেকে এসে দাঁড়িয়ে যায়, আর তারাও প্রাণ ভরে এই দৃশ্যটি দেখতে থাকে। এ অঞ্চলে প্রত্যেকটি জিনিষের পৃথক সত্তা আছে—এ ভূখণ্ডের আশ্চর্য্য রূপটিতে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পরিস্ফুট। সাদা সাদা পাথরে আকীর্ণ সমগ্র অঞ্চল···এরকম পাথরও কখনও চোখে পড়ে নি আমার।

ছ' মাইলের এই পথও শেষ হয়ে যায়···এসে যাই গঙ্গোত্তরীর তীর্থভূমিতে।

এখানে মানুষের ভিড় অল্প নয়, গঙ্গোত্তরীতে কতকটা শহরের আবহাওয়া—বস্তুতান্ত্রিকতার ছাপ পড়েছে যেন। যমুনোত্তরীতে যে নিরাভরণতা, এখানে তা নেই। তার কারণ সহজবোধ্য—অর্থাৎ, দুর্গম ও দুরূহ পথের প্রকট রূপ যমুনোত্তরীতে যতটা, গঙ্গোত্তরীর পথে তেমনিধারা নয়। সেখানে সেই রূপে কতকটা প্রসন্নতা এসেছে। মানুষ এখানে এসে জড়ো হয়েছে, পাণ্ডারা ভিড় জমিয়েছে···ঘরবাড়ী গড়ে উঠেছে বিপুল সংখ্যায়। অবশ্য বদরিকায় যে ভিড়, এখানে সেই তুলনায় কিছুই নয়, কিন্তু মনে হয়—এক দিন এ স্থান শ্রীক্ষেত্রের রূপ নেবে। ধর্ম্মশালা একটা নয়, স্থানসঙ্কুলানের প্রশ্নই উঠে না—একটিকে বেছে নিলেই হ'ল। কমলীবাবাই আমাকে স্থান দিয়েছেন সর্ব্বত্র—এখানেও সেই দাতা-কর্ণকেই বেছে নি। গঙ্গোত্তরীতে ঢোকার আগে ধর্ম্মশালা, দোকানপাট ইত্যাদি···তার পর ভাগীরথী-চুম্বিত মন্দির—মানুষের কোলাহল থেকে একটু দূরে।

অবশেষে এসে গেলাম ভগীরথের স্মৃতিপূত গঙ্গোত্তরীতে···লাঠির ওপর ভর দিয়ে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে। স্বপ্ন হ'ল সার্থক, ইচ্ছা হ'ল পূরণ। কোন দিন কি ভেবেছিলাম যে, এক দিন এক দিকে যমুনোত্তরী ও এক দিকে গঙ্গোত্তরীতে আমার পায়ের চিহ্ন পড়বে? কখনও কি ভেবেছিলাম যে জীবনের এই মহান ব্রত উদযাপনের সুযোগ পাব?

অসম্ভব সম্ভব হ'ল—অসীমকে সীমার মধ্যে পেলাম। অন্য কিছু নয়, সেই একটিমাত্র কথা—যার নাম যোগাযোগ। এটি না এলে জীবনে কোনকিছুই সম্ভব নয়—এর আসা বাঁধভাঙা বন্যার জলের মত···এ অমোঘ, এ অনিবার্য্য। যখন এই যোগাযোগ উপস্থিত হয় না, তখন বুঝতে হবে মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও কিছু মিলবে না, মিলবে না কোন দুর্লভ সম্পদ—কূপমণ্ডুকের মত গতানুগতিকতার অনুবর্ত্তন করতে হবে। কিন্তু মানুষ জানে না—মহাব্যোমের মহারহস্যের ভেতর বসে বসে কলকাঠি নাড়েন এক জন—মানুষ চলে সেই ভাবে। নাস্তিকতার যুক্তি দিয়ে মানুষ বলবে কলকাঠি নাড়ার মালিককে যখন চোখ দিয়ে দেখা যায় না তখন মানার প্রশ্নও ওঠে না···বাস্তব গড়ে তোলার প্রশ্নও ত অর্থহীন।

কি করে বোঝাই, কি করেই বা এর বিশ্লেষণ করি! যোগাযোগ যে কি—ব্যক্তিবিশেষের জীবনে তার প্রভাব কতখানি তার চুলচেরা হিসেব করি কি করে?

কত চেষ্টা, কত ইচ্ছা করেও আসা হয় নি—গোটা ভারতবর্ষ ঘুরেছি, তার বেলায় কোন বাধা আসে নি, এসেছে মহাতীর্থ পরিক্রমণের সুরুতে। বাধার পর বাধা—বন্ধনের পর বন্ধন···কিছুতেই কিছু হয় নি, আকাঙ্ক্ষা অচরিতার্থ ই থেকে গেছে। শুধু মাথা খুঁড়েছি—পাষাণ-বিগ্রহ পাষাণই থেকে গেছে।

তার পর কোথাও কিছু নয়, ডাক এল। কেদার ডাক দিলেন, সেই সঙ্গে বদরীবিশাল। যে বন্ধনের জন্যে জীবন-ইতিহাসের পাতার পর পাতা শূন্যে অলিখিত হয়ে উড়ে গেছে, তা আচমকা জোড়া লেগে গেল। যোগাযোগ লিখে দিল এক উজ্জ্বল অধ্যায়···একটু কম্পন হৃৎপিণ্ডের ভেতর—তার পরেই একছুটে কেদার ও বদরিকা।

সেখানে এক ইঙ্গিত, যে ইঙ্গিতে কাঁধের উপর বৈরাগ্যের ঝুলি উঠে যায়, সংসার থেকেও থাকে না। সেখানে কি পেয়েছি, তার পুনরাবৃত্তি এখানে বৃথা।

তার পর একটা বৎসর···আবার সেই কেঁপে ওঠা, আবার সেই তৃষ্ণা।

ডাক এল, যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরী ছুটে এল উল্কার মত—জীবনের তীর্থপরিক্রমা আবার সুরু হয়ে যায় আমার।

কি করে বোঝাই এ অসম্ভব সম্ভব হওয়ার তত্ত্বকে, কি করেই বা জানাই ডাক না এলে কোনকিছু মানুষের জীবনে সম্ভব নয়।

ধর্ম্মশালায় সুন্দর একটি ঘর মিলল। কাঠের বাড়ী, দোতলার উপর ঘর, সামনে একফালি বারান্দা। বিশ্রামের আশায় চুপচাপ শুয়ে ছিলাম, সামনে দরজাটা খোলা—ধরম সিং অভ্যাসমত চা আনতে গেছে। ভাবছিলাম এটা-ওটা আর সামনের গঙ্গার দিকে চেয়ে ছিলাম—সামনেই কাঠের ব্রীজ ওপারের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করে রেখেছে, ব্রীজের পরই বালিয়াড়ি ক্রমোচ্চভাবে উঠে গেছে—একটি ছোট্ট কুটীর দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ নজরে পড়ল একটি নারীমূর্ত্তি ঐ কুটীর থেকে বেরিয়ে এসে কাদের সঙ্গে যেন কথাবার্ত্তা বললেন, মনে হ'ল তারা যাত্রী। শুয়ে শুয়ে এপার থেকে পরিষ্কার ভাবেই দেখা যাচ্ছিল সবকিছু। কুটীরটির রং গৈরিক, ছবির মত যেন। কে ঐ নারী? কেনই বা ওরকমভাবে বেরিয়ে এলেন? এলোমেলো চিন্তাগুলোর মধ্যে কিসের একটা তাগিদ এল যেন। বেলা ত এখন চারটে—গঙ্গার ওপারটা একটু ঘুরে এলে মন্দ হয় না, মন্দির দর্শন এখন থাক। চা নিয়ে ঘরে ঢুকল ধরম সিং। বললাম, "চল ওপারটা একবার দেখে আসি।"

এর পরে নূতন কাহিনীর সূত্রপাত—এখান থেকেই গঙ্গোত্তরীর সাধুপ্রসঙ্গের সূচনা বলা চলে। ভেবেছিলাম গঙ্গোত্তরী মন্দিরের ও

গোমুখের কিছু কিছু বর্ণনা দিয়েই আমার ভ্রমণকাহিনীর উপর যবনিকা টেনে দেব, কিন্তু আদেশ অমোঘ, এ আদেশ লঙ্ঘন দিয়ে কেবলমাত্র গঙ্গোত্তরীর ছবি আঁকা। একটির সঙ্গে আর একটি অবিচ্ছেদ্য।
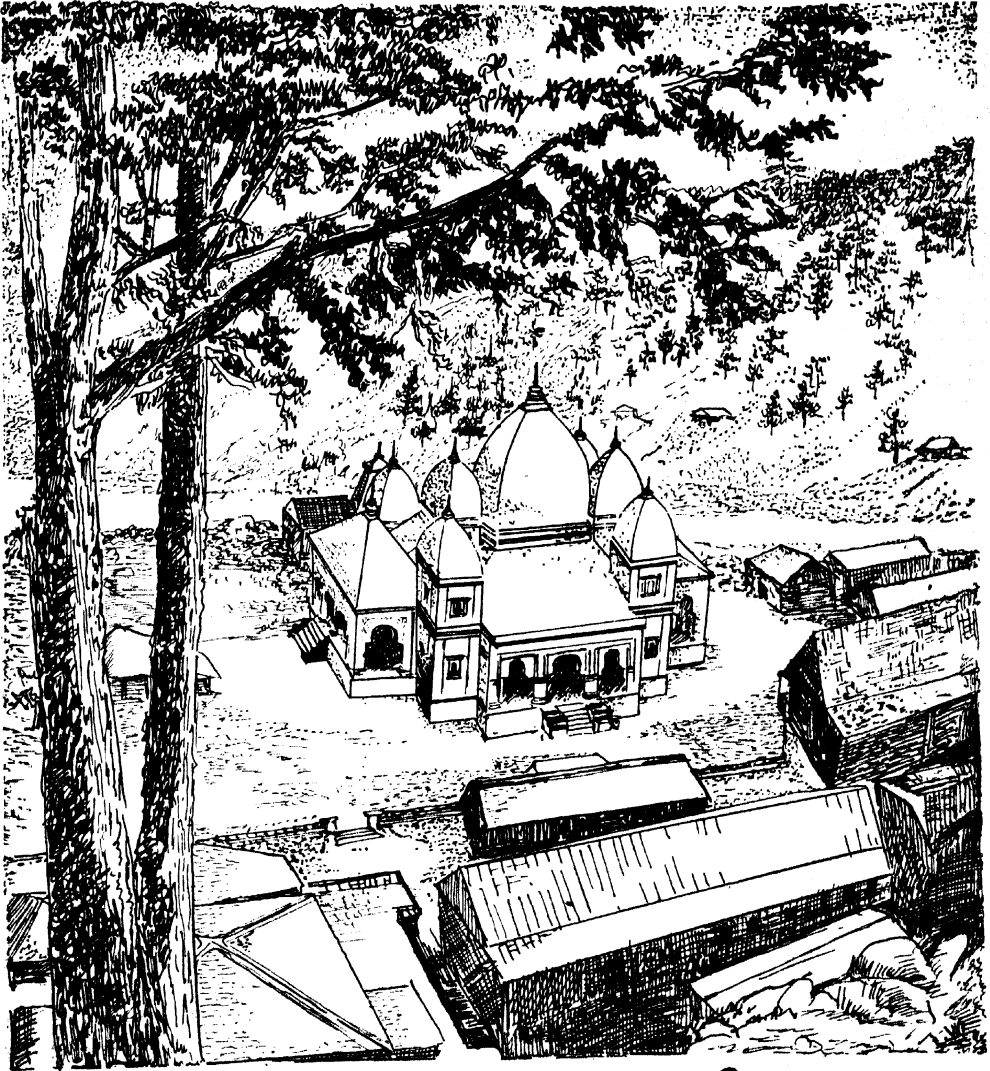
গঙ্গোত্তরীর মন্দির

করার ক্ষমতা আমার নেই। কার কাছ থেকে এ আদেশ এসেছে, সেকথা এখানে বলতে চাই না। আমি শুধু এই কথাই বলি যে, জানাতে আমাকে হবেই। মস্তিষ্ককে বিচ্ছিন্ন করে অবয়বের গঠন যেমন চলে না, তেমনি চলে না এ মহান্ তীর্থের সাধুপ্রসঙ্গকে বাদ

কিন্তু মুশকিল আছে—আর সেই সঙ্গে চিন্তা। এ চিন্তা হ'ল আমার কলম ঠিক উপযুক্ত কিনা—বিশ্লেষণ ও বর্ণনার মর্ম্মস্থলে ঠিকভাবে পৌঁছানো যাবে কিনা। কেননা যাঁদের দেখেছি তাঁরা মহৎ—তাঁদের ব্যাখ্যা শুধু কলম ও কালি দিয়ে সম্ভব হবে কিনা

তাও চিন্তার বিষয়। সবকিছুই কি লেখা যায়? বোধ হয় যায় না; আর যায় না বলেই 'গুহ্য' বলে কথাটির সৃষ্টি হয়েছে। ব্রহ্মতালের পথপ্রান্তে কিংবা খরসালীর সন্নিকটে সেই ফিকে সবুজ সাড়ী-পরা মায়াময়ীর বর্ণনার মত, গঙ্গোত্তরীতে বা গোমুখের পথের উপর কুড়ানো সম্পদের বর্ণনাও সম্পূর্ণ নয়—আংশিকমাত্র।

ধরম সিং নিল লণ্ঠন, আমি নিলাম টর্চ্চ—উদ্দেশ্য, মন্দিরের আরতি দেখে ধর্ম্মশালায় ফিরব। শীতবস্ত্রগুলোকে গায়ে জড়িয়ে নি', কেননা শীত এখানে প্রচণ্ড। ধর্ম্মশালা ছাড়িয়ে একটা চায়ের দোকান চোখে পড়ে—এখানে একটু বসি দ্বিতীয় বার চায়ের আশায়। এখানে এক জন দণ্ডীস্বামীর সঙ্গে আলাপ হয়, সবেমাত্র গোমুখ দর্শন করে তিনি ফিরছেন। এঁর কাছ থেকেই জেনে নি' পথঘাটের খবর, তুষারক্ষেত্রের রূপ, গঙ্গার প্রবাহের ইতরবিশেষের কথা। ইনি একাই গিয়েছিলেন—সঙ্গে ছিল একমাত্র গাইড, যা এখানে অনায়াসলভ্য। যাক্, এঁর কথা শুনে গাইড সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। দণ্ডীস্বামী রাজপুতানার সন্ন্যাসী। কথা-বার্ত্তার পর বুঝিয়ে দিলেন, বারাণসী পৌঁছে বিশ্বনাথকে দর্শন না করলে যেমন বারাণসী দর্শন ব্যর্থ, তেমনি গোমুখকে বাদ দিয়ে গঙ্গোত্তরীর মর্ম্মস্থলের রহস্যোদঘাটনও অসম্ভব। বললেন, যে সব যাত্রী কেবলমাত্র দুর্গমতার ভয়ে গোমুখ দর্শন না করে পেছন ফেরে, তাদের পুণ্যসঞ্চয় আট আনা হয়েছে মাত্র। মানুষটিকে ভাল লাগে, কথা বলে তৃপ্তি পাই। এখান থেকে উঠে নেমে এলাম গঙ্গার ধার-বরাবর—সামনেই কাঠের পুল, পেরিয়ে ওপারে এলাম।

এপারে এসে দাঁড়াতেই সমস্ত দিনের পথচলার অবসাদ যেন দূর হয়ে গেল। মনে হ'ল আবহমানকাল ধরে এই গঙ্গোত্তরীতেই আমি মানুষ হয়েছি। খানিকটা পথ উপরে উঠে গেছে, বিচ্ছিন্ন দেওদারের ছায়া গোটা বালিয়াড়ির বুকের উপর···খানিক দূর চলার পর সেই গৈরিক কুটিরের সন্ধান মিলল, যাকে ধর্ম্মশালা থেকে দেখে আমার মনে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কুটীরটি—অঙ্গনের ভেতর ঢুকতেই মাতাজীর দর্শন পাওয়া গেল। এঁরও গৈরিক বেশ—মধ্যবয়সী, মুখেচোখে দীর্ঘদিনের সাধনালব্ধ প্রশান্তির ছায়া। প্রণাম করলাম আমি আর ধরম সিং। মৃদু হেসে আমাদের বসতে বললেন। কথাবার্ত্তার সুরুতেই জিজ্ঞাসা করি ওঁর পরিচয় ও সামনের ঐ কুটিরের কথা। তিনি শান্ত স্বরে বলতে থাকেন, "কুটিয়া কে অন্দর যো মহাত্মাজী তপস্যা মে লগে হুয়ে হৈঁ—উনকা নাম হ্যায় কৃষ্ণস্বামী। তীশ সাল সে ইসী গঙ্গোত্তরী কো কেন্দ্র বনা ওয়হ য়হাঁ হৈঁ,—ঔর ইস তীশ সালকে অন্দর করীব পচ্চিশ সাল ওয়ে অপনী সাধনা মে লগে হুয়ে হ্যাঁয়—।"

মাতাজী নিজের নাম বলেন ভগবৎপ্রসাদ। চমকে উঠি নামের বৈচিত্র্যে, কিন্তু কিছু না বলে জানতে চাই সাধুটির সাধনমার্গে আসার আগেকার কথা, তাঁর নামগোত্র পরিচয়। এড়িয়ে যান মৃদু হেসে, আমাদের কাম্য জিনিষের পথ করে দেন—সাধুদর্শনের আকাঙ্ক্ষা এঁরই সাহায্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে। রুদ্ধ দ্বার মাতাজীই খুলে দেন, ভেতরটায় আলো-আঁধারির সংমিশ্রণ। কেমন যেন গা সির সির করে ওঠে, ভেতরে প্রবেশ করি যন্ত্রচালিতের মত। দু'এক পা এগোতেই পিঠের ওপর কার যেন হাতের মৃদু চাপ পড়ে—বুঝি, মাতাজীর ডান হাত কাঁধের উপর, বসবার ইঙ্গিত করছেন। আবিষ্টের মত বসে পড়ি, পায়ের তলায় মসমস করে ওঠে কি সব, বুঝি এগুলো ভূর্জ্জপত্র—সারা মেঝের উপর ছড়ানো। প্রণাম করি ভূমিষ্ঠ হয়ে—কপালে দু-একটা পাতা লেগে যায় আমার।

ক্যামেরার লেন্সের মত আমার চোখ দুটো সামনে উপবিষ্ট মূর্ত্তির উপর নিশ্চল হয়ে যায়। সংখ্যাতীত ভূর্জপত্রের উপর সোজা হয়ে বসে আছেন কৃষ্ণস্বামী, পত্রগুচ্ছই এঁর আসন, 'বাঘ-ছালের বালাই নেই। জটার স্তূপের তলায় প্রশস্ত ললাট, সরু বাঁশীর মত নাক, চিবুকের তলা থেকে মুখের জ্যোতির্ম্ময় প্রসন্নতা অনির্ব্বচনীয়। কেমন যেন মনে হয়—এ মুখে বাংলাদেশের ছাপ, কিন্তু অনুসন্ধানের সূত্র মেলে নি। চক্ষুদ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত—মণি দুটি নিশ্চল ও নিথর, অতল রহস্যে তা লীন হয়ে আছে। সম্পূর্ণ নিরাবরণ প্রশান্ত স্থির মূর্ত্তি, হাত দুটি আলগাভাবে কোলের উপর ন্যস্ত। যোগমগ্ন কৃষ্ণস্বামী, প্রপঞ্চ আত্মা ব্রহ্মে স্তব্ধ হয়ে আছে। অনেকক্ষণ বিভোর হয়ে চেয়ে থাকি শুধু, অধীর হয়ে পড়ি এই ভেবে যে কি এক মহাশক্তির আকর্ষণে জীবনের দীর্ঘ ত্রিশটি বৎসর নিরুপদ্রবে কেটে যায় এঁর—কেন কাটে, আর এই কেটে যাওয়ার পটভূমিকায় কি বা আছে? দিন নেই, রাত নেই···সমগ্র চরাচর আত্মার ভেতর দিয়ে সমাধিতে এসে একটি বিন্দুতে স্থির হয়ে গেছে কৃষ্ণস্বামীর। এ মূর্ত্তির কাছ থেকে কথা? তার থেকে পাথরের উপর মাথা খোঁড়া ভাল। নিঃশব্দে বেরিয়ে আসি আর একবার প্রণামের অঞ্জলি রেখে।

কুটিরটির বাইরে এসে কোনও ভূমিকা না করে মাতাজীকে গঙ্গাদাসের কথা জিজ্ঞাসা করি। নামটি শুনেই তিনি চমকে উঠেন; বলেন, "আপকো ইনকী খবর কিসনে দিয়া।" আমি উত্তরকাশীর উপকণ্ঠের বিমলানন্দের কথা বলি, জানিয়ে দি, তার সঙ্গে দেখা হওয়াটাও একটা বিশেষ যোগাযোগের ফল, আর তিনিই গঙ্গাদাসের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি এইটুকু বলেছেন যে, গোমুখের পথেই তিনি থাকেন—পথ ভীষণ, তবে সত্যানুসন্ধানের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ থাকলে দেখা পাওয়া সম্ভব। মাতাজী কি যেন ভাবেন; তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমার আপাদমস্তক একবার দেখে নেন, মুখে চোখে কিসের একটা জ্যোতি ফুটে উঠে—তার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন, "তুম সকোগে?" বলি, "অগর গুরুজী কা আশীর্ব্বাদ রহে তো কেঁও ন সকুঙ্গা।" কয়েকটি মুহূর্ত্তের নৈঃশব্দ্য, মাতাজী বলতে থাকেন, "গঙ্গোত্তরী মন্দির কে পিছে রখ দক্ষিণ-পূব কী ওর যো রাস্তা গোমুখ কে লিয়ে নিকল গয় হৈঁ উসকে দুসরী তরফ হী ওয়ে রহতে হৈঁ। ওয়ে বড়ে সাধু হৈঁ উনকে দর্শন সে আপকা জীবন সার্থক হোগা। রাস্তা বড়ী খারাপ হৈঁ কই এক জগহ তো রাস্তা, হী নহী হৈঁ—পথ বনা কর আগে বঢ়না পড়ে গা। বরফো আগে

য়হী রাস্তা থা গোমুখ যানে কে লিয়ে, পর গঙ্গাজীকী ধারা ধীরে ধীরে বদলতী গই, উর ওর্সে সড়ক ভী টুটতী গঈ। উনকী কুঠিয়া গঙ্গাজীকে কিনারে পর হী হৈঁ—।”

মাতাজী চুপ করে যান। এইটুকুই ত যথেষ্ট—ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে এই পথনির্দ্দেশই জীবনে দুর্লভ বস্তুর সন্ধান এনে দেবে। প্রণাম করে আমরা উঠে পড়ি।

এই কুটিরটির পাশ দিয়ে আর একটি সরু পথ গঙ্গার ধার-বরাবর উত্তর দিকে চলে গেছে। এ পথ আলাদা পথ, কেমন যেন মিল নেই অন্য রাস্তাগুলোর সঙ্গে। দৃষ্টির সামনে দেওদারের যে ঘন জঙ্গল দেখতে পাচ্ছি, একটা অনতিস্পষ্ট হাতছানি দিয়ে এ পথটা ঐ জঙ্গলের মধ্যে যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিসের একটা সাড়া পাই রক্তের ভেতর। বিমলানন্দ বলেছিলেন, গঙ্গার অপর পারে দেওদারের যে জঙ্গল তার মধ্যেই আত্মগোপন করে থাকেন রামানন্দ, হয়ত বা এই সরু পথ ধরে গেলেই মিলবে রামানন্দের আস্তানা। পা চালিয়ে দি, ধরম সিংকে বলি, “উধার চলিয়ে।”

গঙ্গার তীরভূমির দু'পাশে আকীর্ণ যে সকল পাথরের রূপ দেখতে দেখতে আসছি, তার ভেতর কালো পাথরের ভগ্নাংশই বেশী। কৃষ্ণস্বামীর কুটির অদৃশ্য হওয়ার পর এই বেখাপ্পা পথটি সুরু হ'ল গঙ্গাকে পাশে রেখে, খানিকটা আসার পর আচমকা পট-পরিবর্ত্তনের মত কালো রঙের প্রস্তর-সমাকীর্ণতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, জাহ্নবীর গৈরিক-প্রবাহের দু'পাশে দেখা দিল অতি শুভ্র পাথরের মায়া, স্মৃতির ভাণ্ডারে যা এক অক্ষয় সঞ্চয়। যত দূর দৃষ্টি চলে শুধু সাদা আর সাদা, যেন শুভ্র রঙের মেলা বসে গেছে। ছোট-বড় সাদা পাথরের বালিয়াড়ি···তার মধ্যে দিয়ে ভাগীরথী বয়ে চলেছেন, মূর্ত্তিমতী তপস্বিনীর মত···এ যে কি দৃশ্য তা বোঝাই কি করে? গঙ্গোত্তরীমার্গের এই নয়নাভিরাম রূপ, এ রূপ সার্থক রূপ, মহত্তম রূপ—এ রূপের তুলনা নেই। জাহ্নবীগর্ভে বড় বড় পাথর যেন দ্বীপ-রচনা করে রেখেছে, আর সেগুলোতে প্রতিহত হয়ে প্রবাহের যে কলোচ্ছ্বাসের মূর্চ্ছনা, তা শুনতে শুনতে ঘুম এসে যায়···মনে হয় ফিরব না, সংসার অবলুপ্ত হয়ে থাক, জীবনের বাদবাকী ক'টা দিন মায়ের এই স্নেহাঞ্চলের আশ্রয়েই কাটিয়ে দেব। কিছুক্ষণ এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখতে দেখতে চলার পর এক অপরূপ দৃশ্য চোখে পড়ে, এমনটি যে দেখব তা ছিল অপ্রত্যাশিত। সামনে দেখি প্রবাহের রূপ, প্রপাতের রূপ—গতিশীল ধারা এক আকুল উচ্ছ্বাসের আনন্দে একটি বিরাট সাদা পাথরের উপর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে—দূর থেকে দেখলে মনে হয় এ যেন বিশাল শুভ্র কোন এক মহাশক্তির আধারের বুকের উপর যজ্ঞোপবীতের বন্ধনী। কল্পনা করা চলে এ মহাশক্তি—স্বয়ং মহাদেব যিনি গোমুখের কাছে গঙ্গার বেগকে জটাজালের ভেতর ধারণ করেছেন। গঙ্গার প্রবাহের এ শাশ্বত মূর্ত্তি আর কোথাও দেখি নি—এখানে মানসপটে যে ছবিটি ধরা পড়ে সেটি হচ্ছে এই যে, জটাজূটসমাচ্ছন্ন মহেশ দণ্ডায়মান, এক হাতে তাঁর ডমরু আর এক হাতে ত্রিশূল···ভগীরথ যুগযুগান্ত ধরে তপস্যায় সমাধিস্থ···আকাশের দূর নীলিমার মহাব্যোমের ভেতর থেকে মা-গঙ্গা নেমে আসছেন পৃথিবীতে, প্রবাহের সে দুর্নিবার বেগ ধারণ করবার জন্যেই ত শিব, গোমুখে মহেশের উর্দ্ধভাগ—এখানে তাঁর বক্ষদেশ।

শুধু তাই নয়, আর একটি কল্পনাও মনে আসে। সেটা আর কিছু নয় জহ্নুমুনিকে কেন্দ্র করে কল্পনার রূপটি। ভৈরবঘাটির চড়াইয়ের শেষে গঙ্গোত্তরী মন্দিরের পথে, এক মাইল আগে, দূর থেকে গঙ্গার অপর পারে পাহাড়ের যে আকৃতির সঙ্গে ভাগীরথীর অদ্ভুত রূপ দেখেছি, এখানে সেই দেখার চরম সার্থকতা। যে অতি বৃহৎ শুভ্র প্রস্তরখণ্ডের বুকের উপর দিয়ে প্রবাহিণী নেমে আসা—তার সঙ্গে মানুষের জঙ্ঘার সাদৃশ্য বর্ত্তমান। মনে হয় ঠিক এই অঞ্চলকে ঘিরেই মহামুনি জহ্নুর আশ্রম ছিল, আর ঠিক এইখানে বসেই তিনি একটিমাত্র অঞ্জলিতে গঙ্গাকে পান করেছিলেন। সগররাজার যে আরাধনা, শাপমুক্ত হওয়ার যে তপস্যা আর সেই তপস্যার ফলে ভাগীরথীর সেই মুক্তিপর্ব্ব—সবই যেন ঘটেছিল এখানে। পাথরটিকে সারা জীবন মনে থাকার কথা, আর থাকবেও। মনে হয় গোটা মহাভারতের ভাগীরথী-আখ্যানের পাতাগুলো এখানে এলোমেলো-ভাবে পড়ে আছে। এই পাথরটির দু'পাশে দুটি সাদা পাখী চোখে পড়ে, মুখোমুখি হয়ে বসে আছে। দুটির পাশ দিয়ে চলে যাই—ওরা নড়ে না। ওরা কারা কে জানে? অনামী দুটি পাখী, অজানা ওদের ইতিহাস।

কিছু পরেই সেই দেওদার জঙ্গলের সুরু। বিশাল বিশাল সংখ্যাতীত মহীরুহ উঠে গেছে ঊর্দ্ধাকাশে। অপূর্ব্ব নির্জ্জন পরিবেশ, গঙ্গার কলধ্বনিও এখানে নীরব। রামানন্দকেই ভাবতে ভাবতে চলেছি, সন্ধ্যার আর বেশী দেরি নেই, মনে হচ্ছে দর্শন কি মিলবে না! বিমলানন্দ ত এই জঙ্গলেরই বর্ণনা করেছিলেন, এইখানেই ত তাঁর থাকার কথা। ধরম সিং পেছনে পেছনে আসছে, তারও মুখে কথা নেই, সেও একটা কিছু ঘটবার সম্ভাবনায় মূক হয়ে গেছে। কোথাও কিছু নেই, একটি বিরাট দেওদারের মূলকাণ্ডের আড়াল থেকে হঠাৎ দৈত্যের মত একটি বিরাট মানুষ বেরিয়ে এল। আমাদের সামনে দেখতে পেয়েই অদ্ভুত ভঙ্গীতে কটমট করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মানুষটি পেছন ফিরে হনহনিয়ে হাঁটতে সুরু করলে। দেখতে পেলাম সাত ফুট লম্বা এক বিশাল লোমশ পুরুষ—দিগম্বর—হাতে একটা বিরাট লাঠি। দুটি পায়ের পাতা অস্বাভাবিক স্থূল ও বৃত্তাকার। বিমলানন্দের বর্ণনার সঙ্গে সবটাই দুয়ে দুয়ে চারের মত মিলে যায়···কোন ভুল নেই··· ইনিই রামানন্দ, ইনিই যোগসিদ্ধ মহাসাধু···গাছের পাশ থেকে এর আচমকা বেরিয়ে আসা আর তাকানোর ভঙ্গী, তারপর প্রস্থানের ব্যাপারটি, সবকিছুই অদ্ভুত। অবশেষে রামানন্দের সাক্ষাৎ মিলল, ওঁর পিছু পিছু আমি আর ধরম সিং এগিয়ে চলি। আমরা পিছু নিয়েছি কি না সেটা একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিলেন রামানন্দ, তারপর যখন দেখলেন আমরাও মন্ত্রমুগ্ধের মত এগোচ্ছি

তখন ধপ করে একটা পাথরের উপর বসে পড়লেন তিনি; ভাবখানা এই—এরা যখন ছাড়বে না তখন থামা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

পায়ের কাছে এসে তাঁকে প্রণাম জানাই—উত্তরকাশীর সেই বিষ্ণুদত্তের মতই একবার ডান হাতটি আশীর্ব্বাদের ভঙ্গীতে তুলে ধরেন—শুধু এইটুকু যা—কোন কথা নয়, কোন আদর-আপ্যায়নের সুর রামানন্দের কণ্ঠে বেজে ওঠে না। প্রকাণ্ড মুখ, মাথা জটা-বিহীন, বিষ্ণুদত্তেরই মত কাঁচাপাকা চুলে ভর্ত্তি। মাংসল স্থূল গ্রীবা বক্ষস্থল সুবিশাল—এমনটি সচরাচর দেখা যায় না। যোগাসনে বসার মতই তিনি বসে ছিলেন পাথরের উপর। চোখদুটো খোলাই রেখেছিলেন—তবে এ দৃষ্টিতে আগেকার সে ক্রোধবহ্নি নেই, আছে সেই ছল ছল ভাব! আর চোখের দৃষ্টির ভেতর যখন জিজ্ঞাসু মনের পরিচয় নেই তখন বাক্যালাপ করা বা কিছু প্রশ্নের কথা ওঠে না, তাই তৃপ্তিটুকু এই বিরাট অবয়বকে শুধু প্রাণ ভরে দেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গোত্তরী তীর্থভূমির শীতের প্রকোপে আমরা কাতর হয়ে পড়ি, সারা অঙ্গে শীতবস্ত্রের আচ্ছাদন—কিন্তু এ মূর্ত্তি যে একেবারে নিরাবরণ। ভোলানাথের আরাধনায় মানুষটাই ত ব্যোমভোলা হয়ে গেছে। বুঝতে পারি আধ্যাত্মিক মার্গে রামানন্দের প্রভাব কতখানি! বুকের ভেতর উপদেশ তথা ইঙ্গিতপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার যেন ঝড় বইতে থাকে—কিন্তু কণ্ঠে সুর আসে না, কণ্ঠ রোধ হয়ে যায় আমার।

আধ ঘণ্টা···একটা শতাব্দী যেন! সমুদ্রের ঢেউয়ের মত অনুভূতির পর অনুভূতির প্লাবন হতে থাকে···সেই মূকই হয়ে থাকি। তিনটি মানুষের মধ্যে কারুরই মুখে কথা নেই, সংখ্যাতীত দেওদারের শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ হতে থাকে শুধু।

স্বপ্ন টুটে যায়, উঠে পড়ি আমি আর ধরম সিং। বৃহৎ পা দুটি থেকে অঞ্জলির মত তুলে নি কিছু পদরেণু, তা ছোঁয়াই বুকে, কপালে মাথায়···ডান হাতটি আবার আশীর্ব্বাদের ভঙ্গীতে ওঠান খানিকটা, তার পর রামানন্দ উঠে পড়েন। পশ্চিমাংশে দেওদারের জঙ্গলের নিবিড়তার মধ্যে রামানন্দের সুবিশাল দেহটি অদৃশ্য হয়ে যায়। এবার দক্ষিণের পথ। যে পথ দিয়ে রামানন্দের সন্ধানে আসা, সে পথে প্রত্যাবর্ত্তনে বেশী সময় লাগবে—সন্ধ্যারও আর দেরি নেই, কাজেই ও পথ ছেড়ে দি। গঙ্গা থেকে অনেকটা দূরেই চলে এসেছি। এবার সমতল ভূমির সুরু, দেওদারবন শেষ হয়ে এল। খানিকটা পথ আসার পর বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত আর একটি কুটিরের সন্ধান পাওয়া গেল। সামনে একটিমাত্র খোলা দরজা, আশেপাশে জনমানবের চিহ্ন নেই। ধরম সিংকে নিয়ে সরাসরি ভেতরে প্রবেশ করি। দুটি মানুষের প্রবেশের ফলে কুটির-ভ্যন্তরের নৈঃশব্দ্য কতকটা ভগ্ন হয়। তৈজসপত্রের টুংটাং আওয়াজ হয়, বুঝি কুটিরটিতে যাঁর অধিষ্ঠান, জাগতিক ধর্ম্মের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায় নি। এখানেও মেঝের ওপর ভূর্জপত্রের আস্তরণ, যা প্রথমোক্ত কুটিরে দেখে এসেছি। বুঝতে পারি এ অঞ্চলে তপস্যাপূত জীবনের সঙ্গে ভূর্জপত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। নিশ্চিন্ত বুঝতে পারি এই অন্ধকারের মধ্যে মানুষ আছে। যন্ত্র-চালিতের মতই পত্রগুচ্ছের উপর বসে পড়ে উদ্দেশে প্রণাম জানাই। কোন সাড়া পাই না—না মানুষের, না অন্যকিছুর।

নিশ্চল হয়ে বসে আমি আর ধরম সিং অন্ধকারের নিবিড়তার মধ্যে মূর্ত্তি ও আসনের সন্ধান নিতে থাকি। কিছুক্ষণ এই ভাবে বসে থাকার পর কিসের একটা খসখস আওয়াজ হয়, মনে হ'ল, সম্মুখের দশ-বার হাত দূরে অধিষ্ঠিত মূর্ত্তিটি যেন একটু নড়ে উঠল। এক মিনিট, কি দু'মিনিট—চোখের সামনে অন্ধকারের পটভূমিকায় একগুচ্ছ দীর্ঘ দাড়ি ভেসে ওঠে। মুখ দেখতে পাই না, শরীরের অন্যকিছুও চোখে পড়ে না, কেবলমাত্র অবাস্তব জিনিষের মত ঐ অদ্ভুত দাড়িই দৃষ্টির সম্মুখে দেখা দেয়। কিছুক্ষণের জন্যে একটা নিস্তব্ধতা, তারপরেই গম্ভীর গলায় আওয়াজ—"তুম ক্যা মাঙ্গতে হো? কহাঁ ঘর হৈ তুমহারা?"

—"সাধু ঔর মহাত্মা কা দর্শন কে লিয়ে হী মেরা আনা হৈ। বঙ্গালমে মেরা ঘর হৈ—ম্যায় বাঙ্গালী হু।"

"দরশান সে কুছ নহী হোতা হৈ বেটা—করম চাহিয়ে। জপ ঔর ধ্যান কর—য়হী সব, মুক্তি কা রাস্তা হৈ বেটা। দিন রাত লাগাতার ধ্যান লগা, নহী তো গুরু কে গুরু কৈসে মিলেঙ্গে? তেরা জপ-ধ্যান যব নীদ মে ভী চালু রহে, তব সমঝকি ওয়ে মিলেঙ্গে।"

জিজ্ঞাসা করি—"ইস সংসার কে মনুষ্য কে লিয়ে কৌন সা পথ হৈ বাবা? আগে বঢ়নে কা উপায় ক্যা ওহী জপ ঔর ধ্যান?"

—"ওহী একহী রাস্তা হৈ। জীবনকে পল্ পল্ মে উনকী সুখ মে হী উনকো পানা হৈ বেটা। একদিন মে সব নহী হোতা হৈ। আপনা পহলে—জনম কা সুকৃত কা অভাব ন হোনে পর ইসী জনম মে সব সম্ভব হৈ। করম কিয়ে যা বেটা, সচ্চে পথ পর রহ। ঔর ধ্যান কো আগে বঢ়া।"

মূল গঙ্গোত্তরীর এই তিনজন সাধুর কথা আমার স্মৃতির পটে চিরকাল আঁকা থাকবে। গঙ্গাদাসের কথা স্বতন্ত্র, কেননা তিনি থাকেন গোমুখের পথে। কিন্তু মন্দিরকে কেন্দ্র করে যে পৌরাণিক তীর্থ-ভূমি, তার মধ্যে ঐ তিন জনই স্নিগ্ধ জ্যোতি বিকীর্ণ করছেন। রামানন্দের সন্ধান পেয়েছিলাম সুকৃতির ফলে। রামানন্দ ছাড়া অপর দুটি সাধুও কল্যাণকৃৎ, এদের দেওয়া আশীর্ব্বাদও যে-কোন মানুষের পক্ষে দুর্লভ। তৃতীয় সাধুটির নাম আমি জানতে পারি নি, অনেক চেষ্টা করেও নয়। সত্যি বলতে কি, গঙ্গোত্তরীর গঙ্গার অপর তীরভূমিতে সাধুর সংখ্যা বড় কম নয়···এ দেরও আমি দেখার চেষ্টা করেছি, বোঝার চেষ্টা করেছি, কিন্তু স্থানকালপাত্রভেদে তাঁদের সাধনার তত্ত্ব আমার কাছে অনধিগম্য থেকে গেছে। তাঁরা পাকা-পোক্ত ঘরবাড়ী তুলে বাইরে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে ভগবানকে পাওয়ার চেষ্টা করছেন—তাঁদের সঙ্গে দেখা হলে তাঁরাই ডাকেন,

যাত্রীদের ডাকতে হয় না। তাঁরা সহজলভ্য, তাই ভিড় সেখানে··· সহজেই সেখানে আসন মেলে। উত্তরকাশীর উজলীর সঙ্গে এ দের মিল অনেকটা। থাক এঁদের কথা—তবে পূর্ব্বোক্ত তিন জনকে যে বলা চলে গঙ্গোত্তরীমার্গের ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তাতে সন্দেহ নেই। শীতের সময় এ অঞ্চল যখন তুষারে ঢাকা পড়তে থাকে তখনও ঐ ত্রিমূর্ত্তি সাধনার দীপশিখা জ্বালিয়ে রাখেন, তখনও দেওদারের জঙ্গলে দিগম্বর রামানন্দ বিশাল শরীরটা নিয়ে বিচরণ করেন।

উজলী থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে উত্তরকাশীর বিশ্বনাথের মন্দিরে যেমন কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ শুনেছিলাম, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় না। সাধুদর্শনের পালা শেষ করে যখন মন্দিরে এসে যাই তখন ঢাকের শব্দ সুরু হয়েছে, সেই সঙ্গে আরতিও। ঢুকতেই প্রশস্ত নাটমন্দির···এখানে ঢাকের বাজনা চলেছে, গুম, গুম, গুম। নিস্তব্ধতার রাজত্বে শুধু এই আওয়াজ পরিবেশকে করে তুলেছে রহস্যময়। বড় বড় ঢাক শুধু. কাঁসরের আওয়াজ নেই, ঘণ্টারও নয়। এই নাটমন্দিরের সামনে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলে গর্ভগৃহ। স্বর্ণময় বেদী, আর ঐ বেদীর উপর নানা অলঙ্কারভূষিতা গঙ্গামূর্ত্তি, অন্য কোন মূর্ত্তি চোখে পড়ে না। একজন দীর্ঘকায় পুরোহিত কেবলমাত্র কর্পূরের দীপাধারের সাহায্যে মায়ের আরতি করছেন, নৃত্যের ভঙ্গীতে, তন্ময়তার প্রতিচ্ছবি যেন! শীতে জড়সড় হয়ে, গরম জামা-কাপড়ের স্তূপ হয়ে স্বর্গরাজ্যে মায়ের পূজো দেখি। বড় ভাল লাগে ঢাকের আওয়াজের সঙ্গে এ আরতি।

প্রধান মূর্ত্তির আরতি ও পূজা শেষে তন্ময় পূজারী দীপাধারটি নিয়ে নেমে আসেন, তারপর মন্দিরাভ্যন্তরের অন্যান্য মূর্ত্তির সামনে কিছুক্ষণের জন্যে থেমে থেমে আরতি করে যান। আলো-আঁধারির মধ্যে ওসব মূর্ত্তি দেখাও যায় না, বোঝাও যায় না। এর পর পুরোহিত এগিয়ে চলেন, পেছনে ঢাকের বাদ্যসহ যাত্রীদের শোভাযাত্রাও চলতে থাকে। এর পর সুরু হয় মন্দির-আরতি, যা দেখা জীবনের এক অভিনব অভিজ্ঞতা। ভারতবর্ষের বহু স্থানে তীর্থ-পরিক্রমার আশায় ছুটেছি, মন্দির দেখাও বড় কম হয় নি, কিন্তু ঠিক এ বস্তুটি কোথাও চোখে পড়ে নি। ইট-কাঠ এবং পাথরের মন্দিরও ভক্তিমার্গের বেদীতে সম্পূর্ণ মূর্ত্তির রূপই যে নিতে পারে তা জানা ছিল না। মন্দিরের প্রধান প্রবেশদ্বার দিয়ে বেরিয়ে সমগ্র মন্দির পরিক্রমা শেষ করে পুরোহিত আবার এসে থামেন প্রবেশ-পথেরই সামনে।

এর পর ঐ একটিমাত্র দীপাধারের অগ্নিশিখাকে পুরোহিত বহন করে নিয়ে আসেন গঙ্গা-প্রবাহের সামনে, পেছনে সেই ঢাকের বাজনা চলতে থাকে। নিস্তব্ধ নিশুতি রাত···দশ-বারখানা ঘর-বাড়ী থেকে দেখতে পাই ছোট ছোট আলোর বিন্দু, এ বিজন-রাজত্বে মানুষের অবস্থিতির ঐ যা একমাত্র পরিচয়, বাদবাকী বিশ্ব-সংসার অন্ধকারে যেন অবলুপ্ত হয়ে গেছে, আর এই মায়াময় পরিবেশের পটভূমিকায় জাহ্নবীর স্রোতোধারার সামনে মানুষের দীপাধারের আরতি এক অচিন্তনীয় দৃশ্য, তা দেখে মনে জাগে এক অপূর্ব্ব অনুভূতি।

নীরন্ধ্র অন্ধকারপূর্ণ রাত্রি, আকাশে সপ্তমীর একফালি চাঁদ, ছায়াপথ ও তারার মিছিল আর এর তলায় পুরোহিতের ভাগীরথী-পূজা···অপার্থিব ও অপূর্ব্ব, আমার রক্তকণিকার সঙ্গে এ সব জড়িয়ে যায়।

মন্দিরের পাশ দিয়েই ধর্ম্মশালার পথ, যেতে যেতে হঠাৎ বীর-বলদের সঙ্গে দেখা, ওরাও আরতি দেখে ফিরছিল। পূজার দৃশ্য-বৈচিত্র্যে সকলেই ডুবেছিলাম, তাই কারুর সঙ্গে দেখা হয়নি, হয়ত-বা সবকিছুই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখেছি। আমাকে দেখে ওদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দের যে বন্যা নামে তার তুলনা খুঁজে পাই না। ঝড়ের মত বীরবল ও তার মাতাজী উত্তরকাশী থেকে গঙ্গোত্তরীর মন্দির পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা যেভাবে বর্ণনা করে তাতে অভিভূত হয়ে পড়ি। বার বার এই কথাটাই জানায় যে, কোন চটিতেই তারা আমি সঙ্গে না থাকায় তৃপ্তি পায় নি, সব যেন মরুভূমির মত ঠেকেছে। বুঝি, দু'দিনের পথের পরিচয় চিরকালের পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কতকটা জোর করেই ওরা আমাকে মন্দিরে টেনে নিয়ে যায়—উদ্দেশ্য এ গঙ্গামূর্ত্তির সামনে আমাকে শপথ করিয়ে নেওয়া যে, ওদের দেশে আমি একবার যাবই, এটা ওদের দাবি, যে দাবিকে মেনে না নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। বললাম, "যাব···।" গোমুখ ওরা যাবে না, কালকেই রওনা হবে কেদারের পথে ভাটোয়ারী হয়ে। বীরবলের বড় আশা—ফিরতি পথে আমি তাদের সঙ্গ নেব আর তার জের চলবে কেদারনাথ ঘুরে বদরীবিশাল পর্য্যন্ত। এইখানেই প্রথম প্রকাশ করি যে, কেদারনাথ আমি যাব না, বদরীও নয়, বার দর্শন গত বৎসরেই শেষ হয়ে গেছে। বিষাদের ছায়া নেমে আসে ওদের মধ্যে।

বীরবলদের সঙ্গে বিচ্ছেদ এই মন্দিরের পর থেকেই। বুকের ভেতরটা আমার হু হু করে ওঠে। বোধ হয় এমনই হয়, এদের আমি কোন দিনই ভুলব না। ধর্ম্মশালায় যখন ফিরি তখন আটটা বেজে গেছে। গঙ্গোত্তরীতে প্রথম দিনের দর্শনাদি শেষ হ'ল।

ক্রমশঃ

আজিকার ইটালী

ইটালীর সৌন্দর্য্যের অলকাপুরী ভেনিস। এই প্রাসাদপুরীর ভিতরকার 'গ্র্যাণ্ড ক্যানাল' নামক খালটি ইহার সৌন্দর্য্যকে শত গুণে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। তীরস্থিত সুরম্য প্রাসাদসমূহের শোভা অতুলনীয়। খালের বুকে মনুমেণ্টগুলিও এক গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রাসাদমালা এবং মনুমেণ্টসমূহ সংরক্ষণের ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ সযত্নে এগুলির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। গত কয় বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি ভেনিসীয় প্রাসাদ পুনর্নির্ম্মাণ করা হইয়াছে এবং এগুলির ভিত্তিও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।

গ্র্যাণ্ড ক্যানেলের উপর দিয়া গণ্ডোলা নামক ইটালীয় নৌকায় চড়িয়া লোকেরা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করিয়া থাকে—দৃশ্যটি বড়ই চিত্তাকর্ষক।
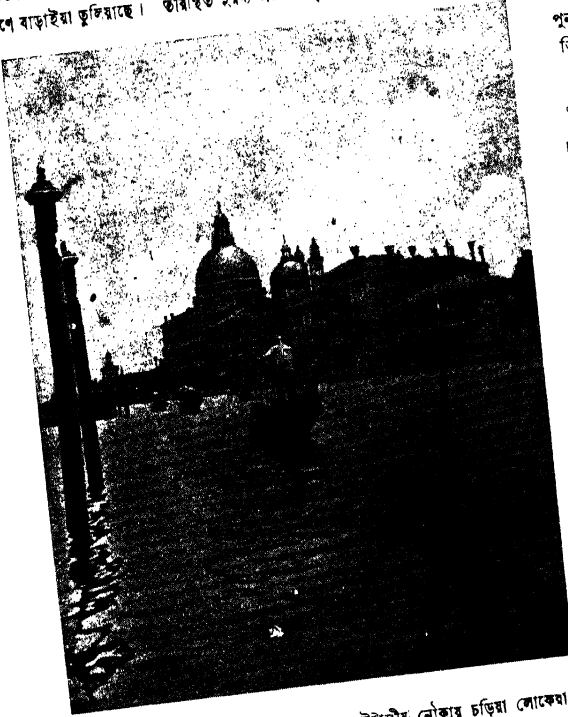
আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহায়তায় আজিকার ইটালী প্রগতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে সত্য, কিন্তু আজও পর্য্যন্ত ঐ দেশটি অনেকগুলি প্রাচীন প্রথাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। ইটালীয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এখনও যে সকল প্রাচীন প্রথা অনুসৃত হয়, নবাগতদের স্বাগত-সংবর্দ্ধনা-জ্ঞাপন তাহাদের অন্যতম। এই উৎসব-দিনকে বলা হয় 'নবাগতদের দিবস'। এতদুপলক্ষে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এবং নগরীর রাজপথে শোভাযাত্রা, রকমারি পরিচ্ছদধারীদের অভিনয়, মুখোশপরা ব্যঙ্গ-কৌতুক ইত্যাদি বিচিত্রানুষ্ঠান হইয়া থাকে।

ইটালীর আরও নানা উৎসবানুষ্ঠানে প্রাচীনের প্রতি ইহার অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। গত বৎসর পিয়াজ্জা দেল্লা সিগনোরিয়ার পালাজ্জো ভেচ্চিওতে অনুষ্ঠিত Haute couture-এর পঞ্চম ইটালীয় কংগ্রেসের অধিবেশনকালে দর্শকদের চিত্তবিনোদনের জন্য ষোড়শ শতাব্দীর একটি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ বিবাহ-অনুষ্ঠানের অভিনয় হয়।

'নবাগতদের দিবসে' রোমের ইউনিভার্সিটি সিটির প্রধান স্কোয়ারে বিচিত্র দৃশ্যের অবতারণা

দক্ষিণ ইটালীর উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী, পেস্তাম অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে একটি নূতন রাস্তা তৈরির কাজ চলিতেছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য্যের ফলে প্রাচীন যুগের নানা সম্পদের আবিষ্কার এবং নূতন কর্ম্মপ্রচেষ্টার জয়যাত্রা এই দুইটি পাশাপাশি চলিয়াছে আজিকার ইটালীতে। দক্ষিণ ইটালীর উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাসমূহ দ্বারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

বর্ত্তমান যান্ত্রিক যুগে যানবাহনের ক্ষেত্রেও ইটালী পিছনে পড়িয়া নাই। দীর্ঘকালব্যাপী অক্লান্ত প্রয়াসের ফলে ইটালীতে মোটরশিল্পের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। গত অর্দ্ধ শতাব্দীকালের মধ্যে এদেশে অনেক নূতন মডেল উদ্ভাবিত হইয়াছে—তন্মধ্যে কোন কোনটি দুনিয়ার বাজারে সেরা জিনিষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

শুধু প্রয়োজন মিটিলেই যে মানুষের চলে না, তাহার মনের ক্ষুধা মিটাইবার ব্যবস্থাও যে থাকা চাই, তাহার সৌন্দর্য্যস্পৃহা চরিতার্থ হওয়াও যে প্রয়োজন, সেকথা আজিকার ইটালী ভুলিয়া
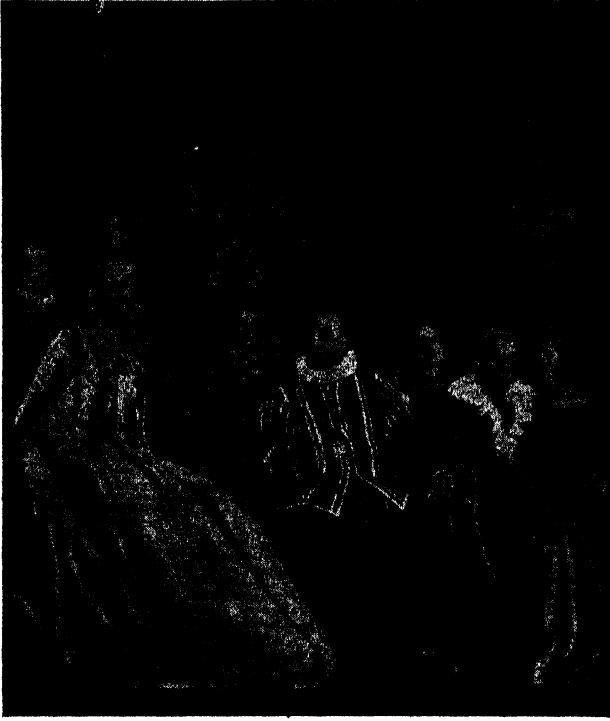
ফ্লোরেন্সে পঞ্চদশ শতাব্দীর বিবাহ-অনুষ্ঠানের যে অভিনয় হয় তাহাতে অংশ-গ্রহণকারী মার্ক্‌ইস মেডিসি, টর্ণাকুইন্সি এবং কাউন্টেস রিভেত্তি দি ভালসাবভো বার্দ্দোর রূপসজ্জা, মহার্ঘ্য পোশাক-পরিচ্ছদ, সুসজ্জিত কক্ষটির গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পরিবেশ দর্শকমণ্ডলীকে ইটালীর নবযুগের (Renaissance period) জাঁক-জমকের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

ফ্লোরেন্সের কারুশিল্পশালায় ঢালাই করা লোহা দ্বারা যে কারুকার্য্য করা হইয়া থাকে তাহা প্রশংসনীয়।

যায় নাই। তাই এই বৈজ্ঞানিক যুগে যন্ত্রশিল্পের আরাধনায় নিরত থাকা সত্ত্বেও সে হাতের কাজকে উপেক্ষা করে নাই। ইটালীয় শিল্পীর নিপুণ তুলিকা বাসনকোসন ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদিকে পর্য্যন্ত এক অপরূপ সুষমায় মণ্ডিত করিয়া তুলে।

ন. ভ.

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

পঞ্চম অধ্যায়

অনুবাদক—শ্রীচিত্রিতা দেবী

দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে
বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে
ক্ষরন্ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা
বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ ॥১

সংসার ঝরে যাহার কারণে,
অবিদ্যা বলি তারে,
বিদ্যার বলে সত্যস্বরূপ
অমৃত প্রকাশ হয়।
কিন্তু এ দুই নিগূঢ় শক্তি
নিহিত ব্রহ্মমাঝে।
সবার অতীত সেই অনন্তে,
এদেরো বিধান রয় ॥১

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্বাঃ
ঋষিং প্রসূতং কপিলং১
যস্তমগ্রে
জ্ঞানৈর্বিভর্তি জায়মানঞ্চপশ্যেৎ ।২

যোনিতে যোনিতে, সকল কারণে
প্রতি বিচিত্র রূপে,
যে পরম এক, করেন অধিষ্ঠান।
সৃষ্টির আগে প্রজ্ঞানে ভরে,
যিনি সৃজেছেন বিশ্বের বীজপ্রাণ।
জন্মকালেও দর্শনে যাঁর ধরা ছিল,
তার২ সত্য।
জ্ঞান অজ্ঞান হইতে ভিন্ন,
সেই তো পরমতত্ত্ব ॥২

একৈকং জালং বহুধাবিকুর্ব
ন্নস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ
ভূয়ঃ সৃষ্টা পতয়স্তথেশঃ
সর্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা ॥৩

প্রতি প্রাণীতরে প্রতি বিচিত্র
কর্মের জাল মেলিয়া,
এই মহাদেব, পুন সেই জাল,
গোটান জগৎ ভরিয়া।
পুরাকল্পিত দেহপতি৩ সব,
নিজেই করিয়া সৃষ্টি,
সবার উপরে চির প্রভুত্বে,
রাখেন যুক্ত দৃষ্টি ॥৩

সর্বা দিশ উর্ধ্বমধশ্চ তির্য্যক্
প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড়ান্।
এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো
যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥৪

উর্দ্ধে ও নীচে এবং পার্শ্বে, ব্যাপিয়া সর্বদিক,
সূর্য্য যেমন রহেন দীপ্তিমান,
তেমনি সে দেব, বরণীয় ভগবান,
কারণস্বভাব, এই পৃথিবীর
অণুপরমাণু ব্যাপিয়া
করেন অধিষ্ঠান ॥৪

১ সর্ব্বজ্ঞ ঋষি কপিলকে যিনি জ্ঞানদান করেছিলেন। কিন্তু অনেকেই বলেন যে, ইনি সাংখ্যকার কপিল মুনি নন। কপিল অর্থাৎ কপিল বর্ণ বা স্বর্ণ বর্ণ হিরণ্যগর্ভ অথবা বিশ্বপ্রাণ-বীজ। সৃষ্টিকালে প্রাণকে তিনি অন্তরে প্রজ্ঞাময় করেই সৃষ্টি করেছেন।

২ হিরণ্যগর্ভের। ব্রহ্ম (আপন স্বরূপে) হিরণ্যগর্ভের (সত্যস্বরূপ) প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

৩ প্রজাপতি হইতে মশকাদি পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেহধারী জীব।

যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ
পাচ্যাংশ্চ সর্বান্ পরিণাময়েদ্ যঃ
সর্বমেতদ্বিশ্বমধিতিষ্ঠত্যেকো
গুণাংশ্চ সর্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ ॥৫

বিশ্বস্বভাব যে করে বিধান,
তিনি পরমেশ্বর,
পরিণামী সবে, বিভিন্ন ফলে,
করেন রূপান্তর।
নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া তিনিই
দ্বিতীয়বিহীন সত্ত্ব।
ত্রিগুণে, তাদের স্বকার্য্য তরে,
যুক্ত করেন নিত্য ॥৫

তদ্বেদ গুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং
তদ্‌ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্।
যে পূর্ব দেবা ঋষয়শ্চ তদ্বিদুস্তে
অমৃতা বৈ বভূবুঃ ॥৬

বেদরহস্য উপনিষদের মর্মে ব্রহ্ম রয়,
বেদপ্রমাণিত সে গূঢ়তত্ত্ব জানেন হিরণ্ময়৪।
অনুভবে তাঁরে জেনেছেন যাঁরা প্রাচীন
দেবতা ঋষি।
তন্ময় তাঁরা অমৃত হলেন, (অমৃত-
সাগরে মিশি) ॥৬

গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্মকর্তা
কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা
স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা
প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্মভিঃ ॥৭

কৃতভোগী জীব ফলকামনায়
নিত্য কর্ম করিছে,
গুণাশ্রিত হয়ে বিভিন্ন দেহে,
জীবনে জীবনে শ্বসিছে,
ত্রিপথ৫ লক্ষ্যি, প্রাণাধীশ জীব
কর্মানুসারে ভ্রমিছে ॥৭

অঙ্গুষ্ঠ মাত্রো রবিতুল্যরূপঃ
সঙ্কল্পাহঙ্কারসমন্বিতো যঃ
বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব
আরাগ্রমাত্রোহ্যপরোহপি দৃষ্টঃ ॥৮

সূর্য্যসমান জলন্তরূপ আমার নিভৃত
হৃদয়ে দীপ্তিমান।
আমারি অহং চেতনসীমায় বদ্ধ তাহারে,
মনে হয় গুণবান৬।
তাই তারে কভু যেন মনে হয় আরাগ্রমিত স্বল্প।
যেন নিতান্ত তুচ্ছ, (সে যেন নহে গো,
মহৎ সত্যআত্মকল্প) ॥৮

---

৪ সেই আদি কারণ এবং আত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে তৎপ্রসূত হিরণ্যগর্ভ জানেন। হিরণ্যগর্ভের প্রকাশ প্রতি প্রাণের স্পন্দনে— তাই তাকে বহুবার, মূল প্রাণ অথবা প্রাণশক্তি বলে উল্লেখ করেছি। ফুলে লতায় পাতায়, বাইরে বিশ্বময় যে প্রাণের লীলা দেখতে পাই, সেই প্রাণই মানবদেহে, বাল্যযৌবনজরার মধ্যে স্পন্দিত হতে হতে সুখদুঃখচেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। তবু প্রতি প্রাণীর অন্তর্নিহিত সেই মূল-প্রাণ, তৎস্বরূপ এবং তদ্‌জনক সেই পরমাত্মাকে মর্ম্মে মর্ম্মে জানে। তাই তাঁকে পূর্ণরূপে অনুভবের মধ্যে পাবার জন্যে, স্বচ্ছচেতনার দর্পণে তাঁকে প্রত্যক্ষ করবার জন্যে, প্রাণের আকুলতা মাঝে মাঝে তার মূঢ় অহং চেতনাকে ছিন্ন করে ছুটে বেরিয়ে আসতে চায়। পিতাকে দেখেছে বলেই পিতৃস্নেহ পেয়েছে বলেই পিতৃগৃহের জন্যে কন্যার যেমন স্বাভাবিক আকুলতা, তেমনি ব্রহ্মের জন্যে হিরণ্যগর্ভের চিরন্তন বিরহ প্রতি প্রাণিদেহে মুক্তির জন্যে কাঁদছে।

৫ ত্রিপথ, অথবা ত্রিমার্গ। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও জ্ঞানের পথ। জীব আপন সঞ্চিত কর্ম্মানুসারে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম অথবা জ্ঞানের পথে চলে।

৬ বুদ্ধি ও বাসনার গুণ আমার অন্তর্যামী আত্মার অধিষ্ঠিত হয়ে, তাঁকেই যেন গুণবাসনাময় বলে প্রতিভাত করে। মন, বুদ্ধি ও দেহ চেতনার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আত্মরূপই জীব। তাই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকেও জীবরূপে কখনও নিতান্ত ক্ষুদ্র, কখনও বা নিতান্ত হীন বলে মনে হয়।

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ
স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥৯

একটি কেশের অগ্রভাগেরে শতভাগ
ভাগ করে,
পুন তাহারেও শতধা করিলে,
যতটুকু পরিমাণ,
ততটুকুতেই পরমাণুময় জীব সে
মূর্ত্তিমান।
তবু চলিতেছে চিরকাল ধরে, আপন
স্বরূপে তার,
অনন্তপানে ক্ষুদ্রজীবের শাশ্বত অভিযান ॥৯

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং
নপুংসকঃ
যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন
স রক্ষ্যতে ॥১০

ক্লীব নয় কভু জীবপরিচয়,
নয় এ পুরুষ নারী।
তবু দেহভেদে, স্বীয় অভিমানে,
বিচিত্ররূপধারী ॥১০

সঙ্কল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈ
গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যাচাত্মবিবৃদ্ধি জন্ম।
কর্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী
স্থানেষু রূপাণ্যভি সম্প্রপদ্যতে ॥১১

দেহ বাড়ে যথা দিনে দিনে এই,
অন্নপানের কারণে,
মন কল্পনা ভোগ মোহ আর
যত কর্মের ফলনে,
দেবতা ও কীট সম বিভিন্ন
সকল জন্ম জননে,
নানারূপে দেহী দেখে আপনারে,
কত বিচিত্র কল্পনে ॥১১

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব
রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং
সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ ॥১২

ত্রিগুণসহায়ে, জীব এ জীবনে,
যত কিছু কাজ করে,
তারি সাথে মিশে পূর্ব প্রজ্ঞা,
বিভিন্ন রূপ ধরে।
ধ্যানউপাসনা, ধর্মকর্ম অথবা
আলস বিলাসে।
মৃত্যুর পরও অন্য জীবনে,
জীবের সংক্রমণ।
চলেছে নিত্য, জুড়িয়া বিশ্ব,
কর্ম সঞ্চালন ॥১২

অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥১৩

অনাদি অনন্ত এই সংসারগহনে,
বহুরূপে বিশ্বস্রষ্টা রহেন গোপনে।
সর্বব্যাপী জ্যোতিস্বরূপ,
সে একক দেবতত্ত্ব।
যে জীব জেনেছে, আপন হৃদয়ে,
মুক্ত সে জন নিত্য ॥১৩

ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং
শিবম্।
কলাসির্গকরং দেবং যে বিদুস্তে
জহুস্তনুম্ ॥১৪

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

শুদ্ধচিত্তে যাঁর অনুভব, আলোকসমান জলে,
যাঁহার কারণ পরিণামে নিতি সৃষ্টি,
প্রলয় ফলে।
প্রাণের শিল্পী, রূপকার যিনি,
চিরমঙ্গলময়।
অদেহী তাঁহারে, যে জানে,
তাহার পুনর্জন্ম নয় ॥১৪

আমাদের দেশের আচার-বিচার

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীর সকল দেশে, সকল সমাজে এবং সর্ব্বকালে নানা প্রকার আচার-বিচার প্রচলিত ছিল ও আছে, সময়ের পরিবর্ত্তনে জনসাধারণের শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতি বা অবনতিতে আচার-বিচারেও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুসমাজে পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বে আমরা যে প্রকার আচার-বিচার দেখিয়াছি, এখন তাহার অনেক পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইতেছে এবং এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া শত বৎসর পূর্ব্বে কিরূপ আচার-বিচার ছিল, তাহা কতকটা অনুমান করিয়া লইতে পারি।

আমার বাল্যকালে আমাদের প্রতিবেশী বহু বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মাথায় শিখা (টিকি) দেখিয়াছি। কিন্তু এখন বোধ হয় গুরু পুরোহিত ছাড়া কোন ব্রাহ্মণের মাথাতে শিখা দেখিতে পাওয়া যায় না। কলিকাতা অঞ্চলের কথা ছাড়িয়া দিলে সুদূর মফস্বলেও শিখাধারী ব্রাহ্মণ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। আমার জননীর মুখে গল্প শুনিয়াছি, তাঁহাদের বাল্যকালে তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ মাত্রেই মাথায় শিখা ত রাখিতেনই, উপরন্তু তাঁহারা মস্তকের চারি দিক ক্ষৌরকার্য্য দ্বারা কেশশূন্য করিতেন। সেই মুণ্ডিত মস্তকের মধ্যস্থলে খানিকটা স্থানে ছোট ছোট কেশ থাকিত এবং সেই কেশের ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটি স্থূল ও সুদীর্ঘ শিখা থাকিত। যাঁহারা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় অবিকল উৎকলবাসীদিগের মত মস্তকের চতুর্দ্দিক মুণ্ডিত করিতেন। তবে তাঁহার শিখাটি সূক্ষ্ম এবং ক্ষুদ্র ছিল। সহজে উহা দৃষ্টিপথে পতিত হইত না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিত্র দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে সেকালের ব্রাহ্মণদের কেশবিন্যাস কিরূপ ছিল।

আমার পিতার মুখে গল্প শুনিয়াছি যে, তাঁহার বয়স যখন ১৭।১৮ বৎসর, তখন একবার তিনি বর্দ্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ অঞ্চলে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছিলেন যে, ঐ অঞ্চলের ব্রাহ্মণ বালকেরা উপনয়নের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত মাথায় 'পঞ্চ শিখা' ধারণ করিত, অর্থাৎ কপালের ঠিক উপরে, দুই পার্শ্বে দুই রগে মস্তকের শীর্ষস্থানে এবং ঘাড়ে, এই পাঁচ জায়গায় পাঁচটি শিখা রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করিত। এই পঞ্চ শিখাধারী ব্রাহ্মণ-কুমারগণ সাধারণতঃ "পঞ্চশিখ" নামে অভিহিত হইত। আমার পিতা "পঞ্চশিখ" ব্রাহ্মণ-কুমার দেখিয়া তাঁহার শিক্ষাগুরু স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট গল্প করিলে ন্যায়রত্ন মহাশয় হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি 'পঞ্চশিখ' ব্রাহ্মণকুমার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছ, কিন্তু মনে রাখিও, তোমার বা আমার পিতৃ-পিতামহগণ তাঁহাদের বাল্যকালে ও কৈশোরে সকলেই 'পঞ্চশিখ' ছিলেন।" এখন বঙ্গদেশে কোন 'পঞ্চশিখ' ব্রাহ্মণ কেহ দেখিতে পান কি?"

সকলেই অবগত আছেন যে, আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, বিধবা, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধারা আহারে নানা প্রকার বাছবিচার করিয়া থাকেন। মুড়ি, চালভাজা বা চিঁড়া ভাজা জলস্পৃষ্ট হইলে উহা সকৃড়ি হইয়া যায়। সেইজন্য উচ্চ বর্ণের বিধবারা তাহা অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করেন। আমি বাল্যকালে দেখিয়াছি, আমাদের প্রতিবেশিনী এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ বিধবা রাত্রিকালে জলযোগের সময় "গালফলার" করিতেন। অর্থাৎ তিনি একটা পাত্রে কিঞ্চিৎ মুড়ি এবং অন্য এক পাত্রে কিছু দুধ ও গুড় লইয়া জলযোগে বসিতেন। তিনি এক মুঠা মুড়ি প্রথমে মুখে দিতেন এবং তাহার পর এক চুমুক দুধ ও একটু গুড় খাইতেন। আমি আমার জননীকে এই ভাবে খাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "ওকে বলে গালফলার।" মুড়ির সঙ্গে দুধ গুড় একত্রে মাখিলে উহা "সকৃড়ি" হইয়া যায়। উনি মধ্যাহ্নে আলোচালের ভাত খান, সন্ধ্যার পর আবার সকৃড়ি খাইবেন কি করিয়া?

আজকালকার তুলনায় সেকালে উচ্চজাতীয়া বিধবাদিগের অন্নবিচার অনেক সূক্ষ্ম ছিল। আমাদের প্রতিবেশী এক সৎ শূদ্র ভদ্রলোকের সহিত আমাদের বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল। তাঁহার পুত্র আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আমি সর্ব্বদাই তাঁহাদের বাড়ীতে

যাতায়াত করিতাম। আমার বয়স যখন ১৬।১৭ বৎসর, তখন একদিন আমি আমার বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া শুনিলাম যে বন্ধুটি বাড়ীতে নাই, কোথায় বাহিরে গিয়াছেন। আমি বন্ধুর শয়নকক্ষে বসিয়া বই দেখিতেছিলাম, এমন সময় সেই বাটীর পাকশালাতে স্ত্রীলোকদিগের একটা গোলমাল উঠিল। সহসা কোন বিপদ ঘটিয়াছে মনে করিয়া আমি পাকশালাতে গিয়া দেখিলাম, বাটীর তিন-চার জন মহিলা একটা দেওয়ালের দিকে চাহিয়া গোলমাল করিতেছেন। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় একজন বলিলেন, "দেখ না, বাবা, সব দেওয়ালময় সকৃড়ি করিয়া দিলে।" আমি ত দেওয়ালে সকৃড়ির লক্ষণ কিছু দেখিতে পাইলাম না। কে সকৃড়ি করিয়া দিল জিজ্ঞাসা করায় উত্তরে শুনিলাম, একটা ক্ষুদে পিঁপড়ে একটি ভাতের কণা মুখে করিয়া দেওয়াল বাহিয়া উপরে উঠিতেছে দেখিবামাত্র আমি গিয়া সেই পিঁপড়েকে ঘরের মেঝেয় ফেলিয়া দিলাম, তাহা দেখিয়া একজন মহিলা আমার হাতে জল ঢালিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "তোমার কাপড়খানা ছেড়ে দাও, আমি কেচে দিই।" আমি কাপড় ছাড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "তুমি বামুন, আমরা শূদ্দুর, শূদ্দুরের সকৃড়ি ছুঁলে, তুমি কাপড় ছাড়বে না?" আমি বলিলাম, "আমি ত ভাত ছুঁই নাই, আমি পিঁপড়েটাকে ছুঁয়েছিলা'ম।" বলা বাহুল্য, আমি কাপড় ছাড়িলাম না। দেখিলাম, একজন স্ত্রীলোক এক বালতি জলে একটি ছোট্ট ঘুটের টুকরা ফেলিয়া সেই জল দিয়া সমস্ত দেওয়ালটা ধুইয়া ফেলিলেন। আমি ভাবিলাম, সকলে মিলিয়া সেই দেওয়ালটাকে ধরিয়া পুকুরে চুবাইয়া আনিলে ভাল হইত।

আমাদের আর একজন সদ্‌গোপ জাতীয়া প্রতিবেশিনী অত্যন্ত শুচিবায়ুগ্রস্তা ছিলেন। শুচিবায়ুগ্রস্তা নারীদিগকে মেয়েলী ভাষায় বলে "শুচীবেয়ে"। ঐ সদগোপ মহিলা রন্ধনশালাতে রন্ধন করিবার জন্য যে এক ঘড়া জল রাখিতেন, তাহার মধ্যে একটুকরা ঘুটে ফেলিয়া রাখিতেন। তিনি বলিতেন, পুষ্করিণী হইতে জল আনিবার সময় কত কীটপতঙ্গের বিষ্ঠা অজ্ঞাতসারে পদদলিত করিয়া আসিয়াছেন। সেজন্য জলটা গোময় স্পর্শে শুদ্ধ করিয়া লইতেন। এজন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহার স্বামীর নিকট হইতে ভীষণ তাড়না সহ্য করিতে হইত। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার শুচীবায়ু কমে নাই। ঐ স্ত্রীলোকটি স্নান করিবার সময় একটি ছোট ছেলেকে ঘাটের উপর দাঁড় করাইয়া রাখিতেন। তাহাকে বলিতেন, "আমি যখন ডুব দিব, তখন মাথার সব চুল জলে ডুবিয়া যায় কিনা একটু দেখিস ত?" বালকেরা অনেক সময় দুষ্টামি করিয়া বলিত, "তোমার দু'গাছা চুল বোধ হয় জলের উপর ভাসিতেছিল।" তাহা শুনিয়া ঐ স্ত্রীলোক আবার চার-পাঁচ বার ডুব দিতেন। এরূপ শুচীবায়ুগ্রস্তা স্ত্রীলোক বাস্তবিকই বিরল।

আমাদের প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা বিধবা এক ব্রাহ্মণী প্রত্যহ ভোরবেলা একটি ছোট ঘড়া লইয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। তিনি স্নানান্তে এক ঘড়া জল লইয়া সিক্ত বস্ত্রে বাটীতে প্রত্যাবর্তন করিতেন। কিন্তু যখন বাটীতে প্রবেশ করিতেন তখন দেখা যাইত, সেই ঘড়াটির জল শূন্য। আমরা একবার তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, সেই ঘড়ার জল লইয়া তিনি পথে ছিটাইতে ছিটাইতে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি কেন জল ছিটাইয়া আসেন জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন, "কত হাড়ি, মেথর, মুদ্দফরাস এই রাস্তা মাড়িয়ে চলে গিয়েছে, তাই আমি গঙ্গাজল ছিটিয়ে এই পথে চলি।" চাল সিদ্ধ হইয়া উহা অন্নে পরিণত হইলে যে অস্পৃশ্য হয়, তাহা কোন স্মৃতিতে লিখিত নাই।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের মুখে যে কাহিনী শুনিয়াছিলাম, তাহা এই: তিনি এক বৎসর চন্দননগর প্রবর্তক সংঘের এক সভায় সভাপতিত্ব করিতে আসিয়াছিলেন। সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল, "বর্তমান হিন্দুসমাজ"। তর্কভূষণ মহাশয়ের নিবাস ভাটপাড়া বা ভট্টপল্লী। এই ভাটপাড়া পশ্চিমবঙ্গে স্মৃতি অধ্যাপনার প্রধান কেন্দ্র। সেই ভাটপাড়ার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এই তর্কভূষণ মহাশয়। তিনি বলিয়াছিলেন যে, একবার পূর্ববঙ্গের রাজা উপাধিধারী কোনও ব্রাহ্মণ ভূস্বামীর আদ্যশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি পূর্ববঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের অন্যান্য অধ্যাপকেরাও নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রীও ছিলেন। এই লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশয় মদ্রদেশীয় ব্রাহ্মণ অর্থাৎ মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ। রাজবাটীতে সমাগত অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ সকলেই স্বপাকে আহার করিলেন। প্রত্যেক অধ্যাপকের জন্য পৃথক পৃথক রন্ধনের স্থান নির্দিষ্ট ছিল। একটা প্রকাণ্ড হল-ঘরের মধ্যে ব্রাহ্মণদের রন্ধনের পঁচিশ-ত্রিশটি স্থান নিৰ্দ্দিষ্ট ছিল। এইরূপ তিন-চারটি হল-ঘরে অধ্যাপকগণের পাকের স্থান করা হইয়াছিল। ঘটনাক্রমে তর্কভূষণ মহাশয়ের জন্য নির্দিষ্ট স্থানের পার্শ্বেই লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশয়ের রন্ধনের স্থান হইয়াছিল। রন্ধনকালে তর্কভূষণ মহাশয় দেখিলেন, শাস্ত্রী মহাশয় ভাতের হাঁড়ি নামাইয়া সেই হাত মাথায় দিলেন। দেখিয়া তর্কভূষণ মহাশয় বিস্মিত হইয়া সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ও কি করিলেন? সকৃড়ি হাত না ধুইয়া সেই হাত মাথায় দিলেন?" শাস্ত্রীমহাশয় সকৃড়ি কথার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। কারণ উহা সংস্কৃত শব্দ নহে। তাহা শুনিয়া তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন, "উচ্ছিষ্ট" অর্থে সকৃড়ি শব্দ বাংলায় প্রচলিত। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, "কোন দ্রব্য মুখে না দিলে তাহা উচ্ছিষ্ট কিরূপে হইবে?" তাহা শুনিয়া তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন, "অন্নটা কি অস্পৃশ্য নহে?" শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, "তণ্ডুল সিদ্ধ করিলে যে অন্ন হয় তাহা যে অস্পৃশ্য, তাহা কোন্ সংহিতা বা স্মৃতিতে আছে?" এই কথা শুনিয়া তর্কভূষণ মহাশয় একটু অপ্রস্তুত হইলেন এবং বলিলেন, "আমি আপনাকে পরে জানাইব।" কিন্তু জানাইবার সুযোগ তিনি আর পান নাই। কারণ তিনি কলিকাতা আসিয়া সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরী ও অন্যান্য পুস্তকাগারে অনু-

সন্ধান করিয়া দেখিলেন, কিন্তু অন্ন যে অস্পৃশ্য, প্রাচীন বা নব্য স্মৃতিতে কোথায়ও তাহা খুঁজিয়া পান নাই।

যাঁহারা দক্ষিণ-ভারতে ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, উড়িষ্যার দক্ষিণে সর্ব্বত্র ভাত, তরকারি দোকানে বিক্রয় হয়। বঙ্গদেশে বা উত্তর-ভারতে যেমন রেল-ষ্টেশনে ফেরিওয়ালারা লুচি ও মিষ্টান্ন বিক্রয় করে, দক্ষিণ-ভারতে তেমনি রেল-ষ্টেশনে ফেরিওয়ালারা ঠোঙ্গায় করিয়া ভাত, তরকারি বিক্রয় করে। যাত্রীরা গাড়ীতে বসিয়া সেই ভাত, তরকারি কিনিয়া খায়। সহযাত্রীদের মধ্যে সকল জাতিই থাকে। সেখানে ভোজনকালে স্পর্শদোষ নাই। অথচ এই মাদ্রাজ প্রদেশের লোকেরাই বলিয়া থাকে যে বাঙালীরা, বিশেষ করিয়া বাঙালী-ব্রাহ্মণেরা পঞ্চমের অর্থাৎ অস্পৃশ্য জাতির ছায়া স্পর্শ করিলে স্নান করেন না, তাঁহারা আবার হিন্দুয়ানির বড়াই করেন কিরূপে?

আমরা তো অন্নকে অশুদ্ধ বলিয়া মনে করি, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা, বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা মনে করেন, বাঙালীরা সক্‌ড়ি বিচার করেন না। মহারাষ্ট্র-সমাজে অন্নের অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে যে ধারণা আছে, অথবা সেদিন পর্য্যন্ত যে ধারণা প্রচলিত ছিল, তাহা শুনিলে পাঠকগণ বিস্মিত হইবেন। "হিতবাদী" পত্রের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বর্গীয় সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় মহারাষ্ট্র-ব্রাহ্মণ ছিলেন। আমি হিতবাদীর সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া বহু বৎসর তাঁহার সহিত এক টেবিলে বসিয়া কাজ করিয়াছি। সেই সময়ে এক দিন আমার একটি পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে আমাদের বাটীতে ভোজনের জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। তাহা শুনিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, "আমরা অর্থাৎ মারহাট্টারা অন্য সমাজের ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করি না, ইহা আপনি জানেন। আপনি আমাকে নিশ্চয়ই 'লুচি' খাওয়াইবেন। তবে আমার জন্য যে কয়খানা 'লুচি' করাইবেন, তাহার ময়দায় জল না দিয়া দুধ দিয়া মাখিবেন। আপনারা ভাতকে সক্‌ড়ি মনে করেন, আমাদের এই সক্‌ড়ি বিচার কিন্তু অন্যরূপ। আমাদের মতে কোন শস্যে জল লাগিলে তাহা সক্‌ড়ি হইয়া যায়। তবে চাল যদি দুধে সিদ্ধ হয়, বা আটা-ময়দা যদি দুধ দিয়া মাখা যায়, তবে তাহা সক্‌ড়ি হয় না।" তিনি আরও আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "আপনাদের হেঁসেলে রান্না নিরামিষ তরকারি খাইতে আমার আপত্তি নাই।" আমি সখারাম বাবুর কথামত দুধে ময়দা মাখিয়া লুচি ভাজাইয়াছিলাম। ইহার পর আরও চার-পাঁচ বার সখারামবাবু আমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া আহার করিয়াছিলেন। আমি প্রতিবারই তাঁহার জন্য ময়দা দুধে মাখিয়া লুচি ভাজাইতাম। তিনি আমাদের হেঁসেলের ভাত, ডাল ও আমিষ তরকারি ছাড়া সকলপ্রকার তরকারিই খাইতেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম যে, চাল, ডাল, গম, আটা, ময়দা প্রভৃতিতে জল ঠেকিলেই তাহা সক্‌ড়ি হইয়া যায়, ইহাই তাঁহাদিগের সমাজে প্রচলিত সংস্কার। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনাদের দেশে মিষ্টান্নের দোকানে কি লুচি, কচুরী, সিঙ্গাড়া বিক্রী হয় না? উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, সেই আটা বা ময়দা দুধে মাখা হয়, জলে নয়। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, এক বস্তা চাউল বা এক বস্তা ছোলার যদি একটু জলের স্পর্শ লাগে তাহা হইলে সে সমস্তই সক্‌ড়ি হইয়া যায়।

মহারাষ্ট্র সমাজের আচার-বিচার সংক্রান্ত আর একটা বিষয়ের উল্লেখ করিব। অনেকের জানা আছে যে, মরাঠা সমাজে স্ত্রীলোকদের অবরোধ-প্রথা নাই। মরাঠা রমণীরা স্বাধীনভাবে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিয়া থাকেন। কোন বাটীতে কোন ক্রিয়া-কর্ম্ম উপলক্ষে স্ত্রীলোকদিগের নিমন্ত্রণ হইলে নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোকেরা ভোজের এক দিন বা দুই দিন পূর্ব্বে নিজের একখানা পরিধেয় বস্ত্র নিমন্ত্রণকারীর বাটীতে পাঠাইয়া দেন। নিমন্ত্রণকারী সেই বস্ত্র জলে কাচিয়া একটা পৃথক ঘরে রাখিয়া দেন। নিমন্ত্রিতা মহিলারা যে-বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ-কর্ত্তার বাটীতে গমন করেন, পথে ব্যবহৃত সেই বস্ত্র পরিয়া তাঁহারা ভোজন করিতে পারেন না। কারণ সেই বস্ত্র রেশমী বা পশমী হইলেও পথে আসিবার সময় কত জাতির ছোঁয়া লাগে। সুতরাং সেই অশুদ্ধ বস্ত্র পরিয়া কিরূপে ভোজন করা চলিতে পারে? যে ঘরে তাঁহাদের পূর্ব্ব-প্রেরিত বস্ত্র রক্ষিত থাকে, একে একে সেই ঘরে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহারা পূর্ব্ব-প্রেরিত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ভোজনস্থানে গমন করেন এবং আহারান্তে আবার পথে বাহির হইবার কাপড় পরিয়া স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সখারামবাবুর মুখে আরও শুনিয়াছি যে, মহারাষ্ট্রে ভোজে 'পলাণ্ডু' ব্যবহার অবাধে প্রচলিত আছে। এই পলাণ্ডু ব্যবহার সম্বন্ধে একটা গল্প বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। "আমি একবার পুরীধামে গিয়া আমাদের পাণ্ডার মুখে এই বিবরণটি শুনিয়াছিলাম: তিনি বলেন, কাশ্মীরের এক জন রাজা সপরিবারে শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য একটা বড় বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছিল। পুরীর কয়েক জন পাণ্ডা কৌতূহলপরবশ হইয়া রাজার পাকশালাতে গমন করেন। তাঁহারা দেখিয়া অবাক হইলেন যে, রন্ধনশালার একপাশে প্রায় আধ মণ 'পলাণ্ডু' রহিয়াছে। কাশ্মীরের রাজা ক্ষত্রিয়, হিন্দুকুলচূড়ামণি! তাঁহার পাকশালায় 'পলাণ্ডু'! তাঁহারা কথায় কথায় এই পলাণ্ডুর বিষয় রাজার কর্ণগোচর করিলে রাজা ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিয়া উঠিলেন, আমার পাকশালায় পলাণ্ডু! আমায় দেখাইতে পারেন? যে আনিয়াছে আমি তাহাকে সমুচিত শাস্তি দিব। পাণ্ডারা রাজাকে লইয়া পাকশালায় গিয়া পলাণ্ডু দেখাইলে রাজা তদ্দৃষ্টে হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'আপনারা ভুল করিয়াছেন, উহা 'পলাণ্ডু' নহে, 'পেঁয়াজ'। পলাণ্ডু অত বড় হয় না, সেগুলো ছোট ছোট হয়। পেঁয়াজ অভক্ষ্য নহে, পলাণ্ডুই অভক্ষ্য।" মরাঠা সমাজে সম্ভবতঃ পলাণ্ডু এবং পেঁয়াজ পৃথক বলিয়া গণ্য হয়। একথাটা অবশ্য সখারামবাবুকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

আমাদের সমাজে বিশেষতঃ উচ্চশ্রেণীর মধ্যে স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। কারণ আমাদের ধারণা সগোত্র হইলেই এক বংশজাত

হয়। কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের এই ধারণা অভ্রান্ত নহে। 'গোত্র' শব্দের মৌলিক অর্থ অনুসন্ধান করিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। "গোত্র" শব্দের অর্থ যে স্থানে গো প্রভৃতি গৃহপালিত পশু ত্রাণ পায় অর্থাৎ রক্ষা পায়। অতি প্রাচীনকালে যখন আর্য্য-সভ্যতা সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে প্রসারলাভ করিতেছিল, তখন সমস্ত দেশ গভীর অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল। সেই অরণ্যের মাঝে মাঝে সশিষ্য ঋষিরা তপোবনে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রধান সম্বল ছিল কৃষিকার্য্য ও গো-পালন। তাঁহারা সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু এবং বন্য মৃগ প্রভৃতি উদ্ভিদভোজী পশুর আক্রমণ হইতে গো-ধন এবং শস্য-রক্ষার জন্য আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়া অনেকটা স্থান বেষ্টনীদ্বারা ঘিরিয়া রাখিতেন। সেই বেষ্টনীর মধ্যে বন্য হিংস্র পশু প্রবেশ করিতে পারিত না। সুতরাং আশ্রমসন্নিহিত গোচারণ ভূমিতে গো, মহিষাদি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারিত। যে ঋষি এইরূপ গোত্রের অধিপতি হইতেন, তাঁহারই নাম অনুসারে সেই গোত্র অভিহিত হইত। কাশ্যপ গোত্র, ভরদ্বাজ গোত্র, বাৎস্য গোত্র, মৌদ্গল্য গোত্র প্রভৃতি গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের নাম এখনও হিন্দু-সমাজে প্রচলিত আছে। কিন্তু সকল ঋষিই গোত্র-প্রবর্ত্তক ছিলেন না। মনু, অত্রি, নারদ, বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণের নামে কোনও গোত্র আছে কিনা আমি জানি না, বোধ হয় নাই। এক একটি গোত্রের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি সকল জাতিরই বাস ছিল। সেইজন্য আমরা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে একই গোত্রের নাম দেখিতে পাই। অনেকে বলেন যে, নিম্নশ্রেণী শূদ্রদের গুরু বা পুরোহিতের গোত্রই সেই শূদ্রজাতির গোত্র হইয়াছে। ইহা অসম্ভব নহে। যাহা হউক, গোত্র বলিলেই যে এক বংশসম্ভূত লোক হইবে, তাহার কোনও মানে নাই। মনে করুন ভরদ্বাজ ঋষির বহু ছাত্র বা শিষ্য উক্ত মুনির আশ্রমে থাকিয়া দ্বাদশ বর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিত। তাহারা সকলেই যে এক বংশজাত ছিল, তাহা সম্ভবপর নহে। অর্থাৎ, আজকাল আমরা "গ্রাম" বলিতে যাহা বুঝি, অতি প্রাচীন কালে "গোত্র" বলিলে লোকে তাহাই বুঝিত।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে গোত্রের বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িতেছে। আজকাল স্বগোত্রে বিবাহ অনেক দেখিতে পাইতেছি। জ্ঞাতিকন্যাকে বিবাহ আমাদের সমাজে নিষিদ্ধ হইলেও মুসলমান ও খ্রীষ্টান সমাজে উহা অবাধে প্রচলিত। এমনকি মুসলমান-সমাজে ভ্রাতুষ্পুত্রকে জামাতৃরূপে পাইলে পাত্রীর পিতামাতা গৌরব-বোধ করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টান-সমাজে জ্ঞাতিকন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু মৃতা পত্নীর ভগ্নীকে বিবাহ একান্ত নিষিদ্ধ। এই নিষেধের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে বহুকাল হইতে আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু আজও পর্য্যন্ত সে আন্দোলনে কোনও ফল হয় নাই।

আমাদের সমাজে এমন অনেক আচার-বিচার প্রচলিত আছে, যাহা কোনও যুক্তি দ্বারা সমর্থিত নহে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি:—পিতা বর্ত্তমান থাকিলে পুত্রের দক্ষিণমুখ হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক অন্ন গ্রহণ নিষিদ্ধ। আমি দু'এক জন পুরোহিতকে এই নিষেধের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা যে যুক্তি দেখাইয়াছিলেন তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, পিতৃশ্রাদ্ধকালে শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে দক্ষিণমুখ হইয়া পিণ্ডদান করিতে হয়। সেইজন্য পিতা বিদ্যমানে পুত্রকে দক্ষিণ মুখে বসিয়া ভাত খাইতে নাই। কিন্তু মৃত পিতার প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান এবং নিজে দক্ষিণমুখ হইয়া অন্ন গ্রহণ কি এক কথা? এই ব্যবস্থা হইতে অনেক প্রাচীনা গৃহিণী নিজ নিজ সংসারে অনুরূপ আর একটি ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পিতা জীবিত থাকিলে পুত্রকে যখন দক্ষিণ মুখে বসিয়া খাইতে নাই, তখন "পুত্তুর" বিদ্যমানে পিতাকেও "উত্তুর" মুখে বসিয়া খাওয়া নিষেধ। এ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই যুক্তিহীন—"নারী সংহিতায়" আছে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে মহাদেব দুর্গাকে বলিয়াছেন:

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্য বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে।

আমাদের সমাজে কিন্তু অনেক যুক্তিহীন আচার-বিচার সুদীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে।
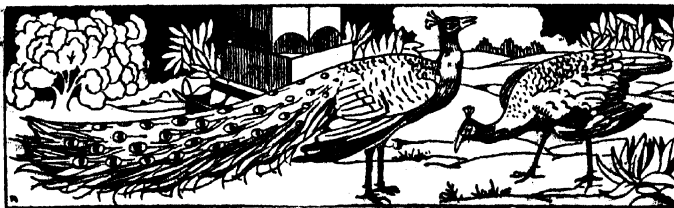
গান্ধীজী

রেজাউল করীম

শান্ত, নির্ব্বিরোধ গান্ধীজীর অন্তরে বিরাজমান ছিল বিদ্রোহের একটা জলন্ত অগ্নিশিখা। মধুর হাসি তাঁর ওষ্ঠে, সুমিষ্ট কথা তাঁর মুখে, সরল সহজ তাঁর চালচলন, অথচ এই মানুষটি ছিলেন একটি ভূকম্পকারী বিপ্লবের অগ্রদূত। সমগ্রভাবে এই মানুষটিকে দেখলে বোঝা যাবে যে, তাঁর এক হাতে ছিল শান্তির মধুভাণ্ড, আর অপর হাতে ছিল বীরের রণতূর্য্য। গান্ধী হেঁয়ালী নয়, গান্ধী কল্পনার মানুষ নয়—একেবারে রক্তমাংসে গড়া বাস্তব জগতের মানুষ। যে জাতির মধ্যে গান্ধীর মত মানুষের আবির্ভাব হয় সে জাতি ধন্য। সে জাতির সামগ্রিক মুক্তি কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। যেসব মহামানব বড় বড় সাম্রাজ্য ভেঙে চুরমার করেছেন, যুগযুগ সঞ্চিত জাতীয় জড়তা দূর করে নূতন জাতির নূতন মানুষের গোড়া পত্তন করেন, নৈতিক আদর্শ দিয়ে শ্মশানের উপর নবসৃষ্টির প্রেরণা জাগ্রত করেন গান্ধী সেই জাতের মানুষ। তাই গান্ধী আজ সক্রেটিস, বুদ্ধ, যিশু খ্রীষ্টের সমপর্য্যায়ভুক্ত মহামানব। অধ্যাপক গিলবার্ট মারি বলেছেন :

"Be careful in dealing with a man who cares nothing for sensual pleasures, nothing for comfort or praise or promotion, but is simply determined to do what he believes to be right. He is a dangerous and uncomfortable enemy because his body which you can always conquer gives you so little purchase over his soul."

এমনি লোক ছিলেন গান্ধী। তিনি যেটাকে সত্য বলে মনে করতেন তা অকপটে বলতেন। মান-অভিমান দ্বিধা-সঙ্কোচ, পূর্ব্বাপরের সঙ্গতি রক্ষার চেষ্টা, এসব কিছুই তাঁকে সত্যের পথ থেকে মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত করতে পারে নি। নিজের কাজকে "Himalayan blunder" বলে স্বীকার করবার সৎসাহস এ যুগে আর কারুর মধ্যেও দেখি না। গান্ধীজী যেদিন প্রকাশ্যভাবে ঘোষণার দ্বারা নিজের কাজকে "বিরাট ভুল" স্বীকার করে বসলেন, সেদিন তাঁর ভক্ত অনুরক্তদের মধ্যে কি বিক্ষোভ; আর সমালোচকদের সেদিন কি আনন্দ। যে মানুষ এমন পদে পদে ভুল করে বসে সারা ভারতের নেতৃত্ব করবার কি অধিকার তাঁর থাকতে পারে? কিন্তু গান্ধী এ সবের দ্বারা বিচলিত নন। "যে ভুল হয়েছে তা আমাকে অকপটেই স্বীকার করতে হবে, আর এই ভুলের জন্য যে ক্ষতি হয়েছে তার প্রায়শ্চিত্তও আমাকেই করতে হবে।" এমনি অকপট সত্যসন্ধ মানুষ ছিলেন গান্ধীজী। এই গান্ধীই ছিলেন আজন্মবিপ্লবী। বিপ্লবীর মন সর্ব্বপ্রকার সংস্কারের মোহ থেকে মুক্ত। সংস্কারমুক্ত মন না হলে কেউ বিপ্লবের ঝাণ্ডা উড়াতে পারে না। সামাজিক কোন সংস্কার গান্ধীর অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি। বাধাবিঘ্ন তাঁকে কোন দিন কর্ত্তব্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। অন্তরের প্রচণ্ড শক্তির সাহায্যে সকল বাধা দলিত মথিত করে ছুটে চলেছেন সংগ্রামের পথে। কখনো সঙ্গী ছিল, আবার কখনো একাই সঙ্গীহীন অবস্থায় পথ তৈয়ার করতে করতে চলেছেন বিংশ শতাব্দীর এই মহামানব। সংগ্রামের ফল কি হবে, সংগ্রাম সার্থক হবে কি না, এ দিকে তাঁর প্রধান দৃষ্টি ছিল না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে, সংগ্রাম করাই ধর্ম্ম—এই আদর্শ তিনি বুঝতেন। সুতরাং এই আদর্শ অনুসারে তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন।

দেশের মধ্যে প্রচলিত যেসব প্রথা ও নজির যুগ যুগ ধরে চলে আসছে, তার মধ্যে যদি দেখতে পেয়েছেন কোন মিথ্যা, তবে সেইখানে তিনি বিদ্রোহের পতাকা তুলেছেন সেই প্রথা ও নজিরকে চুরমার করে ভেঙে দিতে। যে কাজকে নৈতিক আদর্শের দিক দিয়ে সমর্থন করা যায় না, তিনি তার বিরোধিতা করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। আশ্চর্য্যের কথা যে, এই চির বিদ্রোহী গান্ধী অপর এক জন বিদ্রোহী কার্ল মার্ক্সের মত নন—তাঁদের মধ্যে ঐক্যসূত্র যেমন আছে, তেমনি আছে পর্ব্বতপ্রমাণ ব্যবধান। বিপ্লবী গান্ধী মূলতঃ ধার্ম্মিক। ধর্ম্ম বা ঈশ্বরকে বর্জ্জন করে, বা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্বকে লঘু করে তিনি কোন বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের কথা চিন্তা করতে পারতেন না। তাঁর সমস্ত জীবনে সমস্ত কর্ম্মে ঈশ্বরের প্রভাব সদা বিদ্যমান। তিনি ধর্ম্মগতপ্রাণ, কিন্তু তাঁর মনে কোনরূপ dogma বা গোঁড়ামির ভাব ছিল না। তিনি কোন প্রকার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী বা সীমাবদ্ধ সাম্প্রদায়িক ভাব দ্বারা পরিচালিত হন নি। তিনি পাপের সঙ্গে কোন আপোষ করেন নি। কিন্তু পাপীকে সর্ব্বদাই ক্ষমা করেছেন। তিনি চরম আধুনিক, আবার সত্যের দ্বারা পরীক্ষিত আদর্শকে 'অতীত' বলে বর্জ্জন করেন নি। এই দিক দিয়ে তিনি চরম রক্ষণশীল। ধ্বংস তিনি করেছেন অনেক, আবার সৃষ্টিও করেছেন অনেক। একটা বিরাট দেশের বিপুল

সংখ্যক মানুষকে তিনি নূতন শক্তির প্রেরণা দিয়ে একটা জাগ্রত জাতিতে পরিণত করলেন। বস্তুতঃ আজকের নবভারত তাঁরই সৃষ্টি। অবশ্য এই সৃষ্টির কাজে তাঁকে সাহায্য করেছেন আরও অনেকে, অতীতে ও বর্ত্তমানে।

গান্ধীজীর প্রবর্ত্তিত প্রত্যেকটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্ম্মধারার পটভূমিকায় ছিল নৈতিক আবেদন। তিনি যখন বুঝালেন যে দাসত্ব একটা মস্তবড় পাপ, তখন তিনি দাসত্বের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কুফলের উপর জোর দেন নি। তিনি কেবল এই কথাই বলেছেন যে, 'তুমি ততক্ষণ দাস, যতক্ষণ তুমি স্বেচ্ছায় দাসত্ব স্বীকার করে লও। যদি তুমি দাসত্ব স্বীকার না কর, বুক ফুলিয়ে ঘোষণা কর যে, কারুর দাসত্ব মানি না তা হলেই তুমি স্বাধীন। তোমার মনের যদি এমনি জোর থাকে, তবে কেমন করে অপর পক্ষ, সে যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তোমাকে দাস করে রাখতে পারবে?" তাই তিনি বলেছেন:

"I will simply refuse to do the master's bidding. He may torture me, may break my bones to atoms, and even kill me. He will then have my dead body and not my obedience, ultimately, therefore, it is I who am the victor and not he. He has failed in getting me to do what he wanted."

এমন দুর্জ্জয় ঘোষণা বলদর্পী নেপোলিয়ন বা হানিবলের মুখ থেকেও বের হয় নি। পৃথিবীতে কয়জন মানুষ এমন মনের জোর দেখাতে পেরেছেন? গান্ধীর মত দুর্জ্জয় সাহসী বীর আর কি কোথাও আছে? ইতিহাসে অনেক বীরের সন্ধান পাওয়া যায়—তাঁরা যুদ্ধ করেছেন, নররুধিরে ধরিত্রী-বক্ষ প্লাবিত করেছেন। কিন্তু তাঁদের আর গান্ধীর মধ্যে কত পার্থক্য। গান্ধীজীর মতে যে অন্তরে বিদ্রোহী তার হৃদয় শক্ত হওয়া চাই। তাঁর মতে একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় মনের প্রভূত জোরে স্বেচ্ছাচারী শক্তির নিকট মাথা নত করব না এ কথাটা বলার মত এবং সেজন্য মৃত্যুবরণ করার মত অধিকতর সাহসিকতার কাজ আর নাই। কিন্তু এই প্রকার মনের জোরে মানুষ যখন বিদ্রোহী হবে, তখন তার মনে থাকবে না কোন হিংসার ভাব, থাকবে না কোন অনিষ্ট করবার কামনা, বরং তখন তার এই বিশ্বাস থাকবে যে সকল অবস্থার মধ্যে কেবল বেঁচে থাকবে তার অমর আত্মা আর কিছু বেঁচে থাকবে না—তার দরকারও নাই। গান্ধীজী নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে এই বিশ্বাস কেউ কাউকে দিতে পারে না, এই বিশ্বাস আসে ঈশ্বরভক্তের অন্তর থেকে। যে মানুষের অন্তরে বিশ্বাস ও দৃঢ়তা আছে তার হতাশ হবার কিছু নাই।

গান্ধীজী ছিলেন আদর্শ সত্যাগ্রহী। বিপ্লবীমন না হলে কারুর পক্ষে সত্যাগ্রহী হওয়া সম্ভব নয়। গান্ধীজীর আদর্শ অনুসারে সত্যাগ্রহীকে সর্ব্বপ্রকার ভয়ভীতি দূর করতে হবে। সত্যাগ্রহীর ভয় নাই, ভীতি নাই, তার বিশ্বাসের অভাব নাই, এমনকি সে প্রতিপক্ষকে বিশ্বাস করতে ভয় পায় না। গান্ধীজী যেদিন নোয়াখালি অভিযানে গেলেন, সেদিন বুঝা গেল যে কথা ও কাজ তাঁর কাছে দুইই সমান। সেদিন তিনি যে ঘোষণা করেছিলেন তা আজিও কানের মধ্যে প্রবেশ করে অন্তরকে নাড়া দিচ্ছে। তাঁর সেই উক্তি ইতিহাসের একটি যুগান্তকারী ঘোষণা:

"আমি আজ যে সত্যাগ্রহ করতে যাচ্ছি, তার রূপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আজ সরকারের কোন অবিচারের প্রতিকার করার উদ্দেশ্যে আমার এ অভিযান নয়। আজ কারুর বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই। আজ আমি পরীক্ষা করে দেখব জীবনব্যাপী যে অহিংসার সাধনা করে এসেছি সেই অহিংসার দ্বারা আজ মানুষের মনের অমানুষিকতা দূর করতে পারি কিনা। মানুষে মানুষে যে হানাহানি, যে হিংসাবিদ্বেষ, একজন মানুষ অপরকে যে ভয় করে ঘৃণা করে—সেই মনের বিকার মানুষের মন থেকে দূর করতে আমার অহিংসা কতটা কার্য্যকরী আজ জীবনসায়াহ্নে সেইটাই যাচাই করে দেখতে চাই। একাজ অনেক লোক মিলে করা চলে না। আমাকে একাই এই পরীক্ষা করতে হবে। তাই আজ আমি একা চলেছি। আজ আমার কোন অনুচরের ও সঙ্গীর দরকার নাই। কেবলমাত্র ঈশ্বরের দেওয়া শক্তির উপরই আমাকে আজ নির্ভর করতে হবে। তাই আজ আমি জনগণের ভিতর অগ্রসর হতে চললাম। হিংসাবিদ্বেষবিমুক্ত অন্তর নিয়ে আজ আমাকে যেতে হবে। আমার অন্তরে কোন কলুষ যদি থাকে, তবে আমার এ সাধনা ব্যর্থ হবে। তাই আজ আমি দীন ভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমার মন থেকে সকল কালিমা দূর করে দেন। আমার আত্মার মধ্যে তিনি যেন শক্তিদান করেন। এই হ'ল আমার তীর্থযাত্রা। সকল সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে সর্ব্বস্ব দান করতে দীনভাবে নগ্নপদে তীর্থস্থানের দিকে অগ্রসর হওয়াই ভারতের তীর্থযাত্রার আদর্শ। তাই আমি নগ্নপদে চলেছি আমার তীর্থ পরিক্রমায়।"

এইখানে বীর গান্ধীর বীরত্বের সত্যকার পরিচয়। তাঁর বীর পদভরে পৃথিবী কেঁপে যায়—তাঁর একটা বাণী সারাবিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এত যাঁর ক্ষমতা, এত যাঁর তেজ, তিনি আচরণে ব্যবহারে কি নম্র, কি ধীর, কি শান্ত। বস্তুতঃ গান্ধীজী এ যুগের একটা মিরাকল। মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সমানভাবে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। বড় বড় বীরকে দেখেছি মৃত্যুর সময় মনের স্থিরতা রাখতে পারেন নি। নেপোলিয়ন, সিজার, হানিবল, আলেকজাণ্ডার এঁরা দিগ্বিজয়ী বীর। কিন্তু এঁদের শেষজীবন ব্যর্থতায় ভরা। [illegible] গান্ধীজী শেষ দিনেও দেখিয়ে গিয়েছেন যে তিনি [illegible] বীর। ঘাতকের প্রতি তাঁর কোন অভিশাপ নাই—সারাজীবন তিনি পাপীকে ক্ষমা করে গেছেন মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্তেও তিনি ক্ষমাসুন্দর হাসি দিয়ে তাঁর ঘাতককেও ক্ষমা করে গেছেন। মৃত্যুর সেই শেষ মুহূর্ত্তটি আমাদের নিকট যতই মর্ম্মান্তিক হোক, যতই

বেদনাদায়ক হোক—গান্ধীজীর নিকট সেই মুহূর্ত্তটি অত্যন্ত গর্ব্বের, অত্যন্ত গৌরবের। জীবনের কাজ সমাপ্ত করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন করে উপযুক্ত হস্তে সেই স্বাধীন ভারতের পরিচালনার ভার সমর্পণ করে তিনি good life এবং good death একই সঙ্গে অর্জ্জন করবার সুযোগ পেয়েছেন। এ সুযোগ খুব কম মহাপুরুষই পেয়ে থাকেন। আজীবন যারা তাঁকে শত্রু বলে জানত, তারাও সেদিন বুঝল কত বড় অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন তিনি তাদের। গান্ধীজীর মৃত্যুর দিন আমাদের প্রায়শ্চিত্তের দিন। আত্মানুসন্ধান করে দেখতে হবে কোথায় আমাদের ত্রুটি। তা যদি করতে পারি তবে আমাদের গান্ধীবন্দনা সার্থক হবে।

সার উইলিয়ম র‍্যামসে

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

মানুষের জীবনে কখনও কখনও এমন কতকগুলো মুহূর্ত্ত আসে যার প্রতিক্রিয়া তার জীবনের ধারাকে দেয় একদম বদলে—তার জীবনের গতিপথ সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চালিত হয়ে গৌরবের চরমশিখরে পৌঁছায়; অথচ যে ভিন্ন পথে তার সাফল্য আসে তা হয়ত কিছুদিন আগেও তার নিজের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত! তা না হলে উইলিয়ম র‍্যামসে যিনি ছিলেন স্বভাবকবি, পিয়ানোবাদক এবং পেন্সিল স্কেচে সিদ্ধহস্ত, তিনি কিনা একদিন বিশ্ববিখ্যাত রসায়নবিদ হিসেবে সুখ্যাতি অর্জ্জন করতে পারেন! রসায়নশাস্ত্রে যে পর্য্যায় তালিকার (Periodic Table) প্রচলন আছে তার একটি গ্রুপের সবকয়টি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করা যে একই ব্যক্তির জীবনে সম্ভব তা একমাত্র র‍্যামসের জীবনেই সম্ভব হয়েছে, আর এটা বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়!

উইলিয়ম র‍্যামসে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৫২ সনের ২রা অক্টোবর গ্লাসগো শহরে। র‍্যামসের পিতার ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা কিঞ্চিৎ জানতেন। র‍্যামসের কাকা ছিলেন এক জন নামকরা ভূতত্ত্ববিদ। গ্লাসগো একাডেমিতে র‍্যামসের শিক্ষার হাতেখড়ি হয়। এখানকার পড়া শেষ করে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তিন বছর পড়াশুনা করেন। যখন তার বয়স ষোল বছরের সামান্য উপরে তখন তিনি নানা ভাষা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। এ সময় সামান্য গণিত-শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু বিজ্ঞান বিষয়ের নামগন্ধও ছিল না। তবে ফরাসী এবং জার্ম্মান ভাষায় তিনি যে জ্ঞান এ সময় লাভ করেছিলেন তা তাঁর পরবর্ত্তী জীবনে অনেক কাজে লেগেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া ছেড়ে হঠাৎ তাঁর রসায়নবিদ হওয়ার ইচ্ছা মনে জাগে। নিজের বাড়ীতেই তিনি ছোট [illegible] সাদাসিধা পরীক্ষাকার্য্য করে রসায়নশাস্ত্রে জ্ঞান অর্জ্জন [illegible] করতে থাকেন। ১৮৬৯ সনে গ্লাসগো শহরের একটি রাসায়নিক গবেষণাগারে তিনি ভর্ত্তি হন এবং বছর দেড়েক কাজ শিখে তিনি রাসায়নিক বিশ্লেষণকার্য্যে দক্ষতা লাভ করেন। তারপর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নবিদ্যার ক্লাসে হাজিরা দিতে থাকেন। পরে উচ্চতর শিক্ষালাভের নিমিত্ত তিনি জার্ম্মানীর হাইডেলবুর্গ যাওয়া ঠিক করলেন, কিন্তু হঠাৎ ফরাসী-জার্ম্মান যুদ্ধ লেগে যাওয়ায় তার যাত্রা স্থগিত হ'ল। বাধ্য হয়ে তিনি কাজ নিলেন সার উইলিয়ম টমসনের পরীক্ষাগারে। ফরাসী-জার্ম্মান যুদ্ধ শেষ হলে ১৮৭১ সনে র‍্যামসে জার্ম্মানীর টিউবিংসেনে অধ্যাপক ফিটিগের অধীনে কাজ করবার জন্যে চলে যান। জার্ম্মানীতে পড়াশুনা করবার সময় তিনি দক্ষিণ-জার্ম্মানীর নানা স্থানে, সুইজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন। অধ্যাপক ফিটিগের অধীনে তিনি নাইট্রোসেলুলোজ নিয়ে কাজ করেছেন।

টিউবিংসেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টরেট' উপাধি লাভ করে র‍্যামসে গ্লাসগোর এণ্ডারসন কলেজে রসায়নের অধ্যাপকের সহকারীরূপে কাজ নেন। দু'বছর পর তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্য্য গ্রহণ করেন। এখানে ডাক্তারী শিক্ষারত দু'শ ছাত্রের ক্লাস নিতে হ'ত র‍্যামসেকে। কাজটা যদিও বেশ খানিকটা বিরক্তিকর, কিন্তু র‍্যামসের চরিত্রে এমন একটা গুণ ছিল যে, তিনি যে কোন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারতেন এবং তার ভিতর থেকে যেটুকু শান্তি আহরণ করা সম্ভব তা গ্রহণ করতে জানতেন। এখানে অবসর সময়ে তিনি 'পিরিডিন থেকে কার্বকিসলিক এসিড তৈরী করা এবং বেনজিন কার্বকিসলিক এসিডের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক' তাই নিয়ে বহু গবেষণা করেছেন। কুইনিন এলকালয়েড সম্বন্ধেও তিনি গবেষণা করেছেন।

এ সময় বেলফাষ্টে জে. বি. হ্যানয় নামে এক বৈজ্ঞানিক অতি নিখুঁত কতকগুলো পরীক্ষাকার্য্য করে প্রমাণ করেন যে, 'পদার্থের তরল এবং বায়বীয় অবস্থার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা বিদ্যমান থাকে এবং অবস্থান্তর ঘটবার সময় একটা বিশেষ উত্তাপ ও চাপের সৃষ্টি হয় যাকে বলা হয় 'ক্রিটিকাল' উত্তাপ ও চাপ। র‍্যামসে হ্যানয়ের তত্ত্ব মেনে নিলেন না, ফলে এঁদের মধ্যে কিঞ্চিৎ বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্য্যন্ত যদিও র‍্যামসে হেরে গেলেন, কিন্তু এ বাদানুবাদ চালাতে গিয়ে র‍্যামসে হ্যানয়ের নিকট থেকে

এমন কতগুলো জিনিস শিখলেন যাতে তার ভবিষ্যৎ জীবনের গোড়াপত্তন হয়েছিল।

১৮৮০ সন। র‍্যামসের বয়স তখন আটাশ বছর। এ সময় তিনি ব্রিষ্টল কলেজে (পরে বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যাপক পদ লাভ করেন। পর বছর কলেজের অধ্যক্ষ এলফ্রেড মার্শালের অবসর গ্রহণের পর তিনি অধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত হন। এ সময় তিনি বিবাহ করেন। কলেজের অধ্যক্ষ পদে থাকাকালে তিনি কলেজের উন্নতির জন্যে নানা ভাবে চেষ্টা করেছেন। ১৮৮২ সনে রসায়নবিভাগে তাঁর সহকারীরূপে নিযুক্ত হন সিডনি ইয়ং। এ সময়ে র‍্যামসে কাজ করছিলেন স্ফুটনাঙ্কে ইথার এবং বেনজিন বাষ্পের আয়তন নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে। সিডনি ইয়ং কাজে যোগ দিয়ে এ বিষয় নিয়েই গবেষণাকার্য্য চালান এবং এঁরা উভয়ে মিলে অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

তখন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে ছিলেন উইলিয়মসন। কিন্তু তিনি রসায়নের গবেষণা ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিতে মেতে উঠেছিলেন। সুতরাং ১৮৮৭ সনে র‍্যামসে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়ে কাজে যোগ দিলেন। তিনি দেখলেন, এখানে গবেষণার বিশেষ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও গবেষণার কাজ কিছু হচ্ছে না, যন্ত্রপাতি যা রয়েছে তা সব পুরনো ধরণের। র‍্যামসে সবকিছু ঢেলে সাজবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন।

১৮৯০ সনে লীডস শহরে 'ব্রিটিশ এসোশিয়েসন ফর দি এড্‌ভান্সমেণ্ট অব সায়েন্সে'র যে সভা হয়েছিল সেখানে আরহেনিয়াস আবিষ্কৃত 'থিওরী অফ আয়নিক ডিসোসিয়েসন'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে আর্মষ্ট্রং এবং কতিপয় নামকরা রসায়নবিদের সঙ্গে র‍্যামসের মতদ্বৈধ হয়। র‍্যামসে এবং তাঁর সহকর্মীরা যদিও এ সম্বন্ধে কোন পরীক্ষাকার্য্য করেন নি, কিন্তু তিনি অষ্টওয়াল্ডের সঙ্গে পত্রালাপে সে বিষয়ে বহু আলোচনা করেছেন। এমনিভাবে ১৮৯৪ সনের মধ্যেই রাসায়নিক মহলে র‍্যামসের নাম বিশেষ পরিচিত হয়েছিল।

ইতিমধ্যে সমগ্র ইউরোপের বহু মনীষীর সঙ্গে তিনি পরিচিত হন; তা ছাড়া দু'বার আমেরিকা ভ্রমণ করে সেখানেও বেশ নাম করেন।

র‍্যামসের জীবনের চমকপ্রদ অধ্যায়ের সুরু এর পর থেকেই। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ৯২টি মৌলিক পদার্থ বিদ্যমান, যার ভেতরে নানা রকম রাসায়নিক সংযোগে জগতের সবকিছুরই সৃষ্টি। মৌলিক পদার্থগুলি যদি পরমাণবিক ভর অনুসারে পর পর একখানা ছককাটা কাগজে সাজান হয় তবে দেখা যাবে যে, এদের গুণ এবং ধর্ম্মের মধ্যে বেশ একটা সঙ্গতি আছে। একে বলা হয় পর্য্যায়সূত্র বা Periodic Law। Periodic table বা সারণির শূন্য গ্রুপে রয়েছে হিলিয়ম, নিয়ন, আরগন প্রভৃতি কয়েকটি নিষ্ক্রিয় গ্যাসীয় মৌলিক পদার্থ। এ সবক'টিই আবিষ্কার করেছেন র‍্যামসে। সে ইতিহাস বিস্ময়কর!

১৭৮৫ সনে হেনরী কেভেণ্ডিস লক্ষ্য করেন যে, যদি বায়ুর মধ্যে অক্সিজেন মিশিয়ে তার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ চালনা করা যায়, তবে নাইট্রোজেন গ্যাসের অক্সাইড তৈরি হবে। এই অক্সাইডের সঙ্গে পটাস দ্রবণ রাখলে পটাসিয়াম নাইট্রেট তৈরি হবে। এরপর উপরোক্ত মিশ্রিত বায়ুর মধ্য থেকে বাকী অক্সিজেনটুকু সরিয়ে নিলে তিনি পেলেন সামান্য একটু গ্যাস যা তখনকার দিনে জানা গ্যাসের কোনটির সঙ্গে মেলে না। এ ঘটনাটা প্রায় এক শ' বছর বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি।

১৮৯২ সনে লর্ড র‍্যালে পরীক্ষায় প্রমাণ করলেন যে, বায়ু হতে প্রাপ্ত নাইট্রোজেন অপেক্ষা রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত নাইট্রোজেন সামান্য হালকা হয়ে থাকে। তিনি ভাবলেন, এর কারণ হ'ল বায়ুমণ্ডল থেকে তৈরি নাইট্রোজেনে অন্য আর একটি হালকা গ্যাসের অবস্থিতি। কিন্তু র‍্যামসে ভাবলেন এর উল্টো। তিনি বললেন, বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনের মধ্যে একটা ভারী গ্যাসের জন্যেই এ ব্যাপারটা ঘটছে। এ বিষয়ের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্যে র‍্যামসে তার একজন সহকর্ম্মীকে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু কলেজের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হলে তিনি নিজেই এ বিষয়ে পরীক্ষাকার্য্য করতে লেগে গেলেন। অনেক পরীক্ষাকার্য্য করে তিনি একটি অজানা গ্যাস তৈরি করে তার খানিকটা ক্রুকস সাহেবের নিকট পাঠালেন বর্ণালী বিশ্লেষণের নিমিত্ত। ক্রুকস পরীক্ষার পর জানালেন যে, এ গ্যাসটির বর্ণালী কোন জ্ঞাত গ্যাসের সঙ্গে মেলে না। এর পর র‍্যামসে এবং লর্ড র‍্যালে উভয়ে মিলে বহু পরীক্ষাকার্য্য করে আরগন গ্যাসটি আবিষ্কার করতে সমর্থ হলেন। ১৮৯৫ সনের ৩১শে জানুয়ারী রয়াল সোসাইটির এক অধিবেশনে আরগন গ্যাসের পূর্ণ বিবরণী পাঠ করা হ'ল। আরগনের পরমাণবিক ভর নির্দ্ধারিত হ'ল ৩৯.৯ এবং পরীক্ষায় প্রমাণিত হ'ল যে, এ গ্যাসটি সম্পূর্ণভাবেই নিষ্ক্রিয়। এর কিছুদিন পরই র‍্যামসে আর একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস আবিষ্কার করতে সমর্থ হলেন। এটি হ'ল হিলিয়াম যার পরমাণবিক ভর হ'ল ৪।

এর দু'বছর পর ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের রসায়নশাখার সভাপতি-রূপে র‍্যামসে 'একটি অনাবিষ্কৃত গ্যাস' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন, পর্য্যায় সারণিতে হিলিয়াম এবং আরগনের মধ্যবর্তী স্থানে আর একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের অবস্থিতি খুবই সম্ভব। এর পরমাণবিক ভর হওয়া উচিত ২০। কিন্তু এর অন্বেষণকার্য্য খড়ের গাদার মধ্যে একটি সূচ খোঁজ করবারই সামিল।

র‍্যামসে মরিস ট্রাভারসের সহযোগিতায় পরীক্ষাকার্য্য চালাতে লাগলেন। ১৮৯৮ সনে এরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, বায়ুমণ্ডলে শুধু আরগনই পাওয়া যায় না, এখানে রয়েছে আরও চারটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস। এমনি ভাবে আবিষ্কৃত হ'ল ক্রিপটন এবং জেনন। ১৯০০ সনে র‍্যামসে আবিষ্কার করলেন নিয়ন। পরীক্ষায় প্রমাণিত হ'ল যে, নিয়নের পরমাণবিক ভর ২০, যা র‍্যামসে বহু পূর্ব্বেই বলেছিলেন।
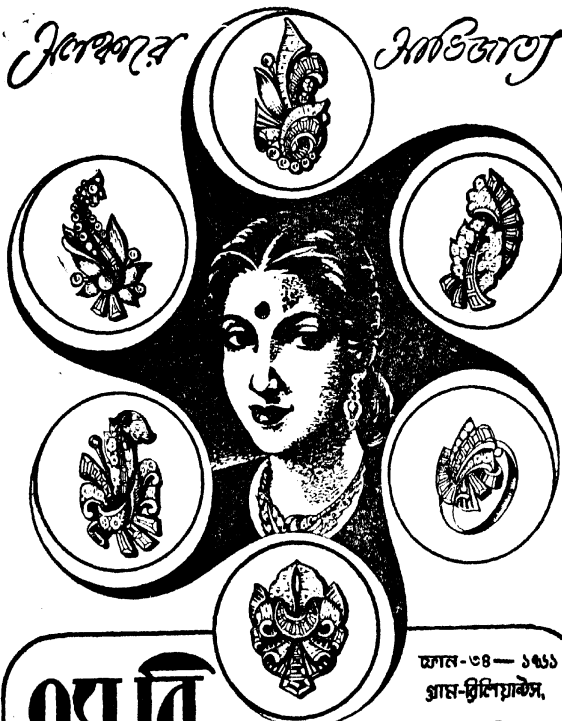
লর্ড রাদারফোর্ড অনেক দিন আগেই লক্ষ্য করেছিলেন যে, থোরিয়ামের মধ্যে 'রেডিও-একটিভ' পরিবর্ত্তনের ফলে একটি গ্যাসের সৃষ্টি হয় যা সম্ভবতঃ নিষ্ক্রিয়। পরে রাদারফোর্ড এবং সোডি লক্ষ্য করলেন, রেডিয়াম ধাতু থেকেও এ জাতীয় একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস পাওয়া যায়, এর নাম দেওয়া হ'ল 'রেডন'। সোডি মনট্রিল থেকে র‍্যামসের নিকট গবেষণা করবার জন্যে চলে এলেন। এঁরা উভয়ে বহু গবেষণার পর ১৯০৯ সনে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করলেন যে, রেডন নিষ্ক্রিয় গ্যাসেরই একটি এবং সেটি রেডিও-একটিভ পরিবর্ত্তনের ফলে সৃষ্টি হয়।

নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি আবিষ্কারের জন্যে র‍্যামসের নাম পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ল এবং বহুস্থান থেকে বহু সম্মান, বহু উপাধি তাঁর উপর বর্ষিত হতে লাগল। ১৯০২ সনে তিনি 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন এবং ১৯০৪ সনে রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এ বছর পদার্থ বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন লর্ড র‍্যালে। ১৮৯৫ সনে রয়াল সোসাইটি র‍্যামসেকে তাঁদের ডেভি মেডেল দিয়ে সম্মানিত করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বাঙ্গালোরে যে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্স রয়েছে তার পরিকল্পনার মূলে ছিলেন র‍্যামসে। তৎকালীন ভারত সরকারের অনুরোধে তিনি এ কাজ করেছিলেন।

১৯১৬ সনের ২৩শে জুলাই সার উইলিয়াম র‍্যামসে দেহত্যাগ করেন।

সিংহলের শিল্প ও সভ্যতা—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

কলম্বোর আনন্দকলেজে চিত্রবিদ্যার ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত মহাশয় সিংহল সম্পর্কে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের ফল কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রবন্ধাকারে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধগুলি আলোচ্য পুস্তিকায় সংকলিত হইয়াছে। ইহাতে সিংহলের শিল্প ও সভ্যতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এক স্থানে পাইয়া বাঙালী পাঠক উপকৃত হইবেন—সিংহলের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের বিবরণ পড়িয়া আনন্দিত হইবেন। বৌদ্ধধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া সিংহলের শিল্প ও সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। তাই এই পুস্তিকার প্রথম প্রবন্ধে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। পরবর্তী প্রবন্ধগুলিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা করা হইয়াছে। সিংহলের শিল্পের ইতিহাস, স্থাপত্য ভাস্কর্য্য ও চিত্র-শিল্পের নিদর্শন, রাষ্ট্র ও শিল্পের পারস্পরিক সম্পর্ক, সংগীত ও সাহিত্য, সিংহলীদের রীতিনীতি আচার-ব্যবহার সাজ-পোশাক, ব্যবসায়-বাণিজ্য ধর্ম্মোৎসব প্রভৃতি। বইখানি পড়িয়া এই সব বিষয়ে আরও খবর জানিবার আগ্রহ হয়। অবশ্য বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করিয়া প্রতিবেশী দেশসমূহের, সুসংবদ্ধ স্বল্পতম বিবরণও বাংলা-সাহিত্যে সুলভ নহে। এরূপ বিবরণ সংকলন ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা দরকার। এই প্রসঙ্গে ভারতের প্রদেশগুলির কথাও স্মরণ করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে এক প্রদেশের লোকের সম্বন্ধে আর এক প্রদেশের লোকের অজ্ঞতা বিস্ময়কর ও লজ্জাজনক।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

স্বদেশী বৌ—শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। বিশ্ববাণী পাবলিশার্স, ৬, মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা-৭। মূল্য আড়াই টাকা।

গল্প-সংগ্রহ। শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তের কোন গল্পের বই ইতিপূর্ব্বে চোখে পড়ে নাই, সে হিসাবে কথা-সাহিত্য জগতে তিনি নবাগতই। কিন্তু ভাষার সাবলীল গতি দেখিলে মনে হয় তিনি নূতন সাহিত্যব্রতী নহেন—বহু পূর্ব্বেই বঙ্গবাণীর সাধনা আরম্ভ করিয়াছেন। বারোটি ছোট গল্প এই সংগ্রহে আছে—সেগুলি ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তথাপি বেশীর ভাগ গল্পে একটি অভাব পরিলক্ষিত হইল। অত্যন্ত সহজভাবে গল্প আরম্ভ হইয়াছে—খানিকটা বেশ সাবলীল গতিতে অগ্রসরও হইয়াছে, কিন্তু পাঠকের প্রত্যাশাকে ক্ষুণ্ন করিয়া সেগুলি যেন মাঝ পথেই থামিয়া গিয়াছে। গল্প পড়িয়া কিছু পাইলাম—এই আনন্দানুভূতি জাগে নাই বলিয়া গল্পগুলি মনের মধ্যে ঠাঁই করিয়া লইতে পারে নাই। কিন্তু ছোট গল্প রচনার রীতি লেখকের অজ্ঞাত নহে। 'পদধ্বনি' 'স্বদেশী বৌ' 'তাসের ঘর', প্রভৃতি গল্পে মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। অত্যন্ত দরদ দিয়া লেখক দেশভক্ত ত্যাগী ছেলেমেয়ের ছবি আঁকিয়াছেন।

পারাবত—শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

গল্প-সংগ্রহ। পারাবত, স্বয়ম্বরা, মিলনান্ত, জোড়বিজোড়, পাখির বাসা, পনেরো টাকার বৌ ও কাণাকড়ি প্রভৃতি সাতটি গল্প এই সংগ্রহে আছে। 'পারাবত' ও 'স্বয়ম্বরা' গল্প দুটিতে বিদেশী প্রভাব আছে—একথা লেখক স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সে প্রভাব সামান্যই। লেখকের স্বীকৃতি সত্ত্বেও পরিবেশ এবং চরিত্রসৃষ্টিতে 'স্বয়ম্বরা' গল্পটিতে বিদেশী গন্ধ পাওয়া যায় না। 'মিলনান্ত' ও 'জোড়বিজোড়' ফিরিঙ্গী সমাজের চিত্র। দুটি গল্পের ঘটনা-সংস্থানে অর্থাৎ বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানোর কৌশল-সৃষ্টিতে খানিকটা মিল আছে, তবু রসবিস্তারে এ দুটির জাত আলাদা। 'মিলনান্ত' গল্পে ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজ এবং 'জকি' জীবনের বেদনা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপটি চমৎকার ফুটিয়াছে। পঙ্গু ও পতিত দুটি সত্তার নিবিড় যোগসাধন গল্পটিকে সার্থক রস-সৃষ্টিতে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে। আলোচ্য গল্প-সংগ্রহে এই গল্পটির বিশিষ্ট, একটি মূল্য আছে। 'কাণাকড়ি' গল্পেও বেকার নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের একটি ছবি পাওয়া যায়। অভাবের তাড়নায় একটি ভীরু গৃহস্থ-বধূ যে দুঃসাহসের কাজ করিয়া বসিল—তাহা ঐ ধরণের মেয়ের পক্ষে অসম্ভবই; কিন্তু একই সঙ্গে দুটি বৃহৎ ভুল ভাঙার বেদনা গল্পটিকে সার্থক করিয়াছে। রস-সৃষ্টিতে সব কয়টি গল্প তুল্যমূল্য না হইলেও প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে প্রত্যেকটি গল্প সমুজ্জ্বল।

অনল-শিখা—শ্রীআদিত্যশঙ্কর। সেনগুপ্ত এণ্ড কোং। ৩/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

নাতিদীর্ঘ ভূমিকায় লেখক নায়ক-চরিত্র সম্বন্ধে কিছু আলোচনা
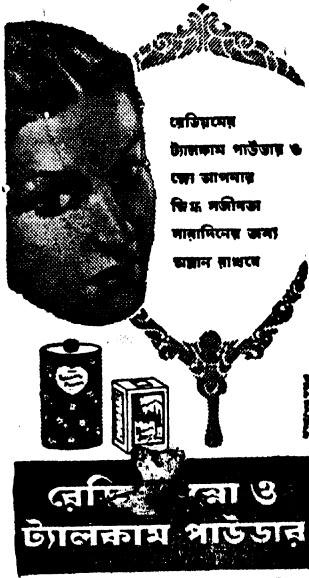
ময়লার বীজাণু থেকে প্রতিদিনই ছেলে-মেয়েদের অসুখের সম্ভাবনা আছে
লাইফবয় মাখিয়ে এই সব বীজাণু ধুয়ে ফেলে প্রতিদিন তাদের রক্ষা করুন
লাইফবয়ের "রক্ষাকারী ফেনা" ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখে
লাইফবয় সাবান
প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে আপনাকে রক্ষা করে
LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY SOAP
L. 249-X52 BG
ভারতে প্রস্তুত
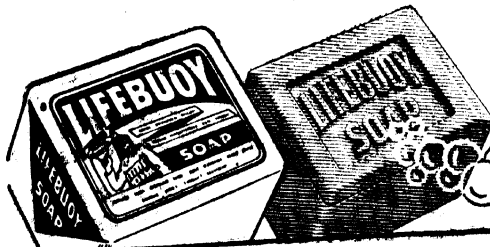
করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে যাহা অসুন্দর, যাহাতে অসংযমের প্রকাশ, চরিত্রের বিকৃতি বা উচ্ছৃঙ্খলতা সেই সব কিছুর অন্তরালে রহিয়াছে ঘটনার প্রবাহ। এই সকল সাধারণ মানুষের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় বলিয়াই বাহ্যিক আচার-আচরণে মানুষের দুর্নীতিটাই চোখে পড়ে এবং বিচারও চলে সেই মাপকাঠিতে। এই গল্পের নায়ক অনলের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের মধ্যে তেমনই অন্তঃপ্রবাহী ঘটনার ধারা বিদ্যমান। সেই ধারার সূত্রটি লেখক যদি গল্পের মাধ্যমে ধরাইয়া দিতে পারিতেন তাহা হইলে কাহিনীটি নিঃসন্দেহে উপভোগ্য হইত। চরিত্রচিত্রণের সবচেয়ে বড় অন্তরায় চরিত্র সম্বন্ধে লেখকের সুদীর্ঘ মন্তব্য। তাহাই গল্পটিকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে। লেখা সাবলীল হওয়া সত্ত্বেও গল্পটি এই কারণে আশানুরূপ জমে নাই।

চণ্ডীমঙ্গলের গল্প—কালকেতু—শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী। কলিকাতা। মূল্য চৌদ্দ আনা।

মঙ্গলকাব্যের কালকেতু-ফুল্লরার উপাখ্যান প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহার গল্পাংশ খুবই চিত্তাকর্ষক, এবং সেকালের বাঙালী জীবনের পরিচয়ও ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। লেখক সেই পুরাতন কাহিনীকে কিশোরদের উপযোগী সরল ও সহজবোধ্য করিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। মাঝে মাঝে মূলগ্রন্থ হইতে দু'এক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া কবিকঙ্কণের রচনা-মাধুর্য্যের পরিচয়ও দিয়াছেন। লেখায় এবং রেখায় গল্পটি মনোরম।

যাত্রা হ'ল শুরু—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সরস্বতী সাহিত্য-মন্দির, সোনারপুর, আর-এস, চব্বিশ পরগণা। মূল্য ছয় আনা।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখকের মধ্যে শুধু এক যাযাবর মানুষই বাস করেন না, এক কৌতূহলী ভক্তিমান এবং ভারতীয় সংস্কৃতিতে আস্থাবান মানুষও আছেন। তাঁহার লেখা পড়িয়া ইহাই মনে হয় গৃহের আরাম আয়াস ও সংসারের সুখদুঃখকে তুচ্ছ করিবার কৌশল তিনি জানেন। যখনই সুযোগ ঘটে এবং সুযোগ না ঘটিলেও, অবসর সৃষ্টি করিয়া তিনি ভারতবর্ষ-পরিক্রমায় বাহির হইয়া পড়েন। একটি তীর্থে একবার নয়—বহুবার গিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হয় না। মোট কথা, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ইতিহাস মিলাইয়া ভারতবর্ষের যেখানে যতকিছু দুরূহ দুর্গম দ্রষ্টব্য স্থান আছে, সবগুলির সন্ধান তিনি করিয়াছেন এবং ক্লেশ-বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া সেগুলি ঘুরিয়া আসিয়াছেন। সেই অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ প্রথম কিস্তিতে তিনি কেদার-বদরী ভ্রমণ-পথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আলোচ্য পুস্তকখানিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে সাহিত্য-রস পরিবেশনের চেষ্টা নাই, কিন্তু যাত্রীসাধারণকে দুর্গম পথে উত্তীর্ণ করিয়া দিবার সাধু প্রচেষ্টা আছে। ভ্রমণকালে মধ্যবিত্তের সুবিধা-অসুবিধা কোথায়, কেদার-বদরীনাথের পথে কোন্ কোন্ দ্রষ্টব্য তীর্থ পড়ে, পথের দূরত্ব, যানবাহন ও আহার-বাসস্থানের মোটামুটি ব্যয়ের হিসাব প্রভৃতি বহু তথ্য এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে পাওয়া যায়। এই ধরণের ভ্রমণ-নির্দেশনামা বাংলা ভ্রমণ বৃত্তান্ত ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কেদার-বদরীর যাত্রী মাত্রেই এই পুস্তিকাখানি সঙ্গে রাখিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

পূজা মাঙ্গলিক
সব চাইতে আজকের দিনে সকলের অন্তর ছাপিয়ে উঠছে কাউকে কিছু দেওয়ার আনন্দ। সকল দেওয়ার শ্রেষ্ঠ দেওয়া,—শত্রুকে ক্ষমা, প্রতিপক্ষকে সহিষ্ণুতা, বন্ধুকে হৃদয়ের প্রীতি, সন্তানকে সৎদৃষ্টান্ত, পিতাকে শ্রদ্ধা, মাতাকে সন্তানের চরিত্র-গৌরব, নিজেকে সম্মান এবং মানুষ মাত্রকেই ভালবাসা,—আর প্রিয়পরিজনকে পূজার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপহার হিন্দুস্থানের বীমাপত্র।
দানের আনন্দ একান্ত ভাবেই আপনার, আর আপনাকে সেবা করবার আনন্দ আমাদের।
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড।
৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩

তুমি কোথায়—শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। কারেণ্ট বুক সপ, ৫৭এ, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম তিন টাকা।

এখানি উপন্যাস। উপন্যাসের মূল ঘটনাটি প্রদীপ ও গৌরীকে লইয়া। পল্লী-বালক-বালিকা। প্রদীপ বড়লোকের ছেলে, গৌরী গরীবের মেয়ে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে। দুটি কিশোর-কিশোরী যখন বড় হইল তখনই ঘটনায় জট পাকাইয়া উঠিল। বড়লোক বাপ গরীবের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ দিতে রাজী নয়। তার পর কাহিনী নানা বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়া দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। গল্পে পল্লীসমাজেরও পরিচয় পাই। লেখকের লিপিকৌশল আছে। রণজিৎ গল্পের দুঃশীল চরিত্র। গল্পের জট খুলিবার সময় এই দুঃশীলের আকস্মিক হৃদয়-পরিবর্তন স্বাভাবিকতার মাত্রা কতকটা অতিক্রম করিয়াছে। গ্রন্থকার তরুণ। তারুণ্যের ত্রুটি যে তিনি অচিরে কাটাইয়া উঠিবেন তাহা লেখকের লিখিবার ভঙ্গী দেখিয়া বোঝা যায়। মা ও সুদীপ্তা মনের উপর ছাপ রাখে। রচনায় আকর্ষণ আছে। কাহিনী মিলনান্তক বলিয়া পাঠান্তে পাঠকের মনে একটি স্বস্তি ও আনন্দের রেশ রাখিয়া যায়।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

নানা চোখে দেখা চীন—কাহাকে বিশ্বাস করিব ? শ্রীসীতারাম গোয়েল—অনুবাদক শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্তী।

চীন ঘুরে এলাম—শ্রীব্রজকিশোর শাস্ত্রী—অনুবাদক শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র দাশগুপ্ত।

আমি কেন কম্যুনিষ্ট নই ?—শ্রীনিরূপম ভট্টাচার্য্য, শ্রীমৃণাল খাস্তগীর, শ্রীশক্তিপদ ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীরেখা মজুমদার। প্রাপ্তিস্থান ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

প্রথম পুস্তিকায় সদ্য চীনভ্রমণকারী ভারতের কয়েক জন নেতার পরস্পর-বিরোধী মত সঙ্কলিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পুস্তিকা ভারত হিন্দ মজদুর সভার এক জন বিশিষ্ট সদস্যের লেখা—ইহাতে যেমন চীনদেশের সপক্ষে, তেমনি ইহার বিরুদ্ধেও মত প্রকাশ করা হইয়াছে। ঐ দেশের অনেককিছু ত্রুটির উল্লেখ লক্ষণীয়। তৃতীয় পুস্তিকার পরিচয় নামেই পাওয়া যায়, ইহার প্রবন্ধগুলি ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্তৃক লিখিত। বলা বাহুল্য, এই পুস্তিকাগুলি সাম্যবাদী বা কম্যুনিষ্টবিরোধী প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত।

মহাযুদ্ধের একাঙ্ক—শ্রীবাস্তব। প্রাচী প্রকাশন, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৮৪। মূল্য এক টাকা।

নাটকের বিষয়বস্তু উদ্বাস্তু-জীবন। উদ্বাস্তু-শিক্ষক হরিহর ঘোষাল আদর্শ-চরিত্র ব্যক্তি। তাঁহার জীবনাদর্শ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুফলপ্রসূ হইয়াছিল এবং এজন্যই নিতান্ত দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি মনোবল হারান নাই। নিরঞ্জন রায় অসদুপায়ে প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিয়াও সুখী হইতে পারেন নাই। তাঁহার একমাত্র পুত্র পর্য্যন্ত তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বসিল। শেষে সততারই জয়ের সূচনা হইল। এই নাটকে বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারী-দের দ্বারা আচরিত যে দুর্নীতির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহা খুবই বাস্তব সত্য। যুদ্ধোত্তর কালের এই পরিণতি আমাদের জাতীয় জীবনের ঘোর কলঙ্ক, ইহাতে সন্দেহ নাই। কম্যুনিষ্ট চিন্তাধারা কিভাবে নিঃস্বার্থ তরুণ

সম্প্রদায়কে উন্মার্গগামী করিয়া তাহাদের জীবনকে ব্যর্থ করিয়া দেয় তাহার চিত্রও ইহাতে আছে। রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করিতে হইলে নাটকখানিকে আরও মাজিয়া-ঘষিয়া লইতে হইবে।

সোভিয়েট অর্থনীতি বিষয়ে সত্যাসত্য—বিতর্ক—১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২৮। মূল্য দুই আনা।

কম্যুনিষ্ট পার্টির শ্রীঅরুণ বসু এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

শ্রীঅম্লান দত্তের পরস্পরবিরোধী মত ও আলোচনা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। লেখকদ্বয়ের চিঠিগুলি যথাক্রমে স্বাধীনতা, যুগান্তর এবং আনন্দবাজার পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। দত্ত মহাশয় বলিতে চান, সোভিয়েট দেশ যে কেবল সুখ-সমৃদ্ধির নিকেতন নহে এই সংবাদ ঐ দেশ কর্তৃক প্রকাশিত পরিসংখ্যান ও তথ্যাদি হইতে জানা যায়।

গান্ধীজীর দর্শনের বৈশিষ্ট্য বা ভারতীয় সভ্যতার সংক্ষিপ্ত পরিচয়—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত। ২৩, বাগমারী রোড, কলিকাতা-১১। পৃষ্ঠা ৪১। মূল্য ছয় আনা।

গ্রন্থকার মনে করেন, সাম্প্রতিক কালে একমাত্র পঞ্চায়েতী গণতন্ত্রের মহিমা প্রচার ও প্রতিষ্ঠা দ্বারাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ও কম্যুনিজমের আসন্ন সংঘাত প্রতিরোধ করা সম্ভব। এই বিষয়ে জনমত গড়িয়া উঠিলে এবং দার্শনিক আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত নেতৃত্বে জনগণ পরিচালিত হইলে বর্ত্তমান বণিকযুগের অবসান হইবে। আলোচনা-প্রসঙ্গে লেখক সুশিক্ষার উপর খুব জোর দিয়াছেন এবং গান্ধীবাদ ও মার্ক্সবাদের তুলনা করিয়া প্রথমোক্তটির শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়াছেন। লেখক আদর্শবাদী সন্দেহ নাই, তবে বর্ত্তমান সমস্যা ও বাস্তব অবস্থার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আছে। এই পুস্তিকা পাঠকের চিন্তার খোরাক যোগাইবে।

পশ্চিমবঙ্গ ও সাধারণ নির্ব্বাচন—কংগ্রেস ভবন, ৫৯-বি, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-২০। পৃষ্ঠা ২৮২। মূল্য দেড় টাকা।

দ্রুত-ফেনিল সানলাইট

না আছড়ে কাচলেও সাদা ও ঝকঝকে ক'রে দেয়

"শিক্ষয়িত্রী বলেন আমি বেশ ফিটফাট থাকি। তার কারণ মা সানলাইট সাবান দিয়ে আমার ফ্রক ধপধপে সাদা ক'রে কেচে দেন। সানলাইটের স্তূপাকার সরের মত ফেনা শীঘ্র ও সহজেই কাপড়-চোপড় থেকে ময়লা বার করে দেয় — আছড়াতেও হয় না।"

"আমার ক্লাসের মধ্যে আমাকেই সব চেয়ে চমৎকার দেখায়। সানলাইট দিয়ে কাচার জন্য আমার রঙিন ফ্রক কেমন ঝকঝকে থাকে দেখুন। মা বলেন সানলাইট দিয়ে কাচলে কাপড়-চোপড় নষ্ট হয় না আর তা টেঁকেও বেশী দিন। এতে খুব খুসী হবার কথা — নয় কি?"

SUNLIGHT SOAP

S. 219-X52 BG

বিগত সাধারণ নির্বাচনে দলহিসাবে কংগ্রেস বঙ্গীয় বিধান সভা, পরিষদ এবং লোকসভা ও রাজ্য-পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। এই পুস্তকে পশ্চিম বঙ্গে কংগ্রেসীদলের নির্বাচন সম্পর্কীয় যাবতীয় তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অন্যান্য দল হইতে যাঁহারা নির্বাচিত হইয়াছেন তাঁহাদের নাম ইত্যাদিও যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে। নির্বাচন সম্পর্কিত নানা নিয়ম, ঘোষণা, পণ্ডিত জবাহরলালের নিবেদন, নির্দ্দেশ প্রভৃতিও এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মুখ্যতঃ কংগ্রেসকর্ম্মীদের উদ্দেশ্যে লিখিত হইলেও পাঠকসাধারণের নিকটও এই পুস্তক নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য আদৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

প্রিণ্টার্স গাইড—(২য় খণ্ড)—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দে। দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিঃ, ১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫। মূল্য ৬।০।

প্রিণ্টার্স গাইড (১ম খণ্ড) বাজারে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। আশা করা যায়, ইহার দ্বিতীয় খণ্ডও ছাপাখানা-সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞাতব্য ও প্রয়োজনীয় তথ্য এবং তত্ত্বসকল প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচিত হওয়ায়, মুদ্রণ-ব্যবসায়ীদের নিকট আদরণীয় হইবে। ছাপিবার কাগজ ও কাগজ-প্রস্তুত প্রণালী, কাগজ-পরীক্ষার নিয়ম, কাগজ গুদামজাত করিবার প্রণালী, বিভিন্নপ্রকার কাগজের পরিচয়, কাগজ খরচের এষ্টিমেট, ছাপিবার কালি, বিভিন্নপ্রকারের কালি ও কালির গুণাগুণ, কালি প্রস্তুত ও ব্যবহার করিবার প্রণালী, বহুবর্ণ ছবি ছাপিবার সঙ্কেত, রঙীন কালি সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য, ব্লক ও ডাই কি প্রকারে তৈরি হয় এবং কি প্রকারে উহা উৎকৃষ্টভাবে মুদ্রিত হয়, এমবসিং, ষ্টিরিওটাইপিং, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, প্রসেস্ এনগ্রেভিং, মুদ্রাযন্ত্র ও বিভিন্নপ্রকারের মুদ্রাযন্ত্রের পরিচয়, প্রুফ বা হ্যাণ্ড প্রেস, প্ল্যাটেন প্রেস, ওয়ার্ফডেল সিলিণ্ডার মেসিন, টু-রেভলিউশন মেসিন, ষ্টপ সিলিণ্ডার এবং মেসিনের পার্থক্য ও সুবিধা-অসুবিধার বিবরণ, মেক-রেডি ও মেশিন চালন সম্বন্ধীয় সমস্যাসমূহ, হাফটোন ব্লক মেক-রেডি করিবার প্রণালী, রোলারের যত্ন ও ব্যবহারবিধি, মুদ্রণ সম্বন্ধীয় করেকটি কার্য্যকরী সঙ্কেত ও নির্দ্দেশ, এষ্টিমেটিং ও কাষ্টিং প্রণালী—ইত্যাদি ছাপাখানা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় এই গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। যে-সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে, পরিশিষ্টে বিভিন্ন অনুশীলনীতে তৎসম্বন্ধে প্রশ্নমালা এবং পরিশেষে বাংলা ও হিন্দী টাইপের বিভিন্ন অংশাদির চিত্র ও কেস্‌চার্ট দেওয়া হইয়াছে। অনেকগুলি একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্র এবং চার্ট সংযোজিত হওয়ায় পুস্তিকাখানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচিত বিষয়সমূহের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্রটি পুস্তকখানির পাঠকের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইবে। যাহারা প্রেস-সংক্রান্ত ব্যবসায়ে লিপ্ত তাহাদের নিকট এই পুস্তক অতীব প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইবে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল